দশম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৯ হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক

শ্রীরসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দশম বর্ষ—প্রথম খণ্ড]

[আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

[বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী]

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী

বঙ্গশ্রী—বিষয়সূচী

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা]

[অগ্রহায়ণ—১৩৪৯

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

দশম বর্ষ | আষাঢ়—১৩৪৯ | ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা
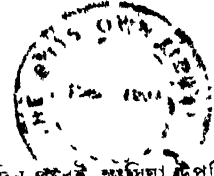
মহাসমর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ

আমাদের বিশ্বাস, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ফলেই এক্ষণে ভারতবাসী আজিকার এই উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছে। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজ্য চিরকাল অটুট ও অক্ষত থাকুক, বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন ভগ্নাংশও কোন দিন বাহিরে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, আমাদের এই কামনাই একান্ত স্বাভাবিক। মানব কল্যাণার্থে প্রকৃতি স্বয়ং যে ইতিহাস বা প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া থাকেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনায় আমাদের সম্যক প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, নিখিল জগতের কল্যাণকল্পে বিশেষ একটি নিখিল জাগতিক প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপই সর্ব্বাধিক প্রয়োজন, এবং এই ক্ষেত্রেও বৃটেনের সহায়তায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হইলেই বৃহত্তম মানব কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহায়তায় প্রকৃতই এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ ঈশ্বরের সম্মতিক্রমেই বৃটিশ সাম্রাজ্য কালক্রমে পৃথিবীর বৃহত্তম উত্তম অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিংশ শতকের প্রারম্ভের কিছুপর হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবম্বিধ পরিব্যাপ্তি ব্যাহত হইয়াছে। তারপর ইহার কিছুদিন পরেই আসিয়া উপস্থিত হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা। কুড়ি বছর পরে, প্রথম যুদ্ধের আঘাত সারিতে না সারিতেই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদক্ষেপ। যুদ্ধ আরও ব্যাপক, আরও রাসায়নিক ও যান্ত্রিক শক্তি সম্পন্ন, আরও ভয়াবহ ও সর্ব্বগ্রাসী।

বর্ত্তমান বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের অদূরদৃষ্টির ফলে কি করিয়া এই বিরাট সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সুরু হইল, কেমন করিয়া উক্ত অপরিণতবুদ্ধি রাষ্ট্রনীতিকগণ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বর্ত্তমানের ভ্রান্ত সভ্যতা, বিজ্ঞান এবং কুশিক্ষার কবলিত মানব সমাজের অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তি দূরীকরণের প্রকৃতি দত্ত নির্দ্দেশ বিস্মৃত হইল সে সমস্তই ইতিপূর্ব্বে আমরা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়াছি। তদুপরি হিটলারের এই দ্বিতীয় সর্ব্বনাশা বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইবার বহুপূর্ব্বে আমরা একথাও বলিয়াছিলাম যে, সর্ব্বমানবের সর্ব্ববিধ কল্যাণকল্পে এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার অভাব, অভিযোগ, অস্বাস্থ্য, অশান্তি প্রভৃতির অভিশাপ মোচনার্থে প্রকৃতির নির্দ্দেশক্রমেই বৃটেন পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশের ভাগ্যবিধাতা এবং

ভারতের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের কর্ণধার। অন্ততঃ বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের পূর্ব্বপুরুষদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এ কথাই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, তাঁহাদের কার্য্য যে পথই অবলম্বন করুক, সমস্ত কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানবের কল্যাণ সাধন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের বিজ্ঞান ও শিক্ষার বৈকল্যের ফলে তাঁহারা কোন সমস্যারই আসল পথের সন্ধান পান নাই। কিন্তু তথাপি, সার্ব্বজনীন কল্যাণার্থে তাঁহাদের একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিকসুলভ অনুসন্ধিৎসা ছিল, এবং জাগতিক সমস্যার সমাধানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের এই পূর্ব্বপুরুষদের এই মানব কল্যাণরূপ মহদুদ্দেশ্য দেখিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এই মহাপুরুষদের সন্তানবর্গও পূর্ব্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মানবসমাজের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগ মোচনে কৃতযত্ন হইবেন আর আমাদের আবেদনও সম্ভবতঃ অপাত্রে ন্যস্ত হইবে না।

কিন্তু বিশেষ লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের মনোযোগ লাভের আমাদের সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। ইতিমধ্যে ফল কি ঘটিয়াছে? বর্ম্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, এবং অন্যান্য পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বৃটেনের অধিকারচ্যুত হইয়াছে। বৃটেনের মিত্র রাষ্ট্রও কেহ কেহ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি, ইয়োরোপীয় কোন মিত্ররাষ্ট্রকে রাজ্য ও প্রজাকুলকে হারাইতে হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে আমরা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে, বৃটেন এমন নির্ব্বোধ হঠকারীর মত সত্যই যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে। কেননা যুদ্ধ বাধিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমরা তারস্বরে বলিতেছিলাম যে, পৃথিবী ক্রমশঃই ভয়াবহ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হইতেছে;—কাজেই তদবস্থায় বৃটেনের আশু-কর্ত্তব্যই ছিল ভারতের বিরাট স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি সাধন করতঃ এই সম্ভাব্য খাদ্য সমস্যার আশু সমাধান সাধন। এতদ্ব্যতীত একথাও আমরা স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে, জার্ম্মানী ও ইটালীর খাদ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত সুতরাং বৃহত্তর সুবিধাপ্রাপ্ত বৃটেনের হস্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল উৎপাদনক্ষম স্থানগুলি কাড়িয়া লওয়ার মানসে বুভুক্ষিত জার্ম্মানী ও ইটালী যে কোন সময়ে যে কোন অ-গণতান্ত্রিক কার্য্য চালাইয়া বৃটেনকে যুদ্ধে নামাইয়া শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে পারে। সেই সময় আমরা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম, কেন, কিসের প্রেরণায় ক্ষুদ্র জার্ম্মানী বিরাট বৃটেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে? এই সমস্যার গুরুত্ব চিন্তা এবং পর্য্যালোচনা করিয়াই তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই বিচক্ষণ পূর্ব্বপুরুষদের সন্তান বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ যুদ্ধকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া ভারতের সহায়তায় পৃথিবীর ক্ষুধা নিবৃত্তির কার্য্যেই আত্ম-নিয়োগ করিবেন, ফলে হিটলারও তাহার নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়িবে। এমন কি মিঃ চেম্বারলেন শান্তির প্রচেষ্টায় আমাদের এই আশার মধ্যে সাফল্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মিও প্রতিফলিত দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা বা বিচারবুদ্ধি সবই একেবারে অন্তর্হিত হইল। তাঁহাদের ভুয়া সম্মানবোধই প্রবল হইয়া উঠিল। অথচ এই বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও নায়কদের ঘটে এই বুদ্ধি জোগাইল না যে, সমস্ত পরিবারটার ভরণপোষণের দায়িত্ব যে অভিভাবকের উপর ন্যস্ত, সেই অভিভাবক যদি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অপারগ হয় তবে তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ মান সম্মানের পালা একেবারেই সাজে না। কিন্তু এই তুচ্ছ সম্মান বোধটার মোহেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আবার এক সর্ব্ববিধ্বংসী সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিলেন।

কাজেই, যুদ্ধ যখন বাঁধিয়াই গেল, তখন আমাদের যুদ্ধ-পরিহারের প্রস্তাবকেও পরিবর্ত্তিত করিতে হইল—কারণ যুদ্ধে বিরত হইতে হইলে এক্ষণে বৃটেনকে পরিপূর্ণ জয়ের টীকা লইয়াই এই যুদ্ধ-বিরতি সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক বা একাধিক রণাঙ্গণে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হইলেই সত্যকার প্রার্থিত বিজয় লাভ হয় না। বরঞ্চ এই যান্ত্রিক ও রাসায়নিক দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলিতে থাকিলে উত্তরোত্তর

প্রাণনাশের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইবে আর মানবতার দিক দিয়া ইহা চরমতম অপরাধ। যুদ্ধে সত্যকার বিজয়লাভ হইবে তখনই, যখন যুদ্ধের মূল কারণ পরিপূর্ণরূপে উৎপাটন করা সম্ভব হইবে। জার্ম্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তির কারণ কি, সে কথাও ইতিপূর্ব্বে আমরা বহুবার ব্যক্ত করিয়াছি। সকল প্রকার কলহের মূলই হইল বর্ত্তমান পৃথিবীর খাদ্যাভাব ও কুশিক্ষা। কিরূপে ভারতের সহায়তায় কর্ত্তৃপক্ষ এই খাদ্যাভাব ও কুশিক্ষা দূর করিতে পারিবেন সে কথাও আমরা পুনঃ পুনঃ তারস্বরে চিৎকার করিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকদের জানাইয়াছি। তাই আমরা বৃটেনকে শত্রুর বিরুদ্ধে বুদ্ধির সংগ্রাম (intellectual war-fare) চালাইতে উপরোধ করিয়াছিলাম। কেননা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, এতদিনের সংগ্রামেও আজ হিটলার কোনরূপ উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, ফ্রান্সেরও প্রকৃত পতন হয় নাই। তাই আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, বৃটেন এক আন্তর্জ্জাতিক জাতি সঙ্ঘের মধ্যস্থতায় হিটলারকে ভাগ্য-সমস্যার সমাধানে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করুক। ইচ্ছামত পথ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা হিটলারের অবশ্য থাকিত, কিন্তু আমরা স্থির জানি, যে পথই গ্রহণ করুক না কেন, জগৎবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন সমস্যার মীমাংসা সাধন হিটলারের সাধ্যাতীত। ভারতের সহায়তায় একমাত্র ইংল্যাণ্ডই এই প্রতিযোগীতায় জয়ী হইতে পারে। কিন্তু অশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সৎপরামর্শের কোনটীতেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ এতাবৎ কর্ণপাত করেন নাই।

তারপর ক্রমে মহাযুদ্ধের দ্বিতীয়পর্ব্ব সুরু হইল। ফ্রান্সের পতনে প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ অভিভূত হইয়া পড়িল। এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনেরও হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল। ব্যাপকভাবে ও দ্রুতগতিতে ধ্বংসবেদীতে শয্যাহীন প্রাণ বলি হইতে লাগিল। বিপর্য্যস্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন কি বিজয়ী জার্ম্মানীর প্রজাবর্গেরও আর স্বদেশের সমর বিভাগের উপর পূর্ব্বের মত আস্থা রহিল না। তীব্র ভাষায় তাহারা, 'যুদ্ধ কবে শেষ হইবে' এইকথা জানিবার দাবী জ্ঞাপন করিল। হিটলার জার্ম্মান প্রজাবৃন্দকে শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হইবে বলিয়া কোন প্রকারে শান্ত করিয়া আবার যুদ্ধে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিল। হিটলারকে পরাজিত করিবার পক্ষে বৃটেনের ইহাই ছিল দ্বিতীয় সুযোগ। সম্ভবতঃ বিজয়োন্মত্ত হিটলার স্বয়ং সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিত, কিন্তু আত্মশক্তি যুদ্ধ-ক্লান্ত প্রজাদের নিকট যে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন বা হিটলার মুসোলিনীর কার্য্যধারা বা তাহাদের বিজয় ফল সম্বন্ধে প্রশ্নাবলী একেবারেই উপেক্ষিত হইত না—একথা আমরা বহু সুস্পষ্ট যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তদুপরি ইংল্যাণ্ড যদি অ্যাক্সিস্ প্রজাবর্গকে এই কথাটা বুঝাইয়া দিতে পারিত যে, যুদ্ধ-বিরতির জন্য অ্যাক্সিস্ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দৃঢ় দাবী জনাইলে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষও জার্ম্মান ও ইটালীয় প্রজাবর্গ সমেত সমগ্র বিশ্ববাসীরই অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তি বিমোচনে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে—তাহা হইলে এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই অধিকতর আগ্রহের সহিত গৃহীত হইত। কিন্তু বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এহেন সুবর্ণসুযোগও হেলায় হারাইয়াছেন।

তারপর বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে যখন জাপান ব্রহ্মের দ্বারদেশে আসিয়া হানা দিল, তখন হইতে সুরু হইল মহাযুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতবাসীকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করণার্থে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের ভারতে পদার্পণ। স্যার ষ্টাফোর্ডকেও আমরা আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাব বিশেষ ভাবে প্রণিধান করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমরা বার বার বলিয়াছিলাম যে, সামরিক রসায়ণ-পদার্থের সংঘর্ষে ভারত-ভূমির পবিত্রতা কলুষিত হইবে-জগৎ-সমস্যার সমাধানে ভারতের মৃত্তিকায় যে বিপুল সম্ভাব্যতা নিহিত রহিয়াছে, ভারত হইতে যুদ্ধকে দূরে সরাইয়া না রাখিলে সে সম্ভাব্যতা পুনর্জ্জীবিত করা আর কদাপি সম্ভব হইবে না। এই কারণেই আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, ভারতের সহিত পূর্ব্বেকার সকল প্রকার ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সম্রাট, পার্লামেণ্ট, ভারতসচিব এবং ভাইসরয়ের সমুদয় ক্ষমতা সম্মিলিতভাবে একজন প্রকৃত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলের হস্তে সমর্পণ করা হোক।

আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করুক। কেন না আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ব্রিটিশ যদি ভারতের সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্যুত হইয়া ভারত হইতে অপসারিত হয়, তবে নিরস্ত্র ভারতের উপর অক্ষ-শক্তি স্বায়তঃ নিশ্চয়ই কোন আক্রমণ চালাইতে প্রবৃত্ত হইবে না। কারণ আক্রমণের কোন কারণই থাকে না। ফলে স্বভাবতই ভারতে আর কোন রণাঙ্গন সৃষ্ট হইবে না। নব নিযুক্ত ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলও প্রত্যেক ক্ষুধার্ত্ত দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে নিবারিতে সক্ষম হইবেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতকে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা হইতে মুক্তি দিয়াছে বলিয়া ভারতও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চিরকাল ইংল্যাণ্ডের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। আর এই ভাবেই ভারত ও ইংল্যাণ্ডের সহ-যোগিতার ফলে জগতের সমস্ত অভাব বিদূরীত হইবে এবং সমস্যার সমাধান হইবে।

কিন্তু এবারেও দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিল না। ব্রিটীশ রাষ্ট্রনীতিকদের স্বভাব-সুলভ উপেক্ষায় স্যার ষ্ট্যাফোর্ডও আমাদের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। ফলে হইল কি? —অনতিবিলম্বেই বর্ম্মা, জাপান কবলিত হইল; আসামের স্থানে স্থানে ও চট্টগ্রামেও বোমা বর্ষিত হইল।

সম্ভবতঃ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখনও ভাবিতেছেন যে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হানিয়াই তাঁহারা ভারতকে রক্ষা করিবেন, এই যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারাই জয়ী হইবেন। আমরাও একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিপুল সংখ্যায় ক্রমাগত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ-কামান প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া বা আমেরিকার সহায়তায় শত্রুর বিরুদ্ধে এই নৃশংস উপায়ে যুদ্ধ চালাইয়া লাভ কি হইবে? বোধ করি, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাইব যে—এই নৃশংস যুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত প্রাচুর্য্যশালী মিত্রশক্তি ক্ষুদ্র অক্ষশক্তিকে পরাভূত করিবে। কিন্তু আবার আমরা প্রশ্ন করিতেছি, প্রতিদিন সহস্র সহস্র প্রাণ বলি দিয়া, লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণশক্তি শোষণ করিয়া বিনিময়ে কেবলমাত্র 'বিজয়' শব্দটি কপালে ধারণ করিয়াই কি বৃটেনের সকল সাধ পূর্ণ হইবে? নিশ্চয়ই নহে।

তাই আমরা আবার বলিতেছি, প্রকৃত জয়লাভের পথ ইহা নহে। যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছে যে কারণে ভারতের সহায়তায় সেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হোক, দেখা যাইবে যুদ্ধ স্বতঃই বিরত হইয়া পৃথিবীতে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অযথা ও অন্যায় উপায়ে মানব সমাজের প্রাণ বিনাশ ও সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও সে জয় জনসমাজ কখনই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে না; বরঞ্চ এই শুষ্ক 'জয়' বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়াই মনে হইবে।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রথম হইতেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের প্রস্তাবে মনোযোগ দিতেন, তাহা হইলে আজ কখনই বৃটেনকে এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইত না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র বৃটেনই ভারতের ভূমি ও ভারতীয়দের সহায়তায় মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম।

স্বভাবতঃ মনে হইবে, আমাদের এই উক্তি বুঝি অক্ষমেরই বাগাড়ম্বর। কিন্তু ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যুদ্ধ বাধিবার বহু পূর্ব হইতেই আমরা যে-যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম তাহা যদি একটিও মিথ্যা প্রমাণিত হইত, বা আমরা আমাদের মতের পরিবর্ত্তন করিতে থাকিতাম, তবে অবশ্যই আমরা আজ আমাদের প্রস্তাবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এত উচ্চদৃষ্টে সেই সত্য ঘোষণা করিতে সাহসী হইতাম না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত আমাদের একটিও অনুমান মিথ্যা হয় নাই—সময়ের পূর্ণতায় প্রত্যেকটি উক্তি বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। তাই এই সাহসেই আজও আমরা ইংরেজ গণমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। তাই অদ্যাপি বৃটেনের গৌরবময় জয় ও সম্পদশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অব্যাহত অগ্রগতিই আমাদের একমাত্র কামনা ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

যুদ্ধ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধের অথবা মারামারির প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন জাগ্রত হয়, যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় কি করিয়া এবং কি করিয়া যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল করা যায়—এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের অথবা মারামারির প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন জাগ্রত হয় এই প্রশ্নের উত্তর লৌকিক ভাবে দিতে হইলে বলিতে হয় যে, প্রথমতঃ খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ও দ্বিতীয়তঃ কু-শিক্ষা বশতঃ দ্বেষ-হিংসা সাধারণতঃ মানুষের মনে মারামারির প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া দেয়।

একজন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া সমাজের হিতকর কোন পরিশ্রম না করিয়া বিলাসের পরাকাষ্ঠার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে, কত খাদ্য, কত পরিধেয় নষ্ট করিতেছে, আর একজন কঠোর পরিশ্রম করিয়া দুই বেলা দুই মুঠা শাক-ভাত পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না—সমাজের মধ্যে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে এতাদৃশ দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্নেহের বন্ধন বজায় থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে মারামারির প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

সমাজের মধ্যে উপরোক্ত অবস্থার উদ্ভব হয় দুই কারণে। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপত্তির পরিমাণ কম হইলে ঐ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। আর শরীর ও বুদ্ধির পরিশ্রমানুসারে বিতরণের ব্যবস্থা না থাকিলে উপরোক্ত অসমান বিতরণ সম্ভব হইয়া থাকে।

সু-শিক্ষার দ্বারা কামাদি রিপুগণকে কি করিয়া বশীভূত করা যায় তদ্বিষয়ক শিক্ষার অভাব হইলে সমাজের মধ্যে কাম-ক্রোধজনিত কার্য্যসমূহ ব্যাপকতা লাভ করিয়া থাকে। এই অবস্থাতেও পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন রাখা সম্ভব হয় না এবং মারামারির প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

যুদ্ধের অথবা মারামারির প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন জাগ্রত হয় তাহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, উহার কারণ খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ও কুশিক্ষাবশতঃ দ্বেষ হিংসার ছড়াছড়ি তাহা হইলে লৌকিক ভাবে ঐ কারণ নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত হয় বটে কিন্তু দার্শনিকভাবে উহা সঠিক হয় না। খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হয় কেন, সমাজে কু-শিক্ষা স্থান লাভ করে কেন—এবম্বিধ প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের অথবা মারামারির প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে উদ্ঘাটিত হয় না।

ইহারই জন্য কোন কার্য্যের অথবা অবস্থার কারণ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিতে হইলে উহা দুই ভাবে করিতে হয়। এক, লৌকিক ভাবে, আর অপর, দার্শনিক ভাবে।

যুদ্ধ অথবা মারামারির প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন জাগ্রত হয় তাহার কারণ সম্বন্ধে দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে অথবা বুঝিতে হইলে অনেকগুলি দার্শনিক তথ্য তাত্ত্বিক ভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়।

এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়—

যে মানুষ এই সংসারে ছিল না, সেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা অতিবাহিত করে,—কত খ্যাতি, কত অখ্যাতি, কত উপেক্ষা পাইয়া থাকে,—আবার কোথায় চলিয়া যায়। কাল যাহা ছিল না আজ তাহা আছে, আগামীকাল আবার তাহা থাকিবে না। অথচ রবি, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগুলি, মেষ, বৃষাদি রাশিগুলি, অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি, আকাশ-মণ্ডল, বায়ু-মণ্ডল প্রভৃতি স্থানগুলি, ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোকগুলি চিরদিনই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে চিরদিনই থাকিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এতাদৃশ ব্যাপারগুলি যদি কেহ দার্শনিকের প্রাণ লইয়া দর্শন করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী :—

(১) এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কতকগুলি ব্যাপার চিরদিনই থাকে কেন, আর কতকগুলি কাল ছিল না, আজ আছে, আবার আগামী কাল থাকিবে না এইরূপ হয় কেন?

(২) যাহা কাল ছিল না তাহা আজ আসে কোথা হইতে এবং কোন পদ্ধতিতে?

(৩) যাহা আজ আছে তাহা আগামী কাল অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যায় কোথায় এবং কোন পদ্ধতিতে?

(৪) কতকগুলি বস্তু দীর্ঘ যৌবন লাভ করে আবার কতকগুলি বস্তু অকালে যৌবন হারাইয়া ফেলে। কতকগুলি বস্তু অস্বাস্থ্যের মধ্যেও দীর্ঘ জীবন লাভ করে আবার কতকগুলি বস্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

এইরূপ হয় কেন?

এবম্বিধ প্রশ্নগুলির উত্তর পাইতে হইলে জগতের স্রষ্টা কে অথবা জগতের কারণ কে এবং তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য চলে কোন্ পদ্ধতিতে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত সাধনা সাপেক্ষ।

অনেকে মনে করেন যে, জগতের স্রষ্টাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। ভারতীয় ঋষি, বিশেষতঃ ব্যাসদেব, এই মতবাদ পোষণ করেন না। তাঁহার লেখাগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের স্রষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোন বিষয়ক জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ও নির্ভুলতা লাভ করা যায় না। এবং জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ও নির্ভুলতা লাভ না করিতে পারিলে কোন বিষয়ক কর্ম্মপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে সঠিকরূপে স্থির করা সম্ভব হয় না। ব্যাসদেবের লেখানুসারে জগতের স্রষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার উপায় মাত্র একটী। সেই উপায়, শব্দ-কার্য্যের মধ্যে তেজ ও রস কিরূপভাবে পরিচালিত হইয়া চৈতন্যের উদ্ভব করিতেছে তাহা উপলব্ধি করা। "শব্দ-কার্য্যের মধ্যে তেজ ও রস কিরূপভাবে পরিচালিত হইয়া চৈতন্যের উদ্ভব করিতেছে তাহা উপলব্ধি করা" —এই বাক্য যাহা বুঝায় আর "শব্দ কি করিয়া অর্থোদ্ভব করিতেছে তাহা উপলব্ধি করা"—এই বাক্য বলিলে একই বক্তব্য প্রকাশিত হয়। মুখ্যতঃ শব্দ ও অর্থের নিত্য ও অনিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সহায়তার জন্যই ব্যাসদেব ঋক, যজু ও সাম এই তিনটী বেদ রচনা করিয়াছেন। আমাদের এই কথায় কেহ যেন বোঝেন না যে, শব্দ ও অর্থের নিত্য ও অনিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সহায়তা করাই তিনটী বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলতঃ বেদের উদ্দেশ্য অনেক। বেদ সর্ব্বতোভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে কোন বিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবেও ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ থাকে না। বেদে প্রবিষ্ট হওয়া ভাগ্য ও সাধনা সাপেক্ষ বটে কিন্তু একবার বেদে প্রবিষ্ট হইয়া উহার রচনাপ্রণালী বুদ্ধি-গম্য করিতে পারিলে উহার সর্ব্বাংশ জানিয়া লওয়া মোটেই ক্লেশসাধ্য নহে। চাবি না পাইলে একটী বাক্স খোলা যেমন ক্লেশসাধ্য, সেইরূপ বেদের রচনাপ্রণালী বুদ্ধি-গম্য করিতে না পারিলে উহার মধ্যে যে কি আছে তাহা বুঝিয়া উঠা মোটেই সম্ভবযোগ্য নহে। অন্যদিকে আবার কোন একটী বাক্সের যথাযথ চাবিটী পাইলে যেমন বাক্সটী খুলিয়া ফেলা এবং তাহার মধ্যে কি কি আছে তাহা দেখিয়া লওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ বেদের রচনাপ্রণালী বুদ্ধি-গম্য করিতে পারিলে উহার মধ্যে যে কি কি আছে তাহা বুঝিয়া উঠা অতীব সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

আমার মতে যাঁহারা বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন অথবা অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা বেদ সম্বন্ধে মনুষ্য সমাজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। বেদ বুঝা সম্ভব কিন্তু বুঝান সম্ভব নহে। যদি কেহ বেদ বুঝিবার জন্য যথাযথ রীতিতে সাধনা করিতে ব্রতী হন তাহা হইলে বেদ-সিদ্ধ আচার্য্য তাঁহাকে বেদ বুঝিবার সহায়তা করিতে পারেন কিন্তু কোন আচার্য্য কোন শিষ্যকে কখনও কোন বেদ সম্যক্ ভাবে বুঝাইতে সক্ষম হন না। যে ভাষায় বেদ ব্যাসদেবের দ্বারা রচিত আছে সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বেদের বক্তব্য সম্যক্ ও নির্ভুলভাবে ভাষান্তরিত হইতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা।

জগতের স্রষ্টা অথবা কারণকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব কিনা তাহা বলিতে বসিয়া মুখ্য বক্তব্য হইতে কিছুদূর হটিয়া আসিয়াছি।

জগতের স্রষ্টা অথবা কারণকে যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহা মনুসংহিতার –

আ-সীৎ ই-দং তমোভূতং
অ-প্র-জ্ঞাতং অ-ল-ক্-ক্ষণং।
অ-প্র-তর্ক্যং অ-বি-জ্ঞেয়ং
প্র-সু-প্-তং ইব সর্ব্বতঃ॥

এই শ্লোকটী স্ফোট পদ্ধতিতে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে।

যদিও ব্যাসদেবের কথায় বুঝা যায় যে, জগতের স্রষ্টাকে অথবা কারণকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব, তথাপি এই প্রবন্ধে আমরা ধরিয়া লইব যে উঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, কারণ যে পদ্ধতিতে এই উপলব্ধি সম্ভবযোগ্য হইতে পারে সেই পদ্ধতি এখন আর কোন মানুষের জানা নাই এবং এখন আর কোন মানুষ উহা ধারণাও করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই, জগতের কারণকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির উপলব্ধি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। শুধু লৌকিক তর্ক ও বিচারের দ্বারা জগতের কারণকে কখনও উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র রসনেন্দ্রিয় জগতের কারণকে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় না।

জগতের কারণ অথবা স্রষ্টা কে তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি না করিয়া সৃষ্টিকার্য্য চলে কোন পদ্ধতিতে তাহা জানিতে পারিলেও আমাদের প্রশ্নগুলির (অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কতকগুলি ব্যাপার চিরদিনই থাকে কেন, আর কতকগুলি কাল ছিল না, আজ আছে, আবার আগামী কাল থাকিবে না—এইরূপ হয় কেন? ইত্যাদি) আংশিক সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

সৃষ্টি-কার্য্য চলে কোন্ পদ্ধতিতে তাহা বুঝিতে হইলে যে একটী জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় কোন্ নিয়মে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় কোন্ নিয়মে তাহা স্থির করিতে হইলে মানুষের গর্ভাবস্থায়, শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

গর্ভাবস্থায় কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমাবস্থায় ভ্রূণ কেবল মাত্র বুদ্ধিগম্য থাকে। এই অবস্থায় ভ্রূণ যে বিদ্যমান আছে তাহা মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। দ্বিতীয় অবস্থায় গর্ভিণীর অরুচি ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মনের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গর্ভিণীর গর্ভে ভ্রূণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তখনও ভ্রূণের বিদ্যমানতা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তৃতীয় অবস্থায় ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে নড়া-চড়া করে। তখন ভ্রূণের বিদ্যমানতা চামড়ার দ্বারা স্পর্শ করা যায়। কিন্তু তখনও অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভ্রূণের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায় না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভ্রূণের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায় যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

মানুষের গর্ভাবস্থায় যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, মানুষের গর্ভাবস্থায় তিনটী অবস্থা আছে, যথা, (১) "ব্যক্ত" অথবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, (২) "অব্যক্ত" অথবা মন-গ্রাহ্য, (৩) "জ্ঞ" অথবা বুদ্ধি-গ্রাহ্য।

শুধু গর্ভাবস্থাতেই যে মানুষের এই তিনটী অবস্থা আছে তাহা নহে। ভূমিষ্ঠ হইলেও মানুষের মধ্যে এই তিনটী অবস্থা থাকিয়া যায়। মানুষের সর্ব্বাংশ কখনও সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। শৈশবাদি সর্ব্বকালেই মানুষের কথেকাংশ ব্যক্ত, কথেকাংশ অব্যক্ত, এবং কথেকাংশ "জ্ঞ" অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য ভাবে বিদ্যমান থাকে।

শুধু মানুষের মধ্যেই যে এই তিনটী অবস্থা বিদ্যমান আছে তাহা নহে। পৃথিবীতলে চরাচর যত জীব দেখা যায় উহার প্রত্যেকের মধ্যেই এই তিনটী অবস্থার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যাইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন—যাহা ছিল না তাহা "জ্ঞ" অবস্থায় অথবা বুদ্ধিগম্য অবস্থায় উপনীত হয় কি করিয়া? আবার যাহা

বুদ্ধিগম্য অবস্থায় ছিল তাহা অব্যক্ত অথবা মনগম্য অবস্থায় উপনীত হয় কি করিয়া? যাহা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল তাহা ব্যক্ত অবস্থা লাভ করে কোন পদ্ধতিতে?

উপরোক্ত তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানুষের মূল উপাদান কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে গর্ভ লাভ করিবার আগে গর্ভিণীর জরায়ুর মধ্যে কি থাকে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে গর্ভলাভ করিবার আগে গর্ভিণীর জরায়ুর মধ্যে থাকে খানিকটা তেজ ও রস মিশ্রিত হাওয়া। এই 'হাওয়া' ঠিক ঠিক ভাবে আকাশ মণ্ডলের হাওয়ার মত নহে। আকাশ মণ্ডলের হাওয়ার সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু জরায়ুর মধ্যে থাকার দরুণ ইহার অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম চৈতন্য প্রদায়িণী শক্তি। মোটের উপর মানুষের মূল উপাদান—তেজ ও রস মিশ্রিত চৈতন্যপ্রদায়িণী শক্তিযুক্ত হাওয়া।

শুধু যে মানুষের মূল উপাদান তেজ ও রস মিশ্রিত চৈতন্য প্রদায়িণী শক্তিযুক্ত হাওয়া তাহা নহে। পৃথিবীতলে চরাচর যত কিছু জীব দেখা যায় তাহার প্রত্যেকের, এমন কি পৃথিবীর পর্য্যন্ত, মূল উপাদান তেজ ও রস মিশ্রিত চৈতন্য প্রদায়িণী শক্তি যুক্ত হাওয়া।

এই তেজ ও রস মিশ্রিত চৈতন্য প্রদায়িণী শক্তিযুক্ত হাওয়া কি করিয়া ভ্রূণের বুদ্ধিগম্য অবস্থায় উপনীত হয় তাহা জানিতে হইলে ঐ হাওয়ার ধর্ম্ম কি কি তাহা জানিতে হইবে। ঐ হাওয়ার ধর্ম্ম অনেক রকমের। ঐ হাওয়ার মধ্যে যে অনেক রকমের ধর্ম্ম আছে তাহা শ্রেণী বিভাগ করিলে ঐ ধর্ম্ম গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ঐ হাওয়া অধিকাংশ অবস্থাতেই তাহার মূল অবস্থা অথবা শান্ত অবস্থা রক্ষা করে। অবস্থা বিশেষে উহার তেজ অথবা রস আধিক্য লাভ করে এবং উহা অশান্ত হইয়া অপর কোন হাওয়ার সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রিয়াশীল হয় এবং অপর হাওয়াকেও ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে। আবার কখন কখন উহা অশান্ত হইয়া অপর কোন হাওয়ার সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রিয়াশীল হয় এবং অপর হাওয়াকে তৃপ্তিকামী অলস করিয়া তোলে এবং নিজেও তৃপ্তি কামী অলস হইয়া পড়ে।

দার্শনিক ভাষায় হাওয়ার এই তিন শ্রেণীর অবস্থার তিনটী নাম আছে, যথা; (১) প্রকৃতি, (২) বিকৃতি, (৩) বিকার। হাওয়ার তিন শ্রেণীর ধর্ম্মের নাম: (১) সত্ত্ব, (২) রজ, (৩) তম। জীবের মূল উপাদান—হাওয়া এবং তাহার তিন শ্রেণীর ধর্ম্ম আছে বলিয়া প্রত্যেক জীবের গুণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা: (১) সত্ত্ব-গুণ, (২) রজ-গুণ, (৩) তম-গুণ। অনেকে মনে করেন যে, প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা আছে। কিন্তু দার্শনিক ভাষায় তাহা সত্য নহে। তাণ্ডব লীলা হয় হাওয়ার বৈকৃতিক এবং বিকার অবস্থায়। প্রকৃতির অপর নাম হাওয়ার 'সমাবস্থা' অথবা "শান্তাবস্থা।" হাওয়ার মধ্যে যে প্রকৃতি-অবস্থা আছে এই ভূমণ্ডল তাহার সৃষ্টি অথবা রাজত্ব বটে কিন্তু হাওয়ার মধ্যে বিকৃতি এবং বিকার অবস্থা না থাকিলে এই ভূমণ্ডলের সৃষ্টি হইতে পারিত না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, তাঁহারা প্রকৃতিকে করায়ত্ব করিতে পারিয়াছেন। দার্শনিক ভাষায় এই কথা সত্য নহে। সমাবস্থা অথবা শান্তাবস্থা প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঐ সমাবস্থা অথবা শান্তাবস্থা কোন মানুষ নষ্ট করিতে পারে না। প্রকৃতির অবস্থার তুলনায় বিকৃতির অবস্থা ও বিকারের অবস্থা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। হাওয়া ক্ষণিকের জন্য বিকৃতি অথবা বিকারের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরক্ষণেই আবার উহা প্রকৃতির অবস্থা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং রক্ষা করে।

হাওয়ার মধ্যে রজ ধর্ম্ম আছে বলিয়া হাওয়া হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে কিন্তু উহা সৃষ্টিপ্রবৃত্ত হইয়া পরক্ষণেই আবার উহার সাম্যাবস্থা অথবা প্রকৃতির অবস্থা রক্ষিত হয়। ইহারই জন্য হাওয়া হইতে রস হয় এবং রস হইতে গুড় হয় এবং রস ও গুড়ের মধ্যে হাওয়া থাকে এবং গুড়ের মধ্যে রস থাকে।

হাওয়ার তিনটী অবস্থা, তিনটী ধর্ম্ম এবং তদ্বশতঃ জীবের তিনশ্রেণীর গুণ কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে হাওয়া হইতে জীবের জ্ঞ-অবস্থা, জ্ঞ-অবস্থা

হইতে, অব্যক্ত অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থার উৎপত্তি হয় কি করিয়া এবং একই সঙ্গে তিন অবস্থা লইয়া জীব চলাফেরা করে কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য হয়। তখন যাহা কাল ছিল না তাহা আজ আইসে কোথা হইতে, যাহা আজ আছে তাহা আগামী কাল অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যায় কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান অতি সহজেই সম্ভব হয়।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কতকগুলি ব্যাপার চিরদিনই থাকে কেন আর কতকগুলি কাল ছিল না, আজ আছে, আবার আগামী কাল থাকিবে না—এইরূপ হয় কেন? এই প্রশ্নের সমাধান ও হাওয়ার তিনটী অবস্থা ও তিনটী ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলে সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে, সৃষ্টি হয় হাওয়ার বিকৃতি ও বিকারের অবস্থায়। বিকৃতির অবস্থাতেও সৃষ্টি হইতে পারে, বিকারের অবস্থাতেও সৃষ্টি হইতে পারে, বিকৃতি ও বিকারের মিশ্রিত অবস্থাতেও সৃষ্টি হইতে পারে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, হাওয়া সৃষ্টি করিয়াই পরক্ষণে পুনরায় তাহার সাম্যাবস্থা অথবা প্রকৃতির অবস্থা রক্ষা করে।

হাওয়ার এই ধর্ম্মগুলি জানা থাকিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, হাওয়া বিকৃতির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং বিকারের অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া যে সৃষ্টি সমূহ করিয়া থাকে তাহা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং ক্ষণভঙ্গুর হয় না। উহা চিরদিনই বিদ্যমান থাকে। আর যে সৃষ্টিগুলি বিকারের অবস্থায়, অথবা বিকৃতি ও বিকারের মিশ্রিত অবস্থায় হইয়া থাকে সেই সৃষ্টিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ক্ষণভঙ্গুর হয়। ইহারই জন্য মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বশা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম প্রভৃতি আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু মানুষের বায়বীয় অংশ চিরদিনই বিদ্যমান থাকে। দার্শনিক-ভাষায় মানুষের বায়বীয় অংশকে লিঙ্গ-শরীর বলা হয়।

রবি, চন্দ্র, প্রভৃতি গ্রহগুলি, মেষ, বৃষাদি রাশিগুলি, অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি, ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোকগুলি যে চিরস্থায়ী হয় তাহাও ঐ কারণে।

কতকগুলি বস্তু দীর্ঘ যৌবন লাভ করে আর কতকগুলি বস্তু অকালে যৌবন হারাইয়া ফেলে কেন তাহার সমাধান করিতে হইলে হাওয়ার তিন অবস্থা ও ত্রিবিধ ধর্ম্মের ফলে জীবের যে ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হয় ঐ ত্রিবিধ গুণের ধর্ম্ম কি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। ঐ ত্রিবিধ গুণের ধর্ম্মের নাম "শ্রদ্ধা।" যে জীব সত্ত্বগুণ-প্রধান তাহার হাওয়ার সত্ত্ব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বলবতী হয়। যে রজ-গুণ প্রধান তাহার হাওয়ার রজ-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বলবতী হয়। যে তম-গুণ প্রধান তাহার হাওয়ার তম-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বলবতী হয়।

জীবের মধ্যে কেহবা সত্ত্ব-গুণ প্রধান, কেহবা রজ-গুণ প্রধান, কেহবা তম গুণ প্রধান হয় কেন—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে শুধু হাওয়ার ধর্ম্ম জানিলে চলে না। কাল ও দিক কাহাকে বলে ও তাহাদের ধর্ম্ম কি কি তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়। ঐ সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নহে।

হাওয়ার সত্ত্ব-ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা বলবতী হয় তিনি নিজের আভ্যন্তরীণ হাওয়ার সাম্যাবস্থা অথবা প্রকৃতির অবস্থা অধিক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার যৌবনও অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

যাঁহার শ্রদ্ধা হাওয়ার রজ ও তম ধর্ম্মের প্রতি বলবতী হয়, তিনি নিজের আভ্যন্তরীণ হাওয়ার বিকৃতি ও বিকারের আধিক্যে ক্লিষ্ট হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাঁহার যৌবনও অকালে নষ্ট হইয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি জানা থাকিলে যুদ্ধ অথবা মারা-মারির প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন জাগ্রত হয় তাহার দার্শনিক কারণ সহজেই অনুমান করা যাইবে এবং তখন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় কি করিয়া এবং কি করিয়া যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল করা যায় তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

আমাদের মতে আকাশমণ্ডলের হাওয়ায় বিকৃতি ও বিকারের অবস্থা আধিক্য লাভ করিয়াছে। আজকালকার মানুষগুলির আভ্যন্তরীণ হাওয়াতেও বিকৃতি ও বিকারের অবস্থা আধিক্য লাভ করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ভাবুককে ক্ষিপ্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক বার হাজার বৎসরের যুগে কয়েক বছর এইরূপ মাতামাতি উপস্থিত হয়। কিন্তু

রাজসিকতা ও তামসিকতার রাজত্ব কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দীর্ঘস্থায়ী হয় রাজসিকতার সহিত মিশ্রিত সাত্ত্বিকতার রাজত্ব।

কি করিয়া জনসমাজের উপর কোনরূপ কর ধার্য্য না করিয়া রাজত্ব করা চলে, কি করিয়া মানুষকে খাটাইয়া লইয়া মানুষের প্রত্যেক পরিবারকে এক একখানি স্বাস্থ্যপ্রদ গৃহ ও তাহার আসবাব দেওয়া যায়, অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তি যাহাতে সমগ্র মানব সমাজের কোন পরিবারে স্থান লাভ করিতে না পারে তাহা কি করিয়া করা যায়, বিনা খরচে প্রত্যেক পরিবারকে কি করিয়া শিক্ষিত করা যায়, কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিলে মানুষ অনায়াসে স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনক্ষম ও সংযমক্ষম হইতে পারে, কি করিলে কৃষকের পক্ষে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা পাঁচ মাস পরিশ্রম করিয়া বার মাসের খোরাক অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, কি করিলে কুটীর-শিল্প পুনরায় যন্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে, কি করিলে শিল্পে ও বাণিজ্যে যাহাতে কোন রকমের লোকসান না হয় তাহা করা সম্ভব হইতে পারে—এবম্বিধ প্রশ্ন মানুষ ভাবিতে আরম্ভ করুক। এবম্বিধ প্রশ্নের সমাধান হইলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, মারামারি কাটাকাটি না করিয়াও জগতে রাজত্ব করা সম্ভব হয়। আরও দেখিবে যে ঐ রাজত্বই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। কল্পনাবলে যদ্যপি ঐ রাজত্ব কেহ দেখিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি কি বর্ত্তমান রাজত্বকে বর্ব্বরতার রাজত্ব বলিয়া অভিহিত করিবেন না ?

কৃত্তিবাস স্মরণে

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

কালের অতলতলে হারাইয়া গেছে কত বর্ষ, মাস, দিন —
অযুত নিমেষের তবু আজো কেন মন মোর কাঁদে থাকি থাকি ?
আদিম পৃথিবী প্রান্তে ফিরিয়া আসিল পুনঃ বসন্ত নবীন,
মুঞ্জরিত পুষ্পবন, — কেন তবু মনে হয় সবি আজ ফাঁকি !

গেছে' আজ বহু বর্ষ, তুমি কবে চ'লে গেছ স্বপ্নের দেশে —
লিখিনি তোমারে কভু, কোনোদিন, কোনোক্ষণে, নিমেষের তরে,
যে-বাণী লিখিয়া গেলে আদিহীন, অনিবার আঁখিজলে ভেসে
— তাহাই রাখিলো ধ'রে তোমার মুরতিখানি অপরূপ ক'রে।

তোমার জনমভূমি, এই সে ফুলিয়াগ্রাম, চিরতীর্থতীর —
হেথায় দাঁড়ায়ে আসি দেখি যে সবার যত মুখের স্বপন ;
বনপথে রামচন্দ্র, ঘন নীল বিষে-ভরা বক্ষ কেকয়ীর —
শ্রীহীন রাজপুরী, অযোধ্যার পথ ভরা করুণ ক্রন্দন।

রাবণ-প্রেয়সী দুখে এখানেই হ'য়েছিলে প্রথম কাতর —
তোমার স্মরণে, বন্ধু, কত কথা আজি যে গো মনে প'ড়ে যায় ;
নদীতান, রাঙা সন্ধ্যা, পুষ্পকলি অরণ্য মর্ম্মর
ছু'লছে প্রথম তান, সেও ত' এখানে তব বুকের বীণায়।

স্মরণের অন্তস্তূপে কত ছবি ভেসে ওঠে আজি বার বার ;
রাজার করুণ মৃত্যু, ভরতের রাজ্য ত্যাগ আর বিলাপন,
রাঙা অশোকের বনে ঝ'রো ঝরো আঁখিধারা দুখিনী সীতার —
পম্পা-সরোবর তীরে বেদনার মূর্ত্তরূপ অনুজ লক্ষ্মণ !

বাঙালীর হৃদিপুরে, হে কবি, তোমার কীর্ত্তি চির মৃত্যুহীন,
তোমার অমর নাম জড়ায়ে রয়েছে আজো লতায় পাতায় —
এ, বন্ধু, প্রেমের গ্রন্থি ছিঁড়িতে পারে না এ যে কভু, কোনো দিন।
ছন্দের গাংগের স্রোতে, সুশীতল, পবিত্র ধারায়

সিক্ত যে ক'রেছে প্রাণ তাপদগ্ধ বাঙালীর আর বাঙলার,
কেটে গেছে বহুযুগ ; তবু তুমি আজো তাই প্রণম্য সবার। *

* ফুলিয়াগ্রামে অনুষ্ঠিত কবির বার্ষিক জন্মোৎসবে পঠিত।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

চৌদ্দ

দেখিতে দেখিতে মহাসমিতির ষোল বৎসরের ইতিহাস পূর্ণ হইয়াছে। মহাসমিতি এখন শিশু অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যৌবনের উৎসাহে সমভাবে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস গত কয়েকটা প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। মহাসমিতির সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক সম্বন্ধে আজ বিগত ইতিহাস উল্লেখ করিয়া কিছু আলোচনা করিব।

আমার যখন বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর, মহাসমিতির তখন জন্ম (ডিসেম্বর, ১৮৮৫) আর ১৯০১ সালের কংগ্রেসের সময়ে আমার বয়স ২২ বৎসর। সেবারে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মের বন্ধে যখন বাড়ী যাই, গ্রামের সমবয়স্কগণ, যাঁহারা কলিকাতা থাকিতেন, তাঁহারা কংগ্রেস সম্বন্ধে কত আলাপ করিতেন। পুনরায় পাঁচ বৎসর পরে যখন কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন আমি কলিকাতা আসিয়া ঘনিষ্ঠভাবে উহাতে যোগদান করি। ইহার পর হইতেই জাতীয়তার পতাকা বহন করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ১৯০২ সাল হইতে কংগ্রেসের ইতিহাস আমার একরকম প্রত্যক্ষীভূতও বলা চলে।

বাঙ্গালীর শক্তি ও নেতৃত্ব, কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও সঙ্ঘশক্তি যে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশীই বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা উদারনীতি গোখেল কেন বলিবেন? 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.'

বস্তুতঃ প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের প্রেসিডেণ্টই ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপরে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতিত্ব করিয়াও জাতীয়শক্তি কম বৃদ্ধি করেন নাই। বাঙ্গালার মাটীতেও চারিবার কংগ্রেস হইয়াছে, প্রথমবারে ১৮৮৬ সালে টাউন হলে, দ্বিতীয়বারে ১৮৯০ টিভলী উদ্যানে, তৃতীয় ও চতুর্থবারে (১৮৯৬, ১৯০১) বীডন উদ্যানে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল, নরেন্দ্রনাথ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন, রমেশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি এক একজন ছিলেন দিক্‌পাল নেতা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর অবদান বড় কম নয়।

সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় কংগ্রেসের অধিবেশন
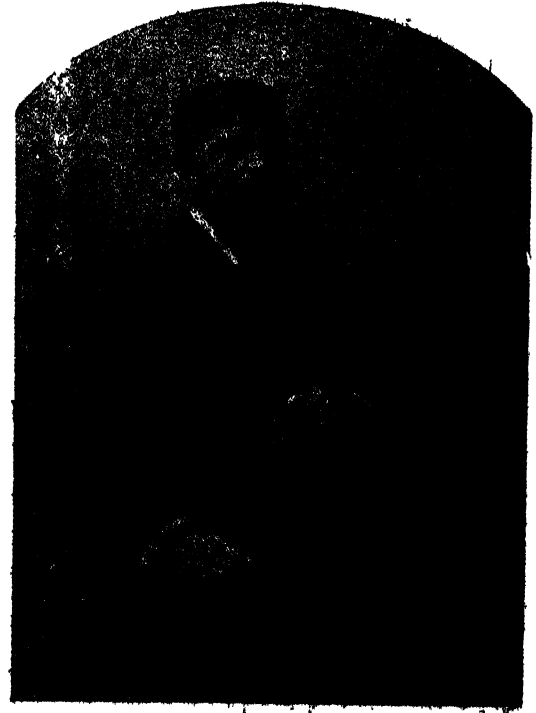
আনন্দমোহন বসু

হইতেই, যে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে জাতীয় মেত্র—ইহার আকাশ, বাতাস, ঊর্দ্ধ নিম্ন মুখরিত হয়, সেই 'বন্দেমাতরম' গানের জন্ম বাঙ্গালা দেশেই। এই কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত না হইলেও উহাই এখন কংগ্রেসের জাতীয় সঙ্গীত। যেমন রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, এই গানও কংগ্রেসের

জন্মের ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রচিত হইয়াছিল। রচয়িতা বলিতেন, 'তোমরা দেখবে, এই গানে একদিন আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হবে, ধূলো থেকে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠবে।' তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তবে তিনি কেবল এই গানই রচনা করেন নাই। "বঙ্গদর্শনে" আমরা প্রথমেই জাতিসত্ত্ব গঠনের পরিকল্পনা পাইয়া থাকি। আবার যে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন ব্যতীত জাতির উন্নতি আকাশ-কুসুম, সেই সম্মিলনের আহ্বানও বাঙ্গালা হইতেই প্রথম উত্থিত হয়। কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্কিম স্পষ্টভাবে বলিয়া আসিয়াছেন—

"তুমি যদি এই হিন্দু মুসলমানে সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। দেশাচারের বশীভূত হইয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ করিও না, প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য সম্রাট নহেন, তিনি জাতীয় ঋষি। জাতীয়তার শক্তিবৃদ্ধি-কল্পে তাহার এবং বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অপরিমেয়। অন্য অন্য সাহিত্যিকগণ সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি।

যে রাজনৈতিক মহানুভব ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, জাতীয়তার প্রাথমিক অবস্থার গঠনকারী হিসাবে তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত হইলেও, তাঁহারা যে জাতির সেবা করিতেন তাহা কতকটা বিলাতী সাহেবদের অনুকরণে। বৎসরে একবার মাত্র সম্মিলনী হইত, সকলে আসিতেন কয়দিন দেশীয় বিষয়ে আলাপা-লোচনায় কাল কর্ত্তন করিতেন, কিন্তু বাড়ী গিয়াই প্রায় অনেক কথা ভুলিয়া যাইতেন। বিলাতের পার্লামেন্টের সভ্যদের অনুকরণে দেশের সেবা চলিত। এই ভাবে বহুদিন চলে। স্বর্গীয় অশ্বিনী দত্তের ন্যায় ব্যক্তি প্রথম হইতেই জনজাগরণের পক্ষে থাকিলেও, বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মনোযোগ এদিকে বড় আকৃষ্ট হইত না। সম্মিলনীর কার্য্যও তাঁহারা সাহেবদের অনুকরণেই পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, কর্ম্ম ক্লান্ত জীবনেও দেশের জন্য কার্য্য করিবেন, ইহা তাঁহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের মধ্যেও যে দেশ-হিতৈষণার প্রবল তেজ বহিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুদিন পরে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। বাঙ্গালা সর্ব্বত্যাগী ঋষির সন্ধান পাইল। তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালা আবার ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিল। বস্তুতঃ জাতীয়তা ধর্ম্মান্তর্গত করিতে, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে এবং দেশের জন্য ধন-জন প্রাণ সব ঢালিয়া দিতে বাঙ্গালার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় কোন নেতাকে আর দেখি নাই। বিলাতী হ্যাটকোট পরিহিত হইয়াও, বিলাতী ব্রিটিশ আইনে সম্পূর্ণ দক্ষ হইয়াও খাঁটি স্বদেশীয়ভাবে দেশের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে দেশবন্ধুর সহিত কোন ভারত-বাসীর বোধ হয় তুলনা হয় না। কিরূপে কংগ্রেস হ্যাটকোট পরিহিত বিদেশী ভাব প্রণোদিত ব্যারিষ্টার ডবলিউ, সি, বোনার্জ্জি প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে একদা হ্যাটকোট পরিহিত স্বদেশী ভাবোন্মত্ত দেশবন্ধুর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় কংগ্রেস পরিচালিত এবং ক্রমে কৌপীনধারী দেশবন্ধুর পরিচালনায় উত্তরোত্তর স্বাধীনতা লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমরা কতকটা বলিয়াছি এবং বিস্তারিত ভাবে আরও বলিব।

সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাব ভিন্ন আরও একটি প্রতিষ্ঠান যে জাতীয়তা বিশেষ ভাবে পুষ্ট করিয়াছে তাহা যেন আমরা বিস্মৃত হই না। বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গলার অপূর্ব্ব সম্পদ। রঙ্গমঞ্চ যে দেশের ও জাতির কত হিতসাধন করিয়াছে তাহা শতমুখে বলিলেও শেষ হয় না। কেহ বিস্মিত হইবেন না, আমি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ করিব।

বঙ্গভঙ্গের সময় যে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন হয়, জাতির জাগরণে ইহাই উদ্যোগ পর্ব্ব। কিন্তু কোন জিনিষের পেছনে যদি শক্ত খুঁটি না থাকে, তবে তাহা জোরালো হয় না, শীঘ্রই শিথিল হইয়া পড়িয়া যায়। তাই অনেকেই স্বদেশী করিত, অনেকটা গড্ডালিকা প্রবাহের মত; সকলে করিতেছে আমরাও করি যেন এইরূপ ভাব। কুমুররা

সে দিন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, জাপান প্রবল রুশ পক্ষকে হারাইয়া দিয়াছে, আমরা কি কিছুই করিতে পারি না, অনেকটা এই ভাবের জাগরণ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই উত্তেজনা বেশী দিন রহিল না। কারণ ভিতরের জোর বেশী ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে আমি কলিকাতা আসি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উৎসাহ দেখিয়া খুবই খুসী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অধিবেশনের অবসান হইতে হইতেই উৎসাহও লোপ পাইবার যে সম্ভাবনা হইল, এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ আমার পক্ষে তাহা হইল না। কেন হয় নাই, সেই কাহিনীই বলিব।

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তখন দুইখানি নাটকের অভিনয় হইতেছিল, একখানি 'সিরাজদ্দৌলা,' আর একখানি 'মীরকাশিম'। দুইখানি নাটকই স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। দুই খানি নাটক হইতেই বুঝিলাম কিরূপে বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিরূপে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, কিরূপে দেশকে ভালবাসিয়া সিরাজ ও মীরকাশিম, মোহনলাল ও মীরমদন, তকি মহম্মদ ও করিম চাচা আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। অভিনয় দেখিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস চক্ষুর উপরে উদ্ঘাটিত হইল। এতদিন যে ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি তাহা ভুলিয়া গেলাম। ঐ দিন হইতেই বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া চিনিলাম, বাঙ্গালাকে ভালবাসিতে শিখিলাম, নিজের হৃদয়ে জাতীয়তা বদ্ধমূল হইল। এই দুইখানি নাটকের অভিনয় না দেখিলে বোধ হয় মনের উদ্দীপনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইত, প্রকৃত জাতির শিক্ষা এই দুইখানি নাটকের মত আর কিছুতেই হয় নাই। বস্তুতঃ এই নাটক দুইখানি সম্বন্ধে তাৎকালিন মুসলমান নেতা আবুল কাসেম (বর্দ্ধমান) স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায়ই বলিতেন, "ম'শায়, দশটা বক্তৃতায় যা না করে, একবার সিরাজদ্দৌলা কি মীরকাশিম নাটকের অভিনয় দেখিলে তার চেয়ে বেশী কাজ হয়।" সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হয় ১৯০৫ সালে, আর মীরকাশিমের অভিনয় হয় ১৯০৬ সালে।

এই দুইখানি নাটকের পূর্ব্বে আরও অনেক স্বদেশী নাটক অভিনীত হয়। সিরাজদ্দৌলার কয়েক মাস পূর্ব্বে অভিনীত হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ'। স্বদেশী যুগে রাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা সংগ্রামে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। প্রতাপের কথায় "জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা!" প্রভৃতি মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। আর তিনি যে স্বদেশবাসীদিগকে মা কালীর সম্মুখে প্রতিশ্রুত করান—

"যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ভূর্জপত্রে ভোজন ক'রব, তৃণ-শয্যায় শয়ন ক'রব, বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রব" প্রভৃতি কথায় এখনও বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়।

লালমোহন ঘোষ
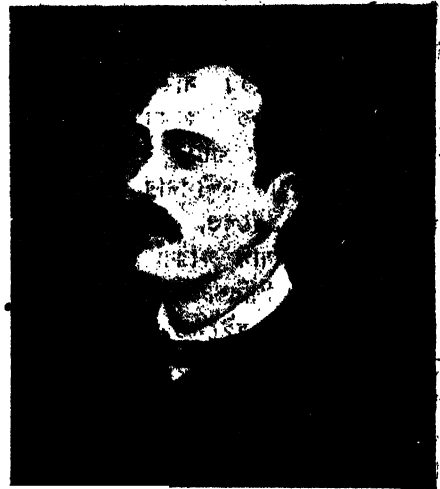
রাণাপ্রতাপ ষ্টারে প্রথম অভিনীত হয় এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে মিনার্ভাতেও হয়। ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের "হলদীঘাট" কবিতাটী চারিজন সৈনিকের দ্বারা আবৃত্তি করান হইত। আর মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয়ের পূর্ব্বে স্বরচিত কবিতাটী আবৃত্তি করিতেন। শুনিয়াছি তাহাতে নাকি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইত। দুই একটি পদ এখনও মনে আছে—

সংগ্রাম হেরিল দূরে, ঝালার সর্দ্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমরদক্ষ
বিপক্ষ-বেষ্টিত, বক্ষে বহে রক্তধার।
রক্ষিতে প্রতাপ রাজে, প্রবেশিল অরি মাঝে
শীঘ্র ছত্র ল'য়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণাজ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার।

অমিত বিক্রম বীর, ঝাল্লার সর্দ্দার
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার
শত হস্তে চলে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার ;
অসংখ্য অসির ঘায়, ক্রমে অবসন্ন কায়
পড়িল সংগ্রামস্থলে করি মহামার
বীরসাজে বৈরীমাঝে বীর অবতার।

জ্ব'লে জ্ব'লে ভস্মরাশি হয় দাবানল
বেগবান ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে
অভাগী ভারত ভাগ্যে, মোগল প্রবল
হল্‌দিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।

কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে রচিত হয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য 'সীতারামের' পরে উপযুক্ত নাটকই বটে। সীতারাম রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের, কিন্তু নাটকে রূপান্তরিত করেন গিরিশচন্দ্র। হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব এবং লাঠির মহিমা, শ্রীর "মার মার, শত্রু মার" কথায় কথায় উদ্দীপনার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সীতারাম দেশবীর হইলেও, দেশবীর প্রতাপাদিত্যকে ক্ষীরোদবাবু সময়োপযোগী করিয়া দর্শকের সম্মুখে আরও হৃদয়গ্রাহী করেন। গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি, সীতারাম এবং সংনাম (অভিনীত পরে হইলেও রচিত হয় অনেক পূর্ব্বে) নাটকে সম্মান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'প্রতাপাদিত্যের'ও সে সময়ে যথেষ্ট সুযশ হয়।

প্রতাপাদিত্য নাটকের প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর চরিত্র সীতারাম ও চন্দ্রচূড় চরিত্রের অনুবৃত্তি মাত্র। চন্দ্রচূড় যেমন শ্রীকে দিয়া গঙ্গারামকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শঙ্করও তেমন যশোরের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য করেন। সীতারামের চাঁদশার ফকিরের কতকটা ছায়া প্রতাপাদিত্যের হিজলীর ঈশার্থাতে আছে। জয়ন্তী এবং বিজয়াতে সাদৃশ্য অনেক বেশী। মৃন্ময় ও সূর্য্যকান্ত নন্দা ও ছোটরাণী এবং গঙ্গারাম ও ভবানন্দ মধ্যেও কিছু কিছু ঐক্য আছে। তবে গঙ্গারাম বিশ্বাসঘাতক হয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া, আর কুচক্রী ভবানন্দ যশোরের সর্ব্বনাশ করে স্বার্থাভিসন্ধিতে। বিজয়ার সময়োপযোগী আবির্ভাব ও সঙ্গীত, শঙ্করের দেশভক্তি এবং প্রতাপের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা নাটকখানিকে খুবই সরস ও সজীব করিয়াছিল। যে দৃশ্যে বিক্রমাদিত্য গোবিন্দদাসের কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে,

শরাহত ভূপতিত পক্ষী তাহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, আর প্রতাপ বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া উক্তি করেন—

"আর আমি দেখলুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে বিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোন কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কিনা—"

বিশ্লেষণ উদ্দীপনার সঞ্চার হইত।

যে দৃশ্যে প্রতাপ ও শঙ্কর আসিয়া প্রসাদপুর গ্রামে কল্যাণীকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করে, এবং

নিশুম্ভ শুম্ভমথনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা॥

সেখানে বিজয়া মায়ের স্বরূপ মূর্ত্তিটি দেখিয়া বলেন—

"চণ্ডীবর মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তানিষিক্তরগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক—যুক্তস্বরে মাকে ডাক। মা মা ব'লে চীৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার একবার আসুন। বল্ মা প্রচণ্ড বলহারিণী! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা করিতে, ইন্দ্রাদি দেবগণসম্মুখে যে অভয় বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

সেস্থানেও দর্শক খুব বিমুগ্ধ হয়।

তবে একটী কথা, "ভীরু পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই ক'রতে পারে না"—প্রভৃতি কথা অনেক স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তির প্রাণে ব্যথা দিয়াছে। স্বয়ং ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন—

"দেশবন্ধু আমাকে বলেন আপনি প্রতাপাদিত্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা কি নিজে অনুভব না করিয়া? আপনি বাঙ্গালী, অন্য জাতির তুলনায় আপনি আপনাকে ছোট মনে করিবেন কেন?"

(মাসিক বসুমতী শ্রাবণ, ১৩৩২)

'প্রতাপাদিত্য' নাটকখানি সে সময়ে একাই আসর জমায় নাই। স্বর্গীয় হারাণ রক্ষিত মহাশয়ের "বঙ্গের শেষ বীর" গ্রন্থখানিকে নাট্যরূপ দান করিয়া স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। তাহাতেও যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। তবে ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকই বেশী জমিয়াছিল।

যাহা হউক, কংগ্রেসের ইতিহাসে রঙ্গমঞ্চের অবদানও যথেষ্ট ছিল বলিয়াই আমরা ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেও বিরত রহিলাম না। আজ বড়ই পরিতাপের বিষয় লোকে তাহা বড় স্বীকার করিতে চায় না। আর করিবেই বা কি প্রকারে? রঙ্গালয়ের আদর্শ ও ধারা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যাভিমুখী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার সাহিত্য ও নাট্য মহারথীগণ এত মহামূল্য জিনিষ দিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া কেন ছাইভস্ম নাটক লিখিয়া ও অভিনয় করিয়া অসারতার পরিচয় দেওয়া হইতেছে, তাহা কি কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন না? আজ মধুসূদনের আক্ষেপোক্তিই "হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" কবিতাটী বার বার আমাদের শ্রুতিপথে জাগরিত হইতেছে। আবার কি একদল নূতন অভিনেতার উদ্ভব হইবে না, যাঁহারা পুনরায় গিরিশ-চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ ও অমৃতলালের নাটক ও প্রহসন অভিনয় করিয়া আবার পুরাতন আদর্শ ফিরাইয়া বিপথগামী জাতিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন? বাঙ্গালার পুরাতন সম্পদ এত বেশী যে এখন আমাদের পরের নিকট হইতে গ্রহণ করা অপেক্ষা দেওয়ার জিনিসই বেশী আছে। বাঙ্গালার ও ভারতের নিজস্ব আদর্শ আছে, তাহা ছাড়িয়া অনুকরণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আগামী কয়েকটী সংখ্যায় ইউনিভার্সিটী বিল, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা ও সুরাট কংগ্রেস প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘালোচনা করিতে অভিলাষ করি। তবে একটী কথায় বড়ই দুঃখ হয়। অনেকেই আস্ফালন করেন যে, What Bengal thinks to day, India thinks to-morrow, সুতরাং বাঙ্গালার নেতৃত্ব থাকিবে না কেন? কেন? থাকিবে না নিজদোষে। সুরেন্দ্রনাথের মত এত বড় বাগ্মী পৃথিবীতে কম, তাই অসাধারণ ক্ষমতাবলে তিনি সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের মত একাধারে বাগ্মী ও লোকশিক্ষক, অন্যদিকে ত্যাগ ও সেবা-ব্রতে বলীয়ান জগতে সুলভ। কেশব সেন মহাশয়ও ছিলেন আদর্শ নেতা। স্বর্গীয় বিপিন পাল মহাশয়ও অসাধারণ বাগ্মিতায় সেই স্বদেশীযুগে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন। অরবিন্দ ঘোষ খুব উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও ত্যাগব্রতাবলম্বন করিয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ, ড্াঃ রাসবিহারী ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যখন রাজনৈতিক জগত হইতে অবসর গ্রহণ করেন, চিত্তরঞ্জন দাশ একাধারে ত্যাগব্রতে, একপ্রাণতায়, বাগ্মিতায় ও ধীশক্তিতে সমগ্র ভারতের অবিসম্বাদী নেতারূপে সকলের হৃদয় জয় করেন। মহাত্মা গান্ধীও পদে পদে তাঁহার সহকর্মীর নিকট পরাজয় মানিয়া লয়েন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব্বের আটমাস কাল মহাত্মাজী প্রতিপদক্ষেপে তাঁহার সাহায্য করিয়া চলিতেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ গুণে জননায়ক ছিলেন। একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন না হইলে কেহই লোকমান্য হইতে পারে না। যতীন্দ্র মোহন কতকটা এই আদর্শ রাখিয়া চলিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রও ত্যাগে এবং কর্ম্ম-শক্তিতে অতুলনীয়। অবস্থার প্রাবল্যে যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে সর্ব্বত্যাগী হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধুর-তায় তিনি আবার ছিলেন অতুলনীয়। নেতার পক্ষে ইহাও একটা গুণ। সুভাষচন্দ্র আবার সর্ব্বত্যাগী হইলেও, একতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতের অবিসম্বাদী নেতৃপদের গৌরবলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রকৃতঃ যে দুইটী বিষয় লইয়া অন্যান্য নেতৃগণের সহিত দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে এই বিষয়ে তিনিই ভুল করিয়াছিলেন। নেতৃবৃন্দ ফেডারেসনও মানিয়া লয় নাই, অথবা গভর্ণ-মেণ্টের সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া আপোষও করে নাই। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্যকার্য্যকালে কংগ্রেস সভাপতি বা পণ্ডিত জওহরলাল কম নির্ভীকতা দেখান নাই।

আজ বাঙ্গালার সে ত্যাগ কোথায়, সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোথায়, বুঝাইবার সে শক্তি কোথায়? দেশসেবা করিবার সময়ই বা আছে কয়জনের? বরং এই বাঙ্গালা দেশেও কংগ্রেসে যে কয়জন আছেন তাঁহারা নিজ পতাকা কখনও যে অবনমিত করেন নাই, তাহা খুবই বলা চলে। তাঁহারা যদি কংগ্রেস সঙ্ঘ আঁকড়াইয়া না রাখিতেন, তবে স্বরাজের ইতিহাসে বাঙ্গালার নাম বোধ হয় বর্ণনার অযোগ্য হইত।

'বাঙ্গালা' 'বাঙ্গালা' করিয়া চীৎকার করিয়া যাহারা ইঁহাদের বিরোধী অথবা কংগ্রেসের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাদের কেবল যে নিজেদের যোগ্যতা নাই তাহা নয়, তাহারা দেশের ভয়ানক শত্রু। বাঙ্গালী যে সেবাব্রত ধরিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই আবার ইহা বড় হইয়া উঠিবে। আমরা সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছি যে এমন বাঙ্গালী শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন, যিনি একদিকে ভারতীয় ঋষির প্রদর্শিত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি আর অন্যদিকে ত্যাগ ও সেবাব্রত লইয়া আবার জগতের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিবেন, সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, সমগ্র জগতে আবার নূতন ভাববন্যা প্রবাহিত করিবেন।

"বন্দেমাতরম্"　　[ক্রমশঃ

বসন্তের অভিযান

বিশ্বনাথ

হে বসন্ত, তুমি মানবের চির আদরের—
যুগ যুগান্তর হ'তে কত আশা লয়ে
মানব চাহিয়া থাকে তব প্রতীক্ষায়।
শীতান্তের মর্মশেষে আর বার শাখে শাখে
ফুটিবে মুকুল—
তরুলতা আর বার নব পত্রে হবে সুশোভিত
মাঠে মাঠে আর বার বাজাইবে বেণু
রাখাল বালক। তব সখা বসন্ত কোকিল
কুহু ডাকে কত প্রেমিকের মনে
আর বার জাগাইবে প্রিয়ের বারতা।
দিকে দিকে নব জাগরণ, নব আমন্ত্রণ!
প্রকৃতি সুন্দরী যেন সাজাইয়া আপনারে
কত না সম্ভার—চাহে মিলাইয়া দিতে
কোন অজানা পুরুষ পদে। হে বসন্ত!
এইরূপ চির আকাঙ্ক্ষিত মানবের।
সৃষ্টির আদিম কাল হতে সেই নিয়মের বশে
ঘোরে তারা, হাসে চাঁদ, ওঠে রবি
দিবসের শেষে নামে রজনীর অন্ধকার
নিদাঘের রুদ্ররূপ এনে দেয় প্রাবৃটের স্নিগ্ধ কোমলতা—
সেই নিয়মের বশে এই রূপ ছিল ত তোমার—
কিন্তু আজ একি তব অভিযান!
কার অভিশাপে, হে রাক্ষসী, ধরেছিস
এ ভীষণা সর্বনাশা রূপ তোর।
যার আগমনে মানব হাসিত,
আজ তার আগমনে দানব খাসিছে।
আজ তোর প্রতীক্ষায়
চাহিয়া থাকে না আর প্রেমিক প্রেমিকা,
চেয়ে থাকে মৃত্যু-দূত।
শীতের কুহেলী বেঁধে রেখেছিল রথচক্র তার;
আজ বসন্তের আগমনে
উঠিবে ঘর্ঘর চক্রপথ তার—
অট্টহাসি হাসিবে গো মৃত্যু দূত কত।
কত নরনারী হবে পিষ্ট। কত যুবক যুবতী,
যারা আপন আনন্দে কাটাইত দিন
কত শিশু কত বৃদ্ধ যাহাদের কাছে
বসন্ত জাগাইত নিত্য নূতন বারতা,
আজ তারা ঐ ভীম রথচক্রতলে
আপনারে দিবে বিসর্জন।
হে আদি কারণ! বলে দাও
আর কতদিন দেখাইবে রুদ্র লীলা তব!
আজ কার পাপে এই শাস্তি মানবের।
আজ যারা বিসর্জিছে প্রাণ, তাহাদের—
কিবা অপরাধ। তারা ত চাহেনি কভু
ভাঙিবারে তোমার নিয়ম।
আপনার ক্ষুদ্র পরিবারে—আপনার গণ্ডীর মাঝে
তারা চাহে আপনারে ঘেরিয়া রাখিতে।
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুঃখ তার—
নাহি চাহে তারা হইবারে রাজ্যেশ্বর—
নাহি চাহে তারা অপার ঐশ্বর্য্য।
তাহাদের কাম্য শুধু আপন গণ্ডীর মাঝে
মিলাইতে আপনারে।
তবে কেন—কেন আজ তাহাদের এই নিষ্পেষণ।
সত্যিকার পাপী যারা—
যাহাদের পাপ আনিয়াছে এ ভীষণ অভিশাপ
বসুন্ধরা পরে, বসন্তের নব
জন্ম আনন্দের দিনে যারা এনে দিল
মৃত্যু আর্ত্তনাদ, তারা তো বসিয়া আছে
পরম নিশ্চিন্তে রুদ্ধ বাতায়ন পাশে।
হে আদি কারণ! ওগো ভগবান!
তুমি জান কিবা ইচ্ছা তব—
যদি নবসৃষ্টি ইচ্ছা—প্রার্থনা মোদের—
ভেঙ্গে ফেল যত পুরাতন, যত পাপ তবে
হান বজ্র যত ইচ্ছা তব,
সেই বজ্রে যদি চূর্ণ হয়ে যাই, তথাপি
নাহিক ক্ষোভ, কিন্তু—ভাঙ্গ,
একেবারে ভেঙ্গে ফেল
এ ভণ্ডামি, এই অপ্রাকৃত সমাজ সভ্যতার
নামে এ দারুণ অভিশাপ! আর বার
উঠুক জাগিয়া সেই রূপ যেই রূপে পুত্র
পুনরায় চিনিবে পিতারে, ভ্রাতা আপন ভ্রাতারে,
যেই রূপে বসন্তের সৃষ্টি অভিযানে
আসিবে না মৃত্যু অভিযান।

বাগ্‌দত্তা*

শ্রীজিতেন্দ্র নাগ চৌধুরী

রাত্রি তখন দশটা, পৌর্ণমাসীর চাঁদ বাগানে যেন আলোর ঝরণা বইয়ে দিয়েছে—সোমেদের বাড়ীর বিবাহের বাগ্‌দানের উৎসব এবং খাওয়া দাওয়ার পালা সবে শেষ হয়েছে। যে মেয়েটীর betrothal পর্ব্ব আজ সমাধা হল তার নাম নীলা। নীলা সোমেদের ছোট মেয়ে, সোমেরা ব্রাহ্ম, তাই খৃষ্টানী কায়দায় বিয়ের পূর্ব্বে বাগ্‌দান উৎসব পালিত হয়। আর নীলার বেলায়ও বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে হল, যেহেতু নীলার ধনী মাতামহী মিসেস্ কর—নীলার বাবা মারা যাবার পর মেয়ের এই বাড়ীতে এসে রয়েছেন, আর শুধু থাকা নয়, বলতে গেলে এ বাড়ী তাঁরই, কারণ নীলার বাবা কেশব সোমের মারা যাবার ৩।৪ মাস বাদে তাঁর দেনার দায়ে যখন বাড়ীখানি বিক্রী হবার অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন এই দিদিমা এসেই সোম কুলকে বাঁচায়।

জ্যোৎস্নাতে উদ্ভাসিত উদ্যানের একটী জামগাছের গুঁড়িতে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়াল নীলা—ঘরের ভিতরের গরম হাওয়া যেন অসহ্য লাগছিল, এখনও সবাই যায়নি, ভাবী শ্বশুর মিঃ আদিত্য এবং তৎপুত্র ভাবী বর অসিত আদিত্য এখনও বসে রয়েছে, তার মাসীমাতা ঠাকুরাণী এখনও নীলার মা নিভাদেবীর সহিত গল্পে মগ্ন। নীলা বাগান থেকে দেখতে পেলে, মা কেমন খুব খুসী ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন মাকে কত ছেলেমানুষ ও সুন্দরী দেখাচ্ছে। দিদিমার সঙ্গে মিঃ আদিত্যও একদিকে কৌচে বসে কথাবার্ত্তা কইছেন, আর আর এক পাশে টেবিল চেয়ারে অসিত একা বসেই পেসান্স খেলছে এক যোড়া তাস নিয়ে, নীলার জন্য একবার উৎকণ্ঠাও দেখাচ্ছে না।

রাত্রি দশটা, বাগানে নীলা একাই দাঁড়িয়ে, আজকের দিনেও তার মনে আনন্দ নেই কেন, সে নিজেও ঠিক বুঝতে পাচ্ছে না। কেমন সুন্দর নিঝুম ও ঠাণ্ডা উদ্যানের ভিতরটা, ঝিঁঝিঁ ডাকছে আপন মনে, ভূমির উপর আলোর বিক্ষিপ্ত পত্রের ছায়ায় ছায়ায় যেন সতরঞ্চি, দূরে ডাকছে শৃগালদল মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে গাছের ওপরে বকগুলো ডানা চাপড়ে গোলমাল করছে। বসন্তের মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে কি সুন্দর। নীলার ইচ্ছে করে এই দক্ষিণ পবনে পাখা মেলে উড়ে যায় দূরে কতদূরে—কি হবে এই নকল জীবন যাপন করে। সাময়িক মুহূর্ত্তে পার্থিব অস্তিত্বটা নীলার যেন মোটেই ভাল লাগল না।

নীলার বয়স সবে ১৯ শেষ হয়েছে, পনর বৎসর বয়স থেকে বিয়ের day-dream করত নীলা। মাস চারেক হল অসিতের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এনগেজমেণ্ট আরম্ভ হল আজ, চলবে তিন মাস, তারপর বৈশাখী পূর্ণিমাতে হবে বিবাহ—দিনস্থির হয়েছে। অসিতকে বেশ ভালই লাগে কিন্তু অসিত কি মনের মানুষ নীলার?

উদ্যানের মধ্যে কূয়ার পাড়ে বসে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ওদের কুটীরটীর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল নীলা। জানলার আলো দিয়ে দেখতে পাচ্ছে চাকর বাকর এখনও যাতায়াত করছে—কিচেন থেকে গোলমাল আসছে তাদের, মাননীয় অতিথিদের বোধ হয় কিছু সরবরাহ করা হচ্ছে। কে যেন বেড়িয়ে এল, না? সিঁড়ির ধাপে এসে দাঁড়াল, শুভেশ না? হ্যাঁ তাই ত, সকলে ওকে শুভো বা শুভা বলেই জানে, কলকাতা থেকে দিন দশেক হল এসেছে, রয়েছে এখানেই নীলাদের বাড়ী, কারণ নীলাদের বাড়ীতেই ও মানুষ। সে অনেকদিন হল, শুভোর মা শুভোকে কোলে করে এসে ঢুকল মৃত স্বামীর দূর আত্মীয়া নীলার দিদিমার বাড়ীতে। শুভোর মা রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, অল্প কয়েকদিন বাদেই মারা গেল, সেই থেকে নীলার বুড়ী দিদিমা এই শুভেশকে মানুষ করেন এবং কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন লেখাপড়া শিখে শুভেশ আর্ট স্কুলে ঢোকে, কারণ ছবি আঁকা তার ভাল লাগত। আর্টিষ্ট শুভেশের স্বাস্থ্য কিন্তু প্রায়ই খারাপ হ'ত এবং প্রতি বৎসরই ২।৩ মাস করে এসে দিদিমার

* বঙ্গশ্রীর পাঠকবর্গ রাশিয়ার সাহিত্য পড়েছেন—সেই সাহিত্যের একটী ভাল গল্প—আণ্টন শেকভের লেখা—এখানে দেশী ছাঁচে গড়ে আপনাদের কাছে ধরলাম।

কাছে থাকত। নীলার দিদিমা যখন নীলাদের বাড়ীটা কিনে ওদের কাছেই থাকতে এলেন তখন থেকে শুভেশও এইখানেই এসে থাকত। শুভেশ পূর্ণবয়স্ক যুবক সে সময়, এবং নীলা কিশোরী, স্বভাবতঃ তাদের মধ্যে পরস্পর একটা প্রীতির বন্ধন ছিল, ভাইবোনের চেয়েও বেশী, বন্ধুত্ব অপেক্ষাও বেশী। নীলাদের বাড়ীকেই শুভেশ নিজের বাড়ীর মতই মনে করত, কারণ পৃথিবীতে ওর আপনার বলতে ত এরাই, রক্তের টান না থাক। ওর একটা ঘর বরাবর আলাদা থাকত। শুভেশ দেখতে যেমন সুন্দর, আচার-ব্যবহারেও ভারী ভাল এবং তার শিল্পী জীবনের মধুর দিকটা দিয়ে সে সকলকেই অন্তরের দিক থেকে জয় করেছিল। নীলার দিদিমা কেবল ওর অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষমতার জন্য মাঝে মাঝে তিরস্কার করতেন, আবার ওর অসুখ করলে ভয়ানক সেবা-যত্ন করতেন।

শিল্পী শুভেশের ঘটী যুগ্ম ভ্রূর নীচের টানা টানা বড় চোখ নীলার ভারী ভাল লাগত। শুভ দেখতে পেল নীলাকে, কাছে এল ওর, নীলার পিঠে মৃদু করস্পর্শ করে বল্লে, "ভারী সুন্দর জায়গাটা, না নীলু?"

নীলা বল্লে, "সত্যি খুব চমৎকার এই সময়টা, তুমি থাক না কিছুদিন, দারুণ গ্রীষ্ম যতদিন না পড়ে, সে সময়টা ভারী unpleasant।

শুভ—"দেখি কি হয়, হ্যাঁ শেষ পর্য্যন্ত সেই রকমই আশা করি থাকা হবে, তবে ভাদ্রমাসে থাকছি না।

বলে শুভ এমনি হা হা করে অকারণে হেসে নীলার পাশে কুয়ার পাড়ে বসে পড়ল।

নীলা ক্ষণেক বাদে বল্লে, "বসে বসে আমার মার দিকে দেখছিলুম, এখান থেকে মাকে কেমন ছেলেমানুষ লাগছে? দেখ শুভদা?

শুভ—হ্যাঁ, ভারী ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে বটে। মাসীর এদিকে অনেক গুণ আছে কিন্তু ভ্যানিটিতেই খেয়েছে। তুমি কিছু মনে ক'র না নীলু, তোমার মার পুরাতন সংস্কার আঁকড়ে থাকা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি কলকাতার সহুরে হয়েছি বলে তুমি হাসছ! কিন্তু আলোক-প্রাপ্তা ব্রাহ্ম গৃহিণীর তা সাজে না, বলে, দুটো আঙ্গুল নীলার মুখের কাছে নেড়ে দিল শুভ।

নীলা ওর রকম দেখে হাসতে লাগল মৃদু, কিন্তু মন ভাল নেই বলে কিছু বলতে পারলে না, মনে পড়ল প্রায় ফি বারেই শুভ এসে এই সব কথা বলে।

শুভ বলে যেতে লাগল—তোমরা এখানে সব এক একটা নিষ্কর্ম্মার দল—কি কর সারাদিন? তোমার মা ত Lady in vanity বিলাতী ডাচেসের মত কেবল ঘুরে বেড়ান—তোমারও ত কোন কাজ আছে দেখি না। ওদিকে তোমার ভাবী বরটী—your engaged fiance অসিত আদিত্যটীও আর একটী অকর্ম্মা—কি করে ও বলতে পার?"

প্রথম প্রথম শুভ দাদার এই সব সমালোচনাতে নীলা হেসে গড়িয়ে যেত—আজকাল আর ভাল লাগে না—এখন ত আদৌ নয়, তাই চটে বললে—'হয়েছে হয়েছে···শুনে শুনে কাণ পচে গেল—নতুন কোন কথা আছে ত বল', বলে নীলা উঠে দাঁড়াল।

শুভ হাসতে লাগল, উঠে দাঁড়াল—তারপর উভয়ে চলে গেল বাড়ীর দিকে। নীলা সুন্দরী, লম্বা স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিত গৌরাঙ্গ দেহলতাকে ভাল ও নূতন এনগেজমেন্টের বেশভূষায় আবৃত অবস্থায় শুভেশের সঙ্গে এগোচ্ছিল পাশাপাশি—ভারী সুন্দর নিজেকে লাগছিল ওর—শুভেশেরও ইচ্ছা করছিল ওর স্মার্ট দেহলতাকে তুলে ধরে কোলে—কিন্তু ওর দুর্ব্বল দেহ, তা পারবে কেন? সেই ভাবটা যেন নীলারও মনে এল—ও-ও যেন শুভর নিরুৎসাহে এবং অক্ষমতায় দুঃখিত বোধ করল।

নীলা বলে উঠল—"তুমি কিন্তু বড্ড বল শুভদা, ঠিক নয় তোমার, তুমি আমার অসিতের কথা বলছিলে—কিন্তু ওকে তুমি জান না।" শুভ—"আমার অসিত···বেশ বেশ নীলু, তোমার অসিতকে নিয়েই মাথা ঘামিও এবার থেকে···"

শুভকে দেখে—দিদিমা, বা দিদা যা বলে ওরা ডাকে—বল্লেন 'আরে শুভ ঠাণ্ডায় বাইরে গেছলি কেন, সাবধানে থাক, দেখবি তোর শরীর বেশ ভাল হয়ে উঠবে, তুই কেবল একটু বেশী করে খা! কলকাতায় থেকে কি চেহারা হয়েছে দেখ দিকি।' বলে মিসেস কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আদিত্য সাহেব আবার ফোড়ন দিলেন, 'কেন ও-ত বেশ গাণ্ডে হণ্ডে খেলে দেখলুম তখন।

"আঃ বাবা তোমার এ অন্যায়···এস শুভ don't mind. তুমি জান বাবা শুভ splenpid ছেলে, ভারী সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, ওর health থাকলে ও একজন টিশিয়ান হতে পারত।" বলে অসিত শুভেশের কাছে এল।

খানিকটা আরও গল্প-গুজবের পর অসিত বেহালা বাজাতে আরম্ভ করল। এইটাই শুধু সে করত, দশ বছর আগে বি, এ পাশ করেছিল কিন্তু আজও পর্যান্ত চাকরী, ব্যবসা কি. কোন কাজ সে করে নি, কেবল মাঝে মাঝে চ্যারিটি পারফরম্যান্সে বেহালা বাজিয়ে আসত।

অসিত মাঝে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল, সকলেই মুগ্ধ হয়ে বসেছিল তার চারিদিকে। কিন্তু এক কোণে বসে শুভ কেবল কেটলি থেকে চা ঢেলে ঢেলে খাচ্ছিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল এগারটা, পটাং করে বেহালার একটা তার ছিঁড়তেই সবায়েরই যেন চৈতন্য হল রাত্রি হয়েছে,সবাই একটু হেসে উঠল। তারপর সব যে যার পথ ধরল। ভাবী-বরকে বিদায় দিয়ে নীলা চলে গেল শুতে সব শেষ কোনের ঘরটীতে, যেটাতে ও আর ওর মা থাকত। হল ঘরের কোণে বসে তখনও শুভেশ চা পান করছিল, চাকর বাকরেরা সব আলো নিভিয়ে দিতে লাগল। বুড়ি দিদিমা চলে গেছেন তার নিজের ঘরটাতে, কিন্তু গৃহকর্ত্রী তিনি মাঝে মাঝে আসছেন একে ওকে তিরস্কার করতে। নীলা ঘরে এসে ভাল পোষাক ছেড়ে আটপৌরে শাড়ী পরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে কাণে আসছে দিদিমার তিরস্কার, লোকজনদের গোলমাল, আর শুভেশের গলা। তারা সব নীরব হয়ে গেল, কেবল থেকে থেকে কাণে এল শুভার কাসির শব্দ তার শোয়ার ঘর থেকে। অনেকক্ষণ বাদে এল ঘুম। কিসের অস্বোয়াস্তি? ঢং ঢং করে হলঘরের ঘড়িতে বেজে গেল বারটা, তবুও নীলার চক্ষে ঘুম নেই।

দুই

১টার আগেই নীলা সজল চোখেই ঘুমল কিন্তু ভোর রাতে গেল ঘুম ভেঙ্গে। পূব গগন থেকে দু'একটা আলোর রশ্মি এসে পৌছেছে ওর ঘরে, লোকালবোর্ডের পথটা দিয়ে চৌকিদার হেঁকে গেল, শুনতে পেল নীলা। 'বাবু জাগ বাবু জাগ' আর ঘুম যে আসে না, বিছানাটা ভারী নরম আর পীড়াদায়ক গোছের লাগছে, উঠে বসে নীলা, ভাবতে লাগল কত কথা মনে পড়ল—অসিত কেমন করে আলাপ করল, তারপর মেশামেশী হল, কি ভাবে অসিত প্রোপোজ করল, হাসতে হাসতে বোকা মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে মুখ রাঙ্গা করে সম্মতি দিল। শুভেশ তখন কলকাতায়, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করবে সে খেয়ালই হয় নি।······বিয়ের ত মাসখানেক বাকি, কিন্তু ওর যেন ভয় করতে লাগল, কেমন যেন একটা অশান্ত ভাব তার চিত্তকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। খাটের উপর বসে নীলা দেখলে জানলা দিয়ে, স্তিমিত ভোরের আলোয় বাগানটা কি সুন্দর, অদূরে করবী ফুলের গুচ্ছগুলি কেমন নেতিয়ে পড়েছে, আর ফটকের মাথায় ওই মাধবীলতার ঝাড়। কেমন সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে বাগান থেকে ভোরের মিষ্টি হাওয়ার সঙ্গে, কিন্তু নীলার অন্তরে কিসের বোঝা?

হাত জোড় করে বলে উঠল "ভগবান্, মন আমার ভারী কেন?"

কেন? শুভেশদার কথা ভেবে! আঃ শুভদার কথাই বা বার বার মনে পড়ছে কেন? আমি অসিতকে ভালবাসি, পছন্দ করি, তাই বিয়ে করব।

'কণ্টক-শয্যা' ত্যাগ করে নীলা চলে গেল বাগানে, একটু পরেই দিদার গলার স্বর আর শুভেশের কাশি তাহাদের ঘর থেকে কাণে এল। ওর ভাবনার সূত্র ছিঁড়ল, সূর্য্যোদয় দেখবে বলে উঠল—শুভদার জন্য বড় দুঃখ হয়, হে ঈশ্বর, তুমি তাকে দেখো।

দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মিসেস কর এবং মিসেস সোম যে যার বিশ্রাম করতে গেলেন, শুভেশ এবং নীলা গল্প করতে লাগল কিন্তু নীলা যে শুভেশের আদর্শ মেয়ে হবে, সে আশা পূরণ হল না, তাই শুভ আবার বল্লে নীলা, নীলু আমার, যদি তুমিও অন্ততঃ আমার কথা শুনতে, শুধু তুমি যদি···

নীলা চোখ বুজে দোলানী ইজি চেয়ারে শুয়ে, আর ক্ষ্যাপা আর্টিষ্ট শুভেশ হলঘরে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগল "আমাদের এই পুরাতনপন্থী সহরটাতে যদি তুমিও অন্ততঃ উচ্চশিক্ষা পেতে calcutta university তে যেতে, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে নীলু, এই রকম অল্পবিদ্যার অন্ধকার ও কুসংস্কারে আজন্ম থেকে প্রাচীনাদের মত কেবল

স্বামীর ঘর করবে, আর বছর বছর ছেলের মা হয়ে জীবন কাটাবে—এ আমার সহ্য হবে না। ব্রাহ্ম তোমরা নামেই, বর্ব্বর যুগের Eveএর অন্তর তোমার একটুও বদলায় নি।"

নীলু 'আদরের নীলা beloved নীলু, এদের একবার দেখিয়ে দাও ত যে জড় অপদার্থের মত বাঁচাটা disgrace, মেয়েদেরও কত জিনিষ করবার আছে···?

'আঃ শুভদা, কেন এত বলছ? আমি এ সব কি পারি? আজ বাদে কাল আমার বিয়ে, আর তুমি lecture দিয়ে energy waste করছ' বলে নীলা শুভেশকে বাধা দিল।

শু—'waste করছি নীলু? তুমি আমার কত আদর্শের জান না, তোমার মত মেয়েকে আমি সাধারণ গৃহস্থের বধূ হতে দেব না, পৃথিবীতে কত কাজ, এ অলস জীবন ভাল লাগে? জনসমাজের, দেশের, কি কাজ তোমরা করছ? অসিত, তোমার মা, দিদা···

নী—থাক, দিদার কথা আর বলতে হবে না, স্মরণ রেখো orphan শুভেশকে ওই দিদাই···

শু—'হাঁ জানি, দিদার কথা বাদ দিচ্ছি—সোমহলকেও উনি বাঁচান, সে ও জানি, কিন্তু তোমরা কি করছ?···নীলা··· রাণী,·· বড় আশা ছিল তোমাকে পাশে নিয়ে দেশের কাজ করব, পয়সা রোজগার আমার ভাল লাগে না, কিন্তু তা হবে না···স্বাস্থ্যের বিকৃতিতেই মরেছি।

নীলা কোন উত্তর দিল না, কেবল দুটো চোখ দিয়ে দুটো অশ্রুকণা ওর সুন্দর রক্তিম গণ্ডদেশে গড়িয়ে এল।

অসিত এল সন্ধ্যের দিকে, যেমন প্রত্যহ আসে সে বেড়াতে, কথা বেশী তাদের হতো না, আজও বিশেষ হল না, খানিকক্ষণ বেহালা বাজালে অসিত, হলঘরে সবাই বসে তখন। রাত্রে গৃহে ফেরার সময় অসিত সবার আড়ালে নীলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে তার গালে ঠোঁটে গ্রীবাদেশে লোভাতুরের মত চুম্বন করে গেল। নীলার যেন ভাল লাগল না, তার দেহের উপর অসিতের এত লোভ, সে ঘৃণা না করে থাকতে পারল না। নীলা অসিতকে আজ আদর করতে পারলে না, কারণ বিবাহের আকর্ষণ, যে বিয়ের জন্য সে মনে মনে পাগল ছিল ছেলে বেলা থেকে সেই আসন্ন বিবাহের প্রতীক্ষার মাধুর্য্য সে অন্তরে অনুভব করলে না, আজ প্রথম।

অসিতকে রোজকার মত বাগানের ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে, দেখে, হলঘর চুপ, অথচ ওদিকে শুভেশ চা পান করে যাচ্ছে মাতালের মদ খাওয়ার মত, এ দিকে দিদা, টেবিলে তাস ফেলে পেসেন্স খেলছে আর মা কি বই একখানা পড়ছে। নীলা আর বসলে না। 'মা যাচ্ছি শুতে, চল্লুম দিদা' বলে নীলা চলে গেল নিজের ঘরে। কাপড় ছেড়েই ধপাস্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

চৈত্রের শেষ, পাতা ঝরা বন্ধ হয়েগাছে গাছে কিশলয়ের আবির্ভাব হয়েছে, বসন্তের এপ্রিলের ফুল কৃষ্ণচূড়া উঠেছে, কিন্তু শুভেশের আর ভাল লাগছে না, বিরক্ত হয়ে সে কলকাতা ফিরবে স্থির করলে। বল্লে—যাচ্ছে তাই সহর, না আছে জলের কল, না আছে ড্রেন, না আছে ইলেকট্রিক, চারিদিকে নোংরা পাড়াগাঁয়ের বদ গন্ধ, আমার অসহ্য লাগছে, কে থাকবে এখানে?

মিসেস্ কর বল্লেন, আর দু'দিন সবুর কর না শুভা, আর ত ক'দিন বাদেই খুকির বিয়ে···

'না, আমি আর থাকতে চাই না!'

"তুই ত বলেছিলি খুব গরম না পড়া মানে জষ্টিমাস পর্য্যন্ত থাকবি, শরীরটাও ভাল করে সারত।"

'না দিদা, আমার ভাল লাগছে না, আমার কাজ করতে ইচ্ছে কচ্চে ভয়ানক'...

বাড়ীর সবাই—নীলা পর্য্যন্ত বিবাহের আয়োজনেই ব্যস্ত, কেউ কি শুভেশের খোঁজ নেয়,. অথচ সবাই বলে থাক থাক,—থেকেই যেতে হল, নীলারও আব্দার।

এদিকে নীলার বিয়ের আয়োজন চলেছে খুব, মা ও দিদিমা উভয়েই ব্যস্ত—গহনা ও জামাকাপড় পছন্দ ও প্রস্তুতিতে প্যাটার্ণ ও ফ্যাসনে আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতির মতামতও বাড়ীতেই পাওয়া যাচ্ছে—অথচ নীলার যেন কোন উৎসাহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—মিসেস কর ও মিসেস সোম অত লক্ষ্যও করেন না, বুড়ীর খরচাতেই বলতে গেলে হচ্ছে সব—তাই থেকে থেকে এটার দাম ওটার দাম অত? বলে তিরস্কার করছেন, কি নিজের ভ্যানিটী প্রকাশ করছেন বলা শক্ত! নীলার মা সেজে গেজে ছেলে

মানুষের মতন ঘুরছেন—কখনও কখনও কৃতজ্ঞতা বশতঃ মাকে খোসামোদ করছেন।

একদিন বিকেলে অসিত নীলাকে একা বেড়াতে নিয়ে গেল তার বাড়ী দেখাতে। বড়লোকের বাড়ী—আসবাব দিয়ে ঝাড় বাতি দিয়ে চমৎকার সাজান—বড় বড় অয়েল পেন্টিং দেয়ালে। একটী বিবস্ত্রা স্ত্রীলোকের তৈলচিত্রকে দেখিয়ে অসিত বল্লে—কি মারভেলাস ছবি দেখ ওটা—রবি বর্ম্মার আঁকা। বানদা বা বেনে বাড়ীর বৈঠকখানায় নগ্নমূর্ত্তির চিত্র বা ভাস্কর্য্যের সমাবেশ থাকে—অসিতের বাড়ীতেও তাই। নীলার কোমরটা ডান হাতে জড়িয়ে ধরে অসিত সব ঘুরিয়ে বেড়িয়ে দেখালে—কিন্তু নীলার বিশ্রী লাগছিল—কেমন যেন একটা ঘৃণা, নগ্নচিত্র দেখে ত গা বমি করে উঠছিল তার। আজ সবচেয়ে স্পষ্ট অনুভব করলে নীলা, যে সে অসিতকে আর ভালবাসছে না—কদিনই তাই মনে হচ্ছিল এবং এই কথাটা কাকে সে বল্‌বে কদিন সে ঠিক করতে পার্চ্ছিল না। ইচ্ছা করছিল—অসিতের হাতটা কোমর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে বসে কাঁদে, বা নিজের অস্তিত্বটা তখনই এই মুহূর্ত্তে জানালা দিয়ে লাফ মেরে শেষ করে দেয়।

চার

রাত্রে শোবার ঘরে নীলা মাকে বল্লে—মা! আমি বিয়ে করব না, করব না—তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, বুঝলে মা! তোমার অসিতকে ভালবেসে থাক্‌তে পারলুম না—আমার আর ভাল লাগছে না, আমায় এখান থেকে পালাতে দাও মা—আমি বুকের এই বোঝা আর সহ্য করতে পারছি না···মুক্তি দাও মা···বলে বার বার করে কেঁদে ফেল্‌লে নীলা।

"না! মা! ও কি কথা···অসিতের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি···ও মিটে যাবে—ঠাণ্ডা হ' মা, অমন হঠাৎ মাথা গরম করে কিছু কোরো না···বড় হয়েছ। অসিত আপনি এসে দেখবি তোর সঙ্গে ভাব করবে।"

নীলা—"কেন আমায় বোঝাচ্ছ মা...তুমি যাও ··আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না।"

মিসেস সোম মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—'দূর বোকা মেয়ে, এই সেদিন কতটুকু ছিলি—এখন আবার তুমি বড় হয়েছ—একজনের বিবাহিতা স্ত্রী হতেছ—তারপর হবে ছেলেপিলের মা আমারই মত, আবার যখন আরও বয়স হবে, তখন তোমারই মত তোমার হবে বিদ্রোহী মেয়ে—সৃষ্টির কাজ ঠিক চলবে—প্রকৃতির যে এই নিয়ম মা—বিয়ে হবে না, এ কি বাগ্‌দত্তা তোমার এখন বলা সাজে?

"তুমি যতই বল মা···আমি স্থির করে ফেলেছি এখন। এবং ওই অসিতের মতন বেনে class ছেলে কখনও বিয়ে করব না—আমি কাজ করব, আরও লেখাপড়া শিখব"। এইটুকু সহজে বলে নীলা আর পারলে না—কান্না মিশিয়ে বলতে লাগ্‌ল—"তুমি, দিদা সবাই আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলেই বাঁচ—engagement আমার cancel কর, আমার এখনও বয়স আছে' কলকাতায় গিয়ে পড়ব—দিদার পয়সায় বড়লোক আদিত্যদের ঘরের বউ হয়ে আমার Future নষ্ট হতে দেব না—ব্রাহ্ম মেয়ে আমি, স্বাধীনতা চাই, তোমরা কিছুতেই ধরে রাখতে পারবে না, দেখ।"

সকাল না হতেই নীলা শুভেশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, মনের মধ্যে ও যে কি বেঁকে দাড়াল, ওই জানে। সারারাত্রি ঘুমোয় নি, আর ফুঁপিয়েছে, অমন সুন্দর টলটলে মুখখানিতে যেন shipwreck-এর ছাপ পড়েছে।

শু—কি ব্যাপার নীলু!

নী—'আমি আর পারছি না শুভদা, তুমি ঠিকই বলেছিলে। অকর্ম্মণ্য নারীজীবন আমার কাছে আজ ভীষণ বিশ্রী লাগছে, আর, আর ওই অসিতের সঙ্গে সারা জীবন ঘর করতে হবে, ভাবলেও যে এখন ভয় করছে শুভদা!'

'Bravo, bravo, নীল ড্রা এই ত চাই—that's good সার্থক জনম তোমার' বলে, শুভ চীৎকার করে হাসতে লাগল।

নীলা—আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। তুমি আমায় নিয়ে চল সহরে, আমি কাজ করে স্বাধীন জীবন যাপন করব।

শু—সে পরে হবে, এখন আবার পড়া সুরু করতে হবে, কালকেই আমি যাচ্ছি, তুমি যাও ত ষ্টেশনে আলাদা গিয়ে

দেখা করো। তোমার কাপড় জামা আমার কাছে দিয়ে যেও, আমার ব্যাগে নিয়ে নেব। টিকিট আমি কেটে রাখব। see off করবার নাম করে গিয়ে ছাড়বার ঘণ্টা পড়লেই গাড়ীতে চড়ে বসো। কলকাতা পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই যাব, তারপর ওখান থেকে তোমাকে একলাই বোলপুরে যেতে হবে।

নীলা—বেশ তাই হবে, তোমার যা ইচ্ছা—কিন্তু কলকাতায় তুমি থাকবে—Victoriaতে পড়লেই ত হত?

শু—না, নীলু, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি না—অথচ চাই তুমি হও আমার আদর্শ মেয়ে।

সেদিন রাতে নীলা ভয়ানক ঘুমুল—পাশে মা শুয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, মিসেস সোম ভাবলেন, সাময়িক উত্তেজনাই বোধ হয় কাল মেয়েটাকে অত অস্থির করেছিল, আজ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাচ্ছে—

পাঁচ

নিদ্রিত জননীর পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে গেল নীলা ঘর থেকে। ভয়ানক বিষ্টি হচ্ছে বাইরে, পোর্টিকোর সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে—শুভেশকে তুলে দিতে মিসেস কর বারান্দায় রয়েছেন, নীলাকে দেখে বললেন তুই সেজে গেজে এলি যে?

শুভদাকে সী অফ্ করতে যাব—

এই বিষ্টিতে! বলিস কি নীলু? তোর যত উদ্ভট কাণ্ড।

যাস নে নীলু…কথা শোন, কি ভীষণ জল পড়ছে…নীলা শুনল না কথা…উঠে বসল গাড়ীতে…নির্ব্বাক, কোন কথার উত্তরও না, দিদিমাকে বলাও হল না শেষকালে যে ও চলল, সী অফ্ করতে নয়, একেবারেই কিছুদিন…বিয়ের কথা ভুলে যাও' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটর ছাড়তেই, নীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে ঢলে পড়ল শুভর কাঁধে—'শুভদা কি করলুম আমি বাগ্‌দত্তার honour টুকুও রাখতে পারলুম না।'

ভাবলে, কি-ই বা এমন দোষ করেছে অসিত, সে ত কত ভালবাসে কত আদর-যত্ন করে…আর মা, দিদা কি দুঃখই না করবে।

ট্রেণে উঠে নীলা একটু হিষ্টিক ভাব করলে, পাগলের মত খানিকটা খুব হাসি হাসলে, ঠাট্টার গোটাকতক কথার ফাঁকে শুভেশের সঙ্গে, তারপর আবার কাঁদতে লাগল, শেষে হাতযোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে মাকে দেখো, মা যেন ভেঙ্গে না পড়ে।

মাকে দিলে টেলিগ্রাম করে—মা, তুমি কিছু ভেব না—আমি শুভদার সঙ্গে চললুম লেখাপড়া শিখতে এবং মানুষ হতে। যে স্বাধীনতা আজ নিজে নিলুম, তাকে সার্থক করে তবে তোমার চরণে পৌছব। ইতি—

তোমার অপরাধী মেয়ে নীলা।

বড় জংসন ষ্টেশনে Telegram পোষ্ট করলে। বৃষ্টি কমে এসেছে কিন্তু আকাশ থম্‌থমে, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

অনেকদিন কেটে গেল, নীলার আর ভাল লাগছে না স্কুলে, বাড়ীর জন্যে, মার জন্যে, দিদিমার জন্যে ভয়ানক মন কেমন করছে। শুভেশের জন্যেও বড় মন কেমন করছে। বাড়ীর চিঠি মাঝে মাঝে আসে, শেষ পত্রে মনে হল তাঁরা ক্ষমা করেছেন অবাধ্য মেয়েকে—যে এন্‌গেজমেণ্ট ভেঙ্গে পালিয়ে আসতে পারে—শুধু এইটুকু ভেবেই বোধ হয় যে, নীলা কোন নোবল কাজের জন্যই পালিয়ে এসেছিল। শুভেশ রুগ্ন, ভাল ছেলে বলেই তাঁরা জানতেন, কিন্তু অমনভাবে নীলার আসাতে তাকেও যথেষ্ট সন্দেহ করেছিলেন মিসেস কর ও মিসেস সোম। ছোট সহরটীর সাধারণ মন্দিরে ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও এ বিষয় বেশ গোলমাল হয়েছিল, বিশেষতঃ আদিত্যদের উৎসাহে। আই, এ পরীক্ষা দিয়ে নীলা দেশে ফেরবার ট্রেণ ধরলে। যাবার পথে কলকাতায় শুভেশকে দেখতে এল। শুভেশকে যেন ঠিক তেমনই রোগা মনে হল—সেই দাড়ী-গোঁফ না কামান সুন্দর কৃশ গৌরবর্ণ মুখখানার মধ্যে বড় বড় চোখগুলি এখনও মেয়েদের আকর্ষণের বস্তু। তেমনি থেকে থেকে কাসছে, যেন একটু বয়স হয়েছে বলে মনে হল, চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

দরজার দিকে ফিরতেই নীলাকে দেখে বললে—'মাই গড, নীলা এসেছ, মাই ডারলিং নীলু, সাড়া দাওনি যে,' বলে হাসতে লাগল সেই অকারণে।

শুভেশ এখন একটা প্রেস্ করে সচিত্র মাসিকপত্র চালাচ্ছে—নীলা দেখলে তার শুভদা তেমনই কেবল কাসে,

হাসে, আর চা খায় কাপের পর কাপ। প্রেস্‌-ঘরটা কি নোংরা, যেখানে সেখানে সিগারেটের টুকরা পড়ে—ছাই আর দেশলাইএর কাঠী চারিদিকে—চা খাওয়া কাপ, ভাঙ্গা প্লেট, এদিক ওদিক ছড়ান, চতুর্দ্দিকে কাগজের জঞ্জাল সেই আবর্জ্জনার মাঝে এসেই অফিস-ঘরে নীলাকে এনে শুভেশ বসাল।

নীলা দেখলে তার শুভদা কোনরূপ আয়েস ও যত্নের ধার ধারে না—আর কেই বা যত্ন করবে—কোন রকমে যেন দৈনিক জীবন কাটাচ্ছে। অসুস্থ শরীরের সেবা করবারই বা কে আছে? ভাবলে শুভদার কাছে থেকে পড়াশুনা করলে দেখা শুনা করতে পারত, কিন্তু তাদের সমাজ পছন্দ করত না, সে বেশ বুঝতে পারে।

নীলা থাকতে পারল না, বল্লে—শুভদা! কি রকম করে আছ বল ত? কেবল লোকস্থান দিয়ে কাগজ চালালে যে ফতুর হয়ে যাবে শুভদা

শুভর গলা কেসে কেসে আর বুকের চাপে ঘড়্‌ঘড়ে হয়ে গেছে, বল্লে—'কেন! কি খারাপ আছি নীলু: বেশ ত' আছি, তোমরা ভুল বুঝছ, আমার মিশন এই কাগজের মধ্য দিয়েই পূর্ণ হবে।'

নী—'কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার খুব শরীর খারাপ।'

শু—'আঃ: ও কিছু নয়: তবে হ্যাঁ, অসুস্থ নই বলি কি করে, তবে খুব খারাপ নয়......

নী—'শুভদা, ও শুভদা, দোহাই তোমার, শরীরকে তুমি এমনি নষ্ট ক'র না,' বলে কাঁদতে লাগল, তিরস্কারের সুরে বল্লে—একটা ডাক্তারও কি দেখাতে পারনি, কেন তুমি স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও নি? বল শুভদা, ও শুভদা! বল না, তোমার অভাব কিসের?... বলে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্‌ল নীলা।

নীলা সামলে নিলে—শুভ নিরুত্তর, নীলার মনে হঠাৎ কোন কারণে অসিতের কথা, অসিতের সেই বাড়ীর কথা, সেই বাড়ীর হল-ঘর, সেই নগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তির তৈলচিত্রখানি এবং ছেলেবেলার ছোটখাট কতকগুলি ছিন্ন চিত্র নিমেষে ঘুরে গেল বায়স্কোপের ছবির মত। শুভেশকে যেন আর তেমন আগের মত কাল্‌চারর্ড বলে মনে হল না।

আবার বল্লে—ওগো, শুভদা? তোমার এত অসুখ, তুমি আমাকে লেখনি কেন—আমি হয় ত কিছু সেবা তোমার করতে পারতুম, যাতে তুমি এত রোগা এবং কাবু হয়ে যেতে না। তুমি যে আমার কি উপকার করেছ, তার কিছু রিটার্ণ দেবার ফুরসৎ পেতুম। তুমি যে আমার সত্যিকার, এখন সবচেয়ে নিকট, সব চেয়ে প্রিয়, তা কি জান না শুভদা।

শুভর এমন অবস্থা দেখে নীলা ওর সেবা-যত্ন করবার জন্য জোর করে ক'দিন রয়ে গেল, তারপর একটু ভাল হতে শুভেশ তাকে বাড়ী ফেরবার তাগিদ দিয়ে একদিন সকালে সত্যই শিয়ালদহের প্লাটফর্মে এনে ফেল্‌লে নীলাকে দেশের ট্রেন ধরতে।

গাড়ী ছাড়তে নীলার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে তার তালুতে একটু ছোট চুম্বন করে শুভেশ বল্লে—কিছু ভেব না নীলু, ভাল হয়ে যাব। তোমার, তোমার এ ক'দিনের সেবার কথা ভুলব না...

যতদূর দেখা যায় ট্রেনের গবাক্ষ-পথ দিয়ে নীলা দেখলে শুভদা তার অতি শীর্ণ লম্বা লম্বা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রোগা হাত দিয়ে রুমাল নাড়ছে।

কেন জানি না, নীলার একটা ভীষণ ভয় হল শুভদা তার বেশীদিন বাঁচবে না ভেবে।

মফঃস্বলের সহর, দুপুরের রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করছে—নীলা ষ্টেশন থেকে নেমে একটা গাড়ী করে বাড়ী এল। তেপান্তরের মাঠ ভেঙ্গে, বিশাল জলা ভেঙ্গে ওদের কুটীরগুলির সামনে যখন এল, মনে হল বাড়ীগুলা যেন কত ছোট মনে হচ্ছে, সব ঘরগুলি যেন রবির আলোয় ঝিমুচ্ছে—মনে পড়ল সেই কত দিন আগে যেন ভোরের আলোয় ঝমঝমে বিষ্টিতে শুভদার সঙ্গে এখান থেকে বিদায় নিয়েছিল।

নীলাকে দেখে দিদা তার ত তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কাছে বসাল—সারা দেহ তার কাঁপছে, আরও বুড়ো হয়েছে আরও থপথপে হয়েছে। কাঁদতে থাকল বুড়ী—'নীলু, এলি দিদি ফিরে, কেন মা এতদিন আসিস নি'?

নীলার মাও যেন বুয়স্থার মতন হয়ে গেছেন। কথায় কান্নায় খানিকক্ষণ কাট্‌ল—নীলা বুঝলে যে, তার বাবার পর অনেক ব্যাপার হয়েছে, যাতে আজ ওদের সমাজে সে পজিশন

নেই, বাগ্‌দত্তা মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি সমাজের কেউই পছন্দ করেন নি। সে হল ঘরে আর আড্ডা জমে না, নিমন্ত্রণ করলেও কেউ আসে না, নীলা যে পড়াশুনা করতে গেছে তা কেউ মানতে চায় না, বলে—অজ্ঞাতকুলশীল পালিত পুত্র শুভেশের সঙ্গে সে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি—

তার ওপর একদিন পুলিশ এসে গভীর রাত্রে খানা তল্লাসী করে কি সব বার করে বোঝায় যে মিসেস কর কি সব অন্যায় ভাবে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাতে মামলা হয়—তাঁরা জিতলেও—সে সুখের জীবনের প্রত্যাগমন হয়নি।

নীলার যেন বড্ড ফাঁকা ফাঁকা আর একা মনে হচ্ছিল—সেই তাদের সোমহল, কি হল এর, যে হল পার্টিতে পার্টিতে গানে, বাজনায় হাসি ঠাট্টায়, খেলায় জমে থাকত, সেখানে যেন একটা শুষ্কতাই বিরাজ করছে।

সেই পুরাতন দিনের শোবার ঘর ওদের, রাতে মার সঙ্গে শুয়ে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এল নীলার কিন্তু মা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন বল ত' মা, তুই খুব খুসী হয়েছিস্ ত'—যে জন্ম তুই চলে গেলি, তা পেয়েছিস্?

'হাঁ মা!'

'তা হলেই ভাল মা' বলে তিনি প্রার্থনা করে শুয়ে পড়লেন। খানিক বাদে বল্লেন—তুই যেদিন চলে গেলি আর এলি না, তারপর তোদের টেলিগ্রাম এল—মা ত' পড়েছ একেবারে বসে পড়লেন—এমন পড়লেন যে তিনটি দিন নড়েন নি, বলেছিলেন তোর মেয়ে আমার সমাজে মুখ দেখান বন্ধ করলে। তারপর কত করে বোঝাই যে সে মুক্তির আলোর খোঁজে গিয়েছে···

নীলা গভীর ঘুমে, চৌকিদার হাঁক মেরে গেল, মিসেস সোমের চোখে তখনও ঘুম আসে নি—কি ভাবছেন—কেবল কি ভাবছেন।

নীলা নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে মাস খানেক কাটিয়ে দিলে ভাল না লাগলেও, পয়সা কড়ি যা শুভ দিয়েছিল তা এখনও রয়েছে, ফুরবার আগেই যেতে হবে। মাকে দেখলে নীলার দুঃখ হয়, দিদিমার সংসারে মা যেন ঠিক সেই দূর আত্মীয়ার মতই আছে, একটা পয়সা দরকার হলেও সেই বুড়ীর কাছে চাইতে হয়।

মা আর দিদিমা, নীলা দেখলে পাড়ার লোকের সঙ্গে বিশেষ করে আদিত্যদের সঙ্গে দেখা হবে বলে বাড়ীর বাইরে বড় যায় না, রবিবার মন্দিরেও নয়। ও একাই একটু বাগানে বা পথে বেড়ায়, মনে হয়, তাদের পল্লী যেন কত বুড়ো হয়ে গেছে। কোন পড়সীও আসে না গল্প করতে, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, নীলার অসিতের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে আর সর্বক্ষণই অন্তরে শুভেশের জন্ম দুশ্চিন্তা হয়। পাড়ার ছেলেগুলো এমন পাজী, আবার যদি কখনও ওকে দেখতে বা গলা শুনতে পায় বেড়ার কাছে এসে পরস্পর বল্‌বে···সেই বাগ্‌দত্তা রে, যে পালিয়ে গেছল।

একদিন নীলা শুভেশের চিঠি পেল, ঢাকা থেকে লিখেছে, যে কাজের জন্ম গিয়েছিল তা হয়েছে কিন্তু আবার অসুখে পড়েছে, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে মিটফোর্ড হাসপাতালে একপক্ষকাল শুশ্রূষার জন্য বন্দী।

নীলার চোখে জল এল, শুভদাকে সে ভালবেসেছিল কিন্তু শুভদা যে বাঁচবে না এ যেন ও স্পষ্ট দেখলে। শুভদা যে ওর গুরু, শুভদাই যে ওর স্বামী, শুভদাই তার ভাবী সন্তানের পিতা, এখন সে কাকে বলবে? সারা রাত্রি সে ঘুমাতে পারলে না। সকালে উঠে ওদের ঘরের জানলার ধারে বসে আছে—তখন সবে ৭টা, শুনতে পেলে দিদিমা যেন কাকে খুব উত্তেজিত হয়ে দ্রুত কি জিজ্ঞাসা করছে, তার উত্তরে কে যেন কাঁদতে লাগল। নীলার বুকের ভিতরটা ঢিব্ করে উঠল, তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এল, দেখলে দিদা ঘাড় নীচু করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, আর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। টেবিলের উপর একটা টেলিগ্রাম পড়ে। দিদিমা নীলাকে দেখে—"ওরে শুভ আমার, ওরে শুভ কেন গেলি রে"···বলে কাঁদতে লাগলেন, নীলাও ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল—টেলিগ্রামটা তুলে দেখলে তাতে লেখা রয়েছে···"কাল সন্ধ্যায় শুভেশের মৃত্যু হয়েছে···অসুখটা যক্ষ্মা—ঢাকা—"

কদিন কান্নাকাটির পর একদিন সকালে নীলা ঠিক করলে এখানে ও থাকিবে না, যে দিকে দু'চক্ষু যায় চলে যাবে···কি করবে সে, এইটেই যে বড় ভাবনা—এখানেও যে তার করবার কিছু নেই—যে জীবন পাবার জন্ম সে ছুটে বেরিয়ে গেছল তা কি সে পেল? আর ভবিষ্যতের কথা—সে ভাবতে পারে না...মাথা ঝিম ঝিম করে।

পরদিন ভোর রাত্রে নীলা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল, মা দিদিমা তখনও ঘুমাচ্ছে, বাহিরে তেমনই বৃষ্টি, যেমন সেদিন, সেই শুভর যাওয়ার দিন পড়ছিল। শুভর সেই ঘরটা তেমনি পড়ে আছে, দেয়ালে একটা ছবি টাঙ্গানো, আল্‌নায় একটা চটী জুতা সে এখানে এলে পরত। টেবিলে একটা চায়ের কাপ উপুড় করা। ওর বিছানার উপর আবেগ ভরে পড়ে একটা চুমা খেলে নীলা, তারপর ছবির কাছে গিয়ে বল্লে, "চল্লুম শুভদা, গুড বাই, তোমার কাছে না গিয়ে তোমার আশীর্বাদকে যেন মানুষ করতে পারি, এই বর তুমি দিও। নারীত্ব ফোটাতে নারীজীবনকে সার্থক করতে তুমি চেয়েছিলে, তা যেন আমি করি। টপ টপ করে নীলার গণ্ড বেয়ে অশ্রু এল নেমে, বল্লে, "ভগবান আমার সহায় হউন, চলি প্রিয়তম!"

শুভর দেওয়া একশত টাকা তখনও নীলার ছিল, সেই নিয়ে এক হাতে একটি ব্যাগ ধারণ করে আর এক হাতে ছাতা নিয়ে কাউকে না বলেই নীলা বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে—টিপ টিপ করে বিষ্টি তখনও পড়ছে—চৌকাঠ পেরোতেই শুনলে হলঘরের ঘড়িতে ঢং করে বাজল সাড়ে ছ-টা।

বাংলার কৃষি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার এট্-ল,

রাঙা মাটী দিয়ে দেয়ালগুলি লেপা ঝক্‌ঝকে সুন্দর,
গোময় গুলিয়া উঠান নিকানো দক্ষিণদ্বারী ঘর।
গোয়ালেতে গরু পুকুরেতে হাঁস,
চাষি বাস করে সুখে বারো মাস,
পালানে উচ্ছে বেগুন-কুমড়া ফলিছে বছর ভর।

অসীম পুলকে কচি ধানগুলি সমীরণে খায় দোল,
মাঠ হ'তে উড়ি যতনে নিড়ায় শোনা যায় কলরোল,
ছাটার কিষাণ ধরিয়াছে গান
আনন্দ-ভরা অফুরান প্রাণ—
নদী জলে যেন পালতোলা নাও তুলিয়াছে কল্লোল।

অতি ভোরে উঠে ক্ষেতে চলে যায় জোয়াল ফেলিয়া কাঁধে,
প্রখর খরায় মাথার উপরে চিল উড়ে উড়ে কাঁদে!
আনমনে চাষি লাঙল চালায়,
ডিঙ্গি বায় বায় গরু দুটি ধায়
ক্ষণিক জিরায়ে কল্কে ধরায় গামছা মাথায় বাঁধে।

প্রাঙ্গণ-তলে তুলসী তলায় নিত্য কিষাণী সাঁঝে,
অঞ্চলে ঢেকে প্রদীপ জ্বালায় নম' করে নত লাজে।
হোগ্‌লাপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা
কুঁড়ে ঘরে আছে সোণার ছেলেরা
আলো করে আছে হাসিমুখগুলি শত দৈন্যের মাঝে।

রাঙা মাটী দিয়ে ঘরগুলি লেপা তক্‌তকে সুন্দর।
লাউয়ের মাচায় পড়িয়াছে জালি দক্ষিণদ্বারী ঘর।
বাঙলার কৃষি বাঙলার মান
বাঙলার বল বাঙলার প্রাণ,
পুকুরে উলসে চিতল, গোয়ালে উঠিছে হাম্বাস্বর।

সেক্সপিয়ার ও বাংলার নাট্যকার

শ্রীমাখনলাল সেন

লোকে সাধারণতঃ গিরিশচন্দ্রকে Shakespear of Bengal (অর্থাৎ বাঙ্গলার সেক্সপিয়ার) বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় ইহাতে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার প্রতি সম্যক ন্যায় বিচার করা হয় না। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র প্রাদেশিক সেক্সপিয়ার, তার উপরে আর কিছু নয়—এ যেন অনেকটা "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" এরই মত অবিচারপূর্ণ তুলনামূলক সমালোচনা; জিনিষটাকে মোটেই তলাইয়া না দেখিয়া একটা মতামত প্রকাশ করা। যাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁহাদের প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় এত সহজেই দেওয়া যায় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তৈয়ারী জামা-জুতার মত "রেডী মেড্" সমালোচনা খাটে না। এ বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নাট্যসাহিত্যে সেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী প্রায় একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন। অনেকের মতে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, আবার কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ নাট্য-কবিদের মধ্যে তাঁহাকে অন্যতম মনে করেন। অনেকের মতে সেক্সপিয়ার কেবল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার নহেন, তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যিক-দিগের মধ্যেও যে মতভেদ না দেখা যায় এমন নহে। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক (যিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, সমালোচক ছিলেন) ভল্টেয়ার নাট্যকার হিসাবে সেক্সপিয়ারের বহু দোষ ধরিয়াছেন। যুগঋষি টলষ্টয় সেক্সপিয়ারকে বড় কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার লেখার মধ্যে অনেক দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার বার্ণার্ড শ'ও সেক্সপিয়ারের লেখার বহু দোষ ধরিয়াছেন। বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও সমালোচক হ্যালাম্ সেক্সপিয়ারের ভাষার দোষ ধরিয়াছেন। সেক্সপিয়ার যে জগতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু কি কাব্যে, কি নাট্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই, এই কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সেক্সপিয়ারের নিছক কবিতা Venas Adonais (ভিনাস এডোনিস্), Rape of Lucrece (রেপ অফ্ লুক্রেশ) Passionate Pilgrim (প্যাশোনেট পিলগ্রীম) ও Sonnet (বা চতুর্দ্দশ পদাবলী কবিতা) সাহিত্য জগতে বিদ্যমান। কিন্তু এই সকল কাব্যের দ্বারা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দাবী করা যায় না। সেক্সপিয়ারের কাব্য-প্রতিভা প্রকৃত পক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার নাটকে। কিন্তু কাব্যের প্রাণ যে অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্য ও অনাবিল আনন্দ, যাহা আমরা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও অভিজ্ঞান শকুন্তলায় দেখিতে পাই, এমন মর্ম্মস্পর্শী, মধুর অথচ উচ্চস্তরের কবিত্ব আমরা সেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাই; যেমন গগন-স্পর্শী কল্পনা, স্বর্গীয় সুষমা, তেমনই ভাবের সম্পদ ও মাধুর্য্যের মন্দাকিনী। মিলনান্ত নাটক, বা কমিডির মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে জগতের সাহিত্যে এমন নাটকই নাই। অথচ বলা হইল, "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজিডির চলন ছিল না; কিন্তু কালিদাস শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে যে Tragicpower বা বিয়োগান্ত নাটক লিখিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা নাট্য সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। অথচ আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছি, Kalidas is Shakespeare of India (অর্থাৎ কালিদাস ভারতের সেক্সপিয়ার)। আমাদের দেশে যেই একজন কেহ কোন বিষয়ে নাম করিলেন, বা বড় হইলেন, অমনি বিলাতী মাপকাঠিতে তাঁহার প্রতিভার মাপ আরম্ভ হইল। উনি বাংলার শেলী, তিনি বাংলার রাস্কিন, ইনি ভারতের ডিমস থেনিস্ ইত্যাদি। দাস-মনোভাব এমনি আমাদের মজ্জাগত! "রেডীমেড্" সমালোচনার এমনি মোহ!

ফরাসীরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার রেসিনকে খুব উচ্চ আসন দেয় বলিয়া ইংরাজেরা উপহাস করিয়া বলেন, 'Racine is a French superstition' (অর্থাৎ রেসিনের অতিপ্রশংসা ফরাসীদের কুসংস্কারের মধ্যে)। কিন্তু একান্ত

দুঃসাহসিক ব্যক্তি ছাড়া ইংরাজদের মধ্যে কেহ সেক্সপিয়ারের লেখার মধ্যে যে সামান্য একটুও দোষ থাকিতে পারে ইহা বলিতে সাহস করেন না। সেক্সপিয়ারের একজন বিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন, সেক্সপিয়ারকে যে যত উচ্চে তুলিতে পারে ও তাঁর সম্বন্ধে বাড়াইয়া বলিতে পারে সাহিত্যে তার তত খ্যাতি।

"Since the rise of Romantic Criticism, the appreciation of Shakespeare has become a kind af auction, where the highest bidder, however extravagant, carries off the prize."

আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে সেক্সপিয়ার যে জাতীয় নাটক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের আর কোন নাট্যকারই যে তুল্যরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, তাঁহার সজীব কল্পনা (life giving imagination)" প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্রকে জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষের মত একান্ত সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই নাট্যকার বা কবির উচ্চ প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমরা ইহার দ্বারাই গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার বিচার করিয়া দেখিব।

নাটকের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে। সব নাটক এক জাতীয় নয়। নানা শ্রেণীর নাটকে নানা নাট্যকার অতি উচ্চ প্রতিভা ও অপূর্ব্ব নাট্য-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন বিভাগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্; চার পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে যে-সমস্ত খ্যাতনামা নাট্যকার ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেক্সপিয়ার মলেয়ার, গেটে, শীলার, রেসিন, ইবসেন, বার্ণার্ড শ,' মেটার লিঙ্ক, গলস্‌ওয়ার্দ্দী বেনেভেন্টোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা আপন আপন নাটকের মধ্যে যে উচ্চপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ও রচনার যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা যেমন অনেকে সেক্সপিয়ারের অপেক্ষা ছোট, আবার অনেক বিষয়ে সেক্সপিয়ারের সমকক্ষ, এমন কি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষাও শক্তিশালী। যদি কেহ প্রথমেই বেয়াদবী মনে না করেন, তবে বিনীতভাবে বলিতে পারি যে, উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতম। গিরিশের দুর্ভাগ্য তিনি বাংলা দেশে জন্মিয়াছিলেন; আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি এ দেশে জন্মিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ জগতের কাছে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় এখনও জগৎ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরাজীতে অনূদিত না হইলে রবীন্দ্রনাথ প্রাদেশিক কবি মাত্র থাকিয়া যাইতেন। গিরিশচন্দ্রের দুর্ভাগ্য আজও পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি ভাল নাটকের ইংরাজিতে অনুবাদ বাহির হয় নাই। তাই গিরিশের খ্যাতি বাংলার বাহিরে প্রচার হইতে পারে নাই। তাই বলিয়া গিরিশচন্দ্র জগতের খ্যাতি লাভের অযোগ্য নহেন। তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক-গুলির মধ্যে যে নাট্য-প্রতিভার ও সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতি বিরল। তবে গিরিশচন্দ্র গরীব বাঙ্গালী, বাংলার বাহিরে কেহ তাঁর খোঁজ রাখে না। এমন কি, আমাদের দেশের সাধারণত শিক্ষিত ব্যক্তি সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে যত খবর রাখেন, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তার অর্দ্ধেকও রাখেন না। অথচ নাট্যকৌশলে, রচনাভঙ্গীতে ও চরিত্রসৃষ্টিতে সেক্সপিয়ারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার দুই একটি বিষয়ে আলোচনা করিব।

সেক্সপিয়ারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এক বিষয়ে অতি আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। দু'জনেই সামান্য অভিনেতা হইতে নাট্যকারের উচ্চ আসন গ্রহণ করেন। তবে সেক্সপিয়ার জীবিকা অর্জ্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন; আর গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাব দূর করিবার জন্য আপনার চাকুরী ছাড়িয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। সেক্সপিয়ারের একজন বিজ্ঞ সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The world that he lived in, the stage that he wrote for, those have left their mark broad on his plays; so that those critics who study him in a philosophical vacuum are always liable to err by treating the fashions of his theatre as if they were a part of his creative genius. He was not a lordly poet who stooped to the stage and dramatised his song; he was bred in the tiring room and on the boards; he was an actor before he was a dramatist." Sir Walter Raleigh.

অর্থাৎ সেক্সপিয়ারের নাটকে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও সেই সময়কার রঙ্গমঞ্চের প্রচুর ছাপ রহিয়াছে। সেক্সপিয়ারের নাটক বুঝিতে হইলে সেগুলিকে বাদ দিলে চলিবে না। সেক্সপিয়ার অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন না যে অবসর বিনোদনার্থ সখ করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিবেন। তিনি সাজঘরের আওতায় মানুষ হইয়াছেন। নাট্যকার হইবার পূর্ব্বে তিনি অভিনেতা ছিলেন। উপরোক্ত সমালোচক আর এক স্থানে বলিয়াছেন।

"Shakespeare's beginings were not courtly, but popular. He was plunged into the wild Bohemian life of actors and dramatists at a time when nothing was fixed or settled, when every month brought forth some new thing and popularity was the only road to success. There was fierce rivalry among the company of actors to catch the popular ear."

অর্থাৎ সেক্সপিয়ারের নাট্যজীবনের প্রারম্ভটা জাঁকজমকের কিছুই নয়। সেই সময়কার অভিনেতা ও নাট্যকারদিগের আমোদপ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সঙ্গে সেক্সপিয়ার একান্ত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন।

উপরোক্ত উদ্ধৃত মন্তব্য দুটিই গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তুল্যরূপে প্রযোজ্য। গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবনের প্রারম্ভ সেক্সপিয়ারের প্রারম্ভেরই অনুরূপ। শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধেও সেক্সপিয়ারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়।

সেক্সপিয়ার স্কুলে কি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। বেশী কিছু যে শিখিয়াছিলেন মনে হয় না। পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেক্সপিয়ারের কোন দিনই বেশী ছিল না। তাঁহার বন্ধু, সহকর্ম্মী ও সহচর বিখ্যাত নাট্যকার বেন জনসন্ বলেছেন, "সেক্সপিয়ার খুব সামান্যই ল্যাটিন জানিত, গ্রীক তার অপেক্ষাও কম।" অথচ সেক্সপিয়ারের নাটকগুলিতে তাঁহার যে অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা একান্ত বিস্ময়কর। কেবলমাত্র এই অলৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া স্যার এডোয়ার্ড ডার্লিংটন্ 'Bacon is Shakespeare" অর্থাৎ সেই সময়কার বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত বেকনই সেক্সপিয়ার এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ও মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম রহস্য যে তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কবি গ্রে বলিয়াছেন, প্রকৃতিদেবী সেক্সপিয়ারের সম্মুখে তাঁহার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখা দিয়াছিলেন।

"To him the mighty Mother did unveil
Her awful face." —Gray.

সেক্সপিয়ার তাঁহার 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকে বলিয়াছেন :

"Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones and good in everything."

ভাবার্থ, তরুলতা, স্রোতস্বতী, প্রস্তরে অর্থাৎ প্রকৃতির সর্ব্বত্র জ্ঞান ও মঙ্গলের বাণী ফুটিয়া আছে। অবশ্য, সেক্সপিয়ারের সময়কার সমাজ তাঁহাকে লোকচরিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত কম শিক্ষা দেয় নাই। Holmes তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'Autocrat of the Breakfast Table" হইতে যে বলিয়াছেন, "Society is a strong solution of books" একথা একান্ত সত্য। সেক্সপিয়ারের 'বিশ্ববিদ্যালয়' বিশ্বপ্রকৃতি ও জনসমাজ,—এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা এইরূপ। গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা একান্ত বিস্ময়কর। তাঁহার নাটকগুলি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। অতি জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব বা দার্শনিক সমস্যার অপূর্ব্ব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, একান্ত সরল ভাষায় তিনি নাটকীয় চরিত্রের মুখ দিয়া এমনি সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত জটিল তত্ত্ব যে প্রকৃতপক্ষে একান্ত গভীর ও জটিল তাহা পাঠক বা দর্শকের মোটেই মনে হয় না। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কোন বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে কেহই সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৌশলের ও কাব্যপ্রতিভার ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অতি উচ্চস্তরের কবি বা লেখক ভিন্ন এই শক্তি অর্জ্জন করা অসম্ভব। The highest art consists in concealing art—এ কথার সার্থকতা এইখানে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাঃ দিনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন "গিরিশচন্দ্র ছিলেন বিদ্যার জাহাজ" কিন্তু এই বিদ্যা কোন পুঁথিগত বিদ্যা

নহে ইহা প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞান। সেক্সপিয়ারের মত গিরিশচন্দ্র ইহার জন্য একমাত্র তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কাছে ঋণী। প্রকৃতি ও বাংলার সমাজ গিরিশচন্দ্রের জ্ঞাননেত্র উন্মেষের পক্ষে কম সহায় হয় নাই। বইপড়া বিদ্যা এমন সজীব হয় না। অবশ্য গিরিশ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিদ্যা কখনও তাঁহার বা অপরের পক্ষে পীড়াদায়ক হয় নাই। পাঠক বা দর্শকের কাছে কখনও দুর্ব্বহ বা দুঃসহ হইয়া উঠে নাই। এই 'সহজ' জ্ঞান আমরা একমাত্র সেক্সপিয়ারের ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখিতে পাই।

সেক্সপিয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও প্রথমে অভিনেতা রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই বিষয়ে সেক্সপিয়ারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অভিনেতা হিসাবে সেক্সপিয়ার যশস্বী হইতে পারেন নাই। সেক্সপিয়ারের সময়ে বারবেজ্ প্রভৃতি অভিনেতারই খুব নাম-ডাক ছিল। মরিস্ বেরিং 'দি রিহার্সেল' নামে যে একখানি ক্ষুদ্র এক অঙ্কের নাটিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সেই ম্যানেজার বলিতেছেন, "সেক্সপিয়ার সেটনের অভিনয় করিবে। আমরা তাকে ডানকানের পার্ট দিয়াছিলাম, কিন্তু সে তার উপযুক্ত নয়।"

(ম্যাকবেথ নাটকের রিহার্সেলে)

The stage Manager: 'Mr. Shakespeare is playing Sayton. (Aside) We cast him for Duncan, but he wasn't up to it."

কথিত আছে যে সেক্সপিয়ার তাঁহার "হ্যাম্‌লেট" নাটকে হ্যাম্‌লেটের পিতার প্রেতমূর্ত্তির ও "এ্যাজ ইউ লাইক্ ইট" নাটকে বৃদ্ধ চাকর 'এ্যাডামের' অভিনয় করিতেন। তাঁহার বন্ধু বেন্ জন্‌সনের ভল্‌পোনি নাটকে পাত্র-পাত্রীর পার্টে যে অভিনেতা নিয়াছেন তাহাদের নামের তালিকায় সেক্সপিয়ারকে একটি সামান্য পার্ট দেওয়া হইয়াছিল দেখিতে পাই। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র সেক্সপিয়ারের বহু উর্দ্ধে। আজ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাংলাদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের যে কোন সুবিখ্যাত অভিনেতা অপেক্ষা গিরিশচন্দ্র বিন্দুমাত্র ন্যূন বা কম শক্তিশালী ছিলেন না। যে একবার গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিয়াছে সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। গিরিশচন্দ্রের যৌবনের অভিনয় দেখি নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ক্লাসিক, মিনার্ভা, ষ্টারে তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে।

এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, গিরিশচন্দ্রের কোন অভিনয়, বা কোন পার্টটি সব চেয়ে ভাল হইয়াছে, তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া একান্ত সুকঠিন। নিমচাঁদ, না যোগেশ? পশুপতি, না সীতারাম? চন্দ্রশেখর, না হরিশ? রঙ্গলাল, না করুণাময়? বিদূষক, না করিম চাচা? প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের এমনই একটি বিশেষত্ব ছিল যাহা অন্য কাহারও পক্ষে অনুকরণ করা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। একমাত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী রঙ্গাভিনয়ে গিরিশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গভীর ট্র্যাজিক পার্ট এমন অপূর্ব্ব সহজ ভাবে আর কেহই অভিনয় করিতে পারেন নাই ছায়াচিত্রের পাশ্চাত্যের সুবিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় দেখিয়াছি; গিরিশচন্দ্রকে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া মনে হয় নাই; বরং বহু অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হইয়াছে। এমন লম্ফ-ঝম্ফশূন্য, সহজ অথচ গভীর মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। এমন কি অমৃত মিত্র, মহেন্দ্রলাল মিত্র ও গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বা সুবিখ্যাত দানীবাবু—যাঁহাদের সমকক্ষ ট্র্যাজিক অভিনেতা বাংলাদেশে আর জন্মায় নাই, তাঁহারাও বহু পার্টের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সুবিখ্যাত অভিনেতাদের অপেক্ষা গিরিশচন্দ্র অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মুখে শুনিয়াছি যে, স্যার হেনরী আয়ারভিং গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এই মত পোষণ করিতেন। পূর্ব্বের ও আধুনিক সময়ের সুবিখ্যাত অভিনেতার অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে কিন্তু এই পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ অভিনেতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ অভিনয়ের খ্যাতি অভিনেতার জীবনের সঙ্গেই অবসান হয়। "কুমার সম্ভবের" রতিবিলাপের সকরুণ বাণী মনে পড়ে, "শশিনা সহ যাতি কৌমুদী," চাঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্না লোপ পায়। সৌভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নট ছিলেন না, তিনি অমর নাট্যকার এবং যতদিন পর্য্যন্ত জগতে নাটকের আদর

থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে—উত্তরোত্তর বাড়িবে বই কমিবে না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদিগের মধ্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্র অন্যতম।

এক্ষণে নাটক সম্বন্ধে সেক্সপিয়ারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের দুই একটি বিষয়ে তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বর্ত্তমান তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। প্রথমে, আমরা সেক্সপিয়ারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার হিসাবে যে পার্থক্য, তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব উহাতে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব নাট্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়ার সমধিক সম্ভাবনা বলিয়া মনে হয়।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ও সমালোচক তাঁহার ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে বলিয়াছেন :

"Shakespeare delighted in creation; Milton in admiration; Swift in destruction; and Byron in Combating."—সৃষ্টিতে সেক্সপিয়ারের আনন্দ।

এ কথা কয়টি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, অন্য কোন নাট্যকার সম্বন্ধে তেমন নহে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার বলে কত যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শত শত চরিত্র কিন্তু সামান্য একটীও অন্যের অনুকরণ নয়! তাঁহার শত শত সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার ও অতিবিস্ময়কর সৃজন-শক্তির যে পরিচয় পাই তাহা জগতের সাহিত্যে একান্ত বিরল। একাধারে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের নাটক রচনা করিবার শক্তি আর কোন নাট্যকারের আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই ; অন্ততঃপক্ষে এপর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্ত মিলে নাই। কেহ কেহ বহু, এমন কি শতাধিক, নাটকও রচনা করিয়াছেন কিন্তু এমন বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চ নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটক আলোচনা করিতে বসিলে ধনঞ্জয় তাঁহার "দশরূপ" নামক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে নাটকের বিভিন্ন আখ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে পড়ে, "বিরিঞ্চি সৃজিত নাটকের সম্যক পরিচয় দিতে কে সমর্থ?"

ট্রাজিডি, কমিডি, রোমান্স, অপেরা, ফার্স, প্যান্টো-মাইম্ ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের নাটকের পরিচয় দিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আবার অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক ; যথা, সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, ধর্ম্ম-মূলক নাটক ইত্যাদি। একই ব্যক্তি এত বিভিন্ন প্রকার নাটক রচনা করিতে পারেন, কেবল যে ইহাই একমাত্র বিস্ময়কর এমন নহে, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, প্রত্যেক জাতীয় বা প্রত্যেক শ্রেণীর নাটকের মধ্যে এমন দুইচারিখানি নাটক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যে কোন একখানি নাটক নাট্যকারকে জগতের নাট্যসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিতে পারে। একখানা "প্রফুল্ল", একখানা "বিল্বমঙ্গল", একখানা "জনা", একখানা "সিরাজউদ্দৌলা", একখানা "বলিদান" যে কোন দেশের যে কোন সময়ের যে কোন নাট্যকারের অক্ষয় গৌরব বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকের তালিকা এইখানেই সমাপ্ত নহে ; দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

কোন নাটকবিশেষের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের নাটকবিশেষের সমালোচনা দেখিতে চাহেন তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ লেকচারার (First Girish Lecturer, Calcutta University) ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ডি-লিট্ মহাশয়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'গিরিশ-প্রতিভা' ও বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত তাঁহার গিরিশ-লেক্‌চার পড়িয়া দেখিবেন। এই দুই গ্রন্থে লেখক গিরিশচন্দ্রের নাটকের যেরূপ সূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে হেমেন্দ্র বাবু যে অন্তঃদৃষ্টি, সূক্ষ্ম সমালোচনার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমালোচনা-সাহিত্যে একান্ত বিরল। গিরিশচন্দ্রকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে হইলে এই দুইখানি বই পড়া একান্ত আবশ্যক। আমরা গিরিশচন্দ্রের নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের প্রতি মাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। একান্ত নিজস্ব, অথচ আর ঐ সঙ্গে সেক্সপিয়ার ও গিরিশচন্দ্রের রচনাপদ্ধতির যে নিকট সাদৃশ্য আছে, আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

এইখানে প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্যক যে, গিরিশ চন্দ্র যত প্রকারের নাটক রচনা করিয়াছেন সেক্সপিয়ার তাহা করেন নাই।

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণি

নাটকের উপরে। ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রকৃত পক্ষে গ্রীক ভাষায় ভিন্ন অন্য কোন পাশ্চাত্য ভাষায় পৌরাণিক নাটক নাই। ইংরেজী সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের নাম করিতে হইলে দুইখানি নাটকের নামমাত্র উল্লেখযোগ্য। মিল্টনের স্যামসন এগোনিষ্টিস্ ও কবি শেলীর প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড। কাব্যসম্পদে প্রমিথিউস আনবাউণ্ডের তুলনা নাই বলিলেও চলে কিন্তু নাটক হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না; বরং শেলীর 'সেন্সী' নাটক হিসাবে বহু শ্রেষ্ঠ। মিল্টনের নাটকে গ্রীক ট্র্যাজিডির গাম্ভীর্য্য ও কঠোরতা বিদ্যমান, কিন্তু কোন রঙ্গমঞ্চেই উহাদের আদর হয় নাই। আর গিরিশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় অতীতকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। যে সমাজ, যে সভ্যতা, যে সংস্কৃতি ও যে বিশ্বাস অতীতের অন্ধকার-গর্ভে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে, গিরিশচন্দ্র সেই বিস্মৃতির গর্ভ হইতে অতীতকে সজীব করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। একমাত্র পৌরাণিক নাটকই গিরিশচন্দ্রের অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচায়ক। সুবিখ্যাত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত স্বর্গীয় হরিনাথ দে মহাশয় এ বিষয়ে অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভা-বলে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সেক্সপিয়ার কোন পৌরাণিক নাটক রচনা করেন নাই।

তারপর ধর্ম্মমূলক নাটক। সেক্সপিয়ার কোন ধর্ম্মমূলক নাটক লিখেন নাই। সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন ধর্ম্মমূলক নাটক নাই। প্রাচীন ইংরেজীতে মরালিটি প্লেজ (Marality plays) মিষ্ট্রী, মিরাকল্, পাশন প্লে নামে ধর্ম্মবিষয়ক কতগুলি ক্ষুদ্র নাটক আছে; সেগুলির নাটক হিসাবে কোন মূল্যই নাই। আমাদের দেশের যাত্রার দলের সংএর মত বাইবেলের ঘটনাবিশেষের জীবন্ত সং মাত্র। নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন কোন গভীর আধ্যাত্মিক সত্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয় ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠে, একমাত্র সেগুলিকেই ধর্ম্মমূলক নাটক বলা যায়। এক হিসাবে জার্ম্মান কবি গেটের বিশ্ববিশ্রুত নাটক "ফাউষ্ট"-কে (Faust) ধর্ম্মমূলক নাটক বলা যায়, যদিও গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও পাঠকের প্রাণে সন্দেহবাদ বা Scepticism বাড়িয়া ওঠে। পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক নাটকে গিরিশচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী—একচ্ছত্র সম্রাট। বিল্বমঙ্গলের ন্যায় উচ্চস্তরের ধর্ম্মমূলক নাটক জগতের সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যে তিনি পঞ্চাশবারের উপর বিল্বমঙ্গল পড়িয়াছেন এবং প্রত্যেক বারেই বিস্ময় ও আনন্দে বলেছেন, ধন্য গিরিশ। সেক্সপিয়ারকেও হার মানাইয়াছে। অথচ আমরা গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার এককথায় রেডী-মেড সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই।

পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ নাট্যকার কেহ আছেন কি না, জানি না। অনুবাদের দ্বারা বিচার করা যায় না—তাই, না হইলে বলিতাম যে গ্রীক নাট্য-কারদিগের সুবিখ্যাত পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের নাটক কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আর অন্য কোন নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের ন্যায় গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী ধর্ম্মমূলক নাটক লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অন্ততঃ পক্ষে ইংরেজীতে অনূদিত কোন ধর্ম্মমূলক নাটকই (Religious Drama) এইরূপ উচ্চস্তরের নহে।

আমরা এবার গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

সেক্সপিয়ারের কয়েকখানা ঐতিহাসিক নাটক বিশেষ প্রসিদ্ধ, যেমন King John, Henry IV. Henry V, Richard II, Richard III, কিন্তু যদি কেহ গিরিশচন্দ্রের লেখা বাঙ্গালীর লেখা বলিয়া অবজ্ঞা না করেন, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, গিরিশচন্দ্রের "সিরাজউদ্দৌলার" ন্যায় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক সেক্সপিয়ারও লিখিতে পারেন নাই। Henry IV নাটকে Falstaff-এর চরিত্র আছে উহা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি সন্দেহ নাই; কিন্তু হেনরী দি ফোর্থ ঐতিহাসিক-নাটক হিসাবে "সিরাজউদ্দৌলা" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজার, কোরিওলেনাস, এণ্টনী ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি নাটক ঐতিহাসিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু এইগুলি সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডির মধ্যেই গণ্য হয়; কারণ এই সব নাটকের মূল মন্ত্র মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ, এখানে ইতিহাসের প্রাধান্য বড়ই কম। যেমন জার্ম্মাণ কবি শীলারের বিখ্যাত নাটক Maria Stuart Maid of orleans এর ট্র্যাজিডি হিসাবেই আদর।

ঘটনাবহুল ইতিহাসের অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল চিত্র সিরাজউদ্দৌলা

নাটকে দেখিতে পাই, অন্য কোন নাটকে এমন ইতিহাসের পরিষ্কার যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই না, অথচ নাটকীয় সৌন্দর্য্যের কোথাও সামান্য ত্রুটী ঘটে নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সিরাজউদ্দৌলা নাটক ও তাহার অভিনয়, দুই-ই আইনের দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। আধুনিক দর্শক ও পাঠকের কাছে উহার কোন মূল্য নাই। তেমনি মিরকাসিমও নিষিদ্ধ (prescribed)। এই নাটক দুইখানির অভিনয় বন্ধ থাকিলেও ছাপিবার অনুমতি দিলে বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যের একটা দুরপনেয় অভাব মোচন হয়।

এবার আমরা গিরিশচন্দ্রের ট্র্যাজিডির কথা বলিব। সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত সমালোচক Dowden সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শিক্ষিত পাঠকের জানা থাকিলেও আমরা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"Tragedy as conceived by Shakespeare is concerned with the ruin or restoration of the soul, and of the life of man. In other words, its subject is the struggle of good and evil in the world. This strikes down upon the roots of things."

অর্থাৎ ভালমন্দ বা মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে চিরন্তন সংঘর্ষ তাহাই সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডির মূলমন্ত্র। গিরিশচন্দ্রের ট্র্যাজিডিরও তাই। মানুষের চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে যে দুর্ব্বলতা লুকাইয়া থাকে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে একদিন তাহাই মানুষকে উৎসন্নের পথে বা ধ্বংসের মুখে নিয়া যায়। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডির ইহাই বীজ, গিরিশচন্দ্রেরও তাই। "প্রফুল্ল" নাটকের যোগেশের চরিত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর গ্রীক ট্র্যাজিডি ও সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডিতে আমরা অদৃষ্টবাদ দেখিতে পাই, গিরিশচন্দ্রের নাটকেও তাই দেখি। সেক্সপিয়ারের একজন সমালোচক বলিয়াছেন :—

"A profound sense of fate underlies all Shakespeare's tragedies. Sometimes he permits his characters, Romeo or Hamlet, to give utterances to it; sometimes he prefers a subtler and more ironical method of exposition. Jago and Edmund, alone among the persons of the great tragedies, believe in the sufficiency of man to control his destinies."

যোগেশ বলিতেছে, "চেষ্টায় সব হয়, কিন্তু মাকে কাশী পাঠানো হয় না"...ইত্যাদি। এদিকে রমেশ মনে করে বুদ্ধিকৌশলে ও চেষ্টায় সর্ব্ব বিষয়েই সাফল্য লাভ করা যায়। ট্র্যাজিডি হিসাবে প্রফুল্ল নাটককে জগতের যে কোন ট্র্যাজিডির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এবং তুলনায় জগতের যে কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডির সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

এবার আমরা গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

সেক্সপিয়ার কোন সামাজিক নাটক লিখেন নাই। তখনকার দিনে সামাজিক নাটকের রেওয়াজ ছিল না। তবে সেক্সপিয়ারের নাটকে তাঁহার সময়কার সমাজের যথেষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম নিখুঁত সামাজিক চিত্র দেখিতে পাই বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের (Moliere) নাটকে, তবে সেই চিত্র কবির অতুলনীয় বিদ্রূপের মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এ্যারিষ্টোফেনিস (Aristophenes) তীব্র ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু উহা সামাজিক নাটক নয়, উহা প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্রূপ; যেমন clouds সক্রেটিসকে ঠাট্টা করিয়া লেখা। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও সমাজিক নাটক নাই বলিলে চলে; তবে "মৃচ্ছকটিক"কে সামাজিক নাটক বলা যায়। বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক নাটক বর্ত্তমান সমাজের সৃষ্টি। অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক জীবনের নানাপ্রকার জটিল সমস্যার ফলে বর্ত্তমান সামাজিক নাটকের উৎপত্তি। জগদ্বিখ্যাত সুইডিশ নাট্যকার ইবসেনকে (Ibsen) বর্ত্তমান সামাজিক নাটকের জনক বলিলে অসঙ্গত হয় না। বার্ণার্ড শ' (Bernard Shaw) গলস্‌ওয়র্দ্দী প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেন প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছেন। কেবলমাত্র খ্যাতনামা বেল-জিয়ান নাট্যকার (Mawrice Materlinck) মেটার লিঙ্কের নাটকে ইবসেনের কোন আধিপত্য দেখা যায় না। বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন সমস্যা, সেইজন্য বিভিন্ন সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নাটক দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তুলনামূলক সমালোচনা খাটে না। ইবসেনের নাটকের মূলমন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীন চরিত্রের স্ফুরণ, আর প্রেমশূন্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বা অমঙ্গলের কারণ।

Two main ideas in Ibsen's works: "First the

supreme importance of individual character, of personality, in the development and enrichment of the individual he saw the only hope of really cultured and enlightened society.

"Second comes the belief that the only tragedy that can be suffered, only wrong that can be committed is the denial of love."

ইবসেনের আদর্শ ও গিরিশচন্দ্রের আদর্শ বিভিন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির সাদৃশ্য অতি সামান্য। এই স্থানে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"Social life in the West is like a peal of laughter; but underneath it is a wail. It ends in a sob. The face and frivolity are all on the surface; really it is full of tragic intensity......Here (in India) it is sad and gloomy on the surface, but underneath are carelessness and merriment."

গিরিশচন্দ্রের সমাজ ও ইবসেনের সমাজ বিভিন্ন। তবে গলসওয়ার্দীর সামাজিক নাটকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। Galsworthy-র নাটক সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচক বলেন :

"His plays for the most part are based on ethical and social problems and are marked by a scrupulously judicial effort to display the opposite points of view typified by his characters."

গিরিশচন্দ্রও প্রতিপক্ষ চরিত্রাঙ্কনে অনেক নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। তবে ভোগ-বিলাসপ্রিয় পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ ও সমস্যা এক আর শাস্ত্রে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসী হিন্দু সমাজের আদর্শ ও সমস্যা অন্য। পাশ্চাত্য সমাজে "বলিদান" বা "শাস্তি কি শাস্তির" আবশ্যকতা নাই; আবার Major Barbara প্রভৃতি নাটকের আমাদের দেশে আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু সামাজিক নাটক হিসাবে যে কোন ভাষার যে কোন সামাজিক নাটকের সঙ্গে তুলনা করিলে 'বলিদানে'র নাট্য-গৌরব বিন্দুমাত্রও ম্লান হইবার নহে। এমন মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক একান্ত বিরল।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক ছাড়া গিরিশচন্দ্র অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী রোমান্স (Romance) লিখিয়াছেন; যেমন "মুকুল মঞ্জরা", "ভ্রান্তি" ইত্যাদি।

'ভ্রান্তি' একখানি অতি শ্রেষ্ঠস্তরের নাটক; রোমান্স হিসাবে আমাদের মনে হয় সেক্সপিয়ারের Winter's Tale ও Cymbalene অপেক্ষা 'ভ্রান্তি' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র "মানবদেবতার" কথা বা Worship of Humanity প্রচার করেছেন। সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তে (Comte) এই মানবের পূজা প্রথম প্রচার করেন। কোম্‌তের মতে নিরিশ্বর দর্শনবাদ (positivism) এর উপর প্রতিষ্ঠিত, গিরিশচন্দ্রের মানব পূজাও বেদান্ত দর্শনের উপর স্থাপিত। 'ভ্রান্তি'তে রঙ্গলাল যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের বাণী মনে পড়ে—

"Men were made for men; correct them, or support them."

মানুষ মানুষের জন্যই জন্মিয়াছে; হয় তাহাকে সংশোধন কর, কিম্বা তাহাকে সাহায্য কর।

জগৎবিখ্যাত লোকহিতকর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মানব মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে অনুপ্রাণিত করেন। বাহির হইতে গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় অনেকেই পান নাই, তাঁহাকে অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। এইস্থানে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক রোমা রোঁলার গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :

It will be remembered that this disciple of Ramkrishna—the celebrated Bengali dramatist, writer and comedian, who had led the life of a "libertine" in the double sense of the classical age until the moment when the tolerant and the mischievous fisher of the Ganges took him upon his hook—had since without leaving the world became the most ardent and sincere of the converts, be spent his days in a constant transport of faith through love, of Bhakti Yoga."

গিরিশচন্দ্রের প্রধান পরিচয়, তিনি অমর নাট্যকার, কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। বার্নার্ড শ' গলস্‌ওয়ার্দীর ন্যায় গিরিশচন্দ্রও অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ, হৃদয়গ্রাহী গল্প ও

উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের "চন্দ্রা" একখানি অতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তবে বাস্তবতার দোহাই দিয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে যেরূপ রিরিংসাপূর্ণ উপন্যাসের প্রচলন হইয়াছে "চন্দ্রা" সে শ্রেণীর নয় বলিয়া বোধ হয় সাধারণ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আজকাল যত রংদার লেখা তত আদর। সমস্ত মনোবিজ্ঞান যৌনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের আর কোন প্রবৃত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। এস্থলে লোকবিশ্রুত পণ্ডিত ও বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক সেণ্টস্‌বেরীর কয়েকটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"It is never so easy to arouse interest in virtue as it is in vice : or in weak and watered vice, as in vice rectified (or unrectified) to full strength."
—George Saintsbury.

যাক এই বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের বাহিরে। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত সীমার মধ্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে গিরিশচন্দ্রকে "বাংলার সেক্সপিয়ার" বলিলে তাঁহার অতুলনীয় নাট্যপ্রতিভার অবমাননা করা হয়। বিশ্বসাহিত্যে অতিশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার নাটকগুলি যে কোন সাহিত্যের অতি শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

স্বদেশের জীবন মন্দিরে হে পাষাণ! কথা কহ তুমি!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কথা কহ,—প্রাণের বিগ্রহ!
অর্ঘ্য লহ।
নীচতার অন্ধকারে আমি
বসে আছি, ওগো অন্তর্যামী!
স্বদেশের জীবন মন্দিরে
ভাসি অশ্রুনীরে।
অভয় মঙ্গলবাণী—
দাও মর্ম্মে আনি।

মৃত্যুর নিঃশ্বাস বহে,—স্বজাতিরে বাঁচাবো কেমনে!
তোমার আলোক মাগি এ দুর্য্যোগক্ষণে,
রণোল্লাসে সভ্যতার রাজপথে শোণিত প্রবাহ
ধায় সিন্ধু সম, দুশ্চিন্তার দুরন্ত প্রদাহ
অন্তরে বাহিরে দেয় বেদনার তীব্র বীভৎসতা।

হে বিশ্ব দেবতা!
বিষবাষ্পজালে ঢাকা আকাশ ভুবন,
অনন্তের শান্তি সমীরণ
নাহি বহে পল্লবে পল্লবে; বসুধার
বীথিকায় নাহিক গীতিকা, স্নেহ প্রীতি মমতার
লেশমাত্র নাহি।
ঝঞ্ঝা ওঠে, শূন্যতলে শত রিক্তরাহী
হোলো দিশেহারা,
বহে আঁখিধারা।
জড় বিজ্ঞানের জ্বালা জ্বলে অহরহ,
মৃত্তিকার হয়েছে দুঃসহ
যন্ত্র-অত্যাচার,—সভ্যতার একি পরিণাম!
দ্বন্দ্ব চলে অবিরাম
মানবে মানবে।
প্রত্যহ আহবে
আত্মার আহুতি দেয়, লিখে দেয় অগ্নির অক্ষরে
বজ্রবাণী ধরার অন্তরে
স্বার্থতার গৃধ্নুতায় বিশ্বময়
বর্ব্বর মানববৃন্দ আনে যে প্রলয়
অসন্তোষে দুরাশায়, ঘূর্ণাবর্ত্তে রয়
হিংসার হীনতা,—করে নাক তোমারেও ভয়।
হে পাষাণ প্রভু মোর! কতদিন র'বে অন্তরালে!
জীবনের দিক্ চক্রবালে
ভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত আজ।
রণসাজ
ধর তুমি,—পাঞ্চজন্য শঙ্খ তব হউক নির্ঘোষ।
এ অন্তরে জাগে রুদ্ররোষ,
সংস্কৃতির ভাবী বিপন্নতা
ভাবি, আর নিজ মনে কহি কত কথা!

পীতাতঙ্ক,
এ সঙ্কটে স্বদেশেরে করিতে নিঃশঙ্ক
তোমার শরণ মাগি,
লক্ষকোটি সন্তানের জননীরে ক'রো নাক আজ হতভাগী

স্বজাতিরে রক্ষা কর এই মোর পরম প্রার্থনা,
শোকে দুঃখে চাহি তব চরম সান্ত্বনা।
বাঁচিবার শক্তি দাও, ভীরুতার মোহ
যাক্ দূরে, স্বজাতিরে দাও এবে শৌর্য্য সমারোহ।
আশীর্ব্বাদে তব
যুগ নব
সৃষ্ট হোক্ দেশের আকাশে,—উপনিষদের দেশে
এ বর্ব্বর শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার শ্লেষে
ভগ্নবক্ষ প্রভু!
আশা করি তবু
তব কারুণ্যের ধারা ঝরিবে হেথায়,
নব প্রভাতের সবিতায়
উদ্ভাসিত হবে পুনঃ ভারতের জীবন-সাবিত্রী।
এ ধরিত্রী
দিবে তার বরমাল্য ভারতের গলে।
আজ যারা অশ্রু জলে
বুভুক্ষায় আর্ত্তনাদে অত্যাচারে হারালো সম্বিৎ
তারা সব চৈতন্যের কৃপা লভি' শান্তির সঙ্গীত
শুনাবে জগতে।
অমৃতের বার্ত্তা দিবে ভুবনে ভুবনে অধ্যাত্মের জয়রথে
করি' আরোহণ।
সঙ্কটমোচন
ক'র প্রভু! এ ভারত তব লীলাভূমি,
স্বদেশের জীবন মন্দিরে হে পাষাণ! কথা কহ তুমি!

মাঝের কয়েকদিন

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

পূজো এসে গেল। স্ত্রী বায়না ধ'রলেন—বাপের বাড়ী যাবেন। গত বছর এমন দিনে ছোট মেয়ে মিনুর ছিল 'টাইফয়েড', ম'রতে ম'রতে তবু যা' হোক্ বেঁচে উঠলো। তারপরে বড় দিনের ছুটিতে গেল নতুন খোকার অন্নপ্রাশন। এম্‌নি ক'রেই সারা বছরটা এটা ওটায় কেটে গেল।...

আবার সেই পূজো এলো।—

নতুন খোকা এবারে কয়েক মাসের পুরণো হ'য়েছে; মার মুখে দিদিমার নাম অনেকটা মুখস্থ ক'রে এনেছে। বায়নাটা তাই এলো এবারে দু'দিক থেকে। একে স্ত্রীর কথা উপেক্ষা করিনি কোনদিনই, তাতে আবার নতুন খোকার প্রথম আব্দার। আমার মত নিতান্ত সাংসারিক স্নেহশীল ব্যক্তির পক্ষে তা' উড়িয়ে দেওয়া চিরদিনই ধাতের বাইরে। হাসিমুখে পঞ্চমী রাত্রে তাই যেয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে এলাম মিনুদের। সঙ্গে গেল পাশের বাড়ীর কলেজে-পড়া রতন—নতুন খোকার মামার দেশের ছেলে।...আমি রইলুম চিরাচরিত এই একঘেয়েমীর মধ্যেই ডুবে; কারণ, আমার কথা স্বতন্ত্র। সারাবছর গায়ের রক্ত জল ক'রে খেটে খেটে টাকা রোজগার ক'রে আনি ঘরে,...তাই দিয়ে বাঁচে এই এতগুলো প্রাণী। কিন্তু গাধারও দিনান্তে একবার ছুটি থাকে, আমার তা-ও নেই, কারণ আমি কেরাণী,—মার্চেন্ট অফিসের কলম-ঘষা কেরাণী। পূজোর ছুটি চারদিন হ'লে যথেষ্ট—যা' নাকি মানুষের পক্ষে কিছুই না। নইলে আমারও কি ইচ্ছে করে না সস্ত্রীক যেয়ে একবার শালাসম্বন্ধিদের দেখে আসি! কপাল...নিতান্ত ফাটা কপাল ছাড়া আর কি?...

আমি যেতে পারলাম না। স্ত্রী অবশ্য যাবার লগ্নে এই নিয়ে ওজর-আপত্তি তুলেছিলেন কিছুটা; কিন্তু যা' হবার নয়, হবে তা' কেমন ক'রে?

ঘরে ফিরে মিনুদের অভাব এবারে যতটা না বোধ ক'রলাম, তার চাইতে বেশী বোধ ক'রলাম হাতে পাওয়া তৈরী খেতে পাবার অভাবটা। নিজের মধ্যে হঠাৎ দ'মে গেলাম। ভাবলাম—কতদিন বিশ্রী রান্নার জন্যে স্ত্রীকে কটু কথা শুনিয়েছি,—কিন্তু আজ মনে হোলো, তবু যেন সেই ছিল ভাল। অন্ততঃ মাঝে মাঝে বিশ্রী লাগলেও তো আর একেবারে অখাদ্য লাগতো না! আজ যে সে-পথও বন্ধ।

নিজে কোনোদিনই রেঁধে খেতে জানি না। রেঁধে খাওয়ার মত ক'রে বাবা মা কোনোদিনই আমায় তৈরী ক'রে তোলেন নি। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন—চিরকালই বাড়ীতে খেয়েছি ঠাকুরের রান্না। সে আজ অনেক বছরের কথা। তারপর মা বিধবা হ'য়ে নিজের জন্যে ঠিক ক'রেছিলেন স্বতন্ত্র রান্নাঘর। সে-হবিষ্যান্ন আমার মুখে উঠতো না। তাই আমি ছিলাম সেজো পিসীর কাছে,—তাও শুধু দু'বেলা ভাল রান্না খেতে পাওয়ার লোভেই।...এমনি ক'রেই বড় হ'লাম, পড়াশুনো ক'রলাম, চাকরী পেলাম। তবু রাঁধতে শিখলুম না, জানলাম শুধু কলম পিষতে। বিয়ে ক'রে তাই স্ত্রীকে কাছ ছাড়া ক'রতে কখনো মন উঠতো না! তবু এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে। স্বাধীন সত্তা ব'লে সভ্যজগতে প্রত্যেকেরই যখন একটা কোন বস্তু আছে, ভাবলাম—আমার স্ত্রীরই বা তা' থাকবে না কেন?—তাই বাধা দিই নি কোনো দিন তার কাজে। সেদিনও তেম্‌নি সহজ হাসি মুখেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম মিনুদের সাথে তার মাকে।

পঞ্চমী রাতটায় মনের সুর তাই পঞ্চমেই চড়ে রইল।...

পরদিন ভোরবেলায় বেরিয়েছি, নিতান্ত নিষ্কর্মা, কাজেই রাস্তায়। শুনলাম, কাছাকাছি নাকি একটা নতুন হোটেল ব'সেছে! অদৃষ্টকে যথেষ্ট তারিফ ক'রলাম। হোটেল ছাড়া আর গতি কোথায়?—

আমার আস্তানা কোলকাতার যে যায়গায়, সেখানে যে কোনো ভদ্র হোটেল চ'লতে পারে বা বসতে পারে এমন ধারণা আমি কোনোদিনই করিনি, বিশেষ ক'রে ক'রবার সুযোগও পাই নি। প্রাণে একবার বল এলো।...আস্তে আস্তে সোজা গিয়ে উঠলাম হোটেল বাড়ীতে। নীচের তলায় তেমন কোনো বন্দোবস্ত নেই। বাইরে কার্ণিসে একটা

'সাইনবোর্ডে' লেখা রয়েছে, "শ্রীধর ভোজনালয়"। নীচে সিঁড়ির পাশে দেওয়ালে আঁটা 'প্লাকে' লেখা, "হোটেলের রাস্তা"। ভাবলাম, তবু যদি এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটা মাসিক ব্যবস্থা ক'রে ফিরতে পারি। কিন্তু হঠাৎ তেমন কোন ব্যবস্থা হোলো না। খবর নিয়ে জানলাম, "কয়েক দিনের জন্যে ম্যানেজার গেছে কোল্‌কাতার বাইরে। সে না এলে "মান্‌থলি সিষ্টেম্‌" নাকি একেবারে অচল।

তা' অচলই হোক্‌ আর যা-ই হোক্‌, ক'টা দিন তো মাত্র। ভাবলাম দৈনিক সোয়া আটআনা ক'রে খাই-খরচা হোলেও কষ্টেসৃষ্টে একভাবে কেটে যাবেই।

কেটে অবিশ্যি গেলও। কিন্তু দু'দিন বাদে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম এই শ্রীধর হোটেলের ম্যানেজারকে দেখে। এ যে আমাদের সেই গদাধর! ফোর্থ ক্লাস থেকে আরম্ভ ক'রে ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত একসাথে যার সঙ্গে হেসে খেলে স্কুল-কলেজের দরজা পেরিয়েছি, নষ্টচন্দ্রার রাত্রে ঘোষেদের বাগান বাড়ীর ডাব-নারকেল ধ্বংস করা থেকে সুরু করে সাঁত্রাগাছির বন্যাপীড়িতদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে বেরিয়েছি,—এই সেই গদাধর। বেশী পড়াশুনো ওর কোনোদিনই ধাতে সইত না, চিরকাল আড্ডা ছিল ওর বিড়িওয়ালা আর উড়ে ঠাকুরদের পানের মজলিসে। জিজ্ঞেস করলে ব'ল্‌তো, "সংসারে সবাই যদি শিক্ষিত আর বড়লোকগুলোর তাবেদারী ক'রে চলে, তবে ছোটলোকদের সাথে মিশ্‌বে কে? ওদের অবিশ্যি টাকা নেই, কিন্তু প্রাণ আছে।"—সভ্য সমাজের বি-এ ক্লাসে প'ড়েও যে ছেলে এমন অনাবিল নিষ্ঠার সঙ্গে ও-সব ইতর সম্প্রদায়ের সাথে মিশ্‌তে পারে, লোকের কাছে সে অবিশ্যি যথেষ্টই বাহবা পাবার যোগ্য, সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের "রাইটিষ্ট গ্রুফের" মত ছিল ওর সম্বন্ধে উল্টো। ওর জোরালো কথার বিষয়বস্তুটা যত বড় দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হোক্‌ না কেন, আমরা ব'লতাম, "পানটা বিড়িটা যদি গাঁটের পয়সা খরচ না ক'রেই চ'লে যায়, তবে আর মন্দ কি? উড়ে ঠাকুরের টিকি ধ'রে বেড়া'লেই তো একদম মোক্ষপ্রাপ্তি।...

গদাধরকে দেখবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলো কথা মনে এসে গেল। তবু ভাল করে চিনে নেবার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ম্যানেজারের দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, যে নিজে উপযাচক হ'য়ে কোনো কথা জিজ্ঞেস ক'রবার পূর্ব্বেই গদাধর বলে উঠলো, "আরে, সনাতন না?"

আমি কতকটা মুখ টিপে হাসতে লাগ্‌লাম।

গদাধর আবার বল্‌তে লাগলো, "তারপর খবর কি বল্‌ দিকি? কোথায় থাকিস, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। সাত মুল্লুক পেরিয়ে এ গোয়ালে কেন হঠাৎ, বল্‌তো?"

হেসে হেসেই আমি বল্‌লাম, "তা' হ'লে এতক্ষণে গরু ব'লেই প্রতিপন্ন হলাম তো? মন্দ নয়।"

"মাই গড্‌", মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গদাধর বল্‌লে, "শেষটায় এ-ই তুই 'মিন' ক'রলি? তা' থাকগে, ব্যাপার কি আগে তাই বল্‌ দিকি, শুনি। তারপর না হয় একটা "কম্পেন্‌সেট" করা যাবে।"

আমি বল্‌লাম "তুইও যেমন 'ইডিয়ট' এর আবার একটা 'কম্পেন্‌সেশন্‌' কি? ব্যাপারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করি, এই হচ্ছে মস্ত ডিফিকালটি। তা'তে ক'রে কর্ত্রী গেছেন দক্ষযজ্ঞে, আছি ভোলানাথ, বনে বাদাড়েই কাটিয়ে দেই।"

কথা শুনে গদাধর খানিকটা মজা পেলো কি না জানি না, কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চোখ গিয়ে নামিয়ে নিলে।

খানিকটা ঢোঁক গিলে আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ, তা ছাখ, তোর এখানে "মান্‌থ্‌লি সিষ্টেমে"র বন্দোবস্ত আছে তো নিশ্চয়ই।"

"কেন, কার জন্যে?" নিতান্ত সহজ ভাবেই প্রশ্নটা শেষ ক'রে গদাধর তার সামনেকার জরাজীর্ণ টেবল্‌টার দেরাজ খুলে ঘাঁটতে সুরু ক'রে দিলে এলোমেলোভাবে!

বল্‌লাম, "জন্যটা অবিশ্যি আমারই; কারণ, বুঝিস্‌ তো পূজোর বাজার—"

দেরাজে চাবি দিয়ে গদাধর হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়লো ব'ল্‌লে, "চল্‌, বাইরে চল্‌, কথা আছে!"

দু'জনে সোজা সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে ফুটপাতে এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম—কি জানি, "মান্‌থলি সিষ্টেম্‌" থেকে এবারে হয়ত ও সুরু ক'রে দেবে ওর ব্যক্তিগতজীবনের রামায়ণ গাওয়া! কিন্তু কপাল ভাল, সুবিধেটা আমার দিক দিয়েই।

ও আবার ব'ল্‌তে সুরু করলে, "জানিস্‌ না তো, এখানে যারা খেতে আসে, লোকগুলো ভারী পাজি। কিছু যদি

ওদের সামনে বলা যায়। তা আমি যখন আছি, অত ভাবনা কি তোর? দু'বারে কতই বা আর খাবি তুই,—ও আমার উপর দিয়েই চ'লে যাবে'খন! বরংচ বউ এলে মধ্যে মধ্যে আমাকে নেমন্তন্ন খাইয়ে দিস্ ভাল ক'রে।" বলেই গদাধর তার সব ক'টা দাঁত বের ক'রে এক ঝলক্ হেসে উঠলে! দেখলাম প্রথম জীবনের সেই সহজ সাবলীল হাসি আজও ওর মুখ থেকে মুছে যায় নি। তবু ওর নিতান্ত বাঁধাধরা করুণায় বদ্ধ হ'য়ে থাকতে মন আমার কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। Business is always business, মিছিমিছি গায়ে পড়ে খাওয়াটা burdensome বই তো কিছু নয়। তাই যথাসম্ভব আপত্তি তুলতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু টি'ক্‌লো না। বল্‌লে, "আমার কাছে অমন লজ্জা করাটা তোর মোটেই উচিত নয় সনাতন। একবার ছোটবেলার দিনগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ তো। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন আমাদের; 'ডিফিকাল্‌টি' প্রত্যেকেরই আছে। তাই নিয়ে লজ্জা ক'রে ব'সে থাকলে কি চলে, বোকা।"

মাঝখানটায় আমি অন্য কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে গদাধর বল্‌লে, "বরংচ কাল থেকে তুই একটু earlier আসিস্; হাজার হ'লেও মেস্-হোটেলের ব্যাপার, গরম ভাতটা ভাগ্যে ঠিক সব সময় মেপে ওঠে না।" গদাধরের মুখে আবার সেই শান্ত সংযত অনাবিল হাসি।

কোনো কথাকেই ওর উপেক্ষা করা গেল না। তাই আপাততঃ ওর সাময়িক নেমন্তন্ন নিয়ে সে দিনের মত ফিরে এলাম বাসায়।

সামনে দেয়ালে টাঙানো ঘরের গ্রুফ্ ফোটোটার দিকে নজর প'ড়তেই হঠাৎ আবার sentiment-এ আঘাত প'ড়ল। টুক্‌টুকে যুঁই ফুলের মত আমার নতুন খোকা; লোকে ওকে গত দীর্ঘ দিনের পুরণো ব'ল্‌লে কি হবে, সত্যি কি ও কখনো পুরণো হ'তে পারে? চির নূতনের স্বপ্ন দিয়ে রচিত ওর জীবনের গ্রন্থি। আর ঐ লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আমার মিনু। ওদের ছেড়ে কোনদিন তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও একা থাকতে পারিনি! বুকের ভেতরটা হঠাৎ বড় খাঁ-খাঁ ক'রে উঠলো।...এমন নিঃসঙ্গ শূন্যতা থেকে কেন জানি না গদাধরের হোটেলটাই যেন হঠাৎ বড় ভাল লেগে উঠলো আমার মনে! তবু তো খানিকক্ষণের জন্যে কতকগুলো লোকের উদরপূর্ত্তির মহড়া দেখে সময় কাটানো যায়।...

পুজো শেষ হ'য়ে গেল।...মহানগরীর বুকে বিসর্জ্জনের ঢাক বেজে উঠলো। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অগণিত লোকের ভীড়ে দেবী-প্রতিমা এসে দাঁড়ালো। চারদিকে নাগরিকের চোখে চোখে হাসি-অশ্রুর অপূর্ব্ব খুসীর স্রোত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কলকণ্ঠে গঙ্গার বুক উচ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠলো। জীবনে এ দৃশ্য আর কোনদিন দেখিনি, আর কোনদিন এমন একান্ত ক'রে দেখবার অবকাশই আমার হ'য়ে ওঠেনি। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ আরতির প্রাণচ্ছটায় এক এক ক'রে প্রতিমা বিসর্জন দেখে চ'ললাম। ভাবলাম—আমার মিনু আর খোকাও তো এমনি ক'রেই লোকের ভীড়ে মিশে গেছে তাদের দাদামাশাইর বাড়ীতে। আমার মত তারাও কি সেখানে একান্ত একা?...

পরদিন বিজয়ার আলিঙ্গন দিতে এলো গদাধর। কর্ত্তব্যটা যদিও আমারই প্রথম ছিল, তবু সে জানতো—সংসারে যত রকমের কুঁড়ে থাকতে পারে, আমি তার মূর্ত্ত প্রতীক। দোষটা তাই সে নেয়নি, নিতে পারেনি। সাথে তার হাতে ক'রে এনেছিল এক হাঁড়ি দ্বারিকের সন্দেশ। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগলো। কোথায় ঘরের অতিথিকে সমাদর ক'রব আমি, তাতে আবার বিজয়া, তা' নয়,—ছি—ছি—ছি। ব'ল্‌লাম, "এগুলো আবার পয়সা খরচা ক'রে ব'য়ে নিয়ে এলি কেন, বল্ তো? এতটা বাড়াবাড়ি ক'রলে সত্যি এবার থেকে তোকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে হবে। না, না, এ—মানে আমাকে লজ্জা দেওয়া।"

কথাটা যেন মনেই ধ'রলো না, হাসিতে গদাধর একেবারে ফেটে প'ড়লে। ব'ললে, "আরে, ও আবার কি কথা? বল্, বিজয়ার দিন গাল খাবার ইচ্ছে আছে? বউ নেই ঘরে, ফাঁকা বাড়ী, এমন একটা special fecility-ই তো হয় না! ...ভোর বেলায় হাঙ্গামা দিয়ে কাজ নেই, ও-বেলায় ধীরে সুস্থে একটা 'পিক্‌নিকের' ব্যবস্থা করা যাবে। হোটেলের ঝক্কিটাও আজ বন্ধ রেখেছি ওদিকে। বুঝলি তো, কিছু ভাবতে হবে না। ঘিয়ে-ময়দায় superfine হ'য়ে যাবে, দেখবি। বরঞ্চ সাথে তার দু'ভরি সিদ্ধেশ্বরী মোদক, বাস্, একেবারে pure digestion." —খুসীতে গদাধর মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু, ডেকে আনা বিপদে পড়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে প'ড়তে হ'ল আমাকে। অথচ নগদ পয়সার সংস্থান নেই আমার এক ক'ড়িও পকেটে। গদাধর তা' জানে, তবু আমাকে লজ্জা দেওয়াই যেন ওর উদ্দেশ্য।

পাকে-চক্রে ভগবানই যখন ভূত হল, আমাকেও তাই হ'তে হ'ল। কোন রকমে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকারের মধ্য দিয়েও গদাধরের ঈপ্সিত 'পিক্‌নিক'টাকে সেদিন সার্থক ক'রে তুললাম। অবিশ্যি নিজের উদরে সিদ্ধেশ্বরী না যাক্, দ্বারিক ভায়া উদরে স্থান লাভ ক'রেছিল অনেকখানিই।

পরদিন আট্‌টার ডাকে চিঠি এলো গোপালপুরের। বিজয়ার সহস্রকোটি প্রণাম দিয়ে অনেক করুণ ক'রে স্ত্রী লিখেছেন,—বাপের বাড়ীতে তার নাকি আর ভাল লাগচে না! ঠাণ্ডা লেগে নতুন খোকার হ'য়েচে সর্দ্দিকাশি। মিনু শুধু 'বাবা-বাবা' করে। তাই লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই রওনা হচ্ছেন তিনি ক'লকাতায়।

এদিকে আপিসের কাজ আবার আরম্ভ হয়েচে। ভাবলাম—তবু যা হোক্, একমাসের ধাক্কা দশদিনে এসে ঠেক্‌লো। বাঁচা গেল। গদাধরের আতিথেয়তা গ্রহণ ক'রলে কি হয়, হোটেলে খাওয়া কি আমার পোষায়? যত পচা সেদ্ধ আর ঘ্যাঁট। অমন খেলে যাদবপুর-সেনিটোরিয়মে ঘুরে আসতে হবে শীগগিরই।...

সে দিনই তাই মনে ক'রে আপিস্ থেকে এক মাসের মাইনে তুলে নিয়ে এলাম আগাম। বাড়ী ভাড়া বাকী প'ড়েছে আবার দু'মাসের। কয়লাওয়ালার তাগিদ লেগে আছে রাত্রিদিন। তবু যদি সারা মাসের খরচ বাদ গিয়ে ওদের খুসী ক'রতে পারি কতকটা!

আপিস ফির্‌তি সবে মাত্র পার্কে এসে ব'সেচি; সন্ধ্যার গ্যাসের আলো তখনো নগরীর বুকে নাচতে সুরু করেনি। দেখলাম—দূরে গদাধর কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ফুলগাছের কাছ দিয়ে অনবরত পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছে, তারই ঠিক কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে বসে দু'টী তন্বী ললনা। ভাবলাম—পার্কে এসে তবে বুঝি গদাধরের আবার এক আধটু প্রেম-চর্চ্চাও করা হয়। ভোজনালয়ের হিসেব কষেও মনের আলয়ে ওর প্রেমের ঠাকুর বাস করে তা' হ'লে! কিন্তু সময়টা বেশীক্ষণের নয়। দেখলাম তরুণী দু'টী স্মিত মুখে উঠে গেল...ধীরে ধীরে গদাধরের পা চলা সুরু ক'রল আমার ব'সে থাকার দিকটাতেই। বুঝে-শুনে আগ তাই খানিকটা আলুথালু হ'য়ে ব'সে রইলাম অন্য দিকে চেয়ে, যেন I am quite apparent from their secrecy!

কানের কাছে হঠাৎ শুনতে পেলাম, "আরে, সনাতন যে!"

কতকটা কৃত্রিম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইতেই ও ব'ললে, "তা' কাজটা তোর খারাপ নয়। সারাদিন আপিসে কলম গুঁতিয়ে brain-এর একটা recreation চাইতো! তবে কি জানিস্, এমন ভূতের মত ব'সে থাক্‌লে তোকে বুল-ডগে পেছু নেবে; একটু চ'লে ফিরে বেড়ানো ভাল, নইলে কি muscle nourishment হয়?" ব'লেই কাছে ব'সে প'ড়ে গদাধর আবার ব'ল্‌তে সুরু ক'রলে, "এই তো আমাকেই যেমন দেখ্‌না, দিনরাত রান্না, বাজার আর হিসেব নিয়ে থাক্‌তে হয় ডুবে, তবু তার মাঝেও সময় পেলে এক আধবার নিজের ইচ্ছেতেই ঘুরে যাই free airy atmosphere থেকে, কিন্তু তোর মত নিতান্ত medicinal idleness নিয়ে আমি কখনো এমন ক'রে প'ড়ে থাকি না। এতে না আছে লাইফের romanticism, না আছে তোদের ঐ socio-meterialistic কোনো substance."—

গদাধরের 'লেক্‌চার' থাম্‌তে চাইলো না। ভাবলাম—আজ হয়ত ওকে একটু বেশী মাত্রাতেই সিদ্ধেশ্বরী পেয়ে ব'সেছে। বল্‌লাম, "তা চল্ যাই, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমার আস্তনাতেই খেয়ে ওঠা যাক্।"

গদাধর অরাজি নয়।

ঘরে এসে নিজের হাতেই ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের ব্যবস্থা সুরু ক'রে দিলাম। দেখলাম—কেট্‌লির দিকে চেয়ে গদাধরের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বল্‌লাম, "দেবরাজ্যে অমৃত, আর মর্ত্ত্যলোকে চা,—no distinction, না কি ব'লিস্, গদাধর?"

একগাল লালা সুদ্ধো প্রকাণ্ড একটা ঢোঁক গিলে গদাধর ব'ল্‌লে, "exactly so, যা ব'লেছিস্! তবে দুঃখ কি জানিস্?—এমন্ নরককুণ্ড নিয়ে আছি যে, একটি বারও

যদি নিজের চুলোয় কেট্‌লি চাপাতে পারি! ঠাকুর চাকর-গুলো যেন কোনোদিন কিছু চোখে পর্য্যন্ত দেখে নি।—একেবারে জাঁক্ মেরে এসে বসে উনুনের চার পাশে। যত সব হারামজাদা—।"

আমি ব'ল্‌লাম, "তা' দিয়ে তোর দরকার কি? চা না হ'লে যখন আমার একটী বেলাও চলে না, তখন তুইও তো পাতভাড়ি বসা'তে পারিস্ আমার সাথে! No shame,—লজ্জার কিছু নেই তা'তে।"

কতকটা কুণ্ঠার হাসি হেসে গদাধর ব'ল্‌লে, "আরে লজ্জা কি আর তোর কাছেরে বোকা, মাঝখানে বিষয়টা দাঁড়িয়েছে তোর বউ। হাজার হোক্ মেয়ে মানুষ, ও যেন আমার কাছে সত্যিই কেমন লাগে!"

গদাধরের পিঠটাকে একবার চাপড়ে দিয়ে আমি ব'ল্‌লাম, "দূর পাগলা, ও ধারণা তোর ভুল; দেখ্‌বি মিশে,—শেষে আর কাছছাড়াটি পর্য্যন্ত হ'তে চাইবি না। She is very efficient in tea making, and even in gossiping also."

দু'জনেই এবারে খুব উঁচু গলায় হেসে উঠলাম।

চা আর বিড়ির ধোঁয়ায় এম্‌নি ক'রে অনেকক্ষণ কেটে গেল। বুঝলাম—রাত্রি ক্রমশঃই বেশ গাঢ় হ'য়ে উঠচে। আজও ভগবানকে ধন্যবাদ, যে, গদাধর এখনো তার রামায়ণ সুরু করে নি; কেবল উপসংহারেই নিবৃত্তি হ'য়ে গেল অনেকটা। ব'ল্‌লে, "চল্‌না, একেবারে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে আস্‌বি। আমার absence-এ আবার 'ক্যাস্' ঘটতি না পড়ে ওদিকটায়। বুঝিস্ তো, দশদিক্ রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে হয় একা মানুষের। তবু যদি ছোট একটা ভাই টাই থাক্‌তো, না হয় দেখাশোনা ক'র্‌তো! আর ভাল লাগে না এই ঝামেলা"—আবার সেই উপসংহারের সঙ্কীর্ণ ছোঁয়াচ। মাঝে মাঝে ভয় ধরিয়ে দেয় গদাধরটা।—

ব'ল্‌লাম, "এ'ক'টা দিন গেলে তবু তোকে রেহাই দিতে পা'রি, গদাধর। মিনুর মার চিঠি পেয়েছি, আস্‌চে শুকুরবার তিনি রওনা হ'চ্ছেন এখানে। ছেলেপিলেগুলোর নাকি স্বাস্থ্য সেখানে টি'কছে না মোটেই। আমারো আর ভাল লাগছে না ওদের ছেড়ে। জানিস্ গদাধর, বেশ আছিস্। সংসারের আসক্তি মানুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলে।" কথাটা ব'লেই বেশ বুঝতে পারলাম—ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস আমার প্রতিটী ধমনীর রক্ত কাঁপিয়ে বেরিয়ে এলো।

গদাধরের মুখে কথা ফুটলো না···

ধীরে ধীরে দু'জনে আবার পথ চ'ল্‌তে সুরু ক'রলাম।—

কিছুটা সামনে কে এক বুড়ো মোটর চাপা প'ড়েছে, তাই নিয়ে পুলিশে-সার্জ্জেন্টে লোকে লোকারণ্য। 'ফোন' করা হ'ল 'এ্যাম্বুলেন্সে', এসে তুলে নিয়ে গেল 'হস্‌পিটালে'। একবার ভাবলাম—দেখে আসি বুড়োকে ভাল ক'রে। আহা! লোকটা যদি না বাঁচে, কী হবে তবে ওর সংসারের দশা! মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর এই তো শেষজীবনের পরিণতি! অন্নাভাবে অর্থাভাবে প্রপীড়িত জরাজীর্ণ দেহটাকে দুমড়িয়ে চ'লে যায় পৃথিবীর দুঃসহ 'ক্যাপিট্যালিষ্ট-সভ্যতা'র যন্ত্রগুলি তার কোনো বিচার নেই, তার জন্যে কোনো শাসন তৈরী হয় নি রাজদরবারে। কিন্তু মনের সে কথা ব'ল্‌বো কাকে?

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—গদাধর কাছে নেই।

ভাবলাম—ব্যাপার কি?···কিন্তু বেশী সময় গেল না। বিচ্ছিন্ন জনতার মাঝ থেকে হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল গদাধর। ব'ল্‌লে, "আরে, আমাদের সেই বিয়ে পাগলা গোঁসাইজী এতদিনে বুঝি শাপমুক্ত হ'ল!"

জিজ্ঞেস্ ক'রলাম, "কোন্ গোঁসাইজী?"

বিশেষ উৎসাহের সাথেই গদাধর ব'লে চ'ল্‌লো,—"মনে নেই সেই বৃন্দাবনী বুড়ো ঠাকুরের কথা,—চার চারটে বিয়ে ক'রেও যার সংসারের আসক্তি মেটে নি। যেখানেই যার সাথে যখন দেখা, আর উদ্ধার নেই, মেয়ে মহলের দালালি ওকে দিতেই হবে। অথচ ব্যাটাচ্ছেলে এতবড় পাজি, যে, নিজের প্রথম পক্ষের আটাশ বছরের আইবুড়ি মেয়ের যদি এখনো একটা সম্বন্ধ টম্বন্ধ কিছু ক'রে থাকে! জিজ্ঞেস্ ক'রলে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বে আর ব'ল্‌বে—টাকার অভাব। জার্ম্মাণ হ'লে ওকে গুলি ক'রে মারতো হিটলার। তুই ঠিক্ দেখে নিস্, ও যদি মরে, আমি তবে হাতে চুড়ি প'রে সারা ক'ল্‌কাতা ঘুরে আস্‌বো।"—একদমে কথাগুলো শেষ ক'রে গদাধর এতক্ষণে নিজের গলায় 'ব্রেক্' ক'রলে।

আমি ব'ল্‌লাম, "তা' চারটে কেন, হাজার বিয়ে করুক্ না, কিন্তু এ'যাত্রা বেঁচে উঠলেও তো কষ্টের একশেষ হ'ল।"

কথাটা গদাধরের মনঃপূত হ'ল না। ব'ল্‌লে, "কষ্টই

যদি না পাবে, তবে ওর শাপ মোচন হবে কেমন ক'রে? যথেষ্ট curse না থাক্‌লে এমন habit কারো দাঁড়ায়, শুনেছিস্? They are the dusts of the society."

কিন্তু তা যা-ই হ'ক্, আমার অত কথার দরকার কি? সামনের উপর লোক্‌টা চাপা প'ড়লো, এই যা—নইলে কে কার জন্যে মায়া ক'রতো! গদাধরের পিছু হেঁটে তাই নিতান্ত ভাল মানুষের মতই উদর পুরে ফিরে এলাম সেদিনের মত ঘরে।

পরদিন ভোর বেলায় সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, দেখ্‌লাম—নীচের ফ্ল্যাটের যামিনী মিস্ত্রিরের ছোট মেয়ে কেতকী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। কেতকীর সাথে মাঝে মাঝে আমার প্রেম চলে, শুধু ভাবের নয়, প্রাণেরও। কারণ, ওর মত কচি-কাঁচা বারো বছরের মেয়ের প্রাণস্পর্শি হাসি-কথা আমার প্রাণে যে খুশীর হিল্লোল বইয়ে দিয়েছে, তার কাছে নিরেট ভাব-সম্পদের কোন দাম নেই। আজ পর্যান্তও ওর মুখে আমি আত্মীয়তার কোন সুর নিয়ে কথা হ'য়ে ফুটে উঠতে পারিনি। দেড় বছর ধ'রে এ' বাড়ীটায় আছি, এই দীর্ঘ দিনের সম্বন্ধ, তবু আমাকে কেটে ছেঁটে নামের আদি পর্বটা বাদ দিয়েও আমাকে চিরদিন ডেকে এসেছে 'লাহিড়ী মশাই' ব'লে। আধো আধো মিষ্টিসুরে কথা; গিন্নি যদিও খ্যাপাতেন, তবু ওর মোহ আমাকে একেবারে মোহাবিষ্ট ক'রেই রেখেছিল।

কেতকী ব'ল্‌লে, "লাহিড়ী মশাই, কাল রাত্রে বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল, জানেন?"

অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে চোখদু'টো বেশ ক'রে র'গড়ে নিয়ে, জিজ্ঞেস্ করলাম, "চোর? তোমাদের বাড়ীতে? বল কি! কিছু খোয়া যায়নি তো?

কেতকী ব'ললে, "না, চোর ধরা প'ড়েছে। আমাদের বাড়ীর সেই পুরণো চাকর গোবরা। ওহো, আপনিই বা তাকে চিনবেন কেমন ক'রে,—আপনারা তো এলেন এই সেদিন।" ব'লে কেতকী একবার মৃদু হাস্‌লো। পরে ব'ললে "বাবা তাকে পুলিসে দিয়ে এসেছেন।"

ব'ললাম, "বাঁচা গেল। আমি ভাবলাম—থিয়েটারে সেদিন যেমন 'ঊষাহরণ' দেখেছিলে, তেমনি ক'রে চোরের হাতে বুঝি আমার 'কেতকী-হরণ' হ'ল। তা' হ'লে কি ভীষণ অবস্থাই হ'ত বল দিকি!"

"আপনি বড্ড দুষ্টু, লাহিড়ী মশাই।"—হঠাৎ কেতকীর লতানো হাতখানি আমাকে পিপড়ের মত একটা চিমটী কেটে গেল।

বললাম, "চোরের শাস্তিটা কি তবে আমাকেই পেতে হ'ল শেষটায়? এবারে দেখছি, চুরি বিদ্যেটা শিখতে হবে, অন্ততঃ তোমার ঘরে।"

"তা' হ'লে মার হাতে ঝাঁটার বাড়ি।"—খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল কেতকী।

হাসি আমারও এসেছিল। চাপা দিয়ে ব'ললাম, "এবারে লক্ষ্মীর মত বস দিকি, চট্ ক'রে মুখটা ধুয়ে এসে ষ্টোভটা জ্বেলে ফেলি। তারপর হালুয়া আর চা, কেমন?

খাটিয়া ছেড়ে উঠতে যাব,—কেতকীর দেরী সইলো না, এক দৌড়ে ছু'টে চলে গেল নীচে। আর দেখা নেই।... এমনটাই ও চিরদিন। মিনুর চেয়েও চঞ্চল ওর গতি, সহজ ওর মন।

—আবার সেই পুনরাবৃত্তি। গদাধরের হোটেল, আপিস, আবার বাসা। এমনি ক'রেই মাঝখানে ক'টা দিন বেশ কতকটা মামুলী অবস্থার মধ্য দিয়েই কেটে গেল।

কৃষ্ণা-পূর্ণিমার ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বেলা হয়ে গেল প্রায় ৮টা। শরীরটাও তেমন ভাল লাগছিল না একেবারে। আগের দিন অকারণে রাত জাগা পড়েছে যথেষ্ট। দেহের পড়তা তখন ভাঙ্গেনি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ছে। খুলে দিতেই তড়িৎ বেগে ঘরে এসে ঢুকলো গদাধর। হাতে তার এক গাদা পদ্মফুলের কুঁড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, "এ আবার কি রে, দেবী অর্চ্চনা হবে নাকি?"

স্মিত হাস্যে গদাধর বললে, "কি আর করি, তবু একবার দেখি, গরীবের ওপর দেবীর করুণা হয় কি না? সত্যি কথা বলতে কি সনাতন, ভাত বিক্রীর মতো জগতে আর কাজ নেই। ওতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তবু তো পেট চালাতে হবে। একা মানুষ হলে ল্যাঠা ছিল না। জানিস তো, ঘাড়ের ওপর বাড়ীতে রয়েছে সোমত্ত বিয়ের যোগ্য বোন, আর বিধবা মা। ওদের দিকে যে আর চাইতে পারি না।

—লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ কি আর এ কপালে জুটবে, সনাতন? We are ungreatful beastal sons of her.'

গদাধরের ভগবদ্ভক্তি যে এতটা কবে থেকে হোলো—সহসা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। বি-এ ক্লাসে 'ইকনমিক্স' নিয়ে যার মুখে 'মার্কস' আর 'হেগেল' ছাড়া কথা শুনতাম না একটিও, আজ তাকে এমন করে pure spiritualistic হতে দেখে সত্যি বড় হাসি পেল আমার। বললাম, "ব্যাপার কি বল্ দিকি? এই ছিলি শাক্ত, একেবারে হলি বৈষ্ণব। কোথায় পড়ে রইল তোর dialectic materialism-এর বক্তৃতা, proletarian love, আর কোথায় দেখছি আজ একেবারে অধ্যাত্মবাদ। very misterious, I see."

শান্ত কণ্ঠে গদাধর বললে, "নিজেই বুঝতে পারলুম না, কেমন করে কি হয়ে গেল। পড়াশুনা নিয়ে যখন ছিলাম, ভেবেছিলাম—future life-টাকে নিজের ইচ্ছে খুসী মতো গড়ে তুলব। তখন পেটের খাবার চিন্তা মাথায় ঢোকে নি। তাই politics করে, যথেচ্ছাচারিতা করে সময়গুলো স্রোতের জলের মত ভাসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একে একে দিন যতই যেতে লাগল, যতই বুঝতে শিখলাম যে, আমি ছাড়া সংসারের দিকে চাইবার আর কেউ নেই আমার পাশে, ততই যেন নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে উঠতে লাগলাম। দেখলাম অদৃষ্ট যাকে প্রতারণা করে, জীবনে তার কোন কাজই পূর্ণতার নাগাল পায় না। আমার আজকের এই স্বাভাবিক সত্তাই সেই পূর্ণ অদৃষ্টবাদের চরম ফল। তুই হয় ত ঘৃণা করতে পারিস, সনাতন, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে যা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করলাম, তাকে অস্বীকার করব কেমন করে? মাঝে মাঝে ভাবি, হোটেলওয়ালা না হয়ে যদি সাহিত্যিক হতে পারতাম, তবে বাস্তব জীবনের একটা নিখুঁৎ চিত্র রেখে যেতাম সমাজের কাছে।"

বলবার হয় ত আরও অনেকটা ছিল, কিন্তু হোল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে গদাধর থেমে যেয়ে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।···এতদিনে সত্যি ওর রামায়ণ শুনতে হোল, কিন্তু নতুন সুরে। এমনটা ভাবি নি। সহানুভূতির সুরে তাই বললাম, "দরিদ্র জীবন আমাদের, তবু ধৈর্য্য নিয়ে শক্তি নিয়ে থাকতে হবে। সুদিন একদিন আসবেই। সেই অনাগত লগ্নের জন্যে দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের, গদাধর। মিথ্যে ভেবে দুঃখ বাড়াসনে মনে।"

কিছুক্ষণ গদাধরের মুখে আর কথা ফুটল না। ভাবলাম এবারে উঠে চায়ের ব্যবস্থাটা করি। কিন্তু গদাধর শশব্যস্তে হঠাৎ উঠে পড়লে, বললে, "আজকে তোর special নেমন্তন্ন রইল আমার কোজাগরীতে। বসবার আর সময় নেই। ঘর নিকান, পূজার ব্যবস্থা করা, সবই তো নিজের করতে হবে তদারক্ করে। উঠি ভাই, কিছু মনে করিস নে।"

গদাধর চ'লে গেল। চার দিকে হঠাৎ একটা থমথমে স্তব্ধতা জেগে উঠল। মিনুরা চলে যাবার পরদিনও ঠিক এমন স্তব্ধতাই বোধ করেছিলাম। কিন্তু আজ আবার কেন? তবু এই ক্ষুব্ধ নিঃসারতার মধ্যে আমার সেই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। আজকের রাত্রিটা শুধু মাঝখানে। কালকেই তো আবার এই ঘরের সকল শূন্যতাকে পূর্ণ করে মিনুদের কলহাসি জেগে উঠবে। নতুন খোকার মুখে মামাবাড়ীর ইতিহাস শুনতে শুনতে আমার দু'চোখ ছেয়ে ঘুম এসে যাবে। হাজার কল্পনায় যেন সমস্তটা মন ছেয়ে গেল!

খানিকবাদে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লাম। আপিসের বালাই নেই। বরাত জোরে লক্ষ্মীপুজোর ছুটি পাওয়া গেছে একদিন। সারা বেলা কি করে যে কাটবে সেই কথাটাই এবারে চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে বাইরে বহুদিনের পুরোণো গলার এক আওয়াজ পেলাম।

আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ যে আমার সেই প্রাচীন এলোপ্যাথ বন্ধু ডাক্তার আর, পি, ঘোষ, বিলেত-ফেরত, প্রকাণ্ড এম্, বি, ডি-টি-এম। বাপ ছিলেন ওর নামজাদা ব্যারিষ্টার। মক্কেল পয়সা ছিল যথেষ্ট। তাই দিয়ে আর, পি, ঘোষের বিলেত যাওয়া। বাড়ী ওদের টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছাকাছি। অনিশ্চিত এক শুভ লগ্নে ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ছ'বছর আগে। তারপর থেকে কবে কোথা দিয়ে কেমন করে বন্ধুত্বটা ধীরে ধীরে ঘোরালো হয়ে উঠলো কতক তার মনেও নেই, বাকীটাও আয়তনে দীর্ঘ। তা অত দিয়ে দরকার কি?

বললাম, "sweet morning, I am lucky enough to have you. তারপর—বহুদিন ডুব মেরে আছ, খোঁজ খবর একেবারে বন্ধ, কোথায় আছ এখন, বল দিকি?"

কতকটা সাহেবি কায়দায় ধন্যবাদ জানিয়ে ডাক্তার বললে, "শুধু আছি বললেই তো আর সব হোল না, ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে। That is a long history."

ভগবানকে ধন্যবাদ, তবু সময় কাটাবার একটা বস্তু পাওয়া গেল বটে। বললাম, "তা হোক্, আমি বরঞ্চ ক্রুকবণে তোমাকে কতকটা comfort দেবার ব্যবস্থা করছি, but plough on your history, please."

ডাক্তার সোচ্ছ্বাসে হেসে উঠলো, ব'ল্লে, "That is a petty thing। ক'ল্কাতা ছেড়ে যখন পাটনা চ'লে যাই, তখন তো তুমিই আমাকে see off ক'রে দিয়ে এলে ট্রেনে। সেই হ'তে দেড় বছর পাটনা থেকে চ'লে যাই আসামে। সেখানে যে কটা মাস ছিলাম, তা' medical lawyer হিসাবে নয়, as an unfortunate life-visitor., মানে প্রতিদিন চোখের সাম্নে যে সব চা-বাগানের কুলীদের রোগে ভুগে ভুগে মরতে দেখতাম, তাতে করে এই জ্ঞানই আমার হলো যে, প্রকৃতির একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে নিয়ে যখন মড়ক লাগে—সেই heavy destruction এর মধ্যে অন্ততঃ M-B, D-T-M failure."

আর' পি,' ঘোষের মুখে কিন্তু এতটুকুও হাসি প্রকাশ পেলো না। অথচ আমার মুখে তখন অফুরন্ত স্রোত।

বাধা দিয়ে ডাক্তার বল্লে, "Do nt lough, শুধু তা-ই নয়। আর এক অভিজ্ঞতা নিয়ে সেখান থেকে ফিরলাম। এ্যামেরিকার দাসত্বপ্রথার কথা শুধু বইতেই প'ড়েছি, কিন্তু চোখের ওপর চা-বাগানের master দের হাতে subordinate কুলীদের যে নির্মম torture দেখতে পেলাম' তা ব'লে বুঝোবার নয়। কিন্তু দাস-নির্যাতনের বিষয়ে সে-দেশের political leader রা, সাহিত্যিকরা সংগ্রাম চালিয়েছিল; অথচ দুঃখ হয়, আজও এদেশের লোক এ'সব uncultured, poor, proletariat দের for এ একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত ক'রলে না! ভেবে দেখ দেখি, জাতির পক্ষে এ কতবড় প্রতারণা!"

চায়ের কাপ আর ছোটোখাটো জলখাবারের একটা প্লেট ডাক্তারের সামনে আগিয়ে দিয়ে বল্লাম, "কেন এ'দেশের Marksist group থেকে তো এদের নিয়ে কাগজে পত্রে ইদানীং বেশ আগুন আগুন কথা বেরোচ্ছে। সেটা hopeful সন্দেহ নেই।"

ডাক্তার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বল্লে, "রেখে দাও তোমার hope; Marksism এর বুলি আওড়িয়ে এখানকার তরুণ সাহিত্যিকরা যা' ব'ল্তে চাচ্ছে—তার পেছনে প্রকাণ্ড একটা opportunate ego ছাড়া কাজের কিছু নেই। জাতির সমস্যা তাতে মিটবার নয়। শুধু মায়া-কাঁদন, আর শুধু উপদেশ।"

প্রতিবাদ ক'রতে সাহস পেলাম না। পারিই বা কতটুকু, জানিই বা কি? সারাদিন করি গোলামী, তারপর সাংসারিক তত্ত্বাবধান,—এরপর ক'টা কেরাণী-জীবনে বাইরের সংবাদ রাখা সম্ভব হ'য়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে যা যতটুকু এর ওর মুখে শুনি, তাই নিয়ে তৃপ্তিতে কাটিয়ে দেই দিন।

ব'ললাম, "চা জুড়িয়ে যে বরফ হ'য়ে গেল। ওটা না হয় আপাততঃ শেষ ক'রে নাও।"

ডাক্তার কয়েকবার কাপে উপর্যুপরি চুমুক দিয়ে নিয়ে কি যেন আবার ব'লতে যাচ্ছিল।

প্রসঙ্গটা আপাততঃ চাপা দেবার জন্যে আমি বল্লাম, "তারপর আসামেই কি এখন র'য়েছ নাকি?"

"এর পরেও কি সেখানে মানুষ থাকতে পারে?" বলে ডাক্তার একবার রুমালে মুখ মুছে নিলে। পরে ব'ল্লে, "মাত্র পাঁচ মাস ছিলুম সেখানে। তারপরে সোজা পাড়ি দেই একেবারে রেঙ্গুনে। এখন সেখানেই আছি। চেষ্টায় র'য়েছি যদি একটা private charitable hospital start ক'রতে পারি সেখানে, তবে poor mass-এর পক্ষে treatment এর খুব সুবিধে হয়, না কি বলো?"

বল্লাম, "তা দেশ ছেড়ে রেঙ্গুনে কেন?"

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার মনের কার্পণ্য ক'রলেন না এতটুকুও। বল্লেন, "এক 'বার্মিজ ট্রেডম্যান' পেয়েছি ওখানে 'থ্রি ফোর্থ মানি' সে-ই meet ক'রতে রাজি হ'য়েছে, তবে হস্পিটালের নামকরণ ক'রতে হবে তার মৃতা স্ত্রীর নামে। বলো তো এদেশে এমন লোক পেতাম কোথায়? বিরাট capitalist হ'লে কি হবে, লোকটা ভারি 'my dear' তাই ভেবেছি—ধনীর অর্থ আর সিন্দুকে না পচে এবারে নরনারায়ণের সেবায় আসুক।"

বল্লাম, "good policy, তবে দেখো, শেষটায় ফ'সকে না যায়!"

হেসে ডাক্তার বল্লে, "পাগল হয়েছ ? আর, পি, ঘোষের নজরে একবার যে আসে' বেড়া টপ্‌কে যাওয়া তার পক্ষে বড় সহজ নয়।"

নতুন কথা আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বল্‌লাম, "এত দিনে বিয়ে করেছ তো নিশ্চয়ই ?"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই কথাটা শুনে ডাক্তার মৃদু হেসে উঠলো ; "এপর্য্যন্ত তা আর হ'য়ে ওঠেনি, ব্রাদার। of course, during my London-time a rosy flower suddenly came over my fortune, but I know not how the opportunity betrayed me severely. ...তা হলেও শেষটায় চিন্তা ক'রে দেখেছি, ঝোঁকের মাথায় কাজটা না হ'য়ে ভালই হ'য়েছে। সংসার করা বড় ঝামেলা ভাই। Most probably you are somewhat experienced in this line ?"

ব'ললাম, "দেখ হে, ঝামেলা হ'লেও ওতে আনন্দ আছে বটে। স্ত্রী-পুত্রের হাতের দানাজল, তোমাদের ঐ 'লাইফ্-ইন্সিওরেন্সের' 'বোনাস্ ডিভিডেন্ট' পাবার মতই অনেকটা। শেষ জীবনের ওটা বড় প্রকাণ্ড সম্বল, বুঝলে!"

কথাটা শুনে ডাক্তার হেসে ফেল্‌লে। আবার কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। পরে ব'ললাম, "তা আমার এই কুঁড়ে আস্তানা তুমি চিন্‌লে কেমন ক'রে, বল তো ? মিঃ হাল্‌দারের কাছ থেকে বুঝি ?"

সত্যতা সূচক ঘাড় নেড়ে স্বল্পকালের জন্যে পারা মেঝেটা পায়চারী ক'রে ডাক্তার তার হাতঘাড়র কাঁটা দুটো আমার চোখের সাম্‌নে তুলে ধ'রে বিদায় নিতে চাইলে।

ব'ললাম, "যে ক'টা দিন আছো, দয়া ক'রে রোজ একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যেয়ো।"

"No need of such a bogus formality," ব'লে স্মিত হাস্যে ডাক্তার গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা শূন্যতায় ঘরটা আবার ভ'রে উঠলো।

এখনও সময় প'ড়ে আছে দীর্ঘ। খাওয়া দাওয়া সেরে তাই বেশ একটা ঘুমের ব্যবস্থা ক'রে নিলাম। ঘুম ছাড়া সময় কাটাবার মতো এমন pretty medium আর কি আছে দুনিয়ায় ! একা মানুষের কাজের ছুটি, না যেন মরণ।

রাত্রের প্রোগ্রামটা বাঁধা ছিল। সন্ধ্যা উৎরে যেতেই ছুটে প'ড়লাম তাই গদাধরের কোজাগরীতে।

প্রকাণ্ড এক গানের মজলিস্ ব'সেছে ছোট্ট একটা পানের রেকাবীকে ঘিরে। পূজোর ঠাকুর কথা দিয়ে সময় মত এখনো এসে পৌছায় নি। সাময়িক মজলিসি আড্ডাটা তাই জ'মে উঠেছিল তীব্র আকারেই। নিজের অস্তিত্বকে যতদূর পারলাম মিশিয়ে দিলাম সুরের মধ্যে। এমনি ক'রেই প্রায় সাড়ে ন'টা কি দশটায় দেবীর প্রসাদে পেট ভ'রে গদাধরকে অশেষ ধন্যবাদে তুষ্ট ক'রে ফিরে এলাম আবার নিজের ঘরে।

বাইরের আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্রের অপূর্ব্ব দ্যুতি। খোলা জানলায় ব'সে একাগ্র চিত্তে সেই ভুবন-ভুলানো রূপই দেখে চলেছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনতে পেলাম—'লাহিড়ীমশাই !'

দরজা খোলাই ছিল। কেতকী এসে ভিতরে ঢুক্‌লো। হাতে তার প্রকাণ্ড একটা তামাটে থালা ফল-ফলারি নাড়ু মোয়াতে ভর্ত্তি। ব'ললে, "লক্ষ্মীপূজোর প্রসাদ, মা পাঠিয়ে দিলেন।"

কেতকীকেও তখন যেন ঠিক লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই দেখাচ্ছিল ! রঙিন জর্জ্জেটের শাড়ীতে যে ওকে এত চমৎকার মানায়, এর আগে এমন চোখ দিয়ে আর কখনো দেখিনি। ব'ললাম, "মা পাঠিয়ে না দিলেও বুঝি আর নিয়ে আসতে নেই !"

বাঁকা ঠোঁটে কেতকী ব'ল্‌লে, "নেই-তো ; কাছে থেকেও পূজো-পার্ব্বণে ঠাকুর দেবতার ছায়া পর্য্যন্ত যারা না মাড়ায়, তাদের সাথে কথা বলাই অন্যায়।"

কচি মুখে বুড়োটে কথাগুলি বেশ লাগছিল। ব'ললাম, "তা কি ক'রবো, বল ? মিনুর মার অনুপস্থিতিতে একেবারে খৃষ্টান হ'য়ে গেছি। তবু তো এ লোকটাকে নিয়ে তোমাদের চ'ল্‌তে হবে ! একেবারে পাশাপাশি ঘর, ফেলে দিতে তো আর পার না !"

অতি সন্তর্পণে থালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কেতকী কতকটা কাছে আগিয়ে এসে ব'ল্‌লে, "নিন্, এবারে কপালে ঠেকিয়ে মুখে পুরুন্।"

ব'ল্‌লাম, "বাঃ রে, এতো জিনিষ কি একা খেতে পারি ! তুমি ভাগ না নিলে যে সব কিছুই প'ড়ে থাকবে। তার চাইতে এস, দু'জনে হাতে হাতে তুলে ফেলি।"

কেতকী সামান্য একটু ন'ড়ে দাঁড়ালো, ব'ল্‌লে, "পেট ভর্ত্তি না ক'রে আমি আর আসিনি, জানবেন।"

কিন্তু, জানবারও তো অনেক সময় অনেক কিছুই অতীত থাকে। কেতকীকে আছে টেনে লাল গোলাপের মতো ওর ঐ কোমল চিবুকে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে ব'ল্‌লাম, "লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন কোনো কিছুতে অমত করতে নেই।"

কেতকীর, দেখলাম সারা গা একবার কেঁপে উঠলো। ব'ল্‌লাম, "জানো কেতকী, কাল দুপুরের গাড়ীতে মিনুরা আসচে।"

শুনে কেতকীর সারা মুখ খুসীতে ছেয়ে গেল। ব'ললাম, "আমি কি ঠিক ক'রে রেখেছি জানো? ঠিক ক'রেছি, কালই সন্ধ্যায় তুমি, আমি, সবাই মিলে 'রূপবাণী'তে যাবো। কেমন, রাজি আছো তো?"

সিনেমার সম্বন্ধে কেতকীর চিরদিনই গভীর উৎসাহ তবু ওর ভয় ছিল বাপের চক্ষুকে। ব'ললে, "বাবা জানতে পারলে যে যেতে দেবেন না, লাহিড়ী মশাই!"

সাহস দিয়ে ব'ললাম, "তা আমি না হয় ব'লে ক'য়ে ব্যবস্থা ক'রে নেবো।"

অদম্য খুসীতে কেতকী হাতে তালি দিয়ে উঠল, ব'ললে, "ইস্,—তা হ'লে কি মজা হবে!"

ইতিমধ্যে নীচে থেকে কেতকীর ডাক প'ড়লো। এক মুহূর্ত্তও আর দেরী ক'রলে না। ছুটে সিঁড়ি বেয়ে চ'লে গেল।

কেমন যেন একটা অজানা চঞ্চল আনন্দে মনটা আমার বহুক্ষণের জন্য ছেয়ে রইলো। তারপর 'বেড লাইট' না নিভিয়েই অজান্তে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি, টের পাইনি। ঘুম ভাঙ্গলো এসে একেবারে পরদিন বেলা আটটায়।...

প্রাণটা কেবলই চাতক পাখীর মত চেয়ে ছিল। কখন ঘণ্টাগুলো বেজে যাবে মিনিটের কাঁটার মত; কখন এই প্রতিমুহূর্ত্তের পথ চাওয়াকে পূর্ণ ক'রে সারা বুকে আমার ছড়িয়ে প'ড়বে এসে নতুন খোকার ফুলের মত দেহটুকুর স্নিগ্ধ কোমলতা!...

দেয়ালে টাঙানো ডল্-পুতুলটার দিকে একবার দৃষ্টি প'ড়ল। মনে হ'ল—এ' ক'দিনেই ধূলো জ'মে যেন ময়লা হ'য়ে গেছে ওটা। ঝেড়ে মুছে আবার ঠিক ক'রে রাখলাম। নতুন খোকার খেলার সাথীকে কি অনাদরে রাখতে পারি কখনো?...

সময় ব'য়ে চ'ললো; আমার প্রতিটী নিঃশ্বাসের মাঝ দিয়ে ঘড়ীর কাঁটাগুলি আগিয়ে চ'লল বাঁ থেকে দক্ষিণে।—

আপিস থেকে আজকের ছুটি নিয়েছিলাম। ষ্টোভ জ্বেলে মিনু, খোকা ওদের জন্যে কিছু খাবার তৈরী ক'রে রাখবার ব্যবস্থা ক'রচি,—হঠাৎ পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধ'রলে কেতকী।

ব'ললাম, "চিনতে পেরেছি, বরঞ্চ কাছে ব'সে একটু কাজের সাহায্য কর দিকি!"

মাথার খোলা চুলগুলো একবার খোপা ক'রে নিয়ে কেতকী সামনে এসে ব'সলে, ব'ললে, "ওদের আসতে আর কত সময় বাকী, লাহিড়ী মশাই।"

ব'ললাম, "এই তো আর ঘণ্টা দেড়েক মাত্র।"

—এর পর এক ঘণ্টা প্রায় এটা ওটাতেই কেটে গেল। ভাবলাম—পাছে 'লেট' হ'য়ে পড়ি। ঘরে তালা মেরে তাই ছুটে প'ড়লাম ষ্টেশনে।—প্লাটফর্মে 'টিম্বার-মার্চ্চেন্ট' মহেশ চক্কত্তির সাথে দেখা। লোকটার সাথে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ভাবটা ছিল আগে থাকতেই। জিজ্ঞেস ক'রলাম, "কোথাও যাবেন বুঝি!"

চক্কত্তি ব'ললে, "আজ্ঞে না, বোনের জামাই আসার কথা আছে কিনা, বেশী কোনদিন ক'লকাতায় আসেনি, তাই যা এগিয়ে নিতে আসা।"—

ব্যবসাদার হ'লেও লোকটা সরল প্রকৃতির। পায়চারী গল্পে তাই কিছুক্ষণ কেটে গেল ওর সাথে বড় মন্দ নয়।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। অগণিত যাত্রীর ভীড়ে কোথায় গেল চক্কত্তি, আর কোথায় রইলাম আমি! কুলি আর বাবুদের উঁচু গলার হাঁক-ডাকের মাঝ দিয়ে মিনুরা এসে কামরা থেকে নামলো। আনন্দে উৎসাহে সারা বুক ভ'রে গেল।

এ যাত্রাও রতন ছিল ওদের সঙ্গে। কথায় কথায় প্লাটফর্মের বাইরে আগিয়ে আস্‌ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ছোট্ট একটা 'এ্যাটাচিকেশ' হাতে দ্রুত পায়ে গেটের ভিতরে আগিয়ে আসচে গদাধর। কতকটা অনুসন্ধিৎসা হ'ল। অথচ কাছে এলে কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রবার আগেই গদাধর ব'লে উঠল, "হঠাৎ বাড়ীর টেলিগ্রাম পেলাম, মার খুব অসুখ। তাই চ'ললাম ভাই। হোটেলের সবই রইল অগোছালো, মাঝে মধ্যে এক আধবার যেয়ে দেখিস সনাতন।"

এক মুহূর্ত্তে সব কিছু যেন কেমন একটা ধাঁধাঁ লেগে গেল,—কেমন একটা এলোমেলো হ'য়ে গেল অবস্থাটা।—নতুন ক'রে গদাধরকে কোন প্রশ্ন ক'রবার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না নিজের মধ্যে।—ওদিকে ওর হয়ত গাড়ী ছাড়বার সময় হ'য়ে এসেছিল এতক্ষণে। আমি শুধু একবার পিছন তাকিয়ে রতনকে ব'ললাম, "তুমি ওদের নিয়ে এস, আগে হেঁটে আমি বরঞ্চ একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।"

বাঙ্গালীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক ভারতবাসী সিভিলিয়ন (I. C. S.) বাঙ্গালী, কিন্তু আজকাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙ্গালার নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমন কি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষক-সভা (Board of Examiners) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, এই পরীক্ষায় আপনাদের ছাত্রেরা আজকাল এত অল্পসংখ্যায় উত্তীর্ণ হয় কেন? বাঙ্গালীর চিরশত্রু লর্ড মেকলে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আইন ব্যবসায়ে এই জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত। কিন্তু আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার বাহির হইতে উকিল-ব্যারিষ্টার আনিবার কথা উঠে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা বাঙ্গালীই প্রথম প্রবর্ত্তিত করে। স্বর্গীয় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। ইনিই ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এফ, আর, এস, (F.R.S.) উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। আর আজ কাল ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উচ্চ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন এমন হইল? ইহার কারণ কি?

বাঙ্গালীজাতির ভিতর কি চিন্তাশক্তি কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে? নিশ্চয়ই হইয়াছে। না হইলে এমন ভাবে সর্ব্বত্রই একটা জাতীয় অবনতি আসিয়া উপস্থিত হইত না। হয় ত কেহ কেহ এইখানে এমন দুই একজন বাঙ্গালীর নাম করিবেন যাঁহারা এখনও বিশেষ ভাবে মেধা ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু এইরূপ দুই একজন ব্যক্তি কোন জাতির সাধারণী মানসিক শক্তির পরিচায়ক হইতে পারে না। বিশেষ ইঁহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় বর্ত্তমানে ঐরূপ বাঙ্গালী দুইজন কি তিনজন জীবিত আছেন।* সাধারণতঃ আজকাল বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তামূলক বিষয়াদির আলোচনা বা অনুসন্ধান প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার বিকাশ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ শিক্ষিতাভিমানী এই সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের আলোচনা নিঃস্বার্থভাবে, আর সত্যের ভিতর দিয়া করিতে পারিতেছেন না। তথ্যানুসন্ধান ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, ইহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র (means to the end), তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনেক স্থলেই আত্মপরিচয় প্রদান।

ধরুন, কেহ বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্ব (philology)-এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয় ত ইনি ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছেন। উহা করিয়াছেন বলিয়াই কি তাঁহার যাবতীয় শিক্ষা উহা সমস্তই বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সন্নিবেশিত করিয়া দিতে হইবে? ভাষাবিজ্ঞান প্রকাণ্ড শাস্ত্র, উহা বহু নিয়ম ও বহু সূত্রের অধীন, ঐ সমস্ত নিয়মাবলী প্রত্যেক ভাষার ভিতরই কার্য্য করিতেছে, কিন্তু এই সকল আলোচনাকারীরা আলোচনা করিতে বসিয়া আলোচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়া ভাষাবিজ্ঞানের যতটুকু তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে সেই সমস্তটুকুই তাঁহাদের আলোচনার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদের আলোচনা লোকমনোহরও হইতেছে না, পৃথিবীর প্রকৃত জ্ঞানভাণ্ডারের কিছু সাহায্যও করিতেছে না। এক কথায় বলিতে গেলে, ইঁহাদের কিছু সংগ্রহ আছে বটে কিন্তু প্রতিভা নাই।

কেন এমন হইল? বাঙ্গালীর ভিতর প্রকৃত প্রতিভা কেন এমন ভাবে একেবারে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল? প্রতিভা কাহাকে বলে? প্রতিভার প্রতিশব্দ আমরা দিয়া থাকি মনীষা, প্রতিভাশালী লোককে আমরা মনীষী বলি, মনসঃ ঈষা অর্থাৎ মনের উপর প্রভুত্ব এই অর্থে মনীষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মনঃ বলিতে নিজেকে বুঝিতে হইবে, নিজের উপর যাহার প্রভুত্ব হইয়াছে সেই লোকই মনীষী বা প্রতিভাশালী। ভগবানেরই নিজের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, কাজেই তিনিই পূর্ণ প্রতিভার আধার; মানুষ নিজের উপর যতই প্রভুত্ব আনিতে পারিবে, অর্থাৎ স্বার্থবোধকে যতই

* যখন এই প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা আলোকিত করিতেছিলেন।

বশীভূত করিতে পারিবে, সেও ততই ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই প্রতিভার আধার হইবে।

স্বার্থজ্ঞান বশীভূত না হইলে প্রকৃত প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব, মানুষ অনেক সময় প্রভূত মানসিক শক্তি (Intellectual force) এর আধার হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং চর্চ্চা (culture) দ্বারা ঐ মানসিক শক্তিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া নিজেকে এক বিরাট শক্তিমান্ পুরুষে পরিণত করে, কিন্তু নিজের স্বার্থজ্ঞানকে যদি সেই ব্যক্তি নিজের বিরাট-শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সেই অতিমানুষী শক্তি হইতে সেই ব্যক্তি জগতের কোন স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হয় না, বরং জগতের অপকারই সে করিয়া যায়। তাহার সমস্ত কার্য্য, আরব্ধ অনুষ্ঠান সকলই পরিশেষে পণ্ড হইয়া যায়। নেপোলিয়নের চরিত্র আলোচনা করিলেই আমরা এ কথার সত্যাসত্য অবগত হইতে পারি। নেপোলিয়নের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয় ইদানীং কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাঁহার কোন কীর্ত্তিই আজ জগতে বর্ত্তমান নাই। তিনি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে নিজকে এবং নিজের বংশকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বংশও আজ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত নাই, সাম্রাজ্যও স্থায়ী হইতে পারে নাই।

নেপোলিয়ন প্রথমে আপনার স্বজাতিপ্রীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ফরাসী জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করেন, ফরাসী জাতি তাঁহার দৃষ্টান্ত ও নায়কত্বের প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে সেই সময়ের বাদ-বিসম্বাদ ও ভ্রাতৃদ্রোহ ভুলিয়া নেপোলিয়নের শাসনাধীনে পুনরায় একত্রিত হইয়া নবগৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। স্বজাতিবাৎসল্যের দ্বারা প্রণোদিত নেপোলিয়ন তাঁহার প্রবল শক্তির প্রভাবে ফরাসীজাতির এই পুনর্জীবন লাভ সংঘটিত করেন। এইটুকুই তাঁহার নিঃস্বার্থ কাজ। এই জন্যই আজও ফরাসীজাতি তাঁহার মূর্ত্তিকে পূজা করিয়া থাকে এবং তাঁহার নামে তাহাদের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু অতঃপর তিনি যাহা করিলেন উহা তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি-বিজড়িত। ফরাসী জাতির একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া তিনি ঐ নব জাগরিত জাতির সাহায্যে নিজেকে ও নিজের বংশকে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্য তাঁহার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হইয়া যায় ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনও সামান্য গৃহস্থ পরিবারে পরিণত হয়। তাঁহার পুত্র বিদেশীয় শক্তির অধীনে যুদ্ধ করিতে গিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। আপনাকে ও আপনার বংশকে পৃথিবীর প্রভুরূপে স্থাপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া নেপোলিয়ন যেরূপ ফরাসীজাতির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি যদি পৃথিবীর সমস্ত দুর্ব্বল জাতিকে প্রবলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তিনি আজ বোধ হয় সর্ব্বত্র দেবতার পূজা পাইতেন। সুখভোগ, অর্থলোভ প্রভৃতি ক্ষুদ্র স্বার্থও যেমন স্বার্থ, তেমনই যশোলিপ্সা, সকলের নিকট প্রাধান্য লাভের চেষ্টা প্রভৃতিও স্বার্থ। শক্তিশালী পুরুষেরা অনেক সময় ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে মুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বার্থ হইতে অনেকেই মুক্ত হয়েন না; যাঁহারা হয়েন তাঁহারাই প্রকৃত মনীষী। এই সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় মানসিক সদ্বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলনের দ্বারা মনোব[illegible] পরিপুষ্টি (Moral culture).

আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ্ William Channing (উইলিয়ম চ্যানিং) তাঁহার self-culture (আত্মোন্নতি) শীর্ষক গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন, "Who ever desires that his intellect may grow up to soundness must begin with moral discipline. To gain truth, which is the great object of the understanding, I must take it disinterestedly. Talent is worshipped; but if devorced from rectitude, it will prove more of a demon than a God," অর্থাৎ, "বুদ্ধিশক্তির সম্যক উন্নতি বিবেকের উপরেই নির্ভর করে। নিঃস্বার্থ ভাবে দেখিতে না শিখিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পূজাপ্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু তিনি যদি ন্যায়মার্গ হইতে বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই করে।" মানসিক সদ্বৃত্তির অনুশীলন (Moral culture) এর দ্বারা লভ্য এই বিশেষ শক্তি বা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা বাঙ্গালী হারাইয়াছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাঙ্গালী আর

এখন কোন কাজই করে না; বাঙ্গালী এখন যাহা কিছু করে উহা সহজই হউক আর কঠিনই হউক, উহার মূলে তাহার কিছু না কিছু স্বার্থ থাকে। এমন কি, জ্ঞানচর্চ্চাও বাঙ্গালী এখন আর নিঃস্বার্থভাবে করে না, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদির আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতে গেলেও বাঙ্গালী আলোচক আগে দেখে এই চর্চ্চা বা আলোচনা হইতে কিরূপে আপনার যশঃ, পদবৃদ্ধি বা অর্থাগমের সুবিধা হইবে। বাঙ্গালীর অধঃপতনের ইহাই হইতেছে একমাত্র কারণ।

কর্ত্তব্য-পরায়ণতাই মানুষকে দৃঢ়চিত্ত করে। যাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি নাই তাহার চিত্তের দৃঢ়তাও নাই। বাঙ্গালীরও এক্ষণে হইয়াছে তাহাই। দৃঢ়তা সহকারে এক্ষণে সে আপনাকে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত করিতে পারে না। সকল বিষয়েই সে এখন চঞ্চল। গুরু বিষয়ের ত' কথাই নাই, কোন লঘু বিষয়েরও শেষ পর্য্যন্ত এখন আর সে এক মনে উপস্থিত হইতে পারে না। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদের উদ্ভব এখন আর বাঙ্গালীর মধ্যে সম্ভব নহে। অথচ লঘুচিত্ততার যাহা ধর্ম্ম তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীকে অধিকার করিয়াছে, সে নিজেকে সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করে; কোন বিষয়ে হতাশ হইলে নিজের অক্ষমতার কথা মোটেই এখন আর বাঙ্গালীর মনে আসে না, তৎপরিবর্ত্তে যাহাদের জন্য সে ঐ কার্য্যে বিফল হইল, তাঁহাদের উপরে অযথা বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে গালি দেয়। Dryden-এর প্রসিদ্ধ উক্তি "first deserve then desire" (অর্থাৎ আগে যোগ্য হও, পরে কামনা করিও) বাঙ্গালী একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

লোভ রক্তমাংসের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহাকে চেষ্টা করিয়া দমন করিতে হয়। চেষ্টার অভাব হইলেই উহা মাথা তুলিয়া উঠে। একমাত্র দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরাই উহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে। কাজে কাজেই বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ণরূপে লোভের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। লোভের দুইটী প্রধান বস্তু, কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুইটী লোভই বাঙ্গালীকে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী যুবকেরা যে অধুনা কোন কঠিন কাজই করিতে অসমর্থ, তাহার অন্যতম—অন্যতম কেন, বোধ হয় একমাত্র কারণ তাহাদের এই অত্যধিক কামিনী-স্পৃহা। ইহাই তাহাদের সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, সেখানে অন্য বিষয়ের স্থান কোথায়? তাহাদিগের বসন-ভূষণ ধ্যান-জ্ঞান সমস্তই একই উদ্দেশ্যে প্রধাবিত। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এই স্পৃহা জীবজগতের সাধারণ ধর্ম্ম। পশুপক্ষী, কৃমি-কীট সকলেই তুল্যভাবে ইহার বশীভূত। ইহাকে স্ববশে আনয়ন করাই মনুষ্যত্ব। এবং ইহাকে স্ববশে আনিতে না পারিলে মানুষ কোন কঠিন কাজই করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐদিকে ধাবিত হয়। যদি কখনও অদৃষ্টদোষে সাময়িক পদস্খলন ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে শক্তিমান পুরুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য অবিলম্বেই উহার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব পুনরায় বজায় করা। এই রিপুর বশীভূত থাকিয়া কেহ কখনও বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই। যদি মৎস্যগন্ধার মোহে আকৃষ্ট হইয়া পরাশর জটা মুড়াইয়া তাহারই কাছে বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কোন দিনই তিনি পরাশর হইতে পারিতেন না।

অর্থলোভের ত' কথাই নাই। আধুনিক বাঙ্গালার অর্থলোলুপতা প্রবাদবাক্যের মত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অফিসই হউক, কারবারই হউক বা অপর কোন প্রতিষ্ঠানই হউক, যেখানেই টাকাকড়ির গোলমালের কথা শুনা যায়, সেইখানেই দেখা যায় বাঙ্গালী তাহার মূলে। বাঙ্গালীর কোন বড় ব্যবসায়, যৌথ-প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত টিঁকে নাই, ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালীর অর্থলোলুপতা। টাকা হাতে আসিয়া পড়িলেই বাঙ্গালী উহা আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। বাঙ্গালীর জাতীয় মনোবৃত্তির এত অধিক পতন হইয়াছে যে, অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী এই জঘন্য, হেয়, হীন উপায়ে অর্থলাভকে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন না। যাঁহারা ঐ সকলের জন্য কষ্ট বা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জন্যই অধিক দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মানসিক অধঃপতনের জন্য সেরূপ দুঃখিত হয়েন না। অনেকে আবার এই দোষ সাহেবদের আছে বলিয়া ইহার সমর্থন করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কোন বস্তু সাহেবদের থাকিলেই উহা স্পৃহণীয় হয় না, বিশেষ এই দোষ সাহেবদের নাই। সাহেবরা অর্থপ্রিয় জাতি বটে, কিন্তু তাঁহারা চোর নহেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের হস্তগত তাঁহাদের

স্বজাতীয়-জনের অর্থ তাঁহারা কখনই অপব্যবহার করেন না। করিলে ব্রিটিশ যৌথ-কারবার আজ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িত না। কেহ কেহ বা চাণক্যের "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" অথবা "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ যেন তেন প্রকারেণ" প্রভৃতি কথা উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করেন যে, অবস্থাবিশেষে এ সকল কার্য্য বিশেষ দোষজনক নহে এবং বলিয়া থাকেন যে, সেকালের লোকেরা বুদ্ধিমান্ ছিল তাই পূর্ব্বোক্ত কথা সকল আমরা শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু উঁহাদেরই "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ", "ধর্ম্মো হি তেষাং কেবলো বিশেষঃ" অথবা "ধর্ম্মেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ" ইত্যাদি কথা বোধ হয় এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন না, বা জানিতে চাহেন না। অবস্থা ত' হইল ইহাই।

এক্ষণে ইহার প্রতীকারের উপায় কি? প্রতীকারের প্রধান উপায় ইহাই হইতেছে যে, বাঙ্গলার যে তরুণ ও নব্য-সম্প্রদায় অধুনা শিক্ষাধীন আছে তাহাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও আত্ম-মর্য্যাদাই মনুষ্য-জীবনের সারবস্তু. এই কথাটা অন্তরের অন্তর হইতে অনুভব করিতে পারে। তাহারা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে যে, যোগ্যতাই সাফল্যের একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ। ছাত্র-জীবন হইতে এই শিক্ষালাভ না হইলে ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া ইহারাও বাঙ্গালীর নামে কলঙ্ক ঢালিয়া যাইবে। শুধু কথায় শিক্ষা হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রে ও প্রকৃত দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা তাহাদের শিখাইতে হইবে। এই সত্য তাহাদিগকে অনুভব করাইতে হইবে যে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদির ফলাফলে চুল চিরিয়া যোগ্যতানুসারেই সাফল্য দেওয়া হয়। যাহার যেমন যোগ্যতা সে ঠিক রকমই ফল পাইয়া থাকে। যোগ্যতা ভিন্ন অপর কোন উপায়ে যে এসকলে একবিন্দুও সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে, এ ধারণা যেন তাহাদের মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হয়। এই ভাবে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করিতে সক্ষম বলিয়া জন-সমাজে যাঁহাদের খ্যাতি আছে তাঁহারাই যেন পরীক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হন। ছাত্রেরাই ভবিষ্যত জাতি, অতএব তাঁহারা সংশোধিত না হইলে জাতি উন্নত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? প্রয়োজনানু-সারে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে পরীক্ষাবলীকে কদাচ যেন নিতান্ত লঘু করিয়া না দেওয়া হয়। ইহার দ্বারাই ছাত্রদিগের মধ্যে উদ্যম, অধ্যবসায় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে উৎকর্ষলাভের চেষ্টা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

ছাত্রজীবনে শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের প্রভাব অসীম, কারণ অধ্যয়নই ছাত্রজীবনে সর্ব্বে-সর্ব্বময় বিষয়। ইহাতেই তাহাদের ধ্যান-জ্ঞান নিহিত থাকে। এই অধ্যয়ন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বলিতে কি উঁহাদিগেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যে বাস করে, তাহার প্রভাব উহার উপর অসীমই হইয়া থাকে। ছাত্রদিগেরও তাহাই হয়। তাহারা সহজেই শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগকে তাহাদের জীবনের আদর্শ ও দৃষ্টান্তস্থল করিয়া লয়। অতএব ইঁহারা যদি হীনবৃত্তি-পরায়ণ অর্থলোলুপ, চাটুকার হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রভাবে ছাত্রজীবনে যে কলুষতা প্রবেশ করে, সারাজীবনেও তাহা সংশোধিত হয় না। অতএব অধ্যাপকমণ্ডলীতে শিক্ষণীয় বিষয়ে পারদর্শিতা যেমন বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের মধ্যে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণ সেইরূপ বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে, শেষোক্ত গুণ সকল সম্পন্ন অধ্যাপকমণ্ডলীই যেন সর্ব্বত্রই নিযুক্ত হয়। হউক তাহাতে বন্ধু-বিচ্ছেদ, আত্মীয়তার হানি, বা আপনার দলপুষ্টির ব্যাঘাত, কর্ত্তৃপক্ষ যেন কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত না করেন। জাতির ভবিষ্যত নষ্ট করিয়া আপনার দলপুষ্টির ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি পারে কি?

যদি কর্ত্তৃপক্ষ স্বার্থানুরোধেই হউক, বা অপর যে কোন কারণেই হউক আপনাদের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন তাহা হইলে জনসাধারণের কর্ত্তব্য একবাক্যে তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা, ইহার সংশোধন করা। জনসাধারণই এই সকল বিষয়ের শেষ বিচারক, তাঁহারা যদি আপন কর্ত্তব্যের প্রতি যথার্থভাবে অবহিত হয়েন, তাহা হইলে সকল অনাচার কদাচার নিন্দা-গ্লানি এক মুহূর্ত্তেই দেশ হইতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আজকাল সকল সময়ে এ সকল বিষয়ে তাঁহারা সেরূপ মনোযোগী হয়েন না, হয়েন না বলিয়াই জাতির এত দুর্গতি। বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকজন মহাপুরুষের চেষ্টায় বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইয়াছিল। উহার ফল স্বরূপ জাতিও দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সেই সকল মহা-পুরুষদের তিরোধানের পর কিছুদিনের মধ্যেই যে কারণেই হউক জনসাধারণের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বারা আবদ্ধ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য চাটুকার সম্প্রদায়-বিশেষে পরিণত হইয়া পড়েন, জাতিও চরম দুর্দ্দশায় আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার বাঙ্গলার জন-সাধারণের মধ্যে সেই অদম্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হউক, আবার তাঁহারা জগতকে বুঝাইয়া দিউন যে, অধর্ম্মপরায়ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির বাঙ্গলা দেশে কোথাও স্থান নাই। তিনি যত বড়ই পাণ্ডিত্যাভিমানী কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি বাঙ্গালী নামের অযোগ্য। জনসাধারণের মধ্যে এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলার তরুণ ও নব্যসম্প্রদায় সংশোধিত হইবেই উপরন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যে-সকল বাঙ্গালী এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া জাতির মুখ আবার উজ্জ্বল করিবেন।

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

চার

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার পর থেকে সুরথ প্রায় প্রতিদিনই লীলাবতীর গতিবিধির উপর গোপন ভাবে দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করলো। তার আশঙ্কা হচ্ছিল, কেদারনাথ অতো সহজে লীলাবতীকে ছেড়ে দেবে না এবং সুযোগ পেলেই তাঁকে আবার নিজ কবলের ভিতর আনতে চেষ্টা করবে।

সুরথ লক্ষ্য করলো লীলাবতী রোজ অপরাহ্নে পাঁচটার সময় মোটরে ক'রে একেলা বেড়াতে বেরিয়ে যান এবং ঘণ্টা দেড়-ঘণ্টা পরেই আবার ফিরে আসেন—আরো লক্ষ্য করলো, তাঁর বেড়াবার স্থান প্রধানতঃ পাহাড়ের দিকটায়ই হ'য়ে থাকে। এরূপ স্থান যে লীলাবতীর বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয় এমন আশঙ্কা করবার কারণ না থাকলেও, সুরথ ছদ্মবেশে সেই দিকটায় কোনো গাছের বা ঝোপের আড়ালে থেকে লীলাবতীর উপর নজর রাখতো।

পাহাড়ের বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্য কবি-প্রকৃতি এই মহিলাকে চুম্বকের মতো টেনে আনতো। সুরথ লক্ষ্য করতো, লীলাবতী এসেই প্রথমতঃ দাঁড়াতেন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী নিজ বক্ষঃস্থিত অযুত শিলাখণ্ড প্লাবিত করে কল্ কল্ নাদে ব'য়ে যেতো তার তীরে এবং সেখান থেকে বিমুগ্ধ চিত্তে দেখতেন, প্রকৃতির সেই বিচিত্র লীলা—তারপর ঐ রাস্তায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল হেঁটে বেড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। নিকটে পাহাড়ীদের ছোট একটা বস্তি ছিল—মাঝে মাঝে তিনি সেই বস্তির ধারের রাস্তায়ও বেড়াতেন এবং বস্তিবাসী ছোট ছেলে-মেয়েদের ডেকে এনে খেল্না, ছবি প্রভৃতি উপহার দিয়ে তাদের তৃপ্ত জন্মাতেন।

সুরথ সেখানে পৌঁছুতো একটু বেলা থাকতেই এবং লীলাবতীর আসবার আগেই একবার চারদিক ঘুরে দেখতো সন্দেহজনক কিছু আছে কি না। একদিন এইরকম পর্য্যবেক্ষণের পর পথের ধারের একটা ঝোপের পশ্চাতে ব'সে সুরথ বিশ্রাম কচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে একখানা মোটরগাড়ী এই দিকেই আসচে ব'লে তার বোধ হ'ল এবং এই গাড়ী যে মিস্ রায়ের নয়, তা তার শব্দ থেকেই সে অনুমান করতে পারলো—তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্য আড়ালে থেকে গাড়ীর উপর নজর রাখলো। চারজন আরোহী নিয়ে গাড়ীখানা খানিকটা এগিয়ে গেল কিন্তু একটু পরেই সুরথ যেখানে লুকিয়ে ছিল, তার নিকটে ফিরে এসে রাস্তার উপর এমন আড়াআড়ি ভাবে রইলো যেন অন্য কোনো গাড়ী আর এগিয়ে যেতে না পারে। সুরথ দেখলো, গাড়ীতে তখন মাত্র দু'জন লোক—তাদের একজন ড্রাইভার, দ্বিতীয় লোকটি ড্রাইভারেরই পার্শ্বে উপবিষ্ট কিন্তু তার চেহারাটা গুণ্ডার মতো। রাস্তার মাঝখানে পথ বন্ধ ক'রে গাড়ী রাখবার কি উদ্দেশ্য এবং অপর আরোহী দু'জন কোথায় কি উদ্দেশ্যে চ'লে গেল, দুলাল কিছুই অনুমান করতে পারলো না। লোক দু'টি গাড়ী থেকে না নেমে নিজ নিজ স্থানে ব'সে রইলো এবং সিগারেট ধরিয়ে ধূম টানতে টানতে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো। কিন্তু কথাগুলো সুরথের কাণে পৌঁছলো না।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর দেখা গেল আর একখানা মোটর গাড়ী এই দিকে আসচে। সন্নিহিত হবার আগেই সুরথ বুঝতে পারলো, এখানা মিস্ লীলাবতীর গাড়ী। এই জায়গায় এসেই গাড়ী থামতে বাধ্য হ'ল। পথরোধকারী ড্রাইভারকে রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্যে বলা হ'লে সে গাড়ী থেকে নেমে এসে লীলাবতীকে সম্ভ্রম সহকারে অভিবাদন করে জানালো :—"এই রাস্তাটা বুঝেছেন কিনা, ঐ সামনে এক জায়গায় ধ্বসে প'ড়ে গেচে, সাবধানে না গেলে, বুঝবেন কিনা, বিপদ ঘটতে পারে—আমরা, তাই বুঝেছেন কিনা, ফিরে এসেচি। একটু এগিয়ে গিয়ে, বুঝেছেন কিনা, দেখে আসতে পারেন।"

—"কালও তো রাস্তা বেশ ভালো ছিল, এরই মধ্যে হঠাৎ ধ্বসে গেল? আশ্চর্য্য বটে। যাক্, একবার দেখে

আসি।" বলেই লীলাবতী গাড়ী থেকে নামলেন এবং হেঁটে সেইদিকে চল্‌লেন।

এই স্থলে বলা আবশ্যক, যে স্থানে গাড়ী থেমেছিল সেই স্থান থেকে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই রাস্তার বাঁদিক দিয়া আর একটা বড় রাস্তা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী সব্‌ডিভিসনের টাউনের দিকে গিয়েচে—মাঝপথে ঐ রাস্তা একটা নদীদ্বারা বিভক্ত।

লীলাবতীর সঙ্গে এই ড্রাইভারও হেঁটে চল্‌লো এবং যেতে যেতে বললো, "এই পাহাড়ে দেশের রাস্তাঘাট, বুঝচেন কিনা, বিশ্বাস করা চলে না। কখন কোন দিক দিয়ে, বুঝচেন কিনা, ঝরণার জল ঢুকে রাস্তাঘাট একদম তলিয়ে দেয়, বুঝেচেন কিনা, তার কিছু ঠিক নেই।"

সঙ্গীর কথার অর্থ বুঝিতে পেরেচেন কিনা এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করে লীলাবতী চল্‌তেই লাগলেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে তিনি দেখলেন উক্ত সঙ্গীর সহচর লীলাবতীর মোটরখানা নিয়ে টাউনের দিকে চলে গেল। বিস্মিত হয়ে তিনি সঙ্গীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কারণ বলবার পরিবর্ত্তে লোকটা ঈষৎ হাসলো এবং সেই মুহূর্ত্তে নিকটবর্ত্তী ঝোপের আড়াল থেকে দু'টি লোক হঠাৎ বেরিয়ে এসে লীলাবতীর দুই পার্শ্বে দাঁড়ালো এবং তাঁকে অপর মোটরখানার দিকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। লোকগুলোর অভিপ্রায় কি বুঝতে না পেরে লীলাবতী তাদের সঙ্গে যেতে বল্‌লেন ঠিক এমনি সময় আর একখানা মোটর এসে পূর্ব্বের মোটরের কাছে দাঁড়ালো এবং সেই গাড়ী থেকে অবতরণ করলো কেদারনাথ। লীলাবতী তাকে দেখতে পেয়ে বুঝলেন, তিনি একটা ষড়যন্ত্রের ভিতরে পড়েচেন। এতগুলো দুষ্টলোকের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা অসম্ভব মনে ক'রে তাঁর সমস্ত সাহস ও বুদ্ধি যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল—তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইত্যবসরে কেদারনাথ নিকটে এসে তাঁকে সম্বোধন ক'রে হাসি হাসি মুখে বল্‌লো :—"নমস্কার মিস্ রায়, এবার আমার সঙ্গে নৌকা-বিহারে যেতে হবে। আপনি কবি ও শিল্পী, প্রচুর আনন্দ পাবেন—কোনো আপত্তি শুনবো না। চ'লে আসুন, বিলম্ব করবেন না।"

ষড়যন্ত্রের ঘৃণিত উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য ইঙ্গিত পেয়ে লীলাবতীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো এবং লুপ্তপ্রায় সাহসও ফিরে এলো। চক্ষু থেকে অনল বর্ষণ ক'রে তিনি কেদারনাথকে বল্‌লেন :—

"শয়তান, মনে করচো, ধর্ম্ম নেই, ভগবান্ নেই, যা খুসি তাই করবে। অসহায়ের সহায় ভগবান হ'য়ে থাকেন সে কথা ভুলে যেও না, হাতে হাতে শাস্তি পাবে, পুড়ে ছারখার হবে। চলে যাও আমার সামনে থেকে, যদি ভাল চাও।"

—"বহুৎ কড়া হুকুম দেখচি। তোমার ভগবান বহুকাল মরে ভূত হয়ে আছেন, সে খবরটা বুঝি জানো না। তার নাম নিয়ে শিশুদের ভয় দেখানো চল্‌তে পারে, কিন্তু সে ভয়ে কম্পিত নয় কেদার-হৃদয়। ভালো মানুষটির মত চলে এসো, গোলমাল করো না।"

লীলাবতী যখন এক পাও চল্‌লো না, কেদারনাথ তখন তাঁকে জোর করে টেনে নেবার জন্য সঙ্গীদের আদেশ করলো। লোকগুলো এই আদেশের প্রতীক্ষায়ই ছিল—এখন হুকুম পাওয়া মাত্র আদেশ-পালনে লেগে গেল। লীলাবতী তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুরথ আর লুকিয়ে থাক্‌তে পারলো না—হঠাৎ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে লাথি ও ঘুসি প্রহারে লোকগুলোকে একে একে ধরাশায়ী করলো। কেদারনাথ তখন একটা রিভলবার বের করে সুরথের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করলো কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। সুরথ চোখের পলকে ছুটে এসে কেদারনাথের হাত থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিলো ও এক ধাক্কায় তাকে তিনহাত দূরে ফেলে দিয়ে বল্‌লো—তোমার অস্ত্র দিয়ে এই মুহূর্ত্তেই তোমার পাপ-জীবনের শেষ করতে পারি কিন্তু তা করে আমার হাত কলঙ্কিত করব না।"

তারপর সে রিভলবারের বাকী পাঁচটা গুলি ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে একে একে ছুঁড়ে অস্ত্রটা দূর জঙ্গলে ফেলে দিলো। কেদারনাথ তখন নির্ভয়ে সুরথকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে তার লোকজনকে হুকুম করলো—"মিস্ রায়কে চট্ করে গাড়ীতে উঠাও, তারপর তাঁর হাত-পা-মুখ বেঁধে

নিয়ে যাও সেই বাংলোতে নদীপথে—আমি অন্য পথে যাচ্ছি। দেরি করো না।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সুরথের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে সাপটে ধরলো। দু'জনে তখন তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হ'ল।

ওদিকে কেদারনাথের লোকেরা লীলাবতীকে ঠেলে নিয়ে গাড়ীতে তুললো ও আদেশ মতো তাঁর হাত-পা-মুখ বেঁধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী নিয়ে সবডিভিসনের রাস্তায় ছুটে চল্‌লো।

কেদারনাথকে ধরাশায়ী ও অজ্ঞান ক'রে ফেল্‌তে সুরথের অনেকক্ষণ না লাগলেও সে দেখলো, লীলাবতীকে নিয়ে মোটরখানা ঝড়ের মতো উড়ে গেল। মুহূর্ত্তে সংকল্প স্থির ক'রে সুরথ কেদারনাথের অপর মোটরে চ'ড়ে আগের গাড়ীর অনুসরণে রওনা হ'ল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সময়েই মোটর-চালনায় তার নিপুণতা জন্মেছিল এবং কলকব্জা সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ হ'য়েছিল। তার ঐ জ্ঞান এখন কাজে লাগলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিয়দ্দূর যাবার পরেই গাড়ীর ইঞ্জিনের একটু গোলমাল উপস্থিত হ'ল এবং তা সেরে নিতে সুরথের প্রায় পোওয়া ঘণ্টা দেরি হ'য়ে গেল। প্রায় পঁচিশ মাইল পথ এসে গাড়ী থাম্‌লো এক নদীর ধারে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেচে কিন্তু জমাট বাঁধে নাই। সুরথ দেখলো, আরোহী ও চালক শূন্য অপর মোটরখানা নিকটেই রাস্তার ধারে প'ড়ে আছে এবং একখানা বড় নৌকা নদীর তীরদেশ ছেড়ে মধ্যভাগ দিয়ে স্রোতের অনুকূলে বেগে চ'লে যাচ্ছে। নিকটে আর কোনো বড় নৌকা ছিল না, সুতরাং সুরথ নির্ভুল অনুমান করলো, লীলাবতীকে নিশ্চয়ই এই নৌকায় উঠানো হ'য়েচে।

সুরথ নদীর তীর ধ'রে ঐ নৌকার অনুসরণ করতে লাগলো কিন্তু আঁধার রাত্রিতে ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম ক'রে দ্রুত চলার পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে লাগলো। তখন ভাগ্যক্রমে নদীতীরে একখানা ছোট নৌকা বাঁধা আছে দেখতে পেয়ে সুরথ অবিলম্বে তার উপর চ'ড়ে বস্‌লো এবং ঐ নৌকা নিয়ে অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'ল।

ঘণ্টা দুই চলার পর সুরথ দেখলো, পশ্চিম আকাশ মেঘ-পুঞ্জে ছেয়ে গিয়েচে, হাওয়া বন্ধ হ'য়েচে এবং প্রকৃতি যেন কারো প্রতীক্ষায় সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা অবলম্বন ক'রেচে। অদূরে বড় নৌকাখানা আশু ঝড়ের আশঙ্কায় নদীর অপর পারে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে নোঙর করলো। ঝড় আস্‌বার আর বিলম্ব ছিল না। ঐ অবস্থায় ছোট নৌকায় নদী পার হবার চেষ্টা বিপজ্জনক হ'লেও সুরথ তা গ্রাহ্য না ক'রে বৈঠা বেয়ে চল্‌লো। মধ্য নদীতে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় উঠলো। সুরথের শক্তিতে নৌকা সামলানো অসম্ভব হ'ল। তখন সে নৌকা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কেটে বড় নৌকার দিকে যেতে লাগলো। ঐ নৌকার মাঝি মাল্লা ও আরোহীরা তখন নৌকা বাঁচাবার জন্য সকলে মিলে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় নিযুক্ত হ'ল। ঝড়ের বেগ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠলো—কড় কড় শব্দে বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছপালা মথিত ক'রে তাণ্ডব-নৃত্যের সহিত ঝড় ব'য়ে চল্‌লো। ডুবে মরবার ভয়ে নৌকার লোকজন সব বাইরে এসে দাঁড়, বাঁশ, কাছি প্রভৃতি নিয়ে নৌকা বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে গেল।

প্রকৃতির এই উদ্দাম-লীলা ভীষণ আতঙ্কজনক হ'লেও সুরথ তারই সুযোগে অলক্ষিতভাবে ঐ নৌকার নিকট উপস্থিত হ'তে পারলো ও অবশেষে তার উপর উঠতেও সমর্থ হ'ল। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। নৌকার ভিতরে এক কোণায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো মিট্‌ মিট্‌ ক'রে জ্বলছিল। সুরথ দেখলো, লীলাবতী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একধারে জড়-পিণ্ডের মতো প'ড়ে আছেন এবং হয় তো প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শিউরে উঠচেন। কোমর থেকে অবিলম্বে একটা ছুরি বের ক'রে সুরথ প্রথমতঃ লীলাবতীর হাতের ও পায়ের বাঁধন কেটে দিলো এবং তাঁর কাণের কাছে মুখ নিয়ে নিজের নামোচ্চারণ ক'রে মুখের বাঁধনও খুলে দিলো। এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধনমুক্ত হয়ে লীলাবতী সুরথের মুখের দিকে গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু তখনই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মুখে মৃত্যু আসন্ন ভেবে শিউরে উঠলেন। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাপটায় নৌকার নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে গেল—মাঝি-মাল্লারা চীৎকার ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পরমুহূর্ত্তে নৌকাখানা একদম উল্টে গিয়ে ডুবতে ডুবতে ঝড়ের মুখে ছুটে চললো, তার ভিতরে আবদ্ধ রইলো লীলাবতী ও সুরথ।

পাঁচ

মাল্লাদের চীৎকারে ভীত হ'য়ে লীলাবতী সুরথের একটা হাত চেপে ধ'রেছিলেন। তারপর নৌকাটা যখন চোখের পলকে উল্টে গিয়ে জলে ডুবতে সুরু করলো, সুরথ তখন তাঁকে শক্ত ক'রে ধ'রে নৌকা থেকে বেরুবার ফাঁক খুঁজতে লাগলো কিন্তু ফাঁক মিলবার আগেই নৌকা তলিয়ে গেল। তখনকার ভীষণ অবস্থা কল্পনার অতীত। সেই নিমজ্জিত অবস্থায় অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে সুরথ অবশেষে অনেক কষ্টে অবরুদ্ধাবস্থা থেকে নিজেকে ও লীলাবতীকে মুক্ত করলো। তখনও মাথার উপর অগাধ জল। অবসন্ন এবং সম্ভবতঃ অচেতন লীলাবতীকে কোনরূপে পিঠে তুলে সুরথ অবশেষে জলের উপর ভাসলো।

ঝড়ের প্রকোপ তখনও সমান ভাবেই বর্ত্তমান ছিল, ঢেউএর পর ঢেউ এসে আবার তাদের ডুলিয়ে দেবার চেষ্টা অবিরাম চালাতে লাগলো। সুরথের দৈহিক শক্তি এতক্ষণে প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেচে, আর বুঝি ভেসে থাকতে পাচ্চে না—লীলাবতীকে নিয়ে এই বুঝি তার সলিল-সমাধি হ'য়ে যায়। একান্ত হতাশভাবে অবসন্ন হাত দু'টি ছাড়িয়ে দিয়ে ভগবানের নামোচ্চারণ ক'রে সে ডুব্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'ল, এম্‌নি সময় তার হাতে ঠেকলো একখানা তক্তা। হাতখানি তখন সেই তক্তাটাকে আঁকড়ে ধরলো, ধরামাত্র সুরথ বুঝতে পারলো তক্তাখানা বেশ মোটা, চওড়া ও লম্বা এবং চাপ দিয়ে দেখলো ভার-বহনে সক্ষম। মৃত্যুর বিভীষিকার পরিবর্ত্তে জীবনের আশা আবার জেগে উঠলো। সে তখন লীলাবতীকে আস্তে আস্তে তার পিঠ থেকে নামিয়ে ঐ তক্তার উপর স্থাপন করলো এবং তাঁর পরিধেয় সাড়ির একপ্রান্ত খুলে তাই দিয়ে তাঁর দেহ ঐ তক্তার সঙ্গে বেঁধে ফেললো। এরূপ বাঁধা সত্ত্বেও ঢেউ এসে মাঝে মাঝে তাঁকে তক্তার উপর থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

প্রায় আধঘণ্টাব্যাপী তুমুল ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করলো—নদীর উদ্বেল বক্ষ আবার সমতল হ'ল এবং আঁধার ঘুচে গিয়ে কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদও পূব আকাশে তার রজত-রশ্মি নিয়ে দেখা দিলো। স্রোতের টানে অনির্দ্দিষ্ট নিশানায় অবসন্ন দেহে যেতে যেতে সুরথ দেখতে পেলো তার খুব নিকট দিয়া একখানি কাণ্ডারী-বিহীন ডিঙি নৌকাও তারই মতো ভেসে চ'লেচে। তখনই তার দেহে আবার নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার হ'ল। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সে তখনই নৌকাটা ধ'রে ফেললো এবং অনেক কষ্টে লীলাবতীকে তার উপর তুললো।

লীলাবতীর তখন সংজ্ঞা ছিল না। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবহণের কৃত্রিম উপায় দ্বারা বহু চেষ্টায় সুরথ তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আন্‌লো। আস্তে আস্তে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত হ'ল। কিয়ৎক্ষণ সুরথের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন:—"এ কি পাতালপুরী? এখানেও কি চাঁদ ওঠে?"

সুরথ শান্তভাবে উত্তর করলো,—"আপনি পৃথিবীতেই আছেন—এই চাঁদও পৃথিবীরই।"

—"বটে? তা হ'লে বেঁচে আছি—আমরা এখন কোথায়?"

—"নদীর উপর একখানা ছোট নৌকায়। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য তিনি ঠিক সময়ে এই নৌকাখানা পাঠিয়েছিলেন।"

—"সব স্বপ্ন ব'লে বোধ হচ্চে। আপনাকে জড়িয়ে ধ'রে ডুবেছিলুম—মনে হ'য়েছিল, পাতালপুরী যাচ্চি, যেতে যেতে আস্তে আস্তে যেন শ্বাস রোধ হয়ে গেল, তারপর আর কিছু মনে নাই। আপনাকে দেখতে পাচ্চি, আপনার সঙ্গে কথাও বলচি, তবুও বিশ্বাস হচ্চে না যে বেঁচে আছি।"

সুরথ তখন যথাসম্ভব সংক্ষেপে উদ্ধারের বিবরণটা বল্‌লো এবং তারপর বল্‌লো,—"ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের প্রাণরক্ষা কিছুতেই সম্ভব হ'তো না। এখন একবার উঠে বসতে চেষ্টা করুন, আর চলুন উভয়ে তাঁর চরণে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।"

লীলাবতী আস্তে আস্তে উঠে বসলেন এবং চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে আনতে মস্তকে করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রাণের নিবেদন জানালেন। সুরথও তা-ই করলো। বেনারসে চিন্তাহরণবাবুর বাড়ীতে থাকা কালে সুরথ তাঁর কাছে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্বকথা শুনে তার নিজের ধারণাগুলো বদলিয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেছিল।

স্রোতের টানে নৌকা আপন মনে ভেসে চল্‌লো অনির্দ্দিষ্ট

ভাবে অজানা দেশের দিকে। আরোহীদের মনে সেজন্য তখনও চিন্তা আসে নি। তারা ভিজে কাপড়ে মুখোমুখী হ'য়ে সেই ক্ষুদ্র নৌকায় বসে ছিল। অবশেষে লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন :—

—"সেই নৌকাটা ডুবে গেল, নৌকার লোকজন সব গেল কোথায়? তারা এসে আবার গোলমাল বাঁধাবে না তো?"

—"নৌকাটা উল্টে যাবার আগেই তারা জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। যদি তারা বেঁচেই থাকে, আপনাকে খুঁজতে এদিকে আসবে না—আপনি বেঁচে উঠেচেন কিংবা ঐ অবস্থায় বেঁচে উঠ্‌তে পারেন, এ রকম বিশ্বাস নিশ্চয়ই তাদের হবে না।"

—"আমার নিজেরই তা বিশ্বাস হচ্চে না—এখনও মনে হচ্চে, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। কি অসাধ্য সাধন করে, নিজ জীবনের প্রতি অণুমাত্র মায়া না ক'রে আমায় বাঁচিয়েছেন ভেবে অবাক হ'য়ে যাচ্চি।"

—"ভগবান এই দেহে কিছু শক্তি দিয়েচেন, আমি তার একটু সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেচি মাত্র—তা না করলেই যে আমার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হ'তো।"

লীলাবতী আর কিছু বল্‌লেন না, শুধু এই আড়ম্বরহীন আত্মপ্রশংসাবিমুখ শুদ্ধ-চরিত্র যুবকের দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁর মনে জেগে উঠ্‌লো, ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে বর্ণিত "নাইট"দের কথা, যাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কতো কাহিনী তিনি প'ড়েচেন। এই যুবক কি তাঁদের চেয়ে কোন অংশে হীন? ভীমসদৃশ শক্তিমান্‌, চরিত্রে এমন মহীয়ান্‌ সাহস ও ত্যাগের এমনজীবন্ত আদর্শ লোক ক'টি দেখতে পাওয়া যায়? রূপ? তারও তো অভাব নেই। কি সুগঠিত দেহ! কেমন প্রশস্ত তার বক্ষ ও ললাট, কেমন দীপ্ত চক্ষু, আর কিবা তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি! সত্য বটে রুক্ষ কেশ আর দীর্ঘ শ্মশ্রুর আবরণে এর মুখের কান্তি আপাততঃ প্রচ্ছন্ন র'য়েচে, কিন্তু ঐ আবরণ অপসারিত হ'লে নিশ্চয়ই ইনি সর্ব্বতোভাবে সুচারুদর্শন হবেন। দেহের সৌষ্ঠব রক্ষার প্রতি এই ঔদাসীন্য তাঁর ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু এই ওদাসীন্য কেন? ইনি কি সংসারী হ'তে চান না, ভব-ঘুরে হ'য়েই জীবন কাটাবেন? এই রকম কতো প্রশ্ন ও চিন্তা এসে লীলাবতীর মনকে আলোড়িত ক'রে তুল্‌লো। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে অবশেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন :—

—"কেদারনাথের ষড়যন্ত্রের কথা জান্‌তে পেরেই কি আমার উদ্ধারের চেষ্টায় সেই পাহাড়ের পথে গিয়েছিলেন?"

—"না, মিস্‌ রায়, ষড়যন্ত্রের কিছুই আমি জান্‌তে পারি নি। ঐ পাহাড়ের দিকে আমিও বেড়াতে যেতাম। কেদারনাথ ও তার লোকজনেরা যখন আপনাকে ধ'রে নেবার চেষ্টা কচ্ছিল, আমি দৈবক্রমে তখন একটা ঝোপের পশ্চাতে ছিলাম, তাই তারা আমায় আগে দেখতে পায় নি।"

—"লোকটা কি সাংঘাতিক! আপনাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য গুলি করতে একটুও ইতস্ততঃ করে নি! ভাগ্যিস্‌ তার লক্ষ্য ঠিক ছিল না, তা নইলে কি সর্ব্বনাশটাই না হ'তো!"

সুরথ ঈষৎ হেসে বল্‌লো,—"আমায় অবাক করলেন যে। আমার ন্যায় নগণ্য লোকের ম'রে যাওয়াটা যে সর্ব্বনাশকর ব্যাপার, এ একেবারে নতুন কথা।"

"—আপনি নিজেকে যতো নগণ্যই মনে করুন না কেন, এমন লোকও তো থাকতে পারে, যার কাছে আপনি মোটেই নগণ্য নন।"

—"তেমন লোকের খবর তো জানিনে।"

—"ধরুন, আমিই যদি সেরকম লোক হই।"

—"তা হ'লে বল্‌বো, হয় আপনি পরিহাস কচ্চেন, নয়তো তুচ্ছ কাচকে উচ্চতর ধাতু বলে ভ্রম কচ্চেন।"

—"পরিহাস করা আমার স্বভাব নয়। তারপর ভ্রমও যদি ক'রে থাকি তাতে ক্ষতির কারণ কিছু নেই। তা যাক্‌, এখন কথা হচ্চে, আমরা তো ভেসে চ'লেচি, কোথায় যাচ্চি, সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে কি?"

—"এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কাজেই কিছু বলতে পাচ্চি না।"

—"শীতে শরীর আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে—গা কাঁপচে।"

—"এক কাজ করুন, দু'হাতের তলা একত্র ক'রে পরস্পর ঘসতে থাকুন, একটু উত্তাপের সৃষ্টি হবে। এই ভাবে বাকী রাস্তাটা কাটাতে পারলে আর ভাবনা থাকবে

না। এই রাত্রিবেলা নৌকাটা কোনো রকমে তীরে ভিড়াতে পারলেও, উপরে উঠতে যাওয়া নিরাপদ হবে বলে মনে হয় না।"

—"না, না, তীরে ওঠবার প্রয়োজন নেই এখন। চলুক নৌকা আপন মনে যেখানে খুসি।"

এর পর আর কোনো কথা না ব'লে উভয়ে নিজ নিজ স্থানে ব'সে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওরূপ ঠাণ্ডার ভিতরেও সিক্তবসনা লীলাবতী তন্দ্রাভিভূতা হ'য়ে পড়লেন

সুরথের চোখে নিদ্রা এলো না। ঘটনাচক্রে লীলাবতীর রক্ষার ভার এখন তার উপর এসে প'ড়েচে। নিদ্রাবস্থায় যদি আবার কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা তাকে জাগিয়ে রাখলো। নিয়ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিতা উচ্চ-শিক্ষিতা এই ধনী কন্যার আজ একি নিগ্রহ। নৌকায় এমন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে লীলাবতীর ঠাণ্ডা দেহ কিয়ৎ পরিমাণেও উষ্ণ রাখা যেতে পারে, এজন্য সুরথ যথেষ্ট দুঃখানুভব করতে লাগলো। এই ভাবে দীর্ঘকাল চুপ ক'রে ব'সে থাকা কালে তার মনে পড়লো, সেই মোটর-দুর্ঘটনার কথা, লীলাবতীর করুণাময়ীরূপে আকস্মিক আবির্ভাব, তাঁর অযাচিত সেবা ও দান, তারপর তেমনি আকস্মিক ভাবে তিরোধানের কথা। কে জানতো, কাশীতে অজ্ঞাতবাস কালে সুরথ আবার তাঁকে দেখার সুযোগ পাবে এবং অবশেষে এই পাহাড় অঞ্চলে এসেও এই মহিলার জীবনের কতগুলো প্রধান ঘটনার সঙ্গে অতি অদ্ভুতভাবে সে জড়িত হ'য়ে পড়বে! লীলাবতী তো তার কেউ নয়, অথচ তাঁর চিন্তায়ই যেন তার মন অহর্নিশি পরিপূর্ণ! কি আশ্চর্য্য, লীলাবতী তাকে নগণ্য লোক ব'লে মনে করেন না, একথা তিনি নিজ মুখে ব'লে ফেলেচেন! এ নিশ্চয়ই হয় পরিহাস, নয়তো ভদ্রতাসূচক উক্তি মাত্র, এর অধিক কিছু নয়। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা কি তার সাজে? সে যে দাগী চোর, খুনী ফেরারী আসামী! এই পরিচয় নিয়ে সে লীলাবতীর কাছে কি ক'রে দাঁড়াবে? তিনিই বা এই পরিচয় জানলে তাকে অতি ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য ব'লে মনে করবেন না কেন? এই ধরণের চিন্তার পর সুরথ স্থির করলো, লীলাবতীকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েই সে একদম সরে পড়বে।

। ক্রমশঃ

দেশবন্ধু তর্পণ

শ্রীভবভূতি রায়

তব স্মৃতি আজ বুকে বুকে পুন জাগিতেছে মনোরম।
নব আষাঢ়ের জলধারা লভি দূর্বাঙ্কুর সম॥
এমনি একটি ঘনঘটাময়
দিবসে বন্ধু এমনি সময়
চলে গেছ তুমি, মোদের বিশ্ব গ্রাসিয়াছে ঘোর তমঃ॥

উদয়ন কথা সম তব কথা ফুরাতে চায় না আর,
ঘরে ঘরে তব চরিতের কথা শুনিতেছি কত বার।
যতবার শুনি কর্ণকুহরে
অমরাবতীর যেন সুধা ক্ষরে
যেথা রও তুমি তব উদ্দেশে শতবার নমো নমঃ॥

বর্ষে বর্ষে তোমার স্মৃতিরে বরণ করিয়া প্রাণে,
সান্ত্বনা লভি, শত লাজ ভয় ক্ষতি ক্ষয় অপমানে॥
তোমার মহিমা পারি প্রকাশিতে
হেন ভাষাসুর নাই মোর গীতে
অক্ষম এই তোমার কবির সকল দৈন্য ক্ষম॥

বৈষ্ণবদর্শন ও যুগধর্ম্ম

শ্রীকান্তীন্দুভূষণ চৌধুরী এম, এ, ডিপ্. লিব্. কাব্যতীর্থ

ভারতের বৈশিষ্ট্য ভারতীয় বিশিষ্ট চিন্তাধারায়। ভারতের কৃষ্টি ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনের ভাবধারায় পুষ্ট। এই সকল দর্শনের মধ্যমণিস্বরূপ বেদান্ত বিরাজ করিতেছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্যের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে এবং যাবতীয় সম্প্রদায়ই এই বেদান্তের মধ্যেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব নিহিত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও এই চেষ্টার ব্যতিরেক দেখা যায় না। বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত মতদ্বয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বে।

> "অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
> ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম
> তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
> প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি॥
> নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
> তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥ (চৈঃ চঃ)

বেদান্তসূত্রের মধ্যে বৈষ্ণবদর্শনের মূলতত্ত্ব নিহিত থাকিলেও এবং বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বৈতাদ্বৈত ভেদের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইলেও, এই সম্প্রদায়ের বাণীর মধ্যে মানবজীবনের এক অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই সকল বাণীর শ্রেষ্ঠ মণি "জীবে দয়া, কৃষ্ণে প্রেম।" বৈষ্ণব-দর্শনের সারতত্ত্ব এই বাণীটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ বলিলে দোষ হয় না।

বর্ত্তমান কালে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে এই সকল প্রাচীন বা মধ্যযুগের দর্শন বা মতবাদ বর্ত্তমান যুগে অচল। কালচক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে যখন সব বস্তুই পশ্চাতে চলিয়া যাইতেছে, তখন এই সকল 'সেকেলে' মতবাদ অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিলে জগতের সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এত গেল সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। জগতে যখন সকল জাতিই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া শুধু শক্তিলাভে এবং শক্তিবৃদ্ধির আগ্রহে সচেষ্ট, ঠিক সেই সময়ে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" এবং "অমানিনা মানদেন" বৈষ্ণবের দ্বারা জগতের কোন্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে? বৈষ্ণবদর্শনের গুরুতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের মূল কথা নাকি ব্যক্তিত্ব (personality) বিলোপ করিয়া দেওয়া? এই ধর্ম্মের আওতায় পড়িলে মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় এবং আধুনিক জগতের সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে ক্ষমতা থাকে না। ফলে সকল জাতি এবং সমাজের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া এই সম্প্রদায় নিজের মতবাদের প্রচার দ্বারা দেশের এবং দশের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করিয়া থাকে। এইরূপ বহুতর অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মতে বর্ত্তমান যুগের ঋষি তিন জন; কার্ল মার্ক্স, ফ্রয়েড এবং আইনষ্টাইন। ইঁহাদের মধ্যে কার্লমার্ক্সই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার মতবাদই জগতের, বিশেষ করিয়া সামাজিক মানুষের মধ্যে এতদিন প্রচলিত চিন্তাধারাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার মতবাদের মূল কথা মানুষ হইয়া মানুষের অধিকার হইতে অপরকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই; আর সেই অধিকার লাভের চেষ্টাই মানুষের ধর্ম্ম। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া আজ জগতের যত নিপীড়িত, সকলেই সাম্রাজ্যবাদ, ধনিকতন্ত্রবাদ—এক কথায় প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দশের রক্তে অর্জ্জিত বিত্ত শুধু একজনের ভোগে কেন লাগিবে? যাহারা যোগায় এবং যাহারা ভোগ করে—তাহাদের মধ্যে আজ দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। মানুষের আদিম সংস্কার ভোগ-লিপ্সা আজ বিকট রাক্ষস-মূর্ত্তিতে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাতে সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, সবই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মানুষের মনে শান্তি, বিশ্বাস, প্রভৃতির স্থান আর নাই। সংসারে শুধু অশান্তি, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা। অপরিমিত ভোগ-লিপ্সায় মত্ত মুষ্টিমেয় প্রভুত্বশালী মানুষের পীড়নে আজ সমস্ত জগৎ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই প্রলয়-তাণ্ডবে সবই আজ বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে—সমাজ,

সভ্যতা, কৃষ্টি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের মূর্ত্তি আজ এমনই করাল মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এই সমস্যার মূল কারণের সন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাই ভোগলিপ্সা। মুষ্টিমেয় শক্তিশালীর অপ্রমেয় ভোগলিপ্সা আর প্রবঞ্চিত সহস্র সহস্র ব্যক্তির মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ—সেও একপ্রকার ভোগলিপ্সা—যদিও অঙ্কুরিত অবস্থায়। সুতরাং বর্ত্তমান যুগ-সমস্যার সমাধান রহিয়াছে এই মূল কারণের অপসারণের মধ্যে।

ধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় সংযম। এই "ক্ষুরস্য ধারা, নিশিতা, দুরত্যয়া" দুর্গম সংসার-পথে চলিবার একমাত্র অবলম্বন সংযম। সংযমের অভাবেই মানুষ আর মানুষ থাকে না। ধর্ম্ম চিরকালই মানুষকে সংযতাচারী হইতে উপদেশ দিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মও এই সংযমের উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু অতি সরস ও মনোরম ভাবে—

> "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপভুঞ্জতঃ।
> নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

কিছু ত্যাগ করিতে হইবে না। সংসারে কিছুই মিথ্যা নয়। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—তিনই সত্য। সুতরাং সংসারে আসিয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযথভাবে বিষয় ভোগ কর। নিজেকে বঞ্চিত করিও না, অপরকেও বঞ্চিত করিও না। এইরূপে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া বিষয় গ্রহণ করাকেই যুক্ত বৈরাগ্য বলে। ইহাই বৈষ্ণবের সংযম। পরের জন্য নিজেকে বা নিজের জন্য পরকে বঞ্চিত করিতে হইবে না। মানুষ যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে বোধ হয় সংসারের দুঃখকষ্ট অনেক কমিয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ধনিকতন্ত্রজাত অসম ভোগলিপ্সারও সমাপ্তি ঘটে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান যুগের ধনিকতন্ত্রবাদ ও শক্তিবাদ মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সমাধানও এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে।

> "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
> কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালীন সমাজের প্রভুত্বশালী কুলীন, পণ্ডিত ও ধনীর অধিকার খর্ব্ব করিয়া সকল মানুষকেই এক শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহিয়াছেন। মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলা দূর করিবার জন্য তিনি সকল মানুষকে সমানাধিকারযুক্ত এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ধনী, দরিদ্র, কুলীন, অকুলীন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই ভগবদ্ভজনে সমান অধিকার—প্রকৃত মানুষ হইবার সমান অধিকার—এই ছিল তাঁহার মতবাদ। ইহাই হইল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাম্যবাদ। বর্ত্তমানে এই সাম্যনীতির যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথা বলা বাহুল্য।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অতি বিনয় ও বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ দিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই ধর্ম্মে মানুষ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এ যুক্তি নিতান্তই অসার। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানুষকে তাহার প্রকৃতশক্তির সন্ধান বলিয়া দিয়া, সেই শক্তিলাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

> 'কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তা'তে তিন প্রধান।
> চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥

মানুষ যে সেই অনন্ত শক্তি ভগবানেরই এক বিশিষ্ট শক্তি, বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং সেই শক্তিকে জাগ্রত করিবার উপদেশ দেয়। তবে শক্তি লাভ করিয়া মানুষ যাহাতে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অপরকে ঘৃণা বা অবহেলা না করে, সেই জন্যই বিনয়াচরণের উপদেশ।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগের কাম্য সাম্যবাদ, শক্তিবাদ প্রভৃতির অভাব বৈষ্ণব দর্শনে নাই। এই সকলের সহিত আরও রহিয়াছে সংযম ও বিনয়। "জীবে দয়া" অর্থে নীচের প্রতি উচ্চের অনুকম্পা নহে, উচ্চ-নীচ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি। আর "কৃষ্ণে প্রেম" অর্থে কৃষ্ণের জীবশক্তির প্রতি অনুরাগ এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণানুরাগ।

কেন এমন হয়?

শ্রীরুদ্র রায়

শঙ্কর যেন নূতন চোখে অদিতিকে দেখলো! সেই ছোট্ট অদিতি এখন কত বড় হয়ে গেছে! চেহারাও গেছে কত বদলে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ যেন এখন তার সব কথায়, কাজে।

দূর সম্পর্কে অদিতি তার বোন হয় বটে কিন্তু শঙ্করের যাতায়াত না থাকায় বহুদিন তাদের দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। ভুলেই প্রায় গিয়েছিল সে অদিতিদের কথা। হঠাৎ তাদের দেখা হয়ে গেল শঙ্করের এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পরিবেশন করেছিল শঙ্কর মেয়েদের দিকে। ভীষণ ব্যস্ত তখন সে, কারুর দিকে তাকাবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত নেই তার।

অদিতি কিন্তু একদম খেয়ালই করেনি। তার ছোট বোন মিনতিই তাকে ডেকে বল্লে, দিদি যিনি এ পরিবেশন করছেন তিনি আমাদের শঙ্করদা নন?

—হ্যাঁরে, তাইতো শঙ্করদাই তো!

—কি শঙ্করদা, চিনতে পারো? —বলে এগিয়ে আসে অদিতি খাবার পর; পিছনে তার ছোট বোন মিনতি। এতদিন তাদের ভুলে থাকার জন্য কত অনুযোগ অভিমান করে সে, তাদের বাড়ী শিগ্‌গিরই একদিন যাবার জন্য অনুরোধও করে বারবার।

তারপরও অনেকদিন কেটে গেছে। হঠাৎ আবার তাদের দেখা নিউ এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচে। সেদিন আর রেহাই পায় না শঙ্কর, অদিতিদের সঙ্গেই তাকে যেতে হয় শ্যামবাজার, ওদের বাড়ী।

বহুদিন পর এসেছে সে; অনুযোগে গল্পে সময়টা হু হু করে কেটে যায়। আসবার সময় অদিতি দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে যায়, অনুরোধ করে আবার আসবার জন্য। ভাল লাগে শঙ্করের এই সমাদর, এই আত্মীয়তা।

তার পর থেকে মাঝে মাঝে যায় সে শ্যামবাজার। কত রকমের গল্প হয় তাদের—ক্লাসের মেয়েদের গল্প, সিনেমার গল্প, রেডিওর গানের গল্প, ছেলেরা ভাল, না মেয়েরা—আরও কত কথা, যেন ফুরাতে চায় না। বসন্ত কালের চাঁদনি রাতে দক্ষিণের খোলা ছাতে বসে হয় তাদের কত কাব্যালোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান। বেশ কেটে যায় সেদিনের সন্ধ্যা। এম্নি করেই দিন যায় চলে—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।

সেবার পূজার ছুটীতে অদিতিদের ঠিক হয় গিরিডি যাওয়া। মিনতির আনন্দই যেন সব চেয়ে বেশী। সেদিন সন্ধ্যাবেলা শঙ্কর আসতেই সে বলে উঠে—জান শঙ্করদা, এবার আমাদের ছুটীতে গিরিডি যাওয়া ঠিক হয়েছে, তোমাকে কিন্তু নিশ্চয়ই যেতে হবে আমাদের সঙ্গে; তা না হলে কোন আনন্দই হবে না। মিনতির কথায় শঙ্করেরও খুব উৎসাহ হয়, ইচ্ছেও হয় গিরিডি যাবার। গিরিডি সে আগে একবার গিয়েছিল, পথ-ঘাট সবই তার জানা। তখনই তাদের পরামর্শসভা বসে, কি কি তারা করবে সেখানে—তোপচাঁচী লেক দেখতে হবে, পরেশনাথ পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে, কয়লার খাদে নামতে হবে, উশ্রী ফল্‌সে পিক্‌নিক্ করতে হবে—আরও কত কি।

অদিতি সেদিন বাড়ী ছিল না, তার এক বন্ধুর জন্মদিনে গিয়েছিল সে ভবানীপুর। মনটা তার বোধহয় কোন কারণে ভাল ছিল না; রাত্রিতে বাড়ী ফিরে মিনতির কাছে সব শুনে হঠাৎ কেন জানিনে বলে উঠে সে—কি দরকার ছিল তোর সাত তাড়াতাড়ি শঙ্করদাকে এত সব বলবার, মেয়ের যেন সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

বুঝতেই পারে না মিনতি কি দোষ করেছে সে। বলে, কেন দোষ কি তাতে? শঙ্করদারও তো কত উৎসাহ, আগ্রহ যাবার জন্য।

ক'দিন পর আবার যখন শঙ্কর আসে তখন মিনতি তাকে বলে—শঙ্করদা গিরিডি তুমি যেয়ো না আমাদের সঙ্গে, দিদি রাগ করেছে তোমাকে যেতে বলেছি বলে। অবাক হয়ে

যায় শঙ্কর মিনতির কথা শুনে। ছবির মতন ভেসে উঠে চোখের উপর এত দিনের সব ঘটনা পর পর। মনে পড়ে, অদিতি যেন তাকে আর আগের মতন চায় না, কাছে বসে গল্প করে না, চলে আসার সময় দরজার কাছে এসে বারবার অনুরোধও করে না আবার শিগ্‌গিরই যাবার জন্য। কেমন যেন তাকে এড়িয়েই চলে আজকাল। তাকে যেন অবিশ্বাস করে, ভয় পায়। ভেবেই পায় না বেচারা অদিতি কেন তার প্রতি এত বিরূপ হল হঠাৎ। কোন দিনই তো সে তাদের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু কামনা করে নি। সহৃদয় ব্যবহার, স্নেহ ভালবাসা তো সে তাদের বিলিয়ে এসেছে বরাবর। সত্যিই বড় কষ্ট হয় তার। অদিতি উপরের ঘরেই ছিল; শঙ্কর ভাবে একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে তাকে—কেন সে তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে, কি সে করেছে? তার সমস্ত স্নেহ, মমতা, ভালবাসার এই কি প্রতিদান!

মিনতি গিয়েছিল শঙ্করের জন্য চা আনতে। ফিরে এসে শঙ্করকে খুঁজে না পেয়ে বেচারী মহা মুস্কিলেই পড়ল। দিদিকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না, সে দিনের মতন আবার যদি চটে ওঠে। দিদি যেন আজকাল কি রকম হয়ে গেছে, কথায় কথায় এত রেগে ওঠে, বাবাঃ!

চায়ের কাপ নিয়ে মিনতিকে ঘুরতে দেখে অদিতি জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মিনু, হাতে চায়ের বাটি নিয়ে কার জন্যে ঘুরে মরছিস রে?

মিনতির বলতে সাহস হয় না সত্যি কথা। বলে, কার জন্য আবার? নিজে খাব তাই নিয়ে এলাম।

গিরিডির বারগণ্ডা পাড়ায় চৌরাস্তার উপর একটা সুন্দর বাংলো বাড়ীতে অদিতিরা এসেছে ক'দিন হল। বেশ লাগছে তাদের জায়গাটা—গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যায় ছোট একটা কাল পাহাড়। বাড়ীর সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে চারদিকে—তাই ধরে কতলোক যায় রোজ উশ্রী নদী, তারের পুল, পচম্বার দিক সকাল বিকেল। হাটের দিন সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা মাথায় পসরা নিয়ে চলে বাজারের দিকে, বারাণ্ডায় বসে অদিতিরা দেখে তাদের উজ্জ্বল আনন্দ, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে উন্মুক্ত আকাশের ফুটন্ত তারাগুলির পানে তাকিয়ে মিনতি ভাবে, শঙ্করদা কেন যে হঠাৎ চলে গেলেন সে দিন! আর তো এলেন না! বাড়ীর সামনের ডাকঘরটা তার মনকে বড় উতলা করে তোলে। ভাবে, লাল বাক্সটার মধ্যে দিয়েই তো সে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারে তার মনের সব কথা শঙ্করদার কাছে।

মাঝে মাঝে অদিতিরও মনে পড়ে শঙ্করের কথা। ভাবে সে, শঙ্করদা যদি এখানে আসতেন তা হ'লে বেশ দূরে দূরে নানান জায়গায় তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে পারতাম। দু'জনে চলে যেতাম নিঝুম দুপুরে উশ্রী নদী পার হয়ে শাল বনের মধ্যের পায়ে চলা পথ ধরে সাঁওতালদের গ্রামের দিকে। সন্ধ্যাবেলা নদীর পাড়ে বসে শুনতাম দূর গ্রামে সাঁওতালদের মাদলের সঙ্গে ঝুমর নাচের নূপুরধ্বনি, আর বাঁশের বাঁশীর মিষ্টি তান। কী সুন্দরই না লাগতো তখন চাঁদনি রাতগুলি। আচ্ছা, শঙ্করদা কেন হঠাৎ আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করলেন? কতদিন যে দেখা হয়নি! ভারী নিষ্ঠুর, একবার ভাবলেনও না যে একজনের মনে কত কষ্ট হতে পারে। একটুও কি বুঝতে পারেন না মেয়েদের মন—আশ্চর্য্য!

মিনতির যেন অসহ্য লাগে সব। দিদিও তার যেন আজকাল কী রকম হয়ে গেছে—কত গম্ভীর, আনমনা। ভারী ত' দিদি, মাত্র ত' তিন বছরের বড়, পড়েন তো থার্ড-ইয়ারে, তার কত গুমোর দেখ না। সারাদিনই তার পড়া আর কাজ, কাজ আর পড়া। আগে দিদি তবু কত গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, গান করত—এখন তাঁর সময়ই হয় না। শঙ্করের উপরই রাগ হয় তার সব চেয়ে বেশী। কত না পরামর্শ গিরিডি আসবার আগে! আচ্ছা, এবার একবার দেখা হ'ক না, কক্ষনো কথা বলব না।

পরের দিনই কিন্তু মিনতি শঙ্করকে চিঠি লেখে—

ভাই শঙ্করদা,

তুমি কি আমাদের একেবারে ভুলেই গেলে? এখানে আসবার আগে কী উৎসাহই না ছিল আমাদের, এখন ভাবি কবে ফিরে যাব। দিনগুলি আর কাটতে চায় না কিছুতেই।

অনেক দূরে মেঘের মতন অন্ধকার বিরাট পরেশনাথ পাহাড়টাকে যখন দেখি তখন ভাবি আসবার আগে তোমার সঙ্গে বসে এখানকার দিনগুলি কাটাবার জল্পনা কল্পনার কথা। কিছুই দেখা হল না শেষ পর্য্যন্ত—একদিন শুধু উশ্রী ফল্‌স্‌ দেখতে গিয়েছিলাম।

দিদিটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে আজকাল, খালি বই নিয়েই আছে সারাক্ষণ। কথাবার্ত্তা বলে না বেশী, আমার সঙ্গেও না।

তুমি কি মোটে আসবেই না গিরিডি? মাকে সেদিন তোমার এখানে আসার কথা বলছিলাম, তিনি খুব আনন্দিত হন যদি তুমি আসো। কবে আসবে জানিও, আমরা ষ্টেশনে যাব। আসবে তো? এসো, এসো, এসো, এসো কিন্তু, না এলে আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। ইতি—

মিনতি

দুর্গাপূজা শেষ হয়ে গেছে, সামনেই কোজাগরী পূর্ণিমা। শঙ্কর হাঁপিয়ে উঠে ক'লকাতায়। এই সময়ে ছোটনাগপুরের শরৎকালের হাস্যময় রূপ কল্পনা করে তার মন হয়ে উঠে ব্যাকুল, সহরের কোলাহল লাগে অসহ্য। অদিতিদের কথাও শঙ্করের মনে পড়ে বড়। মনের রাশ কসে টেনে রাখা সত্ত্বেও, নিতান্ত অগোচরে, তিল তিল করে, দিনে দিনে কতখানি প্রাণ যে ঢেলে দিয়েছে, তা এখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে।

অদিতিরা প্রায় দিন পনেরো হল গিরিডি গেছে। শঙ্কর ভেবেছিল এর মধ্যে নিশ্চয়ই অদিতি তাকে একটা চিঠি লিখবে—ছোট্ট অথচ আন্তরিকতায় ভরা। কিন্তু দিনের পর দিন নিরাশ হয়ে যখন সে চিঠির আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, তখন এল মিনতির চিঠি—সাদর, সহৃদয় আহ্বান' যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

সেদিনই রাত্তিরের গাড়ীতে চল্লো সে মধুপুর, ক'দিন সেখানে থেকে তারপর যাবে গিরিডি।

'মধুপুরে বন্ধু অরুণের বাড়ী এসেই শঙ্কর পড়লো মহা বিপদে। রোজই তাদের একটা-না একটা হৈচৈ লেগে আছে। গিরিডি যাবার কথা বল্লেই সকলের মহা আপত্তি, মুখ ভার। সব চেয়ে মুস্কিল অরুণের বোন অলকাকে নিয়ে। সে এরই মধ্যে শঙ্করের কাছে ইংরাজি-সাহিত্য পড়তে ও রবীন্দ্রনাথের গান শিখতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শঙ্করের কোথাও যাবার কথা হলেই সে যায় গম্ভীর হয়ে, সেদিন আর পড়তেও আসে না, গান শিখতেও চায় না। এখানে শঙ্করের লাগছেও বেশ, তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে গিরিডির কথা—এত কাছে থেকেও কত দূর। মিনতিকে চিঠি লিখে দেয়, মধুপুরে এসে সে এমন আটকা পড়ে গেছে যে, কবে যে গিরিডি যেতে পারবে তার কোন ঠিক নেই, তবে ক'লকাতায় ফিরে যাবার আগে নিশ্চয়ই একবার তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে।

দিন দশেক হয়ে গেছে শঙ্কর মধুপুরে এসেছে, অথচ কোথা দিয়ে যে এ কটা দিন চলে গেল তা মোটে বুঝতেই পারে নি। মনটাও যেন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। ক'লকাতায় ফেরবার তার বিশেষ কোন তাড়া ছিল না, তাই শঙ্কর ভেবেছিল এখানে আরও কটা দিন এ রকম অনাবিল আনন্দে, আরামে কাটিয়ে যাবে। এমন সময় এলো জরুরী খবর দিল্লী থেকে—সাত দিনের মধ্যেই join করতে হবে তাকে Air Force-কাজে।

অনেকদিন আগে দরখাস্ত করেছিল সে ভারতবর্ষীয় বিমান-বাহিনীতে—নূতনত্বের মোহই তখন তাকে টেনেছিল সেদিকে। মাঝে একবার interview দিয়েছিল, কিন্তু সেও বহুদিন আগে। ভুলেই গিয়েছিল শঙ্কর এ সব কথা; হঠাৎ আজ চিঠিটা পেয়ে তার যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সে-ই ভাল, যুদ্ধেই চলে যাবে সে; এ দুনিয়ায় কী বা তার জীবনের দাম! এক ফোঁটা চোখের জলও হয়তো কারুর তার জন্যে পড়বে না।

আজই শঙ্করকে যেতে হবে ফিরে। গাঁথা সুরে বাঁধা বীণার ঝঙ্কার যেন আজ বেসুরে বেজে উঠেছে। অগোছাল মন ও সুটকেশ নিয়ে যখন সে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে, তখন অলকা ঘরে ঢুকে শঙ্করের অবস্থা দেখে বলে, উঠে—"আহা, কি সুটকেশ গুছানোর ছিরি! সব সর ঢের হয়েছে। আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে, তুমি ততক্ষণ চুপটি করে ঐ খাটের উপর বসে বিশ্রাম করো তো।"

নিমেষের মধ্যে গুছানো হয়ে যায় পারিপাট্যরূপে। কী সুন্দর সাবলীল ভঙ্গী অলকার, সব কাজে কত যত্ন, দরদ। মনে পড়ে শঙ্করের অদিতিদের কথা। মিনতিকে কথা দিয়েছিল সে ক'লকাতায় ফেরবার আগে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে গিরিডিতে। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ওদের সঙ্গে। হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না অদিতিদের সঙ্গে। ব্যথায় তার বুকটা টন্‌ টন্ করে ওঠে, চোখে হয়তো দু'এক ফোঁটা জলও আসে।

অলকা তার দিকে তাকিয়ে বলে, "শঙ্করদা, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই?" "না না বেশ আছি" বলে ঘর থেকে চলে আসে শঙ্কর।

অন্ধকার মধুপুর ষ্টেশন, দূরে দূরে এক একটা কেরোসিন তেলের বাতি জলছে। ট্রেণ ছাড়তে আর বেশী দেরী নেই, শঙ্কর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে ব্যস্ত। অলকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সে একদিকে। হঠাৎ যেন আজ সব আলো তার নিবে গেছে। শঙ্করকে বিদায় দেবার সময় বেচারী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। অন্ধকারে কেউ জানতেই পারে না আপনাকে তার উজাড় করে শঙ্করের পায়ে বিলিয়ে দেওয়া। মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্য শঙ্কর অলকার ছোট নরম হাতখানি তার মুঠির মধ্যে চেপে ধরে।

পায়ের উপর দু'ফোঁটা চোখের জল মাত্র। লৌহ-দৈত্যাকার এঞ্জিনের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মিশে যায় আরও দু'টি নরনারীর।

নিউ দিল্লী থেকে অনেক দূরে, ফাঁকা মাঠের উপর শঙ্করদের ছাউনি পড়েছে। সারাদিনই চলেছে তাদের নানারকম ট্রেণিং, এয়ারোপ্লেনের কসরৎবাজি। এখানকার ট্রেণিং শেষ হলেই নিয়ে যাবে তাদের কোন দূর বিদেশে—আরও ভাল শিক্ষার জন্য।

সারাদিন পরিশ্রম করে রাত্রিতে ডিনারের পর শঙ্কর পায় একটু অবকাশ তার নিজের ভাবনাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। মনে পড়ে তার বাড়ীর কথা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কথা—অদিতি, অলকা, মিনতি, বন্দনা, আরও কত জনের কথা। এমনি করেই তার দিন যায় কেটে—ভাবে মরতেই যখন চলেছি তখন কী লাভ আর অযথা মায়া বাড়িয়ে! কী লাভ সবাইকে চিঠি লিখে, সকলের খবর পেয়ে,—শুধু দুঃখ বইতো নয়! বন্ধুরা এসে টানাটানি করে বেড়াতে যাবার জন্য, ক্লাবে যাবার জন্য! তাদের সঙ্গে হৈ হৈ করেই সময়টা যায় কেটে। কিন্তু তবু শঙ্কর ভুলতে পারে কই?

ক'দিন থেকে মনটা তার ভাল ছিল না। এখানে এসে অবধি বাড়ীর দু'চারটে চিঠি ছাড়া বন্ধুবান্ধব কারুরই সে একটা খবর পায় নি, নিজেও কাউকে লেখে নি। ভাল লাগে না তার কঠোর জীবন। শান্তি নেই, এ দুনিয়ায় শান্তি নেই! খালি অশান্তিরই আয়োজন—তারই মহড়া চলেছে সারাদিন ধরে।

এখানকার ট্রেণিংও তাদের শেষ হয়ে এসেছে, শিগ্‌গিরই তাদের কোথাও পাঠান হবে। আজ বিকেলের দিকে শঙ্করের কাজ ছিল না, তাই বন্ধুদের এড়িয়ে সন্ধ্যের সময় এসে বসেছিল সে একা "ওখ্‌লা"তে—যমুনাকে যেখানে বেঁধে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, শান্ত। ভেসে উঠে তার মনে জীবনের শেষ ক'টি বছরের কথা। মাত্র আর দু'টী দিন—তারপর ভারতবর্ষ, তার নিজের দেশ, তার মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে কোন দূর দিগন্তে—হয়তো বা ইহজীবনের মতন। আর দেখা হবে না তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নিতান্ত প্রাণের লোকদের সঙ্গে।

সকাল থেকে ক্যাম্পে সাজ সাজ রব উঠেছে। আজকের রাত্রিতেই শঙ্করদের চলে যেতে হবে—কোথায় কে জানে! —কাজ থেকে ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখে তার টেবিলের উপর কতকগুলি চিঠি। একটা আসছে তার বাড়ী থেকে, তার দিদিরও একটা আছে, আর একটা আসছে তাদের কল্‌কাতার বাড়ী ঘুরে। খামের উপর হাতের লেখাটা দেখে যেন খুব চেনা মনে হয় কিন্তু চিঠিটা পড়বার আগেই তাকে আবার ছুটতে হয় একটু কাজে।

হু হু শব্দে ট্রেণ গাড়ী ছুটেছে মরুভূমির মধ্য দিয়ে। রাত্রি প্রায় একটা বাজে অথচ শঙ্করের চোখে একটুও ঘুম নেই।—কেন, কেন এ রকম হয় দুনিয়ায়! মানুষ ভাবে এক, মনে কামনা করে এক, কিন্তু হয় কি আর এক।

শুয়ে শুয়েই মাথার কাছের আলোটা জ্বালিয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করে শঙ্কর আবার পড়তে লাগল:

শঙ্করদা,

মানুষ এত কঠিন, এত হৃদয়হীনও হতে পারে?

মাস ছয়েক কি তারও আগে মধুপুর থেকে লেখা তোমার একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছিলাম, তার পর থেকে আর তোমার কোন খবরই নেই। মধুপুরে এসে তুমি অনেক দিন থেকে গেলে, অথচ গিরিডিতে কিছুতেই এলে না—কেন, আমি তোমায় আসতে বলেছিলাম বলে? দিদি বল্লে যে তুমি নিশ্চয়ই আসতে, তা আমি এখন বুঝি, তখন বুঝি নি।

সত্যি বলছি, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন তুমি হঠাৎ এসেছিলে আমাদের জীবনে! বেশ তো ছিলাম আমরা, দুঃখ-কষ্ট, বিরহ ব্যথা কিছুই তো আমাদের স্পর্শ করতে পারে নি এতদিন। কিন্তু একটা ঝড়ের মতন তুমি এসে, আমাদের জীবনের মাঝখানে পড়ে সব তোলপাড় করে দিয়ে গেলে। একদিকে অবশ্যি তাতে অনেক লাভবান হয়েছি, উপকৃতও হয়েছি হয়তো, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশী।

তুমি তো চলে গেলে, আর সঙ্গে নিয়েও গেলে আমার জীবনের অনেকখানি—কিন্তু আমিও কি কিছু পাই নি তার বদলে? পেয়েছি বই কি! পেয়েছি অনুভব করবার, উপলব্ধি করবার শক্তি—পেয়েছি অপরিমিত শান্তি। বুঝেছি আগুনে না পুড়লে কাঁচা লোহা ইস্পাত হয় না, খাঁটি হয় না।

শঙ্করদা, শুধু দুঃখ হয় যে তুমি কেবল সামনের দিকে তাকিয়েই পথ চলে গেলে, পিছন ফিরে একবার তাকালেও না। যদি তাকাতে, তা হলে দেখতে পেতে কী সমাদরে তোমার জন্য পূজার অর্ঘ্য সাজানো। ফুল তার এখন বাসি হয়ে গেছে, চন্দন গেছে শুকিয়ে।

দিদির বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আসছে মাসের ৭ই বিয়ে। আশা করি ভাল আছ। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জেনো। ইতি— তোমার মিনতি

কবি কুমুদরঞ্জনের দুই একটী কবিতা

শ্রীভবপতি মৈত্র এম্‌-এ,

কবি কুমুদরঞ্জনের অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাবলীর মধ্যে শ্রীধর অন্যতম। এই কবিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, মানবের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া সকলই ঈশ্বরের করুণাধীন। মানব নিজের চেষ্টায় আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় না। অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণাবলীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ক্রম প্রসার পাইতে থাকে। সকল মানবই সদ্দৃষ্টান্ত দর্শনের দ্বারা সাধু হইতে পারে না। অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধু প্রকৃতি থাকা প্রয়োজনীয়। কারণ Bible এ Sower and the Seed নামক Parable এ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রস্তরে ও অরণ্যে নিক্ষিপ্ত বীজ কোনরূপ ফলোৎপাদক হইল না। সৎক্ষেত্রে পতিত বীজেই ফলোদ্গম হইল। আধ্যাত্মিক আহ্বান মানবের সকল সময়েই আসিতেছে, যদিও সকলেই তাহা শ্রবণ করিতে সৌভাগ্যবান্ হয় না। কবিতায় যতদূর বিবরণ পাওয়া যায় শ্রীধরের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস অল্পকালের জন্যই হইয়াছিল। তবে তাঁহার মনে বাল্যাবস্থা হইতে চৌর্য্যপ্রবৃত্তির সহিত কোমল কারুণ্য প্রবৃত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল এবং শেষোক্ত সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের পক্ষে বিশেষ কারণ হইয়াছিল। বিশ্বপ্রেম-বিকাশের ইহাই প্রথম সোপান। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

অকপট চিত্তে নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ইহাতে আরম্ভ, নাশ বা অকারণে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই। কবি তাহার পরেই বলিতেছেন :

> নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
> স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
>
> একদা তাহার মরেছিল যবে
> পোষা এক শুক পাখী
> দু'দিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল
> বনে বনে তারে ডাকি
> পালিত যতনে বিড়াল কুকুর
> পশুপাখী নানা ভাতি
> জানিনে ত মোরা কবে হতে হল
> সাধু ফকিরের সাথী

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন বোধ হয় শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা। তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যেন সে ঈশ্বরের অপ্রত্যাশিত করুণা লাভ করিতেছে। আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, ভগবৎ-করুণার জন্য তাহাকে জপ তপ করিয়া বেড়াইতে হইতেছে না। "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" রত্ন কাহাকেও খুঁজিয়া বেড়ায় না, রত্নকেই সকলে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণকারী যোগিগণের সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে হয় না। সত্যই তাঁহাদিগের পথ প্রতীক্ষা করে। অন্যত্র আমরা উদাহরণ স্বরূপ Shakespeare এর Tempest নামক নাটকে দেখিতে পাই, নির্জ্জন সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে নির্ব্বাসিত ঋষিতুল্য Prospero সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত নহেন। সত্য ও সৌন্দর্য্য তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। শ্রীভগবানের বিভূতিতে শ্রীধরেরও তদ্রূপ উন্নতি।

"পুণ্যাং পরোপকারশ্চ, পাপঞ্চ পরপীড়নম্।" ইহাই এই কবিতার সারমর্ম্ম এবং আমরা যাহা সতত বাক্যে প্রয়োগ করিয়া থাকি "যত্র জীব তত্র শিবরূপে নারায়ণ।" Leigh Hunt তাঁহার Abu Ben Adam এবং Coleridge তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "Rime of the Ancient Mariner"-এ যে শিক্ষা দান করিয়াছে, তাহাই এই কবিতার প্রতিপাদ্য বস্তু। মানবজাতির সভ্যতার প্রগতির সহিত নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও অযথা অত্যাচার দমনের জন্য অধুনা সমিতি স্থাপিত হইতেছে। এই পদ্যে ভগবান্ যে নিকৃষ্ট মূক প্রাণিগণের সহিত অবিচ্ছিন্ন ও অদ্বিতীয়, তাহাই বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। মনুসংহিতাতে এই বিষয় সুন্দর বর্ণিত আছে। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" প্রাণবন্ত জীবের সেবা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম এ জগতে আর কিছুই নাই। পরের দুঃখে দুঃখী ও পরদুঃখ মোচনে ব্রতী ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি জগতে নাই। ইহাই এই কবিতার সুব্যক্ত অর্থ।

ভগবানের মহিমা ভক্তকে এমন করিয়া কেলে যে, ধর্ম্ম-পথে ক্রমশঃ উন্নীত হওয়া অপেক্ষা পশ্চাদপসরণের কোন

উপায়ও থাকে না। "যোগী মঠ" ত্যাগ করিয়া শ্রীধরের শ্রীধামে আসিয়া উপস্থিত হইবার সময়ও বাল্যকালের কু-অভ্যাস অর্থাৎ চৌর্য্যপ্রবৃত্তি একেবারে মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

"আসিয়া শ্রীধামে মন্দিরে যবে
প্রবেশে হৃষ্টমতি
দৃষ্টি পড়িল দেবতা-গলার
মুক্তা মালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার
কুভাব জাগিল মনে
শ্রীমুখ দেখিয়া কি এক বেদনা
বাজিল মরম-কোণে।"

মুক্তমালা দেবতার, নতুবা অসৎ প্রবৃত্তি বলবতী হইত। শ্রীধরের সেই স্থান হইতে বিদায় লইবার সময় বাউল ঠাকুর আসিয়া শ্রীধরকে সেই মুক্তামালা অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভগবানের আদেশে তাঁহাকে এই মালা উপহার দিতেছেন। ইহাতে শ্রীধরের আরও মর্ম্মান্তিক কষ্ট ও অসহনীয় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি এমন ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক বিকাশ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

"এমনি হরির অহেতু করুণা
প্রেমের এমনি যাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয়
তস্করও হয় সাধু।
শ্রীধর এখন মুছি আঁখিনীর, বলিল রে মন তবে
এখন হইতে যাঁর মালা তাঁর সন্ধান নিতে হবে

গীতাতেও ইহার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

অগ্নি কাষ্ঠরাশি নিমেষে দগ্ধ করে, জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত পাপ-পুণ্য ভস্ম করে। শ্রীধর এখন একটী পশু-পরিচর্য্যায় নিরত সাধুর সন্দর্শন পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সজল নয়নে শ্রীধর বলিল
ওহে সন্ন্যাসী ভায়া
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে
এমনি দারুণ মায়া?
সন্ন্যাসী বলে কি করি ঠাকুর
বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে
সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি
বলিতে পারিনে ভয়ে
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে
জীবালয় দেবালয়ে।

কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর শ্রীধরকে সেই পরহিতব্রতী সাধু একটী মুক্তা বাহির করিয়া রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যটনকারী সাধুর হাতে যেন দেওয়া হয় বলিয়া প্রদান করিলেন। শ্রীধর তখন নিজের মালাটী খুলিয়া দেখিলেন যে একটী মুক্তা মালা হইতে খুলিয়া গিয়াছে। তখন এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বলিলেন যে, মালাগাছটী তাঁহারও নয়। সেই রামেশ্বর-তীর্থযাত্রী সাধুর হাতে সেই মালাটী যেন দেওয়া হয়, বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সাধু মালাটী লইয়া এক বৃহৎ পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন—দেববলে বলী দুইটী সাধু সেখানে আছেন। সন্ধ্যাকালে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ও পশুপক্ষীদের দুঃখের কষ্টের ভবনায় তাঁহাদের চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু পাতিত হয়।

"সাঁজে দুইজনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-স্রব মুকুতার মালা।"

বাস্তবতার দিক হইতে দেখিলে কবিতার মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত ভাবের চিহ্ন দেখা যায়। বাউল ঠাকুর শ্রীধরের হস্তে মুক্তামালা অর্পণ করিলেন। দেবতার আদেশে বাস্তবতার ভঙ্গ হয়। এই প্রাকৃত জড় জগতের ব্যাপারে ভগবানের আজ্ঞার আরোপণ। দ্বিতীয় কথা—দ্বিতীয় সাধু কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মালার গ্রহীতা রামেশ্বরে যাইবেন; ইহাও কোন অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। তবে এইস্থানে এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, কবি পাঠকবর্গের বিশ্বাস ও সহানুভূতি পাইবার সাহস রাখিয়াছেন। কবিতার চরম উদ্দেশ্যের দ্বারাই ইহার সকল প্রণয়ন-পন্থা ও রচনা প্রণালী সুসঙ্গত দেখাইয়াছে। অপর একটী কথা "সন্ধানী হাতে সঁপিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া-মাঝে।" এই স্থলে সন্ধানী কোন্ ব্যক্তি? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় সাধুই ইহার প্রকৃত পাত্র। এই সাধুই তাহার জীবনে প্রতিভাত যে সত্য তাহারই সাধনায় ব্যস্ত। এবং সেই সত্য সাধনার প্রণালী হইতেছে সেবা-যোগ-দ্বারা সাধু জীবের ভিতর দিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান আছেন। "সাঁঝে দুইজনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া

জীবের জ্বালা, মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-দ্রব-মুকুতার মালা।" কবিতার শেষছত্রদ্বয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মুক্তামালার প্রকৃত মালিক পরম কারুণিক জগদীশ্বর। সাধু নিশ্চয়ই সেই মুক্তামালা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন নাই। তৎপরিবর্তে তিনি তাঁহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য জীব সেবার জন্য মুকুতা মালার অর্থে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সত্য সাধনা করিতেছেন। পার্থিব জীবের দুঃখে বিগলিত হৃদয়ে যখন তিনি সন্ধ্যাকালে ভগবৎ আরাধনায় রত থাকেন, তখন মুক্তাবৎ অশ্রুধারা অজস্রধারে তাঁহার চক্ষু হইতে বহির্গত হয়। সাধু মালিকের পদে সেই কঠিন জড় মুক্তামালার স্থলে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ মুক্তাবলী—যে নয়ন ধারা, তাহা প্রত্যর্পণ করেন। ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গিতে এই রচনা-চাতুর্য্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

"কাপালিক"

মানবগণের জনক-জননীই বিশ্বপিতা ও বিশ্বজননীর রূপান্তর। "পৃথিব্যাঃ গুরুতরা মাতা পিতা উচ্চ স্তথোপরি," প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মান্বেষণে অযথা পথে ভ্রমণ করিয়া বৃথা চেষ্টা করেন না। Wordsworth এর Sky Lark-এর মতন "True to the kindred points of heaven and home." সংসার ত্যাগ করিলেই ধর্ম্ম হয় না। মাতা পিতা আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলে ধর্ম্ম সাধনে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়। 'নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।' রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য' ও 'দেবতা' কবিতার তাৎপর্য্যও এতাদৃশ। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবি কুমুদরঞ্জনের আর একটী অদ্বিতীয় কবিতা "কাপালিকে"। কবি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শাক্তদিগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও শাক্তের বিধি-ব্যবস্থা সাধন প্রণালীতে যে কতদূর সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয় তাহা দেখাইয়াছেন। শাক্তের রুক্ষ, উগ্র ও কঠোর মূর্ত্তির ও আচরণের অভ্যন্তরে অতি সরস ও কোমলবৃত্তির সর্ব্বদা পরিস্ফুটন দেখিতে পাওয়া যায়। দয়া, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রীতি সর্ব্বদা বিরাজমানা-পঞ্চমুণ্ডির আসনে উপবিষ্ট, অপগত-সংসার-কুহক কপালে রক্তবর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক রেখা বিশিষ্ট অস্থিমালা করে লইয়া ষোড়শবর্ষীয় কাপালিক ব্যাঘ্রাজিন পরিধান পূর্ব্বক প্রখর ঝটিকাযুক্ত অমাবস্যা নিশীথিনীতে শ্মশানে মহামায়ার উপাসনা করিতেছিল। এক একটী করিয়া প্রলোভনের প্রকৃষ্ট অঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী, কলকণ্ঠ অপ্সরীর নৃত্য গীত, উলঙ্গিনী নিশাচরী রাক্ষসীদের ভীতি-প্রদর্শন তাঁহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। কিন্তু ধীরচিত্ত ব্যক্তির সংযম ব্যাহত হইল এক সামান্য ব্যাপারে।

> "তারপর শ্রান্ত পদে একাকিনী মৃদুমন্দগমনে-
> আসিল কি এক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মানস-নয়নে।
> ক্ষীর ধারা বহে স্তনে, দুটী চক্ষু জলে গেছে ভরি,
> ডাকিল সে সন্ন্যাসীর শৈশবের ডাক নাম ধরি।
> চমকি উঠিল যোগী সে মধুর সে করুণ স্বরে,
> যুগযুগান্তের কথা আজ যেন জাগিল অন্তরে।
> সহসা পড়িল মনে সেই গ্রাম, সেই গৃহখানি,
> শত পরিচিত মুখ, শতকথা কে আনিল টানি।
> বিস্ময়ে মেলিল আঁখি, সব শূন্য, অট্ট অট্ট হাসি—
> ভাঙ্গি তাপসের ধ্যান পলাইল নিরাশা রাক্ষসী।
> বুঝিল সন্ন্যাসী হায়! মোহময়ী মায়ার ছলন,
> ভূতলে লুকায়ে মুখ লুটাইয়ে করিল রোদন।
> নিভাইল হোম-কুণ্ড, কাটি দিল শবের বন্ধন
> ভাঙ্গি দিল পঞ্চমুণ্ডী নৈবেদ্য করিল বিসর্জ্জন।

সাধু তখন দুঃখিত ব্যথিত হইয়া ভ্রমরা নদীতে আত্মহত্যা করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, তখন আরাধ্যা মঙ্গলমাতা আ সয়া দুইটী হাত ধরিয়া বলিলেন—

> ব্যর্থ নহে তোর পূজা দেবগ্রাহ্য সার্থক সুন্দর
> প্রীতা আমি উঠ বৎস, লও নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
> স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-হীন কর্কশ কঠিন কারাগার
> হয় না হয় না কভু দেবতার বিলাস আগার।
> আপনার জননীরে ভেনো বৎস যে পারে ভুলিতে
> বিশ্ব-জননীর স্নেহ সে কখন পারে না লভিতে।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"Charity begins at home." বিশ্বপ্রেম প্রথমেই মানবকে আসিয়া অভিভূত করে না। ইহাও ক্রমশঃ স্তর ও ছোট ছোট বৃত্তাকার ধারণ পূর্ব্বক পরে বৃহত্তর গণ্ডী গড়িয়া উঠে। কাপালিকের প্রথম চেষ্টাই জগজ্জননীর দর্শনের লালসা—তাই সে যখন তাহার নিজের মাতার বচনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইল, তখন সে তাহার ভ্রম মনে করিয়া আত্মহত্যা করিতে ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে বিশ্বমাতাই তাহাকে 'ভ্রম নহে' বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মানব নিজ-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজান্তর্গত ও দেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি প্রেমের বিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশ্বপ্রেমের অধিকারী হয়।

ললিত-কলা

প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্র যবদ্বীপ হলো চির-আনন্দ-মুখর উৎসবের দেশ। উৎসব সেখানে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। প্রকৃতিও সেখানে সর্ব্বদাই রূপ-লাবণ্যমণ্ডিত নব-যৌবনময়ী। বৎসরের বার-মাসই যবদ্বীপের শ্যামল বনভূমি বিচিত্র পুষ্প-পত্রের বর্ণ সম্ভারে শোভিত হয়ে থাকে। রূপ-রস-গন্ধময় মধু-মাস ও বসন্ত সেখানে চির-বিরাজমান। আনন্দ উচ্ছল চির-সুন্দরী শ্যামলা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যবদ্বীপবাসীদের সরল জীবন গড়ে উঠেছে, তাই প্রকৃতির উৎসব সমারোহের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে তাদের জীবনেরও উৎসব। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের বিকাশেই তাদের এত উৎসবের আয়োজন, আর এই উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাদের যাবতীয় চারু ও কারু-কলা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপেই সুসজ্জিত রুচি ও কলানুগত-সৌন্দর্য্য-বোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লোকে আনন্দেই উৎসব করে থাকে, কিন্তু উৎসবের দেশ যবদ্বীপে পরম শোকাবহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকেও উৎসবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়।

যবদ্বীপের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। ঘন-শ্যামল অরণ্যের অন্তঃস্থলে, পাহাড়ের পাদদেশে, বিধ্বস্ত-ভূগর্ভে এবং উন্মুক্ত ভূভাগের ওপর যবদ্বীপের সুদূর অতীতের এবং বর্ত্তমানের অসংখ্য চারু ও কারু-কলার নিদর্শন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার সুদীর্ঘ কলানুরক্তির ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, ভাস্কর্য্যমণ্ডিত, সারি সারি দেউল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায় ও পাদদেশে। পর্ব্বতগুহার মধ্যে শত শত সুন্দর সুকেশা সুবেশা উৎকীর্ণ মূর্ত্তি অতীতের নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে মৌনে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শিল্প-নিদর্শনের মধ্যেই সুপ্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির কিছু না কিছু সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মাদকতা এখনও যবদ্বীপবাসীদের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারে নি, তাই তাদের সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অকৃত্রিম ভাবে অতীতেরই জয়-গান গেয়ে চলেছে, এবং দেশবাসীরাও নিতান্ত সংরক্ষণশীলদের মতই প্রাচীন আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠানগুলিকে আঁকড়ে ধরে চলেছে। 'ডাচ্' প্রভাব তাদের চিরাচরিত রীতি-নীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় নি; কিন্তু ঘোর পাশ্চাত্য অনুকারী আধুনিক জাপানের করতলগত হওয়ায় যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বর্ব্বর মনোবৃত্তি সম্পন্ন জার্ম্মাণ অনুকারী আধুনিক জাপানের হাতে একটী এত সংস্কৃত জাতি যে ধ্বংস হতে বসেছে তা ভাবলে সত্যই ব্যথিত হতে হয়। যাঁরা যবদ্বীপের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন তার সংস্কৃতি কত উচ্চস্তরের এবং কত

মৌলিক। জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে প্রায় এখন কিছুই নেই। জাপান পূর্ব্বে চারু ও কারু-কলায় অনুকরণ করে এসেছে চীনকে, এখন সে অনুকরণ করে চলেছে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে। রাজনীতি ও যান্ত্রিক সভ্যতায় অনুকরণ করে চলেছে জার্ম্মাণীকে। জাপানীদের হাতে পড়ে সরল, সৌন্দর্য্যপ্রিয় যবদ্বীপবাসীরা যে তাদের সৌন্দর্য্য-অনুরাগ এবং প্রকৃতির উপাসনা ভুলবে এবং যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হতে বাধ্য হবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ওয়াইয়াং কুলিৎ নাচের পুতুল

(চিত্রখানি যাদুঘরের ওয়াইয়াং পুতুল দর্শনে লেখক কর্তৃক অঙ্কিত)

প্রাচীন যবদ্বীপের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ চিত্র, নৃত্য-কলা, গীৎ-উৎসব, পুতুলের অভিনয়, আর সর্ব্বোপরি বেশভূষা ও কেশবিন্যাস-কলা তাদের অতি উচ্চ ললিত-কলা-বোধের পরিচায়ক। যবদ্বীপবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে, প্রত্যেক কাজকর্ম্ম, চলাফেরা, আলাপ-আলোচনার মধ্যে আপনা হতেই যেন এক স্বাভাবিক ছন্দের মূর্চ্ছনা ঝরে পড়ে। ঘাটের পাড়ে মেয়েরা তাদের রং-চঙে কাপড় কাচ্ছে,—দেখবেন, তাদের সকলের কাপড় আছড়ানোর শব্দ একই সঙ্গে হচ্ছে এবং তারই তালে তালে মৃদু মিষ্টি একটা অখণ্ড গানের সুর ললিত-ছন্দে ভেসে চলেছে। নদীতে জলক্রের এক সারি মেয়ের দল মাথায় কলসি নিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে,—দেখবেন তাদের প্রত্যেকের পা পড়ছে এক সঙ্গে, একটা লঘু নৃত্যের ছন্দে। একই সঙ্গে তাদের সুপুষ্ট, দীপ্ত, লাবণ্য-মণ্ডিত সুন্দর দেহে বয়ে যাচ্ছে এক লীলায়িত ভঙ্গিমায় চঞ্চল হিন্দোলা, আর তারই সঙ্গে ঐক্যতান গানের একটী মৃদু সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তালে তালে উঠছে তাদের কাঁকনের ঝুম্-ঝুম্ ঝুম্-ঝুম্ অনুরণন! প্রকৃতি যেন তাদের সঙ্গে তালে তালে নেচে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে উঠে গেছে কচি ফিকে সবুজ রঙের ধানের ক্ষেত। তার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে, ঝর্ণা-বওয়া একটী ক্ষীণকায়া নদী সাপের মত এঁকে-বেঁকে—অবিরাম কলধ্বনি তুলে; চঞ্চল বাতাস সন্ সন্ শব্দের ঐক্যতানবাঁশী বাজিয়ে ছুটে চলেছে ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

যবদ্বীপবাসীরা তাদের জীবনের প্রত্যেক কাজকে নৃত্য, গীত দিয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য করে তুলতে জানে। আনন্দ দিয়ে শ্রমের ভার কেমন করে লঘু করে তুলতে হয়, তারা তা ভালই জানে। ললিত-কলা তাদের আলাদা করে শিখতে হয় না। এতে তাদের জন্মগত দখল। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তারা আপনা আপনি পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সমস্ত কলাই আয়ত্ত করে ফেলে। নৃত্য, গীত, মৃৎ-পাত্রের উপর কারুকার্য্য করা, হাত-তাঁতে সুন্দর সুন্দর রঙিন কাপড় বোনা, নাচের বিচিত্র অলঙ্কার ও আভরণ তৈরী করা, চামড়ার কাজ প্রভৃতি যবদ্বীপের প্রত্যেক মেয়েকেই শিখতে হয়। এগুলি তাদের Domestic Science-এর Compulsory Subject-এর মধ্যে পড়ে; আমাদের দেশের সংস্কৃত (Cultured) ঘরের মেয়েদের মত এগুলি তাদের Special Qualification বলে তারা বড়াই করে না।

শোভাযাত্রা

যবদ্বীপে উৎসব মাত্রেই পুতুলের নাচ হয়, এবং শোভাযাত্রা বেরোয়। এমন কি মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে পর্য্যন্ত ঘন-ঘটা করে শোভাযাত্রা বেরোয়। শোভাযাত্রায়, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত কন্যা ও বধূদের সারি আগে আগে যায়, তারও আগে যায় পুরুষরা পতাকা ও কুম্ভ বহন করে। নারীরা

প্রাম্বানান্ মন্দিরে প্রাপ্ত শিব-মূর্ত্তি

তাদের পশ্চাতে ঝারা দিতে দিতে যায়; তারপর যায় অদ্ভুত অদ্ভুত রাক্ষস, বানর, সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি। এর পশ্চাতে বিচিত্র বেশধারী মেয়েরা যায় নাচতে নাচতে এবং পুরুষরা যায় 'উবুদ্' বহন করে।

"ওয়াইয়াং কুলিৎ" বা পুতুলের ছায়া-নাটকের অভিনয়

"ওয়াইয়াং-কুলিৎ" (Wajang Koelit) কতকগুলি বিচিত্র দর্শন পুতুলের নাচ বা অভিনয়। এ কলাটী যবদ্বীপে অতি প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে। চামড়া কেটে কেটে এই পুতুলগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করা হয়। শিং, বাঁশ প্রভৃতির কাঠামোর উপর চামড়ার আবরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার পর, পুতুলগুলি অতি উজ্জ্বল লাল, নীল, বেগুনে সোণালি রঙে রঞ্জিত করা হয়। রং হয়ে গেলে, তাদের অতি সূক্ষ্ম রঙিন রেশমী কিংখাবের বেশ-ভূষায় সজ্জিত করা হয়। পায়ে কাঁকন, হাতে বিচিত্র দর্শন বলয়, গায়ে নানারূপ অদ্ভুত অলঙ্কার পরান হয়। মাথায় বিচিত্র শৃঙ্গ-চূড়াবিশিষ্ট মুকুট এবং গলা ও কোটিদেশে অতি বিচিত্র অলঙ্কার পরান হয়। পুতুলগুলির হাত-পা অতি সরু লিক্ লিকে কাঠী দিয়ে তৈরী। সেগুলি ইচ্ছানুযায়ী আঁকান বাঁকান যায়। সরু সরু কাঠীর সাহায্যে পুতুলগুলিকে অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়ে নাচান হয়।

একটী মঞ্চ থাকে। মঞ্চের সামনে একটী শাদা পরদা খাটান হয়। এই পরদার পশ্চাতে একটি বড় প্রদীপ জ্বলে। পর্দার পশ্চাতে বসে প্রদর্শক, মুখে নাটকীয় ধরণে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উপাখ্যান অবলম্বনে ঘটনাবলী বর্ণনা করে যায়, আর হাতে করে "ওয়াইয়াং কুলিৎ" পুতুলকে আখ্যান-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়ে নাচায়। পর্দার অপর পারের লোকেরা দেখে,—একটী বা ততোধিক ছায়ামূর্ত্তি অঙ্গ ভঙ্গী করে অভিনয় করছে।

এরূপ পুতুলের অভিনয়ে প্রদর্শকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও হস্ত-কৌশলের প্রয়োজন হয়। যারা নৃত্য-কৌশল ও পুতুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি দেখতে চান, তাঁরা পর্দার সামনে না বসে, পশ্চাতে অর্থাৎ প্রদর্শকের দিকে বসেন। যে নাটক অবলম্বনে এই নাটক অভিনীত হয়, তাকে যবদ্বীপের ভাষায় (Wajang Poerwa) বা "ওয়াইয়াং পূর্ব্ব" বলা হয়। কোন কোন অভিনয়ের বিভিন্ন ভূমিকায় শত শত পুতুল অবতরণ করে থাকে। এই পুতুলগুলি প্রদর্শকের হাতের কাছেই কলা গাছের গায়ে কাঠি বিঁধিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

ওয়াইয়াং পুতুলের নাট্যাভিনয়ের বিষয় ও আখ্যান-বস্তুর কোন সীমা নেই। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হতে আরম্ভ করে, কিম্বদন্তীমূলক অভিনয়, যবদ্বীপের জাতীয় বীরগণের জীবন-গাথা, আমাদের দেশের জেলেপাড়ার সংএর মত তামাসা ব্যঙ্গ নিয়েও ওয়াইয়াং পুতুলের নাট্যাভিনয় হয়ে থাকে। যে ওয়াইয়াং পুতুলগুলিকে সাধারণ নাট্যাভিনয়ের চরিত্রে নামান হয় সেগুলিকে "গোলেক ওয়াইয়াং" বলা হয়। ওয়াইয়াংয়ের অতি জন-প্রিয় অভিনয়ের বিষয়-বস্তু হচ্ছে এই জাতীয় যেমন,—অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, শিবের তাণ্ডব-নৃত্য, শিখণ্ডীর যুদ্ধ, যাভার মজপহিৎ ও অন্যান্য রাজাদের যুদ্ধ, প্রেমাভিনয়, প্রভৃতি।

নৃত্যাভিনয়ের পূর্ব্বে তরুণী অভিনেত্রীর সাজ-সজ্জা

নাটকাভিনয় বা ওয়াইয়াং তোপেং

যবদ্বীপে বাস্তব মানুষেও অভিনয় করে থাকে। এ অভিনয়ে বিশেষ করে পুরুষ অভিনেতারা সর্ব্বদাই নিজেদের মুখ কাঠের বা চামড়ার মুখোসে আবৃত রাখে, ঠিক সেরাইকেলা নৃত্যে যেমন নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা মুখোসে মুখ আবৃত করে নামে। এইরূপ অভিনয়ের নাম 'ওয়াইয়াং তোপেং' মানুষ থেকে আরম্ভ করে দৈত্য, রাক্ষস, জীবজন্তুর মুখোস পর্য্যন্ত এতে ব্যবহৃত হয়।

চিত্রাভিনয় বা "বেবার ওয়াইয়াং"

যবদ্বীপে আর এক রকম অভিনয় আছে। এতে সুদীর্ঘ একফালা কাপড়ে অভিনয়ের বিষয়বস্তু অঙ্কিত থাকে,

মৎস্য পুষ্করিণী—গারোয়েট (পশ্চিম যবদ্বীপ)

কাপড়ের টুকরাগুলি ফিতের মত 'রোল' (Roll) করে জড়িয়ে রাখা হয়। 'রোল'টা আস্তে আস্তে খোলা হয়, আর ছবি বাহির হতে থাকে। ছবি দেখে 'দালাং' মুখে ঘটনাবলী বর্ণনা করে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে মৃদু তালে বাজতে থাকে 'গামেলাং'। এইরূপ অভিনয়ের নাম হ'ল "বেবার ওয়াইয়াং"।

নাটক কথকের নাম যবদ্বীপের ভাষায় হলো "Dalang" বা "দালাং"। দালাং আবৃত্তি করে যায়,—পশ্চাৎ হতে মৃদু তালে "গামেলাং" বেজে যায়,—কথক থামলে গামেলাং চড়া সুরে বাজে। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান কথক যা গেয়ে যায়, দোয়ারকেরা তার পুনরাবৃত্তি করে। দোয়ারকদের পুনরাবৃত্তির সময় গামেলাং চড়া সুরে বাজতে থাকে।

"ওয়াইয়াং" পুতুলগুলির হাত সরু সরু হলেও দেখতে ভারী চমৎকার। এগুলি যা তা করে করা নয়। তাদের তৈরীর একটা ধরা বাঁধা নিয়ম আছে, নির্দ্দিষ্ট "Iconography" আছে। "Wajang koelit" মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-বিদ্যা না জানলে, ঐ পুতুল নির্ম্মাণ করা কঠিন। তাদের নির্ম্মাণের একটা বিশেষ কলা রীতি আছে।

নৃত্য-কলা

নৃত্য হলো যবদ্বীপের সমস্ত উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শোভাযাত্রার পুরোভাগে নর্ত্তকীরা বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করে নাচতে নাচতে যায়। নর-নারীদের রেশমের রঙ্গীন বেশভূষা ও উত্তরীয় উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। সেরাইকেলা নৃত্যের মত যবদ্বীপে মুখোস পরে নাচের রেওয়াজের খুব চলন আছে। একে তারা "তোপেং" নৃত্য বলে।

আসামেও এইরূপ মুখোস পরে নাচের রীতি আছে। মুখোস বা আসামী ভাষায় "ছোঁ" পরে যে নৃত্য করা হয় তাকে 'ভাওনা' বলে। মালাবারের কেরল প্রদেশেও এইরূপ রং-চঙে মুখোস পরে নাচার রেওয়াজ আছে। ওদেশে এই নৃত্যকে "কথা-কলি নৃত্য" বলা হয়।

"লেগঙ" (Legong) নামে যবদ্বীপে আর এক প্রকারের নাচ চলতি আছে। ছোট ছোট মেয়েরাই এই নাচ নাচে। বারো বছরের উর্দ্ধ বয়সের মেয়েরা এ নাচে নাকি নামতে পারে না। নাচের জন্য যবদ্বীপ সারা বিশ্বের মধ্যে বিখ্যাত। বিশ্বের বড় বড় নাচিয়েরা যবদ্বীপের নিজস্ব নৃত্যকলা অনুশীলন করতে যবদ্বীপে আসে।

ক্লাথ-এর একটী হ্রদ, পশ্চাতে লামোঙ্গা পর্ব্বত (পূর্ব্ব যবদ্বীপ)
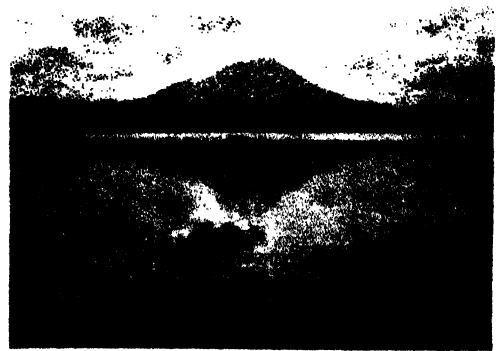
প্রাচীন যবদ্বীপের মন্দির-শিল্প

যবদ্বীপের মন্দিরগুলি বেশ সুবৃহৎ। একক মন্দির অতি
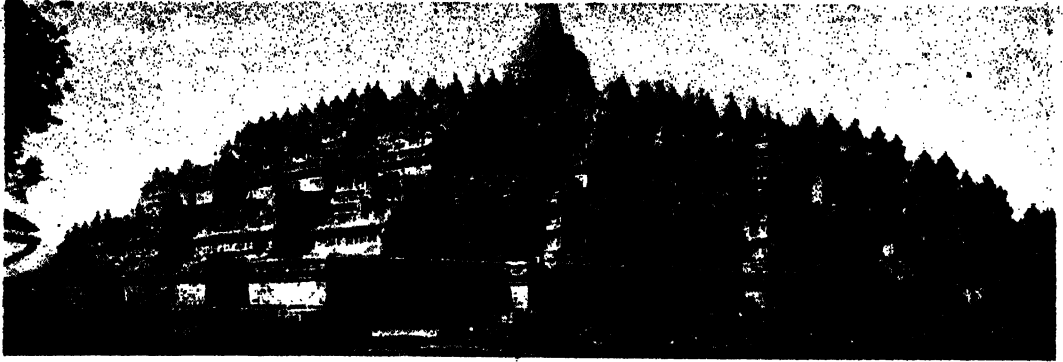
বরবুদুর মন্দিরের সম্পূর্ণ দৃশ্য (মধ্য যবদ্বীপ)

বরবুদুরের ভিতরের একটা অলিন্দ (মধ্য যবদ্বীপ)

বরবুদুরের একটা তোরণ (মধ্য যবদ্বীপ)
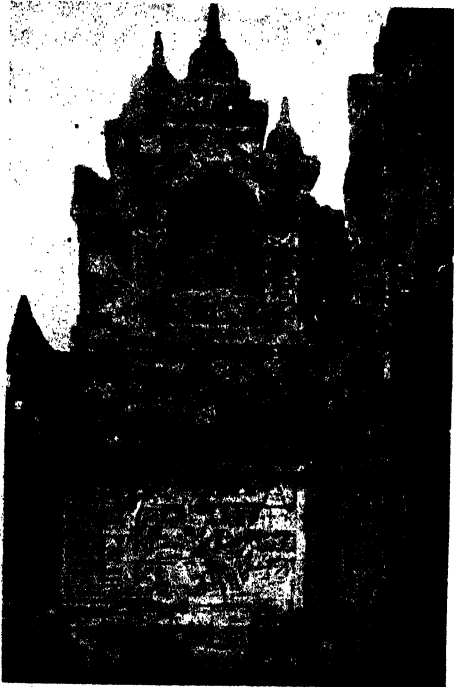
বিরল। মন্দিরগুলি সমষ্টিগতভাবে নির্ম্মিত হয়েছে। সব মন্দিরই পাথর কেটে তৈরী। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্যে সেগুলি
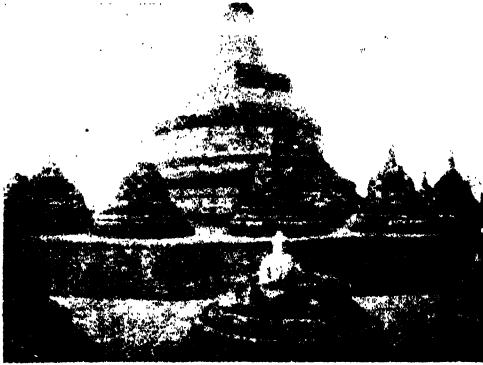
বরবুদুরের ছাদ ও চূড়াসমূহ (মধ্য যবদ্বীপ)

অতুলনীয়। এখানের স্থাপত্য ও বাস্তু-শিল্পে নিখুঁত জ্যামিতিক নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। অধিকাংশ মন্দিরের ভিত্তিভূমি (Foundation) হ'ল সম-চতুষ্কোণ (Square)। মধ্যে একটি বড় মন্দিরকে কেন্দ্র করে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দিরের সমষ্টি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এখন অনেক বড় বড় মন্দিরই ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানের বড় বড় বৌদ্ধস্তূপের অধিকাংশই শৈলেন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধরাজাদের আমলে নবম ও দশম শতকে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধ ছাড়া অপর মন্দিরগুলি শিব, বিষ্ণু, মৈত্রেয়, 'লোরো—জোঙ্গ-বাঙ' বা মহিষ-মর্দ্দিনী, প্রভৃতির জন্য নির্ম্মিত।

প্রম্বানান যবদ্বীপের অতীতের ধর্ম্ম ও শিল্পসম্পদের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। অতীতে এর উপর অনেক বিরাটকায় মন্দির ছিল। এখন সেগুলি কেবল ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষগুলির শিল্পকুশলতা ও অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ডাচ্ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখন বিশেষ যত্ন সহকারে এগুলির উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হয়েছেন। কারুকার্য্য উৎকীর্ণ বড় বড় পাথরের টুকরাগুলি বাছাই করে সেগুলিকে কপিকলের সাহায্যে যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানের অধিকাংশ মন্দিরই ধূসর বেলে পাথরে তৈরি হয়।

এখানের তিনটী মন্দির খুব উঁচু ও অতি বিরাট। তিনটীর মধ্যে মাঝেরটী আবার সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু ও বড়। মন্দিরগুলি উত্তর হ'তে দক্ষিণে একটী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির অনেক ধাপ ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। মন্দিরগুলি বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার। উত্তরে বিষ্ণু, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও মধ্যের মন্দিরটী হলো শিবের। শিবের মন্দির কেন্দ্র করে এর চারপাশে দেড় শত ছোট ছোট মন্দির চারটী সারি দিয়ে সাজান ছিল। এখন সেগুলির সবই প্রায় ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রাম্বানান-তীর্থের মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী যবদ্বীপীয় রাজা দক্ষের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়।

ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তী-শিল্প

যবদ্বীপে মূর্ত্তী শিল্পে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পের হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্প যবদ্বীপে গিয়ে পৌঁছায় ও সমৃদ্ধি লাভ করে। মূর্ত্তিগুলির সুডৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখমণ্ডলের সৌম্যভাব ও দীপ্তি অপরূপ। তাদের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। নরমুণ্ড-শোভিত জটাবিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্ত্তি কি প্রশান্ত। তারা অন্তর্মুখী জ্ঞান উদ্ভাসিত মূর্ত্তির তুলনা মেলে কোথায়! মূর্ত্তির হাতে দুটী দীপ—একটী ঊর্দ্ধমুখ ও নির্ব্বাপিত, অপরটী জ্বলে দীপ্ত অনির্ব্বাণ নিষ্কম্প্র শিখায়। সভ্যতার সুদূর অতীতে যবদ্বীপের প্রাচীন শিল্পীরা যে 'ব্রোঞ্জ' মূর্ত্তিগুলি গড়ে রেখে গেছে—সংস্কৃতির উচ্চতম-সোপানশৃঙ্গে আরোহিত পৃথিবীর কোন্ আধুনিকতম জাতির ভাস্কর্য্যের মধ্যে তার তুলনা মেলে!

বরবুদুর (মধ্য যবদ্বীপ)

রচনার ভঙ্গিমা যেমন মৌলিক, সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যও তেমনি অতুলনীয়। মূর্ত্তিগুলির অপরূপ ছন্দের ব্যঞ্জনা, তাদের

গম্ভীরত্ব ও সুষ্ঠুভাব অতি অল্পদেশের শিল্পকলায় দেখা যায়। Kats এর মতে খৃষ্টীয় নবম শতকের পর হতে
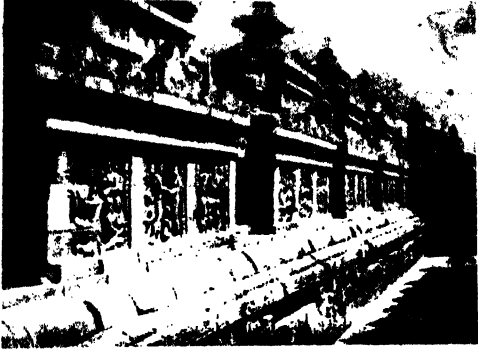
বরবুদুরের ভিতরের একটী অলিন্দ (মধ্য যবদ্বীপ)

এখানের ভাস্কর্য্য ধীরে ধীরে বিকৃত হতে হতে 'পানাতারান্'-এর শিল্পে এক বিশেষ বিকৃত ভঙ্গী ধারণ করে। ওয়াইয়াং পুতুলের এ grotesque ঢং নাকি এই বিকৃতিরই প্রভাবে ঘটেছে। চারশত বৎসরের মধ্যে এই অনিচ্ছাকৃত বিকৃতি ইচ্ছাকৃত অতি কিম্ভূতকিমাকার রূপ পরিগ্রহ করে ওয়াইয়াংয়ের মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। এখানের শিল্পীদের হাত এত Versatile যে medium তাদের কোথাও়ই বাধা দিতে পারে নি। তাদের চপল শিল্প-কুশলী অঙ্গুলী মিহি রেশমী কাপড়ের ওপর যেমন লঘু লতাতন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম লালিত্য ফুটিয়েছে, কিলক ও হাতুড়ীর সাহায্যে কঠিন পাথরের বুকেও ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক রূপলাবণ্য ফুটাতে সক্ষম হয়েছে। কাঠ, পাথর জরি, বাতিক, চামড়া, সোনা, রূপা, কাঁসা প্রভৃতি সমস্ত বস্তু ও সমস্ত রকম ধাতুর ওপরই যবদ্বীপীয় শিল্পীরা কারুকার্য্য করেছে এবং এখনও করে থাকে।

একটু ভাল করে দেখলে বরবুদুরের বিরাটকায় মন্দির গুলির উৎকীর্ণ মূর্ত্তি ও প্রম্বানানের মন্দির গাত্রে রচিত মূর্ত্তির মধ্যে একটী সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রম্বানানের মন্দিরের গায়ে যে চিত্রগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে, তার অধিকাংশই রামায়ণের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। মূর্ত্তিগুলি বেশ প্রাণবন্ত এবং একটু চঞ্চল ধরণের। কিন্তু বর-বুদুরের মূর্ত্তিগুলি অন্যরূপ। তাতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন ফুটে উঠেছে। লঘু, লালিত্য বা চাঞ্চল্যের কোন চিহ্নই তাতে মেলে না। সমস্ত মূর্ত্তি ও পারিপার্শ্বিক অলঙ্করণে সমাধি বা ধ্যানের মত এক গম্ভীর ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। মন্দিরগুলির বিরাটত্ব স্থপতির অনিন্দ্যসুন্দর পরিকল্পনা, কারু-শিল্পীর বিপুল শক্তি ও ধৈর্য্যের নিদর্শন অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। সমগ্র দেশই হলো মন্দির ও উপাসনার স্থান। ধর্ম্মের মহিমায় যবদ্বীপের মাটির প্রতিটী কণা যেন জাগ্রত। চতুর্দ্দিকে বিধ্বস্ত মন্দির, স্তূপরাজি, চূর্ণ-বিচূর্ণ অসংখ্য বিগ্রহের মূর্ত্তি, সমস্ত মিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তুলে মনকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে।

প্রাচীন যবদ্বীপের চিত্রকলা

প্রাচীন যবদ্বীপে আঁকার খুব বেশী প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। অধিকাংশ চিত্রই বড় বড় পাথরের গায়ে ধারাল কিলক দিয়ে খোদাই ক'রে আঁকা। বরবুদুর ও প্রম্বানানে যবদ্বীপের খোদাই চিত্রকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে। রামায়ণ প্রভৃতির পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে এই চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। অধুনা এই চিত্রগুলি ডাচ্ প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং উহার কর্ত্তৃপক্ষেরা শিল্পামোদীদের জন্যে চিত্রগুলির প্রতিলিপি ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। ভাগবতের আখ্যানবস্তু, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতিও হ'ল অনেক চিত্রের বিষয়বস্তু। এ-চিত্রগুলির সহজ প্রকাশভঙ্গী, সাবলীল গতি-ভঙ্গিমা ললিত-ছন্দ, ও সর্ব্বোপরি শক্তির প্রকাশ, তাদের করে তুলেছে অতুলনীয়। এখানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের তুলনা, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভিন্ন অপর কোথাও মেলে না।

বস্ত্র-শিল্প

যবদ্বীপের বাতিক কাপড় আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রধান শিল্প-সামগ্রী। শিল্প-কলার অন্যান্য শাখার মত বস্ত্র-শিল্পেও যবদ্বীপীয়দের অতুলনীয় শিল্প-কুশলতা ও রুচি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যবদ্বীপের মেয়েদের পরিধেয় অতি সাধারণ বস্ত্রের রঙের উজ্জ্বল্য ও পরিকল্পনার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ করে দেয়। এদের পরিধেয় কাপড়গুলি আমাদের দেশের মেয়েদের কাপড়ের মত দীর্ঘ নয়, খাট—অনেকটা বর্ম্মী মেয়েদের লুঙ্গির মত করেই পরা হয়। কোটিদেশে দৃঢ়

করে মেয়েরা কাপড় পরে, কোটির ঊর্দ্ধভাগ একেবারে নিরাবরণ থাকে। তরুণীদের-দাসীরা মন্দিরে পূজা-সম্ভার বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় রঙিণ উত্তরীয় দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে। আজকাল অপরাপর সভ্যদেশের মেয়েদের বেশভূষার প্রভাব পড়ায় যবদ্বীপের সম্ভ্রান্তবংশের মেয়েরা দেহের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত করতে আরম্ভ করছে।

গালার রঙ দিয়ে মেয়েদের একরকম কাপড় হাতে ছাপা হয়। সেগুলির নাম হলো 'সারোঙ'। একখানি সারোঙ কাপড় ছাপতে দুই সপ্তাহেরও বেশী সময় লাগে। ইহা ছাড়া এখানের নানারূপ মনমুগ্ধকর অসাধারণ বর্ণ সুষমা-মণ্ডিত 'বাতিক', 'ইকট', 'কপালা', 'কাইন', মেন্দা প্রভৃতি কাপড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বাতিক যবদ্বীপের নিজস্ব শিল্প। বাতিকের উজ্জ্বল রং ও কারুকার্য্যের কাছে আমাদের দেশের অতি অভিনব বর্ণ ও পরিকল্পনামণ্ডিত আধুনিক সাড়ী, বেনারসী সাড়ী লাক্ষ্ণৌ ঝজিয়াবাদ ও বৃন্দাবনী সবই ম্লান হয়ে যায়। যবদ্বীপের

ক্র্যাটার হ্রদ (Idjen Pleatau) (পূর্ব্ব যবদ্বীপ)

নিতান্ত সাধারণ লোকেরও রং ও 'design' নির্ব্বাচনে অতি সূক্ষ্মরুচি ও দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আর একরকম কাপড়ের চলন আছে এগুলি আদৌ তাঁতে বোনা হয় না।

ব্যাটাভিয়ার শিল্প-কলার প্রদর্শনী

ব্যাটাভিয়ায় প্রত্যেক বৎসর 'অগাষ্ট' মাসের শেষে

টেঙ্গার পর্ব্বতশ্রেণী, সম্মুখে মেঘাবৃত ব্রোমো পর্ব্বত (পূর্ব্ব যবদ্বীপ)

একটি বাৎসরিক শিল্প-কলার প্রদর্শনী হয়। ওদেশে এটির নাম হলো "পাসার গাম্বির"। বিস্তৃত জমির উপর তাঁবু পড়ে। চারদিকে মঞ্চ নির্ম্মিত হয়, বহু পরিশ্রমে সুন্দর কারুকার্য্য খচিত প্রবেশ তোরণ নির্ম্মিত হয়। প্রদর্শনীতে শিল্প-কলা পৃথক পৃথক বিভাগে সাজান হয়। চারু ও কারু কলার বিভাগ একেবারে আলাদা।

এখানের কারু-কলার জিনিষগুলির কারুকার্য্য যেমন সূক্ষ্ম পরিকল্পনাও তেমনি মৌলিক ও বিচিত্র। এখানের শিল্পীরা দস্তুরমত মাথা ঘামিয়ে ও সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ করে নানারূপ অদ্ভুত জিনিষ তৈরী করে থাকে। আমাদের দেশে নারকোলের খোলের একমাত্র প্রয়োগ হলো হুঁকোর খোলে,—কখনও কখনও মেয়েরা নুন, মসলা রাখার কাজে রান্নাঘরে ব্যবহার করে থাকে এবং উনুন ধরানোর কাজে লাগান। কিন্তু যবদ্বীপে নারকোলের খোল হতে চিরুণী থেকে আরম্ভ করে কত বিচিত্র জিনিস যে তৈরী হয় তার ইয়ত্তাই নাই। এক নারকোলের খোলের তৈরী জিনিষেই প্রদর্শনীর একটা বিভাগ ভরে যায়। কাঁসা ও রূপো মিশান একরকম ধাতু (Alloy) থেকে আজকাল এখানে অতি সুন্দর সুন্দর ফুলদানি, দীপাধার, তাম্বুলাধার, সিগারেটের পেটী প্রভৃতি অনেক

জিনিষ নির্ম্মিত হচ্ছে। এগুলির কারুকার্য্য নূতন ও পুরানো ধরণের সংমিশ্রনে এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এখানের গালার কাজের তুলনা সারা বিশ্বে মেলে না।

বুইটেনজর্জের বিখ্যাত উদ্ভিদ উদ্যান (সম্মুখে লাটপ্রাসাদ)

যবদ্বীপের ললিত-কলার প্রত্যেকটী শাখা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রত্যেক কলার মধ্যেই ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব মৌলিক ধারা। যবদ্বীপের নিজস্ব সংস্কৃতির অখণ্ড ইতিহাস মেলে তার সুন্দর সুন্দর মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায়। যবদ্বীপের সংস্কৃতির পূর্ণ স্ফূরণ ও স্বাভাবিক বিকাশ দেখা যায় তার উৎসবের নৃত্য, গীত ও শোভাযাত্রায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ললিত-কলায় উদ্বুদ্ধ যবদ্বীপ, তার সে প্রাচীন সংস্কৃতি এবার ভুলতে বাধ্য হ'ল। ঘোর প্রতীচ্য অনুকারী জাপানীদের হাতে, তাকে এবার আত্মাহুতি দিতে হ'ল; এবার সে তার পূর্ব্ব মৌলিকত্ব ও অতীতের গৌরব ভুলে প্রতীচ্যকে অনুকরণ করতে বাধ্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ*

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রথম মণ্ডল ষোড়শ সুক্ত।

বৃষ্টিদাতা হে মঘবা
অশ্বে এস সোমপানে
সূরচক্ষু ঋত্বিকেরা
প্রকাশ করুক তোমায় গানে।১

আসুক হেথায় অশ্বযুগল
তোমার সুগতম রথে
ঘৃতস্রাবী যব-কণা
পড়ল বেথা বেদীর পথে।২

ভোরের বেলা সবন-কালে
মধ্যদিনে সোমযাগে
যজ্ঞশেষে সোমপানে
তোমায় ডাকি অনুরাগে।৩

ঝলমল কেশর যাদের
সে তুরগে এস আজি
তোমায় মোরা হবন করি
অভিষুত সোমরাজি।৪

পিপাসিত হরিণ সম
পিও পিও সোমধারা
প্রাতঃসবন হল সুরু
স্তোত্রে কর হৃদয়-হারা।৫

ছড়িয়ে আছে সোমসুধা
স্নিগ্ধ এবং পবিত্র যা
বীর্য্যবাহী ইন্দ্র তুমি
দর্ভ হতে পান কর তা।৬

স্পর্শ করুক হৃদয় তব
স্তোত্র মো'দের অগ্রতম,
নন্দিত হও হে মঘবা
সোম যে পিয়ে অনুপম।৭

বৃত্রহন্তা ইন্দ্র তুমি
নন্দিত হও সোমপানে
সর্ব্ববিধ সবনকালে
এস হাসি মোদের গানে।

স্তুতি করি শতক্রতু
সুষ্টুরূপে গভীর ধ্যানে
পূর্ণ কর যাচ্‌ঞা মোদের
অশ্ব, গোধন, কাম্য দানে।

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ ঋগ্বেদ গ্রন্থ হইতে।

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ছয়

নিখিল আশা আকাঙ্ক্ষাময় দুঃখে সুখে
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গঘাত ধরব বুকে।

রবীন্দ্রনাথ

সুব্রতের কাছে গ্রামের সমস্যা বিশেষ সহজ বলিয়া মনে হইল না। পল্লীসংস্কারের জন্য তাহার এই যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ তাহা গ্রামবাসী আপনাদের একান্ত প্রার্থিত দুর্লভ জিনিষ মনে করিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করিবে এই ধারণাই তাহার ছিল। সে ভাবিয়াছিল গ্রামের লোকেরা উন্মুখ হইয়া থাকিবে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের জন্য। সুব্রতের ধারণা ছিল যে, সাধারণ লোকে এখন আপনাদের অভাব কোথায়, কেন তাহারা মধ্যবিত্ত লোকদের চেয়ে জ্ঞানে ও মার্জ্জিত বুদ্ধিতে হীন লইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই সহজ জ্ঞানটা হয় ত' স্বাভাবিক ভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কয়েকদিন এ গ্রামে আসিয়া গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদের সহিত যে আলাপ ও আলোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন দিক্ দিয়াই গ্রামের লোকের আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

কলিকাতা হইতে রওনা হইবার সময় এই আশা সে করিয়াছিল, যে গ্রামে আসিয়াই সে দেখিতে পাইবে গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর লোকেরা শিক্ষালাভের জন্য একটা ব্যাকুল আগ্রহ লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবে কত প্রভেদ! সে দিকে কাহারও কোন আয়োজন নাই—কেহই তাহার আগমনের উদ্দেশ্যকে তেমনভাবে গ্রহণ করিল না।

সুব্রত ভাবিল তবে কি তাহার অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইবে? গ্রাম্য জীবনের সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বে কোন ধারণাই ছিল না—আর প্রথমতঃ গ্রামের বাহিরের রূপ দেখিয়া তাহার মনের ভিতর যে একটা আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল—এইবার তাহার অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য কতটা তাহা সে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছিল। তবে এ কয়দিনে সে গ্রাম্য দুঃস্থ নরনারীদের কাছে কেবল অভাব অভিযোগের কথাই শুনিয়াছে। কোন বিধবা নারী জীর্ণ বস্ত্রে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া আসিয়া ভিক্ষার জন্য হাত পাতিয়াছে, কেহ আসিয়া বলিয়াছে, বড় গরীব মানুষ আমার ছেলের একটা চাকরী করে দেও না বাবা! সর্ব্বত্রই হাহাকার! অভাব-অভিযোগ, কোনরূপ শ্রম-শিল্পের দিকে আগ্রহ নাই কেবল ভিক্ষা চাই—ভিক্ষা চাই; ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও।

গ্রামের পথে বাহির হইয়া তাহার মন আরও বিমর্ষ হইয়া গেল। চারিদিক হইতে যেন মহাশ্মশানের বিভীষিকা ইহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কাঁচা মাটির সংকীর্ণ পথের দুই দিকে বেতসী লতা, অজানা নানা জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন। ডোবা-পুকুর ও দীঘি সব কচুরিপানা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। বড় বড় সব ধনীদের অট্টালিকার মধ্যে বানরেরা দলে দলে বাসা বাঁধিয়াছে। গো-সাপ নির্ভীকভাবে বিচরণ করিতেছে। সাপ পথ ডিঙ্গাইয়া যাইতেছে। উলঙ্গ শিশুর দল ছুটাছুটি করিতেছে। মলিন বসন পরিহিতা গৃহস্থ বধূরা হাতের তেলোতে একরাশ বাসন লইয়া আসিয়া ঘাটে সেই বাসন মাজিতে বসিয়াছে। চারিখানি বাঁশ দিয়া কচুরিপানা সরাইয়া খানিকটা পরিষ্কার জলেই তাহাদের স্নান, তাহাদের বাসন মাজা এবং খাবার জল সংগৃহীত হইতেছে। গ্রামে চার পাঁচটি মাত্র নল-কূপ আছে, সেখান হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে কি গৃহস্থ বধূরা সব সময় পারে? সে দিকে অনেকের তেমন আগ্রহও নাই। এ গ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ধনী বণিক ব্যবসায়ী প্রভৃতির বাড়ী—কেহই গ্রামে থাকেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হয় ত' অন্য কোনও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে সেই জেলার পল্লী উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু নিজ গ্রামের বাস্তু ভিটায় টিনের ঘরগুলির চালখানি পর্য্যন্ত নাই, বেড়া নাই—কতকগুলি কুকুর সেখানে

কুণ্ডলী পাকাইয়া মাটি খুঁড়িয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুম যাইতেছে, কাছ দিয়া গেলে ঘেউ ঘেউ রবে চিৎকার করিয়া যেন বলে, 'কে গা! তুমি আমার শান্তি ভঙ্গ করিতেছ?' কোন বাড়ীর বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক কাহার সঙ্গে যেন ঝগড়া করিয়া পাড়াখানিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কি বিকট চিৎকার! সে দুর্ব্বোধ্য ভাষা সুব্রত বুঝিতে পারিল না।

তাহার গ্রামের পথের সঙ্গী একটি বাড়ী দেখাইয়া বলিল, "এ বাড়ীতে বংশানুক্রমিকভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ হইয়া আসিতেছেন। পিতামহ পেন্সান লইয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। তখন পুকুরের জল টল্‌মল্ করিত, বাগানে দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলের ছিল অপূর্ব্ব মাধুরী, লোকে দাঁড়াইয়া সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য, সে সৌরভ সম্ভোগ করিত। বৃদ্ধ নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত লোকের সংবাদ লইতেন, ক্ষুধার্ত্তদের অন্ন যোগাইতেন, পীড়িতের সেবা করিতেন, ঔষধ দিতেন, বাড়ী হইতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন, শিয়রে বসিয়া রোগীর মাথায় হাত বুলাইতেন—আর আজ এই বাড়ীর দীঘিটি মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, বাড়ীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ঘরে ঘরে তালা বন্ধ, তালাতে মরিচা পড়িয়াছে। অথচ এই পরিবারের লোকের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকুরী ইত্যাদি দিয়া দুই লক্ষ টাকারও উপর বার্ষিক আয়। কলিকাতা, ঢাকা, দার্জ্জিলিং, কাশিয়াং, ঝাঁঝা, বৈদ্যনাথ, কাশী সর্ব্বত্র বাড়ী রহিয়াছে। বধূরা, ছেলেরা কেহ বাড়ী আসিতে চাহে না। গ্রামে অসুখ-বিসুখ, দলাদলি, অসভ্য অশিক্ষিতা পল্লীবধূদের বাস আর দুশ্চরিত্র যুবক ও চোর-ডাকাতেরা বাস করে এই তাহাদের বিশ্বাস! এমন গ্রামে মানুষ আসে?" সুব্রতের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল? এই কি আমাদের পল্লীর রূপ? এই কি আমাদের গ্রামের শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়?

একখানি বাড়ীর দিকে সুব্রতের সঙ্গী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—প্রকাণ্ড দীঘির উত্তর পাড় বাড়ী। বিরাট প্রাচীর ঘেরা। এক সময়ে ইহারা গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন, এখনও এবাড়ীর ছেলেরা রাজকার্য্যে, ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধশালী। বাড়ীটি সত্যই সাত মহলা। পূজার মণ্ডপ, বৈঠকখানা, ঠাকুর-ঘর সবই ছিল অপূর্ব্ব স্থাপত্যের নিদর্শন। আজ সে সকল ভূপতিত। সুন্দর বৃহৎ দীঘিটী জঙ্গলে ভরা। এক পাড়ে দুই তিনটি মঠ। সে প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে বাড়ীর বৃদ্ধা প্রপিতামহী যিনি সতী গিয়াছিলেন তাঁহার ও তাঁহার স্বামী পুত্রের স্মৃতি বহন করিতেছে। যোগ্য বংশধরদের অযত্নে আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

সুব্রত দেখিল জীর্ণ কুটিরে অতি কষ্টে কোন কোন দুঃস্থ পরিবার বাস করিতেছে। সুব্রত ভাবিতে লাগিল—একি বাঙ্গলা দেশ! একি রাজনীতিতে, বক্তৃতামঞ্চে অসাধারণ বাক্য-কুশল বাঙ্গালীর পল্লী! এই তাহার সত্যিকার জীবন।

বড় দুঃখ হইল তাহার মনে। কোন বাড়ীতেই যেন শ্রী নাই। কাহারও যেন বাস করিবার মত যোগ্যতাও নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া গ্রামের লোকেরা সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে—তাহা দিয়া দুই মুঠা ভাতই যে তাহাদের জোটে না। দুইটি লাউ কুমরোর গাছ পুতিয়াও যে রক্ষা নাই; অমনি বানর আসিয়া সমূলে ধ্বংস করিবে। কি অক্ষম অকর্ম্মণ্য এই গ্রামের লোকেরা।

যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল সে আদর্শ গ্রহণ করিবার লোক কোথায়? পথের একটা বাঁক ফিরিতেই খালের পাড়ে দেখিতে পাইল একটি ছোট বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি তরুণী।

গ্রামের বধূরা ও বর্ষীয়সীরা এই তরুণকে দেখিয়া সঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে কিংবা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে—কিন্তু এই দুঃসাহসিক তরুণীটি নির্জীব ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে-দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। কাছে আসিতেই চিনিতে পারিল সে উমা। উমার শুভ্র সুন্দর বেশ। উমা হাসিমুখে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি দয়া করে কি একবার আমাদের বাড়ী আসবেন?"

উমাকে সুব্রত সেদিন দূর হইতে দেখিয়াছিল মাত্র, আর সেদিনকার সে বিচার-সভা হইতে সে দূরেই ছিল। উমার সঙ্গে তাহার আলাপ বা সামান্য মাত্র বাক্য বিনিময় হইবার সুযোগও পূর্ব্বে হয় নাই। শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে এই দুঃখিনী নারীটির দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়া তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা

বশতঃই ইহার প্রতি তাহার একটা করুণার উদ্রেক হইয়াছিল—তাহা তাহার মনের মধ্যেই সংগোপনে ছিল, হঠাৎ এমনভাবে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তাহা সুব্রত প্রত্যাশা করে নাই। সুব্রত কি করিবে ভাবিতেছিল—এমন সময় উমা নিজেই ছোট সাঁকোটি পার হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল এবং হাসিয়া কহিল, "সাঁকো পার হতে পারবেন ত'? লজ্জা করেন না যেন।"

সুব্রত কহিল, "কি যে বলেন!"

সত্যই সুব্রতের ব্যায়াম পুষ্ট বাহু দুইটির অবলম্বনে অতি দ্রুতই সেই বাঁশের সাঁকো উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

সুব্রত ফিরিয়া দেখিল তাহার সঙ্গী তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেন যে একজন অপরিচিত লোককে এমন ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল না।

উমা বাহিরের ঘরের সম্মুখের ছোট প্রাঙ্গণটিতে একখানি মোড়া আনিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল, "আমরা বড় গরীব, আপনাকে বসাতে পারি এমন কোন আসন নাই। একটু দাঁড়ান আমি বাবাকে ডেকে আনছি।" চঞ্চলা হরিণীর মত উমা বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ খালি গায়ে খড়ম পায় দিয়া বাহিরে আসিয়া সুব্রতকে বেশ মনোযোগ সহকারে দেখিয়া কহিল, "আমি ত' আপনাকে দেখেছি বলে মনে হয় না, আপনি কোথা থেকে কবে এলেন?"

উমা আর একটি মোড়া আনিয়া তাহার বাবাকে বসিতে দিয়া কহিল, "বাবা শোননি তুমি ইনি যে আজ কয়েক দিন হ'ল আমাদের গ্রামের জন্য নানা ভাল কাজ ক'রবার জন্য এসেছেন। শোননি কবিরাজ ম'শায়ের কাছে?"

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "শুনবার মন কি আছেরে উমা, আমি পাষাণ হয়ে গেছি।"

উমা কহিল, "বাবা, কেন তুমি ওসব কথা মনে করে দুঃখ করছো। দুঃখটা যে সারাজীবন আমাকেই বইতে হইবে! তুমি ত' তোমার দুঃখ সওয়ার দিন প্রায় শেষ করে এনেছ। ভুল করেছি, দোষ করেছি সে ত' আমিই করেছিলাম, সে বেদনা আমি বহন করবো—যতই গভীর হ'ক না কেন? দেখুন সুব্রতবাবু, আপনি আমার কথা ত' সবই শুনেছেন। তাই আমাকে নির্লজ্জার মত কথা তুলতে হল, বাবা কিছু বোঝেন না।"

সুব্রত গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি সবই শুনেছি। আপনি এখন গ্রামে কি করবেন ভেবেছেন?"

উমা বলিল, "দেখুন, আমি লেখাপড়া ত' তেমন শিখিনি, তবে আমার এক পিসীমা ছিলেন এ গ্রামে চরকা কাটতে আর তাঁত কাটতে অদ্বিতীয়া—তার কাছে চরকা কাটতে আর তাঁত চালাতে শিখেছিলাম, তাই চালাই—দেখবেন। আমার তাঁত, আমার হাতের কাজ?"

সুব্রত উমার সহিত বাড়ীর ভিতরকার একখানি ঘরে প্রবেশ করিল—দেখিল তাঁতে দুইখানি কাপড় তখনও বোনা হইতেছে। একদিকে পাটকরা কয়েকখানি কাপড় ও তোয়ালে রহিয়াছে। বেশ নিপুণ হাতে তৈরী সব।

সুব্রত কহিল, "আপনি কি এসব বিক্রী করেন?"

উমা মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি ভিক্ষা করতে পারব না সুব্রতবাবু—ও গ্রামের বিনোদদা আমাকে সব সাজ-সরঞ্জাম, তুলো সব এনে দেন আর তৈরী জিনিষ বিক্রী করে দেন তাইতে চলে।"

সুব্রত বলিল, "আপনার যদি অসুবিধা না হয় তা হলে আমি আপনার কাছ থেকে কয়েক জোড়া সাড়ী আমার বোনদের জন্য কিনে নিতাম।"

"দাম অনেক পড়বে যে!"

সুব্রত কহিল, "কোন ক্ষতি নেই। ক'লকাতা গিয়ে বলতে পারবো গ্রামের মেয়েরা কত কাজ করে, নিজের হাতে তারা সাড়ী তৈরী করে পরে, আর তোমরা শুধু পড়া পড়া পড়া নিয়েই আছ।"

উমা কহিল, "সে হবে এখন। যাবার আগে ব'লবেন, বাবা দিয়ে আসবেন।"

উমার বাবা কহিলেন, "কি বলবো সুব্রতবাবু, মেয়েটার অনেক গুণ ছিল কিন্তু এমনি ওর বরাত।"

উমা কহিল, "বাবা ওকথাটি বলো না। মানুষ আঘাত পেলেই তার শক্তির আরাধনা করে। ব্যথা পেলেই ব্যথা সইতে পারে। দেখুন, পুরুষ আপনারা, আপনারাও যেমন মানুষ—আমরাও কি তেমন মানুষ নই? আপনারা পুরুষ

যেমন দেশের লোক, সমাজের লোক, আমরাও তেমনই কি দেশের লোক ও সমাজের লোক নই ?"

সুব্রত কহিল, "কে একথা অস্বীকার করতে পারে বলুন ?"

"তবে হাঁ, আপনারা সমাজ গড়েছেন, নিয়মের সৃষ্টি করেছেন, নানা বাধা বিঘ্নের বেড়া দিয়ে আমাদের পিঞ্জরার পাখী করে রেখেছেন। তাই সব অপমানই সইতে হবে তার কোনও প্রতিকার নেই। চিরদিন কি পারবেন আমাদের আটকে রাখতে ? পারবেন আমাদের বরাবর চোখ রাঙিয়ে শাসন করে উৎপীড়িত করতে ?"

সুব্রত গম্ভীর ভাবে এই স্বল্প শিক্ষিতা তরুণীর কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখুন একথার প্রতিবাদ আমি করব না। আমি স্বীকার করি আপনাদের বন্দী করে রাখতে পারব না,—কিন্তু সমাজ শাসন ও পুরাতন বিধি মেনে যারা সমাজ চালনা কর্চ্ছেন তাদের মধ্যে কয়জনের সাহস আছে পুরুষত্ব রয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের মত ? যেখানে বন্ধন, যেখানে শিক্ষা নেই, সাহস নেই, সেখানে কোথা থেকে মুক্তি আসবে ?"

উমা ধীর ভাবে কহিল, "আমি সাধারণ অভিজ্ঞতা হ'তে বলছি—এই অর্থ সমস্যার দিনে মেয়েদের নিশ্চেষ্ট করে ঘরে বসিয়ে রাখলে কি করে চলবে ? আপনারা আমাদের সংসার যাত্রার সহযোগিতা করতে আসেন কোথায় ? আমরা যদিই বা আসি তবে আপনারা শতমুখে নিন্দা করেন, বিচার-সভা বসিয়ে মাথায় পরিয়ে দেন কলঙ্কের মলিন মুকুটখানি। আর নিন্দা করে বেড়ান—শতমুখে। আমি যে লাঞ্ছনা সয়েছি—যে অপমান আমাকে সইতে হল, তার প্রতিকার করতে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধ, কিন্তু কোথায় অগ্রসর হল তরুণের দল ? আচ্ছা বলুন ত, আমি যদি আপনাকেই অনুরোধ করি আমাকে ক'লকাতা নিয়ে গিয়ে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে, পারবেন আপনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ? আছে সে সাহস আপনার ?"

সুব্রত দেখিল, উমা দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে ভাবিতে লাগিল—কি উত্তর দিবে।

উমা মৃদু হাস্য করিয়া নিজেই কহিল, "বিষম সমস্যা না! লোকনিন্দা, দুর্নাম—এই ত' ভয়।

সুব্রত অস্বীকার করিতে পারিল না, কহিল, "দেখুন, এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা আমি ভাবিনি। হয় ত' আমার পক্ষে কোন বাধার কারণ না থাকলেও আপনাদের গ্রামের দিক থেকেও ত' একটা আঘাত আসবে—তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কি আমার মত একজন বিদেশীর পক্ষে সম্ভব !"

"অসম্ভবই বা কি ! আমি বয়সে অল্প হলেও এ কয় বছরে বাঙ্গালা দেশের পুরুষদের চিনে ফেলেছি—যাক্ সে কথা, আমার কথা বলে আপনাকে বিব্রত করব না। আমি আপনার পথ গড়ে নিব, ভয় আমি করব না। মানুষের মত মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা যায়, যে দেশের পুরুষই পুরুষ নয়, মেয়েরাও ভীরু দুর্ব্বল আঘাত সইতেই পারে, দিতে পারে না, তাদের কাছে কেন মাথা নোয়াব—কথখনো না।"

সুব্রত কহিল, "আপনি যে অভিযোগটা আমায় কল্লেন, তার উত্তরে আমারও কিছু বলবার আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা কোথায় ? এইত সবে মাত্র ছাত্র জীবন পার হয়ে এসেছি। ক'লকাতার বাইরে যে জগৎ আছে তার সঙ্গে কোন পরিচয়ই আমার ছিল না। আর সমাজের এই সব জটিল সমস্যা সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি তা শুধু উপন্যাস পড়ে আর বক্তৃতা শুনে। তারপরে এটাও ভেবে দেখবেন—আমাদের পুরুষদের জীবনের যে কর্ত্তব্য তা হচ্ছে পরিবারের বাইরে। সেখানে তাদের জীবনের সম্পর্ক আমাদের দেশে শুধু মনিব ম'শাইয়ের রক্ত চক্ষুর শাসনের কাছে। এজন্য আমরা অতি সতর্কভাবে কর্ত্তব্য পালন করি তাই আমাদের অনেকের দায়িত্ব বোধটা বাহিরের কর্ম্ম-জগৎ নিয়ে। আর আপনাদের নারীদের কাজ ঘরের কোণে সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তাঁদের কাজের সন্ধান রাখে না। কাজেই আপনারা বাড়ীতে যে ভালবাসার একটি সুন্দর আবেষ্টনী গড়ে তোলেন তা শুধু প্রিয়জনদের নিয়েই কি নয় ? কিন্তু এমন দিন এসেছে যেমন সব দেশের নারীর মত আমাদের দেশের নারীদেরও ঘর ও বাইর দু'দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সংসারে পরিবর্ত্তন চলবেই। পুরাতনকে চিরন্তনী করে কে রাখতে পারে বলুন ? সে চেষ্টা ব্যর্থ হবেই, তবে এ পরিবর্ত্তন আমাদের মত দেশে যারা পুরাতনকেই শক্ত করে ধরে রাখতে চায় সেখানে সহজে আসবে না !—তবে আসবেই !"

উমা ধীর ভাবে সব কথা শুনিয়া কহিল, "আপনি এখানে কেন এসেছেন জান্‌তে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই পারেন। আমি এসেছি নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা দানের জন্য। যে কৃষকেরা মাঠের ধূলা-কাদা মেখে জলে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের অন্ন যোগাচ্ছে, যাদের মাথায় দুঃখ দারিদ্রের বোঝা পাষাণ স্তূপের মত চেপে বসে আছে, তাদের লেখা পড়ার ভিতর দিয়ে নিজের অধিকার বুঝতে দিতে চাই, আর বুঝতে দিতে চাই তাদেরও কৃষক সমাজ বলে একটা সমাজ আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেবতাকে কৃষকের বেশে শ্রমিকের বেশে আবির্ভূত হতে দেখেই কি বলেন নাই—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে করছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে॥"

উমার বাবা বলিল, "অতি সুন্দর—চমৎকার কথা বাবা !"

উমা কহিল, "সবই সুন্দর, কিন্তু সুব্রতবাবু আপনি ধূলা-মাটি ক'দিন হাতে মাখতে পারবেন ?"

"একা কি তা সম্ভব ?"

"দশজন কোথায় পাবেন ?"

"গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কর্ম্মপ্রেরণা জাগিয়ে দিন, তারা কাজ করবেন ?"

"ক'জন গ্রামে থাকেন ? আর যারা থাকেন তাঁরা কি তাশ পাশার আড্ডা ছেড়ে আসবেন এসব কাজে ?"

"তবে আমি আর কি করতে পারি বলুন ত' ?"

উমা বলিল, "সে ভাবনা আমার নয়। যে কাজের ভার নিয়ে আপনি গ্রামে এসেছেন, সে কাজ আপনিই সম্পন্ন করবেন।"

উমা বলিল, "শুনুন একটি ছোট কথা। আমি খুব পরিশ্রম ও যত্ন করে তাঁত চালাতে, শাল বুনতে, তোয়ালে, গেঞ্জি এসব তৈরী করতে শিখেছি এবং সে করেই জীবন চালাচ্ছি। আমি একবার আমাদের সব সমবয়সী মেয়েদের ও অন্য সব মেয়েদের বল্লাম—আয় না ভাই, আমরা সকলে মিলে তাঁত চালাই, তা হলে আমাদের নিজেদের অভাবও মিটাতে পারবো। প্রথমটায় বেশ উৎসাহ দেখা গেল। তারপর কি হল জানেন, বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখুন ভাঙ্গা চরকা পড়ে আছে। কাজ করবার লোক নেই। সবাই বলে উঠলেন, গ্রামের লোকেরা বললেন—ওহে গ্রামের নাম বদলে নাম কর তাঁতিপাড়া। এই ত' আমাদের উৎসাহ।"

সুব্রত একে একে উমার সব কাজ-কর্ম্ম, নিষ্ঠা গৃহস্থালী সম্পর্কে তাহার নিপুণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল—প্রত্যেকটি কাজেই তার নিষ্ঠা। প্রত্যেক দিকেই তাহার অপূর্ব্ব নৈপুণ্য আর পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। একপাশে কয়েকটি কার্পাসের গাছ। এইরূপ একটি কর্ম্মনিপুণা তরুণীর প্রতি সমাজের অবিচার তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনার সঞ্চার করিল।

উমা বলিল, "অনেক বেলা হয়ে গেল। আর ত' আপনাকে ধরে রাখতে পারি না। যে ক'দিন এ গ্রামে থাকেন, আমাদের এদিকে বেড়াতে এলে সুখী হব। জানেন আমি বাড়ীর বাইরে কোথাও যাই না—সকলেরই আমি একটা বিদ্রুপের লক্ষ্য হয়ে পড়েছি !"

সুব্রত ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া চলিল শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে। খানিক দূর যাইতেই তথায় সঙ্গী আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "আপনি উমার ওখানে কেন গেলেন বলুত ত' ? ওদের যে সমাজ চ্যুত করা হয়েছে।"

সুব্রত রাগিয়া কহিল, "উমাকে সমাজচ্যুত করে আপনারা সমাজে রইলেন কি করে ? আপনারাই এজন্য অপরাধী ?"

"আমরা ! কি বলেন আপনি ! সমাজে বাস করতে হলে কি তার নিয়ম মেনে চলতে হবে না ?"

"নিশ্চয় মান্‌তে হবে। কিন্তু আপনারাই বলেছেন এর বিবাহ হয়েছিল, দশজনের কাছে-ই যে একে ত্যাগ করেছে তাদের সমাজচ্যুত করেন না কেন ? না তারা বড় লোক। অর্থ আছে এই ত' !"

সঙ্গী যুবকটি কহিল, "এই মেয়েই সে ছেলেকে প্রলুব্ধ করেছিল !"

"ছেলেও তাকে প্রলুব্ধ করেছিল, এও কি সত্য নয়।

দেখুন আপনি একজন শিক্ষিত যুবক—আপনারা কোথায় এই অসহায়া মেয়েটিকে তার এই বিপদে সাহায্য করবেন তা না করে তার বাড়ী যেতে পর্য্যন্ত সাহস পান না, সকলের ভয়ে! এই ত আপনারা সাহসী! দেখুন আমরা এমন অপদার্থ যে স্ত্রীলোকের বিষয় নিয়ে বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই পরম উৎসাহী হয়ে উঠি—নিজেদের দিকে একবার ভুলেও তাকাই না!”

সঙ্গী যুবকটির নাম জিতেন্দ্র। জিতেন্দ্র বি-এ পাশ করিয়া আজ পাঁচ বৎসর বাড়ী বসিয়া আছে। গ্রামের বাহিরে যাইতে সে অনিচ্ছুক।

জিতেন কহিল, “আপনি যে কাজের জন্য এসেছেন, সে কাজে গ্রামের লোকের সহানুভূতি পাবেন না যদি এমনি ভাবে আপনি চলেন।”

সুব্রত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, “চাই না অমন সহানুভূতি! দেখবো কি করিতে পারি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে।”

জিতেন্দ্র কোন কথা বলিল না। সে নীরবে পথ দেখাইয়া সুব্রতকে শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুব্রতের মনে নানা প্রকার গ্রাম্য সমস্যার কথা আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিজেদের ভিতর কি শক্তি আছে, সেই শক্তিকে কি ভাবে তারা নিয়োজিত করিতে পারে, এ সমস্যার মীমাংসা সে কেমন করিয়া করিবে? কি সে জানে? জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার মত মহৎ প্রচেষ্টা, সে কি দুই একদিনের কাজ? দেশের কল্যাণের জন্য যাহারা দেশহিতৈষণার বক্তৃতা করিয়া বেড়ান তাহাদের দেখা ত' গ্রামে মিলে না। কে জাগাইবে এই সব অশিক্ষিত নর নারীর মধ্যে কর্ম্ম প্রেরণা, কে ইহাদের মধ্যেই আপনার স্থান করিয়া কাজ করিবে, বিলাইয়া দিবে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে। তাহা না হইলে এই কৃষকদের, এই শ্রমজীবীদের উদ্বুদ্ধ করিবে কে? শিক্ষা প্রচার, পরহিত ব্রত সাধন, কুটির শিল্পের দিকে মন দিবে কে? যাহাদের লইয়া দেশ সেই জনসাধারণ যদি নিজেদের কর্ম্মভার নিজেরা গ্রহণ না করে তবে দূর হইতে আসিয়া তাহাদের এই অভিযান কতটুকু সফল হইবে? এই গ্রামবাসীদের দুঃখদৈন্যের সহিত, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সকল কার্য্যের মূল অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র গড়িয়া কাজ না করিলে গ্রামের লোকেরা কি করিয়া পথের সন্ধান পাইবে।

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর সুব্রত যখন আত্ম নিবিষ্ট ভাবে গ্রাম্য সমস্যার সমাধানের নানাদিক আলোচনা করিতেছিল এমন সময় ভীষণ চীৎকার ও হৈ-চৈ শব্দে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল গ্রামের ভদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর পঞ্চাশজন লোক শরীরে নানা আঘাতের চিহ্ন লইয়া আসিয়া হল্লা সুরু করিয়া দিয়াছে।

নির্ভীক ও অচঞ্চল ভাবে কবিরাজ মহাশয় তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই পক্ষের লোকই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “চাটুয্যে মহাশয় কি হয়েছে?”

চাটুয্যে মহাশয়ের নাম মোহন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, “দেখুন ত' কি অন্যায়, আমার বাড়ীর সামনা দিয়া হবে কি না বোর্ডের রাস্তা—সরকারী রাস্তা। মেয়ে-ছেলেদের ইজ্জত মারবার ব্যবস্থা।

শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয় ধীরভাবে কহিলেন, “সে ত' সাধারণ রাস্তা। আপনি সে রাস্তা মেরামত করতে বাধা দিতে পারেন না।”

“কি পারি না? দেখুন পেরেছি কি না। আমার বাড়ীর কাছ দিয়া হবে রাস্তা! আমি দোব না—কিছুতেই দোব না! বেটাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।”

অপর পক্ষ হইতে একটী যুবক কহিল, “দেখুন ত' কি অন্যায়! উনি নিজে সেবার গ্রাম্যসভায় বললেন—দেশের ভাল কাজে কেন বাধা দিব! আর আজ কি না এই বিভ্রাট বাধালেন।”

দুই পক্ষে আবার তীব্র বচসা আরম্ভ হইল।

[ক্রমশঃ

বাউল গানের দার্শনিক তত্ত্ব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

গ্রামই হইল বাঙ্গালার প্রাণ-নিকেতন। বাঙ্গালার প্রাণ-কেন্দ্রের পরিচয় পাইতে হইলে বাঙ্গালার গ্রামের পরিচয় লইতে হইবে। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালার গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতেই হইতেছে বাঙ্গালার ভাব-মূর্ত্তি। লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের ভিতরই বাঙ্গালার সত্যকার পরিচয় মিলে। বাঙ্গালার গ্রামের গীতি-কাব্য, বাউল, মুর্শিদা, দেহতত্ত্ব, রূপকথা, রাখালী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোক-গীতিগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্ব ভূমির সত্যকার সংস্কৃতি ও ছন্দের রূপ অন্তর্নিহিত আছে। এই লোক-সঙ্গীতগুলি প্রাচীনকাল হইতে গ্রামে গ্রামে এত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে যে, আজও গ্রামের শিল্পী, কৃষক, গায়ক এইগুলিকে ভুলিতে পারে নাই, প্রাণ দিয়া এ গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত লোক-সঙ্গীতের ভিতর গ্রামবাসী নরনারীদের প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত সঙ্গীতের ভিতর গ্রামবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, প্রেম-বিরহ, সফলতা-বিফলতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণী আজও এ গুলিকে আশানুরূপ সমাদর করেন নাই।

প্রাচীনকালে পলিপার্ব্বন, হলকর্ষণ, শস্যোৎসব উপলক্ষে এই লোক-সঙ্গীতগুলির চর্চ্চা হইত হইত। বৎসরের বিভিন্ন ঋতু লোক-সঙ্গীতের ধারায় সর্ব্বদা মুখরিত হইয়া থাকিত। এই লোক-সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালার প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অপরূপ নিদর্শন ও স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ সাগর।

বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত শ্রেণীর বাউল গানগুলি খুব মূল্যবান। এই বাউল গানগুলি কৃষক ও শিল্পী কুলের সহজাত আনন্দ-প্রসরণ। এই বাউল গান গুলির ভিতর অপরূপ ভাবুকতা, অপূর্ব্ব কল্পনা ও দার্শনিক তত্ত্বের রসপ্রবণতা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। এই বাউল গানগুলির ভিতর অপরিসীম সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার বাউল, দরবেশ, মুর্শিদ শ্রেণীর লোক একান্ত গীত-রসিক। বাউল গানগুলি ভাবের আগুণে পরিপূর্ণ। বাউল গান গুলির ভিতর মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য ধারা বিবৃত হইয়াছে। বাউলদের ধর্ম্মবোধ দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্মস্থল হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বাউল গানগুলি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের ভাণ্ডার হইলেও, এইগুলি গ্রাম্য জনসাধারণের ভাষায় রচিত। বাউলরা গ্রামের পথে পথে গ্রাম্য ভাষায় দার্শনিক তত্ত্বের গানগুলি গাহিয়া থাকে। বাউল গানগুলির ভিতর দিয়া দার্শনিক তত্ত্ব কিরূপে প্রচারিত হইয়াছে, কয়টি বাউল গান উদ্ধৃত করিয়া এখনে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আর কত দিন রইব গো দয়াল
পাগলা ফাটকে।
তুমি যেমন আমি তেমন দয়াল
বাঁধা আছি প্রেম-শিকলে॥
ছয় জন চোরা চুরি করে
গেছে তারা এ দেশ ছেড়ে।
আমি একা পইলাম ধরা
দয়াল বাঁধা আছি প্রেম শিকলে॥

(রাজসাহী জেলার দেহতত্ত্বের গান)

এই গানটিতে বাউল কবি বলিতেছেন যে, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুকে জয় করিতে পারিলে আত্ম-সংযম হয় এবং গুরু প্রেম লাভ হয়।

সাবধান মাঝি এই সংসার পারাবারে।
ভারি বাণ ডেকেছে সাগরে॥
তোমার দফা হৈল রফা
পড়ে গেল ফাফরে॥
খাটবে না জারি জুরি তাই ভেবে মরি
কত বড় বড় মাঝি হাল ছেড়ে ঘুরে মরে॥
একে ত বৃদ্ধ পুরাণ তরী।
তাতে হাল ভাঙ্গা তোমার ছয় গুরার দাঁড়ি॥
জারি কৈ রে পাড়ি মেরে
ডুবে যায় এই নৌকাটা।
এই নৌকায় নাই খুঁটা তাতে যোগ আছে নয়টা
ও যে বিষম লেঠা॥
তরী তরঙ্গেতে টলমল করে
আতঙ্কে পরাণ যায় উড়ে।

গুরু নামের জোরে যাব পারে
জয় কৈরে ঐ যমে রে ॥

বাউল কবি এখানে বলিতেছেন যে, গুরুর উপর অপরিসীম ভক্তি না থাকিলে সংসারে সিদ্ধি লাভ কঠিন। মানুষের ভিতর যে সব রিপু আছে, সেগুলিকে সংযত করিতে না পারিলে গুরুভক্তি একাগ্র হয় না।

জীবন নিয়া জুড়াব রে মন
এল কাল রজনী।
উজান বইলে যাও বইয়া
ভবের ঘাটে ভর পানি ॥
নদীর নাহিক পারাবার
তায় জানিস্ না সাঁতার।
হয় না যেন ভরা ডুবি
সাবধানে ফেল দাঁড় ॥
শুধু গুরুর নামে বয়ে যাও তনু-তরণী।
গুরু বলে যদি পারে যাবি
সার কর চরণ দুখানি ॥

বাউল কবি এখানে গাহিয়াছেন যে, গুরুর অনুগ্রহেই সংসারে যাবতীয় দুঃখ, জ্বালা, আপদ, বিপদ, অতিক্রম করা যায়। আত্মসংযমেই সংসারের বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ভক্তের প্রেমে ওগো বাঁধা আছে সাঁই।
হিন্দু কি মুসলমান বল্যা
তোর জাতের বিচার নাই।
ভক্ত ছিল কবীর জোলা
ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা।
ও তোর সাধন জোরে পায় ॥
দেশে রামদাস মুচি ছিল।
সাধনে তায় মুক্তি সাদ্ধি হৈল ॥
ও আমি শুনি গুরুর ঠাঁই।
(সাঁই গান)

এখানে বাউল-কবি বলিতেছেন যে, গুরুভক্তি যিনি লাভ করেন, তাঁহার নিকট ভেদাভেদ বিচার নাই।

ও মন ভোলা,
তুমি কর্‌ত্যাছ কিসের খেলা।
তুমি আখের আখ্যা দিন গণিও রে
দিন গণ্যা তোর ডুব্‌ল বেলা ॥
আখেরে কি জব দিবি
ও পাগল মন বল একেলা ॥
চন্দ্রের সাথে যোগ দিয়া
তুই কর্‌্যা নিলি ভবের খেলা ॥
তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হৈল
আখের বেলা ডুব্যা গেল।
পিঞ্জিরারে ফাঁকি দিয়া
রয়লা তুমি আখের ভুলি।
তোর পাখী যখন উড়্যা যাবে
তখন পড়্যা রবে সাধের খাঁচা।
ও মন ভোলা,
তুমি কর্‌ত্যাছ কিসের খেলা ॥
(ফরিদপুর জেলার মুর্শিদা গান)

এখানে বাউল কবি গাহিয়াছেন যে, গুরু ভক্তিতেই সত্যকার জ্ঞান মিলে। সব কিছু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—তারপর যাহা সত্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

গুরু বৈলে ডাক রে।
জনম সফল কৈরে রাখ রে ॥
কর্ম্মফলে যাহা হৈবে
মিছে কেন মর ভেবে।
মনের আনন্দে গুরু বৈলে স্বচ্ছন্দ থাক্‌বে ॥
মুখে ডাক গুরু বলি কর্ণে শুন গুরুর গুণাবলী
গুরুভক্তের পদধূলি ও মন অঙ্গেতে মাথ রে।
দিন গেল রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে
উপায় দেখ দিন থাক্‌তে থাক্‌তে
গুরু বৈলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে প্রাণ যদি যায় তবে যাক্ রে ॥
(ভাবের গান)

বাউল কবি এখানে প্রচার করিতেছেন যে, জীবন পথ হইল প্রেমের পথ, পরমার্থের পথ। গুরু-প্রেম লাভ হইলেই সুস্থ হওয়া যায় এবং তাহাতেই অসীম আনন্দ লাভ করা যায়।

তোর দেহে আছে প্রবল অসুরের দল
কামাদি ছয় জন।
তাতে করে বসি দিবানিশি
শ্রবণাদি সুবর্ষণ ॥
শুধু সুধা লভ্য নয় এতে উঠে রত্ন নিচয়।
ভক্তি মুক্তি শঙ্খ শুক্তি ঊর্দ্ধগামী হয় ॥
যার কিরণ স্নিগ্ধকর জীবের জুড়ায় কলেবর।
সাধনে ক্ষীর সমুদ্র মিল্‌বে সাধুসঙ্গ সুধাকর ॥
সুধা দিবে বাঁটিয়ে বঞ্চিয়া অসুরে।
সেই গুরুভক্তি মহামনী মোহিনী হৈয়ে ॥

দুষ্ট কাম বাহুকে বিবেক চক্রে করিবে ছেদন।
উঠিবে নির্ব্বাণকারী ধন্বন্তরী প্রেমসুধা করে ধারণ॥
(ভাবের গান)

বাউল কবি এখানে বলিতেছেন যে, কাম হইতে চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইবে, তবেই পরম প্রেম স্বরূপ গুরুর অখিল রসামৃত মূর্ত্তি মানুষের কাছে প্রকট হইয়া পড়িবে।

বাউলদের দার্শনিক তত্ত্ব সুউচ্চ। বাউল সর্ব্বপ্রথমে আপন দেহ সম্বন্ধে জানিতে চান। বাউল জানেন, মানবীয় দেহই বাস্তবতঃ অখিল বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ, এ দেহের ভিতরই স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য রহিয়াছে এমন কি, এই দেহের ভিতর স্বয়ং গুরুর সত্তা বর্ত্তমান। বাউলমতে গুরুই আধ্যাত্মিক গুপ্ত বিজ্ঞানের আধার। বাউলের মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে, গুরুকে ভজনা করা এবং গুরুর নিকট পরম তত্ত্ব অর্জ্জন করিয়া আত্মাকে ক্রমান্তরে ঊর্দ্ধগামী করিয়া চরম মুক্তি ও নির্ব্বাণ লাভ করা। বাউল মতে গুরুর শক্তি অসীম। গুরু মানুষকে সিদ্ধি ও মুক্তি দিতে পারেন। আর্থিক জগতে গুরুই হইতেছেন ধর্ম্ম ও মোক্ষের পথপ্রদর্শক।

বাউল গুরু এই সব সঙ্গীতের সাধনায় তন্ময় হইয়া যান। বাউল একতারা বা আনন্দ লহরীর তানে স্বর মিলাইয়া পারমার্থিক গানগুলি ভাবের আবেশে গাহিতে থাকেন। তাঁহার সেবাদাসী আনন্দ লহরীর তালে তালে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তখন বাউল নৃত্যে অধ্যাত্ম-সাধনা রূপায়িত হইয়া উঠে। বাউল মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতে গাহিতে গুরুর সত্তা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন।

এককালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বাউল গান আলোচনা করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা অর্জ্জন করিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের অনাদর ও অবহেলায় এইগুলির বিলয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সঙ্গীত আলোচনায় নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের দিক দিয়া অথবা সরলতা ও পবিত্রতার আদর্শ শিক্ষার্জ্জনের দিক দিয়া বাউল গান সংরক্ষণের একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে সমস্ত জিনিষের ভিতরই ওলট-পালট হওয়া সম্ভব। এই প্রকার আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে বাউল ধর্ম্ম ও বাউল সঙ্গীতের ভিতরও অনেক স্থলে বিকৃতি আসিতে পারে। তাই বলিয়া আমরা ইহাকে ঘৃণা করিতে পারি না। ইহার মধ্যে যেটুকু সার বস্তু পাওয়া যায়, তাহা আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি। বাউলের কাছে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, পণ্ডিত, মূর্খ, উন্নত, অবনত, উচ্চ, নীচ, প্রভৃতি ভেদাভেদ কোনও প্রকার সংকীর্ণতার স্থান নাই। বাউলের মতে পার্থিব জগতে এই ধরণের ভেদাভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসার।

আশুতোষ তর্পণ

শ্রীকালিদাস রায়

প্রীতি-লোক ত্যজি মহামানবের স্মৃতি-লোকে তুমি আজ।
যেখানেই থাক জন-হৃদয়ের তুমি রাজ অধিরাজ॥
বৎসরান্তে তব নাম স্মরি
রিক্ত জীবন লই মোরা ভরি,
দিনেকেরো তরে ভুলি সব জ্বালা সব ক্ষয় ক্ষতি লাজ।

যত দিন যায় তোমার মহিমা ভাল ক'রে মোরা বুঝি।
তোমার কথাই ভাবে দেশ যত ফুরায় তাহার পুঁজি।
জাতীয় জীবনে ঘনায় আঁধার,
সে জাতির দশা দেখ একবার,
যে জাতির শিরে পরায়ে গিয়েছ তুমি গৌরব-তাজ॥

তুমি চ'লে গেছ শুনি নাই আর কেশরীর গর্জ্জন,
দিবা বিভাবরী শিবা কোলাহল অশিবেরই লক্ষণ।
শঙ্কিত চিতে তোমারেই স্মরি,
ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে দেশ ভরি,
মনে হয় শুধু অসময়ে গেলে না ফুরাতে তব কাজ॥

একটি মন্দির

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

(অনুবাদ গল্প)

('একটি মন্দির' ইটালীয়ান্ লেখক লুগি পিরন্দেলোর একটি গল্পের অনুবাদ। বিশ্ব-সাহিত্যে পিরন্দেলোর স্থান নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। ইনি ১৯৩৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, এবং তারপর থেকেই এঁর খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিসিলিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠার বছর বয়সের সময় রোমে চলে আসেন। এর ঠিক এক বছর পরেই তিনি জার্ম্মানীতে যান এবং 'বোন' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য ও দর্শনে ডিগ্রী লাভ করে সসম্মানে আবার রোমে ফিরে আসেন।

পিরন্দেলো নিজের সম্বন্ধে কখনও কোথাও কিছু বলেন নি—কাজেই তাঁর জীবনেতিহাসের বিস্তৃত কাহিনী সংগ্রহ করাও সম্ভবপর নয়। একখানি পত্রে তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর প্রথম লেখা জন-সমাজে অনাদৃত হয়েছিল। এমন কি, কেউ তা ছেপে প্রকাশ করতেও রাজী হন নি। কিন্তু প্রতিভা নিজেকে বিকীর্ণ করেই, পিরন্দেলোর খ্যাতি চাপা গেল না। ইনি কিছু কবিতা, সাতটি উপন্যাস, প্রচুর ছোট গল্প এবং আঠাশটি নাটক রচনা করেছেন।

এখানে তাঁর The wayside shrine গল্পটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল। গল্পটি শেখভ মোঁপাসার নীতিতে রচিত হলেও নূতন কলাচাতুর্য্যে এবং অভিনব পদ্ধতিতে গ্রথিত। জায়গায় জায়গায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও আছে গল্পটিতে)

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্প্যাটোলিনোর ঘুম আসছিল না। পত্নী ঘুমিয়ে পড়েছে, পাশের ছোট্ট বিছানায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টী অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু স্প্যাটোলিনোর চোখে ঘুম নেই, তার কেমন অস্বস্তি বোধ হ'ল। প্রাত্যহিক প্রার্থনার জন্য সে অধীর হয়ে উঠল ; অন্ধকার ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের আরাধনা সুরু করে দিলে,—তার মানসিক শান্তি চাই। একটু পরেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত শিস্ দিতে লাগলো সে—ফিফি, ফিফি। যখনই মন তার খারাপ হয়ে উঠতো, কেমন এক ধরণের বিষণ্ণ আর ভারাক্রান্ত হতো, দারুণ দুশ্চিন্তায় কেমন যেন ম্লান আর ম্রিয়মান্ হয়ে উঠতো তার চেতনা, তখনই দাঁতের ফাক দিয়ে ঠিক এমনই করে শিস্ দিত সে—ফি-ফি, ফি-ফি।

পত্নীর ঘুম ভেঙে গেল। সে বললে—কি হয়েছে বলো ত'? এমন করছ কেন?

কিছু না, যাও। ঘুমোয় গে। স্প্যাটোলিনো জবাব দেয়।

এবার স্প্যাটোলিনো ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ঘুম এল না—সে যেন ঘুমোতে ভুলেই গেছে। কাজেই শিস্ দিতে হয়—ফি-ফি, ফি-ফি।

পত্নী এবার ঈষৎ ক্রুদ্ধা হয়ে উঠলো—তুমি কি ছেলে-মেয়েগুলোকেও তুলতে চাও নাকি?

স্প্যাটোলিনো সচকিত হয়ে জবাব দিলে—সত্যিই ত! আমার খেয়াল ছিল না। আচ্ছা এবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ঘুমের।

শেষ চেষ্টাতেও তার চোখে ঘুম এল না। আশ্চর্য্য, এতটুকু তন্দ্রার ভাব পর্য্যন্ত দেখা গেল না। মনের মধ্যে দুর্ভাবনার খোঁচা এসে বিঁধছে খচ্ খচ্ করে—তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, তাই চোখে ঘুম নেই। তাকে সে বার বার ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু পারলে না। ঝিঁঝিঁ পোকার মতো মনের মধ্যে সেই দুশ্চিন্তার বেসুরটা ধ্বনিত হয়ে অনুরণিত হতে লাগলো। সে নিদ্রাহীন চোখ দু'টো ওপরে তুলে শিস্ দিলে—ফি-ফি, ফি-ফি।

এবার পত্নী কিছু বলবার আগেই স্প্যাটোলিনো ঘর ছেড়ে বেরোবার জন্যে তৈরী হল। ঘুম তার হবে না, অথচ শিস্ দিয়ে ছেলেদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে তাদের কষ্ট দেওয়ার কোন মানে হয় না।

পত্নী নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি, উঠে পড়লে যে? যাচ্ছো কোথায় এত রাত্রে?

গম্ভীর এবং সংহত উত্তর হলো : বাইরে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যাচ্ছি। রাস্তার ধারে রোয়াকে বসিগে একবার।

পত্নী ক্লিষ্ট হল কি রুষ্ট হল বোঝা গেল না, সে আগ্রহের

সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে তোমার? খুলে বলো ত' সব। আমার কাছে গোপন করো না কিছু।

স্প্যাটোলিনো অনেক চেষ্টা করে গলার স্বর নামিয়ে বললে, সেই যে বদমায়েস রাস্কেল, আমাদের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের শত্রু—.

পত্নী অধীর হয়ে উঠলো—কে? কার কথা বলছ তুমি?

—সায়েঙ্কারেলা।

পত্নী জিজ্ঞাসা করলো, উকীল সায়েঙ্কারেলা?

স্প্যাটোলিনো কিঞ্চিৎ উগ্র হলো, হাঁ, সেই ব্যাটার কথাই বলছি। সে আমাকে কাল ভোরেই তার বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছে।

পত্নী বললে, বেশ ত, কি হয়েছে তাতে?

স্প্যাটোলিনো দাঁত কড়মড় করে উঠলো রাগে,—কি হয়েছে নয়। তার মত বদমায়েসের কি এমন দরকার থাকতে পারে আমার সঙ্গে, আমার মতো সামান্য একজন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে? পাজী বদমায়েস কোথাকার! কি দরকার তার আমাকে ডাকবার? কেন সে ডাকল আমাকে। পাজী, ছুঁচো, বদমায়েস।

দরজা খুলে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে এল স্প্যাটোলিনো। ঘর থেকে একটা নড়বড়ে চেয়ার বের করে দরজা ভেজিয়ে দিলে সে, রোয়াকের একধারে সরু গলিটা যেখান দিয়ে বেঁকে চলে গেছে স্বল্প দূরে, সেখানে চেয়ার পেতে বসে পড়লো দেওয়ালের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে।

কাছেই একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছিল মিটমিট করে; তারই হলদে রশ্মি এসে পাশের একটা জলাশয়ের ওপর পড়েছে তির্য্যকভাবে; মনে হচ্ছে আলোটা যেন গলে গিয়ে সমস্ত জলে মিশে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আস্তাবল থেকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো। একটা বিড়াল বাইরের পাঁচীলের ওপর এসে বার দুয়েক স্প্যাটোলিনোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ফিরে গেল বিফল হয়ে। স্প্যাটোলিনোর কিন্তু সেদিকে নজর নেই—দুচারটে রূপালি তারা ঝিকমিক করছে সেখানটায়। দু'একবার গোঁফেও হাত দিচ্ছে সে, মাথার চুলগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তার সমস্ত মুখাবয়বের ওপর দৌর্ব্বল্যের একটা কালো ছায়া পড়েছে। ছোট্ট বেঁটে চেহারা তার, ছেলে বয়স থেকে সারাজীবন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে এসেছে সে; মাথায় করে চুণ সুরকির গোলা বয়েছে অক্লান্তভাবে। কিন্তু তবুও তার মুখের ওপর সাধারণ ভদ্রতার যে ছাপটা আজও মুছে যায় নি, তা কোনদিন ম্লান হয় নি; কিন্তু আজ সেই দীপ্তিটুকু অপগত হয়েছে তার মুখ থেকে।

হঠাৎ তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। অস্বস্তিভরে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে সেই অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে অস্ফুট কাতরতায় প্রার্থনা করলে; ঈশ্বর, আমাকে বাঁচিয়ে দাও, আমার সহায় হও, রক্ষা কর আমাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

টাউন কাউন্সিলে আগে যে দল ছিল তাদের এখন সেখান থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে নূতন দল এনে বসানো হয়েছে। স্প্যাটোলিনোর তাই বড় মুস্কিল হয়েছে, এই নূতন দলের মধ্যে সে নিজেকে মিশ খাইয়ে নিতে পারে নি; কেবলি মনে হচ্ছে যেন সে শত্রুর মধ্যে বাস করছে। অন্যান্য সব কারিকরেরা ভেড়ার মত একে একে এই নূতন দলের প্রভুত্ব মেনে নিলে, কিন্তু স্প্যাটোলিনো তা পারলে না। সে আর তারই কয়েকজন সহকর্ম্মী শুধু বিশ্বাস করে রইলো চার্চ্চের ওপর। কেউ এতে টিট্‌কিরি দিলে, কেউ করলে কটাক্ষ, শত্রুরা আর বন্ধুদের কয়েকজনও এর মধ্যে ছিল। স্প্যাটোলিনোর ক্ষোভ হ'ল, জীবনে যা সে সত্য বলে জেনেছে, তার অনুসরণ করায় পাপ নেই; এর জন্যে বিদ্রূপ জুটবে কেন ভাগ্যে? নূতন দল তাকে কোনও কাজে ডাকে না, সত্যের পথ অনুসরণ করছে বলেই তার অদৃষ্টে এত দুর্দ্দশা নেমেছে কি? তার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠলো। আগাগোড়া সব কথা ভেবে তার মাথাও গরম হয়ে উঠলো।

আগেকার দল যে সব উৎসব আয়োজন করত, সে সবদিনের মূল্য নূতন দলের কাছে কিছু রইলো না, কিন্তু স্প্যাটোলিনো সেই পুরণো ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইলো। নিজের যৎসামান্য অর্থে সে সেইকটা দিন একটু বিশেষভাবে পালন করতো।

পেছনে নানা কটু কথা যে না বলতো তার প্রতি, এমন নয়। কিন্তু স্প্যাটোলিনো সেদিকে কান দিত না; নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ভাসিয়ে দেওয়ার কোন অর্থই হয় না অন্যের কথায়। দিনমজুর সে, তার পক্ষে তার সঞ্চয় শেষ করে নিঃস্ব হতে বেশীদিন লাগলো না, দিন দিন স্প্যাটোলিনো দরিদ্র হয়ে উঠলো।

স্প্যাটোলিনোর পত্নী স্বামীর এই আচরণ দেখে নিজে উপার্জ্জনের পথে এগিয়ে এসেছিল। লণ্ড্রী খুলে, সেলাইয়ের দোকান করে দু'চার পয়সা বাড়তি উপার্জ্জন করে থাকে।

স্প্যাটোলিনোর এতে বেদনা বোধ থাকলেও সে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। তার স্ত্রী কি মনে করে যে সে নিজের খেয়ালে চুপ করে বসে থাকে নাকি বাড়ীতে কাজকর্ম্মের চেষ্টা না করেই? কিন্তু কি করতে পারে সে? নিজের মনের শুভ্রতাকে নষ্ট করে, বিশ্বাসকে ধ্বংস করে, ঈশ্বরকে অস্বীকার করে সে ও' নূতন দলে যোগ দিতে পারে না, এই কাজ করার চেয়ে সে বরং তার হাত দু'খানা কেটে ফেলবে, তবুও সে এমন অশুচি কাজ করতে পারবে না।

উকীল সায়েঙ্কারেলা যদিও কখনও কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় নি, তবু ধর্ম্মের প্রতি তার একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। সে উচ্চকণ্ঠে বিরুদ্ধবাদিতা ঘোষণা করে বেড়াতো। ওকালতি ছেড়ে দেবার পর থেকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভদ্র উক্তি করে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার ল্যাগেপা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি কুকুর পর্য্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছে। ল্যাগেপার দোষ কিছু ছিল না, তিনি সায়েঙ্কারেলার আশ্রয়ে সায়েঙ্কারেলারই দুঃস্থ আত্মীয়দের সেবা করতে গিয়েছিলেন। আত্মীয়েরা অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে আসছিল, আর সায়েঙ্কারেলা তখন সহরের উপকণ্ঠে রাজোচিত প্রাসাদে জীবনের সব সুখ, সকল স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছিল।

গরমকাল ছিল বলে, সারারাত বাইরে বসে থাকা সত্ত্বেও স্প্যাটোলিনোর ঠাণ্ডা লাগলো না। সরু নির্জ্জন গলিটার দিকে চোখ মেলে সে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ, কিছু সময় নিজের মনের খেয়ালমত চিন্তার তরঙ্গে ভেসে বেড়িয়েছিল, কিন্তু শিস্ দিতে দিতে সে সব সময়ই সায়েঙ্কারেলার এই অদ্ভুত আমন্ত্রণের কথা ভেবেছে।

উকীল তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে, একথা স্প্যাটোলিনো জানতো; তাই যখনই সে তার স্ত্রীকে উঠতে দেখলো, তখনই গৃহকর্ম্মে মন দেবে সে, কাজেই আর দেরী করা যায় না। স্প্যাটোলিনো উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারখানা রাস্তার ধাপে সেই রোয়াকের ওপর রেখেই সে রাস্তায় নেমে এল। ওটা ডাণ্ডা পুরানো প্রাগৈতিহাসিক যুগের চেয়ার বল্লেই হয় কাজেই চুরি হয়ে যাবার ভয় নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সায়েঙ্কারেলার প্রাসাদ চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীন যুগের দুর্গ গুলোর চারপাশে যেমন দেওয়াল তুলে রাখা হতো দূর থেকে এবাড়ীটাকেও তেমনি মনে হয়। সদর দরজায় একটি লোহার ফটক—সেই ফটকের ভেতর দিয়ে কিছুদূর গেলেই বাড়ীর মালিককে দেখা যাবে—জামা-জুতো পরে ফিটফাট হয়ে বসে আছে। গলার কাছে অসম্ভব অতিরিক্ত মাংস জমা হয়ে স্তূপের সৃষ্টি করেছে এবং এই মাংসস্তূপের মধ্যে সব সময় তার মাথাটিকে এক দিকে হেলিয়ে রাখতে হতো। মাথাটি নেড়া।

এই বৃদ্ধ উকিলটি এতবড় প্রাসাদে একেবারে একা বাস করে থাকে। একটি মাত্র চাকর ছাড়া এখানে তার আর কোন সঙ্গী ছিল না। কিন্তু আশেপাশে তার মুখাপেক্ষী অনেকেই রয়েছে পড়ে—সামান্য আহ্বানে যারা এখানে এসে অজস্র মুখরতায় চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। আর এই বাড়ীটায় ছিল দু'টো কুকুর—নূতন কোনো আগন্তুক এলেই দৌড়ে এসে আগন্তুককে বিপন্ন করে তুলতো।

স্প্যাটোলিনো কলিং বেল টিপতেই কুকুর দু'টো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। কি বিশ্রী ডাক ওদের। সায়েঙ্কারেলার চাকরটি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এল। সায়েঙ্কারেলা প্রাতরাশে বসেছিল, সেও শিস্ দিয়ে কুকুর দু'টীকে থামবার ইসারা করলে, এবং আগন্তুকের দিকে চেয়ে উচ্ছসিত ভাবে বল্লেন—আরে স্প্যাটোলিনো যে, এসো এসো। বসো এখানটায়।

সায়েঙ্কারেলা একটা বেঞ্চির দিকে আঙ্গুল দেখালে বটে কিন্তু স্প্যাটোলিনো দাঁড়িয়েই রইলো। হাতের টুপিটা নিয়ে সে নাড়াচাড়া সুরু করলে।

সায়েঙ্কারেলা বল্লেন—তুমি দেশের একটি অপদার্থ সন্তান।

স্প্যাটোলিনো মৃদুভাবে জবাব দিলেন উকীলের কথার কোনো প্রতিবাদ না করেই—হ্যাঁ স্যর, আমি ম্যাডোনা ম্যাডেলারোটার অপদার্থ পুত্রদের মধ্যে একজন। এবং এই হতে পারার জন্যে কম গর্ব্বও নয় আমার। কিন্তু স্যর, আপনি কি জন্যে ডেকেছেন জানতে পারি কি?

সায়েঙ্কারেলা চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতেই কথাটা বল্লে—এমন কিছু দরকারে নয়, একটি মন্দির তৈরী করবার জন্যে।

মন্দির তৈরী করবার জন্যে? আপনি একি বলছেন? স্প্যাটোলিনো যথেষ্ট আশ্চর্য্য হলো।

সায়েঙ্কারেলা সুর পরিবর্ত্তন না করেই বল্লেন—আমার জন্যে আমি একটা মন্দির করাতে চাই।

স্প্যাটোলিনোর বিস্ময়ের সীমা রইলো না—মন্দির? সায়েঙ্কারেলা তার জন্যে একটা মন্দির করতে চায়? ব্যাপার কী?

সায়েঙ্কারেলা চা-পান শেষ করে টেবিলের ওপর বাটী রাখতে রাখতে বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গেই বল্লেন—হ্যাঁ, আমারই জন্যে। আর মন্দিরটা হবে ঠিক আমারই সদর দরজার সামনে—বড় রাস্তার পাশেই; আর এই প্রাসাদের দিকেই মুখ থাকবে তার। খুব ছোট হবে না মন্দিরটা, কেননা আমি এর মধ্যে যীশুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করবো—দেওয়ালে টাঙাবো ছবি। কাজেই বেশ চওড়া আর বেশ লম্বা হওয়া চাই, বুঝতে পারছ? চারদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা যাবে, চূড়ায় একটা ক্রসও দিতে হবে—বুঝলে?

স্প্যাটোলিনো চোখ বুজে সব শুনলে, মাথা নেড়ে জানলো যে সে বুঝেছে। একটু পরেই গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আপনি বিদ্রূপ করছেন নিশ্চয়ই!

বিদ্রূপ? কি বলছ তুমি?—সায়েঙ্কারেলা বল্লেন।

স্প্যাটোলিনো অত্যন্ত বিনীত স্বরে বল্লে—আপনি যদি ক্ষমা করেন, তবে বলবো ঠাট্টা করছেন আপনি। আপনার মত লোক মন্দির নির্ম্মাণের কথা বলছেন—এ যেন স্বপ্ন তাও; তাও আবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে।

সায়েঙ্কারেলা নেড়া মাথাটি তোলবার চেষ্টা করলো, সে উচ্চকণ্ঠে এমন ভাবে হেসে উঠলো, যেন মনে হল সে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। হাসির পরে বললে—কী বলছ হে স্প্যাটোলিনো? আমি কি এতই অপদার্থ যে একটি মন্দির নির্ম্মাণও করতে পারবো না?

স্প্যাটোলিনো ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিল। সায়েঙ্কারেলার এমন ভক্ত উক্তিতে সে একেবারে খাপ্পা হয়ে গেল—না, আপনি তা পারেন না। কি যুক্তি আছে এর পেছনে—আপনার এই মন্দির নির্ম্মাণ করবার পরিকল্পনার? আমি এমন সরল কথা বলছি বলে ক্ষমা করবেন আমাকে। জানতে পারি কি আপনি সেখানে কাকে স্থাপিত করতে চান? আপনি ঈশ্বরকে এনে বসাতে পারবেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার মত ভণ্ডলোকের স্তোক প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন না। আপনি কি লোকদের ঠকাতে চান? কিন্তু লোকেরও চোখ ফুটেছে আজকাল, তারাও সব জিনিষ তলিয়ে দেখতে পারে।

বৃদ্ধ উকীলের কিছুটা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়ে বল্লেন—নির্ব্বোধের মত কথা বলো না। ঈশ্বরের কি তথ্য জানো তোমরা, মূর্খ স্তাবকের দল! তোমাদের পুরোহিতরা যা বলেছে সেই ত' তোমাদের সম্বল। আমি তোমার সঙ্গে এ-নিয়ে তর্ক করতে রাজী নই।—হ্যাঁ, তুমি চা-পান শেষ করে এসেছ কি?

স্প্যাটোলিনো রূঢ়স্বরেই জবাব দিলে—না, ধন্যবাদ। ওর আর প্রয়োজন হবে না। চা আমি খাই না।

সায়েঙ্কারেলা কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বলতে লাগলো—তোমার মাথা খেয়েছে ঐ পুরোহিতের দল। আমি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি, এ-কথা তারাই রটাচ্ছে; তোমাকেও বলেছে। কিন্তু কেন বলেছে তা জানো? আমি তাদের অর্থ সাহায্য করি না বলে। সে কথা যাক; আমার এই মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে আমি যে উৎসব করবো, সেই উৎসবে ওদের সে আক্ষেপ আমি মিটিয়ে দেব। স্প্যাটোলিনো, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রইলে কেন বলো ত'। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না বোধ হয়? আমার মাথায় এ খেয়াল কেন এল জান? আচ্ছা, বলছি শোনো। সে-দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম—অনেক সাধু সন্ন্যাসী

আমাকে বলছেন—ওরে ঈশ্বর তোর আত্মাকে স্পর্শ করেছেন, তুই মুক্তি লাভ করবি। তাই আমার এ প্রয়াস। তোমার আমার মধ্যেই এ কথা রইল। কেমন?···চুপ করে রইলে যে—জবাব দাও। পেঁচার মত নীরবে অমন করে তাকিয়ে থেকো না।

স্প্যাটোলিনো ছোট করে মাথা নেড়ে বল্‌লে—বেশ।

সায়েঙ্কারেলা হেসে উঠলো উচ্চৈঃস্বরে। হাসি থামলে বল্‌লে—বেশ, বেশ। আমার সঙ্গে কাজ কর্ম্মের নিয়ম ত' তুমি জানই—নূতন করে বলবার কিছু নেই। তুমি কারিকর হিসেবে ভালোই—রাজমিস্ত্রীর সমাজে তোমার খ্যাতি প্রচুর। কাজেই তোমার ওপর একাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আর তোমার অর্থ থেকে তুমি এটা দিয়ে দিবে; কাজ শেষ হলে আমি একেবারে সবটাকা শোধ করে দেব—বিল পাওয়া মাত্রই। কবে থেকে কাজ আরম্ভ করবে, মনে করছ?

স্প্যাটোলিনো বল্‌লে—দেখি, কাল থেকেও করতে পারি।

সায়েঙ্কারেলা জানতে চাইলে কাজটা শেষ হবে কবে।

পূর্ব্বের মতই নির্লিপ্তভাবে স্প্যাটোলিনো জানালে—আপনি যে-রকম মাপ জোপ দিলেন—তাতে ত' মনে হচ্ছে এক মাসের আগে তৈরী করে উঠতে পারা যাবে না।

বেশ—এখন চলো, জায়গাটা ঠিক করে ফেলা যাক্—বলে স্প্যাটোলিনোকে নিয়ে সায়েঙ্কারেলা বাইরে বেরিয়ে এল।

বাড়ীর সামনে যে বিস্তৃত অকর্ষিত জমি পড়ে রয়েছে—সায়েঙ্কারেলারই। সে সেখানে চাষাদের গরু ছাগল চরাবার আদেশ দিয়েছিল, এখন সেখানে মন্দির তুলতে কারুর অনুমতির অপেক্ষা করতে হবে না। স্প্যাটোলিনো এবং সায়েঙ্কারেলা দুজনে মিলেই একটি স্থান নির্ব্বাচিত করে ফেললো। তার পরেই সায়েঙ্কারেলা নিজের বাসার দিক ফিরে গেল, আর স্প্যাটোলিনো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

স্প্যাটোলিনোর অন্তরটা জোরে জোরে জ্বলতে লাগল। অধীর হয়ে সে ফি-ফি, ফি-ফি করে শিস্ দিতে লাগলে। এখন সোজা বাড়ী গিয়ে লাভ নেই, এর চেয়ে অন্য একটা জরুরী কাজ সেরে ফেলতে হবে। সে চললো সেই সন্ন্যাসী ল্যাগেপার আস্তানায়। ল্যাগেপার ঘুম ভাঙতে দেরী হয় বেশ; এখন গেলে দেখা নাও হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি, সে সন্ন্যাসীর বাড়ীর দিকেই জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধু ল্যাগেপা সে দিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; প্রাতঃকালীন পোষাকপরে তিনি একটি বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিলেন; তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, আর অন্য পাশে ছিল দাসী। তারা দু'জনেই তাঁর আদেশের জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

ছেলেবয়সে বসন্ত হয়েছিল একবার, আজও সাধুর চেহারায় সে চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে, মুখখানাকে কুশ্রী করে তুলেছিল। চোখ দু'টি উজ্জ্বল কিন্তু ট্যারা। তিনি চীৎকার করে বললেন—স্প্যাটোলিনো, ওরা আমার সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে। এই ত' সেদিন আমার অনুগত একজন লোক এসে বললে যে আমার সম্পত্তি না কি এখন থেকে জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেল। সমাজ সাম্যবাদীরা যা করেছে—এরা তাই করতে চায়। আমার কাঁচা আঙ্গুরই তারা তুলে নিয়ে নষ্ট করছে, গাছ-গাছরা যা ভালো আছে তা মাড়িয়ে ধ্বংস করে যাচ্ছে। ওরা বলে বেড়ায়, যা তোমার, তা আমারও। আমি এই বন্দুকটা আমার সেই অনুগত সেবকটিকে পাঠাচ্ছি—তাদের পা লক্ষ্য করে গুলি করবার আদেশও দিয়েছি। তাদের সায়েস্তা করতে এই দরকার। হ্যাঁ, স্প্যাটোলিনো, তুমি কি বলতে এসেছ এখানে?

স্প্যাটোলিনো যে কাহিনী বলবার জন্যে ছুটে এসেছিল, তা সুষ্ঠুভাবে বলবার আগেই সায়েঙ্কারেলার নাম শোনবামাত্রই ল্যাগেপা অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি সায়েঙ্কারেলার উদ্দেশ্যে গালাগালি করতে লাগলেন।

স্প্যাটোলিনো বললে, তিনি একটি মন্দির করাতে চান।

মন্দির?—ল্যাগেপা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হবে অবশ্য। আমি নির্ম্মাণ কাজের জন্যে আহুত ও নির্ব্বাচিত হয়েছি।

আপনার কাছে এসেছি পরামর্শ নিতে আমি এ কাজে হাত দেব কি না, স্প্যাটোলিনা বললে।

ল্যাগেপা বললেন, এর জন্যে আমার কাছে ছুটে আসবার কোন মানে হয় না। তুমি তাকে কি বলেছ?

স্প্যাটোলিনো সব ব্যক্ত করে গেল। স্বপ্ন দেখার কাহিনীটিও বাদ দিলে না।

ল্যাগেপা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, স্বপ্ন দেখছে? পাজী বদমায়েস কোথাকার! স্বপ্ন দেখেছে! ঈশ্বর যদি স্বপ্ন দিতেন তবে প্রথমেই তিনি ওর দুঃস্থ আত্মীয়দের সাহায্য করতে বলতেন। তুমি ত' জানো ওরা কত দরিদ্র! আর ব্যাটা উকীল কিনা মন্টোরোর জ্ঞাতিদের সাহায্য করে, যারা পুরোপুরি নাস্তিক এবং সমাজতন্ত্রবাদী, আর এদেরই উইল করে দিয়ে যাবে ও, এও ত' শুনতে পাই। যাক সে কথা। কিন্তু তোমাকে আমি কি বিধান দিতে পারি ব'লে? তুমি তৈরী করতে পার ত' মন্দির। যদি তুমি না করো মিস্ত্রীর অভাব হবে না দেশে, শুধু লোকসান হবে তোমারই। কিন্তু সব সময় মনে রেখো সে শয়তান, সে রাস্কেল, ছুঁচো। তার মধ্যে এক ফোঁটাও সততা নেই।

স্প্যাটোলিনো বাড়ী গেল। সারাদিন মন্দিরের নক্সা করে প্রাথমিক কাজ শেষ করতে করতেই কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় সে দু'জনকে ঠিক করে এল; চুণ সুরকির ব্যবস্থা করলে এবং একটি ছেলেকেও সহকারী হিসেবে সে সংগ্রহ করে আনলে।

পরদিন সকালেই সে কাজ সুরু করে দিলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পথচারীরা স্প্যাটোলিনোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করতে লাগল: কি তৈরী করছ তুমি?

উত্তর হলো—মন্দির।

আবার প্রশ্ন: মন্দির? মন্দির করতে বললে এখানে কার আদেশে?

স্প্যাটোলিনো আকাশের দিকে হাত তুলত; ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলতো, ঈশ্বর।

তা এখানে করছ কেন হে? আর কি জায়গা পেলে না?

কারুর মনে এল না যে উকীলের আদেশেই এখানে মন্দির নির্ম্মিত হচ্ছে। আসলে জমিটা যে সায়েঙ্কারেলার এ কথাটাও কেউ জানত না। স্প্যাটোলিনো ধার্ম্মিক লোক, কিছু টাকা কড়ি সংগ্রহ করে ওই বুড়ো সুদখোর উকীলটার চোখে আঙুল দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখাবার জন্যেই এখানে মন্দির নির্ম্মিত হচ্ছে, একথাই তারা ধারণা করে নিলে। চমৎকার রাজ এটা, এ ছাড়া তাদের মাথায় আর কিছু এল না।

স্প্যাটোলিনোর মনে হল—এই নির্ম্মাণ কাজের ওপর ঈশ্বর বিশেষ খুসী হন নি। একটার পর একটা দুর্য্যোগ তার কপালে এসে জুটেছে; কিছুদূর ভিৎ খোঁড়বার পর দেখা গেল তলায় পাথরের স্তর। সে বিপদ যা হোক করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই কিছু নূতন বিপদ এল—মন্দিরের ইঁট খুলে যেতে লাগল। কিন্তু সে বিপদও কাটিয়ে উঠলে স্প্যাটোলিনো। তারপর, একদিন সেই সহকারী ছেলেটি অকস্মাৎ উঁচু থেকে পড়ে গেল, কিন্তু দারুণ ক্ষতির ষোল আনা সম্ভাবনা বজায় থাকা সত্ত্বেও যেন কোন যাদু মন্ত্রে সে যাত্রায় সে বিপদ অপগত হল। এবং শেষ দিন যে দিন স্প্যাটোলিনো মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করে সায়েঙ্কারেলাকে দেখাবে বলে তার কাছে গেল, সে দিন এক অভাবনীয় বিপদ ঘটলো, এবং এই বিপদ সে কাটাতেও পারলে না। সন্ন্যাসরোগে সায়েঙ্কারেলা মারা গেল; নিজের পরিকল্পনানুযায়ী নির্ম্মিত মন্দির দেখা দূরে থাক, স্প্যাটোলিনোর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনও কথা পর্য্যন্ত হল না।

স্প্যাটোলিনো বুঝতে পারল—এ ভগবানের কাজ। সায়েঙ্কারেলাকে এমন সাজা দিয়েছেন তিনিই। প্রথমে সে বিশ্বাস করতেই পারে নি—ঈশ্বরও এমন হীন লোকদের বিপক্ষে ক্রোধ পোষণ করেন। এরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে তার এ ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে রইল। সে মন্টোরোর জ্ঞাতিদের কাছে গেল। তারাই এখন সায়েঙ্কারেলের উত্তরাধিকারী। মন্দিরের জন্যে যা খরচ হয়েছে—স্প্যাটোলিনো তাই চাইলে। কিন্তু তারা উগ্রভাবে স্প্যাটোলিনোর দাবী অস্বীকার করলে, তারা বললে—ঈশ্বরই তোমাকে আদেশ দিয়েছে মন্দির নির্ম্মাণের, যাও এখন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'র না।

স্প্যাটোলিনো কাঁদো কাঁদো হয়ে তার কাহিনী ব্যক্ত

করে গেল। কিন্তু কেউ তা শুনল, কেউ বা তা শুনলেও না। আর যারা শুনল তারা বিশ্বাসও করল না।

স্প্যাটোলিনো বললে—ব'লতে চান কি আমিই আমার নিজের টাকাতে এ মন্দির নির্ম্মাণ করতে প্রয়াস পেয়েছি ?

তারা বললে, নিশ্চয়ই। যদি আমরা ভাবি যে আমাদের কাকা এমন আদেশ তোমায় দিয়েছেন তবে তাঁর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে। তিনি যে জীবনযাপন করে গেছেন, তাতে কোন পাগলও বলতে পারবে না যে তিনি তোমাকে মন্দির করবার জন্যে মাথার দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করেছেন। যাও এখানে গণ্ডগোল কর না। তোমার ওই পচা মন্দির নিয়েই থাক গে। কোর্ট খোলা আছে, সেখানে যাও।

কোর্ট ? বেশ কথা! স্প্যাটোলিনো তাদের বিপক্ষে মোকদ্দমা রুজু করলে। সে ত' হারাতেই পারে না। বিচার-পতি কি সত্যই বিশ্বাস করবেন না ঘটনাটা ? আর স্প্যাটোলিনো এমন দরিদ্র, তার পক্ষে এরূপ সুন্দর মন্দির গঠন করার হাস্যাস্পদ কথা মনেও উঠবে না বিচারকের। তা'ছাড়া, তার সাক্ষীর অভাব নেই। সাংস্কারেলার চাকর আছে, সাধু ল্যাগেপা আছেন, কুলি দু'জনকে দাঁড় করানো হবে কোর্টে, আর সেই ছেলে সহকারীটি রয়েছে। তা ছাড়া স্প্যাটোলিনোর পত্নীর সাক্ষ্য খুব জোরা'লো হবে। স্প্যাটোলিনো তার কাছে সমস্ত তথ্যই ব্যক্ত করেছে আগাগোড়া। সুতরাং মোকদ্দমায় সে হারতে পারে না।

কিন্তু সে হেরে গেল। তার আবেদন একেবারেই নামঞ্জুর করা হল। সাংস্কারেলার চাকরটি মণ্টেরোর জ্ঞাতিবর্গের কাছে কাজ পেয়ে সে তাদের দিকেই সাক্ষ্য দিলে, আর অন্য সকলের সাক্ষ্য ব্যর্থ হল। লেখাপড়া কিছু নেই, কাজেই মামলা ফেঁসে গেল।

স্প্যাটোলিনোর শুধু পাগল হওয়াই বাকী ছিল। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাচ্ছে বলে তার মনে হল। তার যা কিছু স্বল্প সঞ্চয় ছিল, তা নিঃশেষ করে সে ওই মন্দির গড়েছিল, আজ সে একবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল। তার ওপর মোকদ্দমার খরচ, কোন কুল কিনারা দেখতে পেল না সে। স্প্যাটোলিনো একেবারে মুষড়ে পড়ার মতই চুপ করে বসে রইল, আর চীৎকার করে উঠলো—ঈশ্বর কি সত্যিই নেই ? একি হতে পারে যে স্বর্গেও ঈশ্বর নেই, চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি ?

ল্যাগেপার পরামর্শে আপীল করা হল, কিন্তু কিছুই সুফল ঘটলো না। এখানেও তার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। স্প্যাটোলিনো এই কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো—একেবারে পাথরের খোদাই করা মূর্ত্তির মতো। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—তার শেষ সম্বল কয়েকটি মুদ্রা যা ছিল, তাই নিয়ে। বাজার থেকে সে কিনে আনলে দেড়গজ লাল সালু, আর তিনটে পুরাণো চটের বস্তা।

বস্তা তিনটে পত্নীর কোলে ফেলে দিয়ে বললে—এ দিয়ে একটা বেশ বড়সড় পোষাক করে দাও।

পত্নী লজ্জায় চোখে তাকালো স্বামীর প্রতি—কি বলছে সে ?

স্প্যাটোলিনো উগ্রস্বরে বললে—বলছি না, আমার মাপের একটা ভালো পোষাক তৈরী করো। ও, পারবে না ...বেশ আমি নিজেই তা করতে পারবো। বস্তাগুলো কেটে সেলাই করে সে সেগুলোকে পরিধানযোগ্য করে তুললো। গায়ে দেবার মত সার্ট একটি আর একটি পাজামার মত করলে। তারপর লাল সালু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দু'য়েক পরে খবর পাওয়া গেল—স্প্যাটোলিনো পাগল হয়ে গেছে—খবরটা সমস্ত সহরেই ছড়িয়ে পড়লো। সাংস্কারেলার বাড়ীর সামনের মন্দিরের মধ্যে গিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছে, নিজে যীশু খ্রীষ্টের ভঙ্গী নকল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকে বিস্মিত হয়ে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলো।

যীশু-মূর্ত্তির মত ভঙ্গী করে—কি বলছ হে ?

হ্যাঁ, মন্দিরের ভেতরে সে যীশুর ভঙ্গিমা নিয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—তাও কি সম্ভব ? না, না—তুমি ভুল বলছ।

ভুল আমি বলি না, বিশ্বাস না হয়, এসো আমার সঙ্গে, দেখে যাও।

লোকেরা পঙ্গপালের মত সেখানে জড়ো হতে লাগলো।

খবরটা সত্যি—স্প্যাটোলিনো রেলিং দিয়ে ঘেরা সেই মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে যীশু খ্রীষ্টের ভঙ্গীমা নকল করে। চটের সেই পোষাক পরা, আলখাল্লার মত হাল্কা করে সালুটা চাপানো হয়েছে কাঁধের ওপর। মাথায় কাঁটা দিয়ে তৈরী করা একটা মুকুট, আর হাতে রয়েছে একটা লাঠি।

স্প্যাটোলিনোর মাথা নত ছিল। চোখ দুটো নীচের দিকে করে নীরব হয়ে ছিল সে। এতবড় কৌতূহলী জনতার এত বিভিন্ন প্রশ্নে সে কাণ না দিয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকতে পেরেছে। ছোট ছোট ছেলেরা কমলা লেবুর খোসা ছুঁড়ে মেরেছে পর্য্যন্ত, অন্য অনেকেই খোলাখুলি ভাবে করেছে অপমান, কিন্তু প্রত্যুত্তর কিছু সে দেয় নি, প্রতিমূর্ত্তির মত সে মূক এবং নীরব ছিল। শুধু বারকয়েক চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে তাকিয়েছিল এদিকে ওদিকে।

তার স্ত্রী এলো—সঙ্গে ওই পাড়ার প্রতিবেশিনীরা এলেন। সে স্বামীকে অনুরোধ করলে এই হীন পাগলামি থেকে নিরস্ত হবার জন্যে; নানান লোকেরা এই যে অজস্র অভিশাপের বোঝা মাথায় না চাপালেই ত' হয়, জীবনপথে চলবার সময় যত পাপ এসে জড়ো হয়েছে তার চেয়ে স্বেচ্ছায় আরও পাপ সংগ্রহ করবার কোনো হেতু নেই। তার ছেলেরাও কেঁদে উঠলো—বাবা তাদের এ কেমন ধারা হয়ে গেল। কিন্তু এসব ব্যর্থ হল,- স্প্যাটোলিনো তার নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হবে না।

কিন্তু বিচ্যুতি তবু ঘটলো। অকারণ গোলমাল সৃষ্টি করার কথাটা পুলিশ শুনতে পেয়ে দৌড়ে এল এবং স্প্যাটোলিনোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললো।

স্প্যাটোলিনো ছাড়াবার হাজার চেষ্টা করে অপারগ হবার পর বললে—ছেড়ে দাও আমাকে, একা থাকতে দাও নির্জ্জন এই মন্দিরের মধ্যে। আমার চেয়ে খ্রীষ্টের অনুগত আর বেশী কে বলতে পারো, এমন কেউ আছে কি এখানে? দেখতে পাচ্ছো না লোকে কি করে অপমান করছে আমাকে, টিট্‌কারী দিচ্ছে, ঢিল মারছে ছুড়ে; ছেড়ে দাও আমাকে।

এ মন্দির আমার, আমিই তৈরী করেছি এটা, আমার অর্থ দিয়ে, আমার শ্রম দিয়ে, আমার রক্ত দিয়ে। আমাকে ছেড়ে দাও—পড়ে থাকতে দাও মন্দিরের একপ্রান্তে, এমন নিষ্ঠুর তোমরা হয়ো না।

কিন্তু পুলিশের লোকেরা নিষ্ঠুরই হলো—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা স্প্যাটোলিনোকে আটকে রাখবেই; এবং সন্ধ্যার পর সার্জ্জেণ্ট এসে বললেন—যাও, সোজা বাড়ী চলে যাও এখন, এবং যে পাগলামি তুমি করেছ, সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থেক—বুঝলে? সোজা বাড়ী যাও এখন।

স্প্যাটোলিনো পুলিশ সার্জ্জেণ্টের অনুজ্ঞায় সায় দিয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন।

কিন্তু বাড়ীতে সে গেল না, তার হাতে গড়া বুকের রক্ত নিঙড়ে তৈরী করা মন্দিরের পাশে এসে দাঁড়ালো। মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে তার। আবার ভেতরে গিয়ে খ্রীষ্টের মত পোষাক পরিধান করে সারা রাত সেখানে কাটিয়ে দিলে। এবার দৃঢ়তায় সে এমনি অটল যে হাজার অসুবিধা আর বিপদেও সে এতটুকু পর্য্যন্ত নড়লো না।

লোকে চেষ্টা করলো স্প্যাটোলিনোকে ওখান থেকে হটিয়ে দিতে নানা কটু কথা বলে, না খেতে দিয়ে অনাহারে রেখে অপমান করে; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল—এত তোড়জোড় সব গেল ভেস্তে। স্প্যাটোলিনো পর্ব্বতের মত নিশ্চল হয়ে রইল। অতঃপর তাদের রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—নির্জ্জন মন্দিরেই সে থাক। হতভাগ্য একটি পাগল! কারও ক্ষতি সে করেনি জীবনে, তবু পাগল হয়ে গেল কেমন যেন, জীবনে চরম অভিশাপ ত' এই! সত্যিই স্প্যাটোলিনো বেচারী! তার জন্যে মায়া হয়, বেদনা বোধ জাগে; কিন্তু ক'রবার কিছুই থাকে না।

অল্প পরে লোকে ছোটখাটো উপহার আনতে সুরু করলে তার জন্যে। কেউ দিয়ে গেল আহার্য্য আর পানীয়, কেউ বা ব্যবস্থা করলে বাতি দানের। অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হল যে, স্প্যাটোলিনো পাগল নয়, সে ধর্ম্মাবতার। মহাপ্রভুর আদেশ ও অনুকম্পা ওর প্রতি নিশ্চয়ই আছে। মেয়েরা যায় তার কাছে; নিজের, নিজেদের আত্মীয় পরিজনের মঙ্গল ভিক্ষা করে সেখানে, কাকুতি মিনতি করে স্বার্থসিদ্ধির আকুল প্রার্থনা জানায়।

একজন স্ত্রীলোক তার পোষাক এনে দিলে, চটের চেয়ে কিছু মোলায়েম এবং কোমল। আর বস্ত্রদানের প্রতিদানে সে ভিক্ষা করলো—লটারীর কোন্ কোন্ টিকিট কিনলে তার সুবিধে ঘটবে, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হবে, অদৃষ্ট ফিরবে!

গ্রাম্য মেয়েরা যত সরলই হোক, ঘুষ দেওয়ার গূঢ় অর্থ তাদের অজ্ঞাত নয়।

বড় রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া করে যে সকল লোক যাতায়াত করতো তাদেরও অনেকে নেমে এসে এই নূতন খ্রীষ্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলত দু'চারটে; তারপর চলে যেত যে যার নিজের কাজে। তখন এই নূতন খ্রীষ্টও ঘুমিয়ে পড়বার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠত।

রাত্রে একটি ঝিঁঝিঁ পোকা তারই বাতির মৃদু রশ্মিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার ওপর উড়ে পড়লো, আর সে চমকে উঠে বসল তৎক্ষণাৎ। সহসা তার আচ্ছন্ন চেতনাশক্তি যেন আলো দেখতে পেয়েছে, তার মুখ দেখে এই কথাই মনে হবে। সে তখন প্রার্থনা আরম্ভ করলে। যখন সে গভীর ভাবে প্রার্থনায় মগ্ন ও তন্ময় হয়ে গেছে, তখন আর একটা ঝিঁঝিপোকা, তার অন্তরের মধ্যেকার সুপ্ত ঝিঁঝি পোকাটা জেগে উঠলে, যে ঝিঁঝি পোকাটা আগেকার দিনে তার অন্তরে সচেতন হয়ে উঠতো মাঝে মাঝে, সেটা এখন সাড়া দিলে। স্প্যাটোলিনো মাথার ওপর থেকে কাঁটার সেই মুকুটটা সরিয়ে ফেললে—একদিনেই যেন কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তার মাথায় পরে থাকার; কিন্তু তবুও এখন সে অবিচলিত হাতে সরিয়ে ফেললে মুকুটটা। লোকে যেখানে চন্দন দিয়েছিল, কপালের সেখানটায়ও হাত দিয়ে ঘসে ফেললে সে। শুধু চোখ দুটো একবার দীপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই উদাস হয়ে পড়লো, একেবারে নিস্পৃহ আর নিরাসক্ত। সে তার হাতে গড়া মন্দিরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ওই উদাস বৈরাগী দৃষ্টি মেলে, আর ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে শিস্ বেজে উঠলো—ফি-ফি ফি-ফি।

তুমি ও আমি

কানাই বসু

আমি যেন নদী,
চলি নিরবধি তুমি-গিরিরাজ-চরণ ধুয়ে।
আমি ফুলদল,
তুমি চঞ্চল সমীরণ, বহ মোরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ভরা মেঘ তুমি বিপুল সুদূর,
কঠিনা ধরণী আমি তৃষাতুর,

তোমার বরষা
করিল সরসা ফুটাল কুসুম মোর মরুভুঁয়ে।

কোথা বেণু বনে
ছিনু অচেতনে, বাঁশী করে মোরে জীয়ালে নিশাসে।
মোর দেবালয়ে
রহ দেব হয়ে, চাঁদ হয়ে থেকো আমার আকাশে।

তুমি ছাড়া আমি নহি কিছু নহি,
তুমি আছ বলে আমি যেন রহি,

থাকৃ ব্যবধান,
তবু জানে প্রাণ শত মিলনেতে বাঁধা মোরা দু'য়ে।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

এক

বঙ্কিমের মত অগাধ দেশপ্রীতি অন্য কোন লেখকের দেখা যায় না। এই দেশ ভক্তি কোথা হইতে জন্মিল? ইহা কি মাতৃ ভাষার প্রতি অনুরাগ হইতে? ইহা কি ইউরোপীয় হিত-বাদী দার্শনিকদের গ্রন্থ হইতে সঞ্চারিত? ইহা কি দাসত্বের গ্লানি হইতে?* না, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতা হইতে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই-গুলি তাঁহার দেশভক্তির মূল নিদান নয়, এগুলি দেশভক্তির পরিপোষণে সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। দেশ-ভক্তি তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। তাঁহার চরিত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-বোধ বড়ই প্রখর ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিমান প্রবুদ্ধ হয়। অনেকের জীবনে একটা কোন বিশিষ্ট ঘটনা হইতে দেশানুরাগের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমের জীবনের সেরূপ কোন বিশিষ্ট ঘটনার কথা আমরা জানি না।

ইহা ছাড়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের একটা আদর্শ তাঁহার জীবনে ছিল। সমগ্র দেশে তাহার অভিব্যক্তি ও সেই আদর্শের অনুভূতি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মহামানব বা বিশ্ব তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা তিনি ভাবিতেন না; কারণ, তিনি বুঝিতেন, তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। নিজের শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট রূপ সচেতন ছিলেন। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত-বর্ষের সঙ্গে বঙ্গদেশের এমন কোন অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটে নাই— যে জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জাতীয় অভিমান অনুভব করিতে পারা যায়। "সপ্ত কোটি কণ্ঠে" বঙ্কিম দেশ-মাতার বন্দনা শুনিতে চাহিতেন।

বিশ্ব-রহস্য নয়, মানবজাতির সমস্যা নয়, ভারতের সমস্যা নয়—বাঙ্গালার সমস্যাই তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

---

* একবার তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "চাকরীই আমার জীবনে অভিশাপ।"

তিনি দেখিলেন—জাতীয় জীবনে, সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই সমস্যা—সর্ব্বক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রয়োজন। তাই তাঁহার দেশ-প্রীতি দেশীয় সমাজের সংস্কারের জন্য, স্বধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করিবার জন্য, রায়তদের কল্যাণ সাধন ও দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য, দেশে স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ চিন্তার প্রবোধনের জন্য, লোক-শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহাকে লেখনী-ধারণে প্রণোদিত করিয়াছে। তিনি এক হাতে কশা এক হাতে লেখনী লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। "ক্ষুত্রবিক্ষ্ণ নরাধমদের" শাসন করারও প্রয়োজন ছিল। নিজে তিনি প্রথম শ্রেণীর রসশিল্পী ছিলেন। তিনি দেশের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার শিল্পিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেশপ্রীতিকেই তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ধর্ম্মে পরিণত করেন।* বাঙ্গালা দেশের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তি ও অস্থিরতার অবধি ছিল না। এ যুগে দেশকে এই ভাবে ভালবাসা অসম্ভব নয়, কিন্তু যে যুগে বিদেশের অনুকৃতিই প্রধান ব্রত বলিয়া গণ্য হইত—সে যুগে এইরূপ দেশানুরাগ অন্যের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল।

বাঙ্গালাদেশকে তিনি এমনই ভালবাসিতেন যে, তাঁহার রচনায় বীরধর্ম্মের আদর্শ দেখাইবার জন্য তিনি (রাজসিংহ রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) রাজস্থানের ইতিহাসের দ্বারস্থ হন নাই, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত নিজস্ব বীরধর্ম্মকে তিনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার কল্পিত চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা ফুটাইয়া তোলেন। রাজস্থান হইতে চরিত্রভিক্ষা লইলে সাহিত্যের কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কেবল সাহিত্য রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি স্বকীয় দেশধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গালার নিজস্ব বীরধর্ম্মকে জাগাইবার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার। বাঙ্গালার ঐতিহাসিক বীরচরিত্র তাঁহার মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শের সহিত সমঞ্জস ছিল না—সে জন্য তিনি স্বকীয় আদর্শসম্মত কল্পিত চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজস্থানের রাজসিংহ চরিত্রটিকে আশ্রয় করেন।

Mill, Bentham, Comte ইত্যাদির গ্রন্থ হইতে তাঁহার সমাজকল্যাণ-ধর্ম্মে দীক্ষা। এই ধর্ম্মকে তিনি স্বদেশের সমাজে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি কেবল উপদেশ দেন নাই, দৃষ্টান্তেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদের বাণীর দ্বারা বিদেশীয় মতবাদকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া নব ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্মমত তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ওতপ্রোত। বঙ্কিম প্রত্যেক উপন্যাসে যে একটি করিয়া সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—ঐ ধর্ম্ম তাহাতেই পরিমূর্ত্ত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে দণ্ডাতীত নিষ্কাম মহাপুরুষগণ কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া লোকহিত সাধন করিতেছেন এবং তেজস্বী বীরহৃদয় বাঙ্গালী পুরুষ ও নারীকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষা দিতেছেন। ইঁহারা সাধনার এমন উচ্চ-স্তরে আরোহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগেরই কথা, কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্যই তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ।

বঙ্কিমের সময়ে সাহিত্যে দেশভক্তি-প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ও বক্তৃতাতেও দেশের প্রতি প্রীতি প্রচারিত হইত। বঙ্কিমের সময়ে কবিতায় ভারতমাতার অতীত গৌরবের কথা ও তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথার উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করা হইত। রাজস্থানের ইতিহাসের কথা টডের মারফতে বাঙ্গালীরা জানিতে পারিয়াছিল—রাজপুতদের বীরত্বের কথা বাংলা কাব্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল।

সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় তখন নীলকরদের অত্যাচারের কথা ও সরকারী কোন কোন আইন ও ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অবৈধতার কথা আলোচিত হইত।

দেশবাসী তখন ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে কিছুই বলিত না, বরং ইংরাজশাসনে দেশের লোক বেশ পরিতুষ্টই ছিল। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার আগে দেশে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, দস্যুতস্করের উপদ্রব, শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচার প্রভৃতি প্রচলিত ছিল—সে সমস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশ ইংরাজরাজের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিল। বাংলাকাব্যে কবিদের অশ্রুপাত অনেকটা মুসলমান শাসনের ভারতবর্ষের জন্য। নবাবী শাসনটা গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের স্মৃতি ত তখনও রহিয়াছে।

সে যুগের কবিদের এই যে ভারত-প্রীতি ইহা বিলাতী সাহিত্য হইতেই দেশে সংক্রামিত হইয়াছিল। সকল দেশেই

---

* "বঙ্গদর্শন" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, এখন লোক-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জাতীয় সঙ্গীত ও দেশপ্রীতিমূলক কবিতা আছে। এদেশেও সেজন্ত কবিরা ঐ শ্রেণীর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশকে তাঁহারা জানিতেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁহারা জানিতেন না, শুধু ভারতের জন্যই প্রথা মত অশ্রুপাত করিতেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি কতটা তাঁহার চরিত্রগত, কতটা বিদেশ হইতে সঞ্চারিত তাহা বলা যায় না। সরকারের দাসত্ব করিতে গিয়া তাঁহার জাতীয় অভিমান আঘাত পাইয়া ফণা তুলিয়া উঠিয়াছিল কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। মোটের উপর বঙ্কিমের দেশভক্তি ছিল অকপট ও আন্তরিক। মামুলি প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি সাহিত্যে দেশভক্তির প্রচার করেন নাই। ব্যক্তিগত তেজস্বিতা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জন্মগত আর্য্যজনোচিত আভিজাত্য-বোধ হইতেই বোধ হয় এই দেশভক্তির জন্ম।

তাঁহার দেশপ্রেম অকপট বলিয়াই তিনি গোটা ভারতবর্ষকে লইয়া টানাটানি করেন নাই—তিনি বাঙ্গালা দেশকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া বরণ করেন। ভারতমাতা বঙ্কিমের কাছে বঙ্গমাতায় পরিণত হইল—পরে এই মাতাই জগন্মাতার সহিত একাঙ্গীভূত হইল।

বঙ্কিমের দেশভক্তি শুধু অকপট নয়—সর্ব্বাঙ্গীণও বটে।

বঙ্গমাতা বলিতে তিনি বুঝিতেন, বাঙ্গালাদেশের মাটি, প্রকৃতি, মানুষ, ভাষা, ঐতিহ্য, অতীত গৌরব, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প,—সমস্তই। বাঙ্গালার মৃত্তিকা তাঁহার কাছে সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা। ইহার নদী বন, প্রান্তরের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত, বাঙ্গালার জলধারার কলধ্বনি তাঁহার রচনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। বাঙ্গালার দরিদ্রতম কৃষকটি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয় ছিল। বাঙ্গালীর কল্যাণ সাধনের উৎকণ্ঠায় তিনি প্রাণপণে লেখনী চালনা করিয়াছেন। জগতের হিতসাধনই পরমধর্ম্ম বলিয়া তিনি মনে করিতেন—তাঁহার জগৎ এই বঙ্গদেশ।

আজ বঙ্গভাষাকে ভালবাসিবার লোকের অভাব নাই। আজ সে নিতান্ত দীনহীনা নয়, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে আজ সে সমৃদ্ধা। বঙ্কিমের সময়ে এই ভাষা ছিল দরিদ্র, দুর্ব্বল, হেয়—সে ছিল সকলের অবজ্ঞেয়। বঙ্কিম তখনই তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। বাংলা অপেক্ষা ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশীই ছিল। তিনি বলিতেন,—বাংলা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা তাঁহার পক্ষে সহজ। ইংরাজীতে লিখিয়া দেশদেশান্তরের যশ লাভের লোভ সংবরণ করিয়া তিনি দীন বঙ্গভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। যে অবজ্ঞেয় ছিল—তাহাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া সকলের শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিলেন। যাহারা বঙ্গভাষাকে ঘৃণা করিত তাহাদিগকে তিনি "কৃতবিদ্য নরাধম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় যাহারা লিখিত, তাহাদের ভাষাকে 'মৃত সিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ' বলিতেন। তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া এই ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-ভাষায় সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের সুবিধা ছিল না, সেই ভাষার তিনি এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম বাংলাভাষায় সকলপ্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়। আর বুঝিয়াছিলাম—ভাষা ও সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া দিয়াছিল,—বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে।"

বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাধা দিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায়গণ ও মৌলবীগণ।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্যই ইংরাজী ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজন—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা।

বঙ্কিম বলিতেন,—যে দেশের অতীত গৌরব নাই সে-দেশ অধঃপতিত হইলে আর উঠিতে পারে না। এই অতীত গৌরবের কথা দেশের লোকের জানা চাই। বাঙ্গালার অতীত গৌরবের উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তাই তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি যে শৌর্য্যে অন্য কোন জাতি হইতে ন্যূন ছিল না, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি প্রবন্ধ ও উপন্যাস দুই-ই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল বাঙ্গালার অধঃপতনের মূলে বাঙ্গালার শৌর্য্যের অভাব নয়—বাঙ্গালীর অসংহতি, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশপ্রীতির অভাব। সতের জন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়কে তিনি একটা অলীক গল্প বলিয়া মনে করিতেন এবং পলাশীর যুদ্ধকে তিনি একটা অভিনয় মাত্র মনে করিতেন। তিনি শৌর্য্যের আদর্শ দেখাইবার জন্য রাজপুতানার ইতিহাস হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন

বটে, কিন্তু বাঙ্গালার নিজস্ব শৌর্য্য উপাদানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অধিকতর। এজন্য তিনি সীতারামকে আবিষ্কার করিয়াছেন, মীরকাশিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, প্রতাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্তানসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালীর লাঠিয়াল সম্প্রদায়কে দেবী-চৌধুরাণীতে স্থান দিয়াছেন। বঙ্কিমের লাঠি-প্রশস্তি দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক শৌর্য্যেরই প্রশস্তি। বাঙ্গালার নারীরাও এ-যুগের মত দুর্ব্বল ছিল না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। শ্রী, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি চিত্রে তাঁহার বিশ্বাসটা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার আগে দেশে ছিল অরাজকতা, দস্যুতা, বিশৃঙ্খলা, প্রবলের অত্যাচার, অন্নকষ্ট ইত্যাদি। এই সময়ে যাহাদের হাতে শাসন-ভার ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই বাণীরূপ আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী। সুশাসনই অভিপ্রেত। প্রজার যদি কল্যাণ হয় —লোকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইয়া যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে—তবে শাসক যেই থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ঐ দুই পুস্তকে বঙ্কিম ইংরাজ-শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই করিয়াছেন—পূর্ব্বের শাসনের সঙ্গে তুলনায় এই শাসন যে শ্রদ্ধেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে ইংরাজ-শাসনকে আদর্শশাসন বলা যায় কি না সে বিষয়ে তিনি কোন আলোচনা করেন নাই। বঙ্কিম স্বেচ্ছায় ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই, কিন্তু ইংরাজ-শাসনের যে যে ত্রুটী তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল সেগুলি তিনি নানা নিবন্ধে দেখাইতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। সরকারী চাকরী করিয়া এবিষয়ে যতটা সাহস ও নির্ভীকতা দেখানো চলিতে পারে বঙ্কিম তাহার অনেক অধিকই দেখাইয়াছেন। আজকাল ইংরাজের শাসন ও ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতাকে পৃথক্ করিয়া দেখা হয়। সেকালে দুইটাকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না—সে জন্য ইংরাজের কথা উঠিলেই তিনি অভিনব শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের জন্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। এই ঋণ স্বীকার করিলেও ইংরাজের শাসন, বিচার, অমাত্য-নির্ব্বাচন, শিক্ষা-প্রচার, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ, রায়তদের সম্বন্ধে আচরণ, তোষামোদ-প্রীতি এবং ইংরাজের সুশাসন সম্বন্ধে তাঁহার যেমন ধারণাই থাক—ইংরাজের প্রবল প্রতাপান্বিত দোর্দ্দণ্ড শাসনের শক্তি-সামর্থ্য তিনি বেশ বুঝিতেন। সে জন্য দেশাত্মবোধ ইংরাজ-বিদ্বেষে পরিণত না হওয়াই যে মঙ্গলজনক ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আশা পোষণ করিতেন। বাঙ্গালীর বাহুবল, বাঙ্গালার লক্ষ্য ইত্যাদি প্রবন্ধে তাহার আভাস আছে আনন্দমঠে মহাপুরুষের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান হয়, ততদিন ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।" কমলাকান্তের মুখে তিনি তাঁহার আশার কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তীব্র সমালোচনাও করিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বায়ত্ত শাসনের শিক্ষা ও সুযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়াও তাঁহার ক্ষোভ ছিল।

ইংরাজের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম বহুস্থলে প্রশংসাই করিয়াছেন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে তুলনায় তাঁহাদের সাহস, শৌর্য্য, সহনশক্তি, সংহতি, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি গুণের উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীদের বলিতেন, "ইংরাজের গুণের অনুসরণ কর—দোষের অনুসরণ করিও না।"

ইংরাজের গুণের অনুসরণ করিতে গিয়া সাহেব বনিয়া যাইতে হইবে এমন কথা তিনি মনে করিতেন না।

বঙ্কিম মুসলমান জাতির কথা রায়তদের সম্পর্কে ভুলেন নাই—উপন্যাসেও তাহাদিগকে ভুলেন নাই—কিন্তু যখনই তিনি সাধারণ ভাবে বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধনা বেদনার কথা তুলিয়াছেন, তখন তিনি মুসলমান জাতির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কোন যুগে বিদ্যাজ্ঞান সংস্কৃতির উৎকর্ষ যে কোন দিন সংখ্যাধিক্যের কাছে নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য হইবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তিনি দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছিলেন যে শৌর্য্য, তেজ, সংযম ও সাধনার দ্বারা, তাঁহার উপন্যাসে সে সমস্ত মুসলমান রাজত্বের কুশাসনের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। সে রাজত্ব আর নাই, সে মোগল-পাঠানও আজ নাই। অথচ মুসলমানরা উহাকে নিতান্ত সাহিত্যের ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তবে এ কথাও বলিতে হয়—বঙ্কিমের বঙ্গমাতা—হিন্দুর বঙ্গমাতা—জগন্মাতা মহামায়ার সহিত অভিন্ন—সন্তান-

ধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয়। যে দেশ-প্রীতির সাধনায় ও দেশ-সেবায় বাঙ্গালী বঙ্কিমের কাছে দীক্ষালাভ করিল, তাহাতে আমরা মুসলমান ভ্রাতাদের হারাইলাম। অথচ বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ-সাধনায় আমরা ইংরাজকে হারাই নাই।

দুই

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন। * * সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন কার্য্যে এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।"

বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন কর্ম্মযোগী বঙ্কিমের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে বঙ্কিমের সম্বন্ধে যে সত্যটি বিবৃত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়াই সেই সত্যটির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বঙ্কিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আদর্শ মাসিকপত্র সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য প্রচার ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ। বঙ্কিমের সময়েও দেশে মাসিকপত্র ছিল, কিন্তু সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না, —সেগুলির প্রবর্ত্তন বা পরিচালনার মূলে কোন লোকোত্তর প্রতিভাবান্ মনীষী ছিলেন না—কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সংঘের দ্বারা সেগুলি পরিষেবিত বা পরিপোষিতও হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের এই অভাব অনুভব করিয়া আদর্শ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গদর্শন হইল বঙ্কিমের দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা প্রতিভার একটি প্রধান ভুজ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি এরূপ মাসিক পত্রের সৃষ্টি করিলেন—যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল।"

বাঙ্গালী জাতি এইরূপ আদর্শ মাসিকপত্রই এক-খানি বহুদিন হইতে চাহিতেছিল—তাই 'প্রকাশমাত্র ইহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল'। বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়া বঙ্কিম লঘু সাহিত্যের প্রচার করেন নাই—তবু তাহা ঘরে ঘরে কি করিয়া স্থান পাইল তাহা আমরা বর্ত্তমান যুগে ভাবিয়া বিস্মিত হই। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে 'সারে ভারে ও ধারে' তুলিত হইতে পারে এমন মাসিকপত্র সে যুগে ছিল না, এ যুগেও একখানিও নাই। বঙ্কিম ইহার মধ্য দিয়া উচ্চ আদর্শের সাহিত্যেরই প্রচার করিয়াছিলেন। কেবল সাহিত্য নয়, সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞান শাখার ফলপুষ্পে বঙ্গদর্শনের রসভাণ্ডার তিনি পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। যে রচনা তাঁহার সমুন্নত আদর্শের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইত, সে রচনাকে তিনি বঙ্গদর্শনে স্থান দিতেন না তবু যে বঙ্গদর্শন সে যুগে 'ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছিল' তাহার কারণ সমস্তের মধ্যে বঙ্কিমের অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ। বঙ্কিমের লেখনীস্পর্শে, পরিচালনায়, প্রবর্ত্তনায়, উপদেশে ও সুসম্পাদনায় বিবিধ বিষয়ের রচনাবলী এমনই সরস, চিত্তাকর্ষক, শ্রীসৌষ্ঠবে ও পারিপাট্যে মণ্ডিত, আতিশয্যবর্জ্জিত ও গাঢ়বদ্ধ হইয়া উপস্থাপিত হইত যে, বঙ্গদর্শন বিষয়-গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াও সর্ব্বজনের উপভোগ্য ও হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নয় বৎসর কাল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' জীবিত ছিল, নয় বৎসরে ইহা অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বঙ্কিম এই 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়া বঙ্গসাহিত্যের নিজস্ব গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহার অন্তর্নিহিত মহিমার প্রচার করিয়াছেন, মাতৃভাষা-বিমুখ শিক্ষিত লোকদের মাতৃভাষার সেবায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীদের বাংলা লিখিতে শিখাইয়াছেন, তাহাদিগকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন, দেশে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রবর্ত্তনা দান করিয়াছেন—দেশের সাহিত্য চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—দর্শন-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের রূঢ়তা ও নীরসতা হরণ করিয়া তাহাকে সাহিত্যে পাংক্তেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের আরম্ভে

বঙ্কিম এমন একটা সাহিত্যিক আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাহার পরিবেষ-মণ্ডলে হঠকারী, অনধিকারী, অক্ষম ও প্রতিভাহীন ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সাহিত্যিকদেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ সে যুগের যে সকল সুপণ্ডিত মনীষীর সারস্বত জীবনে সাহিত্যিক প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ছিল, বঙ্কিমের সংস্পর্শে তাঁহাদের সে প্রতিভা সৃষ্টিশক্তিতে পরিস্ফূর্ত ও পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের চারিপাশে বঙ্কিম যে সাহিত্যগোষ্ঠী রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সমাবেশ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন তাই উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার রত্নভাণ্ডার। বঙ্গদর্শনে তাঁহাদের এমন রচনা অজস্রই আছে, যেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কেবল তাঁহাদের নয়—বঙ্কিমচন্দ্রেরও কোন কোন রচনা বঙ্গদর্শনের জীর্ণপত্রে আজিও অনাবিষ্কৃত হইয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসাধনার ইতিবৃত্তও বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাগুলিতে বিকীর্ণ রহিয়াছে।

বঙ্গদর্শনেই সব্যসাচী বঙ্কিম একহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং অন্য হাতে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের চত্বরে যাহাতে আবর্জ্জনা জঞ্জাল জমিয়া অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তির সৃষ্টি না করে সে দিকে বঙ্কিমের ছিল প্রখর দৃষ্টি। এজন্য তাঁহাকে সমালোচকের অঙ্কুশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনি এজন্য বঙ্গদর্শনে আদর্শ অপক্ষপাত সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। কেবল সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নয়, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে পুরাতন বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাগুলি অনুসন্ধান করিতে হয়।

Universityর বাহিরে বঙ্গদর্শন একটা Cultural and educational institution হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা অন্যান্য পত্রিকার আদর্শ স্থানীয় ছিল, সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ও পরবর্ত্তী পত্রিকাগুলি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা, রচনা-রীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিত। এক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথি-গণের রচনার একত্র সম্মেলন আর কোন পত্রিকায় আজও হয় নাই। যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সহিতই লিখিতেন। কারণ, বঙ্কিম-চন্দ্রের মত কঠোর সমালোচকের মনোমত হওয়া চাই। যে-সকল নিবন্ধে সারবস্তু থাকিত, অথচ ভাষার দৈন্য থাকিত, বঙ্কিম সে সকল রচনা পরিমার্জ্জিত করিয়া লইতেন। এই ভাবে লেখকগণ উপদেশ ও পরিচালনা পাইত এবং এই ভাবে নূতন লেখকের সৃষ্টি হইত। বঙ্কিম সুপণ্ডিত কৃতবিদ্য বন্ধুগণকে বাংলা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা ভাষাজ্ঞানের অজুহাত দেখাইতেন। বঙ্কিম সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিতেন—অর্থাৎ নিজে তিনি ভাষার যথাযোগ্য সংস্কার করিয়া লইবেন এই আশ্বাস দিতেন। এই ভাবে তিনি অনেক ইংরাজীনবীশকে বাংলার লেখক করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির তত্ত্ব বাংলায় ব্যক্ত করা যায় না। বঙ্গদর্শন এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শন সেকালে দেশের কি উপকার করিয়াছিল, তাহা বাঙ্কবের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—

"বঙ্গদর্শন সারস্বত-গ্রন্থসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃতটুকু বিতরণ করিত—তাই সেকালের শিক্ষিত সমাজ বঙ্গদর্শনের জন্য চাতকের মত উৎকণ্ঠ হইয়া থাকিত।"

বঙ্কিমের শেষ জীবনে বঙ্গদর্শন তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত লেখনীতেও নব বল সঞ্চার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতি সংখ্যায় বহু পৃষ্ঠাই তাঁহার নিজের রচনায় সমৃদ্ধ থাকিত। যে কালে সাময়িক পত্রের উৎকৃষ্ট আদর্শের অভাব ছিল, ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করিত, ভাষার দীনতাও ঘুচে নাই—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের পরিভাষার সৃষ্টি হয় নাই—লেখকের সংখ্যা ছিল অল্প, দেশে শিক্ষাবিস্তার হয় নাই; এ হেন অবস্থায় আদর্শ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিতে বঙ্কিমকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল—কত চিন্তা করিতে হইয়াছিল—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহু কাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল—প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার

সুদূর সাক্ষাৎ লাভ হইত। বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল।"

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যে নরনারীর অধিকার-সাম্য বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয় তবে মৃত-ভার্য্যা পুরুষদের চিরপাত্রীহীনতা বিধান কর না কেন?" ইহাতে মনে হইবে বঙ্কিম বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে তিনি ঐ সঙ্গেই বলিয়াছেন, "সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নয়, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।" এই কথাই বঙ্কিমের প্রাণের কথা বলিয়া মনে হয়। বাল-বিধবার বিবাহের পক্ষপাতী সে কালের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই ছিলেন—বঙ্কিম এবিষয়ে পিছাইয়া ছিলেন মনে করার হেতু নাই। কুন্দ বিধবা ছিল বলিয়া বিষবৃক্ষ নামের সার্থকতা লাভ করিল ইহা সত্য নয়। পাত্রপাত্রীর ইন্দ্রিয়-লালসার বিষই বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য্যমুখী কমলমণির নামে চিঠিতে বিধবা-বিবাহের বিধান-দাতাকে মূর্খ বলিয়াছে! বলা বাহুল্য ইহা সূর্য্যমুখীরই কথা, বঙ্কিমের নয়।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিম স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করেন নাই। ইহাকে তিনি কুপ্রথা মনে করিতেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য কোন আন্দোলনের প্রয়োজন আছে মনে করিতেন না। তাই বিদ্যাসাগর যখন এজন্য খুব জোর আন্দোলন চালাইতে-ছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। আপনা হইতেই যাহা উঠিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য আবার আন্দোলন কেন?

বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের মধ্য দিয়া স্পষ্টভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেন নাই। বরং দীনবন্ধু তাহা করিয়াছেন। সীতারামে রমা ও নন্দার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। শ্রীর সঙ্গেও ইহাদের বিরোধ নাই। শ্রী যে সীতারামকে ধরা দেয় নাই তাহার কারণ অন্যবিধ।

দেবী চৌধুরাণীতে নয়ান বৌয়ের দ্বারা যে উপদ্রবের কথা বলিয়াছেন—সাগর বৌয়ের দ্বারা তাহা সারিয়া লইয়াছেন। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের তরুণীর প্রতি মোহটাই বড় কথা—বিবাহটা বড় কথা নয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে [illegible]য় নয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথের এই উক্তিতে বঙ্কিমের সায় আসে বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর, বঙ্কিম ইহাকে কুপ্রথা মনে করিলেও ইহাকে খুব বড় একটা অপরাধ মনে করিতেন না। অবস্থা হিসাবে ব্যবস্থা, ফল দেখিয়া ইহার বিচার করিতে হয়। যেখানে সপত্নীত্ব সখীত্বে পরিণত হয়—সেখানে বঙ্কিমের মতে দোষের কিছু নাই।

জাতি-ভেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মত সাম্যে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে জাতিভেদকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধই মনে করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল—প্রাচীন ভারতে বর্ণবিভাগের প্রয়োজন ছিল একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই কেহ শ্রদ্ধেয় হইবেন তাহা তিনি মনে করিতেন না। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণের গুণ যাঁহার মধ্যে আছে তিনিই ব্রাহ্মণ—তিনি যে জাতির লোকই হউন।

"যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাঁহাকে ভক্তি করিব।" তিনি নিজেও কোথাও ব্রাহ্মণ্য অভিমান প্রকাশ করেন নাই।

শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত সমাজের সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না—সেজন্য তাঁহার উপন্যাসে ঐ সমাজের লোকদের স্থান হয় নাই—নিম্নতর জাতির প্রতি অবহেলার জন্য নয়।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "সমুদ্র-যাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত।" সকল প্রাচীন আচার সম্বন্ধেই তাঁহার এই মত। যে আচার লোক-হিতকর তাহা শিরোধার্য্য, যাহা লোকের ক্ষতিকর তাহা বর্জ্জনীয়। আচার দেশকাল পাত্রগত ব্যবস্থা মাত্র, উহাকে বেদবাক্য মনে করার কারণ নাই। প্রাচীন কালের আচার প্রাচীনকালের পক্ষে উপযোগী। বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রার পক্ষে যদি উহা সমঞ্জস না হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন বাঞ্ছনীয়। ক্ষতিকর যদি না হয় তাহা হইলে দেশীয় আচার ত্যাগের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। বঙ্কিমের মত এইরূপ ছিল।

বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের কোন মতামত দেখা যায় না। তবে মনে হয় তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উপন্যাসগুলিতে যেরূপ পূর্ব্বরাগ ও প্রণয়ের জয়গান করিয়াছেন তাহাতে বাল্যবিবাহের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। তাঁহার উপন্যাসে বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির বিবাহে অভিভাবকদের অবিবেচনা যে দাম্পত্যজীবনের ক্ষতিকর হইয়াছে ইহা একাধিক স্থলে দেখানো হইয়াছে। ইহা বাল্যবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যায়।

বঙ্কিম ইংরাজজাতি ও ইংরেজি ভাষার নিকট বার বার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনের প্রশংসাও তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে আছে। ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্ একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাই বলিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, এবং স্বাধীনতার মর্য্যাদাকে ছোট করিয়া দেখেন নাই।

তিনি বিলাতী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় শিল্প-সাহিত্য শিক্ষাদীক্ষাকে অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া দেশের লোকের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষা সমৃদ্ধ বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন—মাতৃভাষা দরিদ্রা বলিয়া তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

ইংরাজের যাহা ভাল তাহা অনুকরণ কর—যাহা মন্দ তাহা কদাচ অনুকরণ করিও না—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। তিনি সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে ছিলেন। অযথা বাঙ্গালী ভাবের বিসর্জ্জন দিয়া সাহেব বনিয়া উঠাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। বিলাতী পোষাক পরিয়া সাহেব সাজাকে তিনি বাঁদরামি মনে করিতেন।

তিনি বলিতেন—"সদনুষ্ঠান কর দেশের মঙ্গলের জন্য, সাহেবেরা প্রশংসা করিবে বলিয়া কিছু করিও না। সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হউক—জাতির মঙ্গল-সাধন—সাহেবের তুষ্টি-সাধন নয়।"

এ দেশে শিক্ষিত সমাজ ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা সহানুভূতির সম্পর্ক নাই—ইহা তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত করিত। যাহাতে এই সহানুভূতির সৃষ্টি হয় এই জন্য তাঁহার একটা প্রয়াস ছিল। যে দেশহিতৈষণায় কৃষক মজুরদের কোন মঙ্গল না হয় তাহাকে তিনি অসার বাক্সর্ব্বস্ব মনে করিতেন। যে সকল বক্তা ও সংবাদপত্রসেবীরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ লইয়া ইংরাজিতে আন্দোলন করিতেন তাহাদিগকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। দেশের জনসাধারণ যে শিক্ষার অংশ পাইল না, সে শিক্ষাকে তিনি অ-শিক্ষা বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির মধ্য দিয়া দেশে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, কিন্তু লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইতেছে ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

বঙ্কিমবাবু চরিত্রহীনা নারীগুলি লইয়া তাঁহার উপন্যাস-গুলিতে বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের জীবনের পরিণতি তাঁহার নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রকৃতির হাতে তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। যদি তাহা দিতেন তাহা হইলে অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁহার উপন্যাসগুলিকে কিছুতেই শেষ করা যাইত না। বাধ্য হইয়া তাঁহার কল্পনাকে প্রকৃতির সহিত শেষ পরিণাম পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে হইত। এই ভাবে অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার কল্পনাকে যে বীভৎস পৈশাচিক রাজ্যে যাইতে হইত—বঙ্কিম তাঁহার কল্পনাকে সেখানে প্রেরণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার শুচিসংযত আভিজাত্য-দৃপ্ত চিত্ত বেশী দূর নামিতে প্রস্তুত ছিল না। প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রেই হীন চরিত্রকে নরকে লইয়া যায় না—স্বর্গের পথে না হউক—সত্যের পথে, মনুষ্যত্বের পথে সে ফিরিয়া আছে। বঙ্কিম প্রকৃতির সে পথও অনুসরণ করিতে চাহেন নাই—তাড়াতাড়ি তাহাদের দণ্ড দিয়া বিদায় করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রধান চরিত্র বলিয়াও কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

মতিবিবির কি পরিণতি ঘটিল তাহা বলিবার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাহাতে কোন দোষ হয় নাই। কপালকুণ্ডলার পরিণতির পর চিত্ত এমন ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকে—নিয়তির গূঢ় রহস্য-চিন্তায় মন এমন তদ্গত থাকে যে, মতি বিবির খোঁজ লইতে আমাদের প্রবৃত্তিই জন্মে না। শৈবলিনীকে তিনি প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য রমানন্দ স্বামীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহার পরিণতি স্বাভাবিক হয় নাই। উহাতে

চন্দ্রশেখরের কথা ভাবিয়া প্রতাপের কথা ভাবিয়া শৈবলিনীর প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতির অভাবই সূচিত হইয়াছে। অথচ শৈবলিনীর প্রতি বঙ্কিমের এত বেশী ক্রোধের কারণ ছিল না। বঙ্কিমের সহানুভূতি মাথায় ধরিয়া সে নারী-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রতি সমাজ ও চন্দ্রশেখর রীতিমত অবিচার করিয়াছে এ কথা বঙ্কিম স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন। শৈবলিনীর চিত্তের আবিলতার জন্য বঙ্কিমের ক্রোধ জন্মে নাই—কাহারও ভ্রূকুটী বা শাসনে কাহাকেও ভালবাসানো যায় না। শৈবলিনী যদি স্বামীকে ভালবাসিতে না পারিয়া থাকে, তাহার জন্য শৈবলিনী দায়ী নয়—দায়ী সমাজ, চন্দ্রশেখর, অদৃষ্ট-দেবতা বা প্রেম-দেবতা। বঙ্কিমের কোপ সে জন্য নয়। বাঙ্গালী সংসারের গৃহিণী হইয়া আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী হইয়া সে যে দুঃসাহসের ও প্রগল্‌ভতার কাজ করিয়াছে, সে যে ভালবাসার কথা ছাড়া সাংসারিক জীবনের অন্যান্য দায়িত্বের কথাগুলি ভাবিতে পারিল না, সে যে বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল না, এই জন্যই বঙ্কিমের কোপ। তাঁহার দুইটি আদর্শ চরিত্রকে সে যে তাঁহার নিজের বাসনার অতৃপ্তির জন্য ধ্বংস করিল সে জন্যও বঙ্কিমের কোপ। যাহার উপর লেখকের কোপ থাকে, লেখক তাহাকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিজের হাতেই গ্রহণ করেন।

কুন্দের প্রাণহানির জন্যই বঙ্কিম হীরার অবতারণা করিয়াছিলেন, গোড়া হইতেই হীরা বঙ্কিমের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। হীরা একটি গৌণ চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হীরা প্রাধান্য লাভ করিল, তখন বঙ্কিম তাঁহার প্রাণের গভীর ব্যথা কোথায় তাহাও দেখিতে ও দেখাইতে বাধ্য হইলেন। বঙ্কিম তখন নিজেই আবিষ্কার করিলেন সমাজের কাছে তাহারও অভিযোগ করিবার আছে। কোন্ দোষে সে জীবনের সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত? অপরাধিনী হইয়াই ত' সে জন্মে নাই। সমাজের অবিচারই তাহাকে অপরাধিনী করিয়া তুলিতেছে। এই ভাবে সে বঙ্কিমের সহানুভূতি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যাহার দ্বারা কুন্দকে হত্যা করাইতে হইবে তাহাকে ভালবাসিলে ত' চলে না। তাহাকে সেই মহাপাপের দিকে ক্রমে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইল।

তারপর বঙ্কিম হীরার পরিণতি দেখাইয়াছেন উন্মত্ততায়। এই দণ্ডও বিচারক বঙ্কিমের কোপের ফল বলিয়াই মনে হয়। হীরার পরিণতির কথা বঙ্কিম বলিতে বাধ্য ছিলেন না। কুন্দের মৃত্যুতে গ্রন্থ শেষ হইলে বোধ হয় হীরার কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। পাঠকেরও হীরার কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হইত না। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের পুনর্মিলনের কথা বলিতে গিয়া হয় ত' হীরার পরিণতির কথা বলিতে হইয়াছে।

এক হিসাবে হীরার পরিণতিকে প্রবৃত্তি-সঙ্গত বলা যাইতে পারে। হীরার জীবনের অপরিতৃপ্ত লালসা, প্রত্যাখ্যাত প্রণয়-পিপাসা ও চরিত্রের অঙ্গীভূত দারুণ ঈর্ষ্যার পরিণতি উন্মাদগ্রস্ততা কি না বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন।

সবচেয়ে দারুণ সমস্যা হইয়াছে রোহিণীকে লইয়া। রোহিণীর পরিণতির জন্য তিনি পিস্তলের প্রয়োগ করিয়াছেন। গোবিন্দলালকে চরমতম পাপী করিয়া তোলা ও রোহিণীর অপসারণ ঐ দুই পাখী তিনি এক ঢিলে মারিয়াছেন।

যাহাদের জীবনে শিল্পী ট্র্যাজেডি দেখান—তাহারা একেবারে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে রস জমে না বলিয়াই আমরা মনে করি। 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' এই নীতির সার্থকতায় আমাদের ন্যায়-তৃষ্ণার তৃপ্তি হয়। ইহা অভাবমোচন মাত্র, ইহা নূতন একটা লাভ নয়। সেজন্য মনে হয় গোবিন্দলালকে খুনী বানাইয়া তাহাকে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না করিলেই ভাল হইত—অনেকে ইহাই মনে করেন। পক্ষান্তরে রোহিণীর জীবনে পাঠক একটা ট্র্যাজেডির প্রত্যাশা করিতেছিল। বলা বাহুল্য জীবনে ট্র্যাজেডির অর্থ মৃত্যু নয়। পাপের স্বাভাবিক পরিণতিই এই ট্র্যাজিডি, অন্ততঃ জীবনের গতির একটা পরিবর্ত্তন—তাহাও প্রকৃতি-সম্মত। কিন্তু রোহিণীর হত্যায় দুইএর একটাও হইল না।

বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই এই ব্যাপার লইয়া এ কথার সমালোচনা হইয়াছিল—বঙ্কিম অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"আমার ঘাট হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাসপাঠে নিযুক্ত, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

বলা বাহুল্য, ইহা উত্তরই নয়, ইহা তাঁহার হাকিমি আসন হইতে তিরস্কার মাত্র।

বলা বাহুল্য, রোহিণীবধ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা নয়। বঙ্কিমের তিরস্কার যেমন জবাব নয়, হত্যাও তেমনি criticism of life নয়। সমালোচকরাই বরং রোহিণীর জীবনের ব্যাখ্যা তাঁহার কাছে চাহিয়াছিল। তাহাই তিনি পুস্তকের গোড়া হইতে দিতেও ছিলেন, এইখানে আসিয়া ব্যতিক্রম করিলেন বলিয়াই পাঠকের ক্ষোভ। অথচ বঙ্কিমকে এই অসঙ্গত ব্যাপারটি ঘটাইবার জন্য অসঙ্গত আয়োজনও করিতে হইয়াছে কম নয়।

বুদ্ধের অবদান

শ্রীমতিলাল দাশ

কাল নিরবধি—আকাশের মত নিঃসীম ও নিরালম্ব। তথাপি মানুষের প্রয়োজনে তাহাকে আমরা ভাগ করি—তাহাকে ছেদ করিয়া কাল্পনিক যুগ, শতাব্দী ও বর্ষ রচনা করি। মানুষের জীবন-সমুদ্রে মাঝে মাঝে আবর্ত্ত আসে—চারিদিক হইতে জলস্রোত একমুখী হইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করে—ইহাকেই বলি যুগসন্ধি।

আজ আমরা এমনই যুগসন্ধিক্ষণে। ইতিহাসের চলার পথে নানা ভাবের ও নানা স্রোতের সংঘর্ষ বাধিয়াছে। দুঃখতমনা গভীর এই নিশীথ রাত্রি শেষ কথা নয়—ইহার শেষে আছে নব আশারুণ দীপ্ত সমুজ্জ্বল প্রভাত। সে প্রভাতের বর্ণরাগ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে না—তাহার জন্য চাই মানুষের সাধনা। তাহার জন্য চাই নব দৃষ্টিভঙ্গী, নব প্রচেষ্টা।

এই সাধনা আশাতুর সাধনা—তাহার লক্ষ্য ভাবী কালে তাহার আশাপ্রদীপ্ত ভবিষ্যৎ, কিন্তু ভবিষ্যৎ ত অবিচ্ছিন্ন নয়; অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাই অতীতের আর এক যুগসন্ধিক্ষণের কথা বলিব।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকেও এমনই পরিবর্ত্তনের যুগ—এমনই বিপ্লবক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যের কাল। তখনকার যে সব দেশে মানুষ সভ্যতার আলোক পাইয়াছিল, সর্ব্বত্র একই ভাবে নব জাগরণের উদ্বোধন হইয়াছিল।

চীনে কংফুসে ও লাওসে, পারস্যে জরথুস্ত্র, গ্রীসে পিথাগোরাস, ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও মহাবীর এই বিরাট বিবর্ত্তনের জয়স্তম্ভ। ইতিহাস চলার ইতিহাস, সে চলার রেখাচিত্রে সাধারণ মানুষ পায় না স্থান—যাহারা মহামানব তাহারাই কেবল দাগ রাখিয়া যান।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি—এই পুণ্য তিথিতেই বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধের বোধিলাভ এবং পারনির্ব্বাণ। এই শুভদিনে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীর মহত্তম ঐতিহাসিক ব্যক্তি বুদ্ধের অবদানের কথা আলোচনা করিয়া সেই মহাপুরুষের শ্রদ্ধাতর্পন করিব এবং তাহার বাণী যে পথনির্দ্দেশ করে তাহার ইঙ্গিত করিব।

'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরে'র কবি জয়দেব তাহার দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া লিখিয়াছেন—

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
> সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্
> কেশব ধৃতবানসি বুদ্ধশরীরং
> জয় জগদীশ হরে।

কিন্তু অবতারে পরিণত হইলে কি হইল, বুদ্ধ তাঁহার আপন দেশে আজ বিস্মৃত—তাঁহার ভাব ও বাণী সর্ব্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম্মের কবলে কবলিত। হিন্দুধর্ম্মকে গালি দিতেছি না—হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, সমুদার, সে আলিঙ্গন করিতে গিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে ইহা তাহার জীবনীশক্তির চিহ্ন। কিন্তু ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয় যে বুদ্ধের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানশিখা আমাদের জীবনে অতি স্বল্পালোক বিস্তার করিতেছে।

মানুষের চলার ইতিহাস প্রগতির ইতিহাস, কিন্তু সে প্রগতি রৈখিক নয়, বৃত্তাকার। উত্থান ও পতন, বৃদ্ধি ও অবসাদের ছন্দে তাহা দোদুল। বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন কালের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। গৌরবময় চূড়া আজিও অপরাজেয় মহত্ত্বে দৃপ্ত। বেদ ও উপনিষদের ছত্রে ছত্রে অমৃতের বাণী, বীর্য্য ও বলের প্রার্থনা, আনন্দ ও অভয়ের জয়গান। বৈদিক ঋষির কণ্ঠে কল্যাণ ও বরাভয়ের মন্ত্র উচ্চারিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শাশ্বত গতির যে চমৎকার বর্ণনা পাই, তাহারই প্রতিধ্বনি আধুনিক পাশ্চাত্য প্রগতিবাদী দার্শনিকদের গ্রন্থে দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই চলার মন্ত্র আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই অপূর্ব্ব শ্লোকের স্বচ্ছ বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

> শ্রান্ত যে জন পন্থা চলি শ্রী যে তারই নানা
> ইক্ষ্বাকুসুত রোহিত ওগো এই ত চিরশ্রুতি,
> রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জাত লভে পাপের হানা
> ইন্দ্রসখা পান্থজনের বলছে চরৈবেতি

জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার   যে জন চলে পথে
ফলগ্রহি আত্মা যে তার   বৃহৎ নেয় লুটি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা   চড়ি মৃত্যুরথে
পথে চলার শ্রমে হত,   চল পথে ছুটি
যে জন বসে ভাগ্য যে তার   রয় ত বসে বসে
উচ্চশিরে যে রয়   সে রয় উন্নতিরি রথে
যে জন রয় শয়নসুখে   ভাগ্য তাহার খসে
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে,   চল চল পথে।
কলি কোথায় ? যে রয় শুয়ে   আছে তারই কাছে,
যে জেগেছে জীবনে তার   দ্বাপর জাগে হাসি,
যে উঠেছে সে চলেছে   ত্রেতাযুগের পাছে
যে চলে সে সত্যযুগে   বাজাও চলার বাঁশী।
যে চলেছে সে পেয়েছে   অমৃতময় মধু
যে চলেছে স্বাদু ডুমুর   খায় সে হাসি হাসি
চেয়ে দেখ দীপ্ত সূর্য্য   আকাশপথের বঁধু
তন্দ্রাবিহীন চলছে শুধু,   বাজাও চলার বাঁশী।

কিন্তু এই আনন্দময় আশাতুর যুগ বেশী দিন রহিল না। বিকার আসিল—সাধনা প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইল, যজ্ঞ ও মন্ত্র মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করিল। জাতিভেদ, কুসংস্কার, পশুবলি এই প্রাণবন্ত সভ্যতার মাঝে নির্জীবতা ও মৃত্যুর ক্লেদ আনিল। আড়ম্বর, ক্রিয়াবাহুল্য, অনুষ্ঠানের নির্ম্মম ভার মানব চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। গীতাতেও পার্থসারথি ইহার নিন্দা করিয়াছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

এই বিদ্রোহী যুগের শ্রেষ্ঠতম সত্যানুসন্ধিৎসু তথাগত বুদ্ধ। তাহার অমর জীবনের কথা সকলে জানেন, তথাপি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করিব।

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে গণতান্ত্রিক নায়ক রাজা শুদ্ধোধনের নয়নমণি হইয়া সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করেন। মানুষের যাহা বাঞ্ছিত তাহা সবই তাহার ছিল। স্নেহময় পিতা, অনিন্দ্যসুন্দরী বধূ প্রেমময়ী গোপা, নবজাত পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্। কিন্তু যে অতৃপ্তি যুগে যুগে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে, সেই অতৃপ্তি তাঁহাকে পাইয়া বসিল। অনিত্য সংসারে তিনি নিত্য সুখের সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই সুগভীর ব্যাকুলতা তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। মহানিষ্ক্রামণের এই বাস্তব দৃশ্য সমস্ত কাব্যের করুণরসে যেন সিক্ত। মহানিষ্ক্রামণ কাব্য হইতে তুলিতেছি—আদরিণী গোপার অভিমান ভরা বাক্যের উত্তরে সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—

'নহে অভিমান ওরে আদরিণী গোপা!
এই জীবনের অনিত্য চঞ্চল খেলা
যত ভাবি, তত ভাবি, না হেরি উপায়,
যে মাধুরী অঙ্গে তব বিলায় লাবণ্য
একদিন জরা আসি করিবে কাতর
ক্ষীণ হবে একে একে সুষমা চন্দ্রমা
সে ভাবনা করেছে ব্যাকুল। পথহারা
পথিকের মত, নিরুদ্দেশ ভাবনায়
আমি মুহ্যমান।

গোপা—ভুলে যাও প্রিয়তম!

সিদ্ধার্থ—   ভুলিতে পারি না,
ঘুরে ফিরে এ ভাবনা রহে বক্ষ চাপি,
বেদনায় যেন মোর না চলে নিঃশ্বাস।
                হে সহধর্ম্মিণী
হও সাথী সত্যকার, দেহ মুক্তি মোরে
প্রেমের বন্ধন হতে।

গোপা— কি বলিছ প্রিয়তম?

সিদ্ধার্থ— আমারে বিদায় দেহ, আমি যাব দূরে
সন্ন্যাস গ্রহণ করি। করিব সন্ধান,
যে সত্য আজিও হায় পায় নি মানব,
আমি তার করিব সন্ধান। তপস্যায়
সে সত্য করিব উদ্বোধন—দেহ তুমি
অনুমতি, দেহ প্রিয়তমে।

বিদায়ের এই অশ্রুজল হয় ত' প্রয়োজন ছিল। বড় কঠিন ত্যাগ না করিলে সত্য হয় ত' আমাদের জীবনে প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে না। সংসারে লক্ষ লক্ষ গোপা জন্ম ও মৃত্যু আধি ও ব্যাধির কবলে কবলিত, তাহাদের দুঃখকাল শেষ করিতে মহাপুরুষ বুদ্ধকে প্রেমের সুগভীর বন্ধন ত্যাগ করিতে হইল।

শুদ্ধোধন যখন বাধা সৃষ্টি করিলেন তখন সিদ্ধার্থ চারিটি বর চাহিলেন—

দেহ মোরে ব্যাধিহীন চির সুস্থ দেহ,
দেহ মোরে জরাহীন অমর যৌবন,
দেহ পিতা মৃত্যুহীন অনন্ত আনন্দ,
দেহ মোরে সুখময় অক্ষয় অমৃত।

পিতা এই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না। উত্তর করেন

অসম্ভব প্রার্থনা পূরণ,
সৃষ্টির বিধাতা যিনি নাহি শক্তি তাঁরো
পূরাতে বাসনা তব।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসের অনুমতি লাভের সুযোগ পাইলেন, কহিলেন—

তবে দেহ অনুমতি
আমি যাব, নাহি জানি কোথা কোন দেশে
সত্যের করিব অন্বেষণ—তপস্যায়
অমৃতের করিব সন্ধান—যদি পিতা
ব্যর্থ হই নাহি ক্ষতি, যদি সত্য পাই
ধরণীর দুঃখধারা করিব নিঃশেষ।

এই মহাভাবে ভাবুক সিদ্ধার্থ মহানিষ্ক্রমণ করিয়া পরম মঙ্গলময় বোধি লাভের জন্য বাহির হইলেন। রাজগৃহে নৃপতি বিম্বিসার তাঁহাকে আপন রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধার্থ বিষসম অনন্তদোষ কামের প্রতি আপন অনাসক্তি জানাইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি নানা সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাহাদের সাধন পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বৈশালীর আঁরাড় কালাম নামক সুপণ্ডিত ঋষির নিকট এবং শৈলগুহার রাম পুত্র রুদ্রকের নিকট তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করেন। এই পণ্ডিতেরা তাহার ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না—রুদ্রকের পঞ্চ শিষ্য কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রীয়, বাষ্প ও মহানামের সঙ্গে তিনি উরুবিল্ব গ্রামে নৈরঞ্জনা নদীতীরে দুশ্চর কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

বুদ্ধদেবের চিত্তেও এই মহৎ সত্য জাগরূক হইল—তিনিও আপন মনে বলিলেন—

"পথ অন্যে কে দেখাইবে? আপন পথ আপনি না দেখিলে অন্যে দেখাইবে কে?"

আত্মসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কঠোর সাধনায় ছয় বৎসর কাটাইলেন। দেহ কঙ্কালসার হইল, অনাহারে, অনিদ্রায় তাহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ঝরিয়া গেল, কিন্তু যে নির্ব্বাণ লাভের জন্য সাধনা, যে বাসনা জয়ের জন্য তপস্যা তাহার কিছুই হইল না। স্নান করিয়া পুণ্যবতী শ্রেষ্ঠী দুহিতা সুজাতার দত্ত পরমান্ন গ্রহণ করিয়া নবীন উৎসাহে সত্যলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

নিয়মিত পানহার আরম্ভ করায় কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার সংকল্প বিচলিত হইল না, বরং নবীন আগ্রহে তিনি বলিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সাধন সময়ে সিদ্ধার্থ ও মারের যে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে। মূর্ত্তিমান কাম মার তাহাকে বলিল, দুর্গম দুষ্কর দুরতি সম্ভব বোধি লাভে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি বাঁচিবার চেষ্টা কর, জীবিতই তোমার পক্ষে শ্রেয়।"

সিদ্ধার্থ পুণ্য ও জীবন লাভের এই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া মারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন—

"কামা তে পঠমা সেনা দুতিয়া অরতি বুচ্চতি।
ততিয়া খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তন্হা পবুচ্চতি॥
পঞ্চমী থীনমিদ্ধন্তে ছট্‌ঠা ভীরূপ বুচ্চতি॥
সত্তমী বিচিকিচ্ছা তে মক্‌খো থম্ভো তে অট্‌ঠমো॥
লাভো সিলোকো সক্কারো মিছো লদ্ধো চয়োযসো।
যো চত্তানং সমুক্কংসে পরে চ অবজানতি॥
এষা নমুচি তে সেনা কন্‌হস্সাভিপ্প্‌হারণী।
ন তং অসুরো জিনাতি জেত্বা চ লভতে সুখং॥"

মারের এই পরিচয় দিয়া সিদ্ধার্থ স্পর্দ্ধায় বলিলেন :—

হে পাপিষ্ঠ মার	প্রমত্ত জনের বন্ধু !
মৃত্যুশ্রেয় পরাজিত	জীবনের চেয়ে,
আম্রপাত্র ঝরে যথা	প্রস্তর-আঘাতে
চূর্ণিব সেনানী তব	প্রজ্ঞাবলে তথা
সংকল্প করিয়া বশ,	স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত
প্রচারিব দেশে দেশে	নূতন বিনয়
অপ্রমত্ত ধ্যানরত	শিষ্য হবে যারা
অশোক অমৃত লোকে	স্থান পাবে তারা।

মার পরাজিত হইয়া পাষাণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত বায়সের ন্যায় গৌতমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধার্থ আবার ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। একোনপঞ্চাশৎ দিনে রজনীর প্রথম যামে এল শুভ মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থের পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে কমলের বিকাশের মত তাহার হৃদয়ে প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব প্রতিভাত হইল।

সত্যলাভে তাহার হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তিনি আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন—

"অনেকজাতিসংসারং সন্ধ্যা বিস্‌সং অনির্ব্বিসং
সহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খ জাতি পুনপ্পুনং।
সহকার দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বং তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

তোমার সন্ধানে ফিরি,	হে গৃহকারক
কত জন্ম জন্মান্তর	কত যে সংসার,
ঘুরিয়াছি নাহি শেষ।	জন্ম দুঃখময়,
চিনেছি তোমায় আজি,	আর না পারিবে
করিতে নির্ম্মাণ গৃহ	ভেঙ্গেছি সকল
গৃহস্তম্ভ, পার্শ্বদণ্ড,	গিয়েছে বাসনা
মুক্ত চিত্ত মোর	তৃষ্ণায় করেছে ক্ষয়।

বুদ্ধদেব ৩৫ বৎসরে বোধি লাভ করেন, তাহার অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি সদ্ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করেন। দিনের পর দিন তাহার অমৃতবাণী মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় মানুষের চিত্তভূমি উর্ব্বর ও সতেজ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ত্রিপিটক ও জাতকে এই সব অপূর্ব্ব আলাপন সংগৃহীত আছে সাহিত্যরস রসিক, ভাবুক, শ্রদ্ধালু তাহাতে অক্ষয় আনন্দ লাভ করিবেন।

[ক্রমশঃ

"মা! মা!"

ডাকিতে ডাকিতে অজিত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রান্নাঘরে ব্রজেশ্বরী বসিয়া খুন্তি দিয়া তরকারি নাড়িতেছিলেন। পুত্রের সাড়া পাইয়া তিনি খুন্তি হাতে বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন।

মাকে খুঁজিতে অজিত ঘরের দিকে যাইতেছিল। ব্রজেশ্বরীকে রান্নাঘরে দেখিয়া হাসি মুখে তাহার নিকট আসিয়া দাড়াইয়া বলিল, "আমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছি মা।"

ব্রজেশ্বরীর মুখ নিমিষে কালীবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ছিঃ বাবা! ও কথা বলে না।"

অজিতের বড় অভিমান হইল, সে বলিল, "বারে! আমি কি ইচ্ছে করে স্কুল ছেড়েছি, সকলে ছাড়ল—আমিও।" সে সহসা ব্রজেশ্বরীর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বলিল, "ওরা কি বলে—জান মা? ওরা বলে, ওটা স্কুল নয়—গোলামখানা।"

ব্রজেশ্বরী এইবার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "কে বলেছে রে, এই কথা?"

অজিত অবাক হইয়া মার মুখে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "সবাই বলে। এমন কি দেশবন্ধুও বলেছেন। তিনি আরও কত কি বলেছেন, যদি আমরা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত ইত্যাদি এক সঙ্গে বয়কট করতে পারি, তবেই আমরা স্বরাজ পাব।" ব্রজেশ্বরীকে জড়াইয়া ধরিয়া আব্দার পূর্ণস্বরে আবার বলিল, "সত্যি মা! আমরা স্বরাজ পাব। স্বাধীন হব।"

পুত্রের অন্তরের কথা ব্রজেশ্বরী বুঝিলেন। তিনি অবাক হইয়া গেলেন, যে অজিত দু'দিন পূর্ব্বেও স্বাধীনতার অর্থ বুঝিত না, আজ কাহার যাদুস্পর্শে তাহার ক্ষুদ্র অন্তরে স্বাধীনতার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। ব্রজেশ্বরী তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিলেন না। হাঁ নেতা বটে,—তিনি শুধু দেশের লোকদের প্রাণে সাড়া তুলিয়াছেন, তা নয়, তিনি দেশের কচি ছেলেদের অন্তরেও স্বাধীনতার ক্ষুধা দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছেন। স্বরাজ হয় ত' নাও হইতে পারে; কিন্তু এই যে দাবানল তিনি জ্বালাইয়া দিলেন, এ ত' সহজে নিভিবার নয়। ব্রজেশ্বরী অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "দেশবন্ধুর কথা কি মিথ্যা হয় বাবা।"

ব্রজেশ্বরীর কথায়, অজিত খুশী হইয়া বলিল, "তবে তুমি আমায় গোলামখানায় পাঠাবে না বল।"

ব্রজেশ্বরী বুঝিলেন, এখন অজিতকে ফিরান অসম্ভব। সে জন্য তিনি অন্যভাবে কথা বলিলেন, "আচ্ছা, বোকা ছেলে ত', পড়া শুনা না কল্লে, কি করে মানুষ হবি ব'লত?"

এত বড় কথা মা জানে, আর সে স্কুলে পড়িয়া জানে না। অজিতের বড় লজ্জা হইল। সে ব্রজেশ্বরীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল, "কিন্তু ওরা যে বলে, গোলামখানায় পড়লে, গোলাম—"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "সবাই কি গোলাম হয় বাবা। এই যেমন দেশবন্ধু, আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি সকলেই এই গোলামখানায় পড়ে, কত বড় হয়েছেন। তুমিও এই গোলামখানায় পড়ে তাদের মতন বড় হবে। দেশের উপকার করবে। মনে রেখো বাবা, মুর্খ দিয়ে গাধার মতন খাটানো যায়, কোন মহৎ কাজ হয় না। তুমি দেশের স্বাধীনতা চাও কিন্তু বিদ্বান না হ'লে, তুমি শুধু পরের কথা শুনে বেড়াবে তোমার কথা কেউ শুনবে না।"

ব্রজেশ্বরীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া, অজিত ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি দেশবন্ধুর মতন হব। স্কুলে যাব। কিন্তু এখন নয়, সবাই গেলে।"

ব্রজেশ্বরী পুত্রের কপালে একটা চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন যাও বিশ্রাম কর গিয়ে।"

অজিত বলিল, "তুমি যখন যাবে, তখন যাব মা।" ব্রজেশ্বরী শুধু হাসিলেন। তিনি তাঁহার কাজে মন দিলেন।

চৈত্রের শেষ। কলিকাতায় অসহ্য গরম। এমন কি রাস্তার পিচগুলা পর্য্যন্ত গরমে গলিয়া যাইতেছে। তাপ্‌সা

গরম, বাতাস নাই। গরমের ভয়ে সকলেই জানালা দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কেহই বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাহির হইতেছে না। দুপুর বেলা, নিস্তব্ধ রাস্তাঘাট। এমন সময় চারিদিক কাঁপাইয়া ধ্বনি হইল, "বন্দেমাতরম্।"

ঘন-ঘন এইরূপ বজ্র-নিনাদে শব্দ হইতে লাগিল। অজিত বারান্দায় ছুটিল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরীকে বলিল, "মা! আমি চললুম!"

ব্রজেশ্বরী তখন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিতেছিলেন, বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এই রোদে কোথায় যাবি বাপ।"

অজিত তখন চলিতে সুরু করিয়াছে, বলিল "আমার স্কুলের ছেলেরা ডাকছে, আমি পিকেটিং-এ চললুম।" অজিত অনুমতির জন্য ব্রজেশ্বরীর মুখের পানে চাহিল।

ব্রজেশ্বরী ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "এই রোদে গিয়ে কাজ নেই বাবা।"

অজিত হাসিতে হাসিতে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মা! দেশবন্ধু বলেছেন, দেশের কাজ যারা করবে, তাদের রোদ, বৃষ্টি তুচ্ছ করতে হবে।" ব্রজেশ্বরীর নিকটে আসিয়া তাহার পা দুখানি ধরিয়া অজিত সহসা বলিল, "যাব মা। ওরা সব অপেক্ষা করছে।"

অজিত এমন ভাবে কথা কয়েকটি বলিল, ব্রজেশ্বরী আর কথা বলিতে পারিল না। তিনি অজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

অজিত আবার বলিল, "যাব মা!"

ব্রজেশ্বরীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি অজিতকে দুই হাতে তুলিয়া শুধু বলিলেন, "যাও। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরবে।"

অজিত আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বন্দেমাতরম।' এবং ব্রজেশ্বরী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, তাহার পায়ের ধূলা লইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বরী মুগ্ধ নয়নে পুত্রের গমনের পথে চাহিয়া রহিলেন।

*　　*　　*

বৈকালে নন্দবাবু অফিস হইতে হাত মুখ ধুইয়া জলখাবার খাইতে বসিলেন। অজিত প্রত্যহ পিতার সহিত বসিয়া জলখাবার খাইত। আজ অজিতকে পাশে না দেখিয়া নন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজিত কোথায়, ওকে দেখছি নে কেন?"

ব্রজেশ্বরী তাহার মাথার উপর ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "পিকেটিং-এ গেছে। সন্ধ্যায় ফিরবে।"

নন্দবাবু সবে মাত্র একটা লুচি তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছিলেন। ব্রজেশ্বরীর কথা শুনিয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি করে জানলে?"

ব্রজেশ্বরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে আমায় জানিয়ে গেছে।"

নন্দবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কিছু বল্লে না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "বলবার কি আছে। সবাই স্কুল বয়কট করেছে। অজিতও—"

নন্দবাবু রাগে ফাটিতেছিলেন। কোন প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "সবাই যা করবে, ওকেও তাই করতে হবে।" নন্দবাবু পুনরায় স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমিই ওর মাথাটা খেলে। তুমি মা নও,—রাক্ষসী।" নন্দবাবু রাগে গজ্ গজ্ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কয়েক দিন পরে। রাত্রিতে আহারে বসিয়া নন্দবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, "সত্যি ও আর স্কুলে যাবে না। এমনি করেই ও জীবনটা নষ্ট করে দেবে।"

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি অত ভাবছ কেন? অজিত বলেছে, স্কুল খুললেই ও স্কুলে যাবে। এতে ভাবনার কি আছে?"

নন্দবাবু বলিলেন, "ভাবনার আছে বৈই কি! যে ছেলে একবার বাহির মুখো হয়, তাকে ফেরানো বড় শক্ত—বুঝলে গিন্নী?"

এই কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী শুধু হাসিলেন। ভারি মধুর হাসি। মনে হয় দুর্গা প্রতিমা হাসিতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "চোখের উপর কত দেখেছি। কত ছেলে কুসংসর্গে পড়ে জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। বাপ, মায়ের কত টাকা চুরি করে উড়িয়ে দিয়েছে, কেউ তাতে বাধা দিতে পারে নি! সুখের বিষয় আমার অজিত সে দলে ভীড়ে নি। সে বেছে নিয়েছে মহৎ কাজ। এই কচি বয়সে তার প্রাণে সাড়া দিয়েছে—স্বাধীনতা। এতে যদি ওর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যায় আমি একটুও দুঃখীতা হ'ব না।"

নন্দবাবু আর থাকিতে পারিলে না। চিৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও পার্কে গিয়ে বল—নাম হবে। দেশের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পরে যাবে।"

নন্দবাবুর কথা শুনিয়া, ব্রজশ্বরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আচ্ছা! অজিতকে তুমি ত খুব দোষ দিচ্ছ। কিন্তু ছেলেবেলায় তুমি কি করেছ; মার মুখে সবই ত' শুনেছি। অজিত তোমারই ছেলে, তুমি যদি নষ্ট না হয়ে থাক, আমার অজিতও নষ্ট হবে না।" ব্রজশ্বরী গর্বিত নয়নে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।

নন্দবাবু বিদ্রূপ কণ্ঠে বলিল, "আমি আর ও। আমরা যা করেছি, অজিত—তা।"

ব্রজশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, "নয় কি সে? তুমি যা করেছ হয় ত' অজিত তা পারবে না। হয় ত' বা, তোমার চেয়ে বেশী করবে। যদি না পারে তাতে ত' দুঃখ হবার কিছু নেই। সবাই সব কাজ পারেও না।"

নন্দবাবু বলিলেন, "তার নমুনা ত' দেখতে পাচ্ছি। সে এই বয়সেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।"

ব্রজশ্বরী একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি তার স্কুল ছাড়াটাই দেখছ। তার ত্যাগটা দেখছ না। যে বয়সে ছেলেরা খেলাধুলা করে বেড়ায়, সে বয়সে সে বেছে নিয়েছে কঠোর সৈনিকের কাজ। যে বয়সে মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ পাবার জন্য ছেলেরা লালায়িত হয়, সে তাহা ত্যাগ করে বেছে নিয়েছে, স্বাধীনতা মহামন্ত্র। খাওয়া পড়া, বেশ ভূষা, কিছুই সে চায় না। যে এই সব ছাড়তে পারে। সে কখনো ছোট হয়ে থাকবে না। সে তুমি জেনে রেখো।"

নন্দবাবু আর তর্ক করিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন, "বেশ! বেশ! তোমরা মাতা-পুত্র মিলে দেশ স্বাধীন কর। আমি দেখে খুশী হই।" কথা শেষ করিয়া নন্দবাবু উঠিয়া পড়িলেন, এবং স্ত্রীর পানে চাহিয়া একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

*

বয়কটের জন্য স্কুল কয়েক সপ্তাহ বন্ধ ছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ এই কয়েক দিন ছেলেদের বাড়ী বাড়ী ঘুড়িয়া, যাহাতে ছেলেরা আবার স্কুলে যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন।

অজিত বড়বাজারে পিকেটিং করিতে যাইতেছিল। ব্রজশ্বরী ডাকিয়া বলিলেন, "কাল ত' স্কুল খুলবে। যাবি ত' বাবা?"

"যাব! তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে, আমি ভারত মাতার সেবা চাইনে? তুমি আমার সকলের বড় মা!" অজিত হাসিয়া বলিল।

"জানি বাবা। তুমি কখনো আমার প্রাণে ব্যথা দেবে না। তবু মার প্রাণ কি না।" ব্রজশ্বরী বলিলেন।

"বাবাকে বলো, কাল আমি স্কুলে যাব। তুমি কিছু ভেবো না মা।" কথা বলিয়া অজিত বাহির হইয়া গেল।

বিলাতী কাপড়ের দোকানে অজিতের দল পিকেটিং করিতেছে। কোন ক্রেতাই দোকানে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়। বহু লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজিতদের কাণ্ড কারখানা সব দেখিতেছিল।

হঠাৎ পুলিশ আসিয়া অজিতদের দলকে চলিয়া যাইতে বলিল, অজিত চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিল। তখন পুলিশেরা লাঠি চালাইতে বাধ্য হইল। লাঠি দেখিয়া সকলে ভয়ে পালাইয়া গেল। কেবল অজিত সাহসের সহিত সেখানে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতেছে, বল ভাই, 'বন্দেমাতরম্।' অমনি আসে পাশে হইতে বহুলোকের চিৎকার উঠিল, "বন্দেমাতরম্।" পুলিশের দল খেপিয়া গেল। তাহারা জনতা সরাইবার জন্য লাঠি চালাইল। সহসা একটা লাঠি অজিতের মাথায় লাগিল, তারপর আর একটা। অজিত 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

বেলা দুইটার সময় এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রজশ্বরী তখন ঘরের মধ্যে আরামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘুমের মধ্যে তাহার মনে হইল, অজিত 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিতেছে।

"যাই বাবা। বলিয়া ব্রজশ্বরী ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া দ্রুত চরণে নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, অজিত নাই। তিনি তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তথাপি ব্রজশ্বরী কিছুক্ষণ রাস্তার পানে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় একটা ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল। ব্রজশ্বরী একটু সরিয়া যাইতেছিলেন। সহসা স্বামীকে ব্যস্তভাবে মোটর হইতে নামিতে দেখিয়া, ব্রজশ্বরী একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

মোটর হইতে নামিয়া স্ত্রীকে নিকটে দেখিয়া নন্দবাবু বলিলেন, "কথা বলবার সময় নেই। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির চল। অজিত হাসপাতালে, অবস্থা বড়ই খারাপ।"

মোটর আসিয়া হাসপাতালে থামিল। হাসপাতালের বাহিরে লোকে লোকারণ্য। ব্রজশ্বরী ভীড় ঠেলিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই দেশবন্ধু ও অন্যান্য নেতারা আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ব্রজশ্বরী আসিয়া অজিতের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অজিতের জ্ঞান হয় নাই। নাক, মুখ দিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। একজন নার্স ও ডাক্তার তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে। অজিতের অবস্থা দেখিয়া ব্রজশ্বরীর মাতৃ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু এখন কাঁদিবার সময় নয়। দুর্ব্বল নারীদের মতন কাঁদিয়া তিনি তাহার পুত্রের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে পারেন না। ব্রজশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে। তথাপি প্রাণপণ শক্তিতে ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "কেমন দেখছেন।"

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "আশা কম।"

ব্রজশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। তিনি অজিতের মাথার নিকট বসিয়া, সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলে গৌরীকে তাঁহার প্রাণের আকুলতা জানাইতে লাগিলেন।

সহসা সকলকে চমকিত করিয়া অজিত অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল, "মা!"

ব্রজশ্বরী পুত্রের মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কি বাবা!"

"তোমায় দেখছি না কেন? তুমি কোথায়?" অজিত তাহার হাত দিয়া মাকে খুজিতেছিল, কিন্তু দুর্ব্বল হাত নাড়িতে পাড়িল না।

ব্রজশ্বরী তাহার দেহখানি অজিতের দেহের উপর রাখিয়া বলিলেন, "এই ত' বাবা। আমি তোমার কাছেই বসে আছি।" তিনি পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অজিতের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। শুধু বলিল, "জল!"

নার্স নিকটে ছিল। সে জলের পাত্র লইয়া দাঁড়াইল। ব্রজশ্বরী তাহার হাত হইতে জলের পাত্র লইয়া অতি সন্তর্পণে অজিতের মুখে জল ঢালিয়া দিলেন। জল কিছুটা গলায় প্রবেশ করিল, বাকীটা চোয়াল বাহিয়া পড়িল। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু অজিতের নাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

নার্স অক্সিজেনের চোঙ্গাটা অজিতের নাকে ধরিল।

অজিত কাহাকে কোন কথা বলিল না। সে চুপি চুপি এক অজনা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। সেখানে পুলিশের অত্যাচার নাই, স্বাধীনতা নিয়ে বিপদ নাই, হিংসা, দ্বেষ নাই, দারিদ্রের কশাঘাত নাই, ধনীর ভ্রূকুটি নাই আছে—কেবল, সুখ ও শান্তি। অজিত সেই মন ভোলানো দেশের দিকে চলিল, কেউ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ডাক্তারবাবু নীরবে উঠিয়া গেলেন। দেশবন্ধু চোখ মুছিলেন। অন্যান্য সকলে মুখ ফিরাইলেন। একমাত্র পুত্রশোকে নন্দবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু যাহার সকলের হইতে বেশী কাঁদিবার কথা, তাঁহার মুখে শব্দ নাই, চোখে জল নাই। কিন্তু তাঁহার মুখ ফ্যাকাসে, রক্ত শূন্য। মনে হয় প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

দলে দলে ছেলেরা আসিয়া ফুলের মালা দিয়া অজিতকে সাজাইল। মুখে অগুরু চন্দন লেপিয়া দিল। তারপর তাহারা অজিতকে সমারোহ করিয়া শশ্মানে লইয়া গেল। ব্রজশ্বরী শেষ পর্য্যন্ত অজিতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। শশ্মানের কাজ শেষ করিয়া যখন তিনি বাসায় ফিরিলেন, তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে।

দেহ আর চলে না। তথাপি অচল দেহটাকে টানিয়া লইয়া ব্রজশ্বরী অজিতের শয়ন কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শয্যা শূন্য—অজিত নাই। তাহার মাতৃ হৃদয় হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্রজশ্বরী দেহ বাঁজ পড়ার মতন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার বুক চিড়িয়া শুধু একটু শব্দ হইল,—"বাবা! অজিত।" এবং অজিতের শূন্য শয্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ব্রজশ্বরী পড়িয়া গেলেন।

*

"কোথায় যাচ্ছ?" নন্দবাবু কাতর স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"পিকেটিং কর্ত্তে।" ব্রজশ্বরী উদাস কণ্ঠে বলিলেন।

নন্দবাবু দুঃখিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমার কি ভাবে চলবে।"

ব্রজেশ্বরী মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, "সব ঠিক আছে। পাঁচুর মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে সব পাবে।" ব্রজেশ্বরী চলিতে সুরু করিলেন।

নন্দবাবু আড় চোখে সেদিক পানে চাহিয়া লইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "এই ভাবে কতদিন চলবে।"

ব্রজেশ্বরী চলিতে চলিতে জবাব দিলেন, "যতদিন পারা যায়।" ব্রজেশ্বরী চলিয়া গেলেন। নন্দবাবু হতাশভাবে সেই দিক পানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রজেশ্বরী কংগ্রেস অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, বেলা, মলিনা, সুহাসিনী সকলেই আপন মনে বসিয়া রহিয়াছেন, কেহই পিকেটিংএ যাইবার উদ্যোগ করিতেছে না।

ব্রজেশ্বরী মনে মনে ভাবিলেন এদের হইল কি? কিন্তু তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? সব চুপ চাপ যে,—যাবি নে?"

সকলে একবাক্যে বলিল, "না!"

ব্রজেশ্বরী ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, "না, কেন? কি হ'ল তোদের?"

মলিনা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ছবিদি আসে নি,—তাই। কে আমাদের নিয়ে যাবে ব্রজদি?"

ব্রজেশ্বরী সকলের মুখের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, সকলের মুখে হতাশার ভাব। ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "ছবিদি আসে নি, তাতে কি হয়েছে। আমাদের মন্ত্র কি? সব ভুলে গেছিস্।" এই বলিয়া তিনি গান ধরিলেন, "তোর ডাক্ শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চল রে, একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।"

অমনি সমবেত নারী কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "একলা চল রে।"

ব্রজেশ্বরী অমনি ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে চল।" সবাই এবার রাজি হইয়া গেল।

ছবি বিশ্বাস উপস্থিত না থাকায় দেশবন্ধু বড় ভাবনায় পড়িয়াছিলেন,—"কে এই নারীবাহিনীকে পরিচালনা করিবে।

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "আমি করবো।"

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "পারবে মা?"

ব্রজেশ্বরী হেট হইয়া দেশবন্ধুর পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমি পারব।" দেশবন্ধু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব্রজেশ্বরী আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বল, বন্দেমাতরম্।" অমনি সমবেত নারী কণ্ঠে ধ্বনি হইল, "বন্দেমাতরম্!" নারীবাহিনী গাহিয়া উঠিল, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালীমা, মানুষ আমরা নহি ত' মেষ।" গাহিতে গাহিতে নারী দল ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দেশবন্ধু মুগ্ধ নয়নে তাঁহাদের গমনের পথের দিকে চাহিয়া ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। সহসা কংগ্রেস অফিসের নিকট বজ্র নিনাদে ধ্বনি উঠিল, "বন্দেমাতরম্।" দেশবন্ধুর ধ্যান ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিলেন,—নারী বাহিনীর সম্মুখে ব্রজেশ্বরী দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "বন্দেমাতরম্।" তাঁহার পশ্চাতে নারী বাহিনী, এবং তাঁহাদের ঘিরিয়া একদল যুবক চীৎকার করিতেছে,—"বন্দেমাতরম্।"

দেশবন্ধু সাধারণতঃ কোমল স্বভাব, অল্পেতেই তাঁহার চোখে জল আসে। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়া গেল। তিনি ধরা গলায় সুশীল নামক একটি স্বেচ্ছাসেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই ব্রজেশ্বরী দেবী দু'দিন হ'ল পুত্রহারা হ'য়েছেন। অথচ তার কোন লক্ষ্য নেই। দেশের কাজে ওর কি আনন্দ, কি উদ্যম,—ভারী আশ্চর্য্য মেয়ে। এ তুমি বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও পাবে না ভাই।"

একদিন রাত্রে হঠাৎ তার বার্ত্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, লাহোর হইতে লালাজী আসিতেছেন। ব্রজেশ্বরীকে দেশবন্ধুর খুব প্রয়োজন। সেই একমাত্র নারী বাহিনীকে ষ্টেশনে লইয়া যাইবার উপযুক্ত লোক।

রাত বারটার সময় মলিনাকে সঙ্গে করিয়া দেশবন্ধু ব্রজেশ্বরী দেবীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচুর মা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! কোথায়?"

"ছাদে। ডেকে দেব বাবু?"

"বাবু ?"

"ঘুমাচ্ছেন ! মাকে ডেকে দেব বাবু ?" পাঁচুর মা পুনরায় সেই কথা উত্থাপন করিল।

মলিনা বলিল, "থাক্ আমরাই যাচ্ছি।" তাঁহাদের ধারনা গরমের জন্য ব্রজশ্বরী ছাদে রহিয়াছেন।

উভয়ে দোতালায় উঠিলেন। দোতালা ছাড়িয়া ছাদের সিঁড়ীতে উঠিতে একটু আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন। তাহারা যতই উপরে উঠিতে লাগিলেন, কান্নার শব্দ ততই স্পষ্ট হইয়া তাঁহাদের কানে বাজিতে লাগিল। উভয়ে নিঃশব্দে আসিয়া ছাদে দাঁড়াইলেন। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। সাড়া ছাদ চাঁদের আলো পড়িয়া ধব্ ধব্ করিতেছে। উভয়েই এক সঙ্গে দেখিলেন, আলুলায়িত কুন্তল মুখে পিঠে পড়িয়া দোল খাইতেছে। বক্ষের কাপড় মাটিতে লুণ্ঠিত। অজিতের ফটো বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজশ্বরী নীরবে কাঁদিতেছেন। সে কি কান্না উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া পুত্রহারা জননীর মর্ম্মভেদী কান্না শুনিলেন। তারপর যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন সেই ভাবেই ফিরিলেন।

সিঁড়ী দিয়া নামিতে নামিতে মলিনা বলিল, "আশ্চর্য্য মেয়ে এই ব্রজদি। দিনে কত হাসি, কত আমোদ। দেখে বুঝবার সাধ্য নেই—ব্রজদির পুত্র মরেছে। আমরা বলাবলি করতুম্ কি ধাতু দিয়েই ভগবান ওর অন্তর গড়েছেন। অথচ ও কত অসহায়! কত রাত না জানি এমনি করে কেঁদে কেঁদে কাটাচ্ছে। আজ এ দৃশ্য চোখে না দেখলে, বিশ্বাসই হ'ত না যে ব্রজদি কাঁদতে জানে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ব্রজদির পায়ে গড়িয়ে পড়ি।" মলিনার বুক চিড়িয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। দেশবন্ধু কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

খবর শুনিয়া পরদিন ব্রজশ্বরী আসিয়া কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত হইলেন। গত রাত্রে, দেশবন্ধু যে শোকসপ্ত রমণী দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার চিহ্ন নাই। কে বলিবে এই রমণী কাল সারারাত পুত্রের জন্য কাঁদিয়াছেন।

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।" নারী দল লইয়া ব্রজশ্বরী গাহিয়া উঠিলেন, "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।" তারপর বাহির হইয়া পড়িলেন।

ব্রজশ্বরীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া দেশবন্ধু ভাবিতে লাগিলেন,—ব্রজশ্বরী মানব না,—দেবী। বাঙ্গালায় যদি ব্রজশ্বরীর মতন আরও দশটি মেয়ে তিনি পাইতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। সহসা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া নারী কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল,—

"বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্।" দেশবন্ধুর চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল।

ষ্টালিন ও কমিউনিজম্

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বিশাল রুশিয়ার ডিক্টেটর বা এক নায়ক যোসেফ ষ্টালিন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জিয়া আখ্যায় অভিহিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজধানী তিফলিসের নিকটবর্ত্তী গোরী নামক ক্ষুদ্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ইয়োসিফ ভিসারিণো-ভিচ্ ঝুগাশভিলি। 'ষ্টালিন' এই নাম নাকি লেনিন রাখিয়াছিলেন। ষ্টালিন এই রুশ শব্দের অর্থ ষ্টিল বা ইস্পাত। লেনিন ষ্টালিনের দেহ-মনের লৌহবৎ দৃঢ়তা দেখিয়া এই নাম দিয়াছিলেন বলিয়া একদল লোকের বিশ্বাস। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে ১৯১০

ষ্টালিন

বা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এই প্রবল বিপ্লবীকে ষ্টালিন, এই ছদ্মনাম বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই ছদ্মনাম ধারণের সময় লেনিন ষ্টালিনকে ভালভাবে চিনিতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ষ্টালিনের পিতা ছিলেন কব্‌লার বা জুতা মেরামতকারী চর্ম্মকার। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কৃষকের কাজ করিতেন। মুসোলিনী-পরিবারের মত এই ঝুগাশভিলি-পরিবারও দারুণ দৈন্য-দারিদ্র্যের দ্বারা দলিত ছিলেন। তবে দারিদ্র্য সত্ত্বেও বালক যোসেফ লেখাপড়া শিখিতে সমর্থ হন। জননীর ইচ্ছায় ইনি ১৫ বৎসর বয়স হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিফলিসের 'অর্থোডক্স থিয়োলজিকাল সেমিনারী' নামক খৃষ্ট-ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার স্কুলে পড়িয়াছিলেন। মুসোলিনীকেও মাতার ইচ্ছাতেই এই জাতীয় শিক্ষায়তনে পড়িতে হইয়াছিল। ইউরোপের আর একজন একনায়ককেও মায়ের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। ইঁহার নাম কামাল আতাতুর্ক। তিন জনের জননীই প্রিয়তম পুত্রকে ধর্ম্মযাজকের জীবন যাপন করাইবার জন্য আগ্রহান্বিতা ছিলেন। মানুষ ইচ্ছা করে একরূপ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয় অন্যরূপ। যোসেফের জননী যোসেফকে ধর্ম্ম-প্রাণ পুরোহিত ও প্রচারক করিতে চাহিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হইল বিপরীত। তাঁহার সেই প্রিয়তম পুত্র যোসেফ শান্ত গম্ভীর গীর্জ্জাগৃহগুলিকে কোলাহলে কম্পিত কল-কারখানায় পরিণত করিলেন, কঠোর করে ধর্ম্মযাজকের জীবনের মূলে কুঠারঘাত করিতে কণামাত্রও কুণ্ঠানুভব করিলেন না। কামাল আতাতুর্কও মসজেদগুলিকে শষ্যা-গারে রূপান্তরিত করিয়া মাতার ধর্ম্মযাজক সাজাইবার আকাঙ্ক্ষাকে পরিহাসে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যখন খিলাফৎ আন্দোলন চালাইতেছেন এবং খিলাফৎ তহবিলের জন্য টাকা তুলিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন তখন মুস্তাফা কামাল ধর্ম্মগুরু খলিফার পদকে বিলুপ্ত করিয়া খিলাফৎকে অতীতের ইতিহাসে পরিণত করিতেছেন। এই তিন জনের মধ্যে একমাত্র মুসোলিনীই ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন। সে যাহা হউক, যোসেফের জননী পুত্র সম্বন্ধে যেটুকু উচ্চাশা পোষণ করিতেন তাঁহার কবলার পিতা সেটুকুও করিতেন না। এবিষয়ে হিটলারের জীবনের সহিত ষ্টালিনের জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ষ্টালিনের পিতার ইচ্ছা পুত্র যোসেফকে তাঁহার অবলম্বিত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে কিন্তু তাঁহার মাতার ইচ্ছা নয় প্রিয়তম পুত্র কব্‌লারের কদর্য্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। হিটলারের মাতাও চাহিতেন, পুত্র বড় হইবে, বড় কাজ

করিবে। অথচ হিটলারের পিতা পুত্রকে অকর্ম্মা এমন কি অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া মনে করিতেন। মাতাদের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পুত্রদের ভাবী-জীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। ষ্টালিনের মাতা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্ব্বক পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে ষ্টালিনের মনে জার্ম্মান অর্থনৈতিক কার্ল মার্কসের ধনসাম্যবাদের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। কার্ল মার্কস তাঁহার 'ড্যাসক্যাপিটল' নামক গ্রন্থে এই মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষ্টালিনের বিপ্লবী-মনোভাবের কথা জানিতে পারিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন, এইরূপ শুনা যায়। অবশ্য এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এই বিতাড়ন ব্যাপারকে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে দারুণ দৈন্যের জন্য যোসেফের দেহ (উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে) এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিল যে তাঁহার মাতাই চার বৎসর পরে তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।

কোন বিখ্যাত লেখক ষ্টালিন প্রসিদ্ধি পাইবার পর তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই জননায়কের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান। এই জর্জ্জিয়াবাসিনী মহিলার নাম একাটেরিণা যুগাশভিলি। ইনি বলেন, "বাল্যকালে সোসো (মাতা পুত্র যোসেফকে আদর করিয়া সোসো বলিতেন) সম্পূর্ণ শিষ্ট শান্ত ছেলে ছিল।" তিনি ইহাও বলেন, পুত্রের বিরাট সাফল্য তাঁহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টালিন মাতাকে জর্জ্জিয়া হইতে মস্কোতে লইয়া যান এবং তথায় তিনি ক্রেমলিন নামক বিশ্ববিখ্যাত রাজপ্রাসাদে পুত্রের সহিত একমাস বাস করেন। যাঁহার জীবন পর্ব্বতাকীর্ণ জর্জ্জিয়ার নিস্তব্ধ নির্জ্জনতার বক্ষে যাপিত হইয়াছে কর্ম্মকোলাহল কম্পিত ক্রেমলিন তাঁহার ভাললাগিবে কেন? এ যেন স্বতন্ত্র জগৎ। তাঁহার শিষ্ট শান্ত সন্তান সোসো আজ এ কি হইয়াছেন? বৃদ্ধা বুঝিতেই পারে না ব্যাপার কি! বিশেষ করিয়া তাঁহার পুত্র কোন্ কার্য্যের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহা তিনি এই এক মাসেও নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। বৃদ্ধার অন্তরাত্মা নিত্যই জর্জ্জিয়ার পার্ব্বত্য নির্জ্জনতার জন্য কাঁদিত। যাহাকে দশমাস গর্ভে ধরিয়া কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন সেই ছোট্ট সোসোর নাগাল আজ তিনি পাইতেছেন না। রাজধানীর আবহাওয়ায় এক মাসেই বৃদ্ধার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জননীর জল হইতে উত্তোলিত মৎস্যবৎ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ষ্টালিন একমাস পরে তাঁহাকে জর্জ্জিয়াতে পাঠাইয়া দেন। পার্ব্বত্য প্রকৃতির বক্ষে বিরাজিত পল্লীর কোলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন সন্দেহ নাই। তবে অন্তরতলে একটা তৃপ্তি লইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন, তাঁহার সোসোর চক্ষে আজ সারা রুশিয়া পরিপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরতন্ত্রীতে একটা বিষাদের সুরও মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কারিত হইতেছিল, সেই শতসাধের সন্তান সোসো আজ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্তের অতীত।

লেনিন

জর্জ্জিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বটে কিন্তু ইহা ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং ষ্টালিনকে ইউরোপিয়ান বলা চলে না, তিনি এশিয়াবাসী। জর্জ্জিয়ানরা রুশও নহে। তাহাদিগকে ককেশিয়ানরক্তযুক্ত একপ্রকার বর্ণ-সঙ্কর বলিলে ভুল হয় না। ইংরেজী ভাষার সহিত পর্ত্তুগীজ ভাষার যতখানি পার্থক্য খাস রুশ-ভাষা ও জর্জ্জীয় ভাষার বৈষম্য তদপেক্ষা

অল্প নহে।. আমাদের দেশে নেপালী-লেপচা বা খাসিয়া-নাগা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মত জর্জ্জিয়ানরা দৃঢ়দেহ পার্ব্বত্য জাতি, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দুর্দ্দান্ত সীমান্ত সম্প্রদায়ও বলা চলে। পার্ব্বত্যজাতি ও সীমান্তবাসী সম্প্রদায় সুলভ সাহস ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের অধিকারী তাহারা। পাহাড়িয়া জাতি বলিয়া জর্জ্জিয়ানদের পায়ের পেশী বিশেষ সবল এবং গায়ের জোরও খাস রুশদের অপেক্ষা অধিক। আর্ম্মেনিয়ানদের ন্যায় জর্জ্জিয়ানদেরও স্বতন্ত্র জাতীয় ইতিহাস আছে। জর্জ্জিয়ান নরনারীর কেশ-কলাপের বর্ণকে লাল ও কালোর সমন্বয় বলা যায় এবং তাহাদের আঁখি-তারকার বর্ণ নিকষ-কৃষ্ণ।

ষ্টালিনের বিপ্লব-বহ্ণি জ্বালিবার বাসনার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার বাল্যজীবনের দারুণ দারিদ্র্যের কথা আমাদের মনে পড়িবে। দারিদ্র্যের নির্দ্দয় কষাঘাত বিলাসের স্রোতে ভাসমান ঐশ্বর্য্যশালী অভিজাত সমাজের বা বুর্গোয়িদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং কার্ল মার্কসের ধনসাম্যমন্ত্র বাল্যকালেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রুশিয়ার বণিকদের অত্যাচারে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল বলিয়াই এই জার্ম্মান পণ্ডিতের মতবাদের বীজ অনুকূল আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিক পাইয়া শীঘ্রই প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইয়াছিল। তিফ্লিসের সেমিনারীতে পাঠকালে ধর্ম্মযাজকের জীবনযাপন প্রণালী তাঁহার বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কোন চিহ্ন এই সকল যাজকদের জীবনে ছিল না। তাহাদিগকে বিলাসী অভিজাত সমাজের একটা অংশ বলিলে ভুল হইত না। ধর্ম্মযাজকরা কিরূপ অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাসপুটনের জীবন। ষ্টালিন বিপ্লববাদের বহ্নি বক্ষে লইয়া থিয়োলজিকাল সেমিনারী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। ইহার পর ধনসাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত মার্কসপন্থী বন্ধুবর্গকে লইয়া সেই অগ্নি-মন্ত্র সমগ্র রুশিয়া ব্যাপিয়া প্রচারিত করিতে প্রাণপণ প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৯৮ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ এই ১৯ বৎসর ষ্টালিন গোপনে বিপ্লববহ্নি বিস্তৃত করিবার জন্য যে বিরামবিহীন চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাকে বিস্ময়কর বলা চলে। করুণা-কণিকা হীন কর্ত্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া সহস্র বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি ধৈর্য্যহারা না হইয়া কঠোরতম কর্ত্তব্য সম্পাদন করা। ধরা পড়িলে জারের যমালয় সদৃশ কারাগারে অবস্থান অথবা তুষার শীতল সুদূর সাইবেরিয়ায় সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন বা মৃত্যু। অন্ধকার কারাগার ও সাইবেরিয়ার অত্যাচার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর। জার-শাসিত রুশিয়ার আদি সম্যবাদী সঙ্ঘ সংগঠন ব্যাপার বড় কঠিন! নিশঃঙ্ক হৃদয়ে অসংখ্য সঙ্কট সঙ্কুল পন্থায় অবিরাম পর্য্যটন! হিটলার ও মুসোলিনী উভয়েই বিপ্লবী। উভয়েই শাসক সঙ্ঘের অসন্তোষজনক কার্য্য করিয়া কিছুকালের জন্য কারাগৃহে গিয়াছেন। কিন্তু যোসেফ ষ্টালিনের পক্ষে কারাগৃহই যেন বাসগৃহ। জারের পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শুধু যে তাঁহাকে বহুবার বন্দিশালায় বাস করিতে হয় তাহা নহে, তাঁহার প্রতি পাঁচবার সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের দণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই পাঁচবারের ভিতর চারবার নির্ব্বাসন হইতে পলায়ন করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় তিনি প্রদান করেন তাহা রোমাঞ্চকর রোমান্সের বিষয়ীভূত হইতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমবারের নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি লাভ করেন। সেবার তুষার-শীতল সুমেরু মণ্ডলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

ষ্টালিন পুরাদস্তুর এনার্কিষ্ট ও টেরারিষ্ট ছিলেন। এই এনার্কিজম জিনিষটার জন্মস্থানই জারশাসিত রুশিয়া। ইহাকে জারের স্বৈরশাসনজনিত অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া বলা চলে। পরে অন্যান্য উৎপীড়িত জাতি এই পন্থায় পর্যটন করিতে আরম্ভ করে। ইহাই 'কাণ্ট অফ দি বম্ব' বা বোমাবাদ। কমিউনিষ্ট পার্টি বা ধনসাম্যবাদী সঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অর্থের আবশ্যক কিন্তু অর্থ কোথায়? সুতরাং দেবী ঠাকুরাণী বা ভবাণী পাঠক, রবিনহুড বা রব রয়ের পন্থা অবলম্বন না করিলে চলিল না। এই সময় কমিউনিষ্টদলের দ্বারা ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দস্যুতা ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। রুশিয়ার এনার্কিষ্টদলই এইরূপ স্বদেশী দস্যুতার পথ প্রদর্শক। এই জাতীয় বহু ব্যাপারের সহিত ষ্টালিনশুধু সংশ্লিষ্ট যে ছিলেন তাহা নহে, এই সমস্ত অনুষ্ঠিত হইবার সময় তিনি দলপতি বা পরিচালকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইবার সময় প্রায় বিশজন

লোক হত হইয়াছিল। সরকারী টাকা জাহাজযোগে যাইতেছিল। বোমার সাহায্যে জাহাজখানি ধ্বংস করিয়া সেই টাকা অপহরণ করা হয়। এই লুণ্ঠনলীলার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় ১৫ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। এই ব্যাপারেও ষ্টালিন দলপতি ছিলেন। হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া পার্টির উপরিওয়ালারা ষ্টালিনের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অর্থ তাঁহাদের আকাঙ্খিত বটে কিন্তু এতখানি অনর্থের বিনিময়ে অর্থ তাঁহারা চান না। এই উপরিওয়ালাদের অন্যতম লেনিনের ইচ্ছায় ষ্টালিনকে সঙ্ঘ হইতে কিছুকালের জন্য বিতাড়িত করা হয়।

এই নির্ব্বাসন ও কারাবাস ছাড়া যে মুক্ত জীবনরূপ অবকাশ বা ফাঁকটুকু ষ্টালিন মাঝে মাঝে লাভ করিতেন তাহা নানা প্রকার কার্য্যে কাটিত বলা চলে। তিনি শুধু ধ্বংসলীলা বা লুট-তরাজই করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হয়। কাস্পিয়ান সাগরতীরে বিরাজিত বাকুতে বাসকালে ভ্রেমিয়া নামক একখানি বলশেভিক কাগজ সম্পাদন করিতেন! কাগজখানি জর্জ্জিয়ান ভাষায়। ইহা ছাড়া সাম্যবাদীসঙ্ঘের সভায় যোগদিবার জন্য ষ্টকহলম, ক্রাকাউ ও প্রেগে গিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 'সাম্যবাদ ও জাতীয় সমস্যা' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐ সময় তিনি রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় মহাসভার ডুমার সোসিয়াল ডেমক্রাটিক পার্টির বলশেভিক বিভাগের নেতা ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, সঙ্ঘের মুখপত্র প্রাভদারও সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিন পুনরায় গ্রেপ্তার হন, এবং তাঁহার উপর নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহাই তাঁহার শেষ নির্ব্বাসন।

তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সঙ্কট সঙ্কুল প্রথম জীবনকে পরবর্ত্তী প্রকৃত কর্ম্মময় বিচিত্র জীবনের আয়োজন বা ভিত্তিভূমি বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। রুশিয়ার বিপ্লবী নেতাদের জীবন সত্য সত্যই অত্যন্ত বিচিত্র ও বিস্ময়কর। ষড়যন্ত্রকারী ও নরহন্তা দুর্দ্দান্ত দস্যুদল বিবেচিত হওয়ায় যাঁহাদের প্রথম জীবনের অধিকাংশকাল কারাবাস ও নির্ব্বাসনে অতিবাহিত হইয়াছে তাঁহারাই রুশিয়ার সর্ব্বশক্তিমান শাসক সঙ্ঘে পরিণতি লাভ করিলেন। ষ্টালিনের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে। ইনি এবং ইঁহাদের অনুচর সহস্র সহস্র ব্যক্তি গুপ্ত ষড়যন্ত্র হইতে ব্যাপ্ত সংগঠনে, বিদ্রোহ হইতে শাসনযন্ত্র পরিচালনে মনোনিবেশ করিলেন। কাল যাহাদিগকে নির্ম্মম কর্ত্তৃপক্ষের রোষ-রক্ত চক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য লুকাইয়া থাকিতে হইত আজ তাঁহারাই রাজপুরুষ বা কর্ত্তৃপক্ষ। বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রনীতিক পরিষদ পলিটবুরোর জন্মগ্রহণ করিবার দিন হইতে ষ্টালিন উহার সদস্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর পলিটবুরোর জন্ম-দিবস। বলশেভিক রুশিয়ায় প্রথম পরিচালক লেনিনও পলিটবুরোর বিশিষ্ট সদস্যদের অন্যতম। ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, সোকলনিকভ এবং বুবনভ এই অপর প্রধান সদস্যদের নামও উল্লেখযোগ্য। বলশেভিজমের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহনকারী এই শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট অষ্ট সদস্যের মধ্যে লেনিন, ষ্টালিন ও ট্রট্স্ককে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম 'ত্রিমূর্ত্তি' বা 'ত্রয়ী' আখ্যায় অভিহিত করা চলে।

যখন রুশিয়ার সিভিলওয়ার অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম বা গৃহ-বিবাদ চলিতেছে তখন ষ্টালিন অপেক্ষা ট্রট্স্কিই অধিক কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমরা এখানে লড়াই করার কথাই বলিতেছি। অবশ্য ষ্টালিনও বিপ্লবী সামরিক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং যোদ্ধারূপে উক্রেইনে ও পেট্রোগ্রাদে গিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘপতি লেনিন ষ্টালিনকে সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদকের পদ প্রদান করেন। লেনিনের মনে ষ্টালিনের প্রতি অনুরাগের পরিবর্ত্তে বরাবরই একটা বিরাগের ভাব বিদ্যমান ছিল। প্রধান সম্পাদক পদে ষ্টালিনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর লেনিনের মনে হইল তিনি কাজটা ভাল করিলেন না। লেনিনের এই সময়কার উক্তি উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। সঙ্ঘের সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া লেনিন বলিয়াছেন—কমরেড ষ্টালিন অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক। আমি কমরেডদিগকে প্রস্তাব করিতেছি তাঁহারা প্রধান সম্পাদকের আসন হইতে তাঁহাকে সরাইবার কোন উপায় আবিষ্কার করুন। তাঁহার স্থানে এমন একজন লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে যিনি অধিকতর ধৈর্য্যশীল, অধিকতর বাধ্য, অধিকতর ভদ্র, অন্যান্য কমরেডদের প্রতি অধিকতর মনোযোগী এবং অল্প খাম-খেয়ালী।

সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত ষ্টালিনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল রুশের বিভিন্ন সম্প্রদায়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি শক্তি-

শালী বিরাট জাতিতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা। অ-রুশ ষ্টালিন এই কার্য্য করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রায় একশত পরস্পর বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রুশিয়ায় রহিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেই অ-রুশ। এক একটি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এক একটি প্রদেশকে লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হইল এবং সেই রাষ্ট্রগুলির সমষ্টির নাম হইল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—'ইউ, এস, এস, আর' অর্থাৎ 'ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ সোভিয়েট রুশিয়া' এই নামকরণ ষ্টালিনই করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাপার সমূহের দিক দিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব মস্কো মহানগরস্থ শাসন-পরিষদের হস্তে ন্যস্ত।

ষ্টালিন এবং ট্রট্স্কি উভয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উভয়ে বিভিন্ন স্বভাবের বলিয়া অনুরাগের পরিবর্ত্তে পরস্পর শুধু বিরাগের নয়, দারুণ বিদ্বেষের পাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। লেনিনও ষ্টালিন সম্বন্ধে সদ্ভাব পোষণ করিতেন না, তাহাও বলা হইয়াছে। শুধু ষ্টালিনের চরিত্রগত দৃঢ়তা দেখিয়া লেনিন তাঁহাকে সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেনিন জানিতেন ষ্টালিন না হইলে চলিবে না। ডুরান্টির মতে, লেনিন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর সঙ্ঘের প্রধান পরিচালকের আসন ষ্টালিনই অধিকার করিবেন। রুশিয়ায় একটা প্রবচন প্রচলিত আছে—লেনিন ষ্টালিনকে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু ষ্টালিন কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। পলস্কোর প্রভৃতির বিবৃতি হইতে জানা যায়, লেনিনের মৃত্যুর চার মাস পূর্ব্বে উভয় নেতার মধ্যে বিশেষ বিবাদ বিসম্বাদ সঙ্ঘটিত হয়। এই বিবাদের কারণ, লেনিনের ধারণা জন্মিয়াছিল ষ্টালিন তলে তলে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া প্রধান নেতার স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

লেনিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবামাত্র ষ্টালিন তাঁহার শূন্য আসন অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। লেনিনের কফিন বা শবাধার ষ্টালিন ও জিনোভিয়েভ বহন করেন। তখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। সঙ্ঘকে নিজের মনের মত করিয়া সংগঠিত করিতে তাঁহার পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। যেমন করিয়া সুদক্ষ কৃষক সুন্দর রূপে শস্যোৎপাদন করিবার জন্য ক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করে তেমনই নির্দ্দয় ভাবে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত বা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। প্রধান বিরোধী ট্রট্স্কি সুদূর মেক্সিকোতে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সেখানেও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইল না। অল্প দিন হইল নির্ম্মম হত্যাকারীর হস্তে তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের উপরেও চিরযবনিকা পতিত হইয়াছে। সুতরাং ষ্টালিন আজ অপ্রতিহত আধিপত্যের অধিকারী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বা এক নায়ক। পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আধিপত্য স্বল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। হিটলার ও মুসোলিনী প্রবল প্রভাবশালী জননায়ক সন্দেহ নাই কিন্তু ষ্টালিন যত লোকের উপর প্রাধান্য প্রসারিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্য অসাধারণ হইলেও সেরূপ বিপুল বা ব্যাপক নহে।

অনেকে মনে করিয়াছিলেন লেনিনের পর ট্রট্স্কিই রুশিয়ার এক নায়ক হইবেন কিন্তু তাহা হইল না। কেন হইল না এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে। তবে কি ট্রট্স্কি নেতৃত্বের উপযুক্ত নহেন বলিয়াই রুশিয়ার ভাগ্যবিধাতা তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন, ষ্টালিন ভাগ্যনিয়ন্তার হস্তচালিত যন্ত্ররূপে সেই অপসারণ ব্যাপারের সহায়তা করিলেন মাত্র? আমাদেরও বিশ্বাস যোগ্যতর বলিয়াই ষ্টালিন লেনিনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। অক্ষমতার জন্য অদৃষ্টের ইঙ্গিতে ট্রট্স্কিকে প্রথমে রুশিয়া হইতে এবং পরে দুনিয়া হইতে সরিয়া যাইতে হইল। অবশ্য ট্রট্স্কিও শক্তিশালী ও প্রতিভাবান পুরুষ কিন্তু যে সব গুণ থাকিলে রুশিয়ার ন্যায় সুবিশাল দেশের বা শতাধিক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে সংগঠিত বিরাট জাতির উপর আধিপত্য করা যায় ট্রট্স্কির তাহা ছিল না। ষ্টালিন ও ট্রট্স্কি এই দুই জন যেন বিভিন্ন জগতের জীব। কার্ল মার্কস-প্রস্তুত সাম্যবাদের সেতু বা সূত্রও দুই জনকে সম্মিলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ষ্টালিন ট্রট্স্কিকে অভিজাত ও অভিনেতা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতেন। ট্রট্স্কি ষ্টালিনকে চাষা, বিশ্বাসঘাতক, বর্ব্বর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিতেন। প্রবল কমিউনিষ্ট হইলেও ট্রট্স্কির প্রকৃতির ভিতর অভিজাত-সুলভ ভাবধারা প্রবাহিত ছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি ছিল প্রখর, সাহস ছিল প্রবল এবং তিনি ছিলেন মার্জ্জিত রুচি ও কায়দা-দুরস্ত লোক। অবশ্য প্রথম দুইটি গুণ ষ্টালিনেরও আছে কিন্তু শেষের দুইটি তাঁহার স্বভাবে আদৌ নাই। ট্রট্স্কি ষ্টালিনকে এতদূর ঘৃণা করিতেন যে সঙ্ঘের সভায় ষ্টালিন যেমন বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন তিনি অমনই কোন সংবাদপত্র তুলিয়া লইয়া তাহা পাঠে রত হইতেন। যেন ষ্টালিনের উক্তির ভিতর শুনিবার উপযুক্ত কিছুই নাই।

কোন বিখ্যাত লেখক উভয়ের স্বভাবের বৈষম্য বা বৈপরীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ইনি বলেন—ষ্টালিনকে আগ্রহশীল রাজনৈতিক এবং সভা-সমিতির লোক বলা চলে। ট্রট্স্কি ঠিক উল্টা। তিনি সভাসমিতির মানুষ আদৌ নন্। ইণ্ডিভিজুয়ালিষ্ট বা ব্যক্তিত্ববাদী যাহাকে বলে তিনি তাহাই। তিনি নিঃসঙ্গতা ভালবাসেন। বিশ বৎসর ব্যাপিয়া সাম্যবাদী সঙ্ঘের সহিত

সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি বলশেভিক বা মেনশেভিক এই দুইটি দলের কোনটির প্রতিই বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ষ্টালিনের ধৈর্য্য অনন্যসাধারণ—আশ্চর্য্যজনক। যেন রক্ত মাংসের মানুষ তিনি ন'ন—তাঁহার পেশী ও অস্থি যেন প্রস্তরে প্রস্তুত। তিনি যেন শীতোষ্ণ বা সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অনুভূতিশীল সাধারণ মানুষ ন'ন—যেন তিনি পাথরের তৈয়ারী প্রতিমা বা ইকন। উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার তাণ্ডবনর্ত্তন, লণ্ডভণ্ডকারী প্রচণ্ড ভূকম্পন, বজ্রাঘাত, সব নীরবে সহিয়া তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যেমন দাঁড়াইয়া থাকে ষ্টালিনও ঠিক তেমনই সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যদিকে ট্রট্স্কি গ্রীক ও পৌরাণিক স্যাটির নামক উপদেবতা-দের মত চিরঅধীর—চিরচঞ্চল। ষ্টালিন মৌণী ও সাবধানী। ট্রট্স্কি সঙ্ঘপ্রিয় বা সঙ্গপ্রিয় না হইলেও মুক্তপ্রাণ, উৎসাহী ও কথোপকথনে অনুরাগী। ষ্টালিন বোমা-নিক্ষেপ দক্ষ বিশিষ্ট এনার্কিষ্ট বা টেরারিষ্ট। ট্রট্স্কি এই সকল নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের শুধু বিরোধী নয়—এই জাতীয় সঙ্ঘটনের সংবাদ তাঁহাকে ভয়ে অভিভূত ও স্তম্ভিত করে। তখন কে জানিত নিয়তি তাঁহার জন্য কোন নিষ্ঠুর টেরারিষ্টের হস্তে নির্ম্মম মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন? ষ্টালিন ষড়যন্ত্র করিতে বা গোপনে কল টিপিয়া কার্য্য সাধন করিতে অদ্বিতীয়। তিনি অকুণ্ঠ ও অকরুণ কঠোর কাজের লোক। অন্যদিকে ট্রট্স্কিকে ভাবজগতের অধিবাসী এবং আবেগশীল ও অভিমানী বলা চলে। ষ্টালিনের সংগঠনী শক্তি বিস্ময়কর। ট্রট্স্কিকে সু-রাজনীতিক আদৌ বলা চলে না। তিনি মিটমাট বা আপোশ করিতে আদৌ জানেন না এবং তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া কাজ করা কঠিন। এমন কি উভয়ের হাস্য করিবার ভঙ্গীও বিভিন্ন। শিকার গলাধঃকরণের পর শার্দ্দুলের পক্ষে হাস্য করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বলিব ষ্টালিনের হাস্য সেই প্রকার। অন্যদিকে ট্রট্স্কির হাস্য সরস শিশু হাস্যের মত উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল ও স্বাভাবিক। নির্ব্বাসিত হইবার পর উভয়েই সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করেন। ষ্টালিন পলান স্থির ও গম্ভীর ভাবে, কূট-কৌশল সহকারে। ট্রট্স্কি টেম্পেষ্ট নাটকের এরিয়েলের মত চঞ্চল চরণে বন্ধন দশা হইতে বিমুক্ত বাতাসের বুকে সহসা লাফাইয়া পড়েন বলিলে ভুল হয় না। একই পন্থার পর্য্যটক বা একই মন্ত্রের সাধক হইলেও উভয়ের মধ্যে মতগত বিভিন্নতাও বিদ্যমান। ট্রট্স্কির মত, কমিউনিজম ধনসাম্যবাদ বহুদেশে বিস্তৃত না হইলে উহার সম্পূর্ণ সাফল্য সম্ভব না, শুধু রুশিয়া এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে চলিবে না, সমগ্র জগৎকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ষ্টালিন বলেন, আগে আমরা আমাদের দেশে পরীক্ষা করিয়া—কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করিয়া দেখি, পরে আমাদের কৃতকার্য্যতা দেখিলে অন্যান্য দেশ সহজেই এই পন্থা অনুবর্ত্তন করিবে। ভাবপ্রবণ ট্রট্স্কি কমিউনিজমের প্রসার সাধনের জন্য অধীর হইয়াছিলেন। ধৈর্য্যশীল ষ্টালিন বলিতেছিলেন—ধীরে, বন্ধু, ধীরে! আমাদের উদার আদর্শ বিস্ময়কর সাফল্য দেখিলে বিপ্লববহ্নি আপনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিস্তার লাভ করিবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ষ্টালিনের শিক্ষা কতদূর? অবশ্য কোন বিশ্বালয়ের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক হইবার উপযুক্ত উচ্চ-শিক্ষার অধিকারী তিনি নহেন তবুও তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলিতে হইবে। বিশেষ দর্শনশাস্ত্রে ও ইতিহাসে তাঁহার অধিকার আছে। বাহির দেখিয়া অনেকে (ষ্টিল বা ইস্পাতের মত বলিয়া ষ্টালিন নামধারী) এই লোকটির মধ্যে শুধু ইন্‌স-টিংট্ বা স্বভাব বুদ্ধি এবং পৈশিকশক্তির বিকাশ দেখিতে পাইবেন—মস্তিষ্ক বা মেধার উৎকট দেখিবার আশা হয় ত' করিবেন না। কিন্তু লোকটির ভিতর দেখিলে বুঝা যাইবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। ষ্টালিন বক্তৃতা করিবার সময় প্লেটো এবং ডনকুইকসোট উভয় হইতে উক্তি উদ্ধৃত করেন। ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইতিহাস ও রাজনীতিক ব্যাপারসমূহের সংবাদ সম্যকরূপে অবগত। সুবিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মিঃ ওয়েলসের সহিত কথোপকথনে ইনি ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যাহা মিঃ ওয়েলসের স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহা কম কথা নহে। কারণ এইচ, জি, ওয়েলসের প্রগাঢ় ঐতিহাসিক জ্ঞানের কথা সকলেই জানেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে একদল বলশেভিক সাহিত্যিক ষ্টালিনের নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থনা জানাইতে আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তোমরা যাহা লেখ তাহাকে অসার আবর্জ্জনা বলিলে অন্যায় হয় না। সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমি যেমন পড়িয়া থাকি তেমনই তোমরাও সেক্সপিয়ার পড়, গোটে পড় এবং অন্যান্য ক্লাসিক্সও অধ্যয়ন কর। [ক্রমশঃ

জ্ঞানদাস

শ্রীকালিদাস রায়

এক

জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও খাঁটী বাংলা দুই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন রচনায় ব্রজবুলি ও বাংলা দুই ভাষার মিশ্রণ আছে।

সাধারণতঃ কবি যেখানে প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,—যেখানে তিনি তাঁহার নিজস্ব মাতৃভাষারই আশ্রয় লইয়াছেন এবং মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, যেখানে তিনি মামুলী ধরণে রূপাদি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন—যেখানে ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা মণ্ডনকলার (Decorative art) চাতুর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা কোন কবি-প্রসিদ্ধির ধারা (Convention and tradition) অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, সেখানে বিদ্যাপতির পদানুবর্ত্তী হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় খুব বেশী। কবি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে ছন্দ, ভাষা বিন্যাস, উপমাভঙ্গী, বর্ণনাভঙ্গীর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে জ্ঞানদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষা বলিয়াই মনে হয়। খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশী। চণ্ডীদাসের গভীর আকূতি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে বারবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভাব ভাষা একই। যেমন—

(১)

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলক পুরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥—চণ্ডীদাস

(২)

গুরুগরবিত মাঝে রহি সখি সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥—জ্ঞানদাস

চণ্ডীদাসের প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় এত বেশী যে, জ্ঞানদাসের অনেক পদ চণ্ডীদাসের নামে এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদ জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পল্লীজীবন-মাধুর্য্য ও গভীর গার্হস্থ্য ভাব জ্ঞানদাসে নাই। জ্ঞানদাসের রচনায় অনেক কিছুই নাই কিন্তু যাহা আছে তাহা এক গোবিন্দদাস ছাড়া অন্য কোন শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবির রচনাতেও নাই।

কবির রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য আছে- বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। জ্ঞানদাস গৌরচন্দ্রিকায় গৌরাঙ্গের প্রেমাবেশে বিকশিত রাধা-কৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যের অপূর্ব্বতা দেখাইয়াছেন। তিনি কলিকালকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছেন…কারণ, এই কালে শ্রীচৈতন্যের অবতার হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, শ্রীরাধার রূপবর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, গোষ্ঠবিহার, অনুরাগ, সম্ভোগ, মিলন, রাসলীলা, দানলীলা, অভিসার, মান, মানভঞ্জন, খণ্ডিতার আক্ষেপ, বিপ্রলব্ধার উল্লাস, মথুরা যাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে জয়দেব হইতে যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে—কবি সেই ধারা অবলম্বন করিয়াছেন।

রূপবর্ণনায় উলট কদলী, কনক মহেশ, কষিতকাঞ্চন, তিলফুল, সিরিফল (শ্রীফল), বাঁধুলী ইত্যাদির বিধিমত সমাবেশ আছে—কিন্তু রূপ বর্ণনার বাড়াবাড়ি নাই। পূর্ব্বরাগের আয়োজনেও বাড়াবাড়ি নাই। 'স্বপ্নদর্শনের' দ্বারা কবি পূর্ব্বরাগের অধিকাংশই সমাপ্ত করিয়াছেন। দুই একটি পংক্তিতে পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন। যেমন—

১। হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিলাইতে পথের নিকটে রয়॥

২। শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা—ইত্যাদি

পদ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কানুর প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির কথা কবি অতি অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ন কোণে চায়।
… …
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়।

চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসও লীলাবিভাবের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
বোলইতে বচন অল্প অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মু চুকাই॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জানু অমিয়া উঘারি॥

এই চমৎকার রসচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্যেও দুর্লভ।

কবি গোষ্ঠবিহারকে বাদ দেন নাই—কিন্তু সখ্যভাবকে তিনি প্রাধান্য দেন নাই। সুবল সাঙ্গাতকে অবশ্য মনের কথা বলিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তাহা মধুর ভাবেরই উন্মেষের জন্য। বাৎসল্যভাবের কবিতাও এই কবির নাই। অনুরাগের গভীরতা দেখাইবার জন্য কবি চেষ্টার ক্রুটী করেন নাই। মাঝে মাঝে কবির লেখনী হইতে যে সমস্ত চমৎকার পংক্তি বিগলিত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যতটা গভীরতা ফুটিয়াছে—রাধার দুর্দ্দশার বর্ণনায় বা রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ততটা ফুটে নাই। দৃষ্টান্ত—

১। তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাতে আন নাই চিতে
রসের পশরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে॥

[কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে—চণ্ডীদাসের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—ইত্যাদি মনে পড়ায়। গভীর প্রেমের মধ্যে দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হইলে ক্রোড়স্থাকেও দূরবর্ত্তিনী মনে হয়]

প্রেম-বৈচিত্ত্যের অপূর্ব্ব বাগ্ চিত্রণ!

২। এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগযুগান্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
শঙ্খ পদ্ম কত মহানিধি পাই॥

[যাহা অসীম অনন্ত তাহাই বৈচিত্র্য বা অপূর্ব্বতা হারায় না। এ প্রেম অসীম ও অনন্ত মহাসিন্ধুর মত। তাই—"দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।" তাই ত' অনুরাগ "তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না।]

৩। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥[১]

৪। ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পীরিতি॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে জাগিতে ঘুমিতে।
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁধি।
তিলে কত বার দেখি স্বপন সমাধি॥

[প্রেমে আত্মহারা হৃদয়ের চমৎকার অভিব্যক্তি]

৫। কুটিল নেহারি গারি যবে দেয়বি তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর।

১ দীনেশবাবু বলিয়াছেন—কে যেন জোড় ভাঙ্গিয়া বেজোড় করিয়া দিয়াছে। গল্প-কথিত গ্রীক দেবতার ন্যায় কে যেন অখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে—সেই দুই খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিবার জন্য বিরহে হাহাকার করিতেছে। জীব যাঁহার অংশ, তাঁহার বিরহে জীবের মন ব্যথাতুর ...দশ ইন্দ্রিয় দিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাই—পরাণপীরিতি তার থির নাহি বাঁধে।

জ্ঞানদাসের এই পদটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে একটি চমৎকার সনেটের প্রেরণা দান করিয়াছিল। সেই সনেটটি এই—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

এইখানে বলিয়া রাখি চণ্ডীদাসের হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার আতিশয্য দুইই রবীন্দ্র-কাব্যকে প্রভাবান্বিত করে নাই, জ্ঞানদাসের সংযত প্রেমাবেগের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কিছু প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে।

[প্রিয়ামুখে মাধুরী ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহার গালিও ইন্দ্রপদ গৌরবতুল্য। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।" বেদ স্তবের যোগ্য এক গভীর প্রেম ছাড়া কেহ ত তাহাকে গালি দিতে পারে না]

চণ্ডীদাসকে বলা হয় দুঃখের কবি—আর বিদ্যাপতিকে বলা হয় সুখের কবি। চণ্ডীদাসের বিরহ বা বিপ্রলম্ভ ও বিদ্যাপতির সম্ভোগ-মিলন রসসৃষ্টির মূল প্রেরণা। আমরা জ্ঞানদাসে দুই-এরই মিলন দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস কেবল বিপ্রলম্ভেই সাফল্য লাভ করেন নাই—সম্ভোগমিলনের কথায় কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস অকুণ্ঠিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি নাই। বসন্তোৎসব, হোলী, রাসলীলা ইত্যাদির উল্লাস-মাধুর্য্য কবির কাব্যে অপূর্ব রসরূপ ধারণ করিয়াছে।—বিদ্যাপতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই বটে কিন্তু এ-বিষয়ে বিদ্যাপতির নীচেই জ্ঞানদাসের ঠাঁই।

পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে
পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলিকলা কত দুহুঁ রসে উনমত
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে
অধরে অমিয়া রস নেল।
রাসবিলাস শ্বাস বহে ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখিচন্দ্রক
বেশভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥

এই পংক্তিগুলিতে রসমত্ততা ফুটিয়াছে কিন্তু লালসার জ্বালা নাই। জ্ঞানদাসের সম্ভোগরসের কবিতার বিশেষত্ব এই। এই শ্রেণীর পদগুলি কবি ব্রজবুলিতে লিখিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারিয়াছেন।

একদিকে গৃহে গুরুজনের গর্জ্জন, ক্ষুরধার স্বামীর তর্জ্জন—আর অন্যদিকে মুরলীধ্বনির আকর্ষণ—এই যে রাধা হৃদয়ের দোলাচল দ্বন্দ্ব—ইহাই হইয়াছে জ্ঞানদাসের বহু পদের প্রেরণা। প্রেমের চিরন্তন লীলার কোন অঙ্গ কবি বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া হয় না—কিশোরীর বাহিরে লজ্জা অন্তরে পিপাসা, গরবিনীর মুখে কুলদর্প সতীগৌরব, অন্তরে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা, সাহসিকার অন্তরে সাহস, বাহিরে ভয়, অভিমানিনীর বহিরঙ্গে অহঙ্কারের শুষ্কতা, অন্তরঙ্গে মিলন-পিপাসার মুখরতা, উপেক্ষিতার বচনে জ্বালা—হৃদয়ে বরণমালা প্রেমলীলার এই চিরন্তন মিশ্রভাবগুলি কবির কাব্যে অপূর্ব্ব রসরূপ লাভ করিয়াছে।

কবি রসশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি রক্ষার জন্য রাধিকার অভিসারিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মানিনী, কলহান্তরিতা ইত্যাদি বিবিধ নায়িকা রূপও চিত্রিত করিয়াছেন—এইগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু মাথুর শ্রেণীর কবিতায় প্রোষিত-ভর্তৃকা রাধার অন্তরের আর্ত্তি কবির কাব্যে করুণ আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে কবি বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রসোদ্গার পর্য্যায়ের অনুরাগের উপচার বর্ণনায় চণ্ডীদাস, বলরামদাস, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবিগণ পদ রচনা করিয়াছেন।—

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিষে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দারিদ যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঞি না পায়।

নরোত্তম লিখিয়াছেন—

সমুখে রাখিয়া মুখ আঁচরে মোছই অলকা তিলকা বনাই।
মদন রসভরে বদন হেরি হেরি অধরে অধর লাগাই।

ধরণীদাস লিখিয়াছেন—

ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে পুন দেই সিঁথায় সিন্দুর।
তাম্বুল সাজাঞে তোলে খাও খাও কত বোলে কতগুণ কহিব বঁধুর।

বলরামদাস বলিয়াছেন—

বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগিয়া থাকে তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়।

এই সমস্তের তুলনায় জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদের রসের গাঢ়তা ও গূঢ়তা যেন বেশী।

১। হিয়ার উপর হইতে শেজে না ছোঁয়ায়
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায়।

নিদের আলসে যদি পাশমোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে।
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস।

২। হিয়ার হিয়ার লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর সদাই ফিরয়ে রঙ্গে।
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে আঁচরে মুছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে হেঞি সদা লয় নাম।

৩। হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটী কয়
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে পথের নিকট রয়।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের বসন সৌরভ যখন যেদিগে পায়
বাহু পশারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়।
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনই যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পিরিতে বাঁধিল তায়।

একমাত্র বলরাম দাসই এই পর্য্যায়ের কবিতায় জ্ঞানদাসের নিকটবর্ত্তী।

কলা-চাতুর্য্য ছাড়া কেবল ভাবের ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যায় না এ কথা জ্ঞানদাস বেশ বুঝিতেন। কেবল ভাষাচ্ছন্দের পারিপাট্যেই তিনি কৌশল দেখান নাই—বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে—গঠন-পারিপাট্যের মধ্যে- ঘটনা সংযোটনার মধ্যেও তিনি অনেক কৌশল দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ—রাধার কুমারীলীলার একটি চিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরলা বালিকা পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে জানে না—তাহার শিশুসারল্যের স্বচ্ছতায় কবি পরবর্ত্তী জীবনের চমৎকার আভাস দিয়াছেন। রাধার জননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

প্রাণনন্দিনী রাধাবিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি।
অগোর চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম
কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন
নব মালিকার মালে।

রাধা উত্তর করিলেন—

মাগো—গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী
লৈয়া গেল মোরে ঘরে।
গোপরাজরাণী নন্দের গৃহিণী
যশোদা তাঁহার নাম।

তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ।
কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
লৈয়া বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাঁহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে।
বিজুরি উজোর মোর দেহখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঞি
কি হেতু মাগিল বর।

এই চিত্রের দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিলেন তাহা রসিক জন বুঝিবেন। রাধার লাবণ্য বিজলির মত, শ্যামের লাবণ্য জলধরের মত, বিজলি ও জলধরে 'সুমেল' দেখিয়া যশোদা দিবাকরের পানে চাহিয়া কি যেন কি বর চাহিলেন। চমৎকার নয় কি এই রস ব্যঞ্জনা ?

তারপর মুরলীর গূঢ় রহস্য রাধা সমাধান না করিয়া ছাড়িবে না—সে মুরলী শিখিতেই হইবে। রাধা আবদার ধরিয়া বলিল—

কোন্ রন্ধ্রে তে শ্যাম গাও কোন্ তান,
কোন্ রন্ধ্রে র গানে বহে যমুনা-উজান।
কোন্ রন্ধ্রে র গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে,
কোন্ রন্ধ্রে র গানে রাধার প্রেম লুটে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—শুধু রাধা হইয়া এই সাধা বাঁশী শিখা যায় না। আমায় ভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট না হইলে এ বাঁশী অসাধ্য সাধন করিবে না।

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব হিলানে থাক তবে সে বিনোদবাঁশরী বাজে।

এই কৌশলে কবি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। বাৎসায়নের 'তদ্রূপো রতিঃ' এই সূত্রটিও এখানে মনে পড়ে। দয়িতের কাছে যাহা পরম প্রিয় দয়িতার কাছে তাহাই হয় পরম প্রীতির ধন।

বংশীর রন্ধ্র অনেক। এই বংশী কেবল রাধার চিত্ত হরণ করিতেছে না, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে উন্মাদিত করিতেছে। যাহার ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রের ভিন্ন ভিন্ন কাজ, তাহার সার্থকতাও অনেক। কেহ যদি ইহাতে ব্যঞ্জনাময় গভীর সার্থকতার সন্ধান করেন করুন। যদি তাহা মিলে অধিকতর আনন্দেরই কথা। বাচ্যার্থ হইতেই আমরা যে মাধুর্য্য পাইতেছি—তাহাই যথেষ্ট মনে করি। [ক্রমশঃ

পঁচিশ

"হাঁ, কমল!"

"কি মা?"

"সেদিন দেখলাম ঐ গাঙ্গুলীদের গার্গীকে নিয়ে তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ। শুনলাম প্রায়ই তাকে নিয়ে বেরোও।"

মায়ের মুখপানে চাহিয়া কমল একটু হাসিল—শেষে হাঃ হাঃ করিয়াই হাসিয়া উঠিল।

"So you have caught me in my game, I see! হাঃ হাঃ হাঃ! Yes, to tell you the truth frankly, I take her sometimes out in the evening. But why should I not? She is one of those girl-friends I spend the evenings with."

"জানি। কিন্তু সেদিনকার ঐ ঘটনাটার পর মনে হয়েছিল, you could no longer be friends in the sense you had been. গার্গী ত' সোজাসুজিই তাই বলে গেল।"

"Yes, she said something like that. But she was not in her senses then. Those hard knocks and counter-knocks between you and her mother were rather too much for her and I, too, to confess the truth, was stunned for the time being! তা সে যাই হউক, ঝগড়াটা যা হ'ল, তোমাতে আর তার মাতে। তাতে ক'রে আমাদের relationটা যে affect ক'রবেই এমন কোনও কথা হ'তে পারে না।"

"কিন্তু ঝগড়াটা যা নিয়ে হ'ল, that affected her very delicately and she felt it very delicately and keenly too. তোমাকেও পরিষ্কার ভাবে ব'লে গেল এর পর আর কোনও সম্বন্ধ তোমাদের ভেতর থাকতে পারে না। কি করে আবার এত শীগগির সেই সম্বন্ধটা ঘটল বুঝতে পারছিনি। এটা কিন্তু সম্ভব নয় যে সে যেচে তোমার সঙ্গে আবার বন্ধুত্বের সম্বন্ধে এসেছে। You must have gone to their place and offered an apology for me and drawn her back to you!"

"Yes, mother dear, I went there, but not to offer any apology for you. I couldn't do it and had no right to do it either. তবে এটা অবিশ্যি realise ক'রবে, সে বন্ধু, এসেছিল এখানে, যে ভাবে যার দোষেই হ'ক, যারপরনাই অপমানিত হ'য়ে গেল। বড্ড দুঃখ হচ্ছিল আমার। তাই গিয়ে তাকে এইটুকু বুঝতে দিয়েছিলাম, যা হ'য়েছে তার জন্যে আমি দায়ী নই। যেমন বন্ধু আমরা ছিলাম তাই থাকতে পারি। সে যদি তাই বুঝে বন্ধু ব'লে আমাকে আবার গ্রহণ করতে পারে বিশেষ সুখী হব।"

"আর অমনি সে পরদিন থেকেই তোমার সঙ্গে বেরোতে সুরু ক'রলে! তার মা—"

"তিনিও ছিলেন, মিষ্টার গাঙ্গুলীও ছিলেন। খুসী হ'য়েই দুজনে আমায় support ক'রলেন।"

বলিয়া কমল একটু হাসিল।

"হু—সেটা তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু মনে করি না। তা—বন্ধু তোমার আরও কেউ কেউ ত' আছে। কদিন ধ'রে, জানতে পারলাম, কেবল ঐ গার্গীকে নিয়েই বেরুচ্ছ—"

"হাঃ হাঃ হাঃ! I see regular spying going on over movements! eh! My driver must have been betraying me! He ought to be horse-whipped and summarily dismissed."

"তোমার 'কার' কিন্তু ড্রাইভার তোমার নয় কমল, আমার। যে কোনও বিষয়ে তার service আমি চাই, দিতে সে বাধ্য। আর তার জন্য dismissও তাকে তুমি ক'রতে পার না।"

হাসিয়া কমল কহিল, "O! I didn't mean anything serious by what I said, mother. I know the car

is yours and the driver too is paid by you and I am very thankful to you for it. And the driver did not really betray any secret. আমার এইসব girl friendদের নিয়ে যে বেরোই, সব open affairs and there's no secrecy about it. তুমি নিজেও ত একদিন দেখেছ।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে কিছুদিন ধরে কেবল ঐ গার্গীকে নিয়েই যে তুমি বেরুচ্ছ—"

"বেরোচ্ছি—তা কি করি বল ? আর সবাই যে আমাকে 'বয়কট' ক'রেছে। কোথাও গিয়ে আর পাত্তা পাই নে। The incidents of that day must somehow have leaked out."

"তাতে 'বয়কট' করা উচিত ছিল, ওদেরই সবার আগে। হাঁ, তুমি গিয়েছিলে ভালই ক'রেছিলে, তোমার পক্ষে ভদ্রতার খাতিরে যেমন দরকার দু'টো মিষ্টি কথা ব'লে এসেছিলে। কিন্তু তাদের গূঢ় মতলব যে কি, কেন তারা হঠাৎ এসে অতটা upset সেদিন হ'য়ে প'ল, সে ত বেশ বোঝা গেল। আর তোমার এই ভদ্রতাটুকুর সুযোগ নিয়ে এমনি ক'রে আবার তোমাকে পেয়ে বসল, তার মানে আর কিছুই নয়, they are out in right earnest to catch you by any means that may come in their way—ready to stoop to anything for that. আর এই যে ব'লছ আর মেয়েগুলো তোমাকে বয়কট ক'রেছে, they will take full advantunge of the opportunity and you will be caught unless you take very very good care."

"Caught! caught by that Gargi—well, that I never will be, I can not be! তা খোলাখুলি সত্যি কথাই তোমাকে বলছি তবে। These girts, well, they good only as far as they go, pleasant companions to pass evenings with. But to be tied to any one of them for life, why, that's something unthinkable. To be caught that way by any-body, well, I shall tell you the truth. I am already caught and nobody else can catch me a new!"

"Caught! তার মানে—" কিছু আশ্বস্ত ভাবে ঈষৎ স্মিত দৃষ্টিতে মাতা পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। পুত্রের মুখ ভরিয়াও চটুল একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"মানে—caught in the trap laid by a pair of match-making mammas! Ha! ha! ha! There!—You have got your heart's desire and let there be an end to all doubts and fears and anxious questionings."

"সত্যি ব'লছ কমল! ঊর্ম্মিকে সত্যি ভাল বেসেছ! আঃ! কি যে আনন্দ আজ আমাকে দিলে!"

উঠিয়া চিন্ময়ী আনন্দের আতিশয্য কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

"Ah! There—there's a good mother—very very dear darling motherly mother!" বলিতে বলিতে মাতার মুখে চুম্বন করিয়া হাতটা ঝাঁকিয়া দিয়া কমল বলিতে লাগিল, "Happy, yes, I too am very happy that I have made you so happy and very thankful too that through your kind offices I have come to know such a girl, and I could never dream that there could be a girl like that in this world of mere pleasure-seeking men and women! আমার এইসব girl friends - তারা এর কাছে কি? ওকে দেখলে, ওর কাছে গেলে, কি করে বোঝাব কি আমার মনে হয়? I see in her a glory of womanhood, just as I see it in you, my dear revered mother, and I want to lay myself all heart and soul at her feet!"

"এই ত চাই বাবা!—একেই বলে ভালবাসা। এই চোখে যে প্রেমের পাত্রীকে দেখতে পারে বিবাহ করে সেই সুখী হয়। সেই স্ত্রীই হয় কেবল তার ভোগের সঙ্গিনী নয়, সংসারে সারাটি জীবন তার কর্ম্মসঙ্গিনী, ধর্ম্মসঙ্গিনী, এদেশে স্ত্রীকে তাই সহধর্ম্মিণীই বলে।"

"ঠিক! তাই এক একবার মনে হয়—mere light-hearted gaities in the evening with these friends—however pleasant they may be for the

time being, cannot bring real solid happiness to a man, neither to a woman. এই রকম সারা জীবনের মত একজন সঙ্গিনী চাই, অফুরন্ত একটা আনন্দ যে যোগাবে—নিত্যকার সব কর্ম্মেই বল, আর ধর্ম্মেই বল। Yes, I really feel like that now and I must have উর্ম্মি for such a companion for life, and I feel—feel deeply in my heart that I cannot like this life without her."

"বেশ কথা—ওদের ওখানেও ত যাও মাঝে-মাঝে।"

"যাই। তবে সদাসর্ব্বদা পারি না, কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। মাসীমা অবশ্যি যখন যাই, বেশ cordially receive করেন। তবে মেসোমশাই কেমন একটা distant ভাব রেখে চলেন, যদিও ব্যবহারটা discourteous কখনও বলিতে পারি না। তা ছাড়া—the whole atmosphere of the home is rather too serious and sombre for me. I can scarcely feel free and at home when I am there."

"উর্ম্মির সঙ্গেও ত দেখা শুনো হয়?"

"হয়। উঁরাও থাকেন, সেও থাকে, হাসি গল্পও বেশ করে, গান টান করেও এক একদিন শোনায়। সেও তেমন যেন জমে না, যদি মেসোমশাই বাড়ীতে থাকেন। তবে মাসীমা আর ছেলে মেয়েরা কেবল থাকলে এক রকম কেটে যায়।"

"উর্ম্মির মনের ভাব কিছু বুঝতে পেরেছ?"

"না। এমনি কথায় ব্যবহারে বেশ pleasant and sweet. তবে তার actual sentiments with regard to me I have not yet been able to gauze. তবে এক একবার মনে হয় she may not be unfavourably disposed towards me."

"তুমি যে তাকে ভালবেসেছ, তারকোনও আভাস তাকে দেবার চেষ্টা করেছ?"

"না। কি করে দেব? I can scarcely get her alone with me. এ সব কথার আভাস দেওয়া যায়, when a fellow courts a girl. আর courting যাকে বলে তা চলতে পারে না unless the man and his girl can talk often tete-atete and for that they must sometimes go out together without any chaperonage."

"হুঁ, সেটা সুকল্যাণী কি মিষ্টার মোকার্জ্জি কেউ সহজে allow করবেন না। এ দেশে অনেকেই করে না। কোর্টসিপটা যা হয় একদম একটা রীতিরক্ষার মত ব্যাপার। দুই পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যেই সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা আগে একটা হয়। যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন তখন ছেলে মেয়েদের সেই ভাবে আলাপ করতে দেন। বাড়ীতেই ছেলে আসে কোনও একটা ঘরে বসে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে; বাড়ীর লোকও সব কাছে কাছেই থাকেন, ঘোরা ফেরা করেন।"

"How very odd and I must say meanly and cruelly suspicious! Courting with suspicious guardians mounting guards all round—well, that's no courting at all! তা'হলে—এ অবস্থায় আমি এখন কি করতে পারি? I must have an opportunity to talk to her of my love and then propose. And this can't be done in company nor under surveilance.

"আচ্ছা, দেখি একবার সুকল্যাণীর সঙ্গে আলাপ করে, কি বলে সে। তবে আমরাও সব ঠিক ঠাক করে ফেলতে পারি, অনেক পরিবারে যেমন করে থাকে।"

"No, no! That's out of the question. How absurd and ridiculous a proposition! No, I cann't be a consenting party to that. I must offer my heart's love myself and get her love in return freely between ourselves without the help of any intermediatories. And for that, I must have her alone with me sometimes."

"আচ্ছা, দেখি আলাপ করে ওর সঙ্গে গিয়ে। হাঁ, তুমি শিলং যাচ্ছ কবে?"

"পরশু।"

"ফিরবে কবে?"

"আট দশ দিন হবে।"

"আচ্ছা, এর ভেতর একটা বন্দোবস্ত যা হয় করে রাখব। ফিরে এসেই propose করবার একটা সুযোগ

যাতে তুমি পাও, সেটা কেন তারা দেখবে না, যদি এই সম্বন্ধ সত্যি তাদের অভিপ্রেত হয় ?"

"আচ্ছা তাই দেখ, যা হয় একটা সুরাহা করে রাখবেই সত্যি বলছি মা আমি আর অপেক্ষাই করতে পারছি না। পাগল হয়ে উঠেছি।"

"কিন্তু একটা কথা বলছি। কমল, ঐ গার্গীকে নিয়ে যেয়োন টেয়োন এখন ছেড়ে দেও। এ সব হালকামো খেলা আর কেন ? ওদের মতলবও মোটেই ভাল নয়।"

"আর ও সব ত' একরকম ফুরিয়েই গেল মা। সবাই বয়কট্ করেছিল। ছিল এক গার্গী। তাও কাল তারা সব বাইরে কোথায় গেছে। আমি পরশু শিলং যাচ্ছি। ফিরে এসে যদি উর্ম্মিকে court করবার opportunity পাই, I am sure I shall win her love by my ardent fiery love, if I have not already won it, তখন এসব একদম খতম্ হ'য়ে যাবে। গার্গী—may be, she has certain designs upon me. কিন্তু যখন দেখবে উর্ম্মিকে সত্যি সত্যিই ভালবেসে আমি ফেলেছি, তাকে কোর্ট করছি, engagement imminent, she too will boycot me like all the rest, and I shall welcome it.—হাঁ, দেখেছ কেমন খাসা একটা engagement ring আমি তৈরী ক'রেছি।"

বলিতে বলিতে আঙুল হইতে খুলিয়া একটী অঙ্গুরী কমল মায়ের হাতে দিল—উপর হাতে হাত জড়ান, নীচে এই motto—Kamal to his Dearest.—

"বাঃ, খাসা আংটিটি ত'। উর্ম্মির জন্যে ক'রেছ ?—হাঁ, ক'দিন দেখছি তোমার হাতে ? তা মনে ক'রেছি, সখ ক'রে নিয়েছ, নূতন নূতন আংটি তুমি ভালবাস। নেও, আশীর্ব্বাদ ক'রছি ফিরে এসেই এই আংটি উর্ম্মির হাতে পরিয়ে দিতে পার।"

"নিশ্চয়ই দেব with your blessing and with that God's own belessing will come upon me."

"হাঁ, ঐ গার্গীরা কোথায় বেরিয়ে গেছে বল্লে না ? কোথায় গেছে তারা ?"

"মিষ্টার গাঙ্গুলীদের বড় একটা Insurance Company আছে কিনা, তারই কোন inspection tourএ বেরিয়েছেন, দারোয়ান ব'ল্লে। সঙ্গে ওদেরও নিয়ে গেছেন।"

"তুমি যে শিলং যাবে সেটা ওরা জানে ?"

"না, কালই গিয়েছিলাম ব'লব ব'লে। তা দেখি, বাড়ীতে তারা কেউ নেই।"

"তোমাকেও জানায় নি কিছু যে বেরিয়ে যাচ্ছে কি কোথায় যাচ্ছে ?"

"না, তরশু গিয়েছিলাম, বেড়াতেও বেরিয়েছিলাম, গার্গীকে নিয়ে। তা বলে নি ত' কিছু। হয় ত' হঠাৎ ঠিক হ'য়েছে যাবে, সময় পায় নি। Next station-এ গিয়ে হয়ত চিঠি লিখবে। আচ্ছা, উঠি তবে এখন। একটা কাজে বেরোতে হবে।"

"এস।"

ছাব্বিশ

চিন্ময়ী সেই দিনই সন্ধ্যায় গিয়া সুকল্যাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পুত্রের সঙ্গে এই আলাপে আশ্বস্ত যতই হউন, আশঙ্কাও সব একেবারে দূর হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, আংটিটা এমন আগ্রহে তৈয়ারী করিয়াছে engagementটাও শিলং যাইবার আগে হইয়া গেলে ভাল হইত ; একেবারে নিশ্চিন্ত তিনি হইতে পারিতেন। কিন্তু পরশু যাইবে, কাল একটি দিন মাত্র সময় আছে। রীতিমত যেরূপ একটা courtship-এর formality সে চাহে, একদিনে তাহা শেষ হইয়া একটা engagement সম্ভব হইতে পারে না। তার আফিসের হুকুম হইয়াছে, বিলম্বও আর করিতে পারে না। সুকল্যাণীও বুঝাইয়া বলিলেন, সেটা কোনও মতেই সম্ভব হইতে পারে না। তা ব্যস্ততার কারণ কিছু নাই। কমল ফিরিয়া আসুক, ইতিমধ্যে এমন ভাবে বন্দোবস্ত সব তিনি করিয়া রাখিবেন, যে সুযোগ যাহা সে চাহিতেছে, তাহা পাইতে পারে। কন্যার মনটাকেও একটু প্রস্তুত করিয়া রাখা দরকার। সে আবার বড় লাজুক—কেমন retiring ধরণের মেয়ে, আজকাল সব মেয়েদের মত forwardness একেবারেই নাই। এখনও পরিষ্কার ভাবে তার মনের গতি এসম্বন্ধে কিরূপ তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, খোলাখুলি কিছু আলাপও করিতে পারেন নাই। নিজেও কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করেন। আবার সেদিনকার ঐ ঘটনার পর, চারিদিকে যেসব কুৎসিৎ কথা রটিয়াছে, তাহাতে এরূপ আলোচনা আরও কঠিন হইয়া

উঠিয়াছে। তবে, কমলের মত এমন ছেলে, চিন্ময়ীদের মত এমন একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার, আশা ত' করেন খুসী হইয়াই সে রাজী হইবে? তবু কমল যে কিরূপ ভালবাসিয়াছে, কত আগ্রহে তাহাকে লাভ করিতে চায়, তাহার একটুখানি আভাষ তাকে দিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ভালবাসা—তা ভালবাসার টানেও অনেক ক্ষেত্রে মনে ভালবাসা জাগিয়া ওঠে, যদি না সে ভাবটা আপনা হইতে আগে দেখা দিয়া থাকে। 'Courtship মানেই ত' তাই, প্রেমিক যুবারা প্রেম নিবেদনে প্রেমের পাত্রীর চিত্ত জয় করিতে চায়। Wooing যে ছেলেরা করে সে ত love win করিবে বলিয়াই করে। মেয়ে যদি তার loveটা আগেই দিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে ত আর সেটা win করিবার মত বস্তু থাকে না, wooing বাজে একটা খেলা হইয়া যায়। কমল এখনও ঠিক উর্ম্মিকে wooing করা যাকে বলে তা সুরু করে নাই। ফিরিয়া আসিয়া তার বলে কমল উর্ম্মির love অবশ্য win করিতে পারিবে—কেন পারিবে না?

অবশ্য পারিবে, মুখে যতই জোর করিয়া সুকল্যাণী বলুন, মনে মনে বেশ কিছু আশঙ্কাও ছিল, হয় ত' পারিবে না। অরুণের প্রতি তার মনের একটা টান যে পড়িয়াছে এই সত্যটাকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করিতেও পারিতেছিলেন না। ইহাও জানিতেন স্বামী মহীন্দ্রনাথ ইহার পোষকতা করেন। তবে এই টানটার মূল কারণ হইতেছে, উভয়ের সমান পৌত্তলিক মতিগতি যে সর্ব্বনাশটা ঐ বুড়ীই সমান ভাবে উভয়ের করিয়া গিয়াছে। মনোভাবে এরূপ একটা সমতা—আর সর্ব্বদা তাহারই আলাপ-আলোচনা ইহাতেও যুবক যুবতীর চিত্তে মিলনের একটা আগ্রহ জন্মিতে পারে, ক্রমে যাহা সত্যকার প্রেমের আকর্ষণে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে যে ভাবটা জন্মিয়াছে সেটা এইরূপ একটা আগ্রহই বটে, এখনও তার উপরে গিয়া সম্ভবতঃ উঠে নাই। মনটা যদি তার ফিরান যায়, টানটাও ঘুরিয়া আসিতে পারে, বিশেষ অরুণের সঙ্গে ওর দেখাশুনাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন কে উহার মনটাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিবে? নিজে তিনি পারিবেন না। পৌত্তলিকতার পক্ষে কোনও কথা শুনিলেই সমস্ত শরীর মন তাহার রি-রি করিয়া উঠে, মাথার ঠিক থাকে না। মহীনের দ্বারাও কিছু হইবে না। উর্ম্মির মনটা যে ফেরে সেটা সে যেন চায়ই না। উল্টা বরং প্রশ্রয়ই দিতেছে, নহিলে সত্য কি উর্ম্মি এত বাড়াবাড়ি করিতে পারিত?

এক আচার্য্য মহাশয় আছেন। মহীনের কথায় ভুলিয়া, যাই তিনি সে দিন বলিয়া গিয়া থাকুন, অবস্থাটা সব ভাল করিয়া বুঝিলে আন্তরিক একটা চেষ্টা তিনি করিবেন, আর সে চেষ্টা সফলই হইবে। উর্ম্মি বালিকা মাত্র। তার সাধ্য কি সকলের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রবীন ঐ আচার্য্যমহাশয়ের জ্ঞানপূর্ণ যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে? হাঁ, এখন এই সঙ্কটে তাঁহারই সহায়তা নিতে হইবে। দশ বারদিন সময় এখনও আছে। ইহার মধ্যে কি সুরাহা একটা হইবে না?

পরদিন সকালে গিয়া তিনি আচার্য্য গৌরাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মোটামুটি সব কথা তাঁহাকে জানাইলেন। সে দিন ছিল রবিবার, সন্ধ্যায় উপাসনা-অনুষ্ঠান তাঁহাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং পর দিন বৈকালে তিনি আসিলেন।

"এই যে মহীন এসেছ আফিস থেকে? ভালই হয়েছে। মা সুকল্যাণী কাল গিয়েছিলেন আমার ওখানে। তাঁর ইচ্ছা উর্ম্মিমালার সঙ্গে—কি জান—এই—একটু আলাপ আমি করি—"

"তা বেশ ত, করুন। উর্ম্মিকে ডাকব?"

"এখানে সুবিধে হবে না বাবা, একটু নিরেলা তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ছাদে গিয়ে বসবার সুবিধে হবে?"

"কেন হবে না? তাই গিয়ে বসুন। ওরে উর্ম্মি, এইবে, আয় এদিকে। আচার্য্য মশাই এসেছেন, তোর সঙ্গে নিরেলা একটু কথা-বার্ত্তা কি ব'লবেন। ছাদে একটা মাদুর টাদুর পেড়ে ওঁকে নিয়ে বস্‌গে যা। আর তোর মাকে বল্‌, এক পেয়ালা চা ওঁকে পাঠিয়ে দেন।"

ছাদে গিয়া উর্ম্মিকে লইয়া গৌরাচরণ বসিলেন। চা-ও কিছু খাবারও প্রেরিত হইল। একটু একটু খাবার মুখে দিয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে গৌরাচরণ কথাটা পাড়িলেন। সাকার ও নিরাকার উপাসনার তুলনা করিয়া ছোট একটি বক্তৃতাই তিনি আরম্ভ করিলেন। উর্ম্মি ধীর ভাবে তাঁহার সব কথা শুনিল। শেষে কহিল, "আচার্য্য মশাই, আপনার সঙ্গে কোন তর্ক-বিতর্ক এ নিয়ে আমি ক'রতে চাই না।

সেটা আমার পক্ষে বড় একটা বাচালতাই হবে। তবে—মাফ করবেন, একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা ক'রব ?"

"কি, বল দিদি।"

"আপনারা কার উপাসনা করেন ?"

"কেন, ভগবানের, অদ্বিতীয় সেই নিরাকার ব্রহ্মের।"

"তিনি যদি মূর্ত্তি ধ'রে কারও প্রাণের ভেতর দেখা দেন ?"

"মূর্ত্তি ধ'রে! কি করে তা হ'তে পারে দিদি ? তিনি যে নিরাকার।"

"সর্ব্বশক্তিমান্‌ও তিনি। ভক্ত যদি চায়, দয়া ক'রে মূর্ত্তি ধ'রে কি তার প্রাণের ভেতর এমন কি চোখের সামনেও দেখা দিতে তিনি পারেন না ?"

"সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, পারেন না, একথা বলাই চলে না। তবে এমন অনেক কাজ আছে—এই ধর যেন পাপ—যা তিনি করেন না।"

ঊর্ম্মি উত্তর করিল, "ভক্ত যদি কোনও মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে সেই ভাবে তাঁকে পেতে চায়, আর দয়া ক'রে যদি সেই মূর্ত্তি ধ'রে তার সামনে তিনি আবির্ভূত হন, তবে সেটা কি পাপ হ'তে পারে আচার্য্য মশাই ?"

"পাপ—না, পাপ আর কি ক'রে বলা যায় ? তবে কি জান দিদি, আমারা বিশ্বাস করি, সাকার উপাসনার চাইতে নিরাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। আর সেই শ্রেষ্ঠ উপাসনাই যখন সবাই করতে পারে, নিকৃষ্ট উপাসনা কেন করবে ?"

"আপনারা তাই বিশ্বাস করেন, কিন্তু সবাই ত' করে না। কত লোকে সাকার উপাসনা করছে ; তাই তারা ভাল মনে করে। মনে হয়, সরল মনে সরল বিশ্বাসে, ভক্তিভরা প্রাণে, যে যে উপাসনা করে, তাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ, তাই তার সফল হয়, তা সে উপাসনা সাকারই হ'ক কি নিরাকারই হ'ক। ধ্রুবপ্রহ্লাদের গল্প পড়েছি, সাকার উপাসনাই তাঁরা করেছিলেন, ঠাকুর মূর্ত্তি ধরে তাঁদের দেখা দেন।"

"ও-সব হল গল্প—"

"গল্প হলেও যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তা ত অসার কি নিকৃষ্ট বলে মনে হয় না। ভাল, ও সব যেন গল্পই হল কিন্তু চৈতন্যদেবের কথা যা পড়েছি সে ত আর গল্প নয়। তিনি যে ঠাকুরের প্রেমে পাগল হয়ে সমস্ত দেশকে মাতিয়েছিলেন, সে ঠাকুর সাকার হরি ঠাকুর। সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—এত সেদিনকার কথা—তাঁরাও কালীর উপাসনা করতেন। এদের ও কি নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপাসক বলতে চান ? তারপর বিজয়গোপাল গোস্বামী—অতবড় একজন সাধু ব্রাহ্ম ছিলেন—তিনিও শেষে সাকার উপাসনায় আত্মসমর্পণ করেন। বহু শিষ্যও তাঁর মত অনুসরণ করে চলছেন।"

গৌরীচরণ মনে মনে অনুভব করিলেন, এই বালিকার যুক্তির কাছে তাঁহাকে হার মানিতেই হইতেছে। একটু ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "কি জান দিদি, দুই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই একটা পদ্ধতির দোষগুণ কিছু বোঝা যায় না। মোটের উপর একটা সত্য এই দেখা যায় যে, দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে যারা পূজো করে, ধর্ম্মবুদ্ধিটাও তাদের সেই মূর্ত্তিরই মত ছোট হয়ে যায়, মূর্ত্তির উপরে আর উঠতে পারে না, ভগবানের অনন্ত স্বরূপকে মনে কখনও ধরতেই পারে না।"

"সেটা বোধহয়—ছোট বুদ্ধি নিয়ে যারা করে, তাদেরই হয়, মূর্ত্তির দোষে হয় না। মন যার বড়, বুদ্ধি যার উদার উন্নত, ভক্তিতে যার প্রাণ ভ'রে গেছে, ঐ অতটুকু মূর্ত্তির ভেতরেই সে বিশ্বের ঠাকুরকে দেখতে পায় ; বিন্দু তার কাছে আর বিন্দু থাকে না, সিন্ধু হ'য়ে ওঠে। আর তা যদি না হয়, নিরাকার অনন্ত ভগবানকেও সে ছোট একটা গণ্ডীর ভেতর এনে ফেলে। আমাদের এই সমাজেও কি কতকটা তেমনি একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছে না ?"

"তা যাচ্ছে বই কি দিদি, তা যাচ্ছে বই কি ? নইলে, আমরা নিরাকার উপাসনা করি, তাই ভাল বুঝি করি, বেশ। কিন্তু যারা মূর্ত্তি পূজা করে, তাদের কোনও অনুষ্ঠানের সংস্রবে কেন আসতে চাই না ? কেন তাদের থেকে সাবধানে দূরে স'রে থাকতে চাই ? কেন তাদের সমান সমান ভাই ব'লে আলিঙ্গন দিতে পারি না ? কেন মনে করি, তারা যেন ভগবানের রাজ্যের বাইরে কোথাও হীন হ'য়ে প'ড়ে আছে ?"

ঊর্ম্মি একটু হাসিল। কহিল, "তা হলে, আচার্য্য মশাই, আমাকে কি ব'লতে চান ? আপনারা নিরাকারের উপাসক, তাই ভাল লাগে, বেশ করুন। আমার যদি সাকার উপাসনা ভাল লাগে—এই ধরুন, শিব ঠাকুরকেই যদি আমি বিশ্বের ঠাকুর ব'লে ধ্যান ক'রে আনন্দ পাই, ভক্তিতে যদি তাঁর সামনে

আমার প্রাণটা মনটা মত্ত হ'য়ে পড়ে, তা কি ক'রতে পারব না?"

"তাই ত! কি ব'লতে এলাম, আর বলাচ্ছই বা কি আমাকে দিদি! তবে কি জান, নিরাকার উপাসনাই বরাবর ভাল মনে করে আসছি. তাতেই আনন্দ পাই—"

"তাই ক'রবেন। আপনাকে ত ব'লছি না আপনি সাকার উপাসনা করুন। কিন্তু আমি যে সাকার উপাসনাই ক'রতে চাই। শিব রূপে, কি দুর্গা রূপে তিনি যদি আমার প্রাণে আসতে চান, কি ক'রে তাঁকে ঠেলে দূর ক'রে দেব? কেনই বা দেব? মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একটা শ্লোকে নাকি আছে—

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা।"

চণ্ডীতেও একটি শ্লোকে আছে—

"নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ।
নামান্তরৈর্নিরূপ্যা সা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ।"

এই দুইটি শ্লোকেই কি নিরাকার সাকার-উপাসনার সকল বিরোধ, সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হ'য়ে যায় নি?"

গৌরীচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "তা হ'য়েছে দিদি। আমার চাইতে জ্ঞানী আর কেউ এর বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি আনতে পারবেন কিনা জানি না, তবে আমি স্বীকার না করে পারছি না যে হ'য়েছে। তার সঙ্গে একথাও স্বীকার ক'রে নিতে হচ্ছে, সাকার কি নিরাকার—ভক্তি যদি থাকে, যার যে দিকে মন টানে, সেই ভাবেই ভগবানকে সে উপাসনা করতে পারে। কিন্তু আর একটা কথাও ভাবতে হ'চ্ছে দিদি—"

"কি আচার্য্য মশাই?"

"সেদিন তোমার বাবার সঙ্গেও সেই কথা হচ্ছিল। কি জান, একটা সমাজভুক্ত হ'য়ে থাকতে হ'লে বিশেষ একটা ধর্ম্মপদ্ধতিও অনুসরণ ক'রে চ'লতে হয়—"

"কিন্তু তাতে যদি আমার মন না টানে? যদি অন্য রকম বিশ্বাসই আমার মনে ধ'রে? আর তারই মত উপাসনাতেই মনের তৃপ্তি আমার হয়? ধরুন, আপনারা যে উপাসনা করেন, তাতেও আপত্তি আমার কিছু নাই। এই ত কাল মন্দিরে গেলাম, আপনার উপাসনা শুনলাম, বেশ ত লাগল। কিন্তু তার চাইতেও—কিছু মনে ক'রবেন না আচার্য্য মশাই—বেশী ভাল লাগে আমার শিবঠাকুরের ধ্যান, তাঁর মন্ত্র জপ, তাঁকে যে এই শ্লোক প'ড়ে প্রণাম করি তাই—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

"বাঃ! চমৎকার শ্লোক ত। কে তোমায় শিখিয়েছে দিদি!"

"আমার দিদিমা।"

"ও! তোমার বাবার পিসিমা, তিনিই এসে এই সব গোল বাধিয়ে গেছেন?"

বলিয়া গৌরীচরণ একটু হাসিলেন।

ঊর্ম্মিও হাসিয়া কহিল, "হাঁ, তিনিই। তাঁকে যে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছি আচার্য্য মশাই।"

"তা এমন প্রণাম, আত্মনিবেদনের এমন মন্ত্র যিনি শেখাতে পারেন, গুরু ব'লে তাঁকে মানতে পার বই কি দিদি?"

"হাঁ, মেনে নিয়েছি। ছাড়তেও যে আর পারি না আচার্য্য মশাই। গুরুও না, মন্ত্রও না।"

"ছাড়, এমন কথাও আমি ব'লতে পারি না। তবে কি জান, এই যে একটা সমাজে আমরা র'য়েছি, তোমার বাবাও র'য়েছেন—"

"আমিও র'য়েছি। বাবার মেয়ে ত, তাঁর এ সমাজ আমারও সমাজ। কিন্তু—হাঁ, আপনি ব'লছিলেন, কোনও সমাজে থাকতে হ'লে নির্দ্দিষ্ট একটা ধর্ম্মপদ্ধতি মেনে চ'লতেই হবে। কিন্তু সেটা কি নিতান্তই দরকার? ভিন্ন ভিন্ন লোক—যদি তাদের রুচি মত, যার যে দিকে ভক্তি হয়, সেই ভাবে উপাসনা করে, সবার সঙ্গে সবাই মানিয়ে নিয়ে কি এক সমাজে তারা থাকতে পারে না? হিন্দুদের ভেতর, শুনেছি, অনেক রকম উপাসনার নিয়ম আছে। তারা ত এক সমাজ হ'য়েই সবাই আছে? বিশেষ একটা মাত্র পদ্ধতি, ভাল লাগুক কি না লাগুক, সবাইকেই মেনে চ'লতে হবে যদি বলেন, তবে মানুষের স্বাধীনতা কোথায় রইল? আমাদের চাইতে তা'হ'লে হিন্দুর স্বাধীনতা যে অনেক বেশী।"

গৌরীচরণ উত্তর করিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে সেদিন সেই কথাই হচ্ছিল দিদি। এইটি হ'ল, বড় একটা সমস্যার

কথা—যা এতদিন আমাদের সামনে আসে নি। তা আধ্যাত্মিক সাধনায় যতই স্বাধীনতা থাক, সামাজিক অনুষ্ঠানে কতকগুলি বাঁধা নিয়মেই হিন্দুকে চ'লতে হয়।"

"তা হয়। কিন্তু তাতে বোধ হয় তেমন কোনও একটা চাপ গিয়ে ইচ্ছামত কারও সাধন ভজনের উপরে গিয়ে পড়ে না। আবার সেই সাধন ভজন যে পথেই যে করুক, সবার সঙ্গে সবাই বেশ মানিয়েও তারা চ'লতে পারে। আমরা কি তা পারব না?"

গৌরীচরণ আবার একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "কি জান দিদি, কতকগুলি জিনিষ আমরা অন্যায় ব'লে বর্জ্জন ক'রেছি—এই যেমন পৌত্তলিক কোনও অনুষ্ঠান। এখন সামাজিক কোনও ব্যাপারে যদি তার কোনও সংস্রবে আমাদের আসতে হয়—"

"কেন তা হবে? ধরুন, আমি ঘ'রে ব'সে যাই ভাবি, যাই করি, আর কার কি এসে যায় তাতে? সামাজিক কোনও ব্যাপারই বা তা নিয়ে কি হ'তে পারে? ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে আমি, ব্রহ্ম মন্ত্রে সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান বাড়ীতেই হউক, কি বাইরে আর কোথাও হ'ক, বেশ গিয়ে তাতে যোগ দিতে পারি। কই, মনে ত' হয় না আমার শিবঠাকুরের কোনও অমর্য্যাদা তাতে হ'চ্ছে। মন্দিরেও ত গিয়ে উপাসনায় বসি। মনে হয় তখন, যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমার শিবঠাকুর। আপনাদের সঙ্গে ব'সে আমি আমার সেই শিব ঠাকুরেরই উপাসনা ক'রছি।"

"হুঁ! কিন্তু আমরা ত ভাবতে পারি না, তোমার ঐ শিবও আমাদের ব্রহ্ম। এই বরং মনে করি, ঐ শিবের পূজো ক'রলে আমাদের ব্রহ্মের অমর্য্যাদা হ'ল।"

বলিতে বলিতে গৌরীচরণ কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

ঊর্শ্মি একটু হাসিল। উত্তরে কথা কিছু কহিল না। গৌরীচরণ কহিলেন, "হাসছ দিদি? হাঁ, স্বীকার ক'রছি, সাকারে নিরাকারে উদার এই অভিন্ন ভাবটা মনে ধ'রে নিতে আমরা এখনও পারি নি। বাধা যে কি আছে, সেটাও ঠিক বুঝতে পারছি নি। নিরাকার তিনি সাকার হ'তে পারেন না, সাকার মনে ক'রলে তাঁকে ছোট করা হ'ল, এই বিশ্বাসই বরাবর পোষণ ক'রছি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।"

"তা বেশ ত, সেই বিশ্বাস ধ'রেই চ'লবেন। তবে আমি আমার এই বিশ্বাস ধ'রে চ'লতে চাই।"

"তাই চল, বাধা দেবার কোনও অধিকার কারও নেই। তবে, হাঁ, একটি কথা। আমাদের এই সমাজের মেয়ে তুমি, বিবাহের বয়স তোমা'র হ'য়েছে, আর বিবাহ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। সেই বিবাহ যখন হবে, তোমার পিতা-মাতা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন ক'রতে চাইবেন—"

একটু সলজ্জ ভাবে আনত মুখে ঊর্শ্মি উত্তর করিল, "ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে আমার ত কোনও আপত্তি নাই আচার্য্য মশাই। তবে ভয় পাই, যদি এমন কোথাও যেতে হয়, যাঁরা—যাঁরা—আমার শিবঠাকুরকে বরদাস্ত ক'রতে পারবেন না—"

"হুঁ। কোনও হিন্দু পরিবারে তোমার বিবাহ হ'লেই ভাল হ'ত। শুনেছি তেমন একটা সম্ভাবনাও হ'তে পারে। যদি হয়, অনুষ্ঠান হিন্দু মতেই সম্পন্ন ক'রতে হবে। তোমার পিতা যদি তা করেন, ব্রাহ্ম সমাজে তাঁকে বড় অপদস্থই হ'তে হবে।"

ঊর্শ্মি তেমনিই নত মুখে উত্তর করিল, "নাই হ'ল তেমন কোনও বিবাহ। কি দরকার? আমি চাই, নিজের মনে নিজে আমি আমার ঠাকুরের উপাসনা ক'রব। তা যদি পারি, তাতেই কৃতার্থ হব। বিবাহ—নাই হ'ল?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "পিতার মর্য্যাদার দিকে চেয়ে, কন্যা তুমি, কন্যার মতই কথা বলেছ। কিন্তু তুমি কিসে সুখী হবে, এটাও ত তোমার পিতাকে দেখতে হবে। ধর, এমন কোনও পাত্রের প্রতি যদি তোমার মন আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে, ধর্ম্মসাধনায়ও যিনি তোমার সহায় হ'তে পারেন, নিজের সামাজিক মর্য্যাদা-অমর্য্যাদার হিসাবে তাঁর সঙ্গে তোমার মিলনে বাধা ত তোমার পিতা হ'তে পারেন না। না, প্রাপ্তবয়স্কা একজন মানবী তুমি, পিতা ব'লে তোমার এই সুখের পথে, কল্যাণের পথে বাধা হবেন, সে অধিকারই তাঁর নাই।"

"কিন্তু আমি কোন্ বিবেচনায় কি ক'রব না করব, সে অধিকার ত' আমার আছে আচার্য্য মশাই?"

"তা আছে, অবশ্য আছে। কিন্তু যাই বল, বড় কঠিন

একটা সমস্যাই উপস্থিত হ'য়েছে। তোমার পিতামাতা দু'জনেই বড় বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছেন। সমাধান যে কি ভাবে হ'তে পারে আমিও ভেবে কূল পাচ্ছি নি।"

উর্ম্মির চক্ষে জল আসিল। কহিল, "বড়ই দুর্ভাগ্য আমার, মা বাবার এত বড় একটা অশান্তির কারণ হচ্ছি। কিন্তু আমি ত আর কিছুই চাইছি নি, নিজের মনে কেবল নিজের ঠাকুরকে পূজা ক'রতে চাইছি। সেটা ত এমন একটা সমস্যার কথা কিছু নয়। বেশ উপেক্ষা ক'রেই তাঁরা চ'লতে পারেন। তবে সমস্যাটা আসছে বিবাহের কথা নিয়ে। দু'জনেই ওরা এখন বিবাহ আমাকে দিতে চান, আর —আর যতদূর জানি—তাতে ইচ্ছা দু'জনের দু'রকম। তা এখন ও'রা ওসব চেষ্টা ছেড়ে চুপ ক'রেই থাকুন না? এর পর সুবিধে যদি কখনও হয় হবে, না হয় না হবে। ঐ যে আমার ঠাকুর—তাঁকেই আমি প্রাণে ধ'রে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'রে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব। ঐ যে মন্ত্রের কথা ব'লেছি—

'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।'

আশীর্ব্বাদ করুন আচার্য্য মশাই, তাই আমার এ জীবনে সফল হ'ক।"

মুগ্ধনেত্রে ছল ছল দৃষ্টিতে গৌরীচরণ কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উর্ম্মির মাথায় হাত দিয়া গদ্‌গদস্বরে শেষে কহিলেন, "তাই হ'ক দিদি, আজ এই আশীর্ব্বাদই ক'রে যাচ্ছি। তিনিই একমাত্র গতি ব'লে এই ভাবে আত্ম নিবেদন যে করতে পারে, জীবনে কল্যাণের পথ তার কি হবে, তিনিই দেখা'বেন, হাতে ধ'রে তিনিই সে পথে নিয়ে যাবেন। আহা, তোমার মত আমিও যদি আজ অমনি বলতে পারতাম দিদি,—

'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

মুদিত নয়নে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "আচ্ছা, রাত হ'য়ে এল, আসি তবে দিদি আজ।" বলিয়া উঠিলেন। উর্ম্মি গলবস্ত্রা হইয়া প্রণাম করিল।

"কল্যাণ হ'ক।" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৌরীচরণ নামিয়া আসিলেন। সুকল্যাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কহিলেন, "না মা, পারলাম না কিছু, পারবও না আর। আমাকেই বরং টলিয়ে তুলেছে, তোমার ঐ মেয়ে। তা আমার অনুরোধ তাকে আর উত্যক্ত ক'রো না তোমরা। শান্তিতে তার নিজের পথে চ'লতে দাও।"

"কিন্তু বিয়ের যে কথাটা হচ্ছে—"

"বিয়ে—তা একটা মীমাংসা তোমরা ক'রে নিয়ে তার যোগ্য পাত্রে যদি দিতে পার, দিও। কিন্তু তা নিয়েও নিজেরা কলহ ক'রে কোনও অশান্তি তার ঘটিও না। আসি মা এখন, এই যে মহীন্, তা আমার কথা ত শুনলে? সেই ভাবে চ'লতে পারলেই সুখী হব। আসি এখন।"

[ক্রমশঃ

কুত্র গচ্ছসি?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বপ্ন-নাটিকা*

মস্কোর বিখ্যাত ক্রেমলিন দুর্গ। সূর্যদেব নেমেছেন পাটে। সে-অন্তিম রক্তরাগে আরও স্পষ্ট দেখা যায় এখানে ওখানে নাজিদের গোলাগুলির ক্ষতচিহ্ন—যদিও ক্ষতি বেশি হয় নি। কামান গর্জায় মুহুর্মুহু। অদূরে ক্রেমলিনের ডাইনে, অন্ত-সীমন্তিনী মস্কোভা প্রবহমানা। ক্রেমলিন প্রাকারের বাইরে বলশেভিক "লাল" সৈন্যরক্ষীদের জটলা দেখা যায় দুর্গ থেকে। মাথার উপরে থেকে থেকে দ্বৈরথযুদ্ধ বাধে লাল ও নাজি গরুড়বাহিনীর। জর্মন অক্ষৌহিনী মস্কোর উপান্তে এসেও মস্কো অধিকার করতে পারছে না রুশ সৈন্যের আশ্চর্য বীরত্বের দরুণ—যদিও নাজি চমূর অসহ্য দম্ভনাদ শোনা যায় কাড়ানাকাড়ার তালে তালে: "Deutschland weber Alles"[১] —এর জাতীয় জয়ধ্বনির রেশও একটু আধটু ভেসে আসে। অমনি পাল্টা জবাব দেয় "লাল" সৈন্যরা বিখ্যাত "কম্যুনিষ্ট মার্সেল্‌স্‌" গেয়ে:

"Ye, workers, now smash to pulp
With your fists that phantom, God.
Onwards! Triumph! March, march!
Onwards and shot on shot…" [২]

কিন্তু ওদের ভাগবত আক্রোশের এ সিংহনাদকেও বুঝি ছাপিয়ে গেল, আকাশের বোমারু বজ্রনাদ আর মাটিতে মুমূর্ষুদের আর্তনাদ।…ঐ আইভান ভালিকি মিনারের কাছেই একটা বোমা পড়ল। জলস্থল উঠল থরথরিয়ে কেঁপে।…দেখতে দেখতে আকাশের স্বর্ণরাগ ধূসরাভ হ'য়ে এলো, বিছিয়ে গেল মধ্যগগনে বাঁকা চাঁদের ম্লান আলো।…দিগন্তে একটি…দুটি…ক'রে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠলো একে একে।…ক্রেমলিনের উস্পেনস্কি গির্জার উপরে কে ও? ষ্ট্যালিন না? চোখে তাঁর দূরবীণ, চারদিক দেখছেন ঘুরে ঘুরে—একা।

ষ্ট্যালিন (চম্‌কে): কে ও? (জেবের ভেতর থেকে পিস্তল বেরিয়ে এল)

আবির্ভাব: মিথ্যে ছোড়া—আমাকে লাগবে না।

ষ্ট্যালিন (সভ্রূভঙ্গে): লাগবে না? পাগল না কি? জানো আমার নিশানা?

আবির্ভাব: জানি—অব্যর্থ। কিন্তু তবু বৃথা হবে। আমি যে ওর নাগালের বাইরে!

ষ্ট্যালিন: বাইরে? প্রগল্‌ভতা রাখো। বল—কে তুমি?

খৃষ্ট (হেসে): Be of good cheer—It is I Be not afraid[৩]

ষ্ট্যালিন: (তিক্ত হেসে) A-f-r-a-i-d! ষ্ট্যালিন! ইয়ার্কির আর জায়গা পাও নি? বল সত্যি ক'রে—কে তুমি।

খৃষ্ট: (শান্ত কণ্ঠে) সত্যি ক'রেই বলছি, আমি সে-ই যাকে তোমরা ক্রসে ঝুলিয়েছিলে।

ষ্ট্যালিন: (তীক্ষ্ণনেত্রে) ক্রসে? মানে? যী-শু।

খৃষ্ট: খৃ-ষ্ট। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই চিনতে পারবে।

ষ্ট্যালিন: মিথ্যে কথা। তুমি হিটলারের চর। (হেঁকে) এ-ই-ই কে আছিস? (চক্ষের নিমেষে চারটি রক্ষকের অভ্যুদয়, সঙ্গে G. P. U.-এর গোয়েন্দা) এ-ই ধর্‌ ওকে—ঐ যে—দেখতে পাচ্ছিস নে? ঐ যে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসছে।

রক্ষক চতুষ্টয়: (প্রায় একবাক্যে) কে? কই? কেউ ত' নেই কোথাও!

খৃষ্ট: (মৃদু হেসে) ওরা দেখতে পাবে না ত'—আমি

* যাকে বলা হয় Vision ওদেশে। উদ্ধৃতিগুলি (নিম্নরেখাঙ্কিত লেখা) সবই বাইবেল থেকে।

১ "জর্মনি সবার উপরে"—জর্মনির বিখ্যাত জাতীয় বন্দেমাতরম্‌।

২ "শ্রমিকগণ। ঘুষি মেরে গুঁড়ো ক'রে দাও ঈশ্বর-মরীচিকাকে। এগোও, জয়লাভ কর—গুলির পর গুলি মার।" —বিখ্যাত রুশ কবি Dem'iyan Bednyi রচিত রুশ গানের ইংরাজি অনুবাদ।

৩ আনন্দ কর: আমি আমি—মা ভৈঃ।

শুধু তোমাকেই দেখা—(ষ্টালিনের হাতে পিস্তল পরপর পাঁচবার আওয়াজ হ'ল)।

খৃষ্ট: (ধোঁয়া কেটে গেলে) কী? (হাসলেন)।

ষ্টালিন: (রক্ষকদের) আচ্ছা, তোমরা এখন যেতে পার। (রক্ষক চতুষ্টয় ও গোয়েন্দা নায়কের প্রস্থান)।

খৃষ্ট: (একদৃষ্টে) কী দেখছ অমন ক'রে ঠায় চেয়ে?

ষ্টালিন: কে তুমি? ভূত?

খৃষ্ট: (হেসে) আমি বলি নি কি যে ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না? সেই যে—মনে নেই?—যখন ইহুদিদের পাণ্ডারা বললে আমি শয়তান ব'লেই আমার হুকুমে শয়তানে পাওয়া রুগি সেরে ওঠে?

ষ্টালিন: না। বাইবল্ আমি ভাল ক'রে পড়ি নি। কী বলেছিলে?

খৃষ্ট: If Satan cast out Satan, He is divided against Himself: how then shall His Kingdom stand?১

ষ্টালিন (পিস্তল পকেটে রেখে): আচ্ছা, তোমার মাথার চারদিকের ও জ্যোতি কিসের?

খৃষ্ট: তোমার বিজ্ঞানের Scribe Phariseeদের তলব কর না, দেখি এ-রশ্মির wave-length মেপে কেমন বলতে পারে?

ষ্টালিন: ফের মস্করা? জান, আমাকে কেউ কখনো হাসতে দেখে নি?

খৃষ্ট (হেসে): সে-যুগেও এম্নি একজন বেরসিককে বলেছিলাম আমি—Physician, heal thyself।২

ষ্টালিন (কুপিত): জান তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ?

খৃষ্ট: আহা, রাগ কর কেন বন্ধু? এই দু'দিন আগে হিটলারের সঙ্গে এত গলাগলি ক'রেও কি শেখ নি যে, যারা হাসতে শেখে নি তারা জীবনকে বুঝতেও শেখেনি?

ষ্টালিন (সব্যঙ্গে): তুমিই কি শিখেছিলে বন্ধু Scribe আর Phariseeদের সঙ্গে গলাগলি ক'রে? শিখলে কি আর ক্রুসে ঝুলবার সময়ে তোমাকে তাদেরই টিটকিরি শুনতে হ'ত যাদের তুমি বাঁচাতে চেয়েছিলে যে—"He saved others: himself he could not save?"১

তাদের টিটকিরি শুনতে হবে জেনেও কেন যে আমি তাদের বাঁচাতে গিয়েছিলাম তোমাকে কী ক'রে বোঝাব বন্ধু? এ যে তোমার বুদ্ধির নাগালের বাইরে।

ষ্টালিন (রুষ্ট): কী? আমাকে নির্বোধ বলতে তুমি সাহস কর?

খৃষ্ট (সান্ত্বনার স্বরে): আহা কথায় কথায় চ'টে ওঠ এই ত' বেরসিকদের—থুড়ি—ডিক্টেটরদের দোষ। নইলে হয় ত' তুমিও পুরোপুরি না বুঝলেও—খানিকটা হদিশ পেতে পারতে আমি কী বলতে চেয়েছিলাম যখন বলেছিলাম—"Whosoever shall save his life shall lose it.২

ষ্টালিন (কুপিত): ওসব ছেঁদো কথা রাখ, আমার কাজ আছে—তোমার মতন আত্মহত্যা ক'রে আকাশে ফুল ফোটাতে চাইবার উৎসাহেরও অভাব।

খৃষ্ট: কী কথা বলব তা' হ'লে? অন্নই সারাৎসার এই মার্ক্সবাক্য—যার ফলে জগতে মানুষ সব আগে পরস্পরের অন্নেরই সাধল সর্ব্বনাশ?

ষ্টালিন: আমরা সর্ব্বনেশে পাপী—জানি। কিন্তু তুমি যদি এতই নিষ্পাপ ফুলের রেণু দিয়ে গড়া ত' এই পাপ ঝড়-ঝাপটার মর্ত্যভূমিতে পাঁপড়ি মেলতে গেলে কোন্ বিড়ম্বনায় শুনি?

খৃষ্ট: যারা শুধু অস্ত্র বোঝে তাদের কাছে কী ক'রে বোঝাব যে, মানুষ যাকে বিড়ম্বনা নাম দিল তারই আসল নাম হ'ল করুণা!

ষ্টালিন: ফে—র হাসি?

খৃষ্ট: (গম্ভীর) আচ্ছা হাসি যখন তোমার চক্ষুশূল তখন ছুটো কান্নার কথাই বলি শোন। দেখ, আমি এসেছিলাম সত্যই: Not to destroy, but to fulfil ৩ তাই ত'

১ শয়তানই যদি তাড়ায় শয়তানকে, সে হয় আত্মবিচ্ছিন্ন। তা' হ'লে তার রাজ্য আর টিঁকবে কেমন ক'রে?

২ ভিষকবর! আগে নিজেকে সারিয়ে তোল।

১ খৃষ্ট অপরকে বাঁচিয়েছিলেন, নিজেকে বাঁচাতে পারলেন কই?

২ যে নিজের জীবনকে আগলে বাঁচিয়ে রাখতে যাবে সে-ই হারাবে জীবনকে।

৩ আমি এসেছি ধ্বংস করতে নয়, সার্থক করতে।

মর্ত্ত্যের মানুষকে শোনাতে এসেছিলাম স্বর্গের বাণী—যে, "ভগবানকে প্রিয়তম স্বজনের চেয়েও ভালবাসবে।" বলেছিলাম—"প্রতিবেশীকে ভালবাসবে নিজের মতন ক'রে।" শুনে গৃহী পণ্ডিতরা উঠল ক্ষেপে। এনেছিলাম সরলতার মন্ত্র, বললাম মানুষকে হ'তে হবে শিশুর ম'ত সরল, অমনি প্রবীণেরা উঠল জ্ব'লে। আরও অনেক বাধা ছিল—শয়তানের প্ররোচনাও—যা তোমরা আজ বিশ্বাস কর না—

ষ্ট্যালিন: কুসংস্কার যে—

খৃষ্ট: হায় রে! শয়তানি বুদ্ধি মানুষকে আজ রোজই চালাচ্ছে—অথচ তোমরা ভাবছ তোমাদের কাজের কর্ত্তা তোমরাই। মানুষ অমানুষ না হলে কি আজকের যুদ্ধ করকে পারত ভাব? হিটলার যে রাজ্যের পর রাজ্য শ্মশান ক'রেও আজ জয়ধ্বনি পাচ্ছে কোটি কোটি মানুষের কাছ থকে সে পেতে পারত কি যদি মানুষ আজ শয়তানের তল্পি বইতে স্বেচ্ছায় না রাজি হ'ত? কিন্তু যাক সে কথা—যা বলছিলাম, আমি এসেছিলাম মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য আনতে, তোমরা চাইলে মর্ত্ত্যকে রসাতলে পাঠাতে—অন্ধ বিজ্ঞানের বস্তুবাদকে চরম মেনে আর স্বার্থের ক্ষণিক সুখকে ভয়ঙ্কর ব'লে না জেনে। তাই তোমরা সত্যকে ছেড়ে রাষ্ট্রে ডাকলে মিথ্যা-নৈতিকদেরকে—"ডিপ্লোমাট" উপাধি দিতে। খাল কেটে কুমীর আনলে ডেকে সাদরে। ফলও ফলল। জানতাম আমি ফলবেই। তাই সেদিন বলেছিলাম মনে আছে? Nation shall rise against Nation and Kingdom against Kingdom ১ হ'লও তাই। মড়াকান্না পৌঁছল স্বর্গেও। ভাবলাম—একবার দেখে আসি যদি এখন সময় থাকে।

ষ্ট্যালিন: এসে দেখলে কী?

খৃষ্ট: আমাকে খেদিয়ে যাঁদেরকে বসালে তোমাদের মন ও হৃদয়রাজ্যের সিংহাসনে তাঁরা স্বর্গের লোভ দেখিয়ে তোমাদের কোন্ আত্মঘাতের অসুখা লোকে ডেকে এনেছেন সেই দৃশ্য। তবু তোমরা নরকে বিশ্বাস কর না।

ষ্ট্যালিন: ফুঃ—যত সব সেকেলে—

খৃষ্ট: জেগে যে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না, বলে না?—ঐ দেখ তোমারই সামনে মানুষ সুরঙ্গ কাটছে মানুষের হাত থেকে বাঁচতে। এতেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। নৈলে ভেবে দেখ একটিবার; যে ভোগের লোভে তোমরা হাজার হাজার সাজানো সাধের বাগান পুড়িয়ে দিচ্ছ—সে ভোগ কি এ-দুর্ভোগের চড়া দরে মানুষ কিনতে রাজি হ'ত যদি সে আজ শয়তানি হিংসা আর আত্মঘাতী লোভে একেবারে অন্ধ না হত।

ষ্ট্যালিন। (চিন্তিত) তুমি ভুল বলেছ ঢের। কেবল একটা কথা হয় ত' বলেছিলে ঠিক: "There shall be weeping and gnashing of teeth.১—(চমকে) ওকি? মস্কোভা নদীর উপর একটা যাত্রীভরা নৌকা উল্টে গেল। (দূরবীন এঁটে) আহা একটা নৌকা তুলছে একটী মেয়েকে—ও কি? নাজিরা টিপ ক'রে মেয়েটিকে গুলি করল আকাশ থেকে!! এর প্রতিফল পাবে।

খৃষ্ট: (সেদিকে তাকিয়ে কান পেতে): রইল শুধু মেয়েটির মা। শুনছ কি বলছে সে? বলছে—ওর চারটি ছেলে দুটি মেয়ে গেছে মাস খানেকের মধ্যে—রইল শুধু ও-ই বেঁচে!

ষ্ট্যালিন: আহা! (সংযত) কিন্তু এ হিংসায় জগতের আজ ভরাডুবি হতে পারত কি যদি তোমার করুণাময় পিতা সত্যিই থাকতেন হালটি ধরে?

খৃষ্ট: (হেসে): তোমাদের তর্কশাস্ত্রের বলিহারি! গাছেরও পাড়বে, তলারও কুড়ুবে! করুণাময় পিতাকে মানবার বেলায় মানবে না—মোহের মন্দিরে করবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্তবগান—আর যখন এ-বুদ্ধি তোমাদের হানবে ছাই শক্তিশেল তখন গাল দেবে কোথায় তাঁর বিশল্যকরণী বলে? সে দিন যখন আমি তোমাদের কাছে এনেছিলাম তাঁর উপদেশ তখন বলিনি কি—I am come in my father's name and ye receive me not: if another come in his own name him ye will receive২

১ সেদিন মানুষ কাঁদবে আর অভিশাপ দেবে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে—(বাইবল)

২ আমি এসেছি আমার পিতার সত্য প্রতিনিধি হয়ে, তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না—পরে যারা আসবে তাঁর জাল প্রতিনিধি হয়ে তাদের তোমরা গ্রহণ করবে

জাতি উঠবে জাতির বিরুদ্ধে, রাজ্য—রাজ্যের

ষ্ট্যালিন (সব্যঙ্গে) : O' thou of whom the world was not worthy ?১

খৃষ্ট : এত ঠেকলে বন্ধু, তবু শিখলে না কোথায় হাসতে হয় আর কোথায় কাঁদতে হয় ?—ফের ঐ…ঐ দেখ একটু চোখ খুলে।

(ষ্ট্যালিন চমকে উঠলেন বোমার শব্দে—প্রাকারের বাইরে পড়ল বোমাটা অনেক-দূর-থেকে-ছোড়া কামানের। পড়ল একদল তরুণ সৈন্যের মাঝে। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল তাদের চিহ্নও নেই শুধু যেখানে তারা ছিল একটা প্রকাণ্ড গর্ত)

ষ্ট্যালিন : (হাতের দূরবীণ কাঁপছে)—হুঁ। (দূরবীণ নামিয়ে) কিন্তু এতে কী প্রমাণ হ'ল শুনি ?

খৃষ্ট : যদি বলি—A tree is known by its fruit ?২

ষ্ট্যালিন (নিশ্চুপ)

খৃষ্ট : কী ভাবছ ?

ষ্ট্যালিন : তুমি না অন্তর্যামী ? বল ত'।

খৃষ্ট : (হেসে) বললেই কি মানবে তোমরা ? টেলিপ্যাথি-জাতীয় একটা গালভরা নাম দিয়ে দেবে উড়িয়ে—নামকেই ব্যাখ্যা ঠাউরে।

ষ্ট্যালিন : এখন অন্তত দেব না—বল।

খৃষ্ট : তুমি ভাবছিলে—আমি সেদিন ঠিক বলেছিলাম কি না যখন প্রচার করেছিলাম—"Be ye wise as serpents and harmless as Doves."৩ নয় ?

ষ্ট্যালিন (বিস্মিত) : এত যখন তুমি জান তখন বলবে আমাকে আর একটা কথা ? আমরা তোমার এ-হুকুমের শুধু প্রথমটুকু তামিল করেছিলাম শেষেরটুকু ছেড়ে। তাই কি আজ বিষের এ-শাস্তি ?

খৃষ্ট : কোন্ শাস্তির কথা বলছ ?

ষ্ট্যালিন : তোমার ভক্তবীর সেণ্ট পলের কথা মনে পড়ে না—"The wages of sin is death ?"৪

খৃষ্ট (তীক্ষ্ণ নেত্রে) : হঠাৎ ভূতের মুখেই রামনাম ?

ষ্ট্যালিন : তা-ও কি ব'লে বোঝাতে হবে বন্ধু ? অন্তর্যামী হ'য়েও জানো না কি তুমি যে আমরা কত আশা ক'রে প্রতি অন্তরের অন্তঃপুরে জ্বেলেছিলাম বিজ্ঞানের মশাল ?

খৃষ্ট : জানি কিন্তু এতে পাপের প্রশ্ন এল কেন—বিশেষ তোমার মনে ? তোমরা না পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক সবই কবে উড়িয়ে দিয়েছ কুসংস্কার ব'লে ?

ষ্ট্যালিন : ঠেকে হয় ত' মানুষ না-ও শিখতে পারে—কিন্তু ঠ'কে না শিখে উপায় আছে কি ?—ঠাট্টা না বন্ধু, আজকাল আমাদের অনেকেরই মনে হয় কোথায় যেন একটা মস্ত ভুল হয়েছে—না—ভুল বললে ভুল হবে। পাপ—পাপ। মস্ত কোনো পাপ। অথচ বুঝতে পারছি না ঠিক—কোথায়। (সহসা) বলবে আমাকে ?

খৃষ্ট (একটু চুপ ক'রে থেকে) : যে-মশাল ভগবান তোমাদের জুগিয়েছিলেন অন্তরের আলো ক'রে তা দিয়ে তোমরা দলে দলে ছুটলে ঘরে আগুন দিতে কেন ? ধর্ম্ম—

ষ্ট্যালিন (বাধা দিয়ে) রক্ষে করো—ধর্ম্ম ভগবান—অতটা তাই ব'লে ধাতে সইবে না। ক্রেমলিনে ঢুকবার সময় দেখ নি কি টাঙানো লেনিনের ঝাণ্ডা যে "ধর্ম্মই হ'ল মনের আফিঙ ?"

খৃষ্ট (সব্যঙ্গে) : আর বৈজ্ঞানিক বোমা গ্যাস টর্পেডো ? আত্মার মলম ?

ষ্ট্যালিন (চিন্তিত) : জানি না। কেবল একটা পুরোণ প্রশ্ন থেকে থেকে মনকে বেঁধে। কী সেটা—আন্দাজ করতে পার কি ?

খৃষ্ট (হেসে) : যে, ঈশ্বরের পুত্র তাঁর পিতৃদেবের মূর্ত্তি গড়েছিলেন এই আফিঙের ধোঁয়া দিয়েই ?

ষ্ট্যালিন (বিষণ্ণ) : কথাটা হাসির নয়—কান্নার। আমি ভাবছিলাম—মানুষ শুভকে চায় এ সত্য, এ-শুভের ইমারৎ গড়তে চায় শক্তির বিজয়স্তম্ভের উপর এও মিথ্যা নয়। অথচ শক্তির প্রয়োগ করতে গিয়ে শুভ সৌধের বনেদ গাঁথতে না গাঁথতে কেন দেখা যায় রোজই যে অজান্তে শুভটা হ'য়ে উঠল গৌণ, অহঙ্কারটাই মুখ্য ? কেনই বা দলছাড়া মানুষ হাজার সুবুদ্ধি হোক না—দলে পড়তে না পড়তে হ'য়ে ওঠে আত্মঘাতী ? কেন এত কুচকাওয়াজ শিখেও শক্তিই হ'য়ে ওঠে শক্তিশেল ?

---

১ জগৎ যাঁর যোগ্য ছিল না (সেণ্ট পলের বাণী—যীশু সম্বন্ধে)

২ গাছকে জানা যায় তার ফল দিয়ে

৩ সাপের মত জ্ঞানী হও—কপোতের ম'ত নিরীহ

৪ পাপের বণ্টন হ'ল মৃত্যু

খৃষ্ট: তোমার বিজ্ঞান কী বলে?

ষ্ট্যালিন: বিজ্ঞান কি শেষ পর্যন্ত কিছু বলতে পেরেছে কোনদিন? না, ব্যঙ্গ রাখো। বল তার চেয়ে তোমার প্রেমের বাণী জ্ঞানের আলো কী বলে? আমরা কি ভুল পথ ধরেছি—শুধু ইন্দ্রিয় বুদ্ধিকেই অদ্বিতীয় দিশারি ব'লে মেনে নিয়ে?

খৃষ্ট: আর একটু খুলে না বললে—

ষ্ট্যালিন: তুমি জানো—মধ্যযুগে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার মোহান্তদের হাতে তোমার মোহান্তরা কী ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল পদে পদে—যার ফলে তোমার প্রতিষ্ঠা প্রভাব দুয়েরই ভাটা প'ড়ে এলো দেখতে দেখতে। আসবে না? বেশির ভাগ মানুষ চিরকালই অনশনে অর্দ্ধাশনে কাটালো, কাজেই তারা সহজেই ক্ষেপে উঠল যখন দেখল যে অল্প দু'চার জন ছিল ধনী তারা বেমালুম চেপে গেছে তোমার সেই কথাটা যে উটের পক্ষে ছুঁচের মধ্যে ঢোকা তবু সহজ, কিন্তু ধনীর পক্ষে স্বর্গের সিংহদ্বারে ঢোকা নয়, শুধু নিরন্নদেরকে দাবিয়ে ব'লে বেড়াচ্ছে তোমার ঐ কথাটা যে Man shall not live by bread alone.[১]

খৃষ্ট: একটু চুক হ'ল—যদিও তোমার অভিযোগের মধ্যে সত্যও আছে খানিকটা।

ষ্ট্যালিন: চুক! কী চুক?

খৃষ্ট: যে, যে-স্বর্গরাজ্যের নির্ভর ইন্দ্রিয়বোধের 'পরেই, তার নগদবিদায় হাতে হাতে, কিন্তু যে-স্বর্গরাজ্যের অতীন্দ্রিয়-বোধের ভিৎ-এ তার খাতিরে—অধ্রুবের জন্যে—ধ্রুবকে ছাড়া সহজ নয়।

ষ্ট্যালিন: কিন্তু যে-অধ্রুবের জন্যে তারা ধ্রুবকে ছাড়বে সে-অধ্রুবের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী যারা—অর্থাৎ তোমার মোহান্তরা—তাঁদের রকম সকম দেখে যে লোকের শ্রদ্ধার গোড়াটাই হ'য়ে এলো দুর্ব্বল—তার কী? তাছাড়া, মাফ কর বন্ধু, তোমাকে দেখলাম বটে, কিন্তু তোমার পিতা যে রয়েই গেলেন পর্দ্দানশীন। আরো তোমাকে যখন লোকে একটু চিনবে চিনবে করছে ঠিক সেই সময়ে তোমার পাণ্ডা পুরুতরাই যে তোমাকে করল আড়াল—তোমার ভাবভক্তিও যেন তাদের মন্ত্র-তন্ত্রের তাপেই আরও গেল উবে। কাজেই তখন রটল—দিকে দিকে—স্বর্গরাজ্যের রাজা "হৃদয়" হচ্ছে আজও নাবালক—অতএব অছি ডাকা হোক বুদ্ধিকে ভক্তির শক্তিহীনতায় নাজেহাল হ'য়ে মানুষ রাজি হ'ল সাগ্রহেই। ফলে জগতে ছত্রপতি হ'লেন ভাব-রাজা না—বুদ্ধি মন্ত্রী। এ সবই তুমি জান।

খৃষ্ট: জানি। তার পর?

ষ্ট্যালিন: আর কী? হানা দিল বিজ্ঞানের হাজা তুকতাক ভেল্কি ফন্দি ফিকির—শুধু বস্তু রাজ্যে বস্তু রাজ্যে নয়, মনোরাজ্যে—প্রাণরাজ্যেও। ওদের চাপে আমাদের ভাবধারা বদলে যেতে লাগল হু হু ক'রে। মোহে প'ড়ে আমরা তোমার পায়ে যে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলাম তাকে রদ ক'রে টিপসই দিলাম বুদ্ধির রাজিনামায়। টিপ সই বলছি এই জন্যে যে বুদ্ধির মোসাহেব বেশি রেক্রুট করা হ'ল নির্ব্বোধ ও অবোধদের পাড়া থেকেই। ফল যা হবার: এল অতিচালাকদের যুগ। তাঁরা রটালেন যে, নগদবিদায় তথা পারের পারানি এক চালাকিরই তহবিলে—বৈজ্ঞানিকেরা পাদপূরণ করলেন ঐ সঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে, এ-বস্তুবিশ্বে বহু ছাড়া চালাকদের আর দ্বিতীয় উপাস্য নেই নেই নেই—থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা এটা স্বতঃসিদ্ধের মতনই ধ'রে নিলাম যে বস্তুই যখন অদ্বিতীয় সত্য তখন সে-রথ টানতে হবে শুধু ইন্দ্রিয়বোধ ও বুদ্ধির জুড়ি জুতে। এ-ও তুমি জান।

খৃষ্ট:. বলছ ভাল। তারপর?

ষ্ট্যালিন: তারপরই এল মানুষের দুর্দিন ঘনিয়ে কেন যে!—লেনিন হাঁকলেন: Freedom is bourgeois prejudice আর স্বপ্ন যদি দেখতেই হয়—

খৃষ্ট: (হেসে) ত দেখো বিদ্যুতের তথা "পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের"?

ষ্ট্যালিন: এতটা বলা চলে না।

খৃষ্ট: এর পরেও "না"? স্বর্গ থেকে আমি ও archangelরা কি দেখি নি স্বচক্ষে তোমাদের সে ধুমধড়াক্কা সব কাল্‌চারকেই বুর্জোয়া ব'লে উড়িয়ে দেওয়া—সব সুকুমার অতীন্দ্রিয় অনুভব উপলব্ধিকেই ঢেঁড়া পিটিয়ে পুলিপোলাও চালান দিয়ে অনুভবহীনদেরকেই আস্ত'জে হোক করা—শুধু এই যুক্তিতে যে অনুভবে তারা কৃপণ হ'লেও

১ শুধু অন্নের জোগাড় হ'লেই মানুষের মুক্তি নেই।

মাংস পেশীতে স্থূল ও ক্ষুধায় উগ্রচণ্ড? দেখি নি কি তোমাদের চেকা গোয়েন্দার সর্ব্বব্যাপী উৎপীড়ন—তোমাদের মতে যাদের সায় নেই তাদের পরে সেই অমানুষিক অত্যাচার—যার নকল করল নাজিরা তাদের আরো সরেস গেস্তাপো গোয়েন্দার কীর্ত্তিকলাপে? শোন বন্ধু, মুখে আজ আমি ব্যঙ্গ করছি বটে কিন্তু সেদিন আমার পিতাকে কত আর্জিই যে জানিয়েছিলাম এ-মতিভ্রম থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে—রক্ষকদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, যখন (তোমাদের ভাষায়) সর্ব্বহারাদের প্রলেটারিয়েট সিংহনাদে ধরিত্রী উঠলেন টলমল ক'রে—যখন তোমরা জোট পাকিয়ে তাল ঠুকে মনপ্রাণ হৃদয়ের সিংহাসন থেকে ভগবানকে নামিয়ে বসালে লুব্ধ ক্ষুব্ধ দুর্গতদেরকে—তাদের হিংসাকে উস্কে দিয়ে—ভুলে গিয়ে যে ভোগের সরঞ্জাম হাত বদল করলেই কিছু ভোগীর মনটা যায় না রাতারাতি বদ্‌লে। হয় শুধু রেষারেষির অপচয় আর হৃদয়বৃত্তির ভ্রষ্টাচার। এহেন কলিযুগে হৃদয়ের বাণী শুনলে হাসি পাবেই ত—তোমাদেরও পেল—তাই তোমরা শান্তির কথা উঠতেই রং তামাসা শুরু করলে—টিটকিরি দিলে আমার এই ধরণের কথায়—Blessed are the peace-makers—For they shall be called the children of God"[১] অবশ্য যুদ্ধের স্বপক্ষে হাজারো যুক্তিরও হাজিরি দিতে দেরি হ'ল না কেন না বুদ্ধিকে যখন বাসনার আগুনে হাওয়া দিতে ডাক দেওয়া হয় সে সাড়া দেয় সাগ্রহেই। তাই তোমরা ঝোপ বুঝে মারলে কোপ—Have-দের প্রতি Have not-দের ঘুমন্ত আক্রোশকে জাগিয়ে তুললে লজ্জিত লোভকে নির্লজ্জ উলঙ্গ ভাবে জাহির করে। মাফ কোরো বন্ধু। একটু আগে তুমি আমার মোহান্তদের দুষছিলে সর্ব্বনাশের ভারা বাঁধার জন্যে। আমি দেখাতে চাচ্ছি—জ্ঞান কারুর বংশকৌলীন্যের অপেক্ষা রাখে না—এ বস্তু যে চায় তাকে বহু সাধনায় তবে অর্জন করতে হয়, এ অর্জনের মূল্য দিতে যে নারাজ জ্ঞানকে সে পায় না কোনো দিনো—না শাস্ত্র আওড়ে, না বিজ্ঞান হাঁকড়ে—না ধর্ম্মের পাণ্ডা জুড়িয়ে, না অধর্ম্মের ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

[১] শান্তির ঘটকরাই ধন্য, কেন না তাদেরই উপাধি হবে ঈশ্বরের সন্তান

ষ্ট্যালিন: হু—ব্যঙ্গের লক্ষ্যবেধ শুধু বলশেভিক তীরন্দাজির করায়ত্ত নয় আজ বুঝলাম—সব প্রথম। তবে—(থেমে গেলেন)।

খৃষ্ট: কী?

ষ্ট্যালিন: (বিষণ্ণ) না, তোমার কথা ফের মনে প'ড়ে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—তুমি যাও।

খৃষ্ট: আহা রাগ করো কেন? বলোই না। (আকাশে দুটো রণার্থী বিমান জ্ব'লে পুড়ে গেল—অদূরে কয়েকটি অর্দ্ধদগ্ধ বৈমানিক প্যারাশুটে নামতে নামতে আর্তনাদ ক'রে উঠল)।

ষ্ট্যালিন (চমকে): ও কী? (দূরবীন লাগিয়ে) আহা দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে ওরা। (দূরবীন নামিয়ে) তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে কী বিপ্লবের ঝড় বইছে আজ আমার মনে, অর্থাৎ আমার মতন অনেক নাস্তিক নেতার মনে। তোমাকে বলতে বাধে কারণ এ-ঝড়ের কারণ মার্ক্স নয়—তুমি।

খৃষ্ট (আশ্চর্য্য): আমি? আমি ত' চেয়েছিলাম শান্তির বসন্ত রাজ্য।

ষ্ট্যালিন (হেসে): বন্ধু, তোমার কথায় আজ আমাকেও হাসতে হোলো। অশান্তিই যাদের উপজীবিকা শান্তিতে তাদের মতন ডরিয়ে উঠবে কে বলতে পারো?—কিন্তু এ ঠাট্টা থাক—এ-ও হাসির কথা নয়—কান্নার।

খৃষ্ট: কী?

ষ্ট্যালিন: এই সংশয় যে বুদ্ধির বাঁকা পথে যুক্তি হয় ত' মিলবার নয়। শোনো, আমাদের ট্র্যাজিডি তুমি এখনো পুরোপুরি ধরতে পারো নি। তুমি ছিলে নিষ্পাপ মানুষ, সরল মানুষ। কুটিল কুচক্রীদের মনস্তত্ত্ব বোঝো নি কোনো-দিনই, তাই ভাবতে অন্তিমে নরকের ভয় দেখিয়ে লোভীকে নির্লোভ করা সম্ভব—বোঝো নি যে মানুষ আর যাই চাক না কেন নিষ্কণ্টক শান্তির "স্বর্গরাজ্য" চায় না।

খৃষ্ট: কী চায় তবে।

ষ্ট্যালিন: (চিন্তিত) কে জানে? হয়ত নিত্য নূতন ঝড়ঝাপটা আবর্ত।

খৃষ্ট: তাহ'লে আর সংশয় কেন বন্ধু? মেঘ ত'

দিব্যি ঘনিয়ে আসছে দিনে দিনে। যা চাও তাই যখন পাচ্ছ হাতে হাতে—

ষ্ট্যালিন : ঐ তো—বলছিলাম না তুমি সরল মানুষ? আমরা কী যে ঠিক চাই তা কি সত্যি জানে কেউ? না না ঘূর্ণীতে ঘুরে মরি লোভের ঠেলায়—ভাবি এই পাক খাওয়াই বুঝি পরম পুরুষার্থ। কিন্তু হায় রে, আকাশ তবুও যে ডাকে! মুক্তি? চাই বটে, অথচ শিকল নইলেও বাঁচি কই?

খৃষ্ট : প্রথমটা দিতে এসেছিলাম আমি—

ষ্ট্যালিন : কে জানে হয় ত' দ্বিতীয়টাই দিতে এসেছে আমাদের লোভের মুগ্ধ বুদ্ধি, বিজ্ঞানের অন্ধ শক্তি, যন্ত্রের দারুণ দুর্দৈব। এইখানেই তো সংশয় বন্ধু! আর এই-খানেই ট্র্যাজিডি।

খৃষ্ট : সংশয়টা বুঝলাম, কিন্তু ট্র্যাজিডিটা ঠিক কী!

ষ্ট্যালিন : আজকের জগতের হাহাকারের দিকে চেয়েও বুঝতে পারছ না বন্ধু? না, টের পাও নি—বুদ্ধি আমাদেরকে কী ভাবে বুঝিয়েছি যে মুক্তি সোজা পথে মিলবার নয়—তার বসতি শুধু বাঁকা পথের দুধারে—সার সার সার সার? কিন্তু প্রশ্নটা এল এইখানেই—যে, যে-বুদ্ধি আমাদের কাণে মন্ত্র দিয়েছিল যে মানুষের স্বাধীন নবাবি কায়েম হবে শুধু যন্ত্রের বেহদ্দ গোলামি ক'রে, যে-বুদ্ধি অন্তরে লোভে প্রেমকে পাঠিয়েছিল স্বপ্ন আর কাব্যের অলস দ্বীপান্তরে, যে-বুদ্ধি আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে জগৎকে কেবল সে-ই বুঝতে পারে মেপেজুপে—সে-বুদ্ধির জন্মদাতা কে?

খৃষ্ট (হেসে) : কী মনে হয় তোমার?

ষ্ট্যালিন (বিষণ্ণ) : জানি না···এক সময়ে মনে হ'ত বুঝি জ্ঞান।

খৃষ্ট : কী?

ষ্ট্যালিন : মনে হয়···যেন আভাষ পাই···অন্তরের অতলে···কী একটা হায়ানিধি যেন সেখানে ওঠে থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে···কিন্তু ধরতে গেলেই ঢেউ তুফানে কোথায় যে যায় তলিয়ে···অথচ—

খৃষ্ট : অথচ?

ষ্ট্যালিন : এ-জগৎ এত সুন্দর···এত আলো এখানে· এত শোভা···এত শস্য, ফল, ফুল, রস, গান, গন্ধ···এ সবই কেন ধ্বংসের মুখে বেঁক নিল? এর নাম কি জ্ঞান? বলো না।

বলেছি আমি কবে—শুধু তোমরা কান দাও নি। তবু আমি কত ক'রে বলেছিলাম মনে আছে?

ষ্ট্যালিন : কী?

খৃষ্ট : The harvest truly is plenteous, but the labourers are few [১]

ষ্ট্যালিন : Harvest? কিসের?

খৃষ্ট (হেসে) তোমার গমের না?

(হঠাৎ আর একটা বোমা ফাটল কাছেই·· ধোঁয়া সরে গেলে ষ্ট্যালিন একা দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল)

ষ্ট্যালিন : কই? কেউ কোথাও নেই তো। কী যে সব জেগে স্বপ্ন দেখছি। এই—কে আছিস? (রক্ষক চতুষ্টয়ের প্রবেশ) ভরশিলভকে সেলাম দে। আর—হ্যাঁ নার্সকে বল একটু অডিকলোন আনতে—আমার মাথাটা গরম হয়েছে। (ফের চোখে দূরবীন লাগালেন)

১ ফসল তো অঢেল, কিন্তু কৃষাণ কয়জনই বা।

যবনিকা

বর্ম্মার কথা

২৪শে মে, ১৯৪২

প্রিয়তম ভূপেন্দ্র,

অনেক দিন যাবৎ তোমাকে কোন পত্র লিখি নাই। তুমি ডিব্রুগড় গিয়াছিলে। সেখান হইতে শ্রীমান্ গৌরীশঙ্করের শিলং-এর বাড়ীতে গিয়াছিলে। অদ্য শ্রীমান্ প্রফুল্ল শঙ্করের কাছে শুনিলাম যে তোমরা শিলং হইতে ধুবরীতে রওনা হইয়া গিয়াছ। শুনিলাম শ্রীমান্ রবি নাকি এখনও অসুস্থাবস্থায় শিলং-এই আছে। শ্রীমানের আরোগ্য কামনা করি। তাহার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত।

তুমি বর্ম্মা হইতে আসিবার পরে সমগ্র বর্ম্মা দেশ এক রকম শত্রু কবলিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ম্মা দেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, উহা বঙ্গদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত, বহুদিন হইতে অসংখ্য বাঙ্গালী ঐ স্থানে গিয়া বসবাস করিতেছিল, কেহ ওকালতি করিয়া, কেহ চাকুরীতে, কেহ বা ব্যবসা করিয়া বর্ম্মায় বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রেঙ্গুন সহরকে বাঙ্গালা দেশের অন্যতম সহরও বলা যাইতে পারে। মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন (কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মিঃ এ, এন সেনের পিতা), মিঃ জে, আর, দাশ (রেঙ্গুন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জাষ্টিস), বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী ব্যক্তি রেঙ্গুনে কেবল বাঙ্গালীদের নয়, নেতৃত্বে সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে বাঙ্গালীদের ক্লাব ছিল, স্কুল ছিল দুর্গাবাড়ীও ছিল। কিন্তু রেঙ্গুন সহর হইতে এখন সকলেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীমান ফণীভূষণ সেন, রমণী সেন উকীল, বহু বাঙ্গালী ডাক্তার, ডকের কর্ম্মচারীগণ, ব্যবসা ও চাকুরীজিবীগণ সকলেই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পুনরায় সমাগত হইয়াছেন। বর্ম্মা-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ পূর্ব্বে বর্ম্মা যাইবার সময় যেমন গরীবের ন্যায় অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বাহির হইতেন, এখন অনেকেই আবার সেইরূপ রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভাল কথা, তোমার বিশিষ্ট বন্ধু বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিয়াংমিয়াতে ওকালতি করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি নাকি তিনি ২।৩ লাখ টাকার সম্পত্তিরও অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তারপর আর তাহার কোন খবর জানিতে পারি নাই, তুমি জানিলে আমাকে অবশ্য জানাইবে।

রেঙ্গুনের পরেই মনে হয় মান্দালায়ের দুর্দ্দশার কথা। এখানে প্রথমে হয় বোমাবর্ষণ, কত লোক গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এখন ত' সহরটাই শত্রুর অধিকৃত। শাক্ গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র এখানকার গভর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি এই বালীগঞ্জেই আছেন। আমার ছাত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল এখন কোথায় আছে ঠিক বলিতে পারি না, তবে মান্দালয়েতে ওকালতিতে যে খুব পসার করিয়াছিল, তাহা তুমিও আমায় বলিয়াছ। সোয়েবুতে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তালুকদার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। তিনিও আসিয়াছেন। যেরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই হউন আর সামান্য অবস্থার লোকই হউন, সকলেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তোমরা এত পসার ও প্রতিপত্তি করিয়াছিলে, তোমারা পুনরায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসায় বাঙ্গালা দেশ কি কম গরীব হইল! বর্ম্মদেশের পতনে বাঙ্গালীরই দুর্দ্দশা বাড়িয়া গেল।

রেঙ্গুনে দুইটী সম্প্রদায় খুব বেশী দেখিয়াছি এক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ আর মান্দ্রাজী 'পঞ্চম', ইহারা 'পেরায়া' নামে অভিহিত। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মনগণ খুব বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণধী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আয়ার। আর পঞ্চমগণ অস্পৃশ্য। আমাদের নমঃশূদ্রদের অপেক্ষাও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি আমার মাতুলবাড়ী ষোলঘরে নমঃশূদ্রগণকে দাদা, মামা বলিয়া ডাকা হইত। লোকে তাহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিত না। তাহারা ঘরামির কাজ করিত, নৌকা চালাইত, সূতার মিস্ত্রীর কাজ করিত ও চাষ করিত। আজ এই পঞ্চাশ বৎসরে স্বল্প চেষ্টায় তাহাদিগকে 'জলচল' করা যদি সম্ভব না হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাদেরই দোষ। কবে আমরা সমদর্শিতা শিখিব?

বর্ম্মায় শুনিয়াছি এই পঞ্চমগণকে পরে নাকি শ্রমিকের কাজ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহারা

সকলেই দেশে ফিরিতে পারিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। মন্ত্রদেশ কি এই সমস্ত দেশবাসীগণকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে বিরত হইবে না? মন্ত্রদেশের কথা আসিতেই শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর কথা মনে পড়িল। ইনিও একজন তীক্ষ্ণধী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। যাক্‌, তাঁহার সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিব না, পরে তোমার কাছে লিখিব

আজ তোমাকে একটী হৃদয় বিদারক কাহিনী বলিব। আমাদের স্বজাতীয়, বোধ হয় আত্মীয়ও হইতে পারেন, জপসার মণীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সপুত্র মণিপুরের পথে স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। ইনি ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। রেঙ্গুনে ভূতত্ত্ববিভাগে (Geological Survey) কাজ করিতেছিলেন। ইনি মণিপুরের পথে বাঙ্গালা দেশে আসিতেছিলেন। সঙ্গে তাহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইনি মোটা মাহিয়ানা পাইতেন ও ইম্ফলে ইউরোপীয় ক্যাম্পে অবস্থান করিতেছিলেন। গৃহশিক্ষক নাকি পিতা ও পুত্র উভয়কেই বাঙ্গালী ক্যাম্পে থাইতে যাইবার জন্ম অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহারা সেখানেই থাকেন। ইত্যবসরে জাপানীদের বিমানযন্ত্র আসিয়া পড়ে ও বোমাবর্ষণ হয়। আঠার বৎসরের ছেলেটী সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় আর মণীন্দ্রবাবু আহত হইয়া কলিকাতা আসেন। ৭।৮ দিন হইল ইনিও ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা গিয়াছেন। অসুখের সময় ছেলের জন্ম নাকি বড়ই আক্ষেপ করেন।

এই গভীর শোকে যতীন্দ্র বাবুকে ও তাহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। শুনিয়াছি, ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদে যতীন্দ্রবাবু না কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। তিনি এখন জপসাতেই আছেন।

ইম্ফলে বোমাবর্ষণের কথা পূর্ব্ব হইতেই শুনিতেছিলাম। ভারতীয় ক্যাম্পে বোমাবর্ষণ হয় নাই। ইংরাজ-সৈন্ম আর কেহ মারা গিয়াছে কি না অথবা কত মারা গিয়াছে—তাহা বলা সুকঠিন। মণিপুর-ইম্ফলের পথের এই পরিণাম। সডিয়ার পথেও বোধ হয় চলাচল সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে গুজব উঠিয়াছিল তিনসুকিয়ায় বোমা পড়িয়াছে। গুজব প্রায়ই সত্য হয় না। তবে ডিব্রুগড় হইতে যে লোকজন পলাইতেছে ইহাতে মনে হয় ঐ দিকটাও নিরাপদ নয়। শ্রীমতী আন্না ও সুধীর না কি ডিব্রুগড় হইতে ধুবড়ী আসিয়া রহিয়াছে? তুমি কিছুদিন ধুবড়ী থাকিও, ইহাতে তোমার মন ভাল থাকিবে। তোমার জন্ম আমি বিশেষ চিন্তিত আছি। আন্না ও সুধীরের সংবাদ জানাইবে, তাহাদের জন্ম চিন্তিত আছি।

লিডো সডিয়ার নিকটবর্ত্তী সহর। আমার বাসায় মাখন নামে যে ছেলেটী থাকিত, তাহাকে তুমি জান, সে সম্পর্কে আমার ভাগিনেয় হয়। শিশু অবস্থায় রবি যখন তাহার জ্যেঠীমার কাছে আসিয়াছিল মাখনও তখন বাসায় ছিল। মাখন রবিকে খুব ভালবাসিত। মাখন আমার সঙ্গেই মেট্রোপলিটান বীমা কোম্পানীতে কাজ করিত। তারপর উচ্চ আশায় অন্য স্থানে চলিয়া যায়। সম্প্রতি দেড় শত টাকা বেতনে লিডোর একটী ফার্ম্মে চাকুরী করিতে গিয়াছে। কলিকাতা হইতে যাইবার পরে সে কোন পত্র লিখে নাই। তাহার জন্ম বড়ই চিন্তিত আছি। কারণ লিডো সম্বন্ধে অনেক গুজব কথা শোনা যায়। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুজব প্রায়ই সত্য হয় না। বস্তুতঃ মাখনের জন্ম আমি বিশেষ চিন্তিত। সে আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র।

ইতিমধ্যে শুনিলাম বদরপুর ও শিলচর প্রভৃতি স্থানে না কি বোমাবর্ষণ হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে জানিলাম ইহা ঠিক নয়—তবে নিকটস্থ একটী গ্রামে না কি বোমাবর্ষণ হইয়াছে। গ্রামে কেন এরূপ হইল? হয় ত' বা কোন বিমানঘাঁটির উপরে শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি পড়িয়া থাকিতে পারে। নতুবা শ্বেতাঙ্গ-গণের বোধ হয় ক্লাব ছিল।

বর্ম্মার কালোয়া স্থানটী শত্রু-অধিকৃত হওয়ার পরে আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্ম বড়ই ভয় হয়। আকিয়াব যখন শত্রু-কবলিত, আর মিত্রশক্তি আকিয়াবের উপর আবার পাল্টা বোমাবর্ষণ সুরু করিয়াছে, তখন চট্টগ্রামের জন্ম বাস্তবিকই ভয় হইয়াছিল। পরে শুনিলাম, চট্টগ্রাম সহরের স্থান বিশেষে না কি বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়াছে, আর কিছু লোকও না কি মারা গিয়াছে। তবে চট্টগ্রামে শত্রুসৈন্ম প্রবেশ করে নাই। কক্সবাজার পর্য্যন্তও শত্রু আসিতে পারে নাই—এ কথা নিশ্চিত।

ভূপেন্দ্র! যুদ্ধ হইতেছে, ইহা অনিবার্য্য। কিন্তু যেরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে লোকে যেন কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই আতঙ্কের জন্য সাধারণ লোককেই কেবল দোষ দেওয়া যায় না।

২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুন সহরে বোমা পড়িল, দুষ্ট লোক রটাইতে লাগিল কলিকাতায়ও শত্রু-বোমা আসিবে। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। সম্মুখে বড়দিনের ছুটী, সকলেই আশা করিল লোক আবার প্রত্যাগমন করিবে, মফঃস্বলের নানারূপ অসুবিধা অসহনীয় হইবে, কলিকাতার স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপাদিত হইল গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে। গভর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন, এক মাসের বেতন অগ্রিম লইয়া পরিবার অন্যত্র পাঠাইবার চেষ্টা কর। আর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দিলেন। কেন যে স্কুল-কলেজ খুলিতে খুলিতেই বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দিল—ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র অন্যত্র সরাইয়া এবং কন্‌ট্রোলারের দপ্তর বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্কুল-কলেজ বন্ধ করা ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ না করিলেও, কার্য্যতঃ ছেলেপিলেদের শিক্ষার পথে যে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কুল-কলেজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, পুনর্গঠনের সম্ভাবনা বড়ই কম।

তুমি শিক্ষা বিভাগের ডাঃ জেঙ্কিন্সের নাম শুনিয়াছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা মন্দিরে স্কুল-কলেজ সম্বন্ধে কয়েকটী কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, আমিও দুই তিনটীতে গিয়াছি। সেখানে দেখিলাম ডাঃ জেঙ্কিন্সের কথাই বেশী বলবৎ থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন যে Secondary Education Bill হইয়াছিল, ইনি তাহার খুব সমর্থনকারী ছিলেন। ডাঃ জেঙ্কিন্স এ দেশের অবস্থা সম্যক্ অবগত কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

এ পর্য্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ বাবুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার থাকুন কি না থাকুন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অখণ্ড আধিপত্য সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত নহে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থির মেজাজ ও নেতৃত্ব শক্তিতে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে আসুন না কেন, এমন কি কংগ্রেসে আসিলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা পাইতেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় আজ তাঁহার আধিপত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে ষোল আনা ভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ এক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধীন পরিচালনা-শক্তি আছে, গভর্ণমেণ্টেরও তাহা নাই। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ভীক ব্যবহারে লর্ড লিটনকে পর্য্যন্ত হার মানিতে হইয়াছিল। শ্যামাপ্রসাদ বাবু মন্ত্রী হইবার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন মত দিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। এইখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে।

আমাদের বন্ধু ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় এসেম্ব্লিতে বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিগণ গভর্ণমেণ্টের দাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কথাটা তীব্র আর কটু হইলেও মন্ত্রিদিগের স্বাধীন মত যে নাই তাহাতে সন্দেহ কি? মন্ত্রিদের কেন স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুরও সমরবিভাগের ইঙ্গিতের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন না। সকল দিক হইতেই মনে হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জননায়ক ডাক্তার শ্যামপ্রসাদ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য রাখিলেই বোধ হয় সব দিক্ হইতে ভাল হইত।

তুমি বলিতে পার ডাঃ বিধান রায় রহিয়াছেন। আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময় কোথায়? তিনি জাতীয়তাবাদী সন্দেহ নাই, কারাদণ্ডও ভোগ করিয়াছেন কিন্তু সময় না থাকিলে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করা যায় না। যে এক-প্রাণতায় স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাঁহার কোন কোন গুণ শ্যামাপ্রসাদবাবু উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামাপ্রসাদ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী, ইহাতে অন্ততঃ আমার ত' ক্ষোভের পরিসীমা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই আমি বিশেষ দুঃখিত। স্কুল কলেজ বন্ধ হইল, গরীব শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীদের চাকুরী গেল, যুদ্ধের বজ্রাঘাত সর্ব্বাগ্রে তাহাদের উপরেই হইল, মন্ত্রী না থাকিলে শ্যামাপ্রসাদবাবু তাহাদের হইয়া অনেক কথা বলিতে পারিতেন। হয়ত' এখনও কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে, হয়ত' আজও কিছু করিতে পারেন। কিন্তু তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, সাগরে শিশির ভিন্ন আর কি?

আরও একটা কথা বলার দরকার। Secondary Edu-

cation Bill-এর মূলে যখন কঠোর কুঠারাঘাত হইবে মনে করিয়া সেই বিলের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদবাবু শিক্ষা-আন্দোলন প্রবর্তন করেন, আমরাও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলাম। হাজরা পার্কে যে একটী কনফারেন্স হয় আমাদের দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষয়িত্রীগণ সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

অন্যান্য বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের বড় দেখি নাই। কিছুদিন হইল, শ্যামাপ্রসাদবাবু মৌলবী ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রী হইলেন। কি কথাবার্তা হইল, কি আপোষ হইল, তাঁহারাই জানেন। এখন আবার সেই বিল নূতন করিয়া আসিতেছে। হিন্দু মুসলমানে আপোষ হইলে আনন্দ বই আর কি হইতে পারে? কিন্তু কথা এই, দেশবাসীর নিকট কোনরূপ আবেদন হইল না, তাহাদের কোনরূপ মত গ্রহণ করা হইল না, কেহ কিছু জানিল না। দেখিতেছি নেতৃত্ব-মোহ শ্যামাপ্রসাদবাবুকেও নিয়মানুগ করিতে বাধা দিতেছে। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে সাধারণকে জাগাইয়া, বলিয়া কহিয়া আপোষ করাই উচিত নয় কি? তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিলাম।

এইখানে আর একটি কথা বলিতেছি।

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মোকর্দ্দমা চলিতেছিল সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাপেক্ষা বর্ত্তমানে আনন্দের বিষয় আর কিছু নাই। এই সব হাঙ্গামাতে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমানের পূর্ব্বে জেল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মুক্তি হওয়াও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আর যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান অর্থহীন, গৃহহীন ও সম্পত্তিহীন হইয়াছেন, তাহাদেরও ক্ষতি পূরণ হওয়া একান্ত উচিৎ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল মোসলেম লীগ ও হিন্দু মহাসভার কথা। আজ লীগের কথা কিছু বলিব না, কিন্তু প্রথমে যখন হিন্দুমহাসভা গঠিত হয় তখন হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ সকলেই ছিল উহার অংশ বিশেষ। বিরাট সঙ্ঘকল্পনায় আমরাও মোহিত হইয়া উহাতে যোগদান করিয়াছিলাম। দেশবন্ধুও বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীযুক্ত শশধর রায়, ৺পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে অনেক দিন সভা করিয়াছিলেন। তখন মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল বড় মহৎ। সমগ্র ভারতে অস্পৃশ্যগণকে জলাচরণীয় করিয়া সকলকে লইয়া এক বিরাট সঙ্ঘ গঠনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কয়েক বৎসর বেশ কাজ হইয়াছে। নকীপুরের রায় যতীন্দ্রনাথ আমাদিগকে লইয়া তখন সম্মিলনে কতবার গিয়াছেন। এখন সে সব উদ্দেশ্য আছে কিনা সন্দেহ। এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান। হিন্দুগণ যেন তাহাদের প্রাধান্য পাইতে পারে, ইহাই হইতেছে প্রধান লক্ষ্য। মুসলমান চায়, হিন্দুও চায়, এই চাওয়া চাওয়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। ধরিয়া লইলাম অনেক সময়েই মুসলমান দোষ করেন, কিন্তু দোষে দোষ কাটে না। সঙ্ঘবদ্ধ হই, আত্মরক্ষা করি, অত্যাচারীর দণ্ড হউক, বেশ ভাল কথা, কিন্তু চাকুরী লইয়া রাজনৈতিক ঝগড়া কেন, চাকুরী পাইলে ত' মিঃ ভট্টাচার্য্য, মিঃ বানার্জ্জি বা মিঃ রহমান বা আলি সাহেবরাই পাইবেন, তাহাতে রামা শ্যামা যদু করিমের কি লাভ? যেমন হিন্দু মহাসভা, তেমন মোসলেমলীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই দেশের ক্ষতি করিতেছে। হিন্দুমহাসভার কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বের মডারেট দলেরই নবতম সংস্করণ—ইহারা সিভিক গার্ডেও যোগদান করিবেন—হিপ্ হিপ্ হুররেও বলিবেন, কেবল হিন্দু বলিয়া প্রতিষ্ঠা চাহেন। কিন্তু সকল হিন্দুকে খুসী করা কি সম্ভব? বরং পূর্ব্বের মডারেটগণকে ঠিক বুঝা যাইত।

আর কংগ্রেসকে গালি দেওয়াই ইহাদের প্রধান কাজ। কিন্তু ইহারা জানে না কংগ্রেস কত সমদর্শী। কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও সকল ভারতবাসীর। আজ যদি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ন্যায় প্রেসিডেন্ট দশ বৎসরও জাতির কর্ণধাররূপে থাকেন, আর যদি সৈয়দ মহম্মদের মত বা ডাঃ খানসাহেবের মত মন্ত্রী অধিক সংখ্যকও হয়েন, তথাপি কংগ্রেস পন্থী ব্যক্তি,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কেহ আপত্তি করিবে না। হিন্দু মুসলমানে কিছু আসে যায় না। দেশকে সত্যি সত্যি ভালবাসিলেই হইল। যে হিন্দু কেবল হিন্দুর কোলেই ঝোল টানিবে, বা যে মুসলমান কেবল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, কংগ্রেসের মতে তাহার কোন পদ বা প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যে ভারতবাসী, হৌক সে মুসলমান কি খৃষ্টান সে প্রকৃতপক্ষে ভারতকে ভালবাসিলে, তাঁহার পদ লাভে কাহারও কোন আপত্তি নাই।

এই কারণেই হিন্দুস্বার্থের বিরোধী বলিয়া মোসলেম লীগের পাকিস্থান-পরিকল্পনা জাতির ঘোর অহিতকর। এই বিষয়ে কংগ্রেস যে পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহাই প্রকৃষ্ট। বস্তুতঃ লীগের পাকিস্থান ও হিন্দুমহাসভার এন্টি-পাকিস্থান, দুই-ই দুর্ব্বোধ্য। জাতি হিসাবে যাহা মন্দ, তাহা প্রকৃতই মন্দ —জাতি হিসাবে যাহা ভাল তাহা সকলের পক্ষেই ভাল। এই বাঙ্গালা দেশকে যাহারা ভালবাসিবে, হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টানের রাজনৈতিক, ধর্ম্ম ও সমাজগত স্বার্থরক্ষা যে করিবে সেই দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি—ইহাতে তাহার নাম আলি সাহেবই হউক বা তিনি মল্লিকমহাশয়ই হউন। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই খারাপ হয় না—আবার মুসলমান হইলেই ভাল হয় না, হিন্দু হইলেই খারাপ হয় না। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, আমার বাঙ্গালাকে ভালবাসিও। কংগ্রেস পাকিস্থানের যেরূপ বিরোধী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই সেরূপ নয়। কেন বিরোধী? কেন না —পাকিস্থানের পরিকল্পনা অখণ্ড দেশাত্মবোধের ঘোরতর পরিপন্থী। পাকিস্থানের বিরোধী যেমন পণ্ডিত জওহরলাল তেমন মৌলানা আজাদ। আর অখণ্ড ভারতের বিরোধ-মূলক পরিকল্পনা বলিয়াই মহাত্মাজী ইহার এত বিরোধী। কংগ্রেস ইহা চায় না, দেশ ইহা চায় না—তবে আবার পাকিস্থান দিবস এবং পাকিস্থান বিরোধী দিবসের আবশ্যকতা কি?

দেশের লোক একমাত্র কংগ্রেসের পতাকাতলে আসিয়া জড়ীভূত হউক, তবেই দেশ শক্তিমান হইবে। আর সকলে মিলিয়া, সব ভুলিয়া, আর্থিক প্রাচুর্য্য ও খাদ্য সম্ভার বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগুক, অসন্তুষ্টি অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু নিবারণ কল্পে ভারতীয় ঋষি প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণ করুন, ইহাই একমাত্র কামনা। ইতি— তোমার হেমেন্দ্র

প্রিয়তম ভূপেন্দ্র,

এতদিনে বুঝিলাম ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ শত্রুর কবলিত, কারণ সে-দিন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি (কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্) জেনারেল ওয়াভেল্ ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের পরিচালনাও জেনারেল ওয়েভেল করিতেন। তবে জেনারেল ওয়েভেল বলেন যে যুদ্ধের অবসান হইলেও একদিন অবশ্যই ব্রহ্মদেশে শত্রুকে পুনরাক্রমণ করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশ আবার আমাদের অধিকারে আসিবেই আসিবে।

ওয়াভেল ভারতে আসিবার পরে জেনারেল আলেক-জান্দার সেনাবাহিনী পরিচালনা করিতেন। তিনি সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। যদিচ আসিবার সময় শত্রুগণ বোমার সহায়তায় স্থানে স্থানে উত্যক্ত করিতে ছাড়িতেন না, তথাপি বলিতে হইবে তিনি এক রকম নিরাপদেই ভারতসীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখন যদি জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিতে চাহে, তবে ইংরাজ-সৈন্য নিশ্চয়ই তাহাদের বাধা দিবে। একেই ত' ভারত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, তারপরে ব্রহ্মদেশ হইতেও বাঙ্গালা ও আসামে সৈন্য আসিয়াছে। এখন ভারতে সৈন্যের অপ্রতুল হইবে না। যদিচ ভারতবর্ষ সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তথাপি বোধ হয় সহায়তার আবশ্যক হইবে না, কারণ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাচুর্য্য খুবই বেশী। যেখানে যাই সেখানে দেখি সৈন্যসমাবেশ!

জাপানীরা প্রথমে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট দিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করে। তাহারা ক্রমে ক্রমে মারগুই, টেভয়, মৌলমিন, খেটন, সেলুইনজেলা এবং টঙ্গু অধিকার করিয়া সমগ্র টেনিসারিম বিভাগে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সেলুইন নদীর তীরে অনেকদিন যুদ্ধ হয়। মৌলমীন সেলুইন নদীরই পারে এবং নদীটী উত্তর দিক হইতে শানষ্টেটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম-দক্ষিণে মার্ত্তাবান উপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিছুদিন পরে ইহারা সিটাং নদী পার হইয়া পেগুতে আসে এবং পেগু, রেঙ্গুন ও প্রোম ও থারওয়াড়ি প্রভৃতি পেগু বিভাগের সমস্ত জিলাগুলিই অধিকার করে। প্রোম ইরাবতীর তীরস্থ প্রধান নগর। এই প্রোমের রাস্তায় অনেকে পূর্ব্বে টাঙ্গুপ হইয়া আরাকান ইয়োমা পার হইয়া আকিয়াব হইয়া কক্সবাজারের মধ্য দিয়া চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইত।

ইরাবদি ডিভিসনের বেসিন, হেনজাডা, মিয়াংমিয়া, মমিব প্রভৃতি সহরও সহজেই জাপানীদের হস্তগত হয়। ক্রমে আরাকান বিভাগের আকিয়াব, কাউকপিয়ো ও সেণ্ডোয়ে প্রভৃতি সহরও ইহাদের হস্তগত হয়। এইভাবে নিম্নবর্ম্মা অধিকার করিয়া মান্দালয় বিভাগের মান্দালয়, ভামো,

মিচিনা, কাঠাডো প্রভৃতি সমস্ত জিলাই শত্রুগণ একে একে অধিকার করিয়াছে। মিচিনা কাঠাডো সর্ব্বশেষ উহাদের হস্তগত হইয়াছে। সেগেঁই বিভাগের সোয়েবো, সেগেঁই ও নিম্ন ও উচ্চ চিন্দুইনও অধিকৃত হইয়াছে। মিক্‌টিলা বিভাগের মিক্‌টিলা, মিনজান প্রভৃতিও পূর্ব্বেই হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই মিক্‌টিলা বিভাগেরই সরকারী উকীল ছিল বন্ধুবর বঙ্কিম গুহ। কিন্তু বহুদিন আর তিনি ইহজগতে নাই। তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি বর্ম্মায় ইঁহার বাড়ীতেও গিয়াছিলাম।

যাহা হউক কিরূপে যে সমগ্র বর্ম্মাদেশ ব্রিটিশের হাত হইতে শত্রুর হাতে চলিয়া যায় তাহা বিস্ময়ের বিষয়। সেলুইন, সিটাং পার হইবার পরে ইরাবতী বক্ষ দিয়া জাপানীরা অবাধে সাম্পানের সহায়তায় যাতায়াত করিয়াছে এবং প্রোম, ইনানজাঙ্গ, মিনজাম, প্যাগান, মান্দালয় প্রভৃতি অধিকারে ইরাবতী শত্রুকে খুবই সহায়তা করিয়াছে। অবশেষে চিন্দুইন নদী পার হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য পূর্ব্বদিকে আসিতে আসিতে ভারতসীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন তাহারা নিরাপদ।

এই চিন্দুইন নদী পার হইতে ব্রিটিশ বাহিনীকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। নদীটি বর্ষার সময় বড়ই খরস্রোতা হয়। আর এবার বর্ষাও শীঘ্র শীঘ্রই নামিয়াছে। হঠাৎ বান ডাকায় সৈন্যগণের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। ফেরীর সহায়তায় তাহাদিগকে পার হইতে হইয়াছে এবং তাই তাহারা সঙ্গে কোন ভারী জিনিষ আনিতে পারে নাই।

জেনারেল ওয়াভেল, জেনারেল ষ্টীল ওয়েল, জেনারেল, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রিটেন এই আকস্মিক বর্ম্মাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। জাপান যেন অতর্কিতে হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্ম্মাদেশ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। এই অতর্কিত যুদ্ধের জন্যই মিত্র-শক্তি জাপানী বিমান-শক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ সৈন্যসংখ্যাও জাপানীদের খুব বেশী ছিল। ভারতবর্ষ হইতে বর্ম্মা যাইবার সুগম রাস্তা না থাকায় সৈন্যের সরবরাহ হইতে পারে নাই। এদিকে রেঙ্গুন দখল করিবার পরে বঙ্গোপসাগরও একরূপ জাপানীদের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল।

এই রাস্তা সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। ভারতবাসী যেরূপ কষ্ট করিয়া আরাকান ইয়োমা পার হইয়াছে, অথবা মনিয়া, প্যালেল, কালেওয়া টামু হইয়া ইম্ফল গিয়াছে, অথবা সডিয়া দিয়া ডিব্রুগড় যাইবার রাস্তা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইচ্ছা করিলেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট খুব সুগম স্থলপথ করিয়া রাখিতে পারিত। তাহা হইলে লোকেরও এত অসুবিধা হইত না। সৈন্যসরবরাহেও বাধা হইত না। কিন্তু কেন করে নাই ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টই জানে। আমরা এবিষয়ে অনেকবার শুনিয়াছি যে স্থলপথে ভাল রাস্তা হইবে। কিন্তু হয় নাই। অনেকে বলেন এই রাস্তা হইলে ভারতীয়গণ দলে দলে বর্ম্মাদেশে যাইত। বর্ম্মীগণ নাকি এবিষয়ে আপত্তি করিয়াছে। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মীগণকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া দেখিতেছি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছে। যাহাদের জন্য এত করিয়াছে, সেই বর্ম্মীগণই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা শত্রুর সহায়তা করিয়াছে, শত্রুকে পথের সন্ধান দিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ কখনও জাপানীদের চাহে না, তাহাদিগকে কোনরূপ সহায়তাও করিবে না। প্রতাপ, রাজসিংহ, শ্রীচৈতন্য, চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীগণ, বঙ্কিম, হেম, রামমোহন, বিবেকানন্দের দেশ-বাসীগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না। কিন্তু আজ তাহারা যুদ্ধও ত' করিতে পারে না। তাহারা এই যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছে না। আর যুদ্ধের সহায়তায় কিছু সুফল ফলিবে এ বিশ্বাসও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহাদিগকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থাগত হইয়াই থাকিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন, তোমরা সকলে গভর্ণ-মেণ্টকে সহায়তা কর। কিরূপে সহায়তা করিব? আমাদের ঢাল নাই, তরওয়াল নাই, আমরা তো নিধিরাম সর্দ্দার! বিনা অস্ত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইব কিরূপে? ভবিষ্যতের আশায় চাকুরী করিয়া সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইব? নলিনীবাবু যদি গভর্ণমেণ্টের চাকুরিয়ারূপে সকলকে চাকুরী করিতে যোগ দিতে বলেন, তবে তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু তিনি বলেন 'আমি চাকুরিয়া হিসাবে বলি না, দেশবাসী হিসাবে বলি'। এখানে তাঁহার কথার অর্থ দুর্ব্বোধ্য। তিনি কেন

গভর্ণমেণ্টকে মত লওয়াইয়া কংগ্রেসের ভাবে আপোষের কার্যটা সারিয়া ফেলুন না? চাকুরী করিতে হয় তিনি চাকুরী করুন। কংগ্রেসের বিরোধী হইতেছেন কেন? নলিনীবাবুই বল, শ্যামাপ্রসাদ বাবুই বল, সন্তোষবাবুই বল আর বীর সাভারকরই বল, সকলেই কংগ্রেসের বিরোধী, সুতরাং তাঁহাদের কংগ্রেস-বিরোধী কোন কথা আমরা শুনিতে চাই না। তবে একথা ঠিক, আমরা এক পরাধীনতার কবল হইতে অন্য পরাধীনতার শিকল পরিতে চাই না। বরং ইংরেজের সহিত কিছুদিন ঘরকন্না করায়—একটু দহরম মহরম হইয়াছে। আর তুমি বাপু জাপানীই হও, জার্ম্মানীই হও, চিনি না, জানি না, তোমার সঙ্গে আমার ভাব কি? তুমি কথায় যাহাই বল, তুমি ত' আমাকে স্বাধীনতা দিবে না। স্বাধীনতা কে কাহাকে দিতে পারে? স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, সেই অর্জ্জনের যোগ্যতা চাই। যোগ্য হইবার জন্য আমরা কি করিতেছি? যোগ্য হইবার এই কি নমুনা। আজ সকলে একতাবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসকে কেন আমরা পুষ্ট করি না? কোথায় তাহা করি? তোমার হেমেন্দ্র

৮ই জুন, রবিবার

প্রিয় ভূপেন্দ্র,

পূর্ব্ব-আসামের কোন কোন স্থলে বোমাবর্ষণ হওয়ায় সমস্ত আসামেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য—কেবল কোথায় পালাই রব! গৌহাটী হইতে অনেকেই অন্যত্র যাইতেছে। শ্রীমান্ প্রফুল্লশঙ্কর যে ছেলেপিলে লইয়া শিলং গিয়াছিল তাহাকে সকলকে আনিতে হইয়াছে, তোমরাও চলিয়া আসিয়াছ। বাঙ্গালা এখন স্থির, তবে কোথায় কি হয় কে জানে? আমরা শ্রীমতী ইন্দিরা ও শ্রীমান্ গৌরীশঙ্করের জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। তাহারা সেই সঙ্গে আসিলে ভাল হইত।

তুমি ডাক্তার নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের পারিবারিক সংবাদে নিশ্চয়ই খুব ব্যথিত হইয়াছ। ছবি মেয়েটী কি চমৎকার ছিল। কেমন সরল। তুমি যে-দিন গৌহাটী যাও, তার পূর্ব্বদিনও তোমাদের বাসায় এক সঙ্গে খাইয়াছি। ছবির জন্য বড়ই কষ্ট হয়। আমার স্ত্রীর বড়ই আক্ষেপ রহিল, ঠিক সময়ে গিয়া তত্ত্ব-খবর লইতে পারে নাই। ডাক্তার বসু শ্রীমান্ প্রফুল্ল শঙ্করের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী। তাহার কাছেই সর্ব্বদা ঐ বাড়ীর খবরাদি পাইতাম। ছবির মৃত্যুর পরদিনই প্রফুল্লশঙ্করের সহিত ওদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। শ্রীমতী জ্যোতির চিঠি পাইয়াছি, এখনও উত্তর দিই নাই।

মেমিও এবং লাসিও হইতে অনেকেই আসিয়াছেন। আমার বন্ধু শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুর শ্রীযুক্ত অনুপম মুখোপাধ্যায় মেমিও হইতে রওনা হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আসিয়া পৌছেন নাই। তবে পরিবারবর্গ এরোপ্লেনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। আমাদের ক্লাসে যে রেবতীরঞ্জন দত্ত পড়িত, সে এখন সপরিবারে বহরমপুরে আছে। তাহার বড় জামতাও লাসিওতে থাকিত। গত সপ্তাহে আসিয়াছে। আমার একটী ভাগিনেয় শ্রীমান্ শৈলেন অনেক কষ্টে শিলচর হইয়া কুমিল্লা আসিয়া পৌছিয়াছে।

লাসিও ষ্টেশনটীর কথা মনে হয়। বড় সুন্দর ষ্টেশন। রেঙ্গুন হইতে লাসিও পর্য্যন্ত ট্রেণ গিয়াছে। এখান হইতে মান্দালয় হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মালপত্র চীনদেশে সরবরাহ হইত। বার্ম্মার পতনে চীনদেশের কি অবর্ণনীয় অসুবিধা হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পার।

মান্দালয় হইতে লাসিও ৪৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব। মেমিওতে গ্রীষ্মের সময় বার্ম্মার গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত হয়। মেমিওর দৃশ্য বড় মনোরম, ইহার স্বাস্থ্য বড় স্নিগ্ধ। মেমিওর পরে গোটেক গহ্বর। গহ্বরের উপর দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে পাশ দিয়াও একটী রাস্তা আছে। গহ্বরটীর দৃশ্য বড় সুন্দর।

গোটেকের পরেই লাসিয়া তারপর—বর্ম্মারোড্ দিয়া চীনদেশের ইউনান প্রদেশে যাইতে হয়। এই ইউনান প্রদেশ আজ বড় বিপন্ন। চীনের চেকিয়েং প্রদেশ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী—এই প্রদেশও বড় বিপন্ন, ইহার রাজধানী কিনহোয়া শত্রুর কবলিত হইতে চলিয়াছে। চীন গেলে ভারতের ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। চীন ও ভারত দুইটী এশিয়ার প্রাচীনতম দেশ। উভয়েই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব করে। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই লিখিয়াছেন—

Asia is one ; the Himalayas divide it only to accentuate.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রেলওয়ের সীমান্ত প্রদেশ কাঠা, ভামো, মিচিনা প্রভৃতি জেলা সবই শত্রুর অধিকৃত হইয়াছে।

মান্দালয়ের কথায়ই মৌন্দন মিনের কথাতেই মনে হয়। থিবো মিনের কথা মনে হয়, রাজ্ঞী সুপায়ালাটে'র কথা মনে হয়। মান্দালয়-রাজ থিবো নির্ব্বাসিত হয়েন রত্নগিরিতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আর তাহারই তিন বৎসর পরে মণিপুররাজ-সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদণ্ড হয় ১৮৯১

খৃষ্টাব্দে। দুইটী ঘটনাই আমাদের মনে আছে। তখন গ্রামের স্কুলে পড়িতাম। আজ বর্ম্মা ও মণিপুরের গোলযোগে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আবার সমগ্র জগতে কিরূপে শান্তি সংস্থাপিত হইবে কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছে? তোমাকে যে দুইখানি ছোট বহি পাঠাইয়াছি তাহা কি পড়িয়াছ? খুব ভাল করিয়া পড়িও। উহাতে পথের নির্দ্দেশ আছে।

তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ছোট ছেলেটী টাইফয়েড্ জ্বরে মারা গিয়াছে। ছেলেটী প্রফুল্লবদন ও মধুর স্বভাবের ছিল, উহার অভাবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কল্যাণীও দুইটী মেয়েকে ৩।৪ দিনের আড়া-আড়িতে হারাইয়াছে। মেয়ে দুইটীও বড়ই মধুর স্বভাবের ছিল। মনীন্দ্র রায় ও তাহার আঠার বৎসরের ছেলেটীর আকস্মিক হৃদয় বিদারক মৃত্যুর কথা তো তোমাকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ছবির মাও শোকে একরকম উন্মাদিনী। এই সব দেব শিশুদের মা বাপের কথা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু শোক নাই কোন ঘরে? তুমি এবং আমি উভয়েই পুত্রকন্যা হারাইয়াছি সে শোকও ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এখন বড় দুঃসহায়। বুদ্ধদেব একবার এক শোক কাতরা জননীকে বলেন, "মা তুমি শোকে কাতর হইয়াছ, দেখি আমি কিছু করিতে পারি কিনা, তুমি আমার জন্য কিছু কৃষ্ণ তিল নিয়া আস, কিন্তু এমন ঘর হইতে আনিবে যে গৃহে কখনও শোকের চিহ্ন পরে নাই।" মহিলাটী সেরূপ গৃহ না দেখিয়া বড়ই ম্রিয়মান হইলেন। এতদুভয়ের কথোপকথন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁহার "বুদ্ধদেব" নাটকে নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন,

স্ত্রীলোক—পিতা,
বুঝি আর নাহি মম পুত্রের উপায়।
সিদ্ধার্থ—কে তুমি কল্যাণী?
কিবা প্রয়োজন তব?
স্ত্রীলোক—পিতা, ভুলেছ কি দুহিতারে?
পুত্রের জীবন আশে করিনু কামনা—
আজ্ঞা দিলে আনিবারে কৃষ্ণ তিল।
সিদ্ধার্থ—এনেছ কি তিল, বৎসে, হেন স্থান হ'তে
যথা মৃত্যুর নাহিক সমাগম?
স্ত্রীলোক—করিলাম অনেক সন্ধান,—
নাহি হেন স্থান;
প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে—
জিজ্ঞাসিনু জনে জনে;
কেহ কভু মরে নাই যথা,—
নাহিক আবাস হেন!
সিদ্ধার্থ—তবে কেন কর মৃত-পুত্র-আশা?
জেন, সতি কাল বলবান—
মৃত্যু হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়।
যে সন্তাপ সহে সর্ব্বজন—
যাহা নাহি হয় নিবারণ—
তাহার কারণ কর না রোদন মাতা।
ধৈর্য্যমাত্র মহৌষধি শোকে—
অনন্ত উপায় বালা!
স্ত্রীলোক—পিতা তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
আসি নাই পুত্র আশে—
আসিয়াছি তব দরশনে!
কিন্তু—
নয়ন আনন্দ ছিল নন্দন আমার।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পুত্র শোকে কাতর হইয়া গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে বুদ্ধদেব নাটক দেখিতে আসেন—

স্ত্রীলোকটীর ক্রন্দনে—
নয়ন আনন্দ ছিল নন্দন আমার

তিনিও হু হু করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন। গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া বলেন, "ভাই আমার প্রাণের কথাটী তুমি কি করিয়া বাহির করিলে?"

অতঃপরে সিদ্ধার্থের উক্তিতে তিনি শোক নিবৃত্ত করেন
হায়—এই হাহাকার ঘরে ঘরে!
কবে হবে দিন—
মহৌষধি বিতরিব জীবে?
জ্ঞানালোকে বিনাশিব দুঃখের তিমির
জীবন থাকিতে ভঙ্গ কভু নাহি দিব।

আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু আজিও

মায়ের বুকে শেল হানিয়া বৎস কি বিদায় নিয়েছে। কোন উপায় নাই,

"ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধি শোকে"

হায় কবে জ্ঞানালোক বিনাশিবে দুঃখের তিমির?

এই মাত্র শুনিলাম জাপানীর 'হোমলিনে' সৈন্যসমাবেশ করিয়াছে। হোমলিন মণিপুর প্রদেশের ইম্ফল হইতে বেশী দূরে নয়। হোমলিন হইতে আসাম সীমান্ত ২০ মাইল দূরে। উহারা যদি এ দিকে আসে তবে তো বড়ই বিপদ। তবে রাজকীয় বিমান বাহিনী হোমলিনে যেরূপ বোমাবর্ষণ করিতেছে তাহাতে বিপদ প্রায় শেষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। দেখি কি হয়। হোমলিন ও আকিয়াব, রেঙ্গুন ও বেসিন প্রভৃতি স্থানে বোমা পড়িলে শত্রুগণ পালাইয়াও যাইতে পারে, আবার মরিয়া হইয়া এ দিকেও আসিতে পারে। কবে আসাম ও বাঙ্গালা হইতে দুর্গতি নাশ হইবে! দুর্গতি নাশিনী মা বাঙ্গালাকে রক্ষা করুণ। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার হেমেন্দ্র

পুস্তকালোচনা

শনিবারের চিঠি ও ঢাকা রেডিও—শনিবারের চিঠি সম্প্রতি আবার সাহিত্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন কেন করেন নাই, কেহ বলিতে পারে না। তবে এবার আরম্ভ করিয়াই ইহার প্রথম পৃষ্ঠার লেখক শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বপক্ষে বেশ এক চোট ওকালতি করিয়াছেন। শনিবারের চিঠি আক্ষেপ করিতেছেন কেন মোহিতবাবুকে ঢাকা রেডিও হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে দেওয়া হয় নাই। কেন না, ইহার মতে মোহিতবাবুর ন্যায় সাহিত্যিক নাকি বাঙ্গালাদেশে আর নাই। শনিবারের চিঠির এরূপ পক্ষপাতিত্বে আমরা খুবই বিস্মিত।

সাহিত্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রবন্ধ যেমন মোহিতবাবু লিখিয়া থাকেন, আমরা জানি যে অনেকেই এরূপ রচনা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেক সাহিত্যরথী আছেন যাহারা কেবল সাহিত্য রচনাই করেন না, আবার রেডিওতে কথা বলিতেও বেশ সুদক্ষ। শনিবারের চিঠি যদি প্রকৃতই উৎকৃষ্ট বিষয়ে রেডিওতে বক্তৃতাদির প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তবে সমভাবে কলিকাতা ও ঢাকা রেডিওকে অনুরোধ করুন যেন এই সব সুদক্ষ বক্তা ও সাহিত্যরথীগণকে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে সুবিধা দেওয়া হয়। কেবল একজনের হইয়া ওকালতি করা কোন পত্রিকা পরিচালকেরই উচিত নয়। আর আমাদের বিশ্বাস মোহিতবাবুও ইহাতে লজ্জিত বই উৎফুল্ল বা উৎসাহিত হইবেন না।

* * *

রাতের কবিতা এবং প্রিয়া ও প্রেম—কবিতার বই। লেখক শ্রীদুলালকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বই দু'খানি কবির প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসার্হ। রাতের কবিতার কয়েকটি কবিতা বিশেষ ভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। জীবনকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে কবি দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সরল অভিব্যক্তিই বইখানিতে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও বড় বড় বুলির অহেতুক ভারে ছন্দ মন্দগতি হয় নাই—ভাবও ব্যাহত হয় নাই। ঝর ঝরে স্পষ্ট ছন্দের মনোরম ভঙ্গিমা মনকে দুলাইয়া দেয়। কিন্তু রাতের কবিতার দু'একটি কবিতাতে কাঁচা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। 'প্রিয়া ও প্রেম'-এ কবি প্রেমের একটি নাতিদীর্ঘ গাথা গাহিয়াছেন। বই দু'খানিই কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করে।

স্নেহের পরশ শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"
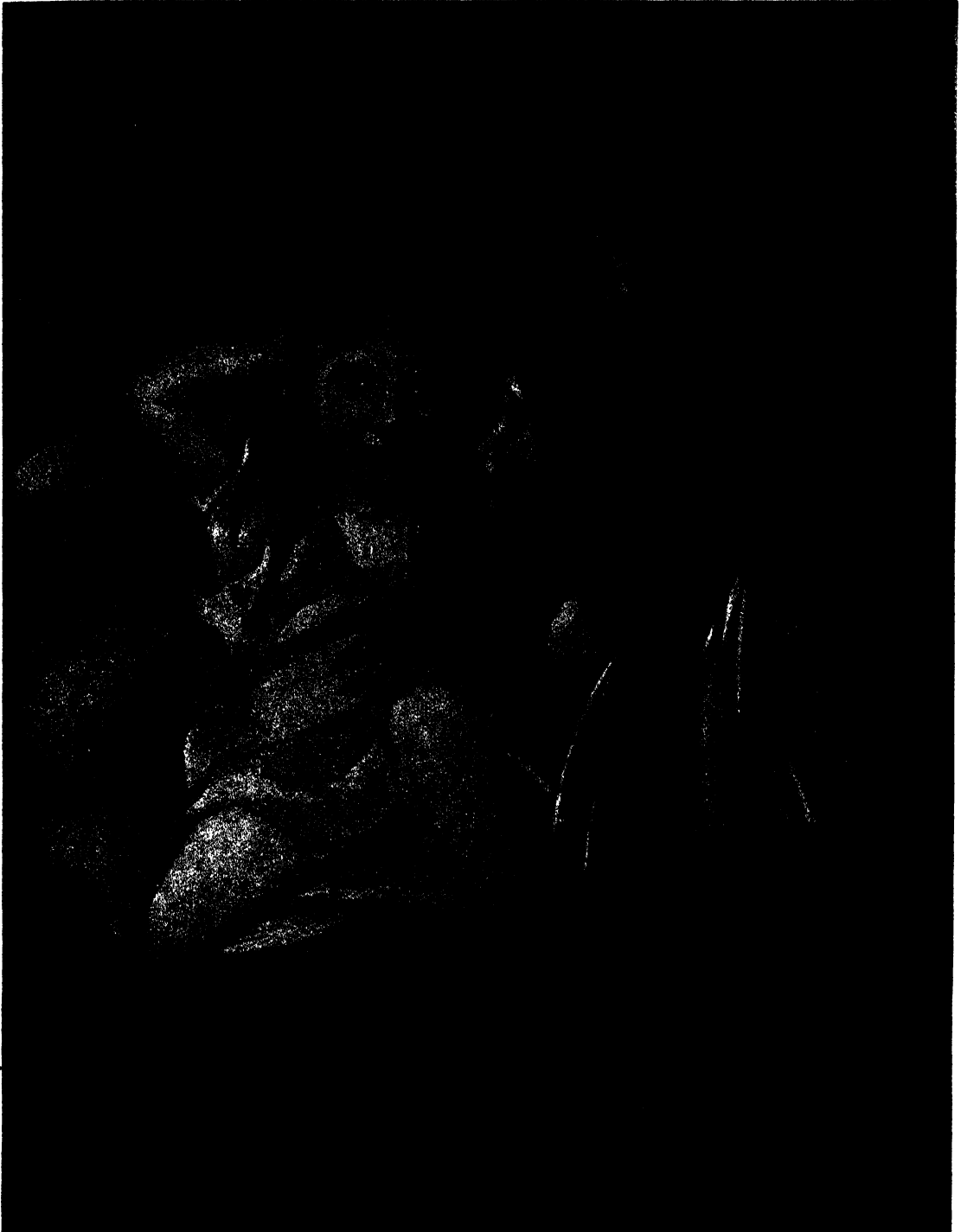
দশম বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৪৯ { ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

নব বিধান ও আশা

প্রতি জাতির মধ্যেই অধুনা এই এক ধূয়া উঠিয়াছে "নব বিধান"। কিন্তু কি এই বিধানের সত্যকার অর্থ, কবে ইহা মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই প্রশ্ন কাহারও মনে বড় একটা উদিত হয় না। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে পরিবারে নিয়তই প্রাত্যহিক প্রয়োজন অপূরিত থাকে, যে-গৃহে সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্য, হিংসা, দ্বেষ ও পাশব প্রবৃত্তির অরাজকতা বিরাজ করে, সেই গৃহে বা পরিবারে কখনই কোনরূপ বিধান বা শান্তিরাজ্য অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং পারিবারিক ব্যষ্টিতে যখন এ কথা সত্য, সমষ্টিবদ্ধ গোটা মানবসমাজেও যে তখন ইহা অমোঘ, এই সামান্য কথাটী বুঝিবার জন্য নিশ্চয় বিশেষ বুদ্ধি-শক্তির প্রয়োজন হয় না।

কাজেই একথাও সহজেই নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সমাজ হইতে অভাব, অশান্তি, হিংসা ও কলহের বাধা সম্পূর্ণ সরাইয়া না ফেলা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র নির্জ্জলা বাক্য-বিলাসের দ্বারা সত্যকার বিধান প্রতিষ্ঠা একান্তই অসম্ভব।

এইবার আর একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়—এই আন্তর্জ্জাতিক সার্ব্বজনীন কলহের কারণ কি? আর কবেই বা এই কলহের অবসান ঘটিবে?

উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, মানব-প্রকৃতির কার্য্যধারা যে বিধি বা ক্রমিকগতিতে নিবদ্ধ, সেই ক্রমিকগতি আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করিতে পারিলেই এই জিজ্ঞাসার মোটামুটি জবাব মিলিবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে যে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্যধারা প্রধানতঃ তিনভাগে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। শৈশবে, যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে এই তিনপ্রকার কার্য্যের ধারা ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে।

শিশুর অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ এবং কর্ম্মশক্তির পরিপুষ্টি—শৈশবের বিশেষ লক্ষণ। প্রেম ও দ্বেষের প্রবল ভাবাবেগ-জনিত কর্ম্মধারা শিশুর মনে স্থান পায় না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে শিশু-হৃদয় নিঃস্পৃহ। দেহের আকর্ষণ শিশুর নিকট অবিদিত। তা ছাড়া শৈশব গঠনধর্ম্মী—যৌবনাভিমুখী ইহার গতি—তাই শিশুর জীবনে কোন পতনের ইতিহাস নাই। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা শিশুর হৃদয় প্রায়ই তাপিত করে না। কেবল একটি বিষয়ে শৈশবের অপূর্ণতা এই যে, এই বয়সে মানবপ্রকৃতি খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপরে নির্ভরশীল।

মানবপ্রকৃতির যৌবন শৈশবের বিপরীত। রক্তমাংসের আকর্ষণ-চরিতার্থতাই এই স্তরের প্রধান ধর্ম্ম। অধৈর্য্য,

উত্তেজনা, চাঞ্চল্য এই দৈহিক আকর্ষণের পরিপোষক। অন্ধ অনুরাগ এবং হিংসা-দ্বেষ যৌবনের সঙ্গী। এই অন্ধ প্রবৃত্তির ফলেই কলহের উদ্ভব। যথোপযুক্ত শিক্ষার বলে এই বৃত্তি দমন করিতে সক্ষম না হইলে কলহের নিরসন সম্ভব নহে। সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহের বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিলে, এই বৃত্তি সহজে প্রশমিত হয় না। এক বিরোধ হইতে বিভিন্ন কলহ সঞ্জাত হয়। সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরোধের কুপ্রবৃত্তি সবচেয়ে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে প্রায়শই প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান প্রয়োজনগুলি অপূরিত রহিয়া যায়, অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তি আসিয়া সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

সর্ব্বক্ষেত্রেই যৌবনের সাথী ধ্বংস এবং বার্দ্ধক্য এই ধ্বংসোন্মুখ যৌবনের পরিণতি। যৌবনের এই ধ্বংসাত্মক ধর্ম্ম ও বার্দ্ধক্য-পরিণতি মুছিয়া ফেলিবার নহে। তবে শক্তির দ্বারা যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া বার্দ্ধক্যকে কিছুকালের জন্য দূরে সরাইয়া রাখা চলে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা দৈহিক বাসনা এবং বাসনার চরিতার্থতার প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া এই দুর্লভ শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব। এই পবিত্র শিক্ষা এবং সংযম ব্যতীত চাঞ্চল্য, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যৌবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

স্বাধীনতার ক্ষুধা যৌবনের চিরন্তন স্বভাব, কিন্তু বিরোধের প্রবৃত্তির ফলে স্বাধীনতার সত্যকার স্বাচ্ছন্দ্য যৌবনে মানুষের অজ্ঞাত থাকে। বিরোধ-প্রবৃত্তি-জাত ষড়যন্ত্রপরায়ণতা মানুষকে চিরকাল এই সত্যকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখে।

যৌবনের পরে বার্দ্ধক্যে আসে কর্ম্মশক্তিহীনতা, আলস্য ও পীড়ার স্থবিরতা।

ব্যষ্টিক জীবনের উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে সকলেই সমষ্টিগত মানবসমাজের কর্ম্মবিভাগও ত অতি সহজেই অবগত হইতে পারিবেন—কারণ ব্যষ্টিতে যাহা সত্য, সমষ্টিতে তাহা অন্যরূপ হয় না।

বর্ত্তমান সমাজ যৌবনে পদক্ষেপ করিয়াছে। তাই স্বভাবতই যৌবন-সুলভ দৈহিক বাসনা চরিতার্থতায় বর্ত্তমান মানবগোষ্ঠী প্রমত্ত; যৌবন ধর্ম্মী প্রবৃত্তির তাড়নায় বাসনাকে সংযত করিবার উপযুক্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিতে সে সক্ষম নহে। তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আন্তর্জ্জাতিক বিরোধও কলহে পরিপূর্ণ। বিশুদ্ধ পশুশক্তি ও বর্ব্বরতাই আজ 'সভ্যতা' নামে অভিহিত। জ্ঞানের আসল প্রয়োজনীয় তথ্যের অজ্ঞতাই 'বিজ্ঞান' নামে পরিচিত। ক্রমাগত বিরোধের ইন্ধন যোগাইয়া চলিলে কি মানুষ কখনও সর্ব্বকাম্য বিধান বা বিন্যাসের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইতে পারে? কখনও নয়।

বর্ত্তমানে যাহারা মানবসমাজের কর্ণধার, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, পাশববৃত্তি-সম্পন্ন ভিন্ন আর তাহারা কিছুই নহে। তাহাই যদি না হইত তবে নিশ্চয়ই আজ বর্ত্তমান বুভুক্ষু নরনারীর দুঃখে তাহাদের হৃদয় এতটুকুও বিগলিত হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ এই কর্ণধারগণের অন্তরে এই বিশ্বজোড়া দুঃখদৈন্য বিন্দুমাত্রও আঘাত হানিতে পারে না—তাই দেশরক্ষা-আইন রচনা করিয়া যে ইঁহারা বর্ত্তমান সমাজকে আপন পক্ষপুটতলেই রক্ষা করিতেছেন এই ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহারই নাম যদি 'রক্ষা' হয় তবে আর 'ধ্বংস' বলে কাহাকে?

কিন্তু একটা কথা তাহাদিগকে মনে রাখিতে বলি যে, ঈশ্বরের রাজত্বকে এই ভাবে কলঙ্কিত করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। এই সব অকর্ম্মণ্য নাস্তিকদের স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন ও মাতাপিতাকে রক্ষা করিবার উপায়ও তাহাদের জানা নাই। ইহারাই আজ বিশ্বজোড়া ধ্বংসের আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছে। মানব-সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই আত্ম-শ্লাঘাপরায়ণ পাশববৃত্তিসম্পন্ন কর্ণধারগণকে স্ব স্ব দায়িত্বের আসন হইতে জোর করিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। নতুবা আর রক্ষার কোন উপায়ই নাই।

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বিচারকে ইহারা উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত, পৃথিবী মানুষের বহির্ভূত জাগতিক নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ এবং প্রকৃতপক্ষে এই অপার্থিব নিয়ম বন্ধনেই ঈশ্বরের আসল রূপ প্রকাশ। এই নিয়মগণ্ডী যদি মানুষেরই কবলিত হইত তবে সময় সময় গর্ব্বান্ধ মানুষ কেন অক্ষম ও অশক্ত হইয়া পড়ে,

কেন তবে সময় সময় মানুষের মরণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না? প্রকৃতই এইরূপ কোন অপার্থিব নিয়ম যদি বিরাজিত না থাকিত তবে এই আত্মশ্লাঘীদের শত্রুরা বাঁচিয়া থাকিবার উপায় পায় কোথা হইতে? ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস অন্ধ অজ্ঞতার চরম মূর্খতা। ঈশ্বর আছেনই, আর তাঁহার বিচারই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসন করে।

রাষ্ট্রের শাসকদের পক্ষে প্রজাকুলের ব্যাপক দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রসার—জঘন্যতম অপরাধ এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজ্যে এই অপরাধের শাস্তি আছেই। আমাদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস যে, ধর্ম্মের কল নড়েই নড়ে।

এই সব অপরাধীরাই রক্ষাকার্য্যের নামে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দিতেছে। এই ধ্বংস করিবার জঘন্য প্রবৃত্তি বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। যাঁহারা এইসব অবিচার ও অপরাধের ফল জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী দূতের আগমন লক্ষ্য করিতে হইবে।

পরিশেষে আমরা এইসব আইন প্রণেতা রাষ্ট্রকর্ণধারদের কেবল তাহাদের প্রতি তাহাদের দূষণীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। প্রকৃতই ইঁহারা যদি পৃথিবী ও নানা সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কল্পনা করেন, তবে তাহাদিগকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে নিজেদের কর্ম্মের সম্ভাব্য পরিণতির সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। আর যাঁহারা প্রকৃতই মানবহিতার্থে এই রাষ্ট্রকর্ণধারদের কার্য্যের সংশোধনে প্রয়াসী হন, সেই উপায়ে পথের নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে তাঁহাদের দুই একটী কথা আপত্তিজনক মনে হইলেও সেই শান্তিপ্রয়াসী মহানুভবদিগকে কিছুতেই নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়, কারণ তাহারাই সাম্রাজ্যের প্রকৃত হিতৈষী বান্ধব।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা

শ্রীঅনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী

দিবস শর্ব্বরী—
অসহ পীড়নে ধরা কাঁদিতেছে গুমরি গুমরি;
সর্ব্বংসহা মাতা আজি সর্ব্বহারা, অশ্রুময়ী, দীনা,
রুক্ষকেশ, ম্লান বেশ, শৃঙ্খলিতা, আভরণহীনা,
শিবের দেউলে হেথা শিবা সুখে করে বিচরণ
শত দুঃখ, লাঞ্ছনায় কাঁদি ফিরে পল্লী-নারায়ণ।
ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি নর—নরবক্ষে হানিতেছে ছুরি,
শাসনের নামে চলে শোষণের ছলনা চাতুরী।
বুভুক্ষা বিরাজে হেথা দিবানিশি জঠরে, জঠরে—
মহামানবের আজি নিরুপায়ে অশ্রুজল ঝরে।

এক মুঠা অন্ন তরে বাহুবল বেচিতেছে নরে,
নারী আজ বেচে দেহ পশু-প্রাণ পুরুষের করে।

ধরণীর শ্যাম-শোভা, পঞ্জরাস্থি বিচূর্ণিত করি'
যান্ত্রিক সভ্যতা-রথ অতন্দ্র চলিছে ঘর্ঘরি
কাঁপাইয়া পৃথ্বীবক্ষ ক্ষণে ক্ষণে তুলিছে গর্জন
উদ্গীরিত বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন গগন, পবন।

অয়ি বিংশ শতাব্দীর যাদুকরি সভ্যতা-সুন্দরি!
তব মোহপাশ হ'তে বসুধারে দাও মুক্ত করি'
ফিরে দাও মুক্ত ক্ষেত্র, বৃক্ষ ঘেরা পাতার কুটীর,
শত-উর্মি-মুখরিত শান্তিদায়ি সেই নদীতীর।
পূত বেদগানে ভরা ফিরে দাও সেই তপোবন—
গুরু পাদমূলে বসি' এক সাথে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
ফিরে দাও শ্রান্তিহরা সেই স্নিগ্ধ বনবীথিতল—
ফিরে দাও সে জীবন মুক্ত, শান্ত, পবিত্র, সরল।
বিশ্ব-প্রেম, ত্যাগধর্ম ফিরে দাও বিশ্বেরে আবার
মৃত্তিকা মায়ের বক্ষ হোক্ পুনঃ আনন্দ আগার।

সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী আলোচনা

শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত ভাষা কাহাকে বলে, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিত হয় কি করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হওয়া যায় কি করিয়া এবম্বিধ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। যে বিষয়গুলির আলোচনার অভিপ্রায়ে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি সেই বিষয়গুলি এত বিস্তৃত এবং তাহা বুঝা এত কঠোর-সাধনাসাপেক্ষ যে, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা এ জাতীয় কোন প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে।

আমি এই প্রবন্ধে যাহা লিখিব তাহার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটী, যথা :—

(১) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মানুষের অভিরুচি বাড়াইয়া দেওয়া,

(২) বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যে নিয়ম অবলম্বন করেন, ঐ নিয়মে যে ভারতীয় ঋষিপ্রণীত গ্রন্থগুলিতে যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে প্রবেশ করা যায় না তাহা বুঝাইয়া দেওয়া,

(৩) কোন্ কোন্ গ্রন্থ কিরূপ ভাবে পাঠ করিলে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় তাহার আভাস দেওয়া।

সংস্কৃত ভাষা কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা 'নিরুক্তে'র নিয়মানুসারে অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রপাঠ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিত হয় কি করিয়া তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা আসিয়াছে মূলতঃ সারদা-তিলক তন্ত্র হইতে।

সংস্কৃত ভাষা কাহাকে বলে এবং উহার ব্যাকরণ লিখিত হয় কি করিয়া তৎসম্বন্ধে আমার যাহা যাহা বক্তব্য আছে তাহা আমি এইস্থানে আলোচনা করিব না। আমার মতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হওয়া যায় কি করিয়া তাহা জানা না থাকিলে উপরোক্ত দুইটী বিষয় জানা সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে আমি সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব।

আমার মতে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের অর্থ, তাহার পর পদের অর্থ, তাহার পর পদোচ্ছেদের নিয়ম প্রভৃতি জানিতে হয়।

অক্ষরের অর্থ জানা যায় কি করিয়া তাহার অনুসন্ধান

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হওয়া যায় কি করিয়া তৎসম্বন্ধে আমি বহু বৎসর হইতে অনেক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। 'অমরকোষ' 'গণপাঠ' এবং 'মুগ্ধবোধাদি' যে কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ জানা থাকিলেই সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়, ইহা প্রচলিত ধারণা। আমিও একদিন এই ধারণারই বশবর্ত্তী ছিলাম। ঘটনাচক্রে আমার এই ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ছাত্রগণ সাধারণতঃ ব্যাকরণের "সূত্র" ও "বৃত্তি" মুখস্থ করেন এবং ভাষ্যে অথবা টীকায় যে অর্থ লিখিত থাকে সেই অর্থকেই ঐ সূত্রের অর্থ বলিয়া মনে করিয়া রাখেন। আমিও বাল্যে ঐ পদ্ধতিই মানিয়া লইয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার মেধা অত্যন্ত ক্ষীণ থাকায় আমি ব্যাকরণের কোন সূত্র এবং বৃত্তি সর্ব্বতোভাবে মনে রাখিতে পারিতাম না এবং প্রায় প্রত্যেক সূত্রের অর্থও গোলমালে নিবদ্ধ হইত। পরবর্ত্তী জীবনে কোন কারণে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে থাকি। কিন্তু তখনও আবার ঐ বিপত্তি উপস্থিত হয়। সূত্র ও বৃত্তি এবং তাহার অর্থ আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে মনে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন সূত্র হইতে বৃত্তির উদ্ভব হয় কি করিয়া, এবং

বৃত্তি হইতেই বা ভাষ্য অথবা টীকায় উপনীত হইবার পদ্ধতি কি, তদ্বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে আমার মনে দুইটী অভিনব প্রশ্নের উদ্ভব হয়। সংস্কৃত অভিধানে এক একটি পদের যে যে অর্থ লিখিত হইয়াছে সেই সেই পদের যে ঐ ঐ অর্থ, তাহার প্রমাণ (অথবা authority) কি এবং ঐ অর্থকে সর্ব্বতোভাবে ধারণা করা যায় কি করিয়া—ইহাই হইল আমার উপরোক্ত অভিনব দু'টী প্রশ্ন। এই দু'টী প্রশ্নের উদ্ভবাবধি উহার উত্তর পাইবার জন্য এক একখানি করিয়া যতগুলি ব্যাকরণ ছাপান হইয়াছে তাহার প্রত্যেকখানি অনুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যাকরণের বৃত্তি অথবা টীকায় উহার উত্তর আদৌ খুঁজিয়া পাই নাই। অষ্টাধ্যায়ী পাঠের মহাভাষ্যের নবাহ্নিক অংশের ভিতর উহার উত্তর আছে বলিয়া প্রথমতঃ অস্পষ্টভাবে আমার অনুমান হয়। এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া মহাভাষ্যের নবাহ্নিক অংশ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছি। মহাভাষ্যের উপরোক্ত অংশের কথাগুলিকে ধারণার মধ্যে আনিবার জন্য আমি অনেক দিন ১৪।১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাল একাদিক্রমে কাটাইয়াছি। মহাভাষ্য হইতে ভাষা সম্বন্ধে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু আমার মূল প্রশ্ন দু'টার কোন স্পষ্ট জবাব আমি আজও পর্য্যন্ত মহাভাষ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। মহাভাষ্যের বক্তব্য বুঝিয়া উঠা খুবই দুরূহ। উহা বুঝিবার জন্য এক এক করিয়া অনেক গ্রন্থ আমার অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ নাগেশ ভট্টের 'প্রদীপ'নামক টীকা। উহা এত সংক্ষিপ্ত যে, উহা হইতে মহাভাষ্যের বক্তব্য ধারণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। বরং মহাভাষ্য হইতে তাহার বক্তব্য অস্পষ্ট ভাবে অনুমান করিতে পারিয়া থাকি, কিন্তু 'প্রদীপ' হইতে মূল বক্তব্য বুঝা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয় নাই। নাগেশ ভট্টের উপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। কাজেই তাঁহার লেখা না বুঝিতে পারায় আমি নিজেকে অত্যন্ত অক্ষম বলিয়া মনে করিয়াছি এবং তাঁহাকে বুঝিবার জন্য আমার মনে অনেক রকমের চেষ্টার উদয় হইয়াছে। এই চেষ্টা ফলবতী করিবার জন্য আমি নাগেশ ভট্টের লিখিত "বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-লঘু-মঞ্জুষা" ও "শব্দেন্দু-শেখর" পাঠ করিয়াছি। আমার মতে ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্র উপাধিধারী পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ সম্বন্ধে যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-লঘু-মঞ্জুষা'র স্থান অতি উচ্চে। এই গ্রন্থের সহিত তুলনা হয় কেবলমাত্র কৌণ্ড-ভট্টের "বৈয়াকরণ-ভূষণের" এবং ভট্টোজী দীক্ষিতের "শব্দকৌস্তভের"। আমার ধারণানুসারে শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের সহিত তুলনা করিলেও নাগেশ ভট্টকে বিস্তৃততর অধীত-শাস্ত্র বলিতে হয়। "বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-লঘুমঞ্জুষা", "বৈয়াকরণ-ভূষণ" ও "শব্দ-কৌস্তভ" পাঠ করিলে ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল রকমে শব্দ হইতে কিরূপে ধারণা করিতে হয় তাহা শিক্ষা করা যায় না। "বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-কারিকা" এবং 'পরিভাষা'র মধ্যেও ব্যাকরণ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আছে, যাহা বড় বড় দার্শনিকগণের জানা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থেও শব্দ হইতে অভিধানের সাহায্য ব্যতীত শব্দের অর্থ স্থির করিতে হয় কি করিয়া তাহার কোন পদ্ধতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রচলিত অভিধানসমূহে বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের যে যে অর্থ দেওয়া আছে, তাহা ঠিক অথবা অঠিক ইহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় শব্দান্তর্গত অক্ষরগুলির অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া – এই কথা আমি প্রথম জানিতে পাই ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থে। কিন্তু ঐ গ্রন্থেও কোন্ অক্ষরের যে কি অর্থ অথবা উহা স্থির করিবার প্রণালী যে কি, তৎ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া নাই।

অকারাদি স্বর ও ককারাদি ব্যঞ্জনসমূহের কোন্ অক্ষরের যে কি অর্থ, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত আছে নন্দিকেশ্বর-প্রণীত 'কাশিকা'য়। ঐ গ্রন্থে বিভিন্ন অক্ষরের যে যে অর্থ দেওয়া আছে তাহা সঠিক কি না তাহা স্থির করিবার সঙ্কেতও বলা আছে। কোন্ অক্ষরের যে কি অর্থ তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করিবার যে সঙ্কেত নন্দিকেশ্বর-প্রণীত কাশিকায় বিবৃত আছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে সিদ্ধগুরু অথবা কেবলমাত্র ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত উহার সহায়তায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণে এক একটী শব্দের উদ্ভব হয়। যিনি

যখন যে শব্দ উচ্চারণ করেন তিনি তখন ঐ শব্দ নিজে শুনিতেও পারেন এবং নাও শুনিতে পারেন। যখন ঐ শব্দ উচ্চারয়িতার শ্রবণ-গম্য হয় তখন উহা ধ্বনিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ অক্ষরের যে কি অর্থ তাহা কখনও তর্ক অথবা অনুমানের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না। অক্ষরের স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারণ করিবার প্রাথমিক উপায় মাত্র একটা। প্রথমতঃ, অক্ষর-জাত শব্দকে ধ্বনিত্বে পরিণত করা। দ্বিতীয়তঃ, অক্ষরটি সর্ব্বতোভাবে উচ্চারিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করা। জিহ্বার দ্বারা যে কোন অক্ষর উচ্চারণ করিলে মুখের মধ্যে, দুই চক্ষুর পশ্চাতে, গলার সম্মুখে, জিহ্বার উর্দ্ধে, টাকরার অধোভাগের হাওয়ার মধ্যে ঐ অক্ষরের ব্রাহ্মী প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়। ঐ প্রতিকৃতি যখন সর্ব্বতোভাবে প্রতিফলিত হয় তখন বুঝিতে হয় যে, অক্ষরটী সর্ব্বতোভাবে উচ্চারিত হইতেছে। আর তাহা না হইলে বুঝিতে হয় যে, অক্ষরটী সর্ব্বতোভাবে উচ্চারিত হইতেছে না। তৃতীয়তঃ, অক্ষরটীর স্বর (অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত অবস্থা), কাল (অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুতাবস্থা) স্থান (অর্থাৎ উরঃ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্তমূল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালুর উপর প্রভাব) প্রযত্ন এবং অনুপ্রদান উপলব্ধি করিতে হয়। এই উপলব্ধিতে প্রযত্নশীল হইবার আগে মনে কিরূপে বিবক্ষার (অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ করিবার ইচ্ছার) উৎপত্তি হয়, আত্মা কিরূপে শব্দের উচ্চারণ করে, বুদ্ধি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিরূপে শব্দের অর্থগ্রহণ করিতে উদ্যত থাকে, শব্দ উচ্চারিত হইলে কায়াগ্নির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে, কায়াগ্নির ঐ প্রতিক্রিয়া বশতঃ দেহস্থ বায়ু কিরূপ চলনশীল হইয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীকে চলনশীল করে এবং স্বরের উৎপত্তি হয়,—তাহা অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়। অক্ষরের স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন এবং অনুপ্রদান উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে অক্ষরটী দ্রব্যবাচক, অথবা গুণবাচক, অথবা কর্ম্মবাচক তাহা অনায়াসে স্থির করা সম্ভব হয়। তখন উরঃপ্রভৃতি আটটী স্থানের উপর যে আটটী প্রতিক্রিয়া হয় সেই প্রতিক্রিয়া-সমূহের সংযোগ লক্ষ্য করিয়া অক্ষরের সম্যক্ অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

অক্ষরের অর্থ-নির্দ্ধারণ করিবার যে পদ্ধতির কথা আমি উপরে বর্ণনা করিলাম তাহা পাণিনীয়শিক্ষায় লিপিবদ্ধ আছে। পাণিনীয়শিক্ষা পাঠ করিলে উপরোক্ত উপলব্ধি-পদ্ধতির কথা জানা যায় বটে, কিন্তু উহাতে সক্ষমতা লাভ করা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি পাণিনীয়শিক্ষা হইতে ঐ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারি নাই। পাণিনীয়শিক্ষা পাঠ করিবার পর ঐ উপলব্ধির জন্য আমার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিতে প্রবেশের সাহায্য করিয়াছিল নন্দিকেশ্বরের 'কাশিকা'। কিন্তু একমাত্র কাশিকার সাহায্যেও আমি কোন অক্ষরের অর্থ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারি নাই। ইহাতে হতাশ হইয়া যত তন্ত্রের গ্রন্থ ছাপান হইয়াছে তাহার প্রত্যেকখানি অনুসন্ধান করি। এই সময়ে আমার মনে সিদ্ধান্ত হয় যে, অক্ষরের অর্থ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন না করিতে পারিলে বেদাদি মন্ত্রগ্রন্থে প্রবিষ্ট হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। এই সিদ্ধান্তবশতঃ অক্ষরের অর্থ উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা আমার মনে আরও দৃঢ় হয়। প্রাচীন তন্ত্র-গুলি যখন প্রথম আমার চোখে আইসে তখন আমার হতাশা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে খানি উল্টাই সেই খানিতেই দেখি অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। আধ-আধ ভাবে অনেক কথা প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন অর্থের উপরই দৃঢ়তা স্থাপন করিতে পারি না। প্রত্যেক তন্ত্রের যে কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে অক্ষরের অর্থ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হয়, কিন্তু কোন তন্ত্রেই ঐ সামর্থ্য অর্জ্জন করিবার কোন পদ্ধতির সন্ধান পাই না। এই সময় একদিন গীতার অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগ পড়িবার কালে হঠাৎ আমার মনে হয় যে, ব্রহ্ম-সূত্রে হয় ত অক্ষরের অর্থ উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি থাকিলেও থাকিতে পারে। ইহা অনেক দিন আগেকার কথা। যে যুক্তিটী আমার মনে উদয় হইয়াছিল তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং'—এই কথা হইতে আমার মনে হইয়াছিল যে, মানুষের হৃদয়ে ব্রহ্মের প্রধান ও প্রথম অভিব্যক্তি শব্দে অথবা

অক্ষরে। 'ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং'—এই কথাটী অক্ষরের সহিত ব্রহ্মের অত্যন্ত যোগাযোগ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি আনিয়া দিয়াছিল। 'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দ-তত্ত্বং যদক্ষরং'—ভর্তৃহরির এই কথাটী উপরোক্ত প্রতীতি আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিল। তখনই ব্রহ্ম-সূত্র খুলিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং উহা খুলিয়া ফেলি। ব্রহ্ম-সূত্র উল্টাইতে উল্টাইতে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপনীত হই এবং অক্ষরাধিকরণের তিনটী সূত্র যথা, (১) অক্ষরং অম্বরান্ত-ধৃতেঃ, (২) সা চ প্রশাসনাৎ, (৩) অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ—আমার নজরে পড়ে। ব্রহ্ম-সূত্র ইহার আগেও আমার উল্টান ছিল। 'উল্টান ছিল' এই কথাটী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম-সূত্রের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে একটা যুক্তিহীন ধারণা ছিল, কিন্তু ঐ ধারণা সূত্রকে উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমি ইহার আগে হইতেই নিজেকে ছয় ভাষ্য-কারেরই (অর্থাৎ শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বৈদিক এবং শ্রীধরের) বিদ্রোহী বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি যে, ভাষ্যকারগণই এতাবৎ বেদান্ত সম্বন্ধে একটা জগাখিচুড়ী জাতীয় ধারণা আমার মনে দিয়াছিলেন এবং ঐ ধারণা আমাকে অহঙ্কার-দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অক্ষরের অর্থ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিবার কোন পদ্ধতি বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে পাওয়া যায় কি না তাহার অনুসন্ধান কল্পে উহা পাঠ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়া অবধি বেদান্ত-সূত্র সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আমার প্রাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। ক্রমেই ঐ ভাব দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। সূত্র ধরিয়া বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে আমি নারাজ। ঋষি সর্ব্ব-সাধারণকে উহা জানাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কেহ কোন সূত্র সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে তিনি উহা জানিবার অধিকারী কি না তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচার করা ব্যাসদেবের উপদেশ। 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' এই সূত্র আমাদিগের উপরোক্ত কথার প্রমাণ। প্রথমতঃ অব্যয় ব্রহ্ম-রূপ হইতে অর্থাৎ অব্যয় আকাশমণ্ডলের সাহায্যে জীবের অভ্যন্তরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর উৎপত্তি হয় কি করিয়া তাহা যাঁহারা সম্যক ভাবে জানিতে পারিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ অব্যয় আকাশমণ্ডলই যে জীবের সাত্ত্বিক অহংকৃতির মূল উপাদান তাহা যাঁহারা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন একমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্ম-সূত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইতে পারেন—ইহাই 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' সূত্রের বক্তব্য। ব্রহ্ম-সূত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইবার অধিকারী হইতে হইলে উপরোক্ত সূত্রানুসারে প্রথমতঃ সাংখ্যসূত্র সম্যক্ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ যোগ-সূত্রের উপলব্ধিসমূহে অভ্যস্ত হইতে হয় এবং দক্ষতা লাভ করিতে হয়।

ব্রহ্ম-সূত্রের প্রত্যেকটী সূত্র উপলব্ধি করিবার জন্য। উপ-লব্ধি না করিয়া কোন সূত্রটী কেবল যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে বুঝা সম্ভব নহে। আমি বর্ত্তমানে যে ধারণার বশবর্ত্তী, তদনুসারে ব্রহ্ম-সূত্রের মূল বক্তব্য প্রধানতঃ চারিটী, যথা:—

(১) **ব্রহ্ম হইতে অব্যয় আকাশে এবং জীব-মণ্ডলে কর্ম্মের উদ্ভব হইতেছে কেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে—তাহা উপলব্ধি করিবার সহায়তা করা,**

(২) **কর্ম্ম হইতে অব্যয় আকাশে এবং জীব-মণ্ডলে তেজ ও সত্ত্বার বীজ এবং তেজ ও সত্ত্বাত্মক রসের উৎপত্তি হইতেছে কেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে তাহা উপলব্ধি করিবার সহায়তা করা,**

(৩) **তেজ ও সত্ত্বাত্মক রস হইতে কর্ম্ম-শক্তি ও ভাবের উৎপত্তি হয় কেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে তাহা উপলব্ধি করিবার সহায়তা করা,**

(৪) **কর্ম্ম-শক্তি ও ভাব হইতে অক্ষর, মন্ত্র, সূত্র ও কারিকার উৎপত্তি হয় কেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে তাহা উপলব্ধি করিবার সহায়তা করা।**

ব্যাসদেবের মতে জীবের অভিব্যক্তি কর্ম্মে ও ভাবে। এই কর্ম্ম ও ভাব মূলতঃ আইসে ব্রহ্ম হইতে। ব্রহ্মের প্রথম

সৃষ্টি কর্ম্ম, দ্বিতীয় রস, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ শব্দ অথবা ভাষা। যাহা ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত তাহাই অন্যান্য ঋষিগণের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম-সূত্রেরই অপর নাম বেদান্ত-সূত্র। যে যে কর্ম্ম-শক্তি ও ভাব-শক্তি লইয়া প্রত্যেক জীবের মৌলিক জীবত্ব সম্বন্ধীয় সমানত্ব ও বৈশিষ্ট্য, তাহার পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কোন্‌টীকে কোন্ নামে কেন অভিহিত করিতে হইবে তাহার প্রত্যেকটীর কথা বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

বেদান্ত-সূত্রের প্রত্যেক সূত্রের অর্থ ও সূত্রসমূহের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আমার যে যে ধারণা বিদ্যমান আছে তাহা প্রত্যেক ভাষ্যকারের ধারণা হইতে পৃথক্। হয় ত আমি পাগল এবং সূত্রকারের সংস্কৃত ভাষা জানি না। আমার ধারণা হয় ত কেবল মাত্র আমার প্রাণের মধ্যেই লুক্কায়িত রাখিবার উপযোগী। কিন্তু তাহা আমি পারি না। কে যেন আমার লেখনীকে ভারতীয় ঋষির কথা লইয়াই ব্যস্ত রাখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আমার গান আমাকে গাহিতেই হইবে। কাহাকেও আমার গান শুনাইবার জন্য সময় সময় ইচ্ছা হইলেও কোন ব্যাকুলতা আমার প্রাণে উদয় হয় না। আমার বিশ্বাস, যিনি আমার মত অল্প-বুদ্ধি, লেখনাপটু, কৌশলাজ্ঞ, বিলাসপ্রিয়, উপভোগ-কামীকে দিয়া ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রের কথা লেখাইতেছেন, তিনিই আবার একদিন—আজ যাহারা অনুপযুক্ত - তাহা-দিগকে ইহা শুনিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া তাহার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিবেন।

মোটের উপর অকারাদি ও ককারাদি অক্ষরের অর্থ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি বেদান্ত-সূত্রে পাওয়া যায় এবং তখন দেখা যায় যে, নন্দিকেশ্বর তাঁহার কশিকায় যে অক্ষরের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ। ইহা ছাড়া 'অক্ষর-কোষ' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে অক্ষরের অর্থ সম্বন্ধে নন্দিকেশ্বরের বিরুদ্ধ যে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক।

প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ সঠিকভাবে কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং ঐ অর্থসমূহ যে সঠিক তাহা উপলব্ধি করিয়া পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি কোন্ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা আমার পক্ষে জানা যতদূর সম্ভব হইয়াছে তাহার আলোচনা আমি এতাবৎ করিলাম।

পদের অর্থ জানা যায় কি করিয়া তাহার অনুসন্ধান

কেবলমাত্র প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ সঠিকভাবে জানিতে পারিলেই কোন পদের অর্থ সঠিক অথবা অঠিক তাহা স্থির করা যায় না। কাজেই শুধু এইটুকু জানিলেই আমার মূল প্রশ্নের (অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধানে প্রত্যেক কথার যে যে অর্থ দেওয়া আছে তাহা সঠিক অথবা অঠিক তাহার প্রমাণ কি এই প্রশ্নের) সমাধান হয় না। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক পদ কতকগুলি অক্ষরের সমবায়ে অথবা মিলনে গঠিত। কখন কখন বেদের মধ্যে নিপাত-শ্রেণীর পদ কেবলমাত্র একটী অক্ষরেই নিষ্পন্ন হয় বটে কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক পদ একাধিক অক্ষরের সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকে। কাজেই কোন পদের কোন অর্থ সঠিক অথবা অঠিক তাহা স্থির করিতে হইলে বিভিন্নার্থক একাধিক অক্ষরের সমবায়ে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তাহা স্থির করিবার নিয়ম জানিবার প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ ছাড়া অন্য কোন ব্যাকরণে আমার নজরে পড়ে নাই। সর্ব্ব প্রথমে ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠকালে অস্পষ্টভাবে এই নিয়মের কথা আমার মনে হয়। কিন্তু তখন ঐ গ্রন্থ হইতে উহা আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই এবং উহার ব্যবহারও আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থে এই নিয়ম যে ভাবে দেওয়া আছে তাহা 'বৈশেষিক' ও 'ন্যায়দর্শনে' সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বুঝা সম্ভব নহে।

এই নিয়ম সম্বন্ধে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের নবাহ্নিক অংশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর। নবাহ্নিক অংশের সূত্রগুলি বুঝা বড়ই দুরূহ। আমি উহা বুঝিবার জন্য কাত্যায়নের বার্ত্তিকে যে সমস্ত সূত্র দেওয়া আছে তাহার সহায়তা লইয়াছি। কাত্যায়নের বার্ত্তিকের সূত্রগুলিও অত্যন্ত দুরূহ। বার্ত্তিকের এই সূত্রগুলি বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ মহাভাষ্যের সাহায্য লই। তাহাতে বার্ত্তিকের মধ্যে কোন

কার্য্য-কারণ-সঙ্গত বক্তব্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তখন হতাশ্বাস হইয়া পড়ি। ইহার কিছুদিন পরে পুনরায় নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় অক্ষরের যে অর্থ দেওয়া আছে সেই অর্থ ও সমাসের সাধারণ নিয়মানুসারে অক্ষর-সমবায়ের যে অর্থ হয় সেই অর্থকে ভিত্তি করিয়া বার্ত্তিক সূত্রগুলির কি কি অর্থ হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। এই নিয়মানুসারে বার্ত্তিকসূত্রসমূহের যে অর্থ হয়, সেই অর্থানুসারে নবাহ্নিক অংশের সূত্রগুলির কি কি অর্থ হইতে পারে এবং এই সূত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে চেষ্টা করি। তখন দেখিতে পাই যে, অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রপাঠের নবাহ্নিক অংশের সূত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন অক্ষরের অর্থের সমবায়ে বিভিন্ন পদের অর্থ কিরূপভাবে স্থির করিতে হইবে তাহার নিয়ম সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে। পরবর্ত্তীকালে দেখিয়াছি যে, জয়াদিত্যের কাশিকায় নবাহ্নিক অংশের সূত্রগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতেও ঐ নিয়ম উদ্ধার করা যায়।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে বিভিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন অর্থানুসারে অক্ষর-সমবায়-সম্বলিত পদসমূহের যে যে অর্থ হয় তৎসম্বন্ধেও ইহার পর আমার মনে প্রশ্নের উদয় হয়। অক্ষর-সমবায়ের অর্থোদ্ধার করিবার যে যে নিয়ম অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের নবাহ্নিক অংশের সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় সেই নিয়মগুলি যে ঠিক এবং তদনুসারে পদের যে যে অর্থ উদ্ধার করা যায় সেই অর্থগুলি যে ঠিক, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন বহুদিন আমাকে চিন্তাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান কিরূপে হইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি প্রথমেই পূর্ব্ব-মীমাংসার সূত্রগুলি চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। শবর-ভাষ্যে ঐ সূত্রগুলি যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে প্রথমতঃ সেই ব্যাখ্যার সাহায্য লই। কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় নাই। ঐ ব্যাখ্যায় সূত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সঙ্গত কোন সম্বন্ধ আমি ধরিতে পারি নাই। পরিশেষে আমি অক্ষরের অর্থানুসারে নবাহ্নিক-প্রদর্শিত নিয়মাবলম্বনে অক্ষর-সমবায়ের যে অর্থ হয় সেই অর্থানুসারে পূর্ব্ব-মীমাংসার প্রত্যেক সূত্রের কি অর্থ হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। এই অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব্ব-মীমাংসার সূত্রগুলির বক্তব্য কি কি তাহা চিন্তা করিতে বসিয়া দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক পদের মধ্যে যে যে অক্ষর আছে তাহার এক একটী জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করিলে ঐ উচ্চারণের ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেই প্রতিক্রিয়া প্রথমে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ প্রতিক্রিয়া কিরূপে মস্তিষ্কের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা দেখান আছে।

পদমধ্যস্থিত বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণফলে মস্তিষ্কের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় তাহার সমবায়ে পুনরায় একটি প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা যায় মুখের মধ্যে, দুই চক্ষুর পশ্চাতে, গলার সম্মুখে, জিহ্বার ঊর্দ্ধে, টাকড়ার অধোভাগে যে হাওয়া আছে তাহার মধ্যে। পদমধ্যস্থিত বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের ফলে যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়, সেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে উপরোক্ত যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে পদের অর্থ যে কি হওয়া উচিত, তাহা সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভব হয়। পূর্ব্ব-মীমাংসা-প্রদর্শিত নিয়মানুসারে যে কয়টি পদের অর্থোপলব্ধি করিবার চেষ্টা আমি এতাবৎ করিয়াছি তাহাতে আমি বুঝিয়াছি যে, ঐ নিয়মে পদের অর্থ স্থির করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক বস্তুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (অর্থাৎ তাহার জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সম্বন্ধীয় তথ্য) সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বমীমাংসার সমস্ত সূত্রের উপরোক্ত ভাবের আলোচনা আমার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কাযেই পূর্ব্বমীমাংসার বক্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে আমি এখনও আলোচনা করিতে পারিব না। পূর্ব্বমীমাংসার আলোচনাকালে আমি দেখিতেছি যে, নিরুক্তান্তর্গত নিঘণ্টু ও নিগমে এবং বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে গভীর প্রবেশ না থাকিলে পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

অক্ষরের অর্থ এবং পদের অর্থ জানিতে পারিলেই যে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের বক্তব্য বুঝা যায় তাহা নহে। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের বক্তব্য বুঝিতে হইলে উহার মধ্যে যে সমস্ত বাক্য থাকে সেই সমস্ত বাক্যের পদোচ্ছেদ কি করিয়া করিতে

হয় তাহা জানা না থাকিলে কোন বাক্যেরই যথাযথভাবে অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

বাক্যের পদোচ্ছেদ করিবার নিয়ম

বাক্যের পদোচ্ছেদ করিবার নিয়ম কি তাহা জানিতে হইলে পদোচ্ছেদ কাহাকে বলে তাহা জানা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বলাই বাহুল্য। বাক্যের পদোচ্ছেদ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে বাক্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি কথা জানিতে হইবে। প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে কতকগুলি অক্ষর থাকে আবার কতকগুলি খণ্ডভাব থাকে। এই খণ্ডভাবগুলির সাহায্যে বাক্যের পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশিত হয়। খণ্ডভাবগুলিও কতকগুলি অক্ষরের সমবায়ে প্রকাশ করা হয়। খণ্ডভাবেরই সংস্কৃত নাম "পদ"। বাক্যান্তর্গত কোন্ কোন্ অক্ষরে এক একটী খণ্ডভাব সম্পূর্ণ করা হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নাম—বাক্যের "পদোচ্ছেদ"। উদাহরণস্বরূপ একটী খণ্ডবাক্য ধরা যাউক, "অগ্নিমিলে—"। "অগ্নিমিলে" এই খণ্ডবাক্যের মধ্যে "অগ্নিং" ও "ইলে" এই দু'টী পদ আছে অথবা "অক্" "নিং" "ই" ও "লে" এই চারিটী পদ আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নাম বাক্যের "পদোচ্ছেদ।" "পদোচ্ছেদ" ও "পদবিভাগ" একার্থক নহে। যত কিছু পদ আছে তাহা কয় শ্রেণীর ইহা স্থির করিবার নাম পদবিভাগ। সংস্কৃত ভাষায় পদের বিভাগ চারিশ্রেণীতে, যথা :—(১) নাম, (২) আখ্যাত (৩) উপসর্গ, (৪) নিপাত।

বাক্যের পদোচ্ছেদ করিবার মূল বিজ্ঞান আছে পাণিনীয় শিক্ষায় এবং তাহা স্পষ্টতর করা হইয়াছে "ছন্দঃ-সূত্রে"।

অক্ষরের অর্থ ও পদের অর্থ নির্দ্ধারণ করা যেরূপ সাধনাসাপেক্ষ, পদোচ্ছেদ করাও সেইরূপ অথবা ততোধিক সাধনাসাপেক্ষ। পদের অর্থ উপলব্ধি করিবার নিয়ম জানা না থাকিলে পদোচ্ছেদ করিবার সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। আগেই দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বমীমাংসায় প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে পদের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, যাঁহারা পূর্ব্বমীমাংসায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষায় ও ছন্দঃসূত্রে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। প্রচলিত টীকার সাহায্যে শিক্ষা ও ছন্দঃসূত্র বুঝা সম্ভব নহে। উহা যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে অক্ষরের অর্থ ও তৎসাহায্যে পদের অর্থ উদ্ধার করিবার নিয়ম জানিতে হয়।

[ক্রমশঃ
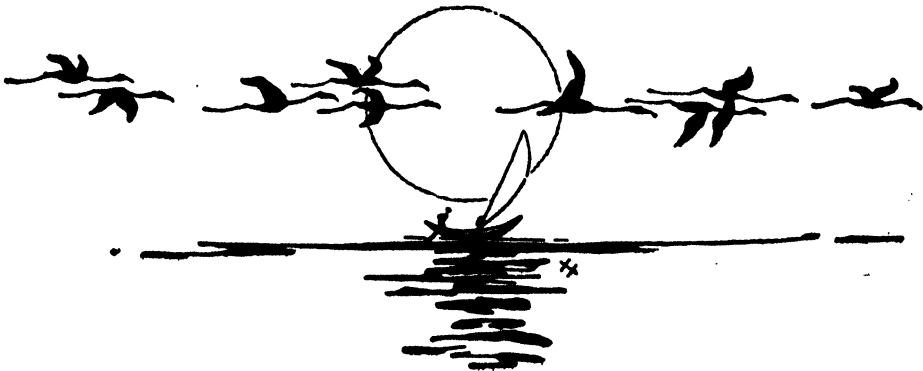
পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা ও ভারতবাসীর দায়িত্ব

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

কয়েক বৎসর আগে আমি "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ আমার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা। তাহাতে দেখাইয়াছিলাম যে, ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে জ্ঞান-, বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে তদ্বিষয়ে সমস্তই সম্পূর্ণভাবে ও নির্ভুলভাবে আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা বশতঃ ভারতীয় সমাজ একদিন নিখুঁৎ ভাবে সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছিল। এই নিখুঁৎ সংগঠনের ফলে ভারতে একদিন ভারতবাসিগণের পক্ষে নিজ নিজ গ্রামে বস-বাস করিয়া, কোন চাকুরী না করিয়া, কোনরূপ মিথ্যা-প্রবঞ্চনার সহায়তা না লইয়া জীবিকার্জ্জন করা এবং স্বাস্থ্যবান্ ও শান্তির জীবন লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতে এই নিখুঁৎ সংগঠন একদিন হইয়াছিল বলিয়া কয়েক বৎসর আগেও যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসিগণের পক্ষে আহারান্বেষণের জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, তখন ভারতবাসী নিজের দেশে বসিয়াই নিজদিগের আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল এবং বিদেশীগণকে তাঁহাদিগের আহারার্জ্জনে সাহায্য করিতে পারিতেছিল। কালক্রমে ভারতবাসিগণ যে ভাষায় ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান লিখিত রহিয়াছে সেই ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানও এক্ষণে বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কি করিয়া এত প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মানুষের পক্ষে ভোলা সম্ভব হইয়াছে এবং কি করিলে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে তাহা দেখানো উপরোক্ত প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য সারা পৃথিবীর মানুষগুলির আর্থিক, শারীরিক, ও মানসিক অবস্থা কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণ এই অবস্থার উন্নতির জন্য কি করিতে পারেন—তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা।

বলা বাহুল্য, আমার মতে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মানুষ আজকাল কি আর্থিক-বিষয়ে, কি শারীরিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে, কি মানসিক শান্তি-বিষয়ে খারাপের চরম অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সব দেশের সব মানুষই যে হুবহু এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আমার মতে সব দেশে অর্থ-বিষয়ে অথবা স্বাস্থ্য-বিষয়ে অথবা মানসিক শান্তি-বিষয়ে ঠিক্ ঠিক্ এক রকমের উন্নতি অথবা অবনতি কখনও হয় না। অর্থ-বিষয়ে অথবা স্বাস্থ্য-বিষয়ে অথবা শান্তির বিষয়ে ভারতবর্ষে যতখানি উন্নতি হইতে পারে অন্য কোন দেশে ততখানি উন্নতি কখনও হইতে পারে না। এই এই বিষয়ক অবনতিও ভারতবর্ষে যতখানি হইতে পারে অন্য কোন দেশে ততখানি হইতে পারে না। আবার ঐ ঐ বিষয়ে ইংলণ্ডে যতখানি উন্নতি অথবা অবনতি হইতে পারে রুশিয়ায় ততখানি উন্নতিও কোন দিন হইতে পারে না এবং অবনতিও হইতে পারে না। সর্ব্বদেশে উন্নতি ও অবনতির চরম অবস্থা কেন সমান হইতে পারে না তাহা কুক্ষি অথবা দিক্-বিজ্ঞানের কথা। আজকাল এই বিজ্ঞান জীবিত নাই। পৃথিবীর সকল দেশের উন্নতি ও অবনতির চরম অবস্থা যে সমান হইতে পারে না তাহা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের জানা আছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বদেশে উন্নতি ও অবনতির চরম অবস্থা কেন সমান হইতে পারে না তৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু জানিবার আছে তাহা সমস্তই ঋক, যজুঃ ও সামবেদে লেখা আছে। কোন্ দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কতখানি উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ তথ্য আছে অথর্ব্ব বেদে এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্তে। স্ফোটবাদের নিয়মানুসারে ঐ দুইখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারিলে উপরোক্ত তথ্য জানা যায়। ঐ দুইখানি গ্রন্থের

কোন খানিতেই কোন দেশের আধুনিক পন্থায় কোন নাম ব্যবহৃত হয় নাই। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি অনুসারে অথবা দ্বাদশ-রাশির সহিত সম্বন্ধানুসারে দেশের নাম দেওয়া আছে। যাঁহারা মনে করেন যে ভূগোল আধুনিক কালের আবিষ্কার তাঁহারা যে কত ভ্রান্ত ও জ্ঞানহীন তাহা বেদের দেশ সম্বন্ধীয় কথাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়। ঐ কথাগুলি জানা থাকিলে বর্ত্তমান ভূগোলকে কতকগুলি অল্পবিদ্যা-যুক্ত মানুষের খেয়ালের অভিব্যক্তি বলিতে হয়।

"পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মানুষ আজকাল কি আর্থিক-বিষয়ে, কি স্বাস্থ্য-বিষয়ে, কি মানসিক শান্তি-বিষয়ে খারাপের চরম অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে"—আমাদিগের এই কথা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের মতে অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তি বিষয়ে পৃথিবীর যে দেশ যতখানি খারাপ হইতে পারে, প্রায় প্রত্যেক দেশই ততখানি খারাপ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক খারাপ হইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত ক্লেশাবহ হইয়া পড়িবে।

এই অবস্থা হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী। ভারতবাসিগণ এক্ষণে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে ঈশ্বরের দেওয়া কি কি সম্পদ্ আছে তাহা যদি আবার ভারতবাসিগণ চিনিয়া লইতে পারেন এবং ঐ ঐ সম্পদের সদ্ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় তাহা যদি তাঁহারা আবার চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পারেন তাহা হইলে আবার পৃথিবী অবনতির চরমাবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে। যাঁহার নিয়মে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন, জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর আবার জন্ম হইয়া থাকে তাঁহারই নিয়মে ভারতবাসিগণ আবার অদূর-ভবিষ্যতে আত্মশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে বাধ্য হইবে। আত্ম-জ্ঞানী ভারতবাসীকে কয়েকটা কামান-বন্দুক চিরদিনের জন্য ভীতিগ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারিবে না। রাজসিকতা ও তামসিকতা সাত্ত্বিকতাকে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করিতে পারে বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল কখনও করিতে পারে না। রাজসিকতা ও তামসিকতার জয় কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাজসিকতা ও তামসিকতার রাজত্ব কখনও নিরাপদ হয় না এবং উহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই জগৎ হইতে মুছিয়া যায়। একমাত্র সাত্ত্বিকতার প্রভাবই নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী।

মিশর, গ্রীক্, রোমান, পাঠান ও মোগলের প্রভাব তামসিকতা মিশ্রিত রাজসিকতার দৃষ্টান্ত। আর ব্যাস, গৌতম, খৃষ্ট ও মহম্মদের প্রভাব সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত। এক চায় বিলাসিতা ও তৃপ্তি, আর অপর বিলাসিতা ও তৃপ্তির সর্ব্ববিধ উপকরণ পাইয়াও নিজ অথবা নিজ দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া সারা জগতের সারা মনুষ্য-সমাজ লইয়া ব্যস্ত। পাঠক, তাকাইয়া দেখুন কাহার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী। মিশর, গ্রীক, রোমান, পাঠান ও মোগলের ভাবধারা ও প্রভাব এখন আর কেহ মনেও করেন না। অথচ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে জানিলে দেখিতে পাইবেন যে, অতর্কিতভাবে এখনও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি ব্যাস, গৌতম, খৃষ্ট ও মহম্মদের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত।

লৌকিক ব্যবহারে পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের অনেকেই সুমধুর, এবং পরিশ্রমী। কিন্তু প্রত্যেক পাশ্চাত্ত্যজাতির অধিকাংশ মানুষই হয় তাঁহাদিগের সমগ্র জাতির নতুবা নিজ নিজ তৃপ্তির ও আরামের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এক জাতি যে অপর এক জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন তাহারও মূল অভিপ্রায় তথাকথিত জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়া জাতির তৃপ্তি সাধন। এতাদৃশ তৃপ্তি ও আরামের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করাকে দার্শনিক ভাষায় তামসিকতা মিশ্রিত রাজসিকতা বলা হয়। সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-বিমুক্ত হয় তাহার জন্য কোন মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমে ব্রতী হইলে সাত্ত্বিকতার উদ্ভব হয়। লিখিত ইতি-হাসে প্রত্যেক জাতির জাতীয় ইতিহাস যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লিখিত ইতিহাসের কালে অর্থাৎ গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে জগতের কোন দেশেই প্রকৃত সাত্ত্বিকতার উদ্ভব হয় নাই। প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য মানুষ হয় নিজ নিজ নতুবা নিজ জাতির উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। এক খৃষ্ট ও মহম্মদ ছাড়া কোন দেশের কোন মানুষই যে সমগ্র

মানবজাতির প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবের কল্যাণের জন্ম কোন শারীরিক অথবা কোন মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অথচ এই পৃথিবীতে প্রাগৈ-তিহাসিক যুগে লিখিত যত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় সেই গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে এখনও দেখা যাইবে যে, এমন একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষের অনেকেই ঐ আলোচনায় প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর দুঃখ মানবজাতির প্রত্যেককে বিধ্বস্ত করে, কেন ঐ সমস্ত দুঃখের উদ্ভব হয়, কোন্ কোন্ বিধি ও নিষেধ অবলম্বন করিলে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক দুঃখ দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সমাজের ও ব্যক্তির আচরণে কোন্ কোন্ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে অনায়াসে মানুষ তাহার প্রত্যেক রকমের দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারে, যে বিধি ও নিষেধগুলি পালন করিলে মানবজাতির প্রত্যেক মানুষটী তাহার প্রত্যেক দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে সেই বিধি ও নিষেধ গুলি কোন্ উপায়ে সমাজ অথবা রাষ্ট্র সংগঠন করিলে অনায়াসে কার্য্যপ্রসূ হইতে পারে—এবম্বিধ চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় ঋষির গ্রন্থগুলি লিখিত।

ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও তন্নিহিত চিন্তাধারার সহিত ঘটনাস্রোতে কিছু পরিচয় হইয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা যে, বর্ত্তমান পৃথিবীকে তাহার দুঃখের চরমাবস্থা হইতে বাঁচাইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী।

আমার এতাদৃশ ধারণার জন্য অনেকে যে আমাকে পাগল মনে করিয়া থাকেন তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি, তজ্জন্য আমি ক্ষুব্ধ নহি। আপাতদৃষ্টিতে এতাদৃশ ধারণা যে পাগলামী-মূলক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যখন শিক্ষিত লোকের অনেকেই মনে করেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃই উন্নতির ক্রমবিধানানুসারে উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তখন যদি কেহ বলে যে পৃথিবী তাহার দুঃখের চরমাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে পাগল মনে করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে মানুষ একদিন একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য একমাত্র পদ-যান, পাল্কী-যান এবং নৌকা-যান ছাড়া অন্য কোন যানের নির্ম্মাণ ও ব্যবহারপ্রণালী জানিত না এবং সেইস্থানে আজকাল রেল, ষ্টীমার ও অ্যারোপ্লেনের সাহায্যে এমন কি একশত ঘণ্টার রাস্তা এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে, যে মানুষের একদিন একস্থান হইতে অন্যস্থানের খবরাখবর আনিতে বৎসরাবধি লাগিত, সেই খবর এখন টেলিগ্রাম ও বেতারের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়া যায়, দূর-দূরান্তরের যে গান ও তামাসা একদিন অনেকের পক্ষেই উপভোগ করা অসম্ভব ছিল, বেতার, বায়োস্কোপ ও টকির সাহায্যে আজ সেই গান ও তামাসা উপভোগ করা অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য হইয়াছে, যে মানুষ একদিন শ্রান্ত কলেবরকে শান্ত করিবার জন্য হাত-পাখার অথবা টানা-পাখার ব্যবহারে অপরকে শ্রান্ত করিতে বাধ্য করিত, সেই মানুষ এখন সুইচ্ টিপিলেই অনায়াসে ইচ্ছানুরূপ সমীরণকে ব্যবহার করিতে পারে,—তখন যদি কেহ বলে যে, পৃথিবী তাহার দুঃখের চরমা-বস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা হইলে তাহাকে পাগল মনে করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহার প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না। কাজেই প্রশ্ন করিতে হইবে যে, আমি এইরূপ পাগলামীর কথা মানুষকে শুনাই কেন?

এত এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ দুঃখের চরমা-বস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এমন কথা আমি মনে করি কেন—তাহার উত্তর দিতে হইলে মানুষকে তাহার নিজের প্রতি নিম্নলিখিত তিনটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে হইবে, যথা :—

(১) প্রত্যেক মানুষ কি চায়? অথবা যিনি নিজেকে এতাদৃশ ভাবে প্রশ্ন করিবেন তিনি নিজে এমন কি কি চাহিয়া থাকেন যাহা তাঁহার পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকেই চাহেন?

(২) প্রত্যেক মানুষ যাহা যাহা চাহে তাহার ভাণ্ডার (stock) সম্বন্ধে মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?

(৩) বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যাহা যাহা দিয়াছেন তাহা কোন্ কোন্ বিষয়ক?

এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ইংরাজী, জার্ম্মান এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে উহার কোনটীর জবাব পাওয়া যায় না। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত যে সমস্ত কথা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে সেই সমস্ত কথার ভিতরও ঐ তি

প্রশ্নের কোনটীর জবাব নাই। তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞ যে সমস্ত পণ্ডিত গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া রাশি রাশি কথা লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের কোন লেখার ভিতরও উহার কোনটীর জবাব দেখা যাইবে না। ঐ তিনটী প্রশ্নের প্রথমটীর নিখুঁৎ জবাব পাওয়া যায় একমাত্র অথর্ববেদে। তাহাও আজকালকার পণ্ডিতগণ যে পন্থায় সংস্কৃত ভাষা বুঝিয়া থাকেন সেই পন্থা অবলম্বন করিলে বুঝা সম্ভব হয় না। স্ফোটবাদের পদ্ধতিতে সংস্কৃত বুঝিতে চেষ্টা করিলে অথর্ববেদের মূলমন্ত্র হইতে "প্রত্যেক মানুষ কি চায়"—এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া নিজের ভাবনারাশিকে বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত হইলেও ঐ প্রশ্নের জবাব আসিয়া যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নটীর জবাব পাইতে হইলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি কত পরিমাণে হইতেছে এবং কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী কত পরিমাণে হইতেছে তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে লেখা আছে সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেক দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পাইবার উপায়—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল, রেডিও, এয়ারো, টেলিগ্রাফিক, টেলিফোনিক প্রভৃতি বিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা লিখিত হইয়াছে সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করা এবং তৎসম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা। যাহারা কেবল মাত্র কিছু নাট্য অথবা কথা-সাহিত্য অথবা কাব্য অথবা দর্শন অথবা আইন অথবা অর্থনীতি অথবা রাজনীতি অথবা পদার্থ-বিদ্যা অথবা রসায়ন অথবা একটা কোন লজি অথবা আধুনিক ইতিহাসের দেড়পাতা পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামক mutual admiration society হইতে একটা এম-এ, অথবা একটা পি-এইচ-ডি অথবা একটা ডি-লিট্ অথবা ডি-এস-সি অথবা এম-ডি উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যে বিভোর হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ তিনটী প্রশ্নের কোনটীর জবাব নির্ভুলভাবে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। অথচ এই পণ্ডিতগণের পক্ষে যদি নিজেরা কি শিখিয়াছেন তাহার একটা Balance Sheet অথবা হিসাব আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যের অভিমান বিসর্জ্জন করিতে পারেন তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটীর জবাব লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

"প্রত্যেক মানুষ কি চায়" তাহার জবাব নির্ভুলভাবে খুঁজিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষই অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া অর্থের প্রাচুর্য্যে, অটুট স্বাস্থ্যে, চিরশান্তিতে, চিরস্থায়ী যৌবন লইয়া সর্ব্বদা সাঁতার কাটিতে চায়। অর্থ অথবা স্বাস্থ্য অথবা শান্তির অভাব না হইলে কেহই মরিতে চায় না। এইখানে আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার অথবা তাহা কিনিবার টাকা-কড়ি বুঝাইবার জন্য অর্থ-শব্দটী ব্যবহার করিয়াছি। এই পাঁচটী বস্তুর একটীরও অভাব হইলে মানুষের আশা অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং মানুষ নিজেকে অল্পাধিক অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া থাকে।

প্রত্যেক মানুষ যাহা যাহা চাহে তাহার ভাণ্ডার (stock) সম্বন্ধে মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, এমন মানুষ পাওয়া যায় না যিনি তাঁহার কোন কাম্য-বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট। বরং প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেক কাম্য-বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভীষণ অপ্রাচুর্য্য অনুভব করিয়া 'কোন বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রাচুর্য্য পাওয়া কখনও সম্ভব নহে' এবম্বিধ তথাকথিত সত্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন।

অর্থ-বিষয়ে দরিদ্রও যেরূপ অভাবগ্রস্ত ধনীও সেইরূপ অভাবগ্রস্ত। দরিদ্র লবণ-ভাতের অভাবে দৈন্যগ্রস্ত, আর ধনী রোলস্-রয়েস্ গাড়ী, কাশ্মিরী কামিনী, বাকিংহাম-প্যালেস্ প্রভৃতি জাতীয় দ্রব্য-সম্ভার কিনিবার মত অর্থের অপ্রাচুর্য্যে দৈন্য-গ্রস্ত।

স্বাস্থ্য-বিষয়ে কেহ বা নিজের, কেহ বা পত্নীর, কেহ বা পুত্র-কন্যার, কেহ বা ভ্রাতা-ভগ্নীর, কেহ বা আত্মীয়-বন্ধুর কোন না কোন অস্বাস্থ্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই জর্জ্জরিত।

শান্তি-বিষয়ে কেহ বা দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের জন্য অশান্তি-গ্রস্ত। আবার কেহ বা পদের ও বিদ্যার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত অনুভব করেন বটে কিন্তু উচ্চতর পদ পাইতে পারেন না বলিয়া অথবা পুত্র-কলত্রদিগের যথোপযুক্ত উন্নতির অভাবে অশান্তিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যাহা যাহা দিয়াছেন তাহা কোন্ কোন্ বিষয়ক তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ধনীর উপভোগ কামনা চরিতার্থ করিতে

হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার অনেক জিনিষই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনায়াস-লভ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষ যাহা যাহা চায় এবং দরিদ্রকে যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার যাহা যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার কোন জিনিষই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সহজ-লভ্য করিতে পারেন নাই। পরন্তু আয়াস-লভ্য ও দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ধনীর উপভোগ কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত জিনিষ সহজ-লভ্য করিয়া দিয়াছেন সেই সমস্ত জিনিষের দ্বারা ধনীর কোন যথার্থ উপকার ও উন্নতি হইতেছে কি না তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান ধনীরও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

প্রত্যেক মানুষ কি কি চায়, এবং যাহা যাহা প্রত্যেক মানুষ চায় তাহার ভাণ্ডার সম্বন্ধে মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার যথার্থ সন্ধান অবগত হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ধনীর উপভোগের বহু সামগ্রী সহজলভ্য করিয়া দিয়াছে কিন্তু তথাপি ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের যে সমস্ত বস্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় তৎসম্বন্ধে মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে এ কথা একেবারে স্বীকার করেন না তাহা বলা চলে না। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের জন-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহাদের মতে জন-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনিবার্য্য। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, কোন অবস্থায়ই কোন মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে এড়ান সম্ভব নহে।

আমাদিগের মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের উপরোক্ত দুইটী মতবাদের কোনটীই যুক্তিসঙ্গত নহে। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক মানুষ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জানা নাই বলিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপরোক্ত মত-বাদ পোষণ করেন। উহা জানিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জন-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের সংস্রব নিতান্ত অল্প। "জীবন দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি"—এই কথা কখনও মিথ্যা নহে। আহার মূলতঃ পাওয়া যায় কৃষি-যোগ্য জমি হইতে। কৃষি-যোগ্য জমির অবস্থা ও পরিমাণ এক্ষণে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যেমন প্রত্যেক দেশে প্রতি লোক-গণনায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেইরূপ আবার কৃষি-যোগ্য জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। হ্রাস পাইতেছে কেবল প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যে খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের অভাবে কষ্ট পাইতেছে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি তাহার কারণ নহে। তাহার মুখ্য কারণ প্রত্যেক বিঘা ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের হ্রাস।

মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে এড়ান সম্ভব কি না তদ্বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে মানুষের কত রকমের দুঃখ আছে, মানুষের সুখ-দুঃখ ভাব আইসে কোথা হইতে এবং কেন, কোন পন্থা অবলম্বন করিলে কোন শ্রেণীর দুঃখ দূর করিয়া দেওয়া যায়—এবম্বিধ সত্যগুলি পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা স্ফোটবাদের নিয়মানুসারে ভারতীয় ঋষির সংস্কৃত ভাষা পড়িতে শিখিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্ববিধ দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া দেওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটী কথা অথর্ব্ববেদে লেখা আছে। ঐ কথাগুলি জানা থাকিলে কোন অবস্থায়ই কোন মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে এড়ান সম্ভব নহে—এই মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ বোধহয় বুঝিতে পারিবেন যে, এত এত বৈজ্ঞানিক উন্নতিসত্ত্বেও মানুষ দুঃখের চরমাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এমন কথা আমি মনে করি কেন।

আমার মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কেবল মাত্র কয়েকটী কৃত্রিম বস্তুর বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। কোন সজীব বস্তুর (Living Beings) বিজ্ঞান তাঁহারা এখনও ঠিকভাবে স্থির করিতে পারেন নাই। কৃত্রিম বস্তুর বিজ্ঞান আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে অথচ সজীববস্তুর বিজ্ঞান আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যাহা কিছু করেন

তাহাতে মানুষের মারণ-কার্য্য সাধিত হয় কিন্তু মানুষকে বাঁচাইবার অথবা তাহার উন্নতিসাধন করিবার কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। কামান বন্দুকাদি মারণযন্ত্র ও বিস্ফোরকাদির কথা বাদ দিয়া রেল, মোটর গাড়ী, অ্যারোপ্লেন, যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার কল ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ঔষধাদির কথা চিন্তা করিলেও দেখা যাইবে যে, আপাতদৃষ্টিতে ঐ সমস্ত বস্তুর দ্বারা মানুষের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ঐ সমস্ত বস্তুর ব্যবহারে মানুষ তিল তিল করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সব কথা আর বাড়াইব না কারণ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে।

মোটের উপর পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা খারাপের চরমতা লাভ করিয়াছে এবং ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী—বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক।

আগেই বলিয়াছি যে, এই অবস্থা হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী। ইহারই জন্য আমরা মনে করি যে, সমগ্র মানবজাতির উদ্ধার-কার্য্যে ভারতবাসীর দায়িত্ব বর্ত্তমানকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গত ২৫০০ বৎসরের মধ্যে আরও তিনবার সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব টলটলায়মান হইয়াছিল। এই তিনবারই সমগ্র মানবজাতির রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন তিন জন এশিয়াবাসী, যথা:—(১) বুদ্ধদেব, (২) যীশু খৃষ্ট, (৩) নবী মহম্মদ। যে যে সঙ্কেতের দ্বারা এই তিন জন মহাপুরুষ অথবা অতি-মানব সমগ্র মানবজাতিকে তাহার টলটলায়মান অবস্থা হইতে তিন তিন বার রক্ষা করিয়াছিলেন সেই সঙ্কেত তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক সঙ্কেতটী ভারতীয় ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে লিখিত আছে।

এই চতুর্থ বারের টলটলায়মান অবস্থা হইতে সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে পুনরায় ভারতবাসীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। সমগ্র মানবজাতির জন্য যে সমস্ত কার্য্যের প্রয়োজন হয়—তাহা ভারতবাসী চিরদিনই করিয়াছে এবং আবার করিবে। ভারতীয় ঋষি সমস্ত মনুষ্যসমাজকে একটী জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থে ভারতীয় জাতি (Indian Nation) অথবা ইংরাজ-জাতি অথবা জার্ম্মাণ-জাতি অথবা শাক্ত-জাতি অথবা বৈষ্ণব-জাতি অথবা ব্রাহ্মণ-জাতি অথবা ক্ষত্রিয়-জাতি বলিয়া কোন কথা নাই, তাঁহাদিগের ভাষায় বৈষ্ণব-সাধক, শাক্ত-সাধক, ব্রাহ্মণ-বর্ণ, ক্ষত্রিয়-বর্ণ প্রভৃতি কথা আছে। 'সাধক' শব্দ, 'বর্ণ' শব্দ ও 'জাতি' শব্দের অর্থে তফাৎ অনেকখানি। স্থান-গত জাতিত্ব (Territorial Nationality) পাশ্চাত্ত্যগণের দান। উহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নিহিত আছে। ঐ সঙ্কীর্ণতা মনুষ্যত্বের অপহারক। আমাদিগের নেতাগণের পক্ষে ঐ সঙ্কীর্ণভাবের স্বাধীনতার অনুকরণ করা মোটেই সঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের নাই। অনেকে মনে করেন যে, ভারতবাসী পরাধীন বলিয়া অবজ্ঞার যোগ্য। আমাদিগের মতবাদ অন্য রকমের। ভারতবাসী অবজ্ঞার যোগ্য কিনা তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ যে শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য গৌরবানুভব করেন সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসিগণ কামনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন। ইহাও সঙ্গত নহে। পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশ তাহার অন্নের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী। উহার প্রায় প্রত্যেক মানুষ তাহার সংসার নির্ব্বাহের জন্য মনিবের দেওয়া চাকুরীর মুখাপেক্ষী। তথাপি তাঁহারা যে নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করেন ইহা তাঁহাদিগের অর্ব্বাচীনতা। তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশের অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে অন্য দেশকে প্রবঞ্চনা ও লুণ্ঠনের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়াছেন। এই দলবদ্ধতাকে তাঁহারা স্বাধীনতা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা কখনও মানুষের অনুকরণযোগ্য নহে।

কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক দেশ কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার দুরবস্থা হইতে স্বাধীনভাবে রক্ষা পাইতে পারে তাহা জানা থাকিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য যে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের নাই তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝা যাইবে। আমরা এক্ষণে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

ছয়

অবশেষে রাত ভোর হ'ল। পাখীর কুজনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে জীবনের সাড়া প'ড়ে গেল। লীলাবতী তাঁর ক্লান্ত দেহ তুলে উঠে বসলেন। প্রভাত রবির সোণালি কিরণে তাঁর মুখ রাঙ্গিয়ে উঠলো।

পূর্ব্ব রাত্রে তাঁদের আহার জোটে নাই, তার উপর গিয়েছে ঝড়ের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই। দু'জনেই খুব ক্ষুধার্ত্ত বোধ করলো কিন্তু খাওয়ার কোন উপকরণই নেই। সুরথ একখানা ছোট বাঁশের টুকরোর সাহায্যে অনেক কষ্টে নৌকাটা উত্তর তীরে নিতে লাগলো, কিন্তু নিকটে কোন লোকালয় দেখা গেল না। তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, তারপর ঘন জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড় ইত্যাদি। মাঠের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাঁদের ভিজে কাপড় শুকিয়ে গেল। অবশেষে মাঠ পেরিয়ে তাঁরা বাগানের মত একটা জায়গায় এসে পৌছলো। সুরথ দেখলো, এ বাগানই বটে, কমলা নেবুর বাগান, ছোট ছোট গাছে অসংখ্য নেবু ঝুলে আছে। তাই দেখে বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে সুরথ বাগানে ঢুকলো কিন্তু পরক্ষণেই নেবুগুলির একান্ত অপক্কাবস্থা লক্ষ্য ক'রে তার মুখখানা মলিন হ'য়ে গেল। আহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই নেবু লীলাবতীর হাতে কেমন ক'রে সে দেবে? তবুও কয়েকটা নেবু ছিড়ে সে সঙ্গে নিলো। এমন সময় বাগানের বাইরের দিকে এক জায়গায় তিন চারটা পেঁপে গাছ দেখতে পেয়ে সে সেখানে ছুটে গেল এবং দেখে আনন্দিত হ'ল যে গাছে দু'টো সম্পূর্ণ পাকা পেঁপে যেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যই ঝুলে র'য়েছে! সুরথ অবিলম্বে পেঁপে দু'টো পেড়ে নিয়ে লীলাবতীর কাছে উপস্থিত হ'ল এবং কাটবার জন্য ছুরি বার করলো। লীলাবতী তার হাত থেকে ছুরিটা চেয়ে নিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন,—

"এ কাজ আপনাদের নয়, মেয়েদের, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করতে গিয়ে অপ্রস্তুত হবেন না, দিন আমার হাতে ছেড়ে, আর পারেন যদি একখানা বড় পাতা নিয়ে আসুন।"

সুরথ নীরবে আদেশ পালনে তৎপর হ'ল। নিকটেই কয়েকটা কলাগাছ ছিল সুতরাং পাতা সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

লীলাবতী পেঁপে দু'টোকে ফলা ফলা ক'রে কেটে কলাপাতার উপর রাখলেন, তারপর সুরথকে ফলাহারে আহ্বান ক'রলেন। ক্ষিধের তাড়নায় এই পেঁপে খেয়েই উভয়ের তৃপ্তি লাভ হ'ল।

তাঁরা একটা বড় আম গাছের তলায় ব'সেছিল। পেঁপে খেতে খেতে দু'জনেই তাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে মনে ভাবছিল, আর ভাবছিল ঐ সব ঘটনার কথা যাদের ভিতর দিয়ে তাঁরা এই অবস্থায় এসে পৌচেছে। এর পর কি অবস্থা দাঁড়াবে, কোথায় গিয়ে তাঁরা আশ্রয় পাবে, আশ্রয় নিতে গিয়ে আবার কোনো নূতন বিপদ উপস্থিত হবে কি না, এই শ্রেণীর নানা রকম প্রশ্ন মনকে বিক্ষুব্ধ করলেও প্রকাশ্যে সে সম্বন্ধে তারা কোন আলোচনা করলো না। লীলাবতীর জীবনে এই এক রহস্য-পূর্ণ নবীন অধ্যায়। তাঁর কবি-চিত্ত তার উন্মাদনার মোহে বিভোর হ'য়ে উঠলো এবং তাঁর কাছে সুরথের শৌর্য্য, সাহস ও ত্যাগ বিনয়ের আবেষ্টনে উজ্জ্বলতর হ'য়ে দেখা দিলো। হঠাৎ লীলাবতী তাকে প্রশ্ন করলেন,—

"আচ্ছা, সুরথ বাবু, একটা প্রশ্ন করতে পারি? উত্তর দেবেন তো?"

'সুরথ বাবু' সম্বোধনে একটু চম্‌কে উঠে, সুরথ বল্‌লো, "নিশ্চয় পারেন, সেজন্য অনুমতির প্রয়োজন করে না।"

"একেবারে নিষ্প্রয়োজন ব'লেও আমি মনে করতে পাচ্ছি না, কারণ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অভ্যাস আপনার নেই।"

"আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তা পারবেন না। যা হোক, মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনার পরিচয়টা আপনি কিছুতেই দেন নি। তা যাক্, সেটা যখন বলেন নি, সে জন্য আর পীড়া-পীড়ি করবো না।"

"বেশ, আপনার নূতন প্রশ্নটি তা'হ'লে বলুন।"

"আপনি কি বিবাহিত ।"

"না।"

"কেন বিয়ে করেন নি ?"

"যোগ্যতার অভাব ব'লে। যে ব্যক্তি সংসারে বিতৃষ্ণ, নির্ধন, অশিক্ষিত এবং সমাজে যার কোন স্থান নেই, তার বিয়ে করা সাজে না। তা ছাড়া, এমন হতচ্ছাড়া লোককে কে বিয়ে করতে রাজী হবে ?"

"সংসারের প্রতি আপনার কেন বিতৃষ্ণা জন্মেছে জানি না, আপনার শিক্ষার অভাবেরও পরিচয় পাচ্ছি না, সমাজে আপনি একান্ত হেয় এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে হ'তে পারে আপনি নির্ধন কিন্তু শুধু এতেই তো আপনার অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না, কারণ সংসারে অর্থই সব নয়, তার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ আপনাতে আছে। তার পর আপনার ধারণা, এমন হতচ্ছাড়া লোককে কেউ বিয়ে ক'তে রাজী হবে না। আপনার এই ধারণা যে ঠিক, তা আপনি কি ক'রে জানলেন ?"

"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

"ও:, আপনার বিশ্বাস, তাই বলুন, আরো বলুন, আপনার সেই বিশ্বাসটি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে একটা বিরাট সত্যের উপর এবং সেই সত্যটি হচ্ছে, আপনার পত্নীত্ব পদের জন্য পদপ্রার্থিনীদের কাছ থেকে অদ্যাপি কোন আবেদন পত্র আসে নি। কিন্তু আপনি যে 'কর্ম্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেন নি, সে কথাটি ভুলে যাবেন না।" ব'লেই লীলাবতী হেসে ফেললেন।

"আপনি উপহাসই করুন, বা যাই বলুন, আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমিই সকলের চেয়ে ভালো জানি।"

"আমিও প্রমাণ ক'রে দিতে পারি, আপনার সম্বন্ধে আপনার নিজের ধারণা আগা গোড়া ভুল।"

"তা সম্ভব নয়।"

"সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সত্য। আপনি বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছেন, আপনার মতো হতচ্ছাড়া লোককে কেউ বিয়ে করতে রাজী হ'তে পারে না, কিন্তু আমি যদি বলি, আমিই রাজী আছি, আমায় অবিশ্বাস করবেন ? আমায় ভালোবাসতে পারবেন না ?"

"ক্ষমা করুন, আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না। আপনি জানেন না, আমি কতো হীন, কতো দীন।"

"আপনি হীন ? মহৎ তবে কে ? আপনার দৈন্য ? তাতে কি এসে যায় ? আমার অতুল ঐশ্বর্য্য র'য়েছে, আপনি সে সবের অধিকারী হবেন।"

সুরথ আর স্থির থাকতে পারলো না, দাঁড়িয়ে উঠে বিনীত ভাবে বললো, "মিস্ রায়, আমায় ভুল বুঝবেন না যদি— আপনার এই অযাচিত ও দেববাঞ্ছিত ভালোবাসা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম হই,—বিশ্বাস করুন, আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতাই সেই অক্ষমতার একমাত্র কারণ।"

সুরথের মনের এমন দৃঢ়তা দেখে লীলাবতী বিস্মিত হ'য়ে গেলেন এবং তার প্রতি আরো বেশী শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে প'ড়লেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল, সুরথের জীবনে নিশ্চয়ই কোনো জটিল রহস্য র'য়েছে যে জন্য সংসারে তার বিতৃষ্ণা এসেছে এবং যা প্রকাশ ক'রে বলা তার পক্ষে এখন সম্ভবপর হচ্ছে না। যথা সম্ভব আত্ম-সংবরণ ক'রে তিনি তখন বললেন, "আপনার প্রতি অবিচার করবো না। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে আপনি আপনার মহত্ত্বকেই বাড়িয়ে তুলেছেন। শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে আসছে। এই প্রসঙ্গ তুলে আপনাকে আর অপ্রস্তুত করবো না, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন। এখন চলুন, আস্তানার সন্ধানে আবার বেরুই।"

কমলাবাগানের পাশ ধ'রে তাঁরা আবার চলতে আরম্ভ করলো এবং অবশেষে একস্থানে পৌঁছে অদূরে একখানা বাংলো ধরণের বাড়ী দেখতে পেলো। তখন তাঁদের ভরসা হ'ল, এবার আশ্রয় স্থান মিলবে। সেই আশায় উৎসাহিত হ'য়ে সেই বাংলোর দিকে রওনা হ'ল। দূর থেকে বাড়ীখানা ঠিক ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছলো তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর। অদূরে অপর দিকে নানা জাতীয় গাছে পরিবেষ্টিত কতগুলো ছোট ছোট বাড়ী দেখে তাঁদের মনে হ'ল, ওটা একটা বস্তি।

সুরথ ও লীলাবতী বাংলোর সীমানার ভিতরে প্রবেশ করলে দারোয়ান জানতে চাইলো, তাঁরা কে এবং কি চায়। এমন সময় প্রৌঢ় বয়স্ক এক ব্যক্তি বাংলো থেকে বেরিয়ে

এসে দারোয়ানকে কড়া ভাবে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে লীলাবতীর সুন্দর মুখখানা তাঁর চোখে পড়াতে সেই কথা আর বলা হ'ল না। সুরথ তখন অগ্রসর হ'য়ে পূর্ব্বরাত্রের প্রবল ঝড়ে তাঁদের নৌকাডুবির ও আনুষঙ্গিক বিপত্তির কথা তাঁকে জানিয়ে বল্‌লো, "আমরা আশ্রয়হীন ও ক্ষুধার্ত্ত, যদি দয়া ক'রে অন্ততঃ এই বেলার আহারের ব্যবস্থাটা ক'রে দেন, তা হ'লে বিশেষ কৃতজ্ঞ হই।"

ঐ ব্যক্তি তাঁর গোঁফ জোড়ায় একটু চাড়া দিয়ে লীলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

"কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগের মত বড় বড় তীর্থস্থান ঘুরে এসে যেটুকু ধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রেছি, অতিথি ফিরিয়ে দিয়ে, বিশেষতঃ এই দুপুর বেলায়, সেটুকু খোয়াতে পারি নে। কি বল হে নদের চাঁদ, পারি কি?"

বক্তার পেছন থেকে লম্বা কালো ছিপ্‌ছিপে চেহারার নদের চাঁদ হঠাৎ বেরিয়ে এসে এক গাল হেসে বল্‌লো,—

"তা কি খোয়াতে পারেন কর্ত্তাবাবু? নিশ্চয়ই পারেন না, আলবৎ পারেন না।"

"শাস্ত্রে ব'লেছে⋯ ⋯"

"আজ্ঞে হাঁ, শাস্ত্রে ব'লেছে বই কি, আলবৎ ব'লেছে, একেবারে খাঁটি কথা ব'লেছে।"

"শাস্ত্রের সেই শ্লোকটা হচ্ছে—"

"হাঁ, হাঁ, সেই শ্লোকটা হচ্ছে।"

"দূর ছাই, মনে আসছে না, তুমি বল তো নদের চাঁদ?"

"কর্ত্তাবাবুর মনে আসছে না, আমার আসবে? এতো বড় নেমকহারাম নদের চাঁদ নয়।"

"শ্লোকটি ঠিক মনে আসছে না বটে, কিন্তু তার ভাবটা—"

"হাঁ, হাঁ, ভাবটা মনে আছে বই কি, আলবৎ মনে আছে, নিশ্চয় মনে আছে।"

"যাক্ গে, সেই ভাবটা ব'লে আর কি হবে।"

"তাই তো, সেই ভাবটা ব'লে আর কি হবে? এই তো হ'ল ঠিক কর্ত্তাবাবুর মতো কথা।"

কর্ত্তাবাবু তখন খোস মেজাজে অতিথি দু'জনকে তাঁর আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে ফরাসের উপর বসালেন এবং তাঁদের আহারের ব্যবস্থার জন্য বাড়ীর ভেতরে খবর পাঠালেন। লীলাবতীর পরিচয় জানবার জন্য কর্ত্তাবাবুর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে তিনি নিজেকে মিসেস্ চন্দ নামে বিধবা মহিলা ব'লে পরিচয় দিলেন এবং বললেন, চিত্র বিদ্যার অনুশীলনে তিনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

কর্ত্তাবাবু প্রীত হ'য়ে বললেন, "খুব ভালো কথা, আমি উদারপন্থী, বিধবা-বিবাহে আমার মোটেই আপত্তি নেই, বিশেষতঃ এমন সুন্দরী ও গুণবতী বিধবা হ'লে। তার পর আমি একটা বড় ইষ্টেটের ম্যানেজার,—মালিক বল্‌লেই হয়, টাকা কড়ির আমার কোনো অভাব নেই, চেহারাটাও নেহাৎ মন্দ নয়, আর বয়সও তেমন বেশী নয়। বেশ থাকবে এখানে, ছবি আঁকবে, নাচবে, গাইবে, কোনো দুঃখ—"

"নাচবে, গাইবে আর তোমার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাইবে" এই কথা ক'টি উচ্চারণ করতে করতে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কর্ত্তাবাবুর নিপুণা গৃহিণী হঠাৎ সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে এক লাফে ফরাসে উঠলেন এবং দু'হাতে প্রেমাস্পদ স্বামীর গর্দ্দানাটি সজোরে চেপে ধ'রে বার কয়েক ঝাকানি দিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন,—

"পোড়ার মুখো মিন্‌সে, এই বুঝি হচ্ছে তোমার আপিস করা! ও মাগী কে? যে তাকে অতো ঠাঁট ক'রে বসানো হ'য়েছে, আবার তার জন্যে নেমন্তন্নের ব্যবস্থা হচ্ছে? এটা কি হোটেলখানা, যে আসবে সেই খেতে পাবে? বের ক'রে দাও ঐ নাচনাওয়ালী মাগীকে। যতো সব⋯⋯"

ম্যানেজার বাবুর গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়ে সুরথ ও লীলাবতী এক সঙ্গে ব'লে উঠলো,—

"এ সব কি বিশ্রী ও অন্যায় কথা বলছেন?"

"বটে? আমার কথা হ'ল বিশ্রী, আর তোমাদের নাচ-গানটা হবে ভারি সুশ্রী?"

"খেমটাওয়ালী মাগীর ঢং দেখো! আমার কর্ত্তাটিকে তো এরই মধ্যে কামরূপের ভেড়া বানিয়েছে। ও সব বদমায়েসি আর চল্‌বে না, চট্ ক'রে স'রে পড়ো, নয় তো নিস্তারিণী দেবীর এই খেংরার তাড়া খেয়ে পালাতে হবে।"

দেবীর হাতে তাঁর দেবের নিগ্রহ প্রত্যক্ষ ক'রে লীলাবতী ও সুরথের বেশ বিশ্বাস হ'ল, তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনটা কার্য্যে পরিণত হ'তে হয় তো অনেকক্ষণ লাগবে না। এরূপ অভ্যর্থনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিল না। সুরথ তাঁর উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন ক'রে লীলাবতীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে

থাকলো। কর্তাবাবুর বিধবা-বিবাহের প্রস্তাবটা নিস্তারিণী দেবীর আবির্ভাবে আর অগ্রসর হ'তে পারলো না।

সাত

বাংলো থেকে তাড়িত হ'য়ে সুরথ ও লীলাবতীর বস্তির দিকে যাওয়া ভিন্ন অন্য পন্থা রইলো না। এরূপ ঘৃণিত অপবাদ ও অভদ্র ব্যবহারের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। পথ চল্‌তে চল্‌তে কেবল সে সব কথাই তাঁদের মনে হ'তে লাগলো কিন্তু মুখ ফুটে কেউ আর সে প্রসঙ্গ তুললো না। নীরবে প্রায় পনেরো মিনিট কাল চ'লে তারা বস্তির সন্নিহিত হ'ল। তখন তাঁদের আগে আগে বড় বড় কাঠের বাক্স-বোঝাই একখানা গরু-গাড়ী ধীর-গতিতে পশ্চিমের দিকে যাচ্ছিল। সাধারণ কৌতূহল বশে সুরথ গাড়ীর সঙ্গী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, "এই সব বাক্সে কি আছে, আর এগুলো নেওয়া হচ্ছে কোথায়?"

লোকটি একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ ক'রে উত্তর করলো, "ব.স্ক দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না 'চা' নিয়ে ইষ্টিশনে যাচ্ছি? আপনারা বুঝি বিদেশী লোক?"

"হাঁ, এই দিকে আর কখনো আসি নি। এখানে যে চা-বাগান হ'য়েছে তা জানতাম না। এই বাগানের মালিক কে?"

"মালিককে কখনো দেখিনি; তবে শুনেছি, ক'ল্‌কাতার কে একজন স্ত্রীলোক-নাম বোধ হয় লীলাবতী দেবী—তিনিই এই সব ইষ্টেটের মালিক, তবে তিনি তো কিছু দেখেন না, এ দিকে আসেনও না, কাজেই ম্যানেজার বাবুই সব ভোগ কর্চ্ছেন। মেয়ে মানুষকে ঠকানো খুব সহজ কিনা, (তখন লীলাবতীর দিকে হঠাৎ তার নজর পড়াতে, তাঁকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লো) আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু আমাদের মালিককে লক্ষ্য ক'রে ঐ কথা ব'লেছি।"

লীলাবতী হেসে বল্‌লেন, "না, না, আমার মনে ক'রবার কি আছে? তা ছাড়া, কথাটা তো মিথ্যে নয়? আচ্ছা, এই চা-বাগানের নাম কি 'চন্দ্রাবতী টি ইষ্টেট'?"

"এতোদিন তো এই নামেই চ'লে এসেছে। এখন শুনতে পাই, শীগ্‌গীরই ঐ নাম বদলে গিয়ে নূতন নাম হবে 'নিস্তারিণী টি ইষ্টেট'।"

"বাগান তৈরী হ'য়ে 'চা' বিক্রী হচ্ছে ক'দিন যাবৎ?"

"এই তিন বছর যাবৎ তো রীতিমতো মাল চালান যাচ্ছে ক'ল্‌কাতায়।"

"বছরে কি পরিমাণ মাল চালান হয়?"

"হাজার বাক্সের কম তো নয়ই, এ বছর হবে তার প্রায় দেড়া পরিমাণ।"

"আশ্চর্য্য, এর কিছু আমায় জানায় নি, সব গোপন ক'রে আসছে!"

লোকটি তখন অপ্রস্তুত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি তবে কে?"

"আমিই এই ইষ্টেটের মালিক মিস্ লীলাবতী রায়।"

সুরথের মুখেও তখন বিস্ময়ের ভাব ফুটে বেরুলো। গাড়ীর লোকটি নিকটে এসে লীলাবতীকে প্রণাম ক'রে বললো, "আমি চিনতে না পেরে, অন্যায় ব'লে ফেলেছি, আমার অপরাধ মাফ করবেন।"

লীলাবতী তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—"তুমি কিছুই অন্যায় বলো নি সুতরাং কোনো অপরাধ হয় নি তোমার। বরং তোমার কাছে খাঁটি সংবাদটা জানতে পেরে আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ম্যানেজার তিনকড়ি বাবু যে আমাকে রীতিমতো ঠকিয়ে আসছেন, এতে আর আমার অনুমাত্র সন্দেহ নেই। সুরথবাবু, আপনিও জানেন না, এই দিকে আমার একটা বড় ইষ্টেট আছে। এই কমলাপুর পরগণা আমার মাতামহের সম্পত্তি। আমার পরলোকগতা মা চন্দ্রাবতী দেবীর নামে 'চন্দ্রাবতী টি ইষ্টেট' প্রতিষ্ঠিত করা হয় সাত বছর আগে। এই বাগান গড়ে তোলবার জন্য কি বছর যথেষ্ট টাকা পাঠানো হয় এখানে ম্যানেজারের নামে। এ বছরও এপর্য্যন্ত তিন হাজার টাকা পাঠানো হ'য়েছে এই ভরসায় যে সাম্‌নের বছর না হ'লেও তার পরের বছর থেকে যথেষ্ট 'চা' পাওয়া যাবে এবং চালান দেওয়া চল্‌বে কিন্তু এখন জানতে পারলাম, তিন বছর যাবতই মাল-চালান হচ্ছে! অনেক দিন থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, এখানে এসে কিছুদিন থাকবো, এখন দৈবক্রমে যখন এসেই প'ড়েছি, তখন এর একটা সুব্যবস্থা না-ক'রে যাবো না।"

গাড়ীর লোকটা তখন আহ্লাদ পেতে ব'সে কাতরভাবে বল্‌লো, "মা ঠাকরুন, কর্তাবাবু যদি জানতে পারেন, আর-

চালানির খবরটা আমি দিয়েছি আপনাকে, তা হ'লে আমার চাকরি তো থাকবেই না, চাবুকের আঘাতে পিঠের চামড়া উঠে যাবে, আর ঘর-বাড়ী ছেড়ে ছেলে পুলে নিয়ে আমার পালাতে হবে। আপনার পায়ে পড়ি, এই গরীব বাদলের নামটা কর্ত্তাবাবুকে বলবেন না।"

লীলাবতী তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই বাদল, তোমার কথা তাঁকে বলবো না, তা ছাড়া, আজই আমি তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত করবো। তুমি মাল নিয়ে তোমার কাজে চ'লে যাও, কাল সকাল বেলায় বাংলোতে এসে আমার সাথে দেখা ক'রো।"

বাদল 'যে আজ্ঞে' ব'লে পুনরায় প্রণাম করলো ও তার পর মাল সমেত গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'য়ে গেল। সে চ'লে গেলে লীলাবতী সুরথকে বললেন, "নিজের জায়গায় যখন এসেছি, এখন আর কাউকে ভয় করি না। কিন্তু সুরথ বাবু, আপনাকে আমার একান্ত দরকার। আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই পাবো জানতে পারলে, আমি অগ্রসর হ'তে পারি। আমার এখানকার ইষ্টেটের ম্যানেজারের কাজটা আপনার নিতে হবে, আজই। বলুন, রাজী আছেন।"

"ম্যানেজারের কাজ আমায় দিচ্ছেন, আমার কি সে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা আছে? অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোকের উপর এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া ভয়ানক ভুল হবে যে।"

"ভুল মোটেই হবে না, কারণ আপনি অন্যায় ও অসত্য আশ্রয় ক'রে আমায় প্রবঞ্চনা করবেন না। তারপর, কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা আসবে। যদি আপত্তির অন্য কোন কারণ থাকে......"

"না, অন্য কারণ কিছু নেই।"

"বাঁচালেন আমায়। তা হ'লে ফের চলুন সেই বাংলোতে।"

"সে কি? খাওয়া-দাওয়া কিছু হ'ল না, এখনই আবার অতোটা দূর হেঁটে যেতে পারবেন কি? ভয়ানক কষ্ট হবে যে।"

"কষ্ট হ'লেও যেতে হবে। ওরা খেতে না দেয়, যা থাকে জোর ক'রে নিয়ে খাবো। জোর করতে পারবেন তো? কোন অপরাধ হবে না, আমারই টাকায় ওদের বাবুগিরি ও কর্ত্তাগিরিটা চলছে জানবেন।"

"প্রয়োজন হ'লে জোর করতেই হবে।"

অতি অদ্ভুত ভাবে নিজ জমিদারির অন্তর্ভূক্ত মহালে উপস্থিত হ'য়েছেন জানতে পেরে লীলাবতীর ক্লান্ত দেহে নূতন বলের সঞ্চার হ'ল। কোন প্রকার অবসাদ না দেখিয়ে তিনি বাংলোর দিকে আবার হেঁটে চললেন। সুরথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন কর্ত্তাবাবু আহারে ব'সেছিলেন। দারোয়ানের বাধা না শুনে তিনি প্রথমতঃ আপিস ঘরে ও তারপর অন্দর মহলে গিয়ে খাবার-ঘরে প্রবেশ করলেন। ম্যানেজার তিনকড়ি বাবু তাঁকে দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। লীলাবতী হেসে বললেন, "দুপুর বেলায় অতিথি ফেলে আহার করলে আপনার কষ্টার্জ্জিত পুণ্য-তহবিল পাছে একেবারে শূন্য হ'য়ে যায়, এই আশঙ্কায় আমরা আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য ফিরে এসেছি।"

এই কথা ব'লেই সম্মুখস্থিত যে সব পাত্র থেকে ম্যানেজার বাবুকে পরিবেশন করা হচ্ছিল, সেগুলো তিনি নিজের কাছে টেনে এনে অবলীলাক্রমে আহার করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর ইঙ্গিতক্রমে সুরথও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলো।

এই ব্যাপারে ম্যানেজার বাবু বিস্ময়ে 'হাঁ' ক'রে আগন্তুক-দের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুলো না। পাচকঠাকুর মুখ বিকৃত ক'রে কি যেন ব'লতে উদ্যত হ'য়েছিল কিন্তু কর্ত্তাবাবুর মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কথাটা তার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত এসে সেখানেই আটকে রইলো। সৌভাগ্য ক্রমে নিস্তারিণী দেবী সেই সময় ঠাকুর ঘরে রাধানাথ জীউর সেবায় নিরতা ছিলেন, নতুবা অতিথি-সৎকারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে হ'তো।

অতিথিরা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কোনরূপে আহারের কাজটা সমাধা ক'রে ফেললো। হাত মুখ মুছতে মুছতে ম্যানেজার বাবুকে সম্বোধন ক'রে অবশেষে লীলাবতী বললেন, "আপনার এই নীরব অতিথি সৎকারের জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন কিছু কাজের কথা আলোচনার প্রয়োজন। দয়া ক'রে একটিবার আপিস ঘরে উঠে আসুন।"

"সুইচ্‌" টিপলে বৈদ্যুতিক আলো যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠে, লীলাবতীর এই বাক্যে ম্যানেজার বাবুর মুখও তেমনি ফুটে উঠলো। তিনি রাগতভাবে হাঁকলেন, "তুমি কোথাকার কে যে জোর ক'রে ঘরে ঢুকে এসে হুকুম চালাতে আরম্ভ ক'রছো? জানো তুমি কোথায় কার সামনে কথা বলছো?"

"জানি বই কি! বেশ ভালো ক'রেই জানি, এ হচ্ছে আমারই কমলাপুর ইষ্টেটের পয়সায় তৈরী বাংলো, আর আপনি আমারই বেতনভোগী কর্ম্মচারী তিনকড়ি মণ্ডল। জোর ক'রে ঘরে ঢুকে হুকুম চালাবার অধিকার আমার আছে কি না এখন বুঝে দেখুন।"

ম্যানেজার বাবুর গোল মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্ত চুপসে গেল কিন্তু পরক্ষণেই রবারের মতো আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। তিনি হো-হো, ক'রে হেসে উঠলেন ও বললেন,

"বেশ ফন্দিটি নিয়ে হাজির হ'য়েছো যা হো'ক, রাণী নয়, স্বামী নয়, একেবারে খোদ মুনিব সেজে উপস্থিত! কিন্তু তোমার জানা উচিত ছিল, সেই মুনিবটি কোন বিধবা স্ত্রীলোক নয়। তিনকড়ি মণ্ডলের কাছে এ সব জালিয়াতি চলবে না। (পাচক ঠাকুরকে সম্বোধন ক'রে বললেন) পাঁড়েজী, নদের চাঁদকো বোলাও, পুলিশমে খবর দেনে পড়ে গা।"

পাঁড়েজী বের হ'য়ে গেলে লীলাবতী বললেন,

"পুলিশে খবর দেবার ভয় দেখাচ্ছেন কাকে? আমি নিজেকে বিধবা ব'লে পরিচয় দিয়েছি ব'লে যদি আপনি মনে ক'রে থাকেন আমি মিস্ লীলাবতী রায় নই, জালিয়াতি ক'রে আপনাকে ঠকাতে এসেছি, তা হ'লে বলতে হবে আপনার বিবেচনা শক্তি একান্তই কম। আগে থেকে খবর পাঠিয়ে ও নিজ পরিচয় দিয়ে এলে যে আপনার কাজের কোন রকম গলদ কিংবা আপনার প্রকৃত স্বরূপটি আমার কাছে ধরা পড়তো না, এটুকু বোঝবার বুদ্ধিটুকুও কি আপনার ঘটে নেই?"

"এ সমস্ত বাক্‌চাতুরীতে তিনকড়ি মণ্ডল ভোলে না।"

"নিশ্চয় ভোলে না, আলবৎ ভোলে না।" বলতে বলতে কর্ত্তাবাবুর প্রতিধ্বনি নদের চাঁদ সেখানে উপস্থিত হ'ল।

"বুঝেছো নদের চাঁদ, এই ধড়িবাজ স্ত্রীলোকটির সাধ হ'য়েছে আমাদের মুনিব সাজবার কি ভয়ানক জালিয়াতি ব'ল দেখি!"

"জালিয়াতি বলতে জালিয়াতি? অতি ভীষণ, সাংঘাতিক, সর্ব্বনেশে, মারাত্মক রকমের জালিয়াতি!"

"আবার জোর ক'রে ঘরে ঢুকে জবরদস্তি ক'রে নেমন্তন্ন খাওয়া! অনধিকার প্রবেশ ও রাহাজানি! শুধু স্ত্রীলোক ব'লে এখনও পুলিশে খবর পাঠানো হয় নি, কি বলো?"

লীলাবতী তাদের কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—

"আপনাদের এই সব রহস্যালাপ শোন্‌বার আমার সময় নেই। তিনকড়ি বাবু, আপনাকে জানাচ্ছি, কমলাপুর জমিদারির বর্ত্তমান মালিক আমি লীলাবতী রায় পরলোকগত হেমন্তকুমার চৌধুরীর একমাত্র দৌহিত্রী। এই ইষ্টেটের ম্যানেজার হিসাবে আপনি যে আপনার মুনিবকে রীতিমতো প্রবঞ্চনা ক'রে আসছেন এবং তাঁর ন্যায়তঃ প্রাপ্য বিস্তর টাকা অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ ক'রেছেন, সেই অপরাধে আপনার কেন শাস্তি হবে না, তার কোনো সন্তোষজনক কারণ দর্শাতে পারেন?"

লীলাবতীর বাক্যের দৃঢ়তা দেখে তিনকড়ি বাবু তখন মনে মনে আতঙ্কিত হ'লেও বাইরে তার কোনো আভাষ না দিয়ে সগর্ব্বে বললেন,—

"যে কোনো স্ত্রীলোক এসে বললেই হ'ল না যে উনিই লীলাবতী রায়। এ সব আইনের কথা, রীতিমতো প্রমাণ চাই, কি বলো নদের চাঁদ?

বেচারা নদের চাঁদ তখন ভয়ানক সমস্যায় প'ড়ে গেল। লীলাবতীর তেজঃপূর্ণ বাক্যে তার এক একবার বিশ্বাস হচ্ছিল, ইনিই প্রকৃত মুনিব, আবার ম্যানেজার বাবুর ব্যবহার দেখে ঐ বিশ্বাসটুকু অটুট থাকতে পারছিল না। সুতরাং দু'কুল বাঁচিয়ে কথা না বললে পাছে আবার মুস্কিলে পড়তে হয়, এই ভয়ে সে বললো,—

"নদের চাঁদ আইন না পড়লেও এইটুকু বলতে পারে, ইনি যদি সত্যি এই ইষ্টেটের মালিক হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই ইনি মালিক, আলবৎ মালিক, আইনতঃ মালিক, রীতিমতো মালিক, প্রমাণশুদ্ধ মালিক, আর কর্ত্তাবাবুও এই ইষ্টেটের ম্যানেজার, আইনতঃ ম্যানেজার, রীতিমতো ম্যানেজার, প্রমাণশুদ্ধ ম্যানেজার, আলবৎ ম্যানেজার।"

মিস্ লীলাবতী গভীর বিরক্তি ও রোষ প্রকাশ ক'রে ব'ললেন, "তিনকড়ি বাবু, আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন, আমার কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রলেই আপনার সকল রকমের দুষ্কৃতির দায় থেকে আপনি রেহাই পাবেন, তা হ'লে ভয়ানক ভুল ক'রেছেন। তবুও আপনার সন্দেহ দূর করবার জন্ত বলছি, আপনার জরুরী তাগিদ পেয়ে গত এপ্রিল মাস থেকে এ পর্য্যন্ত শুধু 'চক্রাবতী টি ইষ্টেটের' জন্ত আমি তিন হাজার টাকার চেক্ পাঠিয়েছি আপনার নামে, তার দু'খানা চেক্ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের ও একখানা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উপর। এতেও যদি প্রত্যয় না হয়, তা হ'লে সুরথ বাবু এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এনে আমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে দেবেন। শুধু তা নয়, কমলাপুর ইষ্টেটের ম্যানেজারের পদ যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ, সেই পদে আপনার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার নীতি-জ্ঞান বর্জ্জিত, লম্পট-প্রকৃতি, প্রতারক লঘুচিত্ত লোককে রাখা যেতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে আপনাকে এই ইষ্টেটের কাজ থেকে বরখাস্ত করলাম। আপনি এই সুরথ বাবুর কাছে আপিসের চার্জ্জ ও হিসেব পত্র এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে বুঝিয়ে দিয়ে এই ইষ্টেটের সীমানা ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন। আপনার নিজের জিনিষ পত্র ছাড়া অন্ত কিছু সঙ্গে নিতে পারবেন না। আরো ব'লে দিচ্ছি, আপনি চ'লে যাবার পরে যদি হিসাবে কোনো গোল-মাল বেরোয়, তা হ'লে উপযুক্ত কোর্টে আপনার যথোচিত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।"

তিনকড়ি বাবুর সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেল, অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর মাথার উপর যেন বজ্রাঘাত হ'ল। লীলাবতীর উক্তির প্রতিবাদসূচক কোন কথা তাঁর মুখ থেকে আর বের হ'ল না, দম্ভপূর্ণ আস্ফালনের পরিবর্ত্তে তিনি এখন নতজানু হ'য়ে করজোড়ে লীলাবতীকে বললেন,—

"ক্ষমা করুন, আমি বুঝতে না পেরে হয় তো অনেক অন্যায় কথা ব'লে ফেলেছি। অন্যায়, অপরাধের জন্ত আমায় যেরূপ ইচ্ছা শাস্তি দিন কিন্তু দয়া ক'রে আমার চাকরিটী নেবেন না, তা হ'লে আমার দাঁড়াবার জায়গাও থাকবে না।"

"আমার আদেশ নড়চড় হয় না, হুকুম মতো চার্জ্জ ইত্যাদি অবিলম্বে বুঝিয়ে দিন। আপনার মতো অযোগ্য লোককে আর এক মুহূর্ত্তও কাজে রাখা উচিৎ নয়।"

সুযোগ পেয়ে নন্দের চাঁদ ব'লে উঠলো, "নিশ্চয়ই উচিৎ নয়।"

এমন সময় নিস্তারিণী দেবী অকস্মাৎ আসরে অবতীর্ণ হ'লেন এবং সম্মুখে লীলাবতীকে দেখে গর্জ্জন ক'রে বললেন, "সেই মাগী আবার এসে হাজির! তাড়িয়ে দিলেও যায় না এমন নির্লজ্জ স্ত্রীলোক তো কোথাও দেখি নি! তোমার জন্ত তা হ'লে দেখছি খেংড়াই চাই, সেই যে বলে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! আর পোড়ার মুখো তুমি, (তিনকড়ির একটি কান ধ'রে) এখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে কি কচ্ছো? প্রেম-নিবেদন হচ্ছে বুঝি? ঢলাঢলি ক'রবার আর জায়গা পেলে না? বুড়ো বিটকেল, বাঁদর, ওঠো, এখান……

গৃহিণীর গালির প্রস্রবণের উদ্গীরণ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনকড়ি বাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অতিশয় ব্যস্ত ভাবে ব'লে উঠলেন, "আরে সর্ব্বনাশ, করো কি, করো কি, থামো থামো কাকে কি বলছো বুঝতে পাচ্ছো না, ইনি আমাদের মুনিব যে, থামো থামো।"

গর্জ্জনের মাত্রাকে হুঙ্কারে পরিণত ক'রে গৃহিণী জবাব দিলেন, "পোড়ার মুখো, এই ঘোমটাওয়ালী মাগী হ'ল তোমার মুনিব?"

তিনকড়ি দু'হাতে গৃহিণীর মুখ চেপে রাখবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না, ফলে ফোয়ারার উদ্গীরণ আরো জঘন্য আকারে বেড়ে চললো।

সুরথ আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না, হাতের আস্তিন গুটিয়ে গৃহিণীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো, "জিভ দিয়ে আর একটি অসভ্য কথা বেরুবে তো এই এক চাপড়ে মাথা শুদ্ধ উড়িয়ে দেবো, স্ত্রীলোক ব'লে রেহাই করবো না।"

সুরথের ব্যায়াম-পুষ্ট বলীষ্ঠ দেহখানা দেখে এবং এই ব্যক্তির কথানুরূপ কাজ করতে সমর্থ তা বুঝতে পেরে গৃহিণী তৎক্ষণাৎ তাঁর কুৎসিৎ জিহ্বা সংযত করলেন। তিনকড়ি মণ্ডল তখন স্ত্রীকে সংক্ষেপে প্রকৃত অবস্থাটা জানিয়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ ভাবে বললেন,—

"শীগ্‌গির মুনিবের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও গিন্নি, তা নইলে

আমার চাকরি তো থাকবেই না, এক ঘণ্টার মধ্যে এই বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হবে।"

গৃহিণীর ভিতরের বহ্নি তখনও নিভে নাই, তাই তিনি জবাব দিলেন,—

"তোমার এই ছাই চাকরি না থাকলো তো ব'য়েই গেল! তার জন্ম পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে বলছো, তোমার ঘেন্না হয় না? কেন, কি অপরাধ ক'রেছি যে ক্ষমা চাইবো?"

তিনকড়ি একান্তই ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর এখানের রাজত্ব যে তাসের বাড়ীর মতো ফুৎকারে উড়ে যাবে, তা তাঁর কল্পনার মধ্যেই আসে নি। মুনিবের হাতে পায়ে ধ'রে কোনোরূপে চাকরিটি বজায় রাখবার যে ক্ষীণ আশা তাঁর মনের কোণে এক মুহূর্ত্ত পুর্ব্বেও উঁকি মারছিল, গৃহিণীর আচরণে তাও বিলীন হ'য়ে গেল। তবুও শেষ চেষ্টা স্বরূপ লীলাবতীর নিকট করযোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,—

"গিন্নির মস্তিষ্কের অবস্থা ভালো নয়, সে বদ্ধ পাগল, নিত্য হিমসাগর তেল ব্যবহারেও কোন উপকার পাওয়া যায় নি। এই পাগলের আবোল তাবোল কথায় কান দেবেন না। তার হ'য়ে আমিই ক্ষমা চাইছি। ম্যানেজারের পদে যদি আমায় রাখতে ইচ্ছা না করেন, যে কোন নিম্ন পদে অবশ্যি রাখতে পারেন, এই সামান্য দয়াটুকু কি আর করবেন না?"

গৃহিণী ফোঁস ক'রে আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লীলাবতী বাধা দিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন,—

"ও সব দুরাশা ত্যাগ করুন! আলমারি, সিন্দুক ইত্যাদির চাবিগুলি রেখে আপনার গুণবতী গিন্নিটিকে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে এই বাংলো ত্যাগ করুন। আমার এই এলাকার মধ্যে আপনাদের ছায়াটি পর্য্যন্ত যেন কেউ আর দেখতে না পায়।"

তিনকড়ি বাবু মরিয়া হ'য়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "গত দশ এগারো বছর যাবৎ আমি এই বাংলোতে বাস ক'রে আসছি। সত্যি আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে?"

"সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? এই মুহূর্ত্তে যেতে হবে।" পিছন থেকে নদের চাঁদ তখন ব'লে উঠলো, "মুনিবের কথা কি কখনো মিথ্যে হয়? নিশ্চয় যেতে হবে, এই মুহূর্ত্তে যেতে হবে, আলবৎ যেতে হবে।"

পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের ক'রে সেগুলো লীলাবতীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনকড়ি বললেন, "এই রইলো তোমার চাবি, তোমার বাড়ী, গাড়ী সব। আমরা চললাম এ সব ছেড়ে, কিন্তু মনে রেখো, এর ফল তোমার পক্ষে ভালো হবে না।"

আর কিছু না ব'লে তিনকড়ি ঘরের বার হ'য়ে গেলেন, নিস্তারিণী দেবীও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে পা বাড়িয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে তিনকড়ির অনুবর্ত্তিনী হ'লেন। বাংলো ত্যাগ ক'রে যাবার আগে তিনকড়িকে দিয়ে চার্জ্জ বুঝিয়ে দেবার কাগজ লিখিয়ে নিতে সুরথের ভুল হ'ল না।

[ক্রমশঃ

যুদ্ধ-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-যুদ্ধ

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধ ও ধর্ম্ম? কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সর্ব্বভূপধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরু-জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয় বিনাশ ভয়ে ভীত, পরম কৃপায় আবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুললোচন, শোকাকুলিতচিত্ত, রথোপরি উপবিষ্ট ত্যক্তধনু অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে; যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই শ্রেয়ঃ নাই।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে।

এক্ষেত্রে যুদ্ধই ধর্ম্ম। যুদ্ধ না করিলে পাপ। কারণ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। সকলের ধর্ম্ম সমান অথবা এক নহে। জাতি, বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মানুসারে যাহার যে ধর্ম্ম, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মাচরণের তুল্য হয়। এই নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদা স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। কারণ প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় ছিল রাজা এবং প্রজাপালন ছিল তাহার প্রধান কর্ম্ম। শক্তি ব্যতীত শাসন সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণ ছিলেন শিক্ষাব্রতী; জ্ঞানে গরীয়ান্। ক্ষত্রিয় ছিল বাহুবলে বলীয়ান্, শাসক ও পালক। দস্যুদমন এবং সমরাঙ্গণে পরাক্রম প্রকাশ ছিল ক্ষত্রিয়ের নিত্যব্রত। এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অন্যান্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।

প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ ছিল ক্ষত্রিয় রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাঙ্গণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, তাঁহার কলঙ্কের সীমা থাকিত না। মহাভারতের যুগে, যুদ্ধের মর্যাদা এতই অধিক ছিল যে, লোকে বিশ্বাস করিত যে, মহাব্রতের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বস্বদানের ন্যায়, গুরুকার্য্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, সমুদায় অশুভ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিত। ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম ছিল; ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রুসংহারও তদ্রূপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে, গুরু, জ্ঞাতি, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব-সংহার-শোকে-বিহ্বল পরম কারুণিক যুধিষ্ঠিরকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব সান্ত্বনা দিয়াছিলেন,—"যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং লোভ পরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণসংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীকে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ।"

মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

রক্ষাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। শক্তি ব্যতীত রক্ষা অসম্ভব। রাজার পালন শক্তি প্রজার শাসন শক্তি চতুরঙ্গিনী সেনা। শত্রুপক্ষের ভেদ, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন এবং শত্রুগণকে উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়। যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, তাহার পক্ষে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন দুরূহ ছিল। লোকজ্ঞান, প্রজাপালন, বিপদ হইতে পরিত্রাণ এবং সমরমৃত্যু ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।

পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ছিল রাজধর্ম্ম। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। রাজধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্ম প্রভাবেই সমস্ত লোক

তিপালিত হয়। মর্য্যাদাশূন্য, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত হইয়া পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং দাচার সম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসন প্রভাবেই নির্বিঘ্নে র্ম্মানুষ্ঠান ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। রাজার বনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই প্রজা নষ্ট হয়। রাজাই সকল লোকের নিয়ম-নিষ্ঠার মূল।

এখন ক্ষত্রিয় রাজা নাই। কিন্তু রাজাই ক্ষত্রিয়। কারণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম, অথবা রাজধর্ম্মই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। রাজ্য লাভ ও রাজ্য রক্ষা, রাজার ধর্ম্ম। যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য লাভ হয় না এবং দণ্ড ব্যতীত রাজ্য রক্ষা হয় না। সর্ব্বদা উদ্যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। নিয়ম ও পুরুষকার সহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়। উদ্যোগই পুরুষকার।

প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ রাজাকে কালের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা দণ্ডনীতি অনুসারে সুচারুপে রাজ্য শাসন ও পালন করিলে সত্যযুগের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাল উপস্থিত হয়। চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করিলে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ বর্জ্জন করিলে দ্বাপরযুগের আবির্ভাব হয়। দণ্ডনীতি সম্পূর্ণ পরিহার করিলে ঘোর কলি প্রাদুর্ভূত হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্ম হেতু প্রজাগণের পাপে লিপ্ত হইয়া কীর্ত্তিভ্রষ্ট হয়েন।

দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্য করা রাজ প্রধান ধর্ম্ম। মহাভারতের যুগে ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। দণ্ড প্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। দণ্ড প্রভাবে ধনসম্পত্তি রক্ষিত হয়। দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। দমন ও শাসন হেতু দণ্ডের প্রয়োজন। দণ্ডনীতিই শাসন নীতি, অর্থাৎ রাজনীতি। রাজাই দণ্ডধর।

কোষ, বল ও জয়—এই তিনটি রাজ্য পুষ্টির প্রধান কারণ। কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ বলের মূল। বল জয়ের মূল। রাজার কোষ ক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়। বলক্ষয় হইলে জয় দূরের কথা, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধন লাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যলাভার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ্ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। আধুনিক যুগে এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা সর্ব্বত্র সহজে অর্থলাভ ঘটে না, সুতরাং বিগ্রহ অপরিহার্য্য। সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। বল প্রয়োগ ব্যতীত কৌশলেও কোষ সংগ্রহ সম্ভব, কিন্তু বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না। আবার কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন রাজা রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন তিনি কলি স্বরূপ।

পুরাকালে জয়লাভ দ্বারা ধনোপার্জ্জন ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি ছিল। সুতরাং এখন রাজার বৃত্তিও তাহাই ধরিয়া লইতে হইবে। প্রজাপালন যেমন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুগণের বিনাশও তেমনি রাজার অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। শত্রু বিনাশ বিষয়ে রাজার দীনভাব অবলম্বন নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হয়েন। যে রাজা নিয়ত শত্রু পীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না। শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। বল দ্বারাই হউক, অথবা কৌশল প্রয়োগেই হউক, শত্রু নিগ্রহে যত্নবান হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কৌশলে সর্ব্বত্র কার্য্যসিদ্ধি ঘটে না, সুতরাং রাজ্যরক্ষা এবং শত্রুবিনাশ যুদ্ধ ব্যতীত অসম্ভব। প্রায়শঃ পরস্বাপহারী দস্যু সমকক্ষ ব্যক্তিরাই রাজাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করে। হের হিটলারের উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পক্ষান্তরে বলপূর্ব্বক পররাজ্য অপহরণ রাজার ধর্ম্ম। যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষা অসম্ভব। এই নিমিত্ত পুরাকালে প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগই ছিল ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। তখন যাহা ছিল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, এখন তাহা রাজা মাত্রেরই ধর্ম্ম। প্রতিপন্ন হইল যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, যুদ্ধ যে মাত্র অনিবার্য্য, তাহা নহে; যুদ্ধ ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যুদ্ধই তাঁহার স্বধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়।

যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে অধর্ম্মের স্থান নাই। যুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও, অধর্ম্মপূর্ব্বক যুদ্ধ ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মযুদ্ধই প্রশস্ত। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছিল। ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয় এবং নিরয়গামী হইতে হয়। ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস। এই হেতু, ধর্ম্মের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ, অধর্ম্ম, অত্যাচার ও অনাচার নিরাকরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধ ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিয়ম ও পুরুষকার সহকারেই তাহা অনুষ্ঠিত হইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষই কয়েকটি নিয়ম ও রীতি নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন "মারি অরি পারি যে কৌশলে" নীতিই প্রবল। নিয়ম ও নীতির ব্যতিক্রম এবং কুট কৌশলই আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার সাধারণ রীতি।

বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক দুর্ব্বল, মিত্র-বিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত অথবা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধ যাত্রা নীতি সঙ্গত। কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া অরাতি পরাজয় প্রচেষ্টাই রাজার প্রথম কর্ত্তব্য। সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সুধী সমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হয়। যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইলে ধর্ম্ম-যুদ্ধ কর্ত্তব্য। স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা সর্ব্বদা নিন্দনীয়। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি অচিরে আপনার বিনাশের ভিত্তি স্থাপন করেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার, প্রাচীন হিন্দুমতে, তপস্যা শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি আশ্রমের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে সত্য, জীবিত, নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার এবং কৌশল দ্বারাই যুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইত।

যুদ্ধে জয়লাভ দৈবায়ত্ত। জয় ও পরাজয়ের কিছুই নিশ্চিত নহে। অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মহামতি ভীষ্ম ধীমান যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সাম্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।" অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অল্পসংখ্যক বীরপুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয় পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

নরপতি যখন আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তখন অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান ব্যক্তির সহিত সন্ধিস্থাপনই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎলাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। এই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই ইংলণ্ডের ভূতপুর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নেভিল্ চেম্বারলেন জার্ম্মানীর অধিনায়ক হের হিট্‌লারের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ নীতি (Policy of Appeasement) অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু, "মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে।" সর্পাপেক্ষা খল অধিকতর ক্রুর। শান্তির চেষ্টা বিফল হইলে অবশ্য যুদ্ধ করিতে হয়।

যে রাজা, অথবা রাষ্ট্রপতি জয়লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম ও নীতি উল্লঙ্ঘন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মানুসারে জয়লাভ যে নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে; পরন্তু অধর্ম্মার্জ্জিত জয় রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রপতিকে অবসন্ন করে। অনেক সময় অধর্ম্মাচরণের ফল সদ্য সদ্য ফলে না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম-তুষের আগুনের ন্যায় অধার্ম্মিকদের সমূলে নির্ম্মূল করে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র, এমন কি প্রপৌত্রকেও উহা ভোগ করিতে হয়। যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি জাতির পক্ষেও ইহা ধ্রুব সত্য। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, রাষ্ট্রপতির পাপে জাতির অধোগতি ঘটে। ইহা সত্যবাদী ঋষি বাক্য। যে রাজা বা রাষ্ট্রপতি ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বার-স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহার ইষ্ট ঘটে; আর যে অধার্ম্মিক নায়ক বলপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম ও অর্থ, বল ও বুদ্ধি এবং মিত্র ও মন্ত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান

উপায়। তাঁহাদের সদ্ব্যবহার অভ্যুদয়ের এবং অসদ্ব্যবহার অবনতির কারণ।

আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, আত্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, দেশরক্ষা ও আশ্রিত রক্ষা হেতু যুদ্ধ ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ধর্ম্ম-যুদ্ধও অন্যায় এবং অধর্ম্ম যুদ্ধের ন্যায় বিনাশমূলক। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ পরিহারই কর্ত্তব্য। যুদ্ধ না করিয়া অতি অল্পমাত্র লাভ ও শ্রেয়। পরস্পর যুদ্ধ চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত চিত্তে স্ব স্ব রাজ্য ভোগ করাই বিধেয়। কিন্তু মানুষের লোভ দুর্জ্জয়। পুরস্কার হৃদয়ব্যাথার কারণ। পুরুষাভিমান, অথবা প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত শান্তির আশা দুরাশা। সুতরাং মানুষ যতই সভ্য ও শিক্ষিত হউক না কেন, যতদিন ষড়রিপুর প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইবে। কিন্তু সার্ব্বজনীন ভাবে, অর্থাৎ একইকালে, সকল মনুষ্যকে, ষড়রিপুর প্রভাব হইতে মুক্তি দেওয়া কখনই লীলাময় বিশ্ববিধাতার অভিপ্রেত নহে; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই তাঁহার লীলা। সুতরাং যুগে যুগে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। জগতের সর্ব্বজাতির মনীষিগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন অন্যায় ও অধর্ম্ম যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম যুদ্ধেরও প্রয়োজন হইবে না। অন্ততঃ প্রয়োজন কম হইবে। দীর্ঘস্থায়ী শান্তির তাহাই একমাত্র পথ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশংবদ জগতে চিরশান্তি অসম্ভব। কারণ, যুদ্ধাদি নিমিত্ত মাত্র। ধর্ম্মসাক্ষী কলই সংহার কর্ত্তা। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ॥

সৃষ্টি ও নাশ—নাশ ও সৃষ্টি তাঁহার লীলা। যিনি শিব, তিনিই রুদ্র; যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী।

বিবেকানন্দ

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

হে যোগী, হে চির-ব্রহ্মচারী, কর্ম্ম-ভক্তি-সাধনা-আধার,
বিবেকের আনন্দ-মুরতি, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-পারাবার!
স্মরিলেই তব পূত-গাথা, সর্ব্বজীবে তব স্নেহ দয়া,
উদ্দাম তরঙ্গ-মালা সম হৃদয়েতে ধেয়ে আসে মায়া,
দীন-নারায়ণ প্রতি!

ওই তব শান্ত আঁখিতলে জাগে সদা যে শক্তি-আধার,
আশীষের স্নিগ্ধ-ধারা সম দিও প্রভু কণামাত্র তার!
যেন তব সুমহান ব্রতে, ব্রতী হ'তে নাহি করি ভয়,
যেতে পারি তব ধ্বজা বাহি'—হাসিমুখে গাহি তব জয়,
বিচার-বিহীন মতি!

অপূর্ব্ব প্রেরণা তব দেব! জীবনেতে সত্য হোক মম,
রুগ্ন, ঘৃণ্য, অনাথ আতুরে হ'তে পারি যেন প্রিয়তম!
আশীষের স্নিগ্ধ ছায়ে তব থাকি যেন হ'য়ে ধীর স্থির,
ব্যথিতের বেদনা বারিতে মিশে যাক মোর অশ্রুনীর
জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে!

হে কুহকী, তব যাদুবলে অহি ক্রোড়ে ভেক করে খেলা,
শত্রু যত হ'য়েছে বান্ধব বিশ্ব আজি আনন্দের মেলা!
দীনসখা, হে গৈরিকধারী, হে মোদের গুরু মহারাজ,
তোমার পবিত্র-গাথা স্মরি, জয়ী যেন হ'তে পারি আজ
তোমারই স্নেহাশীষে।

মরণোন্মুখ

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ মজুমদার

এক

ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর স্যাঁৎসেঁতে মনটা নিয়ে চ'লে এসেছি পুরীর সমুদ্রতীরে। ডাক্তাররা আমার জীবনের আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন, নিজেও বড় আশা রাখি না। বেঁচে থাকবার আর স্পৃহাও নেই। তবে, যে ক'টা দিন বাঁচি, একটু নিরিবিলিতে, হৈ-চৈর বাইরে থেকেই বাঁচতে চাই। তাই চ'লে এসেছি এখানে। আসবার আগে কারু কাছ থেকে বিদায় নিতে হয় নি, কারণ আপন বলতে আমার যাঁরা ছিলেন বা আছেন তাঁদের সন্ধান আমি জানি না। ম'রবার আগেও কারু কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে না; ম'রে গেলে কেউ দু'ফোটা চোখের জলও ফেলবে কিনা কে জানে! এ সংসারে বন্ধনের মধ্যে আছে আমার কতগুলো টাকা। অনেক টাকাই ছিল, পরের দেওয়া টাকা নয়, নিজের রক্ত ঢেলে রোজগার করা টাকা। তাও প্রায় সব শেষ ক'রে এনেছি। বাকী যা আছে, মরবার আগেই হয় ত' শেষ হ'য়ে যাবে। কাজেই অর্থের মায়াও আর থাকবে না। যে বিরাট ব্যবসা থেকে আমার এত টাকার উৎপত্তি, সে ব্যবসাও দিয়েছি তুলে। কাজেই এখন আমি মুক্ত।

বাড়ী ভাড়া নিয়েছি সমুদ্রের খুব কাছেই। জানালার ধারে ব'সে সমুদ্রটা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে ওর কত রূপই দেখছি! অন্ধকার রাতে, জ্যোৎস্না রাতে, সূর্য্য যখন উঠে, সূর্য্য যখন ডুবে যায়, দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদের মাঝে, এক এক সময় এক এক রূপ! এত দেখছি তবু কিন্তু তৃপ্তি নেই।

বাড়ীওয়ালা মেদিনীপুরের লোক। লোকটি মন্দ নয়; কথাবার্ত্তায় বেশ কায়দাদুরস্ত; ভাড়াটের সুবিধা সুযোগের দিকে নজরও তীক্ষ্ণ। ঘর গোছানো থেকে সুরু ক'রে বাজার করা, রান্না করা, আরো যত রকমের কাজ আছে সব ক'রে দেওয়ার জন্য দশটাকাতে একটি মেয়েকে বাড়ীওয়ালাই ঠিক করে দিয়েছে। মেয়েটির নাম প্রভা, মিশমিশে কালো রং, কিন্তু খুব ফিটফাট চলে, আর খুব গম্ভীর। বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে। বিয়ে হয় নি।

আমাদের বাড়ীর রকে ব'সে যে বৃদ্ধ নগরবাসী পান বিক্রী করে, তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রভার এখনও বিয়ে হয় নি কেন। নগরবাসী হেসে ব'লল, "কে ওকে বিয়ে করবে বাবু! মেথর না মুচি কোন্ জাতের মেয়ে কে জানে! আর ঐ তো রং।"

নগরবাসীর কথা শুনে প্রভার হাতের রান্না খেতে প্রথম প্রথম কেমন ঘিন্-ঘিন্ করেছিল। কিন্তু তার পর মনে হ'ল, এ কুসংস্কারের কোন মানে হয় না। আমি অসামাজিক জীব, তাতে আবার মৃত্যুপথযাত্রী। আমার অত বাচ্-বিচার কেন!

প্রভা রোজ সকালে এসে মুখ হাত ধোয়ার জল তুলে আনে, টুথব্রাস এগিয়ে দেয়, তোয়ালে হাতে ক'রে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ধুয়ে আমি ইজিচেয়ারে যেয়ে বসি; প্রভা চা তৈরী ক'রে আনে। ডাক্তাররা চা খেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু চা না খেয়ে আমি পারি না। ম'রে ত' যাবই, চা না খেলে বাঁচব, এমন কথা ত' কোন ডাক্তারই বলতে সাহস করেনি! তবে আর শুধু শুধু ও' জিনিষটা থেকে বঞ্চিত থেকে লাভ কি!

আমার চা খাওয়া হ'য়ে গেলে প্রভা তার গৃহস্থালিতে মন দেয়। আর মাঝে মাঝে এসে আমার খোঁজ নিয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে, কখন কি প্রয়োজন।

প্রভার সেবা যত্নে দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

অসহায় অবস্থায় মেয়েদের সেবা-যত্নের প্রয়োজন যে কত বেশী সেটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। এখন মনে হয়, বাবার নির্দ্দেশ মত বিয়ে করাই আমার উচিত ছিল। যে মেয়েকে বিয়ে ক'রতাম সে হয় ত' আমাকে ভালবাসতে বাধ্য হ'ত। আর, ভাল না বাসলেও আমার জীবনটাকে হয় ত' অনেকটা মধুর ক'রে তুলতে পারত। জীবনটা এমনি ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠত না। খেয়ালের বশে একটা ভুল করে

সারা জীবন কী অশান্তির মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলাম। দশটি বছর ভেসে বেড়ালাম এঘাট থেকে সেঘাটে। কোথায় বা করাচী, কোথায় সে ভ্লাডিভোষ্টক, কোথায় বা ফিজিদ্বীপ আর কোথায় সে সাউথ আফ্রিকা! কত বিচিত্র জাতি, কত অদ্ভুত চরিত্র, কী বিরাট অভিজ্ঞতা! কত ভয়-ভীতি, কত আশা!...কিন্তু, লাভ হ'ল কি? অমানুষিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য করেছি নষ্ট, চিরসাথী করেছি থাইসিস্‌কে। অথচ, পাওয়ার মত কিছুই পেলাম না।

জীবনযুদ্ধে পরাজিত যারা, আজ আমি তাদেরই একজন। এ সংসারে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। জীবনের সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি; আজ আমি রিক্ত। ভাবছি, জীবনের এতবড় একটা অধ্যায় যে পিছনে ফেলে এসেছি, তার এই দীর্ঘ দিনের সঞ্চয় কোথায়। জীবনের যা' কিছু শাশ্বত সম্পদ তা' আমার জীবনে কোন দিনই বর্ত্তায় নি। বাইরের কতগুলো হেঁয়ালিতে ভরা বাজে হৈ-চৈ নিয়ে জীবনের এত বড় একটা অংশকে ব্যর্থতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছি। অর্থ উপার্জ্জন করেছি যথেষ্ট, মান-সম্মান পেয়েছি অফুরন্ত। কিন্তু ওগুলোই কি জীবনের আসল প্রাপ্য। যে ধূসরতা আজ জীবনের উপর আস্তে আস্তে নেমে আসছে, ইহাই কি নিষ্ফল জীবনের শেষ পরিণতি। যে স্বাস্থ্য, যে কর্ম্মশক্তি, যে বিরাট উৎসাহের জোরে একদিন পিতামাতার বুক ভেঙ্গে দিয়ে কক্ষ হারা গ্রহের মত ঘর ছেড়ে ছুটে চলে এসেছিলাম, তাও তো ব্যর্থতার আবেষ্টনে কালের গহিনতায় বিলীন হ'য়ে গেল! আজ আমি রিক্ত—ছন্নছাড়া—শান্তি-হারা।

"বাবু।"

আমি চম্‌কে উঠলাম। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বললাম—"কি প্রভা?"

"চান করুন না! রান্না ত' হ'য়ে গেছে। আমি জল তুলে এসেছি, কাপড় গামছা ঠিক করে রেখেছি। এই নিন্, তেল মাথায় দিয়ে চট্ ক'রে উঠে পড়ুন।"

ব'লতে ব'লতে তাকের উপর থেকে তেলের শিশিটা নামিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল।

রোজই প্রায় একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি।...ইজিচেয়ারে ব'সে ব'সে ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবতে যেয়ে যখনই চোখের কোণে অশ্রু নেমে আসে, তখনই প্রভা এসে হাজির হয়, নানা রকম কাজের কথা ব'লে মনটাকে আমার হালকা ক'রে তোলে।

দুই

পুরী এসেছি আজ তিন মাস।

কিন্তু এই তিন মাসের মধ্যেও বাড়ীওয়ালা, নগরবাসী আর প্রভা ছাড়া অন্য কারু সঙ্গেই আমার পরিচয় হ'ল না। পরিচয় ক'রতে আমি চাইও না। মানুষের গড্ডালিকা প্রবাহের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতেই আমি চেষ্টা করি। কি হবে লোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রে!

সবাই যখন হাওয়া খেতে বেরোয়, আমি থাকি তখন ঘরে ব'সে। আর যখন রাস্তা ঘাটে কেউ থাকে না তখনই হয় আমার বেড়াবার সময়।

সমুদ্রের পাড়ে রোজই অনেকক্ষণ ধ'রে বেড়াই; কিন্তু সে ভোর হওয়ার অনেক আগে। এ সময়টাতে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে। স্তব্ধ পারি-পার্শ্বিকতার মাঝে সমুদ্রের শান্ত—সমাহিত রূপ, পাতলা হ'য়ে আসা অন্ধকারের মধ্য থেকে ফুটে উঠা বালুকারাশির সুদূর-বিস্তৃত ধূসর রেখা, দূরে স্বপ্ন-জড়ানো লোকালয়ের অপরিস্ফুট দৃশ্য,—এসব দেখতে দেখতে মনটা কেমন যেন উদাস হ'য়ে উঠে। নির্জ্জনতার মাঝে মনের এ উদাসীনতাকে ভালরূপ উপভোগ ক'রে নেই। বেশ লাগে! বেশ লাগে এই ভোরের আকাশ, ভোরের সমুদ্র, ভোরের বালুতট, আর এই উদাস করা ধূসর—নরম—হাল্‌কা আবিলতাহীন আবহাওয়া। একটু পরেই ত' ঝাঁকে ঝাঁকে পুরুষ মেয়ে সমুদ্রতীরে ভীড় জমাবে, হট্টগোল আর গণ্ডগোলে সমুদ্রের ধ্যান ভেঙ্গে ফেলবে, আবহাওয়া বিষাক্ত ক'রে তুলবে। ভীড়ের মধ্যে বেড়াতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে। আমি এখানে আসার পর থেকে বাড়ীটা খালি পড়েছিল; সেটা আমার পক্ষেও ভাল ছিল। ওটা ছাড়া কাছাকাছি আর কোন বাড়ী না থাকাতে সব সময় গোলমালের আবর্জ্জনা বাঁচিয়ে চ'লতে পেরেছিলাম।

নগরবাসী খবর দিয়ে গেল, ক'লকাতার কোন এক

ব্যারিষ্টার এসেছেন ও-বাড়ীতে সঙ্গে আছে গিন্নী, ছেলে-পুলে আর বড় ছেলের বউ।

—"ছেলেটি বড় ভাল, বাবু।" নগরবাসী ব'লল।

আমি বললাম—"কি করে বুঝলে?"

"সে আমরা লোক দেখেই বলতে পারি। আর আজ সকাল বেলা ত' আমার সঙ্গে আলাপই হ'ল। কি নরম কথাবার্ত্তা! অত বড় লোকের ছেলে, এতটুকু দেমাক নেই। আপনার সঙ্গে একদিন পরিচয় করিয়ে দেব, তখন দেখবেন, নগরার কথা সত্যি কি না?"

আমি হেসে বললাম—"বেশ, তাই দিও"

ওদের সঙ্গে আলাপ কিন্তু আমার হ'ল না। নিজেরও কোন আগ্রহ ছিল না, ওরাও আমার সঙ্গে পরিচয় করা প্রয়োজন মনে করে নি। নগরবাসীরও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উৎসাহটা দেখলাম, নিবে গেছে। পরে নগরবাসীর দু'একটা টুকরা টাকরা কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অসুখের কথা শুনেই ব্যারিষ্টার পরিবার আমার সঙ্গে মাখামাখি করতে রাজি হন নি। যাক্‌গে—ভালই হ'ল।

আলাপ না হ'লেও ওদের সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথাই নগরবাসীর মারফতে জানা হ'য়ে গেছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের বড় ছেলে বিমল কলকাতায় এম-এ পড়ে, সঙ্গে ল'-ও আছে। ব্যারিষ্টারি পড়বারই নাকি প্ল্যান ছিল কিন্তু যুদ্ধের দরুণ সে প্ল্যানটাকে চাপা দিতে হ'য়েছে। এখন অগত্যা, ল' পাস ক'রে এ্যাড্‌ভোকেট হওয়াই ইচ্ছা।

তিন

শরীরটা যে দিন দিন খারাপের দিকেই চ'লেছে তা' খুব ভালভাবেই টের পাচ্ছি। তেল কমে এসেছে, প্রদীপ নিভ্‌তে আর বেশী দেরী নেই। ভাবছি, আমার নামে ব্যাঙ্কে এখনও যা টাকা আছে, সেটাকাটা প্রভাকেই দিয়ে যাব; যমের দুয়ার পর্য্যন্ত ও-ই তো আমার কাছে থাকবে।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বিছানার উপর এসে বসেছি; প্রভা একখিলি পান এনে আমার হাতে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, আমি ডাকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

বললাম, "প্রভা, আমি ত' শীগ্‌গীরই হয় ত' ম'রে যাব,—"

আর কিছু বলবার আগেই প্রভা ধমক দিয়ে উঠল, "ওসব অলক্ষুণে কথা বললে আমি এক্ষুনি চ'লে যাব, আর আসব না।"

ব'লতে ব'লতে ওর চোখ দু'টো ছল ছল ক'রে উঠল। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। টাকার কথা ব'লব ভেবে-ছিলাম, তা' আর বলা হ'ল না। দুর্ব্বল দেহটাকে বিছানার উপর এলিয়ে দিলাম। প্রভা চ'লে গেল।

জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ পাশের বাড়ীর জানালাতে নজর প'ড়ে গেলে, দেখলাম, একটি বউ একদৃষ্টিতে আমারই ঘরের দিকে চেয়ে আছে। কৌতুহলময় সে চাহনি। বুঝতে আমার দেরী হ'ল না, ওটি বিমলের বউ। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে পাশ ফিরলাম। ভাবতে আমার অবাক লাগে, দুজনের চেহারাতে এমন মিল কি ক'রে থাকতে পারে। মনে হয় যেন ঠিক হেনা।···যে পুরনো স্মৃতিটাকে মেরে ফেলতে চাই সেটা আবার নাড়া দিয়ে উঠছে। বিশ বছর আগেকার একটা ছবি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠছে।

সবে মাত্র তখন যৌবন এসে দেহ মনে ধাক্কা দিয়েছে; দৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে রঙ্গীণ। বয়স আমার তখন একুশ কি বাইশ; ক'লকাতায় থেকে বি-এ পড়ছি। আমাদেরই সাথে পড়ত একটি মেয়ে, নাম ছিল তার হেনা। তারও চেহারা ছিল ঠিক এই রকমের। হেনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে নানা রকম কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে, সে আমাকে ভালবাসে। সত্যকথা ব'লতে কি, আমিও বাস্তবিকই তাকে ভালবেসেছিলাম। তার সে চাহনি, তার কণ্ঠ, তার চলন ভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অনন্ত বারিধির নীলস্বপন ছিল তার চোখে,—সৌম্য, প্রশান্ত আনন। মেয়েদের বন্ধনহীন হাস্য কোলাহলে সে যোগ দিত না;—সে ছিল এক রহস্যময়ী উদাসিনী মূর্ত্তি। অন্তরের ইচ্ছা চেপে রাখতে না পেরে একদিন তাকে ব'ললাম, "চল হেনা, আমরা দু'জনে একসঙ্গে একটা নীড় বেঁধে ফেলি।" হেনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বিয়ের কথা বলছ? সে অসম্ভব। ভুলে যেও না, তুমি অর্থহীন। এতবড় দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার সময় এখনও তোমার হয় নি।" হেনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হ'লাম; এতদিন কি ভুলের পিছনেই ঘুরেছি!

যে মুহূর্ত্তে শুনলাম, আমি অর্থহীন ব'লে আমার কোন দাম নেই, সেই মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, অর্থ আমাকে উপার্জ্জন ক'রতেই হবে। প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি, অজস্র টাকা রোজগার করেছি জীবনে। হেনা কিন্তু তার দেমাক বজায় রা'খতে পারে নি; শেষ পর্য্যন্ত তার বিয়ে হয়েছে এক গরীবের ঘরে।...থাকগে, ওসব পুরানো স্মৃতির জের টেনে লাভ নেই।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি বেলা আর নেই। দিনের আলো ফিকে হ'য়ে এসেছে। প্রভা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ হয় ত' সে আমার জাগবার অপেক্ষাই করছিল। আমি চোখ মেলে চাইতেই সে কাছে এগিয়ে এল, আমার কপালের উপর একখানা হাত রেখে ধীরে ধীরে ব'লল, "আজকে কি শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে, বাবু?" আস্তে আস্তে ব'ললাম "হ্যাঁ, প্রভা।"

পরম শান্তিতে আমার চোখ দুটো বুজে এল।

প্রভা অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, "শরীরের আর দোষ কি? সারাদিন ব'সে ব'সে কি সব বাজে চিন্তা ক'রবেন শরীর খারাপ হবে না?"

—"চিন্তা না করে যে থাকতে পারি না, কি ক'রব?"

—"আচ্ছা, সব সময় আপনি কি ভাবেন, বলুন ত'।"

মহা মুস্কিলে পড়লাম। কি বলি ওকে। কিসের চিন্তা যে সারাক্ষণ করি, সে আমি নিজেই ত' ঠিক বুঝে উঠতে পারি না; ওকে বুঝাই কি করে? খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কথার মোড় ফিরিয়ে ব'ললাম, "আচ্ছা প্রভা, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত তুমি আমার কাছে থাকবে ত'?" কপালের ওপর থেকে ওর হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের উপর রাখলাম।

প্রভা হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। "দাঁড়ান আপনার জন্য চা ক'রে আনছি" বলেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন, বেলা আটটা বেজে গেল, তবুও প্রভার দেখা নেই। ভাবলাম সে হয় ত' আমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে নগরবাসীকে পাঠিয়ে দিলাম প্রভার খবর আনতে। নগরবাসী খবর নিয়ে এল, প্রভা অসুস্থ, আজ আর আসবে না।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে নগরবাসী বলল, "যদি আপত্তি না থাকে, আমিই আপনার রান্নাবান্না ক'রে দিচ্ছি।"

কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভ'রে গেল। কিন্তু এই বৃদ্ধকে কষ্ট দিতে মন সায় দিল না।

বললাম, "না, নগর। আজ আমার শরীরটা খুব খারাপ, আজ আর কিছু খাব না।"

নগরবাসী তার নিজের কাজে চ'লে গেল, আর আমি প'ড়ে রইলাম একলা ঘরে।

আজ কিছুই ভাল লাগছে না; সময় কাটতে চায় না। একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকি, একবার ইজি চেয়ারে যেয়ে বসি, আবার বিছানার উপর এসে শুয়ে পড়ি। এইভাবে সময় কাটানো যখন অসহ্য হ'য়ে উঠল, তখন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম নিজের জীবনকাহিনী লিখতে। কেউ পড়বে এ আশায় নয়, লিখে কিছু সময় কাটানো যাবে এ' আশায়।

চার

লিখতে সুরু করলাম—

গরীবের ছেলে হ'লেও শৈশব আমার কেটেছে আরামে, নির্ঝঞ্ঝাটে, বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যদিয়ে। বাবার একমাত্র সন্তান ব'লে তিনি আমার স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতেন। অনেক আশা করেছিলেন তিনি আমাকে দিয়ে। কিন্তু সে আশার মূলে কুঠার আঘাত করেছি আমি।

বি-এ পাশ ক'রে যখন এম-এ পড়ি, তখন একদিন বাবা চিঠি লিখলেন—'তোমার বিয়ে ঠিক করেছি, আগামী মাসের তিন তারিখ। পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ী চ'লে আসবে।' বাবার চিঠি পেয়ে চিন্তা ক'রে দেখলাম, এ অবস্থায় বিয়ে করা আমার শোভা পায় না। এখন আমার বিয়ে করার অর্থ হবে বাবার ঘাড়ের দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া। এসব ভেবে বাবাকে লিখলাম—"এখন বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" বাবা আমাকে ভুল বুঝলেন। ফেরৎ ডাকে তিনি লিখলেন, "তোমার মত ছেলে আমি চাই না।"

এর পর বাড়ী থেকে টাকা আসা যখন বন্ধ হ'য়ে গেল তখন 'শ্রীদুর্গা' বলে বেরিয়ে প'ড়লাম জীবনের গতি ঠিক ক'রে নিতে। কিছুদিন নানা জায়গায় ঘুরে আস্তানা নিলা এসে আহমেদাবাদের এক কুলি বস্তিতে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তিনটি বছর ওখানে থেকে দেখেছি এবং তা

ভাবে উপলব্ধি ক'রেছি, মানুষ কি ক'রে পশুর স্তরে নেমে আসে, দারিদ্র মানুষকে কত হীন আর কত দুর্ব্বল ক'রে দিতে পারে। আমিও প্রায় ওদেরই মত হ'য়ে গিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে কেবল শিক্ষা ও সংস্কারের অঙ্কুশ আমাকে জাগিয়ে দিত। আজ ব'লতে লজ্জা নেই, ওদের সঙ্গে তাড়ি খেয়ে মাতলামো পর্য্যন্ত করেছি।

ঐ নোংরা জীবনযাত্রা থেকে আমাকে টেনে বের করেছিল এক কর্ণাটি যুবক, আমার দুঃখের দিনের বন্ধু। কাপড়ের কলে কাজ ক'রত সে। সে আমাকে জানিয়েছিল, আমার জীবনের নাকি দাম আছে। তারই পরামর্শ এবং অর্থসাহায্যে ছোটখাট রকমের একটা ব্যবসা সুরু করলাম। তারপর দু'বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে কি ক'রে যে মস্তবড় একজন ব্যবসায়ী হ'য়ে উঠলাল সে কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। আস্তে আস্তে ভারত ছেড়ে বিদেশেও আমার ব্যবসার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে প'ড়ল। আরো টাকা চাই ব'লে ভেসে পড়লাম সাগর জলে।

আমার প্রথম জীবনের সুখের দিনে যে সব বন্ধু জুটেছিল, দুঃখের দিনে তারা সব কোথায় হারিয়ে গেল আর খুঁজে পেলাম না। আবার সেই দুঃখের দিনে পেয়েছিলাম এই কর্ণাটি বন্ধুটিকে। পরে যখন আবার সুখের মুখ দেখলাম, আর্থিক জীবনে যখন প্রতিষ্ঠিত হইলাম, তখন কিন্তু সে ছিল না। ভেবেছিলাম, জীবন সংগ্রামে যদি কোনদিন জয়ী হ'তে পারি তবে বন্ধুকে সাহায্য ক'রব, তাকেও জয়ের পথে নিয়ে যাব। কিন্তু কিছুই হ'ল না। একদিন শুনলাম, বন্ধু আত্মহত্যা করেছে, কারণ অজ্ঞাত।

বন্ধু আত্মহত্যা ক'রল, বাবা-মাও সংসারের আবর্ত্তে কোথায় তলিয়ে গেলেন। বাড়ী ছেড়ে যাবার সাত বছর পর করাচী থেকে বাবার নামে ইনসিওর ক'রে হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি হয়। সে টাকা ফেরৎ এল, সঙ্গে এল এক চিঠি গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টারের কাছ থেকে। তিনি লিখলেন, আমারই শোকে বাবা-মা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে সংসারের মায়া কাটিয়ে কোথায় কোন্ তীর্থে চ'লে গেছেন। তাঁদের খোঁজে অনেক তীর্থ ঘুরেছি; ছোট বড় কোন তীর্থ বাদ দেই নি। কিন্তু এ জীবনে তাঁদের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।

এপর্য্যন্ত লিখে আর লিখা হ'ল না। চোখ ঝাপসা হ'য়ে এল, বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল।

লেখা বন্ধ ক'রে এসে ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছি, এমন সময় প্রভা এসে হাজির। চুলগুলো তার উস্‌খো-খুস্‌ক, মুখখানা একদিনেই অনেক শুকিয়ে গেছে। দেখলে খুব দুর্ব্বল ব'লে মনে হয়।

ব'ললাম, "একি প্রভা! অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি আবার এলে কেন?"

প্রভা মিনিট দুই আমার দিকে চেয়ে থেকে ব'ললে, "আমার ও সামান্য অসুখ, সেরে গেছে। কিন্তু জানি, আমি না এলে আজ আপনার উপোষেই কাটবে।"

"সে কি! অসুস্থ শরীরে তুমি এখন রান্না বান্না ক'রবে নাকি?"

"রান্না বান্না আজ আর ক'রব না। খানকয়েক লুচি আর একটু হালুয়া ক'রে দিচ্ছি।"

কেন জানি না, প্রভার কথায় আমি প্রতিবাদ ক'রতে পারলাম না।

পাঁচ

সমুদ্রের পাড়ে বেড়ানো আজকাল ছেড়ে দিয়েছি, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। শরীর এত দুর্ব্বল যে দু'মিনিট পায়চারি ক'রলেই হাঁপিয়ে পড়ি। অধিকাংশ সময় শুয়েই কাটাতে হয়। কিন্তু দু'চোখে একটুও ঘুম নেই। কাল সারারাত বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে জেগে কাটিয়েছি। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারের রূপ দেখেছি প্রাণ ভরে।

অন্ধকার আকাশের এককোণে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলছিল চির উজ্জ্বল শুকতারা।

পাশের বাড়ীর একটা ঘরে সারারাত একটা নীল আলো জ্বলেছে। ওটা হয় ত' বিমলের ঘর।

কাল সমস্ত দিন উপোস ক'রে কেটেছে, একটু জলও মুখে পড়ে নি। প্রভা কাল আসে নি। নিজে যেয়ে খোঁজ ক'রবার সামর্থ্য নেই, নগরবাসীরও দু'দিন ধ'রে পাত্তা

পাওয়া যাচ্ছে না। এ'রা দু'জনেই এক সঙ্গে গা' ঢাকা দিল কেন?—ব'সে ব'সে তাই ভাবছিলাম।

তখন রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। শুকতারার আব ছা আলোক তখনও আকাশের কোলে একেবারে মিলিয়ে যায় নি।…নীচে বাড়ীওয়ালার চীৎকার শুনে চ'মকে উঠলাম। চীৎকার ক'রে আমাকেই ডাকছিল। নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম অতি কষ্টে।

আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠল, "কাণ্ডটা দেখেছেন বাবু?"

কাণ্ডটা যে কি কিছু বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার?"

—"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। নগরবাসী প্রভাটাকে নিয়ে কোথায় উধাও হ'য়েছে। এই দেখুন, নগরবাসী আবার আমার কাছে চিঠি লিখে রেখে গেছে। রাত্রে এক ছোকড়া চিঠিটা দিয়ে গেল।"

কাগজের টুকরাটা হাতে নিয়ে দেখলাম আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে—"প্রভার জন্য চিন্তা করিবেন না। সে আমার সঙ্গে যাইতেছে। আমরা এই দেশে আর ফিরিব না। ইতি, নগরবাসী।"

বাড়ীওয়ালাকে বললাম, "চিন্তা ক'রে আর কি হবে।"

নিজের মনে মনে বললাম—এ-সংসারে সবই দেখছি সম্ভব।

বেলা দুপুর হ'য়ে এল। সুনীল আকাশ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। নীল সাগরের জলোচ্ছ্বাসে নিরুদ্দেশ যাত্রার ছন্দময় ধ্বনি।

দূরে বিরাট প্রান্তরের একদিকে মাথাভাঙা একটা তাল গাছ নিতান্ত সঙ্গীহীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার পরম মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে আসবে হয় ত'। তারই অপেক্ষায় তৈরী হ'য়ে আছি।

বাবা-মা-হেনা-কর্ণাটিবন্ধু-প্রভা-নগরবাসী-ব্যবসা-বাণিজ্য-সব ছায়াবাজি ব'লে মনে হয়।

মৃত্যুর দুয়ারে এসে আজ মায়া লাগে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে। আজ অনেকদিন পর মনে পড়ে দেশের কথা। দেশের পুকুর, পথ, ঘাট, মাঠ, গাছ-পালা, লতা-পাতা, সবাই মিলে আমাকে হাতছানি দেয়। তারা ডাকে,—ওরে ফিরে আয়: সর্ব্ব-হারা, দেশ-ছাড়া অভাগা। ফিরে আয় তোর চির পুরাতন আবেষ্টনীতে। এতকাল ত' শান্তির আশায় কত দেশে, কত ভাবে দিন কাটালি, কিন্তু কই শান্তি ত' মিল্‌ল না। এবার তুই ফিরে আয়—ফিরে আয়।

চোখে আমার অশ্রুর বন্যা নেমে আসে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে ব'লে উঠে,—হায়রে, ফিরে যাওয়ার সময় ত' নেই।

শরৎ-সাহিত্যের ধারা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

যে প্রেমের বন্যায় একদিন বৃন্দাবন ভাসিয়া গিয়াছিল, যে প্রেমের সাগরে নদীয়া ডগমগ হইয়া সারা বাঙ্গালাকে সেই স্রোতের মুখে টানিয়া আনিয়াছিল, সেই প্রেমের স্পর্শে মানুষ যে ক্ষুদ্র নদীটির মত ধীরে ধীরে আসিয়া মহাসমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেই প্রেমই যে সব—এই কথাটাই শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্পে, তাঁহার উপন্যাসে রূপ দিয়া গিয়াছেন। তাই শিক্ষিতা বন্দনার সকল সংস্কার, সকল অভ্যাস ছাপাইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে বধূরূপে আসিবার সাধনাই বড় হইয়া উঠিল।

শরৎ-সাহিত্যে নারীর আর এক রূপ—তার স্নেহময়ী মূর্ত্তি। ইহার কাছে তাহার মা, তাহার স্বামী পর্য্যন্ত দূরে সরিয়া যায়—এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই দেখি, চঞ্চল প্রকৃতি সরল গ্রাম্য বালক রামের জন্য নারায়ণীর দরদ উপছাইয়া পড়িতেছে। দিগম্বরীর আগমনে রামের সঙ্গে তাহার কলহ যখন লাগিয়াই রহিল, নারায়ণী যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তখন সেই এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিজড়িত মায়ের প্রতি বলিতে বাধ্য হইলেন, মা সত্যিই তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এতবড় ছেলে যেন আধখানা হয়ে গেছে। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ী যেয়ো। তোমার খরচ পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

তবু মাতৃহীন দেবরটিকে ছাড়িতে পারিলেন না।

মেজদিদি হেমাঙ্গিনীও আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বামীগৃহের সকল বন্ধন, সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অসহায় কেষ্টকে সঙ্গে করিয়া পিতৃগৃহে যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন।

শত বাধা সত্ত্বেও এই প্রেমময়ী নারীই যে আবার মানুষের সহজ অধিকার কানায় কানায় ফিরাইয়া লইতে পারে, তার সে অগ্নিশিখা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে এক অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ধর্ম্মের জন্য বিধবার প্রতি কঠোর সংযমের নিয়ম যে কত নিষ্ফল, সে পরিচয় দিতে গিয়া কমল বলে, আত্মনিগ্রহের উগ্রদণ্ডে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে।

প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, বিদ্রোহিনী একে একে সবই শরৎচন্দ্রের তুলির স্পর্শে জলন্ত মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কোথাও তিনি অতিরঞ্জিত করেন নাই। অনেকে তাঁহার প্রতি বক্রোক্তি করিয়া বলেন, নারী মা এই শরৎচন্দ্রের চোখে অপরূপ সৃষ্টি হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু একথা মানিয়া লওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের কাছে শুধু মেজদিদির পরিচয় পাই না, শুধু নারায়ণীকেই একান্ত করিয়া দেখি না তাহার মধ্যে দুর্গামণির কাছে স্বর্ণও দাঁড়াইয়া আছে অতি
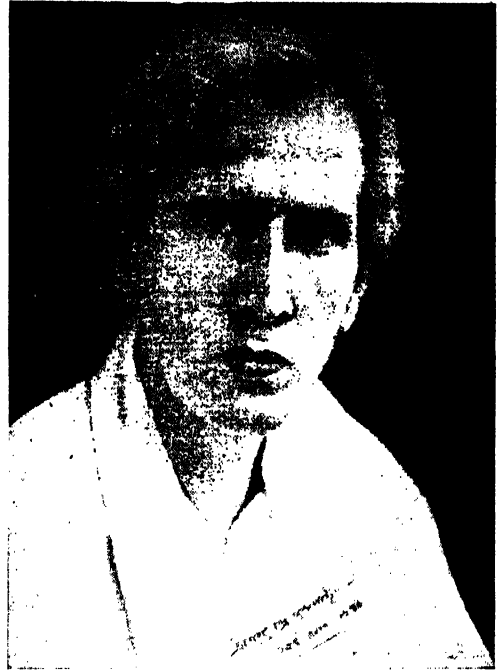
শরৎচন্দ্র

ঘনিষ্ট হইয়া। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর সমান্তরাল করিয়া আছে কাদম্বিনী। আবার আছে অন্নদাদিদি, আছে চন্দ্রমুখী।

চট করিয়া মানুষ সমালোচনা করিয়া বসে, লেখকের ভুল ধরাইয়া দেয়। শরৎশিল্পের যাহারা একান্ত অনুরাগী তাহারাও মাঝে মাঝে এরূপ করিয়া থাকেন। এমন অনেক অনুরাগী আছেন যাহারা গৃহদাহের সমালোচনা করিতে বসিয়া বলেন, কেদারবাবুর চরিত্র ঠিক হয় নাই। কেদারবাবুকে প্রথমেই

অর্থপিশাচ দেখাইয়া পরে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, ঘন ঘন জামার হাতায় চোখ মোছা নিতান্তই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। দেবদাস পড়িয়া বলেন, চন্দ্রমুখী একটা বারবণিতা, তাহার চরিত্র কখনও ওরূপ সুন্দর হইতেই পারে না। এইরূপ আরও কতশত অসংযত প্রলাপ। কিন্তু তাহারা একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, মানুষের চরিত্রে যে কোন মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মানুষের অন্তর অনন্ত, ইহার কার্য্যও অসংখ্য এবং অদ্ভুত। কিন্তু এই সত্যটাই মানুষ তখন অতি সহজেই বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। তাই শরৎচন্দ্র একথা স্মরণ করাইয়া বলিয়া গেলেন। মানুষ অন্তর জিনিষটাকে চিনিয়া লইয়া তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না,—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না, আবার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধে দেখি তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাঁহারা কাব্যে মানুষটিকে চিনিয়া লয়, জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনমতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না, এমনি কত কথা! লোকে বাহবা দিয়া বলে—"বাঃ রে বাঃ। এই ত ক্রিটিসিজম্। একেই ত বলে চরিত্র সমালোচনা। সত্যই ত'! অমুক সমালোচক বর্ত্তমান থাকিতেই ছাই-পাশ যা তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুলভ্রান্তি তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে।" তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া এই সব পড়িয়া আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়াকপাল! মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অখণ্ড, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা। দম্ভ প্রকাশের বেলায় কি তাহার কাণাকড়ির মূল্য নাই। তোমার কোটি কোটি জন্মের কত অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অন্তরে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, একথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না, এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন?

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা শোনা যায়, তিনি নাস্তিক ছিলেন। তিনি নাস্তিক কি আস্তিক সে কথা একমাত্র তিনিই হয় ত বলিতে পারিতেন। কিন্তু যাহারা তাঁহার সাহিত্যের সাথে পরিচিত হইয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাহারা একটা কথা ভুলিয়া যান, সাহিত্যই সাহিত্যিকের নিজের সবটুকু পরিচয় নয়। কিন্তু ইহা ধরিয়া লইলেও তাহাদের মত মানিয়া লওয়া যায় না। একথা বলিলে হয় ত সত্যের অপলাপ হইবে না, যিনি নাস্তিক, তিনি আচারে-ব্যবহারে, কথায় লেখায় সব দিক দিয়া তাঁহার নাস্তিকত্বের উপর জোর দিয়া থাকেন। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে শরৎ-সাহিত্যে তাঁহার আস্তিকত্বেরই বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শরৎচন্দ্র কিছুমাত্র সতর্ক না হইয়া ওজন করা কথা ছাড়িয়া দত্তার মধ্যে লিখিলেন, নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকী কি আছে মা?…এইটিই সব চেয়ে বড় পারা মা! সংসারের মধ্যে সংসারের বাইরে,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছু নেই বিজয়া। তুমি নিজে কোনদিন পার আর না পার, মা, যে এ পারে, তার পায়ে যেন মাথা ঠেকাতে পারো—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করে যাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে মণীন্দ্র বলিতেছে, ধর্ম্মের যেটা গোড়ার কথা, সেটা পরকালের কথা। মরাই শেষ নয়, এই কথা! এই বনিয়াদের ওপর তুমি হিন্দু, তুমিও দাঁড়িয়ে আছ, আমি ব্রাহ্ম আমিও দাঁড়িয়ে আছি। মৃত্যুর পরের ভাবনা তাই তুমিও ভাব, আমিও ভাবি। হ'তে পারে আলাদা রকম করে ভাবি, কিন্তু ভাববার আসল বস্তুটা যে এক, এই কথাটাই মা হয় ত মরণকালে তোমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।…আমার কর্ম্মদোষে হয় ত পশু হয়ে জন্মাব, তখন আমাকে কি করে পাবে ভাই?

শরৎচন্দ্র জানিতেন, ধর্ম্মকে জোর করিয়া আগলাইয়া রাখা যায় না। আবার সকল ধর্ম্মের মূলেই যে এক, একথাটা যে একটা নিরক্ষর অজ্ঞ চাষাও জানে, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়া গেলেন। তাই গৃহদাহে লিখিলেন: ইহারা লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে।…কো

ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই কারণ জগতের সকল ধর্ম্মই যে মূলে এক এবং তেত্রিশ কোটি দেব দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানদের আল্লা যে একই বস্তু, এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাই নাস্তিক শরৎচন্দ্রের হাতে পড়িয়া দিবাকর কোন মতে পূজা শেষ করিয়া নিষ্কৃতি পাইল না। কলেজ হইতে ফিরিয়া বিষণ্নমনে গঙ্গার কাছে গিয়া বসিল। তাই বুদ্ধির বিদ্যুৎ কিরণময়ী 'পশু'র কাছে একেবারে চুপ করিয়া গেল।

কেন ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদ, কেন হিন্দুধর্ম্মের পর ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা উল্কার মত আসিয়া উপস্থিত হইল, আবার হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার ঘাত-প্রতিঘাতই বা কেন একটি একটি করিয়া তিনি বিশ্লেষণ করিয়া গেলেন। হিন্দু সমাজের উপর কঠোর আঘাত পড়িতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার রেষারেষির কারণ হইয়া উঠিল। আবার সময় বুঝিয়া ইহার গুণও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু রেষারেষি করিয়া যে ধর্ম্ম পাওয়া যায় না এই কথাটা সুস্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্যই কেদারবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইল: সমাজ ছাড়া যে ধর্ম্ম, তার প্রতি আর সে আস্থা কোনমতেই টিকিয়ে রাখতে পারি নে মৃণাল।...এত কাল পরে এই সত্যটাই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি যে, লড়াই ঝগড়া বাদা-বাদি রেষা-রেষি করে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম্মবস্তুটাকে পাবার যো নেই।...তুমি বলছিলে মৃণাল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে, ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষা-রেষি থাকবেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে?...আজ দেখতে পেয়েছি, প্রয়োজন ছিলই। আজ দেখতে পেয়েছি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই বলে অভিযোগ করে যে, দেশ বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট করে দিতে পেরেছি, ততখানি খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও পেরে ওঠেনি, নালিশটা ত' আজ আর মিথ্যে বলে ওড়াতে পারিনে মা!... রেষারেষি যদি নাই থাকবে তা হ'লে আমাদের মধ্যে যাঁরা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শ পদবাচ্য তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্ম্মের মন্দিরে ধর্ম্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে একথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে চায়, ত' আমাদের এই বাঁধাঘাটে আসুক। ধর্ম্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তালঠোকায় আমাদের সমাজ শুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমনি গরম, শ্রদ্ধায় তেমনি রুখিয়া হয়ে উঠত—আলোচনার পুলকের মাত্রাও কোথায় এক তিল কম পড়ে না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করছি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে তা থাক কিন্তু ধর্ম্মের লেশমাত্রও কোনখানে থাকবার যো ছিল না। ধর্ম্ম জিনিষটাকে একদিন যেমন আমরা দল বেঁধে মতলব এঁটে ধরতে চেয়েছি, তেমন করে তাঁকে ধরা যায় না। নিজে ধরা না দিলে হয় ত তাঁকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মুহূর্ত্তে যেদিন মানুষের চরম বেদনার উপর পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান তখন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারা চাই। এতটুকু ভুলভ্রান্তির ভয় সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এই ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোর প্রতি বৃদ্ধের তীব্র চাহনি উল্লেখ করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল, প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম্ম?...যাহা ধর্ম্ম সে তো বর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই।...

দুঃসাহসিক অভিযান লিখিতে বসিয়া তিনি এমন এক-খানি গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া গেলেন যাহার তুলনা মেলা ভার।

মহাশ্মশানের গভীর নীরবতার মধ্যে শকুনশিশুর রহিয়া রহিয়া ক্রন্দনধ্বনি, মৃতমানুষের অসংখ্য মাথার খুলির মধ্য দিয়া বাতাসের শন্ শন্ শব্দ—পড়িতে পড়িতে সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া ওঠে। আবার গদ্য-সাহিত্যে আর একটা জিনিষ দিয়া গেলেন—আঁধারের রূপ। মৃত্যুকে আমরা ভয়ঙ্কর, গভীর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। কিন্তু তাহারও যে রূপ আছে, সেও যে সুন্দর, এই কথাটাই বলিতে গিয়া তিনি লিখিলেন, হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্যতরঙ্গ খেলিয়া গেল, মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছেন—আলোরই রূপ, আঁধারের নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষ কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে? এই যে আকাশ বাতাস স্বর্গমর্ত্ত্য-পরিব্যাপ্ত করিয়া সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি!

এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম্য গহণ অরণ্যানী আঁধার, সর্ব্বালোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার, কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দু'চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়াছিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই, তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভগ্নাকীর্ণ মহাশ্মশান প্রান্তে নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অকস্মাৎ মনে হইল কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোনদিন জানি নাই; তবে হয় ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়। একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো! হে আমার অভাগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্বদুঃখ ভয়ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটী চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া তোমার অনুসরণ করি।

পল্লীচিত্র অঙ্কনেও শরৎচন্দ্রের ক্ষমতা অদ্ভুত। গ্রামের প্রতিটি খাল বিল, বনজ জঙ্গল তাঁহার চিরপরিচিত। বর্ষাকালে কাদামাটি হইয়া ইহার সে দুর্দ্দশা তখন গৃহের কোণে লুকাচুরি খেলা, সবই তাহার একান্ত আদরের। ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত গ্রামের শ্রীহীন মানুষ গুলির সঙ্গে তিনি পরিচিত। ইহার ব্যথা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন আর গ্রামের পর গ্রাম একটি একটি করিয়া হাতে তুলিয়া ধরিয়া দরদী শরৎচন্দ্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন।

'এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূ বেশে গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন—এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম, তখনও এই পথ এমন নির্জ্জন, এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে এত পঙ্ক এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম্ম ছিল, তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই। সেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম্ম যেথায় বিকৃত পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প জন্মভূমির সে দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না থাকা যে কত বড় না থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্ব্বে তাহা যেন জানিতামই না। 'সভ্য মানুষ একথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে জন্তু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না। আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর। কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে, তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না, যদি বহিতেই হয়, তবে ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।' এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলাকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। যখন কাছে ছিলে, তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাও নি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্ম্মম দুঃখ তাদের দিতে পার নি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েছ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েছ। দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্ত্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায়, তোমাদের সহরবাসের সর্ব্বপ্রকার আহার বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার।'

"গ্রামের মুদি নিরক্ষর। কিন্তু সরল, সহজ। সহরের বড় বড় ব্যবসার ফন্দী তাহাদের মাথায় কিলবিল করে না। ওই অশিক্ষিত লোকগুলিও যে মানুষ একথা স্বীকার করিতে আবার আমাদের ভাবিয়া লইতে হয়, এমনি আমাদের মন, এমনি শিক্ষা সংস্কার।" আমরা শত অত্যাচার করিলেও আমাদের এক কণা পায়ের ধূলার জন্য ইহাদের মধ্যে

কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ইহার জন্য কতখানি দায়ী আমরা, একবারও ভাবিয়া দেখি না।

গ্রামের সচ্ছলতা, আনন্দ কি করিয়া ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল তাহারই পরিচয় পাই শ্রীকান্তে কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এদের ছোঁয়াচের গুণ।…কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাতবার? দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও এক ফোটা খাবার জল নেই; গ্রীষ্মকালে বাছুরগুলো জলাভাবে ধর্‌ফর্‌ করে মরে যায়। ম্যালেরিয়া, কলেরা ২০ রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হ'য়ে গেল; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্ত্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুধু চালান করে নিয়ে যেতে।

শ্রীকান্ত বুঝিয়াছিল: শুধু মাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে,—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।

মানুষের প্রতি মানুষের বীভৎসরূপ দেখিয়া যে গভীর বেদনা শরৎচন্দ্রের হস্তে ন্যায়ের তুলি ধরাইয়া দিল, যে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা প্রেমের অসীম শক্তি বুঝিয়া তিনি শুধু প্রেমেরই জয়গান করিয়া গেলেন, পল্লীর ঘরে ঘরে রিক্ত, নিঃস্ব, সর্ব্বহারার গগণভেদী করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া বাঙ্গলার দরদী মনুষ্যটির হাত দিয়াই যে "পথের দাবী" বাহির হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! পরাধীনতার অন্তর্দাহে যে অভিশপ্ত জীবন নীরবে শুধু চোখ বুজিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বহিয়া চলিতে হয়, তাহারই অসহ্য উত্তাপে আগ্নেয়গিরি যেন সহস্র ধারে ফাটিয়া পড়িল: আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অধিকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্তগতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে। এই আমাদের পণ।

সবল বলিয়াই যে মানুষ দুর্ব্বলের উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন দরদী শরৎচন্দ্র! আপনাকে যে বাঁচাইতে পারে না তাহার হত্যায়, যে দুর্ব্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষ আপনার হৃদয় বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সবলের এই যে আত্মহত্যার আহোরাত্রীব্যাপী উৎসব চলিয়াছে, ইহার বাতি নিভিবে কবে? এই সর্ব্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবে না!

পারাধীন জাতির এই দানব শক্তিকে কি করা উচিত, তাহা জানাইতে গিয়া বলিলেন, রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখন ক্ষমা করিস নে।

স্বাধীনতার মূল্য দিতে গিয়া কহিলেন, স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথায়?

শরৎ-সাহিত্যের ধারা বিভিন্নমুখী এবং যে দিকে গিয়াছে, সে দিকেই অমৃতরস ঢালিয়া দিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ দুইটী, প্রথমতঃ অধিকাংশ বস্তুই গভীর বেদনা দিয়া তাঁহার দুরদী মনে বার বার ঘা ঠুকিয়া দিয়াছিল। তাই ব্যথার সমস্ত রস নিংরাইয়া তিনি একটির পর একটি তাজমহল সৃষ্টি করিলেন। আর একটি কারণ, যাদু মন্ত্রের মত তাঁহার ভাষা যাহা কিছু দিয়াছে, তাহাই মর্ম্মস্পর্শী করিয়া ছাড়িয়াছে।

যে অন্তর দৃষ্টির দ্বারা কৈলাস খুড়ো, বৃন্দাবন পণ্ডিতকে চেনা যায়, বোঝা যায় চন্দ্রমুখীকে, সে অন্তরদৃষ্টি তাঁহার ছিল এবং সেই অসীম শক্তির দ্বারাই তিনি সারা ভুবনখানি আপনার করিয়া লইলেন, তাই মৃত্যুর কাল শীতল হস্ত তাঁহাকে কাড়িতে গিয়াও ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তাই কবি এই ধ্রুব সত্য কহিলেন,

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥

এলোকেশী সর্ব্বনাশী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় এম-এ, কাব্যপুরাণতীর্থ

কয়েক বছর আগের কথা। দামোদরের বুকের উপর দিয়ে সাত সমুদ্রের জল বয়ে এসে সৃষ্টিকর্ত্তার বিদ্রোহী সন্তানদের ইহজগতের সমস্ত দর্প কঠিন পীড়নে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। দেশের চারদিক হতে ক্ষুব্ধ মানব সন্তানদের অসহায় হাহাকার সমস্ত আকাশখানাকে বিষাক্ত করে তুলছে। মাতা পুত্রের জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য বিধাতার মারণ-যজ্ঞের পাথর বেদীর পদতলে দাঁড়িয়ে বিলাপ রাগিনী শোনাচ্ছে। তবু অদৃশ্য দেহহীন নির্ম্মমের করুণার কোন লক্ষণ নাই; ডান হাতে সৃষ্টি বাঁ হাতে ধ্বংস;—খেয়াল না খেলা, বুঝি না।

দেশের যে যেখানে ছিল—সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল নিঃসহায়দের সাহায্য ক'রবার জন্য। আমি সেই বছরই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিঁড়ি ক'টা ডিঙ্গিয়ে—কলেজ স্কোয়ার, দেশবন্ধু পার্ক, শিয়ালদহ ষ্টেশন করে—টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনে পড়ে একদিন সকলেই বাড়ির বাগানের মোড়ে বসে চায়ের কাপে মুখ দিতে যাচ্ছি—এমন সময় খবরের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে কয়েকটা কথা চোখে পড়ল। কেন জানি না, চা খাওয়া আর সে দিন জমল না। সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে যেয়ে নাম লিখিয়ে কাজের ভার চেয়ে নিলাম।

সকলের সঙ্গে আমাকেও যেতে হল প্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য করবার জন্য। বাঙ্গালার একপ্রান্তের সঙ্গে আর একপ্রান্তের তফাৎ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যে নদীর শান্ত স্বচ্ছ বুকের উপর দিয়ে শীত গ্রীষ্মে একটা বেড়ালও অবজ্ঞাভরে হেঁটে পেরিয়ে যায়—আজ তার ভয়াল ভৈরব মূর্ত্তিতে প্রলয়ের দামামা বাজানো শুনে—কোন মরণশীলের প্রাণ না চমকে ওঠে? নদীতে পরিপূর্ণ তুফান—কোন রকমে পেরিয়ে গেলাম—বর্দ্ধমানাধিপতির হাতীর কাছে আমাদের নশ্বর দেহটা যে কতখানি ঋণী তা আর প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের কাজ পড়েছিল সদরঘাট দিয়ে দামোদর পেরিয়ে দামোদরের দক্ষিণদিকের দুঃস্থদের পরিচর্য্যা করা। কর্ত্তব্যও আমরা যথাসাধ্য সম্পন্ন করেছিলাম। কিন্তু তার মাঝখানে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল—সে কথা আজও ভুলতে পারছি না। তাকে অঘটন বলব, না অনিবার্য্য বলব বুঝতে পারছি না।

নদী থেকে প্রায় এগারো মাইল দক্ষিণে একখানা গ্রামে আমাদের আস্তানা ঠিক করে নিয়েছিলাম। পালাক্রমে এক একজনের এক একদিকে যাবার ভার পড়েছিল। একদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমাকে যেতে হল দক্ষিণ পশ্চিম কোণের একটা গ্রামের দিকে। সকাল থেকে শরীরটা ভাল ছিল না—তবু তাঁবুতে বসে থাকার যন্ত্রণাটা সহ্য করতে পারলাম না—নির্দ্দিষ্টনিয়মে কাজেই চ'ললাম।

সামনেই যে গ্রামটা পেলাম—সেখানে দেখা শোনা করে তাদের সমস্ত কথা লিখে নিয়ে পরের গ্রামটার দিকে যাত্রা করলাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে—গ্রামবাসীরা সকলেই নিষেধ করলে কিন্তু কে যেন আমায় টানতে লাগল, পরের গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম। গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার কথা বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতের বিষয় চিন্তা করতে করতে আমার চোখ দিয়ে জল এল। জমির আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে যেতে একটা প্রকাণ্ড গোচারণ মাঠে এসে পড়লাম।

গোচরটা যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। গ্রাম সেখান থেকে অনেক দূরে। একটা সরু রাস্তা মাঠের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। দু'পাশে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল। সূর্য্য তখনও ডোবে নাই—তবে শেষবারের মত আবীর ছড়িয়ে সমস্ত জগতটাকে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। অজানা জায়গা—অচেনা পথ—রাত্রি হলে গ্রামে যাব কেমন করে—চিন্তা হল।

হঠাৎ শরীরটা খুব তোলপাড় করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল, ভয়ানক কম্প দিয়ে জ্বর এল। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। পথের পাশে একটা বটগাছের তলায় বসে পড়লাম। বসা মাত্রই শোওয়া। সঙ্গে বিছানাপত্র ছিল না—একখানা কাপড় আর একটা শার্ট সম্বল। অত্যন্ত জড়সড় হয়ে কুকুরকুণ্ডলী দিয়ে, কোন রকমে গাছের শিকর আঁকড়ে পড়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত' আকাশটাও মেঘলা মেঘলা। অন্ধকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নক্ষত্রগুলোও যেন এক সঙ্গে লুকিয়ে পড়েছে। বর্দ্ধমান জেলার বিখ্যাত জরাসুর!—জ্বরের ঘোরে আমার কিছু হুস্ ছিল না। হঠাৎ দূরে কি একটা পাখী বিকট চীৎকার করে উঠল। তন্দ্রার ঘোরটা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না।

হঠাৎ কানের পাশে কার যেন কথা শুনলাম। মনে সান্ত্বনা হল—হয় ত একটা গতি হবে। কাপড়ের আঁচল থেকে মুখ বার করে চারদিকে একটু তাকিয়ে নিলাম। জন-মানুষের কোন চিহ্নই নাই—জমাট বাঁধা অন্ধকার!—অন্ধকার যে এমন জমাট বাঁধা আল্কাতরার মত কাল হয়—তা এর আগে কোনদিন দেখি নাই। হঠাৎ দূরে কারা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল—পাশেই কাদের যেন মারামারির আওয়াজ শুনতে পেলাম—মনটা ছ্যাক্ করে উঠল, শেষে কি জ্বরেও নিস্তার নাই—বাকিটা ডাকাতের হাতেই পূর্ণ হবে! সেই মুহূর্ত্তেই পিছন থেকে কাদের যেন অট্টহাসি শুনতে পেলাম—অকস্মাৎ বটগাছের মাথার উপর যেন একটা সূর্য্য উঠল। তারপরেই আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। কখন কখন মনে হল, আশে পাশে যেন কাদের পায়ের তালি, চুড়ির আওয়াজ, চাপা গলার ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এক একবার মনে হল যেন চার পাঁচ শ' লোক সমস্ত মাঠটা জুরে একটা বিরাট কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিয়েছে। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় মনটা ভ'রে গেল। হাতের উপর জোর দিয়ে—গাছের শিকড়ে ভর করে উঠতে গেলাম—কে যেন জোর করে আবার শুইয়ে দিলে। হয় ত যেটুকু চৈতন্য ছিল—তাও এই ঝোঁকেই শেষ হয়ে গেল।

এই রকম অসাড়ভাবে কতক্ষণ কেটেছিল জানি না—হঠাৎ যেন কার ছোঁয়া লেগে ঘোরটা কেটে গেল। তাকিয়ে দেখলাম একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত জটাওয়ালা একটা লোক আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই সরে দাঁড়াল—তারপর হাতের দ্বারা আমাকে ইসারা করলে তার সঙ্গে যাবার জন্য। ততক্ষণে আমার জ্বরের বেগটা অনেকটা কমে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা যে দিকে চলে যাচ্ছে মনে হল, সেই দিকে উঠে পড়ে চলতে লাগলাম। কতক্ষণ এই ভাবে চলেছিলাম—জানি না, খানিক পড়ে দেখলাম—এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানার সামনে এসেছি। বাইরের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না—রাত একেবারে নিশুতি। বারান্দার একটা মাদুর তোলা ছিল—সেটা টেনে নিয়ে যেমন বসতে যাব—অমনি উপর থেকে কয়েকটা কেনেস্তারা টিন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যারা অঘোরে ঘুমাচ্ছিল সবাই ছুটে বেরিয়ে এল। সবার আগে যিনি ছিলেন—তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা রায়মহাশয়। বৃদ্ধ, সুঠাম, সুপুরুষ, দেখলেই ভক্তি হয়।

রায় মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়েই চীৎকার করে উঠলেন, "কে?"

আমি বললাম, "আমি অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমার বাড়ী এখানে নয়, বড় জ্বর একগ্লাস জল।"

রায় মহাশয় হয় ত বুঝলেন—আর যাই হোক লোকটা কেনেস্তারা চুরী করতে আসে নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ জল আনবার হুকুম দিয়েই আমার জন্য নিজের পাশে একটা বিছানা করিয়ে দিলেন। তারপর শুয়ে নানা কথা বার্ত্তার পর তিনি যে ঘটনার বিষয় বল্লেন, সেটা আমার সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হ'ল।

বৃদ্ধ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনি এলেন কোন্ দিক্ দিয়ে—এলোকেশীর ডাঙ্গা দিয়ে নয় ত?

আমি বললাম—"তা ত জানি না—তবে উত্তর দিকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, তার মাঝখানে একটা ঝুরিনামা বটগাছ—সেই গাছের তলাতেই আমি প'ড়েছিলাম সন্ধ্যা থেকে এত রাত পর্য্যন্ত।"

বৃদ্ধ সচকিত হ'য়ে বল্লেন—"তা হ'লেই হ'য়েছে, গুরুবল যে আপনি রক্ষা পেয়েছেন।"

আমি বললাম—"কেন বলুন দেখি, ওখানে খুব সাপ-টাপ, ডাকাত-টাকাত আছে নাকি?"

তিনি বল্লেন—"সাপ হ'লে ত ওঝা ডাকা চল্ত—ডাকাতেরা গরীবের কিছু করে না, কিন্তু এখানে যে আর কোন উপায়ই চল্ত না।"

আমি বল্লাম—"ব্যাপারটা কি, একটু খুলে বলুন।"

বৃদ্ধ বল্লেন—"সে অনেক কথা, আজ রাতটা ঘুমিয়ে নিন্, কাল সকালে সমস্ত বলব।"

কিন্তু আমি নিতান্ত নাছোড়বান্দা হওয়ায় তিনি তখনই তাঁর ঠাকুরদাদার মুখ হতে শোনা একটা সত্য ঘটনার কথা বলতে সুরু করলেন,—

বহুদিন আগেকার কথা। তারপর থেকে প্রায় একযুগ গেছে। তখন ভারতে মোগল বাদশাহদের রাজত্বে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছে। চারিদিকে গোলমাল, লুটপাট, অরাজকতা।

সেই সময় ঐ ডাঙ্গার উপর একঘর খুব প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিল। তখনকার দিনে এই চৌধুরী পরিবারের মত রাজদরবারে খাতির এ তল্লাটে কারও ছিল না। গ্রামকে গ্রাম সবই তাদের ছাড় দেওয়া ছিল—অখণ্ড ক্ষমতা নিয়ে অসাধারণ প্রতাপে তারা শাসনকার্য্য চালাত।

চৌধুরী পরিবারের কর্ত্তার নাম ছিল ভুবনেশ্বর। বাড়ীতে থেকে কাজকর্ম্ম দেখা শোনাই ছিল তার কাজ। লোকটা কোথায় থাকত কি করত কেউ জানেও না; বাড়ীতে থাকত কিন্তু তার নির্দ্দিষ্ট ঘরের বাহিরে কদাচিৎ পা দিত। তার কনিষ্ঠ ভাই যাদবেশ্বর—সে থাকত রাজদরবারে—বাড়ীতে তাকে কেউ কোনদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। বাড়ীর আর সকল কর্ম্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে দোর্দ্দান্ত প্রতাপে জমিদারী চালাত।

চৌধুরী পরিবারের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল—তার নাম ছিল রমানাথ। রমানাথকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। তার যে কি কাজ ছিল কেউ জানত না। আগেকার বৃদ্ধেরা বলতেন—তার কাজ ছিল রূপসীদের সন্ধান আনা—তারপর চৌধুরী জমিদারেরা যত টাকা লাগে খরচ ক'রে সেই রূপসীকে কিনে বা তুলে আনত।

আমি অবাক হ'লাম। বললাম, "রূপসী? বলেন কি? তারপর কি করা হোত।"

বৃদ্ধ বললেন—"শুনেছি, কোন একদিন গভীর রাতে তাদের দিল্লীনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হোত।"

আমি বললাম—"অসম্ভব, এরকম কখনো ঘটে?"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন—"ঘটে কি না জানি না, আমি যা শুনেছি তাই বলছি।"

কাহিনীর শেষটা শোনার বড় আগ্রহ হ'ল, বললাম "তারপর?"

বৃদ্ধ আবার তাঁর কথা সুরু করলেন,

তারপর তাদের দিন এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। চৌধুরী জমিদারের আতঙ্কে আশেপাশের সবাই সব জেনে শুনেও কোন দিন টুশব্দ করতে পারে নাই।

একদিন কি একটা জরুরী চিঠি এল। ভুবনেশ্বর রমানাথকে ডাকলে। রমানাথ কিছুক্ষণ পরেই বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে গেল। স্ত্রী এলোকেশী বারবার নিষেধ করলে। রমানাথকে যেতেই হ'ল।

কয়েকদিন পরে রমানাথ শুক্‌নো মুখে ফিরে এল। আবার সেইদিনই তাকে যাত্রা করতে হ'ল। এবার বোধ হয় কিছু বেশী দিনের জন্য গেল—সম্বলও কিছু বেশী নিলে।

রমানাথের যাওয়ার দুদিন পরেই তার বাড়ীতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বাড়ীতে এলোকেশী একাই ছিল। রাত্রের আহার শেষ ক'রে সে যখন শুয়েছে তখনই দুয়ারে ঘা পড়ল। প্রথমে এলোকেশী বুঝতেই পারলে না, ব্যাপার কি! তারপর দুয়ার ভেঙ্গে একদল লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। এলোকেশী 'ডাকাত পড়েছে' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু শূন্যে শুধু তার চীৎকারের প্রতিধ্বনি ফিরে এল—কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডাকাতেরা বাড়ীর কোন জিনিষপত্র স্পর্শ না ক'রে এলোকেশীকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। এলোকেশী নিরুপায় হ'য়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল—"আমি যদি সতী হই এর যেন প্রতিকার হয়।"

পরদিন সকালে সবাই যখন শুনলে, রমানাথের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল, তখন সত্যিই অবাক্ হ'য়ে গেল।

এলোকেশীকে ডাকাতেরা চৌধুরী জমিদারের বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া একটা যায়গা—তার ভিতর তিন চারখানা ঘর। সেখানে একটা ঘরে তাকে রাখা হ'ল। এলোকেশী দেখলে আগেই আর একজনকে আনা হয়েছে। সে মাটিতে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এলোকেশীর চোখ দিয়ে আগুনের ফিন্‌কি বেরিয়ে এল। এ বুঝি তার স্বামীর কীর্ত্তি। বিধাতার রোষের আগুন শয়তানির ছাই দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। আজ যে তাকেও এরা ধ'রে এনেছে, এটা তাদের নিজস্ব খেয়াল নয়—রুদ্রের অভিশাপ! একথা এলোকেশী যতই চিন্তা করতে লাগল,

ততই তার সঙ্কল্প কঠিন হ'তে লাগল, "আমি যদি সতী হই, আমাকে ধ্বংশ করবে, এমন কেউ দুনিয়ায় নাই।"

কিছুক্ষণ পরে এক বুড়ী আস্তে আস্তে সেই ঘরে এল। যে কাঁদছে তার কাছে যেয়ে বললে, "আমার মেয়ে তোমরা, কাঁদছ কেন?—তোমাদের কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ, তোমরা যাতে দাঁতে সোনা চিবোও, তার ব্যবস্থা করব।" বুড়ী এই সব নানা কথা ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

বুড়ী তারপর এলোকেশীর কাছে কি বলতে গেল, এলোকেশী ভ্রূকুটি করায় সে পেছিয়ে গেল।

তারপর এলোকেশীকে স্বতন্ত্র ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। স্বয়ং ভুবনেশ্বর সেখানে গেল। সে এলোকেশীকে অনেক আদর যত্ন করলে—এলোকেশী সে সব না শুনে তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে ভুবনেশ্বরের পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ ভুবনেশ্বর কঠিন হ'য়ে একটা শিস্ দিলে। চামড়ার বেত নিয়ে একটা মেয়ে ছুটে এসে এলোকেশীর মাথায়, পায়ে, গায়ে চাবুক মারতে লাগল। এলোকেশী যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠল, "আমি যদি সতী হই, তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।" হঠাৎ ভুবনেশ্বর চমকে উ'ঠে বেত থামাতে হুকুম দিয়ে ব'লে উঠল, "সর্ব্বনাশী, ফের যদি এমন কথা বলবি, তোকে জীয়ন্ত মটির তলায় পুঁতে রাখব।

একথা ব'লে ভুবনেশ্বর তখনই সেখান হ'তে চলে গেল।

দুপুর রাতে এলোকেশী ঘর হ'তে বেড়িয়ে এল। কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদের আলোতে সমস্ত পৃথিবীটা ধুয়ে গেছে। এলোকেশী এদিকে সেদিকে আস্তে আস্তে পা ফেলে দেখতে লাগল কোন পথ পাওয়া যায় কি না। চারিদিক খুব শক্ত কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। কোন উপায় নাই। ঘুরতে ঘুরতে এলোকেশী দেখলে সামনে একটা প্রকাণ্ড পুকুর—পুকুরটার দিকেও তারের বেড়া—কেবল অপর পারে জল ঢোকবার একটা ছোট্ট দুয়ার রয়েছে। কিন্তু পুকুরটা না পার হ'তে পারলে সেখানে যাওয়া যাবে না। এলোকেশী কাছেই একটা কলসী দেখতে পেল। কলসীতে ভর ক'রে সে সেই দীঘির অথই কাজলা জলের উপর দিয়ে পাড়ি দিতে লাগল। যদি পুকুর পার হ'তে পারে ভালই—আর না পারলেও ক্ষতি নাই, সতীধর্ম্ম রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। পুরাণ বর্ণনায় বেহুলার যে সৌম্য শতদল মূর্ত্তি কালো জলের বুকে ফুটে উঠেছিল, এলোকেশী তাকেই দ্বিতীয়বার বাস্তবে পরিণত করবে। দেখতে দেখতে সে অপর পারে উঠল, তারপর কলসীটাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে জল-নালার ভিতর দিয়ে কোনরকমে হাতে পায়ে ভর করে পাঁচিয়ের বাইরে চ'লে গেল।

বাইরে সে পথঘাট কিছুই চেনে না। তবু সোজা যেদিকে তার চোখ চলে সেইদিকেই চলতে লাগল। তারপর একটা মাঠে এসে হাজির হ'ল। সেই মাঠে যেমন সে একটা উঁচু বাঁধের উপর উঠতে যাবে, অমনি একটা লোকের গোঙ্গানির শব্দ শুনতে পেলে। সেইদিকে এগিয়ে যেয়ে দেখলে, এক যুবক মাটিতে পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ভিজে কাপড় নিগড়ে জল নিয়ে তার মুখে দিলে। ক্রমে ক্রমে লোকটার চৈতন্য হ'ল। তখন পূবদিকটা অনেকটা ফর্সা হ'য়ে এসেছে। লোকটা মুগ্ধ হয়ে এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করলে, "কে মা তুমি?" এলোকেশী সংক্ষেপে তার পরিচয় দিলে। লোকটা বললে, "আমায় একটু ধর, আমার বাড়ী কাছেই। আমি তোমাকে রক্ষা করব।" তারপর দু'জনে মাঠের পশ্চিমদিকে যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে গেল।

যে লোকটা মাঠে প'ড়েছিল, তার নাম বিশাই। সে সেখানকার বিখ্যাত দিবাকর ডাকাতের ছেলে। দিবাকরের দলের লোকই তাকে জখম ক'রেছে। সে আসছিল ভিন্ন গ্রাম থেকে, দলের লোক চিনতে পারে নাই। তাকে মেরে মাঠে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু তার শ্বাস নিঃশেষ হয় নাই, তাই সে আবার প্রাণ পেল।

দিবাকর বিশাইয়ের সেরকম অবস্থা দেখে একেবারে উন্মাদের মত হ'য়ে গেল। কিন্তু সঙ্গীরা যে অবস্থায় তাকে মেরেছে, সে অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না।

এলোকেশীকে যারা ধ'রে আনতে গিয়েছিল, দিবাকর তাদের মধ্যে প্রধান। এলোকেশীর এই মহৎ উপকার দেখে সে মুগ্ধ হ'য়ে কেঁদে ফেললে।

দিবাকর জোড় হাত ক'রে বললে—'মা, তোমার এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। পাপীকে ক্ষমা কর, আজ থেকে

আমি তোমার দাসানুদাস।' এলোকেশী তদবধি ডাকাতদের ঘরেই থেকে গেল।

এদিকে রমানাথ প্রায় পনের দিন পরে বাড়ী ফিরে এল। এসে বাড়ীর অবস্থা দেখে আর প্রতিবেশীদের মুখে সমস্ত শুনে সে তার প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে দেখা করার কথা ভুলে গেল। ক্ষোভে, রাগে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল। তারপর, কেন কে জানে, খানিক পরেই তার মনে প্রচণ্ড নির্বেদ এল। কাউকে কিছু না ব'লে সে একবস্ত্রেই ঘর থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চ'লে গেল।

ডাকাতেরা দিনের পর দিন এলোকেশীর বড় অনুরক্ত হ'য়ে পড়ল। এলোকেশীও দ্বিতীয় দেবী চৌধুরাণীর মত মা হ'য়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দিবাকর হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে এসে এলোকেশীকে বল্‌লে—'মা, আজ সুযোগ এসেছে, প্রস্তুত থেক, আজ রাত্রেই আমাদের যাত্রা করতে হবে।'

ভুবনেশ্বরের ছোট ভাই আজ দিল্লী থেকে আসবে—পথের মাঝেই তার মাথাটা ছিনিয়ে এনে ভুবনেশ্বরকে উপহার দেবার জন্ম তারা প্রস্তুত হচ্ছিল।

নিশীথ রাত্রে কালীপূজা শেষ ক'রে, মশাল জ্বেলে অস্ত্রশস্ত্র লোফালুফি করতে করতে ডাকাতের দল উত্তর মুখে এগিয়ে চল্‌ল—তাদের সঙ্গে চল্‌লো এলোকেশী।

প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটার পর তারা যখন একটা প্রকাণ্ড মাঠের উপর দিয়া চলেছে, তখন একটা পাল্কীর আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাতেরা বিকট শব্দ ক'রে উঠল, আর মুহূর্ত্ত পার হতে না হতেই তারা সবাই একযোগে ছুটে পাল্কীর উপর লাফিয়ে পড়ল। পাল্কীটা ভেঙ্গে গেল, বেহারারা ছুটে পালিয়ে গেল। ভুবনেশ্বরের কনিষ্ঠ যাদবেশ্বর কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা আর গলার বিচ্ছেদ হওয়ায় কথাটা ভিতরেই থেকে গেল। এলোকেশীর চোখে যেন প্রতিহিংসার বিষ ঝড়ে পড়ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাতদের চৌধুরী জমিদারের বাড়ীতে হানা দেবার জন্ম নির্দ্দেশ দিলে। তখনই সমস্ত ডাকাতেরা রক্তের নেশায় পাগল হ'য়ে মহা উল্লাসে সেই দিকে ছুটে চ'লল।

গভীর রাতে চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম—মাঠের মাঝে এই প্রলয় উচ্ছ্বাস, পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেন একঝাঁক ধূমকেতু ছুটে চলেছে, এলোকেশীর মুক্ত বেণী তাদের পুচ্ছ। প্রতিহিংসার ক্ষুধের আগুন অহরহ ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলছে। শাদা মনটা কিরকম অঙ্গার-কালো হয়, করুণাময়ী নারীজাতির এই পৈশাচিক উল্লাসই তার প্রমাণ। জগদ্ধাত্রী উগ্রচণ্ডা সেজেছিলেন, সীতাদেবী অসীতা মূর্ত্তি ধ'রেছিলেন, একথা মিথ্যা কে বল্‌বে?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা চৌধুরী জমিদারের সদর দুয়ারে এসে হানা দিল। চৌধুরীদের লোকবল খুব কম ছিল না, কিন্তু আজ ছোটবাবুকে সঙ্গে করে আনবার জন্ম দু'চার জন ছাড়া প্রায় সমস্ত দারোয়ান, লস্কর, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে, আর ছোটবাবুর আসার বিলম্ব অনুমান ক'রে পথের পাশে কোন তরলিকা-ভবনকে ধন্য করতে ব'সে পড়েছে।

দিবাকরের দল অবলীলাক্রমে দারোয়ানদের তাগিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। তারপরেই লুঠতরাজ, মারধোর, শিশু-নারী মহলে বিরাট আর্ত্তনাদ! চৌধুরী বাড়ীর কর্ত্তা ভুবনেশ্বর, দোতলা হ'তে নীচে নেমে এসে অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে, "বৃথা চেষ্টা দিবাকর, ফিরে যা, আরও কিছুদিন শক্তিসাধনা ক'রে আয়। আমি সম্পত্তির রক্ষক, এর এক চুলও ক্ষয় হ'লে সহ্য করতে পারব না। যদি বল পরীক্ষা করতে চাস্, আর দু'ঘণ্টা পরে আসিস্, যার সম্পত্তি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবি।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে এলোকেশী আগুনখাকীর মত ছুটে এসে, যাদবেশ্বরের মুণ্ডটা ভুবনেশ্বরের পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে, "যার সম্পত্তি তার অমত করবার কিছু নাই, শয়তান!"

ভুবনেশ্বরের চোখ জ্বলে উঠ্‌ল, চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "এলোকেশী সর্ব্বনাশী!" পাশেই একটা বর্শা ঝুলান ছিল, সেটা তুলে নিয়ে সে সজোরে এলোকেশীর দিকে ছুড়ে দিলে। বর্শাটা এলোকেশীর পাঁজরা ভেদ ক'রে মাটিতে গেঁথে গেল। এলোকেশী আর্ত্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেল। মুহূর্ত্ত পার না হতেই দিবাকরের হাতের খড়্গ ভুবনেশ্বরের মাথা আর দেহের মাঝখান দিয়ে রাজপথ রচনা করলে। দয়ালুর দয়ার যেমন সীমা থাকে না, হৃদয়হীনের নির্ম্মমতারও তেমনি অন্ত নাই। ডাকাতেরা ইতিমধ্যে অনেক নিরপরাধ নির্দ্দোষের রক্তে চৌধুরী বাড়ীকে রাঙ্গিয়ে তুলেছে।

সেই সময় গেরুয়া কাপড় পরা কতকগুলি লোক বাড়ীর ভিতর ছুটে এল। ডাকাতেরা তাদেরও আঘাত দিতে ছাড়ে নাই, কিন্তু তারা যখন কোন প্রতিঘাত দেয় নাই, তখন ডাকাতেরা আর তাদের রক্ত অর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করে নাই।

যেখানে এলোকেশী করুণ আর্ত্তনাদ করছিল, সন্ন্যাসীরা সেইখানে এসে ব'সল।

কয়েকদিন আগে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এখানে এসেছে। চৌধুরীবাড়ীর কাছেই যেখানে রমানাথের বাড়ী ছিল, সেইখানেই তারা আস্তানা নিয়েছে। চৌধুরী বাড়ীর ভিতর এই চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শুনে স্বাভাবিক সেবা প্রবৃত্তি নিয়েই তারা ছুটে এসেছে।

এলোকেশীর করুণ স্বর শুনে তারা মনে ক'রেছিল, তাকেও ডাকাতেরা আঘাত করেছে, কিন্তু এসে দেখলে বিপরীত, ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই এলোকেশীর পা ধরে কাঁদছে।

সেই সময় সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'এলোকেশী!', অমনি এলোকেশী সেই যন্ত্রনা মুহূর্ত্তেও বিদ্যুৎ-বেগে উঠেই সন্ন্যাসীর পায়ের উপর পড়ে গেল। তার পরেই সব শেষ!

সন্ন্যাসী রমানাথ। তৎক্ষণাৎ শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন ক'রে সে বল্লে, আনন্দ, পালিয়ে চল, পালিয়ে চল, এ সেবার স্থান নয়, এ পতনের অতল গহ্বর!

দিবাকর ছুটে যেয়ে তাকে চেপে ধরলে, বললে, "আমি চিনতে পেরেছি, আপনি রমানাথ, চৌধুরীবাড়ীর হ'য়ে একসঙ্গে যখন পাপের পাহাড় তৈরী করেছি, তখন আর অচেনা থাকবেন কেমন করে? আপনি যেথা ইচ্ছা যান, কিন্তু আমাদের মার সম্বন্ধে যেন কোন ভুল ধারণা না করেন। মা আমাকে বারবার বলতেন, 'দেখো দিবাকর, আমি যদি সতী হই, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হ'তেই হবে। তিনি সতী, মনে প্রাণে সতী, চৌধুরী গোষ্ঠী তাঁর সতীত্বের কিছু মাত্রও অঙ্গহানি করতে পারে নাই।"

রমানাথের চক্ষু আদ্র হ'ল। ইঙ্গিতে সমস্ত দলকে ডেকে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

দিবাকরের দল এলোকেশীর শব মাথায় নিয়ে শ্মশানঘাটের দিকে চ'লে গেল।

তারপর কেমন ক'রে কে জানে, চৌধুরীদের সেই বিরাট বাড়ীখানাও সেই রাত্রেই পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেল, ভিতরে যা কিছু ছিল, সবার সৎকার স্বয়ং অগ্নিদেব সম্পন্ন করেছেন।

তারপর কি দিবাকরের দল, কি রমানাথের দল, তারা কোন দিনের জন্য কারও চোখে পড়ে নাই!

বৃদ্ধের কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটু চমকে উঠলাম। এই কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যটাই যেন আজ স্বচক্ষে দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর ঐ জায়গায় আর কিছু ঘটেছে?"

বৃদ্ধ বললেন—"ঘটেছে বৈ কি, চৌধুরীদের বাড়ী ধ্বংস হবার পর আশে পাশের সকলকেই বাড়ী ঘর ছাড়তে হয়েছে।"

আমি বললাম "কি রকম? ভূতের উৎপাত?"

তিনি বললেন, অনেকটা তাই বটে। এ সম্বন্ধে আর একটি বড় করুণ কাহিনী চলতি আছে। অথচ সে কথা এমনি ভয়ানক যে শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয়।"

ততক্ষণে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—"এই কাহিনী শুনে আমার মনে যেন একটা আন্দোলন সুরু হল। আমি ব'ললাম এখন থাক কাল শুনব।

পরদিন সকালে বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এলোকেশীর ডাঙ্গা দেখতে গেলাম। বৃদ্ধ মাঝখানে খানিকটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন —"এইটা রমানাথের ভিটা" একটা শুকনো দাঘি দেখালেন—যেটা পেরিয়ে এলোকেশী আত্মরক্ষা করেছিল।

সেই প্রখর দিনের বেলাতেও আমার মনে হল স্বপ্ন দেখছি। আমার চোখের সামনে যেন প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান ঘেরা পুকুর সবই দেখতে পেলাম। তার উপর কালের দু'শো পদক্ষেপ যেন তার একটী কোণও খসাতে পারে নাই।

রায় মহাশয় বৃদ্ধ সুলভ ভঙ্গীতে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কালস্য কুটিলা গতিঃ।'

কি জানি কেন মনটা বড় দমে গেল। পাশের গ্রামের কতকগুলি গৃহহারা লোক সংবাদ পেয়ে আমাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, 'তোমাদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে গেছে—কাদাতে গ্রামটা ডুবে গেছে—তোমরা দিন কতক এইখানে এসে থাক না।'

তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল; একজন বৃদ্ধ অস্ফুটস্বরে বললে, 'এলোকেশী সর্ব্বনাশী।'

রায় মহাশয়ের রাত্রের কথা স্মরণ করে—কোথায় যেন কি একটা ব্যথার রেশ মনের ভিতর বাজতে লাগল। বললাম, "আমি চল্লাম, আমার এখানকার কাজ এই পর্য্যন্ত। কাল থেকে এখানে নূতন লোক আসবেন, দয়া করে তাকে পথ দেখাবেন।'

দূরে এক ঝাঁক বক পাখার ঝটপটি দিয়ে উড়ে গেল। চারদিক থেকে যেন হাজার হাজার অশরীরী হাতের তালি দিয়ে আমার কথার সমর্থন কর্‌লে। হঠাৎ একটা দমকা ঘূর্ণী হাওয়া আমার চোখে মুখে ধুলোর ঝাপটা দিলে—যে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার পাতায় পাতায় দীর্ঘ-শ্বাসের ঝড় ব'য়ে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথেই এ'গিয়ে চল্লাম। গ্রামবাসীদের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি আমার পিঠে ত্রিশূল বেঁধাতে লাগল।

শূন্য দিগন্ত খাঁ খাঁ করছে—দূরে আকাশ মাটির মুখে চুমো দিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে যেন সেই ভয়ঙ্কর মাঠে উগরে দিতে চায়। যতই চলেছি—ততই মনে হচ্ছে, কানের পাশ দিয়ে কে অনবরত বলে চলেছে 'এলোকেশী সর্ব্বনাশী।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

চার

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাগঠনে যে অপূর্ব্ব সূক্ষ্মানুভূতি ও অপরূপ সৃষ্টি ও রসনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণের পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যে সকল মনস্বী বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে ইঁহাদের রচনায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একটি বিষয়ও এ সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা যখন উন্মার্গগামী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজই তাহাদিগকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করে। তখন ব্রাহ্মসমাজে অদ্বিতীয় বাগ্মী ও লেখক কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা ও পুস্তিকা প্রচারে, রাজনারায়ণ বসু শিক্ষা বিস্তারে, রামতনু লাহিড়ী আদর্শ জীবন যাপনে, পবিত্রতার আলোকে চারিদিক বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারও রসাস্বাদ করিতে বঞ্চিত হন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুইখানি পুস্তকে সুন্দর গদ্য-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ দুইখানি পুস্তকের নাম, ১। রাস সুন্দরীর জীবনী ২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী। এই দুইখানি পুস্তকের ভাব ও ভাষা অনিন্দ্য সুন্দর। রাসসুন্দরী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কিশোরীলাল সরকারের মাতা ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে একজন প্রাচীনা বঙ্গমহিলার রচনা কিরূপ সহজ-সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইতে পারে, তাহা পাঠ করিলে সত্যই বিস্ময়োৎফুল্ল হইতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত অংশই তাহার প্রমাণ।

"সেই পরমেশ্বর আমাদের সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন, বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা সকল লোক যে পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ। ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোক তাঁহাকে ডাকে। তিনি আদিকর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকে ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।"

মহর্ষির জীবনীর ভাষা আরও সুন্দর, মনোরম ও কবিত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে, ঈশ্বর নাই? এই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমিও প্রস্তুত ছিলাম না। তবে কোথা হইতে এত আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।"

রাজা রামমোহনের সময় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় পর্য্যন্ত যে-সকল সাময়িক পত্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনখানি বিশেষরূপে উল্লেখের যোগ্য।

১। রাজা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী",

২। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "রহস্য সন্দর্ভ",

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।"

সুখের বিষয় উঁহাদের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অদ্যাপি জীবিত আছে। এই পত্রিকা স্বনাম খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও চিন্তাশীল, সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ সম্ভারে অলঙ্কৃত হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকায় মহাভারতের উপক্রমণিকা বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য—এই সকল সাময়িক পত্র পাঠেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা প্রণালীর সহায়তা করিয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে পাঠকালে তত্রস্থ সুবৃহৎ পাঠাগারে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান পাঠে নিমগ্ন হইয়া সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তৎকালে হুগলি কলেজে দেশবিশ্রুত মনস্বী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে বঙ্কিমন্দ্রের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টপল্লীনিবাসী কোন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন। তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তিতে তিনি চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উৎকৃষ্ট উপন্যাস ছিল না। বটতলা হইতে প্রকাশিত কামিনী কুমার প্রভৃতি গল্প কাহিনী শিক্ষিত পাঠকসমাজে অনাদৃত ছিল। আরব্য উপন্যাসের তর্জ্জমা পড়িতে তাঁহাদের আগ্রহ হইত না। তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী উপন্যাসের ধরণে সর্ব্বপ্রথমে একখানি উপন্যাস রচনা করিতে সঙ্কল্প করেন। ইংরাজীতে তিনি প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, বাংলাও তিনি সর্ব্বপ্রথমে উপন্যাস লিখেন। সে উপন্যাসের নাম সর্ব্বজন বিদিত 'দুর্গেশ-নন্দিনী।' যদিও ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের ২৭ বৎসর বয়সে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহার পাণ্ডুলিপি উহার ৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উহার পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে শুনাইলে, তাঁহারা প্রথমতঃ উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। পরে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়। তখনও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহার শক্তি তিনি বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কাহাকেও দেখাইয়া তাহার মত গ্রহণ করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাম সর্ব্বনিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তাহা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার প্রতিভার ছায়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 'দুর্গেশনন্দিনী'র যত সংস্করণ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অপর উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলির তত সংস্করণ হয় নাই। ইহার কারণ কি? নূতনত্বের একটা মোহ আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলার প্রথম উপন্যাস। বর্ত্তমান সময়ে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইলে, কেহই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে না, কিন্তু তৎকালে লোকে সাহিত্যাংশে একটি নূতন আলোক দেখিয়া চমকিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার সর্ব্বত্র একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। কৃতবিদ্য সম্প্রদায় ও উৎকৃষ্ট ইংরাজী উপন্যাসের ন্যায় বাংলা উপন্যাসের রসাস্বাদে তৃপ্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও নিজের শক্তির কিছু পরিচয় পাইলেন।

'দুর্গেশ-নন্দিনী' সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার স্যারওয়ালটার স্কটের বিখ্যাত "Ivanhoe" নামক উপন্যাসের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সৌসাদৃশ্য আছে এবং উহারই অনুকরণে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত বলিয়া একটা প্রচলিত মত সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

এ কথা সত্য, উভয় উপন্যাসেই একটি আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। জগৎসিংহ ও Ivanhoe, তিলোত্তমা ও Rowena, এবং আয়েষা ও Rebeccaকে একই পর্য্যায়ে ফেলা যায়। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার সুনিবিড় প্রেম, Ivanhoe ও Rowenaর প্রেমেরই সমতুল্য। পরে তিলোত্তমা ও Rowena উভয়েই নিজ নিজ অভীষ্ট প্রিয়জনকে পাইয়া বিবাহ বন্ধনে সুখী হইয়াছিলেন। Rebecca ও আয়েষা Ivanhoe ও জগৎসিংহকে গোপনে ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নীরব প্রেম ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা ছিল। ঘটনাচক্রে আয়েষার প্রেম জগৎসিংহের সম্বন্ধে একবার মাত্র নিজ মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু Rebeccaর তদ্রূপ প্রকাশ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। আর এক দিকেও একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। জগৎসিংহ ও Ivanhoe যখন

অস্ত্রাঘাতে কাতর ও পীড়িত তখন আয়েষা ও Rebecca উভয়ের বিরামহীন একান্ত যত্ন, সেবা ও শুশ্রূষা। সর্ব্বোপরি আয়েষা ও Rebecca র বিদায়দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে একরূপ। উভয়ের মধ্যে কেহই তাঁহাদের প্রেমাস্পদের নিকট বিদায় লয়েন নাই। Rowena র সহিত Rebecca অনেক কথাবার্ত্তার পর, বলিতেছেন, 'One of the most trifling part of my duty remains undischarged. Accept this casket startle not at its contents" Rowena opened the small silver casket and perceived a necklace with ear jewels of diamonds which were obviously of immense value.

"It is imposible" she said tendering back the casket, "I dare not accept of such consequence."

"Yet keep it lady. Accept these lady, to me, they are valueless. I will never wear jewels any more."

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহের পর আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগিনি, আমি চলিলাম, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।" আয়েষা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন, "তুমি আমার কথা কখনও যুবরাজের নিকট তুলিও না, একথা অঙ্গীকার কর।" এ কথা তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃত হই ও না, স্মরণার্থ যে চিহ্ন দেই তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্ত নির্ম্মিত পাত্র মধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন। তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামী কন্যা, তথাপি সে অলঙ্কার রাশির অদ্ভুত শিল্প রচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্রদীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় Rebecca বহুমূল্য অলঙ্কারপূর্ণ পাত্রধারটি Rowenaকে দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আয়েষা পাত্রমধ্যস্থ বহুমূল্যবান অলঙ্কাররাজি তিলোত্তমার অঙ্গে না পরাইয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ইহাতে প্রাচ্য ভাবধারার বৈশিষ্ট্য কিরূপ সুন্দরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষা করিলেন।

প্রণয়ে নিরাশা হইয়া অব্যক্ত বেদনা Rebecca যখন Rowena-র নিকট বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন, তখন Rowena-র বিধিমত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা বিফল হইল।

Rebecca বলিলেন, "No lady," the same calm melancholy reigning in her soft voice and beautiful features, "that may not be. He to whom I dedicate my future life will be my comforter if I do His will." রায়েনা ভাবিলেন যে রেবেকা কোন ধর্ম্মাশ্রমে জীবন যাপন করিতে চাহেন। জিজ্ঞাসায় রেবেকা উত্তর দিলেন, "No, lady", said the Jewess; "but among my people since the time of Abraham downwards have been women who have devoted their thoughts to Heaven, and their actions to works of kindness to men tending the sick, feeding the hungry, and relieving the distressed. Among these will Rebecca be numbered. Say this to the lord, should he chance to inquire after the fate of her whose life he saved."

অন্যদিকে নিরাশ প্রণয়ে বেদনাতুরা আয়েষা বিদায়ের প্রাক্কালে তিলোত্তমাকে বলিলেন, "তিলোত্তমা, আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কাল হরণ করিব না।"

আয়েষা আপন আবাস গৃহে আসিয়া বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

প্রশান্তি শ্রীবাদল ধর
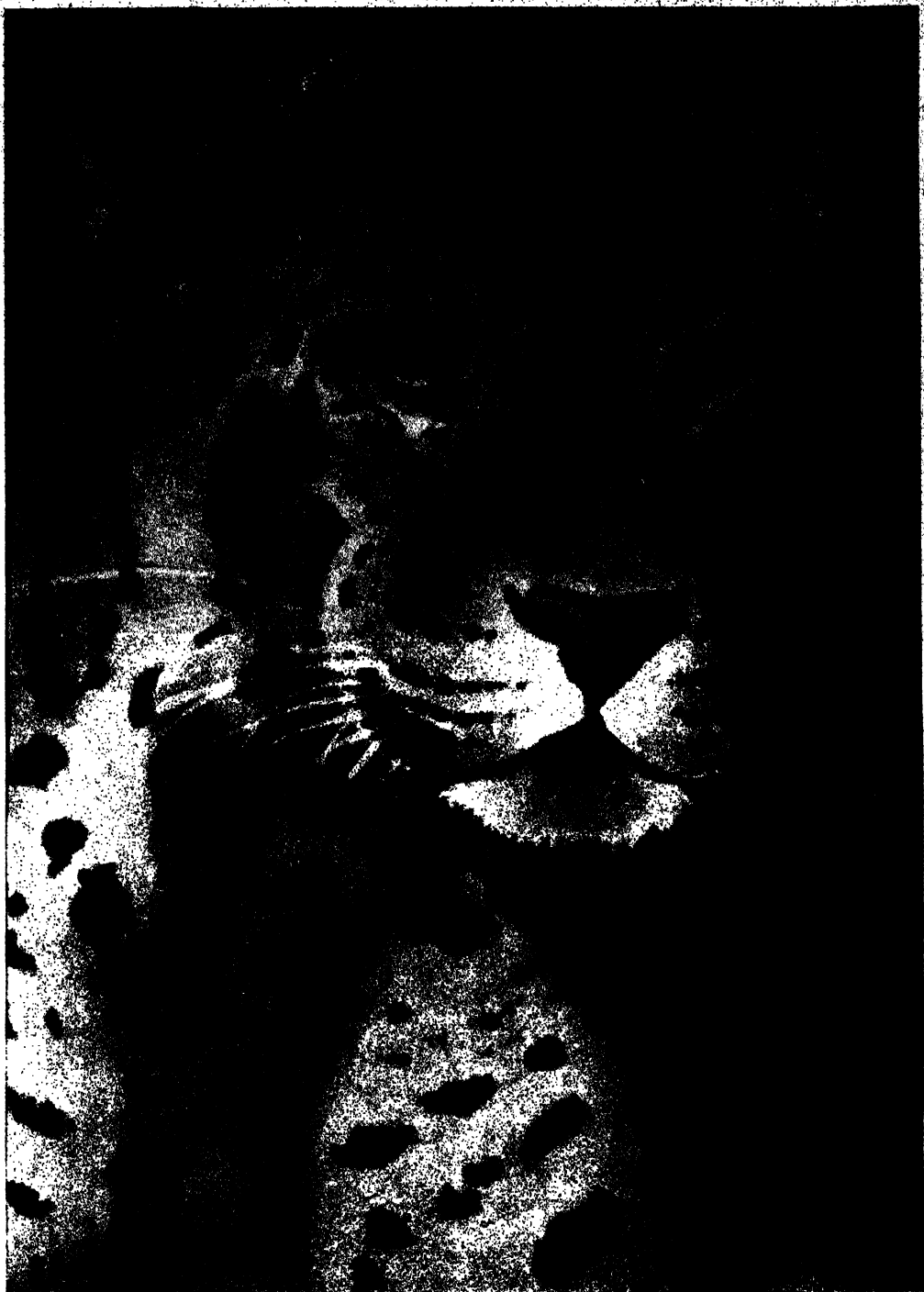
আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য, প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।"

এই বলিয়া আয়েষা গরলধার অঙ্গুরীয় দুর্গ পরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

এই স্থলে স্কট রেবেকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা অপেক্ষা অধিকতর বরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। উল্লিখিত সাদৃশ্যগুলি দেখিয়া কেহ কেহ যদি এইরূপ ধারণা করেন, যে দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র Scott-এর Ivanhoe উপন্যাস পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বড় বড় গ্রন্থকারের মধ্যে দুইজন পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া এক ভাব ও এক চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। এমন কি কালিদাস ও সেক্সপিয়রের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, Ivanhoe ও দুর্গেশনন্দিনীর অন্যান্য বর্ণনীয় বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। এতদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, দুর্গেশনন্দিনী রচিত হবার পূর্ব্বে তিনি Ivanhoe উপন্যাস পড়েন নাই। তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই, এবং এ সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

তর্কানুরোধে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, যে বঙ্কিমচন্দ্র Ivanhoe উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইবার পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন এবং উহার কিছু কিছু ভাব তাঁহার রচিত উপন্যাসে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও কিছু দোষের বিষয় হইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের কোন কোন চিত্র পরবর্ত্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে আর একটি বিষয় যাহা প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িয়াছে তৎসম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাসে মুসলমান বিদ্বেষের কোন গন্ধ পাওয়া যায় কি? বিদ্বেষ দূরে থাকুক, ইহাতে মুসলমান চরিত্র যেরূপ গৌরবোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হেমেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিয়া এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে—বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান বিদ্বেষ ছিল না এবং থাকিতে পারে না। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে যে দুইটি প্রধান মুসলমান চরিত্র পাই তাহার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখা যাউক্।

প্রথমে ওসমান জগৎসিংহের প্রাণ রক্ষা করিয়া স্বয়ং একজন সৈনিকের সাহায্যে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইলেন। স্ত্রীলোকদের উপর কোন অত্যাচার না হয়, সে দিকেও ওসমানের দৃষ্টি ছিল। অয়েষা নিজেই ওসমানের চরিত্রের মহত্ত্ব গ্রন্থের একস্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। ওসমান যখন আয়েষার সেবাধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া জগৎসিংহের জীবন রক্ষা করিবার নিজ স্বার্থসিদ্ধির গূঢ় অভিসন্ধি ব্যক্ত করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, ওসমান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও কিছু ছিল। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে পাছে লোকে দয়ালু চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন, এবং দানশীলতা নারী স্বভাব-বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওসমান তাহারই একজন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওসমান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।" এস্থলে বলা প্রয়োজন যে যদিও ওসমান আয়েষার প্রেমাকাঙ্খী ছিলেন, আয়েষা তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতেন, ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ওসমান তাহা হইলেও আয়েষার প্রতি কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। এই সংযমও তাঁহার মহৎ চরিত্রের একটি লক্ষণ।

নবাব-নন্দিনী আয়েষার চিত্র আরও মধুর ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আয়েষা যেন সাক্ষাৎ করুণারূপিণী! শত্রু হইলেও আহত ও পীড়িত রাজকুমার জগৎসিংহকে দিনের পর দিন যেরূপ নিষ্ঠার সহিত একান্ত আগ্রহে ও ঐকান্তিক যত্নে সেবা করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন তাহা সত্যই অতুলনীয়। উহা দেখিয়া প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেনের কবিতাংশটি আমাদের মনে পড়ে—

> "ততোধিক রমণীর আছে কি বা সুখ,
> রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
> দিবে এই ধরাতলে রমণীর বুক।"
>
> ... ...
>
> 'মিত্ররে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা,
> তাহাতে মাহাত্ম্য কিবা আর,
> শত্রু মিত্র সমভাবে, যেই জন ভালবাসে
> সেই জন দেবতা আমার।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি মুসলমান-চরিত্র যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও কেহ কি বলিতে সাহসী হইবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন? [ক্রমশঃ

চোর

শ্রীআশীষ গুপ্ত

দামী কলমটা পরশুদিন পকেট হইতে চুরি হইয়া গেল। অথচ এই তিন দিন পূর্ব্বেও শঙ্কর যে অতিশয় সাবধানী লোক এবং তাহার কোন জিনিষ যে কোনদিন চুরি যায় নাই একথা লইয়া কি প্রচণ্ড অহঙ্কারই না সে করিয়াছে!

বৌদি কহিলেন, "পাশের পকেটে অমন করে কলম রাখ, বুক-পকেটে রাখলে কি হয়?"

শঙ্কর বলিল "বুক-পকেট থাকলে তাতে রাখলে ক্ষতি হয় না, না থাকলে একটু অসুবিধে হ'তে পারে।"

অপ্রস্তুত হইয়া সুনীতি বলিলেন, "ওঃ, তাই ত দেখছি বুক-পকেট নেই। ওটা না থাকাটাই আজকাল ফ্যাশান বুঝি!"

"ফ্যাশান নয়, জুগিয়ে উঠ্তে পারি নে। তবু ত একটা পকেটের কাপড় বাঁচে!"

ঠোঁট বাঁকাইয়া সুনীতি কহিলেন, "জুগিয়ে উঠতে পারিনে! ন্যাকামি! যেদিন চুরি যাবে কলমটা টের পাবে সেদিন।"

এই মন্তব্যের উত্তরেই শঙ্কর নানাবিধ বাহ্বাস্ফোট প্রকাশ করিল, সে পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়, সহুরে ছেলে, তাহার পকেট হইতে কলম চুরি করিবে এমনতর চোর অদ্যাবধি পৃথিবীতে জন্মায় নাই, যে-কোন চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে শঙ্কর তাহাকে শীতল করিয়া দিতে পারে, কোন তস্করের পিতার পিতারও সাধ্য নাই যে শঙ্করের কোন জিনিষে হস্তার্পণ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

অন্তরীক্ষবাসী ভগবানকে বহু সময়েই পৃথিবীর মানুষের বহু উক্তি শুনিয়া হাসিতে হয়। তাঁহাকে এত ঘন-ঘন হাসিতে হয় যে, সংশয় জন্মে তিনি হাসি বন্ধ করিবার সময় পান কখন! সেদিনও তিনি শঙ্করের কথা শুনিয়া হাসিলেন।

তারপর চোরের গল্প আরম্ভ হইল। দ্রৌপদীর বসনের ন্যায় এই হরণ প্রসঙ্গের আর অন্ত রহিল না। একজনের কাহিনী শেষ হইতে না হইতেই অন্যের কাহিনী আরম্ভ হইতে লাগিল। কাহারও সোনার বোতাম চুরি হইয়াছে, কাহারও ঘড়ি, কাহারও ফাউণ্টেনপেন, কাহারও পাস, মেয়েদের মধ্যে কাহারও গহনা, কাহারও বই ইত্যাদি। শুনিয়া শুনিয়া শঙ্করের মন খারাপ হইয়া গেল। প্রত্যেকেরই অন্ততঃপক্ষে একবার কিছুনা কিছু চুরি গেছে এবং সে কাহিনী তাহার বলিবার আছে, কিন্তু দুর্ভাগা শঙ্করের কোনদিন একটা ভোঁতা পেনসিলও চুরি যায় নাই! অতএব সেই চোর প্রপীড়িত মুখর সমাজে শঙ্করই একমাত্র মৌনীবাবা হইয়া বসিয়া রহিল, নিজেকে সে অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তস্কর মহারাজের এতগুলি নিগৃহীতের মধ্যে কেন যে তাহার সামান্য একটু স্থান হইল না, কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে তাহার কৃপাকটাক্ষ হইতে যে তিনি শঙ্করকে বঞ্চিত করিলেন বুঝিতে না পারিয়া শঙ্করের আর ক্ষোভের ইয়ত্তা রহিল না।

কিন্তু ভগবান বড় তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সুনীতির সম্মুখে শঙ্করের আস্ফালন শুনিয়া অন্তরীক্ষে বসিয়া যে হাসি তিনি হাসিয়াছিলেন সে-হাসির রেখা সেই স্বর্গীয় আনন হইতে তখনও মিলায় নাই!

বেলতলা রোডের মোড়ে বাসে উঠিতেই একটি ভদ্রবেশধারী যুবক তাড়াতাড়ি বাস হইতে নামিতে গিয়া একেবারে শঙ্করের গায়ের উপরেই পড়িয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বাস হইতে অবতরণ করিয়া রাজপথের পাশের গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্করের হঠাৎ সন্দেহ হইল এই লোকটির তাহার গায়ের 'পরে পড়িয়া যাওয়াটা যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। মনে হইতেই ডানদিকের পকেটে হাত দিয়া দেখিল, কলম অদৃশ্য হইয়াছে। ততক্ষণ বাসও কিছুটা অগ্রসর হইয়া গেছে। শঙ্কর পিছনের রাস্তার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে লোকটিকে আর দেখা গেল না। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া একটা সোরগোল তুলিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিবে কিনা একথা চিন্তা করিতে কিছুটা সময় গেল। মনে মনে হিসাব-নিকাশ

করিয়া দেখিল, কলিকাতার রাস্তায় নামিয়া চোর যখন একবার দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে পারিয়াছে, তখন এ-গলি সে-গলি করিয়া সে যে কোন্ গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা দড়ির কসরৎ দেখান অনেক সহজ, অতএব রাস্তায় নামিয়া আহাম্মকের ন্যায় "চোর, চোর" বলিয়া নিষ্ফল চেঁচামেচি না করাই ভাল। ততক্ষণে গাড়ী পদ্মপুকুর রোডের মোড়ে পৌঁছিয়াছে। শঙ্কর স্তম্ভিতভাবে নিজের আসনে বসিয়া রহিল, এমন কি গাড়ীর ভিতরকার অন্য কোন আরোহীকেও সে জানিতে দিল না যে পকেটমার তাহার কান মলিয়া দিয়া গেছে। প্রথমে তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইতে লাগিল। ব্যাটা চোরকে যদি হাতের কাছে পায় তাহা হইলে একটা ভয়ানক কিছু করে, এমন ভয়ানক কিছু করে যে সে বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া চিন্তা করিয়া সেই ভয়ানক কিছুর চেহারাটা অবধি ঠাহর করিতে পারা যাইতেছে না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহার ভারী লজ্জা হইতে লাগিল। বৌদির সম্মুখে যে বাহ্বাস্ফোট প্রকাশ করিয়াছিল সেকথা স্মরণ করিয়া বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়ে এবং বিশেষ করিয়া স্বয়ং বধূঠাকুরাণীর টিট্‌কারীর ভয়ে সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রৌদ্র-ওঠা কুয়াশার ন্যায় তাহার আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া মনে হইল, চোরটা বাহাদুর বটে!—আত্মম্ভরিতার মুখে নিজেকে একটু বেশী বাড়াইয়া বলিলেও শঙ্করের নিজের বিশ্বাস সে সত্যই চতুর এবং সাবধানী যুবক, কাহারও পক্ষে তাহাকে বোকা বানানো খুব সহজ কাজ বলিয়া শঙ্কর কোনদিন বিশ্বাস করে নাই। অথচ এ লোকটা দিন-দুপুরে তুড়ি দিয়া কলমটা লইয়া গেল! শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। না লোকটা চালাক বটে, ব্যবসায়ে হাত পাকাইয়াছে কি চমৎকার। আর তাছাড়া শঙ্করের কত বড় সুবিধা করিয়া দিয়া গেল সে! চৌরনিগৃহীত জন-সমাজে শঙ্করকে আর মুখ বুজিয়া বাক্‌সংযম প্রকাশ করিতে হইবে না। একবার কোথাও চোরের কাহিনী আরম্ভ হইলে এই কলম চুরির ঘটনাকে কত রকমে পল্লবীত করিয়াই যে শঙ্কর বলিতে পারিবে! গাড়ী যখন চৌরঙ্গীতে পৌঁছিল, তখন চোরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শঙ্করের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। বাহিরের ঘরে বসিয়া উকিল যোগেশ রায় নথিপত্র দেখিতেছিলেন। কি একটা প্রয়োজনে দু'এক মিনিটের জন্য উঠিয়া ভিতরে গিয়াছেন, এমন সময়ে ঘরে চোর ঢুকিল এবং টেবিলের 'পরে রাখা ক্যারাট-গোল্ড্-এর হাত ঘড়িটা লইয়া বিনানুমতিতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল, কিন্তু যোগেশবাবু ফিরিয়া আসিয়া প্রস্থানোদ্যত চোরকে দেখিতে পাইলেন এবং পিছন হইতে "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়ার লোক জড় হইয়া গেল, পিল পিল করিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী হইতে লোক বাহির হইতে লাগিল, চোরের কাছা ছাড়িয়া দিয়া যোগেশ রায় হাঁপাইতে লাগিলেন, পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ বণিতা চোরের ভার গ্রহণ করিল।

চোরের রং ফর্সা, চুল ঘাড়ের কাছ হইতে মস্তিষ্কের প্রায় মধ্যস্থল অবধি উত্তমরূপে কামান, কানের পাশ হইতেও প্রায় ইঞ্চি দু'এক চমৎকার করিয়া চাঁছা। গায়ে আলখাল্লার মত লম্বা এক ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, কাপড়ের কোঁচা গিলে করিয়া কোঁচান, কোঁচার প্রান্তভাগ তুলিয়া কোমরে গোঁজা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। চোর অস্বাভাবিক রকমের রোগা। সেই অতিশয় সরু মানুষটির ভাবভঙ্গী কিন্তু অত্যন্ত ভারিক্কি রকমের। মনে হইতে পারিত সভাসদ্-পরিপূর্ণ রাজসভায় যেন রাজাধিরাজ প্রবেশ করিয়াছেন! গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অপ্রসন্ন কণ্ঠে চোর বলিল, "আমায় যেতে দিন—"

যেন সভাশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভক্তবৃন্দের জনতার মাঝখান দিয়া প্রস্থানের পথ চাহিতেছেন, এমনিতর উন্নতর ধরনের বলিবার ভঙ্গী।

প্রত্যুত্তরে সম্মুখে ভোঁদা বলিয়া যে-ছেলেটি দাঁড়াইয়া-ছিল, সে চোরের ডান গালে সশব্দে চপেটাঘাত করিল।

এরূপ অপ্রত্যাশিত বর্ব্বরতায় চোর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল, "এর মানে?"

যোগেশ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রমেন্দ্র এবার পিছন হইতে চোরের বাঁ গালে চড় মারিয়া বলিল, "মানে তুমি আমাদের সার্ব্বজনীন শালা—"

ভিতর দিককার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মেয়েরা মজা দেখিতেছিলেন। রমেন্দ্রের স্ত্রী সুনীতিও তাহার মধ্যে

ছিলেন, রমেন্দ্রের কথা শুনিয়া এমনতর ভ্রাতৃপরিচয়ে সুনীতি লজ্জায় জিভ কাটিলেন।

শ্যামবাজারের প্রয়োজন সারিয়া শঙ্কর বাড়ী ফিরিতেছিল। কলমটা হারাইয়া যাওয়ার জন্য দুঃখ যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে তদপেক্ষা ঢের বেশী। এতদিন অবাধ কলম সামলাইবার জন্য বাসে, ট্রামে, পথে-ঘাটে কম মনোযোগ ব্যয় করিতে হয় নাই। কিন্তু তবুও দামী কলমটা! আর তা'ছাড়া যুদ্ধের বাজারে কলমের দাম যে-রকম বাড়িয়াছে, পুনরায় কিনিতে হইলে হয় ত' আগেকার দ্বিগুণ দাম দিয়া কিনিতে হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শঙ্করের যে খুব খারাপ লাগিতেছিল তা নয়, সামান্য একটা কলম সামলাইবার জন্য স্বচ্ছন্দভাবে পথ-চলা যাইত না। যাক্ আপদ গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। বাড়্তি বোঝা নীচে ফেলিয়া দিলে বেলুন যেমন হঠাৎ অতিরিক্ত লঘু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়, কলম হারাইয়া শঙ্করও তেমনি নিঃশেষে হাল্কা হইয়া যেন শূন্যে ভাসিতে লাগিল। পকেটে মাত্র তিন আনা পয়সা আছে, অতএব সে-দিকে আর মনোযোগ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নব লব্ধ স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া এ-দিক ও-দিক তাকাইতে তাকাইতে বড় বড় পা ফেলিয়া শঙ্কর বাড়ী ফিরিতেছিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দেখে ভিড় জমিয়া গেছে,—উঁকি মারিয়া দেখিল চোর ধরা হইয়াছে। চোরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জনে নানা মতামত প্রকাশ করিতেছিলেন। কেহ বলিতে-ছিলেন, একটা গাধা জোগাড় করিয়া তাহার 'পরে বসাইয়া চোরকে পল্লীপ্রদক্ষিণ করাইয়া আনা হউক। কেহ বলিতে-ছিলেন, বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য যে নাটমঞ্চ সজ্জিত করা হইয়াছিল তাহা এখনও খোলা হয় নাই, সেখানে দাঁড়াইয়া চোরকে বক্তৃতা দিতে ও গান গাহিতে বলা হউক। কেহ কেহ বা শুধু গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, ভাল করিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হউক। তা উত্তম-মধ্যমটা অতিশয় উত্তম ভাবেই চলিয়াছিল,—চড়, কিল, চাঁটি মারিতে আর পাড়ার বিশেষ কেহই বাকী ছিল না। চোর কিন্তু এত প্রহার হজম করিয়াও নির্বিকার! এক একবার মার খায় আর বলে, "মাইরি বল্‌ছি ভাল হবে না কিন্তু—"

কিন্তু কি যে খারাপ হইবে তাহা সে-ও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারে না এবং তাহার প্রহরীরাও সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব প্রহারের মাত্রা বাড়িয়াই চলে।

এমনই সময়ে এই দৃশ্যে শঙ্করের আবির্ভাব ঘটিল। উঁকি মারিয়া শঙ্কর দেখিল, না বলিয়া তাহার পকেট হইতে যিনি কলম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ভদ্রলোক! মুহূর্ত্তে শঙ্করের মনের মধ্যে নানাবিধ চিন্তার বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটিল। প্রথমে মনে হইল, ধরিয়া আচ্ছাসে একবার দক্ষিণ গণ্ডে ও আর একবার বাম গণ্ডে, পুনরায় দক্ষিণ গণ্ডে ও তৎপরে আবার বাম গণ্ডে গনিয়া গনিয়া কুড়িটি থাপ্পড় লাগায়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটার সদাশয়তার কথাও মনে হইল, চৌর্য্যপ্রপীড়িত মুখর সমাজে যে শঙ্করকে বাঙ্‌ময় হওয়ার সুযোগ দিয়াছে, তাহার পথ চলাকে যে নিরুদ্বিগ্ন করিয়াছে, আর—কথাটা মনে হইতেই শঙ্কর চমকিয়া উঠিল। সম্ভবত কলমটা এখনও ওর কাছেই আছে, হয় ত সরাইতে পারে নাই। নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সে তাহার না বলিয়া গ্রহণ করা কলম শঙ্করকে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে!—ইস্! লোকটা ছদ্মবেশী মহাপুরুষ না হইয়া যায় না!

জ্যেঠামহাশয় চীৎকার করিয়া প্রস্তাব করিলেন, চোরের কাপড় খুলিয়া লইয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে জল বিছুটি লাগান হ'ক। ব্যাটা চোর, খাটিয়া খাইতে পারে না, ভদ্রলোক সাজিয়া চুরি করিতে আসিয়াছে!

এরূপ ভয়াবহ প্রস্তাবেও চোর কিন্তু শুধু আর একবার বলিল, "মাইরি বলছি, ভাল হবে না কিন্তু।"

তস্করমহারাজের এরূপ ভয়প্রদর্শনেও দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ বিশেষ ভয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না, ফলে নূতন করিয়া তাহার পরে আর এক প্রস্থ কিল, চড় বর্ষিত হইল। কিন্তু চোর তবুও অচঞ্চল! সে কেবলই 'ভাল হইবে-না' বলিয়া সকলকে শাসাইতে থাকে, অথচ নিজে যে বিন্দুমাত্র কাবু হইয়াছে কিংবা ভয় পাইয়াছে এমন ভাব কিছুতেই প্রকাশ করে না! বা তাহার এরূপ নির্ব্বিকল্প সহিষ্ণুতা ও আত্ম-বিশ্বাস দেখিয়া সকলের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

রমেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, "অনেক মার-ধর ত হয়েছে, এবার ওকে নাকে খৎ দিয়ে ছেড়ে দাও যে আর এমনতর

কাজ করবে না। কিন্তু ছাড়বার আগে ক্ষুর দিয়ে ওর মাথা কামিয়ে ওর মাথায় একটা নিশান করে' দাও। বেশ কাপ্তেন বাবুটির মতন চেহারা, সাজ গোজও তেমনি, খাসা দেখতে হবে—"

চোর এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রহার খাইয়াও কাঁদে নাই, গাধায় চড়িয়া পল্লীপ্রদক্ষিণের সম্ভাবনায় কাতর হয় নাই, সঙ্গীত ও বক্তৃতার প্রস্তাবেও ত্রুটি গ্রহণ করে নাই, এমন কি বস্ত্রহরণ ও জলবিছুটির ন্যায় ভয়ানক অশোভন উক্তিতেও ভীত হয় নাই, কিন্তু মাথায় নিশানের পর স্বাধীনতার এমনতর মধুর প্রস্তাবে সে একেবারে হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজের নাক মলিল, কান মলিল, সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহারই পা ধরিতে লাগিল, "নাক খৎ দিচ্ছি বাবু, পায়ে পড়ছি বাবু, আর করব না বাবু মাথা কামিয়ে নিশেন করে দেবেন না বাবু—"

তাহার সে কি ব্যাকুলতা, সে কি মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি।

শঙ্কর ভাবিল, যুদ্ধের বাজারে কলমের দাম দ্বিগুণ হইয়াছে, বৌদির কাছে বড় মুখ করিয়া চোরের গল্প করিব সত্য, কিন্তু কলম পকেটে করিয়া কিছুতেই আর বাড়ীর বাহির হইব না।—কিন্তু এ লোকটা দেবতা না হইয়া যায় না। বাড়ী বহিয়া কলম ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে! অগ্রসর হইয়া আসিয়া পিছন হইতে চোরের কাঁধে হাত রাখিয়া কৌতুকম্পিত কণ্ঠে শঙ্কর ডাকিল, "বন্ধু—"

চমকিয়া উঠিয়া শঙ্করকে দেখিয়াই চোর পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "আপনার কলম নিন্ স্যর—"

নিজের কান মলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর কখনও করব না স্যর—"

হঠাৎ কেমন করিয়া যেন তাহার মনে হইল যে এবার আশ্রয় পাইয়া গেছে, আর তাহার আশঙ্কা নাই। চোর এইবার শঙ্করের কৌতুকোদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল।

অভিসার

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

কোন অতীতের ফাগুনের দিনে
এসেছিলে তুমি পথ চিনে চিনে
সাক্ষী করিয়া কোন দেবতারে ?
　　তুমি সঁপেছিলে মোরে প্রাণ,
ব্যর্থ করিতে বাসনা আমার,
　　গেয়েছিলে কোন গান ?
এসেছিলে জানি হাসিভরা মুখে
একাকীনি ওগো ভরা কৌতুকে
ললাটের পরে গুণ্ঠন টানি
　　নত মুখী বঁধু সম
সে রূপ তোমার আজিও কাঁদিছে
　　কিশোর চোখেতে মম।
আলো আঁধারের নির্জ্জন পারে
বাহিরিনু যবে আমি অভিসারে
তোমারে প্রথম হেরিলাম আমি
　　মিলনের বধুবেশে
প্রিয় বরণের মালাখানি লয়ে
　　সম্মুখে দাঁড়ালে এসে।

তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে তখন
বুনিতে ছিল যে ফুলের স্বপন
নিশীথের পাখী ডানার ঝাপটে
　　কত কথা গেল কয়ে
উদাসী পবন ফিরিতেছিল যে
　　বাঁশরীর সুর লয়ে
শুধানু তোমারে শত কুতুহলে
প্রথম ঊষার ফোটা ফুলদলে
ওগো অভিসারি! গাঁথিয়া এ মালা
　　কোথায় চলেছ লয়ে ?
অঞ্চল তলে যতনে ঢাকিয়া
　　জনহীন পথ বয়ে ?
ওগো একাকীনী কাহার লাগিয়া
কোন পথিকের স্মরণ মাগিয়া
আশার গরবে অলক দুলায়ে
　　কোথায় চলেছ তুমি ?
দলিয়া চরণে চির সুন্দর
　　শ্যাম তৃণদল ভূমি।

মিলন আশার মদিরায় মেতে
প্রেম ডালি লয়ে পথে যেতে যেতে
শুনিতে চাহি না অপরিচিতা গো
থাকে যদি কোন ক্ষতি
আমারে দেখিয়া কেমনে থামিল
চঞ্চল তব গতি।
কিবা তার নাম ? কোথা তার দেশ ?
কিবা তার রূপ ? কিবা তার বেশ ?
সযতনে গাঁথা মালাখানি তুমি
পরাবে যাহার গলে—
এতটুকু তার শুনিতে চাহি না
যাও বঁধু যাও চলে।
শুধু মনে রেখো এই পথে একা
মোর সাথে কভু হয়েছিল দেখা
হয়ত জীবনে তব সাথে বঁধু
দেখা নাহি আর হবে
কামনা আমার চিরদিন তবু
সাথে সাথে তব রবে।
পথ ছেড়ে দিনু, চলে গেলে ধীরে
ভুলেও বারেক চাহিলে না ফিরে
আমি সেথা বসে কাটানু যামিনী
বটতরু ছায়া তলে
বায়ু করে গেল কানা কানি শুধু
ঘন পল্লবদলে।
তখনো অরুণ মেলে নাই আঁখি
তখনো কুলায় জাগে নাই পাখী
তখনো কুসুম বনতরু তলে
বিরহে পড়েনি ঝরে
নাম খানি মোর লিখিয়া রাখিনু
সেই বটতরু পরে।

যদি কোন দিন এপথে তোমার
প্রয়োজন হয় ঘরে ফিরিবার
হয়তো সেদিন ভুলিয়া বারেক
চাহিবে বটের পানে
নাম খানি মোর নয়নে হেরিয়া
গেঁথে নিয়ে যাবে প্রাণে।
আমার গোপন হিয়াখানি ভরে
তব মুখছবি সযতনে ধরে
অলস চরণে প্রথম উষায়
ফিরে এনু যবে ঘরে
বিস্ময়ে হেরি মালাখানি তব
আমারি শয়ন পরে।
সহসা তখন সব কিছু ভুলে
মালাখানি তব দুটি হাতে তুলে
নয়ন জুড়ায়ে হেরিনু তাহারে
কত রূপে কত বার!
দীনতা আমার যতটুকু ছিল
ঘুচিল যে কিছু তার।
তুমি নাই শুধু মালাখানি রবে
এই কথা মোর মনে হ'ল যবে
যে পথে তোমার পেয়েছিনু দেখা
ছুটিনু সে পথ পানে
পথ পাশে হেরি শত ফুলদল
ঝরে গেছে অভিমানে।
নয়ন দু'খানি ভরে বঁধু জলে
ফিরে এনু সেই বট তরু তলে
হেরিনু সেথায় মম নাম পাশে
তব নাম আছে লেখা।
এতটুকু শুধু পরিচয় দিয়ে
কেন ফিরে গেলে একা ?

যদি কোন দিন দুর্য্যোগ বায়
শ্রাবণের ঘন প্লাবনের ঘায়
বট তরু হ'তে মুছে যায় হেরি
যুগল নামের রেখা
ভুলিব না তবু পেয়েছিনু যেই
অভিসারিকার দেখা।

বুদ্ধের অবদান

শ্রী মতিলাল দাশ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বুদ্ধের জীবন ও অবদান আলোচনা করিবার সময় আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের কথা ভুলিলে চলিবে না। অতি পুরাতন কালে বৈদিক যুগে যে সংস্কৃতি রূপ নিয়াছিল, নানা পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহার ধারা আজিও অব্যাহত আছে। কালের ও অবস্থার পরিবেশ অনুসারে তাহাতে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে তাই ভারতীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বুদ্ধদেব নূতনত্বের দাবী করেন নাই—তিনি পূর্ব্বতনের প্রতিষ্ঠার জন্যই আসিয়াছিলেন। যাহা ম্লান ও যাহা দূষিত হইয়াছিল তাহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া তিনি ভারতীয় চিন্তার সমুজ্জ্বল নূতন রূপ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবকে তাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রচার করিলে আমরা ভুল করিব। মাঝে মাঝে যে সব সংস্কারক আসিয়া ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সাধনা ও বাণীতে তাই পূর্ব্বতন দার্শনিক চিন্তা, পূর্ব্বতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত রিজ ডেভিডস যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :—

"There was not much in the Metaphysics and Psychology of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems and a great deal of his morality could be collected from earlier or later Hindu books. Such originality as Goutama professed lay in the way in which he adopted, enlarged, ennobled and systematized that which had already been well said by other, in the way in which he carried out to their logical conclusion principles of equity and justice already acknowledged by some of the most prominent Hindu thinkers. The difference between him and other teachers lay chiefly in his deep earnestness and in his broad public spirit and philanthrophy."

সত্য চিরন্তন, সত্য সার্ব্বভৌমিক। মহৎ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা নূতন রূপ নেয়—তাহাতেই মহাপুরুষের

বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ আপনার সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতির যে নব রূপ দিলেন তাহাই আজ পৃথিবীর বৃহত্তর ধর্ম্ম। দেশের অচলায়তন ছাড়াইয়া তাহা নব নব রাষ্ট্রে পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তাহার এই সর্ব্বভৌমিক রূপ। আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্ববোধ আধুনিক মনোভাব। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার হইলেও বিশ্বমানবতার প্রচার যথোচিত হইতেছে না। মানুষ আজিও স্বাদেশিকতায় আড়াল তুলিয়া রণতাণ্ডবে মত্ত হইতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু বুদ্ধ যে দীপ জ্বালিলেন, যে দীপ কোনও বিশেষ জাতির, বিশেষ দেশের নয়। ইহুদীরা ভাবিত তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র তাহাদের জন্যই ধর্ম্ম বিকশিত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ তাহার বাণী নির্ব্বাচিত কোনও দল বা জাতির জন্য করেন নাই—তাহার শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক বুদ্ধের বাণীকে দেশ দেশান্তরে পাঠাইবার

বিশেষ চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রবাহিত ও ব্যাপ্ত করিয়াছেন, মহারাজ অশোকও তেমনই বুদ্ধের অবদানকে বিশ্বজনীন করিয়াছেন। বুদ্ধ ভাব, অশোক ক্রিয়া, বুদ্ধ তেজ, অশোক প্রকাশ। মনস্বী এইচ, জি, ওয়েলস অশোককে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম নরপতি বলিয়া অর্ঘ্য দিয়াছেন—সে অর্ঘ্য তাঁহার প্রাপ্য। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বারানসীর নিকট সারানাথের মৃগদাব নামক উদ্যানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। বর্ষা ঋতু তিনি ধর্ম্মালোচনায় কাটাইলেন। বর্ষান্তে তিনি শিষ্যদের নবধর্ম্মের পতাকা হস্তে বাহির হইতে বলিলেন—

"প্রিয় ভিক্ষুগণ !

পেয়েছ যে ধর্ম্মসুধা কল্যাণ-উজ্জ্বল,
আদিতে কল্যাণ যার, অন্তেতে কল্যাণ,
মধ্যেও কল্যাণ-জ্যোতি লহ সেই ধর্ম্ম
দেশ দেশান্তর, বহু জন হিত লাগি,
যাও অনুকম্পা ভরে করহ প্রচার
বহুজনে দিতে সুখ নির্ব্বাণের বাণী
কামনার ধূলি-জাল করে নি আচ্ছন্ন
মনশ্চক্ষু যাহাদের তারা অনায়াসে
করিবে প্রত্যক্ষ নব সত্য তোমাদের।
অমৃতের স্বাদ লভি প্রবৃত্তির দাস
হবে যাত্রী আশান্বিত নির্ব্বাণ-পথের।
যাও সবে যাও প্রদীপ্ত উৎসাহভরে
মানুষের ঘরে ঘরে করহ প্রচার
নব পরিত্রাণ-বাণী।"

ভিক্ষুরা প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্ম তাই সর্ব্বমানবের পবিত্র উত্তরাধিকার—তার সাধনরত্ন প্রতি মানবের অমূল্য সম্পৎ। জগৎ জুড়িয়া যেখানে যে আর্ত্ত আছে যেখানে যে পীড়িত আছে তাহার জন্যই এই অমৃতের প্রস্রবণ চির উন্মুক্ত। আর্ত্ত পীড়িত ভয়ার্ত্ত মানব তথাগত গুরুর মত উপদেশ দেন না, বন্ধুর মত আলিঙ্গন করেন। তাহার বাণী—

"অত্তদীপা বিহরথ অত্তশরণা অনঞঞ শরণা
ধম্মদীপা ধম্মশরণা অনঞঞ শরণা।"

আপনাকেই আপনার দীপ হইতে হইবে, আপনার দ্বারাই ভবনদী পার হইতে হইবে—অনন্যকারণ হইয়া ধর্ম্মকে দীপ করিয়া সত্য লাভ করিতে হইবে।

বুদ্ধ তাই পূজা চান না—তিনি শুধু পথ প্রদর্শক। নিজে যে অমৃত পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সর্ব্বমানবের জন্য তাহার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন—উত্তর-যাত্রীরা তাহার আবিষ্কারের ফল লাভ করুক, এইমাত্র তাহার বাসনা।

তথাগত তত্ত্বের জালে মানুষকে ব্যাকুল করেন না—তিনি মানুষকে সরল সহজ আত্মোৎকর্ষসাধনের পন্থা দেখান। যে যে পরিবেশে আছে সে সেই পরিবেশে থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই—সে বুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিলেই বৌদ্ধ। বুদ্ধপন্থা হইতে তাই বিচিত্র ও বিভিন্ন মানুষের কোনও বাধাই লাগে না। বৌদ্ধধর্ম্মের অবারিত-দ্বার পীড়িত ও তাপিত নর ও নারী যখন খুশী বুদ্ধের শরণ লইয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

বুদ্ধের দ্বিতীয় অবদান তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যখন বিজ্ঞান মানুষের জীবনে আজিকার মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সেই প্রাচীনকালে বুদ্ধ আপন ধর্ম্মকে নিরঙ্কুশ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বৃহস্পতির বচন অবশ্য আছে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কিন্তু সত্যকার জীবনে আমরা শাস্ত্রদাস আচারদাস হইয়া চলি। বুদ্ধদেব কিন্তু তারস্বরে বলিলেন যে তাহার কথা যেন কেহ অবিচারে মানিয়া না লয়, সকলে যেন তাহার ধর্ম্মকে পরীক্ষা করিয়া লয়।

"হে নির্ব্বাণ-পথযাত্রী !

যে ধর্ম্মে আহ্বান করি তোমা সবাকারে
চির অনবদ্য তাহা মঙ্গল-নিদান
সুধীজন মানে তারে প্রশস্ত উদার।
এস হে মানব হে তাপিত আর্ত্ত বন্ধু,
এস মোর কাছে, আমি দিব সুধাধারা,
বলিব না কোনো দুর্জ্জ্ঞেয় রহস্য কথা,
জানাব না পুরাতন সেকালের বাণী,
চাহিব না বিশ্বাসের মূঢ় ভক্তি বন্ধু,
বলিব যা দেখে নিও নিজ চক্ষু দিয়া
বুদ্ধি দিয়া বিচারিয়া করিও গ্রহণ,
বুঝিবে সুফল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণে।
জানে না আড়াল কোনো মোর বাণী প্রিয় !
সে যে ঋজু, সুপ্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট সরল।"

এই কারণেই বুদ্ধের বাণী আধুনিক বুদ্ধিজীবি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। বুদ্ধের সহিত আর একজন মহাপুরুষের তুলনা হয় - তিনি পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ। উভয়েই বেদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করেন এবং ধর্ম্মকে আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও অসারতা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মকে জীবন পথের আলো করিয়া তোলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা অপরাজের গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই অস্বীকার করেন। যে আত্মতত্ত্ব উপনিষদের চরম অবদান, সেই আত্মতত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করিয়া অনাত্মবাদের উপর আপন ধর্ম্মকে দাঁড় করান। বেদবিরোধী বলিয়া বুদ্ধ তাই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হন এবং কালক্রমে আপন দেশ হইতে তাহার ধর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃত ভাবে দেখিলে গীতার শিক্ষা ও বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই—গীতার 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ'—শ্লোকের সহিত বুদ্ধের মুদিতা, মৈত্রী ও করুণার চমৎকার সাদৃশ্য আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তুমি নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে। বুদ্ধও বলিয়াছেন—তুমহেহি কিচ্চং আতম্পং—তোমাকেই উদ্যমের সহিত তপস্যা করিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ আর বুদ্ধের নীতির মধ্যে বহুল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ কোন বিষয়ে আপোষ করেন নাই—তাঁহার নির্ম্মল প্রজ্ঞায় সত্যের যে রূপ ফুটিয়াছে, তাহাকে তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নির্ভীক ঋজুতা, এই সত্যানুসন্ধিৎসু তিগ্মতা, এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁহার শিক্ষাকে বর্ত্তমানের মানুষের এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

বুদ্ধের তৃতীয় বিশেষত্ব—তাহার অনন্যসুলভ প্রাজ্ঞসতা। তত্ত্বের দুর্গম গহনে তিনি সাধককে পথ হারাইতে বারণ করিয়া কল্যাণ ও মঙ্গলের জীবনবৃত্ত অনুসরণ করিতে বারংবার বলিয়াছেন। দার্শনিক কচকচি তিনি ভালবাসিতেন না। যাহা অনির্ব্বচনীয় চরম সত্য তাহা মানুষ কোনও দিন বাক্যে বলিতে পারে না, জীবনের এক বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে সত্যজ্যোতি মানুষের হৃদয়ে আপনা আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা যত দিন না হয় ততদিন এই সমস্ত অব্যক্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব লইয়া অপ্রতিষ্ঠ তর্ক করিয়া লাভ নাই। নির্ব্বাণের শান্তি মানুষের কাম্য—অনির্ব্বচনীয় রহস্য লইয়া কালক্ষেপ করা অথবা অপব্যয় সে বরং মানুষকে ভ্রান্ত করে।

মঝ্ঝিমনিকায় সূত্রে তিনি একটী চমৎকার উপমা দিয়াছেন—একজনের দেহে বিষাক্ত তীর লাগিয়াছে, সে যদি তৎক্ষণাৎ তীর না উঠাইয়া তীর নির্ম্মাতা কে, কে তাহার নিক্ষেপকারী, কি তাহার উদ্দেশ্য এইসব বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সে যেমন অর্ব্বাচীনের মত কাজ করে, তেমনই আধিব্যাধি শোকতাপে জর্জ্জর মানুষ যদি নির্ব্বাণের পথ সন্ধান না করিয়া পৃথিবী ও আত্মাকে লইয়া গভীর তত্ত্বানুশীলন করে তবে সে মূর্খতারই পরিচয় দিবে।

বুদ্ধের দৃষ্টি প্রাগ্‌ম্যাটিক। তিনি যে চারি আর্য্যসত্যের সন্ধান পান, দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ মার্গ—এই সত্য কার্য্যকরী। ইহার আলোচনা ও অনুশীলনে মানুষের সত্যকার উপকার হয়।

দুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিসংশয়ী। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ আমাদের সকলেরই জীবনে ঘটিতেছে—এই দুঃখই মানুষকে দার্শনিক করিয়া তোলে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক মতবাদের দ্বারা বুদ্ধ দুঃখের কারণ নির্ণয় করিলেন—প্রতীত্যসমুৎপাদ এক কথায় ল' অব কজেসান (Law of causation)। দুঃখ বিদ্যমানতার মূল জন্ম। মানুষের যদি জন্ম না হইত, তাহা হইলে তাহাকে কোনও দুঃখ পোহাইতে হইত না। জন্মের কারণ কি? ভব। ভব শব্দের অর্থ জন্মিবার ইচ্ছা—আসক্তি অনুরাগ রূপ উপাদান হইতেই জন্মিবার প্রবৃত্তি হয়। তৃষ্ণা এই উপাদান সৃষ্টি করে। কিন্তু তৃষ্ণা হয় কেন? কারণ পূর্ব্বে সেই সব কামনার বিষয় আমরা উপভোগ করিয়াছি—ইহারই সংজ্ঞাশব্দ বেদনা। তৃষ্ণার কারণ বেদনা—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ হইতেই বেদনা হয়, সংযোগের মূল ষড়েন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষড়ায়তন নামরূপের উপর অবস্থিত আমাদের দেহ মন। নামরূপ—বিজ্ঞানই তাহার মূল—সংস্কার হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন, অবিদ্যাই সংস্কারের কারণ। এই দ্বাদশ হেতুই মানুষের জন্মের ধারাবাহিক কারণ পরম্পরা, ইহাকেই চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান বলে।

বুদ্ধ বুঝিলেন অবিদ্যাই দুঃখোৎপত্তির কারণ। অবিদ্যার

যদি তিরোধান হয় তাহা হইলেই দুঃখ নিরোধ হইতে পারে। এই দুঃখ নিরোধের নামই নির্ব্বাণ। এবং দুঃখ নিরোধের পথ বুদ্ধের অষ্টাধিক মার্গ—সম্যগদৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্ সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যসজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই চতুরার্য্যসত্যের জ্ঞানলাভ সাধনার প্রথম স্তর। নির্ব্বাণ পথযাত্রী দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, দুঃখ নিরোধ কি এবং তাহার রাজ্য কি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া সাধনা আরম্ভ করিবেন। এই জ্ঞান লাভ করিয়া অহিংসা, নৈষ্ক্রাম্য, অব্যাপদ এই তিন বিষয়ে গভীর সংকল্প করিতে হইবে। সাধক আসক্তি ত্যাগ করিয়া অহিংস জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিবে।

চতুর্ব্বিধ মিথ্যা ত্যাগকে সম্যক্ বাক্ বলে—সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচার প্রথম, একজনের কথা অন্যকে বলিয়া তাহার ক্রোধ উৎপাদন পিশুনতা, পরুষ বাক্য তৃতীয়, অলীক কথায় মনস্তুষ্টি সম্পাদন—চতুর্থ। এই চারি প্রকার মিথ্যাবাক্য পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রাণিহত্যায় বিরতি, পরস্বাপহরণে নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য্যকে সম্যক কর্ম্ম বলে। যে সাধক সে সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে—দগ্ধোদরের জন্য সে যেন অসদুপায় অবলম্বন না করে।

পাপনাশ, পাপ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা, পুণ্য উৎপাদন এবং পুণ্যবর্দ্ধনকে সম্যক ব্যায়াম বলে। সত্য জানিয়া যে নির্ব্বাণ পথে চলিয়াছে বারংবার তাহার পদস্খলন হইতে পারে, আত্মজয়ের জন্য তাই তাহাকে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিতে হইবে।

সাধককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার শরীর শরীর মাত্র, তাহার বেদনা বেদনা মাত্র, তাহার চিত্ত চিত্ত মাত্র, তাহার ধর্ম্ম ধর্ম্ম মাত্র। সাধক কখনও যেন ভ্রমবশে দেহকে আত্মা বা বিষয়কে আত্মীয় বলিয়া না দেখেন। সম্যক সমাধি চতুর্ব্বিধ ধ্যান বিতর্ক বা বিচার দ্বারা অনাসক্ত হইয়া মানুষ ধ্যানের আনন্দ লাভ করে। তাহার পর স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও শীল লাভ করে।

ইহাই বুদ্ধের বিশ্বাসলাভের মার্গ—জ্ঞান, আচরণ ও ধ্যানকে সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস করিয়া মানুষ এই পথে কল্যাণ, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও চিরশান্তি লাভ করে। বুদ্ধধর্ম্মকে অনেকে শূন্যতার সাধন বলিয়া ভুল করেন।

বুদ্ধ নিবৃত্তি-মার্গের উপদেষ্টা, কিন্তু এই নিবৃত্তি-মার্গ সাধককে জড় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে না, বরং তাহাকে বীর্য্যবান্ অনলস কর্ম্মী করিবে। বুদ্ধের চতুর্থ বিশেষত্ব তাহার সেবাধর্ম্ম।

বৌদ্ধসাধনায় শীলপালন নির্ব্বানলাভের পন্থা। এই সুখকর শীলগুলি চরিত্রকে দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলে, তাই আজীবন শীল পালন করিতে হইবে। বুদ্ধদেবের এই শীলসাধন এক অভিনব জিনিষ। মানুষ ইহলোক ও পরলোকের সুখকামনায় যে-সব যজ্ঞ, পূজা, ব্রত ও পার্ব্বণ করে বুদ্ধ তাহাদিগকে নিষ্ফল বলিয়াছেন। তিনি সংযম, ইন্দ্রিয় জয় ও চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু চরিত্র শুধু Puritanism নয়—শুষ্ক বৈরাগ্য নয়, ইহা প্রেমময় দয়া দাক্ষিণ্য মৈত্রী মূলক কল্যাণব্রত। বৌদ্ধসাধক চিত্তকে কখনও অনাবৃত রাখিবেন না, তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা মঙ্গলভাবনা দ্বারা চিত্তকে পুণ্য ও পবিত্র রাখিতে হইবে।

বৌদ্ধসাধকের ভাবনার পঞ্চবিধ ভাগ—মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, উপেক্ষা ও অশুভা। প্রথম অনুশীলন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গলকামনা—স্থাবর জঙ্গম চরাচরের মৈত্রী-ভাবনা—যেখানে যত প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই যেন ক্লেশ, পীড়া ও অসৎ আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে মুক্তিলাভ করে। দ্বিতীয় অনুশীলন—করুণা ভাবনা—জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অনুধ্যান। সংসারে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখি তাহাতে আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলতাকে মানিয়া দুঃখ-মোচনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। তৃতীয় অনুশীলন—মুদিতা ভাবনা। সাধকের চিত্তে আসিবে আনন্দের উৎস, যে আনন্দে তাহার দৃষ্টি খুলিবে। সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সাধক ভাবিবেন পৃথিবীর সকলেই সমুন্নতির সৌভাগ্য লাভ করুক, সকলেই শ্রী ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হউক। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে। ধীরে ধীরে দৃষ্টির প্রসার হইবে। সাধক পল্লী, রাষ্ট্র প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবকে এবং বিশ্বজগতকে ভালবাসিতে শিখিবেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অনুশীলন আত্মসম্পর্কীয়—এই দেহকে কৃমি কীটসঙ্কুল জানিয়া সাধক দেহপ্রীতি ভুলিয়া সৌভাগ্যের

প্রতি বিতৃষ্ণ হইবেন এবং উপেক্ষা ভাবনায় সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইবেন। উপেক্ষা ভাবনায় কাহাকেও প্রিয় কাহাকেও অপ্রিয় এই বোধ থাকিবে না—উপেক্ষা কামনা পরিশূন্য অবস্থা। বৌদ্ধেরা উপেক্ষা ভাবকে সর্ব্বোচ্চ ভাব বলেন। উপেক্ষা ভাবের সহিত গীতার স্থিতধী মুনির অবস্থা তুলনীয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

গীতার এই শ্লোকের সহিত উপেক্ষা ভাব অনুরূপ বলিয়া মনে হইবে।

গীতার অনুশাসন আর বুদ্ধানুশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতই পড়া যায়, ততই উহাদের সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর ভাবে পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। উভয় সাধনাই মানুষকে নিরাসক্ত নির্ব্বাসনা হইতে বারংবার উপদেশ দিয়াছে। উরগবগ্‌গে মৈত্রীসূত্রে ব্রহ্মবিষয়ের যে বর্ণনা পাই তাহা পড়িলে মনে হইবে যেন গীতা পড়িতেছি :—

　　　　শান্তিকামী নর,
কর্ত্তব্যকুশল হবে,　　বিনীত, সরল,
অভাব অল্পই তার,　　নাহি অভিমান
অল্পেই সন্তুষ্ট রবে,　　না রবে ভাবনা
জিতেন্দ্রিয়, বিবেচক　　পাপহীন সদা
অপ্রগল্‌ভ, অনাসক্ত,　　করুণা-বিহ্বল।
সব জীব হোক সুখী,　　হোক্ নিরাপদ
সবল দুর্ব্বল কিংবা　　ছোট বড় যারা
দৃষ্ট কি অদৃষ্ট　　দূরে বা নিকটে যারা
ভূতকালে ভাবীকালে　　যেথা যত প্রাণী
হোক্ সবে সুখী—　　এ হবে ভাবনা তার।
করে না বঞ্চনা কারে,　　নাহি জানে ঘৃণা,
ক্রোধে কভু নাহি করে　　অহিত চিন্তন।
পুত্রের জীবন যথা　　নিজ আয়ু দানে
রক্ষেন জননী,　　সর্ব্ব প্রাণী প্রতি তথা
রাখিবে অমেয় প্রীতি　　চিত্তে নিরন্তর।
বৈরশূন্য বাধাশূন্য　　ছড়াবে চৌদিকে
ঊর্দ্ধে নীচে দশ দিশি　　সর্ব্বক্ষণ ধরি
চলিতে বসিতে কিংবা　　শয়নে স্বপনে
মৈত্রীর মঙ্গল-চিন্তা　　হবে ধ্যান তার।

যিনি নিরাসক্তভাবে 'উস্‌সুকেসু অনুস্‌সুকেসু বিহরাম অনুস্‌সুক'—সেই সাধককে আমরা দুর্ব্বল, ভীরু, নিষ্কর্ম্মা বলিয়া যেন ভুল না করি।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীল লেখক আলডুথ হাকসবিন তার 'লক্ষ্য ও পথ' নামক অতিসুন্দর পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"The ideal man is the non-attached man. Non-attached to his bodily sensations and lusts. Non-attached to his craving for power and professions. Non-attached to the objects of those various desires. Non-attached to his anger and hatred, non-attached to his exclusive loves. Non-attached to wealth, fame, social position. Non-attached even to science, art, education, philanthrophy .....Non-attachment is negative only in name. The practice of non-attachment entails the practice of all the virtues......Non-attachment imposes upon those who would practise it, the adoption of an intensely positive attitude towards the world."

বুদ্ধের পঞ্চম অবদান—এই Intensely positive attitude towards the world. আত্মতত্ত্বের গহন বনে, পথ হারাইয়া এই সুন্দর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীর সুন্দর জীবন-যাত্রার প্রতি অনেকে বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল। বুদ্ধের প্রেমের ধর্ম্ম, সেবার বাণী এবং কল্যাণব্রত মানুষের দৃষ্টি ফিরাইল। মানুষ এই জগতের জীবনকে পুণ্য, পবিত্র, স্বচ্ছ, মধুর ও সুন্দর করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের ফল তৎকালীন সংস্কৃতিতে দেখিতে পাই।

বুদ্ধের আগমনে দেশে যে নব বন্যা আসিল, তাহাতে চারিদিকে আনন্দ ও শিল্প প্রকট হইল। কাব্যরস উজ্জ্বল হইল—বৌদ্ধগয়ায় ও সাহিত্যে তাহার পরিচয়। অজন্তার চিত্রকলা, নানা মন্দির ও স্তূপে যে ভাস্কর্য্য আপন ঐশ্বর্য্য ও ছন্দ বিলোল করিয়া দিল তাহাই বৌদ্ধ-সাধনার জীবন-প্রীতির পরিচায়ক।

বুদ্ধের জ্ঞানমূলক প্রেমকে এবং তাঁর নির্দ্ধারিত নির্ব্বাণকে অনেকে ভুল করেন। নির্ব্বাণ শূন্যতা নয়—ইহা নাস্তিত্বের জয়গান নয়। নির্ব্বাণ কামনার অগ্নি জ্বালায়, নির্ব্বাণ—অস্তিত্বের আনন্দের ধ্বংস নহে—নির্ব্বাণ নেগেটিভ নয় পজিটিভ, তাহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় প্রাপ্ত। নির্ব্বাণ

তৃষ্ণার যে অনলশিখা প্রতি নিয়ত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে তাহারই ক্ষয়। কর্ম্মবন্ধনই তৃষ্ণার মূল—জন্ম, জরা, মরণ, পথ প্রবর্ত্তক সেই কর্ম্মবন্ধনের ক্ষয়ই নির্ব্বাণ। মিলিন্দ প্রশ্নে গ্রীক রাজা মিলিন্দের সঙ্গে বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে চমৎকার আলাপ আছে, কৌতুহলী তাহাতে নির্ব্বাণের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন।

নাগসেন বলেন—"নির্ব্বাণ সুখময়, শান্তিময়, আনন্দনিলয় আনন্দপ্রদ এক পরম পবিত্র অবস্থা। কেহ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে, সহসা তাহাকে কেহ মুক্তি দিল—তখন তাহার যে অবস্থা, নির্ব্বাণের আনন্দও সেইরূপ। অজ্ঞান অহঙ্কার প্রভৃতি অগ্নিশিখা তাহাকে ঘিরিয়াছিল তাহা হইতে সে উদ্ধার পাইল। কেহ মলিন ক্লিন্ন পচনশীল গর্ত্তে আছে, সে মুক্ত হইলে যে শুচিসুন্দর ভাব অনুভব করে, নির্ব্বাণে তাহাই হয়, আক্রান্ত ব্যক্তি মুক্ত হইলে যে নির্ভাবনা পায়, নির্ব্বাণ সেইরূপ অভয় দেয়।"

নাগসেনের এই অনুপম সংলাপ হইতে আমরা জানিতে পারি, নির্ব্বাণ শূণ্যতা নয়।

নির্ব্বাণ পবিত্র আনন্দময় অন্তরের অনুভূতি, অবিদ্যা ও তৃষ্ণা পরিশূণ্য অবস্থা। নির্ব্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র—ক্লেশমুক্ত কমলসদৃশ নির্লিপ্ত অবস্থা, বিপদহীন, বিভিষিকা হীন, শান্তিময় অনুপম অনির্ব্বচণীয় অবস্থা।

নির্ব্বাণ-পথ জীবনকে অস্বীকার করে না—জীবনকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে বলে। অহং বোধের মধ্য দিয়া যখন জগৎ দেখি তখন পাই কেবল ব্যথা ও বেদনা, যখন প্রেমের মাঝে দিয়া দেখি তখন তাহাকে সুন্দর ও মধুর দেখি। ভিক্ষুগণকে উপদেশে তিনি বলেন,

> যো তস্সা এব তণহায় আসেস বিরাগ নিরোধো
> চাগো পটিনিস্সগ্‌গো মুত্তি অনালয়ো॥

তৃষ্ণায় যে নিরোধ, বিরাগ বা বিসর্জ্জন তাহাই মুক্তি, তাহাই দুঃখ নিরোধ। এই কামনার নিরোধ হইলেই আমরা মর্ত্তোই অমৃত লাভ করিতে পারি।

এই অমৃত জীবনের জন্য বুদ্ধের শীল, বুদ্ধের নীতি ও কল্যাণব্রত। আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জল্পনা অনেক হইয়াছে, আমাদের দেশে দীনতম লোকও অনেক দার্শনিক সত্য জানে, কিন্তু তাহার ফল ব্যর্থ হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পতনের গভীর অন্ধকার হইতে রক্ষা করে নাই, কারণ দার্শনিকতা মানুষকে বড় করে না, বড় করে চরিত্র।

আমরা চরিত্রহীন, তাই আমাদের এই বিরাট অধঃপতন। দার্শনিক বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া আমরা যেন বুদ্ধের অনুশাসন পালন করি:—

> সর্ব্ব পাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা।
> সচিত্ত পরিয়োদসং এতং বুদ্ধান সাসনং॥

আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার পাপকে বর্জ্জন করি, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং চিত্তকে পরিনির্ম্মল করি। তার্কিকতা এবং দার্শনিকতা শেষ হউক, দেশে বাড়ুক নির্ম্মল মেধা, জাগুক বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রবল। পৃথিবী যেখানে যে মানুষ আছে চরিত্রের মাধুর্য্য সকলে বোঝে, সকলে তাহাকে বোঝে, সকলে তাহাকে অনুসরণ করে। ভাবী বিশ্বমানবতার যুগে বুদ্ধ কথিত এই চরিত্রবলই মানবের প্রধানতম কাম্য হইবে।

ষষ্ঠ অবদান—তাহার কর্ম্মতত্ত্ব। ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদের অংশ—দৃশ্যমান বিশ্বচরাচর অচিরস্থায়ী—যাহা দেখিতেছি তাহা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত, যেখানে কারণ আছে সেখানে কার্য্য ঘটিবে, সেই কার্য্য কারণ হইয়া নূতন ফল প্রসব করিবে, এইভাবে পৃথিবীর অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়াছে। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার কেহই নিয়ামক নাই, ইহা স্বতঃ স্বতঃ পরিচালিত, যখনই কোনও কিছু ঘটিতেছে, তাহার ফল কিছু ফলিতেছে। কোনও কিছুই নিরপেক্ষ নহে, সকলই আপেক্ষিক। সংসারে দৈব বা অকস্মাৎ বলিয়া কিছু নাই—সকলই এক চিরন্তন শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাই, "যে কাজ করিবে তাহারই ফল পাইবে। কর্ম্মে আমার অধিকার, কর্ম্মেই আমার উত্তরাধিকার, কর্ম্ম দ্বারাই আমার জন্মস্থান নির্দ্ধারণ, কর্ম্ম দ্বারাই আমার জাতি, কর্ম্ম দ্বারাই আমার আশ্রয়।"

কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তাহার হাত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু এই কর্ম্মবাদ fatalism নয়। বুদ্ধ মানবাত্মাকে কর্ম্মের চেয়ে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই শাশ্বত প্রবাহ মানুষের প্রজ্ঞার সাহায্যে শেষ হইতে পারে।

কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া মানুষ আসাগারিক হইতে পারে। চক্র যেমন বাহকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কর্ম্মও তেমনিই কর্ত্তার পদানুসরণ করে।

মানুষই আপন চেষ্টায় আপন অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিতে পারে, আপন শক্তিতেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্তির বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। ঘরে প্রদীপ থাকিলে যেমন সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনই প্রজ্ঞার উদয়ে সকল অবিদ্যার শেষ হয়—মানুষ শাশ্বত শান্তি অধিগম করে।

কর্ম্মই নিয়ামক শক্তি—কর্ম্মই জগৎলীলার নটরাজ। তাহার দুরতিক্রম্য দুর্ব্বার রথচক্র বহিয়া চলিয়াছে। আত্মচেষ্টা বলে আত্মশক্তিতে তাহার গতি কমাইতে হইবে। আত্মশক্তিহীন হইয়া সেই কাজ করিতে হইবে যে কাজ করিলে লোকের অনুতাপ করিতে হইবে না এবং যাহার ফল আনন্দ ও প্রফুল্লমনে গ্রহণ করিতে পারা যায়। আসক্তির বন্ধনই সকলের চেয়ে দৃঢ়, সে বন্ধন খুলিবার জন্য চাই জ্ঞান কঠিন বজ্র, মুদিতামধুর কল্যাণব্রত, দৈবীমধুর আনন্দ।

বুদ্ধের সপ্তম ও শ্রেষ্ঠ অবদান—তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন। ধর্ম্ম ও দর্শন যখন কেবলমাত্র বাঙ্ময়, তখন তার প্রভাব থাকে না। যখন তাহা সাধনায় চিন্ময় হইয়া উঠে তখনই তাহা ব্যাপক ও প্রভাবশালী হয়।

বুদ্ধের যে অকলঙ্ক জীবন বৃত্ত বৌদ্ধসাহিত্যে আমরা পাই—তাহার মাধুর্য্যের সহিত তুলনা করা যায় এমন জীবন দুর্ল্লভ। তিনি আপন অলৌকিক প্রতিভায় যে মহান্ সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তত্ত্ব মাত্র হইয়া রহে নাই। নিজের জীবনে তিনি এইসব নির্জ্জীব সত্যকে আপন সাধনায় প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ত' পথভ্রষ্ট আর্ত্ত আমরা তাঁহার সত্যকে কেবল মাত্র দর্শন বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না, তাঁহার বাণীতে হৃদয়ের খাদ্য ও প্রাণের অস্ত্র গড়িয়া তোলে।

প্রাণবান্ এই মহাপুরুষের চরিত্রচিত্র বিশ্বমানবের ধ্যানের বস্তু। পূজাই তথাগতের সেই সুবিমল জীবনায়ন বিশ্বমানবের পূজার সামগ্রী হউক। বুদ্ধদেব হয় ত' যুগোত্তর ও কালোত্তর মহাপুরুষ ছিলেন।

বিজ্ঞান যখন মানবসভ্যতাকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে, সাগর, গিরি, মরু যখন দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িতে পারিতেছে না, দেশদেশান্তর যখন সন্নিকট হইয়া উঠিয়াছে, এই ত' তথাগতের মৈত্রীভাবনার যুগ—এই ত' বুদ্ধের কল্যাণব্রতের উদ্‌যাপনের শুভ অবসর। আজই ত' বিশ্বে মহোৎসবের আয়োজনের কাল—আজই ক্ষুৎক্ষাম আর্ত্ততাপিত লক্ষ লক্ষ মানব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবে-

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

হে মহাপুরুষ, এই পরম শুভদিনে বিশ্বমানব আমরা তোমার শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ ও পুণ্য কর।

বৈশাখী পূর্ণিমায় তোমার পুনরাবির্ভাব যাচ্ঞা করি। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ একান্ত বিপন্ন, আজ ক্রোধ ও লোভের উদ্যত খড়্গ পৃথিবীতে বিভীষিকা প্রচার করিতেছে—আজ মৈত্রী মুদিতা করুণা বিসর্জ্জিত—এই ঘন তমসার দিনে তোমার দশ পায় মিতা লইয়া তুমি অভিশপ্ত মানবজাতিকে উদ্ধার কর। তুমি মৈত্রীবলে যে অমৃত মন্ত্র জয় করিয়াছিলে, করুণাবলে যে অমৃতরস পান করিয়াছিলে, মুদিতাবলে জয়লাভ করিয়া যে সুধাকলস আহরণ করিয়াছিলে তুমি যে প্রদীপ্ত জ্ঞানরূপ কঠিনবজ্রে অবিদ্যাকে ছিন্ন করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে পুনরায় অভ্যুত্থান কর।

ফিরে এস ফিরে এস হে মহামানব!
আন তব বীরবাণী শিক্ষা অভিনব।
মৈত্রীর পতাকা হাতে জ্ঞান-শিখা চোখে
ফিরে এস দুঃখদগ্ধ হীন মর্ত্তালোকে।
দূর কর জিঘাংসার এ রণ-তাণ্ডব
আন প্রীতি আন প্রেম হে মহামানব—
হিংসার অনল জ্বলে, জ্বলে তৃষ্ণাজ্বালা,
লোলুপ বাসনা আনে দুঃখ ক্লেশমালা।
আজ এস অমিতাভ, হে গুরু মহান্
অনির্ব্বাণ চিতাগ্নির করহ নির্ব্বাণ
ধৌত কর ভস্মরাশি অমৃত ধারায়
ফিরুক আনন্দোৎসব এ জীর্ণ কারায়।*

* ১৩৪৯ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জলপাইগুড়ি সাহিত্যিকার সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

রাত্রি.

অনেক রাত্রি হইয়া গেল তবুও সরোজ আসিতেছে না দেখিয়া আমি দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। সরোজ আমার রুমমেট্ সুতরাং চিন্তিত মনেই শুইলাম। কিছুক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুমের ঘোরে কত নূতন রঙীন আশার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তাহা আমার মনে নাই কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা স্বপ্নের কল্পনার মত কাল্পনিক নয়, প্রাঞ্জল। তাহা সত্য এবং নিষ্ঠুর।

দরজা ধাক্কার শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দরজা খুলিলাম। রাত্রি তখন প্রায় একটা—সরোজ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নার আলোতে যেন এক মলিনতার ছাপ দিয়া গেল। চোখ দু'টী উদাস ভাব ধারণ করিয়াছে। মনে হয় যেন ভাষা আছে কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বলিষ্ঠ দেহে যেন শক্তি নাই এমনি একটা ভাব বিরাজ করিতেছিল। ভাবিলাম একটা প্রবল, উদ্দাম ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। মনে পড়িল কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার পিতার অসুখের কথা শুনিয়াছিলাম। সম্ভবত তাহারই একটা কিছু হইবে মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, "তোমার এত রাত্রি হ'ল কেন সরোজ?"

"বাবার সাথে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম" সরোজ বলিল।

"তিনি ভাল আছেন ত'? অসুখ শুনেছিলাম!"

সরোজ বলিল, "হ্যাঁ, তাঁর অসুখ সেরে গেছে এবং সেরে গেছে বলেই আজ আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।"

"তার মানে"—বলিলাম।

সরোজ বলিতে লাগিল, "বাবা আমার ভালর জন্যই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই ব্যস্ততার পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্যই তিনি আজ ক'লকাতাতে পদার্পণ করেছেন।"

আমি ব'ললাম, "এতে তোমার উত্তেজিত হ'বার কি কারণ আছে?"

সরোজ নিজেকে কিছু সামলাইয়া লইয়া বিশেষ জোর দিয়া বলিতে লাগিল, "এ বাবার ভয়ানক অন্যায়, আমার কোন মত না নিয়ে আমার বিয়ে ঠিক করে বসেছেন। এমন কি দিন পর্য্যন্ত ঠিক করেছেন।"

আমি বলিলাম, "এতে অন্যায়ের কি আছে, এত সুখবর।"

সরোজ দুঃখের সহিত বলিল, "তুমি সব জেনে শুনে একে সুখবর বলছো? যে রাত্রির স্বরূপ আলো না জ্বাললে বোঝা যায় না সে রাত্রির কথা তুমি কি একেবারে ভুলে গেছ! তোমার হয় ত' মনে নেই সেই রাত্রি আমার কত সাধনার, কত আরাধনার ফল। সেই রাত্রি দিয়েছে আমার নূতন জীবনের প্রেরণা, দিয়েছে শান্তি, সান্ত্বনা এবং শক্তি। সেই শক্তির উপর নির্ভর করে পেয়েছি আত্মনির্ভরতা যার ফলে আজ আমি দু'শ টাকার রিসার্চ স্কলার। আজ আমি এত সহজেই সেই রাত্রির কথা ভুলে যাবো! এ কি সম্ভব?"

আমি বলিলাম, "বেশ ত', তোমার বাবার কাছে সেই রাত্রির কথা বলিলেই ত' পারতে—তাতে তিনি বিশেষ আপত্তি ক'রতেন না নিশ্চয়ই!"

"তুমি আমার বাবাকে জান না বলেই এ কথা ব'লছো" সরোজ বলিতে লাগিল, "যদিও বাবার জমিদারি ব'লতে কিছুই নেই কিন্তু মেজাজটি জমিদারের উপরে।"

"তাহলে তুমি সেই রাত্রির কথা বলেছিলে?" আমি বলিলাম।

সরোজ বলিল, "বলে ত' ছিলামই, উত্তরে যাহা তিনি বল্লেন তাই সর্ব্বনাশের কারণ। বাবা জানিয়ে দিয়াছেন যে তিনি যাহাকে স্থির করেছেন তাকেই বিবাহ ক'রতে হবে, রাত্রির কথা তিনি মানতে রাজী নন।"

আমি বলিলাম, "তাহ'লে উপায়?"

সরোজ বলিল, "আমি বাবাকে জানিয়েছি সেই রাত্রি

হইবে আমার আমরণ সহায় সম্পদ। তার মধ্যেই আমি আলো দেখব। সুতরাং আমি কাকেও বিয়ে ক'রতে পারব না।"

সরোজের এই ঔদ্ধত্য মহেন্দ্রবাবু কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়াছেন। সুতরাং ইহার পরিণামের অপমানভার তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। সরোজকে মনে মনে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। কারণ মণিদীপা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা এবং সরোজের উপযুক্ত পাত্রী। তবুও যে কেন সরোজ বিবাহ করিতে রাজী নয় তা মহেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিলেন না। একবার শুধু সরোজকে অনুরোধ করিলেন যে মেয়েটিকে সে যেন দেখে আসে। উত্তরে সরোজ বলিয়াছিল, সে মেয়ে দেখিতে পারিবে না। ইহাতে বৃদ্ধ তাহার ক্রোধ আর দমন করিতে পারিলেন না এবং উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও সরোজ, তুমি আমার পুত্র নও। আমি আজ হ'তে মনে ক'রব আমার সরোজ মারা গেছে।"

সরোজ নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল মেসে। আজ তার মন ভারাক্রান্ত—চিন্তায় নয় গ্লানিতে। এক রাত্রির জন্য সে গৃহহারা। পিতা থাকা সত্ত্বেও আজ সে পিতৃহীন। সে আর ভাবিতে পারে না। যে পিতার আদরে, স্নেহে সে এত বড় হইয়াছে তাহার অন্ধ সংস্কারের জন্য কি তিনি তাহার একমাত্র পুত্রকে ক্ষমা করিবেন না? আবার সে ভাবে, হ'ল বা পিতা অন্ধ তার জন্য কি সে সেই রাত্রির স্মৃতি ভুলিতে পারিবে না তাহার পিতাকে সুখী করিবার জন্য? এমনি কত প্রশ্ন তাহার মনে হইতে লাগিল। একবার ভাবিল পিতার রাগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে যদি সে একবার রাত্রিকে প্রত্যক্ষভাবে পিতাকে দেখাইতে পারে।

তারপরের দিন ভোরেই সরোজ বাহির হইয়া গেল রাত্রির হোষ্টেলে। একখানা কার্ড পাঠাইয়া দিয়া সরোজ একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি আসিল এবং সরোজের সাথে পথে বাহির হইল। সরোজ তাহাকে সমস্ত কথাই বলিল। শুনিয়া রাত্রি চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "উপায়।" উপায় সরোজই বাতলাইয়া দিল। স্থির হইল তাহারা দুইজনে মহেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। সামনেই লেকের বাস দাড়াইয়া ছিল। দুইজনে উঠিয়া বসিল। তখন রাত্রির অন্ধকার ছিল না, দিনের আলোর ঝলকানি তাহাদের মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

নিস্তরঙ্গ সিন্ধুতটে

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

নিস্তরঙ্গ সিন্ধুতটে জেগেছে মাধবী রাত, কালো জলে চাঁদ কথা কহে,
বাতাস বুলায়ে যায় সর্ব্বঅঙ্গে আজি মোর কি অজানা নেশার আবেশ,
খনির পাহাড়ী ছেলে বাঁশীতে তুলিল সুর প্রবাসিনী প্রিয়ার বিরহে
আমারে কাটিছে ক্ষণ গতজীবনের প্রতি রেখাপানে চেয়ে অনিমেষ।
রাত্রি কত হবে জান, বারোটা বাজিয়া গেল, সারা বিশ্বে নামিয়াছে ঘুম,
কুলির বস্তিতে সব প্রদীপ নিভিয়া গেছে, লিফ্‌ট্‌ ঘরে শুধু জ্বলে আলো,
স্থলে আর জলে দুই সিন্ধুর সঙ্গম হল অঙ্গে মেখে রাত্রির কুঙ্কুম,
পাহাড়ীয়া বাঁশী খোঁজে দূরদেশী সে মেয়েরে যে তাহারে বাসিয়াছে ভাল।

নির্ব্বান্ধব এ সুদূর অখ্যাত প্রদেশে আমি রাত্রিদিন কাজ করে খাই,
সোনা ওঠে তাল তাল লুব্ধ চোখে চেয়ে থাকি, ওরি কিছু হত যদি মোর
হ'ত না ছাড়িতে তোমা আমার ব্যথার কথা দেবতারে নিয়ত জানাই
এমন সোনার রাত কাটাই একান্তে বসি না পাওয়ার দুঃস্বপ্নে বিভোর।
দুটি আলো জ্বলে শুধু হেথা আর লিফ্‌ট্‌ ঘরে, দুটি চোখে জল দেখা যায়,
পাহাড়ীর বাঁশী খোঁজে দূরের প্রিয়ারে তার, আঁখি মোর খুঁজিছে তোমায়।

ষ্টালিন ও কমিউনিজম্

ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ট্রট্স্কির মতানুসারে আমরা যদি ষ্টালিনকে ভব্যতাহীন গোঁয়ার গোবিন্দ-শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি তাহা হইলেও আমরা ভুল করিব। ষ্ট্যালিন দর্শনার্থীদের সঙ্গে খুব কমই সাক্ষাৎ করেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার ভদ্রতা ও সংযত ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ কিছু জানিতে চাহিলে তিনি হিটলারের ন্যায় ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিরক্তির ভাব ব্যক্ত

ট্রট্স্কি

করেন না, সাধ্যমত এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেই চেষ্টা করেন। বক্তৃতা বা আলাপ-আলোচনার সময় ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনিকদিগকে তিনি 'মেসার্স দি বুর্গোয়ি' অভিহিত করেন। তাঁহার বক্তৃতা করা বা নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা অল্প। সুপ্রসিদ্ধ 'ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান' বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় তিনি ১৮ মাস কাল কোনও সভায় বক্তৃতা করেন নাই। জনৈক লেখকের মতে—হিউমার বা হাস্যরস তাঁহার মধ্যে আছে তবে তাহা প্রাচ্যসুলভ, প্রতীচ্যবাসীর কর্ণে উহা একটু কটু বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। জর্জ্জিয়ানরা ইউরোপীয়ান নহেন, এসিয়াটিক, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ওয়েলস ষ্টালিনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আপনারা পৃথিবীর পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য কি কি কার্য্য করিয়াছেন? ষ্টালিন উত্তর দেন,—বিশেষ কিছুই করি নাই। অবশেষে বলেন,—আমরা অর্থাৎ বলশেভিক দল চতুরতর হইলে অধিকতর কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারিত।

বর্ত্তমানে সমগ্র রুশিয়ায় দেবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে লেনিন ও ষ্টালিনের মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। খৃষ্টীয় দেশসমূহের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা বা ইকনের উপাসনা রুশিয়ার ন্যায় অন্য কোন দেশেই দৃষ্ট হয় নাই। সেই দেশের আজ এই দশা! ইকনোপাসনার এক কণাও এক্ষণে অবশিষ্ট নাই। ইকনের স্থান অধিকার করিয়াছে লেনিন ও ষ্টালিনের ছবি। ষ্টালিন এইরূপ পূজায় বাধা দান করেন না। ইচ্ছা করিলে অবশ্যই পারিতেন। রাত্রিতে ষ্টালিনের আলোকচিত্রকে আলোক-মালায় উদ্ভাসিত করার প্রথা মস্কো এবং অন্যান্য স্থানে প্রচলিত আছে। ষ্টালিন বোধহয় মনে করেন ইহাতে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ষ্টালিনের প্রভাব শুধু অসাধারণ নয়—আশ্চর্য্যজনক। সোভিয়েট সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র সমূহে তাঁহার কথা লিখিত হইলে— মহান্, নির্ভীক, প্রিয়তম, প্রাজ্ঞ, প্রেরণা-প্রদাতা, প্রতিভাধর প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামবাসী কৃষকরা বক্তৃতায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষককর্ম্মী, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, পরম-প্রিয়, আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করে। বক্তৃতা শেষ করিবার সময় আমাদের প্রিয়তম নেতা দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের পরমপ্রিয় ষ্টালিন, আমাদের কমরেড—আমাদের বন্ধু প্রভৃতি বাণী বা সম্বোধন তাহাদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়।

ষ্টালিন বাগ্মী নহেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি বস্তুতান্ত্রিক এবং সাদা-সিধা কিন্তু দীর্ঘ। কার্ল মার্কসের উচ্চারিত সাম্যমন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি যখন লেখেন তখন সেই লেখা এত

গুরুগম্ভীর ও বিস্তৃত হয় যে, দেখিলে মনে হইতে পারে কোন নিম্নশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি 'পি, এইচ, ডি'র থিসিস রচনায় রত হইয়াছেন। বক্তৃতার সময় তিনি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ষ্টালিনের বুদ্ধি বিদ্যুতের মত দীপ্তিশীল বা প্রখর ও বিস্ময়কর নহে, উহা মৃদু বা ধীর প্রকৃতির কিন্তু কৌশলী ও উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকান ওয়ার্কমেন্স ডেলিগেশন' তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে অসাধারণ ধৈর্য্য ও অপূর্ব্ব আন্তর্জ্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। পুরা চার ঘণ্টা ব্যাপিয়া তিনি তাঁহাদের বিভিন্ন বিচিত্র প্রশ্নাবলীর যথাযথ জবাব প্রদান করেন। কোন প্রকার নোট লেখা ছিল না, সুতরাং স্মৃতির সহায়তায় মুখে মুখে উত্তর দিতে হইয়াছিল। এই মৌখিক উত্তরের রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় উহাতে ১ হাজার ১৮ শত শব্দ রহিয়াছে। এই উত্তরগুলিতে তিনি সোভিয়েটের উদ্দেশ্য অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা মেধাবী মানুষ ব্যতিরেকে এরূপ উত্তর প্রদান অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। যখন ডেলিগেশন প্রশ্ন করিয়া করিয়া সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত তখন ষ্টালিন তাঁহাদিগকে আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রশ্ন করা দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। প্রশ্নগুলি ষ্টালিনের রাষ্ট্রনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির এবং আমেরিকার অবস্থার সহিত প্রগাঢ় পরিচিতির বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ষ্টালিনের প্রশ্নাবলীর উত্তর ডেলিগেশন যে ভাবে দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দানে তিনি তদপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কোন কার্য্য করিতে হইলে রুশিয়ার এই একনায়ক তাহা এরূপ একাগ্রতা বা অখণ্ড মনোযোগের সহিত করিয়া থাকেন যে, যতক্ষণ ডেলিগেশনের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল তাঁহার ব্যবস্থানুসারে ততক্ষণ টেলিফোনের ঘণ্টা একবারও বাজে নাই এবং তাঁহার কোন কর্ম্মচারী এমন কি সেক্রেটারীও বারেকের জন্যও কক্ষে প্রবেশ করে নাই।

ষ্টালিনের চরিত্র ধর্ম্মনীতির দিক দিয়া পবিত্র না হউক কর্ম্মনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ এবং ধৈর্য্য ও শৌর্য্যের দিক দিয়া বিশেষ বিচিত্র বটে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিপ্লবাগ্নি নানা কারণে প্রায়ই নির্ব্বাপিত এবং বিপ্লবীর দল কেহ নির্ব্বাসনে, কেহ পলায়নে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরাজিত—এমন কি লেনিনের মত লোকও (কখনও গ্রন্থাগারে কখনও কফিখানায়) লুক্কায়িত তখনও ধ্যানশীল যোগীর ন্যায় একনিষ্ঠ ষ্টালিন দিনের পর দিন কমিউনিজমের পতাকা একা বহিয়া ধীর ভাবে নীরবে চলিয়াছেন। ১৯১৭ পর্য্যন্ত লেনিন প্রভৃতি অন্যান্য সকলে এইরূপ ছন্নছাড়া ধৈর্য্যহারা জীবন যাপন করিয়াছিলেন। করেন নাই কেবল বিস্ময়কর সহিষ্ণুতাশালী যোসেফ ষ্টালিন। ষ্টালিন একদিনের জন্য রুশিয়া ছাড়িয়া যান নাই। সঙ্ঘের শুধু সঙ্কটসঙ্কুল কঠোর কর্ত্তব্যগুলি নয় কদর্য্য কার্য্যগুলিও তাঁহাকেই করিতে হইত। জনৈক লেখক তাঁহার তখনকার কার্য্যাবলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—তিনি যেন পার্টির ঝাড়ুদার—যাবতীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা তাঁহারই কাজ। ইহাতে প্রমাণিত হয় কমিউনিষ্টসঙ্ঘ-সংগঠনে তাঁহার অবদান কি সুমহান। সুতরাং যে অতুলনীয় বা অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি তিনি আজ লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য।

ষ্টালিনের শারীরিক সহনশীলতাও অসীম। তাঁহার 'ডাইলেটেড হার্ট' বা 'বিবর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ড' নামক রোগ থাকা সত্ত্বেও এরূপ শারীরিক শক্তি বিস্ময়ের বিষয় বটে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, মানুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তিশালী মনের নিকট দৈহিক ব্যাধিও বিশেষ কোন প্রভাব প্রসারিত করিতে পারে না। ইনি হিটলারের ন্যায় স্নায়বিক প্রকৃতি সম্পন্ন নহেন। হিটলারের স্নায়ুগুলি সহজেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। কোন বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীগুলিকে অতি উচ্চ সুরে বাঁধিয়া রাখিলে উহার অবস্থা যেমন হয় হিটলারের স্নায়ুগুলি ঠিক সেইরূপ। হিটলারের একটি স্নায়ুগত রোগও আছে, যাহার নাম সমন্যামবুলিজম্ বা স্বপ্ন-সঞ্চরণ। ইটালীয় ডিক্টেটর মুসোলিনী স্নায়ুপ্রধান প্রকৃতির লোক না হইলেও শরীরের উপর তাঁহার প্রভাবের মূল উৎস ইমোশন বা ভাবতরঙ্গ। ষ্টালিন এ বিষয়ে সত্য সত্যই ষ্টিল বা ইস্পাত। তিনি হিটলারের মত নিউরাটিক বা স্নায়বিক বা মুসোলিনীর মত ইমোশনাল নহেন। তবে তাঁহার স্বভাবে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও ভুল হয়, কিন্তু সেই ভাবকে তরল তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত তুলনা চলে না। উহা যেন একটা বড় বরফের খণ্ড।

যে বরফ উত্তাপের স্পর্শে কখনও দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্নায়ু অবশ্যই আছে কিন্তু সেই স্নায়ুজাল বাদ্যযন্ত্রের সরু তারের মত নহে, দুর্ভেদ্য প্রস্তর স্তরের মত।

বিপদ সম্পদ, সুখ-দুঃখ, রৌদ্র-বৃষ্টি, কারাবাস, নির্ব্বাসন, নিন্দা-প্রশংসা—কোনদিকেই না চাহিয়া ধীর পদক্ষেপে অদম্য উদ্যমে লক্ষ্যের পানে আগাইয়া যাওয়া। ওয়াল্টার ডুরান্টির মতে ষ্টালিন অমানুষিক অধ্যবসায়ের অধিকারী। স্থাপত্যশিল্পী যেমন একখানি ইঁটের উপর আর একখানি ইঁট গাঁথিয়া প্রকাণ্ড প্রাসাদ গড়িয়া তোলেন, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ঠিক সেইরূপ ভাবে সাধন করিয়াছেন। সঙ্গী বা সহকর্ম্মীরা কতবার অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা চাহে আলাউদ্দিনের প্রদীপের প্রভাবে প্রস্তুত প্রাসাদের মত এক রাত্রিতে সিদ্ধি বা সাফল্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে। অন্যদিকে চালাকী, চাতুরী, কৌশল এ সকলও ষ্টালিনের বেশ জানা আছে। দরকার হইলে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই রাজনীতি তিনি অবলম্বন করেন।

কার্ল মার্কস্

প্রাচ্য জাতির মধ্যে তাঁহার জন্ম, তিনি পাশ্চাত্য নন। এই সত্য তিনি নিঃসঙ্কোচে স্বমুখে সকলের নিকট স্বীকার করেন। জাপানী সাক্ষাতার্থীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন—স্বাগতম্! আপনার ন্যায় আমিও এশিয়াবাসী।

হিটলার বিরোধী দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিয়া অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রোহমের ন্যায় মিত্রকেও মৃত্যুলোকে পাঠাইতে তিনি কুণ্ঠা বা করুণা অনুভব করেন নাই। ষ্টালিন প্রথমে প্রধান বামপন্থী বিরোধী ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভকে সরাইয়া পরে দক্ষিণপন্থী বিরোধী বুখারিন, রিকর্ভ ও টমস্কিকে অপসারিত করেন। হিটলার ও ষ্টালিন উভয়েই অত্যন্ত নির্ম্মম। তবে হিটলার নিজের নির্ম্মমতার কথা প্রকাশ করেন না, ষ্টালিন করেন। ষ্টালিন 'লেনিনিজম্' নামক পুস্তকে অনেক কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ৮২৫ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকে নিজেদের দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গুণ বা ভালর কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেও দোষ বা মন্দকে লুকান নাই। এই পুস্তকের ২০ লক্ষ অপেক্ষাও অধিক কপি একা সোভিয়েট ইউনিয়নে বিক্রীত হইয়াছিল।

সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র জিনিষটিও ষ্টালিনের দৃষ্টি এড়ায় না। রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্যাপারের দিকেও তাঁহার লক্ষ্য আছে। এতখানি সূক্ষ্ম লক্ষ্য হিটলার বা মুসোলিনীর নাই। নিত্য ডাকে কত জিনিষ আসে, কিন্তু হিটলার সব পড়েন না। যাহাকে একান্ত দরকারী বলিয়া মনে করেন তাহাই পড়েন। কিন্তু ষ্টালিন ডাকে আসা অতি ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। সঙ্ঘের মুখপত্র প্রাভদার শেষ প্যারাটি পর্য্যন্ত পড়া তাঁহার অভ্যাস। প্রত্যেক দিন প্রথমেই লোকাল রিপোর্ট বা স্থানীয় কার্য্য বিবরণীগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশ হইতে যে সকল বিবরণী পেশ করা হইয়াছে তাহাদের ভিতর হইতে সযত্নে বাছিয়া বাছিয়া এই রিপোর্ট সঙ্কলন করা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে সমগ্র দেশের সংবাদই রহিয়াছে।

ষ্টালিনের সংগঠনীশক্তির ন্যায় স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় সাইবেরিয়ার শিল্পসম্পর্কীয় শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ সহর স্থাপন করা হয়। নাম ম্যাজনিটোগরস্ক। এই সহর সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তক রচনা করিতে পারিবে এরূপ লোক তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা গ্যারী নামক একজন লেখকের কথা তাঁহার মনে পড়িল। লোকটি ইজভেস্তিয়া কাগজে সচিত্র রিপোর্ট পাঠাইত। খোঁজ লইয়া জানিলেন, সে তখন কোন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী। ষ্টালিন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তি দিয়া নিকটে আনাইলেন এবং ম্যাজনিটোগরস্ক নামক গ্রন্থ লিখিতে আদেশ প্রদান করেন। অনুচরদিগকে পরিচালিত করিবার দক্ষতায় তিনি অদ্বিতীয়। ম্যাগনেটিজম্ যাহাকে বলে তাহার সেইরূপ শক্তি আছে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনই তাঁহার আকর্ষণী শক্তি। কোন কক্ষে তিনি প্রবেশ করিলে কক্ষস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার উপস্থিতির প্রভাব অনুভব করে। তিনি এমন অনেক কাজ

করিয়াছেন যাহা অন্য লোকে করিলে সকলে তাহার উপর বিশেষ বিরূপ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ কার্য্য করা সত্ত্বেও সকলে অবনত মস্তকে ষ্টালিনের বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলেন, হিটলার অনুচরদের অর্চ্চনার, মুসোলিনী শঙ্কার এবং ষ্টালিন শ্রদ্ধার পাত্র।

ষ্টালিন সরকারী কোন চাকরি করেন না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে তিনি সেণ্ট্রাল এক্জিকিউটিভ কমিটি নামক কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির সদস্য। তবে তিনি কেবিনেট-মেম্বার বা সচিব ন'ন। পূর্ব্বে লেনিন কর্ত্তৃক তাঁহার সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখন আর ঐ পদে অধিষ্ঠিত নহেন। পলিটবুরোর দশ জন সদস্যের অন্যতম তিনি অবশ্যই বটেন। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতি (যাহা হইতে পলিটবুরোর সদস্য গৃহীত হয়) ষ্টালিনকে পদ-চ্যুত করিতে পারেন। আইন-কানুনের দিক দিয়া কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাধিক সদস্য তাঁহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহাই হইবে বটে, কিন্তু সদস্যরা কখনও তাঁহার বিরোধী হন না। কারণ ডিক্টেটররূপে তিনি সমগ্র নির্ব্বাচন ব্যাপারের নিয়ন্তা। সঙ্ঘ এবং সরকার সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করে বলা চলে, কিন্তু ষ্টালিন উভয়ের মধ্যে এক প্রকার (থিয়োরেটিকাল বা মতগত) পার্থক্যের প্রাচীর বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। ডিক্টেটর হইলেও লেনিন চাকরি করিতেন। তিনি শুধু সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন তাহা নহে, মন্ত্রিসভার সভাপতি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীপদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ষ্টালিন শুধু সঙ্ঘের অধ্যক্ষ।

মস্কৌ নগরে অবস্থান কালে ষ্টালিন ক্রেমলিন নামক পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রাসাদে বাস করেন। ক্রেমলিন কি তাহা হয় তো অনেকেই জানেন না। ক্রেমলিন একটি গৃহ নহে। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড—সেই কম্পাউণ্ডের বক্ষে (চল্লিশ হইতে পঞ্চাশটি পর্য্যন্ত) বহু সংখ্যক গৃহ, প্রাসাদ, গীর্জ্জা, ব্যারাক, বাগান ইত্যাদি আছে। এই বিরাট ইমারত মস্কৌ মহানগরের মধ্যস্থলে একটি উচ্চস্থানে অবস্থিত। যেমন এথেন্সের এক্রপলিস তেমনই মস্কৌর ক্রেমলিন। চারিদিকে লোহিত প্রাচীর। এই প্রাচীর-বেষ্টিত সৌধসমষ্টি রুশিয়ার ইতিহাস ও কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাকে রুশীয় ইতিহাসের যাদুঘর বলিলেও ভুল হয় না। ইউরোপের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর অন্যতম। ইহা দেখিলে মুঘলযুগের আগ্রা নগরী এবং প্রাচীন চীনের রাজধানী রঙ্গপুরী পিকিনের কথা মনে পড়ে। বিশ্বের বিস্ময়কর বস্তুসমূহের অন্যতম পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম ঘণ্টা ক্রেমলিনেই দৃষ্ট হয়। একগজ বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট একটি কামানও এখানে দেখা যায়। ঘণ্টাটি এত ভারি যে বাজান যায় না এবং কামানটি এমন বিরাট যে চালান চলে না। ইহা ছাড়া আরও বিচিত্র বস্তু এখানে আছে। কোটি কোটি নরনারী দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জার ও জারিণা এই সৌধাবলীতে বাস করিয়া সমগ্র রুশিয়ার বক্ষে স্বৈরতন্ত্রের রথ-চক্র চালাইতেন। আজ সেই জার ও জারিণার জায়গায় জুতা মেরামতকারী পিতার পুত্র ভূতপূর্ব্ব এনার্কিষ্ট দলপতি জর্জ্জিয়ান ষ্টালিন অবস্থান করিতেছেন (যাঁহার অতীত জীবন কারাবাসে ও নির্ব্বাসনে কাটিয়াছে)। ক্রেমলিন আছে কিন্তু আজ কোথায় সেই জার? ইউরোপের সেই প্রবলতম প্রভাবশালী রাজার বংশই উজাড়। যাঁহারা মস্কৌ গিয়াছেন তাঁহারা রেড-স্কোয়ার নামক প্রশস্ত ভ্রমণ স্থান অবশ্যই দেখিয়াছেন। এই স্কোয়ারের দক্ষিণে ক্রেমলিন এবং বামে কিতেগোরদ। উভয়ের মধ্যস্থলে বিশ্ববিখ্যাত বিচিত্র দর্শন সেণ্টবেসিল গীর্জ্জা। বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া কিতেগোরদ মস্কৌর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ত পল্লী। ক্রেমলিনে প্রবেশ করিবার পাঁচটি তোরণ বা দ্বার আছে। ইহাদের মধ্যে স্প্যাস্কিয়ান প্রধান।

যাঁহারা বলেন ষ্টালিন ক্রেমলিনের ভিতর বন্দীর ন্যায় বাস করেন, বাহিরে আসেন না, তাঁরা প্রকৃত খবর জানেন না। ষ্টালিনকে ক্রেমলিনের বাহিরেও অনেক কাজ করিতে হয়। স্তারায়া প্লোশাদ নামক শহরের বিশেষ কর্ম্মব্যস্ত অংশে অবস্থিত একটি গৃহেও তাঁহাকে প্রায়ই যাইতে হয়। কারণ এখানে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে।

ইটালীতে যেমন ভিলা তেমনই রুশিয়ায় পল্লী-আবাসকে দাচা আখ্যায় অভিহিত করা হয়। মস্কভা নদীর তীরে বিরাজিত উসোভা, আরাকান, জেলঙ্কায়া অঞ্চলে ষ্টালিনের যে দাচা আছে তিনি অনেক সময় সেখানেও থাকেন। এই

পল্লী-আবাস মস্কো হইতে একঘণ্টায় যাওয়া যায়। এই গৃহের পূর্ব্ব অধিকারী জনৈক ধনিক বা ক্যাপিটালিষ্ট। এই ধনিক ছিলেন স্বর্ণখনির মালিক ও বণিক। ধনিকটি দশ একার জায়গা চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়াছিলেন। প্রাচীরের উদ্দেশ্য পাছে উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকরা লুটপাট করে। ষ্টালিন প্রাচীরগুলি ভাঙ্গেন নাই। ষ্টালিনের বাসস্থল এই পল্লীগ্রামাঞ্চল সতর্ক পুলিশ প্রহরিদলের দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মস্কো হইতে এই পল্লীগৃহ পর্য্যন্ত প্রসারিত পথটিতেও গার্ডগণ পাহারায় নিযুক্ত রহে। ষ্টালিনের তিনটি কার আছে। এই তিনটিতেই তাঁহাকে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। গাড়ী খুব জোরে চলে এবং ষ্টালিন সাধারণতঃ চালকের পাশে বসিয়া থাকেন। একনায়কদের জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। হিটলার এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁহার চারিদিকে গার্ড ও গোয়েন্দাগণ (গোপনে বা প্রকাশ্যে) সর্ব্বদা অবস্থান করে। মুসোলিনীকেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। মুসোলিনীকে মারিবার চেষ্টা কয়েকবারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষ্টালিন সতর্কতা অবলম্বন করিলেও হিটলার ও মুসোলিনীর মত আশঙ্কান্বিত নহেন বলিয়াই আমরা জানি। অনেক সময় ক্রেমলিন হইতে অপেরায় গিয়া তথা হইতে বন্ধুদের সহিত জন-বহুল পথের উপর দিয়া পদব্রজে ফিরিয়া আসেন। জনতার ভিতর দিয়া এরূপ ভাবে ভ্রমণ হিটলার ও মুসোলিনীর পক্ষে কল্পনাতীত। ১লা মে ও ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব-দিবস। এই দুইদিন ষ্টালিন লেনিনের সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই সময় লাখ লাখ লোক তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যায়।

ষ্টালিন কোন আড়ম্বর বা আদব-কায়দার ধার ধারেন না। কোন জাঁকজমকযুক্ত ইউনিফর্ম্ম তিনি পরেন না। তাঁহার পরিচ্ছদ জলপাইএর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট একটি জ্যাকেট। এই জ্যাকেটের বোতাম স্কন্ধের নিকটে। ইহা ছাড়া তাঁহাকে রাইডিং ব্রিচ ও বুট পরিধান করিতেও দেখা যায়। বাহির হইবার সময় টুপি পড়েন। এক্ষণে লক্ষ লক্ষ লোক এই পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেছে। ষ্টালিন এক বা দুই সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করিয়া দুই বা তিনদিন সম্যক বিশ্রামের জন্য দাচায় বা পল্লী-আলয়ে চলিয়া যান। আমোদ-প্রমোদ খুব কমই করেন। অপেরা ও ব্যালেট দেখিতে ভালবাসেন। একনায়কদের ভিতর হিটলারের ন্যায় সঙ্গীতানুরাগী আর কেহই নহেন। এই দয়া মায়া বর্জ্জিত কঠিন লোকটি গানে গলিয়া যান, এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিবে। স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ বলিয়া হিটলারের সহজে ঘুম হয় না। পূর্ব্বে রোজ গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে হইত। ষ্টালিন মধ্যে মধ্যে বলশোই থিয়েটার নামক রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যান। কখন কখন সবাক্ ছবি দেখিবার ইচ্ছাও জাগে। চাপাইয়েভ নামক যুদ্ধ সম্পর্কীয় ফিলম তিনি চারবার দেখিয়াছেন। পুস্তক ও পত্রিকা পড়াও তাঁহার পক্ষে প্রীতিপ্রদ, খেলার ভিতর দাবা কখন কখন খেলেন। অত্যন্ত ধূম্রপায়ী। ধূম্রপানের বিরাম নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক বারই পাইপ ব্যবহার করেন। জনশ্রুতি 'এজওয়ার্থ তামাক' তাঁহার প্রিয় কিন্তু এই বিদেশী বা অ-সোভিয়েট তামাক প্রকাশ্যে ব্যবহার করিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন। আহারের সময় আহার্য্যপূর্ণ পাত্রগুলির পার্শ্বে প্রজ্বলিত পাইপটি অবশ্যই থাকে। সুতীব্র সুরা—বিশেষ ব্রাণ্ডি তাঁহার প্রিয় পানীয়। মদের নেশা সহ্য করিবার শক্তিও অসাধারণ। হিটলার ও ও মুসোলিনী উভয়েই মদ্য স্পর্শ করেন না। এ বিষয়ে ডি'ভ্যালেরার অভ্যাস বিচিত্র। তিনি ইংলণ্ডে ও আয়র্ল্যাণ্ডে বাসকালে সুরা স্পর্শ করেন না কিন্তু কন্টিনেণ্ট থাকিলে বিয়ার জাতীয় মদ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ষ্টালিনের স্ত্রীলোকের প্রতি মনোভাব ও ব্যবহারকে স্বাভাবিক বলা চলে। উহা হিটলারের মত অস্বাভাবিক নহে। ষ্টালিন প্রথমা পত্নীর পরপারে প্রয়াণের পর পুনরায় পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর জীবনেতিহাস প্রাক্-বিপ্লব যুগের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া আমাদের অবিজ্ঞাত। ঐ অশান্তিময় যুগে বলশেভিকদের ভিতর পরিণয় প্রথা থাকিলেও বৈবাহিক কোন অনুষ্ঠান হইত না। চার্চ্চ ও পুরোহিত নাই বলিয়া বর্ত্তমানেও পরিণয়-সম্পর্কীয় বিশেষ কোন অনুষ্ঠান সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিতর দৃষ্ট হয় না। ষ্টালিনের ঔরসে, প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মায়। পুত্রটির বয়স বর্ত্তমানে ত্রিশের কম নয়। ছেলেটি তেমন ভাল নয়। বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের পুত্ররা প্রায় এই রকমই হয়। কাশ্মীরের নেহেরু বংশীয় মতিলালের পুত্র জওহরলাল

এই নিয়মের একটা প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম। আর একবার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল ইংলণ্ডের পিট-পরিবারে। অবশ্য মুসোলিনী এ বিষয়ে অধিক সৌভাগ্যশালী। ষ্টালিনের এই পুত্রটি মেনঝিন্স্কির পুত্রের সহিত বিলিয়ার্ড খেলিয়া সময় নষ্ট করিত বলিয়া জানা যায়। মেনঝিন্স্কি সোভিয়েট ইউ-নিয়নের পুলিশ বিভাগের অধ্যক্ষ। ছেলের মতি-গতি ভাল নয় দেখিয়া ষ্টালিন তাহাকে জন্মভূমি জর্জ্জিয়ার রাজধানী তিফ্‌লিসের এক কারখানায় কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিনের প্রথমা পত্নীর নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার এক পুরাতন বিপ্লবী বন্ধু সর্জ্জি এলিলুয়েভকে দেখিবার জন্য লেনিনগ্রাদ যান। তথায় বন্ধুর সপ্তদশী কন্যা নাদিয়েঝদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ষ্টালিন বন্ধু-কন্যাকে বিবাহ করেন। নাদিয়েঝদার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। পুত্রটির নাম ভাশিলি। বর্ত্তমানে তাহার বয়স আঠারোর কম নয়। মেয়েটির নাম শ্বেতলানা। সে এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী। মিসেস্ ষ্টালিন প্রোমাকাদেমিয়া বা শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষার্থ ভর্ত্তি হন। তিনি তথা হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করেন। বিরাট সোভিয়েট রাশিয়ার বিস্ময়কর প্রভাবশালী একনায়কের পত্নী হইলেও তিনি সাধারণ শিল্পীদের মতই পরিশ্রম করিতেন। যাতায়াতের সময় সাধারণ নরনারীর মতই জনতা ঠেলিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিতেন, ক্রেমলিনের কার ব্যবহার করিতেন না। এরূপ বিস্ময়কর সাম্য শুধু রুশিয়াতেই সম্ভব। প্রায় প্রত্যেক নেতার পত্নীই কোন না কোন চাকরি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত।

লেনিনের বিধবা নাজিয়েজদা ক্রুপস্কায়া ক্রেমলিনে কাজ করিতেন এবং থাকিতেনও তথায়। তিনি শিক্ষা-বিভাগের সহকারী সচিব ছিলেন। ম্যাডাম ভি, এন ইয়াকভলেভা অর্থ-সচিব। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদ নারীকে প্রদত্ত হয় নাই। ম্যাডাম বুবনভ সরকারী দোকানে বিক্রেত্রীর কার্য্য করেন। প্রেসিডেণ্ট ক্যালিনিনের পত্নী ম্যাডাম ক্যালিনিন একটি সরকারী গোলাবাড়ীর ম্যানেজার। মোলোটোভের পত্নী পলিন সেমিয়োনোভা ঝেমচুঝনা (সরকারী পাউডার, লিপষ্টিক প্রভৃতি প্রসাধন প্রস্তুত করিবার কারখানার) অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিতা। ম্লাডিমিয়া আইভানভনা নিকোনায়েভা পূর্ব্বে কোন কারখানায় কুলীর কাজ করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের সদস্য। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বারা পরিচালিত একটি প্রচার-বিভাগের অধ্যক্ষতা ইনি করিয়া থাকেন। ম্যাডাম আলেকজেন্দ্রা কলনটে সুইডেন-সম্পর্কীয় সোভিয়েট সচিব। আমরা অল্প-কাল পূর্ব্বের কথা বলিলাম। ইঁহারা সম্প্রতি এই সকল পদে অধিষ্ঠিত নাও থাকিতে পারেন। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব-শালী প্রধান নেতাদের পত্নী এবং অন্যান্য মহিলারা দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। নিষ্কর্ম্মা কেহই নহেন। আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের চিরসহচর আলস্যও নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর ষ্টালিনের দ্বিতীয় পত্নী নাদিয়েঝদার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহাকে সকলে সুস্থশরীরে অপেরায় আসিতে দেখিয়াছিল। এই মৃত্যুসংবাদ অতি সামান্যভাবে ও সংক্ষেপে ঘোষণা করা হয় এবং মৃতদেহ কনভেণ্ট অফ্ নিউভার্জ্জিন্স নামক ভূতপূর্ব্ব খৃষ্টীয় আশ্রমের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচিত্র কাহিনী প্রচারিত হয়। কথিত হয়—ষ্টালিনের জন্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হইত তাঁহার দ্বারা ভক্ষিত হইবার পূর্ব্বে মিসেস ষ্টালিন নিজে খাইয়া সেগুলি (বিষাক্ত কি না) পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এইরূপ কোন পরীক্ষার ফলে মিসেস ষ্টালিনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ সত্য নহে। মিসেস্ ষ্টালিন কয়েক দিন ধরিয়া আন্ত্রিক যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি উহা কিছুই নহে ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-ব্যস্ত স্বামীকে এ বিষয়ে বিরক্ত করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন তিনি স্বামীকে ভয় করিতেন বলিয়া বেদনার কথা বলিতে সাহস করেন নাই। সে যাহা হউক, কষ্ট হইলেও কয়েকদিন তিনি সেই কষ্টের কথা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই, বল-শেভিকসুলভ সহিষ্ণুতার সহিত উহা সহিয়াছিলেন। কিন্তু রোগটি কঠিন। উহা য্যাপেণ্ডিসাইটিস্ বা য্যাপেণ্ডিক্স নামক আন্ত্রিক যন্ত্রের প্রদাহ। যখন তিনি কষ্টের কথা স্বামীর নিকট ব্যক্ত করেন, তখন ব্যাধিটি সাধ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অসাধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের প্রতি

ষ্টালিনের ব্যবহার পিতার যে প্রকার হওয়া উচিত সেইরূপ। কিন্তু এইরূপ কঠোর কমিউনিষ্ট তিনি যে তাঁহার আদেশ আছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা যেন বিদ্যালয়ে একই প্রকার ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। ছেলেমেয়ে যে স্কুলে পড়ে তিনি কখনও সেই স্কুলে নিজে যান নাই। উহা একটি আদর্শ বিদ্যালয়—নাম স্কুল নম্বর ২৫। পিমেনোভস্কি ষ্ট্রীটে উহা অবস্থিত। তাঁহার এই পুত্রটি স্কুলের শিক্ষকদের নিকট হইতে তাহার শিক্ষা ও স্বভাব সম্বন্ধে যে রিপোর্টকার্ড (অল্পকাল পূর্ব্বে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সাতটি 'ফেয়ার' ও পাঁচটি 'গুড' এইরূপ রিমার্ক বা মন্তব্য ছিল—'ভেরি-গুড' বা 'এক্সেলেণ্ট' একটিও ছিল না। ছেলেটির প্রধান পাঠ্য-বিষয় সাহিত্য।

ষ্টালিন মাসিক ১ হাজার রুবল (৬ পাউণ্ড, ১৫ শিলিং) বেতন প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহার অর্থাশক্তি আদৌ নাই এবং অন্যান্য সোভিয়েট নেতাদের মত সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া দরিদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করেন। অন্য যাহাই হউক বলশেভিক নেতাদের উপর টাকার অন্যায় আকাঙ্ক্ষার কলঙ্কারোপ কেহই করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে কমিউনিষ্ট-নীতি অনুযায়ী কেহ মাসিক ২ শত, ২৫ রুবলের বেশী বেতন লইতে পারিত না। পরে বেতন সম্পর্কীয় নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এখন নেতা বা মন্ত্রীদের মাসিক বেতন গড়পড়তা প্রায় ৬ শত রুবল। একজন একাধিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও বেতন একটি কার্য্যের উপযোগীই পাইবেন। কোন সোভিয়েট লেখক লিখিত পুস্তকের জন্য রয়ালটি লইতে পারিবেন না—ইহাও নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আমরা পরে সে বিষয় আরও আলোচনা করিব।

ডিক্টেটর ষ্টালিন ইচ্ছা করিলে জারদের মতই স্বর্ণপাত্রে আহার করিতে এবং ভোগ-বিলাসের অন্যান্য উপকরণ অনায়াসে পাইতে পারিতেন। বিশাল রুশিয়ায় এমন কিছু নাই যাহা আকাঙ্ক্ষা করিলে তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইত। কিন্তু তিনি তাহা চান না। তবে তাঁহার পল্লী-আবাস বা দাচাটি এরূপ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ যে উহা আমেরিকার যে কোন ধনকুবেরের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইতে পারে। পরিচর্য্যার জন্য দাসদাসী, চড়িবার জন্য মোটরকার, পড়িবার জন্য পুস্তক ও পত্রিকাবলী সবই তাঁহার আছে।

হিটলার ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন কিন্তু জীবন বা ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় ধর্ম্মের ধার তিনি ধারেন না। এক নায়কদের ভিতর মুসোলিনী ও ডি'ভ্যালেরা নিয়মিতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ষ্টালিনের কার্য্যাবলী দেখিয়া তাঁহার নাস্তিক্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না। কমিউনিজমে ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের স্থান নাই। তবে ঘরে বসিয়া কেহ প্রার্থনা ও উপাসনা করিলে তাহাতে কাহারও অমত থাকিতে পারে না। গ্রীকচার্চ্চের প্রধান লীলাস্থলী রুশিয়ায় চার্চ্চ বা ধর্ম্মসম্পর্কীয় সঙ্ঘ আর নাই। ধর্ম্মযাজকও নাই। গুরুগম্ভীর গীর্জ্জাগুলি কোলাহল-মুখরিত কলকারখানায় পরিণত। রুশিয়ায় আজ বিজ্ঞান ও যন্ত্রের রাজত্ব। ষ্টালিন বলেন,—ধর্ম্ম জিনিষটা বিজ্ঞান-বিরোধী। বিজ্ঞানের বলেই বড় হওয়া যায়, সুতরাং ধর্ম্ম জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। কিন্তু আমরা ইহা সমর্থন করি না। আমাদের মতে প্রকৃত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তু কখনও নহে। বিজ্ঞানকে স্রষ্টার অপার মহিমার বিজয় বৈজয়ন্তী বলা চলে। তবে রাসপুটিনের ন্যায় ধর্ম্মযাজকের লীলাস্থলী, ভোগাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিত চার্চ্চ প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী বটে। জনৈক লেখক বলিয়াছেন,—একনায়কদের মধ্যে একমাত্র ষ্টালিনই সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহা পাঠ করিয়াছিলেন মাতার ইচ্ছায় তিফলিসের অর্থোডক্স সেমিনারীতে পড়িবার সময়।

সারা সংসারে হিটলারের প্রকৃত সুহৃদ একজনও নাই। মুসোলিনীর প্রধান বন্ধু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। অবিবাহিত হিটলারের সেরূপ সুহৃদের সম্ভাবনাও নাই। ডি'ভ্যালেরার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন। ষ্টালিনের প্রকৃত বন্ধু আছে, তবে খুবই কম। ভোরসিলভ ও কাগানোভিচ এই দুই-জনকে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলা চলে। বন্ধুরা তাঁহাকে ইয়োসিফ ভিসারিনোভিচ বলিয়া ডাকে। আমরা যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহিত কথোপকথনে 'তুমি' 'তুই' প্রভৃতি সম্বোধন ব্যবহার করি তাঁহাদের মধ্যেও সেই রকম চলে। ইয়োসিফ নামের কোন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নাই বলিয়া কোন সংক্ষিপ্ত ডাক নাম বন্ধুদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারে না। কেহ কেহ তাঁহাকে তোভারিস (কমরেড) ষ্টালিন বলে।

বিশাল রুশিয়ার বিস্ময়কর শক্তিশালী এই একনায়কের কোন উপাধি নাই। সেক্রেটারী প্রভৃতি অনুচরবর্গ হিটলারকে বিশেষ ভয় করে। মুসোলিনীও অনেকের ভীতি ভাজন। কিন্তু ষ্টালিন অন্যপ্রকার। অনুচরবর্গ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবে, হীনভাবে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে ইহা তিনি চান না।

পূর্ব্বে রুশিয়ায় মানুষের কোন মূল্য ছিল না বলিলেও ভুল হয় না। ঘোড়া বা গরুর মূল্য অপেক্ষাও মানুষের মূল্য ছিল কম। ষ্টালিনের দ্বারা বিবৃত একটি বিবরণ হইতে আমরা ইহা কতকটা বুঝিতে পারি। তখন তাঁহারা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের ত্রিশজন কোন কার্য্যোপলক্ষে নদীতে গিয়াছিল। যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল একজন নাই। ষ্টালিন সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কোথায়? সঙ্গীরা উত্তর দিল,—সেখানে থাকিয়া গিয়াছে। বিস্মিত ষ্টালিন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—থাকিয়া গিয়াছে ইহার অর্থ? যেন কিছুই ঘটে নাই এইরূপ ঔদাসীন্যের সহিত তাহারা কহিল,—অর্থ খুব সোজা, অর্থাৎ সে জলে ডুবিয়াছে। ষ্টালিন সঙ্গীদিগকে পুনরায় নদীতে গিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। একজন বলিল,—আমার যাইবার উপায় নাই, কারণ ঘোটকীকে জলপান করাইতে হইবে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত ষ্টালিন বলিলেন,—একটা ঘোটকী অপেক্ষা একজন মানুষের জীবনের মূল্য কম? এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে তাহারা কহিল—একটা মানুষ সহজেই সৃষ্ট হয় কিন্তু একটা ঘোটকী সৃষ্টি করা তদপেক্ষা অনেক কঠিন।

কমিউনিজম্ কি, এই জিজ্ঞাসা অনেকের মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। শব্দটির অনুবাদ ধনসাম্যবাদ। কমিউনিষ্ট পার্টি বা ধনসাম্যবাদী সঙ্ঘ সমগ্র রাষ্ট্র ও সমস্ত জাতির কর্ত্তা বা নিয়ন্তা। সঙ্ঘই সর্ব্বস্ব। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে সঙ্ঘ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ করেন। সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্র যেন একটা বিরাট পরিবার। সকলে সমভাবে সেই পরিবারভুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত। সঙ্ঘ যেন সেই প্রকাণ্ড পরিবারের পিতা বা অভিভাবক। যত ফসল দেশের মাটি জন্মাইবে সব সমভাবে সকলের কল্যাণার্থ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এই একনায়ক শাসিত দেশে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র নাই। এখন আছে শুধু অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র মন্ত্রের ঋষি কার্ল মার্কস। এই জনপূজার প্রধান পুরোহিত লেনিন। এই গণ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হোতা যোসেফ ষ্টালিন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন লোক শস্য বা পণ্য উৎপন্ন করিবার উপায়টির উপর স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। সে টাকা জমাইতে বা হস্তান্তরিত করিতে পারে কিন্তু যে বস্তু বা ব্যাপার সেই টাকা উৎপাদন করে তাহা বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিবার অধিকার তাহার নাই। সুতরাং জমি-জমা বা কলকারখানা বিক্রয় করা চলে না। উহার প্রকৃত মালিকও কোন লোক নয়—সঙ্ঘ-পরিচালিত রাষ্ট্রই উহার একমাত্র অধিকারী। ব্যক্তিগত অর্থাগমের জন্য শ্রমিকদিগকে খাটান সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ। তবে কি সোভিয়েট নাগরিকরা উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি পাইতে পারেন না? পারেন বটে, কিন্তু সেই স্বত্বাধিকারের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সরাসরি বংশধর যাহারা তাহারাই উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। না-বালক (অর্থাৎ আঠারো বৎসর বয়স হইতে কম) বিষয় পাইতে পারে না। সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে শুধু ঘরবাড়ীর উত্তরাধিকারী বা অধিকারী হওয়া সম্ভব। সহরের ছোট ছোট বাড়ী অথবা পল্লীগ্রামাঞ্চলের দাচা কেহ ইচ্ছা করিলে কিনিতে পারেন এবং ক্রেতা সেইগুলির আইনসঙ্গত অধিকারী বলিয়াও গণ্য হইবেন। কিন্তু একজন লোক মাত্র একটি বাড়ী বা একটি দাচার অধিকারী হইতে পারিবেন। এ দেশে অনেক সময় একটি বাড়ীতে কয়েকটি পরিবার একত্র অবস্থান করেন। এইরূপ কো-অপারেটিভ গৃহের কোন কক্ষ কেহ কিনিতে কামনা করিলে কেনা যায়। তবে ক্রেতা সোভিয়েটনীতি-বিরোধী কোন কার্য্য করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবসা করা, ধর্ম্ম-যাজক অর্থাৎ পাদরী হওয়া কমিউনিজম্-বিরোধী কোন আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকা—ইহাই প্রধান অপরাধ।

সোভিয়েট নাগরিক কোন গ্রন্থাগার বা শিল্পসংগ্রহশালার অধিকারী হইতে পারেন তবে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে হয়। সামর্থ্য থাকলে মোটর গাড়ী কেনা যায়। নৌকা, লঞ্চ ও ইউবোটও কেনা চলে। এমন কি, বিমানপোত বা এরোপ্লেন কেনা আইনবিরোধী নয়। কিন্তু এত প্রকার সর্ত্তের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় যে, এই সকল যান ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাহায্য পাইবার জন্য লোক ভাড়া করা চলে, দাস-দাসী রাখাও নিয়মবিরুদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত ব্যবসা চলিতে পারে কিন্তু সোভিয়েট সরকার সেইরূপ ব্যবসার উপর এরূপ করভার চাপান যে লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি সরকারী চাকরি না করেন তাহা হইলে ডাক্তার বা উকিল প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করিতে পারেন। 'ষ্টেটবণ্ডস্'

নামক একপ্রকার কোম্পানীর কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। সুদ শতকরা ৮ টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কও আছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক সোভিয়েট সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। এই দেশের সেভিংস ব্যাঙ্ক শতকরা ৮ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিয়া থাকে।

যদি মনে করা হয়, ধনসাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সোভিয়েট রুশিয়ায় সকলের আয় সমান তাহা হইলে ভুল ধারণা পোষণ করা হইবে। সভিকুনো সিনেমা কোম্পানীর জানিটার বা দ্বাররক্ষক মাসে দেড় শত রুবল পান এবং এক একটি ষ্টারের বেতন ১৫ হাজার পর্য্যন্ত হইতে পারে। আজকাল সিনেমা ষ্টারের অত্যধিক কদর বা আদর সর্ব্বত্র। রাশিয়ায় সাহিত্যসেবী ও চিত্রশিল্পীরাও বেশ উপার্জ্জন করেন। উপার্জ্জিত অর্থের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে বেতনরূপে নোটই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। নোট লইয়া করিবেই বা কি? এ দেশে ক্রয় করিবার বস্তু খুবই কম। অন্যদিকে নোটের নিজস্ব মূল্য নাই বলিলেই হয়। ভ্যাসিলি ভি শকওমারকিন নামক নাটক-লেখক একখানা নাটকের জন্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রয়ালটিরূপে ২ লক্ষ রুবল রোজগার করেন। অথচ রুশিয়ায় রয়ালটি লওয়া আইনসঙ্গত কার্য্য নহে। মাইকেল কলৎজফ নামক সাংবাদিক ৩০ হাজার রুবল মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে এইরূপ আয় কাচিৎ দেখা যায়। ক্রমশঃ নূতন নূতন আইনের দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিগত অর্থাগমের পন্থা রুদ্ধ করা হইতেছে। তবে কার্য্যদক্ষতানুযায়ী বেতনাদির কিঞ্চিৎ তারতম্য না থাকিলে চলে না। বিনিময়ে কিছু বেশী না পাইলে লোকে অধিক দক্ষতা দেখাইবে কেন? কিন্তু আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে কলকারখানার মালিক ও কেরাণী উভয়ের আয়ের যে বিশাল বৈষম্য, রুশিয়ায় সেইরূপ প্রকাণ্ড পার্থক্য আদৌ নাই। ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশটি লোক ৫ হাজার পাউণ্ড বৎসরে রোজগার করে।

যদি কেহ মনে করেন চার্চ্চ ও পুরোহিত বিরহিত সোভিয়েট রুশিয়ায় সামান্য কারণেই ডাইভোর্স বা পতি-পত্নী বিচ্ছেদ প্রভৃতি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তিনি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী রহিবেন। নাগরিকদিগের পারিবারিক জীবন যাহাতে প্রীতিপূর্ণ ও সুদৃঢ় হয় সে বিষয়ে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা আছে। সঙ্ঘের মুখপত্র প্রাভদায় দাম্পত্য জীবন ও মাতৃত্ব সম্বন্ধে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে এই দেশে ডাইভোর্স প্রায়ই হইত, এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে কঠোর বিধান বিধিবদ্ধ হওয়ায় দাম্পত্য বিচ্ছেদের সংখ্যা খুবই কম হইয়া গিয়াছে। বিপ্লববাদ প্রথম প্রচারিত হইবার সময় পুত্রকন্যাদিগকে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বিদ্রোহী হইতে উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু এখন তাহাদিগকে পিতৃমাতৃবৎসল হইতেই বলা হয়। অন্যদিকে পিতামাতার পক্ষে সন্তানদিগকে উপেক্ষা করিয়া উশৃঙ্খল-জীবন-যাপন বে-আইনী ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত। বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকার সময় বিদ্যালয়-গুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছিল, পরে উহাদিগকে পুনরায় খোলা হইয়াছে। এখন এখানে দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সবই পড়ান হয়। এমন কি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শেলী, কীটস প্রভৃতি ইংরেজ কবির কাব্য পড়াইবার ব্যবস্থাও আছে।

ষ্টালিন তাঁহার 'লেনিনিজম্' নামক গ্রন্থে সোভিয়েট অর্থ-নীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃত কথা পূর্ব্বে দেশের কর্ত্তা ছিল ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনিকরা। কৃষক ও শ্রমিকদের প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে যাহা জন্মিত তাহা ভোগ করিত ধনিক এবং তাহাদের দানে পুষ্ট ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়। যাহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় শস্য ও পণ্য উৎপন্ন হইত তাহারা খাইতে পাইত না, লজ্জা ও শীত নিবারণের উপযুক্ত পরিচ্ছদ তাহাদের জুটিত না, রোগ হইলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে তাহারা দলে দলে অকালে কালের কোলে স্থান লাভ করিত। কমিউনিজম্ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর সেই উৎপীড়িত হৃতসর্ব্বস্ব কৃষক ও শ্রমিক দল দেশের প্রকৃত কর্ত্তায় পরিণত হইল। অবশ্য ইহা অত্যধিক অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কিন্তু এরূপ প্রবল ও প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়া, এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় নাই। গণতন্ত্র অতি প্রাচীনকালেও (ভারতেও) ছিল কিন্তু শ্রমিকতন্ত্র কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে যাহারা ছিল সর্ব্বহারা পরে তাহারাই হইয়া পড়িল সর্ব্বে-সর্ব্বা। জমি-জমা ও কলকারখানার মালিক হইল সঙ্ঘবদ্ধ চাষা ও কুলীরা। শস্য ও পণ্য হইতে যাহা কিছু লভ্য সব তাহাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয়িত হওয়াই বিধান। যাহারা পালিত পশুপাল অপেক্ষাও উপেক্ষিত ছিল, জীবনের বা জগতের সকল উপভোগ্য হইতে যাহাদিগকে যুগের পর যুগ জোরপূর্ব্বক বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল—সেই চিরলাঞ্ছিতদের, চিরবঞ্চিতদের সগৌরবে ও সানন্দে বাঁচিয়া থাকার ব্যবস্থা করা হইল—তাহারা শুধু খাটিয়া খালাস। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, শীতবারণের বস্ত্র, রোগ নিবারণের ঔষধ, এমন কি অবকাশ-বিনোদনের বস্তু বা ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সাগ্রহে যোগাইবে রাষ্ট্র বা ষ্টেট। ষ্টেট সঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত এবং সেই সঙ্ঘ তাহাদেরই সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নহে। কমিউনিষ্টদের মতে,—ইহাই সত্যিকার স্বাধীনতা। যে দেশের জনসাধারণ অন্ন বস্ত্রের চিন্তায় অস্থির সে দেশ বিদেশী দ্বারা শাসিত না হইলেও পরাধীন।

সস্ত্রীক

কানাই বসু, বি-এল

বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিবার একটু পরে শিবেন্দু আবার আসিয়া হাজির হইল। হাওড়া ছাড়িবার পর ইহারই মধ্যে বার দুই আসিয়া মাধুরীর খবর লইয়া গিয়াছে। আবার সে আসিল, এবং এবারে শুধু হাতে নয়, একটা খাবারের চ্যাঙারি সমেত। দেখিয়া মাধুরীর সামনের বেঞ্চের চশমা-পরা মেয়েটীর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শিবেন্দু বলিল, "এই নাও ধরো। কিন্তু তোমার সীতাভোগটা বাপু তেমন ভালো মনে হল না। তাই খালি মিহিদানাই নিলুম। কি বল?"

শুনিলে মনে হইতে পারে মাধুরী বুঝি গাড়ীতে উঠিবার আগে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিল বর্দ্ধমানে আসিয়া তাহাকে সীতাভোগ মিহিদানা কিনিয়া দিতেই হইবে। কিন্তু তাহা নয়। শিবেন্দুর কথাই ঐ রকম।

মাধুরীকে খাবারের চ্যাঙারি হাতে লইতে হইল। লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে তোমার মিহিদানা?"

এ প্রশ্ন অবশ্য নিষ্প্রয়োজন। মিহিদানার ব্যবহার মাধুরীর অজানা নাই। কিন্তু প্রশ্ন তো তাহার কথায় নয়, প্রশ্ন তাহার কথার সুরে। কিন্তু মিষ্টান্ন-বিলাসী শিবেন্দু তাহার সুর লক্ষ্য করিল না, সে কথারই জবাব দিল।

—"খাবে, আবার কি হবে। একেবারে গরম, মানে বেশী গরম নয়, বেশ খাবার মতন আছে। খেয়ে দেখ না, ভারি মোলায়েম লাগবে।"

শিবেন্দুর মুখের উপর মিহিদানার মোলায়েমত্ব ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টান্ন সম্বন্ধে তাহার দুর্ব্বলতাও যত, সবলতাও তেমনই। খাবার, ভালো ও হাতের কাছে পাইলে, শিবেন্দু রসনা সংযত করিতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য তাহার কুণ্ঠা বা লজ্জার বালাইও নাই।

মাধুরীর হাসি পাইল। তবু সে গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "গরম থাকে ভালোই, তুমি খাও না।"

শিবেন্দু কহিল, "সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আধ সেরটাক্ আগে চেখে দেখেছি, তবে এই এনেছি। চমৎকার জিনিষ, খেলেই বুঝতে পারবে।"

শুনিয়া চশমা-পরা মেয়েটীর ঠোঁটের হাসি কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইল। মাধুরীরও গাম্ভীর্য্য টিকিল না। হাসিয়া বলিল, "তা বুঝেছি, মিষ্টি মাত্রেই তোমার কাছে চমৎকার।" বলিয়া মাধুরী চ্যাঙারি তাহার পাশে বেঞ্চের উপর রাখিল।

দেখিয়া শিবেন্দু বলিল, "বাঃ, রেখে দেবার জন্যে আনলুম বুঝি? সকালে যা তাড়াহুড়ো করে খাওয়া, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে। খানিকটা মেরে দাও না। দাঁড়াও, জল এনে দিচ্ছি।"

শিবেন্দুর ব্যস্ততায় মাধুরী ব্যস্ত হইল। কিন্তু বারণ করিবার অবসর পাইল না। ততক্ষণে শিবেন্দু জলের যোগাড়ে ছুটিয়াছে। চশমা পরা মেয়েটীর হাসি এবার তাহার ঠোঁটের আবরণ ভেদ করিয়া দন্ত-পংক্তি পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। মেয়েটীর পাশে তাহার মা বসিয়া আছেন। তাঁহারও চোখে চশমা। মাধুরী মুখ ফিরাইতে তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইল। বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন, "ক্ষিধে পেয়েছে, খাওনা মা, লজ্জা কি? গাড়ীতে অত লজ্জা করতে গেলে চলে না।"

মাধুরীর লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল। আরক্ত মুখে বলিল, "না না, ক্ষিধে পাবে কেন? এই তো বেলা দশটায় খেয়ে দেয়ে গাড়ীতে উঠেছি, এখনও দু'ঘণ্টা হয় নি। ওর ঐ রকম কথা।"

শিবেন্দুর ফিরিবার পূর্ব্বে এক টিকেট-চেকার আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েদের কামরায় যাত্রী বেশী নাই। আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোকই পুরুষ সহযাত্রীর সঙ্গে সাধারণ গাড়ীই ব্যবহার করেন। মাধুরী দেখিল চশমা-পরা মেয়েটি তাহার ভ্যানিটী ব্যাগ খুলিয়া দুইখানি টিকেট বাহির করিয়া দিল, তাহার নিজের ও তাহার জননীর। ও দিকের জানালার ধারে যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটী এতক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে গাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে যাবতীয় সামগ্রী দেখিতেছিল এবং অনর্গল বাক্যস্রোতে সকলের সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, চেকারকে গাড়ীর দিকে আসিতে দেখিয়াই সে হঠাৎ নিদারুণ ব্রীড়াময়ী হইয়া উঠিল। চট্ করিয়া মুখ

ঘুরাইয়া লইয়া, মাথার উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সে জানালার বাহিরে বিপরীত দিকের শূন্য প্লাটফর্মে কি যে পরম পদার্থ দেখিতে মনঃসংযোগ করিল, তাহা সেই জানে। কিন্তু মনঃসংযোগের একাগ্রতা তাহার অপূর্ব্ব। চেকার তাহার কাছে গিয়া বলিল, "টিকেট ?" জবাব না পাইয়া আবার বলিল, "আপকো টিকেট জেরা দেখলাইয়ে।"

স্ত্রীলোকটী শুনিতে পাইল না। চেকার একটু উচ্চস্বরে বলিল, "টিকেট দেখলানা।"

বাহিরের জগতে তখন কী অদ্ভুত বিস্ময়জনক ব্যাপারই না ঘটিতেছে! একান্ত নিবিষ্টচিত্তা রমণীর কাণে এবারও চেকারের কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। চেকার ঈষৎ কাশিল,—গলা পরিষ্কার করিবার জন্যই হউক বা বহির্মনা ললনার মনকে অন্তর্মুখী করিবার উদ্দেশ্যেই হউক। কাশিয়া বলিল, "দেখিয়ে—ইয়ে শুনিয়ে, কি মুস্কিল ইয়ে আপকো টিকেট হায়, আঃ—"

ব্যর্থ হইয়া চেকার মেঝেতে পা ঠুকিল। কিন্তু মেঝেয় কিম্বা কোথাও পা ঠুকিয়া রমণীর মন আকর্ষণ করা যায় না, ইহা চেকার বাবুর তখনো শিখিতে বাকী ছিল।

তখন বিপন্ন ও বিরক্ত চেকার টিকেট ফুটা করিবার যন্ত্রটী দৃঢ় মুষ্টিতে বাগাইয়া ধরিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্রাবৃত মাথাটীর উপর, —মারিল না,—মাথাটীর উপরে গাড়ীর কাঠের দেয়ালে ঠুকিয়া শব্দ করিল ও সেই সঙ্গে মেঝেতে পুনরায় পাও ঠুকিল।

এত সাধনা বিফল হইল না। রমণীর মন টলিল, ধ্যান ভাঙ্গিল। মাথা ফিরাইয়া লজ্জাশীলা দুইটী, আয়ত না হইলেও, আঁখি তুলিয়া বারেক চেকার বাবুর পানে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল।

চেকার কহিল, "টিকেট হায় ?"

স্ত্রীজনোচিত ও স্বাভাবিক লজ্জায় রমণীর মুখ খুলিল না। অবগুণ্ঠিত মাথা হেলাইয়া জানাইল, "হ্যায়।" চেকার হাত পাতিল। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া রমণী তখন আবার বাহিরের পানে তাকাইয়াছে।

এবারে পুরুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল। আবার গাড়ীতে জোরে জুতা ঠুকিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে চেকার আদেশ করিল, "টিকেট দেখলাও।"

অতঃপর সেই চেকার ও হিন্দুস্থানী রমণীর মধ্যে আলাপ শুরু হইল। রমণী অবগুণ্ঠন ও লজ্জাভার বিসর্জ্জন দিয়া টিকেট সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিল। শুধু বলিল না, শপথ করিয়া বলিল, টিকেট তাহার আছে পাশের গাড়ীতে তাহার সঙ্গী মরদের কাছে। চেকার চাহিল রমণী পাশের গাড়ীতে কোন মরদ তাহার সঙ্গী তাহা দেখাইয়া দিক। অগত্যা অবলা রমণী আবার শপথ করিল ও বলিল, তাহার সঙ্গী গাড়ী ধরিতে পারে নাই, হাওড়ায় পড়িয়া আছে। পরের গাড়ীতে আসিতেছে। বিশ্বাস না হয় চেকার হাবড়ার টিসনে 'তার' ভেজিয়া সন্ধান লইতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ সে তাহার সঙ্গ ছাড়া সঙ্গীর নামও বলিয়া দিল। ইহার পর আর অবিশ্বাস করা চলে না। তাই চেকার প্রস্তাব করিল রমণী যেন এই ষ্টেশনে নামিয়া পরের গাড়ীতে আগন্তুক সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করে। এবং নিজের প্রস্তাবের সমীচীনতা সম্বন্ধে চেকার এতই নিঃসন্দেহ যে স্ত্রীলোকটীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটী পুঁটলি তুলিয়া লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। অগত্যা তাহার অপর গাঁঠরীটী লইয়া সেই লজ্জাশীলা নারী প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে করিতে চেকারের পিছনে চলিল।

চশমা পরা মেয়েটী বোধকরি কলেজে পড়া। পথে ঘাটে অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে তাহার বাধে না। চেকার ফিরিয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওর কি টিকিট নেই? তাই বুঝি ওকে নাবিয়ে দিলেন?"

চেকার একটি "হাঁ" বলিয়া দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিল। মেয়েটী বলিল, "ওকে কি পুলিশে দিলেন?"

চেকার মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাঃ, পুলিশে আর দিলুম না। হাজার হোক মেয়েছেলে। ঐ নাবিয়ে দিলুম। কিন্তু নাবিয়ে দেওয়াও যা আর না দেওয়াও তা। এতক্ষণে হয় তো আর একটা কামরায় উঠে পড়েছে। আর নয় তো পরের গাড়ীতে উঠবে। আবার যতক্ষণ না কোথাও নাবিয়ে দেয় ততক্ষণ চড়ে নেবে। এই করতে করতে দেশ পর্য্যন্ত পৌছে যাবে।"

চেকার আসিয়া মাধুরীর সামনে হাত পাতিল। কিন্তু নিজের কথার সূত্র ধরিয়া মেয়েটীর দিকেই চাহিয়া বলিল, "ওরা ঐ করেই চালায়। শুধু মেয়েছেলে কেন, ওদের পুরুষ গুলো পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ বিনা টিকিটেই চালিয়ে দেয়।" চেকার হাসিয়া মাধুরীর দিকে ফিরিল।

মেয়েটী হাসিল। মেয়েটীর জননীর মুখেও যেন হাসির আভাস ফুটিল। কিন্তু মাধুরীর মুখ শুকাইয়া গেল। তখনও শিবেন্দুর দেখা নাই। মাধুরীর দুশ্চিন্তা হইল কি বলিবে সে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার তো কোনও প্রভেদ নাই। তাহাকেও তো বলিতে হইবে টিকেট তাহার কি একটা আছে, কিন্তু তাহার কাছে নয়, আছে তাহার সঙ্গী পুরুষের কাছে। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। এখনই হয় তো চেকার মেঝেতে জুতা ঠুকিবে। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "টিকিটটা, দেখুন, আমার কাছে নেই, যাঁর কাছে আছে তিনি জল আনতে গেছেন, একটু দাঁড়ান, এক্ষুনি আসছেন।"

তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া চেকার বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ঘুরে আসছি।" তারপর বলিল, "বিনা টিকেটের প্যাসেঞ্জার আমরা দেখলেই চিনতে পারি। আজ ১৩ বচ্ছর এই কাজ করছি।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া চেকার চলিয়া যাইতেছিল। সেই সময় এক ভাঁড় জল লইয়া শিবেন্দু আসিয়া পড়িল। মাধুরী নিশ্চিন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "এই যে উনি এসেছেন।"

চেকার বাবু ফিরিয়া দাঁড়াইল। শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি হয়েছে?"

চেকার বলিল, "না, কিছু হয় নি। এঁর টিকেটটার কথা হচ্ছিল, আপনার কাছে—"

শিবেন্দু কহিল, "হ্যাঁ, আমারই কাছে আছে, এই যে।" বলিয়া কোটের ভিতরের পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দিল

পড়িয়া চেকার বলিল, "সেল্‌ফ্ এণ্ড্ ওয়াইফ্, বেনারস। তাই বলুন। আপনি আমাদেরই দলের কোন ডিপার্টমেণ্টে আছেন? হেড অফিসে নিশ্চয়?"

শিবেন্দু বলিল, "হ্যাঁ, অডিট্ এ।"

চেকার বলিল, "সুখে আছেন দাদা, দিব্যি আছেন। এই দেখুন দিকি কদিন ছুটী আছে, চল্লেন কাশী। স্রেফ্ ছুঁচকার মতন একটা পাশ কেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আনন্দকে আনন্দও হল, আবার সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎকে ধর্ম্মমাচরেৎও হল। দিব্যি আছেন।"

কথা শেষ করিয়া চেকার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। লোকটী কিছু বেশী কথা কহিতে ভালবাসে। কথা কহিয়াই তাহার আনন্দ, শ্রোতার ভাল লাগিল কি না লাগিল তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপও নাই।

মাধুরী মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিন্তু মুখ ফিরাইয়াও স্বস্তি নাই। চশমা পরা মেয়েটী কান দিয়া চেকারের কথাগুলি গিলিতেছে। এবং চোখ না তুলিয়াও মাধুরী যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই কলেজে পড়া, আইবুড়ো মেয়েটা চোখ দিয়া তাহাকে ও শিবেন্দুকে গিলিতেছে।

তখন চেকার বলিতেছে, "আর আমাদের চাকরী? আর বলবেন না দাদা। একটা দিন ছুটী নেই! দিন নেই, রাত নেই, খালি ডিউটি। আর ডিউটি বলে ডিউটি? আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ডিউটি, যে, পাখার তলায় বসে ১০টা ৫টা? রাম বল! গাড়ীতে গাড়ীতে প্রাণ হাতে করে ছোটাছুটি।" হঠাৎ গলা নামাইয়া চেকার বলিয়া চলিল, "মাসের মধ্যে আদ্দেকটা মাস রাত্তিরে বাড়ীতে শুতে পাই না মশাই। বাড়ীতে রাগ করে, বলে, হয় চুলোর চাকরী ছেড়ে দাও, নয় তো ঘর সংসার ছেড়ে দাও। বলবে না মশাই, বলুন তো?"

শিবেন্দু জলের ভাঁড় হাতে করিয়া শুনিতেছিল, না শুনিয়া উপায় নাই বলিয়াই। এতক্ষণে একটু ফাঁক পাইয়া বলিল, "তা তো বটেই।" বলিয়া জলের ভাঁড়টি আগাইয়া দিয়া মাধুরীকে বলিল, "এই নাও, মাধুরী, জলটা ধরো।"

বলিয়াই পাছে চেকার শিবেন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের সুখের সহিত নিজের জীবনের দুঃখের তুলনা ফের শুরু করিয়া দেয় এই ভয়ে, মাধুরীর ধরিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া ভাঁড়টী বেঞ্চের উপর রাখিয়া নিজের কামরার দিকে অগ্রসর হইল।

চেকার ডাকিয়া বলিল—"এই যে দাদা, আপনার পাশটা।" শিবেন্দুকে ফিরিতে হইল।

"শেষকালে ওঁকে আবার ঐ খোট্টা মেয়েছেলেটার মতন, —হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

বোধকরি টিকেটখানা মাধুরীর কিছু আগের শুষ্ক মুখ মনে করিয়াই চেকার হাসিতে হাসিতে মাধুরীর মুখখানি একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একখানি রক্তবর্ণ কাণ

ব্যতীত মুখের আর কোনও অংশ তাহার চোখে পড়িল না। "পাশে"র কাগজটার উপর কি একটু লিখিয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া চেকার প্রস্থান করিল।

শিবেন্দু বলিল, "যত সব রাবিশ! মাধুরী তুমি খেয়ে নাও, বুঝলে, আমি চল্লুম, গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে।" শিবেন্দু পিছন ফিরিল।

মাধুরীর ক্ষুধা পায় নাই। তবু যদিবা শিবেন্দুর নির্ব্বন্ধে কিছু মুখে দিত, এখন সেদিকে তাহার মন একেবারেই গেল না। মন তাহার আটকাইয়া রহিল চেকারের শেষের কথা কয়টাতে। সত্যই তো, ঐ যে কাগজের টুকরাটা, যাহার দ্বারা রেল কোম্পানী তাহাদের বিনামূল্যে কাশী যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছে, সেই কাগজটা যদি শিবেন্দুর কাছে থাকে, তবে পথে আবার যে কোনও চেকার উঠিয়া টিকেট চাহিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি।

মাধুরী কহিল, "আচ্ছা খাব'খন। কিন্তু তুমি দাঁড়াও, আমি মনে করছি তোমার গাড়ীতে যাব।"

বলিতে বলিতে একহাতে খাবারের চাঙারি ও অন্যহাতে জলের ভাঁড় লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শিবেন্দু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, এ গাড়ীতে কি হল? এই তখন বল্লে অত পুরুষের ভিড়ে যেতে ভাল লাগে না। এখানে বেশ গল্প করতে করতে যাবে। আবার কি হল?"

মাধুরী বলিল, "হোকগে ভিড়। তুমিও নিশ্চিন্দি থাকতে পারছ না, পঞ্চাশবার এসে এসে খবর নিতে হচ্ছে। আর আমারও কেমন যেন ভয় ভয় করছে বাপু আলাদা যেতে।"

শিবেন্দু হাসিয়া কহিল, "দূর, দিনের বেলায় আবার ভয়ের কি আছে! তা যেতে চাও চল, চট্ করে এসো, এক্ষুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।"

শিবেন্দু কামরার ভিতর এক পা উঠিয়া বাঙ্কের উপর হইতে মাধুরীর সুটকেসটা তুলিয়া লইল। মাধুরী গাড়ী হইতে নামিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আসি, আবার দেখা হবে। আমরা তো আপনাদের ষ্টেশনেই নাবছি, ওখানে দু'এক দিন থেকে কাশী যাব।"

চশমা পরা মেয়েটী দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "আচ্ছা, নমস্কার।" মেয়েটীর মা কেবল ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় কাত করিলেন। মাধুরীর দুইটী হাত জোড়া থাকায় প্রতিনমস্কার করিতে পারিল না। চলিতে চলিতে মনস্থ করিল, আর কিছু পারুক না পারুক বিদেশে থাকিয়া স্বামীর সহিত অকুণ্ঠ ভ্রমণে পুরুষের মত হাত তুলিয়া নমস্কার করাটা অন্ততঃ অভ্যাস করিয়া লইবেই।

পাশাপাশি গমনশীল শিবেন্দু ও মাধুরীকে দেখিতে দেখিতে চশমাপরা মেয়েটী বলিল, "দুটীতে বেশ মানিয়েছে, নয় মা?"

মা কহিলেন, "হুঁ।"

মেয়েটী আবার বলিল, "আচ্ছা মা, কার রঙ বেশী ফরসা বল তো। বৌটীর, নয়?"

মা বলিলেন, "কে জানে বাবু, অতশত আমি দেখিনি।"

মেয়েটী বলিল, "বরটাও বেশ ফরসা বটে, কিন্তু বৌটীর রঙটা যেন আরও বেশী।"

মা বলিলেন, "মেয়েছেলে, ঘষা মাজা করে, তাই অতটা দেখায়। পুরুষ মানুষকে রোদে বিষ্টিতে ঘুরতে হয়। নইলে ওর চেয়ে ছেলেটাই বেশী ফরসা।"

মেয়ে হাসিয়া বলিল, "তবে যে তুমি বল্লে অতশত দেখ নি? বৌটী কিন্তু বেশ ভাল মানুষ, নয় মা?"

মা কহিলেন, "তা কি করে বলব বাছা, এক দণ্ডের দেখা, কার মনে কি আছে কিছু কি বলা যায়।"

•

গন্তব্য ষ্টেশন আসিল প্রায় অপরাহ্ণের শেষে। গাড়ী প্লাটফর্মের ভিতর ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শিবেন্দু চিৎকার করিতে লাগিল, "অশোক, অশোক।"

প্লাটফর্মের অপর প্রান্ত হইতে ট্রেণের বিপরীত মুখে আসিতে আসিতে শ্যামবর্ণের এক যুবক ডাকিল, "শিবু, শিবু।"

গাড়ী থামিলে দুই বন্ধু যখন সুটকেস, ট্রাঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি নামাইতে ব্যস্ত, ততক্ষণে মাধুরী নামিয়া চশমা-পরা মা ও মেয়ের সহিত গল্প করিল। বাড়ীর নাম বলিয়া তাঁহাদের বার বার নিমন্ত্রণ করিল যেন কাশী যাইবার আগে যে দুইদিন সে এখানে আছে, ইহারই মধ্যে তাঁহারা একদিন তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন। বলা বাহুল্য ঠিক এই নিমন্ত্রণ মাধুরীরও মিলিল।

মা ও মেয়ে এখানকার বাসিন্দা বলিলেও হয়। মা স্থানীয় মেয়েস্কুলের শিক্ষকতা করেন, মেয়ে কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে। তাঁহারা একা ভ্রমণে অভ্যস্ত। কুলী ডাকিয়া, মোটঘাট উঠাইয়া তাঁহারা আগেই চলিয়া গেলেন। যাইবার আগে আর এক দফা নিমন্ত্রণের আদান-প্রদান হইল।

মালপত্র নামাইয়া শিবেন্দু ষ্টেশনের বাহিরে গরুরগাড়ী ঠিক করিতে গেল। অশোক বাক্স বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ছোট ষ্টেশন, যাত্রী বেশী নামে নাই। যে কয়জন নামিয়াছিল, তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার পর পানি-পাঁড়ে তাহার জলের বালতি লইয়া অদৃশ্য হইল। ষ্টেশনের ছোটবাবু যে দুই চারখানা টিকেট পাইলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আফিস-ঘরে ঢুকিলেন। তাহারা দুইজন ছাড়া ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য। ঘুরিয়া ফিরিয়া অশোকের দৃষ্টি কেবলই মাধুরীর মুখের উপর পড়ে।

শেষ অপরাহ্নের রৌদ্রে মাধুরীর মুখের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ রক্তিমাভ দেখাইতেছে। মেঠো হাওয়ার তাড়নায় চূর্ণ কুন্তল সেই রক্তিম মুখের আশেপাশে উড়িয়া পড়িতেছে। সারাদিনের শ্রান্তি ও রৌদ্রের উত্তাপ সেই সুন্দর মুখকান্তিতে একটা শুষ্ক ম্লান শ্রী দান করিয়াছে, যাহা দেখিলে স্নেহময় চিত্তে মায়া জাগে, প্রেমময় চোখে মোহ লাগে, এবং সেই শুষ্ক কোমল মধুর মুখখানিকে অঞ্জলি ভরিয়া ধারণ করিবার জন্য দুইটা হাত লুব্ধ হয়।

পথের বন্ধুদের বিদায় দিয়া মাধুরী এদিকে আসিল। অশোক বলিল, "এইবার কি হয়, বড্ড যে লিখেছিলে আর কথখনো জন্মেও দেখা হবে না?"

মাধুরী বলিল, "না, লিখবে না। একখানা চিঠি লিখলে জবাবের জন্যে হত্যে হতে হয়। কী করে, কত কষ্টে, কত লুকিয়ে যে চিঠি লিখি, আর চিঠির জবাব না পেলে কী রকম যে কষ্ট হয় তা তো জানো না।"

মাধুরীর কষ্টের কথা শুনিয়া অশোক অতি হৃষ্টচিত্তে বলিল, "না, তা আর কী করে জানব বল? আমার তো আর কথনো ওরকম হয় নি। আমাদের বুক যে পাথরের তৈরী।"

মাধুরী বলিল, "তাই তো, পাথরের তৈরীই তো। যে পাষাণ প্রাণ, তার বুক পাথরের নয় তো কী?"

অশোক বলিল, "কিন্তু ঘা খেলে পাথরই ভাঙে।" বলিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া সে খপ্‌ করিয়া মাধুরীর একখানা হাত ধরিয়া নিজের হৃদয়ের উপর স্থাপন করিল ও বলিল, "এই দেখ না।"

দিনের বেলায়, প্রকাশ্য ষ্টেশনে, বিশেষতঃ অদূরে শিবেন্দুর উপস্থিতিতে, এতদূর নির্লজ্জতার জন্য মাধুরী প্রস্তুত ছিল না। ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া সে কহিল, "আঃ, কী কর! মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কেউ দেখলে কী ভাববে বলত? ছিঃ।"

একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া অশোক বলিল, "ফু—উঃ, কে আছে আবার যে দেখবে?''

"বাঃ কেউ নেই? ঐ দেখ।" মাধুরী আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইল গরুরগাড়ীর গাড়োয়ানকে লইয়া শিবেন্দু আসিতেছে। মাথার কাপড় টানিয়া লজ্জিতা মাধুরী অশোকের সান্নিধ্য হইতে সরিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল ও অতি সপ্রতিভ ভাবে অশোক আর একটা সিগারেট ধরাইল।

শিবেন্দু কহিল, "বেটা ছ'আনার কমে রাজী হল না। যাকগে, এই রদ্দুরে, কি বল?"

মাধুরী চাপা গলায় বলিল, "বলুম, বেশী দূর তো নয়, হেঁটেই যাই, তা নয় আবার গাড়ী করা হল।" কিন্তু তাহার কথা না শিবেন্দু না অশোক কেহই কানে তুলিল না। গাড়ীতে মালপত্র ও মাধুরীকে তুলিয়া দিয়া দুই বন্ধু পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলিল।

পথ মেয়ে-স্কুলের পাশ দিয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া দেখিয়া চশমা পরা মেয়েটী মাকে ডাকিয়া বলিল, "ও মা, ঐ দেখ, সেই বৌটী যাচ্ছে।"

মা জিনিষপত্র গুছাইতে ছিলেন, বলিলেন, "কে যাচ্ছে?"

মেয়ে কহিল, "এই যে আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে এল, সুন্দর বৌটী।"

মা কহিলেন, "অ।"

মেয়ে বলিল, "ওমা, দেখ, ওর স্বামীর সঙ্গে আর একটী

কে কালো মতন ভদ্রলোক চলেছে, দুজনকে পাশাপাশি কিরকম দেখাচ্ছে দেখ। পড়ন্ত রদ্দুরে একজনকে যেমন ফরসা দেখাচ্ছে, আর একজনকে তেমনি কালো দেখাচ্ছে। বৌটার কে হয় কে জানে। ও লোকটা কে মা? তুমি চেন?"

তাহার মা এখানকার সব-চিন লোক। সকলেই তাঁহাকে চিনে, তিনিও সকলকেই চিনেন। মা বলিলেন, "কে জানে বাছা, কোথাকার কে, আমার এখন ওসব দেখবার সময় নেই।"

বলিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন শ্যামবর্ণ যুবকটীকে চিনিতে পারেন কি না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শিবেন্দু বেড়াইতে বাহির হইল। মাধুরী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল শিবেন্দু যেন দেরী না করে ও বাজারের খাবার কিনিয়া না খায়। মাধুরী এখনই চা ও জলখাবার তৈয়ারী করিবে। শিবেন্দু জানাইল সে দেরী করিবে না, মাত্র বাজারটা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে।

তখনও ভালো করিয়া সকাল হয় নাই। শিবেন্দুর বাজার ঘুরিয়া আসার অর্থ মাধুরীর জানা আছে। সংসারের কাজ শুরু করিবারও তাড়া নাই। মাধুরী বাগানে ঢুকিল।

কিছুক্ষণ পরে আঁচল ভরিয়া চামেলি ফুল সংগ্রহ করিয়া মাধুরী ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যে ঘরে ঢুকিল, সে ঘরে তথনো অশোক নিদ্রামগ্ন।

পূবের জানালা দিয়া ঊষার গোলাপী আলো আসিয়া অশোকের শ্যামবর্ণের বর্ণান্তর ঘটাইয়াছে। কোমল আলোর প্রলেপে ও সুখনিদ্রার আবেশে স্নিগ্ধ সেই মুখখানি শিশুর মতো সরল, নিশ্চিন্ত ও একান্ত মমতাময়রূপে প্রতিভাত হইল। বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া, মাধুরী আবিষ্ট চোখে সেই প্রিয় মুখ চুরি করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, চোখের পলক পড়ে না। বহুদিনের পর ঈপ্সিত দর্শনের নেশা তাহার কাটিতে চাহে না।

হঠাৎ বাহিরে কোথায় মালির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার দেখার ধ্যান ভাঙ্গিল। দরজাটা খোলা রহিয়াছে। অতি সন্তর্পণে মাধুরী চলিল দরজা বন্ধ করিতে।

কেন যে মানুষের গাঢ় ঘুম একসময়ে হঠাৎ বিনা কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্তে অশোক চোখ মেলিয়া চাহিল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে সে দেখিল মাধুরী। তাহার শুভ্র মসৃন গ্রীবার উপর শিথিল কবরী দুলিতেছে, তাহার সঞ্চারিণী অঞ্চল ভূমিতে লুটাইতেছে, শয্যাতল হইতে শুভ্র ফুলের একটী ছায়াপথ আঁকা হইয়াছে, সেই ছায়াপথের এক প্রান্তে সে, অপর প্রান্তে মাধুরী, এবং ঘরের মধ্যে একটী মন্থর মৃদু সুরভি বিচরণ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া মাধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল অশোক জাগিয়াছে। অশোকের চোখের মুগ্ধতা অনুভব করিয়া মাধুরীর চোখে মুখে একটী সলজ্জ ও সপ্রেম হর্ষের প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল। প্রভাতে এই রমণীয় পরিবেশের মাঝখানে এই মোহিনী মূর্ত্তিকে অশোক শুধু দুই নয়ন মেলিয়া নহে, সারা হৃদয় মেলিয়া দেখিতে লাগিল।

তখন সেই ঘরখানি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং ঘরের ভিতর এই দুইটি উদ্‌ভ্রান্ত নরনারীকে ঘেরিয়া সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাহিরের জগতে সময়ের গতি স্তব্ধ হয় নাই। সেখানে ঊষা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে। পথে লোক চলাচল বাড়িয়াছে।

কালকের সেই চশমা পরা মেয়েটী ও তাহার মা আসিয়া বাগানে ঢুকিলেন। মালী কোথায় ছিল, ইঁহাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া শোনা গেল, বহুমা ঘরেই আছেন ও কাল যে বাবু আসিয়াছেন তিনি বেড়াইতে গিয়াছেন, এই রূপই মালীর মালুম হইতেছে।

দুইজনে সামনের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। এ পাশের ঘরখানি খোলা, শূন্য বিছানা পড়িয়া আছে। ও দিকের ঘরটীর দরজা ভেজানো। মা ও মেয়ে সেই দিকে চলিলেন।

দরজা ঠেলিয়া মহিলা ঘরের ভিতর পা বাড়াইলেন।

পর মুহূর্ত্তে মুখ কালো করিয়া তিনি দ্রুত পিছু হটিলেন। মায়ের কাঁধের উপর দিয়া মেয়ের দৃষ্টিও ঘরের ভিতর গিয়াছিল, সেও মুখ ফিরাইয়া সরিয়া আসিল।

অকস্মাৎ বাহিরের চলমান রূঢ় জগতের সহিত ঘরের কোমল স্থির জগতের সংঘাত হইল। সেই সংঘাতে ঘরের জগৎ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

সেই ঘরের জগাতে যে ছেলেটী তক্তাপোষের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পরম আনন্দে একটী মেয়ের শিথিল কবরীতে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল, এবং যে মেয়েটী ভূমিতলে জানু পাতিয়া বসিয়া ছেলেটীর দুই জানুর মধ্যে নিজেকে বন্দী করিয়া পরম আনন্দে মাথা পাতিয়া সেই প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে নিজের কবরীর প্রসাদী ফুল লইয়া ছেলেটীর বিস্রস্ত চুলে আটকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের দুই জনের মধুর স্বপ্ন টুটিয়া গেল। তাহাদের চৈতন্য হইল পৃথিবীতে সূর্য্য উঠিয়াছে, পৃথিবীর পথে বিচার বুদ্ধিশালী মানুষ চলিতেছে ও আপাততঃ একটী বিচক্ষণ মানুষ প্রবীণা শিক্ষয়িত্রীর রূপ ধরিয়া তাহাদের অতি কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে।

চকিতা মাধুরী মাথার কাপড় টানিতে টানিতে মুখ লাল করিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, অতিথিরা দালান ও রক পার হইয়া বাগানে নামিতেছেন। সে দ্রুতপদে পিছনে আসিয়া জোড় হাতে নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন আসুন, এত শীগগির যে পায়ের ধুলো দেবেন আশা করতে পারিনি।"

তাহার এত যত্নের নমস্কার কেহই গ্রাহ্য করিল না। শিক্ষয়িত্রী কথা কহিলেন না, গম্ভীর মুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মেয়ে মাধুরীর মাথার পুষ্পালঙ্কারের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আহা, আশা কর নি না আশঙ্কা করনি?"

সেই সময়ে তোয়ালে কাঁধে ও টুথ-ব্রাস হাতে, সেই কালো ছোকরাটা, তখনো তাহার চুলে দুই একটি ফুল আটকাইয়া আছে, তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দুই জোড়া চশমায় ছাঁকা তীব্র দৃষ্টি সেই কালো পিঠখানার উপর নিবদ্ধ হইল। মায়ের চোখে জলন্ত ঘৃণা, মেয়ের চোখে ঘৃণা না হোক বিস্ময় ফুটিল, ভাবিল কোথায় সেই সোণার কার্ত্তিকের উজ্জ্বল রূপ, আর কোথায় এই দুষ্কৃতের কালো বরণ! ছি ছি, কি পছন্দ!

মাধুরী হাসিমুখে আসিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া বলিল, "বাগানে বসবেন? কিন্তু রোদ উঠে গেছে, ঘরে বসলে হতো না? একটু চা, টা—"

মেয়েকে উত্তর দিতে হইল না। তাহার মুখ খুলিবার আগেই তাহার জননী পিছন ফিরিয়া তাঁহার সবচেয়ে শিক্ষয়িত্রী-জনোচিত স্বরে কহিলেন, "সুনীতি, চলে এসো। তোমাকে কতবার বলে দিয়েছি, অজানা লোকের সঙ্গে মেশা-মেশি করা আমি পছন্দ করি না।"

সুনীতি চুপ করিয়া রহিল। বলিল না যে তিনিই তো রাত পোহাইতে না পোহাইতে উঠিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন কালকের বৌটির বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য।

মাধুরী বিশ্বাস করিতে পারিল না সুনীতির মায়ের কথার অর্থ। তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া, তাহারই সহিত দেখা করিতে আসিয়া, তাহাকেই মিশিবার অযোগ্য বলিতে পারা যায় কি কারণে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আসিল না।

সে আগাইয়া আসিয়া মূঢ়ের মত মা ও মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এসেই চলে যাচ্ছেন? কেন?"

সুনীতির জননী মনের জ্বালা দূর করিবার জন্য এই সুযোগটুকুই চাহিতেছিলেন। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নাকের উপর চশমা ঠেলিয়া দিয়া তিনি অগ্নিময় ভাষায় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

•

মুখ ধুইয়া আসিয়া অশোক দেখিল মাধুরী তাহার ঘরে টেবিলের উপর দুই বাহুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। অনেক সাধ্য সাধনায় সে অভ্যাগতের হাতে মাধুরীর লাঞ্ছনার কথা শুনিল। কয়েক মূহুর্ত্ত অবাক হইয়া থাকিয়া অশোক হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাধুরী বিস্ময়ে ও রাগে মাথা তুলিয়া বলিল, "তুমি হাসছ কি বলে?"

অশোক হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু আছে? এই বিদেশে অন্ততঃ দুটী মানুষও রইল, যারা তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছে। তোমার ঐ সুনীতি আর তার মাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে।"

মাধুরী ক্রোধে আরক্তমুখে বলিল, "ঐ বুড়ীর আমি মুখ দেখব আবার? এমন কথা বলে আমাকে? বল্লুম উনি আমার স্বামী, তা বলে কি না, আর সেই কালকের বামাটি,

কোথায় গেলেন? ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো, ঘরে একটা, পথে একটা—"

অশোক হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। বলিল, "ঝাঁটা মারো বল্লেন? বাঃ, বাঃ, দেখেছো মাধুরী, ইস্কুল মাষ্টারই হন আর উচ্চ শিক্ষিতাই হন, মূলতঃ বাঙ্গালীর মেয়ে তো। রেগে গেলে নিজের ভাষাই বেরিয়ে পড়ে। সেই গোপাল ভাঁড়ের 'সঁড়া অন্ধা'র মতো।"

মাধুরী বলিল, "থামো। নিজের স্ত্রীকে এতবড় অপমান করে গেল আর তুমি হেসে গড়িয়ে পড়ছ? তোমার লজ্জা করে না?"

অশোক হাসি থামাইয়া বলিল, "আমার নিজের স্ত্রীকে অন্য লোকে পরস্ত্রী বলে মনে করেছে, এতে আমার কী আছে? আর সত্যি বাপু, তাঁরই বা দোষ কি? তুমি সারা দিনটা তোমার শিবুদার স্ত্রী সেজে এলে—"

মাধুরী ভেংচাইয়া কহিল, "সেজে এলে! তুমি কেন আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এলে না?"

অশোক চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "বাঃ, তখন কোথায় বাড়ী কোথায় কী তার ঠিক নাই।"

মাধুরী কহিল, "নেই তো নেই। আমার এমন রাগ হচ্ছে।—ছি ছি ছি।" তাহার মনে পড়িল বর্দ্ধমান ষ্টেশনে চেকারের মন্তব্য। সে আবার কহিল, "ছি ছি ছি ছি।"

অশোক কহিল, "এখন ছিছি করলে কি হবে, তখন তো শিবুদার বৌ সাজতে—"

মাধুরী ঝাঁঝিয়া বলিল, "ফের বলছ ঐ কথা? আমি সাজলুম, না তুমি সাজালে? তুমিই তো তোমার কটা টাকা বাঁচাবার জন্যে শিবুদাকে লিখলে—"

লজ্জায় মাধুরী কথা শেষ করিতে পারিল না। অশোক কহিল, "আমি না হয় লিখলুম, কিন্তু তোমরা দু'টীতে তো রাজী হয়ে গেলে। মনে করলে, খোস খবরের ঝুটোও ভালো, কি বল?"

মাধুরী অতিরিক্ত রাগে কথা কহিল না। অশোক বলিল, "তা সত্যি, শিবুদার চেহারার কাছে কি আমি? আর সেকেও কাজিনে দোষও নেই। অর্জ্জুন আর সুভদ্রার কথাই ধর না।"

মাধুরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল "কী ছোটলোকের মত ঠাট্টা যে কর, আমি কালই চলে যাবো।"

অশোক গম্ভীর ভাবে চুলে বুরুশ ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তা বটে, এখনো শিবুর সেল্‌ফ্‌ এণ্ড ওয়াইফ্‌ পাশটা আছে। কিন্তু শিবুর বদমাইসিটা দেখে', ওটা ওরকম পাশ না নিয়ে উইডোড্‌ সিস্‌টার বলে পাশ নিলেও তো পারতো। তাতে সম্পর্কটা বাঁচতো। তবে হ্যাঁ, তোমাকে ক' ঘণ্টার জন্যে হাত দুটো খালি করতে হ'ত আর সিঁথেটা—"

মাধুরী চেয়ার উল্টাইয়া, অশোকের হাতের বুরুশ কাড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অশোক চিৎপাত হইয়া বিছানায় পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

'ছি-ছি' শুধু মাধুরীই বলিল না। শিবেন্দুও বলিল, 'ছি-ছি-ছি'। এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল, চাকরীর দৌলতে সে বিধবা মা, বোন, অরোজগারী ভাই সাজাইয়া অনেককেই নিখরচায় দেশভ্রমণ করাইয়াছে, কিন্তু 'সস্ত্রীক' পাশ লওয়া এই শেষ, যতদিন না নিজের বিবাহ হয়। ছি-ছি, সহোদরা না হইলেও বোন তো বটে।

আর "ছি-ছি" করিলেন সুনীতির মা!

কথা ছিল মাত্র অশোকের জন্য একটা টিকেট কাটিয়া লইয়া তাহারা তিনজন কাশী বেড়াইয়া আসিবে। কিন্তু মাধুরী বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশোক প্রস্তাব করিল 'পাশ' না হয় তাহার কাছেই থাকিবে, শিবেন্দু টিকেটটা লইবে। কিন্তু মাধুরী বলিল পাশ অশোকের হাতে থাকিলেও তাহাতে নাম তো শিবেন্দুরই থাকিবে। এ লজ্জাকর ব্যবস্থায় সে আর মরিয়া গেলেও রাজী নয়। অগত্যা শিবেন্দুকে একাই যাইতে হইল।

পরদিন বৈকালে তাহাকে কাশীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় অশোক কোনও আপত্তি শুনিল না। সস্ত্রীক সুনীতিদের বাসায় ঢুকিল। ইহাদের এই দুঃসহ নির্লজ্জতার স্পর্দ্ধায় প্রথমটা সুনীতি ও তাহার মায়ের যেমন বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, মিনিট পাঁচ ছয় পরে তাঁহাদের লজ্জা ও অনুতাপ রাখিবারও তেমনি ঠাঁই মিলিল না। প্রচুর আদর যত্ন ও আপ্যায়ন করিয়াও এবং বারম্বার ক্ষমা চাহিয়াও সুনীতির মায়ের মনের গ্লানি দূর হইল না। তিনি বারম্বার বলিলেন 'ছি-ছি-ছি'।

মুঘল রাজসভায় জৈন ধর্ম্মপণ্ডিত

শ্রীললিতমোহন হাজরা বি-এ,

মুঘল বংশের মুকুটমণি মহানুভব আকবরের ধর্ম্মালোচনার কাহিনী অতি মধুর। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের তদানীন্তন খ্যাতনামা ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের নিকট নগণ্য ছাত্রের ন্যায় ধর্ম্ম-শিক্ষা তাঁহার চরিত্রের এক অপূর্ব্ব অধ্যায় রচনা করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মের জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের মুঘল রাজসভায় উপস্থিতির কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইলেও তদানীন্তন অন্য একটি ধর্ম্মের পণ্ডিতদিগের উপস্থিতির কাহিনী উল্লিখিত হয় নাই। যে ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের নিকট সম্রাট তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহিনী প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে নির্ম্মমভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে কেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সুখের বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সত্য কাহিনীর পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। জৈন ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। এই ধর্ম্মের প্রায় সাতজন জ্ঞানী পণ্ডিত সম্রাট আকবরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে তিনজন সম্রাটের ধর্ম্মমত ও রাজ্যশাসন প্রণালীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহিণী আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বোক্ত তিনজন ধর্ম্মপণ্ডিতের নাম হীরাবিজয় সুরী, বিজয়সেন সুরী এবং ভানুচন্দ্র উপাধ্যায়। তিনজনই গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। ঐতিহাসিকদিগের মতে হীরা বিজয় সুরীর ধর্ম্ম ব্যাখ্যার প্রভাবে সম্রাট আকবর শেষ জীবনে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা এই তিনজনের কাহিনী এবং মুঘল রাজভায় তাঁহাদের কর্ম্মালোচনা করিলে সমস্তই অবগত হইব।

হীরাবিজয় সুরী

১৫২৬-২৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে (সম্বত ১৫৮৩) গুজরাতের অন্যতম প্রাচীন নগরী পালনপুরে হীরাবিজয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে বিজয়দাস সুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় হীরাবিজয় ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য 'বাচক' উপাধি লাভ করিলেন এবং ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজপুতনার সিরোহী'র "সুরী" হইলেন। এইরূপে তিনি জৈন সন্ন্যাসীদিগের "তপাগচ্ছ" সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করিলেন।

হীরাবিজয়ের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই হীরাবিজয়ের জয় জয়কার। অবশেষে মুঘল সম্রাট আকবর হীরাবিজয়ের ন্যায় শাস্ত্রীয় আলোচনার কাহিনী অবগত হইলেন। সম্রাট এই পণ্ডিত প্রবরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হীরাবিজয়কে রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য গুজরাতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সাহাবুদ্দিন আমেদ খাঁ-এর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। সাহাবুদ্দিন মুঘল সম্রাটের আদেশ পাইয়া হীরা-বিজয়ের দ্বারস্থ হইলেন। হীরাবিজয়ের নিকট সম্রাটের মন বাসনা নিবেদন করা হইলে তিনি প্রস্তাবে সম্মতি দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। এক দিন নয় দুই দিন নয় প্রায় এক পক্ষকাল তাহার নিকট গমন করিয়াও কোন ফল হইল না দেখিয়া অবশেষে একদিন সাহাবুদ্দিন সাহেব তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। যিনি পার্থিব সুখ চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া কি ফল হইবে? হীরাবিজয় প্রলোভন প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন দেখিয়া সাহাবুদ্দিন সাহেব সম্রাট সকাশে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে সম্রাট একখানি প্রাণস্পর্শী পত্র হীরাবিজয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে হীরাবিজয় সম্রাটের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। রাজসভায় যাত্রা করিবার প্রাক্কালে ধর্ম্মমহামণ্ডলের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বিজয়সেন সুরীর উপর ন্যস্ত করিলেন এবং সকলের অনুমতি লাভ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য সম্রাট রাজকীয় যানের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ব্যবহার করিতে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। তিনি পদব্রজে যাত্রা করিলেন। অবশেষে একদিন সম্রাটের সম্মানিত ও অতি প্রত্যাশিত ব্যক্তিটী সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মব্যস্ততার নিমিত্ত সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া আবুল ফজলকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। আবুল ফজল তাঁহাদের উভয়কে (হীরাবিজয় রাজসভায় আগমন করিবার সময় তাঁহার অন্যতম শিষ্য শান্তিচন্দ্র উপাধ্যায়কে লইয়া আসিয়াছিলেন) অভ্যর্থনা করিয়া রাজদরবারে আনিলেন এবং সম্রাটের আদেশ মত সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। সম্রাট প্রতি দিবস অবসর সময়ে হীরাবিজয়ের নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ তিনি জৈনধর্ম্মের পাঁচটী মূল আদর্শের (১) চুরি করিও না, (২) মিথ্যা বলিও না, (৩) বধ করিও না বা ক্লেশ দিও না, (৪) চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হইবে, (৫) অনুপযুক্ত আশা করিও না; প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এইবার তিনি হীরাবিজয়কে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে হীরাবিজয় সুরী আগ্রায় বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়া শীতের প্রারম্ভে ফতেপুরসিক্রীতে প্রত্যাগমন করেন। ফতেপুরসিক্রীতে প্রত্যাগমন করিয়া সম্রাটের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ইহার ফল স্বরূপ সম্রাট জৈনধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে কতকগুলি সাময়িক আদেশ জারী করিলেন। আদেশগুলি পর বৎসর ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ রহিল। এই আদেশানুসারে ফতেপুরসিক্রীর "দাবর" নামক কৃত্রিম হ্রদে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ হয়। ইহারপরে তিনি রাজসভা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন।

সম্রাট তাঁহার গুরুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিমর্ষ হইলেন—এই কথা বলাই বাহুল্য। সম্রাটের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে হীরাবিজয় সুরী রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন। রাজসভা পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে "জগৎগুরু" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। সম্রাটের অনুরোধে তাঁহার অন্যতম শিষ্য শান্তিচন্দ্র উপাধ্যায়কে মুঘল রাজসভায় রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। ১৫৮৬ এবং '৮৭ খ্রীঃ অব্দের বর্ষা ঋতু অভিরামাবাদ (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) নগরে অতিবাহিত করিয়া ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে সিরোহীর জমিদার কর্ত্তৃক আহুত হইয়া তথায় গমন করেন। সিরোহীকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ঐ বৎসরেই তিনি গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে জৈন ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে প্রয়োপবেশন করিয়া ৬৯ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

বিজয়সেন সুরী

হীরাবিজয় সুরী মুঘল রাজসভায় আগমণের প্রাক্কালে ধর্ম্মমহামণ্ডলের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বিজয় সেন সুরীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং রাজসভা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে অন্যতম শিষ্য শান্তিচন্দ্র উপাধ্যায়কে সম্রাটের অনুরোধ মত রাজসভায় থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শান্তিচন্দ্র উপাধ্যায় সম্রাটের মহানুভবতা এবং শাসনপ্রণালীর জয়গান করিয়া "কৃপারস কোষ" নামক একটি গাথা রচনা করিলেন। এই গাথা প্রায়ই সম্রাটকে পাঠ করিয়া শুনান হইত। সম্রাট ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েকটি ফরমান্ জারী করিলেন। এই ফরমানের বলে জিজিয়া কর এবং পশু হত্যা এক বৎসরের জন্য রহিত হয়। যাহা হউক ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে শান্তিচন্দ্র উপাধ্যায়ও রাজসভা ত্যাগ করিলেন। সম্রাট হীরাবিজয় সুরীর নিকট বিজয় সেন সুরীকে রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। হীরাবিজয় রাজসভায় বিজয় সেন সুরীকে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় সেন সুরী ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজসভায় ছিলেন। একটি তর্ক-সভায় ৩৬৩ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া সম্রাটের নিকট বিজয় সেন সুরী "সওয়াই" উপাধি লাভ করিলেন। সওয়াই অর্থে ¼ অর্থাৎ গৌরবে তিনি অন্য নৃপতি অপেক্ষা ¼ গুণ বড়। বিজয়সেন সুরী সম্বন্ধে Buhler লিখিয়াছেন—

"Vijoyasena who was called by Akabbara (i.e. Akbar) to Labhapura (modern Lahore) received from him great honours, and a Phuramana (i.e. farman) forbidding the slaughter of

cows, bulls, and buffalo-cows, to confiscate the property of deceased persons, and to make captives in war; who honoured by the king, the son of Choli-Begam (i.e. Hamida Banu), adorned Gujrat."

অর্থাৎ "সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিজয়সেন সুরী যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। সম্রাট তাঁহার সম্মানার্থে একটি ফরমান্ জারী করিয়া গো মহিষাদি হত্যা, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করন এবং যুদ্ধে বন্দী করিবার প্রথা রহিত করেন।" বিজয় সেন সুরীর সবিশেষ বিবরণ ইহা অপেক্ষা বেশী জানিতে পারা যায় না।

ভানুচন্দ্র উপাধ্যায়

বিজয়সেন সুরীর পরে ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় আসিলেন। ভানুচন্দ্র সম্রাট আকবরের মৃত্যু পর্য্যন্ত রাজসভায় ছিলেন। সুতরাং ইনিই মুঘল রাজসভায় সর্ব্বশেষ জৈন পণ্ডিত। ভানুচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি একই সময়ে একশত আটটী কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন। সম্রাটের নিকট এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে "খুশ-ফাহম্" অর্থাৎ "জ্ঞানী" এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে সূর্য্যের সহস্র নাম শিখাইয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট তাঁহার সম্মানার্থে একটি ফরমান্ জারী করেন। এই ফরমান্ দ্বারা পালিতান্-এর শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের তীর্থ যাত্রীদিগের উপর যে কর ধার্য্য হইত তাহা রহিত হয়। জৈন্‌দিগের সমগ্র তীর্থস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হীরাবিজয় সুরীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। সম্রাট ভানুচন্দ্রকে "উপাধ্যায়" অর্থাৎ শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি বিতরণ সভার জন্য ৬০০৲ টাকা ব্যয় হয়। আবুল ফজল্ স্বয়ং এই ব্যয়ভার বহন করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি গুজরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, সম্রাটের এই তিন জন জৈন শিক্ষক তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের তথা শাসনপ্রণালীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, সম্রাটের রাজসভায় জৈন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই সম্রাটের শেষ বয়সে ধর্ম্মগুরু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ সম্রাট আকবর সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সম্রাটের বৌদ্ধগুরু কেহই ছিলেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মত কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াদিলাম। তিনি বলিয়াছেন,—

"Akbar never came under Budhist influence in any degree whatsoever. No Budhists took part in the debates on religion held at Fethpur-Sikri, and Abul-Fazl never met any learned Budhists. Consequently his knowledge of Budhism was extremely slight. Certain persons who took part in the debates and have been supposed erroneously to have been Budhists were really Jains from Gujrat. Many Jains visited the Imperial court or resided there at various times during at least twenty years, from 1578 to 1597 A.D. and enjoyed ample facilities for access to emperor. The most eminent Jain teacher who gave instruction to Akbar was Hiravijay Suri. The two other most important instructors were Vijoyasena Suri and Bhanuchandra Upadhaya. The doings of those three persons are recorded in Sanskrit poems entitled (1) Jagadguru-Kavyam; (2) Hira-Saubhagyam; (3) Krparasakosa; and (4) Hiravijaya-Carita; as well as in the Pattavali of the Tapagachha section of the Jain community......The documents prove that Akbar's partial acceptance of the doctrine of ahimsa or abstention from killing, and sundry edicts intended to give effect to that doctrine, directly resulted from the efforts of Hiravijaya Suri and his disciples."

ডাঃ স্মিথের যুক্তি সমর্থন না করিয়া উপায় নাই।*

---

* বেনামা লেখক "C" এর "Hiravijaya Suri or the Jains at the Court of Akbar", Dr. V. A. Smithএর "Jain teachers of Akbar", এবং Indian Antiquity, Vol. XI. এর সাহায্য লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ইতি—লেখক।

তোমারি উদ্দেশ্যে কবি ! রেখে গেনু আমারি প্রণাম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতের স্বর্ণযুগ গুপ্ত যুগে শিপ্রা তটে বসে,
কবিবর ! কবে কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
বেঁধেছিলে বীণাখানি তব
ছন্দে অভিনব !
আজো তার সুরে সুরে আঁধারের স্তরে স্তরে
জলধি স্তনিত এই ধরণীর দিগন্ত অম্বরে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে দামিনী,
আসে নেমে বিরহ যামিনী
নবশ্যাম বনচ্ছায়ে
ঘনবীথি-ব্যাকুলিত বায়ে
অশ্রু বরিষণে—
স্মর-পীড়িতার আসঙ্গ লিপ্সার
অব্যক্ত বেদনে।
প্রেমিকার প্রণয়ের পথপ্রান্তে পুষ্প হয়ে রাজে
অশাশ্বত সংসারের মাঝে
তোমার পবিত্র স্মৃতি,—গন্ধগীতি দিকে দিকে বহে
যুগ হ'তে যুগান্তরে কাব্য তব মৃত্যুহীন রহে।
কবিবর ! ক্ষণিকের নহে—
অনন্তকালের তরে রেখে গেছ আনন্দ-চন্দন
বিরহের পাত্র ভরে, নিখিলেরে করি' আমন্ত্রণ
দিয়ে গেলে প্রেমের স্পন্দন।
হৃদয়-মন্থন করি সে প্রেম শাশ্বত হোলো বিরহ মিলনে
নব নব সৃজনের কাম-উজ্জীবনে।
রিরংসু রমনী হৃদে অতনু পরশে জাগে প্রেমের কল্লোল,
মিলন মালঞ্চে বসি' পুরুষের চিত্ত উতরোল,
তব কাব্য এমনি অদ্ভুত !
মানব মনের সাথে চিরশ্যামা প্রকৃতিরে এক ক'রে রচি' মেঘদূত
বিরহের অন্তরালে রেখে গেলে মিলনের ভাষা,
যুগে যুগে জনে জনে দিয়ে গেলে অভীপ্সিত অভিসার আশা।
এই কথা বুঝেছিলে কবি !
প্রেমসত্য—আর মিথ্যা সবি।

বসিয়া নীরবে
বহুবর্ষ পরে দেখি আজো এই পুণ্যমেঘোৎসবে
ধ্যানের প্রদীপে তব জ্বলিতেছে চিত্ত হবি
হে শাশ্বত কবি !
রণদীর্ণ ধরণীর দেবালয়ে আরত্রিক লাগি
রাত্রির অঙ্গন তলে প্রণমিছে ভক্ত অনুরাগী।
পড়ে মনে রাম গিরি শৃঙ্গে কাঁদে যক্ষ বেদনায়,
অলকার আলেখ্য যে পড়ে মনে,—অর্দ্ধ চেতনায়
ক্ষীণ শশীরেখা সম বিরহিণী প্রাণের বল্লভে
করে অনুধ্যান,—নয়ন পল্লবে
কাঁপে বিষণ্ণতা ;
তুমি তার বিরহের ব্যথা
মন্দাক্রান্তা ছন্দে নব গেঁথেছিলে সঙ্গোপনে বসি।
দূরান্তরে যক্ষের জীবন শশী
কান্তার বিরহে ম্লান অন্ধকারে ছিল অন্তরালে
অনন্তের দিক্ চক্রবালে
মেঘের বলাকাশ্রেণী পক্ষমেলি গেছে দূর পানে
প্রিয়ার সন্ধানে।

বিরহের জাগে প্রতিধ্বনি
অন্তরের অন্তস্তলে রণি
মেঘের মৃদঙ্গ মন্দ্রে হারাইয়া ফেলে আপনারে।
নিখিলের চিত্ত পারাবারে
অনন্ত বিরহ-স্রোত বয়ে যায়
কি কথা কহিতে চায়
বুঝি নাক—মিলনের কোন গান
শুনি নাক,—সংসারের হৃদি তটে মনে হয় সব প্রাণ
যক্ষ বধূসম প্রাণের বল্লভে স্মরি'
রচিতেছে অশ্রু শতনরী,
তমসায় সুপ্ত বিভাবরী।

মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতি শঙ্খ বাজে দূরে
সিদ্ধাঙ্গনা করকা-নুপূরে
মেঘশ্যাম শৈল বক্ষে করে নৃত্য—প্রসারিছে জম্বু বনচ্ছায়া
মৌন স্বপ্ন মায়া।
বিরহের গুরুভারে নুয়ে পড়ে সীমন্তিনী লতা,
প্রোষিত ভর্তৃকামনে কত স্মৃতি, কত জাগে কথা !
কত কাব্য লিপিকার প্রেমকুঞ্জে হয়েছে সমাধি,
নিবেগেছে কতবার আশা ভরা রজনীর বাতি !
তীব্র মনস্তাপে
শতাব্দীর অভিশাপে
কত যক্ষ কত কাল রবে নির্ব্বাসিত ! কেবা তাহা জানে,
কত যক্ষ প্রেয়সীর প্রাণে
প্রসারিত গাঢ় অন্ধকার
কতকাল রবে—হৃদয়ের র'বে রুদ্ধদ্বার।
তুমি কবি বুঝেছিলে ধরণীর প্রতিস্তরে
প্রকৃতির অন্তরের অগোচরে
যে-ভবিষ্য ওঠে গড়ে বিচিত্র বরণে,
তারি আভরণে
আছে প্রেম—আছে সম্প্রযোগ
বিরহ বিয়োগ
কিছু নয়, কিছু নয়
—ও যে মৃত্যু—ও যে ভয় !
মৃত্যুর অতীত তটে সেই কথা আজ তুমি কহিলে কি কবি !
অখণ্ড সত্ত্বার সাথে মিলনের আলিঙ্গন লভি।
চলে গেছ কবিবর !
মানবের মর্ম্মে মর্ম্মে ছন্দের হিন্দোলে তব রতিকলস্বনা—
রাত্রের তরঙ্গে দু'লি
যৌবন-চাঞ্চল্যে তার সঙ্গোপনে সুন্দরের করিতে অর্চ্চনা
রহে জাগরিতা,
প্রণয়ীর পদধ্বনি শুনিবারে হোলো ব্যাকুলিতা।
শান্তি নাই, সুখ নাই ;
ধরণীর ধ্বংস পথে বীভৎসতা বিরাজে সদাই।

ভয়াল দুর্য্যোগ রাতে বিরহিণী অনাথিনী কাঁদে,
মানবের তীব্র আর্ত্তনাদে
সভ্যতা সঙ্কটে পড়ি প্রকম্পিতা মুমূর্ষু পৃথিবী,
মৃত্যুর গহ্বরে আজি লক্ষ লক্ষ জীব
মোরা অসহায়,
এ দুর্দ্দিনে কবিবর ! চিত্ত তবু তব পানে চায়
পরম শ্রদ্ধায়।
মৃত্যু ডাকে
হিংসার বীভৎসরাতে কবিবর ! ঝঞ্ঝাঘূর্ণিপাকে !
ভারতের স্বর্ণ যুগে জন্মেছিলে কবি কালিদাস !
তখনো হয় তো ছিল ভাগ্য পরিহাস
আজিকার সম, বৈদেশিক আক্রমণে সদা—
ভীত ছিল যুগযাত্রী, শক হুণ বর্ব্বরতা
দিয়েছিল দেখা, তুমি তার মাঝে—বসি শিপ্রাতটে
অনন্তকালের কাব্য রচেছিলে মানবের চিত্তপটে—
প্রণয়ের চিত্র উদ্ভাসিয়া ;
কালের বিজয়ী কবি ! তুমি শুধু বেঁচে আছ তমস নাশিয়া।
রেখে গেছ কাব্য-অবদান,
তোমার কীর্ত্তিরে কবি ! হৃদয়ের করি' পীঠস্থান
বর্ষে বর্ষে করি পূজা তব।
নব নব
সভ্যতার যাত্রাপথে র'বে তব তীর্থ-দেবালয়,
এই যন্ত্র সভ্যতার ধ্বংস দিনে লহ অর্ঘ্য, অন্ধকারে যুগঝঞ্ঝা বয়।
আর কিছু মন্ত্র উপচার দিব মোর নাহিক সময়,
সময় ফুরায়ে যায়
কাণে কাণে কে যেন শোনায় !
ফেলে যেতে জীবন সঞ্চয় ;
জয় পরাজয়।
নেপথ্যের অব্যক্ত আহ্বানে
চাহি'দূর পানে
ধায় হিয়া অধীর উদ্দাম,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া তোমারি উদ্দেশে কবি !
রেখে গেনু আমারি প্রণাম।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীভবপতি মৈত্র

কবি ঈশ্বরচন্দ্র তৎকালীন সমাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে রক্ষণশীল দলের অন্তর্গত। তখন পাশ্চাত্যসভ্যতা নূতন আদর্শ লইয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতেছে। তৎসঙ্গে বিজাতীয় দোষসমূহও আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দেশের বহু মনীষি যুবক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-ভাষায় আলাপন, পত্রলিখন, পাশ্চাত্যভাবে জীবন যাপন নূতন সভ্যতার ফল বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। মদ্যপান ও কুসঙ্গ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অনেক সুধী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাঁহার কবিতায় তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে
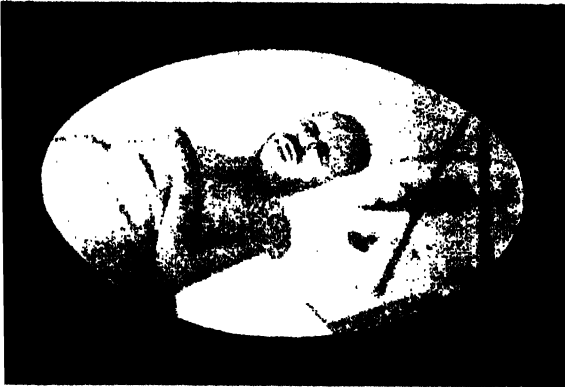
মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বর গুপ্ত

রক্ষা করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এমন কি দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত দেশীয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের বুদ্ধিসম্ভূত নূতন সমাজ-সংস্কারকেও তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। সনাতন ধর্ম্মের কোনরূপ হানির আশঙ্কা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। বঙ্গদেশে নূতন উদ্যমে প্রচারিত নব আলোকসম্পন্ন খ্রীষ্টধর্ম্ম - মিশনারী সাহেবগণ কর্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। দেশের অনেক তরলমতি যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ফলে দিন দিন ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছিল। এই কারণে মিশনারী সাহেবদিগের উপর তাহার প্রবল আক্রোশ। তিনি তাঁহার অনেক কবিতায় তাঁহাদের উপর অভিযান চালাইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলির উপর তাঁহার যেন আস্থা একটু কম। প্রথম ধর্মান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ যে সমাজের নিম্নস্তরের লোক তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই সকল কবিতায় ব্যঙ্গের তীব্রতা একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের কাব্যে আমরা অনেক স্থলে বিজাতীয় অনুকরণের সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক ইহাই দেখিতে পাই। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাদের ন্যায় মার্জ্জিত ভাষায় না হইলেও একই উদ্দেশ্য তাঁহার কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক বর্ণনা যেন সম্পূর্ণ চিত্রকরের তুলি-রেখার ন্যায়—ঋতু বর্ণনা ও প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক হইতে উদ্ধৃত হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তির এমন নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন, যেন ঐ প্রবৃত্তিগুলি মূর্ত্ত হইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতা অতি উচ্চস্তরের—উহা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি উচ্চাঙ্গের। যেসকল কবিতার তীব্রতা অধিক, উহা হইতেছে সেই যুগের ভাষার একটি নিদর্শন। দেশবরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে। সমাজের ক্ষতির ভয়ে সেই পন্থার তিনি অত্যন্ত বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন।

তাঁহার ছদ্ম মিশনারী নামক কবিতায় আমরা দেখিতে পাই যে—

> "ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তারে কিবা ভয়,"
> মান মন্ত্র মহৌষধে প্রতিকার হয়॥
> মিশনরী রাঙ্গানাগ দংশে ভাই যারে।
> একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে॥
> হোঁদোবনে কেঁদো বাঘ রাঙামুখ যার।
> বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥

মিশনারী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ দেখা যাইবে—

> বিদ্যাদান ছল করি মিশনারী ডাক্ত।
> পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
> মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লভ।
> যিশু মন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের ন্যায় তাঁহার সংখ্যাগুণিবার শক্তি। ইংরাজি নববর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

> চাব দিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার
> বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার।
> এই অবনীর করি কত হিতাহিত
> একাগ্র একাগ্রে দিল সবার সহিত।

তাঁহার "অনাচার" কবিতায় এই দেশে কদাচার প্রবিষ্ট হইতেছে তাহা দেখিতে পাই।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা ভোগ দিয়া
আর দিকে মোল্লা বোসে মুর্গীমাস নিয়া।

"নববর্ষের" কবিতায় তিনি বলিতেছেন—তাঁহার সময়ের নূতন আচার কিরূপ ছিল।

সেরী চেরী বীর ব্র্যাণ্ডি ওই দেখ ভরা
এক বিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি সরা
কারী ডিম আলু ফিস্ ডিস্ পোরা কাছে
পেটভুরে খাও লোভ যত সাধ আছে
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব
কাঁটা ছুরী কাজ নাই কেটে যাবে বাবা
দুই হাতে পেট ভোরে খাবো থাবা থাবা।
পাথরে খাব না ভাত গো টু হেল কালো
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরং ভালো
পুরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ,
এখনি সাহেব দেজে রাখিব না ক্ষোভ।

হিংসার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—

হাঁদে দেখি ঘরে ঘরে সকলেই যায় পরে
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি
কত সাজে সাজ করে গরবেতে ফেটে মরে
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি
এই সব জামা জোড়া এই সব গাড়ীঘোড়া
এ সব টাকার তোড়া চোরে কেন হরেনি।

ক্রোধ যেন নিজেই বলিতেছেন,—

মহাবীর আমি ক্রোধ বোধের কি রাখি বোধ
জনমের মত তারে করেছি সংহার।
উপরোধ অনুরোধ হিতাহিত বোধাবোধ
কোন কালে আমি কারো ধারি নাক ধার
পিতামাতা বন্ধু ভাই কিছুই বিচার নাই
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার।

অহংকার সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

রূপে গুণে মানে ধন পরিমাণে
আমার সমান কেবা
দেখ শত শত দাস দাসী কত
সতত করিছে সেবা
দেখ এ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
আমারে কেবা না জানে
আমা সম নাই জয়ী সব ঠাঁই
আমারে কেবা না মানে
সকলেই বশ ভব ভরা যশ
দশ দিকে আছে গাঁথা।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

বাঁধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব।
বচন রচন করি কত কথা বলে
ধর্ম্মের বিচার-পথে কেহ নাহি চলে
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধিবলে কেউ
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ।

তাঁহার "জন্মভূমি" নামক কবিতায় আমরা তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট কবিতার কিঞ্চিৎ আভাস পাই,—

জান না কি জীব তুমি জননী জনম ভূমি
যে তোমার হৃদয়ে রেখেছে,
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে।
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার,
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার—
মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

গ্রীষ্মকালের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি হইলেও অসহ্যভাবের চমৎকার নিদর্শন দেখিতে পাই,—

আর তো বাঁচিনে প্রাণে বাপ বাপ বাপ
বাপ বাপ বাপ একি গুমটের দাপ।
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক ভয়ে বুকে মুখে মারিতেছে লাফ
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁফ।
বার বার কত আর জলে দিব ঝাঁপ?
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ
প্রাণে আর নাহি সহে অনলের তাপ
বিকল হতেছে সব শরীরের কল
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

বর্ষার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—

নীরদ দ্বিরদবর আরোহিয়া তদুপর
ঋতুবর বরষার ঝাঁক
গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্
বাজিতেছে রণ জয় ঢাক।
গুই করে কর কর গতি অতি খরতর
দামিনীর উড়িছে পতাকা
প্রজারূপে তরুচয় প্রণত হইয়া রয়
দিয়া তার ফল পাকা পাকা।

বর্ষার সমাচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

ছুটিল পুবের বায়ু টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু
ফুটিল কদম্বকলিগণ
বরিষে জলদ জল হরিষে ভেকের দল
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ।

প্রতিবিম্ব

শ্রীহরিপদ ঠাকুর

এক

ঘরে আমি একমাত্র ছেলে। বড় লোকের ছেলে হ'লে বোধ হয় বাপ-মা আমায় কবচ ক'রেই গলায় রাখতেন। যদিও বাপ-মা আমায় কবচ ক'রে গলায় রাখেন নি, তবু আদর যত্ন যথেষ্টই পেয়েছি। বোধ হয় বড় লোকের ছেলে-দেরও সকলের অদৃষ্টে এত যত্ন জোটে না। বাপ-মা অবশ্য সবারই থাকে, ছেলেকেও সবাই যত্ন ক'রে থাকে; কিন্তু সব দিক দেখে শুনে মনে হ'ত আমি যেন সকলের চেয়ে একটু বেশী যত্নই পেয়েছি। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। ঘরেও আর ছেলে পিলে ছিল না, আমিই ছিলুম 'সবে ধন নীলমণি'—বাপ-মার ইহকাল-পরকাল এবং বার্দ্ধক্যের সম্বল। ভোরে মা আমায় খাবার খাওয়াতেন, সাবান মেখে চান করিয়ে সাজগোজ করিয়ে স্কুলে পাঠাতেন, আবার এলেই মুখের কাছে দুধের বাটী হাজির ক'রতেন। আমার অপ্রসন্ন ভাব দেখলে বাপ-মার যেন মাথায় বাজ প'ড়ত। সন্ধ্যে হ'লেই বাবা কত রকম দেবতার নাম উচ্চারণ ক'রে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, আমি আরামে ঘুমিয়ে পারতুম।

বাবা ছিলেন একজন যজমেনে ব্রাহ্মণ। সারা দিন পুজো-আচ্চা করে যা পেতেন তাতেই আমাদের সংসার কোন রকমে চ'লে যেত। আমার মা ছিলেন একজন পাকা গৃহিনী। যজমান বাড়ী থেকে চাল ডাল কলা মুলো যা কিছু আসত' তাই দিয়েই মা সংসার চালাতেন। লোকে ব'লত ওরা আছে বেশ।

বাবা ছিলেন খুব পরিশ্রমী। দু' ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়েও যজমানি ক'রে ফিরে আসতেন। আমি কিন্তু স্কুলে যেতে আধ মাইল পথ হাঁটতেও খুব কষ্ট অনুভব ক'রেছি। বাবা আফিং খেতেন, আফিংখোরের দুধ না হ'লে চলে না, দুধ বন্ধ ক'রেও বাবা আমার টিফিনের জলপানি যোগাতেন। আমি সেই জল পানির পয়সা খরচ না ক'রে তা' দিয়ে কিনে বসলুম এক চশ্‌মা। চশ্‌মা অবশ্য চোখের অসুখ হলেই লোকে ব্যবহার ক'রে থাকে। আমার কিন্তু চোখ ছিল খুব সুস্থ এবং সবল, চশ্‌মা নিয়েছিলুম সখের জ্বালায়—বোধ হয় সখটাই ছিল আমার অসুখ। এখন দেখছি চশ্‌মা খুললে কিছুই দেখতে পাই না। অবশ্য এতে আপশোষের কিছুই নেই, যেহেতু এখন দেখতে পাচ্ছি চোখের অসুখ আজ সংক্রামক ব্যাধিতেই পরিণত হয়েছে; যৌবনের কোঠায় পা দিলেই ছেলেদের এ অসুখ আপনা থেকে সৃষ্টি হয়।

মাস কাবারে যখন স্কুলের মাইনে চেয়েছি মনে হ'ত বাবা যেন খুব কষ্ট ক'রে মাইনে দিতেন। ভাবতুম দূর ছাই পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখি—বাবার এ কষ্ট যে আর দেখতে পারি না। আবার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পনায় মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো ক'রবার ইচ্ছেই হ'তো। ছাত্রমহলে আমার খুব সুনাম ছিল। হেড মাষ্টারমশাইও অনেক সময় আমার সুখ্যাতি করতেন। বলতেন 'ছেলেটাকে পড়ালে একটা কিছু হবে।' শুনে একটু অহঙ্কার যে না হ'ত এমন নয়, তবে লজ্জাও হত খুব,—মাথাটা নিচু ক'রে থাকতুম।

তারপর একদিন ম্যাট্রিক পাশের খবর এল। বাবা বললেন কলেজে প'ড়তে। চ'লে গেলুম ক'লকাতায়, মা'র গায়ে যা দু'একখানা সোনার টুক্‌রা ছিল, সব বেচে দিয়ে আমার ভর্ত্তির টাকা জোগাড় হ'ল। বাবা মাসে মাসে আমায় টাকা পাঠাতেন, খরচও খুব হ'ত। অঙ্গে কলেজের হাওয়া লেগে আমি যেন কেমন ধারা হ'য়ে গেলুম। আমি যে ভিখারী যজমেনে বামুনের ছেলে তা' যেন আর মনে রইল না। বাবাকে লিখলেই অমনি টাকা পাঠিয়ে দিতেন। খরচের উপর খরচ, চায়ের দোকান, বায়স্কোপ, থিয়েটার, ক্লাসফ্রেণ্ডদের সঙ্গে চাল বজায় রাখা—এ না হ'লে যে প্রেষ্টিষ্ থাকে না।

তারপর কয়েক বছর পরে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু মহলে মস্ত একটা আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল,—আমি এম্-এ, পাশ করেছি। নিজেরও খুব গৌরব অনুভব হ'ল। বাড়ী গিয়ে শুনি যজমানি ক'রে বাবা যা পুঁজি-পাটা ক'রেছিলেন তাত' গেছেই অধিকন্তু বাস্তুভিটেটুকুও বাঁধা প'ড়েছে। বাবা

ব'ললেন, 'চিন্তা ক'র না, এমনি ক'রে তোমাকে পড়িয়েছি এখন মানুষ হ'য়েছ, চাকরী-বাকরী কর আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল, দিন কয়েক বাড়ী থেকেই ক'লকাতা ফিরে গেলুম।

ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে চাকরী ক'রতে হয় ত' বিচারকের পদে চাকরী ক'রতে হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় হ'লও ঠিক তাই। বিচারক হ'তে হ'লে তোড় জোড়, পড়াশুনো যা কিছুর দরকার, কোনটাই অপূর্ণ রাখলুম না। চাকরী পেয়েই বাবাকে চিঠি লিখে দিলুম—"আমি ডেপুটী হ'য়েছি, মাইনে আড়াইশ' টাকা।

প্রথম মাইনে পেয়ে বাবাকে যে-দিন একশত টাকা পাঠিয়ে দিলুম জানি না বাবার সে-দিন মুখখানা কত উজ্জ্বল আর বুকখানা কত উঁচু হ'য়ে ফুলে উঠেছিল। বাবা লিখলেন, তোমার চাকরীর জন্ম কত দেবতাকে পুজো মানৎ ক'রেছিলুম সে-সব পুজো সম্পন্ন ক'রেছি, বক্রী টাকা বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মিষ্টান্ন ভোজনে খরচ হ'য়ে গেছে। আমার মত দীন-দরিদ্রের ছেলে আজ ডেপুটী হ'য়েছে, এ' থেকে আর উৎসাহের কি আছে, তাই আমি উৎসাহ ক'রে সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছি। তোমার এ কাজে কবে ছুটী পাবে জানাবে। আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি খুব কমে গেছে, কাজ কর্ম্ম ক'রতে পারি না, তাই যজমানগুলি কতক কতক ছেড়ে যাচ্ছে। আগামী ফাল্গুন মাসে তোমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা ক'রেছি। কত দিনে ছুটী পাবে জানাবে। ইত্যাদি।

দুই

তারপর' ফাল্গুনের এক গোধুলি লগ্নে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ে হ'ল বটে, তবে বাবা তাঁর মনমত পুত্রবধূ পেলেন না, বৌ হ'ল আমার মনের মত।

আমি এখন ডেপুটী অর্থাৎ হাকিম, বেলা হাকিম-ঘরণী। ব'লতে ভুলে গেছি আমার গৃহিনীর নাম হ'ল বেলারাণী, এই নামে যে কী সুন্দর ভাব তা ঠিক বুড়ো-বুড়িরা বুঝতেন কি না জানি না, তবে আমি এ নামে বেশ রোমান্স খুজে পেয়েছিলুম। যাক্‌গে রোমান্সের কথা এখন বাদ দিয়ে যা ব'লছিলুম তাই ব'লে যাই। আমি হ'লেম একজন হাকিম, বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের রাজ্যে মানবকুলের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা, কত লোকের জরিমানা করি, কত লোককে জেলে দিই, কত কি করি। রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে চলি তখন কত লোক সেলাম ঠুকে চলে যায়, কিন্তু হ'লে কি হয়—যতক্ষণ আমি এজলাসে কিম্বা বাইরে ততক্ষণই আমি হাকিম।

ঘরে এলেই আমি চোর, এসে দেখতুম আমি বা কোন ছার হাকিম; ঘরে দেখি হাকিমের উপরেও একজন হাকিম সাহেবা বিরাজমানা। মাঝে মাঝে মনটার বড় দৈন্য ভাব এসে দেখা দিত। ভাবতাম, আমি একজন হাকিম, এত বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অথচ ঘরে এলেই গিন্নির কাছে চোর ব'নে যেতে হয়, কেন? নিজে এত টাকা উপায় করি, অথচ একটী টাকা খরচ ক'রতে হ'লেই গিন্নির কাছে অনুমতি নিতে হবে কেন? এর মানে কি? অনেক সময় অন্তরে এইরূপ সাত পাঁচ প্রশ্ন জাগত, আবার অন্তরেই তারা ঘুমিয়ে প'ড়ত।

এইভাবে দিনগুলি সব কেটে যেতে লাগল। বাসায় ঠাকুর, চাকর, ঝি-এর কোনটারই অভাব নেই। কালক্রমে মা ষষ্ঠীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলুম না। দিনগুলি বেশ কাটে। বাড়ীতে মাঝে-সাজে দশ পাঁচ টাকা দিতুম। বাবা লিখতেন, এতে ঠিক সংসার চ'লছে না—যদিও এতে দু'টা পেট চালান যায় কিন্তু তোমাকে পড়াতে যা দেনা হ'য়েছে তার জন্ম মহাজন আদালতের সাহায্য নিয়েছে। দু' মাসের ভিতরে দেনা শোধ না করলে বাড়ীঘর সব নীলামে উঠবে। মনযোগ সহকারে ইচ্ছা ক'রলেই আমি এ দেনা পরিশোধ ক'রতে পারতুম, কিন্তু তার অন্তরায় হতেন আমার গৃহিণী বেলারাণী।

তিনি ব'লতেন, "অত ক'রবার দরকার কি বাপু, মাস কাবারে ত' দশটা ক'রে টাকা পাঠাচ্ছই, পাড়াগাঁয়ে দু'টা পেট চালিয়ে ও থেকেও ত' দুটো টাকা মহাজনকে দেওয়া যায়। পাড়াগাঁয়ে দু'টা পেট চালাতে কত লাগে, না হয় পাঁচ টাকাই লাগুক। তা ত' নয়, তোমার বাবা চান টাকা জমাতে, এ যেন শশুরের বেসাত, চিঠি লিখে নিতে পারলেই হ'ল।"

মাঝে মাঝে মনে হ'য় বাপ মাকে কাছে নিয়ে আসি, বাড়ী ঘর না হয় উচ্ছন্নেই যাক্। শুনলেই গিন্নি বলতেন, "তুমি মোটে বোঝ না, তোমার বাপ মার যা ছিরি আর চাল-চলন তাতে

করে এখানে আনলে, দেখবে তোমার মান-ইজ্জৎ রাখা কঠিন হবে। তুমি একজন হাকিম—ডেপুটী, তোমার বাপ-মা যদি অমন ধরণের হয়, দেখে লোকে কি বলবে। আমি ত' বাপ্ শ্বশুর-শাশুড়ী ব'লে পরিচয় দিতে পারব না।"

গিন্নিরই জয় হ'ল, তাঁর কথাই বহাল রইল।

তারপর একদিন বাবার চিঠি এল—বাড়ী, ঘর, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সবই মহাজন নীলাম ক্রোক করে দখল ক'রে নিয়ে গেছে। আজ আহারের কিছুই সংস্থান নেই, হয় ত' ডাকে তোমার টাকা পাব, এই আশায় গতকাল থেকে উপবাস ক'রে আছি। ধার লোকে কদিন দেয়, আজ কি হবে ভগবানই জানেন।

চিঠিখানা পেয়ে অবধি মনটা বড় অসুস্থ হ'য়ে উঠল। গিন্নিকে বলতেই সে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। গিন্নি বললেন, "নীলেম যদি হ'য়েই থাকে, সে তোমার বাবার দোষেই হ'য়েছে। তিনি পুরুষ মানুষ, ইচ্ছা ক'রলেই এ নীলেম ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। তুমি ত' বুঝবে না, এ নীলেম—নীলেম নয়, তোমাকে আক্কেল দেওয়া। মহাজনের সঙ্গে ষড় করে তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তুমি যদি ছেলেপিলেকে না খেতে দিয়ে মাসকাবারে টাকা ক'টা সব পাঠিয়ে দিতে তবে গিয়ে হ'ত।"

তিন

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বাবার জন্য মনটা যেন কেমন ক'রে উঠল, মণি অর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিলুম। দিন কয়েক পরে দেখি মালিক না পাওয়ায় টাকা ফিরে এসেছে। গিন্নি বললেন, "দেখেছ কত বড় জেদ, তোমার টাকা না রেখে ফেরত দেওয়া হয়েছে,—এর মানে সমাজে তোমায় অপমানিত করা,—ইত্যাদি।"

অনেক রকম বাক্‌চাতুর্য্যে গৃহিণী আমায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখতেন, তবু পোড়া মন ত' বোঝে না। মাঝে মাঝে মনে হ'ত—বাবা কেন আমার টাকা রাখলেন না; মা কেমন আছেন, অনেকদিন তাঁদের দেখি নি। এবার বরং ছুটিতে চেঞ্জে না গিয়ে দেশেই যাব। গৃহিণী শুনেই আবার মোহিনী মন্ত্র ফুঁকে দিতেন, খানিক পরেই বাপ মায়ের স্মৃতিরেখা অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে বিলীন হয়ে যেত।

বছর কয়েক পরের কথা, চাকরীর অজুহাতে এক জেলা থেকে অপর জেলায় বদলি হ'য়ে এসেছি। আছি বেশ। বাপ-মার কথা আর মনেই হ'ত না, মনের গতি এমন হ'য়ে গেল যে, আমি যেন ভুঁইফোড় অর্থাৎ জনকতনয়া সীতার ন্যায় ভূমির গর্ভ থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছি। বেশ যেন রাম আর আমি সীতার ন্যায় পতি-পরায়ণা। পিতামাতার স্মৃতিটুকুও অন্তর হ'তে মুছে গেল।

বাসার খরচ ছিল খুব কম নয়। গৃহিণীর দুটী সহোদরের কলেজের মাইনে, মেসের খরচ এমন কি পোষাক-আসাকও দিতে হ'ত। তারপর গৃহিণীর এক বিধবা ভগ্নীর মাসহারা, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর মাসহারা এ সব ত' না দিলেই নয়। মোট কথা, গৃহিণীদেবীর পিতৃকুলের পোষণ নিয়েই আমার অর্থ-সামর্থ্য নিঃশেষ হ'ত।

হঠাৎ একদিন দূর পাড়াগাঁয়ে বিশেষ একটা তদন্তে যাবার প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়ল। পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ তদন্তে যেতে হ'লে আমাদের জন্য বোট নির্দ্দিষ্ট থাকত, গিন্নি ব'ললেন, বেশ হবে, আমিও তোমার সঙ্গে এবার বেড়াতে যাব। গিন্নির অনুরোধে অগত্যা স্বীকার করতে হ'ল। নির্দ্দিষ্ট দিনে তদন্ত স্থানে উপস্থিত হয়েছি, তদন্ত একরূপ সমাধা হ'য়ে গেছে। ইচ্ছা পর দিনই মংকুমার দিকে রওনা হব। হঠাৎ দেখি গ্রামের একদল ভদ্র যুবক এবং গ্রাম্য জমীদার আমার বোটের কাছে উপস্থিত। আরদালি এসে ব'ললে, তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের ভদ্রতা-সহকারে ডাকিয়ে আমার আফিস-কামরায় এনে বসালুম।

জমীদার বল্‌লেন, আমরা হুজুরের কাছে একখানা দরখাস্ত পেশ ক'রে সেই দরখাস্তের বিষয়ের জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে এসেছি।

দরখাস্ত নিয়ে দেখি, একখানা সাহায্যের আবেদন। ঘটনা জানতে চাইলে জমীদার বললেন, অনেক দিন পূর্ব্বে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী ভিক্ষার্থে এই গ্রামে এসেছিলেন, গ্রামের ছেলেরা তাঁদের থাকবার জন্য একটু স্থানও দিয়েছিল—তাঁরা ভিক্ষা ক'রেই খেতেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণের চোখদু'টী একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণী তাঁকে লাঠী ভর ক'রে ভিক্ষা ক'রে খাওয়ান। আমি আর কি ক'রব, এরা যাতে এই বাদ্‌লা দিনে ভিজে না মরেন তার জন্য একখানা চালা উঠিয়ে

দিয়েছি। আর যে দিন ভিক্ষা মেলে না সেদিন দুটী অন্নের ব্যবস্থা ক'রে দি। ব্রাহ্মণ খুব নিষ্ঠাবান এবং জ্ঞানী বলে মনে হয়। পাড়ার ছেলেরা ব্রাহ্মণের জন্য খুব দুঃখিত হ'য়ে পড়েছে, অথচ এদের এমন সঙ্গতি নেই যে ব্রাহ্মণের বিশেষ সাহায্য করতে পারে—তাই এই ব্রাহ্মণের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে ছেলেরা আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে, এখন আপনার দয়া।

আমি বললুম, সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে অসেন নি কেন?

জমীদার বললেন, যদি অভয় দেন ত' বলি, সে ব্রাহ্মণ এখানে কিছুতেই আসতে চায় না, আমাদেরও আসতে বারণ করেছিল, সে বলে—ডেপুটী জাতির দয়া ধর্ম্ম কিছু নেই, মানুষকে জেলে ফাঁসে দিয়ে দিয়ে ওদের প্রাণ পাথর হ'য়ে গেছে, আমি ডেপুটীর কাছে কখনও ভিক্ষা চাইব না।

আমি বললুম—তাই নাকি, আচ্ছা কিছুতেই সে ব্রাহ্মণ কি এখানে আসবেন না, পারলে একবার আনুন না তাঁকে।

দু'টী যুবক অমনি বোট থেকে নেমে গেল।

অনতিকাল পরেই যুবকটী ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে নিয়ে ফিরে এল। এঁদের দেখেই মনটা যেন কেমন আদ্র হ'য়ে উঠল। হাকিম হলে তার প্রাণটা বোধ হয় পাথর হ'য়ে যায়, কেন না কত লোককে জেলে দিয়েছি, কত দুষ্টের জরীমানা আদায়ের জন্য ঘর-দোর নীলামে চড়িয়ে পথে দাড় করিয়েছি। কৈ, কখনও ত প্রাণ এমন ধারা আর্দ্র হ'য়ে ওঠে নি, হঠাৎ আজ প্রাণটা কেন কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

ছেলেরা তাদের ধরাধরি করে বোটে তুলে নিয়ে এল। তাঁদের দেখেই আমার মনে অনুশোচনার তীব্র দহন জ্বালা জ্বলে উঠল, মনে হ'ল আকাশ থেকে যদি লক্ষ বজ্র এসে একসঙ্গে আমার মাথায় প'ড়ত তবে বোধ হয় একটুখানি সুস্থ হ'তে পারতুম। মুহূর্ত্তে প্রাণে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব হ'ল। কথা ব'লবার শক্তি হারিয়েছি তবু জমীদার ও যুবকদের বললুম, হঠাৎ আমার শরীরটা খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, আপনারা এখন যান। এঁরা আমার বোটেই থাকুন, কাল এঁদের নৌকা ক'রে পাঠিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি বোট ছেড়ে দিতে বললুম।

বোট খানিক দূর চ'লে গেছে, আর থাকতে পারলুম না। কণ্ঠস্বর আটকে আসে তবু কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, "বাবা—বাবা!"

তিনি অন্ধ, দেখতে পান না, মা আমার গলার স্বর চিনতে পেরে ঘোমটা ফেলে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে বললেন, "ওগো, এ যে শুধু ডেপুটী নয়—এ যে আমাদের সমীর

বাবা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ব্যাকুল ভাবে ডাকলেন, "সমীর—আমার সমীর! কৈ, কৈ, বাবা! আয় ত' আমার অন্ধের নড়ি, আমি একটু গায়ে হাত দিয়ে দেখি।"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। আনন্দের আতিশয্যে বাবা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার গায়ের উপর পড়ে গেলেন। মা এবং আমার অনেক ডাকাডাকিতেও আর সাড়া পেলুম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখি হিম—তৈলহীন জীবন-প্রদীপের শেষ শিখা তখন নির্ব্বাণ হ'য়ে গেছে।

বোধ হয় সংজ্ঞাহীন হয়েই বোটে পড়েছিলুম। মহকুমায় গিয়ে জ্ঞান হ'ল। যথাবিধি পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাধা করলুম। ডেপুটীর পিতৃশ্রাদ্ধ খুব জাঁকাল রকমেই সম্পন্ন হ'ল। হাজার হাজার টাকা খরচ করলুম তবু প্রাণে শান্তি নেই, এই শ্রাদ্ধে পরলোকে পিতৃদেবেরও তৃপ্তি হ'ল কি না জানি না!

চার

মন ভাল না। কোর্ট থেকে তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরলাম। বাহিরে দারুণ মেঘ, অনবরত বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরে দেখি আমার মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানারূপ গল্প বলছেন। মনে বড় আনন্দ হ'ল, ভাবলাম, এ আনন্দও আমি অনেকদিন পূর্ব্ব থেকেই ভোগ ক'রতে পারতুম। হঠাৎ দেখি আমার পুত্র নির্ম্মল একটা পুটুলী এনে ব'লছে, "হ্যাঁ ঠাকুমা, তুমি এই ভাঙ্গা পাথর আর বাটীটা ফেলবে না? আমি ফেলে দেব।"

মা ব'ললেন, "ও ফেলতে নেই ভাই, ও তোমার দাদুর চিহ্ন, ওতে ক'রে তিনি ভাত খেতেন।"

নির্ম্মল ব'লল, "আর তুমি খেতে কিসে?"

মা ব'ললেন, "ওতেই খেতুম, তোমার দাদু খেলে ওতেই তাঁর প্রসাদ খেতুম।"

নির্ম্মল ব'লল, "কেন, আর বাসন ছিল না বুঝি, ভাঙ্গা

পাথরে আবার কেউ খায় না কি! আমাদের ত কত বাসন আছে তাই থেকে কেন নিলে না?"

মা ব'ললেন, "পরের জিনিষ কি নিতে আছে?"

নির্ম্মল ব'লল, "তবে যে ব'ললে—বাবা তোমার ছেলে, মিছিমিছি ব'লছ, ছেলে বুঝি আবার পর হয়।"

দাঁড়িয়ে শুনছিলুম, মনে হ'ল নির্ম্মলের শেষ কথায় মা খুব বিব্রত হয়ে প'ড়েছেন, উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

নির্ম্মল নাছোড়বান্দা, আবার ব'লল, "বল না ঠাকুমা, বাবা তোমার কে হয়?"

মা ব'ললেন, "বললুম ত, তুমি যেমন তোমার বাবার ছেলে হও, তোমার বাবাও আমার তেমনি ছেলে হয়।"

"বা-রে! ছেলের এত টাকা থাকতে ভাঙ্গা পাথরে খাচ্ছ কেন?"

মা ব'ললেন, "ওতে কোন দোষ নেই ভাই—বুড় হ'লে ভাঙ্গা পাথরেই যে খেতে হয়।"

চেয়ে দেখলুম, এই কথা ব'লতে ব'লতে মা'র চোখের দু'দিক দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়ছে। পাথর খানাকে আর একটু জোরে আকড়ে নিয়ে নির্ম্মল ব'লল, "বেশ হবে,—পাথরখানা তবে বাক্সে তুলে রেখে দেব, বাবা-মা বুড় হ'লে ভাত খাবে, তখন আবার ভাঙ্গা পাথর কোথায় খুঁজতে যাব।"

পা দু'খানা থর থর ক'রে কাঁপছিল—দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, দৌড়ে গিয়ে নির্ম্মলকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললুম, "ঠিক ব'লেছিস নির্ম্মল, পাথরখানা বাক্সে তুলে রেখে দিস্। শুধু ভাঙ্গা পাথর নয়—ও যে আমার মুক্তা-বসান মুকুর। দিস, বুড় হ'লে ওতেই আমায় ভাত দিস। ঐ পাথর হ'ল আমার মুক্তা বসান মুকুর। ঐ সামনে রেখে আমি চেয়ে থাকব, তুই হবি আমার প্রতিবিম্ব।"

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে আকাশ মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ।

এস

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার এট্-ল

ভারতের ভাগ্যাকাশে ঝঞ্চাক্ষুব্ধ রুদ্রের প্রকাশ,
উড়ায়ে পিঙ্গল জটা প্রলয়ের বিকট উল্লাস।
প্রচণ্ড তাণ্ডবে মত্ত ধূর্জ্জটীর বিশাল বিষাণ
রহি' রহি' গর্জ্জি ওঠে সৃষ্টি স্থিতি নিত্য কম্পমান্!

রণোন্মত্ত একি মূর্ত্তি তীব্র দংষ্ট্রা একি ভয়ঙ্কর,
কর্ণপট বিদ্ধকারী অট্টহাস্যে শিহরে অম্বর।
ধ্বংসের সংগ্রামে বুঝি তৃণসম হব' ধূলিস্যাৎ
পর্য্যাঙ্কের পদপাতে এ পৃথিবী যাবে কি নিপাত?

যুগে যুগে সম্ভবিবে হে কৃষ্ণ হে যুগ অবতার,
উপনীত ধর্ম্মগ্লানি অধর্ম্মের হের' অভ্যুত্থান—
দুষ্কৃত বিনাশ করো সাধুজনে করো পরিত্রাণ,
এস এস চক্রপাণি এ দীন ভারতে পুনর্ব্বার।

দানবের অহঙ্কার চূর্ণ করো দর্পহারী হরি,
ধরিত্রী ধারণ করো হে কৃষ্ণ হে চক্রধারী হরি।

বাউল

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়

ঘরের পাশে একতারা লইয়া গান করিতেই মেয়েটী বলিল, "ভিক্ষা পাবে না, বাসায় অসুখ।" কথাটা শুনিল বটে, কিন্তু গান গাহিতে বিরত হইল না। গানটী পুরামাত্রায় গাহিয়া দেখি চলিয়া যাইতেছে। গাহিল শচীমাতার বিলাপ নিমাইএর সন্ন্যাস উপলক্ষে। ডাক দেওয়ায় ঘরে আসিল একজন দরবেশ, পূর্ব্ব জাতি হিসাবে মুসলমান। বলিল, দোগাছীর ঐ দিকে থাকে, ছোট একটু আস্তানা আছে, পূর্ব্বে নদীয়ায় নবদ্বীপ ধামের নিকট বাস করিত। ছুটীর দিনে কথা-বার্ত্তায় নানা প্রসঙ্গের সৃষ্টি হইল, দেখিলাম বাউলতত্ত্ব, সহজিয়া তত্ত্বের অনেক খবর রাখে।

কপালে জোড়হাত ঠেকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—তত্ত্বের গোড়া—ঠাকুর স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত,
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত।

রসের নিগূঢ় তত্ত্ব, ঠাকুর থুয়ে গেলেন রঘুনাথের কণ্ঠে—রঘুনাথ, দাস গোস্বামী রঘুনাথ:

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা।
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণ কীর্ত্তনে,
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন,
আজন্ম না দিল জিহ্বার রসের স্পর্শন।

গোপী-যন্ত্রের তারে আঙ্গুল বুলাইয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, কথাটা খোলসা করিলেন কবিরাজ গোঁসাই। নাম প্রচার উদ্দেশ্য বটে:

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন,
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রী শচীনন্দন।

কিন্তু আসল কথা হ'ল প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন,

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার,
প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার।

কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সিদ্ধ মুকুন্দ দাসের নাম শুনিয়াছেন কি? সহজিয়া তত্ত্বের সার কথা ত' তাঁহারই জানা ছিল। পঞ্চরসিকের কথা, ঠাকুর বিল্ব মঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায় শেখরের কথা?

কবি প্রেমদাসের নাম করিয়া কয়েকছত্র আওরাইল:

বহিরঙ্গ ভাবে হয়ে কৃষ্ণ রাম নাম,
প্রচারিল জগমাঝে গৌর গুণ ধাম।
অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে,
রসরাজ উপাসনা করিল অর্পণে।

আমি বলিলাম, "বৈষ্ণব সহজিয়া" নামধেয় প্রথার সমালোচনা নানা পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। ৮ম শতাব্দীতে রাঢ় দেশে সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ যে সহজিয়া সাধন প্রচার করেন, তাহাই নানা প্রকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে বাউলিয়া সহজতত্ত্ব কিছু বলিলে ভাল হয়।

দরবেশ হাসিয়া বলিল, সিদ্ধ মুকুন্দ দাসের ৪ শিষ্য সম্প্রদায়, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ।

হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কাটোয়ার যদুনাথ দাসের সংগ্রহ তোষিণী দেখেন নাই?

সম্প্রদায়ের গুপ্ত সাধন তত্ত্ব অন্যে ত জানে না, সাধারণভাবে শুনিয়া লোক তার বিরুদ্ধে কথা বলে, রসিক ভিন্ন রসের খবর কে রাখে,

টলে জীব, অটল ঈশ্বর,
তার মাঝে খেলা করে রসিক শেখর।

আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, রসের পথের ধর্ম্ম, সহজ আনন্দ পথের ধর্ম্ম; প্রচলিত শাস্ত্র নিয়মে বাঁধা নয়, এ ধর্ম্ম জাতি ধর্ম্মের গণ্ডীর অতীত, এ ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের সহজ বস্তু।

একতারায় হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে গাহিল—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে; জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।

তাকে কি দেখা যায়, তাকে কি ধরা যায়, শেষ কথা ত' এই দাঁড়ায়। তার জবাবে বাউল কি বলে, বাউল বলে,

অধরাকে ধরবি যদি ধরার সঙ্গ কর।

:ক ধরা যায় না, তাকেই ত অধরা বলি, কারণ তিনি রূপ, অসীম। আর ধরা হ'ল—এই রূপের জগৎ, সীমার গৎ, এই পরিদৃশ্যমাণ সৃষ্টি।

৷নি অরূপ, অসীম বটে, কিন্তু সীমার মাঝেই তাঁর লীলা,

সীমারূপ হল তার রসমূর্ত্তি।

র'দিকেই ত' রং রাজের রংয়ের খেলা, রসের অঞ্জন চোখে খিয়া দেখিতে পারিলে হয়। কথাটা শুনিয়া মনে পড়িল,

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ

রূপং রূপং প্রতিরূপ বভুব।

একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ॥

।রপর আ' খেল্লা আচ্ছাদিত বুকের উপর হাত দিয়া বলিল, 'হতত্ত্ব বুঝতে হয়, যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। স্তরীত নিজের বুকেই আছে, তবে তার সন্ধানে এদিকে দিকে ধাওয়া কেন ?

ডান হাতে একতারাটী ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বাম হস্ত াহাতে ঈষৎ ঠেকাইয়া অৰ্দ্ধ নিমিলিত নয়নে গান ধরিল,

গোল ঘরে বাস্তবী করে কে

আছে নির্গমে শুয়ে।

সে ঘরের আঠার তালা

বাহিরের দরজা খোলা

মটকার উপর দুই বাতি জ্বলে,

যখন আসবে হাওয়া নিভবে বাতি

যেত মানুষ যাবে চলে।

।নের সুরের রেশ থামিয়া গেলে বলিল, জানেন কি, বিষয়টা ইল এই সকলকে নিজের মধ্যে জানা আর নিজেকে সকলের ধ্যে জানা।

কথাটা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের নিবিড় রস বৈদগ্ধ্যের কথা :ন পড়িল।

সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার রহিয়াছে একটা অনাদি অচ্ছেদ্য প্রম-বন্ধন, সীমা চাহিতেছে অসীমের মধ্যে খুজিয়া পাইতে াপন সার্থকতা, অসীম চাহিতেছে সীমার ভিতর দিয়া াত্ম-চেতনা, আত্মানুভূতি। উভয়ের ভিতর দিয়া চলিতেছে ।নাদি প্রেমের খেলা। অসীম চিন্ময় ভাব স্বরূপ চাহিতেছে ীমার ভিতর দিয়া, রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে আপনি ।নন্ত রূপে আস্বাদন করিতে, অসীম রূপ আবার প্রতি নিয়ত চাহিতেছে, সেই পরম তার স্বরূপের অসীমত্বের সহিত নিবিড় মিলনে আপনার অস্তিত্বকে পূর্ণতার ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া অনুভব করিতে।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে

আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

দেশে দেশে মোর দেশ আছে,

আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই

তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই

কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে চাই

সন্ধান লব বুঝিয়া,

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়

তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

দরবেশ নিজ ভাবে বলিতে লাগিল,—

অনর্থক পাগলের মত দিশেহারা হয়ে বাহিরে তাঁকে খুজলে মিলবে কেন ? সে খোজা মানে বৃথা হয়রাণ হওয়া, তিনিও আমাদের দেহ-মন্দিরে অহর্নিশ বৰ্ত্তমান আছেন।

এইটা হল আসল কথা, বাউলের মানুষতত্ত্ব। মানুষের অন্তর্যামী হলেন এই মানুষ, গোলকের হরিকে দূরে মনে করিলেই ত' পূজার অর্ঘ্য সেখানে পৌছায় না, ঠাকুর আছেন দূরে এই ভাবের পূজাই ত' তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে।

বাউল তার মানুষকে টেনে এনেছে অন্তরের অতি নিকটে, তাঁকে ত' শুধু মানুষ রাখেনি, অন্তরের রসে রসায়িত করে তাকে মনের মানুষ করে নিয়েছে।

আছে যার মনের মানুষ মনে

সে কি জপে মালা,

অতি নির্জ্জনেতে বসে বসে

দেখে সে যে রসের খেলা।

দেহের ভিতরকার পরিচয় জানাই ত' আসল কাজ, রহস্যই ত' ঐখানে। ওদেশের খবর ত' এই ভাণ্ডের মধ্যেই আছে।

সেই খবর জানায় যে সেই ত হল গুরু।

উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—গুরু একটী তত্ত্ব, বাসনা কামনার জ্বালায় মন থাকে না ঠিক, স্বার্থের মলিনতায় দৃষ্টি হয়েছে ঘোলাটে, তাতেই ত' মনে সত্যের রং ধ:ছে না। আবিলতাপূর্ণ জীবনের অতি ঊর্দ্ধে করছে আসল

সত্য বিচরণ। প্রকৃত সত্যের সন্ধান যে পেয়েছে, তাঁর কাছে সমস্ত সত্ত্বাকে সমর্পণ না করলে তাঁর সত্তাটী আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে প্রবেশ করার দ্বার খুঁজে পায় না।

বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—সেই মনের মানুষই পরম-গুরু, তাঁর দয়া ভিন্ন জীবনে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। একতারাটা হাতে লইয়া গান ধরিল :—

গুরু রূপের পুলক, ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
কিসের আবার ভজন সাধন লোক জানিত করে।
অধীন লালন বলে গুরুরূপে নিরূপ মানুষ কেরে
এই ভবে নিরূপ মানুষ কেরে।

বাউলের সাধনা রসের সাধনা, অনুরাগের সাধনা। এরা ত' দেহ ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বস্ব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে না, আবার তাহাদের নিষ্পেষণ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনা করে না। এই সাধন পদ্ধতি রসের প্রেমের আনন্দের ধারায় অভিব্যক্ত।

রসিক বিনা ইহা কেহ জানে না, তাই ত' চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়,
তর-তম করি বিচার করিলে
কোটীতে গুটীক হয়।

সাদা কথায় বলতে গেলে, রসতত্ত্বের কথা হ'ল রসের পথেই পরমের সন্ধান করা। সেই ত' আমার ব্যথিত, সেই ত' আমার পরম আত্মীয়। অনুরাগে তাঁর ধরা। এই জন্যই ত' বাউলরা নিজদের অনুরাগী বলে পরিচয় দেয়।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয় সংস্পর্শে যে সুখ সে ত' নিত্য বস্তু নয়। তার ত' আছে হ্রাস, বৃদ্ধি, উৎপত্তি ও বিলয়। সে সুখ ত' রসের সৃষ্টি করে না। সে ত' স্থূল বিষয়, ঐন্দ্রিক ভোগ মোহ। রসবস্তু থাকে অটলের গাছে,

অটল খেজুরের গাছে কত রস আছে,
খোক্কার গুণে ওনা মিছরী কতই যে না করিতেছে।

রসিকতত্ত্বেই আছে রসের স্বরূপ নির্ণয়, এই বলিয়া প্রাচীনতার আমেজে মেঠোসুরে সরস আবেদনে পুনরায় গান ধরিল :—

প্রেমের সঙ্গি আছে তিন
সরল রসিক বিনা জানা হয় কঠিন,
শুদ্ধ শান্ত রসিক হলে
তবে অধর মানুষ মেলে
রূপ নেহারে গোল করিলে
এসে মানুষ যায় ফিরে।

শীতের বেলা, কথা প্রসঙ্গে বারটা বাজে, দরবেশকে ত' মাধুকরী করিয়া আস্তানায় গিয়া নিজেরই সব করিতে হইবে। বলিলাম, ফিরিয়া যাইতে ত' বেলা ভাটি পড়িয়া যাইবে। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একতারায় ঝঙ্কার দিয়া বলিল, রসিক চেনা কঠিন নয়।

মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা
তারে দেখলে যায় চেনা।
ও তার আঁখি দুটী ছল ছল,
মুখে মৃদু হাসিখানা।
সদাইরে তার শান্তরতি
হৃদ-কমলে জলছে বাতি
রসিক সুজনা।
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল ধরে না।
দেখলে যায় চেনা॥
ফুলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে যে
রসিক সুজনা।
ও সে অনুরাগের ঘরে, কপাট মেরে
নিচ্ছে প্রেম বেচা-কেনা
দেখলে যায় রে চেনা॥

গায়ক শেষ অন্তরাটী বারংবার গাহিতেছে। চাহিয়া দেখি, সে স্থির, অচপল, আত্মপূর্ণ। বুঝিলাম, প্রাকৃত ভোগ মোহের ছাকনিটুকু বাদ দিয়ে জীবনের নির্ম্মল বিশুদ্ধ অমৃতটুকু পান করার কৌশল তার জানা আছে। মনের মানুষ তার,—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুর।

এই বার আসি বলিয়া আমার সংকীর্ণ ঘরের সীমানার বাহির হইল।

অবশিষ্ট দিনটা কেমন এক উদাসভাবে কাটিয়া গেল গাছের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘতর করিয়া দিনের আলো নিভিয় গেল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর দেখি সন্ধ্যা অনেকক্ষ গত, কাক জ্যোৎস্নার মলিন আলো ক্রমশঃই নির্ব্বাণোন্মুখ ঘরের কোণে নানান গাছ গাছালির মধ্যে একটী রজনীগন্ধা তাহার ক্ষুদ্র পুষ্পপাত্র সুঘ্রাণে পূর্ণ করিয়া দেহদণ্ডখানি সদা ঊর্দ্ধে রাখিয়াছে, তাহার মৌন মিনতির সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য কাহার দৃষ্টিপথে পরে, তাই সভয়ে তাহার কত্র তনু মন্দ বা কাঁপিতেছে। নিকটেই তুলসী গাছ, মঞ্জরীত তুলসীর রেণু কণা অজস্র অশীর্ব্বাদের মত তাহার সকল অঙ্গে ঝরিয় পরিতেছে। চারিদিকের সমুদয় জগৎ আমার কাছে সু

বোধ হইতেছে। রজনীর মর্ম্মতন্ত্রী আজ যেন কাতরোক্তিতে ভরা,—

শ্রীহীন কুটীর মোর ম্রিয়মান নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
চেয়ে দেখি বারে বারে পুষ্পের আত্ম নিবেদন।

জানালা খুলিয়া দেখি, অসংখ্য নক্ষত্র খচিত আকাশ, জ্যোৎস্নায় উদ্বেলিত ব্যোমপথে নীল মহাসাগর, পৃথিবীর চিহ্ন অবলুপ্ত, যেন অসীম পারাবারের মধ্যে একবিন্দু প্রাণ চেতনা নিয়ে আমি বসে আছি। গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত অগণিত জগৎ যেন কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। শূন্য আকাশে নিরুদ্দেশগামী বলাকা শ্রেণীর ন্যায় এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি অনাদি অনন্ত প্রবাহের স্রোত বেগে ছুটীয়া চলিতেছে। তাহারা কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে? মনে হইল, বিশ্ব সৃষ্টি যদি আকাশের বলাকার মত গতির আবেগে মত্ত হইয়া অন্ধ প্রবাহে নিশিদিন ছোটে, আমার জীবনও যদি ঐ গতির প্রবাহে অনন্তকাল ছুটীয়া চলে, তবে এই বিশ্ব সৃষ্টির মূল কোথায়? মহাকাল, তুমি বল, এই প্রবাহমান জীব-জগৎ, জন্ম বাল্য কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্দ্ধক্যের ভিতর দিয়া বংশ পরম্পরায় কোথায় যাইতেছে।

হঠাৎ যেন মনে হইল, একতারায় হাত বুলাইয়া কে যেন অতিদূরে গাহিতেছে,

অকূলের এই বর্ণ এ যে দিশাহারার নীল
অন্য পারের বনের সাথে মিল।

গানের মধ্যে যে বক্তব্য ছিল, সুরের সরস আবেদনে তাহা ফুটিয়া উঠিল। কে যেন রসের অঞ্জন মাখাইয়া দিল চোখে। এ ত' বিশ্ব সৃষ্টির নিখিল প্রবাহ, একটী গভীর অর্থকে বহন করিয়া তাহারই প্রকাশরূপে অনাদি কাল হইতে অনন্তের পথে চলিতেছে। এই নিখিল বিশ্ব প্রবাহটী একটী বিরাট বিশ্বমনের বহিঃ প্রকাশ মাত্র। দেখিলাম একটী ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ পুরুষ এই সকল সৃষ্টি প্রবাহের ভিতর দিয়া যেন আত্মোপলব্ধি করিতেছেন।

আজ যেন চিন্মাত্র সৎব্রহ্মের প্রতীক এই মহাব্যোম বিরাট বিশ্বরূপে নয়নে প্রতিভাত হইতেছে, সকল অতীত অনাগত বর্ত্তমান লইয়া বিশাল জগৎটী তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল, আজ তাহার বাস্তব পরিণতি বিশ্ব সৃষ্টি বলিয়া অধিগম্য হইতেছে।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অনাদি অনন্ত ভগবানের বিকাশ, সুন্দর অপরূপ লীলা বৈচিত্র। নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি ধরা বক্ষে তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া আছে। ধ্যান গম্ভীর ভূধর নদীজল মালাবৃত প্রান্তর, শ্যাম শস্যাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা মায়ের রূপ মানসপটে প্রতিভাত হইল।

কিন্তু সন্ততি পরিবৃত জননীর স্নেহ মাধুর্য্য মধ্যে মাতৃরূপের প্রকৃত বিকাশ। যে অগণিত নরনারী যুগ যুগ ধরে এই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে একটী বিরাট সভ্যতা ও জাতীয় জীবনের বিচিত্ররূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তার মধ্যে এই বাউল সম্প্রদায়।

সামাজিক উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তাদের মধ্যে নাই। ভেদাভেদের কৃত্রিম রেখাগুলি এখানে এসে সব মুছে গেছে। এক অখণ্ডিত উদার মনুষ্যত্ব সকল মানুষকে আপন বৃহৎ আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়ে একাকার করে নিয়েছে। বাউলের সাধনা, মানুষের সাধনা—

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।

হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, পূজা পার্ব্বণ নাই, দেউল, দরগা, তীর্থ নাই। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা নাই। দীর্ঘকেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু, গায়ে প্রকাণ্ড ঢিলে আলখেল্লা, হাতে একতারা, নগ্নপদ এই বাউল সম্প্রদায়। সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমানভাবে ইহাতে স্থান পেয়েছে, সাম্প্রদায়িক জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি এসে বাউল জীবনের বিরাট সাম্যের মহাসমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

"ভারতের জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনার সুবিশাল ইমারতে নানা প্রকার মশলার মিশাল আছে। কত জাতির, কত জীবনের সত্য ও সাধন প্রতিভা কত কাল ধরে তার মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে, যুগে যুগে কালে কালে এখানে যারা এসেছে, তারা এর অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তারা এখানে নেওয়া দেওয়া এখনও করিতেছে, সেই সব দান প্রতিদানের নিরন্তর উত্তর ও প্রত্যুত্তরে ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের বনস্পতি নানা শাখা ও প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ক্রমশঃ আপন বিস্তারের সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছে।"

আমাদের বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে এই গভীর মরমী সাধনা লোকচক্ষু ও লক্ষের অন্তরালে, একান্তে, নিভৃতে তার অমূল্য সম্পদ নিয়ে অবস্থান করিতেছে। দেখে মন আবিষ্ট হয় যে এমন একটী অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লী সাধনার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠতম, সূক্ষ্মতম, উচ্চতম এবং আধুনিক তত্ত্ব এবং সত্যগুলি এমন সহজে সরস সৌন্দর্য্যে পুষ্পিত হয়ে আছে।

বাউল রচিত সাহিত্যের দুইটী ভাগ, একটী তত্ত্ব প্রকাশের জন্য, অপরটী রসানুভূতির জন্য। ইহার আছে mystic মরমী বা ভাবক দিক আর কবিত্বের দিক—

নিশিথে যাইও রে ভোমরা ফুলবনে
নয় দরজা কইরা বন্ধ লইত রে ভাই ফুলের গন্ধ।

প্রভৃতি সঙ্গীতে কাব্য সন্ধানী তত্ত্বের মেঘ ঘটার মধ্যে রসের বিদ্যুৎ লীলা দেখিতে পাইবেন।

মনের বাঘ

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেহের পঞ্চস্তরের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম তৃতীয় স্তরে Dermis বা সত্যিকার চামড়ার সঙ্গে রক্তের নাড়ী স্নায়ু এবং মাংসপেশীগুলি চিদম্বরমের অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির মত গায় গায় জড়িয়ে আছে। সে কথাটি এরি মধ্যে ভুলে যান নি নিশ্চয়ই ? লতা যেমন গাছ বেয়ে বেয়ে উঠে তার সারা গা ছেয়ে ফেলে, মাংসপেশীরাও তেমনি হাড়ের কাঠামোটাকে ঘিরে তার সারা গা আচ্ছন্ন করে রয়েছে। লতা গাছকে জড়িয়ে ফেলে তার নিজের প্রয়োজনে, গাছের তাতে ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি কিছুই নেই। কিন্তু মাংসপেশীরা যে জীর্ণ শীর্ণ কিম্ভূতকিমাকার কঙ্কাল ভূতটাকে জড়িয়ে থেকে জি, পালের কাদার গোলার লেপের মত তাকে অমন সুন্দর সুঠাম মসৃণ করে তোলে সে কার প্রয়োজনে ? শুধু কি তার নিজের ? না একেবারেই নয়। বলে—'ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্'। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল এবং ব্রাহ্মণের সংযম তপঃনিষ্ঠা পরস্পর সাপেক্ষ। এই দু'য়ের মিলনেই ভারতে একদিন জ্ঞান, কর্ম্ম ও শক্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিল। জগৎ স্তম্ভিত হয়ে ভারতের মহামহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখেছিল। হাড় মাংসপেশীরাও তেম্নি পরস্পর সাপেক্ষ। হাড় না থাকলে মাংসপেশীরা হ'ত কেঁচোর মত লিক লিকে, আবার মাংস পেশীরা না থাকলে হাড়ের কাঠামোটা হ'ত নির্জ্জীব, অসাড়, নিস্পন্দ ও অচল। চিৎপাত শুয়ে থাকা ভিন্ন আর কোন কাজই তাকে দিয়ে হত না। আপনার ঐ মনোহর দেহটি নিয়ে রাজহংসটির মত হেলে-দুলে যে চলেন, সাধনা বোস যে জগৎ মাতান নাচ নাচেন, ঐ যে ভুবনমোহন হাসিটি হাসছেন পাকা আঙ্গুরের মত সরস মধুর ঠোঁট দুটি নোড়া দাঁতের আভায় আশপাশ উদ্ভাসিত করে, আপনি যে কথা কন, এ সবই ঐ মাংসপেশীদের জন্যে। ওরা হাড়কে নড়ায় তাই হাড় নড়ে, ওরা আঙ্গুলকে মুঠো করায় তাই আঙ্গুল মুঠো করে, ওরা উঠায় তাই আপনি উঠেন, ওরা বসায় তাই আপনি বসেন ; এক কথায় ওদের বাদ দিয়ে কোন কাজটিই আপনি কর্ত্তে পারেন না। অবশ্য কর্ত্তারও কর্ত্তা আছেন, বাবারও বাবা আছেন, ওদেরও আবার চালক আছে। সে কথা এখন থাক সে কথা পরে হবে। উপস্থিত এই জানুন যে, ওরাই আমাদের সব করায়।

একটা গোটা মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচশো রকমের মাংসপেশী আছে, বিশ্রী বিশ্রী তাদের সব নাম। সেই সব আখাম্বা নামগুলো করে আপনাদের কোমল কাণে ব্যথা দিতে চাইনে। তবে একটা কথা না বল্লেই নয়। সেটা এই যে, মাংসপেশীদের দুটো শ্রেণী আছে—এক শ্রেণীর নাম voluntary muscles বা অনুগত মাংসপেশী। অপর শ্রেণীর নাম involuntary muscles বা অবাধ্য মাংসপেশী। ভাবুন অবাধ্য মাংসপেশী কি ? এই অবাধ্যতার যুগে ঘরে বাইরে অবাধ্যতা দেখে দেখে এমনিতেই পিত্তি যখন জ্বলে যাচ্ছে, তখন এই দুঃসংবাদটা শুনে আপনার কেমন লাগছে বলুন তো—যে, আপনার দেহের মধ্যেই এমন কেউ আছে যারা আপনার কথা শুনতে বাধ্য নয় ? তা যেমনই লাগুক সত্য সত্যই থাকবে—আপনার ভাল মন্দের ধার সে ধারবে না—তার নিজের একগুয়েমীতেই সে চলবে। এই যে আপনি লিখছেন—লিখছেন—লিখছেন, অনবরতই লিখে যাচ্ছেন। তিনটে আঙ্গুল—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, কেমন ক্রীতদাসের মত আপনার আজ্ঞাবাহী হয়ে অবিশ্রাম কলম চালাচ্ছে, একবারও বলছে না যে, আমরা আর পার্চ্ছি নে। ঐ যে, চশমা পরা সুন্দর কিশোরটী কেমন বেশে Cycle চালিয়ে যাচ্ছে—পা দুটি তার অবিরাম ঘুর্চ্ছে—একবারও বলছে না, "তুমি দাঁড়াও একটিবার আর আমরা পার্চ্ছি নে।" কেন জানেন ? আঙ্গুল আর পায়ের পেশীগুলো সব অনুগত মাংসপেশী বা voluntary muscles তাই তারা এত বাধ্য। আবার উল্টো করে দেখুন, আঙ্গুলগুলো যদি অবিশ্রাম চলতেই থাকতো, আপনি পার্চ্ছেন না তবু ওরা লিখতেই চাইত, পা দুটো যদি লাট্টুর মত ঘুরতেই থাকতো, আপনি থানায় গর্ত্তে গিয়ে পড়েছেন তবু তারা যদি থামতে চাইত না, তাহলে মুস্কিলের একশেষ হত। তাও হয়নি, কেন না ওতে আছে সব voluntary muscles. হাতের সঙ্গে জোড়া যেখানে যে

muscles আছে সব voluntary muscles. এই মাংসপেশীগুলোর বলই বাহুবল। এই পেশীগুলোর উন্নতির জন্যেই ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের সার্থকতাতেই শরীরটা হয় বেশ muscular বা মাংসল। রোগে ভুগে এই মাংসগুলো শুষ্ক শীর্ণ হয় বলেই লোক শীর্ণ দুর্ব্বল হয়, চলতে পারে না, তখন ডাক্তারেরা বলেন, The patient has lost the tonicity of his muscles অর্থাৎ রোগী মাংসপেশীর কর্ম্মশক্তি হারিয়েছে। তাই টনিকের ব্যবস্থা করেন।

অবাধ্য ছেলেটা প্রায় আপনার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতে চায়। অবাধ্য চাকরটাও পারৎপক্ষে আপনার কাছ ঘেঁষতে চায় না। অবাধ্য মাংসপেশী বা involuntary muscles গুলোও তাই, তারাও কখনও আপনাকে দেখা দেয় না, থাকে শরীরের ভেতর বুক পেটের মধ্যে লুকিয়ে। নিজের কাজ তারা নিজের ইচ্ছামত করে যায়। আপনার কোন কথাই শোনে না। জিজ্ঞেস করেন কি তাদের কাজ? তাদের কাজ যা আপনি খান, তাকে চাপতে চাপতে ক্রমে নীচে আরও নীচে পেটে, নাড়ীভুঁড়িতে নিয়ে যাওয়া। বুকের রক্ত টিপতে টিপতে, চাপতে চাপতে সমস্ত শরীরে নিয়ে যাওয়া, আবার বুকে ফিরিয়ে আনা। এককথায় শরীরের যেখানেই নল সেই নলের মধ্যে দিয়ে নেওয়ার মত ফিরিয়ে আনবার মত যা সব কিছু নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা।

অশান্ত বালক সংশোধনের জন্য বিখ্যাত স্কুল ছিল V. M. Boarding School. কত কত দুর্দ্দান্ত ষণ্ডামার্কা বালককেও অতি শিষ্ট, শান্ত হয়ে ফিরে যেতে দেখেছি। কিন্তু এই যে আমাদের Involuntary বা অশান্ত মাংসপেশীগুলো এই হতভাগাদের সংশোধনের কোন উপায়ই আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হ'ল না।

দুপুরে আপনি নেয়ে উঠেছেন সেই ১১॥০টায়—রাত ৮টা এখনও খিদের নাম নেই। পেট ভার হয়ে আছে। অম্বল হচ্ছে ঢেঁকুর উঠছে, কেন জানেন? অন্ননালীর অবাধ্য মাংসপেশীগুলো সমস্ত দিন শুয়ে নিদ্রা দিয়েছে কোন কাজই করেনি। আপনার যেখানকার ভাত সেইখানেই রয়ে গেছে। আবার কখনও হয়তো কাজের তাড়া এত। সকাল সকাল খিদে পাওয়া সেদিন একেবারেই অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তা হলে কি হয়? আপনার অলস muscles গুলো সেদিন অতি চতুর হয়ে যা কিছু খেয়েছিলেন সাত তাড়াতাড়ি সেগুলোকে নাবিয়ে দিয়ে আপনাকে খিদে পাইয়ে দিয়ে বসে আছে। এদের কি কর্ত্তে ইচ্ছে করে বলুন তো? কেষ্টা বেটা যে এদের চেয়ে ঢের ভাল। ওতে voluntary muscles থাকতো তো এসব কোন হাঙ্গামাই হতে পার্ত্ত না। আপনি ইচ্ছে মত ক্ষিদে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পার্ত্তেন। কারো বুক এমন চলে যেন ইঞ্জিন চলেছে, তুমি যত বল, যত চেপে ধর, তার বয়ে গেছে থামবার জন্যে। সে তার নিজের খামখেয়ালিতে চলেছে। আবার কারো বুক এমন চলে যে হাজার কাণ পেতেও কার বাবার সাধ্য ধুকধুকি তার শোনে, যেন শালা মরে আছে, ঐ যে হৃদপিণ্ডটা ওটা যদি voluntary muscles এ তৈরী থাকতো এক কথায় ও আপদ চুকে যেতো। ইচ্ছে মত বেগ বাড়িয়ে কমিয়ে নিতাম। Heart disease বলে কোন শক্ত রোগ থাকতো না, অল্প সল্প যা হোত অনায়াসেই সেরে নেয়া যেতো।

খিদে থাক আর না থাক খেয়ে তো যাচ্ছেন অনবরতই। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে এই যে এতখানি বয়েস হ'লো—যা খেয়েছেন, যদি ওজন নেয়া যেতো, দেখা যেতো যে, গুদোমকে গুদোম সাবাড় করে দিয়েছেন। এই যে বস্তা বস্তা চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, মণ মণ তেল, ঘি, মাখম, ছানা, চিনি, বাগান বাগান শাকসব্জি, ফলমূল, তরি-তরকারি, এগুলো কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলেই নিশ্চিন্তি! আর যে কি তাদের হলো, কোথা দিয়ে কোথায় কোন্ দেশে তারা গেল, খোঁজ নেবার বা জানবার তোয়াক্কা রেখেছেন কি? বলবেন, না, মোটেই না, খেয়েছি মজা ক'রে—মজা করে জানতে পারতুম তো জানতে চাইতুম! জানার হাজার নট্‌খটী ও হ্যাঙ্গাম পোয়াবে কে? দেখুন কুল পাওয়া যায় গাছের তলায় বসেই। ডাব খেতে হয় অত বড়ো উঁচু গাছের ডগা থেকে কষ্ট ক'রে পেড়ে! তা ব'লে কি আপনি কুলই খাবেন, ডাবের অমৃত ধারার স্বাদ নিয়ে দেখবেন না কি যে তৃপ্তি? খাওয়ার মজাটা অনায়াসলভ্য, জানার মজাটা একটু আয়াসসাধ্য—কিন্তু তুলনায় প্রথমটা যদি হয় ছিদেম মুদির চিটে গুড়, দ্বিতীয়টা যে ভীমনাগের আবার-খাবার। চলুন না

আমার সঙ্গে একটু কষ্ট ক'রে দেখিয়ে দি পরিস্কার ক'রে, কথাটা সত্যি কি মিথ্যে! বলেছি ডাব খেতে হয় কষ্ট করে পেড়ে, আরও একটু কষ্ট আপনাকে করতে হবে, যন্ত্রপাতি নিয়ে বেশ পাওয়ারফুল একটা টর্চ্চ নিয়ে ঢুকতে হবে গিয়ে তেমন তেমন একটা পেটের ভেতরে। তেমন তেমন বলছি এই জন্যে যে জায়গার অসঙ্কুলান না হয়, দুটো লোক আমরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে দেখে শুনে বেড়িয়ে বেড়াতে পারি! ভাব ছেন তেমন পেট আবার কোথায় পাওয়া যাবে! যাবে যাবে Circular Road এর তলা দিয়ে যে পাইপ গেছে দেখছেন কি? তেমন ব্যাসের একটা পেট আছে আমার জানাশুনো! তবে এক মুস্কিল এই বৃকোদরের ভাগ্যবান মালিকটি উপস্থিত কলিকাতায় নাই। তাঁর যথা এবং সর্ব্বস্ব উদরটি নিয়ে বোমার ভয়ে কলিকাতা ছেড়ে ঘাঁটালে গিয়ে লুকিয়েছেন; তা কি করা যায়? গরজের বালাই নেই, চলুন টিকিট কেটে ঘাঁটাল মুখোই রওনা হই। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ উঠলুম তো গিয়ে ঘাঁটালে। বর্ষার কোলাব্যাঙটির মত ধরলুম চেপে ভুরো-পেটা লোকটাকে। মশায়, রাজী কি হ'তে চায়? প্যাক প্যাক ক'রে চেঁচাতে লাগল। বললুম আপনারা মাষ্টারলোক ছাত্রদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এ ছাত্রটির জন্য একটু কষ্ট স্বীকার আপনি করবেন না? আর তেমন কষ্টই বা কি? যে দাঁতের ফাঁক আপনার বিশেষ হাঁও আপনাকে কর্ত্তে হবে না, ঐ ফাঁক দিয়েই ছোটখাট দুটো লোক আমরা অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারব। তা ছাড়া দু'মাস ম্যাট্রিকের দু'টো ছেলে পড়িয়ে যা পান আমরা তা দিতে রাজী আছি। ব্যস্ আর যায় কোথায়? সাপের মাথায় যেন ধুলোপড়া প'ড়ল! তক্ষুনি রাজী! সামান্য হাঁ কর্ত্তেই, সেই মহাকালের ছবি দেখছেন? মুখ দিয়ে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, মানুষ, গরু কত কি ঢুকছে-বেরুচ্ছে, তাঁর তুলনায় জীবজন্তুগুলোকে দেখাচ্ছে যেন মশা মাছি? মশা, মাছির মতই আমরাও ঢুকে গেলুম মুখের ভেতর! ভয় কর্ত্তে লাগল, ঢুকচি তো পাছে হজম হয়ে যাই! কিন্তু না সে ভয় মিছে! নিদ্রা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল নিতম্ব লম্বোদর বোকড়াদন্ত ভদ্রলোকটি এমন নিবিষ্ট চিত্তে সাড়ম্বরে ভোজন-ক্রিয়া আরম্ভ করেন যে সেই পাহাড় প্রমাণ ভোজ্যরাশির মধ্যে সামান্য দুটো মানুষ আমরা নিঃশেষে ঢাকা পড়ে যাব! পেটের মাংসপেশীগুলো আমাদের অস্তিত্ব মোটে অনুভব কর্ত্তে পারবে না! তা হজম করবে কি? ঢুকে প্রথমেই নজরে এল লোকটার দেড়হাত লম্বা লকলকে নোলাটা, অর্থাৎ জিবটা! Voluntary muscles বা অনুগত মাংসপেশী কাকে বলে আপনি জানেন। এটা সেই অনুগত মাংসপেশীতে তৈরি—তাই এটা মালিকের অত্যন্ত অনুগত এবং বশম্বদ! যা বলান তাই বলে—যা খাওয়ান তাই খায়—শুধু অতি ঝাল, অতি টক বা অতি তেতো হলে কুঁকড়ে-মুকড়ে একটু অসম্মতি জানায় মাত্র। এম্নি না হয়ে এটা যদি তৈরি হতো involuntary muscles বা অবাধ্য মাংসপেশীতে, বিপদের অবধি থাকতো না। আপনি বলতে চাইতেন রাম ও বলতো রহিম, আপনি বলতে চাইতেন সাপ, ও বলতো ব্যাঙ, আপনি বলতে চাইতেন ভাই, ও বলতো শালা, কি মুস্কিল হতো বলুন দেখি? তা তো হয় নি, হয়েছে এত বাধ্য পরিশ্রমী এবং অক্লান্ত-কর্ম্মী যে কিছুতেই শ্রান্ত অবসন্ন হয়েও পড়ে না। বাগ্মী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, অভিনেতা রাত্রির পর রাত্রি সমান অভিনয় করে যাচ্ছেন, ক্যালোয়াৎ নানা বিতিকিচ্ছিরি মুখভঙ্গি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলাবাজি ও জিবের কসরৎ ক'রে চলেছেন, গলা বেচারী ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছে! জিব বেটার কিন্তু শ্রান্তির কোন লক্ষণ নেই! বরাবর যেই চাঙ্গা সেই চাঙ্গা! চালিয়ে গেলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত বুঝি অনবরতই চলতে পারে। আর এত শয়তান এই ছুঁচো বেটা, সব জিনিষের রসটাও খাবে নিজে, মিছিমিছি খাটিয়ে নেবে বোকা দাঁতগুলোকে। কষ্ট করে চিবুবে তারা রসটা চুষে খাবেন উনি! কদ্দিন সয়! জুচ্চুরিটা বুঝতে পেরে দাঁতেরা যদি তেড়ে এল ওকে কামড়াতে, হ'লই বা তারা দলে ভারি—৩২ জন, ও একলা! ছুঁচোর মতই এমন পালিয়ে পালিয়ে ফিরবে সাধ্য কি তাদের ওর কিছু করে! যদি দৈবাৎ একটা কামড় বা লেগে গেলতো "উ হু-হু" করে এমন আদুরে গোপালের মত মুখে মুখে তাদের নিজের গা বুলুতে থাকবে যে, সব ভুলে গিয়ে তারা ওর সেবা যত্নে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হবে! যাক জিব পেরিয়ে নীচের দিকে একটু নাবতেই দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। শটকরে টর্চ্চটা জ্বাললুম, আশ্চর্য্য হয়ে দেখি, দু'টো Tunnel

বা সুড়ঙ্গ বরাবর নীচের দিকে নেমে গেছে। দু'টোর একটা সাম্নে একটা পেছনে! আবার বিশেষ করে দেখতে গিয়ে দেখি সাম্নেরটা তৈরি cartilage বা নরম হাড় দিয়ে, পেছনেরটা muscles বা মাংসপেশী দিয়ে গলার ঠিক মাঝখানটা উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত বরাবর একটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে অনুভব করুন দেখবেন শক্ত লাগছে অথচ চাপে খানিকটা বসছে! আর একটু জোরে চাপলেই নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার মত হচ্ছে!

এই হাতে যেটা পাচ্ছেন, এটাই সাম্নের সুড়ঙ্গটা, বা পাইপটা। নাক দিয়ে যে শ্বাস প্রশ্বাস আমরা নিয়ে থাকি এই পাইপ দিয়েই তা ফুসফুসে গিয়ে ঢোকে! তাই এটায় বেশী চাপ লাগলেই নিশ্বাস আটকে আসে। এটাকে বলে Larynx (ল্যারিংস) বা শ্বাসনালী। এটার ঠিক পেছন দিকে নেবে গেছে, আর একটা পাইপ বা সুড়ঙ্গ। শ্বাসনালী সাম্নে দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল করেছে বলে সেটা আপনি হাত দিয়ে অনুভব কর্ত্তে পার্চ্ছেন না। এটার নাম Pharynx (ফ্যারিংস) বা অন্ননালী। যা কিছু খাদ্য বা পানীয় আমরা খাই বা পান করি এই পথেই তারা নেবে যায়।

আপনি কখনও বিষম গেছেন কি? কি রকম বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হয় বলুন দেখি? নিশ্বাস আটকে যাওয়ার মত হয়। মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ একটা অশান্তির একশেষ হয়। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ কোত্থেকে কেন এমনতরটা হয় বলতে পারেন? না তো! নিশ্চয়ই না, আচ্ছা শুনুন হয় এম্নি করে। জিবের যেখানে শেষ, পাইপ দুটোর সেখানে আরম্ভ। যা কিছু আপনি খাবেন, সাম্নের পাইপের মুখটা পেরিয়ে তবে তো পেছনের পাইপের মুখে গিয়ে তাকে ঢুকতে হবে, পেরুবার সময় হঠাৎ যদি তার কোন অংশ সামনের পাইপে ঢুকে যেতে চায়, তবেই এই অবস্থাটা হয়। সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলতে থাকে, "আহা, বিষম গ্যাছে! বিষম গ্যাছে গো! মাথায় থাবড়া মার মাথায় থাবড়া মার।" Larynx বা শ্বাসনালীতে হবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ, সে পথে আসবে যাবে খালি বায়ু আর বায়ু এবং চব্বিশ ঘণ্টা তাতে বায়ুর চলাচল আছেই আছে। যাই বায়ু ছাড়া অন্য কেউ তাতে intrude বা অনধিকার প্রবেশ কর্ত্তে যায়, "কোন হ্যায়" বলে পুলিশ পাহারা—বায়ুরা এসে মারে তাকে ধাক্কা। intruder খাদ্যের টুকরোগুলি নিরুপায় হয়ে বেরিয়ে আসে যেখান দিয়ে পথ পায়, অর্থাৎ মুখ দিয়ে নাক দিয়ে কান দিয়ে। বেচারা বিপন্নের একশেষ হয়।

আচ্ছা, এমন প্রতি গরাসকেই তো পেরিয়ে যেতে হবে সামনের গর্ত্তকে? কাজেই প্রতি গরাসই তো সামনের গর্ত্তে ঢুকে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে? সত্যি পারে বা পার্ত্তো! কেন পারে না জানেন? আপনি আলজিবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, নিজের এবং অপরের আলজিব দু'একবার নিশ্চয়ই দেখেও ফেলেছেন! এবং আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছেন ওটা আবার কিবে বাবা? একটা গল্প বলি শুনুন, এক বুড়ীর দু'টো পোষা বিলিতি ইঁদুর ছিল—একটা ছোট আর একটা বড়ো। বুড়ি একটা কাঠের বাক্সে তাদের রাখতো, ছোট ইঁদুরটির বেরুবার জন্য একটা ছোট এবং বড়োটার জন্যে একটা বড়ো গর্ত্ত বাক্সের গায় করে দিয়েছিল! বড়ো গর্ত্তটা দিয়ে যে দুটো ইঁদুরই বেরুতে পারে, এটা বুড়ীর মাথায় আসে নি। আপনিও হয় তো ভেবেছেন ভগবান কি এত বোকা? বড়ো জিনিষ আস্বাদের জন্য দিয়েছেন একটা বড়ো জিব, আর ছোটর জন্য দিয়েছেন ঐ ছোট্টটা! না অত বোকা সত্যি তিনি নন্। নাম আলজিব হলেও জিবের কাজ মানে আস্বাদ নেবার কোন কাজই ও করে না। করে একটা সদা জাগ্রত সতর্ক প্রহরার। আলজিব বা uvulaটা (ইউভিউলা) আছে ঠিক সাম্নের পাইপের মুখের কাছে, যাই আপনি কোঁৎ করে বা ঢক্ করে গিলতে যান ও অম্নি তড়াক করে ঐ পাইপের মুখটা নিঃশেষে আটকে বসে, গরাসটা আপনার হড়্ হড়্ করে ওর ওপর দিয়ে গিয়ে পেছনের পাইপে ঢুকে যায়। একটু জল খান, দুটো ভাত খান, যাই খান ফি বারেই এই ব্যাপার হচ্ছে! দেখেছেন বন্দোবস্ত? আপনি বলবেন আমরা হ'লে আরও ভাল বন্দোবস্ত কর্ত্তুম, ও গর্ত্তের মুখটা একেবারে আটকে দিতুম; আলজিবটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে কাজে অবহেলা করলেই যে বিষম খাওয়া তাও কখনো হতে পার্ত্তো না। বাঃ, বেশ আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। একেবারে আটকে দেবার কথা দূরে থাকুক বেশ অনুভব করে দেখুন দেখি, গেলার সময় গলার মধ্যে যে অবস্থাটি করে

আপনি গেলেন, সে রকম ভাবে গলাটা আপনি কতক্ষণ রাখতে পারেন? নিশ্বাস আটকে আসে কি না, কেমন, দেখলেন তো? আটকে দেবার জো নেই, কেন না ওটা যে শ্বাস প্রশ্বাসের পথ, ওটাকে আটকে দিলে যে মানুষ মরে যাবে। তাই uvula বা আল্‌জিবটি আছে এক দিকে আটকানো এক টুকরো মাংসখণ্ডের মত। এত সতর্ক ও যে শিশু ঘুমোলেও ও থাকে জেগেই। তাই মায়েরা দুরন্ত ছেলেকে না জাগিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তার খাওয়ানোর কাজটা সেরে নিতে পারেন। আল্‌জিবের মত সজাগ পাহারাটি না থাকলে কি হতো বলুন দেখি? প্রথম ঢোক খাওয়াতেই তো শ্বাস নালিতে দুধটা ঢুকে গিয়ে ছেলে মরে যেতে পারতো! Larynx বা শ্বাসনালীর কথা এখন এখানে থাকবে; তার প্রসঙ্গ যখন আবার আসবে তখন বিশেষ ক'রে বলব। এখন চলুন পেছনের সুড়ঙ্গ—ঐ অন্ননালাটায় গিয়ে ঢুকি এবং তন্ন তন্ন করে দেখি কোথায় কতদূর গিয়ে ও শেষ হয়েছে এবং ওতে কি আছে। আগে বলেছি, অন্ননালীটি তৈরী মাংস-পেশী দিয়ে, ওটা থাকে নরম রবারের পাইপের মত চিপসে। শ্বাসনালীটা তৈরী নরম হাড় দিয়ে, কাজেই এটা থাকে শক্ত রবারের পাইপের মত টাইট হয়ে। কেন না অন্ননালীটা যদি চিপসে থাকে কোন ক্ষতি নেই, খাবার যখন ভেতর দিয়ে যাবে তখন ফুলে উঠে জায়গা করে দিলেই হ'ল। কিন্তু শ্বাসনালীটা যদি অনবরত চিপসে থাকতো কি হ'ত বলুন দেখি? নিশ্বাস আটকে সবাই আমরা মরে যেতুম! নয় কি? তাই ওটা এমন জিনিষ দিয়েই তৈরী, যেন কখনও চিপসে যেতে না পারে। বড়ো গরাসটা যখন খাই অন্ন-নালীটা একটু বেশী ফুলে উঠে ওকে চেপে ধরে আর নিশ্বাস আটকে যাবার মত হয়। একদিন একটা Restaurant এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম দেখি ভেতরে কিসের একটা গোলমাল এবং সকলের মুখেই আতঙ্ক। আমায় ডাকতেই ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি একটা লোক মুখ উঁচু করে হাঁ করে আছে। চোখ দু'টো তার কপালে গিয়ে ঠেকেছে। নিশ্বাস নিতে পাচ্ছে না। লোকগুলো কি করবে বুঝতে না পেরে তাকে ঘিরে খালি হৈ চৈ কচ্ছে। জিগগেস করে জানলুম, আস্ত একটা আলু এক বারে গিলতে পারে ব'লে বাজি ফেলে আলুটা গিলতে যেতেই লোকটার এমন দশা হয়েছে। আমি আর দেরী না ক'রে একটা fork (কাঁটা) চেয়ে নিয়ে হাঁ করা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং আলুটার যে অংশটুকু তখনও দেখা যাচ্ছিল তাতে বসিয়ে দিয়ে একটা মোচড় দিতেই সেদ্ধ আলুটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নির্বুদ্ধি লোকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন ব্যাপারটা কি হয়েছিল? আস্ত আলুটা অন্ননালীতে ঢুকে তাকে অত্যধিক ফুলিয়ে তুলে শ্বাসনালীর ওপর ভয়ানক রকম চাপ পড়েছিল, কাজেই লোকটা নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবার মত হয়েছিল! আলুটা ভেঙ্গে দিতেই টুকরোগুলো সহজেই অন্ননালী বেয়ে ভেতরে চলে যেতে পারল, অন্ননালীর চাপ কমে গেল, এবং অন্ননালীর চাপ কমে যেতে শ্বাসনালীর ওপর অযথা চাপও কমে গেল, লোকটা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল! কেমন তাই নয় কি?

[ক্রমশঃ

টেলিফোন বার্ত্তা

শ্রীভুবনমোহন সাহা

(একাঙ্ক নাটিকা)

নিখিলের বিবাহবাসর কলিকাতার বাহিরে। কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রিত বন্ধু নন্দ কার্য্যের ঠেকাবশতঃ তথায় উপস্থিত হইতে না পারায় টেলিফোনে আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। তৎসহ কিছু উপদেশমঞ্জরীও প্রেরিত হইতেছে।

নন্দ। (টেলিফোন ধরিয়া) Trunk Call connection !

টেলিফোন অপারেটর। Number, please !

নন্দ। বি, বি, ৭-১ ৪৮*

অপারেটর। Wait for ten minutes, please !

(দশ মিনিট বাদে ক্রীং-ক্রীং শব্দে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল)

হ্যালো ! হ্যালো !

নন্দ। Is it প্রজাপতি-বৈঠক ?

সেক্রে। হাঁ মশায়, কাকে চান ?

নন্দ। I want the commissioner of marriage.

সেক্রে। বাংলায় বলুন না স্যার।

নন্দ। কমিশনার—কমিশনার অব্ ম্যারেজ্ আছেন ?

সেক্রে। ও-হো-হো—বুঝতে পেরেছি স্যার, আপনি প্রজাপতি ধুরন্ধরকে চান।

নন্দ। হাঁ-হাঁ মশায়, আর কত বাংলা করে বলব !

সেক্রে। আচ্ছা ধরুন স্যার, আমি ডেকে দিচ্ছি, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি ?—আপনি কে, কোত্থেকে বলছেন ?

নন্দ। বলে দেবেন—friend।

সেক্রে। ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার।

নন্দ। রাবিশ ! আপনি ক'দ্দিন কাজ করছেন—মাইনে পান ?

সেক্রে। আজ্ঞে না, অনারারি, বুঝতে পেরেছি— ধরুন স্যার।

কমিশনার। হ্যালো ! yes, who are you please !

নন্দ। Frien d

কমিঃ। ক'থেকে বলছেন—কি জানতে চান ?

নন্দ। Calcutta থেকে। নিখিল দত্ত vs বেলারাণীর application-র শুনানীর তারিখ ত' আজকে ?

কমিঃ। হাঁ, আর কি চান ?

* বি, বি বকবিসা—বিবাহবাসরের নাম। ৭-১-৪৮ বিবাহ তারিখ।

নন্দ। নিখিল বাবু বৈঠকে হাজির আছেন কি ? kindly একটু ডেকে দিন না !

কমিঃ। ধরুন ডেকে দিচ্ছি।

নিখিল। হ্যালো, কে নন্দ ! কি ভাই এত বলে এলাম তবু তুই এলি না !

নন্দ। কি করব ভাই, যুদ্ধের জন্য ভয়ানক কাজের pressure পড়ে গেছে ; শ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নাই। সাহেব কিছুতেই ছুটী মঞ্জুর করলে না।

নিখিল। একদিনের জন্যও যদি তুই আসতে পারতিস, তা হ'লে বড়ই আনন্দ হ'ত ! ভবেন, রমেন, দ্বিজেন, সবাই বৈঠকে হাজির।

নন্দ। উপায় নেই—এমন কি অফিসের ভিতরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যাকগে দুঃখ করিস না, আজকেই ত' শুনানীর তারিখ ?

নিখিল (কম্পিতকণ্ঠে) হাঁ-ভাই-ই !

নন্দ। ও কি ! অত নারভাস হচ্ছিস কেন ? "fight to the last ditch"

নিখিল। বিবাদিনীর তোড়জোড় খুব বেশী, একে ত' বড় লোকের মেয়ে, তাতে আবার রূপে বিদ্যাধরী আর বিদ্যায় B. A. third year.

নন্দ। তাতে অত ঘাবড়াবার কি আছে ! তুইও-ত' B. A. fourth year. তবে বিবাদিনীর তরফে অনেক স্ত্রীয়াম্ ঈপ, সাক্ষী-সাবুত হাজির !

নিখিল। হাঁ, তাতেই ত' বেশী ভয়—

নন্দ। ওতে কিছু ভয় নেই, সবই দরখাস্তের সর্ত্তের উপর নির্ভর করে। কি কি সর্ত্ত দিয়েছিস আমায় একবার শোনা ত'।

নিখিল। সর্ত্তগুলি খুবই liberal, তবুও ভয় হয়, কি জানি প্রজাপতি ধুরন্ধরের কি খেয়াল ! আর বিবাদিনীর কি রঙীন্ মর্জ্জি ! বলছি শোন্—

১। পণ গ্রহণ করিব না (কেন না বিবাদিনী পণের উপর ভয়ানক চটা)।

২। বিবাদিনীর জন্ত পনর হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করিয়া রাখিব।

৩। চাকুরীর মাহিনা আনিয়াই বিবাদিনীর হাতে দিব এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে চাহিয়া লইয়া খরচ করিব।

৪। হালফ্যাসানের দ্রব্যসম্ভারে বিবাদিনীর মনস্তুষ্টি করিতে কার্পণ্য করিব না।

৫। অনুমতি না পাইয়া যখন তখন কথা বলিয়া বিবাদিনীর কোপবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিব না।

৬। Her Majesty's whimsকে সব সময় শ্রদ্ধা করিয়া চলিব।

৭। Her Majesty's নজরবন্দী থাকব এবং বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইব না।

৮। বিবাদিনী আমার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতে বলিবে আমি সানন্দে সেরূপ আজ্ঞাধীন হইয়া চলিব।

৯। বিবাদিনীকে কখনও রন্ধনশালার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কথা বলিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিব না।

১০। গোলাপী কথার নেশায় (অবশ্য অনুমতি লইয়া) বিবাদিনীকে মশগুল রাখিতে চেষ্টা করিব এবং নভেল পড়িবার আগ্রহ প্রকাশ করিবামাত্র আনিয়া হাজির করিব।

১১। বিবাদিনীর ইচ্ছায় মা ষষ্ঠী কৃপা করিলে, মা ষষ্ঠীর কৃপার দাসকে বিবাদিনীর নির্দ্দেশানুসারে সেবাযত্ন করিতে ক্রটী করিব না।

১২। বিবাদিনী কোন কারণে রুষ্ট হইলে নোটিশ না দিয়াই এবং Divorce Act অমান্য করিয়া স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছেদন করিতে পারিবেন।

অপারেটর। Have you finished!

নন্দ। Not yet—হ্যালো নিখিল, এসব Womanish সর্ত্তে কি আর এই War timeএ Ultra-modern (now Marshal) প্রজাপতি ধুরন্ধর তোমার application মঞ্জুর করবেন, আমার ত' মনে হয় না। A. R. P.র ব্যবস্থা ত' কিছুই কর নি।

নিখিল। (সভয়ে) তা হলে কি হবে ভাই! তুই যদি এই সময় উপস্থিত থাকতিস্?

নন্দ। যে সব সর্ত্তগুলো বলছি লিখে নাও, application এ include করে দিও, দেখবে প্রজাপতি ধুরন্ধর বাপ বাপ করে দরখাস্ত মঞ্জুর করে দেবে।

১। আজকাল জান ত, Nazi raid কিম্বা Jap raidর ভয় কত, রাত্রি ৯টার পূর্ব্বে Black-out (ব্লাক আউট) করে দেবে নতুবা Defence of India (বেলাবাণী) Rules এ পড়ে যাবে।

২। A. R. P. Shelter-র জন্য একটা Slit trench অথবা Concrete vault ঠিক করে রেখো।

৩। মধুযামিনী (Honey-moon) যাপনের জন্য এক বৎসরের মত খাদ্যদ্রব্য কাঠ কয়লা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখবে।

৪। এক বছরের মধ্যে "সত্যাগ্রহ আন্দোলনে" যোগদান ক'রবে না।

৫। কাঁচ ব্যবহার আজকাল বিপজ্জনক, বিবাদিনীর হাতে কাঁচের চুড়ী ও চোখে চশমা প'রতে দেবে না।

৬। বিবাদিনীর চোখের বালি হবার ভয় থাকলে কিছু বালির বস্তার ব্যবস্থা রেখো।

৭। বিবাদিনীর সঙ্গে কথা ব'লবার সময় planetএর position দেখিয়া লইবে।

৮। হ্যালো—Mutual riot-এর সম্ভাবনা দেখলে প্রেমিক কবি জয়দেবের সেই চিরপরিচিত "দেহিপদবল্লভ-মুদারম্" কথা কয়টী স্মরণ করিবে।

৯। শুভদৃষ্টির সময় forget-me-not ফুলের মালা বিবাদিনীর গলায় পরিয়ে দেবে।

১০। বিবাদিনীর ফুলশয্যার শান্তিরক্ষার জন্য বিবাদিনীর নিশাচর Sisterদের হস্তবিচ্ছুরিত কড়ি ও কোমল Splinters থেকে বাঁচতে হলে Baffle wall কিংবা Siegfried line তৈরীর ব্যবস্থা রেখো।

১১। Submarine অথবা U-boat attack-এর সম্ভাবনা দেখলে বিবাদিনীর চতুঃসীমানায় mine পেতে রাখবে এবং তাঁহার চলাচলের পথে উপযুক্ত convoy-এর ব্যবস্থা করবে।

১২। শূন্যপথে Parachutists কিংবা dive-bombers আক্রমণের ভয় থাকলে জানালার ধারে anti-aircraft gun বসিয়ে রাখবে।

১৩। যতই বিপদের সম্ভাবনা দেখ না কেন বিবাদিনীকে কখনও open city declare করো না।

১৪। শত্রুর আক্রমণ থেকে বিবাদিনীকে রক্ষা করা একান্ত অসম্ভব হলেও Scortched earth policy adopt ক'রবার পূর্ব্বে ভাল করে ভেবে দেখবে।

হ্যালো নিখিল, এই fourteen points এর উপরে দৃষ্টি রাখলে দেখো তোমার application ঠিক মঞ্জুর হয়ে যাবে।

নিখিল। বেশ! বেশ! Grand suggestions! বাঁচালে ভাই, Thank you, তারপর—finished!

অপারেটর। (connection cut off)।

নিখিল। আ-হা-হা!

বাংলা ও হিন্দী গান

শ্রীহরিপদ দত্ত

কি উপায়ে বাংলা গানের শাস্ত্রসম্মত আকারে প্রবর্ত্তন ও প্রসার সম্ভবপর আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় সে বিষয়ে যাহা সমীচীন বিবেচনা করিয়াছি তাহা গত আশ্বিন ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত উভয় সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাচীন ওস্তাদী (Classical) সঙ্গীতের অনুকরণে বাংলা গান রচিত ও উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হয় ত, শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছি। কিন্তু যে সকল রাজমিস্ত্রী কর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল প্রভৃতি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের যন্ত্র-সম্ভার একখানি কর্ণিক, একখানি বাইস্ বা বাস্, একটি ওলন ও একগাছি পাটায় পর্য্যবসিত হইলেও তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন আর্কিটেক্ট (Architect) ও ইঞ্জিনীয়ার (Engineer) এবং খিলান প্রভৃতির গঠনের জন্য তাহারা কাঠাম (Frame) পাইয়াছিল। পল্লীগ্রামে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শতকরা নিরানব্বই খানি কেবলমাত্র রাজমিস্ত্রীগণ আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনীয়ারের বিনা সাহায্যে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং খিলান-গঠনের জন্য তাহাদিগকে বংশখণ্ড, ইষ্টক ও মৃত্তিকা বা শুরকীর সাহায্যে কালবুদ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। তথাপি পল্লীগ্রামের অট্টালিকাও বাসোপযোগী এবং যে উদ্দেশ্যে সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইতেছে। আশা করি ভবিষ্যতে বাংলাভাষার কোন Architect বা Engineer লেখককে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলা গানের ওস্তাদী গান হিসাবে প্রচলন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হইবে, রচনার অপকৃষ্টতাজনিত নিন্দায় কিছু আসে যায় না।

ধ্রুপদ, বিশেষতঃ চৌতালযুক্ত ধ্রুপদ এরূপ ভাষায় রচিত যাহা বাঙ্গালীরও বোধগম্য। সে-গানগুলিতে প্রধানতঃ দেবদেবীর মহিমা কীর্ত্তিত অথবা রাগরাগিনীর পরিচয় কিম্বা সঙ্গীতের রূপ ও জাতির বিষয় বর্ণিত। সে ভাষার মূলভিত্তি দেবনাগর, তবে দুই চারিটী হিন্দী শব্দেরও সমাবেশ আছে। বাঙ্গালী শ্রোতাগণের পক্ষে সে সকল গান আপত্তিজনক না হইবার ত' কথা, পরন্তু আনন্দজনক এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে-ভাষাতে এই সকল গান রচিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ এমন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে স্থানে স্থানে তাহার অর্থবোধ হয় না। ভাষার এইরূপ বিকৃতির জন্য দায়ী বাঙ্গালী এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ অহিন্দু গায়কগণ, কারণ তাঁহারা গানের অর্থোপলব্ধি না করিয়া তোতাপাখীর মত তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিলে ভ্রম এবং ভ্রমের ফলে বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় যাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন এই বিকৃত ভাষার সংস্কার বা সংশোধন অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এরূপ অবস্থায় বাংলা ভাষায় ধ্রুপদরচনা অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ধামার সংযুক্ত গানের অধিকাংশ হোরী-বিষয়ক। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের এবং ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণের হোরী-লীলা কীর্ত্তিত। ভাষা শুদ্ধ হইলে এ সকল গানও সহজবোধ্য হইত। দুঃখের বিষয় পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাদের ভাষাও বিকৃত হইয়াছে। সেজন্য বাংলা ধামারের রচনাও আবশ্যক।

ভাষাবিকৃতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করা হইল—

ইমন কল্যাণ—চৌতাল

উত্তিম মধিাম নিকৃষ্ট সো গাওয়ে গাওয়ে গুণী ত্রয়ো বিধান।
আ লুম্ তেরি আলাপয়ে তিথি চোখি তা না না সো
হরিগুণ রসনা মিলি গাওয়ে সোহি উত্তম জান॥
অধম মধ্যম নর নারীন্দ্র ত্রিলোক সুখ গাওয়ে
আদি ইন্দ্র দেওয়ানাকো করত-হ্যায় অপমান—
যোগরাজ দাস ঘট দিম তা দিম তা না না না না না
আনা রসে সুরহীন আলাপ এ সোহি নিকৃষ্ট জান॥

এ গানটির প্রথম চরণে "উত্তম" ও "মধ্যম" বিকৃত হইয়া "উত্তিম" ও "মধিাম"-তে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণের "আলাপয়ে" 'আলাপে' হওয়া উচিত। চতুর্থ চরণে শুদ্ধ "নরেন্দ্র" অশুদ্ধ "নারীন্দ্র"-রূপ ধারণ করিয়াছে; "সুখ সো"-র স্থলে "সুখসে"-র প্রয়োগে ঐ চরণের অর্থবোধ হয়। পঞ্চম

চরণে "আদি"-শব্দ "ইন্দ্র"-শব্দের পরবর্ত্তী হইলে অর্থ সহজ-বোধ্য হয়; "দেবনা"-শব্দ উচ্চারণ হিসাবে বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না, কারণ এই শব্দের মধ্যবর্ত্তী 'ব' অন্তস্থ 'ব' যাহার উচ্চারণ বঙ্গেতর প্রদেশে 'ওয়' বা 'ইয়'। ষষ্ঠ চরণের "দাস" ও "ঘট" কি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝা গেল না, সুতরাং উহা শুদ্ধ বা বিকৃত বলা যায় না। সপ্তম চরণে "আনারসে"-শব্দ "আনারস" হওয়া উচিত যাহার অর্থ নীরস বা রসহীন; "আলাপএ"র প্রকৃত রূপ "আলাপে"। অনেক হিন্দীগানের ভাষা ইহা অপেক্ষা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

নিম্নে দুইটি হিন্দী খেয়াল ও তদনুকরণে রচিত বাংলা গান সন্নিবিষ্ট হইল—

বাহার—ধিমা ত্রিতালী

কালিয়ানা সঙ্গ করত রঙ্গ রালিয়া
ভ্রমর গুজারে ফুলে ফুলোয়ারি
চাহো মোরা মোরা বোলে কোয়েলা
কুহুক শুনি হুঁক উঠি।
লহর লহর লহর আও সব বিরিছন
মোরি লয়ে নার গাড়ুয়া ভরণে আয়ি
হাত রাগ সে ফুকার কিলিওয়াল বার বার॥

*

হে গোপাল নন্দদুলাল কুঞ্জকাননে
বিহার কাহার লাগি বাজে বাঁশী কেন
রাধা রাধা রাধা বলে' বদনে
কে তব রাধা কহ শুনি।
গাহিছে লুকা'য়ে বাঁশরী মাঝে বুঝি পিক আসি'
পশে কাণে যেন সুরের অমিয়রাশি
হিয়া আকুল কেমনে কুল রাখিব নাহি জানি॥

বাগেশ্রী-কাওয়ালী

বন্ধনুয়া বাঁধরে বাঁধ সব মিলাকে মালিনীয়া।
সদা রঙ্গ কি টানন সো
বাঁধোয়া বাঁধা দে শুন
সাহেবাকো সাদিয়া॥

*

অন্ধকারে অরুণজ্যোতি জগপালক জগপতি।
পাপে দণ্ডবিধানকারী
অমরা গুণ বিচারি'
অগতি পরাগতি॥

সত্য কথা বলিতে কি, উপরোক্ত হিন্দীগানদ্বয়ের অর্থ না বুঝিয়াই কেবল তাহাদের ছাঁচে বা মাপে যথাক্রমে বাংলা গান দুটি রচিত হইয়াছে। আমূল অনুকরণ করিতে হইলে রচয়িতার স্বাধীনতা থাকে না। কাজেই রচনায় প্রাঞ্জলতা ও কমনীয়তার অভাব হয়। সেই হিসাবে বাংলা গান দুটির ভাষাগত মাধুর্য্য নাই। তবে কথায় বলে "কাঠের বিড়াল হইলে কি হয়, ইঁদুর ধরিতে পারিলেই হইল।" আসল উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, রচনায় নৈপুণ্যের অভাব গণনার মধ্যে আনিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, খেয়াল-গানে সুরের কার্য্যই অধিক। সুরবিস্তারের সহায়তা করিতে হইলে গানের ভাষার দিকে তেমন দৃষ্টি রাখা, অন্ততঃ এরূপ অনুকরণে, চলে না। ঠুংরী-গানের বাংলা রূপ, হয়ত, অপেক্ষাকৃত রুচিসঙ্গত হইবে।*

* পূর্ব্বে এই বিষয়ের যে সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন পূর্ব্বতন সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। ভ্রমবশতঃ তাহা হয় নাই।—সম্পাদক।

পুরী

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

(ভ্রমণ-কাহিনী)

১০ই এপ্রিল ১৯৪১ সাল, জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির একটি উল্লেখযোগ্য শুভদিন। পুরী পথের যাত্রী দৈবাৎ স্বপ্নাতীতভাবে হয়ে পড়লুম। ইটালীর ৺দেবনারায়ণ দের উপযুক্ত বংশধর শ্রীযুক্তবাবু নৃপেন্দ্রনাথ দের পুরীর স্বর্গদ্বারে নিজ বাসভবন 'দেব নিবাসে' অতিথি হ'বার একান্ত অনুরোধ, মাত্র তিন দিনের জন্য যত্ন করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব কোন মতেই এড়ান গেল না। পুরী যাবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছে, ঘটা করে সে বর্ণনা লেখাও এখন একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের এ যাত্রা যেমন আশাতীত মধুর, মাত্র তিন দিন যাপনেও যেমন একটা, ভোজন থেকে আরম্ভ করে আমোদের বৈশিষ্টতা আছে ঠিক তার পরিসমাপ্তিও মনে

সাক্ষীগোপালের মন্দির

একটা শিহরণ ও আবেগ এবং জীবনের অতীত তিন দিন ফিরে পাওয়ার একটা বৃথা বাসনা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

৮-১৩ মিঃ পুরী এক্সপ্রেস তমসাবৃত হাওড়া ষ্টেশন—কলিকাতাকে মহাযুদ্ধের আসন্ন কবল হ'তে রক্ষার প্রচেষ্টা ও সতর্কতা—ফেলে রেখে অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটে চল্‌ল, মনেও একটা ত্রাসের সঞ্চার থেকে মুক্ত শান্তি এনে দিল। ইণ্টার ক্লাসের একখানি রিজার্ভ সীটে অন্ধকার প্রান্তরের তারকা খচিত আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছি। অন্ধকারের রূপ দেখবার এ প্রয়াস আমারই মত দুই তিনটি তরুণ তরুণীর মধ্যে দেখলুম। মাথার উপর নিঃসীম নীল আকাশ ···মৃত্যুপারের দেশ···চির রাত্রির অন্ধকার, যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে···গ্রহ ছোটে, চন্দ্র সূর্য্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুড়িয়া বেড়ায়···তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে বহুদূরে দেবলোকের মেরু-পর্ব্বতের ফাঁকে ফাঁকে তারারা মিট্‌ মিট্‌ করে ···এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে দুইটি সেই যে উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার সঙ্গী হয়েছিল, তারা কত কথাই না আমাকে বল্‌ল। মেঘের ফাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেই লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু নীরব তাদের সঙ্গী, কোন উত্তরই আর পায় না। দূরে পাহাড়ের অবিচ্ছেদ শ্রেণী, কালো রংয়ের মেঘের সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবেই মিশ খেয়েছে। রেল লাইনের ধারে কত মাটির ঘর, কত সুন্দর পরিপাটি করেই তৈরী—নির্জ্জন প্রান্তরের মাঝে কত সুন্দর অনাড়ম্বর ভাবে অন্য আর এক জীবন যাত্রা।

রাত ৩টা আন্দাজ 'দ্বারিকের' সিঙ্গারা, কচুরী, সন্দেশ ইত্যাদি ভক্ষণের পর সেই গরমে বরফ জলটা মন্দ লাগল না। অবশ্য আমাদের দুই তিনটি ছোট সঙ্গী অভুক্ত ছিল নিদ্রিত থাকায়। ভোর ৫টায় তাদের ট্রে সাজান চা মাখন পাঁউরুটি আমি নিজ হাতেই offer করি। পরে আমাদের গাড়ী ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হ'ল। হিন্দুর তীর্থস্থান, "কণারক" ভুবনেশ্বর চাক্ষুষ দেখা সম্ভব হয় নাই, কাযেই সে স্থানের ধূলি স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হলুম। গাড়ী ছাড়বার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। হঠাৎ দেখতে পেলুম একটি কায়দাদুরস্ত মহিলা, পায়ে হিল্‌ তোলা জুতা, একটি সিল্কের রুমাল বিপর্য্যস্ত কেশগুলিকে বাগে আনার জন্য অতি সুন্দরভাবে বাঁধা। রেশমের মতই অলকাগুচ্ছকে রুমালখানা হাওয়ায় দুলতে বাঁধা দিচ্ছিল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তিনি প্রত্যেক কামরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছেন, কি যেন খুঁজতে ব্যস্ত। গাড়ী start এর জন্য গার্ড নীল রঙের নিশান দেখাল, কিন্তু তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ আমারই অজ্ঞাতে

আমার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল, আমাদের কামরাতে আমাদের সঙ্গী হবার আহ্বান।

কোন রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করেই তিনি রাজী হলেন, উঠে এলেন আমাদের কামরাটিতে। কথাবার্ত্তা হল—শুনলুম তিনি পুরীর B. N. Ry. Hotelএ উঠবেন। সমুদ্র দেখবার হঠাৎ ইচ্ছা হল, তাই তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে পুরীর যাত্রী পেয়ে সঙ্গীরূপে নিয়েছেন মাত্র এই পথটুকুর জন্য। তিনি Oxfordএর B. A. এবং উপস্থিত 1st classএর আরোহী। তাঁহার মালগুলি কোন কামরাটিতে আছে, তাই অন্বেষণ করতে তাঁরা ব্যস্ত, কারণ পুরী আর অধিক দূর নয়। রেল হ'তেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি, সাক্ষী-গোপালের মন্দির দেখতে পেলাম। ৬.৭ মাইল দূর হ'তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের দর্শন পেয়ে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল। যে দেবভূমির কথা এতকাল লোক-মুখে শুনে এসেছিলাম, যার অলৌকিক মাহাত্ম্যের পরিচয় পুস্তক পাঠে অবগত হ'তাম, সেই হিন্দু মহাজাতির তীর্থস্থান আজ আমাদের সম্মুখে—জানি না আপনা হ'তেই কেন মস্তক নত হ'ল। বেলা প্রায় ৯টা আন্দাজ পুরী পৌঁছিলাম। Oxfordএর B. A. মহিলাটি বিদায় নিলেন, আবার দেখা হবে বলে।

পাণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বাধ্য হয়ে ব'লতে হল যে, আমাদের পাণ্ডা ঠিক করাই আছে। নাম জানতে চাইল, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বললুম, "নরহরি" "কাণ্ডারী" ইত্যাদি যে নাম মুখে আসে, তাই।

স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের অতি নিকটেই "দেব নিবাস"। বাড়ীটির situation খুবই সুন্দর। ঘর থেকে যে দিকেই তাকান যাক না কেন, চারিদিকেই সমুদ্র। নানা রংয়ের জলরাশি, অবিশ্রাম গর্জ্জন, সব সময়েই সব অবস্থাতেই যেন মনে করিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত যে আমরা এখন সে ক'ল-কাতার আবহাওয়া ছেড়ে তাদের অভ্যাগত অতিথি, চক্ষু কর্ণ মন এখন সবটাই যেন তাদের জন্য নিয়োজিত, সম্পূর্ণভাবেই যেন আমরা সেগুলি তাদের জন্যই ব্যবহার করি। জামা-জুতা ছেড়েই তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের ধারে গেলুম। বিশাল জলরাশির বিরাট সে রূপ দেখে বিস্ময় বেড়ে থাকে সীমা ছাড়িয়ে। মনকে অধিকার করে অতিমাত্রায় এক অদ্ভুত চিন্তা। বুকটা যেন খাঁ-খাঁ করে উঠে! কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সব চিন্তা সব মানসিকতা যেন একটা বিরাট শূন্যতার চারিদিক ঘিরে হাহাকার করছে। ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন ক'রবার এরূপ স্থান আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সত্যই সমুদ্র দর্শনে হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র হয়, বিশ্বপতির অপ্রমেয় মহিমার ছায়া হৃদয়ে প্রতি-ফলিত হয়, হৃদয় হ'তে সঙ্কীর্ণতা দূর হয়।

ট্রেনের শ্রান্তি অপনোদনে দুপুরটা কোথা দিয়ে কেটে গেল। বৈকালে Victoria Hotel, Governor House, Flag House ইত্যাদি দেখে বাড়ী ফেরা গেল প্রায় ৭টায়। রাতে সমুদ্রের চরে বসে অপরিচিত সঙ্গীদের সাথে আলাপ

জগন্নাথদেবের মন্দির

করে নিলুম—মাত্র তিন দিনের আলাপ, তাদের অবাধ মেলা-মেশা ও সাহচর্য্য জীবন পথে একটা স্মরণীয় দিন বলে মনে একে রেখে দেব। রাত ১১টা এই ভাবেই কেটে গেল। তারপর সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি শুনবার জন্য জেগে রইলুম আমি একা, প্রায় ২টা পর্য্যন্ত। নক্ষত্রখচিত আকাশ শুধু মাথার উপর, কিন্তু একটি তারাও দৃষ্ট হয় না সমুদ্রের উপর ঐ আকাশে। বিদ্যুতের মত শুভ্র ফেনপুঞ্জ ও ফস্‌ফরাসযুক্ত স্রোত অসংখ্য শ্বেত পুষ্পের মালা পৃথক্ ভাবে নিয়ে এসে বদল করছে একই সঙ্গে ঐ বেলাভূমির সাথে—তার শেষ নেই, বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। রাত প্রায় ১২টায় চাঁদ উঠল, প্রতিফলিত ক'রল তার স্নিগ্ধ আলো সমুদ্রের বেশ,

রূপ, সৌন্দর্য্য পরিবর্ত্তনের জন্য। ভগবানের লীলা, এ রূপের ছড়াছড়ি দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। 'শিবু'—আমার তিন দিনের অন্তরতম সঙ্গীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গল প্রায় ভোর ৫৷৷০টায়।

দু'জনেই মাদ্রাজের দিকে বেড়িয়ে পড়লুম। পথেই সূর্য্যোদয়—পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে সমুদ্রের আত্মীয়তা বেশী সে কথা এখন প্রকাশ হল। "প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে বেজে উঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায় এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতিরোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গ-মর্ত্তের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।" অনেক দূরে বেড়াতে গেলুম, কিন্তু বালুর চড়ে ছোট বড় থাবার স্পষ্ট দাগ দেখে ফিরতে হল। "নুলীয়া"দের সমুদ্রে পান্‌সি ভাসান ও মাছধরা দেখবার মত। প্রায় ৭৷৷০টায় বাড়ী ফিরলুম। লৌহ ও ফস্‌ফরাস যুক্ত সমুদ্রের জলে এতক্ষণ হেঁটে চলায়, পায় একটা দাগ পড়েছিল। হাত-পা ধুয়ে নানারূপ উপাদেয় ভোজ্যের সহিত "চা"পান আরম্ভ হ'ল; রসনার পরিতৃপ্তির জন্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থার ত্রুটী ছিল না।

সমুদ্রের ঢেউয়ের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল আবহমান কাল থেকে অশ্রান্ত ঢেউএর ক্লান্তিহীন যাওয়া-আসার বিরাম নাই কেন? আমাদের যাওয়ার পরও কি অপরের আসার, আর দু'চোখ ভরে তাদের দেখবার প্রতীক্ষায় এমনি ভাবে আছড়ে পড়বে? সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। দেখতে দেখতে ভাবে বিভোর ও আত্মহারা হ'য়ে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে ইচ্ছা করে। মনে প'ড়ে গেল Wordsworth-এর মনের কথা, যেখানে তিনি ঢেউগুলি দেখে বলেছিলেন, হে সুন্দর! নিয়ে চল আমায় দূরে বহুদূরে, মৃত্যু পদে পদে কিন্তু এ মৃত্যু স্বার্থবিজড়িত সংসারে থাকা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়ঃ। সত্যই এ শান্তিপুঞ্জ ছেড়ে, সাধনার পবিত্র আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে, দ্বেষ-হিংসা স্বার্থময় জগতে প্রবেশ করতে মন চায় না। সেই অবধি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—দেখে আর দেখে আশ মিটছে না। সঙ্গীরা বলে অত বেশী সমুদ্রের দিকে তাকিও না। তারা ক্ষুণ্ণ, তাদের সঙ্গে আমোদে যোগদান না ক'রতে পারায়। সামনের ঘরে নৃত্য-গীতের মহড়া চলেছে। ধূপের মিষ্ট সুবাস, ঝরণার সুমিষ্ট তান প্রভৃতি মনকে আকর্ষণ করছে, জাগিয়ে তুলছে তন্দ্রালুপ্ত মনন শক্তি। এখনও দুটি গানের রেশ যেন ভেসে আসছে—

কেন সুন্দর হে রইলে বসে বিরহ হয়ে
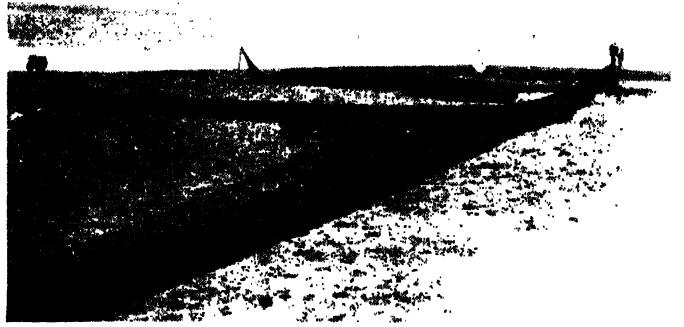
নুলীয়াদের মাছধরা

সবার দেবতা তুমি এই চেয়েছি মনে,
শুনাব মনের কথা, শুনাব তোমায় নিরালায় প্রেম কুজনে।

খুবই মিষ্ট, মধুর প্রাণস্পর্শী গান, রেখে ঢেকে উপভোগ করবার মত। বাহাদুরী দিয়ে তারিফ করতে পারলুম না। অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে অপরূপ রাজ্যের কলা এই গান। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর। এই অর্থের যোগে একটা ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী, ঘনিষ্ঠ করে পরস্পরের প্রাণ দরদভরা ঐ সুরের তরঙ্গে।

বেলা ১০টায় পুরীর পুণ্যস্থানগুলি দেখতে বের হওয়া গেল। মাসীর বাড়ী, বৈকুণ্ঠধাম, জগন্নাথদেবের ভ্রমণোদ্যান, লোকনাথ এবং চক্রতীর্থের দেবাদি দর্শনের পর জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করা গেল। নানা প্রবৃত্তিসম্পন্ন তীর্থযাত্রীর জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পাশাপাশি রয়েছে এই

মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে, জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তের প্রতীক রূপে। লক্ষ্মী মাতার মন্দিরে শব্দ কর্‌লুম, রাগিণী আপনা হতেই কিছুক্ষণ বেজে চল্‌ল। ইহা বাঙ্গালী কলেজের জনৈক প্রফেসর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং এখনও অনেকের অজ্ঞাত।

প্রায় ২টা নাগাদ্ বাড়ী ফেরা গেল। সমুদ্রস্নানের পর জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণে নিজেদের কৃতার্থ মনে করলুম। বৈকালে সমুদ্রজলে যে কত রং হ'তে পারে তার সীমা নেই।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, যেমন আকৃতির হরিরলুঠ, তেমনি রংয়ের। রংয়ের তান উঠেছে, তানের উপর তান। সমুদ্রের দূর তীরে যে ধরা আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, দেখা গেল সমুদ্রের সফেন তরঙ্গরাশি অসীমের টানে অব্যক্তের দিকে "আরোর" দিকে কূল-খোয়ান অভিসার যাত্রা করেছে ঐ ছলে, আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করবার জন্য। জলের উপর সূর্য্যাস্তের আলপনা আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে নীলাম্বরীর ঘোমটা পরা সন্ধ্যা এসে বসল; মনে পরে গেল মাইকেলের কয়েক লাইন :—

> চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
> দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
> আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
> ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।"

পুরীতে তিনদিন যাপনের আজ শেষ রাত্রি। জগন্নাথ দেবের সন্ধ্যারতী ও পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য পাণ্ডাদের হস্তে বেত্রাঘাত মাথা পেতে নিয়ে বাড়ী ফিরতে হ'ল রাত ১টায়। গল্পগুজবেই বাকী রাত কাটিয়ে দেওয়া গেল। সকালে সমুদ্রস্নান এক সঙ্গেই করা হল। উন্মত্ত ঢেউগুলো এমন বেয়াড়া যে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে একজনকে আর একজনের উপর ফেলে দিচ্ছে যেন তাদের মত এলোমেলো মাতামাতি করে জীবনটা কাটিয়ে দিলেই চলবে। ঝাঁঝাঁ ক'রছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ কেহ কোনদিকেই নেই, আকাশ মেঘমুক্ত। সমুদ্রের রূপ, ঐ রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বলব? দূর-প্রসারী নীল আকাশ আর সমুদ্র যেখানে মিশেছে, সেই দিকেই চেয়ে আছি; কি জানি আজ কত কথাই মনে পরছে, বিশেষ ক'রে নিরালা সাঁওতাল পরগণার একস্থানে বাস করার কথা। বহুদূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনধারা, বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখীর কলকাকলীর মধ্য দিয়ে, জানা-অজানা বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়ে সুখে বহুকাল আগে বহিত এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগ ছিল তার আজ তা স্বপ্ন—কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন সেটা ঠিক তেমনি ভাবে আনা সম্ভব হবে না। এই তো ফাল্গুন চৈত্র মাস—সেই বাঁশবন, শুকনা বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি,--রঙিন মনে জানালাটার ধারে বসে' ব'সে কতকাল আগের সে সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীতরাত্রির সুখস্পর্শ লেপের তলা—অনন্তকাল সমুদ্রে সে সব ভেসে গিয়েছে, কতকাল আগে।...

'দেব নিবাস'

পুরীর তল্পীতল্পা গুটাতে আরম্ভ করা হল প্রায় বেলা ৩টা থেকে। এ কয়দিন মেলামেশাতেই পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা মায়া ও আকর্ষণের ভাব অজানিত ভাবে এসে পরেছিল—সকলেই আজ অল্প বিস্তর বিষণ্ণ, একথা মানতেই

হবে। বাগানে খানিকটা পায়চারী ক'রলুম; কতকগুলি ফুল ফুটন্ত, কতক মুসরে আছে, আবার কতকগুলি ঝরে

সমুদ্র-বেলা

প'ড়েছে। আমাদের মানসিক অবস্থা আর এদের এ পরিবর্ত্তনের যেন একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে।

…ইংগিতে হায়
জানাতে সে চায়
সুগভীর ভালবাসা,
অভাগারা কেহ বোঝে না ইসারা,
না জানে পড়িতে নীরব ভাষা!

প্রকৃতির সহিত মনের নাকি দৃঢ় সম্পর্ক। সমুদ্রের তরঙ্গ আজ এ সময়ে ক্রমশঃ ফুলে উঠছে—বিদায় নিতে গেলুম তখনি তার মাঝে, প্রণাম দিয়ে এলুম "আবার আসব বলে।" পুরীর স্মৃতি—একটি ফুল যাবার মুখে সাগ্রহে তুলে নিলুম; কিন্তু সেটি বোধ হয় কোন একটি সঙ্গীর হাতে জামিন স্বরূপ রয়ে গেছে। ক'লকাতায় আজ সেই ফুলটিকে মনে করে, সেই না-বলা, অশ্রুত বাণী "নীরব ভাষার" উত্তর 'ওমর খৈয়ামে'র ভাষায় জানাচ্ছি:—

'ভুলো না তা'দের বন্ধু, জীবনের আনন্দ লগনে—
ক'রে গেছে যা'রা কাল হাসি-খেলা তোমাদের সনে;
বিস্মৃত স্মৃতির টানে অতীতের মনে-পড়া মুখ,
মৃত্তিকার কারাগারে কাঁদে যা'রা তৃষাতুর বুক,
অনাদৃত তাহাদের ভুলে-যাওয়া সমাধি-শিয়রে,
ঝ'রে-পড়া গোলাপের দু'একটি পাপড়ি আদরে,
ভালবেসে মাঝে-মাঝে সযতনে দিও, রেখে দিও,
তোমাদের পাত্র হ'তে সুধ-সুরা স্নেহে বরষিও।"

বিশ্বের-রূপ

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেদনায় পরিম্লান ক্ষুব্ধ যেন বিশ্বের আকাশ
প্রখর রৌদ্রের দীপ্তি প্রদীপ্ত করিল ধরাতল—
বিদগ্ধ সুন্দর দেখি মৌন ম্লান কোশ ও পলাশ
প্রিয়ার আঁখির তীরে প্রস্ফুটিছে ব্যথার কমল।

আষাঢ়ের মেঘলোক ভরে যেন বিপুল ব্যথায়
যে-দিকে নয়ন মেলি "প্লেন্" দেখি মাথার উপর—
বিধ্বংসী বিষের বাষ্পে খিন্ন প্রাণ ভরিছে জ্বালায়
জার্ম্মাণ বোমারু দূরে ধ্বংস করে সুন্দর নগর।

প্রকৃতির রম্যভূমি রহস্যের আনন্দ নিলয়
গভীর-অরণ্য-রাজি শূন্য হোল রণের দাপটে—
উল্লসিছে দিকে দিকে পশুত্বের ব্যর্থ পরিচয়
বিশ্বের ধ্বংসের রূপ কম্পমান মূর্ত্ত স্মৃতিপটে।

রুদ্রের প্রচণ্ড রোষে পৃথ্বী যেন হারাইছে দিশা—
দুর্য্যোগের সন্ধিক্ষণে হে যোগীন্দ্র শান্ত কর তৃষা।

জ্ঞানদাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুই

আর একটি দৃষ্টান্ত নৌকাবিলাস। মথুরার হাটে ক্ষীর-সর বেচিবার জন্য গোপবধূগণ চলিয়াছেন—ঘাটে একখানি নৌকা লইয়া শ্যামরায় অপেক্ষা করিতেছেন। নাবিকবেশী শ্যাম গোপবধূদের পারে লইয়া যাইতে চাহিলেন—গোপবধূগণ নাবিককে ক্ষীরসর উপহার দিয়া নৌকায় আরোহণ করিল। বেলা শেষ হইয়া আসে, নৌকা আর পার হয় না। মাঝ যমুনায় নৌকা যখন গেল তখন ঝড় উঠিল। গোপবধূগণ ভয় পাইয়া নাবিককে তিরস্কার করিতে লাগিল।

নাবিক উত্তর দিল—

আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল কাণ্ডার করেতে নাহি রয়।
এতদিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি যুবতীর যৌবন এত ভারী।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড় যৌবন পাতল কর তবে ত বাইয়া যেতে পারি॥
খাওয়ায়ে ক্ষীরসরে কি গুণ করিলা মোরে আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই তোমরা হৈলে প্রাণের বৈরী।

এখানেও যদি কেহ আধ্যাত্মিক স্বার্থকতার সন্ধান করেন তবে তিনিও বঞ্চিত হইবেন না। কেবল রসসৃষ্টির কৌশল মাত্র ধরিয়া লইলেও রসোপভোগে বাধা হইবে না। কবির ওস্তাদি এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুসরণে জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণকে শুল্কগ্রহীতা দানীর ছদ্মে যমুনার ঘাটে আবির্ভূত করিয়াছেন। রাধা বড়াইএর সঙ্গে ক্ষীরসর বেচিতে চলিয়াছেন। রাধা বলিতেছেন—

ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহে বৈরী হইল যৌবন
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়া ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন।
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
কবি জ্ঞানদাস কয় মোর মনে হেন লয়
চাঁদে যেন গরাসয়ে রাহু।

রাধাকে বিব্রত করিয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য কবির ইহাও এক কৌশল।

গায়ক গাহিয়া চলেন—তিনি নিজেই জানেন না কখন তাঁহার সঙ্গীত চরম উৎকর্ষের শিখরে উত্তীর্ণ হইবে। যে ধৈর্য্য ধরিয়া গোড়া হইতে শুনে সেই চরমোৎকর্ষের অপূর্ব্বতার আস্বাদ পায়। কবিও রচনা করিয়া চলেন—সহসা এক সময় তাঁহার রচনা পরম সত্যকে আবিষ্কার করিয়া চরম কথাটি রসঘন ভাষণে প্রকাশ করিয়া ফেলে। এই রসঘন ভাষণগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র রচনার অঙ্গীভূত হইয়া, বরং শিখরীভূত হইয়াই, এইগুলি পরিপূর্ণ মূল্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এইগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় কবি রসলোকে কতটা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন। এইগুলির দ্বারাই অথবা এইগুলি যে সকল কবিতার হৃৎমর্ম্ম সেই সকল কবিতার দ্বারাই একজন কবির কৃতিত্বের বিচার হওয়া উচিত।

রসিক সুজন তরুলতার অঙ্গে জীবন্ত ফুটন্ত ফুল দেখিতেই ভালবাসেন—ফুলকে বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া নিষ্ঠুর পূজারী দেবপূজা করিতে পারে—অরসিক বিলাসী দেহগেহের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারে, হৃদয়হীন বৈজ্ঞানিক তাহার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে পারে, রসিকসুজন তাহাতে ক্ষুব্ধই হয়। সমালোচনার কাজ অনেকটা বৈজ্ঞানিকের কাজ। সেজন্য আমি রসিকজনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞানদাসের রসকুঞ্জ হইতে কয়েকটি কুসুম চয়ন করিয়া দেখাইতে চাই। যে সকল পদে নিম্নলিখিত অংশগুলি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে রসিক বন্ধুগণ যেন সেই পদগুলির রস আস্বাদ গ্রহণ করেন। আমি কেবল সেই পদগুলির প্রকারান্তরে সন্ধান দিলাম।

জ্ঞানদাস অতিরিক্ত আলঙ্কারিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। একেবারে অলঙ্কৃতিকে বাদ দিয়া কোন প্রথমশ্রেণীর কবির চলিতে পারে না। কবিতার রসঘন অংশগুলি ও গভীর সত্যকথাগুলি অলঙ্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ পাইতে চায়—সেজন্য অলঙ্কৃতিকে বর্জ্জন করা সম্ভব নয়। জ্ঞানদাসও তাঁহার চরমকথাগুলি কোথাও অলঙ্কৃত পংক্তিতে কোথাও সহজ সরল

ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত ও উপমারই সাহায্য লইয়াছেন।

১। মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীমতীর কি দুর্দ্দশা হইল, কবির নিম্নলিখিত চারিপংক্তিতে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে।

অরুণ অধর বাঁধুলী ফুল পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুরাতুল।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া আর॥

বন্ধুজীবের মত অরুণ অধর ধুতুরার মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। অঙ্গের বসনও ভার স্বরূপ হইল, আঙুলগুলি এমনই শীর্ণ হইয়া গেল যে অঙ্গুরী বলয়ের মত ঢল ঢল করিতে লাগিল।

২। পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপনিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ॥

হে মাধব, পথে রাই-এর সঙ্গে দেখা। তোমার প্রসঙ্গ তুলিলাম। তাহাতে তাহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল—সে যেন কদম্ব পুষ্প দিয়া অনঙ্গের পূজা করিল। তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ যে কত তাহা কি আর তাহার মুখ হইতে শুনিতে হইবে?

৩। কেনে তোর তনু হেন বিবরণ মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিব রে মথিয়া থুঞাছে শিরিষ কুসুম মালা॥

ননদী শ্যামোপভুক্তা রাধার অঙ্গের বৈবর্ণ্য দেখিয়া বলিতেছে--তোর তনুর এ দশা কেন হইল? চন্দ্রকলা কেন মলিন হইয়াছে? মত্ত করিবর যেন শিরীষ ফুলের মালা বিমথিত করিয়া রাখিয়াছে।

৪। মরণ শরীরে পরাণ পাওল ঐছন সব ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া যেমন অমিয়া সাগরে কেলি॥

বিরহপীড়িতা ব্রজবধূগণ কদম্বতলে শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইল—তাহারা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল—দাবানলে দগ্ধ মরালীরা যেন অমৃতসাগরে কেলি করিতে লাগিল। এখানে উপমার চমৎকারিতা লক্ষ্য করিতে হইবে।

৫। ঘর হৈতে বারাইতে চাল না ঠেকিল মাথে
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা
হরিণী পালায়ে যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মাথায় চাল ঠেকিল না—হাঁচি টিকটিকি পড়িল না, কোন বিঘ্নের আশঙ্কা ত ছিল না। কিন্তু এ কি ননদী বাঘিনীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাধা হরিণী গৃহের বাহির হইল—কিন্তু পথে দানীর ছদ্মবেশে শ্যাম ব্যাধের হাতে পড়িল।

৬। কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার ধন আমি যে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥

বঁধু তোমাকে কি দিব? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনই ত' তোমাকে দিতে চাই, আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন তুমি, অতএব এ দান ত' চলে না। তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন আমার জীবন। তাহার ত তুমিই অধিকারী। নূতন করিয়া তাহা আর তোমাকে কি দিব?

আত্মসমর্পণের ভাষা ইহার চেয়ে অপূর্ব্ব আর কি আছে?

৭। এতদিনে অমিয়া সরোবরে আছিনু
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে,
চন্দনপবন হুতাশন হিম করে
বিষধর বিলসে কলঙ্কে।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, শ্রীরাধার কি দশা? শ্রীরাধা বলিতেছেন, এতদিন অমৃত সরোবরে ছিলাম—অঙ্কে ছিল চিন্তামণি। আজ চন্দনাক্ত পবন হইয়াছে হুতাশন, চন্দ্রে কলঙ্করূপে বিষধর বিচরণ করিতেছে অর্থাৎ চন্দ্র বিষ বর্ষণ করিতেছে।

৮। হাসি দরশই মুখ ঝাঁপই গোই,
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই।
করে কর বারিতে উপজল প্রেম,
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥

অভিমানিনী গৌরী হাসিয়া মুখ দেখাইয়া মুখখানি ঢাকিল। বাদলে যেন চাঁদ ব্যক্ত হইতে পাইতেছে না। হাতে হাত দিবামাত্র প্রেম-সঞ্চার হইল, দরিদ্র যেন ঘট ভরিয়া সোনা পাইল।

৯। শ্যাম সুধাকর নিকটহি রোয়ত কুরু চিত কুমুদ-বিকাশ,
অঞ্চল অন্তর মান তিমির বহু দূরে রহু মদন হুতাশ।

অভিমানিনী রাধাকে সম্বোধন করিয়া সখী বলিতেছে, শ্যাম সুধাকর নিকটে রোদন করিতেছে, চিত্তকুমুদ বিকশিত কর, মানের আঁধার আঁচলের আড়ালেই থাকুক, মদনানল নির্ব্বাপিত হউক।

১০। তোমার মধুর গুণ কত পরথাপলু সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর কমলিনী না সহে পরাণে।

সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, অভিমানিনী রাধার চিত্ত

কিছুতেই গলাইতে পারিলাম না। তোমার গুণের কথা ফলাও করিয়া তাহার কাছে বিবৃত করিলাম—সে সব বিপরীত বুঝিল। চাঁদ হিম বর্ষণ করিলে কমলিনী যেমন সহ্য করে না, সেও তেমনি কোন অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিল না।

> ১১। কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব,
> আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব।

মানিনী শ্রীমতীর ভৎর্সনার মধ্যেও ব্যঞ্জনার কি গভীর দরদ ফুটিয়াছে। তুমি কেন নিজের দিব্য দিতেছ, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে—তোমার নিজের অনিষ্টসাধনের অর্থ ত' আমারই জীবন হরণ। জীবনটুকু এখনও আছে • তাহাও কি লইতে চাও?

> ১২। অনুখন দুনয়নে নীর নাহি তেজই
> বিরহ অনলে দিয়া জারি।
> পাবক পরশে সরস দারু যৈছে
> একদিশে নিকসয় বারি॥

বিরহ অনলে তনু জ্বলিতেছে—চোখের জল অনবরত ঝরিতেছে। ভিজা কাঠ আগুনে দিলে যেমন ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে এবং একদিক দিয়া জল ঝরিতে থাকে—রাধার সেই দশা হইয়াছে।

> ১৩। আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপরীত ভৈগেল কেতকী ফুলে,
> কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে।

শ্রীরাধা গুরুগঞ্জনায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে—কুমারী অবস্থায় ছিলাম মালতী—বিবাহের ফলে হইলাম কেতকী—চারিদিকে কুল-শীলের কাঁটায় ঘেরা। কাঁটার জন্য ভ্রমর আর আসিতে পাইল না। ভ্রমর ও মালতী (অধুনা কেতকী) দূরে থাকিয়া দুইজনেই ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

> ১৪। চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
> এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে।
> কাঁদিতে না পাই বন্ধু কাঁদিতে না পাই।
> নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥

প্রাণ ভরিয়া ডুকরিয়া যে কাঁদিব তাহারও উপায় নাই। চোরের পত্নী যেমন ফুকরিয়া কাঁদিতে পারে না—আমারও সেই দশা হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের "চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে পারে"—এই পংক্তির ভাবই জ্ঞানদাস এখানে গ্রহণ করিয়াছেন।

> ১৫। শুন শুন সই তোমাদেরে কই প'ড়িনু বিষম ফাঁদে,
> অমূল রতন বেড়ি ফণিগণ হেরিয়া পরাণ কাঁদে।
> গুরু গরবিত বোলে অবিরত এ বড়ি বিষম বাধা,
> একুল ওকুল দুকুলে চাহিতে সংশয় পড়িল রাধা॥

একদিকে গুরু-গঞ্জনা, অন্যদিকে শ্যামের পীরিতি—দোটানায় পড়িয়া রাধা বলিতেছে—অমূল্যরত্ন যেন ফণিগণে বেষ্টিত হইয়া আছে। রত্নের লোভও ছাড়িতে পারি না, ফণীর দংশনও সহ্য হয় না।

> ১৬। সইলো পীরিতি দোসর ধাতা।
> বিধির বিধান সব করে আন না শুনে ধরম কথা॥

বিধির বিধান টলে না—বিধির বিধান সবই অন্যথা করিয়া দেয়—কোন উপাসনা, কোন আবেদন, কোন ধর্ম্মকথা শোনে না। শ্যামের পীরিতি হইয়াছে দ্বিতীয় বিধি—দ্বিতীয় ধাতা। বিধির বিধানের মত উহা আমাকে চালিত করিতেছে—জাতিকুলমান বা সতীধর্ম্মের আবেদন শুনিতে চায় না।

জ্ঞানদাসের রচনায় অর্থালঙ্কার কিছু কিছু আছে—কিন্তু শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁহার আদৌ লোভ ছিল না। গোবিন্দদাস ও জগদানন্দ ছিলেন অতিরিক্ত অনুপ্রাসের ভক্ত—ছন্দোবৈচিত্র্যের দিকেও তাঁহাদের লোভ ছিল খুব বেশী। বিদ্যাপতির রচনায় শ্লেষযমকের ছড়াছড়ি—গোবিন্দদাস এ-বিষয়ে বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ শিষ্য। জ্ঞানদাস শব্দালঙ্কারের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হ'ন নাই—শাব্দিক চাতুর্য্যের প্রলোভন তাঁহাকে আবিষ্ট করে নাই। অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি গভীর অনুভূতিগুলির অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহার ভাষার পারিপাট্যেরও অভাব নাই। স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় যতটা পারিপাট্য ও শ্রীসৌষ্ঠব দান করিতে পারা যায়, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন। শব্দালঙ্কৃত ভাষার তুলনায় তাহা জোরালো ত' হইয়াছেই—অর্থালঙ্কার-মণ্ডিত ভাষার চেয়েও তাহা অধিকতর রোচনীয় হইয়াছে।

মানভঙ্গের পর্য্যায়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে অলঙ্কৃত ভাষা বসাইয়াছেন। যেন শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও অলঙ্কার-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মান পরিহার করিবেন। এ যেন অলঙ্কার দিয়া গৃহিণীর মান ভাঙ্গানো। জ্ঞানদাস অলঙ্কৃত বাক্য একেবারে ব্যবহার

করেন নাই তাহা নহে, তবে তাহাতে চাতুর্য্যের চেষ্টা নাই। যেমন—

শ্যাম সুধাকর নিকটহিঁ য়োয়ত কুরু চিত কুমুদ বিকাশ,
অকুল অন্তর মান তিমির রহু লোচন পড়ল উপাস।

কিংবা

প্রেম রতন জনু কনয়া কলস পুন ভাগো যে হয় নিরমাণ।
মোতিম হার বার শত টুটয়ে গাঁথিয়ে পুন অনুপাম।

অনলঙ্কৃত ভাষার আবিষ্করণই চমৎকার।

অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতবাণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে।
চাহ চাহ মুখ তুলি চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাই তুয়া চরণের ধূলি।
দেলহ দেলহ দেলহ রাই সাধের মুরলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ায় পুতলি।

এক পংক্তিতে খণ্ডিতার আক্ষেপ কি গভীর ভাবেই ফুটিয়াছে,—

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।

এক কথায় কি মধুর অভিশাপ রাধার মুখে প্রকাশ পাইয়াছে! যে মোরে ছাড়িতে বলে হবে বধের ভাগী। রাধাকে যে চিনিয়াছে—রাধাচরিত্র যে জানে সে ইহার বেশী বলিতে পারে না।

জ্ঞানদাসের রচনা হইতে সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় গূঢ় গভীর ভাবপ্রকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই—

১। রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি যে করে প্রাণ॥

এখানে অলঙ্কার নাম মাত্র—সহজ কথারই জোর বেশি।

২। সখী বলিতেছেন—এ কিগো রাই, তোর সাজসজ্জা সব বিফল গেল? যদি শ্লথশিথিল ধ্বস্ত স্রস্তই না হইল তবে তোকে এত সাজাইলাম কি জন্য? তোর শ্যাম কি শিশু, না তোর হৃদয়ই কঠোর?

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন দেখিয়ে অধিক উজোর
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী শিথিল না ভেল তোর?
অমল বদন কমল মাধুরী না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি হাসি না কহসি বাত॥

৩। শ্রীকৃষ্ণের আদরের মধ্যে কি দরদই না প্রকাশিত হইয়াছে!

এস বস মোর কাছে রৌদ্র মিলয় পাছে
বসনে করিয়া মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পশারিণী' কবিতাটির শেষাংশ মনে পড়ে।

৪। শ্রীরাধার এই আক্ষেপে কি বেদনাই না ফুটিয়াছে!

সহজে বরণ কালো তিমিরপুঞ্জ ভেল অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বাঁধিয়া গলে সে ধনী মজাল জাতিকুল।
একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি সকলি কহসি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিনু মনে ফুলে ফলে কতই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে যে দিলা লাজ জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥

৫। রাধার আক্ষেপ, এই প্রেম ত' অনেকেই করে—আমারই কেন এত জ্বালা?

কেন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
কিবা সে মোহন রূপ মোর চিত্ত বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে।

৬। প্রভাতে ব্রজশিশুগণ বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া গোষ্ঠে যায়—প্রাণনাথকে সহজভাবে দেখিবার উপায় নাই।—'হাতে প্রাণ ক'রে' তবে দেখিতে হয়।

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাথ।

৭। নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটি সুভাষিতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—

লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত করয়ে মুরুখ জনে মানয়ে সরিষ প্রমাণ।

সুজনের লঘু উপকার করিলেও সে তাহাকে পর্ব্বত প্রমাণ মনে করে—মূর্খকে অচল প্রমাণ হিতসাধন করিলেও সে সর্ষপ প্রমাণ করে।

৮। শ্রীকৃষ্ণ অভিমানিনী রাধাকে বলিতেছেন—আমি এত সাধাসাধি করিতেছি, উত্তর দিতেছ না, আমার নিবেদন

না হয় ছাড়িয়া দাও, 'দারুণ দক্ষিণ পবন যব পরশব' তখন কি করিবে ?

কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি তব কাঁহা রাখবি মান ?
কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরবি পরাণ ?

৯। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

যে চাঁদের সুধা দানে জগৎ জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হইয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি কর পরসাদ॥

কেমন স্বচ্ছ সরল ভাষায় প্রাণের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে ! কবি রাধাশ্যামের মিলনকে বলিয়াছেন, "দুখ সঞে সুখ ভেল, দুহুঁ অতি ভোর।" রাধা অভিমান করিয়া বলিতেছে, "বাদিয়ার বাজি যেন তোমার পীরিতি হেন," "পানিতৈল নহে গাঢ় পীরিত।" রাধা প্রথম দর্শনকে পাষাণের রেখা ও বৃথা প্রবোধকে বলিতেছেন—পানির লিখন। এইরূপ ছোট ছোট কথায় কবি অনেকটুকু ভাব সহজেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভীকে বলিয়াছেন, 'ভ্রমর তিয়াষ।' রাধা-শ্যামের বহু আকাঙ্ক্ষিত আদরকে 'ভাদরের বাদর' বলিয়াছেন, "সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিবে দে ?"

কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধরণ করিয়া দেখাইতেছি জ্ঞানদাসের রচনা কিরূপ রসঘন—এই কবিতাগুলিতেই জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

১। শ্রীকৃষ্ণের রাধার স্বপ্নে মিলন একটি অপূর্ব কবিতা।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শব্দে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরি বোলে কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিনি ঝিনি বাজে ডাহুকা সে গরজে স্বপন দেখিনু হেনকালে।
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক রহু কুলের কামিনী।
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখ ছটা নিন্দে ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেয় ছলে আমা কিন বিকাইনু বোলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল,
অঙ্গ অবশ ভেল লাজমান ভয় গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

চণ্ডীদাসের—

পরাণনাথেরে স্বপনে দেখিলাম সে যে বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।

এই পদটি স্বপ্নমিলনের পদ। এই পদটিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিয়াছেন।

একজন সমালোচক বলিয়াছেন, "নিরাভরণা সুন্দরীর গলে মোতির মালা পরাইয়া দিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের 'পদটির' তেমনি অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন"। দুঃখের কবি চণ্ডীদাস স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটির কথাও বলিয়াছেন। জ্ঞানদাস এমন মধুর স্বপ্নটিকে আর ভাঙ্গিতে দেন নাই। এই পদটি রামানন্দ বসুর—তোমারে কহিয়ে সখী স্বপনকাহিনী পদটিকেও মনে পড়ায়।

এই কবিতায় রচনার পারিপাট্যের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে সুখস্বপ্নের অনুকূল পরিবেষ্টনীটিকে। কবি যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে রাধার নয়নে নিদ্রাবেশ ঘটাইয়াছেন—তাহা সুস্বপ্নের পক্ষে কেমন অনুকূল লক্ষ্য করিতে হইবে। বরিষণের রিমিঝিমিধ্বনি, পালঙ্কের সুখশয্যা, ঝিল্লার একটানা সুর, দাদুরী ও ডাহুকীর কলস্বর,—সর্বোপরি কবির কলচ্ছন্দের অনুরণন কেমন করিয়া শ্রীমতীর ঘুমকে ঘনাইয়া আনিতেছে, স্বপ্নদৃষ্ট দয়িতের লীলামাধুরীটুকু স্বপ্ন ও তাহার ছন্দোময় রূপকে কি অপূর্বতা দান করিয়াছে—তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

এই কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকেও চঞ্চল করিয়াছিল, তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন···স্বপন দেখিনু হেনকালে।

সে-দিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন্ একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন, মুখ চোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজলপরা, ঘাট থেকে নীলশাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে-মেয়ে আজ নাই, আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।" আর একস্থলে কবি বলিয়াছেন—

সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া রিমিঝিমি বারি বর্ষে।
মনে মনে ভাবি কোন পালঙ্কে কে নিদ্রা যায় হর্ষে॥

গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর কবি কাব্যের রঙ্গে।
স্বপ্ন পুলকে কে জাগে চমকি বিগলিত চীর অঙ্গে॥

জ্ঞানদাসের আর একটি বিখ্যাত পদ—

২। মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।
নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়
কখনও না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায়।
নেয়ের নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে।
অকাজে দিবস গেল নৌকা পার নাহি হলো
পরাণ হইল পরমাদ,
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হইয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবিহ বিষাদ।

নাবিকবেশী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে যমুনা পার করিয়া দিতেছেন—মানসগঙ্গার জলে তরণী টলমল—গগনে উঠিল মেঘ—পবনে বাড়িল বেগ। ব্রজগোপীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ব্যাপার বিচিত্র কিছু নয়—কিন্তু এই কবিতা আমাদিগের চিত্তকে অজ্ঞাতসারে যমুনাতীর হইতে ভবনদীর পারে লইয়া যায়। কবি ইহাতে কোন Symbolical significance হয় ত দিতে চাহেন নাই—কিন্তু রচনার গুণে আমাদের চিত্তকে লোকোত্তর করিয়া রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে।

নিম্নলিখিত কবিতার একটি Symbolical interpretation দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে—

দিবালোক যায় চ'লে দিগন্তে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণ তেজা দিনান্ত তপন,
মাথার উপর দূরে বকপাঁতি যায় উড়ে
কেশে রেখে ধবল স্বপন।
ওপারের পানে চাহি বসে আছি, তরী বাহি
কাণ্ডারী করিছে পারাপার,
খেয়া ঘাটে বসি হেরি আমারো ত নেই দেরী
চমকিয়া উঠি বার বার।

মান-ভার, লজ্জা-ভার ঋণ-ভার, সজ্জা-ভার
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা,
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে শির পৃষ্ঠ নুজো ভারে
পার হওয়া নয় মোর সোজা।
ভার মুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি করি?
তরী বাহি যায় আসে কোন ভার লয় না সে
কোন ভার সয়না সে তরী।
সব চেয়ে গুরুভার মনোবাস বাসনার
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার ঘাটে
স্মরি নৌকাবিলাসের গান।
"মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাই কেউ।"
দুকূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
ভাঙা তরী সহেনাক ভর,
কানু কয় "এই নদী পার হ'তে চাও যদি
নীরে ডারো ক্ষীর দধি সর।
বলয় নূপুর হার আদি সব অলঙ্কার
এ সবের রেখ না মমতা,
অই সব ভার ধরি টলমল মোর তরী
লঘু কর তব তনু-লতা।
শুধু এই ভার কেন? তব বসনেরো জেন
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া, সব লজ্জা ভয়।"

জানিনা কি ভাবি কবি এঁকেছেন এই ছবি
হয়ত বা রসেরি কৌশল,
আজি খেয়া ঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিতে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী,
বসনে গুণ্ঠিত মন বাসনা-কুণ্ঠিত মন
অকূলে কেমনে দিব পাড়ি?

জ্ঞানদাসের এই পদটি চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া চলিতেছে—

৩। সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।
সখি কি মোর কপাল লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে,
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আসে,
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপ,
জ্ঞানদাস কহে পীরিতি করিয়া পাছে কর অনুতাপ।

কবি এই ভাবটি অন্যত্র দুই পংক্তিতেই প্রকাশ করিয়াছেন—

গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়ব অনলে।

ভাবটির জন্য নহে—ভাব প্রকাশের ভঙ্গীর জন্য এই কবিতাটি এমন চমৎকার যে ইহা চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে—যুগে যুগে অভাগাদের কণ্ঠে ইহা প্রাণের ভাষা দিয়াছে বলিয়া আরো চমৎকার।

জ্ঞানদাসের আর একটি পদ—

৪। কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিনু বাটে তিমিরে গরাসল মোরে।
রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ায় টানিল বামে ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে ললিত লাবণ্য রূপ শেষ।
ললাটে চন্দন পাঁতি নব গোরচনা ভাতি তার মাঝে পূনমিক চাঁদ,
অলকাবলিত মুখ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ কামিনীজনের মনফাঁদ।
লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয় নীলমণি মুকুতার পাঁতি,
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা ভুবন মোহন রূপ ভাতি।
সঙ্গে ননদিনী ছিল সকল দেখিয়া গেল অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে,
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয় সে কি সতী বোলাইতে পারে।

এখানে প্রথম দর্শনের মুগ্ধতার সহিত ননদিনীর ভয়ের মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি রূপ লাভ করিয়াছে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যেও দুর্লভ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু কবিই গতানুগতিক ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় মৌলিকতার বড়ই অভাব। তাঁহাদের তুলনায় জ্ঞানদাসের রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। জ্ঞানদাস গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ঐ ধারার রসতরঙ্গগুলি তাঁহার নিজস্ব।

সম্ভবামি যুগে যুগে

বিশ্বনাথ

অসুরের দলে তাণ্ডব চলে,—পিণাক পাণির পিণাক জ্বলে
বসুন্ধরার বুকের উপর অত্যাচারের রথ যে চলে
আজ কোথায় দেবতা কোথায় দেবতা চীৎকারে যত মানব দল
দৈত্যে দানবে তরবারী হানে—আপন ধ্বংসে আত্মহারা
যুগযুগান্তের কত না রূপের পূর্ণ হয়েছে পাপের ভরা,
ব্রাহ্মণরূপে যাহাদের কাজ সমাজের হিতে দিতে বিধান
আজ সমাজ স্বার্থ ভুলেছে তাহারা, ক্ষুদ্র স্বার্থে বিভোর প্রাণ।
কিসের দর্প করিছে তাহারা কেন যে তাদের এ অভিমান—
যেথা মানব কাঁদিছে দুঃখ দৈন্যে জর্জ্জর যেথা মানবপ্রাণ
আজ ব্রাহ্মণ কোথা, কোথা ক্ষত্রিয়, কোথায় বৈশ্য কোথায় তারা,
নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া হয়েছে সবাই আত্মহারা।
ধর্ম্মের নামে কেহবা সাজিছে, লইছে কেহবা নাম দেবতার
কেহবা বলিছে মানবের হিত সমাজ স্বার্থ লক্ষ্য তার।
সব ভণ্ডামী সব জুয়াচুরী অপরের হিত বোঝে না এরা
লজ্জা এদের কেমন করিয়া নিজেরে করিবে গৌরব ভরা।
এরাই ত সব অসুরের দল এরাই ত সব দৈত্যদানব
এদেরই দলনে যুগে যুগে হয় মহাশকতির আবির্ভাব।
তাই বুঝি তুমি পাঠায়েছ দেবি পিণাক হস্তে রুদ্রদূত
তাই বুঝি দেবি দিকে দিকে সবে হইতেছে গো ভস্মীভূত
জ্বালাও রুদ্র জ্বালাও দেবতা ধ্বংস কর গো এ অভিশাপ
ধর্ম্মের গ্লানি দূর হয়ে যাক পুড়ে ছাই হোক্ যতেক পাপ
বসুন্ধরা তো অনেক সয়েছে এটুকুতে তার হবে না ক্ষতি
এদের দলনে আবার বাহিবে মঙ্গল শাঁখ-নিনাদ-গীতি,
জানি যে আমরা এদের বিনাশে হইবে তোমার আবির্ভাব
হে যুগদেবতা ওগো ভগবন, ওগো যুগান্তের মহামানব
তুমিই বলেছ আসিব আবার শুনায়েছ তুমি এ মংবাণী
হইবে দেবতা তব আবির্ভাব নাশিতে যতেক ধর্ম্ম গ্লানি।

বন্ধন মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

সাতাস

"ও মা! কমল দা যে, আপনি এখানে যে—"

"বাঃ! গার্গী যে, বটে! তুমি—"

"এই ত বাবার সঙ্গে পরশু এসেছি! মা!"

মা অদূরেই একধারে কয়েকটি গাছের আড়ালে তখন ছিলেন। সাড়া পাইয়া বিস্মিত দৃষ্টি অথচ প্রসন্ন স্মিতমুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—"

"Good evening Mrs. Ganguly! Indeed, very glad to meet you here. How—how very pleasant a surprise! How do you do?"

বলিতে বলিতে কমল হাতখানি বাড়াইয়া দিল। মিসেস্ গাঙ্গুলী ধরিয়া বেশ জোরে ঝাঁকিয়া দিলেন। গার্গীর কোমলকর পল্লবখানিও কমলের কঠোর মুষ্টিতে বাঁধা পড়িল, ঈষৎ স্মিত মোহন কটাক্ষে একটিবার চাহিয়া লালিম মুখখানি সরস ভরে গার্গী একদিকে ফিরাইয়া নিল।

"তা আপনারা এখানে—Indeed very welcome, a very happy concidence, জানতাম না ত' কিছু?"

"এই ত' বেরোবেন ওদের অফিসের একটা inspection tour-এ, তা হঠাৎ ব'ললেন চল এবারটা বেরিয়ে আসি তোমাদের নিয়ে। গরম প'ড়েছে বেজায়, গার্গীর শরীরটাও ভাল নয় শিলংএ ক'দিন থাকবে, আমি ওদিককার আর ক'টা জায়গা ঘুরে তোমাদের নিয়ে ফিরব। তোমার সঙ্গে ত' আর তারপর দেখা হয় নি—তা তুমি হঠাৎ এখানে এসেছ—"

"আফিসের হুকুমে। একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ এখানে হ'চ্ছে তার কাজকর্ম্ম তদারক করতে পাঠিয়েছেন। সেদিন গিয়েছিলাম আপনাদের ওখানে ব'লে আসব ব'লে। তা গিয়ে শুনলাম আপনারাও কোথায় বেরিয়েছেন মিষ্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে।—তা বেশ হ'য়েছে। Really very lucky! ভাবছিলাম দিনগুলো ত' যাবে কাজকর্ম্মের হিড়িকে, সন্ধ্যেগুলো কি ক'রে কাটাব! তা আপনারা এয়েছেন—বেশ আমোদে কাটবে। আর গার্গীই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ক'লকাতায়ও এখন আমার only friend! নয় গার্গী। হাঃ হাঃ হাঃ!"

"যান্!—"

আবার তেমনই একটি মোহন কটাক্ষে চাহিয়া হাসি-চাপা লালিম মুখখানি গার্গী তেমনই একটা সরমের ভঙ্গীতে ফিরাইয়া লইল। কমলের মুখখানিতেও একটা লালিম হাসি ফুটিল। দেহ ভরিয়া কোমল একটা ব্যাপক রোমাঞ্চ উঠিল, ঠিক যেমন একটা স্পন্দন পূর্ব্বে সে কখনও অনুভব করে নাই। গার্গীর মুখে এমন সরসভরা লালিম হাসি আর সেই হাসির মুখখানি এমন ভাবে ফিরাইয়া যাওয়া আর কখনও সে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সন্ধ্যাবিনোদনে এতদিন তাহাদের যে নিয়ত সঙ্গ—আর পরস্পরের প্রতি যত কিছু ব্যবহার সব কি তবে সাময়িক একটা স্ফূর্ত্তির খেলাই মাত্র ছিল না? লীলি, ফ্যানী প্রভৃতির ন্যায় গার্গী তাহাকে যে Cupture করিতে চায় ইহাও সে বুঝিত, কিন্তু সেটা কি কেবল তাহার উচ্চ পদগৌরবের লোভে মাত্র নয়? সত্যই কি তবে সত্যকার সরল নারী প্রাণে গার্গী তাহাকে ভালবাসিয়াছে? আজিকার এই যে ভাবান্তর তাহাও যতদূর সে বুঝিতে পারে, এইরূপে ভালবাসার লক্ষণ বলিয়াই ত' মনে হয়। আর তাহার সাড়া তাহারও চিত্তে কি সেইরূপ একটি সাড়া তুলিয়াছে। না, না—তা হইতেই পারে না। সে যে ঊর্ম্মিকে ভালবাসিয়াছে সত্যকার যে নারীত্ব তাহা সে ঊর্ম্মিতেই দেখিয়াছে,—ঊর্ম্মিকেই পত্নীত্বে লাভ করিয়া সাংসারিক জীবনে সুখের একটা স্থিতি সে লাভ করিতে চায়। পুরুষ মাত্রই যাহা কামনা করে,—When they become tired of all such exuberations of lusty early youth, sowings of wild oats and all that a happy privilege of his masculine sex, every where.

মা তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সাবধানই সে থাকিবে। তবে সন্ধ্যাবিনোদনে এইরূপ সব তরুণীদের সঙ্গ এমনই একটা মৌতাতের মত অভ্যাস তার হইয়া গিয়াছিল

যে, কোনও একটি দিন তার অন্যথা হইলে সে পাগলের মত হইয়া উঠিত। বায়ু হিল্লোল বিহীন গৃহে গ্রীষ্মাতিশয্যে মানুষ যেমন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটায় তেমনই ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইত। শিলং-এ যখন আসে, এইরূপ সঙ্গিনীর অভাবে সন্ধ্যাগুলি তার কি ভাবে কাটিবে ভাবিয়া সে কূল পাইত না, বড় একটা অস্বস্তিও বোধ করিত। নূতন জায়গায় নূতন এইরূপ কাহারও সঙ্গলাভকরা কি সম্ভব হইবে?—তবে পরিচিত কোনও পরিবার যদি এখানে থাকেন। কিন্তু আসিয়াই দেখিল, গাঙ্গুলীরা এখানে। এত বড় একটা শুভ সংঘটন—স্বপ্নেও তা সে ভাবিতে পারে নাই—Providence বলিয়া যদি কেহ থাকেন—thanks, thousand and one thanks to Him! এমন একটা provision না চাহিতেই করিয়া রাখিয়াছেন। মনে পড়িল, বাল্য বয়সে ব্রহ্ম সঙ্গীত শুনিয়াছিল—

"কি আর চাহিব নাথ, না চাহিতে দিয়াছ সকল।"

যাক্! বাঁচা গেল, গার্গী সম্প্রতি তাহার একমাত্র প্রিয় বান্ধবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আর বান্ধব বিহীন বিজন গহন সদৃশ এই স্থানে আসিয়া সেই গার্গীকেই সে পাইল!—

Providence or no Povidence—a very lucky wind fall and he will take the fullest advantage of it। গার্গী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে? পড়িয়া থাকে ভালই। He too will do a lot of lovemaking and the evenings will pass full gleefully on—

কমল যাহাই মনে করুক শুভ এই যোগাযোগটা কেবল অনুকূল দৈবযোগেই ঘটে নাই। গুপ্ত কৌশল যোগে নিজেরাই ইহাঁরা ঘটাইয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর যাহারা ছিল, সকলেই কমলের সাহচর্য্য আপাততঃ কিছুকালের জন্য বর্জ্জন করিয়াছে। সন্ধ্যা অবসরে গার্গীকেই কেবল সে চায়, আর কেবল গার্গীই তাহাকে চায়। এই সুযোগটা সিদ্ধির পথ অনেকটা সরল করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাধাও যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কমলের মা-ই বড় একটা সম্ভাবিত বাধা। কোনও মতে যদি জানিতে পারেন, গার্গী এমন একটা অপ্রতিদ্বন্দ্ব আমল তাহার উপরে পাইয়া বসিয়াছে, তখনই পুত্রকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আবার ঊর্ম্মির উপরেও বড় একটা টান তাহার আছে, সে জানে সেখানে ও যায় আসে, তবে তাহাকে লইয়া এখনও বাহির হইতে পারে না। কিন্তু যাওয়া আসা ত করেই। লোকনিন্দার ভয়ে ঊর্ম্মিকে তাহার সঙ্গে বাহির হইতে না দিলেও বাড়ীতেই সুকন্যাণী নিভৃত আলাপের এমন সুযোগ করিয়া দিবেন যে, ওখানেই একদম জমিয়া বসিবে। আবার যাহারা আজ বর্জ্জন করিয়াছে, তাহারাও কাল হয় ত আসিয়া জুটিতে পারে। এখন এই ফাঁকে বাহিরে যদি কমল কোথাও যায় আর তাঁহারাও সেখানে যাইতে পারেন, তবে এ সব বাধা ত কিছু আসিবেই না, সুযোগটাই বরং আরও বড় একটা সুযোগ হইয়া উঠিবে। কমলের নিভৃত সঙ্গ লাভের অবসর গার্গীর পক্ষে অনেক বেশী ঘটিবে, সময়টা কমলের গার্গীর দিকে একটানা হইয়া থাকিবে, নানা টানে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে না, কর্ম্মের অবসরে চিত্তবিনোদনের সম্বল গার্গীর সঙ্গ বই আর কোথাও সে সহজে পাইবে না। সুলভ এই সঙ্গ থাকিতে আর কোথাও সে তাহা খুঁজিয়া লইতেও যাইবে না। তাঁহারা জানিতেন, আফিসের কাজে কমলকে মধ্যে মধ্যে বাহিরেও যাইতে হয়।

মিষ্টার গাঙ্গুলীর এক বন্ধু সেই আফিসে কাজ করিতেন। তাঁহার কাছে গোপনে সন্ধান নিতেন, শীঘ্র এরূপ কোনও সম্ভাবনা ঘটিবে কি না। একদিন সংবাদ পাইলেন, কমল শিলং যাইতেছে, এবং আট দশদিন সেখানে থাকিবে। বাঃ! শিলং! শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলতায় ভরা স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে কুঞ্জে কুঞ্জে সাজান বাগানখানি—ভূতলে যেন একখানি ত্রিদিবের নন্দন আপনা হইতে প্রকৃতি দেবী সাজাইয়া তুলিয়াছেন। সেখানে এই বিরাম ভূমিতে দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত কমলের একমাত্র চিত্তবিনোদিনী গার্গী। গার্গীও বেশ জানে যে মোহ মদিরা শ্লথতার কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কি কৌশলে কমলকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। অবিলম্বে গাঙ্গুলী দম্পতি এই একটা উপলক্ষ ধরিয়া কমলের অজ্ঞাতে শিলং যাত্রা করিলেন।

সাক্ষাৎ হইল! পরস্পর এইরূপ প্রীতি সম্ভাষণ এবং অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাৎকারকে সানন্দ অভিনন্দনের পর কমলকে লইয়া কন্যা সহ মিসেস গাঙ্গুলী বাসস্থলে ফিরিয়া আসিলেন, চা পানে ও গার্গীর দুই একটি সঙ্গীত আলাপনে অতি আপ্যায়িত হইয়া কমল তাহার হোটেলে ফিরিল।

দিনের কার্য্যাবসানে প্রত্যহই কমল আসিত; গার্গীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত। কখনও অপেক্ষাকৃত জনবিরল বিটপীকুঞ্জে কলধ্বনি নির্ঝরিণী নিকটে, পুষ্পমণ্ডিত বেদিকাবৎ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া হাসি-গল্প করিত। কিন্তু প্রকৃতির এই নয়নমোহন চিত্তরসল উদ্যানে যেরূপ একটা গলা-গলি চলা-ঢলি ভাব কমলের জন্মিবে বলিয়া ভরসা গাঙ্গুলীরা করিয়াছিলেন তাহার তেমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। এইরূপ একটা সন্দিগ্ধভাবাবেশে মধু মুহূর্ত্তে সঙ্গহারা হইয়া কমল প্রেম নিবেদন করিবে, তার কোনও সম্ভাবনা গার্গী দেখিল না। যদিও এরূপ একটা ভাবাবেশে তাকে আনিয়া ফেলিতে নারীজনসুলভ ছলাকলার প্রয়োগে ত্রুটি সে কিছু করে নাই। এদিকে কমলের ফিরিবার সময় হইয়া আসিল; এই সুযোগও যদি হাতছাড়া হইয়া যায়, এমন আর একটি আসিবে না; আশাও তার পূর্ণ হইবে না। কমল তার প্রেমে পড়ে নাই; পড়িবেও না। প্রেমের টানে আপনা হইতে ধরাও দিবে না। প্রেমে যদি কাহারও সে পড়িয়া থাকে পড়িয়াছে উর্ম্মির। ধরা সে উর্ম্মির হাতেই দিবে। অপেক্ষাও আর বেশী দিন হয় ত করিবে না। কেনই বা করিবে! যেমন সে চায়, তেমন তার মা চায়, উর্ম্মির মাও তেমনই অতি আকুল হইয়া এই চাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। উর্ম্মি নিজেই কি চাহিতেছে না; অবশ্য চাহিতেছে। কমল কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেই এই সকল চাওয়া পরস্পরের টানে মনের কোঠা হইতে খোলাখুলি বাহিরে আসিয়া মিলিবে। অচিরেই উর্ম্মি গিয়া দখল করিয়া বসিবে মল্লিক-গৃহের সেই রত্নবেদিখানি, যাহা সে নিয়ত এরূপ আগ্রহে কামনা করিতেছে। না না, কিছুতেই সে তাহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না,—আরও উর্ম্মির সম্মুখে তাহার সেই অবমাননার পর। সে যে পণ করিয়াছে, সেই রত্নবেদিতে সেই গিয়া জমকাইয়া বসিবে, এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে, চিন্ময়ী মল্লিকের দর্পচূর্ণ করিবে। কিন্তু প্রেমের টানে কমল আসিয়া তাহার হাতে বাঁধা পড়িবে না। সময়ও আর নাই। এই কামনা যদি তাহাকে পূর্ণ করিতে হয়, পণ যদি তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, অবিলম্বে আচম্বিত কোনও কূট অছিলায় অসতর্ক কমলকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। এখন সেই অছিলা কি হইতে পারে। গার্গী তাই এখন ভাবিতেছিল। মায়ে-ঝিয়েও সেইরূপে সলা-পরামর্শ অনেক হইল।

আঠাশ

অপরাহ্নে একদিন লাবানের নিকটেই একটি পাহাড়ের উপরের দিবাবসানে একটি শিলাখণ্ডে গিয়া দুইজনে বসিল। ঝরণার একটি জলধারা অদমান ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃদু মধুর কুলু কুলু সঙ্গীতের তালে তালে যেন নাচিয়া নাচিয়া পায়ের নীচ দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যারবির রক্ত রশ্মিজাল গার্গীর মুখখানি ভরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, চূর্ণ কুন্তল মন্দ বায়ু হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল, কমল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, গার্গীকে সত্যই এমন সুন্দর তখন তাহার চোখে লাগিল।

গার্গী যেন কিছু আনমনা কেমন গম্ভীর। ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস সে ত্যাগ করিল।

"কি, কি ভাবছ গার্গী?"

ঈষৎ একটু হাসিয়া গার্গী কহিল,

"ভাবছি—হাঁ, আপনি কবে ফিরছেন ক'লকাতায়—সময় ত বুঝি হয়ে এল?"

গভীর আর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল।

কমল কহিল, "হাঁ, পরশু—নেহাৎ না হয়ে ওঠে তরসু যাব।"

"থাকতে পারেন না আর ক'টা দিন?"

"কাজ হয়ে যাবে, কি অছিলা ধরে থাকব আর? আফিসে কৈফিয়ৎ ত একটা আছে।"

"হু"। ক'দিন আর বাবা এখানে আমাদের ফেলে রাখবেন জানি না। বলেন, আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে কিছুদিন রাখবেন আমাকে এখানে। তিনিও এই পরশু তরসুই বোধ হয় আবার বেরোবেন। এদিককার টুর সেরে আবার ফিরবেন মাস খানিক ও হয় ত হতে পারে?"

"হুঁ"—এই মাত্র বলিয়া কমল যেন কি ভাবিতে লাগিল।

গার্গী গভীরতর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তাই ভাবছি, কমলদা আপনি চলে গেলে কি করে এখানে থাকব, যায়গাটি খুব সুন্দর। কিন্তু কাজকর্ম্ম ত এমন কিছু নেই—দিনটা যেন কাটতেই চায় না। বিকেলের দিকে আপনি আসেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই চেড়াই—

বেশ কেটে যায়। মনেই থাকে না বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে অজানা অচেনা দূর একটা যায়গায় সত্যি যেন বনবাসে আছি। এই বনবাসও, তা সত্যি বলতে কি কমলদা শুনলে আপনি হয় ত হাসবেন যেন নন্দনবাস আমার হয়ে ওঠে। যখন আপনাকে পাই, আপনার সঙ্গে বেড়োই শিলং যে এত সুন্দর লোকে বলে, সেটা আমি ঠিক সত্যি বলে বুঝতে পারি। আপনি ছেড়ে গেলে বনবাস আমার সারাদিন রাতেরই সত্যিকার বনবাসই হবে। আরও বাবা বলেছেন এক মাস কি করে যে থাকব।"

হুঁ—Without any congenial friends to pass

atleast the evenings with life here would be dull very and almost unbearably dull for you. তবে এইটুকু consolation তুমি নিতে পার, আমার অবস্থাও অনেকটা এমনি হ'য়ে দাঁড়াবে। ক'লকাতায়—why, is something like a big forest—a forest of big houses inspite of its timming noisy population —no body caring for no body else except on business. Even neighbours living in the same street or lane side by side and face to face remains quite strangers for years on! দিনটা তবু কাজে কর্ম্মে কেটে যায়। আর সন্ধ্যে বেলায় থিয়েটার বল, সিনেমা বল, কি পার্ক বল, মনের মত বন্ধু ছাড়া—ঠিক যেন বনে বনে একলা একটা ভূতের মতই ঘুরে বেড়ান হয়। তুমি রইলে এখানে—আমার দশাও ঠিক তেমনি হ'য়ে দাঁড়াবে।

মোহন একটি স্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গার্গী কহিল, "কেন, বন্ধু ত একলা আমিই নই, ঐ ত লীলি র'য়েছে, ফ্যাণী র'য়েছে, মন্দা, নন্দা—"

"সবাই যে আমাকে বয়কট ক'রেছে!"

"বয়কট ক'রেছে! তার মানে—"

"মানে—সেদিনকার সেই unfortunate incidentটার পর কোথাও গিয়ে আর পাত্তা পাইনে। কাউকে আর দেখ আমার সঙ্গে বেরোতে?"

"না, তা—দেখি না বটে। কিন্তু তাতে বয়কট করা উচিত ছিল, আমারই। কিন্তু তা পারি নি—"

বলিতে বলিতে আর একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে মুখখানি একদিকে ফিরাইয়া লইল।

"না তা পার নি—and I deem it a particular favour for which I am very very thankfull!"

বলিতে বলিতে গার্গীর হাতখানি হাতে চাপিয়া ধরিল। গার্গী বড় মধুর একটু হাসিয়া ফিরিয়া রহিল, হাতে হাত খানি একটু নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বঃ! এই আংটীটি আপনার হাতে—হাতে হাত জড়ান—খাসা আংটীটি ত!—আগে আপনার হাতে দেখিনি—এখানে এসেই দেখছি।

"নুতন গ'ড়য়ে নিয়েছি এখনে আসবার কেবল আগে।"

গার্গী কহিল, "এ রকম clasp ring আরও অনেক দেখেছি। কিন্তু এতে বেশ একটা novelty আছে—হাত দুখানি দু-রকম—"

"হাঁ, একখানি male একখানি female—"

"হাঁ, তেমনই ত লাগে, দেখি ভাল ক'রে গড়নের designটা! দেখতে পারি?"

বলিতে বলিতে আংটীটায় একটু টান দিয়া তখনই আবার থামিয়া কমলের মুখপানে চাহিল।

"দেখ।"

আংটীটি খুলিয়া কমল গার্গীর হাতে দিল। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে গার্গী বলিয়া উঠিল, "ওমা, ভিতরের দিকে আবার একটা mottoও র'য়েছে—Kamal to Dearest। কার এটা হবে?"

চটুল হাসিভরা বিলোল দৃষ্টিতে গার্গী চাহিল।

"যে নিতে পারে তার," তেমনই চটুল হাসি মুখে কমল এই উত্তর করিল।

"কিন্তু তার যে দাবী—"

"যার আছে, সেই নেবে?"

"এমন আমায় যদি থাকে?"

"থাকে পাবে।—

"জানি না আছে কি না, আপনি দিলেই তখন বুঝব।"

কমলের সাধ্য হইল না, তখন বলে, না, দিব না, একটু কি ভাবিয়া বলিয়া ফেলিল, "চাও তুমি আংটিটি!"

"বলতে লজ্জা করে, তবে তবে—"

ঈষৎ রক্তাভ অবনত মুখে আংটিটি হাতে নাড়িতে লাগিল, কমলের বড় দুঃখও হইল।

কহিল, "বেশ, নেও তবে।"

"হাতে পরিয়ে দিন।"

আংটিটি লইয়া কমল গার্গীর আঙ্গুলে ঈষৎ কম্পিত হস্তে পরাইয়া দিল।

কাছে ঘেঁসিয়া গার্গী কমলের গায়ে একেবারে ঢলিয়া পড়িল, বুকে মুখখানি রাখিয়া বাষ্পার্দ্র চক্ষু দুটির ঢুলু ঢুলু মদির লোলুপ দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, "কমল? তা' হ'লে—তা' হ'লে আমি তোমার dearest—"

কেমন একটা চমকে কমল শিহরিয়া উঠিল। তখনই আবার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "Well so if it pleases you. And yes somehow let's play this fun to the finish." বলিয়া গার্গীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মৃদু একটি চুম্বন অঙ্কিত করিল, করিয়াই আবার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

*

পরদিন দুপুরের পর বেলা তখন প্রায় দুইটা—কমল তাহাদের কারখানায় লোক মারফতে গাঙ্গুলী সাহেবের একখানি চিঠি পাইল। লিখিয়াছেন, হঠাৎ অতি জরুরী একটা টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি দার্জ্জিলিং যাইতেছেন, সেখান হইতে কলিকাতায়ও অবিলম্বে ফিরিতে হইবে এ দিকে আর আসিবার সুবিধা হইবে না, তাই গার্গী ও তার মাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, দেখা করিয়া বিদায় লইবার অবসর হইল না, কলিকাতায় শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

কমল বেশ একটু স্বস্তিই যেন তখন বোধ করিল।

[ক্রমশঃ

নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

দুই

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণেও ভারতীয় নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতেরও বিরাট-পর্ব্বে নাট্যশালা এবং বৃহন্নলা কর্ত্তৃক উত্তরাকে নৃত্যগীত অভিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার কথা আছে। অর্জ্জুন (বৃহন্নলা) চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের নিকটে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরও উল্লিখিত আছে যে, উত্তরা অভিমন্যুর পরিণয়োৎসবকালে গায়ক, আখ্যায়ক, নটবৈতালিক, সূত ও মাগধগণ সমাগত ব্যক্তিগণের স্তুতি-পাঠ করিয়াছিলেন। বনপর্ব্বেও যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "যশের নিমিত্ত নট ও নর্ত্তককে অর্থদান করা রাজার কর্ত্তব্য।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রবেশ কালে বসুদেব আত্মীয় স্বজন, নগরবাসী এবং নট নর্ত্তক প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—

নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ
গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ।

—১ম স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়

শ্রীধরস্বামী 'নট' অর্থে "নবরসাভিনয় চতুর" বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণের গোষ্ঠবিহার ও তদানুসঙ্গীত নৃত্যগীত হইতেই গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণযাত্রার উৎপত্তি।

'হরিবংশে' আবার দেখিতে পাই যে, প্রভাবতী হরণকালে প্রদ্যুম্ন নটবেশে অভিনয় করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপর্ব্ব)। সত্রাজিত রাজার পুত্র ঋতধ্বজও (কুবলায়স্ব) নাটকাভিনয় দর্শনে অনুরাগী ছিলেন।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" লিখিত আছে, নাটকাভিনয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। "অর্থ-শাস্ত্রে" নাট্যকার 'ভাষের' নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মনু সংহিতায়ও অভিনয়ের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণীর কথা উল্লিখিত আছে—

"নটশ্চ করণশ্চৈব"।—মনু ১০।১২।

এইশ্রেণীর মধ্যে কদাচার যে খুবই বিরাজ করিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কারণ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নটদিগের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের স্ত্রীগণ অভিনয়ের কার্য্য করিত এবং ইচ্ছামত পরপুরুষের মনোরঞ্জন করিত (যস্য যস্যাচঃ কার্য্যামুচ্যতে তং তং ভজন্তে)।

পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

অতএব আমরা দেখিতে পাই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়াই নাট্যকলা স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে মহাকাব্যের যুগ পর্য্যন্ত এই নাট্যরস অধিক পরিপুষ্টি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে নাটক ও অভিনয়

"ললিত বিস্তরে" উল্লিখিত আছে কলাবিদ্যার অনুশীলনে বুদ্ধদেবের কোন নিষেধ আজ্ঞা ছিল না, বরঞ্চ তিনি উহাতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যে সময়ে তিনি রাজগৃহে অবস্থান করেন, তাঁহার শিষ্য মোদ্‌গল্যায়ণ ও উপতিষ্য সকলের সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং "দিগ্‌বধ" নাটকের অভিনয় হয়।

এই অভিনয়ে কুবলয়া নাম্নী একজন অভিনেত্রী অপূর্ব্ব কলা-কৌশলের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজগৃহে অভিনয়ের সময় তাহার মোহিনীশক্তি কয়েকজন বৌদ্ধ-ভিক্ষুককে একেবারে বিচলিত করিয়া ফেলে। বুদ্ধদেব ইহাতে কুবলয়াকে অভিসম্পাত প্রদান করেন এবং শীঘ্রই সেই নারী বিকট-দর্শনা কুরূপা বৃদ্ধায় পরিণত হয়। পরে অনেক কাকুতি ও অনুতাপের ফলে বুদ্ধদেব তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং এবার সে তপস্যায় নিরত থাকিয়া মুক্তি লাভ করে।

মগধের রাজা বিম্বিসার নাগরাজাদের সম্মানার্থ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কুষাণরাজ কনিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ প্রণীত "সারিপুত্র প্রকরণ" নামে একখানি নাটক মধ্য এসিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। কুষাণরাজত্ব মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

"বৌদ্ধজাতকে"ও নট ও নাটকের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'জাতক' খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। সামান্য সামান্য কথার অবতারণা না করিয়া কনভের জাতকের একটী চমকপ্রদ আখ্যান বিবৃত করিব। ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, বোধিসত্ত্ব সেখানে প্রসিদ্ধ দস্যুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দস্যু বড় অত্যাচারী ছিল, অতঃপর রাজা অনেক চেষ্টায় প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে সৈন্য পাঠাইয়া এই দস্যুকে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন।

সেখানে শ্যামা নামে এক বারবিলাসিনী বাস করিত। রূপ ও ছলাকলার জন্য তাহার খুবই খ্যাতি ছিল। সহস্র মুদ্রার পারিতোষিক ব্যতীত কাহারও অদৃষ্টে শ্যামার সঙ্গলাভ ঘটিত না। কিন্তু শ্যামা এই দস্যুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিল। তাহাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। শ্যামার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল এক তরুণ বণিকপুত্র। দস্যুকে মুক্ত করিবার জন্য সে ঐ তরুণ প্রেমিককে দিয়া শাসনকর্ত্তার নিকট এক সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করে। দস্যু মুক্তিলাভ করিল বটে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড হইল বণিকপুত্রের। এবারে দস্যুর সহিত মিলিত হইয়া শ্যামা তাহার ঘৃণ্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিল এবং তাহার সংসর্গেই রাত্রি দিন যাপন হইতে লাগিল। এদিকে দস্যুর মনে ভয় হইল। সে ভাবিল যে তাহার অদৃষ্টেও কোনদিন সওদাগর-পুত্রের দশা ঘটিতে পারে। কাল বিলম্ব না করিয়া দস্যু শ্যামাকে পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল।

দস্যু চলিয়া গেলে শ্যামা কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, দস্যুর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইল। দস্যুকে খুঁজিবার জন্য সে কয়েকজন নটকে আহ্বান করিল। তাহাদিগকে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিল। সহস্র মুদ্রা পাইয়া নটগণ জিজ্ঞাসা করিল—

"আর্য্যে, আপনার জন্য আমাদের কি করিতে হইবে ?"

শ্যামা—তোমাদের এই দস্যুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সর্ব্বত্র যাইবে, কোনস্থান যেন তোমাদের অগম্য না থাকে। প্রতি গ্রাম, নগর ও জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে সকলকে আহ্বান করিবে (তেতথা সমাজম করণতা পথমম এবা গীতকরং পরিভ্রমণ) এবং সেই সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট এই ভাবে গান ও অভিনয় করিবে যে—

"শ্যামা জীবন ধরিতেছে শুধু তোমারই জন্য,
তুমিই কেবল তাহার প্রণয়পাত্র, আর কেউ নয়,
জীবনে মরণে কেবল তুমিই তাহার।"

কিন্তু বোধিসত্ত্ব আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। নিরুপায় হইয়া নিরাশ হৃদয়ে শ্যামা আবার তাহার পূর্ব্বব্যবসায়ে ফিরিয়া গেল।

এই স্থানে নট, সমাজ এবং সমাজমণ্ডলী শব্দের প্রয়োগ আছে। এখানে নট শব্দের অর্থ অভিনেতা, সমাজ শব্দের অর্থ অভিনয় প্রদর্শন এবং সমাজমণ্ডলের অর্থ রঙ্গমঞ্চ। সমাজ শব্দে যে নাট্যাভিনয় বুঝায় তাহা বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহু স্থলে দৃষ্ট হয়। গিরনার পাহাড়ে অশোকের প্রথম শিলালিপিতে (First Rock Edict) নাট্যাভিনয় অর্থেই 'সমাজ'* শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণেও এই ভাবে সমাজ শব্দের প্রয়োগ আছে।

বাৎস্যায়ণের "কামসূত্রে"ও নাটক, প্রেক্ষণম্, কুশীলব প্রভৃতি 'সমাজ' শব্দের সহিত এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "কামসূত্র" খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ শতাব্দীতে রচিত। ইহার প্রথমাধিকরণে উল্লিখিত আছে—

"মাসের বা পক্ষের কোন এক শুভদিনে সরস্বতীর মন্দিরে সমগ্র নাগরিক মণ্ডলকে আহ্বান করিতে হইবে। সেখানে নট সঙ্গীতজ্ঞ এবং কলানিপুণ অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পরীক্ষা হইবে। অতঃপরে অভিনয় অনুষ্ঠান হৃদয়গ্রাহী হইলে তাহাদিগকে অভিনন্দন করা হইবে, নতুবা গন্তব্য স্থানে যাইতে দেওয়া হইবে না।"†

"কুশীলবাশ্চাগন্তবঃ প্রেক্ষণকমেষাং দদ্যুঃ"

অতএব এই সব মহাকাব্য ও পুরাণাদি গ্রন্থে যে অনবরত নাটক, সমাজ, প্রেক্ষাগৃহ, নট প্রভৃতি কথা দৃষ্ট হয়, তাহাতে অভিনয় বিদ্যার প্রাচীনত্বই সমধিকরূপে প্রমাণিত হয়।

এখন কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিব। প্রথম প্রমাণ—সীতাবেঙ্গা পাহাড়ে প্রত্নতত্ত্বঘটিত তত্ত্ব, দ্বিতীয় প্রমাণ—ভাস, শূদ্রক, কালীদাস ও ভবভূতির অমর নাটকাবলী।

* ন চ সমাজো কটব্যো বহুকম হি দোষম্।—First Rock Edict of Girnar Rock.

† বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খারসিয়া ষ্টেশন হইতে একশত মাইল দূরবর্ত্তী এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দুই সহস্র ফিট্ উচ্চে।

সীতাবেঙ্গা পাহাড়ের তত্ত্ব

প্রায় ৮০।৯০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। মধ্যপ্রদেশের শিরগুজা করদরাজ্যের অন্তর্গত লক্ষণপুর নামে একটী জমিদারী পরগণা আছে। ইহারই একটী পাহাড়ের নাম রামগড়। এই পাহাড়ে দুইটী অমূল্য নাট্যরত্ন খচিত গুহার আবিষ্কার হইয়াছে। কর্ণেল আউজলী (J. R. Ouseley) গুহা দুইটীর সন্ধান পাইয়া তথায় যাইয়া দেখিতে পান যে উহাদের প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে।

রামগড় পাহাড়টী কিন্তু খুব নির্জ্জন নয়। এখানে রঘুনাথের একটী ভগ্নপ্রায় মন্দির এখনও আছে, হিন্দুমাত্রই এই মন্দিরে সমাগত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। নিকটে আরও কয়েকটী ভগ্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে সীতা, লক্ষ্মণ, মহাবীর প্রভৃতির মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরেই এইখানে মেলা হইয়া থাকে এবং হিন্দুমাত্রই এই মেলায় সমবেত হয়।

এই রামগড়* পাহাড়ের উত্তর দিকে একটী সুড়ঙ্গপথ আছে, উহার দৈর্ঘ্য ১৮০ ফিট, এবং পথটী মোটেই সরু নয়। একটী বৃহদাকার হস্তী অনায়াসে এই পথ দিয়া যাইতে পারে, তাই সুড়ঙ্গটীর নাম 'হাতিপুল'। পাহাড়ের পশ্চিমে দুইটী গুহা আছে এবং ইহাদের প্রবেশদ্বারও পশ্চিম দিকে। এই দুইটীর উত্তর দিকের গুহাটীর নাম সীতাবেঙ্গা ও দক্ষিণ দিকটীর নাম যোগীমারা। উভয় গুহা দুইটীই যোগীদের আবাস স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার থিয়োডর ব্লক্ গুহা দুইটী দেখিতে যান এবং প্রাচীর গাত্রের খোদিত লিপি ও চিত্রাদির ফটো তুলিয়া লইয়া আসেন। অনুসন্ধানে বুঝা গেল যে ঐ সকল লিপি কাব্য ও নাটক সম্পর্কিত। ডক্টর ব্লকের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীর নামানুসারে গুহাটীর নাম হয় সীতাবেঙ্গা। ইহার আকৃতি গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ—অর্দ্ধবৃত্তাকার (Resembles in all details the plan of a small Greek Amphi-Theatre)। গুহার মধ্যে প্রাচীরগাত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, অনুমান হয় গর্ত্ত গুলিতে লৌহদণ্ড প্রোথিত করিয়া পর্দ্দা টাঙ্গানো হইত। গুহার বাহিরে কতকগুলি সারি সারি সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আসনের সংখ্যা পঞ্চাশ কি কিছু বেশী হইবে। আসনগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত ছিল। গুহাটীর দৈর্ঘ্য ৪৬ ফিট ও প্রস্থে ২৪ ফিট। গুহার অভ্যন্তরেও তিন দিকে তিন সারি আসন আছে। আসন শ্রেণীর প্রত্যেকটীর উচ্চতা ২॥০ ফিট, প্রস্থ ৭ ফিট। গুহার ভিতরে এবং বাহিরের আসন শ্রেণীর অস্তিত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রীষ্ম এবং শরৎঋতু দর্শকগণ গুহার বাহিরে এবং বর্ষা ও শীতকালে ভিতরে বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন।

সীতাবেঙ্গা গুহার লিপি উদ্ধার করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে বসন্তকালে যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, চারিদিক সঙ্গীত ও বাদ্যে মুখরিত হইয়া, হিন্দুর প্রধান উৎসব "দোলযাত্রা" সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়, সীতাবেঙ্গায় আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং অভিনয় সকলের প্রাণে আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিত।

ব্লক সাহেব তাঁহার নবাবিষ্কারের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। তবে একটী বিষয়ে তিনি একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি গ্রীক্ মঞ্চের কথাই শুনিয়াছেন হিন্দুর রঙ্গভূমির কথা তো শুনেন নাই, তাই গ্রীক্ মঞ্চের অনুরূপ বলিয়া উক্ত গুহাটীর পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে গুহাকার দ্বিতল মঞ্চের উল্লেখ আছে—

> কার্য্যায়সং প্রতিদ্বারং দ্বারবিদ্ধং ন কারয়েৎ
> কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।

সীতাবেঙ্গার রঙ্গমঞ্চ ইহারই একটী হইবে।

দ্বিতীয় গুহা যোগীমারায় যে লিপি উৎকীর্ণ আছে ব্লক সাহেব নিম্নলিখিত উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—

(১) শুতনুক নাম
(২) দেবদাশিক্যি
(৩) শুতনুক নাম দেবদাশিক্যি
(৪) তম কময়িথ বলনশেয়ে
(৫) দেবদিনে নাম লুপদখে

কথাকয়টী একত্র করিলে ইহার অর্থ হয় যে, দেবদিন নামক সুদর্শন রূপদক্ষ যুবক শুতনকানাম্নী এক দেবদাসীর প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হন। হয় তো এই প্রেম কাহিনীর মধ্যে

* গত ১৯৪০ সালের কংগ্রেস অধিবেশন রামগড়ে হয়। মৌলানা আজাদ সভাপতি হয়েন।

কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই ইহা শিলালিপিতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, কোন রসজ্ঞ ভাস্কর তাঁহার গভীর ভালবাসার কথা স্বহস্তে গুহাপ্রাচীরে লিপিবদ্ধ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

যোগীমারা গুহাটীতে আরও লিপি আছে, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে একথা ঠিক যে এই গুহায়ও এখনও একটি মঞ্চ বিদ্যমান আছে। উহাতে বোধ হয় সঙ্গীত ও আবৃত্ত্যাদি হইত।

রামগড় পাহাড় ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় পাহাড়ের রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব বা নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। নাসিকের পর্ব্বত গুহায় নাট্যাভিনয়ের স্মৃতিচিহ্ন পুলমায়ির রাজত্বকালের। ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। কলিঙ্গের খরবেলাতে হাতিগুম্ফ শিলালিপি হইতেও প্রাচীন ভারতের অভিনয় প্রথার চিহ্ন পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুহাকার রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে আছে।

আবার বলি ডাক্তার ব্লক বলিয়াছেন বলিয়াই মনে করিবেন না যে, গ্রীকমঞ্চের নিকটই ভারতীয় মঞ্চ ঋণী। ভারতের নাট্যকলা সম্পূর্ণ মৌলিক। তবে একটা গোল বাধিতে পারে হিন্দু নাটকের "যবনিকা" কথাটীতে। ইহাতে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন গ্রীক Ioian রূপান্তরই যবনিকা, আর গ্রীসদেশের Ioian জাতির সহিত হিন্দুদের প্রথম পরিচয় হওয়ায় তাহারা যবনিকা কথাটী গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ যুক্তির মূলে অনেকটা ভ্রম দেখা যায়। যবনিকা যে গ্রীক সংগৃহীত নয়, তাহা অনেকেই বলিয়াছেন :—

(১) গ্রীস অভিনয়ে যবনিকার ন্যায় কোন পর্দ্দাই ছিল না ······ (ডাঃ কীথ্)।

(২) যবনিকার সহিত গ্রীক নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই ······ (উইণ্ডিস্)।

(৩) যবন শব্দে কেবল Ioian জাতিকেই বুঝায় না, গ্রীক অধিকৃত পারস্য, মিশর, সিরিয়া বাক্‌ট্রিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের সহিতই 'যবন' শব্দ সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত দেশের নিকটই যদি এই কথাটী পাওয়া গিয়া থাকে, তবে গ্রীকসংস্রব প্রমাণিত হয় কিরূপে ? পণ্ডিত সিলভা লেভি দৃঢ় ভাবে বলেন, পারস্য দেশ আনীত কারুকার্য্যখচিত পরদা যবনিকা আখ্যা পাইয়াছিল।"

কিন্তু এ যুক্তিও খুব যৌক্তিক নয়। পারস্য কেন, অন্য কোন জাতি হইতেই হিন্দুরা 'যবনিকা' শব্দ গ্রহণ করেন নাই। বহু হিন্দু গ্রন্থে যবন, যবনী শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যবনীরা হিন্দুরাজগণের মস্তকে ছত্রধারণ করিত, চামরব্যজন করিত ও তাহাদিগকে পরিচর্য্যা করিত। এই যবনী স্ত্রীলোকরা অভিনয়ের সময় পট বা পর্দ্দা টানিয়া ধরিত। তাই যবনিকা অর্থে 'পট' বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ যবনিকা কথার অর্থও পট। আমাদের দেশের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ রমেশ দত্ত মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে, যবনিকা এই যমনিকা শব্দের রূপান্তর মাত্র। চলতি কথায় 'ম' 'ব'তে পরিণত হইয়াছে, যেমন আমকে অনেক স্থলে আঁব বলে।

তারপরে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে যবন ও যবনী শব্দের উল্লেখ আছে। কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলায় যবনীর উল্লেখ করিয়াছেন—

এসো বাণাসণ হত্থাহিং জবনীহিং
বনপুপ্পমালা ধারিনীতিং

রঘুবংশেও বর্ণিত আছে যে, রাজা রঘু পারস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং পারস্যদেশের নর্ত্তকীদিগকে তিনি যবনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ।

দিগ্বিজয়ী রঘুর সময় হইতেই এই যবনীগণ ভারতে আনীত হয় এবং অনেক নৃপতির গৃহে তাহারা বেতনভোগী হইয়া অবস্থান করিত।

মালবিকাগ্নিমিত্রেও বর্ণিত আছে যে পুষ্পমিত্র রাজার অশ্ব সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে উপস্থিত হইলে একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পুরাণে আছে সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরে বাস করিত বলিয়া তুর্ব্বসুর সন্তানগণ যবনাখ্যা প্রাপ্ত হয়। সিন্ধুর অপর তীরবর্ত্তী স্থান য়্যাটক, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান গান্ধার প্রদেশ বই আর কিছুই নয়, উহা

ভারতেরই অন্তর্গত। অতএব 'যবন' ভারতবর্ষের স্থান বিশেষেও বাস করিত।

পাণিণির 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'তে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। তাহারা নাকি শয়নাবস্থায় ভোজন করিত। মনুর পুত্র পিসধ্র গাভী হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ও তাহার সন্তান সন্ততি 'যবন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন যে যবন জাতি সম্পূর্ণরূপে মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন!

এমন একদিন ছিল আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া যদি কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করিত বা স্বধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত তাহাকেই যবন বলিয়া সমাজচ্যুত করা হইত। এদিকে আবার হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি মাত্রই আর্যগণ কর্ত্তৃক যবনাখ্যা প্রাপ্ত হইত।

অতএব দেখা যায় 'যবনিকা' হইতে যবন অর্থাৎ গ্রীক সংস্রব কি প্রভাব প্রমাণিত হয় না। ভারতবর্ষে যবন বলিয়া জাতি ছিল, পারসীয় যবনা নর্ত্তকীগণ হিন্দুর গৃহে অবস্থান করিত। আর একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকারগণ 'যবনী' প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে পরিচিত হইয়াও 'যবনিকা' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ভবভূতি, ভাস ও শূদ্রকও ঐ কথাটী ব্যবহার করেন নাই। যদি গ্রীক্ প্রভাব ভারতীয় নাটক ও রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হইত তবে সে প্রভাব হইতে এই সমস্ত নাট্যকারগণ সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন কিরূপে?

আমরা দেখিতে পাই যে সর্ব্বপ্রথম রাজশেখর তাঁহার 'কর্পূর মঞ্জুরীতে' যবনিকা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রাজশেখরের—সময়কাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী। অর্থাৎ ভারতীয় নাট্যকলা পরিপুষ্টির অনেক পরে।

অতএব হিন্দুর নাটক ও রঙ্গমঞ্চ যে সম্পূর্ণ আদিম ও অকৃত্রিম এবং গ্রীকপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, একবিষয়ে আর কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না!

দ্বিতীয় প্রমাণ—সংস্কৃতে রচিত অমর নাটকরাজির সহিত গ্রীক নাটকের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

সংস্কৃত নাটকের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মহাকবি কালিদাসের কথা। কালিদাসের নাম স্মরণ মাত্রেই প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় গৌরব, গর্ব্ব ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্ব্বশী' এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' এই তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠরত্ন। এই নাটকখানি পাঠ করিয়াই প্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি গেটে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বলিয়াছিলেন,

"Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
is one sole name Gombiue ?
I name, thee, O Shakuntala ;
and all at once is said"

বাসন্তং কুসুমং,-ফলং চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ যদ্।
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়ো-
রৈশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্॥

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মিঃ চেজীর (Mr. Chazy) সঙ্কলিত শকুন্তলা নাটক পাঠ করিয়া গেটে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় পরিপূর্ণ।*

অভিজ্ঞান শকুন্তলার ঘটনা বৃত্তান্ত এইরূপ—

হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি রথে চড়িয়া একটি মৃগের অনুসরণ করিতেছিলেন। মৃগটি যেন কোথায় আত্মগোপন করিল। রাজা সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৃগটি কোন্ পথে গিয়াছে। সারথী পথ-নির্দ্দেশ করিলে রাজা দুষ্মন্ত সেই পথ অনুসরণ করিয়া মৃগটিকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শরাহত মৃগ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অতি দ্রুত দৌড়াইতে দৌড়াইতে বৈখানস ঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মৃগের অনুসরণ করিয়া রাজাও তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঋষি বৈখানস তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এ আশ্রম-মৃগ বধ করিবেন না।" দুষ্মন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বৈখানস অকৃতদার অপুত্রক

* This letter is to be found in Hixxel's introduction to his German Translation of Shakuntala.

রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মহারাজ, আপনার রাজ-চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ হউক।"

অতঃপর রাজা ঋষি কণ্বের আশ্রমে যাত্রা করিলেন। দুষ্মন্ত অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন মহর্ষি কণ্ব তপশ্চর্য্যার জন্য হিমাচল পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন, কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা অতিথি-চর্য্যার জন্য আশ্রমে রহিয়াছেন। আশ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজা দুষ্মন্ত রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং রাজ-আভরণ ও ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া বিনীতবেশে কণ্বমুনির আশ্রম-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সহসা তাঁহাকে বিস্ময়-চকিত করিয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। রাজা ভাবিলেন, "এই মুনির আশ্রমে পত্নীলাভ!" কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এইখানেই সমাপ্ত হইল না। তরুণী-কণ্ঠের কলধ্বনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—"সখি, এই দিকে, এই দিকে।" রাজা বিস্মিত হইয়া আলবালে জল-সেচন-নিরতা শকুন্তলাকে দর্শন করিলেন; ভাবিলেন, "অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।" রাজ-অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরীদের কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল; ভাবিলেন, "এই তন্বী অপ্রচুর বল্কল-পরিহিতা হইলেও কিন্তু অধিক মনোহারিণী—ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।"

মুগ্ধ দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া শকুন্তলা এবং তাহার সখীদ্বয়কে দেখিতে লাগিলেন। এ দিকে সহকার-বৃক্ষ ও বনজ্যোৎস্নাকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে দেখিতে শকুন্তলা বলিলেন, "সখি, সহকারের সহিত বনজ্যোৎস্নার মিলন কি রমণীয় সময়েই না হইয়াছে! সহকার আজ নবপল্লবিত, উপভোগে সমর্থ, বনজ্যোৎস্নাও নবযৌবনা।"

প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শকুন্তলা এত উৎসুক হইয়া বনজ্যোৎস্নাকে দেখিতেছে কেন জান?"

অনসূয়া। "না, তা ত' জানি না।"

প্রিয়ম্বদা। "শকুন্তলা ভাবিতেছে, বনজ্যোৎস্না যেমন যোগ্য বর লাভ করিয়াছে, আমারও যেন তেমনি একটি সুন্দর বর হয়।"

বৃক্ষান্তরাল হইতে আশ্রমবাসিনী এই তিনটি তরুণীর রহস্যালাপ শুনিতে শুনিতে দুষ্মন্তের হৃদয়ে শকুন্তলাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল, তিনি ভাবিলেন, "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহ ক্ষমা, তাহা না হইলে আমার শুদ্ধচিত্ত ইহার অভিলাষী হইল কেন?"

এদিকে শকুন্তলা নবমালিকায় জল সেচন করিতেছিলেন। মধুপানরত একটি ভ্রমর জলসেচনে ত্রস্ত হইয়া নবমালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত কুসুম সদৃশ শকুন্তলার মুখের উপর উড়িয়া পড়িতে লাগিল। রাজার মনে হইল, "এই মধুকরই যথার্থ কৃতী। আমরা শুধু তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াই মরিলাম।" ভ্রমর কিন্তু কিছুতেই শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার সখীদ্বয়কে অনুনয় করিতে লাগিল। সখী দুইজন কিন্তু স্মিতহাস্য করিয়া বলিল, "আমরা তোমাকে রক্ষা করিবার কে? রাজাই তপোবনের রক্ষক, তুমি রাজা দুষ্মন্তকেই স্মরণ কর।" রাজা দুষ্মন্তও দেখিলেন আত্মপ্রকাশের উত্তম সুযোগ। তিনি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পৌরবরাজ কর্তৃক ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি ভাবিলেন এই তপোবনবিরোধী ভাব মনে উদিত হইতেছে কেন? দুষ্মন্তের পরিচয় শুনিয়া অনসূয়া রহস্য করিয়া বলিল, "ধর্ম্মচারিগণ তাহা হইলে আজ সনাথ।" 'সনাথ' শব্দটি শুনিয়া শকুন্তলার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তখন একসঙ্গে দুই সখী প্রশ্ন করিলেন, "শকুন্তলে, তাত কন্ব যদি আজ আশ্রমে থাকিতেন তাহা হইলে কি হইত?"

কথা প্রসঙ্গে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিচয় লাভ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার আশা দুরাশা নয়—"ন দুরবাপেয়ং খলু প্রার্থনা।" দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। গান্ধর্ব্ব পরিণয়ে তাহাদের এই প্রেম পূর্ণতা লাভ করিল। কিন্তু তারপর আসিল বিদায়ের সময়, দুষ্মন্তকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অভিজ্ঞান স্বরূপ শকুন্তলাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া রাজা রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

দুষ্মন্ত প্রস্থান করিবার পর শকুন্তলার চিত্ত দুষ্মন্তময় হইয়া গিয়াছিল—প্রিয়তমের চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ভরপুর। এ দিকে দুর্ব্বাসা ঋষি আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু দুষ্মন্তের চিন্তায় বাহজ্ঞান শূন্য শকুন্তলার কর্ণে অতিথির আগমন বার্ত্তা পৌঁছিল না। ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "যাহার চিন্তায় তুই অতিথির অবজ্ঞা করিলি সে তোকে বিস্মৃত হইবে।"

প্রিয়ম্বদার অনুনয়ে দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমার শাপ ব্যর্থ হইবে না, তবে অভিজ্ঞান দর্শনে শাপ অন্ত হইবে।"

তারপর কণ্বমুনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধ্যানযোগে শকুন্তলার পরিণয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবে শকুন্তলা সম্বন্ধে কোন কথাই দুষ্মন্তের স্মৃতি পথে উদিত হইল না। এ দিকে অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার এই ভীষণ সঙ্কটে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া অপ্সর তীর্থাভিমুখে চলিয়া গেল।

শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট সেই অঙ্গুরী একটি রোহিত মৎস্য খাদ্য ভ্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এক ধীবর ঐ মৎস্যটিকে ধৃত করে। মাছ কাটিবার সময় ধীবর সেই অঙ্গুরীয়কটি প্রাপ্ত হয় এবং উহা বিক্রয় করিতে যাইয়া চোর সন্দেহে ধৃত হয়। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়াই রাজার মনে শকুন্তলার স্মৃতি জাগ্রত হইল।

শকুন্তলার স্মৃতি যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় স্বর্গ হইতে ইন্দ্রের আহ্বান আসিয়া পৌছিল—দানব যুদ্ধে দুষ্মন্তের সাহায্য প্রয়োজন। যুদ্ধ শেষ করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দুষ্মন্ত কশ্যপ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে শকুন্তলার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইল।

মালবিকাগ্নি মিত্র

বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্র তাঁহার মহিষীর সখী মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজ বিদূষক গৌতমের সহায়তায় রাণী ধারিনী উভয়ের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। ইতিপূর্ব্বে ধারিনী এবং তাঁহার সপত্নী উভয়েই এই প্রণয় ব্যাপারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী

প্রতিষ্ঠানাধিপতি মহারাজ পুরুরবা কেশী দৈত্যকে পরাজিত করিয়া উর্ব্বশীকে মুক্ত করেন। ইহার পর হইতে পুরুরবা এবং উর্ব্বশী উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়েই উভয়ের জন্য ব্যাকুল কিন্তু রাণী উশীনরী প্রতিবাদিনী। এ দিকে, একদিন দেবসভায় ভরত প্রণীত 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' অভিনয় হইতেছিল। লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন উর্ব্বশী। পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে অভিনয়ের সময়েও পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে পুরুরবার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিল। এই অপরাধে ইন্দ্র তাহাকে স্বর্গ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। অনেক অনুনয়, অনেক মিনতির পর, ইন্দ্র তাহাকে পুত্রলাভ পর্য্যন্ত পুরুরবার সহিত থাকিতে আদেশ দেন। উশীনরীও পতির কার্য্যে বাধা দিবেন না প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর পুরুরবার সহিত উর্ব্বশীর আর একবার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সাময়িক। উর্ব্বশী পুত্রলাভ করিবার পরও ইন্দ্র তাহাকে পুরুরবার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

কালিদাসের নাটক তিনখানির গল্পাংশ খুব সংক্ষেপে এখানে আমরা উল্লেখ করিলাম। এক্ষনে নাটকে রস সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত চিত্রিত করাই যদি নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে, নানাবিধ রস সৃষ্টি করিয়াও কালিদাস নাটক তিনখানিতে এই ঘাত-প্রতিঘাত বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মালবিকাগ্নির ধারিণীর চরিত্র উদ্বেগ, ঈর্ষা, নৈরাশ্য, রোষ, অভিমান, শ্লেষ মালবিকালাভে ধারিণী ও ইরাবতীর প্রতিদ্বন্দিতা প্রভৃতি নাট্য সম্পদে অতুলনীয়। পুরুরবার সহিত উর্ব্বশীর মিলন ও বিচ্ছেদ, উশীনরীর আত্মত্যাগ অতি উজ্জ্বলভাবে বিক্রমোর্ব্বশীতে চিত্রিত হইয়াছে আর শকুন্তলার তো কথাই নাই। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ নাটক আর দ্বিতীয় নাই।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন। বিক্রমাদিত্য শকদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করেন। প্রচলিত মতানুসারে কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিত-দিগের মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ।

কালিদাস ও সেকস্‌পীয়রের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধান। অথচ অনেকেই উভয় কবির মধ্যে রচনা ও ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তবে, সংস্কৃতনাটক মিলনান্তক আর সেকস্‌পীয়রের অনেক নাটকই বিয়োগান্ত।

বিশেষতঃ কালিদাসের ধারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর সেক্‌স্‌পীয়রের ধারা জাতীয় আদর্শের অভিব্যক্তি।*

কালিদাস এবং পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাট্যকারগণের অঙ্কিত বিদূষক-চরিত্র এবং সেক্‌স্‌পীয়রের ফুলস্ (Fools) প্রায় একই রকমের, হাস্য পরিহাসে উভয়েই দর্শক ও পাঠকের আনন্দ বর্দ্ধন করে। কিন্তু বিদূষকের বিশেষত্ব রাজার প্রণয় ব্যাপারে সহায়তা করায় আর সেক্‌স্‌পীয়রের 'লীয়ার' প্রভৃতি নাটকের 'ফুলের' (Fool) বিশেষত্ব নিজের বিপদ সত্ত্বেও কঠোর অপ্রিয় সত্যবাদিতায়। তবে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক-চরিত্রের অভিব্যক্তিই যে সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের বিদূষক-চরিত্রে হইয়াছে আর Piechel on Home of Puppet Plays গ্রন্থেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন—"Hindu Vidushaka is the original of the buffoon who appears in the plays of the medeaval Europe."

"ভাস" এর নাটকাবলী

"মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের প্রস্তাবনায় মহাকবি কালিদাস সূত্রধারের মুখে বলিয়াছেন—

"প্রথিতযশাং ভাসসৌমিল্লঃ কবিপুত্রাদিনাংনাটকানতিক্রম্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।" অর্থাৎ ভাস প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথিতযশা কবিগণের নাটক অতিক্রম করিয়া নূতন রচনায় কালিদাসের বহু মান অর্থাৎ গর্ব্ব করিবার কারণ কি?

পরবর্ত্তী কবি বাণভট্টও ভাসের কবি-যশ স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

> সূত্রধার-কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ
> সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।

রাজশেখরও ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তে'র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব্ব নাটক কোন সমালোচকের অগ্নি-পরীক্ষাতেই ভস্মীভূত হইতে পারে না।" "প্রকৃত গন্ধবহের" কবি বাক্‌পতিও ভাসের নাম বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

*কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইতে চাহিলে পাঠককে স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের "শকুন্তলা তত্ত্ব" গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

কালিদাস, বাণভট্ট, বাক্‌পতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথিতযশা কবি ও দৃশ্যকাব্যরচয়িতা এই ভাস কে? এই কবির সহিত এতদিন কাহারও কোন পরিচয় হয় নাই—এই রত্ন ছিল এতদিন লুপ্ত, তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা এতদিন ছিল প্রচ্ছন্ন—লোক চক্ষুর অন্তরালে। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে সম্প্রতি এই রত্নের উদ্ধার হইয়াছে।

কিছুদিন হইল থিরুবাঙ্কুর (ত্রিবাঙ্কুর) রাজ্যে মহাকবি ভাসের রচিত কয়েকখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রকাশন কার্য্যের অধ্যক্ষ পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পদ্মনাভপুরের নিকটবর্ত্তী "মনলিক্কর" মঠে তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত দশখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। 'ইউরেকার' ন্যায় আকাশলব্ধ দুষ্প্রাপ্য রত্ন এই পুথিগুলি এতদিন অজ্ঞাত ছিল। নবাবিষ্কৃত এই দশখানি মহামূল্য নাটকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) স্বপ্নবাসবদত্তা (২) প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধারয়ণ (৩) পঞ্চরাত্রম্ (৪) চারুদত্ত (৫) দূতঘটোৎকচ (৬) অভিমারক (৭) কর্ণ চরিত (৮) মধ্যম ব্যায়োগ (৯) কর্ণভার (১০) উরুভঙ্গ।

পুঁথিগুলি তালপত্রে "মালয়ালম্" অক্ষরে লিখিত। পুঁথিগুলি অন্ততঃ খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন। নাটকগুলি অবশ্য রচিত হইয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বে।

বাত্তথুরুত্তির সন্নিহিত কলসপুরের গ্রহাচার্য্য গোবিন্দ শিরোমণি শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়কে আরও তিনখানি নাটক প্রদান করিয়াছেন। এই নাটক তিনখানির নাম (১) অভিষেক নাটক (২) প্রতিমা নাটক (৩) দূতবাক্যম্।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার আদেশে রাজ-দরবার হইতে এই ত্রয়োদশখানি দৃশ্যকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে মহীশূর এবং বিজয়নগরের রাজসরকারও শাস্ত্রী মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল মহাশয় ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহাকবি ভাস খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথম পাদে কাণ্ববংশীয় নৃপতি নারায়ণের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ডাক্তার কীথ্ এবং উইন্টারণিজ

বলেন যে, মহাকবি ভাস ছিলেন কালিদাসের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বের নাট্যকার। কারণ, তাঁহারা বলেন, ভাস রচিত নাটকগুলির ভাষা ও রচনাভঙ্গীর সহিত অশ্বঘোষ অপেক্ষা কালিদাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং অশ্বঘোষ প্রথম শতাব্দীর এবং কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়া ভাসের সময়কাল বোধ হয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী হইবে।

রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাই ভাস-রচিত নাটকের প্রধান অবলম্বন। তন্মধ্যে অভিষেক এবং প্রতিমা নাটক রামায়ণ বর্ণিত আখ্যায়িকা আর সমস্ত নাটকই মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। তেরখানা নাটকের মধ্যে পাঁচ খানা নাটকেই মাত্র একটি করিয়া অঙ্ক। এই পাঁচখানা নাটকের নাম (১) মধ্যম ব্যায়োগ (২) দূতবাক্যম্ (৩) দূত ঘটোৎকচ (৪) কর্ণভার এবং (৫) উরুভঙ্গ। পঞ্চরাত্র নাটকে আছে তিন অঙ্ক। প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ এবং চারুদত্ত এই দুই নাটকের অঙ্ক চারিটি বাল চরিতের পাঁচ অঙ্ক এবং স্বপ্নবাসবদত্তা এবং অভিসারক নাটকের ছয় অঙ্ক। সাত অঙ্ক আছে কেবল অভিষেক এবং প্রতিমা নাটকে।

ভাসরচিত অধিকাংশ নাটকেই সুলভ রসিকতার কোন স্থান নাই, অপ্সরার রুণুঝুণুও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবজীবনের যে বিবিধ বিচিত্র ভাব, তাহা অতি সুন্দরভাবেই ভাসের নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটী বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে যে, কালিদাস যে খুব বড় কবি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাসের নাটক পাঠ করিলে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের যে বিশেষ সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং এই উন্নত রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া রচিত ভাসের নাটকাবলী তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এ সম্বন্ধে ডক্টর উইণ্টারনিজও লিখিয়াছেন—Kalidas may be a greater poet and greater master of language but as drama of his or any of the later poets, could not be compared as a stage-play with any of the thirteen plays ascribed to Bhasa.—Indeed these dramas are the works of a dramatic genius wonderfully connected with the Stage.

বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ "শারীপুত্র প্রকরণ" এবং আরও দুইখানা নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই নাটক তিনখানির কোন কোন অংশ মধ্য এশিয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অশ্বঘোষের আবির্ভাব হইয়াছিল। অশ্বঘোষ, ভাস এবং কালিদাস ব্যতীত প্রাচীন যুগের আরও একজন শক্তিশালী নাট্যকারের পরিচয় আমরা পাই। ইনি 'মৃচ্ছকটিকা' নাটক রচয়িতা রাজা শূদ্রক। রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইনিও নাট্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা শূদ্রককে অনেকে কল্পিত (legendary) ব্যক্তি বলিয়াই মনে করেন। কেবল অধ্যাপক ষ্টেন্ নো (Prof. Sten Know) তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, আভীর-নৃপতি শিবদত্তই রাজা শূদ্রক। ইনি খ্রীষ্টীয় ২৪৮-৯ অব্দে চেদীরাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে রাজা শূদ্রককে "মৃচ্ছ-কটিকা" নাটকের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন দণ্ডী এই নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতের অনুকূলে তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সারবত্তা তেমন বিশেষ কিছুই নাই।

মৃচ্ছ-কটিকা শব্দের অর্থ মৃৎ অর্থাৎ মৃত্তিকার+শকটিকা - Toy Cart. ভাসের "চারু দত্ত" এবং শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকা" একই আখ্যান ভাগ লইয়া রচিত—চারুদত্ত এবং বসন্তসেনার প্রণয়-ব্যাপারই উভয় নাটকের বিষয়। অনেক সমালোচকের মতে উভয় নাটকই একই নাট্যকারের রচনা। কিন্তু এই মত যুক্তিমূলক নহে। নাটক দুই খানির মধ্যে পার্থক্য অনেক। মৃচ্ছকটিকার মূল আখ্যানের সহিত অনেক কূট-রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয় জড়িত রহিয়াছে, কিন্তু "চারুদত্ত" নাটকের ঘটনার সহিত রাজনীতির কোন সংস্পর্শ নাই। কৃষকপুত্র আর্য্যক রাজা পালককে রাজসিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, "চারুদত্ত" নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু মৃচ্ছকটিকাতে নাই। চারুদত্তের পুত্র আসিয়া বলিয়াছিল তাহার একটা মৃচ্ছকটিকা আছে। তাহার এই কথা হইতেই নাটকের নাম "মৃচ্ছকটিকা" হইয়াছে।

ভাসের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে। কিন্তু ভাস এবং কালিদাস উভয়ের মধ্যবর্ত্তী

বৎসরের মধ্যে কোন নাটক রচিত হইয়াছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতইতিহাসের এই যুগটিকে উজ্জ্বলতম যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৌভাগ্য সম্পদে, জ্ঞানানুশীলনে ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠযুগে কোন নাটক রচিত হয় নাই একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভারতের সৌভাগ্য যেমন একদিন সমগ্র পৃথিবীর ঈর্ষার উদ্রেক করিত, তেমনি তাহার দুর্ভাগ্যও ঘটিয়াছিল খুবই। বহুবার বৈদেশীক আক্রমণে ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্য যেমন লুণ্ঠিত হইয়াছে তেমনি তাহার জ্ঞান-সম্পদে পরিপূর্ণ অনেক অমূল্য গ্রন্থও বিনষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থ একদিন অপরিমেয় যশার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে সেগুলির অধিকাংশের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত। এই সকল পুস্তকের পুনরুদ্ধার করিতে আরও যে কত গণপতি শাস্ত্রীর প্রয়োজন হইবে, তাহা কে জানে ?

মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীহর্ষ। "রত্নাবলী," "নাগানন্দ" এবং "প্রিয়দর্শিকা" এই তিনখানি নাটক শ্রীহর্ষ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। থানেশ্বর এবং কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীহর্ষ অভিন্ন বলিয়াই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কেহ কেহ আবার উল্লিখিত নাটক তিনখানি হর্ষবর্দ্ধনের রচিত নহে বলিয়া সন্দেহ করেন। রাজা হর্ষবদ্ধনের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। মম্মথ ভট্ট তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে রাজা হর্ষবর্দ্ধন বাণ কবিকে কাহারও কাহারও মতে কবি ধাবককে স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। টিকাকারগণ এই স্বর্ণদানকে অবলম্বন করিয়াই 'রত্নাবলী' নাটক বাণ রচিত কিন্তু উহা শ্রীহর্ষ রচিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ যে "নাগানন্দ" নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা I-sting স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। দামোদর গুপ্ত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রত্নাবলী শ্রীহর্ষ রচিত তাহা দামোদর গুপ্ত তাঁহার "কুত্তমিমত" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌশাম্বী অধিপতি মহারাজ উদয়নের প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার মাতুল বিক্রমবাহু ছিলেন সিংহলের অধিপতি। বিক্রমবাহুর এক কন্যা ছিল, তাহার নাম রত্নাবলী। যিনি রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন তিনি সসাগরা ধরিত্রীর এক-ছত্রাধিপতি হইবেন এই কথা শ্রবণ করিয়া কৌশাম্বী-রাজ তাহার পাণি-প্রার্থী হইয়া বিক্রমবাহুর নিকট প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পাছে ভাগ্নেয়ী বাসবদত্তার প্রাণে কোনরূপ কষ্ট হয় এই আশঙ্কায় সিংহবাহু রাজা উদয়নের হাতে রত্নাবলীকে সম্প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মন্ত্রী তখন বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিংহলরাজ রত্নাবলীকে কৌশাম্বী প্রেরণ করিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু সমুদ্রপথে জলযান ভগ্ন হইয়া গেলে কৌশাম্বী দেশীয় বণিক-গণ রত্নাবলীর প্রাণ রক্ষা করিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি আবার তাহাকে সাগরিকা নাম প্রদান করিয়া রাজমহিষী বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করেন।

মদনোৎসবের সময় সাগরিকা মহারাজ উদয়নকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সাগরিকা রাজার একটি চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল এমন সময় তাহার সখী সুসঙ্গতা তাহা দেখিতে পাইয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তির পাশে সাগরিকার ছবি অঙ্কিত করিয়া দিল। ইতিমধ্যে রাজপশু-শালার একটি বানর শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় সাগরিকা ও সুসঙ্গতা চিত্রফলক ঐস্থানে ফেলিয়া কোন বৃক্ষের অন্তরালে প্রস্থান করিলেন।

রাজা উদয়ন চিত্র দর্শন করিয়া সাগরিকার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং সুসঙ্গতা রাজাকে সাগরিকার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, চারিচক্ষের মিলন হইল। ক্রমে রাণী বাসবদত্তা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া সাগরিকাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং প্রচার করিলেন তাহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। অতঃপর মন্ত্রীর চেষ্টায় এক ঐন্দ্র-জালিকের ক্রীড়াপ্রদর্শন উপলক্ষে সাগরিকার সত্য পরিচয় প্রকাশিত হয়। তখন স্বয়ং বাসবদত্তা সাগরিকাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করেন।

নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকার ঘটনাবলীও এরূপ চমকপ্রদ।

[ক্রমশঃ

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সাত

ভেঙ্গেছে ভোজের বাজি, শূন্যময় সব আজি।

দীনেশচরণ বসু

সামান্য ঘটনা লইয়া এতবড় একটা কলহ ও অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সুব্রতের কাছে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।

মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটি পথ। এই পথটি নদীর পার হইতে সোজাসুজি চলিয়া গিয়া পশ্চিম দিকের মাঠের ভিতর দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এ পথটি পুরাণো পথ এবং সাধারণের চলাচলের পথ। এ পথ দিয়া বিবাহের শোভাযাত্রাও যেমন চলে তেমনি শবযাত্রাও চলে। যাহাকে ঐ অঞ্চলে বলে 'সাদি গমি'র রাস্তা। এ পথ এক সময়ে ছিল প্রশস্ত, পরিস্কৃত এবং গ্রামের একমাত্র সুন্দর পথ। এখন এ পথের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিকের বাড়ী হইতে অনেক খানি নিজ নিজ দখলে আনিয়া পথটি সংকীর্ণতর করা হইয়াছে। এখন ইহার আকার অনেকটা দু'পেয়ে পথের মত। প্রাচীন অধিবাসীরা মৃত, তাহাদের বংশধরেরা প্রবাসী। আর কোন দিন গ্রামে ফিরিবে কি না তাহাও কেহ জানে না। মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ গ্রামে নবাগত। পদ্মায় তাহার পৈত্রিক নিবাস ভাঙ্গিয়া ফেলায় এ গ্রামে মাতুলবাড়ী আসিয়া বাস করিতেছেন। মাতুল বংশের কেহই বাঁচিয়া নাই, কাজেই মাতুল সম্পত্তি পাইয়া তিনি এ গ্রামে বেশ স্থায়ী ভাবেই বাস করিয়া আসিতেছেন কয়েক বৎসর যাবত। গ্রামের লোকের কাছে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি—বিশেষতঃ নিঃস্ব, দরিদ্র, নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু বৎসর দারোগাগিরি করিয়া এবং প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেশ আরামে বাস করিতেছিলেন। মহাজনী কারবারেও টাকা বাড়িতেছিল, আর গ্রামের মধ্যে কলহ বাঁধাইয়া মহকুমায় মোকর্দ্দমার তাঁদ্বির করিয়াও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বাড়ী ছিল নিষ্কর্ম্মাদের মস্ত একটি আড্ডা। তাস পাশার আড্ডা জমিত আর পান তামাক চলিত সমান ভাবে, সে দলের মধ্যে এমন কেহই ছিল না যাহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কিছু না কিছু টাকা না ধারিত। এ সব কারণে গ্রামের লোকদের মধ্যে অনেকেই ছিল তাঁহার পক্ষপাতী এবং অনেক কিছু অন্যায় কাজও ইহাদের দিয়াই সম্পন্ন করাইত।

মোহন চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "দেখুন কবরেজ মশাই, আপনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না বলে দিচ্ছি। আপনাকে গ্রামের দশজনে মানে, আপনি এ সব ব্যাপারে দূরে থাকলেই ত' পারেন।"

কবিরাজ মহাশয় শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দেখুন, এ পথ গ্রামের পথ, সরকারি কাগজ-পত্রেও এ পথের কথা আছে, নক্সা আছে, আপনি একজন শিক্ষিত লোক হয়ে এ পথটি তৈরী করতে দিবেন না, একি অন্যায় নয়?"

চট্টোপাধ্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, "অন্যায়? কিসের অন্যায়?"

"অন্যায় এই যে, গ্রামের লোক চায় যে, গ্রামের সংস্কার হয়, পুরাণ পথ ঘাটের সংস্কার হয়, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয়, ব্যারাম পীড়া দূর হয়, গোপাঠ বা গোচারণ ক্ষেত্রগুলি আবার পশ্বাদির খাদ্য শস্যে পরিপূর্ণ হয়, একি কোন অন্যায় কাজ? বলুন আপনি? আপনিই ত সেদিন আমাদের হিতসাধিনী সভায় সকলের আগে প্রস্তাব করেছিলেন, এ রাস্তাটির সংস্কারের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডে দরখাস্ত দিতে। এবং সকলেই একযোগে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন রাস্তার কাজ আরম্ভ হবার সময়ে কেন বাধা দিচ্ছেন বলুন ত?" কবিরাজ মহাশয় বিদ্রোহী দুই দলকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বেশ ধীর ভাবে এ কথা কয়টি বলিলেন।

মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "আমি কি তখন ভেবেছিলাম যে, আপনারা সত্য সত্যই এত তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজে লেগে যাবেন?

একটি যুবক কহিল, "আপনারা প্রাচীন, আপনারা বিজ্ঞ,

কোথায় আপনারা এ সব কাজে উৎসাহ দিবেন, তা না হয়ে কোথাকার কয়েকটা ভাড়াটে লাঠিয়াল এনে আমাদের গায়ে লাঠি তুলতে হুকুম দিলেন।”

চট্টোপাধ্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, “কিছু অন্যায় করিনি। তোমরা গ্রামের ছেলেরা যে ভাবে আমার বাড়ী চড়াও করেছিলে, যে রকম করে ‘বন্দেমাতরম্’ বলে চেঁচাচ্ছিলে, সে চীৎকার শুনে আমার ব্রাহ্মণী ত ডাকাতে বাড়ী চড়াও করেছে বলে একেবারে বাইরে ছুটে এসেছিলেন।”

তরুণটি কহিল, “মিথ্যা কথা!”

“কি আমি মিথ্যা কথা বলি। সেদিনকার ছেলে তুমি, আমায় বল মিথ্যাবাদী। চল্লাম আমি।” চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “স্বীকার ক’রলাম ছেলেরা অন্যায় করেছে। আমি তাদের শাসন করবো, কিন্তু আপনি তাদের গায়ে লাঠি তুলতে হুকুম দিলেন কোন মুখে? এ ছেলেরা ত কোন দোষ করেনি। কুলি মজুর গেছে রাস্তাটা ঠিক করতে আমাদের নির্দ্দেশ মতে আর আপনি নিজে আমাদেরই একজন হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েও দিচ্ছেন বাধা?”

চট্টোপাধ্যায়ের দলের লোকদের মধ্য হইতে একজন কহিল, “আরে মশায়, আপনিই ত আস্কারা দিয়া পোলাগুলির মাথা খাইবেন? আমারাও মশায় এ গ্রামের লোক, কোন দিন ত দেখি নাই, ঐখান দিয়া সাদিগমির রাস্তা। আসেন চাটয্যে মশায়, এ ঠাকুরে দেবত্ব নাই। জয় মা তারা!”

আর একজন কহিল, “কব্‌রাজের বড় বাড়াবাড়ি অইচে। সবটার মধ্যেই আসেন মাতব্বরি করতে। আপনে ডরান কেন্? যদি ফৌজদারি করাও হয় করবেন দুই নম্বর। দেইখ্যা লইমু, আমরাও আছি সাক্ষী দিতে হয় মুন্সীগঞ্জ গিয়া দিমু।”

চাটুয্যে মহাশয় কোন মীমাংসার জন্য আর অপেক্ষা করিলেন না, সদলবলে সদর্পে চলিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শত অনুরোধেও তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না।

গ্রামের ঐ একটি পথ। সে পথ যদি বন্ধ হয় তবে মানুষ চলিবে কেমন করিয়া। আর গ্রামের সংস্কারই বা হইবে কিরূপে? অথচ কত কষ্টেই না গ্রামের কল্যাণকামী কয়েকজন ভদ্রলোক ও শিক্ষিত কয়েকজন যুবক নানারূপ দরবার করিয়া এ পথটির সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহা কি না ব্যর্থ হইতে চলিল। গ্রামের লোকেরা যদি নিজেদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইতে না চাহে তবে কে তাহাদের মুক্ত করিবে! কবিরাজ মহাশয় মনে মনে এই কথাই ভাবিতেছিলেন।

পল্লী সংস্কারকামী তরুণের দল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কহিল, “দেখুন কবিরাজ মশায়, আমরা কোন দিন আপনার কথা অমান্য করিনি, কিন্তু আজ করবো। চাই না কুলি-মজুর, আমরা নিজেরা কোদাল ধরবো, মাটি কাটবো, জঙ্গল সাফ করবো, দেখি কে বাধা দেয়।”

শিবানন্দ কবিরাজ মহাশয় একটি যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখ সুবোধ, তুমি কেমন করে সবার বিরুদ্ধে যাবে?”

সুবোধ সে বৎসর বি-এ পাশ করিয়া দিনাজপুর জেলার কোন এক মফঃস্বলের স্কুলের মাষ্টারি করিতেছিল। সে শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া কাকা ও কাকীমার কাছেই মানুষ হইয়াছে। নিঃসন্তান মোহন চট্টোপাধ্যায় সুবোধকে নিজের পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করিতেন এবং তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। সুবোধ পল্লী সংস্কারকদের মধ্যে ছিল একজন প্রধান। তাহার পিতৃব্যের ব্যবহারে সে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু সে কি করিতে পারে?

সুবোধ মৃদু স্বরে কহিল, “জ্যাঠামশাই,” কবিরাজ মহাশয়কে সে জ্যাঠামশাই বলিয়া সম্বোধন করিত। “দেখুন, কোন দেশের কোন মহৎ কাজই কি বিনা বাধায় হয়েছে?”

“হয়নি স্বীকার করি, কিন্তু কি করবে বল? কত বড় দুর্ভাগ্য আমাদের এই সব শিক্ষিত পুরুষদেরও বোঝাতে পারি না। শুধু আপনার স্বার্থটাকেই বড় করে দেখলে ত চলে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ কি বেশী দিন বেঁচে থাকে? মানুষ মরে, কিন্তু জাতি বাঁচে যদি মানুষের মত মানুষ তাকে গড়ে তোলে।” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “এই গ্রামের অবস্থাই দেখ না কেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল দেহি দেহি রব—খেতে দাও, ঔষধ দাও, পথ্যি যোগাও, কি করে পারি বলত! তারপর পথ ঘাটের দুরবস্থাও দিন রাতই দেখতে পাচ্ছ! বাড়ীর সামনের জঙ্গলটুকু কেউ পরিষ্কার করবে না। পুকুরের পানা কেউ তুলবে না। এ

কিসের সমাজ? বলতে পার কিসের আমাদের অহঙ্কার? তোমরা কি মনে কর কয়েকজন উকীল, ব্যারিষ্টার, আর সরকারী কর্ম্মচারী নিয়েই সমাজ?"

সুবোধ কহিল, "নিশ্চয়ই নয়, জানেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাইরে পড়ে রয়েছে বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ। লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ মজুর, দীন দরিদ্র নরনারী রয়েছে, যারা বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত প্রাণ। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, 'A nation dwells in cottages' আমাদের বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এ কথা যেমন খাটে, এমন অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না। সেই গ্রামকে যদি আমরা কেবলি পিছে ফেলে রাখি, তবে কেমন করে গ্রামের মঙ্গল হবে! ছেলে বেলায় পড়েছিলাম—

অধর্ম্মের পথে ভাই ধর্ম্মপথে অরি,
ধর্ম্মপথে চল ভাই সহোদরে ছাড়ি।

আমি ঠিক করেছি যে করেই হউক দেশের কাজে লেগে যাব।"

সুবোধের কথায় কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "দেখ সুবোধ, আমি বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে ও এই বার্দ্ধক্যে কোন দিন গ্রামকে পরিত্যাগ করিনি, আমি এ গ্রামের প্রত্যেক ধূলিকণাকে মাথার মণি বলে গ্রহণ করি, এ গ্রামের গাছপালা আমার দেবতা, কিন্তু কিছু কি করতে পেরেছি। দিনের পর দিন গেছে, মানুষ করবার জন্য চেষ্টা করেও নিঃস্বার্থ যুবকসঙ্ঘ গড়ে তুলতে ত পারলাম না। কেবল দল গড়া, কেবল পরনিন্দা, আপনাকে বড় বলে ভাবে, এ করে করেই বৎসরের পর বৎসর কেটে গেছে কিছু করে উঠতে পারি নি। ওহে সুবোধ, আমার দেশ, আমার জাতি, আমার বাড়ীকে আমি সুন্দর করবো, ধনে মানে সম্ভ্রমে ও স্বাস্থ্যে বড় করে তুলবো, এমন ভাবনা কোন দিন ত আমাদের মনে আসে না।"

আর একটি যুবক কহিল, "দেখুন, আমাদের লজ্জায় মাথা নীচু হয়, যখন দেখি আমাদের গ্রামের দুর্দ্দশা, শুনি লোকের মুখে নিন্দা। না-না, যা হবার হবে আমরা আছি আপনার সঙ্গে, বিদ্রোহী আমরা হবই, তবে এ বিদ্রোহ ত বিপ্লব নয়, এ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টি করবো কল্যাণের পথ। রাজপুরুষেরা আসবেন আমাদের পল্লীর কল্যাণ করতে এমন আশা করা ভুল। প্রত্যেক জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে তাহাদের নিজেদের শক্তি ও সাধনা। প্রত্যেক মানুষ আপনাদের উদ্ধার আপনারাই কি করবে না!"

কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত তরুণদের সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তবে এস আমরা পণ করি, পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামের উন্নতি করবো সব দিকে। পারবে তোমরা আমার সঙ্গে কাজ করতে? আছে সে সাহস তোমাদের।"

যুবকেরা সমবেত কণ্ঠে কহিল, "আছে-আছে-আছে।"

সুব্রত তাহার ঘরে বসিয়া গ্রামবাসী তরুণদের এই উৎসাহ পূর্ণ বাণী শুনিয়া প্রাণের মধ্যে একটা নবীন প্রেরণা অনুভব করিল। তাহার প্রাণেও আবার উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত হইল, সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, তাহাদের কথা।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "দেখ, আমরা আগে একটা পরিকল্পনা তৈরী করবো। তারপর ধীরে ধীরে কাজ সুরু করে দেবো। দেখি কে আমাদের বাধা দেয়। তবে এখন আমরা রাস্তার কাজে হাত দিয়েছি, সে কাজ কাল থেকেই সুরু করবো। তোমরা লাঠি খেয়েছ, সে লাঠি যে কতখানি আমার গায়ে এসে পড়েছে তা ত তোমাদের বোঝাতে পারবো না। কাল সকালেই এস তোমরা, আমি সকলের আগে কোদাল ধরবো চাটুয্যে ম'শায়ের বাড়ীর কাছে, দেখি তিনি কি করেন। আমরা ত কোন অন্যায় করতে যাচ্ছি না, যতটুকু চওড়া পথ, যতটুকু জমি সর্ব্বসাধারণের বরাবর অধিকারে রয়েছে জনসাধারণের সে স্বত্ব লোপ করে ফেলার শক্তি কারু নাই। বরং যিনি সে কাজে বাধা দিবেন, তিনিই করবেন অন্যায়। আমি গ্রামের দীন-দরিদ্র, অক্ষম সকলের হয়ে চাই গ্রামের কল্যাণ, লাঠির ঘায়ে মারা যাই সেও ভাল। অন্যায়কে বাধা দিতেই হবে, তাতে যদি মৃত্যু আসে তাও মঙ্গল।"

তরুণের দলও পণ করিল, তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে এ কার্য্যে তাঁহার সহায় হইবে।

এমন সময় ঘটিল এক অভাবনীয় ঘটনা।

উমা বিস্রস্ত বসনে আলুলায়িত কেশে সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম ও রক্তাক্ত চিহ্ন লইয়া আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল।

কবিরাজ মহাশয় চমকিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। উমার দুই গণ্ডে রক্ত চিহ্ন, হাতে রক্তের

দাগ, চোখের কিনারায় রক্ত, সুন্দরী উমাকে এইরূপ নিপীড়িতা অবস্থায় দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "উমা কি হয়েছে ?

উমা কহিল, "আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে !"

যুবকেরা ও কবিরাজ মহাশয় উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "কি কি হয়েছে ?"

উমা সংক্ষেপে যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, কাল সন্ধ্যার পর মাধব মামা ও কয়েকজন বিদেশী লোক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকে। উমা তাহার বাবাকে কহিল, দেখুন ত বাবা, কে আমাকে ডাকছে ! তাহার বাবা বাহিরে আসিয়া দেখিল, মাধব মামা ও কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি। মাধব তাহার বাবাকে কহিল, উমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

রামগতি কহিলে, "কেন সে যাবে ?"

মাধব কহিল, "আমাদের ইচ্ছা। আপনাকেও চিরদিনের জন্ম এ গ্রাম ছাড়তে হবে, নইলে ভাল হবে না।"

রামগতি কহিলেন, "দেখুন আচার্য্য মশায়, আমাকে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন করেও কি আপনার সাধ মিটল না। কেন আমি গ্রাম ছেড়ে যাব ? কেন আমার ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাব।"

মাধব বলিল, "আমি আপনাদের সঙ্গে করে নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। আপনাদের খোরাক পোষাকের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের এ গ্রাম ছাড়তেই হবে।"

রামগতিও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফলে তর্কাতর্কি ও অবশেষে কলহ আরম্ভ হইল। তারপর সে শুনিল তাহার পিতার কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ।

উমা পিতার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার বাবা মাটিতে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহার পিঠে আঘাতের চিহ্ন। মাথায় রক্তের দাগ। উমা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সে সাহায্য চাহিয়া চীৎকার করিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। ঐ অপরিচিত লোক কয়টা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া একটা নৌকায় তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহার চীৎকার শুনিয়া নদীর পার হইতে কয়েকটি লোক ছুটিয়া আসায় সে মুক্তি পাইয়া এখানে আসিয়াছে। উমা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

উমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুব্রত বাহিরে আসিয়া ঐ শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এদিকে উমার পিতা হতভাগ্য রামগতিকে যখন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে আনা হইল, তখনও তাহার জ্ঞান হয় নাই।

গ্রামের যুবকেরা প্রাণপণ সেবা ও যত্ন করিল। সাধ্যমত চিকিৎসারও ক্রটি হইল না, কিন্তু রামগতি বাঁচিলেন না। হতভাগ্য রামগতি দুঃখ, দারিদ্র্য ও নির্য্যাতন সহিয়া চলিয়া গেলেন সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে। উমা পিতার শবদেহের কাছে বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না। সে যেন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ পাষাণ প্রতিমা। সুব্রত আপনাকে সংযত করিতে পারিল না। এমন একটা দুর্ঘটনার ও সেও বিচলিত হইল। কিন্তু কি সে করিতে পারে ! এ গ্রামে থাকিতে তাহার মন সরিতেছিল না। সে স্তব্ধ হইয়া তাহার ঘরখানিতে বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ
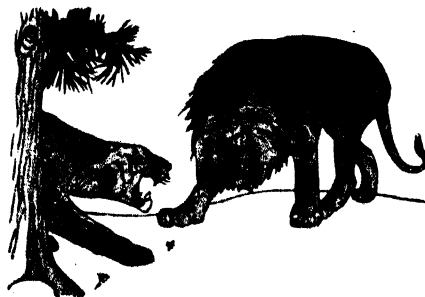
রাজসিংহের ভূমিকা

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

আট

গত শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসিংহের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা পাঠকের নিকট অনেক কথা নিবেদন করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইতিহাসেই যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুরাগেই দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া বঙ্কিম কর্ত্তৃক অভিহিত না হইলেও, ইহাদের ভিত্তি ইতিহাসের উপরেই। এইগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া এইসব পুস্তকে ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের দোষত্রুটী দেখাইতে যাহারা প্রয়াস পান, আমরা তাহাদিগকে প্রতিবাদ করিয়া কোন কথা লিখিতে চাই নাই। কিন্তু "রাজসিংহের" কথা স্বতন্ত্র, এখানি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন—

"আমি পূর্ব্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারাম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

আর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনার সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন "যুদ্ধাদির ফল ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা উদিপুরী ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেব চরিত্র বর্ণনা করিয়া আরও লিখিয়াছেন—

"কথিত আছে নৃত্যগীত কেহ করিতে না পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এই উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

"ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ খুল্লতাত ও সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গণাগণও যে মদ্যপায়িণী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।"

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইহার ঘটনাবলী বাস্তব সত্যের উপর নির্ভরিত এবং ইহার কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিম জোর করিয়া লিখিয়াছেন, অথচ আজ ভূমিকা লিখিতে গিয়া যদি কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চান যে, বঙ্কিম যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা মূলতঃ সত্য নয়, তবে সাধারণ লোকের মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মিবে যে বঙ্কিম ইতিহাস ভাল জানিতেন না, বঙ্কিমের ইতিহাসের ভিত্তি কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং ঐতিহাসিক ইতিহাস প্রণয়ণে বঙ্কিমের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে আমি যাহা লিখিলাম তাহা অনুমানের কথা নয়। দেখিতে পাইতেছি যে, অর্ব্বাচীন লেখকরা এইরূপ বলিয়াও থাকেন। কেহ কেহ আবার একথা বলিতেও ত্রুটী করেন না যে, "দেখ, বঙ্কিম বন্দেমাতরম্ লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু সপ্তকোটি কথাটা কবি সুলভ ভাষা, বঙ্কিম মুসলমানদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাদের নিন্দার কথা পাইলেই তিনি মুখর হইয়া উঠেন, বিদ্বেষবশতঃই তিনি অকারণে ঔরঙ্গজেব চরিত্র বিকৃত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।" তাই এই সমস্ত লেখকগণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে আমরা সচেষ্ট হইতেছি।

বঙ্কিম কোন জিনিষই রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিতেন না। তাই যেমন ওসমান, মোবারক, আয়েষা, দলনী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আবার ঔরঙ্গজেব, কতলুখাঁও অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বঙ্কিমের উপর খড়্গাহস্ত। তাঁহারা বলেন চন্দ্রশেখর, চন্দ্রচূড়, সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক প্রভৃতি চরিত্র আঁকিলেও কেন তিনি পশুপতি ও হরবল্লভ

প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত করিলেন। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমরা রাজসিংহ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব এবং এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই পূর্ব্বোক্ত উক্তি এতই যুক্তিহীন এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত যে খণ্ডন করা একান্ত প্রয়োজনীয় ও হিন্দুমুসলমানের হিতমূলক মনে করিয়াই আমরা বিজ্ঞ ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উক্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি—

(১) রূপনগরের কাহিনী প্রকৃতই সত্য,

(২) রাজসিংহ যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন, তাহা যশোবন্ত কর্ত্তৃকও লিখিত হয় নাই (আর্ম্মি) বা শিবাজী কর্ত্তৃকও হয় নাই (সরকার) পরন্তু এ বিষয়ে মহামতি টডের উক্তিই খাঁটি সত্য,

(৩) "ঔরঙ্গজেব মহারাণার সৈন্য কর্ত্তৃক ঘেরাও হইয়া একদিন অনাহারে কাটাইলেন, উদিপুরী বেগম বন্দিনী হইবার পর রাণা তাঁহাকে মুক্তি দিলেন"—স্যার যদুনাথ যে লিখিয়াছেন তাঁহার কথা প্রকৃত নহে,—এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই সত্য কথার অবতারণা করিয়াছেন,

(৪) যুদ্ধে রাণার সাহস, ব্যূহরচনাপ্রণালীর কৌশল, পরিচালনাশক্তি নিতান্তই অতুলনীয়,

(৫) ক্ষমাশীলতায় রাণা শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না,

(৬) যুদ্ধে রাণার জয় হইয়াছিল,

(৭) সন্ধিতে রাণা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছিলেন। জিজিয়া কর বন্ধ হইয়া যায়,

(৮) রাণা ও রাজপুতগণ প্রাণতুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন,

(৯) তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জাতীয়তা ছিল।

এতদ্ব্যতীত স্যার যদুনাথ যে দেখাইয়াছেন, "পিসী ভাইঝী (অর্থাৎ রোশেনারা এবং জেব-উন্নিসা) উভয়ে অনেক স্থলেই মদন মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন" বঙ্কিমের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, আমরা তাহাও খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিম জেব-উন্নিসার চরিত্র প্রকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াও ক্রমে তাহাকেই আবার অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে শ্রেষ্ঠমানবী-চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, স্যার যদুনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বিবৃত করিয়াছেন বঙ্কিম সেদিক হইতে সে চরিত্র বিচার করেন নাই; তাই স্যার যদুনাথ বঙ্কিমের মতের সহিত তাঁহার পার্থক্য কোথায় তাহা দেখাইয়া ঐতিহাসিক বিষয়ে আলোচনা করিলেই ভাল করিতেন।

যাহাহউক, স্যার যদুনাথ অথবা অন্য কোন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি এবিষয়ে আলোচনা করিয়া সাধারণের নিকটে তাঁহাদের এবিষয়ে বক্তব্যগুলি উপস্থিত করিলেই ভাল হইত। কিন্তু যদিও আমরা এবিষয়ে কোন মত যুক্তি পাই নাই। পরম্পর শুনিতে পাইলাম দুই একজন ব্যক্তি নাকি এবিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "মনুচীর উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এসমস্ত লিখিয়াছি। মনুচীর উক্তি সর্ব্বথা গ্রহণীয় নয়, কেননা তিনি দারার পক্ষানুবর্ত্তী ছিলেন।" এই সমস্ত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলেন তবে আমরাও তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারি। যাহাহউক তাঁহাদের এরূপ উক্তিতে মনুচী সম্বন্ধে সাধারণের কুসংস্কার জন্মিবার যে সম্ভাবনা, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

মনুচী যে এদেশে অনেকদিন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাজাহানের জীবিতাবস্থায়ই সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে যখন বিবাদ সুরু হয়, তখন তিনি আগ্রা আসিয়া দারার অধীনে বারুদখানায় কাজ গ্রহণ করেন। তিনি দারার প্রধান Artillery man হইয়াছিলেন। মনুচী দারার গুণে ও মধুর ব্যবহারে এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে দারার দুরদৃষ্টের পরে অনুরুদ্ধ হইয়াও ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। এইখানে মনুচীর পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা উচিত ব্যবহারের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং মনুচীর কথাকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

তথাপি যখন যুদ্ধ হয় দারা এবং ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এবং মনুচী একজনের পক্ষে ছিলেন তখন পোষকতা মূলক প্রমাণ ব্যতীত মনুচীর কথা গ্রহণ করা অযৌক্তিক না হইলেও, দেশবাসীকে আমরা কেহ মনুচীর কথাই অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব না। তাই এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে পোষক প্রমাণ ব্যতীত মনুচীর কথা বস্তুতঃই আমরা গ্রহণ করি নাই। এ সময়ে বার্ণিয়ারও ভারতে ছিলেন এবং তিনি

ঔরঙ্গজেবের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিও অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। টেভার্ণিয়ারও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন আর ঔরঙ্গজেব তাহার বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন, টেভার্ণিয়ারও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই বার্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ার, দারা ও ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, মূলতঃ মনুচীর উক্তি তাহাতে সমর্থিত হইলেই মনুচীর এতৎসম্পর্কীয় কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছি, নতুবা নয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ মোরাদ ও ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে পূর্ব্বে বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে একজন রাজসিংহাসন লইবেন, অপরজন পাঞ্জাব, কাবুল দেশ প্রভৃতি পাইবেন। ইহা কেবল কোন একজন মুসলমান ইতিহাস লেখকের উক্তি মাত্র। কিন্তু স্যার যদুনাথ ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি দেখিলাম যে, স্কুল পাঠ্য একখানি ইতিহাসে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতই দিয়াছেন। এখানে মনুচী বলেন, ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মের ভাণ করিয়া মোরাদকে বশীভূত করেন, সাম্রাজ্য বিভাগের কোন কথা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে মনুচীর উক্তি গ্রহণীয় কি না, তাহাই বিচারের বিষয়।

কিন্তু এই উক্তিতে দেখিতেছি কেবল ঔরঙ্গজেবের পক্ষানুবর্ত্তী বার্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ারই মনুচীর উক্তি সমর্থন করেন নাই, এমন কি খাপি খাঁর পর্য্যন্ত সেই রূপই উক্তি। সুতরাং এখানে নিশ্চয়ই মনুচীর কথা অকাট্য সত্য। আমিও এইরূপ ক্ষেত্রেই মনুচীর উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সময়ান্তরে সব কথাই পাঠকের নিকট বিবৃত করিব। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও স্যার যদুনাথ অথবা তাহার কোন মতানুবর্ত্তী ব্যক্তি যদি বলেন যে, মনুচী দারার লোক ছিলেন বলিয়া তাহার এইরূপ উক্তিও অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়া উচিত, আর মনুচীকে সমর্থন করিয়া তাহারাও কলুষিত হইয়াছেন তবে পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, এইরূপ যুক্তিতে কোন সার পদার্থই নাই। স্যার যদুনাথ প্রভৃতি যাঁহারা ঔরঙ্গজেবকে কারণে অকারণেই 'হিরো' করিতে চান, তাঁহারা দেখিতেছি এই সব যুক্তি সত্ত্বেও অর্থাৎ বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার, খাঁপিখান প্রভৃতির উক্তিসত্ত্বেও ইচ্ছামত দুই এক জনেরই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পরিমাপ করিয়া যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে মনুচীর কথা অসমর্থিত, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। এবং পাঠকবর্গকেও তাহা গ্রহণ করিতে বলি নাই। সুতরাং মনুচীর সমর্থিত উক্তি গ্রহণ করিয়া আমরা কি অন্যায় করিয়াছি ?

কিন্তু রাজপুত যুদ্ধের কাহিনী এ পর্য্যায়ে পড়ে না। রাজপুতগণের সহিত মনুচীর পরিচয় ছিল না। হিন্দুগণ সম্বন্ধে তাহার ধারণাও খুব ভাল ছিল না। বিশেষতঃ রাজপুত যুদ্ধ হয় দারার সহিত যুদ্ধেরও বিশ বৎসর পরে। আর তখন মনুচী ফিরিয়া আসিয়া ঔরঙ্গজেবের পক্ষেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষতঃ মনুচী দারাকে যেরূপ ভালবাসিতেন ঔরঙ্গজেব পুত্র শাহ আলমকে তদপেক্ষা অনেক বেশী ভালবাসিতেন। মনুচী দারার হঠকারিতা প্রভৃতি কতিপয় দোষের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু শাহ আলমের কোন দোষের কথা বলেন নাই। শাহ আলমের মাতা (ঔরঙ্গজেবের প্রধানা বেগম) মনুচীকে খুব স্নেহ করিতেন, তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। তাহাকে পুত্রবৎ দেখিতেন। যেবার যুদ্ধে তিনি শাহ আলমের সহগামীই ছিলেন। এমতাবস্থায় দারার ব্যাপারে যে সমর্থন প্রমাণের আবশ্যক হয়, রাজপুত এবং পর্ত্তুগীজদিগের সহিত দ্বন্দ্ব ব্যাপারে সে প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এই সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর বিববরণ হিসাবে বৈদেশিক ভ্রাম্যমাণের বিবরণ গ্রহণ করিলে ইতিহাসের মূল্য বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণই গ্রহণীয় না তাঁবেদার প্রণীত বিবরণই গ্রহণীয়। পাঠকই বিচার করুন বঙ্কিম সত্য বলিয়াছেন কি না যে—

"প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী, হিন্দু-দ্বেষক, হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন, বিশেষতঃ, মুসলমানদিগের চিরশত্রু রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতি পক্ষপাত নাই, এমন নহে।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে আমরা যে ইতিহাস প্রদান করিয়াছি তাহা সদসনদ্ বিচার করিয়া দিয়াছি। যেখানে অবস্থা এবং পোষণমূলক কথার সহায়তা লইবার আবশ্যক হইয়াছে, এবং যখনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে তখনই তাহা গ্রহণ করিয়াছি। মনুচীর প্রদত্ত বিবরণ—তাই অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এরূপ ভাব পোষণ করি নাই। বস্তুতঃ যদি মনুচী, বার্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ারকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব ?"

যাহা হউক, এ সকল কথার পুনরালোচনা না করিয়া এখন একটী দরকারী বিষয়ের উল্লেখ করিব। রাজসিংহ প্রণয়ণ কালে বঙ্কিম বলিয়াছেন—

"ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।"

এই সামান্য কথাটীকে অনেকেই সাদাসিধে ভাবে বুঝিয়া বলিয়াছেন, "বাহুবল দেখানোই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য, তাই উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাস বেশী ভাল হইবে না। বঙ্কিমের ন্যায় সাহিত্য-সম্রাটের পক্ষে ব্যক্তি বিশেষের পলোয়ানগিরি দেখাইতে হইলে মেনাহাতী অথবা স্বর্গগত পরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় একজন কুস্তিগীর সম্বন্ধে লিখিলেই যথেষ্ট হইত। আর রাজসিংহ এমন বিরাটকায় বা অমিতবলশালী ব্যক্তিও ছিলেন না যে তাঁহাকেই আদর্শ স্বরূপ দেখাইতে হইবে। তবে রাজসিংহ লিখিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কথায় কথায় তিনি জাতির উল্লেখ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।" তাই রাজসিংহকে উদাহরণ স্বরূপ বলিলেও তিনি 'রাজপুতজাতি সম্বন্ধেই' মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, "মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।" এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র—জাতিই বুঝাইতেছেন। এ সম্বন্ধে আরও ভাল করিয়া দেখা যাউক।

বঙ্কিম রাজসিংহে লিখিয়াছেন, "ভারতকলঙ্ক নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে কারণের মধ্যে নহে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।" সুতরাং বাহুবল ব্যতীত বঙ্কিমের অন্য কোন জিনিষের দেখানোই প্রয়োজনে হইয়াছে। সে জিনিষটী কি?

তাই বলি হিন্দুদিগের বাহুবল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য হইলেও যদি কেহ 'ভারত কলঙ্ক" না পড়িয়া রাজসিংহ পড়েন, তবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'রাজসিংহে' ধরিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পণ্ডিত প্রবর স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় "রাজসিংহের ভূমিকায়" এই বিষয়টী কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' লেখেন ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শনে।" এইরূপ প্রবন্ধ লিখিবার দ্বাদশ বৎসর পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আবার 'প্রচারে' "বাঙ্গলার কলঙ্ক" লেখেন। উভয় প্রবন্ধের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা নিজেই লিখিয়াছেন—

"যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ 'প্রচার' সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গলার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তান মাত্রেই আমাদের সহায় হউন।

"যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক! এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার।"

এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটী বাহির হইবার পরেও ৭।৮ বৎসর পরে "রাজসিংহ" লিখিত হয়। সুতরাং 'ভারতকলঙ্ক' অথবা উহার পরিশিষ্টাংশ 'বাঙ্গালার কলঙ্কে' বঙ্কিম কি বলিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "রাজসিংহের ভূমিকায়" স্যার সরকার কিছু বলেন নাই।

আর একটী কথাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'প্রচার'ও 'নবজীবন' বাহির হয় ১৮৮৪ সালে। প্রথম হইতেই 'প্রচারে' কতকগুলি বহুমূল্য প্রবন্ধ বাহির হয়—যেমন "হিন্দুধর্ম্ম"। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।" অতঃপরে প্রচারে "কৃষ্ণ চরিত্র"ও বাহির হইয়াছে এবং তিনি দেখাইয়াছেন সম্যক অনুশীলিত মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ পুরুষ।" ঠিক এই সময়ে "নবজীবনে" বাহির হইয়াছে "ধর্ম্মতত্ত্ব" বা অনুশীলন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন Substance of religion is Culture. অর্থাৎ যিনি সমস্ত বৃত্তি অনুশীলিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই ধর্ম্মশীল ব্যক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই তত্ত্ব "প্রফুল্ল" চরিত্রেও দেখাইয়াছেন, তাই দেবী চৌধুরাণী একখানি দেব-গ্রন্থ। রাজসিংহ উপন্যাস খানিতেও দেখিতে পাই রাজসিংহ সম্যক অনুশীলিত চরিত্র। তাহার দৈহিক বল যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার সব বৃত্তিগুলিই সম্যক

বশীভূত। জানি না, পূর্ব্ব হইতে এই ভাবেই অর্থাৎ এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি রাজসিংহের চরিত্র অঙ্কন করিতে চাহিয়াছিলেন কি না। কিন্তু এই রূপই হইয়া পড়িয়াছে। তাই রাজসিংহ পড়িবার পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণ চরিত্র, হিন্দুধর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া লইলেই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে—নতুবা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে একজন বলশালী ব্যক্তির চরিত্র উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি একদিকে যেমন সম্যক অনুশীলন সিদ্ধ একজন বীরের চরিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন আবার জাতি প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তির আদর্শও উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জাতি প্রতিষ্ঠা কি, 'ভারতকলঙ্ক' বলিতে তিনি কি বুঝেন, বাঙ্গলার সত্যই কোন কলঙ্ক আছে কিনা, কি ভাবে সেই কলঙ্ক অপনোদিত হইতে পারে, বঙ্কিম উক্ত দুইটী প্রবন্ধে বড় সুন্দর ভাবে কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা আগামী বারে এই দুইটী প্রবন্ধ সম্বন্ধে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য উপস্থিত করিয়া পাঠকের নিকট ভিতরের সবকথাগুলি বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

উপসংহারে বলিতে চাই যে, বঙ্কিমই যে বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের পথ প্রদর্শক, এ বিষয়ে আর কেহ বলুন আর না বলুন, পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছেন। রাখালবাবু লিখিতেছেন—

"এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।" আজ কতিপয় অর্ব্বাচীন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহাই বলুন, রাখালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞানগরিমায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।" আজ কত লোক আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিন্তু সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, জ্ঞানের প্রভায় বঙ্কিম এতই গরীয়ান যে তদপেক্ষা বড় ঐতিহাসিক এ পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। বস্তুতঃ বঙ্কিম কেবল সাহিত্য সম্রাটই নহেন, ইতিহাস আলোচনায় বর্ত্তমান বাঙ্গালার অনুসন্ধিৎসু লেখকগণের তিনিই গুরু। রাখাল বাবু সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ঐতিহাসিক। এই রাখালদাস বাবু বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গালার কলঙ্কের অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধিৎসু লেখক খুব বেশী দেখি নাই। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইঁহারাও বঙ্কিম কর্ত্তৃক যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ অক্ষয় বাবু সম্বন্ধে রাখালদাস বাবুই লিখিয়াছেন, "আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের একটী কথাই বোধহয় অক্ষয়কুমারকে সিরাজদ্দৌলা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।" সে কথাটী কি, তাহাও আগামী বারে পাঠকগণকে উপহার দিয়া এই সমস্ত বিষয়ের বিষদালোচনা করিব। ইতিহাসজ্ঞ, জাতীয়তার ঋষি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমই করিয়াছিলেন "বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নতুবা বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।" আমরা সেই ঋষির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বঞ্চিত হইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাহার ব্যর্থতা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়া, আর যেন আপনাদিগকে আরও কলঙ্কিত না করি, ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

[ক্রমশঃ

———

বাংলা কথা-সাহিত্য

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, এম-এ

বাংলা কথা-সাহিত্যের আকাশে তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সকলেরই চোখে পড়ে :—(১) বঙ্কিমচন্দ্র, (২) রবীন্দ্রনাথ এবং (৩) শরৎচন্দ্র। ইঁহাদের ছাড়া আর যে সমস্ত কথা-সাহিত্যিক বাঙ্গালায় ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যাইবার মত রচনা ও বিষয়বস্তু তাঁহাদের আছে কি না সন্দেহ। তবে আধুনিক প্রগতি-মূলক কথা-সাহিত্যের কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। কিন্তু এই সকল সাহিত্যিকের মধ্যে এখনও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা দেখা দেয় নাই।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহাকে বাঙ্গালার স্যর ওয়াল্টার স্কট বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় বিদেশী লেখকদের অনুপ্রেরণা ছিল না, এমন নয়। তবে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে বাঙ্গালার সামাজিক বহু সমস্যার চিত্র স্বকীয় উপন্যাসগুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রাজরাজড়ার চরিত্র লইয়া রচিত। কয়েকখানিতে ভাষাও বড় সংস্কৃত ঘেঁষা। কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ লইয়া তিনি যে সমস্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেই গুলিতেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে এবং ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম ও রাজনীতি মূলক উপন্যাস "আনন্দ মঠ" ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রতিভার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী, এমন কি মহত্তর উত্তরাধিকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে সাইকোলজিক্যাল নভেল বলিলেই ভাল হয়। আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলির অবতারণা ও আলোচনা তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। রাজনৈতিক সমস্যাও বাদ যায় নাই। নারী ও পুরুষের মনোভাবের পরস্পর সংঘাত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। এমন কি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা "যোগাযোগ" নামক উপন্যাসে সাইকো-এনালিসিস ও প্রগতি-সাহিত্যের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের ষ্টাইল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। তবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাঙ্গালী জীবনের সাধারণ সমস্যাবলীর নিখুঁত চিত্র। বিশেষ করিয়া নারী-সম্প্রদায়ের প্রতি বাঙ্গালী সমাজের নিষ্ঠুর এবং ভণ্ড ব্যবহার শরৎচন্দ্রের কলমের মুখে এক নূতন সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে। আধুনিকতম রাজনৈতিক মতবাদ ও সমস্যাগুলির অবতারণাও তাঁহার "পথের দাবী"তে স্থান লাভ করিয়াছে। "পল্লী-সমাজ" বাঙ্গালার পল্লী-সমাজের এক করুণ চিত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্রের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হইয়াও বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে তেমন আদর লাভ করিতে পারে নাই। বিশ্বমানবের জগৎ-জোড়া সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনায় এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ছোট বড় কোনও কথা-সাহিত্যিকই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। তাই বাংলা-সাহিত্যে টলষ্টয়, গোর্কি, রোমা রোলাঁর উপন্যাসের মত একখানি বইও আজ পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার বড় জোর কেরাণীর জীবন-কথা ও তাহার সমস্যার আলোচনা বাংলা কথা-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। মানব সমাজের বৃহত্তম অংশ সমাজের ধন-উৎপাদক শ্রমিক-কৃষকের জীবন কথা ও সমস্যা লইয়া এক-আধখানি উপন্যাস বাংলায় লেখা হইলেও, প্রথম শ্রেণীর বই একখানিও নাই। বিশ্ব মানবের চিরন্তন রহস্যময় সমস্যাগুলি লইয়াও আমাদের কথা-সাহিত্যিকরা মাথা ঘামান নাই।

আসল কথা, আমাদের লেখকগণ যে মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই সমাজের চরিত্র চিত্রনেই মনোযোগ দিয়াছেন। মাত্র দু' একজন লেখক কয়লাখনির কুলি, নৌকার মাঝি প্রভৃতির জীবন-চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু সে পরের চোখে দেখা জিনিষের মত।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার পাঠকশ্রেণী মধ্যবিত্ত লোক-জনসাধারণ এখনও শিক্ষার আলোক লাভ করে নাই। তাই তাহাদের মধ্যে পাঠকও নাই, লেখকও নাই। সুদূর ভবিষ্যতের তাহাদের সেই আলোকময় যুগের জন্য আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

একটা রামছাগল, একটা মর্কট ও একটা ভল্লুক যেমন বেদের (বেদিয়ার) অর্থোপার্জ্জনের সম্বল, বাঙ্গালার অনেক নভেলের সম্বল তেমনি একটি বিধবা মেয়ে, একটি মেস এবং একটি অকর্ম্মা ছোকরা !

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী পরস্ত্রী হইয়াও যেরূপ সতীত্ব বাঁচাইয়া দিবাকরের সহিত প্রেম করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি আধুনিক প্রগতি-সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ অবশ্য সতীত্বের বালাই লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকের জনপ্রিয়তা দাঁড়াইয়াছে—যৌনবিহারের নিখুঁত চিত্র অঙ্কণে। Sex suppression বর্ত্তমান বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতী সমাজের একটি রোগবিশেষ। তাই সিনেমায় যেমন ইহাদের ভীড়,

এই সকল উপন্যাস পাঠেও তেমনি আগ্রহ। এ বইগুলি যেন সাহিত্যিক মদনানন্দ মোদকের মোড়ক!

আধুনিক কথা-সাহিত্যে দেখা যায় সিগারেট, চায়ের মজলিস ও মোটর বিহারের আধিক্য। কেহ কেহ মদের হলাহলও পরিবেশন করিয়াছেন। নায়ক নায়িকার জীবনে crisis আনিতে হইলে লেখক একজনের তীব্র জ্বর ঘটাইয়া বসেন, সেবাপরায়ণা নায়িকা নায়কের কপালে হাত দিয়া চমকিয়া উঠেন এবং তাড়াতাড়ি হাতপাখা লইয়া জোরে বাতাস আরম্ভ করিয়া দেন! আর সুস্থ অবস্থায় চা করিয়া, লুচি ভাজিয়া খাওয়ান!

বিশ্বের যে সমস্ত সমস্যায় সমগ্র মানবের চিত্ত আজ আলোড়িত, বাঙ্গালী জীবনে তাহার রেখাপাত হইলেও, বাঙ্গালার সাহিত্যে আজও তাহার প্রতিচ্ছবি ফুটে নাই। ইউরোপের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের পর মানব-সমাজে যে ওলট-পালট আরম্ভ হইয়াছে, নূতন সমাজ গঠনের জন্য যে বিরাট স্পন্দন এবং বিপুল অনুভব মানুষকে আকুল করিয়াছে, তাহার প্রতিঘাত বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে কই?

অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা কেবল সেই আলোড়নের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাই। গোর্কির "মা", শোলোখফের "Quiet flows the Don", টলষ্টয়ের দু'একখানি বই-এর অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে এক নূতন রসের পরিবেশ করিয়াছে। জনকয়েক লেখকের রচনায় পাশ্চাত্য মনীষীগণের সৃষ্ট চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র দেখা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দৃষ্টিপ্রদীপ", অচিন্ত্য কুমার সেনের "প্রচ্ছদপট", দিলীপ কুমার রায়ের "দোলা", অন্নদাশঙ্কর রায়ের "আগুন নিয়ে খেলা", ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের "রবীন মাষ্টার", মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি" প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাইকমল", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী", ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইলেও কথা-সাহিত্যের মত মনোরম। প্রবোধ কুমার সান্যালের "মহা প্রস্থানের পথে" বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব রচনা। কিন্তু এ একেবারে আমাদের ঘরোয়া দৃশ্যের চিত্র। বিদেশীর পক্ষে ইহার রস আস্বাদ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়।

জীবনের সে অনুভূতি কোথায়—যাহা আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বমানব মনের দুয়ারে আঘাত করিবার অধিকারী করিয়া তুলিবে? বাঙালী সাহিত্যিক জীবন বৈচিত্র্যহীন, সমাজসমস্যাও একঘেয়ে, পাঠকশ্রেণীও morbid মনোভাবাপন্ন—এ অবস্থায় সার্ব্বজনীন রসের সৃষ্টি কোথা হইতে হইবে?

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ উপন্যাস অপেক্ষা বাঙালী লেখকগণ সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বাংলা ছোটগল্প ছোটও নয়, গল্পও নয়।" যাই হোক, বিভিন্ন লেখকের রচিত অনেক ছোট গল্প বিদেশী উচ্চশ্রেণীর লেখকের গল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অনুবাদের মারফৎ বহু প্রথম শ্রেণীর বিদেশী সাহিত্যিকের গল্প বাংলায় স্থান লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালার মেয়ে কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তেমন কিছু সৃষ্টি নারী-সমাজ হইতে হয় নাই। যেখানে পুরুষের জীবন এমন পঙ্গু ও সীমাবদ্ধ, সেখানে নারী-সমাজ কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই বাঙ্গালার নারী-সমাজ হইতে সাহিত্য সৃষ্টির আশা করাই অন্যায় হইবে।

মুসলমান সমাজের দান বাংলা-সাহিত্যে কম নয়। কিন্তু কথা-সাহিত্যে তেমন জবর লেখকের আবির্ভাব আজিও হয় নাই। কাজী নজরুল ইস্লাম, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করে নাই।

বৌদ্ধযুগ অবলম্বনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনা এক নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে বটে, কিন্তু রসপিপাসুগণের এইগুলি মনোজ্ঞ হয় নাই।

মধ্যম শ্রেণীর রচনা হইলেও "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম প্যাঁচার নক্সা", "স্বর্ণলতা", "মডেল ভগিনী" প্রভৃতি রচনা এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও উল্লেখযোগ্য।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রচনায় পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রভৃতি নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার অধিকাংশই বিদেশী সাহিত্যের মাল মশলা লইয়া গঠিত।

বাংলা-সাহিত্যের যুগ প্রবর্ত্তক নূতন লেখকের প্রতীক্ষায় আমাদিগকে আবার কতদিন থাকিতে হইবে, জানি-না। অবশ্য তাঁহার আগমনী নির্ভর করে যুগ-পরিবর্ত্তনের ও তদনুসারী জাতীয় ও সমাজসমস্যার আলোড়নের উপর। সাহিত্যের স্যানিটারী কমিশনার সে সাহিত্য শাসন করিতে পারিবেন না—কিম্বা তাহা প্রোপাগাণ্ডা মূলক হইবে না, তাহা আমরা খুবই জানি। তবুও আর্ট জীবন প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এ-কথা মনে রাখিয়াই আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

পুস্তকালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথম খণ্ড, কমার্সিয়াল প্রিণ্টিংএ মুদ্রিত, ছবি ও 'কভার' মুদ্রিত মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে। মূল্য পাঁচ খণ্ডে অনূ্যন ২০৲। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্র দাশগুপ্ত, ১২৪।৫ বি, রসা রোড, কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী এতদিনে যে বাহির হইতেছে ইহাতে দেশবাসী বিশেষ আনন্দিত হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। তবে গ্রন্থকার বঙ্গশ্রীর অন্যতম লেখক বলিয়া আমাদের কাগজে গ্রন্থকারকে সাধুবাদ করিয়া কিছু লেখা কর্ত্তব্য নহে। পুস্তকের গুণাগুণ বিচারকর্ত্তা পাঠকবর্গ, আমরা পাঠকের নিকট ইহার বক্তব্য বিষয়গুলি কেবল উপস্থিত করিয়াই দায়মুক্ত হইব।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বাহির হয়, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশংসার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্কিমজীবনী'ই নাম করিবার মত একমাত্র জীবনী। কিন্তু শচীশবাবু নিজেই বলেন, সে-খানিতে জীবনীর উপাদান আছে। কিন্তু উহা প্রকৃত জীবনী নহে। হেমেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিতে অনেক জিনিষ দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। দেখিলাম যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বঙ্কিমের জীবন প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, গ্রন্থকার সে সমস্ত বিষয়েই জোর দিয়াছেন। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয় সরকারের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীর রাধাবল্লভ, উহার রথ, গোষ্ঠ, পূজা, মেলা, যাত্রা, কথকতা বঙ্কিমের ভাবী জীবনী গঠনে খুবই সহায়তা করিয়াছে, তাই প্রথম অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পিতার নিষ্কামব্রত, অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু এবং তিব্বতীয় সাধুকর্ত্তৃক পুনর্জীবন লাভ, গুরুদেবের প্রভাব, বঙ্কিম জীবনের সহিত পিতৃগুরুদেবের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। জীবানন্দের প্রাণদাতা চিকিৎসকই যেন সেই গুরুদেব। গ্রন্থকারও আনন্দমঠ হইতে মিলাইয়া তাহা দেখাইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন প্রথম মেদিনীপুরে, তারপর হুগলী কলেজে, শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে খুব বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সমস্ত কাগজপত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে আসেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী পাইয়া যশোহর চলিয়া যান। এই দুই বৎসরের কলিকাতার অবস্থা বঙ্কিম জীবনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে গ্রন্থকার সব বিষয়গুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়াছেন। এই সময়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং সিপাহী বিদ্রোহ। রাণী লক্ষ্মীবাঈর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এত শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁহার আদর্শে বঙ্কিম কোন্ কোন্ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিশদ্‌ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা, বাংলা-সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত লোকের অনাদর, দেশীয় চালচলনে বীতশ্রদ্ধা, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করায় বঙ্কিমচন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুব ভাল করিয়া বুঝা যাইতেছে। আর বঙ্কিমের উপন্যাস বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইলে এই দুই বৎসরের অবস্থাও যে প্রতিফলিত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যের তাৎকালীন অবস্থা ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বেশ বিস্তৃতভাবে দেওয়ায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যে অগ্রগতি সম্বন্ধে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ, স্ত্রী বিয়োগ, পুনর্ব্বিবাহ, বঙ্কিম-সাহিত্যে উভয় স্ত্রীর প্রভাব সম্বন্ধেও গ্রন্থকার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সরবরাহ করিয়াছেন।

শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিম হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই সমভাবে মঙ্গল কামনা করিতেন, তবে হিন্দু ও মুসলমানের খারাপ দিকটা দেখাইতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। তাই যেমন ওসমান, মোবারক, চাঁদশা ফকির, আয়েষা, দলনী প্রভৃতি চরিত্র আঁকিয়াছেন তেমন ঔরঙ্গজেব চরিত্রও ইতিহাসানুযায়ী করিয়াই উপস্থিত করিয়াছেন।

যেমন চন্দ্রশেখর, চন্দ্রচূড় আঁকিয়াছেন তেমন আবার পশুপতি, হরবল্লভ প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনেও দোষ ধরেন নাই। 'বন্দেমাতরম্' যে সর্ব্বজনীন গান, হিন্দু মুসলমান ইহুদী খৃষ্টান সকলেই উহাতে যোগদান করে গ্রন্থকার তাহাও দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা সরল। ভাষার কোন চাকচিক্য নাই, সহজ কথায় গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমের স্বহস্ত লিখিত শেষ রচনাও যে গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহাতে পাঠকবর্গের তুষ্টি বিধান হইবার সম্ভাবনা। স্থানে স্থানে বঙ্কিমের কথা ব্লক করিয়া দেওয়ায় গ্রন্থখানি প্রামাণ্য হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে ১৮ খানি হাফটোন ব্লকের ছবি আছে। ছবিগুলি গতানুগতিক ভাবে দেওয়া হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী, বৈঠকখানা, রথ, জন্মস্থান, মেলার স্থান, যে যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন ও স্ত্রীর ছবিখানি দেওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

গ্রন্থকার আরও চারি খণ্ডে গ্রন্থ শেষ করিবেন। ভরসা করি সেই সব পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ২১ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের নেগুঁয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হইয়া বাড়ী হইতে যাত্রা পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে।

স্বপ্নে দেখা মেয়ে—শ্রীআশীষ গুপ্ত :

বইখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। বাংলা দেশে যে কয়জন সাহিত্যিক শুধু মাত্র ছোট গল্প লিখিয়াই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—আশীষবাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম। আমরা ইতিপূর্ব্বে আশীষবাবুর "ইহাই নিয়ম", "বন্দিনী সুভদ্রা" "নব নব রূপে" পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি—'স্বপ্নে দেখা মেয়ে' তাঁহার সেই পূর্ব্বতন খ্যাতিকে সমুজ্জ্বল করিয়া বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। ছোট গল্প লিখিতে বসিয়া লেখক কোথাও বড় বড় কথা বলিয়া রচনাকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। নিজের সুনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি স্খলিত হন নাই। একটি চরিত্র নিয়া শুধু মাত্র একটি ক্ষণকে কেন্দ্র করিয়া, জীবনের যে কোনও একটি ভগ্নাংশ তুলিয়া নিয়া তিনি ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। আসলে ছোট গল্পের প্রাণ-ধর্ম্মই এই। "স্বপ্ন দেখা মেয়ে"র মধ্যে ওই স্বপ্ন দেখা মেয়ের গল্পটি (ট্যান্টালাস) সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছে। গল্পটির নামকরণের আধুনিকত্ব ও মৌলিকত্ব আছে। অভিশপ্ত ট্যান্টালাসের মতই নায়িকা শিবানীর চারিদিকে স্বপ্ন রঙীন উজ্জ্বল জীবন বিকীর্ণ হইয়া ঝিকমিক করিতেছে—সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষায় শিবানী থাকিয়া থাকিয়া কাতর হইয়া উঠিতেছে, মনের সেতারে বাজিতেছে জয় জয়ন্তী রাগিনী, কিন্তু পরিপার্শ্বিকতার অবশ্যম্ভাবিতা, দুঃখীর গৃহে জন্মগ্রহণের অভিশাপ মেয়েটীর জীবনধারাকে মুক্ত হইতে দিতেছে না, অন্ধকারময় সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাপ্ত হইতে আলোর উৎসে যাইতে দিতেছে না। ট্যান্টালাসের মতই সে সতৃষ্ণ, অসংহত, অবুঝ কিন্তু কাতর। গল্পটির প্রত্যেকটির চরিত্র এমনই জীবন্ত হইয়াছে যে পড়িবার সময় মনে হয়—আশেপাশে চরিত্রগুলি ঘোরাফেরা করিতেছে দেখিতে পাইব। গল্পটি সব দিক দিয়াই উপভোগ্য হইয়াছে।

সামান্য একজন বিধবা জ্যাঠাইমা সুকুমারীর চরিত্রের একটি দিক নিয়া সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন আশীষবাবু।

রাত্রে ঘুম আসিতেছে না, সেই অতন্দ্র মুহূর্ত্ত নিয়া যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব্ব।

'ভাগ্যহীন সিদ্ধেশ্বর', 'পাঁকের ফুল', 'নিজের রোজগারে' 'সাময়িকী' প্রভৃতি গল্পও বেশ সুখপাঠ্য। বইখানির সকল গল্পই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অল্প কথার মধ্যে তিনি সুন্দরভাবে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশীষবাবুর ভাষা যেমন ঝরঝরে ও সংহত, বলিবার কৌশলও তেমনই মনোরম এবং পরিচ্ছন্ন। বইখানি বাংলা সাহিত্যে পাকা আসনের দাবী করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ছাপা ও বাঁধাই বেশ সুষ্ঠু।

ভ্রম সংশোধন ঃ—

বন্ধন-মুক্তি উপন্যাসের স্থানে স্থানে ভ্রমবশতঃ 'জালিস' মুদ্রিত হইয়াছে—ঐ সকল স্থলে 'জালিম' হইবে। সঃ, বঃ

আবির্ভাব—২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮
তিরোভাব—২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

দশম বর্ষ } ভাদ্র—১৩৪৯ { ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

ভারত হইতে ব্রিটিশ-শক্তি অপসারণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবী

সকলেই জানেন, ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি (Working Committee) অনেক আলোচনার পরে জুলাই মাসে ওয়ার্দ্ধায় গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়ার্দ্ধার প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে,—

"ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইলেই দেশের মধ্যে, যাহাদের যথেষ্ট দায়িত্ব জ্ঞান আছে, এমন সব প্রধান প্রধান ব্যক্তি লইয়া একটী অস্থায়ী শাসনতন্ত্র (Government) গঠিত হইবে। এই শাসনতন্ত্রই এমন প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে, যাহাতে অচিরেই ইহা হইতে একটী গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইতে পারে। এই শেষোক্ত পরিষদ কর্ত্তৃকই সর্ব্ববিধ ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে এমন একটী শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।"

ব্রিটিশ অপসারণের অর্থ কি? এ সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী বলেন যে, "ইংরেজ জাতির অপসারণের অর্থ এই নয় যে, সকল ইংরেজই এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে শাসনতন্ত্রের হস্তান্তরের কথাই বলা হইয়াছে। পরন্তু, যে সকল ইংরেজ ভারতভূমিকে তাঁহাদের নিজ দেশ মনে করিয়া এখানে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা ভারতবাসীর সমকক্ষ হইয়া এদেশে থাকিবার বাসনা পোষণ করেন, প্রস্তাবটীতে তাঁহাদের অপসারণের দাবী করা হয় নাই।"

এই প্রবন্ধে তিনটী বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করিতে চাই—

(১) কংগ্রেস কমিটী যে সকল যুক্তিতে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী করিয়াছেন, সেই যুক্তিগুলি কি বিনা বাধায় গ্রহণীয়?

(২) এই পদ্ধতিতেই কি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধ হইবে?

নাই। আমাদের মনে হয় এরূপ দাবী বস্তুতঃই অসঙ্গত ও অশোভন।

দেখিতেছি, প্রধানতঃ দুইটী কারণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটী এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(১) বৈদেশিক শাসন যত ভালই হউক না কেন, আসলে যে তাহা মন্দ ও ভাবী ক্ষতির কারণ—এই সচেতনা।

(২) নিজের দেশের রক্ষাবিধানে ও সমগ্র বিশ্বের এই ধ্বংসশীল রণোল্লাস নিবারণে পরাধীন ভারতের অক্ষমতা।

উপরোক্ত দুইটী কারণের কোনটীই ত্রুটীহীন বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয় না এবং সেই কারণে ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করাও যাইতে পারে না। বৈদেশিক শাসন মাত্রই মন্দ, ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। আমাদের দেশের কয়েকবৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। সকলেই জানেন, ১৭৫৭ সালে ভারতে প্রথম ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় শতাধিক বৎসর, অর্থাৎ ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজ শাসন ভারতের কোন ব্যক্তি বিভাগের কোন উপকার করে নাই। ইতিহাস প্রমাণ করিতে বাধ্য যে, মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজরাজত্বের প্রথম ভাগে সেই অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধন হয়। পাঠান ও মোগল শাসনের সময়ে, যাহাতে প্রজাবৃন্দ নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, তজ্জন্য ভারতীয় ঋষিদিগের শিক্ষা ও কৃষ্টি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে মাঝে মাঝে সেরূপ চেষ্টা হইত। ভারতীয় ঋষি প্রণীত কল্পপন্থার দ্বারা যেরূপ সুখে ও শান্তিতে দিনাতিপাত করা সম্ভব হইত, সেই সুখ ও শান্তির অবস্থা পুনরানয়নের উদ্দেশ্যেই শাসনকর্ত্তাগণ এইরূপ উদ্যমের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী হাজার বৎসরের মধ্যে এরূপ চেষ্টা হয় নাই।

যুক্তিযুক্তভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবস্থাবিশেষে কখনও কখনও বিদেশী শাসনেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি আমরা দেখিতে পাই না যে, কোনও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যখন তাহার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-হিংসায় তাহারা জর্জ্জরিত হয়, তখন সেই বিবাদ ও কলহ মিটাইবার জন্য বাহিরের লোকের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হইয়া উঠে? ব্যক্তিগত জীবনে বিবাদমান পরিবারের পক্ষে যে সত্য লক্ষিত হয়, সমগ্র জাতিতেও তাহাই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ, পরাধীন ভারত শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, এরূপ যুক্তিরও কোন মূল্য নাই। এ কথা সত্য যে, বৃটিশ শাসনের দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহায়তা করিতেছে। বস্তুতঃ, এই মহাসমরে ভারতের যদি কোন অবদান না থাকিত, তবে তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্যের সহিত ব্রিটিশ শক্তির এরূপ মিত্রতা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং এত দৃঢ় হইত না। পরাধীন ভারতও কি সৈন্যসংগ্রহে কি সামরিক উপকরণ সম্ভারে কম সহায়তা করিয়াছে? নিশ্চয়ই না। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ-রাজ যদি খাঁটি রাজনীতি-তত্ত্ব বুঝিয়া বিজ্ঞতা দেখাইতে পারে, তবে এই মানব ধ্বংসকারী যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া সুফল আনিয়া দিতে ভারতবর্ষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা বা মুস্কিল হইবে না। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যে অজুহাতে ওয়ার্কিং কমিটী ইংরেজ-শক্তির অপসারণের দাবী করিতে চাহিয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছে তাহার মূলে কোন যৌক্তিকতাই নাই। আর ইহাতে কোন ফলও হইবার সম্ভাবনা নাই।

এখন দেখা যাউক, এই উপায়ে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে কি না? অনুধাবন করিলে প্রথমেই উপলব্ধি হইবে, কেন ওয়ার্কিং কমিটী ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির অপসারণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। কেন? দাবী উপস্থিত করিয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী শুধু দাবী জানাইয়াই কি ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে পারিবেন?

আমাদের উত্তর—না, নিশ্চয়ই নয়। যতক্ষণ না এই দাবী যে ন্যায্য বা ইহার দ্বারা অধিকাংশ ভারতবাসী ও ইংরেজ উভয়েরই বৃহত্তর উপকার সাধিত হইবে তাহা পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করা না যায়, এবং ইহাও প্রমাণিত না হয় যে, ব্রিটিশমন্ত্রীসভা, ভারত সচিব, ভাইস্‌রয় যাহা করিতেছেন, স্বাধীন ভারত তদপেক্ষা বেশী হিতসাধন করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজ-শক্তির পক্ষে ভারতীয় প্রজাবৃন্দকে কোনরূপ স্বাধীনতা দেওয়ার কোন কারণই থাকিতে পারে না। আজ যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবটী পাশ হওয়া মাত্রই ব্রিটিশ রাজ-শক্তি আপনাকে এখান হইতে অপসারিত করেন তবে তাঁহাদিগকে আমরা কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলিব? আমাদের মতে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-শক্তির অপসারণের কোন কারণই নাই। যে পর্য্যন্ত না আরও জোরাল যুক্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এই নব কল্পিত শক্তি বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের পথে প্রধাবিত হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের কথাও উঠিতে পারে না এবং অপসৃতও হইতে পারে না।

দেশের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আসিয়া যে শীঘ্রই একটী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে তাহারও কি কোন নিশ্চয়তা আছে? বরং এরূপ প্রচেষ্টায় আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি হওয়ারই গুরুতর সম্ভাবনা। ভারতে অসংখ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, সামাজিক বিষয়েও একের অন্যের সহিত কোনও ঐক্য নাই। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হইলেই এই সমস্ত দল ও উপদল সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া একে অন্যের প্রতিকূল হইবে। ফলে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। দেশ অশান্তি, কলহ ও বিশৃঙ্খলতায় ভরিয়া যাইবে। সত্য কথা বলিতে কি, পরিষদ এমন কোন আইনসঙ্গত কর্ম্মপন্থা বাহির করিতে পারে না, যে পন্থাকে জাতির সর্ব্বসাধারণের গুরুতর সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত এবং খাঁটি মস্তিষ্কপ্রসূত বলা যাইতে পারে।

পরিশেষে আমরা শুধু এইটুকু দেখিব যে ওয়ার্কিং কমিটীর এই প্রকারের দাবী কি ভারতবর্ষের অথবা অন্য কোন দেশের জনসাধারণের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবে? এ প্রশ্নেরও আমাদের একই উত্তর—ইহা সম্ভব নয়। যদি ওয়ার্কিং কমিটীর এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যদি তথাকথিত সত্যাগ্রহের (আইন অমান্য যাহার নামান্তর) হুমকী আসে, তবে এই প্রস্তাবের সমর্থকগণকে কারারুদ্ধ করা ভিন্ন আর গভর্ণমেণ্টের কি গত্যন্তর থাকিতে পারে? মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলনা আবুলকালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কারার বাহিরে রাখা গভর্ণমেণ্টের তখন এক রকম দুঃসাধ্যই হইয়া উঠিবে।

আমাদের মতে জগত আজ গুরুতর এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আজ ভারতের সাহায্য জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য্য হইয়াছে। ভারত যদি আজ মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও মৌলনা আজাদের ন্যায় নেতৃবৃন্দের পরিচালনা ও সহায়তা লাভে বঞ্চিত হয়, তবে সে জগতের কোন হিতসাধনই করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ, এই সমস্ত জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলে না ভারতবাসীর—না জগতের—অন্য কোন জাতিরই বিন্দুমাত্র উপকারও হইবে না।

তারপরে জিজ্ঞাস্য এই, এইরূপ আন্দোলনে প্রকৃত জনজাগরণের পক্ষেও কি বিশেষ সুবিধা হইবে? এখানেও আমরা বলিব—না। জনসঙ্ঘের দিক হইতেও বলিতে হয় যে, কোন আন্দোলনই সুচিন্তিত না হইলে, প্রকৃত যুক্তির উপর নির্ভরিত না হইলে, অসম্ভব ব্যাপার ইহার লক্ষ্য থাকিলে, দাবী মরিচীকার ন্যায় আশাতীত হইলে কোন আন্দোলনই ফলপ্রসূ হয় না। আর জনজাগরণের পক্ষেও তাহাতে কোন সুবিধা হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, যে অজুহাতে ব্রিটিশ-শক্তির উচ্ছেদ সাধনের দাবী করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই খাঁটি নহে। আর আইন অমান্যের সেইরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। যাহা চাই তাহা অস্পষ্ট, উহা সহজপ্রাপ্য নয়, কাজেই সেইরূপ কাল্পনিক দাবীতে দেশব্যাপী অমঙ্গলজনক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া

লাভ কি? আমরা তাই মিঃ গান্ধীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন দাবী পূরণের জন্য জেদ করিয়া আপনাকে বিপদাপন্ন না করেন এবং স্বেচ্ছায় কারাদণ্ডে না দণ্ডিত হয়েন। বরং আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন সুযুক্তিপূর্ণ দাবী এবং প্রকৃত মঙ্গলজনক উপায় উদ্ভাবন করিয়া সমগ্র মানব মণ্ডলীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হয়েন; যে উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে, যেরূপ হিতসাধন ইতিপূর্ব্বে আরও কোনও স্বাধীন জাতি কর্তৃক সম্ভব হয় নাই।

ভারতবর্ষ হইতে কি কি যুক্তির উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্রিটিশ-শক্তি অপসারণের দাবী করা যাইতে পারে?

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির অপসারণের আশু প্রয়োজনের যে প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সম্যক আলোচনার পূর্ব্বেই আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের মতে রাজার প্রভুত্ব, পার্লামেন্টের ক্ষমতা, মন্ত্রি-সভার আধিপত্য, ভারতসচিবের নায়কত্ব, রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরের একচ্ছত্রতা এবং গভর্ণর জেনারেলের প্রভাব—ইহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবেই ধরি, বা তাহাদের সমবায় শক্তিই পরিকল্পনা করা যাউক—এতদুভয়ের প্রতিই "ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি" কথাটী প্রযোজ্য।

উপরোক্ত ছয় প্রকার শক্তির মধ্যে প্রথমতঃ রাজার শক্তির অপসারণের কথা বলাও যা, প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করাও তাই। ইহা ভিন্ন ইহার অর্থ আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, ভারতভূমি হইতে পার্লামেন্টের শক্তি বা ভারতসচিব কিম্বা কেবিনেটের প্রভাবের অপসারণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেন না বাস্তবপক্ষে এই সমস্ত শক্তিগুলির কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষেই নাই। বাকী থাকে সম্রাট-প্রতিনিধি বড়লাটবাহাদুরের কথা। সকলেই জানেন তাঁহার দুইটী পদ, তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তাও বটেন, আবার অন্যদিকে সম্রাট-প্রতিনিধিও বটেন। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের এই উভয়বিধ ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া ভারত শাসন করিবার কোন অভিনব শাসনপ্রণালী যতদিন না পার্লামেন্ট এবং সমগ্র ইংরেজ জাতির মনঃপূত হয় ও অনুমোদিত হয় সে পর্য্যন্ত ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের অপসারণের দাবীতেও কোন যৌক্তিকতা নাই।

ভারতের প্রধান সেনাপতি ও অপরাপর পদস্থ রাজ-পুরুষগণের, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অপসারণের প্রশ্নও উপরোক্ত একই কারণে যুক্তিযুক্তভাবে দাবী করা যাইতে পারে না, বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও নির্দ্দিষ্ট ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার দোষ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কর্ম্মভার হস্তান্তরিত করিয়া কোনও ভারতবাসীর হস্তে দিবার কথা উঠিতে পারে না। অবশেষে ধরা যাউক, ব্যবসা বিষয়ক ও সামাজিক সম্পর্ক। এসম্বন্ধেও বলা যায় কি যুক্তির দিক হইতে, কি মানবতার দিক দিয়া ইংরেজের সহিত সম্পর্ক বিলোপ কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে একটা কথা এই যে, যদি দেখা যায় ব্রিটিশ-রাজনৈতিকগণ কোনরূপ হিতজনক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে নিতান্তই উদাসীন বা অসমর্থ, অথবা অধিক সংখ্যক দেশবাসীর পক্ষে একান্ত কল্যাণকর কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, এদিকে এমন বিচক্ষণ ভারতবাসী আছেন বা ভারতীয় সম্প্রদায় রহিয়াছে, যিনি বা যাহারা মানবকল্যাণকর কার্য্যের প্রকৃষ্ট পরিকল্পনা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম, তখনই কেবল রাজপ্রতিনিধি এবং গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতার বিলোপ সাধন এবং সেই গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা ও পদবী ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে কোন বিশেষজ্ঞ ভারতবাসীর অথবা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপরে হস্তান্তরিত করিবার প্রশ্ন উঠে।

আমাদের মনের ভাব একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণের সহায়তায় আরও স্পষ্ট করিয়া আমরা বলিতে চাই।

মনে করুন গান্ধীজী অথবা ওয়ার্কিং কমিটী নিম্নলিখিত দাবীগুলি যদি উপস্থিত করেন—

প্রথমতঃ—আমাদের সমর্থক ও অনুবর্ত্তী ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ব্রিটিশসরকারের সমক্ষে আমরা এই দাবী জানাইতেছি যে, ভারতের জন্য সমরায়োজন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেন হয়, যাহাতে ভারতের ত্রিসীমানায়ও কোনরূপ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে না পারে, যাহাতে শত্রুপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত অথবা বাধ্য হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হয়, এবং যাহাতে তাহারা নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমরপ্রিয়তা ও অন্যান্য মানব-ধ্বংসী প্রচেষ্টা সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া এমন কর্ম্মপদ্ধতি মানিয়া লয় যেন শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি নিরোগ দেহ, মানসিক শান্তি এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অন্ন-জল ও পরিধেয় পাইতে বঞ্চিত না হয়।

দ্বিতীয়তঃ—আমরা আমাদের সমর্থক এবং অনুবর্ত্তী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ইংরেজ সরকারকে এই দাবী জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষে এমন কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেন যাহাতে কোন শ্রেণীর কোনও ভারতবাসী হইতে কোনও প্রকার কর আদায় না করিয়াও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ—আমাদের অনুবর্ত্তী ও সমর্থক ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ সরকারকে আমরা এই দাবী জানাইতেছি যে, তাহারা যেন এমন একটি কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থার প্রবর্ত্তন করেন, যাহাতে প্রত্যেক ভারতীয় অর্থব্যয় না করিয়াও এমন শিক্ষা লাভ করিতে পারে যাহা দ্বারা যে কোন অবস্থায় নিজের নিজের জীবিকা অর্জ্জন, দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও মানসিক শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। আরও দেখিতে হইবে যে, উপরোক্ত কর্ম্মপন্থা যেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়-রূপে অন্ততঃ প্রত্যেকের না হউক, ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে ফলপ্রসু হইয়া উঠে।

চতুর্থতঃ—আমরা আমাদের অনুবর্ত্তী ও সমর্থক দেশবাসীর পক্ষে ইংরেজ সরকারের নিকটে আরও দাবী করি যে, ইংরেজ সরকার এমন একটি কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থা যেন বাহির করেন যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী পাঁচ বৎসরের অনধিককাল মধ্যে নিজ পরিশ্রমের দ্বারা আসবাবপত্রযুক্ত প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ব্যবহার্য্য বাসনপত্র সমেত, শ্রীসম্পন্ন একটী বাসগৃহ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। এই ব্যবস্থাও অধিকাংশ ভারতবাসীর হিতকল্পে পাঁচ বৎসর মধ্যেই যাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে, গভর্ণমেণ্টকে তাহা দেখাইতে হইবে।

পঞ্চমতঃ—আমরা আমাদের অনুবর্ত্তী ও সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষে আরও দাবী করিতেছি যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া এমন একটি কার্য্যকরী প্রকৃষ্ট কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করেন যাহাতে প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্র, শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিক যেন একদিকে যেমন সকল অবস্থায়ই ন্যায়সঙ্গত লাভ করিতে পারেন আবার তাহারা যেন অন্যায়মত লাভ করিতে বঞ্চিত হয়েন।

ষষ্ঠতঃ—আমাদের সমর্থক ও অনুবর্ত্তী ভারতবাসীর পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের নিকটে আমরা আরও দাবী করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন এমন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করেন যাহাতে যে সমস্ত ভারতবাসী দৈহিক পরিশ্রমের উপযোগী, তাহাদের যেন বেকার বসিয়া থাকিতে না হয়, এবং তাহারা যেন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার কার্য্যে দৈহিক কর্ম্ম করিবার জন্য অনতিবিলম্বে নিযুক্ত হয়, আর একান্ত আবশ্যকীয় আর্থিক সংস্থান, দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

সপ্তমতঃ—ব্রিটিশ সরকারের নিকট আমাদের অনুবর্ত্তী ও সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আমরা আরও দাবী করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন এমন একটি কার্য্যকরী পন্থা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন যাহাতে কাজ করিবার পক্ষে সক্ষম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কি কৃষি কি শিল্প কি বাণিজ্যমূলক প্রতিষ্ঠানে অনতিবিলম্বে বুদ্ধির কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে এবং এই সকল ব্যক্তিও যেন সকল সময়েই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র, দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

অষ্টমতঃ—আমাদের অনুবর্ত্তী ও সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষে বৃটিশ শক্তির নিকট আমরা আরও দাবী জানাইতেছি, তাঁহারা যেন এমনভাবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করেন যে অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যেই যেন প্রত্যেক শ্রমিক অন্যের দাসত্ব না করিয়া স্বাধীনভাবে কি কৃষিজীবীর কি শিল্পীর কি ব্যবসায়ীর কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং তদ্দ্বারা জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়।

নবমতঃ—আমাদের সমর্থক ও অনুবর্ত্তী ভারতবাসীর পক্ষে আমরা ব্রিটিশ শক্তির নিকট আরও দাবী জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন এমন একটি কার্য্যকরী আইন প্রণয়নপন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন যাহাতে ধর্ম্মগত, সমাজগত, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক পরস্পর সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হইয়া উঠে।

দশমতঃ—আমাদের অনুবর্ত্তী এবং সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আমরা এই দাবী জানাইতেছি যে, ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়নে এক কার্য্যকরী ব্যবস্থার যেন প্রবর্ত্তন করেন, যাহা কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী মূলক কোনরূপ প্রবঞ্চনা কি প্রতারণার কাজে এখন হইতেই সকলকে যেন নিবৃত্ত করিতে বাধ্য করে।

একাদশতঃ—আমাদের অনুবর্ত্তী এবং সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আমরা এই দাবী জানাইতেছি যে, ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়নে এমন একটী কার্য্যকরী ব্যবস্থার যেন প্রবর্ত্তনা করেন যেন এখন হইতেই অনাবশ্যক এবং দীর্ঘকালব্যাপী কোন মামলা মোকদ্দমা আর না হইতে পারে, যেন মোকদ্দমায় সকলের পক্ষেই সুবিচার লাভ করা সম্ভব হয়, আর এমন ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচারক যেন তাহার রায় প্রদান করেন যাহাতে আপিলে উহা বাতিল হইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

দ্বাদশতঃ—আমাদের অনুবর্ত্তী এবং সমর্থক ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আমরা এই দাবী জানাইতেছি যে, ব্রিটিশ সরকার এমন একটী কর্ম্মপন্থা প্রবর্ত্তিত করুন যাহাতে আগামী সাত বৎসরের মধ্যেই ভারতের সকল প্রদেশের প্রত্যেক কৃষিযোগ্য ভূমিখণ্ডই এমন উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করিতে পারে যেন আমাদের সোনার ভারতবর্ষ চাষের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা না করিয়া এবং কৃত্রিম জলসেচন ব্যতীতও এত প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যপ্রদ শস্য উৎপাদন করিতে পারে যাহাতে ভারতবাসীর খাদ্যোপযোগী সমস্ত অভাব মিটাইয়াও জগতের অন্যান্য দেশেরও,—এমন কি শত্রুরও,—যাহারই কোন খাদ্যাভাব ঘটে অথবা যে স্থানের কাঁচা মালের কোন সময়ে অভাব হয়, সেই দেশের জন্যও ইচ্ছামত উক্ত মাল ও খাদ্য বিনা মূল্যে দান করিতে সক্ষম হয়।

আমাদের মত এই যে, গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণ এই দ্বাদশটী দাবীর কথা এবং উক্ত দাবী কয়েকটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দ্বাদশ প্রকারের বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশবাণী গভর্ণমেণ্টের কাছে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া বলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশটী দাবী পূরণের জন্য কি কি স্বতন্ত্র কর্ম্মপদ্ধতি হওয়া আবশ্যক, গান্ধীজী ও উপরোক্ত সভ্যগণের তাহাও সরকারকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে এই পন্থা নিরূপণ বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছেন। গান্ধীজী বা তাঁহার সহকর্ম্মীগণ উক্ত কর্ম্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বস্তুতঃই যদি পরিজ্ঞাত না থাকেন, তবে জিজ্ঞাসিত হইলেই এই ক্ষুদ্র লেখক কৃতজ্ঞতার সহিত সেই সমস্ত কর্ম্ম-পন্থা তাঁহাদিগের কাছে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে কোন ত্রুটী করিবে না। আমরা গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে আরও একটী বিষয়ে অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত জগৎবাসীকেই তাঁহাদিগের জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, যদি ইংরেজ সরকার এইরূপ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে তাঁহারা অচিরেই উপরোক্ত ব্যবস্থাদি সম্ভব হইতে পারে এমন কর্ম্মপন্থা সমস্ত দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করিবেন এবং এই পন্থাগুলির কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে প্রত্যেক সংস্কারশূন্য বা বিদ্বেষবিহীন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। উপরোক্তভাবে জানাইয়া দেওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, জগৎবাসীর সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া যে যাহাদের উপর ভারত-শাসনের গুরুতর দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে, ভারতের কল্যাণের

উপায় কি হওয়া উচিত তাঁহারা তাহা জানেন না কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট এবং সুচিন্তিত উপায় জানেন গান্ধীজী এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণই।

উপরোক্তভাবে লোকহিতকর প্রকৃত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের অজ্ঞতা ও ভারতীয়দের জ্ঞান যখন প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে তখনই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা, ভারতসচিব ও বড়লাট বাহাদুরের হাতে যে শাসনভার ন্যস্ত আছে তাহা হস্তান্তর করিবার দাবী সুসঙ্গত ও সময়োপযোগী হইবে, আর তখনই ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা উঠাইয়া আনিয়া, হয় গান্ধীজী নতুবা তাঁহার অনুমোদিত কোন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিবার দাবী সত্যিকার দাবী বলিয়া গণ্য হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত সেরূপ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের দাবী বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে যখনই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, প্রজা-শাসনের ও প্রজাবৃন্দের কিসে মঙ্গল হইবে, তাহার গুরুতর দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহারা তাহা সম্পন্ন করিতে জানে না, কিন্তু জানেন গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তখন কোন দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার সরাইয়া নিয়া গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণের হাতে ন্যস্ত করার দাবীতে কোন অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা নাই আর উহা বাস্তবিকই সেইরূপ দাবী নৈতিক দাবী।

আমাদের মতে, স্বাধীনতা বা ব্রিটিশশক্তি অপসারণ—ইহার কোনটাই দাবী হওয়া উচিত নয়।

যদি ব্রিটিশ শক্তি যোগ্য ভারতীয় ব্যক্তিগণের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করে, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, ব্রিটিশ কেবিনেট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ভারতসচিব এবং ব্রিটিশ বড়লাট বাহাদুরের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত তাহা ভারতের গভর্ণর জেনারেলের হাতে আসিয়া পড়ে, এবং এই গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে আসিয়া পড়ে তবে কার্য্যতঃ প্রকৃতপক্ষে ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ ও আমাদের স্বাধীনতা লাভ—এই দুইই হইয়া পড়ে নাকি?

যদি কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ না করিয়া কেবল ব্রিটিশ রাজ-শক্তি অপসারণের অথবা স্বাধীনতা প্রদানের দাবী উপস্থিত করা হয়, সে দাবী নিতান্তই অস্পষ্ট হইবে। যখন এরূপ দাবী করা হইবে, তখন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের ভারতের শাসনতন্ত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ন্যায়তঃ অধিকার আছে। এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিতে চাহিবার দাবী করিতে, ও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু যদি ভারতবাসী দাবী উপস্থিত করিয়া বলে যে, "ব্রিটিশের হাত হইতে এই গভর্ণর জেনারেলের পদটী আমাদের নিকটে হস্তান্তরিত হউক," তবে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ করিবার অথবা সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থিরীকরণ করিতে চাহিবার কোন অধিকার ব্রিটিশ সরকারের থাকে না। ইহার কারণ আর অন্য কিছুই নয়—কারণ এই যে, যখন শেষোক্ত প্রকারে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার দাবীর কথা উঠে, তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসনবিধিও বর্ত্তমান বিধি ব্যবস্থানুযায়ী ভাবেই পরিচালিত হইবে। আর যদি একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে সক্ষম থাকেন এবং সাম্প্রদায়িক গোলমাল নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতেও তিনি অপারগ না থাকেন, তবে একজন ভারতীয় গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে কেন যে তাহা অসম্ভব হইবে, ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা বলিতেছি গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতার হস্তান্তরের দাবী উপস্থিত করিলে, সাম্প্রদায়গত সমস্যার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা দাবীর উপযুক্ততা প্রসঙ্গে এতক্ষণ

আমরা যাহা বলিয়াছি—তদুপরি আরও আমরা বলিতে চাই যে, জাতিবিদ্বেষ এবং আমূল পরিবর্ত্তনের স্পৃহা উভয়ই শাসনাধিকার লাভে আমাদের যোগ্যতার পরিপন্থী। একথা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে যে, কেবল ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়াই যে আমরা কাহারও সহিত আমাদের ব্যবসায়িক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ রাখিব না, এই যুক্তি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন, এবং আমরা সেরূপ সঙ্কীর্ণ নীতি কখনও অবলম্বন করিব না।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে পর, আমাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ন্যায্য শাসনবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত উপায়ে বিদেশবাসীকে অধিকার দিতে আমরা কখনও দ্বিধা বোধ করিব না। •

যদিবা আমাদের প্রস্তাবিত উপায়ে এবং নীতিতে গান্ধীজী বা ওয়ার্কিং কমিটী গভর্ণর জেনারেলের পদ ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে গান্ধীজী অথবা ওয়ার্কিং কমিটীর উপর হস্তান্তরিত করিবার দাবী উপস্থিত করেন, তাহা হইলেই যে মিঃ চার্চ্চিলের অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ সরকার তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তাই নাই। কিন্তু তখন এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে যে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, সেই অবস্থায় কোন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসীই কংগ্রেসের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া আন্তরিকতার সহিত কাজ করিতে আর দ্বিধা করিবে না। আর গভর্ণমেণ্টের ভেদনীতিও তখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

ভারতের জন সাধারণের মঙ্গলার্থ মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটী যদি পূর্ব্বোক্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন, আর অজুহাত উপলক্ষ করিয়া সে দাবীর উপযুক্ত সাড়া দিতে যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উদাসীন বা অপারগ হন, আর এদিকে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটী যদি জগতকে বুঝাইতে সক্ষম হন যে,"দেখিতে পাইতেছ প্রজার হিতকল্পে শাসনকর্ত্তৃবৃন্দ যাহা করিতে পারে নাই, এই প্রকৃষ্ট কর্ম্মপন্থায় আমরা তাহা করিতে পারিব" তবে নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটীর দাবীর পূরণ সম্পর্কে কেবল মিত্র শক্তির মধ্যে নয়, ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যেও ভীষণ মতভেদ হইবে।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী পূর্ব্বোক্ত পথে চলিলে যুদ্ধের অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষ আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে কিন্তু আমাদের মতে যুদ্ধ কিম্বা ভারতের দ্বারদেশে শত্রুর উপস্থিতির জন্য এইরূপ আন্দোলন নিবারণ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কারণ ভারত প্রবেশের পূর্ব্বেই শত্রুকে কিরূপভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইবে তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা এই আন্দোলনের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে।

স্বীকার করি গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যগণ ভারতের স্বাধীনতার চিন্তায় গুরুতর ভাবে মস্তিষ্কের আলোড়ন করিতেছেন কিন্তু তিনি কি কর্ম্মক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের প্রস্তাবগুলির প্রতি একটুও মনঃসংযোগ করিবেন না ?*

গভর্ণমেণ্ট বিরোধী আন্দোলন ধ্বংস করিবার উপায়

ব্রিটিশ সরকার যদি ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর দাবী পূর্ণ না করেন, তবে উক্ত কমিটী ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, নীতির দিক হইতে এই অন্দোলন তো সমর্থন করাই যায় না, পরন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গতও নহে। আর অভীষ্ট উদ্দেশ্য সাধনেও ইহা কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবম্বিধ আন্দোলন সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কিরূপ পন্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য আমরা তাহাই আলোচনা করিতে অভিলাষ করি।

এই ভারতবর্ষে এইরূপ আইন অমান্য আন্দোলনের

* "দি উইকলি বঙ্গশ্রী"র ২১শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী সন্দর্ভ হইতে।

প্রসঙ্গটী মোটেই অভিনব নয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইহার পরিচয় অনেক বার পাইয়াছি। গত বিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আন্দোলন এদেশে প্রথম সুরু হয়। এই অল্পদিন মধ্যেই অন্ততঃ তিনবার এই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। পারিলে কি কংগ্রেস ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারিত? গভর্ণমেণ্ট হয় তো সাময়িকভাবে ইহার গতি প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক প্রতিরোধে ইহার মূলোৎপাটন হয় নাই। তাই মাঝে মাঝে আবার ইহা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। আমরা চাই ইহার অবসান, কেবল মাত্র অবরোধই যথেষ্ট নহে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, গভর্ণমেণ্ট কেন ভারতভূমি হইতে এই আইন অমান্য আন্দোলনের স্পৃহা সমূলে ধ্বংস করিতে পারেন নাই?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে যে, কোন্ জাতীয় লোকেরা সাধারণতঃ এই আন্দোলনে যোগদান করে, আর আন্দোলন দমন কল্পে গভর্ণমেণ্টই বা কি কি পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কোন্ জাতীয় লোকেরা এই আন্দোলনে যোগদান করে তাহা অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমেই স্থির করিতে হইবে এই দেশে কত শ্রেণীর লোক বাস করে? বিস্তারিত-ভাবে উল্লেখ না করিয়া আমরা দেখিতে পাইব যে, মোটামুটিভাবে আমাদের দেশবাসীগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) ধনিকগণ—দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার, শিল্পাধ্যক্ষ, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে;

(২) চাকুরী জীবী—গভর্ণমেণ্ট বা বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত দপ্তরের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ (অফিসার); এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) বৃত্তিজীবী—যেমন উকীল, চিকিৎসক, সংবাদিক, দালাল, কৃষি এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি, চাউল উৎপাদনে সহায়তাকারী ও সামাজিক কর্ম্মীগণ ইত্যাদি—

(৪) কেরাণী ও সাধারণ নিয়ম পরিদর্শনকারী চাকুরী-জীবীগণ;

(৫) অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রভৃতি শ্রেণীর চাকুরীজীবীগণ;

(৬) ছাত্রগণ,

(৭) বেকার বা অনুপযুক্ত আয় বিশিষ্ট শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়;

(৮) শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকবৃন্দ;

(৯) কৃষক ও কৃষি-কার্য্যেরত শ্রমিকগণ;

অনুসন্ধান করিলে সহজেই দেখা যাইতে পারে যে, এই নয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে সবিশেষ অগ্রণী হয়, তাহাদের মধ্যে নিম্ন-লিখিত শ্রেণীরাই সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়:—

(১) বৃত্তিজীবীগণ অর্থাৎ উকিল এবং ডাক্তার প্রভৃতিই আন্দোলনের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপর ও কর্ম্মশীল হইয়া উঠে। প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহারই আন্দোলনের পরি-চালনার ভার গ্রহণ করেন।

(২) ছাত্রগণ, বেকার বা অনুপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত যুবক-সম্প্রদায় এরূপ আন্দোলনের উগ্র পরিপোষণকারী হইয়া থাকেন।

(৩) আন্দোলনের তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ইহার পোষকরূপে অতিমাত্রায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

(৪) কোন কোন সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, কৃষি-শ্রমিক-গণও আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং না বুঝিয়াও কখনও কখনও কারাবরণও করে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না।

(৫) চাকুরীজীবী (অফিসারই হউক অথবা সামান্য কেরাণীই হউক), অধ্যাপক, উপদেষ্টা, শিক্ষক প্রভৃতি কার্য্যকরীভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন না বটে, তবে আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি যথেষ্ট থাকে। কেবল দেখা যায় যে অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মোটা বেতনভোগী অধ্যাপক এবং অ-ভারতীয় অফিসারগণের মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

(৬) ধনিকগণ (দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ, যুবরাজগণ, জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ) প্রায়ই এই আন্দোলনে

সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, আর হইতে যোগদানও করেন না।

কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক আইন অমান্য আন্দোলনে কার্য্যকরীভাবে যোগদান করিয়া থাকে তাহা দেখিবার পরে, যদি ইহা অনুসন্ধান করা হয় যে, কেন ইহারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে—

(১) উকীল, ডাক্তার, সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিজীবী লোকেরা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিশেষ উৎসাহী হইয়া যে উঠেন, তাহার কারণ এই নয় যে, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বদেশপ্রেমিক, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য দেশস্থ উকীল, ডাক্তার ও সাংবাদিক প্রভৃতির প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ বলিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন। এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ উকীল, ডাক্তার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ক্ষেত্রের দালাল প্রভৃতির দ্বারাই পরিচালিত হয়। ভারতীয় বৃত্তি-জীবীদের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে এই ভাবই অতিস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে যে, এই প্রচলিত শাসন পদ্ধতির বিপক্ষে ইঁহারা যে আন্দোলন চালাইয়া থাকেন, তাহা অধিকাংশক্ষেত্রেই বুভুক্ষু, গৃহহীন, অর্থহীন, সাধারণ লোকের হিতব্রতে, সমাজ সেবার মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া করেন না, আন্দোলন পরিচালিত করেন সমবৃত্তিজীব পাশ্চাত্ত্যগণ যেমন তাহাদের দেশে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, ইঁহারাও যেন তদ্রূপ নিজের দেশের গভর্ণমেণ্টে সম্মান ও লাভজনক পদলাভ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। নিজের দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য কিরূপ ভীষণ, কি দুঃখে তাহারা জীবনধারণ করে, সেই সব বিষয়ে ইঁহারা মাথা ঘামান না, অথবা তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধেও ইঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। ইঁহারা সকলেই প্রায় বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সন্তান, শিক্ষা কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে মোটেই পারেন নাই। দেশের সত্যকার সমস্যা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন জ্ঞানও নাই। তবে একটী কথা বলা আবশ্যক যে নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে এই উক্তিগুলি যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন এ কথা সত্য নয় যে তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক কেহই নাই। আমরা কেবল এটুকুই বলিতে চাই যে, সে দেশপ্রেমিকের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা সাধারণতঃ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

(২) ছাত্র, বেকার যুবক এবং শিক্ষিত স্বল্পবেতনভোগী যুবকদের মধ্যে দেশের প্রতি একটা টান আছে কিন্তু তাহাও প্রকৃত দেশপ্রেম নহে। ইহা অন্ধ দেশ-প্রেমিকতার নামান্তর মাত্র। যে পর্য্যন্ত দেশের বুভুক্ষা, দারিদ্র্য, অন্নাভাব দূর করা না যায়, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তির অবসান না ঘটে, সে পর্য্যন্ত জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র,—এরূপ মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাহারা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয় না। আন্দোলনে যোগদান করে যেহেতু তাহাদের অযোগ্য অধ্যাপকমণ্ডলী, উপদেষ্টা ও শিক্ষকবর্গের নিকট হইতে তাহারা দেশপ্রেমের একটা ভ্রান্তধারণা, ভূয়া অনুপ্রেরণা পাইয়া থাকে।

(৩) ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা গভর্ণমেণ্টবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে, আন্দো-লনের খুব পক্ষপাতী বলিয়া নয়, আন্দোলন জিনিষটা খুব ভাল বোঝে বলিয়াও নয়, যোগদান করে, যেহেতু আর্থিক অভাবের জন্য তাহারা সদাই অসন্তুষ্টচিত্ত। তাহারা মনে করে যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারাই শুধু তাহাদের আর্থিক অভাব অপনীত হইতে পারে। তাই তাহাদিগকে তাহারা মাতব্বর বা মুরুব্বি বলিয়া মনে করে। তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি নিয়োগকারীদের প্রায়ই সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না। গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকেও তাহারা তাহাদের অভিযোগ জানাইতে পারে না। সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাহাদের নিকট অগ্রসর হইলেই তাহারা মনে করে যে, ইহাদের অনুবর্ত্তী হইলে এবং একমাত্র ইহাদের চেষ্টায়ই তাহাদের অভাব মোচন হইবে। তাই ইহারা এই সব রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকে।

(৪) ঠিক উপরোক্ত কারণেই কৃষি-শ্রমিকগণ ও গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকে।

(৫) উচ্চপদস্থই হউন, কি নিম্নপদস্থ কেরাণীই হউন, চাকুরীজীবীগণ, অধ্যাপকগণ, উপদেষ্টা বা শিক্ষক মণ্ডলী এরূপ আন্দোলনে যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাহার কারণ—

(ক) নিজেদের মাসিক আয়ে তাহারা সন্তুষ্টচিত্ত নহেন ;

(খ) উপরওয়ালাগণের নিকট তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট বিক্ষোভ আছে ;

(গ) যে শিক্ষায় হিংসা দমিত হয়, দ্বন্দ্বকলহের স্পৃহা প্রশমিত হয়, চিত্ত নিবৃত্ত থাকে এইরূপ শিক্ষালাভ করিতে তাঁহারা পারেন নাই এবং এই কারণেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষায় অনুক্ষণ তাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন।

আইন অমান্য আন্দোলনে কোন্ শ্রেণীর লোক যোগদান করে এবং কেনই বা যোগদান করে ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিলাম যে, আন্দোলনকারীগণের মধ্যে কেহই দেশের সর্ব্বসাধারণের জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির—দারিদ্র, অস্বাস্থ্য ও অশান্তি - যাহাতে অচিরেই সমাধান হইতে পারে, এই মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই গভর্ণমেণ্ট বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তাহা নয়।

দেশের শতকরা অর্দ্ধ জন ব্যক্তি বৃত্তিজীবী। এখনই দেশ স্বাধীনতা লাভ করুক এবং তাহা হইলে তাঁহারাও অচিরেই পদগৌরব এবং অর্থলাভে নিরত থাকিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যেই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় উহার পরিচালনায় বৃত্তিজীবীগণ প্রবৃত্ত হন।

ছাত্র, বেকার ও স্বল্পবেতনভোগী শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা দেশের সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা দুইজন।

ইহারা যে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন তাহার কারণ তাহারা মনে করে যে, দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করা ধর্ম্মকার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষি শিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত শ্রমিকগণের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন। ইহারা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারে না এবং মনে করে যে, এই আন্দোলনে যোগদান করিলে তাহাদের অর্থকষ্ট দূর হইবে, তাই তাহারাও ইহাতে সহানুভূতি দেখায়। চাকুরীজীবী, আফিসার, কেরাণী, শিক্ষক প্রভৃতি দেশের সমগ্র জনগণের শতকরা দুইভাগ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের প্রতি সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকে এবং তাহাদের চাকুরীতেও তাহারা মোটেই প্রীত নয়। ধনিক শ্রেণীর লোকও শতকরা অর্দ্ধজন। ইহারা দেশের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কিন্তু ইহারা আন্দোলনে যোগদান করেন না। এমন কি তাঁহারা জানেন যে, যদি সুস্থাপিত প্রচলিত শাসন যন্ত্রে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে তবে ভবিষ্যতে তাহাদেরও ইহাতে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং তাহাদের অবস্থাও শোচনায় হইয়া পড়িবে।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই প্রতীতি হয় যে, গভর্ণমেণ্ট বিরোধী এবম্বিধ আইন অমান্য আন্দোলনের স্পৃহা একেবারে সমূলে বিধ্বংস করিতে হইলে, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের নিম্নলিখিত সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয়।

(১) এমন সব কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে দেশের—বিশেষতঃ দেশের মেরুদণ্ড, সর্ব্ব আন্দোলনের প্রধান কার্য্যকরী সঙ্ঘ শতকরা ৯৫ জন শ্রমিকের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাদের দুঃখ, দৈন্য, অস্বাস্থ্য বা অশান্তি দূরীভূত হইলে, তাহাদের অসন্তুষ্টি যেমন বিলীন হইয়া যাইবে, দেশে কোনরূপ বিরোধী আন্দোলনও প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বত্র কার্য্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে একদল নিয়োজিত কর্ম্মচারীর সহায়তায় দেশের আপামর সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে তাহাদের দুঃখ-দৈন্য, অস্বাস্থ্য ও অসন্তুষ্টি দূর করিতে গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন। এরূপ বুঝাইবার অর্থ এই যে, দেশবাসীর যেন বোধগম্য হয় যে দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কতবেশী হিতকামী। ইহাতে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে, গভর্ণমেণ্টও দেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইবেন। এদিকে আবার নেতৃবৃন্দের দ্বারা তাহাদের বিপথে চালিত হইবারও সম্ভাবনা থাকিবে না।

(২) এমন কার্য্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাতে ধনিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন। ধনিকগণের মধ্যে এরূপ নৈতিক চেতনা উদ্বোধিত করাও আবশ্যক, কিন্তু কোনরূপ আইন প্রণয়নে ইহা কার্য্যকরী হইবে না। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ কার্য্যপদ্ধতি দ্বারা ধনিকগণকে তাহাদের প্রকৃত কাজে লাগাইতে পারেন।

(৩) শিক্ষার এমন সংস্কার করিতে হইবে যাহাতে প্রাদেশিক বৈষম্য অন্তর্হিত হয় এবং বিশ্বপ্রেম তাহার স্থান অধিকার করে।

বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষই ভাই এইরূপ বিশ্বমানবতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ছাত্রগণকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীরই অঙ্গবিশেষ এবং সেই মণ্ডলীর কোন সভ্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসা দ্বেষ পোষণ করা বা কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত থাকা তাহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজিক প্রত্যেক বিষয়ক স্বার্থেরই পরিপন্থী। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, অশান্তি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সত্যিকার যে পন্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহা ছাত্রদিগকে বিষদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, গভর্ণমেণ্ট যে পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই অভীষ্ট সাফল্য আনয়ন করিতে পারিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিথ্যার আশ্রয়ে প্রচার কার্য্যে ইষ্টাপেক্ষা অহিতেরই সৃষ্টি বেশী হইয়া থাকে। এইভাবে যদি শিক্ষার সংস্কার হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণের এইরূপ বিপথমুখী আন্দোলনে যোগ দিবার সম্ভাবনা একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপরেই যে কোন বৃত্তি লাভ করা সম্ভব হইবে এই উপায় একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রবেশ-লিপি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। পরীক্ষায় পাশ করিবার পরেও চরিত্র এবং মনোবৃত্তির পরীক্ষায় অতিরিক্ত দক্ষতা জন্মিলেই এই সমস্ত প্রবেশলিপি প্রদান করা হইবে। যাহারা নিজেদের প্রবৃত্তি, উত্তেজনা, হিংসা-দ্বেষ দমনে অসমর্থ, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর কোন কার্য্য করিতে যাহারা পরাঙ্মুখ, স্বকীয় চিন্তায় যাহারা সর্ব্বদা মগ্ন, যাহারা স্বার্থ-কেন্দ্রিক, ঈর্ষা পরায়ণ—এমন সব লোক সাধারণ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার মত ছাড়পত্র পাইবেন না। এইরূপ হইলে নেতৃবৃন্দ প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট বিরোধী বিপথগামী আইন অমান্য অন্দোলনে যোগ দিবার মত অনুবর্ত্তী লোক বেশী পাইবেন না।

(৫) চাকুরীরও সংস্কার করিতে হইবে। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশই চাকুরীর জন্য চূড়ান্ত যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। নিম্নতর কর্ম্মচারীগণ, কেরাণীকুল এবং ভৃত্যগণেরই কেবল মাহিনা দেওয়া হইবে কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবর্গকে এভাবে কোন বেতন দেওয়া হইবে না। যিনি জনসাধারণের অভাব, অস্বাস্থ্য অশান্তির দূরাকরণার্থ সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয় করিতে না পারিবেন, অফিসারের চাকুরীলাভে তাঁহার যোগ্যতা থাকিবে না। জনসাধারণের হিতার্থে যাহারা যেরূপ কার্য্য করিবে, তদনুযায়ীই পারিতোষিকও তাহারা সেই ভাবেই পাইবেন। কিরূপ বুদ্ধি ও শ্রমের কার্য্যের কিরূপ মূল্য হইবে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বুঝাইয়া বলা দুঃসাধ্য। তবে উপযুক্ততা এবং কার্য্যক্ষমতার উপর তাহা নির্ণীত করিতে হইবে। এইভাবে চাকুরীর সংস্কার হইলে অধিকাংশ গভর্ণমেণ্টের পদস্থ ব্যক্তিগণের অসন্তুষ্টি ক্রমেই হ্রাস পাইবে।

এই পাঁচ প্রকারের কর্ম্মপন্থা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সকল শ্রেণীর মধ্যে যে অসন্তোষবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত আছে, তাহা অচিরেই অপসারিত ও নির্ব্বাপিত হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট বিরোধী আন্দোলন এই সমস্ত লোকদের মধ্যে কখনও প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না।

এখন দেখা যাউক, গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিপরীতমুখী আন্দোলন নিবারনকল্পে কি কি প্রচেষ্টা করিয়াছেন—

(১) দেখা যায় যে, তাঁহারা দমননীতি প্রয়োগ করিয়া

নেতৃবৃন্দকে ও তাঁহাদের গোঁড়া অনুবর্ত্তীগণকে জেলে পুরিয়া থাকেন।

(২) তাহারা তথাকথিত স্বাধীনতার দিকে যেন একটু একটু করিয়া কিছুটা অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের মতে ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তেমনি অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের নিবেদন, নেতৃবৃন্দের ভুল-ভ্রান্তি এবং দোষ অপরাধ বুঝাইয়া না দিয়া তাহাদিগকে জেলে পুরিয়া দেওয়ায় কর্তৃপক্ষের কোন নৈতিক অধিকার নাই। তাহাদিগকে সংশোধনের সময় না দিয়া বন্দী করাও যেমন যুক্তিহীনতার পরিচায়ক, তেমনি অন্যায়ও বটে। স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য জেলও দিতেছেন আবার দীর্ঘদিনের কিস্তিতে হইলেও সেই স্বাধীনতার সামান্য অংশও দফায় দফায় দিতে হইতেছে, ইহাপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক, পরস্পর বিরোধী ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

আমরা জানি কর্তৃপক্ষ যেমন বিরাট তেমনি সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত। আমাদের মত নগণ্য সম্পাদকের মতামতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মত সময় তাঁহাদের নাই। কিন্তু যাঁহারা দেশের জনসাধারণের সেবা ও গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটী হিতকরী কথা গভর্ণমেণ্টকে শুনাইবার তাঁহাদের অধিকার আছে, আর গভর্ণমেণ্টেরও এই সমস্ত কথা প্রণিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হওয়া নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, গভর্ণমেণ্টও নিন্দার্হ নীতি ও পন্থায় পরিচালিত হইতেছেন।

কেবল যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আইন অমান্য আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকিত, তবে আমাদের এতটা ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনে কৃষক-মজুর সম্প্রদায়েও আজ সাড়া পড়িয়াছে। ইহারাই শতকরা দেশের ৯৫ জন এবং যদিও সাধারণতঃ ইহারা রাজনৈতিক আন্দোলনাদিতে প্রায়ই উদাসীন, তথাপি তাহারাও আজ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও যদি প্রকৃষ্ট পথ অনুসৃত না হয়, তবে হয় তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখিতে পাইব, সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ই ইহাতে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে, আর জার্ম্মান এবং জাপান আক্রমণ ব্যতীতও দেশে এমন এক ওলটপালট হইবার আশঙ্কা আছে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুই উহা হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

কিন্তু এখনও সময় আছে। আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। যুদ্ধের অজুহাতে এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করিলে সবই পণ্ড হইয়া যাইবে। এই যুদ্ধের সময়ও দেশব্যাপী অসন্তোষ নিবারণ কল্পে কি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে এখনও সংযুক্তি প্রদানে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আমরা এবিষয়ে গভর্ণ-মেণ্টকে সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। গভর্ণমেণ্ট এই দণ্ডে ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া সকলের সন্তুষ্টি বিধান করুন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। এই ব্যবস্থাতেই আক্রমণকারীর চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, ইংরেজশক্তির জয় অবধারিত হইবে, আমরা আবার শক্তি ফিরিয়া পাইব। ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা—একমাত্র পন্থা। ডাক আসিয়াছে, সময় নাই, এই উপযুক্ত সময়। সরকার বাহাদুর কি অতি বিলম্ব হওয়ার পূর্ব্বেই সচেতন হইবেন না? ভগবান তাঁহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন!

ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সম্প্রতি "হরিজনে" লিখিয়াছেন,

"আজ আমাদের পাকিস্থানও নাই, হিন্দুস্থানও নাই,—আমরা বাস করিতেছি "ইংলিস্থানে"। তাই আমি সমগ্র ভারতবাসিকেই অনুরোধ জানাইতেছি, প্রথমে আমাদের জন্মভূমিকে যেই হিন্দুস্থান ছিল, সেই হিন্দুস্থানে পরিণত করি, তারপরে আমাদের পরস্পরের বিবাদও আমরা নিজেরাই মিটাইয়া লইব, কাহার কি অধিকার হওয়া উচিত, নিজেরাই মীমাংসা করিব। ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড জাতির আবাসভূমিতে পরিণত করিবার পরে আর কোন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিবে না। প্রতিনিধি-বর্গই উহার পুনর্গঠন সম্পাদন করিবেন। তখন হয় তো এক হিন্দুস্থান হইতেও পারে, আবার বহু পাকিস্থানও থাকিতে পারে।"

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি—প্রধান নেতার উপরোক্ত উক্তি এবং নির্দ্দেশগুলিতে আমরা একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মতে "ভারত আজ হিন্দুস্থানও নয়, পাকিস্থানও নয়, ইংলিস্থান মাত্র," এরূপ উক্তি সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতে আজ মুসলমান, হিন্দু ও ইংরেজ এই তিন সম্প্রদায়ই যথেষ্ট প্রবল, সুতরাং ভারতভূমিকে পাকিস্থান, হিন্দুস্থান ও ইংলিস্থানের সমবেত ক্ষেত্র বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

অহিংসার মূলমন্ত্র যদি ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে "প্রথমতঃ দেশকে হিন্দুস্থানে পরিণত করি, তারপরে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটাইয়া লইব", এ কথা বলা চলে না। আমাদের বলিবার হেতু এই যে প্রকৃতপক্ষেই যদি ভারতকে হিন্দুস্থানে পরিণত করিতে হয়, তবে দেশ হইতে ইংরেজ না তাড়াইলে তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। আজ যদি ইংরেজগণ স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতে রাজী হন, তবে অবশ্য অহিংসার নীতি ত্যাগ না করিয়াও পূর্ব্বেকার হিন্দুস্থানে পরিণত করিবার কথায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু যখন দেখিতেছি ইংরেজ স্বেচ্ছায় এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নহে, তখন হিংসার আশ্রয় না লইয়া কিরূপে দেশকে হিন্দুস্থানে পরিণত করা যায়, আমরা সে কথার অর্থ কিছুই বুঝি না।

এ কথা ঠিক যে ইংরেজের এই দেশ হইতে চলিয়া যাওয়াতেই তাহাদের স্বার্থ বরং বেশী সিদ্ধ হইবে। আমাদের মতে এই কথার সার তত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, এ দেশ ছাড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার পক্ষে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে মোটেই অসঙ্গত নয়। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ না করে, তবে অহিংসার উপাসক ব্যক্তিগণের ভারতকে হিন্দুস্থানে পরিণত করিবার ধারণা পোষণ করারও নৈতিক অধিকার নাই।

অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া আমাদের এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যেন প্রকৃত খাঁটি ভারতীয় ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হয়; এবং প্রবেশ করিয়া রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইংরেজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যেন প্রত্যেক দেশবাসীর অভাব, দৈন্য, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিরূপ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে কৃতকার্য্য হয়।

বিবাদ ও কলহপ্রবৃত্তি হইতেই যে হিংসামূলক কার্য্যের উদ্ভব হয় এবং দ্বন্দ্বকলহ যে, কি ব্যক্তিবিশেষের, কি সম্প্রদায়ের, কখনও কোন হিতসাধন করিতেই সমর্থ নয়, এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবে। অবশ্য কখনও কখনও কলহপরায়ণ ব্যক্তিগণকে দমিত রাখিবার জন্য হিংসার ভাণ করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত হিংসা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

গান্ধীজী যে বলেন 'ভারতকে জাতিতে পরিণত করিবার পরে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিবে না', এ কথারও তাৎপর্য্য আমরা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। আমরা জানি না যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত গান্ধীজী প্রদেশগুলি শাসন করিবার কোন কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন কি না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত কোন নিখুঁত গভর্ণমেণ্ট সম্ভব ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বর্ত্তমান জগতে প্রবহমান কালের গতি এবং ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্কে পৃথিবীর স্থানের সীমা—এই উভয়ই নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সমগ্র মানবজাতিকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে ভারতের এক বিশিষ্ট সাধনা রহিয়াছে। আর অভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির প্রবল সমস্যা সমাধান করিবার পক্ষে প্রকৃত পন্থা নিরূপিত না হইলে সমস্ত জগতই যে ধ্বংস-রাক্ষসীর করাল গহ্বরে নিমজ্জিত হইবে তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একমাত্র ভারতই সেই সমাধানসূত্র আবিষ্কারে সক্ষম এবং ইহাতেই জগতের হিতকল্পে অসামান্য সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে। জগৎ আজিও হয় তো এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিবে না, হয় তো আমাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে কিন্তু অবস্থা এমন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে যে উপরোক্ত সমাধান সূত্রের জন্য জগৎ নতজানু হইয়া ভারতেরই পদতলে উপবেশন করিতে বাধ্য হইবে। আশা করি, আমাদের নেতৃবৃন্দও ভারতসন্তানগণের সার্ব্বজনীন হিতের জন্য ভারতীয় ঋষিগণের গচ্ছিত সেই পরম নিধি পাইতে আকিঞ্চন করিবেন এবং সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ শোধরাইয়া প্রকৃত ভারতবাসী হইতে সচেষ্ট হইবেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ভাব ও বাক্য ধার করিয়া কথার ইন্দ্রজালে আমাদিগকে বিমুগ্ধ না করিয়া একবার

ভারতীয় ঋষিগণের পবিত্রতার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করুন। ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান ও ভারতীয় বিজ্ঞান যদি অসম্পূর্ণ থাকিত, তবে তাহাদের ঐ ভেল্কি চলিতে পারিত। কিন্তু নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ঋষির জ্ঞান ও ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং শ্রেষ্ঠ না হইয়া পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কত জাতির উত্থান পতন হইয়াছে, কত জাতির নাম পর্য্যন্ত ধরিত্রীগর্ভ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু একমাত্র ভারত ভিন্ন আর কোন জাতিই সমগ্র জগতের মানবমণ্ডলীর হিতের জন্য সাধননিরত থাকেন নাই, সমগ্র জগতের মঙ্গল-বিধান কল্পে ভারত ভিন্ন আর কেহই আত্মনিয়োগ করে নাই। এই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি, কিন্তু তথাপি আজও সেই আত্মত্যাগী ঋষিগণের মহাপুণ্যে ইহা বাঁচিয়া রহিয়াছে। অন্যান্য জাতি নিজ নিজ হিতকল্পে নিজ নিজ ভাবের কার্য্য সাধন করিয়াছে কিন্তু ভারত বাঁচিয়া রহিয়াছে, ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছে, আত্মনিয়োগ করিয়াছে এই বিশাল পৃথিবীর সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য। আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে সেদিন প্রায় সমাগত হইয়া আসিয়াছে যখন আবার ভারত সমগ্র জগতের হিত-কল্পে কর্ম্মতৎপর হইবে। আর ভারতের পুণ্যে সমগ্র জগৎ আবার ত্রিবিধ অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবে। যেদিন সেই শুভমুহূর্ত্ত সমাগত হইবে, তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আরও বরং দ্বিগুণ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইবে। কিসে সেই ত্রিবিধ মহাভয় বিদূরিত হইবে সে সম্বন্ধে সমগ্র সূত্রটী এতশীঘ্র দেওয়া উচিত নহে কিন্তু সে সূত্র মনুসংহিতায় নিহিত আছে আর প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিলে এবং বিশুদ্ধ ভাবে পড়িতে জানিলেই সেখানে উক্ত তত্ত্বটী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

যে সময়ে জনাব জিনা এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ পাকিস্থানের দাবী সমানে চালাইয়া আসিয়াছেন তখন আমরা হিন্দুরাও কেন যে সে-বিষয়ে বধির হইয়াছি, তাহা বুঝিতেছি না। এই সময়ে আমাদেরও সেই পাকিস্থানই মানিয়া লওয়া উচিত। যদি না মানি তবে দ্বন্দ্বকলহ লাগিয়াই থাকিবে, আমরাও ইন্ধন প্রদান করিতেই থাকিব। আর যদি মানিয়া লই, তবে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান হইয়া যাইবে। এখন ভাবিয়া দেখুন কোনটি ভাল? দ্বন্দ্বকলহের বৃদ্ধি, না অবসান? এই সব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনেই সম্ভব হইবে, আর সেই গভর্ণমেণ্টে সমস্ত সম্প্রদায় হইতেই সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। ইহার সর্ত্ত হইবে যে, কোন আইনই বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সভ্যের অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, আর প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা উহা গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সভ্য হইতে হইলে কেবল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলেই হইবে না, আরও কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্ট গুণ থাকাও দরকার। এই সব গুণের অধিকারী না হইলে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াও কেহ সভ্য হইতে পারিবেন না। এই উভয়বিধ বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যক লোক না পাইলে অল্পলোক লইয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত করিয়া কাজ চালাইতে হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ যে আইন প্রণয়ন করিবেন তাহাতেই প্রদেশসমূহের শাসনকার্য্য চালাইতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণরের পদ যে সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য তাহাদের মধ্য হইতেই একজনকে দিতে হইবে। অবশ্য উক্ত গভর্ণরের আবশ্যকীয় গুণাবলী থাকাও চাই। যেহেতু গভর্ণরের পদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যপদের দায়িত্ব খুবই বেশী তাই এই দুইটি পদ কমিটি দ্বারা বাছাই করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত আবশ্যকীয় গঠনপ্রণালীতে, সমগ্র দেশের আইন প্রণয়নেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতামত প্রদান করিবার অধিকার থাকিবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি দেশের সাধারণ নিয়মানুসারেই নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করিবার সুযোগ পাইবে।

আমাদের মনে হয়, এই ব্যবস্থা সকল সম্প্রদায়ের সন্তোষবিধানেই তৎপর থাকিবে এবং ইহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে বিধায় আমরা আশা করিতে পারি যে আমাদের প্রধান নেতা সকলের সমক্ষে ইহা উপস্থিত করিতে বিলম্ব করিবেন না। অতঃপর যদি কোন

সম্প্রদায় পুনরায় দ্বন্দ্বকলহে রত হইয়া দেশের অশান্তি বিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, আমাদের নিশ্চিত ধারণা আছে ভগবান আমাদের প্রধান নেতার আরব্ধকার্য্যে নিশ্চয়ই সহায় হইবেন।

বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতি

আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের এবং আমাদের সরকারের বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরীক্ষা করা উচিত, এই নিবন্ধে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ত্তমান যুদ্ধকে বিশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইব। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়া রাখি, প্রজা অথবা সরকার কেহই যেন কোন অবস্থাতেই আতঙ্কগ্রস্থ না হন। যে কোন অবস্থাতে সঙ্কিত হওয়া নীতি-বিগর্হিত। বরঞ্চ বিপদ যদি কিছু আসে তো নির্ভয়ে সেই বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য সাহস ও উপায় অর্জ্জন করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ভয় পাইবার মত কোন অবস্থার যদি আবির্ভাব ঘটে, তবে হাজার হইলেও একথা ধ্রুব সত্য বলিয়া আমাদের জানিতে হইবে যে, কর্ত্তৃপক্ষ যাহাই করুক, সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে প্রজাপুঞ্জকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেই কৃতযত্ন। সুতরাং প্রজাবর্গেরও কর্ত্তব্য কর্ত্তৃপক্ষকে সাধ্যমত সহায়তা করা। কারণ প্রজাকুল অযথা সঙ্কিত হইয়া উঠিলেই গভর্ণমেণ্টও অকারণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন। অতএব সর্ব্বাগ্রেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবস্থা যেরূপই হউক, দেশবাসী যেন কোনক্রমে হাল ছাড়িয়া না দিয়া বসেন।

আর একটা কথা আগে হইতে বলিয়া রাখি যে প্রজাপুঞ্জকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতে আমরা এই আলোচনার অবতারণা করিতেছি না। সরকারমহল যেন চিন্তা করিয়া আমাদের কথাগুলি প্রণিধান করেন, এই উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধটীর অবতারণা করিতে চাই।

বিভিন্ন সীমান্তে ব্রিটিশ-কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতার জন্য ব্রিটিশ-প্রজাবৃন্দের নিশ্চয়ই গর্ব্বান্বিত হইবার কারণ আছে। বিভিন্ন সীমান্তে ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তির কার্য্যাবলীর একটা নিখুঁত চিত্র প্রদর্শনে বোধ করি আমাদের উত্তরটা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। বর্ত্তমানে মিত্রশক্তি নিম্নোক্ত সীমান্তগুলিতে নিয়োজিত আছেন।

(১) সামরিক অবস্থানের দিক হইতে মিশর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। নাৎসী সেনাপতি রোমেল এই অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন। গত কয়েকদিন হইতে নাৎসী-বাহিনী এখানে যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই তথাপি জার্ম্মাণদের সম্ভাবিত আক্রমণ সর্ব্বথা প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতির তৎপরতা সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রবল রাখিতে হইবে।

(২) অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী এক অঞ্চলে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সেনাপতি ও নৌ-সেনাধ্যক্ষেরাও তাই এই সীমান্তের জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তৎপর হইয়া আছেন।

(৩) প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারতমহাসাগর দিয়া ইংলণ্ডের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার যে যোগাযোগ পথ রহিয়াছে, জাপান প্রাণপণে সেই পথ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং বৃটেনের নৌ ও বিমানবহরের সেনাধ্যক্ষবৃন্দকে এই পথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

(৪) জার্ম্মান ও ইটালীয় বাহিনী একত্রিত হইয়া ভূমধ্যসাগরের প্রবল শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহরকে ধ্বংস করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্রিটিশ নৌ ও বিমান শক্তিকে এই সীমান্তেও খুব ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

(৫) সংবাদপত্রে প্রকাশ, রাশিয়ায় জার্ম্মানবাহিনী ককেশাস ও মস্কো লাইনকে প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি জার্ম্মানবাহিনী কর্ত্তৃক ককেশাস অঞ্চল যে অধিকৃত হইতে পারে এই আশঙ্কাও অমূলক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এখানে ও পারস্যে ব্রিটিশ-বাহিনীকে অত্যন্ত সাবধানে অবস্থান করিতে হইয়াছে ও হইবে।

(৬) ফ্রান্সে একটি বিরাট জার্ম্মান বাহিনী মোতায়েন। এখান হইতেও যে জার্ম্মানগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে পারে, সে সন্দেহেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

(৭) আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া আমেরিকার সহিত ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে যে সমরোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে, জার্ম্মান-সাবমেরিণ ও ইউ-বোট সমূহ

সেই ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে কৃতসংকল্প। ব্রিটিশ নৌ ও বিমানবহরকে এস্থানেও অতিশয় তৎপরতা ও সাবধনতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে ও হইবে।

(৮) চীনে জাপ কর্ত্তৃপক্ষ কোরিয়া হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত একটী রেলপথ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ-কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের এই অসৎ প্রয়াসকে সমূলে বিনষ্ট করিতে চীনকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেছে।

(৯) বর্ম্মার নিকটবর্ত্তী আসাম সীমান্তেও জাপ আক্রমণের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। ব্রিটিশ-কর্ত্তৃপক্ষকে এখানেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

এই নয়টি সীমান্ত ব্যতিরেকেও আরও কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্রিটিশ-কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় জাপানী ও নাৎসীদের কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ এখানেও ব্রিটিশ-সরকারের নিশ্চয়ই দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, শয়তানের তাণ্ডবলীলা বেশ পুরাদমেই চলিয়াছে সম্ভবতঃ এইরূপ সর্ব্বধ্বংসী শয়তানী খেলার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আর কোন দিনই এত জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইল, এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সব কিছু হইতে সরিয়া দাঁড়াইব, না এই ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু কর্ত্তব্য আছে?

অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। কেন না ইহা অতি সহজ কথা যে, যদি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই সংগ্রামে কোনরূপ ভীত ও চকিত হইতেন অথবা আমাদের কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনার সহায়তা লাভের জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমানের এই সামরিক পরিস্থিতিতে কোন অংশ গ্রহণ করিতে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত প্রজা হিসাবে নিশ্চয়ই কর্ত্তৃপক্ষকে সেই প্রার্থিত সহায়তা দানের জন্য আমরা অগ্রসর হইব। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিজেরাও শঙ্কা বা আতঙ্কের কোন নিদর্শন দেখাইতেই প্রস্তুত নহেন এবং আমাদের প্রস্তাব বা পরিকল্পনার সহায়তা লাভের জন্যও তাঁহাদের তেমন আগ্রহ নাই। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমরা জানি, আমাদের ভাগ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনে আমাদের পতনও অনিবার্য্য। সুতরাং এদিক দিয়া আমাদের সকল ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল সম্ভাবিত বিপদকে সর্ব্বপ্রকারে নিবারিত কর কারণ আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, শয়তান পক্ষ ব্রিটিশসাম্রাজ্যকে আঘাত করিতে যে-সব আক্রমণ হানিবে প্রত্যুতপক্ষে সেই আঘাত আমাদেরই সকলের গায়ে লাগিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও দুঃসহ করিয়া তুলিবে এবং আমাদের অশেষ ক্ষতি সাধন করিবে।

অথচ এই বিপদ এড়াইবার জন্য ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সে ব্যবস্থা যে মোটেই কার্য্যকরী নহে এ কথা কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বহুবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং এ কথাও বহুবার বলিয়াছি যে, প্রজাপুঞ্জের জীবন হানি ও সম্পত্তি নষ্ট না করিয়াও এই বিপদকে নিবারণ করিবার যে একটি আশ্চর্য্য পথ আছে, সে পথের সন্ধানও আমরা কিছু দিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমরা বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রস্তাবের আমরা কোন উল্লেখযোগ্য সাড়াই পাইলাম না। কাজেই বাধ্য হইয়াই আজ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যতদিন না তাঁহাদের অবলম্বিত পথের ভ্রান্তি সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মিলিত হইতেছে এবং নিজেদের যোগ্যতায় সন্দেহ জন্মিতেছে, ততদিন,বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই নয়টি সীমান্তের ব্যাপারে আমাদের বোধ হয় কিছুই করিবার নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভিযান জয়যুক্ত হউক—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করা ছাড়া ভারতীয়দের আর কিছুই করিবার নাই। আমরা স্থির জানি, অবস্থা যতই না কেন বিরুদ্ধ ও ভীষণ হউক—যে-পক্ষ ন্যায়পূর্ণ ও সৎ, যে-পক্ষ প্রজাপুঞ্জের প্রাণ ও সম্পত্তির বিনাশে পরাঙ্মুখ—সে-পক্ষের জয় অনিবার্য্য; প্রতিপক্ষ শতগুণে শক্তিশালী হইলেও সেই ন্যায় পক্ষকে পরাজিত করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের বাহিরের ব্যাপারে বর্ত্তমানে আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছু না থাকিলেও ভারতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কার্য্যকরী অংশ

গ্রহণ করিবার জন্য ভারতবাসীদের আগাইয়া আসা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে জাপানীদের এবং পশ্চিমসীমান্তে নাৎসীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আজ হউক বা কাল হউক—অদূর ভবিষ্যতে যে কোন এক-দিন ভারতের মাটি সম্ভবতঃ শয়তানের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। আজই শয়তানের এই বাসনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার মত প্রকৃষ্ট পন্থা আমাদের জানা আছে। আর কর্ত্তৃপক্ষ নিরুদ্বেগেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, এই পন্থাবলম্বন করিতে তাঁহাদের কোনরূপ হীনতা স্বীকার করিবারও কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেন জানি না, কর্ত্তৃপক্ষ তথাপি আমাদের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার আবশ্যকীয়তা বোধ করেন নাই। সম্ভবতঃ, পরাধীন জাতি পরিকল্পিত প্রস্তাব বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে তাঁহাদের সম্মানে আঘাত লাগিতেছিল। কারণ কর্ত্তৃপক্ষের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে আমাদের এই পরিকল্পনা পেশ করিয়া তাঁহার নিকট আমরা এই মনোভাবেরই পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এই মনোভাবের জন্য আমরা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি। কেন না আমরা জানি, পরাধীন জাতির গর্ব্ব করিবার কিছু নাই—গর্ব্বিত হওয়া তাহার সাজেও না।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ না বুঝিলেও আমাদের একান্ত অনুরোধ যে আমাদের দেশবাসী যেন আমাদের এই প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আশা করি, সম্মিলিত ভারতীয় গণশক্তি তাহাদের প্রিয় জন্মভূমিকে যুদ্ধের ধ্বংস ও কবালতা মুক্ত রাখিবার জন্য সমকণ্ঠে কর্ত্তৃপক্ষের দরবারে আবেদন জানাইবেন। কারণ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়তঃ বাধ্য। কর্ত্তৃপক্ষের এই নৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্যই তাঁহারা ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার অস্ত্র লাভে বঞ্চিত রাখিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের এই সম্মিলিত প্রার্থনার উত্তরেও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন, কর্ণপাত না করেন, আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন, তবে সর্ব্বশক্তিমান ও পরম কারুণিক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকাই আমাদের একমাত্র উপায়। *

* "দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"র ২৯এ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী সন্দর্ভ হইতে।

গান

কানাই বসু, বি-এল

তোর বুকের মাঝে যে জন আছে
বাহিরে কেন খুঁজিস তারে?
মিছে গহন বনে মরলি ঘুরে
মনের কোণে চাইলি না রে।
রজনী দিন যে তোরে ঘিরে
মোহন বাঁশী বাজায় ফিরে,
তুই কৃপণ প্রেমে ফিরালি তারে
জীবন মূলে কিনবি যাঁরে।

তুই নয়নে রাখ তীর্থবারি, হৃদয়ে দেবালয়,
প্রেমের বাণী-মন্ত্র নে না, মিলবে পরিচয়।
কতবা দিবি নিজেরে ফাঁকি,
মোহের ধোঁয়া কাটবে না কি?
এই ভুবন ভরা আলোয় শুধু,
তুই কি রবি অন্ধকারে?

মানুষ নিয়ে খেলা

শ্রীরাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরী

সে আজ এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র বছর পাঁচেক আগে আমাদের বাড়ীর খান তিনেক বাড়ীর উত্তরে হরিহর সরকার মহাশয় বাস করতেন। ভদ্রলোকের যেমন চেহারা তেমনি ছিল তাঁর সাজ-পোষাক। মাথার উপরে বিরাট এক টাক। টাকের দু'পাশে যে ক'টি চুল ছিল তার প্রায় সব ক'টিই ইঁদুরে খাওয়ার মত এবড়ো খেবড়ো—মানে কোথাও আছে কোথাও নেই। হাঁসলে দাঁতের মাড়ির সঙ্গে তোবড়া গালের সংমিশ্রণে এমন একটা খেলা হয়ে যেত যা দেখে অপর দশজনেও সে হাঁসিতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারত না। মুখের পরিমাপে নাকটি এত ছোট যে হাত দু'টি পিছনে রাখলে ভুল করে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করাটা সাধারণের পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ উৎকল গ্রাম-বাসীদের পক্ষে ত' নয়ই। তবে রং বেরং-এর সুতোর কারুকিরি করা চশমাখানা সর্ব্বদা নাকের উপর থাকাতেই যা একটু ভরসা।

পরনে ভদ্রলোকের বড়জোর একখানা লাল পাড় দু'হাত ধুতি পায়ে পুরানো একজোড়া সাইড স্প্রীং জুতো আর গায়েতে মেয়েদের বডি-জামার মত একটা টাইট মার্কিনের ফতুয়া। নাপিত বা রজকের সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করতেন না আর করলেও বছরে বার চারেকের বেশী তো নয়ই।

পাড়ার লোকের কাছে তিনি ফাটা হরি সরকার অথবা একাদশী সরকার এই দু'টি নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। দু'টো নামের মানেই এক,—অর্থাৎ কি না তাঁর আসল নামটার ভেতর এমন একটা মাহাত্ম্য ছিল যেটি মুখে আনলে আর সে-দিন কিছু মুখে দেওয়া ঘটে উঠ্‌তো না, মানে সে-দিন একাদশী না থাকলেও একাদশী করতে হত। আর প্রথম নামটার মানে তো সোজা। অর্থাৎ কি না তাঁর নামের জোরে মাটির হাঁড়ি ত ফেটে যেতই এমন কি লোহার হাঁড়িতে চাল চড়ালে সেটাও আস্ত থাকত কি না সে বিষয়েও অনেকের যে সন্দেহ না ছিল এমন নয়।

সকালে তাঁর মুখ দেখে কাকে কি রকমন বিপদের হাতে পড়ে নাস্তা নাবুদ হতে হয়েছে, তার সামান্য একটু ইতিহাস জানতে পাড়লে আমাদের পাড়ায় সকাল বেলায় ফেরিওয়ালার চলাচল ত' বন্ধ হতই এমন কি লোক চলাচলের সংখ্যাও যে কম না হত তাও সঠিক করে বলা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। কথায় কথায় কেউ যদি কোন দিন তাঁর নাম মুখে এনে ফেল্‌তেন ত' অমনি বিষে বিষে বিষক্ষয় হয় এই পুরাণো পদ্ধতির অনুসরণ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দায়ে ভূপেন শুদ্ধাচারী, সুর্য্যশেখর কালী, যদু ভড় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের নাম বার বার তিনবার উচ্চারণ করে তবে একটু মনে প্রাণে সুস্থ অনুভব করতেন।

এ হেন সরকার ম'শায় কিন্তু বিশেষ কারণ ছাড়া কারও সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করতেন না এবং কথা বল্‌লেও এত কম বলতেন যে যাতে মনে হত যে ভদ্রলোকের সদা সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে ক'লকাতা কর্পোরেশন তাঁহার এই সুন্দর মুখের উপর একটা কদাকার মিটার বসিয়ে দিয়ে গত বছরের ঘাটতি বাজেটের দেনা মেটাবার আশায় "কথা কওয়া ট্যাক্স" নামে একটা নূতন ট্যাক্সের সৃষ্টি করে ফেলে।

কেউ বল্‌তেন, সরকার ম'শায়ের আট লক্ষ টাকার থ্রি হার্ফ পার্সেণ্ট আছে, আবার কেউ বল্‌তেন, যাই বল না কেন বার লক্ষ টাকার এক পয়সা কম নয়। যাই হোক বারই থাক আর আটই থাক—তাঁর যে এই ক'ল্‌কাতার সহরে খান দশেক বাড়ী আছে এবং সে-গুলোর ভাড়া বাবদ যে তাঁর মাসে হাজার খানেক টাকা সিন্দুকে উঠতো সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহই ছিল না।

স্ত্রী, নিজে, দুসম্পর্কের এক পিসিমা আর একটা মেধো বলে চাকর এই নিয়েই ছিল তাঁর সংসার। কাজের ভেতর-হিসেব লেখা, বেলা বারটা নাগাদ বাজার থেকে যত রাজ্যের সস্তা জিনিষগুলো কিনে আনা, আর প্রত্যেক মাসে দশ বার দিনের জন্যে কোথাও উধাও হওয়া। জিজ্ঞেস্ করলে বলতেন, "সুদের তাগাদায় গিয়েছিলেম কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে কোন ব্যাটা একটা পয়সাও ঠেকালে না। সব ব্যাটা জোচ্চর; পয়সা নেবার বেলায় যেন ভিজে বেড়ালটী,

আর দেবার বেলায় যত রাজ্যের ওজর আপত্তি।" হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক কি জানি কেন আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং সেই জন্যেই বোধ হয় কথা-বার্ত্তা আমার সঙ্গে একটু বেশী করে বলতেন। ছোটবেলায় একবার তিনি নাকি আমায় পোষ্য নিতেও চেয়েছিলেন। ঠাকুরমা তখন বেঁচে। দিদির মুখে শুনতে পাই যে, কথাটা ঠাকুরমার কাণের ভেতর যেতেই তো তিনি তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। চীৎকার করে পাশের বাড়ীর তেলি গিন্নিকে ডেকে বললেন, "শোন দিদি, একবার স্পর্দ্ধার কথাটা শোন। পাঁচটী মেয়ের পর মাদুলী পড়ে, কত দেবতাদের কাছে হত্যে দিয়ে তবে এইটুকু সোঁনার চাঁদ পাওয়া গেছে তাও বুড়োর সহ্য হচ্ছে না। টাকার সুদ খেয়ে বুড়োর লোভ বেড়ে গেছে, বলে কি না নন্দকে আমার পুষ্যিপুত্তুর নেবে। টাকা জমাচ্ছিস্, আবার পরের ছেলে জমাবার লোভ কেন গা?"

যাক্ সে-দিনের কথা। এখন ঠাকুর্দ্দা নাতি সম্পর্ক হয়েছে এবং সেজন্যে কোন দিন হয় তো ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস্ করতাম, "আচ্ছা দাদু, এত পয়সার মালিক হয়ে আপনি দু'হাত কাপড় পড়েন কেন?"

রসিকতা করে জবাব দিতেন, "কি করব দাদু, চার হাত পরলে তোমার দিদিমা বড় রাগ করেন, সেইজন্যে একটু বাবুয়ানি করে ফেলি।"

—আচ্ছা, ঐ বিশ্রী চশমাখানা বদলে একখানা ভাল চশমা কেনেন না কেন?

—কি জান দাদু, অনেক দিন চোখের উপর আছে তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরেই বল, আর বছর তিরিশেক আমার কাছে আছে বলে একটু মায়া জন্মে গেছে বলেই বল ওটাকে "ডাইভোস" করতে যেন প্রাণটা কেঁদে ওঠে।"

—দাঁতগুলো তো বাঁধিয়ে ফেললে পারেন?

—মহামুস্কিলে পড়ে যাবো দাদু, মহামুস্কিলে পড়ে যাবো। এই সুন্দর মুখের ওপর এক পাটি নূতন চকচকে দাঁত দেখতে পেলে তোমার দিদিমার মরা নদীতেও আবার বান দেখা দেবে। তখন তার জন্যেও আবার একপাটি অর্ডার দিতে হবে। চাই কি একখানা দয়ারামের সাড়ী, মফচেন, কিউটেক্স, লিপষ্টিক, ভ্যানিটি ব্যাগ, একখানা পানসে চশমা এ সবেরও যে অর্ডার না দিতে হবে তাই বা জোর করে এখন থেকে কি করে বলা যায়? তারপর এই সব কিনলে আজ এ সভায় বক্তৃতা করতে হবে, ও সভায় সভাপতি হতে হবে, অমুক ক্লাবে চাঁদা দিতে হবে বলে পাড়ার যত ছেলের দল এসে প্রত্যেক দিন বাড়ী ঘেরাও করে দাঁড়াবে, তার চেয়ে যেমন ভগবানের দেওয়া রিপু কর্ম্ম মার্কা চেহারা আছে তেমনি থাকাই ভাল। এতে খরচাও হবে না আর কাছেও কেউ ঘেঁসবে না।

রসিকতায় পেরে ওঠা দায় দেখে চুপ করে যেতাম, আর ভাবতাম এমন অল্পভাষী লোকের ভেতর এত রস কেমন করে জমা হয়ে থাকে।

কিন্তু এত ভালবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সেদিন যখন তিনি অফিস যাবার মুখে পেছন থেকে আমার নাম ধরে বার দুয়েক ডাক দিয়ে বসলেন সে দিন সত্যিই আমার চোখ দিয়ে জল এসে পড়লো। একেই দশটা বেজে দশ মিনিট, তায় আবার নূতন চাকরী হয়েই হাজরে-খাতায় দু'দিন লাল চিকে পড়ে গেছে; সুতরাং মনে মনে সরকারের মুণ্ডপাত না করে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম ওকালতী পাশ করে অর্থাৎ টাউটদের পেছনে পেছনে গাছতলায় ঘুরে ঘুরে, মানে এক রকম বছর ছয়েক বেকার থেকে যদিও বা একটা বরাত ক্রমেই জুটেছে তাও তোমার সহ্য হল না! এ পাড়ায় এত লোক থাকতে আমাকে এত ভাল না বাসলেই কি নয়! আমার চক্ষু লজ্জা আছে সে কথা সত্যি এবং মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারি না সে কথাও মিথ্যে নয় কিন্তু তাই বলে গরীব দুর্ব্বলের প্রতি এ অত্যাচার কেন?

কাছে এসে সরকার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ দাদু, শুনলাম তোমার নাকি চাকরী হয়েছে?"

উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।"

"কই আমাকে ত এ সুখবরটা দাও নি?"

শুনে মনে মনে ভাবলাম এক মাসের মাইনে হাতে আসবার আগে তোমাকে এ খবরটা দিলে সদ্য সদ্য আপিসের হাতের নোয়া যে খসে পড়বে তা কি আজ কারও অজানা আছে! তুমি যে সদ্য কাঁচা খাওয়া দেবতা তাকি তুমি নিজেও জান না? এত বয়স পর্য্যন্ত যদি এখনও তোমার সে জ্ঞান না হয়ে থাকে ত একদিন সকালবেলা এ মোড়

থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত পাড়ার সকলকে ডেকে আলাপ করলে সেই দিনই সকলে মিলে বেশ করে তোমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেবে।

মুখে বললাম, "সময় করে উঠতে পারি নি সেই জন্যে।"

"তা মাইনে হ'ল কত ?"

সভ্যজগতে মাইনের কথা যে কেউ কাউকে জিগ্যেস্ করতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। সত্যি কথাটা বলতে বাস্তবিকই লজ্জা হতে লাগলো। তাই লজ্জার খাতিরে একটু মিথ্যের সাহায্য নিয়ে বলে ফেললাম, "আজ্ঞে আশী টাকা।" বৃদ্ধ শুনে আমার গা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "বেশ দাদু, বেশ হয়েছে। শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তা যাও দাদু, আপিস যাও আবার দেরী হ'য়ে যাবে।"

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ছাড়ান পেয়েই এক দৌড়। ডালহৌসীর একখানা চল্‌তি ট্রামে উঠে পড়ে ভাবতে লাগলাম সরকার ম'শায়ের কৃপায় এখন কোথায় গিয়ে ঠেক্ খাই তা তিনিই জানেন যিনি সরকারের ন্যায় এ অপরূপ জীবটীর সৃষ্টি করেছেন। হেদোর মোড়ের গির্জ্জা, ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়ী, মেডিকেল কলেজের মস্‌জিদ ট্রামে যেতে যেতে যা নজরে প'ড়ল তাঁর উদ্দেশ্যেই একটি করে প্রণাম ঠুকে ফেললাম।

বিশ্বাস আমার সকলকার উপরই আছে আর না রেখেই বা করি কি! যা দিন কাল পড়েছে তাতে সকলকেই ত সন্তুষ্ট রাখতে হবে? মরলে আবার হয় ত জন্ম হতে পারে কিন্তু চাকরী গেলে আবার চাকরী হবে এ বিশ্বাস আমি অনেক দিনই হারিয়ে ফেলেছি।

বরাৎ ক্রমে ছোট সাহেবের আসতে সেদিন মিনিট পনেরো দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই রক্ষে, তা না হলে লাল চিকে পড়ে এক টাকা হিসেবে পুরো একদিনের মাইনে ত কাটা যেতই এমন কি প্রথম মাসেই তিন দিন দেরীর জন্যে আমার মত সতী সাধ্বী কেরাণীর সিঁথের সিঁদুর চিরদিনের জন্যে যে মুছে না যেত তাই বা জোর করে কে বলতে পারে?

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে সবেমাত্র একখানা পরোটা মুখে দিয়েছি আবার সরকার ম'শায়ের গলায় আমার নামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠলো। একবার ভাবলাম বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি, আবার ভাবলাম দিদির গলার স্বর অনুকরণ করে ভেতর থেকে জানিয়ে দিই যে আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বাড়ীর বার হয়ে গিয়েছি এবং কখন ফিরবো তারও কোন ঠিক নেই। কিন্তু কোনটাই যখন আমা দ্বারা হ'বার সম্ভাবনা নেই তখন ভাল ছেলের মত তাড়াতাড়ি পরোটাগুলো নাকে মুখে গুজে দিয়ে সরকার ম'শায়ের সঙ্গে দেখা না করতে যাওয়া ছাড়া আর আমার কিই বা উপায় থাকতে পারে? বাইরে যেতে যেতে মনে হ'ল আমার আশি টাকা মাইনে শুনে বোধ হয় কিপ্পনটা কিছু ধার চাইবার মতলবে এসেছে। ভাবলাম, আশী টাকা মাইনে না বললেই ছিল ভাল। কিন্তু ল' পাশ করে যত বয়েস তত মাইনে এ সত্যি কথাটা বলিই বা কি করে? যাক্, যখন দুষ্কর্ম্ম করাই গেছে তখন কি আর করা যাবে বলুন? মনে মনে ভগবানের নাম নিয়ে সরকার ম'শায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সরকার মশাই এ কথা সে কথার পর আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং নানারূপ হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন যা শুনে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। ভাবলাম এমন বরাত করে এসেছি যে যেখানেই যাই না কেন আর যে কাজই করি না কেন উপদেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই? বাড়ীতে স্ত্রীর উপদেশ, রাস্তায় চলিবার উপদেশ (keep to the left)-ট্রামে উঠবার ও নামবার উপদেশ, পার্কে পার্কে হেল্‌থ অফিসারের টীকা লইবার উপদেশ, ট্রেনে চেন টানবার উপদেশ, অফিসে বড় বাবুর উপদেশ, সিনেমায় চুপ (Silence) করে থাকবার উপদেশ, খবরের কাগজে দেশনেতাদের উপদেশ—এই উপদেশের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে কোন দিন না মা ভাগীরথী গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে। কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে গঙ্গার স্নান করে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় সরকার ম'শাই জানলার কাছে থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "দাদু, যাচ্ছো কোথায়? আজকের দিনে তোমার দিদিমার কাণ্ডটা একবার দেখে গেলে না?" বলে তাড়াতাড়ি একরকম জোর করেই আমাকে তাঁর বাড়ীর ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি দিদিমা অর্থাৎ সরকার-গিন্নি গোটা কতক কলসী নিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে আছেন। কলসী গুলো দেখিয়ে সরকার মশাই আমাকে বললেন, "আচ্ছা বল ত দাদু, তুমিই বল। বলি, মরা গরু কখনও কি ঘাস

খায় ? তোমার দিদিমা বলে কি না একটা টাকা দিতে হবে কলসী উচ্ছুগ্গু করবে। আমার এবং ওঁর বাবা-মা নাকি হাঁ করে বসে আছেন কবে তাঁর ছেলে নগদ একটা টাকা খরচা করে তাঁকে জল দেবে বলে! আরে বাবা, যদি সত্যিই তাদের জল তেষ্টা পেয়ে থাকে ত এত পুকুর, গঙ্গা, কুয়ো, টিউব-ওয়েল, কল থাকতে তাঁরা তোমার ঐ পচা কলসীর জল খেতে যাবে কেন বল ত? সকাল থেকে কত করে বোঝাচ্ছি তা তোমার দিদিমা কিছুতেই বুঝবে না। এমন অবুঝ লোকও ত জীবনে দেখিনি রে বাবা। বোঝাও ত দাদু, একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাও ত। হাজার হলেও ত ওকালতী পাস করেছ, কত জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়েছ আর সামান্য একটা মেয়ে মানুষকে বোঝাতে তোমাদের মত লোকের কতক্ষণ।"

শুনে ত অবাক হ'য়ে গেলাম। বুড়ো বলে কি? খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে বাড়ী থেকে এক্ষুণি আসছি বলে সেই যে পিট্টান দিলাম আর কিছু দিনের মধ্যে সরকার ম'শায়ের বাড়ীর মুখো হলাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ওর সঙ্গে মেলা-মেশা ত দূরের কথা ওর ত্রিসীমানা আর মাড়াবো না।

*

প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে। সরকার-গিন্নি মারা গেছেন। সরকার ম'শায়ের সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হ'ত না আর হ'লেও কাজের অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়তাম। ইদানিং তাঁর চাকরটার কাছে প্রায়ই শুনতাম যে তিনি সোদপুর না কোথায় গেছেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, কলসী উৎসর্গের পর থেকে আমার আর সরকার ম'শাইকে একেবারে ভাললাগত না, আর সেই জন্যে তিনি ডাকলেও আর আমি বড় একটা যেতাম না। কিন্তু যে দিন রাতে তাঁর বৃদ্ধা পিসিমা তাঁর চাকরটিকে দিয়ে বার বার আমাকে ডেকে পাঠালেন সেদিন আমি না গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলাম না। গিয়ে দেখি সরকার ম'শাই শুয়ে আছেন আর পিসিমা তাঁর মাথার কাছে একখানা পাখা নিয়ে কোন রকমে বাতাস করছেন। জিগ্যেস করলাম, "কি হয়েছে পিসিমা?" পিসিমা বললেন, "এই দেখনা বাবা, বার বার সেদিন বারণ করলাম জ্বর গায়ে সোদপুর গিয়ে কাজ নেই, তা আমার কথা কি কাণে তুললে। তারপর জ্বর গায়ে সোদপুর থেকে চলে আসা সে কি এ বয়সে সব সময় সহ্য হয়?……এখন আমি একা বুড়ো মানুষ কি করি বল ত বাবা?"

কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? রুগীর গায়ে হাত দিয়ে মনে হ'ল একশো ছ'এর কম নয়।

জিগ্যেস করলাম, "ডাক্তার ডেকে আনবো।" ডাক্তারের নাম শুনে বৃদ্ধ হাত দু'টা কোন রকমে তুলে জানালেন, "না।" ভাবলাম কৃপণ মানুষ নগদ দু'টাকা খরচ করতে কষ্ট অনুভব ক'রছেন। বললাম, "টাকা লাগবে না, আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে তাকে ডাকলেই সে আসবে।" তথাপি সেই এক উত্তর—"না।"

নিরুপায় হয়ে বললাম, "তা'হলে কি ক'রব পিসিমা, বলুন?"

পিসিমা বললেন, "কি আর করবে বাবা, যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে। ভাইপোদের একজনকে খবর দিয়েছি সে এসে যা হয় করবে।"…

"…তা'হলে আমি?" পিসিমা সিন্দুক খুলে একখানা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই কাগজখানা দেবে বলে তোমাকে বারবার মেধোকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিল।"

এতক্ষণে বোধ হয় বৃদ্ধ একটু সুস্থ অনুভব করলেন। আস্তে আস্তে আমাকে কাছে ডেকে কাগজখানাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই উইলখানার রেজিষ্টারী করার ভার তোমার উপর রইল। আর পার ত পিসিমাকে একটু দেখো।" আর তিনি বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ আপনা হতেই বুজে গেল। হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমারও শ্বাস রোধ হবার উপক্রম হল। কি করব? কাকে ডাকব… কিছুই যখন ঠিক করতে পারছিলাম না তখন মেধোর সঙ্গে এক ভদ্রলোক ঘরের ভিতর ঢুকেই সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জিগ্যেস্ করলেন, "কেমন আছেন জ্যাঠামশাই? সব চুপচাপ। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু জানেন।" বললাম্ "বিশেষ কিছু নয় তবে জ্বর হয়েছে আর অবস্থাও বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না।" কথাগুলো বলে এবং ভদ্রলোককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ না দিয়েই সোজা

ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। কিন্তু ডাক্তার ডেকে যখন ফিরলাম তখন অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। সমস্ত রাতগুলি টাল-বেটালে কাটল। ভোরের দিকে ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যখন বরফ নিয়ে ফিরলাম তখন তাঁর এক আত্মীয় বল্লেন, "বরফ দেবার আর দরকার নেই নন্দবাবু, জ্যাঠাম'শাই আপনা হতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।"

*

ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন করে শকুনিরা সন্ধান পায় এবং সকলে এসে এক সঙ্গে জোটে তেমনি করে সরকার ম'শায়ের আত্মীয় স্বজন সব জুটে পড়লেন। যে সরকার ম'শাইকে এঁদের ভিতর অনেকে কৃপণ বলে গালাগালি দিয়াছিলেন এবং উহার ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নান করতে হয় বলে সকলকে সাবধান করে দিতে এতটুকু লজ্জা অনুভব করেন নি তাঁদের ভেতর আজ অনেককে চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদতে দেখে আমার সত্যিই বিস্ময়ের সীমা রইল না।

বাইরে এসে উইলখানা আগাগোড়া পড়লাম। একবার—দুবার…তিনবার যখন পড়লাম তখন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। এ জীবনে অনেক উইল দেখেছি অনেক উইলের কথা যে না শুনেছি এমন নয়, কিন্তু এমন একখানা উইলের কথা শুধু আমি কেন আমার মতন আর দশজনেও শুনেছেন বা দেখেছেন বলে মনে হয় না। দানের পরিমাণে হয় ত ইহার চেয়ে অনেকের উইলে অনেক বেশী, কিন্তু নিজে না খেয়ে আর আজীবন দারুণ কষ্ট করে এবং নামের মোহ ত্যাগ করে জগতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে প্রায় দুইশত পরিবারের ভরণ পোষণের ভার এমনভাবে মাথা পেতে নিতে এবং সেটি চিরস্থায়ী ক'রবার মানসে এমন একটি উইলের সৃষ্টি করতে কে ক'টি দেখেছেন? এতদিনে মনে হল বুড়ো মাঝে মাঝে উধাও হতেন কোথায় এবং কেন! ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে যে সব উইলের সৃষ্টি হয় সে শ্রেণীর উইল যে এ নয় এবং অনেক দিনের সঞ্চিত বাসনা যে এই উইলখানির সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়ান আছে তা ডাক্তার, এটর্নী এবং সাক্ষীদের সই এর তারিখ দেখলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

যাক, পরের দিন বেলা একটা নাগাদ সৎকারের কোন ব্যবস্থাই দেখলাম না বটে কিন্তু যা চোখে পড়ল এবং তাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলাম তা সচরাচর হয় ত বা সকলের ভাগ্যে ঘটবে না। সকল আত্মীয়দের এটর্নী উকীল প্রভৃতি এলেন। ঘরে ঘরে নূতন কড়া লাগান হ'ল এবং ছুঁটা করে তালা লাগাতেও দেরী হল না। পরে নানারূপ জল্পনা কল্পনার পর সকলের উপস্থিতিতে সিন্দুক খুলে সেই পয়সায় তাঁর সৎকার করা উচিত কি না সেই নিয়ে বেশ একটু বচসা যে না হল এমন নয়। পরে ঠিক হল আপাততঃ সিন্দুকের সাহায্য না নিয়ে সকলের সমান বখরায় সৎকার করা হবে।

ঘাটে যাইয়াও সেই একই ব্যপার। মুখাগ্নি কে করবে সেই নিয়ে বিভ্রাট বেঁধে গেল। যে মুখ দেখলে অন্ন জুটবে না বলে তাঁদের ভেতর প্রায় সকলেই কিছুদিন আগে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে পাড়ায় চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিয়ে গেছলেন, আজ তাঁরা সকলেই সেই মুখে আগুন দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শেষে ক্যামেরাকে সাক্ষী রেখে দু'জনে মিলেই আগুন লাগিয়ে দিলেন। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমিও যে একদিন তাঁহাকে কৃপণ বলে উপেক্ষা করেছিলাম তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইলাম। পরে চিতার পাশে অন্যমনস্কভাবে বসতে যাব এমন সময় একটু দূরে সরকার ম'শায়ের আত্মীয় স্বজনের গলা শুনে মনে হ'ল বোধ হয় তাহাদের ভেতর হাতা-হাতি লেগে গেছে। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে একটু নির্জ্জন জায়গা খুজে নিলাম। অভাগা আত্মীয় বেচারীদের জন্যে সত্যিই বড় কষ্ট হ'ল। কিন্তু উপায় কি! বসে কেবলই মনে হ'তে লাগল কি ক'রে সোদপুরে তার প্রতিষ্ঠিত নারী কল্যাণ সমিতি এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রায় দুইশত দুঃখী পরিবারের ভরণ পোষণের ভার তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার দ্বারা যথাযথভাবে বজায় রাখা সম্ভব হবে।

*

সমস্ত কাজ শেষ করতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল, চিতার উপরে শেষ কলসী জল দিয়ে ফিরে আসবার মুখে মনে হ'ল লোকটা মানুষ না দেবতা!

ভগবানের উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে আপনা হতেই কথাক'টি বেরিয়ে গেল—"আমরা তোমার খেলার পুতুল সত্যি, কিন্তু মানুষ নিয়ে এমনতর খেলা তুমি আজ পর্য্যন্ত ক'টি খেলতে পেরেছ প্রভু!"

বঙ্গীয় গণ-শিক্ষা ও গণ-শিল্পের ধারা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

আমাদের দেশে পূর্ব্বে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, একথা বলা যায় না। কবি-কথকতা, ব্রত-প্রণালী, শিল্প-ধারা প্রভৃতি ধারার ভিতর দিয়া শিক্ষা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িত। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে নাগরিক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সুদূর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে অন্তরের যোগ ও ঐক্য ছিল, তাহা এখন অবলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুই শ্রেণীর চিন্তা ও ভাব-ধারার মধ্যেও ক্রমশঃ একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অক্ষর পরিচয় যদিও কম ছিল, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সকলেরই অল্প-বিস্তর ছিল।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ করা। লিখন-পঠনে অভ্যস্ত হইলেই শিক্ষা সমাপ্ত হইল মনে করিবার হেতু নাই। লিখন-পঠনেই যদি শিক্ষা পর্য্যবসিত হয় এবং তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষায় দেশ ও জাতি লাভবান হইতে পারে না; তাহাতে অর্থ ও সময়েরই অপব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতের শিক্ষার চিরন্তন পদ্ধতি ছিল অন্য প্রকারের; তাহাতে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইত।

আমাদের দেশে সাহিত্য, শিল্পানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুষ্ঠান, নৃত্য-কলা প্রভৃতির ভিতর দিয়া শিক্ষার যে ধারা বর্ত্তমান ছিল এবং বর্ত্তমানেও পল্লী প্রদেশে জীবন্ত রহিয়াছে, তাহাকে 'গণ-শিক্ষা' নামে অভিহিত করা যায়।

আধুনিক শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গ্রামবাসীর মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। নাগরিক সভ্যতা ও গ্রাম্য সভ্যতার ভিতর যে সুদৃঢ় দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে গণ-সংস্কৃতি ও গণ-সংযোগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। আজ আমাদের দেশের গ্রামের সাহিত্য, শিল্প ও উৎসবগুলি মরণোন্মুখ—শিক্ষিত শ্রেণীর অবহেলা ও অনাদরই ইহার অন্যতম কারণ। গ্রামবাসীদের আন্তরিক চেষ্টায় এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেইটুকু আমরা যদি সংগ্রহণ না করি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এইগুলিও বিলীন হইয়া যাইবে।

আমরা যদি গ্রামের সাহিত্য, গ্রামের শিল্প, গ্রামের উৎসব-গুলিকে পুনরায় বাঁচাইয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে "গ্রাম-উন্নয়ন" অনেকটা সুগম হইয়া আসিবে। ইহাতে গ্রামে শিক্ষার প্রসার লাভ করিবে। গ্রামের শিল্পকলাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেকটা উন্নত হইবে। অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন ও গণ-জীবনের মধ্যে যে দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে এবং একটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গণ সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানে গণ-সাম্যের যে প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিব। গ্রামের পাল-পার্ব্বণ, আতিথেয়তা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, পথ-নির্ম্মাণ, প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে সার্ব্বজনীন সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আবার উহা ফিরিয়া আসিবে। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব্বে আমাদের গ্রামগুলিতে এগুলির প্রভাব ছিল না। খুড়া, মামা, দাদা প্রভৃতি গ্রাম্য সম্বন্ধের ভিতর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভাব বিরাজমান থাকিত। দেশের যে সব স্থানে এখনও আধুনিক শিক্ষা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্য অনেক পরিমাণে অব্যাহত আছে। সেই সব অঞ্চলে গ্রাম্য সংস্কৃতির অনুশীলন এখনও কিছু কিছু সংরক্ষিত আছে। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা নৃত্যানুষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুসলমানে সমবেতভাবে যোগদান করে এবং উৎসবগুলিকে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। জাতির অতীত সংস্কৃতির ক্রমধারার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্রমধারার ভিতর এমন মিলন-নির্ঝরিণী অন্তঃপ্রবাহিত হইতেছে, যাহাতে

জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশের নর-নারী মৈত্রী ও ঐক্য-প্রবাহে সংস্কৃতির গর্ব্বে গৌরবান্বিত হইতে পারে। বাঙ্গালার গণ-শিক্ষা যদি এই ভাবে ঐক্য-প্রবাহের ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভূমিতে মৈত্রী ও একতার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে

বর্ত্তমান জটিলতার যুগে সাহিত্যকে বিলাসিতা বা ভোগের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করিলে গণ-জীবন জয়যুক্ত হইতে পারিবে না। সাহিত্যকে এমনভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া গণ-শিক্ষা ও জাতীয়তা সম্পূর্ণ রূপায়িত হইয়া উঠে। তবেই গণ-শিক্ষা গণ-জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হইতে পারিবে। গণ-সাহিত্য হইবে তাহাই, যাহাতে গণ-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা রসাত্মকভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। গণ-সাহিত্য হইবে শুদ্ধি ও সরলতার বাহক—তাহাতে গণ-শিক্ষা সহজ হইয়া উঠিবে। গণ-সাহিত্যে স্ব-দেশের জাতীয় সংস্কৃতি-ধারার ছবি সুস্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—তবেই, গণ-জীবন মুক্তির এবং শক্তির ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিবে। যদি গণ-সাহিত্যকে গণ-জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারা যায়, তবেই গণ-সাহিত্য হইবে সত্য, সুন্দর ও বলিষ্ঠ।

বাঙ্গালার শিল্পী ও কৃষক শ্রেণীর পল্লীবাসিগণ লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই এই লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের প্রধান শিক্ষা হইতেছে সাম্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের আদর্শ প্রচার করা।

ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে শিক্ষার কর্ম্মানুষ্ঠান কতকটা চলিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিক্ষা যতক্ষণ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-কলার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। শিল্প-কলার সাহায্যে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। শিল্প-কলার অনুশীলনে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে সৌন্দর্য্য-সুষমাবোধ ও রসবোধ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। শিল্পকলার রসবোধ অভাবে মানুষ শিল্পের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার যতখানি মনোযোগ দেন, শিল্প-কলার শিক্ষায় তাহার কিছুই দেন না। ইহার একমাত্র কারণ বোধ হয় আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ শিল্প-কলার উপযোগিতা বুঝেন না। ইহার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষা প্রণালী। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষানুশীলনের ন্যায় শিল্পকলার অনুশীলনও যে একান্ত অপরিহার্য্য আমরা এখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের দেশের যে দুই চারি জন শিল্প-কলার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, অথবা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা পেশাদারী শিল্পী বলিয়া থাকি অথবা ইহা তাঁহাদের বিলাস বলিয়া বুঝি। এই প্রকার ধারণার মূলে রহিয়াছে শিল্প-কলার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা এবং শিল্প-কলার রসবোধের অভাব।

শিল্প-কলার দুইটি দিক আছে—একটি হইতেছে আনন্দোপভোগ, অপরটি হইতেছে অর্থার্জ্জন। তাছাড়া শিল্প-কলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন চারু-শিল্প ও কারু-শিল্প। চারু-শিল্পের অনুশীলনে আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রচুর আনন্দ পাইতে পারি। আর, কারু-শিল্পের অনুশীলনে আমরা জীবনধারণের জন্য অর্থার্জ্জন করিতে পারি।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শিল্প-কলার সৌন্দর্য্যবোধে অধিকারী ছিলেন। আমাদের সে চোখ আর আর নাই। আজও পল্লীবাসীদের মধ্যে শিল্প-কলার অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীবধূ প্রতিদিন তাঁহার মাটির গৃহখানি পরিস্কৃত করেন, আলিপনা দেন এবং গৃহখানি নানাভাবে সুসজ্জিত করেন।

বাঙ্গালার শিল্প-কলার ধারাবাহিক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভিজাত ও লৌকিক স্তর ছিল। অভিজাত উন্নত শ্রেণীর শিল্প ছিল প্রস্তর শিল্পের ভাস্কর্য্য। ভাস্কর্য্য-শিল্পে বাঙ্গালাদেশ অষ্টম শতকে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। বরেন্দ্রের অধিবাসী বীট্‌পাল ও ধীমান্ সেই সময়ে প্রধান শিল্পী ছিলেন। তাঁহারা বিহার ও তিব্বতে গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছিলেন। অভিজাত ভাস্কর্য্য-শিল্প বাঙ্গালাদেশে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত জীবন্ত ছিল। তারপরই ভাস্কর্য্য-শিল্পের অধঃপতনের যুগ। অতঃপর অভিজাত শিল্পের ধারা পোড়ামাটির (Terra Cotta) শিল্পকলার ভিতর দিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতে থাকে—এই ধারা অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল।

তারপর পোড়ামাটির শিল্প-কলার অধঃপতন সুরু হয়। ভাস্কর্য্য-শিল্প অথবা পোড়ামাটির শিল্প দেশের নৃপতি বা জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট হইত। বাঙ্গালাদেশের মিউজিয়মগুলিতে ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন যেমন, অষ্টভুজা, দশভুজা, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি প্রস্তর মূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত রহিয়াছে।

এই অভিজাত উন্নত শিল্প-কলায় দেশের অনুন্নত অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের অধিকার ছিল না। অশিক্ষিত সম্প্রদায় হয় ত অভিজাত শিল্প বস্তুগুলি দর্শন করিবার সুযোগ পাইত, ব্যবহার করিতে পারিত না। এই জন্য অনুন্নত অশিক্ষিত সম্প্রদায় সহজলভ্য মাটি ও কাষ্ঠের সাহায্যে শিল্পকলার অনুশীলন করিত—এই শ্রেণীর শিল্পই ছিল লৌকিক-শিল্প, দেশের "গণ-শিল্প"। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পীরা কাষ্ঠ ও মাটির সাহায্যে অষ্টভুজা, দশভুজা, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্ত্তি রচনা করিত। অদ্যাপি এই লৌকিক শিল্প-রীতি প্রাণবন্ত রহিয়াছে।

আমাদের সামাজিক জীবনে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি জননীর মঙ্গল কামনাকে কেন্দ্র করিয়া সুসম্পন্ন হয়। এই সব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শিল্প-কলার প্রাধান্য এত বেশী দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে মনে হয় শিল্প-কলার অনুশীলন হেতুই এই সব অনুষ্ঠান। গ্রাম্য শিল্পী বর ও কন্যার জন্য সোলার মুকুট রচনা করে—সোলার মুকুট শিল্প-শ্রীতে মণ্ডিত হয়। বরণডালা ও চালুনীতে গ্রাম্য শিল্পী নানাপ্রকারের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করে। গৃহখানির অঙ্গণ নারীর আলিপনা চিত্রকলায় পরিশোভিত হয়। এই আলিপনা শিল্পরীতির মধ্যে বাঙ্গালী নারীর রসগ্রহিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় মিলে। আলিপনা ললিতকলা বাঙ্গালী মহিলার জাতীয় সম্পত্তি। অদ্যাপি আলিপনা শিল্পরীতি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। আলিপনার ভিতর দিয়া মহিলারা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ও বাঙ্গালী প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি মধুরভাবে ফুটাইয়া তোলেন। এই আলিপনা শিল্পের মধ্যে এমন একটি সুললিত মধুর সুরের রেশ রহিয়াছে, যাহাতে দর্শকের মনে আপনা হইতেই স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। গ্রীক, রোমীয় বা চৈনিক শিল্প-সৃষ্টির মূলে ছিল দেশের রাজশক্তি—সেখানে দেশের মনোরঞ্জনের জন্যই শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের শিল্প-সৃষ্টির মূলে এরূপ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতীয় শিল্প রীতি মূলতঃ ধার্ম্মিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকেই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও ভারতীয় শুভকর্ম্ম বা দেব অভ্যর্থনার প্রারম্ভেই আলিপনা শিল্পরীতি।

ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সাঁজতি প্রভৃতি ব্রত উপলক্ষ্য করিয়া নারী আলিপনা শিল্প-রীতি শিক্ষা করিবার সুযোগ পান। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য লৌকিক শিল্প-সৃষ্টিতেও পল্লীর মহিলা সুনিপুণা। শয্যা, বালিশ, আসন, প্রভৃতিতে ব্যবহারের নিমিত্ত পল্লীর মহিলারা কাঁথা প্রস্তুত করেন। এই কাঁথায় রং-বেরং এর সুতা দিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত হয়। কাঁথার চিত্রগুলি অপূর্ব্ব শিল্প ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। পল্লীজীবনে নারীর কল্যাণ-হস্তের শিল্পকলার মধ্যে শিকা, পাশা, দাবা খেলার ছক, পানের বটুয়া প্রভৃতি বিচিত্র কারুকার্য্য, চিত্রমণ্ডিত সাজি ও কুলা, শিশুদের খেলার জন্য সোলা ও মাটির পুতুল, মাটির কলসী, সরা প্রভৃতির উপর কারুকার্য্য প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসনীয়। এই সব কারু-শিল্পে পরিবারের আর্থিক সাহায্যও হয়। বহু পল্লীনারী এই জাতীয় কারু-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করেন।

গ্রামের মালাকর, ছুতার, কুম্ভকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নরনারী পুরুষানুক্রমিকভাবে নিপুণ শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহারা সোলা, কাষ্ঠ, মাটি প্রভৃতির লৌকিক শিল্পের ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। বীরভূম, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের নরনারীর জীবিকা হইল পট-চিত্র অঙ্কন। রাজসাহী জেলার কলম অঞ্চলের, পাবনা জেলার বেড়া অঞ্চলের, ঢাকা, কলিকাতা কুমারটুলী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা মাটির সাহায্যে সুন্দর কারুশিল্প রচনা করে এবং এই সব বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

বাঙ্গালাদেশে বাঁশ খুব সহজ-লভ্য। বাঙ্গালাদেশের পাটনী, মুদ্দাফরাস, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁশ হইতে কারু-শিল্প রচনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। শিক্ষিতদের হাতে পড়িলে বাঁশ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। বাঁশ-শিল্পের ব্যবসাতে মূলধনও বেশী প্রয়োজনীয় নহে। গৃহের ব্যবহারের জন্য বাঁশ হইতে বহু কারু-শিল্পই

রচনা করা যাইতে পারে যেমন, মোড়া, চেয়ার, বাস্‌কেট্‌, সাজি, ঝুড়ি, চালুনী, বরণডালা, কুলা, টোকা, পাখা, পেটারী প্রভৃতি। রচনা কৌশল নিপুণ শিল্পীর অধীনে শিক্ষনীয়। বাঁশের মোড়া ও চেয়ারের উপর কারুকার্যাদ্বারা চামড়ার গদি বসাইলে এগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। বাঁশের চাষও কঠিন নয়। বাঙ্গালাদেশে বহু অনাবাদী জমি পড়িয়া থাকে। এই সব স্থানে অল্প ব্যয়েই বাঁশের চাষ করা যাইতে পারে। কলিকাতা ও ভারতের প্রধান প্রধান প্রদর্শনীতে বাঁশের কারু-শিল্পগুলি দেখান যায় এবং ইহাতে এ গুলির জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতে পারে। বাঁশের ন্যায় বেঁতও বাঙ্গালাদেশে সহজ লভ্য। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের বহু স্থানে বেঁতের জঙ্গল দৃষ্ট হয়। বেঁত হইতেও মোড়া, চেয়ার, কুলা, ডালি, পেটারী প্রভৃতি কারু-শিল্প রচিত হইতে পারে। বাঁশ ও বেঁত-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা পরীক্ষা হওয়া অতি প্রয়োজন।

এককালে বাঙ্গালার তাঁত-শিল্প জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিন্তু উৎসাহ ও গবেষণার অভাবে তাঁত-শিল্প এখন পল্লীতে লৌকিক শিল্প হিসাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাঁত-শিল্পেও মূলধন বেশী প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালাদেশেই তুলা, রেশমের চাষ সহজেই হইতে পারে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ঢাকার মস্‌লিন ও বালুচর শাড়ী বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপের অধিবাসিগণের নিকট সুপরিচিত লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার বয়ন-শিল্পের পুনরুদ্ধারে বহু লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে। বাঙ্গালার তাঁত-শিল্পের প্রতি সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালার চাষীরা নানা কারণে দেশ হইতে কার্পাস ও রেশমের চাষ তুলিয়া দিয়া পাট চাষের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পাট চাষের ফলে দেশের জলবায়ু নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও প্রনষ্ট হইয়াছে। অতিরিক্ত পাট চাষের পরিবর্ত্তে কার্পাস ও রেশমের চাষের পুনঃপ্রবর্ত্তন হইলে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যও বদলাইবে এবং আর্থিক উন্নতিও সাধিত হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ পাইলে বাঙ্গালার তাঁত-শিল্প উন্নততর হইতে পারিবে। শ্রীরামপুর, শান্তিপুর, প্রভৃতি স্থানের তাঁতের মিহি ধুতি সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকার 'জামদানী' শাড়ী নানা কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ।

কারু-শিল্পের মধ্যে শঙ্খ-শিল্প এবং হস্তিদন্তের শিল্প কাজ অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়া লাভজনক ব্যবসা। ঢাকার শঙ্খ-শিল্প এবং মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের শিল্প-কাজ সমগ্র বাঙ্গালায় সুবিখ্যাত।

প্রাচীন বাঙ্গালার অভিজাত উন্নত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বর্ত্তমানে মৃত। ভাষা ও সাহিত্যের মতই প্রাচীন বাঙ্গালার অভিজাত উন্নত শিল্পি ভাস্কর্য্য ও পোড়ামাটির কারু-শিল্প বর্ত্তমানে মৃত। প্রাচীন বাঙ্গালার লৌকিক-শিল্পের ধারা আজও পল্লীতে পল্লীতে অল্প বিস্তর জীবন্ত রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার অভিজাত সাহিত্য ও শিল্পের অধঃপতনের মূলে রহিয়াছে যে, এইগুলি ছিল ধনী লোকের বিলাস, ভোগ এবং গর্ব্বের বস্তু। এ গুলির উপর জনসাধারণের অধিকার ছিল না। লৌকিক-সাহিত্য ও লৌকিক-শিল্প ছিল জনসাধারণের নিত্যকার ব্যবহারিক বস্তু। সেই জন্যই জনসাধারণের লৌকিক-সাহিত্য ও লৌকিক-শিল্পের ধারা লোক পরম্পর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। লৌকিক-সাহিত্য ও লৌকিক-শিল্পের ধারা সংরক্ষিত হইবার আরও হেতু রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার জনসাধারণ লৌকিক-সাহিত্য ও লৌকিক-শিল্পের ধারা প্ররক্ষণ করিবার জন্য এ গুলিকে সুদীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য এ গুলির স্থায়ী প্রচার ও জনপ্রিয়তার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঠিক এই কারণেই পাল-পার্ব্বন, উৎসব অনুষ্ঠানগুলির প্রবর্ত্তন। প্রাচীন উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সামাজিক ও ধার্ম্মিক। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক উৎসব। রথযাত্রা, মহরম, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ধার্ম্মিক উৎসব। প্রাচীনকালে এই সব উৎসব ছিল বড় বড় প্রদর্শনী বিশেষ। প্রত্যেকটি উৎসবের তিনটি করিয়া অঙ্গ ছিল—(১) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান (২) সঙ্গীতের আসর (৩) মেলা অনুষ্ঠান। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পূজা-পার্ব্বণ, লোকজনের ভুরি ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিত। সঙ্গীতের আসরে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথকতা, কবি, কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতি নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইত। মেলা অনুষ্ঠানটিই ছিল প্রধান ব্যবহারিক প্রদর্শনী। মেলায় জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইত। মেলায় পল্লী প্রদেশের কারুশিল্পের আমদানী হইত। এই সব কারুশিল্পের মধ্যে কাঠ ও মাটির নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর পুতুল ও খেলনা, পট চিত্র, বাঁশী, বিচিত্রিত পাখা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সব অনুষ্ঠান ছিল গণ-সাম্যের কেন্দ্রস্থল। এই সব অনুষ্ঠানের প্রধান শিক্ষা ছিল জনসেবা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। এই সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জনসাধারণের আনন্দের প্রবাহ থাকিত জীবন্ত।

এক

নমাজপড়া শেষ করিয়া মতিবিবি উঠিয়া বসিল। সম্মুখে দাসী অণিমা দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বিবি সাহেবা, কয়েকটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

—হিন্দু!

—হিন্দু।

—কেন?

—বলতে পারি না। ডাকব?

—না। আমিই যাচ্ছি,—চল! কোথায়?

—অন্দরমহলে।

মতিবিবি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা বসিয়াছিল। মতিবিবিকে দেখিয়া তাহারা সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

মতিবিবি মোলায়েম স্বরে বলিল, "তোমরা এসেছ কেন, কি চাও?"

সকলে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা কয়েক পা আসিয়া বলিল, "মা! আমরা দীন-দুঃখী লোক, আপনাদের খেয়ে-পরে মানুষ—"

মতিবিবি হাসিয়া বলিল, "খাজনাবাকী পড়েছে?"

"না।"

মতিবিবি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে?"

"মা! আগামী পূর্ণিমায় মোদের হোলী উৎসব—কিন্তু..."

"মানে কিছু চাই, কেমন?"

"আজ্ঞে না! হুজুর নিষেধ করে দিয়েছেন। তার এলাকায় কেউ হোলী খেলতে পারবে না।"

"বাপজান বলেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ!"

"অসম্ভব! এ অন্য লোকের কাজ। তোমারা বাপজানের নিকট গিয়ে সব খুলে বল,—বুঝলে।"

"আজ্ঞে, মোদের মরদরা তানার নিকট গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও ঐ এক কথা বলে দিলেন।"

তাহাদের চোখে জল আসিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া বলিল, "তুমি ছাড়া মা মোদের উপায় নেই। তুমি এর বিহিত করে দাও।"

মতিবিবি কোমল স্বভাবা। নিজেও একজন গোড়া মুসলমান। প্রত্যহ দিনে, রাত্রে কোরাণ পাঠ করে, নমাজ পড়ে। এই সব কারণে তাহার মন যেমন উদার, তেমনই পবিত্র।

মহিলাদের কথা শুনিয়া, তাহার কোমল প্রাণে ব্যথা পাইল, বলিল, "তোমরা যাও। আমি বাপজানকে বলে তোমাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিব।" মহিলাদল সন্তুষ্ট হইল। তাহারা মতিবিবিকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

অণিমাবিবি কহিল, "এ তোমার অন্যায় বিবিসাহেবা। হুজুরের হুকুমের উপর কথা বলা তোমার উচিত হয় নাই। এতে ছোট-লোকেরাও প্রশ্রয় পায়। হুজুর শুনলেও তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।"

মতিবিবি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা! সে আমি বুঝব, তুই যা।"

তখন দুপুরবেলা। মতিবিবি পিতার খোঁজে চলিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া নদীর হাওয়া বহিতেছিল। দূরে, বহু দূরে আম্রশাখে বসিয়া একটা কোকিল ডাকিতেছিল কুহু, কুহু।

জমিদার নসিরুদ্দীন খোলা বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। দূরে বিশখা নদী কল্ কল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। মতিগর গ্রামখানিকে এই নদীই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরিয়া রাখিয়াছে।

মতিবিবি খুঁজিতে খুঁজিতে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নসিরুদ্দীন তখনও একমনে বই পড়িতেছিলেন। মতিবিবির মা নেই। শিশু অবস্থায় তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতাই তাহাকে লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়াছেন। তাহার যত আবদার, খেলাধুলা পিতার সঙ্গেই করিত। নসিরুদ্দীনও কন্যা ভবিষ্যতে কষ্ট পাইবে মনে করিয়া আর বিবাহ করিলেন না। কাজেই এ বাড়ীতে মতিবিবির অসীম ক্ষমতা।

নসিরুদ্দীনকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মতিবিবির মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া নসিরুদ্দীনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাত দিয়া পিতার চোখ টিপিয়া ধরিল।

নসিরুদ্দীন মৃদু হাসিয়া বলিল, "জাহানারা—আবদুল—ফতেমা—" মতিবিবি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "হুয়ো, বলতে পারলে না, হুয়ো।" বলিতে বলিতে সে আসিয়া পিতার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নসিরুদ্দীন হাসিয়া বইতে মন দিলেন। মতিবিবি পিতার হাত হইতে বইটা ছোঃ মারিয়া লইয়া গেল।

নসিরুদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, "কি মতলব নিয়ে এসেছ মা, বল?"

"গল্প বল, বাপজান।"

"কি গল্প বলব মা! ভূতের, রাক্ষসের।"

"ও ছাই ভাল লাগে না। নূতন দেখে বল।"

"তবে তুই বল,—আমি শুনি?"

"আমি বলব, বাপজান?" মতিবিবি খুসী হইয়া উঠিল।

"বল।"

"আমার গল্প শুনে রাগ করবে না,—বল?"

"না তুই বল।"

"আচ্ছা! বলছি,—শোন! ওকি বই হাতে নিলে যে?"

নসিরুদ্দীন হাসিয়া বলিল, "এই রাখলুম। এখন তুই বল।"

"শোন!" মতিবিবি বলিতে আরম্ভ করিল,—"এক গ্রামে এক জমিদার বাস ক'রত। জমিদার মুসলমান হ'লেও হিন্দু মুসলমান প্রজাদের সমান চক্ষে দেখত। প্রজারাও জমিদার সাহেবকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রত। মোট কথায় দেশটা বেশ সুখেই চলত। হঠাৎ জমিদার সাহেবের দুর্বুদ্ধি হ'ল। সে কতগুলো স্বার্থপর লোকের পরামর্শ শুনে, হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার সুরু করে দিল। তাহাদের ধারণা হিন্দুদের উপর যত অত্যাচার করবে, মুসলমান সমাজে তাহাদের নাম ততই প্রতিষ্ঠা হবে।"

নসিরুদ্দীন হাসিয়া ফেলিলেন। বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক, তোমাকে আর কষ্ট করে গল্প বলতে হবে না। কিন্তু তোর মতলব কি বলত মা?"

মতিবিবি হাসিয়া বলিল, "শুনলাম! তুমি নাকি হিন্দুদের হোলী উৎসব করা নিষেধ করে দিয়েছ! একথা কি সত্যি বাপজান?"

"হ্যা! সত্যি।"

মতিবিবি চমকিয়া উঠিল, বলিল, "তোমার মুখে না শুনলে, এ আমি বিশ্বাস করতুম না। এ আদেশ তুলে দিতে হবে বাপজান?"

নসিরুদ্দীন কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুই না মুসলমান। তোর দেহে না মুসলমান রক্ত বইছে। তোর মুখে এই কথা,—ছিঃ!"

মতিবিবি হাসিল, বড় মধুর ভাবে হাসিল, বলিল,—"বাপজান।"

"কি মা?"

"বাপজান! আমি মুসলমান। আমার দেহে মুসলমান রক্ত বইছে,—সে ঠিক। কিন্তু বাপজান, মুসলমান ভালবাসে তার ধর্ম্মকে,—তাই সে অপরের ধর্ম্মে হাত দিতে প্রাণে ব্যথা পায়। মুসলমান জানে তার ধর্ম্মকে রক্ষা করতে, তাই সে অপরের ধর্ম্মে বাধা দিতে তার হাত ওঠে না। বাপজান অপরের ধর্ম্মে হাত দিলে খোদা নারাজ হন। খোদার অভিশাপ নিও না বাপজান। হিন্দুদের তুমি উৎসব করতে দাও।"

নসিরুদ্দীন অবাক হইয়া গেলেন। এতটুক বয়সে সে এত কথা কি করিয়া শিক্ষা করিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে বুকে টানিয়া লয়। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া গম্ভীর মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! আচ্ছা! সে দেখা যাবে, এখন তুই যা!"

সরলমতি মতিবিবি পিতার মনের কথা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল তাহার পিতা তাহার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। সে জন্য সে হাসিয়া বলিল, "জানি বাপজান জানি! তুমি আমার কথা কখনো ফেলতে পার না। নাও! এখন বই পড়, আমি আসি।" মতিবিবি চলিয়া গেল।

দুই

আজ হোলী উৎসব। সারা ভারতবর্ষ এই উৎসবে মাতিয়া উঠিল। শুধু মতিহার গ্রাম কয়েকখানি বিষাদে

ম্রিয়মান। হিন্দু মাতব্বররা দলে দলে জমিদার বাড়ীতে গিয়া ধন্না দিল। নসিরুদ্দীনকে কত অনুনয় বিনয় করিল, কত কাঁদিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাহারা বিষণ্ণ বদনে ফিরিতে বাধ্য হইল।

হরিমোহন বলিল, "আমরা উৎসব করবই। এতে আমাদের বরাতে যা আছে হউক।"

গোপাল ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "ধর্ম্মের অবমাননা সইব না। উৎসব আমরা করবই।" একে একে সকল মাতব্বররা একমত হইল। মতিহার গ্রামখানি আবার আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

কে কাহার গায় রং দিবে, তাহা লইয়া হুড়া-হুড়ি মাতা-মাতি চলিল। সকলে রং খেলায় ব্যস্ত। পথ ঘাট রঙ্গে লালে-লাল হইয়া উঠিল।

নসিরুদ্দীনের কাণে সকল ঘটনা গেল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার ভাবি জামাতা হাসান আলী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। সেই এই জমিদারীটা পরিচালনা করিত। সে বলিল, "বেটাদের বড় সাহস বেড়েছে। আপনার হুকুমটার কোন মর্য্যাদা রাখলে না।"

নসিরুদ্দীন উদাস ভাবে বলিলেন, "থাক! বছরের দু'টা দিন—করুক।"

হাসান আলী হাসিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে, বেটাদের একবার আস্কারা দিলে মাথায় উঠে বসবে। আমাদের আর মানতে চাইবে না, হুজুর।"

"বেশ! তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, কর। কিন্তু ওরা ফি বছর ত করেই থাকে।"

"আর কিন্তু টিস্তু তুলবেন না হুজুর।" বলিয়া হাসান আলী দ্রুত চলিয়া গেল। উৎসব বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। যাহারা জমিদারের ভয়ে উৎসবে যোগদান করে নাই তাহারাও এখন একে একে আসিয়া উৎসবে যোগ দিতে লাগিল। আমোদ মাতিয়া উঠিল। অকস্মাৎ জমিদারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দল আসিয়া উৎসবে বাধা দিল। উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাজিয়া উঠিল। বহু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় নিহত হইল, কেউ বা আহত হইল। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিল, গৃহে গৃহে আগুণ জ্বালাইয়া দিল। আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে পল্লী কাঁপিয়া উঠিল। হিন্দুরাও প্রতিধ্বনি করিয়া উত্তর দিল, 'বন্দেমাতরম্।' ক্ষুদ্র গ্রাম কয়েকখানি পৈশাচিক উৎসবে মাতিয়া উঠিল।

মতিবিবি ঘরে বসিয়া সব শুনিল। যাবার সময় নসিরুদ্দীন ঘরের ভিতরে আসিলে, তাহার নিকট মতিবিবি কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, "বাপজান, একি কল্লে? কেন তুমি গুণ্ডাদের খেপিয়ে তুললে?"

নসিরুদ্দীন আজ কন্যাকে সান্ত্বনা দিলেন না। বরং একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "সব ব্যাপারে তুই মাথা ঘামাস্ কেন,—বল ত'? এ সব রাজনৈতিক ব্যাপার। তুই কি বুঝবি,—বল!"

"রাজনৈতিক-টৈতিক বুঝি না বাপজান। তুমি থামাবে কি না,—বল?"

"আমি থামলেও হিন্দুরা থামবে না! যে আগুন জ্বলেছে,—তা ভাল করেই জ্বলুক।"

"তবে, তুমি থামাবে না বল?"

"উপায় নেই?"

"আছে, বাপজান?"

"নেই,—নেই,—নেই,—যা বিরক্ত করিস নি।"

কোন যুক্তিই নসিরুদ্দীনের কানে গেল না। কয়েক দিন ধরিয়া সমানে গৃহদাহ, খুনা-খুনি উভয় পক্ষে চলিল। সহর হইতে পুলিশ আসিল, সৈন্য আসিল। কিন্তু কোন প্রতিকার হইল না। দাঙ্গা সমানে চলিতে লাগিল।

একদিন গভীর রাত্রে নসিরুদ্দীনের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কি মনে করিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মতিবিবির ঘর হইতে তখন আলোর রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। এত রাত্রে ঘরের মধ্যে আলো দেখিয়া নসিরুদ্দীন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজা ভিতর হইতে খোলা ছিল। নসিরুদ্দীন মৃদু আঘাত করিতে দরজা আপনি খুলিয়া গেল। মতিবিবি তখন হাটু গাড়িয়া বসিয়া খোদার প্রার্থনা করিতেছে। তাহার দু'নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল। নসিরুদ্দীন স্পষ্ট শুনিলেন, মতিবিবি প্রার্থনা করিতেছে,—খোদা! খোদা! এই অত্যাচার বন্ধ করে দাও,—খোদা! পিতার সুবুদ্ধি দাও। তাঁহাকে অন্যায়ের হাত হ'তে বাঁচাও। আমি আর এ অত্যাচার দেখতে পারি না—খোদা!

নসিরুদ্দীনের চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাহার কন্যা এত উদার, এত মহৎ। বিশ্বমানবের জন্য তাহার অন্তর কাঁদিয়া বেড়ায়। পিতার মঙ্গলের জন্য তাহার এত আকুলতা। সে পিতাকে কত বুঝাইয়াছে, কত অনুরোধ করিয়াছে, পিতা তাহার কথা শোনে নাই। সে জন্য সে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া খোদার নিকট তাহার পিতার মঙ্গল কামনা করিতেছে। নসিরুদ্দীন আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধরা গলায় ডাকিলেন,—মা!

কোন উত্তর নাই। নসিরুদ্দীন আবার ডাকিলেন,—মা! এইবার মতিবিবি চমকিয়া উঠিল। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া মতিবিবি উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, "বাপজান! তুমি,—তুমি এসেছ! খোদা তা হ'লে আমার ডাক শুনেছেন।"

"শুনবেন বই কি মা!" নসিরুদ্দীন ধরাগলায় বলিলেন।

মতিবিবি পিতার হাত দু'খানি ধরিয়া আবদার পূর্ণ স্বরে বলিল, "তবে, তুমি এই দাঙ্গা বন্ধ করে দেবে বাপজান,—বল?"

"দেব মা! দেব! তুই যাতে খুসী হ'স তাইকরব।"

পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া মতিবিবি বলিল, "আঃ! তুমি কি ভাল বাপজান। না বুঝে তোমায় কত মন্দ বলেছি। আমায় ক্ষমা কর বাপজান!" বলিয়া সে পিতার পা স্পর্শ করিতে গেল।

মতিবিবিকে সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া নসিরুদ্দীন বলিলেন, "তোর দোষ কি মা! সবই ত' আমার দোষ। যাও এখন শোও গিয়ে।" নসিরুদ্দীন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তিন

সতি সত্যি দাঙ্গা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচ যেমন আর জোড়া লাগে না, সেইরূপ হিন্দু-মুসলমানের মনে শান্তি ফিরিয়া আসিল না। তুষের আগুনের মতন তাহাদের অন্তর জ্বলিতে লাগিল। ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখ ছাড়িয়া জ্যৈষ্ঠে পড়িল। ভাঙ্গা হাট আর বসিল না। তুচ্ছ একটা ব্যাপার লইয়া প্রায়ই দাঙ্গা বাঁধিয়া উঠিত।

লোকের যখন দুঃসময় আসে, এমনি করিয়া আসে। গত বছর বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ ফসল ভাল জন্মিল না। এ বছরও তাহাই হইল। কৃষকরাও দাঙ্গা লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহারাও কোন কাজ করিতে পারে নাই। ফলে এই দাঁড়াইল, মাঠে ধান নাই, হাতে পয়সা নাই। জমিদারের খাজনা আছে, ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ আছে। বর্ষা আসিলে শোণ ছাওয়াইতে হইবে। কিন্তু পয়সা কোথায়।

জমিদারেরও টাকার প্রয়োজন। তাহাও যথেষ্ট খরচ। পৌষে লাটের খাজনা দিতে হইবে এখন হইতে ভালরূপ খাজনা আদায় করিতে না পারিলে, পরে বিপদে পড়িতে হইবে। নসিরুদ্দীন বড় চিন্তায় পড়িলেন।

একজন তহশিলদার বলিল, "প্রজারা খাজনা দিতে চায় না, হুজুর। বলে হাতে পয়সা নেই, কোত্থেকে দেব।"

নসিরুদ্দীন বলিলেন, "ইচ্ছায় না দেয় ত' জোর করে আদায় কর।"

নসিরুদ্দীন হাসানকে ডাকিয়া বলিলেন, "এদের দিয়ে কাজ হবে না। তুমিই খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কর।"

তাহাই হইল প্রজাদের উপর পীড়ন করিয়া টাকা আদায় হইতে লাগিল। মহলে মহলে হাহাকার পড়িয়া গেল, প্রজারা সব ক্ষেপিয়ে গেল।

নবাবগঞ্জের প্রজারা খুব প্রবল। জমিদারের লোকেরা গিয়া কোনই সুবিধা করিতে পারিল না। নসিরুদ্দীন চিন্তিত হইয়া উঠিল।

হাসান আলী বলিল, "কোন চিন্তা করবেন না, হুজুর। আমি গিয়ে বিদ্রোহ দমন করে আসব।"

অন্য উপায় নাই। কাজেই জমিদার বাধ্য হইয়া বলিলেন, "বেশ যাও, কিন্তু খুব সাবধান হয়ে কাজ করবে।"

"সে জন্য ভাববেন না, হুজুর।" হাসান আলী চলিয়া গেল কিন্তু নসিরুদ্দীন নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

মতিবিবি কি একটা কাজে সেখান দিয়া যাইতেছিল। নসিরুদ্দীন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "মা! একটা কথা।" মতিবিবি জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া রহিল।

নসিরুদ্দীন বলিল, "রাম মণ্ডলকে জান ত' মা! সে বিদ্রোহ করেছে। তাকে দমন করতে হাসান গিয়েছে। তাই ভাবছি। রাম মণ্ডল যে দুর্দ্দান্ত লোক। ডাকাতি করে বার চার জেলও খেটেছে। বেটা গ্রামের সকলকে

হাত করেছে। তাই ভাবছি মা! আমিও যাই। খোদার মনে কি আছে কে জানে।"

মতিবিবি চমকিয়া উঠিল, বলিল, "আমিও যাব বাপজান।"

নসিরুদ্দীন চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তুই! তুই যাবি,—বলিস কি ?"

মতিবিবি দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ৷! বাপজান আমি যাব।" নসিরুদ্দীন কন্যাকে চিনিতেন। বাধ্য হইয়া তাহাকে নিতে স্বীকৃত হইলেন।

নবাবগঞ্জ ছোট গ্রাম। চারিধারে ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ডোবা ও পুষ্করিণী আছে। হাসান আলী আসিয়াছে খবর দিতে কয়েকজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া উপস্থিত হইল।

হাসান আলী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা খাজনা বন্ধ করেছ কেন ?"

উপস্থিত সকলে বলিল, "মোদের ক্ষেমতা নেই হুজুর,—তাই।"

"জমিদারের প্রাপ্য—তোমাদের দিতেই হবে।"

"নিশ্চয় দেব হুজুর! কিন্তু এবছর মোদের মাফ করে দিন, হুজুর!"

"সে হবে না। যাও নিয়ে এসো।" কেহই এই কথায় নড়িল না!

"যাও! দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

"হুজুর!"

"কোন কথাই শুনব না, খাজনা চাই। যদি না দাও, তবে জোর করে টাকা আদায় করব।"

গোলাম হোসেন বলিল, "হুজুরের মরজী, মোরা অক্ষম।"

"বদমাইসী রাখ। বেত মেরে সায়েস্তা করব।"

"বেতমারা অত সস্তা নয়, হুজুর।" রাম সর্দ্দার বলিল।

"কে,—তুই ?"

"রাম সর্দ্দার!"

"তুই এদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিস্!"

"আজ্ঞে! হুজুর।"

"কেন ?"

"মোদের হাতে টাকা নেই হুজুর।"

"টাকা নেই, উল্লুক কাহেকার। সব কাজ চলছে, টাকা দিবার বেলা নেই।" হাসান আলী মুখ ভেঙ্গিয়ে উঠল!

"সত্যি, নেই হুজুর।"

"আছে কি না আছে দেখছি। জোর করে টাকা আদায় করব!"

"আমি বাধা দেব হুজুর।"

রাগে হাসান আলী ফুলিতেছিল। তাহার হাতে যদি বন্দুক থাকিত হয় ত রামের মাথাটা একটা গুলি করিয়া উড়াইয়া দিত। সে তাহার সঙ্গিদের হুকুম দিল, "এদের বেঁধে কাচারী ঘরে নিয়ে যাও!

রাম মণ্ডল বলিল, "কেন ওদের কষ্ট দিচ্ছেন, হুজুর। মোদের গায় হাত দিলে ওদেরই মাথা উড়ে যাবে হুজুর, এ রাম মণ্ডল, অন্য কেউ নয়।"

হাসান আলী রাগে দাঁতে ঠোট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শুনেছি, তুমি বড় খেলোয়াড়। উত্তম, আমি তোমার সঙ্গে খেলব। যে হারবে তাকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে,—কেমন রাজি ?"

রাম বলিল, "বেশ! কিন্তু হুজুরের এ সখ না হলেই ভাল হ'ত।"

উভয়ে লাঠি লইয়া উভয়কে আক্রমণ করিল। হাসান আলী খুব কৌশলী খেলোয়াড়। রাম সর্দ্দার তাহার খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। হাসান আলীর সুখের শরীর, সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহার দম্ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময় মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া নসিরুদ্দীন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় হাসান আলীর হাতের লাঠি পড়িয়া গেল। সর্দ্দারের লাঠি গর্জ্জিয়া উঠিল। হাসান আলীর বিপদ দেখিয়া মতিবিবির অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সে ভুলিয়া গেল, সে অসূর্য্যম্পশ্যা, ভুলিয়া গেল সে জমিদার নসিরুদ্দীনের কন্যা। তাহার অন্তর হইতে একটা চীৎকার বাহির হইয়া গেল। সে দ্রুত পালকী হইতে নামিল।

সেদিকে চাহিয়া রামের হাতের লাঠি থামিয়া গেল। প্রজারা বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বোরখায় আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া মতিবিবি আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং হাসান আলীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

প্রজারা সকলে হতভম্ব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে তাহারা বুঝিতে পারিল, এই সম্ভ্রান্ত মহিলাটি আর কেহই নয়, তাহাদের ক্ষুদ্র মা! বিপদে আপদে যাহার নিকট কোনগতিকে একবার হাত পারিতে পারিলেই হইল, আর তাহাদের ভাবিবার কিছু ছিল না। তাহারা আরও জানিত, এই যে এত বড় দাঙ্গাটা যে বন্ধ হইয়া গেল, তাহার মূলে, তাহাদের এই মা-ই-ছিল। তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের মা! মা! এসেছেন!"

বৃদ্ধ প্রজারা তাহাদের গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, "মা! সন্তানদের একটা নিবেদন আছে।"

মতিবিবি কথা বলিল না। বোরখার মধ্যে দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রজারা সকলে হাত জোড় করিয়া বলিল, "যদি কষ্ট করে এই দীনদের গ্রামে পা দিয়েছেন, তখন আমাদের কিছু নজর গ্রহণ কর মা।" হিন্দু মুসলমান যে যাহা পারিল আনিয়া মতিবিবির পায়ের নিকট রাখিয়া সম্মানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্রোহ ভাঙ্গিয়া গেল।

চার

বর্ষাকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রাম্য পথ সকল কাদায় থক্ থক্ করিতেছে! কোলা ব্যাঙগুলি আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ প্রাতঃকাল হইতে বাতাসের জোর অনেক বেশী। বৈকাল হইতে না হইতে ভীষণ ঝড় উঠিল। বাতাস গুম্ গুম্ করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। কড়-কড়, হুড়-হুড় শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিল।

নসিরুদ্দিন ও মতিবিবি ঘরে বসিয়া জানালা দিয়া ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতেছিল। হাসান আলী কয়েকজন লোক লইয়া সেখান দিয়া দ্রুত যাইতেছিল। নসিরুদ্দিন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ হাসান?"

"আজ্ঞে! নদীর পাড়। গোলা ঘরগুলার চালা ঠিক করে বাঁধতে যাচ্ছি।"

"এই ঝড়ে যেও না!"

"না গেলে চালাগুলো উড়ে গেল এবছরের ধান, চাল সব নষ্ট হবে।" হাসান আলী পশ্চাতে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, কর্ত্তব্য আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, চল্লুম। হাসান কাহারও কথা শুনিল না, সে নদীর পার ছুটিল।

বাহিরে দাঁড়ান যাইতেছিল না, ঝড়ে যেন উড়াইয়া লইয়া যায়। মড় মড় করিয়া গাছগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঘরের চাল সকল উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। হাসান আলী অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গিরা কে কোথায় রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। সহসা একটা গাছের ডালের ঘা খাইয়া হাসান আলী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মতিবিবি ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া উহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

নসিরুদ্দীন সেখানে ছিলেন, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যাসনে, মতি যাসনে।" কিন্তু তাহার চীৎকার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল, মতিবিবির কানে তাহা প্রবেশ করিল না।

কন্যাকে সাহায্য করিবার জন্য নসিরুদ্দীন ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ঝড়ে তাহাকে এক ঝাপ্টায় ফেলিয়া দিল। নসিরুদ্দীন আহত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীর ভৃত্যরা তাহাদের মনিব-কন্যার সাহায্যের জন্য ছুটিল। কিন্তু সব বৃথা! এত জোরে তখন বাতাস বহিতেছিল, কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না।

মতিবিবি অতি কষ্টে, অনেক চোট্ সহ্য করিয়া হাসান আলীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসান আলী তখন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঝড়ের একটা অদ্ভুত শব্দ হইতেছে, 'গুম্ গুম্'। মতিবিবির মাথার উপর দিয়া কত চালা, কত টিন, গাছ পালা ইত্যাদি উড়িয়া যাইতে লাগিল। মতিবিবি দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ঝড়ে তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে চায়। সে ভয়ে ভয়ে শুইয়া পড়িল।

ভীষণ অন্ধকার। তাহার উপর বাণডাকার শব্দ। উঁচু হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে জলস্রোত ছুটিয়া আসিতেছে। বিশখা নদীতে বাণ ডাকিয়াছে। নদীর পাড়ের ঘর বাড়ী সব ভাসাইয়া লইয়া জল তাহাদের পানে আসিতেছে। মতিবিবি আর উপায় না দেখিয়া হাসান আলীকে তাহার ওড়না দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে বাঁধিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোত হাসান আলীকে একটা ঝাকানি

দিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মতিবিবি গাছটা প্রাণ পণ শক্তি আকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সে ডুবিল কি মরিল, কে জানে!

দুর্য্যোগ যেমন হঠাৎ আসে, যায়ও তেমনি হঠাৎ। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস পড়িয়া গেল। জল যাহা গ্রামে উঠিয়াছিল, তাহাও নামিয়া গেল। কত যে মরিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিল তাহারা ভাবিল, মরিলেই ভাল হইত।

ঝড় থামিলে নসিরুদ্দীন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যেদিকে তাকান, কেবল ধূ ধূ করে খোলা মাঠ। এখানে মন্দির নাই, মসজিদ নাই, ঘর নাই, গাছ নাই, মানুষ, পশু, পক্ষী নাই। যে দিকে তাকান যায় শুধু নাই, নাই। এ যেন এক শূন্য প্রেতপুরী।

নসিরুদ্দীন ধীরে ধীরে কয়েকজন সহচর লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন, কাল তিনি যাহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, শাসন করিয়াছেন, যাহাদের বুকের রক্ত দেখিলে খুসী হইয়াছেন আজ তাহারা সবাই এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নসিরুদ্দীনের মনে হইল, এ যেন তাহার অত্যাচারের ফল। তিনি মনে মনে বলিলেন, খোদা! এ রকম ত আমি চাই নাই। আমার অপরাধের জন্য আমায় যত ইচ্ছে শাস্তি দিতে,—দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ শাস্তি বহিবার আমার ক্ষমতা নেই। নসিরুদ্দীনের দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু শোক করিবার সময় নাই। সম্মুখে তাহার কর্ত্তব্য আহ্বান করিতেছে,—ক্ষুধার্ত্ত অর্দ্ধ উলঙ্গ, সর্ব্বস্বান্ত নরনারী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সব দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে হইল,—আমরা সকলেই প্রকৃতির দাস। তাহার নিকট হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, পশু পক্ষী নাই। নসিরুদ্দীন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—বুঝেছি খোদা! বুঝেছি কিন্তু বড্ড দেরীতে জ্ঞান হ'ল।

অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর মতিবিবিকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল। সকলে ধরা ধরি করিয়া বাসায় লইয়া আসিল। মতিবিবির শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "হুজুর! প্রজারা সব বাড়ী ঘিরিয়াছে, তারা খাবার চায়!"

নসিরুদ্দীন উদাস স্বরে বলিলেন, "গোলা খুলে দাও!"

"হিন্দু প্রজাও আছে হুজুর?"

"হ্যাঁ! তাদেরও দাও!"

"হিন্দুদের দেব হুজুর!" কর্ম্মচারী বিস্ময় স্বরে বলিল।

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাদেরও দেবে। আজ আমার নিকট সব সমান!"

"তা হলে গোলায় যে চাল আছে, তাতে কুলাবে না।"

"টাকা নিয়ে যাও! সহর থেকে কিনে দেবে,—যাও।" কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

মতিবিবি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "বাপজান!"

"কি মা!"

মতিবিবির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। "নসিরুদ্দীন বলিল, ও বুঝেছি মা! তোর ভয় নেই, লোক গেছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি হাসান আলীকে লইয়া একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘর আবার লোকের ভীড়ে গরম হইয়া উঠিল। হাসান আলীর জ্ঞান ফিরিল, কিন্তু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। নসিরুদ্দীন ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় বসিলেন।

অদূরে কর্ম্মচারীরা প্রজাদের চাউল দিতেছিল।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

বাংলা-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট।

তিনি একাধারে কবি, স্বদেশ মন্ত্রের উদ্গাতা, হাস্যরসিক ও নাট্যকার কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তাঁর প্রতিভার যাদুদণ্ডের স্পর্শ দিয়ে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বাঙ্গালার সুপ্ত চেতনাকে আঘাতে আঘাতে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা-সাহিত্য-রস-পিপাসুগণের চিত্তে যে অবিসংবাদিত উচ্চ আসন লাভ ক'রেছেন, তা সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে মাইকেলোত্তর যুগের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবি হিসাবে তাঁর দাবীই সর্ব্ববাদীসম্মত। সমস্ত সমালোচকই আশা করি মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার ক'রতে দ্বিধা ক'রবেন না।

বাংলা-সাহিত্য দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার অপরিমিত দানে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে এবং বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে তিনি নবযুগোদয় ঘটিয়েছেন বলেও অনেকে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন। নবযুগের কথা ছেড়ে দিলেও বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ যে বহুদিন ধরে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার প্রবল প্রভাব অতিক্রম ক'রতে পারে নি সে কথা সকলকেই মানতে হবে। এমন কি বর্ত্তমানের পট ও পীঠ উভয় স্থানেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান ক'রলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অনেকখানিই দেখতে পাওয়া যাবে।

যাই হোক, এই বিভিন্নমুখী দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষাত্মক আলোচনা ক'রবার পূর্ব্বেই তাঁর নিজস্ব কবি-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করার একান্ত দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাকে বিচার ক'রতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে মূলতঃ হাস্য-রসিক বলে মনে করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এমন নির্ম্মল বিশুদ্ধ হাস্যরস আজ পর্য্যন্ত কেউই পরিবেশন ক'রতে পারেন নি, এ কথা অবশ্য স্বীকার ক'রতেই হবে। এমন কি তাঁর গান স্বচ্ছ সাংগীল ভঙ্গীতেও গভীর ব্যঞ্জনায় সত্যকার লিরিক পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির অন্তর্নিহিত কবি-ধর্ম্মকে মূলতঃ হাস্য-রসিকতার রসলোকবিহারী বলে মনে ক'রলে ভুল হবে। বরং কবির অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ ক'রলে একটী সুগভীর দেশাত্মবোধপ্রসূত বিপুল স্বাজাত্যাভিমানই তাঁর কবি-ধর্ম্মের মূলে প্রেরণা রূপে কাজ করেছে বলে আমার মনে হয়। এই মূল শক্তিটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে। কবি তাঁর দেশকে ভালবেসেছিলেন। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস বাঙ্গালার নরনারী, বাঙ্গলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁর অন্তরে যে

সুগভীর প্রেমের উদ্বোধন করেছিল, তারই স্পর্শ তাঁর নিগূঢ় মর্ম্মবীণায় ঝঙ্কার তুলেছে বিভিন্ন সুরে। নাটক, স্বদেশী সঙ্গীত, হাসির গান সেই একই বীণার তিনটি বিভিন্ন 'গ্রাম' মাত্র।

কথাটা আরো একটু বিশদ ক'রে ব'লবার দরকার। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গরিমাময় অতীত ইতিহাসে কবি যেমন অনির্ব্বচনীয় গৌরব বোধ করেছেন, তেমনি করেছেন তার কলঙ্কময় বর্ত্তমানহীনাবস্থায় অসহনীয় লজ্জা অনুভব। হীন-বীর্য্য ভীরু ও মেরুদণ্ডহীন বর্ত্তমান বাঙ্গালার ক্লৈব্য তাঁর সুগভীর স্বাজাত্যাভিমানের মূলে আঘাত করে তাঁকে কঠোর সংস্কারক ক'রে তুলেছে। এই সংস্কারক রূপেই যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার

হীনতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ও মহান আদর্শের পবর্ত্তনায় তাঁর সাধনা।

এই হিসাবে কবিকে আমরা প্রগাঢ় আশাবাদী রূপেই দেখতে পাই। বর্ত্তমানের হীন শোচনীয়তা যতই তাঁকে ক্লেশ দিয়েছে, ততই তাঁর কণ্ঠে আশার বাণী ফুটে উঠেছে 'যাদের গরিমাময় অতীত তাদের কখনও হবে না ধ্বংস'। এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে কে রক্ষার ভার নেবে? কে আছে দধীচি, যে অস্থি দানে এই দেব-ভূমিকে রক্ষা ক'রতে পারবে? এই আত্মঘাতী আত্মবিস্মৃত জাতির সুপ্ত চেতনার দ্বারে বারে বারে তাঁর কণ্ঠ গর্জ্জন ক'রে ফিরেছে 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি ত মেষ'। ভীরু মেষপাল আমরা নই, আমরা মানুষ, দেশের ভাগ্যের উপর দিয়ে বিপর্য্যয়ের যে ঘন কৃষ্ণ মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তারই অন্তরাল থেকে আবার নবীন গরিমা উদ্বোধিত করে তুলবার দায়িত্ব আমাদেরই। এই প্রবল আশাবাদী সংস্কারকের মূর্ত্তিই পাই আমরা তাঁর হাসির গানের ভিতরেও।

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে ও সমাজ-জীবনে অন্তঃসার-শূন্য দায়িত্বপরাঙ্মুখ, বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর আত্মপ্রতারণা-মূলক হীন বুদ্ধিকে কবি শ্লেষ বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে দিয়েছিলেন তাঁর হাসির গানে। তাঁর স্বদেশভক্ত নেতা নন্দলাল আমাদের কারোই অপরিচিত নেই। তাঁর ইরাণদেশের কাজীকে আজও আমরা শাসনযন্ত্রের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। মুঘল ব্যাঘ্রের মুঘলরাজ্য গেলেও ব্যাঘ্রভীতি আমাদের আজও বিদূরিত হয় নি। 'রিফর্ম্মড্ হিন্দুজ', 'বদলে গেল মতটা' কিম্বা 'হ'তে পার্ত্তাম' জাতীয় মনোভাব এখনো আমরা পরিত্যাগ ক'রতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল অনবদ্য হাসির গান লিখেছেন অনিবার্য্য কান্নার হেতুকে ছদ্মবেশ পরিয়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সেই হাসির গান শুনে হাসি। বিকৃত হিন্দুয়ানীর নামাবলী-ঢাকা বিচারভ্রষ্ট ভণ্ড সনাতনপন্থী ও তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গিল্‌টি-করা আচারভ্রষ্ট চরিত্রহীন ইয়ংবেঙ্গল উভয়কেই তাঁর তীব্র বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী অভিনন্দন গ্রহণ করতে হয়েছে। সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই অন্তর-বাহিরের এই বিভিন্নতা কবিকে উৎপীড়িত ক'রেছে, তাই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামীর বিরুদ্ধেই তিনি নির্ম্মম অভিযান সুরু ক'রেছিলেন। বাহিরের নামাবলী বা বিলাতি গিল্‌টি তুলে ফেলে ভিতরকার সত্যবস্তুটিকে দেখবার জন্য তিনি যে আয়না হাতে সমাজের বিভিন্নস্তরে ঘুরেছিলেন, ভিতরকার আসল মানুষটিই তাতে শুধু প্রতিফলিত হয়েছে। কবি একস্থানে বলেছেন,—"ন্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারো অন্তর্দাহ হয় ত আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহার সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয় তাহা হইলে এ'ব্যঙ্গ তাঁহাদের গায় লাগিবার কথা নহে—" দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি চিনতে পারা সত্ত্বেও আমাদের তা গায় লাগেনি। আমরা শুধু হেসেছি এবং হাস্যবিস্ফারিত মুখে দ্বিজেন্দ্রলালকে হাসির গানের কবি বলে অভিনন্দন দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

পূর্ব্বেই বলেছি যুগসুপ্ত বাঙ্গালীর নিবীর্য্য অবসাদকে কবি যুগবৎ একহাতে যেমন বিদ্রূপের কশায় জর্জ্জরিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, অপর হাতে তেমনি প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী, পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের কথা নীতিজ্ঞান বিজ্ঞানের লুপ্ত অধ্যায়ের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের নবজীবনে উদ্বোধিত করে তুলবার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব্যসাচী কবিকে আমরা পেয়েছি নাট্যকাররূপে।

লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারের যন্ত্রহিসাবে রঙ্গমঞ্চের স্থান যে অবিসংবাদিরূপে শ্রেষ্ঠ তাতে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং এই রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করেই কবি তাঁর আশা উদ্দীপনার অগ্নিবাণী সম্মোহিত জনগণের অবচেতন মনে অনুপ্রবিষ্ট ক'রিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

ভারতের অতীত ইতিহাসের কলঙ্কময় গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে বীর রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান বিদ্যুৎবিকাশের মতই ক্ষণিকের জন্য ভারতের ভাগ্যগগন উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। কবি বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রতিভার আরশীতে সেই তীব্র বিদ্যুৎবিভা সুপ্ত বাঙ্গালীর চক্ষে প্রতিফলিত করে বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' 'তারাবাই', 'মেবার পতন' প্রভৃতি সমুদয় নাটকেই সেই নব-জাগ্রত রাজপুতজাতির পুনরভ্যুদয়মূলক প্রতিক্রিয়ার দৃপ্ত-কাহিনী, 'সিংহল বিজয়', ও 'চন্দ্রগুপ্তে' অতীত ভারতের লুপ্ত

গৌরব গাথা। জাতির জাগরণের জন্য তার পূর্ব্ব গরিমার ঐতিহ্য অপরিহার্য্য ব'লেই কবিকে বেছে বেছে ইতিহাসের পাতায় এমিতর সত্য ঘটনার উদ্দীপনা সংগ্রহ ক'রতে হয়েছে।

নাটকের বিষয় বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও শব্দ চয়ণ ও বাক্যবিন্যাসের যে অভিনব ধারা তিনি অবলম্বন ক'রেছিলেন সেদিক থেকেও তাঁর জুরি বাঙ্গালাদেশে অধিক জন্মায়নি। চলতি ক্রিয়াপদগুলিকে দ্বিত্বধ্বনি বহুল করে ও বাক্যের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াপদগুলির তির্য্যক ব্যবহারে চলতি গদ্য ভাষায় যে পৌরষ তিনি দান করে গিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। কথ্য বাংলার কোমল ভাষাই ঐশ্বর্য্যময় গুরুগম্ভীর হয়েছে তাঁর হাতে এবং ভাষার ভাব প্রকাশের শক্তি দ্বিগুণিত হয়ে গিয়েছে তাঁর রচনাশৈলীর গুণে। এইজন্যই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে শুধু ওজস্বিনী ভাষার আকর্ষণেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে সহজে মুগ্ধ করে রাখবার ক্ষমতা তাঁর নাটকগুলির আছে।

দ্বিজেন্দ্র-নাটকের অপর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর আদর্শবাদ ও অন্তর্মুখীনতা। সত্যকার নাটকীয় পরিস্থিতি বা dramatic element তাঁর নাটকের ঘটনা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে নাট্যকার হিসাবে এই দিক দিয়ে তিনি সত্য সত্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের গতি ও পরিণতির দিক থেকেও তাঁর প্রতিভার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সামান্য একটু তুলনা করে বুঝবার চেষ্টা করা যাক।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটক রচনা ক'রতে গেলেও রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য করে নরনারীর অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনায় দেশকাল নিরপেক্ষ একটা চিরন্তন আবেদন ফুটয়ে তুলতে চান, যথা, চিত্রাঙ্গদা, তপতী, বিসর্জ্জন প্রভৃতিতে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী কোন মহান চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে ভাবে নাটকীয় ঘটনা সংস্থান প্রয়োজন সেইভাবেই অগ্রসর হয়েছেন। এ সম্বন্ধে 'দুর্গাদাস' নাটক রচনার প্রারম্ভে কবির একখানা পত্র উল্লেখ করি.—"দুর্গাদাসের জীবন অমূল্য, অতুল্য, অসাধারণ। এ চরিত্র এত মহান্ যে আমার সত্য সত্য ভয় হইতেছে পাছে আমার এ অযোগ্য লেখনী তাঁহার সে স্বর্গীয় চরিত্রাঙ্কণে অক্ষম হইয়া কোন প্রকারে তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরবের লাঘব ঘটায়।" অর্থাৎ তিনি চান কোন আদর্শ চরিত্রকে বিভিন্নঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করে তুলতে। এইদিক দিয়ে তিনি অবশ্য সফল হয়েছেন কিন্তু সমালোচকগণের মতে সাহিত্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্র নাটকের এইস্থানে হয়েছে ত্রুটি। তাঁরা বলেন কবির নিজস্ব সত্তা এত বেশী আত্মকেন্দ্রিক, যে সমস্ত চরিত্রের ভিতর থেকে কবির ব্যক্তিরূপটাই ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে সুতরাং কোন চরিত্রই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৈচিত্র্য আনতে পারে নি তাঁর নাটকে। এই ত্রুটির অনিবার্য্য পরিণতি রূপে কবির সমস্ত নায়ক চরিত্রগুলিই প্রায় এক আকৃতির হয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি একের সঙ্গে অন্যের ভাবগত সংঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন, চাণক্যও সেই ভাবেই করেছেন মাতৃ-মহিমা কীর্ত্তন। নির্ব্বাসিত শক্তসিংহ যে সুরে মাতৃভূমি মেবারের স্তব করেছেন, আন্টিগোনাস তেমনি সুরেই স্বদেশের জন্য আর্ত্তনাদ করেছেন। ইন্দ্র যে ভাষায় অহল্যাকে প্রলুব্ধ করেছেন সেই ভাষাতেই ভীষ্ম প্রলোভন ত্যাগের সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। অর্থাৎ সমস্ত চরিত্র ঘটনা ও বক্তব্যের ভিতর থেকে একটি মাত্র ব্যক্তিরই বক্তব্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং এই ব্যক্তিটি কবি স্বয়ং।

সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে নাট্যকার তাঁর নাটকের ভিতরেই নিজেকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে নায়ক নায়িকাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পারিপার্শ্বিক ও মনোজগতের সংঘাত জনিত চাঞ্চল্যকেই নাটকের মূল উপাদান ক'রবেন। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে হয়ত ত্রুটি আছে এবং তার কারণও আমি পূর্ব্বে উল্লেখ ক'রেছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক শুধুই সাহিত্য নয়, তা একাধারে সাহিত্য ও আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মচেতনার শুভ শঙ্খনাদ। কবি যে তীব্র অন্তর্দাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে সাহিত্যের খাতিরে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব ছিল না। নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় বলেছেন—

নাটকেরে যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
তাহাই আমার ব্রত, তাহাই আমার কাজ,

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক ভাই—

সুতরাং নাটক রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের নিছক সাহিত্য রচনা নয়, জীবনের পুণ্যব্রত হিসাবেই তা' গ্রহণ করেছিলেন এবং এই জন্যই নৈর্ব্যক্তিক কাব্য বিচারের আদর্শ অনুযায়ী তাতে কিছু ক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক নাটক ছাড়াও কবি কতকগুলি পৌরাণিক, সামাজিক এবং প্রহসন রচনা ক'রেছিলেন। আদর্শের দিক দিয়ে পৌরাণিক নাটকেও অবশ্য প্রাচীন ভারতের পুণ্যাদর্শই চিত্রিত হয়েছে কিন্তু তাঁর পূর্ব্বতন বা সমসাময়িক নাট্যকারগণের সঙ্গে এ বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট প্রভেদ আছে। মাইকেল, রাজকৃষ্ণ, অমৃতলাল বা গিরিশচন্দ্র যে সমস্ত পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন তাঁর নায়ক নায়িকারা কেহই পৌরাণিক যুগোচিত অলৌকিকতার কুহেলী ভেদ করে সত্যকার সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারে নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী, সীতা বা ভীষ্ম নাটক বিষয়বস্তুর পৌরাণিকতা বজায় রেখেও বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে। এ কাজটা যে কত কঠিন তা সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

সামাজিক নাটক কবি মাত্র দু'খানা রচনা করেছেন—"বঙ্গনারী" ও "পরপারে"। পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য বা মিশন সামাজিক নাটক রচনার তেমন সহায়ক নয়, এবং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক কবি-ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবনের মৃদুচিত্র অঙ্কণের প্রতিকূল। সুতরাং এই দু'টি তাঁর তেমন উচ্চশ্রেণীর হ'তে পারেনি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কল্পিত পৌরাণিক যুগে বা বিস্মৃত ঐতিহাসিক যুগে আদর্শ চরিত্রের সম্ভাবনা আমাদের চোখে ক্রটি বলে ধরা না পড়লেও, নিত্য-নৈমিত্তিক সমাজচিত্রে তা একান্তই অবাস্তব হয়ে পড়েছে। সুতরাং উক্ত বই দুটোতে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এই দোষের জন্যই তা বোধ হয় তেমন জনপ্রিয় হতে পারে নি। উপরন্তু বঙ্গনারীর শেষাংশে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের যে প্রভাব দেখা যায়, সেটাও বোধ হয় এর বিষয়বস্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব কবিধর্ম্মের প্রতিকূল বলে।

প্রহসন রচনায় কবিকে আমরা আর এক বেশে দেখতে পাই। হাসির গানের বেলায় আমরা তাঁর যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন সংস্কারকের মূর্ত্তি দেখেছিলাম, তাহারই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে তাঁর প্রহসনগুলিতে। সমস্ত প্রহসনগুলিই প্রায় সমাজের দোষ-ক্রটি দেখাবার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছলনায় রচিত। তার মধ্যে 'একঘরে', 'কল্কি অবতার', 'আমলা বিদায়', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থকয়খানিতে সমাজের সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে যে তীব্র অভিযান তিনি ক'রেছেন তা যেমন উপভোগ্য তেমনি মর্ম্মভেদী। এই প্রহসনগুলিকে তাঁর হাসির গানেরই বিস্তৃত ও সঠিক সংস্করণ বলা যায়। নিপুণ হস্তে সমাজের বিভিন্ন স্থানে তিনি যে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করেছেন তার একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। এর মধ্যে বিরহ ও পুনর্জ্জন্ম প্রহসন দু'খানা অবশ্য বিদ্রূপাত্মক ব্রহ্মাস্ত্র নয়, নিছক হাস্যরসের blank fire। 'বিরহ' নাটিকার ভূমিকায় কবি বলেছেন,—"হাস্য দু'প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া আর এক প্রকৃতগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিক মাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা—" হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি দুই প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন প্রথমোক্ত প্রহসন কয়খানিতে তিনি সমাজের প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করে দীর্ঘায়ত নাসার প্রতি সামাজিক অস্ত্রচিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং শেষোক্ত চিত্রে নাসিকাটি বিপরীতমুখী করে এঁকে নিছক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সংস্কারপন্থী মন এখানেও একেবারে চুপ ক'রে থাকতে পারে নি। সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে গেলে সেখানেও সাধারণ কবি-প্রসিদ্ধি ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে একটুখানি তির্য্যক কটাক্ষ আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

মোট কথা দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা-সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন একটা মিশন নিয়ে। কবি হিসাবে এতে তাঁর মূল্য কি ভাবে নির্ণীত হবে জানিনে তবে তাঁর প্রতিভার প্রচণ্ড প্রবাহ অবসাদনির্জ্জীব আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর ঘুমন্তচিত্তকে যে ভাবে বার বার আঘাত ক'রেছে তার মূল্য সামান্য নয়। এই বিষয়ে কবির একখানা চিঠির কিয়দংশ উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ ক'রব,—"আমি বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে বা এ দেশে আর কিছু না ক'রে থাকি—চিরকাল অন্যায় অসত্য ও Hypocrisy expose করে এসেছি। দৌর্ব্বল্যকে যদি কখনও আক্রমণ করে থাকি, একশ'বার ক্ষমা প্রার্থনা করব। কিন্তু অন্যায়, ন্যাকামি ও Hypocrisy দেখলেই আমার মেজাজ ঝাঁ করে উষ্ণ হয়ে উঠে। কি কর্ব্ব বল? সে আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম, কিছুতেই পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না—" কবি যে স্বভাবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতে পারেন নি তার প্রমাণ তাঁর সমুদয় গানে, নাটকে, প্রহসনে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাঁর স্বভাবচতুর স্বদেশবাসীরা স্বভাবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিপূজা ক'রবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পেরেছে কি না ভাব্‌বার কথা।

রক্ষাকবচ

শ্রীশোভা দেবী

বর্ষার পাগলা ঝোরা রাভি নদীর অনতিদূরেই একটী ছোট বাংলো, বাংলোর চারিদিক ঘিরিয়া মনোরম উদ্যান। উদ্যানটী নানারকম দেশী ও বিলাতী ফুলগাছে পরিপূর্ণ। সামনে একটী লতামণ্ডপ ও তাহারই উপর একটী খোদাই করা শ্বেত মার্ব্বেল পাথরের পরীমূর্ত্তি, পরীর হাতে একটী ফ্ল্যাগ,—তাহারই উপর গৃহস্বামীর পরিচয় লেখা রহিয়াছে।

এই বৎসর বাড়ীখানিতে গৃহস্বামী আসেন নি। ফাল্গুনের প্রথমদিকেই একজন চিত্রবিদ্ আসিলেন, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কিছু সঞ্চয়ের অভিলাষে। সঙ্গে আসিলেন সুশ্রী বিদুষী স্ত্রী চিত্রা। তা'ছাড়া চাকর, বামুন ও সাংসারিক আসবাব পত্র আসিল প্রচুর।

গাড়ী হইতে লাহোর নদের দৃশ্য দেখিয়া চিত্রা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামীকে কহিল, "বিধাতার ছবির নকল ক'রবে তুমি? এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির লীলায়িত ভঙ্গিমা তুমি ফোটাবে তুলির রঙে? এর কাছে কি ছার মানুষের জীবন!"

প্রদ্যোৎ একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "ওগো গিন্নী, বিধাতার ছবির কতটুকুই বা আমরা নিতে পারি, এ কথা সত্যি। কিন্তু মানুষের চোখের সামনে এই বিরাট রূপের একটুখানি আভাষ না দিলে আমাদের কাজ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সে সৌন্দর্য্যের একটু ইঙ্গিত না পেলে মানুষই বা তার ঘর ছেড়ে বাইরের ডাকে ছুটে যায় কেন? আজ রাভি টেনে এনেছে আমায়—আমার রঙে প্রকাশ হবে তার রূপ মাধুরী।"

চিত্রা কোন কথা কহিল না. স্বামীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র।

*

বাংলোখানি কেমন করিয়া সাজাইবে এই লইয়া স্বামী স্ত্রীর দুই দিন কাটিয়া গেল। তার চার পাঁচ দিন পর চিত্রা প্রদ্যোৎকে কহিল, "দেখো দিকি আমার বাংলোখানি! ঘরেও বোধ হয় তোমার আর্টের খোরাক মিলে যাবে।"

বাস্তবিকই চিত্রার রুচি প্রশংসনীয়। তাহারা তারপর কয়েক দিন ধরিয়া সাদরা, সালিমারবাগ প্রভৃতি জায়গা বেড়াইয়া আসিল।

একদিন সন্ধ্যায় ক্যান্টন্‌মেণ্ট্ দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে প্রদ্যোৎ কহিল, "জান চিত্রা, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, কাল তাঁর খবর পেলাম। তুমি যদি বল তো তাঁর সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দি।"

চিত্রা বলিল, "বেশ তো, তোমার বন্ধু তিনি, তাঁর সাথে নিশ্চয়ই আলাপ ক'রব। তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করা যাক্ না কেন? পরশু আমরা নুরজাহান দেখতে যাব, তাঁকেও আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্যে কালই বলে এসো, কেমন?"

প্রদ্যোৎ বলিল, "বাঃ, সেই বেশ হবে। তবে তিনি বার-এ্যাট্ ল, সাহেবিকেতাই তাঁর অঙ্গের ভূষণ, সেই মতই ব্যবস্থাটা কর তা'হলে।"

*

সকালবেলা চিত্রা সবেমাত্র স্নান সারিয়া রান্না ঘরে যাইতেছিল, এমন সময় প্রদ্যোৎ কহিল, "চিত্রা, অনুপ এসেছে। সে তার বৌদির সাথে আলাপ করার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর এ দিক্‌কার আয়োজন কতদূর?"

চিত্রা বলিল, "সবই গোছান হয়েছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বের হওয়া চাই। এখন তোমার বন্ধুর চা, খাবারটা তৈরী করে তবে দেখা ক'রব। আচ্ছা তুমি যাও না বাপু ততক্ষণ তাঁর কাছে, কি মনে কচ্ছেন বল তো?"

প্রদ্যোৎ একটু দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া কহিল, "মনে ক'রছে বন্ধুটী আমার, স্ত্রীর খুব ভক্ত।"

"যাও দুষ্টু," বলিয়া চিত্রা রান্না ঘরে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

অনুপবাবু এলাহাবাদে ব্যারিষ্টারী করেন, পশার না হইলেও, ভাবনা বড় নাই, পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। চেহারা দোহারা ও সুশ্রী। সম্প্রতি একটী কার্য্যোপলক্ষে লাহোরে আসিয়াছেন। বেশভূষায় খুব সৌখীন।

নীল রংয়ের পর্দ্দা ঠেলিয়া চিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল, পরণে একখানি কমলা রংয়ের শাড়ী ও সেই অনুযায়ী ব্লাউস্। হাতে গোছা কয়েক সোনার চুড়ি, কানে হীরার দুল, শুভ্র

কপালে একটী সিন্দুর বিন্দু। বড় সুন্দর তাহাকে মানাইয়াছিল।

এক হাতে চায়ের কাপ ও পিছনে বামুনের হাতে খাবারের রেকাবী। সম্মুখের টেবিলের উপর চা রাখিয়া চিত্রা নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি যে এখানে এসেছেন তা আমরা জানতাম না; যাক্, আপনাকে এই প্রবাসে পেয়ে আমরা খুব খুশী হয়েছি।"

অনুপ কহিল, "এই ইডিয়েট্‌টাই তো আমার খোঁজ নেয় নি, আপনি আর জানবেন কি করে বলুন?"

প্রদ্যোৎ কহিল, "বেশ যা হোক্ এখন যত দোষ সব নন্দ ঘোষের? তোকে আনার কলির ভিড় থেকে বার করলে কেরে? এই প্রদ্যোৎ শর্ম্মাই তো। যাক্ ঝগড়া পরে করিস্, এখন চা'টা খেয়ে নে, সেটা তোর জন্যে গরম রইবার অপেক্ষা ক'রবে না।"

ঐ সময় একটী হিন্দুস্থানী চাকর আসিয়া খবর দিল—"গাড়ী এসেছে।"

*

সুরজাহান দেখিয়া বাড়ী ফিরবার পথে প্রদ্যোৎ চিত্রাকে কহিল, "আমাদের পিক্‌নিকে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে।"

রাভির তীরে পিক্‌নিক্‌। অনুপের নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

পিক্‌নিকের জায়গাটী দেখিয়া চিত্রা তার স্বামীকে কহিল, "খুব সুন্দর জায়গাটী তো, সত্যিই তুমি একজন আর্টিষ্ট।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া প্রদ্যোৎ চিত্রার গণ্ডে একটী টোকা মারিল।

চিত্রা মহা উৎসাহে রান্নায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর অনুপ আসিয়া কহিল, "বৌদি, আজকের দিনটী কিন্তু রান্নায় আপনারও যতখানি অধিকার, আমাদেরও ঠিক ততখানি। কাজেই খুন্তিখানি আমাকেও একবার ছেড়ে দিতে হচ্ছে।"

চিত্রা একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ তো নিন্ না, তবে কপির ডালনাটাকে আপনার হাতের স্পর্শে যেন অখাদ্য করে তুলবেন না।"

প্রদ্যোৎ আসিয়া কহিল, "কি গো, রান্নার দেরী কত? পেটটা আর অপেক্ষায় মোটেই রাজী নয়। ওরে বাবা, অনুপ দেখছি খুন্তি ধরেছে, তা'হলেই আজ খাওয়া হয়েছে!" এই বলিয়া প্রদ্যোৎ হাসিতে লাগিল।

অনুপ বলিল, "বাঃ রে, আজকের দিনটাও বসে খাব নাকি? তোমারও রান্না করা উচিৎ।"

"মাপ কর ভাই," বলিয়া প্রদ্যোৎ বসিয়া পড়িল।

চিত্রা বলিল, "বনভোজন দেরী করে খেতে হয়, তবে তো আমোদ জমবে।" প্রদ্যোৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শুধু বসে থাকলে হবে না মশাই, এই পাতাগুলো ধুয়ে খাবার জায়গা কর।"

প্রদ্যোৎ হাসিতে হাসিতে "তথাস্তু" বলিয়া পাতা ধুইতে আরম্ভ ক'রল। একখানি পাতায় প্রায় চারি ঘটি জল ঢালিয়া অনুপকে বলিল, "দেখলি অনুপ তোর বৌদি আমাকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিল।"

চিত্রা অনুপের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, আমার সব জলটুকু একখানি পাতা ধোয়াতেই গেল যে। কিন্তু মনে থাকে যেন কাঁধে করে রাভি থেকে জল আনতে হবে।"

"ওরে বাপ্‌রে" বলিয়া অদূরে উপবিষ্ট কানাই চাকরকে ডাকিয়া পাতা ধুইবার আদেশ করিয়া প্রদ্যোৎ পালাইয়া গেল। কানাই পাতা ধুইয়া জায়গা করিয়া দিলে পর চিত্রা দু'জনকে খাইতে বসাইল।

খাওয়া শেষে অনুপ চিত্রাকে কহিল, "বৌদি, আপনাকে সার্টিফিকেট দেওয়া গেল"।

চিত্রা কহিল, "আপনি তো তার একটু ভাগ না নিয়ে ছাড়লেন না"।

প্রদ্যোৎ কহিল, "দেখ, আমি good boy, কোন দিকে কিছু নেবার চেষ্টা করি নি, শুধু শুয়ে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, না চিত্রা?"

প্রদ্যোতের কথায় অনুপ হাসিয়া, প্রদ্যোতের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "বেশ, তোমাকেই তা হলে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিৎ।"

খাওয়া দাওয়া সব শেষ হলে পর প্রদ্যোৎ বলিল, "চল, একবার সাদরা ঘুরে আসি।"

চিত্রা কানাইয়ের সাহায্যে জিনিষ-পত্র সব গুছাইয়া

তুলিতেছিল—সে বলিল, "আর কতক্ষণই বা বেড়াবে, সন্ধ্যা তো প্রায় হয়ে এল।"

অনুপ বলিল, "কিন্তু বৌদি সূর্য্য অস্তাচলে যাচ্ছেন বটে তবে তাঁর রাঙা আলোর সুদখোর চন্দ্রদেবও এখনি পূবের আড়ে উঁকি মারলেন বলে।" বাস্তবিক সেদিন ছিল শুক্লা দশমী তিথি, চিত্রা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাদরা যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সেখানে কেহই ছিল না। চিত্রা ও প্রদ্যোৎ একটা মিনারে গিয়া উঠিল, অনুপ ইহাদের আগেই অন্য একটা মিনারে উঠিয়াছিল। দূর হইতে সে দেখিল চিত্রা ও প্রদ্যোৎ উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছে। ক্লান্ত চিত্রা প্রদ্যোতের কোলের উপর একখানি হাত রাখিয়া দূর বনানীর পানে চাহিয়াছিল, প্রদ্যোৎও তাহার একখানি হাত চিত্রার পিঠের উপর রাখিয়া, তাহারই নির্দ্দেশিত লক্ষ্যের পানেই চাহিয়াছিল। উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক প্লাবিত।

অনুপের বুকের মাঝে হঠাৎ কি যেন একটা দুঃখ, কি যেন একটা ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল! ঐ দম্পতির পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—কত সুখী এরা! এদের দু'জনার জীবনই যেন এই শুভ্র জ্যোৎস্নার মতই উজ্জল ও নির্ম্মল।

নিজের বুকের দ্বন্দ্ব সামলাইয়া কিছুক্ষণ পরে অনুপ ডাকিল, "প্রদ্যোৎ রাতের খোঁজ রাখ কি? রাত যে দশটা বাজে।"

চিত্রা ও প্রদ্যোৎ উভয়েই একটু অপ্রস্তুত হইয়া চাহিয়া দেখিল অনুপ সামনের মিনারেই দাঁড়াইয়া আছে। চিত্রা কহিল, "আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? সাদরায় এসে অবধি তো আপনি অন্তর্দ্ধান হয়েছেন—নেমে আসুন।"

অনুপ উত্তরে কহিল, "আমার কথা যে আপনাদের কেমন মনে আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।" অনুপ নামিয়া আসিয়া দেখিল চিত্রা ও প্রদ্যোৎ তখনও নামে নাই। সে বলিল, "ওহে এখনও এখানে বসন্ত উপভোগ করার মত সময় আসে নি—শীতের আমেজ বেশ আছে, নেমে এস।"

প্রদ্যোৎ নামিতে নামিতে কহিল, "বা-বাঃ, কি অন্ধকার! বাইরে তো আলোর মাতামাতি। এখন নামাই মুস্কিল।"

অনুপ আগাইয়া আসিয়া কহিল, "বৌদিকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি, তুমি নেমে পড়।"

সত্যিই, অন্ধকারে অচেনা পথে চিত্রার একটু অসুবিধাই হইতেছিল, সে প্রদ্যোতের একখানি হাত ধরিয়া নামিতেছিল।

অনুপের কথা শুনিবামাত্র সে প্রদ্যোতের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক'হল, "আমি নিজেই নামতে পারবো—যদি দরকার হয় আপনার বন্ধুটীকে নামিয়ে নিন।"

অনুপ একটু আহত হইয়া কহিল, "বেশ তো বৌদি, সাহায্যের দরকার না হয় তো নিজেই নামুন, আর যদি কিছু মনে করে থাকেন এ কথায় তা হলে আমায় মাপ ক'রবেন।"

চিত্রা বলিল, "কি যে বলছেন, এতে আবার মাপ চাওয়ার কি থাকতে পারে? জানই তো আজকাল মেয়েদের স্বাবলম্বন ও শক্তি সম্বন্ধে কত কথাই না উঠছে— এখন তো আমরাই আপনাদের সাহায্য কোরব।"

প্রদ্যোৎ বলিল, "আচ্ছা এখন চল তো রাত যে অনেক হ'ল—।"

চিত্রা বলিল, "সত্যি, আর দেরী করা ঠিক নয়। এখনই ভূতপূর্ব্ব সম্রাট যদি তাঁর প্রেয়সীকে দেখবার জন্যে মিনারে উঠে আসেন তা হ'লে মুস্কিল!" অনুপ বলিল, "সেটা আশ্চর্য্য নয়।"

বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী থামিবামাত্র অনুপ কহিল, "আচ্ছা আজ তা হলে আসি বৌদি।"

চিত্রা কহিল, "আশা করি মাঝে মাঝে আপনার দেখা পাব।"

অনুপ কহিল, "দেখা নিশ্চয়ই পাবেন, শেষকালে দেখা পাওয়ার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হ'য়ে উঠবেন।"

প্রদ্যোৎ কহিল, "আর দেরী করিস্ নে—অনেক রাত হ'ল।"

"আচ্ছা—good night বৌদি, প্রদ্যোৎ" বলিয়া অনুপ বিদায় নিল।

এর কয়েকদিন পর একদিন দ্বিপ্রহরে অনুপ চিত্রাদের বাংলোয় আসিয়া বাইরের ঘরে কাউকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা সব কোথায় গেছেন?"

কানাই চাকর কহিল, "মাইজী রান্নাঘরে, বাবু দোমহলে পর।"

অনুপ রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "বৌদি"। চিত্রা তখন একাগ্রমনে কি একটা নূতন খাবারের

তন্ময়ে নিবিষ্ট ছিল। মাথার উপর কাপড় ছিল না, উনানের আগুনের তাপে ও শ্রমে তাহার গৌরবর্ণ সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপ অপলক নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল।

চিত্রা সামনে ফিরিয়া তাহার পানে চাহিতেই লজ্জায় তাহার রাঙামুখ আরও রক্তবর্ণ ধারণ করিল। একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আসুন, কখন এলেন?"

অনুপ কহিল, "এইমাত্র, এই রান্নাঘরের জলের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর কি খাবার তৈরী হচ্ছে?"

চিত্রা বলিল, "খেয়ে তার পরিচয় পাবেন, এই মাত্র ঝি ঘর ধুয়ে গেল, বড় জল এখানে, আপনি ওপরে যান, সেখানেই আপনার বন্ধুকে পাবেন।" অনুপ উপরে চলিয়া গেল।

প্রদ্যোৎ একমনে ছবি আঁকিতেছিল। অনুপের সাড়া সে পায় নাই। অনুপ পিছনে দাঁড়াইয়া ছবি আঁকা দেখিতে লাগিল। ছবিখানি ছিল চিত্রার, সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় রাভির তটে অস্তমান সূর্য্যের পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। ছবিখানি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল।

অনুপ একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়াছিল। তাহার মুখে কিসের যেন একটা দুঃখ, একটা অতৃপ্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল, কি যেন একটা না-পাওয়ার ব্যথায় তাহার হৃদয় ভারী হইয়া উঠিল।

প্রায় ২০ মিনিট পর ছবিখানি শেষ করিয়া প্রদ্যোৎ ভাল করিয়া দেখিল ও আপন মনে বলিয়া উঠিল, "চিত্রা যেন ছবিতে আরও সজীব হ'য়ে উঠেছে।"

হঠাৎ অনুপ বলিয়া উঠিল, "বাঃ! কার ছবি ভাই, দেখি দেখি"—যেন সে কিছুই এতক্ষণ দেখে নাই।

প্রদ্যোৎ চকিত হইয়া পিছনের দিকে অনুপকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, "কখন এসেছিস্ চুপি চুপি চোরের মত? আচ্ছা দেখ তো তোর বৌদির এ ছবিখানি কেমন হ'য়েছে?"

অনুপ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সপ্রতিভ হইয়া কহিল, "খাসা ছবি হ'য়েছে, চিত্রাদেবী ঠিকই চিত্রিত হ'য়েছেন, তোর হাত বেশ সিদ্ধি লাভ করেছে দেখছি, আর কি আঁক্‌লি রে?"

প্রদ্যোৎ কহিল, "আরও খানকতক এঁকেছি, চল ওঘরে।" তাহারা বারান্দার কোল ঘেঁসিয়া একটী ছোট ঘরে প্রবেশ করিল। একটী দেরাজের ভিতর হইতে খান কয়েক ছবি প্রদ্যোৎ বাহির করিয়া অনুপকে দেখাইতে বসিল। প্রথম ছবিখানি সেদিনকার সাদরা-ভ্রমণের সেই জ্যোৎস্না-ধোয়া রাভি ও ঘুমন্ত বনানীর দৃশ্য, আর একখানি লাহোর ক্যান্টন-মেন্টের একটী জায়গার ছবি। আর ২।৩ খানি পাঞ্জাবী পরিবার ও লরেন্স্ পার্কের মণ্টুগুমারি হলের, আর একখানি চিত্রার ছবি ছিল, প্রদ্যোৎ সেখানি বাহির করে নাই। অনুপ দেরাজের ভিতর হইতে সেখানি বাহির করিতেই প্রদ্যোৎ কহিল, "ভাই, ওখানি দেখা তোর বৌদির বারণ ব'লেই বের করি নি।"

অনুপ ছবিখানি তুলিয়া কহিল, "আশা করি আমার ওপর সে আদেশ নেই।"

হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে চিত্রা নিজ হাতে তৈরী দু' প্লেট খাবার লইয়া দরজার সামনে উপস্থিত হইল। অনুপের হাতে সেই ছবিখানি দেখিয়া চিত্রার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠিল। অনুযোগ-ভরা দৃষ্টিতে সে প্রদ্যোতের পানে চাহিয়া রহিল। প্রদ্যোৎ দুষ্টুমীভরা গম্ভীরমুখে কহিল, "এই দেখ না চিত্রা, অনুপ তোমার বিশ্রী ছবিখানি না দেখে কিছুতেই ছাড়বে না, আমি আর কি করব—বল?"

চিত্রা টেবিলের উপর খাবার নামাইয়া রাখিয়া যাইতে যাইতে অনুপের অলক্ষ্যে প্রদ্যোৎকে একটী ছোট্ট কিল দেখাইয়া পলায়ন করিল।

ছবিখানি দেখিয়া অনুপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া কহিল, "বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো!" রাভির তটে একখানি চেয়ারের উপর পাঞ্জাবী যুবকের বেশে বই-হাতে চিত্রা বসিয়া আছে, বুকে একটী আধফোটা মার্শেল নীল, ছবিখানি খুব সুন্দর হইয়াছে।

অনুপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবিখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, এদের জীবন কি সুন্দর। চিত্রার মত এমন স্ত্রী যার তার মত সৌভাগ্যবান কে। চিত্রার কথা ভাবিলেই অনুপের কেমন যেন একটু প্রদ্যোতের উপর আজকাল হিংসার উদ্রেক হয়, কেন সে নিজেই বুঝিতে পারে না। অনেক কিছু ভাবিয়া সে স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "খাসা ছবি হ'য়েছে, এবার সুন্দর হাতের খাবার খাওয়া যাক্।"

খাবার খাইতে খাইতে প্রদ্যোৎ কহিল, "সত্যি ভাই,

আমি তো ছিলাম একটা ভবঘুরে, না ছিল কোন আস্তানা, না ছিল কোন সাংসারিক জ্ঞান। কাজের মধ্যে ছিল শুধু দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ান একটা ছেড়া ব্যাগ সঙ্গে করে; জীবনটাকে নূতন করে চেন্‌বার, আনন্দকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ ক'রবার সৌভাগ্য সেইদিনই হ'ল যেদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত পেলাম চিত্রাকে। সেইই আমায় মানুষ করে তুলেছে।”

অনুপ কহিল, “সে তো দেখতেই পাচ্ছি”, কিন্তু ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাথায় তাহার বুকটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠল। ভাবিল, “আহা, চিত্রা যদি আমার হত।”

দুইজন মিলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রাঙির তীরে আসিয়া পৌছাইল। সেখানে আসিয়া দেখিল, চিত্রা সিঁড়ির উপর বসিয়া একমনে একটী জামায় এমব্রয়-ডারির কাজ করিতেছে। অনুপ কহিল, “এই যে বৌদি এবার চল্লাম।”

চিত্রা কহিল, “অন্ধকার হ'য়ে আসছে, আপনাকে আর বস্‌তে বল্‌তে পারি না, যাবেন তো সেই এখানে নয়।”

অনুপ কহিল, “হ্যাঁ, তাতো ঠিকই, তবে আপনাদের সান্নিধ্যে এলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না বৌদি।”

চিত্রা কহিল, “সেটা আমাদের সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।”

অনুপ ক্রমশঃ প্রদ্যোতের গৃহে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। প্রায়ই সে আসে এবং সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া যায়। প্রতিদিন চিত্রার নিকটে আসিয়া তাহার মধুর ব্যবহারের স্মৃতিটুকু উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ভালবাসার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সে কেমন করিয়া তাহার ভালবাসা প্রকাশ করিবে, কি করিলে চিত্রাকে আরও সুখী দেখিবে এই ভাবনা অনুপকে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ত করিয়া তুলিত।

একদিন সান্ধ্যভ্রমণের পর প্রদ্যোৎ ও চিত্রা গৃহে ফিরিয়া দেখিল তাহাদের বারান্দায় ছোট টেবিলের উপর একটী হলদে রংয়ের খাম পড়িয়া আছে। প্রদ্যোৎ সেখানি লইয়া কহিল, “দেখ চিত্রা এ প্রবাসে আবার কে তাঁর শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ পাঠালেন।” চিঠিখানি পড়িয়া সে কহিল, “আরে এ যে আমাদের চিরকুমার সভার সেক্রেটারী বরেন্দু…। বন্ধু আমার এবার তার মানসীর মণি কাটার পথের সন্ধান পেয়েছে। আর এতদিন তা পায় নি বলেই চিরকুমার সভার শেষদ্বার রক্ষা ক'রছিল। যাক্ ভালই হল, আমরা সব মেম্বরই যখন সভার গণ্ডী অতিক্রম ক'রেছি তখন বন্ধুবরকে আর কেন বলি। কিন্তু চিত্রা, আমরা সবে ক'দিন হল এখানে এসেছি, আবার সব ওলোট্ পালোট করে যাওয়া ঠিক হবে কি? এবার আর কোথাও যাব না—কি বল?”

চিত্রা কহিল, “সেটা কি ভাল হবে, তিনি এত করে লিখেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু না গেলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হ'বেন, তবে আমি আর যাব না—এখানেই থাকি তুমি বরং ২।১ দিনের জন্য ঘুরে এস।”

প্রদ্যোৎ কহিল, “কিন্তু এই অচেনা বিদেশে তুমি একা থাকবেই বা কি করে?”

চিত্রা কহিল, “তোমার পুরাণ কানাই চাকর ও পাঁড়েজি বামুন আছে, কিছু ভাবতে হবে না।”

প্রদ্যোৎ কহিল, “আচ্ছা এক কাজ করলে হয়, ২।৩ দিনের জন্যে আমার অনুপস্থিতে অনুপকে এখানে থাকতে বলি—তা' হলে আর ভাববার কোন কারণ থাকবে না। কি বল?” চিত্রা তাহাতে আপত্তি জানাইলে প্রদ্যোৎ কহিল, “তা'হলে আমারও আর গিয়ে কাজ নেই।” অগত্যা চিত্রাকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রদ্যোতের প্রস্তাবেই রাজী হইতে হইল।

পরদিন সকাল বেলা অনুপ আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রদ্যোৎ বলিল, “অনুপ, একটা কথা আছে। আমাদের চিরকুমার সভার সেক্রেটারীর বিয়ে। বন্ধু লিখেছেন, আমি না গেলে তার বিবাহোৎসব উৎসবই নয়, যেতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে চিত্রাকে নিয়ে। সে এখানেই থাকবে—, কাজেই তোমাকে ৩।৪ দিনের জন্যে তার বডিগার্ড হয়ে একটু কষ্ট করে এখানে থাকতে হবে, তুমি রাজী হলে আমি নিশ্চিন্ত মনে একবার ঘুরে আস্‌তে পারি

অনুপ একটু আপনার মনে চমকাইয়া উঠিল। তাই তো প্রদ্যোৎ বলে কি! তারপরই কহিল, “বেশ তো আমিই থাকব, এ আর বেশী কথা কি ভাই? কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বন্ধুর বিয়ের ভোজ খেয়ে এস।”

সেই মুহূর্ত্তে চিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল, সদ্যস্নাতা, পরণে একখানি নীলাম্বরী সাড়ী, তার আঁচলখানি গলায় বেষ্টিত,

কপালে চন্দনের টিপ দেবতার চরণাঙ্গুলির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। সে হাসিয়া কহিল, "আপনার গার্ড দেবার ডিউটি প'ল? মেয়ে জীবনটা এমনই দুর্ব্বল, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালীর ঘরে, যে তাদের মুখের কথাটা কেউ ভরসা করে নিতে পারে না অনুপবাবু! নিজেদের ক্ষমতা যে কতটুকু তা তো কেউ ভেবে দেখেন না। আজ যদি আমার বাড়ী ডাকাত পরে, একজন কিম্বা দু'জন পুরুষ মানুষের কতটুকু ক্ষমতা যে বাড়ীর মেয়েদের রক্ষা করবে? রক্ষা ক'রতে হ'লে অন্ততঃ ১৫।২০ জনের আগ্‌লিয়ে থাকা দরকার—কি বলেন?"

অনুপ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ডাকাত পড়ার প্রয়োজন ভেবেই কি তারা থাকে বৌদি? এমন কতকগুলি কাজ আছে ও দরকার পড়ে সময় সময় যে পুরুষ মানুষের দরকার হয়।"

প্রদ্যোৎ অনুপের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "তা সে যত বড়ই বিদুষী ও সাহসী হোক না কেন।"

এ ইঙ্গিতটা যে তাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, চিত্রা সেটা বেশ বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ডবল্ ফোর্সের মুখে তো আমি দাঁড়াতে পারবো না, তা জানি, যাক্ তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।"

প্রদ্যোৎ খুশী হইয়া আপনমনে কহিল, "এইরে এবার অভিমানিনির মান ভাঙ্গাতে আমার প্রাণ যাবে দেখছি।"

আর অনুপ ভাবিল—প্রদ্যোতের ইচ্ছামতই আমি চিত্রার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত, চিত্রা কি আমায় সন্দেহ করে, আমার মনের ঢেউয়ের উন্মত্ততা কি চিত্রার কাছে বিন্দুমাত্র ধরা পড়ে গেছে।···

তখন আর বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হইল না। অনুপ কহিল, "প্রদ্যোৎ, তোমার ট্রেন তো রাত্রি ৮-৩০ টায়, আমি বিকাল ৫ টায় আস্‌বো।

*

প্রদ্যোৎকে রওনা করাইয়া দিয়া অনুপ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল চিত্রা জ্যোৎস্না পুলকিত রাভির তীরে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে অনুপ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তন্ময়তায় চিত্রা এমন নির্লিপ্তা ছিল যে অনুপের আগমন সে টের পাইল না। চিত্রা শুধু ভাবিতেছিল প্রদ্যোতের কথা, এমন কেন হয়? আজ একটী লোক তাহার পাশে নাই বলিয়া সমস্ত বুকখানি অকারণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সমস্তই যেন ফাঁকা মনে হইতেছে। পাছে তাহার দুর্ব্বলতা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় তাই সে প্রদ্যোৎকে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। সকলেই বলে তার মনের জোর নাকি অসীম।

চিত্রা যখন ভাবের ঘোরে এমনি বিভোর, সেই সময় অনুপ ডাকিল, "বৌদি।"

পিছনপানে না তাকাইয়া চিত্রা কহিল, "চলুন অনুপবাবু, খাবেন চলুন, রাত হয়েছে। আপনার বোধ হয় বেশী রাতে খাওয়া অভ্যাস নাই

অনুপ কহিল, "খুব আছে বৌদি, আপনি আমার জন্যে এত ব্যস্ত হবেন না। প্রদ্যোৎ যাওয়ার সময় বলে গেল আপনার সাথে গল্প-সল্প করে আপনাকে একটু আনন্দ দিতে, আপনি যদি শোনেন আপনাকে আমার জীবনী শোনাব।"

চিত্রা কহিল, "হ্যাঁ, শুনবো বৈকি,—তবে তার আগে আপনার খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবেন, চলুন।"

অনুপ কহিল, "চলুন, যখন আপনার এত তাড়া, তখন ঐ পর্ব্বই আগে সেরে নেওয়া যাক্।"

খাওয়া শেষ হইলে চিত্রা কহিল, "অনুপবাবু আজ শুয়ে পড়ুন, কাল দুপুরে আপনার গল্প শুনবো।"

অনুপ কি বলিতে যাইয়া চুপ করিল ও পরে বলিল, "আচ্ছা তাই হবে বৌদি, আপনার শরীর ও তার থেকে মনের অবস্থা বেশী খারাপ—আজ আপনি রেষ্ট নিন্।"

চিত্রা চলিয়া গেল। অনুপ রাভি তটে আসিয়া বসিল। উন্মুক্ত আকাশতলে বাতাসের স্নিগ্ধ পরশে সে যেন অনেকখানি আরাম পাইল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে বসিয়া থাকার পর জাহাঙ্গীরের সমাধিমন্দির হইতে ১২টা বাজিয়া উঠিল। অনুপ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে চিত্রার কথা ভাবিতেছিল।

পরদিন দুপুর বেলা আহারাদি শেষ করিয়া ড্রইংরুমের একটী সোফায় বসিয়া চিত্রা অনুপের জীবন কথা শুনিতেছিল। তাহার ইংলণ্ড ও য়ুরোপ ভ্রমণ, রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী ও পাশ্চাত্য নারীর প্রেমালাপ ইত্যাদি নানা কথা অনুপ কহিতে লাগিল। হঠাৎ সে গলায় স্বর একটু

নীচু করিয়া কহিল, "বৌদি, সমস্ত য়ুরোপ ভ্রমণ করেও আপনার মত এমন সুন্দরী ও গুণবতী নারী আমার চোখে পড়ে নি।"

চিত্রা মুগ্ধ হইয়া অবাক বিস্ময়ে তাহার গল্প শুনিতেছিল; ঐ কথায় হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। সমস্ত মুখখানি সূর্য্যাস্তের রঙিন আভার মত রাঙা হইয়া উঠিল, লজ্জায় কি বিরক্তিতে অনুপ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অনুপ বিকালবেলা চিত্রার ঘরে আসিয়া দেখে সে একমনে সেলাই করিতেছে। অনুপ কহিল, "বৌদি বেড়াতে যাবেন না?"

চিত্রা কহিল, "আজ আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, আপনিই একটু ঘুরে আসুন।"

সহসা অনুপ চিত্রার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "কই, না তো, গা বেশ ঠাণ্ডা আছে। অত বেশী সেলাই কচ্ছেন বলেই শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছে।"

চিত্রা কহিল, "আমার আজ বেড়াবার মোটেই ইচ্ছা নেই—আপনাকে তো আগেই বলেছি।" অনুপ আর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি ৯টার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পুষ্পোদ্যানে একখানি ইজিচেয়ারে চিত্রা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা জ্যোৎস্না ধারায় অভিসিঞ্চিত। বহুক্ষণ ধরিয়া অনুপ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেখিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে তার হাতখানি একবার চিত্রার কপালে স্পর্শ করিল। সে স্নিগ্ধ পরশ তাহার সকল দেহে অজানা আনন্দের শিহরণ আনিয়া দিল। সে নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না, দুইহাতে চিত্রাকে জড়াইয়া ধরিল।

মুহূর্ত্তে আতঙ্কিত চিত্রা চমকাইয়া উঠিল—তারপর ধীর স্বরে কহিল, "দাদা, তুমি কখন এলে? আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?"

অনুপ বিদ্যুৎবেগে হাত দু'খানি সরাইয়া লইয়া, নিমেষমাত্র চিত্রার মুখের পানে তাকাইয়া মুখ নামাইয়া লইল। তাহার মুখ তখন পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া গিয়াছে, আত্মগ্লানিতে মন তাহার ভরিয়া উঠিল, নিজকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া মনে হইল, সে ভাবিল—যাকে ভালবসি, তাকে কি এমনি করে গৌরবের সিংহাসন হ'তে ধূলার আসনে নামিয়ে আনতে হয়! নিজের ভার যেন সে আর বইতে পাচ্ছিল না, মর্ম্মাহত স্বরে কহিল, "চিত্রা, বোনটী আমার, আমায় ক্ষমা কর, আজকের এই ব্যবহারের জন্ম আমি অনুতপ্ত।"

*

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার সময় অনুপ তাহার সুটকেশ গুছাইয়া লইতেছিল। চিত্রা বাহিরে দাড়াইয়াছিল। এমন সময় "কই সব কোথায়, বেয়ারা তোর মাইজী কোথায় রে" বলিতে বলিতে প্রদ্যোৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিত্রা তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ও পরে কহিল, "কেমন বৌ হল?"

প্রদ্যোৎ কহিল, "মন্দ নয়, তাই বলে কি আমার মত?"

চিত্রা তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "যাও"। স্বামীর ঐ ছোট দু'টী কথায় চিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল—তার মনে আজ কত কথাই উঠিতেছিল, স্বামী তার কি তা জানে! আর সে কখনও তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না—আজ তার কত গর্ব্ব। তাঁহাকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য সে হারায় নি।...

এমন সময় হাতে সুটকেশ লইয়া যাত্রার বেশে অনুপ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। তাহার চেহারাটা যেন কেমন মলিন ও রুক্ষ।

প্রদ্যোৎ কহিল, "ভাই, একি এমন অসময়ে তুমি কোথায় যাবে?"

অনুপ কহিল, "প্রথমে বাড়ী, তারপর আর একবার লম্বা পাড়ি দেব, য়ুরোপ ঘুরে আসবো

প্রদ্যোৎ হাসিয়া কহিল, "বন্ধু, ওসব দেশে যাওয়া বেশী ভাল নয় হে, মন হারাবার বিশেষ ভয় আছে।"

অনুপ চিত্রার মুখের পানে একবার চাহিয়া আনন্দের স্বরে কহিল, "আর ভয় নেই ভাই, রক্ষাকবচ আমার সঙ্গেই আছে।"

দেশ-বিদেশের ঘর-বাড়ী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

জীব-মাত্রেরই একটা আশ্রয় বা অবস্থান স্থান থাকে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ সকলেরই গৃহ আছে বলিলে ভুল হয় না। পক্ষীদের কেহ বৃক্ষের বক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, কেহ বৃক্ষ কোটরে, কেহ বৃক্ষ শাখায় পত্র-পুঞ্জের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করে। পশুদিগের মধ্যে কেহ গুহায় বা গর্ত্তে, কেহ ঝোপে-ঝাড়ে, কেহ বা সঘন-সন্নিবিষ্ট তরু-লতার তলদেশে আশ্রয় লয়। ক্ষুদ্রকায় কীটপতঙ্গের গৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশল আমাদিগকে অধিক বিস্ময়াবিষ্ট করে। পিপীলিকার গর্ত্ত, মধু-মক্ষিকার চক্র এবং উহাদিগের নির্ম্মিত ঢিবি বা বল্মীক আমাদিগের চিরন্তন বিস্ময়ের বস্তু। যখন অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রাণীও আশ্রয় রচনা করিয়া বাস করে তখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের পক্ষে এ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়াই স্বাভাবিক। সভ্যতার সঙ্গে ঘর-বাড়ীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মানুষ যত সভ্য হইয়াছে ততই তাহার বাস-গৃহের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। বন্য পশু এবং বস্ত্র বিহীন বনবাসী আদিম মানুষ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই কম। আদিম মানুষ পশুর মতই সারাদিন খাদ্যের খোঁজে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রিতে গর্ত্তে-গুহায়, ঝোপে-ঝাড়ে, বৃক্ষের কোটরে বা তলে ঘুমাইত। মানুষ যখন গুহা-গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করে তখন সভ্যতার পথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে বলিলেও ভুল হয় না। সুদূর অতীতের গুহা-গৃহবাসী মানবগণ গুহা-গৃহ-গাত্রে এমন কতক-গুলি নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে যাহাদিগকে সভ্যতার সূচনা বা উন্মেষের পরিচয় বা চিহ্ন বলিয়া গণ্য করা চলে। শুধু আশ্রয় হইলেই হয় না মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যও চায়! এই স্বাচ্ছন্দ্য কামনা হইতেই সত্যকার সভ্যতার উদ্ভব। স্বাচ্ছন্দ্যকামী মানুষ ক্রমশঃ পশুত্বের স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন কোন দেশের আদিম অধিবাসীরা আজিও প্রায়ই আদিম অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছে বটে কিন্তু গুহাবাসী নরনারী আর দেখা যায় না বলিলেও চলিতে পারে। তবে আদিম মানবের বাসস্থল সেই গুহা-গৃহগুলি এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় মাত্র কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে মানুষ বাস করিত। গুহাবাসী মানুষের আঁকা বিচিত্র চিত্রগুলি এরূপ অবিকৃত রহিয়াছে যে কিছুতেই মনে করা যায় না আমাদিগের এবং ঐ সকল চিত্রের রচয়িতাদিগের মধ্যে বহু সহস্র বৎসরের বিপুল ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে। আদিম মানুষ গুহা-গৃহ হইতে ক্রমশঃ গিরি গাত্রে বা পর্ব্বত পার্শ্বে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকায় পুয়েব্লো আখ্যায় অভিহিত আদিবাসীরা প্রথমে নিসর্গ-নির্ম্মিত গুহা-গৃহ সমূহে অবস্থান করিত কিন্তু পরে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইবার জন্য পর্ব্বত-পার্শ্বে গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডেও এক সময় গুহাবাসী নরনারীই ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতের আদিবাসীদিগের মধ্যেও আর গুহাবাসী দেখা যায় না। তবে কোন কোন সম্প্রদায় এখনও দুর্গম গিরিগাত্রে বাস করিয়া থাকে। বৃটেনের আদিমতম অধিবাসীরা (প্রস্তর যুগে) গুহায় অবস্থান করিত ইহা অনেকেই জানেন কিন্তু এই দেশে এমন গুহা-গৃহ এখনও আছে যেখানে বর্ত্তমানেও মানুষ বাস করিতেছে, এ সংবাদ হয় তো অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। উর্সেষ্টারশায়ারের কিনভাব নামক স্থানে অবস্থিত হোলি-অষ্টিন-রক নামক পাহাড়ে এই গুহা-গৃহগুলি বিরাজিত। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা যে অবস্থায় ছিল এখনও প্রায় সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। কয়েকটি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আধুনিক যুগের নরনারী এখানে বাস করিতেছে।

যেখানে গিরিশ্রেণী আছে অবশ্য সেইখানেই গুহা-বাস সম্ভব। পাহাড় বিহীন আরণ্য প্রদেশ বা সমতল প্রান্তরের অধিবাসীরা গাছের ডাল পাতা এবং শুষ্ক তৃণগুল্মের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। এখনও কোন কোন দেশের আদিবাসীরা সেই আদিম প্রণালীতেই কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতেছে। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নততর বা বিচিত্রতর জীবন যাপন পদ্ধতি অবলম্বনের ইচ্ছা জাগ্রত হয় সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আদিবাসীদিগের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা

সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে বা প্রথম-প্রস্তর যুগের স্তরে আজিও রহিয়াছে। বুদ্ধি বৃত্তির দিক দিয়াও ইহারা অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে বলা চলে। ইহারা গাছের ছাল বা পত্রে প্রস্তুত কুটীরে ডাল-পাতার ছাউনি দিয়া যে বাস-গৃহ তৈয়ারি করে তাহা প্রায়ই প্রস্তরযুগের মতই। এই সকল কুটীরের একদিক একেবারে খোলা। অষ্ট্রেলিয়া বিশাল দেশ। ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করে এবং তাহাদিগের কুটীর-রচনা প্রণালীও বিভিন্ন। কোন অংশের কুটীরগুলিকে "হাম্পি" আখ্যায় আভহিত করা হয়। কোন অংশের বাস-গৃহগুলি "গুনিয়া" নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থান বিশেষের আদিবাসীরা "উয়ার্লি" নামধারী কুটীরে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এমন কুটীরও আছে যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রণালীতে প্রস্তুত। শীর্ষ এবং পার্শ্বগুলি শুষ্ক তৃণ পত্রাদির দ্বারা সযত্নে গড়িয়া তুলিয়া পরে উহাতে কর্দ্দম বা পঙ্কের প্রলেপ দেওয়ার প্রথাও কোন কোন অংশে প্রচলিত রহিয়াছে। কোন কোন জায়গায় কাঠের কুটীর দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বিরাজিত দ্বীপপুঞ্জে পলিনেশিয়ান, পাপুয়ান প্রভৃতি শাখার অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় সমূহ বাস করে। এই সকল শাখার শোণিতগত সম্মিলন বহু বর্ণ-শঙ্কর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী-দিগের মধ্যে যাহাদিগের ভিতর পাপুয়ান প্রভাব অধিক, তাহাদিগের বাসগৃহ অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের। পাপুয়ান জাতি-প্রধান অন্যান্য দ্বীপেও এইরূপ গৃহ দেখা যায়। পাপুয়ান প্রণালীতে প্রস্তুত গৃহগুলির ব্যাস আট ফিট্ এবং উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফিট্ হইয়া থাকে। এক একটি কুটীরে একাধিক পরিবারও বাস করিতে দেখা যায়। যাহারা অবিবাহিত তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ রচিত থাকে। দ্বিতল কুটীরও দেখা যায়। চারিটি দৃঢ়-দেহ দণ্ড বা খুঁটী চারিদিকে পুঁতিয়া উহার সহিত বৃক্ষ-বল্কলের দেওয়াল সংলগ্ন করিয়া এই সকল দ্বিতল কুটীর গড়িয়া তোলা হয়। কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা প্রথমতলের ছাদ বা দো-তলার মেজে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। দ্বিতলের পার্শ্ব এবং শীর্ষ হইতে বল্কলখণ্ড বাহির হইয়া গৃহবাসী নর-নারীকে বৃষ্টি ও বাতাস হইতে রক্ষা করে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে বিরাজিত হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে তৃণ রচিত গৃহাবলীই অধিক দেখা যাইত। বর্ত্তমানে এই জাতীয় গৃহ অল্পই দৃষ্ট হয়। সভ্যতার প্রসারের সহিত প্রায় সর্ব্বত্রই সৌধ সমূহ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে এই সকল দ্বীপের সহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম অঞ্চলে প্রাচীন প্রণালীর তৃণ কুটীর আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। হাওয়াইয়ান দ্বীপাবলীতে আজকাল যে সকল কুটীর দেখা যায় তাহাদের কাঠামো কাষ্ঠ রচিত কিন্তু ছাউনি তৃণের। এই ছাউনি শুধু সুদৃশ্য নহে সুদৃঢ়ও বটে। ইহাতে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। আগুন লাগিবার আশঙ্কায় এই সকল কাষ্ঠ ও তৃণ নির্ম্মিত কুটীরের অভ্যন্তরভাগে চুল্লি প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। গৃহের বহির্ভাগে অগ্নির ব্যবস্থা করা হয়। বাহ্যদৃশ্যে যাহাই হউক তৃণের ছাউনিযুক্ত এই সকল কুটীরের অভ্যন্তর ভাগ গরম এবং আরামপ্রদ বটে।
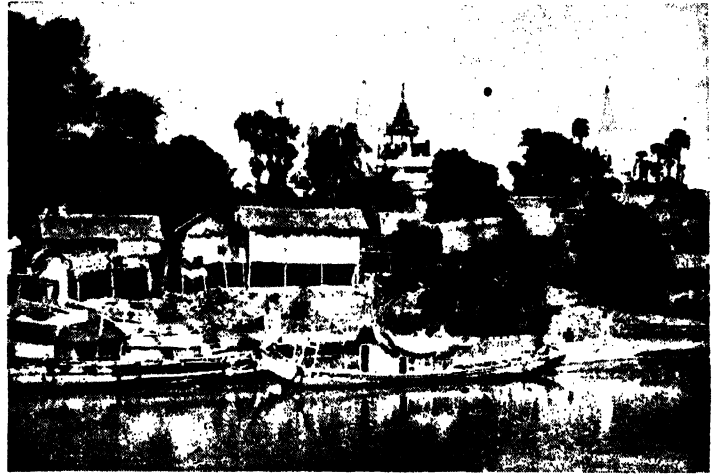
দণ্ডের উপর দণ্ডায়মান গৃহ—ব্রহ্মদেশ (অদূরে প্যাগোডা দেখা যাইতেছে)

ফিজি দ্বীপের তৃণ রচিত গৃহগুলি উন্নততর প্রণালীতে প্রস্তুত। এই পদ্ধতির মধ্যে কতকটা আধুনিক রুচির পরিচয় আছে। হাওয়াইয়ান দ্বীপের কুটীর অপেক্ষা ইহারা উচ্চতর হইয়া থাকে। তৃণ রচিত প্রাচীরের গাত্রে খলপার আচ্ছাদন দেওয়া হয় এবং তলদেশে চাতাল রচনা করা হইয়া থাকে। ছাদ

ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া একটি দীর্ঘ দারুদণ্ডে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আজকাল এই সকল গৃহের অভ্যন্তরস্থ কক্ষগুলিতে চেয়ার, টেবিল, কৌচ প্রভৃতি আধুনিক রুচিসম্মত
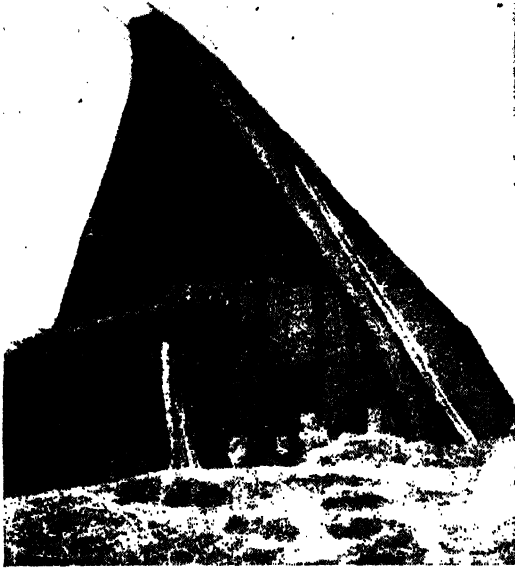
অবিবাহিতদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট নাগা-গৃহ

আসবাবপত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃণকুটীরে এই সকল দ্রব্য দেখিবার আশা সাধারণতঃ কেহ করিতে পারেন না। পৃথিবীর কোন কোন অংশে মধুচক্রের আদর্শে প্রস্তুত গৃহাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুর মণ্টানা নামক প্রদেশে মধুচক্রাকার কুটীরাবলী দেখা যায়। তৃণ এবং নল-জাতীয় উদ্ভিদে ইহারা প্রস্তুত। দূর হইতে ইহাদিগকে দেখিলে ঘাসের তৈয়ারি বড় বড় মৌচাক বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার হটেণ্টট নামক সম্প্রদায়ও মৌচাকের মত আকারের বাসগৃহ প্রস্তুত করে। এই সকল গৃহ বক্রাকার কাঠিতে প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে এক জাতীয় উদ্ভিদের মাদুর আচ্ছাদিত করা হয়। এই সকল কুটীর ক্রেয়াল আখ্যায় অভিহিত। এই সকল কুটীর পরস্পর চক্রাকারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে বলিয়াই মধু চক্রাকার বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। মধ্যস্থানে পালিত পশুপাল ও পক্ষীগণকে রাখিবার স্থান, চারিদিকে চক্রাকার পল্লী। আফ্রিকার আরও কতিপয় সম্প্রদায় এই ধরণের গৃহ রচনা করিয়া বাস করে।

পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ড-কোষ্ট নামক উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের অন্যতম অধিবাসী ফ্যাস নামক সম্প্রদায় বৃক্ষ-বল্কলে রচিত কুটীরে বাস করিয়া থাকে। এই সকল অনুচ্চ কুটীরের দ্বারগুলি এতক্ষুদ্র যে ছিদ্র বলিলেই চলে। ইহাদিগের আয়তন ১৪ বা ১৫ বর্গ-ফিটের অধিক নহে এবং ইহারা সম্পূর্ণরূপে বাতায়ন বিরহিত। দুইটি কাঠিতে সংলগ্ন একখণ্ড বল্কল কপাটের কাজ করে। পথ এবং কুটীরতল দুইই বালুকাময়। কক্ষতলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে উদ্গত ধূম্র ছাদের ছিদ্র পথে নির্গত হইয়া থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদিগের বাসগৃহে আসবাব-পত্র অতি সামান্য। একখানি কাঠের বেঞ্চ, সেই বেঞ্চের উপর একটি কাঠের বালিশ ও কতকগুলি ময়লা ন্যাকড়া, ইহাই বিছানা। পরিচ্ছন্নতার সহিত ইহাদের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। এই সকল গবাক্ষবিহীন গহ্বরবৎ বল্কল-গৃহের অভ্যন্তরভাগে আলোক ও বাতাস অতি অল্পই প্রবেশ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের কতিপয় দ্বীপে গাছের উপর গৃহ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। নিউগিনি দ্বীপে বৃক্ষশাখার উপর বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক প্রকার গৃহ অবিবাহিত তরুণীগণের বাস-স্থলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল গৃহ কাষ্ঠে রচিত। মইয়ের সাহায্যে গৃহে উঠিতে হয়। কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এই গৃহের নিকটে আসিলে কুমারীর দল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিলাখণ্ডসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকে। অবশ্য এইরূপ অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করিয়া রাখা হয়। মালয় উপদ্বীপে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলীতে দণ্ডসমূহের উপর দণ্ডায়মান গৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল স্থানের ভূমি জলসিক্ত বা স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া অস্বাস্থ্যকর তথায় এইরূপ গৃহ প্রস্তুত-প্রণালী প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ সোজা এবং শক্ত বড় বড় কাষ্ঠদণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর কুটীর রচনা করা হয়। এই সকল গৃহ ভূমিতল হইতে অনেকখানি উচ্চে রচিত হইবার অন্যতম কারণ হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপ এবং হিংস্রতর শত্রু সম্প্রদায় হইতে আত্মরক্ষা। বোর্ণিও এবং নিউগিনিতে দণ্ডের উপর দণ্ডায়মান এক প্রকার প্রকাণ্ড গৃহ দেখা যায়।

ইহাতে বহু পরিবার একত্র বাস করে। এই জাতীয় গৃহ প্রায় ৪ শত ফিট্ দীর্ঘ হইয়া থাকে। নিউগিনি বা পাপুয়ার প্রভৃতি পল্লীগ্রামে এক একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বড় বাড়ী থাকে। ইহাদিগকে মিলন-মন্দির বলিলে ভুল হয় না। অতিথি-অভ্যাগতের থাকিবার জন্য এই গৃহ ব্যবহৃত হয়।

স্যামোয়া দ্বীপের গৃহসমূহ দেখিলে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপাবলীর গৃহ সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ প্রায়ই ঐ ধরণের গৃহই অধিকাংশ দ্বীপে দেখা যায়। প্রথমে কতকগুলি বিশেষ মজবুত কাঠের খুঁটি চক্রাকারে প্রোথিত করা হয়। মধ্যবর্ত্তী একটি খুঁটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য খুঁটিগুলি দাঁড়াইয়া থাকে। ইহার পর অনেকগুলি কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে নারিকেল রজ্জুর-সাহায্যে এই সকল দণ্ডের সহিত বাঁধিয়া কুটীর রচনা করা হয়। ইক্ষু-পত্র বা প্যাণ্ডানাস নামক তালজাতীয় তরুর পত্রাবলীতে প্রস্তুত সূক্ষ্মাগ্র ছাউনি ছাদের কার্য্য করে। সময়ে সময়ে তালজাতীয় তরুর পত্রে তৈয়ারী একপ্রকার পর্দা টাঙান হইয়া থাকে। ঝড় বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়, লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার জন্য নহে। নিউজি-ল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাউরিদিগের গৃহ-নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের কথাও উল্লেখনীয়। মাউরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপের আদিবাসী অপেক্ষা সভ্যতর জাতি সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের গাত্রে তাহারা যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় এক প্রকার সভ্যতার বিকাশ তাহাদিগের মধ্যে হইয়াছিল। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সাধারণ বাসগৃহ ছাড়া মিলনমন্দির বা অতিথি-অভ্যাগতের বাসস্থানরূপে যে সকল বৃহৎগৃহ ইহারা প্রস্তুত করে তাহাদিগের বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ইহারা "হোয়ারেহোয়া কাইরো" আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহাতে সকলের সমান অধিকার। এই কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ ৭০ বা ৮০ ফিট্ দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং প্রস্থে প্রায় উহার অর্দ্ধেক হইবে। গৃহের সর্ব্বত্রই মাউরি শিল্পীদের কারুকার্য্য কৌশলের পরিচয় আছে। এই সকল শিল্পী পুরুষানুক্রমে কাঠের উপর কারুকার্য্য করিয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় কাঠের উপ[র] মনুষ্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই সকল মূর্ত্তির অধিকাংশেরই হস্তে পাঁচটির পরিবর্ত্তে তিনটিমাত্র অঙ্গুলি রহিয়াছে। ইহার কারণ, এই সকল শিল্পীর পূর্ব্বপুরুষ নুকু-মাই-তেকোর দক্ষিণ হস্তে তিনটি অঙ্গুলি ছিল।

দক্ষিণ টিউনিসিয়ার অধিবাসী অর্দ্ধসভ্য লিবিয়ানগণ অন্ধকার কন্দরতুল্য গৃহে বাস করিতে ভালবাসে বলিলে ভু[ল] হয় না। অনেকে গুহায় বা গুহাতুল্য গৃহে বাস করে তাহারা যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা দেখিলেও সারি সারি বিরাজিত গুহা-গৃহ বলিয়া মনে হইতে পারে। প্রত্যে[ক] ঘর যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনই অন্ধকার। যেখানে গৃহাবলী দ্বি-তল সেখানে বহিঃপ্রাচীরের সহিত সংলগ্ন অসমা[ন] শিলাগুলি উপরতলে উঠিতে সোপানের কার্য্য করে। পশ্চি[ম] আফ্রিকার গৃহ-নির্ম্মাণকারীরা কোন প্রকার যন্ত্র-পাতি ব[া] হাতিয়ারের সাহায্য না লইয়া শুধু হস্তের সাহায্যে গৃহ নির্ম্মা[ণ] করে। লাল কাদা হইতে ইহারা এক প্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করে এবং সেই ইষ্টকগুলিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট করিয়া উহাতে [এক] জাতীয় কাদার প্রলেপ প্রদান করে। প্রখর সূর্য্যকরে শুকাইয়া গেলে এই সকল কর্দ্দম-গৃহ বিশেষ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে তৃণ বা পত্রের ছাউনি প্রস্তুত করা হয়। এক একটি গৃহে অনেকগুলি ঘর থাকে। নাইগেরিয়ার
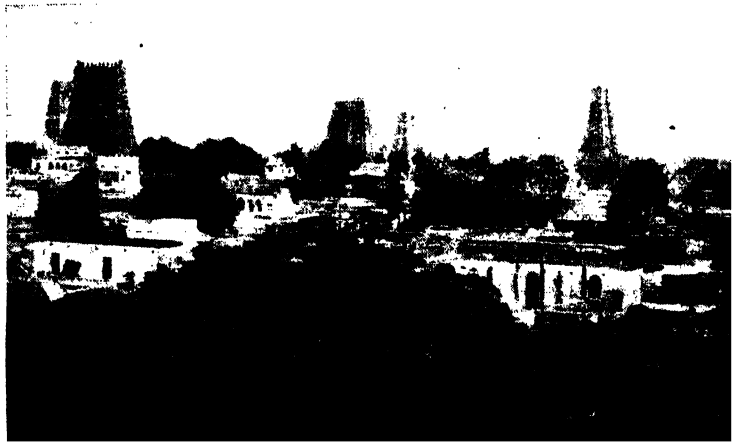
দ্রাবিড়-স্থাপত্যের চিত্তাকর্ষক নিদর্শন—মাদুরার মন্দির

অধিবাসীরা কর্দ্দম-নির্ম্মিত গৃহের শীর্ষে দীর্ঘাকার তৃণাবলীর ছাউনি রচনা করিয়া যে সকল বাস-ভবন নির্ম্মাণ করে তাহা দেখিলে বাঙ্গালার পল্লী-গৃহ মনে পড়া সম্ভব। ইহাদের ঘর ছাইবার দক্ষতা দেখিয়াও বাঙ্গালী শ্রমিকদিগের কথা মনে হইতে পারে। ছাউনির আকার অনেকটা আমাদের দেশের ঘরের চালের মত। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন স্থানে

সিংহলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কুটীর

গাছের গুঁড়ি বা কাষ্ঠদণ্ডের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। বন্যা এবং বন্য পশুর ভয়েই এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কাষ্ঠখণ্ড বিছাইয়া ঘরের পুরোভাগে বারান্দা রচনা করা হয়। স্ত্রীলোকেরা বারান্দায় বসিয়া গৃহকর্ম্ম করে। তৈজস-পত্রের অধিকাংশই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কলা প্রচুর জন্মে বলিয়া উহাই ইহাদিগের অন্যতম আহার্য্য। স্ত্রীলোকেরা কোন বক্ষাবরণ ব্যবহার করে না। আফ্রিকার আসান্টিবাসী নিগ্রো সম্প্রদায় যে সকল সুক্ষ্মাগ্র কর্দ্দম-গৃহ প্রস্তুত করে তাহা দেখিতে অতি বিচিত্র। আফ্রিকার প্রখর রবিকরে শুকাইয়া কর্দ্দম প্রস্তরের মত শক্ত হইয়া যায়। এই সকল কর্দ্দম কুটীরের দুই দিক্ মন্দিরের মত সুক্ষ্মাগ্র বলিয়া দূর হইতে দেখিলে বিশেষ বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়।

নাইগেরিয়ার হাউসা নামক নিগ্রো সম্প্রদায় অতি সহজেই তৃণ-কুটীর প্রস্তুত করিতে পারে বলিয়া তাহারা একই গৃহে বহু লোক বাসকরা পছন্দ করে না। কয়েকটি টিকাঠি পুঁতিয়া তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত করিলেই হাউসাদিগের বাসোপযোগী কুটীর প্রস্তুত হইল। আবহাওয়া ভাল থাকিলে এই সকল তৃণ-গৃহ স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু প্রবল ঝড়-বৃষ্টিকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি ইহাদের নাই। নল জাতীয় উদ্ভিদে তৈয়ারি দরজা বা কবাটকে দিনে সরাইয়া রাখা হয়। রাত্রি হইলে উহা দ্বারদেশে সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে নিউগিনির দণ্ডাবলীর উপর দণ্ডায়মান গৃহের কথা কহিয়াছি। সেখানে যেমন অবিবাহিতা তরুণীগণের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ থাকে তেমনই অবিবাহিত তরুণদিগের জন্যও বিশিষ্ট গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকার প্রথা প্রচলিত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ইগোরোট নামক সম্প্রদায়রা উচ্চ খুঁটির উপর কুটীর রচনা করিয়া বাস করে। ভিত্তিস্বরূপ কাষ্ঠ-স্তম্ভগুলি এরূপ আকৃতির যে কোন অনিষ্টকর প্রাণী সহজে উঠিতে পারে না। ইগোরোটরা এককালে অতি ভীষণ স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিত এবং তাহাদিগের মধ্যে শত্রুর মস্তক সংগ্রহ করা গৌরবজনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত। অনামে মই নামক এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে। ব্যাঘ্রের ভয়ে ইহারা ভূমি হইতে উচ্চে বিরাজিত গৃহে বাস করিতেছে। মই-এর সাহায্যে গৃহে আরোহণ করিয়া পরে সেই মই সরাইয়া লওয়া হয় সুতরাং কেহ সহজে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে অনেকে একত্র অবস্থান করে।

ব্রহ্মদেশে পাদাউং নামক এক পার্ব্বত্য জাতি আছে। ইহারা কাষ্ঠখণ্ডসমূহে দ্বিতল কুটীর প্রস্তুত করিয়া নিম্নতলে পালিত পশুপালকে রাখে এবং নিজেরা উপরে বাস করে। কয়েকখানি কাষ্ঠকে সিঁড়ির আকারে স্থাপন করিয়া তাহারই সাহায্যে দ্বিতলে আরোহণ করা হয়। গুরুভার অলঙ্কারে মণ্ডিত বিচিত্রাকৃতি পাদাউং নারীরা বিদেশীয় দর্শকের দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সুতীব্র শীতের লীলাস্থলী উত্তর রুশিয়ার আরণ্য অংশের অধিবাসীরাও কাঠের ঘরে বাস করে। এখানকার কাঠুরিয়া সম্প্রদায় কাঠ ও কুঠারের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে বলিলে ভুল হয় না। কাঠের উপর কাঠ সাজাইয়া ইহারা এরূপ কুটীর রচনা করে যে, প্রচুর তুষার-

পাত হইলেও কুটীরবাসীর কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। তুষার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাষ্ঠখণ্ড সংযোগে যুগ্ম-ছাদ রচনা করার প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলিয়া তথায় কোন গুরুভার পদার্থে গৃহনির্ম্মাণে নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় না। সাধারণতঃ বাহিরের প্রাচীরগুলি কাষ্ঠে এবং ঘরের দেওয়ালগুলি কাগজে তৈয়ারি করা হয়।

এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মানুষ প্রথমে যাযাবর জীবন যাপন করিত। যেখানে নিজের বা পালিত পশুপালের আহার্য্য মিলিত সেইস্থানে অস্থায়ী বাস-গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহারা বাস করিত। কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। যাহারা শিকারের সাহায্যে পশুপালন করিয়া জীবন যাপন করে তাহারা আজিও যাযাবর প্রকৃতি পরিত্যাগ করে নাই। ভূমির উর্ব্বরতার জন্য যেখানে কৃষিকার্য্য সম্ভব নহে সেখানেও মানুষ যাযাবর জীবনে বাধ্য হয়। আর্য্যগণও এক সময় যাযাবর জীবন যাপন করিতেন বলিয়া অনেকের অভিমত। কৃষিবিদ্যা শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্থায়ী বাস-স্থানে অবস্থান আরম্ভ করেন। এখনও বহু যাযাবর জাতি মধ্য এশিয়ায় ও তিব্বতে এবং আরবাদি মরু প্রধান দেশে বাস করে। প্রধানতঃ পশুপালনের সাহায্যে ইহারা জীবিকার্জ্জন করে। যেখানে যখন চারণ-ভূমি পাওয়া যায় তখন সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া বাসকরা হয়। তিব্বতীয় যাযাবররা ইয়াক নামক পশুপালন করে এবং ইয়াকচর্ম্মে নির্ম্মিত তাঁবুতে অবস্থান করে। উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরাও যাযাবর সম্প্রদায়। ইহারা উইগওয়াম নামক বৃক্ষ-বল্কল-নির্ম্মিত গৃহে অথবা টেপি আখ্যায় অভিহিত চর্ম্মনির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করে। তবে আজকাল বিসন প্রভৃতি বন্য পশু বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া ক্যানভাস বা কার্পাসে প্রস্তুত তাঁবু ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি পোল বা দীর্ঘদণ্ডের কাঠামোর উপর চর্ম্ম বা ক্যানভাসের আচ্ছাদন সংলগ্ন করিয়া এই সকল অস্থায়ী বাসস্থান প্রস্তুত করা হয়। শিল্প সৌন্দর্য্যশালী ও বন-বৈচিত্র্যমণ্ডিত শিবিরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। নেকড়ে, ভল্লুক বা ঈগলের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিলে জানিতে হইবে সেই শিবির কোন সর্দ্দারের। সম্প্রদায়ভেদেও শিবিরের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাঁবু স্থানান্তরিত করিবার সময় প্রোথিত দণ্ডগুলিকে তুলিয়া এবং উহার গাত্রে আচ্ছাদনীটি জড়াইয়া টাট্টু ঘোড়ার পিঠে স্থাপনপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হয়।

উত্তর মেরুর অধিবাসী এস্কিমোরাও প্রধানতঃ যাযাবর জাতি সন্দেহ নাই। অনেকে শুনিলে বিস্মিত হইবেন, ইহারা শীতের সময় তুষার গৃহে বাস করে। শীতের সময় তুষার গলিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই এইরূপ করা হয়। এই সকল স্তূপাকৃতি তুষারকুটীরে প্রবেশ করিবার জন্য ছিদ্রবৎ ক্ষুদ্র একটি দ্বার থাকে। বাহিরে শীত যতই তীব্র থাকুক এই সকল কুটীরের অভ্যন্তরভাগ গরম। চর্ব্বির সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত আলোক কোন সময়েই নির্ব্বাপিত করা হয় না। শীতের তীব্রতা কমিলে তুষার দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে অবস্থায় তুষারগৃহে বাস যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় না। তখন ইহারা সীলচর্ম্মে নির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করে। তিমির হাড় অথবা পাথরের উপর মাটি লেপিয়া ইগলু নামক এক প্রকার কুটীর প্রস্তুত করিয়াও ইহারা বাস করিয়া থাকে। রেডইণ্ডিয়ানদিগের সূক্ষ্মাগ্র শিবিরের সহিত এস্কিমোদিগের চর্ম্ম-নির্ম্মিত কুটীরের সাদৃশ্য আছে।

মরুবাসী যাযাবর

দারু-দণ্ডসমূহের উপর দণ্ডায়মান গৃহকে "পাইল-হাউস" বলা হয়। আমরা মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত মহাসাগর

বঙ্গে বিরাজিত দ্বীপাবলীতে এই জাতীয় গৃহ থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু অনেকে জানেন না এইরূপ গৃহ য়ুরোপেও রহিয়াছে। য়ুরোপের মধ্যে হল্যাণ্ড বিচিত্র দেশ। সমুদ্র হইতে নিম্ন বলিয়া এই দেশকে বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহু ডাইক বা বাঁধ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই দেশের অধিবাসীদিগকে সমুদ্র সলিলের সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হয়। এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নগর এমষ্টারডাম যথায় দণ্ডায়মান তথায় একটি জলা বিরাজিত ছিল। সমস্ত সহরটিই পাইপ বা দণ্ডাবলীর উপর দণ্ডায়মান বলিলে ভুল হয় না। বন্যা হইতে বাঁচিবার জন্য হল্যাণ্ডের অন্তর্গত মার্কেন নামক দ্বীপের অধিবাসীরাও পাইলের উপর গৃহ রচনা করে। হল্যাণ্ডে গমন করিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতুড়ির সাহায্যে গৃহ নির্ম্মাণের পাইল বা দণ্ড প্রোথিত করার শব্দ প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়।

পঞ্জাবের পল্লী-অঞ্চলের পান্থ নিবাস

প্রাচীন সভ্যতার লালাস্থলী চীনদেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ যেরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে তেমন আর কোথাও নহে। চীনের প্যাগোডাগুলিকে এই জাতীয় স্থাপত্য-শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন বলিলে ভুল হয় না। প্যাগোডাগুলির মধ্যে ন্যানকিংএর পোর্সিলেন-টাওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইলেও সুচাউর কাষ্ঠনির্ম্মিত প্যাগোডাটিকে সুন্দরতম বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। মানুষ সর্ব্বত্রই বাসগৃহ অপেক্ষা দেবগৃহ বা উপাসনাগৃহকে উচ্চতর ও বিচিত্রতর করিতে প্রয়াস করিয়াছে। সুচাউর প্যাগোডা অষ্টতল বিশিষ্ট। শুধু চীন নহে, তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া, ভুটান, সিকিম, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন প্রভৃতি বুদ্ধ-বাদ প্রধান দেশমাত্রতেই আমরা প্যাগোডা বা প্যাগোডা জাতীয় গৃহ দেখিতে পাই। গৃহের শীর্ষদেশের প্রান্তগুলিকে ঊর্দ্ধমুখও সূক্ষ্মাগ্র করাই এই জাতীয় স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চীনের অংশ বিশেষে নৌকায় বাস করার প্রথা প্রচলিত। কোন কোন বিশনি সহরের অধিকাংশ অধিবাসী পুরুষানুক্রমে সপরিবারে নৌকাতেই বাস করিতেছে। পয়ঃ-প্রণালীই এই সকল সহরের প্রধান পথ। লোক-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়াই চীনে নৌকা-গৃহে বাসকরার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের মন্দির, বৌদ্ধদেশসমূহের প্যাগোডা, চোর্টেন, গোম্পা, দাগোবা প্রভৃতি মঠ ও মন্দির ইস্‌লামীয় দেশগুলির মস্‌জেদ এবং খৃষ্টানদিগের নির্ম্মিত গীর্জ্জা-গৃহ ও মনাষ্টারি রচনা-বৈচিত্র্যে, স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যে এবং শিল্পৈশ্বর্য্যে সাধারণ বাসগৃহ অপেক্ষা বহুগুণ চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। শিল্পী দেব-গৃহ রচনায় তাহার সমগ্র শক্তি নিঃশেষে নিযুক্ত করেন বলিলে ভুল হয় না। রোমের সেণ্ট পীটার্স গীর্জ্জা, লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি, ভীনিস নগরের সেণ্টমার্কস্‌ উপাসনাগৃহ, মিশর এবং ভারতবর্ষের গুম্বজ গম্বীর ও মিনারমণ্ডিত মসজেদ সমূহ, চীনের সুচাউর এবং ব্রহ্মদেশের শোয়েডাগণ ও আনন্দ প্যাগোডা, দ্রাবিড় বা দক্ষিণ ভারতের বিরাট গোপুরম বিশিষ্ট মহান্‌ মন্দিরগুলিকে গৃহ-শিল্পের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা চলে। প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ মন্দিরে জাতীয় শিল্প-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণ কৌশলে গ্রীস ও ইটালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। গ্রীস ক্রীটের নিকট এবং ক্রীট মিশরের নিকট নির্ম্মাণ কৌশল শিখিয়াছিল সন্দেহ নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে স্থাপত্যশিল্প কি প্রকার বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা মোহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত হই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকায় বাস করিয়া আসিতেছে। বাবিলোনিয়া

ও আসিরিয়াতেও সৌধ-শিল্প উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিনেভে নগরের ধ্বংসাবশেষকে এই সত্যের সাক্ষী বলা চলে। সৌধ-শিল্পে গ্রীস ইটালীর গুরু হইলেও পরে ইটালী গৃহ-রচনায় অধিকতর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এথেন্সের পার্থেনন সৌধ-শিল্পের সুন্দরতম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া আজিও বিবেচিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। পর্ব্বতরাজ হিমাদ্রির ক্রোড়স্থিত ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিতে যে জাতীয় বাসগৃহ আমরা দেখিতে পাই, দূর দক্ষিণে বা দ্রাবিড়ে আমরা তাহা দেখি না। বঙ্গ-দেশেরই সকল অংশে গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতি একই প্রকার নহে। পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী বলিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণ মাটির ঘরে বাস করে। নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ মাটি-গৃহ-রচনার অনুপযোগী বলিয়া তথায় সাধারণতঃ বাঁশের বেড়ার ঘরে বাস করা হয়। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই খড়ের ছাউনি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় কিন্তু বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খাপরার ছাওয়া ঘরই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্ববঙ্গকে পশ্চাতে রাখিয়া সলিলসিক্ত আবহাওয়া বিশিষ্ট আসামের ভিতর দিয়া ব্রহ্মদেশের দিকে যতই অগ্রসর হইব ততই আরণ্য ও পার্ব্বত্য সম্প্রদায়সমূহের বিচিত্রদর্শন কুটীরাবলী দেখিতে পাইব। ভূমিতল হইতে বলিয়া মাচায়ের মত ব্রহ্মদেশেও কাষ্ঠদণ্ড বা বংশখণ্ডের উপর নির্ম্মিত কুটির স্থানে স্থানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে কাষ্ঠরচিত গৃহ ও প্যাগোডা দুইই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার অন্যদিকে আমরা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া যতই পশ্চিমে অগ্রসর হই ততই শুষ্কতর আবহাওয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া গৃহসমূহও সেই আবহাওয়ার উপযোগী হইয়া থাকে। পঞ্জাবেও খাপরার ছাওয়া গৃহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পঞ্জাবের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রস্তর প্রস্তুত গৃহের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন সীমান্তবাসী পশুপালক সম্প্রদায় যাযাবর প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে। পশু-চারণের জন্য প্রতিবৎসর ইহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উষর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে তৃণাবৃত প্রান্তর-প্রধান প্রদেশে নামিয়া আসিয়া থাকে।

সৌধ-শিল্পের সহিত সভ্যতার সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে দেশ সভ্যতালোকে যত উজ্জ্বল সেই দেশ স্থাপত্য ঐশ্বর্য্যেও তত সমৃদ্ধ, এই সত্য স্বীকার করিলেও আমরা ভারতীয় সভ্যতার ভিতর এমন একটি অধ্যাত্ম প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই যাহা কোলাহল মুখরিত সহরের সৌধ সমূহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, তপোবন-বক্ষে বিরাজিত কুটীরাবলীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সভ্যতার পরিমাণ বাহ্য সম্পদের পরিমাণের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষই ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য, সুতরাং পর্ণ-কুটীরেও ইহার বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। অন্যদিকে বেশ-ভূষার ঘর-বাড়ীর এবং যান-বাহনাদির আড়ম্বর বা সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বস্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমেরিকায় পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা তথায় স্থাপত্য ঐশ্বর্য্যের আশ্চর্য্যজনক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। নিউইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি সহরে যেরূপ বিশাল গৃহসমূহ দেখা যায় তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের কোন পল্লীগ্রামবাসী আমেরিকার এই সকল বহুতল বিশিষ্ট গৃহ দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইবেন। অন্যদিকে যে পরমপবিত্র সভ্যতা ভারতের পর্ণকুটীরালীতে জন্ম ও বিকাশ লাভ করিয়াছে বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ত্যাগ-পূত ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত জীবনে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই সুবিশাল সৌধবাসীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের গ্রাম্য কুটীর

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

আট

কমলাপুর ইষ্টেটের বার্ষিক আয় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। কিন্তু এই আয় হইতে লীলাবতী কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাঁর আদেশ ছিল, আয়ের সমস্ত টাকা কৃষির উন্নতি-কল্পে, লাভজনক ব্যবসায়-স্থাপনে ও প্রজাদের শিক্ষাদান ও অন্যবিধ কল্যাণজনক কার্য্যে যেন ব্যয় করা হয়। কৃষির দিক দিয়ে "চন্দ্রাবতী টি ইষ্টেট্" ও বিস্তীর্ণ কমলালেবুর বাগান এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ছিল পাথর-চূণের কারখানা। প্রজা সাধারণের উপকারের জন্য জলাশয় খনন, জঙ্গল আবাদ, স্কুল-পাঠশালা স্থাপন ইত্যাদি কাজ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

ম্যানেজার তিনকড়ি মণ্ডল ছিলেন লীলাবতীর পরলোকগত মাতামহ হেমন্তকুমার চৌধুরীর আমলের কর্ম্মচারী। প্রায় দু'বৎসর অতীত হ'ল চৌধুরী মহাশয় স্বর্গস্থ হ'য়েছেন। সেই অবধি লীলাবতী এই ইষ্টেটের মালিক। এই সময় মধ্যে লীলাবতীর সঙ্গে তিনকড়ির দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নি। তিনকড়ির রিপোর্টের উপর নির্ভর ক'রে লীলাবতী এখানের চা-বাগানের উন্নতির জন্য টাকা পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু এই চা-বাগান থেকে গত তিন বছর যাবৎ চা তৈরী হ'য়ে যে ক'লকাতার বাজারে বিক্রী হচ্ছিল, এ সংবাদ তিনি জানতে পারেন নি, এমন কি লীলাবতীর মাতামহের কাছেও তা গোপন রাখা হ'য়েছিল। কমলালেবুর বাগান, পাথর-চূণের কারখানা ও জমিদারি সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারেও তিনকড়ি বাবু ঐ রকম প্রতারণা ক'রে আসছেন কি না, লীলাবতী তখনও তা জানতে পারেন নি—দু'চার দিনের ভিতর সে সব জানবার সম্ভাবনাও ছিল না।

বাংলো দখল করার পর লীলাবতী সুরথকে নিয়ে ঐ স্থানটার পরিদর্শনে বের হ'লেন। বাড়ীটির অবস্থান খুব সুন্দর ছিল, সুতরাং পরিদর্শনান্তে লীলাবতী তৃপ্তি প্রকাশই ক'রলেন। অবশেষে আপিস ঘরে ব'সে তিনি সুরথকে বললেন, "আপনি আজ থেকে এই কমলাপুর ইষ্টেটের ম্যানেজার হ'লেন—আপনার আদেশমত এখানের যাবতীয় কাজ চলবে। পুরাতন চাকর ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাদের রাখা আবশ্যক বোধ করেন রাখবেন। এদের ভিতর অনেকেই হয় তো তিনকড়ি বাবুর অন্যায় কার্য্যসমূহের সাহায্যকারী আছে, শুধু এই অপরাধে তাদের চাকরী কেড়ে নেওয়াটা আপনিই হয় তো সঙ্গত মনে করবেন না যদি বুঝতে পারা যায় ওরা শুধু ম্যানেজার বাবুর আদেশ পালন করতে বাধ্য হ'য়েছে, কিন্তু যারা স্বভাবতঃ অসাধু প্রকৃতি, শঠতায় ও মিথ্যাবাদিতায় সিদ্ধ-হস্ত সেই সব লোককে না রাখাই উচিত হবে। রান্না-ঘরে একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন, তা ছাড়া, আমার একটি পরিচারিকা চাই।"

সুরথ বিনীতভাবে বললো, "এই অযোগ্য ও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের উপর অতি বড় দায়িত্ব পূর্ণ কাজের ভার দিলেন। আপনার আদেশ ও উপদেশ প্রাণপণে পালন ক'রতে চেষ্টা ক'রব। ইষ্টেটের কাজ ঠিক বুঝে নিতে কিছু সময় লাগবে। আমার মনে হয়, বাদল নামে যে লোকটা চা-বাগানের খাঁটি সংবাদটি দিয়েছিল, তার সাহায্যে ভাল লোক বেছে নিতে পারব। সে কাল সকালেই আসবে। আপনাকে কিছু দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে, কারণ তিনকড়ি বাবু যেরূপ ধূর্ত্ত লোক ব'লে মনে হয়, তাতে তিনি একটা গোলমাল না ক'রে যে চুপ মেরে থাকবেন, এমন বিশ্বাস হয় না।"

"সেই হিসেবে তাহ'লে আপনারও সাবধানে থাকা দরকার। তিনকড়ি বাবু আপনাকে নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেন নি।"

"তা না করুক, আমি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ।"

"সেই সামর্থ্যের সবটুকু কি আপনার নিজের রক্ষায়ই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, আমার জন্য কিছুই থাকবে না?"

সুরথ অপ্রতিভ হ'য়ে উত্তর করলে, "ঐ সামর্থ্যের সবটুকুর উপর আপনার দাবীই প্রথম ও অগ্রগণ্য এবং ঐ দাবী অবহেলা ক'রবার মতো দুর্ব্বলতা ও নীচতা বোধ করি আমার কল্পনার মধ্যেও নেই।"

লীলাবতী হেসে ব'ললেন, "আপনার সম্বন্ধে ওরূপ হীন

ধারণা যে আমার মোটেই নেই, তা নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন করে না। আসল কথা, আমি নিজে ভয়ের কোনো কারণ দেখছি না। তবুও সাবধানে থাকায় দোষ নেই। আপনি ভেবে চিন্তে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রবেন আচ্ছা, নদেরচাঁদ লোকটাকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

"তাকে আমি হিসেবের মধ্যেই ধরছি না, সে সত্তাবিহীন প্রতিধ্বনি মাত্র।"

"আমারও মনে হয় সে একটি Perfect specimen of His Master's Voice, আর আমার বিশ্বাস, তার কাছ থেকে ভিতরের অনেক খবর জানতে পারা যাবে—একবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন। আমি এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই। আপনি নিকটেই থাকবেন, আর খবর নেবেন ডাক ঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশন ইত্যাদি কোথায় ও কতদূরে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও মাতব্বর লোকদের সঙ্গেও পরিচয় ক'রে নেওয়া দরকার।"

লীলাবতী তারপর বিশ্রামের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় গেলেন। ইত্যবসরে সুরথ নদের চাঁদকে ডেকে এনে ও নানা রকম প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলো, সে এখানে নকল-নবিশের কাজ করে এবং কর্ত্তাবাবুর সব কথার প্রতিধ্বনি ক'রতে তার মত ওস্তাদ আর কেউ ছিল না ব'লে তিনকড়ি বাবুর কাছে তার বেশ একটু প্রতিপত্তি জমে উঠেছিল। সেরেস্তার বড় বাবু, চা-বাগানের ম্যানেজার, চুণের কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং কমলাবাগানের সুপারভাইজার যে তিনকড়ি বাবুরই লোক, এ সংবাদও তার কাছ থেকে জানা গেল। নানা রকম প্রশ্ন ক'রে তার কাছ থেকে আরও অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সুরথ বের করতে পারল। দেখা গেল, লোকটার ব্যক্তিত্ব ব'লে কিছু নেই, মুনিবের কথার প্রতিধ্বনি করা ও তাঁকে খুশী রাখাকেই সে তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে নিয়েছিল। তার সাহায্যে সেই দিনই লীলাবতীর জন্য একজন প্রৌঢ়া পরিচারিকা নিযুক্ত করা হ'ল।

নিজ জমিদারিতে মিস্ লীলাবতী রায়ের আগমন ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার তিনকড়ি মণ্ডলের চাকরী স্খলন ও নির্ব্বাসনের সংবাদ অতি অল্প সময় মধ্যে চারি দিকে ছ'ড়িয়ে পড়লো। অপরাহ্নে ইষ্টেটের কর্ম্মচারীদল ও স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর লোক লীলাবতীর সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হ'লে, তিনি তাঁদের যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং তাঁর নূতন ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ক'রে দিলেন। লীলাবতীর কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে সকলেই খুশী হ'য়ে ঘরে ফিরলো।

সুরথকে প্রথম কয়েক দিন যথেষ্ট শ্রম ক'রে সকল সেরেস্তার কাজ-কর্ম্ম ও কাগজ-পত্র পরীক্ষা করতে হ'ল। পরিদর্শনের ফলে অনেক রকম গলদ ধরা পড়লো। দেখা গেল, কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহযোগীতায় তিনকড়ি বাবু বিগত ৭।৮ বৎসর যাবৎ মুনিবকে নানা রকমে ঠকিয়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আত্মসাৎ ক'রেছেন।

কর্ম্মচারীদের কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'লে তারা অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রল এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না ব'লে প্রত্যেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিল। এই লোক-গুলো যে শুধু চাকরী বজায় রাখবার জন্যই তিনকড়ির সহায়তা ক'রেছে, অন্য কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে নয়, সুরথ তা বুঝতে পেরে তাদের কর্ম্মচ্যুত করল না।

কিন্তু সমস্যা র'য়ে গেল, তিনকড়ি বাবু ইষ্টেটের এতো টাকা নিয়ে কোথায় রাখলেন বা কি করলেন। এ সম্বন্ধে কর্ম্মচারীদের কেউ কিছু বলতে পারলো না। চাকরী থেকে বরখাস্ত হ'য়ে তিনি যে সস্ত্রীক কমলাপুর ত্যাগ ক'রে গেছেন, এ সংবাদ যথা সময়ে লীলাবতীর নিকট পৌঁছেছিল। তাঁর জিনিষ-পত্রাদিও তাঁরই নির্দ্দেশ মত ষ্টীমারযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। তারপর, তাঁরা কোথায় গেলেন, সে সংবাদ অবিশ্যি জানতে পারা যায় নি।

তিনকড়ি বাবু এখানে না থাকলেও সুরথ বাংলোতে দিবারাত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থা রাখলো এবং লীলাবতী যাতে কোথাও একা না যান তারও বন্দোবস্ত ক'রল। একটা সপ্তাহ নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল দেখে লীলাবতী অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন।

এই বাংলোতে এতকাল শুধু ম্যানেজার বাবুই বাস ক'রে এসেছেন। লীলাবতীর থাকার উপযোগী আসবাবপত্র এখানে কিছুই ছিল না। তাই তিনি বাড়ীটিকে সুসজ্জিত ক'রবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন—ক'লকাতায় ও অন্যান্য স্থানে নানা প্রকার জিনিষ-পত্রের অর্ডার পাঠাতে লাগলেন

এবং বাংলোটিরও মেরামতাদি কাজের জন্য মিস্ত্রী লাগিয়ে দিলেন।

এক দিন অপরাহ্নে সুরথকে ডেকে তিনি বললেন, "এই স্থানটা আমার বেশ ভাললাগছে। বছরের কয়েকটা মাস এথানেই কাটাবো ভাবছি, কিন্তু বাড়ীটার কিছু উন্নতির দরকার—ড্রয়িংরুমের পাশে একটা লাইব্রেরী ঘর ও আর্ট-গেলারির মতো আর একখানা ঘর হ'লে মন্দ হয় না। কোন ইঞ্জিনীয়র দিয়ে একটা প্লান্ তৈরী ক'রে আমায় দেখাবেন, তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া চাই। এজন্য আমার Madras tourটা cancel ক'রে দিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব হবে কি ?"

"বেশী লোক লাগিয়ে দিলে সম্ভব না হবার কি আছে। দু' এক দিনের মধ্যেই একটা rough plan দেখাতে পারব আশা করি।"

"তা হ'লে খুব ভালই হয়। আমি ঠিক কি চাই দেখিয়ে দি'চ্ছি।"

এরপর কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লীলাবতী নিজেই একখানা নক্সা এঁকে সুরথকে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় লীলাবতীর শোবার ঘর হ'তে তাঁর পরিচারিকা হঠাৎ ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠলো। সুরথ অমনি সেদিকে ছুটে গেল, লীলাবতীও তার পিছনে পিছনে গেলেন। বাগানের মালী ও আরও কয়েকজন লোক সেখানে ছুটে এলো। ঝির চীৎকার তখনো থামে নি, সে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপছিল ও অনবরত চেঁচাচ্ছিল। অনেক প্রশ্নের পর জানা গেল, সে তার কর্ত্রী ঠাক্রুণের বিছানা ঝাড়তে এসে লেপের নীচে একটা কালো কুচকুচে সাপ দেখতে পায় এবং লেপ তোলা মাত্র সাপটা এক হাত উঁচু ফণা তুলে তাকে প্রায় ছোবল মেরেছিল আর কি—সে এখনও বেঁচে আছে কি না ঠিক বুঝতে পার্চ্ছে না, তবে সাপটা বিছানায়ই র'য়েছে।

সবাই তখন চাইলো বিছানার দিকে এবং দেখে বিস্মিত হ'ল, সত্যই ঐ রকম ভয়ানক একটা সাপ লেপের এক ধার দিয়ে খাট থেকে আস্তে আস্তে নামবার চেষ্টা কর্চ্ছে। সুরথ তাড়াতাড়ি আঙ্গিনা থেকে প্রায় চার হাত লম্বা এক খণ্ড লাঠি নিয়ে এলো এবং কামরা থেকে সকলকে বের ক'রে দিয়ে এক আঘাতে সাপের কোমর ভেঙে দিলো। কিন্তু চল্‌তে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সাপটা সেখান থেকেই ফণা তুলে রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল। হঠাৎ নন্দের চাঁদ ছুটে এসে সুরথের হাতে আপিসের দো-নলা বন্দুকটা দিয়ে বললো, "দু'টো ৪নং কার্ত্তুজ ভ'রে এনেছি, গুলি করুন, এ আর কি সাপ, এর বাবা সাপ, ঠাকুর্দ্দা সাপ পর্য্যন্ত এক গুলিতেই মরবে, নিশ্চয় মরবে, আলবৎ মরবে।"

লাঠির চেয়ে যে বন্দুক ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না সুতরাং লাঠি ফেলে সুরথ বন্দুকটা হাতে নিল এবং সাপের ফণা লক্ষ্য ক'রে গুলি ক'রল। 'গুড়ুম' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাপের ফণা ও তার নীচের এক ফুট পরিমাণ দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে উড়ে গেল।

লীলাবতী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাপের পরিণাম দেখলেন এবং ঝি ওটাকে না দেখলে তার নিজের পরিণাম আজ কি হ'তো তাই ভেবে শিউরে উঠলেন। লীলাবতীর কোন অনিষ্ট হয় নি জানতে পেরে সকলেই স্বস্তি অনুভব ক'রল।

কিন্তু এই ঘটনাকে সুরথ সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা ব'লে গ্রহণ করতে পারল না। লীলাবতীর বিছানার উপর সাপ আসবার কোন হেতুই খুঁজে পাওয়া গেল না, বিশেষ এই ঋতুতে। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে পাকাবাড়ী, ঘরের নিকটে কোনো আবর্জ্জনার স্তূপ, ঝোপ, জঙ্গল বা এমন কিছু নেই যেখানে সাপ থাকতে পারে। তবুও এখানে একেবারে বিছানার উপর কি ক'রে তার আবির্ভাব হ'ল, এটা একান্তই বিস্ময়ের ব্যাপার। তবে কি এটা কোন ষড়যন্ত্রের ফল ? কেউ অগোচরে এই বিষাক্ত সাপ বিছানার উপর রেখে যায় নি তো ? লীলাবতীর এমন সাংঘাতিক শত্রু কে হ'তে পারে ? সুরথ কিছুই স্থির করতে পারল না।

সেই রাত্রে লীলাবতী ঐ ঘরে শয়ন ক'রলেন না। এই ব্যাপারের লোমহর্ষণ স্মৃতিটুকু ছাড়া তাঁর মনে এই সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চিন্তা আসে নি, সুরথও কিছু ব'লল না।

একটু অনুসন্ধানের পর সুরথ জানতে পারল, ঐ দিন অপরাহ্ণে এই ঘটনার ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে একজন বুড়ো ভিখারী কাঁধে ঝোলা ও হাতে লাঠি নিয়ে ভিক্ষার জন্য বরাবর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ ক'রেছিল এবং পয়সা বা চালের পরিবর্ত্তে কিছু মুড়ি ও গুড় চেয়ে নিয়ে বারান্দার নীচে ব'সে আহার ক'রে গিয়েছিল। ঐ সময়ে তার কাছে কেউ ছিল

না এবং কেউ তাকে ঘরে প্রবেশ করতেও দেখে নি। সুতরাং, এই ভিখারী যে সেই ঘটনার সহিত কোনোরকমে সংশ্লিষ্ট এ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না। চারি দিকে লোক পাঠিয়ে ঐ ভিখারীকে ধ'রে আনবার চেষ্টাও বৃথা হ'ল, তার আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সুরথের মন থেকে তবুও সন্দেহ দূর হ'ল না। এই লোকটাই তার ঝোলার ভিতরে সাপ নিয়ে এসে এক ফাঁকে লীলাবতীর ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার উপর সাপটা ছেড়ে দিয়ে স'রে প'ড়েছে, এ ধারণা তার র'য়েই গেল। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে ঐ লোকটা কে?

নয়

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন সুরথ একখানা প্লান এনে লীলাবতীকে দেখালো এবং সব বুঝিয়ে ব'লল। লীলাবতী প্রীত হ'য়ে ব'ললেন, "বেশ তো হ'য়েছে প্লান্‌টা, কিন্তু এত অল্প সময় মধ্যে এমন সুন্দর প্লান্ কি ক'রে তৈরী হ'ল? ইঞ্জিনীয়ার পেলেন কোথায়?"

"এ জন্য ইঞ্জিনীয়ার ডাকবার প্রয়োজন হয় নি। আমাদের জরীপ বিভাগ থেকে ড্রয়িংএর যন্ত্রপাতি ও কাগজ নিয়ে আমিই কোন রকমে এটা খাড়া ক'রেছি।"

"আপনি এঁকেছেন? বলেন কি, এ তো কোনরকমে খাড়া-করা প্লান্ নয়, একেবারে পাকা হাতের তৈরী! আপনার তা হ'লে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া আছে নিশ্চয়ই।"

"ছিল সামান্য রকম পড়া, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।"

"আপনি কে এবং কি, এটা ক্রমেই ঘোরালো রকমের problem হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ আপনি কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না।"

সুরথ এর কোন জবাব দিল না। লীলাবতী তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "নিজেকে লুকিয়ে রাখবার ইচ্ছার অন্তরালে আপনার কি উদ্দেশ্য আছে বা থাকতে পারে জানি না এবং আপনি যখন তা জানতে দেবেন না সে জন্য পীড়াপীড়ি ক'রেও লাভ নেই। কিন্তু একটা অনুরোধ না ক'রে পারছি না, আপনার মুখের এই বড় দাড়ি গুলোর মায়া আপনার ছাড়তেই হবে। আমি এ জিনিষটা মোটেই দেখতে পারি না।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সুরথ বললো, "আপনার অনুরোধকে আদেশ ব'লেই ধ'রে নিচ্ছি এবং তা পালন করবো কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"প্রয়োজন বোধে এই অনুরোধ করি নি, এটা আমার একটা খেয়াল মাত্র। আশা করি, কাল থেকেই আপনার নূতন চেহারা দেখতে পাব।"

এরপর বাড়ীর প্লান্ নিয়ে কতক্ষণ আলোচনা হ'ল। এই বাংলোটা ছিল একতলা বাড়ী। উপর তলায় লীলাবতীর থাকার ঘর হ'লে ভাল হবে বিবেচনা ক'রে সুরথ সে রকম প্রস্তাব ক'রল। লীলাবতী প্রথমতঃ একটু আপত্তি ক'রেছিলেন কিন্তু পরে ঐ প্রস্তাব অনুমোদন ক'রলেন।

স্থির হ'ল, বাড়ীর কাজের জন্য ও প্রস্তাবিত লাইব্রেরীর জন্য কয়েক জন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হবে। এ জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হ'ল।

বাড়ীর কাজ আরম্ভ ক'রতে তিন সপ্তাহের বেশী বিলম্ব হ'ল না। সুরথের নিজের তত্ত্বাবধানেই সমস্ত কাজ হ'তে লাগল, তার সঙ্গে রইল মাত্র একজন ওভারশিয়র।

দাড়ি শূন্য সুরথের চেহারা এখন বাস্তবিকই বদলে গিয়েছে। লীলাবতীর মনে হ'ল, এই সৌম্য চেহারা যেন তিনি পূর্ব্বে কোথায় দেখেছিলেন কিন্তু অনেক ভেবেও স্মরণ ক'রতে পারলেন না কোথায় বা কি অবস্থায় দেখেছিলেন।

বাংলোর জন্য কিছু ভাল পাথরের প্রয়োজন হ'ল। সুরথ একদিন তার অন্বেষণে পাথর-চূণের কারখানার অনতি-দূরবর্ত্তী এক ছোট পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল। তাকে ঐ দিকে যেতে দেখে কারখানার এক জন লোক ছুটে এসে তাকে সাবধান ক'রে বললো, "ঐ ভূতের পাহাড়ে কোন জন-মানব যায় না, আপনিও যাবেন না। পাছে কেউ গিয়ে বিপন্ন হয় সে জন্য আগের ম্যানেজার বাবু পাহাড়-ঘিরে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে রেখে গেছেন।"

সুরথ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, "কেন, ঐ ভূত বুঝি মানুষের ঘাড় মটকে দেয়?"

"শুধু ঘাড় মটকানো নয়, বুক চিরে রক্ত চুষে খায়। সেবার ম্যানেজার বাবুর দু'টো লোক ঐ পাহাড় থেকে বি একটা গাছ কেটে আনতে গিয়েছিল দিন দুপুরে। তাদের আর ফিরে আসতে হ'ল না। তারা ফিরলো না দেখে প

দিন খোঁজ করতে গিয়ে পাহাড়ে ঢোকবার মুখেই দেখতে পাওয়া গেল, তাদের বুক-চেরা রক্তমাখা জামা-কাপড় সব ঝুলছে গাছের মাথায়। সংবাদ পেয়ে কর্ত্তাবাবু নিজে লোক-জন নিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এলেন এবং তারপর কাঁটা তার দিয়ে সব জায়গা ঘিরে দিলেন। লোক দু'টো ম'রে যে ভূত হ'য়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই, এখনও সন্ধ্যার পর ও গভীর রাত্রে তাদের ভয়ানক আর্ত্তনাদে পাহাড় কেঁপে ওঠে।"

"তা হ'লে ওই পাহাড়টায় দস্তুর মত ভূতের আড্ডা র'য়েছে বলতে হবে।"

"আজ্ঞে হাঁ। কত লোক যে ওধার দিয়ে যেতে ভয় পেয়ে মারা গেছে এবং কঠিন ব্যারামে ভুগেছে তার অন্ত নেই। কয়েক বছর যাবৎ কেউ আর সে পাহাড়ে যায় না।"

"সাবধানের মার নেই, আমি ও পাহাড়ে যাবো না, দূর থেকে একটু দেখে আসবো, সন্ধ্যার আগেই ফিরব।"

লোকটির বিস্ময় জন্মায়ে সুরথ আবার চ'লল ঐ পাহাড়ের দিকে। ভূতের গল্পটা তার কাছে একটু রহস্যজনক মনে হ'ল। বড় বড় গাছ ও পাথরে পরিপূর্ণ এই পাহাড়টা ছিল লীলাবতীর জমিদারিরই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই ভূতের ব্যাপারের পর থেকে এই পাহাড় হ'তে আর কিছুই আয় হয় না। সুরথ অনেক রকম ভূতের গল্প শুনেছে কিন্তু কোথায়ও সত্যের সন্ধান পায় নাই। এখানের এই গল্পটিও ঐ রকম অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তা নিঃসংশয় রূপে জানবার জন্য তার অত্যন্ত আগ্রহ হ'ল।

পাহাড়ের কাছে গিয়ে সুরথ দেখল, সত্যিই সেখানে পাহাড়ের তলায় অনেকটা স্থান ঘিরে কাঁটা তারের বেড়া র'য়েছে। ঐ দিন ঐ পর্য্যন্ত দেখেই ফিরবার জন্য রওনা হ'ল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সুরথ ধীর পদে বাংলোর দিকে ফিরছিল। এই পথে লোক চলাচল এক রকম নেই বললেই হয়। সুরথ এখন পর্য্যন্ত কোন লোকের সাক্ষাৎ পায় নি। তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় পশ্চাতে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সুরথ ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো এবং দেখল এক ব্যক্তি একটা পেতলের কলসী হাতে তারই পেছনে পেছনে আসছে। নিকটে কোথাও ভাল জলাশয় আছে সুরথ তা জানত না, তাই কৌতূহলী হ'য়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, "কলসী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"আইগ্যা, বাড়ীতে ছুট পুয়াডার পেটের দরদ, তার লাইগ্যা দাওয়াই-পানি আনতে ইন্দারায় যাইয়াম্।"

"ইন্দারা? এখানে আবার ইন্দারা কোথায় হে?"

"এ অ'ল্লা, সোনাপীরের হাজার বছরের পুরান্ ইন্দারার পানি খাইয়া লাখ্ লাখ্ মানুষ ভাল অইছে, এই খবরডা কর্ত্তা জানৈন্ না? তাজ্জবের কথা আর কি।"

"সোনাপীরের ইন্দারা? কৈ শুনিনি তো? কতদূর এখান থেকে?"

"ঐ ডাইনের দিগে যে বটগাছডা দেখ্ছুইন্, তার লাগ পশ্চিমেই আছুইন্ ইন্দারা, চোমৎকার তার পানি, চোমৎকার তার সোয়াদ্। কর্ত্তা, দেইখ্বেন ত আমার লগে আউখান।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে সুরথ লোকটির পেছনে পেছনে চললো এবং কয়েক মিনিট মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। বাস্তবিকই সেখানে ভাঙা ইটের স্তূপের পশ্চাতে একটা অতি পুরাতন ইন্দারা ছিল কিন্তু এটা যে এখনো ব্যবহারের উপযোগী কিংবা ব্যবহার হচ্ছে, তার কোন লক্ষণ সুরথ দেখতে পেলো না। একটু বিস্মিত হ'য়ে তাই সে জিজ্ঞেস ক'রল, "এই তোমার সোনাপীরের ইন্দারা? এ যে একেবারে খট্ খটে শুক্‌নো ব'লে মনে হচ্ছে। জল কোথায়?"

"আইগ্যা, এ হোন্ ত বর্‌খা সাই, এর লাগি পানি নীচে লাইমা গেছুইন্।" ব'লেই লোকটা ইন্দারার উপর খানিকটা ঝুকে প'ড়ে বললো, "এই দেখুইন্ না, পানি নীচে কেমুন তক্ তক্ কছছুইন্।"

তারপর সে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। তখন সুরথ জল দেখবার জন্য তারই মতো একটু ঝুকলো। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই লোকটা হঠাৎ সুরথের একটা পা ধ'রে তাকে ইন্দারার ভিতরে জোরে ঠেলে দিল। আকস্মিক ধাক্কা সামলাতে না পেরে সুরথ একেবারে ডিগবাজি খেয়ে প'ড়ে গেল ইন্দারার ভিতরে।

লোকটা তারপর ইন্দারার মুখের ধারে কিয়ৎক্ষণ কাণ পেতে রইলো এবং অবশেষে কলসী হাতে ফিরে চললো ভূতের পাহাড়ের পূর্ব্বদিকস্থিত একটা বস্তির দিকে।

মিনিট পাঁচ সাত পর ঐ ইন্দারার নিকটবর্ত্তী আঁধার থেকে বেরিয়ে এলো একজন অল্প বয়স্ক যুবক। সে তাড়াতাড়ি ইন্দারার মুখের কাছে এসে মুখ নীচু ক'রে ব্যস্ত ভাবে ডেকে ব'লল, "ম্যানেজার বাবু, শুনতে পাচ্ছেন কি? ভয় ক'রবেন না, আমি বন্ধু লোক, শীগ্‌গির বলুন কেমন আছেন?"

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, "একটা গাছের শিকড়ের মত কি একটা ধ'রে কোন মতে ঝুলে আছি, আর বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকতে পারব না, হাত অবশ হ'য়ে আসছে।"

"আর কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই উঠাবার ব্যবস্থা কচ্ছি।"

যুবক তখন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে গায়ের চাদর প'রে পরণের ধুতিখানা টেনে বের ক'রল, তারপর ঐ ধুতিকে লম্বালম্বি ভাবে ৪।৫ খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে প্রায় ৫০ হাত লম্বা মোটা দড়িতে পরিণত ক'রল এবং অবশেষে তার এক প্রান্ত ইন্দারার কাছের একটা বড় গাছের গোড়ার সঙ্গে বেঁধে অপর মাথা ইন্দারার ভিতর ছেড়ে দিল। প্রায় কুড়ি হাত নীচে গিয়ে পৌঁছতেই সুরথ সেটা আঁকড়ে ধরলো এবং আস্তে আস্তে ঐ দড়ি বেয়ে ইন্দারার মুখের নিকট পৌঁছল। তারপর যুবকের সাহায্যে উপরে উঠতে আর বেশী আয়াস করতে হ'ল না। নিরাপদে উপরে উঠেই সুরথ ঐ যুবককে সম্বোধন ক'রে বললো, "আপনি কে, জানি না, কিন্তু এই উপকার ভুলতে পারব না, আর একটু বিলম্ব হ'লে কোন্ অতলে প'ড়ে হয় তো প্রাণটা যেত।"

"আপনি বেঁচেছেন এই যথেষ্ট—কোথায়ও আঘাত লাগে নি তো?"

"তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। তবে মাথায় ও পিঠে হয় তো আঘাত থাকতে পারে।"

অন্ধকারে আঘাত দেখার সুবিধা হ'ল না। যুবকটি তবু সুরথের মাথার পিছনে হাত দিয়ে পরীক্ষা ক'রে একটা জায়গা ফুলে গিয়েছে ব'লে বুঝতে পারল এবং সেখানের কতকটা চুল যেন ভিজে ব'লে ঠেকলো। সুরথকে সে বিষয়ে কিছু না ব'লে যুবকটি শুধু ব'লল, "অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, চলুন তাড়াতাড়ি ঘরে যাই, তারপর দেখে শুনে যা হয় করা যাবে।"

সুরথ দ্বিরুক্তি না ক'রে বাংলোর দিকে পুনরায় চ'লল। কেমন আকস্মিক ভাবে এই যুবকটি এসে তার প্রাণ বাঁচাল, সুরথের মনে ঐ কথাটিই ক্রমাগত জেগে উঠতে লাগল। ভগবানই যে তাকে উপযুক্ত সময়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ ক'রবার কিছু রইল না। কিছু দূর গিয়ে সুরথ জিজ্ঞেস ক'রল, "আপনি কি ক'রে জানলেন, আমি ইন্দারার ভিতর প'ড়েছি?"

"আজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে চূণের কারখানার কাছে এসে শুনলাম, আপনি ভূতের পাহাড়ের দিকে গিয়েছেন, তা ছাড়া অনেক ভূতুড়ে কাণ্ডের কথাও শুনলাম। আপনার ন্যায় আমারও একটু কৌতূহল হ'ল, ব্যাপারটা কি দেখি। তারপর এ দিকে অনেকটা দূর এসে দেখতে পেলাম, আপনি বাংলোর সোজা পথ ছেড়ে এই ইন্দারার দিকে একটা লোকের পেছনে পেছনে যাচ্ছেন। আমিও তখন ঐ পথ ধ'রলাম, তারপর ইন্দারার কাছাকাছি এসে দেখি আপনার সঙ্গের লোকটা আপনার পা-ধরে আপনাকে ঠেলে ফেলে দিল ইন্দারার ভিতরে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম কিন্তু কোনরকমে সামলে নিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। তারপর লোকটা চ'লে যেতেই এসে আপনার খবর ক'রেছি।"

"ভাগ্যিস্ চেঁচান্ নি। চেঁচালে পর আমার উদ্ধার তো হ'তোই না, আপনারও একটা বিপদ ঘটতে পারত। লোকটার যে কোন রকম বদ্ মতলব ছিল আগে একটুও বুঝতে পারি নি।"

"লোকটাকে চেনেন কি?"

"না, সম্পূর্ণ অচেনা লোক সে। আমায় ফাঁকি দিয়ে ওখানে নিয়ে গেছিল, এখন তা বুঝতে পাচ্ছি।"

"এখানে আপনার কোন শত্রু আছে কি?"

"আমি কারো কোন অনিষ্ট করি নি সুতরাং আমার কেউ শত্রু আছে ব'লে জানি না, তবে আগের ম্যানেজারকে বরখাস্ত ক'রে তাঁর পদে আমায় নিযুক্ত করা হ'য়েছে ব'লে তাঁর মনে বিরুদ্ধ ভাব থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।"

"তিনি নেই, কিন্তু তাঁর চর বা চেলা দু' একজন থাকতে পারে না কি? আমার সন্দেহ হয়, ঐ লোকটা নিশ্চয়ই ভাড়াটে লোক। আপনার খুব সাবধানে থাকা দরকার।"

"আপনার কথা হয় তো ঠিক, কিন্তু যাক্ সে কথা।

আপনি এখানে কোথায় থাকেন? আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

"ভিখারীর কোন পরিচয় থাকে না। আমি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছি, সম্প্রতি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-পুরুষদের বাসস্থান দর্শন ক'রে এখানে এসেছি। আজ দিন দশেক হ'ল আপনাদের ৺রাধানাথ জীউর মন্দিরের পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে সেবকরূপে বাস কচ্ছি।"

"আপনি তা হ'লে বৈষ্ণব?"

"হাঁ, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত।"

"কি নামে পরিচিত?"

"লোকে আমায় 'গৌরদাস' ব'লে ডাকে।"

সুরথ আর কোন প্রশ্ন ক'রল না। তার মনে হ'ল, এই বৈষ্ণব যুবকের কণ্ঠস্বর যেন কোন বিশেষ পরিচিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কিন্তু সে কার কণ্ঠের, কিছুতেই তার স্মরণ হ'ল না।

আধ ঘণ্টা পরে বাংলোতে পৌছে পরীক্ষান্তে দেখা গেল, সুরথের মাথার একস্থান ও পিঠের দু'তিন স্থান কেটে গিয়েছে, তা ছাড়া হাতেরও কয়েক জায়গায় আঁচড় লেগেছে। আঘাত কঠিন না হ'লেও সেগুলো ধুয়ে তখনই তাতে ঔষধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ হ'ল। সুরথ চাইল, এই আঘাতের কথাটা যেন মোটেই জানাজানি না হয়। তাই ডাক্তারকে খবর দেওয়া হ'ল না। গৌরদাস নিজেই তখন ঘা ধুয়ে ও তাতে ঔষধ লাগিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। সুরথের ঘরে প্রয়োজনীয় সব জিনিষই ছিল ব'লে কোন অসুবিধা হ'ল না। এ কার্য্যে তুলসী মালাধারী গৌরদাসের তৎপরতা দেখে সুরথ অনেকটা আশ্চর্য্য বোধ ক'রল। আঘাতের কথাটা যথাসম্ভব গোপন রাখবার জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়ে গৌরদাস অবশেষে বিদায় গ্রহণ ক'রল।

কিন্তু এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখা সম্ভবপর হ'ল না। গৌরদাস চ'লে যাবার কিছুক্ষণ পরেই লীলাবতী এসে সুরথকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় দেখে শঙ্কিত মনে নানা প্রকার প্রশ্ন ক'রে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন। কোন শক্ত জায়গায় হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে মাথায় সামান্য একটু জখম হয়েছে, এরূপ কিছু তাঁকে বলতেই হ'ল। লীলাবতী এর বেশী এইটুকু মাত্র জানলেন যে গৌরদাস নামে এক বৈষ্ণব যুবক ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিয়ে গিয়েছে।

পরদিন শরীরের অবস্থা ভাল থাকলেও সুরথ ঘরের বার হ'ল না। গৌরদাসকে খবর দিয়ে আনিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুরথ জানতে চাইল, গৌরদাস আরও কিছুদিন কমলাপুরে থেকে যেতে পারে কি না। তার উত্তরে গৌরদাস বললো, "এখান থেকে মণিপুর যাবো ব'লে স্থির ক'রে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু কত দিনে সেখানে পৌছতে পারব জানি না, কারণ পাথেয়ের ব্যবস্থা এখনও হ'য়ে ওঠে নি।"

"সে ব্যবস্থা কি ক'রে হবে মনে কর্চ্ছেন?"

"মনে কিছুই করি নি, একমাত্র শ্রীশ্রীগোবিন্দজী ভরসা, ভেক্ নিয়েছি, ভিখ যদি মিলে ভাল, নয় তো এ দু'টি পায়ের উপর ভর ক'রেই চলতে হবে।"

"তা হ'লে আপনার তাড়াতাড়ি কিছু নেই। একটা কাজ করলে, এই ইষ্টেটেরও একটু উপকার হয়, আপনারও ভিখ্ মিলে যেতে পারে।"

"সে তো খুব ভাল কথা, কিন্তু কাজটা কি বলুন।"

"আমাদের একটা লাইব্রেরী হবে, তার জন্য ঘর তৈরী হচ্ছে। এরই মধ্যে বিস্তর বই এসে প'ড়েছে এবং আরও আসবে। এই সমস্ত বই-এর লিষ্টি ক'রে সে গুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে বিভিন্ন বিভাগে সাজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

'আপনি যদি মনে করেন আমার দ্বারা এ কাজ হ'তে পারবে এবং এতে দু' এক মাসের বেশী সময় লাগবে না, তা হ'লে আপত্তি কচ্ছি না।"

"এই সময় মধ্যেই কাজ হ'য়ে যাবে ভরসা করি। তা হ'লে যত শীগগির সম্ভব কাজ আরম্ভ ক'রে দিন।"

গৌরদাস সম্মতি দিয়ে তার পর দিনই কাজে যোগদান ক'রল।

সপ্তাহ কাল মধ্যেই সুরথ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে পূর্ব্বের মত নিয়মিত রূপে যাবতীয় কাজ দেখতে লাগলো। তার মাথার আঘাতটা কি ভাবে লেগেছিল তার প্রকৃত বিবরণ গোপনই র'য়ে গেল, কারণ গৌরদাস কোন কথা প্রকাশ করে নি।

সুরথ কিন্তু ভূতের পাহাড়ের কথাটা ভুলতে পারল না। তার কেমন একটা ধারণা হ'ল, ওখানে নিশ্চয়ই একটা কিছু রহস্য আছে এবং জেদ হ'ল, ঐ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে।

এক দিন অপরাহ্নে কোন একটা কাজ উপলক্ষ্য ক'রে সুরথ এক ঘোরালো পথে ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম দিকটায় একাকী উপস্থিত হ'ল এবং তারপর গাছের পাতার স্থায় সবুজ রংএর চাদর দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে পাহাড়ের ভিতর ঢুকে পড়লো। এখানেও কাঁটা তারের বেড়া ছিল কিন্তু সুরথ তার কাটবার একটা যন্ত্র সঙ্গে এনেছিল। অতি সন্তর্পণে চ'লে পাহাড়ের ঠিক উপরে উঠতে তার প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। সেই স্থানে পৌঁছে সুরথ দেখলো, একটা অতি পুরাতন বাড়ী গাছ ও পাথরে বেষ্টিত হ'য়ে এমন ভাবে সেখানে অবস্থিত আছে যে এর অস্তিত্ব নীচের সমতল ভূমি থেকে জানবার কোন উপায়ই নেই। তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। সুরথ গা ঢাকা দিয়ে বাড়ীটার চারি দিক ঘুরে দেখল, তাতে মানুষ বাস করবার কোন লক্ষণ নেই। বাড়ীটা পাথরের তৈরী, তাতে দু'টি মাত্র কুঠুরী, দোর-জানালায় কবাটাদির চিহ্ন নেই। সম্মুখের আঙ্গিনা আগাছাবর্জ্জিত এবং অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। অদূরে ছোট বড় বিস্তর জঙ্গল, তাতে জানোয়ারাদি থাকা অসম্ভব নয়। এমনি সময় দু'টো বন্য শেয়াল এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্য ঝোপের দিকে চ'লে গেল। সুরথ তখন ঘন পাতা-বিশিষ্ট একটা বড় গাছের উপর উঠে তার এক শাখায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রল—তার সঙ্কল্প, সারাটা রাত সে এখানে ব'সেই কাটাবে।

প্রায় দু'ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে থাকার পর তার দুই চোখ ঘুমের তাড়নায় বুজে আসতে লাগল। ঘুম এলে পাছে গাছের উপর থেকে প'ড়ে যেতে হয়, এই আশঙ্কায় সুরথ পকেট থেকে একটা দড়ি বের ক'রে তাই দিয়ে গাছের সঙ্গে নিজের দেহ শক্ত ক'রে বাঁধবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সে চমকে উঠল এবং ঐ শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাকান মাত্র যে বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য তার চোখে পড়লো তাতে তার সকল দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। সুরথ দেখল, লম্বা দাড়ি, লম্বা কান ও উঁচু শিংওয়ালা এক রাক্ষসাকার মূর্ত্তি এক হাতে খড়্গ ও এক হাতে একটা শিঙা নিয়ে আঙ্গিনার উপর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ঐ মূর্ত্তির দু'পাশে দুই চোখ ও কপালের উপর এক চোখ, এই তিন চোখ থেকে এক একটা উজ্জ্বল আলো ক্ষণে ক্ষণে ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠে আবার নিভে যাচ্ছে! মুহূর্ত্ত পরে সেই মূর্ত্তি প্রথমতঃ শিঙাধ্বনি ও তারপর অতি বিকট চীৎকার ক'রে সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে তুললো। ঐ চীৎকার শুনে দূরবর্ত্তী জঙ্গলের শেয়ালের দল চেঁচিয়ে উঠে ও গাছের কোটরবাসী পেঁচাগুলো কিচ্ কিচ্ শব্দ ক'রে তাদের ভীতি জানিয়ে দিলো। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ঐ মূর্ত্তির তাণ্ডব নৃত্য চললো, তারপর অকস্মাৎ আর একবার শিঙা-ধ্বনি ও চীৎকার ক'রে মূর্ত্তিটি অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

বিস্মিত ও স্তম্ভিত সুরথ কিয়ৎক্ষণ একেবারে কাঠ হ'য়ে রইল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার গল্পে শোনা যেতে পারে, কিন্তু চক্ষে দেখবার সুযোগ কারও কখন হ'য়েছে কি না তার জানা নেই। ঐ শিংওয়ালা তিন-চোখো মূর্ত্তিই তা হ'লে ভূত! কিন্তু ভূতের কি আর কোন কাজ নেই? সন্দেহাকুল চিত্তে সুরথ আরো ভূতের আগমন ও তাদের তাণ্ডব নাচ দেখবার প্রত্যাশায় গাছের উপর চুপ ক'রে ব'সে রইলো কিন্তু সারা রাতের মধ্যে মাঝে মাঝে পাখীর ডানার শব্দ ও দু' একটি বন্য জন্তুর গমনাগমনের সাড়া ভিন্ন আর কিছু শুনতে পেলো না। ঊষার আলো ছ'ড়িয়ে পড়বার পূর্ব্বেই সুরথ গাছ থেকে নেমে যে পথে এখানে এসেছিল সেই পথ ধ'রে ঘরে ফিরে চললো।

চলতে চলতে তার মনে নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে লাগলো। ভূতের পাহাড়ে গিয়ে রাত্রিবাস ক'রে কেউ জীবন্ত ফিরে আসতে পারে না, এই জনরব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা সুরথ নিজেই তার প্রমাণ। তবে এই জনরবের উৎপত্তি হ'ল কেন এবং তার স্রষ্টা কে? ঐ ভূত প্রকৃত না কৃত্রিম? প্রকৃত ভূত হ'লে, পাহাড়ের উপর সুরথের অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য সে জানতে পারল না কেন। সুরথ সঙ্কল্প করল, আবার একদিন পাহাড়ে গিয়ে প্রকৃত সত্য জানবার চেষ্টা করবে।

[ক্রমশঃ

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

এক

বাংলার আদর্শ গদ্য ভাষা কি হওয়া উচিত এ বিষয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যত চিন্তা করিয়াছেন এদেশে কেহই ততটা করেন নাই। এজন্য তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এত শ্রম স্বীকারও কেহ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টিকে তাঁহার দায়িত্বস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। বাংলা-গদ্য ভাষাকে তিনি যে অবস্থায় পান এবং তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন দুইএর তুলনা করিলে তাঁহার সাধনাকে পূর্ণ এক শতাব্দীর কাজ এবং একাধিক সাহিত্য রথীর কাজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনি একাই ত্রিশ বৎসরের সাধনায় তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই দুইয়ের মধ্যে কতগুলি স্তর আছে—সব স্তরগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এই ক্রমোন্নতির প্রধান কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার কোন স্তরেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সংস্কৃতের অনুবাদের মত গদ্যকে খাঁটি বাংলা গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল পণ্ডিতি বাংলার বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযান নয়, তাঁহার মতে পণ্ডিতি বাংলাও যেমন খাঁটি বাংলা নয়—ইংরাজী তর্জ্জমা করা বাংলাও তেমনি খাঁটি বাংলা নয়। তিনি যে সকল ইংরাজীনবীশদের বাংলা লিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল সমসাময়িক ইংরাজীনবীশরা বাংলা লিখিত, তাহাদের ভাষা 'বাংলা হরফে ইংরাজী' বলিয়া তাঁহার প্রীতিকর হইত না। এই দোষটি তিনি ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনে সম্পাদকতা করিবার সময়। ইংরাজীনবীশদের লেখাগুলিকে তাঁহার আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইত। শেষজীবনে তিনি বলিয়াছিলেন—'বাংলা গদ্য লেখা বড়ই শক্ত, এখন পর্য্যন্ত খাঁটি বাংলা লিখিতে পারিলাম না।' উৎকর্ষ সাধনের এই আগ্রহের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনে যে গদ্যভাষার সহিত পরিচিত হ'ন তাহার কতকটা আদালতি, কতকটা পণ্ডিতি এবং কতকটা সেকালের সংবাদপত্রের প্রচলিত ভাষা। তাঁহার হাকিম পিতার সাহচর্য্য, ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণের সাহচর্য্য ও প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকার সংসর্গ হইতে তাঁহার যে শ্রেণীর গদ্যভাষার সহিত পরিচয় ঘটে, তাহা তাঁহার নিকট অদ্ভুতই মনে হইয়াছিল। তিনি নিজে ঐ ভাষায় ললিতা মানসের বিজ্ঞাপন লেখেন, সে ভাষার নমুনা এই—

"সুকাব্য-সমালোচকদের অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্যরচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়—গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। ইহা তাঁহার কিশোর বয়সের ভাষা। এই ভাষাকে বঙ্কিম বলিয়াছেন—লৌকিক বাংলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তারপর বঙ্কিম অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষার সহিত পরিচিত হইলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষাকে তিনি মার্জ্জিত সুমধুর ও মনোহর বলিয়াছেন। কিন্তু এ ভাষায় তিনি বৈচিত্র্য ও ওজস্বিতার অভাব আছে মনে করিতেন। আর একটি অভিযোগ এই ভাষার বিরুদ্ধে এই—এই ভাষায় সকল প্রকার ভাবের প্রকাশ হয় না। অতীত যুগের কথা ইহাতে বেশ বলা চলে—কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কথা ইহাতে প্রকাশ করিতে গেলে অস্বাভাবিক শুনায়। ইহাতে সম্যকরূপ ভাব প্রকাশও হয় না। বিদ্যাসাগরী ভাষা যদি চলিতে থাকে, তবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু তদুপযোগীই হইবে, বহু বিষয়বস্তু বর্জ্জিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের গণ্ডী সংকীর্ণ হইবেই, সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।

দেশের ভাষায় শক্তির পরিসর সংকীর্ণ হইলে কি অসুবিধা তাহা অপরে তেমন বুঝিবে না, যেমন বুঝিবে সাহিত্যের রচয়িতারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুই তিনখানিতে

বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের এই উপন্যাসগুলির আখ্যানবস্তু অতীত যুগের এবং এগুলি ইতিহাস—রচনার ভঙ্গীতে লেখা। সেজন্য ভাষা ততটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। বঙ্কিম কিন্তু এই বইগুলি লিখিতে গিয়া বুঝিলেন উপন্যাসের ভাষা এরূপ হওয়া উচিত নয়। উপন্যাস সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত, সর্ব্বসাধারণ যদি তাঁহার উপন্যাস উপভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে তাঁহার রচনাই ব্যর্থ। বড় বড় সমাস ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, সংস্কৃতে যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। তারপর উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর মুখের কথা থাকে—এসকল কথা পুস্তকের মৌলিক ভাষা হইতে পৃথক হওয়া চাই। মুখের কথা মৌলিক ভাষার কাছাকাছি না হইলে অস্বাভাবিক শুনায় ও তাহাতে আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়। ইহাও তিনি অনুভব করিয়াছেন—বর্ত্তমান যুগের আখ্যানবস্তু লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে হইলে, এই ভাষা একেবারেই অচল হইবে। এই সকল কারণে তিনি পণ্ডিতি ভাষার উপর রীতিমত বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতি ভাষাকে তিনি রীতিমত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অপরপক্ষে পণ্ডিতেরা তাঁহার রচনার ভাষার দোষ ধরিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' বইখানি দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশকে তিনি "বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত" বলিয়াছেন। আলালী ভাষাকে বঙ্কিম আদর্শ গদ্যভাষা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লসিত হ'ন নাই। পণ্ডিতি ভাষার ঠিক বিপরীত ভাষায় গ্রন্থ-রচনা দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল। গ্রন্থ-রচনায় পণ্ডিতি ভাষাকে একেবারে অস্বীকারের সাহস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একদিকের চূড়ান্ত প্রচলিত ছিল—আর একদিকের চূড়ান্তের আবির্ভাবে তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল যে, এবার দুই ভাষার মধ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনে আদর্শ গদ্য ভাষা পাওয়া যাইবে।

আলালী ভাষায় কি কি দোষ তাহাও তিনি বলিয়াছেন—

"ইহাতে গাম্ভীর্য্যের ও বিশুদ্ধির অভাব আছে ···হাস্য ও করুণ রসের ইহা উপযোগী। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না এ ভাষা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল ও অপরিমার্জ্জিত।"

'হুতোম পেঁচার নক্সা'র ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই আমল দেন নাই।

তবু আলালী ভাষার আবির্ভাবে বঙ্কিম কেন উল্লসিত হইয়াছিলেন তাহার কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন—

"ইহাতে প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দর হয় এবং যে সর্ব্বজনগ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এভাষার পক্ষে তাহা সহজগুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নয় এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাংলা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার একসীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহাদের কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশের দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিলেন—দুই ভাষার সমাবেশে নূতন ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ইহাকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—সাগরী ভাষা ও আলালী ভাষার মধ্যগা।

বঙ্কিমবাবু দুই ভাষার সমাবেশে যে ভাষায় বই লিখিতে লাগিলেন—সে ভাষা ইংরাজীনবীশদের প্রিয় হইল। কিন্তু পণ্ডিতরা গালি পাড়িতে লাগিল—যাহাদের কাছে সাহিত্যরস বড় কথা নয়—সংস্কৃত সমাস-সন্ধিই বড় কথা—তাহারা বঙ্কিমের রচনাকে অবজ্ঞেয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল। তাহারা সংস্কৃত শব্দের সহিত খাঁটী বাংলা শব্দের সমাবেশকে গুরু-চণ্ডালী দোষ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং বঙ্কিম ও তাঁহার সমর্থকদলকে 'শব-পোড়া মড়া-দাহের দল' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর ভাষা অনেকটা সংস্কৃতানুগ। রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার ভাষা সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন—"ঐ ভাষারই কেমন একটা ভঙ্গী আছে যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।"

অর্থাৎ মৃণালিনীর ভাষা ইতরজনোচিত। এই উক্তি হইতে মনে হয়—এই সকল পণ্ডিতগণ সাহিত্যের মাধুর্য্য বুঝিতেন না—ভাষার গাম্ভীর্য্যকেই সাহিত্য মনে করিতেন।

যাই হউক, বঙ্কিম আলালী ভাষার অনুসরণ করেন নাই। করিলে আর একটি দোষ হইত—সে দোষ এই—পণ্ডিতি ভাষা জনসাধারণের কাছে যেমন দুর্ব্বোধ্য, আলালী ভাষা কলিকাতার বাহিরের লোকের কাছে তেমনি দুর্ব্বোধ্য। ইহাতে যে শহুরে idiom এবং আরবি পারশী শব্দবাহুল্য আছে—তাহা অনেকের কাছেই অপরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় যে চল্‌তি ভাষার সহায়তা লইলেন—তাহাতে এ দোষ নাই। বাঙ্গালীমাত্রের পক্ষেই তাহা সহজবোধ্য হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে সমাস-সন্ধি যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিতে লাগিলেন—এবং বাক্যগুলিকে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, তৎসম শব্দের বদলে প্রচুর তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতি ভাষায় বাংলা idiomএর প্রবেশ নিষেধ ছিল—বঙ্কিমী ভাষায় ক্রমে সেগুলির স্থান হইতে লাগিল।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু বর্ত্তমান যুগের কাছাকাছি যত আসিতে লাগিল—ভাষাও তত প্রাঞ্জল ও চল্‌তি ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা প্রথম প্রথম পণ্ডিতি ভাষাতেই লিখিত হইত—শেষের দিকে তাহা সম্পূর্ণ চল্‌তি ভাষাতেই দাঁড়াইল। ভাষার আড়ষ্ট ভাব, পণ্ডিতি ভঙ্গী, ও সংস্কৃত ব্যাকরণের কড়া শাসন যত কমিয়া আসিল—ভাষা ততই সরস ও কবিত্বময় হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা ও সাবলীলতা লাভ না করিলে কখনও ভাষায় রসসৃষ্টি হইতে পারে না।

ভাব প্রকাশের জন্য অসংখ্য শব্দের প্রয়োজন—বাংলার চলিত ভাষায় তাহা নাই—সর্ব্ববিধ ভাবের সুপ্রকাশ দান করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রয়োজনমত শব্দ আহরণ করিতে হইবে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে নব নব শব্দ গঠন করিতে হইবে—একথা বঙ্কিমবাবু বুঝিতেন। সে সকল শব্দের সমাবেশ তাঁহার রচনাভঙ্গীর পক্ষে অশোভন বা অস্বাভাবিক মনে করিতেন না। কেবল সংস্কৃত শব্দে কেন—গ্রাম্য, পার্শী, ইংরাজী, হিন্দী ভাবপ্রকাশের জন্য যে কোন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে—তাহাই তিনি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। এই-রূপ বহু শ্রেণীর শব্দের সমাবেশ সেকালের পণ্ডিতদের কাছে অসঙ্গত ও অশোভন মনে হইয়াছে—কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। আমরা মনে করি উহাতে বাংলার আদর্শ গদ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সংস্কৃতানুগ ভাষার একেবারে প্রয়োজন নাই—তাহা তিনি মনে করিতেন না। যেখানে বর্ণনীয় বিষয় বেশ গুরু-গম্ভীর, যেখানে হৃদয়ের একটা গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে, যেখানে প্রকৃতির একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সমাসসঙ্কুল সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি এ ভাষাকে বর্জ্জন করেন নাই—নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ঐ ভাষা প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন।

আবার আলালী ভাষাকেও তিনি অপাংক্তেয় মনে করেন নাই। যেখানে বর্ণনীয় বিষয় লঘু-তরল সেখানে আলালী ভাষাই আসিয়া পড়িয়াছে। মুচিরাম গুড়ের কাহিনীতে, কৃষ্ণকান্তের উইলের স্থলে স্থলে এবং কমলাকান্তের দপ্তরের কোন কোন স্থলে বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া আলালী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা, কলাকুশল ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট—শব্দাবলীর ধ্বনি, ওজন, সমাবেশের উপযোগিতা ইত্যাদি বুঝিবার কাণ তাঁহার মত কাহার ছিল বা আছে? লোকে বৃথাই দোষাবিষ্কারের চেষ্টা করে। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছেন। অনেক স্থলে কোন ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয় নাই। স্বভাবতই তাঁহার রসগর্ভ লেখনী হইতেই যথাযোগ্য ভাষাই নির্গত হইয়াছে। উপন্যাসে তাঁহার প্রয়োজন ছিল রসের ভাষা। ইহা কোন চতুষ্পাঠীতে পাওয়া যায় না, হাট-বাজারেও পাওয়া যায় না। ইহার জন্ম রসিকের মনোভূমিতে। তাঁহার রসিক মন যাঁহার জন্ম দিয়াছে—তাহা যথাযোগ্য সে বিষয়ে কোন রসিক পাঠকের সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমবাবুর ভাষায় পণ্ডিতরা আর একটি দোষ ধরিত—আজও কোন কোন পণ্ডিত দোষ ধরে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তিনি সংস্কৃত পদ-বিন্যাসেও মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ

নাই। বঙ্কিমবাবু অতি যত্ন সহকারেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। তবু কেন যে এইরূপ ক্রটী ঘটিত—তাহা বলা শক্ত। একজন এই ক্রটীর কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল, তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা এ বিষয়ে কাণকেই অধিকতর দক্ষ বিচারক মনে করেন। এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের কড়াকড়ি নিয়ম মানিবার প্রয়োজন আছে, তিনি মনে করিতেন না। তাহা ছাড়াও পণ্ডিতি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্যও হয় ত তিনি এ বিষয়ে সাবধান হইতেন না। এজন্য অজ্ঞতা দায়ী নয়, অসতর্কতাও দায়ী নয়, বোধ হয়, দায়ী দম্ভময়ী তেজস্বিতা।

যে সকল পদ বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও সেইগুলির প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নিয়ম লঙ্ঘন। পণ্ডিতরা এইগুলিকে দোষ মনে করিতেন এবং এখনও করেন, আমরা তাহা দোষ মনে করি না। আমরা জানি ইতিপূর্ব্বে, বিধাতৃ-পুরুষ, চক্ষুর্লজ্জা ইত্যাদি সংস্কৃত মতে বিশুদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে বিধাতাপুরুষ, চক্ষুলজ্জা লিখিলে ভুল ত' মনে করিই না বরং এইরূপই সঙ্গত মনে করি। বঙ্কিমবাবুর মতও ইহাই ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কোন অঙ্গের বা উপকরণের আতিশয্যও নাই, দৈন্যও নাই। সংযম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। জীবনে যেমন তিনি মিতবাক ছিলেন—রচনাতেও তাই। বাচালতার তিনি পক্ষপাতী নহেন। বঙ্কিমের ভাষায় বাগ্‌বাহুল্য নাই বলিয়া ইহা একদিকে যেমন গাঢ়বদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। রচনায় তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের লোভ সংবরণ করিয়াছেন—আর তাঁহার নিজের কাছে যাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় নাই ভাষায় তাহার প্রকাশ দানের চেষ্টা করেন নাই। তাহার ফলে ভাষা কোথাও আবিল বা অস্বচ্ছ হয় নাই, অর্থবোধ করিতে কোথাও কষ্ট হয় না, ঠারে-ঠোরে বুঝিতে হয় না। অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক স্পষ্টতার সহিত তাঁহার বক্তব্য সর্ব্বত্র উপস্থাপিত। ভাষা যেখানে ব্যঞ্জনাময় সেখানেও একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যঙ্গার্থেরই দ্যোতনা দেয়—পাঠককে অনির্দ্দেশের পথে লইয়া যায় না। ভাষার লীলা-কৌশল চাতুর্য্য শব্দের ছটা ঘটা সমারোহ কোথাও ভাবকে গৌণ করিয়া তুলে নাই। ভাব সর্ব্বত্রই প্রধান। ভাষা তাহার বাহন মাত্র। ভাবের পরিচালনায় ও অনুশাসনে ভাষার যত কিছু লীলা বিলাস, যত কিছু কলা-কৌশল।

বঙ্কিমবাবুর আর একটি বিশেষত্ব—তিনি পাঠককেও শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন। পাঠককে অল্পবুদ্ধি মনে করিয়া তিনি কোন জিনিষের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নাই—একটা ভাবঘন বা রসঘন কথা বলিয়া তাহার জন্য এক পাতা ধরিয়া টীকাভাষ্য করেন না। পাঠকের রসবোধের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল—বঙ্কিমের মত দাম্ভিক লোকের পক্ষে ইহা বিচিত্র কথা বটে। কিন্তু তিনি যেমন দাম্ভিক ছিলেন তেমনি মিতভাষী ছিলেন। মিতবাক্ দাম্ভিক লোকেরা বেশী কথা বলিয়া শিক্ষকতা করিতে ভালবাসেন না।

দুই

বঙ্কিমের প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদেশে সেগুলি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। তখনও দেশে শিক্ষাবিস্তার হয় নাই, অন্তঃপুরে তখনও শিক্ষা প্রবেশই করে নাই। কাজেই পাঠক সংখ্যা অল্পই ছিল। বঙ্গভাষাকে তখন অধিকাংশ লোকে অনাদর করিত। পণ্ডিত মহাশয়রা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সেকালে যে বাংলা লিখিতেন তাহা প্রধানতঃ উদরান্ন সংস্থানের জন্য। ইহা ছাড়া হিন্দুর শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সেকালে যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত সেগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য ও ইংরাজীনবিশ অনাচারীদের গাল-মন্দ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাংলা লিখিতে হইত। সে বাংলা সংস্কৃতেরই বিভক্তি বাদ দিয়া বাংলা ক্রিয়াযোগে রূপান্তর মাত্র। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে তাঁহাদের দুইটি অভিযোগ। প্রথম অভিযোগ—উহার ভাষা ব্যাকরণ দুষ্ট এবং গুরুচণ্ডালী দোষে কলঙ্কিত। বঙ্কিমের ভাষাকে তাঁহারা 'শব পোড়া মড়াদাহ' শ্রেণীর ভাষা বলিতেন। দ্বিতীয় অভিযোগ—পুস্তকগুলি বিদেশীয় ঢঙে বিজাতীয় ভাব লইয়া লেখা—স্বদেশীয় আদর্শের ঐগুলিতে অমর্য্যাদা করা হইয়াছে।

ইংরেজীনবীশদের দল বাংলা ভাষাকে নিকৃষ্টতর ভাষা বলিয়া ঘৃণা করিত। বাংলায় পুস্তক রচনা করাকে তাঁহারা

বাতুলতা মনে করিতেন এবং বাংলা বই পড়াকে লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। কেহ কেহ লুকাইয়া পড়িতেন এবং গোপনে অশিক্ষিত অন্তঃপুরিকাদের পড়িয়া শুনাইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেকালে কলেজের পরীক্ষায় সংস্কৃত ছিল না বাংলাই ছিল গৌণভাষা। অথচ সেকালের গ্র্যাজুয়েটেরা বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। বঙ্কিমবাবু ইংরাজীনবীশদের অগ্রগণ্য হইয়াও বাংলায় বই লিখিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

তবু বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির যেটুকু আদর হইয়াছিল তাহা ইংরাজীনবীশদের কাছেই। বঙ্কিম ইংরাজীনবীশদের অগ্রণী এবং হাকিম হইয়াও বাংলা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজী-নবীশরা তাঁহার পুস্তকগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে নাই। বঙ্কিমবাবু নিজের আভিজাত্য ও সামাজিক মর্য্যাদার অংশ বঙ্গভাষাকে দান করিয়া তাহাকে কতকটা শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজীনবীশদের অনেকে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সমাদর করিয়াছিলেন ঠিক সেই জন্যই যে জন্য পণ্ডিতরা সেগুলির অনাদর করিয়াছিলেন।

বঙ্গভাষায় ইংরাজী ভাব, আদর্শ, ভঙ্গী ইত্যাদিকে প্রবর্ত্তিত দেখিয়া এবং সংস্কৃতের বন্ধন হইতে তাহার আংশিক মুক্তি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের ব্রতভঙ্গ করিয়া বাংলা পড়িতে সুরু করেন। মোটের উপর, এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই ইংরাজীনবীশদিগকে বাংলা পড়িতে বাধ্য ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষার মর্য্যাদা তাঁহাদের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিম যদি ইংরাজীনবীশের মুখপাত্র ও হাকিম না হইতেন—তাহা হইলে বঙ্গভাষার মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা ও কলঙ্কমোচনের ঢের বিলম্ব হইত। উপন্যাসগুলির নিন্দা করিলে বঙ্কিম অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন—স্থিরচিত্তে রূঢ় সমালোচনা সহ্য করিয়া লইতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার আত্মাভিমানের জন্য নয়—বঙ্গভাষার প্রতিই ঐরূপ সমালোচনায় অশ্রদ্ধা সূচিত হইত মনে করিতেন। বঙ্গভাষায় উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়াও যাঁহারা সহানুভূতির চোখে দেখিতে পারিত না, তাহাদের প্রতি বঙ্কিম বিরক্তই হইতেন।

বঙ্কিম মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন বটে কিন্তু তিনি নিজেও নিজের সৃষ্টিতে তুষ্ট হইতেন না। সমালোচকদের মন্তব্যের সহিত মিলুক আর নাই মিলুক, গ্রন্থগুলি যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতেছে না তাহা তিনি বুঝিতেন। সে জন্য প্রত্যেক সংস্করণে তিনি গ্রন্থগুলির আমূল সংস্কার করিতেন—পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিতেন। নিজের রচনার দোষত্রুটীর জন্য যিনি নিজেকে ক্ষমা করেন না তাঁহার কাছে বেদরদী সমালোচকের দায়িত্বশূন্য মন্তব্য অসহ্য। যাহারা নিজেরা একেবারে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না, রসবোধের কোন পরিচয় দেয় নাই, তাহাদের মতামতকে বঙ্কিম ধৃষ্টতারই দৃষ্টান্ত মনে করিতেন।

বিরুদ্ধ মন্তব্য ও রূঢ় সমালোচনায় বঙ্কিম বিরক্ত হইলেও কথনও হতোদ্যম হন নাই। অবিচলিত থাকিবার জন্য যে আভিজাত্য ও তেজস্বিতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। তিনি স্তুতিনিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার প্রতিভা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। নিজের শক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, আর বিশ্বাস ছিল অনাগত পাঠক সম্প্রদায়ের উপর। তিনি অনেক সময় নীরবে মহাকালের বিচারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিকগণ চারি পাশে চাহিবার অবসর পান না, তাঁহারা প্রবর্ত্তিত সমগ্র যুগের উপরই নির্ভর করেন—বর্ত্তমানের উপর খুব বেশী নির্ভর করেন না। বঙ্কিম ছিলেন একাধারে আদর্শ স্রষ্টা এবং আদর্শ উপভোক্তা। স্রষ্টা হিসাবে তিনি নির্ব্বিকার। উপভোক্তা হিসাবে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মূল্য মর্য্যাদা ভাল করিয়াই বুঝিতেন, সে জন্য তিনি নিশ্চিন্ত ও অবিচলিত থাকিতে পারিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এক বিষবৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসের নাম করণে গ্রন্থের মর্ম্মকথার দ্যোতকতা রক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলির নামকরণে একটা সার্থকতা আছে। যেমন সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কমলমণি, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী, ভ্রমর, রোহিণী, নন্দা, শ্রী ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"স্ত্রীরাই এ দেশে মানুষ।" ভক্তির পাত্র নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"স্ত্রীও আদর্শ মহিলা হইলে স্বামীর ভক্তির পাত্র।" বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে এবং স্ত্রীচরিত্রগুলিই প্রবল ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বঙ্কিম

চন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। Realistic উপন্যাসে বাঙ্গালী স্ত্রীচরিত্রের কথা—লাঞ্ছনা, দুঃখ-ক্লেশ অবিচারের কাহিনী ছাড়া আর কিছু হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস Realistic নয়, তাই তিনি নিজের আদর্শবাদের স্বপ্ন দিয়া স্ত্রী-চরিত্রগুলিকে তেজস্বিনী ও শক্তিমতী করিয়া গঠন করিয়াছেন। সমাজে তাহারা অসহায়া, অবলা, বঙ্কিম তাহাদের সামাজিক জীবনের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারেন নাই, সাহিত্যে তাহাদিগকে মহিমার সিংহাসনে বসাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া হিন্দুর ঐতিহ্য ও আদর্শের সহিত মিলাইয়া তিনি বীরাঙ্গনা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীত্বের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ভ্রমর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতার বাণীকে তিনি মূর্ত্তি দান করিয়াছেন—প্রফুল্ল চরিত্রে। সীতারামের মত মহাবীর চরিত্র শ্রীর কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। শৈবলিনীর জন্য প্রতাপ জীবন উৎসর্গ করিল। বঙ্কিম প্রথম প্রথম নারীকে বলীয়সী করিয়াছিলেন রূপ-জ্যোতিতে—পুরুষ সেখানে শলভতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে তিনি নারীত্বের আদর্শ মহিমার আবিষ্কার করিয়াছিলেন—চরিত্রবলই নারীত্বের প্রধান বল এই সত্যকে তিনি বাণীরূপ দান করিয়াছিলেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ঐ চরিত্র লইয়া তাঁহার উপন্যাস রচনার ইচ্ছা ছিল।

বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিতেন ইতিহাসের ছন্দে। এমন ভাবে উপন্যাস তিনি আরম্ভ করিতেন যেন তিনি একটি পুরাতন ঘটনা বা একটি ঐতিহাসিক বিষয় বিবৃত করিতেছেন। সেজন্য বর্ত্তমান যুগের বিষয় ছাড়িয়া তিনি পুরাকালের আবহাওয়ার সাহায্য লইতেন। রচনার ভাষা ভঙ্গীও সেজন্য ইতিহাসেরই উপযোগী হইত। ঘটনা পরম্পরা ও জীবনের বৈচিত্র্যের সাহায্যে তাঁহার উপন্যাস অগ্রসর হইত। চরিত্র-গুলির আচরণের দ্বারা উপন্যাসের পুষ্টি হইত। চরিত্রগুলির মনের খবর বঙ্কিম জানাইতেন না—তাহাদের মুখের উক্তি ও আচরণ হইতে তাহাদের মনের কথা অনুমান করিয়া লইতে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বাহিরের জীবন-সংগ্রামই প্রবল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে মূল চরিত্র ধনিসম্প্রদায় বা অভিজাত সম্প্রদায় হইতে পরিকল্পিত। নিম্ন শ্রেণীর নর নারীর স্থান কেবল ভৃত্যরূপে। দেশের আর্ত্ত লাঞ্ছিত জনগণের বেদনা তাঁহার উপন্যাসের উপজীব্য হয় নাই—রসসৃষ্টির সহায়তাও করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতেন তাহা নহে, তাহাদের জীবন লইয়া, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট অভাব অভিযোগ লইয়া খেলা করা, রঙ্গ করা বা সহানু-ভূতির অভিনয় করাকে তিনি হৃদয়হীনতা মনে করিতেন।

বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি ছিল অবাধ ও সুদূরপ্রসারী। মোগল রাজের অন্তঃপুর হইতে গ্রামের পোষ্টাপিস, রাজপুতনার গিরিসঙ্কট হইতে হিজলির বালিয়াড়ি কোথাও তাঁহার কল্পনা বাধা পায় নাই। এইরূপ কল্পনার অবাধ লীলার জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি Romanceএ পরিণত হইয়াছে।

বঙ্কিমের চরিত্রগুলির অধিকাংশই রক্তমাংসের মানুষ নয়। কোন একটা ভাবকে তিনি নারী বা নরের রূপ দান করিতেন। যাহাকে বলে Personified Ideas, তাহাই। চরিত্রগুলির কোনটিতে শৌর্য্য, কোনটিতে সতীধর্ম্ম, কোনটিতে সংযম, কোনটিতে চাপল্য, কোনটিতে সারল্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।
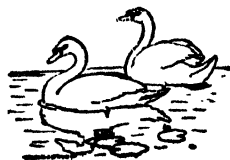
কালিদাস রায়ের পল্লী-কবিতা

শ্রীভবপতি মৈত্র এম্-এ

বঙ্গীয় পল্লীকবি কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের পল্লী-কবিতার মধ্যে প্রধান হইতেছে কৃষাণীর ব্যথা, কৃষকের ব্যথা, ছা ঘরে, পুত্রহারা, কুড়ানী, কৃষকবালার ব্যথা ইত্যাদি। কবিতাগুলি পড়িয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পল্লীকবিদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ তাঁহার কৃষাণীর ব্যথা ও কৃষকের ব্যথা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখনীয়। এই দুই কবিতা সর্ব্বজনেরই সুবিদিত, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের অন্তেবাসিগণের ইহা কণ্ঠস্থ। কৃষাণীর ব্যথা ও কৃষকের ব্যথা কবিতাদ্বয় অতি করুণ রসে পূর্ণ। এই উভয় কবিতাই, বিরহ-শোক ও ভাব-প্রবণতা পূর্ণ এবং বাস্তব ঘটনাযুক্ত খেদোক্তি। সাংসারিক দৈনন্দিন দুঃখ দৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সংসারক্ষেত্র পার হইতেছে এমত অবস্থায় একে অপরের বিরহে খেদোক্তি এই কবিতা দুইটীতে বর্ত্তমান। পল্লীগ্রামের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে এই কবিতা বহুদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পল্লীগ্রামের কৃষক কুলের কঠোর পরিশ্রম, সধারণ দৈন্যাবস্থা, জমিদারের অত্যাচার ও মহাজনের উৎপীড়ন, পত্নীর পতির কর্ম্মক্ষেত্রে, আহারে, বিহারে, সর্ব্বদা অনুবর্ত্তন, দুঃখের ভিতরে সরল আনন্দ, সুমিষ্ট ভাষণ সমস্তই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। নিম্নলিখিত ছত্রগুলি হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে,

> সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
> আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায়! সংসার আঁধারিয়া।

> দু'বেলা পাওনি পেট ভরে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
> লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
> এক মুঠা চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়াছ চলি,
> উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি।
> দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিন রাত,
> মাঠে মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণ-পাত।
> খাজনার লাগি জমিদার বাড়ী সহেছ যাতনা কত,
> মহাজন দেনা সুদের লাগিয়া গঞ্জনা দেছে শত।

বাস্তব জীবনের কঠোরতার ভিতর দিয়া গৃহীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ত্যাগের আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

"কৃষাণীর ব্যথা" কবিতায় সকল বিষয়ই পূর্ব্ববৎ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কৃষাণীর বিরহ-দুঃখ প্রকৃতির সহিত যোগ-সম্বন্ধ ও সহানুভূতির বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিতেছে— Wordsworth এর Lucy কবিতাতেও এইরূপ বর্ণিত আছে—

> She is in her grave
> Ah—the difference to me.

কবি কালিদাস রায়ের কবিতাতেও—

> তেমনি পড়েগো কাল ছায়া ঐ ভরিয়া বকুল-তল
> বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল।
> সাঁজে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে
> বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা রয়ে যায় ঘরে।
> পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায় জ্বলে না দুপুরে চুলো।
> আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।

"কৃষকের ব্যথা" কবিতাটি সাংসারিক কার্য্যে বিপত্নীক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে তাহাই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং কৃষক ঐ কার্য্যসকল একলা সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। সেজন্য তাহার পত্নীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছে। কৃষকের উক্তি শুনিয়া মনে হয় তাহার প্রৌঢ়াবস্থা।

> এমন করে কেমন করে আঁধার ঘরে আর
> তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার।
> দুয়ারে নাই জলের ছড়া উঠানে নাই ঝাঁট
> বিহানে আর গোয়াল ঘরে করে না কেউ পাট।
> গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয় না আজি দোয়া
> খামার থেতে তোমার ধান খড় যে যায় খোয়া।
> গোয়ালে নাই সাঁজাল ধোয়া পড়ে না ঘরে সাঁজ
> মাদুর পেতে কে দেখে? শুই গামছা পেতে আজ।
> বারেক ফিরে এসে
> লক্ষ্মী মোর লহগো ভার তোমার ঘরে হেসে।

এই কবিতায় বিরহী কৃষক মৃতপত্নী কৃষাণী ও বিরহিনী কৃষাণী মৃতস্বামী কৃষকের পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছে কারণ

তাহাদের ভিতর এমন কোন উচ্চভাবের প্রেরণা নাই যাহাতে তাহারা এরূপ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে। তাহাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা যেন একটু অল্প বলিয়া মনে হয়। শিক্ষা তাহাদের মধ্যে সম্ভবপর না হইলেও ধর্ম্মে বিশ্বাস তাহাদের এ বুদ্ধি দিতে পারিত, তাহা নাই বলিয়াই আবেগের আতিশয্যে। Wordsworth এর Laodamia কবিতায় দেখা যায় Protesilans এর অশরীরী মূর্ত্তি Laodamiaকে উপদেশ দিতেছেন, "God approve the depth, not the tumult of the soul, fervent, not ungovernable love." তৎপরে কবি Wordsworth আরও বলিয়াছেন, "Her bondage prove the fatters of a dream as opposed to love."

কৃষকের ব্যথা ও কৃষাণীর ব্যথা কবিতায় দেখা যায় যে, কৃষকজীবনের গ্রাম্য ছবি যে পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে সেই পরিমাণে বিরহী ও বিরহিনীর শোকাবেগ মন্দীভূত হইয়াছে নতুবা এরূপ নিখুঁত বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া স্বাভাবিক নহে। মহাকবি Milton-এর Lycidas সমালোচনাপ্রসঙ্গে Dr. Johnson এইরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন। কৃষকের ব্যথা ও কৃষাণীর ব্যথা দুইটী আপামর জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে—সকল মানবেরই কৃষকের ও কৃষাণীর অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা ছাড়া কৃষক ও কৃষাণীর জীবনের সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ত্যাগ ও দুঃখ সহিষ্ণুতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের ভিতর দিয়া চরিত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শন করে ও সকলের চক্ষে তাহাদিগকে বরণীয় করিয়া তুলে।

"পুত্রহারা" কবিতাটি সর্ব্ববিষয়ে অতি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, কবিতাটীর আরম্ভ অতি সুন্দর হইয়াছে। সাধারণ ভাবে ইহার আরম্ভ নয়, ইহা নাটকীয় ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। চারুকলার দিক্ হইতে অতি চমৎকার হইয়াছে। Connected Narrative অন্তরকম আরম্ভ। এই চারুকলার আরম্ভ আরও স্পষ্টতর ও সজীবতর হইয়া উঠে, ইহাতে প্রথমেই পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে।

> আবার আমার এই বয়সে ধরতে হলো হাল,
> আবার আমার আপন হাতে ছাইতে হলো চাল।
> আবার ছুনী সেঁচতে হলো মাখতে হলো পাঁক
> আবার ছানী কাটতে হলো বইতে হলো বাঁক।

পুত্রকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিয়া আয়যুক্ত হইলে, পুত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, বিপত্নীক কৃষক তাহাকে কৃষক করে। সেই পুত্রের মৃত্যুর পর পুনরায় জীর্ণ শরীর লইয়া পূর্ব্বের বৃত্তিতে ফিরিয়া যাইতে হইল। এবং এই কার্য্যে কৃষক বিরক্তির সহিত প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু যেন বিধাতার নির্দ্দেশের উপর একান্ত নির্ভরশীল। কবিতায় পুত্রবধূর শ্বশুরের শুশ্রূষার জন্য পুনঃ পুনঃ তাহাকে কঠোর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাইয়া স্বয়ং দুঃখ দৈন্য স্বীকার পূর্ব্বক দাসীবৃত্তিতে সম্মত হইতেছে কিন্তু শ্বশুর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান পারিবারিক সম্ভ্রম ও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে অকুণ্ঠিত।

> নজর ঘোলা পাঁজর ভাঙ্গা মাজাতে জোর নাই
> কেমন করে বেঁচে আছি ভাবি কেবল তাই
> বৌমা বলেন চালিয়ে নেব কোনো রকম করে
> ধান ভেনে কি দাসীপনা নিয়ে পরের দোরে।
> তুমি বাবা এই বয়সে মাঠে যেও না আর
> তাই কি তারে করতে দেব থাকতে কথান হাড়।

কবিতাটি অত্যন্ত করুণ রসে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন—ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ ধনঞ্জয়। Wordsworth তাঁহার Michael নামক কবিতায় দেখাইয়াছেন, "Love is power". There is a comfort in the strength of love" তাহাই এস্থলে প্রযোজ্য। পুরুষের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা জীবিকার্জ্জন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা—"Man must work". কৃষকের সন্তানের প্রতি ভালবাসার পরিচয় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে সুখে রাখিবার চেষ্টা। ব্যক্তিগত কষ্ট দুঃখ ও শোক আসিলেও দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিতে হইবে।

তাঁহার পল্লী কবিতা "কুড়ানী"র ভিতর আমরা কুড়ানীর মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা দেখিতে পাই। কবি কুড়ানীর প্রতি সমাজের অবিচার বর্ণনা করিয়াছেন। কুড়ানী বলিয়া সে সমাজে পরিত্যক্ত যদিচ সমাজের প্রভূত উপকারী। অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলে পরিশ্রমের যে মূল্য আছে তাহা বুঝা যায়। মিতব্যয়িতা অপব্যয়ের সংহারক। সমাজে অজ্ঞাতসারে যে অবশ্যম্ভাবী অপচয় ঘটিয়া থাকে, কুড়ানী তাহার ভিতর হইতে এই পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করিতে

সমর্থ হয়, যাহাতে তাহার নিজের ও তাহার মাতার ভরণ-পোষণ কার্য্য চলিতে পারে। পক্ষান্তরে মূলধন ব্যতিরেকে শ্রম যে মূল্য উৎপাদনে সমর্থ ইহা হইতেছে কবিতাটির অর্থনীতির দিক দিয়া মূল্যাবধারণ, কারণ আমরা ইহা দেখিতে পাইতেছি—

"নালাটি শুকায়, কাঁকড়া লুকায়, মাছ চুঁড়েমরা মিছে,
গুগলি শামুক কুড়ায়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হা হাঁ করে আসে ছুটে,
মোর ভাগে তাই লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুটে।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে আছে, বাপ মরা মনে নাই,
ঘরটি পড়িলে পাড়াপড়সীরা দেয় নাই মোরে ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দেব না পা ভুলে, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরি করি না ভিখও মাগি না এমনি করিয়া রই।
অনেক বকেছি কুড়ানি বলিয়া ঢেঁক নাক মিছে পিছু,
মাঠেতে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে চুঁড়িলে মিলিবে কিছু।"

কবি কালিদাস রায়ের "হা ঘরে" কবিতায় ভবঘুরে হা ঘরে জীবনে আশ্চর্য্যজনক মহত্ব দেখিতে পান। বাস্তবতার দিক হইতে দেখিলে ইহা কতদূর যথার্থ তাহা চিন্তার বিষয়। "হা ঘরে"র বর্ণনাটি অতি সুন্দররূপেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। Mathew Arnold তাঁহার Scholar Gypsy নামক কবিতায় দেখাইয়াছেন যে Oxford Scholar বিদ্যা সমাপন করিয়া Gypsy জাতির মধ্যে "Gypsylore" শিক্ষা করিতে গেলেন।

হাঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে করে গৃহস্থালী
জীবন জোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটী জালি
কোলের ছেলে সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি মাটীর থালা
ডুগডুগি আর তেলের চোঙা সবুজ কাচের কণ্ঠমালা
আকাশ তাহার ঘরের চালা রবি শশীর আলোক জ্বলা
মাঠময় তার বাড়ীর উঠান প্রমোদভবন গাছের তলা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথও "মেথর" সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটী যেন "Heightening of the Common place" হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তারপর কবি বলিতেছেন—

সকল বাঁধন হারা সে যে জানে নাক সমাজ রীতি
জীবন পথে লক্ষ্যহারা সে যে জানে নাক স্বাস্থ্যনীতি॥

অবস্থাটা যেন অনেকটা "In a state of nature" কবি তাহাতে বিশ্বপ্রেমিক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছেন।

শেষ কয় ছত্রে—

জানে নাক ভিক্ষা মাগা চাকরি চুরি প্রবঞ্চনা
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরেই একটী কণা।
জীবিকা তাহার সাপ খেলান নানারকম বাজীর খেলা
মনে পড়ায় বাজীর ছলে বিশ্ব-বাজিকরের খেলা।
কোনো শাসন রুক্ষ নয়ন পারে নিক বাঁধতে তারে
সকল আইন দ্বন্দ্ব হয়ে বন্দী হল তাহার দ্বারে।
সহচরের পতন হেরি থামে নাক যাত্রা পথে
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে স্বর্গে অটল অচল রথে।

সংসারে আমরা "হাঘরে" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়া থাকি তাহাদ্বারা "না করে চুরি প্রবঞ্চনা" প্রভৃতি কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু সমাজ নীতির বহির্ভূত হওয়াও তাহারা বহুস্থলে সমাজের অকল্যাণকর কার্য্য করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের ভিতরে স্বর্গযাত্রার জন্য যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। তাঁহার ঐকান্তিকতাও নিয়মিত সত্যনিষ্ঠাই স্বর্গ পথের যাত্রার সহচর হইয়াছিল। 'হাঘরে'র জীবনে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সে লক্ষ্যহারা সুতরাং যুধিষ্ঠিরের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। বিশ্ববাজীকরের মেলার সহিত তাহার বাজীর খেলায় এমন কোন সৌসাদৃশ্য নাই ইহা সহজেই মনে পড়ে। এই উপমা দ্বারা তিনি "হাঘরে"র পৌরুষ বর্ণনা ছলে অদৃষ্টবাদের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, যাহার মূল তত্ত্ব হইল এই পৃথিবীতে মানুষের পৌরুষের কোন অবসর নাই, অদৃশ্য শক্তিদ্বারা সকল বিষয়ই সর্ব্বসময়ে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

পর্ণ পুটির পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রণে শেষ কয় ছত্রে এইরূপ ছিল—

বাঁধন হারা মুক্ত পুরুষ অগ্রগামী অনেক দূর
দূরে বুঝি জাগছে তোমার দিক্‌সীমান্তে স্বর্গপুর।

কবিতাটীতে একটু অতিশয়োক্তি সর্ব্বদাই রহিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও কবিতাটী সকলের প্রিয় হইবার কারণ মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয় গ্রামের বিদ্রোহভাব বর্ত্তমান আছে, তাহার আত্মনির্ভরশীলতা অদ্ভুত। সকল বিষয়ে স্বাধীনতা তাহাকে অন্যের চক্ষে মহান্ দেখায়—

কোনো রাজার নয়ক' প্রজা দীন দুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয়না কারো থাকে না সে কারো ঋণে।

ঋষি-কন্যা শ্রীবাদল ধর
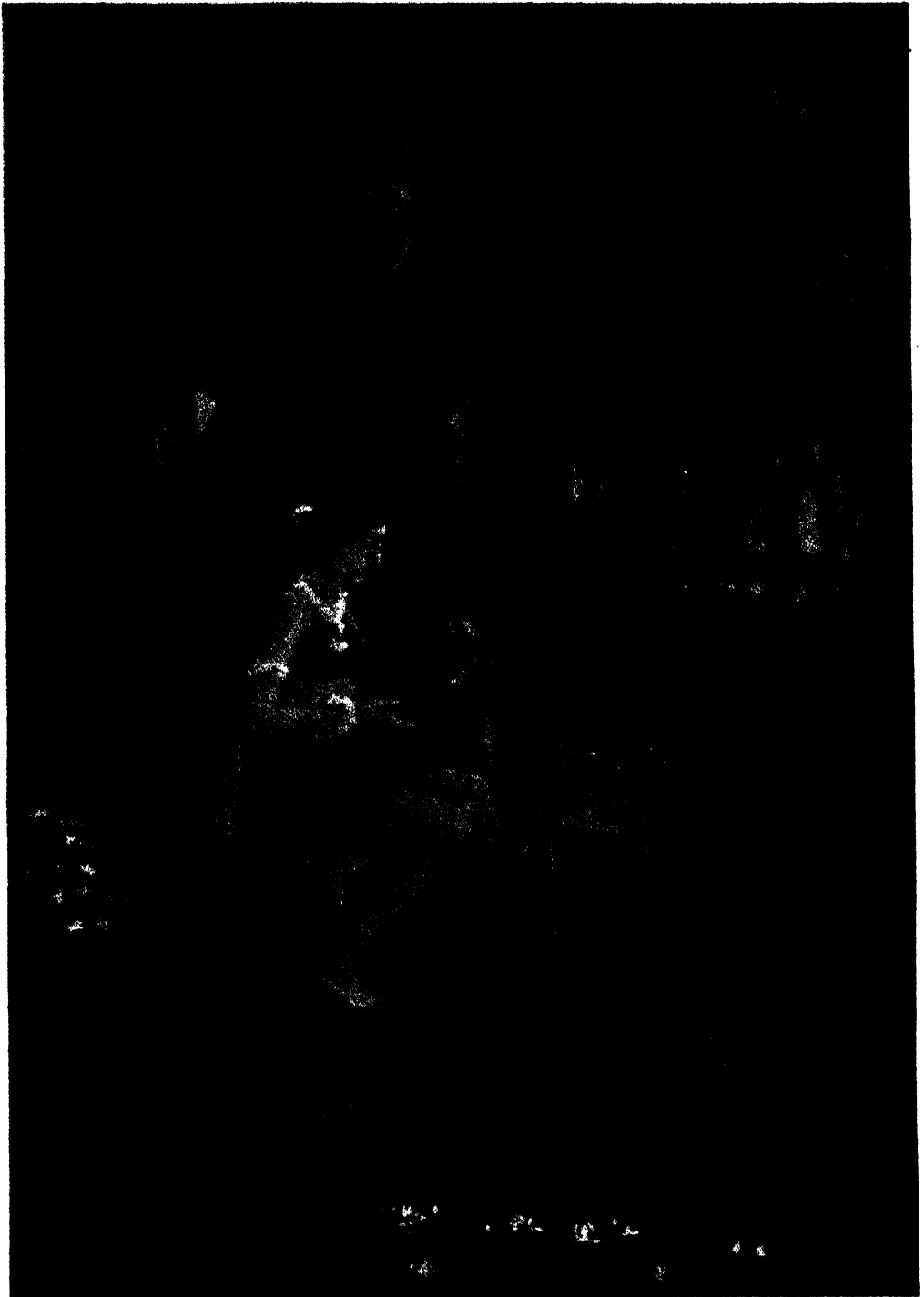
"কৃষক বালার ব্যথা" কবিতায় কবি কালিদাস রায় ভাবের অপূর্ব্বতা দেখাইয়াছেন। কৃষক কন্যার যাবতীয় মনোভাব এই কবিতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষকবালার প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে তাঁহার মনোগত ব্যথা এইস্থলে সুব্যক্ত হইয়াছে, Shakspeare এর কাব্যে যেমন "a nameless woe I wot" রহিয়াছে, কৃষকবালার তদ্রূপ অবস্থা—

আমার এমন কি হলো বোন খাঁখাঁ করে প্রাণটা খালি
ঘরের কাজে মন লাগে না বাড়ীর লোকে দিচ্ছে গালি,
আমার জ্বালা সে কি জানে
দুপুর রাতে বাঁশীর গানে ?
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি
রাতে তারো ঘুম কি রে নাই বাঁশী কেন বাজায় খালি।

কৃষকবালা গুণমুগ্ধা নায়িকা। নায়কের গুণগুলি কবি এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন কৃষকবালার মুখ দিয়া—

একদিনে সে দশটি বিঘা ফেলতে পারে একাই রুয়ে
বৃধীর মত ঢুখোল গাই ও একলহমায় ফেলে দুয়ে
মস্ত ষাঁড়ের শিঙটি ধরে
ফিরায় সে যে গায়ের জোরে
তাল নারিকেল গাছে উঠে পায়ের জোরে লাফায় ভুঁয়ে
দেখি তাহার সাঁতারকাটা অবাক হয়ে কলসী থুয়ে
কবির দলের দোহারীতে যায় সে মেতে পরাণ খুলে
বাউল নাচে ঘুঙুর পায়ে নাচে সে যে হাতটি তুলে
গাজনদিনে সন্নিসি সাজ
বাবরী চুলের ঢেউ খেলা ভাজ
মনসাতলায় মালামো তার করে না দেখে পরাণ ভুলে
আমার ত কেউ নয়কো তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে।

পল্লীগ্রামে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এইগুলি যে নায়কের উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এবং কবিও ইহা সুন্দরভাবে যথাযথ বর্ণনাই করিয়াছেন, কবিতার পরের অংশে—

কাণে গোঁজা সন্ধ্যামণি নতুন তালের ছাতি কাঁধে
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে যদি আবার কোমর বাঁধে
বৃন্দাবনের কালার পারা,
করে আমায় আপন হারা,
তারি পায়ে পড়তে লুটে শুধু আমার পরাণ কাঁদে
বাঁশী পাচন ধরে যখন কালায় মতন মোহন ছাঁদে।

এই স্থলে কবি অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের, অসাধারণও অতি প্রসিদ্ধ বস্তুকে উপমা স্থল করিয়া সাধারণ ও সামান্ত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই জন্ত রসাংশে কিঞ্চিৎ হানি হইলেও নায়িকার প্রীতি ও একনিষ্ঠার প্রগাঢ়তা দৃষ্ট হইয়াছে। কবিতায় বালিকার পূর্ব্বরাগের যথেষ্ট নিদর্শন আছে, যথা—

আমি যখন দাদার লাগি ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে
কণ্ঠরি গান গেয়ে গেয়ে ভুঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে।
সে যদি চায় নয়ন তুলে
তবে আমার মনের ভুলে
বাবলা বেড়ায় আঁচল বাধে পিছনে পড়ি পিছল বাটে
অই আলো মোর মনটা লোটায় শরীর চলে বিলের মাঠে।

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্তও শকুন্তলার অবস্থা এইরূপই—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং • নীয়মানস্থ॥
দর্ভাঙ্কুরেণ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা ইতি।

কবিতাটির একটি বিশেষ দষ্টব্য বিষয় এই যে নায়কের নায়িকার প্রতি কোনরূপ প্রীতি প্রদর্শনের চিহ্ন মাত্রই নাই। ইহা কেবল একদিক দর্শাইতেছে—

(Tennyson এর May Queen ও তদ্রূপ। May Queen তাহার নায়কের প্রতি কোনরূপ প্রীতি-প্রদর্শন করিতেছেন না।)

He thought I was a ghost, mother, for I
was all in white
They call me cruel-hearted, but I care not
what they say
For I am to be queen of the May, I am
to be queen of the May,
They say he is dying all for love, but that
can never be
They say his heart is breaking mother,
what is that to me ?
There is many a bolder lad who will
woo me any summer day
And I am to be queen of the May, mother,
I am to be queen of the day.

পূর্ব্বরাগের ফলে অত্যন্ত মানসিক চঞ্চলতা, নিদ্রাহীনতা হেতু তাহার স্মৃতি বিভ্রম ও দৈহিক অসুস্থতা উৎপন্ন হইয়াছে।

"রাজানং কামিনং চৌরং প্রবিশন্তি প্রজাগরাঃ।"

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে।

শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈর বিগময়ন্ত্যুনিদ্র এব ক্ষপাঃ।

অন্যমনস্কতা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই কবিতার অংশ হইতেই ব্যক্ত হয়—

আমার এমন কি হলো কেন হু হু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুটনা কোটায় আঙুল কাটে
হাট যেতে হায় যাইগো মাঠে
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই নুনের সরা দুধেই ঢালি
আমার যে বোন আসছে কাঁদন হু হু করে প্রাণটা খালি।

কবিতাটির বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় কবিতাটির ঘটনা সমাজ-সঙ্গত কি না? কৃষকবালিকাদের বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হইয়া থাকে। আধুনিক সভ্য ও পাশ্চাত্যগৃহে শিক্ষিতা ও প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার মুখ হইতেই এইরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি কৃষি সম্পন্ন আধুনিক যুগের পরিচয় দেয় বলিয়াই সকলের চিত্তাকর্ষক। শকুন্তলার যুগে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বাধীন প্রেম ও প্রীতি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ সংরক্ষণশীল কৃষককুলের মধ্যে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে তাহা বিবেচ্য।

"পল্লীবধূ" কবিতাটিও পল্লীজীবনের একটি সুন্দর দৃশ্য প্রস্ফুটিত করিয়াছে। পল্লীবধূগণের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ নিজের ও বাহিরের লোকের চক্ষুর অগোচরেই হইয়া থাকে। তাঁহাদের কার্য্যের কোন প্রচার নাই, অন্তঃকরণের শোভনতায় তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্য দিয়া জীবনের ধারা স্বচ্ছ ও মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছে। গোময় মাডুলি লেপন, তুলসী-তলমার্জ্জন, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, বালক-বালিকাদের স্নান ও শৌচাদি ক্রিয়াসম্পাদন, অতিথি ভিখারীদের সন্তুষ্ট করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি, শ্বশুর-শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের সেবাশুশ্রূষার কার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহারা দৈনিক অগ্রসর হইতে থাকেন।

উচ্চ হাসিটি শোনে নাই কেহ, নাহি রাগ অভিমান
আঁখিপুট তলে নয়নের জলে সব ব্যথা অবসান,
গৃহকোণে সদা শুভদা বরদা কেহ না জানিতে পায়,
কুটীরে কুটীরে লক্ষ্মী অচলা তবু রটে গোটা গাঁয়
ননদীর গালি তাড়নায় তার ধ্যান গরিমা না টলে।
গৃহকাজে কার হয়েছে কঠোর ক্ষয় হয়ে গেছে শাঁখা
হলুদ কাজলে সিঁদুর তৈলে সতীর মহিমা মাখা।
লজ্জা সরম সজ্জা পরম অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধন নিরতা এযে গো পল্লীবধূ।

পল্লীবালিকা "দুলালী" শ্বশুরভবনে গত হইলে তাহার পিত্রালয়ে অনুপস্থিতিহেতু দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিতেছে, এক কথায় বলিতে পারা যায় বালিকা দুলালী তাহার পিতৃভবনে অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছিল। গৃহকর্ম্মের সকল বিষয়ে তাহার সমভাগিত্ব আছে। তাহার শ্বশুরালয়ে গমনে পিত্রালয়ে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া শকুন্তলার অভাবে কণ্বমুনির আশ্রমের অবস্থার কথা মনে পড়ে। তাহার শ্বশুরালয় গমনের সময় নিদাঘ কলি। কারণ কবি প্রথমেই বলিতেছেন—

পড়িছে ঝলসি কুন্দ অশোক জাতী যূথীমাধবী গন্ধরাজ
সেফালি চামেলি ঝড়োছিল বড় পিয়াসায়
খরতাপে আহা শুকায় বিকল নিরাশায়
শ্রীফলপত্র আজি দেব পূজা উপচার
তুলসীমাত্র সাজ
গৃহের লক্ষ্মী দুলালী গিয়াছে পরঘরে
এ গৃহ আঁধার আজ।

এই স্থানে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই সকল ফুলগুলি একই সময়ে বোধ হয় প্রস্ফুটিত হয় না, কবি বোধ হয় কোন আদর্শ সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন যখন সকল পুষ্পোদ্গম হইয়া থাকে। শেষের ছত্র কয়টি অতি চমৎকার হইয়াছে—

আহা সে যে কোন অপরিচয়ের মাঝ
তথা গৃহভরা হাস্যোৎসব
আহত নিরত ফুল সব নদী কল্লোলে
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন অঞ্চলে
নাহিক ব্যথার সাথী।
মা হারা এই গৃহ কাঁদে হেথা হায় লুটে
নিভায়ে ঘরের বাতি॥

অনিবার্য্য

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

দুঃস্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই বোধ করি অস্বস্তিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম আসিতে চাহে না, আসিলেও সেই ক্ষণিকের ঘুমটুকু কেবল স্বপ্নে ভরা এবং সেই স্বপ্নগুলি কেবল দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিবে। যেন কেহ যাইতে চাহে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার বিপুল প্রয়াস করি, ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবশেষে হতাশ্বাস ও ক্রন্দনের মধ্যে নিদ্রা টুটিয়া যায়। জাগিয়াও তাহার প্রভাব মনকে খানিকক্ষণ অভিভূত করিয়া রাখে, বিমর্ষ হইয়া যাই।

এই বিশ্রী স্বপ্নগুলি দেখিবার কারণ কি? মনে মনে অনেক সময় ভাবি। সহস্র ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া শুইলেও স্বপ্নের পট পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার কারণ জীবনে বহু আশাভঙ্গ, বহু মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া মন ভাঙ্গিয়া আছে। সর্ব্বদাই আতঙ্কে থাকি। সেই সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত মন সুপ্তির অচেতনার অন্তরালে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নরূপে আসে কেবল জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষ।

নিরুপায় মানব-আত্মার ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠি। ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উঠিয়া বসিলাম। চলন্ত ট্রেণের একটানা সুর বাজিতেছে। মেল ট্রেন—অতিদ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। চারিদিকে প্রাণ জুড়ানো স্নিগ্ধতা। পাতায় লতায় শিশিরের সিক্ততা শ্যামলতাকে গাঢ়তর করিয়াছে। দূরে আঁধারের অস্পষ্ট আভাসের সম্মুখে কুজ্ঝটিকার আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। দিকচক্রবাল রেখা ক্রমেই স্ফুটতর হইতেছে। পূর্ব্বদিকে অরুণিমার বিকাশ হইতেছে, এখনি স্বর্ণরেণু ঝরিয়া পড়িবে ধরিত্রীর শ্যাম অঙ্গে। দেখিতেছিলাম, কি মধুর দৃশ্য, কি গভীর স্তব্ধতা! সকলে এখনও ঘুমাইয়া আছে—স্বামীও পুত্রকন্যা। মৃদু শীতের আমেজে সকলেই গাত্রবস্ত্রগুলি নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ঘুমাইয়া আছে। ট্রেণের কামরা নির্জ্জন। একা আমি জাগিয়া আছি।

সময়ে সময়ে একা নির্জ্জনে পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণে আনিতে বড় ভাল লাগে। কত কথাই মনে আসিতেছে।

জানালা দিয়া দেখা যায় পশ্চিমের রুক্ষতা চলিয়া গিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি ছাড়িয়া আসিয়াছি।

বাঙ্গালার শ্যামলতা ক্রমেই গাঢ়তর হইতেছে। মাটির বুক ভরিয়া অসংখ্য নারিকেল ও তালের গাছ, ছোট ছোট পুকুর, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ি। বধূরা কলসে জল লইতেছে, কেহ বা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। চাষীরা বলদ লইয়া মাঠে যাইতেছে। দেখিতে বড় ভাল লাগে।

দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি বাঙ্গালার অভ্যন্তরের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ব্যবধানে দেশে ফিরিতেছে—শ্বশুর বাড়ীর দেশে।

বাল্য ও কৈশোরের মধুমাখা দিনগুলি আজ আবার নূতন করিয়া মনে পড়িতেছে।

আমার পিতা থাকিতেন বিহারের এক ক্ষুদ্র সহরে কিন্তু বিবাহ হইল বাঙ্গালার এক পল্লীগ্রামে। পিতা সুপাত্র দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, গ্রামের কথা বিশেষ ভাবেন নাই।

বিবাহের পর যখন গ্রামে প্রথম ঘর করিতে আসিলাম প্রথম দিকে মনে আমার অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করিতাম। দীপের অনুজ্জ্বল আলোক, সন্ধ্যারাত্রে শিয়ালের উচ্চচীৎকার, মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার করিত। স্নান করিতে হইবে পুকুরে। সে কেমন করিয়া করিব? মাঘের শীতে পুকুরের কালো জল যেন দৃষ্টির ভিতর দিয়া বরফের ছুরির মত প্রবেশ করিত কিন্তু তবুও ওই জলেই স্নান করিতে হইবে। কিন্তু সকল ভীতির সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছিল অজস্র সোহাগে আদরে প্রীতিতে। সমবয়স্কা বাল্যসখী ননদগুলি দুই চারিদিনেই অপরিচয়ের সকল বাধা দূর করিয়া দিল। জল ঠাণ্ডা লাগে, শীতের দিনে পুকুর ধারে পাতা জ্বালিয়া তাহারা জল গরম করিয়া দিয়াছে, আমার কুণ্ঠার বাধা মানে নাই।

ছোট ছোট দেবরগুলি তাহাদের মুখরোচক খাদ্য বৌচ, কুল, কামরাঙ্গা সংগ্রহ করিয়া কতদিন আনিয়া খাওয়াইয়াছে। বই পড়িতে ভালবাসিতাম। বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া

দিয়াছে। আজও তাহার স্মৃতি মনে মধুর হইয়া জাগিয়া আছে। অথচ তাহারা আমার আপন ননদ-দেবর নয়, গ্রাম সম্পর্কেই তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ।

বিবাহের পরই স্বামীর পাঠ সাঙ্গ হয়, তিনি ভাগলপুরে থাকিতেন চাকরীর ট্রেনিংএ। গৃহে থাকিতাম আমি ও শ্বশ্রূমাতা। শ্বশ্রূমাতার সস্নেহ ব্যবহারে পিত্রালয়ের অভাব একদিনের জন্যও অনুভব করিতাম না।

সন্ধ্যার দিকে সঙ্গী হইত অরুণ। সহসা মনে পড়িল অরুণের কথা। কেমন আছে সে কে জানে!

অরুণ গ্রামেরই একটি ছেলে। তাহার প্রথম দিনের আগমন আজও মনে পড়ে। আসিয়াছিল ছোট একটি এঁচোড় আমার শাশুড়ীকে দিবার জন্য। প্রিয়দর্শক লাজুক বালক। শাশুড়ী তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। "অরুণ, এ তোর বৌদিরে, লজ্জা কিসের?"

হাসিয়া অরুণ সলজ্জে আমাকে প্রণাম করিল।

আমার শাশুড়ী বলিলেন, হ্যাঁরে শুনছি তোর মাষ্টার নেই, তা তুই বউমার কাছে এসে সন্ধ্যে বেলায় পড়িস না কেন, পড়িস, বুঝলি? মাকে বলে পড়তে আসিস, জানিস বৌমা আমার ইংরেজী লেখাপড়াও জানে।

এই কথাটি আমার শাশুড়ী প্রায়ই গর্ব্বের সহিত সকলকে জানাইতেন যে, তাঁহার বৌমা ইংরেজী লেখা-পড়া জানে। তাঁহার স্নেহপূর্ণ গর্ব্বোজ্জ্বল মুখখানি আজও স্মরণ করিলে আমার অশ্রুপূর্ণ আঁখির সম্মুখে ভাসে। অরুণ বিস্মিত চোখে ইংরেজী শিক্ষিতা বিদুষী বৌদির পানে একবার দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা জ্যাঠাইমা আসব।"

ইহার পর তাহাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হয় নাই। প্রায় নিত্যই সে আমার নিকট পাঠ বুঝিতে আসিত।

শাশুড়ী কখনও বসিয়া সুপারী কাটিতেন, কোনও দিন নিকটে শুইয়া থাকিতেন।

আমরা মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিতাম। দীপের আলোকে কখন অরুণ লিখিত, কোন দিন পাঠ অভ্যাস করিত, আর কোন কোনদিন বা কেবলই গল্প করিত। তাহাদের ক্লাসের ছেলেদের দুষ্টামীর গল্প, মাষ্টারদের গল্প। পড়িতে বলিলে শুইয়া পড়িয়া বলিত, "আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না বৌদি, একটা গল্প বল।"

কন্‌ট্রাক্টারীতে অরুণের পিতামহ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। মস্তবড় বাড়ী ও প্রচুর অর্থ পুত্রদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এক পুরুষে সেই অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। সংস্কার অভাবে সেই বৃহৎ বাটী অত্যন্ত শ্রীহীন এবং জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ—বিদ্যাহীন, শিক্ষাহীন ও দুশ্চরিত্র মাতালের বংশ। অরুণের ঠাকুর্দ্দাও মদ খাইতেন কিন্তু তাহা সীমা অতিক্রম করিত না, ফলে বিদ্যা তাঁহার না থাকিলেও বুদ্ধিবলে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহা সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু অরুণের পিতা ও জ্যেঠ্যাতাত উভয়েই ঘোরতর অসংযমী ও মাতাল। ধনীপিতার পুত্রদ্বয় উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে সম্পূর্ণ ভাসিয়া গিয়াছেন। অরুণের জ্যেঠতাত তাঁহার সম্পত্তি খোয়াইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

অরুণের পিতা ঘোরতর মাতাল। মদ্যপান করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রকে নিদারুণ প্রহার ও লাঞ্ছনা দেন। অত্যন্ত কুৎসিৎ ও নিন্দনীয় ব্যক্তি তিনি।

অরুণ সেই পিতার পুত্র কিন্তু মনে হয় ভিন্ন প্রকৃতি ও আকৃতি। কমনীয়, সুদর্শন, লাজুক, সরল বালক। অতি ভদ্র নম্র সুমিষ্ট তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার ব্যবহার।

পুত্রের এমন সুবুদ্ধির কারণ তাহার মাতা। অরুণের মাতা বা আমি যাঁহাকে কাকীমা বলি তিনি অতিশয় সুশীলা, স্থির ও ধীর প্রকৃতির নারী। এত মিষ্ট তাঁহার কথা-বার্ত্তা যে বার বার শুনিতে ইচ্ছা হয়। কণ্ঠস্বরে তাঁহার একটী অনির্ব্বচনীয় কোমলতা ছিল, শুনিতে ভাললাগিত। যৌবনে সুন্দরী ছিলেন, তাহা তাঁহার দারিদ্র্যসংঘাতে ও মনঃকষ্টে জর্জ্জরিত আকৃতি দেখিলেও বোঝা যাইত।

তিনি মধ্যে মধ্যে আমার শাশুড়ীর নিকট আসিতেন। বেশীর ভাগ দিনই তাঁহাকে আসিতে হইত কোন্‌ না কোন রন্ধনের দ্রব্য চাহিতে, তাহাতে লজ্জায় যেন তিনি মরিয়া যাইতেন।

আমার শাশুড়ী তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাইতেন সান্ত্বনা দিতেন। কতদিন শুনিয়াছি তিনি বলিতেন, "দুঃখ করো না কাত্যায়নী, তোমার অরুণকে দেখলেই মনে হয় ভাল ছেলে হবে। আহা বাছা বেঁচে থাক, বড় হয়ে তোমায় সুখ শান্তি দেবে।"

কাকীমা হাসিয়া উত্তর দিতেন, "আমার সুখের আশা আর করি না, তবে মনে হয়, ভাল হলে ওরই ভাল।"

কখনও কখনও বলিতেন, "যে বংশের ছেলে, দিদি, ভয় হয় যে ওই ধারা এড়িয়ে যেতে পারবে কি না।"

আমার শাশুড়ী আশ্বাস দিতেন, "না না ওর ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় ওর বাপ-জ্যাঠার মত হবে না আর তোর রক্তও তো ওর গায়ে আছে।"

খুড়িমা হাসিতেন, "আমার রক্ত গায়ে থাকলে কি হয় দিদি, বংশের রক্তের জোর ঢের বেশী, ওদের সে তো তুমি চোখেই দেখছ।"

কাকীমার পুত্রের প্রতি অনাস্থায় শাশুড়ী ক্ষুব্ধ হইতেন, বলিতেন, "লেখাপড়া শিখলে দেখো ও খুব ভাল ছেলে হবে।"

আমার শাশুড়ীর ধারণা ছিল যে বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা কোনও মন্দ কাজ হইতে পারে না।

কাকীমার কথা শুনিয়া মনে হইত যে, যত আশঙ্কাই মনে তিনি পোষণ করুন তবু তাঁহার মধ্যে ক্ষীণ আশাও থাকিত যে অরুণ মানুষ হইবে, সে ভাল হইবে এবং হয় ত বাঁচিয়া থাকিলে শেষ বয়সে তিনি শান্তি পাইবেন। হয় ত এই আশাই তাঁহাকে সঞ্জীবীত রাখিত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও।

একদিন সন্ধ্যায়, সেদিনের কথাটি আজও আমার স্পষ্ট স্মরণ হয়, আমি বসিয়া একখানা দৈনিক কাগজ পড়িতেছিলাম এবং অরুণ তাহার হাতের লেখা লিখিতেছিল। সহসা অরুণ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "বৌদি, তুমি গোপালদাকে চেন ?"

আমি পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিলাম, "না, কে তোমাদের গোপালদা, তাকে আমি কি করে চিনবো ভাই ?

"সে কি, গোপালদাকে তুমি চেন না! সবাই জানে আর তুমি জান না, আশ্চর্য্য।" বিস্ময়ে অরুণ অবাক হইয়া যায়। আবার সে চিনাইবার চেষ্টা করিল, "সেই যে সেই যিনি দুর্গা-পূজোয় তাঁদের বাঙ্গাল দেশের মত আরতি করেছিলেন, দেখনি তুমি ?"

আমি বলিলাম, "আরতি দেখেছিলুম কিন্তু গোপালদাকে দেখিনি, অন্ততঃ মনে তো পড়ছে না।"

চিনাইবার চেষ্টায় হতাশ হইয়া আবার বলিল, "গোপালদা চরকাকেটে জেলে গিয়েছিলেন, নুন তৈরী করে জেলে গিয়েছিলেন, সে সব শুনেছ ?"

আমি হাসিলাম "না, ওসব কিছু শুনিনি কিন্তু কি করেছে তোমার কীর্ত্তিমান গোপালদা, সেইটেই বল না ?"

"ওঃ আচ্ছা!" মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল, "না কিছু করেননি। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের স্কুলে আসেন টিফিন পিরিয়েডে আমাদের অনেক গল্প বলেন। আজ এসেছিলেন, অনেক দিন পরে। আজও অনেক বীরের গল্প ক'রতে ক'রতে আলেকজান্দার দি গ্রেটের মাতৃভক্তির একটা গল্প বললেন। মায়ের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন জান ? এই দেখ, আমার মুখস্থ নেই লিখে নিয়েছি বৌদি, তুমি পরে দেখ।" বলিয়া অরুণ তাহার লাল কাগজের মোটা খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

আমি ইংরেজী পড়িতে ও বুঝিতে পারিতাম। অল্প বয়সে আমি মাতৃহীন হই। পিতা অনেক যত্নে তাঁহার মাতৃহীনা কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাই তখনকার দিনেও আমি ইংরেজী বিদ্যা কিছু শিখিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার খাতায় মোটা মোটা কাঁচা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"Antipater does not know that a drop of Alexander's mother's tears can sink the whole world."

অরুণ বলিল, "মানে জান বৌদি ? মানে হচ্ছে, আলেক-জান্দারের মায়ের এক ফোঁটা চোখের জলে সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবে যেতে পারে। তারমানে গোপালদা ব'ললেন যে, আলেকজান্দার তাঁর মাকে এত ভালবাসতেন যে তিনি তাঁর সামান্য দুঃখও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর জন্য তিনি সব ক'রতে পারতেন।"

"শুনে বড় ভাল লাগল কথাটা, তাই গোপালদাকে জিজ্ঞেস করে লিখে নিয়েছি। মুখস্থ করে ফেলব। কাল তোমায় মুখস্থ দেবো বৌদি।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে সে-দিন বালকের কথা শুনিয়াছিলাম। কাকীমার কথা স্মরণ হইয়াছিল এবং হয় ত বা মনে হইয়াছিল যে, এত অল্প বয়সে যাহার অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ সে বালক হয় ত কাকীমাকে সুখী করিবে।

মুখে বলিয়াছিলাম, "অরুণ তুমিও এমনি ভালবাসবে কাকীমাকে ?"

মস্তক হেলাইয়া উত্তর দিয়াছিল, নিশ্চয়।

আমি বলিয়াছিলাম 'তবে তো কাকীমার আর কোন কষ্ট থাকবে না তুমি বড় হলে।' অরুণ স্থির বিশ্বাসের সহিত বোধ হয় উত্তর দিয়াছিল, 'না বৌদি মাকে আমি খুব যত্ন ক'রব।'

বহুদিনের কথা এসব। প্রায় ২৫।৩০ বৎসর আগেকার কথা।

তাহার পর আমার স্বামী তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষিত, এম্-এ পাশ ছিলেন। বড় চাকুরীতে বাহাল হইয়া বহুদিন সিমলা পাহাড়ে বাস করিতেছেন। শাশুরী তাঁহার পুত্রের চাকুরী পাইবার অল্পদিন পরে গত হন। স্বামীর নিকট আমি চলিয়া যাই। আমিও দেশ ছাড়িয়াছি বহুদিন—প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে। প্রথম দিকে অরুণ পত্র দিত। দেশের খবর অল্প-স্বল্প পাইতাম। ধীরে ধীরে সেও পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। আমার সংসার বাড়িয়াছে সন্তানাদি হইয়াছে, তাহাদের পড়া-শুনা, বিবাহ ইত্যাদিতে বাহিরের সংবাদ পাইবার অবকাশ পাই নাই।

আপনার সংসারের বৃহৎ, তুচ্ছ সুখ-দুঃখের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া বাহিরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি প্রায়।

আজ সংসারের ক্ষণিক মুক্তির অবসরে অনেক কথা মনের মধ্যে ভিড় জমাইয়াছে। তাই দেশাভিমুখী হইয়া পুরাতন অনেক স্মৃতিই স্মরণে আসিতেছে।

একে একে অনেক কথা মনে পড়িতেছে, সেই পল্লী, সেই গ্রাম এবং তাহার যত নরনারী।

অরুণের সেই সরল, সুন্দর মুখখানি, কাকীমার সেই মৃদু হাসি, মধুর কণ্ঠস্বর। কেমন আছে সব? কেমন আছে অরুণ? কত বড় হইল? কি করিতেছে?

দুই

গ্রামে পৌছিয়া ঘরদরজা পরিস্কার করিতেই দুই চারিদিন কাটিয়া গেল। পাকা দোতলা বাটী হইলেও দীর্ঘদিন সংস্কার অভাবে জীর্ণ হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে গ্রামে রটিয়া গেল যে, আমার স্বামী অত্যন্ত ধনী হইয়া পুনরায় গ্রামে বসবাস করিতে ফিরিয়াছেন।

একে একে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ দেখা করিতে আসিতেছেন। দিনে রাত্রে আমার অবসর হয় না। গৃহ সংস্কারের সকল ব্যবস্থা এবং সামাজিকতা বজায় রাখিতে হয়। অবশেষে স্বামী ও পুত্রকন্যার স্বাস্থ্যরক্ষার সকল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিয়া ক্রমে ক্রমে পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত গ্রামখানিকে দেখিবার আগ্রহ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আলো হাওয়া ও দিনরাত্রির বদল হয় না। কিন্তু মনে হইতেছে সকল রকমেই গ্রামখানি বদলাইয়া গিয়াছে এবং আমিও বদলাইয়া গিয়াছি মনে প্রাণে। খালি গ্রামের একটু মধুময় স্মৃতি ছোট্ট একটি স্বপ্নের মত মনের মাঝে রহিয়াছে। বাটীর সামনে পশ্চিম দিকে বোসদের যে তৃণাস্তৃত বিস্তৃত ভূমি পড়িয়া থাকিত তাহার মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এক মস্ত সিনেমা হাউস।

তাহার পাশেই মস্ত বাজার বসিয়াছে। আমাদের গৃহখানি ছিল বসতিবিরল ঘন ঝোপ-ঝাড় ঘেরা জমির মধ্যে। এখন দেখিতেছি সমস্ত পরিষ্কার হইয়া বাটীর চারিপার্শ্বে অজস্র নূতন বাটী হইয়াছে। অজানা লোকদের বাটী, নূতন মুখ সব। কথা কহিয়া তৃপ্তি হয় না। তাহাদের দেখিয়া আরাম পাই না। পুরাতন সঙ্গী সঙ্গিনীদিগের মুখ স্মরণে আনিয়া মনটা খাঁ খাঁ করে। সমাগতা প্রতিবেশিনীদের নিকট তাহাদের সন্ধান লইতে গিয়া শুনি, কেহ মারা গিয়াছে কেহ বিদেশবাসী হইয়াছে। মোটকথা আমি যেমনটি চাহিতেছি তাহা নাই। সকালে উঠিয়া পুত্রকন্যাদিগের জলযোগের আয়োজন করিয়া দিয়া কুটনা কুটিতে বসিয়াছি এমন সময় সদুপিসি আসিলেন। তিনি বরাসফুল লইতে আসিয়াছেন। পাহাড় হইতে আসিয়াছি যদি বরাসফুল আনিয়া থাকি তবে তাহা যেন কিছু তাঁহাকে দিই কারণ তাহার নাতনীর রক্ত আমাশয় হইয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল বরাসফুল রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। কন্যা মীরা পান আনিয়া দিল। পুরাণো দিনের লোক সদুপিসি, তাঁহার নিকট গ্রামের কথা শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক খবর পাইলাম।

অরুণ ও কাকীমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, তাঁহারাও এ কয়দিনের মধ্যে দেখা করিতে আসেন নাই। আজ সদুপিসিকে কাকিমা ও অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কি এ গ্রামে নাই?

মুখখানি তাঁহার গম্ভীর হইয়া গেল, বলিলেন, "তুমি শোন নি মা, ওদের কথা? অরুণ? সে ছোঁড়া তো একেবারে বয়ে গেছে। মাতাল বদমায়েস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর হবে নাই বা কেন? কি বাপের ছেলে, কি বংশের ছেলে? দুঃখ হয় বৌদির জন্যে—ওর মার জন্যে।

অমন যে সুন্দরী তা সে রূপ এক বাঁদরের হাতে পড়ে বৃথাই গেল। চিরকাল মনোকষ্টে কাটলো। যদি স্বামী মরে একটু শান্তি পেলে তা সে শান্তিও থাকতে দিলে না ছেলে। বুড়ো বয়সে খোয়ারের অবধি নেই।

রূপে গুণে রাজপুত্তুরের মত ছেলে ছিল। আর ভাল ছেলে বলেই তো বে' থা দিলে ছেলের। কিন্তু কপাল, কপাল যাবে কোথায়?" সদুপিসি আপন কপালটা একবার চাপড়াইলেন।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। অরুণ মদ খায়? মাতাল? শেষে অরুণও! পুনরায় সদুপিসিকে প্রশ্ন করিলাম, "কেমন করে এমন হল পিসিমা? ছেলেটিতো ভারি ভাল ছিল পড়াশুনোয়, নম্র ব্যবহারে খুব চমৎকার বলেই তো মনে হতো।"

সদুপিসি কহিলেন, "হঁ্যা মা ছিলও তো তাই। তাই ভরসা করেই তো মা বিয়ে দিলে, এখন বউটার দুর্দ্দশা দেখে কাঁদে আর বলে, 'এ পাপের শাস্তি সবটা আমার। আমি জেনে শুনে, ওদের বংশের ধারা সব জেনে, কেন ছেলের বিয়ে দিলুম।' তা তুই কি করবি? তুই তো ছেলেকে শেখাসনি আর মাতাল হবার পরও বিয়ে দিস নি। বউয়ের তো একটা আলাদা কপাল আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মদ খেতে শিখলো? কেমন করে?"

সদুপিসি কহিলেন, "ফ্যাক্টারীতে। ওই ফ্যাক্টরী অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করেছে। তোমরা চলে যাবার ক'বছর পরে বাবা মলো তখন ছোঁড়া ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বাবা মরতে লেখা-পড়া ছেড়ে দিল। ঘরে তো কিছু ছিল না বাবা সব উড়িয়ে পুড়িয়ে গেছলো। ফ্যাক্টারীতে কাজ পেলে। তা বেশ মাইনে। ভাল করে কাজ করতে লাগলো। মা বিয়ে দিলে। কিন্তু সঙ্গতো ভাল নয়। রাত্রিতে কাজ করলে, বেশী কাজ করলে বেশী টাকা পাওয়া যায়। রাত্রের বন্ধুরা বোঝালে ওষুধের মত একটু-আধটু মদ খেলে শরীর তাজা থাকবে। রোজগারের নেশায় বোধ হয় তাই সুরু করলে। তারপর সুরু করলে ও রক্তের দোষ যাবে কোথায়? দেখতে দেখতে ঘোর মাতাল হয়ে উঠলো। বেশী রোজগার দূরে থাক এখন সব পয়সাই উড়ে যাচ্ছে।

৫।৭টি ছেলে পিলে। বউ কিছু বলতে গেলে বা বোঝাতে গেলে তাকে ধরে মারে। মেজাজ হয়েছে তিরিক্ষি।

মাকে এমনিতে মেনে চলে, তবে মাঝে মাঝে মদের ঝোঁকে তাও বলে বৈ কি। শুনি মাকে ইংরেজীতে গাল পাড়ে। মায়ের কপাল, এমন মা!"

আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। আরও দুই চারিটা কথার পর পিসিমা উঠিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "একবার অরুণের মার কাছে সময় করে যেও বউমা, তোমায় দেখলে হয় ত খুশী হবে।"

সহসা আমার সমস্ত দিনটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। মনটা এক অবর্ণনীয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অরুণকে আমি সত্যই ভালবাসিতাম। আমার ভ্রাতৃহীন হৃদয়ে সে ভাইয়ের স্থান লইয়াছিল এবং ভাই বলিয়া মনে করিবার মতই সেই বালক—সুন্দর প্রিয়দর্শন বালক। কত মিষ্ট কথা, মিষ্ট ব্যবহার। একে একে সব কথাই মনে হয়। কত দিনের কত কথা। অবশেষে অরুণ এমনি হইয়া গেল! এতগুলি লোকের কল্যাণ আশীষ বৃথা হইয়া গেল?

আমার শাশুড়ীর কথা মনে হয়। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, অরুণ যেন মানুষ হয়। কত সান্ত্বনাই কাকীমাকে তিনি দিয়াছেন। সব বৃথা হইয়া গেল!

কাকীমার মুখ মনে পড়ে। রক্তের ত্রুটি এমনই মারাত্মক যে অবশেষে কাকীমার সকল আশঙ্কাকে সত্য করিয়া অরুণ তাহাদের বংশের ধারাই বজায় রাখিল।

কাকীমা আজও বাঁচিয়া আছেন। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন হয় ত এই একটি সান্ত্বনাকে নীরবে পোষণ করিয়া যে পুত্র তাঁহার মানুষ হইবে। কিন্তু আজ?

পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। নিজের দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি চোখে দেখিতে দেখিতে আপন অদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন। আর সেই বধূটি!

সান্ত্বনা দিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই, শুধু অন্তরের সহানুভূতি নীরবে নিবেদন করিয়া আসিব বলিয়া স্থির করিলাম।

অরুণ, না, অরুণকে আর আমার দেখিতে ইচ্ছা হয় না। আমার মনে তাহার সেই সরল বালক-মূর্ত্তিই অঙ্কিত থাকুক।

সে যে বংশের ছেলে সেই বংশের মত হইয়াছে, বলিবার কিছুই নাই। বাঁচিয়া থাক।

তিন

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছি। নীচে পড়ার-ঘর হইতে ছেলে মেয়েদের পড়ার আওয়াজ আসিতেছে।

চাকরকে একটি লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে আসিতে বলিয়া কাকীমার বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

অরুণদের বাটী আমাদের বাটী হইতে খানিক দূরে মুখুয্যে পাড়ায়। খানিকটা রাস্তা হাটিয়া তবে উহাদের বাটীতে পৌছান যায়।

বাটীর সম্মুখে পৌছিয়া চাকরকে লণ্ঠন হাতে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পথ দেখিয়া ভিতরের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীটা পড়োবাড়ীর মতই নীরব। অতবড় বাড়ী অন্ধকারে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। অঙ্গনের চারিপাশ ঘেরিয়া মস্ত দালান ও কোলে কোলে ঘর। একদিকে কয়েকটা ঘরে বোধ হয় ইঁহারা থাকেন। প্রদীপের মৃদু আলোক দেখা যাইতেছে। আর সব অন্ধকার। মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে, কি কথা বলিয়া প্রথম বাক্যালাপ আরম্ভ করিব? আর একটু অগ্রসর হইতেই কাণে আসিল পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠ, জড়াইয়া জড়াইয়া কি যেন বলিতেছে। শিহরিয়া সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইলাম। অরুণ তাহা হইলে বাড়ীতেই আছে? আর কাহারও তো সাড়া নাই।

অরুণের কণ্ঠস্বর, কি! মাকে গালি দিতেছে? কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম মাতাল জড়িতস্বরে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলিতেছে, "Mother, don't cry. Mother, Antipater does not know that a drop of Alexander's mother's tears can sink the whole world. মা, ওমা কেঁদো না, আমি···আমি তোমার দুঃখু দূর করবো। মা, ওমা"—মাতাল কাঁদিতে লাগিল, অতি মৃদু অতি ধীরে, আবার থাকিয়া থাকিয়া একই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। স্মরণ হইল সতুপিসি বলিয়াছিলেন, মাকে ইংরেজীতে গালি দেয়।

অরুণ তাহার আদর্শ হারাইয়াছে, পন্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জীবনের গতিই তাহার ভিন্নাভিমুখী। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল সে আকাঙ্খা প্রকাশ পাইয়াছিল বালক অরুণের এই লাইন দু'টি মুখস্থ করাতে—আজও তাহা সে ভোলে নাই।

জ্ঞানহারা মাতাল যখন আপনি আপনার ত্রুটি অন্তরে অনুভব করিয়া বেদনা বোধ করে তখন তাহার মনের আদর্শ অন্তরে বিদ্যুতের রেখায় বোধ করি বাহিরে ফুটিয়া উঠে। তাই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অন্তরের কথা প্রকাশ করে।

আধখোলা দরজা দিয়া দেখা যায় পাশের ঘরখানির সম্মুখে মেঝেতে বসিয়া আছেন এক বৃদ্ধা—নিশ্চল নিস্পন্দ। জপ করিতেছেন কিম্বা ভাবিতেছেন, কি ভাবিতেছেন কে জানে?

সন্তানের অবনতি মায়ের নিকট সুদুঃসহ। আমার উপস্থিতি তাঁহার নিকট লজ্জাকরই হইবে। আমি কিছু জানি না, ইহাই তাঁহার জানা থাক। আমার সহানুভূতি তাঁহার দুঃখের নিকট কতটুকু!

অন্ধকারে অঝোরে আমার চোখের জল ঝরিতে লাগিল। নীরবে অবনতমস্তকে ফিরিয়া আসিলাম।

মুরলীবিলাস

শ্রীরামশশী কর্ম্মকার, এম্‌-এ, বিদ্যাবিনোদ

দুই

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে * ঠাকুর রামাঞির জন্মাবধি খড়দহ গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রথম কিশোর যবে ঠাকুর রামাঞি', তখন তিনি জাহ্নবী দেবী কর্ত্তৃক খড়দহে আনীত হন। রামাই বীরচন্দ্র প্রভুকে জ্যেষ্ঠস্থানে প্রণাম করেন। কয়েকমাস পরেও বীরচন্দ্রকে দেখি 'মধুর মুরতি তাহে বয়সে কিশোর' (পুঁথি পৃঃ ৪৭ খ)। কৈশোর সাধারণতঃ ১১ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত ধরা যায়। তাহাতে অনুমান করা যায় তৎকালে বীরচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫, এবং রামাইর বয়স ১৩ বৎসরের অনধিক। সুতরাং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে খড়দহে আগমন হয়।

ঠাকুর রামাই খড়দহে বীরচন্দ্র ভবনে পরম সুখে বাস করিতে থাকেন। 'চাতুর্মাস্য ঐছে রহে শ্রীপাট খড়দহে' (পৃঃ ৪৭খ) চার মাস ঐরূপ থাকেন। কিন্তু কোন্ মাসে তথায় আসেন? পুঁথিতে উল্লেখ আছে—

> মাঘ মাস হৈতে ঐছে বৈশাখ পর্য্যন্ত।
> ভাগবত ভক্তি শিখেন আদ্যন্ত।—পৃঃ ৪৮ ক।

অতএব বুঝা যাইতেছে ১৪৬৮ শকাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে কিম্বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে রামাই খড়দহে আসেন এবং বৈশাখ পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সমস্ত দিন নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীজাহ্নবী চরণতলে বসিয়া দুই ভাই ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তত্ত্বশিক্ষাকালে জাহ্নবী দেবী নায়কনায়িকাভেদের লক্ষণ সুবিস্তারে শিখাইয়া দেন। নায়কনায়িকা লক্ষণ অলঙ্কারশাস্ত্রের বিষয়। এই সব লক্ষণের জ্ঞান বৈষ্ণবগণ বর্ত্তমান কালে 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক শ্রীরূপ রচিত গ্রন্থ হইতে লাভ করেন। কিন্তু তখনও ত সে গ্রন্থ বাঙ্গালায় প্রচলিত হয় নাই। প্রসিদ্ধি আছে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশে প্রচারার্থ প্রদত্ত বহু গ্রন্থের সহিত উক্ত গ্রন্থও আনিতেছিলেন; বিষ্ণুপুরের নিকটে দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত সমস্ত গ্রন্থরত্নই বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর রায় প্রাপ্ত হন এবং শ্রীনিবাস গোস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। যতদূর জানা হইয়াছে তাহাতে উক্ত ঘটনা ১৫০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ঘটে। আলোচ্য পুঁথির ১১৩ সংখ্যক পাতায় এবং ১২৮ সংখ্যক পাতায় লিখিত আছে যে, রামাই বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট বহু গ্রন্থ উপহার পান। তন্মধ্যে 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থদ্বয় ছিল। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার জন্য বীরচন্দ্র পরমানন্দে কয়েকমাস বাঘ্‌নাপাড়ায় রামাই সমীপে অবস্থান করেন। এ বিষয়ের আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া শ্রীঠাকুর রামাঞির তীর্থ ভ্রমণকাহিনী অগ্রে বলিব। ঠাকুর দুইবার ভ্রমণে বাহির হন; একবার দক্ষিণে নীলাচল পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন পর্য্যন্ত।

প্রথমে নীলাচলগমন বর্ণনা করিব। ভক্তিশাস্ত্র পড়িয়া এবং সেই সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় জীবনকাহিনী শুনিয়া রামাঞির সুকুমার মনে দৃঢ় সংকল্প জাগে, প্রভুর লীলাক্ষেত্রগুলি দেখিব। রামাঞির ইচ্ছা, মহাপ্রভুর ন্যায় নিঃসঙ্গে পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বৈষ্ণবসমাজে রাজোচিত সম্মানের অধিকারী বীরচন্দ্রপ্রভুর ভ্রাতৃস্থানীয় রামাই উপযুক্ত পরিজনবর্গ না লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইতে পারেন না! কাজেই জাহ্নবী দেবীর আদেশ মত যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইল। বহু লোকজন লইয়া রামাই শিবিকারোহণে যাত্রা করিলেন। তখন বৈশাখ মাস মাসের শেষে যে যাত্রা হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। পূর্ণ চারি মাস অবস্থানের পর তীর্থ যাত্রার অবসান হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশবর্ষে পদার্পণ করিয়াই ১৪৬৯ শকাব্দের বৈশাখের শেষে রামাই যাত্রা করেন। এত অল্প বয়সে তীর্থ যাত্রার ইচ্ছা জাগা অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না। কথিত আছে শ্রীনিবাস দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সকালে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভের জন্য একাই পুরীতে গিয়াছিলেন।

---

* ১৩৪৭ সালের বৈশাখের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রবীণ পরমেশ্বর দাশ যাত্রীদলের নায়ক নিযুক্ত হইলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও সহচর। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১১শ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ শাখায় পরমেশ্বর দাশের উল্লেখ আছে। "পরমেশ্বরদাশ নিত্যানন্দৈকশরণ" আলোচ্য গ্রন্থের ৫৪খ পাতায় দেখিতেছি—

শ্রীপরমেশ্বর দাশ নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাতায়াত কৈলা রঙ্গে॥

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ২৯১ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় দীনেশবাবু পরমেশ্বরী দাস নামক জাহ্নবীর এক মন্ত্রশিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন কি না বলা কঠিন। যাহা হউক পরমেশ্বর দাশের নেতৃত্বে রামাঞির যাত্রীদল যাত্রা করিল।

যাত্রীদল গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণমুখে 'সুবিস্তার' রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইল এবং 'চতুর্দ্বারে' আসিয়া সেদিন অবস্থান করিল। রামাঞির প্রথম লক্ষ্যস্থল পাণিহাটি গ্রাম। তথায় গৌরাঙ্গলীলার সুপ্রসিদ্ধ রাঘবপণ্ডিতের বাড়ী। রামাই উপযাচক হইয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় রামাইকে 'গৌরাঙ্গের গুণলীলা' শুনাইয়াই তৃপ্ত করিয়াছিলেন—না, 'রাঘবের ঝালি'র হৃতাবশিষ্ট অর্পণ করিয়া কৃতার্থও করিয়াছিলেন, পুঁথিতে তাহার উল্লেখ নাই। অবশ্য সে দিবস তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর বিদায় নেন এবং ক্রমে রেমুণায় উপনীত হন। পথিমধ্যে কত গ্রামে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কত গ্রাম্যজনই তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার সুনির্দ্দিষ্ট সংবাদ নাই। রেমুণায় গোপীনাথ জিউর মন্দিরে সন্ধ্যায় নৃত্যগীত করেন, এবং প্রসাদীমালা ও 'অমৃত-কেলি' নামক বিখ্যাত ক্ষীর প্রসাদ লাভ করিয়া পরমানন্দে পরদিন দক্ষিণপথে অগ্রসর হন। তাহার পর

কথো দিনে কটকে গেলা ক্রমে ক্রমে চলি।
সাক্ষিগোপাল দেখিতে মনে হৈলা কুতুহলি॥
—পুঁথি পৃঃ ৫৬ ক।

দুই বিপ্রের আকর্ষণে মধ্যভারতে বিদ্যানগরে (বর্ত্তমান বিজয়-নগরে?) শ্রীগোপালের প্রকাশ এবং তথা হইতে উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক কটকনগরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা—ইহার বৃত্তান্ত নিত্যানন্দ সবিস্তারে মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহা উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিতেও লিখিত হইতেছে—

নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত দুই বিপ্রের কথা।
যৈছে গোপাল আসি সাক্ষি দীল এথা॥—পুঁথি পৃঃ ৫৭ ক

পুরীর রাজা বিদ্যানগরের বিভব হরণ করিয়াছিলেন। পুঁথির 'এথা' পদটি বিদ্যানগরের গৌরব অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। গোপালজী কোথায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন?

প্রভাতে রামাই কটক ছাড়িয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে 'আঠার নালা' সমীপে উপনীত হইয়া অদূরে শ্রীমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখিতে পাইলেন। তখন যান হইতে

ভুমেতে নামিয়া কৈল অষ্টাঙ্গ প্রণাম। —পুঁথি পৃঃ ৫৭ খ

অতঃপর নাচিতে নাচিতে, নগরের বহিঃসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং অবিলম্বে নগর-উপকণ্ঠে 'নরেন্দ্র' নামক পবিত্র সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। 'নরেন্দ্র' তীরে দাঁড়াইলে পুরীর যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, কবি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। পাঠযোগ্য বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

নারিকেল বন কত আম্র কাঠাল।
খজুর কদলি বন উচ্চ উচ্চ তাল॥
বকুল কদম্ব কত চম্পক কানন।
অশোক কিংশোক কত দাড়িম্বোপবন॥
নানা জাতি বৃক্ষ কত পুষ্পের আরাম।
নানা জাতি পক্ষি ডাকে শুনি অনুপাম॥
পাচির বেষ্টিত কত পুষ্পের উদ্যান।
নানা জাতি ঘর কত দেখিতে সুঠান॥
দালান অট্টালিকা কত চতুশালা ঘর।
নানা চিত্র পতাকাদী দেখিতে সুন্দর॥ ইত্যাদি
—পুঁথি পৃঃ ৫৭ ক

পুরীর এই বর্ণনা কবির কল্পনাপ্রসূত কিম্বা যথার্থ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সুস্পষ্ট হইবে। তবে বলা যায়, এই বর্ণনার সহিত চরিতামৃতের বর্ণনার মিল নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত পংক্তি কয়টীর মধ্যে 'নাথিয়া', 'আম্র', 'অশোককিংশোক' এবং 'উদ্যান' ও 'সুঠান' পদ-গুলির প্রতি শাব্দিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমরা 'আম্র' স্থলে 'আব' দেখিয়াছি।

সঙ্গিগণ সহ ঠাকুর রামাই জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিলেন। 'অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা পড়ে সভে ভূমিতলে।' রামাইর শরীরে অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। তদ্দৃষ্টে

সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধ্যাহ্নের আরতিধ্বনি শ্রবণের পূর্ব্বে রামাই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তার পরে সমুদ্র স্নানের জন্ম প্রস্থান করিলেন। স্নানান্তে সিংহদ্বারে আসিতেই পাণ্ডারা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড় করাইয়া দিল। জগন্নাথদেবের দর্শনে প্রেম-বিহ্বল রামাই প্রণাম করিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে 'পণ্ডিত গোসাঞি' জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া ব্যাপার দেখিতে পান এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। পরমেশ্বর-দাশ গোসাইজিকে চিনিতেন। আরতি অন্তে উভয়ের পরিচয় হইল। পণ্ডিত গোসাঞি পরিচয় পাইয়া সানন্দে রামাইকে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন।

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র পুরীতে 'পণ্ডিত গোসাঞি' নামে পরিচিত। চরিতামৃতের ১ম খণ্ডে ১০ম পরিচ্ছেদে আছে—

বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।

ইনি ভাগবতের উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। রামাই তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে থাকিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বলেন—পণ্ডিত গোসাঞি গৌরাঙ্গের জন্মের ১ বৎসর ২ মাস পরে (অর্থাৎ ১৪০৯ শকের বৈশাখে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহা নরহরির পদে ও প্রেমবিলাস—১৪শ অধ্যায়ে সমর্থিত হইয়াছে। ইনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহপাঠী ছিলেন।

আলোচ্য পুঁথি অনুসারে ঠাকুর রামাই ১৪৬৯ শকে অর্থাৎ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বৈশাখের শেষে দক্ষিণে যাত্রা করেন, এবং আষাঢ়ের প্রারম্ভেই পুরীতে পৌছেন। তৎকালে পণ্ডিত গোসাঞির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব কিনা গ্রন্থান্তর হইতে দেখা যাক। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'ভক্ত-প্রসঙ্গের' ২য় খণ্ডে (পৃঃ ২২২) বলিয়াছেন—১৪৪০ শকে অর্থাৎ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস ১৪।১৬ বৎসর বয়সে পুরীতে গিয়া শুনেন গৌরাঙ্গ দেহত্যাগ করিয়াছেন; পণ্ডিত গোসাঞি রহিয়াছেন। শ্রীনিবাস (১৫৩৩,৩৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার নিকট ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু পণ্ডিতের হস্ত-লিখিত ভাগবতখানি মলিন হইয়া দুষ্পাঠ্য হওয়ায় শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে আসিয়া নূতন পুঁথি সংগ্রহ করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পুরী প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, গদাধর দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসের প্রথম পুরী গমনের কত বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু দেখা যায় (ভক্ত প্রসঙ্গে) দুঃখিত মনে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনের পথে মথুরায় আসেন তখন ১৪৬৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃঃ। তখন সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট ও রূপ দেহত্যাগ করিয়াছেন। শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সনাতন গোস্বামী ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৬ শকে) আর সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে (১৪৭৬ শকে) দেহত্যাগ করেন। রূপ গোস্বামী সনাতনের ৮।৯ বৎসর পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। রঘুনাথ ভট্টও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে (১৪৭৬ শকে) দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে পৌছিয়া শ্রীনিবাস ইঁহাদিগকে মৃত দেখিলেন কি প্রকারে? একই গ্রন্থের মধ্যে সময়ের অসামঞ্জস্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবভক্ত ও লেখক কাহারও সঠিক কাল নির্ণয় অদ্যাপি দুরূহ রহিয়াছে। স্বর্গীয় দীনেশ বাবু History of the Medieaval Period of Baisnava Literature গ্রন্থে আলোচনা করিতে গিয়া, ইহা অনুভব করিয়া পৃথক্‌ভাবে লিখিয়াছেন—ভক্তিরত্নাকরের মতে চৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১২।১৩ বৎসর বয়সে শ্রীনিবাস পুরী যান; কিন্তু 'প্রেমবিলাস' মতে চৈতন্যের মৃত্যুর বহুপরে শ্রীনিবাসের জন্মই হয়; যুবক শ্রীনিবাস ২০ বৎসর বয়সে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, বৃন্দাবন যান। এদিকে ১৫০৩ শকে অর্থাৎ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-চুরির কথা এবং ১৫০৪ শকে অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুরীর উৎসবের কথা সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত হওয়ায় প্রেমবিলাসের ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কথা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। দীনেশবাবু এমনও জানিয়াছেন (ibid) যে, শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে নবদ্বীপে বৃদ্ধা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার, শান্তিপুরে দেবী সীতার এবং খড়দহে দেবী জাহ্নবীর আশীর্ব্বাদ লইয়া ধন্য হন। আলোচ্য পুঁথি হইতে পরে জানিতে পারিব, দেবী জাহ্নবী ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশেই খড়দহ চিরতরে ত্যাগ করেন। এইরূপ বিরুদ্ধ বিবরণের বেড়াজাল ভেদ করিয়া সত্য কাল নির্ণয় করা কঠিন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীনিবাসের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই রামাঞির সাক্ষাৎকার হইতেছে না। তাই এক একবার মনে হইতেছে প্রেমবিলাসের ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কথায় কিছু সত্য আছে না কি?

পণ্ডিত গোসাঞি রামাইকে কাশী মিশ্রের বাড়ীতে লইয়া যান। মিশ্র মহাশয় পরিচয় পাইয়া মহাস্নেহে রামাইকে স্বগৃহে রাখেন এবং মহাপ্রভু যে-যে স্থানে যে-যে লীলা করিয়াছেন, তৎসমুদয় দেখান। এই প্রসঙ্গে মিশ্র একটি স্থান দেখাইয়া বলেন—

এই স্থান হৈতে ভাবে মুরছিত পথে।
বাহির হইয়া প্রভু পড়ে এই ভিতে॥
এইখানে মুখসংঘর্ষণ প্রেমাবেশে।
ক্ষত হৈল মুখপদ্ম ধারা রুধিরেতে॥—পুঁথি পৃঃ ৬১ খ।

এই স্থানটি পুরী মন্দিরের অন্তর্গত কি না পুঁথিতে স্পষ্ট উক্ত নাই। মুখসংঘর্ষণের অর্থ মিশ্রদ্বয় রামাই ঠাকুরকে বলিতে পারেন নাই। গ্রন্থান্তরে এ কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা রঘুনাথ দাসের 'গৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষ' হইতে লইয়া কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। রামাই তাহা এখনও পাঠ করেন নাই।

অন্যান্য ভক্তদের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় রামাই প্রশ্ন করিলে, মিশ্র বলিলেন—

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর বিচ্ছেদে।
অন্তর্ধান কৈল মহাপ্রভুর পশ্চাতে॥
তার অন্তর্ধানে শ্রীরামানন্দ রায়।
অন্তর্ম না হঞা আছেন মৃতজন প্রায়॥
মৃত্যুজন প্রায়—পুঁথি।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরহে বিহ্বল।
মহাপ্রভুর ধ্যানে রহে ছাড়ি অন্ন জল॥
প্রতাপ রুদ্র হয় মহারাজ চক্রবর্ত্তি।
বিষয় ছাড়িয়া সদা ধ্যায় তার মূর্ত্তি॥—পুঁথি পৃঃ ৬২ক।

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই স্বরূপ দেহত্যাগ করেন; কত মাস বা দিন পরে তাহা স্পষ্ট উক্ত নাই; কিন্তু সে দুঃসংবাদ অদ্যাবধি নদীয়া প্রভৃতি স্থানে পৌছে নাই,—ইহা সুস্পষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের পর পুরীর সহিত নদীয়ার যোগাযোগ ছিন্ন যে হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাই বোধ হয় কারণ।

পুঁথিতে জানা যাইতেছে যে, পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র দেব তখনও জীবিত; রায় রামানন্দও আছেন; এমন কি বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও রহিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া 'ভোজ প্রবন্ধের' অনৈতিহাসিকতার কথা মনে পড়ে। 'Chaitanya and his companions' নামক গ্রন্থের ৭৮—৮৯ সংখ্যক পাতাগুলিতে স্বর্গীয় দীনেশবাবু সার্ব্বভৌমের বিষয় লিখিয়াছেন। তথায় দেখা যায় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু পুরীতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত মিলিত হন; তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স ২৪ বৎসর। একমাত্র পুত্র মুগ্ধবোধের টীকাকার পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে রাখিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ দেহত্যাগ করেন। 'ভক্ত প্রসঙ্গে'র ২৬৬ পৃষ্ঠায় সতীশবাবু স্বীকার করিয়াছেন ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকাব্দে মাঘমাসে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নীলাচলে গমন করেন। ১৪৩১ মাঘমাসে ১৫০৯ হয় না ১৫১০ খৃষ্টাব্দ হয়। দীনেশবাবুর মতে সার্ব্বভৌম, মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। যদি দেহত্যাগ না করিয়া থাকেন এবং ৮০ বৎসরে গৌরাঙ্গমিলন ঠিক হয় তাহা হইলে মহাপ্রভুর তিরোধানের ১৪ বৎসর পরে রামাঞির পুরী ভ্রমণকালে সার্ব্বভৌমের বয়স অনূন ১১৮ বৎসর হইবে। তাহা অসম্ভব বলিয়া তৎকালে বিবেচিত হইত না। বৃহৎ বঙ্গের ৭৩৩ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু বলিয়াছেন চৈতন্যের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন মৃতপ্রায় ছিলেন। বর্ত্তমান পুঁথি তাহা সমর্থন করিতেছে। কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন এই সময়ে মহারাজের চিত্তবিনোদন জন্য 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' লিখিয়া শুনান। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ২৬৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় পরমানন্দ সেনের জন্ম ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে এবং 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' রচনা ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে হয়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ পৃষ্ঠা ৯০) ১৪৯৪ শক অর্থাৎ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত নাটকরচনা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং রামাইর প্রতাপরুদ্রকে দেখা অসম্ভব নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের দেহত্যাগের নানাবিধ প্রবাদ আছে। 'মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে' এইরূপ একটী প্রাচীন পদ দীনেশবাবু শুনিয়াছেন। আলোচ্য পুঁথি উক্ত পদের অর্থকে সমর্থন করিতেছে।

গোপীনাথ মন্দীরে প্রভু প্রবেশ করিলা।
কোথাকারে গেলা পুন বাহির না আইলা॥—পুঁথি পৃঃ ৬২ক

অবশ্য এই সংবাদ জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে'র সংবাদের ন্যায় ঐতিহাসিকত্ব দাবী করিতে পারে কিনা বলা কঠিন। রক্তমাংস গঠিত দেহকে হঠাৎ অদৃশ্য করা অলৌকিক

ব্যাপার। বর্ত্তমান পুঁথিলেখক তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইহার অপর একটি নিদর্শনও দিয়াছেন। পরে বক্তব্য।

গোপীনাথ জিউর মন্দির দেখিয়া ঠাকুর রামাই হরিদাসের ভিটায় গেলেন এবং মিশ্রমুখে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ শুনিলেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে চৈতন্যকে সম্মুখে দেখিতে দেখিতে ১৫১০।১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। ভক্তপ্রসঙ্গ ১ম খণ্ডে সতীশবাবু বলিয়াছেন ১৪৪৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে হরিদাসের মৃত্যু হয়। এইটি সম্ভব। গৌরাঙ্গ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র সন্ন্যাস নেন।

ঠাকুর রামাই ক্রমে রায় রামানন্দের বাসভবনে গিয়া উপনীত হইলেন। কাশীমিশ্র রামাইকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। রামাই রায়ের সহিত কৃষ্ণকথায় এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আলাপে মহানন্দে দিন যাপন করিতে থাকিলেন। রায় রামানন্দ যেন বেশী কথাবার্ত্তায় রত হইতে চান না; তিনি যে এখন বাচিয়া আছেন, তাহাই দুঃখের বিষয়; বলিলেন—

> স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে না হল্য মিলন।
> স্বরূপ ভাগ্যবান্ পাইল প্রভুর চরণ॥—পুঁথি পৃঃ ৬৬খ

রায় রামানন্দের উপদেশে রামাই স্বরূপের কড়চা নকল করিয়া লইলেন। অচিরে রূপ সনাতনের সহিত মিলিবার পরামর্শও রায় রামাইকে দিলেন। দীনেশবাবু বলিয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২৯০)—রায় রামানন্দ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কথাটা বিচার্য্য।

এইরূপে নীলাচলে চারি মাস কাটিয়া গেল। (পুঁথি পৃঃ ৬৫ ক) ঠাকুর রামাই যে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারি মাস পুরীতে ছিলেন তাহার বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে।

> কার্ত্তিক আইল গেলা বর্ষার সঞ্চার।
> সুখাইল মহিরাজপথ সুবিস্তার॥—পৃঃ ৬৭ খ

পুনশ্চ—

> এইরূপে গেল তার বর্ষা চাতুর্ম্মাস।
> ... ...
> রথযাত্রা আদী লিলা দেখি কুতুহলে।
> সভায় আজ্ঞা লয়্যা পুন গৌড়দেশ চলে॥—পৃঃ ৬৭ক

অতএব জানা গেল রামাই কার্ত্তিক মাসের গোড়াতেই পুরী ত্যাগ করেন। পথে বিলম্ব করেন নাই।

> কাহার সকল চলে পতঙ্গগমনে।—পৃষ্ঠা ৬৮ক

রামাই শিবিকারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তাহার বাহকগণকে 'কাহার' বলে। হিন্দিতে 'কাহার' আছে। হেমচন্দ্র স্বীয় 'দেশীনামমালা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'কাহারো পরিখন্ধে' (২য় বর্গ ২৭ শ্লোক)। পরিস্কন্দ বা পরিষ্কন্দ জলাদিবাহী অস্থায়ী ভৃত্য।

যাহা হউক ঠাকুর রামাই দ্রুতগামী বাহক বাহিত শিবিকায় দেড়মাসের স্থানে প্রায় একমাসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমগ্র অগ্রহায়ণ মাস তথায় অবস্থান করিয়া জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। (পৃঃ ৮৩ খ)।

নবদ্বীপ পৌছিয়াই রামাই পিতামাতার নিকট লোকদ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া

> আপনে চলিলা বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দীরে।—পুঁথি ৬৮ক

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত রামাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার কতক মহিমা তৎসমীপে বর্ণনা করিয়া পরে ঠাকুর পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন এবং লোকমারফৎ দ্রব্যাদি খড়দহে পাঠাইয়া দিলেন।

সারা অগ্রহায়ণ রামাই নবদ্বীপে রহিলেন। প্রত্যহ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ বন্দনা করিতে ভুলেন নাই। নবদ্বীপবাসী ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে

> শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত মুকুন্দাদী সনে।
> কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা শুনে কায়মনে॥—পুঁথি পৃঃ ৬৯ক

ইহাদের মধ্যে শ্রীবাস চৈতন্য অপেক্ষা ৪০ বৎসরের বড়। সুতরাং তখন তাঁহার বয়স হইবে ১০২। মুরারিগুপ্ত প্রভৃতির বয়স নির্ণয় দুষ্কর হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের শেষদিকে কোনমতে পিতামাতার অনুমতি লইয়া রামাই শান্তিপুরে গমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতগৃহিণী দেবী সীতা পুত্র অচ্যুতানন্দকে রামাইর প্রত্যাগমনের জন্য পাঠাইলেন। ভক্ত প্রসঙ্গের ১ম খণ্ডে অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দের জন্ম ১৪১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। সে হিসাবে তৎকালে অচ্যুতের

বয়স ৫৫ বৎসর। কিন্তু পুঁথির বর্ণনা অচ্যুতের সহিত রামাইর বয়সের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতেছে না।

আদর করিঞা ঘরে আনহ রামাঞি।
আনন্দে অচ্যুতানন্দ আইলা তার ঠাঞি॥
তারে দেখি ঠাকুর নাম্বিঞা ভূমিতলে।
দুহ প্রেমাবেশে বাহু ভেড়ি করে কোলে॥
সভে হরি হরি বলে পুলকিত অঙ্গ।
দোঁহার নঞানে বহে প্রেমার তরঙ্গ॥
ভাব সঙ্গোপিয়া চলে হাথ ধরাধরি।—পুঁথি পৃঃ ৭২খ

অচ্যুতের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রামাই দেবী সীতার পাদ বন্দনা করিলেন। এ পুঁথিতে অদ্বৈতাচার্য্যের অপর পত্নী দেবী শ্রীর কোন উল্লেখ নাই। সীতাদেবী রামাইকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। নবদ্বীপের সকলের কথা শুধাইতে গিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। দীনেশবাবু যথার্থই দুঃখ করিয়াছেন যে, চির ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর নিয়মপালনে কঙ্কালসার তন্বঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইল, জানা যায় না। নিত্যানন্দ দাস একবার সেই ভগবৎপরায়ণার অপূর্ব্ব সাধ্বী মূর্ত্তি আভাসে দেখাইয়াছিলেন মাত্র, তারপর কোন লেখক তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। (বৃহৎবঙ্গ পৃঃ ৭৪১)। বর্ত্তমান পুঁথিতে দেবী সীতা প্রশ্ন করেন,

বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে আছয়ে প্রাণ ধরি।
এ বড় সন্তাপ দুঃখ সহিতে না পারি।—পৃঃ ৭৩ক

তাহার উত্তরে রামাই বলেন—

শ্রীমতি ঈশ্বরি জিউর শ্রীচরণ দেখিয়া।
ধড়ে প্রাণ নাঞি রহে জায় বিদরিয়া॥ - পৃঃ ৭৩ক

এইমাত্র।

রামাই অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 'বিদেষ ঠাকুর বড় আইলা প্রত্যাশায়।' (পুথি পৃঃ ৭৪ ক)। বাড়ীর দাসদাসী পর্য্যন্ত অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে বিয়োগব্যথায় কাতর রহিয়াছে দেখিলেন। অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৫৫ শকাব্দে (১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ) মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৪৭)। ঈশাননাগর 'অদ্বৈতপ্রকাশে' বলিয়াছেন—

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।

দীনেশবাবুও ঈশাননাগরের উক্ত কথায় অবিশ্বাস করেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার তিরোভাবকাল হইবে ১৪৮০ শকাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৫৮। 'ভক্ত প্রসঙ্গে' (১ম খণ্ডে) সতীশবাবু ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ স্বীকার করিয়াছেন। দীনেশবাবু যখন অদ্বৈতের জন্মবর্ষ ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ (বৃহৎবঙ্গ পৃঃ ৭১০।৭১১) এবং মৃত্যুবর্ষ ১৫৫৭ (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৪৬) ধরিয়াছেন ; আবার বলিয়াছেন "'প্রেমবিলাসের' মতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ; ঈশান নাগর কৃত 'অদ্বৈতপ্রকাশে' ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।" আলোচ্য পুঁথির ভাব স্বীকারে আমরা মনে করি রামাইর তীর্থভ্রমণ বর্ষের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত দেহত্যাগ করেন।

শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া রামাই আড়িয়াদহ (এড়িয়াদহ) গ্রামে গেলেন এবং 'দাশ গদাধর পদে করিলা প্রণাম'। (পৃঃ ৭৬ক)। তাঁহার নিকট পাঁচদিন ছিলেন। কুবের নন্দন দাশ গদাধর গৌরাঙ্গের আদেশে নিত্যানন্দ সহ নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচারে ব্রতী হন, ইহা চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে ১১শ পরিচ্ছেদে উক্ত আছে। এখানেও সেই কথার সমর্থন রহিয়াছে : —

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ সঙ্গে।
তারিলা সকল লোক ভক্তি প্রেমরঙ্গে॥—পুঁথি ৭৬খ

কেহ কেহ মনে করেন গৌরাঙ্গের ১১ মাস পরে অর্থাৎ ১৪৫৬ শকাব্দ বৈশাখে গদাধর দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণবদিগ দর্শনীতে মুরারিলাল অধিকারী বলেন ১৫০৩ শকে, কিন্তু অমূল্যধন রায়ভট্ট বলেন ১৪৫৮ শকে। গৌরাঙ্গতরঙ্গিনী সম্পাদক রায়ভট্টের মতই অধিক সঠিক মনে করেন। রামাই মিলন তাহা হইলে সম্ভব হয় কি ?

অতঃপর রামাই ঠাকুর—

বাসুদেব ঘোষ গৃহে করিলা গমন।
চারি ভাই সহ ক্রমে হৈল দরশন॥
শ্রীবাসু শ্রীগোবিন্দ শ্রীযুত শঙ্কর।
শ্রীমাধব ঘোষ খ্যাতি গৌরাঙ্গকিঙ্কর॥—পুঁথি পৃঃ ৭৬খ

দীনেশবাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ২৯৪ পৃষ্ঠায় তিন ভাইএর উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদির ১০ম পরিচ্ছেদেও ঐ তিনজনেরই উল্লেখ আছে :—

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।

—চৈঃ চঃ, আদি, ১০ম পরিঃ

পুঁথিতে চতুর্থ ভ্রাতা শঙ্কর ঘোষকে দেখিতেছি।

তথায় দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া

মেলানি মাগিলা সভার পদে প্রণমিয়া।—পুঁথি পৃঃ ১৬খ

ঠাকুর রামাই নিজের দৈন্য দেখাইবার জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে সকল ভক্তের পদে প্রণতি জানাইয়াছেন। রায় রামানন্দের নিকট ঠাকুর রামাই যেরূপ দৈন্য দেখাইয়াছিলেন তাহা রায় স্বীকার করেন নাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

দয়া করি মোর মাথে দেহ ত চরণ।—পুঁথি পৃঃ ৬৪ক

অবশ্য রায় মহাশয় সম্মত হন নাই। ঘোষ ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায় লইয়া ঠাকুর

তার পর চলি গেলা অম্বিকা নগর।

জাহা বিরাজিত গৌরনিতাই সুন্দর॥—পৃঃ ১৬খ

অম্বিকানগরে গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সরাখল, তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত। ইনিই নিতাই-গৌরের কাষ্ঠময় বিগ্রহ সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রচার করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। মল্লিখিত 'বৈষ্ণব কবি লোচন দাস' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩৪৬ বৈশাখের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত) গৌরীদাসের গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিটি গোবিন্দদাসের আনন্দলতিকা। তন্মতে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই গৌরীদাস ভবনে যান। কিন্তু বর্ত্তমান পুঁথিতে একটু কালের পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে।

গৌরিদাস পণ্ডিতের কথা না জায় বর্ণন।
নিরন্তর উদ্বেগ প্রভুর না পাঞা দর্শন॥
বিগ্রহ স্বরূপ করি করয়ে পিরিতি।
দর্পণ সেবনে সুখে গোঙায় দীবারাতি॥
শেষ লীলা কালে দোঁহে আইলা তাঁর ঘরে।
সচল বিগ্রহ দেখি পণ্ডিত আদরে॥
দোঁহার পদ ধৌত করি মস্তকে ধরিলা।
নানাবিধ ব্যঞ্জন করি পাক আরম্ভিলা॥
... ...
চারি মুর্ত্তি বসি সুখে ভোযন করিলা।
পণ্ডিত ঠাকুর দেখি আনন্দে ভাসিলা॥

—পুঁথি পৃঃ ১৬খ-১৭ক

প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য গৌরীদাসকে শান্ত করিয়া মহাপ্রভু বর দিতে চাহিলে, পণ্ডিত বলিলেন:—

......বরে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহার পদ যেন করিয়ে সেবন॥—পৃঃ ১৭ক

তখন

প্রভু কহে চারি মুর্ত্তি তুমা বিদ্যমান।
কোন্ দুই মুর্ত্তি রাখিবে সন্নিধান॥—পৃঃ ১৭ক

তদুত্তরে

পণ্ডিত কহেন তুমী তব দক্ষিণে নিতাই।
এই দুই মুর্ত্তি রহ বলিহারী জাই॥—পৃঃ ১৭খ

তাহাতে

সুমধুর হাসিঞা রহিলা দুই ভাই।
আর দুই মুর্ত্তি চলি গেলা অন্য ঠাঞি॥
সেই হৈতে দুই ভাই পণ্ডিত সদনে।
সেবা অঙ্গিকার করি রহে দুইজনে॥—পৃঃ ১৭খ

পাঠকগণ নিশ্চয়ই একটি রহস্য লক্ষ্য করিতেছেন। ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের ইচ্ছায় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সহ তথায় অচল হইয়া রহিলেন এবং ভক্ত নির্ম্মিত বিগ্রহদ্বয়ই সচল হইয়া জগতে প্রকাশ পাইলেন। আনন্দলতিকায় লোচনদাস এই মতেরই সুদৃঢ় সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

তাঁরে পাঠাইয়া প্রভু আপনে রহিলা।

এই দুইটি পুঁথির মতে (রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণ বিবরণের ন্যায়) দারুময় বিগ্রহরূপী গৌর-নিতাইয়ের ধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্য হইয়াছিল। স্বয়ং গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ অম্বিকা নগরে ভক্তগৃহে (বলিভবনে ভগবানের ন্যায়) বদ্ধ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, আনন্দলতিকায় দেখা যায় সন্ন্যাস করিয়াই অর্থাৎ মধ্যলীলার প্রারম্ভেই গৌরাঙ্গ পণ্ডিতের গৃহে আসেন। বর্ত্তমান পুঁথিতে উক্ত হইতেছে 'শেষলীলাকালে' মহাপ্রভু গৌরীদাসের গৃহে আসেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদ দৃষ্টে স্পষ্ট হইবে যে, প্রথম ২৪ বৎসর আদি-লীলা; 'চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।' তারমধ্যে '...ছয় বৎসর গমনাগমন। নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥' এই ছয় বৎসরের বৃত্তান্ত মধ্যলীলার। ইহার প্রারম্ভে গৌরাঙ্গ আনন্দলতিকামতে

গৌরীদাসের (অন্যান্য পুঁথির মতে অদ্বৈতাচার্য্যের) গৃহে গমন করেন। 'অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।' ইহাই 'শেষলীলা' নামে বর্ণিত। এ সময়ে গৌরাঙ্গের গৌড়াগমন কেহ বলেন নাই। মুরলীবিলাস রচয়িতা লিখিলেন কেন—বলা কঠিন। শুধু তাই নয়, শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনকাতর গৌরীদাস স্ব-ইচ্ছাক্রমে বিগ্রহপূজা করিয়া চিত্তবিনোদনরত হন। পরে গৌরনিতাই আসিয়া বিগ্রহপূজা দেখেন এবং বিগ্রহদ্বয়কে নিজকার্য্যে পাঠাইয়া স্বয়ং তথায় রহিয়া যান। বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। গৌরীদাস ১৪৮১ শকে (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে) অপ্রকট হন ইহা বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীতে মুরারিলাল লিখিয়াছেন।

গৌরীদাসের দ্বারে ঠাকুর রামাই উপস্থিত। পণ্ডিত সংবাদ পাইয়াই বাহির হইয়া মহাসমাদরে ভবনমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় ২।৩ দিন অবস্থান হইলে প্রসাদ ভক্ষণও হইল। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু রামাইকে আত্মপরিচয়ের কোন সুযোগ দিলেন না। বাসুদেবের প্রিয় বংশীর অবতার বংশীবদনানন্দ, তিনিই রামাইরূপে অবতীর্ণ। তাই আশা করিতেছিলেন রামাই সঙ্গে কৃষ্ণচৈতন্য আলাপ করিবেন।

তথা হইতে ঠাকুর বিদায় লইয়া অভিরাম গোপালদর্শনে যাত্রা করিলেন। ঐতিহাসিক মর্য্যাদাশালী 'চৈতন্যমঙ্গলের' রচয়িতা রামানন্দের মন্ত্রগুরু ছিলেন এই অভিরাম গোস্বামী। তিনি অম্বিকানগরের অদূরবর্ত্তী স্থানে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহার কতকগুলির সমর্থন বর্ত্তমান পুঁথিতে পাইতেছি। পরমেশ্বর দাস পথে যাইতে যাইতে রামাইকে অভিরামচরিত শুনান। পঠনীয়বোধে পুঁথির বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণলীলা পূর্ব্বকালে।—পুঁথি ৭৮ক
শ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে লুকালুকি খেলে॥
খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণ লিলা অন্তরে।
তদবধি রহে তেহো পর্ব্বতকন্দরে॥
ইহা কলিজুগে পুন গৌরাঙ্গ হইলা।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুরে মিলিলা॥
পরিচয় পাঞা করে সভার অন্বেসন।
প্রভু উর্দ্ধে সিয়া দীল শ্রীদাম করণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মত্ত সিংহের গমনে।
শ্রীদামেরে খুজি বুলে গিরি গোবর্দ্ধনে॥
ডাকিতে ডাকিতে উত্তর দীলেন শ্রীদাম।
কে ডাকে উত্তর তারে দেই বলরাম॥
বলাইর নাম শুনি আইলা চলিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু নিতাই দেখিয়া॥
কোথা হৈতে আইলা তুমী কিবা তুমার নাম।—পুঁথি ৭৮খ
নিত্যানন্দ প্রভু কহে আমী বলরাম॥
শ্রীদাম কহেন মোরে কহ প্রপঞ্চিয়া।
নিত্যাই কহেন দেখি মোরে ধরসিয়া॥
হাত তালি দীয়া আগে চলিলা নিত্যাই।
শ্রীদাম ঠাকুর চলে পশ্চাতে গড়াই॥
ধরিতে না পারে, নিত্যাই দ্রুতগতি জায়।
শ্রীদাম ঠাকুর চলেন লাগি নাঞি পায়॥
এক দৌড়ে চলি আইলা গৌড় ভুবনে।
শ্রীদাম পশ্চাতে চলি আইলা তার সনে॥
গৌড় দেসে আসি নিত্যাই তারে ধরা দীলা।
শ্রীদাম ঠাকুর তারে কহিতে লাগিলা॥
তুঞি দাদা বটিব, কিন্তু হেন দশা কেন।
কানাঞি কোথাকে গেলা সত্য করি মান॥
নিত্যানন্দ প্রভু তারে কহিল্যা সকল।
শ্রীদাম ঠাকুর শুনি হাসে খল খল॥
আমী জাব নাঞি তোথা আনিব তাহারে।
আমি আইলাঙ বলি তুমী কহগা তাহারে॥
নিতাই চলিয়া গেলা শ্রীদাম রহিলা।
... ...

তার পরে—

মালিনি ঠাকুরাণি খেলে সিশুর সংহতি।
তাঁরে দিখি চিনি ডাকি লইলা সুমতি॥
তেহো পাছে চলি জায় আগেতে শ্রীদাম।
নদী পার হঞা আইলা খানকুল গ্রাম॥
নদীর তরঙ্গ দেখি পার হৈতে নারে।
... ...
এহেন তরঙ্গে যেহোঁ পায় চলি জায়।
এহো ত মনুষ্য নহে কোন দেব জায়॥
মালিনি সহিত আসি কদম্বের তলে।
তৃতিয় দীবস রহে কেহো কিছু বলে॥
গ্রামের সকল লোক চরণে পড়িলা।
অনুগ্রহ করি কিছু কহিতে লাগিলা॥
মহোৎসব কর তবে করিব ভোজন।
শুনি সব লোক দ্রব্য করে আহরণ॥—পুঁথি ৭৯ক

মালিনি করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন সভার কৈল নিমন্ত্রণ॥
শ্রীদাম আবেসে ডাকে কানাঞি বলাই।
ত্বরা করি আইষ যে যে মোর হবি ভাই॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক পাঞা।
নিত্যাই চৈতন্য দু ভাই আইল ধাইয়া।
দ্বাদশ গোপাল উপগোপাল সহিত।
শ্রীদাম সাক্ষাতে আসি হৈলা উপনীত॥
দেখিঞা শ্রীদাম মহানন্দে ভাষে সুখে।
সোল সাঙ্গোর কাষ্ঠকে মুরলী ধরে মুখে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলা।
তাঁর নৃত্য পদাঘাতে ভুমীকম্প হৈলা॥
স্বাম সহিত প্রভু দেখে দাণ্ডাইয়া।
শ্রীদাম ঠাকুর নাচে আবিষ্ট হইয়া॥
... ...
গোলে কন্ত্রহারণ আস্যা হস্ত প্রশারিলা।
সোল সাঙ্গোর কাষ্ঠ শ্রীদাম তার হাথে দীলা॥
সেই কাষ্ঠ ফেলিল মালিনি ঠাকুরাণি।
দণ্ডবৎ কৈলা আসি জোড় করি পানি॥
প্রভুরে চিনিঞা শ্রীদাম দণ্ডবত কৈলা।
প্রভু তারে উঠাইয়া কোলেতে করিলা॥
প্রভু তার বক্ষসম তেহোঁ অতি দীর্ঘ।
হস্তের জতনে প্রভু তারে করে খর্ব্ব॥
শ্রীদাম কহেন তুমি আমারে এড়ীয়া।
হেথাকে আসিয়াছ রে মোরে প্রপঞ্চিয়া॥
দাদা দাদা বলিয়া নিত্যাই পায় ধরি।
নিত্যানন্দ প্রভু তারে ধরি কোলে করি॥
সুন্দরানন্দ পরমেশ্বর গৌরীদাস আদী।
ধনঞ্জয় কাশীশ্বর দেখিয়া আহ্লাদী॥
সভার সনে কোলাকলি পরম উল্লাষ।
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল তরাষ॥
... ...
যবন দুহিতা বলি মালিনি মানিলুঁ।—পুঁথি ৭২খ।
এহো কোন দেবকন্যা প্রত্যক্ষে দেখিলুঁ॥
সোলসঙ্গোর কাষ্ঠের বংশী করে ধরি নাচে।
হেন কাষ্ঠ বাম হস্তে করে ধরি নাথে॥

ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে দেবতা মনে করিলেন; নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া অপরাধী মনে প্রসাদ পাইবার জন্য তথায় উপস্থিত রহিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ স-গণ ভোজন করিলেন। মালিনী পরিবেশন করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ ও সমাগত সকলে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেন।

কত জন খাইল সংখ্যা না হয় তাহার।
দুঃখী কাঙ্গালে নঞা গেলা ভার ভার॥—পুঁথি পৃঃ ৭৩খ

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীদামকে অভিরাম গোপাল নাম দিলেন। ইনি আবার রামদাস নামেও প্রসিদ্ধ। দেবকী নন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে,

ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে।
সোল সাঙ্গোর কাষ্ঠ জে বা বংসি করি ধরে॥
—পুঁথি (dated 1078 B. S.) পৃঃ ৮খ

চৈতন্য চরিতামৃতও রামদাস নাম স্বীকার করিয়াছে—

রামদাস মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গোর কাষ্ঠ যেই তুলি কৈলবাঁশী॥
—চৈঃ চঃ আদি ১১শ পরিচ্ছেদ

অভিরাম ওরফে রামদাস অম্বিকানগরের অদূরে বাস করিতে থাকিলেন। অভিরামের 'ষোল সাঙ্গোর' বাঁশীর অদ্ভুত কথা ভীমসেনের আশী মণ লোহার গদার কাহিনীর মত শুনাইলেও, ষোল জনের বহন যোগ্য দ্রব্য একজন বহন জগতে আজও অসম্ভব নয় বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। মালিনীর নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থান্তরে অনুসন্ধেয়। অভিরাম গোস্বামী ঠাকুর রামাঞিকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া তথায় রাখিলেন।

দুই চারি দিন পরে তথা হইতে শ্রীখণ্ডে রামাঞির সঙ্গে নরহরি ঠাকুরের মিলন হইল। দীনেশ বাবু বলেন—নরহরি সরকার ১৪৬৫ (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৯৫) অথবা ১৪৭৪ (বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৭১১) অথবা ১৪৭৮ (বঙ্গভাষাও সাহিত্য পৃঃ ২৯০) খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্ম গ্রহণ করেন। 'Chaitanya and his companions' নামক গ্রন্থে ১৪৭৮ খৃঃঅব্দকে নরহরির জন্মবর্ষ ধরা হইয়াছে। দীনেশ বাবুর সিদ্ধান্ত, নরহরি ১৫৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে রামাঞির ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তীর্থ ভ্রমণ কালে উভয়ের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় কিরূপে? তবে কি নরহরি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন? চৈতন্য মঙ্গলরচয়িতা লোচন দাসের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর। এই গুরুর আদেশে লোচন দাস (জন্ম ১৫২৩ খৃঃঅব্দে) প্রৌঢ় বয়সে চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন; তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩২৬)। লোচন দাসের আনন্দলতিকা এই মতের সমর্থন করে। লোচনের ৫২ বৎসরে নরহরি জীবিত থাকিলে তাঁহার মৃত্যু ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দীনেশ বাবু ঘটাইলেন কি নজীরের বলে, জানা যায় নাই। মুরলী বিলাশের কথায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে নরহরির সহিত মিলনে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত রামাইর সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের আনন্দ ধরে না। কেন? বলা যায় না। কিন্তু পুঁথিতে রহিয়াছে 'দুহুঁ দুহাঁ স্তুতি নতি করি সমাদর। (পৃঃ ৮০ খ)। ইনি নিশ্চয়ই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নন। নরহরি সরকারের ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র, মুকুন্দ দাস কবিরাজের তনয়। (Chaitanya and his companions পৃঃ ১০০) কেহ কেহ প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মনে করেন মহাপ্রভুর অপ্রকটদিনেই মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে রঘুনন্দনের দেহত্যাগ হয়। কিন্তু প্রেমবিলাস, ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে রঘুনন্দন খেতুরীর উৎসবে যোগ দেন (১৫৫২ খৃঃ অব্দে)। (গৌরপদ তরঙ্গিনী পৃঃ ৫২) আলোচ্যপুঁথি এই মত সমর্থন করিতেছে।

ঠাকুর রামাই শ্রীখণ্ডে দুইদিন অবস্থান করিয়া এবং আরও অনেকস্থানে ভ্রমণ করিয়া খড়দহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মাঘ মাস। পুঁথিতে রহিয়াছে,

> নীলাচল হৈতে গৃহে কার্ত্তিকে আইলা।
> দুই মাস গৌড় দেশে ভ্রমণ করিলা॥
> মাঘমাসে শ্রীপাট খড়দহে আগমন।
>
> —পুঁথি, পৃঃ ৮১ক

বিদায় বেলায়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তনে বিশ্ব ঘোরে অদৃশ্য ইঙ্গিতে,
রহস্যের উদ্ধলোকে বোধাতীত জ্যোতির অক্ষর।
সে অক্ষরে মিশিতেছে কত সত্ত্বা বিচিত্র সঙ্গীতে,
শান্তি পারাবার পারে দেখে গেনু লোক লোকান্তর।
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা বারে বারে কাণে আসে মোর,
যাত্রা মোর সুরু কবে হোলো কোন্ লাবণ্য-প্রভাতে
ভাবি আর স্বপ্নস্মৃতি দেয় দোলা! নয়নের লোর
কেমনে নিবারি! একা চলি! কিম্বা কেহ চলে সাথে!
প্রশ্ন জাগে ক্ষণে ক্ষণে, চলা মোর শেষ নাহি হয়,—
রূপ হ'তে রূপান্তরে সীমা হ'তে সীমাহীন দূরে!
পথের নাহিক শেষ, নাহি কোন পাথেয় সঞ্চয়।

ছায়া এলো,—ছায়া হোলো দীর্ঘতর, অশ্রুভারাতুর,
নিঃসঙ্গ জীবনে তব থেমে যাবে প্রাণের উৎসব;
বিজন কুটির প্রান্তে র'বে প্রিয়া বিরহ-বিধুর
তুমি তো পাবে না ফিরে মোর ছন্দ কাব্য কলরব।
কতদিন, কত রাত্রি, কত সন্ধ্যা স্মৃতিচিত্র আঁকি
আমারি কহিবে কথা, তুমি শুধু শুনিবে নীরবে;
পুষ্পিত অঙ্গনে মম নিরালায় ডেকে যাবে পাখী
এ সংসার দু'দিনের,—কেন দুঃখ, কেন ব্যথা তবে!

ভুলে গেছি অতীতের সাধনার শান্ত ধ্যানচ্ছবি
বন্ধনের যন্ত্রণায় জ্বলে মরি সহস্র বিক্ষোভে;
আমার সম্মুখে নিত্য অস্তাচলে চলে যায় রবি,
প্রভাত আসিছে ফিরে বক্ষে তার নব পুষ্পশোভে।
আমার জীবন রবি অস্তে যাবে ছিন্ন করি মায়া,
নব নব পূর্ব্বাচলে দিবে দেখা, মৃত্যু নাহি মম।
মৃত্যু ও যে অনন্তের যাত্রা পথে রজনীর ছায়া;
আলোকের তীর্থে যেতে এই ছায়া হেরি গাঢ়তম।

এ সংসার সৃষ্ট হোলো স্থূল জড় ভৌতিক আণবে,
মায়াচ্ছন্ন প্রাণীদল হেথা আসে কর্ম্মের বাঁধনে।
প্রতিদিন দেহতত্ত্বে চিত্ত রাখি অণুর আহবে
দেয় তার মন প্রাণ, ভুলে যায় প্রজ্ঞান সাধনে।
অক্ষর সাগর সনে যেথা মিশে শান্তি পারাবার,
নাহি ব্যোম নাহি পৃথ্বী নাহি কোন স্থানু চরাচর।
সেথা যবে ডুবে গিয়ে আপনারে হেরিব না আর;
উদিবে না আত্মরবি, সেইক্ষণে রবে নাক স্বর।

তীর্থ যাত্রা হবে শেষ তীর্থের সলিলে অবগাহি
সেই পথ কত যুগ খুঁজিতেছি আলো অন্ধকারে!
শুনেছি ঋষির মন্ত্রে সত্য আছে! আর কিছু নাহি
তার লাগি যাত্রা মোর, প্রেম দিয়া ভুলায়োনা তারে!

কাছে এস প্রিয়তমে মুছে ফেল তব আঁখিজল,
যাবার সময় হোলো কেন এত হতেছ চঞ্চল।

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

(উনত্রিশ)

শিলং-এর কাজ সারিয়া কমল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়া মাতার কাছে শুনিল, ঊর্ম্মির সঙ্গে নিভৃত আলাপের সুযোগ পাইতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত সুকল্যাণী করিবেন। এখন যত শীঘ্র সম্ভব কমল বিবাহের প্রস্তাব করিলে এবং তারপর উভয়ের একটা engagement হইয়া গেলেই ভাল হয়। সুকল্যাণীরও ইচ্ছা তাই। কমল নিজেও তাই ভাবিতেছিল।

সেদিনকার ঘটনাটা—অতর্কিতে কেমন যে কাণ্ড হইয়া গেল! পরদিনই আবার তাহার সঙ্গে একটিবার সাক্ষাতের অবসর ঘটিবার আগেই গার্গীরা হঠাৎ শিলং ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অথচ গার্গী বলিয়াছিল, তাহার পিতা কিছুদিন তাহাকে ও তাহার মাকে শিলং-এ রাখিবেন। গাঙ্গুলী সাহেবের চিঠিটা যখন সে পায়, কারখানার কাজের ভীড়ে সে ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি পড়িয়া পকেটে রাখে এবং তখনকার মত কেমন একটা স্বস্তিও বোধ করে। বৈকালে হোটেলে যখন ফিরিল, বাথরুমের কাজ সারিয়া পোষাক বদলাইয়া চা-পানের পর চিঠিটা বাহির করিয়া আবার ভাল করিয়া পড়িল। তাই ত'! আগের দিন সন্ধ্যার সেই ঘটনার পর হঠাৎ এ ভাবে চলিয়া গেল—ব্যাপার কি? আফিসের কোনও জরুরী টেলিগ্রাম সত্যই যদি আসিয়া থাকে অন্ততঃ সন্ধ্যা নাগাত অপেক্ষা করা যে অসম্ভব হইত তাহা নয়। যত ভাবিতে লাগিল, নানারকম আশঙ্কা তাহার মনে খোঁচা দিয়া উঠিতে লাগিল। হয় ত' বা একটা প্যাঁচেই উহারা তাহাকে ফেলিবে! সেদিন একটিবার দেখা হইলে সে বুঝিতে পারিত ঐ ঘটনাটা কেবল হালকা একটা খেলা বলিয়াই মনে করিয়াছে, না সত্যই কোনও গুরুত্ব তাহাতে দিতে চায়। কিন্তু দেখাই আর হইল না—হঠাৎ অমনই চলিয়া গেল! কেন গেল?—মতলবটা কি হইতে পারে? যাহাই হউক, এখন কলিকাতায় ফিরিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঊর্ম্মির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব সে করিবে, engagement ও একটা করিয়া ফেলিবে। কোর্টসিপ—ও-সব formalityর সময় আর নাই। ঘন ঘন যে ঊর্ম্মির সঙ্গে নিভৃত আলাপের অবসর সে পাইবে, তাহারও সম্ভাবনা কিছু ও-বাড়ীতে নাই। দুই একদিন পাইলেও অভিভাবকদের পাহারায় সে যা হইবে, সেটা কোর্টসিপের একটা প্রহসন মাত্র। না, ও-সবে আর কাজ নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম যে সুযোগ ঘটিবে, তখনই সে প্রস্তাব করিবে। ঊর্ম্মি—না, প্রত্যাখান তাহাকে করিবে না। সে সম্ভাবনা কিছু থাকিলে তার মা এত আগ্রহে এই সম্বন্ধের চেষ্টা করিতেন না। এরূপ চেষ্টা মায়েরা যখন করেন, কন্যার মন বুঝিয়াই করেন। নহিলে সে ত' যাচিয়া একটি ভদ্রলোককে কেবল অপমান করাই হয়।—তবে ঐ আংটিটা—তা আর একটা অমন আংটি—বরং আরও ভাল কায়দার আংটি কলিকাতায় ফিরিয়া দু'দিনেই সে তৈয়ারী করিয়া নিতে পারিবে।

মাতা কহিলেন, "তা হ'লে আর বেশী দেরী ক'রো না কমল, কাল পরশুই যাও একটিবার, ওখানে গিয়ে ঊর্ম্মির সঙ্গে আলাপ কর।"

"হুঁ!—কাল আর ফুরসুৎ হবে না, পরশু যাব। একটু বেলাবেলিই আফিস থেকে ফিরব। কিন্তু ঊর্ম্মির সঙ্গে আলাপের সুবিধে হবে ত'? আমিও দেরী আর বেশী ক'রতে পারছি না।"

বলিতে বলিতে একটু নিশ্বাস চাপিয়া নিল।

"গিয়ে দেখ, ভরসা ত' করি পাবে। কথাবার্ত্তা ত' সব ঠিকই আছে।—ভয় কেন পাচ্ছ?"

"ভয়! হাঃ হাঃ হাঃ।—ভয় কেন পাব? তবে হ্যাঁ, তা—to speak you the truth, I don't feel very free and at home like there. The whole atmosphere of the house—why it is—it is—তা সে যাহাই হউক, যাব; আর opportunity যদি পাই, I shall take courage in both hands and declare my

love and propose forthwith without any more than shilly-shallying."

বলিয়াই কমল উঠিল।

সেই পরশুই একটু সকাল করিয়া কমল বাড়ীতে ফিরিল। পোষাক ছাড়িয়া হাতমুখ বেশ সাবানে ধুইয়া পুঁছিয়া তাহার ভাল একটি ধুতি-সুট অর্থাৎ কোচান মিহি ধুতি পাঞ্জাবী ও উড়ুনী পরিল। আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথায় মৃদুগন্ধ কিছু 'এসেন্স' ঢালিয়া এবং মুখে কিছু 'স্নো' মাখিয়া মাথাটি বেশ করিয়া আঁচড়াইল, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া কখনও কিছু পিছনে সরিয়া কখনও কয়েক পা সম্মুখে আসিয়া মুখখানি কেমন দেখাইতেছে, হাসির কোন্ ভঙ্গীটা কিরূপ শোভন হয়, এই ধুতি-সুটটিই কেমন মানাইয়াছে, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মুখ ভরিয়া মধুর চটুল একটু হাসি ফুটিল। হ্যাঁ, বেশ মানাইয়াছে! মাথার চুলগুলি হাতে আর একটু চাপিয়া চুপিয়া দিয়া তখন বাহির হইল।

"এই যে! ভাল আছ তোমরা উর্ম্মি?"

সন্ধ্যাবেলা পিতা আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবেন। উর্ম্মি বাহিরের দিকে তার পিতার বসিবার ঘরটিতে টেবিল চেয়ারগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া বই-টইগুলি সব গুছাইয়া রাখিতেছিল। সাড়া পাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

"ওমা! কমলদা যে! আসুন, ভাল আছেন ত? কবে ফিরলেন? শিলং গিয়েছিলেন শুনলাম।"

"এই ত' পরশু ফিরেছি। আছি ভালই, thanks। এখন একটা চেঞ্জও ত হ'য়ে গেল। তা তোমাদের খবর ভাল ত'?"

হ্যাঁ, এই ভাল যাচ্ছে একরকম—" বলিতে বলিতে ঘুরিয়া পাখাখানা খুলিয়া দিয়া আসিয়া কহিল, "তা বসুন, বসুন আপনি। মাসীমা মেসোমশাই ওঁরা ভাল আছেন ত' সবাই? এর ভেতর মাসীমা এসেছিলেন একদিন। তাঁর কাছেই শুনলাম আপনি শিলং গেছেন।"

উর্ম্মি একখানি চেয়ার ও ছোট একটু টেবিল পাখাখানির কাছে সরাইয়া দিল। কমল বসিতে বসিতে কহিল, "হ্যাঁ, আছেন তাঁরা বেশ ভালই। আমাকে ত খাসা আরামে বসালে। তা তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে?"

হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "না, এই ত' বসছি।"—বলিয়া একটু ফাঁকে একখানি চেয়ারে কমলের সম্মুখীন হইয়া বসিল।

"মাসীমা কোথায়? ওপরে আছেন বুঝি?"

"না, এই ত কতক্ষণ হ'ল, তাঁর একজন বন্ধু এসেছিলেন মিসেস সরকার, তার সঙ্গে কোথায় বেরোলেন। সন্ধ্যা নাগাত ফিরবেন ব'লে গেলেন।"

"মেসোমসাই।"

"আফিস থেকে এখনও ফেরেন নি।"

"কখন ফেরেন? এই ছ'টা"—বলিয়া মণিবন্ধে ঘড়ীটির দিকে চাহিল।

উর্ম্মি কহিল, "ছ'টায়ই আফিস ছুটী হবার কথা। তবে কাজের চাপ প্রায়ই এত থাকে যে সন্ধ্যার আগে ফিরতেই পারেন না। এক একদিন রাতও হ'য়ে যায়।"

"হুঁ! তুমি তাহ'লে একাই বাড়ীতে রয়েছ?"

হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "হ্যাঁ, ওরাও সবাই খেলতে গেছে ঐ পার্কে। তা আপনি বসুন না? আমি এই চট করে চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসছি।"

"না না, তুমি বসো, বসো! চা এখন থাক। এই ত' একটু আগেই খেয়ে আসছি। বসো, বসো তুমি বসো।"

উর্ম্মি আবার বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কমল কহিল, "তাহ'লে দেখছি একলা তোমাকেই বাড়ীর পাহারা রেখে সবাই বেড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তোমাকেই, ধর, কেউ যদি এসে চুরি করে নিয়ে যায়? হাঃ হাঃ হাঃ!"

"হি হি হি! আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে! দামী একটা জিনিষ ত নই, জ্যান্ত মানুষ—"

"তা সোনারূপোর চাইতেও জ্যান্ত এমন একটি মানুষকে অনেক দামী ব'লেও কেউ কেউ মনে করে। তেমন লোভ হ'লে আর এমন একটা ফাঁক পেলে"—

হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "তা এমন ভাবনাই বা কি? আপাততঃ আপনিই ত খাসা একজন পাহারা রয়েছেন।"

"পাহারা—হুঁ—তা আছি আপাততঃ—দৈবাৎ এসে পড়েছি তাই। কিন্তু এই পাহারাগিরি"—বলিতে বলিতে কমল থামিয়া গেল।

হাসিয়া উর্ম্মি কহিল, "যতক্ষণ দরকার মনে করেন, করুন না? বাবার ফিরতে যদি দেরীই হয়, মা চ'লে গেছেন

সন্ধ্যা নাগাতই ফিরবেন। এলেন এদ্দিন পরে, দেখাশুনো না করেই কি যাবেন? তবে এতক্ষণ খালি-খালি ব'সে থাকবেন—তা বরং খাবার টাবার কিছু এনে দিই, খান—"

"না না, খাবার টাবার আবার কি হবে? খালি-খালি! তুমি রয়েছ, এও আবার খালি-খালি? এই রকম একটু খালি-খালিই যে আমি চাইছি—নিরেলা মন খুলে দু'টি কথা তোমাকে বলব তাই। সেই সুযোগ আজ প্রথম পেলাম। আর তুমি ব'লছ কিনা গিয়ে খাবার আনবে, আর তাই ব'সে ব'সে খেয়ে বৃথা এটা নষ্ট করে ফেলব?—উর্ম্মি!"

উর্ম্মি একটু চমকিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে কেমন ভাববিভোর পেলব একটা ধ্বনি, চক্ষু দু'টিতে কেমন মদির বিলোল দৃষ্টি! একেবারে খোলাখুলি কিছু না বলিলেও, স্পষ্ট এরূপ ইঙ্গিত মাতার কাছে সে পাইতেছিল যাহাতে এরূপ কিছু একটা যে ঘটিবে তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল। পিতাও ইতিমধ্যে একদিন চটুল হাসিমুখে তাহাকে বলিয়াছিলেন, অতি brilliant একটা proposal তোর আস্‌ছে রে উর্ম্মি, একেবারে সপ্তম স্বর্গে উঠে যাবি। মনটাকে সে প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। কিন্তু তবু কেমন একটা আতঙ্কে সমস্ত দেহটা তার শির শির করিয়া উঠিল।

তেমনই কোমল কণ্ঠে কমল আবার ডাকিল, "উর্ম্মি!"

চেয়ারখানাও একটু টানিয়া কাছে সরাইয়া বসিল।

উর্ম্মি কহিল, "কি বলুন?"

"তুমি—তুমি—কি সেই মনের কথাটা আমার বুঝতে পারছ না?—কখনও একটু বুঝতে পার নি?"

"আপনি—আপনি ত' কিছু বলেন নি—"

"না, মুখে খুলে কিছু বলিনি। এমন নিরেলা একটা সুযোগই পাই নি। কিন্তু তবু—তবু—সত্যিই কি এদ্দিনে আমার মনটা তুমি বুঝতে পার নি?—বুঝতে পারছ না আজ এখনও কত ভাল তোমায় আমি বাসি—সত্যিকার যে ভালবাসা—the real hearty love of a man for a woman—সেটা যে কি বস্তু, বইতে পড়েছি, লোকের মুখেও অনেক শুনেছি। কিন্তু নিজের মনে realise কখনও করতে পারি নি। করেছি—তোমাকে দেখে—উর্ম্মি!"

উর্ম্মি তেমন স্তব্ধভাবেই বসিয়া রহিল; মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি কিছু হইল না।—কমল কহিল, "হাঁ বুঝতে পারছি উর্ম্মি I have rather shocked you by my sudden and unceremonious declaration of love. কিন্তু আর ধৈর্য্য ধরেই আমি থাকতে পারছি নি। প্রথম যখন তোমাকে দেখলাম —I was charmed—simply charmed! A thrill of sweetness, I had never experienced before, passed throughout my whole body and soul! সেই অবধি যত দিন যাচ্ছে, যত তোমাকে দেখছি, স্পষ্ট এটা বুঝতে পারছি সেই যে sensation--সেটা love—love at first sight. সেই love চাপতে কখনও চাইনি, আনন্দে বাড়তেই দিচ্ছি। সকল প্রাণ মন আমার আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ছাপিয়ে পড়ছে, ভেতরে আর ধরেই রাখতে পারছি নি। উর্ম্মি—!"

বলিতে বলিতে উর্ম্মির হাত খানি হাতে চাপিয়া ধরিল, হাতখানি আস্তে মুক্ত করিয়া উর্ম্মি তখন কহিল, "কেন আর আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কমলদা এ সব কথা বলে—"

"লজ্জা! হাঁ, a modest decent girl like you—লজ্জা তুমি পেতেই পার। কিন্তু পুরুষ আমরা বড় নির্ল্লজ্জ urge of love, ভালবাসার আবেশ সমস্ত লজ্জার বাঁধ আমাদের ভেঙ্গে বেরোয়। পুরুষই তাই প্রেম নিবেদন করে, প্রেমের পাত্রীকে লুঠেও নিয়ে যায়। অবশ্যি এটা আমি মনে করি না যে আমার এই ভালবাসার সমান একটা response তোমার কাছে এখুনি পাব। তবে সেটা তুলতে আমি পারব, যদি—যদি—তুমি বোঝ সেই privilege আমাকে দিতে পার। পার না কি উর্ম্মি?"

আনতমুখে মৃদুস্বরে উর্ম্মি কহিল, "কিছুই বুঝতে পারছিনি আমি—কি করতে হবে। তা এসব কথা আপনার যা ব'লবার থাকে বাবাকে বলুন।"

"তাঁকে ত' বলবই। তাঁর সম্মতি ছাড়া তোমাকে ত' পেতেই পারি না। কিন্তু তোমার যে ভালবাসা চাই—that must come from you freely from your own heart and I must win it or atleast feel sure that I am in the way of winning it. তখনই তাঁর অনুমতি চাইব আমাদের মিলনে যে সুযোগ এদ্দিন ধরে এত আগ্রহে চেয়েছি, প্রথম আজ তা পেলাম and I must avail myself of it to offer myself heart and soul

with all I have at your feet to-day! Will you—will you accept me ঊর্ম্মি?"

বলিতে বলিতে জানু পাতিয়া ঊর্ম্মির সম্মুখে বসিয়া পড়িল, হাত দু'টি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "Say that you will. If you have not yet come to love me, say atleast you are not disinclined to allow me the privilege!"

ও মা! এ যে রীতিমত একটা রঙ্গমঞ্চের প্রহসন! হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল।

"ছি ছি! ও কি করছেন কমলদা? আমার এমন লজ্জা করছে, আর এখন হাসিও পাচ্ছে? ছিঃ, উঠুন, উঠে ভাল হয়ে বসুন।" বলিতে বলিতে নিজেও উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

"ঐ যে! বাবা আসছেন। আপনার যা বলবার ওঁকেই বলুন। কর্ত্তা উনি, আমি কেউ নই।"

বলিয়াই ঊর্ম্মি পাশের একটি দরজা খুলিয়া ত্রস্ত বাহির হইয়া গেল। অগত্যা কমল তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের পর্দ্দাটি সরাইয়া মহীন্দ্রনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"এই যে! ভাল আছ কমল! বসো।"

"Thanks! নমস্কার মিষ্টার মোকার্জ্জি! আছি ভালই এক রকম। আপনি—"

"এই চলে যাচ্ছে এক রকম। বসো, বসো।" বলিয়া নিজে বসিলেন, কমলও নিকটে একখানি আসনে বসিল।

"হ্যাঁ, কি বলছিল ঊর্ম্মি? গেল কোথায়?"

"এই ত' বেরিয়ে গেল। বলছিল, হ্যাঁ, আমি—আমি—you will kindly excuse me—I was—I was—given to understand that you have no objection—তাই যখন এলাম, ঊর্ম্মি একাই বাড়ীতে ছিল—the opportunity tempted me and I offered my love to her—and—"

"তা ক'রেছ বেশ। আপত্তির কারণ আমাদের কিছুই নাই। তোমার মাকেও জানান হ'য়েছিল, কমল যদি চায় বিবাহ প্রস্তাব ক'রতে পারে!—তা ঊর্ম্মি কি বল্লে?"

"ব'ল্লে, আমার যা কথা আপনাকে জানাতে হবে। কর্ত্তা আপনি—"

"হাঁ, ঠিক বলেছ এদেশের মেয়েটির মতই কথা ব'লেছে।"

"হাঁ, আমিও সেটা appreciate ক'রছি।—An ideally modest girl as she is—she could not do otherwise, যদিও—যদিও তার কাছ থেকে direct একটা response তখন বড় eagerly চেয়েছিলাম।"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। A young man in love সর্ব্বদাই এটা চায়।"

"Thanks! তা হ'লে এখন আপনাদের একটা decision—অবিশ্যি off hand একটা decision কিছু এক্ষুণি আমি চাইছি না, সেটা সম্ভবও নয়। তবে কবে তক—"

"দেখি, তোমার মাসীমা আসুন, তার সঙ্গে আলাপ করি। তারপর বুঝতেই ত' পার—ঊর্ম্মি এখন বড় হ'য়েছে, তার মনের ভাব কি সেটাও ত' জানতে হবে।"

"নিশ্চয়ই! যে যাই বলুক না decent dutyful মেয়েটির মত—সে যাকে মনে মনে খুশী হ'য়ে বেছে নেবে, ভাল যাকে ঠিক বাসতে পারবে—দিতে হবে তাকে আপনাদের তারই হাতে, অবিশ্যি আপনারাও যদি তাকে from all other consideration esteemable ব'লে দান করতে পারেন।

"ঠিক কথা। বেশ সন্তুষ্ট হ'লাম শুনে।—হাঁ, তাহ'লে সব দিক ভেবে চিন্তে বুঝে আমরা দেখি, ঊর্ম্মি কি কি ব'লে তাও শুনি। তারপর—এই ধর তিন চার দিনের ভেতর তোমাকে জানব।"

"Thanks!—And I shall wait patiently and hopefully!—হ্যাঁ, আপনি অফিস থেকে এই ফিরছেন, বিরক্ত করব না আর। আসি তবে, নমস্কার।"

"এস।"

ত্রিশ

"কমল!"

"কি মা?"

সকাল বেলায় খবরের কাগজটা দেখিতে দেখিতে চিন্ময়ী হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, কমলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাগজটা কমলের হাতে দিয়া কহিলেন, "এটা কি কমল! এই যে বিজ্ঞাপনটা—"

চিহ্নিত একটা অংশের দিকে কমলের দৃষ্টি পড়িল। চক্ষুমুখ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। কাগজখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া লাফ দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলে প্রচণ্ড একটি মুষ্টিপাত করিয়া কহিল, "Damn it! It's false!—An absurd prepostorous claim!—Engagement!—না, কোনও engagement তার সঙ্গে শিলং-এ আমার হয় নি!—আজ আর উপায় নাই। The very next morning will come out a sharp emphatic contradiction from me in bold letters in a box and put them to shame!"

"কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটাই বা কি ক'রে বেরোল! কিসের বলে তারা বের ক'রতে পারল? কিছুই বুঝতে পারছি নি আমি,—তারাও তবে শিলং গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, আমি গিয়েই দেখি তারা ওখানে।"

"হুঁ!—ঠিক এমনি একটা আশঙ্কাই আমার মনে তখন উঠেছিল। নিশ্চয়ই তারা খবর পেয়েছিল—কি ক'রে জানি না—তুমি শিলং যাচ্ছ।"

"And they went there with the deliberate purpose of dragging me in to this trap by—by—a vile shameless trick! A cunning plot deliberately laid beforehand and most cunningly executed!"

"কি হ'য়েছিল কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি নি কমল। তবে এটা বেশ বুঝা যাচ্ছে ওদের বাড়ীতে সর্ব্বদা যেতে আসতে, আর ঐ মেয়েটাকে নিয়েও পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে।"

"হ্যাঁ। আর—আর—না, লজ্জার অবসর আমার আর নেই—খুলেই তোমাকে সব বলছি—মাফ করতে আমাকে পারবে কি না জানি না।—I can't ask for it,—I don't deserve it either. The arrant fool that I was—I—I—was tricked into parting with that ring one evening."

"আঁ! বল কি কমল! আংটিটিও তাকে দিয়ে দিয়েছ?"

"সে নিয়েছে—বিশ্রী একটা চালাকী করে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। আংটিটি সে দেখতে চেয়েছিল—খুলে হাতে দিলাম, দেখলাম তার নিতান্ত ইচ্ছা আংটি তাকে দি আর এমন ভাবে সে জানাল, যে ফিরিয়ে আর নিতে পারলাম না—দিয়েই দিলাম।—তখন—তখন—সে—না, সে সব আর তোমাকে বলবার মত কথা নয়।"

স্তব্ধ ভাবে চিন্ময়ী ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া শেষে কহিলেন, "তাহ'লে ত' এই রকম একটা দাবী তারা ক'রতেই পারে। হ্যাঁ, পরদিন আবার যখন দেখা হ'ল—"

"দেখাই আর হয় নি। পরদিনই শিলং ছেড়ে চ'লে আসে। একটিবার কেউ এসে দেখাও আমার সঙ্গে করে নি!"

"আরও চমৎকার!"

অস্থিরভাবে কমল গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল চিন্ময়ী কহিলেন, "পরশু এই প্রস্তাবটা গিয়ে ওখানে ক'রে এলে, আর আজ এই বিজ্ঞাপন—ক'দিন আগেই তুমি engaged হ'য়ে এসেছ! কী যে তারা ভাববে, চোখে যখন প'ড়বে—"

"ভাববে আমি—আমি—একটা Thorough bred scoundrel; a knave of the first water!—তবে—তবে—কাল আমার contradictionটা যখন বেরোবে—"

"কিছুই তাতে হবে না। গাঙ্গুলীরা সেটা মানবেই না। এত বড় একটা প্রমাণ রয়েছে হাতে—"

"চি-চি একটা প'ড়ে যাবে। সবাই জানবে, সবাই বলাবলি করবে, আমি একটা scoundrel—an unscrupulous libertine—ভদ্রঘরের মেয়ের মান রেখে চলি না! কিছুই ভাবতাম না মা, আমাকে লোকে যা খুশী ব'লত—I could stand that. কিন্তু—কিন্তু—আমি যে তোমার ছেলে মা—"

কমল কাঁদিয়া ফেলিল,—মায়ের সম্মুখে বসিয়া টেবিলের উপরে মাথাটি রাখিল।

অশ্রু পুছিয়া মা কহিলেন, "কমল! কেঁদো না,—উঠে ব'স যা হবার হ'য়ে গেছে। Scandal—সে একটা হবেই। সেটা কেবল তোমার একলার নয়—আমাদের এই familyর বড় একটা scandal হবে।—তবু—তবু—আজ এই আঘাতের

ব্যথাটা—এই লজ্জা—এই বোধটুকু যদি তোমার মনে জাগিয়ে থাকে, আমাদের ছেলে তুমি, ব্যবহার তোমার তারই যোগ্য হওয়া চাই—সেইটেই ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে করব।"

"সেটা সেটা—হ্যাঁ, জেগেছে আমার মনে। চেষ্টা করব, প্রাণপণে চেষ্টা করব, যাতে—যাতে তোমার যোগ্য ছেলে হয়ে মুখ তুলে লোক সমাজে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু—কিন্তু উর্ম্মিকে আর পাব না! হয় ত' পেতামই না, সে আমাকে চাইতই না,—কিন্তু এই রকম একটা কেলেঙ্কারীতে মুখে চূণ কালী মেখে যে তাকে আজ হারাতে হল—"

আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। টেবিলের উপরে ভর করিয়া দু'টি হাতে মুখখানি চাপিয়া ধরিল।

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া চিন্ময়ী কহিলেন, "কি করবে কমল? অনেক ত্রুটি করেছ, শাস্তি কিছু তোমাকে ভোগ করতেই হবে। বিধাতার অমোঘ বিধান,—দেনা যা করেছ শুধতেই হবে। কেউ এড়াতে পারে না। তবে—তবে—ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। উর্ম্মি যদি সত্যিই ভাল তোমাকে বেসে থাকে, ক্ষমা করতে পারবে। আর তার বাবা মাও—ঠিক যদি বুঝতে পারেন কিসে কি হয়েছে, আর যদি দেখতে পান তোমার ভবিষ্যৎ ব্যবহারে তুমি এই ঘরের যোগ্য ছেলে, সত্যি একটা scoundrel নও, a true gentleman inspite of all your past follies—তাঁরাও হয় ত শেষে relent করবেন। তবে এই সব মেয়েদের সংসর্গ একদম তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

মুখ তুলিয়া কমল কহিল। দৃঢ় স্বরে কহিল, "দেব!- তোমার সামনে তোমার দিকে চেয়ে আজ বলছি মা, একদম দেব। The pill has been bitter enough for me, আর ও পথে মনই আমার যাবে না।"

"বড় খুশী হলাম কমল! আমি—আমিও সরল প্রাণে তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম। তবে আপাততঃ একটা কৈফিয়ৎ ওদের দিতে হবে; জানাতে হবে তোমার সেই প্রস্তাব তুমি তুলে নিচ্ছ, as a gentleman you ought to do under the circumstances, তোমাকে কিছু করতে হবে না, বুঝিয়ে যা লিখতে হয় আমিই সুকল্যাণীকে লিখছি।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কমল কহিল, "বেশ তাই করো—, এই মুখ নিয়ে আর কি তাঁদের কাছে যেতে পারি? উর্ম্মির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি? তবে—তবে—এটা চাই—তাঁরা-তাঁরা আমার positionটা একটু বুঝতে পারেন, একদম একটা অপদার্থ লক্ষ্মীছাড়া বলে না মনে করেন। That would be my best consolation now!"

"হ্যাঁ।—একটা consolationই মাত্র!—তার বেশী—সাবধান কমল—বড় কোনও আশা মনে পোষণ করো না। আবার হয় ত একটা দুঃখ পাবে। জানি না, উর্ম্মি তোমাকে কি চোখে দেখেছে,—মেয়ে মানুষের প্রাণে ভালবাসতে আদবে তোমাকে পেরেছেই কিনা। যদি না পেরে থাকে—"

"আর পারবে না। হয় ত' শুনব আমাদের এই গোলমালটার একটু কিছু কিনারা হতে না হতেই আর কোথাও তার বিয়ে হয়ে গেল? হ'ক, কি করব? I shall pass out of her life. But I wish she may be happy and live a long happy life with a loving and beloved husband!"

স্নেহ করুণ দৃষ্টিতে চিন্ময়ী পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। একটু হাসিয়া শেষে কহিলেন, "এখন এই গোলমালটা যা পাকিয়ে উঠল তার কি কিনারা হতে পারে? সহজে ওরা ছাড়বে বলে ত' মনে হয় না।"

"না, তা ছাড়বে না। তবে এই একটা চালাকীর চালে আমার ঘাড়েও এসে চেপে বসতে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ! হঠাৎ এই একটা publicity দিয়ে ভাবছে আমাকে একদম আটকেই ফেল্লে। কিন্তু ভুল বুঝেছে the fools! (ঘড়ী দেখিয়া) এ বেলা আর সময় নেই, ও বেলা সন্ধ্যে নাগাত একবার যাব, নিশ্চয়ই তারা ফিরে এসেছে।"

"যাও। দেখ কি তারা বলে, Attitude তারা কি নেয়। চেষ্টা বৃথা বুঝে যদি নিরস্ত হয় ভাল। নইলে—

"It must be fought out! Sensational একটা public scandal হবে। হ'ক! পস্তাতে হবে-তাদেরই বেশী। মোটা damage একটা আদায় করে নেবে? নিক!—But that will damage her reputation irreparbly for good. And that damage money with whatever her father can spare will not buy her a respectable settlement in life!'

বলিয়াই কমল উঠিল।

[আগামী বারে সমাপ্য

বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

প্রধানতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত ও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত খাঁটি বাংলার পদগুলি অবলম্বনে এই নিবন্ধ রচিত হইল। বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক নহেন—সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। যাঁহারা বলেন বড়ু চণ্ডীদাসই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন যৌবনে, আর পদাবলী লিখিয়াছেন বার্দ্ধক্যে—তাঁহাদিগকেও রসাদর্শের পার্থক্যের জন্য প্রকারান্তরে দুই চণ্ডীদাসই স্বীকার করিতে হইতেছে। দ্বিজ চণ্ডীদাস আর বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি হউন আর পৃথক্ ব্যক্তিই হউন—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলিকে উপেক্ষা করিবার যো নাই। এইগুলি এমনি চমৎকার যে, এইগুলিকে মণিরত্নের সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর দীন চণ্ডীদাসের ভাগ্য এমন ছিল না যে, তাঁহাকে এই মণিরত্নভরা হেমঘটের অধিকারী মনে করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনাগুলি তাঁহার হইতে পারে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেকগুলি পদ অপরের ভণিতাতে পাওয়া যায়, সেগুলি তাঁহাদেরও হইতে পারে—চণ্ডীদাসেরও হইতে পারে। যদি সেগুলি অন্যের বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও অনেক উৎকৃষ্ট পদ অবশিষ্ট থাকে। এইগুলির জন্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজন ঘটিতেছে। চণ্ডীদাসের নামে কোন গৌরচন্দ্রিকার পদ নাই। আরও দুই একটি কারণে দ্বিজ চণ্ডীদাসকেও শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

নরহরি চক্রবর্ত্তী যে চণ্ডীদাসের স্তুতিতে বলিয়াছেন—

> সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে
> যাহার চরিতে ঝুরে পশুপাখী পিরিতে মজিল যে।

সে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস বলিয়া মনে হয় না। ইনি পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

এই নিবন্ধে প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি লইয়া আলোচনা করা হইল। বলা বাহুল্য ইহাদের কোন কোন পদ দীন চণ্ডীদাসের।

চণ্ডীদাসের পদাবলীসাহিত্যে প্রেম এইরূপ শিরোনামা না দিয়া 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেম' শিরোনামা দেওয়া হইল। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেমের স্বরূপই চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদে পাই।*

নায়ক-নায়িকার রূপ-মাধুরী অনুরাগের উদ্দীপন বিভাব। সে জন্য রূপবর্ণনার প্রয়োজন আছে—যে রূপ দেখিয়া নায়ক-নায়িকা জীবন যৌবন লাজ ভয় মান সব ভুলিয়া যাইবে তাহা অপূর্ব্ব হওয়াও চাই। বৈষ্ণব কবিগণ রূপবর্ণনার প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন। এ জন্য চিরকাল কবিরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ব্বতা দেখাইবার জন্য যে সকল উপমা ব্যবহার করেন কবিগণ চণ্ডীদাসাদি সেগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—তবে বিদ্যাপতি বা সংস্কৃত কবিদের মত খুঁটিনাটি করিয়া নয়। এ জন্য ডম্বরু, বিল্ব, কনককটোরা, চাঁদ, কমল, খঞ্জন, দাড়িম্ব বীজ, বিম্ব, বন্ধুজীব, চামর, থির বিজুরি, কুন্দকুঁড়ি, মুকুতার পাঁতি ইত্যাদি সমস্তই উপমায় লাগাইয়াছেন। মনে হয় কবিদের ইহাতে মন উঠে নাই। তাই তাঁহারা অনেকক্ষেত্রে মুগ্ধতার গভীরতার দ্বারাই মনোমোহনের মোহনতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে এমন অপূর্ব্ব তুলিকাস্পর্শ

---

* চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত পদগুলি অন্য কবির নামেও পাওয়া যায়। ১। কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি, ২। পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে—নরহরির নামে। ৩। সই কত না রাখিব হিয়া। আমারি বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া—(ঈষৎ রূপান্তরিত) জ্ঞানদাস ও নরহরি দাসের নামে। ৪। সজনি, ও ধনি কে কহ বাথে—লোচনদাসের নামে। ৫। কাহারে কহিব মনের কথা, কেবা যাবে পরতীত—রামচন্দ্র ঠাকুরের নামে। ৬। বন্ধু কি আর বলিব তোরে, এ তিন ভুবনে আর কেহ নাই দয়া না ছাড়িহ মোরে—দীনবন্ধু দাসের নামে। ৭। কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে—(বিদগ্ধ মাধবের শ্লোকানুবাদ) যদুনন্দন দাসের নামে। ৮। থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিনু ঘাটের কূলে, ৯। ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে, ১০। চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার—রামগোপাল দাসের নামে কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ১১। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল—জ্ঞানদাসের নামে।

দিয়াছেন যাহাতে সমগ্র রূপ আপনা হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছে —দশটি উপমাঙ্গ জোড়া দিয়া রূপ পরিকল্পনা করিতে হয় নাই, কয়েকটি সেই শ্রেণীর পংক্তির এখানে উদ্ধার করি,—

১। স্বপ্নসম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।

২। বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন মোহন লখিয়া নাহিক লখি।

৩। জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর লোল পিতে করে উতরোল নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

৪। বৃকভানুসুতা চরণ হইতে নিরীখন করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া।
মনে মনে বনফুল তুলি রাধে পুজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ মানস ভিতরে থুই।
সই চাহনি মোহিনী থোর
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝল রূপের নাহিক ওর।

৫। নয়ন কমল অতি নিরমল তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি যেনবা দিয়াছে দেখা।

৬। চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে দেখিতে যাইবে চল।

৭। সই, এমন সুন্দর কান
হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি তেজি ভয় লাজ মান।

কবি নায়িকার লীলাভঙ্গী, চলন বলন, হাব ভাব, বিলাস-বিভ্রমের ইঙ্গিত করিয়া রূপের আকর্ষণী মাধুরী বাড়াইয়াছেন,—

১। বসন খসায়ে অঙ্গুলি চাপায়ে কর সে করচে থুইয়া।

২। ধীরে ধীরে যায় থমকিয়া চায় ঘন না চায় সে লাজে।

৩। ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস।

চণ্ডীদাস (মতান্তরে লোচনদাস) নিম্নলিখিত পদে একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন,—

সজনি, ও ধনি কে কহ বাটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি কো ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করেছে আসন এলায়ে দিয়েছে বেণী।
উচকুচমূলে হেমহার দুলে সুমেরু শিখর জিনি।
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে পড়েছে চিকুর রাশি
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্কী চাঁদার শরণ হইল আসি।
কিবা সে দুভুলি শঙ্খ ঝলমলি শরু শরু শশিকলা,
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময় দেখিয়ে হইনু ভোলা।
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নয় থির মনমথ জ্বরে ভোর।

দ্বিজ চণ্ডীদাস সরল মাধুরীর দ্বারাই রসসৃষ্টির জন্য বিখ্যাত, —তাই বলিয়া কবিজনসুলভ চাতুরীও তাঁহার কম ছিল না। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে কবি যথেষ্ট চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নাপিতিনী, দেয়াসিনী, গ্রহবিপ্র, চিকিৎসক, বাজিকর, দোকানী, বেদিয়া, মালিনী ইত্যাদি নানা রূপ ধরাইয়াছেন। বেদিয়া সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃকভানুর অন্তঃপুরে সাপখেলানো দেখাইতে গিয়াছেন—গোপীরা তুষ্ট হইয়া বলিতেছে,—

থাক কোন স্থানে ?

উত্তর—

থাকি বনের ভিতরে নাগ দমন বলে মোরে
মোর নাম জানে সব জনে।
বসন মাগিবার তরে আইনু তোমার ঘরে
কৃপা করি দেহত আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি।

ইহার বাচ্যার্থে যে চাতুর্য্য ফুটিয়াছে—তাহাই যথেষ্ট। কেহ যদি ইহার ব্যঙ্গার্থ বা আধ্যাত্মিক অর্থ ধরেন—তিনি আরও বেশি পাইবেন।

গোপীরা বলিল,—

চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা লও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।

উত্তর—

চুরি দারি নাহি করি ভিখ মেগে পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ?

শ্রীকৃষ্ণ বাজিকরবেশে আবার রাধিকার মন ভুলাইতে আসিলেন। পুরুষের পৌরুষ ব্যঞ্জক কৃতিত্ব কৌশল দেখিলে নারীর মন ভুলে ইহাই কবির ইঙ্গিত। কবি বলিয়াছেন—

কানুর পিরীতি কুহকের রীতি সকলি মিছাই রঙ্গ

*

লোকে নয় রাজি কেমন এ বাজি রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছা নয় রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ?

এখানে লোকোত্তর অর্থদ্যোতনার চাতুর্য্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে নাপিতিনীবেশে সাজাইয়া কবি রাগরসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—ইহাও চাতুর্য্যের দ্বারা রসসৃষ্টি। ফাঁকি দিয়া প্রণয়িনীর চরণ সেবার মধ্যে যে গূঢ় রস আছে—'দেহি পদপল্লব মুদারম্'-এর মধ্যেও তাহা নাই।

বসিল সে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটি আনিল জলের ঘটি ঢালিল সে সুবাসিত বারি।
করে নথ রঞ্জিনী চাঁচয়ে নখের কণি শোভিত করল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায় ধীরে ধীরে আধ গায় হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে।
নাপিতিনী একে শ্যামা ননীর পুতলি, বামা বুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘসিয়া ঘসিয়া পায় আলতা লাগায় পায় কতই না নব নব ছন্দে।
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি তলে লেখে নাম আপনার।
নাপিতিনী বলে ধনী দেখত চরণখানি ভাল মন্দ করহ বিচার।

কবি চাতুর্য্যের দ্বারা এখানে আদিরসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বৈদ্যবেশে সাজাইয়াও কৌশলে রসসৃষ্টি করিয়াছেন। বৈদ্য রোগ ধরিয়া দিল,—

"পিরীতির রসে জারিয়াছে বিসে পরাণ রহে না রয়।"

আত্ম বিস্মরণময় সর্ব্বজয়ী প্রেমের স্বরূপ, তাহার গাঢ়তা, গূঢ়তা, ও গভীরতা, তাহার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, তাহার আকুলতা ও বিহ্বলতা দেখাইতে কবি আপনার রসঘন অন্তরের সর্ব্বস্ব পদাবলীর মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন।

রাধার অন্তরে পূর্ব্বরাগের স্পর্শ লাগিয়াছে—রাজার ঝিয়ারী কোন দিন কোন বেদনা তিনি পান নাই—"আজনম ধনী হাসি বিধুমুখে কভু না হেরিয়ে আন,"—তাহার অন্তরে এমন কি হইল—সে একদিনে 'মহাযোগিনীর পারা' হইল কেন? অসময়ে এই কিশোরী বয়সে অনিদান বৈরাগ্য কোথা হইতে?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায়।

সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে না, রাঙা বাস পরে, আহারে রুচি নাই, কখনও চোখে শ্রাবণের ধারা—কখনও—

এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি।

সেকি হাত বাড়াইল চাঁদে? সখী বুঝিয়াছেন, তিরস্কার করিয়া সখী বলিতেছেন,—

বুঝি অনুমানি কালারূপখানি তোমারে করিল ভোর।

রাধার আবেদন—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে।
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে চাহি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে আপনার যৌবন যাচায়।

নামের প্রতাপেই এই দশা, তাহাকে দেখিলে যুবতী-ধর্ম্ম থাকিবে না, অঙ্গের পরশে কি হইবে কে জানে? শ্যাম নাম কাণে প্রবেশ করিয়া এই অঘটন ঘটাইয়াছে। কোন যুগযুগান্তরের কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত এই নাম রাধার মরমে প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রসুপ্ত জন্মান্তর সৌহৃদ স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল! এখনও রাধা চোখে দেখেন নাই—রূপজ অনুরাগ কি করিয়া বলা যাইবে? নামে যে প্রেমের সূত্রপাত নামগানেই তাহার পর্য্যবসান হইয়াছে, ইহার বেশী কিছু বলিব না। প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় এ কোন প্রেমের কথা?

তারপর প্রথম দর্শনে কি রসমুগ্ধতা, কি বিহ্বলতা এ যেন কত যুগযুগান্তরের হারাধন সহসা নয়নে পড়িল—

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।
গোকুল নগর মাঝে আর ত রমণী আছে তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।
মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে তাহে শোভে ময়ূরের পাখ।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখ।
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয় রসের নাগর বড় কালা।

শ্যামকে রাধা প্রথম দেখিলেন। কবি কি চিত্তোন্মাদ আবেষ্টনীর মধ্যে শ্যামকে দেখাইলেন! যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে, মুখে বাঁশী, গলে মালতীর মালা, মল্লিকাদামবেষ্টিত ময়ূর পাখার চূড়া, সে চূড়ার টালনী আবার বাম দিকে—ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়াছেন—এই চিত্রটি রাধার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইল। সেই সঙ্গে এই মূর্ত্তি বাঙ্গালী জাতির চিন্ময় মন্দির আর মৃন্ময় মন্দিরেও চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

তারপর মুরলীর ধ্বনি। কবি যদুনন্দন দাস বলিয়াছেন—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে আসিয়া পশিল মোর কানে।

—তাহাতে কাণ জুড়াইল কিন্তু প্রাণ এমন করে কেন? একি অমৃত না বিষ?

রাই কহে কেবা কেন মুরলী বাজায় হন বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে হিমে তনু শীতল করিয়া মোর হিয়া।
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে ছেদন না করে হিয়া মোর
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি।

পীরিতির স্বরূপ আর মুরলীধ্বনির স্বরূপ দুই-ই এক—বিষামৃতে একত্রে মিশানো।

শ্যাম গোষ্ঠে চলিয়াছেন সাথীদের সঙ্গে—রাধা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন—

আঁখির পুতলি হারকার মণি যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল পাছে বা গলিয়া ঝরে॥
ননীর অধিক শরীর কোমল বিষম ভানুর তাপে।
জানি বা অঙ্গ গলি গলি হয় ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙা চরণ ভেদিয়া ছেদিবে মোর মনে হেন ভয়॥
কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা হেনক সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয় হায়রে বুঝিতে নারি॥
ছারে খারে যাক অমন সম্পদ অনলে পুড়িয়া যাক।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিলে পায় কত সুখ পাক॥

কি দরদই না ইহাতে ফুটিয়াছে! যশোদার দরদও এখানে হার মানিয়াছে।

শ্যাম হেন ধন কোথায় রাখিবে ঠিক করিতে না পারিয়া রাধা বলিতেছে,—

হেন মনে করি আঁচল থাপিয়া আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে ডাকা চুরি দিয়া পাছে লয়ে যায় সখি।
এ রূপ লাবণ্য কোথায় রাখিতে মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যেথায় সেথানে করেছি ঠাঁই।
সবার গোচর নাহি করি, কত রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া সিঁধ যবে যাই নিঁদ কেহ বা করয়ে চুরি।

রাধার সব চেয়ে বড় বেদনা—

স্বতন্তরা নাই গুরু পরিজনা তাহার আছয়ে ডর।
যেন বেড়া জালে সফরি সলিলে তেমতি আমার ঘর।

বঁধুর পীরিতির সম্যক্ আদর করিবার উপায় নাই। তাই রাধার মনে হয়—'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাই ঘরে।'

নহি স্বতন্তরা গুরুজন ডর বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কতনা যাতনা দিনু।
এ ঘোর রজনী মেঘঘটা বঁধু কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।

প্রেম বড় বেদনার ধন। সুখের লাগিয়া যে প্রেম করিতে যায় সে মূঢ়। প্রেমে জ্বালা আছে জানিয়া শুনিয়াই যে এ প্রেমকে বরণ করিতে পারে—জ্বালা তাহার মালা হইয়া তাহাকে গৌরব দান করে। প্রেম যত গাঢ়, বেদনা তত গাঢ়। যে প্রেম 'নিমিখে মানয়ে যুগ ক্রোড়ে দূর মানে' সে প্রেমে সুখ কোথায়? এ প্রেমে সম্ভোগেও সুখ নাই—কবি বলিয়াছেন—

দুহু ক্রোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

এ প্রেম—দুই আত্মার একত্ব লাভের প্রয়াস—এ প্রেম এমনি চিন্ময় যে, হারচন্দন চুয়া চীরের ত কথাই নাই দেহের ব্যবধানটি পর্য্যন্ত এ প্রেম সহ্য করিতে পারে না।

যুগে যুগে কবিরা যে প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কত উপমারই প্রয়োগ করিয়াছেন—এ প্রেম সে প্রেম নয়। ইহা কি উপমা দিয়া বুঝাইবার জিনিষ? কবি বলিয়াছেন—

জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
ভানু কমল বলি সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা।
কুসুম মধুপ কহি সেও নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে।

অন্য কবিরা যে প্রেমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সঙ্গে হয় ত এ সকলের তুলনা চলিতে পারে। কবি যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন—সে প্রেমের কোন উপমা নাই। তাহা যদি থাকিত—তবে কবি ভাল ভাল অলঙ্কার দিয়া বেশ শাসনসংযত ভাষায় ও ছাঁদে তাহার বর্ণনা করিয়া অমরুশতক শ্রেণীর কাব্য লিখিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রকাশের জন্য এত আকলি বিকলি করিতেন না—"হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি"র ভাষায় কবিতা লিখিতেন না।

কবি চিত্তরঞ্জন

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি-এল্

বঙ্গ জননীর সুসন্তান ভারতীর বরপুত্র, সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিকের শুভ মুহূর্ত্তে পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের ভাগ্যাকাশে সেদিন যে তরুণ-রবির উদয় হইল, কে জানিত তাহার অসামান্য প্রতিভার আলোকছটায় একদিন সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। দেশবন্ধুর পিতার নাম স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাশ এবং মাতৃদেবী ছিলেন নিস্তারিণী দেবী।

দেশবন্ধুর সর্ব্বমুখী প্রতিভার আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তিনি কি ছিলেন এবং দেশবাসীর মনের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া নিজের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র দেশ বুঝিতে পারিয়াছিল সেই দিন, যে দিন স্বরাজ-সূর্য্যের বহ্নিভরা আলোকরশ্মি সহসা ম্লান হইয়া মধ্যাহ্ন গগনেই অস্তমিত হইল। দেবীর বোধনের ঘট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সে দিন বঙ্গের ভাগ্যাকাশে ইন্দ্রপাৎ হইয়া গেল। ১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে দেশবন্ধু তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। বাঙ্গালার ভাগ্যে সে কি এক মহাদুর্দ্দিন। দেশ মাতৃকা শ্রেষ্ঠ সন্তান হারাইল, সমগ্র দেশ বন্ধু হারা হইয়া তপ্ত অশ্রু ধারায় বুক ভাসাইল। সে দিনের কথা আজিও স্মরণ হইলে নয়ন যুগল অশ্রু আপ্লুত হইয়া উঠে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি ছিলেন এই প্রশ্ন করিলে প্রথমতই মনে হয়, তিনি কি ছিলেন না। তাঁহার প্রতিভা ছিল গগন চুম্বি গৌরী শৃঙ্গের ধবল মালা, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া জল্ জল্ করিয়া পৃথিবীর বুকে চির প্রতিভাত থাকিবে। তিনি ছিলেন দেশ সেবক, সমাজ সেবক, দানবীর, আইন বিশারদ ও শ্রেষ্ঠ কবি। আমরা তাঁহাকে ব্যারিষ্টার রূপে মিঃ চিত্তরঞ্জনকে দেখিয়াছি, তাঁহার আইনের জটিল তর্কের মীমাংসা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। আবার আমারা তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রূপে দেখিয়াছি। তিনি বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে ডুবিয়া যান নাই। যেই অন্তরের মানুষ ডাক দিল, অমনি বিলাসী চিত্তরঞ্জন এক ডাকেই সাড়া দিয়া বিলাস ব্যথনের হর্ম্মপ্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া অনন্ত নীলাকাশের অসীম বুকে আশ্রয় লইলেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। পৃথিবীর কোন বন্ধনই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। যে দিন সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন দেশ মাতৃকার পুণ্য বেদীমূলে সমস্ত দান করিয়াও মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মত দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার শেষ আশ্রয়স্থল রসারোড স্থিত প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দান করিয়া মাতৃযজ্ঞে শেষ আহুতি প্রদান করিলেন, সে দিন সমগ্র দেশ অবাক্ বিস্ময়ে

মিঃ চিত্তরঞ্জন

এই বিরাট্ পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী যে রূপকথা নহে তাহাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বিংশ শতাব্দীতে লোক চক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট করিয়া দিলেন। এখানেও বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে এমনি করিয়া কোন্ নেতা দধিচীর মত বুকের অস্থি দান করিয়াছেন? ১৯১৭ সালে ১০ই অক্টোবর ময়মনসিংহে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন, "দেশই আমার ধর্ম্ম, আমার চির জীবনের আদর্শ ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমার ভগবানকে আমার সম্মুখে দেখিতে পাই।" এমনি করিয়া দেশের জন্য আর কে পাগল হইয়াছিল? আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন,

"বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গান, এবং মহাপ্রভুর জীবন গৌরব বাঙ্গালীর প্রাণের গৌরব বাড়াইয়াছে। আমরা ভাসিয়া ডুবিয়া বাঁচিয়াছি।" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃমূর্ত্তি গড়িলেন, তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু আমরা দেশমাতৃকাকে চিনিলাম কৈ? তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি একা মা মা করিয়া রোদন করিলাম।" মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তিনি যেন মুক্তির অবতার ছিলেন।" ১৯২০ সালে ৬ মাস কারাভোগের পর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যে দিন তিনি মুক্তি লাভ করেন সে দিন জেলে গেটে যেন সমগ্র দেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নিজের মধ্যে আপনার নেতাকে পাইবার জন্য সে কি আকুল আগ্রহ? মুক্তির পর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেন তাহাতেই চিত্তরঞ্জনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, "বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি, তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই। তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ ও স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" দেশবন্ধু বলিয়াছেন, "অত্যাচারে অত্যাচার সৃষ্টি করে।" দেশবন্ধুর অমর আত্মা অনন্তধামে চির বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। শৃঙ্খলিতা মাতৃভূমির বন্ধন মোচনের জীবন ভরা এই যে আকুতি, তাহা কি ব্যর্থ হইবে? বাঙ্গালার প্রতি অনুপরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে তিনি মিশিয়া আছেন। বাঙ্গালার তরুণের ধমনীতে ধমনীতে চিত্তরঞ্জনের রুধিরধারা প্রবাহিত থাকিয়া তাঁহার আরদ্ধকার্য্যের পরিসমাপ্তির নিমিত্ত চিত্তরঞ্জনের ভাবধারা বাঙ্গালার বুকে চির জাগরিত আছে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমি আবার এই বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিব।"

আমার মনে হয় দেশবন্ধুর এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল তাঁহার অন্তর্মুখী চিন্তাধারা। ফল্গু-নদীর অন্তঃসলিলা স্রোতের মত এই চিন্তাধারা মুহুর্মুহু দেশবন্ধুর চিত্তকে আপ্লুত করিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে এই সাবলীল স্রোত ব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়া চিত্তরঞ্জনের সত্যিকারের রূপ আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে। সেই স্থানেই আমরা দেখিয়াছি—চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত কবি।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই কবি প্রতিভার উন্মেষ দেখা দেয়। যখন তিনি লণ্ডন মিশনারী স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র তখন হইতেই তিনি কাব্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। এই কবি প্রতিভা একদিন সমগ্র বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই রবীন্দ্র-যুগের কবি হইলেও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় চিত্তরঞ্জনের কবি প্রতিভা ম্লান হয় নাই। "কবি ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি" কবিতায় চিত্তরঞ্জন তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,

> এ নহে রবির লেখা সুন্দর সনেট্‌,
> শরদ প্রভাতসিক্ত শুভ্র শেফালিকা;
> *
> এ মোর হৃদয় জাত মলিন মালিকা।

কবি সত্যদ্রষ্টা। যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর, কবি তাহারই উপাসক। এবং তাহারই রূপ বর্ণনায় নিজকে ঢালিয়া দেয়। কবি শুধু ভাববিলাসী হইলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সমাজের দিকেও কবির কর্ত্তব্য অনেকখানি আছে। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম হইলেও কায়মনপ্রাণে সত্যিকারের হিন্দুপন্থী ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের মতবাদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি মালঞ্চ নামক কাব্য গ্রন্থে কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশ করেন। এই মালঞ্চ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'সোহং" কবিতায় চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছেন,

> অসার সকল জ্ঞান ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী!
> তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার?
> আপনারি উচ্চারিত মেঘ-মন্দ্র বাণী
> আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার।
> ক্ষুদ্র তুমি ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
> অসীম অনন্ত শক্তি মহাদেবতার?
> জ্ঞান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত
> নিতান্ত নিস্ফল হেথা মানবের প্রাণ?
> যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
> শত আবরণে আপনারে মূর্ত্তিমান।"

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

> "কাহার চরণে তুমি সাজাইছ ডালা
> কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা?"

কবি "ঈশ্বর" কবিতায় তাঁহার প্রাণের বেদনা জানাইয়াও কোন উত্তর না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন,

'বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু। তৃষ্ণার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ বক্ষ হ'তে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রুসিক্ত লজ্জা নত আঁখি।"

তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে নিঠুর আখ্যা দিয়া লিখিয়াছেন,

ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র-সম
করুণা বিহীন তুমি অনন্ত নিঠুর।"

ভগবৎ চরণে প্রাণ মন সকলই অর্পণ করিয়াও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় দেখিয়া তিনি অভিমান ভরে লিখিয়াছেন,

"আকুল পরাণ ল'য়ে ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণ তলে আসিব না আর।"

তিনি অহঙ্কার শীর্ষক কবিতায় তথাকথিত সাধু আখ্যাধারী হট্‌যোগী, যাহারা এই পৃথিবীর নর-নারায়ণের দিকে একটিবারও ফিরিয়া চায় না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,

"মাতার ক্রন্দন শুনি চেও না ফিরিয়া ;
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক,
ঊর্দ্ধ মুখে পুজা কর দেবতা গড়িয়া
প্রাণ পুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।"

"ধার্ম্মিক" কবিতায় তিনি ধর্ম্মের নামে যাহারা ব্যবসা চালাইতেছেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,

"ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছে স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া ;
নিমিষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান্ স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া।
ওহে সাধু আমি জানি অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায়॥

তিনি তাঁহাদিগকে সমাজ বক্ষে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

"এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ,
কাজ কি এ মিথ্যা ভরা দেবতার ভাণ।"

চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টিতে সমাজ দেহের কোন অংশই বাদ যায় নাই। তিনি "বার বিলাসিনী" কবিতা লিখিয়া ব্রাহ্ম সমাজ হইতে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এই কবিতায় তিনি বেদনার তুলিতে তাহাদের ভিতরের মানুষের প্রাণের বেদনা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন,

"ওগো আমি যৌবনে যোগিনী।
এ বিশ্ব লালসা ছাই ;
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই ;
চলিয়াছে কলঙ্ক কাহিনী।
তুমি যেয়ো এলে উষারাণী।
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাশে
রজনীর কলঙ্কের বাণী
ভুলে যেয়ো রজনীর কলঙ্ক কাহিণী !
শুধু আমি রব কলঙ্কিনী।"

"লালসা" কবিতায় কবি বড় ব্যথা বুকে পাইয়া লিখিয়াছেন,

"আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল !
আর আসিও না কাছে
কি জানি গো পাছে
দগ্ধ হয়ে যাও তুমি
শুভ্র শতদল "

'নিশীথে" কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

নূপুর খুলিয়া লও !
যদি এ রজনীর অন্ধকারে বাজে
আমাদের দুজনার কলঙ্কের কথা।
... ...
কৌতুহল পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা পড়ে যায়

দু'জনার সর্ব্বসুখ অন্তরের ছায় "

তিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া "জাগরণ" কবিতায় লিখিয়াছেন,

"আজি এ হৃদয় মোর ছিড়েছে বন্ধন
প'ড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প কারাগারে।

প্রকৃত প্রেম প্রেমিক প্রেমিকার মিলন মাধুরীতে পূর্ণ, প্রাণে প্রাণে দু'য়ে এক হ'য়ে মিশে যাওয়া। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে লালসা জাত প্রেম কণ্টক স্বরূপ। তাই কবি লিখিয়াছেন,

"তোমার এ প্রেম সখি শানিত কৃপাণ।
দিবানিশি করিতেছে হৃদি রক্তপান।"

"ঘুম ঘোর" কবিতায় কবি আঁকিয়াছেন আত্মসমর্পণের ছবি।

"আমি তো সঁপিনী হৃদি
আপনি পড়েছে ঢুলে;
নিশীথের ঘুম ঘোরে
তোমারি চরণ মূলে।
মরণেরে দেব বলে
পরাণ খুঁজিনু হায়;
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
সে প্রাণ তোমারি পায়।"

"প্রাণের গান" শীর্ষক কবিতায় কবি তাঁহার প্রাণের কথা বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিয়াছেন,

"ধরণীর আলো লেগে লাজে গীত ফিরে যায়
আপনা আবরি রাখে যত ডাকি আয় আয়।"

"ভুল" কবিতায় কবি বিশ্বের বুকে নিজকে ভুলিয়া গিয়াছেন,

"ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা!
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরাণ পাগল পারা।
আকাশে যখন চাই
শশী তারা কিছু নাই;
শুধু জাগে ওই ওই
তোর নয়নের তারা।"

"কল্পনা" কবিতায় কবি নিপুণ তুলিতে রাগ দিয়াছেন,

"এ তনুর প্রতি অনু তৃষিত লোলুপ
এ প্রাণের পিপাসার কোথা তব রূপ।"

তিনি দুঃখকে প্রাণ ভরিয়া প্রেয়সীর মত বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাই তিনি দুঃখে কোন দিনই বিচলিত হন নাই। তিনি জীবনে কোন দিনই দুঃখ-কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই, এবং হাসি মুখেই ভগবানের দান বলিয়াই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্বসুখ হতে।
... ...
নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার
আলিঙ্গন পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান;
বিমুক্ত কুণ্ডলে কর আনন্দে আঁধার।"

তিনি সুখকে এই ধরণীর বস্তু বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। সুখকে কবি মায়া মৃগ বলিয়াই উপহাস করিয়াছেন,

"ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ মণ্ডিত
থাক তুমি স্বর্ণপুরে সুরেন্দ্র বন্দিত।"

দেশবন্ধু ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। তাই তিনি "দরিদ্র" কবিতায় দরিদ্রের ডাকে প্রাণের সাড়া দিয়াছেন,

"তোমরা ডেকেছ তাই আসিয়াছে আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের।
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।"

মালঞ্চের পর চিত্তরঞ্জনের "অন্তর্য্যামি" নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় চিত্তরঞ্জনের অন্তরের কথা স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন কায়মন প্রাণে পরম বৈষ্ণব, তিনি বিশ্বের প্রতি অনুপরমানুতে শ্রীভগবানের লীলা মাধুরী দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"সকল গানের মাঝে
তব গানগুলি।"

আবার যখন অবসাদ আসিয়াছে তখন,

"যখনি দেখিতে পারি অন্ধকার আসে
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তারি চারি পাশে।
কোথা হতে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।"

চিত্তরঞ্জন জীবনের প্রতিকার্য্যকে শ্রীভগবানের দেওয়া কার্য্য বলিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া একান্ত মনে চলিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করে।

"যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই;
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই।"

তিনি পথের নির্দ্দেশ চাহিয়া আবার লিখিয়াছেন,

"এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই;
চরণে বিঁধুক কাঁটা, তাতে ক্ষতি নাই।"

আবার লিখিয়াছেন,

"ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বন পথ দিয়া।"

অন্তরের গোপন কথা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন,

"কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে;
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে।"

আবার অন্ধকারে পথ হারা আকুল হইয়া বলিয়াছেন,

"মরম আঁধারে বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও,
আমার সকল তারে বাজাও বাজাও।"

তিনি পথের সন্ধানে ছুটিয়াছেন,

"যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর,
আমার অন্তর আত্মা বাসনা বিভোর।"

এম্‌নি করিয়া পথের সন্ধানে বাহির না হইলে কি সে পথের সন্ধান মেলে ?

"সেই পথ লাগি আজ মন পথ বাসী ;
সেই পথ খালি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।"

কিন্তু এই যে কণ্টকাকীর্ণ পথ, তুমি এই কাঁটা পথে, হে হৃদয় বিহারী, তুমি কেমন ক'রে আসবে ?

"এস আমার আঁধার ঘেরা, এস ভয়হারী ;
এস এস হৃদ্ মাঝারে হৃদয় বিহারী।"

আবার আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছেন,

"এস মন বন পথে, এস বনমালী,
চরণ তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন জলে ধুয়ে ;
পরাণ ভরে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে"

কিন্তু আমার এ হৃদয় যে কণ্টকাকীর্ণ। তোমায় কোথায় বসাব,

"এস আমার প্রাণের বঁধু! এস করুণ আঁখি ;
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা
তোমায় কোথায় রাখি।

এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশি।"

তাই মৃত্যুঞ্জয় দেশবন্ধুর ললাটে মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"এসেছিলে সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ ;
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

ইহার পর দেশবন্ধুর কিশোর কিশোরী কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় চিত্তরঞ্জন বাল্যলীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"কাছে কাছে নাইবা এলে, তফাৎথেকে বাসব ভাল ;
দুটী প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে প্রদীপ জ্বাল।"

বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,

"নিবিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুল হার ;
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার।"

ইহার পর মালা প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জনের এই মালা প্রেমভক্তি কুসুম-রচিত কবি হৃদয়ের অফুরন্ত ভাবধারা ছন্দোময়ী ভাষার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই "মালা" "প্রিয়েরে দেবতা করে দেবতারে প্রিয়।" কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,

"আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে ;
কেন রাখিয়াছ ওগো প্রদীপ জ্বালিয়া ?"

এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি লিখিয়া চলিয়াছেন,

কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে !
প্রজ্জ্বলিত হৃদি মাঝে শূন্য সব ঠাঁই ;
হে প্রেম নিষ্ঠুরা ! আমি যে তোমারে চাই।
আমি যে তোমারে চাই সন্ধ্যার মাঝারে ;
তোমার ও প্রদীপের আলো অন্ধকারে,
সকল সকল মাঝে সর্ব্ব বেদনায়।"

কবি শুধু চাহিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। অনন্তকাল ধরিয়া অসীমকে অসীমের বুকের মাঝে এই যে চাওয়া, ইহার শেষ কোথায় ? তাই কবি লিখিয়াছেন,

"তোমারে খুঁজেছি আমি আলোক আঁধারে ;
সারাটি জীবন ধরি, মরণ মাঝারে—
সকল ফুলের মাঝে, সর্ব্ব সাধনায়
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর সন্ধ্যায়।
হে মোর লুকান ধন! আজো তুমি জয়ী
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ী।"

কিন্তু অনাদিকাল হইতে যুগ যুগ ধরিয়া এই যে না পাওয়া, এই না পাওয়াই প্রেমকে আরও সুন্দর করিয়া তোলে। কারণ পাওয়ার পর আর চাওয়ার আনন্দ থাকে না। পাওয়ার জন্য এই যে আকুল আকাঙ্খা, ঐ পাওয়ার বুকেই তার চির সমাধী হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ "ভুলভাঙ্গা" কবিতায় ইহারই রূপ দিয়াছেন,

"বাঁশী বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশী ;
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।"

সুখের ছলনা কবি চিত্তরঞ্জন নিপুণ হস্তে "মরমের সুখ"

কবিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ছলনার কুহেলী মায়ার পরশ হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রিয়কে উপদেশ দিতেছেন,

"আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পের সৌরভ
সাজাও অন্তর মোর! এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোণে,
এ শুধু সুখের ছল! আমারে ছলিছে,
তোমারেও ছলিতেছে। মম মন-বনে
আমারি মরমতলে সুখেরে খুঁজিও।"

"সে কি শুধু ভালবাসা" কবিতায় কবি ভালবাসার যে রূপ দিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল।

"কেমন সে ভালবাসা, বলা কি সে যায়?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায়।
যবে তুমি দূরে থাক ওগো প্রিয়তম
তোমারি আশার আশে নর্ত্তকীর সম
অঞ্চল দোলায়ে তার নূপুর গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ তালে নাচে, এ অন্তরে মম।"

দূরে থাকিলে প্রাণের আকুল আকাঙ্খার অভিব্যক্তি করিয়া নিকটে আসিলে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন,

"তোমা যবে কাছে পাই হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল—উন্মাদের গান।"

তখন বিক্ষুব্ধ সাগরে অন্তর তরুণী

"এই ভাসে, এই ডোবে, জীবন মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্ব্ব মন সর্ব্ব দেহ সমস্বরে গায়
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির আলিঙ্গন।"

"স্বর্গের স্বপন" কবিতায় কবি মর্ত্তের বুকে যে রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গের রূপ বিমলীন হইয়া গিয়াছে,

"হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময়!
আজি পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়।
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে,
... ...
যেমনি বাজায়ু বাঁশী সলাজ চরণে
বাহিরিলে দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব ধরণে
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প, মস্তকে গগন!—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন।"

"শূন্যপ্রাণ" কবিতায় কবি তার পরিপূর্ণ প্রাণের সবটুকু দান করিয়াছেন,

"সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আমি,
চাও যদি ল'য়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।"

এমনি করিয়া কে আর আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে? "প্রেমসত্য" কবিতায় কবি চিত্তরঞ্জন অন্তর দৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকৃত রূপ দর্শন হয় তাহাই লিখিয়াছেন,

"জ্ঞান চক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিলে প্রিয়ে!
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি নেত্র দিয়ে।"

আর একস্থানে কবির আত্মা কি তাহা অতি সহজ ভাবে বলিয়াছেন,

"কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে।"

"দান" কবিতায় কবি তাঁর অন্তরকে বিলাইয়া দিয়াছেন,

"ওগো, আমার প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান,
তুমি নয়ন মুদিয়া তুলিয়া লইও
ভরিও তোমার প্রাণ।"

"অন্তিমে" কবিতায় কবি চিত্তরঞ্জনের প্রাণের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"নিভিয়া গিয়াছে হাসি
শুকায়ে গিয়াছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি
মৃত্যুর একি রে ভুল!
বঁধু নাই—বাঁশী নাই—
বৃন্দাবন? তাও নাই;
অন্তরের সাধ গুলি
পুড়িয়া হয়েছে ছাই।"

"তুমি ও আমি" কবিতায় কবি চিরবাঞ্ছিত অন্তরের "বন বুকের

কাছে পাইয়াও যেন পরিপূর্ণ ভাবে মিলন সুখ আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না। তাই লিখিয়াছেন,

"তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি ;
দুজনের মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সমস্ত কবিতাই মহাপ্রেমের ভাব গঙ্গায় উচ্ছ্বসিত। জীবন রহস্যের পরপারে মোহ যবনিকার অন্তরালে যে চির আলোক বিদ্যমান আছে তাহাই কবির 'সাগর সঙ্গীতে' মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সাগর সঙ্গীতকে কবি চিত্তরঞ্জনের জীবন সঙ্গীত বলা যাইতে পারে।

"তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,
আমার সকল অঙ্গ শিহরে শিহরে।
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে,
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।"

সাগরের বুকে প্রভাতের বাণী বাজিয়া উঠিল। চির-উচ্ছল কল কল ঊর্ম্মিমালার বুকে জীবনযাত্রা সুরু হইয়া গেল।

"ওই তো বেজেছে তব প্রভাতের বাঁশী
আনন্দে উৎসবে ভরা! সূর্য্য কর রাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজলে উছল জলে কুসুম ফুটায়।"

সেই প্রভাতের বাণী শুনিয়া কবির হৃদয় মিলন আকাঙ্খায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,

"তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে
সোণার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে,
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার।"

চিত্তরঞ্জন সাগরের নীল জলে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন,

"সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলোমাঝে সাঁঝের আঁধারে।
তাই আমি খুঁজিয়াছি হৃদয় দুয়ার
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।"

এই জীবন সমুদ্রের পারে দাঁড়াইয়া মহাতরঙ্গের সুর লহরীতে প্রাণ মন ঢালিয়া কবি লিখিয়াছেন,

"তোমার এ গীত প্রাণে সারা দিনমান—
আমি হে রেখেছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, বাজাও আমারে,
দিবস রজনী ভরি আলোক আঁধারে।"

এই যে মহাসাগরের অনন্তকাল ধরিয়া উদ্বেল তরঙ্গের নিত্য খেলা, এই খেলা কবির জীবনে কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাই তিনি জানাইয়াছেন,

"আমার জীবন ল'য়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে।
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমনে?
…　　　…
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু দিবস যামিনী।"

এইবার কবি রত্নাকরের ভাব-সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছেন,

"তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া
আমার নয়ন পটে, আমি অন্ধ হব,
শব্দ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব।
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁদিবে কেবল।"

ভক্তকবির এই যে আকুল নিবেদন তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে। এমনি করিয়া একদিন সাধক রামপ্রসাদ এই বাঙ্গালার বুকে গাহিয়াছিলেন,

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে
হৃদি রত্নাকরের অতল জলে।"

এক নিমিষেই সুখ আবার পর মুহূর্ত্তেই দুঃখ আনিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তোলে। তাই আকাশ ভরা ধূসর-আঁধারের দিনে সাগরের বুকে যে হাহাকার উঠে, তাহার সহিত জীবন সমুদ্রের তুলনা করিয়া কবি লিখিয়াছেন,

"একি সুখ, একি দুঃখ, প্রণয় গভীর
একি? উজল, উন্মাদ অশান্ত অধীর।
কি গাহিছে, কি চাহিছে হৃদয় আমার,
আজি এ আকাশ ভরা ধূসর আঁধার।
…　　　…
আজি যে ফেলেছে ছেয়ে প্রলয় তুফান,
তোমার আঁধার বুকে। আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা উন্মাদের মত
আমার হৃদয় তলে গরজে সতত।"

যেন মহরুদ্রের ধ্বংসের নেশায় প্রলয় বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে,

"এযে গো নির্দ্দয় রুদ্র। মরণের রঙ্গে
চরাচর ডুবে যায় প্রলয় তরঙ্গে।

ঘনঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড়—পাতালে অম্বরে।"

এ মরণ খেলায় কবি-হৃদয় কম্পিত হয় নাই। কবি তাহাকে সাগ্রহে বরণ করিতে দু'বাহু প্রসারিত করিয়াছেন,

"অনন্ত এ প্রভঞ্জনে মোর বক্ষ ভরি,
ছিন্ন পাল, ভগ্ন হাল, ডুবে মন তরী।
প্রলয় পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে।
এস তবে মৃত্যু রূপে ওগো সিন্ধুরাজ
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।"

এইবার কবি পারের কাণ্ডারীকে সজল নয়নে পার কর, পার কর, বলিয়া আকুল নিবেদন জানাইতেছেন,

এ পারে আলোক ভরা, ওপারে আঁধার
পার করে দাও মোরে ওগো পারাবার।
এপার ওপার করি পারি না তো আর
আজ মোরে লয়ে যাও ওপারে তোমার।
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই;
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।

এম্‌নি করিয়া আত্ম নিবেদন না করিলে কি কূলের কাণ্ডারীর দর্শন মিলে? কবি চিত্তরঞ্জন ছিলেন কায়মনপ্রাণে একনিষ্ঠ পরম বৈষ্ণব। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে নারায়ণ রূপী আখ্যা দিয়াছিলেন। সত্য সত্যই এই বিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর পদ লালিত্যের অমর সুধা এই চিত্তরঞ্জনের কবিতায় যেমনটি পাওয়া যায়,—তাহার আর তুলনা হয় না।

"নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার,
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই তো হাতে মোহন বাঁশী;
সেই মুরতি হেরবো বলে
পরাণ বড় অভিলাষী;
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে,
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার!
এস আমার পরশ মাণিক
বেদ বেদান্তে কাজ কি আর।"

এই চিত্তরঞ্জনের শেষ কবিতা। মৃত্যুর পরশ যখন তিনি সর্ব্ব অঙ্গে অনুভব করিতেছেন, জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে এম্‌নি করিয়া আর কে কালরূপের রূপসাগরে ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন? ধন্য কবি চিত্তরঞ্জন! ধন্য তোমার জীবন ব্যাপী সাধনা! তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে। তোমাকে পাইয়া বঙ্গবাসী বাঙ্গালী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। কে বলে তুমি নাই। বাঙ্গালী তোমাকে হৃদয় মন্দিরে প্রাণ পুষ্পের অঞ্জলী দিয়া নিত্য তোমার পূজা করিয়া থাকে। মৃত্যুর কি সাধ্য আছে তোমাকে কাড়িয়া লইয়া যায়?

মরণ করেছ জয়,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী!
মৃত্যু তব নাই।
মৃত্যু শুধু নিয়ে গেছে
চিতাভস্ম হ'তে
এক মুঠো ছাই।

বিন্দু

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমার অস্তিত্ব আছে নাহি তবু স্থান পরিমাণ
তোমারেই কেন্দ্র করি অনন্তের পরিধি প্রমাণ
মহাকাল চক্রপথে। দর্শনের চারু ইন্দ্রজাল
কাল পরিমাণ যথা স্থান তথা ঘটায় জঞ্জাল;
তথাপি রয়েছ তুমি, আছ তুমি এ ধ্রুব প্রত্যয়
উত্তরের ধ্রুবতারা কূট প্রশ্ন করি সমন্বয়
জ্যামিতির১ সূক্ষ্মতায়।

প্রস্থহীন ঋজু বক্র রেখা
সুদীর্ঘ বন্ধুর পথে বিন্দুদের পদচিহ্ন লেখা
বিবর্ত্তিত দর্ব্বীকর২ বিনিদ্র নয়নে। মনে হয়—
তথাপি রয়েছ তুমি স্বপ্নে সত্যে প্রভূত বিস্ময়
অবস্থিতি কেঁদে মরে অভিমানে পরিমাণ বিনা
রাবণের চিতা জ্বলে অনির্ব্বাণ পরিণাম হীনা
মন্দোদরী সীমন্তের সৌভাগ্যের শেষ চিহ্ন সম
স্মরণের ললাটিকা সিন্দূরের বিন্দু অনুপম।

১ A point has position but no magnitude—Geometry.

২ দর্ব্বীকর—সর্প।

একটা নূতন কিছু

শ্রীযামিনীমোহন কর এম-এ

(জমিদার উদয়ভানু রায় চৌধুরীর প্রাসাদ, রাত্রি একটা, বাহিরে প্রচণ্ড জল-ঝড়। হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ হল এবং ঘরের একটা জানালা খুলে গেল। একজন লোক জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল, ভেতরে ঢুকে সে একটা ছোট টর্চ্চ-লাইট জ্বাললে। পকেট থেকে সব যন্ত্রপাতি বার করে সাজাচ্ছে এমন সময় প্রতাপ ঘরে ঢুকল, ঢুকেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বাললে। আগন্তুককে ঘরে দেখে চমকে উঠল।)

প্রতাপ—কে?

আগন্তুক—(পকেট থেকে পিস্তল বার করে) চুপ, হাতে কি দেখেছ?

প্রতাপ—তুমি চোর, চুরি করতে এসেছ?

আগন্তুক—তুমি কি মনে করেছিলে এই জল-ঝড়ে রাত্রি একটার সময় জানালা টপকে একজন সাধুপুরুষ তোমাদের ধর্ম্ম-কথা শোনাতে এসেছে?

প্রতাপ—না, না তা কেন, মানে জিজ্ঞেস করছিলুম সত্যিই চোর তো?

আগন্তুক—তুমি কি ভেবেছিলে স্বপ্ন দেখছ? আমি চোর নই ডাকাত। চোরের কাছে পিস্তল থাকে না, এটুকু বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে।

প্রতাপ—ডাকাত!

আগন্তুক—হ্যাঁ, যে সে ডাকাত নই স্বয়ং অনন্তরাম, যাকে ধরবার জন্য সরকার পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অতএব সাবধান, টুঁ শব্দ করলেই গুলী করব।

প্রতাপ—(একটা চেয়ারে বসিয়া) আমি এই চেয়ারে চুপ করে বসে থাকি। জান, আজ আমি খাবার সময় দাদুকে বলছিলুম আমাদের জীবনটা একেবারে ডাল্—গন্ধময়। একটা নূতন কিছু কখনও ঘটতে দেখলুম না। আচ্ছা, সত্যই তুমি অনন্তরাম তো?

অনন্ত—হ্যাঁ, এই দাড়ী গোঁফ দেখে বুঝতে পারছ না?

প্রতাপ—আমরা তো কেউ তাকে দেখিনি কি না, আমাদের ফ্যামিলিতে বুঝলে কখনও নূতন কিছু হয় না। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ব্যস। আমরা কারুর টাকাও মারি না, বউ নিয়েও ভাগি না। ডার্ব্বীও জিতি না, রেসে সর্ব্বস্বান্তও হই না, এমন কি একটা খুন, চুরি, ডাকাতি পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে হয় না। আগুন লাগা কি একটা অ্যাকসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হতে দেখলুম না। যাক্, এইবার খবরের কাগজে আমাদের নাম বেরোবে, হয় ত' একটু চেষ্টা করলে একটা ফ্যামিলি গ্রুপের ছবিও ছাপাতে পারে। মোট কথা একটু নূতন কিছু হবে।

অনন্ত—তুমি এখানে এলে কেন? কোন শব্দ শুনেছ?

প্রতাপ—না, দৈবাৎ এসে পড়েছি, ঘুম হচ্ছিল না, ভাবলুম, একটা বই নিয়ে এসে পড়ি। এই ঘরে কালকে যে বইটা পড়ছিলুম সেটা ছিল—

অনন্ত—উঠো না, উঠলেই গুলী করব, হাত উঁচু করে থাক।

প্রতাপ—(হাত উঁচু করে) আহা! চট কেন, আমাকে শত্রু মনে করো না। তুমি আমাদের জীবনে একটা নূতন কিছুর সন্ধান এনেছ অতএব আমরা তোমাকে পরমবন্ধু মনে করছি। তুমি কি সেফ্ ভাঙ্গবে?

অনন্ত—হ্যাঁ ভাঙ্গব, তবে তুমি যদি এর পাসওয়ার্ড জান—

প্রতাপ—আমি জানি না, দাদু জানে। দাদুর অনেক টাকাকড়ি এর মধ্যে আছে। তাছাড়া ঠাকুমার, আমার বোনের গহনাপত্তরও এতে আছে। হাত উঁচু করে রেখে রেখে ব্যথা করছে, নামিয়ে ফেলি।

অনন্ত—বেশ নামাও। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করলেই গুলী করব মনে থাকে যেন।

প্রতাপ—জমিদার উদয়ভানুর নাতি বিশ্বাসভঙ্গ করবে একথা তুমি ভাবতে পারলে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আচ্ছা, তুমি সেফ ভাঙ্গতে পারবে?

অনন্ত—নিশ্চয়, আমি আধুনিক ডাকাত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেফ ভাঙ্গব।

প্রতাপ—তাই নাকি? তুমি ত তাহলে শিক্ষিত!

অনন্ত—আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

প্রতাপ—তবে ডাকাতি কর কেন ?

অনন্ত—কারণ, এতে চট্ করে টাকা রোজগার হয়। আমি কাজ আরম্ভ করি। তুমি চুপ করে বসে থাক।

প্রতাপ— আর একটা কথা।

অনন্ত—কি, তাড়াতাড়ি করে বল দেরী হয়ে যাচ্ছে।

প্রতাপ—আমার বোন অপু মানে অপর্ণাকে ডেকে আনি। তোমাকে দেখলে সে খুব খুশী হবে। সত্যকরে ডাকাত আমরা কখনও দেখিনি।

অনন্ত—ঠাট্টা হচ্ছে।

প্রতাপ—জমিদার উদয়ভানুর নাতি ঠাট্টা করবে একথা তুমি ভাবতে পারলে ?

অনন্ত—বেশ মহিলাদের আমি না বলতে পারি না, তাকে ডেকে আন। কিন্তু সাবধান বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

প্রতাপ—পাগল জমিদার উদয়ভানুর নাতি যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে না সে ত তোমায় আগেই বলেছি।

অনন্ত—তবে যাও আর দেরী করো না। (প্রতাপের প্রস্থান)

অনন্ত—বৃষ্টিতে ভিজে শীত লেগে গেছে। ততক্ষণ একটা সিগারেট খেয়েনি। (অনন্ত সিগারেট ধরাচ্ছে এমন সময় জমিদারের পুরাতন খাসভৃত্য জগন্নাথের প্রবেশ, অনন্তকে দেখে চমকে উঠল)

জগন্নাথ—কে তুমি, চোর !

অনন্ত—তাতে তোমার কি ? মাথার উপর হাত তোল ন'লে গুলী করব।

জগন্নাথ—তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। (জগন্নাথ চোর বলে চীৎকার করতে গেল। সবে সে বলেছে এমন সময় অনন্ত তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, ধস্তাধস্তিতে জগন্নাথ পড়ে গেল অনন্ত তার মুখে রুমাল গুঁজে দিলে)

অনন্ত—কেমন হয়েছ ত ? এবার মুখে রুমাল গুঁজেছি এরপরে পিস্তলের গুলি গুঁজে দোব। আধুনিককালে পৌরাণিককালের মত বিশ্বাসী চাকর বাড়ীতে থাকা ঠিক নয়। তোমায় গুলী করাই উচিৎ। (প্রতাপ ও অপর্ণার প্রবেশ)

প্রতাপ—তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি, আমার বোন অপর্ণা—অনন্ত, বিখ্যাত ডাকাত। জানিস্ অপু, অনন্ত দাদুর সিন্দুক ভেঙে সব চুরি করে নিতে এসেছে।

অপর্ণা—তাই নাকি, হাউ ইন্টারেষ্টিং, সেফ ভাঙতে পারবে ত ?

প্রতাপ—একি জগন্নাথের এ অবস্থা কেন ?

অনন্ত—আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য চেঁচাতে যাচ্ছিল তাই ওকে বেঁধে ফেলেছি।

অপর্ণা—ওকে ছেড়ে দিন, ও আমাদের পুরাতন চাকর, কর্ত্তব্য পালন করতে গেছিল। জগন্নাথ তুমি আর গোলমাল করো না বাপু।

অনন্ত—এর কথায় তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু গোলমাল করেছ কি গুলী করব।

জগন্নাথ—ও চোর চুরি করতে এসেছে।

প্রতাপ—সে আমরা জানি ও চোর নয় বিখ্যাত ডাকাত অনন্তরাম, সরকার ওকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আমাদের ভাগ্যি যে ও আমাদের বাড়ীতে এসেছে।

জগন্নাথ—কর্ত্তাবাবু শুনলে—

অপর্ণা—সে জন্য তুমি ভেব না, কাল সকালে আমি দাদুকে বলব'খন।

অনন্ত—তোমরা বক্ বক্ করে আমার কাজের ভয়ানক ক্ষতি করছ, যদি চুপ না কর তা'হলে সকলকে গুলী করব।

অপর্ণা—বটেই ত, জগন্নাথ, হয় তুমি শুতে যাও না হয় চুপ করে দেখ, জীবনে এই প্রথম একটা নূতন কিছু হচ্ছে, তোমার জন্য তা পণ্ড হয়ে যাবে ?

জগন্নাথ—চুপ করে বসে চুরি হওয়া দেখব।

অনন্ত—বেশ তোমায় গুলী করে মারছি, তা'হলে আর চোখে দেখতে হবে না (পিস্তল উঠিয়ে ধরলে)।

অপর্ণা—না না বেচারীকে মারবেন না, বুড়ো মানুষ, ও আর কথা কইবে না।

অনন্ত—মহিলাদের কথায় আমি কখনও না বলতে পারি না, তোমাদের সেফের পাসওয়ার্ড জান ?

অপর্ণা—না, শুধু দাদু জানেন—

প্রতাপ—জিজ্ঞেস করে আসব ?

অপর্ণা—কি রকমে সেফ ভাঙতে হয় দেখতে হবে।

অনন্ত—এই লোহার সেফে দেখতে দেখতে আমি গর্ত্ত করে দেব।

জগন্নাথ—ছাই করবে, পাকা লোহা—

অপর্ণা—চুপ কর না জগন্নাথ।

অনন্ত—আলো বড্ড কম।

প্রতাপ—আমি ঘরের সব আলো জ্বেলে দিচ্ছি, (আলো জ্বেলে দিল)।

অনন্ত—এইবার আর গোল করো না—(জমিদার উদয়ভানুর প্রবেশ)।

উদয়—কিরে প্রতাপ, অপু, এতরাত্রে এ ঘরে আলো জ্বেলে কি করছিস। জগন্নাথও রয়েছে, ব্যাপার কি? এ লোকটা কে?

জগন্নাথ—চোর—

প্রতাপ—আঃ, তুমি থাম জগন্নাথ, আমি বলছি। দাদু, এই লোকটি বিখ্যাত ডাকাত অনন্তরাম, যাকে ধরবার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

উদয়—অনন্তরাম, আমাদের বাড়ীতে! না না এ অসম্ভব, নিশ্চয়ই কোন বাজে লোক অনন্তরাম সেজে বাহাদুরী নেবার চেষ্টায় আছে।

অনন্ত—হ্যাঁ আমি সত্যই অনন্তরাম, দাড়ী গোঁফ দেখে বুঝতে পারছেন না। তারপর এই পিস্তল—

উদয়—হুঁ, অনন্তরাম বলেই ত মনে হচ্ছে, আমরা তাকে আগে কখনও দেখি নি কিনা, তাই সন্দেহ হচ্ছিল। পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলুম।

অপর্ণা—দাদু, ইনি আমাদের সেফ ভেঙ্গে সব লুট করে নিয়ে যেতে এসেছেন।

উদয়—হাউ থ্রিলিং, বেশ বেশ। আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি এত বাড়ী থাকতে বেছে বেছে আমাদের বাড়ী এসেছ, কি খাবে বল?

অনন্ত—আমার এখন খাবার সময় কোথা, অনেক কাজ বাকী আছে। এদের কথার জ্বালায় কোনও কাজ করতে পারি নি।

উদয়—তোমরা সকলে চুপ করে বস, ওকে কাজ করতে দাও, গো অন—

অনন্ত—(পিস্তল উঁচিয়ে) আপনি সেফের পাসওয়ার্ড জানেন?

উদয়—আমার সেফ জানব বই কি।

অনন্ত—তাড়াতাড়ি বলুন, নইলে এক্ষুনি গুলী করব, সমস্ত রাত্রি একটা বাড়ীতে সেফ নিয়ে টানাটানি করলে আমার ব্যবসা চলে না।

অপর্ণা—অনন্তবাবু, পিস্তলটা আমায় দিন। আমরা এলুম আপনার সেফ্ ভাঙ্গা দেখতে নিরাশ করবেন না।

অনন্ত—এই নিন্ পিস্তল। আমি মহিলাদের কোনও কথায় কখনও না বলতে পারি না। তা'ছাড়া আপনি যে ভাবে কথাটা বললেন, তাতে আমার সেফটা ভেঙ্গে দেখানই উচিৎ। (পিস্তল দিল)।

অপর্ণা—পিস্তলটা এই টেবিলের উপর রইল। (রাখল)

উদয়—বিনা পাসওয়ার্ডে সেফ খুলবে।

অপর্ণা—হ্যাঁ দাদু, পৃথিবীর সব সেফই ও ভাঙ্গতে পারে।

প্রতাপ—অনন্তরাম ডাকাত সেফ ভাঙ্গার জন্য বিখ্যাত।

উদয়—আমাদের খুব ভাল বরাত বলতে হবে। জীবনে এই প্রথম একটা নূতন কিছু ঘটবে। অনন্ত, তুমি ধীরে, সুস্থে কাজ কর। কোনও তাড়া হুড়ো নেই, এই ত সবে রাত দেড়টা, বহুদিন আগে আমাদের এক চাকর পুকুরে ডুবে মারা গেছল, এ ছাড়া আমাদের ফ্যামিলিতে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নি।

অনন্ত—তা'হলে আপনারা চুপ করে বসুন, আমি কাজে লেগে যাই, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। কেউ কথা বললেই গুলী করব।

অপর্ণা—একটা কথা।

অনন্ত—কি? তাড়াতাড়ি বল, অনেক দেরী হয়ে গেছে।

অপর্ণা—ঠাকুমাকেও ডেকে আনি। আমরা সকলে দেখব আর ঠাকুমা দেখতে পাবেন না সেটা ভাল দেখায় না। ভয়ানক দুঃখিত হবেন।

উদয়—ঠিক বলেছিস অপু। তোর ঠাকুমাকেও ডেকে আন। গায়ে বেশ ভাল করে ঢাকাঢাকি দিয়ে আসতে বলিস। ওর শরীর খারাপ। বৃষ্টি পড়ছে, চট করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

অপর্ণা—কি বলেন অনন্ত বাবু, ঠাকুমাকে ডেকে আনি।

অনন্ত—বেশ যাও। মহিলার আবেদনে আমি না বলতে পারি না, কিন্তু সাবধান। বিশ্বাসঘাতকতা করলে—

অপর্ণা—জমিদার উদয়ভানুর নাতনী বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন—

উদয় ও প্রতাপ—(একসঙ্গে) তাই ত এ কথা ভাবতে পারলে।

অনন্ত—ওকি আর সত্য সত্যই বললুম, একটা কথার কথা মাত্র! আচ্ছা যাও, আর দেরী করো না।

অপর্ণা—থ্যাঙ্কইউ (অপর্ণার প্রস্থান)

উদয়—এরকম ভাল দর্শক পাবেন না, সে আমি বলে দিচ্ছি।

অনন্ত—আমি একলা কাজ করতেই ভালবাসি। সেফে কতটাকার গহনা আছে?

উদয়—হাজার কুড়ি হবে।

প্রতাপ—তোমার এ যন্ত্রপাতিগুলো খাঁটি ষ্টিলের?

অনন্ত—বেষ্ট্‌ সেফিল্ডষ্টীলে তৈরী।

উদয়—ঠিক কথাই তো, এসব কাজে ভাল জিনিষ ব্যবহার করাই উচিৎ।

প্রতাপ—কোন জায়গাটা ভাঙ্গবে?

অনন্ত—আমি বৈজ্ঞানিক ডাকাত। আধুনিক মেথডে অক্সিথাইড্রোজন ফ্লেমে ষ্টীল গলিয়ে ফেলে গর্ত্ত করে দেব। এইখানটায়, এই দাগ দিয়ে রাখলুম, (খড়ি দিয়ে সেফে দাগ দিলে)

প্রতাপ—আমরা কোনরকম সাহায্য করতে পারি কি?

অনন্ত—তোমরা চুপ করে থাকলেই অনেক সাহায্য হবে।

প্রতাপ—জগন্নাথ সেফের চারধারে গোল করে চেয়ার সাজিয়ে দাও।

জগন্নাথ—(চেয়ার সাজিয়ে) হুজুর, আমি একটা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে আসি।

উদয়—হ্যাঁ, যাও। তুমি বুড়ো হয়েছ চট করে ঠাণ্ডা লেগে গেলেই মুস্কিল, আর দেখ, আমাদের জন্য একটু চা করে আনো, কি বল অনন্ত।

অনন্ত—বেশ তো। বৃষ্টিতে মন্দ হবে না।

(জগন্নাথের প্রস্থান)

উদয়—কাল রাত্রি অবধি আমরা ভাবতে পারি নি যে আমাদের জীবনে একটা নূতন কিছু ঘটতে পারে।

প্রতাপ—সে জন্য অনন্তর ধন্যবাদ প্রাপ্য, কি ভাবে তা প্রকাশ করা যায়।

অনন্ত—চুপ করে বসে থাকলেই বিলক্ষণ প্রকাশ করা হবে, তোমাদের সঙ্গে ক্রমাগত কথা কইতে গিয়ে আমার কাজে এখনও হাত পড়ল না।

উদয়—ব্যস, আর কথা নয়, এইবার তুমি কাজে লেগে যাও। আমরা সব চেয়ারে চুপ করে বসে তোমার বিচিত্র কার্য্যকলাপ দেখি। (উদয় ও প্রতাপের চেয়ারে উপবেশন)

অনন্ত—ঐ জানালাটা বন্ধ করে দিলে সুবিধা হত। ভয়ানক হাওয়া আসছে, এতে গ্যাস জ্বলবে না।

প্রতাপ—আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

(প্রতাপ জানালা বন্ধ করল, অপর্ণা ও শাল মুড়ি দিয়ে তার ঠাকুমা গৌরী দেবী ঘরে ঢুকলেন)

গৌরী—তাইত রে অপু! সত্যই ত।

উদয়—ভাল করে দেখ গিন্নী, এই হল অনন্ত, বিখ্যাত ডাকাত। সরকার একে ধরে দেবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ঘোষণা করেছেন।

গৌরী—(ভালভাবে নিরীক্ষণ করে) সত্যি, না না তোমরা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।

অনন্ত—ঠাট্টা নয়, আমি সত্য সত্যই অনন্ত ডাকাত। দাড়ী, গোঁফ দেখে বুঝতে পারছেন না। তারপর এই পিস্তল—

গৌরী—তা বটে, তবে নিশ্চয়ই সত্যিকারের অনন্ত ডাকাত। হ্যাঁগো, আমাদের কি সৌভাগ্য।

উদয়—আমরাও ত তাই বলাবলি করছিলুম।

অপর্ণা—এই প্রথম আমাদের জীবনে এই রকম একটা নূতন কিছু ঘটল।

গৌরী ঠিক কথা, এইবার মকরের জারিজুরি ভাঙ্গব। ওদের বাড়ী একটা সামান্য চোর এসেছিল, তাইতে কি জাঁক। বললে, "মকর, জানিস, সে কি ভীষণ চোর। দেখলে ভয় করে। আমাদের ত্রিশ হাজার টাকার গহনা নিয়ে গেছে।"

উদয়—তুমি তাই বিশ্বাস করলে?

গৌরী—পাগল। ওদের জমিদারী দেনার দায়ে নিলেমে চড়তে বসেছে, এ'র বাড়ীতে ত্রিশ হাজার টাকার গহনা। এমন বাড়িয়ে তিলকে তাল করে তোলবার স্বভাব—

প্রতাপ—কাগজে ওদের সম্বন্ধে লিখে তো ছিল—

গৌরী—আমরা ছবি বের করব। হ্যাঁগা, তুমি কি বল?

উদয়—কালই একটা গ্রুপ ফটো তোলবার জন্য ক'লকাতা থেকে ভাল একজন ফটোগ্রাফারকে ডেকে পাঠাব।

অপর্ণা—এইবার ওঁর হাতের কাজ দেখ—

অনন্ত—এত কথা কইলে কাজ দেখাব কি করে। আপনারা যদি দয়া করে চুপ করে বসেন—

উদয়—বটেই তো। নাও, তোমরা সবাই চুপ করে চেয়ারে বস।

অপর্ণা—উনি কাজ করুন, আমরা গান করি। অনেকটা সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ডমিউজিকের মত।

প্রতাপ—খুব ভাল আইডিয়া।

গৌরী—তোরা দুজনে "আর কতদিন" গানটি কর।

(অপর্ণা ও প্রতাপের গান)

আর কতদিন থাকিব বসিয়া পেটেতে বাঁধিয়া দড়ি,
আঙুল চুষিয়া হে ভব কাণ্ডারী কেমনে তোমারে স্মরি
পাশের বাড়ীতে পাঁঠার গন্ধ
আমাদের যে গো আহার বন্ধ,
তারা খায় লুচি আমরা পান্তা একি গো বিচার হরি—

অনন্ত—আঃ, গান বন্ধ কর। এতো গোলমালে কখনও কাজ করা যায়। চুপ করে বসে না থাকলে এক্ষুনি তোমাদের গুলী করব। পিস্তলটা কই?

অপর্ণা—এই যে টেবিলের উপর, দেব।

অনন্ত—হ্যাঁ, দাও।

অপর্ণা—এই নিন্। (পিস্তল দিল)

অনন্ত—এইবার আমি সেফের ষ্টীলে অক্সিহাইড্রোজন ফ্লেম দিয়ে গর্ত্ত করব, লোহা দেখতে দেখতে মাখনের মত গলে যাবে।

গৌরী—দেখো বাছা হাত-টাত না পুড়ে যায়।

প্রতাপ—আমি মেডিকাল কলেজে পড়ি। অ্যাকসিডেণ্ট হলে ফার্ষ্ট এইড দিতে পারব।

উদয়—আমার মনে হয় এরকম খাটুনীর কাজের আগে, একটু চা খেয়ে নিলেও মন্দ হ'ত না।

অনন্ত—যা' বলেন।

উদয়—প্রতাপ, জগন্নাথকে একবার ডেকে দাও তো।

প্রতাপ (দরজার কাছে গিয়ে) জগন্নাথ, জগা, জগু—

জগন্নাথ—(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই। (ট্রেতে করে চা'র কেৎলী, বাটী ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ)।

গৌরী টেবিলের উপর রাখ। (জগন্নাথ রাখলে)।

অপু তুই ভাল করে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ কাপ চা' করে দে তো দিদি।

অপর্ণা— আপনার ক'চামচ চিনি লাগবে অনন্তবাবু?

অনন্ত—আমি একটু বেশী চিনি খাই, চার চামচ।

অপর্ণা—এই নিন্, (অনন্তকে চা দিল) তোমরাও নাও, (অনন্ত ব্যতীত সকলেই চা খেতে লাগলেন)

অনন্ত—চায়ে কিছু মেশানো নেই তো?

অপর্ণা—ছিঃ, ছিঃ,. জমীদার উদয় ভানু রায় চৌধুরীর নাতনী অতিথির চায়ে কিছু মিশিয়ে দেবে একথা আপনি ভাবতে পারলেন?

অনন্ত—(লজ্জিতভাবে) না না, এম্‌নি জিজ্ঞেস করলুম, শাস্ত্রেই লেখা আছে সাবধানের বিনাশ নেই।

গৌরী—তা বটে, কিন্তু অতিথি নারায়ণ, একথাও আমরা ভুলতে পারি না।

অনন্ত—(চা খেতে খেতে) ক'টা বাজল?

প্রতাপ—তোমার হাতেই তো ঘড়ি রয়েছে।

অনন্ত—তাই তো, একেবারে ভুলেই গেছলুম, দুটো বেজে গেছে, আর দেরী করা চলবে না। এবার আপনারা সকলে চুপ ক'রে বসুন, আমি কাজে লেগে যাই।

জগন্নাথ—এত লোকের সামনে দিয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে—

উদয়—আঃ জগন্নাথ চুপ কর না। দেখছ একটা নূতন কিছু ঘটতে চলেছে আর তুমি কথা কয়ে সব পণ্ড ক'রে দিচ্ছ।

অনন্ত—কেউ গোলমাল করলে এবার আমি গুলী করব আমার কাজের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে।

অপর্ণা—না, আর কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না, কাজে লেগে যান।

অনন্ত—(পকেট হাতড়ে) এই যা'—

প্রতাপ—কি হল?

অনন্ত—তাড়াতাড়িতে আমি ব্লোপাইপ আনতে গিয়ে সিগারেট লাইটার নিয়ে এসেছি।

উদয়—তবে ! এখন কি করবে ?

অনন্ত—(পিস্তল হাতে নিয়ে) এখন এই পিস্তলই একমাত্র উপায়, আপনি সেফের পাসওয়ার্ড বলুন।

গৌরী—ও মা গো, তুমি কি সত্য সত্যই খুন করবে না কি ?

অনন্ত—আপনি কি ভেবেছিলেন এই দুর্যোগে রাত্রে আমি স্রেফ আপনাদের সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছি।

গৌরী—দাও গো, সিন্দুকটা খুলেই দাও।

উদয়—তুমি পিস্তল নামাও হে, আমি দেখছিলুম তুমি সেফ খুলতে পার কি না, না পারলে অবশ্যই আমি নিজে খুলে দিতুম—

অপর্ণা—সে তো দিতেই হতো, নইলে অনন্তবাবুর এত মেহন্নত বৃথাই যেত।

প্রতাপ—আর একটা নূতন কিছু ঘটতে পারত না। আমরা কিন্তু কাগজে তুমি সেফ ভেঙ্গেছ এই কথাই বলে পাঠাব, তুমি এতে আপত্তি করতে পারবে না।

অনন্ত—এতে আর আপত্তি করব কেন ; আর দেরী নয়, এইবার সেফটা খুলুন।

উদয়—এই যে খুলছি—(সেফ খুলতে লাগলেন)

প্রতাপ—জগন্নাথ, তুমি আমায় একটা এট্যাচি কেস এনে দাও, সব গুছিয়ে নিয়ে যাবার সুবিধে হবে।

অপর্ণা—আচ্ছা দাদু, আমাদের গাড়ীটা বারকরে দিলে হতো না, এই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী যেতে হবে—

উদয়—কথাটা মন্দ বলিস নি।

গৌরী—আমি বলি কি বাছা বৃষ্টিটা থামলে অথবা সকালে দু'টি খেয়ে একেবারে যেত।

অনন্ত—আচ্ছা সে কথা পরে ভাবা যাবে (উদয়ের প্রতি) আপনি এক একবারে গহনাগুলি বার করুন। (উদয় সেফ থেকে গহনাগুলি বার করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলেন)

উদয়—তোমার সুবিধের জন্য টেবিলের উপর সব সাজিয়ে দিলুম পুরণোগুলো গিন্নির আর আধুনিকগুলো ছোট গিন্নির অর্থাৎ নাতনীর।

অনন্ত—এ যে অনেক দামের হবে।

গৌরী—তা হবে বৈ কি। এইত সেদিন অপুর বিয়েতে সব করিয়ে দিলুম। অবশ্য সব গহনা এখানে আনিনি। কিছু শ্বশুরবাড়ীতে আছে, তবুও নেই নেই করেও প্রায় হাজার দশেকের গহনা শুধু ওরই আছে। তা ছাড়া আমারও কিছু কিছু আছে, এদেরও আংটি, ঘড়ি, চেন—

অনন্ত—আছে হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, আমি ওসব এক সঙ্গে নিয়ে যাব।

উদয়—প্রতাপ, দেখত দাদা, এখনও জগন্নাথ এট্যাচি কেস নিয়ে এলো না কেন ?

প্রতাপ—(দরজার কাছে গিয়ে) জগন্নাথ, জগা, জগু—

জগন্নাথ—(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই, (এট্যাচি কেস হাতে প্রবেশ)

উদয়—নাও হে অনন্ত, তুমি গহনাগুলি এতে ভরে নাও।

অপর্ণা—আমার একটি অনুরোধ রাখবেন অনন্ত বাবু।

অনন্ত—বল, যদি সম্ভব হয় ত রাখব।

অপর্ণা—গহনাগুলি ত আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, সেই বিয়ের রাত্রে পরেছি আর ত পরবার সুযোগ ঘটে নি, যদি কিছু মনে না করেন একবার একটু পরি—

অনন্ত—বেশ পর, সুন্দরী যুবতীদের অনুরোধে আমি না বলতে পারি না—কিন্তু সাবধানে বেশী দেরী করলেই গুলী করব।

প্রতাপ—তোমাকে আর একদিন আসতে হবে।

অনন্ত—হ্যাঁ, আমি আসি, আর তোমরা পুলিশে ধরিয়ে দাও।

প্রতাপ—ছিঃ ছিঃ, জমিদার উদয়ভানুর নাতি তোমাকে ইনভাইট করে পুলিশে ধরিয়ে দেবে।

অনন্ত—তবে ?

প্রতাপ—আজকে মলয় মানে অপুর স্বামী এসে পৌঁছতে পারে নি, সে বেচারী তোমায় দেখতে পেলে না।

অনন্ত—আমি না হয় একদিন তারই বাড়ী যাব। ঠিকানাটা আমায় দিয়ে দেবেন।

উদয়—তা মন্দ বলনি, প্রতাপ একটা কাগজে মলয়ের ঠিকানাটা লিখে দাও।

প্রতাপ—দিচ্ছি (লিখে) এই নাও ঠিকানা।

উদয়—জগন্নাথ, ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বল।

অনন্ত—আজ্ঞে আমি নিজের গাড়ীতে এসেছি।

প্রতাপ—তাই না কি, তোমার নিজের গাড়ী আছে।

অনন্ত—হ্যাঁ, (অপর্ণার প্রতি) এবার গহনাগুলো খুলে দিতে হবে।

অপর্ণা—বেশ দিচ্ছি।

গৌরী—প্রতাপ, এগুলো এটাাচিকেসে ভরে দে।

উদয়—হ্যাঁ হে অনন্ত এই বৃষ্টিতে তোমার যেতে কষ্ট হবে না?

অনন্ত—আজ্ঞে না, আমি গাড়ীতে চলে যাব।

প্রতাপ—আপনার গাড়ী কি মেক।

অনন্ত—ব্যুইক।

প্রতাপ—কত নম্বর।

অনন্ত—হ্যাঁ আমি নম্বর বলি আর তোমরা পুলিশে ধরিয়ে দাও।

প্রতাপ—জমিদার উদয়ভানুর নাতি অতিথিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে এ কথা তুমি ভাবতে পারলে?

গৌরী—হিন্দুরঘরে অতিথি নারায়ণ—(ড্রাইভারের প্রবেশ)

ড্রাইভার—হুজুর—

উদয়—কি রাম, এত রাত্রে, ব্যাপার কি?

ড্রাইভার—আজ্ঞে আমাদের গ্যারেজের সামনে একটা ব্যুইক গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনন্ত—আমার গাড়ী।

প্রতাপ—কত নম্বর দেখেছ?

ড্রাইভার—আজ্ঞে হ্যাঁ, B. L. A. 0567.

অপর্ণা—ও যে আমাদের গাড়ীর নম্বর!

উদয়—কার, মলয়ের।

অপর্ণা—হ্যাঁ দাদু।

প্রতাপ—তুমি মলয়ের গাড়ী কোথায় পেলে?

অনন্ত—জোগাড় করেছি, ডাকাতি করতে হলে একটা মোটর থাকা উচিৎ।

গৌরী—মলয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

অনন্ত—আজ্ঞে না, দাও, গহনার বাক্সটা দাও। আমি এবার যাই।

উদয়—তুমি মলয়ের গাড়ীটা কি ফেরৎ দিতে যাবে?

অনন্ত—আজ্ঞে না, আমি ওটা এখন ব্যবহার করব ঠিক করেছি।

প্রতাপ—এই নাও, এট্যাচিকেসে সব গহনা ভরে দিয়েছি।

অনন্ত—দাও, আচ্ছা আমি তাহলে এবার চলি, কিন্তু সাবধান আমায় কেউ ফলো করলেই গুলী করব।

প্রতাপ—জমিদার উদয়ভানুর বাড়ীর কেউ তোমায় ফলো করবে একথা তুমি ভাবতে পারলে।

উদয়—বিশেষ করে তুমি আমাদের জীবনে একটা নূতন কিছু—

অনন্ত—আজ্ঞে না, আমি কি আর ও কথা সত্যি সত্যি বললুম।

উদয়—ড্রাইভার, তুমি ওর গাড়ীটা গাড়ীবারান্দার নীচে নিয়ে এস। ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে যাবে।

ড্রাইভার—আচ্ছা হুজুর। (ড্রাইভারের প্রস্থান)

অপর্ণা—দাদু, ওঁকে একটা কিছু সুভিনির দিলে কি রকম হয়?

উদয়—খুব ভাল আইডিয়া।

প্রতাপ—আমাদের পুরণো গ্রুপ ফটো একটা দিই, তাহলে চিরদিন আমাদের মনে রাখতে পারবেন।

অনন্ত—আমার এমনিতেও মনে থাকত। এরকম ভদ্র ব্যবহার অন্য কোথাও পাই নি।

উদয়—আমরাও তোমাকে মনে রাখব। প্রতাপ, যাও আর দেরী করো না। (প্রতাপের প্রস্থান) আমিও আমার অটোগ্রাফের অ্যালবামটা নিয়ে আসি, তোমাকে একটা অটোগ্রাফ কিন্তু দিতে হবে।

অনন্ত—বেশ তো, কিন্তু সেই অটোগ্রাফ নিয়ে শেষে কোন গণ্ডগোলে—

উদয়—জমিদার উদয়ভানু অটোগ্রাফ নিয়ে গণ্ডগোল করবে এ কথা তুমি ভাবতে পারলে অনন্ত—

অনন্ত—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।

উদয়—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি অ্যালবাম নিয়ে আসছি।

গৌরী—হ্যাঁ গা কাল রাত্রে অনেক চপ কাটলেট ভাজা হয়েছিল। রেফ্রিজেরেটারে আছে কিছু, খাইয়ে দিলে হতো না।

উদয়—ঠিক বলেছ গিন্নী। ওকে অনেকটা যেতে হবে। পেটভরে খাইয়ে দাও।

গৌরী—জনার্দ্দন আমার সঙ্গে এস।

(উদয়, গৌরী ও জনার্দ্দনের প্রস্থান)

অপর্ণা—আচ্ছা অনন্তবাবু, আপনি কখনও ধরা পড়েন নি?

অনন্ত—না, তবে তোমরা আমাকে—

অপর্ণা—আমরা ত ধরি নি।

অনন্ত—না ধর নি, কিন্তু ইচ্ছে করলে ধরিয়ে দিতে পারতে ত?

অপর্ণা—ছিঃ, ছিঃ। জমিদার উদয়ভানুর বাড়ীতে অতিথি রূপে এসেছেন, আর আমরা ধরিয়ে দেব, একথা ভাবতে পারলেন।

অনন্ত—আমার কিন্তু তোমার কাছে ধরা পড়তে আপত্তি ছিল না। দেখ অপর্ণা, তোমাদের গহনা-পত্তর সবই নিয়েছি, কিন্তু আসল রত্ন নেওয়া হয় নি।

অপর্ণা—কি বলছেন আপনি, আমি যাই।

অনন্ত—যেতে দিলে তো। এই দরজা আটকে দাঁড়ালুম, (দরজায় দাঁড়িয়ে) অপর্ণা এখন কেউ নেই, তুমি আমার সঙ্গে—

অপর্ণা—(তীক্ষ্ণস্বরে) আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করবার এই কি প্রতিদান। পথ ছাড়ুন বলছি, নইলে আমি চীৎকার করব।

অনন্ত—চেঁচালেই গুলী করব। আমার হাতে পিস্তল আছে। কেউ বাধা দিতে সাহস করবে না। তোমায় আমি জোর করে নিয়ে যাব। (অপর্ণার হাত ধরিল)

অপর্ণা—হাত ছাড়ুন। অসভ্য—

(ছবি হাতে প্রতাপ, অ্যালবাম হাতে উদয় ও খাবার প্লেট হাতে গৌরীর প্রবেশ)

প্রতাপ—অ্যা, একি!

অপর্ণা—দাদু আমাকে একলা পেয়ে—

প্রতাপ—হাত ছেড়ে দাও, বদমাইস।

অনন্ত—ছাড়ব না, গোলমাল করলেই গুলী করব।

গৌরী—ও বাবাগো একি সর্ব্বনেশে ডাকাত!

উদয়—তুমি ছোটলোক ভদ্রতা জান না।

প্রতাপ—দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

(প্রতাপ অনন্তর ঘাড় ধরল, ঝুটোপুটীতে দাড়ী খুলে গেল।)

উদয়—অ্যা, তুমি মলয়।

গৌরী—তাই ত নাত-জামাই যে!

প্রতাপ—মলয়!

অপর্ণা—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা।

মলয়—কি বলুন একটা নূতন কিছু হল তো।

উদয়—তা হল, কোন সন্দেহ নেই।

গৌরী—তোমার পেটে পেটে এত ছিল।

প্রতাপ—বদমাইস যে বলেছি ঠিকই বলেছি।

মলয়—আমার ঘাড়ে কিন্তু ব্যথা হয়ে গেছে। জমিদার উদয়ভানুর বাড়ীতে এসে যে শেষ পর্য্যন্ত মার খেতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তবে একটা নূতন কিছু হ'ল এই একমাত্র সান্ত্বনা।

গৌরী—বাকী সান্ত্বনা অপু দেবে। দিদি, নাতজামাইয়ের ঘাড়ে একটু হাত বুলিয়ে দিস।

অপর্ণা—যাও, তোমরা সবাই ভারী অসভ্য।

ভারতের খনিজ-সম্পদ্

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

তামা

নর সমাজে তামার ব্যবহার কতদিন প্রচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। প্রত্যুত প্রায় সকল ধাতু সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। যখন আবিষ্কারের পর্য্যায় আকস্মিক মাত্র ছিল এবং শিক্ষা ও সভ্যতা সন তারিখ নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই, সেইরূপ সময়ে তাম্র লইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, ধাতুর মধ্যে তামাই সর্ব্বপ্রথমে মানুষের কাজে লাগে। ইহা কি ভাবে প্রথমে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্তিকা-খনন কার্য্যে স্বাভাবিক অবস্থায় তামা পাইবার পর উহার বর্ণ দেখিয়া আদিম মানব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। তাম্র-মাক্ষিকের সহিত কাঠকয়লা ও গাদ দূর করিবার উপযোগী বিগালক প্রস্তরাদি মিলাইয়া প্রচুর তাপ দিবার পর তামার উদ্ধার সাধন করিতে অনেক কাল কাটিয়া গিয়াছে। পরে পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া কবে হইতে মানুষ নিয়মিত তামার ব্যবহার সুরু করিয়াছে তাহার নির্দ্ধারণও আজ অনুমানসাপেক্ষ।

মানবসভ্যতার বিবর্ত্তনে তামার দান নিতান্ত কম নয়। তামার আবির্ভাব ও ব্যবহারের জ্ঞান জগতে প্রস্তরযুগের অবসান ঘটাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সকল দেশের প্রস্তর ব্যবহারের আরম্ভ ও শেষ কোনও একটী সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে সম্পাদিত হয় নাই। যে দেশ তদানীন্তন সভ্যতায় যত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা সেই অনুপাতে পূর্ব্বযুগ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাম্রের সহিত খাদ (রাঙ্গ) মিশ্রণ সহজ হইয়াছিল। এই মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া তাহা বহু কাজে ব্যবহৃত হইত এবং হয় ত সেই কারণে তাম্রযুগ (copper age) না হইয়া ব্রঞ্জ-যুগ (bronze age) নামে ইতিহাসে উহা পরিচয় লাভ করিয়াছে। সহজেই অনুমিত হয় যে, তাম্রের বহু পরে রাঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাদের সংমিশ্রণে যে যৌগিক ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কাল আরও অনেক পরে। কিন্তু এই সমস্ত কাল একাকার ধারণ করিয়া ব্রঞ্জ-যুগ নামে পরিচিত। ইহার পরই জগতের লৌহযুগের আবির্ভাব এবং উহাই আধুনিক মানব-সভ্যতার অগ্রদূত।

তাম্র-মাক্ষিক

খনির মধ্যে নানা অবস্থায় তামা পাওয়া যায়। অবিমিশ্রিত তামা জগতে দুর্লভ নহে; কিন্তু মাক্ষিক হইতে যে-পরিমাণ তামা উদ্ধার করা যায় সে তুলনায় উহা নিতান্ত কম। বিশুদ্ধ তামা ছাড়া সল্‌ফাইড্ (sulphide)*, অক্সাইড (oxide) ও কার্ব্বোনেট (carbonate)† এবং সিলিকেট (silicate)§ নামে মাক্ষিক বা তাম্র-প্রস্তর পাওয়া যায়। উহার মধ্যে আবার সল্‌ফাইড্ (sulphide) বা পাইরাইটিস্ (pyrites) এর অংশই বেশী এবং জগতে তাহা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তামা নিষ্কাশিত হয়।

বিশুদ্ধ তাম্র (Native copper)

নানা অবস্থায় বিশুদ্ধ তামা খনির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও পাতলা স্তর, সরু সূত্রের ধারায় দীর্ঘ, দানা বা পিণ্ডরূপে অবস্থান করে। এই পিণ্ড এক একটী এক শত টন বা ততোধিক বৃহৎ পরিমাণের হইয়া থাকে। প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও লেক সুপিরিয়র (Lake Superior) অঞ্চলে, বিশেষতঃ মিসিগানের (Michigan)

---

* Sulphide : Chalcopyrites or yellow copper ore ; bornite or erubescite or peacock ore ; chalcocite or copper glance ; tetrahedrite or grey copper ore.

† Carbonate (oxide) : Azurite or chessylite malachite or green carbonate of copper ; cuprite or red oxide of copper ; melaconite or black oxide of copper.

§ Silicate : Chrysocolla.

উত্তর-উপদ্বীপ প্রদেশে এইরূপ তাম্র পাওয়া যায়। পাঁচ হইতে ছয় হাজার ফুট নীচে পিণ্ডাকারে তামা অবস্থান করে, কিন্তু তাহা উদ্ধার করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ডাইনামাইট বা বিস্ফোরকযোগে কঠিন প্রস্তর বিদীর্ণ করা সম্ভব, কিন্তু তামা নরম বলিয়া ডাইনামাইট-বিস্ফোরণে ভিন্ন হয় না, কেবলমাত্র বিস্ফোরণের স্থানে গহ্বর হইয়া যায়। তখন খনি হইতে যন্ত্রাদিযোগে খণ্ড খণ্ড করিয়া উদ্ধার করিতে হয়। কানাডার উত্তরে করোনেশন উপসাগরের নিকটে কপার-মাইন নদী অঞ্চলে (Coppermine River area) খাদবিহীন তামা পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন একদিন এই অঞ্চল মিসিগানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

পৃথিবীর তামা

জগতে তাম্রের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। যান্ত্রিক সভ্যতা, বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারবৃদ্ধির সহিত তামার চাহিদা জগতে বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল মহাদেশেই অল্প-বিস্তর তামা পাওয়া গেলেও এশিয়া মহাদেশ এ বিষয়ে সমৃদ্ধিহীন। আর উত্তর-আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান।

প্রতি বৎসর আন্দাজ ২৩ লক্ষ টন তামা নিষ্কাশিত হয়। অত্যুৎকৃষ্ট মাক্ষিকের বিশ্লেষণে শতকরা ৩৫ বা ততোধিক অংশ তাম্র পাওয়া গেলেও কারখানায় তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। যেখানে ৭ বা ৮ ভাগ তামা উদ্ধার করা হয়, সেই সকল স্থানই জগতে অধিক তামা সরবরাহ করে।

মোট ২৩ লক্ষ টন তামার মধ্যে আমেরিকা প্রধান এবং তাহার অংশ প্রায় আট লক্ষ টন। ১৯৪০ সালে ইহা নয় লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। তাহার পরই দক্ষিণ আমেরিকার চিলি (Chile)-র স্থান। পরে পরে উত্তর রোডেসিয়া (আফ্রিকা), কানাডা (উত্তর আমেরিকা), বেলজিয়ম, অধিকৃত কঙ্গো (Belgian Congo, Africa) প্রভৃতির স্থান।

প্রবন্ধের শেষ ভাগে পরিশিষ্ট (ক) হইতে নানা দেশের পরিমাণ ও শতকরা অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দেশ ও প্রদেশ বিভাগ

তামা উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটী স্থান অপরাপর স্থান অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। এ বিষয়ে আরিজোনা, উটা, মণ্টানা, নেভাডা, মিসিগান, আলাস্কা, কলোরাডো, কালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানই প্রধান।

কানাডার মানিটোবা, উত্তর কিউবেক (রুইন জেলা) ও অণ্টারিও (সুডবেরী জেলা) অধিকাংশ তামা উৎপাদন করে।

চিলিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় ১৬,০০০ খাদ আছে; তন্মধ্যে আণ্টোফাগাষ্টা প্রদেশে চুকিকামাটা, আটাকামায় পাত্রেরিলোস, ও-হিগিন্সে এল-টেনিয়েণ্ট, **পেরুতে** পাস্কো, পুণো, **বলিভিয়ার** ওরুরো ও পটুসো জেলা, **মেক্সিকোর** এলনোরা ও উলিক, (আফ্রিকা) **কঙ্গোর** কাটুঙ্গা প্রদেশ, **দক্ষিণ আফ্রিকায়** নামাকুয়াল্যাণ্ড, **দক্ষিণ রোডেসিয়ায়** ফকন্ (Falcon) মাইন বা খনি-প্রধান।

জাপানের হনসু ও সোকোকু এশিয়ার মান রক্ষা করিয়াছে। নিক্কির নিকট আসিও খনি এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া খ্যাতি আছে।

ভারতের তামা

তামার ব্যাপারে ভারতবর্ষ অতিশয় দরিদ্র। এত বড় দেশের পক্ষে বৎসরে যে তামা পাওয়া যায় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে; সেই জন্য ভারতবর্ষে বহুপরিমাণ তামা ও তাম্রদ্রব্য আমদানী করা হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই দেশের মধ্যে তদানীন্তন কালে যতখানি প্রয়োজন হইত, তাহা ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইত। এদেশে বহুস্থানে তাম্রমাক্ষিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই খনির কাজ চালাইবার মত প্রচুর মাক্ষিক নাই। ধারাবাহিক স্তর হিসাবে ভারতে কোথাও তাম্রখনি পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ পাহাড়ের কোনও একস্থানে সীমাবদ্ধ স্তূপ বা গুচ্ছরূপে ঘটিয়া থাকে। পর্ব্বতের মধ্যে ফাটলের ভিতর যখন মাক্ষিক আসিয়া

কালক্রমে জমিয়া যায়, মাত্র তখনই কেবল ধারাবাহিক বা অবিচ্ছেদ্য প্রকৃত স্তর হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়।*

ভারতে তাম্র-মাক্ষিকের অবস্থিতি

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাম্র-মাক্ষিকের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু ইহার অধিকাংশই খনির কাজের উপযোগী নহে, কেবলমাত্র ভূতত্ত্ববিদের নিকট অনুসন্ধানের বস্তু। এখন মাত্র সিংহভূমিতে যে মাক্ষিক পাওয়া যায়, তাহা হইতে এক বিদেশী কোম্পানী তাম্র নিষ্কাশন করিতেছে। মহীশূরেও সামান্য পরিমাণ তাম্র নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

আধুনিক ভূতত্ত্ববিদেরা তাম্রমাক্ষিকের অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, বহুকাল পূর্ব্বে খনির কাজ সমাপ্ত হইবার পর সে স্থান ত্যাগ করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে হাজারিবাগের বারগণ্ডা, দেওঘরের বৈরুথী, রাজপুতনার মধ্যে উদয়পুর, বুন্দি ও ইংরেজ-অধিকৃত আজমীরে, আলওয়ার রাজ্যের ইন্দাবাস ও প্রতাপগড়ে, ভরতপুরের বাসাওয়ার, জয়পুরের সিংহানা ও ক্ষেত্রিতে, যুক্তপ্রদেশ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কুমাওন ও গাড়োয়ালে তাম্রমাক্ষিকের উদ্ধার ও তাহা হইতে তাম্র নিষ্কাশনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বালুচিস্থানে উৎকৃষ্ট তাম্রমাক্ষিক আছে এরূপ অনুমান। মিঃ ম্যালেট (Mr. Mallet) সার ফারমর (Sir Lewis Fermor) এর মতে স্বাধীন সিকিম রাজ্যের ভোটাঙ ও ডিকচু প্রদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাক্ষিকের সন্ধান আছে এবং তাহা লইয়া তাম্র উদ্ধার কার্য্য সহজেই চলিতে পারে।

পুরাতন জ্ঞান

ভারতবর্ষে কতদিন হইতে তাম্রসম্পর্কিত জ্ঞান লোকে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা আজ নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। কেহ কেহ অনুমান করেন অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল এবং তাম্রনির্ম্মিত তৈজসাদি করিতে কাংস্যকারদিগের পটুত্ব অসাধারণ ছিল। খনির মধ্যে প্রস্তর হইতে মাক্ষিক উদ্ধার কার্য্যে এবং তাহা হইতে তাম্র নিষ্কাশনের কৃতিত্ব আজও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিতেছে। তাহাদের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা আজও আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। যেখানে তাহারা মাক্ষিক উদ্ধার করিয়াছে, সেই খনিতে বা খাদে আর ব্যবহারযোগ্য মাক্ষিকের চিহ্ন মাত্র নাই।† তাম্র নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত গাদে বা ময়লায় যে তাম্র মিশিয়া আছে, আজিকার বিজ্ঞানের যুগেও মাক্ষিক হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক তাম্র উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।‡ এই যশঃ বিশেষ করিয়া সিংভূমের তামালা বা (তাম্র-উদ্ধারকারী)দের প্রাপ্য। তাহারা যে মাক্ষিক (oxide) লইয়া কাজ করিত তাহা অপেক্ষা আধুনিক মাক্ষিকে (sulphide) ধাতুর পরিমাণ অনেক বেশী; তহা ছাড়া বর্ত্তমানে দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি করিবার বহু উন্নততর ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের এসকল সুবিধা ছিল না, সুতরাং তাহাদের গৌরব অধিক।

পরিচয়

আজ আর এ জাতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। Ball

---

* As a rule, to which there are probably not very many exceptions, the copper ores of India do not occur in true lodes, but are either sparsely disseminated or are locally concentrated in more or less extensive bunches and nests in the rocks which enclose them; occasionally cracks and fissures traversing these rocks have by infiltration become filled with ore which thus resembles true lodes.
Geology of India—V. Ball.

† The skill of these ancients is indicated in the manner of their mining. Down to the depth at which they ceased working, usually water level, they have left no workable copper except in the pillars for holding up the walls; they have picked the country as clean as the desert vulture picks a carcass. Looking over some of these old workings it is often remarked that 'they must have worked over it with tooth-picks.'
—J. A. Dunn.

The number and extent of the ancient workings testify to the assiduity with which every signs of the presence of ore was exploited by these early pioneers and those who followed them up to recent times. —V. Ball.

‡ The innumerable slag heaps scattered throughout the belt further illustrate the skill of these people; a typical analysis of slag near Mosabani contains only 0·26 per cent. cu. which is as good as can be obtained from many modern smelters. But in making comparisons of this nature it should be remembered that they were using for the most part oxidised ores and were smelting with charcoal. —Dunn

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, ইহারা সিংহভূমের আদিম অধিবাসী নহে। † ভিন্ন মতে, ইহারা স্থানীয় কোল বা ভূমিজ § এবং ইহাদিগকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হইত। সাধারণতঃ কৃষি ও পশুপালন ছাড়া সময়মত ইহারা মাক্ষিক হইতে ধাতু উদ্ধার করিত এবং অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসাদি তৈয়ারী করিবার জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। লৌহসম্পর্কে এই অসুরদিগের নামের বহু উল্লেখ আছে এবং যথাস্থানে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

আধুনিক যুগে ১৮৩৩ সালে মিঃ জোন্স ধলভূমে তামার অবস্থিতি সম্পর্কে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। ১৮৪৭ সালে Mr. J. C. Haughton আরও বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সময় 'তামা ডুংরী' (তামার পাহাড়) নামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং 'তামা-পাহাড়' ও 'তামা জুরি' প্রভৃতি শব্দ হইতে এই সকল স্থান পুরাতন তাম্রশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া স্থির করা হয়। ১৮৫২ সালে বিদেশী বণিক এই প্রদেশ ধলভূম রাজের নিকট ইজারা পত্তন লইতে চাহিলে, রাজা অসম্মত হন। ১৮৫৪ সালে মিঃ রিকেট্‌স্ (H. Ricketts) এই সকল প্রদেশ পরিদর্শন করেন এবং বাৎসরিক কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া তাম্রমাক্ষিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালাইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। ইহার পরই মিঃ ষ্টোয়ার (M. Emil Stoehr) দুইটী ইংরেজ কোম্পানীর তরফে ভারতে আসেন এবং মাক্ষিকের অবস্থান, পরিমাণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য পরামর্শ দেন। ইহার উপর নির্ভর করিয়া ১৮৫৭ সালে সিংহভূম কপার কোম্পানী (Singhbhum Copper Co.) জন্ম লাভ করে। এই সময়ে লাণ্ডু ও জামজুরী প্রদেশ হইতে মাসে ১,২০০ হইতে ১,৩০০ হন্দর মাক্ষিক উত্তোলিত হইয়াছে। সাকসন (Saxon) প্রদেশের খনির মজুর এবং ইংলণ্ডের ঢালাইকার বা মাক্ষিক গলাইবার মিস্ত্রি আনিয়া রাজদোহায় কারখানা স্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হয়। কিন্তু বিষম খরচের চাপে এই কোম্পানী শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়।

ইহার পরই (১৮৬২) হিন্দুস্থান কপার কোম্পানী—Hindostan (Singhbhum) Copper Company নামে দ্বিতীয় কারবার স্থাপিত হয় এবং দুই বৎসর চলিবার পর ইহাও বন্ধ করিতে হয়। আন্দাজ ১৮৯১ সালে নূতন করিয়া জমি পত্তন লইয়া রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী (Rajdoha Mining Company) রাখা ও রাজদোহা নামক স্থানে মাক্ষিক তুলিতে আরম্ভ করে। এই অঞ্চলে স্বর্ণপ্রাপ্তির লোভে আরও তিনটী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। এই সকল তামা ও সোণা কোম্পানী বহু টাকা নষ্ট করিয়া সমস্ত কার্য্য বন্ধ করে। পরিশেষে ১৯২৪ সালে ২১শে জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন (Indian Copper Corporation) স্থাপিত হইলে সকল অনিশ্চয়তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কোম্পানী ১৯২৯ সালে মাক্ষিক হইতে তামা উদ্ধারের কাজ আরম্ভ করে এবং ১৯৩০ সালে পিতলের চাদর তৈয়ারী করিবার জন্য মিল (rolling mill) স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে এতৎসম্পর্কে সমস্ত কাজই বন্ধ হয়।

মাক্ষিক উদ্ধার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৫৭ সালে সিংহভূম কপার কোম্পানী কিছুদিন ধরিয়া প্রতি মাসে কিছু কিছু তাম্রমাক্ষিক উদ্ধার করিত; কিন্তু এই পরিমাণের কোনও স্থিরতা ছিল না, কারণ প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত চলিত না। সিংহভূম কপার কোম্পানী লোপ পাওয়ায় সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়।

ইহার পর নূতন নূতন কারবারের সঙ্গে কিছু কিছু মাক্ষিক উদ্ধার হইয়াছে। আমরা ১৯১৪ সাল হইতে নিয়মিত হিসাব দেখিতে পাই; তখন পরিমাণ ৪০০ হন্দর ছিল। মাক্ষিক উদ্ধারের কলকব্জা যুদ্ধান্তে পাওয়া যাইবে বলিয়া মাক্ষিক উদ্ধার কাজ চলিতে থাকে এবং ১৯১৭ সালে ২০,১০৮ হন্দর হয়। ১৯১৮ সালে যন্ত্রাদি না পাওয়ায় মাক্ষিকের পরিমাণ ৩,৬১৯ হইয়া যায়। পরে সুচারুরূপে কাজ চলিতে থাকিলে ১৯২২ ৩০,৭৬৪ হন্দর পর্য্যন্ত উঠিলেও ঐ সময় কোম্পানীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বশতঃ ১৯২৩ সালে মাত্র ৬,৫৫০ হন্দরে নামে।

† Indications exist of mining and smelting having been carried on in this region from a very early period, and the evidence available points to the seraks or lay Jains as being the persons who, perhaps, 2,000 years ago initiated the mining.
—Geology of India, Ball.

§ Colonel Dalton.

পরের কয়েক বৎসর, ১৯২৯ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ বন্ধ থাকায় আর মাক্ষিক উত্তোলিত হয় নাই। তাহার পর হইতে নিয়মিত কাজ চলিতেছে এবং মাক্ষিকের হিসাব পাওয়া যাইতেছে; পরিশিষ্ট (খ)। ইহার মধ্যে ১৯৩৭ সালের ৩,৭১,৪৫৮ টন (মূল্য ৪৮,৬৯,৭৯০ টাকা) পরিমাণ হিসাবে সর্ব্বপ্রধান। অন্যান্য বৎসর দাম ইহা অপেক্ষা চড়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ৩,৬০,২১৬ হন্দর মাল উঠিয়াছে, আনুমানিক মূল্য ৪৭,৮৮,০০০ টাকা।

বর্ত্তমানে সিংহভূমের মোসাবনী, ধোবানী, বাদিয়া ও সুর্দ্দা হইতেই প্রায় সমস্ত মাক্ষিক উৎখাত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মোসাবনী প্রধান। মহীশূরে যে তামার খনি আছে যেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ ১৯৩৮ সালে ৫১ টন তাম্রমাক্ষিক উদ্ধার করা হইয়াছে।

তামার পরিমাণ

যে পরিমাণ মাক্ষিক পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা তামার পরিমাণ যে অনেক কম হয় তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। ভারতের মাক্ষিক হইতে উহার ওজনের শতকরা তিন ভাগও তামা উদ্ধার করা যায় না। যতদিন নিয়মিত হিসাব পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরিমাণ হিসাবে ৭,২০০ টন (১৯৩৭) প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৩৯ সালে ৬,৮০০ টন তামা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ভারতে উৎপাদিত তামার বাৎসরিক হিসাব পরিশিষ্ট (গ) হইতে পাওয়া যাইবে।

পিতল বা পিতলের চাদর

ভারতের তামার হিসাব দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পিতল-কাঁসার কথা আলোচনা করা দরকার। ভারতের পুরাতন তামা পিতল বিশেষতঃ কাংস্য বা কাঁসার তৈজসপত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিক হিসাবে ১৯৩০ সালের পূর্ব্বে ভারতে এক তোলাও পিতল উৎপাদিত হইত না। ঐ সালে ঘাটশিলায় মৌভাণ্ডারে তাম্রের কারখানার সঙ্গে পিতলের চাদর তৈয়ারী করিবার (rolling mill) মিল স্থাপিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শতকরা ৬২ ভাগ তামার সহিত, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত দস্তা ৩৮ ভাগ মিশাইয়া 'চাদর' বা পাত প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সালে ৭১৮ টন মাল প্রস্তুত হয়, ১৯৩৮ সালে তাহা ৯,৮৭৭ টনে পৌঁছে। কয়েক বৎসরের হিসাব পরিশিষ্টে (ঘ) দেওয়া হইল।

উদ্ধার-প্রণালী

মাক্ষিক হইতে কেবলমাত্র তাপযোগে তাম্র উদ্ধার প্রণালী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অবশ্য মাক্ষিকের গুণাগুণের উপর ইহা সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। মাক্ষিক চূর্ণ করিবার পর চুল্লীর মধ্যে অন্যান্য খনিজ প্রস্তরাদি (flux বা বিগালক) যোগে গাদ বাহির করিয়া দিয়া তামা উদ্ধার করা হয়। আবার কোনও স্থানে সূক্ষ্মাকারে চূর্ণিত মাক্ষিক যন্ত্রদ্বারা প্রচুর জলে ধৌত করা হয়। ঐ জলে পাইন, জলপাই প্রভৃতি তৈল যোগ করিবার পর উহার মধ্যে নলদ্বারা বায়ু চালিত করা হয়। এই সমস্ত সময়েই যন্ত্রের দ্বারা ঐ জল বিষমভাবে আলোড়িত হইতে থাকে। বায়ুযোগে জলের উপর বৃহদাকার বুদ্বুদ উঠিতে থাকে এবং ভরা পাত্রের উপর দিয়া বুদ্বুদ ভাসিয়া নীচে পড়িয়া যায়। যাহাতে পাত্রটী সর্ব্বসময় তাম্রচূর্ণমিশ্রিত জলে ভরা থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আছে। ঐ তৈলযুক্ত বুদ্বুদের সহিত তাম্র ভাসিয়া উঠে এবং পাত্রের গা বাহিয়া পড়িয়া নীচে পাত্রে জমা হয়। পরে উহা উদ্ধার করিয়া তাপযোগে শুষ্ক করা হয়। এইরূপ তামার সহিত যৌগিকভাবে অনেক ময়লা থাকে, সুতরাং তাহাকে আবার বড় চুল্লীতে (furnace) দগ্ধ করিয়া তামা উদ্ধার করা হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এই উপায় অবলম্বিত হয়; কিন্তু প্রাচীনকালে কেবলমাত্র তাপদ্বারা (মল দূর করিবার উপযোগী প্রস্তরাদি বা বিগালক সংযোগে) তামা উদ্ধার-প্রণালী প্রচলিত ছিল।

স্বরূপ

গভীর গোলাপী ও লালের সংমিশ্রণে তামার রঙ বুঝিতে পারা যায়। তাম্রমাক্ষিক নানা রঙের হয়, তন্মধ্যে সলফাইড (pyrites) ও অন্যান্য দুই প্রকার প্রস্তরে ময়ূরের রঙ পাওয়া যায়। ম্যাজেণ্টা (magenta) যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাম্রমাক্ষিকের রঙ সহজেই ধারণা করিতে পারেন।

তাম্রে কতগুলি বিশেষ গুণ বর্ত্তমান। ইহা অতি ক্ষীণ বা সূক্ষ্ম পাত বা তারে পরিণত করা যায়। পাত ও বৈদ্যু-

তিক শক্তি বহন করিবার পক্ষে অত্যন্ত সুকর বলিয়া এই সম্পর্কিত কার্য্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ধাতুর মধ্যে একমাত্র রৌপ্যের সহিত এই বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে, অথচ রৌপ্য অপেক্ষা দামে সস্তা বলিয়া তাম্রের প্রচুর প্রচলন।

বাণিজ্য

তামার অপ্রতুলতা প্রযুক্ত বিদেশীরা ভারতবর্ষে বিরাট বাণিজ্য করিয়াছে এবং বহুদিন তাহা অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়াছে। এই অবস্থা আরও কতদিন চলিবে তাহা অনুমান করিয়া বলা কঠিন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই তামা এদেশে আসিতেছে, তবে ১৮১৩ সালে যখন হইতে 'কোম্পানী' ছাড়াও অপর লোকে ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইল, তখন হইতে যে হিসাব পাই, তাহাতে কোনও বৎসর তামার আমদানী বাদ পড়ে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮২১-২২ সালের হিসাবে আমদানী-করা তামার পেরেক ও তাম্রপিণ্ডের মূল্য ৪৩ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭ টাকা ছিল। ইহা কেবল মাত্র বাঙ্গালার হিসাব। এই ক্রমবর্দ্ধমান আমদানী ১৯১৩-১৪ সালে ৭,৪৬,৮৭০ হন্দর মাল ৪ কোটী ১১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকায় পৌঁছে। ইহা ব্যতীত-বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার-এর ভিন্ন আমদানী ছিল। তারের মূল্য ১৯৩৮-৩৯ সালে ১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার এবং যন্ত্রপাতি ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই উভয়বিধ এবং উপরোক্ত তাম্রপিণ্ড, পেরেক চাদর প্রভৃতি ভারতে আমদানীর মধ্যে ব্রিটেনই সর্ব্বপ্রধান বিক্রেতা।

এই অনুপাতে রপ্তানী কিছুই নহে। ১৮৭৫-৭৬ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত তাম্রমাক্ষিকের কিছু কিছু রপ্তানী ছিল। তাহা বর্ত্তমানে নাই। ভারতে যতদিন 'ঢেপুয়া' প্রভৃতি বেশী ওজনের তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল ততদিন তাহারও রপ্তানী ছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে ১,০২৭ হন্দর তাম্রমুদ্রা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৫০ টাকায় রপ্তানী হয়।

তামার বা পিতলের চাদর প্রভৃতি কিছু কিছু রপ্তানী আছে, কিন্তু তাহা কোনও সময় ৭৫ লক্ষ টাকার পরিমাপ পার হয় নাই।

যদি অধিক তাম্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া আমদানী বন্ধ করিতে পারি। তাম্রসংক্রান্ত তার, যন্ত্রপাতি, জগতের খুব বড় শিল্প; আমাদের দেশে ইহার কিছুই হয় নাই। তামা আমদানী করিয়াও এই জাতীয় শিল্প পরিচালনা করা অসম্ভব নহে। ইংলণ্ডে নাম মাত্র তামা পাওয়া যায়, তাহাতে ইংলণ্ডে তাম্রসংশ্লিষ্ট শিল্প গড়িয়া উঠিবার কোনও বাধা হয় নাই। যুদ্ধান্তে যে বিরাট শিল্প-পরিকল্পনার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের স্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবহার

তামার ব্যবহার হইতে দেশের মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কারখানা-শিল্পের একটী ধারণা করা যায়। চোলাই (brewing), রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গৃহাদি নির্ম্মাণের সরঞ্জাম, টাকশাল (mint), তৈজসপত্রাদি, ছাপাই কাজ, নল বা পাইপ প্রভৃতি অজস্র ব্যাপারে তামার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। পিতল, কাঁসা ও তামা-সংযুক্ত বহু প্রকার নূতন মিশ্র ধাতু প্রভৃতি তামা না হইলে চলে না। তামার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বা solts নানা প্রকার রঙ, কীটনাশক দ্রব্য, বার্ণিশ বা পালিশ, রঙিন আতসবাজী ও অন্যান্য কাজে লাগিতেছে। আমেরিকা প্রচুর তাম্র উৎপাদন করে এবং দেশের মধ্যে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যে যে কার্য্যে আমেরিকায় যত পরিমাণ তামা লাগে, তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম, তাহা হইতে নানাপ্রকার শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাইবে:—

মোট ৬ লক্ষ ৫ হাজার টন (১৯৩৮) তামা খরচ হয়; তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ১,৫০,০০০ টন, আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তি বহনের জন্য তার ৬২,০০০, মোটরগাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে ৫০,০০০, গৃহাদি নির্ম্মাণের সরঞ্জাম ৬৭,৫০০, টেলিফোন টেলিগ্রাফ ৩০,০০০, রেডিও যন্ত্র ১৭,৫০০, রেল, শিল্পে ব্যবহার, জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণে স্বতন্ত্রভাবে তার ও তামার ছড় (rod) ৬০,০০০, যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণে ১২,০০০, ঢালাই কার্য্যে ৩১,০০০, ঘড়ি প্রভৃতি ৩,০০০, খাদরূপে ২,৬০০, রেফ্রিজারেটার প্রস্তুত কার্য্যে ৬,৭০০, ঘরের মধ্যে তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে ৬,১০০ এবং অন্যান্য কার্য্যে; যথা—তাপ-নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রের নল, আলোর নল, জোড়াই বা ঝালাই করিবার ছড়, স্ক্রু করিবার ছড়, "জার্ম্মাণ-সিলভারের" পাত, প্রসাধনের সামগ্রী (pin প্রভৃতি), ফিতা বন্ধনের খোপ (eyelets and grommets), খোদাইকার্য্যের পাত, টর্চ্চ তৈয়ারীর নল ইত্যাদি নানা কার্য্যে ৪৬,২০০ টন তামা খরচ হয়।

আমাদের দেশে এ সকলের এখন অনেক বাকী।

পরিশিষ্ট (ক)

জগতে উৎপাদিত তামার পরিমাণ *

প্রতি দেশের হিসাব

(১৯৩৯ ও ’৯৪০)

	১৯৩৯	১৯৪০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৬,৬০,৭০০	৭,৯৬,৬০০
চিলি	৩ ৩৯,২০০	৩,৯৩,৮০০
কানাডা	২,৭৬,২০০	—
কঙ্গো	১,২২,৬০০	—
রুশগণতন্ত্র	১,০৭,০০০	—
জাপান	৭৭,০০০	৭২,৬০০
মেক্সিকো	৪৭,৪০০	৫৭,৬০০
যুগোশ্লাভিয়া	৪১,৭০০	৪৩,০০০
পেরু	৩৫,৬০০	৪৪,০০০
জার্ম্মানী	৩০,০০০	—
সাইপ্রস	২৪,৪০০	—
নরওয়ে	২০,০০০	—
অষ্ট্রেলিয়া	১৯,৮০০	—
ফিনল্যাণ্ড	১৫,০০০	—
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	১০,৪০০	১৩,৬০০
কিউবা	১ ,৩০০	১০,৫০০
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	১০,৩০০	—
সুইডেন	৯,৬০০	—
ফিলিপাইন	৭,৫০০	৯,৫০০
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা	৮,৭০০	—
তুরস্ক	৬,৭০০	৮,৭০০
বলিভিয়া	৪,১০০	—

* সাধারণতঃ প্রতিবৎসর খনি হইতে যে মাক্ষিক উঠে, তাহা হইতে প্রাপ্ত তাম্রের পরিমাণ দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া কোনও কোনও দেশে বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, ব্যবহৃত বা পুরাতন তামা পুনরায় গালাই করিয়া তাম্র উদ্ধার করা হয়; তাহার পরিমাণ জগতে নিতান্ত কম নহে।

পরিশিষ্ট (খ)

ভারতে উৎপাদিত তাম্র-মাক্ষিকের পরিমাণ ও তাহার আনুমানিক মূল্য

(১৯১৪ হইতে ১৯৩৯)

সাল	মাক্ষিক	মূল্য
	টন	টাকা
১৯১৪	৫,৪০০	২৯,০০০
১৯১৫	৮,০১০	১,৮০,২২৫
১৯১৬	৪,১৩৫	৯৩,০৩৭
১৯১৭	২০,১০৮	৫,৫২,৪৩০
১৯১৮	৩,৬১৯	৬০,৭৯৫
১৯১৯	৩২,৭৫৬	৫,২৪,০৯৬
১৯২০	২৮,১৬৭	৪ ২২ ৫০৫
১৯২১	৩২,৫৫০	৪,৮৮,৪০০
১৯২২	৩০,৭৯৪	৬,০৭,৬৪০
১৯২৩*	৬,৫৫০	৬৫,০০০
*	—	—
১৯২৯	৭৩,৫১৯	
১৯৩০	১,১৯,৭৮৭	
১৯৩১	১,৪৪,২৫০	
১৯৩২	১,৬৫,৯৭৭	
১৯৩৩	২,০১,৭২২	২২,১২,৯৬
১৯৩৪	৩,২০,৬০৬	৩৪,১৯,৮৬
১৯৩৫	৩,৫০,৮০১	৩৪,৮৮,৮০
১৯৩৬	৩,৫৭,১৯৪	৪০,০৩,২০
১৯৩৭	৩,৭১,৪৫৮	৪৮,৬৯,৭৯
১৯৩৮	২,৮৮,০৭৬	৩২,৪০,৬৪
১৯৩৯	৩,৬০,২১৬	৪৭,৮৮,০০

* ১৯২৩ সালের কতকাংশ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ ব ছিল।

পরিশিষ্ট (গ)

ভারতে উৎপাদিত তামার পরিমাণ

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত

সাল	টন	সাল	টন
১৯১৯	৯৮৬	১৯৩২	৪,৪৪৩
১৯২০	৫১২	১৯৩৩	৪,৮০০
১৯২১	৮৩৩	১৯৩৪	৬,৩০০
১৯২২	১,০৩৭	১৯৩৫	৬,৯০০
১৯২৩	১৮৭	১৯৩৬	৭,২০০
—	—	১৯৩৭	৬,৮৩০
১৯২৯	১,৬৩৫	১৯৩৮	৫,৩৩০
১৯৩০	২,৯৭৪		
১৯৩১	৪,০৬৯	১৯৩৯	৬,১০০

পরিশিষ্ট (ঘ)

ভারতে উৎপাদিত পিতলের চাদর

১৯৩০ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত

সাল	টন
১৯৩০	৭১৮
১৯৩১	৩,৬৩৭
১৯৩২	৫,৪৪০
১৯৩৩	৬,১৪৩
১৯৩৪	৮,১৮০
১৯৩৫	—
১৯৩৬	৯,৮৭৭
১৯৩৭	৮,৬৯৬
১৯৩৮	৮,২৩৬

উপনিষদের মন্ত্র শুনাও হে কবি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম, এ, ব্যারিষ্টার এট্ ল

প্রতীচী বাজায় তূর্য্য ভৈরব নিনাদে,
পীত-প্রাচী হুঙ্কারিছে সম কণ্ঠ তুলি ;
নব সভ্যতার সৃষ্টি স্বার্থের সংঘাতে—
শ্যেনধৃত বাজ সম মাথে রক্ত ধূলি।
পররাষ্ট্র লোলুপতা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,
নিঃশেষে গ্রাসিতে চায় সমগ্র বসুধা।

॥

কে গা'হবে পুনর্ব্বার ভারতের বাণী
অরণ্যের শ্যামচ্ছায়ে হ'ত যা ঝঙ্কৃত ?
কে শোনাবে ঋষিকণ্ঠে বরাভয় দানি
সুখদ পাপঘ্ন সৌম্য শান্তি সমন্বিত ?

॥

উপনিষদের মন্ত্র শুনাও হে কবি—
ধীরোদাত্ত সুরে আঁকি অরণ্যের ছবি।
মন্ত্রমুগ্ধ সর্প সম নিখিল বসুধা
আকণ্ঠ করিবে পান চিরশান্তি সুধা।

নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

তিন

ভাস, কালিদাস ও শূদ্রের পরেই ভবভূতির নাম আসিয়া পড়ে। তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল অষ্টম শতাব্দীতে। ভবভূতির নাম সংস্কৃত-সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাহার নাট্য-প্রতিভা সংস্কৃত-সাহিত্যের যে কোন প্রসিদ্ধ নাট্যকার অপেক্ষা একটুকুও ন্যূন নহে। 'উত্তররামচরিত' ভবভূতির জগদ্বিখ্যাত নাটক। তিনি কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রামহোৎসব উপলক্ষ্যে নটগণের অনুরোধে অভিনয় করিবার জন্য এই নাটক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। এই নাটকের রচনা-কৌশল ও নাট্যসৌন্দর্য্য অতুলনীয়। সীতার বিলাপ, লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার বিরহে রামচন্দ্রের গভীর শোক এই নাটকখানিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। লোকরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে দিয়া রামচন্দ্র গভীর শোকে যে অন্তর্দ্দাহ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার বর্ণনা কি চমৎকার!

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাৎ অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথঃ।
পুটপাক প্রতিকাশো রামস্য করুণোরসঃ॥

উত্তররামচরিতের প্রভাব বাংলা ভাষার উপর খুব বেশী। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তররামচরিতের' অপূর্ব্ব সমালোচনা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের এতদবলম্বনে রচিত "সীতার বনবাস" অতিশয় হৃদয়গ্রাহী নাটক।

"উত্তররামচরিত" ব্যতীত ভবভূতি আরও তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—হয়গ্রীব বধ, মালতী-মাধব এবং মহাবীর চরিত। "হয়গ্রীববধ" নাটক রচিত হইয়াছিল মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য। 'মালতী ও মাধবের প্রণয়-কাহিনী লইয়া' মালতী-মাধব নাটক রচিত হইয়াছে। মালতী-মাধবের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল :—

মালতী মন্ত্রীর কন্যা, মাধব একজন তরুণ বিদ্যার্থী। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াশক্ত হয়। রাজার ইচ্ছা ছিল তাঁহার প্রিয়পাত্র নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ দেন। কিন্তু মালতী নন্দনকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত। মাধবের বন্ধু মকরন্দের চেষ্টায় মাধবের সহিত মালতীর বিবাহ হয়।

সেক্সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েটের সহিত মালতী-মাধবের কতকটা সাদৃশ্য আছে। ঋষিকুমারী কামন্দকীর ছায়াও সেক্সপীয়রের ফ্রায়ার লরেন্সে সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান। মালতী-মাধবে শৃঙ্গার রস প্রধান। কিন্তু এই শৃঙ্গাররসে অন্তর্নিহিত হইয়া পবিত্রতা এবং করুণ রসের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। অধ্যাপক Horace Hayman Wilson (হোরাস হেম্যান উইলসন) বলিয়াছেন আধুনিক ইউরোপের যে সকল নাটক শৃঙ্গাররস-প্রধান নাটক রচিত হইয়াছে মালতীমাধবকে তাহাদের সমশ্রেণীর নাটক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মালতী-মাধবে আমরা হিন্দুর তৎকালীন জাতীয়-জীবনের নিখুঁত চিত্র দেখিতে পাই। বস্তুতঃ হিন্দুনাটকের মধ্যে ইহা যে একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাবীর চরিতে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবির জন্মভূমিতে প্রবাহিত গোদাবরী নদীর বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক।

ভবভূতির নাটকে হাস্যরসের অল্পতা এবং গম্ভীর ও করুণ-রসের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। বিন্ধ্যপর্ব্বতের শোভা বর্ণনা অতি উচ্চাঙ্গের। মহর্ষি বাল্মিকী-তপোবনে লবকুশের অবস্থান এবং বিদ্যাশিক্ষার সহিত সিম্বেলিনে এ (cymbeline) বেলে-রিয়াসের মঠে রাজকুমার গেডোরিয়াস ও আর্‌বিরেগাসের অবস্থানের অনেকটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ভবভূতির প্রভাব সেক্সপিয়রের নাটকে কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে কে বলিতে পারে।

ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাণ্যকুব্জের রাজা যশোবর্দ্ধনের রাজ-সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তির জন্য ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভবভূতির পরেও বহু সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছে।

সে গুলির বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে রূপক (প্রসিদ) ও উপরূপক (সাধারণ) নাটকের এই শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকজন নাট্যকার এবং তাহাদের রচিত কয়েকখানি নাটকের নাম উল্লিখিত হইত :—

নাট্যকার	নাটক
শ্রীহর্ষ	রত্নাবলী, নাগানন্দ
মহেন্দ্র বিক্রমবর্দ্ধন (কাঞ্চীর পল্লববংশীয় রাজা)	প্রিয় দর্শিকা মত্তবিলাস (প্রহসন)
অনঙ্গহর্ষ মত্ররাজ	তপসবৎসরাজ চরিত
মায়ুরাজ	উদাত্তরাঘব
যশোবর্দ্ধন (কান্যকুব্জের রাজা)	রামভ্যুদয়

এ স্থলে আর একটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ছলিতরাম, পাণ্ডবানন্দ, তরঙ্গদত্ত, পুষ্পদূষিতকা বা পুষ্পভূষিতা প্রভৃতি নাটক কাহার রচিত, তাঁহা নিশ্চয়রূপে কিছুই জানা যায় না।

নাট্যকার			নাটক
ভীমত	...	...	অনর্থরাঘব
জয়দেব	...	...	প্রসন্নরাঘব
রবিবর্দ্ধন	...	...	প্রসন্নাভ্যুদয়
শেষকৃষ্ণ	...	...	কংসবধ
রাম বর্ম্মণ	...	...	রুক্মিণী পরিণয়
শ্যামরাজ দীক্ষিত	...	...	শ্রীদাম চরিত
ক্ষেমেন্দ্র (কাশ্মীর)	...	...	চিত্রভারত
কুলশেখর বর্ম্মন (কেরলের রাজা)		...	সুভদ্রা-ধনঞ্জয়
	...	...	তপতী সম্বরণ
প্রহ্লাদন দেব	...	...	পার্থ পরাক্রম
বিশালদেব বিগ্রহরাজ	...	...	হরকেলি নাটক
বামন ভট্টবান	...	...	পার্ব্বতী পরিণয়, (এই নাটকখানিকে এক সময়ে বিখ্যাত কবি বাণের রচিত বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল)
জগজ্জ্যোতি মল্ল	...	...	হরগৌরী-বিবাহ
মণিকা (নেপালের কবি)	...	...	ভৈরবানন্দ
হরিহর	...	...	ভর্তৃহরি নির্ব্বেদ
সোমদেব	...	...	ললিত বিগ্রহরাজ নাটক
বিদ্যানাথ	...	...	প্রতাপরুদ্র কল্যাণ
জয়সিংহ শূরী	...	...	হাম্বির মদ মর্দ্দন
গঙ্গাধর	...	...	গঙ্গাদাস প্রতাপবিলাস
বেঙ্কটনাথ	...	...	সঙ্কল্প সূর্য্যোদয়
বিলহন	...	...	কামসুন্দরী (নাটিকা)
মদনবাল সরস্বতী	...	...	বিজয়শ্রী বা পারিজাতমঞ্জরী (এই নাটকের দুইটি অঙ্ক প্রস্তরে খোদিত আছে)
মথুরা দাস	...	...	বৃষভানুজা (নাটিকা)
নরসিংহ	...	...	শিবনারায়ণ ভঞ্জ মহোদয়

নাট্যকার			নাটক
ঘনশ্যাম	...	...	আনন্দসুন্দরী (সত্তক)
বিশ্বেশ্বর	...	...	শৃঙ্গারমঞ্জরী (ঐ)
উদ্দন্দীন্	...	...	মল্লিকা মারুত (প্রকরণ) (এক সময়ে এই নাটকখানিও বাণ রচিত বলিয়া অনেকের ধরণা ছিল)
রামচন্দ্র (জৈন)	...	...	কৌমুদী মিত্রানন্দ
	...	...	(প্রকরণ)
রামভদ্র মুনি (জৈন)	...	...	প্রবুদ্ধ রৌহিণেয় (ঐ)
শঙ্খধর কবিরাজ	...	...	লতকা মেনকা (প্রহসন)
জ্যোতিশ্বর কবিশেখর	...	...	ধূর্ত্ত-সমাগম
জগদীশ্বর	...	...	হাস্যার্ণব
শ্যামরাজ দীক্ষিত	...	...	ধূর্ত্ত নর্ত্তক, কৌতুকরত্নাকর
বামন ভট্ট বাণ	...	...	শৃঙ্গার ভূষণ
রামভদ্র দীক্ষিত	...	...	শৃঙ্গারতিলক
বরদারাজ (অমল আচার্য্য)	...	...	বসন্ততিলক
কাশীপতি কবিরাজ	...	...	মুকুন্দানন্দ
শঙ্কর	...	...	শারদাতিলক
নল্ল কবি	...	...	শৃঙ্গার সর্ব্বস্ব
কেরল প্রদেশের	...	...	
কটিলিঙ্গের যুবরাজ	...	...	রস-সদন
বৎসরাজ (কালিঞ্জর রাজার	...	...	
পরমাদিদেবের মন্ত্রী)	...	...	(১) কীরাতার্জ্জুনীয়ম্
			(২) কর্পূর চরিত
			(৩) হাস্যচূড়ামণি (প্রহসন)
			(৪) রুক্মিণী হরণ
			(৫) ত্রিপুরদহ
			(৬) সমুদ্রমন্থন
বিশ্বনাথ	...	...	সৌগন্ধিকাহরণ
কাঞ্চন পণ্ডিত	...	...	ধনঞ্জয় বিজয়
বোক্কাদিত্য	...	...	ভীমবিক্রমব্যায়াগ
রামচন্দ্র	...	...	নির্ভয় ভীম
কৃষ্ণ মিশ্র	...	...	বীর বিজয়
কৃষ্ণ অবদূত	...	...	সর্ব্ববিনোদ নাটক
রাম	...	...	লম্মথোন্মথ
ভাস্কর কবি	...	...	উন্মত্তরাঘব
লোকনাথ ভট্ট	...	...	কৃষ্ণাভ্যুদয়
কৃষ্ণ কবি	...	...	শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি
রূপগোস্বামী	...	...	দানকেলি কৌমুদী
মহাদেব	...	...	সুভদ্রা হরণ
মেঘপ্রভাচার্য্য	...	...	ধর্ম্মাভ্যুদয়
সুভট্ট	...	...	দূতাঙ্গদ
ব্যাসশ্রী-রামদেব	...	...	সুভদ্রা-পরিণয়,
	...	...	রামাভ্যুদয়
	...	...	পাণ্ডবাভ্যুদয়
শঙ্করলাল	...	...	সাবিত্রী চরিত
মধুসূদন	...	...	মহাটক
রামকৃষ্ণ	...	...	গোপাল কেলি চন্দ্রিকা

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় নাট্যকলা কিরূপ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারের রচিত দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ করিয়া তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান রাজত্বকালে ভারতীয় নাট্যকলার কোন উন্নতি তো হয়ই নাই অধিকন্তু অবনতির অধস্তন সোপানে অবতরণ করিয়াছে। ইহার কারণ, প্রথমত মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের নাট্যকলার প্রতি অনুরাগের অভাব, দ্বিতীয়তঃ বিজাতীয় ভাষার প্রচলনের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতি, তৃতীয়তঃ পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল—স্ফূর্ত্তিহীনতা। মুসলমানগণের শিল্পানুরাগ, মুসলমান কবি সাদী ও হাফেজ প্রভৃতির ফারসী ভাষায় রচিত গীতাবলী হিন্দুদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতের মুসলমান নৃপতিগণ নৃত্যগীতাদি ইসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে বলিয়া নাট্যকলার পোষকতা করিতেন না। তাই দ্বাদশশতাব্দীর শেষভাগ হইতে (১১৯৩ খৃঃ) ইংরাজ-অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্যকলার ইতিহাস একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার শিষ্যগণ সহ লীলা-রসাস্বাদনের জন্য ভক্তিরসাশ্রিত নাট্যকাব্যের অভিনয় করিয়া নাট্যকলাকে সামান্য ভাবে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন এই মাত্র বলা যাইতে পারে

কথিত আছে নদীয়ার ভূম্যাধিকারী বুদ্ধিমন্ত খাঁর বাড়ীতে তাঁহারই ব্যয়ে "শ্রীকৃষ্ণ লীলা" অভিনয় হইয়াছিল। নারদের ভূমিকায় শ্রীবাসের অভিনয় দর্শকের প্রাণে ভক্তিরসের উৎস প্রবাহিত করিয়া দিত, আর কৃষ্ণ-মহিষী রুক্মিণীর ভূমিকায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এত তন্ময় হইয়া অভিনয় করিতেন যে তাঁহার মাতা শচীদেবী পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এই অভিনয় ঠিক নাট্যাভিনয় কি না তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিনয়ানুরাগেই তাঁহার পার্ষদ ও শিষ্যগণের মধ্যে নাটকের চর্চ্চা হইয়াছিল। তাই এই যুগেও রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বলিত রূপগোস্বামীর রচিত "বিদগ্ধমাধব", "ললিতমাধব" নাটক "কর্ণপুর" কবিপ্রণীত চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটক ১৭শ শতাব্দীতে রচিত লোচনদাসের "জগন্নাথ বল্লভ" প্রভৃতি নাটকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। আমাদের প্রদত্ত এই তালিকা সত্ত্বেও রাজোৎসাহের অভাবে মুসলমান রাজত্বকালে নাট্যকলার যে বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে আরও কয়েকজন নাট্যকার এবং তাঁহাদের রচিত নাটকের কথা উল্লেখ করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আদিশূরের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণ "বেণীসংহার" নাটক রচনা করিয়াছেন। এই নাটকখানি বীররস প্রধান। একাদশ শতাব্দীতে রচিত দামোদর মিশ্রের "মহানাটক" এবং কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" এই দুই-খানি প্রসিদ্ধ নাটক। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকখানি রূপক। রিপুর উপর ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্যই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। তাই এই নাটকখানিতে বিবেক, ভক্তি, বৈরাগ্য, কলি, পাপ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিই নাটকীয় চরিত্র। গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" ও "বুদ্ধদেবের" প্রথম দৃশ্য হইতে এসম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত দুইখানি নাটকের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। সোমদেব রচিত "ললিত বিগ্রহরাজ" নাটক এবং বিগ্রহ পাল রচিত "হরকেলি" নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইখানি নাটক কোন কাগজে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় না। আজমীর সহর হইতে একমাইল দক্ষিণে তারাগড় পাহারের নাজিমদ্দিন নামীয় মসজিদের গাত্রে প্রস্তরলিপিতে এই দুইখানি নাটক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় হিন্দুগৌরব মুসলমানদের হস্তে লুপ্ত হইলেও হিন্দুভাস্কর নিজ কীর্ত্তি বিস্মৃত হইতে না পারিয়া সজলনেত্রে মস্জিদের এক কোণে উহা চিরস্থায়ী রাখিতে ত্রুটী করে নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় নাট্যকলার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য সভ্যদেশ গ্রীসের নাট্যকলার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই সর্ব্বপ্রথম দেবোদ্দেশে নাটক অভিনীত হইত। Aristotle (আরিষ্টটল) বলিয়াছেন বাকাদেবের (Bachus) বিজয়োৎসব বা জন্মোৎসবে যাঁহারা গান রচনা করিতেন তাঁহারাই আদি নাটকের স্রষ্টা। গার্গি লিখিয়াছেন—"The hymns in

honour of Bachus while they described his rapid progress and splendid conquests, became imitative and in the conquests of the Pythian games, the players on the flute who entered into competition were enjoined by an express law to represent successively the circumstances that had preceded, accompanied and followed the victory of Apollo over Pythian." আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্ব্বে উৎসবের সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পুরহিতগণের দ্বারা সঙ্গীত অভিনয় হইত। এই দেবোদ্দেশে অভিনীত নাটকই মিষ্টিক ড্রামা (Mystic drama) বা রূপক নামে পরিচিত ছিল। উহাই ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া মিষ্টিরি ((Mystery) অথবা মিরাকেল অর্থাৎ অলৌকিক ব্যাপার মূলক নাটকের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল উৎসবের সময় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দেবোদ্দেশে ছাগ বলি প্রদত্ত হইত। এবং এই গান ছাগ-গীতি বা Tragadio নামে অভিহিত হইত এবং এই Tragadio শব্দ হইতেই গ্রীক-ট্রেজেডি (Greek Tragedy) বা বিয়োগান্ত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় হোমার রচিত ইলিয়ড ও ওডেসিতেও নাটকের বীজ যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য এরিষ্টটল হোমারকেই নাট্যকলার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু থেসপিস্‌ই (Thespis) পাশ্চত্ত্য নাট্যকলার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। এইজন্য নাট্যকলা সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় অনুষ্ঠানই থেসাপিয়ান আর্ট (Thespian Art) এবং অভিনেতৃগণ থেসপিয়ানের সন্তান সন্ততি নামে অভিহিত হইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩৬ অব্দে এই থেসপিসই সর্ব্বপ্রথম গানের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য একজন অভিনেতার প্রচলন করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের সময় টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তাচ্ছলে একজন গায়ক গান করিত। সেই প্রথা হইতেই অভিনেতার প্রথম উদ্ভব। ক্রমে ৫১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রাইনিকাস (Phrynichus) কর্ত্তৃক থেসপিসের একমাত্র অভিনেতাই অভিনেত্রীর কার্য্যেও নিযুক্ত হয়। পরে এস্‌কাইলাস (Aeschylus) নাটকে সঙ্গীতের ভাগ কমাইয়া বক্তৃতার ভাগ বাড়াইয়া দেন এবং কথোপকথনের জন্য দ্বিতীয় অভিনেতার সৃষ্টি করেন এবং চরিত্রানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদের অবতারণা করেন। সফোক্লিস অভিনেতার সংখ্যা বাড়াইয়া তিন জন করেন। এস্‌কাইলাসও তাহার অনুকরণে তিন জন কখনও বা চারি জন অভিনয় করেন। এই অভিনেতাদের একজন নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিত। এস্‌কাইলাস নীরব অভিনয়ও প্রবর্ত্তন করেন। ইনি প্রায় ৯০ খানি ট্র্যাজিডি প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই সমস্ত নাটকের স্থলবিশেষের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। নীতিবিগর্হিত বিষয়ের প্রচার হেতু তিনি রাজদ্বারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার সহোদর Smymius বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতি সহকারে স্বীয় পরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বদেশ রক্ষার জন্য সেলিমের যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হওয়ায় দেশ-ভক্তির নিদর্শন সেই ছিন্ন হস্তখানি খুলিয়া সজলনেত্রে সকলকে দেখান। বিচারকগণ তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী ও ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইয়া এস্‌কাইলাসকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করিতে আদেশ করেন। এস্‌কাইলাস তাঁহার অপ্রত্যাশিত মুক্তির আদেশে এত ব্যথিত ও রুষ্ট হন যে, এই মুক্তির আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া দেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন এবং সিসিলিতে যাইয়া যাবজ্জীবন নির্জ্জনে বাস করেন।

সুসেরিয়ান (Susarian) খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮০ অব্দে গ্রীকগণের দোষগুলিকে (vices and follies) ব্যঙ্গ করিয়া রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় করেন তাহা হইতেই কমেডির সৃষ্টি হয়। ইহারই কিছুদিন পরে থেস্‌পিস সুগভীর ভাব এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেন এবং প্রথম নাটক Alcestis খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩৬ অব্দে অভিনীত হয়। ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রচলনে Solon প্রথমে ভয় পাইয়া থেস্‌পিস্‌কে বলিয়াছিলেন,

"If we applaud falsehood in our public exhibitions, we shall soon find that it will insinuate itself into our most sacred engagement."

অবশ্য সলোনের ভয়ের কোন কারণ হয় নাই। কবিগণ ট্র্যাজেডি এবং কমেডিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন এবং জনসাধারণও অভিনয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। তবে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ট্র্যাজেডি অপেক্ষা তরল ভাবাপন্ন কমেডিই সাধারণ

গ্রাম্য ও ইতর লোকের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বিদ্রূপাত্মক নাটকের আদর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এপিকারমাস, এরিষ্টফিনিস্ প্রভৃতি ব্যঙ্গকাব্যলেখকগণ কমেডি অভিনয় করিবার জন্য অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা নিযুক্ত করেন। যখন অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণের হাতে গ্রীসের কর্তৃত্ব ভার তখন এরিসটফেনিস্ বিশেষ দক্ষতাসহকারে রঙ্গরস চাতুর্য্যের অবতারণায় এই সকল লোকের ছল প্রকাশ করিয়া দেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার Equites কমেডিতে ক্লো (Cloe) নামক জনৈক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গর্ব্বিত সিনেটারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে কেহই সাহসী না হওয়ায় তিনি নিজেই এই ভূমিকা গ্রহণ করেন। এথেন্সবাসিগণের উপর এই অভিনয় এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহারা ক্লোকে পাঁচ ট্যালেনটস্ অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করে এবং নাট্যকারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া অভিনয়ের পরে তাঁহাকে লইয়া বিজয়োল্লাসে গভীর জয়ধ্বনিসহকারে সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করে।

'ক্লাউডস্' কমেডিতে এরিসটফেনিস সক্রেটিসকে ব্যঙ্গ করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। কারণ, সত্য, সরলতা, জ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ বিজ্ঞ সক্রেটিস্ এই সকল ব্যঙ্গকবিগণ কর্তৃক স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের কুৎসা রটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। সক্রেটিসের ন্যায় জ্ঞানী বক্তির কুৎসা রটনায় অনেকেই এরিসটফেনিসের প্রতি বিরক্ত হইলেও তাহার বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গরসে তাহার কোন দোষই লোকের নিকট মার্জ্জনার সীমা অতিক্রম করে নাই।

এরিসটফেনিস সফোক্লস ও ইউরিপিডিয়াসের সমকালবর্ত্তী। কথিত আছে লিসিয়াসের অধীনে একবার শত্রুর নিকট পরাজিত লইয়া এথেন্সবাসী খুব নিগ্রহ ভোগ করে। কিন্তু ইউরিপিডিয়সের কবিতা আবৃত্তি করিলেই তাহারা শৃঙ্খল মুক্ত হইত। প্লুটার্ক বলেন এই সকল সৈনিকগণ স্বদেশে ফিরিয়া কবির সম্বর্দ্ধনা করিতে ভুলিত না। কারণ, তাঁহার কবিতাই তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। ইউরিপিডিয়সই সর্ব্বপ্রথম নাটকে দার্শনিকতা ও মনস্তত্ত্ব আনয়ন করেন।

এইভাবে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দর শার সময়ে গ্রীক নাট্যকলা অজস্র কুসুম সম্ভারে সজ্জিত বিশাল বিটপীতে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া তুলে।

গ্রীকগণ তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার গৌরব করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও শিক্ষার উচ্চাদর্শ, ইতিহাস ও দর্শন, শিল্প ও স্থাপত্য যেমন সম্পূর্ণ আদি ও অকৃত্রিম, উহার নাট্যকলাও তেমনি সম্পূর্ণ মৌলিক। অধ্যাপক উইলসন বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ভারতীয় নাট্যকলার অকৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিন্দু নাট্যকলার মৌলিকতা সম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"The origin of the Indian drama may unhesitatingly be described as purely native. The Mohomedans, when they overran India, brought no drama with them; the Persians, the Arabs and the Egyptians were without a national theatre. It would be absurd to suppose the Indian drama to have owed anything to the Chinese or its offshoots. On the other hand there is no real evidence for assuming any influence of Greek examples upon the Indian drama at any stage of its progress. Finally, it has passed into its decline before the dramatic literature of Modern Europe had sprung into being.—"

উভয় দেশের নাট্যকলা স্বস্ব ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিলেও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি একমাত্র ভারতবর্ষেই হইয়াছে। অধিকন্তু হিন্দু নাটক যখন উন্নতির উচ্চ শিখর হইতে অবনতির পিচ্ছল সোপানের নিম্নস্তরে নিপতিত হইল, তাহারই পর হইতে আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যকলার আরম্ভ।

পণ্ডিত প্রবর Stanley Rice ও "Indian Arts and Letters" নামক পত্রিকায় (Vol. I No. 2) লিখিয়াছেন—

"It is indeed significant that in all those discussions (Influence of the Greeks upon Sanskrit drama) it is always assured that the influence to be traced must have originated in the west and have operated on the east. This is probably due to the classical obsession of Europeans, for, as a matter of fact in the thing of the mind, at any

rate until very recently, it is always the East that had reacted upon the West, and the most notable example is, of course, Christianity itself."

ডাক্তার কীথও ভারতীয় নাট্যকলার স্বাতন্ত্র্য ও অকৃত্রিমতা স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল অনুসন্ধিৎসু মনীষী ষ্টাননিরাইস, উইলশান, উইনলডিস, উইন্টারনিজ, ম্যাকডোলেন প্রভৃতি সকলেই ভারতীয় নাটকের অকৃত্রিমত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

এই সকল প্রত্নতত্ত্ব-মূলক গবেষণা-লব্ধ অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও ডাক্তার বেবর যে বলেন নাট্যকলার জন্য ভারতবর্ষ গ্রীসের নিকট ঋণী তাঁহার এই উক্তিকে প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রথমতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীস দেশে নাট্যকলা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং এস্‌কাইলাস, ইউরিপিডস্‌ ও সফোক্লিস বৌদ্ধ যুগের সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ দিকে, ঋগ্বেদ যে অতি প্রাচীন তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই স্বীকার করিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদে নাটকের বীজ বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'সুপর্ণাধ্যায়', 'শত পথ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এই সমস্তই যে গ্রীস দেশের ইসকাইলাস ও সুসারিয়েন প্রভৃতির অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। "নাট্যশাস্ত্রও" এই সময়ের অনেক পূর্ব্বে রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, রামগড়ের যে প্রাচীন নাট্যশালাকে ডাক্তার ব্লক গ্রীক এম্পিথিয়েটারের অনুরূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা নাট্য শাস্ত্র বর্ণিত গুহা-নাট্যশালা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত নাটকের সহিত গ্রীক্‌ ট্রেজিডি অথবা কমিডির কোনও সাদৃশ্য নাই। গ্রীক কমিডি ব্যঙ্গমূলক প্রহসন মাত্র, আর সংস্কৃত কমিডি শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি এবং ট্রেজিডিমূলক গ্রীক্‌ নাট্যগ্রন্থ এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আরও কয়েকটী কারণ বলিতেছি,

(১) গ্রীক নাটকের ট্রেজিডি ধ্বংস মূলক আর সংস্কৃত কমেডি গঠন মূলক। আমাদের নাট্যসূত্রানুসারে সংস্কৃত নাটক ট্রেজিডি হইবার উপায়ই নাই।

(২) গ্রীক নাটকে দেশ, কাল এবং ঘটনার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়—three unities of time, place and action. গ্রীক নাটকে দৃশ্য বা কালের ব্যবধান নাই—প্রকৃত ঘটনা ঘটিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন অভিনয়ও ঠিক ঠিক ততটুকু সময়ব্যাপী। ভারতীয় নাটকে দেশ ও কালের ঐক্য আদৌ রক্ষিত হয় নাই। কেবল ঘটনার সমঞ্জস্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

কিন্তু গ্রীক নাটকে কোনও একটি সম্পূর্ণ ঘটনা নির্দ্দিষ্ট কাল ও স্থান আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়া থাকে।

(৩) ভারতীয় নাটকে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহার এই পঞ্চ সন্ধি রক্ষিত হইয়া থাকে। নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চ সন্ধি সমন্বিতম্‌। গ্রীক ট্রেজিডিতে এই পঞ্চ সন্ধির নিয়ম রক্ষিত হয় নাই।

(৪) সংস্কৃত নাটকে অঙ্কাবতার—যেমন ভবভূতির উত্তর-রাম চরিতের শেষ অঙ্কের ন্যায় এক অঙ্কের মধ্যে নূতন একখানি নাটকের "মায়া সীতা" ও বাল রামায়ণে সীতাহরণ অভিনয়—বিস্কম্ভব, প্রবেশক, চূলিকা প্রভৃতি নাট্য সম্পৎ প্রধান অঙ্গ বর্ত্তমান আছে, আর গ্রীক নাটকে ইহাদের অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না।

(৫) হিন্দু নাট্যশালার নির্ম্মাণ ব্যবস্থা (যাহা নাট্যশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়) গ্রীক রঙ্গালয়ের নির্ম্মাণ ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

(৬) কালিদাস, ভাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারের জগদ্বিখ্যাত দৃশ্যকাব্যে গ্রীক নাটকের সামান্য প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না।

ভারতে এবং গ্রীস দেশে নাট্যকলার উৎপত্তি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে হইয়াছে এবং উভয় দেশেই যে নাট্যকলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারা যায়। এবিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

নেপালে বাংলা নাটক

মুসলমান প্রভাবের সময় বাঙ্গালায় নাট্যকলার প্রসার হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাধীন প্রদেশ সমূহে উহার বাধা হয় নাই। তাই বাঙ্গালায় যখন নাট্যামোদ যাত্রা, কবি ও পাঁচালীতে নিবদ্ধ রহিল, অন্যত্র বাঙ্গালীর রচিত নাট্যসাহিত্যের সমভাবেই বিকাশ হইতে লাগিল। তাই আমরা উড়িষ্যা, নেপাল ও আসামে নাট্য-সাহিত্যের পরিচয় পাই।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকখানি নাটক নেপালে পাওয়া গিয়াছে—বাংলা নাটক হইলেও, ইহাদের ভাষা নেপালী। শ্রীযুক্ত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেইগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকায়ও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যে চারিখানি নাটকের পরিচয় তিনি দিয়াছেন উহাদের নাম—

(১) বিদ্যাবিলাস (কাশীনাথ)

(২) মহাভারত (কৃষ্ণদেব)

(৩) রামচরিত্র (গণেশ)

(৪) মাধবানল কামকন্দলা (ধনপতি)

বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী বাদে মিথিলারাজ হরিসিংহদেব বৈদেশিক অধীনতার ভয়ে নেপালে পলায়ন করেন। ক্রমে তিনি ঐ স্থানে একটা রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন। হরিসিংহদেব হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অনেক বাঙ্গালী ও মৈথিলী পণ্ডিত তাঁহার অনুবর্ত্তী হন এবং তাঁহাদের সহায়তায় নেপালের কৃষ্টিসাধনে তিনি তৎপর হন্।

নেপালের প্রাচীন রাজবংশের কুমার জয়স্থিতির সহিত হরিসিংহদেবের বংশের এক রাজপুত্রীর বিবাহ হওয়ায় উভয় বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। জয়স্থিতির বংশধর ভূপতীন্দ্রমল্ল ও তাঁহার পুত্র রণজিতের সময়েই ঐ নাটক কয়খানি রচিত হয়। রণজিতই মল্লবংশের শেষ রাজা। তিনি ১৭৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জয়স্থিতি বাঙ্গালা হইতে পাঁচজন ও মিথিলা হইতে পাঁচজন পণ্ডিত আনাইয়া সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নাটক কয়খানি কিন্তু বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে নাই—একটী কি দুইটী পাত্র এক একবার প্রবেশ করিতেছে এবং গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকল গানের শেষেই রাজার নামে একটী ভণিতা আছে। যেমন—

রূপগুণ আগরি রতিতহু সুন্দরী
প্রবেশ কয়ল নটধামে।
কেলিকলা রস করব সখি মিলি
কহ বীর ভূপতীন্দ্র নামে হো হো।

"বিদ্যাবিলাস" নাটকে সাতটী অঙ্ক আছে, কিন্তু কোন অঙ্কেই গর্ভাঙ্ক নাই। বিদ্যা, সুন্দর ও মালিনী নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ইহাতেও নান্দী, সূত্রধার ও নটী ঠিকই আছে। নাটকগুলি সঙ্গীত-বহুল, একটী কি দুইটী কথার পরই গানের অবতারণা। নান্দী সংস্কৃতে চরিত, সূত্রধারের কথাও সংস্কৃত ভাষায়। তারপরে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও নিজেদের পরিচয় প্রদান। চারিখানি নাটকেই এই রীতিই অনুসৃত।

"মহাভারত" নাটকে তেইশটী অঙ্ক। প্রথমে নান্দী শ্লোক, তারপর রাজবর্ণনা, দেশবর্ণনা তৎপরে ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রবেশ। কয়টী অঙ্কে সমগ্র মহাভারতের প্রধান প্রধান কথা বর্ণিত হইয়াছে—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, যুদ্ধ, বিলাপ কোনটাই বাদ যায় নাই—কিন্তু বিবরণগুলি বড় সংক্ষিপ্ত, দুই একটী কথায় মাত্র বর্ণিত। রাজসূয় যজ্ঞে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন শকুনিকে মনের দুঃখে বলিতেছেন—

হামে বড় পাবল লাজ মাতুল
হসল বৃকোদর চলু ঘর ধায়
শরণ লেল তুঅ করব উপায়।

যুদ্ধের অঙ্কেও দুইজন দুইজন করিয়া পাত্রের প্রবেশ এবং দুই একটী কথার পরেই প্রস্থান। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ :—

বুঢ় বয়সে হাম পাবল শোক
হরি হরি যে করত ত্রাণ।
করম লিখল ফল দূর নাহি যায়
জয় ভূপতীন্দ্র নৃপভাণ॥

তৃতীয় নাটক রামায়ণ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে বিষ্ণু, দশরথ লোমপাদ, রাবণ, জনক, উর্ম্মিলা।

শ্রীকৃষ্ণ—তেহো স্ত্রী-জাতি। যুদ্ধ সময়ে যাহাত উচিত নহে।

সত্যভামা—হে স্বামী! আমার বহুত সতিনি। ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীকে দেব, তহে বুঝয়ে নাহি। হামু তোগারি সঙ্গ নাহি ছাড়ব।

যাত্রাসময়ে নারদ আসি বোলল—

হে হরে তুহু সম স্ত্রীজিত পুরুষক বহু নাহি দেখি, যুদ্ধ সময়ে স্ত্রীক চোড়য়ে নাহি পারহ। তুহু জগৎগুরু।

গরুড়—হে স্বামী! আমি থাকিতে তুহু পায়ে বেড়াব
অঃ হামার কন্ধে চড়ি পাপী নরকাসুর বধ করো
গিয়া।

সূত্রধার সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণ করিল। উহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ গরুর বাহনে বায়ুবেগে কামরূপ পাই পাঞ্চজন্য ধ্বনি কয়ল···

গানের একটি নমুনা দিতেছি—

(রাগ—কানারা)

চললি গোবিন্দ গরুড় কন্ধে
নরক মারিতে কয়লি প্রবন্ধে।
বায়ুক বেগে চলয়ি পখীরাজ
তিন এক মিলল কামরূপ রাজ।
ফুকল শঙ্খ হরি বারবার
শুনি দানবক ভেল হৃদি বিদার।

শ্রুতকীর্ত্তি, বিশ্বামিত্র, দত্তাত্রেয়, কালী, তারা, দুর্ব্বাসা, কালনেমি সকলেরই এক একবার প্রবেশ এবং নিজের কথা বলিয়া প্রস্থান। যেমন—

রাবণ—দশমুখ ধরি আমি ললিত সুবেশ
আমার (র) সমান বীর আর কেবা আচ্ছে
ভরতে পলায়া জায় ন আইসে কাচ্ছে।

নাটকে শৃঙ্গার রসেরও অবতারণা আছে—

সুবদনি সুদে যাণী করিবো চুম্বনে
দেখিয়া মুখের শোভা, চঞ্চল হৈলো মনে
মান ছাড়িয়া দেব রসদান।

তৃতীয় খণ্ডে রাবণ বলিতেছে—

করিবো রণ অবে রামের কাছে গিয়া
আমার সংমুখে বৈরি কে থাকিতে পারে
রিপুগণ দেখিয়া মারিবো তারে।

পরে রাম বলিতেছেন—

চলো অবে অবিলম্বে অযোধ্যানগরে
আনন্দ করিবো আজি সকলে মিলাবো
সেখানে করিবো গিয়া বিচার করিবো।

চতুর্থ নাটক মৈথিলি, হিন্দি ও বাঙ্গলা ভাষার সংমিশ্রণে রচিত।

এই চারিখানি নাটক ভিন্ন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপালের কয়েকখানি অর্দ্ধ সংস্কৃত অর্ধমৈথিলি নাটকের পরিচয়ও দিয়াছেন। হরগৌরী বিবাহ নাটক, কুঞ্জবিহারী নাটকে মৈথিলী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভূপতির পিতা জিতামিত্রমল্ল রচিত "অশ্বমেধ" ও "গোপীচন্দ্র" নাটকের পরিচয় দিয়াছেন। রঙ্গপুরের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষে রচিত হয়—অনুমান ১৭১২ খৃষ্টাব্দে। ইহাতে অন্যান্য ভূমিকার সহিত গোপীচন্দ্র ও ময়নাবতীর কথা আছে। এই নাটকে গানের বাহুল্য নাই, গদ্যই বেশী এবং ইহার ভাষা প্রাচীন বাংলা। যেমন—

কোটোয়াল—বঙ্গদেশের অধিপতি মহারাজা গোপীচন্দ্র তার
কোটবার—কলিঙ্গীনাম অমী আছে।
ভাগিখোর—ভাল কহিলেন। অহে খেতু মহাপাত্র কলিঙ্গা
কোটবার আমার এক বচন অবধান করো।
খেতু—সর্ব্বথা।
ভাগিখোর—সমস্ত লোক বধিয়া দাড়িয়া লুটিয়া আনিয়া এমন
এমন কর্ম্ম করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকিলো
আমার সমান ভাগিখোর নাম আর না আছে।
খেতু—সত্য কহিলেন। ওহে কলিঙ্গ কোটবার তুমার হমার
রাজা গোপীচন্দ্র আছে তার দর্শন করিতে জায়কো
চলো।

নাটকগুলির ভাষা যাত্রার ন্যায়। বাঙ্গালায়ও এ-সময়ে থিয়েটারের পরিবর্ত্তে 'যাত্রাই' প্রচলিত ছিল।

এই কয়খানি ব্যতীত আরও নাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আসামে বাংলা নাটক

সম্প্রতি আসামে শঙ্করদেব রচিত অসমীয় ভাষায় একখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। নাটকখানিতে একটী মাত্র অঙ্ক এবং উহার ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত।

শঙ্করদেব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসামে আবির্ভূত হ'ন। তিনি অসমীয়া ভাষায় বহু কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন। কালীয়দমন নাট্, পারিজাত হরণ নাট্, সীতা স্বয়ম্বর নাট্, পত্নীপ্রসাদ নাট্ প্রভৃতি। পারিজাত হরণ নাট্ সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

অসমীয়াদের সহিত বাঙ্গালীদের নিকট সম্বন্ধ, কামাখ্যা বাঙ্গালীর তীর্থস্থান। তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং চেহারার সহিত বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরলোকগত দেবব্রীর

ওস্কণ বাম ফুকন, বর্দ্দোলী ও চৌধুরীরা যে বাঙ্গালী নয়, কেহ বলিতে পারিবে না। এই নাটকের ভাষাও কতকটা প্রাচীন বাংলার ন্যায়, অবশ্য সূত্রধারের কথাবার্ত্তা সংস্কৃতে। পারিজাতহরণের ভাষার সামান্য আভাস দিতেছি—

সত্যভামা—হে স্বামী হামার পারিজাত তরু তুহু দিতে সত্য কয় বোল।

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! পাপী নরকাসুরে দেবতা সবক জিনিয়ে সর্ব্বস্ব আনল। আশু তাদেক মারি দেবকার্য্য সাধো। পাছে পারিজাত আনো।

সত্যভামা—আঃ স্বামী! উচিত কহল। আশু দেবকার্য্য সাধি সেহি যাত্রায়ে পারিজাত আনহ। হামু তোহারি সঙ্গে চলবো।

মণিপুরে নাটক

মণিপুর অধিবাসীগণ অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া গৌরব করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাহার জন্ম। এখানকার হিন্দুরা বাঙ্গালীর ন্যায় খোল করতাল লইয়া অনেক সময়ে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও সঙ্গীত-প্রিয়।

ইঁহারা আপনাদের কন্যাদিগকে গৃহস্থালীকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গীতও শিক্ষা দিয়া থাকেন। গানগুলি সাধারণতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে রচিত। উহার ভাষা বাংলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও উহা ভাঙ্গা বাংলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের নৃত্যও খুব মনোরম। রাসলীলা উৎসবের সময়ে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। কুমারীগণ রেশমী পোষাক পরিহিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে এবং গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করে।

রবীন্দ্রনাথ এইসব নৃত্যের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে পণ্ডিত-প্রধান গ্রামাদিতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। বিক্রমপুরের রাজনগরের "রাজাবিজয়" নামক একখানি অপ্রকাশিত নাটক আজও ঢাকা মিউজিয়ামে আছে। এই সব অভিনয়ের বেশী নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না।

সাধারণের আমোদের জন্য যাত্রাই থিয়েটারের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তবে ইংরেজী শিক্ষার ফলে আবার সেই সম্পদ আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। প্রথমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের থিয়েটারই পুর্ণোদ্যমে চলিত। দর্শকের মধ্যে ইংরেজই বেশী আসিত। ধনী ও শিক্ষিত বাঙ্গালীও মাঝে মাঝে থাকিতেন। ক্রমে তাঁহাদের অনুকরণে ইংরেজীতে থিয়েটার চলে। এবং পরে পরিবর্ত্তনের ফলে বাংলায় থিয়েটার আরম্ভ হয়। প্রথমে ধনীরাই বন্ধুবান্ধবদের জন্য নিজ নিজ গৃহে থিয়েটার করিতেন। সাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে মধ্যবিত্ত যুবকগণের চেষ্টায় থিয়েটার চলিতে আরম্ভ হয়। এই মধ্যবিত্তগণের থিয়েটারও প্রথমে হয় এমেচিয়ার ভাবে এবং পরে তাহা সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। রঙ্গালয়ের এই ধারাবাহিক ইতিহাস ইংরেজী থিয়েটারের নিকট কম ঋণী নয়। তাই পূর্ব্বাপর ইতিহাস দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রথম অধ্যায়

ইংরেজী থিয়েটার

১। প্লে-হাউস্—

সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী থিয়েটারের নাম "প্লেহাউস্"—নথিপত্র হইতে ও নক্সা ইত্যাদিতে ধারণা হয় উহা লালবাজার ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান পুলিশ আফিসের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। ৮নং লালবাজার যে চৌতালা বাড়ীটী আছে, ঐ স্থানেই পূর্ব্বে থিয়েটার ছিল। আজকাল মিশন রোর নাম তখন ছিল "Rope walk"। এই রাস্তাতেই কাউন্সিলের মেম্বর ক্লেভারিং ও মন্‌সন্ আসিয়া পরে বাস করিয়াছিলেন। থিয়েটার বাড়ীটী ছিল এই মিশনরো রাস্তার পূর্ব্ব পারে। আজকাল মার্টিন কোম্পানীর বাড়ীটার কতকাংশও বোধ হয় থিয়েটার বাড়ীর অন্তর্গত ছিল। তখন ডেলহৌসীপার্ক (লালদিঘীর) পূর্ব্বপারে কোন বাড়ী বা রাস্তা ছিল না। তাই দিঘীর পূর্ব্বপারে ছিল থিয়েটার, পশ্চিম-উত্তর পাড়ে ছিল পুরাণ কেল্লা (old fort) বা পুরাতন দুর্গ।

এই থিয়েটারে ড্রেক হলওয়েল প্রভৃতির বিশেষ সংশ্রব ছিল। কিন্তু সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণে নাট্যশালাটিই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি ইহা অধিকার করিয়া এখান হইতেই পুরাতনকেল্লার দিকে লক্ষ

করিয়া তোপ ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতেই শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতা অধিকৃত হয়।

এই দুর্গের উত্তর দিকে ক্লাইভষ্ট্রীটের পারেই একটী গির্জ্জা ছিল। ইহারই নাম ছিল St. Aunne Church. কলিকাতা আক্রমণ কালে প্লে-হাউস হইতে ব্যবহৃত তোপে এই গির্জ্জাটীও ধ্বংস হয়। পুনরায় ইংরাজরা Play Houseটীকেই গির্জ্জায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এমন কি ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা এবিষয়ে সম্মতিও দিয়াছিলেন, ফলে তাহা কেন ঘটিয়া উঠে নাই বলা যায় না।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় Stanhope সাহেবের যখন শুভাগমন হয়, তখন এই থিয়েটারটীর কথা তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপরে ১৭৭৫-৭৬তে বর্ত্তমান রাইটরস্ বিল্ডিংসএর উত্তর দিকে "Calcutta Theatre" প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার নাম হয় New Play House এবং লালবাজারের থিয়েটারটীর নাম হয় Old Play House. এই পুরাতন বাটীতে একজন নীলাম বিক্রেতা (auctioneer) থাকিতেন, তাহার নাম ছিল Williamson. কোম্পানীর নীলামের ডাক এই সাহেবই করিত। অভিনয় কি নৃত্য এখানে আর হয় নাই।

Williamsonএর কিন্তু বাড়ীটীতে কোন স্বত্ব ছিল না। বাড়ীটী ছিল ডবিলসনের। তিনি Palk নামক এক ব্যক্তির কাছে মর্টগেজ দিয়াছিলেন। Palk উক্ত Williamsonকে ১৭৭৭ অব্দে থাকিতে দেন, কিন্তু পরে তাহাকে আর কিছুতেই উঠাইতে পারেন না। Palk তখন মোকর্দ্দমা করিতে বাধ্য হ'ন এবং আদালত হইতে Williamsonকে একেবারে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা হয় ১৭৮১। তারপরে বাড়ীটীকে ২।৩ বৎসর মধ্যেই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেকির বেঙ্গল গেজেট বাহির হয়, ইতিপূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রাদি না থাকায় Play Houseএর আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

২। কলিকাতা থিয়েটার (The Calcutta Theatre.) এইটী ইংরেজদের দ্বিতীয় নাট্যশালা। ১৭৭৫ সালের জুনমাসে (১লা) এই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ভূমির জন্য পাট্টা গ্রহণ করা হয়। ভূমির পরিমাণ ৫ বিঘা। পূর্ব্বে মিঃ আইয়ার (Ahyre) থাকিতেন। ১৭৫৬ সালে কলিকাতা অধিকার কালে তিনি নিহত হন।

রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৬ সালের শরৎকালে।

বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসএর পশ্চাদ্ভাগে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চাঁদা তুলিয়া এই টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। গবর্ণর জেনারেল, চিফ্ জাষ্টিস্ কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারকগণ সকলেই চাঁদা প্রদান করেন ও উৎসাহ দেন। অভিনেতাগণ ছিলেন সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়। তাঁহারা কোন প্রকার বেতনাদি বা অর্থ গ্রহণ করিতেন না। প্রবেশ মূল্য যাহা আদায় হইত তাহা রঙ্গালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সঞ্চয় করা হইত। এই থিয়েটারে শুধু পিট্ এবং বক্স ছিল। পিটের প্রবেশ মূল্য ৮৲ আট টাকা এবং বক্সের এক মোহর। এই থিয়েটারকে হৃদয়গ্রাহী করিতে ব্যয় বাহুল্যের ত্রুটি করা হয় নাই। রঙ্গমঞ্চকে ইংলণ্ডের থিয়েটারের প্রথায় পাদ-প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করা হইত।

লালবাজারের প্লে-হাউস হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য এই নাট্যশালার নামকরণ হইয়াছিল নিউ প্লে হাউস (New Play House). লালবাজারকে বলা হইত ওল্ড প্লে হাউস। এই রঙ্গালয়ের ভূমির পাট্টা চুয়াত্তর জন ব্যক্তির নামে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্, জেনারেল মনসন্, রিচার্ড বারওয়েল চীফ্ জাষ্টিস্ স্যার এলিজা ইম্পে প্রভৃতিও ছিলেন। ষ্টেনহোপ যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এই রঙ্গমঞ্চ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নিউ প্লে হাউস্ বা কলিকাতা থিয়েটার এত বিখ্যাত ছিল সে উহার পূর্ব্বদিকস্থ রাস্তার নাম থিয়েটার ষ্ট্রীট্ রাখা হইয়াছিল।

কলিকাতা থিয়েটার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা বিলুপ্ত হয় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে। এই থিয়েটারের স্থানে মেসার্স ফিন্‌লে মুয়র এণ্ড কোং (Messrs. Finlay Muir & Co.) তাহাদের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে হয় জেম্স্ ফিণ্ডিং এণ্ড কোং, বর্ত্তমানে তথায় ১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স গিণ্ডলে এণ্ড কোং লিমিটেড-এর ফার্ম্ম চলিতেছে।

[ক্রমশঃ

মনের বার্ধ

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যাক্, রাঁস্তোরার পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ ছেড়ে চলুন আমরা আবার আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। এগুব কি, যত নীচের দিকে নামি জমাট বাঁধা অন্ধকার ততই যেন আমাদের খেতে আসে! যাই হোক টর্চ্চ দিয়ে দেখে দেখে পিচ্ছল সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নামতে লাগলুম। চিৎপুর রোডের যেমন এক প্রান্তে আছে চিৎপুরের খাল, অপর প্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে সেই ধর্ম্মতলার চৌমাথায় আর সবটার নাম এক নয়, খানিকটা আপার, খানিকটা লোয়ার চিৎপুর রোড, খানিকটা আবার বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। কোথাও সরু কোথাও মোটা হ'য়ে এঁকে বেঁকে চলেছে! এই সুড়ঙ্গ পথটাও তেম্নি—এর এক প্রান্ত আছে জিবের তলায়, অপর প্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে সেই গুহ্যদ্বারে, এবং সবটার নাম এক নয়। প্রারম্ভে মুখটার কাছে এর নাম pharynx, পরবর্ত্তী ন' ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার নাম gullet (গালেট), aesophagus (ইসোফেগাস্) বা টাক্‌রা। ক্রমে যত নীচের দিকে নেমে যাব, এমন তর সব নূতন নামের নূতন নূতন অনেক জায়গা দেখতে পাব। এক রকম লোক আছে, বড় পিটপিটে, তারা কারো গায়ের বাতাস সইতে পারে না, এই টাক্‌রাটা ও ঠিক তাই, উপর থেকে যাই কিছু ওর গায়ে গিয়ে ঠেকুক, সে খাবারই হোক, জলই হোক, মুহূর্ত্তেক ও তাকে সয় না, কোঁৎ ক'রে চেপে নীচের দিকে দেয় ঠেলে, এমনি ঠেলতে উপর ভাগটা সঙ্গে সঙ্গে থাকে সরু হ'তে, কাজেই ভোজ্যপেয়-দের উপরের দিকে ফিরে আসবার আর কোন উপায়ই থাকে না, নীচের দিকে তাদের নেবে যেতেই হয়। আমাদেরও সেই দশাই হ'ল, দু'টো প্রাণী আমরা, একটু ক'রে এগুচ্ছি, আর একটা ক'রে চাপ খাচ্ছি, এমনি ক'রে ন'ইঞ্চি জায়গায় ন'টা চাপ খেয়ে হড়্ হড়্ ক'রে তলার দিকে নেমে গেলুম। যেখানে গিয়ে ঠেকলুম, সে একটা দোর—তাকে বলে Stomach-door (ষ্টমাক-ডোর) বা Cardiac orific (কার্ডিয়াক্ অরিফিস্)। এই দোর দিয়ে খাদ্য পানীয়েরা stomach (ষ্টমাক্) বা পেট গিয়ে ঢোকে। আমরাও তাই গিয়ে ঢুকলুম। একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! কাশীর বাঙ্গালীটোলার ঘিঞ্জি পেরিয়ে দশাশ্বমেধের ঘাটের খোলা জায়গাটীতে এসে যেন পৌঁছিলুম! মনে কল্লুম এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে আবার নবদিগ্বিজয়ে বেরুব। কিন্তু তার কি জো আছে? সভয়ে দেখি, ওটার ভিতর চলেছে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির অবিশ্রাম টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগবগ টগবগ, মাঝে মাঝে পাহাড়ি নদীর ঘূর্ণিপাক! নৌকাডুবি হ'য়ে অন্ধকারে ঝড়ের নদীতে প'ড়ে মানুষ যেমন গাছের শেকড় বা এম্নি একটা কিছু আঁকড়ে ধ'রে কোন মতে থাকে, আমরাও তেম্নি পেটের দেয়ালের কোন একটা মাংসপেশী খাম্‌চে ধ'রে কোন রকমে ঝুলে থেকে দেখতে লাগলুম, খাবারগুলোর অবস্থা। মশায়, বলব কি সমুদ্র মন্থনের কথা পুরাণে পড়েছিলাম, পেটের ভিতর যেন সেই রকম একটা ব্যাপার চলেছে! ভাত, মাছ, তরিতরকারি দাঁতের চিবুনি খেয়েও খানিক আস্ত আস্তই যারা এসে ঢুকেছিল, দেখতে দেখতে তারা মিলে মিশে একাকার হ'য়ে হয়ে গেল খানিকটা food-paste (ফুডপেষ্ট) chyme (কাম্) বা কাই! তখন আর কার বাবার সাধ্যি চেনে যে তারা অতগুলো জিনিষের সংমিশ্রণ! আশ্চর্য্য হ'য়ে এই সব ব্যাপার দেখছি, ওমা, এরি ভিতর দেখি তারা চল্ল সেই কাইয়েরা, পেটের ডানদিক বেয়ে আর একটা দোর পেরিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চল্লুম, কোন রকমে পেট-সমুদ্দুরের ঘূর্ণিপাক পেরিয়ে! ঢোকবার পথে যে ফটকটা পেরিয়ে ঢুকেছিলাম, তাকে যেমন বলে কার্ডিয়াক্ অরিফিস, বেরুবার পথের এই ফটকটাকে তেম্নি বলে pylorus (পাইলোরাস)! এই দুটোতে আছে বেশ একটু তফাৎ! প্রথমটা যেন আফিস ফটকের দর্শনদারী দরোয়ান, বসতে হয় তাই বসে আছে। কারা ঢুকছে চেয়েও দেখছে না। দ্বিতীয়টা যেন সদা সজাগ সতর্ক জেলখানার প্রহরী! বিনা পাশে মাছিটি অবধি বেরুবার জো নেই। দাঁত যার নেই কুমীরের মত সে গিলে গিলে খাক, আফিসের যার তাড়া, সে দুই দুই চিবনে এক একটা গ্রাস গিলে ফেলুক, কার্ডিয়াক্ অরিফিস্ কিছুই বলবে না, স্বচ্ছন্দে পথ ছেড়ে

দেবে। কিন্তু ওগুলো পেটে গিয়ে সৃষ্টি করবে নানা অশান্তির! তিন চাকরের কাজ এক চাকরকে কর্ত্তে হ'লে সে যেমন করে; পেটও তেমনি চটে গিয়ে গজর গজর কর্ত্তে থাকবে, বলবে দাঁতের, কাজ দাঁত করবে না, মুখের লালার কাজ লালারা করবে না, আমি বুঝি একলা সব করব? থাক্ গিয়ে সব প'ড়ে, আমি কিছু কর্ত্তে পারব না। ফলে, হয় পেট ব্যথা, পেট ভার, ঢেকুর, অম্বল, অক্ষুধা। পাইলোরাস কিন্তু তা নয়, সে একটা জোয়ানস্প্যানিয়ার্ডের মত বসে আছে ওঁৎ পেতে! ঠিক দেখছে কে বা কারা বেরিয়ে যাচ্ছে? পেটের কাজ যদি পেট ষোল আনা না করে থাকে, কাইগুলো যদি বেশ খুটখাট মুক্ত মোলায়েম মসৃণ না হয়ে থাকে, বিনা ওজর আপত্তিতে বিনা ঘেউ ঘেউতে সে তাদেরকে কিছুতেই বেরুতে দেয় না, কাজেই ওগুলোকে আবার ফিরে যেতে হয় সেই পেটে! Head-Examiner-এর হাত থেকে এক রাশ কাগজ Re-examine করবার হুমকি নিয়ে ফিরে এলে নব্য পরীক্ষকের যে অবস্থা, কিছু বলবারও উপায় নেই, সইবারও জো নেই, খালি মনে মনে গজ গজ, গজর গজর! পেটেরও শুধু ভিতরে ভিতরে বড় বড়, বড়র বড়র! যাক্, আমরা ইংরেজ রাজত্বের প্রজা, ঘোত ঘাত অনেক রকম শিখেছি, কাজেই তাদের সঙ্গে কাইদের মত মোলায়েম মসৃণ হ'য়ে না গেলেও 'পাইলোরাস' পেরিয়ে যেতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। পেরিয়ে গিয়ে এবার যেখানে পড়লুম, সেও আবার আগেকার মত বিশ্রী একটা সরু পাইপ! তবে একটু লম্বা আছে এই যা, কেন না, গালেটটা লম্বা মোটে ৯ ইঞ্চি, এটা লম্বা ১২ ইঞ্চি। এটার দরবারি নাম duodenum (ডিওডেনাম্) আট পৌরে নাম "বারো ইঞ্চি পাইপ"। এটার ভিতরে ঢুকে সঙ্গী তো ভয়ানক বেজার! বলে, একি? ছি ছি ছি, এমন বিপদে তো কখনও পড়ি নি? বল্লুম, "কি হ'ল?" "দেখুন না কাপড় চোপড়গুলো রংএ রংময় হয়ে গেল?" দেখি সত্যি সত্যিই তাই, কাইগুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেই এসে ভিতরে ঢোকা, কোত্থেকে কতকগুলো নীল সবুজ রং ফোঁচ ফাঁচ ক'রে গাময় ছড়িয়ে পড়া! বলে কি অদ্ভুত? এখানেও হোলীখেলা! কিন্তু এটা যে ভাদ্রমাস? ভাদ্রমাসে দোল? কি জানি বাবা, বিদ্‌ঘুটে দেশের বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড। কিন্তু রংটা দিলে কে? পিচ্‌কারীও দেখছি নে, মানুষেরও সাড়াশব্দ পাচ্ছি নে? খালি ফোঁচ আর ফোঁচ? টর্চ্চের আলোতে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লুম, "পিচ্‌কারী নেই বটে ঠিক পিচ্‌কারীর মুখের মত এই দেখ দুটো মুখ পাইপটার ভিতরে হা করে আছে এবং তাই দিয়েই পাইপের বাইরে উদরগহ্বরে বসে কে বা কারা এই রং ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার্চ্ছে? তবে ওরা সত্যকারের রং নয় দুটো দু'রকমের digestivejuice (ডাইজেষ্টিভ জুস) বা পাচক রস। নীলটাকে বলে bile (বাইল) বা পিত্ত, সবুজটাকে pancreatic juice (প্যানক্রিয়েটিক্‌জুস্) বা প্যানক্রিয়ার রস। প্রথমটা আসে liver (লিভার) থেকে, দ্বিতীয়টা আসে sweetbread (সুইট্‌ব্রেড) বা pancreas (প্যানক্রিয়া রস) থেকে। হজমের জন্যে এদের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। এ দু'টো রস যদি এম্নি করে কাইগুলোর সঙ্গে এসে না মিশতো তারা নিঃশেষে হজম হয়ে গিয়ে রক্ত মাংসে পরিবর্ত্তিত হয়ে দেহকে পুষ্ট-বলিষ্ট ও কর্ম্মঠ করে তুলতে পারত না—ঐ ভাবেই বরাবর নেবে গিয়ে আন্‌ডিজেষ্টেড অবস্থায় বাহের সঙ্গে পড়ে যেতো—তুমি দুর্ব্বল, অসাড়, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়তে। এই জন্যেই লিভারের এবং প্যানক্রিয়ার এতো গৌরব এবং এ দুটো যন্ত্রকে সুস্থ রাখবার জন্যে ডাক্তারেরা এত ব্যস্ত। এইবার শোন লিভার কি এবং প্যানক্রিয়াস কি! লিভারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ—প্যানক্রিয়ার নাম খুব সম্ভব শোন নি।

লিভার এক আশ্চর্য্য যন্ত্র। এটা আছে ডান উপরপেটের মধ্য থেকে কাঁকালের প্রায় সবটা জুড়ে। কাজেই আকারেও সাধারণতঃ যা মনে করা হয় তা নয়, বেশ বড়। তুমি ত পূর্ণবয়স্ক, তোমার লিভারটা ওজনে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট আউন্স হবে।

ছাল ছাড়ান পাঁঠাগুলো দোকানে ঝুলতে থাকে দেখেছ তো? দুই অসমান ভাগে বিভক্ত আরক্ত ধূসর রংএর সেই যে মেটুলিটা দলদল কর্ত্তে থাকে, তাও তো লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই। বাঙ্গালার কোন কোন উপভাষায় এটাকে আবার 'কালিবুক' বলে। এই মেটুলি বা কালিবুকই লিভার। মানুষের লিভারও ঠিক ঐ রকমেরই, তবে আকারে হয় তো আর একটু বড়। কিন্তু একথা এখন থাক—প্যানক্রিয়াসের

কথাটা একটু বলে নি—নাড়িভুঁড়ির কথার সঙ্গে এ কথাটা আর একটু ফলাও করে বলা যাবে।

প্যানক্রিয়াস যন্ত্রটাও কম আশ্চর্য্য নয়, সেটা আছে পেটের মাঝামাঝি এ কাঁকাল থেকে সে কাঁকাল অবধি লম্বাভাবে। ছুরি কাঁচি যেমন দরকার দিনের প্রায় সারাক্ষণ সকল কাজে, ঢাল তলোয়ার কদাচিৎ কখনও কিন্তু যখন দরকার পড়ে, না পেলে বিপদের আর অন্ত থাকে না, লিভার ও প্যানক্রিয়াসের কাজটাও অনেকটা সেই রকমের। লিভার যেন ছুরি কাঁচি আর প্যানক্রিয়াস্ ঢাল তলোয়ার।

লিভার অবশ্য সামান্য রকম বিগড়োয় তো সহজেই তোমার একটা ভয়ানক অসুখ কিছু করবে না—হবে অম্বল, হবে অরুচি, হবে কাঁকালের তলায় অল্পবিস্তর ব্যথা, তবে ভয়ানক রকম বিকল হলে সে ভয়ানক কথাই বটে। কিন্তু প্যানক্রিয়াস যদি খানিকটাও বিগড়োয় তোমার পেচ্ছাবে দেখা দেবে সুগার, অসাবধান ডাক্তার চীৎকার করে বলবে, হয়েছে diabetis (ডাইবিটিস) বা বহুমূত্র।

আচ্ছা, এই যে প্যানক্রিয়েটিকজুস্ নামে elixin বা অমৃত রস যা বার ইঞ্চি পাইপে গিয়ে খাদ্য বা তার কাইদের সঙ্গে মেশে বলে ডিয়াবিটিস হতে পায় না। প্যানক্রিয়াস্ এ জিনিষ পায় কোথায়?

পায় না—এ জিনিষ তার নিজের কারখানায় নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। তৈরির material বা মসলা থাকে রক্তের কোন এক বিশেষ উপাদানে—এই উপাদানও নেয় রক্ত থেকে টেনে, তারপর তাই দিয়ে নিজের মনে বসে বসে এই অমৃত রসটী তৈরী করে, আর দরকার মত ঢেলে ঢেলে দেয়, ডিয়াবিটিসের মত অত বড়ো শক্ত রোগ থেকে তোমাকে রক্ষা করে। কত বড়ো উপকারী বন্ধু বল দেখি? অথচ তুমি একে চেন না! একটু রং কাপড়ে লেগেছে ব'লে রেগে খুন হও। যশ ভাগ্যটাও এক বড় ভাগ্য। লিভারের সে ভাগ্যটা খুব বেশী! অবশ্য আমি বলছি না সে কিছু করে না, কিন্তু লিভারের নামে বাজার সরগরম, আর এই প্যানক্রিয়াস বেচারীর নামও কেউ জানে না। তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি কৃতজ্ঞ চিত্তে অন্ততঃ এই নামটী স্মরণ রাখবে, "প্যানক্রিয়াস"।

যাক্ রং চং মেখে ভূত সেজে চল্লুম কাইদের সঙ্গে বার ইঞ্চি পাইপ ছেড়ে আরো এগিয়ে। এবার আর গেট কেট কিছু নেই, অনায়াসে চলে যেতে পারলুম। যেখানে গিয়ে ঢুকলুম এও ঐ বার ইঞ্চি পাইপেরই কণ্টিনিউয়েসন—তবে আকারে আরো সরু. কিন্তু লম্বা ঢের বেশী—প্রায় কুড়ি ফুট হবে—এটার নাম small intestine (স্মল ইন্টেষ্টিন্) বা ছোট অন্ত্র। কুড়ি ফুট লম্বা একটা সাপ যদি কুণ্ডলী না পাকিয়ে টান টান হ'য়ে শুয়ে থাকে জায়গা জোড়ে সে অনেকটা। কুড়ি ফুট লম্বা এই অন্ত্রটাও যদি খানিকটা ভাজে ভাজে খানিকটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পেটের ঐ ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে নিজেকে সঙ্কুলান ক'রে নিতে না পারতো—মানুষের পেটটা হতো লম্বা কুড়ি ফুট! লম্বোদর নামটা সার্থক হতো, এখন যাদের আমরা লম্বোদর বলি সত্যি কথায় তারা তো লম্বোদর নন—"চওড়োদর!"

এটায় এসে ঢুকতেই সঙ্গী ভারি খুশী, কেন না শাদা একরকম জলীয় পদার্থ অসংখ্য gland (গ্ল্যাণ্ড) বা গাঁট থেকে ফোয়ারার মত চুঁয়ে উঠে আমাদের রং চং গুলো নিঃশেষে ধুয়ে পরিস্কার করে দিলে। তখন সে সানন্দ বিস্ময়ে বল্লে, দেখুন স্যার, যে কাইদের সঙ্গে এতটা পথ এক সঙ্গে এসে এতো দহরম মহরম হলো, এখন আর তাদের চিহ্নও পায়া যায় না, বার ইঞ্চি পাইপে নীল সবুজ রং মেখেই ওদের অনেকটা ভোল ফিরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখানকার এই গাঁটগুলোর শাদা রসে আছে এমন যাদু যে দেখতে দেখতে ওদের একেবারে বদলে দিলে? এখন ওরা যে কোন তরল জিনিষের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারে! এরা যে মুখে এবং খানিকটা পেটেও হরেক রকমের আস্ত আস্ত খাদ্যাংশ ছিল কে বলবে? এই ঐন্দ্রজালিক শাদা রংটার নাম কি স্যার?" বল্লুম এটার নাম intestinaljuice (ইন্‌টেষ্টিনালজুস্) বা আন্ত্রিক রস।

এই সব কথা হচ্ছে এরি ভিতর সঙ্গী ভয়চকিত সুরে আবার বল্লে, "দেখুন দেখুন অজগরের মত কুণ্ডলী পাকান নলটার ভাজে ভাজে জোঁকের মত সরু সরু কি কতকগুলো কিল বিল কর্চ্ছে? ইস্! কত, অগুন্তি! কি রকম মুখ নেড়ে নেড়ে আসছে। জোক! নিশ্চয়ই জোক! পচা পুকুরের জলের মত জ্যান্ত মানুষের পেটের ভেতরে লাখ লাখ জোক? আমাদের নাকে মুখে চোখে ঢুকে যাবে না

তো ?" আশ্বাস দিয়ে বল্লুম, "না ভয় নেই, ওগুলো জোঁক নয়, ওদের বলে Villi (ভিলি) বা মাংস-কেশ !"

"মুখ দিয়ে দিয়ে ওরা ওকি তুলে তুলে নিচ্ছে স্তার ?"

"খাদ্যের সার অংশ,—অম্নি ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে রক্তের নাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছে ! ঐ দেখ, প্রত্যেক ভিলিতে একটা ক'রে কোনটায় বা দুটো ক'রে শাদা, এবং অনেকগুলো লাল রেখা, দুধ ঘি মাখন .জাতীয় খাদ্যের সার ভাগ ভিলিরা ঐ শাদা রেখায় বা সূক্ষ্ম নলে, এবং অন্যান্য জিনিষের সারভাগ ঐ লাল রেখায় বা সূক্ষ্ম রক্তের নাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছে ! যেহেতু ঐ শাদা রেখাগুলো দিয়ে শুধু দুগ্ধ জাতীয় জিনিষই যায় সেই জন্যে ওদের নাম lacteal (ল্যাকটিল্) বা milk. tube (মিল্ক্ টিউব্) কি না দুধের নল । লাল রেখাগুলোয় থাকে রক্ত, তাই ওদের নাম Capilaries (ক্যাপিলারিস) কি না সূক্ষ্ম রক্তের নাড়ী ।

শরীর রক্ষার দু'টী প্রধান উপাদান রস ও রক্ত । Heart বা হৃদ্‌যন্ত্রের কথা যখন হবে তখন দেখবে Heart একটা pumping machine. ও পাম্প ক'রে সারা দেহে এই রস রক্ত চালিয়ে দেয়—পাম্পের টানে যেখান থেকে যায়, আবার তারা সেখানেই ফিরে আসে । যাবার সময় রস-রক্ত মিলে মিশেই যায়—অনেক দূর গিয়ে তবে তারা আলাদা হয়, ফেরবার সময় আবার দু'জনে মিলে এক হয়ে ফিরে আসে ।

Small intestine বা ছোট অন্ত্রের ভেতরকার এই যে দুধের নল এবং রক্তের নাড়ী—এদেরও ঐ একই কথা, খানিকটা পথ আলাদা গিয়ে শেষে দু'জনে এক হয়েই হার্টে গিয়ে ঢোকে ।

দুগ্ধনলের পথ বেয়ে দুধ বা মাখন জাতীয় খাদ্যের সার ভাগেরা চল্ল সে পথে, তার দরকার উপস্থিত আমাদের নেই, কাজেই সে কথা এখন থাক । রক্ত নাড়ীর পথ ধরে এই পথ ধরে এই নূতন তেজিয়ান রক্তেরা চল্ল যে পথে সে Red Roadটা চিনে না রাখলে কোন মতেই আমাদের চলবে না, কাজেই সে কথাটাই এখন বলি ।

লিভারের কথা বলতে বলতে মাঝ পথে থেমে গেছলুম, এবার আবার নূতন ক'রে সে কথা পারলুম—সার্কাস্ খেলোয়ারেরা টাটকা বন থেকে ধরা বাঘ নিয়ে খেলা দেখায় না, কিছু দিন খেতে না দিয়ে রসটা খানিকটা মজিয়ে নিয়ে তবে তাকে পাবলিকের সম্মুখে বার করে । প্রকৃতিও তেম্নি সদ্য শাণ দেয়া ক্ষুরের মত খাদ্যের সারাংশেভরা over rich বা অতিরিক্ত তেজিয়ান রক্তদের দেহে চালিয়ে দিতে চান না, কেন না তাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা । তাই কোন একটা যন্ত্রে ফেলে ধারটা কিছুটা মেরে নিয়ে, তবে তাদের ব্যবহারে লাগান । লিভার সেই ধার মারবার যন্ত্র । কাজেই এই নূতন রক্তেরা এখান থেকে ক্রমবর্দ্ধমান নাড়ী বেয়ে ঢুকল গিয়ে লিভারে, সেখানে লিভার তাদের কিছুটা সারাংশ রেখে ধারটা কিছুটা মেরে দিলে, বেরিয়ে গেল তারা লিভার ছেড়ে আর একটা নাড়ী বেয়ে আপন গন্তব্য পথে হার্টের দিকে ।

বার ইঞ্চি পাইপের প্রসঙ্গে দেখেছি লিভার থেকে কেমন করে পিত্তরস এসে তাতে পড়ে । এই পিত্তরস লিভার পায় কোথায় ? কোথায় পাবে ? পেয়ে আবার কে কবে বড়ো কাজ কর্ত্তে পেরেছিল ? বলে—"ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ।" পায় না, নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়, এই যে রক্তের অংশ বিশেষ রেখে দিলে তাই থেকে । এই অংশটা যদি লিভার রেখে না দেয়, এই over rich বা অতিরিক্ত তেজী রক্তটা শরীরে ছেয়ে গেলে মানুষের কঠিন কঠিন অসুখ হয়, তার মধ্যে jaundice (জণ্ডিস্) বা ন্যাবা প্রধান । তা'হলে দেখা গেল লিভারের দুটো কাজ, প্রথমটা—তেজের আতিশয্য কমিয়ে দিয়ে রক্তকে যথাযোগ্য করে দেয়া ।

দ্বিতীয়টা পিত্তি তৈরি করে তাই দিয়ে হজমের সাহায্য করা । দুঃখের বিষয় প্যান্‌ক্রিয়াসের নাম যেমন তুমি জানতে না, লিভারের এই প্রথম কাজের কথাটাও তেমনি নিশ্চয়ই শোন নি । লিভার যদি একটা যন্ত্র না হয়ে, হতো একটা লোক, বলতুম লোকটী বেশ ফিট ফাট । পিত্তিটা তৈরি করে নিয়ে কোথা রাখব কোথায় রাখব করে যেখানে সেখানে ফেলে রাখে না—এবং কাজের সময় না পেলে চীৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় করে না । বেশ একটী চামড়ার থ'লে তৈরি ক'রে নিয়েছে, পিত্তিটা বানিয়েই তাতে ভ'রে রেখে দেয়—দরকার মত তাই থেকে বার ইঞ্চি পাইপে গিয়ে পড়ে ব্যস । এই থলের নাম gall-bladder (গল ব্লাডার) বা পিত্তস্থলী ! এতে প্রত্যহ প্রায় দু'পাঁট পিত্ত জমা হয় । অতিরিক্ত মাংস খাবার দরুণ এই পিত্তস্থলীতে

পিত্ত জমে পাথরের ছোট ছোট নুড়ির মত হ'য়ে গিয়ে gall-stone (গেলষ্টোন নামে) কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই মাংসটা একটু রয়ে সয়ে খেলে ভাল হয়।

এইসব কথার ভিতরে হঠাৎ চেয়ে দেখি যেখানে আমরা ছিলুম সেখানে আর নেই,—ধাক্কা খেতে খেতে স্মল ইন্টেষ্টিন বা ছোট অন্ত্রের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। কাইরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তবে পরিমাণে তারা অনেক কমে গেছে,—কেন না সার ভাগের অনেকটা যে তাদের ইতিপূর্ব্বেই রক্তেরা নিয়ে নিয়েছে।

এঁকে বেঁকে আসতে আসতে পেটের ডানপাশে কুচকীর একটু উপরে, অপেক্ষাকৃত একটু মোটা অন্য একটা পাইপে এসে ঢুকলুম। পাইপ টা এখান থেকে বরাবর উপরের দিকে ডান কাঁকাল অবধি উঠে গেছে। ঐ বেয়ে উঠ্‌ছি এমনি সময় হঠাৎ ছোট নল থেকে বড় নলে ঢোক্‌বার ঠিক জংসনের মুখে ছোট্ট সরু একটা কেচোর মত জিনিষে হাত ঠেকিয়ে সঙ্গী বলে উঠলো, "দেখুন তো স্যার এটা কি ঝুলছে?"

বল্লুম, "এটা Appendix (এপেনডিক্স)। বিশেষজ্ঞরা বলেন—বহু যুগ আগে এখানে কি একটা যন্ত্র না কি মানুষের ছিল, কালক্রমে লোপ পেয়ে গেছে—ঐ টুকুন মাত্র অবশিষ্ট থেকে তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

"ও দিয়ে কি হয়?"

"ভাল হয় না কিছুই অথচ মন্দ হয় যথেষ্ট, এই যে পথে আমরা উঠ্‌ছি—বাদ বাকী কাইগুলোওতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে—ওর একটু আধটু যদি ঐ সুড়সুড়ির ভিতর একবার ঢুকে গেল তো ব্যস্‌ আর দেখতে হবে না—হলো এক ভয়ানক অসুখ, যার নাম শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে।"

"সে কি? কি নাম স্যার?"

."Appendicitis" (এপেনডিসাইটিস)।

"ইস্‌! এরি নাম এপেনডিসাইটিস?"

"হ্যাঁ—আচ্ছা শোন এক কাজ করা যাক্‌—ভদ্রলোককে এত কষ্ট দিয়ে—ভিতরে যখন এসেছি—একটা উপকারও ক'রে যাই"—এই বলে ছুরিটা বার ক'রে কচ্‌ ক'রে এপেনডিক্সটা কেটে দিলুম।

সঙ্গী বল্লে, "কি কল্লেন?"

বল্লুম, "ঠিক বল্লুম ওর যখন কোন দরকার নেই—অথচ ও থেকে বিপদের সম্ভাবনা ঢের, ও কেটে বাদ দেয়াই ঠিক। পেট কাটতে না হলে প্রত্যেক মানুষটারই এম্নি করে বাদ দিয়ে নেয়া যেতো কিন্তু তা সম্ভব না হলে ত কোন কারণেই যা দেবই abdomal operation বা উদরচ্ছেদ দরকার হয়ে পড়ে। সুবিজ্ঞ Surgeonরা আসল কাজের সঙ্গে,—এই আপদ দূর করে দিয়ে patient এর একটা অতিরিক্ত উপকার করে দিয়ে থাকেন।

এই বলতে বলতেই আমরা উপরের দিকে উঠে যেতে লাগলুম—যে চওড়া পাইপ বেয়ে উঠলুম নাম তারও দু'টো। রাশ নাম—large intestine (লার্জ ইন্টেষ্টিন্‌) বা বড় অন্ত্র, ডাক নাম colon (কোলন) বেশ ছোট্ট নামটী না? যেমন মণ্ডন—নটন—গর্ডন এই সব। এম্নি কাঁকাল অবধি উঠলুম। এই উঠন্ত অংশের নাম ascending colon (এসেণ্ডিং কোলন) তারপর এ কাঁকাল থেকে যে কাঁকাল অবধি আড়া আড়ি ভাবে যেতে লাগলুম। এই আর ভাগের নাম transverse (ট্রান্সভার্স) colon। তারপর বা কাঁকাল থেকে হড়্‌ হড়্‌ করে নীচের দিকে পড়ে যেতে লাগলুম এই ভাগটার নাম descending (ডিসেণ্ডিং) colon. এই ডিসেণ্ডিং কোলনের শেষের খানিকটা জায়গায় নাম rectum (রেক্‌টাম্‌) এটা গুহ্যদ্বারে গিয়ে শেষ হয়েছে। Small intestine খাদ্যের সার ভাগ সবটা তুলে নিতে পারে নি, যেটুকুন অবশিষ্ট ছিল এই কোলন বা large intestine সেটা নিঃশেষে টেনে নিলে, এখন বাকী রইল waste (ওয়েষ্ট) বা আবর্জ্জনা, এই আবর্জ্জনাটাই গুহ্যদ্বার পথে বেরিয়ে আসে। আমাদের দু'জনকারও বেরুতে হল এই পথেই—কি কষ্টে বুঝতেই পার্চ্ছেন; তবে তার জন্যে অনুশোচনা নেই আছে আনন্দই কেন না জ্ঞান অমূল্য সম্পদ, সন্ধান পেলে দুর্গন্ধ নরকে ডুব দিয়েও তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে বৈ কি [ক্রমশঃ

আলোচনা

মনুচী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল

"রাজসিংহের ভূমিকা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ

বঙ্গশ্রীর শ্রাবণ সংখ্যার ২৮১ পৃষ্ঠায় দেখিলাম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"মনুচী যে এদেশে অনেক দিন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাজাহানের জীবিতাবস্থায়েই সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে যখন বিবাদ সুরু হয়, তখন তিনি আগ্রায় আসিয়া দারার অধীনে বারুদখানার কাজ গ্রহণ করেন। তিনি দারার প্রধান artillery man হইয়াছিলেন। মনুচী দারার গুণে ও মধুর ব্যবহারে এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে, দারার দুরদৃষ্টের পরে অনুরুদ্ধ হইয়াও ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই।"

জীবনচরিত লেখক হিসাবে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবু বাংলা-সাহিত্যে সুনাম পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি মনুচীর এমন অপরূপ জীবনেতিহাস কোথায় পাইলেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

মনুচীর নিজ লিখিত কোনও ইতিহাস অদ্যাপিও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। মনুচী ভারতে থাকিতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উহার এক স্মৃতিলিপি নিজে সঙ্গে লইয়া যান। ঘটনাচক্রে পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত এই স্মৃতিলিপিগুলি ডালাওস্ নামক ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তে পড়ে। ডালাওস্ উহা জেসুইট পাদ্রী ফাদার কত্রূ:কে দেখাইলে পাদ্রী বাবাজী এই সন্দর্ভগুলিতে নিজ সম্প্রদায়ের অনেক প্রশংসা আছে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক উহার অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু এই করুণা বিতরণের সময় মনুচীর স্মৃতিলিপি নিতান্ত প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও উহার এমন পরিবর্ত্তন ও অংশ বিশেষের পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন যে আজ কতখানি মনুচীর আর কতটা বাবাজীর নিজ সংগ্রহ তাহা বুঝার কোনও উপায় নাই। তাহা হইলেও এই তথাকথিত অনুবাদ মনুচীর নিজ জীবিতকালেই প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে মনুচীর যে জীবনেতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না। ফাদার কত্রূর ফরাসী গ্রন্থ ১৭০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭০৯ সালেই লণ্ডনের লাডগেট ষ্ট্রীটের জোনাব বাউআর (Jonab Bowyer) উহার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফাদার কত্রূ্র গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে উহার যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয় তাহাতে এই গ্রন্থকে—

—Extracted from the memiors of M. Manouchi, Avenetian, and Chief Physician to Ourangzeb for above forty years—

চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধতন কাল ঔরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক ভিনিস দেশীয় মনুচীর স্মৃতিলিপি হইতে সংগৃহীত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনুচীর লেখার প্রামাণ্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ফাদার কত্রূ গ্রন্থের নিজ লিখিত ভূমিকায়ও স্থানে স্থানে মনুচীর জীবনেতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভূমিকায় একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"I knew withal that Monsieur Manouchi had not made only some slight excursions in the Dominions of the Mogol. He is none of those Traders of Europe, whom business obliges either to pass in hast (haste) thro (through) some Provinces of the Indies, or reside in a Seaport Town at a great distance from the Capital. He's a Physician whom his profession has obliged to reside for a long time in the Emperor's Family. As he has liv'd forty years at Court, and by his profession has had a free admittance into the seraglio, a

favor refused to most Travellers, it should not be thought strange that he has come at the best memoirs; and had the perusal of the authentic chronicle of the Empire.

(Bangabasi, reprint)

—আমি প্রকৃতপক্ষে জানিতাম মঃ মনুচী মোগলের রাজ্যে মাত্র সামান্ত রকমের ঘোরা ফেরাই করেন নাই। যে সমস্ত ইউরোপীয়কে ব্যবসা উপলক্ষে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইত বা রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনও সহরে বাস করিতে হইত, তিনি তাহাদের মত ছিলেন না। তিনি একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহাকে নিজ ব্যবসায়ের জন্ত বহুকাল (মোগল) সম্রাটের পরিবারে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি চল্লিশ বৎসর রাজসভায় বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যবসাব্যপদেশে রাজঅন্তঃপুর অবধি প্রবেশ করিতে পাইয়াছিলেন, এই অধিকার অধিকাংশ ভ্রমণকারীকেই দেওয়া হয় না সুতরাং তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতি সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সঙ্কলন দেখিতে পাইবেন ইহাতে বিচিত্রতা কি ?

সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সম্বন্ধে লেখক বলেন —

"As to the two last Reigns, it must be allowed that no one was better qualified to give a just relation of them than M. Manouchi. He came into the Indies in the life-time of Cha-Jahan ; he followed the Fortune and person of Dara, eldest son to the Emperor ; he was present at all the Battles which in the issue deprived this unfortunate Prince of his Throne and Life."

(Bangabashi Edition)

শেষ দুইটী রাজত্ব সম্বন্ধে একথা বলিতেই হইবে, মঃ মনুচী হইতে উহার বর্ণনা দেওয়ার উৎকৃষ্টতর লোক কেহ ছিলেন না। তিনি সাজাহানের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে আইসেন এবং সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার সঙ্গে থাকিতেন এবং দারার ভাগ্যের সহিত তাঁহার নিজ ভাগ্যেরও উত্থান-পতন হইয়াছিল। যে সমস্ত যুদ্ধে হতভাগ্য দারা তাঁহার জীবন ও সিংহাসন হারাইয়াছিলেন তাহার সমস্তগুলিতেই মনুচী উপস্থিত ছিলেন।"

নিজ প্রচারিত গ্রন্থের শেষভাগে পাদ্রীকাত্রু মনুচী সংগৃহীত মোগলদরবার, সেনাবল, অর্থসম্পদ ইত্যাদির এক বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণের মধ্যে মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরের এক বিচিত্র চিত্র সমাবেশিত রহিয়াছে। এই চিত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন—

"He (M. Manouchi) has seen he says, he has examined into the truth of all he delivers. He had lived among the Mogols eight and forty years at the time of writing his memoirs which was in 1697. He had travelled almost through all the Provinces of that vast Empire. He was in a very honourable post, whereby he might certainly with more ease than the common Travellers of Europe come to the knowledge of the mysteries of the Serglio which were carefully conceal'd from the eyes of the Publick.

"তিনি (মনুচী) বলেন তিনি যাহা লিখিতেছেন তাহার সমস্তই হয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন নয় ত বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। মনুচী তাহার স্মৃতি লেখার সময় অর্থাৎ ১৬৯৭ সালে ৪৮ বৎসর মোগলদিগের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক অতি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তজ্জন্তই তিনি সাধারণ ভ্রমণকারী হইতে সহজে মোগলের শুদ্ধান্তঃপুরের গোপন তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছিলেন।

গোলন্দাজ সর্দ্দারের পদ কি এমনই সম্মানিত ?

তারপর আবার গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"The Inner Court of the Mahal is a Region of mystery where never any except the eunachs, are permitted to enter. We may venture to say that none of our travellers have hitherto given a just description of it. A man must belong to the same profession with M. Manouchi and have at

Court all the credit of an old Physician to be admitted into the Seraglio.

—প্রসাদের শুদ্ধান্তঃপুর নিতান্ত রহস্যজনক স্থান, খোজা ভিন্ন কাহারও সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। …আমাদের ভ্রমণকারীরা এতাবৎ তাহার প্রকৃত বর্ণনা দিতে পারেন নাই, একথা বলা যায়। এই অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাইলে মঃ মনুচীর ন্যায় বৃদ্ধ চিকিৎসকের প্রতিষ্ঠা থাকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

মনুচীর জীবিতকালেই তাহার গ্রন্থের যিনি সম্পাদনা ও প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া মনুচীকে চিকিৎসা ব্যবসায়ীও চল্লিশ বৎসরের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক বলিয়া গ্রহণ করিব, না শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবুর কথায় তাঁহাকে গোলন্দাজ সর্দ্দার (Chief Artillery man) বলিয়াই মানিয়া লইব ?

তারপর Chief Artillery man বলিতে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র-বাবু কি "Captain of the Canoneers"কে বুঝাইয়াছেন ? যদি তাহা হয়, তবে সেনাপতি খলিলখাঁর দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করিতে গিয়া মনুচী তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Calil Khan had secured the Captain of the Canoneers in his interest, and ordered him not to obey any orders but his own" (B. P. page 272).

—খলিলখাঁ গোলন্দাজ সর্দ্দারকে নিজস্বার্থে হাত করিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের ভিন্ন আর কাহারও আদেশ মান্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সর্দ্দার সাহেবই যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন করিয়া শত্রুসৈন্য পাল্লার মধ্যে আসার পূর্ব্বেই গোলা ছাড়িয়া ধুলা ও ধোঁয়ায় দারার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা মনুচীর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। দারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন মনুচীই এই "হাত করা" সর্দ্দার একথা কি ভাবা যায় ? আর, মনুচী নিজের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিবেন, ইহাও কি স্বাভাবিক ? মনুচীর সম্পাদক ও প্রচারকই কি তাহা পারেন ?

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সাজাহান পীড়িত হইয়া পড়িলে তৎ-পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ হয়। এই বৎসরেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বও আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবুর মতে এই ভ্রাতৃ-বিরোধের সময়ই মনুচী আসিয়া বারুদখানার কাজ গ্রহণ করেন। বারুদখানার কাজ হইতে একেবারে "প্রধান Artillery man" এক বৎসরেই এতবড় উন্নতি, ইহা কি সম্ভব ? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে দারা এক অনভিজ্ঞ নবাগতকে তাহার 'প্রধান Artillery-man'এর কাজ দিয়াছিলেন ? কিন্তু মনুচীই বলিয়াছেন "He (Dara's) liberality had drawn to him from all parts the ablest Ingineers and the best gunners of all the nation of Europe" অর্থাৎ দারার বদান্যতায় তাহার কার্য্যে ইউরোপের সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজগণ যোগ দিয়াছিলেন। একজন অর্ব্বাচীন এই দলের 'সর্দ্দার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিতে প্রবৃত্তি হয় কি ?

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য "মনুচী দারার গুণে ও মধুর ব্যবহারে এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে দারার দুরদৃষ্টের পরে অনুরুদ্ধ হইয়াও ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই", ইহাও ঐতিহাসিক সত্যের নিতান্ত পরিপন্থী।

নিজ ভূমিকায় কাত্রু লিখিয়াছেন—The treasure M. Manouchi has sent us from the Indies, is not yet wholly exhausted"—মঃ মনুচীর যে সম্পদ (গ্রন্থ) ভারতবর্ষ হইতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, উহা (প্রকাশ করা) এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। বলিয়াছি, মনুচীর গ্রন্থ ১৬৯৭ সালে লিখিত হয়। ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। যদি মনুচী ঔরঙ্গজেবের অধীনে কর্ম্মই গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে এই উনচল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি ভারতবর্ষে কি করিতেছিলেন ?

তারপর দারার প্রতি এই অগাধ প্রীতি যাহার বলে তিনি ঔরঙ্গজেবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, এই প্রীতির এই পক্ষপাতিত্বের কথাই কি সত্য ? দারা প্রভৃতি সাহজাহানের পুত্রগণের চরিত্র বর্ণনায়, দারার সংক্ষিপ্ত পিতৃ-ক্ষমতা পরিচালনের সময়ের বর্ণনায় কোথাও কি এই অযৌক্তিক প্রীতির কোনও প্রমাণ আছে ? দারার চরিত্র বর্ণনা কালীন গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছে নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবে তাহাতে দারার গুণের সহ দোষও দেখান হইয়াছে। দারার

বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার প্রশংসা করিবার পরই মনুচী বলিতেছেন—

"So many rare qualities which could not choose but gain him the love of the people. rendr'd him haughty and too persuining on his own merit. It was on affront to offer him the least advice and a wronging his judgment to pretend to see further into matters than he."

এই সমস্ত দুর্লভ গুণে কোথায় তাঁহাকে তাঁহার প্রজা-বৃন্দের প্রীতির পাত্র করিয়া তুলিবে না তাহাকে উদ্ধত প্রকৃতি ও অহঙ্কৃত করিয়া তুলিল। তাহাকে পরামর্শ দিতে গেলে তিনি অপমান বোধ করিতেন আর তাঁহার অপেক্ষা কেহ অধিক দূরদর্শী একথা ভাবিতে দেওয়ার অর্থ ছিল তাঁহার বিচারশক্তির অসম্মান করা।

ইহার পর দারার সহিত তাঁহার মন্ত্রিগণের সম্বন্ধের বিষয়ে বলিতেছেন, দারা মন্ত্রীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন মন্ত্রীরাও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না। মন্ত্রণা সভায় দারাও মন খুলিয়া আলোচনা করিতেন না মন্ত্রীরাও তাহাকে সদুপদেশ দিতে সাহস করিতেন না। মোটের উপর দারা নিজ গুণের কথা এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার গুণ তাঁহার নিজের উন্নতির পক্ষে তাঁহাকে কোনও সাহায্যই করিতে পারে নাই—অর্থাৎ "গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যায় বিদ্যায়"। এই কি প্রশংসা? ইহাই কি গুণমুগ্ধের ভাষা!

তারপর দারার "মধুর" ব্যবহারের নমুনা লেখক যাহা দিয়াছেন তাহা আরও চমৎকার!

"As soon as Dara begun to come into powers he grew imperious and inaccessable"—তাহার উপর যতই ক্ষমতা অর্পিত হইতে লাগিল তিনি ততই উদ্ধত প্রকৃতি হইতে লাগিলেন ও লোকের পক্ষে তাহার দেখা পাওয়া অসম্ভব হইল। (Page 239)

আবার,—

"So much power increased the pride of a Prince naturally haughty; all his answers were slighting and his airs scornful,

(Bangabashi Edition Page 240)

এত অধিক ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় স্বাভাবিক উদ্ধত প্রকৃতি সাহজাদার অহঙ্কার বাড়িয়া গেল, তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অপমানজনক উত্তর দিতেন আর ঘৃণার ভাব দেখাইতেন, তারপর গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"সম্রাটের সমস্ত মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সমস্ত সেনাপতিই সাহজাদার ঈর্ষার ও দুর্ব্যবহারের পাত্র ছিলেন। উজীর সাদুল্ খাঁএর মৃত্যুর জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইয়াছিল। যশোবন্ত সিংহকে তিনি ঘৃণা দেখাইতে 'নট' বলিয়া ডাকিতেন। মীরজুম্‌লাকে গোলকুণ্ডার যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাইবার সময় তাঁহার শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ সৈন্য তিনি কাড়িয়া লয়েন ফলে মীরজুম্‌লা প্রতিশোধ লওয়ার ভয় দেখাইয়া যান। বাদশাহ-জাদা যাহাকেই তাঁহার কাজে আগ্রহশূন্য বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাকেই হয় কারাগারে নয় নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি একজন পারিষদ (Secretary of state) কে নিজ শয্যায় ফাঁসীর অবস্থায় মৃত পাওয়া গেলে তাহার মৃত্যুর জন্যও দারাকে সন্দেহ করা হয়। দারার সম্মুখে কোনও সেনাপতি বা মন্ত্রীর প্রশংসা করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কৃতদাস আবর খাঁএর প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাদের মনে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিতেন।"

এই সমস্তই মনুচীর নিজ উক্তি। এসব কি দারার গুণের কথা না মধুর ব্যবহার? আর যিনি নিজ গ্রন্থে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সাহজাদা দারার এই "গুণ" আর "মধুর ব্যবহারের" উল্লেখ করিয়া উহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি গুণ-মুগ্ধ হইবেন না ত হইবে কে?

তারপর ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে মনুচীর যে বদ্ধমূল ঘৃণা ছিল, যাহার বলে মনুচী তাহার অধীনে চাকুরীই গ্রহণ করেন নাই তাহার একটু নমুনা দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ঔরঙ্গজেবের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া মনুচী বলিয়াছেন—

Nature seem'd to have taken a pleasure in displaying in this Prince's person all the greatest perfections of body and mind—দেহ মনের সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীদ্বারা প্রকৃতি এই রাজপুত্রটীকে সজ্জিত করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকিবেন বলিয়াই মনে হয়।

ইহা ত চরম ঘৃণারই কথা। যাহার সম্বন্ধে মনোভাব এই তাহার চাকুরী কি লওয়া যায়?

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হেমেন্দ্র বাবু নিজ প্রবন্ধেই পরে লিখিয়াছেন, মনুচী পরে ফিরিয়া আসিয়া ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কথাটার অর্থ কি? এই ফিরিয়া আসিবার অর্থ কি 'ভারতবর্ষ হইতে ভিনিস আসিয়া? ইহার কি কোনও প্রমাণ আছে? হেমেন্দ্র বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? আর 'ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী' অর্থই বা কি? কোন চাকুরী লইয়াছিলেন—এই গোলন্দাজ সর্দ্দার? ঔরঙ্গজেব কি তাহার ভ্রাতার এই অর্ব্বাচীন গোলন্দাজ সর্দ্দারকে হঠাৎ নিজ হেকিম সর্দ্দার বানাইয়া ছিলেন। অবশ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে আজকাল ইহা হইতেছে কিন্তু তখনকার দিনেও কি এমন প্রতিভার খেলা হেকিমিতে চলিত? জানি না; তবে এমন genius যে হঠাৎ রাজবৈদ্য হইয়া উঠিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা কি অস্বাভাবিক নহে?

উপসংহারে বক্তব্য এই মনুচীর গ্রন্থের সাহজাহানের জীবনের শেষ অধ্যায় হইতে পরবর্ত্তী অংশ ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। মোগল ইতিহাসের আর যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় উহা হয় Travellers tales—ভ্রমণকারীর গল্প "স্পেশিয়ালের পত্র" নয় স্তাবকের প্রভুস্তুতি না হয় নিন্দুকের মিথ্যা নিন্দায় পূর্ণ গল্প। সেকালের ইতিহাসের বিপদই এই। সমসাময়িকের লেখা হইলে তাহাতে লোকের ব্যক্তিগত মনোভাবের ছাপ না থাকিয়া পারিত না। বিশেষতঃ যে সমস্ত ইতিহাস লিখিয়া স্বেচ্ছাচারী সম্রাটকে দেখাইতে হইত বা যে সমস্ত ইতিহাস এইরূপ সম্রাটের নিকট লিখিত পত্রাদি (despatch) হইতে সংগৃহীত, তাহাতে প্রভুর মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা বা মনোরঞ্জন প্রচেষ্টার ছায়া না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে সমস্ত ইতিহাস ভারতবর্ষে প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, বিদেশে বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই প্রভুকে খুশী করার চেষ্টার কোনও কারণ থাকা সম্ভব নহে অবশ্য কৃতজ্ঞতার ছায়া যে পড়িতে না পারে এমন নহে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই উহা ধরিতে পারা সহজ। এই সমস্ত গ্রন্থের বিপদ উহার লেখক হয় সত্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না, নয় ত দেশীয় ভাষা রীতিনীতির জ্ঞান না থাকায় উহা বুঝিতে পারেন না। যত ভুল দেখা যায় মনুচী লিখিত গ্রন্থ সাধারণ্যে যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহার সাহজাহানের জীবনের শেষ অংশ হইতে পরবর্ত্তী অংশ এই সমস্ত দোষ হইতে মোটামুটি মুক্ত। পাদ্রী কক্রর হাতে পড়িয়া মনুচীর নিজ লেখার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে উহাতেও হয় ত এই দোষমুক্তির সাহায্য করিয়াছে। ফলে একদিকে যেমন নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক চরিত্রাবলীর নিন্দা ও প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে তেমনই এই সমস্ত চরিত্রাবলীর সহ নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও স্বচক্ষে দেখিতে বা সর্ব্বোত্তম সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন। ইহার পর লেখকের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিচারসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তিশালী থাকায় এই গ্রন্থ মোগল ইতিহাসের একখানি অমূল্য উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অমূল্য উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া অন্যায় যে কিছুমাত্র করেন নাই তাহা নিশ্চয়। স্যর যদুনাথ প্রমুখ মোগল যুগের ঐতিহাসিকগণও যদি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সম্রাটের স্তাবকগণের লেখা ইত্যাদির উপর নির্ভর না করিয়া এই জাতীয় উপাদানের উপর আরও একটু নির্ভর করিতেন তবে মন্দ ত করিতেনই না বরং তাঁহাদের লিখিত ইতিহাস আরও মূল্যবানই হইত।

* * *

হেমেন্দ্রবাবুর প্রত্যুত্তর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার প্রবন্ধটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এবং মূলতঃ তিনি আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। যে দুই একটী গৌণ বিষয়ে তিনি আমাদের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইলেও, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে কলিকাতায় থাকিয়া প্রমাণ মূলক পুস্তকাদি দেখিবার আমাদের যে সুবিধা আছে, সুদূর মফঃস্বলে তাঁহার তাহা নাই। তাই এই অ-সমান তর্কদ্বন্দ্বে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে,

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসে নিরপেক্ষতা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। পাদ্রী কত্রুর লিখিত স্থান সমূহ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

সুরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় :—

(১) মনুচীর উক্তি নিরপেক্ষ।

(২) তাঁহার গ্রন্থে ঐতিহাসিক চরিত্রাবলীর নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) "মনুচীর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ, বুদ্ধিবিচার সম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তিশালী থাকায়", মোগল ইতিহাসের উহা অমূল্য উপাদান।

(৪) মনুচীর গ্রন্থের, সাজাহানের জীবনের শেষ অধ্যায় হইতে পরবর্ত্তী অংশ, ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র এই অমূল্য উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই।

(৬) স্যার যদুনাথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ঔরঙ্গজেবের স্তাবকগণের রচনায় নির্ভর না করিয়া মনুচীর ন্যায় ভ্রাম্যমান-প্রদত্ত উপাদানের উপর নির্ভর করিলে তাহাদের ইতিহাস আরও মূল্যবান হইত।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়াছি "মনুচী প্রদত্ত প্রমাণ খুবই মূল্যবান"—(বঙ্গশ্রী ১৩৪৮, শ্রাবণ, ২৮১ পৃঃ) সুতরাং উপরোক্ত উক্তিগুলির সহিত যে আমরা সম্পূর্ণ এক মত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই দশ মাসে রাজসিংহের ভূমিকা আলোচনা করিতে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ দিয়াছি, মনুচীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমরা বলিয়াছি "দারার সম্বন্ধে মনুচী যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার (মনুচীর) পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা উচিত ব্যবহারেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং মনুচীর কথাকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" (শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ ২৮১) তথাপি আমরা বলিয়াছি "মনুচীর কথা অযৌক্তিক না হইলেও দেশবাসীকে আমরা পোষকতামূলক প্রমাণ ব্যতীত দারা সম্বন্ধে তাহার কথা অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব না।" আমরা দারার ব্যাপারে পোষকতামূলক প্রমাণ দিতে চাহিয়াছি, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু বলেন, "মনুচী দারার সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর কথা বলিয়াছেন, দোষের কথাও অনেক উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং মনুচী নিরপেক্ষ, তাই তাঁহার উক্তি প্রমাণ হিসাবে অমূল্য সম্পদ।"

সুতরাং সুরেন্দ্র বাবুর এই কথায় আমাদের প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। বরং তিনি মনুচীর উক্তি সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষাও বেশী আস্থাবান। আমরা স্থানে স্থানে পোষক প্রমাণের পক্ষপাতী ; তিনি তাহা চাহেন না। ইহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণই নাই। আমরাও সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে মূলতঃ প্রত্যক্ষদর্শী মনুচীর উপরেই বেশী জোর দিয়াছি।

তবে মনুচীকে Artillery man বলায় আমাদের উক্তিতে সন্দিহান হইয়া সুরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মনুচীকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও চল্লিশ বৎসরের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক বলিয়া গ্রহণ করিব, না, শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র বাবুর কথায় তাহাকে গোলন্দাজ সর্দ্দার (Artillery man) বলিয়া মানিয়া লইব ?"

"চল্লিশ বৎসরের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক" মনুচী সম্বন্ধে এই সুরেন্দ্র বাবু Father Francois Catrou র পুস্তক হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু Catrou র সব বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ মনুচীর লিখিত বিবরণী রহস্যজনকভাবে তাহার হস্তগত হওয়ায় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ২৭২ পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ড ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত করেন *। পুস্তকের নাম হয় Historic Generale de l' Empire du Mogol depuis Sa fondation, Sur les Memocries de M. Manouchi Venetien le Pere Francois Catroe de la Compagni de Jesus. ইহার পরে ঐ বৎসরেই দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয়। এই অংশে প্রদত্ত পাদ্রী কত্রু কর্ত্তৃক প্রদত্ত মনুচীর জীবন-চরিতই সুরেন্দ্র বাবুর নিকট প্রধান উপাদান মূলক প্রমাণ। ইংরাজীতে অনূদিত হয় উহা ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে (সুরেন্দ্র বাবুও তাহাই বলেন)—কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৭০৬ অব্দে মনুচী আক্ষেপ করিয়া বলেন, তাহার অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায়

* সুরেন্দ্র বাবু যে বলেন ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড বাহির হয়, তাহা ঠিক নয়। ১৭০৫ সনের গুরুত্ব বেশী থাকায়ই এই প্রসঙ্গটুকুর উল্লেখ করিলাম।

তাহার লিখিত খাতাপত্র হস্তান্তরিত হইয়াছে। অথচ ১৭১৫ সালে তৃতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কিত করিবার সময় কত্রু বলেন, "মনুচী স্বেচ্ছায় তাহাকে উহা দিয়াছেন।" মনুচীর অনুবাদক ও টীকাকার মনীষী আর্ভিন বলেন, "কত্রুর উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা—he speaks a deliberate lie." আমরাও বলি উহা মিথ্যা, কারণ মনুচী নিজে বলেন, "the manuscript was communicated to the jesuits without my knowledge and consent." সুতরাং কত্রুর প্রদত্ত জীবন-চরিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না। বিশেষতঃ ১৭০৫ সালে কত্রু মনুচী লিখিত সমস্ত বিবরণ পড়িতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে সাজাহানের সময়ের কথা ছিল। ১৭১৫ সালে যে ৩য় খণ্ড বাহির হয় তাহাতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং কামবক্সের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাদি ছিল। সুরেন্দ্র বাবু বোধ হয় এই খণ্ড দেখেন নাই। সুতরাং ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে অনুদিত পুস্তকে কত্রু প্রদত্ত মনুচীর জীবনী নির্ভুল এবং অকাট্য মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর্ভিন বলেন, "কত্রু মনুচীর নামটীর পর্য্যন্ত বানান ভুল করিয়াছেন। ইহার উচ্চারণ Manucci, Manouchi নয় আর কত্রুর পুস্তকের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে" (bore the brunt of adverse criticism)

এই গৌণ প্রমাণ ছাড়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কি কোন প্রমাণ আছে? আচ্ছা দেখা যাউক।

আমরা এই সম্বন্ধে দুইটী প্রমাণ উপস্থিত করিব। প্রথম, মনুচীর সমগ্র ৪ খণ্ডের পুস্তক। দ্বিতীয়, মনুচীর গ্রন্থের (Storia De Mogor) সমালোচক ও অনুবাদক মনীষী আর্ভিন প্রদত্ত মানুচীর জীবনী। মনুচীর উক্ত পুস্তক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে চারি খণ্ডে আছে এবং প্রত্যেক খণ্ডই বিরাটকায় গ্রন্থ। মিঃ আর্ভিন এই পুস্তকেরই মুখবন্ধও (Introduction) লিখিয়াছেন ও স্থানে স্থানে টীকা করিয়াছেন। এই পুস্তকে আর্ভিন এতই পরিশ্রম করিয়াছেন যে, স্যার যদুনাথ প্রমুখ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। আর আজ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের ও উক্ত টীকা বা জীবনী সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদই হয় নাই। বস্তুতঃ আর্ভিনই Manucci মনুচীর প্রথম ইংরাজী অনুবাদক, আর এই গ্রন্থখানি যে প্রামাণ্য, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুরেন্দ্রবাবু যে বলেন, মনুচীর নিজ লিখিত কোনও ইতিহাস অদ্যাপিও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই, একথা সর্ব্বৈব অনুমান-মূলক। যখন কত্রু তাহার টীকা সমেত পুস্তকখানি মনুচীকে পাঠান, মনুচীর রাগের পরিসীমা থাকে না। অবিলম্বে তিনি প্রথম তিন ভাগের সর্ব্বপ্রাথমিক লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী (mes) ও ৪র্থ ভাগ ভিনিস নগরীর সিনেটের কাছে পাঠা'ন এবং সেখান হইতে ক্রমে পর্ত্তুগীজ ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রিত হয় ও Storia Int. xxxiv শেষে আর্ভিন ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। আমরাও আজ এই গুলির সহায়তায়ই সুরেন্দ্র বাবুর সন্দেহ ভঞ্জনে প্রয়াস পাইব।

মনুচী যে একজন চিকিৎসক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তিনি যে বহুদিন দিল্লীর প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন এ কথাও খুবই সত্য। সুতরাং পাদ্রী কত্রুর "He is a physician whom his profession has obliged to reside for a long time in the Emperor's family"—এই উক্তিতে কোন অত্যুক্তি নাই। তবে কত্রুর উক্তি তিনি "যে চল্লিশ বৎসরই রাজপ্রাসাদে থাকিতেন, এতদিনই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে "ঔরঙ্গজেবের চিকিৎসক ছিলেন," আমরা, সে কথার প্রতিবাদ করি। আমরা উপরোক্ত পুস্তক (Storia) এবং আর্ভিনের টীকা ইত্যাদি ও তৎপ্রদত্ত মনুচীর জীবনী হইতেই এই উক্তির প্রতিবাদ করিব।

মনুচীর নিবাস ছিল ভিনিস সহরে (ইটালীতে) এবং চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্মার্ণার (এসিয়া মাইনর) একখানি যাত্রী জাহাজে পলাইয়া এসিয়ায় আসেন এবং কিছুদিন ইরানে (পারস্য দেশে) আসিয়া ১৬৫৮ জানুয়ারীতে সুরাট আসিয়া পৌছেন। আগ্রার অনতিদূরে দারার সহিত ঔরঙ্গজেবের যখন যুদ্ধ হয়, ইহারই ঠিক পূর্ব্বে মনুচী মাসিক ৮০৲ বেতনে Artillery man গোলন্দাজ সৈন্যরূপে দারার চাকুরীতে নিযুক্ত হন। (Vide Storia De Mogor) Vol I Int. viii.

সমুদ্রগড়ের যুদ্ধের সময় মনুচী দারার সঙ্গে যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং খলিয়ুল্লার বিশ্বাসঘাতকতা মূলক সমস্ত কাজকর্ম্মই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এ কথাও সত্য।

একে বয়স অল্প, তাহাতে অল্পদিন কাজে ভর্ত্তি হইয়াছেন, তাই তখনও তিনি Chief of the Artillery man হন নাই। দারার পরাজয়ের পরে মনুচী ছদ্মবেশে ঔরঙ্গজেবের সেনা-নিবাসে প্রবেশ করিয়া যোদ্ধাদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরে লাহোরে গিয়া তিনি দারা সেঁকোর সহিত মিলিত হন এবং সেখান হইতে মূলতান ও বক্করে যান। এই বক্করেই তিনি প্রধান Artillery man হইয়াছিলেন (He was placed in at the head of the artillery in the latter fortress under the Command of the Eunuch Basant) এই বক্করে বাসন্ত খুব যুদ্ধ করে, কিন্তু লড়াইতে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর মনুচী পলাইয়া দিল্লী চলিয়া আসে। ঔরঙ্গজেবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা না থাকায় মোগলের অধীনে আর চাকুরী না করিয়া ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মনুচী কাশ্মীর যায় কিন্তু সেখান হইতে একেবারে পাটনা আসিয়া নৌকাযোগে রাজমহল ঢাকা, হুগলী, সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এবং ক্রমে কাশিমবাজার হইয়া পুনরায় আগ্রা আসিয়া উপস্থিত হন।

সুরেন্দ্র বাবু বিশ্বাস করেন নাই যে মনুচীর ঔরঙ্গজেবের উপর অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু স্বরচিত গ্রন্থে মনুচী নিজে বলেন, "ঔরঙ্গজেবের প্রতি অশ্রদ্ধাই তাহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ না করিবার অন্যতম কারণ"—

> "There was also the aversion
> I had to Aurongzeb."
>
> Storia Vol II page 77 line 2.

এইবার সর্ব্বপ্রথমে মনুচী কিছু চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া অল্পদিন মধ্যে দিল্লী ও আগ্রাতে ব্যবসায় আরম্ভ করে।

চিকিৎসক থাকিয়াও জয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র কিরাত সিংহের অধীনে দৈনিক দশ টাকা বেতনে গোলন্দাজ সৈন্যের সেনাপতি (Captain of Artillery man) হয়েন। জয়সিংহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে কিছুদিন থাকিয়া ক্রমে সেখানে ঔরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ সাহ আলমের সহিত পরিচিত হন। শিবাজীর দর্শনও মনুচীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল এবং বিজাপুর অভিযানেও মনুচী ছিলেন।

ক্রমে মনুচীর এই কাজে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং মনুচীর জয়সিংহের চাকুরী ছাড়িয়া বোম্বাই সহরের ২৮ মাইল উত্তর বেসিন নামক স্থানে আসেন (Vide Storia De Mogor II 108, 109) সেখান হইতে গোয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন (Vol. 130, Storia), এবারও দৈনিক ৫৲ বেতনে কিরাত সিংহের অধীনে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিরাত সিং কাবুলে থাকিতে আদিষ্ট হইলে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মনুচী লাহোরে গিয়া আবার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং ৭ বৎসর ব্যবসা করে ১৬৭৬।৭৭ সালে মনুচী দমন (Daman) এ ছিল (II-137, III-198) এবং ১৬৭৭ সালে বোম্বাই ফোর্টের নয় মাইল উত্তরে বন্দোরায় ছিল।

কিন্তু আশু লাভজনক একটী ব্যবসায়ে যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া মনুচী আবার দিল্লীতে আসে। সাহআলমের বেগমের সাংঘাতিক কর্ণ পীড়া হওয়ায় বেগম মনুচীর চিকিৎসায় রোগমুক্ত হন। আর মনুচী তখন হইতে চিকিৎসকের কার্য্যই করিতে থাকেন। ১৬৭৮ হইতে ১৬৮১ পর্য্যন্ত সাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য থাকেন এবং রাজপুত্র যুদ্ধের সময় বাদশাহজাদার সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। যুদ্ধের কয়েক দিন পরে মনুচী আবার চাকুরী ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরেও ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চিকিৎসকের কার্য্যই করেন, কিন্তু রাজধানীতে থাকিয়া নয়।

উক্ত ইতিবৃত্ত পাঠে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, মনুচী প্রথমে আর্টিলারি ম্যানই ছিলেন, তারপরে বক্করে Captain হন এবং অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এ-সব কথা যে ঠিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ উক্ত গ্রন্থগুলিই ইহার প্রমাণ। সুতরাং নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রবাবুর বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, আমি যে ইতিহাস দিয়াছি তাহা 'অপরূপ' নয়, সত্য অবলম্বন করিয়াই উহা দিয়াছি এবং চিকিৎসক হইলেও ইতিহাসই মনুচীকে গোলন্দাজ সর্দ্দার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আর আমিও তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং গোলন্দাজ সর্দ্দার হওয়াও বিচিত্র নয়, আর ভিনিসে না গিয়াও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে আগ্রায় ফিরিয়া আসায়ও বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। Storia De Mogor and Irvine প্রদত্ত জীবনাখ্যা পাঠ

করিলে সুরেন্দ্রবাবুর সন্দেহ থাকিবে না যে, গোলন্দাজ সর্দ্দারও কিরূপে "হাকিম সর্দ্দারে" পরিণত হইতে পারে আর "ইহা বর্ত্তমান সময়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ন্যায় মোটেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নয়'। সত্য ঘটনাই বটে।

এখানে দিল্লীর প্রাসাদে শাহ আলমের বেগমের চিকিৎসা করেন, ঔরঙ্গজেবের প্রধানা বেগম (শাহআলমের গর্ভধারিণী) মনুচীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। যুদ্ধের সময় মনুচীর ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন, এই হিসাবেই মনুচী মোগল দরবারে চাকুরী করিতেন বলা যাইতে পারে। ইহা চাকুরীই বলুন আর যাহাই বলুন, মনুচী যে ঔরঙ্গজেবের প্রাসাদে আবার আশ্রয় লাভ করে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অন্যত্র সুরেন্দ্রবাবু বলেন, "মনুচী দারার গুণে ও মধুর ব্যবহারে এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে দারার দুরদৃষ্টের পরে অনুরুদ্ধ হইয়াও ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই'—ইহাও ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী।

দারা যে মনুচীর প্রতি অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করিতেন তাহা মনুচী শতবার বলিয়াছেন। সত্য বটে সময় সময় দারার উদ্ধত ব্যবহারে মিরজুম্লা, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ রুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই সব ব্যক্তি ছিল বিশ্বাস ঘাতক। কিন্তু সাধারণের সহিত দারার ব্যবহার বস্তুতঃই প্রশংসনীয় ছিল। লোক হিসাবেও দারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। দারার পিতৃভক্তি ছিল অসাধারণ, জ্যেষ্ঠা ভগিনী জাহানারাকে দারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, স্ত্রীর প্রতি দারা অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং যাহারা সাম্রাজ্যের অহিতকারী নয় এইরূপ ব্যক্তির প্রতি দারার ব্যবহার কখনও বিরক্তিকর ছিল না। সুরেন্দ্রবাবু-উল্লিখিত মনুচীই বলেন—

"Dara was a man of dignified manners, of a comely countenance, joyous and polite in conversation ready and gracious of speech, of most extraordinary liberality, kindly and compassionate. Vol. I. 221."

সুরেন্দ্র বাবু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন দারার liberalityতে বহুব্যক্তি তাঁহার অধীনে কাজ করিতে আসে। কিন্তু এখানে কথা হইতেছে মনুচীর প্রতি ব্যবহারের কথা। আর তাহা যে সর্ব্ববিষয়ে অনিন্দ্য ছিল মনুচীর বিবরণীতে তাহার শতশত প্রমাণ আছে। দারার ঔদ্ধত্যের কথা অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু হৃদয় ছিল তাঁহার অতীব মহান ও প্রশস্ত। দারা পরদুঃখকাতর ছিল, তাহার মধ্যে কোন ক্ষুদ্রতা ছিল না, আর ঈশ্বরে সে প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল। তদুপরি তাহার ক্ষমা ছিল অসাধারণ। এমতাবস্থায় মনুচীর পক্ষে দারাকে শ্রদ্ধা করা আর কপটতার জন্য ঔরঙ্গজেবকে অশ্রদ্ধা করা কিছু মাত্রই অস্বাভাবিক ছিল না। এই কপটতার কথা যে মনুচী বহুবার বলিয়াছেন তাহা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ পড়িলেই পাওয়া যাইবে।

তবে এ কথায় আমরা সুরেন্দ্রবাবুর সহিত একমত যে, দারার দোষাবলী বর্ণনা করিতেও মনুচী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। আমরাও বলি নিরপেক্ষ মনুচীর পক্ষে দারাকে ভালবাসায় ও প্রতিপক্ষ ঔরঙ্গজেবকে অশ্রদ্ধা করায় তাঁহার বিবরণীকে পক্ষপাত দুষ্ট বলা যায় না, কারণ এ সমস্ত ক্ষেত্রে "মনুচীর পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা উচিত ব্যবহারেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।" (২৮১ পৃঃ শ্রাবণ বঙ্গশ্রী—১৩৪৯)

পরিশেষে সুরেন্দ্রবাবু যে লিখিয়াছেন, "জীবন চরিত লেখক হিসাবে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবু বাঙ্গালায় সুনাম পাইয়াছেন" ইহাতে তাঁহার উদারোক্তিতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে লেখক বিনা প্রমাণে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার প্রশংসা ন্যায় বিরুদ্ধ, কারণ প্রমাণ শূন্য জীবন চরিত প্রকৃত জীবনী নয়, উহা নবন্যাস বা উপকথার নামান্তর মাত্র। সুতরাং উহা একান্ত অসার। যদি আমার প্রমাণগুলিতে সুরেন্দ্রবাবুর আস্থা না জন্মে, তবে আমার লিখিত জীবন-চরিতেও তাহার শ্রদ্ধা হইবার কারণ নাই।

পুনরায় সুরেন্দ্রবাবুকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য-সাধুবাদ প্রদান করিয়া এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। *

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

* শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবুর রাজসিংহের ভূমিকা আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

শরৎ-সাঁঝে

শ্রীঅসিতারঞ্জন বসু

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"
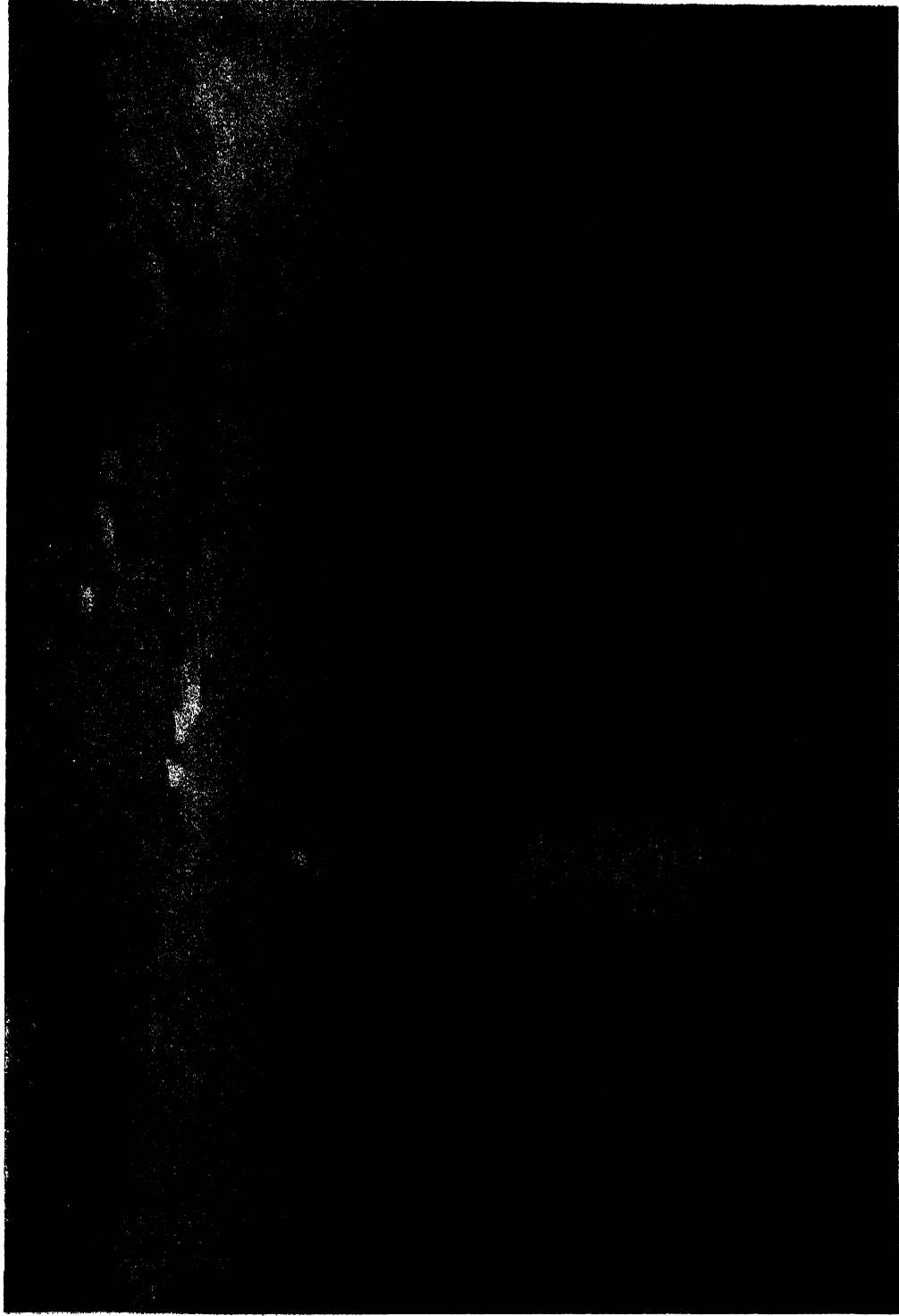
দশম বর্ষ } আশ্বিন—১৩৪৯ { ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

ইহা কি বিষম ভুল ?

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে, এ দেশের ব্রিটিশ অফিসারগণই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আটকের জন্য দায়ী এবং তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ অফিসারগণ বিষম ভুল করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারি না। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া দেশের পক্ষে বড়ই অনিষ্টের কারণ, কিন্তু তাহা হইলেও কি করিয়া ব্রিটিশ অফিসারদিগকে এই অটকের জন্য দায়ী করা যায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সংবাদ-পত্র পাঠ করিলে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, কংগ্রেস কর্ত্তৃক ভারত হইতে ব্রিটিশ-শক্তি অপসারণের দাবী প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বড়লাট বাহাদুর তাঁহার শাসন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়া সদস্যবৃন্দের সহিত নেতৃবৃন্দের আটক-প্রশ্ন লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এই প্রশ্ন লইয়া সদস্যদের মধ্যে যে মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা কোন সংবাদে প্রকাশ পায় নাই, অথচ এই পরিষদে ভারতীয় সদস্যদিগের সংখ্যাই অধিক। কাজেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, নেতৃবৃন্দের আটক সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনও ভুল হইয়া থাকিলে ব্রিটিশ অফিসারগণ হইতে বড়লাট বাহাদুরের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণই অধিকতর দায়ী। এইরূপ অবস্থায় এবম্বিধ প্রতি কার্য্যের জন্য ব্রিটিশ অফিসারদিগকে দায়ী করিলে আমাদের বিচারশক্তির অভাবই প্রতিয়মান হইবে এবং আমাদের দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি প্রকটিত হইবে। বিশ্ব রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্থান লাভের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে হইলে ভারতীয়গণকে এবম্বিধ মনোভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমাদের মতে গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই তাঁহাদের নিজ আটকের জন্য অধিকতর দায়ী। নেতৃবৃন্দ অবশ্যই জানিতেন, দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহারা (গভর্ণমেণ্ট) কোন মতেই দেশের মধ্যে অরাজকতার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। ভারতশাসনের দায়িত্ব একজন ব্রিটিশ অফিসারের হাতে না থাকিয়া একজন ভারতীয় অফিসারের হাতে থাকিলে তাহাকেও এই নীতিই অবলম্বন করিতে হইত এবং তিনিও যাহারা প্রকাশ্যে আইন অমান্য করিতে চাহিত তাহা-দিগকে বন্দী না করিয়া গভর্ণমেণ্ট চালাইতে পারিতেন না। বস্তুতঃপক্ষে আইন অমান্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এমন একটী অবস্থার সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন যাহাতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নেতৃবৃন্দকে বন্দী না

করিয়া গত্যন্তর ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, গান্ধীজী এবং অবরুদ্ধ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণার পরে তাঁহাদিগকে আটক করিয়া গভর্ণমেণ্ট কোনই ভুল করেন নাই।

আইন অমান্যের নীতি ঘোষণা করাও গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী কার্য্য এবং গভর্ণমেণ্টেরও ইহা দমন করিবার ন্যায়তঃ সর্ব্বপ্রকার অধিকার আছে। নেতৃবৃন্দ যদি আইন অমান্যের আন্দোলন ঘোষণা না করিয়া কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন এবং সেইরূপ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে আটক করিতেন তাহা হইলে জনসাধারণ অবশ্যই বলিতে পারিত যে গভর্ণমেণ্ট নেতৃবৃন্দকে আটক করিয়া ভুল করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কাজই করেন নাই, কারণ, আইন অমান্যের নীতি প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টকে মাত্র এই কার্য্যের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এমন কোন নীতি অবলম্বন করেন নাই যাহার ফলে দেশের মধ্যে কোন ক্রমেই আইন অমান্যের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে না। . কিন্তু কোন ক্রমেই একথা বলা চলে না যে, যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ আইন অমান্যের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভুল করিয়াছেন। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, নেতৃবৃন্দ যখন বড়লাট বাহাদুরের সহিত আলোচনা করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট কিছু সময়ের জন্য তাঁহাদের আটক স্থগিত রাখিতেও পারিতেন। ইহার বিরুদ্ধে এই বলিবার আছে যে, নেতৃবৃন্দের আটক স্থগিত রাখিলে প্রজার ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য প্রশ্রয় পাইত এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরোধী আন্দোলন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত।

আমাদের মতে, কংগ্রেসের দাবী যদি প্রজার ন্যায্য অধিকারের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিত এবং কোনক্রমেই উহা অতিক্রম না করিত তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেন না। তাহার দাবীগুলি পূরণ করা না হইলে সে গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করিবে, কোনও ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বলিবার অর্থ প্রজার ন্যায্য অধিকার অতিক্রম করা। যদি ইহা নিসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করা না যায় যে, যাঁহাদের হাতে ভারত শাসনের নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহারা কি করিয়া প্রজার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূর করিতে হয় তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহা হইলে ভারতের কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের পক্ষে ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন অপসারণের দাবী করিবার ন্যায়তঃ অধিকার নাই।

আমরা উপরোক্ত কথাগুলি প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি, মানুষের সৃষ্ট কোনও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি না, কারণ, মানুষ অনেক সময়ই ভুল প্রমাদ করিয়া থাকে। মানুষ যে সমস্ত আইন রচনা করে তাহাতে অবিচার সম্ভব হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে কোন অবিচার সম্ভব হইতে পারে না। বর্ত্তমান মানব সমাজ প্রকৃতির এই নিয়মগুলি প্রকৃষ্টরূপে জানে না, কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, প্রকৃতির মধ্যে এমন সব নিয়ম রহিয়াছে যাহার নিকট অতি শক্তিশালী ব্যক্তিকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। যাহারা মানব-ধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রে আস্থাবান তাহারা মনে করিতে পারেন যে, কেবলমাত্র বাহুবলেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু প্রকৃতিতে ইহা সম্ভব হয় না। যাহারা বাহুবলে বিশ্বাসী তাহারা মনে রাখিবেন প্রকৃতির এরূপ নিয়ম আছে যাহার নিকট অতি প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তিকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয় এবং যাহার প্রভাবে অতীব শক্তিশালী সাম্রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তৎস্থলে দুর্ব্বল জাতির গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা ইহা না বলিয়া পারি না যে, আমাদের প্রিয় নেতৃবৃন্দ তাহাদের দাবীগুলি রচনাকালে প্রজার ন্যায্য অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন এবং এইজন্যই তাঁহারা দণ্ডনীয় হইয়াছেন। এইরূপ দণ্ড আমরা আকাঙ্ক্ষাও করি না পছন্দও করি না বরং, ইহা আমরা ঘৃণা করি এবং এড়াইতে চেষ্টা করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। আমাদের পূজ্য পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এবং আমাদের স্নেহের সন্তান-সন্ততিগণের

দুঃখও আমরা নিবারণ করিতে পারি না যদি তাহারা পাপ এবং ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত হন।

আমরা কেবল মাত্র তাহাদের ভুলগুলি দেখাইয়া দিতে এবং তাহা প্রতিকারের উপায়গুলি বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাহাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করে।

ভারতের অধিকাংশ লোক জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি পাইতে থাকিলে ভারতবাসীর পক্ষে গভর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের দাবী করিবার কোনও অধিকার থাকিত না। বর্ত্তমান সভ্যতা হয় ত প্রত্যেক দেশকেই স্বাধীনতার দাবী করিবার অধিকার দিয়াছে, কিন্তু ইহা সত্য যে, এথেন্সের সভ্যতাই প্রথমতঃ এই দাবী প্রবর্ত্তন করে এবং পরবর্ত্তী সভ্য-জগতে ইহা গৃহীত হয়, কিন্তু প্রকৃতিতে এইরূপ দাবী করার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ দাবী প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত হইলে এথেন্স এবং রোমের প্রভুত্ব আরও দীর্ঘস্থায়ী হইত। আমরা যদি বলি বর্ত্তমানে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আকাঙ্ক্ষা করা পাপের কাজ এবং সেই জন্যই এইরূপ স্বাধীনতার উপাসকেরা কতকগুলি মানবধ্বংসী পশুতে পরিণত হইয়াছে এবং পরিণামে তাহারা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ইহার জন্য সাজা পাইবেই, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের লোকেরা যে আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা আমরা জানি। রাজনৈতিক আদর্শের বর্ত্তমান ইতিহাস লেখকগণ একথা স্বীকার করিতে নাও পারেন, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, রাজনৈতিক আদর্শের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক-গণ ইহা স্বীকার করিবেন যে, রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ-ই মানুষের ভিতরে পাশব প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছে এবং মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে। লোকে আমাদের সম্পর্কে যাহাই বলুক না কেন, আমাদের মতে ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতার বর্ত্তমান আদর্শের মোহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাদের শান্তিময় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী জিনিষগুলি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র যাহারা গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন তাহাদের পরিবর্ত্তন তাহাদের দাবী করিবার অধিকার আছে, কারণ ভারতের অধিকাংশ লোকই শান্তিময় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী জিনিষ-পত্র পাইতেছে না।"

ভারতের জনসাধারণ মনে রাখিবেন যে, যে সমস্ত দ্রব্যাদি তাহাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য তাহা যে তাহারা পাইতেছেন না এ কথাও তাহাদের প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকার নাই। কাজেই গান্ধীজীর ন্যায় নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি এইরূপ সুখ-সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন না—যাহা তাহারা ভারতের দীন-দরিদ্রের সহিত উপভোগ করিতে পারিবেন না, অথবা যাহারা এইরূপ ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন না যাহা উপভোগ করা বর্ত্তমান দুঃখ-দারিদ্রপূর্ণ জগতে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাদিগকেই জনসাধারণের এই অভাব-অভিযোগ-গুলি ব্যক্ত করিবার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। জনসাধারণের গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্টের যে সকল অফিসারের হাতে জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রহিয়াছে তাহারা অনুপযুক্ত হইলে তাহাদের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য জনসাধারণের যথাশক্তি চেষ্টা করিবার ন্যায্য অধিকার আছে।

আমাদের মূল বক্তব্যগুলি এই :—

(ক) আমাদের মতে ইংলণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার উপযুক্ত লোক এখন আর ইংলণ্ডে জন্মিতেছে না। আমাদের এইরূপ বলিবার কারণ, ইংলণ্ডে সাম্রাজ্য শাসন করিবার ন্যায় উপযুক্ত লোক জন্মিতে থাকিলে এক্সিস শক্তিগুলির ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তিগুলি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করিত না।

(খ) পরাধীন ভারতকে অতি বিনয়ের সহিত ইংলণ্ডের জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ইংলণ্ডে রাজ-নীতিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব হইয়াছে এবং যাহাদের লইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এবং কমিটীগুলি গঠিত হইয়াছে তাহাদের রাজনীতিক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ আছে।

(গ) উপরোক্ত কার্য্য সাধনের জন্য পরাধীন ভারত তাহার শাসকবৃন্দের নিকট কি দাবী করিতে পারে তাহা

তাহাকে প্রথমে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণমেণ্টের কিরূপ কর্ম্মপন্থা ও আইনপ্রণয়নে ভারতের দাবীগুলি পূরণ হইতে পারে তাহা গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হইবে।

(ঘ) পরিশেষে ভারতবাসিগণ তাহাদের শাসকবৃন্দের নিকট যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করিতে পূর্ণ অধিকারী—সেই সমস্ত দাবীগুলি শাসকবৃন্দ কোন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া ও আইন প্রণয়ন করিয়া পূরণ করিবেন তাহা শাসকবৃন্দের নিকট ভারতবাসিগণ জানিতে চাহিবেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক সংখ্যায়—"ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের দাবী কি কি কারণে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে ?"-এতৎ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা আমাদের কর্ম্মপন্থাগুলি দেশবাসিগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছি।

দেশবাসী আমাদের প্রস্তাবিত পন্থায় চলিলে গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আইন অথবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিবার নৈতিক অধিকার গভর্ণমেণ্টের থাকিবে না। মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা লাভ করিবার জন্য যে কর্ম্মপন্থা ও আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয় তাহার মধ্যে দাবীগুলি সীমাবদ্ধ থাকিলে দেশে সম্প্রদায়গত কিম্বা রাজনীতিগত কোন বিভেদ উপস্থিত হইতে পারে না। আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে কংগ্রেসের দাবীগুলি তাহার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলে জনাব জিন্না কিম্বা চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালআচারিয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তিই দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি এইরূপ কোন বিভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে দেশবাসী দেখিতে পাইবেন যে কোন একটী অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়ার ফলে জন-সাধারণ এই সকল ব্যক্তির নেতৃত্ব অস্বীকার করিবে এবং সমগ্র দেশ একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কেবল তাহাই নহে, ভারতের উপরোক্ত দাবী সম্পর্কে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কাহারও আপত্তি উপস্থিত হইলে এই অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়ার ফলে তাহাদের মধ্যেও বিভেদ উপস্থিত হইবে।

আমাদের মতে, ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের দাবী করিয়া এবং আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে ভুল করিয়াছেন তাহা তাঁহারা এখনও স্বীকার করিতে পারেন। এই ভুল স্বীকার করিলে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নেতৃবৃন্দকে জেলে রাখিবার কোন অধিকার থাকিবে না। যাহারা দেশ সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ ভুল স্বীকারে লজ্জিত হইতে পারেন না এবং হওয়া উচিতও নয়। কারামুক্ত হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহাদের দাবীগুলি উপস্থিত করিতে পারেন। মানব সমাজকে তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার একাধিক পন্থা বিদ্যমান নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্পর্ক ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু কিম্বা মিঃ জয়াকরের ন্যায় কোন ব্যক্তি জগতকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপায় জ্ঞাত আছেন এরূপ সাক্ষ্য তাহারা এখন পর্য্যন্তও দিতে পারেন নাই। একমাত্র গান্ধীজীর কার্য্যকলাপ হইতে এই উপায় সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা গান্ধীজীকে তাঁহার কর্ম্মপন্থা সংশোধিত করিয়া তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

ভারত কি রক্ষা পাইয়াছে ?

ভারত সচীব মিঃ এমেরী গত ৯ই আগষ্ট তারিখে বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তৎপরতা ও দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারত এবং মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যকে গুরুতর দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলে যে সমস্ত নির্ভীক ভারতীয়, ব্রিটিশ, মার্কিন ও চীনা সৈন্যগণ ভারতে থাকিয়া ভারতরক্ষায় ব্যাপৃত আছে এবং শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য ভারতকে ঘাঁটীস্বরূপ গড়িয়া তুলিতেছে তাঁহাদের কার্য্যে অতর্কিতে গুরুতর বাধা পড়িতে।

তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এই,—ভারতীয় কংগ্রেস একটী আন্দোলন চালাইবার জন্য সঙ্কল্প করে এবং কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই উহার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, শাসন বিভাগ,

আইন-আদালত, স্কুল ও কলেজ—এই সকলে ধর্ম্মঘটের প্ররোচনা দান, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও যান-বাহনাদি চলাচলে বাধা প্রদান, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কর্ত্তন এবং সৈন্যসংগ্রহ-কেন্দ্রসমূহে সত্যাগ্রহ—এই সমস্ত এই আন্দোলনের কর্ম্মতালিকার অঙ্গীভূত ছিল। কংগ্রেসের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলে যাঁহারা ভারতরক্ষার জন্য এবং মিত্রশক্তির চরম জয়লাভের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত—তাঁহারা অতর্কিতে তাঁহাদের কার্য্যে বাধা পাইত। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে যথাসময়ে আটক করিয়া এই অতর্কিত বাধা প্রতিহত করিয়াছেন এবং ভারত ও মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যকে গভীর দুর্দৈব হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আটক করিবার জন্য ভারত গভর্ণ-মেণ্ট তৎপরতার সহিত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সারবত্তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু মিঃ এমেরীর বেতার বক্তৃতার পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না যে, যাঁহারা ভারত রক্ষার জন্য উদ্যোগ আয়োজনে ব্যপৃত তাঁহাদের কার্য্যে অতর্কিত বাধা প্রদানের জন্য কংগ্রেস উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছে। আমরা কংগ্রেসের কর্ম্ম-পন্থার সমর্থক নহি, বরং কংগ্রেসের কার্য্য-কলাপের আমরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকি। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমাদের কোন মোহ নাই। গান্ধীজীর বিজ্ঞতার উপরও আমাদের আস্থা নাই, কিন্তু তথাপিও বৃদ্ধের কার্য্যকলাপ এবং আদর্শের আমরা প্রশংসা করি। যে বৃদ্ধ, ভুল পথেই হউক বা ঠিক পথেই হউক, মানব কল্যাণের জন্য চিরজীবন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন তাঁহার কোন কার্য্য-কলাপের উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তিকে অতর্কিত আঘাত করা, এইরূপ উক্তি সত্যের অপলাপ বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশ্বাস, গান্ধীজীর দোষ সাব্যস্ত করার জন্য মিঃ এমেরী যদি খাঁটী প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে যাঁহারা মনযোগের সহিত গান্ধীজীর কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা মিঃ এমেরীর এই উক্তি বিশ্বাস করিবেন না। মিঃ এমেরীর এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়, ভারত সচীবের পদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি কত অযোগ্য। এইরূপ উক্তি করা ব্রিটিশ মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের মতে মিঃ এমেরী ব্রিটিশ নহেন, অথবা ব্রিটিশ চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছে। আমরা এই কথাগুলি বলিতেছি কারণ ব্রিটিশ-চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি তদনুসারে আমাদের বিশ্বাস কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইয়া কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোন খাঁটী ইংরেজ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের উপর দোষারোপ করিতে পারেন না। ইংরেজ জাতির আমরা শত্রু নহি। আমাদের বিশ্বাস, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের মৈত্রিভাব বজায় রাখাই ভারতের মুক্তি লাভের সহজ পন্থা। আমাদের মতে একজন খাঁটী ইংরেজ ও একজন খাঁটী স্কচের সহিত আমাদের আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব; কিন্তু যখন আমারা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তির যথোপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানের অভাব তাঁহাকেই ভারত সচীবের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে তখনই আমাদের মন অবসাদগ্রস্থ হয়। মিঃ এমেরীর বুদ্ধিরও অভাব আছে। তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন না যে, যদি এই কথা বলা হয় যে, ভারতের কোন কোন ব্যক্তি, তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তদ্রূপ ব্যাপকভাবে ধর্ম্মঘটের প্ররোচনা দানের সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উভয়ের প্রতিই দোষারোপ করা হয়। মিঃ এমেরী যে সমস্ত গর্হিত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আয়োজন যদি সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন জাগে এদেশের গভর্ণমেণ্ট এবং পুলিশ বাহিনী তখন কি করিতেছিল। আমাদের মতে তাঁহার উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে মিঃ এমেরী গভর্ণমেণ্ট ও পুলিশ বাহিনীকে যেরূপ অযোগ্য বলিয়াছেন তাঁহারা সেরূপ অযোগ্য নয়।

কোনরূপ ধ্বংসাত্মক কার্য্য সাধনের জন্য প্রকৃতপক্ষে এদেশে কোন উদ্যোগ আয়োজন করা হয় নাই। যাহারা এদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ রাখেন না কেবল মাত্র তাহারই সন্দেহ করতে পারেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন সফল করিবার জন্য এদেশে উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা ঘটনাবলী সঠিকভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য কোন উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। এক শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের উপর ব্যপক অসন্তোষ রহিয়াছে। ইহারা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গান্ধীজী কোন আন্দোলন ঘোষণা করিলেই উপরোক্ত অসন্তুষ্ট ভারতীয়গণ এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকে। গান্ধীজী এই শ্রেণীর ভারতীয়দের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন এবং এইজন্য কোন উদ্যোগ

আয়োজন না করিয়াই তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারেন।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ব্যাপকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাইবার জন্য কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ যদি কোন উদ্যোগ আয়োজন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে নেতৃবৃন্দকে আটক করা মাত্রই ধ্বংসাত্মক কার্য্যের চেষ্টা পরিদৃষ্ট হইল কি করিয়া? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু কোন রকমেই অহিংসানীতি উপাসকেরা এইরূপ হিংসাত্মক কার্য্যের সহিত জড়িত আছেন তাহা মনে করা যায় না। গান্ধীজী ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠান-কারীদের সহিত জড়িত একথা মনে করিলে বলিতে হয় যে, তাঁহারা কপট। যাহারা গান্ধীজীর লেখা ও বক্তৃতা পাঠ করিয়া কিংবা তাহার সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানেন তাঁহারা যুক্তিযুক্ত ভাবে তাঁহাকে কপট বলিতে পারেন না। যে-সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্য্য সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা যে পঞ্চমবাহিনীর কার্য্য নয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের মতে এই দেশে পঞ্চম-বাহিনী আছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তাহাদের সহিত কোনই সংস্রব নাই। খুব সম্ভব এই বিশ্বাসঘাতকগণ এদেশের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে এবং যখনই তাহারা সুযোগ পাইয়াছে তখনই তাহারা শয়তানের খেলা আরম্ভ করিয়াছে।

তৎপরতা ও দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভারতগভর্ণমেণ্ট ভারত ও মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যকে গুরুতর দুর্দ্দৈব্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন, মিঃ এমেরীর এই আশা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মতে যুদ্ধের আনুসঙ্গিক উপদ্রবগুলি অবশেষে সঙ্ঘটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এইরূপ আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমরা পুনরায় বলিতেছি, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহাদিগকে আটক না করিয়া গভর্ণ-মেণ্টের গত্যন্তর ছিল না। মনে রাখিতে হইবে, দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পারেন না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের ফলে ভারত বিপন্মুক্ত হইয়াছে। ভুলিলে চলিবে না বর্ত্তমানে ভারতের নিকট দুই রকমের উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে: একটী হইয়াছে বহির্দ্দেশীয়, অপরটি আভ্যন্তরীন। ইহার কোনটীই অর্থাৎ বিদেশীয় শক্তির আক্রমণের আশঙ্কা এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বন্দী করিয়া এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলীর অবসান ঘটাইয়া দুর করা সম্ভব নহে। বরং গান্ধীজীর ন্যায় উদারচেতা জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপ বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত না হইলে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে ভারতকে মুক্ত রাখা সুদুষ্কর। তর্কস্থলে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাহায্য ব্যতীতও অন্যান্য নেতৃগণ আভ্যন্তরীণ শান্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম। এইরূপ হইলে আমরাও সুখী হইতাম। কিন্তু যাঁহারা বাস্তব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কেবল অশান্তি সৃষ্টি করিতেই পারেন কিন্তু অশান্তি দুর করিতে পারেন না, কেবলমাত্র কংগ্রেস নেতৃগণই এই অশান্তি দুর করিতে পারেন। আমাদের মতে, ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ যদি আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া ভারত শাসনের নীতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন তাহা হইলেই ভারত শত্রুর আক্রমণের বিপদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই রাজনীতিজ্ঞান দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ বড়লাট বাহাদুরকে জেলে যাইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাঁহার মত অহিংসার উপাসকের পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন অবলম্বন করা সঙ্গত নহে, কারণ ইহা কখনও অহিংস থাকিতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীজীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, মহাত্মা যদি এমন কোন নীতি প্রস্তাব করিতে পারেন যাহা মানুষের ভিতর পাশবিক ভাবের অবসান ঘটাইবে এবং প্রত্যেক মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনিবে, তাহা হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা, যে অব্যক্ত শক্তি এই অর্দ্ধনগ্ন ফকিরের কার্য্যাবলী পরিচালিত করিতেছে তাহাই তাঁহাকে উপরোক্ত নীতি বড়লাটের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম করিবে। বড়লাট বাহাদুর কি প্রচলিত ব্যবহারিক নিয়মানুবর্ত্তীতা পরিত্যাগ করিয়া উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সঙ্কট সময়ে উপরোক্ত পন্থা ব্যতীত ভারতকে রক্ষা করিবার অন্য পন্থা নাই।

ভগবত কৃপায় ব্রিটীশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের দাম্ভিকতা ও বিবেক হীনতা অনুধাবন করিয়া তাহা সংযত করুন এবং ঐশী শক্তির ইচ্ছায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

চণ্ডীদাসের "পীরিতি"

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

চণ্ডীদাস যে গভীর প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা তিল-মাত্র উপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না। উপেক্ষায় এই প্রেম অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান, অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও মরণাকাঙ্ক্ষার রূপ ধারণ করে। প্রেমের এইরূপ বৈচিত্র্য বর্ণনায় কবির সমকক্ষ কেহ নাই।

অধীর প্রতীক্ষার পর যখন আশাভঙ্গ হইল তখন শ্রীমতী বলিতেছেন—

জাতী রুইনু যুথী রুইনু রুইনু গন্ধমালতী
ফুলের সুবাসে নিদ নাহি আসে পুরুষ নিঠুর জাতি।
কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেলাইয়া শেজ বিছাইনু কেনে
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায় রসিক নাগর বিনে।

পাছে বঁধুয়ার গায়ে কাঁটা বিঁধে সেই ভয়ে ফুলের বোঁটা ফেলিয়া কেবল পাঁপড়ি দিয়া শয্যা বিছাইলাম—কিন্তু রসিক-নাগরের না আসায় তাহা কাঁটায় ভরিয়া উঠিল—

পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির সখীরে কহিছে ধনী
বাহির হইয়া দেখলো সজনী বঁধুর শব্দ শুনি।
পুন কহে রাই না আসিলে বঁধু মরমে রহল ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া ভাঙ্গিব আমার মাথা।
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা শেজ বিছাইনু ফুলে,
সব হৈল বাসী আর কেন সই ভাসা গে যমুনা জলে।
কুসুম কস্তুরী চুবক চন্দন লাগিছে গরল হেন,
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী দংশিছে হৃদয়ে যেন।
সকল লইয়া যমুনায় ডার আর ত না যায় দেখা
ভালের সিঁদুর মুছি কর দুর-নয়ানে কাজর রেখা।
আর না রাখিব এছার পরাণ না যাব লোকের মাঝে
স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস আনিতে নিঠুর রাজে।

রাই ছার পরাণ ত রাখিবে না—

পরাণ গেলে কি হবে পিয়া দরশন?

প্রাণ হইতেও বঁধুয়া বড়। প্রাণ অতি তুচ্ছ—সে প্রাণ দিতে রাধার আপত্তি নাই—কিন্তু প্রাণ না থাকিলে বঁধুয়াকে কি করিয়া পাওয়া যাইবে? বঁধুয়ার জন্যই প্রাণ রাখিতে হইবে—মহাশ্বেতার মত জপমালা ধরিয়া অথবা শবরীর মত অর্ঘ্য সাজাইয়া।

রাধার আক্ষেপে নিখিল-জগতের সকল উপেক্ষিত হৃদয় হইতে উদ্গত যুগ যুগান্তরের বিলাপ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
কোন বিধি সিরজিল সোঁতের সেঁওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

শ্রীমতী বলেন—বঁধু আজ কি মনে পড়ে—'মুই ত অবলা অথলা হৃদয় ভাল মন্দ নাহি জানি' বনের হরিণীকে বাঁশীর তালে ভুলাইয়া হাতে চাঁদ দিলে—

যখন নাগর পীরিতি করিলা সুখের নাইক ওর।
স্রোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা কাটিল প্রেমের ডোর।

ভুলিয়া গেলে—

নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু ডালি
হাতে হাতে মাথে নিল কলঙ্কের ডালি।
এতেক সহিল অবলা বলে ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।

তোমাকেই বা কি দোষ দিব? সকল দোষ আমারই—

সকল আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ
না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি কাহারে করিব রোষ।
সুধার সাগর সমুখে দেখিয়া আইনু আপন সুখে
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুখে।

কিন্তু আমার জানা উচিত ছিল—

১। সোনার গাগরী যেন বিষ ভরি দুধেতে ভরিয়া মুখ
বিচার করিয়া যে জন না খায় পরিণামে পায় দুঃখ।
২। ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পুরিয়া যতনে তাহাকে পুষে
কোন একদিন সেই বাদিয়ারে দংশে সে আপন রোষে।

রাধা সখীদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন—'আর কেহ যেন এ রসে ভুলে না ঠেকিলে জানিবে শেষে।'

সই আমার বচন যদি রাখ
ফিরিয়া নয়ন কোণে না চাহিও তার পানে কালিয়া বরণ যার দেখ।

পীরিতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে কখন তাহার নয় ভাল
কালিয়া ভূষণ কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশিনিশি অনুখন প্রাণ করে উচাটন বিরহ আগুনে জ্বলে তনু
ছাড়িলে ছাড়ান নয় পরিণামে কিবা হয় কি মোহিনী জানে কালা কানু

বলিতেছি বটে সই—ছাড়িলে ছাড়ন যায় না যে। আমি ত ভুলিবার চেষ্টা কম করিতেছি না—

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে এবড়ি মরমে বড় ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই কানাকানি শুনি এই কথা।
সই—লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো তাজিয়াছি কাজরের সাধ।
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি নাহি চাই তরুয়া কদম্বতরু পানে।
সেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটি শুনিয়া গো দুটিহাত দিয়া থাকি কাণে ॥

কিন্তু জলও ঢালিতে হয়—চুলও এলাইতে হয়—

কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে
নিরবধি দেখি কালো নয়নে স্বপনে।
কালকেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি
করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি।
সখি—কি বুকে দারুণ ব্যথা
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরীতির কথা।
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া যেজন পীরিতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।

...

দিবস রজনী গুণি গুণি গুণি কি হৈল অন্তরে ব্যথা
খলের বচনে পড়িয়া শ্রবণে খাইনু আপন মাথা।
কে বলে পীরিতি ভাল ওগো সখি কে বলে পীরিতি ভাল
সে ছার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে সোণার বরণ কালো।
বিষের গাগরী ক্ষীর মুখে ভরি কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার এ বধ কাহারে লাগে।
নীরলোভে মৃগী হরিষে ধাইতে ব্যাধ শর দিল বুকে
জলের শফরী আহার করিতে বড়শী লাগিল মুখে।
নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী চঞ্চু পশারল আশে
বারিক বারণ করিল পবন কুলিশ মিলল শেষে।
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া অবলা বালারে দিল,
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে নিকটে মরণ ভেল।
লাগ হেম পেয়ে যতনে বাঁধিতে পড়িল অগাধ জলে
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে।

উপেক্ষিতা রাধার প্রাণের বেদনা বুঝাইতে শ্যামের পীরিতি কত ভাবেই উপমিত হইয়াছে। এ সমস্তই গভীর প্রণয়-মথিত অভিমানের বাণী।

১। নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর লেহা।
২। আপনা খাইনু সোণা যে কিনিনু ভূষণে ভুষিব দেহ
সোণা যে নহিল পিতল হইল এমতি কানুর লেহ।
৩। কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয়।
৪। মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া উপরে দেওল চাপ
আগে সুধা দিয়া মারল বাঁধিয়া এমন করয়ে পাপ।
নৌকায় চড়ায়ে লয়ে দরিয়ায় ছাড়য়ে অগাধ জলে
ডুবু ডুবু করে ডুবিয়া না মরে উঠিতে না পারে কূলে।

অনুরাগের একটি প্রধান অঙ্গ অনুযোগ। এই অনুযোগে যে অভিমান মিশ্রিত আছে—তাহাই রসের প্রেরণা।

ছায়ার আকার ছায়াতে মিলায় জলের বিম্বফি প্রায়
হেন নিশাকালে নিশার স্বপনে তেমতি পীরিতি ভায়।
তেমতি তোমার পীরিতি জানিনু শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে ভাসাইলে দরিয়ায়।

'যেদিন যাইয়া ধরেছিলে দুই পায়' সেদিনের কথা ভুলিয়া গেলে? যেদিন দশনে কুটা ধরিলে সেদিনের কথা ভুলিয়া গেলে? শপথি করিয়া পীরিতি করিলে তাহা কই রাখিলে? আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম পুরুষ বলিয়া উদাসীন হইয়া আছ।

ভুজঙ্গ সমান যেন তুয়া মন তোহার চলন বাঁকা
তোমার অন্তর সেই সে সোসর এদুই তুলনা একা।
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী হৃদয়ে বিষের রাশি
অন্তরে কুটিল মুখে মধু ধর আমরা এমন বাসি।

শ্রীমতী বড় বেদনাতেই বলিতেছেন—

বঁধু কি আর বলিব তোরে
অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধ
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বতলে
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে।
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ কুলের বালা
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পীরিতি কেমন জ্বালা।

দারুণ অভিমানে শ্রীমতী ভুরু নাচাইয়া বলিতেছেন—

পীরিতি করিলে কেমন দগধিলে বিরহবেদনা দিয়া
কালিয়া কঠিন তুয়া অকরুণ নিদারুণ তোর হিয়া।
পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায় পীরিতি ছাড়িতে নারে
পীরিতি রসের পশরাটি তাকি রাখালে বহিতে পারে?

যে জন রসিক রসে ঢবঢর মরমী যেজন হয়,
হেরেরেরে করে ধবলী চরায় সেজনা রসিক নয়।
রসিকের রীতি সহজ সরল রাখালে তাহা কি জানে?
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা সুধাসম কানু মানে।

শ্রীমতী রুষিয়া বলিলেন—যে গোরু চরায় সে কি পীরিতির মর্ম্ম জানে? শ্রীমতীর এই গঞ্জনা কানুর কাছে সুধার মত মধুর লাগিল। প্রেমের ইহাই ধর্ম্ম। প্রেয়সীর ভৎ'সনা প্রেমের কলকাকলীর মত। এই অনুযোগের মাধুরীর লোভেই দয়িত নব নব অপরাধ করে।

জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

কুটিল নেহারি গারি যবে দেয়রি তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন।
দেবস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।

প্রেমের এ রঙ্গ প্রেমিক বুঝে।

প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ—কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পীরিতি নিজেই জ্বালাময়ী—পীরিতির স্পর্শ একবার লাগিলে তাহার জীবনে স্বস্তি সুখ চিরদিনের জন্যই গেল।

অন্তরে ইহার স্পর্শ লাগিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—

সব কলেবর কাঁপে থর থর ধরণ না যায় চিত
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি শুনহ পরাণমিত।

শ্রীমতী বলিতেছেন—

সজনি, না কহ ওসব কথা
কালিয়া পীরিতি যার মরমে লাগিয়াছে জনম অবধি তার ব্যথা।
কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে বুকের পাঁজর ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।
যে জন পীরিতি করে
তুষের অনল সাজাইয়া যেন এমতি পুড়িয়া মরে।

... ...

আন সে আনল বারি ঢালি দিলে তখনি নিবিয়া যায়,
মনের আগুন নিবাইব কিসে দ্বিগুণ জ্বলিয়ে যায়।
বন পোড়ে বলে বনের আগুনি দেখয়ে জগৎলোকে
এবড় বিষম শুনগো সজনি জলে উঠে বিনা ফুকে।

... ...

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর ভুবনে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে।

বল কিবুদ্ধি করিব এখন ভাবনা বিষম হ'ল
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ণি কি হলে হইবে ভাল।

... ...

না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হলো
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।

পাশরিতে চাহি যদি পাশরা না যায়
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়।

... ...

আর কেহ যেন এ রসে ঠেকেনা ঠেকিলে জানিবে শেষে।

... ...

পীরিতি আদর করিয়া সখিলো কেবা কোথা ভাল আছে।

... ...

চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভাল কালায় পীরিতি লেঠা
যেমন জানিবে সরোরুহ ফুল তাহার অঙ্গেতে কাঁটা।

এই যে জ্বালা, ইহা পীরিতির অঙ্গীভূত—সকল পীরিতি সম্বন্ধেই এই কথা। রাধার পীরিতিতে এ জ্বালা আছেই—তারপর আছে গুরুজন-জ্বালা। এই গুরুজন-জ্বালা ও কলঙ্কের জ্বালা রাধাপ্রেমকে গাঢ়তর ও গভীরতর করিয়াছে—ইহাই রাধাকে প্রেমরণরঙ্গিণী করিয়া তুলিয়াছে—রাধার অন্তরের সমস্ত প্রসুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছে। সেই সমস্ত শক্তি প্রেমকে শক্তিমান্ করিয়াছে—অন্যদিকে ইহা পাষাণের মত রসধারাকে অবরোধ করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও কলধ্বনিময় করিয়া তুলিয়াছে। মাধুর্য্যে ইহা সঞ্চারী ভাব যোগাইয়াছে—তাহা অপূর্ব্ব রসে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

মুরলীতান শুনিয়া রাধার প্রাণ বনের দিকে ছুটিতে চায়—কিন্তু উপায় নাই। সখীকে বড় দুঃখেই বলিতেছে—

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই অফুরাণ হলো গৃহকাজ
খাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে তাহার অধিক দ্বিজরাজ॥
যে কুলে বিচ্ছেদ ভয় একুলে নহিলে লয় সুসারিতে নিশি গেল আধা
হাসিয়া মদনসখা হেনকালে দিল দেখা কহ দূতি কি করিবে রাধা?
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেরাইতে চায় পাখী তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়—ইত্যাদি

এই কবিতা আমাদের চিত্তকে প্রাকৃত প্রেমের গণ্ডী ছাড়াইয়া লইয়া যায়।

শ্রীমতী বলিয়াছেন—'যেন বেড়াজালে শফরী সলিলে

তেমতি আমার ঘর'। অভিসারে যাওয়ার উপায়ও নাই—ঘরের মধ্যেও অনেক সাবধানে থাকিতে হয়—

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া।
পুলক পুরয়ে অঙ্গ আঁখি ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল।

শ্যাম-প্রসঙ্গ উঠিলে মনে সাত্ত্বিক রসের উদয় হয়—তাহাতে অঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে—বহু চেষ্টা করিয়া সে রোমাঞ্চ গোপন বা সংবরণ করিতে হয়। ইহা কি কম দুঃখের কথা? সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অবহিত্থা নামক সঞ্চারীভাব বলিয়াছেন। কাঁদিবারও উপায় নাই—তাই চোখ বুঁজিবার উপায় নাই—

"দু আঁখি মুদিলে বলে কানু লাগি কাঁদি।"

রাধা বলিতেছেন—

আঁধুয়া পুকুরে যে মীন রহয়ে ঝাঁপয়ে ধীবর জালে
তেন হাম আছি এঘর করণে গুরুজনা যত বলে।
ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটয়ে দেহ
আমার দুখের আচার বিচার একথা বুঝিব কেহ।
বণিকজনার করাত যেমন দুদিক কাটিয়া যায়
তেমন আমার গুরুজনা কাটে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

'ননদীর কুবচনে আমার দেহ ভাজা ভাজা'—'আমার পরবশ পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ'—'ননদীবচনে পাঁজর বিঁধিল ঘুণে।' সে ননদী—

নয়নে নয়নে নয়ন পিঞ্জরে রাখয়ে আপন কাছে
জলে যাই যাবে সাথে চলে তবে শ্যামেরে দেখি সে পাছে।
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন যেমন তরাসে কাঁপে
আমার তেমতি ঘরের বসতি গরজি গরজি ঝাঁপে।

শ্রীরাধার বলিবার কথা—পিঞ্জরে বসিয়া তোমারে ভাল-বাসিতে হয়—এ কথা কি ভাবিয়া দেখিবে না?

"আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যেতে পথ নাই।"

কেবল গুরুগঞ্জনা নয়—লোকগঞ্জনাও আছে। আচ্ছা সখী জিজ্ঞাসা করি—

গোকুলনগরে আমার বঁধুরে সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে লোকে কেন এত হাসে।

সখী, সব চেয়ে ঘৃণার কথা—

কহিও তাহার পাশে
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে সে মোরে দেখিলে হাসে।

জানি না কাহার ধন আমি কাড়িয়া লইলাম।

একদিকে 'কুলের করাতি' অন্যদিকে 'শ্যামের পীরিতি'—এই দোটানায় শ্রীমতীর মন দোল খেলিয়াছে—আর চণ্ডীদাস রঙ্গ উপভোগ করিয়া বলিয়াছেন—

যেই মনে ছিল তাহা না হইল সোঙরি পরাণ কাঁদে
লেহ দাবানলে মন যেন জ্বলে হরিণী পড়িল ফাঁদে।
পালাইতে চায় পথ নাহি পায় দেখিয়ে অনলময়
বনের মাঝারে ছটফট করে কত যে পরাণে সয়।

এ কিরূপ দশা—না—

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।

শ্রীমতী বলেন—চরণ থাকিতে আমি পঙ্গু, বদন থাকিতে আমি মূক আর নয়ন থাকিতে আমি অন্ধ—

চরণ থাকিতে না পারি চলিতে সদাই পরের বশ
যদি কোন ছলে তার কাছে এলে লোকে কবে অপযশ।
বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঁইসে অবলা নাম
নয়ন থাকিতে সদা দরশন না পেলাম নবশ্যাম।

এই দোটানা যখন অসহ্য হইয়াছে শ্রীমতী তখন গালাগালি করিয়াছেন, পাপপড়সীদের অভিসম্পাত দিয়াছেন—

সব কুলবতী করয়ে পীরিতি এমতি না হয় তারে
এ পাপ পড়সী সকল ডাইনী সকলি দোষায় মোরে।
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়।
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর।

আবার মরণ চাহিয়াছেন—কিন্তু মরণও হয় না—

"নবীন পাউষের মাছ মরণ না জানে।"

মরিলেও কি কলঙ্ক যাইবে? 'বিষ খেলে দেহ যাবে রব রৈবে দেশে'। শ্রীমতী শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহিনী—

কানুসে জীবন জাতি প্রাণধন এদুটি আঁখির তারা
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি নিমিখে নিমিখে হারা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি যার যেবা মনে লয়
ভাবিয়া দেখিনু শ্যামবঁধু বিনু আর কেহ মোর নয়।
যে মোর করমে লিখন আছিল বিহি ঘটায়ল মোরে
তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতী কুল লয়ে থাক ঘরে।
গুরু দুরজন বলে কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া
শ্যাম অনুরাগে এতনু বেচিনু তিল ও তুলসী দিয়া।
পড়সী দুর্জ্জন বলে কুবচন না যাব সে লোকপাড়া
চণ্ডীদাস কয় কানুর পীরিতি জাতি কুলশীল ছাড়া।

শ্রীরাধার প্রেমের এই দ্বন্দ্ব-লীলার শেষ সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মরণ—

সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন। ইহা রস-জীবনের পরম সাধনা—সকল প্রেমেরই এই ধারা। সাধক জীবনে এই ধারা অনুসরণ করিয়াই শেষে পরমেষ্ট ধনকে লাভ করে।

আত্মসমর্পণের আকুলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটি পদ তুলি—

জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণসম পরাণ বঁধুয়া তুমি।
সখীগণ কহে শ্যাম সোহাগিনী গরবে ভরয়ে দে
হামারি গৌরব তুহুঁ বাড়াইলি অব টুটায়ব কে।
তোহারি গরবে গরবিনী হাম গরবে ভরল বুক
চণ্ডীদাস কহে এমত নহিলে পীরিতি কিসের সুখ।

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ না হইলে পীরিতি জ্বালাময়ই থাকে—আত্মসমর্পণেই সুখ—পরম মুক্তি।

বন্ধু কি আর বলিব আমি
তোমা হেন ধন অমূল্যরতন তোমার তুলনা তুমি।
অবলাজনের দোষ না লইবে তিলে কত হয় দোষ,
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িও মোরে না করিও রোষ।
তুমি যে পুরুষ শকতি ভুষণ সকল সহিতে হয়
কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া ছাড়িতে উচিত নয়।
তিলেক না দেখি ও চাঁদ বদনে মরমে মরিয়া থাকি
নয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া চণ্ডীদাস আছে সাখী।

সত্যই রাধার আত্মবিস্মৃত সর্বস্বপণ প্রেমের যদি সাক্ষ্য মানিতে হয়—তবে চণ্ডীদাস হইতে বড় সাক্ষী আর মিলিবে না। দুই-তিনটি পদ একত্র করিয়া তুলিয়া দিই—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে জীবনে প্রাণনাথ হইও তুমি।
বহু পুণফলে গৌরী আরাধিয়ে পেয়েছি কামনা করি
কি জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে তেঁইসে পরাণ ধরি।
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে বিধি মিলাওল আনি
পরাণ হইতে শতশতগুণে অধিক করিয়া মানি।
আনের আছয়ে আনজন যত আমার পরাণ তুমি
তোমার চরণ শীতল জানিয়ে শরণ লয়েছি আমি।
গুরুগরবিত তারা বলে কত সে সব গৌরব বাসি
তোমার কারণে এত না সহিয়ে দুকুলে হইল হাসি
শুন হে নাগর করি জোড়কর এক নিবেদিয়ে বাণী
এই কর যেনে ভাঙ্গে নাহি যেন নবীন পীরিতিখানি।
কুলশীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি কালি দিয়া দুই কুলে
এ নব যৌবন পরশ রতন সঁপেছি চরণ তলে।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী।
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে।
এ কুলে ও কুলে গোকুলে দুকুলে আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।
সতী বা অসতী তোহে মোর পতি তোহারি আনন্দে ভাসি
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর ভূষণে দূষণ বাসি।
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া মরি।

আর একটি পদ উদ্ধরণ করিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করি—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লব।
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে ওপদ করেছি সার
ধন জন মন জীবন যৌবন তুমি সে গলার হার।
স্বপনে শয়নে নিদ্রা জাগরণে কভু না পাসরি তোমা
অবলার ত্রুটী শত হয় কোটি সকলি করিবে ক্ষমা।
না ঠেলিহ বলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর
ভাবিয়া দেখিনু তোমা বঁধু বিনে আর কেহ নাই মোর।
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি তবে যে মরিব আমি
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে দয়া না ছাড়িহ তুমি।

অসূয়া ও অমর্ষ গভীর অনুরাগের একটি অঙ্গ। শ্রীমতী কুল-মান-শীল সমস্তের শিরে পদাঘাত করিয়া নিজের যৌবন জীবন সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রত্যাশা করেন শ্রীকৃষ্ণ রাধা ছাড়া অন্য কাহারও প্রেমে বাঁধা পড়িবেন না। শ্যামনিন্দা তিনি সহিতে পারেন না—শ্যামানুরাগের নিন্দাও তিনি সহিতে পারেন না—শ্যামের সোহাগে অন্য কেহ অংশিনী হয়—তাহাও তিনি সহিবেন কেন? ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্।

রাধিকার প্রতিনায়িকা কেহ না থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু প্রতিনায়িকা না হইলে রসোৎসবের পরিপূর্ণতা হয় না,—রাধার প্রেমের মূল্য-মর্যাদাও বাড়ে না। প্রেম-লীলার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া কাব্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বৈষ্ণব কবিগণ চন্দ্রাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর নাম পুরাণে আছে—কবি চন্দ্রাবলীতে জীবনসঞ্চার করিয়া রাধানুরাগে নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন।

বাসক-সজ্জা করিয়া রাধিকা শ্যামের জন্য সারারাত্রি প্রতীক্ষা করিলেন—শ্যাম আসিলেন না। মালতীর মালা শুকাইল, অগুরু চন্দন চুয়ার আয়োজন ব্যর্থ হইল,—রাধার বেণীবন্ধন শিথিল হইল না—তাহার অঙ্গের মৃগমদ পত্রলেখা লুপ্ত হইল না—শ্যাম আসিলেন না। শ্যাম তবে কোন্ কুঞ্জে গেলেন?

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে শ্যাম—

"গলে পীতবাস করিয়া সাহস দাঁড়াল রাইএর আগে।"

রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি নাগরেরে পাড়ে গালি—

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ঐখানে থাক

মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ।

নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে কালোর উপর কালো

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে আজ ভাল।

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও নয়ন ভরিয়া দেখি।

নীল কমল ঝামর হয়েছে মলিন হয়েছে দেহ

কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি নিঙাড়ে লয়েছে সেহ।

এইভাবে রাধার প্রাণের বেদনা গভীর ব্যঙ্গরূপ ধরিয়া ব্যঞ্জনাগর্ভ রস-কবিতায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমতী যে কথা বলিলেন তাহা সাংঘাতিক—

শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত

এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত।

সাধিলে মনের কাজ কি আর বিচার

দূরে বহু দূরে রহ প্রণাম আমার।

চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে

চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে।

সত্যই তাই। শ্রীমতী ব্যঙ্গভরে বলিলেন—তোমাকে এতকাল চুম্বন করিয়াছি—আজ প্রণাম গ্রহণ কর। এই প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া রাধা উচ্চতম প্রেমসম্বন্ধকে সাধারণ পতিপত্নীর লৌকিক সম্বন্ধে নামাইয়া যে কোপ প্রকাশ করিলেন—এইরূপ কোপ আর কিছুতে প্রকাশ পাইতে পারে না। প্রেমের পাত্রকে ভক্তির পাত্র বলিলে তাহাকে বুক হইতে সরাইয়া মাথায় রাখা হয়—তাহাতে নিকটকে দূর করা হয়। ইহাতে অভিমানের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"এ কথা বলিলে কেমনে?" যে ভক্তি প্রেমের তরল অবস্থা শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তির ভয় দেখাইলেন। দাস্যরস নিম্নস্তরের বস্তু—দাস্যরসের স্তরে নামিয়া আসিয়া শ্যামকে দণ্ড করিতে চাহিলেন। মাধুর্য্যের ক্ষীর-সরোবরের কলহংসকে দাস্যরসের ক্ষারসরোবরে টানিয়া আনার মত দণ্ড আর কি আছে?

তারপর শ্রীমতী মানে বসিলেন—দুর্জ্জয় মানে। সখীরা অনেক সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। শ্যামের হইয়া ওকালতি করিতে আসিয়া তাহারা বলিল—

সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত না বৈসে নদীর তীরে

নবজলধর বরিষণ বিনে না পিয়ে তাহার নীরে।

যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে পিবয়ে সে নীর ঘোর

তবহু তাঁহারি জল সোঙরিয়ে গলে শতগুণ লোর।

চাতক নবজলধর ছাড়া পিয়াসা নিবারণ করে না—কখনও নদীর জল স্পর্শ করে না। তবে পিপাসার আধিক্য হইলে যদি সামান্য নদীর জল পান করে—তবে জলধরের নাম স্মরণ করিয়া তাহার চোখ দিয়া শতগুণ নীর প্রবাহিত হয়, অতএব শ্যাম-চাতকের অপরাধ ক্ষমণীয়।

শ্রীমতীর উত্তুঙ্গ মান-শৈল তাহাতে বিগলিত হইল না—তখন সখীরা শাসাইয়া বলিলেন—

তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক তাহে ময়ূরের পাখা

তোমাহেন কত কুলবতী সতী দুয়ারে পাইবে দেখা।

মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া নিভাইবে আর কিসে

শ্যামজলধর আর মিলিবেনা কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

এই ভাবে শ্রীমতীর আশঙ্কার সঙ্গে অনুতাপ জন্মিল—

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু কাহে করিনু হেন মান

শ্যাম সু নাগর নটবর শেখর কাঁহা সখি করল পয়াণ?

তপ বরত কত করি দিন যামিনী যো কানু কো নাহি পায়

হেন অমূল্য ধন মঝুপদে গড়ায়ল কোপে মুই ঠেলিনু পায়।

জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া

কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল গোড়া কেটে আগে জল দিয়া

এ দিকে শ্যামের অবস্থাও তথৈবচ। শ্রীকৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন—

হাত দিয়া দেখ সই মোর কলেবর

ধান দিলে হয় খই, বিরহ প্রখর।

জিহ্বা খণ্ড খণ্ড হলো রাধা রাধা বলি

তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হৈল শলি।

মরিলে পোড়াইও সই যমুনার কিনারে

সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে

মরিবার বেলে রাধা সেঁওরাও একথা
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা।

সখীরা আবার রাধার কাছে গেলেন—তখন রাধা কৃপা করিলেন।

এই যে মানের লীলা—ইহার কতকটা প্রথাগত,—সংস্কৃত সাহিত্য ও সেকালের সাহিত্যে যেরূপ নির্দ্দেশ ছিল বৈষ্ণব কবি তাহার কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতকটা চণ্ডীদাসের নিজস্ব। বাঙ্গালী কবির নিজস্ব অংশই সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্টতর। গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাষায় মান ভঞ্জন করিয়াছেন—তাহা প্রাণের ভাষা নয়। তাহা বরাত-দেওয়া অলঙ্কৃত ভাষা—ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিয়াছিলেন, নতুবা শ্রীমতী নাটুকে ভাষায় আরও চটিয়া যাইতেন। চণ্ডীদাসের মানলীলায় একটা অকৃত্রিম মাধুর্য্য আছে - কবি কোথাও রসশাস্ত্রের প্রথা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিরা দুইবার মানের অবতারণা করিয়াছেন—একবার রাসলীলার পূর্ব্বে—আর একবার চন্দ্রাবলী-প্রসঙ্গে। দুই মানের মধ্যে পার্থক্য আছে।

বংশীধ্বনি শুনিয়া শারদ পূর্ণিমায় শ্রীমতী শ্যামের নিকট গেলেন। শ্যাম বলিলেন—সতীধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম, তাহাই রক্ষা করা উচিত। যে শ্রীমতী শ্যামের জন্য কুল-শীল-মান-লাজ সব বিসর্জ্জন দিয়াছেন—অনবরত লোকগঞ্জনা ও গুরুজন-তর্জ্জন সহ্য করিয়াছেন—সেই শ্রীমতীকে কি না সতীধর্ম্মের কথা তুলিয়া প্রত্যাখ্যান। এখানে যে রাধার দুর্জ্জয় অভিমান হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? রাধার মুখে এখানে দারুণ আক্ষেপ উদ্গীর্ণ হইয়াছে—উহা তিরস্কারের রূপ ধরিয়াছে—কিন্তু অপর রমণীর নাম দিয়া ব্যঙ্গ করা চলে নাই। চন্দ্রাবলী সম্পর্কীয় মানের তুলনায় এ মান দুর্জ্জয়। এই মান ভাঙ্গাইতে সখীদের ও শ্রীকৃষ্ণের বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। কবি এই মানভঞ্জনের জন্য প্রকৃতির সহায়তাও লইয়াছেন।

শ্রীমতী মাধবীতলে মান করিয়া বসিয়া আছেন—এক কোকিল ডালে বসিয়া পঞ্চমে তান ধরিল। কোকিলের তানে প্রাণের সঙ্গে মান গলিয়া যাইবার কথা। শ্রীমতী কোকিলের গায় কালার রঙ দেখিয়া করতালি দিয়া উড়াইয়া দিল।

তারপর ময়ূর ময়ূরী আসিয়া নাচিতে লাগিল। ময়ূর ময়ূরীর রঙ্গনৃত্য দেখিয়া শ্রীমতীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু কালার চূড়ার সঙ্গে ময়ূরের পাখার সম্বন্ধ আছে বলিয়া এবং কালার রঙের সঙ্গে তাহাদের কণ্ঠের রঙের সাদৃশ্য বলিয়া শ্রীমতী তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন।

তারপর ভ্রমর ভ্রমরীর পালা।

শ্রীমতী অঞ্চলের আঘাতে শ্যামের বর্ণে কলঙ্কিত চঞ্চল চঞ্চরীগণকে দূর করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়—অঙ্গের নীল কাঁচুলি পর্য্যন্ত দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

কাল আভরণ তেয়াগি তখন পরল ধবল বাস।

এই দুর্জ্জয় মান দূর করিবার জন্য যে নারীকে শ্যাম উপেক্ষা করিয়াছিলেন নিজের সেই নারীরূপ ধরিতে হইয়াছিল।

নাপিতানীর ছদ্মে কবি রাধার চরণ ধরাইয়াছেন—

চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে।

তারপর রাধা দেখিলেন—

কিছার মানের দায়ে রমণী সাজিল
এতবলি সুন্দরী পাশে দাঁড়াইল।

[ক্রমশঃ

কথা-শিল্পী প্রভাতকুমার

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্র মোহন সরকার বি-এল

কথা-শিল্পী প্রভাতকুমারের অনন্য সাধারণ প্রতিভার একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। প্রভাতকুমারের স্থান কোথায় ভবিষ্যত তাহা নির্ণয় করিবে।

এই রবীন্দ্র-যুগেও প্রভাতবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ে নাই বলিলেও অত্যুক্ত হইবে না। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা কম কথা নহে। প্রভাতবাবুর 'বস্তুশিশু' গল্পটি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন শেষে সেই লেপচা রমণীর অমানুষিক কার্য্য গল্পটিকে এক অভিনব পরিণতিতে লইয়া গল্পটিকে এক বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, এবং ঐ গল্পটিতে যে ব্যথার রেশ রাখিয়া যায় তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব।

তারপর তাঁহার গল্পগুলি একঘেয়ে নয়। তাঁহার গল্পে শুধু বাঙ্গালার চিত্র নয় তাহাতে কখনও কখনও সেই সুদূর ইংলণ্ডের ঘরের কথা ছোট তুলির টানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনও ভারতের পশ্চিম প্রদেশের ছবি পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন আবার কখনও বাঙ্গালার চিরন্তন শ্যাম-শোভা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এমনি নানাদেশের ছবি দেখিতে দেখিতে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তম্ভিত করিয়া রাখে।

তারপর তিনি সামান্য একটু তুলির টানে সব ছবিটি নিঁখুতভাবে একখানি চলচ্চিত্রের মত পাঠকের মনে অঙ্কিত করিয়া দেন। তাঁহার 'কাশিবাসিনী' গল্পে রেলের বাবুর গৃহখানি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল, রাস্তা হইতে সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দার মত। তারপরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর। একটি কাঠ রাখিবার ঘর—কপাট নাই। উঠানটি টালি বিছান। মধ্যস্থানে আলিশাযুক্ত কূপ—মাসিক ভাড়া ৩॥০ টাকা। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ—একটি চক্ষুগম্য করিয়া দেখিল"—অন্যস্থানে লিখিয়াছেন,—"তিনি অল্প বিস্তর ইত্যাদি গান করিতেন।"

'কাশিবাসিনী' গল্পে কাশিবাসিনীর শেষ আশীর্ব্বাদ যেমন করুণ তেমনি সামান্য কথায়—'সাবিত্রী হও'। এই একটি কথায় তাঁহার সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করিয়া পাঠকের সম্মুখে তার জীবনের মর্ম্মন্তুদ বেদনার একটা ইঙ্গিত করিয়া গেল।

তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর। পাঠককে 'না' বুঝিতে দেওয়ার ভাষা তাঁহার ছিল না। এমন সরল ভাষাতে গল্প লিখিতে বঙ্গভাষায় রায় জলধর সেন বাহাদুর সক্ষম ছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত গল্প লেখকগণ ভাষাকে একটু ঘোরালো করলে একটা কৃতিত্ব মনে করেন। কিন্তু প্রভাত বাবুর ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ছিল। এই দিক হইতে তিনি অন্যান্য গল্প লেখক হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন।

তিনি তাঁহার তুলির স্পর্শে সমাজের চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'আমার উপন্যাস' গল্পে কন্যাদায়ের চিত্র, তৎসঙ্গে বিমাতার অত্যাচার, পাচক ঠাকুরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদিতে 'সমাজ ব্যাধি কন্যাদায়ের' নির্ম্মম কাহিনী নিপুন হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি সমাজকে কষাঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করেন নাই, তিনি সমাজের ব্যথাকে মৃদু স্পর্শ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সহানুভূতির অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। এমনি করিয়া সমাজচিত্র অঙ্কিত করিতে এক প্রভাতবাবু ও জলধর সেন মহাশয় সক্ষম হইয়াছেন।

বর্ত্তমান তরুণ লেখকগণ অথবা তরুণ পন্থী লেখকগণ সমাজচিত্রের নামে স্থানে স্থানে বীভৎস নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়া ও অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া সহজে বাহবা পাইতে চান ও 'রিয়ালিষ্টিক্ স্কুলের' লেখক বলিয়া নিজকে জাহির করিতে যাইয়া সমাজের ললাটে পঙ্কতিলক পড়াইতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাতে সমাজের শিরে পঙ্কের তিলক ধারণেই শেষ হয়—পঙ্কোদ্ধার হয় না। এমনি আবিলতা হইতে প্রভাতবাবু দূরে ছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল কেন না তাঁহার সমাজের গ্রাম্য জীবন হইতে সহর এবং সহর হইতে বিলাতের সহর সর্ব্বপ্রকার জীবনের একটি নিঁখুত অভিজ্ঞতা ছিল। যখন এমনি অভিজ্ঞতার অভাব

হয় তখন কেবল নানা প্রকারের "ইসম্" দিয়া গল্প ভর্ত্তি করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। প্রভাতবাবু এই "ইসম্" হইতে বহু দূরে ছিলেন।

তিনি হাস্যরস অবতারণা করিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার "আম্রতত্ত্ব" গল্পে রেলের গার্ড ডি'সুজা সাহেবের নিজের নামের আমের ঝুড়ি হইতে নিজেই আম খাইয়া শেষে অনুশোচনা ও পরিতাপের সীমা ছিল না। ডি'সুজা সাহেবের নিজের কৃতদুঃখে পাঠকের হাসি রাখিবার স্থান নাই। এমনি অনেক হাসির ছবি তাঁহার তুলিতে সম্ভব হইয়াছে।

তিনি তাঁহার গল্পে বিলাতের সমাজের ছবি ও তাহার দোষ-গুণ অঙ্কিত করিয়াছেন। 'তাঁহার ফুলের মূল্য' গল্পে ইংলণ্ডের দরিদ্র পল্লীর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। মিসেস্ ক্লিফোর্ডের 'অঙ্গুরিয়ের মধ্যে ছবি দেখিয়া আশঙ্কা করা' রূপ কুসংস্কারের ছবি (যেমন বাস্তুসাপ গল্পে ভারতীয় কুসংস্কারের ছবি) ও পরিশেষে অ্যালিস্ মারগারেট ক্লিফোর্ডের ভ্রাতৃপ্রীতি ও তাহার সেই করুণ কাহিনী কেমন নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। ম্যাগিকে আর ইংলণ্ডের মেয়ে মনে হয় না, মনে হয় সেও আমাদের বাঙ্গালার স্নেহ-করুণ-কাতর ভ্রাতৃশোকাচ্ছন্ন ভগ্নি। অন্য গল্প লেখক হইলে এই গল্পকে কোথায় লইয়া যাইতেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু মনে হয় যেন এমনটি, এমন সুন্দর করুণ পরিসমাপ্তি হইত না।

তাঁহার অনেক উপন্যাস যেমন 'নবীন সন্ন্যাসী' হিন্দী ও ও মারাঠী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। জানি না, এমনি সৌভাগ্য বাঙ্গালায় কয়জন গল্প লেখকের ভাগ্যে হইয়াছে। এমনি অন্যভাষাতে অনুদিত হওয়া গল্প লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাবে বঙ্গভারতী কথা-সাহিত্যের দিক দিয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা যতই দিন যাইতেছে ততই অনুভব করিতে পারিতেছি। বাংলা-সাহিত্যে এখন বহু কথা-শিল্পী আত্মপ্রকাশ করিলেও প্রভাত বাবুর স্থান পূরণ করিবার লোকের অভাব অনুভূত হইতেছে।

ভ্রান্ত ধরণী গেছে বহুদূরে চন্দ্রসূর্য্য হ'তে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আসে আশ্বিন বরষে বরষে শত শত যুগ ধরি'
শুভ্র শরতে শেফালী-মাল্য পরি।
তেমনি এসেছে আশা-আনন্দে গন্ধে আবরি ধরা,
ধূসর আকাশে ঊষার কিরণ ফোটে;
নব কিশলয় কাশের গুচ্ছ গোষ্ঠ বীথিকা ভরা,
প্রাণ-দেবালয় প্রাঙ্গণ-পথে মানস-ভৃঙ্গ জোটে,
ওঠে মন্দিরে গীতির গুঞ্জরণ,
তবু মনে হয়, ভ্রমিতেছে ভয়,—চিত্তে বেদনা করিছে সঞ্চরণ।

হৃদয় ছায়ায় হত বাসনায় তবু ঝরে ফুলদল,
কাঁদে জীবনের প্রভাতের তরুতল!
অন্তর লোকে মুক্তি-স্বপন-ইন্দ্রধনুরে খুঁজি'
বাজে শৃঙ্খল বন্দিনী বিহগীর।
তন্দ্রাতীরের শিশিরের জল করে ছল্ ছল্ বুঝি,
মাটির তলায় নবাঙ্কুরের জমেছে নয়ন নীর।
যায় নি এখনো,—যাবে কি দুঃখ গ্লানি!
বন-মর্ম্মের মর্ম্মর ব্যথা পথে প্রান্তরে করিতেছে কাণাকাণি।

পূজা-উৎসব সমারোহে কোন অজ্ঞাত গৃহ কোণে
অবনতমুখী কুললক্ষ্মীর মনে
চলে যাওয়া কোন্ শারদ দিনের পার্ব্বণ হাসি গান
পেতেছে আসন স্বপন দুয়ার খুলে।
অকাজের যত বৃথা আলাপন যেথা হোল অবসান,
স্মরণের ডালি ভরিতে ভরিতে যায় সবে কাজ ভুলে,
সেথা বাজে বটে উৎসব বেণু বীণা!
তবু তো সুরের স্পন্দন নাহি,—রাগিনী হয়েছে দীনা।

বোধন প্রদীপে কুণ্ঠিত শিখা, কুম্ভে রোদন বারি,
পূজা উপচার সাজায় শীর্ণা নারী।
মেষ মহিষের বলিদান আর অজ-মানুষের বলি,
রক্ত জবায় প্রতিমার ফুলসাজ।
ঢাক ঢোল আর মরণ-তূর্য্য ধ্বনিত জীবন দলি'
বক্ষে বিশাল বনস্পতির বিনা মেঘে পড়ে বাজ;
তথাপি গগনে ঊষার দেউটি জ্বলে!
তথাপি তটিনী বুকে দোলে তরী,
আলোক ধারায় ঢেউগুলি নেচে চলে।

কৃষাণের ঘরে অশ্রুত কত অশ্রুর ইতিহাস
আসে বাহিরিয়া,—করে আছে উপবাস
কতদিন ধরে! হয় নি ফসল, এমনি ভাগ্যহত,
ছেলেমেয়ে সব মরে যায় অনাহারে।
করকা-আঘাতে সাধের কুটির বরষায় হোলো গত,
ভরসা কোথায়! কোন মহাজন দেয়নাক ঋণ তারে।
জমে আছে তার পিপাসার ব্যাকুলতা,
কেহ তো তাহারে বাস নাক ভালো,
কেহ তো শোনে না তাহারি দুঃখ কথা?

স্বার্থ-জড়িত পাগল-সাধনা খ্যাতির জন্য তব,
তামসিক পূজা করে গেলে আজ নব।
তোমারি মতন বাকী সব লোক করিছে আড়ম্বর,
অভাগার পানে তোমরা চাহনা কেহ,
দুঃখী জনের দুয়ারে কখন মিলিয়া পরস্পর
করোনি মিতালী,—পুষ্ট করেছ কেবলি তোমার দেহ।
বন্ধু! শিখেছ যুগের ধর্ম্মনীতি!
দীনতা বিরোধে মিলন-পন্থা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,—
জাগিছে জগতে ভীতি।

এই আশ্বিনে পুচ্ছ নাচায়ে গাহিতে চাহে না পাখী,
হংসপদিকা পায় না মিলন রাখী।
শুনেছ কি তুমি হত্যার কথা মাটির ঢেলার লোভে!
দস্যি ছেলের দেখেছ দস্যুরূপ?
দেখেছ কি কভু অধঃপাতের জনতারে বিক্ষোভে
এমন দিবসে ধ্বংসের লাগি জ্বালাতে বহ্নি ধূপ?
—তাণ্ডব নাচ কোন শতাব্দী কোলে!
উন্মাদনার চলে অর্চ্চনা কুটিরে কুটিরে কান্নার রোলে রোলে।

ভ্রান্ত ধরণী গেছে বহুদূরে চন্দ্রসূর্য্য হ'তে
নাহি রসতেজ ক্ষিতি তত্ত্বের পথে।
তাই তো গরল ক্ষীরোদ সাগর, পশু হয়ে গেছে নর;
যাবে কি অবনী রবির উৎস মুখে!
হয় তো তাহার ফিরিতেছে গতি,—গতি যেন মন্থর,
তাণ্ডব নাচ থামিবে হয় তো বর্ত্তমানের বুকে!
রাজার দুলাল! পেয়েছ কি তুমি ভয়?
মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ব্যতীত আজি মিলনের নাহি কোন পরিচয়।

বাঙ্গালার মাটি

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, এম-এ

বৃদ্ধ পেশকার অবিনাশ সেনকে চেনে না—এমন লোক বর্দ্ধমান সহরে খুব কমই আছে। তাঁর সুবিস্তৃত টাক, নিকেলের চশমা, কোঁচকান কপাল, কোটরগত-চক্ষু বিশ বছর ধরে সবার দৃষ্টি ও মনের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে। খোসবাগানের একখানা আধপুরাণো বাড়ীতে তিনি সুদীর্ঘকাল বাসা বেঁধে আছেন। খোসবাগান পল্লীর মাঝে এই বাড়ী আর এই মাথা-জোড়া টাকওয়ালা লোকটার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মা ষষ্ঠীর কৃপা তার উপর যে বর্ষিত হয় নাই—এমন কথা বলা চলে না। কন্যাভাগ্যের পরম স্বচ্ছলতা তাঁর পক্ষে যেমনি অসহ্য—পুত্রভাগ্যের নিতান্ত দৈন্যও তেমনি কষ্টকর। কন্যাব্যূহের একে একে সবগুলিরই গতি করেছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। বহু কষ্ট কল্পিত কঠোর বর্ণনার পরে পূর্ণচ্ছেদে এসে পৌঁছালে যেমন শান্তি—বিধাতারও দীর্ঘকালের কন্যা সৃষ্টির প্রয়াসের পর পুত্রে এসে থামাতে হয় ত' সেই রকম শান্তি—আর শ্রোতাদের মত গৃহস্থেরও কিছু কম নয়।

সুবিধার বিষয়, ভদ্রলোকের প্রতি লক্ষ্মীদেবীও কোনরকম কৃপণতা করেন নাই। মাসের শেষে ডান হাত দিয়ে যেটুকু পেতেন—সারা মাস ধরে বাঁ হাত দিয়ে পুষিয়ে নিতেন তার তিন গুণ। টাক, চশমা, ভুরু—সবাই মিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে আদালতে একান্ত 'অধৃষ্য' 'অনধিগম্য' করে তুলেছিল। কিন্তু তাঁর খোসবাগানের বাসায় বহু মৌমাছি নিজের খোরাকের মধু নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে খোস মেজাজে ঘরে ফিরে গেছে। কাজেই ব্যয়ের চেয়ে তাঁর আয়ের অঙ্ক অতিরিক্ত হওয়ায় মধুভাণ্ড পরিপূর্ণই থাকৃত। এই জোরেই পাঁচ পাঁচটী মেয়েকে পার বলে পার—একেবারে পদ্মা পার, ব্রহ্মপুত্র পার করে ছেড়েছেন—পুত্র নীলু অর্থাৎ নিখিলকে গঙ্গা পার করে কল্‌কাতার জল পেট ভরে খাইয়ে মেডিক্যাল কলেজের সমস্ত সিঁড়ি পার করে—সাত সমুদ্রের পরপারে শ্বেতদ্বীপে পাঠিয়েছেন।

অবিনাশ সেনের বাসার সামনেই প্রবীন উকিল বিশ্বেশ্বর চাটুয্যের বাসা। সহরে এমন বড়লোক নাই—যার সঙ্গে অবিনাশ বাবুর আলাপ নাই—বা যার কাছে সে খাতির পায় না। কিন্তু আলাপ বা খাতির আর বন্ধুত্ব এক কথা নয়। বন্ধুত্ব যদি তাঁর কারও সঙ্গে থাকে, তিনি এই বিশ্বেশ্বর বাবু। বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে অবিনাশ বাবুর অনেক দিক দিয়াই মিল—এমন কি বহু কন্যা ও এক পুত্রত্ব পর্য্যন্ত। অবিনাশ বাবু কিন্তু এক পুত্রে সন্তুষ্ট ছিলেন না—আর বিশ্বেশ্বর বাবুর কোন আপত্তি ছিল না। বিদেশস্থ ছেলের কথা ভেবে অবিনাশ বাবু মাঝে মাঝে বলতেন; 'বিশ্বেশ্বর, একপুত্র নিয়ে যাদের সংসার করতে হয়—তাদের ক্রমে ক্রমে পুত্র শোকের ব্যথাটাকে সইয়ে নিয়ে রাখ্‌তে হয়—কোন্ দিন কোন্ দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিব্‌বে কে বলতে পারে—আগে থাকৃতে তৈরী থাকাই ভাল।' বিশ্বেশ্বর চাটুয্যে কিন্তু এ দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী। তিনি বল্‌তেন, 'পুত্র একা,—পিতাও ত' একা।' তিনি এক পুত্রের ভরসাতেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পুত্রের বয়স ভর্ত্তি হবার আগেই—পুত্রবধূর মুখ দেখে—সংসারের অনেক ডালপালা বাড়িয়ে ফেলেছেন।

অবিনাশ বাবুকেও তিনি ছাড়েন নাই। নিখিল যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়্‌ছে—তখনই তার কোঁচার সঙ্গে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মেয়ে অনিলার শাড়ীর আঁচল বেঁধে দিলেন। তাঁর যুক্তিতে, ছেলে যত বড় হয়—ততই তারা নিজেরা চরে খেতে শেখে—পিতা মাতা-রূপ নগণ্য রাখালেরা ঝোঁপ ঝোড়ের আড়ালে কাঁটায় হাত পা ছিঁড়ে তাদের নাগাল থেকে বঞ্চিত হয়—আর ঠিক সেই সুযোগে কোন না কোন ডাইনী রাক্ষসী জোয়ান্ ছেলের নধর মাংস খাবার মতলবে নাগপাশ হেনে তাকে নিজের খোঁয়াড়ে চিরদিনের মত আটকে ফেলে। বলা বাহুল্য, নিখিলের ডাক্তারী পড়া শেষ হবার আগেই অবিনাশ সেনের বহু যত্নের পৌত্রীর জন্য তাকে অনেক অপ্রয়োজনীয় ডাক্তারী করতে হ'য়েছিল। যদিও পৌত্রীর চেয়ে পৌত্রমুখ দেখ্‌বার জন্য অবিনাশ বহু লালসান্বিত হ'য়ে পড়েছিলেন—তবু পৌত্রীর হাবভাব দেখে তাঁর খুব ভালই লাগ্‌ল। নাতনী দেখ্‌তে খুব ফর্‌সা

হ'য়েছিল ব'লে আদর ক'রে তার নাম দিলেন—মলিনা। ডাকনাম হ'ল মলি।

ক'ল্‌কাতার পড়া শেষ ক'রে নিখিলকে বিলাত যেতে হ'ল চক্ষুসম্বন্ধে বিশেষ বিদ্যা লাভ কর্‌তে। এতদিনে নিখিলও ছোটখাট একটি সংসারী হ'য়ে প'ড়েছে। তার মন চল্‌তে চায় না—কিন্তু পাকে চল্‌তে হ'ল। পিতার আকৃতি যেমন শত শত বছরের ঝড়-খাওয়া উঁচু-মাথা পাহাড়ের চূড়ার মত নিরেট—সময়ে সময়ে তাঁর প্রকৃতিও হয় আবার তার চেয়ে বহুগুণ কঠোর। অনিলার জলভরা চোখ, মলির হাসি-মাখা মুখ, ভাবতে ভাবতে আবছা দৃষ্টিতে কোন রকমে প্ল্যাটফরম্ পেরিয়ে সে বোম্বাই যাবার গাড়ীতে চ'ড়ে বস্‌ল। সেই গাড়ীতে তার এক বন্ধুও গেল—দাঁতের সম্বন্ধে বিশেষ চিকিৎসা শিখ্‌তে। সেই হিসাবে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাত্রাটা অন্ততঃ নিতান্ত একঘেয়ে বা নিঃসঙ্গ হয় নাই।

নিখিল আস্‌বার সময় মেডিক্যাল কলেজের তার এক প্রফেসারের কাছ হ'তে এক চিঠি এনেছিল বিলাতের এক ডাক্তারের নামে। তিনিই সেখানে তার থাক্‌বার খাবার সমস্ত ঠিক্ ক'রে দিলেন। নিখিল এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গৃহ-অতিথি হ'য়ে র'ল। যথাসময়ে বাড়ীতে চিঠি লিখল। সেখান হ'তেও তার বহু আকাঙ্ক্ষার পত্র এল। এমনিভাবে দিন চল্‌তে থাক্‌ল।

নিখিল যে বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল সে বাড়ীর গৃহ-স্বামী সাধারণতঃ কার্য্যব্যাপদেশে বাইরে থাক্‌তেন। গৃহকর্ত্রী বড় মহীয়সী মহিলা। তাঁর তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠার নাম এথেল। তিনি নিখিলকে কোন দিনের জন্য তাঁর মেয়েদের থেকে ভিন্নভাবে দেখেন নাই। কয়েকদিন পরে গৃহস্বামীর সঙ্গেও নিখিলের পরিচয় হ'ল। তিনিও মহৎ লোক। একটি অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে কয়লার খাদ দেখাশোনা করা তাঁর কাজ। স্ত্রী ও কন্যাগণকে সহরেই রেখেছিলেন—ছুটীর দিনে বাড়ী ফিরে আস্‌তেন।

ক্রমে ক্রমে গৃহকর্ত্রীর আর তাঁর মেয়েদের সঙ্গে, বিশেষতঃ, এথেলের সঙ্গে নিখিলের বেশ আলাপ জমে গেল। নিখিল তাদের কাছে ভারতের বিভিন্ন জনপদের কত বিচিত্র গল্পই না বল্‌ত—তারা এত তন্ময় হ'য়ে যেত যে চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে যেন তার কথাগুলো গিলে খেত। কোন একটা গল্প বল্‌তে গিয়ে মাঝখানে থেমে আবার নিখিল দুষ্টুমিও কর্‌ত। কোনদিন বল্‌ত—মনে কর এথেল—আমরা সুন্দরবনের নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি—স্যাঁতস্যাঁতে মাটির উপর দিয়ে নদীর চড়ায় চড়ায় হাঙ্গরেরা হাঁ ক'রে বেড়াচ্ছে—গাছে গাছে প্রকাণ্ড ময়াল সাপ দোল খাচ্ছে—লতাপাতার আড়ালে বুনো জানোয়ারেরা বিকট চীৎকার কর্‌ছে। সেইখানে মনে কর—হঠাৎ তোমার অত্যন্ত জলতেষ্টা লেগেছে—আমি লোণাজল বাঁচিয়ে ভাল জল পাবার আশায় অনেক দূরে চলে গেছি—এমন সময় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে তোমার সামনে এসে বার বার হালুম্ হালুম্ ব'লে তোমাকে নমস্কার জানালে—। এথেল ভীত চকিত হ'য়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলত—"না না জল আমার দরকার নাই—আমি শুকিয়ে ম'রে যাই সেও ভাল—তবু এ সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

হঠাৎ একদিন কি খেয়াল বশে এথেল জিজ্ঞাসা করল, "নিখিল, তোমার বিয়ে হয়েছে?"

নিখিলের সমস্ত দেহ টল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌ল। কি উত্তর দেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। একবার তার মনে হ'ল, যদি বিয়ে হ'য়েছে বলি, তাহ'লে হয় ত' এই মেয়েটির সঙ্গে আমার দুরত্ব যোজন পরিসর হ'য়ে পড়্‌বে। সে হয় ত' আমাকে সব রকমে এড়িয়ে চল্‌বে। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়, ক্ষণিকের উত্তেজনায় নিখিল ব'লে ফেলল, "না।"

বাস্—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু এই ছোট্ট 'না' কথাটির পরিণাম ক্রমে ক্রমে গভীরতর হ'য়ে দাঁড়াল।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। নিখিলের দেশে ফিরে আস্‌বার সময় হ'ল। তার চ'লে আসবার একদিন আগে হঠাৎ এথেলের পিতা ফিরে এলেন; তারপর তিনি এথেলের মাতা ও আরও কয়েকজন আত্মীয়বান্ধব সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্ত্তী একটি ছোট্ট গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনান্তে বিদায়যাত্রায় নিখিলের সহচরীরূপে এথেলকে তার সঙ্গে বেঁধে দিলেন। এথেলের মাতা ও তার ভগ্নীরা চোখের জলে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। এথেল ও নিখিল উভয়েই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভারতের পথে যাত্রা করল।

যাত্রা করার পর থেকেই এথেলের সমস্ত স্ফূর্ত্তি যেন জল থেকে তোলা মাছের মত একেবারে উবে গেল। নিখিলের

অন্তরেও বিরাট ঝড় চল্‌ছে। সে বিবাহিত—তার সংসার আছে—ছোট্ট মেয়ে মলি এতদিনে কত বড় হ'য়েছে কে জানে! সে এথেলকে নিয়ে কি কর্‌বে—তাকে কোথায় রাখ্‌বে! হঠাৎ তার মনে হ'ল তার বন্ধু অনাদি দত্ত দাঁতের চিকিৎসা শিখ্‌তে বোম্বাই এসেছিল, সে এখনও ফিরে যায় নাই। ওখানে তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় চিকিৎসক আছেন; তার পড়া শেষ হ'বার পর সে তাঁর কাছেই রয়েছে। মনে মনে স্থির করল, এথেলকে তার কাছেই রেখে যাবে। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করবে। সে কোন মতেই তাকে নিয়ে পিতার সে অগ্নিমূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌বে না, আর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!—অসম্ভব!—সেও কল্পনাতীত।

নিখিলের উৎকণ্ঠা দেখে অথবা চিরদিনের মত জন্মভূমিকে ছেড়ে আসার জন্য এথেলের মনেও খুব ওলট পালট চল্‌ছিল।

দীর্ঘদিনের সমস্ত পথটা তাদের কাছে নিতান্ত কষ্টকর, দুঃসহ, মৌনময় হ'য়ে পড়ল। জাহাজের দোলা, ঢেউয়ের চাপা গর্জ্জন, মেঘের উদ্বেগ আন্দোলন—দু'জনকেই কেমন বিমর্ষ ক'রে তুলল দেখতে দেখতে তারা বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছাল।

নিখিলের বন্ধু অনাদি দত্ত তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য এসেছিল। সে হঠাৎ তার সঙ্গে এথেলকে দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল। নিখিল ইঙ্গিতে তার আগ্রহের আতিশয্য দমিয়ে তার সঙ্গে জাহাজ ঘাট হ'তে বেরিয়ে গেল। তারপর অনাদিকে গোপনে সমস্ত কথা ব'লে সে এথেলকে তার কাছে রেখে যেতে চাইল। অনাদি বিস্তর আপত্তি করলেও শেষে নিখিলের নিরুপায় অবস্থা দেখে রাজী হ'ল।

নিখিল অনাদির বাসার পাশেই একটি সুন্দর ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া নিয়ে অনাদির তত্ত্বাবধানে এথেলকে রেখে গেল। যাবার সময় এথেলকে ব'লে গেল, 'দেশে একবার দেখাশোনা ক'রে দু'সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসছি।' এথেলের মনে নানা অশান্তি আঘাত পাওয়া সাপের মত পলে পলে ফণা তুলে উঠ্‌ছিল, কিন্তু নিখিলের উপরেও তার কোন সন্দেহ হ'ল না। কাজেই কিছুদিনের জন্য তার বোম্বাই সহরে বাস করাই ঘটল।

নিখিল বাড়ী ফিরে এল। সকলেই বিপুল উৎসাহান্বিত। মাতা অন্নদা বহুদিন পরে হারানিধি—অঞ্চলের মাণিককে ফিরে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি কথায় বার্ত্তায় ডাকা-ডাকিতে ঘর মাতিয়ে তুললেন। বধূ অনিলার অন্তরের আনন্দ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত অন্তরেই থেকে গেল, বাইরে তার কোন প্রকাশ হ'ল না। বৃদ্ধ অবিনাশবাবুর স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গতায় এ ব্যাপারে কোন জোয়ারের সৃষ্টি করল না। অবাক্ হ'য়ে গেল ছ' বছরের মেয়ে মলি! সে ডাগর ডাগর সাদা চোখে নিখিলের দিকে তাকিয়ে রইল। নিখিল তাকে আদর করতে গেল, সে আরও অবাক হ'য়ে গেল।

কিন্তু নিখিলের কিছুই ভাল লাগে না। তার মনের যেন কোন্ তার ছিঁড়ে গেছে; কোথায় যেন কোন করুণ স্বর থেকে থেকে বেজে উঠছে; সমস্ত আমোদ, উৎসব, কলরব তার কাছে নিরর্থক মনে হ'তে লাগল। সে খেয়ে সুখ পায় না, বিশ্রামের মাঝে বিভীষিকা দেখে, বন্ধুরা তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে এসে তার মৌন ম্লানিমা দেখে নিরুৎসাহ হ'য়ে ফিরে যায়।

বৃদ্ধেরাও তার এই খাপছাড়া গতিবিধি লক্ষ্য করেছে একদিন বিশ্বেশ্বরবাবু অবিনাশবাবুকে বললেন, "অবিনাশ, বাবাজীর অবস্থা যে বেশ সুবিধাজনক নয় দেখছি।"

অবিনাশবাবু নাক হ'তে চশমা নামিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, "ও-রকম দু' একদিন হয়ই। চার চার বছর একটা জায়গায় কাটিয়ে এল, যেমন হোক্ আলাপ পরিচয় পাঁচ জনের সঙ্গে হ'য়েছিল ত'! আমি যখন খুলনা থেকে বদ্‌লী হই, তখন এখানে এসে এমন মুস্‌ড়ে গেছ্‌লাম যে তিন দিন বিছানা ছাড়ি নি। তারপর থেকে কলে কৌশলে বদ্‌লী হওয়ার হাত থেকে এড়িয়ে এড়িয়েই এসেছি। এক একটা জায়গা পাল্টান, যেন ছকের একটা ক'রে হাড় খসিয়ে দিয়ে যাওয়া।"

বিশ্বেশ্বর বললেন, "তা নয় অবিনাশ,—বিলাতে সে নানারকম রং বেরংএর নরনারী দেখেছে—এখানকার কালা আদ্‌মীদের দেখে ওর মন লাগাম মান্‌ছে না। এই জন্যেই তোমাকে বারণ করেছিলাম—আমাদের মত সাধারণ লোকের ঘরের ছেলে বিলাত গেলে টাল সাম্‌লাতে তাকে টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত বিক্রী করতে হয়।"

অবিনাশ মৃদুহাস্য ক'রে বল্‌লেন, "সেটি হ'বার যো নাই বিশ্বেশ্বর, অন্ততঃ আমার ছেলের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এ আমি হলফ ক'রে ব'লে দিতে পারি।"

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন, "না হে, বিলেতে নানা রকম চপ্ কাটলেট খেয়ে এসে এখানকার লতাপাতার তরকারি নাকি খুবই বিস্বাদ লাগে। ভাল কথা, ওর পসারের দিকে কোন আশা ভরসা পাচ্ছ?

অবিনাশ বল্‌লেন, "এত শিগ্‌গীর সে কথা কেমন ক'রে বল্‌ব। দু'চার মাসের মধ্যেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে ব'লে আশা করি। এই ত' ক'দিন এসেছে এরই মধ্যে রাজবাড়ী থেকে দু'টো ডাক এল।"

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন, "কথাটা ঠিক—ডাক আস্‌বেও—অন্ততঃ তুমি যতদিন বেঁচে আছ। কিন্তু সমস্ত বৰ্দ্ধমান সহরে রাজা ত' একজন!

অবিনাশ বললেন, 'সে কথা সত্যি,—বৰ্দ্ধমানের মত একটা পচা সহরে এ রকম বিলেতফেরৎ চক্ষুচিকিৎসকের চলা একেবারেই অসম্ভব। আর কিছুদিন দেখা যাক্—তারপর না হয়—কল্‌কাতায় একটা বাড়ী দেখ্‌লেই হ'বে।"

বৃদ্ধদের মধ্যে নিখিলের সম্বন্ধে এই ধরণের সমস্ত কাথা-বাৰ্ত্তা চল্‌তে থাকে।

এদিকে অনাদি নিখিল চ'লে আসবার দু'দিন পরেই কল্‌কাতা হ'তে একটা টেলিগ্রাম পেল, "তার মার কঠিন পীড়া। দেখবার আশা থাক্‌লে সে যেন শীঘ্র চ'লে আসে।"

অনাদি বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল,—এথেলকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল—কিন্তু এথেল কিছুতেই একা একা থাক্‌তে রাজী হ'ল না। বিশেষতঃ, নিখিলের জন্যে তার মন অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। সে হঠাৎ একটা ঝোঁকের বশে তার মাতৃভূমি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ফেলে—এই সুদূর প্রাচ্যভূমিতে এসে পড়েছে, এই সুবিস্তৃত জনবহুল ভারতভূমিতে তার আপনার লোক কে আছে? যতই দিন যায়—নিখিল তার কাছে বেশী ঘনিষ্ঠ, বেশী আত্মীয় হ'য়ে ওঠে।

অনাদি অনন্যোপায় হয়ে এথেলকে সঙ্গে নিয়ে কল্‌কাতায় এল। লাভলক্ ষ্ট্রীটে তার জন্যে একটা ছোট-খাট বেশ পরিপাটি বাসা ভাড়া ক'রে তাকে সেখানে রেখে নিখিলকে সংবাদ দিল।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই নিখিল এথেলের কলিকাতা আগমনের সংবাদে যুগপৎ আনন্দিত ও বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। এথেল তার এত কাছে এসে পড়েছে—অথচ তার সঙ্গে দেখা করবারও উৎসাহ নাই। সে যে এথেলের কি উপায় কর্‌বে সেই কথাই সৰ্ব্বদা ভাবে। টাকা-পয়সার টানাটানিও তাকে কম ব্যথা দেয় না। কেন গেছ্‌ল সে বিলাত—নিজের ইহকাল পরকাল খোয়াতে? বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার সে—লোকে তাকে ডাক্‌তে সাহস করে না। কোন দিক্ থেকে কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই যা দিয়ে সে এথেলের কাছে নিজের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখবে। সে শুধু অবাক্ হ'য়ে চিন্তা করে—কি পিশাচের মোহ তার মধ্যে জেগেছিল যার জন্য সে এথেলের কাছে বিবাহ অস্বীকার ক'রে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছিল? সে কত বড় কাপুরুষ—কত ভীরু! মাঝে মাঝে নিরুপায় হ'য়ে মনে করে—মোহের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

অনিলা ক'দিন হ'তেই নিখিলের এই ভাবান্তর লক্ষ্য কর্‌ছিল। একদিন রাত্রে সে নিখিলকে খুব জেদ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে বল্‌তেই হবে তোমার দুঃখ কিসের।"

নিখিলও মনের কথা কাউকে না বল্‌তে পেয়ে ক'দিন থেকেই নিদারুণ অস্বস্তি বোধ কর্‌ছিল। অনিলাকে সে বহুদিন থেকেই দেখছে—তার প্রকৃতি তার অবিদিত নয়। সে জান্‌ত—আর কিছু না হোক্—অনিলা তাকে ঘৃণা কর্‌বে না বরং সান্ত্বনাই দেবে।

একে একে সে অনিলাকে সমস্ত ঘটনা আনুপূৰ্ব্বিক বল্‌ল। বল্‌তে বল্‌তে সাময়িক অনুশোচনায় তার চোখ ছল ছল কর্‌তে লাগল। নিখিল পুরুষ হ'লেও তার মাঝে কতকটা স্বাভাবিক দুৰ্ব্বলতা ছিল। এই দুৰ্ব্বলতাই তার সকল অনর্থের মূল।

অনিলা স্থির হ'য়ে সমস্ত কথাই শুন্‌ল। তার মধ্যে এতটুকু চঞ্চলতা দেখা গেল না। নিখিলের কথা শেষ হ'বার পর স্বামীর চেয়ে সেই যেন বেশী চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। হঠাৎ সে নিখিলের কাছে স'রে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কত-দিন পরে তোমার রোজগার সুরু হবে ব'লে মনে হয়?'

নিখিল অন্যমনস্কভাবে বল্‌ল, 'মাস তিনেক পরে।'

অনিলার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—সে যেন এই সময়টার একটা গতি হবে ব'লে আশা করে। নিখিল স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অনিলা বল্‌ল, "তুমি কালই আমার কতকগুলো গহনা নিয়ে কল্‌কাতা যাও; সেখানে এগুলো বিক্রী ক'রে একটা ব্যবস্থা ক'রে এস।"

অনিলা খুব বড়লোকের মেয়ে। শ্বশুর-বাড়ীতে আসবার সময় তার বাবা তাকে অনেক টাকার গহনা দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাববশে অনিলা সর্ব্বদাই নিরাভরণা। সে সব গহনা তার চিরদিন তোলা থাকে। মেয়ে বড় হ'লে তাকে দেবে ব'লে মাঝে মাঝে অভিলাষ প্রকাশ করে। আজ তার স্বামীর বিপদে সে গহনার শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারের পথ দেখতে পেল।

একটা কি ডাক্তারী সভায় যোগদানের জন্য তার আহ্বান এসেছে ব'লে নিখিল তার পরদিনই কল্‌কাতা চ'লে গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন—কোন ডাক্তারী সভাই তার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল না। সে সোজা এথেলের বাসায় গিয়ে উঠল। তারপর যথোচিত আলাপ-আলোচনা কথাবার্ত্তার পর—সে বহু টাকার সাজসরঞ্জাম আসবাব-পত্র দিয়ে এথেলের ঘর ভরিয়ে—তার থাকা-খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত ক'রে বাড়ী ফিরে এল।

আস্‌বার সময় যেমন সে ল্যান্সডাউন রোডে এসে নেমেছে—অম্‌নি তার এক পিস্‌তুত ভাই সমীরের সঙ্গে দেখা। সে এখন কলেজের ছাত্র—বিলাত-ফেরৎ দাদার সঙ্গ পাওয়া, তার কাছ হ'তে নানা রকমের কাহিনী শুনে তার মনের কল্পনাকে রাঙ্গানো—তার পক্ষে বিশেষ প্রলোভনের বিষয়।

সে ছুটে এসে নিখিলকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল, "এই যে নিখিল দা,—এমন দুঃখু দুঃখু ভাব কেন?"

নিখিল সংক্ষেপে বল্‌ল, "আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলুম। তার মার বড় অসুখ—বাঁচে কি না সন্দেহ।"

টানাটানি করে সমীর তাকে বাড়ী নিয়ে গেল। ল্যান্সডাউন রোডের উপরেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিখিলের পিসেম'শায় বাড়ী তৈরী ক'রেছেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর—সৌখীন ধরণের।

নিখিলের পিসীমা নিখিলকে দেখে বড় আহ্লাদিত হলেন। বিলাত থেকে আসার পর একদিনও না আসায় নানারকম অনুযোগ করলেন। আহারাদির পর নিখিল তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। পিসীমা তাকে আবার আস্‌বার জন্যে বিশেষতঃ মলিকে নিয়ে একদিন আস্‌বার জন্য বারবার বহুবিধ অনুনয়-বিনয়সহকারে অনুরোধ করলেন।

অনিলা নিখিলের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনে ভারী খুসী হ'ল। সে আব্দার ধ'রে বস্‌ল, "আমি কিন্তু একদিন তোমার বিলাতের সহচরী বিদ্যাধরীকে দেখতে যাবো।" নিখিল স্মিতহাস্যে সম্মতি দিল।

সপ্তাহ পরে নিখিল আবার কল্‌কাতা গেল। পিসীমার অনুরোধক্রমে মলিকেও সঙ্গে নিতে ভুল্‌ল না।

নিখিল সঙ্কল্প ক'রেছিল, পিসীমার ওখানে মলিকে রেখে এথেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু, কার্য্যতঃ হ'ল বিপরীত। সে যেন কেমন যন্ত্রচালিত হ'য়ে প্রথমেই এথেলের বাসায় গিয়ে হাজির হ'ল।

মলি এথেলের বাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম, বিশেষতঃ এথেলকে দেখে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ততোধিক অবাক্ হ'ল ঠাকুরমাকে সেখানে না দেখে। সে নিখিলকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা ঠাকুরমা কই?"

নিখিলের পিঠে যেন কে সপাং ক'রে চাবুক বসিয়ে দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার চৈতন্য ফিরে এল, কিন্তু এখন সে নিরুপায়। শুক্‌নো কাঠের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে এথেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এথেল উত্তেজনার আতিশয্যে তিলেকমাত্রে চেয়ার ছেড়ে নিখিলের কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, "এ মেয়েটি কে, নিখিল?"

ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। নিখিলের মনে হ'ল, কোন মহান্ লীলা-কুশল অশরীরী তাকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর ক্রীড়ার যাদুদণ্ড বারংবার ঘুরিয়ে চ'লেছেন। বহুরূপীর বর্ণ-পরিবর্ত্তনের মত তার অভিনয়ের ধারা পলকে পলকে পাল্‌টে যাচ্ছে। মানুষ যতই চঞ্চল, উদ্বিগ্ন হয়, সেই যাদুকর বুঝি ততই প্রশান্ত সহাস্য হ'য়ে উঠে। নিখিল এথেলের প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্তভাবে বল্‌ল, "আমার মেয়ে।"

"তোমার মেয়ে!"—এথেলের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সমস্ত শরীর তার পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। পাশের ইজি

চেয়ারটার উপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ে নিখিলের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মনে হ'ল তার সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। নিখিল আস্তে আস্তে তার কপালে হাত বুলাতে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে এথেল মাথা তুল্‌ল। নিখিলের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "নিখিল, তোমার এ দুর্ব্বলতা, এ কাপুরুষতা অসহ্য।"

তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই চুপচাপ। এথেলের মনে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। তার অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহ করতে চায়। এথেলের মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল—যেটা সাধারণ নারীর মধ্যে একান্ত বিরল। হাজার অবস্থা-বিপর্য্যয়েও কঠোরতা কর্কশতা যেন তার প্রকৃতির বাহিরে। আজিকার আঘাত তার সব চেয়ে বড়। সে যে শাখায় ভর ক'রে তার নারীজন্মের সার্থকতার আশায় সুখের নীড় রচনা করতে ব'সেছিল—আকস্মিক বৈশাখ ঝটিকায় সে শাখা ভগ্ন, বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত। তার মন সহস্র মুখ দিয়ে বল্‌ছে, নিখিল প্রতারক,—তবু সকল অন্তর দিয়ে সে সে-কথা মান্‌তে পারছে না। কিন্তু ফুলের ভিতর কালসাপ—নিখিলের সরলতা, উদারতা, প্রীতির নির্ম্মল প্রবাহের তলায় এ কি প্রবঞ্চনার বালুচর!

এথেল অবাক্ হ'য়ে গেল—তার চোখ মুখ দিয়ে আশ্চর্য্যের চিহ্ন ফুটে বেড়িয়ে এল। খানিকক্ষণ পরে এথেল বল্‌ল, "নিখিল, আমার কথা তোমার স্ত্রী জানে?"

নিখিল উত্তর দিল "জানে।"

এথেল জিজ্ঞাসা করল, "আমার সম্বন্ধে তার ধারণা কিরূপ?"

নিখিল স্থিরভাবে বল্‌ল, "ভাল।"

এথেলের দুই চক্ষু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল; সে বলল, "ভাল কি ক'রে জান্‌লে?"

নিখিল বল্‌ল, "তার মুখের কথায়।" তারপর যেন একটু দৃঢ় হ'য়ে বলল, "আর তোমার ঘরের এইসব আসবাব-পত্র কেমন ক'রে এল জানো?"

এথেল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নিখিল উন্মনা হ'য়ে ব'লে চলল, "এ সব আমি যোগাড় করেছি তার গায়ের গহনা বিক্রী ক'রে। এথেল, আমার স্বরূপ আমি এতদিন তোমায় বলি নি—আমায় ক্ষমা করতে পারবে না? সত্যি ক'রে, আমি খুবই গরীব। বাবা বড়লোক হ'লেও আমার দারিদ্র্যের কিছু লাঘব হয় নি। নিমেষের ভুলে, মুহূর্ত্তের মোহে, সত্যি কথাই আমি আজ বলব, আমি ভারতবাসী আর তুমি ইংরাজ নারী, তোমার রূপের মোহই আমার এ কাপুরুষতার কারণ। তোমার স্বভাব মাধুর্য্যও আমাকে কম মুগ্ধ করে নি। তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, এ দরিদ্রের সকল অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট যে মাথা পেতে সহ্য করছ, এর চেয়ে সান্ত্বনা আর কি আছে? কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, আমি কোনদিন তোমায় দুঃখ দেব না, যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হ্রাস হবে না—।" আর নিখিলের কথা বেরুল না—তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

এথেল কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইল, তারপর অতি সংযত ভাবে বলল, "নিখিল, আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও; আমি কালই বিলেত যেতে চাই।"

নিখিল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এর উত্তরে সে অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

মলি এ সব ব্যাপারের কিছুই বুঝ্‌ছিল না, সে শুধু অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল। এথেল মলির গোল নিটোল হাতখানি বুকের কাছে নিয়ে বারবার চেপে ধরল, বারবার চুমু দিল।

তারপর এথেল নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "নিখিল, তোমার এমন স্ত্রী, এমন কন্যা, আমি এদের সুখের ভাগ কেড়ে নেব না। আমি যাব—তবে যাবার আগে তোমার সহধর্ম্মিণীকে একবার দেখে যাব। তুমি বাড়ী ফিরে যাও, কাল বোম্বাই যাবার গাড়ীতে আমাকে তুলে দিও। আসবার সময় যেন তাকে সঙ্গে এনো। আর মলিকে আজ আমি আমার কাছে রাখতে চাই।"

এথেল এতদিন নিখিলের কাছে বাংলা বলতে শিখেছিল। মলির সঙ্গে আলাপ করতে তার কোনরকম বাধল না।

মলি বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। তার আদার ঝোঁক নাই বললেই হয়। সে সহজেই এথেলের কাছে থাকতে রাজী হ'ল।

নিখিল যেন কেমন অভিভূত হয়ে গেল। নীরবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'ল।

নিখিল মায়ের কাছে আর্জি পেশ করল, "পিসীমা বধূকে দেখবার জন্য একান্ত অধীর, কাল আবার তার বাড়ীতে কি একটা কাজ আছে, সেইজন্য কালই তাকে নিয়ে যাওয়া দরকার; মলিকে সেইজন্য আজ আনা গেল না।"

নিখিলের মাতা অন্নদার মন খুবই সরল। তিনি সহজেই স্বীকার করলেন, পিতার যদিও কিছু অমত ছিল, মাতা মত দেওয়ায় তিনি আর কোন আপত্তি করলেন না।

যবনিকার অন্তরালে যে পঞ্চাঙ্ক নাটকের সুদীর্ঘ অভিনয় চল্‌ছিল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তার কোন সন্ধানই পান নাই। ঝিশ্বেশ্বর চাটুয্যে অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোক। যদিও তিনি আভাষে ইঙ্গিতে নিখিলের প্রতি সন্দেহের কথা জানিয়েছিলেন তবু স্নেহাধিক্য বশতঃ পিতা সে কথা মান্‌তে রাজি হ'ন নাই।

পরদিন সকালের ট্রেণেই নিখিল কল্‌কাতায় চলে গেল। অনিলাকে রাত্রেই সমস্ত কথা ব'লেছিল। হাওড়া ষ্টেশন হ'তে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তারা সোজা লাভলক ষ্ট্রীটের বাসায় উঠ্‌ল।

মলি তখন এথেলের পাশে ব'সে, একরাশ খেলনা নিয়ে কোনটার কি ভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয়, তাই শিখ্‌ছিল। নিখিল আর অনিলার প্রবেশে সে সব ফেলে উভয়েই সচকিত হয়ে উঠ্‌ল।

এথেল অনিলাকে দেখে সত্যই বিস্মিত হ'য়ে গেল। কতখানি সংযম, সৌম্যশ্রী তার মুখে চোখে! সে ছুটে এসে অনিলার হাত ধ'রে এনে পাশে বসিয়ে কথাবার্ত্তা সুরু করল। মলি নিখিলকে খেলনাগুলির গুণপনা বুঝিয়ে দিতে লাগল।

যথাসময়ে এথেলকে যাত্রা করতে হ'ল। যাবার সময় সে মলির মাথায় পিঠে চাপ্‌ড়ে তাকে আদর করল। মলি ইতিমধ্যেই এথেলের বড় অনুরক্ত হয়ে পড়েছে, সে তাকে ছাড়্‌তে চায় না। এথেল তার জামার ভিতর হ'তে এক টুক্‌রা সিল্কের কাপড়ে জড়ান একটি ছোট্ট নেক্‌লেস বার ক'রে মলির গলায় পড়িয়ে দিল। অনিলা ব্যস্ত হ'য়ে সেটি তাকে ফিরিয়ে দিতে গেল, সে মাথা নেড়ে বলল, "এইটি আমার স্মৃতিচিহ্ন।" অনিলা তখন প্রতিদানে তার গলার নেক্‌লেস খুলে দিতে গেল। এথেল অস্বীকার ক'রে বলল, "আমায় যদি দেবে তোমার পায়ের তলা থেকে কিছু মাটি তুলে দাও। বাঙ্গালার মাটি আমার চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক। নিখিলকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু নিখিলের চেয়ে ভালবাসার বস্তু আছে—সে তুমি। তোমার সঙ্গে ভালবাসার মূলে নিখিল, ছাড়াছাড়ির মূলেও সেই!"

অনিলা এথেলের হাত চেপে ধ'রে বলল, "দিদি, যেও না। দু'জনে একসঙ্গে ঘর সংসার পাড়ব। দু'টো ফুল একবোঁটায় থাকে না কি?"

এথেল মৃদু হাস্য ক'রে বলল, "তা আর হয় না বোন, বিদায়!"

অনিলা এথেলকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করল। ইংরেজ নারীর এত কোমলতা—এত দরদ সে আর কোথাও দেখে নাই। তার বাবার প্রকাণ্ড ইলেক্‌ট্রিকের কারখানা, বহু সাহেব সেখানে কর্ম্মচারী আছে। তাদের মেমদের সঙ্গে সে অনেক আলাপ করেছে—মেমদের কাছেই সে লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু আজ এথেলের কাছে যে মনের সে পরিচয় পেল, এমনটি কোথাও দেখে নাই, সে মুগ্ধ, বিস্মিত হ'য়ে গেল।

এথেল সত্য সত্যই তার রুমালে ক'রে খানিকটা মাটি বেঁধে নিল। যাবার সময় অনিলাকে ও মলিকে বুকের ভিতর চেপে ধরে—চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌ল।

নিখিলও গাড়ীতে উঠ্‌ল। অনিলাকে সেইখানেই রেখে গেল—ফিরে এসে নিয়ে যাবে।

নিখিলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্‌ছিল। তার ভিতর যে দুর্ব্বলতা ছিল, তার সঙ্গে কিছু নারী সুলভ কোমলতাও ছিল। সে যেন আর নিজেকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। এথেলও যে চঞ্চল হয় নাই—তা নয়; তবে সে নিজের চঞ্চলতা চেপে নিখিলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা গঙ্গার সেতু পার হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌছাল। ট্রেণ ছাড়তে আর বেশী দেরী নাই, তারা সোজা প্লাটফরমের দিকে এগিয়ে চলল।

এথেল গাড়ীতে বসল। নিখিলের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না; উচ্ছ্বাসে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল।

এথেল গাড়ীতে ব'সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "নিখিল, তুমি সুখী হবে। এমন যার স্ত্রী—সে কখনও অসুখী হ'তে পারে না। আমি তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হ'তে চাই না। তাই আমি চললাম। তবে তোমাদের স্মৃতি আমার চিরদিন মনে থাকবে। বাঙ্গালার মাটির কথা আমি শুধু পুঁথিতেই পড়েছিলাম—আজ নিজের চোখে সে মাটির গুণ দেখে চোখ মন সার্থক ক'রে নিলাম। আজ তোমার দয়ায় আমি যে সোনার বাঙ্গালার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম—এই আমার পরম লাভ। এখানে শুধু সোনার ফসল ফলে না—এখানকার মানুষ, মন, সবই সোনার। এমন মহীয়সী নারীজাতি পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে বিরল। জীবনে এমন দিন আসতে পারে—যে দিন তোমাদের কথা ভুলে যাব, কিন্তু তোমাদের এই সোনার বাঙ্গালার পবিত্র মাটির কথা আমি কিছুতেই ভুলব না।"

নিখিল কি বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু আর বলা হ'ল না। গাড়ী ছেড়ে দিল। এথেল গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড় মুহ্যমান হ'য়ে পড়ল। বসবার আসনের উপর উবুড় হ'য়ে পড়ে উচ্ছ্বাস চাপতে লাগল। নিখিল এথেলকে দেখতে না পেয়ে পাগলের মত ছুটে এগিয়ে গেল—চীৎকার ক'রে ডাকল—কিন্তু কেউ উত্তর দিল না—প্রতিধ্বনি শুধু ব্যঙ্গ করল, গাড়ী দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গেল—এথেল চ'লে গেল—তার স্মৃতি ছাড়া আর কিছু থাকল না।

নিখিলের সমস্ত শরীর দুলতে লাগল। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল—ট্রেণ লোহার রাস্তার বদলে তার বুকের উপর পায়ের পর পা ফেলে শত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল। হায়—নিষ্ঠুর গাড়ী—দানবের শক্তিতে ক্ষুদ্র মানবের দেহ হ'তে প্রাণটাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণ রাখতে মানুষের কত আকুলি-ব্যাকুলি,—সে কঠোর জল্লাদ—সে যেন যমরাজের প্রধান সেনাপতি। করুণা কাতরতা, মমতা—তার যেন হাস্যরসের খোরাক। গাড়ী যেমন দ্রুতপদে চ'লেছে, তেমনি দ্রুতপদেই হয় ত' আবার কাল ফিরবে। কিন্তু এথেল? নিষ্ঠুর দস্যু এথেলকে কোথায় রেখে আসবে?

আশে পাশে ফেরিওয়ালারা বিকট স্বরে চীৎকার করছে, বহু যাত্রী, জনতা কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করছে—ইঞ্জিনের ক্রুদ্ধ নিশ্বাস, গাড়ীর রুদ্র পদক্ষেপ—বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটাচ্ছে। নিখিল সংজ্ঞাহীনের মত মাটিতে ব'সে পড়ল। পিছন থেকে অনাদি তাকে তুলে ধ'রে বলল, "চল, ফিরে চল।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

বঙ্গদর্শন (১৮৭২) বাহির করিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর তিনখানি উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭) ও মৃণালিনী (১৮৬৯) প্রকাশ করেন। কিন্তু এই উপন্যাসগুলি লিখিবার পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একথা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল যে, বাংলা সাহিত্যের অভাব সকল দিকে, কেবল উপন্যাস লিখিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। বাংলা সাহিত্যের কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি সামাজিক বিষয়, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল বিভাগে—হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইহার ফলেই বঙ্গদর্শন প্রকাশ। বঙ্কিম যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স তেত্রিশ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তিনি নব্যবঙ্গের চিন্তারাজ্যের অবিসংবাদী সম্রাট্ স্বরূপে শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

একথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় ইংরাজী নবেলের আদর্শে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ দেশী ছাঁচে ঢালিয়া তিনি ইহার একটি নিজস্ব রূপ দিয়াছেন। কল্পনার সহিত বাস্তবের অপরূপ সঙ্গতি কেবল শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ লোকেই সম্ভবে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত এসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত এই :—"যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দ-পণ্ডিত বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন, যে তাঁহার যশ করে করুক আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব পর্য্যন্ত বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার—তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্য মাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।"

অতুল্য মনীষাশালী বিবেকানন্দের মতও ঐরূপ।

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতের সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ বিদ্বান্ ও সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ, চৈতন্য পর্য্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট কিন্তু কটমট ভাষা যাহা অপ্রাকৃতিক, কাল্পনিকমাত্র তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা করে সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে ও পাঁচজনে ওসকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গী সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেই দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।"

উপন্যাসের ভাষা সহজ সুন্দর সরল হওয়া আবশ্যক। লেখকের সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বরে

রচনা যেন অযথা ভারাক্রান্ত না হয়। রচনা যত সহজ সরল সুস্পষ্ট হইবে, ততই হৃদয়গ্রাহী হইবে। বিশেষতঃ কথোপকথনের ভাষা কোন ক্রমেই অন্যরূপ হইতে পারিবে না। স্থানবিশেষে প্রাকৃতিক বা রূপবর্ণনায় এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতেও দৃষ্টি সজাগ রাখিতে হইবে, যেন আতিশয্য না আসিয়া পড়ে।

ছোট গল্পের অপেক্ষা উপন্যাস লেখকের একটু অধিক স্বাধীনতা আছে। ছোট গল্পের বর্ণনার বাহুল্য একেবারেই বর্জ্জনীয় কিন্তু উপন্যাসে উহার বিধিমত প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়। ছোট গল্পে স্বল্পপরিসরের মধ্যে একটি চিত্র ফুটাইতে হইবে, উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলির সহিত আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলির চিত্র বিকশিত করিতে হইবে। ছোটগল্প সনেটের মত, উপন্যাস যেন কাব্য—কাহিনী।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীর মধ্যে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। ইহা অপূর্ব্ব কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত। ইহার তুল্য গ্রন্থ কেবল বঙ্গসাহিত্যে নহে, জগতের যে কোন সাহিত্যে দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র যদি আর কিছু না লিখিতেন, কেবল কপালকুণ্ডলাই তাঁহাকে শাশ্বত যশের অধিকারী করিয়া অমরত্ব দান করিত।

দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক না হইলেও, উহাদের ভিত্তি ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্গেশনন্দিনীতে মোগল পাঠান দ্বন্দ্ব ও মৃণালিনীতে বখতিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক গৌড় বিজয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গৌণভাবে ঐরূপ ঐতিহাসিক তথ্য যুক্ত থাকিলেও, মুখ্যতঃ এই দুইখানি উপন্যাস প্রণয়কাহিনী-মূলক। কপালকুণ্ডলায় কেবল একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাসের ভাষা সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে একেবারে মুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্গেশনন্দিনীতে শব্দাড়ম্বর, সমাসচ্ছটা ও অনর্থক শব্দের যোজনায় কোন কোন স্থল দুষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয় তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন ঘোর নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। পথিক কেবল বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে মহারবে উদ্দাম ঝটিকা প্রবাহিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছা গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যের সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐসময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়ায় পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলকায় কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলকায় স্তূপ অট্টালিকা হইবে এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন।"

উদ্ধৃতাংশে একই শব্দের পুনরুক্তি দোষও ঘটিয়াছে। এইবার মৃণালিনীর আরম্ভভাগ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, সমাস-শৃঙ্খলিত হইলেও অন্যান্য ত্রুটী বর্জ্জিত।

"একদিন প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অপূর্ব্ব প্রাবৃট-দিগন্ত-শোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট কাল কিন্তু মেঘ নাই অথবা যে মেঘ আছে তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জল ঝঙ্কারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী যেন দুই ভগ্নী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবন-তাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় ঐ সকল দোষ একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইহার আরম্ভের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে অন্য দুইখানি উপন্যাসের ভাষার পার্থক্যও সহজেই ধরা পড়িবে।

"সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন

করিতেছিল। পর্ত্তুগীস ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে,রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল, নাবিকেরা দিক্ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা-পুরুষ এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথা-বার্ত্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পারবি ?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

কপালকুণ্ডলায় প্রাকৃতিক বা রূপ বর্ণনায় সহজ সরল ভাষা ব্যবহৃত না হইলেও উহাতে দোষ স্পর্শ করে নাই বরং তাহাতে উহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। উহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে হইবে যে, ঐরূপ স্থলে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার না করিলে লেখার মাধুর্য্য সম্যক্ পরিস্ফুট হইত না। মোটের উপর কপালকুণ্ডলার ভাষা অপর দুইখানি উপন্যাসের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ স্থলে সতর্ক দৃষ্টি না রহিলেও গ্রন্থ দুইটির অপরাপর অংশ ঐরূপ ত্রুটী হইতে মুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই জানিতেন উপন্যাসের প্রাণ সরল ভাষা, কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি সংস্কৃতের মোহ একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিষবৃক্ষ এবং পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে ভাষা সরলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে চলতি ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যদি এখন কোন উপন্যাস লিখিতেন, তাহার ভাষা রূপান্তর লাভ করিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত ভাষার মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, নদী-প্রবাহের মত ভাষাও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

গদ্যরচনায় শব্দ-বিন্যাস, বাক্য-গ্রন্থন ও অনুচ্ছেদ-বন্ধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে রচনা শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীও সুখপাঠ্য, মনোরম ও চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে। তিনি দুর্গেশনন্দিনীতে প্রচলিত উপমা ত্যাগ করিয়া এবং কোথায়ও বা একেবারে ত্যাগ না করিলেও বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিয়া নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন।

রচনা-চাতুর্য্যে ও গল্প বিন্যাসের কুশলতায় দুর্গেশনন্দিনী সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর মন অধিকার করে। এই আসক্তি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের প্রধান গুণ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থবর্ণিত কল্পিত চরিত্রগুলি সত্যের ন্যায় পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হইবে এবং তাঁহাদের সুখ দুঃখ আশা-নিরাশায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। দুর্গেশনন্দিনী পাঠ কালে পাঠকের মনে ঐরূপ ভাব জাগিবে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে আনয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ যে ভাঁড়ামি করিয়াছে, তাহা রসিকতার ধার দিয়াও যায় না। এই চরিত্রচিত্রণ বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বিতার উপযুক্ত হয় নাই।

[ক্রমশঃ

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

দশ

বাংলোতে একজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন,—নাম ডাঃ এন্, চৌধুরী এম-এ, পি, এইচ-ডি। ইনি কল্‌কাতার এক বড় কলেজের প্রফেসর। প্রায় দেড় বছর আগে এঁর সহিত লীলাবতীর বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত হ'য়েছিল কিন্তু লীলাবতী তখন থিয়োসোফিকেল সোসাইটির ভিতরে এসে পড়াশুনায় ও ঐ বিষয়ক আলোচনায় এতো বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, বিয়ের বিষয় চিন্তা করবার তাঁর আদৌ অবকাশ ছিল না। মিঃ চৌধুরীকে তিনি তখন ব'লতে বাধ্য হ'য়েছিলেন যে, মিঃ চৌধুরী যদি অন্ততঃ এক বছর অপেক্ষা করতে পারেন, তাহ'লে তখন এ সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনা ক'রে যা হয় উত্তর দেব। মিঃ চৌধুরী ঐ প্রস্তাবে রাজি হ'ন। সে অবধি লীলাবতী সোসাইটির নানা কাজে ভারতের বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন ক'রে ঘুরছিলেন।

বছর প্রায় পূর্ণ হচ্ছে দেখে মিঃ চৌধুরী লীলাবতীর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে কমলাপুরে এসে হাজির হ'লেন তাঁর শেষ কথাটি জানবার জন্ম। লীলাবতী তাঁকে সম্ভ্রম সহকারে সম্বর্দ্ধনা করলেন বটে, কিন্তু অন্তরে বেশ একটু বিচলিত হ'লেন, কারণ মিঃ চৌধুরীর কথা তিনি এ পর্য্যন্ত মোটেই ভেবে দেখেন নি। সেই দিনই অপরাহ্নে লীলাবতীর সহিত বাগানে বেড়াবার সময় মিঃ চৌধুরী তাঁর মত জানতে চাইলেন। লীলাবতী হেসে উত্তর করলেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি বোধ হয় হিসেবে ভুল ক'রেছেন, বছর পূর্ণ হ'তে এখনো মাসেকের উপর বাকী আছে। তার আগে জবাব পাবার দাবী করাটা ঠিক হ'ল কি?"

"বছর এখনো পূর্ণ হয় নি, একথা ঠিক। হঠাৎ একটা কাজে আমার এদিকে আসতে হ'য়েছিল। ভাবলাম, এত কাছে যখন এসে প'ড়েছি আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবো না। আর এটা অবিশ্যি আশা ক'রেছিলাম, আপনি হয় তো এরই মধ্যে একটা কিছু স্থির ক'রে রেখেছেন, তাই জানতে চেয়েছি। বাস্তবিক জবাব একটা পেতে হবে এক্ষুণি, এমন কোন দাবী নিয়ে উপস্থিত হয় নি। তবে আমার তো মনে হয়, অনুকূল জবাব দেবার পক্ষে কোন অন্তরায় নেই।"

"হয় তো নেই। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, আমি এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়টা ভেবে দেখবার অবকাশই পাই নি। আপনি তো আজই চ'লে যাচ্ছেন না, কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যান, ইত্যবসরে আমায় একটু ভাবতে দিন।"

"বেশ তাই হোক, আমি ৩৷৪ দিন থাকতে পারবো। অবিশ্যি জানেন, আপনার দাদাম'শায় আমাকে কেমন স্নেহের চোখে দেখতেন, আর এটাও জানেন, তাঁরই উৎসাহে আমি পি, এইচ-ডি ডিগ্রির জন্ম বিলেতে পড়তে যাই। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনাকে অনেক আগেই থিয়োসোফির কবল থেকে মুক্ত ক'রে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন।"

"দাদাম'শায় তাঁর নাতনির উপর অতটা জুলুম করতেন কি না জানি না, কারণ থিয়োসোফির সঙ্গে তাঁর তেমন বিরোধ ছিল না। সে যাই হোক, তিনি যে আপনাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন সেইটেই খুব বড় কথা, যা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হ'লেও খুব কঠিন। সব ভেবে চিন্তে দেখে নিই, তারপর আপনাকে জানাবো। আপনিও ভেবে দেখুন, কাজটা উভয়ের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর হবে কি না। দাদাম'শায় বা অপর কেউ এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন ব'লেই যে আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য থাকবে না এমন হ'তে পারে না।"

মিঃ চৌধুরী লীলাবতীর যুক্তির সারবত্তা বুঝে প্রতিবাদ সূচক কোনো কথা বললেন না, প্রত্যুত তা স্বীকার ক'রে নিলেন। এই প্রসঙ্গে তখন আর আলোচনা না হয় এই উদ্দেশ্যে লীলাবতী কোন একটা কাজের অছিলায় অন্যত্র চ'লে গেলেন।

সেই দিনই রাত্রিতে আহারের সময় লীলাবতী সুরথকে তাঁর ম্যানেজার রূপে মিঃ চৌধুরীর সহিত পরিচিত করিয়ে দিলেন। অল্প ক্ষণের আলাপেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট

হ'ল। বস্তুতঃ মিঃ চৌধুরী ও সুরথের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, এই জন্য পরস্পরকে চিনে নিতে কারো অধিক সময় লাগলো না।

বিলেত যাবার পূর্ব্বাবধি মিঃ চৌধুরী লীলাবতীকে জানতেন এবং মনে মনে তাঁকে ভালবাসতেন কিন্তু সঙ্কোচ-বশতঃ মুখ ফুটে তা কদাচ তাঁকে বলতে বা জানাতে পারেন নি। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেও তাঁর মনের অবস্থা ঐ রূপই ছিল কিন্তু সে কথা তিনি জানাতে পারলেন শুধু লীলাবতীর দাদাম'শায়কে। মিঃ চৌধুরী আশা করেছিলেন, দাদাম'শয়ই উভয়ের মিলন সংঘটন ক'রে দেবেন কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তিনি অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। এর প্রায় ছ'মাস পরে মিঃ চৌধুরী একদিন সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে লীলাবতীর নিকট নিজেই বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লীলাবতী এজন্য প্রস্তুত না থাকলেও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নি, শুধু ভেবে দেখবার জন্য এক বছর সময় চেয়েছিলেন।

দু'দিন পর লীলাবতী ও সুরথ বাড়ীর কাজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে দ্বিতলের নূতন ঘরের ছাদের উপর উঠেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে লীলাবতী সুরথকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "মিঃ চৌধুরীকে আপনার কি রকম লোক ব'লে মনে হচ্ছে?"

"মাত্র দু'দিনের আলাপ হ'লেও তাঁর প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হ'য়েছি, বেশ উদার তাঁর প্রাণ। শিক্ষাভিমান বর্জ্জিত এমন সরল প্রাণ লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।"

"আপনি এত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন, এখন করি কি?"

"কেন, আমি কি ভুল ব'লেছি?"

"না, তা নয়, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। মত দেবো কি না ঠিক করতে পাচ্ছি না, ভয়ানক সমস্যায় প'ড়েছি।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সুরথ বললো, "মিঃ চৌধুরীর বংশমর্য্যাদা ও পারিবারিক অবস্থাদির সম্বন্ধে কিছু ব'লবার আছে কি না জানি না, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তিনি যে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য লোক এ বিষয়ে আমার মোটেই সংশয় হচ্ছে না।"

"কৌলিন্য বা পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলবার নেই। আমার দাদাম'শায়ের খুব ইচ্ছা ছিল, এই সম্বন্ধ হয়, কিন্তু আমি আদৌ বিয়ে করবো কি না, এইটেই এতদিন স্থির করতে পারি নি।"

"সেটা এখন হয় তো স্থির হ'য়ে গেছে, তার উপর র'য়েছে আপনার দাদাম'শায়ের সম্মতি, সুতরাং আপত্তির আর কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পাচ্ছি না।"

"আমিও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। যাক্ এখনো ঢের দিন হাতে আছে, তারপর জবাব দেবো। ভালো কথা, আপনার গৌরদাস বাবাজি লাইব্রেরীর কাজটা ভালরকমই চালাচ্ছে আর এ কাজে তার বেশ উৎসাহ আছে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

"তাহ'লে তাকে এই কাজে নিয়োগ করাটা ভুল হয়নি। লোকটা পায়ে হেঁটে মণিপুর যেতে চাইছিল তাইতে বুঝেছিলাম তার অধ্যবসায় আছে।"

"হাঁ, সে যেমন অধ্যবসায়ী তেমনি বিনয়ী। এ কাজটা হ'য়ে গেলে একে স্থায়ীভাবে লাইব্রেরীয়ান ক'রে রাখতে পারা যায় কিনা দেখবো ভাবছি। ৺ঠাকুরবাড়ীর সেবার্চ্চনাদি দেখবার ভারটাও ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে বাবাজি হয়তো খুশী হ'য়েই থাকবে।"

"এ সম্বন্ধে আপাততঃ তাকে কিছু না বলাই বোধ করি ভাল হবে।"

"বেশ, এখন আর কিছু বলবো না।"

সেই রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে লীলাবতী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে পড়লেন—মিঃ চৌধুরীকে কি জবাব দেবেন, ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিলেন না। বস্তুতঃ মিঃ চৌধুরীর যোগ্যতা সম্বন্ধে লীলাবতীর মোটেই সংশয় ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর প্রাণের অনুরাগ আছে কি? অন্তর অনুসন্ধান ক'রে লীলাবতী দেখলেন, মিঃ চৌধুরীর প্রতি তাঁর আছে শুধু শ্রদ্ধা, ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তা আদৌ নেই। আর দেখলেন, তাঁর হৃদয় অধিকার ক'রে আছে নীরব-প্রকৃতি সুরথ, কিন্তু সুরথ কি তাঁকে ভালবাসার চোখে দেখেন? কই তিনি তো কখনো কোন বাক্যে বা আচরণে আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন ইঙ্গিত দেন নি, বরং সেরূপ সম্ভাবনার সীমা থেকে নিজেকে নিরন্তর অপসারিত ক'রেই রাখছেন শুধু কি তাই, নিজের পরিচয়টা পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ গোপন

রেখেছেন, যেন সেটা কোন জটিল রহস্যে ঘেরা। ঐ রহস্য লীলাবতী একদিন না একদিন উদ্‌ঘাটন করবেনই। অপর দিকে, সুরথ প্রকৃত বীর পুরুষ, লীলাবতীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, জীবন বিপন্ন ক'রে তাঁকে বাঁচিয়েছেনও, কিন্তু তিনি সকল প্রকার প্রলোভনের অতীত। হ'তে পারে তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাঁর মত উন্নত-চরিত্র ত্যাগী নির্লোভ ব্যক্তি ক'জন আছে? লীলাবতীর কল্পনারাজ্যের আদর্শের অনুরূপ যদি কেউ থাকে, তবে এই সুরথ,—আর তাঁর অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যদি কেউ দাবী করতে পারে, তবে সে ব্যক্তি সুরথ ভিন্ন আর কেউ নয়। লীলাবতী বেশ বুঝতে পারলেন, মিঃ চৌধুরী যতই যোগ্য হউন, তিনি তাঁকে স্বামীত্বে বরণ ক'রতে পারবেন না।

শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, অকূল সাগরে প্রবল ঝড়ে তাঁর নৌকা ডুবে গেল—তিনি নিরুপায় হ'য়ে অতল জলের নীচে তলিয়ে যেতে লাগলেন, শ্বাস-রোধ হ'য়ে এল, প্রাণ বুঝি এই বেরিয়ে যায়—এমনি সময় কোথা থেকে দু'খানি সবল হাত এসে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে আস্তে আস্তে জলের উপরে টেনে তুললো—অবরুদ্ধ শ্বাস আবার বইতে সুরু করলো—মৃত্যুর বিভীষিকার পরিবর্ত্তে সমস্ত দেহে একটা আরামের স্পন্দন অনুভূত হ'ল, মুহূর্ত্ত পরেই আবার বোধ হ'ল, তাঁর অবশ দেহ যেন কারো কোলের উপর শায়িত এবং একখানি দিব্য মুখ উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে আনত হ'য়ে রয়েছে—সেই মুখখানি সুরথের। হঠাৎ একটা শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল—স্বপ্নের চিত্রটি তখনও তাঁর অনুভূতির বহির্ভূত হ'য়ে পড়েনি। লীলাবতীর কাছে ঐ শেষ চিত্রটি এতই মধুর বোধ হচ্ছিল যেন তাতে বিভোর হ'য়ে আরো কিছুকাল থাকতে পারলেই ভাল হ'তো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁর ভ্রান্তি দূর হ'ল—স্বপ্নের অবাস্তবতা তাঁকে যেন ব্যথিত ক'রে তুললো। কিন্তু এই স্বপ্নটা কি একেবারেই মিথ্যা? দু'মাস পূর্ব্বে ঠিক এই অবস্থাটাই কি তাঁর হয়েছিল না? লীলাবতী ভাবলেন, নৌকাডুবির পর সুরথ তাঁকে এইভাবেই তো উদ্ধার ক'রেছিলেন এবং তাঁর অজ্ঞানাবস্থায় এই ভাবেই হয় তো তিনি তাঁর মুখের দিকে আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। আশ্চর্য্য, এতদিন এই কথাটা একবারও তাঁর মনে হয়নি! সুরথের সঙ্গে তাঁর জীবন এমন ভাবে জড়িত হ'য়ে পড়লো কেন?

শয্যাত্যাগ করার পূর্ব্বেই লীলাবতীর সংকল্প স্থির হ'য়ে গেল,—তিনি ঠিক করলেন, মিঃ চৌধুরীকে তিনি বিয়ে করতে পারবেন না।

ওদিকে সুরথও তার বিছানায় শুয়ে নানা চিন্তায় আকুলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। লীলাবতীর বিয়ের প্রস্তাবে তার মন বিচলিত হচ্ছে কেন? এরূপ দুর্ব্বলতা তার মধ্যে কেন এল? লীলাবতী জানেন না,—তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি, সুরথ কত হীন, কত দীন, কত ঘৃণ্য এবং সমাজের কত নিম্নস্তরে তার স্থান! সম্পূর্ণ নিরপরাধ হলেও সে জেলখাটা দাগী চোর! সে খুনী পলাতক আসামী। সে প্রতারক, লীলাবতীকে সে সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা ক'রেছে ঐ সব কথা গোপন ক'রে। না জেনে তিনি এখন তাকে একটু স্নেহের চোখে দেখছেন বটে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই প্রতারণা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে, তখন তিনি তাকে কি মনে করবেন? সে তাঁর কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে কি? অসম্ভব,—তার অলীক স্বপ্ন বুদ্‌বুদের ন্যায় ভেঙে-চুড়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক, হোক তার মনে ব্যথা কিন্তু লীলাবতী সুখী হো'ক। মিঃ চৌধুরী রূপে, গুণে সবরকমে সম্পূর্ণ যোগ্য লোক। লীলাবতী তাঁকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই সুখী হ'তে পারবেন। সুরথ স্থির করল, লীলাবতী আবার যদি তার কাছে ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তা হ'লে আগের চেয়েও জোরের সহিত মিঃ চৌধুরীর প্রস্তাব সমর্থন করবে।

লীলাবতী ইচ্ছা ক'রেছিলেন মিঃ চৌধুরীকে আর বৃথা আশায় না রেখে সেই দিনই তাঁর সংকল্পের কথা তাঁকে জানিয়ে দেবেন, কিন্তু কিছুতেই তা পারলেন না, অপ্রিয় কথাটি ব'লে তাঁর মনে আঘাত দিতে কেমন একটা সংকোচ ও ব্যথা বোধ হ'তে লাগলো। শেষে স্থির করলেন, মিঃ চৌধুরী নিজে জানতে না চাওয়া পর্য্যন্ত তিনি চুপ ক'রেই থাকবেন।

একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেইদিন অফিস ও কারখানার কাজ-কর্ম্মাদি বন্ধ ছিল এবং বাংলোর বেশীর ভাগ লোকই তিন মাইল দূরবর্ত্তী এক মেলায় আনন্দোৎসব করতে চ'লে গিয়েছিল। সুতরাং এদিকে কোন কাজ না থাকায় অপরাহ্নকালে মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে লীলাবতী বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন এবং গল্প করতে করতে দূরের পাহাড়ের

কাছাকাছি এসে পড়লেন। এই পাহাড় সম্পর্কিত অনেক বিভীষিকাপূর্ণ গল্প তাঁর কানে পৌঁছেছিল। অকস্মাৎ অদূরে সেই পাহাড়টা দেখতে পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে না ভেবে ঐ পাহাড়েরই গল্প বল্‌তে বল্‌তে উভয়ে ফিরে চল্‌লেন। মিঃ চৌধুরী ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ে কতদূর বিশ্বাসী সে সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ না ক'রে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়র তাঁর কাব্যে কি ভাবে ভূতের অবতারণা করেছেন তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লেন। কিন্তু এই আলোচনা অধিকদূর অগ্রসর হ'তে পারলো না,—বক্তা ও শ্রোত্রীকে চমকিত ক'রে হঠাৎ সাত আট জন মুখোশপরা লোক তাঁদের ঘিরে ফেল্‌লো এবং একটি কথাও না ব'লে তাঁদের হাত-পা-মুখ বেধে কাঁধে তুলে নিয়ে চল্‌লো। প্রায় আধ ঘণ্টার পর একটা গুপ্ত পথে ভূতের পাহাড়ের উপর নিয়ে তাঁদের মুক্তি-প্রাঙ্গণে ফেলে রেখে ঐ লোকগুলো চ'লে গেল। হাত-পা-মুখ বাঁধা ছিল ব'লে তাঁদের কথা বল্‌বার কিংবা নড়া-চড়া করবারও শক্তি ছিল না। বাঁধন ছিঁড়বার জন্ত তাঁদের সকল চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। কে কি উদ্দেশ্যে তাঁদের এখানে এনেছে, তাঁরা কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। তবে উদ্দেশ্যটা যে নিশ্চয়ই ভাল নয়, এ সম্বন্ধে তাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। দারুণ শীতে মুক্ত আকাশ-তলে এইভাবে পাহাড়ের উপর প'ড়ে থাকার কষ্ট অপেক্ষাও পীড়াদায়ক হ'ল, তাঁদের আসন্ন অকাল-মৃত্যুর বিভীষিকা। ভূতের পাহাড় থেকে কেউ জীয়ন্ত ফিরে যেতে পারে না, এই জনরবের কথা অল্পক্ষণ পূর্ব্বেও তাঁরা আলোচনা ক'রেছিলেন। কে জান্‌তো, অবশেষে এইভাবে তাঁদের দেহ-ত্যাগ ক'রতে হবে। জীবনের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ র'য়ে গেল। এই ভয়াবহ স্থান থেকে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নেই বুঝে তাঁরা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলেন।

এইভাবে অনেকক্ষণ চ'লে গেল। অবশেষে বন্দী ও বন্দিনীকে অতিমাত্র বিস্মিত ও ভীত ক'রে আবির্ভূত হ'ল এক বিকটাকার মূর্ত্তি, এক হাতে শিঙা অপর হাতে খড়্গ নিয়ে। শিঙার ধ্বনি ও তার হুঙ্কারে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠলো,—তারপর চল্‌লো বন্দী ও বন্দিনীর চারি দিক ঘিরে ঐ বিকট মূর্ত্তির তাণ্ডব-নৃত্য ও ক্ষণে ক্ষণে তার তিন চক্ষু থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণ। ভয়ে লীলাবতীর দেহের সমস্ত রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। আর একবার শিঙা-নিনাদ ক'রে সেই মূর্ত্তি উত্তোলিত খড়্গ হস্তে লীলাবতীর নিকট এসে দাঁড়ালো এবং পর মুহূর্ত্তে লীলাবতী দেখলেন সেই খাঁড়া তাঁর মাথার উপর পড়বার জন্মে উদ্যত,—ভয়ে তার চোখ বুজে এল এবং বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর আর্ত্তস্বর বেরুবার জন্ত চেষ্টা ক'রে গলার কাছে এসে আটকে গেল। লীলাবতী দেখতে পেলেন না বটে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ঐ বিকটমূর্ত্তি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে খাঁড়াসমেত ছিটকে পড়লো প্রায় পাঁচ হাত দূরে, এবং পরক্ষণেই তার মুখ থেকে ফুটে বেরুলো এক গভীর কাতরধ্বনি। সেই ধ্বনি বের হ'তে না হ'তেই তার উপর একজন লোক লাফিয়ে পড়লো এবং তার দীর্ঘ শ্মশ্রু ধ'রে আকর্ষণ করলো,—তখন ঐ শ্মশ্রুর সঙ্গে উঠে এলো লম্বা শিং ও উঁচু কাণযুক্ত একটা অদ্ভুত মুখোশ এবং তখনই বেরিয়ে পড়লো তার প্রকৃত চেহারা। আগন্তুক সুরথ দেখে বিস্মিত হ'ল, শিং দাড়ি বর্জ্জিত এই "ভূত" হচ্ছে মিস্ লীলাবতীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার তিনকড়ি মণ্ডল! সুরথ আরো দেখলো, ভূতমশায় ধাক্কা খেয়ে তার নিজ হাতের খাঁড়ার উপর এমনি ভাবে প'ড়েছে যে খাঁড়ার মুখ গভীরভাবে তার বুকে বিঁধে জীবন বিপন্ন ক'রে ফেলেছে।

সুরথ অবিলম্বে লীলাবতী ও মিঃ চৌধুরীকে বন্ধন-মুক্ত ক'রে তিনকড়ির নিকট উপস্থিত হ'ল এবং খুব আস্তে আস্তে খাড়াটা বুক থেকে টেনে বের করলো। ক্ষতস্থান থেকে এরই মধ্যে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, এখন আরো বেশী পরিমাণে রক্ত পড়তে লাগলো। সুরথ তাড়াতাড়ি একটা জামা ছিঁড়ে তা দিয়ে রক্ত-ক্ষরণ বন্ধ করবার চেষ্টা করল কিন্তু সফল হ'ল না। তিনকড়ি মণ্ডল বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তিম কাল উপস্থিত এবং ক্রমই তাঁর শক্তি হ্রাস হ'য়ে যাচ্ছে। তখন লীলাবতীকে নিকটে আহ্বান ক'রে তিনি ক্ষীণ-কণ্ঠে যা বল্‌লেন, তার মর্ম্ম এই :—

"বুঝতে পাচ্ছি, আমার যাবার সময় হ'য়ে এসেছে—যাবার আগে কয়েকটা কথা ব'লে যেতে চাই, সময়ে কুলাবে কিনা জানি না। প্রথম কথা, আমার প্রকৃত নাম তিনকড়ি মণ্ডল নয়, যদিও এই নামেই এই ইষ্টেটের চাকুরীতে ঢুক-

ছিলাম। আমার আসল নাম গদাধর মান্না—লোকে ডাকতো গদু মান্না ব'লে। গয়নার লোভে এক ভদ্রলোকের পরিবারকে খুন ক'রে দেশ থেকে সরে প'ড়ি। তারপর আরও দু'এক জায়গায় এই শ্রেণীর আরো কয়েকটা অপরাধ ক'রে ক'লকাতায় গিয়ে তিনকড়ি মণ্ডল নাম নিয়ে কিছুদিন ভদ্র-ভাবে থাকি এবং ঐ সময়েই এই ইষ্টেটের চাকরী পেয়ে এখানে চ'লে আসি। নিস্তারিনী আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়—খুনের ব্যাপারের পর সে আমার সঙ্গে জুটে যায় এবং কৌশলে আমার আসল পরিচয়টা বের ক'রে নেয়। তারপর তার এক দূরসম্পর্কিত ভাই রমেন অধিকারী আমাকে খুনী পলাতক আসামী ব'লে চিন্‌তে পেরে পুলিশে ধরিয়ে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। তখন প্রাণের ভয়ে কিছু নগদ টাকা তাকে দিয়ে পরে মাঝে মাঝে আরও টাকা দিবার অঙ্গীকার ক'রে এবং এ পর্য্যন্ত নিয়ম মতো দিয়ে এই কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছি। রমেন অধিকারীর একটা বড় দল আছে—তারা পিস্তল, বন্দুক, গুলি, বারুদ এই সব সংগ্রহ করে। দু'বছর যাবৎ তাদের কয়েক জন লোক এসে এই পাহাড়ের এক গুপ্ত কুঠরীতে আড্ডা নিয়েছে। পাছে পুলিশ বা অন্য লোক-জন এসে ঐ আড্ডার সন্ধান পায়, এই ভয়ে তারা ভূতের গল্পের সৃষ্টি ক'রেছে এবং রোজ রাত্রিতে একজন না একজন ঐ মুখোশ প'রে নাচা-নাচি হাঁকা-হাঁকি ক'রে ভয় দেখায়। মাঝে মাঝে তারা অন্য জায়গায়ও চ'লে যায়, আবার ফিরে আসে। তারা এখানে না থাকলে আমাকেই ভূত সেজে নাচা-নাচি করতে হয়। পুলিশে খবর দিলে, তারা আমায় গুলী ক'রে মেরে ফেলবে এবং আমার পূর্ব্বজীবনের সব কথা ব'লে দেবে ব'লে, বরাবর ভয় দেখিয়ে আসছে। আমি তাই ভয়ে তাদের সব রকম আদেশ পালন ক'রে আসছি। এই ইষ্টেটের অনেক টাকা ওদের দিয়েছি, আর অনেক টাকা আমি নিজেও লুকিয়ে রেখেছি, নিস্তারিনীর ভয়ে। নিস্তারিনী সব সময় আমার উপর পাহারা দিত এবং সব কথা ঐ দলের লোকজনকে বলে দিত। ইচ্ছা ছিল, আপনাকে, সুরথ বাবুকে আর নিস্তারিনীকে শেষ ক'রে ঐ দলটাকে একদম শেষ করবো, তা হ'লে নিশ্চিন্তে এই ইষ্টেটটা ভোগ করতে পারবো, কিন্তু তা আর হ'ল না—নিজের অস্ত্রে নিজেই মারা গেলাম। আপনার ঘরে আমিই সাপ ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম এবং সুরথ বাবুকেও ইন্দারায় ফেলে দিয়েছিলাম আমারই লোক দিয়ে, তাঁকে দূর করবার জন্য। কিন্তু আপনার সঙ্গের এই লোকটী তো সুরথ বাবু নয়? এঁকে বোধ করি ভুল ক'রে ধ'রে এনেছে। আর বলতে পাচ্ছি না,—অপরাধ ক্ষমা করবেন—গুপ্ত কুঠরীটা উত্তরের দিকে পাথরের নীচে—অনেক পিস্তল, বন্দুক পাওয়া যাবে সেখানে। নিস্তারিনীকেও ছাড়বেন না,—সেও ঐ দলের লোক—আমার লুকান টাকাগুলো সব নিয়ে সে সরে পড়েছে—রমেন, নিস্তারিনী কাউকে ছাড়বেন না—আর বলতে পাচ্ছি না—গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল, জ...ল...

বাক্য আর শেষ হ'ল না—একটু একটু ঘর্ ঘর্ শব্দ ক'রে কিছুক্ষণ পরেই বেচারীর প্রাণবায়ু নির্গত হ'য়ে গেল।

লীলাবতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "অদ্ভুত পরিণাম! আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও এই ব্যক্তিই আমাদের প্রাণ নিবার উল্লাসে খাড়া হাতে আস্ফালন কচ্ছিল!"

মিঃ চৌধুরী বল্‌লেন :—"সুরথ বাবু ঠিক সময়ে না এলে ভীষণ মৃত্যু থেকে কিছুতেই আমাদের অব্যাহতি ঘটতো না ভয়ে এখনও গা কাঁপচে। সুরথ বাবু কেমন ক'রে সব জানতে পারলেন এবং ঠিক সময়ে এসে আমাদের বাঁচালেন, বুঝতে পাচ্ছি না।"

সুরথ বল্‌লো, "সে সব পরে শুনবেন। এখন আর এক মুহূর্ত্তও আপনাদের এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই শবদেহের কি ব্যবস্থা করা যায়? এই ভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। আসুন মিঃ চৌধুরী, এক কাজ করা যাক—এখানে দু'টো পাকা কুঠরী আছে—তার একটাতে এই শব রেখে যাই—পরে লোকজন নিয়ে এসে দাহের ব্যবস্থা করা যাবে কিংবা পুলিশে সংবাদ দেওয়া যাবে।"

সেই অনুসারে তিনকড়ির দেহ কুঠরীতে নিয়ে রাখা হ'ল এবং তারপর সুরথ ঘনপাতা বিশিষ্ট কয়েকটা গাছের ডাল কেটে এনে সেগুলো দিয়ে ঐ দেহ ভাল ক'রে ঢেকে দিলো।

ভূতের কৃত্রিম দাড়ি শিঙ যুক্ত মুখোশটা নিকটেই প'ড়ে ছিল। সুরথ সেটা তুলে পরীক্ষা ক'রে দেখলো তার ভিতরে র'য়েচে একটা ব্যাটারি ও তার সঙ্গে তারযুক্ত তিনটা ইলেক্ট্রিক বাতি। এই ব্যাটারির সাহায্যেই যে তিন

কৃত্রিম চোখের ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বাতি জ্বলে উঠত ও আবার নিভে যেতো, এখন তা পরিষ্কার বোঝা গেল। সুরথের সঙ্গে একটা টর্চ্চ বাতি ছিল। সুরথ ঐ বাতি দিয়ে পথ দেখিয়ে চল্লো।

পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় এসে সুরথ সঙ্গীদের বলল, কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভূতের পাহাড়ের নিকট থেকে ফিরবার পথে তাকে কেমন ক'রে ভুলিয়ে একটা পুরাতন ইন্দারায় ফেলে দিয়ে মারবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল এবং তার পরক্ষণেই দৈবক্রমে গৌরদাস এসে তাকে কেমন ক'রে বাঁচিয়েছিল। আবার দিন কয়েক পূর্ব্বে গোপনে ভূতের পাহাড়ে এসে সুরথ কি ভাবে সারারাত গাছের উপরে ব'সে থেকে ভূতুড়ে কাণ্ড সব দেখেছিল, সে সব কথাও আজ মিঃ চৌধুরী ও লীলাবতীকে বললো,—সব শেষে বলল,—"এই ভূতের ব্যাপারের ভিতরে যে একটা রহস্য আছে, গোড়াতেই আমার সে রকম সন্দেহ হ'য়েছিল,—তারপর যখন ভূতের বিকট চেহারা ও নাচ স্বচক্ষে দেখে পাহাড় থেকে নিরাপদে জ্যান্ত ফিরে আসতে পারলাম এবং আমি যে ভূতের কাণ্ডকারখানা লুকিয়ে দেখে এসেছি, ভূত তা জানতেও পারলো না, তখনই বুঝে নিলাম, এ নিশ্চয় সাজানো ভূত। তাই সঙ্কল্প করলাম, আবার একদিন লুকিয়ে পাহাড়ে যাব এবং গিয়ে ভূতের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করব। সেই উদ্দেশ্যেই আজ সন্ধ্যার আঁধারে সকলের অগোচরে পাহাড়ের দিকে চ'লে আসি। আপনারা যে এদিকে এসেছেন কিংবা আসবার সঙ্কল্প ক'রেছেন, তার কিছুই আমি জানতাম না।"

লীলাবতী বললেন, "এদিকে আসবো ব'লে আমরা বের হই নি—গল্প করে চলতে চলতে এদিকে এসে পড়েছিলাম, তখন হঠাৎ পেছন থেকে কয়েকজন লোক আমাদের ধ'রে হাত-মুখ-বেঁধে কাঁধে তুলে পাহাড়ের উপরে নিয়ে এলো।"

সুরথ বলল, "তারা নিশ্চয়ই তিনকড়ি বাবুর ভাড়াটে লোক—এখন বুঝতে পাচ্ছি, তারা ভুল ক'রে মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে গে'ছিলো এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে নিয়ে যাওয়া। এই একটু খানি ভুলের ফল কি সাঙ্ঘাতিকই হ'তে যাচ্ছিল। যাক্, তারপর আমি যখন পাহাড়ে উঠলাম, তখন ঘোর অন্ধকার, ভাবলাম, একটা গাছের উপর উঠে ভূতের প্রতীক্ষা করব, কিন্তু তা আর ক'রতে হ'ল না, ভূত আজ অনেক আগেই এসে হাজির এবং এসেই শিঙা বাজিয়ে ডাক-হাঁক-নাচ সুরু ক'রে দিল। একটু পরেই তার তিন চোখের আলোকে দেখতে পেলাম, দু'টি লোক মাটিতে প'ড়ে আছে ও ভূত তাদের ঘিরে নাচছে, তার পরেই সে একজনকে আঘাত করবার জন্য তার হাতের খাঁড়া তুললো। আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলাম। কিন্তু ঐ শিং দাড়ির অন্তরালে যে তিনকড়ি মণ্ডলের মুখখানা ছিল, তা কল্পনায়ও আনতে পারি নি।"

লীলাবতী বললেন, "ভগবান অতি আশ্চর্য্য ভাবে মানুষকে রক্ষা করেন। ভূতের রহস্য আবিষ্কারের কৌতূহলটা আপনার যদি আজই ঠিক এই সময়ে না হ'ত, তা হ'লে তিনকড়ি বাবুর বলিদানের কাজটা নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে যেতো এবং পরে বলির কথাটা জানা জানি হ'লে সেই অপরাধের জন্য ভূতই দায়ী হ'ত। ফন্দিটা মন্দ ছিল না। আচ্ছা, এই যে রমেন অধিকারীর গুপ্ত আড্ডার কথা শোনলাম, সে সম্বন্ধে কি করা উচিত?"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "আমার মনে হয়, পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল। তারা এসে যা ভাল মনে করে করবে, আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

সুরথ বলল, "ব্যাপারটা পুলিশের হাতে যাওয়াই ঠিক, সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রথমেই তিনকড়ির মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের সবাইকে নিয়ে টানাটানি হবে, সে যে নিজের খাঁড়ার উপরে প'ড়ে মারা গিয়েছে এ সম্বন্ধে সন্তোষ-জনক প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, হ'লেও পুলিশ সহজে তা বিশ্বাস করবে না, ফলে আমাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। তারপর রমেনের আড্ডা যদি আবিষ্কার হয় এবং সেখানে বন্দুক, পিস্তলাদি পাওয়া যায়, ব্যাপারটা আরো গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াবে। যে রকম দিন কাল প'ড়েছে, সকল দোষ এসে আমাদের ঘাড়েই চাপবে এই জন্য আমার মনে হয়, আমরা তিন জন ছাড়া এ সব কথা আর কেউ যাতে জানতে না পারে সে জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক হ'তে হবে। কাল ভোরে মিঃ চৌধুরী ও আমি পাহাড়ে এসে শবদাহের ব্যবস্থা করব, আর সম্ভব হ'লে গুপ্ত আড্ডারও খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখবো।"

লীলাবতী এবং মিঃ চৌধুরী সুরথের প্রস্তাবই অনুমোদন করলেন। যাতে কোনরকমে পুলিশের সম্পর্কে যেতে না হয়, সুরথ সেজন্য সব সময় সচেষ্ট থাকত। তার অপরিসীম আশঙ্কা ছিল, পুলিশ এলেই তার যে পরিচয় সে এতকাল অতি সাবধানে গোপন ক'রে এসেছে, সেটা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সে যে খুনী পলাতক আসামী, এই চিন্তা সে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারত না।

কিন্তু লীলাবতী তা জানতেন না। তাঁর ভাব-প্রবণ চিত্ত সুরথের নির্ভীকতার এই আর একটা জলন্ত নিদর্শন দেখে আরও বিমুগ্ধ হ'ল। আজ যে তাঁদের প্রাণ বেঁচেছে, অতি নিষ্ঠুর, কঠোর ও নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছে, তা সুরথেরই জন্য। গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

পর দিন মিঃ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে সুরথ ভূতের পাহাড়ে গেল এবং দেখে ব্যথিত হ'ল, তিনকড়ি বাবুর দেহের উপর প্রায় এক ডজন শেয়াল ভোজে ব'সেছে। দেহের অতি সামান্য অংশই তখন ভুক্তাবশিষ্ট ছিল। আর দশ মিনিট মধ্যে কয়েক খণ্ড হাড় ভিন্ন আর কিছুই থাকবে না বুঝতে পেরে ঐ দেহ পোড়াবার সঙ্কল্প তাঁদের ত্যাগ করতে হ'ল।

তাঁরা তখন গুপ্তকুঠীরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল। তিনকড়ি বলেছিলেন উত্তর দিকে পাথরের নীচে সেই কুঠরী। রমেনের দলের কেউ সম্ভবতঃ তখন উপস্থিত ছিল না। তাই তিনকড়ি নিজে ভূত সাজবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রায় দু'ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর একরাশ পাথরের মধ্যভাগে একখণ্ড অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পাথর দেখে সুরথের সন্দেহ হ'ল। ঐ পাথরখানা দু'জনে ধ'রে সরাবামাত্র তার নীচে ধাপযুক্ত একটা সুরঙ্গের পথ দেখা গেল—ঐ সিঁড়িপথে আট নয় ধাপ নেমেই তার একটা সম্পূর্ণ পাথর-ঘেরা ঘরের মধ্যভাগে উপস্থিত হ'ল। প্রায় ৪ ফুট উঁচুতে ছোট জানালার মতো একটা ফাঁকা স্থান দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ ক'চ্ছিল—ঐ আলোতেই বুঝ্‌তে পারা গেল, ঘরটা আয়তনে প্রায় ৭ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট লম্বা এবং তার ভিতর তিন চার জন লোক বেশ থাকতে পারে। ঘরের ভিতর কোথাও বন্দুক, পিস্তলাদির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া গেল না। সুরথ বিশ্বাস ক'রেছিল, তিনকড়ি বাবু মৃত্যুকালে কখনই মিথ্যাকথা বলেন নি। যদি তা-ই হয়, বন্দুক সব গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কোথাও লুকানো আছে। সুরথ আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল,—অবশেষে দেয়ালের গায়ের একটা পাথর অপসারিত করামাত্র তার পশ্চাদ্ভাগে দশটা বন্দুক, তিনটা পিস্তল ও পাঁচ বাক্স বন্দুকের গুলি বেরিয়ে পরলো। সুরথ মিঃ চৌধুরীকে বুঝিয়ে বললো, এই সমস্ত জিনিষ থাকা বিপজ্জনক সুতরাং এ-গুলো ধ্বংস ক'রে ফেলাই সঙ্গত। বাইরে থেকে শুক্‌নো কাঠ এনে এই ঘরের ভিতরে তিনকড়িবাবুর দেহের পরিবর্ত্তে বন্দুক-পিস্তলের চিতা-শয্যা তৈরী করা হ'ল। সমস্ত সাজানো হ'লে সুরথ তাতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলো, মিঃ চৌধুরীও এলেন। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠবার একঘণ্টা পরে একটা ভীষণ শব্দে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠল এবং গুপ্ত-কুঠরীর চারিদিকের পাথরগুলোর কয়েকটা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে, কয়েকটা ছড়িয়ে গিয়ে ও বাকীগুলো ঘরের মাঝখানে স্তূপাকার হ'য়ে পড়ল। যে-ভাবে কয়েকখণ্ড পাথর ছুটে বেরিয়েছিল, সুরথ ও মিঃ চৌধুরীর সৌভাগ্য যে সেগুলোতে তারা আহত হন নি। সুরথ তখন যথার্থই অনুমান করলো, ঘরের ভিতর কোথাও হয় তো বোমা বা বিস্ফোরক দ্রব্য লুকানো ছিল, আগুনের সংস্পর্শে এসে সেগুলো ফেটে এই কাণ্ডের সৃষ্টি ক'রেছে। এক হিসেবে ভালই হ'ল—গুপ্ত ঘর ও বন্দুকাদির চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়ার আর সম্ভাবনা রইল না।

সমস্ত শুনে লীলাবতী এক রকম নিশ্চিন্ত হ'লেন। রমেনের দলের সহিত তাঁর কোনো বিরোধ না থাকলেও এত নিকটে তাঁরই জায়গায় তাদের আড্ডা থাকলে যে কোন সময়ে তারা একটা বিভ্রাটের সৃষ্টি করতে পারতো। সেই সম্ভাবনা এখন অনেক পরিমাণে ক'মে গেল।

মিঃ চৌধুরীর সেই দিনই চ'লে যাবার কথা। লীলাবতী এখনও তাঁকে কোন উত্তর দেন নি। উত্তর পাবার জন্য মিঃ চৌধুরী তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে, লীলাবতী বললেন, "সামনের মাসের পনেরো তারিখে এখানে নূতন লাইব্রেরীর উদ্বোধন উৎসব হবে, সেই উৎসবে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ কচ্ছি, আপনি অবিশ্যি আসবেন, তখন আমার উত্তর জানাবো।"

এই উত্তর সম্পূর্ণ তৃপ্তিপ্রদ না হ'লেও মিঃ চৌধুরী প্রতিবাদসূচক কিছু বললেন না, বরং ঐ উৎসবে উপস্থিত থাকতে চেষ্টা ক'রবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ দিনই ক'লকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন। [ক্রমশঃ

চোলরাজ্যে রাজস্ব প্রণালী

শ্রীললিতমোহন হাজরা, বি-এ

ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির এক গৌরবময় যুগ দাক্ষিণাত্যে আরম্ভ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের তামিল রাষ্ট্রগুলির বিস্তৃত কাহিনী যদিও অদ্যাবধি ভারতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যোগ্য স্থান লাভে বঞ্চিত, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মুষ্টিমেয় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগের নিকট মূল্যবান্ এবং লোভনীয় বস্তু। কি উন্নত প্রণালীর শাসন-পদ্ধতি, কি আধিমানসিক উৎকর্ষ, সকল দিয়া তামিল রাষ্ট্রগুলি তদানীন্তন মধ্যযুগীয় যাবতীয় রাষ্ট্রকে পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্র এবং তথাকথিত ধর্ম্মযুদ্ধ তথা পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা যখন মধ্যযুগীয় ইতিহাস কলঙ্কিত করিতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলি এক অপূর্ব্ব মানবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। বর্ত্তমানে যে গণতন্ত্র রক্ষা-কল্পে পৃথিবীর বক্ষে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তাহা নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যে বিনা রক্তপাতে কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে হিন্দুধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব উদারতা এবং সার্ব্বভৌমিকতা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন জাতীয় সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদগুলি একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মহাভারত ভারতবাসীর অন্তরে ভারতীয় মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত করিয়াছিল বলিয়াই এখানে ধর্ম্মান্ধতা কখনই অমার্জ্জিতরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নাই। তাই দেখি, ভারতীয় ধর্ম্ম ইতিহাসে এই সমীকরণ এবং ঐক্যানুসন্ধান প্রচেষ্টা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

চোল নৃপতিবর্গের ইতিবৃত্ত আলোচনার প্রারম্ভে চোল-রাজ্যের সীমা এবং বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাহার অবস্থান উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। অদ্যাবধি সঠিক সীমা নির্দ্ধারিত না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্ত্তমান সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং মহীশূর রাজ্যের কতকাংশ এই রাজ্যভুক্ত ছিল। তদানীন্তন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ড্য-নৃপতিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য এই রাজ্যভুক্ত হওয়ায় পাণ্ড্যদিগের রাজধানী তাঞ্জোরনগরী সমগ্র রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। চোল-নৃপতিগণের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে—ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সাধারণতঃ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আমরা চোল-নৃপতিগণের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসে বিরাট নৌ-বাহিনীর কাহিনী অবগত হই। কিন্তু তাঁহাদিগের আভ্যন্তরীণ শাসন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাহিনী সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। যদিও আমরা রাজস্ব প্রণালীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব তথাপি এই আলোচনার সহিত স্বায়ত্তশাসন প্রণালী এবং প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক অধিকারের কথা সংযুক্ত হইবে। এই কারণে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এই দুই দিক আলোচনা করিয়া উল্লিখিত মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ইহা কাব্য নয়-নির্ম্মম ঐতিহাসিক বাস্তব। চোল নৃপতিবর্গের প্রত্যেকের শাসন-নীতি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে প্রত্যেক নৃপতির রাজত্ব-কালে এমন কিছু মূল্যবান সংগঠনমূলক ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনিবার্য্য। যে কর্ম্মদক্ষ এবং প্রজাহিতৈষী নৃপতিগণ স্বীয় রাজত্বকালে আশ্রিত প্রজাবৃন্দের নিমিত্ত সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাই বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

বিজয়ালয় চোল তাঁহার রাজত্বকালে শাসনপ্রণালীতে এক বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবর্ত্তন করিয়া বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়ালয় সিংহাসন আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসনে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়ালয় এর বৈপ্লবিক নীতি বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নৃপতিবর্গের উল্লেখ না করিলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর

অপলাপ করা হইবে। তাঁহার সমসাময়িক নৃপতিবর্গের মধ্যে কাঞ্চীর ক্ষীয়মাণ পল্লবগণ এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়ালয় সামরিক শক্তিবলে এত প্রবল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক পরাক্রমশালী নৃপতিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই কারণে তিনি পরকেশরী বর্ম্মণ বিজয়ালয় নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা পর্য্যায়ক্রমে 'পরকেশরী বর্ম্মণ' এবং 'রাজকেশরী বর্ম্মণ' উপাধি ধারণ করিতেন। প্রখ্যাত প্রথম রাজারাজ বিজয়ালয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যবধানের মধ্যে অনেক নৃপতি রাজত্ব করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম আদিত্য, প্রথম পরান্তক, গণ্ডরাদিত্য, সুন্দর চোল, দ্বিতীয় পরান্তক এবং মধুরান্তক, উত্তম-চোল প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র চোল-বংশীয় নৃপতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চোল শাসন-পদ্ধতির মধ্যে গ্রাম্য পরিষদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। ত্রিবিধ গ্রাম্য-পরিষদ ছিল। ব্রাহ্মণদিগের পরিষদ 'সভা' গ্রাম্য সর্ব্বসাধারণের পরিষদ 'উরার' এবং ব্যবসায়ীদিগের পরিষদ 'নগরত্তার' নামে অভিহিত হইত। 'নাত্তার' নামে একটি জেলা পরিষদ থাকিত এবং এই পরিষদে সমগ্র জেলাবাসিগণের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যাগুলি আলোচিত হইত। ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রাম 'অগ্রহার' নামে অভিহিত হইত এবং স্বল্প জমিজমার মালিকের সভায় আসন থাকিত কিন্তু মূর্খ ব্রাহ্মণ বিশাল সম্পত্তির মালিক হইয়াও সভার আসন গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। কারণ সভায় আসন গ্রহণকারী সদস্যদিগের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হইলে কেহ সভ্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পরিষদ সহযোগিতা এবং গঠনমূলক নীতির দ্বারা পরিচালিত হইত। এই জন্য কোন সভ্য অহেতুক পরিষদ-গৃহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার মানসে পরিষদে উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে পরিষদের বিধানানুসারে তাহাকে জরিমানা দিতে হইত। ন্যায়তঃ মতদ্বৈধ ব্যতীত সভ্যদিগের অবাধ্যতা নিরুৎসাহিত করা হইত। 'উরার' 'নগরত্তার' এবং 'নাত্তার'এর পরিষদ-বিধি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ 'সভা'র বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধি ব্যতীত অন্যান্য বিধিমতে 'উরার' 'নগরত্তার' এবং 'নাত্তার' এর কার্য্য পরিচালিত হইত।

পরিষদের সভা সাধারণতঃ মন্দিরে বসিত। প্রত্যেক মন্দিরে এই জন্য বিশেষ একটি অংশ নির্ম্মিত হইত এবং সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দির সংযুক্ত 'সভামণ্ডপ' এই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশ্য সময়ে সময়ে এই সভা তেঁতুল এবং শিমুল বৃক্ষতলে বসিত। এই উদ্দেশ্যে বৃক্ষতল বাঁধাইয়া মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইত। সচরাচর এই মঞ্চগুলি নাগপ্রস্তরে নির্ম্মিত হইত, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল নাগগণ ন্যায় বিচারের জন্য বিচারস্থলে উপস্থিত থাকেন। অবশ্য ইহা কিংবদন্তী। 'ভট্টস্' অর্থাৎ জ্ঞানী পণ্ডিতমণ্ডলী "বিশিষ্ট" অর্থাৎ ধার্ম্মিক এবং মন্দিরের পূজারীগণ ও গ্রাম্য বৃদ্ধগণ "সভার" নির্ব্বাচকমণ্ডলী। সময়ে সময়ে শিশুও সভার সভ্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল: কোন প্রস্তাবের আলোচনা কালে যে সমস্ত গ্রহণ করা হইত তাহা বর্ত্তমান যুগের ন্যায় "হাঁ" এবং "না" (Ayes or Noes)এর ন্যায় হইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকানির্ম্মিত টিকিট থাকিত এবং তাহাদ্বারা সভ্যগণ স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেন। এই টিকিটগুলি সভ্যগণ একস্থানে রাখিয়া দিতেন এবং এই স্থান হইতে সভ্যদিগের মতামত সম্বলিত টিকিটগুলি সংগ্রহ করিবার ভার শিশুর উপর অর্পিত হইত। সচরাচর ব্রাহ্মণদিগের সভার অধিবেশনে নগরত্তার, উরার এবং 'নাত্তার'এর প্রতিনিধিগণ যোগদান করিতেন। উল্লিখিত পরিষদ সত্বেও মিলিত জীবনের ভাবধারা কোন ক্রমেই ব্যাহত হয় নাই। যাহাই হউক—এই শাসনপদ্ধতি মন্দির-সমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিচালনায় প্রযুক্ত হইত। অবশ্য ইহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব বালক-সমিতিও ছিল।

গ্রাম্য সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা দ্বিবিধ—(১) আইন প্রণয়ণ এবং (২) শাসন বিভাগ। এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদ (General Assembly) বলিলে বুঝিতে হইবে যে তিনটি পরিষদ একত্রিত হইয়া সভা আহ্বান করিত এবং এই সভা সাধারণ পরিষদ নামে অভিহিত হইত। এই সভা আহ্বান করিবার নিমিত্ত কোন নোটীশের ব্যবস্থা ছিল না। টম্‌ টম্‌এর বাদ্য-ধ্বনি দ্বারা সদস্যদিগকে জ্ঞাত করান যাইত যে, সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করা হইতেছে। টমটমএর বাদ্য

শ্রবণ করিয়া পরিষদের সদস্যগণ মন্দিরস্থ সভামণ্ডপে একত্রিত হইতেন এবং বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। এই সভায় একজন রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতেন। এই পরিষদ মন্দিরের পক্ষ হইতে ভূমি বিক্রয় অথবা ক্রয় করিতেন এবং ক্রয় বিষয়ে ক্রীত ভূমিকে নিষ্কর ভূমিতে পরিণত করিবার জন্য ইঁহারাই কাণ্ডল্ অর্থাৎ অগ্রিম দাদন হিসাবে যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতেন। কারণ, এই অর্থের বার্ষিক কুসীদ দ্বারা রাজস্ব প্রদত্ত হইত। মন্দির ক্রেতা হিসাবে ইঁহারাই কাণ্ডল্ প্রদানের অসমর্থ হইলে তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা সমগ্র গ্রামের উপর বণ্টন করিয়া দিতেন। মন্দিরের পক্ষ হইতে অথবা মন্দিরের নিজস্ব তরফ হইতে বদান্যতার নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। এই অর্থের কুসীদ হইতে তাঁহারা বার্ষিক ন্যাস পরিচালনা করিতেন। এই বিনিযুক্ত অর্থ মৌলিক এবং গঠনমূলক কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যয় করা হইত। উদ্যান, আর্দ্র এবং শুষ্কভূমি, পুষ্করিণী এবং জলসেচন, সেতুশুল্ক এবং বিপণি-কর পতিত ভূমি এবং তাহার সংস্কার, মন্দির এবং দাতব্য সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সমিতি (Committee) কয়েকটী গঠন করা হইত :—

১। পুষ্করিণী সমিতি (Tank Committee) ২। উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ সমিতি (Garden Supervision Committee) এবং ৩। স্বর্ণপরীক্ষক সমিতি। এই সমিতিত্রয়ের কর্ম্মপন্থা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

১। পুষ্করিণী সমিতি—কোন পুষ্করিণীর মোহনা ভগ্ন হইলে সমগ্র গ্রাম বন্যাপ্লুত হইবার আশঙ্কা থাকায় এই ভগ্ন মোহনা পুনর্নির্ম্মাণের নিমিত্ত এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্থ প্রদান করা হইত এবং ইহাও নির্দ্ধারিত হইত যে, প্রদত্ত অর্থের বার্ষিক কুসীদ স্থানীয় মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই সমিতি একাধারে ব্যাঙ্কার এবং ন্যাসধারী।

২। উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ সমিতি—স্থানীয় উদ্যানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এই সমিতি গঠিত। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কর্ম্ম ছিল। ক্যানালের কোন তীর ভগ্ন হইলে তাহা সংস্কার করিবার এবং তীর বিস্তৃতির নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে সন্নিকটস্থ ভূমি সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব এই সমিতির উপর অর্পিত হইত। কোন সেচনী ক্যানাল এক গ্রামের উপর দিয়া অন্যগ্রামে প্রবাহিত হইলে প্রথমোক্ত গ্রাম্য পরিষদ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং ক্যানালের গতিপথ নির্দ্ধারণ করিত, সুবিধা উপভোগ নিমিত্ত একটি কর আদায় করিতেন।

৩। স্বর্ণপরীক্ষক সমিতি—মাদভিষী নামীয় রাজপথের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে চারিজন, সামরিক বিভাগ হইতে দুই জন, ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে তিন জন, মোট নয়জন সদস্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। প্রৌঢ় এবং স্বর্ণ পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ এই সমিতির সভ্য মনোনীত হইতে পারিতেন না। সদস্যদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইত যে, কেহ যেন অযথা পরশমণির উপর স্বর্ণ মর্দ্দন না করেন। কোনরূপ প্রতিগ্রহ পরিচ্ছদ না রাখিয়া এই মদ্দিত স্বর্ণচূর্ণ পুষ্করিণীসমিতির হস্তে প্রদত্ত হইত। অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা পরিষদের ছিল। এই অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্য পরিষদ ভূমি বাজেয়াপ্ত এবং প্রকাশ্যে নিলাম করিতেন। মন্দির সংক্রান্ত ভূমি হইলেও পরিষদের এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথ ছিল না। অবশ্য মন্দির সংক্রান্ত সম্পত্তি সচরাচর নিলামে উঠিত না, কারণ হিন্দু-সম্প্রদায় এই অনাদায়ী রাজস্ব নিলামের সময় প্রদান করিতেন। নিলামের পূর্ব্বে নিলামী সম্পত্তি কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক কি না, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তিনবার নিলামী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইত। এই নিলাম "নৃপতির শ্রেষ্ঠ নিলাম" নামে খ্যাত। এই নিলাম কদাচিৎ হইত। যদি কোন ভূস্বামী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন অথবা রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতার জন্য কোন ভূস্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে এই বিধি প্রয়োগ হইত। কাবেরী নদীর বন্যায় কোন ভূমি ছয় অথবা সাত বৎসর ব্যাপী অনাবাদী থাকিলে পরিষদ তাহা নিলাম করিতেন এই নিলামে উল্লিখিত পন্থা প্রযুক্ত হইত না।

নগদ মুদ্রায় এবং উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব আদায় দিবার সুব্যবস্থা ছিল। উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইত। এই রাজস্ব একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ ব্যতীত সমগ্র রাজস্বই জনসাধারণের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইত। দেবতা এবং ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া 'কুদিস'গণ অর্থাৎ ভূস্বামীগণ প্রজাস্বত্বের বাধ্যবাধকতা হইতে বঞ্চিত হইতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধিকার রক্ষিত হইত। ইহা

হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, রায়তগণ রাজস্ব এবং প্রজাস্বত্বের নিয়মাধীনে আবাদী ভূমির স্থায়ী স্বত্ব উপভোগ করিতেন। কোন ভূমি হস্তান্তরিত অথবা বিক্রীত এবং পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার চৌহদ্দী যথাযথ বর্ণিত এবং সীমা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত হইত।

চোল নৃপতিবর্গের রাজত্বকালে জল-সেচন-ব্যবস্থা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। করিকায়ে চোলের কাবেরী নদীর উভয় তীর বন্ধন ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জলের কোন প্রাকৃতিক উৎস মজিয়া যাইতে দেওয়া হইত না। সেচের পুষ্করিণী এবং কূপ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইত—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক গ্রাম্য পরিষদে একটি পুষ্করিণী-সমিতি গঠিত হইত তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কীয় বহু প্রসঙ্গনির্দ্দেশ অনুশাসন-লিপিতে দৃষ্ট হয়। সুশৃঙ্খলাসম্মত এবং যত্ন সহকারে জল সরবরাহ করা হইত। এই নিমিত্ত আর্দ্র ভূমি কনারু, সদীরম্, সীরত্ত, সত্রুক্কম্, পদগম্ প্রভৃতি নামে বিভক্ত হইত এবং যে প্রধান এবং উপনালা এই ভূমি অঞ্চলে জল সরবরাহ করিত সেগুলি নৃপতি, যুবরাজ, এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবিশেষের নামে অভিহিত হইত। ভূমির ভৌগলিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে জল সরবরাহ করা হইত। কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার জন্ম রাজদণ্ডের সুব্যবস্থা ছিল।

ভূমি বিক্রীত হউক অথবা ইজারা দেওয়া হউক অথবা হস্তান্তরিত করা হউক অথবা দান করা হউক, সকল ক্ষেত্রেই এমন সরল এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দলিল সম্পাদন করিতে হইত, যাহার ফলে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ উঠিত না। নিম্নলিখিত ভাষায় দলিল সম্পাদন করিতে হইত।

"আমি সানন্দে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে আমার ভূমি বিক্রয় করিতেছি। নির্দ্দিষ্ট মূল্য পাইয়া আমি এই ভূমি বিক্রয় করিলাম এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই দলিল ক্রেতার ভূমিস্বত্ব উপভোগের একমাত্র অস্ত্র। ইহা ব্যতীত অন্য কোন দলিল থাকিলে তাহা জাল বলিয়া স্বীকৃত হইবে।" বিক্রীত ভূমির অন্তর্গত স্থাবর এবং অস্থাবর দ্রব্যাদির মালিক ক্রেতা—তাহা বলাই বাহুল্য। দলিল লেখক এই দলিলে স্বীয় স্বাক্ষর করিতেন। অন্যান্য সাক্ষী থাকিতেন। সাক্ষী অশিক্ষিত হইলে অন্য ব্যক্তি প্রথমোক্ত সাক্ষীর নাম বকলমে লিখিয়া সাক্ষী হইতেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, নারীগণ স্বাধীনভাবে ভূমি ক্রয়, বিক্রয় অথবা দান করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একজন মুদ্রুকন্ (এটর্ণী) থাকিতেন। সাধারণতঃ গ্রাম্য প্রধানগণ এবং মধ্যস্থগণ দলিলের সাক্ষী হইতেন

ভূমি হস্তান্তর এবং রাজস্ব প্রাপ্তির হিসাবপত্র 'তিনাইক্কলম্' নামীয় বিভাগের অধীনে সযত্নে রক্ষিত হইত। এই বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তিনাইক্কলম্ নামে অভিহিত হইতেন। দাতব্য সম্পর্কিত নিষ্কর ভূমির হিসাব রক্ষা করিতেন "ভরিপোত্তলম্"। হিসাব পরীক্ষা অতি সাধারণ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। সময়ে সময়ে রাজাদেশে বিশেষ হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। প্রথম পরান্তক তাঞ্জোর জেলার 'তেরনীত্তানম্' মন্দিরের হিসাব পুনঃ পরীক্ষার জন্য বিশেষ পারিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির জন্য হিসাবরক্ষকগণ গ্রাম্য বাণিজ্য-সমিতির সম্মুখে শাস্তি লাভ করিত। হিসাব রক্ষায় যোগ্যতা প্রদর্শনে পুরস্কৃত হইবার সুব্যবস্থা ছিল।

গ্রাম্য শাসন-পদ্ধতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটাইলে নৃপতি, গ্রাম্য ম্যাজিষ্ট্রেট, দাতব্য সমিতির সদস্যগণ অথবা অন্যান্য বিচারক অপরাধীর বিচার করিতেন। আইন অমান্যকারীগণ 'উনদিগৈ' এবং 'পত্তিগৈ' প্রদর্শন করিয়া আইনগত সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইত। "উনদিগৈ" এবং "পত্তিগৈ" শব্দের সঠিক অর্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ইহার তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।

নৃপতি রাষ্ট্রের পুনর্ব্বিচার সংক্রান্ত সম্ভ্রম এবং সর্ব্বোচ্চ ধারক এবং বাহক ছিলেন। শাসন-প্রণালীর বিভিন্ন বিভাগ সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁহার অধীনে অসংখ্য কর্ম্মচারী থাকিতেন। পরবর্ত্তী চোল নৃপতিগণের অনুশাসন-লিপিতে সামরিক বিভাগ ব্যতীত একবিংশতি বিভাগের উল্লেখ আছে।

এই শাসনপদ্ধতি বিশ্লেষণে একটি কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যাহা নৃপতি নিয়ন্ত্রিত হইলেও প্রজাপুঞ্জের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইতিহাসে এইরূপ মধ্যযুগীয় প্রগতিশীল শাসনপ্রণালীর কার্য্যকারিতা যখন অন্যান্য মহাদেশে কল্পনাতীত বলিয়া পরিগণিত, তখন ভারতবর্ষের একটি রাষ্ট্রে ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব মানবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। মধ্যযুগীয় পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা কি করিয়া সম্ভব হইল? উদার এবং উন্নত-প্রণালীর শিক্ষাবিস্তৃতির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।*

---

* V. K. S. Pillai লিখিত "Tawils 1800 years ago" এবং Prof. Krishnaswami Aiyangar লিখিত "Ancient India" পুস্তকের সাহায্য অবলম্বনে লিখিত—লেখক।

সত্যিকারের মানুষ

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

এক

রমলা কলিকাতার বড় কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার রমেশ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী, তার নাম রমা দেবী কিন্তু রমা নামটা নেহাৎ সেকেলে ব'লে তিনি রমা নামকে রূপান্তরিত ক'রে রমলা নাম গ্রহণ করেছেন এবং সেই নামেই তিনি কলিকাতা-সমাজে পরিচিত। রমলা না কি যৌবনে সুগায়িকা ছিলেন ও সে-সময় গায়িকা হিসাবে তাঁহার যশঃসৌরভ সমগ্র কলিকাতায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এ রকম কিম্বদন্তীও আছে। বর্ত্তমানে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে একজন বিশেষ জহুরী সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। স্বামীর ব্যবসায়ে অর্থাগমের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমলার সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ও বাটীতে সঙ্গীতের বিরাট আসর করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত আকারে উপস্থিত হয়েছিল, কিছুকাল আগেও তিনি বিখ্যাত গায়িকা কেশোরা বাঈয়ের গানের আসর ক'রে গুণী সমাজে বিশেষ সমাদর পেয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় এক গানের আসর, রমলা ও তাঁহার এক মাত্র কন্যা শেফালী বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে হলঘর সাজাচ্ছেন। একজন বড় মুসলমান-ওস্তাদ ও একজন বীন্‌কার-ক'ল্লু খান্ ও দেদার বক্স, একজন গলার কাজ ও একজন যন্ত্রের কাজ দেখাবেন। পাড়ার কৃষ্ণ ও শশীপদ গাইবে। রেডিওর গাইয়ে—ভূতো পাড়ারই ছেলে, ছেলে বেলা থেকে আর্‌ম্ভ ক'রে এখন রেডিওর বিখ্যাত পরিচালক ভূতনাথ বাবু—একাধারে গান ঠিক করেন, নাটক ঠিক করেন, অভিনয় করেন, রেডিওর সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

পাড়ার রমণী চাটুয্যে, তাকেও রমলা ও শেফালী আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী হ'লেও সে গাইতে রাজী হয় নি, কারণ হারমনিয়াম আসরে যদি কোন প্রকারে একবার বাজে সে আসর ছেড়ে চ'লে যায়—

যাই হোক শীঘ্রই কণ্ট্রাক্টর সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে নানান ধরণের গাড়ী হর্ণ দিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ পাগড়ীতে শোভিত মুসলমান-ওস্তাদ তানপুরো, বীণা, হারমনিয়াম তবলচী নিয়ে আসরে প্রবেশ ক'রলেন, তাঁদের স্থান অবশ্য হল্লের এক দিকে করা হয়েছিল একটু দূরে। মহিলা, পুরুষ সব এসে উপস্থিত হলেন—চা কার্পোর বাড়ীর নানাবিধ কেক্ ঘন ঘন বিতরিত হ'তে আরম্ভ হবার পূর্ব্বে সকলেই মিঃ চৌধুরীর খোঁজ ক'রলেন কিন্তু মিঃ চৌধুরীকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেফালী কলেজে বি-এস্ সি প'ড়তো, দেখতেও সুন্দরী বটে, তাকে পড়াতো অতনু রায়। সে এম্-এস-সিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রলেও কোন কলেজে সামান্য দেড়শত টাকা মাইনে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, রমলা অতনুকে মাসে একশ ক'রে টাকা দিতেন, শেফালীকে পড়ানোর জন্য।

রমলা অতনুকে বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শেফালী অতনুকে রাত্রে আহার কর্ত্তে ব'লেছিল।

সকলে যখন এসেছে ও চা পানের পর যখন সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে, তখন অতনু প্রবেশ ক'রলে। অতনুকে দেখে রমলা হেসে তাকে হলে ব'সতে ব'ললেন, শেফালীও বিশেষ কিছু না ব'লে অতনুর দিকে তাকিয়ে একবার শুধু হাসলো।

অতনু অতি সুপুরুষ ও সুন্দর গান গাইতে পারলেও সে তার আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী, কাপড়, হাফসোল দেওয়া স্যাণ্ডাল নিয়ে, মোটর গাড়ীতে ভ্রাম্যমান সৌখীন আদ্ধীর পাঞ্জাবী ও দিশী কাপড়-পরিহিত বাবুদের সঙ্গে ব'সতে লজ্জা পেয়ে বারান্দায় গিয়ে ব'সলো—

এই বুদ্ধির জন্য শেফালী না হোক, রমলা তার বুদ্ধির তারিফ ক'রেছিলেন মনে মনে।

অতনুর অবস্থা এই আসরে হয়েছিল অনেকটা দরিদ্র আত্মীয়ের ধনীর গৃহে উপস্থিতির মতন। ধনী ব্যক্তি আত্মীয়ের সম্বন্ধের জন্য হয় তো বাধ্য হ'য়ে পায়ের ধূলা নিলেন, মেয়েরা কেউ এসে মামা ব'ললে, মা দাদা ব'ললেন কিন্তু এই সব বলার মধ্যে ও পায়ের ধূলো নেওয়ার মধ্যে সকলেরই আনন্দের চিহ্ন থাকে না, সকলেরই মনের মধ্যে ছিলো এই কথা, "কি আপদ—না হয় দাদা, না হয় মামা,

তাই ব'লে এই এতগুলো লোকের সামনে তিনি এসে তাদের অপদস্থ ক'রলেন, যখন তিনি জানেন যে, হৃদয় অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই, কারণ ওটা ভগবানের দান, অথচ স্বীকার ক'রলেও বিপদ"—এই সব কথা বোধ হয় অতনুর জানা ছিল, তাই সে নিজের অবস্থা বিবেচনা ক'রেই বারান্দায় নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছিল। গরীব মাষ্টার, এই হলে তার স্থান কোথায়?

ওস্তাদের গান, বাংলা গান, ছেলে মেয়েদের সব হয়ে গিয়েছে, আসর ভাঙ্গবার সময় হয়ে এসেছে, এই সময়ে মিঃ চৌধুরী প্রবেশ করলেন, সকলেই তাঁকে নমস্কার করলেন। তিনি প্রতিনমস্কার করে হলের মধ্যে যেন কাকে খুঁজছেন, তার পর একটু হেসে বারান্দায় গিয়ে বললেন, "অতনু না— যা ভেবেছি তাই—তোমার গান এখনও নিশ্চয়ই হয় নি।"

অতনু বললে "না—থাক না।" মিঃ চৌধুরী বললেন, "না-না, তা কি হয়, তুমি এদের চেয়ে ঢের ভাল গাও, এসো।" চৌধুরী কিছুতেই ছাড়লেন না—হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে হারমনিয়ামের কাছে যখন অতনুকে বসালেন, তখন রমলা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "বেশ বেশ, গাও অতনু"—

অতনু তার উদাত্ত কণ্ঠে গাইল, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে"—সকলেই বাংলা গানের ভাব ও সুরের সমন্বয়ে ও শশীপদের সুন্দর তবলা বাজানোতে মুগ্ধ ও মোহিত হয়ে গেল।

গান শেষ হওয়ার পর সকলে আসর ভঙ্গ করে বাটীতে প্রত্যাগমন করলেন।

শেফালী যত্ন করে অতনুকে খাওয়াল, রমলা একবার করুণা করে এসে মাষ্টার মশায়কে বললেন "অতনু, লজ্জা করে খেও না।" আহারের পর অতনু বাটীতে প্রস্থান ক'রল।

দুই

রাত্রে খাওয়া শেষ হতে দেরী হয়েছে—বেশী রাত্তিরেই চৌধুরী ঘরে এলেন। রমলা ঘরে পান চিবোতে চিবোতে এসে স্বামীর নিকটে উপস্থিত হলেন। চৌধুরী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "গানের আসর কি রকম হলো।"

রমলা উত্তর দিলেন, "বেশ সুন্দর।" কিয়ৎক্ষণ পরে রমলা বললেন, "শেলী বড় হয়েছে—বি-এস্-সিও পাশ কর্লে, ওর বিয়ে দিয়ে দাও, আর দেরী করা নয়—তুমি এ বিষয়ে কিছুই ভাব না?"—চৌধুরী চুপ করিয়া আছেন। রমলা পুনরায় বললেন "মিঃ চক্রবর্ত্তীর খুব ইচ্ছে যে তাঁর ছেলের সঙ্গে শেলীর বিয়ে দেন—লীলা সেই কথাই আমাকে বলছিল। তাদের ঐ একই ছেলে আর অনেক টাকা—সমীর এই পনের দিন পরেই বিলেত থেকে ফিরে আসছে। শেলীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?"

"চৌধুরী বললেন, তা ত হয় কিন্তু তা হবে না। ওর বিয়ের জন্ম এত ভাবনা কেন তোমার? পাত্র ঠিকই আছে।"

রমলা বললেন, "কে?"

চৌধুরী বললেন, "কেন, অতনু।"

রমলা যেন বিস্মিত আতঙ্কে বললেন, "অতনু?"

চৌধুরী বললেন, "হাঁ, আশুও তাই বললে।" এই কথা বলে চৌধুরী পাখা থেকে দূরে তাঁর নিজের সাদাসিধে ক্যাম্পখাটে শুলেন। রমলা আর কিছু বললে না। খানিক পরে তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বামীর ক্যাম্পখাটের কাছে বসে মাথা টিপতে টিপতে বললেন, "তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই অতনু বড় গরীব।"

চৌধুরী বললেন, "বড় গরীব নয়, দু'জাগায় বাড়ী আছে, জমীও আছে—তবে অবস্থা খারাপ হওয়াতে সংসার কর্ত্তে পারছে না, বাড়ীর অর্থাভাবে বাড়ী বিক্রী করে নি।"

রমলা বললেন, "সে গরীবই—তার সঙ্গে কি আর মিঃ চক্রবর্ত্তীর ছেলে সমীরের তুলনা হয়।"

চৌধুরী বললেন, "গরীব বলেই অতনুর সঙ্গে বিয়ে দেব— আমি অতনুর বয়সে গরীবই ছিলাম, ডিষ্ট্রিক্ বোর্ডে সুপার-ভাইসারি করতাম, আড়াইশ টাকা মাইনে—তোমার জ্যেঠা-মশায় এই বিয়ে দিয়ে ছিলেন বলে তোমার আত্মীয়েরা তাঁকে বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি—আর আজ...রমলা, ভাগ্য নিয়ে লোকে আসে, শেলীর ভাগ্যে যদি টাকা থাকে অতনু অনেক টাকা আনবে।"

রমলা বললেন, "তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই—তুমি আর অতনু! অতনু সত্যিই বড় গরীব—"

চৌধুরী বললেন, "গরীব হওয়া দোষের নয় রমলা, হৃদয় বা ভালবাসা বলে যদি কিছু থাকে ঐ জগতে তবে ঐ গরীবের মধ্যেই আছে।"

রমলা বললেন, "এ তোমার অন্যায় কথা।"

চৌধুরী বললেন "একটু ভেবে দেখো—এই যে আমি আশুর কাছে যাই—এতো লোক ত কলকাতায় আছে, এই আলীপুরের একজন সাধারণ উকীল, সংসার কোন রকমে চলে, মেয়ের বিয়ে অতি কষ্টেই দিয়েছে, থাকে এক সামান্য বাড়ীতে, তার কাছেই যাই—ও আমার গ্রামের সহপাঠী বাল্যবন্ধু।"

রমলা বললেন "তোমার সবই অদ্ভুত।

চৌধুরী বললেন, "ভেবে দেখ, রমলা বড়লোক টাকা-ক'ড়ি, বাড়ী—এ সবের মধ্যে আছে প্রাণের অভাব, দুঃখ কষ্ট গোপন করার চেষ্টা—লোকের সহানুভূতি ভাবের আদান প্রদান বন্ধ কর্ব্বার আপ্রাণ চেষ্টা—আমার মনে আছে, যখন মা আমাদের নিয়ে যাত্রা দেখতে যেতেন ঐ আশুই আমাদের বাড়ীতে ছেলে-পিলে দেখতো, আবার যখন আশুর মা আশুকে নিয়ে যাত্রা দেখতে যেতেন তখন আমি গিয়ে তাদের বাড়ীতে ছেলে-পিলে দেখতাম। গরীবের দুঃখ না জানালে উপায় নেই কি না, সেইজন্য ভাবের আদান-প্রদান একটু বেশী হয়, আর সেটা সরল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি—আর বড় লোকের আদান-প্রদান সবই বাড়ী-গাড়ীর মধ্য দিয়ে এসে প্রাণহীন ভালবাসার এক অভিনয় হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে আদান প্রদান সম্ভব। রমলা, অতনু গরীব ব'লে আর আমায় বাধা দিও না।"

রমলা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আর আলোচনা করলেন, না—তিনি স্বামীকে বিশেষভাবেই জানতেন। গানের আসর করা বা অন্যান্য অনেক কাজে চেধুরী স্ত্রীর কার্য্যে প্রতিবাদ না করলেও তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, স্ত্রীর খামখেয়ালী বা তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশেষ দৌর্ব্বল্যের জন্য জীবনে গুরুতর ব্যাপারে কোন অঘটন না ঘটে।

তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হ'য়েও জীবনের গতিকে বিলাসের কলুষিত পঙ্কে নিমজ্জিত করেন নি—এই কারণে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে স্ত্রীকে মাথা নত ক'রতে হ'তই।

রমলা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে পরে বললেন, "তোমার রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—ঐ বড় পাখার তলায় শোও না কেন? কি এক ক্যাম্প খাট, পাখা নেই এখানে।"

চৌধুরী ব'ললেন, "এইখানেই আমার বেশ ঘুম হয়—অত বড় খাট আর ঐ পেল্লাই গদীতে শুলে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

রমলা ব'ললেন, "তুমি প্রায়ই ব'লো বুক ধড়ফড় করে, অথচ একদিনও তো শুতে দেখলাম না—এ খাট কি আমি নিজে শোবার জন্য তৈরী করিয়েছি? কেন শোও না বল তো?"

চৌধুরী ব'ললেন, "দেখ রমলা, আমি গ্রাম্য ইস্কুলের হেডমাষ্টারের ছেলে, চিরকাল মাটীতে না হয় তক্তাপোষে শুয়েছি, কলেজে এম-এ পর্য্যন্ত বৃত্তি পেয়েছি, সোনার মেডেল-গুলো গালিয়ে মার গয়না করে দিয়েছিলাম—তার খানিক এখনও তোমার গায়ে আছে। শিবপুরে বি-ই পাশ করেছি সেও বৃত্তির টাকা থেকে—"

রমলা বাধা দিয়ে ব'ললেন, "এককালে কষ্ট তুমি করেছ সত্যি কিন্তু তাই বলে—"

চৌধুরী কথা না শেষ কর্ত্তে দিয়ে ব'ল্‌লেন, "তা নয় রমলা, যখনই আমি ঐ খাটে শুতে চেষ্টা করেছি আমার চোখের সামনে বাবার ঋষিতুল্য সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠেছে—কি রকম কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে শান্তি নিয়ে মেজেতে নিদ্রা যেতেন।" এই কথা বলে তিনি ক্যাম্পখাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, "ওঠো—" তারপরেই স্ত্রীকে ঘর্ম্মাক্ত দেখে ব'ললেন, "কি সর্ব্বনাশ, ঘেমে অস্থির হয়ে উঠেছ যে, যাও যাও খাটে শুয়ে পড়গে, পাখা খুলে দিয়ে"—তারপর ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, "মেনি মেনি"—মেনী ঝি এসে উপস্থিত হ'লেন, তিনিও প্রায় গৃহিণীর ন্যায় স্থূলাঙ্গী।

ঝিকে বললেন, "যা তোর দিদিমণিকে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে দে, খাটের সিঁড়ি তৈরী হয়েছে তো।"

রমলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "হাঁ। সিঁড়ি করেছে, ভারী সুবিধা হয়েছে।'

চৌধুরী বললেন, "কেমন সুবিধা হয়েছে তো আমি যখন বলেছিলাম রেগে তো কথা বন্ধ করেছিলে, এই মোটা শরীর আর এই উঁচু খাট সিঁড়ি না হলে চলে না, মেনি নিয়ে যা, আর দিদিমণিকে বেশ ভাল করে হাত পা টীপে দে, খাওয়ার পর এই গরমের মধ্যে বসে হাফিয়ে পড়েছেন, যা।"

স্ত্রী মেনির সঙ্গে প্রস্থান করলে চৌধুরী একবার পিতার তৈলচিত্রের সামনে নমস্কার করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এ দিকে শেফালী তার ঘরে চিন্তায় মগ্ন, তার কেবল মনে হচ্ছে কেন সে অতক্ষণ অতনুকে বারান্দায় বসে থাকতে দিল, কেন তার মা অতনুকে ডেকে গান কর্ত্তে বলেন নি, তার বাবাই বা কেন এসেই এই সব ঘটেছে এই কল্পনা করে অতনুকে সকলের সামনে বিশেষ সম্মান করে গান গাওয়ালেন?

কিন্তু অতনু যখন ঐ সব ধনী সৌখীন যুবকের মধ্যে এসে বসলো তখন যেন রাজার মতন বসেছিল, কোথায় ভেসে গেল ধনী যুবকদের আদ্ধীর পাঞ্জাবী, কোঁকড়া চুল, হীরের আংটী—কি আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল শেফালীর। ভগবান্ অতনুকে সৌন্দর্য্যের বিভূতি দান করেছেন। মানুষের কি সাধ্য তাকে ম্লান করে।

অতনুকে সে একদিন বলেছিল দাড়ী কামাতে, আর একদিন বলেছিল দেশী খদ্দরের জামা-কাপড় কিনতে—অতনু গোড়ায় হেসেছিল। শেফালী তো জানে না যে অতনু একদিন সত্যিকারের বড়লোকেরই ছেলে ছিল, তার বাবা দান করে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সে হেঁসে শেফালীর এই সব কথার উত্তরে একদিন বলেছিল "A false aristrocrat robes to the chin, at me goes stark as Appolo.

সে মনে মনে এই কথা শুনে সেই দিন থেকে অতনুকে ভালবেসেছে, হৃদয়-মন্দিরে তাকে নিভৃতে স্থান দিয়েছে—অতনুর চরিত্রের মধ্যে পৌরুষ, নির্ভীকতা, অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এ সব গুণ শেফালীকে আকৃষ্ট করেছে সত্যিই। রমলা অতনুকে পছন্দ কর্ত্তেন বটে কিন্তু সেটা দরিদ্র অধ্যাপক ও শিক্ষক হিসাবে। অতনুকে মাসিক এক শো টাকা দেওয়া হয় শেফালীকে পড়ানোর জন্য, সেটা দয়া করে দেওয়া হয়, অতনুকে তিনি একটু অনুকম্পার চোখেই দেখতেন।

শেফালী মার ভয়ে হয় তো অতনুকে প্রাণ ভরে সমাদর করতে পারত না। গানের আসরে তার ব্যবহার যে মোটেই ভাল হয় নি ও এই ব্যবহারের জন্য সে কি করে অতনুর কাছে ক্ষমা চাইবে, তাই ভাবতে ভাবতে শুয়ে প'ড়লো।

তিন

প্রায় তিন মাস গত হয়েছে—শেফালী বি-এস-সি পাশ করেছে। রমলা শেষ পর্য্যন্ত মিঃ চক্রবর্ত্তীর ছেলে সমীরের সঙ্গে শেলীর বিবাহের চেষ্টা করে বিফল হয়ে স্বামীর মত অনুসারে শেফালীর বিবাহ অতনুর সঙ্গেই দিয়েছেন। প্রফুল্লমনে রমলা এ বিবাহে যোগদান করেন নি কিন্তু শেষে নিরুপায় হয়ে মনকে প্রফুল্ল করতে বাধ্য হয়েছেন। চৌধুরী অতনুকে বিলাতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে পাঠাবেন। রমলার ঝোঁক যে বাড়ী শুদ্ধ চৌধুরী ছাড়া অতনুর সঙ্গে বিলাতে যাবেন। শেফালীই এই প্রস্তাবে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। চৌধুরী অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেফালীকে নিরস্ত করেছেন, তখন রমলা অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।

অতনুকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ চৌধুরী হাজারীবাগের বাড়ী দিয়েছেন, শেফালীকে রাঁচীর বাড়ী দিয়েছেন।

অতনু ও শেফালী প্রায় এক সপ্তাহ হাজারীবাগেই আছে। আজকাল শেফালী অতনুর কাছে অনেক বাংলা গান শেখে। সে সন্ধ্যায় প্রকাণ্ড টেবিল-হারমোনিয়ামে অতনু বসেছে শেফালীর অনুরোধে গাইতে। সে গাইছে দিলীপ কুমার রায়ের রচিত বিখ্যাত গীত "ছিলে তুমি দূরে মম হৃদি-পুরে, ও গো বাজাতে কেমনে বাঁশরী" সেই গান আকাশ বাতাস প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক মধুর ধ্বনি এনেছে, সেই করুণ ধ্বনি অতনুর অশ্রু-সজল চোখে মূর্ত্ত জাগ্রত হয়েছে। শেফালী তার সুন্দর মুখখানি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল—গান শেষ হ'লে সে অতনুকে জড়িয়ে ধরলে।

খানিক পরেই মোটরের হর্ণ শোনা গেল। চৌধুরীর গাড়ীর হর্ণ ব'লেই মনে হ'ল। চৌধুরী হেঁসে ব'ললেন "শেলী, তোর মা কিছুতেই ছাড়লেন না—হঠাৎ চলে এসেছি"—শেফালী ব'ললে, "বেশ ভালই হয়েছে বাবা।" রমলা অতনুকে নিয়ে বারান্দায় গেলেন।

শেফালী বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সমাপন করে বাবার ও মার জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে গেল।

রমলা অতনুকে নিয়ে বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে প্রীত হ'য়ে অতনুর ব্যবস্থার বিশেষ প্রশংসা

ক'রে তাঁর বান্ধবী কোন বড় ব্যারিষ্টারের গৃহিণীর বাটীতে গেলেন হাজারীবাগে একটি গানের আসর করবার জন্ম।

সকালে চৌধুরী দেখলেন যে অতনু নিজে ইঁদারা থেকে জল তুলছে—আর শেফালী কলসী ক'রে জল তুলে কাঁকে নিয়ে চ'লেছে। চৌধুরী ভারী খুশী হয়েছেন, তিনি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে ডেকে ব'ললেন, "দেখো দেখো খুকী কেমন কাঁকে ক'রে কলসী নিয়ে যাচ্ছে—আর অতনু কেমন জল তুলছে ইঁদারা থেকে"—রমলা বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন, "যেমন শ্বশুর এক পাগল, তেমনি জামাইও জুটিয়েছেন এক পাগলকে—তোমার পাগলামীর জন্ম এখানে মান-সম্ভ্রম সব যেতে ব'সেছে"—চৌধুরী ব'ললেন হেঁসে, "মান-সম্ভ্রম এতো ঠুন্‌কো জিনিষ নয় রমলা, যা এই ব্যাপারে চ'লে যাবে, এতে মান-সম্ভ্রম বেড়েই যাবে। খুকী কী ভালো মেয়ে হয়েছে অতনুর কাছে দীর্ঘকাল প'ড়ে তা বুঝতে পারছ? অতনুর দেশের বাড়ীতে কল নেই কিন্তু বাড়ীর কম্পাউণ্ডেই বেশ পুকুর আছে। সেখানে অতনুর এক বৃদ্ধা পিসীমা আছেন—তাঁকে পাছে বেশী জল আনতে হয় পুকুর থেকে ব'লে খুকী কাঁকে কলসী নিয়ে জল আনা অভ্যাস করছে"—রমলা ব'লেন, "কি বিয়েই দিয়েছো মেয়ের, আর বলো না"—চৌধুরী হেঁসে ব'ললেন, "কি বিয়ে দিয়েছি সে পরে বুঝতে পারবে"।

কিছুক্ষণ পরে যখন অতনু ও শেফালী চৌধুরীর কাছে বাগানে বেঞ্চির ওপর এসে ব'সলো তখন চৌধুরী ব'ললেন, "অতনু, তুমি ইঞ্জিনীয়ার হবে খুব ভালই—আজ তোমার ঐ ইঁদারা থেকে জল তোলা দেখে আমি বুঝতে পারছি।" শেফালীকে কাছে টেনে নিয়ে ব'ললেন, "তুইও পাকা ইঞ্জিনীয়ারের গিন্নী হ'তে পারবি।"

রমলা এসে ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে বসলেন। তিনি ব'ললেন, "মেয়েটা আমার খেটে খেটে মরে যাবে।" চৌধুরী হেঁসে ব'ললেন, "মোটেই মরবে না এবং বেশী বাঁচবে—ও ভাল ভাবে বাঁচবে তোমার মতন ওর জন্ম বছরে অন্ততঃ চার বার ডাঃ বিধানচন্দ্র আর স্যার নীলরতনের ওখানে ছুটোছুটী করতে হবে না।" রমলা চ'টে চ'লে যাচ্ছিলেন, চৌধুরী হেঁসে রমলার হাত ধ'রে ব'ললেন, "আহা চ'টো কেন? ব'সো ব'সো—খুকী, মাকে হাওয়া কর"। রমলা ব'ললেন, "না হাওয়া করতে হবে না—বুড়ো বয়সে এত রঙ্গও করতে পারো।" তিনি খানিক পরে বাগানে ফুলের কি অবস্থা হয়েছে তাই দেখতে গেলেন। চৌধুরী ব'ললেন, "দেখো অতনু, খুকীকে ব'লতাম কাপড় কাচা, বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁট দেওয়া এ সব নিজে ক'রতে—আর তোমার শাশুড়ী কি চটাচটাই চ'টতেন।" শেফালী হেঁসে ব'ললে, "বাবা, তুমি মাকে ভোর বেলা ওঠাবেই আর মা কিছুতেই ওঠবেন না—" চৌধুরী হেঁসে ব'ললেন, "ওই যে আমার মা রাত্রি থাকতে ওঠে পুজোর জায়গা করা থেকে আরম্ভ করে সংসারের সমস্ত কাজ করতেন—আর আমি ছিলাম মার ডান হাত, আমি যখনই দেখতাম যে তোমার মা নাসিকা গর্জ্জন করছেন তখনই মনে হোত যে আমার স্ত্রী বা আমি, আমার বাবা কি মার চেয়ে ঢের উপরে? এই মনে ক'রে নিজের উপরে কি ধিক্কার আসতো।" এই কথা বলার পর সকলে ঘরের মধ্যে এসে ব'সলেন। অতনু ব'ললে, "দেখুন সত্যিকথা বলতে কি, আমার বাবাকে দেখে যাদের টাকা আছে তাদের উপর উচ্চ ধারণাই ছিল—কিন্তু যখন অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসতে হ'ল তখন একটা কথা বিখ্যাত নভেলে পড়েছিলাম তাই মনে হ'ত; "Money breeds a kind of gangrened insensitiveness"—সেটার যে exception আছে তা দেখতে পাচ্ছি"—চৌধুরী ব'ললেন, "বড় লোকের মধ্যে ভাল লোক আছে বৈ কি—তার সংখ্যা অল্প, তুমি যে ঐ কথাটা ব'ললে, Money breeds a kind of gangrened insensitiveness—ভারী সুন্দর কথা, নভেলে ব'লেছে? লেখকের নাম কি মনে আছে"—অতনু ব'ললে, "বোধ হয় Aldous Huxley"—চৌধুরী ব'ললেন, "নভেল সত্যিই কত উপরে উঠেছে এ যুগে"—অতনু ব'ললে "আপনার কাছে এ কথা শুনে আনন্দ হ'ল—আপনি সেই Dickens, Thackeray George Eliotএর যুগের লোক।" শেফালী ব'ললে, "বাবার মধ্যে দুই যুগেরই যেন একটা সুন্দর Synthesis দেখতে পাই—বাবার হৃদয়…" চৌধুরী বাধা দিয়া ব'ললেন—"তোর বাবা এ যুগে একটা ঋষি, নে—Rubbish of nonsense—থাম্—তার চেয়ে তুই এখন ডি-এল, রায়ের সেই গানটা গা দেখি "প্রেমে নয় আপন হারায়, প্রেমে পর আপন

হয়, আদানে প্রেম হয় না'ক দীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়"—ঐ গানটা"।

শেফালী অতি সুন্দর ভাবেই গানটী গাইল। চৌধুরী হেঁসে বললেন, "চমৎকার! অতনু কী সুন্দরই শিখিয়েছো।" অতনু বললে, "ওর গলা ভারী মিষ্টি, আর গলা আশ্চর্য্য রকম খেলে—আপনারা যখন ওকে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন শেখাতে আরম্ভ কল্লেন তখন আমি মানা করেছিলাম, কারণ কীর্ত্তনের একটা ষ্টাইল আছে, গলার কাজ তান বিস্তারের পদ্ধতি অন্য রকম —গলা ঐ রকম ভাবে বসে গেলে ওস্তাদী গান বা বাংলা সাধারণ গান গাওয়াও আয়ত্তের মধ্যে আনা শক্ত হয়ে পড়ে, সেই জন্য শেলীকে গান শেখাতে কষ্ট পেতে হয়েছে। দেখবেন ক্রমশঃই ভাল গাইবে।" এর পর সকলে স্নান আহারে ব্যস্ত হলেন।

সন্ধ্যা হয়েছে, চৌধুরীর বাগানে পাহাড়ের ওপর থেকে জ্যোৎস্নার প্লাবন এসে পাহাড়, বাগান, প্রান্তরকে ভাসিয়ে দিয়েছে। চৌধুরী নিজের ঘরে বসে তামাক খেতে খেতে একটা বই পড়ছিলেন—হঠাৎ মোটরগাড়ীর হর্ণ শোনা গেল, তার পরেই এক বৃদ্ধকে চৌধুরীর ঘরে প্রবেশ কর্ত্তে দেখা গেল।

চৌধুরী তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, "আসুন, আসুন, চক্রবর্ত্তী ম'শায়, চেহারা এ রকম হয়ে গিয়েছে কেন? কি খবর, সমীর ভাল আছে তো?"

চক্রবর্ত্তী বললেন, "সমীর ভাল আছে, তবে বুড়ো বাপকে এ রকম দাগা দেওয়া উচিত হয় নি, ছিঃ ছিঃ—সেই পরামর্শ ই তো কর্ত্তে এসেছি"—

চৌধুরী বললেন, "কি হয়েছে?"

চক্রবর্ত্তী বললেন, "পুত্ররত্ন বিলাত থেকে এক মেম বিবাহ করে এনে এলাহাবাদে রেখেছিলেন, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যাপারটা লুকিয়েছিল। মজুমদারের অমন সুন্দরী মেয়ে ইহুদীর মতন দেখতে, গ্রাজুয়েট, বিয়ে দিলাম। বিয়ে দেওয়ার পর মেম এসে উপস্থিত, আইনের প্যাঁচে পড়ে মেমকে দশ হাজার টাকা দিয়ে divorce এ রাজী করিয়েছি, পুত্র রত্নকে উদ্ধার কর্ব্ব, কিন্তু পানদোষ ও তার সঙ্গে মেয়ে মানুষের উপর অসাধারণ আসক্তি—তার কি করি।"

চৌধুরী বললেন, "মেমকে বিদায় করুন তো। the rest বৌমা will manage—you need not bother"

চক্রবর্ত্তী ব'ললেন, "বৌমা পার্ব্বেন ঠিক, মিঃ চৌধুরী।"

চৌধুরী ব'ললেন, "নিশ্চয়ই, এক কাপ চা খেয়ে যান্।" চক্রবর্ত্তী চা না খেয়েই প্রস্থান ক'রলেন।

রমলা আগেই সমীরের বিষয় সংবাদ পেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীকে বলেন নি। স্বামীও এ বিষয়ে স্ত্রীর সহিত আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নি।

তিনি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করেছেন এই সময় এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চাষী "সাহেব" ব'লে এসে ঘরের বাইরে দাঁড়াল। চৌধুরী সস্নেহে ডাকলেন, "কে চমরু, ভাবিসনে, তোর ছেলে ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুকে যখন তোর ছেলেকে দেখালাম, তিনি ব'ললেন, যে জ্বর হয়েছে বেশী কিছু ভয় নেই—নে চারটে টাকা নিয়ে যা।" তিনি ব্যাগ থেকে টাকা বার কর্চ্ছেন এই সময়ে রমলা ঘরে প্রবেশ করে একটু উন্নত কণ্ঠে ব'ললেন, "জ্বালাতন, জ্বালাতন।" এই কথা শুনেই চমরু ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে দ্রুত প্রস্থান ক'রলে। চৌধুরী টাকা নিয়ে তাকে দিতে ঘরের বাইরে গেলেন।

শেফালী মার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে ঘরে প্রবেশ করেছে সঙ্গে সঙ্গে অতনুও এসেছে। শেফালী জিজ্ঞাসা ক'রলো, "কি হয়েছে মা?" রমলা ব'ললেন, "কি আর হবে, তুমি আর তোমার বাবা আমায় দস্তুর মতন ক্ষেপিয়ে ছাড়বে দেখছি।" এই সময়ে চৌধুরী ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। রমলা ব'ললেন, "ঐ যে লোকটা এসেছিল, সে তোমার বন্ধু বোধ হয়—ছোটলোক ঘরের মধ্যে এসে চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়েছে আর তুমি তার গায়ে হাত দিয়ে কি আদরই কচ্ছিলে—ছিঃ ছিঃ।"

চৌধুরী ব'ললেন,, "ছিঃ ছিঃ রমলা, ও বন্ধু বটেই তো। রমলা, যা লোককে দিয়ে যাবে তাই সঙ্গে যাবে, যা রেখে যাবে তার কাণাকড়িও সঙ্গে যাবে না।"

রমলা চটে ব'ললেন, "সঙ্গে যাক আর নাই যাক্, ছোট লোকদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া—"

চৌধুরী ব'ললেন, "রমলা, হ'তে পারে সে দরিদ্র, হ'তে পারে সে নিরন্ন—কিন্তু সে মানুষ তো। আমরা বড়লোক ভাবি যে দরিদ্রকে সাহায্য করলাম, তার কি উপকার কর্ল্লাম, আমি পুরুষ মানুষ না হয় ভাবতে পার্ত্তাম কিন্তু তুমি নারী হ'য়ে এ কথা তুমি কি ক'রে ব'ললে? দরিদ্রের উপকার কর্ল্লাম সে কথাটাই ভাবি কিন্তু সে যে সাহায্য নিয়ে কি উপকার কর্লো তা তো ভাবি না—ভাবি না যে, এই ভিখারী-রূপী শঙ্করের নৈবেদ্য প্রস্তুত করলাম—পূজার নৈবেদ্য—তাই অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী—শঙ্কর তাঁরই দ্বারে ভিখারী।"

শেফালী মুচকে মুচকে হাঁসছিল। কিছু বললে না।

রমলা ব'ললেন, "না না, ছোট-লোককে ঘরে ঢুকতে..."

চৌধুরী হেঁসে শেফালীর গাল চাপড়ে ব'লে উঠলেন, "Life, after all, is a tragedy—Hurrah—"

পদাবলী-সাহিত্যে মরমীভাব ও কাব্যবস্তু

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, বি-এল্

এমন একদিন ছিল, যখন আড়ম্বরবিহীন রস-তন্ময় জীবন-যাত্রা এই ভারতবর্ষের সারস্বত সাধনার অঙ্গ ছিল, কেবল কৌতূহলী মনের তৃপ্তির জন্য সচেষ্ট না থাকিয়া আনন্দ দান ও আনন্দ গ্রহণ করিতে হয়। সূক্ষ্মতর অতীন্দ্রিয় আনন্দ উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

অতীতকে ছাড়া যায় না, ভবিষ্যতের পথ সুগম করিবার জন্য অতীতের রসবত্তাকে, আধুনিক জীবনের স্বল্পে সন্তুষ্টি ও সারল্যকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা সার্থক হইবে।

পদাবলী-সাহিত্য বাস্তব জীবনের বিচিত্র নিগূঢ় অনুভূতির কথা। এই অনুভূতিজাত আনন্দ বলিবার বা বুঝাইবার নয়, ইহা উপলব্ধির বস্তু। সৌন্দর্য্য উপভোগ ত' অনেকেই করে, কিন্তু উপলব্ধি করি কয়জন?

যাঁহারা প্রকৃত রসিক, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ রসানুভূতির উপর রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই অনুভূতির সাহায্যেই রসতত্ত্বের মরমী বা ভাবকদিকের গূঢ়তম ভাণ্ডার খুলিতে হয়। রসশাস্ত্রজ্ঞ ও রসজ্ঞ এক কথা নহে, কেবল ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্গে করিয়া এই তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না, নিজের অনুভূতি দ্বারাই ইহার মরমীভাব অবগত হওয়া যায়।

পদাবলী-সাহিত্যের মরমী দিকের আনন্দ চেষ্টায় মিলে না, জ্ঞানে তাকে ধরা যায় না, পাইবার শুধু একটী রাস্তা ভগবৎকৃপা।

আজকাল পদাবলী-সাহিত্য সম্পর্কে বিবিধ প্রকার আলোচনা হইতেছে, তাহাতে সুধীবৃন্দ রসাস্বাদ করিতেছেন। রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া ভগবৎকৃপার প্রেরণা পাইয়া পদাবলী কীর্ত্তন করেন। যখন প্রত্যেকটী পদের রস মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে, যখন রসকীর্ত্তনে সঙ্গীতকলার অন্তরতম প্রাণবস্তু তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে, পদাবলী, সাহিত্যের মরমীভাব তখনই সম্যক্ প্রকারে ব্যক্ত হয়।

পদাবলী-সাহিত্য প্রেমবৈচিত্র্যের কথা

মানব হৃদয়ের একটী নিগূঢ় প্রবৃত্তিকে রূপান্তরিত করিয়া ভাবমূলক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, মধুর প্রেম ভাবটী মানবোচিত বাসনার অকৃত্রিম গাঢ়তায় পরিপুষ্ট করা হইয়াছে।

কাল বলি কালা, গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকী।
যৌবন সায়রে সাধিতেছে ভাটা
তাহারে কেমনে রাখি।
জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর,
জীবন থাকিলে বঁধুয়া পাইব
যৌবন মেলা ভার।
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল,
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু
বঁধু ফিরে নাহি এল।
যাও সহচরি জানিয়া আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশে আমি যাই চলি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

যদি যৌবনই চলিয়া যায়, প্রেমাস্পদের প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষার সময় চলিয়া যায়, যদি কৃষ্ণবিলাসের বস্তুই চলিয়া যায়, তখন সে জীবনে বঁধুয়া আসিলে সেবা হইবে কি প্রকারে?

সেই প্রাণবঁধুর জন্য
পল পল করি দিবস গোঁয়ায়নু
দিবস দিবস করি মাহা
মাহ মাহ করি বরিখ গোঁয়ায়নু
না পূরিল মনোরথ আশা।

সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যের অন্তরালে আছে একটী মধুর প্রেম-ভাব, তাহা মানবোচিত বাসনার অকৃত্রিম গাঢ়তায় পরিপুষ্ট, বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্যপিপাসু কবি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মানবলীলার ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিল, প্রেমের রাজ্যে ঈশ্বর-আরাধনা মানবমুখী

হইয়াছে, আবার বিবিধ ভাববৈচিত্র্য পার্থিব জীবনের যবনিকা ভেদ করিয়া অলৌকিক জ্যোতিঃ রহস্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে
আঙ্গিনার মাঝে, তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল ঘরে।

বৈষ্ণব কবিতায় যদিও আধ্যাত্মিক মনোভাবের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে, তথাপি তাহা এই রূপ-রস-গন্ধ-জারিত সংসারের প্রেম কবিতার নিয়ম ব্যতিক্রম করে নাই। আমাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে যে ছন্দ বিদ্যমান, সেই ছন্দে মরমী কবি সত্য সুন্দরকে উপলব্ধি করিয়া সেই অব্যক্ত সুন্দরকে রূপায়িত করিয়াছেন।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়,
ছায়ার সহিত, ছায়া মিশাইয়া
পথের নিকট রয়।
আলো নই সে জন মানুষ নয়,
তাহার সঙ্গেতে পীরিতি করিলে
কি জানি কি তার হয়।
সহজ রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর হয়,
বাতাসে বসন উরিতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়।
চমক চলনি, ও গীম দোলনী
রমনী-মানস-চোর,
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরিতে
মরমে পশিল মোর।

পদাবলী-সাহিত্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের প্রবেশদ্বার হইতেছে গৌরচন্দ্রিকা, উহাদ্বারা লীলাকীর্ত্তনের বিষয় নির্দ্দেশ করা হয়। শ্রোতৃবর্গ গৌরচন্দ্র শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব চিত্তকে প্রথম হইতেই আলোচ্য লীলার অভিমুখে লীলা স্মরণ বিলাসরূপ সাধন কার্য্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন।

প্রেমের আতিশয্যে গৌরাঙ্গের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্রের ঢেউ যমুনা-লহরীতে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে, ভাবের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণভ্রম হইয়াছে।

শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত মহাভাগ্যবান্ বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ দেখিয়া গৌরচন্দ্রিকা রচনা করিয়াছেন—

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাশরা,
নয়ানে অঞ্জন হইয়া লাগিয়াছে পারা।

প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গলীলার অভিধানে কৃষ্ণলীলার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন হইল, অপ্রত্যক্ষ কৃষ্ণ লীলার নিগূঢ় রস উৎস প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গ-লীলায় প্রকট হইল।

ঘটনার ফিরিস্তি দ্বারা যে জীবনের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, যে জীবন ভাবঘন তত্ত্বময়, কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। চৈতন্য দেবের অভ্যুদয় বাংলা সাহিত্যে অভিনব রসধারার সৃষ্টি করিল, সাহিত্য তাহার অলৌকিক জীবনের অনুপ্রেরণায় প্রেম ধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া সহস্রধার উৎসে চতুর্দ্দিকে উৎসারিত হইল, তাহাতে যে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল আজিও গৌরজন সে রসে বিভোর হইয়া আছে।

যথার্থ প্রেম তাহাকেই বলি, যাহা ব্যর্থতার মধ্যে এক-নিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকে, অবিচলিত সংযমের অপূর্ব্ব শুচিতায় দীপ্যমান।

আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী,
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পীরিতি
জগৎ শুনিয়া সুখী।

প্রেমাস্পদের শুভ কামনায় নিঃশব্দে নিঃশেষে আত্মবিলোপ করিয়াছে, তাহা দৈহিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই, দেহধর্ম্মের উর্দ্ধে হৃদয়-ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে।

কাব্য রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের মধুচক্র, ইহার নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে স্বল্প প্রকাশের মাধুর্য্য শ্যামঘন হইয়া উঠিয়াছে,

এতদিন বুঝিলাম বচনক অন্ত,
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।

পদাবলী-সাহিত্যে নিত্য বৃন্দাবন শুধু ধ্যান-ধারণায় সৃষ্টি হয় নাই। বেদ-বেদান্তের অরূপ পদাবলীতে শ্যামরায়ের বেশে আসিয়াছেন। সে বৃন্দাবন স্বপ্নলোকের আবহাওয়ায় আবৃত

নহে। নীল আকাশে নীল ঘনাবলীর নীল ছায়ায় নীল বসুন্ধরা ছায়াময়ী হইয়াছে। বিকশিত নলিনীর পরাগ-রেণু অঙ্গে মাখিয়া প্রমত্ত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবিরূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা মানোরচিত ভাব ও ভাষায় উজ্জ্বল হইয়াছে, গীতিময় শব্দচিত্র-পরম্পরায় তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে।

এই সাহিত্যে কল্পনার সহিত বাস্তবের আছে সংযোগ, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবের আছে অপূর্ব্ব মিশ্রণ, বৈষ্ণব কবিগণ মকরন্দ-লোভে অন্ধ অলির ন্যায় যে রস-সাহিত্যের সৃজন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আছে বাস্তব অনুভূতি। পরোক্ষভাবে পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিলাস-লীলা বর্ণিত হইলেও ইহা কবিজীবনের নিগূঢ়তম সুখ ও দুঃখের বর্ণবিন্যাসেও সত্য ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বন্ধু—তুঁহি সে আমার প্রাণ,
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান।
পীরীতি রসেতে ঢালি তনু মম
দিয়াছি তোমার পায়,
তুঁহি মোর পতি, তুঁহি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ
তোঁহার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোঁহাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি,
কহে চণ্ডীদাস, পাপ-পুণ্য মম
তোঁহারি চরণ খানি।

এই জগতের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতির উপরই লোক-লোচনের অন্তরালে স্থিত অতীন্দ্রিয় জগতের শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্তরের সহিত বাহিরের, বাস্তবের সহিত অবাস্তবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই পদাবলী-সহিত্যের কাব্যবস্তু।

এখানে মর্ত্ত্য-প্রেমের ভিতর দিয়াই অমর্ত্ত্য-প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, কর্ণ যাহা শুনিতে পায় না, ত্বক্ যাহাকে ছুঁইতে পারে না, রসের অঞ্জন-মাখা নয়ন তাহা দেখিতে পায়, রসসিক্ত শ্রবণ তাহা শুনিতে পায়, রসধারা-স্নাত স্পর্শ তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার সঙ্গ লাভ করে। এইরূপে রসের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হয়।

পদাবলীর মহাজনগণ মানবপ্রেমের শ্রেষ্ঠ সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপে পরম রসময় ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, আপনার কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি পূর্ণ করিয়াছেন।

মানুষ চিরকাল দেহের সুখের জন্য লালায়িত। এই দেহের সম্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়ভোগের একটী বিশেষত্ব আছে—যাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না, আবার ধরিয়া থাকিলেই প্রাণে শান্তি জন্মে না। কিন্তু ইহার পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাড়া পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে জন্মিয়াও এই রসবস্তু অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়।

মনের মানসে পরাণ উছলে, ঐছন হয় অকাজে,
যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন, কানে সে মুরলী বাজে।
যদি চলিতে না চাহ কানুর পাশে চরণ স্থির না বাঁধে
গোবিন্দ দাস কহে, কানুর লাগিয়া, ভাল সে পরাণ কাঁন্দে।

মানবপ্রাণের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা, পিপাসা, আশা ও সাধনা যে অজানা বস্তুর সন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল বৈষ্ণব মহাজনগণ সকল রূপ রস সৌন্দর্য্যের বিকাশ, তৃপ্তি, শান্তি ও চরিতার্থতার নিধান রূপে বিনোদিয়াকে গ্রহণ করিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে সরল ও সুগভীর প্রেমধর্ম্ম দার্শনিক তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অভিনব রূপ ধারণা করিয়াছে। উপনিষৎ বলেন,

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

রসস্নাত কাব্য বলেন—

তোমার গরবে গরবিণী হাম
রূপসী তোমার রূপে।

এই প্রেমগাথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ভাবের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঊর্ম্মিমুখর ক্ষুব্ধ সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া যে প্রেম আপনার মর্য্যাদা ও সত্যকে পরীক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ভাব ও কল্পনার সহিত প্রকৃতির এই উৎসব, সমারোহের মধ্যে মধুর রসের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব বিরহ-মিলন-কাহিনী শব্দ ঝঙ্কার, ছন্দ হিল্লোল, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় কবিমানসের বিচিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমুদয় পদাবলী-সাহিত্যকে মনোমুগ্ধকর রূপ প্রদান করিয়াছে।

আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য এই বিশ্বসৃষ্টির রস মাধুর্য্য উপভোগ। যিনি স্রষ্টা, তিনি ত' এই পরিদৃশ্যমান জগতে মহারূপেরই বিলাস করিতেছেন। এই বিশ্ব আত্মার সহিত একান্ত যোগসাধনই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই ত পদাবলী-সাহিত্যের প্রকৃত কাব্যবস্তু।

সমগ্র অনুভূতিই সাহিত্য, সেই জীবনের অনুভূতির জীবন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্য রস। প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছি, তাহাতে আমার জড়াতীত নিত্যসিদ্ধ সমগ্রতা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই—

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

সাহিত্য জ্যামিতির প্রাথমিক সূত্রের ন্যায় স্থিতিশীল নয়, একথা সত্য, পরিবর্ত্তনশীলতা নব নব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠাই সাহিত্যের ধর্ম্ম সন্দেহ নাই।

কিন্তু মহাজন-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে এক অভিনব যুগ আনয়ন করিয়াছিল। ভক্ত রসিক মহাজনগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা দ্বারা আত্যন্তিক আনন্দ-রস পান করিয়াছিলেন। সে রস দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। মহাজনগণ বিষয়বিচারের ঊর্দ্ধে অপূর্ব্ব চিন্ময় রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই যুগে সাহিত্য-জগতে স্বার্থের আহুতি হইল, অধিকার লোপ হইল, মানবজীবনে রূপান্তর সৃষ্টি হইল।

রসানুভূতিতে মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় প্রেমিক কবিগণ কোমল অশ্রুর উৎসে রস-সাহিত্যের সৃজন করিলেন।

পাণ্ডিত্যের ঊর্দ্ধে অনহঙ্কৃত অবস্থা, যে অবস্থায় রসের প্রবাহে জীবন সহজ হয়, সেই অনুপ্রেরণা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় কবিরাজ গোস্বামী লাভ করিলেন। তাই শুষ্ক শ্রৌত মধুর হইল, শাস্ত্রাম্বুধি মন্থন করিয়া তাহাতে চৈতন্য-চরিতামৃতের অবিমিশ্র রসনির্য্যাস মাখাইয়া বক্তব্য মধুর করিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিলেন।

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত,
বাহে বিষ জ্বালাময়, ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃত একত্র মিলন॥

যাত্রী

শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

শতাব্দীর যাত্রাপথে ঝঞ্চাবর্ত্ত সম্মুখে আবার,
দিগন্তে ঘনালো ছায়া, নেমে আসে ঘন অন্ধকার।
অরণ্যের শঙ্কা জাগে, দিকে দিকে চলে অভিযান,
খণ্ড প্রলয়ের দিন এলো কিরে! কোথা পরিত্রাণ!
বিক্ষুব্ধ বিহঙ্গ কাঁদে, ভেঙ্গে পড়ে মহীরুহ শাখা,
প্রাণের প্রান্তরে হেরি অতীতের স্মৃতিচিহ্ন আঁকা—
তারি পানে চেয়ে দেখি, দুঃখ হয় অতীতের তরে,
জানি নাক ভবিষ্যত যাবে চলে কোন্ পথ ধরে।

যদি আসে তপোবন আরণ্যক সভ্যতার সনে,
দ্বন্দ্ব দ্বেষ হিংসা যত মুছে যায় মানুষের মনে,—
তবে হবে ধরণীর সার্থকতা সৃজিয়া মানব,
আজ শুধু পথ চলি আর শুনি সদা আর্ত্তরব।
সাম্য মৈত্রী প্রেমধর্ম্ম বিশ্ব হ'তে গেল কিগো চলে?
কোথায় আশ্রয় খুঁজি ভীত হয়ে ভাসি অশ্রুজলে!

বন্ধু

শ্রীঅবনী রায়

ভগবান্ চক্ষু দিয়েছেন পরেশকে দু'টিই। একটা বোধ হয় শুধু শোভার জন্য। নইলে কোন জিনিষই সে দু'চোখে দেখে না। পরেশ জানে, কোনদিন তার কিসের লেক্‌চার, অথচ রুটিনের মাথায় পিরিয়ড্‌টা স্পষ্ট লেখা থাকা সত্ত্বেও তাহা তার চোখে পড়ে না, ঘড়িটাও তার সামনেই থাকে, কাটাগুলিও যথানিয়মেই ঘুরে, অথচ রোজ রোজ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, কখন নাইতে হইবে, কখন খাইতে হইবে আর কখন কলেজের বেলা হয়।

ভোলা আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল,—মা বল্‌লেন, কলেজের বেলা হয়ে গেছে, নাইতে চলুন, বাবু!

পরেশ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, ওঃ, দশটা, সর্ব্বনাশ!

খাইতে বসিয়া সে খুব তাড়া-হুড়া করিতে লাগিল। বিভা তাহাকে শান্ত করিয়া বলিল, ধীরে সুস্থে খাও, এত তাড়া কিসের? ক্লাশ ত' সে একটা পনেরোয়।

একটা পনেরোয়? পরেশ যেন নূতন কথা শুনিল; বলিল, দেখি রুটিনটা। ওরে, ও ভোলা! দেথ ত' আমার জামার পকেটে···

বিভা হাসিল, বলিল, কি হবে জামার পকেট খুঁজে? আজ বুধবার না? বুধবার ত থার্ড পিরিয়ডেই তোমার প্রথম ক্লাশ।

রুটিন আর আনাইতে হইল না। কেন না পরেশ জানে বিভাই তার যাবতীয় কাজকর্ম্মের সজীব রুটিন। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর বিপর্য্যয় ঘটা হয় ত' বা সম্ভব, কিন্তু যে রুটিন বিভার মনের ফলকে একবার দাগ কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়বার রুটিন পরিবর্ত্তনের নোটিশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে দাগ কিছুতেই মুছিবে না।

পরেশকে নিয়া বিভা কি বিপদেই না পড়িয়াছে। বিভা মনে করে, স্বামী তার ছেলেমানুষটি, ছোট শিশুর মতই তাহারও শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান নাই। চৈত্রের খড়তপ্ত দ্বিপ্রহর। পরেশ হয় ত' গরম সুট পড়িয়া চলিল কলেজে। বিভা তক্ষুণি ছুটিয়া আসিয়া বলে, "তোমাকে নিয়ে আর পারিনে, বাপু! কি ছেলে মানুষ হচ্ছ দিন দিন বল্‌তো? এমন গরমে প্রাণ আই-ঢাই করে, আর তুমি···। নাও, খোলো এ সব। আমি নিয়ে আস্‌ছি গরমের পোষাক।" পরেশ তার ভুল বুঝতে পারে, লজ্জিতও হয়; বলে, ওঃ, বড্ড ভুল হোয়ে গেছে। এম্‌নি তার ভোলা মন! কাজেই তাহার জীবনযাত্রার যাবতীয় খুটিনাটি, যয়, কবে তার ফাউন্টেন্ পেনে কালি ভরা হইয়াছে, আজ কালি না ভর্ত্তি করিয়া দিলে, বিধিসঙ্গত নিয়মে চলা উচিত কি না বিভাকেই দেখিতে হয়। স্বামীকে একাকী ছাড়িয়া দিয়া বিভা সোয়াস্তি পায় না মোটেই। একান্ত অসম্ভব ও অশোভন, তাই! নইলে সেও রোজ রোজ স্বামীর সঙ্গে কলেজে যাইত।

বাড়ী ফিরিতে একদিন পরেশের রাত হইয়া যায়, আর বিভার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। সহরময় ট্রাম বাসের ঘটা, বলা কি যায়! যে খেয়ালী মানুষ, অম্‌নি ভোলার ডাক পড়ে। যা' ত' ভোলা, বিপুলবাবুর বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে আয় ত'। সেখানে না থাকে ত' আশিষ বাবু আর গগন বাবুর ওখান থেকেও ঘুরে আসবি। বলবি, কাল খুব তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল, আজ যেন বেশীক্ষণ বাইরে বাইরে না থাকেন, বুঝলি? ভোলার আপত্তি করিবার উপায় নাই, করিলে বলে, তোর ঐ এক দোষ। কি হয় তোর দু'বাড়ী ঘুরে আস্‌তে। পুরুষ মানুষ তুই। ভোলা নানাপ্রকারে বিভাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, যে তার যখন তখন বাবুকে ডাকিতে যাওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। বাবুর বন্ধুরাও ঠাট্টা করে, কিন্তু বিভা কিছুতেই বুঝিবে না। ভোলা বাহির হয়। মুখে তার দুষ্টামির হাসি, ঘরে তারও বৌ আছে!

জোর রাজনীতি চলিতেছিল। এমন সময় ভোলার আবির্ভাব। বন্ধুরা হাসিয়া খুন। বন্ধু আশিষ পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওহে! ছেলেমানুষ, বৌ সোহাগী! তোমার টেলিগ্রাম। বন্ধুরা ভোলার এই নাম রাখিয়াছে।

পরেশ বিরক্ত হইল; বলিল, ভারী জ্বালাতন!

বন্ধুরা বলিল,—জ্বালাতন নয়, পরেশবাবু! এ তোমার দুর্ব্বলতা। আচ্ছা পরেশ! বিয়ে কি শুধু তুমিই করেছ, না দুনিয়াসুদ্ধ লোকেই করে? কিন্তু তোমার মত এমন বৌ-পাগলা স্বামী আর ক'জনকে দেখেছো বলতে পারো? পরেশ লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। বন্ধুরা উৎসাহ পাইয়া বলিল, ছিঃ, পরেশ! তোমার মত শিক্ষিত যুবক যে শুধু বৌ বৌ করে এভাবে নষ্ট হোয়ে যাবে, তা' ভাবিনি। তুমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, ব্যবসায় অধ্যাপনা, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার ভার তোমাদের। আর তুমি যে এভাবে নিশ্চেষ্ট থেকে তোমার স্পেণ্ডিড ক্যারিয়ারটা মাটি করবে, তা ভাবতেও কষ্ট হয়। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তোমাদের ন্যায় শিক্ষিতদের সার্ভিসের যে কত প্রয়োজন!

পরেশ কি বলিতে চেষ্টা করিল, বলিল, কি যে তোমরা বল্‌চ, বন্ধুরা তাহার কথাটাকে শেষ করতে দিল না; বলিল, বল্‌ছি, সত্যি কথা! বল্‌লে দুঃখ পাবে জানি, তবু না বলে পারছিনে, বন্ধুর কর্ত্তব্যে ত্রুটি থেকে যায়। একটা কথা মনে রেখো, পরেশ, সে স্ত্রীই সংসারে সব নয়। সংসারে নাম-কাম, যশ-সম্ভ্রম,—এ সবের মূল্যও কারো চেয়ে কম নয়। তুমি বুঝতে পাচ্ছো না বটে, কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখছি,—পাব্লিক লাইফে একটা বিশিষ্ট স্থান তোমার চেষ্টার অপেক্ষায়। তুমি বিদ্বান, তুমি বুদ্ধিমান, তুমি বিত্তবান—এত সব সুযোগ হাতে পেয়েও তুমি তা' হেলায় নষ্ট করো না, পরেশ! তোমাকে ঘরের কোনঠাসা করে রেখে তোমার স্ত্রী সুখী হ'তে পারেন, কিন্তু বন্ধু আমরা,—আমরা পারিনে। আমরা চাই, যেমনি স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে, তেমনি পাব্লিক লাইফেও তোমার গর্ব্ব যেন আমরা করতে পারি। আমরা চাই, তুমি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াও, রাজনীতি, অর্থ-নীতি আর সমাজনীতির আলোচনা করো। দেশের বহুবিধ সমস্যার চিত্র চোখের সম্মুখে তুলে ধরো, দশজনের একজন হও।

সেদিন রবিবার। কলেজ নাই। বিভারও শরীর খারপ সে উপরে শুইয়া আছে। ভোলা বাজারে গিয়াছে। পরেশ তার পড়ার ঘরে। ভিখারী ডাকিল,—দু'দিন কিছু খাইনি বাবা! পরেশের মন তখন ম্যাথমেটিক্যাল্ প্রব্লেমের গোলক ধাঁধাঁয় ঘোরপাক খাইতেছে। প্রথমটা ভিখারীর কাতর নিবেদন পরেশ শুনিতে পায় নাই। ভিখারী এবার আরও নিকটে গিয়া বলিল, কিছু ভিক্ষে পাই বাবা! দু'দিন খেতে পাই নি। এবার সে শুনিতে পাইল, শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! দু'দিন কিছু খেতে পায় নি! পরেশ ভিক্ষুককে কাছে ডাকিয়া পকেট হইতে দু'টি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে যাইবে এমন সময় ভোলার আবির্ভাব! বাবুর কাণ্ড দেখিয়া তাহার বাজারের ঝুরি মাথায়ই রহিল। সামান্য ভিক্ষুক, এক মুষ্টি চাউল পাইলে যে বর্ত্তে যায়, তার জন্যে দু' দু' টাকা! অনর্থক এই অর্থের অপচয় ভোলা সইতে পারিল না, বলিল, এ আপনি কি কর্চ্ছেন, বাবু!

—বড় কষ্ট হে ওদের! বলিয়া পরেশ দু'টি টাকা ভিক্ষুকের হাতে গুঁজিয়া দিল।

টাকা হাতে পাইয়া ভিক্ষুক স্তম্ভিত। ভোলা ছুটিয়া এ সংবাদ মা ঠাকরুণকে দিতে গেল, আর ভিক্ষুক এ ফাঁকে পরেশের শিরে দুর্ব্বোধ্য আশীর্ব্বাদের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পলাইয়া গেল।

মা-ঠাকরুণ নীচে নামিয়া আসিল; বলিল, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে বলো তো? ভিক্ষুক বিদায় দু' টাকা!

পরেশ বুদ্ধিহীন, পরেশ ছেলে মানুষ, পরেশের জ্বালায় বিভার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নাই,—এসব কথা পরেশ স্ত্রীর মুখে প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্নেহময়ী পত্নীর নিছক স্নেহের ভৎর্সনা বলিয়াই এসব কথা সে সহ্য করে, সব শাসন মাথায় পাতিয়া নেয়, আবার লজ্জিতও হয় এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল হইতে দিবে না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করে। আবার তার অভিমানেও ঘা' লাগে। এসব কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার মত বুদ্ধি পরেশের যথেষ্টই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী তাহার অধিকারে, সে কলেজের প্রফেসর!

চাকর গিন্নী উভয়েই তাহার কাজের প্রতিবাদ করিয়া গেল, অথচ কি এমন গর্হিত কাজটা যে সে করিয়া ফেলিয়াছে, বুঝিতে পারে না। পারে না বলিয়াই আজ তার রুদ্ধ অভিমান পরেশকে এদের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, কাজটা কি এমন

অন্যায় হয়েছে শুনি ? ফকির ভিকিরি বলে এরা বুঝি মানুষ নয় ? মানুষের মত বাঁচবারও বুঝি এদের অধিকার নেই ? অথচ কত কষ্টেই না ওদের দিন চলে। আমরা না দিলে ওরা কোথায় পাবে শুনি ? বল্‌লে, দু'দিন কিছু খায় নি। ভাবতে পারো উপবাসের জ্বালা কত ? উপোস্ ত' কোনদিন থাকোনি, তা' বুঝবে কি করে ?"

বিভা হার মানিল ; বুঝিল,—এ স্বামীর মনের কথা নয়, খেয়াল। সম্প্রতি বোধ করি সোস্যালিজমে পাইয়াছে, তা' নইলে, যে লোক এক চোখ বন্ধ করিয়া পথ চলে, পথের দু'ধারে অগণিত ভিক্ষুকের দল মাঘের শীতে, আষাঢ়ের বাদলে গাছতলায় আর গাড়ীবারাণ্ডায় পড়িয়া কত কষ্টে যে দিন কাটায় দেখিতেই পায় না, যে লোক এক ম্যাথমাটিকেল্ প্রব্লেম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কিছুর খোঁজ রাখে না, সে হঠাৎ এত দয়ার সাগর হয় !

বিপুলবাবু প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের বহুবিধ আলাপ আলোচনাকেই বিভা এই জন্য দায়ী করে। ভোলার মারফৎ ক্লাবের কার্য্যকলাপের অনেক কাহিনীই বিভার কাণে আসিয়াছে।

নিছক খেয়ালবশে অর্থের এই অপচয়, পরেশের আজ নূতন নহে। সেদিন কলেজ ফেরৎ পরেশ বিভার জন্য এক শাড়ী কিনিয়া আনিয়াছে। বেশ রং-চং জমকালো কার্ণাটিক শাড়ী, দাম তার যা-ই হউক, এ প্রকারের শাড়ী মাদ্রাজী, মারাঠী কি মারোয়ারী মহিলাদের পড়িতে দেখা যায়, বাঙ্গালী সমাজে এ আজও অচল। পরেশ কিন্তু অতশত ভাবে নাই। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সুন্দর জিনিষ উপহার দিতে হয়, দিয়াছে, শাড়ীর জমকালো রং পরেশের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়াছে, কাজেই সে কিনিয়াছে, ব্যস ! বিভা কিন্তু এই শাড়ী লইয়া সুখীও হয় নাই, দুঃখও করে নাই, শুধু খেয়ালী স্বামীর দৃষ্টির দৈন্যে করুণার হাসি হাসিয়া চুপ করিয়াছে। পরদিন পরেশ কলেজে বাহির হইয়া গেলে বিভা ভোলাকে সঙ্গে করিয়া দোকানে গিয়া শাড়ী বদলাইয়া নিজের পছন্দ মত আর একটা কিনিয়া আনিয়াছে। অথচ মজা এই, বিভার পরিধানে নূতন শাড়ী দেখিয়া যেমন সে অবাক হয় নাই, তেমনি তাহার নিজের কেনা শাড়ী সম্বন্ধেও কোনদিন কোন প্রশ্ন করে নাই।

তদবধি বিভা সংসারের যাবতীয় খরচপত্রের ভার আপন হতে টানিয়া নিয়াছে। মাস কাবারে মাইনের টাকা বিভার হাতে দিয়াই পরেশ মুক্ত। এমন কি তাহার দৈনন্দিন পকেট খরচার টাকাও তাহাকে প্রয়োজন মত স্ত্রীর কাছে চাহিয়া নিতে হয়।

ক্লাবে ডোনেশন দিতে হইবে বলিয়া সেদিন পরেশ বিভার নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিল। বিভা জানিতে চাহিল, এটাকায় কি কাজ হবে তোমাদের ক্লাবে ?

পরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন ? কি দরকার এত জিগ্যেস্‌বাদের ?

এমনি শুনি।

পরেশের চোখে উত্তেজনা, বলিল, আজকাল তোমার কি হল বল ত' ? সবটাতেই যে বাড়াবাড়ি বড় ? সব কিছুরই কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমার কাছে ? কিন্তু কেন ? আমার টাকার দরকার, টাকা দাও, ব্যস্, ফুরিয়ে গেলো।

বিভা পরেশের উত্তেজনা আর বাড়াইল না, চুপ করিল, কিন্তু বিচলিত হইল। বিভা ক্লাবের সমুদয় সংবাদই পায়। সেখানে কি সব আলোচনা হয়, বিভাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরেশকে এক একদিন কি রকম বিব্রত হইতে হয়, কিছুই তাহার শুনিতে বাকি নাই। এতদিন সে চুপ করিয়াছিল, কিন্তু ইদানিং তাহার কাণে আসিয়াছে, সেখানে দেশোদ্ধারের নামে জোর ফ্লাস খেলা চলে, আরও নাকি কিছু। এসবের মূলে রহিয়াছে বিপুলবাবু, স্বামীর বাল্যবন্ধু, যিনি কোনদিন অর্থার্জ্জনের ধার ধারেন না, বাপের রোজগারে খান। বিপুল বাবুকে বিভা খুব ভাল করিয়াই জানে। আরও জানে যে, পিতৃছত্রতলে প্রতিপালিত ও পরিপোষিত জীবদের কোনটারই অভাব বিপুলবাবুতে নাই। সুতরাং চাঁদা করিয়া ডোনেশন উঠাইয়া ক্লাব করার অর্থ বিভার নিকট সুস্পষ্ট। তারপর পরেশের এই উত্তেজনা শুধু নূতনই নয়, একেবারে অপ্রত্যাশিত। এই উত্তেজনার উৎস যে কোথায় বিভা তা' অনুমানে বুঝিতে পারে। কাজেই সব জানিয়া শুনিয়া বিভা স্বামীর উত্তেজনার নূতন খোরাক জোগাইতে রাজি হইল না, শুধু বলিল, আজ তো টাকা নেই, কালটাল নিলে হয় না ? ভাগ্যিস্ এবার আর পরেশ জেদ করিল না। বিভা বলিয়াছে, টাকা নাই, সুতরাং সত্য সত্যই নাই। পরেশের এর

উপর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন এতদিন ছিল না, আজও ক'রল না।

বিভা শান্তস্বরে কহিল, আজ আর ক্লাবে নাই বা গেলে, চলো না, শুন্‌ছি, মেট্রোতে নাকি একটা খুব ভাল বই হচ্ছে দেখে আসি। বহুদিন ত' সিনেমায় যাই না। পরেশ কিন্তু রাজি হইল না; বলিল, "আজ ত' আমার যাবার উপায় নেই। খুব জরুরী মিটিং আছে একটা আজ ক্লাবে।" বিভা নিরস্ত হইল, কিন্তু একটা আশঙ্কা বিভার অন্তর জুড়িয়া রহিল।

দেখে আয় তো ভোলা, ক্লাবে কি হচ্ছে আজ। শুধু দেখে আসবি, কাউকে কিছু বলিস্ না যেন, বুঝ্‌লি?

মা-ঠাক্‌রুন্ বলিয়া দিয়াছেন, 'কাউকে কিছু ব'ল্‌নি।' কাজেই কিছু বলিবার ঝোঁক ভোলার প্রবল হইয়া উঠিল। সে বুদ্ধি দিয়া পাণ্ডিত্য করিয়া কহিল, মা বল্‌লেন,…

বন্ধুরা হাসিয়া উঠিল,—হো, হো, হো, হো……

পরেশ অপ্রস্তুত, মুখের এক প্রকার বিকট ভঙ্গি করিয়া বলিল,—মা বল্‌লেন, কি বল্‌লেন, বল্।

—মা বললেন…

—আবার, মা বল্‌লেন।…কি বললেন? বেরো এখান থেকে, হতভাগা গাধা কোথাকার! আর যদি কোন দিন কাজের সময় বিরক্ত করতে এখানে আসিস্…

ভোলা পলাইল।

বাড়ী ফিরিয়া পরেশ বিভাকে সাবধান করিয়া দিল, আর যদি কোন দিন কাজের সময় বিরক্ত করতে ভোলাকে আমার কাছে পাঠাও, তবে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

মাস কাবারে পরেশ সব টাকা পয়সা নিজের কাছে রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত সংসার চালাইতে লাগিল। বিভা এখন স্বামীগৃহের মূক পোষ্যা। কিন্তু স্বামীর অপটু হস্তের ব্যয়-বাহুল্য এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলা বিভা সহিতে পারে না। কিন্তু কোন কিছু বলিবারও তার উপায় নাই। পরেশ অসম্ভব রকম ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বেহায়ার মত কোন কিছু বলিতে গেলে বলে,—মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাকো, পুরুষদের কোন কিছুতে কথা কইতে এসো না। খরচপত্রের কথা বলিলে বলে,—আমার টাকা আমি যে-ভাবে খুশী খরচা করবো তুমি চুপ করো।

বিভা নিরুপায়। সে এখন আপন ঘরে পর, স্বামীর অনুগ্রহপুষ্ট জীববিশেষ।

বিভার মন ভাল নয়, ফলে শরীরও খারাপ। মা লিখিয়াছেন,—সেখানে যত্ন নেবার লোকের অভাব, আমার নিকট চলে এসো।

শ্বশুরও পরেশকে লিখিয়াছে,—শুন্‌ছি না কি বিভার শরীর ভাল নয়। তুমিই বা একেলা মানুষ কি করে ওকে দেখা-শোনো করবে। যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তবে দিন কতক বরং এখানে থেকে যাক্।

পরেশ আপত্তি করিল না, ভাবিল, আপদ কিছুদিন দূরে দূরে থাকাই ভাল। বন্ধু মহলে সময় নেই, অসময় নেই, অপ্রস্তুত হইতে হয় না। ভাবিয়া লিখিল, যা' ভাল মনে করেন, করুন, আমার আপত্তি নেই। বিভাও ভাবিল, এভাবে নিজের ঘরে পর হয়ে থাকার মত বিড়ম্বনা খুব কমই আছে। তার চেয়ে বরং দিন কতক দূরে দূরে থাকাই ভাল; কতকটা অদর্শনে, কতকটা ঠোকর খাইয়া যদি পরেশ বিভার মূল্য বোঝে। ভাবিয়া মাকে লিখিল,—আমি আসিব।

পরেশ এখন স্বাধীন, পরেশ এখন মুক্ত। সদ্যমুক্ত জোড়াগাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় নিরঙ্কুশ। স্নেহের শাসন নাই, মমতার অত্যাচার নাই, ভালবাসার আতিশয্য পায়ের বেড়ির মত তাহার গতিপথ সংযত করিতে কেউ আসে না।…… বিভা পিতৃগৃহে।

পরেশ ক্লাবের কাজে, রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিল। এতদিনে তাহার সোস্যাল ক্যারিয়ার আরম্ভ হইল; দশ জনের একজন হওয়ার সুযোগ মিলিল। পরেশ এখন এদের ক্লাবকমিটির প্রেসিডেণ্ট। অর্থব্যয়? পৃথিবী নাম যশ গাছের ফল নয়; তার জন্য দস্তুর মত মাল-মসলা খরচা করিতে হয়। ম্যাথমেটিকেল্ প্রব্লেম? চুলোয় যাক্। চারদিক সমানভাবে বজায় রাখা কখনও চলে?

এ ভাবে কিছুকাল চলিল। তারপর আস্তে আস্তে উৎসাহে ভাটা পড়িতে লাগিল। যতই দিন যায়, ততই পরেশ কিসের একটা অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল। এক এক সময় হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া আসে,

ভোলা! অমনি পুরুষকার মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। মনকে কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া বলে, আবার! বন্ধুরা কি বলবে?

ভোলা উত্তর দেয়, বাবু! ডাকছিলেন?

পরেশ লজ্জিত হয়, বলে, না থাক, যা।

ভোলা পিছন ফিরে। অমনি আবার ডাক পড়ে; বলে, শোন, কোন চিঠি পত্র?

—না বাবু!

পরেশের মান অভিমানের বাণ ডাকে; মনে মনে বলে, কেমন আক্কেল ওর? একটা চিঠি-পত্র দিতে কি দোষ? সে মাঝে মাঝে ভাবে, সেই না হয় লিখিবে। আবার তাহার চিঠি পাইয়া বিভা তাহাকে কি দুর্ব্বলই না মনে করিবে; ভাবিয়া নিরস্ত হয়। এ দিকে বিভারও অভিমান কম নয়!

বন্ধুরা সব বোঝে, ঠাট্টা করিয়া বলেও, কি হে মণিহারা ফণি!

পরেশ বিরস বদনে উত্তর দেয়, শরীরটা বড় জুৎসই নেই, ভাই!

—যেহেতু গাইডিং ফোর্স কাছে নেই।

পরেশের শরীরটা আজকাল সত্য সত্যই বড় খারাপ। এতদিন শুধু তাহার শরীর খারাপের কাহিনীই শুনিয়া আসিয়াছে সে এক জনের মুখে। নিজে বড় একটা টের পায় নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। তাহার শরীর খারাপ ভালর কথা ভাবিবার জন্ত যাহার মাথাব্যাথা সেই তাহার শরীর খারাপ হইবার পথে, খারাপকে বাঁধা দিয়েছে আর পরেশকে শুধু জানিতে দিয়াছে, যে তাহার শরীর খারাপ। এখন কিন্তু সে নিজে টের পায়, নিজে বোঝে, কখন তার ক্ষুধাতৃষ্ণা, কখন মাথাধরা আর কখন জ্বর জ্বর।

আজকাল তার প্রতি কাজেই বিশৃঙ্খলা। রুটিন ঠিক থাকে না, পেনে কালি ভরা হয় না, দাড়ি বড় হইয়া যায়, কিন্তু কামাইবার সময় হয় না, কলেজের বেলা হইয়া যায়। কোনদিন চশমা ফেলিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হয়, আর খোঁজ হয় বাসে বসিয়া, ব্যস্, দৌড়ো আবার ফের কোন দিন বা সোমবারকে বুধবার পড়িয়া লেক্‌চার তৈরী করে আর ক্লাশে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়। বাড়ী ফিরিয়া রাগারাগি করে। ভোলাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন চিঠিপত্র এলো রে, ভোলা!

—না, বাবু!

পরেশের রক্ত গরম হইয়া ওঠে। ভোলা সব বোঝে, সহানুভূতির স্বরে বলে, কেমন নিষ্ঠুর তিনি? এতটা দিন কোন চিঠি পত্র……

পরেশ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে; বলে, তোকে এখানে আর পণ্ডিতি করতে হবে না, যা তোর কাজে, হতভাগা কোথাকার!

নিজের মনের কথা ভোলার মুখ দিয়া বাহির হয়, পরেশ তা সইতে পারে না

পরেশ ক্লাবে যায়, কিন্তু না খেলা ধূলায়, না কথাবার্ত্তায় কোন কিছুতে সে মন বসাতে পারে না। বন্ধুরা কথা বলে খেলা করে, পরেশ শুধু কাণে শোনে আর চোখে দেখে। রাত বাড়িয়া চলে কিন্তু শরীর খারাপ বলিয়া আর কেউ তাহাকে ডাকিতে আসে না। অনেক রাত্রে বাড়ী আসিয়া দেখে, ভাত ঢাকা। কোনদিন খায়, কোনদিন বা ভাল লাগে না বলিয়া উঠিয়া পড়ে। পরেশ নিজ হাতে বিছানা পাতিয়া শুইতে যায়, অমনি ভোলা ছুটিয়া আসিয়া বলে, আসুন বাবু, আমিই বিছানাটা……। পরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, কোন দরকার নেই, আমার বিছানা আমিই পাড়তে পারি, তুমি যাও।

বাজারের সময় ভোলা আসিয়া বলে, বাবু! বাজারের টাকা

পরেশ অবাক হয়; বলে, এর মাঝেই টাকা? টাকা কি চিবিয়ে খাস্? এই না সেদিন দশটাকা দিলুম।

—সব খরচা হোয়ে গেছে, বাবু! বলিয়া ভোলা খরচের লম্বা ফর্দ্দ পেশ করে। পরেশ কোন কথা শোনে, কোন কথা বা না শুনিয়াই বলে, আর পারিনে বাপু! তোমাদের যা' খুশী করো। আমার হাতে টাকা নেই। বলিয়া সে বাহির হইয়া যায়। ভোলা তাহার 'নিজের' টাকা দিয়া কোনরকমে সেদিনকার মত বাজারটা সারিয়া লয়।

খাইতে বসিয়া পরেশ পেট ভরিয়া খাইতে পারে না। ভোলা বলে, মাকে আসতে লিখে দেবো বাবু? পরেশ মুখ না তুলিয়াই বলে, তাই দে।

কে বলিবে কেন, পূর্ব্বে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়াই বিভা কলিকাতা চলিয়া আসিল। মা-ঠাকরুণের এই

আকস্মিক শুভাগমনে ঠাকুর চাকর কেউ প্রসন্ন হইতে পারে নাই। দাদাকে সঙ্গে করিয়া বিভা যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন রাত প্রায় একটা। পরেশ তখনও ফিরে নাই।

বিভা ভোলাকে ডাকিয়া কহিল, এত রাত্তিরে একটা লোক না খেয়ে দেয়ে বাইরে, তোদের কি কারু হুঁস নেই? ধন্য মানুষ তোরা, বাবা! যা' শীগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আয় গে।

ঘর দরজার অবস্থা দেখিয়া বিভার চোখে জল আসিল। শোবার ঘরে গিয়া দেখে মেঝেতে ভাত ঢাকা। চারিদিকে একরাশ পিপ্‌ড়ে জড় হইয়াছে। টেবিলের উপর রাজ্যের ধুলাবালি। বইপত্র কতক টেবিলের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো, কতক খাটের উপর খোলা, আর কতক বা খাটের নীচে আর আলমারীর ফাঁকে পড়িয়া আরসুলা আর মাকড়সার আবাস ভূমিতে পরিণত।

মশারীর এক কোণ খোলা দেখিয়া মনে হয়, বাকি তিন কোণ খোলার নিয়ম বহুদিন হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার আর কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতার ধোবারা বুঝি সব ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বাড়াভাত আস্তাকুড়ে ফেলিয়া বিভা যখন উনুনে হাড়ি চড়াইতে গেল, তখন ঠাকুর আসিয়া বলিল, আঁপনি সরুন, মা! আমিই রাঁধছি।

বিভা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, আর দরদ্ দেখাতে হবে না, বেরোও এখান থেকে। ঠাকুর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তা কখনও হয়!

হাঁ হয়, খুব হয়। তা নইলে আর রাঁধবে কে বল? তোমাদের রান্নাবাড়ার সম্বন্ধ ত' শুধু মাইনের সঙ্গে। তোমার মাইনের রান্না ত আজ হয়ে গেছে। আর একবার রাঁধায় ডবল মাইনে জোগাবার টাকা আমার নেই। এমন নবাব-পুত্তুর ঠাকুর চাকর নিয়ে আমার চলবে না—কাল থেকে তোমাদের ছুটি।

... ...

এক মুখ দাড়ি লইয়া পরেশ যখন বাড়ী ঢুকিল তখন বিভার রান্না প্রায় শেষ। পরেশকে দেখিয়া বিভা চোখের জল রোধ করিতে পারিল না। তাহার ঐ স্বাস্থ্য এই হইয়াছে!

খাওয়া-দাওয়ার পর বিভা পরেশকে বলিল, তোমার শরীর আজকাল খুব খারাপ হয়ে গেছে, না? চল না দু'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। হাওয়া পরিবর্ত্তনে যদি শরীরটা একটু ভাল হয়। যাবে?

পরেশ আগের মত বিভার অভিভাবকত্বে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া বলিল, তোমার যেমন খুশী।

পরদিন পরেশ তিন মাসের ছুটী চাহিয়া দরখাস্ত করিয়া আসিল।

শরৎ-বরণ

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ

শরৎ এসেছে পল্লীর বাটে—বরণ করে নে তায়
বিছাও শেফালি আসন তোমার শ্যামল ধরণী গায়
শিশিরে গাঁথিছে মুকুতার মালা
মালতী ধরিছে লাজের ডালা
কে কোথায় আছিস আয়রে ছুটীয়া বরণ করিবি আয়
শরৎ এসেছে পল্লী দুয়ারে বরণ করে নে তায়।

আল পথে পথে আলিপনা আঁকা কোমল দূর্ব্বামূলে
দাঁড়ায়ে কে ঐ নদীর বাঁকেতে কাশের চামর তুলে
মাঠের পথেতে রাখাল ছেলে
বাজায় বাঁশীটি পরাণ ঢেলে,
পাগল ভ্রমর পরাগের লোভে আজিকে আপনা ভুলে
শরৎ এসেছে গাঁয়ের বাটে বরে নে পরাণ খুলে।

সোনালী ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে ঐ উথলে হরিৎ আজি
বনে বনে কত ফুল ফোটে আজ ভরে নে যে যার সাজি।
ভোরের আকাশে আরতির সুর
দূর হতে দূরে যায় বহু দূর।
দীঘির জলে মরাল মরালী দেখায় সুরের বাজি
সোনালী রোদের আঁচল দোলায়ে শরৎ এসেছে আজি।

কামিনী আজিকে হেনার সাথে করিতেছে কানাকানি
সরমে কেতকী পথের বাঁকেতে ঘোমটা দিতেছে টানি!
প্রকৃতি আজিকে পরাণ খুলি
আকাশের বুকে বুলায় তুলি;
ফুটেছে কমল আলো করি জল, হাসিভরা মুখখানি
বরণ করে নে শরৎ মায়েরে—নদী গাহে এই বাণী।

বৃহত্তর ভারতীয় রূপ-বিদ্যা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, তত্ত্বারিধি

বহুকাল পরে ভারতীয় রূপবিদ্যার উপর জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও বৃহত্তর ভারতের শিল্পকলার উৎসস্বরূপ তাকে মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি। ভারতের ধর্ম্ম এক সময় সমগ্র এসিয়ায় ব্যপ্ত হয়েছিল, নানাদেশের সাধক ও শিক্ষার্থী এসে ভারতের তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ ক'রত। শুধু তা নয় ভারতের রূপ বিদ্যাও এই ক্ষেত্রে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিক নানা ঘটনা হতে দেখা যায়, ভারতের আদর্শ কি করে শুধু আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভিতর দিয়ে নয় ব্যবহারিকা অনুষ্ঠানের সহায়তায় এরূপ একটি ব্যাপক মর্য্যাদা পায়। মহীপাল ধর্ম্ম পঞ্জাব, কাশ্মীর, কাফির স্থান, খোটান ও চৈনিক তুর্কীস্থান প্রভৃতি জায়গায় বিস্তৃত হয়। ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বোধি ধর্ম্ম চৈনিক সম্রাট্ Wu-Tiof কে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোরিয়াও এ ধর্ম্ম প্রবেশ করে। যেখানকার বর্ণমালা সংস্কৃত হতে গৃহীত। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে রাজা Srang tsan Sgan Po কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয়। তিনি ভারতীয় মূর্ত্তি ও গ্রন্থাদি আনয়ন করেন তিব্বতে।

ভারতীয় পরিব্রাজক গুণবর্ম্মণ ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টনের নিকট একটি মন্দিরে একটি বৌদ্ধ জাতকের দৃশ্য আঁকেন।* আরও এক শতাব্দী পরে চৈনিক ভিক্ষু Hwui-sheng ভারতবর্ষ হ'তে ভারতীয় স্তূপগুলির পিত্তলের নমুনা (model) নিয়ে আসেন। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত পরিব্রাজক Hiuen Tsang ভারতবর্ষ হতে চীন দেশে বুদ্ধের স্বর্ণ, রৌপ্য স্ফটিক ও চন্দন কাঠের মূর্ত্তি আনয়ন করেন। † এ সময় সম্রাট্ Yangti-র রাজসভায় দুইজন ভারতীয় চিত্রকর ছিল। এদের নাম হচ্ছে কাবোধ ও ধর্ম্মকুক্ষ।

ইদানীং কোন কোন পণ্ডিত বলছেন, চীন দেশীয় চিত্রকলাই শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় চিত্রকলা এর নিকট হতশ্রী। এ শ্রেণীর উক্তির প্রতিবাদ করে H. F. E. Visser বলেছেন :—

The two magnificent poles of the art of Asia are India and China. If there is any question as to one having influenced the other then the land is of course India §

বস্তুতঃ ভারতীয় চিত্রবিদ্যাদি তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, ইন্দোচীন ও লঙ্কা প্রভৃতি স্থানে

অবেয়দান মন্দিরের বোধিসত্ত্ব (ব্রহ্মদেশ)

প্রভাতোরণের মত বিস্তৃত হয়। এ সব রচনার ভঙ্গী আবেষ্টনশ্রী একান্তভাবে ভারতীয়।

এসব রচনার মুখ্য আদর্শ পাওয়া যায় অজন্তা ও বাঘ-গুহায়। অজন্তা চিত্রকলার কাল হচ্ছে ৫০ খ্রীঃ অব্দে হ'তে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত। বাঘ-গুহার চিত্র হচ্ছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর রচনা। বাদামী গুহার রচনার সহিত অজন্তার রচনার প্রচুর সাদৃশ্য আছে, এ রচনাও ষষ্ঠ শতাব্দীর। ভারতের অভ্যন্তরে এসব সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের চরম দান। একটি

---

* Edward Chavaunas Guna Varma Young Paots 11 me Series P. 200

† Travels in India (Yuan Chwang's) Royal Asiatic Society, London [1904] P. 11.

§ H. F. E. Vesser—The influence of Indian Art. P. 114.

পরিপূর্ণ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এসব রচনায় এবং এদের আকর্ষণ এমন জগদ্ব্যাপী যে এসিয়ার সমগ্র চিত্রচক্র এসব জায়গার আদর্শ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছে।

মুসলমান আক্রমণে যখন বঙ্গ ও বিহার উৎখাত হয় এবং পূর্ব্বাঞ্চলের বিদ্যাপীঠগুলিকে অগ্নির লেলিহান কবলে ভস্মীভূত করা হয় তখন ভারতীয় পণ্ডিতেরা ও শিল্পীরা প্রাক্‌ভারতের সীমান্ত ছেড়ে উত্তরে নেপাল ও তিব্বত এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তার হয়ে পড়ে। এদের চিত্রকলাতে ভারতীয় ধারার আদর্শ দীপ্যমান। নেপালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রাক্‌ভারতীয় আদর্শ, নেপাল হতে তা বিস্তার হয়েছে তিব্বতে ও চীনে। চৈনিক সম্রাট কাবলা খাঁ বিখ্যাত নেপালী চিত্রকর আনিকোকে তাঁর রাজকীয় সজ্জাকলায় দপ্তরের প্রধান শিল্পীরূপে নিযুক্ত করেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে Stein ও Le cog পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের খোটানে চিত্রকলার প্রচুর নিদর্শন পেয়েছেন। Daudan Viliq এর অষ্টম শতাব্দীর চিত্রকলার সহিত অজন্তার সাদৃশ্য প্রচুর। এসব জায়গায় অজন্তার প্রাচীন পদ্ধতিই ক্রমিক ভাবে অনুসৃত হয়েছে। সম্প্রতি ইতালীয় অধ্যাপক Giuseppe Tucci তিব্বতের Tabo ও Tsaparang অঞ্চলে ভারতীয় চিত্রকলার আশ্চর্য্য নমুনা দেখতে পেয়েছেন। * এসব চিত্রকলার আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ অপূর্ব্ব ব্যাপার।

চৈনিক সাম্রাজ্যে তুনহুয়াঙে যে সহস্রবুদ্ধ গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও ভারতীয় চিত্রাদর্শ অক্ষতভাবে আছে। যদিও নানাদিকের মণ্ডণ ও সজ্জায় চৈনিক প্রথা বর্জ্জিত হয় নি তবুও মূল দেবমূর্ত্তি ও ধারায় ভারতীয় আদর্শ অক্ষত আছে।

ব্রহ্মদেশের চিত্রকলাতেও অজন্তার গভীর আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যের পদাঙ্ক অনুসৃত হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার হিল্লোলিত রেখাজালে জগতের দুরূহতম তত্ত্ব ও উচ্চতম অতিমানব ও দেববিভূতি ধরা পড়েছে সুনিপুণ ভাবে। জগতের আর কোনও চিত্রবিদ্যা দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতি সীমাহীন কল্পনার মর্য্যাদা রক্ষা করে সে সব তুরীয় আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে নি।

এ সমস্তের এক একটী কল্পনার বহু স্তর আছে। অতি নিখুঁতভাবে এ সমস্ত স্তরকে চিত্রিত করেছে ভারতীয় চিত্রশিল্প। এজন্য সকল দেশের রূপকল্পনা ও রূপায়তনে

পদ্মনারথায় চিত্র (সখি পরিবেষ্টিত মহারাণী)

ভারতীয় আদর্শের স্থান ছিল। সম্প্রতি ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত পুঁথি ব্রহ্মযামল তন্ত্র পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পুঁথি দেব কল্পনার ভিতরই তিনটী স্তর উল্লেখ করেছে। এই তিনটী স্তর হচ্ছে (১) দিব্যাধিক, (২) দিব্য, (৩) দিব্যাদিব্য। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, মাইনিনীয়, গ্রীক প্রভৃতি কোন সভ্যতা এরূপ দিব্যস্তরের কোন সূক্ষ্মতর সীমানার সন্ধান দিতে পারে নি।

আবার তুরীয় স্তর ছেড়ে ঐহিক স্তরেও সূক্ষ্ম পরিবেশনের সীমা নেই। বুদ্ধ চিত্র বা মূর্ত্তি অঙ্কনে নানা জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন উঠেছে। বুদ্ধ মানুষ না দেবতা? এ বিচার না হ'লে বুদ্ধকে চিত্র বা মূর্ত্তিতে ফলিত করা অসম্ভব। লোকোত্তর-

* New Asia. Vol. I No. 1. p. 12.

বাদীদের মতে বুদ্ধ মানবও নয়, দেবতাও নয়। মধ্যমিকামঞ্জিকাচক্র বুদ্ধকে অতিমানবরূপেই কল্পনা করেছে। মজ্ঝিমানিকায় (৩।১১৮) ও দিঘনিকায়ে (২।১২) বুদ্ধের জন্ম প্রসঙ্গ আছে। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে বুদ্ধের তুরীয়রূপ, আদিবুদ্ধরূপ কল্পিত হয়েছে। অথচ বৌদ্ধ হীনযানের অনাত্মবাদ এর বিপরীত পথেই অগ্রসর হয়েছে। অজন্তায় যেমন বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে পরমকরুণাময়রূপে, তেমনি অন্যত্রও বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের অসংখ্য মূর্ত্তি আছে।

বৃহত্তর ভারতের চিত্রকলায় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য ও অনুপম প্রকাশভঙ্গী অতি চমৎকারভাবে অনুসৃত হয়েছে, মনে হয় যেন এ সব দেশও ভারতের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভূত। ব্রহ্মদেশেও অপ্রত্যাশিতভাবে যে সব চিত্রপর্য্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সৌকুমার্য্য, স্বচ্ছতা ও সহজ আবেশ সহসা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। মিন্‌পাগানে অবেয়দান মন্দিরের প্রাচীরচিত্রে আছে এক চিত্রপদ্ধতির ইন্দ্রজাল। তা' যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অজন্তার সহিত সমান ধর্ম্ম রক্ষা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাক্‌ভারতীয় বাস্তববাদের সহিতও তাহার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি। বোধিসত্ত্ব লোকনাথের এই ব্রহ্মদেশীয় মূর্ত্তি সমসাময়িক আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করেছে। এক সময় এ সব মূর্ত্তিই ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের ভ্রাতৃত্বের সেতুস্বরূপ ছিল।

ইন্দো-চীনের ব্রহ্মামূর্ত্তি ও যবদ্বীপের শ্রীদুর্গা মূর্ত্তি ভারতের অতি গভীরতর আত্মীয়তায় এ দু'টি দেশকে আবদ্ধ করেছে। অন্ততঃ এ দু'টি দেশে চিত্রকলায় প্রমাণ পাওয়া না গেলেও মূর্ত্তিকলার অভ্রান্ত পর্য্যায় একটি বিস্ময়ের ব্যাপার।

লঙ্কাদ্বীপের সহিতও ভারতের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। এখানকার মূর্ত্তিকলার গৌরব ভারতের যশোমাল্য আহরণ করেছে। চিত্রকলায় শ্রীগুহের অতুলনীয় রচনা এখনও নিষ্কম্পদীপের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত আছে মনে হয়। এ সবও ষষ্ঠশতাব্দীর রচনা। পল্লুনারুবার চিত্রকলার মাদকতা এ যুগেও প্রত্যাখ্যান করা যায়। প্রকাশভঙ্গীর অভিনব ও
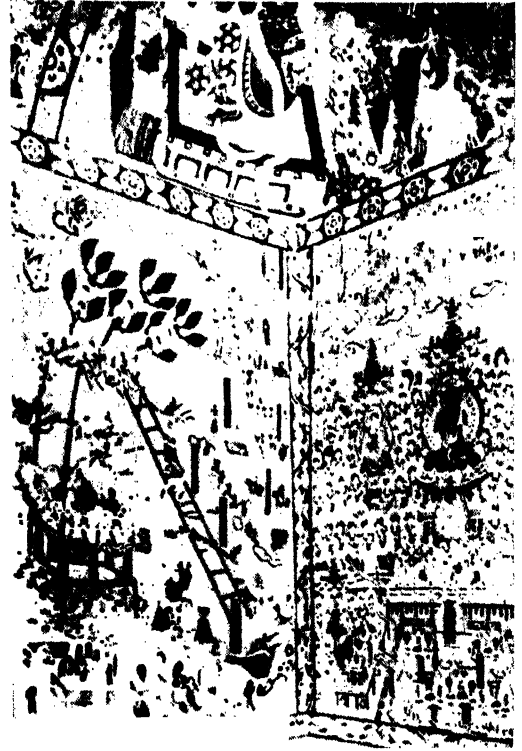
ঝটিকা (সহস্র বুদ্ধগুহার চিত্র)

বিচিত্র প্রাচুর্য্য এ-সব রচনাকে অমরত্বের দিব্যশ্রীতে মণ্ডিত করেছে। ভারতের রূপ-বিদ্যা এমনি করে সঞ্চারিণী দীপশিখার মত এসিয়ার সর্ব্বত্র আলোকপাত করে ধন্য হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস

শ্রীনৃপেন্দ্র মোহন সাহা, এম্-এস্-সি

সৌর-জগৎ ও পৃথিবীর উৎপত্তি

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" কবির এই গান বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রকৃতই আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই পৃথিবী কত সুন্দর! ইহার কোথাও ফল-পুষ্প সুশোভিত দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল বনানী আবার কোথাও অগ্নুত্তপ্ত বালুকণার বিরাট মরুভূমি। কোথাও ইহার অভ্রভেদী গগনচুম্বী পর্ব্বতশ্রেণী আবার কোথাও অতলস্পর্শী মহাসমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাস।

এই শস্যশ্যামলা পুষ্পোজ্জ্বলা ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য একদিকে কবির মনকে যেমন বিমোহিত করিয়া তোলে, অপরদিকে ইহার উৎপত্তির জটীলতা বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে করিয়া তোলে বিমূঢ়! আমরা জানি আমাদের পৃথিবী একটী গ্রহ। পৃথিবী এবং আরও কয়েকটী গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট পথে অবিশ্রাম ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। গ্রহগুলির চারিদিকে ঘুড়িতেছে তাহাদের উপগ্রহ। এই সমস্ত ঘূর্ণায়মান গ্রহ এবং উপগ্রহাদি লইয়াই সূর্য্যের পরিবার। এই পরিবারকেই আমরা বলিয়া থাকি সৌর-জগৎ। কিন্তু কেমন করিয়া কবে যে এই জগৎ উৎপন্ন হইল তাঁহা আজও নিশ্চিতরূপে স্থির করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু কল্পনার বিরাম নাই। যুগে যুগে মনিষীগণ তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী বিভিন্নরূপে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আমাদের ধারণা ছিল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই একদিন একই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। বহু বহু কাল পূর্ব্বে কোন এক গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে অলস নিদ্রার পর ভগবান স্বয়ং তাঁহার এক উদ্ভট খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া মহাশূন্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবলমাত্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী নহে তাহার মধ্যস্থ সজীব নির্জীব যাবতীয় পদার্থ যাহা কিছু এখন আছে এবং পূর্ব্বে ছিল সমস্তই তৈয়ার করিয়া একেবারে পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর বক্ষে মানুষ, পশু, পাখী পাহাড়-পর্ব্বত নদ-নদী যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছিল, জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে। আদিকালের সৃষ্ট সেই জীব-জগৎ জন্মমৃত্যুর ঘোর পাক খাইতে খাইতে এখন পর্য্যন্তও অবিকৃত অবস্থায় টিঁকিয়া রহিয়াছে, তাহার না হইয়াছে কোন পরিবর্ত্তন, না হইয়াছে কোন উৎকর্ষ সাধন।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞান সুসংস্কার বা কুসংস্কার কোন প্রকার সংস্কারকেই প্রশ্রয় দেয় না। নিজের অপ্রমত্ত চিন্তাধারার কষ্টিপাথরে গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা যাচাই না করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কোন তথ্যই মানিয়া ল'ন না। তাই সহস্র বৎসরাধিক প্রচলিত জগৎসৃষ্টির এই সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ আজ এই বৈজ্ঞানিক যুগে সম্পূর্ণ অচল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নির্ভুলভাবে স্থির করিয়াছেন যে, জীব-জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ক্রম পরিবর্ত্তনের ফলে জীবগণ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছে। আরও বহুবিধ কারণে জগৎ সৃষ্টির এই সুপ্রাচীন মতবাদ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নূতন করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত। ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের চিন্তাধারার বশবর্ত্তী হইয়া জগৎসৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিকল্পনা অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হইলেও অন্ততঃ এক বিষয়ে একমত। বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই মানিয়া লইয়াছেন যে, এই গোটা সৌর-জগৎটাই উৎপন্ন হইয়াছে একটী মাত্র নীহারিকা হইতে। এখনও রাত্রিকালে নির্মেঘ আকাশে যন্ত্র সাহায্যে লক্ষ্য করিলে নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে বহুস্থানে উজ্জ্বল একপ্রকার হাল্কা মেঘের মতন পদার্থ দেখা যায়, উহারাই নীহারিকা। নীহারিকা অত্যুত্তপ্ত বাষ্পীভূত বহুবিধ অজৈব মৌলিক উপাদানে গঠিত। ইহারা স্বচ্ছ। ইহাদের মধ্য দিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী উজ্জ্বল নক্ষত্র সমূহ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী নীহারিকা হইতে এক একটী সৌর-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সৌর-জগতের সূর্য্য সমূহই রাত্রিকালে নক্ষত্ররূপে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অদ্যাবধি অনেক নীহারিকা বারিধীর অবস্থায়ই

রহিয়াছে। তাহা হইতে নূতন নূতন সৌর-জগৎ ক্রমাগত সৃষ্ট হইতেছে।

আমাদের সৌর-জগৎ এবং পৃথিবীও এইরূপ একটী নীহারিকা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সেই নীহারিকাটী কোথা হইতে কেমন করিয়া মহাশূন্যে আবির্ভূত হইল তাহা আজিও অজ্ঞাত। এই প্রশ্নে পণ্ডিতগণ আজও নিরুত্তর। এই স্থানেই আসিয়াই তাঁহাদের চিন্তাধারা ব্যাহত হয়, কল্পনা পঙ্গু হইয়া পরে, পরীক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। মহাশূন্যে নীহারিকার উপস্থিতি ধরিয়া লইয়াই পণ্ডিতগণের কল্পনার জাল রচিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত তাঁহাদের কল্পনা অনুযায়ী জগৎসৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ সমূহের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স্‌ জিন্সের 'জোয়ারী' মতবাদ সবিশেষ নির্ভরযোগ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী—বহু বহু কাল পূর্ব্বে—এখন হইতে কয়েক সহস্রকোটী বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের সৌর-জগতের জনক নীহারিকাটী অন্যান্য নীহারিকার প্রবল আকর্ষণের ফলে মহাশূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই ভ্রমণ পথে দৈবাৎ ইহা অপর একটী ভ্রাম্যমান বিরাট নীহারিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া পরে। আগন্তুক নীহারিকার প্রবল আকর্ষণে আমাদের নীহারিকা হইতে একটী অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার দিকে ছুটিতে থাকে। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত অংশ তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভ্রাম্যমাম নীহারিকাটী মহাশূন্যে অন্তর্ধান করে। ফলে বিক্ষিপ্ত অংশটী তাহার জনক নীহারিকার আকর্ষণে পরিয়া তাহাকেই প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকে।

প্রথমাবস্থায় নীহারিকা এবং তাহার বিক্ষিপ্ত অংশ উভয়েই অতিশয় উত্তপ্ত এবং বায়বীয় অবস্থায় ছিল। কিন্তু মহাশূন্যে ভ্রমণকালে তাহারা অনবরত তাপ বিকিরণ করিতে থাকে। উত্তপ্ত দেহ হইতে তাপ বিকিরণের ফলে তাহা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কোচিত হয়। ভ্রমণকালে তাপ বিকিরণের ফলে নীহারিকা এবং তাহার বিক্ষিপ্ত অংশ উভয়েই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কোচিত হইতে থাকে। বিক্ষিপ্ত অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া তাহা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হয় এবং সঙ্কোচিত হইয়া একটী পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এই পিণ্ডটীও পুনরায় দুইটী বিভিন্ন নীহারিকার বিপরীত আকর্ষণের ফলে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে চূর্ণিকৃত অংশগুলিও মহাশূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পূর্ব্বের ন্যায় জনক নীহারিকাকে আবর্ত্তন করিয়া ফিরিতে থাকে। মহাশূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই চূর্ণসমূহই "উল্কা" বলিয়া এখন পরিচিত। অনেক সময় নানাবিধ অজ্ঞাত কারণে এই সমস্ত ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ডের বহুসংখ্যক একস্থানে আসিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে পরস্পর প্রবল ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হইয়া থকে। এই তাপে উল্কাপিণ্ডগুলি গলিয়া বাষ্প হইয়া পুনরায় একত্রীভূত হয়। এইরূপে এক সময় একত্রীভূত উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিই এক একটী গ্রহ এবং জনক নীহারিক আমাদের বর্ত্তমান সূর্য্য।

নবজাত, অত্যুত্তপ্ত, বাষ্পীভূত গ্রহ-পিণ্ডও সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণকালে অনবরত তাপ বিকিরণ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময় নিকেল, লৌহ প্রভৃতি উল্কাবক্ষের গুরু পদার্থসমূহ সঞ্চিত হয় গ্রহ-পিণ্ডের কেন্দ্রের দিকে এবং অন্যান্য হাল্কা উপাদানসমূহ ফেনার ন্যায় উপরে ভাসিতে থাকে। উল্কাবক্ষের অন্যান্য বায়বীয় উপাদান এবং বাষ্পীভূত জলীয় অংশসমূহ তাহার উপর সঞ্চিত হয়। এইরূপে সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডল। তখনকার দিনে, এখন হইতে কয়েক সহস্র কোটী বৎসর পূর্ব্বে, ইহাই ছিল আমাদের গ্রহ পৃথিবীরও অবস্থা। কোথাও না ছিল একটু জল, না ছিল কোন স্থল, না ছিল কোন আশ্রয়। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপীয়া ছিল অত্যুত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ, ফুটন্ত তরল পদার্থের এক মহাসমুদ্র, কোন প্রকার প্রাণীর বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু ধরিত্রীর কর্ম্মশক্তি অসীম। কিছুতেই সে নিরোৎসাহ হয় না। অনবরত অপ্রতিহত ভাবে তাপ বিকিরণ করিতে থাকে। ফলে ইহার উপরের স্তর ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া শক্ত হয় এবং সঙ্কোচনের ফলে বন্ধুর হইয়া উঠে। এইরূপে কোথাও উৎপন্ন হয় অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী এবং কোথাও উৎপন্ন হয় গভীর গহ্বর। ইতিমধ্যে বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশ ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া সৃষ্টি করে মেঘ এবং বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকে ভিজাইয়া ভাসাইয়া সঞ্চিত হয় সেই গহ্বরসমূহে। এইরূপে সৃষ্টি হয় মহাসমুদ্রের। এই বৃষ্টি দুই একদিন বা দুই এক মাস ব্যাপী হয় নাই—শত সহস্র বৎসর ব্যাপী অবিশ্রাম এই বর্ষণ হইতে থাকে। বৃষ্টির-জলে মিশ্রিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদান নামিয়া আসে পৃথিবীবক্ষে এবং সেখানে অন্যান্য উপাদানের সহিত রাসায়নিক সংযোগের ফলে গঠন করে, কোমল ভূত্বক—মাটী। অনাগত জীব-জগতের আশ্রয়স্থল—ভবিষ্যৎ প্রাণস্পন্দনের পাদপীঠ।

দুলারী

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, ব্যারিষ্টার, এট্-ল

সখি, সখি, চেয়ে দেখ হৈমকান্তি কন্দর্প জিনিয়া
বরতনু শ্রুতিমূলে সচন্দন কুসুম মঞ্জরী।
শুভ্র উপবীত গলে, সদ্যস্নাত মহানন্দা নীরে,
অন্য মনে বেদমন্ত্র উচ্চারি চলেছে গৃহপানে
আলো করি প্রত্যুষের নগন্ন ধূসর পথখানি।

সখি, আমি রাজার দুলালী, দুলারী আমার নাম
কহ সখি, কেন মোর মর্ম্ম মাঝে তৃণাঙ্কুর সম
অনুরাগ উপজিল, কেন মন হেন উচাটন?
এত বলি নীরবিলা ধনি। সহসা থামিল যেন
বসন্তের কলকণ্ঠ পিক। উত্তরে কহিলা সাখী,
জান না দুলারী, ও যে কালাচাঁদ অকলঙ্ক শশী;
বাল্যাবধি নিষ্ঠাবান্ অতি ধর্ম্মভীরু। পিতৃহারা,
চিরদিন মাতৃভক্ত। অস্ত্র বিদ্যা করায়াত্ত করি'
উন্নীত সমৃদ্ধ পদে। অবগাহি' মহানন্দা নীরে
চলিয়াছে গৃহপানে, ক্ষৌমবাস পরি, নগ্নপায়।
কেন সখি রাজার দুলালী, তনু যার সুকুমার
অধরের কোণে যার কুসুমবিলাস, বরাননে
নতব্রীড়া, বুকে মধু অন্তরে অমৃত, শত শত
রাজপুত্র যার লাগি লালায়িত, অয়ি সপ্তদশী,
ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মণের লাগি চঞ্চলতা, কেন প্রশ্ন,
কেন তৃষ্ণাতুর? অধরে ধরিয়া হাসি, অগ্নিবাণ
কটাক্ষে হানিয়া, মুগ্ধ কর দগ্ধ কর পুরুষেরে।

নহে সখি নহে, স্বাতিনক্ষত্রের বারিকণা নিত্য
শুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিছে, নদীতীরে অগাধ সলিলে
আকণ্ঠ ডুবায়ে দেহ ঊর্দ্ধে চাহি যাচিছে চাতক
মেঘবারি। আমি ক্ষুদ্র নারী, কেমনে জানি না, হিয়া
আর মোর হিয়া নহে। অতনুর কুসুমশায়কে
রক্তসিক্ত। আমারে আনিয়া দেহ আকাশের চাঁদ,
এত বলি' শিশু যথা বাড়ায় দুবাহু, চিত্ত মোর
শত বাহু বাড়াইছে কালাচাঁদ চাঁদ অভিলাষে।

ব্যর্থ মনোরথ ফিরে এল দূতী, শিরে বহি' বহু
অপমান। গোপন লিপিকা অনুত্তরে উপহাস
করে। ব্যর্থ হল তামসী নিশীথ অভিসার—ব্যর্থ
ব্যর্থ রাজার দুলালী, দুলারী ঢাকিল ম্লানমুখ।

নহে নহে, কহে কালাচাঁদ, আমার আজন্ম শিক্ষা
হিন্দুধর্ম্ম, পিতৃগৃহ ছাড়ি' চাহি না নবাবজাদী।
বিষফণা বিস্তারিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল রাজরোষ,
ক্রূর সর্প সম। জল্লাদ, ডাকিল নৃপ, কল্য প্রাতে
বধ্যভূমে মশান প্রাঙ্গণে অগণ্য জনতা মাঝে
শূলে বিদ্ধ করি দেহ, সমুচিত শিক্ষা দেবে এরে।

না জাগিতে বিহঙ্গ কাকলী লোকে লোকারণ্য
বধ্যভূমি। কেহ কহে, এ কৌতুক দেখিনি জীবনে কভু,
জীবন্ত মানবে শূলে কেমনে বিঁধিবে? কেহ কহে,
শূলে নহে, তপ্ত শূলে! রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহের
সূচাগ্রে সুদূর ঊর্দ্ধে তিলে তিলে বীভৎস মরণ!

প্রস্তুত, কহিল বিপ্র। শুধু মাতৃনাম উচ্চারিল
সঙ্গোপনে—ভীত নরনারী মুদিল নয়ন ত্রাসে।
কৃতান্ত সদৃশ কৃষ্ণ জল্লাদ বিপুল বাহুবলে
আচ্ছন্ন পাষাণ-মূর্ত্তি কালাচাঁদে টানিল নিকটে।

হেনকালে কোথা হতে উন্মাদিনী কে এল রে ধেয়ে
রূপ লাবণ্যের খনি, এলোকেশী, লুণ্ঠিত বসনপ্রান্তা,
অশ্রুসিক্ত কমল নয়না, রমণী ললামভূতা,
রূপসী কাঁদিয়া কহে, ভূতলে শশাঙ্ক যেন পড়ি!
রে জল্লাদ, হত্যা! মোরে হত্যা কর আগে, আমার এ
যৌবনের কোন প্রয়োজন, যদি নাহি লভিলাম
পরাণবল্লভে? প্রেম শূন্য এ বিশ্বসংসার তুচ্ছ!
মিথ্যা করিয়াছি ধ্যান সুদীর্ঘ রজনী, গৃহে
সখিজন পাশে উপহাসাস্পদা, পিতামাতা হেরি'
সরোষে ফিরায়ে মুখ চলি যায় আরক্ত নয়নে।
অগ্রে মোরে, এই সপ্তদশ বসন্তের মালিকারে,
খণ্ড খণ্ড করি ধূলায় বিলীন কর, তার পর
দয়িতেরে যাহা ইচ্ছা করিও—পালিও রাজাদেশ।

বিপ্র ধীরে কুমারীর করপদ্ম লইয়া যতনে
কহিল, দুলারী, প্রিয়ে, নহি আর ব্রাহ্মণ সন্তান,
তোমার অনন্ত প্রেম, আত্মদান, এরে ছাড়ি আমি
চাহি না রহিতে ক্ষুদ্র ধর্ম্মের বন্ধনে। অনুরাগে
রোমাঞ্চিতা, বাণীহারা—অশ্রুসিক্ত নয়ন তুলিয়া
ঊর্দ্ধে হেরিলা বাঞ্ছিতে—ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখী সম।

আয়র্ল্যাণ্ড

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আইরিশরা আপনাদের জন্মভূমিকে অতিশয় আবেগ, আগ্রহ ও আদরের সহিত "আয়ার" আখ্যায় অভিহিত করে কিন্তু এই দ্বৈপায়ন দেশ ইংরেজদিগের দ্বারা আয়র্ল্যাণ্ড আখ্যায় অভিহিত। কল্পনাকুশলী কবিকুলকর্তৃক এই বারিধি বেষ্টিত রাষ্ট্র "এমারেল্ড আইল" বা মরকত দ্বীপ আখ্যাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাব্যে ও গাথায় "এরিণ" নামেরও ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, এই দেশকে এমারেল্ড-আইল বা মরকত-দ্বীপ বলা হয় কেন? মরকত মণির মত শ্যামসুন্দর একপ্রকার শস্প বা তৃণ এই দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলিয়াই ইহা মরকত-দ্বীপ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সবুজকেই এই শস্প-শ্যাম দেশের জাতীয় বর্ণের গৌরবাসন দেওয়া হইয়াছে। এই দেশের জাতীয় চিহ্নও সবুজ। শ্যামরক নামক এক প্রকার শ্যামল উদ্ভিদকে জাতীয় চিহ্নরূপে ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ বোতামের ছিদ্রের মধ্যে ইহাদিগকে সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। শ্যামরকের প্রত্যেক পত্র ত্রিধা বিভক্ত বলিয়া ইহাকে ট্রিনিটি বা খ্রীষ্টীয় ত্রি-শক্তির (ঈশ্বর, ঈশ্বর-পুত্র ইশা এবং হোলি গোষ্ট বা পবিত্রাত্মা) নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়। আইরিশদিগকে এই ত্রি-শক্তির বিশেষ ভক্ত বলা চলে।

এই দ্বীপ ইংলণ্ডের পশ্চিমে বিরাজিত। দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানকে ডোভার ও ক্যালের ব্যবধানের সহিত তুলনা করা চলে। আয়র্ল্যাণ্ডের আয়তন ৩২ হাজার ৫ শত ৮৬ বর্গ মাইল। এই দেশ দৈর্ঘ্যে ২ শত ৮০ মাইল এবং প্রস্থে ১ শত ৬০ মাইল হইবে। স্কটল্যাণ্ড অপেক্ষা ইহা কিছু বৃহত্তর। ইহা চারিটি প্রদেশে বিভক্ত—(উত্তরস্থ) আলষ্টার, (পূর্ব্বস্থ) লীনষ্টার, (পশ্চিমস্থ) কোনট এবং (দক্ষিণস্থ) মুনষ্টার। এই চারিটি প্রদেশকে ৩২টি কাউণ্টি বা জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই স্থানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড বা আলষ্টার নব-গঠিত আইরিশ গণতন্ত্রের অন্তর্গত নহে, উহা স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজ্য।

আয়র্ল্যাণ্ডকে কেল্টিক সভ্যতার লীলা-স্থলী বলা চলে। ইহার অতি প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কেল্টিক দেব-বাদের এবং সেই দেব-বাদ সম্পর্কীয় বিচিত্র কথা ও কাহিনী সমূহের বিশেষ সম্পর্ক আছে। অবশ্য কেল্টিক জাতির জন্মস্থান আয়র্ল্যাণ্ড নহে। আল্পস্ পর্ব্বতিপুঞ্জের উত্তরস্থিত অংশ-বিশেষকে কেল্টিক জাতির উদ্ভব-ভূমি বলিয়া মনে করা হয়। পরে তাহারা ব্রোঞ্জযুগে গল্ বা ফ্রান্সে আসিয়া বাস করে
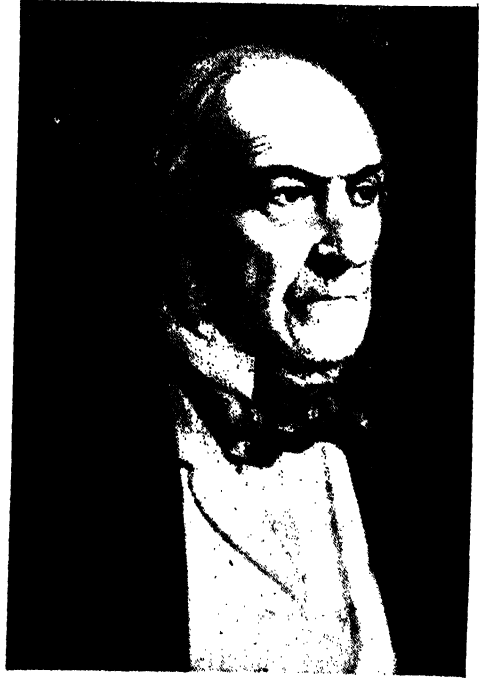
গ্ল্যাডষ্টোন

এবং তথা হইতে নানা দেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী বৃটনরাও কেল্টিক ছিল। বৃটেনের মধ্যে ওয়েলশ ও স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারদিগের দেহে কেল্টিক-রক্ত এখনও প্রবাহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। গল্ হইতে কেল্টিক সম্প্রদায় বিশেষ আয়ারে আসিয়া বাস করিবার পর তথায় একটি বিশিষ্ট কৃষ্টি ও দেব-বাদ সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীন বৃটেনের দেব-বাদ অধিকতর বিস্তৃত ও বিচিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে উভয় দেশেই

দেব-বাদ প্রতিষ্ঠিত থাকার কালে "ড্রুইদ" আখ্যাধারী পুরোহিতদিগের প্রবল প্রভাব প্রসারিত ছিল।•

আয়র্ল্যাণ্ডে কেল্টিক দেব-বাদের কেন্দ্র ছিল তারা নামক নগরী। তারা নামটিতে আমাদের মনে নানা প্রকার বিচিত্র কল্পনা বা অনুমান জাগাইয়া তুলা অসম্ভব নহে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও এই নামটির মধ্যে ভারতীয় প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। দূর আটলান্টিক বক্ষে বিরাজিত দ্বৈপায়ন দেশের ধর্ম্ম-বাণী কেল্টিক কৃষ্টি কেন্দ্র তারা নগরীর সহিত আমাদের দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা তারাদেবীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা নির্ণয় করা অবশ্য সহজ নহে। এক সময় মধ্য আমেরিকায় "মায়া" নামক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় ভাষার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এই মায়া শব্দটিও পুরাতত্ত্ববেত্তাদের মনে নানা প্রকার জিজ্ঞাসা জাগ্রত করিয়াছে।

তারা শুধু যে, আইরিশ দেব-বাদের কেন্দ্র ছিল তাহা নহে, প্রাচীনকালে উহাই আয়ারের রাজধানী ছিল। তখন এই দেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত রহিলেও এক একজন রাজা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া অন্যান্য রাজগণের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইতেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে কর্ম্যাক্-ম্যাক্-এয়ার্ট নামক নৃপতি "আর্দ্দ-রী" বা রাজ-চক্রবর্ত্তী রূপে বিশেষ প্রভাব প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারা নগরীই এই প্রবলপরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। প্রায় সকল আর্দ্দ-রীই তারাকে কেন্দ্র করিয়া রাজত্ব করিতেন। তারায় বিরাজিত আর্দ্দ-রীর দরবার কমনীয় কণ্ঠ কবিকুল ও চারণগণের গীতি ও গাথায় মুখরিত রহিত। কেল্টিক দেব-দেবী ও বীরবর্গের কীর্ত্তি-কাহিনী হইতে বহু বিচিত্র গীতি ও গাথা জন্ম লাভ করিয়াছে। যখন চারণগণ বীণা বাদন পূর্ব্বক অতীতের বিচিত্র চরিত্র বীরবর্গের যশোগাথা গাহিতেন তখন সকলে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিত। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-কেন্দ্র ও রাজধানী সেই ঐশ্বর্য্যশালী তারার গৌরব-গরিমার শেষ নিদর্শনটুকুও অদৃশ্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটী তৃণাচ্ছাদিত স্তূপ ব্যতিরেকে অতীতের কোন অবশেষ এই স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেখানে প্রবল পরাক্রান্ত আর্দ্দ-রীর দরবার ছিল সেখানে একখানি ক্ষুদ্র শিলাও অতীত গৌরবের সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া নাই। কেল্টিক কৃষ্টির কেন্দ্র স্বরূপ যে স্থানে প্রবল প্রভাবশালী ড্রুইদদিগের পৌরহিত্যে দেব-বাদ সম্পর্কীয় নানা প্রকার বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদিত হইত, নানা প্রকার মন্ত্র-তন্ত্র উচ্চারিত হইত সেখানে আজ সেই সকল ব্যাপারের নিদর্শন রূপে কিছুই দেখা যায় না।

তারা হইতে দেব-বাদের নিদর্শনগুলি নিঃশেষে অদৃশ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। এই সকল কারণের অন্যতম আয়র্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রবল প্রচার। খ্রীষ্টীয় মতবাদ বৃটেনে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এই দেশে প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার মূলে আইরিশ প্রচারক দিগের প্রচেষ্টাও বিদ্যমান ছিল এই সত্যে সন্দেহ নাই। আইরিশ জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহারা অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। যেমন দেব-বাদের বিচিত্র পরিণতির মূলে এই প্রবল ভাবাবেগের প্রভাব রহিয়াছে তেমনই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে আবেগ বশে দেব বাদ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় মতবাদ গ্রহণ করিতেও ইহাদের পক্ষে বিলম্ব ঘটে নাই। যাঁহারা আয়র্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন তাঁহাদের মধ্যে সেণ্ট প্যাট্রিকের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি পরে এই দেশের পরম পূজনীয় পৃষ্ঠপোষক মহাপুরুষে পরিণতি পাইয়াছেন। নানা প্রকার অদ্ভুত কিম্বদন্তী ইঁহার সম্বন্ধে প্রচারিত রহিয়াছে। অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের সাহায্যে ইনি প্রাচীন দেব-বাদকে ধ্বংস করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের বক্ষে খ্রীষ্টীয় মতবাদের যে বীজ বপন করেন তাহা পরে বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়।

সেণ্ট প্যাট্রিকের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচারিত রহিয়াছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তিনি বৃটেনের উত্তরাংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে স্কটল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। কেহ কেহ মনে করেন, রোম্যান-দিগের নির্ম্মিত প্রাচীন প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিক্টস্ এবং স্কটস্ আখ্যায় অভিহিত উত্তরস্থ দুর্দ্দান্ত জাতিদ্বয়ের অত্যাচার হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার উত্তরে রোম্যান সম্রাট হাড্রিয়ানের আদেশে এই প্রাচীর প্রস্তুত করা হয়। স্কটস্‌রা আদিতে আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তথা হইতে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বৃটেনের উত্তরাংশে আসিয়া বাস করিলে তাহাদিগের বাসস্থান

বলিয়া ঐ প্রদেশ স্কটল্যাণ্ড নাম প্রাপ্ত হয়। ৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট প্যাট্রিক জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর তখন দুর্দ্দান্ত পিক্টস ও স্কটসগণ ঐ প্রদেশে আসিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা বালক প্যাট্রিককে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তিনি তাহাদিগের দ্বারা ক্রীতদাসরূপ আয়র্ল্যাণ্ড বা আলষ্টারে অবস্থিত এণ্ট্রিম নামক স্থানে গিরিশ্রেণীর মধ্যে নীত হন। তথায় তাঁহার প্রভু তাঁহাকে মেষপাল চরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়সে তিনি সুযোগ পাইয়া গলদেশে অর্থাৎ ফ্রান্সে পলাইয়া যান। তখন গল্ রোম্যান প্রভাব সম্ভূত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। রোম্যান প্রধান্যের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মও তথায় প্রচারিত হইয়াছিল। প্যাট্রিক গলে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবার পর পোপ প্রথম সেলেশটিয়ান এবং গলের খ্রীষ্টীয় আচার্য্যগণ তাঁহাকে বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রচারকরূপে আয়র্ল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দেন। সেন্ট প্যাট্রিক আয়র্ল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজধানী ও আইরিশ দেব-বাদের কেন্দ্রস্থল তারা নগরীতে আসিয়া তদানীন্তন আর্দ্ধ-রী বা রাজচক্রবর্ত্তীর দরবারে খ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রচার করেন। ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করিয়া তিনি আইরিশ জাতির ভাবপ্রবণ অন্তরে প্রবল প্রভাব প্রসারিত করিতে সমর্থ হন। সেন্টপ্যাট্রিকের প্রচার ও প্রচেষ্টা কেল্টিক দেব-বাদের ধ্বংসাবশেষের উপর খ্রীষ্টীয় চার্চ্চের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠে। সুতরাং আয়র্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে, অথচ ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার লাভ করে। রোম হইতে প্রেরিত সেন্ট আসাষ্টাইন দক্ষিণ ইংলণ্ডকে দীক্ষা দান করেন এবং আয়োনা দ্বীপ হইতে আগত আইরিশ প্রচারকরা উত্তর ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করে। গ্রেটবৃটেন বা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দেব-বাদের বা ড্রুইদদিগের দুর্গ স্বরূপ তারাতেই খ্রীষ্টের বাণী সেন্ট প্যাট্রিক কর্ত্তৃক প্রথম উচ্চারিত হয়। আধুনিক রাজধানী ডাবলিনের অনতিদূরে বর্ত্তমান মীথ নামক কাউন্টিতে এবং বয়িন নদের তটদেশে তারা নগরী বিরাজিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

যে দ্বৈপায়ন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া কেল্টিক দেব-বাদ সম্পর্কীয় কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল এবং যাহা হইতে বহু বিচিত্র পৌরাণিক কথা ও কাহিনী জন্মলাভ করিয়াছে তাহা খ্রীষ্টীয় কৃষ্টি বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির লীলাস্থল হইয়া বিস্ময়কর পরিণতি বা পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা বিঘোষিত করিল সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘকালের সংস্কার সহজে যাইবার নহে সুতরাং দেব-বাদ সম্পর্কীয় বহু বিচিত্র বিশ্বাস খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত হইয়া এই দেশে একটি বিশিষ্ট খ্রীষ্টীয় মতবাদ সৃষ্টি করিল বলিলে ভুল হয় না। খ্রীষ্টান হইলেও আইরিশ জাতির মধ্যে আজিও নানা প্রকার সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত এই দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কীয় বহু প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গির্জ্জা, মঠ এবং শিক্ষানিকেতন গড়িয়া উঠিল। নবম শতক হইতে

এনি বেসান্ত

এক অভিনব বিপদ দেখা দিল। উত্তর হইতে নৌ-যুদ্ধ নিপুণ নর্স জাতি এবং দুর্দ্দমনীয় দিনেমারগণ আগমন করিয়া আইরিশদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। নর্সরা স্কটল্যাণ্ডে এবং দিনেমাররা ইংলণ্ডেও অত্যাচার করিয়াছিল। অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত স্কান্দিনেভিয়ান জাতিদ্বয় আয়র্ল্যাণ্ডের খ্রীষ্টীয় আশ্রমগুলিকে এবং শিক্ষামন্দিরসমূহকে পোড়াইয়া ফেলিল। বহু মূল্যবান গ্রন্থ পুড়িয়া ছাই হইল। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ এবং বিদ্যামন্দিরবাসী অধ্যাপক, শিক্ষার্থিগণ পলায়ন করিল।

দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের বক্ষে স্কান্দিনেভিয়ানদিগের অত্যাচার বার বার চলিবার পর ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত এমন একজন বীরের

আবির্ভাব ঘটিল যিনি অত্যাচারীদিগের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া অবশেষে তাহাদিগের দুর্ব্বার গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। এই বীরের নাম ব্রায়ান বোরু। ইনি ৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আর্দ্ধ-রী বা রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হন। তারা এবং ক্যাসেল এই দুই নগর তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত ক্লনতার্কের যুদ্ধে ইনি নিহত হন বটে কিন্তু ঐ যুদ্ধের ফলে স্কান্দিনেভিয়ানদিগের অত্যাচারের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় হেনরীর সময় হইতে আয়র্ল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক আরম্ভ হয়। তখন ডায়ারমিড লীনষ্টারের রাজা ছিলেন। তদানীন্তন আর্দ্ধ-রীর সহিত ইঁহার সম্প্রীতি ছিল না। সম্ভবতঃ ইনি আর্দ্ধ-রীর দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই ইংলণ্ডাধিপতির সহায়তা প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় হেনরীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রেমব্রোকের তৎকালীন আর্ল ষ্ট্রংবো ডায়ারমিডকে সাহায্য করিবার জন্য বাহিনী সহ আয়ার্ল্যাণ্ডে আগমন করেন। ইনি অবশেষে ডায়ারমিডের কন্যা ইভাকে বিবাহ করিয়া এই দেশেই বাস করেন। দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় হেনরী নিজেই আয়ারে আসিয়া আইরিশ নৃপগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এইরূপে উভয় দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রবর্ত্তিত হয় তাহার মধ্যে প্রথম হইতেই প্রীতির অভাব ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। সে যাহা হউক, দ্বিতীয় হেনরীর সময় আয়র্ল্যাণ্ড অংশতঃ ইংলণ্ডের অধীন হইয়া পড়ে। ইঁহার সময় হইতে ইংরেজদিগের কেহ কেহ আয়র্ল্যাণ্ডে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। তবে তৎকালে পূর্ব্ব পার্শ্বের পেল নামক জিলাতেই ইংরেজ প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। টুডর রাজ-বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন হইবার পর হইতে এই প্রভাব প্রবল হইয়া পড়ে এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডই ইংলণ্ডের শাসনাধীন হয়।

প্রথম জেমসের সময়ে আলষ্টারে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। বিদ্রোহ দমিত হইবার পর আইরিশ জমিদারদিগকে তাড়াইয়া জমিগুলি ইংরেজ ও স্কচ উপনিবেশিকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। পরে পুনরায় বিদ্রোহপাবক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে ক্রমওয়েল এবং তাঁহার অনুচরগণ বিদ্রোহ দমনের জন্য এই দেশে আগমন করেন। তৎকালে ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। ইঁহার অনুগত যোদ্ধৃবর্গ "আইরণ সাইডস্" আখ্যায় অভিহিত হইত।

এইস্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রথম জেমসের সময় হইতেই আলষ্টার ইংরেজ-প্রধান প্রদেশ হইয়া পড়ে। আলষ্টারের অন্তর্গত ছয়টি জিলা যে আইরিশ আর্ল বা জমিদার দ্বয়ের অধিকারভুক্ত ছিল তাঁহারা উৎপীড়নের আশঙ্কায় স্পেনে পলায়ন করিলে তাঁহাদিগের জমিদারীই ইংরেজ ও স্কচ্ ভূম্যাধিকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই জমিদারদ্বয়ের মধ্যে টাইরোণের আর্ল ও-নীলের নাম অপেক্ষাকৃত অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অসন্তুষ্ট ও অশান্ত আয়র্ল্যাণ্ডকে দমিত রাখিবার জন্য তথায় যে বৃহৎ বাহিনী রাখিতে হইত তাহার ব্যয় ভার বহন করিতে প্রথম জেমসকে ঋণ জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর অত্যাচার ও অবিচার করা হইত বলিয়াই তাহার বক্ষে বিদ্রোহ-বন্যা বার বার বহিয়া যাইত। আয়র্ল্যাণ্ডের অশান্তির অন্যতম প্রধান হেতু ছিল ধর্ম্মমতগত বিভেদ। শাসিত আইরিশ জাতির অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক অথচ শাসক ইংরেজ-দিগের প্রায় সকলেই প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী। ইহাতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের পরস্পর অপ্রীতি ও বিদ্বেষ দিন দিন তীব্রতর হইয়া পড়িতেছিল। একই ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শুধু কতিপয় মতগত বিভেদের জন্য এইরূপ প্রচণ্ড বিদ্বেষ বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা হিন্দুমুসলমান বিদ্বেষের কথা কহিয়া ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা য়ুরোপের এই সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের কাহিনী পাঠ করিলে বুঝিবেন তাঁহাদের ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আইরিশরা ক্যাথলিক বলিয়া অধিকতর উৎপীড়নের পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তৃতীয় উইলিয়মের শাসনকালের অবসান হইবার পর হইতে ক্যাথলিক মতাবলম্বী আইরিশদিগের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার আরও বাড়িয়া উঠিল। আয়র্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিন নগরে যে আইরিশ ব্যবস্থাপকসভা বসিত রোমান ক্যাথলিকের পক্ষে তাহার সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অথচ

আইরিশ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র ছিল। ডাবলিনের এই প্রোটেষ্টাণ্ট সদস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপকসভায় যে সকল আইন-কানুন প্রস্তুত করা হইতে লাগিল তাহাতে রোম্যান ক্যাথলিকদিগের উপর অত্যাচার করিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গেল। এই স্থানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত আয়র্ল্যাণ্ডে যে সকল প্রোটেষ্টাণ্ট ছিল তাহাদের প্রায় সকলেই মূলতঃ ইংরেজ। বিশুদ্ধ আইরিশদিগের মধ্যে দুই একজন ছাড়া সকলেই ক্যাথলিক ছিল বলিলে ভুল হয় না। পরে ক্যাথলিক প্রতিকূল আইনগুলি ক্রমশঃ উঠাইয়া দেওয়া হইলেও তাহাদিগের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের অবসান ঘটিল না।

ডাব্লিনের পার্লিয়ামেণ্ট ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের প্রভাব হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রখ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ উইলিয়ম পিট মন্ত্রী হইবার পর আইরিশদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। বাণিজ্য বিষয়ে আইরিশরা ইংরেজদিগের নিকট বিদেশীয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইত। শুল্ক না দিয়া ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। পিট আয়র্ল্যাণ্ডকে বাণিজ্য বিষয়ক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আইরিশরা শুধু সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহিল না। তাহারা চাহে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন। আইরিশ রাষ্ট্রীয়সভা পিটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তবুও পিট আয়র্ল্যাণ্ডের কল্যাণ করিবার কামনা পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে ক্যাথলিকদিগের রাষ্ট্রসভার সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট দিবারও অধিকার ছিল না, সদস্য হওয়া তো দূরের কথা। এইবার তাহাদের ভোট দিবার অধিকার জন্মিল। অবশ্য তৎকালে ইংলণ্ডেও ক্যাথলিকরা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইতে পারিত না। যাহাতে ক্যাথলিকরা আইরিশ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে এবং তাহারা সরকারী কর্ম্মচারী হইবার অধিকারও লাভ করে উদারচেতা পিট সেইরূপ প্রস্তাব করিতে সঙ্কল্প করিলে আয়র্ল্যাণ্ডের কয়েকজন প্রোটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ডে আসিয়া রাজা তৃতীয় জর্জ্জের নিকট আবেদন করিল, যেন ক্যাথলিকদিগকে সে প্রকার অধিকার না দেওয়া হয় কারণ তাহারা সেইরূপ অধিকার পাইলে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের অনিষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। জর্জ্জের ইংলণ্ডবাসী প্রজারাও এই অধিকার প্রদান ব্যাপারে ক্যাথলিকদিগের বিপক্ষেই অনুরোধ করিল সুতরাং পিট আয়র্ল্যাণ্ডের অকৃত্রিম কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

আইরিশরা বুঝিল, ইংলণ্ড স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে কোনও দিন কোনও অধিকার দিবে না। দুই একজন উদারচেতা ব্যক্তি ব্যতিরেকে ইংরেজদিগের মধ্যে কেহই তাহাদিগের কল্যাণকামী নহে। কেহই চাহে না তাহারা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করুক। স্বতন্ত্রতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্জ্বলিত তাহাদিগের অন্তরের চিরন্তন অসন্তোষাগ্নি প্রবলতর হইয়া অবশেষে বিদ্রোহ-বহ্নির আকার পরিগ্রহ করিল। আইরিশ ক্যাথলিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া "ইউনাইটেড আইরিশমেন" বা "সম্মিলিত আইরিশদল" আখ্যায় অভিহিত একটি দল গড়িয়া তুলিল। এমন কি স্বদেশের স্বাধীনতাকামী কতিপয় প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীও এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বাড়াইয়া তুলিল। সম্মিলিত আইরিশ দল ইংলণ্ডের অধীনতা বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ব্যবস্থা হইল তাহাদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করিবার জন্য একটি ফরাসী নৌ-বাহিনী আয়র্ল্যাণ্ডের উপকূলে উপনীত হইবে। রণ-পোত ও ফরাসী সেনাদল আসিয়া পৌঁছিল বটে কিন্তু যিনি সৈন্যগণকে পরিচালিত করিবেন সেই সেনাধ্যক্ষ আসিলেন না। যুদ্ধ জাহাজগুলি অধ্যক্ষের আগমনের আশায় ব্যাণ্ট্রি বে নামক উপসাগরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অধ্যক্ষের আসিবার পূর্ব্বেই প্রবল ঝড় উঠিয়া রণ-পোতগুলিকে ব্যাণ্ট্রি বে হইতে দূরতর সাগর বক্ষে লইয়া গেল। সুতরাং ফরাসী সৈন্যগণের পক্ষে আয়র্ল্যাণ্ডের উপকূলে অবতরণ সম্ভব হইল না।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নিরাশামগ্ন আইরিশরা সত্য সত্যই বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলিত করিল। বিদ্রোহীরা কর্ত্তৃপক্ষ বা প্রতিপক্ষদিগের গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল এবং নির্দ্দয় হত্যা-কাণ্ডও আরম্ভ হইল। কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষাবলম্বী আইরিশ প্রোটেষ্টাণ্টদলও বিদ্রোহ-দমনে বিদ্রোহীদিগের মতই নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিদ্রোহীদল ভিনেগার হিল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত সৈন্যসঙ্ঘ কর্ত্তৃক তাহারা

আক্রান্ত হইলে যে সংঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইল তাহাতে নির্মমভাবে উভয় পক্ষেরই বহু লোকের জীবন নাশ ঘটিল। অবশেষে ইংরেজ সৈন্যগণ বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইল বটে কিন্তু উহার অব্যবহিত পরে যে সকল পাশবিক অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিতে লাগিল তাহাকে হৃদয়-বিদারক ও ভয়াবহ বলিলে ভুল হয় না। বহু নির্দোষ ব্যক্তির উপর শুধু সামান্য সন্দেহের জন্য নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। বিচারকগণ বিচারের নামে যাহা করিতে লাগিলেন তাহাকে শুধু স্বৈরাচারই বলা চলে। এইরূপ একজন স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর বিচারককে "ফ্লগিং ফিজ্‌জেরাল্ড" বা বেত্রাঘাতকারী ফিজ্‌জেরাল্ড নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অত্যাচার দূর করিবার জন্য পিট (পূর্ব্বে যিনি ভারতে ছিলেন) লর্ড কর্ণওয়ালিসকে আয়র্ল্যাণ্ডের লর্ড লেফটেনাণ্টরূপে প্রেরণ করিলেন। ইনি অত্যাচার দমন করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পিট ভাবিলেন বৃটেন এবং আয়র্ল্যাণ্ড উভয় দেশের পার্লিয়ামেণ্টকে একত্রিত করিলে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে। যাহাতে ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হইতে এবং সরকারী চাকুরী পাইতে পারে সেই চেষ্টাও তিনি করিতে লাগিলেন। আইরিশ পার্লিয়ামেণ্ট ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সহিত সম্মিলনে সম্মতি প্রকাশ করিল না এবং রাজা ক্যাথলিকদিগের দাবী পূর্ণ করিতে রাজি হইলেন না। রাজার এই অসম্মতির জন্য পিট পদত্যাগ করিলেন।

রাজা চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বকালে এবং ডিউক অফ ওয়েলিংটনের প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় কেমন করিয়া ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রীয় সভায় সদস্য হইবার অধিকার লাভ করিল তাহা উল্লেখ করা আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্লেয়ার নামক কাউন্টি হইতে রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্যাথলিকরা সদস্য হইতে না পারিলেও ভোট দিবার অধিকার তাহাদের ছিল। ক্লেয়ার কাউন্টির অধিকাংশ অধিবাসীর ভোট পাইয়া যিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন তিনি একজন ক্যাথলিক। ইঁহার নাম ও'কনেল আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সাধনার ইতিহাসে ইঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ইনি এরূপ অদম্য উদ্যম ও অতুলনীয় সাহস প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, আইরিশরা ইঁহাকে "লিবারেটর" বা মুক্তিদাতা আখ্যায় অভিহিত করে। ইনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট আয়র্ল্যাণ্ডের কাহিরসিভিন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যবহার-জীবীর কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাচনের ফলে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বলিয়া গণ্য হন। ও-কনেল নির্ব্বাচিত হইলেন বটে কিন্তু ক্যাথলিক বলিয়া প্রচলিত আইন অনুসারে তিনি রাষ্ট্রীয় সভায় উপবিষ্ট হইতে পারেন না। অথচ ও-কনেলের নেতৃত্বে তখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, যদি পুনরায় নির্ব্বাচন হয় তাহা হইলে লীনষ্টার, মুনষ্টার ও কোনট্ তিনটী প্রদেশের প্রত্যেক কাউন্টি হইতেই ক্যাথলিক সদস্য নিশ্চিতই নির্ব্বাচিত হইবে, শুধু হইবে না প্রোটেষ্টাণ্ট প্রধান ও ইংরেজ অধ্যুষিত আলষ্টার হইতে। ওয়েলিংটন নিজেও ক্যাথলিকদিগকে অধিকারদানের বিশেষ বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ঐরূপ অবস্থায় ক্যাথলিকদিগের দাবী অস্বীকার করিলে আয়র্ল্যাণ্ডে পুনরায় বিদ্রোহশক্তি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি নৃশংস ধ্বংসলীলা আবার অভিনীত হইবে। যুদ্ধ কি ভয়াবহ অনিষ্টকর ব্যাপার তাহা বহু তুমুল যুদ্ধের অধিনায়ক ওয়েলিংটন যেমন জানিতেন তেমন আর কে জানিবে? সুতরাং যাহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিরুদ্ধ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করাই তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় মহাসভায় ক্যাথলিকদিগের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার সম্পর্কীয় একটি বিল বা আইন গৃহীত হইবার জন্য পেশ করা হইল। এই আইন গৃহীত হইলে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মতই ক্যাথলিক-দিগেরও পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইবার অধিকার জন্মিবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই বিলের বিরোধী হইলেও ওয়েলিংটনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও চেষ্টায় ইহা রাষ্ট্রীয় মহাসভার অনুমোদন প্রাপ্ত হইল। এই আইন ব্রিটিশ ও আইরিশ ইতিহাসে "ক্যাথলিক এমানসিপেশন বিল" আখ্যায় অভিহিত। এই বিল বিধিবদ্ধ হইবার বা ক্যাথলিকদিগের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকৃত হইবার মূলে দেশপ্রাণ ও-কনেলের প্রাণপণ প্রচেষ্টার প্রভাব কতখানি ছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য বটে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে

আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয়-মুক্তি-সংগ্রামের এই প্রসিদ্ধ অধিনায়ক ও যোদ্ধার জীবনের অবসান ঘটে বটে কিন্তু সেই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন) আর একজন আর একজন বিখ্যাতনামা দেশভক্ত বীর-পুরুষের আর একজন অদম্য উদ্যমশীল যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম পার্ণেল।

আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ও মুক্তি-রণক্ষেত্রে পার্ণেলের আবির্ভাবকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা বলিলে ভুল হয় না। আইরিশ জাতির স্বতন্ত্র হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া পড়িতেছিল সন্দেহ নাই। আমাদের স্বাধীনতা-সাধনার সহিত আইরিশদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ ইহা বিভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অহিংস, কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ড স্বতন্ত্রতার জন্য হিংসাপূর্ণ উপায়ও বার বার অবলম্বন করিয়াছে। স্বাধীনতা সকলেই চায়। স্বাধীনতার জন্য স্কট্ল্যাণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল। তারপর স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের সহিত আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। আইরিশরা কেল্টিক বা ক্যাথলিক যাহাই হউক তাহারা ইংরেজদিগের জ্ঞাতি বা স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মী সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু তবুও ইংরেজরা আইরিশদিগকে স্বাধীনতা দিতে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী আয়র্ল্যাণ্ড স্বাধীনতার জন্য বার বার ব্যগ্র বাহু বিস্তৃত করিয়াছে, সময়ে সময়ে সেই হস্তে অস্ত্র ধরিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অন্য দিকে ইংলণ্ড কঠোরভাবে তাহার প্রার্থনাকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং শস্ত্রের সাহায্যে তাহার স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোনও জাতির অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একবার জাগ্রত হইলে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে, এই সংশয়াতীত সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই। বিস্ময়ের বিষয় ইহাই, শাসক জাতি এই শাশ্বত সত্যের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বাধীনতার জন্য অতিশয় আগ্রহশীল শাসিতকেও চির-পদানত রাখিতে প্রয়াস করেন।

আয়র্ল্যাণ্ডে "ফেনিয়ান্" আখ্যায় অভিহিত একটি দল ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দলের উদ্দেশ্য আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র করা। অবশ্য এই উদ্দেশ্য তাহারা হিংসাপূর্ণ উপায়েই সাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। বহু আইরিশ আমেরিকায় বাস করে। সুতরাং ফেনিয়ান দলের বহু সমর্থক আমেরিকায় ছিল। যুদ্ধ করিতে হইলে যেরূপ শৃঙ্খলা ও অস্ত্র শস্ত্রের দরকার ফেনিয়ানদিগের তাহা ছিল না তবু তাহারা বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলিত করিল। ইহারা কতকগুলি পাহাড়ের উপর সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় তুষারপাত হওয়ায় তাহাদিগের অসুবিধা বৃদ্ধি পাইল। ফলে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বিদ্রোহ দমন সহজ হইয়া পড়িল। বহু ফেনিয়ান বন্দীকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইল। যখন ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে কতিপয় ফেনিয়ান বন্দীকে বন্দীবাহী ভ্যানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন এক দল আইরিশ তাহাদিগকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে গুলী করিলে জনৈক পুলিশের লোক নিহত হয়। ইহাতে কয়েক জন আইরিশকে হত্যাপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইরূপে উভয় দেশের দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িয়াই চলে।

আয়র্ল্যাণ্ডে পার্ণেলের ন্যায় দেশ-প্রেমিক নেতার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এমন একজন বিচক্ষণ ও মহাপ্রাণ রাজনীতিজ্ঞ আবির্ভূত হন যাঁহাকে আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসনের অকপট সমর্থক ও আয়র্ল্যাণ্ডের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বলা চলে। আইরিশ-স্বরাজের অকপট পৃষ্ঠপোষক এই ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের নাম উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্লাড্‌ষ্টোন। বিচক্ষণ গ্লাড্‌ষ্টোন বুঝিলেন আইরিশদিগকে বরাবর বল-প্রয়োগে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টায় ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে। তাহাদিগের চিরন্তন ও অত্যন্ত অসন্তোষের প্রকৃত কারণ কি তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহারা যাহা চায় তাহা তাহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য হইলে তাহা তাহাদিগকে অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি দেখিলেন সত্য সত্যই আইরিশ ক্যাথলিকদিগের উপর অতিশয় অবিচার এবং তথাকার প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। আয়র্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। এই দেশের ক্যাথলিক জনসাধারণের অর্থে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়। অন্য দিকে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজকদিগের ভরণপোষণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ক্যাথলিক মতাবলম্বী

আইরিশদিগকেই করদানে বাধ্য করেন। মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন এই অন্যায় বিধান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎকালে ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিবার বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু হাউস অব্ কমন্সের অধিকাংশ সদস্য গ্লাড্‌ষ্টোনকে সমর্থন করিলেন। ফলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল এবং গ্লাড্‌ষ্টোন প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী প্রথমেই আইরিশ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকরাই নিজ নিজ ধর্ম্মমণ্ডলীর নিকট হইতে ভরণপোষণের উপযোগী অর্থ প্রাপ্ত হইবেন, এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কাহাকেও সাহায্য করিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। ইহার পর এই মন্ত্রী-সভা আইরিশ জমিদার ও প্রজাদিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তিত করিলেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিস্‌রেলীর নেতৃত্বে পুনরায় কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকিবার পর ঐ সালে গ্লাডষ্টোনের অধীনে উদারনৈতিক মন্ত্রি-সভা পুনরায় রচিত হয়। এই সময় প্রসিদ্ধনামা আইরিশ নেতা পার্ণেলের পরিচালনায় আয়র্ল্যাণ্ডে হোমরুল-মুভমেণ্ট বা স্বরাজ আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতে থাকে। "হোমরুল" শব্দটির বহুল ব্যবহার আয়র্ল্যাণ্ড সম্পর্কেই প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। পরে ভারত সম্পর্কে এই শব্দটি স্বর্গীয় এনি বেশাণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহাকে ভারতীয় হোমরুল-মুভমেণ্টের অন্যতম প্রবর্ত্তক বলা চলে। পার্ণেল স্বদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য কমন্স সভায় যে বাগ্মিতা ও বিক্রম প্রকাশ করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করেন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মহামতি মতিলাল নেহরু প্রভৃতি ভারতীয় নেতাগণ এই দেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাহাই করেন বলিলে ভুল হয় না। পার্ণেল সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যদি কমন্সসভায় আইরিশ সমস্যা সম্বন্ধে, আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান সম্পর্কে আলোচনা না হয় তাহা হইলে তাঁহারা পদে পদে বিরোধিতা করিয়া ও বাধা দিয়া সভায় এইরূপ অবস্থার উদ্ভব করিয়া তুলিবেন যাহাতে কোন বিষয়েরই আলোচনা সম্ভব হইবে না। পার্ণেল প্রবর্ত্তিত এই অপোজিশান ও অবষ্ট্রাকশান অর্থাৎ বিরোধিতা ও বাধা প্রদানের নীতি ভারতীয় নেতারাও অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিংসাপূর্ণ উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ণেল স্বরাজসম্পর্কে নিয়ম-তান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

স্বজাতিবৎসল পার্ণেল দেশের দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্থ দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অত্যাচারী জমিদার বা জমির অধিকারীদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে অভিনব পদ্ধতি বা আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন তাহাও পরে ভারতীয় নেতৃবর্গের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। ইহাই "বয়কট" আন্দোলন। যে জমি হইতে অন্যায়ভাবে কৃষককে বঞ্চিত করা হইয়াছে সেই জমি কেহ রাখিতে বা কিনিতে পারিবে না। সেইরূপ জমি কেহ রাখিলে বা কিনিলে তাহাকে সকলে বয়কট করিবে অর্থাৎ তাহার সহিত সকলে অসহযোগ করিবে। যাঁহার সহিত এইরূপ অসহযোগ সর্ব্বপ্রথম করা হইয়াছিল তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন বয়কট। সুতরাং "বয়কট" শব্দটিরও জন্মস্থান আয়র্ল্যাণ্ড। নিয়ম হইল যাহাকে বয়কট করা হইবে তাহার সহিত কেহ কথা কহিবে না, তাহাকে কেহ কোন জিনিষ বিক্রয় করিবে না, মোটের উপর কেহই তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবে না। আইরিশরা ভারতবাসীর ন্যায় অহিংসার উপাসক নহে সুতরাং তাহাদের পক্ষে এইরূপ অসহযোগকে অহিংস রাখা বেশীদিন সম্ভব হইল না। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানাস্থানে হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ পার্ণেল প্রভৃতি বয়কট আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও কর্ম্মিগণকে এই সকল হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ বলিয়া মনে করিলেন। ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কারারুদ্ধ হইলেন। যাহার উপর কোনপ্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল তাহাকে বিনা বিচারেই বন্দি-বাসে বাস করিতে হইল। কৃষকদিগের কয়েকটি অসুবিধা দূর করিবার জন্য আইরিশ-ল্যাণ্ড-য়্যাক্ট নামক অইন প্রস্তুত করা হইল বটে কিন্তু পার্ণেল সেই অইনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কৃষকদিগকে এই আইন অমান্য করিতে উপদেশ দিলে তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করা হইল। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করার পর অসন্তুষ্ট আইরিশদিগের মধ্যে হিংসার ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি কারাগার হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন, তাঁহাকে কারামুক্ত করা হইলে এবং কৃষকদিগের পক্ষে অধিকতর অনুকূল আইন প্রস্তুত করিলে তিনি এই সকল হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিবেন। পার্ণেলের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন বটে কিন্তু হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড উহার পরেও কিছুকাল চলিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর দেশপ্রাণ পার্ণেল পরলোকে গমন করেন।

[ক্রমশঃ

সত্যের আলো

শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

[একাঙ্কিকা]

[বিগত মহাযুদ্ধে যে সমস্ত ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে রাজধানী দিল্লীর শেষপ্রান্তে 'ইণ্ডিয়া গেট'। তারই ওপর জ্বলে আলো—লোকে বলে সত্যের আলো।

মনে হয় যেন এই সত্যের আলোয় বীর ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছিল রাজার ধর্ম্মে আর নিজের কর্ত্তব্যে।

এই-আলো মাঝে মাঝে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, দিক্ বিদিক আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

ইণ্ডিয়া গেটের চারিধারে সিঁড়ি, সেই সিঁড়িতে রোজ থাকে কত লোক ; কেউ আসে বেড়াতে, যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিমন্দিরকে স্পর্শ করে কেউ তাদের জন্যে দেয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস কিম্বা দু'ফোঁটা অশ্রুজল। কেউ আসে তাদের প্রিয়জনকে দিনান্তে একটিবার দেখে যেতে। এতেই তাদের তৃপ্তি, তাদের আনন্দ...

এই জনতায় রোজ থাকে একটি মেয়ে – বসে বসে কি যেন সে ভাবে...

দূর থেকে ভেসে আসে সহরের স্তব্ধ কোলাহল—যেন চাপা আর্ত্তনাদ তাকে ব্যঙ্গ করে সহর প্রান্তের এই স্মৃতি-মন্দিরের পবিত্রতা।

এমনি করে রাত্রির নির্জ্জনতা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

একে একে সকলে চলে যায়, কেবল ঐ মেয়েটি বাদে···সে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া অদূরস্থিত সেই অতীতের ভগ্নপ্রায় সাক্ষ্য 'ইন্দ্রপ্রস্থ' দুর্গটির দিকে চেয়ে কি ভাবতে থাকে।

হয় ত' ভাবতে থাকে ঐ নিস্তব্ধ পাষাণের স্তূপকে ঘিরে রয়েছে ওরই মতন কত নারীর কত ব্যথা···কত আঁখিজল . কত বেদনা...কত মৃত্যু। মেয়েটি এমনি কত কথাই না ভাবতে থাকে।

হঠাৎ একজন অচেনা পুরুষ (আগন্তুক) ওর পাশে এসে থমকে দাঁড়ায়।]

আগন্তুক। তুমি···এখনও এখানে বসে!

[মেয়েটি আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকে, কি ভাবে, তারপর কথা বলে চলে]

মেয়ে। হ্যাঁ···কি অপূর্ব্ব রাত্রি!

আগন্তুক। মন্দ নয়···একটু ঠাণ্ডা!

মেয়ে। এখানে বসে অস্পষ্ট দেখা যায় সহরটিকে··· আবছায়া অন্ধকার···এই সহরের বুকের ওপর দিয়ে তারা গিয়েছিল···এই সহরই এদের দিয়েছিল···

আগন্তুক। কি দিয়েছিল?

মেয়ে। এইসব মৃতের দল—যাদের স্মৃতি, যাদের আত্মা ভীড় করে আছে এই স্মৃতিমন্দিরের ধারে ধারে—হয় ত' তোমার আমার দিকে তাঁরা চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগন্তুক। তুমি কি দেখছ অমন করে শূন্য দৃষ্টিতে?

মেয়ে। আমি? আমি দেখছি একটির পর একটি আলো নিভছে, কখনও এক সঙ্গে অনেকগুলো—অনেক অনেকদিন আগে মানুষের জীবন প্রদীপও হয় ত' এমনিভাবে নিভেছিল—কখনও একটি একটি করে—কখনও একসঙ্গে অনেকগুলো।···তুমি ক্লান্ত?

আগন্তুক। এখন না! কখনও কখনও হই! বিশেষ করে যখন মৃত্যুর মতন অবসাদ আসে।

মেয়ে। কিন্তু তোমার কাজ এখানে ভারী সুন্দর—ভারী সুন্দর···সত্যের প্রতিমূর্ত্তিকে অনুক্ষণ পাহারা দেওয়া।···

আগন্তুক। আমার এক সময় মনে হয় কে জানে এখানে কি রকম লাগবে!

মেয়ে। এই একটি স্থান যেখানে আমি সত্যিকার শান্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

আগন্তুক। আর এই একটিমাত্র স্থান যেখানে আমি প্রশান্ত, চঞ্চল হয়ে উঠি।—দূরে একটা বাস্ আসছে।···

মেয়ে। হঁ্যা! আমার মনে আছে এমনি করে একদিন বাস চলে গিয়েছিল—আমি ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিদায় দিয়েছিলাম।···তারা আর ফিরে আসে নি।

আগন্তুক। কেউ ফেরে নি?

মেয়ে। নাঃ, বাসটিও না ···তারা পৌঁছেছিল বোধ হয়···

আগন্তুক। আমার হাসি আসে···

মেয়ে। কেন?

আগন্তুক। যখন ভাবি যে সবাই ভাবে আমরা পৌঁছুই নি।···

মেয়ে। আপনিও ছিলেন?

আগন্তুক। হ্যাঁ আমিও ছিলাম।···থাকগে ও-সব কথা···আমি আজও আছি—তুমি প্রায়ই এখানে আস, না?

মেয়ে। আমার ইচ্ছে করে এইখানেই থাকি···চিরদিন ···চিরকাল।

আগন্তুক। এই সিঁড়িটাই তোমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান।···কত লোক এখানে আসে কত লোক কত রকম জায়গা বেছে নেয়···কত রকম জায়গা খুঁজতে থাকে···ব'সে তাদের নিত্যকার ভাববার কাজ সারবে বলে।

মেয়ে। কে জানে হয় ত' তারা ভাববে বলে আসে না।

আগন্তুক। যারা এখানে আসে তারা ভাবনা এড়াতে পারে না। কারণ মৃত্যু এখানে মূর্ত্তি পেয়েছে—এখানে সে জীবন্ত···মৃতেরাও হয় ত' ভাবে!···কাল তুমি আবার আসবে না কি?

মেয়ে। আমি?···ঠিক জানি না। কত জিনিষ আমার মনকে পরিপূর্ণ ক'রে রাখে···কত জিনিষের জন্যে মন হাহা-কার করতে থাকে—কখনও পূর্ণতা, কখন বিরাট শূন্যতা··· কিন্তু কখন যে কোন্‌টি তা আমি বুঝি না!

আগন্তুক। সকলেই তাই। আমরা কেউ তা বুঝি না ···কখনও না···আজ পর্য্যন্তও কেউ তা বোঝে নি!

মেয়ে। ওপরের ঐ আলো কত দিন এমনি ক'রে জ্বলছে···আমি আগের বার যখন এসেছিলাম, তখন ওটা ছিল না। মন্দিরটা যেন ওটার জন্য আরও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

আগন্তুক। আমি ওটাকে সব সময়ই দেখি···কিন্তু আমার ভাল লাগে না। বীভৎস নগ্নতা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে —মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। মনে হয়, যে অদৃশ্য পুরুষ ওটাকে জ্বালিয়ে রাখে সে যেন ইচ্ছে ক'রে আমাদের চোখের ওপর ঐ আলো ফেলে আমাদের সচকিত ক'রে দেয়···ও হয় ত' জানে আমরা চমকে উঠি—তাই ওর এই অদ্ভুত খেলা··· কি ভাগ্যিস্, পাশে কোন মেয়ে নেই, থাকলে সেও হয় ত' চমকে উঠত।

মেয়ে। কে মেয়ে?

আগন্তুক। এমনি একজন।

মেয়ে। যে তোমাকে ভালবাসে?

আগন্তুক। বলতে পার।

মেয়ে। তোমাকে কি কেউ কোনদিন ভালবাসে নি?

আগন্তুক। অনেকে বেসেছে···

মেয়ে। সত্যিকার ভালবাসা!

আগন্তুক। তাও বলতে পার···সকলেই আমায় সত্যি ভালবাসত।···একজন বাদে।

মেয়ে। তার মানে? তুমি কি তাকে···

আগন্তুক। ব'লে যাও।

মেয়ে। আমি ভাবছিলাম···যাক্ সে কথা,···তুমি কি বলছিলে তাই বল।

আগন্তুক। আমি?...একজন বাদে...তুমি হয় ত' তা'কে বলবে···বলবে হয় ত' কল্পনা।

মেয়ে। স্বপ্নের মেয়ে।

আগন্তুক। আমার পক্ষে তারা সকলেই স্বপ্নের মানুষ।

মেয়ে। অদ্ভুত!···তাই না?

আগন্তুক। আমি সে কথা বলি নি,···কি রকম জান? —তারা প্রায় সকলেই যেন তোমাকে চেনে···অথচ কিছু বলে না···তারা কি ভাবে? সে কথা ভাবতেও আমার কেমন অদ্ভুত লাগে।

মেয়ে। যেমন?

আগন্তুক। যেমন তারা হয় ত' ভাবে আগে তোমায় কোথায় তারা যেন দেখেছে। তাদের কারো কারো জন্যে আমার দুঃখ হয়—প্রায় সকলের জন্যেই···তাদের চোখ থেকে ঝ'রে পড়ে এক অদ্ভুত আলো···কিন্তু কেন জানি দৃষ্টি বিনিময়ে তাদের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিলিয়ে যায়— প্রাণহীন···প্রস্তর-মূর্ত্তির নীরবতা···তারপর ভয়, দ্বিধা···আর চোখে জ্বলে ওঠে সেই তীব্র আলো। সেই আলো আকর্ষণ করে···তাদের সেই দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরানো যায় না,— যতক্ষণ না তারা দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। মানুষ যেন তাদের ঐ দৃষ্টিতে হারিয়ে যায়···

[চারিদিকে নিস্তব্ধতা বাড়তে থাকে—রাত্রি আরও নিবিড় হ'য়ে নামে ·· অন্ধকারে ওপরের আলো আরও জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে...দূর থেকে ভেসে-আসা কোলাহল ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আসে। দূরের ঘড়িতে সময় এগিয়ে চলে বাজে ন'টা]

আগন্তুক। অনেক রাত হ'ল···তুমি কি আরও বসবে?

মেয়ে। তোমার সঙ্গে বড্ড বেশী কথা বলছি.. না?

বোধ হয় রাত্রি ব'লে…হয় ত' আর কিছু…কিন্তু কি যে তা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না…আমি নিজেও তা বুঝি না…হয় ত' এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্যে…হয় ত' এখানে থাকার জন্যে…

আগন্তুক। দিনের কোলাহলে মানুষ পরের শব্দে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—তাই নিজেই কথা ব'লে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে…জানতে চায়…জানতে চায়!…তুমি এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা বসতে পার—আমি তোমাকে বাধা দেব না—তোমাদের কাউকে আমি বাধা দিতে পারি না—আমি বাধা দিতে চাই না।

মেয়ে। বস এইখানে।

আগন্তুক। এই যে বসি। আমার মনে আছে এক-দিনের কথা…একটি মেয়ে প্রায়ই এখানে আসত…একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে আমায় দেখল—তার পর দিন থেকে আর সে আসে নি—কখনও না। কিন্তু তার সেদিনের হাসি আমার আজও মনে আছে…

মেয়ে। আলোটা হঠাৎ সতেজ হ'য়ে উঠল। ক্রমেই উর্দ্ধে উঠছে—বহু উর্দ্ধে…যেন কাকে খুঁজে মরছে!…খোঁজা—অবিরত, অবিরাম,…কি খুঁজছে?…তুমি কোন্ বাহিনীতে ছিলে? রাত্রের অন্ধকারে তোমার পোষাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

আগন্তুক। দিনের আলোতেও হয় ত' পারতে না।

মেয়ে। 49th Regiment-এ আমার ভাই ছিল।

আগন্তুক। নামকরা বাহিনী।

মেয়ে। এত প্রশংসা কেন?

আগন্তুক। আমিও সেই বাহিনীতে ছিলাম কি না!

মেয়ে। ঠিক ত', এবার বুঝতে পারছি। [উৎসাহিত ভাবে] আচ্ছা, তুমি—[হঠাৎ থেমে, নিরুৎসাহ হ'য়ে] তুমি চিনবে না বোধ হয়, রণবীর বলে কাউকে চিনতে? সেই আমার ভাই।

আগন্তুক। হবে। নাম সম্বন্ধে স্মৃতি শক্তি এক রকম প্রায় লোপ পেয়েছে—চেহারা ভাল মনে আছে। কতদিনের কথা—প্রায় ৪০ বছর। চেহারা কখনও ভুলি না। একদিন কত কথাই তাদের বিষয় আমি জানতাম, কিন্তু তাদের বিষয় সব ভুলে থাকি, মনে পড়ে তখন যখন হয় ত' পথের মাঝ-খানে তাদের কাউকে দেখি। একটি ঘটনার সূত্র ধরে সব মনে পড়ে যায়। যেন উজ্জ্বল আলোয় সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মেয়ে। কি অদ্ভুত! হঠাৎ একজনকে দেখে ভুলে যাওয়া ঘটনা মনে পড়ে যাওয়া।

আগন্তুক। যাকগে ও কথা। তোমার ভায়ের কথা বল শুনি।

মেয়ে। রণবীর! সে—সে ভাল বেহালা বাজাতে পারত—সে মারা গেছে। আজও সময় সময় মনে হয় কল্পনায় যেন তার বেহালা শুনছি—কখনও কখনও তাকে দেখি—

আগন্তুক। তাই কি তুমি এখানে আস?

মেয়ে। হয় ত'—

আগন্তুক। ভাল গিটার বাজাত'?…যেন মনে পড়ছে।

মেয়ে। তুমি তাকে জানতে?

আগন্তুক। খুব লম্বা;

মেয়ে। হ্যাঁ, এবং সুন্দর। কুড়ি বছর বয়স—

আগন্তুক। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ভারি মজা লাগে…এমনি করে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা…তাই না?

মেয়ে। হ্যাঁ তাই…এই ত' জীবন—পুনর্জ্জীবন।…সে হাসপাতালে মারা যায়।

আগন্তুক। শুনেছিলাম, সে মারা গেছে…তোমার কি মনে আছে আমাকে?

মেয়ে। তোমাকে?

আগন্তুক। হ্যাঁ, আমাকে?

মেয়ে। [কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, তারপর] না, আমার মনে হয় না! হয় ত' রাত্রির অন্ধকার বলে তাই—তাই গুলিয়ে যাচ্ছে, আর তা ছাড়া…

আগন্তুক। ভাল করে দেখ ত'—মনে পড়ে?

মেয়ে। [চিন্তা ক'রে] না, না, আমার মনে হয় না, এখানে বড্ড অন্ধকার, সবই যেন অস্পষ্ট, তুমিও যেন আবছায়া…অস্পষ্ট…তোমার নাম কি? হয় ত' আমি…তোমার কণ্ঠস্বর যেন…

আগন্তুক। নাম থাক্‌! যদি আমায় নাই জান, তা' হ'লে যে কোন নাম আমার হ'তে পারে—আর যদি জান, তা হ'লে যতগুলো ইচ্ছে নাম হতে পারে…

মেয়ে। কিন্তু তুমি কে তা না বললে আমি কি করে বুঝব; তোমার পরিচয় বল। তোমার চেহারা যেন চেনা, কোথায় যেন তোমায় আগে দেখেছি। মন যদি মুক্ত হয় স্মৃতির ভারে যদি না শৃঙ্খলিত হয়, তা হ'লে অনেকক্ষণ একটা চেহারা দেখলেই মনে হয়—আগে যেন কোথায় দেখেছি…আচ্ছা, দাঁড়াও, আলোটা আবার ভাল করে জ্বলুক…

আগন্তুক। অদ্ভুত! কত লোককে আমরা জানি না, যারা আমাদের জানে…আর কত লোককে আমরা জানি…ভুলে যাই। আর যাদের জানি না তাদের বলতে হয় যে জানি—শুধু তাদের সুখী করবার জন্যে। মিথ্যার অভিনয়… নয় কি না?

মেয়ে। তুমি বড্ড হাস' না?

আগন্তুক। যখন সকলে আমাদের দিকে চেয়ে হাসে তখন আমাদের ত' হাসতে হয়…যখন কেউ হাসে না তখন মনটা খারাপ থাকে।

মেয়ে। তুমি এখানে নূতন এসেছ না। সম্প্রতি কিছু দিন আগে আমি যেন তোমাকে ওখানে, ঐ গাছটার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

আগন্তুক। প্রায়ই এখানে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই… আমায় দেখে না…তুমি অমন করে কি দেখছ? তোমার ভায়ের কথা আমায় বল।

মেয়ে। তুমি কি তাকে আহত অবস্থায় দেখেছ?

আগন্তুক। সে কথা কেন?…হ্যাঁ দেখেছি।

মেয়ে। আমারও যেন তাই মনে হ'ল। কি আশ্চর্য্য! আমার স্পষ্ট ধারণা হ'ল, তুমি যেন তাকে দেখেছ? আমাকে তার কথা বল' না! সে কি খুব ভীষণভাবে আহত হয়েছিল?

আগন্তুক। সে কথা থাক্‌। কি লাভ তার কথা মনে করে, কিম্বা অন্য কারুর।

মেয়ে। সে কি জানতে পেরেছিল যে মৃত্যু শিয়রে!

আগন্তুক। না, সে অবকাশ সে পায় নি, আমরা কেউই জানতে পারি নি…আমিও সেই দলেই ছিলাম…তাদের মধ্যে একজন—

মেয়ে। সেও ঐ দলে ছিল, আমি যাকে—[নিজেকে সামলে নিয়ে] আমার একটি বন্ধু—

আগন্তুক। হ্যাঁ, তার বুকে গুলী লেগে সে মারা যায়!

মেয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে জানলে, যাকে আমি…

আগন্তুক। আমি তোমার ভাইকে জানতাম, সেই বলেছিল।

মেয়ে। বলেছিল? কি বলেছিল?

আগন্তুক। সে তোমার কথা আমায় বলেছিল।

মেয়ে। কিন্তু আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা; মানে, তারা কেউই জানতাম না যে আমরা, মানে এমন কি সেও জানত না যে আমি তাকে ভালবাসি।

আগন্তুক। জানত না? আমার কিন্তু মনে হয় সে জানত'—তোমার নাম লীলা, না?

মেয়ে। হ্যাঁ, তুমি কি তখন ছিলে যখন সে—

আগন্তুক। কিছুক্ষণের জন্যে…

মেয়ে। তারা তাকে খুঁজে পায়নি।

আগন্তুক। তাই কি তুমি এখানে আস, তার জন্যে?

মেয়ে। হ্যাঁ, তাকে কাছে পাব বলে, এখন এইটেই একমাত্র স্থান যেখানে তাকে খুব কাছে পাওয়া যায়।

আগন্তুক। এ ক'বছর তুমি তাকে ভুলে যাওনি?

মেয়ে। আমরা কেউ ভুলি, কেউ না। আমি তাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, আমি চেয়েছিলাম যেন সে নিরাপদে ফিরে আসে, চেয়েছিলাম কারণ বুঝেছিলাম দেরী হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম সে বুঝবে। নিজেকে যে ভালবাসা স্বীকার করে না, তারই অনুপ্রেরণায় লেখা অস্পষ্ট ভাষা…

আগন্তুক। চিঠি! সেখানকার কাদায় হাজার হাজার এমন চিঠি জীবন্ত সমাধি লাভ করেছে।

মেয়ে। আমার প্রায়ই মনে হয় সে আমার পাশে, খুব কাছে, যেমন…

আগন্তুক। হ্যাঁ, তারা আছে, সেই সব মানুষ, এই বিশাল স্মৃতি-মন্দিরের প্রস্তরে প্রস্তরে। সবাই হারিয়ে
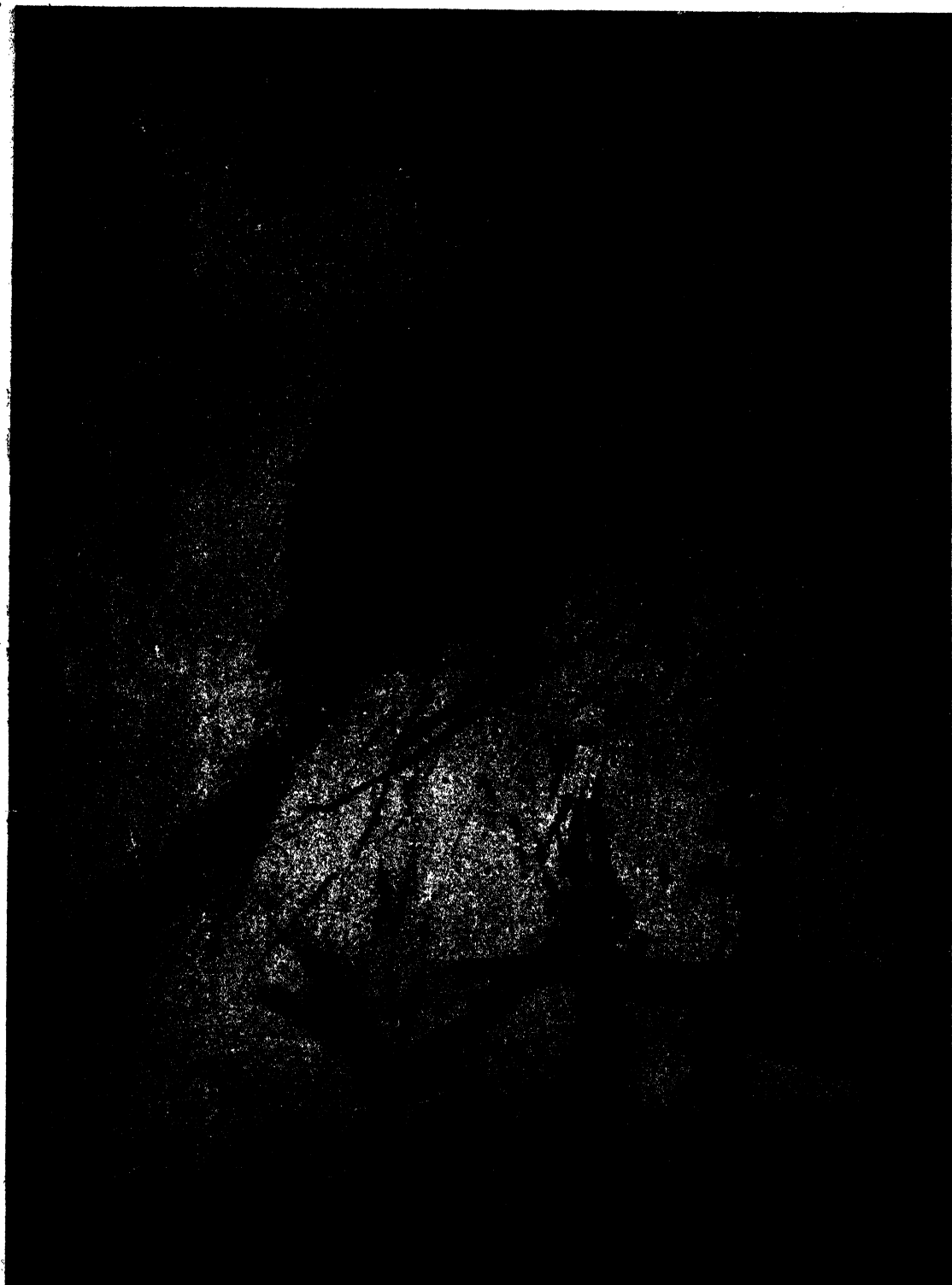
গেছে, কেউ ফিরে আসেনি, শুধু তোমার মতন কারো কারো আশা আজও তাদের খুঁজে বেড়ায়। হয় ত' কল্পনায় তাদের পায় ঠিক পাশটিতে···যেমন তুমি আজ পেয়েছ।

মেয়ে। তোমার কথায় তার কথা মনে পড়ছে... আমার পক্ষে কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি; যদি তাই হ'ত তাহ'লে আমার কথা তার মনকে গিয়ে আঘাত করত না।

আগন্তুক। হয় ত' সে অন্য কোন নামে সমাধিস্থ আছে।

মেয়ে। তা হ'ত না, যদি তাকে আমি বলতে পারতাম যে আমি এখানে আছি! [কি ভেবে] অন্য কোন নামে! হ্যাঁ, আমিও অন্য নামে তাকে ভালবাসা জানিয়েছিলাম। বড্ড বেশী কথা বলছি, না? হয় ত' রাত্রি, হয় ত' তুমি পাশে আছ তাই···

আগন্তুক। আমাদের এক ধর্ম্মযাজক বলতেন, মৃতের সঙ্গে যদি কথা বলা যায় তাহলে তারা পাশে দাঁড়িয়ে শোনে ···তুমি কি কখনও তা অনুভব করেছ?

মেয়ে। কল্পনায় তাদের চাপা আর্ত্তনাদ শুনেছি।

আগন্তুক। আমি তোমাকে রোজ দেখি কিন্তু কোনদিন বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু আজকে রাত্রে কি যেন হ'ল।

মেয়ে। কেন, আজকে রাত্রে কেন?

আগন্তুক। কাল থেকে তুমি হয় ত' আর আসবে না। তোমার ছায়া কাল থেকে আর দেখতে পাব না।

মেয়ে। তারপর? আমায় ভুলে যাবে?

আগন্তুক। আমি ভুলি না—কাউকে ভুলিনি—যাদের ভালবাসি তাদের সকলের ছায়া দেখি তা'র চোখে, যাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু তাকে যে ভালবাসতাম, যাবার আগে তা বুঝিনি। সেও জানত' না।

মেয়ে। সে কি তোমাকে ভালবাসত?

আগন্তুক। এখন জানি সে ভালবাসত—সেও একদিন জানবে যে আমিও তাকে ভালবাসতাম।

মেয়ে। তুমিও ঠিক আমার মতন। একজন ভালবাসে অন্যে তা জানে না···তারপর চিরনিস্তব্ধতা।

আগন্তুক। সে হয় ত' মনে মনে উপলব্ধি করেছিল? সব কথা কি বলতে হয়!

মেয়ে। স্মৃতিমন্দির। মৃত্যুর শূন্যময় স্মৃতি—তুমি মূর্ত্তিমান মৃত্যু—আমি জীবন। তুমি আগলে আছ মৃতদের স্মৃতি, আমি চাই তাতে বিলীন হ'তে। তুমি তাদের কতবার দেখেছ—আমি তাদের কল্পনা করেছি স্বপ্নে। আচ্ছা, যারা মৃত তারা কি সব বোঝে?

আগন্তুক। যারা জীবিত তারাই কি বোঝে?—যারা মৃত তারা জীবনের দিকে চেয়ে থাকে ঠিক এমনি ভাবে, যেমন ভাবে, যারা জীবিত তারা মৃতদের দিকে চায়। দু'দলের এই জানবার কৌতূহল উর্দ্ধগামী ঐ আলোর মতন ছুটে চলে, দূরে—বহুদূরে, কি যেন খুঁজে বেড়ায়। মৃতরাও তোমার মতন এমনি ভাবে, যারা জীবিত তাদের কথা জানতে চায়—শুনতে চায়···আমি তা জানি···তোমাদের জীবিতদের রাজ্যের ভাবনা যেমন মৃত্যুর দুয়ারে এসে থমকে দাঁড়ায়, এগিয়ে যাবার পথ পায় না—তেমনি এই মৃতদের ভাবনা জীবনের শেষ-ধাপের ঠিক ওপরটিতে থমকে দাঁড়ায়, নাবতে পারে না।

[দূরে ঘড়িতে বাজল রাত বারটা, অস্পষ্ট ভেসে এল তার শব্দ।]

জীবনের কাছে তারা যা' পায় মৃত্যুর-দেশে সেইটাই তাদের বেঁচে থাকবার অবলম্বন। তুমি চলে যেও না যেন, আমি আসছি।···জানি তুমি ভয়ানক ক্লান্ত···তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে···থেক—

[আগন্তুক চলে গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধা—সত্যের আলো সুদূর দিগন্তে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোথায় যেন কার হারান আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদছে···]

[ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ভারী বুটের শব্দ খট্ খট্ খট্, এসে দাঁড়ায় প্রহরী ঘুমন্ত মেয়েটির পাশটিতে।]

প্রহরী। এই কে শুয়ে এখানে?—এই···

মেয়ে। (ধড় মড়িয়ে উঠে বসে) আমি!

প্রহরী। যাও যাও বাড়ী যাও, অনেক রাত হয়েছে, বারটায় আমাদের গেট বন্ধ হয়—তারপরে এখানে আর কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। এখানে ঘুমোচ্ছ কেন? Surgent দেখলে পুলিশে দিত। তোমার ভাগ্য ভাল যে আমি দেখলাম।

মেয়ে। [আশ্চর্য্য হ'য়ে] ঘুমিয়েছিলাম! আমি কি অনেকক্ষণ আছি?

প্রহরী। তা বলতে পারি না। আমি এইমাত্র এলাম—এসে দেখলাম তুমি সিঁড়িতে ঘুমোচ্ছ—যাও বাড়ী যাও। তুমি না গেলে গেট বন্ধ করতে পারব না।

মেয়ে। সে কোথায় ?

প্রহরী। সে কে ?

মেয়ে। যে আমার সঙ্গে এত কথা ব'লছিল। [হাসতে হাসতে প্রহরী যাবার জন্যে পা বাড়াল]—যেও না, আমায় ব'লে যাও। আমায় বলতে হবে !

প্রহরী। কি বলতে হবে ?

মেয়ে। সে কোথায় ?—ঘণ্টার পর ঘণ্টা যার সঙ্গে গল্প করছিলাম এই সিঁড়িতে বসে।

প্রহরী। স্বপ্ন দেখছিলে—তোমাদের, মেয়েদের এখানে বেশীক্ষণ না থাকাই ভাল!—জায়গাটা ভাল নয়—নির্জ্জন আর তা ছাড়া মৃতদের আড্ডা—যাও বাড়ী যাও।

মেয়ে। আমি যে স্পষ্ট দেখলাম সে ঐ মন্দিরে গেল।

প্রহরী। ভুল।

মেয়ে। ভুল নয়—আমি যে তাকে এখন চিনতে পেরেছি—"সে"—বুঝতে পারছ না—"সে"—"সে" এসেছিল। সত্যি সত্যি "সে" এসেছিল—আমি তখন তাকে চিনতে পারি নি—কি রকম সব গুলিয়ে গিয়েছিল—"সে" গেছে ঐ মন্দিরে—আমি স্পষ্ট দেখেছি।

প্রহরী। এস, চলে এস—তুমি ক্ষেপে গেছ।

মেয়ে। না আমি যাব না, সে ঐখানে আছে।

প্রহরী। আছে—সে ঐখানেই আছে—আরও কত লোক ঐখানে আছে—ঠিক তারই মতন—চিরকাল থাকবে—মানুষের সভ্যতাকে ব্যঙ্গ ক'রে—

মেয়ে। হাঁ্যা তাই। সে ছিল, সে আছে, সে থাকবে।

[পাখী উড়ে বীভৎস চীৎকার করে, কে যেন অন্ধকার থেকে বললে]

হাঁ্যা, থাকবে—সবাই থাকবে, স্মৃতি-মন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সভ্যতাকে ব্যঙ্গ ক'রে—সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে…

["সত্যের আলো" তখন ছুটে চলেছে ওপর দিকে—"সত্যের আলো" পৌঁছোবে কি তার লক্ষ্যকেন্দ্রে ?]

বিদায়-বেলায়

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

সাগরপাড়ে ডুবল রবি—নাই তো সময় নাই,
আজকে আমি সবার কাছে বিদায় নিয়ে যাই।
কাজ ভাঙানো সন্ধ্যা বেলা
ভাঙ্‌লো আমার সকল খেলা
সাঁঝের বাতাস বয়ে ফেরে তাহার বেদনাই,
আমার যাবার সময় হল, তাইতো আমি যাই।

বন্ধু আমার, সাথী আমার, ওগো আমার প্রিয়
আজকে আমার বিদায় দিনে প্রীতি-প্রণাম নিও।
রেখে গেলাম বিদায় গীতি
বিদায় দিনের খানিক্ স্মৃতি
তার বদলে পারো যদি অশ্রু একটু দিও,
বন্ধু আমার, সাথী আমার, ওগো আমার প্রিয়।

রোজ সকালে উঠবে রবি শিরিষ গাছের শিরে,
সন্ধ্যা বেলায় এমনি আবার ডুব্‌বে সাগর তীরে,
এমনি ফুলের মুকুলগুলি
গাছের শাখে উঠবে দুলি
সন্ধ্যা হলে পাখীরা সব ফিরবে তাদের নীড়ে,
শুধুই আমি কখনো আর আসবো না গো ফিরে।

ডিঙি বেয়ে সাগর জলে অচিন দেশের নেয়ে
অমনি করে যাবে নিতি আনমনে গান গেয়ে,
সওদাগরের ডিঙিখানি
সাগরকূলে ভিড়বে জানি
শুধুই আমার ডিঙিখানি দেখবে না আর চেয়ে,
দেখবে শুধুই সাগর বুকে অচিন দেশের নেয়ে।

রইবে সবই ধরার বুকে শুধুই আমি ছাড়া,
বইবে বাতাস উধাও হয়ে অমনি বাঁধন হারা,
রাত পোহালে ভোরের পাখী
করবে নিতুই ডাকাডাকি
দিনের শেষে আকাশ কোণে উঠবে সাঁঝের তারা,
রইবে সবই যেমন আছে শুধুই আমি ছাড়া।

প্রিয়া, তোমার কাজের ফাঁকে এমনি দুপুর হবে,
নীড়হারা কোন উদাস পাখী ডাকবে করুণ রবে,
অলস দেহে এলো চুলে
মোর কবিতা বসবে খুলে
ক্ষণে ক্ষণেই আমার কথা তখন মনে হবে,
প্রিয়া আমি তোমার পাশে থাকবো নাকো যবে।

বন্ধু আমার, সাথী আমার, ওগো আমার প্রিয়,
চলার পথের ভুলগুলি সব ক্ষমা করে নিও,
দুঃখ যদি কারুর মনে
দিয়েই থাকি অকারণে
বিদায় বেলায় সে সব ভুলে প্রীতি আশীষ দিও,
বন্ধু আমার, সাথী আমার, ওগো আমার প্রিয়।

মুর্শিদাবাদের কথা

শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজদ্দৌলা

(রাজত্ব ১৭৪১-১৭৫৬ খ্রীঃ)

আলিবর্দ্দী খাঁ মির্জ্জা মহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র। মির্জ্জা মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বতন নবাব সুজাউদ্দিনের এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের দুইটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ হাজী আহম্মদ এবং কনিষ্ঠ মির্জ্জা মহম্মদ আলি (আলিবর্দ্দী খাঁ)। হাজী দিল্লীর সম্রাটের জহরৎ রক্ষক ছিলেন। গিরিয়া সমরে মুর্শিদকুলিখাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজখাঁকে পরাজিত করিয়া ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আলিবর্দ্দীখাঁ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ প্রাপ্ত হন। গিরিয়া সমরে নবাব সরফরাজ নিহত হওয়ায় আলিবর্দ্দী স্বীয় অপরাধের জন্য সরফরাজ জননী জিন্নেতুন্নেসা বেগমের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন, কিন্তু জিন্নেতুন্নেসা নবাব আলিবর্দ্দীর কথায় উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লন, তথাপি আলিবর্দ্দী সরফরাজ পরিবারের প্রতি কোনদিন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আলিবর্দ্দী অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির প্রজাবৎসল নবাব ছিলেন। তিনি নিজের উদার ব্যবহারে শত্রু মিত্র সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ সরুফন্নেসা নামক এক সাধ্বী সতীকে বিবাহ করেন। এই উদারচেতা রমণীরত্না সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গিনী। ইঁহার সুপরামর্শে অনেক সময় নবাব অনেক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

যুদ্ধ বিগ্রহ

আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালে সরফরাজখাঁর ভগ্নীপতি সুজা খাঁর জামাতা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ (জগৎ শেঠের অনুরোধে সম্রাট্ মুর্শিদকুলি খাঁকে নবাবী প্রদান করেন) আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বালেশ্বরের নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। প্রধান সেনাপতি আবদ আলির বিশ্বাসঘাতকতায় মুর্শিদ যুদ্ধে হারিয়া সপরিবারে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। যুদ্ধাবসানে আলিবর্দ্দী বুদ্ধি কুশলতায় উড়িষ্যা প্রদেশকে শান্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন।

বর্গীর হাঙ্গামা

আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে দিল্লীর বাদশাহের শক্তি ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে এক পার্ব্বত্য হিন্দু মহারাষ্ট্র জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহারাই বর্গী নামে পরিচিত। বর্গীরা দলে দলে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুক্ত অসিকরে উত্তর ভারতে ইতস্ততঃ লুঠ তরাজ আরম্ভ করিল। পরে বঙ্গদেশের প্রতি ইহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী এবং মুর্শিদাবাদের আশেপাশে ইহারা ব্যাপক অত্যাচার সুরু করিল। মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচারই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে খ্যাত। আলিবর্দ্দী খাঁ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় রঘুজী ভোসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সেনাদলের সহিত বহরমপুর ও সারগাছির মধ্যস্থিত "মনকরা" প্রান্তরে আলিবর্দ্দীর সেনাদলের যুদ্ধের উদ্যোগ হয়। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বেই আলিবর্দ্দী কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ শিবিরে আনিয়া হত্যা করেন। ইহার ফলে মহারাষ্ট্র দল যদ্যপি ঐ সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, তথাপি ইহারা উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী একবার বর্গীর আক্রমণে বিব্রত হইয়া মহারাষ্ট্র বালাজিরাও ও এই ভাস্করের দলকে বহু অর্থদানে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্থ পাইয়াও ইহারা এ-স্থান হইতে একেবারে চলিয়া যায় নাই, সুবিধা পাইলেই আক্রমণ করিত।

মুস্তাফা খাঁর বিদ্রোহ

১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে আলিবর্দ্দীর সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ রাজ্য লোভে প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে পরাজিত হইয়া মুস্তাফা বর্গী দলে যোগ দেয়। ভাস্কর হত্যার সংবাদ পাইয়া ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে রঘুসিং আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রঘুসিং নবাবকে বিশেষ বিব্রত করিয়া তোলে। বর্গীর অত্যাচারে বাঙ্গালা শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়।

নিরুপায় হইয়া আলিবর্দ্দী দেশের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়া ভগ্নীপতি মীরজাফর খাঁকে সেনাপতিরূপে ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় মহারাষ্ট্র দমনে প্রেরণ করেন।

সমসের খাঁর বিদ্রোহ

অব্যবহিত সময়ে সুযোগ বুঝিয়া বিহার শাসনকর্ত্তা সমসের খাঁ এবং অপর আফগান জায়গীরদারগণ আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দিনকে বধ করাইয়া নবাবের অগ্রজ হাজী আহম্মদ এবং নবাব কন্যা আমিনাকে বন্দী করিয়া বিহার করতলগত করেন। এই সংবাদে আলিবর্দ্দী ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদল লইয়া শত্রু দমনে বিহার যাত্রা করিলেন। পথে পুনরায় মহারাষ্ট্র দল আক্রমণ করে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। পাটনার অন্তর্গত "বারে" উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সমসের পরাজিত ও নিহত হইলেন।

আতাউল্লা ও মীরজাফরের চক্রান্ত

কটকে যাইয়া মীরজাফর মহারাষ্ট্র দমনের কথা ভুলিয়া যৌবন তরঙ্গে দোল খাইতে লাগিলেন। বিহার হইতে ফিরিয়া আলিবর্দ্দীর এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র আত্মীয় আতাউল্লাকে মীরজাফরের সাহায্যে উড়িষ্যা পাঠাইলেন কিন্তু ফল বিপরীত হইল। আতাউল্লা মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। অবশেষে উভয়েই পরাজিত হইয়া নবাবের নিকটে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রদিগকে কটকের বাহিরে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু ইহার পর হঠাৎ একদিন মহারাষ্ট্রদল কটক অধিকার করিয়া বসিল। কোন প্রকারে মহারাষ্ট্র দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে এক চুক্তিতে নবাব মহারাষ্ট্রদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিলেন এবং দ্বিতীয় চুক্তিতে বঙ্গদেশ হইতে বার লক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। এইবার বর্গীদল শান্ত হইল। আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রদমনে নিজেকে বিশেষ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন সেই সুযোগে ইংরেজেরা কাশীমবাজার কুঠীরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাঁথিয়া দ্বারদেশে কামান সাজাইয়া কুঠীরটিকে একটি ক্ষুদ্রকার দুর্গে পরিণত করিয়া ফেলেন।

চরিত্র :—আলিবর্দ্দীর চরিত্র মুর্শিদকুলিখাঁর চরিত্রের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। ইনিও প্রজাবৎসল, চরিত্রবান ও কর্ম্মদক্ষ নবাব ছিলেন। ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমান চক্ষে দেখিতেন। মুর্শিদ যদিও বা অর্থের জন্য জমিদারদের প্রতি কখন কখন উৎপীড়ন করিতেন, কিন্তু আলিবর্দ্দীর চরিত্রে এ সামান্য কলঙ্কও স্পর্শ করে নাই। তবে ইহাই অতীব দুঃখের বিষয় যে মসনদ অধিকার করা অবধি নবাব আলিবর্দ্দী একটি দিনও নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাইতে পারেন নাই।

শেষজীবনে শোথ রোগে ভুগিয়া নবাব আবিবর্দ্দী ৮০ বৎসর বয়সে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ইহধাম পরিত্যাগ করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর তিনটীমাত্র কন্যা ছিল।* ইঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। এই তিন কন্যার সহিত স্বীয় অগ্রজ হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের বিবাহ দেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটীর সহিত নোয়াজেস মহম্মদ, মধ্যমার সহিত সাইয়েদ আহাম্মদ ও কনিষ্ঠা আমিনার সহিত জয়েনউদ্দিনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিন জামাতাকে নবাব তিন প্রদেশের (নোয়াজেসকে ঢাকা, সাইয়েদ আহাম্মদকে পূর্ণিয়া, এবং জয়েনউদ্দিনকে পাটনা) শাসনভার প্রদান করেন। আমিনার পুত্র মির্জ্জামহম্মদকে (সিরাজদ্দৌলাকে) আলিবর্দ্দী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মাতামহের পরলোক গমনের পর আলিবর্দ্দীর নয়ন নিধি সিরাজ বাংলা-মসনদে অভিষিক্ত হন। পরলোকগত নবাব আলিবর্দ্দীর নশ্বর দেহ খোসবাগ সমাধি-মন্দিরে † স্বীয় জননীর ক্রোড়পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নবাব আলিবর্দ্দীর উপাধি হইয়াছিল সুজাউল্-

*আলিবর্দ্দীর কয়টি কন্যা, ইহা লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়টি ছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে চাহেন না। মুতাক্ষরীণে পাওয়া যায়, আলিবর্দ্দীর তিন কন্যা। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "নবাবী আমলে বাংলার ইতিহাস" নামক পুস্তকে বলেন, আলিবর্দ্দীর কন্যা ছিল দুইটী। আবার আর্ম্মি বলেন, নবাব আলিবর্দ্দীর মাত্র একটী কন্যা।

† নবাব আলিবর্দ্দী নিজ জননীর সমাধির জন্য এই খোসবাগ সমাধি-মন্দিরের সৃষ্টি করেন, তিনি ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নবাবগঞ্জ এবং ভাণ্ডারদহের আয় হইতে ৩০৫্ টাকা ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার স্বাধীন নবাবের সমাধি-মন্দিরে সান্ধ্যদীপ জ্বালিবার জন্য বর্ত্তমানে মাসিক মাত্র চারি আনার তৈলের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মুলক (বঙ্গবীর) হেসামুদ্দৌলা মহবৎজঙ্গ (রাজ্যের কৃপান ও নায়ক)।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

(রাজত্ব ১৭৫৬ খ্রীঃ, এপ্রিল—১৭৫৭ খ্রীঃ, জুন)

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যে সময় বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হন, সেই শুভক্ষণে আমিনার গর্ভে ১৭৩০ খৃঃ অব্দে মির্জ্জা মহম্মদের (সিরাজদ্দৌলার) জন্ম হয়; সিরাজের পিতার নাম জয়েনউদ্দিন। উক্ত উৎসবের শুভদিনে নবজাত দৌহিত্রকে আলিবর্দ্দী পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শিশুই উত্তর-কালে যৌবনের প্রথম লগ্নে মাতামহের পরলোকগমনের পর নবাব নাজিম সিরাজদ্দৌলা নামে বঙ্গ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অপুত্রক স্নেহবৎসল মাতামহের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের ফলে এবং প্রথম জীবনে সর্ব্বদা অসৎ চরিত্রের পরিষদবর্গ পরিবেষ্টিত থাকায় সিরাজ কিঞ্চিৎ অসংযমী হইয়া পড়েন। কিন্তু বলা বাহুল্য মসনদের গুরুভার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবার পর সিরাজ-চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

প্রথমজীবন - সিরাজের বাল্যজীবনে আলিবর্দ্দী খাঁকে বঙ্গে বর্গী দমনে বিশেষ ব্যস্ত দেখিয়া আফগান জায়গীরদারগণ নজরানা লইবার ছলে পাটনায় আসিয়া সিরাজের পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া পিতামহ এবং মাতা আমিনাকে বন্দী করেন। ১৭ দিন কারাযন্ত্রনা ভোগ করিয়া হাজি আহম্মদ মারা যান। প্রিয় জনের এই প্রকার দুরবস্থার কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র বালক সিরাজ ক্ষিপ্ত শার্দ্দুলের ন্যায় শত্রুদমনে মাতামহের সহিত পাটনায় যাইয়া আফগানদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং জননীর বন্ধন মোচন করেন। আফগানদিগকে বিহার হইতে বিতাড়িত করিয়া আলিবর্দ্দী মহাসমারোহে বীর বালক সিরাজকে পাটনার মসনদে বসাইয়া তাঁহার (সিরাজের) কার্য্যের সহায়তার জন্য জানকীরামকে বিহারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া নয়নানিধি সিরাজকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল মধ্যেই আলিবর্দ্দীকে পুনরায় মারহাট্টা যুদ্ধে মেদিনীপুর যাইতে হয়, এই সময় অসৎ পারিষদেরা মাতামহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সিরাজকে পরামর্শ দেয়। সেনাপতি মেহেদিনেসার কুপরামর্শে সিরাজ আলিবর্দ্দীর নিকট ফরাসী ভাষায় উত্তেজনা পূর্ণ এক পত্র লিখিয়া জননী এবং পত্নী লুৎফুন্নেসাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ ৮০ মাইল পথ চলিতে পারে এইরূপ এক গো-যানে চড়িয়া সেনাপতি মেহেদিনেসার খাঁর সহিত পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনায় জানকীরামের সহিত অসদ্ব্যবহারের ফলে মেহেদিনেসা হত হইল, মাতামহের নামে সিরাজ রক্ষা পাইয়া গেলেন, আলিবর্দ্দী পাটনায় আসিয়া সিরাজকে অনেক বুঝাইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া পাঠাইয়া পুনরায় মেদিনীপুরে রওনা হইলেন।

হোসেন কুলী হত্যা—সিরাজের পিতৃব্য নোয়াজেস মহম্মদের সহকারী হোসেনকুলী খাঁ সিরাজ-জননীকে কুপথ গামিনী করায় মাতামহের জীবিতকালেই সিরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া হোসেন কুলীর ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দেন।*

১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে সিরাজ মাতামহ কর্ত্তৃক হুগলীতে প্রেরিত হইয়া ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকদিগের নিকট নানা প্রকার উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হন।

হীরাঝিল—ভোগবিলাসী সিরাজের পক্ষে বৃদ্ধ মাতামহের সহিত এক প্রাসাদে বাস করা কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়া পড়ায় সিরাজ স্থানান্তরে একটি সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া মাতামহের নিকট আবদার করিয়া বসিলেন। সিরাজের প্রস্তাবে আলিবর্দ্দী দ্বিরুক্তি করিলেন না। ভাহা-পাড়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে (বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জের অপর পারে) একটি কৃত্রিম হ্রদ খনন করাইয়া তাহার পার্শ্বে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া সিরাজের কারুকার্য্য শোভিত সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। নিজ নামানুসারে সিরাজ মনসুরগঞ্জ নামে এখানে একটি গঞ্জ (বাজার) স্থাপন করিলেন। হীরাঝিলের এই প্রমোদ ভবন মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ নামে ইতিহাস পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করে। সিরাজ এই প্রাসাদে আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীর জীবিতকালে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ রক্ষণের জন্য জমিদারদিগের নিকট হইতে এক কর আদায় সুরু হয় কিন্তু ঐ কর শেষে নজরানার পরিবর্ত্তিত হয়। নজরানার পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা হইতে বাৎসরিক আয় দাঁড়ায় ৫০১৫৯৭৲ টাকা।

---

* মুতাক্ষরীণ বলেন—মাতামহের আদেশে এবং মাতামহীর উত্তেজনায় ও নোয়াজেস মহম্মদের সম্মতিক্রমে সিরাজ হোসেন কুলীকে হত্যা করান।

একবার এই মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজ নবাব আলিবর্দ্দীকে আমন্ত্রণ করিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা দাবী করিয়া বসেন। অবশেষে মাতামহ দৌহিত্রের দাবী পূরণ করিলে সিরাজ তাঁহাকে মুক্তি দেন। ইহার পর দেখিতে দেখিতে সিরাজের সুখের দিন ফুরাইল। আলিবর্দ্দী পরলোকগমন করিলেন। মুর্শিদাবাদ মসনদ প্রাপ্ত হইয়া হীরাঝিল প্রাসাদেই সিরাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন *।

আলিবর্দ্দীর অন্তিমশয্যায় সিরাজ—অন্তিমশয্যায় আলিবর্দ্দী সিরাজকে নিকটে ডাকিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, "দাদু, তোমার তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তায় কতরাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়েছি। হোসেনকুলীর প্রতিপত্তি তোমার ভবিষ্যৎ পথ সুগম হতে দিত না। মাণিকচাঁদ তোমার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াত; সেই বিবেচনায় তাকে বৃহৎ অট্টালিকা দানে তুষ্ট করেছি। বৃদ্ধের শেষ অনুরোধ—ইংরেজের সঙ্গে বেশ একটু বিবেচনা করে চলবে, তাদের গতি লক্ষ্য রাখবে আর তাদেরকে দুর্গ নির্ম্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ ক'রতে দেবে না। † বিলাস পরিত্যাগ কর, রাজকার্য্যে দৃষ্টি রেখো, সুরাপান কোর না।" বলাবাহুল্য মাতামহের শেষ উপদেশে সিরাজ নিজের সমস্ত ভুল বুঝিতে পারিলেন। এই দিন হইতেই সিরাজ চিরদিনের জন্য সুরাপাত্র পরিত্যাগ করিলেন। ‡ ক্রমে তাঁহার চরিত্র-স্রোত নির্ম্মলগতি ধারণ করিল; নবাব সিরাজদ্দৌলা সংযমী, ধার্ম্মিক, রাজনীতিজ্ঞ ও বন্ধুবৎসল হইলেন।

সিরাজ ও ইংরেজ কোম্পানী—মনসুরগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইয়া সিরাজ দেখিলেন বৈদেশিকের বানিজ্যে দেশীয় শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। য়ুরোপীয় বণিকে দেশ ছাইয়া যাওয়ায় দেশের টাকা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমারগণের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার উপায় ছিল না, কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর বিনা শুল্কে জলে স্থলে বাণিজ্য করিবার বাদশাহি ফরমান থাকায় দেশীয় বণিকদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহা ছাড়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও আপন আপন স্বার্থে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই কারণে সিরাজ ইংরেজদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। আলিবর্দ্দীর শেষ জীবনে ইংরেজ ও ফরাসীতে য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলিকাতার দুর্গ সংস্কার এবং সৈন্যদল গঠনে সচেষ্ট হইলেন। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিল আর বাঙ্গালা দেশে দুর্গ সংস্কার আরম্ভ হইল দেখিয়া কোম্পানীর ভাবগতিকে সিরাজ বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী শেষ সময় সিরাজকে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময় নবাব সরকারের রাজবল্লভ § গুপ্ত শত্রুতা করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নবাব সরকারের অনেক গোপনীয় কথা কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির গোমস্তা ওয়াট্‌স্ সাহেবের নিকট ফাঁস করিয়া দিতে লাগিলেন। ওয়াট্‌স সাহেবের নবাব দরবারের তথ্য প্রতিনিয়তই কলিকাতায় ইংরেজ-গভর্ণরের নিকট পাঠাইতে কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা হয়। অপরদিকে রাজবল্লভেরও ইংরেজ কোম্পানীতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়া উঠে। রাজবল্লভের এইপ্রকার ব্যবহার সিরাজের কর্ণগোচর হইতে বাকী থাকিল না।

* "মসনদ অব্ মুর্শিদাবাদ"-এর ২০৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায় মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ এতই বড় ছিল যে, একস্থানে তিনজন য়ুরোপীয় নৃপতি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বা হীরাঝিলের চিহ্নমাত্র নাই। উহা ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

† Ive's Journal,

‡ বিশেষ বিবরণ—অক্ষয় মৈত্র মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা, ১০২ পৃষ্ঠা

§ রাজবল্লভ দুর্লভ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মতিঝিলের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ঢাকার শাসনকর্ত্তা নোয়াজেস মহম্মদের প্রতিনিধি ছিলেন। রাজবল্লভ ঢাকা হইতে মতিঝিলে নোয়াজেসকে রাজকর পাঠাইতেন। আলিবর্দ্দীর বৃদ্ধ অবস্থায় ইনি পুত্র কৃষ্ণবল্লভের হস্তে ঢাকার রাজভাণ্ডার সমর্পণ করিয়া নোয়াজেসের সহায়তা করিতে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। সিরাজের রাজত্বকালে রাজবল্লভ পিতার সাহায্যে নবাব সরকারের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন; ইংরেজদিগকে ইহারা পিতা পুত্রে বিশেষ সাহায্য করায় ক্লাইভ ইহাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সাহিত্য, ষষ্ঠ বর্ষ, ৬৭৯ পৃষ্ঠা

প্রাচীন ভারতের সমর ও সমরাস্ত্র

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আবহমানকাল হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এই পৃথিবীর বুকে আসন পাতিয়াছে। কত কত অভিযান, বিপুল সেনাবাহিনী ও বিস্ময়কর মারণাস্ত্র এই ধরণীকে রুধিরসিক্ত ও ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আদি-জননী এই ভারতবর্ষেও কত কত সমরাঙ্গণের সৃষ্টি হইয়াছে। বীরগণ যৌবনের একমাত্র সম্পৎ তরল উষ্ণ শোণিত দান করিয়াও অরাতি বধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। বীরত্বের সাথে প্রতিভার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল। তাহার ফলে নূতন নূতন অস্ত্র-শস্ত্র ও সমর কৌশলের জন্ম হইয়াছিল। অবশ্য নীতির দিক দিয়া প্রাচীনকালের যুদ্ধের সহিত বর্ত্তমানকালের যুদ্ধের সহিত ঢের তফাৎ। আর বর্ত্তমানকালের যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের দুই দুইটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ ছাড়াও দেবাসুরের অনেক যুদ্ধের কাহিনী আমরা পুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। চণ্ডীতেও দেখি, মহাদেবী শত্রুনিধনের জন্য স্বয়ং রণরঙ্গে মাতিয়াছেন। অসুরদের সাথে লড়াই করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত কত বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আমরা প্রাচীন ভারতের সমর ও সমরাস্ত্র সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতের অস্ত্র-শস্ত্রের উল্লেখ ধনুর্ব্বেদেই পাওয়া যায়। ধনুর্ব্বেদের গুরু ব্রাহ্মণ। রথ, গজ, অশ্ব, পত্তি এবং যোধ—এই পাঁচটী হইল 'পঞ্চবল'। আয়ুধ মোটামুটি ৫ প্রকার যথা, (১) যন্ত্রমুক্ত ক্ষেপনী ও চাপযন্ত্র যাহা নিক্ষিপ্ত হয়, যেমন পাষাণ ও শর, (২) হস্তমুক্ত শূল, ত্রিশূল ইত্যাদি (৩) মুক্ত অমুক্ত অর্থাৎ প্রয়োগের পর যাহা প্রতিসংহার করিতে পারা যায়, যেমন কুন্ত (কোঁচ) প্রভৃতি, (৪) অমুক্ত—অসি, খড়্গাদি, (৫) হস্তপদাদি। তখন বাহুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হইত। খড়্গাযুদ্ধ ছিল অধম। ধনুর্ব্বেদই ছিল শ্রেষ্ঠ। কারণ, দূর হইতে শত্রুবধ করা যাইত। ধনুর্গ্রহণ, জ্যা আরোপণ, শর যোজন ইত্যাদি আয়ত্ত করা বিলক্ষণ কষ্ট-সাধ্য ছিল। তখন শিক্ষার্থীকে কঠোর সাধনা করিতে হইত। অস্ত্র ও শস্ত্রে পার্থক্য আছে। শুক্রনীতি অনুসারে মন্ত্র, যন্ত্র, অগ্নিদ্বারা যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহা অস্ত্র; তদ্ভিন্ন খড়্গা, কুণ্ড প্রভৃতি শস্ত্র। অস্ত্রের আবার বিভিন্ন শ্রেণী আছে, যথা, দিব্য, আসুর, মানব, মান্ত্রিক, যান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র উত্তম ও নালিকাস্ত্র মধ্যম এবং শস্ত্র প্রয়োগের স্থান তার পরেই। শুক্রের নালিকাস্ত্র বন্দুক।

তখন পাশ বৃত্তাকারে মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া চর্ম্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করা হইত। অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগের বহুনিয়ম ও বহুশ্রেণী বিভাগ ছিল। খড়্গা ও চর্ম্ম ধারণ ৩২ প্রকার, পাশ ধারণ ১১ প্রকার, শূল কর্ম্ম ৫ প্রকার, চক্রকর্ম্ম ৭ প্রকার, মুদ্গার কর্ম্ম ৫ প্রকার, গদা কর্ম্ম ৩২ প্রকার, ভিন্দি পাল ও লগুড় ৪ প্রকার, কৃপাণ কর্ম্ম ৭ প্রকার, বজ্র কর্ম্ম ৪ প্রকার ও বহুযুদ্ধ ৩৪ প্রকারের। তখনকার যুদ্ধে রথ ও গজের খুব প্রাধান্য ছিল। কালক্রমে অবশ্য গজের হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অশ্ব, অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন ধানুষ্ক এবং ধানুষ্ক রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

ধনু ছিল ৩ প্রকারের :—লোহ, শৃঙ্গ এবং দারু। তামা বা ইস্পাৎ নির্ম্মিত ধনু লৌহ ধনু। মহিষ বা মৃগ শৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনু শাঙ্গধনু। চন্দনবৃক্ষ, বেতস, সাল প্রভৃতি নির্ম্মিত ধনু দারুধনু। ধনুর জ্যা তৈরী করা হইত বংশ, ভঙ্গ ও চর্ম্মদ্বারা। প্রাচীনকালে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রই তৈলদ্বারা ধৌত করা হইত। সেই সময় গজ, অশ্ব, রথ, প্রভৃতির সম্বন্ধে নিপুণ শিক্ষা দেওয়া হইত।

যুদ্ধ যাত্রার একটা সুনির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। মহারাজ মনুর মতে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা বিধেয়। রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসেই সংঘটিত হইয়াছিল। চতুরঙ্গ সেনার উল্লেখ অনেক জায়গায়ই পাওয়া যায়। বর্ষাকালে পদাতিক ও গজারোহীসেনা, হেমন্তে রথ ও অশ্বসেনা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে চতুরঙ্গ সেনা নিয়োগ করাই তখনকার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। বিপুল পদাতিক সৈন্যই শত্রুজয় করে, এই ধারণা তখনকার যোদ্ধারা পোষণ করিতেন। প্রাচীনকালে রাজন্যবর্গ দিগ্বিজয়ের বাসনায়

ষড়বিধ বলের ব্যূহরচনা করিয়া যথাবিধি দেবতার অর্চনা পূর্ব্বক যুদ্ধে বাহির হইতেন। বলাধ্যক্ষ (প্রধান নায়ক) বীর যোদ্ধৃবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রে গমন করিতেন। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও আটবিক সৈন্যরা সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকিত এবং পশ্চাৎ থাকিতেন সেনাপতি মহাশয়। মৌল (সদ্বংশজাত পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত), ভৃত (বেতনপ্রাপ্ত), শ্রেণী (যুদ্ধকর্ম্ম সুনিপুণ, কিন্তু স্বাধীন), সুহৃৎ (মিত্র রাজার), দ্বিষৎ (শত্রুর সেনা বা শিবির হইতে পলায়িত) ও আটবিক (অরণ্যপ্রদেশের অশিক্ষিত পার্ব্বত্য সৈন্য; ইহারা খুব বিক্রমশালী ও যোদ্ধা)—এই ছয় প্রকার সৈন্য ষড়্‌বল বলিয়া অভিহিত হয়। এই সব সৈন্য সব সময় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। তখন সমরাঙ্গণে বা যুদ্ধ শিবিরে রাণীরাও গমন করিতেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সৈন্যদের সাথে অনেক বেশ্যা গমন করিয়াছিল সুরা আসব প্রচুর পরিমাণে থাকিত। নারীরা সৈন্যদের রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইতেন। সম্মুখে, পশ্চাৎ ও পার্শ্বে কিরূপ সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে উহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল। সকল দিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিতে হইত। ব্যূহ দুই প্রকারের ছিল—প্রাণীর অঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ। সকল প্রকার ব্যূহ রচনাতেই পাঁচ স্থানে সেনানী সন্নিবেশ করার কথা আছে। নৃপতির স্বয়ং ব্যূহ রচনা বা যুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। সেনানীবৃন্দের পশ্চাতে একক্রোশ দূরে রাজা অবস্থান করিতেন। অগ্রে চর্ম্মী, তারপর ধন্বী, অশ্ব, রথ, গজ পর্য্যায়ক্রমে পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিত। শত্রুর ভেদ, নিজের সৈন্যের রক্ষা, প্রভৃতি চর্ম্মীর কর্ম্ম। যুদ্ধে বিমুখী করণ, সমষ্টিভূত শত্রুসৈন্যের দূরে অপসারণ, ও ক্ষিপ্রগতিতে গমন ধন্বীর কাজ। শত্রুসৈন্যের ত্রাসন হইল রথীর কাজ। সংহতের ভেদন, ভিন্ন সৈন্যের সংহতি, প্রাকার দুর্গ, তোরণ প্রভৃতিতে শত্রু লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিতে পারে এমন গুপ্ত স্থানের বিনাশ ও সুবিশাল বৃক্ষ সমূহের উৎপাটন হইল গজকর্ম্ম। শত্রু সৈন্যের মধ্যে যাহাতে একটা মহাত্রাসের সঞ্চার হয়, তাহাদের মধ্যে মোহ ও ভীতি জন্মে এইজন্য ধূম্রকুণ্ডলীর সৃষ্টি করা হইত। ধূপ-ধুনা খুব পোড়ান হইত এবং ধ্বজা পতাকা নিয়া প্রলয়ঙ্কর বাদ্যভাণ্ডের সৃষ্টি করা হইত। শত্রু যখন হীনবল, অসমর্থ বা অসাবধান তখন আক্রমণ করার নাম কূটযুদ্ধ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইত। খুব কম স্থানেই উহার প্রয়োগ হইত। ক্লান্ত বা নিদ্রিত শত্রুকে বধ করা অন্যায় যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। শত্রুকে বিষমিশ্রিত অস্ত্রদ্বারা বধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষ-দিগ্ধ বাণ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। এইগুলি ন্যায়যুদ্ধের সংজ্ঞায় পড়িত না। এইসব প্রয়োগকারী যোদ্ধা কীর্ত্তি অপেক্ষা অকীর্ত্তিই অর্জ্জন করিতেন বেশী। পদাতির মধ্যে যাহারা যুদ্ধবিহীনাবস্থায় থাকিত তাহাদের কাজ ছিল নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করা, বিশাল বিশাল পথঘাট বাঁধা, কূপ খনন এবং গজ ও অশ্বাদির আহার্য্য সংগ্রহ করা। 'ভোগব্যূহ' বলিয়া একপ্রকার ব্যূহ কল্পনা ছিল। ভোগ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে চলিত বলিয়া উহার নাম ভোগব্যূহ

স্মরণাতীত কাল হইতেই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকারেই রাজ্যশাসন চলিয়া আসিয়াছে। সাধু ও শিষ্টজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি পৌরুষ ও বীর্য্যবত্তা সহকারে দান, পরস্পর ভীত ও সংহতের প্রতি ভেদ এবং এই তিন শ্রেণীর উপায় অবলম্বন করিয়াও যে অদম্য শত্রু তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগই তখনকার দিনের রাজনীতিকদের মত। ইহা ব্যতীত উপেক্ষা, মায়া, ইন্দ্রজাল বলিয়া তিন প্রকারের উপায়ও গ্রহণযোগ্য ছিল। নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজী দ্বারা শত্রুকে উদ্বেজন করা হইত। অনেক সময় নানাবিধ কুহক (যাদু) দ্বারা শত্রুপক্ষকে ভয় দেখান হইত যে, দেবতারা চতুরঙ্গ বলে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। স্তম্ভমধ্যে দেবতার বেশে থাকিয়া, নিশাকালে পুরুষ রমণীবস্ত্র পরিধান করিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন দ্বারা শত্রুসৈন্যের মধ্যে ভীতি বিহ্বল-ভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হইত। যক্ষ, বেতাল, পিশাচ ও দেবতার রূপ ধারণ এইগুলি মানুষী মায়া। ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার রূপধারণ, অস্ত্র-শস্ত্র-মেঘ-অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-বৃষ্টি-অগ্নি প্রদর্শন দ্বারা মায়াজাল বিস্তার করিয়া শত্রুর ভয়ের চেষ্টা বিধানও অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। প্রাচীন ভারতে বন্দুক-কামানের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। খ-ধূপ (হাউই) জানা ছিল। তখন দৈববলও ছিল যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই বীরত্ব ও পৌরুষেরই প্রশংসা করা হইত।

তখন চতুর্ব্বল ব্যতীত নৌ-বলও ছিল। কারণ, নদীবহুল স্থানে নৌ-সেনা আবশ্যক হইত। যেমন, পূর্ব্ববঙ্গে রথভূমি নাই, কাজেই নৌ-বহর আবশ্যক। বর্ত্তমানকালের মহাবীর হিটলারও নাকি রণস্থলে অভিযান চালাইবার পূর্ব্বে শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার নাকি জ্যোতিষী পণ্ডিতও অনেক আছে। সেইকালে ভারতের রাজন্যবর্গ বিজয়াদশমীর দিন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন এবং পবিত্র মুহূর্ত্তে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন।

প্রাচীন যুগে ধনু ছিল প্রধান অস্ত্র। শিবের ধনু ছিল ৫॥০ হাত। শ্রীবিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের ৩॥০ হাত। ধনুর শরের জন্য শরৎকালে পূর্ণগ্রন্থি, সুপক্ক, পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, বর্ত্তুল, ঋজু শরগাছ আহরণ করা হইত। যে শরগাছের ঝাড়ে স্বাতি নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয় এবং তাহার মূলে বিষ উৎপন্ন হয়। বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত না হইলেও উহা কাঁপিতে থাকে। এইরূপ ঝাড়ের মূল শরের ফলে লেপন করিলে, তদ্দ্বারা ক্ষত স্থানের চিহ্ন থাকিয়া যায়। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। শরের লক্ষ্য ৪ প্রকার যথা, স্থির, চল, চলাচল, দ্বয়চল। সাতটি দিব্যাস্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদের নাম:—ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড, ব্রহ্মশির, পাশুপত, বায়ব্য, আগ্নেয় ও নরসিংহ। তখন সৈন্যদের শিক্ষাপ্রণালী ছিল চমৎকার। সৈন্যেরা শিক্ষার্থী অবস্থায় প্রথম শিখিতেন ক্ষাত্রকোষ ব্যাকরণ সূত্র, মনুর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরার ব্যবহার অধ্যায়, জয়ার্ণবতন্ত্র, বিষ্ণুযামল, বিজয়োত্থাতন্ত্র, স্বরশাস্ত্র ও সর্ব্বশেষে ধনুর্ব্বেদ। ভাবিয়া দেখুন, যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগকে কত কিছু শিখিতে হইত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বিদ্যানুশীলন কত ব্যাপক ও গভীর ছিল। বাণের মধ্যে নারাচ, নালীক, শতঘ্ন এই তিন এরই উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। শতঘ্নী মারণাস্ত্র দুর্গপ্রাকারের উপর স্থাপিত হইত—কামানের মত। প্রাচীন সমরে কামানের ব্যবহার দেখা যায় না। ইহার উদ্ভাবনা ও ব্যবহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। বন্দুক-কামানের উদ্ভাবনাও হইয়াছিল এই ভারতবর্ষেই। উহা খুব সম্ভবতঃ সপ্তম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে। একপ্রকার বাণ ছিল উহার রঞ্জক-নালিকা বদ্ধ করিয়া বায়ুমুখে নিক্ষেপ করিলে সেই বাণ ঘুরিয়া আসিত। উহার নাম ছিল খগবান। ইহা হইতেই বন্দুকের নাম হইয়াছে নালীকাস্ত্র। তবে উহা বলা অশোভন বা অসঙ্গত হইবে না যে, বন্দুকের আবিষ্কারই ধর্ম্মযুদ্ধ বা ন্যায়যুদ্ধকে লোপ করিয়াছে। তীর বন্দুক অপেক্ষাও ভয়ানক অস্ত্র। এখনও এমন অনেক পার্ব্বত্য জাতি আছে যে, হাতে তীর থাকিলে ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতেও তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হয় না। যুদ্ধে কে কে অবধ্য তাহা নীতিশাস্ত্রে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ আছে। মহারাজ মনু কর্ণী, বিষদিগ্ধ ও অগ্নিদীপ্তবাণ নিক্ষেপ নিষেধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের মত যেন-তেন-প্রকারেণ শত্রু নির্ম্মূল করাই তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। অস্ত্রহীনকে কখনও আঘাত করা হইত না। এমন কি যুদ্ধকালে দৈবাৎ অস্ত্র যদি শত্রু হস্তচ্যুত হইত তবে তাহাকে অস্ত্রধারণ করিবার সময় দিয়া বা অস্ত্র দিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইত। যুদ্ধে নারী ধর্ষণ বা হত্যা, হাসপাতালে বোমা ফেলিয়া শত শত লোকের জীবন নাশ, দেবমন্দির কলুষিত করণ, অপাপবিদ্ধ কুসুমসুকুমার শিশুদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য শিশু-বাহী সামুদ্রিক পোতের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ ইত্যাদি পৈশাচিক কার্য্য করিয়া শত্রুপক্ষকে জব্দ করা তখনকার যোদ্ধাদের ধারণার বাহিরে ছিল। কদাচিৎ দুই এক স্থলে নীতিবিগর্হিত যুদ্ধ যদি কেহ করিয়াও থাকে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

আগ্নেয়াস্ত্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, নাগবাণ, বরুণবাণ, ঔর্বাগ্নি, নালীক, অয়োগুড, অয়ঃকণপ, তুলাগুড, বায়ব্যাস্ত্র, সিস্, সুর্মিণ প্রভৃতি অনেক অস্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োগ সেইকালে দেখা যায়। শতঘ্নী কামানের গোলার মত একেবারে অনেক লোক বধ করিতে পারিত। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষস সৈন্যেরা এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। ভুশুণ্ডী বৃত্তাকার লৌহ গদাবিশেষ। সুপ্ত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার জন্য রাক্ষসরা ইহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। ঔর্বাগ্নি একপ্রকার বারুদ বিশেষ। অয়ঃকণপ ঠিক বন্দুক না হইলেও বন্দুক জাতীয় অস্ত্র।

কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নিদেবের ভোজন তৃপ্তির জন্য এই অস্ত্র দ্বারা খাণ্ডব বন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ঘূর্ণনবেগে বৃহৎ বৃহৎ

পাষাণ পর্য্যন্ত বহুদূর নিক্ষিপ্ত হয়। অয়োগুড় লোহার গুলি। জম্ভাসুর দেব-সৈন্যের প্রতি আয়োগুড় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, মৎস্যপুরাণে এমন উল্লেখ আছে। তুলাগুড় একপ্রকার গোলাবিশেষ। সীস্ দ্বারা শত্রু বিনাশের কথাও অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায়। তবে সীস্ ধাতু বা বন্দুকের গুলি নয়। সীস্ শব্দের অর্থ নদী ফেন বা সাগর ফেন। সূর্ম্মী হইল ধাতুময়ী প্রতিমা। গুরু স্ত্রী গহনকারীকে জ্বলন্ত সূর্ম্মী আলিঙ্গন করাইয়া হত্যার ব্যবস্থা ছিল। ইহা ব্যতীত মায়া যুদ্ধ ছিল। রাক্ষস ও অসুরেরা উহাতে খুব দক্ষ ছিল। কতকগুলি সমরাস্ত্রের অদ্ভুত ধরণের প্রক্রিয়া ও প্রয়োগ ছিল বলিয়া উহাদের নাম ছিল "দিব্যাস্ত্র"। উহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী ও সন্ধান খুব গোপনে রাখা হইত। ঐ সকল দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করিতে হইত। সেই সব অস্ত্র প্রয়োগের মন্ত্র ভুলিয়া গেলেই বিপদ। কারণ, সমস্ত উদ্দেশ্যই তখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত। শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করাই সেনাপতির প্রধান কার্য্য। ঐ জন্য অনেক সময় শত্রুসৈন্যের ভিতর মদ-মত্ত-হস্তী চালনা করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় ধাতুময় পিণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হইত। গ্রীক্ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা মহারাজ পুরুর সৈন্যদিগের এইরূপ অগ্নি বর্ষণ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া 'কপাট' যন্ত্র নামে এক ভীষণ অস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, শত্রুরা দুর্গপ্রাকারের কপাট-পথে আসিলেই কপাট পরিখার জলে পূর্ণ হইত।

বর্ত্তমান যুগে সমর ও সমরাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন হইয়াছে বটে, কিন্তু কয়েকটি অস্ত্রের ব্যবহার আধুনিক যুদ্ধেও দেখা যায় না। যেমন বজ্র, বরুণাস্ত্র (যেই অস্ত্র প্রয়োগে জলধারা পড়িত), বায়ব্যাস্ত্র, (যাহা দ্বারা মেঘ ও ধূম নিরাকৃত হইত), নাগবাণ (সর্পদ্বারা পাশবদ্ধ হওয়া), সম্মোহন বাণ। এইগুলিকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বরং প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এইগুলির সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ই জন্মে। বর্ত্তমানের যুগের যুদ্ধে বিমানেরই প্রাধান্য। সেইকালে যে বিমান ছিল তাহা ত অনেকেরই জানা আছে। মেঘের আড়ালে থাকিয়াই ত মেঘনাদ যুদ্ধ করিতেন। তারপর আসে বর্ত্তমান যুগে Parachute বা বিমানছত্রিকার কথা। উহার ব্যবহার প্রাচীনযুগে দেখা যায় না। মহাবীর হনুমান ত এক লম্ফেই ভারত মহাসাগর পার হইয়া রাবণ রাজার সুবর্ণময়ী লঙ্কাপুরীতে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহাতে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু এইরূপ বর্ণিত আছে যে, লম্ফ প্রদান করিবার পূর্ব্বে তিনি (বীর হনুমান) এক তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া তৎপর লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাও কি অনেকটা প্যারাসুটবাহিনীদের মত অবতরণ নয় কি?

সে যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, পরাক্রম পরিপূর্ণভাবেই লক্ষিত হয়। তদুপরি নীতি বা আদর্শের দিক্ দিয়া ত বর্ত্তমান কালের যুদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন যুগের যুদ্ধ অনেকাংশে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। অবশ্য যুদ্ধ মাত্রেই ক্ষয়, ক্ষতি, লাভ, লোকসান, জনপদ-বিধ্বস্ত, অর্থনাশ, জীবনহানি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কোন্ যুদ্ধে রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত না হইয়াছে এবং শোকার্ত্তের বুক-ফাটা করুণ ধ্বনি শুনা না গিয়াছে? সেই বক্ষ-পঞ্জর-ভেদী আর্ত্তনিনাদ কি ভুলিবার? তবে ভারতের প্রাচীনকালের যুদ্ধ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। আর সত্য রক্ষার জন্যই যুদ্ধের সংঘটন হইত। পররাজ্য গ্রাস করিবার জন্য স্বার্থ-প্রণোদিত জাতি-প্রেমে মাতিয়া বর্ত্তমানকালের যুদ্ধের মত তখনকার বীরর্ষভেরা নরমেধ যজ্ঞে মাতিতেন না। শিশুর জীবন, নারীর সতীত্ব এইকালের যোদ্ধাদের নিকট অতিশয় অকিঞ্চিৎকর জিনিষ। বর্ত্তমানকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও উন্নততর প্রণালীর যুদ্ধে নগ্ন পাশবিকতার পৈশাচিক রূপটাই কি বীরত্ব অপেক্ষা বেশী জাজ্জ্বল্যমান্ হইয়া দেখা দেয় না? প্রাচীনকালের যুদ্ধে যতটুকু ন্যায় ও সত্যের স্থান ছিল বর্ত্তমান কালের সুসভ্য জাতিদের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলে কি?

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

রত্নপুরের পোষ্টমাষ্টার রাখালদাস মৈত্রকে চেনে না, এমন লোক জোগাড় করিতে হইলে সমস্ত গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হয়।

পৈত্রিক নাম রাখালদাস, কিন্তু এই নাম গ্রামে অচল, দুই একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মুখে অবিশ্যি এখনও এই নাম চলে। তবে তাঁহাদের সংখ্যা বড় অল্প। 'মাষ্টারমশাই' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

গ্রামের পোষ্টাফিস। সকলেই প্রায় আসিয়া নিজ নিজ নামের চিঠি লইয়া যায়। রামচরণ পিওনকে আর কষ্ট করিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিতে হয় না। সকলে আসে চিঠি লইবার জন্যও বটে—'অধিকন্তু ন দোষায়' হিসাবে মাষ্টারের গল্প শুনিবার জন্যও বটে। কী বকিতেই না পারেন মাষ্টার! তিন পা-ওয়ালা এবং একদিক সাজানো ইঁটের উপর বসানো চেয়ারটায় বসিয়া চিঠিতে ষ্ট্যাম্প লাগাইতে লাগাইতে এবার কেন অজন্মা হইল, ওলাউঠার প্রকৃত কারণ কি, ডাকঘর কবে হইতে প্রচলন হইয়াছিল, প্রত্যেক জায়গায় তাঁহার মত কর্ম্মঠ মাষ্টার হইলে কত সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ হইতে পারিত ইত্যাদি তথ্য তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিতে থাকেন। কথার ঝোঁকে অনেক চিঠিতে ষ্ট্যাম্প মারা হয় না, এমনিই চলিয়া যায়। তাহাতে অবিশ্যি বিশেষ ক্ষতি নাই, কেহই এ বিষয় লইয়া অনুযোগ অভিযোগ করেন না।

আজ পনর বৎসর ধরিয়া মাষ্টারমশাই এই কাজ করিয়া চলিয়াছেন। প্রত্যেকের চিঠিপত্র বিলি তিনি নিজ হাতেই করেন। রামচরণকে পোষ্টাফিসের কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছুই করিতে হয় না, শুধু কালেভদ্রে কখনও উপরওয়ালা কেহ আসিলে খাকির কোট চাপাইয়া অনর্থক এ দিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া সে নিজের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয়। অন্য সময়ে মাষ্টারের বাড়ীর কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া তামাক টানিতে থাকে টুলটার উপর বসিয়া মাষ্টারের দিকে পিছন ফিরিয়া—ফুরুক, ফুরুক—ফু-স্।

আজ সকালে উঠিয়াই মাষ্টার হাঁক ছাড়িলেন, "ওরে রামু, ওরে রামচরণ, ওরে ব্যাটা হতচ্ছাড়া গাধা!" কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সাত সকালে এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইল, তাহার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। আপন মনে সে কয়লা দিয়া উনুন সাজাইতে লাগিল। মাষ্টার বাহিরে আসিয়া ধমক দিলেন, বলি, "ওরে নবাবপুত্তুর কাণে কথা যাচ্ছে কি!" নবাব পুত্তুর ধড়মড় করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না!'

"তা' যাবে কেন? ব'সে ব'সে গাঁজার মৌতাত জমাচ্ছ যে!"

রামচরণ একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেল, "ছি, ছি, মাষ্টার মশাই যে কী বলেন। ছি, ছি—"

মাষ্টার কঠিন মাটিতে নামিলেন,—'থাক, ঘটা করে আর রাবণের চিতে সাজাতে হবে না, যাও তো মানিক, এবার বাজারে যাও, কাল কি বলেছিলাম পই পই করে, মনে আছে?' কিন্তু কোন রকম উত্তর পাইবার আগেই আবার বলিলেন, 'তা আর আছে! ছাই আছে, সেই যদি মনে থাকবে, তবে কি আর পিওনি করে দিন যায়—পোষ্টমাষ্টার হয়ে যেতিস এতদিনে, বুঝলি?"

রামচন্দ্র মহোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে, বুঝেছি" খুব একটা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বোধের মত টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল সে।

বেশ জুটিয়াছে মাষ্টার এবং পিওনটি।

মাষ্টার এবার নিজেকে ভারী করিয়া তুলিলেন, "শোন, কি কি আনবি বাজার থেকে। ভাল রুয়ের পেটী আনবি, তোমার আবার যে হাত, কুচো চিংড়ি এনে হাজির ক'রোনা যেন। বড় দেখে বাজারের সেরা কৈ আনবি-তেলকৈ হবে। পয়সার জন্যে তোমার মায়া দেখাতে হবে না। ফুলকপি, বাঁধাকপি খুব ঠাসা, লাউ কচি দেখে, কলা বেশ পাকা দেখে আর—আর যা পাবি তাই আনবি। একটু থামিয়া—ফিরবার পথে মধু গয়লার দোকান থেকে দই

আনবি, অ, কি আনবি বলতো?" কথা বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি রামচরণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রামচরণ প্রথমে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইয়া রহিল, পরে দুইবার আকাশের দিকে তাকাইল, বারতিনেক অযথা পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁড়িল, তারপর ইডিয়েটিক এ্যাঙ্গেলে ঘারটা বাঁকাইয়া মোষ্ট প্যাথেটিক হাসি হাসিয়া বলিল, "কি?"

মাষ্টার হতাশায় ঘাড়ের একদিকে মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে আর কি! ওরে কতবার তো বললাম, ফুল, ফুল, ফুল, অমু ফুল ভালবাসে, ফুল আনবি, চাটুজ্জের কাছে আমার নাম বলবি, দেবেন আর দুটো ফুলদানি, বুঝলি ব্যাটা গোবর্দ্ধন।"

রামচরণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে বুঝিয়াছে।

আজ এত ঘটা করিয়া যাহার জন্য বাজারে যাওয়া, সে মাষ্টারের ভাই অমূল্য, পাঁচবৎসর পরে বড়দিনের ছুটীতে সে গ্রামে আসিতেছে দুপুরের গাড়ীতে। এতদিন কলিকাতায় থাকিয়া বি,এ অবধি পাশ করিয়াছে, এখন এম,এ পড়ে।

মাষ্টারমশাই নিঃসন্তান, প্রৌঢ় মৈত্র দম্পতি সমস্ত স্নেহ মমতা উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন এই অমূল্যর উপর। অমূল্যকে পৃথিবীতে আনিয়াই তাহার মা খালাস। মার কথা অমূল্যর মনেও নাই, বাবা যে কবে মারা গিয়াছেন, সে কথা তাহার মনে পড়ে ধূ-ধূ। তারপর দাদা-বৌদির স্নেহ মমতায় সে আজ এতবড়টী হইয়াছে।

মাষ্টার কবে হইতে লিখিতেছেন অমূল্যকে দেশে আসিতে। সে আজ নয় কাল নয় করিয়া পাঁচটি বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে, 'পরীক্ষার বছর' 'শরীর তেমন ভাল নয়' 'শুধু শুধু টাকা ব্যয় করে কী হবে' ইত্যাদি অজুহাত দেখাইয়া সে এতদিন গ্রামে আসে নাই, মাষ্টার যে ছুটি-ছাটায় গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারিতেন না এমন নয়। তবে সত্যিকথা বলিতে কি, কলিকাতায় যেন প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে, তার উপর সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার মত পয়সাই বা কোথায়!

রামচরণকে বাজারে পাঠাইয়া মাষ্টার গেঞ্জির পর সাদা জিনের কোটটি চাপাইয়া পোষ্টাফিসের দিকে রওনা হইলেন। সদর হইতে ডাক লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে হয়ত!

ডাক লইতে লোক আসিয়া জমিয়াছে অনেক, মাষ্টারের মনটা সেই কখন হইতে উসখুস্ করিতেছে। কাল অমূল্যর চিঠি যখন তাঁহার হাতে আসে তখন অনেকেই নিজেদের চিঠি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে, আর গৃহিণী ভবানীকে সংবাদটা জানাইতে বড় তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহাকে আফিস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং খবরটা তেমন ফলাও করিয়া দেওয়া হয় নাই।

"কি হে মাষ্টার, গুন্‌গুন্ ক'রে গান ধরেছো যে! বলি ব্যাপারটা কি হে!" গাঙ্গুলী আসিয়াছেন ডাক লইতে।

"এই যে খুড়ো, এসো এসো! তা আর অন্যায়টা কি হয়েছে বল।" তারপর হঠাৎ সুর পাল্টাইয়া বলিলেন—'অমু আসছে আজ, আরে অমু—আমার ভাই! ভুলে গেলে না কি!'

গাঙ্গুলীর স্মরণে আসিল,—"ও, অমু, আমাদের অমু আস্‌ছে না কি। বেশ বেশ! অনেকদিন—"

মুখের কথা কাড়িয়া মাষ্টার বলিতে সুরু করিলেন,—"হ্যাঁ তা' অনেকদিন হ'ল বৈ কি! ভাইটি আমার পড়াশুনোর জোঁক। আস্‌ছে বার এম্‌-এ দেবে, কতবার লিখলাম, ওরে অমু, আয় ফিরে আয়, তোর আর পড়াশুনো করে কি হবে, আমার তো বয়স হ'ল, এবার তোকে কাজে ঢুকিয়ে আমি বিশ্রাম নি-ই, সদরে লিখলেই হয়ে যাবে, সাহেব আমাকে আবার খুব ভালবাসে কি না! তা' ছেলের মন ওঠে না, বলে, ও-সবে তার পোষাবে না। সে প্রফেসর হবে, বুঝলে খুড়ো মস্ত বড় প্রফেসর হবে সে।" গাঁয়ের লোক বহুবার একথা শুনিয়াছে।

কথা বলিয়া সকলের মুখের উপর দিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া চিঠিতে ষ্টাম্প লাগাইতে লাগাইতে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"তা যখন গোঁ ধরেছো হও বাবা হও! কতবার লিখলাম, গ্রামে এসো একবার। কতদিন দেখি না দেখতে বড় সাধ যায়। তা' বাবুর কি আর সময় আছে! শেষে এবার লিখলাম, তোমার বৌদিমণির শরীর ভাল নয়, তোমাকে দেখবার জন্য বড় ছটফট করছে। চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজীর উত্তর এল, আস্‌ছি।"

চিঠি বিলি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কি ভালই না বাসে বৌদিটিকে! সে আজ অনেককাল আগের কথা,

বুঝলে খুড়ো। গিন্নীতো অমূকে খেতে বসিয়েছে। অমূ বায়না ধরল দুধ-ভাত খাবে। সবে চাকরীতে ঢুকেছি, মাইনে পাই খুবই সামান্য। দুধ পাব কোথা? গিন্নী বোঝালে, রাত্রে খাবি। কিন্তু ছেলের সেই এক গোঁ। শেষে কাঁসার গেলাস তুলে মারল ওর কপালে। কপাল কেটে দর দর করে রক্ত—" হঠাৎ কথার মাঝখানেই তিনি ফোক্‌লা দাঁতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"আর একবার, তখন অমূ ফাষ্ট কেলাসে পড়ে। ওর বৌদি যাচ্ছে ঘাটে বাসন মাজতে, হঠাৎ চীৎকার শুনে দৌড়ে গেলাম, দেখি, গিন্নী ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর বাঁশবনের মধ্য দিয়ে কে পালাচ্ছে। ছুটে গিয়ে ধরলাম তাকে। ওমা, দেখি আমাদের অমূ। ভূত সেজে"—হঠাৎ বাহিরে নজর পড়িতেই তিনি থামিয়া গেলেন, একটি শ্রোতাও আর সেখানে অবশিষ্ট নাই।

···মাষ্টার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রামচরণ ইতিমধ্যে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভবানীও যাহোক একরকম করিয়া দক্ষিণদিকের ঘরটা সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিয়াছেন. পোষ্টাফিস হইতে তিন পায়া টেবিলটা আনিতে হইবে। মাষ্টারের নিজের একটা ফর্সা ধুতি না হয় একটু ঝুলাইয়া বিছাইয়া দিবেন টেবিলটার উপর। তাহা হইলেই চতুর্থ পায়াটির দৈন্য আর ধরা পড়িবে না। কয়েকটা দিন আফিসে টেবিল না হইলেও চলিবে। অমূল্য যেন না কোন অসুবিধা ভোগ করে এখানে আসিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়াই আবার যেন সে এখানে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে।

মাষ্টারের মনে ভবিষ্যতের একটা বড় সুখকর কল্পনা ভাসিয়া উঠিল, কলিকাতা ফিরিবার একমাস পরেই যেন আবার অমূল্য ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহাকে ও ভবানীকে প্রণাম করিয়া অমূল্য মাথা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার বলিলেন, "কিরে শরীর ভাল আছে?"

অমূল্য ধরা গলায় বলিল, "হাই আছে। কলকাতায় আবার মানুষ থাকে নাকি! বৌদিমণির রান্না সেখানে পাওয়া যায় নাকি! আছে নাকি সেখানে এমন সুন্দর নীল আকাশ, এমন সুন্দর গাছ-পালা। আমি কিন্তু আর সেখানে যাব না, বুঝলে দাদা।···কিন্তু তখন নরম হইলে চলিবে না মাষ্টারকে, ছদ্ম গাম্ভীর্য্য মুখের উপর আনিয়া বলিতে হইবে, "তা' কি হয়, পড়াশুনো···"কথার মাঝ খানেই অমূল্য ছোট ছেলেটির মত ঠোঁট ফুলাইয়া বলিবে, "ছাই! বৌদিমণি, আমি কিছুতেই যাব না কিন্তু।" ভবানী তখন তাঁহার দিকে কটাক্ষ হানিয়া বলিবেন, "দেখি, অমূকে এখান থেকে কে একপা সরায়? তারপর অবিশ্যি আর মাষ্টার আপত্তি করিতে পারিবে না, অমূল্য এখানেই থাকিয়া যাইবে, ভারী মজা হইবে তাহা হইলে কিন্তু।"

হঠাৎ ভবানীর কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, "তুমি যে অবাক করলে গো! ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে একা একা হাসছ কেন?"

মাষ্টার অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, "তাই নাকি, হাসছিলাম নাকি, এঁ্যা? যাঃ, বললেই হোল—"তারপর কি মনে হইতেই সুর পাল্টাইয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "একটা বড় মজার কথা ভাবছিলাম, ভবানী!"

ভবানী তাঁহার কণ্ঠ সংলগ্না হইয়া বলিলেন, "কি কথা গো, বল না!"

বাহির হইতে রামচরণের ডাক আসিল, "চান ঘরে জল দিয়েছি, বাবু।"

"মজার কথা" শোনা আর হইল না। মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এখনই আবার ষ্টেশনে দৌড়াইতে হইবে কি না!

মাষ্টার চান করিয়া কোটের প্রত্যেকটি বুতাম লাগাইলেন, বুক খোলা করিয়া রাখিলে চলিবে না। অমূল্য সহরের মানুষ, তাহার কাছে অতটা গেঁয়ো না হইলেও চলিবে। তারপর বাক্স খুলিয়া একটা অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিলেন। বিবাহের সময় পাওয়া চাদরটি বাহির করিয়া ঘাড়ের দুপাশ দিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভবানী তো দেখিয়া হাসিয়াই খুন! মাষ্টারেরও যে হাসি পায় নাই, এমন নয়, তবে এমন গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া বলিলেন, "কি গো হাসছ যে!"

"হাসব না! একেবারে বর সেজেছো যে—"

"তা আর হাসবার কী হোল! করে বস আবার একটা বিয়ে, মজাটা টের পাবে তখন।"

ঠোঁট উল্টাইয়া ভবানী বলিলেন, "হুঁস্, অত সোজা নয়, বুঝলে? বুড়োর কাছে সতীনের ঘর করতে মেয়ে দেবে কে?"

মাষ্টার কণ্ঠস্বরে একটু রাগের আভাস আনিয়া ফেলিলেন, "বুড়ো, বুড়ো করো না বলছি।" তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন, "যাই এবার, সময় যে হ'য়ে এলো। তুমি সব যোগাড় যন্ত্র করে রেখো, কেমন ?" ভবানী স্মিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

বহুদিন পরে আজ নব বসন্তের ছোঁয়া লাগিয়াছে বুঝি এই প্রৌঢ় দম্পতির চিত্তে !

...মাষ্টার ষ্টেশনে চলিয়া গেছেন অনেকক্ষণ। ভবানী সব কাজকর্ম্ম সারিয়া সামনের সিঁড়ির উঁচু ধাপটিতে আসিয়া বসিলেন। অতীতের কত কথাই না ধীরে ধীরে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

মনে পড়িতে লাগিল...কাঁসার-গ্লাস মারিয়া তাঁহার মাথা ফাটানো...বাঁশবনের পাশে দাঁড়াইয়া অমূল্যর ভূত দেখানো, চৈত্র দুপুরে আম গাছের ডালে বসিয়া পা দোলাইয়া অমূল্যর কাঁচা আম খাওয়ার সেই মনোরম ভঙ্গীটি...পিছন দিক হইতে তাঁহার চোখ টিপিয়া ধরিয়া অমূল্যর বালকোচিত প্রশ্ন—কে বলতো, বৌদিমণি...ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কলিকাতায় পড়িতে যাইবার সময় অমূল্যর সেই বুক ফাটা কান্না...

ভবানীর চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার বুকের ভিতর ডুকরাইয়া কে যেন কাঁদিয়া উঠিল,—ওগো, আবার কি ফিরে আসবে সেই দিনগুলি ? অমূকে কি সেই রকমটি দেখতে পাব ? উত্তরও দিল যেন কে—পাবে গো পাবে। অমূ একটুও বদলায়নি। আবার সে ঠিক সেই সোণার কাঠি রূপোর কাঠির গল্প বল, আবার সে খাওয়ার সময় বায়না ধরবে, "এটা খাব না, ওটা খাব না', দুষ্টুমি করে মটর শুঁটির ক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে বসে থাকবে, বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব প'ড়ে যাবে...

পাঁচ বৎসর তো মোটে, কিন্তু ভবানীর মনে হয় একযুগ যেন অমূল্যকে দেখেন না।...কিসের শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলেন মাষ্টার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন উঠানে, অমূল্য তো নাই সঙ্গে।

ভবানী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"কৈ, অমূ আসে নি ?"

মাষ্টার সোজা জবাব না দিয়া শুধু আবোল-তাবোল বকিতে লাগিলেন,—তার কি আর কাজের অভাব আছে না কি ? কলকাতা সহর বুঝলে ! সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব, অনেক সব ব্যাপার—' হঠাৎ কি মনে হইতে কোটের পকেটে হাত ঢুকাইয়া এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—'এই ত্তাখ—ওকি তোমার চোখে বুঝি আবার জল এল ? আরে তুমি এতে দুঃখ করছো কেন। সময় পাইনি, আসতে পারেনি। সময় পেলেই আসবে ঠিক আসবে।" তারপর কথার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, রায়দের বিপিনকে চেনো তো ! সে অমূদের মেসে উঠেছিলো, তার হাতে অমূ এই চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, "আমার বন্ধুর বিয়ে, কিছুতেই ছাড়লো না। তাদের দেশে যাচ্ছি। কয়েকটা দিন সেখানে থাকতে হবে। এবার ছুটিতে আর যেতে পারলাম না। তুমি মনে কিছু করো না যেন দাদা।"

নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

চার

কলিকাতার থিয়েটার

যে স্থানে "দি ক্যালকাটা থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ সেই ১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং লিমিটেড-এর ফার্ম্ অবস্থিত।

থিয়েটারের পক্ষে উপযুক্ত স্থানেই ক্যালকাটা থিয়েটার অর্থাৎ নিউ প্লে হাউস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রঙ্গ গৃহের পশ্চাতে এক সুবৃহৎ মনোরম প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস বাস করিতেন। পরবর্ত্তী কালে এই বাড়ীতে ওরিয়েণ্টেল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল।*

এই রঙ্গমঞ্চকে সুসজ্জিত করিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটী করা হয় নাই। সাজ-সজ্জা দৃশ্য-পট ইত্যাদি কলিকাতায় যতদূর উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব তাহারই সমাবেশ এখানে করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মিসেস্ হে খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। মিসেস্ হে ছিলেন ব্যারিষ্টার পত্নী। মহীশূরাধিপতি হায়দর আলী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ হেকে বন্দী করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার স্বামী কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যান। মিসেস্ হে পুনরায় ১৭৮৪ সালেও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

মিস্ সোফিয়া গোল্ডবোর্ণও এই রঙ্গমঞ্চ এবং উহাতে অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দৃশ্যপটগুলি সুন্দর, পোষাক পরিচ্ছদগুলি উৎকৃষ্ট। যেন স্বর্ণকার গোলকুণ্ডা সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার অত্যুজ্জ্বল অকৃত্রিম জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিত। হীরক ও মণিমুক্তার সাজ-সজ্জাগুলি সুরুচির পরিচয় প্রদান করিত। কবি, অভিনেতৃবর্গ, হীরক মণি-মুক্তার সাজ-সজ্জা এবং থিয়েটারের মনমুগ্ধকর আবহাওয়া সকলে মিলিয়া আমার মনে এমনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে আমি ডালিকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমার জন্মভূমিকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আরাবেলা এবং আমার জননীকে এমন কি সমস্তই আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বাঙ্গালায় যতদিন আমি ছিলাম, তাহার মধ্যে এই অভিনয় দর্শনের সময়টুকুই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক মুহূর্ত্ত।

জনকতক দেশীয় মহিলা বক্সে বসিয়াছিলেন, দীপালোকে তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় মহিলা বলিয়াই ভ্রম হইত। তাঁহাদের মলিন রং, উজ্জ্বল চক্ষু, তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং দৈহিক সজীবতা আমাকে আনন্দ-প্রদান করিয়াছিল। তাঁহাদের আকৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের পরিচয় প্রদান করিত, তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদও ছিল জমকালো।

"বিভিন্ন শ্রেণীর বহু ভদ্রলোকে 'পিট' ভরিয়া গিয়াছিল। অভিনয় আমার চিত্তকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে অনেকবার আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, আমি কি সত্যই ব্রিটিশ মেট্রোপলিস্ লণ্ডন নগর হইতে চারি সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিতেছি!"

মিস্ সোফিয়া গোল্ড বোর্ণের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে এই রঙ্গমঞ্চ যে খুব উন্নত ধরণের ছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই।

"কলিকাতা থিয়েটারে" যে সকল নাটকের অভিনয় হইয়াছে তাহার সকলগুলির পরিচয় পাইবার কোন উপায় নাই। সেক্সপীয়রের বহু নাটক এখানে অভিনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে "হ্যামলেট," "রিচার্ড দি থার্ড" এবং অন্যান্য নাটক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। "ট্রেজিডি অব মহমেট" নাটকের অভিনয়ও হইয়াছে। "কলিকাতা থিয়েটারের" প্রথম যুগে যে সকল নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছে তন্মধ্যে মিলনান্তক নাটক "বিউক্স" (Beaux) এবং "লিথি" (Lethe) নামক প্রহসনের কথা জানিতে পারা যায়। অতঃপর "ট্রেজিডি অব ভেনিস্" (Tragedy of Venice Preserved) এবং "মিউজিক্যাল লেডী" (Musical Lady) প্রহসন অভিনীত হওয়ার কথা আমরা জানিতে পারি। এই নাটক অভিনয়ে

* গ্রন্থকারের The Indian Stage ১৮৯ পৃষ্ঠা

ক্যাপ্টেন কল্ (Captain Call) জাফিরের (Jaffir) ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ে তিনি এত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "প্রাচ্য গ্যারিক" (Garrick of the East) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। ইহারই এক বৎসর পূর্ব্বে ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ গ্যারীক মহাপ্রস্থান করেন। কলিকাতা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া তিনি এত আনন্দিত হন যে, বিলাত হইতে মিঃ মেসিঙ্ক নামক একজন অভিনেতাকে অভিনয় এবং Stage এর তত্ত্বাবধান করিতে কলিকাতা পাঠাইয়া দেন।

যাহা হউক, উপরোক্ত নাটকে সমগ্র প্রধান ভূমিকার অভিনয়ই যে খুব উৎকৃষ্ট হইত, তাহা তৎকালীন "বেঙ্গল গেজেটে" প্রকাশিত এই নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা হইতে জানিতে পারা যায়।

১৭৮৪ সালে দর্শকগণের সুবিধার জন্ত গ্যালারি হইতে বক্স পৃথক করা হইয়াছিল। অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যের অভাব না থাকিলেও দেখা যাইত যে, দর্শকগণ রসজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়েও তাঁহারা হাস্য রসের প্রত্যাশা করিতেন।

কলিকাতা থিয়েটারে প্রথম কোন অভিনেত্রী ছিল না। পুরুষেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিত, ক্রমে অ.শ্রু মহিলা নিযুক্ত করা হয়।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ বীষ্টো নামক একজন সুন্দরী মহিলা ওল্ড কোর্ট হাউসের এক মজলিসে নৃত্যগীত প্রদর্শন করেন। তিনি কলিকাতায় এমন একটী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেখানে মেয়েরাই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করিবে। মিসেস্ বীষ্টোর নৃত্য গীত দর্শনে এবং তিনি শীঘ্রই স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খুলিবেন, এই কথা শুনিয়া কয়েক মাস মধ্যেই কলিকাতা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের রঙ্গালয়েও একজন অভিনেত্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী লোকের প্রথম অভিনয় একটী নূতন জিনিষ হইয়াছিল।

এই থিয়েটারের সহিত একটি বল-রুমও (Ball Room) সংযুক্ত ছিল। ওল্ড কোর্ট হাউস যখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তখন বড় বড় ভোজ-সভা প্রভৃতি এই কলিকাতা থিয়েটারেই হইত।

সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে থিয়েটারে কোনরূপ যোগ দেওয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস পছন্দ করিতেন না।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থিয়েটারে এক নূতন নিয়ম হয়। প্রতি সিজনে (Season) ছয়টি করিয়া অভিনয় হইত এবং যিনি ১২০৲ সিক্কা টাকা চাঁদা প্রদান করিতেন, তিনি এক সিজনের জন্ত টিকিট প্রাপ্ত হইতেন। এই টিকিটে তিনি নিজে এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই অভিনয় দেখিতে পারিতেন। সাধারণতঃ সন্ধ্যা আট ঘটিকায় থিয়েটারের দ্বার খোলা হইত। দ্বাররক্ষকগণ সকলেই ছিল ইউরোপীয়।

ক্রমে "কলিকাতা থিয়েটারের" অনেক টাকা ঋণ হইয়া পড়িল এবং লোক-রঞ্জনের শক্তিও আর তেমন রহিল না। বিশেষতঃ ঐ স্থানটিও ক্রমে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এইজন্ত কিছুদিন পরে "কলিকাতা থিয়েটার" একেবারে বন্ধই হইয়া গেল এবং নীলামকারক মিঃ ররোর্থ (Mr. Rawroth) সেখানে বাস করিতেন। পরে বাবু গোপী মোহন ঠাকুর উহা ক্রয় করিয়া বাড়ীর পূর্ব্বদিকটায় নূতন 'চীনাবাজারের' প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লিখিত দুইটি নাট্যশালা ব্যতীত প্রাচীন কলিকাতা প্রবাসী ইংরেজদের আরও দুইটি প্রমোদভবন ছিল, একটির নাম "হারমনিকান টেভার্ণ" (Harmonican Tavern), অপরটি "লণ্ডন টেভার্ণ" (The London Tavern). পুরাতন জেলের বিপরীত দিকে বর্ত্তমানে যেখানে লালবাজার পুলিশ কমিশনার আফিস সেইখানে "হারমনিকান টেভার্ণ" প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে কলিকাতায় এই বাড়ীটাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। কয়েকটী ভদ্রলোক এই টেভার্ণের পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের নামের বর্ণমালার অনুক্রমে এক একদিন কনসার্ট, বল, সান্ধ্যভোজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। শীতকালে মাসে দুই দিন করিয়া এই অনুষ্ঠান হইত। একজন মহিলা এই টেভার্ণে খুব ভাল বীণা বাজাইতেন। লণ্ডন টেভার্ণ হারমনিকান টেভার্ণের নিকটেই ছিল।

সেক্সপিয়রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে দ্বিতীয় চার্লসের অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেও পুরুষেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিত। পরে ক্রমওয়েলের

সময়ে দুইটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া থিয়েটার বন্ধই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস্ ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া নাট্যাভিনয়কে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। স্যার উইলিয়ম ডেভেনাণ্ট এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। মিসেস্ সাণ্ডারস ইংলণ্ডের প্রথম অভিনেত্রী।

মিসেস্ ব্রীষ্টো

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগে বাঙ্গালাদেশে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের প্রথা মিসেস্ ব্রীষ্টোই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই ওল্ডকোর্ট হাউসে নৃত্যগীত প্রদর্শন করেন। তাহারই নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া যে কলিকাতা থিয়েটার নাট্যাভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীর প্রচলন করেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতা থিয়েটারে অভিনেত্রী গৃহীত হওয়ার পাঁচ মাস পরে মিসেস্ ব্রীষ্টো চৌরঙ্গীতে তাঁহার "প্রাইভেট থিয়েটারের" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলিকাতা থিয়েটারের অনেক অভিনেতা তাহার থিয়েটারে যোগদান করে।

এখানে মিসেস্ ব্রীষ্টোর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস-এর সময় চুঁচুড়াতে একটি সুশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বাস করিতেন। তাহার নাম এমিলা রেংহাম। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমকও ছিল খুব বেশী। কলিকাতার ইংরেজ মহলে তাঁহার খুব নাম ছিল। তাহার পিতা সেন্টহেলেনাতে কাজ করিতেন। তিনি তাহার পিতার সহিত পূর্ব্বে সেখানেই বাস করিতেন। মিঃ হিকির সম্পাদিত "বেঙ্গল গেজেটে" তাহার নামে অনেক কুৎসা প্রচারিত হইয়াছিল। ভদ্রলোকের পরিচালিত সংবাদপত্রে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র সম্বন্ধে কুরুচিপূর্ণ হীন সমালোচনার প্রকাশ হওয়ায় কলিকাতার তৎকালীন ইংরেজ সমাজের হীনরুচির পরিচয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তখনকার ইংরেজ চরিত্র বড় প্রশংসনীয় ছিল না। কোম্পানীর সাধারণ কর্ম্মচারীদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত জাল করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কাউন্সিলের সদস্যগণও প্রকাশ্যভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করিতেন। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলীপুরের বিখ্যাত দ্বৈতযুদ্ধে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসকে গুলী করিয়াছিলেন। জনৈক বিখ্যাত সাংবাদিক চীফ্ জাষ্টিসের অন্যায় অবিচারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

মিঃ জন ব্রীষ্টো অনারেবল্ জন কোম্পানীর একজন বড় সওদাগর ছিলেন। ১৭৮২ সালের ২৭শে মে তারিখে মিঃ ব্রীষ্টোর সহিত আমেলিয়া রেংহামের বিবাহ হয়। তখন মিঃ ব্রীষ্টোর বয়স ৩২, আমেলিয়া রেংহামের বয়স ১৯ বৎসর। আমেলিয়া রেংহাম কলিকাতার ইংরেজদের সামাজিক জীবনে যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মিসেস্ ব্রীষ্টো খুব নিপুণা অভিনেত্রী ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (এমিলা) তাঁহার চৌরঙ্গীর বাড়ীতে প্রাইভেট থিয়েটারে বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে শুক্রবার হইতেই তিনি বিশেষভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ করেন। এই দিন 'Poor Soldier' নামক নাটক অভিনীত হয়। তাঁহার এই থিয়েটারে আরও কয়েকজন অভিনেত্রী ছিল।

মিসেস্ ব্রীষ্টো মিলনান্তক নাটকই খুব ভাল অভিনয় করিতে পারিতেন। হিউমার পূর্ণ সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। "Poor Soldier" নাটকের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। তৎকালীন কলিকাতা গেজেটে এই অভিনয়ের এক প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

পুরুষের ভূমিকা অভিনয়েও মিসেস্ ব্রীষ্টো বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের "জুলিয়াস্ সিজার" নাটকের Lucius-এর পুরুষ-ভূমিকা অভিনয় করিয়া তিনি খুব নাম করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মহিলা কর্ত্তৃক পুরুষ-ভূমিকা অভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হয়। এই প্রথার এত বহুল প্রচার হইয়াছিল যে, বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে কোন এক সময়ে এক এমেচার পার্টি কর্ত্তৃক জুলিয়াস্ সিজার অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে জনৈকা অভিনেত্রী কেসিয়াসের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ইংলণ্ডেও অভিনেত্রীগণ এত নাম করিয়াছিল যে, "কিল্লিগ্রেউ"র (Killigrew) প্রণীত মিলনান্তক নাটক "পারসন্‌স্ ওয়েডিং" (Person's Wedding) শুধু মহিলাগণ কর্ত্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকে ভৃত্যগণ ব্যতীতও পুরুষের ভূমিকা ছিল সাতটি, আর স্ত্রীলোকের ভূমিকা ছয়টি।

মিসেস্ ব্রীষ্টো তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্যে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় দর্শনে কলিকাতা প্রবাসী ইংরেজ সমাজ এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে ১৭৯০ সালে তিনি যখন বিলাতে চলিয়া গেলেন তখন কলিকাতার আনন্দ উৎসবের উজ্জ্বল দীপ্তি সকলের কাছেই যেন ম্লান বলিয়া বোধ হইতেছিল।

তৎকালে মিসেস্ কারগিন নামক আর একজন অভিনেত্রীও বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মিলনান্তক এবং বিয়োগান্ত উভয় নাটক অভিনয়েই তাহার দক্ষতা ছিল। 'প্রিন্স প্যাকেট' নামক জাহাজে যখন তিনি বিলেত প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন জাহাজে আরও কয়েকজন যাত্রীসহ তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সিসিলির পর্ব্বতমালার নিকটে তাহার মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার নিস্পন্দ বক্ষে আর একটি মৃত শিশুকেও পাওয়া গিয়াছিল।

"দি ক্যালকাটা থিয়েটারে" এবং মিসেস্ ব্রীষ্টোর থিয়েটারে দেশীয় দর্শকেরও সমাগম হইয়াছিল। তাহারা এই সব ইংরেজী অভিনয় বুঝিতে পারিতেন কি না বলা যায় না। তবে শীঘ্রই তাঁহাদের চরিতার্থতা সম্পাদন করেন রুশ দেশীয় মঁসিয়ে লেবেডফ্।

এই লেবেডফ্ একজন ভাগ্যান্বেষী, ইউক্রেন দেশে চাষবাস করিতেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে রাজকার্য্যে ইটালীর নেপেল্‌স্ সহরে যান। সেখান হইতে লণ্ডনে যান। পরে Band Master হইয়া মান্দ্রাজে আসেন। তিনি যখন কলিকাতা আসেন তখন ক্যালকাটা থিয়েটারের খুব সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তখনও অভিনেত্রী লওয়া হয় নাই। ইনি মাঝে মাঝে Benifit Night এর উদ্যোগ করিয়া গীতবাদ্যের আয়োজন করিতেন এবং দর্শকদের চিত্তবিনোদন করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগারও করিতেন। ১৭৯০ সালে একবার ওল্ড কোর্ট হাউসে যে সঙ্গীত ও বাদ্যের আয়োজন হয়, তাহাতে এক একখানি টিকেটের দাম হয় ১২৲ বার টাকা। ইনি প্রথমে ৪৭ নম্বর টেরেটি বাজারে থাকিতেন, পরে ৩ নম্বর ওয়েষ্টন লেনে উঠিয়া যান।

লেবেডফের ইচ্ছা হইল কলিকাতায় দেশীয় থিয়েটার করেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাকে একজন বাঙ্গালীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। তিনি মনে করিলেন যে, তরল এবং হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয় দেশীয় লোকের হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাই তিনি দুইখানি ইংরাজী নাটক Disguise ও Love is the Best Doctor এর অনুবাদ করাইয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে পণ্ডিত গোলকনাথ দাশই তাঁহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান করেন। লেবেডফ্ বিষয়টীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য অভিনয় করাইবার পূর্ব্বে কয়েকজন পাণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহায়তায় রচনাটী আরও নিখুঁত করিয়া লয়েন।

অনুবাদ করিবার জন্য এই দুইখানি বই মনোনীত করিবার কারণ সম্বন্ধে লেবেডফ নিজেই বলিয়াছেন, "আমি লক্ষ্য করিলাম ভারতবাসীগণ সাধাসিধা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিষয় অপেক্ষা হাস্যরসাত্মক বিষয় এবং মানবেতর প্রাণীর অনুকরণ করিতে খুব ভালবাসে। এই জন্যই এই দুইখানি নাটক আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম। এই নাটক দুইখানি খুবই আনন্দ দায়ক। এই নাটক দুইখানিতে চৌকিদার, সেভয়ের অধিবাসী, বোবেরা, চোর, গুণ্ডা, উকীল, গোমস্তা সমস্তই আছে এমন কি ক্ষুদ্র লুণ্ঠনকারী দল পর্য্যন্ত।"

নাটক দুইখানির অনুবাদ শেষ হইলে লেবেডফ কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া বই দুইখানি পড়িতে অনুরোধ করেন। নাটক দুইখানি পাঠ করিয়া তাহাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার অনুবাদের দ্বারা হাস্যরসাত্মক এবং গম্ভীর রসাত্মক দৃশ্যগুলির রসভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই অনুবাদ কার্য্যে তাঁহার শিক্ষক পণ্ডিত গোলকনাথ দাশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লেবেডফ নিজেই বলিয়াছেন, "একজন খুব ভাল শিক্ষক লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ অনুবাদ করিতে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম। নতুবা কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে এইরূপ অনুবাদ করা সম্ভব হইতে পারে না।"

এই নাটক দুইখানির অনুবাদ পণ্ডিতগণ অনুমোদন করিলে গোলকনাথ দাশ মহাশয় লেবেডফের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি যদি এই নাটক দুইখানির প্রকাশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উহা অভিনয় করিবার জন্য গোলকনাথ দাশ দেশীয় লোকের মধ্য হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাব লেবেডফের খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বিশেষ উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সহকারে এই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। অভিনয়ের লাইসেন্সের জন্য গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোরের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনিও বিনা-আপত্তিতে লাইসেন্স প্রদান করেন

লেবেডফ তাঁহার অনূদিত নাটক দুইখানি অভিনয় করিবার জন্য কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটুলীতে (ডোমলেন) একটী বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করান। এই ডোমটুলী চিৎপুর রোডের পশ্চিমদিকে চিৎপুর রোড ও চীনাবাজারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটই ডোমটুলী। লেবেডফের এই থিয়েটার ২৫নং ডোমটুলীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খুব সম্ভব, ২১নং এজরা ষ্ট্রীটে অথবা তাহার একটু পূর্ব্বদিকে আজকাল যেখানে আমেরিকান চার্চ্চ অবস্থিত উহাই লেবেডফের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার স্থান। স্থানীয় লোকেরা এখনও ঐ স্থানটিকে "নাচঘর" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কাল এই দীর্ঘকালেও লোকের স্মৃতিকে মলিন করিতে পারে নাই। আর এই স্থানটি কিন্তু আজও আমোদ-প্রমোদ শূন্য হয় নাই। ইহারই অল্প একটু পূর্ব্বদিকে চিৎপুর রোডের উপর সেন্ট্রাল থিয়েটার অবস্থিত। লেবেডফের এই বাঙ্গালা থিয়েটারই আদি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ। আর প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর।

এই অভিনয় উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ বাঙ্গালী রীতিতেই সজ্জিত করা হইয়াছিল। সঙ্গীত ও বাদ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কি দেশী, কি বিলাতী কোন বাদ্যযন্ত্রই বাদ দেওয়া হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ কবি রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের কয়েকটী ঝঙ্কারপূর্ণ কবিতা গানের সুরে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পরে রহস্যপূর্ণ দৃশ্যাদির অবতারণা করা হইয়াছিল।

"দি ডিজগাইজ" নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রবেশ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বক্স ও সিট ৮৲ টাকা, গ্যালারী ৪৲ টাকা। টিকিট থিয়েটার গৃহেই পাওয়া যাইত। প্রথম রাত্রি অসম্ভব রকম ভীড় হইয়াছিল। অভিনয় দেখিবার জন্য দেশী ও বিলাতী বহু দর্শক শুভাগমন করিয়াছিলেন।

"দি ডিজগাইজ" নাটকের পুনরায় অভিনয় হয় ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে। প্রথম অভিনয়ের রাত্রিতে অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় দর্শকের সংখ্যা পূর্ব্বেই মাত্র ২০০ দুই শত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক টিকিটের মূল্য স্থির হইয়াছিল এক মোহর (তখনকার ৪০ শিলিং)। অত্যধিক প্রবেশ-মূল্য সত্ত্বেও বহু টিকিট পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য লেবেডফ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন যে, "টিকিট প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, প্রবেশদ্বারে কোন মূল্য গ্রহণ করা হইবে না। আর অভিনয়ের অন্ততঃ দুইদিন পূর্ব্বে টিকিটের জন্য লেবেডফের নিকট আবেদন না করিলে টিকিট পাওয়া যাইবে না।" এই বিজ্ঞপ্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় লেবেডফের থিয়েটারের প্রতি লোকের মন কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই রুশদেশীয় ভাগ্যান্বেষী লেবেডফ ভারতীয় রীতিনীতি এবং ভাষাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়াই এদেশের লোকদিগের আমোদ-প্রমোদের জন্য আয়োজন করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অবশ্য অর্থ উপার্জ্জনও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

এই অভিনয়ের পরে লেবেডফ মোগল সম্রাটের থিয়েটার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা খুব বলবতী হইয়াছিল। লেবেডফ তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলস্বরূপ একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন এবং উহা বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই বৎসরেই তাঁহার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর রুশিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগে তিনি রাজদূত নিযুক্ত হন এবং গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সেণ্টপিটাস্-বর্গে একটী সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডফ পরলোকগমন করেন।

লেবেডফ এবং তাঁহার শিক্ষক পণ্ডিত গোলকনাথ দাশের সমবেত চেষ্টায় কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটকের

অভিনয় হয় এবং এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। অবশ্য ইহার সাত বৎসর পূর্ব্বে মিসেস্ ব্রীষ্টোর চেষ্টায় কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই অভিনেত্রী শ্বেত রমণী। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় সর্ব্বপ্রথম লেবেডফের উদ্যোগে এবং গোলকনাথ দাশের সহায়তাতেই হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় অভিনেত্রী লইয়া একটী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটারও অচিরেই উঠিয়া যায়। অতঃপরে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে স্থায়ীভাবে স্ত্রীলোক প্রবেশ করে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু যাঁহার অধ্যাপনার গুণে লেবেডফ সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার সহায়তায় লেবেডফ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, যাঁহার চেষ্টায় স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছিল সেই পণ্ডিত গোলকনাথ দাশ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন, পণ্ডিত গোলকনাথ দাশই "হিতোপদেশ" প্রণেতা গোলক শর্ম্মা। কিন্তু সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে কিছু বলিবার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অজ্ঞাত পরিচয় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পথ প্রদর্শকের প্রতি বাঙ্গালার নাট্যামোদীগণ চিরদিন শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিতে বিরত হইবে না।

বাঙ্গালা থিয়েটার বা লেবেডফের নূতন থিয়েটার লুপ্ত হওয়ার পরে ইংরেজদের আরও কয়েকটী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কোনটাই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে "চন্দননগর থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে ১৮০৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে "এল, এ্যাফোকেট" নামক প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। এই প্রহসনের অভিনয়ের সময় একটী ভারী মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি দৃশ্যে ফরাসী গ্রাম্য বিচারক বিচার করিতে বসিয়াছেন। আসামী একজন মেষরক্ষক, এই মেষ রক্ষকটি তাহার মনিবের কয়েকটি খুব মাংসল ভেড়া চুরি করিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় চলিতেছে এমন সময় গোল হইল যে ষ্টেজ ম্যানেজারের ঘড়ীটি চুরি গিয়াছে। যে লোকটী সিন টানিত, তাহারই উপরে সন্দেহ পড়িল। ষ্টেজ ম্যানেজার অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া লোকটাকে টানিতে টানিতে ষ্টেজের মধ্যে যেখানে বিচারের অভিনয় চলিতেছিল, ঠিক সেইখানে লইয়া আসিলেন। বিচারকের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিতেছিলেন তিনি বিচারকোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া লোকটীকে মাটিতে লম্বা হইয়া পড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিতে বলিলেন, থতমত খাইয়া লোকটীও সত্যই অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিল। ষ্টেজ ম্যানেজারও তাহাকে ভৎসনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। লোকটিও ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। এই জীবন্ত অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে আর একটী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। এই থিয়েটারের নাম এথেনিয়ম (The Atheneum)। পর্ত্তুগিজ গির্জ্জার নিকটে ১৮ নং সারকুলার রোডে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম রাত্রে "আর্ল অব্ এসেক্স" নাটক এবং "রেইজিং দি উইণ্ড" (Raising the Wind) প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। প্রবেশ মূল্য ছিল এক মোহর।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে "খিদিরপুর থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে "দি লাইং ভেলেট" (The Lying Valet) প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে "দমদম থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারের খবর লোকে বড় বেশী রাখিত না। চার্লস ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্বপ্রথম এই থিয়াটারকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত করেন। ইনি গোলন্দাজ সৈন্যের (Artillery) সেকেণ্ড ব্যাটারীতে কাজ করিতেন। বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি যখন দমদমে কাজ করিতেন তখন "দমদম থিয়েটারের" "থেসপিয়ান ব্যাণ্ডে" যোগদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণের সহায়তায় এই থিয়েটারের অভিনয় অনেক উন্নত হইয়াছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখে চার্লস ফ্রাঙ্কলিন পরলোক গমন করেন।

১৮২৬ সালের ১০ই এপ্রিল এই থিয়েটারে "ফাউন্টেন-বিউ" অভিনীত হয়। ইহার অভিনয় যাহারা করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই অবৈতনিক। অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। মিস্ ডলি বুলের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন মিসেস্ এস্থার লীচ (Esther Leach)। তাহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহার অভিনয় দক্ষতার জন্ম তিনি বাঙ্গালার মিসেস্ সিডনস্ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮২৬ সালের এপ্রিল মাসে তাহার জন্ম এক সাহায্য রজনীর অভিনয় হইয়াছিল। অতঃপর তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটারে যোগদান করেন।

১৮২৬ সালের অক্টোবর মাসে থিয়েটারের কিছু মেরামত কার্য্য সম্পন্ন হয়। বক্সের দর্শকগণের নিকট গ্যালারীটা একটা বিরক্তকর পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। তাই, গ্যালারী তুলিয়া দিয়া পিটকে বড় কর হয়। ইহাতে দর্শক দিগের বসিবার স্থানের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল। এইভাবে রূপান্তরিত হইয়া ১৮২৬ সালের জানুয়ারী মাসে পুনরায় এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হয়। পুনরায় অভিনয় আরম্ভ হইবার প্রথম রজনীতে "ওয়াগস্ অব্ উইণ্ডসর" এবং "বোম বাষ্টেস্ ফেরিওসো" (Wags of Windsor" and "Bambastes Farioso)" অভিনীত হয়।

এক সময়ে "দমদম থিয়েটারে"র খুব ভাল ভাল নাম করা অভিনেতা ছিল, অভিনয়ের খ্যাতিও ছিল খুব। কলিকাতা হইতে পর্য্যন্ত বহু লোক "দমদম থিয়েটারে" অভিনয় দেখিতে আসিত। তৎকালে এক সময়ে সমস্ত থিয়েটারেরই দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। "দমদম থিয়েটার"ও উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই।

হোয়েলার প্লেসে (Wheler Place) একটী থিয়েটার ছিল। জনকতক নির্দ্দিষ্ট লোক মাত্র এই থিয়েটারের দর্শক ছিলেন। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট প্লেস ওয়েষ্টের কোন একটী অংশে এই থিয়েটার অবস্থিত ছিল। উহা হইতে কর্ক স্ক্রু লেন নামে একটী রাস্তা বাহির হইয়াছিল। এই রাস্তাটি "ফাঁসি" অথবা ফাঁসি লেনের সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে এইখানে ফাঁসি দেওয়া হইত বলিয়া গলিটীর এই নাম হইয়াছে।

সেক্সপিয়রের "টেমিং অব্ দি স্ক্রু" নাটককে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিখ্যাত গ্যারিক একখানি তিন অঙ্ক নাটক লেখেন। উহার নাম "Chatterine and Petruchio." এই থিয়েটারে ১৭৯৭ সালের ৫ই মে তারিখে উক্ত নাটকখানা এবং The Mogul Tale নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। ১৭৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারী 'Irishman in London" এবং ২২শে জানুয়ারী "The Agreeable surprise" নাটকের অভিনয় হয়।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ধর্ম্মতলায় ড্রামণ্ডস্ একেডেমীতে (Drummonds Academy) হোমস্ প্রণীত বিয়োগান্ত নাটক "ডগলাস" (Doglus) অভিনীত হয়। এই অভিনয় করিয়াছিল কয়েকটী অপরিণত বয়স্ক বালক। তাহাদের মধ্যে হেনরী ডি রোজিও নামক একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ বালক ছিল। পরবর্ত্তী কালে ইনি শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কবি হিসাবে খুব নাম করিয়াছিলেন। উল্লিখিত অভিনয়ে ইনি তাহার স্বরচিত একটী প্রস্তাবনা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ডি রোজিওর নাম চিরস্মরনীয় হইয়া রহিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের পরে তাঁহার ছাত্রগণই বাঙ্গালার রাষ্ট্রনীতির পথ প্রদর্শক ও সমাজসংস্কারে অগ্রণী হইয়াছেন।

বৈঠকখানা থিয়েটার

বৈঠকখানা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই থিয়েটার ছিল ১১৭ নং বৈঠকখানা রোডে। বৈঠকখানা অঞ্চলে পূর্ব্বে একটা পুরাতন বট গাছ ছিল। মফঃস্বল হইতে যে সকল ব্যবসায়ী ব্যক্তি কলিকাতায় আসিত, তাঁহারা এই বৃহৎ বট বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিত। ক্রমে উহা ব্যবসায়ীদের বৈঠকখানা বা বিশ্রাম স্থানে পরিচিত হইয়া উঠে। কলিকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক এই বট বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ধূম পান করিতে ভালবাসিতেন। এই জন্ম এই স্থানটিকে তিনি সহর প্রতিষ্ঠার জন্ম পছন্দ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বট গাছটী জীবিত ছিল।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে এই থিয়েটারে "দি ইয়ং উইডো অর লেসেন্ ফর্ লাভার" (The young widow or Lesson for Lover) নামক নাটক অভিনীত হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই থিয়েটারের অভিনেত্রী মিসেস্ কোহেনের বেশ নাম ছিল।

তৎকালে কলিকাতায় আরও একটী থিয়েটার ছিল। উহার নাম "The Fenwick Place Theatre." হোগলার বেড়া দেওয়া একটা ঘরে এই রঙ্গমঞ্চ অবস্থিত ছিল। ঘরটী খুব বড় ছিল, ভিতরে যথেষ্ট হাওয়া খেলিত। বাড়ীটী একরকম খোলা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ রাস্তা হইতে উহার ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যাইত।

চৌরঙ্গী থিয়েটার স্থাপিত হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই থিয়েটার কলিকাতাবাসীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিবার অনুপ্রেরণা এই চৌরঙ্গী থিয়েটার হইতে লাভ করিয়াছিল এবং ইহারই ফলস্বরূপ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর "হিন্দু থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন এবং "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় করিবার জন্য নবীনকৃষ্ণ বসুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌরঙ্গী থিয়েটার এবং "দি সানস্ সৌসিই" (The Sans Souci) বাঙ্গালীর প্রাণে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাই বেলগাছিয়াতে স্থায়ীভাবে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মূল।

চৌরঙ্গী থিয়েটার

চৌরঙ্গী থিয়েটার যে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমে উহার নাম ছিল "প্রাইভেট সাবস্ক্রিপসন থিয়েটার।" ইহার নির্ম্মাণ-ব্যয় এবং রঙ্গমঞ্চের আবশ্যকীয় সাজসজ্জা ও দ্রব্যাদির খরচ কয়েকজন ভদ্রলোক চাঁদা করিয়া বহন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যেককে ১০০৲ একশত টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইয়াছিল। চৌরঙ্গী রোডের উপর এবং অপর একটী রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রঙ্গমঞ্চের সংস্রব হইতে উক্ত রাস্তা "থিয়েটার রোড" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত উহা এই নামেই পরিচিত। "কলিকাতা থিয়েটারের" সংস্রব হইতে আর একটি রাস্তা যে থিয়েটার ষ্ট্রীট নাম পাইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চৌরঙ্গী রোড এবং ইণ্লিসিয়াম রোডের (বর্ত্তমান লর্ড সিংহ রোড) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান জুড়িয়াই চৌরঙ্গী থিয়েটার অবস্থিত ছিল। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সংলগ্ন উত্তরদিকে "ব্যালার্ডস্ প্লেস্" (Ballard's Place) নামক গৃহ অবস্থিত ছিল। উহা বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হলের পশ্চিম এবং থিয়েটার রোডের "কিংস কোর্টে"র দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্যার উইলিয়াম মার্কবি এখানে বাস করিতেন। পরে উহা বোর্ডিং হাউসে পরিণত হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ময়রা (লর্ড হেষ্টিংস) শাসন ভার গ্রহণ করেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের জন্য তিনি খুব বড় রকমের একটা চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় ২৫শে নভেম্বর তারিখে সর্ব্বপ্রথম এই রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথম অভিনয়ের দিন সপত্নীক গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ রঙ্গশালায় উপস্থিত থাকিয়া অভিনয়ের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই থিয়েটার গভর্ণর জেনারেলের সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল; এবং তিনি স্বয়ং কয়েকবার অভিনয় দর্শন করিয়াছেন।

ফ্রী স্কুলের সাহায্যের জন্য ১৮১৪ সালের ১৩ই মে চৌরঙ্গী থিয়েটারে গোল্ডস্মিথের "শী ষ্টুপস্ টু কঙ্কার" (She stoops to conquer) অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে ৩৬০০৲ হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। খরচ হইয়াছিল ১৫০০৲ টাকা। মার্লোর ভূমিকায় জনৈক অভিনেতা লর্ড ময়রাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার স্বরচিত একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত হইল :—

Vain is the hope and fruitless the endeavour
To gain without alloy the general favour
All causes of compliment or blame to show
And please the many while offending none,
And arduous is the post to him assigned
Who seeks to satisfy the public mind.

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা, লেডী লাউডন, প্রধান বিচারপতি, লেডী ইষ্ট এবং আরও অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী এই অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জনৈক ব্যারিষ্টার মিঃ হিউম এই অভিনয়

উপলক্ষে একটী চমৎকার ড্রপসীন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রং কাঁচা থাকায় ড্রপসীন ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। এই নাটক অভিনয়ের পর "ম্যাকবেথ"এর অভিনয় হয় এবং সেই সময় সর্ব্বপ্রথম এই ড্রপসীন ব্যবহার করা হয়।

পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট ও "চৌরঙ্গী থিয়েটারের" একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮২৭ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে "পিজারো" (Pizzaro) অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে স-পত্নীক গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড কম্বারমিয়ার, কমাণ্ডার-ইন্-চীফ, স্যার জন ক্যাম্বেল দর্শকরূপে এই অভিনয়ের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

থিয়েটারের প্রতি গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু চৌরঙ্গী থিয়েটার তাঁহারও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "আয়রণ চেষ্ট" (Iron Chest) নাটকের অভিনয়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এবং প্রধান সেনাপতি দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় চৌরঙ্গী থিয়েটার যথেষ্ট উন্নতি এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮২৬ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত উহার গৌরব অধ্যায়, তখন উহা উন্নতির উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত। এই সময় প্রবেশ মূল্য ছিল বক্স ১২৲ সিক্কা টাকা, পিট ৮৲ টাকা। কিন্তু পরে উহা কমাইয়া যথাক্রমে ৮৲ টাকা এবং ৬৲ টাকা করা হইয়াছিল। প্রথমে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে অভিনয় হইত। পরে শুক্রবার রাত্রে অভিনয় হওয়াই স্থির হয়। সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৬ ছয়টায় থিয়েটারের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং অভিনয় শেষ হইত রাত্রি ১১টায় কখনও বা সাড়ে দশটায়। একবার অভিনয়ের অনেক আয়োজন হওয়ায় শেষ হইতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছিল! এজন্য যবনিকা পতনের পূর্ব্বেই অনেক দর্শক চলিয়া গিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারে প্রত্যহ দর্শকের সংখ্যা দুই শত হইতে তিনশত পর্য্যন্ত হইত।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনেতাগণ কেহই বেতন গ্রহণ করিতেন না। বেতন কেবল অভিনেত্রীদেরই ছিল, তাঁহারা থিয়েটারের বাড়ীতেই বাস করিতেন। এই থিয়েটারে অনেক ভাল ভাল অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে চৌরঙ্গী থিয়েটারের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অভিনয়ে গারড্যাল এটকিন্সন্ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দর্শকগণ তাঁহার অভিনয় খুব পছন্দ করিতেন। ১৮৩৭ সালে তিনি হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন। মিসেস্ মেরী গোটলেব, মিসেস্ ব্লাণ্ড, মিসেস্ ফ্রাঙ্কলিন, মিসেস্ চেষ্টার, মিসেস্ এস্থার লীচ খুব নাম করা অভিনেত্রী ছিলেন। মিসেস্ মেরী গোটলেব ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরে মিসেস্ কেলী তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন।

চৌরঙ্গী থিয়েটার যে সকল বিখ্যাত অবৈতনিক অভিনেতার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহাদের মধ্যে হিন্দু কলেজের স্বনামখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষাবিদ্ ডাঃ হোরাস হেমেন উইলসন, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের হেনরী মেরীডিথ পারকার, মিঃ জে, এইচ ষ্টকলার, স্যার জে, পি, গ্রান্ট, মিঃ উইলিয়ম লিনটন, মিঃ জর্জ্জ চিনারী, মিঃ টমাস আলসোপ, ক্যাপ্টেন ডব্লিউ, ডি, প্লেফেয়ার, ক্যাপ্টেন জর্জ্জ অগাষ্টাস্ ফ্রেডারিক ফিটজ ক্লেরেন্স এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হেনরী মেরিডিথ পারকার কিছুদিন রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন, পরে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হইয়াছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাদক, চমৎকার অভিনেতা এবং সুলেখক ছিলেন। তিনি সাধারণের স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটারের জন্য "এম্যাচারস্" নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। থিয়েটারে বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইতে পারিতেন যে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে Proteus (প্রটিয়াস) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। মিঃ পারকার বাকিংহামের ক্যালকাটা জার্ণেলের একটী প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মিঃ ষ্টকোয়ালার "জনবুল" নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাকে তিনি পরে "ইংলিশম্যানে" পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন ড্রুরী লেনের (Drury Lane) থিয়েটারের ভিতরে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সেরিডেনের দৃষ্টিও

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরিডেনই তাঁহাকে লর্ড বায়রণের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। মিসেস্ সিডনস্ কর্ত্তৃক লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। বিখ্যাত অভিনেতা এড্‌মণ্ড কিন্ তাঁহাকে অভিনেতা হওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারে তিনি কেসিয়াস, ইয়াগো, পিজারো প্রভৃতি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

স্যার জে, পি, গ্রান্ট (বাঙ্গলার ছোটলাট নহেন) বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ছিলেন। বোম্বাইএর গভর্ণর লর্ড এলেনবর্গের সহিত একবার তাঁহার মতভেদ হয়। নিজের স্বাধীন মতকে ক্ষুণ্ণ হইতে না দিয়া তিনি চাকুরীই পরিত্যাগ করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি থিয়েটারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উইলিয়ম লিন্টন্ জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন। সেণ্ট জনস্ কেথেড্রালে তিনি পিয়ানো বাজাইতেন। জুলিয়াস সীজারের ভূমিকায় তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি কিছুদিন চৌরঙ্গী থিয়েটার লিজ নিয়াছিলেন।

জর্জ্জ চিনারী ছিলেন একজন চিত্রকর। কলিকাতায় তিনি অনেক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কেপ্টেন্ জর্জ্জ অগাষ্টাস্ ফ্রেডারিক ফিটজ ক্লেরেন্স ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের পুত্র। তিনি মারকুইস্ হেষ্টিংস্‌এর এডিকং ছিলেন। পরে তিনি আর্ল অব্ মনষ্টার হইয়াছিলেন। যতদিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন ততদিন চৌরঙ্গী থিয়েটারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গের মধ্যে মিসেস্ এস্‌থার লীচের স্থান ছিল সকলের উপরে। তিনি বাঙ্গালার মিসেস্ সিডনস্ নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ লীচের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন সৈনিক ছিলেন। সৈন্য বিভাগের জনৈক বিপত্নীক কর্ম্মচারী মিঃ জন লীচের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মিসেস্ লীচ অপেক্ষা তাঁহার স্বামী সতর বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি যখন দমদম থিয়েটারে অভিনয় করিতেন, তখনই তাহার খ্যাতি কলিকাতা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মোটামুটি রকম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুখস্থ করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। যখন বালিকা মাত্র তখনই টম্ থাম্ব এবং লিট্‌ল্ পিক্‌ল্ (Tom Thumb and Little Pickle) অভিনয়ের জন্য তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার অভিনয় দক্ষতা দেখিয়া সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে সেক্সপিয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। সেই হইতেই তিনি অমর সেক্সপিয়রের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন এবং কি গদ্য কি পদ্য সেক্সপিয়রের যাহা কিছু তিনি কাছে পাইয়াছেন, সমস্তই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট'এর পৃষ্ঠপোষকতায় চৌরঙ্গী থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ মিসেস্ লীচকে চৌরঙ্গী থিয়েটারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বামীকে গ্যারিসন্ সার্জ্জন মেজর করিয়া ফোর্ট উইলিয়মে বদলী করা হয়। মিসেস্ লীচ্ প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী ছিলেন। দেখিতেও ইনি যেমন সুশ্রী ছিলেন, তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, তাঁহার স্বভাব ছিল বিনয়নম্র, ব্যবহার ছিল মধুর, আর কণ্ঠস্বর ছিল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতই মাধুর্য্যপূর্ণ। নাটক অভিনয়ের জন্য যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন তাহার কোনটারই অভাব ছিল না। ইংলিশম্যানের সম্পাদক মিঃ ষ্টকোয়েলার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার সমকক্ষ ইংলণ্ডেও কেহ ছিল না। ওথেলো (Othello) দি ওয়াইফ (The wife), দি হাঞ্চব্যাক(The Hunchback) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটক, কি Lady of the Lyons এর ন্যায় উৎকৃষ্ট মিলনাত্মক নাটক, কি La Muetta-এর ন্যায় পঞ্চরং, কি ইটালিয়ান অপেরার ছোট ছোট ভূমিকা প্রকৃতির এই চতুরা অভিনেত্রীর কাছে সকলই ছিল সমান।

১৮২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি Lady Teazle এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই ভূমিকার অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছিল। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সহিত মিসেস্ লীচ অভিন্ন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অদৃষ্টের সহিত চৌরঙ্গী থিয়েটারের ভাগ্যও যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। ১৮২৬ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত চৌরঙ্গী থিয়েটারের উন্নতির সময়, এই সাত বৎসর তিনিও অখণ্ড মনোযোগের সহিত অভিনয় করিতে পারিয়াছিলেন। তারপর আসিল পরিবর্ত্তন; কিন্তু শুধু তাঁহার ভাগ্যেই নহে থিয়েটারের ভাগ্যেও। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু

হয়, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহার স্বাস্থ্য এতই খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি আর অভিনয়ে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইল। ১৮৩৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে তিনি যে অভিনয় করেন চৌরঙ্গী-থিয়েটারে উহাই তাঁহার শেষ অভিনয়। তাঁহার বিদায়ের সময় যে ছন্দময়ী বিদায়বাণী তিনি আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার দুর্ভাগ্য কলিকাতার নাট্যশালার উপরেও ছায়াপাত করিয়াছিল। মিসেস্ লীচের সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গী থিয়েটারেরও সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

এই থিয়েটার কোম্পানীর হিসাব নিকাশ প্রতিবৎসর কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারীগণের সভায় পেশ করা হইত। হিসাব আসেল যে টাকা উঠান হইয়াছিল তাহা ছাড়া ১৮২৫—১৮২৬ সালে আয় হইয়াছিল ৮৪৬২৲ টাকা আর মোট খরচ হইয়াছিল ৮৩৫৬৷৵০ আনা। সুতরাং ঐ বৎসর খরচ বাদে ৫৬৵০ আনা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু শতকরা ৮৲ টাকা সুদে থিয়েটারের কিছু ঋণ ছিল। উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮০১৩৵১০। সত্ত্বাধিকারীদের খরচ হইয়াছিল ১৯৫।৶৬ এবং থিয়েটারের দেনার মোট পরিমাণ হইয়াছিল ১০১২২৲ টাকা। এই দেনা আদায়ের জন্য একটা নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রতি অংশের জন্য প্রত্যেক সত্ত্বাধিকারীকে ১০০৲ টাকা দিতে হইবে এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত অংশের জন্য দিতে হইবে ৫০৲ টাকা। মিঃ লিনটন্ ছিলেন থিয়েটারের লীজ গ্রহিতা। তিনি তাঁহার লীজের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিয়া লইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল এবং কার্য্য পরিচালনের সমস্ত ভার অর্পিত হইল মিঃ প্রেস্কেপের উপর।

অতঃপর ভাল ভাল অভিনেতা এবং অভিনেত্রী সংগৃহীত হওয়ার পর থিয়েটারের অনেকটা উন্নতি হইতে লাগিল এবং থিয়েটারের বাড়ীও মেরামত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৩—১৮৩৪ হইতে থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। কাজেই প্রতি রাত্রি ১০০৲ টাকা ভাড়ায় এক ইটালিয়ান কোম্পানীর নিকট থিয়েটার লীজ দেওয়া হইল। ইহার পর থিয়েটারের কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছিল বটে। কিন্তু ইটালিয়ান অপেরা খুব জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, কাজেই এত উচ্চহারে ভাড়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন প্রতি রাত্রি ৫০৲ টাকায় এক ফ্রেঞ্চ কোম্পানীকে থিয়েটার লীজ দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারাও ভাড়া চালাইতে না পারায় রঙ্গমঞ্চের সত্ত্বাধিকারীগণ নিজেরাই অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহারা থিয়েটারের প্রবেশ মূল্য হ্রাস করিয়া দিলেন, বক্স হইল ৬৲ টাকা, পিট্ ৩৲ টাকা। ইহাতে দর্শকের সংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু থিয়েটারকে অধিক দিন আর বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। ঋণ ক্রমশঃ বাড়িয়া ২০৭৩৯৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নাট্যশালা নীলামে বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে চৌরঙ্গী থিয়েটার উহার সমস্ত সাজ-সজ্জা সীন-সিনারী সহ নীলামে ক্রয় করিলেন। এই থিয়েটার দ্বারা নিজে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি উহা ক্রয় করেন নাই—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উহার পূর্ব্বতন সত্ত্বাধিকারীদের নামে থিয়েটারের উন্নতিবিধান করা। তিনি প্রত্যেক অংশের জন্য দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিয়া পূর্ব্বসত্ত্বাধিকারীদের অংশীদার হইয়াছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই বিপুল স্বার্থত্যাগ ব্যতীত চৌরঙ্গী থিয়েটার অকালেই বিলুপ্ত হইত। অবশ্য থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড এবং তাঁহার দুই ভগ্নী চৌরঙ্গী থিয়েটারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা যখন ভারত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ১৮৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস্ ইডেনের একখানি চিঠি হইতে কলিকাতার তৎকালীন থিয়েটারের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের স্বদেশ যাত্রা উপলক্ষে থিয়েটারের অবৈতনিক অভিনেতৃবর্গ অভিনয়ের এক আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছায় আজ রাত্রে আমরা থিয়েটার দেখিতে যাইব। তাপমানের উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী

উঠিয়াছে, কিন্তু নূতন থিয়েটারে পাখার কোন বন্দোবস্ত নাই। অনেক সময় সন্ধ্যাকালে মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয়, কিন্তু সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে বাতাস একটুকুও থাকে না, আমরা আবার রাজার মৃত্যুর জন্য কাল পোষাক পরিধান করিয়া আছি।"

১৮৩৭ সালে ২৬নং রেজিমেন্টের প্রাইভেটগণ কর্তৃক পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণের সাহায্যের জন্য রোবরয় (Rob Roy) এবং অনেষ্ট থীবস্ (Honest Thieves) অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু লেডীস্ কমিটি (Ladies Committee) টিকিট বিক্রীর ৬০০৲ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রথাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার উদ্দেশ্যে চার্চ্চের প্রেরণাতেই নাকি তাঁহারা ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

চৌরঙ্গী-থিয়েটারের অবস্থা পরে আবার খারাপ হইয়া দাঁড়াইল, আবার অনেক টাকা ঋণ হইল। তখন থিয়েটারকে বিক্রয় করা অথবা লীজ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না। থিয়েটারটিকে কি উপায়ে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিঃ সি, আর, প্রিন্সেপ, মিঃ জে, পি, গ্রাণ্ট, মিঃ ডাবলিউ, ইয়ং, মিঃ ডবলিউ, পি, গ্রাণ্ট, এবং আরও কয়েকজন এক সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মিঃ মান্নুক (Mr Mannuck)। সভায় স্থির হয় থিয়েটার বিক্রয় তো করা হইবেই না, এমন কি ভাড়াও দেওয়া হইবে না। খরচের পরিমাণ অর্দ্ধেক হ্রাস করিয়া থিয়েটারকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন একা আসে না। একদিকে আর্থিক অনটন আর একদিকে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে কেহ মৃত, কেহ অসুস্থ, কেহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই তখন সব দিক দিয়াই চৌরঙ্গী থিয়েটারের জীবন-মরণ সমস্যা। এদিকে আবার থিয়েটারের সীনগুলি ছেঁড়া-নেকড়ায় পরিণত হইয়াছে, পোষাক-পরিচ্ছদ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাদ দিয়া জল পড়ে, চামচিকা এবং ইঁদুর থিয়েটার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ থিয়েটারে বড় যাইতেন না। ইতিমধ্যে থিয়েটারের সমস্ত দুর্ভাগ্যের সহিত চৌরঙ্গী-থিয়েটার একদিন অগ্নিদেবের কৃপায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ১৮৩৯ সালের ৩১শে মে রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে দেখা গেল থিয়েটার গৃহে আগুণ লাগিয়াছে। থিয়েটার গৃহ সাজসজ্জা, সীন-সীনারী, আসবাবপত্র প্রভৃতি দাহ্যমান পদার্থে পরিপূর্ণ। কাজেই অগ্নির লেলিহান জিহ্বা এত দ্রুত গতিতে থিয়েটার গৃহকে গ্রাস করিতে লাগিল যে দমকল আসিয়াও আর উহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বক্স, পিট, গ্যালারী সমস্ত সাজসজ্জাসহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। থিয়েটার গৃহের উপরিভাগে কাঠের ডোম (dome) ছিল। উহাতে আগুণ লাগিয়া অগ্নিশিখা এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে সহরের সুদূর প্রান্ত হইতেও লোকে এই আগুণ দেখিতে পাইয়াছিল। ডোমটী ভস্মীভূত হইয়া রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় ভীষণ শব্দে নিপতিত হইল। অগ্নির কবল হইতে মাত্র দুইটী অংশ রক্ষা পাইয়াছিল। থিয়েটার বাড়ীর পশ্চিমদিকের এবং দক্ষিণদিকের অংশ কেবল পোড়ে নাই। থিয়েটারের সেক্রেটারী এই দক্ষিণ-অংশে বাস করিতেন। থিয়েটারের সামান্য একটা জিনিষও রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। আগুণ যে কিরূপে লাগিয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেদিন রাত্রে "পাইলট" (Pilot) এবং শ্লিপিং ড্রট্ (Sleeping Draught) এর রিহারসেল হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় রিহারসেল শেষ হয় এবং তাহার একটু পরেই অভিনেতাগণ বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে সমস্ত আলো নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রতি রাত্রে ষ্টেজের সম্মুখে যে বাতিটি জ্বলে তাহাই কেবল জ্বলিতেছিল। সর্ব্বশেষে থিয়েটারের সেক্রেটারী মিঃ ষ্টোর শয়ন করিতে যান। তিনি সর্ব্ব প্রথম আগুণ লাগার বিষয় জানিতে পারেন।

চৌরঙ্গী-থিয়েটার এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকদিন পর্য্যন্ত উহার ধ্বংশের কথা লোকের মুখে মুখে ছিল। থিয়েটার ইন্সিওর করা ছিল না। কাজেই স্বত্বাধিকারীদের ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল ৭৬০০০৲ টাকা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮০৯-২৪ ফেব্রুয়ারী) প্রসিদ্ধ সেরিডেনের Drury Lane থিয়েটার ভস্মীভূত হইলে লর্ড বায়রণ যে কবিতাটি রচনা করেন, চৌরঙ্গী থিয়েটার ভস্মীভূত হওয়ায় আজ তাহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে—

"In one dread night our city saw and sighed
Bowed to the dust Drama's tower of pride,
In one short hour beheld the blazing flame
Apollo sank and Shakespeare ceased to reign."

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আট

ব্যথিয়া পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূচ্ছ'না-ভরে গীত ঝঙ্কার
ধ্বনিছে মর্ম্ম মাঝে!
রবীন্দ্রনাথ

বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের দিন গ্রাম্য নরনারীদের মধ্যে যে প্রীতির ভাব ও আলিঙ্গন চলিয়াছিল সেই দৃশ্যটি সুচিত্রার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে মনে হইতেছিল, এত প্রীতি ও মিলন যেখানে, সেখানে কখনই কোনও বিদ্রোহের ভাব জাগিতে পারে না। কিন্তু এ কয়-দিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল গ্রাম্য জীবনে ও সহরের জীবনে কত কি প্রভেদ! গ্রামের প্রাচীনা ও প্রবীণা মহিলারা তাহার সম্বন্ধে এমন সব অসঙ্গত প্রশ্ন তাহার সম্মুখেই করিয়াছে সুচিত্রার কাছে তাহা একান্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। সুচিত্রা সে সব বড় একটা গায়েই মাখে নাই। অনেক অপ্রিয় মন্তব্য হইতে তাহকে রক্ষা করিয়াছে কুন্তলা। কুন্তলার স্বভাবের বিশেষত্ব এই যে, সে কোনরূপ অন্যায়কে সহিতে পারে না—সে বেশ নির্ভীকভাবে গ্রাম্য নারী সমাজের নেত্রীদের বুঝাইয়া দিয়াছে যে সুচিত্রা কত বড় ঘরের মেয়ে এবং কতখানি নিঃস্বার্থভাবে সে আসিয়াছে গ্রামের নারী সমাজের কল্যাণের জন্য। এই যে গ্রামের নারী সমাজ নানা ভাবে আলস্যে দিন অতিবাহিত করিতেছে, অনাহারে দিন যাপন করিতেছে, স্বাস্থ্যহীন, সৌভাগ্যহীন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী নারী সমাজকে জাগাইয়া তুলিবার এই অভিযান করিতে যে তরুণী সর্ব্বপ্রকার আলোচনা, নিন্দাবাদ ও কুসংস্কারকে প্রতিহত করিয়া এক অখ্যাত ও অজ্ঞাত পল্লীতে ছুটিয়া আসিয়াছে সে কি তাহার কম মানসিক শক্তির পরিচায়ক।

সুচিত্রা ও কুন্তলা দুই জনে তাহাদের তেতলার নিভৃত কক্ষটিতে বসিয়া কথা বলিতেছিল। ঘরের সম্মুখে খোলা ছাদ। ছাদের আলিসার কাছে দুইটি সুপারি গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর সম্মুখে দক্ষিণদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে মাঠের পর মাঠ চোখে পড়ে। মাঠে মাঠে ধান। ধানের সোনার শিষগুলি বিস্তৃত মাঠের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে দূরবর্ত্তী গ্রামের মঠের চূড়া,—আর কুটিরশ্রেণী, আঁকাবাঁকা খাল। শরতের প্রসন্ন রৌদ্র প্লাবনে একটা উৎসাহ ও আনন্দের বার্ত্তা যেন দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে।

রৌদ্র আসিয়া সারা ছাদখানিতে পড়িয়া উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। শীতের বেশ একটু আমেজ পড়িয়াছে। আসন্ন শীতের অনুভূতি বেশ আরামপ্রদ। দুইখানি চেয়ারে বসিয়া কুন্তলা ও সুচিত্রা গল্প করিতেছিল। কুন্তলার মা সম্মুখস্থিত টিপয়খানির উপর তাঁহার নিজ হস্তে প্রস্তুত প্রচুর মিষ্টান্ন ও চা আনিয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবেশনে তিনি আনন্দ পাইয়া থাকেন। আর সুচিত্রা মেয়েটিকে তাহার খুবই ভাল লাগিয়াছে। তিনি পাড়ার মহিলাদিগকে বলিয়া বেড়ান—কি চমৎকার মিষ্টি স্বভাব। কে বলবে এতটা লেখাপড়া শিখেছে। খাসা মেয়ে—কলকাতার মেয়ে এত ভাল হয় তা ত' জানতাম না!

সুচিত্রা ও কুন্তলা পরম তৃপ্তির সহিত চা ও জলযোগ করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা কথার আলোচনা করিতেছিল।

সুচিত্রা বলিতেছিল, "আর ত' চুপ করে বসে থাকতে পারি না ভাই, একবার তোর দাদাকে বল কাজ সুরু করে দিই। না জানি সুব্রতবাবু কত কাজ কর্চ্ছেন।"

কুন্তলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই ত' এক মুহূর্ত্তও চুপ করে থাকিস্ না ভাই। মা বলেন, মেয়েটী একেবারে রূপে লক্ষ্মী - গুণে সরস্বতী। আমি মাকে বলি এ তোমার কি অন্যায় মা, আপন মেয়েটির সুখ্যাতি না করে, সুখ্যাতি কর কিনা এক বিদেশী মেয়ের!"

সুচিত্রা বলিল, "একি অন্যায় ভাই তোর, আমার প্রশংসা শুনে তোর হিংসে হয়?"

"হবে না—একশোবার হবে। ভাল কথা—তুই সুব্রত-বাবুর ঠিকানাটা জানিস্ ত?"

"সত্যি ভাই না।"

"কেন এক সঙ্গে ফিরবার জন্যে নাকি ?"

"কি যে বলিস্। এ ক'টা দিন ত কেবল খেতে আর গল্প করতে করতেই কেটে গেল। হাঁ ভাই, এইবার তোর দাদাকে বলে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে দে। মাকেও বল্না ভাই।

এমন সময়ে সিঁড়ির কাছে চটিজুতার চট্‌পটাপট্‌ শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ির দরজার কাছ হইতে ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আস্তে পারি কি ?"

সুচিত্রা অতি মধুর স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই পারেন, আসুন!"

কুন্তলা বলিল, "ছোড়দা, সুচিত্রা তোমার কথাই বলছিল। ওর আর চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। ও যে কাজে এসেছে সে কাজ সুরু না করলে লোকে কি বলবে। তাই আমরা দু'জনে ব্যস্ত হয়েছি কাজ সুরু করে দিতে। বল না ভাই ছোড়দা—কি ভাবে কাজ সুরু করা যায়!"

ত্রিবিক্রম পাশের একখানি ছোট চৌকি টানিয়া বসিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি করবেন সঙ্কল্প করে এসেছেন বলুন ত'! সব শুনে দেখবো কি ভাবে আপনাকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি।"

সুচিত্রা ঘরের মধ্য হইতে তাহাদের সব কাগজ পত্র, বিলি করিবার জন্য ছাপানো বই, খাতা পত্র, পেন্সিল একে একে সব আনিয়া দেখাইতে লাগিল। ত্রিবিক্রম বেশ মনোযোগের সহিত সে সব নিবেদনপত্র ও বক্তৃতার মর্ম্ম পড়িয়া কহিল, "আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদের মধ্য হতে নিরক্ষরতা দূর করা। সেজন্য গ্রামের মেয়েদিগকে উৎসাহিত করা, এই ত'?"

সুচিত্রা বলিল, "মোটামুটী তাই। তারপরের কাজ যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান পালন, গৃহশিল্প এ সব বিষয়ে কাজ দেখাবেন, আমরা কর্ম্মীর দল, যারা Rural uplift এর problem বেশ ভালো করে আলোচনা করেছেন। আমাদের লক্ষ্য হবে তাদের এই যে অজ্ঞানতার অন্ধকার সেই অন্ধকার হতে মুক্তির আস্বাদ, আলোর দীপ্তি প্রকাশের প্রচেষ্টা। সেজন্য আপাততঃ প্রয়োজন হয়েছে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে একটা কার্য্য-সূচী প্রস্তুত করা। আপনি আমাদের একটু সাহায্য না করলে ত' চলবে না। করতেই হবে যে।"

সুচিত্রা সেদিন বাসন্তী রংয়ের একখানি শাড়ী ও সঙ্গে ম্যাচ করার মত হাতকাটা ব্লাউস্ পরিয়াছিল। চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে কাঁধে, কপোলে ও বাহুর দুইপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখখানি বিকশিত মৃণালের মত উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল দেখাইতেছিল।

ত্রিবিক্রম সুচিত্রার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "আপনি যে সঙ্কল্প নিয়ে এখানে এসেছেন সে যে অতি মহৎ তাতে কে সন্দেহ করবে বলুন! কিন্তু আপনি যদি একথা মন হতে ভুলে যান যে এটা পল্লী গ্রাম, তাহলে ভুলই করবেন। এখানকার বেশীর ভাগ লোক যাঁরা শিক্ষিত ও উন্নত তাঁরা বিদেশে বাস করেন। গ্রামের সমস্যা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার ত কোন দরকার করে না। আর গ্রামে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের গৃহিণী, কন্যা ও বধূদের শিক্ষার অবসর কোথায়?" তারপর কুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিল, "হ্যাঁরে কুন্তলা, তুইও ত' তোর বন্ধুর একজন সহকর্ম্মী, তুই ওঁকে নিয়ে একবার গ্রামে বেড়িয়ে আয় না।"

কুন্তলা বলিল, "আমার সাথে ত কারু সঙ্গে তেমন আলাপ নেই ছোড়দা, সে ত তুমি জানই। আমাকে ত সবাই ডাকে বিবি মেয়ে! আর বছরে ক'দিনই বা দেশে থাকি!"

"জানিরে জানি, কিন্তু তা হলেও তারা যে তোর গাঁয়ের লোক বোন্।"

"সেকি আমি জানি না দাদা! কিন্তু আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকে! তাই তুমিই একাজে আমাদের পথ দেখাও লক্ষ্মীটি!

ত্রিবিক্রম নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ সুচিত্রা কহিল, "আপনার চা খাওয়া হয়েছে?"

ত্রিবিক্রম হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই এক বিষম নেশা আছে আমার, বিলেত থাকতে এটি আমার বিশেষ করে পেয়ে বসেছিল।" সুচিত্রা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি বিলেত গিয়েছিলেন নাকি?"

কুন্তলা বলিল, "সেখানেও ত' দাদা বেশ ভাল ডিগ্রীও পেয়েছিলেন, বড় সরকারি কাজও জুটেছিল—কিন্তু সে দিকে ত' আর গেলেন না।" ত্রিবিক্রম তাহার হাতের বেতের মোটা লাঠিটা দিয়া জোরে ছাদের উপর একটা আঘাত করিয়া কহিল, "চুপ কর, তোর ঐ বাজে বকা ছেড়ে দে।"

কুন্তলা কহিল, "দেখলি ভাই সুচিত্রা, ছোড়দার আচরণ! বাবা! সত্যি কথা বলবারও জো নেই।"

ত্রিবিক্রম বলিতে লাগিল, "সকলের আগে আপনি একবার আমাদের গ্রামখানিকে ঘুরে দেখুন। উৎসবের আনন্দের মধ্যে দৈন্য কখনও ধরা পড়ে না। আমি আমাদের দেশের অনেক বড় বড় নেতাকে আক্ষেপ করতে শুনেছি "দেশের কাজ করবার সুযোগ কোথায়?" সুযোগ কি আপনি এসে ধরা দেয়? তাকে খুঁজে বের করতে হয়। নিজের চোখে সব দেখলে আপনি নিজেই বেছে নিতে পারবেন, আপনার কর্ম্মক্ষেত্র, চলুন ত তৈরী হয়ে আমার সঙ্গে। আমি নীচে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। কিরে কুন্তলা তুই রাগ করলি নাকি?" কুন্তলা—মৃদুস্বরে কহিল, "বাবা! যে রাগ তোমার। তুমি আমার মুখ চেপে রাখবে কিনা! সত্যি কথা বলতে গেলেই চটে যাও। আমি একশোবার বলব!"

এইবার ত্রিবিক্রম রাগ করিল না। সে পরম স্নেহের সহিত কুন্তলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "দেখ তোর বন্ধুর কাছে যত পারিস আমার নিন্দে করিস্ আমি তোকে অভয় দিলেম। তোরা আয়! আমি আজ তোদের সব দেখিয়ে আনতে চাই। ত্রিবিক্রম একথা বলিয়া চটীর চট্ পটাপট্ শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।"

খানিক পরে কুন্তলা ও সুচিত্রা সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া ত্রিবিক্রমের সঙ্গী হইল। তাহারা তিনজনে গ্রামের পথে চলিল—প্রথমেই তাহারা আসিল গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়টি দেখিতে। একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত ও মহিলা শিক্ষয়িত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পূজার ছুটি তখনও ফুরায় নাই, তবু পণ্ডিত মহাশয় ও শিক্ষয়িত্রী ত্রিবিক্রমের কথায় গ্রামের সব মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ছোট প্রাইমারী বিদ্যালয়। একখানি টিনের ঘরে বসিয়াছে। ঘরের একদিকের বেড়া নাই! বারান্দায় রাত্রিতে যে গরু, ভেড়া ও ছাগল আসিয়া আশ্রয় নেয় তাহার অনেক চিহ্ন তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। পথটি জঙ্গলে ও কাদায় ঢাকা। দুই দিকে কণ্টক গুল্ম। স্কুলের সম্মুখস্থ স্কুল ঘরে কোন রকমে কয়েক খানি বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। একদিকে একখানি চাটাইয়ের উপর বসিয়া কয়েকটি ছোট মেয়ে কাঠের তক্তির উপর খড়ি দিয়া ক, খ লিখিতেছে। উচ্চ শ্রেণীতে বড় জোর চার পাঁচটি মেয়ে।

ত্রিবিক্রম, সুচিত্রা ও কুন্তলাকে সহ স্কুলে আসিলে পর বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় ও তরুণী শিক্ষয়িত্রী বিনীত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও দাঁড়াইল। সুচিত্রা লজ্জিত হইয়া কহিল, তোমরা সব বসনা ভাই! পণ্ডিত মহাশয় একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আপনাদের মত মহীয়সী বিদুষী মহিলার শুভাগমনে আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়-গৃহ পবিত্র হইল। আমরা এবং আমাদের ছাত্রীর ধন্য হইল।' পণ্ডিত মহাশয় এই ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল বক্তৃতা করিলেন। তারপর দুইটি ছোট মেয়ে আসিয়া সুচিত্রা, কুন্তলা ও ত্রিবিক্রমের গলায় তিনটি শেফালি ফুলের মালা পরাইয়া দিল।

সুচিত্রা মালাটি খুলিয়া কহিলেন, "এ কি পণ্ডিতমশায়!

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মাননীয় অতিথিদের আর কি দিয়েইবা আমরা সম্মান করতে পারি! তাই এই সামান্য ফুলের মালা।"

সুচিত্রা গণিয়া দেখিল সব শুদ্ধ মাত্র পনেরোটি মেয়ে হাজির হইয়াছে। একটি ছোট মেয়েকে সে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিল এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি নাম ভাই!" মেয়েটি ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িয়াছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমার নাম এই—কমলা। বাঃ বেশ নামটিত তোমার। তুমি কি বই পড় বলতে পার? ক খ, লিখি পড়ি। আর 'সহজ পড়া' প্রথম ভাগ পড়ি। আজ কি খেয়ে স্কুলে এসেছ। সকাল বেলা তোমার মা কি খাইয়ে দিয়েছেন? ফিরতে ত' বেলা হবে খানিকটা।"

কমলা মুখখানি কাচুমাচু করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নুন দিয়ে ভাতের ফেন খেয়ে এসেছি।

কমলার রঙটি বেশ ফর্সা। মুখখানি বেশ ঢল ঢলে। বয়স তার পাঁচ ছয় বছরের বেশী নয়, অতি নোংরা ছেঁড়া একটি ফ্রক পরিয়া স্কুলে আসিয়াছিল।

তোমার এই জামাটি যে একেবারে ছিড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি! কমলা কহিল, "আমার ত আর কোন জামা নেই কি না, আপনারা আসবেন বলে মা এই জামাটি আজ পরিয়ে দিয়েছেন! আমার এই একটি মাত্র পোষাকী জামা আর ত'

কোন জামা আমি পরি না। খালি গায়ে স্কুলে আসি কিনা। তাই জামা আর লাগে না।" এই বলিয়া মেয়েটি কিক্ করিয়া হাসিল এবং সুচিত্রার সাড়ীর আঁচলটা ধরিয়া নাড়াচড়া করিতে লাগিল। তারপর সে যে মেয়েটির কাছে গেল—সে মেয়েটির বয়স হইবে প্রায় বারো বছর। উচ্চ প্রাইমারী ক্লাশে পড়ে। অতি ছেড়া একখানি কাপড় কোন রকমে সেফালি ফুলের বোঁটা দিয়া রঙ করিয়া পরিয়াছে। আট দশ যায়গায় সেলাই তবু কাপড়খানি পরিবার যোগ্য হয় নাই। সুচিত্রা বিষণ্ণভাবে মেয়েটির দিকে চাহিয়া কুন্তলার দিকে চাহিল। কুন্তলা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল। কোন কথা কহিল না।

এইভাবে সুচিত্রা একে একে প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় করিল এবং বলিল, "আজ বিকেলে আমরা তোমাদের বাড়ী বেড়াতে যাব।" সে কাহাকেও পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদ্যা পরীক্ষা করিতে গেল না। মেয়ে কটির সামাজিক অবস্থা, দুঃখ দৈন্যের কথাই তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। মেয়েরা বুঝিয়াছিল, হয় ত' স্কুলের ইন্স্পেকট্রেস তাহাদের স্কুল দেখিতে আসিয়াছেন, তাই তাহাদের মনে একটা ভয় ও আশঙ্কার ভাব ছিল, কিন্তু সুচিত্রাও কুন্তলার সুমিষ্ট ব্যবহারে তাহাদের সেই সঙ্কোচ দূর হইল তাহারা অকপটে তাহাদের জীবনের ও বাপ মার সব দুঃখ দৈন্যের কথা বলিয়া গেল।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দুই জনেই গ্রামের লোক। শিক্ষক ভদ্রলোক যে সামান্য বেতন পান—জেলাবোর্ড হইতে তাহা কখনও তিন মাস কখনও বা ছায়মাস পরে আসে। অথচ এই বৃদ্ধের আট দশটি লোককে প্রতিপালন করিতে হয়। একজোড়া চটি জুতা সেই কোন্ যুগে কিনিয়াছিলেন সেইটী তাহার সম্বল, পরণে অর্দ্ধমলিন একখানি কাপড় সেখানিকে সোডা দিয়া কাচিয়া যতটা পরিষ্কার করা সম্ভব তাহাই করিয়াছেন। গায়ে একটি সেকেলে ধরণের সার্ট তাহাতে বুতাম নাই কাপড়ের সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। লোকটি দীর্ঘ ছিপ্ ছিপে শ্যামবর্ণ। লম্বা পাকা দাড়ি। মাথার চুলও কাঁচা পাকা। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম মদনমোহন দত্ত। দত্ত মহাশয় এ গ্রামের অনেকেরই গুরু। এ গ্রামের প্রথম পাঠশালায় পণ্ডিতি করিতে করিতে তাঁহার বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি আসিয়াছে। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসেন। ইঁহার অনেক ছাত্র আজ ডেপুটী, জজ ও সাবজজ। কিন্তু তাঁহারা এই গ্রামের শিক্ষককে কি আর কখনও স্মরণ করেন। রোগে ভুগিলেও তাহাকে স্কুলে এক দিনের জন্য অনুপস্থিত হইতে দেখা যায় না। যখন বর্ষার জলে পথঘাট ডুবিয়া যায়, তখনও শ্রাবণের বর্ষা মাথায় করিয়া হাঁটুর উপর কাপড়খানিকে তুলিয়া নালা, খাল সব পার হইয়া স্কুলে আসেন। কতদিন আসিয়া দেখিয়াছেন স্কুলঘরে হয় ত' একটিমাত্র ছেলে বা মেয়ে বসিয়া আছে, ব্যাঙের অশ্রান্ত ডাকে শ্রাবণের ঘনঘোর প্লাবনে আকাশ অন্ধকার হইয়া আছে। ঝড়ের বাতাস মাতামাতি করিতেছে। কোনদিকে লক্ষ্য নাই পণ্ডিত-মহাশয় সেই একটিমাত্র ছেলে বা মেয়েকে লইয়া পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন—

> "কি কারণ ভীরু, তব মলিন বদন ?
> যতন করহ লাভ হইবে রতন।
> কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ,
> উদ্যম বিহনে কার পুরে মনরথ ?
> কাঁটা হেরি, ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ;
> দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

এই দীর্ঘ জীবন কবিতা পড়াইয়াও তিনি ক্লান্ত হন নাই, উদ্যম হারান নাই, তবু কি তাঁর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ? ঘরের চালে ছন থাকে না. ঘরে চাল থাকে না, ক্ষুধার জন্য ক্ষুধিত ছেলেমেয়েরা কাঁদে, তবু তাঁহার আজ চল্লিশবৎসরের উপর—

> কাঁটা হেরি, ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

পড়া চলিতেছে।

সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই যে স্কুলে ঢুকিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সেই এক চাকুরীতেই বহাল আছেন। একদিন এই গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলটিতে প্রায় দেড়শত দুইশত ছাত্র ছিল, গ্রামখানি গম্ গম্ করিত। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইল—ছাত্রবৃত্তি ও মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলির হইল শোচনীয় দুরবস্থা। পণ্ডিতমহাশয় সে সময়ে বেতনও বেশী পাইতেন এবং ছেলেদের কাগজ, পেন্সিল, খাতা যোগাইয়াও তাঁহার দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত—এখন

সেইদিন আর নাই। নিরীহ পণ্ডিতমহাশয়ের কেমন মায়া —তিনি গ্রাম আর স্কুল এ দু'টি ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। মদন পণ্ডিতমহাশয়ের দৈন্য দেখিয়া তাঁহার এক কৃতী ছাত্র এক জমিদারকে বলিয়া একটি ছোট মহালের নায়েবীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মদন পণ্ডিত তাঁহার এই জন্মভূমিকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী হইলেন না। এই গ্রাম ও গ্রামের লোককে এমন দরদ দিয়া ভালবাসিতে বড় দেখা যায় না।

কোন বিধবা একটিমাত্র শিশুসন্তানকে লইয়া বাড়ীতে বাস করিতেছে, কে তাহার বাজার করিয়া দিবে? সেখানে পণ্ডিতমহাশয়ই হাজির আছেন। হাট ও বাজার করিয়া দেন। এমন অনেক অভিভাবকহীন পরিবারের বাজার করিবার ভার তিনি স্বেচ্ছায় বহন করেন। পরের সেবা, পরের কাজ করিয়াই তাঁহার আনন্দ।

সুচিত্রা পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ করিল। তাঁহাকে আপনার পাশে বসাইয়া সব কথা শুনিল। তারপর কহিল, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, আপনি কি এ গ্রামের নিরক্ষরদের শিক্ষার ভার নিতে পারেন না?

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "পারি মা, কিন্তু কে পড়বে বলুন ত মা!"

"কেন? গ্রামে ত অনেক স্ত্রীলোক আছেন, তাঁরা কি আপনাদের অবস্থার উন্নতি করতে চান না!"

"কে না চায় বলুন? তবে সে প্রাণ কি তাঁদের আছে?"

"সে প্রাণ আপনারাই ত তৈরী করে নিতে পারেন না।" তারপর শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনিও ত একাজ আমাদের সঙ্গে করতে পারেন। পারেন না কি?"

শিক্ষয়িত্রীর নাম গিরিবালা। সে কুলীনকন্যা বিধবা। মামার বাড়ী এই গ্রামে। মামার বাড়ীতেই সে মানুষ হইয়াছে। তাহার স্বামী এই বর্ত্তমান যুগেও বেশী কিছু নয় পাঁচটিমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পাঁচটি পত্নীর মধ্যে দুইজন স্বামীর জীবিতকালেই মারা গিয়াছেন। গিরিবালার সহিত যখন সেই বিধুঠাকুরের সন্তান কুলীনশ্রেষ্ঠ করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, তখন গিরিবালার বয়স মাত্র আঠারো উনিশ বৎসর—সুন্দরী যুবতী। আর মুখুয্যেমহাশয়ের বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। গিরিবালার মামারা মুখুয্যে-মহাশয়কে রাজী করিয়া এই বিবাহ দিলেন এবং বলিলেন যে আমরা ত' সব বিদেশে দূর আসামে থাকি, গিরিকে ত আর সেখানে নেওয়া যায় না। আমাদের বাড়ীঘর দেখবার শুনবার ভার আপনার আর গিরির উপর রইল। সদাশয় মুখুয্যেমহাশয় এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীদের সন্তানেরা সকলেই কৃতী হইয়াছিলেন, কেন না মুখুয্যেমহাশয় কৌলিন্যের জোরে খুব বড়লোকের কন্যা ও ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা নিজ নিজ পিত্রালয়েই থাকিতেন। ছেলেমেয়েদের ভরণ পোষণের ভার তাঁহার ছিল না। হয় ত' আট দশবৎসর পরে পত্নী ও পুত্র-কন্যা সম্ভাষণে আসিতেন। এবং কিছু টাকা আদায় করিয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগটি হাতে করিয়া প্রস্থান করিতেন। ছেলে বাবাকে জানিত না, তাহাদের যত কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল শুধু মাতুলবাড়ীর সহিত। সেই সব ধনী কন্যাদের কাছে যৌবনে খানিকটা সমাদর থাকিলেও বৃদ্ধ বয়সে কোন সমাদরই ছিল না—তাই তিনি সেবাপরায়ণা একটি যুবতী ভার্য্যার সন্ধান করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সহজেই তাঁহার আশাতীত পত্নী লাভ হইল।

গিরিবালা সব শুনিল, সব বলিল, কিন্তু নিরীহ পরের আশ্রিতা সে, তাহার ত' কিছু করিবার অধিকার নাই। অথচ সে বেশ মেধাবী ছিল, নিজের চেষ্টা ও যত্নে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহার তরুণ মনের মধ্যে যে বাসনা ও কামনা স্ফুরিত হইতেছিল তাহা মুকুলেই বিলীন হইয়া গেল।

গিরিবালার বিবাহের পর তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী মাত্র পাঁচ-বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। গিরিবালা সুন্দরী। গিরিবালা তরুণী, তাহার স্বভাবটিও মধুর। মদন পণ্ডিতমহাশয়ের, চেষ্টা ও যত্নে এবং ত্রিবিক্রমের আগ্রহে সে ট্রেণিং পাশ করিয়া এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইয়াছে। গিরিবালা সীবন-শিল্পে ও সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। গিরিবালার এই পরিচয়টুকু এখানে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়াই দিলাম।

গিরিবালা কহিল, "সেত খুবই ভাল কথা। কিন্তু কাকে শিখাবেন? কে শিখবে বলুন ত?"

সুচিত্রা কহিল, "এ ত' কোন অন্যায় কাজ নয় গিরিদেবী। এই যে আপনি এখানে কাজ কচ্ছেন, যদি আপনি আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করে কোন একটা বড় কাজে লেগে যেতে পারেন, তাহলে কত ভাল হয়। সেরকম একটা কিছু কি আপনি চান না?"

"চাই, কিন্তু সুযোগ কোথায়? সুযোগ করে নেওয়ার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন বটে, কিন্তু সাহায্য ত আমরা পাই না। বলুন ত কে আমাদের মত হতভাগিনীদের কথা ভাবে?"

কুন্তলা কহিল, "গিরিদিদি ভাই, তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আমরা কথা কইব। পণ্ডিতমহাশয়ও থাকবেন। তোমাদের দু'জনেরই কিন্তু ভার নিতে হবে ভাই।"

গিরি বলিল, "যদি পারি ভাই কুন্তল, তবে কেন নেব না বলো? তবে জানত দেশের কথা। কত কি নিন্দা ও গ্লানি মাথায় করে কাজ করতে হয়।—সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, আমি কাজের ভিতর দিয়েই এইরূপ জীবনটা বিলিয়ে দিতে চাই, কিন্তু পারি কই? তুমি ত জান ত্রিবিক্রমদা, আমাকে গ্রামের কর্ত্তারা এখনও মাষ্টারণী বলে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। আর দেখছেও পাচ্ছো, এ-গ্রামে প্রায় দু'শো তিনশো মেয়ে আছে যারা স্কুলে আসতে পারে, কিন্তু কয়জন আসে? কয়জনে মেয়েদের মানুষ করতে চায়? দূর থেকে যে জিনিষকে খুব সুন্দর বলে মনে হয়, কাছে এসে দেখতে তা নয়।"

ত্রিবিক্রম কহিল, "গিরি, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, সহরের আবহাওয়া জানি না। এঁরা সব সহুরে মানুষ, এঁদের শিক্ষা, এঁদের আদর্শ যদি নিতে পারিস্ তবে সে সুযোগ যেন হারিয়ে ফেলিস্ না বোন্। অন্ততঃ একথা টা মনে রাখিস্ যে এমন একজন লোক এসেছেন যার মন সত্যই গ্রামের দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠেছে।"

সুচিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নত মুখে কহিল, "দেখুন ত্রিবিক্রমবাবু, আপনি মানুষটিত বড় সোজা নন। ছিঃ এরকম করে ঠাট্টা করতে হয়!"

ত্রিবিক্রম গম্ভীর ভাবে কহিল, "কি রকম?"

"এত বাড়িয়েও বল্‌তে পারেন! আমি কি করতে পারি। কি আমার ক্ষমতা আছে। একথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন বলুন ত? আমিত আপনার সাহায্য চাই।"

ত্রিবিক্রম স্থির দৃষ্টিতে সুচিত্রার মুখের দিকে চাহিল। সুচিত্রার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। ত্রিবিক্রম বলিতে লাগিল, "দেখুন, দেশে ছেলেদের জন্য স্কুল অনেকেই করে, কিন্তু মেয়েদের জন্য বেশী স্কুল করা কি দরকার নয়? তারপর আমাদের শিক্ষার সংজ্ঞা কি জান না। মেয়েদের নাচ, গান আর স্তোত্র মুখস্থ করালেই কিংবা ইংরেজি কয়েকখানি কেতাব পড়ালেই কি তাদের শিক্ষা হয়? শরীর, মন, মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য তত্ত্ব যে শিক্ষায় নাই, সে শিক্ষা কি আবার শিক্ষা নাকি? এমন শিক্ষা দিতে হবে যে শিক্ষার সাহায্যে তারা আপনার পায়ে সহজ সরল ভাবে দাঁড়াতে পারে। সেকাজের জন্য আমাদের কর্ম্মী সৃষ্টি করতে হবে। আমরা চাই মানুষ হতে। মানুষ করতে। আমি আপনাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কোন কথা বলি নি। আপনার মত একজন মেয়ে যে সাহস করে গ্রামের ভগ্নীদের সঙ্গে মিলবার জন্য ছুটে এসেছেন সে কিরকম আনন্দের কথা?—আপনার আদর্শে যদি নানা জেলার সুশিক্ষিতা মেয়েরা গ্রামে গ্রামে ছুটে আসে—গ্রামের কাজে মন দেয় তবে কতদিন থাকবে দেশের এই দৈন্য? পুরুষের উপর সব নির্ভর করলে কোন ফল হবে না। সরকারও বেশী কিছু করবেন না। তাঁরা দেখাবেন অর্থের দৈন্য। আমি কি চাই জানেন?—শুধু মানুষ—কাজের মানুষ।"

সুচিত্রা কোন উত্তর দিল না। সে তাহার হাতে ঝুলানো ব্যাগটি হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিল, "আপনি আপনার বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের এ টাকাটা দিয়ে কিছু মিষ্ট কিনে খাওয়াবেন।" আর দশটি টাকা গিরিবালা দেবীর হাতে দিয়া কহিল, "গিরি-দিদি, আপনি এ টাকাটা নিন্ স্কুলের মেয়েদের এক সুযোগ মত খাইয়ে দিবেন।"

গিরিবালা লজ্জিত ভাবে টাকাটা গ্রহণ করিয়া বলিল-'তাই হবে দিদি!'

নয়

জগতের দুঃখ নাথ যত তুচ্ছ ভাব তত তুচ্ছ নয়

—অক্ষয়কুমার বড়াল

ত্রিবিক্রম কহিল, "এইবার চলুন আমাদের পল্লীনিকেতনের দিকে।"

সুচিত্রা ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "চলুন। তবে নামটিতে মোটেই কবিত্ব নাই।"

ত্রিবিক্রম পাশের একটা বেতের ঝোপের আক্রমণ হইতে তাহার মোটা খদ্দরের চাদরখানি মুক্ত করিতে করিতে কহিল, আমি ত' কবি নই! কাজেই যা মনে এল তাই রাখলাম। আপনাদের মত কবি হলে হয় ত' নাম দিতেম কবিদের মত কোন একটা কোমল শব্দ দিয়ে।"

কুন্তলা চলিতে চলিতে কহিল, "দাদা, এ কোন্ পথে নিয়ে এলে? এ পথে ত' আগে কোন দিন এসেছি বলেও মনে হয় না?"

ত্রিবিক্রম কহিল, "সেনেদের বাড়ী। জানিস্ ত' এই সেনেরা একদিন ছিল গ্রামের সেরা ধনী। দোল, দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ছিল এঁদের। কিন্তু দেখুন আজ দেয়াল ভেঙে পড়েছে, ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছে। একেবারে পোড়াবাড়ী। আপনি Goldsmith-এর "The Deserted Village পড়েছেন ত'?"

সুচিত্রা কহিল, "এক সময় পড়েছিলাম।"

ত্রিবিক্রম কহিল, "আমাদের গ্রাম দেখলে Goldsmith-এর কবিতা মনে পড়ে যায়।" তারপর অতি মধুরকণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল,

'Sweet smiling village, loveliest of the lawn,
Of thy sports are bled, and all thy charms with-drawn,
Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen,
And desolation saddens all thy green :
One only master grasps the whole domain,
And half a tillage stints thy smiling plain :
No more thy glassy brook reflects the day,
But chok'd with sedges, works its weedy way.
Along thy glades; a solitary guest,
The hollow-sounding littern guards its nest ;
Amidst thy desert walks the lapwing flies,
And tries their echoes with unvaried cries.
Sunk are thy bowers, in shapeless ruin all,
And the long grass o'ertops the mouldering wall ;
And, trembling, shrinking from the spoiler's hand
Far, far away, thy children leave the land."

কবি যেন আমাদের গ্রামের এই শোচনীয় দুর্দ্দশাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে লিখেছিলেন বলেই মনে হয়।

তিন জনে গ্রাম্যপথে চলিতে লাগিল। পথের ডান পাশ দিয়া একটী খাল বহিয়া গিয়াছে। এই খাল গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। খালের পাশে বট, হিজল ও বাঁশের ঝাড়। জল এখন দ্রুত নামিয়া যাইতেছে, তাই স্রোতের তোড় খুবই বেশী।

সুচিত্রা পথের দুই দিকের বাড়ীঘর দেখিতে দেখিতে চলিল। গ্রামখানি শ্রীহীন কোন বাড়ীঘরেরই তেমন পারিপাট্য নাই। বাহির বাড়ীতে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া কোথাও হয় ত' কেলি কদম্বের গাছটি দেখা যাইতেছে, কোথাও হয় ত' বড় একটা চাঁপা গাছ। কোন বাড়ীতে লোক আছে বলিয়াই মনে হয় না। পাশে একখানি দো-চালা ঘরে ধোপা-বৌ একখানি শত ছিন্ন কাপড় পরিয়া একরাশ কাপড়ে সোডা মাখাইতেছে। গোয়ালবাড়ীর গরুগুলি এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। কোন যত্ন নাই এই নিরীহ বাক্‌হীন পশুগুলির প্রতি। উলঙ্গ শিশুগুলি তাহাদিগকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কেহ ত্রিবিক্রমকে বলিতেছে, "ঠাকুর ভাই, কই যাও?" ত্রিবিক্রম তাহাদের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলে, "আশ্রমে যাচ্ছি ভাই।"

এই ভাবে প্রায় দেখিতে দেখিতে তাহারা যেমন খালের একটা বাঁকের কাছে আসিল, তখন একটি প্রৌঢ়া জেলে গিন্নী আসিয়া ত্রিবিক্রমের পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া কহিল, "শ্রীনাথেরে লইয়া যাও দাদাভাই।"

"কি হয়েছে তার?"

"আইগ্যা, আইজ চাইর দিন ধইরা জ্বর। কেবল ছট্‌ফট্ করতে নাগছে।"

ত্রিবিক্রম সুচিত্রা ও কুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারা এখানে একটু দাঁড়ান। এখানেই আমাদের নৌকাতে উঠতে হবে।"

সুচিত্রা মিনতির সুরে কহিল, "আমরা কি আসতে পারি।"

ত্রিবিক্রম কহিল, "আসতে বাধা নেই, তবে না এলেই ভাল হয়! জানেন ত' এরা ভালমন্দ কিছুই বোঝে না, অনেক সময় বড় কঠিন পীড়াকেও উপেক্ষা করে, নির্ভর করে শুধু, তুলসীতলার মাটির উপর। হায় রে অবোধের দল!"

সুচিত্রা ও কুন্তলার আগ্রহে সে তাহাদিগকেও সঙ্গে লইল।

খালের পাড় হইতে সরু একটি পথ—শ্রীনাথ মালোর বাড়ীর পাশ দিয়া ঋষি পাড়ার দিকে গিয়াছে। খালের দুই দিকে কৈবর্ত্তদের বাড়ী। কোথাও কেহ জাল শুকাইতেছে, কোথাও কেহ জাল বুনিতেছে। কোন বৃদ্ধ জেলে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছে। জেলে বউরা বাহিরে উঠানের এক পাশে রান্না চড়াইয়া দিয়াছে।

একটি বড় বাড়ীর এক কোণে শ্রীনাথের মা তার একমাত্র ছেলে শ্রীনাথ সহ বাস করে। শ্রীনাথ এই প্রৌঢ়ার একমাত্র ছেলে। শ্রীনাথ বলিষ্ঠ যুবক। সে তাহাদের পাড়ার সাধন জেলের সঙ্গে জলে নৌকা চালায় ও মাছ ধরে। শ্রীনাথ এক চতুর্থাংশ লাভ পায়।

এইবার তাহারা দেশে তেমন সুবিধা করিতে না পারায়, আসাম অঞ্চলে মাছের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিল। সেখান হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর লইয়া আসিয়াছে।

ত্রিবিক্রম সুচিত্রা ও কুন্তলা নীরবে শ্রীনাথকে দেখিতে আসিল। শ্রীনাথের থাকিবার ঘর ত' আর ঘর নয় জীর্ণ কুটির। চালে ছন নাই বলিলেই চলে। বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাটিতে হোগলার উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানার উপর শুইয়া জ্বরের যন্ত্রণায় শ্রীনাথ এপাশ ওপাশ করিতেছে। তার চোখ দু'টি রক্ত জবার মত লাল। সে প্রলাপ বকিতেছিল—"আর গাঙ্গে যাইমু না! আহা-হা বড় রুই মাছটা জাল ছিঁড়া গ্যাল রে!

ত্রিবিক্রম শ্রীনাথের মাকে বলিল, "কি করেছিস শ্রীনাথের মা! এক্ষুণি ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের ডাক্তার নলিনী বাবু একটি রোগী দেখিয়া সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ত্রিবিক্রমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া এদিকে আসিয়া বলিলেন, "কে ত্রিবিক্রম দাদা এখানে, কি মনে করে?"

"কে নলিনী?"

"হ্যাঁ দাদা।"

"এস ত ভাই।" নলিনী আসিলে ত্রিবিক্রম রোগীর কথা বলিলেন।

ডাক্তার সযত্নে শ্রীনাথকে পরীক্ষা করিয়া ভীত স্বরে কহিলেন, "দাদা!"

"কি নলিনী!"

"Hopeless!"

"বল কি? তবে!"

"ঔষধ দিব, এপর্য্যন্ত। নার্সিং খুব ভাল দরকার। এ বুড়ী কিছু পারবে না। কি করবেন বলুন ত!"

"আশ্রমে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয় না?"

"না, না, এখন নাড়াচাড়া চলবে না। Impossible."

ত্রিবিক্রম ডাক্তারকে দুইটি টাকা ভিজিট দিতে গেলে, নলিনী ডাক্তার হাসিয়া কহিল, "দাদা, এতদিন কি আপনার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি। যেখানে টাকা নিতে হয় সে আমি জানি। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি এক্ষুণি আমার কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এসে দেখা শুনা করবে।"

সুচিত্রা রোগীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। সে মৃদু স্বরে কহিল, "আমরা কি কোন কাজেই লাগতে পারি না!"

"না পারেন না?"

"কেন?"

"জানেন প্রত্যেক বিষয়েই একটা শিক্ষা চাই, ধৈর্য্য চাই, আর চাই সকলের উপর প্রাণভরা ভালবাসা, সে ভালবাসা, সে দরদ আপনারা কোথা থেকে পাবেন বলুন ত'? সে প্রাণ, সে উদ্যোগ, সে উৎসাহ সে সব কিছু কি আছে আপনাদের? কেবল আছে মুখস্থ বিদ্যা, সভার আড়ম্বর, আর বক্তৃতা। ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ!"

"এখন সে সব কথা নয়!"

ত্রিবিক্রম বলিতে লাগিল, "ঘরে ঘরে, বাড়ী বাড়ী, রোগ, শোক অভাব ও অভিযোগ, এর প্রতিকার কি সহজ? কে এই নিরক্ষরদের মানুষ করবে, কতদিনে এরা আপনাদের অভাব ও অভিযোগের প্রতিকারের জন্ম মাথা তুলে দাঁড়াবে জানি না। চলুন, আর দেরী করলে চলবে না! আমি আশ্রম থেকে দু'জন ছেলেকে পাঠিয়ে দিব সেবা করতে। এত

বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে অনেক বড় লোকের বাস থাকলেও এ গ্রামে কেহ একটী ডাক্তারখানা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে নাই। বেচারা নলিনী মেডিক্যাল কলেজের খুব ভাল পাশ করা এম, বি, একে জোর করে গ্রামে রেখেছি।"

ত্রিবিক্রম উঠিয়া দাঁড়াতেই শ্রীনাথের মা ত্রিবিক্রমের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আমার শ্রীনাথ বাঁচবে ত!"

শ্রীনাথেরও যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরবাই! আমি বাঁচুম ত? আপনে আমায় বাঁচান!"—সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ত্রিবিক্রম শ্রীনাথের মায়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া কহিল, "এই নে, তোর খাবার সব জিনিষ কিনে আনিস্। ঘরে ত' দেখলাম একমুঠো চালও নেই রে। শ্রীনাথের ব্যারাম সোজা হয় নি রে শ্রীনাথের মা। কম্পাউণ্ডারবাবু আসবেন আর আশ্রমের ছেলেরা আসবে। সব ব্যবস্থা করবে তারা। সাবধান তুই যেন মিছামিছি চেঁচামিচি করিস্‌নে।"

শ্রীনাথের মা কাঁদিয়া ফেলিল। ত্রিবিক্রম লাঠিখানি হাতে লইয়া আগাইয়া চলিল। সুচিত্রা ও কুন্তলা পিছু পিছু চলিল।

জেলে পাড়ার পূব দিকের পথটি ধরিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। দুই পাশে—চালতে, জলপাই, বেল ও কালজাম গাছ। দূরে মাঠের মধ্যে একটা বড় বটগাছ। বটগাছের বিরাট শাখা প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাহারা ঘন পত্রাচ্ছন্ন একটি গাবগাছের তলায় খালের ঘাটে বাঁধা ছোট ডিঙ্গি নৌকায় উঠিলেন। একটি বালক মাঝি নাম তার—ফড়িং, সে নৌকাখানিকে লগি বাহিয়া লইয়া চলিল।

কুন্তলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলে নাই। এই বার সে নৌকায় বিছান সতরঞ্চখানার উপর বসিয়া নিজমনে মধুর-স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল;—

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ অপার বাসনা;
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে!

সুচিত্রা চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। খালের দুই পাশে বাড়ী ঘর। দুই দিকে এমন জঙ্গল যেন একটা অন্ধকার গুহার মধ্য দিয়া তাহারা চলিয়াছে।

সুচিত্রার মনের মধ্যে নানা সমস্যার উদয় হইতেছিল। কাব্যের ছবি, উপন্যাসের বর্ণনা কত বড় যে মিথ্যা আজ এ কয়দিন গ্রামে আসিয়াই তাহা উপলব্ধি করিতেছে। সহরে দিবারাত্রি কোলাহল, ট্রামের ঘর্ঘর রব, মোটরের অবিশ্রাম গতি, সিনেমার ভিড় ও বিলাসিতার অপূর্ব্ব মোহের মধ্য দিয়া কে বুঝিতে পারে যে এই বাঙ্গালাদেশে এত দৈন্য। এর কি কোন প্রতিকার নাই! শ্রীনাথ মালো কৈবর্ত্তের ছেলে। বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ—আজ রোগে শীর্ণ। কে জানে বাঁচিবে কিনা! নিরক্ষরা সরলা জননীর পুত্রের গুরুতর ব্যাধি বুঝিবার মত জ্ঞানটুকুও নাই। স্বাস্থ্য, জ্ঞান, চিকিৎসা কোনদিকেই যে তাহাদের জ্ঞান নাই। জ্ঞান থাকিলেই বা অর্থ আসিবে কোথা হইতে? সুচিত্রা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা জাগিয়া উঠিল। তাহার মন ব্যাকুল হইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—দেশের ও দশের সেবা করিতে, এই সব দুর্গতদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে। কিন্তু কোথায় অর্থ, কোথায় শক্তি!

ত্রিবিক্রম ছইয়ের বাহিরে নৌকায় গলুয়ের উপর ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া কি নৌকাযাত্রীরা কি পথের দুই পাশের পুরুষ ও নারী, কি বালক-বালিকা সকলেই—'কর্ত্তা পেরণাম হই,' কেহ বা 'দাদাভাই রহিমের বড় জ্বর একবার দেইখ্যা আইবেন,' কেহ বলিতেছিল 'ঘরে ত চাউল নাই—কর্ত্তা!' এমনি অভাব অভিযোগের কাহিনী শুনিতে শুনিতে ও উত্তর দিতে দিতে ত্রিবিক্রমের সারাখানি পথ চলিতে হইল।

খালের একটা বাঁক ফিরিতেই নৌকাখানি একটা মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রান্তর এখন আর প্রান্তর নাই। এ যেন বিরাট হ্রদ। একটীও কচুরিপানা নাই। চারিদিকের জলরাশির মধ্যে দ্বীপের মত ত্রিবিক্রমের পল্লী-নিকেতন আশ্রম দেখা যাইতেছিল।

নৌকাখানি ভিড়িলে তাহারা তিনজনে পাড়ে নামিল। সুচিত্রা এখানে আসিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এ আশ্রম যে রীতিমত প্ল্যান করিয়া করা হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। চারিদিক মুক্ত—বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে

নিকেতনের চারিদিক জল প্লাবনের অনেক উপরে। চরিদিক ইট দিয়া সুন্দর ও মজবুত করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়ায় প্লাবনের জল কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আশ্রমের চারিদিকে পাকা রাস্তা, লাল সুড়কি ফেলিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। জল নাই কাদা নাই। ঝাউগাছ ও দেবদারু গাছ এবং কলমের নানা ফলবান তরু সবুজ সুন্দর শ্রীতে চারিদিকের রম্য উপবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ত্রিবিক্রম প্রথমে সুচিত্রা ও কুন্তলাকে সহ তাহার বসিবার ঘরে আসিল। সে এখানে বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করে। ঘরটি দেশীয়ভাবে সজ্জিত। তবে চেয়ার টেবিলও আছে। তাহারা ঢুকিতেই টুনু আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "স্যার।"

"কি টুনু?"

"আজ্ঞে সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি, স্যার! ডাক্তারবাবু যেমন বললেন, তেমনি আমি, শচীন আর শৈলেশ গিয়ে শ্রীনাথের জন্য তক্তপোষ, বিছানাপত্র, ঘর দোরের বেড়া, সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। আজ ত' আর তাকে আনা যাবে না। কাল নিয়ে আসা যাবে, ডাক্তারবাবু সঙ্গে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিবেন।" হঠাৎ সুচিত্রা ও কুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিল, "নমস্কার! আপনারা এসেছেন! বেশ! আশ্রমটা ঘুরে দেখবেন না, আমাদের সব কাজ!"

ত্রিবিক্রম কহিল, "টুনু, তুই কি বাজে বকা কখনও ছাড়বি নে?

টুনু কহিল, "কিছু ত' বাজে বকিনি স্যার! সব কাজের বলছিলুম।"

"আচ্ছা সে হবে। এখন তিন পেয়ালা চা করতে বলত ঠাকুরকে।"

"কেন স্যার? Why পাঁড়ে ঠাকুর স্যার! আমি ত স্যার চা করতে expert স্যার। পাঁড়ে ঠাকুর ত চা করে না —করে জলো সরবৎ! একেবারে water!"

"আচ্ছা তবে তুই-ই কর।"

টুনু মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া গেল।

ত্রিবিক্রম সুচিত্রাকে এই আশ্রমের plan, কি কি কাজ এখানে করা হয়—সে সম্বন্ধে সব কথা পুঁথি-পত্র, ছবি, সব দিয়া বুঝাইতে লাগিল। সুচিত্রা তাহার চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া ত্রিবিক্রমের পাশে আসিয়া বসিল।

কুন্তলা বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোড়দা ভাই, তোমাদের দীঘিটি কি চমৎকারই না হয়েছে দেখতে! কালো জল একেবারে টল্ টল্ করছে। পাড়ে কি সুন্দর সব ফুল ফুটেছে। এত বড় গোলাপ ত কখনও দেখি নি! আয় না ভাই সুচিত্রা একটু দীঘির পাড়ে গিয়ে বসি!

ত্রিবিক্রম তাহার হাতের লাল পেন্সিলটা দিয়া একটা যায়গা চিহ্নিত করিয়া সুচিত্রাকে কি যেন বুঝাইতেছিল। এমন সময় কুন্তলার কথায় সে হাসিয়া কহিল, কুন্তলা!

কি ছোড় দা!

তুই কতদিন পরে এখানে এলি বল ত!

চার বছরের কম নয়।

কেমন লাগছে দেখতে!

দেখ ভাই ছোড়দা—তুমি একেবারে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পটিও হার মানিয়েছ। তাই তুমি এখানেই থাক। বেশ নিরিবিলি কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

আচ্ছা, চা খেয়ে চল্ তোদের সব দেখিয়ে আনি। আমার সামান্য চেষ্টার ফল!

খুব ভাল! চমৎকার হবে! কুন্তলা একেবারে হাততালি দিয়া উঠিল।

কুন্তলার স্বভাবটি চঞ্চল হইলেও ছিল বড় মধুর। সে দুঃখ বেদনা রোগ ও শোকের মধ্যে কোন রকমেই ডুবিয়া থাকিয়া দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া বেদনাতুর করিতে চাহিত না। তাহার মুখে প্রায়ই একটি গান শুনা যাইত—

"আনন্দময়ের ধারা আনন্দে যেতেছে বয়ে
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে!"

কুন্তলার কোমল মন সহজেই ব্যথিত হইয়া উঠিত। যে করুণ দৃশ্য দেখিয়া আসিল, এই দৃশ্য যে গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সুচিত্রা ও কুন্তলা দীঘির পারে সোপানোপরি আসিয়া বসিল। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। আর দীঘির চারিপারে ফুলের বাগান। শেফালী ফুল অজস্র ঝরিয়া পড়িয়াছে। গোলাপ ফুটিয়াছে অসংখ্য। বেল, যুঁই, চামেলী তখনও ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়াছে। কোথাও স্থল পদ্ম, কোথাও টগর, কোথাও কাঠ গোলাপ, কোথাও শ্বেতজবা, লালজবা ফুটিয়া চারিদিকে শোভা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছে।

ঘাটের দুই পাশে দুইটি ইউকেলিপটাস গাছ। তাহাদের পাতায় সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ঝলমল্ করিতেছে। সুচিত্রার বিমর্ষ মন এইবার অনেকটা প্রফুল্ল হইল। সূর্য্য কিরণে তখন চারিদিক ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

কুন্তলা কহিল, সুচিত্রা জানিস্ এই যে দীঘির কাল জলের রূপ দেখে মোহিত হয়েছি এক সময়ে এটা ছিল একটা দীঘির কঙ্কাল মাত্র, না ছিল জল, না ছিল পাড়। বর্ষাকালে এর শুষ্ক বুক জলে ভেসে যেত আর গ্রীষ্মকালে ফুটি ফাটার মত এর বুকের শুকনো মাটি দেখে দুঃখ হ'ত। আজ ছোড়দা তাকে পরিণত করেছেন এক চমৎকার দীঘিতে। কুন্তলা মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল,

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয় নীরে।
তল তল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শব্দ চিনি, নূপুর রিণি কি ঝিনি,
কেগো তুমি একাকিনী আসিয়াছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয় নীরে।"

কুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রাও যোগ দিল। সে বলিতে লাগিল, "যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও আপনা ভুলে,

হেথা শ্যাম দুর্ব্বাদল, নবনীল নভস্থল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়ে পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুল বনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি' কুঞ্জ তৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে। বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।।

রবীন্দ্রনাথের "হৃদয় যমুনা" আবৃত্তি করিতে করিতে কুন্তলা ও সুচিত্রা যখন ভাব বিভোর চিত্তে সব ভুলিয়া গিয়াছিল, সে সময়ে কখন যে ত্রিবিক্রম আসিয়া তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে কবিতার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেছিল তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারে নাই।

আবৃত্তি শেষ হইলে পর—ত্রিবিক্রম কহিল, কি সুন্দর আপনারা আবৃত্তি করতে পারেন। কি চমৎকার লাইন ক'টি।

"যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে।
কোল দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।"

সত্যিই তাই নয়?

সুচিত্রা লজ্জিত হইয়া কহিল, ভারি অন্যায় ত আপনার!

কি অন্যায় বলুন ত!

এমন করে লুকিয়ে কবিতা শোনা! আমাদের লজ্জা করে না বুঝি!

এই যে আপনারা বললেন—

ঢেকে দিয়ে সব লাজ সুনীল জলে।'

এমন সময় টুনু দৌড়াইতে দৌড়াইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "স্যার, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! আহা-হা। এত যত্ন করে চা-টা তৈরী করলুম। আপনাদের জন্যে।"

ত্রিবিক্রম টুনুর কাঁধে হাত দিয়া কহিল, "Stupid কোথাকার! তোমার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি হলো না—চা এখানে নিয়ে আসতে!"

"বুদ্ধি থাকলে ত' স্যার, একটা বড়লোক হতেম। Greatman স্যার!"

"যা যা দৌড়ে সব নিয়ে আয়গে।"

তাহারা তিনজনে সেই কাঠের উপর বসিয়া আনন্দের সহিত চা পান করিয়া বাহির হইল পল্লীনিকেতনের চারিদিক দেখিতে শুনিতে।

সুচিত্রার মনে সত্য সত্যই অপূর্ব্ব আনন্দের উন্মেষ হইল। সে একে একে শিশু বিদ্যামন্দির, তাঁতশালা, আশ্রমের ছাপাখানা, কাগজ তৈরীর যায়গা, অন্ধ ও বধিরদের শিক্ষার মন্দির দেখিতে লাগিল। যতসব হতভাগা বধির ও অন্ধেরা এখানে নানা শিল্পকাজে ব্যস্ত। কোন বধির ছেলে কাঠের বাক্স, টেবিল, চেয়ার তৈয়ারী করিতেছে, আঁকিতেছে, কেহ মেলায় ও বাজারে বিক্রীর জন্য মাটির, কাঠের ও টিনের খেলনা তৈরী করিতেছে। অন্ধেরা বাঁশ ও বেত দিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য চেয়ার, বাস্কেট, মোড়া, টেবিল সব প্রস্তুত করিতেছে। নীরবে কাজ করিতেছে। বেশভূষা সকলেরই দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সুচিত্রা শিক্ষা ও শিল্প বিভাগে ছোটদের শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সে অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে কহিল, "ত্রিবিক্রমবাবু, বাস্তবিক এখানে আমার আসা ভুল হয়েছে, আমার ত' কিছুই করবার নাই দেখছি।"

প্রফুল্লচিত্তে ত্রিবিক্রম কহিল—

"My strength is the strength of ten,

Because my heart is pure :—

মানে কি জানেন আমি যে একাই দশজন। কেন বলেন ত!"

আমাদের দেশের যুবকেরা যদি সং ও মহৎ হয় তাহা হইলে অনেক কাজই করতে পারে। হৃদয়ে তাদের বল আসে। ভালবেসে দরদ দিয়ে মানুষের বা সমাজের সেবা করলে একদিন তা সার্থক হবেই। অভাব ঘুচবে শুধু দুর্গতদের নয় আমাদেরও।

খানিক দূরে একটি বড় ঘর। ঘরের মধ্যে পরিষ্কার সতরঞ্চ পাতা। তাহার মধ্যে প্রায় চল্লিশজন চাষী বসিয়া আছে। আর দুইটি যুবক তাহাদের কাছে সহজ সরল ভাবে তাহাদেরই ভাষায় কি ভাবে বীজ পাওয়া যায়, কি দাম দেওয়া যায় সব কথা বুঝাইয়া বলিতেছিল। কি ভাবে ফসল বৃদ্ধি পায়, চাষীদের উন্নতি না হইলে যে দেশ বাঁচিতে পারে না, সেই কথাই তাহাদের বুঝাইতেছিল। কৃষাণেরা পরম আগ্রহের সহিত সব কথা শুনিতেছিল। ত্রিবিক্রম, সুচিত্রা ও কুন্তলাকে দেখিয়া তাহারা বিনীতভাবে অভিবাদন করিল। ত্রিবিক্রম বলিল, "রাত্রিতে এদের লেখাপড়া শিখাই। এই ঘরটির নাম দিয়েছি চাষীদের ঘর। আমাদের এঅঞ্চলে যে সব কৃষি-যন্ত্র আছে সে সবই এখানে সংগ্রহ করেছি। এগুলোকে ঠিক কি ভাবে আমাদের দেশের উপযোগী করা যায় সেদিকেই আমার লক্ষ্য। আমরা এরূপ কয়েকখানি নূতন ধরণের লাঙল আবিষ্কার করেছি, এই দেখুন না?

সুচিত্রা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, কিন্তু সে কি বুঝিবে? সে মুখে শুধু সাধারণভাবে কহিল, চমৎকার!

এমনিভাবে তাঁতিশালা, কামারশালা সব দেখিয়া তাঁহারা আসিল সমাজে যারা ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত সেই সব ঋষি, মুচি, প্রভৃতিদের সন্তান বালক-বালিকাদের বিদ্যামন্দিরে। এ ঘরটি অতি সুন্দর করিয়া সাজান। প্রত্যেকের জাতি ও ব্যবসা হবে গৌরবের সে কথা বুঝাইবার মত নানা ছবি ও প্রবচন দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো আছে। ইহারা যেমন লেখাপড়া শিখিতেছে, তেমনি বাজার করিত, চামড়া পরিষ্কার করিত এবং জুতা তৈয়ার করিতেও শিখিতেছে অতি সুনিপুণভাবে। একজন চীনা এবং এদেশীয় অভিজ্ঞ মুচী বালকদের জুতা প্রস্তুতি শিক্ষা দিতেছে। এখানকার তৈয়ারী জুতা শুধু গ্রামে নয় সহরেও বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ছেলেমেয়েরা ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া কেহ তাহার হাত ধরিল, কেহ তাহাদের পাশে পাশে নিজ নিজ কৃতিত্বের কথা কহিয়া চলিল। এরা নিজেদের কাপড়, জামা, জুতা নিজেরাই প্রস্তুত করে। বিলাসিতা বলিয়া কিছুই নাই, গরীব পিতামাতাদের জন্য কিছু কিছু অর্থও ইহারা দেয়।

দেখিতে দেখিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। তাহারা যখন বাড়ী ফিরিল তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

ত্রিবিক্রমের বাবা বলিলেন, "ত্রিবিক্রম, তোর কি আর বুদ্ধি হবে না। এই বিদেশী মেয়েটিকে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত উপোস করিয়ে রাখলি? কুন্তলা তোরও ত দাদাকে বলা উচিত ছিল।"

ত্রিবিক্রম সুচিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিল এবং কহিল, একদিনে কি সব দেখা চলে বাবা!

সুচিত্রা কহিল, "ওর কোন দোষ নেই। আমিই যে দেখতে দেখতে বেলা করে ফেলেছি। কত কাজ করছেন ইনি ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। বাস্তবিক ত্রিবিক্রমবাবু সত্যই দেশের মানুষকে ভালবাসেন, সত্য সত্যই দেশের মাটি তাঁর স্বর্গধূলি। আমি ধন্য হয়েছি এসব দেখে।"

ত্রিবিক্রমের বাবা আর একটি কথাও কহিলেন না। শুধু সুচিত্রার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা বাছা, তোমার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

সুচিত্রা ও কুন্তলা বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। ত্রিবিক্রম কোনখানে যে অদৃশ্য হইল তাহারা তাহা দেখিতেই পাইল না।

[ক্রমশঃ

বাংলা ও হিন্দী গান

শ্রীহরিপদ দত্ত

গত ভাদ্রের সংখ্যায় গানের অন্তর্বর্ত্তী তানের কথা বলিয়াছিলাম। আশা করি যে অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছি পাঠকগণ তাহা বুঝিয়াছেন। সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতৃবর্গ তান কি তাহা নিশ্চয়ই বুঝেন এবং ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ অর্থাৎ স, ঋ, গ, ম, প, ধ ও নি এই সাতটি সুর বা পর্দ্দার সংযোগে স্বরগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বুঝেন। স্বরগ্রামের যে তিনটি গ্রাম আছে—উদারা, মুদারা ও তারা—অনেকে ইহাও অবগত আছেন। কিন্তু এই সাতটি পর্দ্দার মধ্যে কোন কোন পর্দ্দার যে সরল বা 'খাড়া' রূপ ব্যতীত আর একটি রূপ আছে তাহা সকলে বুঝেন না। যেমন ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের কোমল রূপ এবং মধ্যমের 'কড়ি' বা কড়া রূপ। কতকগুলি রাগ ও রাগিনীতে কোন কোন পর্দ্দার সরল রূপ, আবার কতকগুলিতে কোন কোন পর্দ্দা কোনওরূপে আদৌ ব্যবহৃত হয় না, যেমন হিন্দোলে ও মালকোষে ঋষভ ও পঞ্চমের ব্যবহার নাই। কল্যাণে কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়, শুদ্ধ বা খাড়া মধ্যমের ব্যবহার নাই; সঙ্গীত বিদ্যায় প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন ইহা অল্প লোকেই বুঝেন।

প্রত্যেক দুইটি ক্রমিক পর্দ্দার মধ্যে সাতটি 'শ্রুতি' আছে, যথা ষড়জ ও ঋষভের মধ্যে সাতটি শ্রুতি, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে সাতটি শ্রুতি ইত্যাদি। আবার এক একটি শ্রুতির সাতটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বিভাগ আছে। ইহা সুশিক্ষিত গায়ক ভিন্ন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অবগত আছেন—উপলব্ধি বা কণ্ঠে প্রকাশ ত' দূরের কথা। বস্তুতঃ শ্রুতির এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলি অধিকাংশ শিক্ষিত গায়কেরও উপলব্ধির বহির্ভূত। তান, গমক ও মূর্চ্ছনা (মিড়) এই শ্রুতিসম্বলিত। শ্রুতির বিকাশ ইহাদের মধ্যেই হইবার কথা। সাধারণ শ্রোতা তান, গমক ও মূর্চ্ছনার বিভিন্নতা অবগত নহেন; তাঁহারা গমক ও মূর্চ্ছনাকে তান বলিয়াই বুঝেন। আমি সেদিন কেবল অন্তর্বর্ত্তী তানের কথাই বলিয়াছি, গমক বা মূর্চ্ছনার কথা বলি নাই। গমক সাধারণতঃ ধ্রুপদ ও ধামারে এবং কিয়ৎ পরিমাণে খেয়ালে প্রকাশিত হয়। তান ও মূর্চ্ছনার সমধিক প্রয়োগ ও প্রকাশ খেয়ালে, টপ্পায় ও ঠুংরিতে।

পাখোয়াজে যে যে তাল বাদিত হয়, সেই সেই তাল সংযুক্ত গানই সাধারণে ধ্রুপদ শ্রেণীভুক্ত-রূপে বিদিত। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে চৌতালসংযুক্ত গানই সাধারণতঃ ধ্রুপদ-আখ্যায় অভিহিত এবং ধামার তালযুক্ত গান ধামার বলিয়া কথিত। পাখোয়াজের সহিত যে-সকল গান সঙ্গত হয়, তাহাদিগকেই আমরা ধ্রুপদ বলিব, কারণ, চৌতাল ও ধামার ব্যতীত আরও অনেক পাখোয়াজের তালের সহিত গান সংযুক্ত হয় যথা, সুরফাক্তা, তেওরা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল প্রভৃতি। ঝাঁপতাল পাখোয়াজেও বাজে, তবলমৃদঙ্গে অর্থাৎ বাঁয়াতবলায়ও বাজে, তবে গান ভেদে।

গত সংখ্যায় যে উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্ত্তী তানের উল্লেখ করিয়াছি, গমক ও মূর্চ্ছনাকে অন্তর্বর্ত্তী তানের শ্রেণীভুক্ত করিলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই সংক্ষেপে উপরোক্ত বিষয়গুলির অবতারণা করা হইল।

যে-সকল কথা বা শব্দের সংযোগে গান রচিত হয়, তাহার একটি অক্ষরে স্বরগ্রামের একাধিক পর্দ্দার প্রয়োগ অসম্ভব বলিলেও চলে। যেমন 'করকা'-শব্দের তিনটি অক্ষরে যথাক্রমে তিনটি পর্দ্দাই প্রযুক্ত হইতে পারে। 'ক'-তে যদি ধৈবত প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে ধৈবতের সঙ্গে পঞ্চমের সংমিশ্রণ অসম্ভব। কিন্তু 'ক'-তে যদি ধৈবত প্রয়োগ করা হয় এবং 'র'-তে নিষাদ বা পঞ্চম প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে এবং তালের সহিত সামঞ্জস্য সম্ভবপর হইলে, ধৈবত ও নিষাদ বা পঞ্চমের মধ্যে শ্রুতির সমাবেশে তান বা মূর্চ্ছনার অবতারণা করা যায়। কিন্তু তালের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা অসম্ভব হইলে, তান বা মূর্চ্ছনা অসম্ভব হইবে। সেখানে দেখা যাইবে যে ত্রি-অক্ষরযুক্ত শব্দ 'করকা'র স্থলে দ্বি-অক্ষরযুক্ত 'শিলা'-শব্দ ব্যবহৃত হইলে তান ও মূর্চ্ছনার অবতারণায় সুরহিসাবে গান মধুরতর হইবে, তবে, হয় ত' কবিতা হিসাবে

নিকৃষ্টতর হইবে। যদি কোন সুশিক্ষিত গায়ক গান রচনা করেন, তিনি সুর ও লয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'করকা'র পরিবর্ত্তে 'শিলা' ব্যবহার করিবেন, কারণ, তাহা হইলে 'শিলা'-কে 'শি-ই-লা'-রূপে গাওয়া যাইতে পারিবে, অথবা 'শি' ও 'লা'-র মধ্যে আরও বেশী 'ই'-কারের সন্নিবেশ সম্ভব হইবে। এইরূপ উহ্য স্বরবর্ণের সমাবেশে তান, গমক ও মূর্চ্ছনার আকারে শ্রুতির প্রকাশের স্থান ও সুবিধা পাওয়া যায়। একটি ব্যঞ্জনবর্ণের উপর দুইটি পর্দ্দা প্রয়োগ করিতে যাইলে সেই বর্ণের অন্তিক স্বরবর্ণ স্বভাবতঃ আত্মপ্রকাশ করিবে; যেমন 'ক'-তে ধৈবত ও কড়িমধ্যম একসঙ্গে লাগাইবার চেষ্টা করিলে 'ক'-এর সহিত 'অ'-এর আবির্ভাব হইবে এবং 'ক'-এ একটি পর্দ্দা ও 'অ'-এ একটি পর্দ্দা লাগিয়া যাইবে। প্রয়োজন মত অর্থাৎ পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দূরত্ব হিসাবে 'ক-অ'-এর উচ্চারণ প্লুত বা দীর্ঘ হইতে পারে। শব্দ-সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে অধিক ব্যবধান থাকিলে স্বর-বর্ণের সমাবেশে তান, গমক ও মূর্চ্ছনার অবতারণা সহজসাধ্য হয়, গানে রাগরাগিনীর রূপের বিকাশ সম্ভবপর হয় এবং 'সমঝদার' শ্রোতার নিকট গান শ্রুতিমধুর হয়। সেই জন্যই 'করকা'-র পরিবর্ত্তে 'শিলা' শব্দের সন্নিবেশ বাঞ্ছনীয়, যদিও এইরূপ পরিবর্ত্তন রচয়িতার মনঃপূত না হইতে পারে। সাধারণতঃ বাংলা-গান-রচয়িতাগণের শ্রুতি, তান, গমক ও মূর্চ্ছনার বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ বা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সুর-লয়যুক্ত অর্থাৎ 'সুরেলা' গানের পরিবর্ত্তে অক্ষর-বহুল ও যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের বিন্যাসে এবং বহুশব্দের সংযোগে ছন্দোবদ্ধ কবিতাই রচনা করিয়া থাকেন। আধুনিক বাংলাগানে যে সুর সংযুক্ত হয়, রাগরাগিনী সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় তাহা সুরের খিচুড়ীতে পরিণত হয়। এইরূপ গান শুনিয়া বিশ্বনাথ রাও মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, "সুরের বাপান্ত হইতেছে।"

গান-রচয়িতাগণকে নিরুৎসাহ করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে যদি সদুপদেশ শুনিলে তাঁহারা বিরক্ত না হন, তাঁহাদিগকে বলি যে যদি নিজের সুর-লয়বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অভাব থাকে, গানে সুরসংযোগ করিবার সময়ে তাঁহারা যেন কোন শিক্ষিত সুরশিল্পীর সাহায্যগ্রহণ এবং তাঁহার উপদেশ মত শব্দের পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে মূর্ত্তিহিসাবে যদিও রচনা রচয়িতার মনঃপূত না হয়, রস ও ভাবের হিসাবে অপকৃষ্ট না হইতেও পারে, প্রত্যুত গান হিসাবে, উৎকৃষ্টই হইবে। বলা বাহুল্য, গানে ছন্দ বা যতির পতন দোষাবহ নহে।

সুরের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করেন এমন শ্রোতার অর্থাৎ "সমঝদার" শ্রোতার অভাব নাই। সুরের মাধুর্য্য কেবল মানুষ কেন, পশু, পক্ষী, এমন কি সরীসৃপকুলও উপভোগ করিয়া থাকে। সাপুড়েরা যে বাঁশী বাজায়, তাহার কারণ সাপ সুরে মুগ্ধ হয়। একটি প্রবাদ আছে যে রাত্রিকালে বাঁশী বাজাইতে নাই, তাহা হইলে সাপ আসিতে পারে। এ-প্রবাদকে ভিত্তিহীন বলা যায় না। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। ত্রিহুতের রাজসভায় এক সময়ে দুইজন দিগ্বিজয়ী গায়ক উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে এই বিচারের ভার রাজার উপরে ন্যস্ত করিতে চাহেন। রাজা সে ভার নিজে গ্রহণ না করিয়া একটি ষণ্ডকে সভাস্থলে আনাইলেন এবং তাহার সম্মুখে গায়কদ্বয়কে যথাক্রমে গাহিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, যাঁহার গান শুনিয়া ষণ্ড মাথা নড়িবে, তিনিই শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন হইবেন। আসল কথা এই যে সুরের মাধুর্য্য স্বভাবতঃই জীবকুলের উপভোগ্য ও চিত্তহারী। মানুষ যখন জীবকুলে শ্রেষ্ঠ, তখন এ-মাধুর্য্যের উপভোগ তাহার স্বভাবসিদ্ধ। সকলের কণ্ঠে সুরের প্রকাশ না হইলেও অধিকাংশ মানবের প্রাণে সুর আছে। পশু, পক্ষী বা সরীসৃপ ভাষা বুঝে না, তথাপি সুর উপভোগ করে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে গানের প্রথম ও প্রধান উপাদান সুর, ভাষা নহে। সুর ব্রহ্ম, সুরেই গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। গান শুনিয়া যখন সুরে প্রাণ বিভোর হয়, যখন শ্রোতা সুরের মন্দাকিনীতে মগ্ন হইয়া যান, তখন ভাষার দিকে কি কাণ থাকে? যাঁহারা তর্জ্জার মত গান শুনিতে চাহেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। ভাষার লালিত্যরক্ষাই যদি অভিপ্সিত হয়, কবিতা রচনা কর, গান-রচনার জন্য লেখনী ধারণ করিও না। যে-রচনায় ভাষার লালিত্য নাই, তাহাতে যে ভাবের ও রসের অভাব না হইতে পারে, ইহা, বোধ হয়, সকল সাহিত্যসেবী স্বীকার করিবেন। গীতগোবিন্দের ভাষায় অসাধারণ লালিত্য আছে বলিয়া কি

কবিত্ব হিসাবে শ্রীহর্ষ অপেক্ষা জয়দেব শ্রেষ্ঠ? ইহা, বোধ হয়, কেহ স্বীকার করিবেন না।

যাঁহার ভাষার অনুকরণে বা আদর্শে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ লেখক-লেখিকার ভাষা গঠিত এবং যাঁহার লেখনী-নিঃসৃত গানের আদর্শে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ গান রচিত, বর্ত্তমান শতাব্দীর সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে কখন সুরের উপর ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তিনি সুর বুঝিতেন। পৈতৃক বাটীতে আশৈশব তিনি অনেক ওস্তাদীগান ওস্তাদের মুখে শুনিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রীয় সুর শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি সুরবিস্তারের পক্ষে রবিবাবুর গানও, দুই চারিটি ব্যতীত, সুবিধাজনক নয়।

কঠিনতম সমস্যা এই যে বাংলা গান, যে-পরিমাণে এবং যে-ভাবেই রচিত হউক, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে উহা গাহিবে কে? যে-কারণে শিক্ষিত গায়কগণ বাংলা গান গাহিতে চাহেন না পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে যে গায়ক যে যে গান (অবশ্য হিন্দী গান) ওস্তাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে সেই সেই গানের অনুরূপ বাংলা গান রচিত হইলে, হয় ত, তাঁহারা গাহিতে চাহিবেন, কিন্তু সেরূপ গান রচনা করিবার, বা করাইবার জন্য এবং তাহা কালবুদের সুরে-লয়ে ভিড়াইতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা কি গায়কগণ স্বীকার করিবেন? এখন গায়কসমাজের মানসিক অবস্থা এই যে, কোন কোন জল্‌সায় যদি কেহ বাংলা গান গাহেন, সে-গান সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রীয় নিয়মে রচিত ও গীত হইলেও অন্য গায়কগণ গান ও গায়ক উভয়েরই প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথম প্রথম জল্‌সায় বা অন্যান্য সঙ্গীতসম্মিলনীতে এরূপ বাংলা গানের প্রবর্ত্তনও যথেষ্ট সাহসসাপেক্ষ। প্রয়োজন হইলে এ-সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে। একটা নূতন কিছু করিতে গেলেই সমাজের বিরাগ ও বিদ্রূপের ভাজন হইতে হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে—জগৎস্রষ্টার প্রবর্ত্তিত এই সনাতন নিয়মের আবিষ্কারক আবিষ্কৃত সত্যের অপলাপে অসম্মত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিতে গিয়া স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

কালভৈরব

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

দীনুর কাছে অনেক টাকা বাকী প'ড়ে গেছে—
খাজনা নিতে গেলুম সেদিন তাই।
জীর্ণ শীর্ণ দীনু এসে ছালা পেতে দিল—
বোস্‌লুম না: বিশ্রী ছেঁড়া চট্।
"বলি, তিন সনের যে বাকী প'ড়ে গেল—"
করজোড়ে কি যেন সে বোল্‌তে প্রয়াস পায়।
জমিদারের কাছে এ-সব অজানা ত' নয়?
আচ্ছা ক'রে ধমক দিয়ে দি'।
কড়া গলায় তাগিদ লাগাই জোর।
কথা যেন গেলই না ক' কানে।
দেখ্‌লুম: সে কাঁকুড়-ফাটা শুক্‌নো মাঠের পানে
একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু।
দারুণ হ'লো রাগ।
কিন্তু—
হঠাৎ যেন কে এসে মোর
ধ'রলে টুঁটি টিপে।
মাথার মধ্যেও স্নায়ুগুলো
উঠ্‌লো চড়াৎ ক'রে!!
মাত্র—
একটী হেঁচ্‌কা টান।
আগড়খানা খুল্‌তে যেটুক্ দেরী—
ঘোড়ার মত টগ্‌বগিয়ে ছুট্‌নু বাড়ীর মুখি।
পিঠখানা মোর পুড়েই যাবে বুঝি:
বিঁধছে এসে তীক্ষ্ণ দু'টী চোখ,
আর—
হা হা ক'রে হাস্‌ছে ফাটা মাঠ।

বাঙ্গালার লবণ-সমস্যা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ চৌধুরী

সমস্যাই বটে—সমুদ্রবারি-বিধৌত বিস্তৃত তীরভূমি থাকিতেও বাঙ্গালায় আজ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে এ সমস্যা দাঁড়াইবে তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। গত মহাযুদ্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নিষেধ আইন (Prohibition Act) তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনে,* বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের উদ্দীপনায় উত্তরকালে বা প্রকৃতপক্ষে গান্ধী-লবণ-আন্দোলনের পর বঙ্গবাসীর লবণ প্রস্তুতিতে প্রথম উদ্যম দেখা দেয়।

অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বা তাহারও অধিক হইবে সুফলা বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ব্রিটিশ-দমন-নীতির ফলে সামান্য আহার্য্য লবণের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছে। সে নীতির কথা বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে, সে অপ্রিয় কথা আর নাই বা তুলিলাম। বাঙ্গালার সেই তথাযুগের লবণ-শিল্পের লোপ পাইবার পর বঙ্গ-বন্দরে (কলিকাতায়) চেশায়ার, লিভার-পুলের লবণের পিছু পিছু আসিল জার্ম্মানীর হামবুর্গ ও রুমানিয়ার ভূমধ্যসাগরের লবণ, তারপর আমদানী হইল লোহিত সাগরের লবণ পোর্টসৈয়দ, মাসওয়াব প্রভৃতি দেশ হইতে। ক্রমে আসিলেন এডেন যিনি বাজার প্রায় একচেটিয়া করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এইসব বিদেশী নুনের আমদানী (ডামিপং) পরে তথাকথিত দেশী বা ভারতীয় লবণ বণিকদের (বোম্বাই, করাচী বা ওখা, পোরবন্দর অঞ্চলের) অত্যন্ত অন্যায় মনে হওয়ায় তাহারাও কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বন্দরে তাহাদের সামর্থ অনুযায়ী যতটা পারিল লবণ পাঠাইতে আরম্ভ করে।

বাঙ্গালার মাটিতে যে পরিমাণে নুন ইদানীং প্রস্তুত হইতেছিল তাহা এই সমস্ত বিদেশী, অ-ভারতীয় বা অ-বাঙ্গালী লবণের তুলনায় ভূণাংশ বিশেষ। ১৯৩৮-৩৯ এর সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় মোট ১,৪১,০০,০০০ মণ লবণ বাঙ্গলাদেশে বাহির হইতে আমদানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগ অর্থাৎ ৪৪,২৫,০০০ মণ এডেন হইতে এবং শতকরা ৩৯ ভাগ অর্থাৎ ৫৫ লক্ষ মণ পোর্টসৈয়দ, জিবুতী, রাসহাফুন ও লিভারপুল হইতে আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে, কিন্তু এই বাহিরের লবণ, যাহার আমদানী জলপথেই জাহাজযোগে হইতেছিল, যুদ্ধের দরুণ আর সেরূপ আসিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই লবণের হাহাকার—আমাদের এখন ইহাই সমস্যা। তৃণাংশকে অন্ততঃ কিছু অংশ করিতে হইবে।

এই বৎসরের ২রা এপ্রিল তারিখ হইতে জলপথে কোন লবণ আসে নাই, অথচ এডেন, করাচী, ওখা, বোম্বাই হইতে জলপথে যে লবণ আমাদের আসে তাহা মোট চাহিদার বোধ করি তিন ভাগের দুই ভাগ। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমদানী বন্ধের আশঙ্কায় কলিকাতার বাজারে হঠাৎ লবণের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে সময় আমদানী কমে নাই, বরঞ্চ মূল্য বৃদ্ধির দরুণ গভর্ণমেণ্ট ওয়ার হাউসে লবণ বহু পরিমাণে জমা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই কয়েকমাস লবণের বাজারে সমস্যা পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের উপকূলে যে কয়েকটী নুনের কারখানা হইয়াছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা নিজ নিজ ব্যবহার উপযোগী লবণ যাহা নোণা মাটি চাঁচিয়া প্রস্তুত করে তাহার মোট পরিমাণ যাহা হয় সমগ্র প্রদেশের চাহিদার তুলনায় তাহা মুষ্টিমেয়। উপরন্তু বর্ষা আসিল এই সামান্য লবণও পাওয়া যাইবে না। অথচ বঙ্গ, বিহার, আসাম ও নেপালের মোট বাৎসরিক চাহিদা দেখা যায়, ৮০ হইতে এক শত লক্ষ মণ। প্রতি বৎসর কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে এই পরিমাণ লবণই আমদানী হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রামবাসীরা নোণা মাটি হইতে নুন প্রস্তুত করার এক কুটীরশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। এই লবণে কোন শুল্ক লাগে না যদি ইহা নিজের ব্যবহার ছাড়াও নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করা যায়। এইভাবে লবণ প্রস্তুতি পূর্ব্বে বে-আইনী ছিল। ১৯৩০ সালে গান্ধী-আরউইন

চুক্তির ফলে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা উপকূলবাসীদের এই সুবিধা সুচক্ষে দেখেন না এবং প্রায়ই ইহাদের পশ্চাতে লাগিয়া থাকেন। এই জন্য মাঝে ইহাদের পরিমাণ কিছু কমিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে লবণের বাজারে গোলমাল সুরু হওয়ায় তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ভাবে অল্প অল্প করিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহারা শুধু নিজের নহে উত্তরাঞ্চলের লোকদের চাহিদা মিটাইতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালার উপকূলবর্ত্তী জনপদসমূহে গান্ধী-আরউইন-চুক্তি অনুসারে যে লবণ প্রস্তুত হইতেছে তাহা রপ্তানী করিবারও একটী সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই সীমার বাহিরে গেলেই শুল্ক দিতে হইবে এবং গোলায় পুরিতে হইবে। এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার পর বাজারে কুটীর শিল্প লবণের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালে কাঁথি বাজারে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার ধব্‌ধবে সাদা জ্বাল দেওয়া নুন বিক্রয় হইয়াছে। পরে আর সেরূপ নুন দেখা যায় নাই। কারণ কয়েকজন চতুর মাড়োয়ারী এই লবণ কিনিয়া সরকারকে শুল্ক না দিয়া অন্য অন্য স্থানে বিক্রয় করিতেছিল।

এক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর কথামত এই সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী নিম্ন-ভূমিতে বা নোণা নদীর ধারে নোণা মাটির স্তূপ করিয়া যে সমস্ত লোক লবণ প্রস্তুত করে তাহারা ইচ্ছা করিলে বাঁকে করিয়া বহিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া গ্রামের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। ইহা হইলে তবু নিম্ন বঙ্গের চাহিদা কিছু মেটে।

আজ যদি এই লবণের রপ্তানীর সীমা উঠাইয়া দেওয়া হয় তবে উপকূলবাসীগণ বাঙ্গালার অভ্যন্তরে এই লবণ চালান দিতে পারে। এই মলঙ্গীদের আর একটা অসুবিধা আছে। জ্বালানী কাঠ বা কয়লা প্রচুর পরিমাণে এবং সুবিধা দরে যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিস্তৃত সমুদ্রতটের বহুস্থানে স্তূপীকৃত নোণা মাটি সংগৃহীত রহিয়াছে—এই সব মাটি হইতে বেশ কিছু পরিমান লবণ প্রস্তুত হয় যদি এই সব দরিদ্র মলঙ্গীরা সাহায্য পায় অর্থে এবং জ্বালানীর কন্‌সেশনে।

আর একটী নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সরকার পক্ষ হইতে নৌকা চলাচল বন্ধ করা। উপকূল ভাগে খাল বিল নদীর বাহুল্যে জ্বালানী আনিতে নৌকাই একমাত্র ভরসা—সেই নৌকাই যদি না ভাসিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে মলঙ্গীরা কিরূপে লবণ জ্বাল দিবে। এই নৌকা চলাচল নিয়ন্ত্রণে আমাদের বাঙ্গালীদিগের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী নুনের কারখানারও বড়ই অসুবিধা হইতেছে—সে বিষয় পরে বলিতেছি।

যাহাই হউক, মলঙ্গীদের লবণ আমাদের চাহিদার অতি অল্প অংশ মিটাইতেছে আর তার কিঞ্চিৎ অধিক অংশ সরবরাহ করিতেছে বাঙ্গালার কয়েকটি শিশু প্রতিষ্ঠান। এই

নোণাজল তোলা হইতেছে

প্রতিষ্ঠানগুলি বহু বাধা বিপদ সত্ত্বেও সুন্দরবনে, চট্টগ্রামে এবং কাঁথির সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানে লবণ প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু সমগ্র চাহিদার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। এই চাহিদা মিটাইতে হইলে ভারতবর্ষের উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিশাল লবণ খনি রহিয়াছে—সেই সমস্ত স্থান হইতে অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী করাচী, ওখা, বোম্বাই প্রভৃতি ও দক্ষিণে মাদ্রাজ, টিউটিকর্ণের লবণ যাহা সাধারণতঃ এতদিন জাহাজেই আসিয়াছে তাহা রেলযোগে আনয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উত্তর ভারতে মেয়ো খনির খেওড়া প্রভৃতি সৈন্ধব লবণ-ভূমির উন্নতি বিধায় ভারতসরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে এবং Additional Import duty বা বাড়তি আমদানী শুল্ক হইতে বহু উন্নতি করাও হইয়াছে।

তাঁহারা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, খেওড়া খনি হইতেই শুধু বৎসরে ৬০ লক্ষ মন লবণ উত্তোলন করা যাইতে পারে। সৈন্ধব লবণ কলিকাতার বাজারে অল্পই চলে ইহা বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

রেলযোগে আনয়ন করিতে বহু ওয়াগনের প্রয়োজন এবং শুধু তাহাই নহে রেল কোম্পানীর মাশুলও বহুঅংশে কমাইয়া দেওয়া উচিত। এখন এইদিকেই মহাসমস্যা— যুদ্ধের কাজে ওয়াগন এত লাগিতেছে যে এই সব সামান্য ব্যাপারে রেলওয়ে ওয়াগন পাওয়া যাইবে না। যাহাও পাওয়া যাইবে তাহার মাশুল এত অধিক লাগে যে তাহাতে লবণের

নোণাজল ঘনীভূত করা হইতেছে

শুল্ক দিয়া বাজারে পড়তা পড়িবে না। অবশ্য মাঝে কলিকাতার বাজারে লবণের যে মূল্য উঠিয়াছিল তাহার তুলনায় বোধ করি রেলযোগের সৈন্ধব লবণ ও সুমূল্য হইত।

বাঙ্গালার মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়, কলিকাতাই প্রধানতঃ বাঙ্গালার আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের রপ্তানি কেন্দ্র, কলিকাতা হইতে লবণ বাঙ্গালার আভ্যন্তর প্রদেশে রেলযোগে বা ষ্টিমার বা নৌকাযোগে রপ্তানি হইয়া থাকে। গত কয়েক মাস যাবৎ মাত্র সামরিক সরবরাহের দরুণ মালগাড়ী দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—কাজেই চাহিদা মত লবণ সর্ব্বত্র যাইতে পারে নাই। উপরন্তু বাঙ্গালার উপকূলভাগের নৌকা বা অন্য জলযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত বা বন্ধ হওয়ায় জলপথেও লবণের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে।

দুই

এই সব সমস্যা সমাধান হইত যদি বর্ম্মার মত বাঙ্গালার নিজস্ব লবণ শিল্প অটুট থাকিত অথবা গত মহাযুদ্ধের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বাঙ্গালার আপন সমুদ্রকূলে বিস্তৃত লবণ প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু তাহা নাই গভর্ণমেণ্টকে অসংখ্যবার এই দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে বহুবার এই সম্বন্ধে দেশের লোক সরকারকে জানাইয়াছে যে, অর্থ সাহায্য এবং কয়েকটী সুবিধা সাহায্য দিলেই বাঙ্গালায় বিরাট লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

সুখের বিষয় এই যে, সাধারণের আনুকূল্যে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান ১৯৩১।৩২ সাল হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সুন্দরবন ও কাঁথির লবণাক্ত ভূমিতে বা সমুদ্রের তীরে কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছে। ফুলচরিতে চট্টগ্রাম ট্রেডিং, সুন্দরবনে লোকমান্য, পওনীয়ার, ইণ্ডিয়ান সল্ট, বেঙ্গল সল্ট, প্রিমিয়ার প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানী অল্পবিস্তর লবণ প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতেছে।

এখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের উচিত এই সমস্ত ফ্যাক্টরী-গুলিকে তাহাদের লবণ-প্রস্তুতির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যত প্রকার সাহায্য প্রয়োজন তাহা দেওয়া।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, যে সমস্ত কোম্পানী এখনও অর্থাভাবে কারখানা খুলিতে পারে নাই তাহাদের অর্থ সাহায্যে লবণ-প্রস্তুতির ক্ষমতা দান করা। যেমন—আসাম, বেঙ্গল, গ্রেট বেঙ্গল, সুন্দরবন সল্ট প্রভৃতি কোম্পানীগুলি।

তৃতীয়, এই সমস্ত শিশু কোম্পানী যে লবণ প্রস্তুত করে তাহার উপর লবণ-শুল্ক আরোপ সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করা।

লবণ-প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পক্ষ হইতে ডিউটী লওয়া হয়, অর্থাৎ প্রথমেই শুল্ক দিয়া তারপর বাজারে লবণ ছাড়িয়া লাভ করা—ইহাতে কোম্পানীগুলির লোকসান হয়, কারণ জল-নিকাশের পরে লবণের ওজন কমিয়া যায়।

আর চতুর্থতঃ, ১৯৩১ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত অতিরিক্ত লবণ-শুল্কের (Additional Import Duty) যে অর্থ রাজ-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঙ্গের লবণ-শিল্পের উন্নতি সাধন করা।* এই অতিরিক্ত শুল্ক যখন আরোপ করা হয় তখনই কথা হইয়াছিল যে, এই বাড়তি অর্থ ভারতের নিজস্ব লবণ-শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানে ব্যয় করা হইবে। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের লবণ খনিগুলিতে এই অর্থ হইতেই বহু উন্নতি করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশে সে অর্থের প্রাপ্য অংশ তাহার লবণ-শিল্পের গবেষণায় কিছুই ব্যয় হয় নাই।

মিষ্টার পিট্ বলিয়া একজন ইংরেজ লবণজ্ঞকে ভারত-সরকারের তরফ হইতে ১৯৩১।৩২ সালে ভারতে প্রেরণ করা হয়, বঙ্গের লবণ-শিল্পের পুনর্বিকাশ করা সম্ভব কি না তাহা গবেষণা করিবার জন্য। তিনি বাঙ্গালার উপকূলে কয়েকটী স্থান ঘুরিয়া গিয়া এক রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার আর্দ্রতা (humidity) এবং দীর্ঘস্থায়ী বর্ষায় লবণ-প্রস্তুতি মোটেই লাভজনক হইবে না। এই রিপোর্টের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সরকারী তরফ হইতে কোন প্রয়াস দেখা দেয় নাই। কিন্তু স্বদেশী কয়েকটী কোম্পানী আজ ৮।১০ বৎসর ধরিয়া কাজ করিয়া দেখাইতেছেন যে, বাঙ্গালায় লবণ-শিল্পকে আবার ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইতেছে। পিট্ হয় ত' খুব লাভের কথাই ভাবিয়াছিলেন—সে সময় অবশ্য লবণের বাজার-দর ভীষণ অল্প ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু আজ বাজারে লবণের মূল্য আগুনের ন্যায় হওয়ায় জাহাজ-

চুল্লীতে নুন জাল দেওয়া হইতেছে

যোগে আমদানী এক প্রকার বন্ধ হওয়ায়, ওয়াগনযোগে সৈন্ধব বা খনিজাত লবণ আনয়নে অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সমাধান করিবে কে? প্রত্যেক প্রদেশকেই আত্মনির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত। পিট্ হয় ত' সেদিন এই কথা ভাবেন নাই। সৌভাগ্য এইটুকু যে, পিটের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী সুলভ লবণের সম্মুখীন হইয়া কারখানা বসাইয়াছিলেন, তাই আজ যাহা কিছু অল্প লবণ আমরা পাইতেছি—আজ তাঁহাদের কল্যাণেই।

পিটের রিপোর্ট মোটেই ঠিক নহে, একথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি,—অতিরিক্ত শুল্ক হইতে গবেষণা করিবার কথা বলিয়া বহুবার ভারত সরকার দপ্তরে ডেপুটেশন পাঠান

* ১৯২৯ সালে সুচতুর বোম্বাই অঞ্চলের লবণ বণিকগণ ভারত সরকারের নিকট স্বদেশীর অজুহাতে বিলাতী লবণকে কোণঠাসা করিবার জন্য এই বাড়তি শুল্ক আরোপ করার জন্য অনুরোধ করে। তাহারই ফলে ১৯৩১ সালে Additional Salt Import Duty Act পাশ হইয়া লিভারপুল, হামবুর্গ, রুমানিয়া, স্পেন প্রভৃতি লবণের উপর মণকরা চার আনা করিয়া বাড়তি শুল্ক বসে—পরে দশ পয়সা হইতে আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষ এই শুল্ক ছিল ছয় পয়সা। ১৯৩৮ সালের ১লা মে এই ডিউটী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

হইয়াছিল। ১৯৩৩,৩৪ সাল আমরা বহু সভাসমিতি করিয়া সরকারের নিকট রিজলুশন করিয়া পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু রাজভাণ্ডার হইতে কিছুই প্রায় এই শিল্প-উন্নতি বিধায় ব্যয় হয় নাই। আজ সরকার-পক্ষ বুঝিতেছেন যে কি ভুলই না করিয়াছেন তাঁহারা। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট মাঝে একজন বাঙ্গালী বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে Depute করেন সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুত করা যায় কি না সে-বিষয় গবেষণা করিতে—তিনি সমস্ত দেখিয়া আসিয়া ভালই রিপোর্ট দেন কিন্তু আজ পর্যান্ত রাজপক্ষ হইতে কোন রূপ উদ্যম দেখা যায় নাই। অথচ সুন্দরবনে

বোম্বাই প্রদেশে লবণ প্রস্তুত

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কারখানা করিয়া কিছু কিছু লবণ প্রস্তুত করিতেছে। এই কিছু কিছু করা ফ্যাক্টরীর সংখ্যাধিক্যই বর্ম্মারও লবণ-শিল্প বাঁচাইয়াছিল—তাহারা তাহাদের এই দুর্দ্দিনে বোধ করি ভাতের পাতে নুন একটু পাইতেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিষ সে বিষয়ে আমরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে আরউইনের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহারই ফলেই উপকূল-বাসীরা লবণ প্রস্তুত করিতে পারিতেছে। আজ কুটীর-শিল্প এই অল্পবিস্তর লবণও আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার একাংশ অন্ততঃ সমাধান করিতেছে।

পুরাকালে লবণ বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে আর কিছু না হউক এই মলঙ্গীদের প্রস্তুত লবণের output বেশ কিছু বাড়িবে এবং অন্ততঃ ৫৬ ভাগের একভাগ লবণ আমরা বাঙ্গালার বাজারের জন্য পাইব, আর এক পঞ্চমাংশ পাইব আশা করিতেছি বাঙ্গালার লবণ-কোম্পানীদের কারখানাগুলি হইতে—বাঙ্গালা সরকার এইরূপ মনে করেন। কিন্তু বলিয়াছি এই সব কারখানার অনেক সুবিধা করিয়া দিতে হইবে এবং এই সুবিধা রাজসরকার পক্ষ হইতেই আমরা আশা করি, যেহেতু স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির এমন কিছু মূলধন নাই যাহা দিয়া এইসব করিতে পারে।

সরকারের উচিত—উপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডগুলিকে সুলভে ইজারা দেওয়া, সেই জমিতে গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দেওয়া, রেলওয়ে-সাইডিং এর ব্যবস্থা করা। মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের লবণ-ভূমির পাশেই রেলওয়ে-সাইডিং নির্ম্মান করা আছে। কোষ্টাল লাইনের সঙ্গে এইসমস্ত কারখানার রেল-সংযোগ না করিলে দেশীয় নৌকা যোগে বিলম্বে লবণ পাঠাইলে চলিবে কেন? *

বাঙ্গালার নিম্নভূমিতে লবণ প্রস্তুতের প্রয়াস আরম্ভ হয় বলিতে গেলে গান্ধী আরউন চুক্তিমত মলঙ্গবাদের নুন তৈয়ার করিবার কিছুদিন পরেই। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম কাঁথিতে একটী কারখানা হয় তার পর '৩৫ সালের শেষভাগে বোধ করি আর একটা কোম্পানী কারখানা স্থাপনা করে।

*বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের সরকারী রিপোর্ট ১৯৩৮—৩৯ অনুযায়ী দেখিতে পাই সেই সময় সাতটী নুন কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিতেছিল এবং তাহার মধ্যে মেদিনীপুর অর্থাৎ কাঁথির বেঙ্গল-সল্ট ও প্রিমিয়ার মোট ৬,৬০০, ২৪ পরগণায় ৪টী—৩,৩৯০ এবং চট্টগ্রাম ট্রেডিং—৯১০ মণ লবণ প্রস্তুত করে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান বৎসরে একা বেঙ্গল সল্টই ২০।৩৫ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিতেছে।

দ্বিতীয় কারখানাটাকে এখন আর চেনা যায় না। সমুদ্রসৈকতে এই কারখানা যেন একটী ছোট সহরের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বয়লার হাউস্, পাওয়ার হাউস, ওয়্যার হাউস, পাম্প হাউস, বড় বড় রিজার্ভয়ার, ফারনেস প্রভৃতি স্থাপনে এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারখানার কয়েকখানি ছবি এই প্রবন্ধের সাথে দেওয়া গেল। ইহাদের নুন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ:—প্রত্যহ জোয়ারে যখন সমুদ্রের জল কারখানার নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিতে থাকে সেই সময়ে ইলেকৃট্রিক, পেট্রল, কয়লা বা কেরোসিন এর সাহায্যে চালিত পাম্প-এর সাহায্যে খুব বড় বড় কয়েকটী মূল ট্যাঙ্কে এই নোণা জল ভর্ত্তি করা হয় এবং সেই জল (sea-lime) কয়েকটী সিরিজ অব কনডেন্সারে চালিত করা হয়। কনডেন্সার অর্থে কয়েকটি খুব অগভীর ঘণীভূত করিবার ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণীকে বুঝায়। মূল ষ্টোর হইতে প্রথম নম্বর কনডেন্সিং বেডে কিছু সাগরের নোণাজল চালিত করিলে এই জল সারাদিন বাতাস ও রৌদ্রে পরিমাণে হ্রাস পায় কিন্তু অধিকতর লবণাক্ত হয়। পরদিন এই লবণাক্ত জলকে দুই নম্বর কনডেন্সিং বেডে চালিত করা হয় এবং খালি ১ নম্বরে পুনরায় টাটকা সমুদ্রের জল ভরা হয়। এই ভাবে ৩৪টা সিরিজে আনিয়া ৩।৪ দিনে সাগরের জলকে খুব ঘন করা হয়, যাহাতে শতকরা ২২।২৩ ভাগ লবণ থাকে। সাদা সমুদ্রের জলে বড়জোর ৩॥০ ভাগ লবণ থাকে। ঘন নোণাজল (ব্রাইন) কে কয়েকটী রিজার্ভায়ারে জমায়েত করা হ এবং সেইখান হইতে পাম্প করিয়া ফারনেসে পাঠাইয় বড় বড় প্যানে জ্বাল দিয়া লবণ বহিষ্কৃত করা হয়। এই হইল বর্ম্মা পদ্ধতি। এই প্রণালীতেই বেশীর ভাগ বঙ্গে কারখানাগুলি লবণ প্রস্তুত করিতেছে।

তবে বেঙ্গল-সল্টের কারখানায় মাদ্রাজ এবং করাচীর মাটির (clay) বেডে এবং সিমেণ্ট বেডে করকচ লবণ প্রস্তুত হয়। এই বৎসর মার্চ্চমাস হইতে মে-মাসের শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টির স্বল্পতা হেতু এই প্রণালীতে বহুল পরিমাণ লবণ অতি অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাই হউক, এই কারখানাগুলিই ত' তবু খানিকটা আমাদের সমস্যা দূর করিয়াছে। করকচ-লবণ পাইতে হইলে উপরোক্ত ঘন জলকে চুল্লিতে না পাঠাইয়া সোজাসুজি একেবারে পরিষ্কার পেটা মাটীর বেডে বা সিমেণ্টের বেডে পাঠাইয়া (পাতলা করিয়া) সারাদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। বিকালে দেখা যায় তাহাতে নুন পড়িতেছে।

উত্তর ভারতে লবণ উত্তোলন

বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তি

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিম্ন বঙ্গ

খুলনা

খুলনা জেলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত। উহা উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২১°১৮´ এবং ২৩°১´ কলা ও পূর্ব্ব দ্রাঘিম ডিগ্রী ৮৮°৫৪´ এবং ৮৯°৫৮´ কলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। জেলার বিস্তৃতি ৪,৭৬৫ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে সুন্দরবন-অংশ ২,৬৮৮ বর্গ মাইল। এই বন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬০ মাইল হইবে। উহা উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২১°৩১´-২২°৩৬´ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ডিগ্রী ৮৮°৫´-৯০°২৮´ কলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত।

গত ১৯৩১ সালের লোক-গণনায় কংগ্রেস-পক্ষ অসহযোগ করায় গণনা যথাযথ হয় নাই বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গত ১৯২১ সালের আদমসুমারী মতে বাঙ্গালার জেলাগুলির লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ,—

ময়মনসিংহ—	৪৮,৩৭,৭৩০ জন	মুর্শিদাবাদ—	১২,৬২,৫১৪ জন
ঢাকা—	৩১,২৫,৯৬৭ "	হুগলী—	১০,৮০,১৪২ "
ত্রিপুরা—	২৭,৪৩,০৭৩ "	বগুড়া—	১০,৪ ,৬০৬ "
চব্বিশ পরগণা—	২৬,২৮,২০৫ "	বাঁকুড়া—	১০,১৯,৯৪১ "
বাখরগঞ্জ—	২৬,২৩,৭৫৬ "	হাবড়া—	৯,৯৭,৪০৩ "
রংপুর—	২৫,০৭,৮৫৪ "	মালদহ—	৯,৮৫,৬৬৫ "
ফরিদপুর—	২২,৪৯,৮১৮ "	জলপাইগুড়ি—	৯,৩৬,২৬৯ "
যশোহর—	১৭,২১,২১৯ "	বীরভূম—	৮,৪৭,৫৭০ "
দিনাজপুর—	১৭,০৫,৩৫৩ "	দার্জ্জিলিং—	২,৮২,৭৪৮ "
চট্টগ্রাম—	১৬,১৯,৪২২ "	চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য-প্রদেশ—	১,৭৩,২৪৩ "
রাজসাহী—	১৪,৮৯,৬৭৫ "		
নদীয়া—	১৪,৮৭,৫৭২ "	খুলনা জেলার লোক সংখ্যা—	১৪,৫৩,০৩৪ জন
নোয়াখালী—	১৪ ৭২,৭৮৬ "		
খুলনা—	১৪,৫৩,০৩৪ "	তন্মধ্যে হিন্দু—	৭,২৬,৮৬১ "
বর্দ্ধমান—	১৪,৩৮,৯২৬ "	মুসলমান—	৭,২২,৩৮৭ "
পাবনা—	১৩,৮৯,৪৯৪ "	অন্যান্য—	৩৭৮৬ "

গভর্ণমেন্টের আয় ১৫ লক্ষ টাকার কিছু উপর।

সীমা—খুলনা জেলার উত্তরে যশোহর জেলা, পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর, পশ্চিমে ২৪ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

খুলনা সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিনটী মহকুমার সমবায়ে জেলাটি গঠিত। সদর খুলনা ও বাগেরহাট ভৈরব নদের দুই তীরে এবং সাতক্ষীরা একটি খালের উপর অবস্থিত।

খুলনা সদর মহকুমার অধীন থানা যথা,—(১) খুলনা সদর, (২) বটিয়াঘাটা, (৩) ডুমুরিয়া, (৪) পাইকগাছা, (৫) তেরখাদা, (৬) দৌলতপুর, (৭) ফুলতলা, (৮) দাকোপ। ইহাদের অন্তর্গত ৫৭২ খানি গ্রাম আছে।

বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত থানা যথা,—(১) বাগেরহাট সদর, (২) মোল্লারহাট, (৩) রামপাল, (৪) মোরেলগঞ্জ, (৫) ফকিরহাট, (৬) কচুয়া, (৭) স্বরূপখোলা। ইহাদের অন্তর্গত ৫৯৩ খানি গ্রাম আছে।

সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন থানা যথা,—(১) সাতক্ষীরা সদর, (২) আশাশুনি, (৩) কলারোয়া, (৪) কালীগঞ্জ, (৫) তালা, (৬) শ্যামনগর, (৭) দেবহাটা। ইহাদের অন্তর্গত ৮৪৩ খানি গ্রাম আছে।

জেলার মোট গ্রাম-সংখ্যা—২০০৮।

নদী—এই জেলার চারিটি বড় বড় নদী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সংযুক্ত। নদীগুলির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম। বৃহৎ নদীগুলি জেলার ভিতর দিয়া দক্ষিণ মুখে সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যমুনা একেবারে জেলার পশ্চিম সীমায় অবস্থিত—উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। আর একটু পূর্ব্বে কপোতাক্ষ ইহার প্রায় সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। ভৈরব তাহার শাখাপ্রশাখা লইয়া মধ্যাংশ জুড়িয়া আছে। পূর্ব্বসীমায় মধুমতী। দক্ষিণে নদীর গোলক ধাঁধা।

মহাভারতের বনপর্ব্বে আমরা পাই, যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে আসিয়া অতঃপর গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন।

তথায় পাঁচ শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। তীর্থ-জলে অবগাহন করিয়া তিনি কলিঙ্গ দেশে গমন করিলেন।

"ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়!
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতিভারত্য॥

—মহাভারত, বনপর্ব্ব ১১৩। ১-৩

আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে,—"সরকার বারবাকাবাদভুক্ত কাজিহাটা নামক স্থানে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বমুখী স্রোতস্বতী পদ্মাবতী বলিয়া খ্যাত। অপরটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা। (বর্ত্তমানে হুগলী ও ভাগীরথী নদী)। এই তিনটির সঙ্গম-স্থান ত্রিবেণী। গঙ্গা সপ্তগ্রামের নিকট (বর্ত্তমানে ঐ অংশ ২৪ পরগণা ও খুলনার অন্তর্গত) সহস্রমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। সরস্বতী ও যমুনাও সাগরে গিয়া মিশিয়াছে।"*

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার সাগরসন্নিহিত সুন্দরবনাঞ্চলে আসিয়াই তাঁহারা পাঁচ শতাধিক নদী দেখিয়াছিলেন।

এই জেলার অন্যান্য নদী যথা,—ইছামতী, সোনাই, কানখালী, কালিন্দী, খোলপেটুয়া, বেতনা, গলঘসিয়া, শোভনালী, আঠারবাঁকী, রূপসা, ভদ্র এবং সুন্দরবনের অন্তর্গত রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, মার্জ্জাল ও হরিণঘাটা প্রভৃতি।

মহারাজা বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ পুত্রের নামে যে পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল খুলনা জেলা উহার বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত সমতট পর্য্যন্ত বিজয় অভিযান করেন। জেনারাল কানিংহামের মতে বিদ্যাধরী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র 'ব'দ্বীপটিই সমতট এবং যশোর (ঈশ্বরীপুর) উহার রাজধানী। বর্ত্তমানে সেই যশোর আজ খুলনা জেলার একটি গণ্ডগ্রামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শীলভদ্র নামক এক মহা পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমতটেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি নিজের অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যগুণে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে নালান্দা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলা এই তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় আমরা পাই। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-চাং-এর ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে মগধে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া এই বৃদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতের পদতলে বসিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে গুরুর আদেশে চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। সমতটের অপর এক অধিবাসী ইন্দ্রভদ্রও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের এক পূর্ণাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। গৌড় নিবাসী পণ্ডিত শান্তরক্ষিতও নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহু পণ্ডিতলোকের আবির্ভাব হয়। ঐ সময় তিব্বতের রাজা থি-স্রং-ডেন-সাং পূর্ব্বোক্ত শান্তরক্ষিত ও অপর একজন পণ্ডিতকে তিব্বতে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা রাল্পাচান বঙ্গদেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া সংস্কৃত ভাষা হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর নিবাসী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অন্যতম ছিলেন।

"In the 9th century many learned pandits from Bengal were invited to Tibet by King Ralpachan and employed by him in translating sanskrit works into Tibetan." †

কালিদাস রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন,—রঘুর সৈন্য ভগীরথ-অনুবর্ত্তিনী গঙ্গানদীর মত পশ্চিম সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া তালীবন-কৃষ্ণ সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন।

* Mr. Blochman's Edition of the Aini-i-Akbari P. 388.

† Indian Pandits in the Land of Snow.
—By Roy Bahadur Sarat Chandra Das.

সুহ্মগণ বেতস লতার মত কম্পিতকলেবরে রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। যাহারা নৌবল-সম্পন্ন ছিল অর্থাৎ যাহারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিত রঘু সেই বঙ্গ-নৃপতিদিগকে বাহুবলে পরাজিত করিয়া গঙ্গা-প্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের উপর বিজয়-স্তম্ভসকল স্থাপিত করিয়াছিলেন।

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ্য তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু চ॥"

—রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ ৪, ৩৪-৩৬ শ্লোক।

পূর্ব্ব-সাগর বলিতে বঙ্গোপসাগরকে বুঝাইত এবং গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ বলিতে মোহনাস্থিত অসংখ্য নদনদী-খণ্ডিত ভূ-খণ্ডগুলিকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

সপ্তমশতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন চাং সমতট রাজ্যকে সুজলা সুফলা ধনধান্যপুষ্পভরা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"The climate is soft and the habits of the people agreeable. The men are small of stature and of black complexion, but hardy by nature and deligent in the acquisation of learning. There are some 30 Budhist monasteries with some 2,000 priests and 100 Hindu temples, while the naked ascetics called Nigranaths are also numerous."

অর্থাৎ জলবায়ু সু-সহ। অধিবাসীদের চালচলন মনোজ্ঞ। ইহারা খর্ব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু এবং বিদ্যার্জ্জনে বিশেষ উৎসাহী। প্রায় ত্রিশটি বৌদ্ধমঠ আছে, সেখানে ২,০০০ ভিক্ষু আছে। ১০০ হিন্দু-মন্দির আছে। নগ্ন সন্ন্যাসী নিগ্রনাথের (?) সংখ্যা অসংখ্য।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন গঙ্গার মোহনাস্থিত বর্ত্তমান সুন্দরবন অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে জেলাটি বল্লাল সেনের রাজ্যের বাগড়ী প্রদেশের অংশ ছিল।

আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল-সম্রাট্ আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোডরমল্ল বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজস্ব নির্দ্ধারণ জন্য সুবা বাঙ্গালাকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে বিভক্ত করেন। ঐ ১৯টি সরকারের মধ্যে ১১টি সরকার উত্তর ও পূর্ব্বে, ৪টি ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং অপর চারিটি গঙ্গার পশ্চিম ভাগীরথীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। ১৯টি সরকার যথা,—

১। সরকার গৌড়—মালদহ জেলার অন্তর্গত ৬৬ পরগণায় বিভক্ত ছিল। খাজনা জমা—৪,৭১,১৭৪ টাকা।

২। সরকার তাজপুর—পূর্ণিয়ার পূর্ব্বাংশে ২৯ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৬২,০৯৬ টাকা।

৩। সরকার পূর্ণিয়া—৯ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৬০,২১৯ টাকা।

৪। সরকার ঘোড়াঘাট—রংপুর জেলায় ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—২,০৯,৫৭৭ টাকা।

৫। সরকার বার্ব্বেকাবাদ—রাজসাহী জেলায় ৩৮ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৪,৩৬ ২৮৮ টাকা।

৬। সরকার পিঞ্জরা—দিনাজপুর জেলায় ২১ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৪৫,০৮১ টাকা।

৭। সরকার বাজুহা—ঢাকা জেলায় ৩২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৯,৮৭,৯২১ টাকা।

৮। সরকার সিলেট—৮ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৬৭,০৪০ টাকা।

৯। সরকার সোনার গাঁ—বিক্রমপুর হইতে মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—২,৫৮,২৮৩ টাকা।

১০। সরকার ফতেহাবাদ—সোনারগাঁর দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত (সাবাজপুর ও সন্দীপসহ) ৩১ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৯৯,২৯৩ টাকা।

১১। সরকার চাটগাঁ—৭ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—২,৮৫,৬০৭ টাকা।

১২। সরকার তাড়া বা রাজমহল—৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৬,০১,৯৮৫ টাকা।

১৩। সরকার শরীফাবাদ—রাজমহালের দক্ষিণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ২৬ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৫,৯২,২১৮ টাকা।

১৪। সরকার ভূষণা—নদীয়া ও যশোহর লইয়া ৮৮ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৯০,২৫৬ টাকা।

১৫। সরকার খলিফাবাদ—খুলনা জেলায় ৩৫ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৩৫,০৫৩ টাকা।

১৬। সরকার বাবলা—৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—১,৭৮,২৬৩ টাকা।

১৭। সরকার সেলিমাবাদ—ভাগীরথীর পশ্চিম তীর, সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও ৩১ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৩,৪০,৭৪৯ টাকা।

১৮। সরকার মান্দারণ—দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী অংশ। ১৬ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—২,৩৫,৮৮৪ টাকা।

১৯। সরকার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ—ভাগীরথীর উভয় তীরে বিস্তৃত এবং ৪৩ পরগণায় বিভক্ত ছিল। জমা—৪,১৮,১১৮ টাকা।

শেষোক্ত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ সরকারের সীমানা ছিল উত্তরে পলাশীক্ষেত্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদী হইতে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ ভূ-ভাগ এবং দক্ষিণে সাগর দ্বীপপুঞ্জের হাতিয়াগড়। সরকার সপ্তগ্রামের ৪৩টি মহালের মধ্যে বোধেন (বুড়ান) ও সেলকী (হিলকী) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পেনগাঁ (ভালুকা) দক্ষিণ-সাতক্ষীরার কতকাংশ লইয়া গঠিত ছিল। ঐ অঞ্চলের কতকাংশ আবার সরকার খলিফাতাবাদভুক্ত ছিল। ধুলিয়া-পুর পরগণা যমুনা ও কালিন্দীর মধ্যস্থলে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী খুলনা জেলার যশোর (ঈশ্বরীপুর) আদি লইয়া গঠিত ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের মতে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও খুলনা জেলার অস্তিত্ব ছিল। সমগ্র ভাবে জেলাটি নিম্নভূমি। গঙ্গা ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের দক্ষিণ 'ব'দ্বীপের মধ্যাংশ লইয়া গঠিত। বহু নদী, খাঁড়ি ও খালদ্বারা বিভক্ত। দেশটি সমতল।

খুলনা সদর

খুলনা সহর কলিকাতা হইতে ১০৯ মাইল দূর এবং ভৈরব ও রূপসা নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। বর্ত্তমান সহর হইতে এক মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে তামিলপুর নামক গ্রামে পুরাণাদি বর্ণিত খুল্লনাদেবীর প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতা (খুল্লনেশ্বরী) এবং অপর পারে চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। উহা রূপসা ও ভৈরবের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। রূপসা তখন নদী ছিল না, হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত। খুলনা তালিমপুরের সহিত যুক্ত ছিল। খুল্লনাদেবীর নামেই সহরের নাম খুলনা হইয়াছে। পুরাণাদি হইতে জানা যায়, চণ্ডীদেবী মর্ত্ত্যে স্বীয় পূজা প্রচারের মানসে রত্নমালা নামক এক অপ্সরাকে মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া পৃথিবীতে পাঠান। চণ্ডী তাঁহাকে অভয় দেন যে, তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিবেন। রত্নমালা 'খুল্লনা' নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কালক্রমে বর্দ্ধমান জেলার উজ্জয়িনী নগরের ধনী ধনপতি সওদাগরের মহিষী হন। ধন-পতির প্রথমা স্ত্রী লহনা অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন। ধন-পতির অনুপস্থিতিতে তিনি খুল্লনাকে ছাগ চারণের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। খুল্লনা তাহাই করিতে থাকেন। অবশেষে চণ্ডীদেবী স্বপ্নযোগে ধনপতিকে সমস্ত জানাইয়া তাঁহাকে ফি'রয়া আসিতে আদেশ করেন।

আরও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল যখন ধনপতি তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে জ্ঞাতিগোত্রকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কারণ তাঁহার স্ত্রী খুল্লনা অনেক দিন বনে বনে ছাগল চড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। কিন্তু খুল্লনা তাঁহাদের আদেশমত বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের সতীত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ধনপতি সিংহলে বাণিজ্য করিতে যান। চণ্ডীকে অবহেলা করার জন্য চণ্ডী তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া এমন এক ঝড়ের সৃষ্টি করেন যে, একখানি ছাড়া ধনপতির সমস্ত বাণিজ্য-পোত ধ্বংস হইয়া যায়। এইরূপে সিংহলে পৌঁছিয়া তিনি বন্দী হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শ্রীমন্ত নামক একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তিনিও শাপভ্রষ্ট অপ্সর 'মালাকর'। শ্রীমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-অন্বেষণে সিংহল গমন করিয়া পিতার উদ্ধার সাধন করিলেন। অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে রত্নমালা স্বর্গলাভ করিলেন।

খুল্লনাদেবীর মন্দিরটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নদীগর্ভে নিমজ্জিত

হইয়া যায়। পরে অপর একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হয়।

খুলনা জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া খুল্লনা দেবীর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। বোধ হয় নানা প্রকার মানসিক অশান্তির কারণ তিনি সহর হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্ত্তী কপিলমুনি নামক গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসভবনের ভিটাটি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, উহাকে 'খুল্লনার ভিটা' বলে। গ্রামের একটি পুল ও একটী খাল অদ্যাপিও 'খুল্লনার পুল' ও খুল্লনার খাল' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কালক্রমে এই স্থান জনমানব শূন্য বৃহদারণ্যে পরিণত হইয়া থাকিলেও উপরোক্ত ঘটনা সকলের দ্বারা প্রমাণিত হয় স্থানটি কত প্রাচীন। জনশ্রুতি যে, খুল্লনা তাঁহার কপিলমুনির আবাসেই জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভিটাটি যেমন তাঁহার তথায় অবস্থিতির পরিচায়ক লোকের ব্যবসা বাণিজ্য ও চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি যে পুল নির্ম্মাণ ও খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন (যাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে) তাহাও ঐ সময় স্থানটি যে জনাকীর্ণ ছিল তাহা প্রমাণ করে। মাধবাচার্য্যের অষ্টমঙ্গলা নামক গ্রন্থে খুল্লনার রন্ধন সম্বন্ধে একটি সরস কবিতা হইতে তৎকালে এ দেশের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া যায়। কবিতাটি এই,—

"পাবক জ্বালায়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলায় বিশেষে॥
যুদ্ধ করি রামা রান্ধে ঘৃতেতে আগল।
জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল॥
জলপাই অম্বল রান্ধে মহা হৃষ্ট হয়্যা।
সম্ভরি ওলায় তাতে শঙ্খ-পোড়া দিয়া॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধি থুইল এক ভিত।
আমিষ রান্ধিতে পরে খুল্লনা দিল চিত॥
মনের হরিষে রান্ধে রুহিতের মাচ।
চুরিতা মিশায়ে রান্ধে উরিকা আনাজ॥
বড় বড় কৈ মৎস্য রান্ধিল হরিষে।
অপূর্ব্ব খরুল মাচ রান্ধে অবশেষে॥
কাল ব্যঞ্জন রান্ধে হিঙ্গু দিয়া তায়।
সম্মোহন ঘৃত দিয়া সম্ভারি ওলায়॥
কৃষ্ণসার মাংস রান্ধে তৈল কটা ভরি।
তিক্ত মিষ্ট মিশালে রান্ধয়ে নিমছারি॥
ক্ষীর পুলি রান্ধে রামা হরষিত হয়ে।
ডুবাইয়া থুল তারে ঘনাবর্ত্ত পায়ে॥
সমুদ্রের ফণাপিঠা অপূর্ব্বত গনি।
দধি মধু চন্দ্রপুলি রান্ধে সুবদনি॥
অপূর্ব্ব পিষ্টক রচে লাল মৈলাম।
পুষ্প পাণি পিঠা রান্ধয়ে অনুপম॥
কলা পিঠা রান্ধে মনের হরিষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥"

[ক্রমশঃ

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

একত্রিশ

"কমল!—এস, এস কমল!—কদ্দিন পরে যে তোমাকে আবার পেলাম!"

পর্দ্দাটি সরাইয়া কমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গার্গী একাই অতি পরিপাটি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া একখানি কৌচে ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া ছিল। বিজ্ঞাপনটা বাহির হইয়াছে, বোধ হয় অপেক্ষাই করিতেছিল কমল আসিবে। দেখিয়াই মদির ঢুলু ঢুলু চোখে মধুরমোহন হাসিমুখে হাত দুটি বাড়াইয়া অগ্রসর হইল, কাছে আসিয়াই দুটি বাহুতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিতে গেল। একটু ধাক্কা দিয়াই কমল তাহাকে সরাইয়া দিল; রুক্ষস্বরে কহিল, "থাম! সর, সরে যাও!—এসব familiarities চল্‌তে পারে, এমন কোনও সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার ঘটে নি।"

"কমল!"

গার্গী কাঁদিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কমল কহিল, "থাম!—ও-সব ন্যাকামো আর ক'রতে হবে না! ঢের হ'য়ে গেছে; আর নয়।—ব'সো,—কথা আছে আমার!—"

বলিয়া একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল, গার্গীও তাহার সেই কৌচখানির উপরে গিয়া একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কঠোর দৃষ্টিতে কমল চাহিয়া রহিল। একটু সোজা হইয়া বসিয়া অশ্রু পুছিতে পুছিতে বাষ্পাবেগ-স্খলিত কণ্ঠে গার্গী কহিল, "কমল! এ তুমি আজ কী ব'লছ কমল! আমরা—আমরা—যে engaged—বিবাহপণে বদ্ধ প্রেমিকা, প্রেমিক!"—

কমল উত্তর করিল, "প্রেমিকা-প্রেমিক খেলার খেয়ালে হ'তে পারি।—ও-সব flirtation তুমিও ঢের করেছ, আমিও ক'রেছি। একলা তোমার সঙ্গে নয়, আরও অনেকের সঙ্গে। এতেই কেউ সত্যিকার প্রেমিক-প্রেমিকা হয় না। বিবাহপণে বদ্ধ! Engaged। হাঃ হাঃ হাঃ! আমরা যে engaged—সে খবরটা এই বিজ্ঞাপনটায় আজ দেখলাম!—আগে জানতাম না।"—

বলিয়া খবরের কাগজের একটা cutting পকেট হইতে বাহির করিল।—

"সে কি কমল!—এই ত' সেদিনকার কথা—শিলং-এর সেই পাহাড়ে সেই সান্ধ্যরবির রক্তরশ্মিরঞ্জিত কুঞ্জটির পাশে, রাঙা হাসির ঝলক ছড়িয়ে কুলু কুলু সেই যে ঝরণাটি ব'য়ে যাচ্ছিল, তারই কেবল উপরে ব'সে—"

"হ'য়েছে, হ'য়েছে, থাম এখন! ও-সব রোমাণ্টিক কবিতার ছটা—আগুনের ঝলকার মত আমার কানে এসে লাগছে।—ও-সব ন্যাকামোর সময় এ নয়।—I have come for an explanation—plain and simple!"

"আমার কথাটাও শুনবে না কমল! explanation—তাই ত' আমি দিচ্ছি।"

"বেশ, বল যা ব'লতে চাও, ও-সব রোমাণ্টিক ভণিতা ছেড়ে সোজাসুজি যা ব'লবার থাকে বল।"

গার্গী আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রু পুছিতে পুছিতে শ্লথকণ্ঠে কহিল, "তাই-ই ত' ব'লছি। সেই যে তখন engagement আমাদের হ'ল—জানি না কি অপরাধে আমার কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে এই ক'দিনে তা ভুলে গেলে। ভাল, তবে এই অভিজ্ঞানটি দেখাচ্ছি,—এই যে আংটি আমার হাতে পরিয়ে তখন দিলে—'Kamal to his Dearest'! মুখেও ব'ললে আমিই তোমার dearest।—তোমার বুকে আমার মুখখানি রেখে আদর ক'রে—আদর ক'রে—কি আর ব'লব, ভুলে কি সত্যিই যেতে পার কমল? এই আংটি দেখেও মনে পড়ছে না?"

কণ্ঠস্বর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। চক্ষু দুটি ভরিয়া অশ্রুধারাও বহিতেছিল, বাষ্পভারাক্রান্ত নাসিকাও ঘন ঘন কুঞ্চিত হইতেছিল। কিন্তু আংটি আঙ্গুলে আর না পরিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া কোমরের একধারে গার্গী গুঁজিয়া রাখিল।

হাঃ হাঃ করিয়া কমল হাসিয়া উঠিল।

"ভয় নাই! আংটি আমি কেড়ে নেব না। অমন একটা আংটি খেলাঘরের প্রেমিকাকেও সখ্ ক'রে

লোকে উপহার দিয়ে থাকে। তাতেই প্রমাণ হয় না, সত্যিই সে তার dearest—আর তার সঙ্গে তার engagement হ'য়ে গেল। তোমাদের সেই নাটুকে দুষ্মন্ত শকুন্তলা দুর্ব্বাসার যুগও আর নেই। অভিজ্ঞান দেখিয়েও স্মরণ করিয়ে কিছু দিতে হবে না। সব আমার মনে আছে। আংটিটি তোমাকে দিয়েছিলাম মনে আছে, কী পাকা ছলে আমাকে ভুলিয়ে ওটা তুমি নিয়েছিলে। ছলটা তলিয়ে তখন বুঝতে পারি নি। মনে হ'চ্ছিল, নূতন ধরণের একটা রঙ্গের খেলাই আমরা খেলছি।"

"হাঁ, ছলের এমন খেলা, পুরুষ তোমরা, মেয়েমানুষকে নিয়ে অনেক খেলা খেলে থাক।"

"তা থাকি। কিন্তু এই যে ছলের খেলাটা তুমি আমার সঙ্গে খেলেছ, কোনও পুরুষ কোনও মেয়েকে নিয়ে কখনও তা খেলতে পারবে না। পুরুষকে ডোবাতে অনেক ছল-কৌশল মেয়ে মানুষ ক'রে থাকে। কিন্তু তুমি যা ক'রেছ, তার তুলনা আর মিলতে পারে না। নভেলিষ্টদেরও কল্পনার অতীত!"

মনটা গার্গীর আগুন হইয়া উঠিতেছিল। অতি আয়াসে কিয়ৎকাল চাপিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "তাহ'লে তোমার অভিপ্রায় কি? ব'লতে চাও, শিলঙের সেই ঘটনা কেবলই একটা খেলা, কোনও seriousness তার নেই?"

"না, একদম নেই? তোমরাও মনে ক'রতে পারনি, serious একটা engagement আমাদের হ'ল। তাহ'লে পর দিনই অমনি পালিয়ে আসতে না, আমার সঙ্গে একটিবার দেখা হবার আগেই।"

"বাবা—হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলেন—"

"হাঃ হাঃ হাঃ। ভাবছ মাথাভরা আমার কেবলই গোবর, এই ছলটুকু বুঝবার মতও বুদ্ধির ঠাঁই নেই? ভয় পেয়েছিলে পরদিনই পাছে সব ফাস হ'য়ে যায়। বুদ্ধিও ঠাওরাতে পারনি কি ফিকিরে এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাবে। তাই অমনি সবাই পালিয়ে এলে, তারপর বুদ্ধি পাকিয়ে কি এটর্ণী কারও সঙ্গে শলাপরামর্শে হঠাৎ এই বিজ্ঞাপনটা বের ক'রে ফেলেছ। মনে ক'রেছ, এতেই অমনি আমি বাঁধা প'ড়ে যাব! হাঃ হাঃ হাঃ!—আজ এটা বের ক'রে ভাবছ একদম কিস্তি মাত ক'রে ফেলেছ! কিন্তু কাল সকালেই দেখবে—সব কাগজে দেখবে—আমার contradiction—emphatic contradiction in bold types in prominent places—যা নাকি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।"

গার্গী ভ্রূকুটি করিল; মুখ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁতে ক্ষণকাল ঠোঁট চাপিয়া থাকিয়া রক্তচক্ষু তুলিয়া কহিল, "তা হ'লে প্রকাশ্য একটা বিজ্ঞাপনে আমাদের এই engagementটা অস্বীকার ক'রতে চাও?"

Engagement! Engagement কি হয়েছে যে তাই অস্বীকার কর'ব। তোমাদের মিথ্যা এই দাবীটা repudiate ক'রতে চাই!"

"মিথ্যাদাবী! সর্ব্বদা আমাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে; ওখানে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হ'লে; এমন দিন যায় নি আমাকে নিয়ে না বেরোতে, পাহাড়ে পাহাড়ে না ঘুরে বেড়াতে। চেনা-শোনা কে না তা দেখেছে? তারপর এই আংটি রয়েছে প্রমাণ? Repudiate তুমি করলেই দাবীটা অমনি মিথ্যে হয়ে গেল?"

"বটে! কি ভাবছ? এই সব প্রমাণেই বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করবে? হাঃ হাঃ হাঃ! যদি সম্ভবও তা হয়, I shall compel you to seek divorce before the month is over!"

গার্গী উত্তর করিল, "জানি তুমি যা করবে! সব তুমি পার, পারবে। তবে এও জেনো, একবার তোমার গৃহে তোমার বিবাহিত স্ত্রীর স্থান নিয়ে গিয়ে যদি বসতে পারি, তা থেকে নড়াতেও কেউ আমাকে পারবে না। ডিভোর্স—আমি চাইলে ত হবে? উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ তোমরা যা করে বেড়াও সবাই জানে। কটা ডিভোর্স তাতে এদেশে কি ওদেশে হয়? এটুকু বুদ্ধি স্ত্রীরা রাখে।—স্বামীর সংসারে এই settlement আর positionটা যদি অন্য সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হয়, স্ত্রীরা চোখে ঠুলী আর কাণে তুলো দিয়েই রাখে।"

"বাব্বাঃ?—এতখানি বুদ্ধি পাকিয়ে এই সব হিসেব কিতেব করেও রেখেছ!—আশ্চর্য্য বটে!—শিখলেই বা কোথায়? কিন্তু বিবাহ হ'লে, স্ত্রীর এই স্থানটা দখল করে গিয়ে

বসতে পারলে ত তবে এই সব প্ল্যান চলবে? বিবাহ যদি না করি?"

"করবে না! সত্যিই বলতে চাও করবে না?—"

"নিশ্চয়ই না। কি ভাবছ তুমি? তোমার মত একটা মেয়েকে জেনে শুনেও কেউ বিয়ে করে আস্ত পাগল না হলে? কি করবে তোমরা? হাত পা বেঁধে টেনেহিঁচড়ে আমাকে রেজিষ্টী আফিসে নিয়ে যাবে, আর বিবাহের দলিলটা সই করাবে?—"

নিবিড় ঘনঘোরে গার্গীর বদনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল,—দু'টি চক্ষে দুইটি বিদ্যুৎশিখা ছুটিল,—বেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল; আঙ্গুল তুলিয়া কহিল, "তা হ'লে—তাহ'লে বলছি মিষ্টার—"

অতি ভীষণ রোষোচ্ছ্বাসের চাপে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

"তাহ'লে -তাহ'লে হাঁ, বল্‌ছি কমল, আদালতের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে!" বলিতে বলিতে ভীমনেত্রা ভীমবক্ত্রা প্রিয়ম্বদা পাশের একটি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। কন্যা তাহার পার্ট কিরূপ অভিনয় করে অন্তরালে থাকিয়া তাহাই তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, কন্যার বাক্যবাণ অচল হইয়া পড়িল, নিজে আসিয়া সাক্ষাৎ সমরে অবতীর্ণ হইলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে গার্গী বসিয়া পড়িল। কন্যাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া প্রিয়ম্বদা কহিলেন, "হাঁ, আদালতের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে। মনে করেছ এই scandal নীরবে আমরা অমনি হজম করে যাব? দাবীটা যে আমাদের মিথ্যা নয় এটা প্রকাশ্য আদালতে সাব্যস্ত আমাদের করতেই হবে। আর এটাও সকলে দেখবে কত বড় একজন পাষণ্ড নরাধম তুমি! অহঙ্কারে ধরা কে সরা জ্ঞান করেন চিন্ময়ী মল্লিক—তার মুখেও চুণ কালী পড়বে!"

"তার চাইতে অনেক বেশী চুণ কালী পড়বে ঐ গার্গীর মা আপনার মুখে!—আদালতের আশ্রয় নেবেন? বেশ তাই নিন। পারেন আদালতের রায়ে সাব্যস্ত করুন, আপনাদের দাবী মিথ্যে নয়। আমার বয়ে যাবে তাতে। হদ্দ বড় একটা ড্যামেজের ডিগ্রি পাবেন, সেটা দেবার মত সামর্থ্য আমার আছে। আর কি করবেন আমার? যোগাইটীতে আমার স্থান যেমন আছে, তেমনই থাকবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের বাঞ্ছিত কে কোনও পাত্রীকে বিবাহ আমি করতে পারব যদি করতেই চাই।"

"অন্ততঃ সুকল্যাণী মোকাজ্জির মেয়ে উর্ম্মিকে পারবে না। সেও আমাদের বড় একটা revenge আর বড় একটা consolation হবে।"

হাসিয়া কমল উত্তর করিল, "উর্ম্মিই একমাত্র বাঞ্ছিত পাত্রী এ দেশে নয়। আমার এমন কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু আসল ক্ষতিটা হবে আপনাদের। ভেবেছেন ঐ গার্গীকে সম্ভ্রান্ত কোনও ভদ্রলোক আর বিবাহ করতে আসবে?"

"সবাই তোমার মত হৃদয়হীন পশু নয়! উদার এমন ভদ্র যুবাও আছে, লাঞ্ছিতা জেনেই যেচে এসে তাকে বিবাহ করবে।"

"যেচে কেউ আসবে না। তবে ড্যামেজের টাকাটায় কিনতে যদি কোনও হতভাগাকে পারেন!"

বলিয়াই কমল বাহির হইয়া গেলে।

বত্রিশ

দুই দিনের দুইটি বিজ্ঞাপনের কাগজ লইয়া গালে হাত দিয়া সুকল্যাণী বসিয়া ভাবিতেছিলেন। কিন্তু ভাবিয়া কূল কিনারা কিছু পাইতেছিলেন না। একেবারে মিথ্যা হইলেই বা ওরা এই বিজ্ঞাপনটা কোন্ সাহসে দিল? আর মিথ্যা হইলেই বা কমল এমন জোর একটা প্রকাশ্য প্রতিবাদ কেন করিল? গার্গী আর গার্গীর মার বড় একটা লোভ কমলের উপর আছে, আর কমলের ব্যবহারে কিছু আশাও যে গার্গী পাইত, তাহাদের বাড়ীতে সেদিনকার ঐ ঘটনায় স্পষ্ট তাহা বুঝা গিয়াছে। কিন্তু লোভ ত তাঁহারও বেশ একটা ছিল, আর তাই না উর্ম্মিকে লইয়া তিনি সে দিন উহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। না, লজ্জাকর এই সত্যটা মনে মনে অস্বীকার করিতে আর তিনি পারেন না,—কোনও যুক্তিতে এতটুকু এদিক ওদিক করিতেও পারেন না। চিন্ময়ী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বন্দোবস্তটা উভয়ের হীন একটা কূটচক্র মাত্র। তাহার গৃহের সেই পার্টিটা—তাও এমনই একটা চক্র তাঁহার। অনেক সময়ই কথাটা মনে খোঁচা

দিয়া উঠিত। কিন্তু আজ—আজ সেই সত্যের নগ্ন বিকট রূপটা অতি স্পষ্ট জলন্ত রেখায় মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল, গ্লানিটাও বড় তীব্র জ্বালায় অনুভব করিতেছিলেন। সত্যই ত? গার্গীর মাতে আর তাঁহাতে তফাৎ কি? তবু তারা সুনীতি-কুনীতির কোনও ধার ধারে না সোজাসুজি স্বার্থবুদ্ধিতেই চলে, যে কোনও উপায়ে স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চায়। আর তিনি? সেই স্বার্থবুদ্ধিতেই চলিতেছেন সেই হীন উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি করিতেও চাহিতেছেন, অথচ বাহিরে সেটা দেখাইতে চাহেন না; ব্রাহ্ম সুনীতির উচ্চ আদর্শের গর্ব্ব করিয়া চলেন, কোনও ত্রুটি কাহারও ক্ষমা করিতে পারেন না; অথচ মনকে চোখঠার দিয়া বড় একটা স্বার্থের লোভে যাহা করিয়াছেন, তাহাকে ঠিক স্পষ্ট দুর্নীতি না বলা যাউক, অতিহীন একটা কৌশল বটে! আবার লোককে দেখাইতে চাহেন সরলভাবেই চলিতেছেন যাহা করিতেছেন সাধারণ সামাজিক ব্যবহার মাত্র; গূঢ় কোনর উদ্দেশ্য মনের অন্তরে চাপা নাই। কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণতা, পবিত্রতা, সরল অকপট আচরণ—ব্রাহ্ম চরিত্রনীতির আদর্শ এই। এই আদর্শ মানিয়া চলিতে চেষ্টাও বাল্যাবধি করিয়াছেন, চলিতে যাহাতে পারেন, সত্যস্বরূপ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের নিকটে প্রত্যহ সেই প্রার্থনাও করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ একটি যুবার সঙ্গে কন্যার বিবাহ যদি দিতে পারেন, সেই আশার মোহে যাহা তিনি এতদিন করিয়াছেন, তাহাতে, হায়, কত নিম্ন স্তরে আপনাকে তিনি নামাইয়া ফেলিয়াছেন! জীবন ভর সকল সাধনা সকল প্রার্থনা এই এক লোভে তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে! আর এই যে যুবা—যে সব ত্রুটি তাঁহার চরিত্রব্যবহারে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্য কোনও যুবার চরিত্রে তাহা দেখিলে ক্ষমা তিনি করিতে পারিতেন না। এই সব নির্লজ্জা মেয়েদের লইয়া সর্ব্বদা আমোদ করিয়া বেড়ায়। মুখে সর্ব্বদাই চুরুটের গন্ধ পাওয়া যায়। আবার বিলাতফেরত-সৌখীন যুবারা অনেকে নাকি সুরাপানও করে। কমলও ত ঠিক তাদেরই একজন! কি করে কে জানে? তবে চিন্ময়ীর পুত্র, এই যা কথা। কিন্তু তিনি ত একটিবার সন্ধান লইয়াও দেখেন নাই, এরূপ কোনও ত্রুটি তার আছে কি না? আসল কথা—অতটা ঘাঁটিয়া দেখিতে চাহেনই নাই! যাহা চোখে একেবারে ঠিকরাইয়া আসিয়া পড়ে, তাহাও যেন দেখিয়াও দেখিতে চাহেন নাই। পবিত্রতা ও মিতাচার ব্রাহ্মজীবনের প্রধান দুইটি সুনীতির সূত্র ছিল, এখনও তার গর্ব্ব তিনি করেন! কিন্তু কমলের চরিত্র ব্যবহারে এই দুইটি নীতির কি প্রভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন? চিন্ময়ী বলিয়াছিলেন, আজকাল ছেলেরা মেয়েদের লইয়া মজলিস করিয়া বেড়াইতে চায়, মজলিসী মেয়েও তাহারা অনেক পায়। ইহাই নাকি রেওয়াজ হইয়াছে! কিন্তু রেওয়াজ যাহা কিছু হয়, তাহাকেই ত সুনীতি বলা চলে না। ইহার তুলনায় অরুণ চরিত্রব্যবহারে কত উন্নত, ধর্ম্মমতে পৌত্তলিক হিন্দু হইলেও চরিত্রব্যবহারে সে ব্রাহ্মনীতির উচ্চ আদর্শই মানিয়া চলে। চরিত্রগত দুর্নীতি অপেক্ষাও কি পৌত্তলিকতা বেশী দোষের? যদি এমন দোষেরই তা হইবে, পৌত্তলিক হিন্দু কেহ চরিত্রনীতিতে এত উন্নত হইতে পারিত না। আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ব্রাহ্ম-পরিবারের যুবক-যুবতীদের সুনীতির পথে স্থির রাখিতে না পারে, তবে—তবে তাহারই বা এমন মাহাত্ম্য কি?

ভাবিতে ভাবিতে গভীর একটি নিশ্বাস সুকল্যাণী ত্যাগ করিলেন। বিজ্ঞাপন দুইটির দিকে আবার চাহিলেন। সে দিন গার্গীর সেই সব কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাহাকে লইয়া কমল সর্ব্বদা বেড়াইত। আবার শিলঙে যেমন তারা চায়, তেমন কমলও যায়। সেখানেও তাহাকে লইয়া নিশ্চয়ই বেড়াইত। সেখানে একা গার্গীই তার নিয়ত সঙ্গিনী ছিল, দলের আর কেহ শিলঙ যায় নাই। এমন কিছু কি ঘটিতে পারে না, যাহাতে ওরা এই দাবী করিতে পারে? আবার কমলও এমন জোরে একটা প্রতিবাদ করিয়াছে। শিলঙ হইতে ফিরিয়াই ঊর্ম্মির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। ইহারই বা অর্থ কি? ভাবিতে ভাবিতে আর ভাবিয়া উঠিতেই তিনি পারিতেছিলেন না। কাগজ দুইটা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থির ভাবে গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

তখন চিন্ময়ীর পত্রখানা আসিল। বসিয়া পত্রখানি সুকল্যাণী পড়িলেন। মর্ম্ম ছিল এইরূপ—সম্প্রতি কমল ঊর্ম্মির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু তারপরেই একটি কথা প্রচার হইয়াছে ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে শিলঙে গার্গী গাঙ্গুলীর সঙ্গে তার engagement হয়। সংবাদপত্রে

প্রথম এই সংবাদ এবং কমলের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ যাহা বাহির হইয়াছে, সুকল্যাণী ও মিষ্টার মোকার্জ্জি অবশ্য তাহা পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ আদালত পর্য্যন্ত ব্যাপারটা যাইবে এবং প্রকাণ্ড একটা scandalও হইবে। এ অবস্থায় উর্ম্মির সঙ্গে বিবাহের কথা আপাততঃ আর চলিতেই পারে না। কমল তাই তার প্রস্তাব তুলিয়া নিতে চায়। নিজে বড় লজ্জাবোধ করে, তাই তার অনুরোধে তিনিই তার পক্ষে এই কথা সুকল্যাণীকে ও মিষ্টার মোকার্জ্জিকে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে জানাইতেছেন। নির্দ্দোষতার প্রমাণে ভদ্রসমাজে আবার যদি সে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে—তবে সে কবে হইবে, হইবে কি না কে জানে? তাই ভবিষ্যতে কি হইতে পারে না পারে, তার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বৃথা।

পড়িতে পড়িতে সুকল্যাণীর চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। আর যত ত্রুটিই তার থাক, এ বিষয়ে অন্ততঃ কমল সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ভদ্রসন্তানের মতই ব্যবহার করিয়াছে। বড় আশাই তিনি করিয়াছিলেন উচ্চ পদগৌরবে উর্ম্মিকে প্রতিষ্ঠিতা করিবেন, সেই আশার মোহে আপনাকেও অনেক হীন তিনি করিয়াছেন। কিন্তু সব আজ ব্যর্থ হইয়া গেল, রহিল কেবল সেই হীনতার গ্লানি, বুকভরা পরিতাপ! হয় ত হীন মিথ্যা ব্যবহারে যে পাপ তিনি করিয়াছেন, তাহার শাস্তি এই সত্য-স্বরূপ ন্যায়দণ্ডধারী স্বয়ং ভগবানই তাঁহাকে দিলেন। ধীর চিত্তে এই দণ্ড শিরে তিনি বহন করিবেন, সকল হীনতা হইতে মনকে মুক্ত রাখিতে, সত্যের সম্মুখে, ন্যায়ের সম্মুখে সকল ব্যবহারে নত হইয়া চলিতে, প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। দর্পহারী ভগবান্ মাথার উপরে রহিয়াছেন, কিসের দর্প মানুষ করিতে পারে? সত্যের দৃষ্টি তিনি যাকে দয়া করিয়া দেন, সেই লাভ করে!' বিবেকে তাঁহার বাণী তিনি যাকে শোনান সেই মাত্র শুনিতে পায়। তাঁহার এই দয়া ব্যতীত কি শক্তি মানুষের আছে? সর্ব্বপ্রকারে দীনাত্মা হইয়া তাঁহার চরণ যে শরণ লইতে পারে, এই দয়া সেই মাত্র পায়। মনে পড়িল যিশুখৃষ্টের সেই উপদেশ—Blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of Heaven, সেদিন মন্দিরে আচার্য্য মহাশয়ের সার্মনের (sermon) সূত্র যাহা ছিল। এ উপদেশের সূত্রটি আরও অনেক সময় তিনি শুনিয়াছেন, সেদিন বক্তৃতাও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কই, দীনাত্মা, poor in spirit, যাহাকে বলে, সেরূপ ভাবও ত তিনি মনে কখনও আনিতে পারেন নাই! জীবনে আজ প্রথম কেবল অনুভব করিতেছেন দীনাত্মা কাহাকে বলে। সত্যের এই যে আলোক পাত তাঁহার চিত্তে আজ হইতেছিল, চিত্তে কি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন? চরিত্র ব্যবহারকে কি তাহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন?

হাতের উপরে মাথাটি রাখিয়া নিমীলিত নয়নে বহুক্ষণ সুকল্যাণী বসিয়া রহিলেন। তারপর নতজানু হইয়া যুক্ত করে তাঁহাদের প্রার্থনার মূল এই সূত্রকয়েকটি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবির্ম্ময়েধি।

স্বামীর পদশব্দ পাইয়া চমকিয়া সুকল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন।

মহীন্দ্রনাথ তখন আফিস হইতে ফিরিলেন।

"কি সুকু!"

"না, এই বসে বসে ভাবছিলাম, কী হ'ল, আর—আর—আমিই বা এই একটা লোভে প'ড়ে এদ্দিন কী না করলাম।"

একটু হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা এটা এমন অস্বাভাবিক কাজও কিছু নয়। প্রচলিত একটা কথাই এদেশে আছে, মাতারা কন্যার বিবাহে পাত্রের বিত্তই আগে কামনা করেন।—তা, সে যা হবার হয়ে গেছে, মিছে আর ভেবে কি হবে? হাঁ, কথা আছে, আস্‌ছি হাতমুখটা ধুয়ে।"

বলিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুকল্যাণী দরজার কাছে আসিয়া ডাকিয়া কহিলেন, 'উর্ম্মি, উনি এসেছেন, খাবার টাবার নিয়ে আয়।"

মহীন্দ্রনাথ হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিলেন, উর্ম্মি খাবার ও চা দিয়া গেল।

সুকল্যাণী কহিলেন, "চিন্ময়ী এই চিঠিটা লিখেছে।"

পত্রখানি মহীন্দ্রনাথ পড়িলেন,—মুখে একটু হাসি ফুটিল। কহিলেন, "হাঁ, পত্রখানি লিখেছেন বেশ। এ অবস্থায় যেমন লিখতে হয়। কমলও যার উপদেশে অন্ততঃ ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করেছে। সেদিনও বেশ শিষ্ট সংযতভাবে কথাবার্ত্তা ব'লে গেল। তবে—"

"কি তবে ?"

"আমি গাঙ্গুলীদের ওখানে গিয়েছিলাম। শুনে যা এলাম, তাতে ক'রে তারা যে দাবী করছে, সেটা একদম একটা ভুয়ো কথা ব'লেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিলঙে তাঁরা যান। যেমন এখানে তেমন ওখানেও ঐ মেয়েকে নিয়ে সর্ব্বদা বেরোত, একটা আংটিও দেখালেন—"

"আংটি !"

"হাঁ, ওঁরা বলেন, engagement ring—হাতে হাত ধরা ডিজাইন—আবার 'মটো' (motto) খোদা আছে—Kamal to his Dearest !"

"হুঁ !"

"মেয়েটা ছিল ওর—কি আর বলব, এই আজ কাল ছেলেরা যেমন বলে বড় একজন 'প্রিয় বান্ধবী'। সখ করেও দিয়ে দিতে পারে। তবে ওঁরা বলেছেন, engagement ring। কমল নাকি কাল ওখানে গিয়ে খুব ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে এসেছে। আজ ত কাগজে তার প্রতিবাদও একটা বেরিয়েছে।"

"হুঁ।"

"ওঁদের কথায় যা বুঝলাম, সহজে ছাড়বেন না। আদালতে মামলা রুজু করবেন।"

"তাতে কি হবে ? রায় যদি তাদের পক্ষেও হয়, কমলকে কি বাধা করতে পারবেন, মেয়েকে বিয়ে ক'রতে ?"

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তাও কি হয় কখনও ? এই মাত্র প্রমাণ হবে, engagement একটা হ'য়েছিল, আর লম্বা একটা ড্যামেজ আদায় করে নিতে পারবেন। চুলোয় যাক্। আমাদের আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অল্পে অল্পে এড়িয়ে গেছি এই ঢের।"

"হুঁ। কিন্তু ঊর্ম্মিকে বিয়ে দিতে ত হবে।"

"দেখ, ভাল আর কোনও ছেলে যদি পাও—"

"কই, তেমন ভাল পরিবারের পছন্দমত ছেলেই ত বড় দেখতে পাই না। লোকই বা আমরা কটি ? ভাল ছেলে এত কোত্থেকে আসবে ? হিন্দু সমাজ অনেক বড়। সকল রকম পরিবারেই ভাল ভাল অনেক ছেলে আছে।"

"তেমন মেয়েও অনেক আছে, কত বি-এ, এম্-এ পাশ করেছে, হাল ফ্যাসনেও চলে। তাদের পেতে আমাদের মেয়ে নিতে জাত খুইয়ে তারা আসবে কেন ? আমরাও ত হিন্দু অনুষ্ঠানে তাদের কারও ঘরে সেধে দিতে পারি না।"

সুকল্যাণী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। উত্তরে আর কিছু বলিলেন না।

তেত্রিশ

গাঙ্গুলীরা নালিশ রুজু করিলেন, মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। এরূপ মোকদ্দমা এদেশে অতি বিরল। মল্লিক পরিবারও কলিকাতায় উচ্চতর সমাজে পরিচিত সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার। রহস্যটা কি জানিবার জন্ম বড় একটা কৌতূহলও সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিল। কাগজওয়ালারা গার্গী কমলের নাম জুড়িয়া রহস্যরঞ্জিত কতরকম ধুয়াই মোড়ে মোড়ে হাঁকিতে লাগিল। আদালতের জবানবন্দীতে ও জেরায় আধুনিক শিক্ষিতসমাজে তরুণ তরুণীদের ব্যবহার সম্বন্ধেও এমন অনেক কথা বাহির হইল, যাহাকে কোনও শিষ্টসমাজের যোগ্য ব্যবহার বলিয়াও মনে করা কঠিন।

সকালে একদিন অরুণ আসিয়া মহীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিল। নীচের বাহিরের দিকে নিভৃত এক গৃহে অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া বাহির হইয়া গেল। উপরে যখন মহীন্দ্রনাথ উঠিয়া আসিলেন, মুখে একটা অস্বস্তির ভাব।

সুকল্যাণী কহিলেন, "কি, কি হ'য়েছে ? অরুণ এসেছিল কেন ?"

"ব'লো, ব'লছি ! কমলের পক্ষে এটর্নী যিনি, অরুণ সেই অফিসে ঢুকেছে ; মোকদ্দমার কাগজপত্র তারই হাতে তৈরী হ'চ্ছে।—ব'লে গেল, গাঙ্গুলীরা আমাদের—মানে—এই আমাকে আর ঊর্ম্মিকে সাক্ষী মেনেছে।"

"সাক্ষী মেনেছে !—তোমাকে—ঊর্ম্মিকে ! কি সর্ব্বনাশ ! তোমরা—তোমরা—কি সাক্ষী দেবে ! ঊর্ম্মি—"

"ওরা এইটে প্রমাণ ক'রতে চায়, কমল যে এই প্রতিশ্রুতিটা ভাঙ্গল, তার কারণ ঊর্ম্মির টানে সে প'ড়েছে ; আর সেই টানে তাকে ফেলবার মতলবে অনেক চাল-চক্র আমরা অনেকদিন থেকে চালাচ্ছি। শিলঙ থেকে ফিরবার পরেও আবার আমাদের ফাঁদে এসে সে পড়েছে। তাই এখন engagement-এর কথাটা একদম অস্বীকারই ক'রছে।"

স্তব্ধভাবে সুকল্যাণী বসিয়া রহিলেন,—মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "একটা কারণও দেখাতে হয় কেন কমল সম্বন্ধটা ভাঙ্গতে চায়। তা ছাড়া তোমাদের—বিশেষ উর্ম্মির উপরে বড় একটা আক্রোশ ওদের আছে। একটা ধারণা ওদের জন্মেছে, উর্ম্মির উপরে সত্যিকার একটা ভালবাসার টান কমলের প'ড়েছে, তাই গার্গীকে বিয়ে ক'রতে নারাজ। নইলে ক'রত। যে-সব মেয়েদের সঙ্গে কমল মেলামেশা ক'রত, তাদের ভেতর গার্গীকেই নাকি বেশী পছন্দ সে ক'রত, কিন্তু উর্ম্মির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সে টানটা নাকি ঢিলে প'ড়েছে!—সেই আক্রোশটাও মেটাতে তারা চায়, প্রকাশ্য আদালতে এমন সব প্রশ্ন ক'রে যাতে—যাতে আমাদের মাথা হেঁট হয়। প্রমাণ হয় এই সব হীন চালে আমরা—আমাদের সঙ্গে উর্ম্মিও—কমলকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা সবাই ক'রেছি।"

"কি সর্ব্বনাশ! তা অরুণ ত' কমলের উকিল।"

মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, তা এটর্ণীদের লোক থাকে, বড় বড় মামলায় গোপনে খবর নেয়, বিপক্ষ উকিল এটর্ণীরা কি প্ল্যানে মোকদ্দমা চালাবে, কি সব সাক্ষী এনে কি প্রমাণ করাবে। তাই বুঝে তারা তাদের যা ক'রতে হবে তাই স্থির করে। লোকদের কাছ থেকে এ-সব খবর জোগাড় করবার ভারও পড়েছে অরুণের উপরে। ওরা—ওরা—নাকি উর্ম্মির মুখ থেকেই কথা সব বের করবার চেষ্টা ক'রবে, প্রশ্নও সব সেইভাবে তৈরী ক'রছে। তোমার সেই পার্টি, তাতে কি হ'য়েছিল, মল্লিকদের বাড়াতে তুমি উর্ম্মিকে নিয়ে গিয়েছিলে, উর্ম্মি সেখানে কি গান ক'রেছিল, তারপর কমল যে আসত যেত, উর্ম্মি তাকে গান শোনাত—সব কথা তারা উর্ম্মিকেই জিজ্ঞাসা ক'রবে, তার মুখ থেকেই বের ক'রে নেবে। আমার সাক্ষী হবে কতকটা সাক্ষীগোপালের মত। আর উর্ম্মির সাক্ষীতে যদি খাক্‌তি কিছু ঘটে, সেটা পুরিয়ে নেবে আমার সাক্ষীতে। অরুণ সব জানিয়ে গেল। ব'লে গেল, এই সব বুঝে খুব সাবধানে যেন আমরা তৈরী হই।"

বিবর্ণ মুখ, বিবর্ণ ওষ্ঠপুট থর্ থর্ কাঁপিতেছিল। জিহ্বাও আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। অস্পষ্ট স্বরে থামিয়া থামিয়া কোনও মতে সুকল্যাণী উচ্চারণ করিলেন, "তৈরী হব! কি তৈরী হব? আমরা এসব জানি কি? আর উর্ম্মি—ছেলেমানুষ—কি ক'রবে সে? হাঁ, অরুণ যদি এসে তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে যায়—"

"ব'লব তাকে। হাঁ অরুণকেও সাক্ষী মেনেছে?"

"অরুণকে!"

"হাঁ, সে উর্ম্মিকে ভালবাসে; বিবাহের প্রস্তাব করে। তুমি তাকে তখনই বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছ, কড়া নিষেধ ক'রে দিয়েছ বাড়ীতে আর না ঢোকে,—কমলের সঙ্গে তখন উর্ম্মির বিবাহের চেষ্টা চলিতেছিল।—সেই থেকে ঘরের ছেলেটির মত হ'য়েও সে আর এবাড়ীর পথও মাড়ায় না। নিশ্চয়ই গাঙ্গুলীদের চর আছে, আশে পাশে ঘোরে, সব খবর সংগ্রহ করে!—যেমন অরুণের সাক্ষীতে, তেমন উর্ম্মির সাক্ষীতেও এসব প্রমাণ ক'রে নেবে!"

সুকল্যাণী একেবারে তখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, চক্ষু দুটি বুজিয়া কৌচখানির পিঠে অবসন্নভাবে হেলিয়া পড়িলেন। ত্রস্ত উঠিয়া মহীন্দ্রনাথ একটু জল মাথায় ও মুখে দিয়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিলেন, ডাকিলেন, "সুকু! সুকু!"

"আঁ!"

"কি ক'রছ? শান্ত হও, স্থির হও, একটু ধৈর্য্য ধর।" বলিতে বলিতে বাহুতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একেবারে কাছে টানিয়া আনিলেন। স্বামীর বুকে মুখখানি রাখিয়া সুকল্যাণী অসহায়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। মুখ তুলিয়া শেষে কহিলেন, "কি ক'রলাম, কি ক'রলাম! উর্ম্মির একেবারে সর্ব্বনাশ আমি ক'রলাম! অনেক তাড়না লাঞ্ছনা তাকে ক'রেছি। আজ কদিন ধ'রে ভাবছি আর মনে এই কথাটাই কেবল আমার ঠেলে ঠেলে উঠছে কি অন্যায় শাসন তাকে আমি ক'রেছি। কে আমি—কিসের স্পর্দ্ধা আমার হ'য়েছিল যে মনে ক'রেছি ধর্ম্মের সত্য একলা আমিই বুঝেছি। মনে মনে আজ দু'দিন কি যে পুড়ে মরছি সে আর তোমাকে কি বলব, তারপর—তারপর এই একটা লোভে পড়ে, কি যে একটা হীনতা ক'রলাম। ছল চক্র—হাঁ, সত্যিই ত ক'রেছি। তুমি করনি, উর্ম্মিও কিছু ক'রে নি। ক'রেছি আমি—একা আমি; আর সেই যে পাপ তার ফলে চুণকালি এসে প'ল উর্ম্মির মুখে না, না, ক্ষমা আমাকে কেউ ক'রতে পারে না! আমি নিজে পারি না, কে পারবে? স্বয়ং, স্বয়ং সেই কৃপাসিন্ধু—না, তিনিও এতটুকু কৃপা আমাকে ক'রতে পারেন না! কৃপা আমি চাইতেও পারি না। না না, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও আমাকে! তোমার এ স্নেহের যোগ্য আমি নই।"

বলিয়াই স্বামীর বাহুবেষ্টন হইতে আপনাকে জোরে মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া সুকল্যাণী নিজের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

স্নানাহার করিয়া মহীন্দ্রনাথ আফিসে গেলেন। উর্ম্মি

গিয়া তখন মায়ের কাছে বসিল। কিছু সুস্থ হইলে স্নান করাইয়া তাঁহাকে কিছু খাওয়াইল। নিজে দুটি আহার করিয়া আসিয়া কাছে বসিল। কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সারাটি দিন সুকল্যাণী শুইয়া রহিলেন।

সাক্ষীর পরোয়ানা আসিল। তারিখ পড়িল। উর্ম্মিকে লইয়া মহীন্দ্রনাথ আদালতে গেলেন। সুকল্যাণীর ইচ্ছা হইতেছিল সঙ্গে যান, কিন্তু হাত পা আর উঠিতেছিল না। ঝির একান্ত অনুরোধে একটু দুধ মাত্র পান করিয়া শুইয়া পড়িয়া রহিলেন। মেজো মেয়ে নির্ম্মলা আসিয়া কাছে বসিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এক একটি ঘণ্টা যেন এক একটা যুগের মত তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বেলা চারটার সময় সুকল্যাণী নীচে নামিয়া আসিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটায় মহীন্দ্রনাথ উর্ম্মিকে লইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন, সঙ্গে অরুণও আসিল।

উঠিয়া সুকল্যাণী ছুটিয়া গিয়া উর্ম্মিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "উর্ম্মি! উর্ম্মি! আয় মা আমার বুকে আয়! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তুই করে এলি মুখে চুণকালি মেখে। তবু, তবু আয় আমার বুকে আয়! পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে, এক যদি জুড়োয়।"

উর্ম্মি হাসিয়া উঠিল।

"পাগলের মত কি ব'লছ মা?—চুণকালি। চুণকালি পড়ে তাদেরই মুখে অন্যায় যারা করে। আমি ত অন্যায় কিছু করিনি, অন্যায় কিছু ভাবিওনি। সুধোও না বাবাকে—খাসা সাক্ষী দিয়ে এসেছি। ধীরস্থির হ'য়ে সব কথার উত্তর যেমন দিতে হয়, দিয়েছি। এতটুকুও ভয় পাই নি। ব'সো, ব'সো, শান্ত হ'য়ে এসে ব'সো।" বলিয়া মাকে লইয়া একখানি কৌচে গিয়া বসিল।

একটু শান্ত হইয়া চক্ষু দুটি পুছিয়া সুকল্যাণী স্বামীর দিকে চাহিলেন।

হাসিয়া মহীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ব'লব খুলে সব পরে, এখন একটু খাবারটাবারের যোগাড় দেখ। অরুণও এসেছে হয়রান হয়ে। কিছু ভয় নেই। খাসা উত্তরে এসেছে উর্ম্মি। কাল কাগজে ত সব দেখবে? এতটুকু গ্লানির ইঙ্গিতও কেউ ওর নামে ক'রতে পারবে না। তবে তোমার যে কিছু কলকৌশল এই ব্যাপারে ছিল, সেটা একেবারে চাপা দেওয়া যায় নি।" বলিয়া একটু হাসিলেন।

"চাপা কি ক'রে দেবে? দিতে হ'লে মিথ্যে ব'লতে হয়।—না না, পাপের এ শাস্তিটুকু আমার অতি লঘু শাস্তি বরং হ'ল। এ দয়ার যোগ্য আমি নই।"

নির্ম্মলা তখন ঝির সঙ্গে চা ও খাবার লইয়া আসিল, ছোট দুইটি টেবিল দুইটি কৌচের সামনে আগেই রাখিয়া গিয়াছিল; তাহার উপর সাজাইয়া রাখিল। আহারপানে সকলে ক্লান্তি দূর করিলেন, সুকল্যাণী স্পর্শও কিছু করিলেন না। স্নিগ্ধ স্থির দৃষ্টিতে অরুণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল, আঁচলে পুছিয়া কহিলেন, "অরুণ!"

"কাকীমা!"

"তোমার উপরে বড় দুর্ব্যবহার আমি ক'রেছি।"

হাসিয়া হাত দুটি জোড় করিয়া অরুণ কহিল, "কেন ও-সব পুরাণো কথা আজ তুলছেন কাকীমা?"

"ক্ষমা ক'রো আমাকে!"

"কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে কাকীমা?"

ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সুকল্যাণী আবার কহিলেন, "উর্ম্মিকে তুমি বিবাহ কর'তে চেয়েছিলে—"

"আজ্ঞে—" বলিয়া হাত দুটি জোড় করিয়া শির একটু নত করিল।

"এখনও বিবাহ ক'রতে চাও ওকে?"

অরুণ উত্তর করিল, "দয়া ক'রে যদি দেন কাকীমা—আমি যে কৃতার্থ হব।"

"অতি উদার তুমি, ভালও ওকে বাস। আদর করেই নেবে জানি। কিন্তু তোমার বাবা মা—"

"আপনি জানেন না কাকীমা, কত আগ্রহ তাঁদের উর্ম্মিকে যদি ঘরে নিতে পারেন, আর পারলে কত খুসী হবেন। এই—এই—মোকদ্দমার কথা ভাবছেন? কিন্তু তাঁরা ত জানেন সব। উর্ম্মি তাঁদের চোখে এতটুকুও হীন এতে হয় নি, হ'তে পারে না।"

"ভাল, উর্ম্মিকে তবে তোমার হাতে তাঁদের ঘরে আজ দিলাম। উনিও মনে মনে তাই চান জানি।" বলিতে বলিতে উর্ম্মিকে লইয়া উঠিয়া আসিয়া তার হাতখানি অরুণের হাতের উপরে রাখিলেন।

চক্ষুদুটি পুছিয়া কহিলেন, "আমার কাজ আমি আজ করলাম। এখন অনুষ্ঠান—সে উনি আছেন, তোমার বাবা মা আছেন, পিসীমা আসবেন, যে ভাবে যা করতে হয় তাঁরাই করবেন। কোনও আপত্তি আমি করব না; কৃতার্থ হ'য়ে দেখব, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে কৃতার্থ হব।

সকলেরই চক্ষু বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল। অরুণ ও উর্ম্মি উঠিয়া সুকল্যাণীকে ও মহীন্দ্রনাথকে ভূনত প্রণাম করিল।

শেষ

বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সাহিত্য ও শিল্পকে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা হ'তে এবং আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ও উৎপাদিকা শক্তির সংস্রব হ'তে বিচ্ছিন্ন ভাবে ধরলে মস্ত ভুল করা হবে। সাহিত্য এবং শিল্প আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন, বরং অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। সাহিত্যিক জাতীর প্রাণ-শক্তির গভীর উৎস বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয়। রুশ দেশের বিগত রুশ বিপ্লব, আজ শুধু মাত্র তথাকার নির্য্যাতিত মানবগণকেই স্বাধীনতা দান করে নাই, বিগত রুশ বিপ্লব যেমন বিরাট রুশ দেশের নির্য্যাতিত জনগণকে জার তন্ত্রের লৌহ-কবল হ'তে মুক্ত করেছে, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত দুঃস্থ মানবের বেদনাময় ও নৈরাশ মনে এক মহৎ মুক্ত জীবনের আদর্শ ও স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছে। তাই আজ সোভিয়েট সাহিত্য আলোচনার সময়, বিগত বলশেভিক বিপ্লবকে উপেক্ষা করে, তার সাহিত্য ও শিল্প আলোচনা করা নিরর্থক হবে।

কারণ আমরা জানি, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির যোগাযোগে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমিকে কেন্দ্র করে আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি গড়ে উঠে। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তর্বর্ত্তী শিল্পী ও সাহিত্যিক গণ যখন সাহিত্য ও শিল্পকে শুধু মাত্র art for art's sake বা শিল্পের খাতিরে শিল্প, অথবা যাঁরা শিল্প ও সাহিত্যকে বিশুদ্ধ শিল্প ও বিশুদ্ধ সাহিত্য মাত্র ধ্বনী তোলেন, তখন উহা হাস্যকর বলেই মনে হয়। এই হাস্যকর মতের প্রথম গুরু হচ্ছেন ক্রোচে। বেনে ডেটো ক্রোচে বলেন, Art is independent 60th of science and of the useful and the moral". শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ক্রোচের এই অভিমত আমি মানতে প্রস্তুত নই। কারণ সাহিত্য বা শিল্প কোন অবাস্তব কল্পনা-বিলাস নয়। বাস্তব জীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সত্য ও প্রকৃত অবস্থাকে ভিত্তি করেই শিল্প ও সাহিত্য গড়ে ওঠে। ইতিহাস যেমন গতিশীল ও বাস্তব, আমাদের জীবন ও সমাজ তেমনি গতিশীল ও বাস্তব এবং সংগ্রাম মুখর। আমাদের প্রতিটী অবস্থা, আমাদের জীবন-প্রণালী দৈনন্দিনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, সর্পিল বিরোধ মুখর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে নব নব জীবনের জগতে অগ্রসর হচ্ছে। শিল্প ও সাহিত্য তেমনি গতির ছন্দে, বাস্তবের মূর্ত্ত আঘাতে এবং আবর্ত্তে, ভাবলোক হ'তে বস্তুজগতে ও ধর্ম্মলোক, দর্শনলোক অতিক্রমণ করে, প্রকৃত জীবন ও সম্যক্ সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিতে নিজকে রূপায়িত করছে। তখন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিটী ঐতিহাসিক স্তর ও পরিচ্ছেদ বিচার ও বিশ্লেষণ করলে আমরা সেই সেই স্তরের উৎপাদিকা শক্তির পারস্পারিক সম্বন্ধের প্রতিফলন দেখতে পাই। তখন ক্রোচের ঐ অভিমতকে একান্ত বুদ্ধিজীবীর Intellectual Pleasure বা খেলো সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক প্রসাধন বলতে দ্বিধা বোধ করি নে। এবং তখন এও বলতে বাধ্য হ'তে হয় যে, এই ভগ্নপ্রায় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কৃত্রিম আবহাওয়া ও মৃত-প্রায় বুর্জ্জোয়া সভ্যতার শ্মশানে পূতিগন্ধময় মৃতদেহকে ফুল দিয়ে ঢেকে রাখবার বৃথা প্রয়াস এ সব শিল্পী ও সাহিত্যিক-গণ করছেন।

বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃত বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গেছেন,

> —হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ঙ্করী! দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
> তুলেছে কুটীল ফণা চক্ষের নিমিষে
> গুপ্ত বিষ-দন্ত তা'র ভার তীব্র বিষে।—শতাব্দীর সূর্য্যাস্ত

সভ্যতা যেমন বহুস্তর অতিক্রম ক'রে বর্ত্তমান সাম্রাজ্য-তন্ত্রে পদার্পণ করেছে, তেমনি সাহিত্য ওরিয়েণ্টাল ও ক্লাসিক্যাল স্তর অতিক্রম করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, রোমাণ্টিক স্তরে পড়েছে। আজ সেই রোমাণ্টিক স্তরও ভগ্ন প্রায়। সাহিত্য আজ ঐ তিন স্তরকে অতিক্রম করে,

এক নূতন পথে, নূতন সুরে পরিণত হ'তে চলেছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের আবর্ত্তে দিশেহারা সাহিত্যিকগণ, যেমন টি, এস, এলিয়ট ; এজরা পাউণ্ড, প্রভৃতি প্রগতি বিরোধী সাহিত্যিকগণ ও কবিগণ আজ দিশেহারা হয়ে উঠেছে। এঁদের কণ্ঠে একমাত্র নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে, কোনরূপ দৃপ্ত গান নেই, উৎসাহ নেই, মানবজীবনের জন্য কোন নূতন জীবন যাত্রা প্রণালীর কোন সঙ্কেত নেই, ওঁরা শুধু নৈরাশ্যের মধ্যে দিশেহারা হ'য়ে একমাত্র মৃত্যুর অন্ধকার রূপ দেখছেন। ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস্ তিনিও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার একনিষ্ঠ ভক্তরূপে হতাশ হ'য়ে, The new world order-এ নিরবুদ্ধিতার চরম পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অন্য রূপ দেখতে পাচ্ছি। সোভিয়েট রুশিয়ায় এখন আর জার-তন্ত্র নেই, তথায় জনগণের সম্মুখে সমাজতন্ত্রবাদ দৃঢ়ভিত্তিতে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের নিকট আজ জীবনের অর্থ নবভাবে দেখা দিয়েছে। জীবন সেখানে আর বেদনাময় হতাশ ও নৈরাশ্যের ভ্রূকুটীতে বিষাক্ত হয়ে উঠছে না। সেখানকার জীবন আজ সুন্দর ও স্বাস্থ্যময় এবং বেগবতী নদীর মত নৃত্য চটুল গতিতে ছুটে চলেছে। সাহিত্য সেখানে শুধু মাত্র নিষ্ফল-মনোরাজ্যের বস্তু নয়, শুধু মাত্র চাতুর্য্য পরিপূর্ণ শব্দের ঝঙ্কার বা অর্থহীন বিকৃত কুৎসিত ও অলঙ্কারিক বাক্য সমষ্টি নয়। বর্ত্তমান সোভিয়েট সাহিত্যে ও শিল্পে জীবনকে ও জনগণকে অস্বীকার করে না। বরং জনগণের জন্যই যে সাহিত্য ও শিল্প তা জোড়গলায় বলা হচ্ছে। বিগত রুশ বিপ্লব যেমন জাতির দেহ হ'তে লৌহ নিগর খুলে দিয়েছে, তেমনি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রচুর মহান্ সম্ভাবনা ও স্বর্ণময় ছবি জাগিয়ে ধরেছে। তাই বিগত সোভিয়েট লেখকদের বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনে একদা ম্যাক্সিম গোর্কী বলেছিলেন, "We must grasp the fact, that it is the toil of the masses which forms the fundamental organizers of culture, and the creator of all ideas.…" সোভিয়েট সাহিত্য ব্যক্তিগতজীবনের ভাব বিলাসিতায় রচিত সাহিত্যিক, সমগ্র জাতির ও জনগণের প্রকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবিতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্ত্তমান সোভিয়েট সাত্যিকগণের কথা বলতে গেলে, প্রথমেই মনে জাগে ম্যাক্সিম গোর্কীর কথা। সেই ১৯০৫ সালে প্রথম রুশ বিপ্লবের সূত্রপাত। সেই নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নেও সাহিত্য নষ্ট হয় নি। ম্যাক্সিম গোর্কী এক চর্ম্মকার পুত্র, তিনি চিরজীবন বেদনা ও দুঃখের সাগরে সাঁতার দিয়েছেন, তিনি চিরদিন অজস্র দুঃখ, কষ্টের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে, একে একে যুগান্তরকারী পুস্তকগুলি লিখে ফেলতে লাগলেন। রুশিয়ার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর কথা-সাহিত্যিকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কী, তিনি সিংহগর্জ্জনে সমস্ত অবসাদ কুসংস্কার প্রভৃতিকে তলিয়ে দিয়ে, রুশিয়ার সুচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করলেন। তাঁর রচিত, দি মাদার, ফোমা গাডেইয়েভ, লোয়ার ডেপথস্ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি চিরকালের মত অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। ম্যাক্সিম গোর্কী শুধু মাত্র সাহিত্য নিয়েই থাকেন নি, তিনি রাজনীতির সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বারবার নির্ব্বাসন ও কারাগারে পাঠিয়েও, তাঁর সাহিত্য-সৃজনীর প্রমত্ত গতিবেগ জার-গভর্ণমেণ্ট নষ্ট করতে পারে নি। নানা দুঃখ ও বিপর্যায়ের মাঝেও তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি। সর্ব্বসাধারণের জন্য, শ্রমিক কৃষকের জন্য, জনগণের জন্য তিনি আজীবন সক্রিয় ভাবে যুদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে' তাঁর অক্লান্ত সমাজ সেবা প্রতিদিন নব নব রূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

"Proletarian literature will be a literature of labour fighting for emancipation…It will be a literature of struggle against Fascist obscurantism and mysticism." এই মহান্ ব্রত ম্যাক্সিম গোর্কীর ছিল। প্রায় সকল দেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর এই অভিমত যে, রসোত্তীর্ণ না হ'লে, সাহিত্যকে সাহিত্য পদবাচ্য বলা যায় না। কিন্তু রসোত্তীর্ণ বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা আমার কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু রসোত্তীর্ণ অর্থে যাই হোক্ না কেন সাহিত্যে জীবনীশক্তি আছে কি না তাই প্রথম বিবেচ্য হওয়া দরকার। শিল্প ও সাহিত্যে, জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ সহায়তা করছে, তার পরিবেশ। মানুষের পরিবেশকে সব সময় আবার মানুষের জীবনযাত্রা ও তার উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত করছে। যার ফলে, শ্রেণীর উৎপত্তি, ও যার পরিণাম শ্রেণী সংগ্রাম। আমি

মনে করি, সাহিত্যের ভিতর প্রচুর জীবনীশক্তি থাকা প্রয়োজন। সাহিত্য শুধু মাত্র বর্ত্তমান মানবগণকেই পথ নির্দ্দেশ করবে না, বরং সাহিত্য মানবগণকে তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মুক্তময় জীবনের অগ্রগতির নির্দ্দেশ দান করবে। এই নব সংস্কৃতি ও নব সৃষ্টির মূলে যে পরিবেশ ও তার অনুকূলে চাই নব শৃঙ্খলামুক্ত সভ্যতা ও শ্রেণীহীন সমাজ। কারণ মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে, শৃঙ্খলাযুক্ত থাকে ও দৈনন্দিন জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য দিবারাত্র সংগ্রাম করতে থাকে, তাতে নব-সৃষ্টি, নব-সংস্কৃতি তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। শৃঙ্খলাযুক্ত পরাধীন মানবের চিন্তা-ধারা, মানবের পরিবেশের উপযুক্তই প্রকাশ পায়। কারণ মানবের চিন্তা-ধারা হচ্ছে Active historical agent.

লেনিন বলতেন ও বিশ্বাস করতেন যে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, ছিন্নবস্ত্রে শরীর ঢেকে কদর্য্য জীবনযাত্রা যারা নির্ব্বাহ করে, সেই সমাজের লোকদের দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। তা সে সাহিত্যই হোক্ বা যে কোন আর্টই হোক্। যতদিন পর্য্যন্ত সমগ্র জনসাধারণ শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক অবস্থায় সাম্য ও শ্রেণীহীন সামাজিক জীবন যাপন না করতে পারছে, ততদিন নব-সংস্কৃতি ও সাহিত্য এবং নব আর্ট সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ শ্রেণী দ্বারা শোষণের ফলে, পরাধীনতার মধ্যে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের ভিতর অনাহারে ও কদর্য্যজীবন যাত্রার মধ্যে চিন্তারাশি বিমুক্ত হ'তে পারে না। ঐ অবস্থায় যে কোন সাহিত্য গড়ে উঠবে, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। ঐ অবস্থায় সাহিত্যকে বলব শোষকশ্রেণীর ও এক বুদ্ধিমান শ্রেণীর ভাববিলাসের খোরাকী সাহিত্য। অর্থাৎ উপরোক্ত শ্রেণী শোষণের শাসনের আওতায় যে সাহিত্য ও শিল্প বা যে কোন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তার রস উপভোগ করবে স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি, তদ্দ্বারা সমূহের কোন কল্যাণকর সাহিত্য মোটেই সৃষ্টি হবে না। কারণ, যে পরিবেশের ভিতর ও মানসিক অবস্থা নিয়ে যে-সব সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, তার ভিতর তৎকালীন শ্রেণীশাসনের জয় গানই বেজে উঠবে, অথবা এজরা পাউণ্ড, বা এলিয়ট এঁদের মত নৈরাশজনিত একমাত্র মৃত্যুর গান বা শোকাবহ সুরই সে সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হ'বে।

এখন আমি সংক্ষেপে রুশ-সাহিত্য ও রুশ-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করব। রুশ-সাহিত্য ও রুশিয়ার সাহিত্য প্রতিভা খুব হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় নি অথবা এ আকস্মিক নয়। রুশদেশের বিরাট প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সাহিত্য-প্রতিভায় জগৎ মুগ্ধ হয়েছে, রস উপভোগ করেছে ও বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। রুশিয়ার পুশকিন, গোগল, টুর্গেনিভ, ডাষ্টেয়ভস্কি, শেখব, কুপ্রিন, গোর্কী, টলষ্টয় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ ছাড়াও আরও বহু কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চেখভের সমসাময়িক গারসিন, করলেনকো, মেরাজাভোস্কি প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ ও রুশ দেশত্যাগী কুপ্রিনের সমসাময়িক প্রোকোফিয়েভ ও কিরস্কি প্রভৃতিকে বাদ দেওয়া চলে না; আর প্রোকোফিয়েভ হচ্ছেন পশ্চিমা সঙ্গীতের একজন দিকপাল বিশেষ।

গত উনবিংশ শতাব্দী হ'তে আজ পর্য্যন্ত যত সাহিত্যিক রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তা ইংলণ্ডের চাইতে বেশী। রুশ-সাহিত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে তার সজীবতা, গতি ও প্রাণ। সেই সজীবতা ও গতি পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আর একটা জিনিষ আমার মনে হয়, তা এই যে, রুশিয়া প্রতীচ্যের দেশ হওয়া সত্ত্বেও, প্রাচ্যের সঙ্গে, বিশেষ ভাবে, বাঙ্গালার সঙ্গে উহার যেন বহু অংশে মিল দেখতে পাওয়া যায়।

টুর্গেনিভ ও পুশকিনের পর হ'তে, গোর্কী পর্য্যন্ত আমরা তাঁদের সৃষ্ট-সাহিত্য প্রভৃতির সহিত বিশেষ পরিচিত।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর হ'তে, সমগ্র রুশিয়ায় বিদ্যুতের মত জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প ছড়িয়ে প'রল। শিল্প ও সাহিত্য নব ভাবে জনগণের মধ্যে মর্য্যাদা লাভ করল। নূতন আকারে, নূতন ভাবধারার মধ্যে সাহিত্য এবং শিল্প ফুটে উঠলো। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের বিরাট দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করলো। সাহিত্য ও শিল্প জনগণের কল্যাণের জন্য আদর্শের জন্য স্বীকৃত ও অধিকার অঙ্গীকৃত হ'ল। ১৯১৭ সালকে আমি রেনেসাস বলব পুশকিন, টুর্গেনিভ হ'তে যে সাহিত্য ও শিল্প তিল তিল করে জমে আসছিল তা গোর্কী পর্য্যন্ত এসে এক যুগান্তর উপস্থিত হ'ল। তারপর গোর্কীর সময় হ'তে সোভিয়েট

হিত্য ও শিল্পকলা, চারুকলা, সিনেমা, থিয়েটার, অন্যান্য র্ট, এক নবরূপে যুগান্তরের স্বপ্ন নিয়ে, নূতন প্রেরণার ফলে তীক্ষ্ণ হয়ে বিকশিত হ'ল। বিগত ১৯৩৫ সালে ধারিণ সর্ব্বরুশীয় লেখক সঙ্ঘের অধিবেশনে সাহিত্যের পর এক দীর্ঘ এবং উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ই সভায় পনের শত লেখক যোগদান করেছিলেন। তাঁর কৃতায় সাহিত্য সম্বন্ধে ও মার্ক্সিষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশদ ালোচনা ও সমালোচনা হয়েছিল।

বিগত ১৯২৬ সালে রুশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে চরম, এবং র্ত্তমান ১৯৪২ সালের ইতিহাস আরও দুরূহ ও তীক্ষ্ণ এবং রমতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। বিগত ১৯১৫ সাল সমগ্র রুশিয়ায় গৃহযুদ্ধ, অন্নসমস্যা, দুঃখ দুর্দ্দশা ও সমগ্র পৃথিবীর নাশক্তি দ্বারা আক্রান্ত অবস্থার এক দুর্দ্দৈব দিনের তিহাস! সেই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে Bulgakov লখেছেন, Days of Turbines, আর Pudovkir এর The fall of St. Petersburg এবং Einstein এর Potemkin প্রভৃতি ঐ ইতিহাসকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঐ সময় Nep এর শেষ যুগ। সেই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎপাদনের বিধি ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য স্বীকৃত হওয়ার দরুণ নানা অরাজকতা, অদূরদর্শীতার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার সাহিত্য হচ্ছে, Moon on the right, Dog haze, Squaring the circle, The pew table of commandments প্রভৃতি। তারপর এল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সমাজব্যবস্থা নূতন ভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। লোকের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাচিত ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলো। কৃষি সমবায়ে, যন্ত্রযুগে, শিল্পে, সাহিত্যে এক নবরূপ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্য ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ কাজ দেশ দেশান্তরে প্রচারের জন্য তৈরী হ'ল Rapp অথবা Proletarian Writer's society. এই Rapp রুশিয়ার জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এনে ফেললো। এই সঙ্ঘ হতে কৃষক মজুরদের জন্য, তাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ও তাহাদের প্রকৃত সাহিত্য রসিক করবার জন্য অজস্র গল্প, কবিতা প্রভৃতি ও নূতন পুস্তকাদি বের হ'তে লাগলো। অবশ্য পরে, এই Rapp'কে নানা কারণের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ভেঙ্গে দেন।

বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য যা গড়ে উঠেছে, তা অপূর্ব্ব ও যুগান্তরকারী। গ্লাডকভ, ইভানভ, পাভলেঙ্কোর, আফিনোজে-নেইভ, ওস্ট্রভস্কি, পাষ্টের নাক, শলোকভ, এরেনবুর্গ, বাবেল, পোগোডিন, মেকিটেঙ্কো, শিরভান ঝাডে, আকোপিয়ানের প্রভৃতির নাম আজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে প'রেছে।

রুশিয়ার এশিয়া অধিকৃত সোভিয়েট রাজ্য, জারের আমলে যে সব দেশের লোক বর্ণমালার কোনই জ্ঞান রাখত না, আজ সেই সব দেশেও বড় বড় লেখক, বড় বড় কবি জন্মেছে। উজবেখাস্তিথানের কবি আবদুল্লা কাদিয়া, কিরগীজ স্থানের কবি আলি টোকোম্বাএভ, ইরাণী কবি লাথুটী, জর্জ্জিয়ার লেখক চিকোভানি ও ডাডিআনি আজ আর অখ্যাত নয়।

সর্ব্বসাধারণ আজ কি ভাবে সাহিত্য-রসিক হয়েছে তা নিম্নলিখিত হারে পুস্তক বিক্রীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়।

গোর্কীর পুস্তক বৎসরে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়, শলোকভের পুস্তক বৎসরে ৬ লক্ষ বিক্রয় হয়, টলষ্টয়ের পুশকিন, গোটে, সেক্সপীয়ার, স্কট, ডিকেন্স, বালজাক, ফ্লোবেয়ার, মোঁপাসা প্রভৃতির পুস্তক বিক্রয় সংখ্যা বিস্ময়কর। পুশকিনের পুস্তক বিগত ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত, মাত্র এক বৎসরে ১,৭৫,০০,০০০ কপি বিক্রয় হয়। ফয়কটবাঙোরের উপন্যাসের চাহিদা একবার এক লক্ষের উপর হয়। এ ছাড়া, সমগ্র রুশিয়ায় ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের চাহিদা খুবই বেশী।

সমগ্র রুশিয়ায় আজ লাইব্রেরী অজস্র ভাবে গড়ে উঠেছে। গত ১৯৩৬ সালে রুশিয়ায় লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল ১৩৫৮৪৭, উহার মধ্যে ১৫ হাজার লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও বেশী। এই কয় বৎসরে রুশিয়ার সাহিত্য যেরূপ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারণ বিগত রুশ বিপ্লবের পর, প্রায় চল্লিশটী ভাষা প্রথম ছাপাখানায় তাদের মুদ্রিত চেহারা দেখতে পেলো। এখানে বিশদ ভাবে রুশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতি বা লাইব্রেরী সংক্রান্ত ব্যাপার বা রুশিয়ার শিক্ষায়তন সম্বন্ধে বলা হয়ে উঠবে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রুশিয়ার

চিঠিতে যা লিখেছেন তাতে রুশিয়ার শিক্ষা-বিধি সম্বন্ধে বহু কিছু জানতে পারা যায়।

আমি আমার পূর্ব্বের আলোচনায় ফিরে আসি। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করা গেলে দেখা যায়, সাহিত্য নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। এক সময়ে সাহিত্য নানারূপ কথার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তারপর তার প্রকাশ দেখা গেল রোমান্ সাহিত্য ও এলিজাবেথিয়ান্ সাহিত্যের নানা অসম্ভব অভাবনীয়তার ভেতর। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে, সম্ভাবনীয় ঘটনার মধ্যে, সাহিত্যের গতি ও রূপ পরিবর্ত্তিত হ'ল। একসময় সাহিত্য তাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য ব'লে পরিগণিত হ'ত। যার উৎপত্তি ও লয় হ'ত অবাঙমনসোগোচরের মধ্যে, সেই স্পর্শাতীত, অদৃশ্য ও কল্পনাতীত ঈশ্বরের স্তব স্তুতিই ছিল উৎকৃষ্ট সাহিত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্য প্রকাশ পাচ্ছে অনিবার্য্য বাস্তব ঘটনার রূপের মধ্যে ও সমাজ ও সংসারের প্রকৃত রূপের ভিতর হ'তে। ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগা বর্ত্তমান সাহিত্যের বিন্দুমাত্র বিষয় নয়। Subjective truth গৌণ, মুখ্য হচ্ছে Objective truth.

যে সংগ্রামশীল মানবজাতি আজ অধঃপতিত, যে দুঃস্থ, অনাহারী মানবগোষ্ঠী নানা বিষয়ে শোষিত হচ্ছে সেই মানবমনের ও মানবজাতির কল্যাণকর বিষয় বস্তু যা, তাই বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যের পটভূমিতে কাজ করছে। The aim of their tendency is to liberate the toilers, to free all mankind from the yoke of capitalist slavery." ইহাই রুশ-সাহিত্যের আদর্শ। নেপথ্যচারী কোন অবাঙমনসোগোচর বস্তুর বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যে স্থান নেই; বা কোন শ্রেণী* বিশেষের সুখ দুঃখের কথা, বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্যে স্থান নেই। কারণ রুশ-সাহিত্যের উৎস হচ্ছে মানবতার বেদী মূল।

রুশ-সাহিত্যিকগণ আজ পর্য্যন্ত যে সব চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন এবং সূক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টি দ্বারা যে সব চরিত্রগুলি নানা বিপর্য্যয়মূলক, দ্বন্দ্বমূলক ও সংগ্রামমুখর জীবনের রেখা ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব্ব ও অসামান্য। সেই সব চরিত্রের ভিতর সুন্দরতম জীবনের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় অপরূপ শিল্প-চাতুর্য্যও প্রকাশ পাচ্ছে; সেই সব চরিত্রে যে সঙ্গীত-ঝঙ্কার উঠছে তদ্বারা সমগ্র মানবসমাজ কল্যাণকর হ'য়ে উঠেছে। শুধু মাত্র বর্ত্তমানের মানবসমাজ নয়, অনাগত ভবিষ্যতের স্ফুটন্মোখ জীবনগুলি পর্য্যন্ত যে সুন্দরতর হ'বে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও উপদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইহাই রুশ-সাহিত্যিকগণের অপরিসীম কৃতিত্ব। কারণ রুশদেশের শিল্প হয়েছে মানবের ও এর কাব্য হয়েছে জীবনের। যেথানে অর্থনৈতিক পরাধীনতা নেই, কোন বিশেষ শ্রেণী কর্ত্তৃক শোষণ ব্যবস্থা নেই, তাই রুশ-সাহিত্য পরিপূর্ণ সাহিত্য, প্রকৃত সাহিত্য, জীবনের সুন্দরতম সাহিত্য ও সঙ্গীত। বারান্তরে সোভিয়েট সাহিত্যের বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।*

---

*এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি। (১) সোভিয়েট দেশ (২) Russian Literature, Ideals and Realities.

মনের বাঘ

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস

যে শ্বাস ফেলি তাকে বলি নিঃশ্বাস, যে শ্বাস টানি তাকে বলি প্রশ্বাস। জিবের যেখানে শেষ, পূর্ব্বে দেখেছি, সেখানে আছে দুটো নলের মুখ। সামনেরটা Larynx, পেছনেরটা Pharynx—শ্বাসনালী ও অন্ননালী। অন্ননালীতে ঢুকে তার শেষ আমরা দেখে এসেছি, এবার দেখি—শ্বাসনালীতে ঢুকে তার ব্যাপারটা কি! Medium তো আমাদের ঠিকই আছে মুখ-গহ্বরের মত নাকের গহ্বর দুটীও তার উপযুক্তই! কাজেই ঢুকতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হ'ল না। প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে গিয়ে গিয়ে একেবারে Larynx বা শ্বাসনালীর মুখের কাছে উপস্থিত,—এখানেও আবার সেই অন্ধকার, টর্চ্চ জেলে দেখি ছোট্ট একটী দোর,—তাতে আবার একদিকে আটকান ছোট্ট একটী কপাট—দোরটীর নাম Glottis (গ্লটিস্), কপাটটীর নাম Epiglottis (এপিগ্লটিস)। কপাটের গায়ে বায়ু গিয়ে ধাক্কামারতেই সসম্ভ্রমে সে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াল;—হুস্ হুস্ ক'রে বায়ু চল্ল নলমুখ বেয়ে ভিতরের দিকে,—আমরাও চল্লুম—অবশ্য বহু সাধ্য সাধনায় প্রবেশপত্র সংগ্রহ ক'রে,—কেন না বায়ু ভিন্ন যে কারো পক্ষে ঐ পথে প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। যাই হোক, চলেছি আর অনুভব কচ্ছি—যেন ভেতর থেকে কামারের হাঁপরের মত একটা বা দুটো Pumping Machine আমাদের টেনে নিচ্ছে।

Pharynx বা অন্ননালীর পথটা যত দীর্ঘ এ-পথটা তত নয়, তা হ'লেও অন্ননালীরও যেমন খানিকটা ক'রে যেতেই একটা ক'রে নূতন নাম—এরও তাই। আগেই বলেছি—Larynx-এর মুখে যে ছোট্ট ছিদ্রটী দিয়ে আমরা ঢুকলুম তার নাম Glottis (গ্লটিস্)। তারপর নলের যে অংশটা বেয়ে সোজা একটানা বুকের মাঝামাঝি অবধি নেমে গেলুম তার নাম Trachea (ট্র্যাকিয়া) বা Windpipe (উইণ্ড-পাইপ)। এখানে এসে হ'লো এক মুস্কিল—দেখি নলটা দু'শাখায় ভাগ হ'য়ে, একটা শাখা ডাইনে, আর একটা বাঁয়ে চ'লে গেছে—এখন কোন্ দিকে যাই। ভাবলুম দু'জন দু'দিকে যাব। সঙ্গী রাজী নয়—ভয় পায়, বলে অন্ধকারে অচেনা পথে একলা গিয়ে শেষে হয় বিপ্লবীদের ঢিলে, নয় তো Sergeant-এর গুলীতে মারা যাব! যা হোক অনেক ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এক পথে তাকে পাঠিয়ে একপথে নিজে গেলুম। এই যে শাখা দুটো—এই দুটোরি নাম—Bronchi (ব্রঙ্কাই) বা Windtubes (উইণ্ড-টিউবস্)। এই দু'শাখায় বায়ুরাও দু'ভাগ হ'য়ে দু'পথে চল্ল, আমরাও চল্লুম তাই। নেবে নেবে গিয়ে দেখি—শাখা দুটো ক্রমে ছোট, আরো ছোট, আরো ছোট—শেষে বহু ডালপালায় ভাগ হ'য়ে দু'ধারে দুটো Lungs বা ফুসফুসে গিয়ে ঢুকেচে! আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি এই দুটো হাউস হাউস্ ক'রে অনবরত একবার ফুলে উঠছে একবার চিপসে যাচ্ছে! বুঝলুম এই দুটোই সেই Pumping Machine, এরাই আমাদের অমন ক'রে টানছিল।

আপনার নাকের ছিদ্রের ভিতর দেখেছেন কি রকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুল, এ-চুল শুধু নাকেই নয়, এই রকমের সূক্ষ্ম মাংস কেশ সারা Trachia, Bronchi, এবং তার সমস্ত শাখা প্রশাখা ছেয়ে আছে! ডাক্তারী কথায় এদের বলে Cilia (সিলিয়া)। প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে ধুলো ময়লা যা কিছু আসুক না কেন এদের কাজ সে-গুলোকে উপরের অর্থাৎ বাইরের দিকে ঠেলে বের ক'রে দেওয়া। শুধু তাই নয়—আপনার বা আপনার দুগ্ধপোষ্য শিশুর Bronchi বা তার শাখা প্রশাখায় যখন সর্দ্দি জ'মে কষ্ট দিতে থাকে, ডাক্তারেরা বলেন Bronchitis হয়েছে,—তখন এই জমাট বাঁধা সর্দ্দিগুলোকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে Larynx-এর মুখের কাছে এনে দেয়, যাতে ক'রে আপনি হক্ ক'রে ফেলে দিতে পারেন; আপনার বাচ্চা ও গিলে ফেলে—অন্ননালীর পথে চালিয়ে দিতে পারে, যাতে বাহ্যের সঙ্গে ওগুলো বেরিয়ে যায়। এ-কাজ এ-মহোপকার কারা ক'রে জানেন কি? ঐ Ciliaরা! ওষুধ অবশ্য সর্দ্দিটাকে নরম ক'রে দিতে সাহায্য

করে, ওষুধ তো আর ধাক্কামেরে ও-গুলোকে উপরে তুলে দিতে পারে না, সে কাজ ক'রে ঐ মালিন্যাসহিষ্ণু Ciliaরাই !

কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা ! বিস্ময় বোধ হয় না কি ? এই অপূর্ব্ব কলা কৌশলের মধ্যে কোন এককুশ হস্তের নিপুণ কারিগরি প্রত্যক্ষবৎ সুস্পষ্ট অনুভূতি হয় না কি ?

যাক্—সূক্ষ্মতম Bronchiatubes পার হ'য়ে হাওয়াদের সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে গিয়ে শেষে দুই Lungs বা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ কল্লুম !

শরীরের চর্ব্বির স্তরে যেমন দেখেছি, সমস্ত শরীরটাকে বেপে আছে Fat cell's বা চর্ব্বির কোষ। এই ফুস্‌ফুস্ দুটো তেম্নি আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে কোটী কোটী Air cells (এয়ার সেল্‌স) বা বায়ুকোষ ! আমাদের সহযাত্রী বায়ুরা এই সেল বা কোষগুলোর মধ্যে নিজেদের ঘর-বাড়ীর মতো বাসা নিতে লাগলো, আমাদের জন্তে কোন ঘর আর অবশিষ্ট রইল না, অগত্যা সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হ'ল। ইতিমধ্যে সঙ্গীর চীৎকার শুনে চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস কল্লুম—"কি হ'ল ?" বল্লে—"কি হ'ল দেখুন না চেয়ে !' সত্যি আমার খেয়াল ছিল না—চেয়ে দেখি সঙ্গীর এবং আমার নিজেরও বটে—কাপড় চোপড় সমেত সমস্তটা শরীর কালো রক্তে কালিপানা হয়ে গেছে ! বল্লে—"এ কি হ'ল ?" বল্লুম—"এই তো হবে।" যে-দেশের যে-প্রথা। সেই মনে নেই—ডিওডেনামে ঢুকে নীল সবুজ রং মেখে কি রকম ভূত হ'তে হ'য়েছিল। "হাঁা, সে তো হ'য়েছিল পিত্তি এবং প্যানক্রিয়ার রসেদের জন্তে কিন্তু এ কি ? রক্ত চলাচলের যন্ত্র Heart (হার্ট) বা হৃদ-যন্ত্র। রক্তের দেখা পাব সেখানে গিয়ে—এখানে ওরা এল কোত্থেকে এবং কেন ?" "রক্ত চলাচলের যন্ত্র Heart বটে ; কিন্তু ফুস্‌ফুস দু'টোকেও তুমি আর একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশ ব'লে ধ'রে নিতে পারো —কেন না Heart-ই সারাদেহে রক্ত সরবরাহ ক'রে তাকে সতেজ-সবল-সুস্থ রাখে বটে, কিন্তু সে রক্তটাকে মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন নির্ম্মল ক'রে না দিলে, সে অপরিচ্ছন্ন মলিন রক্তে দেহ সতেজ সুস্থ হওয়া দূরে থাক্, বরং নিস্তেজ অসুস্থ হয়েই পড়ে। কাজেই মাজা ঘষা চাই—এ-মাজা ঘষার কাজ করে ফুস্‌ফুস্ তার বায়ু-কোষের বায়ুর সাহায্যে ! সুতরাং সারাদেহে রক্তটাকে চালিয়ে দেবার আগে Heartকে একবার রক্তদের ফুস্‌ফুসের কাছে পাঠিয়ে দিতেই হয়। এই যে কাল্‌চেরক্ত এসে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ ও আমরা রক্তের কালিতে নেয়ে উঠলুম—এ সেই Heart-এরই কাজ।

এই সব কথা হচ্ছে—এরি ভেতর চেয়ে দেখি—যে ফুসফুস এবং আমরা কালিঝুলি মাথা ভূত ছিলুম, দেখতে দেখতে লাল টকটকে হ'য়ে গেলুম। কাল রক্ত যারা এক পথ দিয়ে এসেছিল, লাল টকটকে হয়ে অন্য পথ দিয়ে তারা বেরিয়ে চল্‌ল !

সঙ্গী বল্লে, চলুন ফিরে যাই, বড্ড বিশ্রি একটা গন্ধ ছাড়্‌ছে ?

আর থাকা যাচ্ছে না ! বুঝলুম রক্তের মলিন অংশ থেকে carbonic acid নামে যে দুর্গন্ধ গ্যাস নির্গত হচ্ছে তারি গন্ধের কথা সঙ্গী বলছে। নিঃশ্বাস বাতাসের সঙ্গে এই বদ গ্যাসই বেরিয়ে আসে, বায়ু চলাচলশূন্য ঘরে এরি গন্ধ পীড়ার কারণ হয়। বল্লুম, হ্যাঁ চল—শুধু বদ গন্ধই নয় এটা একটা বিষও বটে, এর ভেতর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদও নয়। কি ভাবে অর্থাৎ কি রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বিষটা বেরোয় দেখ :—

এই যে প্রশ্বাস-বায়ু, যার সঙ্গে ফুসফুসে এসে আমরা ঢুকেছি—ঢোকবার সময় প্রতি একশ ভাগে এর পরিমাণ ছিল এই রকম :—

Oxygen (অক্‌সিজেন)	২১	ভাগ
Nitrogen (নাইট্রোজেন)	$\frac{৭৯}{১০০}$	ভাগ

নিঃশ্বাস-বায়ু হ'য়ে এটা তখন বেরিয়ে চল্ল—এখন এর পরিমাণ এই রকম :—

Oxygen	১৬	ভাগ
Nitrogen	৭৯	ভাগ
Carbonic Acid	৫	ভাগ

এটাই দুর্গন্ধ বিষয়।

তা হ'লেই দেখ নিজের পাঁচ ভাগ প্রাণদ oxygen গ্যাস রক্তকে দিয়ে, বিনিময়ে রক্তের পাঁচ ভাগ মারণ গ্যাস carbonic acid টেনে নিয়ে, রক্তকে ক'রে দিয়ে—নিষ্কলঙ্ক লোহিতবর্ণ, বলদ, প্রাণদ, পুষ্টিদ,—নিজেকে ক'রে নিয়ে

দুর্গন্ধ, মলিন, মৃত্যুপ্রদ জগৎ-প্রাণ এই প্রশ্বাস-বায়ু এখন নিঃশ্বাস বায়ু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—চল আমরাও—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি—
দেহ মন প্রাণ সকলি দাও—
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

জীবনে এই যার motto, 'সেই মহাত্মা বায়ুর সঙ্গই নি'। দেখি মহতের সঙ্গে এই পরোপকার মহাব্রতের কণামাত্র শিখতে পেয়েও যদি ধন্য হতে পাই—

এই হ'ল প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা—সম্পদে যাঁর সঙ্গ নিয়েছিলাম, আজ তাঁর বিপদে তাঁকে ত্যাগ করে কৃতঘ্ন নরাধম কেমন ক'রে হব ?

সঙ্গী বল্লে, "ঠিক !" অতএব তাই হলো নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বে যে পথ ধরে ঢুকেছিলাম—সেই পথ বেয়ে আবার আমরা বেরিয়ে আসতে লাগলাম ; আসতে আসতে বল্লাম, এবার নিশ্চয় বুঝেছ—বিশুদ্ধ বায়ুর কেন এত দরকার ! কেন মানুষ pure airএর জন্য এত পাগল ! Seasonএ কেন পুরী, দার্জ্জিলিং, শিমলা, শিমুলতলা, দেওঘরে লোকের এত ভীড় ?

বায়ু বিশুদ্ধ না হ'লে প্রতি ১০০ ভাগে ২১ ভাগ oxygen থাকে না, উপরন্তু তাতে নানা বদ গ্যাস মিশ্রিত থাকে, কাজেই রক্ত পাঁচ ভাগ oxygen নিতে ঠিক পারে না—নিজের পাঁচ ভাগ carbonic acidও বার ক'রে দিয়ে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নও হ'তে পারে না, মলিন কৃষ্ণবর্ণ দূষিত রক্তে ক্রমে শরীর আচ্ছন্ন হ'তে থাকে—শরীর দিনে দিনে শীর্ণ, মলিন, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। খাদ্য, পানীয় এবং নির্ম্মল বায়ু শরীর রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই তিনটি জিনিষের মধ্যে খাদ্য অপেক্ষা পানীয়ের প্রয়োজন অধিক,—বায়ুর প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বিগতবর্ষ ১৯১৪-১৮ খ্রীঃ অব্দের মহাযুদ্ধে আমাদের একটী বন্ধু ডাক্তার war service নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম—আহতের সংখ্যা যখন বড্ড বেশী হ'য়ে পড়ল, হস্‌পিটালে আর স্থান সঙ্কুলান হল না, প্রথমে গীর্জ্জায় শেষে সস্ত সস্ত তাঁবু ফেলে এবং চালা তুলে তাদের জন্য জায়গা করতে হলো। অবশ্য এই সব খোলা তাঁবু এবং চালার হতভাগ্য রোগীদের জন্য ডাক্তার এবং নার্সেরা সকলেই শঙ্কা বোধ কর্ত্তে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ! ক্রমে দেখা গেল—খোলা হাওয়ার গুণে হস্‌পিটাল বিল্ডিং এবং গীর্জ্জায় রোগীদের অপেক্ষা, এই সব রোগীরাই আগে আগে সেরে উঠতে লাগলেন। যাক, প্রশ্বাসের সঙ্গে যতটা বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সদ্যঃ সদ্যঃ সবটাই বেরিয়ে আসে না, খানিকটা তখনকার মত ফুসফুসের বায়ুকোষে থেকে যায়। এই বায়ুকে বলে stationary বা residual air (রেসিডিউয়াল এয়ার)। প্রত্যেক মানুষের ফুসফুসে ২৩০ কিউবিক্ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু নিয়তই থাকা দরকার। প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে টাট্‌কা বায়ু যেমন ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে থাকে, এই পুরাতন stationary বায়ুরা তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ক্রমশঃ বেরিয়ে আসতে সুরু করে। প্রতি প্রশ্বাসে যতটা বায়ু আমরা টেনে নি' যদি ওজন করা যেতো—দেখা যেতো যে, তারা ২৬ কিউবিক্ ইঞ্চি পরিমাণের মত জায়গা দখল কচ্ছে, এদিকে দেখছি—প্রতি মিনিটে ১৬ থেকে ১৮ বারের মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমরা নি'। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে—stationary বা স্থায়ী বায়ুটাকে তাড়িয়ে দিতে আধ মিনিটের বেশী সময় ফুসফুসের লাগে না।

প্রবল জ্বর, নিউমোনিয়া কিম্বা heartএর পীড়ায় সাধারণতঃ দেখা যায় শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ১৬-১৮ ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। এর অর্থ এই, প্রকৃতি মাতা শীঘ্র শীঘ্র পুরাতন বায়ুটাকে দূর করে দিয়ে নূতন টাটকা বাতাস টেনে নিয়ে সমূহ বিপদ থেকে তাঁর ভীত বিপন্ন দুর্ব্বল স্নেহের সন্তানকে বাঁচাতে চান।

মাংসের দোকানে ঝুলন্ত পাঁঠার ফুসফুস আপনি দেখেছেন, মানুষের ফুসফুসও ঠিক ঐ রকমই। যথাযথ অবস্থায় ঐ ফুসফুস দু'টোকে ঘিরে একটা নরম পাতলা চামড়ার ব্যাগ থাকে—সেটার নাম pleura (প্লুরা)। শ্বাস যন্ত্র দুটোর বক্ষ-প্রাচীরের সঙ্গে ঘর্ষণ লেগে পাছে কোন ক্ষতি হয় এই জন্যে pleura সতত serum (সিরাম) বা রসে সিক্ত থেকে lubrication (লুব্রিকেসন) দিয়ে তাদের রক্ষা করে।

পূর্ব্বে যে bronchi ও bronchial tubeএর কথা বলেছি—তাতে সর্দ্দি জমলে ডাক্তারেরা বলেন bronchitis হয়েছে ! ফুসফুসের নিজের দেহে জমলে বলেন pneumonia (নিউমোনিয়া) হয়েছে, আর এই pleuraয় জমলে বলেন—pleurisy (প্লুরিসি) হয়েছে। [ক্রমশঃ

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনা প্রাণদায়িনী"

দশম বর্ষ } কার্ত্তিক—১৩৪৯ } ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

৺পূজার উদ্দেশ্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

শারদীয় দুর্গোৎসবের দিন আবার সমাগত। একদিন এই দুর্গোৎসব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দ দান করিত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আনন্দের স্থলে এক্ষণে দুশ্চিন্তা সর্ব্বত্র অধিকার লাভ করিয়াছে।

আমাদের মতে কিছুদিন আগে যাহা শারদীয় দুর্গোৎসবে পরিণত হইয়াছিল তাহা আরও সুদূর অতীতে 'শারদীয় দুর্গাপূজা' নামে অভিহিত ছিল। যদি ঐ শারদীয় দুর্গা-পূজা দুর্গোৎসবে পরিণত না হইত তাহা হইলে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটিত না। আমাদিগের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝিতে হইলে দুর্গা-পূজা ও দুর্গোৎসবের মধ্যে কি তফাৎ তাহা বুঝিতে হইবে।

৺পূজা সাধনার বিষয়, আর উৎসব উপভোগের বিষয়। সাধনায় সাত্ত্বিকতার উপলব্ধি হয়, আর উপভোগ-প্রবৃত্তিতে তামসিকতার অভিব্যক্তি হয়।

আমরা বলিতে চাই যে, মানুষ যদ্যপি ৺পূজাকে উৎসবে পরিণত হইতে না দিয়া সঠিকভাবে সাধনাকারে বজায় রাখিত তাহা হইলে ৺পূজার কয়টী দিনে উৎসবের অথবা অনুৎসবের কথাই আসিত না। ইহা ছাড়া যে দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি আজ মানুষকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে সঠিকভাবে ৺পূজা যদ্যপি বজায় থাকিত তাহা হইলে ঐ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি মানবসমাজে উদ্ভব হইতে পারিত না। অধুনা প্রত্যেক পূজাটী হয় কতকগুলি কু-সংস্কারগত উপাসনায়, নতুবা পুতুলের পূজায়, নতুবা পাথরের নুড়ির পূজায় পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ—মানুষ এক্ষণে "দেব", "দেবতা" এবং "দেবী" বলিতে কি বুঝায়, তাঁহাদের ৺পূজা বলিতে কি বুঝায় এবং ৺পূজার উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। মনুষ্য-সমাজকে ৺পূজার ব্যবস্থা, ৺পূজার মন্ত্র ও ৺পূজার নিয়ম সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন ভারতীয় ঋষি। তাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের বেদে, তাঁহাদিগের তন্ত্রে তাঁহাদিগের দর্শনে, তাঁহাদিগের মীমাংসায়, তাঁহাদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং তাঁহাদিগের স্মৃতি শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের প্রচারিত কোন পূজায় কোন হলাহলি অথবা মাতামাতি প্রকাশক কোন উৎসব নাই। উহাতে আছে কেবল তিনটী সাধনা। প্রথমতঃ নিজের শরীর, নিজের ইন্দ্রিয়, নিজের মন, নিজের বুদ্ধি এবং নিজের আত্মাকে সর্ব্বোচ্চ শক্তিতে সামর্থ্যযুক্ত করিবার সাধনা। দ্বিতীয়তঃ চরাচর যত কিছু জীব আছে, যতকিছু উদ্ভিদ্ আছে, যত কিছু খনিজ পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক কার্য্য উপলব্ধি করিবার সাধনা। তৃতীয়তঃ জগৎকারণের যে কার্য্যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর

উদ্ভব হইতেছে ও তাঁহাদের কার্য্য চলিতেছে এবং সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত বায়ু, তেজ ও রসের কার্য্য চলিতেছে তাহা বুঝিবার সাধনা।

ভারতীয় ঋষি ৬পূজার যে পদ্ধতি মনুষ্য-সমাজকে দান করিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে উহা বুঝিবার অধিকারী নহে। উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভাগ্য ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু বুদ্ধি ও কর্ম্ম-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ভারতীয় ঋষির ৬পূজার উদ্দেশ্য, ঐ পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম বুঝিতে হইলে যে বুদ্ধি ও কর্ম্ম-শক্তির প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ভারতীয় ঋষি তাঁহাদিগের মীমাংসা শাস্ত্রে অকাট্য যুক্তির দ্বারা মানুষকে বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের জ্ঞানের ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা সর্ব্বতোভাবে সাধন করা সম্ভবযোগ্য। জ্ঞানের ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের ঐ পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে উহা সম্ভবযোগ্য হয় না। কেন তাহা হয় না, তাহা ঋষিগণ দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগের বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্রে। জ্ঞানের ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হইলে জন্মাবধি কতকগুলি অসাধারণ সামর্থ্য লাভ করা একান্ত আবশ্যকীয়। কোন্ কোন্ শিশু ঐ অসাধারণ সামর্থ্য লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের শৈশব অবস্থাতেই স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে কিন্তু যাহারা ঐ স্বাভাবিক সামর্থ্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে নাই তাহাদিগকে ঐ সামর্থ্য প্রদান করা কাহারও পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না এবং তাহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয় না।

জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সামর্থ্যের যে বীজ লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় ঐ বীজ লাভ করিতে পারিলেই যে আপনা হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জিত হয়, তাহা নহে। স্বাভাবিক সামর্থ্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শিক্ষা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সামর্থ্যের যে বীজ লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, সেই বীজ লাভ করিয়াও যদি শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা ঐ বীজকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিস্ফুট না করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে শিক্ষা ও কঠোর সাধনা দ্বারা মানুষের আশৈশব অসাধারণ স্বাভাবিক সামর্থ্যের বীজকে ফুটাইয়া তুলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও কঠোর সাধনার অন্যতম সাধনা ৬পূজা।

মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয় না বটে কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধিত না হইলে সমাজের কোন অবস্থাতেই মনুষ্য-সমাজের কাহারও পক্ষে সুখ-শান্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করা ও জীবন নির্ব্বাহ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। অপূর্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সমাজের যে সংগঠন সাধিত হয়, সেই সংগঠনে সমাজের কাহারও পক্ষে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নহে। এই কারণে যাঁহারা আশৈশব স্বাভাবিক অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ লইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করেন এবং শিক্ষা ও কঠোর সাধনা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা সমাজ-সংগঠনের ও সমাজ-পরিচালনার জন্য স্বভাবতঃ দায়ী হইয়া থাকেন। এই অসাধারণ মানুষ-গুলি যদি তাঁহাদিগের উপরোক্ত স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাতিত্য ঘটিয়া থাকে। সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে সুখ-শান্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে ও জীবন যাপন করিতে পারে তদনুরূপ সমাজ-গঠনের ও সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব যেরূপ এই অসাধারণ মানুষগুলির স্কন্ধে স্বভাবতঃ নিহিত, সেইরূপ আবার যাহাতে ঐ অসাধারণ মানুষগুলি শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাহার সহায়তা করাও সমাজের প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব।

কাযেই ৺পূজা যাহাতে যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হয় তাহা করা যেরূপ কতকগুলি ভাগ্যবান্ মানুষের অন্যতম দায়িত্ব সেইরূপ আবার উহার সহায়তা করা সমাজের প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব।

এক কথায়, ৺পূজা যেরূপ যথাযথ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কার্য্য সেইরূপ আবার উহা সর্ব্বসাধারণের কার্য্যও বটে।

৺পূজায় কি কি সাধনা আছে তাহার কথা বলিতে বসিয়া আমরা কাহার পক্ষে পূজারী হওয়া সম্ভব এবং কেন পূজা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহার আলোচনা করিলাম।

এক্ষণে আমরা দেব, দেবতা এবং দেবী বলিতে কি বুঝায় এবং তাঁহাদের পূজা কি বস্তু তাহার আলোচনা করিব। হিন্দু সমাজে যতকিছু ৺পূজা এখনও বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটী হয় ৺দেবের পূজা, না হয় ৺দেবতার পূজা, নতুবা ৺দেবীর পূজা। "দেব", "দেবতা" ও "দেবী" কাহাকে বলে তাহার একটা ধারণা না থাকিলে কি করিলে যে তাঁহাদিগের পূজা করা হয় তৎসম্বন্ধে কিছুই বুঝা যায় না। "দেব", দেবতা" ও "দেবী বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা একাধিকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আত্মতত্ত্বের অভ্যাসে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে ঋষিগণ ঐ তিনটী কথার দ্বারা কোন্ বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মানবসমাজের প্রত্যেকে যেরূপ ৺পূজা করিবার অধিকারী নহেন, সেইরূপ যে সমস্ত দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা করা হয় তাহা বুঝিয়া উঠাও প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আশৈশব যাঁহারা অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের ঐ অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ যথোপযুক্ত শিক্ষা ও কঠোর সাধনা দ্বারা মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করা হয় কেবলমাত্র তাঁহাদিগের পক্ষেই এই কথাগুলি বুঝা সম্ভব হয়। নিরুক্তের দৈবত-কাণ্ডে ঐ কথাগুলি বুঝিবার নিয়ম বিস্তৃতরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠেও এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। দেব, দেবতা ও দেবী সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা বলিব তাহা ঐ দুইখানি গ্রন্থ ও শব্দ স্ফোটতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ কথায় কথায় বলে যে "দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক"। "দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক"—এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে "দৈব" বলিতে কি বুঝায় তাহা কতক পরিমাণে ধারণা করা সম্ভব হয়। যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পুরুষ ত্রিবিধ; অর্থাৎ ক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তম। দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক কি করিয়া হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে তাহা আগে বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়া মানুষ বলিতে কি বুঝায় এবং মানুষ তাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিচালনা কিরূপ ভাবে করিতেছে তাহা স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে প্রথমতঃ দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়ব প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; আর দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়বের ঐ দুই অংশে চারিটী প্রধান কার্য্য বিদ্যমান আছে। মানুষের অবয়বের একটী অংশ কেবলমাত্র বায়বীয় এবং আর একটী অংশ বায়ুমিশ্রিত মেদ-অস্থি-মজ্জা-বসা মাংস রক্ত ও চর্ম্মভাগ। মানুষের অবয়বের এই দুইটী অংশের তিনটী কার্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। একটী তাহার বায়বীয় অংশের কার্য্য, দ্বিতীয়টী তাহার বায়ুমিশ্রিত মেদাদি অংশের কার্য্য এবং তৃতীয়টী তাহার উপরোক্ত দুইটী অংশের আদান-প্রদানের কার্য্য। মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে এই তিনটী কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের চৈতন্য ও ইচ্ছার উৎপত্তি হইত না এবং মানুষ চলাফেরা করিতে পারিত না। কুম্ভকার হুবহু একটী মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে বটে কিন্তু ঐ মূর্ত্তিতে মানুষের উপরোক্ত তিনটী কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না। ইহারই জন্য মানুষের স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও কৃত্রিম মূর্ত্তিতে এত প্রভেদ ঘটিয়া থাকে।

মানুষের বায়বীয় অংশের কার্য্যের দার্শনিক নাম—অক্ষর-পুরুষ—

বায়ুমিশ্রিত মেদাদি অংশের কার্য্যের দার্শনিক নাম—ক্ষর পুরুষ—

ঐ দুইটী অংশের আদান-প্রদান কার্য্যের দার্শনিক নাম—পুরুষোত্তম—

অক্ষর-পুরুষ, ক্ষর-পুরুষ ও পুরুষোত্তম এই তিনটী প্রধান কার্য্যের কোন কার্য্যটীই মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হইত না, যদি মুক্ত বায়ু মানুষকে ঘিরিয়া না থাকিত এবং ঐ মুক্ত বায়ুর মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিবার ব্যবস্থা না থাকিত।

এই মুক্ত বায়ু মানুষের অভ্যন্তর ও বাহির লইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম "দৈব-কার্য্য।"

এই মুক্ত বায়ু অক্ষর-পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম—"দেব।"

এই মুক্ত বায়ু ক্ষর-পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম—"দেবতা"—

এই মুক্ত বায়ু পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম—"দেবী।"

মুক্ত বায়ু মানুষের অবয়বের সহিত সর্ব্বদা কিরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া আভ্যন্তরীণ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কিরূপে তাহার কর্ম্ম-শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ, বিকাশ, বহির্মুখীণতা, বিনাশ, অন্তর্মুখীণতা ও বৃদ্ধি সাধিত করিতেছে—তাহা সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার দার্শনিক নাম দেবপূজা, দেবতাপূজা ও দেবীপূজা।

মানুষ যেরূপ বায়বীয় ও বায়ু-মিশ্রিত মেদাদি ভাগ—এই দুই অংশে বিভক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক পরমাণুও বায়বীয় এবং মিশ্রিত-পঞ্চভূতাত্মক শরীর—এই দুই অংশে বিভক্ত।

ত্রিবিধ পুরুষ যেরূপ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, সেইরূপ উহা প্রত্যেক পরমাণু ও চরাচর প্রত্যেক জীবের মধ্যেও বিদ্যমান।

দেব, দেবতা ও দেবী যেরূপ প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে বিদ্যমান সেইরূপ উহা প্রত্যেক পরমাণু ও চরাচর প্রত্যেক জীবের মধ্যেও বিদ্যমান।

এক কথায়, যাহার দেহ আছে তাহার মধ্যেই ত্রিবিধ পুরুষ ও ত্রিবিধ দৈবত কার্য্য (অর্থাৎ দেব, দেবতা ও দেবী) বিদ্যমান আছেন।

অনেকে মনে করেন যে দেবতা কেবলমাত্র বস্তু-বিশেষের (যথা প্রস্তর-শিলা ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির) মধ্যেই বিদ্যমান থাকেন। এই ধারণা একেবারেই সত্য নহে। স্বভাবের সৃষ্টি যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যেই ত্রিবিধ পুরুষ ও দেব, দেবতা ও দেবী বিদ্যমান থাকেন। এতদ্বিষয়ে শিবসংহিতার নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্লোক পাঠ করিলে অনেক কথা জানা যায়—

> দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
> সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥ ১॥
> ঋষয়ঃ মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
> পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥ ২॥
> সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
> নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥ ৩॥
> ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
> মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥
> জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

এই উপরোক্ত শ্লোক পাঁচটীর মর্ম্মার্থ—

এই দেহে (অর্থাৎ দেহযুক্ত যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে) সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরুর কার্য্য, সরিৎসমূহের কার্য্য, সাগরসমূহের কার্য্য, শৈলসমূহের কার্য্য, ক্ষেত্রসমূহের কার্য্য, ক্ষেত্র-পালকসমূহের কার্য্য, ঋষিগণের কার্য্য, মুনিগণের কার্য্য, সমস্ত নক্ষত্রের কার্য্য, গ্রহের কার্য্য, পুণ্যতীর্থের কার্য্য, পীঠের কার্য্য, পীঠদেবতার কার্য্য, ভ্রমণশীল চন্দ্র-সূর্য্যের সৃষ্টি সংহার কার্য্য বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আবার ইহার মধ্যে আকাশ, বায়ু, তেজ, রস এবং ক্ষিতিও বিদ্যমান আছে (১-৩)।

যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে, দেহের মধ্যে যাহা থাকে, দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা থাকে, তাহাদের সমস্ত কার্য্যই দেহে প্রতিবিম্বিত হয় এবং দেহকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহাদের সমস্তই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দেহকে উপলব্ধি করিবার পন্থাঃ স্বকীয় মেরুদণ্ডের যে যে কার্য্য হইতেছে তাহা একে একে উপলব্ধি করা (৪)।

মেরুদণ্ডের কার্য্য অবলম্বন করিয়া যিনি একে একে, যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে, দেহের মধ্যে যাহা থাকে,দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা থাকে—তাহাদের সমস্তই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী (৫)।

উপরোক্ত পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য যথাযথ বুঝিতে পারিলে পূজার বিধান ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অনায়াসসাধ্য হয়।

যে কোন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ না কেন,সর্ব্ব প্রথমে স্বকীয় দেহের মধ্যে (অর্থাৎ মেদাদিসম্ভূত শরীরের মধ্যে) এবং যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে তাহার মধ্যে (অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অংশের মধ্যে) কি কি কার্য্য বিদ্যমান থাকে তাহার প্রত্যেকটী নিখুঁত-ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই ক্রমে ক্রমে দেহের কার্য্য, দেহাভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অংশের কার্য্য এবং ঐ দুইএর ঘাত-প্রতিঘাতের কার্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দার্শনিক ভাষায় উপরোক্ত তিনটী উপলব্ধির নাম ক্ষর পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার লাভ করা। ইহা পূজার প্রথম অঙ্গ। ঐ তিনটী উপলব্ধির সমাধান হইলে দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা বিদ্যমান থাকে তাহার ও তাহার কার্য্যের (অর্থাৎ মুক্ত বায়ু দেহের কোন্ অংশকে কিরূপ ভাবে আবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐ আবেষ্টনের ফলে দেহে ও দেহাভ্যন্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা) উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দার্শনিক ভাষায় এই উপলব্ধিকে দেবতা-বিশেষের পূজা বলা হইয়া থাকে। ইহা ৺পূজার দ্বিতীয় অঙ্গ। ইহার পর মানুষের কাম্য যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটীর প্রতি উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সংযত করিতে হয়। ইহা ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ। এই উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে বস্তু-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না।

ভারতীয় ঋষির কথানুসারে এই পৃথিবীতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহার প্রত্যেকটী মানুষের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি অথবা উপভোগ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার উহার প্রত্যেকটী মানুষের সত্ত্বার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে। এক কথায়,—পৃথিবীতে ভগবান্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিরই ব্যবহার দ্বিবিধ; যথা—

(১) ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এবং

(২) সত্ত্বার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি—

প্রত্যেক বস্তুর এই দ্বিবিধ ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন বস্তুবিশেষের যে ব্যবহারে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে পারে সেই ব্যবহারে কখনও সত্ত্বার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না, পরন্তু ক্রমিক ক্ষয় ও বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। আবার যে ব্যবহারে সত্ত্বার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে সেই ব্যবহারে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধিত হইতে পারে না।

ভারতীয় ঋষির কথানুসারে উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে সংযত করিতে না পারিলে প্রত্যেক বস্তুর উপরোক্ত দ্বিবিধ ব্যবহারবিধি পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। এই উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিকে দার্শনিক ভাষায় তামসিকতা বলা হইয়া থাকে। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতার বীজ পাইয়া থাকে। ইহার জন্য বলিতে হয় যে, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিই মানুষের স্বভাবের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, তামসিকতা (অর্থাৎ উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি) সংযত করা মানুষের পক্ষে কত কঠিন। অথচ এই তামসিকতা (অর্থাৎ উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি) সংযত না করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে বস্তু-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া অথবা মনুষ্যনামের যোগ্য হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ মনুষ্যজীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এখনও পুরোহিতগণ ৺পূজায় যে নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ঐ নিয়মের মধ্যে কোন সময়ে আমরা ৺পূজার যে তিনটী অঙ্গের কথা বলিলাম সেই তিনটী অঙ্গ হুবহু নিহিত ছিল।

এখনও পুরোহিতগণ যে কোন দেবতার পূজাতেই প্রবৃত্ত হউন না কেন—প্রথমতঃ সামান্যার্ঘ্য, দ্বিতীয়তঃ আসনশুদ্ধি, তৃতীয়তঃ গুরুপংক্তিপ্রণাম, চতুর্থতঃ করশুদ্ধি,

পঞ্চমতঃ ভূতশুদ্ধি, ষষ্ঠতঃ মাতৃকান্যাস, সপ্তমতঃ অন্তর্মাতৃকান্যাস, অষ্টমতঃ বাহ্যমাতৃকান্যাস, নবমতঃ সংহারমাতৃকান্যাস, দশমতঃ গন্ধাদি অর্চ্চনা, একাদশতঃ প্রাণায়াম, দ্বাদশতঃ বিশেষার্ঘ্য, ত্রয়োদশতঃ গণেশাদি দেবতার পূজা, চতুর্দ্দশতঃ সূর্য্যাদি গ্রহগণের পূজা, পঞ্চদশতঃ শিবাদি দেবতার পূজা, ষোড়শতঃ আরাধ্য দেবতার ধ্যান, সপ্তদশতঃ আরাধ্য দেবতার মানসিক পূজা, অষ্টাদশতঃ বিবিধ উপচারের নিবেদন, উনবিংশতঃ আরত্রিক, বিংশতঃ বলিদান করিয়া থাকেন।

সামান্যার্ঘ্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা সামান্যার্ঘ্যের মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। ঐ মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সামান্যার্ঘ্যের উদ্দেশ্য,—যাহাতে কোন বস্তুর উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিতে প্রবুদ্ধ না হইতে হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করা।

সেইরূপ আসনশুদ্ধির মন্ত্রার্থ বুঝিয়া লইয়া আসনশুদ্ধির উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে—মানুষের দেহ যে সর্ব্বতোভাবে বায়ুর দ্বারা আবেষ্টিত এবং অন্তর্নিহিত বায়ুর কার্য্যফলে যে মানুষ হাঁটিতে ও বসিতে পারে তাহার স্মরণ করাই আসনশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

সেইরূপ গুরুপংক্তিপ্রণামে যে যে মন্ত্র পড়া হয় তাহার অর্থ বুঝিয়া লইয়া উহার উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মাথার মধ্যে যে তিনটী তেজরেখা বিদ্যমান আছে এবং যে তিনটী তেজরেখার জন্য মস্তিষ্ক তাহার স্বরূপ বজায় রাখে এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে, সেই তিনটী তেজরেখাকে উপলব্ধি করা ও তাহাদিগকে স্মরণ রাখা গুরুপংক্তিপ্রণামের উদ্দেশ্য।

কর-শুদ্ধির মন্ত্র পড়িয়া তাহার মন্ত্রার্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে,—দেহের মেদাদি অংশের মধ্যে যে বায়ু আছে তাহা স্মরণ করাই উহার উদ্দেশ্য।

ভূত-শুদ্ধির মন্ত্র পড়িয়া ঐ মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, দেহের মেদাদি অংশের মধ্যে যে বায়ু আছে সেই বায়ুই যে দেহের গুণাগুণের নিয়ামক তাহা উপলব্ধি করা অথবা ক্ষর-পুরুষকে প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

মাতৃকান্যাসের মন্ত্র পড়িয়া ঐ মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অক্ষর-পুরুষকে প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস ও সংহারমাতৃকান্যাসের মন্ত্র পড়িয়া ঐ তিনটী মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র তিনটী পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষোত্তমের প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

সামান্যার্ঘ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সংহারমাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার প্রথম অঙ্গ।

গন্ধাদির অর্চ্চনা হইতে আরম্ভ করিয়া আরাধ্য দেবতার মানসিক পূজা পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার দ্বিতীয় অঙ্গ।

বিবিধ উপচারের নিবেদন হইতে বলিদান পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ।

যথযথভাবে যদি দেব, দেবতা ও দেবীগণের পূজা আবার আরম্ভ হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পুতুল পূজা অথবা পাথরের নুড়ি পূজা বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে যে পূজার উপর বিদ্বেষ আছে, তাহা আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। তখন আবার প্রকৃত পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং যে সংগঠনে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে সর্ব্ববিধ সমস্যা হইতে রক্ষা পাইতে পারে সেই সংগঠনের পরিকল্পনা মানুষের মনে স্থান পাইবে।

এত ভুগিয়া, এত সহিয়া মানুষ কি এখনও তাহার তমসাজাল ছিন্ন করিবে না?

মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির কয়েকটী মোটা কথা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মানুষের জীবন সর্ব্বদাই সুখ-দুঃখে মিশ্রিত। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টা কেহ সুখে কাটাইতে পারেন না। আবার প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টা কাহারও নিছক দুঃখেই কাটে না। যিনি অত্যন্ত দুঃখী তাঁহারও দুঃখের মধ্যে একটা না একটা সুখের অবসর উপস্থিত হয়। প্রতিদিনে সুখের ঘণ্টা আছে, আবার দুঃখের ঘণ্টাও আছে। প্রতিজীবনে সুখের দিন আছে আবার দুঃখের দিনও আছে। যাঁহারা সুখের প্রার্থী তাঁহাদিগের দিন উপরোক্তভাবে কাটিয়া যায়। এবং নাগাড় সুখ তাঁহাদিগের ভাগ্যে মেলে না। যাঁহারা দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যাকুল তাঁহাদিগের দুঃখও সর্ব্বতোভাবে কখনও দূরীভূত হয় না। প্রতিপদবিক্ষেপে তাঁহারাও দুঃখ পাইয়া থাকেন। নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনের হিসাব আত্মপরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়া লইলে উপরোক্ত সত্যের সাক্ষ্য প্রত্যেকেই পাইতে পারিবেন। যিনি যতগুলি জীবনের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত তিনি ততগুলি জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত সত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন।

মানুষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী তাঁহারা, যাঁহারা জীবনের উপভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া সমস্ত অবস্থাতেই নিজদিগকে মানাইয়া লইয়া চলিতে পারেন। সমস্ত অবস্থাতেই নিজেকে মানাইয়া লইতে হইলে মন ও বুদ্ধির যে ক্ষমতা প্রয়োজন, সেই ক্ষমতা অর্জ্জন করা একে ত অত্যন্ত কঠিন, তাহার পর আবার মানুষের রক্ত-মাংস লইয়া যাঁহাদিগের জীবন তাঁহাদিগের পক্ষে সমস্ত অবস্থাতে নিজেকে মানাইয়া লওয়া সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমি আরামের জন্য মোটর-গাড়ী চাই না, অট্টালিকা চাই না, নানা রকমের ডাল-তরকারীর আমার প্রয়োজন হয় না, অঙ্গের ভূষণের জন্য ফিন্-ফিনে সাদা ধপ্-ধপে কাপড়-জামার দিকে আমার লক্ষ্য নাই। আমি চাই একখানি খড়ের ঘর, দুই বেলা দুই পেট মোটা-ভাত, তরকারীর মধ্যে একটু লবণ, গোটাকতক লঙ্কা এবং একটু ফ্যান, লজ্জানিবারণের জন্য খান দুই মোটা কাপড়, শীতের সময় একখানা মোটা চাদর। তাও আমি কাহারও নিকট ভিক্ষাস্বরূপ চাই না। মানুষ যতখানি খাটিতে পারে ততখানি খাটিতে আমি প্রস্তুত আছি। অথচ আমি খাটিবার সুযোগ পাইতেছি না এবং আমার ভাগ্যে ঐ মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটিতেছে না। অথবা হয় ত আমি খাটিবার সুযোগ পাইয়াছি, সমস্ত দিন খাটিয়াও থাকি কিন্তু তথাপি আমার ও আমার অবশ্য প্রতিপালনীয় পরিজনের জন্য যে কয় পোয়া মোটা ভাত ও যে কয়খানি মোটা কাপড়ের একান্ত প্রয়োজন তাহা কিনিবার মত পারিশ্রমিক আমি পাই না। এতাদৃশ অবস্থার উদ্ভব হইলে কোন মানুষের পক্ষে তাহা মানাইয়া চলা সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। নিজের অথবা যাঁহারা অবশ্য প্রতিপালনীয় তাঁহাদিগের পেটের আগুন যখন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া ওঠে তখন ঐ আগুন যুক্তি-তর্ক অথবা দার্শনিকতার দ্বারা নির্ব্বাপিত করা যায় না, তখন একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েক মুঠা ভাত।

ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের বৈশেষিক দর্শন এবং পূর্ব্বমীমাংসায় অতি স্পষ্ট ভাষায় দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক জীবের জীবনধারণ করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি বস্তু আছে। মানুষের জীবনধারণ করিবার জন্য যাহা কিছু অত্যাবশ্যকীয় কেবলমাত্র তাহা পাইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজসিকতা ও তামাসিকতার সহিত মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহার জন্য সে সর্ব্বদাই জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা অত্যাবশ্যকীয় তদপেক্ষা কিছু বেশী কামনা করিয়া থাকে। মানুষের রাজসিকতা ও তামসিকতা আপনা হইতেই সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই স্বাভাবিক রাজসিকতা ও তামসিকতা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার উপায় মাত্র

একটী, যথা: সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা বলিতে কি বুঝায় তাহা বিশদভাবে লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে, তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। মোটামুটী ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, যে শিক্ষায় ও সাধনায় মানুষের রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি সংযত হয় এবং কি করিলে মানুষের অস্তিত্বের রক্ষা করা ও বৃদ্ধি সাধন করা সহজসাধ্য হয় তাহা জানা সম্ভব হয়—সেই শিক্ষা ও সাধনার নাম সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা। স্বাভাবিক রাজসিকতা ও তামসিকতা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা না হইলে মানুষের কাম্য-বস্তুর পরিমাণ ও সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং তাহার অভাব দূর করা অসম্ভব হয়। এই জন্যই ঋষিদিগের মতে মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে সমাজমধ্যে সর্ব্বস্তরের মানুষের সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার ব্যবস্থা যাহাতে সংগঠিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনায়।

ঋষিদিগের দর্শনের ভাষায় মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ, যথা: (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক, (৩) আধিদৈবিক। এই দার্শনিক কথাগুলি চলতি ভাষায় বুঝা বড় কঠিন। দার্শনিক ভাষা ও ভাব বাদ দিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত কি কি কার্য্য করে তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদ্বারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের দৈনন্দিন কার্য্য ত্রিবিধ, যথা: —(১) অন্তরের কার্য্য, (২) শরীরের কার্য্য, (৩) অপরের সহিত সম্বন্ধের কার্য্য। মানুষের এই ত্রিবিধ কার্য্য তাহার ইচ্ছা ও চৈতন্যানুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহার ইচ্ছার পূরণ না হইলেই সে দুঃখানুভব করে। ইচ্ছার পূরণ না হওয়ার নাম অভাব বোধ করা। কোন কাম্য-বস্তুর অভাব হইলেই মানুষ দুঃখ পায়। মানুষের কাম্যবস্তু পঞ্চবিধ, যথা: (১) আর্থিক স্বচ্ছলতা, (২) নীরোগতা (৩) শান্তি, (৪) দীর্ঘ-যৌবন, (৫) কষ্টহীন কালমৃত্যু। মানুষের কাম্য-বস্তু যেরূপ পঞ্চবিধ সেইরূপ আবার মানুষের অভাবও পঞ্চবিধ, যথা:—(১) অর্থিক অভাব, (২) স্বাস্থ্যাভাব, (৩) অশান্তি, (৪) অকাল-বার্দ্ধক্য, (৫) ক্লেশকর অকাল মৃত্যু। মানুষ বুঝুক আর না-ই বুঝুক, প্রত্যেক মানুষ আর্থিক অভাবাদি উপরোক্ত পঞ্চবিধ অভাব কি রকমে দূর করিবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতি পঞ্চবিধ কাম্যবস্তু কিরূপে লাভ করিবে, তাহার জন্য সর্ব্বদা হয় অন্তরের কার্য্য, নতুবা শরীরের কার্য্য, নতুবা অপরের সহিত সম্বন্ধের কার্য্য করিতেছে। পঞ্চবিধ অভাবের কোন একটী অভাব দূর করিতে না পারিলে, অথবা পঞ্চবিধ কাম্য-বস্তুর কোন একটি কাম্য-বস্তু লাভ করিতে না পারিলে, মানুষ হয় অন্তরে, না হয় শরীরে, না হয় অপরের সহিত সম্বন্ধের কার্য্যে দুঃখানুভব করে। কাযেই মানুষ যাহাতে তাহার দুঃখ দূর করিয়া সুখলাভ করিতে পারে তাহা করিতে হইলে, সে যাহাতে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশ বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়:—

(১) মানুষের স্বাভাবিক রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং সংযত হয় তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনা,

(২-৪) মানুষের অন্তর, বাহির ও অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার দ্বার যে দশটী ইন্দ্রিয়, তাহা যাহাতে সমান ভাবে বলিষ্ঠ হয় তাহার শিক্ষা ও সাধনা,

(৫-৯) কি করিলে আর্থিক অভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং ক্লেশকর অকালমৃত্যু দূর করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনা,

(১০-১৪) কি করিলে আর্থিক স্বচ্ছলতা, নীরোগতা, শান্তি, দীর্ঘ-যৌবন এবং কষ্টহীন কাল-মৃত্যু লাভ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনা।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত চতুর্দ্দশ বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা মানুষ যাহাতে লাভ করিতে পারে সমাজমধ্যে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষ তাহার দুঃখের হাত হইতে এড়াইয়া সুখ লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু মানুষের জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা তাহার অত্যাবশ্যকীয় সেই সমস্ত বস্তু যাহাতে উৎপন্ন হয়—তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে মানুষ সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা লাভ করিয়াও অভাবের হাত হইতে এড়াইয়া কাম্যবস্তু অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না এবং সুখলাভ করিতে পারে না।

কাযেই মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে একদিকে যেরূপ তাহার সুশিক্ষা ও সুসাধনার ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেইরূপ আবার মানুষের জীবন ধারণের জন্য যাহা

যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা যাহাতে সমাজমধ্যে উৎপন্ন করা এবং বণ্টন করা অনায়াসসাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা যাহাতে সমাজমধ্যে উৎপন্ন করা ও বণ্টন করা অনায়াসসাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে তাহার বিচার করিতে বসিয়া ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বমীমাংসায়, বৈশেষিক দর্শনে এবং অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত সত্যগুলি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—

(১) গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার প্রভেদানুসারে মানুষ স্বভাবতঃ চারিশ্রেণীর। মানুষের এই স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগানুসারে তাহার খাদ্য ও পরিধেয়াদি অত্যাবশ্যকীয় বস্তুরও শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

(২) মানুষের স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগানুসারে তাহার শিক্ষা ও সাধনার শ্রেণীবিভাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৩) মানুষ তাহার শিক্ষা ও সাধনায় যত কৃতকার্য্য হইবে তাহার জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ তত কমিয়া যাইবে।

(৪) যে যত আত্মবশ হইবে সে তত সুখী হইবে। যে যত পরবশ হইবে সে ততই দুঃখী হইবে। এই নিয়মানুসারে যাহাতে জন্মভূমি হইতে মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলি উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে পরভূমির প্রতি মুখাপেক্ষী হইতে না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য।

(৫) প্রকৃতির এমন নিয়ম যে, জীবন ধারণের জন্য যাহার যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহার প্রত্যেকটী মানুষের জন্মভূমির আশেপাশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জন্মভূমির আশেপাশের জমিতে যাহা উৎপন্ন হয় না তাহার ব্যবহার মানুষের পক্ষে কখনও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ হয় না।

(৬) যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, যে দেশের মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহার প্রত্যেকটীর কাঁচামাল সেই দেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

(৭) প্রকৃতির এমন নিয়ম যে, যখন যে দেশের মনুষ্য-সংখ্যা যেরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই দেশের জমির প্রসবিনী শক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, মানুষের শিক্ষা ও সাধনা দুষ্ট হইয়াছে এবং মানুষের ব্যভিচারের ফলে জমি, জল ও হাওয়া কলুষিত হইয়াছে।

(৮) জমির প্রসবিনী শক্তি অটুট রাখিতে হইলে, হাওয়া যাহাতে বৈকৃতিক অথবা কোন কৃত্রিম বস্তুর দ্বারা কলুষিত না হয় এবং স্বাভাবিক নদীস্রোত যাহাতে কোন ক্রমে অবরুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

(৯) জমির প্রসবিনী শক্তি অটুট রাখিতে পারিলে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। জমির এতাদৃশ অবস্থায়, ফল ও ফুল কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন করা সঙ্গত নহে। তাহাতে হাওয়া বিকৃত হইতে পারে। শস্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও হাওয়া কলুষিত হয় না, বরং অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং জমির প্রসবিনী শক্তিও অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(১০) শিল্পের যে প্রণালী অবলম্বন করিলে হাওয়া বিন্দুমাত্রও বিকৃতি প্রাপ্ত অথবা কলুষিত হইতে পারে, সেই প্রণালী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। হাওয়া বিকৃত হইলে একদিকে যেরূপ মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে থাকে, সেইরূপ আবার জমির প্রসবিনী শক্তি কমিতে থাকে এবং ফসলও অস্বাস্থ্যপ্রদ হয়।

(১১) বাণিজ্যের যে প্রণালীতে বণিক্ লোভী অথবা লোকসানগ্রস্ত হইতে পারে, সেই প্রণালী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

(১২) কাহারও মানুষের কার্য্য কখনও কুমার মানুষের হস্তে ন্যস্ত করা সঙ্গত নহে। গুণ ও কর্ম্ম-শক্তির প্রভেদানুসারে মানুষের স্বাভাবিক যে চারিটী শ্রেণী-বিভাগ

আছে, তদনুসারে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা অর্জ্জন করিবার কর্ম্মও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া উচিত।

(১৩) প্রত্যেক দেশে স্বভাবতঃ শ্রম-ক্ষম মানুষের সংখ্যাই বার আনার অধিক হইয়া থাকে। এই শ্রমক্ষম মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে বটে কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি যতই মার্জ্জিত হউক না কেন, তাহা কখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। স্বাভাবিক যে বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বসমূহে প্রবেশ লাভ করে, সেই বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কোন দেশে কখনও এক আনার বেশী জন্ম গ্রহণ করে না। ইহাও একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর বুদ্ধি আছে—যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বসমূহে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না বটে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগসমূহে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

(১৪) মানুষের জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা অর্জ্জন করা সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অনায়াসসাধ্য করিতে হইলে স্বভাবতঃ যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার উপযোগী বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা যাহাতে প্রকৃতির খুঁটিনাটিগুলিকে লক্ষ্য করেন,—প্রকৃতির নিয়মানুসারে মানুষ যাহাতে চলা-ফেরা করে তাহার বিধি-প্রণয়ন করেন, বিকৃতির নিয়মানুসারে যে সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ তাহা যাহাতে স্থির করেন তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা একান্ত কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত সত্যসমূহকে ভিত্তি করিয়া যে দেশ পরিচালিত হইবে, সেই দেশে তাহার প্রত্যেক অধিবাসীর পক্ষে জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যক তাহা উৎপন্ন করা ও অর্জ্জন করা অনায়াসসাধ্য হয়—ইহা ভারতীয় ঋষিগণের অভিমত।

যাহাতে জমির উর্ব্বরা শক্তি কোনক্রমে নষ্ট না হয়, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি যাহাতে অটুট থাকে, কৃষির উপযোগী প্রত্যেক জমি-খণ্ডে যাহাতে চাষ আবাদ করা হয়, যাহাতে হাওয়া কোনক্রমে বিকৃত হইতে পারে তাদৃশ কোন শিল্প-প্রণালী যাহাতে গৃহীত না হয়, যে প্রণালীতে হাওয়াকে বিকৃত না করিয়া শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন করা যাইতে পারে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক শিল্প-ক্ষম ব্যক্তি যাহাতে শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত হন, যাহাতে বণিকগণ অর্থলোলুপ অথবা লোকসানগ্রস্ত হইতে পারেন তাদৃশ বাণিজ্য-নীতি পরিহার করিয়া—যাহাতে বণিকগণ সাধুত্ব বজায় রাখিতে বাধ্য হন এবং যথোপযুক্ত লাভবান্ হইতে পারেন তাদৃশ বাণিজ্য-নীতি যাহাতে অবলম্বিত হয়,—সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে, প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা অত্যাবশ্যকীয় তাহা উৎপন্ন করা ও বণ্টন করা যে অনায়াসসাধ্য হইতে পারে ইহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

পৃথিবীতে যতগুলি দেশ আছে তাহার প্রত্যেক দেশের মানুষগুলি যদ্যপি ঐ অবস্থায় উপরোক্ত বিধানে তাহাদিগের নিজ নিজ দেশে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার ব্যবস্থা করে এবং তাহাদিগের নিজ নিজ দেশে যাহাতে জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলির উৎপত্তি ও বণ্টন অনায়াসসাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ দূর হওয়া ও সুখলাভ করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু যখন কোন কারণে পৃথিবীর কোন দেশে সেই দেশের মানুষগুলির জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলি সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন করা অসম্ভব হয় তখন আর কাহারও পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবনা অথবা দেশগত ভাবনায় আবদ্ধ থাকিলে চলে না। এতদবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবনায় অথবা দেশগত ভাবনায় আবদ্ধ থাকিলে কাহারও পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিজ নিজ দেশের ত' দূরের কথা, ব্যক্তিগত দুঃখ পর্য্যন্ত দূর করা সম্ভব হয় না। যখন কোন কারণে পৃথিবীর একটি অথবা একাধিক দেশে সেই দেশের মানুষগুলির জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলি উৎপন্ন করা অসম্ভব হয় এবং ঐ দেশগুলিকে অপরাপর দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় তখন প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সমগ্র মনুষ্যসমাজকে একটি পরিবার বলিয়া মনে করে এবং নিজেকে ঐ পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য করে তদুপযোগী শিক্ষা বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক। এতাদৃশ অবস্থায় যে-সমস্ত দেশের ভূমি স্বভাবতঃ অত্যধিক

প্রসবশালিনী সেই সমস্ত দেশের মানুষগুলি যাহাতে অভাবগ্রস্ত দেশের মানুষগুলির প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া আন্তরিক ভাবে তাহাদিগের অভাব পূরণের জন্য প্রবৃত্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে মানুষ পশুবৎ দ্বন্দ্বকলহ পরায়ণ হইয়া থাকে।

মানুষের শারীরিক বল পাশবিক। তাহার বুদ্ধির ও মনের বল দৈবিক। মানুষ স্বভাবতঃ বুদ্ধির ও মনের বলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া থাকে। বুদ্ধির ও মনের যথার্থ বলকে যখন মনুষ্যসমাজ মানিয়া লয় তখনই মানুষের ক্রমোন্নতি হইতে আরম্ভ করে। প্রকৃত বুদ্ধির ও মনের বলকে অবজ্ঞা করিয়া যখন কুবুদ্ধি ও কুচক্রকে অথবা শারীরিক বলকে মানুষ প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যসমাজের শিক্ষা ও সাধনা কলুষিত হইয়াছে এবং মানুষ পতিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমূহের অভাব উপস্থিত না হইলে মানুষের এতাদৃশ পতন কখনও হয় না।

(১) এতাদৃশ অবস্থায় মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ৭টী, যথা—

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সমগ্র মনুষ্যসমাজকে একটী পরিবার বলিয়া মনে করে এবং নিজেকে ঐ বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক একটী মানুষ বলিয়া গ্রহণ করে তদুপযোগী শিক্ষা বিস্তার করা।

(২) যে সব দেশের জমি স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসবশালিনী, সেই সব দেশের মানুষ যাহাতে অভাবগ্রস্ত দেশের মানুষগুলির প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া তাহাদিগের অভাব মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়—তদুপযোগী শিক্ষাবিস্তার করা।

(৩) যে সব দেশের জমি স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসবশালিনী সেই সব দেশের রাষ্ট্র-পরিচালনা যাহাতে কুবুদ্ধি, কুচক্র ও শারীরিক বলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের আয়ত্তাধীন না হয়—তাহার ব্যবস্থা করা।

(৪) যে সব দেশের জমি স্বভাবতঃ অধিক প্রসবশালিনী সেই সব দেশের রাষ্ট্র-পরিচালনা যাহাতে যাঁহারা আন্তরিকভাবে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সমভাব-সম্পন্ন, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও সূক্ষ্মতম অংশে প্রবিষ্ট, যাঁহারা রাগ-দ্বেষের ও দ্বন্দ্ব কলহের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) যাঁহারা দ্বন্দ্ব কলহ অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের অথবা কুচক্রের অথবা চরিত্রহীনতার অথবা আচার-ভ্রষ্টতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে কোন সমাজপরিচালনার কোনরূপ গুরুভার প্রাপ্ত না হন—তাহার ব্যবস্থা করা।

(৬) প্রত্যেক দেশে যাহাতে কুশিক্ষা ও কুসাধনা বন্ধ হইয়া সুশিক্ষা ও সুসাধনা বিস্তার লাভ করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা।

(৭) প্রত্যেক দেশে যাহাতে যাহা যাহা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় তাহার উৎপত্তি ও বণ্টন অনায়াসসাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা। দুঃখ দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে ঋষিগণের আরও অনেক কথা আছে। এ প্রবন্ধে শুধু মোটা কথাগুলি বলা হইল। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত পরিচিত, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, পাশ্চাত্য দর্শনেও আর্থিক স্বচ্ছলতা,নীরোগতা ও শান্তি লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কেহই ঐ ঐ বিষয়ক সব কথাগুলি তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থে গুছাইয়া লিখিতে পারেন নাই এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে যে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হয় না। সেইরূপ নীরোগতা ও শান্তি লাভ সম্বন্ধে যে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারা নীরোগতা ও শান্তি লাভ করা যায় না।

মনুষ্য সমাজের দুঃখ দূর করিতে হইলে ভারতবাসীকে অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার কারণ ভারতবর্ষের জমি স্বভাবতঃ অন্যান্য দেশের জমির তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসব-ক্ষমতাযুক্ত। ভারতবর্ষের বুদ্ধিমান্ মানুষগুলি দো-আঁসলা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইয়া খাঁটি ভারতবাসীরূপে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ভারতের বুদ্ধিমান মানুষগুলি যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইবার জন্য যত্নশীল না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির কাহারও কোনরূপ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইবে না—ইহা আমাদিগের অভিমত।

বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তি

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিম্নবঙ্গ

খুলনা

খুলনা সহরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অপর একটি প্রবাদ এই যে,—বর্ত্তমান খুলনা সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তর পূর্ব্বে প্রাচীন খুলনা অবস্থিত ছিল। উহার নাম ছিল নয়াবাদ। সুন্দরবনে কাষ্ঠ, মোম, মধু প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়ীরা রাত্রিকালে বনপ্রদেশে ঢুকিতে সাহসী হইত না। নয়াবাদের ঘাটে নৌকা রক্ষা করিয়া রাত্রিযাপন করিত। অনুকূল স্রোত বা বায়ু প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ নৌকা খুলিয়া সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে যাইত, অমনি বনদেবতা 'খুলনা' 'খুলনা' বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। এইরূপে স্থানটির নাম খুলনা হইয়াছে। কিন্তু আগেরটিই অধিক সমর্থনযোগ্য। কেননা এই জেলায় খুল্লনা দেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মুখে সমান প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার নামানুসারে খুলনার অধিষ্ঠাত্রী খুল্লনেশ্বরী দেবী উহার অপর এক প্রমাণ স্বরূপে এই সহরে বিরাজ করিতেছেন।

ভৈরবের কূলে অবস্থিত খুলনা সহরের দৃশ্য অতি মনোরম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। রাস্তাগুলি পীচ দেওয়া এবং জলনিকাশের ড্রেনগুলিও সুব্যবস্থিত। সহরে জলের কল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। সহরটি শুধু যে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের সীমান্ত তাহা নহে, বড় বড় সমস্ত নদী-পথ খুলনা হইয়া গিয়াছে। এ কারণ সহরটি প্রকাণ্ড চালানী কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। চাউল, চিনি, সুপারি, নারিকেল, তামাক প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য নৌকাযোগে এখানে আসিয়া বাহিরে চালানের জন্য জড় হয়। সেনের বাজার, আলাইপুর, ফকিরহাট, বাগেরহাট, ফুলতলা, তালা, মোরেলগঞ্জ, চাঁদখালি, বড়দল, মসজিদকুড় প্রভৃতি স্থান এই জেলার এক-একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে খুলনা পর্য্যন্ত ১০৯ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'পূর্ব্ববঙ্গ সেণ্ট্রাল' নামক একটি রেললাইন আছে। উহা ইং ১৮৮৪ সালে জার্ম্মাণ দেশবাসী রথচাইল্ড নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী কর্ত্তৃক ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। পরে ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যায়। বর্ত্তমানে ১৯৪২ সালে ১লা জানুয়ারী হইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত যুক্ত হইয়া উহাদের সম্মিলিত নাম হইয়াছে, 'বি এণ্ড এ রেলওয়ে।' খুলনা ঘাট হইতে নড়াইল, কালিয়া, মাগুরা, বোয়ালমারী, বরিশাল ও সাতক্ষীরা (এল্লারচর) প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্য আর, এস, এন্ কোম্পানীর ষ্টীমার সার্ভিস আছে। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে খুলনার অন্যতম মহকুমা সাতক্ষীরা পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিসও আছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে খুলনা মহকুমা প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম মহকুমা। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খুলনাকে স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করা হয়। এই জেলার সাতক্ষীরা মহকুমাটি পূর্ব্বে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল।

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। যে বন এককালে মানুষের সাহস ও বিক্রমে কম্পিত হইত সেখানে আজ হিংস্র পশুরাই বিক্রম দেখাইতেছে। যে বনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কামান গর্জ্জিয়া উঠিত সেখানে আজ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতেছে। প্রাচীন দুর্গ, হর্ম্ম্য মন্দির ও মসজিদাদির ধ্বংসস্তূপ যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাও জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে লোকে নিজ নিজ প্রয়োজনে লইয়া যাইতেছে। আবার চাষ আবাদের সময় কৃষকেরা লাঙ্গলের ফালে সরাইয়া স্থানচ্যুত করিতেছে। বনের যে সকল অংশ এ পর্য্যন্ত অগম্য হইয়া রহিয়াছে তাহার ভিতর কি আছে না আছে জানিবার উপায় নাই। আজ সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। ইষ্টকের কঙ্কাল দেহ রাখিয়া সে স্বর্গরাজ্য বনালয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বন-রাজ্যে প্রতাপ রাজমুকুট পরিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তাহার পূর্ব্বেও যে হিংস্র পশুরা আরও একবার কি তাহারও অধিকবার মানুষের হাতে তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহা পর্ত্তুগীজ-ঐতিহাসিকেরা সুন্দরবনে যে পঞ্চ বিনষ্ট নগরীর * কথা বলিয়া গিয়াছেন তদ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং এই বন পর্য্যায়ক্রমে কতবার মনুষ্যের আবাসভূমি এবং পশুদিগের বিচরণ স্থল হইল কে বলিবে?

খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের নদী সকলের মধ্যে রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, মার্জ্জাল, হরিণঘাটা, আড়পাঙ্গাসিয়া ও ভাঙ্গর প্রধান। এগুলি দক্ষিণে সমুদ্র-সম্মুখীন নদী। ইহাদের দেহ বিরাট—সমুদ্রবৎ। ইহাদের সংলগ্ন নিম্নলিখিত নদীগুলির আকারও বড় কম নহে;—যমুনা, ইছামতী, কপোতাক্ষ, খোলপেটুয়া, ঠাকুরাণী, হাড়িয়াভাঙ্গা ভৈরব, শিবসা, পশুর, ভদ্র ও ভোলা প্রভৃতি।

রায়মঙ্গল সুন্দরবনের একটি প্রধান নদী। উহা পশ্চিমে কালীগঞ্জের নীচু দিয়া খুলনা ও ২৪ পরগণায়

* 'Five lost towns' on the maps of De Barros (in his Da Asia) Blaeve and Van den Broucke.

সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পৌছিবার ৬ মাইল পূর্ব্বে যমুনা ও হাড়িয়াভাঙ্গার সহিত নদী-সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে। রায়মঙ্গল মোহনার নিকট সুন্দরবনের ২৮৭ নং লাট। এখানে মাস্তলার কিছু পূর্ব্বে রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে প্রতাপের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'রায়মঙ্গল দুর্গ' অবস্থিত ছিল। দুর্গের ধ্বংসস্তূপ এবং পরিখার চিহ্ন গুলি স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে দালানের ভগ্নাবশেষও আছে।

রায়মঙ্গলের চারিমাইল পূর্ব্বে মালঞ্চ নদী। আরও কিছু পূর্ব্বে আড়পাঙ্গাসিয়া নদী আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্লাইমাউথ জাহাজ এই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী আড়াইবাঁকীর খালের উপর প্রতাপের 'আড়াই-বাঁকীর দুর্গ' ছিল। পর্ত্তুগীজ সেনাপতির আগষ্ট পেড্রো ঐ দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন।

রায়মঙ্গলের দক্ষিণে মালঞ্চ নদীর মোহনায় একস্থানে নদীর তলদেশ পাওয়া যায় না। বর্ষার সময় অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে খুলনা, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার লোকে কামানের শব্দের মত একপ্রকার শব্দ শুনিতে পায়। ঐ শব্দ বরিশাল জেলার দিক হইতে আসে বলিয়া উহাকে 'বরিশাল গান' বলে। খুলনার নীল কুঠীর সাহেব জমিদার রেণী (Mr. H. J. Rainey) বলিয়াছেন,—

"This circumstance, I have carefully observed for a series of years, and hence I admitted the noise as coming from the sea-board. Khulna is situated on the confluence of the rivers Bhairab and Rupsa (the latter a local name for the continuation of the Passar), which run respectively north and east of it, and when I was residing there, I noticed that the sound appeared to come from the south-east, while now I am living across the Rupsa, on the west side of it, the noises are heard from the south-west."

রেণী সাহেবের মন্তব্য ছাড়া R. D. Oldham's Manual of Geology গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"In the sea outside the middle of the delta there is a singularly deep area known and marked on the charts as 'the Swatch of No Ground' in which soundings which are from 5 to 10 fathoms all round, change almost suddenly to 200 and even to 300 fathoms."

মার্জ্জাল বা মার্জ্জাটা নদী পাটনী নদীর ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ৩।৫ মাইল বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড নদী। ইহার অভ্যন্তরভাগে দুইটি দ্বীপ আছে। একটির নাম 'পোড়ভাঙ্গা'। ১৭৭১ সালে বার্কসায়ার নামক জাহাজ এখানে এই নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হয়। মার্জ্জাল ও আলজী নদীর মধ্যবর্ত্তী সুন্দরবনের ১৯৮নং লাট। আলজীর কূলে কূলে চলিলে তীরে বিস্তর ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্জ্জাল-মোহনা অতিক্রম করিলেই সমুদ্রে পড়িতে হয়। ঐ সঙ্গমস্থল হইতে সমুদ্রের কূল বাহিয়া কিছুদূর গেলে 'ফুলঝুড়ী' নামক একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। জনমানবহীন অরণ্যমধ্যস্থ এই পুষ্করিণীর জল এখনও ব্যবহারের উপযোগী রহিয়াছে। ইহার কিছু দূরে একস্থানে বিস্তর লোহিত ও কৃষ্ণ প্রস্তর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

ভাঙ্গড়ের পনর মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হরিণঘাটার মোহনা। এই নদী ৯ মাইল বিস্তৃত সমুদ্রবিশেষ। হরিণঘাটার মোহনার একটি শাখার নাম 'চাঁদের আড়া'। এইখানে চাঁদ সওদাগরের পোতাশ্রয় ছিল। তীরে প্রাচীন রাস্তা, পুষ্করিণী ও ভগ্ন গৃহের ইষ্টকস্তূপ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। হরিণঘাটার 'tiger point' বা বাঘের কোণা নামকস্থানে বিস্তর ঘর বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ রহিয়াছে। স্থানটি প্রাচীন বন্দর ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করে এবং পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকেরা সুন্দরবনের যে পঞ্চ বিনষ্ট নগরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা তাহার একটি বলিয়া বলেন।

খোলপেটুয়া নদী শাখাগুলির নিকট কপোতাক্ষ নদী হইতে পশ্চিম মুখে কিছুদূর পর্য্যন্ত 'অরুচর' নামে অভিহিত। পরে বেতনা নদীর জলে পুষ্ট হইয়া দক্ষিণ-দিকে গলঘাসিয়া নদীতে মিশিয়াছে। এই মিলিত দেহ সুন্দরবনের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার কপোতাক্ষ নদীর সহিত মিলিত হইয়া পাঙ্গসা পর্য্যন্ত গিয়াছে। গলঘসিয়ায় মিলিত হইবার পর ইহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। নদীটি পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্য-পথ।

সুন্দরবনের ১৬৭ নং লাটের অন্তর্গত প্রতাপনগরের দক্ষিণ খোলপেটুয়া নদীর উপর বিছট নামক গ্রামে তিন মাইল বিস্তৃত একটি ডক আছে। উহার বাঁধের তলদেশ ৯০ ফুট বিস্তৃত এবং উচ্চতা ৩০ ফুট। উহা কাহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল নির্ণয় হয় নাই। নিকটে কপোতাক্ষ নদী অতিক্রম করিলে বহুদূরবর্ত্তীস্থান জুড়িয়া কেবলই ইষ্টক স্তূপ দৃষ্ট হয়। বড় বড় সৌধের ভিত্তিমূল, বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ও প্রাচীন রাস্তা সকল দেখা যায়। সুন্দরবনের পঞ্চ বিনষ্ট নগরীর উহাও বোধ হয় অন্যতম।

খোলপেটুয়া ও কদমতলী নদীর মধ্যে ১৬৯ নং লাট। ঐ লাটের পোদখালি গ্রামের পশ্চিমভাগে পুষ্করিণী,

পাকাবাড়ী এবং প্রাচীন রাস্তার অবশেষ আছে। এখানে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়।

পশর নদীর দুইটি খাল আছে। একটির নাম 'নন্দবালা' অপরটির নাম 'কুমুদবালা'। নন্দবালার উত্তর পারে ২৪৮ নং লাট। ঐ জঙ্গলের মধ্যে বকুলবৃক্ষ ঘেরা একটি পুষ্করিণী আছে। পশর নদীর তীরবর্ত্তী ২২৬নং লাটে প্রাচীন রাস্তা পুকুর ও ঘরবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে।

ঠাকুরাণী নদী জামিরা নদীর একটি শাখা। ঠাকুরাণীর শাখা মণি নদীর মোহনায় একটি আকাশচুম্বী বিজয়স্তম্ভ আছে। উহা 'জেটার দেউল' নামে খ্যাত। ১১৬নং লাটের অন্তর্গত। এই দেউলের চুড়া বহুদূরপথ হইতে দৃষ্ট হয়। উহা অক্ষত শরীরে আজিও দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাহার গৌরব কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে তাহার মূল সাক্ষী হিসাবে এই বনপ্রদেশই বর্ত্তমান আছে। মানুষে তাহার কিছুই জানে না। এইখানে প্রতাপের গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ রুডা বা রডা নৌ যুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন। * মণি নদীর পশ্চিম তীরে ২৭ নং লাটে 'রায়দীঘি' ও 'কঙ্কন দীঘি' নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ নদীর তীরে ২৬ ও ২১৬ নং লাটের মধ্যে প্রতাপের মণিদুর্গ অবস্থিত ছিল।

খুলনা জেলার এই প্রকাণ্ড নদীটি মার্জ্জাল নদীর ত্রিমোহনায় আসিয়া মিশিয়াছে। ত্রিমোহনার নিকট শিবসা নদীর গায় ২৩৩ নং লাট। এখান হইতে শিবসার তীর বাহিয়া প্রায় এক মাইল স্থান জুড়িয়া নদীর তীর ইষ্টকাবৃত হইয়া আছে। উহা নদীগর্ভে নিমজ্জমান কোন দুর্গের ইষ্টক বলিয়া মনে হয়। নদীর উপর বহুস্থান ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে। তন্মধ্যে প্রকাণ্ড একটি স্খলিত দ্বিতল বাড়ীও দেখা যায়। উহার বহু প্রকোষ্ঠ ছিল। এইখানে ১২০ ফুট দীর্ঘ সমচতুষ্কোণ একটি পুষ্করিণী আছে। উহার প্রাচীর ৫ ফুট উচ্চ। ঐ লাটের অন্তর্গত শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যে অবস্থিত 'শেখের টেক' নামক স্থানে দু' একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার কিছু দূরে প্রতাপের শিবসা দুর্গ অবস্থিত ছিল। উহার প্রাচীর খাড়া আছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এইখানে আছে। এখান হইতে যতই দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায় ততই অসংখ্য পুকুর, গৃহ ও প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে একটি মন্দির আজিও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। মন্দিরটি কারুকার্য্য খচিত। উহা কালীমন্দির হইবে। কেন না নিকটেই কালীর খাল অবস্থিত। এখানে এবং নিকট চতুষ্পার্শে বিস্তর গাবগাছ দেখা যায়।

সুন্দরবন সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলি আবশ্যক। পূর্ব্বে এই বন আরও অধিক দুর্গম ছি কাঠুরিয়ারা ব্যতীত বন মধ্যে অপর কেহ ঢুকিতে স হইতেন না। কাঠুরিয়াদিগেরও অনেক কাণ্ড করিয়া প্রবেশ করিতে হইত।

আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সুন্দর বনে কাটিবার সময়। এই সময় বরিশাল, খুলনা, ফরি কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও যশোহর প্রভৃতি জেলা কাষ্ঠব্যবসায়ী কাষ্ঠ আহরণে আসে। কিন্তু এই নরখাদক ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশু কর্ত্তৃক অধি বহুলোক প্রতি বৎসর ইহাদের কবলে পড়িয়া হারাইয়া থাকে। এ কারণ এখনও পর্য্যন্ত কাষ্ঠব্যবসা স্থানীয় ফকরের দ্বারা বনদেবতার পূজা না দিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে সাহসী হয় পূর্ব্বে আবার এই পূজায় ঘটা-পটাও বড় কম ছিল স্থানীয় ফকিরের বনের জীব-জন্তুর উপর অসাম আধি ছিল। তিনি ইহাদের নিজের শাসনাধীনে রা ছিলেন। কাষ্ঠব্যবসায়ীরা প্রথমতঃ ফকিরের নি উপস্থিত হইলে তিনি পূজার জন্য স্থান নির্ব্বাচন ক দিতেন। তখন সেই স্থানে পূজার আয়োজন করা হ তাঁহার নির্দ্দেশ মত ঐ স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পরি করিয়া দিলে তিনি ভূমির উপর বৃত্তাকারে একটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ঐ বৃত্তের মধ্যে লতা প দ্বারা সাত খানা কুঁড়ে ঘর নির্ম্মিত হইত। দক্ষিণ হ প্রথম ঘরখানি বিশ্ববান্ধব জগবন্ধুর, দ্বিতীয় ধ্বংস মহেশ্বরের, তৃতীয় সর্প দেবতা মনসার, চতুর্থ জঙ্গ আত্মশক্তির রূপ-পরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। প কুটীরখানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগে কালী তাঁহার দুহিতা কালীমায়ার। অন্যভাগে জঙ্গলের বে শক্তি অপর পরীর জন্য এবং ইহার পরবর্ত্তী গৃহখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগে কামেশ্বরী দেবী অপরভাগে বুড়ী ঠাকুরাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। প রক্ষাচণ্ডী নামক বৃক্ষ, যিনি বনমধ্যে সমস্ত অকল্যাণ হই লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী দুইখ কুটীরে পতাকা উড্ডীন থাকিত। উহার প্রথম কুটীরখা গাজী সাহেব এবং তাঁহার ভ্রাতা কালুর, অপরটি তৎ চওয়াল পীর ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাম গাজীর। নিকটে ব দেবতার জন্যও একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এই স ঠিক হইয়া গেলেই দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য পূ কার্য্য আরম্ভ হইত। পূজার উপকরণ,—আতপ তৎ

---

*Bengal Past and Present Vol II. P. 159

কলা, নারিকেল, চিনি, মিষ্টি, মৃৎপ্রদীপ এবং আম্রপল্লবাচ্ছাদিত মঙ্গলঘট। এগুলি যাত্রাকালে কাঠুরিয়ারা গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া রওনা হইত। পূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে সকল গৃহগুলির উপরই পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নানারূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা পূজার কার্য্য শেষ করা হইত। তখন ফকির কাষ্ঠব্যবসায়ীদিগকে কাষ্ঠ আহরণে ভরসা দিতেন।

পূর্ব্বে যে গাজী সাহেব এবং তাঁহার ভ্রাতা কালুর কথা উল্লিখিত হইল ইহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সমস্ত পশুদিগকেই বশীভূত করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের ছিল। আহ্বানমাত্র ব্যাঘ্র সকল আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ইঁহাদের কাছে চলিয়া আসিত। এই দুই ভ্রাতা ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া জঙ্গল প্রদক্ষিণ করিতেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই ইঁহারা সমান পূজ্য ছিলেন। যে কেহ কোন উদ্দেশ্যে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার কালে গাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিত। এই গাজীসাহেব কে ছিলেন বর্ত্তমান ফকিরেরা বলিতে পারেন না। ১৯০১ সালে বেঙ্গল সেন্সাস রিপোর্টে মিঃ গেট (Mr. Gait) ইঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন,—

"Zindah Gazi from Zindik-i-Ghazi conqueror of infidels, rides on the tiger in the Sundarbans, and is the patron Saint of woodcutters, whom he is supposed to protetct from tigers and crocodiles. He is sometimes indentified with Ghazi Miayan and sometimes with Ghazi Madar. One Mahammadan gentleman tells me he is Badirudin shah Madar, who died in A. H. 840 fighting against the infidels. Songs are sung in his honour and offerings are made after a safe return from a journey. Hindu women often make vowes to have songs sung to him if their children reach a certain age. His shrine is believed to be on a mountain called Madaria in the Himalayas."

খুলনা জেলার প্রায় অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া সুন্দরবন। উহা উত্তর নিরক্ষ ২১°৩১´—২২°৩৬´ কলা এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮°৫´—৯০°২৮´ কলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। বন্যার লেভেল হইতে জমি ১২।১৩ ইঞ্চি উচ্চ। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেজর রেনেল ও অন্যান্য কর্ত্তৃক উহার জমি মাপ করা হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রবার্টসন কলিকাতা হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত জলপথ মাপ করেন এবং ১৮১১—১৪ সালে লেফট্‌ন্যাণ্ট ডব্লিউ, ই, মরিসন সুন্দরবন অঞ্চল জরীপ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা কাপ্তেন হজেস মরিসন কর্ত্তৃক উহা সংশোধিত হয়। এই মরিসন সাহেব রায়মঙ্গল হইতে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া বাণিজ্যপথ সহজ ও সুগম করিয়া দেন। উহা মরিসন খাল নামে খ্যাত। এই খাল খনন করার ফলে কালিন্দী স্রোতস্বিনী হইয়া উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল রায়মঙ্গলে বহন করিয়া দিয়া চাষের জন্য তীরবর্ত্তী ভূভাগের উন্নতি সাধন করে।

মিঃ প্রিন্সেপস্ আবার যমুনা হইতে হুগলী নদী পর্য্যন্ত এবং লেফট্‌ন্যাণ্ট হজেস পশর পর্য্যন্ত জরীপ করিয়া সমগ্র সুন্দরবন লাটে লাটে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। এই হজেস লাইন ও প্রিন্সেপস লাইন অবলম্বন করিয়া সুন্দরবনের মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর পথে ডায়মণ্ডহারবার। ভাগীরথীর ঐ অংশ সমুদ্রবিশেষ। খুলনা ও ২৪ পরগণার অসংখ্য নদনদী ও খাল দক্ষিণগামী হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে এই সকল নদনদী ও খাল দিয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করা যায়। নদী ও খালের এক একটি মিলনস্থলে ইংরেজ সরকার হইতে কাষ্ঠফলকে পথের বিবরণ দেওয়া আছে।

সুন্দরবনের উঠিত জমির মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ জমিতে ধান্য জন্মে। স্থানে স্থানে পাটের চাষও হইয়া থাকে। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের উপর যে মেঘমালার সৃষ্টি হয় তাহা বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হইয়া ঐ বনের উপর দিয়া যাইবার কালে বাধা পাইলেই গলিয়া পড়ে। ফলে প্রচুর বৃষ্টির দরুণ জমি রসযুক্ত ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়।

বন সম্পদের মধ্যে মধু, মোম, হরিণের শিং, গোল-পাতা, নল ও কাষ্ঠ প্রধান। বনের অন্তর্গত নদী ও খালে ভেটকী, পারসে, ভাঙ্গন, টেংরা, কাল, গলদা চিংড়ী, কুচো চিংড়ী, চিত্রা, তপসে, রেখা, রুচো ও দাঁতনে প্রভৃতি এবং বিল অঞ্চলে কৈ, মাগুর, সোল, ল্যাটা ও ও শলসে প্রভৃতি মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কলিকাতায় এই সকল মৎস্য চালান দিয়া বহু ধীবর জাতীয় লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। নদীর তীরে তীরে মহাজনগণ কর্ত্তৃক মৎস্যের বহু ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা কুচো চিংড়ী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য শুকাইয়া রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড় বাজারে চালান দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু এই সকল নদীতে যে পরিমাণে মৎস্য জন্মে ব্যবসায়ের দিক দিয়া উহার অত্যল্পই কাজে লাগান হয়। কারণ, কলিকাতা প্রভৃতি দূর অঞ্চলে মৎস্য সুরক্ষিত অবস্থায় পাঠাইবার তেমন কোন পাকা ব্যবস্থা এ যাবত হয় নাই। হাপরের মধ্যে জলে ভাসাইয়া কতক মৎস্য টাটকা আনিবার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু উহা অত্যন্ত সময়-সাপেক্ষ। বরফ দিয়া যে সকল মৎস্য পাঠান হয় তাহা অনেক সময় টিকে না। এ কারণ লোকসানের ভয়ে একাজে বড় কেহ অগ্রসর হয় না। কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্য সংরক্ষণের উপায় করিতে পারিলে এই বন দেশের ধন-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে।

জীব-জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, হরিণ, শূকর, বনবিড়াল, খাটাস, সজারু ও বানর প্রধান। এখানকার ব্যাঘ্রকে 'Royal Bengal Tiger' বলে। পূর্ব্বে এই বনে গণ্ডারও বাস করিত বলিয়া শুনা যায়। জঙ্গলে নানা জাতীয় পক্ষী ও বিষধর সর্প আছে। নদ-নদীগুলি কচ্ছপ-কুম্ভীরে পূর্ণ।

ইহাই সুন্দরবনের এক চিত্র। ইহার আর এক মন-মুগ্ধকর চিত্রও আছে। কিন্তু ইংরেজ পর্য্যটক মিঃ এফ্., ই, পারজিটার (Mr. F. E. Pergeter) সুন্দরবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"The scenery in the Sundarbans possesses no beauty." * অর্থাৎ সুন্দরবনের কোন সৌন্দর্য্য বা রূপ নাই। সকলের চক্ষু কিছু সমান নয়। সুন্দরবন পার্ব্বত্য বন নহে। এই বনে ঝরণা নাই—উষ্ণ প্রস্রবণ নাই—উপলখণ্ড নাই—গাঢ় তমসাবৃত পার্ব্বত্য গুহাদিও নাই। ধাপে ধাপে পাহাড়ের শ্রেণী ইহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াও নাই। সমতল শ্যামল জলাভূমির উপর ইহা অবস্থিত। অসংখ্য প্রকাণ্ডকায় নদ-নদী এবং খাল, বিল রজত শুভ্র জলধারায় স্নেহালিঙ্গনে ইহার সারাদেহ জটাজালে জড়াইয়া ধরিয়া কখনও বা নিস্তরঙ্গ—নিদ্রালস; কখনও বা কল্ কল্ গল্ গল্ শব্দে, আবার কখনও বা ভীম গর্জ্জনে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিয়া ছুটিয়া চলে। তীর-লগ্ন শরবন ও বনজ লতার ঝোপ শিশুসুলভ কৌতূহলে নদীর জলের সফেন বীচি-ভঙ্গে পড়িয়া সৈকত-সান্নিধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি খায়। হরিণশিশু লাফাইয়া ছুটিয়া কখনও বা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়া নদ-নদীর চঞ্চল গতি-বেগ চাহিয়া চাহিয়া দেখে। অসংখ্য নদ-নদী ও খাল ইহাকে দ্বীপাকারে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গর্জ্জন-গীতি এবং তাণ্ডব-নৃত্য-রত সলিল বেষ্টনীর মধ্যে এই সকল ভাসমান স্বপ্নপুরীগুলিকে প্রেমালিঙ্গনে কাঁপাইয়া দেয়। দিগম্বর শিবের মত উন্নতশীর্ষ বৃক্ষসকলের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া গুঞ্জন করিয়া উঠে। নদী সকল যখন স্থির, নিস্তরঙ্গ, অস্ত-আকাশের লোহিত রাগ-রেখা যখন হীরক-জলে আপন আপন স্বর্ণদেহ মিশাইয়া খেলিতে থাকে তখন মাঝি-মাল্লারা মিঠা সুরে গাহিয়া চলে,—

"সম্মুখেতে রাঙ্গা মেঘ করে খেলা,
তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা।"

আবার যখন নদ-নদীর দুর্বিনীত বীচিমালা ক্ষেপিয়া গিয়া সর্পের মত ফণা তুলিয়া গর্ভস্থিত নৌকাসকল নাচাইয়া দোলাইয়া সংহার মূর্ত্তিতে গ্রাস করিতে চাহে, তখন তাহারা নৌকা সামলাইতে হিমসিম্ খাইয়া, ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে গাহিয়া উঠে,—

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নে-রে—বাইতে পারলাম না—
আ—আহা—হা।"

[ক্রমশঃ

* The Sunderban, Calcutta Review, Vol. LXXXIX, 1889.

জাগৃহি

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

এক

"মরে গেলাম। আর মারবেন না, বাবু! পায় ধরছি!"

মোটর মৃদু গতিতে চলিতেছিল। মনটা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। সহসা বালক-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ কাণে গেল। দশবৎসরের কন্যা আরতি পাশে বসিয়াছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, দেখুন, ছেলেটাকে কিরকম মারছে!"

সোফার আদেশ পাইবামাত্র গাড়ী থামাইল।

বাহিরে আসিয়া অদূরে ক্ষুদ্র জনতা দেখিলাম। একজন বলিষ্ঠ যুবক একটি বছরদশেকের ছেলের হাত মুচড়াইয়া ধরিয়াছে। অপর একজন অর্দ্ধবয়সী লোক বালকের পৃষ্ঠে কিল চড় বেপরোয়া বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। ক্রুদ্ধজনতা বালককে গালি দিতেছে।

একজন বলিয়া উঠিল, "এই বয়সে চুরিবিদ্যে ধরেছিস্! আচ্ছাকরে মার লাগাও, বরেনবাবু।"

প্রাণটা যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বালক ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তচীৎকারে বলিতেছিল, "আর মারবেন না, বাবু! প্রাণ গেল।"

কিন্তু চোর-বালকের উপর কাহারও দয়া হইতে পারে না। দ্রুত চলিলাম। সহসা দেখিলাম, একটি আঠার উনিশ বৎসরের প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ যুবক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রহারকারী ব্যক্তিকে সবলে সরাইয়া দিয়া অপর যুবকের হাত হইতে বালককে মুক্ত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কি করছেন ম'শাই, ছেলেটা যে মরে গেল!"

বরেনবাবু নামক লোকটি আরক্ত ক্রুদ্ধমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুমি কেহে বাপু? ছেলেটা ঐ বাড়ী থেকে টাকা চুরি করেছে, তাকে মারবে না?"

জনতাও সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

নবাগত যুবক বলিল, "চুরি করা মহাপাপ—মস্ত দোষ তা জানি। কিন্তু তাই বলে এ রকম শাস্তিদেবার কি অধিকার আমাদের আছে বল্‌তে পারেন?"

চোর চুরি করিলে তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার মানুষের নাই? লোকগুলি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

যে যুবক বালকের হাত মুচড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে সক্রোধে বলিল, "দুচার ঘা দিয়ে ছেলেটাকে শাসন ক'রা হচ্ছিল। তা না করে যদি পুলিশে দেওয়া হত, তাতে খুব ভাল হত বুঝি?"

প্রিয়দর্শন যুবক শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "প্রহারের অধিকার যেমন আমাদের নেই, পুলিশে দেবার অধিকারও আমাদের তেম্‌নি নেই। কারণ, এই ছেলেটির চোর হবার মনোবৃত্তির জন্য আমরা সবাই দায়ী।"

কথাটা শুনিবা মাত্র চমকিয়া উঠিলাম। আরতি মার হাত ধরিয়া জনতার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম।

একজন উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তার মানে?"

যুবক পূর্ব্ববৎ শান্তকণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলিল, "মানে খুব সহজ। এ ছেলেটি চোর হল কেন বল্‌তে পারেন?"

একজন বলিয়া উঠিল, "মন্দ সঙ্গে মিশে চুরি কর্‌তে শিখেছে।"

নবাগত যুবক বলিল, "তার জন্য দায়ী কে, ম'শাই?"

বরেনবাবু বলিল, "ওর মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "শুধু তাঁরাই নন। আপনি, আমি—আমাদের সমাজের যাঁরা শীর্ষস্থানে আছেন তাঁরা এবং যাঁরা আমাদের লালন ও শাসনের কর্ত্তা তাঁরাও। এক কথায় সমগ্র মনুষ্যসমাজ।"

এই তরুণ বয়স্ক যুবকের কথার মধ্যে চিরন্তন ভাবধারার যে প্রবাহ ছিল তাহা আমারও হৃদয়তটে আঘাত করিতে লাগিল। চিরন্তন সত্য বস্তুতান্ত্রিক মিথ্যা সভ্যতার পিনাল কোডের ধারার মধ্যে হারাইয়া গিয়া যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বিশ্ব নিয়ন্তার বিধান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া যেন মনে হইল।

যুবক বলিতেছিল, "ছেলেটি অভাবের তাড়নায় অথবা লোভে পড়ে চুরি করেছে। ওর অভাব মেটাবার ও শিক্ষার দায়িত্ব আমরা নেই নি—মনুষ্যসমাজ সে বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু যেই ও মনুষ্যসমাজ-বিধানের গণ্ডী লঙ্ঘন করে অন্যায় কাজ করেছে, অমনি তার অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য

আমরা কঠোর এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু ভেবে দেখে বলুন ত', সে অধিকার কি আমাদের আছে ?"

জনতার অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসমাজের লোক। তাঁহারা বুঝিলেও সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই একজন বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ওরকম মতবাদ চালাতে গেলে আর অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া চল্‌বে না। তাহলে চোর, গাঁটকাটা, জুয়াচোর, ডাকাত, লম্পট, গুণ্ডা, খুনে সবাইকে ছেড়ে দিতে হয়।"

যুবক বলিল, "রোগের প্রতিকারের বা রোগ যাতে না হতে পারে সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার এবং অবস্থা সৃষ্টির বদলে অমোঘ দণ্ডের ব্যবস্থা করলেই এই রকম হবে। কিন্তু তাতে চিরন্তন সনাতন সত্য আমাদের উপর প্রসন্ন হবেন না।"

বালক একটু আশ্বস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবু, আমি চুরি কর্‌তে চাই নি। ঐ বাড়ীর চাকর আমাকে লোভ দেখিয়ে ভিতরে তার বাবুর ঘরে নিয়ে যায়। যে বাক্সে টাকা ছিল, তার গায়ে চাবি লাগান ছিল। চাকরটা চৌকী দিতে থাকে, আমি ওর কথামত টাকা বের করে আনি। বাড়ীর লোকরা দেখতে পাবামাত্র চাকরটা পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়েছে, আমি পালাতে পারি নি।"

নবাগত যুবক বলিল, "সে টাকা কোথায় ?"

"ঐ নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছি।"

তদন্তের পর টাকাগুলি পাওয়া গেল।

জানা গেল বালকের পিতা আদালতে মুহুরীগিরি করিয়া সামান্য উপার্জ্জন করেন। অতি দরিদ্র কায়স্থ পরিবার। মাতা আছেন, কিন্তু অন্যত্র পাচিকাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অগ্রসর হইয়া যুবকের হাত ধরিয়া বলিলাম, "আপনার কথা একটাও মিথ্যা নয়। আমরা সত্যই অপরাধী। কিন্তু এত অল্প বয়সে আপনার এ জ্ঞান কোথা থেকে হ'ল ? আপনাকে আমি অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

যুবক লজ্জারক্ত আননে দৃষ্টি নত করিল।

জনতা আমার মন্তব্যের পর যেন নিশ্চল হইয়া রহিল। আমার বেশভূষা, মোটরগাড়ী হয় ত' জনতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, যুবকের নাম অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এস্‌, সি পড়ে। এবার তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণী চলিয়াছে।

চোর-বালকের হাত ধরিয়া যুবক বলিল, "কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী ? আমিও এই অঞ্চলে থাকি। এখন থেকে তোমার শিক্ষার ভার আমি নিলাম।"

আরতি আমার পাশে দাঁড়াইয়া যুবককে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। কথাগুলি সে বুঝিতেছিল কি না জানি না, কিন্তু তাহার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন অভিনন্দনের ভাষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই

আমার একমাত্র সন্তান আরতি মাকে লইয়া আমি ও গৃহিণী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ, সে গতানুগতিক পথে চলিতে চাহিত না। একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। আমরা চাহিয়াছিলাম, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সে কলেজে পড়িবে। সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সুন্দরী। কলেজে পড়িলে ভাল ঘর বর জুটিয়া যায় বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল।

কিন্তু আই, এ, পড়িবার সময় সে বলিয়া বসিল যে, গৃহে পড়িয়া সে পরীক্ষা দিবে। কলেজের মেয়েদের সঙ্গে গিয়া হুড়াহুড়ি করিতে তাহার মন চাহিত না। সঙ্গিনী বলিতে সে তাহার জননীকে বুঝিত এবং সঙ্গী বলিতে তাহার বাবাই না কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর আছেন তাহার মাষ্টার মহাশয়। অবশ্য এজন্য মনে মনে আমি খুবই খুশী ছিলাম। কিন্তু গৃহিণী বলিতেন, এই প্রগতির যুগে অত্যন্ত আধুনিকা না হইলে মেয়ের জন্য মনের মত পাত্র পাওয়া কঠিন হইবে।

অবশ্য এ বিষয়ে গৃহিণীর সহিত আমার মতের পার্থক্য ছিল। প্রগতিপরায়ণা, অত্যন্ত আধুনিকা মেয়েদের যে ভাল ঘর বর সর্ব্বক্ষেত্রে সুলভ তাহা সত্য নহে। তবে নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকা অবাঞ্ছনীয় নহে।

আরতি বাড়ীতে গান গাহিতে শিখিয়াছিল। তাহার জননী ঐ বিদ্যা বিশেষভাবে পিতৃগৃহ হইতে শিখিয়া আনিয়াছিলেন। তবে তিনি নৃত্যবিদ্যায় অজ্ঞ। আরতিরও সে দিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না।

প্রবীণ ও পরিণতবয়স্ক কলেজের অধ্যাপক অবিনাশ

চট্টোপাধ্যায় আরতির গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁহাকে মোটা পারিশ্রমিক দিতে হইত। কিন্তু অর্থের অভাব আমার ছিল না। তাই একমাত্র সন্তানের সুশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিতাম না।

অধ্যাপকমহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে, আমার এই কন্যাটির বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই ধীর। এমন মেধাবিনী মেয়ে নাকি হাজারে একজন মেলাও কঠিন। অবশ্য একথায় আমার পিতৃহৃদয় গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিত।

পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত সে অধ্যাপকমহাশয়ের নিকট আরও অনেকপ্রকার ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিত। অল্পবয়সে তাহার পাঠস্পৃহা দেখিয়া আমিও সময় সময় বিস্মিত হইতাম।

আমি নিজেই একজন কেতাবকীট ছিলাম। পিতার আমল হইতে অজস্রগ্রন্থ আমার পুস্তকাগারে সঞ্চিত হইয়াছিল। আমিও বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আরতি আমাকে প্রায়ই বলিত, "বাবা, আপনার কলকাতায় অনেক বাড়ী আছে। ভাড়া দিয়ে অনেক টাকা আপনি পান। কিন্তু দেশের জমিগুলো যদি চাষ করতেন আরো ভাল হত না কি?"

পিতা কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিবার পর গ্রামে বড় একটা যাইতেন না। আমিও তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মার তীরেই আমাদের পৈতৃক বাসভবন এবং বহু জমি-জমা ছিল। ঠিক জমিদারী না বলিতে পারিলেও তালুকের সংখ্যা যে অল্প ছিল তাহা নহে। নায়েব গোমস্তাদিগের উপর আদায় তহশীলের ভার দিয়াই পিতার মত আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম। পৈতৃক ভিটায় বারমাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু আমরা কদাচিৎ দেশে গিয়া এই সকল পার্ব্বণের আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।

আরতি মাঝে মাঝে দেশে যাইবার জন্য আমাদিগকে উত্যক্ত করিত; কিন্তু গৃহিণী তাহাতে সম্মত হইতেন না। তিনি পশ্চিম-বঙ্গের কন্যা; পদ্মা পার হওয়ার প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। অবশ্য আমার মন পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তির রঙ্গমঞ্চ দেখিবার জন্য আগ্রহে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। বাল্য ও কৈশোরে কয়েকবার বাবার সঙ্গে দেশের ভিটায় গিয়াছিলাম। আনন্দ যে পাই নাই তাহাও নহে। কিন্তু গৃহিণীর নিদারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বে বিবাহের পর এতকাল দেশে যাইতে পারি নাই।

কলিকাতার আবহাওয়ায়, বিলাসম্ভোগে লালিত পালিত হইয়াও আরতির মন কেন যে পল্লীগ্রামে যাইবার জন্য এমন ব্যস্ত হইত তাহার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি নাই। কিন্তু বুঝিতে পারিতাম যে, দেশে যাইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে তাহার আননে বিমর্ষতা ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু জননীর ঘোর অনিচ্ছা দেখিয়া সে আর পীড়াপীড়ি করিত না।

কিন্তু দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের আলোচনা হইলেই সে আগ্রহভরে সে কথা শুনিত এবং বলিত, "বাবা, দেশবন্ধু পল্লী-গ্রামের কত প্রশংসা ক'রে গেছেন। দেশের যাঁরা মহৎ লোক, সবাই গ্রামের উন্নতি করবার কথা বলছেন; কিন্তু আপনি মোটেই দেশে যেতে চান না।"

তাহার এই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয়ে সত্যই আমি আনন্দ লাভ করিতাম; কিন্তু বিব্রতবোধও করিতাম। আমার আরতি মা এ যুগের মেয়ে হইয়াও যেন বহু অতীত যুগের মনোবৃত্তির অধিকারিণী হইয়াছে।

তাহার গর্ভধারিণী বলিতেন, "দেখ্ আরতি, ওসব শেখা-বুলি তুই আমার কাছে বলিস্ না। লেখাপড়া শিখে মেয়ে যেন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্ছেন!" তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কখনও বলিতেন, "এসব কথা তুমিই ওকে শিখিয়েছ। আমি তোমাদের দেশে যেতে চাই না, তাই ওর মুখ দিয়ে ঐ রকম কথা বলাচ্ছ।" আবার কখনও বলিতেন, "তা বেশ ত'! তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি যাও না। আমি কিন্তু এখান থেকে নড়্ছি না।"

আমাদিগের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকাল মধ্যে মতানৈক্যের সূত্র ধরিয়া মনোমালিন্যের অবকাশ কখনও ঘটে নাই। পত্নীর তীব্র মন্তব্য শুনিয়াও আমি নীরবে হাসিতাম; কিন্তু বিব্রতবোধ যে করিতাম তাহা মিথ্যা নহে।

তিন

কৃতিত্বের সহিত আই-এ পরীক্ষায় আরতি সাফল্যলাভ করিল। তাহার জননী কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আমাকে তাড়া দিতে লাগিলেন। আমিও মেয়েকে খুব বড় করিয়া

বিবাহ দিবার পক্ষপাতী ছিলাম না। ষোড়শী কন্যাকে পাত্রস্থ করার বিলম্ব করা সুসঙ্গত নহে। সর্দার বিবাহ বিলকে কোনদিন কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।

কিন্তু আরতি বি-এ পড়িবার জন্য জিদ ধরিল। সে স্বভাবতঃ প্রগল্ভা, বাক্‌চতুরা ছিল না। কিন্তু বিবাহের আলোচনা উঠিলেই সে প্রকারান্তরে তাহার জননীকে জানাইয়া দিত, বি-এ পাশের পূর্ব্বে সে তাহার পিতৃগৃহ হইতে অন্যত্র গিয়া অন্য প্রকার জীবনযাত্রা যাপনের আদৌ পক্ষপাতিনী নহে।

গৃহিণী মুখে যাহাই বলুন না কেন, আরতি তাঁহার নয়নের মণি ছিল। তাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই রাখিবার ব্যবস্থারও তিনি অনুমোদন করিতেন না। আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব আরতিই পাইবে সে কথা সত্য এবং মেয়ে ও জামাতাকে ভালভাবে গৃহে রাখিবার প্রচুর সঙ্গতিও আমাদের ছিল; কিন্তু গৃহ-জামাতার কল্পনা পর্য্যন্ত আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। উহাতে আমাদের খেয়াল মিটিতে পারে বটে, কিন্তু মেয়ে ও জামাতার পরিণাম সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।

আরতির বি-এ পড়া চলিতে লাগিল। গৃহে পড়িয়াই সে পরীক্ষা দিবে। এদিকে আমিও সুপাত্রের সন্ধানে ঘটক নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু মনের মত সুপাত্রের সন্ধান পাইলাম না। মেয়ে সুখী হইতে পারে এমন ঘর ও বর এ যুগে যেন দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

সে-দিন সন্ধ্যার পর আরতির পড়ার ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মাষ্টারমহাশয় তাহাকে পড়াইতেছিলেন। এমন ভাবে মাঝে মাঝে আমি পাঠকক্ষে আসিয়া নীরবে বসিতাম। আমার মা জননীর মনের গতি বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করার সুবিধা অধ্যয়নকালে পাওয়া যায় উহা জানা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করিতাম।

আরতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসও লইয়াছিল। সে ইতিহাসও খুব ভালবাসিত। আমারও ইতিহাসের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে মানুষ হওয়া যায় না।

মাষ্টারমহাশয় তাহাকে সে-দিন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়াইতেছিলেন। নীরব শ্রোতা হিসাবে আমিও উহা শুনিতেছিলাম। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বীজ কেমন করিয়া ফরাসী জন-সাধারণের মনে উপ্ত হইয়াছিল, মাষ্টার মহাশয় তাহা সুন্দররূপে বুঝাইতেছিলেন।

সহসা আরতি প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা, মাষ্টার মশাই, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রেরণা দাসজীবনে কি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে?"

প্রশ্নটি শুনিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে-দিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণী একটি পাত্রের কথা বলিয়াছিলেন। এম্-এ পাশ ছেলেটি সেক্রেটেরীয়েটে ভাল চাকুরী করিতেছে। কিন্তু আমি চাকুরিয়া পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের পক্ষপাতী নহি, সে-কথা গৃহিণীকে বলিয়াছিলাম। তাহাতে উভয়ের মধ্যে কিছু আলোচনাও চলিয়াছিল। আরতি কি অন্তরালে থাকিয়া সে আলোচনা শুনিয়াছিল?

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "দাসত্ব মনুষ্যত্ব প্রকাশের অন্তরায় তা তোমাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছি, মা। মনুষ্যত্বের প্রকাশ যে আধারে হয় না, সেখানে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র বিশেষ কাজ করতে পারে না।"

কথাটা খুবই সত্য। আমি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করিলাম না। শিক্ষক ও ছাত্রীর আলোচনা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

আরতি বলিল, "ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হলে আধারকে হীনতার সংস্রব থেকে মুক্ত রাখাই দরকার। সুতরাং দাসজীবন মোটেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। কেমন, তাই নয় কি, মাষ্টারম'শাই?"

"তুমি ঠিক ধরেছ, মা। তাই সকল দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ দাসত্বজীবনকে অবলম্বন করেন নি।"

কন্যার মনের গতি কোন্ পথে চলিতেছে তাহার প্রচুর ইঙ্গিত পাইলাম। মনে মনে সংকল্প দৃঢ় হইল যে, চাকুরীজীবীর হাতে আরতিকে সমর্পণ করিলে সে সুখী হইবে না। যে যুবক স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এমন ভাবের পাত্র নির্ব্বাচনের দিকেই এখন হইতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিঃশব্দে পাঠকক্ষ হইতে বাহির হইবামাত্র দেখিলাম,

পর্দ্দার অন্তরালে গৃহিণীও দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করিলাম।

বলিলাম, "মেয়ের মনের ভাব বুঝলে?"

তিনি বলিলেন, "আমি রোজই দু'বেলা পড়ার সময় শুন্‌ছি। তুমি কি মনে কর, আমাদের একমাত্র সন্তানের দিকে আমি লক্ষ্য রাখি না?"

তিনি যে সু-গৃহিণী তাহা জানিতাম। কিন্তু এমন দুরদর্শিনী তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাই নাই। পঁচিশ বৎসর একত্রবাসের ফলেও নারীচরিত্রকে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি নাই। আজ মনে হইল, পুরুষ সত্যই স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ।

আমার হাত ধরিয়া উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমার এ গৌরী মায়ের যোগ্যবর সহজে মিল্‌বে না দেখছি

হাসিয়া বলিলাম, "দুর্ভাবনা করো না, ভগবানই মিলিয়ে দেবেন।"

চার

কলিকাতার চলমান জীবনস্রোতে সহসা ভীষণ আবর্ত্ত দেখা দিল। নাগরিকদিগের সহজ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা, শঙ্কা ও বিভীষিকা জাগিয়া উঠিল। সিঙ্গাপুরে ফ্যাসিষ্ট জাপানীশক্তির জয়লাভে সমগ্র ভারতবর্ষেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতার বিশৃঙ্খলা সীমা অতিক্রম করিল।

বোমার আশঙ্কায় নিষ্প্রদীপ সহর হইতে দলে দলে সহর-বাসীরা অন্যত্র পলায়ন করিতে লাগিল। এমনই জনরব উঠিল, জাপান এখনই বিমান আক্রমণ করিয়া সহর ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। সহরত্যাগের অনুকূলে সরকারী বিজ্ঞপ্তিও বাহির হইল।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই মধ্যে পলায়নের বেগ—স্ত্রী-পুত্রগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিবার জন্য আকুলতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আমাদিগকেও স্পর্শ, অভিভূত করিয়া ফেলিল।

ত্রিশখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীর অধিকাংশ ভাড়াটিয়াই বাড়ী চাবী বন্ধ রাখিয়া অনির্দ্দেশযাত্রায় পাড়ি জমাইলেন।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার প্রায় সকল গৃহ হইতেই নারী, বালক-বালিকা ও শিশুর কলরব অন্তর্হিত হইয়া গেল। চাকুরীজীবী পুরুষরা বাড়ী আগলাইয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ মুক্ত রাখিলেন।

গৃহিণীর সদাপ্রসন্ন মুখে ভীতির ম্লানছায়া গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "কি হবে? আমরা কোথায় যাব?"

আরতি হাসিয়া কহিল, "কেন, মা, আমাদের দেশে চল যাই। সেখানে ত' আমাদের সবই আছে।"

গৃহিণীর মুখে আপত্তির একটি শব্দও বাহির হইল না।

আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই নায়েব গোমস্তাকে জরুরী চিঠি লিখিয়া বাড়ীঘর বাসোপযোগী করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়াছিলাম। সে-কথা বাড়ীর কাহাকেও জানাই নাই। শুধু তাহাই নহে, বহু মূল্যবান দ্রব্য ব্যাঙ্কে রাখিবার নাম করিয়া বিশ্বস্ত লোকের সাহায্যে দেশের সুদৃঢ় কোষাগারে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। নায়েবমহাশয় আমাকে জানাইয়াছিলেন, বাড়ীঘর চুণকাম করিয়া সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে।

আমি শান্তভাবে বলিলাম, "তুমি ত' দেশে কখনো গেলে না। এবার চল না সেখানে যাই। আমাদের ওখানে কোন জিনিষেরই অভাব হবে না। শুধু সিনেমা মোটর ছাড়া—"

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সিনেমা দেখ্‌বার সখ আমার নেই। আমার ভয়, পাড়াগাঁয়ের জঙ্গল, আর মশা।"

হাসিয়া বলিলাম, "ওটা তোমার কল্পনা। আমাদের গ্রাম দেখ্‌লে তোমার ভুল ভেঙ্গে যাবে। এখানে টাকায় ৪ সের জলো দুধ খাও। সেখানে বাড়ীর গরুর মিষ্টি গাঢ় দুধ দেখলে কত আনন্দই পাবে। গাওয়া ঘি চোখে দেখ নি বল্‌লেই চলে। পুকুরের মাছ যত চাও তত পাবে

আরতি বলিল, "গোলাভরা ধান আছে ত', বাবা?"

"গেলেই দেখতে পাবে, মা। সেখানে শুধু সহরের বিলাসিতা নেই। আর সবই আছে।"

"কবে আমরা যাব, বাবা?"

রিজার্ভ কর্‌বার ব্যবস্থা করছি। পেলেই রওনা হব

আরতি বলিল, "মাষ্টারমশাই বল্‌ছিলেন, আজকাল গাড়ীতে জায়গায়ই পাওয়া যায় না—রিজার্ভ অসম্ভব।"

সে-কথা অতিরঞ্জিত নহে। কিন্তু বি এণ্ড এ রেলের একজন উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আমার চৌরঙ্গীস্থিত একখানি বাড়ীর ভাড়াটিয়া। তাঁহাকে দিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন পাওয়া যাইবে।

আরতি নতনেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, একটা কথা বল্‌ব? আপনি রাগ করবেন না?"

তাহার কথার ভঙ্গীতে মন আর্দ্র হইল। আমার একমাত্র সন্তান এমন কি কথা বলিবে, যাহাতে আমার ক্রোধ প্রকাশ পাইতে পারে?

হাসিয়া বলিলাম, "মা তোকে ত' আমার কিছুই অদেয় নেই। তবে অমন ভাবে কথা বল্‌ছিস্ কেন?"

"বলছিলাম মাষ্টারমশাইকে আমাদের সঙ্গে নিলে হয় না? তাঁর কলেজ ত' এখন তিন মাস বন্ধ। সংসারে তিনি ও তাঁর স্ত্রী। আমাদের বাড়ীতে জায়গার অভাব হবে না।"

বি-এ পরীক্ষা দিবার তাহার আগ্রহ এ অবস্থাতেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সকল পরীক্ষার সময়ই পিছাইয়া দিয়াছেন। স্কুল কলেজ সবই বন্ধ। আরতি মায়ের এ ইচ্ছাটা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতে হইবে।

বলিলাম, "তাঁকে বলে দিও, যদি তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে চান, সমাদরে তাঁদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হবে।"

আরতির আনন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পাঁচ

ঢাকা মেল উর্দ্ধশ্বাসে অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া ছুটিতে-ছিল। প্রথম শ্রেণীর একটা রিজার্ভ কামরায় আমরা কয়জন যাত্রী। নীচের বেঞ্চগুলিতে আরতি তাহার মাতা এবং মাষ্টারমহাশয়ের পত্নী সুখসুপ্তা। উপরের একটি বাঙ্কে মাষ্টার মহাশয় স্থান করিয়া লইয়াছেন।

আমার চোখে নিদ্রা নাই। রেলে আমার ঘুম হয় না। আমি গৃহিণীর মাথার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের বিচিত্র রূপ দেখিতেছিলাম।

ডাকগাড়ীর ইঞ্জিন হইতে মাঝে মাঝে আর্ত্ত চীৎকার উত্থিত হইতেছিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া ট্রেন অধীরগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সমগ্র প্রকৃতি নিদ্রামগ্ন। প্রান্তরের মসিরেখা—নিষ্প্রদীপ-গ্রামগুলির ছায়াচ্ছন্নরূপ মানসপটে বিচিত্র ভাবের সঞ্চার করিতেছিল।

গাড়ীতে চড়িলেই আমার তাম্রকূটধূমপানেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে চুরুটিকায় অগ্নি সংযোগ করিতেছিলাম। গড়গড়া সঙ্গেই ছিল, কিন্তু পার্শ্বস্থ কক্ষে নিদ্রামগ্ন ঠাকুর বা বিশুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া ধূমপান করিবার ইচ্ছা হইল না। বেচারারা আজ খুব পরিশ্রম করিয়াছে।

সহসা একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া ট্রেন থামিয়া পড়িল। এখানে ডাক গাড়ী থামিবার কথা নহে। বাতায়নের ধারে আসিয়া দেখিলাম, একটা ছোট ষ্টেশনের কাছে গাড়ী থামিয়াছে।

ব্যাপার কি? সমগ্র গাড়ীর আরোহীরা সচকিত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

গার্ড সাহেব লণ্ঠন হস্তে অগ্রসর হইতেই প্রশ্ন করিলাম, কি হইয়াছে?

তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বিপদজ্ঞাপক রক্ত আলোক দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ট্রেন থামান দরকার।

পথের ধারের ছোট ষ্টেশনটি সহসা সজাগ হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারা গেল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনে একখানি গোয়ালন্দগামী মালগাড়ীর ইঞ্জিনের সহিত, কলিকাতাগামী ডাকগাড়ীর ইঞ্জিনের সংঘর্ষ হইয়াছে। তাহার ফলে মালগাড়ীর ইঞ্জিন ও একখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়াছে। ডাকগাড়ীর না কি কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। শুধু ইঞ্জিন গাড়ী জখম হইয়াছে। রেলপথ গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব। ততক্ষণ ডাকগাড়ী এই ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতে বাধ্য।

ঘড়ীতে তখন ২টা বাজিয়াছে। প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নিরুপায়।

গৃহিণী, আরতি—সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

মাষ্টারমহাশয় নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "চমৎকার অবস্থা দাঁড়াল, মণিবাবু!"

বলিলাম, "ভবিতব্য বলুন! বোমার ভয় এড়াতে গিয়ে ট্রেন সংঘর্ষের অবস্থা আমাদের ঘটে নি, এ জন্ত তাঁকে ধন্তবাদ দেওয়াই উচিত।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "এ দুর্ভোগ যে কতক্ষণ আছে, কে জানে!"

আরতি বলিল, "আগের ট্রেনের কোন লোকজন মারা পড়ে নি ত, বাবা?"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "মা লক্ষ্মীর একটা বৈশিষ্ট্য দেখ্‌ছি, মণিবাবু। পরের জন্ত ভাবনাটাই বেশী।"

কন্তার সম্বন্ধে এরূপ প্রশংসা শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। বলিলাম, "কোন লোকজন মরে নি বা আঘাত পায় নি বলেই শুন্‌ছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাই যেন হয়।"

সহসা মাষ্টারমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এটা রিজার্ভ কামরা!" বলিতে বলিতেই তিনি দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ীর আলোতে দেখিলাম, দুইজন য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ-ধারী লোক দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মাষ্টারমহাশয়ের সাহায্যের জন্ত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই লোক দুইটি বলপূর্ব্বক কামরার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা য়ুরোপীয় হইলেও ভদ্রবংশের সন্তান নহে, তাহা তাহাদের আকার প্রকারেই বুঝা গেল।

ক্রোধভরে বলিলাম, "এ গাড়ী রিজার্ভ করা। এখুনি নেমে যাও।"

উভয়ে বিদ্রূপভরে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যাব না। এ গাড়ীতে অনেক যায়গা। আমাদের গাড়ী মানুষে ভরা। এখানেই আমরা থাকব!"

তাহাদিগের অশিষ্ট ব্যবহারে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "দেখ্‌ছ না, এখানে ভদ্র মহিলারা রয়েছেন। তোমাদের একটু ভদ্রতাজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই! যাও—এক্ষুনি নাম!"

অবশ্য প্রৌঢ়ত্বের পদবীতে পা দিলেও, দুর্ব্বল ছিলাম না। চিরদিন শক্তিচর্চ্চা করিয়াই আসিয়াছি।

মাষ্টারমহাশয় তাহাদিগকে ঠেলিয়া নামাইবার চেষ্টা করিতেই একজন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "এমন লোভনীয় সংসর্গ ছেড়ে আমরা নিশ্চয় যাচ্ছি না।"

তাহাদিগের লুব্ধদৃষ্টি আরতির দিকে নিবদ্ধ দেখিলাম। আরতির আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখে শঙ্কার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

ক্রোধভরে গর্জ্জন করিয়া আমি এক জনের বুকে পদাঘাত করিতেই অসভ্য বর্ব্বরটা গাড়ী হইতে নীচে প্লাটফরমে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় লোকটা আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নারীকণ্ঠের মিলিত আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমিও মরিয়া হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিলাম। উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হইতেছে, এমন সময় য়ুরোপীয়টা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "Oh God!—হা ভগবান!"

চাহিয়া দেখিলাম, ক্রুদ্ধ দেবসেনাপতির ন্যায় এক সুন্দর যুবক য়ুরোপীয়টাকে এক টানে গাড়ী হইতে প্লাটফরমে নামাইয়া দিল।

প্রথম যে লোকটাকে আমি পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সে লোকটা কখন উঠিয়া আসিয়া মাষ্টারমহাশয়কে চাপিয়া ধরিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। দেখিলাম, আর একটি তরুণ বয়স্ক কিশোর সেই য়ুরোপীয়টার মুখে অনবরত ঘুষি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গোলমাল শুনিয়া গার্ড ছুটিয়া আসিল। অনেক যাত্রীও সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছিল।

সকল কথা শুনিয়া গার্ড বলিল, "এরা সত্যই অন্যায় করেছে। যদি বলেন ত এদের পুলিশের হাতে দিয়ে দিই।"

আমি বলিলাম, "তাই করাই উচিত। কিন্তু আদালতে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই। এ সকল কুকুরকে মুগুর মারা ছাড়া ঔষধ নেই!"

দেব সেনাপতির মত প্রিয়দর্শন যুবকটি বলিল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। গার্ড সাহেব, ওদের অন্ত কামরায় বসিয়ে দিলেই ভাল হয়।"

অপর কিশোরটি বলিল, "ওদের গায়ের ব্যথা সারতে সময় লাগবে। আপনার যুযুৎসুর প্যাঁচ ও ঘুষির বহর বড় সহজ নয়!"

যুবক দুইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্ত অধীর হইয়াছিলাম। মাষ্টারমহাশয় তখনও হাঁপাইতেছিলেন।

বলিলাম, "আপনারা গাড়ীতে উঠে আসুন। আজ আপনারা সাহায্য না করলে অনেক লাঞ্ছনা আমাদের হয় ত ভোগ করতে হ'ত।"

আমার সাগ্রহ আবেদন তাহারা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

দেখিলাম, আরতির নাসারন্ধ্র তখনও আরক্ত ও স্ফীত। সে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওদের পুলিশে দিলেন না, মাষ্টার মশায়! আমার বাবার গায় যে হাত তোলে তাকে আমি মরে গেলেও ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না!"

প্রথম কান্তিমান যুবক প্রশংসদৃষ্টিতে আরতির দিকে চাহিয়া বলিল, "চমৎকার! বাঙ্গালীর মেয়েদের মুখে এমন কথা আমি আগে কখনো শুনি নি! উনি কি আপনার মেয়ে, স্যার?"

স্বীকার করিলাম, আমারই একমাত্র সন্তান এই আরতি।

তাহার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, "পশুদুটো যা মার খেয়েছে তাই যথেষ্ট, মা! পুলিশের হাঙ্গামায় না যাওয়াই ভাল। এর জন্য আমাদের আবার আদালতে যাওয়া আসা কর্‌তে হবে। তাতে কোন লাভ হবে না।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "সে কথা ঠিক।"

মেয়েরা একখানি বেঞ্চে গিয়া বসিলেন।

যুবক দুইজনকে আমাদের বেঞ্চে পাশে বসাইলাম।

প্রথম যুবক বলিলেন, "এখনো রাত আছে। ওঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। আমরা আপনাদের পাশের গাড়ীতেই আছি। এখন সেখানে যাই।"

আমি বলিলাম, "তা কি হয়! যাঁরা আমাদের এত সাহায্য কর্‌লেন, তাঁদের পরিচয় না জানলে যে আমাদের অপরাধ হবে!"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "সাড়ে চারটা বেজেছে। শীতও বেশ। এখন একটু চায়ের আয়োজন হলে মন্দ হয় না।"

সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল। বিশু চাকরকে ডাকিয়া ষ্টোভ ধরাইতে বলিলাম।

ছয়

পূর্ব্বদিক্‌ ফিকা হইয়া আসিতেছিল। তখনও গাড়ী জড়বৎ স্থির।

অতিথি যুগলকে হাত মুখ ধুইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

আরতিকে বলিলাম, "তোমার ভাঁড়ারে চায়ের সঙ্গে আর কি জিনিষ দেবার মত আছে, মা?"

গৃহিণী কন্যাকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র ঝুড়ি হইতে বিস্কুটের টিন এবং সন্দেশের চুপড়ি বাহির করিলেন। আরতি চারি জনের জন্য প্লেট সাজাইয়া দিল।

যুবক দুইটি মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইল। অনাবশ্যক কুণ্ঠা ও বাচনিক ভদ্রতাপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় শিষ্টাচারের বালাই তাহাদিগের আচরণে নাই দেখিয়া সত্যই তৃপ্ত হইলাম।

শীতের উষায় আরতি-মায়ের পরিবেশিত চা ও খাবার সুস্বাদুই বোধ হইল।

চা-পর্ব্ব শেষ হইলে প্রশ্ন করিলাম, "যদি আপত্তি না থাকে, আপনার নামটা বল্‌বেন কি?"

যুবক স্মিতহাস্যে বলিল, "আমরা ইংরেজ নই। আত্মপরিচয় দেওয়াতে এ দেশের লোক অপমান বোধ করে না। আমার নাম শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মনে হইল, এ নাম যেন অপরিচিত নহে। পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি।

দিনের আলো তখন কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল। যুবকের মুখের দিকে চাহিলাম। এ মূর্ত্তি যেন কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

বিশু-প্রদত্ত গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া বলিলাম, "আপনার চেহারা ও নাম আমার অপরিচিত নয়। বলুন ত' কোথায় আপনাকে দেখেছি?"

যুবক এবার আমার দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া দেখিল। তারপর বলিল, "আমিও এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, কিন্তু আমিও আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি। দাঁড়ান—মনে করি—আচ্ছা, হয়েছে। আপনি কি একদিন মোটরে করে মনোহরপুকুর রোড—হাঁা, কলকাতায়—সেখানেই আমাদের বাড়ী, দুপুরবেলা যাচ্ছিলেন?"

সহসা ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য আমার মনে পড়িল। সে ছবি আমার মানসপটেই অঙ্কিত ছিল। কিন্তু তখন এই কান্তিমান যুবকের আননে এমন ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ এমন পুষ্টভাবে দেখা দেয় নাই।

বলিলাম, "বেশ মনে পড়েছে। একটি ছেলেকে চোর ব'লে সকলে মার্‌ছিল, আর আপনি তাকে রক্ষা করেন।"

যুবক পার্শ্বস্থ কিশোরকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, "এই সেই ছেলে।"

বিস্ময়ে দ্বিতীয় যুবকের দিকে চাহিলাম। দশ বৎসরের শীর্ণকায় বালক এখন আঠারো উনিশ বৎসরের বলিষ্ঠ এবং শ্রীমান্ যুবক।

আরতির আয়ত নয়নযুগলের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি উভয়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলাম। গৃহিণীও এ কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনিও কৌতূহলভরে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন।

অসিতকুমার বলিল, "ম্যাট্রিক ও আই-এস্ সি পাশ ক'রে যোগেশ এখন কৃষিকাজ নিয়ে মেতে আছে। ও এখন আমার ডান হাত বল্‌লেই চলে।"

যে একদিন টাকা চুরি করিয়া প্রহৃত হইয়াছিল, হয় ত' বা ভবিষ্যতে পাকা চোর হইয়া জেল খাটিত, সেই যুবক এখন লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে, এ সংবাদে সত্যই আমার মন আনন্দ-প্লাবিত হইল।

বলিলাম, "আপনি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ব'লেই ওকে মানুষ গড়্‌তে পেরেছেন।"

অসিতকুমার উদাসভাবে বলিল, "সত্য চিরদিন আমাদের কাছে ধরা দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চলি ব'লেই মানবজাতি ক্রমে অধঃপাতে চলেছে!"

যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি আমার এই দাদার সকল পরিচয় জানেন না। উনি শুধু আমাকে মানুষ হ'বার অধিকার দিয়েই নিশ্চিন্ত নন। দেশের ছেলেদের মধ্যে কতজনকে যে গ'ড়ে তুলেছেন তা' বলা যায় না।"

বাধা দিয়া অসিতকুমার হাসিয়া বলিল, "তুমি থাম, যোগেশ। অত্যুক্তি মোটেই ভাল নয়।"

উত্তেজিতভাবে যোগেশ বলিল, "আমি একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না, স্যার। আপনি আমার পিতৃতুল্য। ইচ্ছে কর্‌লে উনি খুব বড় সরকারী কাজ পেতেন। ওঁর পিতৃপুরুষরা শুধু জমিদার নন, বড় চাকুরে। কিন্তু উনি দাসত্বকে পছন্দ করেন না। নিজেকে উনি কৃষিজীবী ব'লে পরিচয় দেন।"

সত্যই কৌতূহল বাড়িতেছিল।

আমাদের সকলের কৌতূহলদৃষ্টির আঘাতে অসিতকুমার বোধ হয় একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। কারণ, সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল

মাষ্টারমহাশয় এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা কোথায় যাবেন? বাড়ী আপনাদের কোথায়?"

যুবক মুখ ফিরাইয়া বলিল, "লক্ষ্মীকান্তপুর—পদ্মার পারেই বল্‌তে পারেন্।"

আমি বলিলাম, "ষ্টীমারেই যাবেন ত? কোন্ ষ্টেশনে নাম্‌বেন?"

"তারপাশা।"

"তারপাশা? আমরাও ত' ওখানে নাম্‌ব!"

যুবক এবার যেন আগ্রহভরে বলিল, "ওখান থেকে কতদূর যাবেন? আপনাদের বাড়ী কোন্ গ্রামে?"

নাম বলিবামাত্র অসিত বলিল, "ওখানে ত' মুখুজ্জেরা খুব ধনী ও মানী লোক। আপনি তাঁদের কাউকে চেনেন?"

হাসিয়া বলিলাম, "মুখুজ্জে বংশের সবাই মৃত; একা আমিই বেঁচে আছি।"

"ওঃ! আপনার নাম আমি শুনেছি বোধ হয়। আপনিই কি মণিবাবু?"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "ওঁর নাম আপনি কোথেকে শুন্‌লেন? উনি কল্‌কাতা ছেড়ে এক পা নড়েন না।"

অসিতকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যই জানি। মুখুজ্জেদের অনেক জমিজমা আছে। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। অথচ মালিকরা দেশেই আসেন না। সে জন্য ওঁর নাম আমার খুব মনে থাক্‌বারই কথা।"

যুবকের কথায় শ্লেষ ছিল না, কিন্তু একটা ব্যথার রেশ যেন ছিল। সত্যই আমি পিতৃপিতামহের জন্মভূমির প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালনে এতদিন বিরত ছিলাম। সে লজ্জা এবং অপরাধের সীমা নাই।

গৃহিণী ও কন্যার দিকে চাহিলাম। গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু আরতির মুখে যেন বিজয়িনীর মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় প্লাটফরম্ সচকিত হইয়া উঠিল। যে সকল যাত্রী প্লাটফরমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা স্ব স্ব কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টাধ্বনি হইল। যুবকযুগল উঠিয়া দাঁড়াইল। অসিতকুমার বলিল, "আমাদের কামরায় চল্‌লাম। ষ্টীমারে আবার দেখা হবে।"

তাহারা দ্রুত নামিয়া গেল। আমি উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, গৃহিণী, মাষ্টারমহাশয়ের পত্নী এবং আরতি তিনজনই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছেন।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

সাত

ষ্টীমারে অসম্ভব ভীড়। বোমা-ভয়ভীত নরনারী সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামের আশ্রয় নিরাপদ মনে করিয়া বিভ্রান্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের কেবিন হয় ত' মিলিবে; কিন্তু সোপানপথে অসংখ্য নরনারীর ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

সঙ্গের জিনিষগুলি কুলিদিগের মাথায় চড়াইয়া দিয়া প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইলাম। কিন্তু যাত্রীদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইবার উপায় থাকিলেও, সে কাজ যেন সমর্থনযোগ্য মনে করিলাম না।

এমন সময় দেখিলাম, এক দল যুবক সেই জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। তাহারা কি স্বেচ্ছাসেবক? কোথা হইতে ষ্টীমারঘাটে স্বেচ্ছাসেবকের দল আবির্ভূত হইল?

দলের পুরোভাগে অসিতকুমারকে দেখিতেছি না? দশ মিনিটের মধ্যে যাত্রীরা শৃঙ্খলাসহকারে সিঁড়ি দিয়া ষ্টীমারের উপর উঠিতে লাগিল! সে দৃশ্য চমৎকার! এত যে গোলমাল সবই যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইল।

একে একে যাত্রীরা ষ্টীমারে উঠিতে আরম্ভ করিলে অসিতকুমার ও যোগেশ হাসিমুখে আমাদের দলের কাছে আসিয়া বলিল, "চলুন, আপনাদের ষ্টীমারে উঠিয়ে দেই।"

বেশ সুস্থভাবে ষ্টীমারে উঠিয়া কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অসিত বলিল, "আমি এক্ষুনি আস্‌ছি। যোগেশ, তুমি দেখো ওঁদের যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

ত্বরিত গতিতে যুবক ষ্টীমারের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তোমাকে আপনি না বলে তুমি বল্‌ছি বলে কিছু মনে করো না। আমি তোমার ঠাকুরদাদার বয়সী বল্‌লেই চলে।"

যোগেশ বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে; সে কি কথা! আপনি আমায় তুমি বল্‌বেনই ত।"

আচ্ছা বাপু, তোমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদল কোথা থেকে যোগাড় করলে?"

মৃদু হাসিয়া যোগেশ বলিল, "এ স্বেচ্ছাসেবকদল অসিতদার গড়া। উনি কৃষক-প্রজাদলের মাতব্বর সভ্য। এ-অঞ্চলের সবাই ওঁকে জানে—ওঁর কথা শোনে। ব্যবস্থা-পরিষদের উনি একজন গণ্যমান্য সদস্য। সহরত্যাগী লোকদের কষ্ট হবে বলে উনি এখানে একদল স্বেচ্ছাসেবক রেখেছেন।"

যুবকের পরিচয় যতই পাইতেছি ততই উহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িতেছে। বাঙ্গালা মায়ের এমন কয়েক হাজার ছেলে থাকিলে আজ কি আর ভাবনা ছিল!

ষ্টীমার তখন পদ্মার জলরাশি মথিত করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যোগেশের সহিত মাষ্টারমহাশয়ের আলোচনা সূত্রে জানিতে পারিলাম, অসিতকুমার বিস্তীর্ণ জমির মালিক। সে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিতেছে। বি-এস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার পিতা তাহাকে আরও পড়িবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহা করে নাই। কৃষিকার্য্যের দিকে বিশেষ আগ্রহ থাকায়, সে পৈতৃক জমি লইয়া সেই কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যোগেশকে আই-এস-সি পাশ করাইয়া সে তাহাকেও বৈজ্ঞানিক চাষীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। সে এখন অসিতকুমারের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকমণ্ডলীর সহিত অসিতকুমারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাহারা জানে অসিতকুমার তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদিগের উন্নতির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারে। তাই অনায়াসে সে প্রজাদলের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপরিষদে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান বলিয়া তাহার নিকট জাতিভেদের বালাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্বধর্ম্মের প্রতি তাহার অনুরাগ অল্প নহে।

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। দেখিলাম গৃহিণী ও মাষ্টারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মিলিয়া ষ্টোভে লুচি তরকারী ও হালুয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আরতি-মা কখন যে স্নানশেষে শুচিবেশ পরিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে আসিয়া বলিল, "বাবা খাবার তৈরী, আপনারা আসুন।"

বলিলাম, "আমাদের একজন অতিথি এখনো অনুপস্থিত। তাঁকে ফেলে—"

যোগেশ বলিল, "আমি তাঁকে ডেকে আনছি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে দেবসেনাপতির মত প্রিয়দর্শন যুবক

যোগেশের সহিত আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "ষ্টীমারে হাজার যাত্রী উঠেছে। তাদের বস্‌বার জায়গা করে দিয়ে এলাম, স্যার!"

প্রসন্নমুখে বলিলাম, "আপনাকে প্রশংসা কর্‌বার মত ভাষা—"

বাধা দিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমাকে আপনি বলে যদি আপনারা কথা বলেন, তাহলে আমি মনে বড়ই ব্যথা পাবো। আর প্রশংসার কথা তুলে আমায় লজ্জা দেবেন না। বাঙ্গালাদেশের ছেলেরা যদি বাঙ্গালীদের জন্য এটুকুও না কর্‌বে, তবে তাদের জন্মগ্রহণের কোন অর্থ হয় না।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "একথা ক'জন ভাবে, ক'জন বা পালন করে, অসিতবাবু?"

তাহার মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, "সে কথা অস্বীকার কর্‌তে পারি না।"

আরতি আসিয়া জানাইল, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে।

চারিজন টেবিলের সম্মুখে আহারে বসিলাম।

আট

ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে আমাদের গ্রাম।

অসিতকুমার ও যোগেশকে অনুক্ষণ মনে পড়িতেছিল। চমৎকার ছেলে দুইটি! তাহারা তারপাশা হইতে তাহাদের গ্রামের দিকে যাত্রা করিয়াছে। দুইখানি ঘাসি নৌকা আমাদিগকে বহন করিয়া চলিতেছিল। তখনও ক্ষেতের সকল ফসল আহৃত হয় নাই। কবির ভাষায়—ধানের উপর দিয়া বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে গৃহিণী ও আরতি সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামের শোভার মাধুর্য্য কলিকাতা সহরের মানুষরা কদাচিৎ উপভোগের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

গৃহিণীর নয়নের মুগ্ধ-বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া বলিলাম, "কেমন লাগ্‌ছে? বন-জঙ্গলে বাঘের সন্ধান পেলে?"

লজ্জিত স্মিতহাস্যে তিনি বলিলেন, "তোমাদের দেশ যে এত সুন্দর আগে তা ভাবিনি।"

আরতি বলিল, "তোমাদের দেশ বল্‌ছ কেন, মা? তোমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশ কি তোমারও নয়?"

গৃহিণীর মুখমণ্ডল আরক্ত আভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া পশ্চাতের দিকে চাহিলেন। সস্ত্রীক মাষ্টারমহাশয় যে নৌকায় আসিতেছিলেন, তাহা পিছাইয়া পড়ে নাই।

আমাদের গ্রামের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। নায়েব মহাশয়ের বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারিব না। পিতৃপুরুষরা বহু অর্থব্যয়ে গ্রামের রাস্তা পাকা করিয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম সেই রাস্তা নূতন মেরামত করা হইয়াছে। কোন জঙ্গলের অস্তিত্ব নাই। সমগ্র গ্রামখানির শুধু নয়, আশে পাশের দশবারখানা গ্রামের মালিক আমরা। পদ্মার তটভূমি পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের সমস্ত ভূমিই আমাদের। তারপাশা ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সদর রাস্তা দিয়া আমাদের গ্রাম পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী হইলেও, পদ্মা হইতে সরাসরি আমাদের গ্রাম তিন মাইলের অধিক হইবে না। একটা ছোট খাল আমাদের গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বহুদূরে গিয়া পদ্মায় মিশিয়াছে।

গ্রামের লোকরা পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। একস্থানে দেখিলাম, লোকজন লইয়া নায়েব মহাশয় দাঁড়াইয়া।

মুহূর্ত্তে রটিয়া গেল গ্রামের মালিকরা আসিয়াছেন। বহু লোক আমাদিগকে সমাদরে অভিবাদন জানাইতে লাগিল। গৃহিণী এরূপ রাজোচিত সম্বর্দ্ধনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহার আননে বিমল আনন্দের দীপ্তি দেখিয়া আমারও মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। আরতিও বিস্ময় বোধ করিতেছিল। কিন্তু তাহার নয়নে একটা বিচিত্র আলোক ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম।

প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া কঙ্করাকীর্ণ পথে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। সমগ্র অট্টালিকা যেন নববেশ পরিয়াছে। দীর্ঘ দিনের অবহেলার দৈন্য তাহার অঙ্গের কোথাও দেখিতে পাইলাম না। নায়েব মহাশয় আমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি মন কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল

পরিচ্ছন্ন বেশে দাস-দাসীরা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে দীর্ঘকাল দেখে নাই। মালিক-পত্নী ও কন্যাকে কখনই প্রত্যক্ষ করে নাই। সকলেরই আননে আশা ও আনন্দের দীপ্তি।

পাল্‌কী হইতে নামিয়াই গৃহিণী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অট্টালিকার পুরোভাগেই প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যান। আমার অনুপস্থিতে ও অবহেলা সত্ত্বেও বিশ্বস্ত নায়েব মহাশয় পুষ্পোদ্যান রচনায় অনবহিত হন নাই। তাঁহারা তিন পুরুষ আমাদের বিস্তৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। দেশে না আসিলেও দেশের বাড়ীঘর, বাগান, পুষ্করিণী যাহাতে সকল সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, এসম্বন্ধে আমার আগ্রহের অভাব ছিল না। নায়েব মহাশয় তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন।

বাহিরের দার্ঘিকা অপেক্ষা অন্দরের পুষ্করিণীর কালো জলের শোভা দেখিয়া আরতি হাসিয়া বলিল, "স্নান করে আরাম পাওয়া যাবে, মা।"

গৃহিণী মুখে কিছু বলিলেন না।

আমি বলিলাম, "বিশ্রাম ও আহারাদির পর ধানের গোলা, গোয়াল, বাগান সব দেখে খুব আনন্দই হবে।"

নায়েব মহাশয় পরিণত বয়স্ক। গৃহিণী তাঁহাকে অনেকবার কলিকাতার বাড়ীতে দেখিয়াছেন। আরতিরও তিনি সুপরিচিত।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "কলকাতার দুধ ও এখানকার দুধের স্বাদের তফাৎ দেখে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, দিদিরাণী।"

নায়েব মহাশয়কে গ্রাম্য সুবাদ অনুসারে আমি নায়েব কাকা বলিতাম। সেই সূত্রে গৃহিণীও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

মাষ্টারমহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাদিগের পল্লীগ্রামের সম্পদ দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন।

নয়

আরতির মার আনন্দ দেখিয়া আমার অন্তর তৃপ্ত হইল। গৃহিণীও বিশেষ প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। বাড়ীর এলাকার মধ্যেই দশটা মরাই ধানে বোঝাই। গোয়ালে পয়স্বিনী গাভী। আমার আদেশক্রমে নায়েব মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই চারিটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের গতি দেখিয়া পল্লীগ্রামের আশ্রয়ে একদিন যাইতেই হইবে মনে করিয়া পূর্ব্বাহ্নে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। প্রত্যহ তের চৌদ্দ সের খাঁটি দুগ্ধ পাইয়া গৃহিণী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ভাণ্ডারে বহুসংখ্যক কেরোসিন তৈলের টিন, খেজুরগুড়ের নাগরী, ইক্ষুগুড় এবং প্রচুর চিনি ও লবণ সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। কলিকাতায় মাটি পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে হয়। এখানে গাছে গাছে নারিকেল, সুপারি, ঝুনা নারিকেল গুদামজাত হইয়া রহিয়াছে। মাতা জন্মভূমির আশীর্ব্বাদে এখানে কোনও অভাব নাই। মনে অনুতাপ হইল, এতদিন কেন মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি নাই!

আমার বসিবার ঘরের পাশেই আর একটি ঘরে মাষ্টার মহাশয় আরতিকে পড়াইতেন। দুইবেলা নিয়মিত পাঠে আরতি মোটেই অবহেলা করিত না। গ্রামের লোকের কৌতূহল দৃষ্টি যাহাতে তাহার পাঠের ব্যাঘাত না ঘটাইতে পারে, এজন্য অন্দরের সমীপবর্ত্তী নিরালা ঘরটি সে বাছিয়া লইয়াছিল। আমিও সাধারণ বৈঠকখানাঘরে প্রয়োজন না হইলে বড় একটা যাইতাম না। আমার পাঠকক্ষেই থাকিতাম।

সেদিন কি একটা প্রয়োজনীয় কাজে নায়েব কাকা আমার পড়িবার ঘরে আসিলেন। আরতির পড়া শেষ হইয়াছিল। মাষ্টারমহাশয় আমার ঘরে একখানি কৌচে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। আরতি "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল।

প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রগুলির গ্রাহক হিসাবে, "প্রবাসী", "মাসিক বসুমতী", "ভারতবর্ষ", "বঙ্গশ্রী", "প্রবর্ত্তক" আমি পাইতাম। পল্লীগ্রামে উহারা আমার গৃহিণীরও সঙ্গী ছিল।

আরতি সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, নায়েব দাদা, আমাদের এই গ্রামের আশপাশের গ্রামগুলি কি আমাদের?"

"হাঁ, দিদিরাণী। একসঙ্গে দশখানা গ্রাম তোমার বাবার তালুকের মধ্যে।"

"এই দশখানা গ্রামে কত লোক আছে, আপনি জানেন?"

"তা জানি বইকি, দিদি। আমাদের গ্রামেই পাঁচশ

ঘর লোক আছে। তার মানে প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। অবশ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে। বাকি দশখানা গ্রামের লোকের সংখ্যা ৩২,৩৩ হাজার হতে পারে।"

"আপনি হিন্দু, মুসলমান সব ধরে বলছেন ত?"

আরতির প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, আমি বিস্ময় ভরেই এই আলোচনা শুনিতেছিলাম। মাষ্টারমহাশয়ও এইবার সংবাদপত্র হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ছাত্রীর দিকে চাহিলেন।

নায়েব কাকা হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, দিদিরাণী! কাকেও বাদ দিয়ে কি হিসেব ধরা যায়?"

আরতির মুখ গম্ভীর। সে বলিল, "আমাদের গ্রামের পঁচিশ ঘর গৃহস্থের মধ্যে কারও অন্নকষ্ট আছে কি না জানেন, দাদা?"

এই প্রশ্নে নায়েবকাকা যেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন। আজ সকালেই তিনঘর প্রজা—একঘর হিন্দু ও দুইঘর মুসলমান প্রজার অন্নকষ্টের সংবাদ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সেই সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণের জন্ত তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। সেকথা তিনি আরতির কাছে কুণ্ঠিত ভাবেই প্রকাশ করিলেন।

আরতি প্রশ্ন করিল, "এবার ফসল কেমন হয়েছে বলুন ত?"

"খুব ভাল হয়েছে বলা যায় না, তবে মন্দ নয়। কিন্তু ঐ তিনঘর প্রজার একবিঘেও চাষের জমি নেই। তারা জন মজুরের কাজ করে দিন গুজরাণ করে। অসুখে পড়ে তাদের বড়ই কষ্ট চলেছে।"

"আমাদের সরকারীতে পুরাতন ধান কত মজুদ আছে বল্‌তে পারেন?"

নায়েবকাকা একটু থামিয়া বলিলেন, "ভাঁড়ারে পাঁচশ মণ চাউল ছাড়া, এখানকার গোলায় বোধ হয় দশহাজার মণ ধান মজুত। তা ছাড়া ভাজনডাঙ্গা, পরাণপুর, পলাশগাঁতি কাছারীতে যেসব মরাই আছে তাতেও প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার মণ ধান জমা করা আছে। এবছরের ধান এখনও পাওয়া যায় নি।"

"আমাদের এত ধান চাল মজুদ থাক্‌তে, তিনঘর প্রজার অন্নকষ্ট কি দুঃখ ও লজ্জার কথা নয়, নায়েব দাদু?"

"নিশ্চয়। তাই তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে এসেছিলাম। কিন্তু এ খবর তুমি কি করে পেয়েছ, দিদিরাণী?"

ম্লান হাসিয়া আরতি বলিল, "রাম হরি ঘরামীর ছোট মেয়েটি আজ ভোরে এখানে এসেছিল। তার কাছেই শুনেছি।"

আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমার গ্রামের লোক অনাহারে থাকিবে—আমার কোন প্রজার অন্নকষ্ট হইবে, ইহা পরিতাপের কথা!

আরতি বলিল, "বাবা, যে তিনঘর প্রজার জমি নেই, তাদের চাষের জমি দেবার বন্দোবস্ত হয় না?"

নিশ্চয়ই হয়। আমার খামার জমির পরিমাণ অল্প নহে। তাহা হইতে তিনটি দুঃখী পরিবারকে সামান্য খাজনায় কয়েক বিঘা করিয়া জমি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আরতিমাকে বলিলাম, "আমাদের ভাঁড়ার থেকে তিনজন প্রজার বাড়ী কত চাল পাঠাতে হবে, মা?"

আরতি একটু ভাবিয়া বলিল, "যেরকম দিনকাল পড়েছে, বাবা, তাতে একবছরের আগে ত চাষ করে ধান পাবে না।"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তা'হলে বছরের খোরাকী ধানই তোমার দেবার ইচ্ছে। কেমন নয়, মা-লক্ষ্মী?"

আরতি বলিল, "বাবার মত মানুষের পক্ষে তাইত করা উচিত।"

"নায়েবকাকা, ঐ তিনঘর প্রজার বাড়ী আমার গোলা থেকে আন্দাজ করে ধান পাঠিয়ে দেবেন। একসঙ্গে না হয়, দরকারীমত তারা এসে নিয়ে যাবে।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "প্রত্যেকের প্রয়োজন কত, তা নায়েবমশাই জেনে ব্যবস্থা কর্‌তে পারবেন।"

নায়েবমহাশয় এ ব্যবস্থায় যে প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারে বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না।

আরতি বলিয়া উঠিল, "দাদু, ওরা ধান ভেনে চাল করে খাবে। তাতে ত সময় যাবে। আমি ভাঁড়ার হতে কিছু কিছু চাল ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চাই।"

চমৎকার! নারীর মনে যে মাতৃভাব আছে তাহা আমার তরুণী কন্যার অন্তরে জাগিয়া উঠিতে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

আরতি দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

নায়েব মহাশয়কে বলিলাম যে, আমার যাবতীয় প্রজা—ভদ্র, চাষী, মজুর প্রজাদিগের কাহার ঘরে কত চাউল বা ধান মজুদ তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে। কেহ যেন এই অনুসন্ধানে ভয় না পায়। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, আমার কোন দেশভাই যেন মহাযুদ্ধের দুর্দ্দিনে অনাহারে কষ্ট না পায়। তাহাতে আমার সঞ্চিত সমুদয় ধান যদি এবৎসর সকলকে বিলাইয়া দিতে হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না। আমার আরতি মা আজ আমার দৃষ্টি মুক্ত করিয়া দিয়াছে!

মাষ্টারমহাশয় গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মণিবাবু, আপনার মেয়ের মধ্যে জাগরণ এসেছে, তা আপনার মত পিতার কন্যা বলেই সম্ভব হয়েছে।"

নায়েবমহাশয় ব্যবস্থামত কাজ করিবার জন্য তৎপর হইলেন।

দশ

সরস্বতীপূজার বড় বিলম্ব নাই। পৈতৃক ভিটায় বারমাসে তের পার্ব্বণ হইতই। আরতি মা ধরিয়া বসিল, দেবী ভারতীর পূজায় সে আমাদের আশপাশের গ্রামসমূহের যাবতীয় নরনারীকে নিমন্ত্রণ করিবে। দশদিন পরেই পূজা। এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগের গ্রাম ছাড়াও আরও দশখানা গ্রামের নরনারীর সংখ্যা ৩০।৩২ হাজার হইবে। প্রায় ৩৫ হাজার নরনারী, বালকবালিকাকে সযত্নে ভোজন করান—সংস্কারগত, কৃষ্টিগত, ধর্ম্মগত ব্যবধান বজায় রাখিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করার ব্যবস্থা অত অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব। অর্থব্যয়ের কথা ধরিলাম না। আমার ব্যাঙ্কে ও অন্য নানাভাবে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যাহা, তাহা হইতে আমার একমাত্র সন্তানের সাধু ইচ্ছা মিটাইতে অর্থব্যয় আমার পক্ষে আদৌ কষ্টকর হইবে না।

আরতি কথাটা বুঝিল। তখন সে বলিল, "তবে আমাদের গ্রামের সবাইকে খাওয়াতে হবে। সে ব্যবস্থা এখন থেকেই করুন।"

অবশ্য তিন চারিহাজার নরনারীর জন্য ব্যবস্থা করাও সহজ নহে। কিন্তু উহা করিতেই হইবে। তবে এজন্য কর্ম্মী এবং দক্ষ লোকের প্রয়োজন।

মাষ্টারমহাশয় সহসা বলিয়া উঠিলেন, "অসিতকুমার ও যোগেশকে এ কাজের ভার দিলে কেমন হয়, মণিবাবু?"

কথাটা মনে ধরিল; কিন্তু অল্প দিনের পরিচয়ের ফলে তাহাদিগের উপর এতটা চাপ দেওয়া কি সঙ্গত ও শোভন হইবে?

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "তাদের নেমন্তন্ন করেই দেখা যাক্ না।"

তাহা হইলে মাষ্টারমহাশয়কে লইয়া আমারই নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে হইবে। নায়েব মহাশয় লক্ষ্মীকান্ত পুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সহিত পরিচিত। স্থির হইল তিনিও আমাদিগের সঙ্গে যাইবেন।

আরতি বসিয়া বসিয়া সব শুনিতেছিল, সে বলিল, "আর একটা কাজ আছে, বাবা। এ অঞ্চলে একটাও মেয়ে স্কুল নেই। সরস্বতী পূজার দিন এখানে মেয়ে স্কুল খোলা হবে বলে ঘোষণা করতে হবে।"

কন্যার মন এ কোন পথে চলিয়াছে?

হাসিয়া বলিলাম, "মেয়েস্কুল ত খোলা হবে। কিন্তু তাদের পড়াবে কে?"

আরতি সলজ্জভাবে বলিল, "মার সঙ্গে, জ্যেঠিমার সঙ্গে পরামর্শ হয়ে গেছে, তাঁরা দু'জন আর আমি এই তিনজনে আরম্ভ করে দেব। তারপর শিক্ষয়িত্রীর অভাব হবে না।"

জ্যেঠিমা বলিতে সে মাষ্টারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকেই লক্ষ্য করিয়াছিল। আমার গৃহিণী আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী যে বি-এ পাশ তাহা জানিতাম না।

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা কতদিন চলিতে পারে? আরতির ত' বি-এ পরীক্ষা আসন্ন। মাষ্টারমহাশয়ই বা এখানে আর কতদিন থাকিতে পারিবেন? গৃহিণীও কি পল্লীগ্রামের আবহাওয়া বেশীদিন সহ্য করিতে পারিবেন?

আরতি আমার দিকে তাহার আয়ত নয়নযুগল তুলিয়া চাহিয়াছিল। বোধ হয় সে আমার মনের সংশয়ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল, "আমি পরীক্ষার জন্য একাজ করতে পারব না, ভাবছেন বুঝি? না, বাবা, মাষ্টার মশাই আছেন, তিনি জানেন আমার সব পড়া প্রস্তুত। তা ছাড়া সকালে সন্ধ্যায় রোজ পড়লে কিছু আটকাবে না। যা

বলেছেন, তিনি এখান থেকে শীঘ্র কোথাও যাবেন না। জ্যোঠিমাও তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন না। তারপর ধীরেসুস্থে ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু মেয়ে স্কুল খুল্‌তেই হবে। তার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই।"

আমার অন্তরের অমূর্ত্ত কামনাগুলি আমার মা-জননীর মধ্যে ক্রমেই যেন রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে! জীবনে ইতিহাস দর্শন, কাব্য সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শুধু স্বাবলম্বী দেশের কল্পনাই মনে জাগিয়া উঠিত, কিন্তু তাহাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতে পারি নাই। শুধু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়াই নিরস্ত হইতাম। কিন্তু আজ কোন্ দেবতা তাঁহার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে আমার চিরসহরবাসিনী কন্যার অন্তরের মণিকোঠায় চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন? আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার চরণতলে উৎসর্গ করিলাম।

আবেগ দমন করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠের স্বর ভারী হইয়া উঠিল। বলিলাম, "তোর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটী করব না, মা।"

খুশীমনে আরতি অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

মাষ্টারমহাশয় অবিনাশ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আপনি গোড়া থেকেই আরতির শিক্ষার ভার নিয়ে এসেছেন। তার মনে আপনি যে জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছেন, সে জন্য আপনাকে আমি ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানাতে অসমর্থ। পিতা হয়েও আমি যা না পেরেছি, আপনি তা সার্থক করে তুলেছেন। আজ আমি আপনাকে সত্যই দাদা বলে প্রণাম করছি।"

সত্যই বয়োজ্যেষ্ঠ অবিনাশ বাবুর পদধূলি আমি মাথায় দিলাম। তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "মণিবাবু, আমার সারাজীবন শিক্ষকতা করে কেটেছে, কিন্তু এমন মেধাবিনী, এমন বিরাট হৃদয়ের অধিকারিণী কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে আমি পাই নি। এ রকম হাজার তুই মা যদি বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যেত, তা হলে এদেশের ভেতর বাইরের চেহারা বদলে যেত।"

তাহা কি অসম্ভব? আমার এই বাঙ্গালাদেশ, যেদেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দেশভক্ত সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যে দেশে শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানবের লীলাস্থান—যে দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ প্রভৃতি মহামনীষীর উদ্ভব—যে দেশে মাইকেল, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথের মত মহাপ্রতিভাবান কবির জন্ম হইয়াছে, সে দেশ অন্ধকারের মায়ায় আর কতদিন আচ্ছন্ন থাকিবে? পুরুষ যে পরিমাণে জাগিয়াছে, সেই অনুপাতে মাতৃজাতির জাগরণের জন্য দেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। এস শক্তিরূপিণী জননি! মাতৃজাতির অন্তর তলে তোমার আসন বিছাইয়া দাও!

সত্যই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা আরতি মার আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল।

"বাবা, একবার ভেতরে আসুন, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

এগার

লক্ষ্মীকান্তপুরে প্রবেশ করিতেই গ্রামের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইলাম। আমাদের গ্রামের পরিচ্ছন্নতা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও লক্ষ্মীকান্তপুরের জলনিকাশের ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, চাষের অবস্থা ভারতীয় কৃষি প্রণালী সম্মত বলিয়া মনে হইল। জলাশয়গুলির অবস্থা চমৎকার। মাঝে মাঝে নলকূপ, আগাছার জঙ্গল নাই বলিলেও চলে। সত্যই কৃষি-প্রধান সুন্দর সুসজ্জিত গ্রাম।

সুদৃশ্য এবং ইষ্টকনির্ম্মিত পথ দিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ভবনে গিয়া পৌঁছিলাম। আমরা খুব ভোরে বাহির হইয়াছিলাম, কয়েকমাইল পথ আসিতেই আটটা বাজিয়াছিল।

একজন লোক ছুটিয়া আসিলেন, নায়েব মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। বৈঠকখানা ঘরে সসম্ভ্রম কর্ম্মচারীটি আমাদিগকে বসাইলেন। জানা গেল, অসিতকুমার ও যোগেশ তখন কফিক্ষেতে কাজকর্ম্ম দেখিতেছে।

পরমুহূর্ত্তে একজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক আমাদিগের কাছে আসিলেন। অবিনাশ বাবুকে দেখিয়াই তিনি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "অবিনাশদা, তুমি এখানে?"

"আরে রাজেন্দ্র, তুমিই বা এখানে কেন?"

"এটা যে আমার বোনের বাড়ী। অসিত আমার ভাগ্‌নে।"

"বটে! তাই না কি!"

শুনিলাম রাজেন্দ্র বাবু ও অবিনাশ বাবু সতীর্থ। বয়সে রাজেন্দ্রবাবু অপেক্ষা মাষ্টারমহাশয় এক বৎসরের বড় বলিয়া তিনি অবিনাশবাবুকে দাদা বলিয়া ডাকেন। রাজেন্দ্রবাবুও অবিনাশবাবুদের কলেজের অধ্যাপক। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। কারণ, উভয়েই সগোত্র চট্টোপাধ্যায়।

এমন সময় আর একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুখের আদল দেখিয়া মনে হইল, ইনিই সম্ভবতঃ অসিতের পিতা। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, আমার অনুমান সত্য। ডেপুটী হইতে জেলার হাকিম হইয়া স্ত্রী পুত্রের পীড়াপীড়িতে তিনি সম্প্রতি পেন্সন্ লইয়াছেন। এখনও পাঁচ বৎসর তিনি চাকরী করিতে পারিতেন।

অল্প সময়ের মধ্যে গৃহে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অসিতের পিতা ও মাতুলের সৌজন্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। পরিচয়ে আরও প্রকাশ পাইল, লক্ষ্মীকান্তপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সহিত আমার পিতৃপুরুষের ঘনিষ্ঠ বান্ধবতা ছিল।

আমাদের আগমনের কারণ সংক্ষেপে বলিলাম। অসিতের পিতা ও মাতুলের নয়ন যুগল যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয়কে একান্তে ডাকিয়া লইয়া রাজেন্দ্র বাবু কি যেন আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমি অসিতের পিতার সহিত তাঁহার পুত্রের সহিত কি করিয়া প্রথমে পরিচয় হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম।

বুঝিলাম, পুত্রগর্ব্বে পিতার হৃদয় ভরপুর। একটি পুত্র ও একটি কন্যার তিনি জনক। কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আটাশ বৎসরের পুত্রকে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। দেশের কল্যাণের জন্য সকল সময়েই তাহার প্রাণ ব্যাকুল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবশেষে হাসিয়া বলিলেন, "অসিত তার গর্ভধারিণীর কাছে কি বলে জানেন? সে চাষী বনে গিয়েছে। চাষীর ঘরে অভিজাত বংশের বিলাসিনী মেয়ে মানাবে কেন? শুনেছেন মশাই, আমার পাগল ছেলের কথা।"

কথাটা শুনিয়া শুধু চমৎকৃত হইলাম তাহা নহে। মনের মধ্যে একটা আশার স্পন্দনও অনুভব করিলাম। হরের জন্য গৌরীই তপস্যা করিয়াছিলেন। আর উমাকে পাইবার জন্য হরের সে উগ্র তপস্যা কালিদাসের বর্ণনায় অমর হইয়া আছে।

"আপনারা এসেছেন!"

আনন্দপ্রফুল্ল মুখে অসিত ও যোগেশ দ্রুতচরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অসিতের গৌরবর্ণ ব্যায়ামপুষ্ট দেহে তখনও শ্রমজাত নিদর্শন মিলাইয়া যায় নাই। যোগেশ আসিয়া তাড়াতাড়ি আমার ও মাষ্টারমহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। অসিতও সৌজন্য প্রকাশ করিল।

আমাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বলিলাম। উভয়েই বিশেষ উল্লাসভরে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে সে একশত কর্ম্মপটু শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া যাইবে। কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা নাই। তাহারা মাঝে মাঝে সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্র ও কৃষিজীবীদিগকে ভূরিভোজনে আমন্ত্রণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

অসিতের পিতা, মাতুল এবং পরিবারস্থ প্রত্যেককেই আমি সাগ্রহ সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলাম। অসিতের জননী যদি দয়া করিয়া আমাদিগের গৃহে পদধূলি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা সতাই ধন্য হইব।

রাজেন্দ্রবাবু ইত্যবসরে কখন অন্দরে গিয়াছিলেন, জানি না। তিনি হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আমার ভগিনী আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তিনিও যাবেন। আপনার যে কন্যার আগ্রহ ও প্রেরণায় এমন ব্যাপার ঘটতে চলেছে, তাকে তিনি দেখতে চান। আমরা সবাই সেদিন আপনার অতিথি, মুখুজ্জে মশাই!"

সত্যই ইঁহাদিগের অমায়িক ব্যবহারে পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

মাষ্টারমহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া অসিতের পিতাকে বলিলাম, "আমাদের মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠায় আপনাকে পৌরোহিত্য করতে হবে কিন্তু।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দেখুন, আমার অবশ্য আপত্তি হবে না। কিন্তু আমি ও ভার নেবার যোগ্য নই।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "আপনি যোগ্য নন, অমন কথা বল্‌বেন না।"

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এক কাজ করুন। আমার বোন অসিতের মাকেই সভানেত্রীত্ব করবার জন্য ধরে বসুন। তিনি সংস্কৃতে এম্, এ। শুধু তাই নয়, ছদ্ম নামে নানা মাসিক পত্রে তাঁর লেখা গল্প, কবিতা প্রবন্ধ ছাপা হয়ে আসছে। সুলেখিকা বলে তাঁর প্রসিদ্ধিও আছে।"

উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলাম, "তা'হলে আমাদের সাগ্রহ আর্জ্জি তাঁর কাছে আপনাকেই পেশ করতে হবে, চাটুজ্জে মশাই!"

"সানন্দে তা করব। অসিতের মনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা সে তার মার কাছ থেকেই পেয়েছে জানবেন।"

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ভায়া, তোমার প্রভাবও তার উপর কম নয়। তোমাকেও আমি বরাবরই জানি। 'নরানাং মাতুল ক্রম'—একি মিথ্যা হতে পারে?"

অসিতের পিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওঁরা ভাই বোনে মিলে আমাকেও রেহাই দেন নি। কি রকম কৌশল করে যে এতদিন চাকরী বজায় রেখেছিলাম, তা আমিই জানি।"

অসতের মুখে হাস্য রেখা উদ্ভাসিত হইতে দেখিলাম। প্রায় এগারটার সময় সানন্দে, আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় লইলাম। মধ্যাহ্ণ আহারের অনুরোধ অনেক কষ্টে এড়াইলাম। অসিত ও যোগেশ আমাকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "কিছু ভাববেন না। আপনাদের কাজ সুশৃঙ্খলে সমাপ্ত হবে।"

ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহাই হউক।

বার

পূর্ব্বপুরুষগণের দুরদর্শন ও সুব্যবস্থার ফলে বাসভবনের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পূজার বাড়ী। নিত্য বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। তাহা ছাড়া প্রকাণ্ড পূজার দালানে বিভিন্ন শক্তি মূর্ত্তির পূজা সমারোহ সহকারে হইত। পূজা বাড়ীর সংলগ্ন অতিথিশালাও তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পূজাবাড়ীর পুরোভাগে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন ছিল। সেখানে যাত্রা গান হইত। তথায় ৫।৬ হাজার লোক বসিয়া যাত্রা গান বা কথকতা শুনিতে পারিত। সেই বিরাট প্রাঙ্গনে মেরাপ বাঁধিয়া লোকজনের বসিবার ব্যবস্থা হইল, সভার মঞ্চ নির্ম্মিত হইল। আরতি-মার প্রস্তাব মত অতিথিশালায় আপাততঃ বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইদানীং অতিথি সমাগমের মোটেই বাহুল্য ছিল না। প্রয়োজন হইলে আমাদের বাস ভবনে অতিথি অভ্যাগতের সেবা চলিতে পারিবে।

প্রকাণ্ড দীঘির তিন পার্শ্বে ব্যবস্থা মত মেরাপ বাঁধা হইল। তথায় স্ত্রী ও পুরুষদিগকে পৃথক পৃথকভাবে ভোজনে পরিতৃপ্ত করিবার বন্দোবস্ত হইল।

অসিতকুমার ও যোগেশ পূজার তিনদিন পূর্ব্বে দলবল সহ আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রামের কর্ম্মঠ ও উদ্যোগী যুবকদিগকে লইয়া তাহারা চারিদিকে শৃঙ্খলা সহকারে যেরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাহাতে আমার মনের উদ্বেগ প্রশমিত হইল।

আমাদের গ্রামের হিন্দু মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমানভাবে উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অসিতকুমারের অসামান্য প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকার দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঙ্গালা দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু নূতন মন্ত্রিদলের আবির্ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নূতন ভাবধারার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল।

এ কথা সত্য, এ পর্য্যন্ত আমাদের তালুকের অন্তর্গত কোন স্থানেই সাম্প্রদায়িক অশান্তির আবির্ভাব হয় নাই। তাহার প্রধান হেতু যে, অসিতের ব্যাক্তিত্বের প্রভাব ও সমদর্শিতা তাহার পরিচয় সরস্বতী পূজার আয়োজনে আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল।

পূজা মণ্ডপে দেবীভারতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার আরতি মা যেন দশভূজা হইয়া পরিশ্রম করিতেছিল। তাহার জননী, মাষ্টারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং গ্রামের বহু বর্ষিয়সী ও তরুণী পূজার কার্য্যে ব্যাপৃতা।

গ্রামের নরনারীরা পূজা প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। অসিতের পিতা, মাতা, মাতুল প্রভৃতি উৎসব প্রাঙ্গণে যথা-সময়ে উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি প্রদান করিলেন। আজ সত্যই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই।

পূজা শেষ হইবার পর দেখিলাম, আমার কন্যা আরতি-মা কয়েকজন তরুণীকে লইয়া সমস্বরে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ বন্দনা গীতি, অমর সঙ্গীত "বন্দেমাতরম" গাহিতেছে। বোধ হয় আমাদিগকে বিস্মিত ও পুলকিত করিবার জন্যই আরতি পূর্ব্বাহ্নে তাহার এই ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করে নাই।

যখন তাহাদিগের মিলিত মধুর কণ্ঠে "বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং। নমামি কমলাং অতুলাং" ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তখন সত্যই সমগ্র হৃদয়ে পুলক সঞ্চার অনুভব করিলাম। দেখিলাম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং রাজেন্দ্রবাবু রুমালে অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছেন। অসিতকুমার যোগেশকে পার্শ্বে লইয়া নিমীলিত নেত্রে সেই সঙ্গীত সুধা যেন পান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। মাষ্টারমহাশয় বেদীর অদূরে নতজানু হইয়া বসিয়াছেন।

গান সমাপ্ত হইলে সহস্র সহস্র দর্শকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বন্দে মাতরম্!"

সাধকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র দেশজননীর পূজার জন্য যে মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া নহে। উহা দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য দেশের সন্তানগণকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোনও দেশে, আর কোনও সাধক এমন মন্ত্রদর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন কি না জানি না। সকল দেশের ভাষার সহিত আমার পরিচয় নাই, কিন্তু যতদূর জানি এমন মন্ত্র যে দ্বিতীয় আর নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

প্রসাদ বিতরণের পালা সমাপ্ত হইল, অসিতকুমার সদলবলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণকে পরিতোষরূপে ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

পুরুষদিগের আহার স্থানে আমি মাষ্টারমহাশয়ের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। অসিতের পিতা এবং রাজেন্দ্রবাবুও উৎসাহভরে আমাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

নারীবিভাগে আমার গৃহিণী প্রভৃতি রহিয়াছেন। গ্রামের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণার এ সকল বিষয়ে নাম ডাক ছিল। তাঁহারাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং আমার দুশ্চিন্তার কোন হেতু ছিল না।

বেলা দু'টার মধ্যে যেন ইন্দ্রজাল বলে সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেল। সত্যই এমন শৃঙ্খলার সহিত এত বড় ব্যাপার মিটিয়া যাইবে ইহা আমার কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু কর্ম্ম-সাধনায় যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা সবই সম্ভবপর। অসিতকুমারকে ভাবাবেশে আমি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলাম। কিশোর যোগেশও আমার বাহুমূলে আবদ্ধ হইল।

যোগেশ বলিল, "আপনি আমাদের প্রশংসা করছেন, কিন্তু আপনার মেয়ে আরতিদিদি যা করেছেন, তা যদি দেখতেন ত' অবাক হয়ে যেতেন, মুখুজ্জে মশাই! সবাই বলছে যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা আজ সকলকে অন্ন বিলুচ্ছেন!"

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এতে একটুও অতিরঞ্জন নেই। আমার বোন্ একটু আগেই বলছিলেন, এমন হাসি, এমন অক্লান্তভাবে সেবারতা আর কোন তরুণীকে তিনি জীবনে কখনো দেখেন নি। আপনার মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা সার্থক হয়েছে, মুখুজ্জে মশাই!"

সমগ্র অন্তরের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা তাঁহারই চরণের উদ্দেশে উজাড় করিয়া দিলাম।

তের

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সভার অনুষ্ঠান হইবে। পুরুষ ও নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র বসিবার স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আজিকার সভায় অসিতের জননী সভানেত্রী। সে কথা রটিয়া গিয়াছিল। দলে দলে নরনারী সমাগম হইতে লাগিল। শিক্ষার অভাবে মাতৃজাতি জীবন-সংগ্রামে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, এ অনুভূতি এখনও সমগ্র জাতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু গ্রামের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যে ইহা একবারেই বুঝেন না, ইহা সত্য নহে। নারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার অভাবের বেদনা পুঞ্জীভূত হইতেছিল, ইহাও অস্বীকার করা চলে না। সহরবাসিনী বহু নারী বোমার হিড়িকে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখানে তাঁহাদিগের কন্যাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা যদি হয়, তবে অনেকেই আর সহরে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য তিনটি বিষয়ের অভাবের জন্যই অনেককে বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়। সে অভাব যদি গ্রামে মিটিয়া

যায়, তবে পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র সহস্র কষ্ট স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন আছে?

সভানেত্রীর বক্তৃতায় সকলেই আগ্রহ অনুভব করিতে লাগিলেন। অসিতের জননীর বাগ্মিতাশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সত্যই যাঁহারা জগতে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা জননীর শিক্ষা প্রভাবেই বড় হইতে পারিয়াছেন। অসিতের মনে যে বিরাট দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহার জননীর কৃতিত্ব তাহাতে অল্প নহে। সভানেত্রীর কণ্ঠে দেশাত্মবোধের বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উপসংহারকালে তিনি আমার আরতি-মাকে উভয় বাহুর দ্বারা ধরিয়া ভাবাবেগে বলিয়া উঠিলেন, এই তরুণী মায়ের প্রাণ তাহার দেশের ভগিনীদিগের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল। এখন সকলের সমবেত চেষ্টায় নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, এই বিদ্যালয় অবৈতনিক। কাহাকেও বেতন দিয়া প'ড়িতে হইবে না। ইহার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমার ষ্টেট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদত্ত হইবে। তাহা ছাড়া ইহার ধন-ভাণ্ডারের জন্য আপাততঃ পাঁচহাজার টাকা জমা দেওয়া হইবে।

অসিতের পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিলেন, "আমাদের গ্রামে ছেলেদের বিদ্যালয় হয়েছে, কিন্তু আজও মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠেনি। আজ এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য, ধনভাণ্ডারে আমিও হাজার টাকা দিলাম। মণিবাবুর মেয়ে আরতি-মার এ দৃষ্টান্ত আমাকে অভিভূত করেছে।"

মাষ্টারমহাশয় বিদ্যালয় সংলগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করিলেন।

দর্শকদল আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

একজন মুসলমান ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "এই বিদ্যালয়ে কি সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা পড়তে পারবে?"

দেখিলাম, আরতি সভানেত্রীর কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। সভানেত্রী উঠিয়া বলিলেন, "ধর্ম্ম যার যার মনের জিনিষ। এখানে সকল ধর্ম্মের সকল শ্রেণীর মেয়েরই অবাধ প্রবেশের অধিকার। সাম্প্রদায়িকতার স্থান এ প্রতিষ্ঠানে হবে না। বাণী-বিদ্যাদায়িনী নির্ব্বিচারে জ্ঞানই বিতরণ করে থাকেন

অনেকেই আপনাদের কন্যাদিগকে পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। দেখা গেল, প্রথম দিনেই নানা বয়সের একশত বালিকা বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে উৎসুক।

আরতি মার আননে যে বিজয়দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা আমার দৃষ্টি এড়াইল না।

* * *

মাঘের আকাশ মেঘলেশশূন্য। প্রচণ্ড শীত। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতি রাত্রির আহার এখানে সমাপ্ত করিলেন। রাজেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পরিহাস-রসিক। অবিনাশবাবুর সহিত তিনি নানা প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে গোপন আলোচনাও চলিতেছিল।

অসিতের পিতা আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "মণিবাবু, আমার উদাসীন শঙ্করকে ঘরের বাঁধনে বাঁধবার জন্য উমা মায়ের প্রয়োজন। এটা কি দুরাশা?"

সাহস করিয়া এ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিতেছিলাম না। তাঁহার করযুগল ধারণ করিয়া বলিলাম, "তা' হ'লে ত' আমরা ধন্য হব।"

রাজেন্দ্রবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনার মেয়ে নিজে জেগেছেন, আর সকলকে জাগাচ্ছেন। সুতরাং তপস্বিনী উমার সাহায্যে আমরা বুড়োরাও হয় ত' মানুষ হতে পারবো।"

মাষ্টারমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে একটা কথা বলিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি আরতিকে লইয়া আসিতেছেন। তাহার আরক্ত আনন দীপালোকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

ধীরে ধীরে নতজানু হইয়া সে অসিতের পিতা ও মাতুলের চরণ বন্দনা করিল। আমি এবং মাষ্টারমহাশয়ও বঞ্চিত হইলাম না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "অন্নপূর্ণা মা আমার! পিতৃগৃহে যে জাগরণ তুমি এনেছ, আমার বাড়ীতেও তার আলো ছড়াতে হবে যে, মা!"

অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে শঙ্খধ্বনি হইল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণীর পার্শ্বে অসিতের জননী। উভয়েরই হাতে শঙ্খ।

সাধু হরিদাসের পুণ্যকথা

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত, এম্‌-এ,

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল

যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের অনতিদূরে বূঢ়ন নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। হরিদাস ঠাকুর বূঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের কোন ঘটনাই বৈষ্ণব কবিগণ উল্লেখ করেন নাই। তিনি কতকাল স্বীয় গৃহে ছিলেন, কিরূপে কোন্ স্পর্শমণির স্পর্শে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা এখন কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। একজন মুসলমানের পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ভক্তচুড়ামণি বলিয়া পরিগণিত হওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের সময় মুসলমান রাজাদের প্রভাবে শত সহস্র হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা সত্য, কিন্তু মুসলমানের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া এবং হিন্দুসমাজের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্কে কোন মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

সাধনবলে দাসীপুত্র নারদ মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। চরিত্রমাহাত্ম্যে বিদুর সাধুভক্তদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। কঠোর তপস্যাবলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তকুলচুড়ামণি প্রহ্লাদ দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতা, গুরু, শিক্ষক সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী ছিল। স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে তাঁহাকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন পিতার কঠোর শাসন, শিক্ষকের কুশিক্ষা তাঁহাকে সে মন্ত্র হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। হরিদাসের গুরুও স্বয়ং ভগবান। তিনি বঙ্গদেশে দ্বিতীয় প্রহ্লাদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রহ্লাদের ন্যায় তিনি সকল অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহার পুণ্য প্রতিভা, তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, তাঁহার চরিত্রের বল ও মাধুর্য্য, তাঁহার বিনয় ও দৈন্য, তাঁহার অতুলনীয় দয়া, ক্ষমা ও তিতিক্ষা তাঁহাকে প্রহ্লাদের আসনে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে, প্রহ্লাদ পৌরাণিক চিত্র, কিন্তু হরিদাস ঐতিহাসিক চরিত্র, তাঁহার জীবনের মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময় চরিতের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে, হরিদাস হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানধর্ম্মে নীত হইয়াছিলেন। পরে আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, তাঁহারা একথা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে মুসলমানের ঘরে এরূপ আদর্শ ভক্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই।

বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে,
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে
কুলে তবে কি করিবে নরকেতে মজে।
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া হরিদাস বারংবার দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, যোগী, জ্ঞানী সিদ্ধভক্ত হরিদাস নিজকে তৃণ হইতেও নীচ জ্ঞান করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সকল উপদেশের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনিয়া সদা হরি।"

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সদা সর্ব্বদা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। উন্নত বৈষ্ণব মাত্রেরই জীবন এই আদর্শে গঠিত।

কিন্তু ভগবানের কৃপায় হরিদাসের মধ্যে এই আদর্শটি জ্বলন্তভাবে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবন দাস হরিদাসের ভগবদ্দর্শন বর্ণনাকালে তাঁহার দৈন্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ।"

ভাব বিহ্বল হরিদাস অর্জ্জুনের ন্যায় আত্মহারা হইয়া বলিলেন,

"নিগুর্ণ অধম সর্ব্ব জাতি বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু। তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান॥"

হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণসভার সমক্ষে হরিদাসকে বলিলেন,

"কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এইত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥"
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা যে জান হরি নামের মাহাত্ম্য॥"

এখানে নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া আক্রমণকারীকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন তখন গৌড়ের ভক্তগণ প্রতিবৎসর পুরী গমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। এক সময়ে ভক্তগণ আসিয়া একে একে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাসকে না দেখিয়া মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস কোথায়। সকলে পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন হরিদাস দণ্ডবৎ হইয়া রাজপথে পরিয়া আছেন। ভক্তগণ ধাইয়া আসিয়া হরিদাসকে বলিলেন—প্রভু তোমাকে দেখিতে চাহেন, সত্বর চল

"হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি হায়।
মন্দির নিকটে মোর নাহি অধিকার।"
"মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গনে কৈল তারে উঠাইয়া॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু সঙ্গে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥" —চরিতামৃত

যে নিজকে হেয় জ্ঞান করে মানুষ ও ভগবান তাহাকে উচ্চ আসন প্রদান করেন। হরিদাস নিজেকে অস্পৃশ্য পামর বলিয়া ধিক্কার দিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিলেন, তোমার স্পর্শে আমিও পবিত্র হইলাম। তুমি দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতেও পরম পবিত্র। হরিদাস বলিলেন যে আমাকে দর্শন করিলে পাপ হয়, স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় কিন্তু যখন হরিদাসের মৃতদেহ নিয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্র তীরে গিয়া সমুদ্রের জলে স্নান করাইলেন তখন বলিয়াছিলেন সমুদ্র আজ হরিদাসের স্পর্শে মহাতীর্থ হইল।

হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল॥"

শুভক্ষণে সমুদ্র তীরে মহাপ্রভু যে মহাসত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসীর হৃদয় কন্দরে অহর্নিশি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হউক। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের সাধু মহাজন আমাদের নমস্য আমাদের পূজনীয়। হরিদাস ঠাকুর মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজকে মহা উদারধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। হরিদাসের পিতামাতার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, কিরূপে তিনি গৃহত্যাগ করেন এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিরা নির্ব্বাক্। হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যপূর্ণ আত্মা ও ভক্তিময় হৃদয় নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হয়ত কোন ভক্তচরিত বা ভক্তিগ্রন্থ দৈবাৎ অধ্যয়ন করিয়া ভাবে উন্মত্ত হইয়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগী ভক্তদের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। হরিদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সময় অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বঙ্গদেশে আসিয়া অনেককে শিষ্য করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে মাধবেন্দ্রের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য মাধবেন্দ্রের নিকট ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্য বল্লভ দত্ত প্রভৃতি অদ্বৈত প্রভুর সমবয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই মাধবেন্দ্রের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সমস্ত ভক্ত বৈষ্ণবই সাক্ষাৎ কিংবা গৌণভাবে মাধবেন্দ্রের শিষ্য। হরিদাস ঠাকুরকেও সেইরূপ মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়া অনুমান করা একান্ত অসঙ্গত নহে। সমসাময়িক লোকেরা যখন তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনা

সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত রহিয়াছেন তখন আজ পাঁচ শত বৎসর পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনার জন্য ঐতিহাসিক ভিত্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে আজকাল যেমন আবশ্যক অনাবশ্যক সব কথা একত্র গ্রথিত করিয়া রাখার পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না। লেখক একটি জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সংবাদ সংসারকে জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কোন্ দেশে কি প্রকারে সেই জীবনধারাটি প্রবাহিত হইয়া এরূপ উদার মহান্ উচ্ছ্বসিত প্রবাহে পরিণত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যত্নবান্ হন নাই। আর একটি কথা। ভগবৎপ্রাণ বৈষ্ণবদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ছিল না। তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বড়ই ভয় করিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে শত শত বৈষ্ণব মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে কেহ যে কোন দেশে যে কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে সে দেশ সে সমাজকে ধন্য করিয়া মহাপুরুষোচিত যশ ও গৌরবলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের অল্প লোকেই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় জীবনের সংবাদ রাখে। চতুর্দ্দিক হইতে নদীসকল আসিয়া যেমন মহাসমুদ্রের মধ্যে আপনাদের বারিপ্রবাহ ঢালিয়া দেয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শত শত পারিষদবর্গ সেইরূপ আপনাদের পবিত্র জীবন-ধারা চৈতন্য-সমুদ্রে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তাহাদের কোনটি প্রেমের ধারা, কোনটি বিশ্বাসের ধারা, কোনটি শান্তির ধারা, কোনটি বৈরাগ্যের ধারা, কোনটি পুঞ্জীভূত পুণ্যপ্রবাহ। মহাপ্রভুর মহাযজ্ঞে আহুতিদান করা ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সেই প্রয়োজন সাধন কে কতটুকু করিয়াছেন তাহার প্রতিই কেবল বৈষ্ণবদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু হরিদাস সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, তিনি মহাপ্রভুর জীবন-যজ্ঞে যোগদান করিয়া পূর্ব্বেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে লুক্কায়িত রাখিতে যত্ন করিতেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে জীবনব্যাপী অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মহত্ত্বকে খাঁটি সোনা বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রহ্লাদ, ঈশা ও শাক্যসিংহের ন্যায় সকল অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমসিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এমন অতি আশ্চর্য্য অগ্নি-পরীক্ষাপূর্ণ জীবন-চরিতে কোথাও বাজে কথা নাই যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সে দিকেই কেবল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব। পাঠকগণের নিকট নিবেদন, তাহারা কেবল এ জীবন-গঙ্গার সৌম্য মোহিনী মূর্ত্তি দেখুন, অদ্ভুত তরঙ্গভঙ্গ দেখুন, উভয় পার্শ্বস্থ রমণীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হউন আর জানিয়া রাখুন—এ জীবন-গঙ্গার উৎপত্তি বিষ্ণুপাদ-পদ্ম হইতে। এই জন্যই এই জীবন-গঙ্গার স্পর্শে সমুদ্রও মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেণাপোলের সাধন-কানন

হরিদাসের সঙ্গে সমাজের প্রথম পরিচয় বেণাপোলের সাধন-কাননে। এই বেণাপোল একটী ক্ষুদ্র গ্রাম; এখন শিয়ালদহ-খুলনা রেল লাইনের অন্তর্গত একটী সুপরিচিত ষ্টেশন। বেণাপোলের যে মাঠের উপর দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে তাহা এখনও হরিদাসের মাঠ বলিয়া খ্যাত। হরিদাস অকৃত-দার অবস্থায় গার্হস্থ্যসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বেণাপোলের গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বিজন বনে তৃণলতা দ্বারা একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেন। হরিদাস তাঁহার কুটীরের নিকট একটী তুলসীতরু রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন এবং তারপর তুলসীর মূলে জলসেচন করিয়া তাঁহার সেই তৃণকুটীরে নাম-জপে নিবিষ্ট হইতেন। তিনি এমন সুমধুর ধ্বনিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন যে, লোকের প্রাণে তাহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখজনক হইত। তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ও দিবসের প্রায় সময়ই বহু লোক তাঁহার আশ্রমের অদূরে বসিয়া থাকিত। তিনি সমস্ত দিন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমসিন্ধুনীরে এরূপ মগ্ন হইতেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন। কিরূপে দিন অতিবাহিত হইত তাহা তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে বন হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী মুষ্টিমিত অন্ন ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। হরিদাসের নিয়ম ছিল প্রতি মাসে এক কোটী নাম জপ করিবেন। সুতরাং প্রতি দিন অন্ততঃ তিন লক্ষ নাম জপ বা কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার সংখ্যা পূর্ণ হইত না। ইহা দিবামানের দ্বাদশ ঘটিকায় অসম্ভব। হরিদাস

এই নিমিত্ত আবার আসনে বসিয়া নাম-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার সেই সঙ্কল্পিত তিন লক্ষ সংখ্যা পূর্ণ হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতেন।

"হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা—।
বেনা পোলের বন মধ্যে কত দিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন,
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥"

—চরিতামৃত

শাস্ত্রে সাধনের জন্য কতগুলি স্থান প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত আছে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকং।
তীর্থ প্রদেশাঃ সিন্ধুনাংসঙ্গমঃ পাবনং বনং।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহং
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাং।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥

—কুলার্ণবতন্ত্র

ইহার মধ্যে হরিদাস ঠাকুরকে আমরা বনে, উদ্যানে, গুহায়, নদীতীরে ও সমুদ্রকূলে দেখিতে পাই। তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে মুমুক্ষু হইয়া বেড়াইয়া বেড়ান নাই। লোকহিত ব্রত তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম ছিল, এজন্য তিনি লোকালয়ের অদূরে থাকিতেন এবং উচ্চারণ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সেই সুমধুর কীর্ত্তনের মোহিনীশক্তিতে প্রস্ফুটিত শতদল পানে মধুলোভী ভৃঙ্গ যেমন ধাবিত হয় সেইরূপ শত শত লোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হরিদাসের হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল যে তিনি মনে করিতেন একবার মাত্র হরিনাম শ্রবণ করিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে। পশুপক্ষীরা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা হরিনাম শ্রবণ মাত্রই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি বলিতেন যাঁহারা মনে মনে হরিনাম জপ করেন তাঁহারা কেবল আপনাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেন আর যাঁহারা উচ্চরবে কীর্ত্তন করেন তাঁহারা শত সহস্র জীবের উপকার করেন।

শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম,
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে নাপারে,
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে,
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে।
কেহ আপনার মাত্র করায় পোষণ,
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।

— চৈতন্য ভাগবত

এইরূপে তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য ও প্রচার ধর্ম্মের গুরুত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "হরিদাস! কলিকালে মুসলমানেরা গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে; ইহাদের কিরূপে নিস্তার হইবে ভাবিয়া পাই না।"

হরিদাস উত্তর করিলেন, "প্রভু! কিছু চিন্তা করিও না, যবনদের দুঃখে দুঃখী হইও না।"

যবনদের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হারাম হারাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে নাছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামাভাস হৈতে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

অজামিল ঘোর পাপী ছিলেন। তিনি মৃত্যু সময়ে নিজ পুত্র নারায়ণকে একাগ্রমনে ডাকিয়াছিলেন, সেই জন্য বিষ্ণুদূত আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে যমদূত আসিয়া বলে যে, যে ব্যক্তি আজীবন ঘোরতর মহাপাপে লিপ্ত ছিল তাহার উপর যমেরই অধিকার। বিষ্ণুদূত বলেন, 'যে

ব্যক্তি মৃত্যু-সময় "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ না করিলেও তাহার বৈকুণ্ঠলোকে গতি হইবে। দুই দূত অনেক তর্কাতর্কির পর যমরাজের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হইলেন। পরম বৈষ্ণব যমরাজা বিষ্ণুদূতের মতে মত দিলেন।

নাম মাহাত্ম্য পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য জগতে ঘোষিত হইল।

এই নাম মাহাত্ম্য বর্ণনে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, ভাগবত মুখরিত। এই নাম মাহাত্ম্যে রত্নাকর দস্যু কবিগুরু বাল্মীকি হইলেন। এই নামের গুণে জলে পাষাণ ভাসিয়াছে। এই নামের গুণে অহল্যার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। এই নামের মাহাত্ম্য বশিষ্টদেব পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য বশিষ্ট দেবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বশিষ্টদেবের অনুপস্থিতে তদীয় পুত্র মহারাজা দশরথকে এই পাতি দিলেন যে ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষালণের জন্য তিনবার 'রাম'নাম উচ্চারণ কর। বশিষ্ট এই কথা শ্রবণে পুত্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, "ধিক্ তোর শিক্ষা-দীক্ষায়, তুই আমার পুত্র হইয়া রাম নামের মাহাত্ম্য কিছুই অবগত নহিস। সংসারে এমন পাপ নাই যাহা একবার মাত্র রাম নামে দূর না হয়। তাহাতে তুই তিনবার নাম উচ্চারণ করিবার বিধি দিয়া "রাম" নামের মাহাত্ম্য সঙ্কুচিত করিয়াছিস্। তোকে অভিসম্পাত করি তুই চণ্ডালের কুলে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" বশিষ্ট-তনয় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে বশিষ্ট বলিলেন যে, "তুই যখন গুহকচণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি তখন 'রাম' তোকে সুহৃৎরূপে আলিঙ্গন করিবেন।' একদা চৈতন্যদেবকেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

নৃপতি হোসেন শাহ তাহার স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার মুখে করওয়ার পানি দিয়া তাহার জাতিনাশ করাইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিরায় এই দুঃখে দেশত্যাগ করিয়া বারানসী চলিয়া গেলেন। সেখানে পণ্ডিতেরা তাহাকে তপ্ত ঘৃত মুখে ঢালিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। সুবুদ্ধিরায় মর্ম্মাহত হইয়া গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া এই উপদেশ দেন যে—মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বল।

> "একনামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে,
> আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।"

বশিষ্ট দেবের ন্যায় চৈতন্যদেবও বলিলেন যে একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

> একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
> পাপী হয়ে তত পাপ করিবার নারে।

যিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত, তাহাকে কেবল পাপ মুক্তির উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত না হইয়া প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব তাহাকে চরম পুরুষার্থ শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় স্বরূপ দ্বিতীয়বার নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ দিলেন। ভক্তেরা যেমন হরিনাম কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরাও সেইরূপ ওংকারের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। নাম আর বস্তুর মধ্যে প্রভেদ নাই। ব্রহ্মবিদেরা শব্দব্রহ্ম বলিয়া একথার সাক্ষী দিয়াছেন। বাইবেলেও ঠিক সেই কথা আছে।

Word was with God; Word was God.

আধুনিক ব্রাহ্ম সাধকের মধ্যেও কেহ কেহ নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্ম সাধক গাহিয়াছেন—

> আসিছে ব্রহ্ম নামের তরণী কে কে যাবি তোরা আয়রে।

কবি ব্রহ্ম নামকে ভব-সমুদ্র পার হইবার তরণীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তু হইতেও নাম বড়, শ্রীকৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণের নাম বড় একথা সত্যভামার উপাখ্যানে সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। সত্যভামা নারদকে কৃষ্ণের ওজনের ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বারকার সকল ধনরত্ন একত্র করিয়া পাল্লার একদিকে চাপাইয়া দিলেন, আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন, কিন্তু দ্বারকার সমস্ত ধনরত্নও কৃষ্ণের ওজনের সমান হইল না। তখন সব ধনরত্ন নামাইয়া একটী তুলসীপত্রে "কৃষ্ণ" নাম লিখিয়া শূন্য পাল্লায় রাখা মাত্র কৃষ্ণ উপরের দিকে উঠিলেন।

> "তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
> নীচে হইল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ।
> কৃষ্ণনাম গুণের বেদে নাহিক সীমা।
> বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণ নামের মহিমা॥

; কৃষ্ণনাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণনাম চিত্ত করি দৃঢ় ॥
হরি হরি বলিয়া পাইবে হরিকে।
হরির মুখের কথা নাহিক সন্দেহ ॥
—কাশীরামদাস

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বারংবার বলিয়াছেন :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

আর হরিদাস ঠাকুর এই হরিনামকেই সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন এই জপ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই যজ্ঞের আরম্ভ বেনাপোলের সাধন কাননে শেষ পুরুষোত্তমে জীবনের শেষ দিন। নাম কীর্ত্তনরূপ যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন 'রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও একদিনের জন্য সে ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি এই নামের তরণী অবলম্বন করিয়াই ভব-সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। এই নাম সঙ্কীর্ত্তনেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা

রামচন্দ্র খান বনগ্রাম প্রদেশের তদানীন্তন ভূম্যাধিকারী ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ড প্রধান বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহার অধিকারের মধ্যে শত শত লোক প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে অবনত হইত—রামচন্দ্র খানের পক্ষে ইহা বড়ই অসহনীয় হইল। সাধুদ্রোহী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ পাপাশয় রামচন্দ্র খান হরিদাস ঠাকুরের অপমান করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র খানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হরিদাস ঠাকুরের নিষ্কলঙ্ক ও উদার চরিতে কোথাও কোনপ্রকার দোষ বাহির করিতে পারিল না। নিচাশয় রামচন্দ্র খান নিরাশ হইল না, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে সংসারের তীব্রতম প্রলোভন তাঁহার সামনে ধরিয়া তাঁহার চরিত্রে পাপের প্রবেশ দ্বার উন্মোচন করিবে। রমণীর রূপলাবণ্যে মানুষের কথা দূরে থাকুক দেবতাদের মন পর্য্যন্ত চঞ্চল হইতে দেখা গিয়াছে। রমণীরূপে মহাযোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, ভক্তের মন টলিয়াছে, সাধু মহাজনের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র মনে করিল পৃথিবীতে এমন কোন্ সাধু আছে যাঁহার হৃদয় আসাধারণ রূপবতী যুবতীর রূপলাবণ্যে টলিবে না। তাই সে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী বেশ্যাগণ একত্রিত করিল।

কোন্ প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥
বেশ্যাগণে কহে বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্ম্মনাশ ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥

রামচন্দ্র খান বেশ্যার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার আর কাল বিলম্ব সয় না। তিনদিনের কথাটা তাহার ভাল লাগিল না। তাহার ইচ্ছা ঐ মুহূর্ত্তেই হাতে হাতে সাধু হরিদাসকে কুক্রিয়ান্বিত অবস্থায় ধরিয়া আনে।

"খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে।"

বেশ্যা রামচন্দ্র খানের অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি রাখিত। সে বলিল ইহা কি সম্ভবপর যে আমি যাব আর হরিদাসের ন্যায় সাধু আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ফাঁদে পড়িবে। তাঁহার সঙ্গে আগে আমার সঙ্গ হউক, পরে তুমি তোমার পাইক পাঠাইও।

বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয় বারে পাইক লইব তোমার ॥

এইরূপ কথোপকথনের পর সে সুন্দরী যুবতী সময় ও সুযোগের অন্বেষণে রহিল এবং একদিন রাত্রিকালে বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সাধন-কাননের নৈশ-সৌন্দর্য্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করতঃ ধীরপদ নিক্ষেপে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল। যুবতী হরিদাসের চরিত্র জানিয়া আশ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিল। সে প্রথমতঃ তুলসীতলায় নমস্কার করিল; তারপর হরিদাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল—

"তুলসীরে নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিল দাঁড়াইয়া ॥"

পরে দ্বারে উপবেশন করিয়া হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সুমধুর স্বরে কহিতে লাগিল, "ঠাকুর তোমার অপরূপ

রূপলাবণ্য এবং যৌবন-শোভা দেখিয়া কোন্ রমণী মন সংযত রাখিতে পারে। তোমার সঙ্গম লাভের জন্য আমার মন লুব্ধ। তোমাকে না পাইলে আমার প্রাণ বাঁচিবে না।

"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বৃন্দাবন দাসও তাঁহার রূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন,
সর্ব্ব-মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম।

হরিদাস ব্রহ্মচারী, চিরকুমার ব্রতধারী, নবীন তপস্বী, নবীন যোগী, নবীন ভক্ত। যে পরীক্ষায় শত শত সাধু মহাজনের পদস্খলন হইয়াছে, যে পরীক্ষায় মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ হইয়াছে আজ সে পরীক্ষা তাহার নিকট উপস্থিত। কিন্তু হরিদাস যে কেবল স্থির অচল অটল ছিলেন তাহা নহে, তিনি বেশ্যার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না; তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন না। যিনি নামামৃত সিন্ধুমধ্যে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন হইয়া থাকেন তাহার নিকট মোহ কি ছার! যিনি অহোরাত্র শ্রীহরির রূপসাগরে নিমজ্জিত থাকেন তাঁহার নিকট রমণীর রূপ কিরূপ নগণ্য! প্রভু ঈশা যখন সয়তান কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন—Get thee behind me, Satan, সয়তান, আমার পশ্চাৎ দূর হ।

হরিদাস সয়তানের দূত সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি বেশ্যাকে দূর করিয়া দিলেন না।

মার যখন পুরুষসিংহ শাক্যসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিল তখন তিনি সিংহ-বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

"মেরু পর্ব্বতরাজ স্থান তু চলেৎ সর্ব্বং জগদ্বোভবেৎ
সর্ব্বে তারক সঙ্ঘ ভূমি প্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রানভাৎ।
সর্ব্ব সত্ব করয়ে একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
নত্বেব দ্রুমরাজ মূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ॥"

"এবং মেরু পর্ব্বতরাজ স্থানভ্রষ্ট হইবে, সমগ্র জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে তথাপি এই যে বৃক্ষমূলে আমি বসিয়া আছি এখান হইতে আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।"

যোগীবর ঈশার ভ্রূকুটী, শাক্যসিংহের পরুষকার ব্যঞ্জক অভূতপূর্ব্ব হুঙ্কার আমাদের নিকট অতুলনীয় স্বর্গ সম্পদ; কিন্তু হরিদাসের ব্যবহার ততোধিক আশ্চর্য্য ও মনোমুগ্ধকর। ভক্ত হরিদাস সয়তানের শক্তি লেশমাত্রও অনুভব করিলেন না। তিনি সয়তানকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাকে ভগবানের করুণার অধিকারী করিয়া ভগবানের পাদপদ্মরূপ পরম মোক্ষপদ দিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। ভগবান বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহং॥"

সেইজন্য যখন পিশাচী পুতনা ধাত্রীরূপে স্তনে কালকূট মাখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিল তখন পরম কারুণিক ভগবান তাহাকে ধাত্রীর লভনীয় পরমপদ দান করিয়াছিলেন। এ করুণার তুলনা নাই। পুতনা যখন পাপের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন তাহার পরিত্রাণের শেষ আশা প্রদীপটী নিবিয়াছিল, তখন ভগবানের করুণা তাহার উদ্ধারের জন্য মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র খান প্রেরিত বেশ্যাও যখন নরকের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজন পূজ্য ভক্ত চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইল তখন পরম কারুণিক ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার প্রতি মনুষ্যোচিত বিদ্বেষ ঘৃণা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে করুণাময় ভগবানের একবিন্দু করুণা আস্বাদন করাইতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥

বেশ্যা অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। হরিদাস নামকীর্ত্তনে আত্মবিস্মৃত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। বেশ্যা সমস্ত রাত্রি ঐভাবে বসিয়া হরিনাম শুনিয়াছিল।

এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গম॥

রামচন্দ্র খান শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। এবং পরদিন রাত্রে দ্বিগুন উৎসাহের সহিত তাহাকে পুনরায় হরিদাসের নিকট পাঠাইল।

আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি—তোমার অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হইলে হবে তোমার মন॥

তখন বেশ্যা তুলসী ও হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া পূর্ব্ববৎ নাম শুনিতে লাগিল। আজি দুই একবার আপনিও একটুকু শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিল।

"তুলসী ও ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি শুনে বলে হরি হরি॥"

বেশ্যার মন ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিনেই তাহার নামে রুচি জন্মিল। আজিও সমস্ত রাত্রি নাম সঙ্কীর্ত্তনে শেষ হইল। বেশ্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। হরিদাস বিনয় করিয়া বলিলেন যে আমি মাসে কোটী নাম জপ করি। মাস শেষ হইতেছে। আজ সংখ্যা পূর্ণ হইবে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নাম নিলাম তবু সংখ্যা পূর্ণ হইল না। কাল নিশ্চয়ই সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

বেশ্যা গিয়া রামচন্দ্র খানকে সকল কথা বলিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে বেশ্যা পুনরায় ঠাকুর হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইল। সে দিনও পূর্ব্ববৎ তুলসী ও হরিদাস ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া দ্বারে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং নিজেও মাঝে মাঝে হরি হরি—বলিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন আজ সংখ্যা পূর্ণ হইবে তবে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ভগবানের করুণার উপর হরিদাস ঠাকুরের অটল বিশ্বাস। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তৃতীয় দিন রাত্রি শেষে পাষাণে কুসুম ফুটবে। মরুভূমি প্রেমাসারে সিক্ত হইবে ভগবানের করুণা পাপীয়ারে অবতীর্ণ হইবে। হরিদাস এই উদ্দেশ্যে আজ ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিতে ডাকিতে রাত্রি শেষ হইল। রজনীর অন্ধকারের সহিত বেশ্যার পাপসিক্ত হৃদয়ের ঘোরান্ধকার দূর হইল। তারপর যখন পূর্ব্বদিক রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া গগনে উজ্জল রবির কিরণছটা ছড়াইয়া পড়িল, তখন বেশ্যার হৃদয় আকাশে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত পাপাবলীর বীভৎস মূর্ত্তি স্পষ্টভাবে তাহার মানস পটে প্রকটিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বেশ্যার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আত্মহারা হইয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র খান তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল সে কথা স্বীকার করিল। অবশেষে তাহার পুঞ্জীভূত পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা চাহিল।

"দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুই অধমে নিস্তার॥"

ঠাকুর বলিলেন যে "রামচন্দ্র খানের কথা আমি সব জানি। সে অবোধ ও মূর্খ সেই জন্য তাহার অত্যাচারে আমার মনে দুঃখ নাই। তুমি যে দিন এখানে আসিয়াছিলে সেইদিনই আমি এ স্থান ছাড়িয়া যাইতাম। কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য তিন দিন রহিলাম।"

ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ, সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥"

কি অতুলনীয় নির্ব্বিকার চিত্ত! পাপীর প্রতি কি অগাধ প্রেম!

হরিদাস পাপীর মুক্তির জন্য তিন দিন যাবৎ বিকারের কারণ সামনে রাখিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অন্য কোন মহাপুরুষ হয় ত এই মহা প্রলোভনের নিকট হইতে সরিয়া পড়িতেন, কিন্তু হরিদাসের একদিকে যেমন নিজের চরিত্রের উপর অটল বিশ্বাস অপর দিকে তেমন ভগবানের করুণার

উপর ষোল আনা নির্ভর। হরিদাসের চরিত্র-গৌরবের নিকট মহামহাযোগী সাধু ভক্তেরা মস্তক অবনত করিবেন। ভক্ত বৃন্দাবন দাস হরিদাসের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন।

"এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দেখনে॥
উহান যে যোগ্যপদ হরিদাস নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্বভূত বৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতরী॥
উঁহি যে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহার স্পর্শ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা শিবে হরিদাস-হেন ভক্ত সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥"
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্ম-পাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥

হরিদাসের সংসর্গে বেশ্যার অনাদি কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইল, সংসার-বন্ধন মুক্ত হইল। সে হরিদাসের চরণোপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—ঠাকুর তুমি আমার গুরুদেব। আমার যাহাতে ভবভয় ক্লেশ দূর হয় সেই উপদেশ দান কর। হে আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি আমার জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দাও।

ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

হরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে এই উপদেশ দান করিয়া হরিনাম লইতে লইতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বেশ্যা গুরুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। সে তাহার বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া মাথা মুড়াইল। বিত্ত সম্পত্তি লুটাইয়া দিয়া ভিখারিনী সাজিল। হরিদাসের সাধন কাননের অধিকারিণী হইয়া হরিদাসের কুটীরে বাস করিতে লাগিল। গুরুর পদানুসরণ করিয়া দিন তিন লক্ষ নাম জপ করিতে লাগিল। তুলসী সেবন ও চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহার ইন্দ্রিয় সংযত হইল। হরিনাম করিতে করিতে তাহার হৃদয় আকাশে দিব্য প্রেমচন্দ্রের উদয় হইল। চতুর্দ্দিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে অস্পৃশ্যা কুলটা—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥"

এ জগতে কেহ ছোট নয়, কেহ তুচ্ছ নয়, কেহ অস্পৃশ্য নয়, কেহ ঘৃণার পাত্র নয়। ভগবানের কৃপা হইলে বাজারের বেশ্যা ও মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায় দেবতার পবিত্র আসন লাভ করিতে পারে। ঈশা শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" হরিদাস ঠাকুর সে উপদেশটী স্বকীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা—জনসাধারণে প্রচার করিলেন।

হরিদাসের অন্তিমশয্যা

মাষ্টারম'শায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
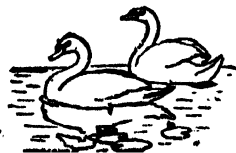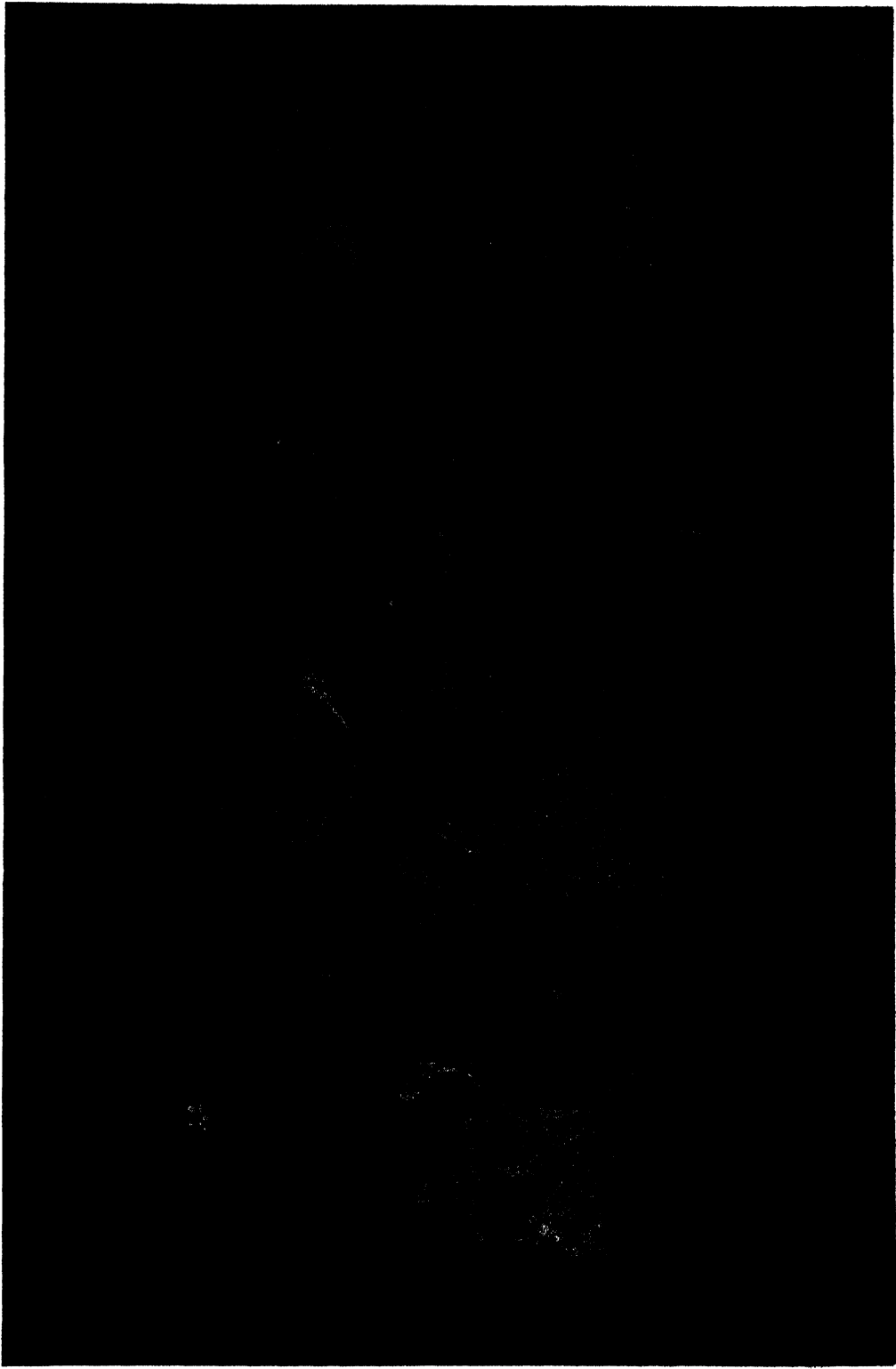
নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, কিন্তু প্রায় সকলেই বলে 'মাষ্টার মশায়'। কেবল কৃষক ও মুটে মজুরদের মধ্যে যাহারা বিশেষ বয়স্ক বা বৃদ্ধ তাহারা 'দাদাঠাকুর' বলিয়া ডাকে। নাম অনেকেই জানে না। পরণে দেশী মিলের নয়, গোবিন্দপুরের তাঁতীদেরই তৈয়ারী মোটা আট হাতী ধুতি। গায়ে জোলাদের বোনা মোটা কাপড়ে প্রস্তুত প্রাচীন প্রণালীর আজানুলম্বিত জামা। পায়ে গ্রামেরই গুরুচরণ মুচির রচনা দশ আনা দামের বাদামী চটি। মাথায় পুরাতন একটি ছাতা। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দূর হইতে দেখিলেও জানা যায় মাষ্টারম'শায় যাইতেছেন। যাহারা সৌখীন বা বিলাসী তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাষ্টারম'শায়কে 'গোবিন্দপুরের গান্ধী' বলিয়া ঠাট্টা করে।

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বিশ বৎসর বয়সে গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসরকাল সমভাবে শিক্ষকতা করিয়া সম্প্রতি পঞ্চাশে পদার্পণ করিয়াছেন। কলেজে পড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাপ বিষয় সম্পত্তি কিছু না রাখিয়া অথচ সংসারটি ঘাড়ে ফেলিয়া সহসা ইহলোক হইতে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সেই ইচ্ছা দমন করিয়া কুড়ি টাকা বেতনের শিক্ষকতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বহু প্রকার পুস্তকে পূর্ণ বিদ্যালয়ের বড় লাইব্রেরীর বইগুলি একে একে পড়িয়া তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পূর্ণ করিয়াছেন। বিলাসিতা বর্জ্জিত জীবনের পক্ষপাতী মাষ্টারম'শায় অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় কমাইয়া মধ্যে মধ্যে পুস্তক ক্রয় করিয়াও পড়িয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহার গৃহেও একটি ছোট খাটো গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে।

কুড়ি টাকায় সংসার চলে না, সুতরাং মাষ্টারম'শায়কে বাধ্য হইয়া কয়েকটি বালকের গৃহশিক্ষকের কার্য্যও করিতে হইয়াছে। তিনি সকালে দুইটি এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দুইটি এই চারিটি বাড়ীর প্রাইভেট টিউটরী করেন। ইহা ছাড়া দুই একটী গরীবের ছেলে তাঁহার গৃহে আসিয়া পড়িয়া যায়। অবশ্য পরে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ মাষ্টারম'শায়ের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। তবে সুপারিশ ও খোসামোদের জোরে অন্যান্য মাষ্টারের বেতন যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, খোসামোদ এবং আপনার জন্য অনুরোধে অনভ্যস্ত মাষ্টারম'শায়ের মাহিনা ঠিক তত শীঘ্র এবং সেই পরিমাণে বাড়ে নাই। বিশ বৎসরে তাঁহার বেতন দশ টাকা মাত্র বাড়িয়াছিল। তাঁহার বেতন না বাড়াইবার প্রধান অজুহাত তিনি ম্যাট্রিক মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত তকমার দিক দিয়া তিনি ম্যাট্রিকের অধিক না হইলেও, শিক্ষায়, শিক্ষা দিবার দক্ষতায় তিনি কোন গ্রাজুয়েট শিক্ষক অপেক্ষা কম নহেন। এই সত্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ জানেন না তাহা নহে। কিন্তু মাষ্টারম'শায়ের দিক হইতে স্কুলের মালিক (স্কুল প্রতিষ্ঠাতার পুত্র) জমিদার জয়নারায়ণ চৌধুরী ও স্কুল কমিটীকে তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট করিবার কোন চেষ্টা কোন দিন অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধির বিষয় বিশেষ বিলম্বে বিবেচিত হইয়াছে। মাষ্টারম'শায়ের বেতন বিশ বৎসরে মাত্র দশ টাকা বাড়িয়া ত্রিশ টাকা হইবার দশ বৎসর পরে এক দিন অকস্মাৎ তাঁহার বেতন চল্লিশ টাকায় পরিণত হয়, সেই ঘটনা আমরা পরে জানাইব। এখন মাষ্টারম'শায় স্কুল হইতে চল্লিশ টাকা এবং গৃহশিক্ষকের কায করিয়া ত্রিশ টাকা পান, সুতরাং সর্ব্বসমেত সত্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। মাষ্টারম'শায়ের পিতা শেষ বয়সে মৃত্যুর কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার ফলে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মাষ্টার মশায়ই সেই ভ্রাতা ও ভগিনীকে মানুষ করিয়াছেন। এই উপার্জ্জন হইতেই ভ্রাতার পড়ার খরচ যোগাইয়াছেন এবং ভগিনীটির বিবাহ দিয়াছেন। মাষ্টারম'শায়ের তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা।

গোবিন্দপুর গণ্ডগ্রাম। গ্রামে কয়েক ঘর বড় জমিদারের বাস। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, চতুষ্পাঠী বা টোল, বাজার-হাট, ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি সমস্তই এই গ্রামে রহিয়াছে। জমিদারের মধ্যে জয়নারায়ণ চৌধুরীর

আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারই পিতা হরিনারায়ণ বাবু হাইস্কুল স্থাপন করেন। জয়নারায়ণবাবু পিতার একমাত্র পুত্র। প্রায় মানুষ মাত্রই অল্পবিস্তর তোষামোদপ্রিয়। যাহারা সর্ব্বদা চাটুকার শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেই জমিদারদের পক্ষে তোষামোদপ্রিয় হওয়া আরও স্বাভাবিক। সুতরাং ঐশ্বর্য্যাভিমানী জমিদার জয়নারায়ণবাবু স্তুতিবাক্য বা তোষামোদ ভালবাসিলে তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কোন উপলক্ষ্য হইলেই গ্রামের অন্যান্য লোকদের ন্যায় স্কুলমাষ্টারেরাও জয়নারায়ণবাবুকে তুষ্ট করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু মাষ্টারম'শায়কে কোন দিনই এখানে দেখা যায় না। কোন উৎসব উপলক্ষ্যে আহারের নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠপুত্র মুনীশকে পাঠাইয়া দেন। নিরামিশাষী এবং আহার সম্বন্ধে শুচি ও সংযমের পক্ষপাতী বলিয়া বিশেষ বাধ্য না হইলে অন্য কোথাও খান না। মাষ্টারম'শায়ের অনুপস্থিতি জয়নারায়ণবাবু লক্ষ্য করেন না তাহা নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন, মাষ্টারম'শায় কেন আসেন না? নানা জনে নানা উত্তর দেয়।

কেহ কহে লোকটা দাম্ভিক।

কেহ বলে, লোকটা একান্ত অসামাজিক, কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে বা কথাবার্ত্তা কইতে জানে না।

কোন কোন প্রকৃত চাটুকার বলে—হুজুর, লোকটা কাপুরুষ, হুজুরের সামনে এসে বসবার সাহস নেই বলেই আসে না।

কেহ কেহ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, অদ্ভুত লোক এই মাষ্টার'মশায়টি। ওর মনের ভাব বুঝবার যো নাই।

কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহে, এখানে আসবে কি? কোন ভদ্রলোকের সঙ্গেই ত মেশে না। ওর আড্ডা বাগ্দীদের বাড়ীতে, হাঁড়ি ডোম মুচির বাড়ীতে! আমি তো লোকটার গায়ে পাঁচ বছর একটা জামাই দেখছি। গুরুচরণ মুচির তৈরী এক জোড়া চটিতে দু'বছর চালায়। একটা ছাতাই দশ বছর মাথায় দিচ্ছে। বছরে এক জোড়া সাত হাতী বা আট হাতী ধুতি বাস্‌ তাতেই চলে যায়। মাষ্টারী করে রোজগার তো কম করে না, কিন্তু কৃপণের অগ্রগণ্য। আমরা তো ওর নাম দিয়েছি গো বিষ্ণুপুরের গান্ধী।

ইহাদিগের মধ্যে যাহারা কিছু স্পষ্টবাদী ও সত্যানুরাগী—তাহারা বলে, উনি আসবেন কখন, মিশবেনই বা কখন? ভোরে কাক কোকিল না ডাকতেই টিউশানী করতে বেরিয়ে যান, ফেরেন ন'টার পর। তারপর খেয়েই ছোটেন স্কুল। স্কুলে চারটে পর্য্যন্ত খেটে বাড়ী ফিরে এসে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন কি না জানি না, তার পর রাত ন'টা পর্য্যন্ত আবার টিউশানী। রাত ন'টা হ'তে এগারটা পর্য্যন্ত নিজে পড়েন, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমোন—এর ওপর আবার হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাও আছে। ছুটির দিনে দিন রাত ডাক্তারী ক'রে এক মিনিটও ফুরসৎ মেলে না।

যাহারা মাষ্টারম'শায়ের নিকট হইতে উপকার পাইয়াছে নিন্দক ও বিদ্রূপকারীদের মধ্যে এরূপ লোকের অভাব নাই। এই সকল মতামত জয়নারায়ণবাবু নীরবেই শুনিয়া যান। একটি ঘটনায় মাষ্টারম'শায়ের চরিত্রের যে পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও লোকটি যে অদ্ভুত ও বিষয়বুদ্ধিহীন সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাভিমানী বিষয়ী চিত্ত মাষ্টারম'শায়ের বিচিত্র ব্যবহারের কোন যুক্তি-কারণ আজিও খুঁজিয়া পান নাই। আমরা ঘটনাটি পরে বলিতেছি।

অবসর সময়ে মাষ্টারম'শায় হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসাও করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ শিশুদের চিকিৎসাই তিনি করেন। মাষ্টারম'শায়ের মত শিশুদের চিকিৎসক এ অঞ্চলে আর নাই এইরূপ কথা অনেকের মুখেই শুনা যায়। সময়াভাব বলিয়া সাধারণতঃ রবিবারে এবং অন্যান্য ছুটির দিনেই তাঁহার পক্ষে চিকিৎসা-কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। তবে নিত্যই সকালের টিউশানী শেষ করিয়া নয়টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে রোগী-দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করেন। বিকালেও সাড়ে চারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঔষধ দিয়া থাকেন। রোগীর বাড়ীতে গিয়া রোগী দেখিয়া আসা ছুটির দিন ভিন্ন প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না, তবে রোগ কঠিন হইলে অন্যদিনেও টিউশানী করিয়া ফিরিবার পথে রোগী দেখিয়া আসেন। যতই পরিশ্রম করিতে হউক চিকিৎসা করার বিনিময়ে কাহারও নিকট হইতে কিছুই লন না। সুতরাং সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদের পক্ষে মাষ্টারম'শায়ের

যারা চিকিৎসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করা স্বাভাবিক। তবে অন্য কোন চিকিৎসক আরোগ্য করিতে না পারিলে শেষ কালে রুগ্ন শিশুকে একবার মাষ্টারম'শায়কে দেখাইবার ইচ্ছা আশঙ্কাকুল আত্মীয়দের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সাধারণতঃ দরিদ্ররাই—সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই মাষ্টারম'শায়ের সহায়তা সাগ্রহে গ্রহণ করে এবং মাষ্টারম'শায়ও তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রস্তুত থাকেন। যে গৃহে দুঃখ ও দারিদ্র্য যত অধিক সেই গৃহে গিয়া মাষ্টারম'শায়ের চিকিৎসা করিবার আগ্রহও তত বেশী, এই সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

মাষ্টারম'শায়ের এই স্বেচ্ছাকৃত কঠোর কর্ত্তব্য বা দাতব্য ব্যবস্থা ও বিতরণের সহিত তাঁহার জীবনের যে শোক-করুণ ব্যাপার বিজড়িত রহিয়াছে তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সে অনেক দিনের কথা। গ্রামে তখন চিকিৎসকের সংখ্যা কম ছিল এবং দাতব্য ঔষধালয়টি সবে স্থাপিত হইয়াছে মাত্র। মাষ্টারম'শায়ের প্রথম সন্তান দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্রটি অসুস্থ হইয়া পড়ে। সামান্য জ্বর ও ও সর্দ্দি কাসির ভাব হইতে ক্রমশঃ শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি অতিশয় অস্বস্তিকর উপসর্গ সমূহ দেখা দেয়। সন্তানমাত্রেই পিতা-মাতার পরম প্রিয় কিন্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের অন্তরতল হইতে বাৎসল্যের উৎস প্রথম নিসৃত হয় সেই প্রথম জাত পুত্র বা কন্যা পিতা-মাতার মনকে যত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে তেমন বোধ হয় আর কেহই করে না। মাষ্টার-ম'শায় ব্যাকুল হইয়া গ্রামের এবং গ্রামান্তরের প্রায় সকল চিকিৎসককেই দেখাইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার পুত্রের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া যাহা ঘটাইলেন তাহাকে চিকিৎসা-বিভ্রাট বলা চলে। কেহ কহিলেন ব্রঙ্কাইটিস, কেহ কহিলেন ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, কেহ কহিলেন টন্‌সলাইটিস, কেহ বা সমগ্র কণ্ঠনালীতে প্রদাহ বলিয়া মনে করিলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বলিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না।

এদিকে শিশুর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। শ্বাস-কষ্ট অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। শিশু কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, শুধু অব্যক্ত অস্বস্তিতে কখন শয্যার উপর কখন বা পিতা-মাতার কোলে ছটফট করে। মাষ্টারম'শায়ের মনে হইতে লাগিল যেন কোন নির্দ্দয় অদৃশ্য শক্তি কঠোর হস্তে শিশুর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। শিশুর দুঃসহ কষ্ট মাষ্টারম'শায়ের সমগ্র অন্তরকে উদ্বেগ ও বেদনায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। অবশেষে স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীর গহণা বন্ধক দিয়া পঞ্চাশটি টাকা আনিলেন এবং স্থির করিলেন রোগার্ত্ত পুত্রকে লইয়া সস্ত্রীক কলিকাতা যাইবেন ও তথাকার কোন বিখ্যাত চিকিৎসককে দেখাইবেন। কিন্তু যে-দিন যাইবার কথা সে-দিনই পরম মিত্রের মত মৃত্যু আসিয়া শিশুর সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাইল।

শিশুর বিয়োগ-বেদনা অপেক্ষা তাহার অবর্ণনীয় রোগ-যন্ত্রণার স্মৃতিই মাষ্টারম'শায়ের পক্ষে অধিক কষ্টকর হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি যদি ব্যাধি বিজ্ঞানের বা চিকিৎসাশাস্ত্রের কিঞ্চিৎমাত্রও জানিতেন তাহা হইলে হয় ত' পুত্রের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন। মুমূর্ষু ও মৃত শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শোক-সন্তপ্ত ও নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য অনুতপ্ত মাষ্টারম'শায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হউক তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, বিশেষ শিশু-রোগের সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিবেন। কয়েকখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মাষ্টারম'শায় সে-দিনই শিশুর শ্মশানকৃত্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শিশুকে লইয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য যে পঞ্চাশটি টাকা গহণা বন্ধক দিয়া আনিয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে কলিকাতা হইতে কয়েকখানি ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক আনাইয়া প'ড়তে লাগিলেন। এই অধ্যয়নের আলোকে তিনি যে-টুকু বুঝিলেন তাহাতে মনে হইল তাঁহার পুত্র ডিপ্থিরিয়া নামক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে মাষ্টারম'শায় প্রত্যেক রোগার্ত্ত শিশুকে পরলোকগত পুত্রের প্রতীক বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টাকে আপনার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিলেন। প্রত্যেক

রোগগ্রস্ত শিশুর কাতর মুখমণ্ডলে তিনি তাঁহার মুমূর্ষু পুত্রের অব্যক্ত-বেদনায়-ব্যাকুল করুণ মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিলেন। এই বিয়োগবেদনা তাঁহার জীবনে যুগান্তর আনিল ব'ললেও ভুল হয় না।

মাষ্টারম'শায়ের দশ টাকা বেতন বাড়িবার মূলে যে ঘটনার প্রভাব বিদ্যমান আমরা এইবার তাহা জানাইব। এই ঘটনা হইতেই জমিদার জয়নারায়ণবাবুর মনে মাষ্টারম'শায় সম্বন্ধীয় ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা বলিতেছি দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন জমিদার হরিনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর অল্পদিন মাত্র যুবক জয়নারায়ণবাবু বাপের প্রায় বাৎসরিক লাখ টাকা মুনাফার জমিদারীর অধিকারী হইয়াছেন।

দুই

সে-দিন রবিবার। রবিবারে মাষ্টারম'শায়কে টিউশানীও করিতে হয় না। ছাত্রদের অভিভাবকদের ইচ্ছাতেই ইহা হইয়াছে। তাহারা মাষ্টারম'শায়কে বলে, আপনি হপ্তায় একটা দিনও বিশ্রাম করুন। কিন্তু বিশ্রাম যাহাকে বলে মাষ্টারম'শায় সে-দিনও তাহা পান না। দেখিয়া মনে হয় যেন বিশ্রাম তিনি চাহেনও না।

মাষ্টারম'শায় প্রাতঃকালে বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসিয়া রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় গ্রামের পরাণ বাগ্দী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া 'পেন্নাম হই দাদাঠাকুর' বলিয়া প্রণাম করিল, তারপর ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—আমার ছোট ছেলেটা সারারাত অজ্ঞেন হ'য়ে প'ড়ে আছে দাদাঠাকুর। তিন দিন জ্বর। ঠাওরেছিলাম দশ জনের আশীর্ব্বাদে এমনিই সেরে যাবে, কিন্তু কাল সাঁজের বেলা হ'তে জ্বর চন্দনা নদীর বানের মত হু হু ক'রে বেড়েই চলেছে দাদাঠাকুর। গা আগুনের মত গরম। গায়ে ধান রাখলে ফুটে খই হয়ে উঠবে, দাদাঠাকুর। রাত যখন এক পহর তখন হ'তে চুপ ক'রে প'ড়ে আছে। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। শুধু জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ক্ষেন্তর মা তো সারা রাত কান্নাকাটি করছে আর বলছে, ওগো দাদাঠাকুরকে ডেকে আন, দাদাঠাকুর এলেই বাছা আমার ভাল হয়ে উঠবে, ক্ষেন্ত যখন আট মাসের তখন দাদাঠাকুরই তাকে যমের মুখ হ'তে ছিনিয়ে এনেছিল। আমি বললাম, দাদাঠাকুর সারাদিন খেটেখুটে একটিবার চোখ বুজেছে এ-সময় আমি তেনাকে ডাকতে পারব না, ক্ষেন্তর মা। রাতটা কাটুক, সকালেই আমি দাদাঠাকুরের পায়ের ওপর গিয়ে পড়ব। দয়ার শরীর, উনি না এসে থাকতে নারবেন।

এই বলিয়া পরাণ মাষ্টারম'শায়ের পা দুটি জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল, মাষ্টারম'শায় ধমক দিয়া বারণ করিয়া বলিলেন, এ-রকম কর যদি তা হ'লে শুধু আজ নয়, কোন দিনই আমি তোমাদের কথা শুনব না। ক্ষান্তর মা না হয় মেয়েমানুষ, কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে এত অধীর হ'লে চলবে কেন? তুমি বাড়ী যাও, আমি এদের ওষুধ দিয়ে আগে তোমার ছেলেকে দেখে আসব, তারপর আর সব কাজ ক'রব।

পরাণ হাত জোড় করিয়া আবার কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাষ্টারম'শায় ক্রোধের ভাব দেখাইয়া কঠোর কণ্ঠে তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, বাজে কথা আর একটিও বললে আমি যাব না।

উচ্ছ্বাস দমন করিয়া পরাণ চলিয়া যাইতেই জমিদার জয়নারায়ণবাবুর বরকন্দাজ রাম-লছমন সিং আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার রঙীন পাগড়ীমণ্ডিত মস্তকটি ঈষৎ নত করিয়া কহিল—পরণাম, মাচটার বাবু। হুজুরের হুকুম আপনাকে একবার জল্দি যেতে হোবে। একঠো চিঠঠি দিয়েছেন।

এই বলিয়া সে মেরজাই জাতীয় জামার পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মাষ্টারম'শায়ের হাতে দিল। পত্রখানি জনৈক আমলার লেখা। উহা এইরূপ—

মাষ্টার মহাশয়,

বাবুর ছেলেটির বিশেষ অসুখ। তাঁহার ইচ্ছা আপনি অতি শীঘ্র আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবেন। এই পত্র পাইবামাত্রই আসিবেন। ইতি—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার

মাষ্টারম'শায় ছেলেটিকে দুই-একবার দেখিয়াছেন। ধনীর দুলাল সুস্থ-সবল শুভ্র শরীর সুন্দর শিশুটির হাস্যোজ্জ্বল মুখ তাঁহার মনে পড়িল। হাস্যের পরিবর্ত্তে সেই মুখে আজ

হয় তো বিরাজ করিতেছে রোগ-যন্ত্রণাজনিত কাতরতা। মাষ্টারম'শায় পত্র পড়িয়া রাম-লছমন সিংকে কহিলেন—তুমি যাও। বাবুকে বলবে আমি যত শীঘ্র পারি গিয়ে তাঁর ছেলেকে দেখে আসব।

রাম-লছমন সিং বলিল—বাবুর হুকুম আপনিকে হামার সঙ্গেই যেতে হোবে।

মাষ্টারম'শায় কহিলেন—যারা ঔষধ নিতে এসেছে তাদের ঔষধ দিয়ে আমি একবার পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে দেখতে যাব। তাকে দেখেই আমি তোমার বাবুর ছেলেকে দেখে আসব। বুঝলে?

মাষ্টারম'শায়ের কথা রাম-লছমন সিংয়ের পক্ষে সত্যই বুঝা কঠিন হইল। গ্রামের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র সেই পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে আগে দেখিয়া গ্রামের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার, স্কুলের যিনি মালিক সুতরাং মাষ্টারম'শায়েরও যিনি মনিব তাঁহার ছেলেকে পরে দেখা হইবে, ইহার অর্থ সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে বিস্ময়ের সহিত কহিল—পরাণ বাগ্দী কোন্ ভারি লোক আছে যে তার ছেলিয়াকে আগে দেখিবেন? চলুন খোঁকাবাবুকে পহেলে দেখিবেন।

মাষ্টারম'শায় বলিলেন—রাম-লছমন সিং, তুমি আসবার আগেই পরাণ বাগ্দী এসেছিল। তাকে আমি কথা দিয়েছি আগে তার ছেলেকে দেখব। তা ছাড়া তোমার বাবু বড় লোক, তিনি ইচ্ছে করলে বড় বড় ডাক্তার ডেকে এনে ছেলেকে দেখাবেন কিন্তু পরাণ তো আর তা পারবে না।

রাম-লছমন সিংয়ের মত লোক এ সব যুক্তি বুঝিতে পারে না। তাহারা জানে মালিকের হুকুম সর্ব্বাগ্রে এবং নির্ব্বিচারে পালন করিতে হইবে। সে বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিল—'হামার বাবু' 'হামার বাবু' বোল্‌ছেন, তা তোমহার বাবু কোন আছে? তুম্‌হি কার ইস্কুলমে মাচ্‌টারী করছে? কে তোমাকে তলব দিচ্ছে?

মাষ্টারম'শায় কহিলেন—বেশী কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নাই, সিংজি। যা বলেছি বাবুকে বলগে। পরাণের ছেলেকে দেখেই ঐ পথে চলে যাব, বেশী দেরী হবে না। এই বলিয়া তিনি রাম-লছমন সিংএর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আগত রোগীদিগকে দেখিয়া ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিরক্ত ও বিস্মিত রাম-লছমন সিং লম্বা লাঠিটিকে বার বার মাটিতে ঠেকাইয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া জন্মস্থান আরা জেলার ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তিন

জয়নারায়ণবাবু নিজেই মাষ্টারম'শায়ের আসার আশায় বহির্ব্বাটিতে বসিয়াছিলেন। রাম-লছমন সিংকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মাষ্টারম'শায় আস্‌ছেন? তোমাকে যে বল্লাম সঙ্গে নিয়ে আসতে?

রাম-লছমন সিং কহিল—মাচ্‌টার আজব আদমি আছে হামি তো বার বার বল্লাম হুজুরের হুকুম আপনিকে হামার সঙ্গেই যেতে হোবে। মাচ্‌টার বাবু বোল্‌লেন, হামি আগে পরাণ বাগ্দীর ছেলিয়াকে দেখবে, তারপর তোমার বাবুর ছেলিয়াকে দেখতে যাবে। তোমার বাবু তো বুঢ়া লোক আছেন, তিনি বড়া বড়া ডাগ্‌দার বোলাতে পারবেন, পরাণ বেচারাকা কোন্ আছে? মাচ্‌টার বাবু কছুতেই হামার বাৎ শুন্‌লে না, হুজুর।

জয়নারায়ণ বাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাম-লছমন সিংএর দিকে চাহিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—আগে পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে দেখবে, তারপর আমার ছেলেকে দেখতে আসবে?

মনে মনে বলিলেন, আমার স্কুলে কুড়ি-পঁচিশ টাকার মাষ্টারী করে যার জীবন কাটল তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি হলাম পরাণ বাগ্দীর চেয়ে ছোট? ঐশ্বর্য্যাভিমানী জয়নারায়ণবাবুর দেহখানি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার ধারণা তাঁহারই স্কুলের এই সামান্য শিক্ষক, বরাবরই তাঁহাকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে। আজ সকল অবজ্ঞা ও অবাধ্যতার প্রতিশোধ তিনি লইবেন, প্রতিফল তিনি দিবেন। স্কুলের সেক্রেটারী ভবতরণ দত্ত তাঁহারই একজন শিক্ষিত প্রজা। তিনি যাহা বলিবেন সে তাহা নতশিরে শুনিবে। স্কুল কমিটীও তাঁহার হস্ত চালিত পুত্তলিকা মাত্র।

জয়নারায়ণ বাবু কাগজ কলম লইয়া তখনই লিখিতে বসিলেন। তাঁহার হাত ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, তবুও স্বহস্তেই লিখিলেন। দুই খানি পত্র লিখিয়া রাম-লছমনসিংকে দিলেন। বলিলেন, একখানি স্কুলের সেক্রেটারী ভবতরণ

বাবুকে আর একখানি হেড মাষ্টার যদু বাবুকে দিয়ে এস। "যো হুকুম, হুজুর" বলিয়া রাম-লছমন সিং পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তখন জয়নারায়ণবাবু একজন কর্ম্মচারীকে টেলিগ্রাফ করিবার ফর্ম্ম চাহিলেন। কর্ম্মচারী উহা আনিয়া দিলে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাড়ীর ম্যানেজারকে লিখিলেন, যেন তার পাইবা মাত্রই তিনি কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু চিকিৎসককে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর জয়নারায়ণবাবু দ্বারোয়ানকে আদেশ দেন যেন মাষ্টারমশায় আসিলে 'দরকার নাই' বলিয়া তাঁহাকে দ্বার হইতেই বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

অন্দরের একটি সজ্জিত কক্ষে জয়নারায়ণবাবুর রুগ্ন পুত্র উচ্চ পালঙ্কের উপর বিস্তৃত শুভ্র শয্যায় শুইয়া আছে। যে কুঞ্চিতকৃষ্ণ কেশরাজির জন্য শিশুর শুভ্র-সুন্দর শরীরকে সুন্দরতর বলিয়া মনে হইত আইসব্যাগ দিবার সুবিধার জন্য চিকিৎসকদের আদেশে তাহা নির্ম্মূল করা হইয়াছে। জয়নারায়ণবাবুর পত্নী মমতা দেবী পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার মুণ্ডিত মস্তকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন। আদেশের প্রতীক্ষায় দুইজন দাসী দূরে বসিয়া আছে। মমতাদেবী স্বরূপগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার সত্যকিঙ্কর রায়ের কন্যা, তাঁহার অপরূপ রূপসী বলিয়া খ্যাতি আছে। দেখিলে বুঝা যায় সেই খ্যাতি মিথ্যা নহে। এইটিই ইহাদের প্রথম সন্তান। বালকের বয়স দুই বৎসরের বেশী হইবে না। পক্ষকাল পূর্ব্বে যাহা সুস্থ সবল ও শুভ্র সুন্দর ছিল সেই সুকমল শরীরের ব্যাধিজনিত বিবর্ণতা ও শীর্ণতা সুপরিস্ফুট। যাহা হাস্যের উৎস ছিল সেই সুকুমার মুখে এক প্রকার কাতরতার ভাব সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে। জ্বর হইলে ডাক্তারেরা প্রথমে ম্যালেরিয়া বলিয়া ধরিয়া লইয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিয়াছিলেন কিন্তু কোনই উপকার হয় নাই। অবশেষে টাইফয়েড বলিয়া স্থির হয় এবং সেইরূপ চিকিৎসা চলিতে থাকে। ইহাতেও রোগ উপশম হওয়া দূরের কথা দিন দিন বাড়িতেই থাকে। জিলার মধ্যে যত বড় ডাক্তার আছে সকলকেই ডাকিয়া দেখান হয়। এখন সর্ব্বদা জ্বর লাগিয়াই আছে এবং ক্রমশঃ এক প্রকার আচ্ছন্ন ভাব শিশুর মনকে বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাহার ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া যেন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে হইতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছে।

বিরক্ত হইয়া জয়নারায়ণবাবু ও মমতাদেবী ডাক্তারদের বিদায় করিয়া দিয়াছেন। এই সময় তাঁহাদের দাস-দাসীদের-মধ্যে কয়েকজন মমতা দেবীকে বলে—মা, একবার মাষ্টার মশায়কে ডাকিয়ে খোঁকা-বাবুকে দেখান। উনি কত ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছেন। এই বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে মাষ্টারমশায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী মমতা দেবীর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করে। সেই জন্য তিনি স্বামীকে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছেন একবার মাষ্টার মশায়কে ডাকিয়া আনাইতে।

উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আকুল মমতা দেবী ভাবিতেছেন, কখন মাষ্টারমশায় আসিবেন? মধ্যে মধ্যে পুত্রের মুখের কাছে মুখ নামাইয়া অশ্রু-কম্পিত কণ্ঠে কহিতেছেন—খোকনমণি খিদে পায় নি?

কিন্তু শিশুর কণ্ঠ হইতে কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রত্যেক প-শব্দে মমতাদেবী মনে করিতেছেন, এইবার বুঝি তাঁহার স্বামী মাষ্টারমশায়কে লইয়া ঘরে আসিতেছেন। তাঁহার মনের কোনে আশার ক্ষীণ আলোক জাগিতেছে, যখন মাষ্টার মশায় এত ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েকে মৃত্যু মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন তখন তাঁহার পুত্রকেই বা আনিতে পারিবেন না কেন?

জয়নারায়ণবাবু বিশেষ উত্তেজিত ও চিন্তিতভাবেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উত্তেজনা মাষ্টারমশায়ের ব্যবহারে, চিন্তা পুত্রের জন্য।

স্বামীকে দেখিয়া মমতাদেবী বিশেষ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাষ্টারমশায় এসেছেন?

রোগকাতর অচেতন পুত্রের সম্মুখে উত্তেজনা প্রকাশ অনুচিত জানিয়া জয়নারায়ণবাবু আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—মমতা, কেন তুমি মাষ্টারমশায়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ? তোমাকে যারা মাষ্টারমশায়ের চিকিৎসার কথা বলেছে তারা মূর্খ, তারা অজ্ঞ, তারা রোগেরও কিছু জানে না, চিকিৎসারও কিছু বোঝে না। যে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে চির জীবন আমারই স্কুলে টিচারী করছে, সে ডাক্তারী শিখলে কখন কার কাছে? দু'খানা বই আর একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে যে ডাক্তারী করে তার ডাক্তারী পরাণ বাগদীর বাড়ীতেই চলতে পারে, আমার বাড়ীতে নয়। আমি

কল্‌কাতায় টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, সেখানকার সব চেয়ে বড় যে শিশু-চিকিৎসক তাঁকেই পাঠাবার জন্য। আজ রাত্রেই তিনি এসে পড়বেন। তুমি ভেব না, কল্‌কাতার ডাক্তার এসে দেখলেই খোকন ভাল হ'য়ে যাবে।

মমতাদেবী ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন না। কেন তাঁহার স্বামী সহসা মাষ্টার মশায়ের বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন? তিনি উদ্বেগ-কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্রন্দনের মতই করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, মাষ্টারম'শায় কি আস্‌বেন না বলেছেন?

জয়নারায়ণবাবু বিদ্রূপাত্মক স্বরে উত্তর দিলেন—না, আস্‌বেন না বলেন নি; বলেছেন, আগে পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে দেখবেন, তারপর আমার ছেলেকে দেখতে আস্‌বেন।

মমতাদেবী যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রশ্মিরেখা দেখিতে পাইলেন। তিনি সাগ্রহে কহিলেন—তবে মাষ্টারম'শায় আস্‌বেন?

জয়নারায়ণবাবু দৃঢ়স্বরে কহিলেন—আস্‌লেও আস্‌তে দেওয়া হবে না। যার কাছে পরাণ বাগ্দী আমার চেয়ে বড় তার দ্বারা আমি আমার ছেলের চিকিৎসা কিছুতেই করাব না। সে আমার বাড়ী আসার অযোগ্য। তাকে আমি চিকিৎসক ব'লেই স্বীকার কর্‌তে চাই না। তুমি আমার কাছে মাষ্টারের নাম মুখে এনো না। কল্‌কাতার সব চেয়ে বড় ডাক্তার যিনি তিনিই যখন আস্‌ছেন তখন তোমার ভাবনা কর্‌বার তো কোন দরকার নেই

তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, মমতা!—যিনি মেডিকেল কলেজে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে প'ড়ে শিখে প্রশংসার সঙ্গে পাশ করেছেন, তারপর কল্‌কাতার মত জায়গায় চিকিৎসা ক'রে ছেলেদের রোগে সকলের চেয়ে বড় ডাক্তার ব'লে গণ্য হ'য়েছেন, তুমি তোমার ছেলেকে তাঁর চিকিৎসাধীনে রাখতে চাও না—যে লোক আমারই স্কুলে ত্রিশ টাকার মাষ্টারী কর্‌তে কর্‌তে বাড়ীতে দু'খানা হোমিওপ্যাথিক বই প'ড়ে গোবিন্দপুরের বাগ্দীদের কাছে ডাক্তার সার্টিফিকেট পেয়েছে—তারই দ্বারা ছেলের চিকিৎসা করাতে চাও? এই বলিয়া জয়নারায়ণবাবু উত্তেজিতভাবেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্য সময় হইলে মমতাদেবী যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে স্বামীকে বুঝাইয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তর্ক বা প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে জাগিল না। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য চেতনারহিত পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে আগে দেখিব বলিয়া মাষ্টারম'শায় তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে মত্ত স্বামীর মনে আঘাত দিয়াছেন ইহা তিনি বুঝিলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে মাষ্টারম'শায়ের স্বভাবের যে আভাস তিনি পাইলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামীর উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি সত্ত্বেও মাষ্টার মশায় সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধিই পাইল। পরাণ বাগ্দীকে তিনি জানেন না। অবশ্যই সে দরিদ্র। মমতাদেবী মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—হে প্রভু, এই দরিদ্রের পুত্রকে রোগমুক্ত কর। আজ তিনি শুধু নিজের পুত্রের জন্য নয়, সকল রোগার্ত্তের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—সকলের আশীর্ব্বাদ তাঁহার পীড়িত পুত্রের উপর বর্ষিত হইয়া তাহার আরোগ্যের সহায়ক হউক।

চার

মাষ্টারম'শায় গৃহাগত রোগীদিগকে দেখিয়া ঔষধাদি দিবার পর পরাণ বাগ্দীর ছেলেকে দেখিবার জন্য গ্রামের বাগ্দীপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাগ্দীপাড়া গ্রামের প্রায়ই প্রান্তভাগে অবস্থিত। পরাণের কন্যা কাঞ্চনমণিকে দেখিবার জন্য তিনি পূর্ব্বে পরাণের বাড়ীতে কয়েকবার গিয়াছিলেন। শুধু বাগ্দীপাড়ার মধ্যে নয় সমগ্র গোবিন্দপুরের মধ্যে পরাণের মত দরিদ্র আর কেহই নহে। ইহার কারণ, পরাণের প্রায়ই জ্বর হইয়া থাকে বলিয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন-চার মাস তাহাকে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, অথচ এমন কেহ নাই যে তাহাকে জীবিকার্জ্জনে সাহায্য করে। ইহার উপর তাহার অনেকগুলি অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যা যাহাদের খাটিয়া খাইবার বয়স এখনও হয় নাই। সুতরাং তাহার সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ছেলেমেয়েদিগকে কোন প্রকারে দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে দিয়া পরাণ ও পরাণের পত্নী অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকে এরূপ দিনের অভাব নাই। কোন কোন দিন সন্তানদিগকে দিয়া উদ্বৃত্ত কয়টি অন্ন লইয়া ইহাদের মধ্যে যে অনুরোধ-উপরোধ চলে

তাহাতে বুঝা যায় জাতিতে বাগ্দী এবং অতি দরিদ্র হইলেও ইহাদের ভিতর দাম্পত্যপ্রীতির অভাব নাই।

পরাণ বলে—ক্ষেন্তর মা, ভাত ক'টি তুই খা, তোকে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হচ্ছে, আমি ত' জ্বরো-রুগী, আমি না খেলেও ক্ষেতি হবে না।

পরাণের পত্নী বলে—ক্ষেন্তর বাবা, তুমিই খাও। জ্বরে ভুগে ভুগে তুমি যা রোগা হয়েছ তাতে উপোস কর্‌লে তুমি উঠ্‌তেই পারবে না। দু'দিন না খেলেও আমি চলাফেরা কাজ-কম্ম কর্‌তে পারব।

অবশেষে সেই ভাত কয়টি দুইজনে ভাগাভাগি করিয়া খাওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না, কারণ কেহই একা খাইতে রাজি হয় না। মধ্যে মধ্যে পরাণ মাষ্টারম'শায়ের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী বলে। মাষ্টারম'শায় তাহাকে সিকিটা-আধুলিটা দিয়া সাহায্য করেন।

পরাণ পূর্ব্বে বরাবরই গ্রামের দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ আনিয়া খাইত, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। মাষ্টার-ম'শায়ের ঔষধ খাওয়ার পর এবার বর্ষায় আর জ্বর আসে নাই। দাতব্য ঔষধালয়কে উদ্দেশ করিয়া পরাণ বলে—ওরা গরীব ব'লে বড় হেনস্তা ক'রে ওষুধ দিত দাদাঠাকুর। শিশি হাতে ক'রে সারাদিন ডাক্তারখানার দরজায় ধন্না দিয়ে ব'সে থাক্‌তে হ'ত। তারপর যা' পেতাম, দাদাঠাকুর, তাতে মনে হ'ত, বর্ষায় চন্দনা নদীতে যে বান আসে তারই জল বোধ হয় বড় বড় শিশিতে ভ'রে রেখেছে। যাদের পয়সা আছে তারা গেলে নূতন ক'রে ওষুধ তৈরী ক'রে দিত, গরীবের বেলায় সেই বানের জল। সেই জলের জন্ম জ্বর-গায়ে পহরের পর পহর হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌তে হ'ত, কতক্ষণে কোপাণ্টার বাবুর কেরপা হবে।

মাষ্টারম'শায়কে দেখিবামাত্র পরাণ ও পরাণের পত্নী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণামের পর পরাণের পত্নী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া কহিল—বাব্‌তা, আমার দীনু তো চল্‌ল। যেমন ক্ষেন্তকে যমের মুখ হ'তে ছিনিয়ে এনেছিলেন তেমনই আমার দীনুকেও আনুন, বাব্‌তা। পরাণ ছোট ছেলেটির নাম রাখিয়াছে দীনবন্ধু। ক্ষান্তর মার ইচ্ছা হইতেছিল মাষ্টারম'শায়ের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া এবং উহাদিগকে চোখের জলে ভিজাইয়া দুঃখ নিবেদন করিতে, প্রাণাধিক পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিতে কিন্তু কন্যা ক্ষান্তমণির অসুখের সময় মাষ্টারম'শায়ের স্বভাব সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়াছে তাহাতে ঐরূপ করিলে মাষ্টারম'শায় অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন বুঝিয়া সে অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিল।

প্রবল জ্বরের ঘোরে অভিভূত শিশু অতিশয় মলিন শয্যার উপর শুইয়াছিল। নিদারুণ দৈন্যের নিদর্শন সেই ছিন্ন-মলিন শয্যা মাষ্টারম'শায়ের মনকে বিশেষ ব্যথিত করিল। ক্ষান্তর অসুখের সময় মাষ্টারম'শায় পরাণকে বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ রোগীর বিছানা কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। বিছানার উপকরণ কিনিবার জন্ম পরাণের হাতে মাষ্টার কিছু দিয়াও ছিলেন। ঐ পয়সায় পরাণ বিছানার উপরে পাতিবার জন্ম একখানি চাদর কিনিয়া আনিয়াছিল। মাষ্টার মশায় জানেন, যেখানে পেটের অন্ন জুটা কঠিন সেখানে পরিষ্কার বিছানার আশা করা যায় না, তবুও চোখে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর।

মাষ্টারম'শায় চিকিৎসকরূপে বহু দরিদ্রের গৃহে গিয়া বুঝিয়াছেন, উৎকট অভাবের জন্যই স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাগুলি পালন করিতে পারে না বলিয়াই চাষাভূষা-মুটে-মজুরদের মৃত্যুর হার এত অধিক। ইহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যাহাদের ভোগের উপকরণ, বিলাসের লীলা-নিকেতন গড়িয়া উঠে সেই বিলাসী বাবুর দল ঐশ্বর্য্যের কোলে দুগ্ধ-শুভ্র সুকোমল শয্যায় শুইয়া ইহাদের দারুণ দুর্দ্দশার দৃশ্য কোনদিন কল্পনা করিতেও চেষ্টা করেন না, এই চিন্তাই মাষ্টার মশায়কে সর্ব্বাপেক্ষা বেদনা দেয়।

পরাণের ছোট ছেলে দীনুর রোগ পরীক্ষা করিয়া মাষ্টার-ম'শায় ক্ষান্তর মাকে একঘটি ঠাণ্ডা জল আনিতে বলিলেন। জ্বরের প্রাবল্যের জন্যই সে অচেতনের মত পড়িয়াছিল। মাষ্টারম'শায় ঠাণ্ডা জলে শিশুর সমস্ত মাথা সিক্ত করার পর তাহার অচেতন ভাব কমিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার আনীত ঔষধের ছোট বাক্স হইতে একটি ঔষধ দিয়া বলিলেন—এই ওষুধ এখন একবার দাও। যদি জ্বর না কমে তা হ'লে ঘণ্টাখানেক পরে আর একবার দিও, যদি কম থাকে তা হ'লে তিন ঘণ্টা পরে দেবে।

মাষ্টারম'শায় রোগী দেখিতে যাইবার সময় একটি ছোট বাক্স সঙ্গে লইয়া যান। বাক্সটিকে ব্যাগের মত হাতে ঝুলাইয়া যাওয়া যায়। সেদিনকার বাজার-হাট করিবার জন্য একটি টাকা মাষ্টার মশায়ের কাছে ছিল, তিনি উহা পকেট হইতে বাহির করিয়া পরাণের হাতে দিয়া বলিলেন—সাবান কিনে বিছানা-পত্রকে পরিষ্কার কর, অন্য কিছু দরকার হ'লে কিনো। আমি ও-বেলায় আর একবার এসে তোমার ছেলেকে দেখে যাব। তারপর শিশুর পথ্যাদি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করিয়া মাষ্টারম'শায় বিদায় লইলেন।

বাগদীপাড়ার পর ডোমপাড়া ও মুচিপাড়া। তারপর চন্দনা নামক পল্লী-প্রান্তবাহিনী ছোট নদী। কিন্তু মাষ্টার মশায়কে সে দিকে যাইতে হইবে না, তিনি যাইবেন গ্রামের অপর প্রান্তে অবস্থিত বাবুপাড়ায়। যে-পাড়ায় জয়নারায়ণ বাবুর বাস উহা বাবুপাড়া আখ্যায় অভিহিত। গ্রামের মধ্যে যাঁহাদিগকে জমিদার শ্রেণীর বলা চলে তাঁহাদের অধিকাংশই এই পাড়ায় বাস করেন। মাষ্টারম'শায়ের বাড়ী গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত ভচ্‌চাজ-পাড়ায়। এই ভট্টাচার্য্য-পাড়াকে কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া ভট্টপল্লী বলেন।

বাগদী প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পল্লীতে মাষ্টারম'শায় যেরূপ সম্মানিত হন সেরূপ আর কোথাও নয়। এই সকল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিবার সময় পথের ধূলির উপর ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁহার অগ্রগতি প্রায়ই পদে পদে বাধা পায় বলিলে ভুল হয় না। এই ভক্তির মধ্যে কৃত্রিমতার কণা মাত্রও নাই। ইহা তাহাদের কৃতজ্ঞতার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। মাষ্টারম'শায় কতদিন বলিয়াছেন, তোমরা এ-রকম কর তো আমি তোমাদের পাড়ায় আর আসব না। ইহারাও করজোড়ে কহিয়াছে, দোহাই দাদা-ঠাকুর, আমরা আর কখনও এ-রকম করব না, কিন্তু মাষ্টার-ম'শায়কে কয়েকদিন পরে আবার যখন দেখে তখন সে কথা ভুলিয়া প্রণাম করিয়া ফেলে।

যেমন পূর্ব্বে রাজবাড়ীর সম্মুখে সিংহদ্বার থাকিত তেমনই জয়নারায়ণবাবুর প্রাসাদতুল্য বিশাল বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড দরজা। যখন মাষ্টারম'শায় সেই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন হনুমান সিং নামক দারোয়ান পাহারা দিতেছে। হনুমান সিং বিশবৎসর যাবৎ এই দেশেই বাস করিতেছে, দেশে যায় না, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উপর তাহার অধিকার রাম-লছমন সিংয়ের ন্যায় অদ্ভুত নহে। মাষ্টার মশায় দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই হনুমান সিং বাধা দিয়া বলিল—বাবু বলেছেন, খোকাবাবুকে দেখবার জন্য আর আপনার যাবার দরকার নেই।

কথাটা শুনিয়া মাষ্টারম'শায় মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই হনুমান সিং দুঃখিতভাবে বলিল—মনে কিছু করবেন না, মাষ্টারম'শায়, আমরা চাকর মাত্র। হুকুম না মানলে আমাদের উপায় নাই।

মাষ্টারম'শায় মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—এর জন্য আমি কিছু মনে করতে যাব কেন, হনুমান সিং? বোধ হয় খোকাবাবু ভাল আছেন, সেই জন্যই আমার যাবার দরকার নেই বলা হয়েছে। আমি দেখি আর না দেখি, খোকাবাবু ভাল থাকলেই হ'ল।

এই বলিয়া মাষ্টারম'শায় বিষন্ন মনেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি হনুমান সিংকে ঐ কথা বলিলেন বটে কিন্তু পথে আসিতে আসিতে হনুমান সিংহের ভাষা ও বলিবার ভঙ্গী সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই বুঝিতে পারিলেন জয়নারায়ণবাবু তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের একটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। সেই কারণ, তিনি জয়নারায়ণবাবুর ছেলেকে দেখিবার পূর্ব্বে পরাণ বাগদীর ছেলেকে দেখিব বলিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন।

গৃহে পৌঁছিয়া মাষ্টারম'শায়ের মনে পড়িল হাটে যাইতে হইবে। গোবিন্দপুরে নিত্য বাজার বসিলেও রবিবারের হাটে সকল জিনিষ যেমন সস্তায় পাওয়া যায় বাজারে তেমন মেলে না। এই জন্য অনেকে সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি হাটে কিনিয়া রাখে। মাষ্টার মশায়ের পক্ষে অন্য দিন বাজার করা চলে না কিন্তু রবিবারে চলিতে পারে। হাটে গিয়া জিনিষ-পত্র কিনিতে হইবে বলিয়া যে টাকাটি সকালেই নিস্তারিণী দেবী দিয়াছিলেন তাহা তো পরাণকে দিয়া আসিয়াছেন সুতরাং আর একটি টাকা না চাহিয়া লইলে চলিতে পারে না। মাষ্টারম'শায় ধীর পাদক্ষেপে সঙ্কুচিত-ভাবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ম্মরত পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন—মুনীশের মা, আর একটা টাকা দিতে হবে।

নিস্তারিণী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—একটা টাকা? কিসের জন্যে?

মাষ্টারম'শায় বলিলেন—হাটের জন্য।

নিস্তারিণী দেবী বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হাটের জন্য? হাটের টাকাতো তোমাকে সকালেই দিয়েছি।

মাষ্টার মশায় অপরাধীর ন্যায় কহিলেন—সে টাকাটা আমি পরাণ বাগ্দীকে দিয়েছি।"

নিস্তারিণী দেবীর সমগ্র অন্তর বিরক্তি ও বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে কহিলেন—বেশ করেছ, খুব ভাল কাজ করেছ, শুনে আমার পরাণ জুড়িয়ে গেল। তোমার ঐশ্বর্য্য উথলে উঠছে, টাকা কোথায় রাখবে তার জায়গা পাচ্ছ না, তা' দেবে না? ধন্যি মানুষ যা হোক্! রোগী দেখে পয়সা আনা দূরের কথা, ঘরের পয়সা রোগীকে বিলিয়ে দিয়ে আসছে। আগে সিকিটা আধুলিটা দিতে, আজ একেবারে গোটা টাকাটাই দিয়ে চ'লে এসেছ। দু'দিন পরে যা কিছু আছে সব বিলিয়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই দ্বিতীয় দাতা হরিশ্চন্দ্র হয়ে যাবে।

মাষ্টারম'শায় দুঃখিতভাবে কহিলেন—যদি ওদের দুর্দ্দশা দেখতে, মুনীশের মা, তোমারও দয়া হ'ত।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—তুমি ওদের দুর্দ্দশা দেখতে গিয়েছ, কিন্তু তোমার দুর্দ্দশা কে দেখে, বলতে পার? বাপ এই বসত-বাড়ী ছাড়া আধ হাত জমিও রেখে যান নি, উল্টো ঘাড়ের উপর চাপিয়ে গিয়েছেন নাবালক ছেলেকে আর আইবড় মেয়েকে। বোনের বিয়ে আর না দিলেই নয়। দু'মাস মামার বাড়ী গিয়েছে বটে কিন্তু মামাতো আর বিয়ে দেবেন না, বিয়ে তোমাকেই দিতে হবে। এই বছরেই দিতে হবে, তা না হ'লে লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। এরই মধ্যে লোকে বলাবলি আরম্ভ করেছে। ভায়ের পড়ার খরচ দিতে একদিন দেরী হ'লে কড়াকথায় ভরা চিঠি এসে পৌঁছয়; যেন বাপ মস্ত বড় জমিদারী রেখে মারা গিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের কাপড় না কিনলেই নয়। সেলাই ক'রে রিপু ক'রে আর চলে না। আমি বছরে চারখানা মাত্র কাপড়ে চালাই কিন্তু এইবার চারখানাই অচল হ'য়ে এসেছে। ভ্রাতা কর্ণেরও ত' আস্ত কাপড় মাত্র একখানায় দাঁড়িয়েছে। ছেলে মেয়েদের জামা এক বছর কেনাই হয় নেই, এবার পুজোতে কিনতেই হবে। মুনীশ রোজ বলে, মা জুতাজোড়া অচল হয়ে পড়েছে, তালি দিয়ে আর চলে না, এতেই ছেলেরা ঠাট্টা করে হাত তালি দিতে আরম্ভ করেছে। ওরা তো আর তোমার মত মহাত্মা নয়। ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কি ভাল জামা জুতো পরবার সখ হয় না? এবার বর্ষায় ছাওয়া হয় নি বলে বৃষ্টি হলে কোন কোন ঘরে জল পড়ে। যার নিজের এই দুর্দ্দশা অন্যের দুর্দ্দশা দেখে দয়া করতে যাওয়া তার সাজে না।

মনে যাহাই হউক, পত্নীর কোন কথার প্রতিবাদ করা মাষ্টারম'শায়ের স্বভাব নয়। তিনি জানেন এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিলে অসন্তোষ বা উত্তেজনার আগুণে ইন্ধন যোগানই হয়। মাষ্টারম'শায় মৃদু কণ্ঠে সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

নিস্তারিণী দেবী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—একটা কেন যা আছে সব এনে দিচ্ছি। তার পর আমি চলে যাচ্ছি চাঁদের হাট। এইবার তুমি নিজে চালাও। এই বলিয়া নিস্তারিণী দেবী যে কয়টা টাকা তাঁহার কাছে ছিল সব আনিয়া মাষ্টার মশায়ের সম্মুখে ঝন্ ৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

মাষ্টারম'শায় একটি টাকা তুলিয়া লইয়া "এক টাকা নিলাম, আর সব রেখে দাও, মুনীশের মা"—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পাঁচ

রাত্রি দশটার সময় কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বিখ্যাত ও বিচক্ষণ শিশু-চিকিৎসক হোমিওপ্যাথ নহেন, এলোপ্যাথ। ইনি জয়নারায়ণবাবুর পুত্রকে পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র গুলি দেখিয়া জয়নারায়ণবাবুকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—এ সব কথা খোকার মায়ের সামনে বলা উচিত বিবেচনা করি না। এখানকার ডাক্তারেরা খোকাকে অতিরিক্ত ওষুধ খাইয়েছেন, সহ্য করবার শক্তি কতখানি তা ভেবে দেখেন নি। রোগ এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে ওষুধের দ্বারা কোন ফল পাওয়ার আশা করা যায় না। যাঁরা মনে করেন রোগ ওষুধে আরোগ্য হয় তাঁরা ভুল বোঝেন। ওষুধের

কাজ স্বভাবকে সাহায্য করা। রোগ আরোগ্য করে স্বভাব বা শরীর নিজে। এমন একটা অবস্থা আসে যখন শরীর আর কারও কোন সাহায্য নিতে পারে না। অতিরিক্ত বা অনুপযুক্ত ওষুধ অনেক সময় শরীরের স্বাভাবিক রোগ নাশক শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। আপনার ছেলের বেলায় অনেকটা তাই হয়েছে। ছেলের ইন্টেষ্টাইন বা অন্ত্র বিশেষ ভাবে আক্রান্ত, মস্তিষ্কের অবস্থাও খুব খারাপ। তবে রোগের বিষ অন্ত্রকে আশ্রয় করেই সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়ে শেষে মস্তিষ্ককেও আক্রমণ করেছে সন্দেহ নেই। গাছের তলায় জল না দিয়ে মাথায় জল ঢাললে যা হয় এখানকার ডাক্তারা কতকটা সেই রকম চিকিৎসা করেছেন। এখন আপনার ছেলের অবস্থা চিকিৎসার অতীত। মায়ের সাম্‌নে একথা আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না, বলা উচিতও নয়। বাপ হলেও পুরুষ আপনি, আপনার কাছে মনের বল ও সাহসই আশা করা যায়। আমি এখানে বসে থাকলে কোন ফল হবে না। হাতে দুটো খুব দরকারী কেসও আছে। যেখানে রোগ কঠিন অথচ আশা আছে সেখানেই আমরা চেষ্টা করি বেশী। যেখানে আশা নেই বা খুব কম সেখানে আমরা না থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের ব্যবস্থামত চললেই হল। এ অবস্থায় বেশী ওষুধ দিতে চেষ্টা করলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না। একটা ওষুধ আমি দিয়ে যাচ্ছি। যদি ফল হবার হয় এতেই হবে। অবস্থা যেমনই হোক আপনার ছেলের আরোগ্যই আমি কামনা করছি। যে সব নিয়ম বলে দিয়ে যাচ্ছি সেগুলো যেন পালন করা হয়, এইটেই লক্ষ্য রাখবেন।

কলিকাতার ডাক্তার পর দিন বেলা আটটার সময় দুই শত টাকা দর্শনী এবং যাতায়াতের খরচ লইয়া বিদায় লইলেন। মমতাদেবীর নিকট ভরসার কথা বলা হইলেও ডাক্তারের ভাবভঙ্গীতে তিনি বুঝিলেন ডাক্তার তাঁহার পুত্রের অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

ছয়

পর দিন টিউশানী করিয়া ফিরিবার পথে মাষ্টারম’শায় শুনিলেন কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জয়নারায়ণবাবুর ছেলেটি কেমন আছে তিনি তাহা ঠিক জানিতে পারিলেন না। কেহ কহিল অবস্থা খুবই খারাপ, কেহ কহিল, কিছু ভাল আছে।

স্নানাহার সারিয়া স্কুলের দিকে অগ্রসর হইয়া মাষ্টারম’শায় স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছিতেই রাম-লছমন সিং তাহার বিপুল ভোজপুরী বপুখানি লইয়া লাঠি হস্তে গেটের মাঝখানে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারম’শায় সবিস্ময়ে রাম-লছমন সিংয়ের মুখের দিকে চাহিলে সে বিদ্রূপাত্মক মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, “আপনিকে ঢুকতে দেবার হুকুম না আছে মাষ্টারবাবু। শুধু হামার বাবু নয়, সেকেরটারী ভবতারণ বাবুভি বলেছেন, আপনিকে আর স্কুলমে পড়াইতে হোবে না। মাষ্টারম’শায় মুহূর্ত্তেই ব্যাপারটি বুঝিয়া লইলেন। জয়নারায়ণ বাবু যে রোষ ও অসন্তোষের বসে এতদূর অগ্রসর হইবেন তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই।

রাম-লছমন সিংকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় হেড মাষ্টারের দ্বারা প্রেরিত একজন শিক্ষক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—হেড মাষ্টারমশায় বল্লেন তাঁর এতে কোন হাত নেই, আপান যেন তাঁর ওপর রাগ না করেন। হেড মাষ্টারমশায় এও বল্লেন আপনি জয়নারায়ণবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে ধ’রে বিনীত ভাবে অনুরোধ করলেই তিনি নরম হয়ে যাবেন।

“হেড মাষ্টারমশায়কে বলবেন শুধু তাঁর উপর নয়, আমি এতে কারও উপর রাগ করবার কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না” এই বলিয়া মাষ্টারম’শায় তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। তখন স্কুল বসিবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল বলিয়া ছেলেরা কেহ গেটের কাছে ছিল না।

চিন্তা-ভারাক্রান্ত চিত্তে পথে চলিতে চলিতে মাষ্টারমশায় ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার শিক্ষক জীবনের দীর্ঘ বিশবৎসর অতিবাহিত হইবার পর এ কি দুঃখকর ঘটনা সহসা ঘটিল? এখন বিবেচনার বিষয়, তাঁহার কোন ত্রুটি বা অন্যায়ের জন্য এই ঘটনা ঘটিয়াছে কি না? দরিদ্র পরাণ বাগদীর পুত্রকে আগে দেখা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে কি না? তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁহার বিবেক এই প্রশ্নের উত্তরে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, অন্যায় হয় নাই।

এইরূপ ক্ষেত্রে যদি তিনি জয়নারায়ণবাবুর ছেলেকে পূর্ব্বে দেখিয়া পরাণের পুত্রকে পরে দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শুধু যে অর্থশালীর খাতিরে দরিদ্রকে উপেক্ষা করা হইত তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও পদদলিত করা হইত। সুতরাং এই ঘটনার পরিণাম যতই দুঃখকর বা ভয়াবহ হউক উহাকে সাহসের সহিত বরণ করা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে এখন অন্য কোন উপায় নাই।

পথে বিবেকের বাণী শুনিয়া মাষ্টারম'শায় মনে মনে যতই সাহস সঞ্চয় করুন গৃহে পদার্পন করিয়া পত্নীর সম্মুখীন হইবার সময় সকল সাহস যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি যে পত্নীকে ভয় করেন তাহা নহে। দুঃখ-দারিদ্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহার পত্নী তাঁহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে কোনদিন চেষ্টা করিলেন না, ইহা তাঁহাকে বড়ই দুঃখ দেয়। তাঁহার পত্নী চান, তিনি অর্থের ও অর্থশালীর উপাসনা করুন, কিন্তু সেরূপ উপাসনা দূরের কথা, চিকিৎসার বিনিময়ে কোন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি কিছু দিতে চাহিলে তাহাও তিনি লয়েন না। নিকটবর্ত্তী ন'পাড়া নামক গ্রামের সঙ্গতিশালী গোবিন্দ হালদারের একমাত্র পুত্র মাষ্টারম'শায়ের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিলে হালদারমহাশয় বলিয়াছিলেন—মাষ্টারমশায়, আপনি নগদ টাকা-কড়ি না নেন, আমি দশবিঘা ভাল জমি আপনার নামে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি, আপনাকে এটা নিতেই হবে।

কিন্তু হালদারম'শায় কিছুতেই মাষ্টার-ম'শায়কে সম্মত করাইতে পারে নাই।

নিস্তারিণী দেবী এই সংবাদ শুনিয়া স্বামীকে গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌লে।

শুধু গোবিন্দ হালদার নয়, জমি অনেকেই দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মাষ্টারম'শায়ের সঙ্কল্প টলে নাই। মাষ্টারম'শায় মনে করিয়াছেন, চিকিৎসা করিয়া কাহারও নিকট হইতে কখনও কিছু লইবেন না, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিতেছেন। অন্যদিকে নিস্তারিণী দেবী মনে করিয়াছেন, পারিশ্রমিক রূপে যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা না লইয়া তাঁহার স্বামী শুধু যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন তাহা নহে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সত্য ও ত্যাগের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দারিদ্র্যও মহিমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে ইহা নিস্তারিণী দেবীর কল্পনাতীত। মাষ্টারমশায়ের দুঃখ, ত্রিশ বৎসরকাল একত্র বাস করিয়াও তিনি স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না। নিস্তারিণী দেবীর দুঃখ, ত্রিশবৎসর চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীকে তাঁহার হিত-বাক্যানুসারে কার্য্য করাইতে পারিলেন না; সংসারীর পক্ষে অর্থকে উপেক্ষা করা চলে না, এই সরল সহজ সত্যটাকে তাঁহার স্বামীকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না।

মাষ্টারম'শায় যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন তখন নিস্তারিণী দেবী রন্ধনশালায় ছিলেন। দশবৎসরের মেয়ে মায়া যখন গিয়া বলিল মা, বাবা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীর চিন্তা গম্ভীর বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—ফিরে এলে যে? অসুখ করে নি ত?

বিশবৎসরের মধ্যে স্বামীকে স্কুল যাইবামাত্রই এমন ভাবে ফিরিয়া আসিতে কোনদিনই তিনি দেখেন নাই।

মাষ্টারমশায় সঙ্কোচের সহিত কহিলেন—অসুখ করে নি।

নিস্তারিণী দেবী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—তবে ফিরলে কেন? কিছু ফেলে গিয়েছ?

মাষ্টারম'শায় উত্তর দিলেন—কিছু ফেলেও যাইনি। আজ হ'তে স্কুলের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রইল না।

নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় নিস্তারিণী দেবী এত বিস্মিত হইতেন না। তিনি অবাক্ হইয়া আশঙ্কাপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাষ্টারমশায় শান্ত স্বরেই বলিলেন—স্কুলের যিনি কর্ত্তা সেই জয়নারায়ণবাবুর ইচ্ছা নয় আমি তাঁর স্কুলে মাষ্টারী করি। এই বলিয়া তিনি বিস্ময়বিহ্বল পত্নীকে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিলেন।

ব্যাপারটি শুনিয়া নিস্তারিণী দেবীর মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহাকে হাস্য বলা যায় না, ক্রন্দনও বলা চলে না, হাস্য ও ক্রন্দনের মধ্যবর্ত্তী অদ্ভুত অবস্থা বলা চলে। সেই প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীর সহিত তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "জয়নারায়ণবাবু খুব ভাল কাজ করেছেন, খুব বুদ্ধিমানের

কাজ করেছেন, এর জন্তে আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি। এরকম না করলে তোমার মত লোকের চোখ খুলতে পারে না, চৈতন্ত হ'তে পারে না। আমি একশোবার বলব ঠিক কাজ করেছেন তিনি। পরাণকে একটা টাকা দিয়েছিলে ব'লে কাল আমি দুঃখ করছিলাম, পরাণের জন্ম চাকরি গেল জেনেও আজ আমার কোন দুঃখ হচ্ছে না। তোমার মত লোকের এ-ই উপযুক্ত শাস্তি। টিউশানীগুলো থাকবে মনে করছ? স্কুল-মাষ্টার ছিলে ব'লেই লোকে বাড়ীতে ছেলে পড়াবার জন্য তোমাকে ডাকতো। যখন শুনবে তোমার স্কুল-মাষ্টারী গিয়েছে তখন তারাও একে একে বিদেয় ক'রে দেবে বাস, তখন ছেলে-মেয়ে সব চারিধারে বসিয়ে নিরাহারে তপস্তা আরম্ভ করবে এতেই নিজে গোবিন্দপুরের গান্ধী নাম নিয়েছ, এইবার গুষ্টিশুদ্ধ গান্ধী সেজে গণ্ডায় গণ্ডায় উপোস করবে। আমি কিন্তু আজই চ'লে যাব চাঁদেরহাট!"

ভিতরের বারান্দায় একখানি মাদুর পাতা ছিল, মাষ্টার মশায় তাহার উপর চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাদ বা তর্ক কোনদিনই করেন না, সেদিনও করিলেন না। জানেন পত্নীর রোষাগ্নি ক্রমশঃ আপনিই নিবিয়া যাইবে। একটু থামিয়া নিস্তারিণী দেবী কহিলেন, "আশ্চর্য্য লোক কিন্তু! বিশ বৎসর যাঁর স্কুলে মাষ্টারী করলে, গ্রামের যিনি সবচেয়ে বড় জমিদার তাঁর ছেলেকে আগে না দেখে, পরাণ বাগ্‌দী, যার কাছ থেকে কোন কালে কোন উপকার পাবার আশা নেই, যাকে উল্টো ঘর থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করাত হয়, তার ছেলেকে দেখতে গেলে আগে? আমি যত ভাবছি ততই অবাক্ হচ্ছি। সেদিন মুণীশ বল্‌ছিল, "মা, স্কুলের ছেলেরা বলে, তোর বাবা ম্যাট্রিক-পাশ কিন্তু তোর বাবার মত পণ্ডিত স্কুলের কোন মাষ্টারই ন'ন। এমন পণ্ডিতের খুরে কোটি কোটি নমস্কার।" এই বলিয়া নিস্তারিণী দেবী দুই হাত যোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

তারপর কহিলেন, "কেন পরাণকে ব'লে বাগ্দীপাড়ায় একটা টোল খোলাও না; পড়ুয়ার-অভাব হ'বে না। ডোম-পাড়া, মুচিপাড়া, আরও সব পাড়া হ'তে পড়ুয়ার দ'ল এসে দিনরাত হট্টগোল তুলে শুধু টোল নয় সমস্ত গোবিন্দপুর গ্রামখানাই গুলজার করবে।"

ইহার পর রন্ধন-সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কাজটুকু সারিবার জন্ম একবার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া নিস্তারিণী দেবী মিনিট পনেরো পরে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সোজাসুজি স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন, জয়নারায়ণবাবুর কাছে এক্ষুণি যাও তুমি। যিনি মনিব তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তোমার মানের হানি হবে না। গরীবদের দয়া করতে হবে তা জানি, কিন্তু বিশেষ মনিবের মানও তো রাখতে হবে। কাল যদি তুমি পরাণের ছেলেকে পরে দেখতে, তাতে কোন ক্ষতি হ'ত কি? কিন্তু এতে কি হ'ল, একবার ভেবে দেখ দেখি। যদি এই চাকরি ফিরে না পাও তা হ'লে কি দুর্দ্দশা হবে একবার সেই কথা ভাব। এতেই চালান যায় না, তার উপর স্কুলের ত্রিশ টাকা যদি বাদ প'ড়ে যায়, তা হ'লে সংসার অচল হয়ে যাবে। একটু জিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে যাও। ছেলের অসুখ বেশী না হ'লে কোলকাতা হ'তে ডাক্তার আসবে কেন? গেলে ছেলের খবর নেওয়াটাও হবে। বলবে, আমার ভুল হয়েছে, আমি, জানতাম না খোকাবাবুর এতখানি অসুখ, জানলে আগেই এসে খোকাবাবুকে দেখে যেতাম।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া নিস্তারিণী দেবী কহিলেন, এক-গুঁয়েমী কোর না। বড়লোকের সঙ্গে, জমিদারের সঙ্গে অসদ্ভাব রাখতে নেই। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জলে বাস করা চলে না। যার সংসারে ছেলেপিলে কেউ নেই, তারই বলা চলে, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না।

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, আমি সবই ভেবে দেখেছি। জানি স্কুল-মাষ্টারী গেলে আমাদের কতখানি যাবে, কতখানি অসুবিধায় পড়তে হবে, কিন্তু উপায় তো দেখছি নে। সত্যিই আমার যদি কোন ভুল হ'ত, অন্তায় হ'ত আমি পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা বোধ করতাম না। কিন্তু আমি তো কোন ভুল করি নি। জয়নারায়ণবাবুই ভুল ধারণায় আমার ওপর বিরূপ হয়ে ব'সে আছেন। আমি যখন পরাণকে বলেছি, তোমার ছেলেকে আগে দেখে তারপর অন্য কাজ করব, তখন পরাণের ছেলেকে আগে দেখতেই হবে। সত্যের চেয়ে বড় তো কিছু নেই, মুণীশের মা। সত্যের জন্ম দুঃখ-দারিদ্র্য দূরের কথা যদি মরতেও হয়, সে মৃত্যুও ভাল। মানুষ সত্য রক্ষা করলে, সত্য মানুষকে রক্ষা করেন, এই সত্যে আমি বিশ্বাস করি, মুণীশের মা। কোন রকমে দিন চলবেই,

পৌরহিত্যই আমাদের বংশগত বৃত্তি। আমার ঠাকুরদাও পৌরহিত্য করেছেন। বাবাই পৌরহিত্য ছেড়ে ব্যবসা করতে গিয়ে পৈত্রিকসম্পত্তি সব হারালেন। না হয় আমি আবার সেই পৌরহিত্যই করব। কিন্তু তাই ব'লে সাংসারিক সুবিধার জন্য বড়লোককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে চলতে, সত্যকে পায় দলতে পারব না আমি।

এইবার নিস্তারিণী দেবীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নামিল। স্বামী কোনদিন তাঁহার কথানুসারে বা মতানুসারে চলেন না, চিরদিন তাঁহার বাক্যকে উপেক্ষা করিয়াই আসিতেছেন, এই চিরন্তন দুঃখ তাঁহার উথলিয়া উঠিল। উদ্গত অশ্রুধারা অঞ্চলে মুছিয়া তিনি ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন— তোমার মত বিবেকী লোককে, তোমার মত সত্যবাদীকে সংসারী সাজতে কে বলেছিল? সন্ন্যাসী হ'লেই তো পারতে? সংসারী সেজে এতগুলি ছেলেমেয়েকে সংসারে এনে তারপর তাদের অনাহারে রেখে সত্যের ধ্বজা তুলে ব'সে থাকলে খুব কর্ত্তব্য করা হবে তোমার। তোমার সত্য আর বিবেক আছে। বেশ তো। তারাই বোনের বিয়ে দিয়ে দেবে। তারাই মাসে মাসে ভাইকে টাকা পাঠাবে। এই সংসারের জন্য ভেবে ভেবে, খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, আমি আর কিছু করতে পারব না। আমি এক্ষুণি পঞ্চুকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আজ আমি চাঁদের হাট যাবই। ঢের সহ্য করেছি, আর পারব না। তোমার সত্য আছে, বিবেক আছে, তারাই চালিয়ে নেবে। তারাই রেঁধে-বেড়ে দেবে, তারাই ছেলে-মেয়ে দেখবে। তোমার আর ভাবনা কি?'

এই সময় বড় মেয়ে মায়া আসিয়া পিতার চিন্তামলিন গম্ভীর মুখের পানে এবং মাতার অশ্রুসিক্ত মুখ ও উত্তেজিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়াছিল।

নিস্তারিণী দেবী বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে কহিলেন—মায়া শোন, দুটো বড় বড় ধামা খালি ক'রে রেখে দে। তোর বাবা কাল হ'তে টিকিতে ফুল গুঁজে বাড়ী বাড়ী পুজো ক'রে বেড়িয়ে চাল, কলা, মণ্ডা, মেঠাই, বাতাসা এত এত নিয়ে আসবেন, তোরা ধামায় ভ'রে রেখে দিয়ে দু'বেলা মনের সুখে খাবি। এইবার তোদের মণ্ডা-মেঠাই খেয়েই পেট ভ'রে যাবে, ভাত রাঁধবার দরকারই হবে না। আমি তো আজ বিকেলেই নিতুকে নিয়ে চাঁদের হাট চ'লে যাচ্ছি। যদি নিতুটাও থেকে যায় তো আরও ভাল। আমি একেবারে খালাস পাই, আমার হাড়ে বাতাস লাগে। নিতু নিস্তারিণী দেবীর আড়াই বৎসর বয়স্ক পুত্র নিত্যনিরঞ্জন।

ব্যাপার কি মায়া ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে বাপের পাশে বসিয়া, তাঁহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া এবং মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মায়ের মত মমতা-মধুর স্বরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ স্কুলের ছুটি এত সকাল-সকাল কেন হ'ল, বাবা? কৈ দাদা তো এল না?

মাষ্টারম'শায় কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিস্তারিণী দেবী মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বিদ্রূপের স্বরেই বলিলেন—স্কুলের কর্ত্তারা তোর বাবাকে একেবারে ছুটি দিয়েছেন; বলেছেন, আপনি এতদিন এত খাটলেন, এইবার আপনার ছুটি, আর আপনাকে স্কুলে আসতে হবে না। মায়ার মুখ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নেহশীল পিতার সুমধুর সঙ্গ-সুখ, তাঁহার শান্ত-শীতল সাহচর্য্য তাহারা অতি অল্পই উপভোগ করে। ভোর হইতে তাহাদের শুইবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার কাজের বিরাম নাই। ছুটির দিনেও তাহারা কখন বাপকে বেশীক্ষণ আপনাদের মধ্যে পায় না। বাপের মুখে নানা দেশের এবং নানা দেশের সাধুপুরুষদের অদ্ভুত জীবনের গল্প শুনিতে মায়া বড় ভালবাসে, কিন্তু পোড়া লোকগুলোর জ্বালায় শুনিবার যো আছে কি? যেমন গল্প আরম্ভ হইল অমনই 'মাষ্টারম'শায় বা 'দাদাঠাকুর' বলিয়া ডাকের উপর ডাক। মায়ার বড় রাগ হয় ওদের উপর। সুতরাং পিতার অফুরন্ত অবকাশের কথা শুনিয়া বিষয়-বুদ্ধি-বিহীনা সরল বালিকার পক্ষে উল্লসিত হইয়া উঠা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সে সানন্দে কহিল—স্কুলের কর্ত্তারা তো বড় ভাল লোক, বাবা? এইবার তুমি আমাদের সারাদিন গল্প শোনাবে।

নিস্তারিণী দেবী কহিলেন, "তবে আর কি, গল্পেই তোদের পেট ভ'রে যাবে, তোর বাবাকে পুজোও করতে হবে না। তারপর স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, শোন, ঘর-সংসার সব বুঝে নাও তুমি। আমি এক্ষুণি পঞ্চুকে ডাকাচ্ছি আজ বিকেলে আমি যাবই। এই বলিয়া স্বামীকে শেষ নোটীশ দিয়া নিস্তারিণী দেবী ছেলে-মেয়েদিগকে খাইতে দিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন।

নিস্তারিণী দেবীর পিত্রালয় গোবিন্দপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ

দূরবর্ত্তী চাঁদের হাট নামক গ্রাম। পিতা ও মাতা উভয়েই কিছুকাল হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন বড় ভাই সপরিবারে চাঁদেরহাটে বাস করিতেছেন। নিস্তারিণী দেবী স্বামীর ব্যবহারে যখনই অসন্তুষ্ট হন তখনই চাঁদেরহাট যাইবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুনিলে মনে হয় সেই সঙ্কল্প কখন টলিবে না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে রাগ বা অভিমানের আগুন নিভিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদেরহাট যাইবার ইচ্ছাও চলিয়া যায়। কখন কখন এমন হয় পঞ্চু বা পঞ্চানন মণ্ডল গরুর গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করে, নিস্তারিণী দেবীও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া গরুর গাড়ীর দিকে অগ্রসর হন কিন্তু হয় তো এমন সময় বারান্দায় দেওয়াল বা দরজার পার্শ্বস্থ প্রাচীর হইতে একটি টিক্‌টিকি টক্ টক্ শব্দ করিয়া উঠে আর অমনিই পতি ও পুত্র-কন্যাদের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি যাওয়া স্থগিত রাখেন। বলেন—লক্ষ্মীছাড়া টিক্‌টিকি আর ডাকবার সময় পেলে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি মনে মনে টিক্‌টিকির উপর সন্তুষ্টই হন। আর একবার গরুর গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন এমন সময় মায়া হাঁচিয়া ফেলিল বলিয়া যাওয়া হইল না। "হতভাগা মেয়ে আর হাঁচবার সময় পেলি না?" বলিয়া নিস্তারিণী দেবী মায়াকে বকিলেন বটে কিন্তু আমরা জানি তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন, হেঁচে বাঁচালি, মায়া। একবার মায়ারও ছোট জয়া পিছু ডাকিয়াছিল বলিয়া যাওয়া হয় নাই। পঞ্চুকে বলিয়াছিলেন, পঞ্চু, বাবা, আজ গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কাল এনো, সব্বাই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেছে, দেখছ না।

নিস্তারিণীদেবীর শেষবারের যাওয়ার চেষ্টাটী কিছু অধিক কৌতুককর হইয়াছিল। পঞ্চুর গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। রোষাগ্নি নিভিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তারিণীদেবীর চাঁদের-হাট যাইবার ইচ্ছাও চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চুকে ফিরাইয়া দিবেন কি বলিয়া? পঞ্চুকে এমনিই ফিরাইয়া দিলে তাঁহার পক্ষে পরাজয় স্বীকার করা হইবে এবং তিনি পতি ও পুত্র-কন্যাদের হাস্যভাজন হইবেন। নিস্তারিণীদেবী জানেন, তাঁহার না-যাওয়ার কারণ রূপে একটা-না-একটা বাধা শেষ পর্য্যন্ত আসিবেই। পঞ্চুও জানে মা-ঠাক্‌রুণ কখনও যাইবেন না। সে শুধু মা-ঠাক্‌রুণের মনস্তুষ্টির জন্যই গাড়ী লইয়া আসে, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে না। কিন্তু সেদিন নিস্তারিণী-দেবী দরজা পার হইয়া গরুর গাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু কোন বাধাই পাইলেন না। নিস্তারিণীদেবী ভাবিলেন, শুনেছি পশ্চিমের টিক্‌টিকিগুলোর অধিকাংশই বোবা, এ দেশের টিক্‌টিকিগুলোও হঠাৎ বোবা হ'য়ে গেল না কি? ছেলেমেয়েদের একটাও যদি একটুখানি হাঁচে বা একবার পিছু ডাকে? সবাই যেন তাঁকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে! নিস্তারিণীদেবী নিরুপায় হইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন এমন সময় একটা চিন্তা অন্ধকারে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত তাঁহার মনে জাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— মায়া, তোর বাবা কোথায়?

মায়া বলিল—বাবা বেরিয়ে গিয়েছেন।

নিস্তারিণীদেবী ক'হিলেন—কোথায় কি রইল না জানিয়ে কি ক'রে যাই? মানুষের আক্কেল দেখ, ঠিক যাবার সময় স'রে পড়েছে! পঞ্চু, বাবা, আজ আর হ'ল না।

শুনিয়া পঞ্চুও বাঁচিল। সে সানন্দে গাড়ী লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। [ক্রমশঃ

টেলিভিসন্
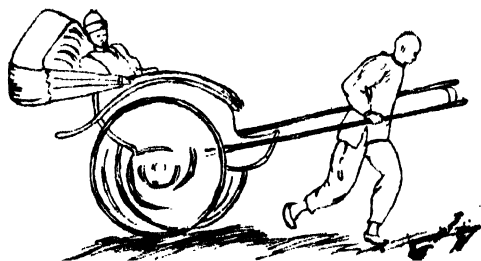
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র বি, এস্-সি (লণ্ডন)

আজকাল রেডিও-র খুব চলন হয়েছে। অনেক বাড়ীতেই রেডিও সেট আছে। রেডিও-র নূতনত্ব অনেকটা চলে গেছে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কে কোথায় গান গাইছে বা বক্তৃতা দিচ্ছে, একটা সুইচ্ ঘুরিয়ে দিয়ে ঘরের আরাম কেদারায় শুয়ে তা শুনা অনেকেরই দৈনন্দিন অভ্যাসের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু টেলিভিসনের এখনও এদেশে চলন হয় নি। রেডিওতে কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি

টেলিভিসন্ যন্ত্র

কথা বল্‌ছে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে এটা এখনও আমাদের অনেকের কাছে রহস্যের সামিল। রেডিও-র সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা মোটামুটি ধারণা আছে। Sound সাধারণতঃ হাওয়ায় ভেসে আসে কিন্তু সেই soundকে ইথারের ঢেউয়ের সাহায্যে দূর-দূরান্তরে খুব শীঘ্রই পাঠান যায় এবং সেই ইথারের ঢেউ রেডিও সেটে ধ'রে আমরা দূর থেকে আসা sound শুনতে পাই। কিন্তু এই সঙ্গে light ও পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণে ইথারের ঢেউয়ের সাহায্যে পৌছান সম্ভব হয়, সে কথাটা অনেকেরই কাছে নূতন ঠেক্‌বে।

অন্ধকারে আমরা কোনও জিনিষ দেখতে পাই না। আলো জিনিষের উপর পড়লে সেই আলো প্রতিফলিত (reflected) হ'য়ে আমাদের চোখে পড়লে তবে জিনিষটা আমরা দেখতে পাই। যেমন একটা আয়নার উপর সূর্য্যের আলো ফেলে আয়নাটাকে ঘোরালে দেওয়ালে আলোর প্রতিফলিত বিম্ব (reflection) পড়ে তেম্‌নি কোনও জিনিষের উপর আলো পড়লে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে, আমরা জিনিষটাকে সে প্রতিফলিত আলো দিয়েই দেখতে পাই। আলো সরল রেখায় (straight line) চলে। কাচের মত স্বচ্ছ জিনিষের মধ্য দিয়ে ইহার গতি অবারিত, কিন্তু অস্বচ্ছ জিনিষের উপর পড়লে ইহার গতিরোধ হয় ও প্রতিফলিত হ'য়ে ইহার গতির দিক বদ্‌লে যায়। আয়নায় আমরা মুখ দেখতে পাই তাহার কারণ বাহিরের আলো আমাদের মুখে পড়ে, আমাদের মুখ থেকে আলো আয়নার পিছনে পারদের উপর পড়ে এবং সেখানে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। আয়নায় দেখা মুখ ঠিক মুখ বলেই মনে হয় তাহারও একটা কারণ আছে। মুখের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে যে আলোর রশ্মিগুলি (beams of light) আয়নায় পড়ে, সে রশ্মিগুলির কোনও-টার জ্যোতিঃ কম। রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে চোখে যখন আসে তখন তাদের জ্যোতির তারতম্য অনুসারে আলো-ছায়ার অনুভূতি হয় এবং এই আলো-ছায়ার সমাবেশ থেকে আমাদের চোখকে চোখ, নাককে নাক, ভুরুকে ভুরু বলে ধারণা জন্মে। ভুরু থেকে যে আলোর রশ্মি আসে, সে রশ্মির জ্যোতিঃ কম কাজেই ভুরুটা কালো দেখায়, কপাল থেকে যে আলোর রশ্মি আসে তার জ্যোতিঃ বেশী, কাজেই কপালটা উজ্জ্বল দেখায়। মুখের বিভিন্ন অংশের আলোর জ্যোতির তারতম্য আছে বলেই মুখের অনুভূতি হয়। মুখের এই আলো-ছায়ার প্রতিফলিত রশ্মিগুলি যথাযথভাবে দূরে

পাঠিয়ে অন্ত লোকের চোখের মধ্যে আনতে পারলে, শেষোক্ত ব্যক্তিও মুখটা দেখতে পাবেন, যদিও দ্রষ্টা ও দৃষ্টের মাঝখানে শত সহস্র মাইল ব্যবধান রয়েছে। দৃষ্ট মুখের হাব-ভাবের পরিবর্ত্তন হলে আলোছায়ার সমাবেশের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং দ্রষ্টার চোখে সে পরিবর্ত্তনের অনুরূপ অনুভূতি হয়।

টেলিভিসন বুঝ্‌তে গেলে জিনিস দেখা সম্বন্ধে আরও একটা কথা জানা প্রয়োজন। যদি কোনও অন্ধকার ঘরে একটা ফুলদানি থাকে, কেহই দেখতে পায়না কাছেও না, দূরেও না। যদি সেই ফুলদানির কোনও এক অংশে একটা আলোর রশ্মি লেন্সের সাহায্যে ফেলা যায়, সেখান থেকে রশ্মিটি প্রতিফলিত হবে, সেই প্রতিফলিত রশ্মিট কোনও ব্যক্তির চোখে প্রবেশ ক'র্‌লে ফুলদানির সেই অংশটুকু তিনি দেখতে পাবেন। পরে ফুলদানির অপর একটী অংশে আলোর রশ্মি ফেলিলে, প্রতিফলিত রশ্মি চোখে এসে সে অংশের অনুভূতি জাগাবে। যদি এই প্রতিফলিত রশ্মিগুলির জ্যোতিতে তারতম্য থাকে তাহ'লে চোখে আলোছায়ার অনুভূতি হবে। এইভাবে ফুলদানির একটীর পর একটী অংশ থেকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি যদি খুব তাড়াতাড়ি (quick succession) চোখে ফেলা যায়, তাহলে সমস্ত ফুলদানিটা দৃষ্টিগোচর হবে। যদিও রশ্মিগুলি পরের পর এসে পৌঁছুচ্ছে, তাদের সময় ব্যবধান খুব কম ব'লে, সবগুলোকে একসঙ্গে আমরা অনুভব করি। যেমন একটা ফ্যানের চারটা ব্লেড্ আছে আলাদা আলাদা। যখন ফ্যান্ চালান হয়, তখন তাড়াতাড়ি ঘোরার দরুণ আমাদের চোখে মাত্র একটা ঘূর্ণায়মান অবিচ্ছিন্ন চাকতির মত দেখায়। ফ্যানটা যখন বন্ধ করা হয় ও ব্লেডের গতি কমে আসে তখন ব্লেডগুলির স্বাতন্ত্র আমরা বুঝতে পারি।
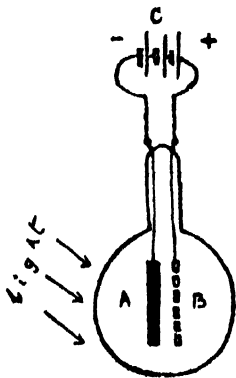
ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেল

ফুলদানির উপর থেকে আসা প্রতিফলিত রশ্মিগুলিকেও যদি প্রয়োজনমত তাড়াতাড়ি একটার পর একটা চোখে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে ফুলদানিটাও একটা সমগ্র জিনিষ বলে মনে হবে। একথা কাছের লোকের বেলায় যেরূপ খাটে
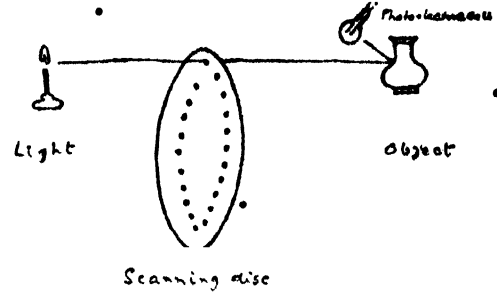
দূরের একজন লোকের সম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ ভাবেই খাটে। তবে দূরের সম্বন্ধে সমস্যা এই যে প্রতিফলিত রশ্মিগুলিকে হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠান সম্ভব কিরূপে হয়। টেলিভিসন্ এই সমস্যার সমাধান করেছে ইথারের ঢেউএর সাহায্য নিয়ে। রেডিওতে যেমন ইথারের ঢেউ-এর সাহায্যে sound ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হয়, টেলিভিসনে তেমনই ইথারের ঢেউএর সাহায্যে light ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইথারের ঢেউ-এর সাহায্যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আলোর রশ্মি (beams of light) নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, আলোর সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক কারেন্টের সম্বন্ধ আছে ব'লে। Photo electric cell নামক একরকম valve আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভিতর আলো ফেলে electric current সৃষ্টি করা যায়। এই Valve এর কোনও এক বিশিষ্ট অংশে আলোর রশ্মি প'ড়লে electric current বইতে থাকে। আলোর জ্যোতির তারতম্য অনুসারে এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ জোর কম হয়। যখন কোনও এক স্থান হ'তে কোন জিনিষের image (ছবি) পাঠাতে হবে, জিনিষের উপর হ'তে প্রতিফলিত রশ্মি photo electric cell এর নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আরম্ভ হয়। এই electric current ইথারে ঢেউয়ের গতি সৃষ্টি করে এবং সেই ঢেউ সঞ্চারিত হয় বিশ্বের চারিদিকে। ইথারের ঢেউএর গতি অত্যন্ত বেশী, সেকেণ্ডে ১৮৬০৩০ মাইল—আলো যে বেগে শূন্যে চলে, ইথারের ঢেউও সেই বেগে চলে। ইথারের ঢেউ গ্রহণ করবার যন্ত্রপাতিকে receiving set বলে। এই যন্ত্রের একটী বিশেষ অঙ্গ Cathode ray tube নামক একরকম Valve। ইথারের ঢেউ receiving set এ

গৃহিত হলে cathode ray tube এ electric current সৃষ্টি হয় এবং টিউবের এক ধারে আলো দেখা যায়। Current এর জোর কম অনুযায়ী cathode ray tube এর আলোর জোর কম হয়। যেখান থেকে image আসছে (Transmitting station) সেখানে যে ধরনের আলো photo electric cell এ পড়ছে, receiving set এর cathode ray tube এর ধারে ঠিক সেইরূপ আলোর তারতম্যের সৃষ্টি হচ্ছে।

টেলিভিসনের খুঁটিনাটি জানতে গেলে, প্রথমে Photo electric cell এর কার্যাকারিতা সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। Photo electric cell এর ভিতরে দুটি ধাতু-নির্ম্মিত প্লেট আছে—cathode ও anode ও Cellটি কাঁচের তৈয়ারী। ইহার ভিতরের হাওয়া বার করে নেওয়া হয়। Cathode এর সঙ্গে কোনও ব্যাটারীর negative pole সংযোগ করা হয়, anode এর সঙ্গে ব্যাটারীর positive
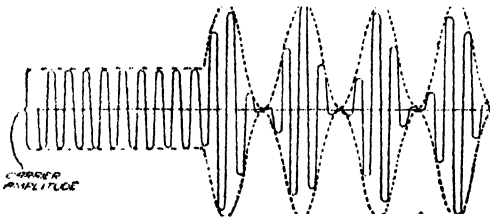
pole সংযোগ করা হয়। সাধারণতঃ photo electric cele এ কোনও electric current থাকে না। কিন্তু যদি কোনও আলোর রশ্মি Cathode এর উপর পড়ে তাহলে current বইতে সুরু করে cathode থেকে anode এর দিকে। আলো জোর হ'লে current জোর হয়, আলো কম হলে current কম হয়। যদি একজন মানুষের ভুরু থেকে আলো cathode এর উপর ফেলা হয়, current কম হবে, কিন্তু যদি কপালের আলো ফেলা হয়, current জোর হবে। এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশ থেকে আলো একটার পর একটা cathode এর উপর ফেলা যায়। যন্ত্রটাকে বলে scanning disc। এটা একটা গোলাকার চাকা, তার ধারে ধারে ছোট ছোট ফুটো আছে প্রায় ৩০টা। চাকার একদিকে একটা ল্যাম্প, আরএক দিকে যে মুখটার image পাঠাতে হবে সেই মুখ। চাকা মাঝখানে থাকায় মুখটা অন্ধকার। যেই চাকাটা ঘোরান হয়, ফুটোগুলো আলোর রেখার লাইনে একটার পর একটা আসে এবং ফুটো দিয়ে মুখের উপর আলো পড়ে। মুখের যে অংশে আলো পড়ে সে অংশটা উজ্জ্বল হয়। ফুটোগুলো এমন ভাবে spirally সাজান যে চাকা ঘুরলে বিভিন্ন ফুটো দিয়ে আসা আলো মুখের বিভিন্ন অংশে পড়ে—কোনওটা ভুরুর উপর, কোনওটা ঠোঁটের উপর, কোনওটা নাকের উপর, এমনি ভাবে। মুখের বিভিন্ন অংশ হ'তে প্রতিফলিত আলোর রশ্মি একটার পর একটা এসে photo electric cell এর cathode এর উপর পড়ে এবং electric current সৃষ্টি করে। Scanning disc একবার ঘুরে এলে মুখের সমস্ত অংশটুকু থেকে আলোর রশ্মি একটার পর একটা photo electric cell এ এসে কম জোর electric current সৃষ্টি করে। Scanning discটা খুব জোরে ঘোরান হয়, মিনিটে প্রায় ৭৫০ বার—photo electric cell এ electric current এরও হ্রাস বৃদ্ধি হয় অনুরূপ গতিতে।

Photo electric cell এর electric current ইথারের ঢেউ-এর সাহায্যে দূরে সঞ্চালিত হয়। রেডিওতে যেরূপ এস্থলে ঠিক একইভাবে ইথারের ঢেউ কাজ করে। Transmitting station থেকে ইলেকট্রিক স্পার্ক সাহায্যে ইথারে ঢেউ তোলা হয়। সে ঢেউকে carrier wave বলে। যখন টেলিভিসন্ সেটের photo electric cell-এ electric current-এর হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সে হ্রাস বৃদ্ধিটা carrier wave এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে carrier wave-এর উঠা-নামার পরিমাণটার হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত ঢেউকে modulated wave দুই সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে চলে।

Modulated wave যখন receiving set-এ প্রবেশ করে তখন set-এর ভেতর electric current সৃষ্টি হয়। এই currentকে cathode ray tube-এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। Cathode ray tube একটা লম্বা কাচের টিউব, তার একটা দিক সরু, সেদিকে cathode থাকে, অপর দিক ফানেলের মত বড়। ফানেলের মত দিকের শেষটা চ্যাপ্টা, এই চ্যাপ্টা ধারটায় একরকম রাসায়নিক দ্রব্য মাখান থাকে, এটা screen-এর কাজ করে। Cathode ray tube-এ সরু দিক থেকে electric current প্রবাহিত হয়

চ্যাপ্টা দিকের অভিমুখে। Current থাকলে চ্যাপ্টা দিকটায় screen এ একটী আলোর বিন্দু দেখতে পাওয়া
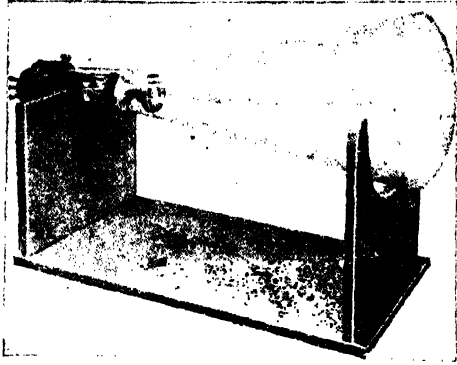
যায়। Currentএর হ্রাসবৃদ্ধি হলে ঐ আলোর বিন্দুর জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ও ছায়া আলোর স্বৃষ্টি হয় screen এর উপর। টিউবের ভিতর দু'জোড়া ধাতুর পাত আছে, তাদের deflecting plates বলে। এই প্লেটগুলো magnetএর মত কাজ করে—বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বাঁদিক, ডানদিক, উপর, নীচে নাড়ায়। এই নাড়ানর ফলে screenএর উপর আলোর বিন্দুটি নড়ে চড়ে বেড়ায় (a moving shot of light). Deflecting plates গুলোকে এমনভাবে সাজান হয় যে transmitting station এ scanning discএর ভিতর দেয়ে আলোর রশ্মি যেভাবে নড়ে, cathode ray tube এ screen উপর আলো বিন্দুটিই ঠিক সেইভাবে নড়ে। Scanning disc খুব জোরে ঘোরে, সেই অনুপাতে screen এর আলোর বিন্দুও খুব জোরে নড়ে —ফলে ভ্রামমান্ আলোর বিন্দু থেকে একটী সমগ্র ছবি ফুটে উঠে। Scanning discএর ভেতর দিয়ে একটীর পর একটী আলোর রশ্মি যেমন জিনিষের বিভিন্ন অংশে পড়ে, cathode ray tubeএর screenএর উপর তার অনুরূপ ছবি দেখা যায়। Scanning discএর গতির সঙ্গে deflecting platesএর কাজের খাপ খাওয়ান অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হ'লে cathode ray tubeএর screen এ যে ছবি ফুটে উঠে সেটা বিকৃত (distorted) হয়। এই খাপ খাওয়ানকে synchronising বলে। Synchronising ঠিকমত হ'লে transmitting stationএ যা দেখান হয়, receiving setএর cathode ray tubeএর screenএ হুবাহু প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এই উপায়ে বহুদূরে যা ঘট্ছে তা দেখতে

পাওয়া সম্ভব হয়। Cinema screenএ ছবি দেখার মত মনে হয়।

আকিঞ্চন

শ্রীসুমতি সেনগুপ্তা

জীবন আমার জাগুক তোমার পূজার তরে
সাধনা মোর ধন্য হ'বে তোমার চরণ পরে।
তোমার দয়ায় নয়ন-তারা
এনেছে যে অশ্রু ধারা
সেই ধারাতে ধুয়ে দেব হৃদয় শতদলে,
শত ফুলের মাঝে লুটাক তোমার চরণতলে।

সাধনা মম জ্বলুক বাতি
সেই আলোকে হোক আরতি
হৃদয় আমার শোধন ক'রে আজ
তোমার পায়েই সমর্পিনু আমার সকল কাজ।
দুঃখ আমার দহন ক'রে
ধূপের ধোঁয়ায় রেখো ঘিরে
চিত্ত মম শুদ্ধ হ'বে পূজার সমাপন
বিত্ত হ'বে চরণ সরোজ এই তো আকিঞ্চন।

মরিয়ম

শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

যতদিন পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ত্তা ছিলেন, ততদিন বেশ মানিয়ে গুছিয়ে কাজ চল্‌ত। কিন্তু পরবর্ত্তীপুরুষের আমলে নূতন অবস্থার উদ্ভব হল। কিছুই নয়, সামান্ত ঘটনা থেকে উৎপত্তি। প্রতিদিনের নবনব পর্য্যায়ে অবস্থাটা জটিল হয়ে উঠ্‌ল। অবচেতন মনের দিগন্তে ঝড়ের রেখা দেখা দিল।

ও বাড়ীর হানিফ যতদিন বেঁচে ছিলেন, আর এ বাড়ীর পরাণ বৃদ্ধ ও পঙ্গু হ'ন নি, ততদিন দুইটি পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে অসদ্ভাবের সম্ভাবনা ঘটে নি। এদের বাছুরটা যদি ওদের বাড়ীতে কোন রকমে গিয়ে পড়ত, তা হ'লে ওরা ডেকে সরলভাবে বল্‌ত—'উঠোন ছেয়ে আছে লাউ কুমড়ার চারা গাছ, খেয়ে ফেল্‌তে পারে, একটু আগ্‌লে রেখো।' আর ও বাড়ীর মুর্‌গী এসে এবাড়ীর ভেতর উপদ্রব কর্‌লে এরা বল্‌ত—'মুর্‌গী নিয়ে যাও, বড় উৎপাত কর্‌ছে—'

মেয়ে কিম্বা পুরুষ যারই যখন কোন কাজের জিনিষের দরকার হত, বাড়ীতে না থাক্‌লে সেটা পরস্পরের মধ্যে চেয়ে চিন্তে কাজ চালান হত। কোন রকম সঙ্কোচ বোধ ছিল না। দুইটি পরিবারের জাতিগত ধর্ম্ম ভিন্ন হলেও বৃত্তিগত ধর্ম্ম একই অর্থাৎ উভয় পরিবারই কৃষি-ধর্ম্মী। হানিফ পরাণের জমি চষে দিয়েছেন এবং পরাণ হানিফের জমিতে বীজ বুনে দিয়েছেন—এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। সুতরাং কৃষি-ধর্ম্মের অমর্য্যাদা কোনদিন ওঁরা করেন নি বা পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য ভঙ্গ করেন নি।

এখন আর সেদিন নেই, আছে তার স্মৃতি মাত্র।

বৃদ্ধ পরাণ জীবন সন্ধ্যার পথে বসে পারের খেয়ার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন, সংসারের ভার নিয়েছে ওঁর বড় ছেলে পতিত। হানিফের পরিবারবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্ত হওয়াতে বৃদ্ধ বড়ই মনে আঘাত পেয়েছেন। পুত্রকে বল্‌লেন, 'উপযুক্ত হয়েছ, ভেবে দেখ'।

পতিত বল্‌লে, 'কিন্তু'—

ওর কথায় বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।'

পতিত প্রত্যুত্তরে বল্‌লে, 'কেন?'

বৃদ্ধ এ কথায় একটু উত্তেজিত হলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন, 'তোমরা সব বোকার মত কাজ ক'র্‌ছ।'

'কি এমন বোকামি হয়েছে?'

'তোমাদের বোকামি থেকেই ত এই ঝগড়ার উৎপত্তি—'

'তা বলে দরাপের বউ এসে চোখ মুখ ঘুরিয়ে দু'কথা বলে যাবে?'

'ধর, ওদের মরিয়ম যদি তোমার খোকাকে মেরেই থাকে ত' তাতে কি হয়েছে? এক পাড়ায় বাস কর্‌তে গেলে অমন হয়ে থাকে। ওবাড়ীর বউ যদি একটা অপমানের কথা বলেই থাকেন তবে ভাল কথায় তোমাদের ত' সেটা শুধ্‌রে দেওয়া উচিত ছিল, তা না করে তোমরা সব ঝগড়ায় মেতে উঠ্‌লে—'

পরাণের কথা পতিতের ভাল লাগ্‌ল না। পিতার কাছ থেকে চলে গেল।

পতিতের স্ত্রী মাধবী এল চড়া পর্দ্দায় মেজাজটা তুলে।

বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'তোমরা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ বউমা!'

মাধবী বল্‌লে, 'ছেলেটার পিঠে দাগ পড়ে গেছে, মা হ'য়ে কেমন করে চোখে দেখি।'

বৃদ্ধ পরাণ শুয়ে ছিলেন, ধীরে ধীরে উঠে বসে গড়্‌গড়ার নলটী মুখে নিয়ে দু'একটা টান দিলেন, তারপর বল্‌লেন, 'দাগটা আজ বাদে কাল মিলিয়ে যাবে কিন্তু যাবে না ওদের মনে যে দাগা দিতে বসেছ। তোমার ছেলেরই ত' দোষ বাপু! ওর দোষ ত' দেবে না।'

কথাগুলি মাধবীর মর্ম্মস্পর্শী হ'ল না। দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে, 'মরিয়মকে একবার পেলে হয়'—

'বুড়োর কথা শোন, বিভ্রাট ঘটিও না।'

'দরাপের বউ কিনা বলে আমার ছেলেকে পুতে ফেল্‌বে? যত বড় মুখ না তত বড় কথা।'

বৃদ্ধ পরাণ মাধবীর মুখেরদিক্ চেয়ে কি ভাব্‌লেন—হয় ত' ভবিষ্যতের কথাই ভাব্‌লেন। শোচনীয় পরিণাম ঘটবার আশঙ্কায় ধীরে ধীরে বল্‌লেন, 'এখন যাও, সমস্ত ভুলে গিয়ে সব মিটিয়ে ফেলগে, এর যদি জের টেনে যাও, তাহ'লে ক্রমেই খারাপ ফল ফল্‌বে।' বৃদ্ধের কথা গ্রাহ্যের মধ্যে এলো না।

পতিত ও মাধবী প্রতিবেশীর কাছে হার স্বীকার কর্‌তে রাজী নয়।

দরাপ বরং তার স্ত্রীকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিল।

'ছেলেপিলের ঝগড়া বা মারপিট হয়েই থাকে—বেশী দূর না এগিয়ে যাওয়াই ভাল।'

স্ত্রী সাকিনা স্বামীর কথা শুনে বল্‌লে, 'ওদের বউ যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছে। কি করে সহ্য করি বল ত'? মানুষ ত' আমি।'

দরাপ বল্‌লে, 'ওদের হরিদাসকে নিজের ছেলের মতই দেখি, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়াটা পছন্দ করিনে। কর্ত্তাদের আমলে কেমন সদ্ভাব ছিল বল ত'?'

সাকিনা বললে, "তাই ভেবে, বুঝিয়ে বল্‌তে গেলাম ওদের বাড়ীর বউকে—ওরা এল দল বেঁধে—সহ্যেরও ত' সীমা আছে!" সাকিনা কথাগুলি বলে ঢেঁকিশালায় চলে গেল।

দরাপ দাওয়ায় বসে চুপ করে হুঁকায় তামাক খেতে লাগ্‌ল। তার উদাস দৃষ্টি দূরের আকাশ স্পর্শ কর্‌ল। বাতাসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘনীভূত হ'ল। এমন সময়ে এল পতিত। দরাপকে দু'কথা শুনিয়ে দিল। কথায় যেন শান দেওয়া ক্ষুরধার। দরাপের ভাল লাগে না, তবু চুপ করে শোনে।

শেষে পতিত বলে ওঠে, "বেশ তাই যেন করে দেখ—আমার ছেলেকে কেমন তোমার বউ পুতে ফেলে দেখ্‌ব—পয়সার জোর হয়েছে কিনা?"

"দশ টাকা চালের মণ আর আট টাকা কাপড়ের জোড়া। আমাদের পয়সার জোর কোথায় ভাই! এবার বৃষ্টি নেই, ফসল ত' হ'ল না। বিবি যদি বলেই থাকে সত্যি সত্যি কি—"

"যেন তাই করে, দেখে নেব"—পতিত উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বল্‌ল।

দরাপ আর মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ল না। বল্‌ল, "কি দেখে নেবে শুনি? যা ক্ষমতা তা ত' জান্‌তে বাকী নেই।"

পতিতের চোখ দু'টি যেন বিদ্যুতের চেয়ে তীব্র হ'ল। বল্‌ল, "আচ্ছা দেখা যাবে—"

দরাপ হুঁকো থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌ল, "আচ্ছা।"

দরাপের অন্তর বিষিয়ে ওঠে, কমনীয় কথা বল্‌তে পারে না।

ঝোড়ো হাওয়ার মত পতিত দরাপের উঠোন ত্যাগ করে বাড়ীর দিকে গেল। বিক্ষুব্ধ হৃদয় উত্তেজিত হ'ল।

মাধবী বাড়ীর উঠোন থেকে চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কেন গেছ্‌লে ওদের বাড়ী—ঠিক হয়েছে, অপমান করেছে ত', চাষা, তার আবার কত ভাল হবে।"

সাকিনা ঢেঁকিশালা থেকে বেরিয়ে বল্‌লে—"তোরা ভারি ভদ্দর লোক। তোরা চাষা ন'স্? চালুনি আবার ছুঁচের বিচার করে।"

তারপর উভয়পক্ষে ঝগড়া সুরু হয়। ক্রমে মাধবী ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে বাড়ার উঠোন ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে।

সাকিনাও এগিয়ে আসে, বলে, "তুই আমার অমুক জিনিষটা নিয়েছিস, ফেরত দে।

ও জবাব দেয়, 'আমারও অমুক জিনিষটা তোদের কাছে আছে মনে নেই।'

ক্রমে উভয়দলের মধ্যে গালাগালি ও চীৎকার চল্‌তে থাকে।

এর কুকুর যেম্নি চীৎকার করে, ওর কুকুর অম্নি ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। শেষে পাড়ার লোক ছুটে আসে, ভিড় জমে যায়। ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধ পরাণ বলেন, 'আর কেন, ছেড়ে দাও না—'

কে-ই বা বৃদ্ধের কথা শোনে! অদৃষ্ট নিষ্ঠুর!

একটা দীর্ঘশ্বাস বৃদ্ধের বক্ষ ভেদ করে বাহির হলো। বাইরের নীলাকাশ তখন বাদল দিনের মেঘে অস্পষ্ট হয়ে

আছে। বৃদ্ধের দুই চোখ বেয়ে জল ঝরে। বলেন, 'আজ যদি হানিফ ভাই বেঁচে থাক্‌তো—'

ঝগড়া কোনমতেই থাম্‌লো না।

মরিয়ম বরাবরই শান্ত প্রকৃতির। হরিদাস দুষ্টু। তা হলেও দু'জনের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, তা ওদের কথা-বার্ত্তা ও কার্য্য-কলাপে বেশ ধরা পড়ত। দু'জনে প্রায় সমবয়সী। মরিয়ম কিছু খাবার পেলেই হরিদাসকে ডেকে এনে তার ভাগ দিয়ে বলতো, 'খোকন, এইটুকু খেয়ে ফেল—' হরিদাসের অসীম আনন্দ হতো। এমনও অনেক সময়ে ঘটেছে মরিয়মের সব খাবারটা হরিদাস কেড়ে খেয়েছে এবং নিজে খাবার এনে মরিয়মকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেয়েছে। মরিয়ম স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে বলেছে, 'ওই খোকা, বড় তাড়াতাড়ি খাচ্ছিস্, আস্তে আস্তে খেয়ে ফেল্—গলায় বাঁধবে। খাচ্ছিনে ভয় নেই—' হরিদাস হেসে বলেছে—'দিলে তো খাবি।' এর পর মরিয়ম কোন কথা বলেনি বটে, তৃপ্তি যে পেয়েছে তা ওর চোখ মুখের ভাবে বেশ বুঝা যেত।

এত অল্প বয়সেও যে মরিয়ম সারল্য ও স্নেহের পরিচয় অম্নিভাবে দিতে পারতো—এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বল্‌তে হবে। হরিদাসের দুষ্টুমি হয় ত' দিনে দিনে দারুণ ভাবে বেড়ে উঠতো না, যদি অভিভাবকরা লক্ষ্য রাখতেন। কেউ ছেলের সম্বন্ধে নিন্দা বা অভিযোগ করলে মাধবীর মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে। বলে, 'আমার ঐ শিবরাত্তিরের সল্‌তে—হারামরা ছেলে। ওকে কিছু বল্‌তে গেলে, চোখ ফেটে জল আসে—'

কিন্তু প্রতিবেশীরা সহ্য করবে কেন? সময় ও সুযোগমত বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেয়।

মরিয়মের জন্যই হোক্ বা স্নেহাতিশয্যেই হোক্ দরাপ বা সাকিনা ওর দুষ্টুমি ক্ষমার চক্ষে দেখে এসেছে, আদর যত্ন করতে কার্পণ্য করে নি। দরাপের বাড়ী গিয়ে হরিদাস মুরগীগুলোকে জ্বালাতন করে, বাঁধা গরুর দড়ি খুলে দেয়, গরুর গাড়ীর উপর উঠে নাচতে থাকে, ঢেকিশালায় গিয়ে ধান ছড়িয়ে দেয়, এ'মধারা কত কি করে থাকে। সাকিনা বলে, 'খোকন! ছিঃ অমন ক'রো না। লো'কে নিন্দে করে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার দুষ্টুমি করে। মরিয়ম বলে, 'ভাই! অমন করিস্ না,—আয়।' হরিদাসকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে খেলাঘর পেতে খেলা করবার চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে হরিদাস খেলাঘর ভেঙে দিয়ে ছুটে বাড়ী চলে যায়। মরিয়ম মুখখানি অন্ধকার করে বসে থাকে, কাঁদে না।

কি ভাবে ও-ই জানে! দিন আসে, দিন চলে যায় এম্নিভাবে।

সেদিন পুকুর ঘাটে গিয়েছিল মরিয়ম, সঙ্গে ছিল হরিদাস। ঘাটে কেউ ছিল না। মরিয়ম তার মাটির ঘট ডুবিয়ে জল নেবার চেষ্টা করছিল এমন সময়ে হরিদাস ধাক্কা দিল। মরিয়ম আচম্‌কা ধাক্কা পেয়ে জলে পড়ে গেল, কোনমতে সাম্‌লাতে পারল না। গভীর জলে গিয়ে পড়লে হয় ত' মরিয়ম আর উঠতে পারতো না; কোন রকমে সাম্‌লে উঠে এসে সে বল্‌লে, 'খোকা! আর একটু হ'লে যে ডুবে যেতাম।' হরিদাস ভাবলে—বুঝি খুব মজা করা গেছে। আবার মরিয়মকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলো। মরিয়ম কখন রাগে না কিন্তু এবার সে রেগে গেল। ওর হাত ধরে পিঠে কয়েকবার জোরে চড় মারলো। হরিদাস মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এলো। মাকে বললে, 'মরিয়ম আমাকে বড্‌ডো মেরেছে।' মাধবী ভিতরের ব্যাপারটা শুনবার অপেক্ষা করলো না। চীৎকার করে উঠলো। বল্‌লে, 'এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার ছেলের গায়ে হাত—একরত্তি গুঁড়ো—উঃ—পিঠটা যে ভেঙে গেছে।' মাধবীর চীৎকারে নিস্তব্ধ পাড়াটা চম্‌কে উঠলো। এদিকে মরিয়ম এসে সাকিনাকে সব বৃত্তান্ত বল্‌তে লাগল।

সাকিনা বল্‌লে—'একি অন্যায় কথা! আমার মেয়ে যদি জলে ডুবে যেতো—'

মাধবীর চীৎকার শুনে সাকিনা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, 'চীৎকার করছ কেন? আগে ব্যাপারটা শোন—'

'কোন কিছু শুনতে চাইনে—এ যে একেবারে সর্ব্বনেশে কাণ্ড—' মাধবী কথা কয়টী বলে' ছেলেকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে এনে পিঠটা দেখালো।

সাকিনা বল্‌লে, 'আগে শোন আমার কথা—'

মাধবী শোনে না, হৈ-চৈ সুরু হয়ে যায়। সাকিনা মাধবীদের উঠানে এসে বুঝাতে গেল যে, হরিদাস মরিয়মকে জলে ফেলে দিয়েছিল, তাই মরিয়ম হরিদাসকে চড় মেরেছিল। ছেলেমানুষ ওরা—ওদের কি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

সাকিনার সম্মুখে মাধবী হরিদাসকে প্রহার করতে করতে বললো, 'আর যাবি—কখনো যাবি ওদের বাড়ী!' হরিদাস চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে আর বলে, 'ওরে বাবাগো—মেরে ফেললে গো—'

'মরিয়মের সঙ্গে কথা বল্‌বি—বল্‌ বল্‌ছি—আজ তোর মুখ দিয়ে রক্ত তুল্‌বো।'

পাড়ার মেয়েরা ছুটে আসে, বলে, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—ও যে মরে যাবে—কি সর্ব্বনাশ! পায়রার ওপর যেন বাজ পড়েছে।'

পরাণ ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে!'

কেউ উত্তর দিল না। বৃদ্ধ আপন মনে বলতে লাগলেন, 'আরো কতদিন যে আমার এই সব জ্বালা পোহাতে হবে!' বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত।

পতিত সে সময়ে মাঠে গিয়েছিল আর দরাপ গিয়েছিল টাকার তাগাদায় অন্য গ্রামে। নতুবা ব্যাপারটা হয় ত' এরূপভাবে ভীষণ হতো না অথবা হয় ত' এর চেয়েও ভীষণ হতো—কে তা বলতে পারে!

মরিয়ম ঘরের ভেতর বসে কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর অনুতাপ হোল। হরিদাসকে যেদম প্রহার করছে তার মা—সব চেয়ে এই কষ্টটাই ওর মনের মধ্যে দেখা দিল। ভাবল ছুটে গিয়ে হরিদাসকে টেনে আনি, শেষে যদি হরিদাসের মা মারে তা হ'লে ত' আরও মুস্কিল। যাওয়া হলো না। বাইরে এসে দেখলো ওর মার সঙ্গে হরিদাসের মায়ের খুব ঝগড়া চলছে। দুই বাড়ীর উগ্র কুকুরগুলো পর্য্যন্ত ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। মরিয়ম চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত শুনতে পারে না। চোখ ছলছল করে—ঘরে আসে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়।

মাধবী কারো কথা শোনে না, কটুবাক্য আর প্রহার থামে না। শোনা যায়—'বল্‌ যাবি, মরিয়মের কাছে যাবি—'

'—তোমার পায়ে পড়ছি মা!—আর যাবো না, আর মেরো না—'

যে দু'টী প্রাণী পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত হয়েছিল ভাগ্যচক্রে তারা বিচ্ছিন্ন হবার পথে এসে দাঁড়াল। দিন চলে যায়, রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে আসে—চাঁদ ডুবে যায়, তারা ডুবে যায়। মরিয়ম স্বপ্ন দেখে—কি স্বপ্ন দেখে সেই জানে! ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠে—'খোকন, আর তোরে মারব না'।...কিছু পরে, স্বপ্নের ভেতর সে বলে,—'আমার খেলা ঘর ভেঙে দিলি। তুই ভারি দুষ্টু—না, কিছু বলব না।" সাকিনা মরিয়মকে পাশ ফিরে শুইয়ে দেয়। ও চুপ করে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মরিয়ম কাঁদে আর বলে—"খোকন আর আসবে না, মা! কার সঙ্গে খেলব।" সাকিনা সান্ত্বনা দেয়, বলে, "সাথীর অভাব কি মরিয়ম! দিলদার আছে ত', ওকে নিয়ে খেলবি।" মনে প্রবোধ দিলেও ব্যর্থ হয়ে যায়। মরিয়ম শুয়ে পড়ে। সাকিনা বে-গতিক দেখে দিলদারকে কোলের কাছে শুইয়ে দেয়। ভাইটিকে বুকের কাছে নিয়ে মরিয়ম বলে, "দিলু! তুই আমায় আদর করবি না!" দুগ্ধ পোষ্য শিশু ওর দিকে চেয়ে থাকে। সাকিনা মরিয়মের চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, "তুই কেন অমন করিস্‌—যারা তোর আপনজন তাদের নিয়ে থাক।" সাকিনা ওর মন ভুলাবার চেষ্টা করে—ভুলাতে পারে না। লঘু হৃদয় আহত। সঞ্জীবন মুহূর্ত্ত আর আসে না।

বালিকা মরিয়ম বালক হরিদাসকে পেতে চায়,—শিশুর উপর মন বসাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ওর স্নেহ পুষ্ট হয়েছে হরিদাস। তাই, ও কেমন করে ভুলবে ঠিক করতে পারে না। যে দম প্রহার পেয়ে এ দিকে হরিদাসের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে। ও পাখীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে না, ওর দুষ্টুমি আর দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠশালায় যাবার সময় বাড়ী থেকে বেরোয়, ফিরে এসে কোথাও যায় না। সকালে মায়ের সঙ্গে একবার স্নান করতে যায়, সারা দিন বাড়ীর ভেতর থাকে।

ওর যাওয়া আসার পথে দৃষ্টি দেয় মরিয়ম। কথা বলতে ইচ্ছা হয়—পারে না। হরিদাস ওর দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলে যায়। কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। মরিয়মের জন্য ওর কি প্রাণ কাঁদে না! যে মরিয়ম অন্তরের মাধুর্য্য দিয়ে ওর অন্তর রচনা করেছে, সে মরিয়মের জন্য ও কি বিরলে চোখের জল ফেলে না! ও কি মরিয়মকে চায় না! হয় ত' চায়—নিরুপায়।

ডাকবার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু ভরসা হয় না। কয়েক দিন ধরে মরিয়ম ব্যাকুল হয়েছে, কোন মতে ব্যাকুলতা চাপতে পারে না। চলতি রাস্তার ওপর দিয়ে হরিদাস পাঠশালায় যাচ্ছিল—সঙ্গে কেউ ছিল না। পথ দিয়ে চলেছে হরিদাস। কিছুদূর গিয়ে সে মরিয়মের গলার আওয়াজ পেল। ডাকছে—"খোকা—খোকা।" পিছন ফিরে দেখে মরিয়ম। মেঘাচ্ছন্ন দিনের সজল ছায়ায় দাঁড়িয়ে মরিয়ম বললে, "খোকা, চল্ খেলা করি গে।"

হরিদাস মুখখানি অন্ধকার করে বললে, "মা টের পেলে আর আমাকে জ্যান্ত রাখবে না। তুই এখন যা।"

"মা টের পাবে কেন রে—"

"যদি পায়—'

"না, না—পাবে না—ঐ বাগানটার ভেতর দিয়ে দু'জনে ছুটে যাব—চল্—চল্—" হরিদাস তবু থমকে দাঁড়ায়, কিছু বলে না।

মরিয়ম ওর হাত ধরে বলে—"আয় খোকা, জানতে পারবে কি করে—"

"কেউ বলে দেবে হয় ত'।"

মরিয়ম ওর কথা শোনে না, বুঝাতে থাকে। শেষে হরিদাসের মন টলে যায়। মনে সঙ্কোচন তিরোহিত হয়।

ওরা দু'জন চলতি পথের পাশে যে তৃণক্ষেত্র ছিল সেটি পেরিয়ে বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমবাগানে গিয়ে পড়ল। যেতে যেতে মরিয়ম বলে, "খোকা! সোনামণি ভাই আমার, তোরে না দেখলে যে প্রাণ কেমন করে। তুই বাড়ীতে গিয়ে বললি—"

গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করে হরিদাস বলে, "এতটা হবে জানতাম না—"

তারপর আম্রবীথির নিভৃত-ছায়ায় এসে ওরা কাণামাছি খেলতে সুরু করে দিল।

হরিদাসকে পেয়ে মরিয়মের আনন্দ ধরে না। বাদলের হাওয়া বয়ে যায়। হরিদাস সব ভুলে গিয়ে খেলায় মেতে ওঠে।

ভরা দুপুরে ওদের খেলা চলছে এমন সময়ে পণ্ডিতের মাহিনদার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে ডাকল, "হরিদাস।"

হরিদাস ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে গাছের আড়ালে লুকাল। মরিয়ম দাঁড়াল কিন্তু ভীতা হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ওর মাথার ভেতরে ঝঞ্ঝাতাড়িত তরঙ্গের ন্যায় চিন্তার পর চিন্তা আসতে লাগল। মাহিনদার বললে, "দাঁড়াও আজ তোমার কি হয়—খেলা হচ্ছে, পাঠশালায় যাওয়া হয় নি।' হরিদাসকে মাহিনদার ধরলে। হরিদাস কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ছেড়ে দাও দাদা! তোমার পায়ে পড়ছি—"

"উঁহু, সে হবে না। চল, মায়ের কাছে—"

হরিদাসকে টানতে টানতে নিয়ে চলল মাহিনদার। ওর কান্না থামে না, মরিয়মও চোখের জল ফেলতে ফেলতে পিছু পিছু যায়। আকাশ ব্যথিয়ে ওঠে, বর্ষণ সুরু হয়।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই হরিদাসের আতঙ্ক বৃদ্ধি হোল। কোন মতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে চাইল না। মাহিনদারও ছাড়ল না।

মরিয়ম বাড়ী চলে গেল। মুখ খানি ম্লান করে ভাবতে থাকে,—হরিদাসের অদৃষ্টের লাঞ্ছনার কথা।

মাধবী রুদ্র মূর্ত্তিতে ছেলের সম্মুখে দেখা দিল। কয়েকটি চড় মারতেই হরিদাস ঘরের মধ্যে ছুটে গেল।

মরিয়মের নাম শুনতেই মাধবী আরও ক্রুদ্ধা হোল। বললে, "ঐ মেয়েটাই আমার ছেলের পরকালটা নষ্ট করবে দেখছি।"

'ভূষণ, কাল থেকে রোজ তুমি খোকাকে পাঠশালায় দিয়ে আসবে আর নিয়ে আসবে। ওর ওপর নজর রাখবে যেন কোন রকম বদমায়েসী না করে। করলে, আমাকে বলে দেবে।"

মাহিনদার বললে, আচ্ছা মা, তা-ই হবে।"

• •

মরিয়মের সঙ্গে হরিদাসের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা রইল না। অন্তরে আঘাতের ওপর আঘাত পেয়ে মরিয়ম মুষড়ে পড়ল। জগতের কাছে ও যেন অপরাধী হয়ে রইল। তবুও হরিদাসের যাওয়া-আসার পথে ওর দৃষ্টি পৌছায়, তার ওপর আর কিছু হবার উপায় রইল না। তবে কি ওর অন্তর জুড়ে ভীরুতা বাসা বেঁধেছে! এর উত্তর কোথায়! কোথায় সান্ত্বনা! অরুণের আলো উষার অলকে আবীর মাখিয়ে দিয়ে যায়—পাখী ডেকে উঠে, মরিয়ম হরিদাসের কথা ভাবে।

উদাস-বিহ্বল দৃষ্টিতে সমগ্র দ্বিপ্রহর চেয়ে থাকে হরিদাসের আসা-যাওয়ার পথের দিকে। সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তের কোলে ঢলে পড়ে, মরিয়ম হরিদাসের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলে—রাত্রির নিস্তব্ধতা ও শান্তি মাঠ-ময়দান আর অরণ্যবীথির উপর নেমে আসে। ও কুটিরের ভেতর বসে হরিদাসের পড়াশুনার আওয়াজ শুনতে থাকে। যে আঘাত ও পেয়েছে, সে আঘাতের ব্যথা কোন মতে যায় না। কিছুদিন দুঃসহ বেদনা সহ্য করে' মরিয়ম হঠাৎ একদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। সাকিনা ওর মাথার কাছে বসে বাতাস করতে থাকে। মরিয়ম জ্বরের ঝোঁকে কত আবোল-তাবোল ব'কে যায়। ডাকলে কখন সাড়া দেয়, কখন দেয় না।

ডাক্তার এসে বলেন, 'ভয় নেই, সাত দিনের দিন জ্বর ছেড়ে যাবে।'

সাকিনা স্বামীকে বলে, 'মরিয়মের চাউনি দেখেছ, ওর চাউনি কিন্তু আমার ভাল লাগছে না,—'

দরাপ স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'ভয় কি! সেরে যাবে। ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, শুনলে ত'—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাকিনা বললে, 'ঐ যা একটু ভরসা। দরগায় সিন্নি মানৎ করেছি—খোদার দয়া।'

দরাপ চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, 'এমন মেয়ে দেখা যায় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ।'

সাকিনা ম্লান হ'য়ে ব'সে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পাড়ার সবাই দেখ্‌তে আসে মরিয়মকে,—আসে না কেবল পতিত আর মাধবী।

বৃদ্ধ পরাণের কাণে গিয়েছিল মরিয়মের অসুখের কথা।

বৃদ্ধ ডেকে পতিতকে বল্‌লেন, "তোমাদের একবার দেখে আসা উচিত ছিল। বিপদে আপদে দেখাশোনা করাই ত' সত্যিকারের কাজ।"

পতিত বল্‌লে, "আমরা কেউ যাব না।"

বৃদ্ধ উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন, "তোমার বিপদে আপদে আস্‌বে কেন?"

মাথা ঘুরিয়ে পতিত ব'লে গেল, "অত ঝগড়ার পর—অত অপমানের পর যাওয়া চলে না।"

মাধবী একটু কড়া মেজাজ দেখিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে। বলল, "আপনি বেশ যা' হোক্—"

বৃদ্ধ বল্‌লেন, "তা' বটে—"

"কোন্ আক্কেলে আপনি বল্‌লেন ওদের ঐ হতচ্ছাড়া মেয়েটাকে দেখে আস্‌তে?"

"মা, আক্কেলই যদি থাক্‌বে ত' এতকাল বেঁচে থাক্‌ব কেন অকেজো হ'য়ে? তোমাদেরই বা মুখনাড়া সহ্য কর্‌ব কেন? সক্ষম থাক্‌লে নিজেই যেতাম। হা অদৃষ্ট! ভগবান যদি মর্‌বার সময় ডেকে নিত—"

"আপনার মত লোকের তাড়াতাড়ি মরাই ভাল—নতুবা সংসারের শান্তি হবে না।"

"হ্যাঁ, তা' ত' এখন বল্‌বেই—আমার খেয়ে আমার দাড়ি উপ্‌ড়ালে ধর্ম্ম থাক্‌বে কেন মা? কালের ধর্ম্ম—তোমার দোষ কি—যাও, আমার কাছ থেকে স'রে যাও। তোমার মত বউয়ের মুখ দেখাও পাপ।"

"বেশ, ভাল কথা—"

মাধবী রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পতিতকে ডেকে বল্‌লে, "গাড়ী ঠিক ক'রে দাও, আজ-ই বাপের বাড়ী চ'লে যাব। বুড়ো না ম'রে গেলে আমাকে এখানে এনো না।"

পতিত বল্‌লে, "বুড়ো মানুষের কথায় কি রাগ করে? কাজ কর গে। ক'দিনই বা বাঁচবে!"

"বুড়ো হ'য়েছে ব'লে লোকের মাথা চিবিয়ে খাবে—কেমন? যে পারে সংসার করুক—এখানে আর নয়। হেঁটেই চ'লে যাব।"

পতিত চিন্তিত হ'ল। বুঝাবার চেষ্টা করে, মাধবী বোঝে না। কি কর্‌বে ঠিক কর্‌তে পারে না, স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি চল্‌তে থাকে।

বৃদ্ধের কাণে গিয়ে পৌঁছায়। বলেন, "যাক্ না বাপের বাড়ী—অত খোসামোদ কিসের বাপু! তুমি একটি আস্ত গাধা, নইলে বৌর আঁচল ধ'রে বেড়াও!—পড়ত যদি আমাদের আমলের হাতে, দেখ্‌তে এক কথায় ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত।"

পতিত কোন কথা বল্‌ল না। বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে বক্‌তে বক্‌তে শেষে কান্না সুরু ক'রে দিল। পতিত ওর কান্না

থামাতে পারল না, নারীর মত অসহায় হ'য়ে বেরিয়ে এসে মাঠের দিকে চ'লে গেল।

হরিদাস মায়ের কাছে ব'সে রইল। ওকে মাধবী বল্লে, "তোর জন্যেই ত' আমার কপালে এত!—"

হরিদাস মুখখানি ম্লান ক'রে ব'সে রইল, কিছু বলল না।

এমন সময়ে পাড়ার হালদার-গিন্নী এসে বল্লেন, "বউমা! আমার সঙ্গে একবার হরিদাসকে দিতে পার—"

"কেন?—"

"মরিয়মের কাছে নিয়ে যেতাম। বিকারের ঝোঁকে হরিদাসকে কেবল ডাকছে।"

ব্যগ্র হ'য়ে হরিদাস বল্লে, "মা! ছুটে গিয়ে মরিয়মকে দেখে আসি না কেন?"

হালদার-গিন্নী বল্লেন, "চল্ বাবা তুই চল্—ছুটে দেখে আস্‌বি এখুনি, মা কিছু বলবে না।"

হরিদাস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মাধবী গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "খোকা! খবরদার—"

হরিদাস মায়ের কাছে ব'সে রইল। কোন কথা বলল না। হালদার-গিন্নী নিরাশ হ'য়ে চ'লে গেলেন। হরিদাসের গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

পশ্চিমের দিক্‌চক্রবালে তখন সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। ধূসর হ'য়ে আসছিল ধরণীর প্রাঙ্গণ।

পতিত বাড়ী ফিরে এল। মাধবী বল্লে, "গাড়ীর ব্যবস্থা করেছ?" পতিত প্রত্যুত্তর দিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে?"

"না, আমি এখানে থাকব না। বাপের বাড়ী না পাঠান পর্য্যন্ত এখানকার কিছু ছোঁব না। উপোস ক'রে থাকব।"

উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডা চলল। শেষকালে পতিত উত্তেজিত হ'য়ে বলল, "এই যে যাচ্ছ, আর যেন ফিরতে না হয়। মেয়ে মানুষের এত তেজ!"

"তা' হবে কেন? মেয়েমানুষ ত' মানুষ নয়—জানোয়ার!"

"চুপ ক'রে থাক বলছি!"

মাধবী প্রত্যেক কথারই তীব্র উত্তর করতে থাকে। পতিত অসহিষ্ণু হয়। ভাবে—যা' বরাতে থাকে, তাই হবে—বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। গরুর গাড়ী আনতে মাহিনদারকে আদেশ দিল। মাধবীও কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে হরিদাসের হাত ধ'রে গাড়ীতে উঠল। যাত্রার মুখে পতিতের মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে মাধবী বলল, "এ ভিটাতে যেন আর না ফিরি।"

পাশের গ্রামে মাধবীর বাপের বাড়ী—বেশী সময় নেবে না, তাই পতিত মাহিনদারকে বলল, "ভূষণ! এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসো, মাছ ধরার জালটা ছিঁড়ে গেছে, এসে ঠিক করতে হবে।"

সন্ধ্যার আঁধারে গাড়ীখানি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

বৃদ্ধ পতিতকে ডেকে বল্লেন, "এইবার ওদের বাড়ী যাও। যাঁর ভয় করতে, তিনি ত' বিদেয় হ'য়েছেন। এখন আর তোমার ভয় কি! লোক-ধর্ম্মটা বজায় ক'রে এস।"

গম্ভীরভাবে পতিত বলল, "যাচ্ছি।"

"আমার ওপর রাগ করছ কেন বাছা! তোমার ভালর জন্যেই বলছি।"

পতিত ধীরে ধীরে দরাপের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে কেঁদে উঠল।

মরিয়মের প্রাণ-পাখী তখন খাঁচা থেকে চিরদিনের জন্য উড়ে বেরিয়ে গেছে।

পতিত অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।

কান্নার রোল বৃদ্ধেরও কাণে গিয়ে পৌঁছাল।

বৃদ্ধ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল্লেন, "আমাদের মত লোক মরে না,—মরে কি না ওরা!"

একটা জীবনের উদয়ের দিগন্ত যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল—পৃথিবী স্তম্ভিত হ'য়ে রইল। এ বিশ্ব-সংসারে এমনি হয়!

দেখতে দেখতে কত বৎসর চলে গেল। গত যুদ্ধের সময়ে এই ঘটনার সৃষ্টি হ'য়েছিল, আজ আবার চলেছে তার চেয়েও বৃহত্তর যুদ্ধ—এর মাঝখানে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। কত বসন্তে, কত বর্ষায় শরতে কত উৎসবের মাঝে সাকিনা মরিয়মকে স্মরণ করেছে—ওর কবরে গিয়ে কেঁদেছে।

আজ বৃদ্ধ নেই, তাঁর জীবনের ছিন্ন পৃষ্ঠা বহুদিন হ'ল ঝরে গেছে। হরিদাস কোনদিন মরিয়মকে ভুলতে পারে নি। যে হরিদাসের জন্য মরিয়ম কেঁদে কেঁদে জীবন নিঃশেষ করে দিয়েছে, সেই হরিদাস মরিয়মের জীবনের সঙ্গীত শেষ করতে দেয় নি। তাই দিলদার আজ সকালে চিঠিখানি পেয়ে সাকিনাকে বল্লে—'মা! দাদা আস্‌বে লিখেছে—গত বছর এম্নি দিনেই দাদা দিদির কবরের ওপর মস্তবড় ঘর করে দিয়েছে—কেমন তা-ই নয়!" সাকিনার চোখ জলে ভরে উঠল, বল্লে,—'এই দিনেই মরিয়ম আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। হরিদাস হাকিম হয়েও ভুল্‌তে পারে নি আমাদের মত লোককে। ওতো হাকিম নয় দিলদার, ও যে চাষার ঘরের মাণিক। ওর জন্যে আজ গাঁয়ের শ্রী ফিরেছে। তুই যা দলিজখানা ঠিক করে রাখ্‌গে।'

সেই সময়ে দরাপ এল। হরিদাস আস্‌বে শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, "সাকিনা! আজ আমাদের কি আনন্দ! আমাদের মহকুমার হাকিম আস্‌বে এই কুঁড়েঘরে, ও ত' হাকিম নয় রে—ও আমার কলজে—দুঃখ এই, মরিয়ম দেখ্‌তে পেল না। ওর কবরে পাকা দালান দিয়েছে হরিদাস।'

দিলদার বল্লে, 'বাপ্‌জান, দাদার জন্তে মাছ ধরে নিয়ে আসি।'

'—যা হয় করগে বাপু—সাকিনা, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন—হরিদাস আস্‌ছে'

প্রভাতের সূর্য্য মধ্যাহ্নের পথে এগিয়ে চলেছেন। পৃথিবীর আজ খণ্ড প্রলয়ের দিন।

বিদ্যা-বাগ

দুর্ম্মুখ

এ কথা জানিতে তুমি, বাঙ্গালার সুযোগ্য সন্তান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু এই পরীক্ষা-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্‌—বাপ মার ছিল এ কামনা।
চাকুরী যে বজ্রসু কঠিন
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে জীবন যে হ'য়ে গেল লীন,
নিত্যাভাবে শুধু দীর্ঘশ্বাস-জর্জ্জরিত সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

এম্‌-এ, বি-এ পরীক্ষার ঘটা,
যেন শূন্য দিগন্তের ভোজবাজী ইন্দ্রধনুচ্ছটা!
অনাহারে প্রাণ যায় যাক্,
শুধু থাক্ ইউনিভার্সিটির ফল,
দেশশুদ্ধ বাঙ্গালীকে পিষে মারা কল
সিনেটের হল।

হায় ওরে যুবক-হৃদয়! বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার,
নাই যে সময়, নাই নাই,
পরীক্ষার খরস্রোতে ভেসেছ সদাই।
এবে অফিসের ঘাটে ঘাটে,
এক হাটে অর্দ্ধচন্দ্র, ভুলি তাহা যাও অন্য হাটে।
মাষ্টারের লেক্‌চার শ্রবণে
তব হৃদি-বনে
জীবনের আশার মঞ্জরী
মিথ্যাভাষে দিল ভরি'
ছাড়ি' বিদ্যালয়ের অঞ্চল,
চাকুরী-বাজারে এসে ধূলায় লুটায় ছিন্ন দল।

উপায় যে নাই,
ডিগ্রী হাতে ঘোর-ফের তাই।

হৃদয়ে ফোটায়ে তোল নব আশারাজি,
পুনঃ পুনঃ চূর্ণ হয় 'নো ভেকান্সি' কাণে ওঠে বাজি'

হায় রে হৃদয়!
তোমার সঞ্চয়,
কাণা কড়ি দাম নাই তার, স্বাস্থ্য জীবন শুধু ক্ষয়।
বাপ-মার অর্থ অপব্যয়।

হে যুবক, তাই তব বিক্ষত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সাহেবের হৃদয় হরণ
ডিগ্রীতে ভুলায়ে,
কণ্ঠে তব মেডেল দুলায়ে।
বুঝিল এখন
ভিত্তিহীন পড়াশুনা অর্থহীন একেবারে বাজে।

রহে না যে
বিলাসের অবকাশ
বারো মাস।
নাই নাই অশান্ত ক্রন্দনে
ইচ্ছা হয় আত্মহত্যা—রজ্জুর কঠিন বন্ধনে।

যৌবনেতে বাণীর মন্দিরে
প্রফেসারে
যে ভক্তি দিয়াছিলে তারে,
বৃথা সব, দাগা রেখে গেল এইখানে,
অন্তরের কোণে।

তাহাদের অর্থলোলুপতা
কুটিলতা

তখন পড়ে নি ধরা—আজিকে সেখানে,
প্রকাশিত সবই,
তাহাদের হৃদয়ের ছবি,
বাণীর মন্দিরে ভগ্নদূত,
কিম্ভুত, অদ্ভুত!

ছন্দে গানে
নজর যে পকেটের পানে
'ছিনি মিনি তোমাদের নিয়া
কারসাজি দিয়া।

জীবনের প্রথম আভাসে
যে ঠকান ঠকেছ তা' করুণ নিশ্বাসে,
মনোহারী বাক্যস্রোতে ভাবের বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙ্গালের মত তাই দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

তোমাদের অর্থ দিয়া যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া ক্রিটিক প্রহরী
কয়জন নিজ ভাতে ঝোল যে মাখিয়া
কদলী দেখায়, অন্তে মরুক কাঁদিয়া।

পড়াশুনা শেষ আজ,
শিরে বাজ,
আশা তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
আকাশ-কুসুম টুটে,
তব ডিগ্রীদল
যাদের গর্ব্বের ভরে ধরণী করিত টল্‌মল্‌
ত'দের আসল দাম আজি ধরা পড়ে
দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে পথের ধূলির 'পরে।
প্রাণ আজ গাহে না তো গান,
আশার ছলনে ভুলি হৃদয় তো মিলায় না তান।

তব আশা-সুন্দরীর নুপুর নিক্কণ
ভগ্ন হৃদয়ের কোণে
ম'রে গিয়ে পেঁচী স্বনে
কাঁদায় রে জীবন-গগন।
তবু হায় তোমরা চিরদিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি হীন,
ধ'রে আছ এই কাঠগড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়া।
বৎসরান্তরে
বাহিরিছ কাতারে কাতারে
অমূল্য সে ডিগ্রী নিয়া
জীবন যৌবন স্বাস্থ্য মূল্য দিয়া।
মিথ্যা কথা, কে বলে রে চেন নাই,
এখনও বোঝ নাই এই ঠকাবার কারবার।
ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকার
আজিকে হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া,
অনটন-জর্জ্জরিত হিয়া,
আজিও কি হবে না বাহির—
বাণীর মন্দির
বাঙ্গালীর হ'ল নতশির,
সবার পশ্চাতে থাকি'
অবজ্ঞা লাঞ্ছনা সহি' ডিগ্রী যত্নে ঢাকি।
নষ্ট ক'রে গড়িতে না পারে,
সবে আজ অপমান করিছে তাহারে।
স্বাস্থ্যবান্ বাঙ্গালার লোকে
চাষ ছেড়ে বাবু ব'নে কৃষ্টির আলোকে।
বাঙ্গালার গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
শিক্ষা-পথে উদ্দেশ্যবিহীন।
হে যুবক, কোনো মহাজাতি কোনদিন
পারে নাই উন্নতি করিতে,
দেশ, শিক্ষা, ভূমি ছাড়ি' কৃষ্টিরে ধরিতে
নাহি পারে,
তাই তো তোমারে

জীবন-সংগ্রাম-পথে দুই পায়ে ঠেলে
অন্য জাতি চ'লে যায় ফেলে।

হে বাঙ্গালী, হ'তে পারো পুনশ্চ মহৎ,
যদি তব জীবনের রথ—
ফেরাও দেশের প্রতি হৃদয় তোমার
বারংবার
এই
একমাত্র পথ তব, অন্য পথ নেই।

যে শিক্ষা দেশের পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
পরের আদর্শ নিয়ে যে শিক্ষা পেতেছে আসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে
দাও তাহা ধুলিরে ফিরায়ে,
নব পথে শুদ্ধ চিতে শুভ যাত্রা ক'রে
এগোও উৎসাহভরে।

হঠাৎ সহসা
হেরিবে জীবন মাঝে আশীর্ব্বাদ স্বর্গ হ'তে খসা।

তুমি প'ড়ে আছ দূরে
সুপ্ত দেশপ্রেমের অঙ্কুরে
শ্রদ্ধার বারি দানে,
কলহগম্ভীর গানে।

আজি হ'তে চাই
খাঁটী দেশী যাহা কিছু তাই
ধার-করা ভাষা, শিক্ষা রুধেছিল উন্নতির পথ,
সৃজেছিল বিঘ্নের পর্ব্বত।

আজি তার রথ
চূর্ণ করি' মায়ের আহ্বানে
দেশপ্রেম টানে
জননীর সিংহাসন পানে।
নাই
জন্মভূমি কেঁদে মরে তুমি হেথা নাই
মায়ের কোলেতে সবে ফিরে এসো ভাই।

ট্র্যাজিকনাট্যে মধুসূদনের প্রতিভা

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ

কিন্তু তাহা হইলেও বলিব মৃত্যুই ক্লাসিকেল ট্র্যাজিডির শেষ কথা। মধুসূদন সেই আদর্শ এখানে পুরামাত্রায় বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এইখানে একটা প্রশ্ন সাধারণতঃই উঠিতে পারে: মৃত্যুই যদি ট্র্যাজিডির শেষ কথা হয়, এবং মানুষের সমস্ত চেষ্টা যদি তাহার কঠোর নিয়তিকে কাটাইয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে জীবনে সান্ত্বনা রহিল কোথায়?

সান্ত্বনা তো নাই। অন্ততঃ গ্রীক ট্র্যাজিডি পড়িয়া বিশেষ সান্ত্বনা পাই নাই। মানুষ সেখানে অনেকটা অদৃশ্য হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। তাহার সমস্ত আশা ভরসা নিয়তির ক্রূর উপহাসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যায়। তাই তো সেখানে জীবনের কোন মূল্যই নাই। মানুষ হইয়া জীবনের মূল্য দিতে পারিলাম না—ইহার সান্ত্বনা নাই। কিন্তু সেক্সপীয়রে আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা মিলিল। না, মানুষকে আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম—তাহা তো সে নহে। তাঁহার দৃষ্টি নৈরাশ্যবাদী সোপেনহয়ারের মত নহে। তিনি জীবনকে খণ্ড খণ্ডভাবে না দেখিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই জীবনকে তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই। তাঁহার নায়ক দোষে গুণে মিশ্রিত মানুষ। দোষ সে করে—ভুল সে করে—দুঃখভোগ সে করে; কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনে শিক্ষাও সে অনেক পায়। জীবনকে যত টুকরা করিয়াই ভাঙা যায়—প্রত্যেক টুকরাটিই এক একটি মুক্তার মত উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাই তো দেখি জীবনে শিক্ষার বিষয় কত। মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যদিয়া জীবনের ভগ্নরথ যে পথে চালাইয়া দেয়—তাহারই দুই ধারে কত জিনিষই না ছড়ানো থাকে। যে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারে সে-ই কি লাভ কম করে? মৃত্যু যে একদিন আসিবে—আমাদের স্নেহ মমতা যে আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখিতে পারিবে না—এই ধ্রুববিশ্বাস-ই কি কম লাভ? মৃত্যুর জন্য সব সময়ে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার যে শিক্ষা, তাহার দাম-ই কি কম? মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে ইহাই চরম সত্য। তাই তো সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডির চরম কথা—"Ripeness is all."

এই "Ripeness" সেক্সপীয়রের প্রায় প্রত্যেক ট্র্যাজিক-নায়কের আসিয়াছে। যে লিয়ার নিজের উন্মত্ত বাসনার তৃপ্তি হইল না বলিয়া স্বার্থপরের মত বিনাদোষে আপনার প্রিয়তমা কন্যাকেও বিসর্জন দিলেন—তাহার দুঃখ এতটুকুও বুঝিতে চাহিলেন না—সেই লিয়ার যখন আকাশজোড়া কালো মেঘের মুহুর্মুহু গর্জনের নীচে দাঁড়াইয়া নিজের কষ্ট অপেক্ষা পার্শ্বের "Fool"-এর কষ্ট অধিক উপলব্ধি করিলেন, তখন মনে হয় যাহাই হউক রোদে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়াও তাঁহার শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। যে জীবনকে উপহাস করিয়া ম্যাকবেথ জমার ঘরে অঙ্কের পর অঙ্কপাত করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে জীবনটাকে আচ্ছা ঠকান ঠকানো হইল সেই জীবনই যে তাঁহার চোখে ধূলি দিয়া খরচের ঘরে সেই সমস্ত অঙ্ক সাজাইয়া জমার ঘরে শূন্য বসাইয়া রাখিবে—এতবড় দুঃসংবাদের কথা ম্যাকবেথ জানিতেন কি? তাই যখনই প্রকাণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া তিনি ইহা আবিষ্কার করিয়া বসিলেন, তখনই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল যে জীবন একটি "Walking shadow"। শেষ অঙ্কের ম্যাকবেথ প্রথম অঙ্কের ম্যাকবেথ অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ।

এই শিক্ষাই জীবনের সম্বল। যাহার এই শিক্ষা হয় নাই তাহার সান্ত্বনা নাই। "কৃষ্ণকুমারীতে" এই শিক্ষা কোথায়? কৃষ্ণার জীবন এত ক্ষণস্থায়ী যে এইরূপ কোন শিক্ষার অবসর তাহার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণার মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নাই। যে আঘাত তাহার পরিণতিকে এত করুণ ও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আসিয়াছিল সম্পূর্ণ বাহির হইতে। যে জীবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিতে-না উঠিতেই নিতান্ত আকস্মিক ভাবে নষ্ট হইয়া গেল তাহার জন্য দুঃখ করি; কিন্তু তাহার উপর ভরসা রাখি না। জীবনকে উপভোগ করিবার দীর্ঘ অবসর না থাকিলে তাহার ব্যর্থতায় এত দুঃখ

আসিবে কেন? ভীমসিংহকে যখন আমরা প্রথম দেখি তখন তাঁহার চরিত্র যেরূপ হতাশায় ভরা ছিল—নাটকটির যেখানে যবনিকাপাত হইল সেইখানেও তাহা সেইরূপ। তাঁহার মধ্যে প্রাণময় অংশ বড় কম। চরিত্রের এই জড়ত্ব কোন কলাবিদের পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়। তাই দেখি "কৃষ্ণকুমারী"তে মৃত্যু আসিয়াছে—রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে—হাহাকার উঠিয়াছে—বিষাদ, অশ্রু ও অবসাদের হাট বসিয়া গিয়াছে—কিন্তু সান্ত্বনা নাই।

কন্যাবিতাড়িত অসহায় রাজা লিয়ার তীব্র জলঝড় ও বজ্রাঘাতের মধ্যে পড়িয়া গরীবদের যে দুঃখ তাহা একবার বুঝিয়াছিলেন। আর প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন উদয়পুরকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছিল তখন আমাদের কৃষ্ণাও একবার গরীবদের দুঃখ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একজনের শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে—জীবনে ঠকিয়া—ঐরূপ বিশেষ অবস্থায় না পড়িলে হয় তো ঐরূপ শিক্ষার সুযোগ লিয়ারের কোনদিনই হইত না। আর কৃষ্ণার শিক্ষা বিলাসের আরাম শয্যায় শায়িত হইয়াও উহা তাহার কোমল প্রাণের কষ্টকর কল্পনা। লিয়ারের পক্ষে যাহা শাপে বর হইয়াছিল,—কৃষ্ণার পক্ষে তাহাই বরে শাপ হইয়া দেখা দিল।

"কৃষ্ণকুমারী"র মধ্যে ট্র্যাজিক আবহাওয়ার আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে প্রাকৃত ঘটনাবলীর পাশে অপ্রাকৃতের আয়োজন। যে যে রীতি অবলম্বন করিয়া সেক্সপীয়র তাঁহার ট্র্যাজিক-নাট্যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার একটি। "ম্যাকবেথ" নাটকের "The witches", "The goary-headed Banquo by the dining table", "The hanging dagger in the sky" প্রভৃতি এবং "হ্যামলেট" নাটকে "The royal deceased father" এই অতিপ্রাকৃতের সংবাদ বহন করিয়া আনে। যে অদৃশ্য নিয়তি আমাদের জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—ইহারা যেন তাহারই সিপাই সান্ত্রীর দল। ইহারাই অতীন্দ্রিয় জগতের টুকরা টুকরা কয়েকটা সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। নায়ককে ট্র্যাজিক করিয়া তুলিতে সেক্সপীয়রে অনেক ক্ষেত্রে ইহারাই লইয়াছে প্রথম প্রেরণা, তাই সেখানে তাহাদের জন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে

মধুসূদনের এইরূপ একটি আবহাওয়ার পরিকল্পনা যে একেবারে বৈদেশিকভাবে পুষ্ট তাহা নাও হইতে পারে। কারণ আমাদের সংস্কারও এ-বিষয়ে কম যায় না। মানুষের জীবনের পশ্চাতে, লক্ষে ও অলক্ষে, যে শত শত অশরীরি আত্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং মানুষের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে অতিপ্রাকৃত আয়োজন আভাসে ইঙ্গিতে তাহা জানাইয়া দেয়—ইহার শত শত উদাহরণ আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট পরিচিত। আমাদের মত এত অধিক সংস্কার প্রিয়তা অন্য কোন জাতির আছে কি না সন্দেহ। তথাপি বলিব, এই বিষয়ে মধুসূদন সেক্সপীয়র কর্ত্তৃক অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। অতি সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাসকে আর্টের সহিত সুকৌশলে নাটকের প্রাণবস্তুর সহিত খাপ খাওয়াইবার শিক্ষা তিনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যগুরুর নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন বলিলে বিশেষ অন্যায় বলিব বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু তাহা হইলেও "কৃষ্ণকুমারী"তে যে অতিপ্রাকৃতের আকর্ষণ তাহা সেক্সপীয়র হইতে অনেক বেশী। "Witch" গুলিকে দেখিয়াছিলেন মাত্র ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো। বাকি যে সব ভৌতিক দৃশ্য স্থান পাইয়াছে—তাহার দ্রষ্টা একমাত্র ম্যাকবেথ-ই। অনেকে মনে করেন ঐগুলির স্রষ্টাই ম্যাকবেথ। প্রকৃতপক্ষে হয় তো ঐগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না,—কিন্তু কল্পনাপরায়ণ ও পাপকার্য্যের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়াও তাহাতে লিপ্ত যে ম্যাকবেথ,—ঐগুলি তাঁহারই চিন্তাগ্রস্ত মস্তিষ্কের ফল। হ্যামলেটের নিহত পিতাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তিন বন্ধুতে। কিন্তু এখানে দেখি, অনেকেই অনেক প্রকার উপলক্ষ্য দর্শন করিয়াছে। আর একটা কথা। ম্যাকবেথ ছিলেন কল্পনাপরায়ণ—তাঁহার পক্ষে স্বীয় কার্য্যাবলীর অনুশীলন সম্ভব; এবং হ্যামলেট ছিলেন "Highly sensitive",—তাঁহার পক্ষে মৃত পিতার মৃত্যু অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক। কিন্তু এইক্ষণে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহার সহিত কোন একটি বিশেষ চরিত্র বিশেষ ভাবে জড়িত, অথচ অনাগত ঘটনার ছায়াপাত অনেকের মনেই হইয়াছে। সেই জন্যই এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাই বলি, এখানে আমাদের জাতীয় সংস্কারই জয়ী হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখি কৃষ্ণা জাগ্রত অবস্থায় শূন্যে পদ্মিনীর মূর্ত্তি দর্শন করিল। সমস্ত উদ্যান হঠাৎ পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হইল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; তারপরেই তাহার গতিহীনতা ও মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি। কৃষ্ণা শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে বলিতেছেন,—দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুল-মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নেই। আমি এই কুলের বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী……”

পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণাকে লইয়া যখন ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে জগৎসিংহ ও মানসিংহ যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, হয় কৃষ্ণা আর না হয় যুদ্ধ, ঠিক সেই সময়ে ভীমসিংহের মন্ত্রী এই গণ্ডগোলের মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়া দিলেন। “তিনি একখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন,—মহারাজ! এ পত্রখানি আমি গতরাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কোথা থেকে কে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে তার আমি কোন সন্ধান পাচ্ছি না।

মন্ত্রী যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, এ বিশ্বাস না করিলে বলিতেই হইবে যে, পত্র প্রেরণ ব্যাপারটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। পত্রে লেখা ছিল কৃষ্ণাকে হত্যার উপদেশ।

পঞ্চম অঙ্কের গোটা দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটাই যেন একটি অনাগত বিপদাশঙ্কায় থম্ থম্ করিতেছে। অনেকেরই মনে ভয় এই বোধ হয় পরলোকের কোন ছায়ার সহিত মুখোমুখী হইয়া গেল। উদয়পুরের একলিঙ্গের মন্দির সম্মুখে চারিজন সন্ন্যাসীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতেও বেশ একটি সঙ্কেত (omen) সূচিত হইয়াছে। প্রথম সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয়টি বলিতেছে :—

……অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো যেন, সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোত নির্গত হ’চ্ছে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্ছেন আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্ছেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হল। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যে বিপদ উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ;—এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত ; আর কি বিপদ ঘটতে পারে ?

দ্বিতীয় ;—……আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত তার প্রতিই কোন অনিষ্ট হতে পারে,……আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ঘটবে।

সত্য সত্যই ঝড় উঠিল। সমস্তই অন্ধকারে একাকার হইয়া গেল। ঝড় যখন থামিল—অন্ধকার যখন কাটিয়া গেল—তখন দেখি ভগবানের দেওয়া অনন্ত আলো বাতাসের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে দুইটি স্পন্দন হীন দেহ—তাহাতে নাই জীবনের লালিমা—তাহাদের উপর পড়িয়া গিয়াছে মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকা।

এইখানে রাজপুরীর সহিত সন্ন্যাসীদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। অথচ তাহারাও তো প্রকৃতির আভাস ইঙ্গিত হইতে বুঝিতে পারিল যে অমঙ্গল একটা ঘটিবেই।

পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে অহল্যাদেবীর কথা হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনিও কৃষ্ণার সম্বন্ধে একটা কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন, “আমার বোধ হল যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একজন ভীমরূপী পুরুষ একখানি অসি হস্তে করে এই মন্দিরে প্রবেশ কল্ল।……আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে, আর ঐ বীরপুরুষ কল্ল কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হল।”

অথচ তিনি জানিতেন না যে প্রকৃতই বলেন্দ্রসিংহ নিষ্কোষিত অসি হস্তে রাজকুমারীর পালঙ্কের নিকট মৃত্যু দূতের মতই দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এমন কি সংসার ত্যাগিণী, সংসার-মায়া-শৃঙ্খল-মুক্তি কামিনী তপস্বিনীও বাদ যান নাই। তাঁহাকেও আশ্চর্য্যের সহিত ভাবিতে হইয়াছে কুস্বপ্ন কি সত্যই বাস্তবে- পরিণত হয় ?

—কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দ-রাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলেম, তা কি যথার্থ হল ?

[তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

মৃত্যু যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণা আর

একবার তড়িৎ গতিতে আকাশে কোমল বাদ্য শুনিল ও শূন্যে পদ্মিনীর মূর্ত্তি অবলোকন করিল।

এইগুলি বিশদরূপে বলিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, সেক্সপীয়রের পাঠকরা তাঁহার অতি প্রাকৃতের আয়োজনকে কল্পনাপ্রবণ নায়কের কৃতকর্ম্মের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এইখানে সে অবসর নাই। "কৃষ্ণকুমারী"র শেষ দৃশ্যে যে নৃশংস কার্য্য সংঘটিত হইবে তাহার-ই জন্য মধুসূদন আমাদিগকে অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়াছেন।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। মধুসূদন জাগতিক ঘটনার বিপর্য্যয়ের পশ্চাতে প্রকৃতির বিপর্য্যয়কে স্থান দিয়াছেন। ঝড়, ঝঞ্ঝার প্রকোপ ও মুহুর্মুহু বিদ্যুতের লেলিহান জিহ্বা যখন পৃথিবীর বক্ষোরক্ত নিঃশেষে শুষিয়া লইতেছিল—আকাশে বাতাসে জগতের অলক্ষে কৃষ্ণার জীবন-দীপ অস্বাভাবিক ভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছিল। পশ্চাৎপটে প্রকৃতির এই দুর্যোগ থাকায় কৃষ্ণার আত্মহত্যাটি করুণতর হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাভাবিক কোন ঘটনার জন্য অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতার আবশ্যক। মধুসূদন তাহা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রেও এই রীতিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাঠক "কৃষ্ণকুমারী"র পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভৃত্যের স্বগতোক্তি, চারিজন সন্ন্যাসীর কথোপকথন ও "ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন" শুনিয়া রাণার উক্তি, এবং তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণার স্বগতোক্তি [উঃ! কি ভয়ানক বিদ্যুৎ!……ইত্যাদি] পাঠ করুন, আর সেই সঙ্গে "ম্যাকবেথ" নাটকে ডানকান হত্যার বিভীষিকাময়ী রজনীর কথা স্মরণ করুন। মৃতরাজাকে জাগাইতে আসিয়া লেনক্স বলিতেছে—রজনী শৃঙ্খলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; যেখানে আমরা শুইয়াছিলাম ঝড়ে সেখানকার প্রদীপ উলটাইয়া দিল; আকাশে বাতাসে মৃত্যুর অদ্ভুৎ কাতর গোঙানি শোনা যাইতেছিল।" কেবল তাহাই নহে ;…

…………the obscure bird
Clamour'd the lifelong night! Some say, the earth
was feverous and did shake.

"কৃষ্ণকুমারী"র পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভৃত্য বলিতেছে,—[সচকিতে] ও বাবা! ও কি ও! তবে ভাগ একটা পেঁচা, আমার প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছিলো। শুনেছি পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী।

এই দৃশ্যে চারিজন সন্ন্যাসীর কথোপকথন আমি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তারপর ভীমসিংহের কথা। ঝড় ও আকাশে মেঘ গর্জ্জন পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেখিয়া রাণা বলিতেছেন,—[আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ

ত করিয়া] রজনীদেবী পামরের সহিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছে,…হে তমঃ! তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছ ?

মোট কথা, গোটা পঞ্চম অঙ্কটাই এই ঝড়, জল ও বজ্রাঘাতের রাজ্য। এক্ষণে প্রকৃতির উদ্দামতার সহিত মানব প্রকৃতির উদ্দামতা মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন এই অস্বাভাবিকতার আবশ্যক এই জন্য যে, ইহা ট্র্যাজিডির বিভীষিকা বাড়াইয়া দেয়, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার মধ্যেও একটা স্বাভাবিকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্বের মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকিতে হয় তো তাহা প্রকৃতি। এই প্রকৃতিরই বিবর্ত্তনের ফলে জীবের উৎপত্তির কথা যদি সত্য বলিয়া মানিতে হয় তো একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহাদের মধ্যে রহস্যজনক একটা আত্মীয়তা রহিয়াছে। এক হইতে অন্যকে পৃথক করা যায় না। আরও একটা কথা। ট্র্যাজিডির মূলতত্ত্বের মধ্যে মানুষের নিঃসহায়তা প্রচার করাটাই আসল কথা। মানুষকে পরাজিত করিবার জন্য বিশ্বের অণু পরমাণুর চেষ্টার যে অবধি নাই—মানুষকে ব্যর্থ মনোরথ করিবার জন্য যে অদৃশ্য জগৎ নানারূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে—এক কথায় চারিপার্শ্বের অবস্থা বিপর্য্যয় মানুষকে যে তাহার বিষাদময় পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দেয়—ইহা দেখানই ট্র্যাজেডির মূল উদ্দেশ্য। আর সেইটি অনেকটা সাফল্য লাভ করে এই ভাবে।

মধুসূদনের আর একটি দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। এখানে দেখি যে নাট্যকার প্রথম দৃশ্যেই আমাদের লক্ষ্যটিকে কেন্দ্রীয় বস্তুর দিকে টানিয়া দিয়াছেন। ক্লাসিকেল ট্র্যাজিডিতে, বিশেষ করিয়া সেক্সপীয়রে, কেন্দ্রীয় চরিত্র খুব বড় করিয়া অঙ্কিত করিবার রীতি দেখা যায়। প্রকৃত চরিত্রটি ষ্টেজে আবির্ভূত হইবার

পূর্ব্বে দর্শক ও পাঠক তাঁহার সম্বন্ধে এত বেশী শুনিয়া বা পড়িয়া ফেলেন যে তাঁহাকে দেখিবার জন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। ক্লাসিকেল ট্র্যাজিডির নায়ক সাধারণ লোকের বহু উচ্চে। চরিত্রের দৃঢ়তায়, বাহুবলে ও নৈতিক পবিত্রতায় তাঁহারা জনসাধারণের আদর্শ স্বরূপ। সেই জন্তই তাঁহাদিগকে বড় করিয়া অঙ্কিত করিবার প্রথা ছিল। ক্লাসিকেল ট্র্যাজিডিতে ট্র্যাজিডি ঘটিয়াছে ঐ সমস্ত দৃঢ়চেতা রাজা বা জননায়কদের। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সমস্ত পুরুষ-সিংহেরাও প্রকৃতির ক্রূর পরিহাসে বিপর্য্যস্ত—তুমি আমি কে?

যাহাই হউক, সেই জন্তই নায়ককে তাঁহারা দর্শকের সম্মুখে খুব বড় করিয়াই উপস্থাপিত করিতেন। মধুসূদনও তাহাই করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ধনদাসের নিকট একটি ছবি দেখিয়া রাজা জগৎসিংহ বলিতেছেন,—বাঃ! এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ তো আমি কখনও দেখি নাই!...

যে লম্পট রাজা নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনে করে সেও কৃষ্ণার সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি অপরূপত্বের ছাপ লক্ষ্য করিল। পাঠকের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দিয়া ধনদাস বলিল, "মহারাজ, আপনি কেন, এরূপ বোধ হয়, এজগতে আর কেউ কখনও দেখেনি।"

কেবল এই টুকুতেই আমরা বুঝিতে পারি না, কে সে নারী! নাট্যকারও সুকৌশলে উপমার পর উপমা প্রয়োগ করিয়া আমাদের আগ্রহকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা, এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী।"

জগৎসিংহের কারবার নারীর দেহকে লইয়া—তাহার মধ্যে নারী সৌন্দর্য্যের উপাসকের চিহ্ন নাই। কিন্তু কৃষ্ণার কমনীয় দেহকান্তির মধ্যে এমন একটি অসাধারণত্ব রহিয়াছে যাহা, পরে অবশ্য যাহাই হইয়া থাকুক, প্রথমে জগৎসিংহকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কারণ অদৃশ্যা কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করিয়া জগৎসিংহ যে কয়টি কথা বলে—

রাজা। (স্বগত) হে রাজলক্ষ্মি! তুমি কোন ঋষিবরের শাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্চো?

আবার, কৃষ্ণার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিংহকে কটুক্তি করিয়া বলিতেছেন, "বটে বামণ হয়ে চাঁদে হাত।...কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ বৈদেহির উপযুক্ত পাত্র?"

আবার,—

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্ঘ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে।

[১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

তাহা হইতেই তাহার প্রমাণ হয়। জগৎসিংহ একজন পাকা জহোরি; তাহার নিকট বিলাসবতীর খাদ ধরা পড়িয়া গিয়াছে—তাই সে পাকা সোনার দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এইখানে কথা এই যে, যদিও কৃষ্ণার মধ্যে ট্র্যাজিক হিরোর বিশেষত্ব বিশেষ নাই তথাপি তাহার প্রতি সহানুভূতি কি আমাদের কম? কৃষ্ণা যে তাহার অসামান্য রূপ এবং ততোধিক কোমলতা, কমনীয়তা ও সরলতা লইয়াও জীবন উপভোগ করিতে পারিল না, দুষ্ট কীট আসিয়া অকালে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া দিল, তাহার জন্ত কি আমরা দুঃখ করি না? করি বইকি? আজ কৃষ্ণার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন অজ্ঞাত রমণীর হত্যা হইত তাহা হইলে আমরা কি অতটা দুঃখ ভোগ করিতাম? নিশ্চয় না। মধুসূদন অসামান্য প্রতিভা বলে ও বিশিষ্ট কলাবিদের মত প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই জন্তই প্রথম দৃশ্যটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদনের ট্র্যাজিক প্রতিভার মোটামুটি আলোচনা করিলাম। এইখানে ট্র্যাজিডি অর্থে আমি ক্লাসিকেল ট্র্যাজিক নাটককেই গ্রহণ করিয়াছি; সেইজন্ত ট্র্যাজিক মতবাদ লইয়া যে আলোচনা করিলাম তাহাও ক্লাসিকেল।

মধুসূদনের ট্র্যাজিক প্রতিভার আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কৃষ্ণকুমারীকে বাছিয়া লইয়াছি। যদিও মধুসূদনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় নাটক লেখা হইতেছিল, এবং যদিও মধুসূদন নিজেই কৃষ্ণকুমারী রচনার পূর্ব্বেই দুইখানি নাটক শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা করিয়াছেন, তথাপি ট্র্যাজিডি বলিতে তাঁহার ঐ একটিকেই বুঝায়। ['মায়া কানন' তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার উপর কোন অভিমত আমি প্রকাশ করিব না।] সেইজন্ত এক "কৃষ্ণকুমারী"র মধ্যেই তাঁহার এই ট্র্যাজিডি

প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল। এই ট্র্যাজিডি রচনার কিছু পূর্ব্বেই "মেঘনাদ বধ" ও "ব্রজাঙ্গনা" রচনা করেন। এই সময়টায় তাঁহার উপর বৈদেশিক প্রভাব অত্যন্ত পড়িয়াছিল। সেই জন্ত যদি বলি যে কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে বৈদেশিক ক্লাসিকেল ট্র্যাজিডির আদর্শই তিনি ফুটাইতে চাহিয়াছিল তাহা হইলে বিশেষ অন্যায় করিব না। আমি আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে এইটুকু প্রমাণিত হইবে যে, যদিও মধুসূদন ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে গ্রীক আদর্শ ও সেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাহার মধ্যে ট্র্যাজিডির গভীর কোন তত্ত্ব বিশেষ পাই না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি নাটকের একটী নূতন রীতির আমদানি করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে বাংলা নাট্য-জগতে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। "কৃষ্ণকুমারী" প্রকাশিত হইবার পরেই দীনবন্ধুর ট্র্যাজিক নাটক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইল; এবং তাহার পর হইতেই বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজিডির জন্ত একটি বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। যে সমস্ত সংস্কারবদ্ধ প্রাচীনপন্থারা মনে করিতেন যে, আমাদের দেশের পুরাতন মাল-মশলাকে "থোড়া-বড়ি-খোড়" ও "খোড়-বড়ি-থাড়া" হিসাবে সাজাইয়া না লইয়া নাটক রচনা সম্ভব নয়, এবং গায়ের জোরে সম্ভব হইলেও তাহা জনপ্রিয় হয় না, তাঁহারাও কম বিস্মিত হন নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও মধুসূদন বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই; আর কেবল মধুসূদন কেন, দীনবন্ধু ও গিরিশ-চন্দ্রও ট্র্যাজিক নাটকে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কারণ মায়াবাদ ভারতীয় সাধনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজিত। তারপর আমাদের জাতীয় জীবনের পুঁজি এত অল্প এবং ইহার আবেষ্টনী এত সীমাবদ্ধ যে তাহার মধ্যে গভীর ট্র্যাজিডির অবসর নাই।

যাহাই হউক, মধুসূদন এবিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শক; সুতরাং আর্টের দিক দিয়া তাঁহার মধ্যে একটু আধটু গোল থাকিলেও এবং সেক্সপীয়ারের মত বিরাট কোন কীর্ত্তির অধিকারী না হইলেও, বাংলা সাহিত্যের যে কোন প্রকৃত সমাজদারই তাঁহার প্রতিভাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

শরতের উৎসব

শ্রী কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

চাষার নয়নে ভাদর ঝরিল আশ্বিন এলো পরে—
মার আগমনে বিষাদ বাড়িল বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।
সারা বছরের ভরা বেদনায় কত ছিল মনে আশা—
জননী আসিলে রাঙা পায়ে তার নিবেদিবে ভালবাসা।
নিবেদিবে সব বেদনার বোঝা খুশীর লহর তুলি—
বঞ্চিত যত করুণাবিহীন অতীতের দিনগুলি।
এলো আশ্বিন হৃদয়ের বীণ্ গাহিয়া করুণ সুরে—
সবই যেন ছিল, আজ নাই নাই হারাল সে কোন্ দূরে।
ঘরে নাই ধান মাঠের ফসল দেরীতে ফেলিবে সব—
ক্ষুধার তাড়নে কে পূজিবে কারে? ক্ষুধিতের কলরব।
মলিন করিল গ্রাম অজন দহনের কোলাহলে—
পূজা উপচার আজিকে কেবল ভরিল আঁখির জলে।
গ্রামের মহিমা মলিন হইল দুঃখের কারাগারে—
অনাহার সেথা হাতছানি দেয়; অনটন বারে বারে।

দুঃখ ওদের গভীর অতল বেদনায় সীমাহীন—
কে রাখে জগতে গরীবের খোঁজ যারা অসহায় দীন?
গভীর মিতালী বাঁধিয়াছে ওরা মরিয়া মরণ সাথে—
ভয়ালের রূপ দেখে ওরা নীতি আপনার আঙিণাতে।
আসে ম্যালেরিয়া মহামারী আসে করে না কাহারে ভয়—
তিলে তিলে ওরা জীবন দানিয়া মরণে করেছে জয়।
গ্রাম ছাড়ি যারা শহর গড়িল পল্লীরে অবহেলি—
বছরের পর তারা এলো ঘরে ওরা দেখে আঁখি মেলি।
বলে যেন শুনি "এলে ভাই সব শরতের উৎসবে—
কঙ্কালসার কাঙাল আমরা কিসে উৎসব হবে?

কাঙালিনী মার পূজা উপচার জীবনের অবসানে—
সার্থক হোক বঙ্গ ভরিয়া চাষীদের বলিদানে।"

সহোদর

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

(নাটিকা)

প্রথম অঙ্ক

[স্বর্গীয় বিমলা প্রসাদ সান্ন্যালের বাড়ী। তাঁর সেজো ভাই ও বন্ধু হরিচরণবাবু কথা কইছেন]

তারিণী। ভাই বলে ভাই, একেবারে মায়ের পেটের ভাই। আর শুধু কি ভাই—বড় ভাই।

হরিচরণ। ঠিকই ত। বিমলাবাবু তিন মাসের ওপর রোগ ভোগ করে মারা গেলেন—শুনছি ম'শায়রা আরো তিন ভাই আছেন, কৈ একদিনও ত কাউকে একবার উঁকি দিয়ে যেতে দেখলাম না!

তারিণী। ব্যাপারটা কি জানেন? দাদা অল্পবয়স থেকেই কেমন একটু সাহেব ঘেঁসা হয়ে পড়েছিলেন—ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানতেন না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করতেন না—দু'বার তিন বার বিলেত গেলেন, এই নিয়ে বাবার সঙ্গে হল তাঁর মতের অমিল—বাবা গোঁড়া হিন্দু, ফলে গোঁড়া থেকেই হল আমাদের ছাড়াছাড়ি।

হরিচরণ। বুঝলাম। তাহলে আজ তিনি চোখ বুজতে না বুজতেই যে আপনারা একযোগে এসে হাজির হলেন?

তারিণী। তা হবে না? সহোদর ভাই—তাঁর কাল হল তাঁর ছেলে নেই, মেয়ে নেই—আমরাই ত তাঁর সব, তাঁর পরকালের কাজ করতে হবে, তাঁর অগাধ ধন-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে। না এসে পারি কখনো? হাজার হলেও দাদা ত, আর সে যে-সে দাদা নয়, একেবারে ইন্দ্রতুল্য।

হরিচরণ। কিন্তু এতে ধর্ম্মের দিক থেক আপনাদের কোন প্রত্যবায় হবে না?

তারিণী। তা কি করে হবে? দাদা ত আর বেঁচে নেই—ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসেব ছিল, যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। এখন যখন তাঁর মৃত্যুই হল, এখন তাঁকে ত মুক্তি দিতে হবে।

হরিচরণ। ঠিক কথা। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বড়ই কষ্ট পেয়েছেন…বড্ড অসহায় হয়ে মারা গেছেন…

তারিণী। তা আর বলতে হবে? আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই—বিয়ে করেন নি, থাওয়া করেনি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার বলতে কেউ নেই…

হরিচরণ। তবু যাহ'ক ম'শায়ের ছোট ভাই বনমালী বাবু সস্ত্রীক এসেছিলেন—শেষ ক'টা দিন তাঁরাই করেছেন তাঁর সেবা যত্ন, নইলে একটু জলের অভাবেই তাঁর প্রাণটা যেত।

তারিণী। বনমালী এসেছিল নাকি আগে থেকেই?

হরিচরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখের সুরুতেই তাঁরা আসেন, আর স্বামী-স্ত্রীতে প্রাণপণ করে সেবা করেন তাঁর শেষদিন পর্যন্ত। বড় লক্ষ্মী বৌমাটি—তিনি কত সুখ্যাতি করতেন তাঁর আমার কাছে। দিন নেই রাত নেই একটানা পরিশ্রম করছেন। নিজের খাওয়া-শোয়ার কথা পর্য্যন্ত মনে থাকতো না।

তারিণী। চেনেন নি ওদের মশাই। আমার এই যে ছোট ভাইটিকে দেখছেন ওটি হচ্ছে আদৎ শয়তান, আর বৌমাটির ত কথাই নাই। দু'জনে পয়সার জন্যে পারে না হেন কর্ম্মই নেই! যেই খবর পেয়েছে দাদার ব্যারাম, অমনি চুপি চুপি এসে জুটেছে, কাউকে ঘুণাক্ষরে একবার জানতে পর্য্যন্ত দেয় নি। মৎলবটা বুঝেছেন ত!

হরিচরণ। আহা তা কেন হবে? প্রায়ই আসতেন ভদ্রলোক—বিমলাবাবু ভালবাসতেন ওঁকে, মাঝে মাঝে টাকা পয়সাও দিতেন কিছু কিছু। একদিন দেখলেন বড্ড অসুখ দাদার, আমায় বললেন, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসবো, দাদার একটু সেবার সুবিধা হবে, আমি বললাম, আসুন—কিছু মৎলব নিয়ে আসেন নি ওরা।

তারিণী। আপনি ওদের চিনবেন অত সহজে? আরে মশায় মায়ের পেটের ভাই ত—তার সম্বন্ধে যে কথা বলছি, এ কি আর এমনি? ঐ লক্ষ্মীছাড়া করে এক হোটেলের সরকারী, আর ওর পরিবার করেন জামা শেলাই—ওদের সঙ্গে সাধে আর আমরা সম্পর্ক রাখতে পারি নি? ও ত আসবেই টাকা চাইতে, একি আর দাদার ওপর টান, এ হল—

হরিচরণ। থাক গে। তবে শুনেছি বিমলবাবুর কাছে য় ম'শায়ের পিতৃদেব যখন গত হন, তখন উনি নেহাৎ াবালক। ওকে ম'শায়রা লেখাপড়া শেখান নি, একটি পয়সা র্যান্ত দেন নি পিতৃসম্পত্তির—উনি দোকানে কাজ করে, বিড়ি বিক্রি করে নানা রকমে মানুষ হয়েছেন, তারপর বিমলবাবু দেশে এলে উনি তাঁর সাহায্য পেয়ে…

তারিণী। এই সব বলতেন দাদা? বলেছি ত দাদার র্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না, নইলে আর বাবা শুধুশুধু বড় ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন? বাবা ছিলেন…

হরিচরণ। সেই অধার্ম্মিক দাদার টাকা-পয়সা…

তারিণী। আহা ও কথা তুলছেন কেন? ও ত আমাদেরই দায়, আপনি বাইরের লোক, আপনি ওর মর্ম্ম কি বুঝবেন? আপনি ছিলেন তাঁর বন্ধু আর আমরা যে সহোদর ভাই—

হরিচরণ। ঐ মহিলাটি কে আসছেন?

তারিণী। কৈ? ওঃ ওঃ হেম…আমাদের বোন। ওর বিয়ে দেওয়া নিয়েই ত দাদার সঙ্গে বাবার গোল বাঁধলো, বাবা ঠিক করলেন এক কুলীন পাত্র, দাদা বললেন, না ও বুড়োর সঙ্গে কিছুতেই দেওয়া হবে না বিয়ে, এক হীন জাতের ছোকরা ডাক্তার জোগাড় করলেন তিনি, শেষটা বাবা জোর করেই দিলেন ও বিয়ে, আর দাদা…

হরিচরণ। সেই থেকে বাড়ী ছাড়লেন!

[হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

তারিণী। তাই। এই যে হেম এসেছে। আয় হেম, আয়—হেম রে দাদা আমাদের নেই! আহা…

হেম। ওহো দাদা গো, তুমি কোথায় গেলে গো? এমন দাদা কি মানুষের হয় গো? দাদা ত নয়, যেন ইন্দ্র! আমি পোড়ামুখী বেঁচে রইলাম, আর তুমি চলে গেলে… আজ তিরিশ বছর তোমার সঙ্গে যে দেখা নেই গো!

হরিচরণ। স্থির হন, মানুষ ত অমর নয়…বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি…

তারিণী। আহা-হা, আপনি কি বুঝবেন ম'শায়? ওর কোথায় লেগেছে? ওর বিয়ে নিয়েই যে দাদা আমাদের বিরাগী হন! আর বিয়ের এক বছর পরেই ওর হাতের লোহা…আহা-হা!

হরিচরণ। তারপর?

তারিণী। আমার ভগিনীপতির বয়স হয়েছিল এই যা, নইলে ভদ্রলোকের বিষয় সম্পত্তি টাকা-পয়সা বেশ ছিল, বাবা ত আর হাত-পা বেঁধে ঐ একটি মেয়েকে জলে ফেলেন নি।

হরিচরণ। হুঁ।

হেম। ওঃ, হো হো বাবা গো। তুমি আজ কোথায় গো? তোমার মাথার মণি যে দাদা…

[মেজ ভাই অন্নদাচরণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢুকলেন]

অন্নদা। যাক, তোরা এসে পড়েছিস? তা বেশ বেশ, আমার একটু দেরী হয়ে গেল…তা হেমও এসেছিস, তা বেশ বেশ, সবই অদেষ্ট…তা…

তারিণী। আমাদের মেজদা—

হরিচরণ। বুঝেছি।

অন্নদা। ইনি?

তারিণী। দাদার বন্ধু এটর্নি…

অন্নদা। ওঃ তা আমি ত ঠিক সময়ে আসতে পারি নি। তা দাদার বিষয়-সম্পত্তির কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের হিসেব কেতাব, ঘরোয়া জিনিষ পাতি সব ঠিকঠাক আছে? ওসবের বন্দোবস্ত করে ফেলতে হয়, আর সকলে মিলে বসে, কি বলে গিয়ে একটা শ্রাদ্ধো…

হরিচরণ। ব্যস্ত হবেন না। তাঁর কাগজপত্র সমস্তই লোহার সিন্দুকে রেখে শীল করা হয়েছে—মূল্যবান জিনিষ-পত্রও সমস্তই ঘরে আটক করা হয়েছে, তাঁর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হলেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

অন্নদা। উত্তরাধিকার? আমরাই ক'ভাই বোন তাঁর উত্তরাধিকারী…তাঁর ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ ছিল না, আমরাই সব…

হরিচরণ। তা বললে ত হবে না, ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বাড়ী ছাড়া, তখন আপনাদের পিতা বেঁচে, তারপর সারা জীবন তিনি কখনো ইউরোপে, কখনো আমেরিকায়, কখনো বর্ম্মায় কাটিয়ে, শেষ কালটা ক'লকাতায় ছিলেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হল ষাট বছর বয়সে। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর কোথাও তিনি বিয়ে-থাওয়া…

অন্নদা। ছি-ছি, বলেন কি ম'শায়? এ বংশের ছেলে

অত ছ্যাঁচড়া হয় না। দাদা আমাদের ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান···

হরিচরণ। তবু আইনের খাতিরে আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আর আমি তা করতে আপনাদের বাধ্য করবো।

তারিণী। মানে?

অন্নদা। বাধ্য করবেন?" আপনি কে? আপনাকে পোঁছে কে? দাদার বন্ধু ছিলেন—দাদা নেই, আপনি এবার সরে পড়েন ভালোই, নইলে···

হেম। বটেই ত। বলে যার ধন তার ধন নয়···

হরিচরণ। আপনারা যাই বলুন—এছাড়া আমার উপায় নেই। আপনার দাদা অন্তিমকালে সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে গেছেন আমারই হাতে—আমি রীতিমত তদন্ত না করে কিছুই করতে পারি না, বুঝলেন।

অন্নদা। আচ্ছা দেখি আপনি কি করতে পারেন। আদালত আছে—এ মগের মুল্লুক নয়।

তারিণী। ঠিকই ত!

হেম। তা নয়ত কি?

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ঐ বাড়ীর দোতালা। হেমাঙ্গিনী এবং ছোট বৌ প্রমীলা কথা কহিতেছেন]

হেম। দেখো ছোটবৌ, কিছু লুকোবার চেষ্টা করো না—ব্যাপার কিন্তু অনেক দূর গড়াবে।

প্রমীলা। আমি কি জানি ওসবের? আমি মুক্ষু মেয়ে মানুষ, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কি তিনি উইল করেছেন? কত ডাক্তার, উকিল, মোক্তার আসতো তাঁর কাছে।

হেম। কিন্তু এতদিন ধরে ত তুমি ছিলে—বাড়ীতে একটা লেখা-পড়ার ব্যাপার হয়ে গেল, তুমি সে সম্বন্ধে কোন কাণাঘুষোও শুনতে পেলে না, একি আর হয় কখনো?

প্রমীলা। কি করে পাবো? ওষুধপত্তি তৈরি করা, রুগীর গা মোছানো, মাথা ধোয়ানো, তার বিছানা বালিশ পরিষ্কার করা—কাজ কি কম ছিল? দিন রাত্তির ত থাকতাম ঐ নিয়ে!

হেম। আর দাদার কাছে যেতে না কখনো?

প্রমীলা। কেন যাবো না? সর্ব্বদাই যেতাম কিন্তু তিনি ভাসুর, আমি বৌমানুষ, আমার সঙ্গে আর কি কথা হবে তাঁর? ঐটা দেও, ওটা করো···এই পর্য্যন্ত কথা হত!

হেম। বুঝলাম তুমি ভাঙবে না কিছু। এই করে তুমি নিজেও ফাঁকে পড়বে, আর সকলকেও পথে বসাবে।

প্রমীলা। সেকি! আমি ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই···

হেম। আরে নেকী, তুমি বোঝো কিছু? ঐ হরিবাবু লোকটা বলছে, দাদা নাকি উইল করে সর্ব্বস্ব কাকে দিয়ে গেছেন, আমাদের জন্যে এক কাণা কড়িরও ব্যবস্থা নেই।

প্রমীলা। তোমরা কি মনে করছো, সে আমি? তাঁর ধন, তিনি যাকে খুশী তাকে দিয়েছেন—তাতে আমার বলবার কি আছে? আর বললেই বা তা শুনছে কে?

হেম। ওরে আমার সাধুপুরুষ রে! তাই দাদা মরবার আগ থেকেই এসে জেঁতে বসেছেন—যাতে কিছু হাতিয়ে নিতে পারেন। তা শোনো, উইলে কি আছে না আছে এখনো খুলে বলো—মেজদা আছে, সেজদা আছে যাহ'ক একটা হিল্লা হবে নইলে এরপর কিন্তু কেঁদে রাত পোহাবে না!

[অন্নদার প্রবেশ]

অন্নদা। তা—তা হেম, পারলে কিছু বের করতে?

হেম। হ্যাঁ, সেই হিঁদু কি না!

অন্নদা। তাহলে দেখছি সোজা অঙ্গুলে ঘি বেরুবে না। ঘরের বৌ, আমি কোন খিটকেল করা পছন্দ করি নে··· নইলে তারিণী যা বলেছে সে ত বিষম কথা!

হেম। কি মেজদা?

অন্নদা। বলবোই বা কি? এসব বড়ই লজ্জার কথা—হরিবাবু বলছেন, দাদার মাথার নীচে আলমারি, হাতবাক্স এসবের চাবি থাকতো, ছোটবৌমা সেটা জানতেন—দাদা মারা যাবার পরে নাকি তিনি দেরাজ থেকে ক'খানা গিনি আর কিছু সোনার জিনিষপত্র পাচ্ছেন না। তাঁর সন্দেহ···

হেম। বুঝতেই পারছি। তা তোমরা কি ব্যবস্থা করছো?

[তারিণীর প্রবেশ]

অন্নদা। তারিণী বলছে···ঐ যে তারিণী আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করো সব! ওরে তারিণী, বৌমা নাকি কিছুই বলবেন না···

তারিণী। তাহলে যা দেখছি পুলিশই ডাকতে হয়! দাদা আমাদের সকলেরই দাদা, সোনাদানা যা তাঁর ছিল, সে আমাদের সকলেরই—তা যে একলা নেবেন, এ ত আর হতে পারে না।

হেম। বটেই ত।

প্রমীলা। একি, সকলে মিলে আমায় চোর ঠাউরাচ্ছেন, আমি বড়ঠাকুরের দেরাজ থেকে···ভগবান নেই, এত অবিচার সইবে? মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি ঠাকুরঝি···

হেম। আহা আমার সতীরে, কিছু জানেন না উনি—ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ডাকো তোমরা পুলিশই ডাকো।

প্রমীলা। হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করো না তোমরা—বড়ঠাকুর নিজে হাতে আমায় ক'খানা গিনি আর কিছু সোনার জিনিষ দিয়ে গেছেন কিনা?

হরিচরণ। আপনারা আবার কি নিয়ে গোলমাল করছেন?

তারিণী। গোলমালটা কি মশাই? দাদার সম্পত্তি ভাইরা নেবে, এতে গোলযোগ কোনখানটায়? আপনি ত আছেন কি করে সব বাগাতে পারেন, সেই তালে—ও মাগীও সেই মতলব নিয়েই আগে আগে এসে হাজির হ'য়েছে! আপনারা ভেবেছেন বুঝি আমরা অম্নি অম্নি ছেড়ে দেব?

হরিচরণ। তা দেবেন কেন? আপনারা যতটা যা পারেন চেষ্টা করেই দেখবেন। একটা কথা শুধু মনে রাখবেন আপনার দাদা যা কিছু রেখে গেছেন, তাতে আপনাদের কারুর এক কণা অধিকার নেই!

অন্নদা। কেন নেই?

হরিচরণ। তিনি তাঁর উইলে সব তাঁর ন্যায়সঙ্গত ওয়ারিশকে দিয়ে গেছেন। শুধু ছোট বৌমাকে ক'খানা গিনি আর কি কি জিনিষ আলাদা করে দিয়ে গেছেন, সে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে।

অন্নদা। তাঁর আবার ওয়ারিশটা এলো কোথা থেকে?

হরিচরণ। যথা সময়েই দেখতে পাবেন।

তারিণী। ওসব ধাপ্পাবাজী রাখুন, আমরা তাঁর উইল দেখতে চাই।

হরিচরণ। মজা এই যে, উইলখানিও চুরি হয়েছে—তাঁর আয়রণ-চেষ্টে আমারি সামনে সেটা চাবি বন্ধ করা হয়েছিল, তারপর সেটা আর বের করা হয় নি, কিন্তু এখন দেখছি, সেটা আর সেখানে নেই!

অন্নদা। কোথায় গেল তা'হলে?

হরিচরণ। গণৎকার নই, বলতে পারি না। তবে তাতে যাবে আসবে না কিছু, আইন সম্মত ওয়ারিশ এলে বিনা উইলেই তাঁর উত্তরাধিকার পেতে পারেন—আমি আশা করছি, আজই তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারব।

তারিণী। আমি যদি বলি, আপনিই উইল চুরি করেছেন?

হরিচরণ। বলুন, কিন্তু দু'একদিনেই বুঝবেন সেটা ঠিক নয়।

তারিণী। আচ্ছা, যাক না কোথায় যাবে, আদালত ত আছে। আমার নাম মামলাবাজ তারিণী সাণ্ডেল···

অন্নদা। তা দাঁড়া তারিণী, আমিও আছি—যা'হক একটা পরামর্শ করতে হয়। আয় হেম, তুইও আয়···এত ভাল কথা নয়!

[ছোট বৌ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

(বনমালীর প্রবেশ)

বনমালী। কি তোলপাড় কাণ্ড! দাদা মারা গেলেন, সে জন্যে কারুর এক ফোঁটা দুঃখ নেই—কি করে তাঁর সর্ব্বস্ব দখল করা যায়, তাই হল ওঁদের একমাত্র ভাবনা। ছি ছি···

প্রমীলা। উইল চুরি হয়েছে···জানো?

বনমালী। শুনলাম। তা হয়েছে হকগে—দাদাই গেলেন, তা তাঁর সম্পত্তি—যে পায় সে পাকগে!

প্রমীলা। আচ্ছা উইল না পাওয়া গেলে, কি হবে?

বনমালী। কি জানি কি হবে? ওয়ারিশ প্রমাণ করার জন্যে সব মরবে মামলা মোকদ্দমা করবে···

প্রমীলা। তুমিও করবে ত?

বনমালী। কি জন্যে? দাদা হাতে করে যা দিয়ে গেছেন, তার বেশী আমাদের দরকার কি?

প্রমীলা। কেন তুমিও ত একজন···

বনমালী। ও সব কথা ভাবার আমাদের কোন লাভ নেই ছোট বৌ, আজীবনই গেল অভাব-দুঃখে…

প্রমীলা। কিন্তু উইল কে চুরি করেছে জানো?

বনমালী। কে?

প্রমীলা। আমি।

বনমালী। সে কি? অ্যাঁ, সে কি? কি জন্যে করলে তুমি?

প্রমীলা। উইলে তিনি সব দিয়ে গেছেন তাঁর একমাত্র মেয়ে ডলীকে…

বনমালী। একমাত্র মেয়ে ডলী?

প্রমীলা। হ্যাঁ, রেঙ্গুনে থাকে সে—তার মাকে বড় ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ওখানে থাকতে।

বনমালী। ওঃ, তা সে উইল তুমি চুরি করলে কেন?

প্রমীলা। কেন? তা'হলে আমরাই বড় ঠাকুরের সম্পত্তিটা ভাগাভাগি করে নিতে পারব। এরপর ডলী যখন টের পাবে, তখন আর কি করবে আমাদের? তাছাড়া সে এত দূরে আসবে, তারই বা ভরসা কি আছে?

বনমালী। কি করে চুরি করলে তুমি?

প্রমীলা। চাবি কোথায় থাকত আমি জানতাম। একদিন বড়ঠাকুর যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন, সেই ফাঁকে সিন্দুক খুলে আমি বের করে নিলাম উইল।

বনমালী। তারপর?

প্রমীলা। তারপর উনুনে পুড়িয়ে ফেললাম।

বনমালী। ছোটবৌ! যার বাপের সম্পত্তি, তাকে ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব নেব আমরা? ছি ছি! কেন, আমরা ভিক্ষে করে খেতে পারবো না? এ তুমি কি করেছ…অ্যাঁ? এসো, এক্ষুনি এসো তুমি…ওঁদেরকে বলবে এসো যে দাদার মেয়ে আছে—এ সম্পত্তি আমাদের নয়—তুমি উইল দেখছ …ছি ছি!

প্রমীলা। যদি তারপর কিছু হয়?

বনমালী। হবে। দু'জনেই জেলে যাবো—কিন্তু তাই বলে জেনে শুনে একটা মেয়েকে ফাঁকি দোব? দাদার মেয়ে …ছি ছি, এই কি কাজ হল? হ'লামই বা গরীব, আমরা মানুষ ত!

* * * *

তৃতীয় অঙ্ক

[ঐ বাড়ীর তেতলা। তিন ভাই ও হেমাঙ্গিনী যুক্তি পরামর্শ করছেন]

অন্নদা। তা—তা, ছোটবৌমা একটা বুদ্ধির কাজই করেছেন বলতে হবে—উইলখানা যে খতম হয়েছে, এতে আমাদের কাজ অনেকটা সোজা হয়ে গেছে।

হেম। ও কি আর আমাদের জন্যে করেছে মনে কর মেজদা? ও করেছে নিজের জন্যই।

তারিণী। তা ত আর হতে পারে না—আমরা থাকতে সর্ব্বস্ব একা হাত করবে কি করে?

হেম। পারবে না, তবে মৎলবটা ছিল তাই। দেখেছ কি শয়তান মেয়ে মানুষ, পেটে পেটে বুদ্ধি! এদিকে বড়ঠাকুর বলে কেঁদে অজ্ঞান, ওদিকে বড়ঠাকুর ডাঙায় থাকতেই তার কাগজপত্র হাত সাপাই করেছে! যা হ'ক বংশ বটে!

অন্নদা। মরুকগে, তাতে আমাদের যখন সুবিধেই হয়েছে তখন ও কথায় আর কাজ কি? উইল যখন নেই, তখন ও ছুঁড়ীকে ভাগানোর পথে আর ত কোন বাধা নেই। অনায়াসেই বলা যাবে…

তারিণী। কে তুমি বাছা? তোমার মাকে যে আমাদের দাদা বিয়ে করেছিলেন, তার কোন লেখাপড়া আছে? আমরা তাঁর সহোদর ভাই-বোন, কস্মিনকালে আমরা তোমাদের নামগন্ধ জানলাম না, আর আজ তিনি নেই আজ তুমি এসে দাঁড়ালে কিনা তুমি দাদার মেয়ে, তাঁর ধনসম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ। ও সব ধাপ্পাবাজী চলবে না…

অন্নদা। আসলে ও হল হরিবাবুর কারসাজী। ঐ ব্যাটাই ছুঁড়ীকে খাড়া করেছে—হয় ত ওর মাগীটাগী হবে—দাদার মেয়ে সাজিয়ে ওর হাতে দিয়ে সব গাফ করবার চেষ্টায় আছে।

হেম। আমার কিন্তু তাই মনে হয়। মাগীর যেরকম ঢং ঢাং দেখলাম, ও ত গেরস্ত ঘরের মেয়ের মত নয়। কাল যার বাপ মরেছে, তার কখনো ঠোঁটে রং আর চোখে চশমা দেবার সাধ থাকে? আর ছি।

তারিণী। তা তোর সঙ্গে আলাপ-সালাপ কিছু হয়েছে?

হেম। রামো চন্দর! এসে সরাসরি গিয়ে উঠেছে দাদার

ঘরে—ঐ অনামুখো হরিচরণের সঙ্গে কি সব গুজগুজ করে পরামর্শ করেছে, আমাদের কি খুঁজেছে না ডেকেছে?

তারিণী। তাতে আমাদের ভারী বয়ে গেল! তা সে দাদার মেয়েই হন, আর হরিবাবুর রাখনীই হন, বাছাধনকে ফিরতে হবে মুখ কালি করে…এ তোমায় আমি বলে রাখলাম হেম। ও সব রাম চালাকির আমি ধারধারি না।

হেম। ছোট বৌ কিন্তু এরি মধ্যে কি করে জমিয়ে নিয়েছে। দেখি দু'জনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে কি সব সলাপরামর্শ হচ্ছে!

তারিণী। তা আর নেবে না? ওরা হল জাত ভিখিরি…দেখেছে, দাদার সম্পত্তির কড়াক্রান্তিও আর পাওয়া যাবে না, সব চলে যাবে এই ছুঁড়ার হাতে—সঙ্গে সঙ্গে ওকে জপাতে সুরু করে দিয়েছে, যাতে কিছু…

হেম। তা নয় ত কি! আমরা সবাই রয়েছি… এই তোমরা রয়েছ দুই উপযুক্ত কাকা, আমি রয়েছি একটা পিসি, তুই যদি সত্যিকার আপনার লোকই হবি ত তোর কি একটা আক্কেল হল না যে এসে আমাদের একটা করে দণ্ডবৎ করবি। যেমন মানুষ ঠিক তেমনি মানুষই চিনে নিয়েছে! ঝাটা মারি অমন ভাইঝির মুখে!

অন্নদা। এ জন্যে দায়ী ঐ হরে ব্যাটা! নইলে ছোট-বৌ ত ইচ্ছেয় হ'ক অনিচ্ছেয় হ'ক, ভালো কাজই করেছে!

তারিণী। ঐ হরিচরণের নষ্টামি আমি ভালো করে দিচ্ছি, তুমি দেখো না! আর বনা, ছোট-বৌমা কাজ ভালই করেছেন…তোর চেয়ে তাঁর বুদ্ধি আছে। এতদিন ত দাদার কাছে, আখেরের ব্যবস্থা কিছুই করতে পারিসনি—তিনি যাই, উইলখানা…

বনমালী। বল কি সেজদা।' ছোট বৌ ভীষণ অন্যায় করেছে। দাদার মেয়ে…

তারিণী। থাম থাম, বাজে বকিসনে। দাদা কি বিয়ে করেছিলেন, তাই তাঁর মেয়ে!

বনমালী। আহা তোমরা জান না। বর্ম্মায় থাকতে দাদা…ওর খুড়ীমাকে সব কথা বলেছে ডলী…

অন্নদা। কে? ডলী? বেলী, চামেলী, হেলী অনেক নাম শুনেছি বাবা…ডলী, ইস্ ভদ্রলোকের মেয়ের নাম ডলী আর এই হল দাদার মেয়ে! বনা তুই কি ঘাস খাস না কি?

হেম। সত্যি ছোড়দা, বয়স হয়েছে, কিন্তু তোমার কিছু বুদ্ধি হয় নি।৹ দেখতে পাচ্ছো না, ও একটা নষ্ট মেয়েমানুষ …আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে ঐ অলপ্পেয়ে হরিচরণ ওকে দাদার মেয়ে সাজিয়ে এনেছে।

বনমালী। আরে না না। তোর ভাজ যে দাদার উইল দেখেছে…দাদা নিজে হাতে লিখে গেছেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে ও…

অন্নদা। বিয়ে করা পরিবারের কি না তা তুই কি করে জানলি?

বনমালী। সব কথা যে বলেছে ও ছোট বৌকে…বড় ভালো মেয়ে। কত কেঁদেছে! আহা, আপনার জন… কখনো দেখে নি কারুকে!

তারিণী। চুপ কর তুই আহাম্মক কোথাকার। আপনার জন · হেন তেন বলে স্বীকার করলে শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকে পড়বি বলে দিচ্ছি। উইল টুইলের কথা একদম ফাঁস করছি নে কারুর কাছে…

বনমালী। তার মানে? আমি ত ছোট বৌকে নিয়ে গিয়ে হরিবাবুর সঙ্গে মুকাবিলা করিয়ে দিয়েছি, ডলীকেও বলেছি মা…আহা ওরা কত দুঃখ করলে শুনে! অভাবে প'ড়ে বেচারী ভুল ক'রল তা ছাড়া তখন ত ও ডলীকে দেখেনি—অমন সুন্দর মেয়ে সে! হবে না, দাদার মেয়ে।

তারিণী। শুনলে মেজদা, গোরুটার কাণ্ড শুনলে! ওরে গর্দ্দভ, তোকে এই ভালমানুষী করতে বললে কে?

অন্নদা। নীরেট কোথাকার! সব পণ্ড করলি তুই…ছি ছি, এমন বলদ দেখছে কেউ ভূভারতে!

বনমালী। তা বৈকি, যার জিনিষ সে পাবে না, আর আমরা মজা করে তাই ভোগ দখল করবো।

হেম। তবে মরো গে চিরকাল ঘুঁটে কুড়িয়ে। আজীবন বেড়াচ্ছ দরজায় দরজায় হাত পেতে—তাতেও সাধ মেটে নি!

বনমালী। হেম, তুই ত ছোট বোন! গরীব হলেও আমি তোর বড় ভাই—জেনে শুনে একটা অন্যায় হতে দিইনি বলে তুই আমায় যা খুশী তাই বলছিস্!

হেম। বলছি সাধে! নিজের হাতে তুমি আপন পায়ে কুড়ুল মারলে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সর্ব্বনাশ করলে! হায়

হায় আমার মাথা ফাটিয়ে মরতে ইচ্ছে করে…মুখের গরস মুখ থেকে পড়ে নষ্ট হল…

তারিণী। তুই ভয় পাসনে হেমা, আমি থাকতে কার সাধ্যি দাদার সম্পত্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করে। ওসব হরিচরণের বুজরুকি আর এদের ন্যাকামিতে আমি ভুলছি না…

অন্নদা। বটেই ত!

[হরিচরণ ও ডলীর প্রবেশ]

হরিচরণ। এই হল আপনাদের দাদার মেয়ে…আলাপ করো মা তোমার মেজকাকা আর সেজ কা…ওঁকে ত আগেই দেখেছ, আর উনি তোমাদের পিসিমা।

[প্রস্থান]

তারিণী। তা হ্যাঁ, তুমি কে বাছা? আমাদের দাদা ত ছিলেন চিরকুমার…

অন্নদা। তা—তা তোমাকে আমরা কি করে তাঁর মেয়ে বলে…

হেম। তোমার চেহারা চাল-চলন কিছুই ত এ বংশের মতো নয় মা!

তারিণী। মানে দেখা নেই শুনো নেই চেনা নেই পরিচয় নেই, হুট করে এসে দাঁড়ালেই ত আর মেয়ে বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না…

অন্নদা। কথাটা হচ্ছে গিয়ে একটা সমাজ বলে জিনিষ আছে ত!

হেম। তা আবার নয়। হিন্দুর ঘরের কথা…

বনমালী। আঃ ও বে…

তারিণী। থাম বনমালী…

অন্নদা। তুই ত ভারী বুঝিস দুনিয়ার ব্যাপার স্যাপার।

ডলী। আপনারা বৃথা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি ত আপনাদের দাদার সম্পত্তি দখল করতে আসি নি…

তারিণী। তবে?

ডলী। আমি এসেছি বাবার শ্রাদ্ধ করতে, তাঁর ছেলে বলতেও আমি, মেয়ে বলতেও আমি, ওটা আমাকেই করতে হবে…তারপর আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাব। সবই আপনাদের থাকবে, আমি কিছু নিয়ে যাব না…

অন্নদা। আহা তুমি ছেলেমানুষ, বোঝ না। সম্পত্তির কথা হচ্ছে না…দাদার সম্পত্তি যে পায় সে পাক, তা নিয়ে কিছু নয়—কিন্তু তুমি যে দাদার মেয়ে সেটা ত আমাদের জানতে হবে, নইলে কি করে তাঁর অন্তিম ক্রিয়া আমরা তোমাকে করতে দিই…একটা ধর্ম্ম বলে ত জিনিষ আছে।

ডলী। তার প্রমাণ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। বাবা-মার বিবাহ রেজিষ্ট্রেরী দলিল আমার কাছেই আছে। কিন্তু তাতে দরকার নেই কিছু। আমি সবই শুনেছি খুড়ীমার কাছে—বাবা এখানে কি ভাবে ছিলেন, কি হয়ে মারা গেলেন কে তাঁকে দেখাশুনো করেছিলেন সবই। তারপর তিনি মরার পর কি হল তাও সবই শুনেছি…তা এজন্যে আপনারা কেন এত কষ্ট করতে গেলেন, আপনাদের প্রাপ্য আপনারা নেবেন—এতে আর হাঙ্গাম কি?

তারিণী। তুমি যদি দাদার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত মেয়েই হও ত সবই তোমার...প্রমাণ দেখাও। দেখিয়ে নিয়ে নাও এ ত সাফ কথা!

ডলী। দেখুন, ধর্ম্মপত্নীর সন্তানই আমি, সম্পত্তিও আমারই কিন্তু তবু আমি নেব না, তার কারণ আমার মারই নিষেধ আছে।

তারিণী। কিজন্যে?

ডলী। তাঁর সঙ্গে বাবা ভাল ব্যবহার করেন নি। তাঁকে বিয়ে করবার পরই তিনি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে ছিলেন এবং তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন। শেষকালে আমাকে আর মাকে ফেলে রেখেই তিনি চলে এসেছিলেন। বাবাকে বিয়ে করবার দরুণ মার আত্মীয়স্বজন সবাই পর হয়ে গেলেন, দিন চলে না আমাদের, অনেক দুঃখ করে আমায় তিনি মানুষ করেন। তারপর আমি যখন মাষ্টারীতে ঢুকলাম মা তখন মারা গেলেন—মৃত্যুকালে তিনি আমায় বলে গেছেন, আমি যেন বাবার মেয়ের কাজ করি, কিন্তু তাঁর এক কাণা কড়িও যেন গ্রহণ না করি!

অন্নদা। হুঁ।

তারিণী। তা তোমার যখন মাতৃআজ্ঞা কি আর করবে?

হেম। তা ছাড়া ধর্ম্মের দিক থেকেও তোমার উচিত নয় কিছু নেয়া। ওরকম বিয়ে ত বিয়ে নয় তোমরা কি না কি জাত, আমরা হলুম বামুন।

ডলী। আজ্ঞে আমি ত বলেছিই, আমি কিছু নেব না, আমি মাসে মাসে যা পাই তাতেই আমার বেশ চলে যায়। আমি হরিবাবুকে বলেছি, আপনাদের সকলের ভেতর সবই সমান করে…

বনমালী। পাগল! দাদা নেই, তাঁর সম্পত্তি আমরা নোব! আমরা কি এতই…ও তোমার জিনিষ…

অন্নদা। বনা!

তারিণী। আদৎ গাধা!

বনমালী। ঘরের মেয়ে, দাদার মেয়ে এও কি একটা কথা হ'ল! চল মা, চল তুমি…হ্যাঁ! [উভয়ের প্রস্থান]

হেম। হাজার হলেও ভগবান আছেন ত!

অন্নদা। মেয়েটা মন্দ নয় দেখছি!

হেম। মন্দ নয়? দায়ে পড়ে বেটী সাধুপুরুষ সাজছে, বুঝতে পারছে ত যে দাবী প্রমাণ করতে পারবে না।

তারিণী। তা ছাড়া কি! যাকগে, হকের ধন, তাই মারা গেল না, তাই!

অন্নদা। সবই ভগবানের হাত!

দুর্গা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্নপূর্ণা মা আমার অন্নরিক্তা কেন হ'লে, কেন নৃত্য ভিখারীর বুকে ?
ডাকিনী প্রেতিনী লয়ে একী রঙ্গ মহামায়া, মুক্তকেশী উন্মাদ কৌতুকে ?
অগ্নিময় জটাভারে আবরিয়া বিশ্বাকাশ
ক্রুর অট্ট অট্ট হাস্যে জাগাতেছ একী ত্রাস
খসি পড়ে উল্কাপিণ্ড বিদ্যুৎ-জিহ্বায় দেবী কার রক্ত করিছ লেহন ?
চিৎকারিছে যেরুপাল হে বিরাট সিংহীরূপা জ্বলে শিশু নখরে দহন।

কাম পিশাচের রক্তে পঙ্কিল শ্মশান-ভূমি গর্জ্জে মৃত্যু ঘোর অন্ধকারে
জ্বলে চিতা ধূমাবতী লেলিহ লোলুপ বহ্নি সর্ব্বধ্বংসী ভয়াল হুঙ্কারে।
কালকায়া হে করালি লুকাইয়া মাতৃরূপ
রাক্ষসীর মত কেন ভীমদন্তে মৃত্যু-যূপ,
নিঃশ্বাসে তুলিয়া ঝঞ্ঝা হাহা-শব্দে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী একী অভিযান ?
হে মহাডামরী মূর্ত্তি ডম্বরু নিনাদে কাঁপে ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান।

দাম্ভিক দৈত্যের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি দেবী, জয়ঘণ্টা বাজায়ে চণ্ডিকা
রক্তবৃষ্টি করিতেছ শৃগাল কুকুর কাঁদে আর্ত্তনাদে একী প্রহেলিকা!
শুম্ভ-নিশুম্ভেরে বধি পান করি রক্তবীজ
মহিষ মর্দ্দিনীরূপে মূর্চ্ছা যায় মনসিজ
গ্রাসিবে কি মহাকালী অসীম বিশ্বের সত্তা, উদরস্থ করি দেশ কাল ?
'স্নেহ দয়া মায়া' শূন্য তাই কি আকাশে ওড়ে রক্তবর্ণ রুক্ষ জটাজাল।

সিংহীরূপা হে রুদ্রাণি কোটি কৃষ্ণ হীরকের দ্যুতি জ্বলে কাল অঙ্গে তব
উন্মত্ত চরণতলে শিবাত্মা হিরণ্যগর্ভ নির্ব্বিকার একী অভিনব!
অধর্ম্মারণ্যের বুকে জ্বলে ধূ ধূ দাবানল
পশুর বিভৎস স্বরে উঠে তীব্র কোলাহল
দনুজ দলনী তব শাণিত নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন জড়ত্ব জঞ্জাল,
খল খল ব্যঙ্গহাসি হাসিছে প্রেতাত্মাদল ছায়ামূর্ত্তি কুৎসিত কঙ্কাল।

বুঝিছে মা অন্নরিক্তা স্বহস্ত সৃজিত সৃষ্টি কেন কর স্বহস্তে সংহার
আপনার মুণ্ড কাটি' কেন হও ছিন্নমস্তা বুঝেছি মা বুঝেছি এবার।
যখনি তোমার সৃষ্টি স্পর্দ্ধায় তুলিয়া শির
ভুলে যায় ধ্বংস-স্মৃতি কোটি গত শতাব্দীর
তখনি মা অন্নপূর্ণা স্নেহশূন্যা মূর্ত্তিধরি চূর্ণকর মর্ত্ত্য অহংকার
তাই কি আবার এলে সিংহীরূপে হে রুদ্রাণি, প্রেতভূমে ছাড়িয়া হুঙ্কার ?

ঘোর রাত্রি অমাবস্যা তোমার আশ্রয় লাগি মর্ত্ত্যশিশু জ্বালায় দীপালী
তুমি কি আশ্রয় দেবে পাগলিনী মা আমার, আশ্রয় কি দেবে মহাকালী
হ্রীং মন্ত্র উচ্চারিয়া ডাকে চিত্ত-কাপালিক,
তামসিক শর্ব্বরীতে ভয়ত্রাস্ত চারিদিক
হে জীবপালিনী দুর্গে ভীতি-দুর্গ বিঘাতিনী হে সর্ব্বাণি লহ নমস্কার,
হে ব্রহ্মের দৈবীমায়া, প্রসন্ন দক্ষিণকরে লুপ্ত করো মৃত্যু অন্ধকার!

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমতের কথা বলিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বের ও তাঁহার সময়ের শিক্ষিত-সমাজের বিবিধ ধর্ম্মমতের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হয়। বঙ্কিমের পূর্ব্বে কুসংস্কারে কলঙ্কিত, লোকাচারে দেশাচারে কলুষিত, গতানুগতিক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম মুহুর্মুহু আঘাত লাভ করিতেছিল। বর্ত্তমান যুগে উহা প্রথম আঘাত লাভ করিয়াছিল রামমোহনের হাতে। এই আঘাত ভিতর হইতে। বাহির হইতে খৃষ্টান মিশনারীরা নানাভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। রামমোহন বাঙ্গালীকে শুনাইয়া দিলেন—"প্রতিমা পূজা পাপ, দেবদেবীরা অলীক কল্পনা মাত্র—এক ব্রহ্ম আছেন, তিনিই সব। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানবজীবনের চরম চরিতার্থতা এবং বেদান্তই ধর্ম্মশাস্ত্র।"

দেশের সাধারণ লোক তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝিল না—তবে অনেক শিক্ষিত লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইল।

ওদিকে মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সশঙ্ক হইয়া উঠিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সাহায্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মনোযোগ দিলেন। তাহার সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

অন্যদিক হইতে অর্থাৎ ইউরোপ হইতে দুইটি বিরাট অভিযান হইল। একটি অভিযান খৃষ্টান মিশনারীদের। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে বর্ব্বরের ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহাদের কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আর একটি অভিযান সংস্কৃতিগত (cultural). সেকালের হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্রগণ তাঁহাদের গুরুগণের নিকট যে শিক্ষা পাইলেন—তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নয়—তাহা সকল ধর্ম্মেরই বিরোধী। ফলে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হইলেন নাস্তিক, কেহ কেহ জড়বাদী, কেহ কেহ সংশয়বাদী (sceptic) কেহ কেহ অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। তাঁহাদের অনেকেরই ধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ থাকিল না। ইঁহারা শুধু হিন্দুর ধর্ম্মের নয়—হিন্দুর সাধারণ জীবনযাত্রারও বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

এহেন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকগণও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা বিবিধ মতের সমন্বয় সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে জ্ঞান ভক্তি ধর্ম্মের—সত্য-শিব-সুন্দরের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব হিন্দুধর্ম্মের বিবিধ শাখার মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন—বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত প্রতিমা পূজার সমন্বয় করিয়া তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে ব্রহ্মময়ী বলিয়া পূজা করিতেন। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় দেখিলেন—পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আগত বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধিই হিন্দুধর্ম্মের পরম অরাতি। তখন তিনি হিন্দুর প্রত্যেক খুটিনাটি আচার আচরণের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবারে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের কেন্দ্রস্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে দেবদেবীর নিত্যসেবা, বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ, সাধুসন্ন্যাসী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগম হইত। এদিকে তিনি সেকালের বিলাতি শিক্ষার চরম যাহা তাহাই বরণ করিলেন—ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গ্রন্থাদি পাঠ করিলেন এবং সাহেবদের অধীনে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মনে যৌবনকাল হইতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। তিনি মাইকেলের মত সাহেব হইয়া অথবা ভূদেবের মত আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ হইয়া জীবন কাটাইতে পারিলেন না। প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানিবার জন্য—কেবল জানিবার জন্য নয়—সমগ্র দেশবাসীকে প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সমগ্র দেশবাসীকে প্রকৃত ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় তাঁহার অধিকার কি, একথা সেকালে অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সাহেবিভাবাপন্ন একজন হাকিমের এ সাধ কেন?

ইহার উত্তর এই ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কথা,—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা সত্যোপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা। এ উৎকণ্ঠা বহু মহামহোপাধ্যায়ের এমন কি বহু সাধু সন্ন্যাসীর মনেও না জাগিতে পারে, আবার সেরেস্তাদার রামমোহন, অশিক্ষিত পূজারী রামকৃষ্ণ, হাকিম বঙ্কিমের মনেও জাগিতে পারে।

সত্যের জন্য এই দারুণ পিপাসা লইয়াই বঙ্কিম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশী সমাজের শিক্ষা ও স্বদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব সেই পিপাসাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

বঙ্কিম ছিলেন কর্ম্মজগতে একজন হাকিম--কিন্তু ভাব-জগতে তিনি শিল্পী, রসিক, কবি। তাঁহার প্রাণের সাধনা ছিল সাহিত্য সৃষ্টি। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা ছিল এমনই দুর্দ্দম যে তিনি অনেক সময়ই ভুলিয়া যাইতেন যে তিনি সাহিত্যিক—তাই তাঁহার রচিত সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই অবিমিশ্র সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই ধর্ম্মের আদর্শ অনেক সময় মনুষ্যত্বের আদর্শের রূপ ধরিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসের আদর্শকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নির্ম্মল রসানন্দ বিতরণের জন্য, তাঁহার ক্রমেই মনে হইল "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" তাহার ফলে তিনি যাহা দেশবাসীকে দিলেন তাহা জ্ঞানমিশ্র রস—তাঁহার হাতে তত্ত্ব হইল রসস্নিগ্ধ আর রস হইল তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

তিনি হয় ত দেশের কালপাত্র বিচার করিয়া ভাবিয়াছিলেন সাহিত্য অপেক্ষা করিতে পারে—ধর্ম্ম অপেক্ষা করিতে পারে না। অথবা ভাবিয়াছিলেন—সত্যধর্ম্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী একটা উচ্চতর ভাবাদর্শ লাভ না করিলে সাহিত্যের ব্রহ্মস্বাদ সহোদর রস সে পরিপাক করিতে পারিবে না।

এমন কথাও মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-চিন্তাই দেশকে শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাহা সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—তারপর যুক্তিমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের সাহায্যে তাহাই প্রচার করিয়াছেন; শেষে আদর্শ মানব-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ লোক-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসায় অধীর, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত ধর্ম্ম মতকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া নিজের আশ্রয়টিকে খুঁজিয়াছে। বঙ্কিমের চিত্ত যদি গতানুগতিক হইত তাহা হইলে নির্বিবাদে পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া ভূদেববাবুর মত জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন—যদি তাঁহার চিত্ত প্রগতিশীল ও একান্ত সত্যনিষ্ঠ না হইত তাহা হইলে তিনি তৎকাল প্রচলিত কোন একটি দলে ভিড়িয়া স্বস্তিতে কাল কাটাইয়া দিতে পারিতেন। স্বস্তি, তুষ্টি ও শান্তিপ্রিয়তা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। বিশ্রাম ও বিরতি তাঁহার জীবনে ছিল না, সমস্ত জীবনটাই তাঁহার ছিল সত্যের উদ্দেশে যাত্রা—কেবলই আগাইয়া চলা। "এহো বাহ্য আগে কহ আর" ইহাই ছিল তাঁহার জীবনমন্ত্র।

সেজন্য তাঁহার জীবন ধর্ম্মজগতের বহু পথই অতিক্রম করিয়াছে, ধর্ম্মাদর্শের বহু স্তর তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। একটি সমগ্র জাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মবোধের যতগুলি সোপান অতিক্রম করে তাঁহার নিজের জীবনেই তিনি ততগুলি স্তর অতিক্রম করিয়াছেন।

এক সময়ে তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, এক সময়ে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এক সময়ে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে সাধু সন্ন্যাসীদের ভক্ত ছিলেন, এক সময়ে তিনি বেনথামের হিতবাদকেই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়াছেন, এক সময় তিনি রুশো ভল্টেয়ারের সাম্যবাদকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করিয়াছিলেন কোঁতের মানব-ধর্ম্ম এক সময় তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, সালির অনুশীলন-তত্ত্ব তাঁহাকে কম প্রভাবিত করে নাই। সমস্ত মতবাদই তাঁহার জীবনে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনটাই তাঁহার জীবনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে পারে নাই।

তাঁহার চিত্ত চাহিয়াছিল সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়—নিজের বুদ্ধিকে তিনি কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারেন নাই, কোন প্রকার অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন উপাস্যের মধ্যে সত্যশিবসুন্দরের মিলন—উপাসনার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য।

রামমোহনের ধর্ম্মমতে তিনি ভক্তি খুঁজিয়া পান নাই—নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও শূন্যবাদে কোন প্রভেদ আছে তাহা তিনি মনে করিতেন না। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতে তিনি মানবিকতার

অভাব দেখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমতে কর্ম্মের স্থান সংকীর্ণ, তাহা তাঁহার রুচিকর হয় নাই। পরমহংসদেবের ভক্তি-সাধনাকে তিনি অতিরিক্ত আবেগাত্মক মনে করিতেন। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকে তিনি নিতান্ত ছেলেমানুষি মনে করিতেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যে আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ তাহা ও তিনি গোড়াতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থলে আমাদের দেশাচার, লোকাচার ও কুসংস্কারগুলির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে।

যে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি তিনি দেশীয় ধর্ম্মমতগুলিতে প্রয়োগ করিয়াছেন—সমভাবে তাহা বিদেশী মতগুলিতেও প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশীয় মতগুলিতে তিনি প্রধানতঃ মানবতার অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—বিদেশীয় মতগুলিতে তিনি মানবতার অভাব দেখেন নাই বটে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরহিতব্রতকে তিনি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করিতেন সত্য—কিন্তু সেই ব্রতের মূলে ভগবদ্ভক্তির অভাব থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণ, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে পরোপকার সাধনের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে—একটি করিয়া পরহিত ব্রতীর সাধু চরিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে—কিন্তু এই হিতব্রতী সাধুসন্ন্যাসী প্রকৃতই জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ ও শ্রীভগবানে নিবেদিত জীবন। এই আদর্শ তিনি বিলাতী গ্রন্থে পান নাই। হিতের পরিমাণ সম্বন্ধে বিলাতী মনীষীদের গ্রন্থে যথেষ্ট বিচার আছে (The greatest food of the greatest member), কিন্তু হিতসাধনের ধ্রুব প্রেরণা হিসাবে ভগবদ্ভক্তির কথা নাই।

বিদেশী সাম্যবাদে মানুষের অধিকার তত্ত্ব লইয়া অনেক বিচার আছে—কিন্তু শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান অতএব মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই—এই যুক্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নয়। সেজন্য ইহা শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের রুচিকর হয় নাই। মানবসেবাকেই ভগবানের উপাসনা বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ভক্তির স্থান কই? তাহা ছাড়া এই মতবাদে মানুষের কি করিতে হইবে তাহার অনুশাসন আছে—কিন্তু মানুষকে কি হইতে হইবে সে আদর্শ কই?

ইউরোপীয় মতবাদের মধ্যে একমাত্র সীলির অনুশীলন বাদকে তিনি কতকটা স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্ব আর সীলির অনুশীলন তত্ত্ব অবশ্য এক নয়। সীলি শিক্ষা সংসদের মধ্য দিয়া যে কালচার তাহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। বঙ্কিমের অনুশীলনবাদের আদর্শ উচ্চতর ও ব্যাপকতর। দেবীচৌধুরাণীর সাধনার মধ্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বেদকে বঙ্কিম রূপক কাব্য বলিয়াই মনে করিতেন। বঙ্কিম বৈদিক দেবদেবীর সেই মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

প্রাকৃতিক জগতের বৈচিত্র্যই বেদে রূপকায়িত বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

বেদান্তের মায়াবাদ বা সোহহং বাদ বঙ্কিমের মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই। উহাতে জ্ঞানেরই প্রাবল্য—ভক্তির স্থান নাই বলিলেই হয়। উপনিষদে তিনি মানবতার ও কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যায় তিনি ভক্তির গাঢ়তা পান নাই।

পুরাণকে তিনি 'ধর্ম্মমোহের ফল' বলিয়াছেন। পুরাণে দেবতারাই হইয়াছেন প্রবল, মানুষ সেখানে দেবলীলার ক্রীড়ার পুত্তলিমাত্র। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনিবার্য্য পরিণতিই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম। আর পৌরাণিক সাহিত্যের ছায়াই প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য। পুরাণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না।

শাক্য সিংহের ধর্ম্মে ভগবানের স্থান নাই। তাহা ছাড়া শাক্যসিংহ গৃহী হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। যিশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধার্ম্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। ভক্তিহীন বৌদ্ধধর্ম্মে মানবহৃদয় উপেক্ষিত নয়। তবু ইহা তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই।

যে সন্ন্যাসধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মে সার্থক হয় নাই সে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাই তাঁহার রচনায় আদর্শ সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন—প্রকৃত সন্ন্যাস কর্ম্মত্যাগে নয়—নিষ্কাম কর্ম্মে, জীবের কল্যাণ সাধনে। মানব জাতির কল্যাণ সাধনই সন্ন্যাসীর পরমধর্ম্ম।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ব্রজলীলার সংযোগ বঙ্কিমের রুচিকর হয় নাই। রাধার হৃদয়চোর বৃন্দাবনের মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণকে তিনি উপাস্য মনে করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ মানুষও নন, ভগবানও নন—কাব্যের নায়ক ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। বৈষ্ণব কবিতা তিনি ভালবাসিতেন

কাব্য-রসের জন্য—ধর্ম্ম-সাহিত্য বলিয়া নয়। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র প্রেমের ধর্ম্মকে তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ মনে করিতেন না।

জীব বলি দিয়া যে শক্তির পূজা দেশে প্রচলিত আছে, সে শাক্ত ধর্ম্মও বঙ্কিমের কাছে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় নাই। শক্তির পূজা শক্তিমানের পূজা। অশক্তের শক্তি পূজায় অধিকার নাই। জীবের কল্যাণের জন্য শক্তির প্রয়োগকেই তিনি শক্তিপূজা মনে করিতেন, ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—এই প্রার্থনায় নয়। 'দিষো জহি' এ প্রার্থনায় নয়—দ্বিষো জয়েই তাঁহার পূজা।

এই ভাবে একেএকে ত সবই গেল? থাকিল কি?

থাকিল—ঈশ্বর স্বয়ং এবং মানব। এবং শাস্ত্রের মধ্যে থাকিল গীতা।

বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন—ঈশ্বরতা ও মানবতার মিলন—একাধারে ঈশ্বর ও মানব। সমস্ত মানব জাতির মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান আছেন—এই তথ্যে তিনি তুষ্ট হ'ন নাই। এমন একটি মনুষ্য তিনি চাহিয়াছিলেন যাঁহার মধ্যে শ্রীভগবানের পূর্ণাভিব্যক্তি হইয়াছে।

কেবল শাস্ত্রের বিধিপালন বা মহাপুরুষদের অথবা অন্তর্যামীর নির্দ্দেশ পালনকেই তিনি ধর্ম্ম মনে করেন নাই—করা অপেক্ষা হওয়ার মধ্যেই ধর্ম্মের গভীরতর সত্য নিহিত ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য। এই হওয়া কাহার মত হওয়া? অনন্ত ব্রহ্মের মত হওয়া যায় না—মানুষকে সমস্ত মানুষের মতই হইতে হইবে। এমন মানুষের মত হইতে হইবে—যাঁহার মধ্যে ভগবান পূর্ণাভিব্যক্ত। মানুষের জন্য তাই চাই পূর্ণাদর্শ।

মানুষ স্বভাবতঃ যে বৃত্তিগুলি পাইয়াছে, যে বৃত্তিগুলির সমন্বয়েই তাহার বুদ্ধি, মন ও চৈতন্য, সেই বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও ক্রমাভিব্যক্তি সাধনেই তাহার মনুষ্যত্বের চরিতার্থতা। সাধারণ মহাপুরুষদের এক একজনের মধ্যে এক একটি বৃত্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, অপরাপর বৃত্তিগুলির পূর্ণ প্রবোধন হয় নাই।

তিনিই মানুষের পূর্ণাদর্শ, যাঁহার মধ্যে প্রত্যেক বৃত্তিরই সমভাবে পূর্ণাভিব্যক্তি সাধিত হইয়াছে। এই বৃত্তিগুলিকে তিনটি প্রধান বৃত্তিতে পরিণত করা যায়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানবৃত্তি, অনুভূতি বৃত্তি, কর্ম্ম বা ইচ্ছা বৃত্তির অনুগত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম তিনটি সেই প্রধান বৃত্তি। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—যে মহাপুরুষের মধ্যে সুসমঞ্জস ও সর্ব্বাঙ্গীণ চরমোৎকর্ষ লাভ ক'রয়াছে—তিনিই মানুষের পূর্ণাদর্শ—তিনিই ভগবানের অবতার। জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। বহু যুক্তির দ্বারা ইহা তিনি প্রমাণও করিয়াছেন।

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

গীতার এই বাণীতে তিনি বিশ্বাস করিতেন।

বঙ্কিম তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন—জগতের কোন ধর্ম্ম প্রেমাত্মক, কোন ধর্ম্ম কর্ম্মাত্মক, কোন ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক। এই জন্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ—সকল ধর্ম্মই অসম্পূর্ণ। মানুষের চিত্তের যাহা চিরন্তন উপাদান চিত্তের ধর্ম্মেরও তাহাই উপাদান। সেই হিসাবে ধর্ম্মের উপাদান তিনটি—কোনটিকে বাদ দিলেই ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। এই তিনেরই সামঞ্জস্য-ময় মিলন হইয়াছে যাঁহার মুখের বাণীতে ও জীবনে—তিনিই পূর্ণাদর্শ—তাঁহার অনুবর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

নিখিল-শাস্ত্র-পুরাণাদি খুঁজিয়া বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে এই পূর্ণাদর্শ পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবান্—ইহা কে না জানে? বঙ্কিমের ইহাকে আবিষ্কার বলিয়া মনে করিবার কারণ কি আছে? কারণ অবশ্যই আছে। বলিলে আমরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকেই বুঝি—তিনিই এ দেশের উপাস্য। তিনিই ব্রজলীলা ছাড়িয়া মাথুর-লীলা করিয়াছেন, তারপর দ্বারকা-লীলা করিয়াছেন—ইহাই আমরা বুঝি। তিনি স্বয়ং ভগবান্—তিনি উপাস্য কিন্তু তিনি মানুষ এবং মানুষের আদর্শ—এ ভাবে আমরা ভাবি নাই।

বঙ্কিম ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পরিকল্পিত আদর্শ হইতে বাদ দিয়াছেন। কারণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিশাসিত মনে মিলন ঘটানো যায় না। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকেই বঙ্কিম পুরুষোত্তম মনে করিয়াছেন এবং ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাদর্শত্বের পরিপন্থী উপাখ্যানাদিকে

তিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে রচিত কোন কোন উপাখ্যানের তিনি নূতন করিয়া তাঁহার মতবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলিকে হয় বর্জ্জন করিয়াছেন অবিশ্বাস্য বলিয়া—নয় ত তাহার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—তাঁহার জীবনেই জ্ঞান, প্রেম কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের অবতার সে ধারণা তিনি শাস্ত্র বা লোকমত হইতে গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, জগতের কোন মহাপুরুষে মানবতার এমন সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাভিব্যক্তি ঘটে নাই—"তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে ও অপরিমেয় বলে পরিণত। তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য ও জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্ব-লোকের সর্ব্বহিতে রত। বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।" বঙ্কিম তাই বলিয়াছেন, জগতের সকল মহাপুরুষের সমস্ত গুণ একত্র মিলিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে। সকল ধর্ম্মপ্রচারক একাধারে শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান। এইরূপ যুক্তির পথ দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীভগবানের অবতার ছাড়া মনুষ্যে এত মহিমা, এত সদ্‌গুণ, এইরূপ পরিপূর্ণ আদর্শের চরিতার্থতা দৃষ্ট হয় না।

যদি শ্রীভগবানকে উপাসনা করিতে হয় তবে কাঠ-পাথরের মধ্যে তাঁহার উপাসনা কেন?—জড়ের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধানের কি সার্থকতা? তাঁহার আংশিক অভিব্যক্তি যে মানুষের জীবনে, সেই মানুষের জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যেই তাঁহার উপাসনা করাই উচিত। সেই মানুষের মধ্যে আবার যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার মধ্যেই তিনি পূর্ণভাবে অভি-ব্যক্ত। তাঁহারই উপাসনা প্রকৃত উপাসনা। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণ।

কাঠ-পাথরের অনুসরণ করা যায় না, সাধারণ মানুষেরও অনুসরণ বাঞ্ছনীয় নয়, অসাধারণ মানুষকেই অনুসরণ করিতে হয়—অসাধারণ মানুষের চরিত্রকেই আদর্শ ধরিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই অনন্যসাধারণ মানুষই মানুষের আদর্শ, অনুকরণীয় ও উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ এই অনন্যসাধারণ মানুষ—এবং সে জন্য ভগবানও তিনি।

এই ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নূতনরূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অনেকটা এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব-কল্পনার সৃষ্টি। সাহিত্যে এই আবিষ্কার অনেকটা অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা আবিষ্কার। বঙ্কিমের এই শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। কিন্তু এই উপাসনা পূজা হোম ভোগ আরতি বা সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা উপাসনা নয়। এই উপাসনা কি তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উপাসনাও জ্ঞান, প্রেম; কর্ম্মের সমন্বয়ের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট।

জীবের সহিত ভগবানের সম্পর্ক বুঝাই জ্ঞানপথে তাঁহার উপাসনা। জীবের কল্যাণের জন্য নিস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—ঐ কল্যাণের দ্বারাই নিরূপিত হইবে কোন্ কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম অপকর্ম্ম। যে কর্ম্মই হউক তাহার ফল তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। শুধু কর্ম্মফল কেন সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ—ইহাই ভক্তিপথের উপাসনা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে আপনার জীবন গঠন—আপনার ত্রিবিধ মনোবৃত্তির সুসমঞ্জস সর্ব্বাঙ্গীণ উন্মেষ সাধনের জন্য অনুশীলন। এই অনুশীলন বা সাধন ছাড়া উপাসনায় অধিকার জন্মে না—নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন বা শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ সম্ভব নয়। এই অনুশীলনকেই বঙ্কিম প্রধান ধর্ম্ম মনে করেন। ইহারই আভাস দিয়াছেন তিনি দেবীচৌধুরাণীর সাধনায়—এবং কতকটা আনন্দমঠের সন্তানদের সাধনায়।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখের বাণী বলিয়া এবং তাঁহার মতবাদের সুসঙ্গত পরিপোষক বলিয়া গীতাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গীতার চিরপ্রচলিত পণ্ডিতী ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি নূতন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। বঙ্কিমের ব্যাখ্যাই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে—দেশের শিক্ষিত সমাজ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দেশে গীতার প্রচলন তেমন ছিল না—বঙ্কিমই গীতা-প্রচারের গুরু। বঙ্কিম শুধু গীতার ব্যাখ্যা

করেন নাই—আনন্দ মঠ ও দেবীচৌধুরাণী এই দুইখানি উপন্যাসে গীতার বাণীকে উদাহৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে গীতার বাণীর প্রয়োগ ঐ বই দুইখানি হইতেই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে গীতা কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—কি ভাবে গীতা বাঙ্গালী জাতির একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখিয়া যান নাই। তবে তিনি যখন ঐ বাণীর প্রচার করিয়া যান এবং যখন গীতার মর্ম্মানুসারে আদর্শ চরিত্র অঙ্কন করিয়া যান—তখন তিনি বেশ বুঝিতেন—ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের সহিত গীতার বাণী প্রচার করিয়াই বঙ্কিম এ দেশে ঋষিপদবাচ্য হইয়াছেন।

বঙ্কিম যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন—দেশের শাক্ত ধর্ম্মেরও তেমনি একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্ম জ্ঞান গম্য হইতে পারে, মানুষের উপাস্য হইতে পারে না—তাই তাঁহার মতে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তিগম্য ও উপাস্য হইয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ভগবতী ও ভক্তির দ্বারা আত্মীয় করিয়া তুলিতে পারা যায় বলিয়া বঙ্কিমের মনে হয় নাই। প্রচলিত শাক্ত ধর্ম্মের ভক্তিকে তিনি ভক্তি না বলিয়া সভয় কিংবা সকাম উপাসনার অঙ্গমাত্র মনে করিতেন। যেখানে তাহা নয়, সেখানে তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদ বলিয়াই মনে হইয়াছে। এজন্য তিনি পরমহংসদেবের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে ভক্তির মূলে বিচার বোধ নাই—তাহাকে তাঁহার প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি তাই মহাশক্তির একটি অন্তরঙ্গ রূপ কল্পনা করিয়া বাঙ্গালীর শক্তি উপাসনায় বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগন্মাতা বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে আহ্বান করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই এ আহ্বানে সমগ্র বিশ্ব-মানবকে ভ্রাতৃ স্থানীয় মনে করিতে হয়। বঙ্কিম বুঝিতেন, নিজের জাতির লোকগুলিকে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে ভাই মনে করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাই তিনি জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীকে দেশমাতা রূপে কল্পনা করিয়াছেন। দেশমাতাই দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গা। দেশমাতার সেবাই জগন্মাতার উপাসনা। ইহাই তাঁহার নূতন শাক্তধর্ম্ম।

দেশমাতার সেবার অর্থ দেশবাসীর কল্যাণসাধন, পরহিত ব্রত। অতএব ইহারও মূলে রহিয়াছে মানবের কল্যাণসাধন। দেশরূপা শক্তির পূজা করিতে হইলে শক্তিমান হইতে হইবে। শক্তির দ্বারাই শক্তির পূজা। এখানে শক্তি ও ভক্তি পৃথক বস্তু নয়। উপাসনায় যেমন ধূপদীপ পুষ্প চন্দনাদি উপচার আহরণ করিতে হয়, তেমনি শক্তি আহরণ করিতে হইবে। এতদিন আমরা মহাশক্তির কাছে দেহি দেহি করিয়া সমস্তই প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি। এই উপাসনায় দেহি দেহি নাই। সাধনার বলে শক্তি আহরণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। অতএব ইহারও মূলে অনুশীলন—পুরুষকার, সাধনা,ত্যাগ, তিতিক্ষা,সংযম, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদি। আমাদের শরীর ও মানস বৃত্তিগুলির যথাযোগ্য সুসমঞ্জস সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই আমরা শক্তিমান ও শক্তি পূজার অধিকারী হইতে পারিব। এই অনুশীলনের আভাস দানের জন্যই ও জগন্মাতাকে দেশমাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্কিম আনন্দ মঠ রচনা করিয়াছিলেন।

দেশসেবার প্রধান উপকরণ সংহতি। এই সংহতির একটি সূত্র চাই—একটি মিলন-কেন্দ্র চাই। অন্য দেশে যাহাই হউক এদেশে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া মিলন-সূত্র বা মিলন-কেন্দ্র সন্ধান করা বৃথা। এই নবীন শাক্ত ধর্ম্মই হইল যে মিলন সূত্র। দেশরূপা শক্তির পূজা-বেদিকাই হইল মিলন-কেন্দ্র। বঙ্কিম প্রধানতঃ ইহলোকের মোক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ব্রহ্মময়ী মোক্ষদার দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমের এই ধর্ম্ম যুগোপযোগীই হইয়াছে। বঙ্কিমের সময়ে পাশ্চাত্ত্য শাসন ও শিক্ষা-দীক্ষার আঘাতে ও আক্রমণে বাঙ্গালীর মনে দেশপ্রীতির ধীরে ধীরে সঞ্চার হইতেছিল, কিন্তু তাহা কোন আশ্রয় লাভ না করিয়া অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছিল। বাঙ্গালী সাহস করিয়া দেশকে জননী ও দেশবাসীকে ভাই বলিয়া আহ্বান করিতে পারে নাই। বঙ্কিম সেই নবাঙ্কুরিত দেশপ্রীতিকে একটি ধ্রুব আশ্রয় দান করিলেন। নির্ভীক সন্তান দেশমাতাকে জগন্মাতার সিংহাসনে বসাইয়া যেমন আহ্বান করিলেন—অমনি দলে দলে বাঙ্গালীরা 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া দেশবাসীর বেদীপাশে সমবেত হইল। দেশের লোক যে সম্বোধন চাহিতেছিল বঙ্কিমের কণ্ঠেই তাহা ধ্বনিত হইল। বঙ্কিম যদি নবধর্ম্মের একটা আশ্রয়ের পরিকল্পনা না করিতেন

তাহা হইলে দেশপ্রীতি কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইবার কোন সুযোগ পাইত না। যে-দেশের লোক অন্য কিছুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলেও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে সে-দেশের জন্য এইরূপ শক্তিধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। অন্যদেশে যাহা বিচার-বিবেচনার দ্বারা সম্পাদিত হয় এদেশে তাহা সম্পাদিত হয় আবেগের দ্বারা। এ-দেশে জন্মভূমিতে মাতৃত্বকল্পনা না করিলে, বিশেষতঃ জগন্মাতার মহিমাকল্পনা না করিলে, দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠার উপায় ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

আমরা যে রূপকে ভাবের দ্বারা এবং ভাবকে রূপের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া তবে অন্তরের অন্তরঙ্গ করিয়া লই—তবে আমাদের প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ ইত্যাদি স্ফুরিত হয়, বঙ্কিম তাহা বুঝিতেন। তাই তিনি একদিকে অনন্তকে রূপের দ্বারা এবং অন্যদিকে সুফলা সুজলা শস্যশামলা জন্মভূমিকে জননীত্বের মহিমায় কল্যাণময়ী করিয়া দেখাইয়াছেন।

বঙ্কিমের বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব দেশবাসী গ্রহণ করে নাই। ইহার মধ্যে তাহারা বঙ্কিমের বিচারবুদ্ধিই দেখিয়াছে—হৃদয়াবেগকে দেখিতে পায় নাই। আমাদের দেশের লোক সুচিন্তিত বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত ভক্তিকে ধর্ম্মের ভিত্তি মনে করে না। তাহা ছাড়া, বঙ্কিম যে ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—আমাদের রসতত্ত্বে তাহা নিকৃষ্টশ্রেণীর দাস্য ভাবেরও নীচে। ইহাতে অন্তরের উন্মাদনা নাই। এদেশের লোকের মনে তাহা ধরে নাই। তবে বঙ্কিমের নবশাক্তধর্ম্ম দেশের লোক গ্রহণ করিয়াছে—তাহার মধ্যে প্রাণের আবেগ আছে। ফলাফল যাহাই হউক, এই ধর্ম্ম বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই বঙ্কিম জাতীয় জীবনের গুরু, নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা প্রফেট।

পল্লী-পুরোহিত

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ওগো ও দেশেরমুক্তিদাতা শান্তিকামী পুরোহিত,
অন্তরে তুমি করিতে শিখেছ বাহিরেতে নর প্লরের হিত।
নিজেরে শুধুই এমনি করিয়া অঞ্জলী দেছ বিশ্ব মাঝ,
ত্যাগের খড়্গে বলি দিয়া সব, ধরি দারিদ্র্য-কাঙ্গাল সাজ।
ভিক্ষার ঝুলি করেছ ধারণ স্কন্ধে ভুলিয়া লজ্জাবোধ,
দয়াময় দেহ করুণা এতই কেমনে সে ঋণ হইবে শোধ।
প্রতিদান তার ফিরিয়া পাবার লালসা তোমার ছিল না কভু,
তোমার শক্তি হীন দুর্ব্বল, এত শীঘ্রই লুপ্ত প্রভু ?

বাক্য যাহার ছিল সুসত্য, একটী কথায় অকস্মাৎ
নিখিল বিশ্ব হইতে পারিত এক নিমেষেই ভস্মসাৎ।
বহ্নির শিখা জ্বলিত নয়নে কালানল তেজে রাত্রিদিন,
কালের প্রভাব বিস্তার সাথে সেই কিগো আজ হয়েছ হীন ?
তব সাধনার যজ্ঞাগ্নির অপরিসীম্ ঐ গগন ধূমে
হোত ধূমায়িত, টলিত স্বর্গ, বিরাজিত পূত বিশ্বভূমে।
ওঙ্কারে ছিল ঝঙ্কার সুর টঙ্কার দিয়া উঠিত প্রাণে,
বিশ্বভুবন মাতিয়া থাকিত অভিন্নতায় সাম্যগানে।

ওগো পল্লীর পুরোহিত তুমি হারায়েছ সব কাম্যফল,
তব বেদ গীতা শাস্ত্রালোচনা প্রাণের শ্রেষ্ঠ সে সম্বল।
উপবীত বহ কণ্ঠেতে আজ, ব্রাহ্মণ শুধু রয়েছ নামে,
প্রাণ দিতে নিজ স্বার্থের খোঁজে,ঘুরিছ ব্যাকুল দিবস যামে।
শূদ্রেরে দেখ ঘৃণার চোক্ষে, অপমান কত কর যে দান,
ন্যায় সম্মান চাহ ফিরে আরো, ব্যথা দিয়ে চাও অকুলপ্রাণ ?
ছুঁড়ে ফেল সব, দেশের জাতির কল্যাণ লাগি' জাগ আবার,
পূর্ব্ব শক্তি বক্ষে করিয়া, হৃদয়েতে বাণী সান্ত্বনার।
কীর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি ধরিয়া জাগুক্ এ যুগ-সন্ধ্যাখনে,
শেষের দিনেতে দেখাও অতীত গৌরব-স্মৃতি এ ত্রিভুবনে।
আবার ঝরাও ঝরণা ধারায় নব উদ্যমে করুণা-ধারা,
স্বর্গের সুখে ধরণীর বুক নাচিয়া উঠিবে আত্মহারা।

পথচারীর গবেষণা

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

(নক্সা)

এক

বর্ত্তমান-জগতে কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র কাহারো জীবন, সম্পত্তি, অর্থ আজ নিরাপদ নয়। সকলেই যেন এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে পথচারীর ন্যায় ভ্রাম্যমান।

জগতের বিরাট পটভূমিতে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তা হ'তে ভারতও মুক্তি পায় নাই। বাঙ্গালাদেশের এক প্রান্তে সমরানলের প্রবল বহ্নি এসে শীঘ্রই উপস্থিত হবে এ আশঙ্কাও আছে। দেশময় অন্নবস্ত্রের অভাব।

কলিকাতা সারারাত্রি আলোকমালায় সজ্জিত থাকতো। দীর্ঘকাল সেই নগর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নগরবাসীর জীবন নিরাপদ নয়—ঘন ঘন সাইরেন বাজে। যানবাহনে যাতায়াত করাও নিরাপদ নয়, সাধারণের একমাত্র সুবিধাজনক যানবাহন ট্রামগাড়ী ক্রমাগত বিধ্বস্ত হচ্ছে। আরোহী আহত হ'য়ে ট্রামের মাসিক টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাসে যাতায়াত কচ্ছে। যখন ট্রাম বন্ধ হয় তখন কখনও ট্রেণে কখনও পদব্রজে পথচারীর ন্যায় আফিসে উপস্থিত হচ্ছে। আকাশে বিমানের ঘন ঘন যাতায়াতে মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা কেন বিমান এত তৎপরতার সহিত পরিভ্রমণে ব্যস্ত।

কলিকাতাবাসী অনেকের মনে নানান সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। যাহারা কলিকাতাকে বিপজ্জনক স্থান মনে ক'রে স্ত্রী পুত্র মাতাকে দূরে স্থানান্তরিত ক'রেছিলেন, ট্রেণে যাতায়াত বন্ধ হওয়াতে তাঁদের বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাঁহারা নানান রকম বিপদ কল্পনা ক'রে অস্থির হয়ে পড়েছেন। মানব মাত্রেই কল্পনা করে, জীবনকে কাল পাত্র দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না ক'রে ব্যাপকভাবে জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে এটা লক্ষ্য করা কঠিন নয় যে, জগতে মানব মাত্রেই পথচারী-জগতের কর্ম্মরঙ্গ-ভূমিতে সে পথচারী, তাহার চিত্তের বিরাট পটভূমিতে সে পথচারী, আমাদের কিরণও সেই পথচারী।

কিরণের পথচারী মন পূজার অবকাশে কলিকাতা থেকে "বেহারে" যেতে ব্যগ্র, অথচ বেহার সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ সংবাদ নিত্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাহাতে বেহারে যাওয়ায় বিপদ আছে। কিরণের মন যুক্তিকে গ্রাহ্য কত্তে চায় না। স্থির করেছে পূজার সময়ে বেহারে যাবেই। এ প্রসঙ্গ নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে বহু বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছে।

শরতের শ্রান্ত সন্ধ্যাকে ম্লান ক'রে ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে যখন আকাশে উপস্থিত হ'লো, তেতালার ছাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কিরণ চুপ করে ব'সেছিল।

স্ত্রী স্বামীর অন্বেষণ ক'রে কোথাও না সাক্ষাৎ পেয়ে ছাদের সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। স্ত্রী বললেন, "অন্ধকারে ব'সে আছ কেন, চলো নীচে চলো, যেও ভাগলপুরে—সময় বড় খারাপ এখন কলকাতা থেকে বেরোনো উচিত নয়, কি ক'রে যাবে? রামপুরহাট পর্য্যন্তও হয় তো ট্রেণ যাবে না।"

কিরণ উত্তর দিলো, "ট্রেণে না হয় ষ্টীমারে যাবো—অফিস থেকে তো সেই জন্য দশদিনের আগে ছুটী নিয়েছি।"

স্ত্রী বলিলেন, "বেশ তাই যেয়ো, এখন নীচে চলো।"

কিরণ কাতর স্বরে জানালো "ওগো আমায় একটু একলা থাকতে দাও—" স্ত্রী আর কিছু না ব'লে নীচে প্রস্থান ক'রলেন।

কিরণ গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হ'লো—আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, সময়ে সময়ে একটা কোন কথা অনেক ঘটনাকে মনের মন্দিরে এক মুহূর্ত্তে এনে উপস্থিত করে যা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না, লিখিত ভাষায় তার অভিব্যক্তি যতই সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী হোক না কেন তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

"ভাগলপুর" একটা সহরের নামমাত্র কিন্তু এই নামে কিরণের মনে এক মুহূর্ত্তে কি চিন্তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ হ'লেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা সম্ভব। "ভাগলপুর"—"ভাগলপুর" নাম শুনলেই কিরণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়। স্মৃতির জোয়ার দু'কূল

ভাসিয়ে তাকে নিয়ে যায় মধুর স্মৃতির রাজ্যে—ভাগলপুর তাহার জন্মভূমি—জীবনের প্রভাতে সব ঘটনা মধুর রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় তার মানস মন্দিরে—তাদের বাড়ীতে একদিন কি আনন্দই ছিল, গঙ্গার কল-কল্লোল একদিন তাকে কি মধুর রাজ্যে নিয়ে যেতো। গঙ্গাবক্ষে দূরে জামালপুরের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে গরিমাময় সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করে সে সোল্লাসে চীৎকার করতো—পূর্ণিমার রাত্রে যখন অস্তগমনোন্মুখ কৌমুদীর আলো ও ছায়ার সংমিশ্রনে গঙ্গার মধ্যে এক আলোকিত পথের সৃষ্টি হোত সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করতো। তার শয়ন মন্দির থেকে বর্ষায় "তট বিপ্লাবনী ধূসর তরঙ্গভঙ্গে" জাহ্নবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি লক্ষ্য করে সে ভীত হয়েছে। কখনও বা প্রকৃতি দেবীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে যিনি এই রহস্যময়ী প্রকৃতির স্রষ্টা তাঁকে প্রণাম করেছে।

কিরণ বড় মানসিক দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছে—প্রায় দশ মাস পূর্ব্বে সে একবার মাতা ও দুই পুত্রকে ভাগলপুরে প্রেরণ ক'রেছিল, স্ত্রীকে ও শিশুপুত্র কন্যাদের স্থানান্তরিত ক'রেছিল উড়িষ্যা প্রদেশে শ্যালকের বাটীতে। প্রায় পাঁচমাস পরে স্ত্রীকে নিয়ে আসে শ্যালকের অনুরোধে কারণ সে সময় মান্দ্রাজ উপকূলে বিশেষ গোলমাল হ'য়েছিল। সে ঠিক ক'রেছিল মাকে পূজার সময়কালে আনবে কিন্তু বেহারের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সে কল্পনা তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

ভাগলপুরের স্মৃতি কথা মনে উদয় হ'লে তার মনে মার সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার পিতার অতি সুন্দর সৌম্য পবিত্র আনন মূর্ত্ত হয়ে দেখা দেয়। কিরণের কি আনন্দ পিতার পুস্তকাবলীর রাজ্যে ভ্রমণ করা।

সে হঠাৎ যেন বাস্তব রাজ্যে ফিরে এলো। সে শীঘ্র নীচে এসে হাফসার্ট পরে বেরিয়ে গেল হাওড়া ষ্টেশনে জানতে ট্রেনের কি অবস্থা। ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে ব'ললে স্ত্রীকে, "আমি কালই ভাগলপুর যাব, গাড়ী রামপুরহাট পর্য্যন্ত যাবে।"

স্ত্রী ব'ললেন, "কাল যাবে কি ক'রে আফিস খোলা যে।"

কিরণ ব'ললে, "পরশু থেকে আমার ছুটী আরম্ভ—ছুটীর আগের দশদিন ছুটী নিয়েছি যে।"

দুই

হাওড়া ষ্টেশনে কিরণ মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে জনসমাগম বিশেষ নেই লক্ষ্য করে সেই গাড়ীতে উঠে নিজের বিছানা পেতে ফেললো—কিছুক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধ এসে আর একপাশে একটা বেঞ্চি অধিকার ক'রলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক সুন্দর যুবক চোখে সুন্দর সোনার চশমা, গায়ে মটকার পাঞ্জাবী, ঘাড়ের ওপরে একটা চেষ্টার ফিল্ড, রিষ্টওয়াচ শোভিত হাতে একটা ছোট কাঠের বাক্স নিয়ে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কুলী একটা মাঝারী ধরনের কুমীরের চামড়ার সুটকেস্, ছোট হোল্ডল ও একটা ছোট বাক্স নিয়ে মাঝের বেঞ্চিতে রাখলো। কুলীকে বিদায় দিয়ে যুবক ব'ললে, "দাদা, কিছু যদি না মনে করেন আমি আপনার পাশে একটু বসি।"

কিরণ ব'ললে, "বসুন না, এতে মনে করবার কিছু নেই।"

যুবক ব'ললে, "আমাকে আপনি ব'লবেন না, আমি আপনার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট।"

কিরণ হেঁসে ব'ললে, "বেশ ভাই তুমিই ব'লবো।"

যুবক কিছুক্ষণ পরেই ব্যস্ত হয়ে রিষ্টওয়াচ দেখে ব'ললে, "এ কি রকম হোল—গাড়ী ৭ টার সময় ছাড়বার কথা সাড়ে ৭ টা বাজলো—"

বৃদ্ধ পাশের বেঞ্চি থেকে ব'ললেন, "যুদ্ধের সময় কিছু ঠিক আছে।"

যুবক ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললে, "দেখি, একবার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" সে দরজা উন্মুক্ত ক'রে গার্ড সাহেবের কাছে ছুটলো। কিরণও বৃদ্ধ উভয়েই হাসছেন যুবকের ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে। কিছুক্ষণ পরে যুবক এসে সংবাদ দিল যে এখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরী হবে গাড়ী ছাড়তে। সে খানিকক্ষণ ব'সে আবার কিরণকে ব'ললো, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি—"

যুবকের কথার মধ্যে একটা সলজ্জ ভাব ছিল—

কিরণ ব'ললে, "বলুন না।"

যুবক ব'ললে, "আপনার একটা মতামত আমার দরকার।"

কিরণ ব'ললে, "মতামত কিসের।"

যুবক কোন কথা না ব'লে কুমীরের চামড়ার সুটকেস

খুলে কতকগুলো রঙিন শাড়ী কিরণের কাছে রেখে ব'ললে, "দেখুন এই শাড়ীগুলো কিনেছি—সবই আমার স্ত্রী ডলির—খুব ফর্সা দেখতে, খুব সুন্দরী—মানাবে তো ?"

কিরণ ব'ললে, "চমৎকার মানাবে—আপনার খুব High class taste দেখছি, সুন্দর—"

যুবক ব'ললে, "তা আমার একটু আছে—আপনি একটু চা খাবেন ?"

কিরণ ব'ললে, "আমি এখনই চা খেয়েছি আবার···"।

যুবক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলে, বৃদ্ধও স্বীকৃত হলেন।

কিরণ ব'ললে, "তোমরা খাও—আমাকে···"

যুবক উত্তর দিল, "এখনও পাকা কুড়ি মিনিট দেরী গাড়ী ছাড়তে, যাই চায়ের অর্ডার দিয়ে আসি।"

যুবকের গতিবিধি লক্ষ্য করলে এই কথাই মনে আসে যে তার হৃদয় আজ আনন্দে ভরপুর, তার সান্নিধ্যে যে আসে তাকেই সে আনন্দ দিতে চায়। শীঘ্রই যুবক খানসামাকে সঙ্গে করে চা, কেক, ক্রিমরোল ইত্যাদি এনে গাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হ'ল। গাড়ীতে এই তিনজন ব্যতীত আর যাত্রী ছিল না। বৃদ্ধের আগ্রহ খুব লক্ষ্য করা গেল—তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ব'ললেন, "খাওয়া দাওয়াই হচ্ছে ভ্রমণের আনন্দ—ভ্রমণ কর্ত্তে গিয়ে মনে করো দেখি প্রায় আট মাইল হেঁটে যখন চা, ডিমের আমলেট, রুটী, টোষ্ট তা যতখানি রুটী মোটা ঠিক সমপরিমাণে সেই রকম মোটা মাখম রুটীর ওপরে তাও পাঁচ কি সাতখানা আর সুরভি সুগন্ধ চা অবশ্য কড়া চা অন্ততঃ পেয়ালা চার পাঁচ, এ না হ'লে কি বেড়ানো বা ভ্রমণ-এর কোন মানে হয়—মনে আছে তো, "The cups that cheer but not inebriate"।

যুবক এই অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধকে ও কিরণকে আপন করে ফেলেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন ভোজন বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হ'ল।

কিরণ ব্যাগ বার করতেই যুবক ব'ললে, "কিছু মনে করবেন না—আমি বিল আগেই pay করেছি।"

খানসামা যথাসময়ে এসে ট্রে কাপ ইত্যাদি নিয়ে গেল। যুবক ট্রের উপর একটা আধুলী দিতেই খানসামা একগাল হেঁসে সসম্ভ্রমে আদাব্ করে চ'লে গেল—ট্রেণও whistle দিয়ে ছেড়ে দিল।

কিয়ৎদূর ট্রেণ অগ্রসর হ'তেই যুবক কিরণকে বলেছে তার জীবনের ইতিহাস—সে ভাল কাজই ক'রে কিন্তু যুদ্ধের হাঙ্গামার জন্য ডিব্রুগড় থেকে তার স্ত্রী ও ছেলেকে তার বর্দ্ধমানের বাটীতে পাঠিয়েছে, প্রায় দশ মাস সে স্ত্রী ও ছেলেকে দেখে নি। তার স্ত্রী লিখেছিলেন শাড়ী ও ভাল্‌সাটিনা নিয়ে যেতে—তার স্ত্রী কি রকম সুন্দরী, মেমদের মতন গায়ের রং কোঁকড়া কোঁকড়া কেশরাশি, সুন্দর চোখ মুখ নাক, ঠোঁট অত্যন্ত পাতলা আর কি সুন্দর গান করতে পারে। যখন তার স্ত্রী গান গায় ও সঙ্গে সে ক্লারিওনেট বাজায় তখন মনে হয় যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত ভেসে এসেছে সুদূর মর্ত্তে। ভাল্‌সাটিনা কিনতে প্রায় দু'শো টাকা লেগেছে।

হঠাৎ যুবক ব'ললে, "দখবেন ভাল্‌সাটিনা।"

সে ক্ষুদ্র একটা সুন্দর বাক্স আনলো—কিরণ ইতিপূর্ব্বে এত ছোট ফোল্ডিং ভাল্‌সাটিনা দেখে নাই—সে ভাল্‌সাটিনা খুলিয়া সুরটা কি রকম দেখছিলো—কিরণ হারমনিয়াম খুব ভাল ও মধুর বাজায়। একটু সে বাজাতেই যুবক কিরণের হাত ধ'রে ব'ললে, "আপনি নিশ্চয়ই গান করতে পারেন"।

কিরণ ব'ললে, "এক সময় পারতাম বটে কিন্তু এখন আর সে-রকম পারি না এই রকম কেউ কেউ ব'লে থাকে, তোমার ভাল্‌সাটিনা চমৎকার।"

যুবক বলিল, "যদি দয়া ক'রে গান করেন আমি ক্লারিও-নেটটা বার করি"—সে আর মতের অপেক্ষা না ক'রে ছোট বাক্স খুলে ক্ল্যারিওনেট বার করলো। বৃদ্ধ ব'ললেন, "গাও না বাবা একটা গান, গাড়ীতে উঠে কেবলই কথা হচ্ছে কখন কি হয় তার মধ্যে গান হ'লে মন্দ হবে না, গাও"।

কিরণ গান ধরলেন—

"মলয় আসিয়া কয়ে গেল কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে,
আমার তৃষিত অন্তর ব্যথা ওগো সযতনে তুমি নাশিবে—"

যুবক সঙ্গে সুন্দর ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে, গান শেষ হবার পর বৃদ্ধ কিরণকে ব'ললেন, "বাঃ সুন্দর গলা তোমার, বড় দরদ দিয়ে গান ক'রো।"

গান শেষ হয়েছে, কিরণ ভেবেছিল যে যুবক আর একটা গান করতে বলবে, কিন্তু হঠাৎ ক্ল্যারিওনেট রেখে যেই গাড়ী থেমেছে সে হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নাম্‌লো, খানিক পরেই হতাশ ভাবে এসে ব'ললেন,

"শ্রীরামপুর, এখনও অনেক দেরী"। সে টাইম টেবল একবার দেখলে, একবার রিষ্টওয়াচ দেখলো। একবার সুটকেশ খুলে ছেলের গায়ের নানান রকম জামা খেলনা সব গুছিয়ে রাখলো, স্ত্রীর কাপড় সব পাট্ ক'রে সুটকেসে রাখলো, চেষ্টারফিল্ড হোল্‌ডলের মধ্যে রেখে দিল। যতই বর্দ্ধমান কাছে আসতে তার অস্থিরতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল। সে জানলার ভিতর থেকে বুক পর্য্যন্ত বাড়িয়ে আনন্দে দূরে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের আলো দেখছিলো। বৃদ্ধ ব'ললেন, "বাবা স্থির হয়ে ব'সো"। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী "in" করতেই সে চলন্ত অবস্থায়ই ক্লারিওনেটের বাক্স হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্‌ম লাফিয়ে পড়লো, কিন্তু নিজেকে সামলাতে না পেরে প'ড়ে গেল, হাতের ক্ল্যারিওনেটের বাক্স তার মাথা ঠুকে গিয়ে মাথা ফেটে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটলো। গাড়ী তখন থেমেছে, কিরণ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে নেমে জল আনতে ছুটলো, জল নিয়ে এসে দেখে যুবকের স্ত্রী অশ্রুসজল চোখে স্বামীর মাথা কোলে ক'রে বসে আছেন, ছেলেকে নিয়ে ঠাকুর দূরে দাঁড়িয়ে আছে, বৃদ্ধ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছেন, সে মাথায় বরফ দিয়ে ব'ললেন, "কোন ভয় নেই—" যুবক ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাচ্ছে, স্ত্রীর হাত চেপে ধরেছে—

কিরণ যুবকের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিল। যুবক মিথ্যা বলে নি, তার স্ত্রীর মত সুন্দরী অতি অল্পই কিরণ দেখেছে। স্ত্রী ব'ললেন, "আপনি এবিপদে অনেক করেছেন—উনি ভাল···"

কিরণ ব'ললে, "কোন ভয় নেই, যখন জ্ঞান আছে serious কিছু হয় নি—ডাক্তার একটা এখুনি Anti-tetanus injection দিয়ে দেবেন—তবে ষ্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়াই ভাল।" কিরণ উভয়ের বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

কিরণ ব'ললে, "কি আশ্চর্য্য—এই গান হ'ল, ক্ল্যারিয়নেট বাজালো আর পরমুহূর্ত্তেই এই কাণ্ড হল। ক্ল্যারিয়নেটের বাক্সটা না থাকলে বোধ হয় বিশেষ কিছু হ'ত না। গাড়ীও বিশেষ জোরে যাচ্ছিল না, কিন্তু by chance কিরকম হ'য়ে গেল, একেই অদৃষ্ট ব'লে।"

বৃদ্ধ ব'ললেন, "তোমার তা মনে হ'তে পারে, বাবাজী, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। যুবককে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং সে যে এই আঘাত পেল তার জন্য দুঃখও হয়েছে, কিন্তু এই অঘটনের কারণ যে শুধু chance বা অদৃষ্ট তা নয়।"

কিরণ আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন না। আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে ও তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

বৃদ্ধ ব'ললেন, "পৃথিবীতে কোন ঘটনা আকস্মিক ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনার একটা কারণ আছে। যে ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তখনই সেই ঘটনা হয় আকস্মিক—যেমন ডাক্তার অনেক সময়ে মৃত্যুর কারণ স্বরূপ বলেন যে 'হার্ট ফেল' ক'রে মারা গিয়েছে। আমরা অবশ্য ব'লে থাকি, "কি অদৃষ্ট, দৈব"—কিন্তু সত্যকারের যে 'দৈব বা অদৃষ্ট' ঘাড় ধ'রে মানুষের এই আকস্মিক ঘটনা ঘটাচ্ছে অকারণ এর অর্থ আমি আজও খুঁজে পাইনি। 'কর্ম্মফল' কথাটা ভয়ানক সত্যি। ট্রেণে যুবকের গতিবিধি, উত্তেজনা লক্ষ্য করে, বাবাজী, আমার মনে হয়েছিল যে হয় তো কোন অঘটন ঘটতে পারে।"

কিরণ ব'ললে, "আপনি কি ব'লছেন? chance, accident ব'লে কিছু নেই? আপনার কাছে এই রকম ঘটনা স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়?"

বৃদ্ধ ব'ললেন, "আমি ব'লতে চাই যে জগতে যে প্রত্যহ কোটী কোটী ঘটনা ঘ'টছে সেই ঘটনার প্রত্যেকটী প্রত্যেকের সঙ্গে গ্রথিত—সে গ্রন্থী অবিচ্ছেদ্য। মানব জীবনেও প্রত্যেক ঘটনা অপর ঘটনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে গ্রথিত—। সময়ের ব্যবধানের মধ্যে প্রত্যেক ঘটনা আসে আবার চ'লে যায়, আবার ফিরে আসে। কখনও একটা সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, মানব জীবনেও এক ক্ষুদ্র ঘটনায় জীবন আরম্ভ হয়ে সেই মানব যশের শিখরে উঠে, কত অহঙ্কার প্রকাশ করে, কত দম্ভ, অসংযম লিপ্সাকে খাদ্য দেয় আবার সেই মানবই লক্ষ্য ক'রে যশের বাদ্য থেমে যায়, আনন্দের হাসি ম্লান হ'য়ে অদৃশ্য হয় মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদের মধ্যে।"

কিরণ ব'ললে, "আপনি একজন বড় দার্শনিক দেখছি।"

বৃদ্ধ হেসে ব'ললেন, "বাবাজী, দার্শনিক কথাটার প্রকৃত অর্থ তোমরা জান না—দার্শনিক ব'লে আমায় আর লজ্জা দিও না—শোন, সময় একটা চক্র—কথায় আছে না 'চক্রাৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। কিন্তু এই চক্রে সুখ দুঃখ খামখেয়ালীর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে মনে হ'লেও সেটা

আমাদের ভুল। চক্রের মধ্যে সুখ-দুঃখের পরিভ্রমণ একটা কঠোর নিয়মে পরিচালিত হয়—এই নিয়মকে যদি তুমি 'ভগবান্' বলো সুখী হবো, যদি 'ভগবান্' না বলো এবং এই যদি তোমার বিশ্বাস হয় যে 'ভগবান্' নেই—একটা প্রাকৃতির নিয়মই জগতকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে, তবে এই কথা আমি ব'লতে পারি, যে নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য, জগত চালিত হচ্ছে, যে নিয়মে ঋতুর পরিবর্ত্তন হচ্ছে, যে নিয়মে প্রভাতের সূর্য্য নিয়মিতভাবে আলো বিতরণ করে—সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেয়, যে নিয়মে তামসী রাত্রে আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ আলোক বিতরণ করে, যে নিয়মে পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নার প্লাবনে জগৎকে ভাসিয়ে দেয়, এই সবই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয় তবে' তার বহু উর্দ্ধে জগতে অদৃশ্যভাবে মহাক্ষমতাশালী শক্তিমান এমন 'একজন' আছেন, যিনি এই প্রাকৃতিক নিয়ম তোমাদের Law of Natureকে চালিতও করেন আবার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ও সৃষ্টি করেন। সেই অদৃশ্য মহাশক্তিকে আমরা বিভিন্নরূপে দেখি। কখনও তাঁর রূপ বালসুলভ দুঃসাহসিক অপকার ক'রবার প্রবৃত্তির মধ্যে লক্ষ্য করি, কখন তাঁর রূপের মধ্যে প্রকাশ হয় ভাল-মন্দ বিচারের অভাব, কখনও তাঁর রূপকে মনে হয় কঠোর নির্ম্মম, নিষ্ঠুর। কিন্তু যাই মনে হোক্ এটা লক্ষ্য ক'রো যে সেই অদৃশ্য মহাশক্তির, সেই 'একজনের' বিচার আশ্চর্য্য রকম নির্ভুল।"

কিরণ ব'ললে, "এ কথা কি ক'রে আপনি ব'লতে পারেন —বিচার নির্ভুল?"

বৃদ্ধ হেসে ব'ললেন, "একটা দৃষ্টান্ত না দিলে তুমি বুঝতে পারবে না—ধরো নেপোলিয়নের কথা—তোমরা তো ব'লবে যে, by chance নেপোলিয়ন যদি ওয়াটারলুতে না হেরে যেতো কেউ কি তাকে হারাতে পারত?"

কিরণ ব'ললে, "ঠিক কথাই তো Victor Hugo তো সেই কথাই ব'লেছেন।"

বৃদ্ধ বললেন, Victor Hugo ঠিক সে কথা ব'লেন নি সব কারণ দেখিয়ে শেষে ব'লেছেন যে, God ছাড়া কেউ নেপোলিয়নকে হারাতে পারত না। দেখো নেপোলিয়নের পরাজয়ের প্রয়োজন ছিল। ফরাসীরা একদিন বোরবন্দের তাড়িয়ে ফরাসীদেশকে স্বাধীন করেছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন সেই স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে যা স্বেচ্ছাচারিত্ব, লোভ, জিঘাংসা অসংযমের পরিচয় দিলেন তা কখনও কোন বোরবন্ সম্রাট কল্পনা করেনি। এই জিঘাংসা লিপ্সা, অসংযমের জন্য তার পরাজয়ের প্রয়োজন ছিল, সেটা by chance ঘটে নি—সেই এক জনের ভ্রূকুটীতে এই কার্য্য হ'য়েছিল।"

কিরণ ভগবান মান্তো, সেই কারণে সে আর তর্কে অগ্রসর না হ'য়ে কেবল ব'ললে "বাস্তবিক নেপোলিয়নের জীবনে একটা tragedy।"

বৃদ্ধ ব'ললেন, "Tragedy নয়? ভাব দেখি এক দিকে বিরাট ব্যক্তিত্ব, জীবন অসামান্য বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল যা একটা রূপ কথার মতন, অসাধারণ মণীষা, বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভা, অমানুষী শক্তি; অপর দিকে ক্ষুদ্র দ্বীপ, মূত্র কোষের ব্যাধি, নিত্য নিয়ত খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দোষারোপ, চিকিৎসকের সহিত নিত্য কলহ, অশান্তি—এক সাধারণ, নিতান্ত সাধারণ বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ জীবন—মনে হয় না কি বাবাজী, যে এই কি সেই নেপোলিয়ন যে একদিন ইউরোপের ত্রাস স্বরূপ ছিল। তার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ ইউরোপ কিছু কর্ত্তে পরে নি—কিন্তু কেন? কেন এ অবস্থা হোল তার—সেই অদৃশ্য মহাশক্তি "একজনের" নির্ম্মম কঠোর পরিহাস ব্যতীত আর কিছু কি? কে জানে হয় ত' হিট্লারকেও একদিন এই কঠোর পরিহাস সহ্য ক'র্ত্তে হবে—অসংযম দণ্ডের শাসন আছেই আছে। যুবকও আজ সেই অসংযমের জন্য শাস্তি পেয়েছে by chance হয় নি।"

কিরণ ব'ললে, "আপনার কথাগুলো বেশ লাগছে কিন্তু যুক্তি—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি হয় তো নেপোলিয়নের সমর্থক অনেক পণ্ডিত পাবে যাঁরা যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দেবেন যে নেপোলিয়নের কোন দোষ ছিল না কিন্তু আমি পণ্ডিত নই—তাই সাধারণভাবে কথাগুলো বলেছি—হয় তো এর মধ্যে যুক্তির অভাব লক্ষ্য কর্ব্বে তুমিও কিন্তু গভীর ভাবে কথাগুলো যদি ভাব এই কথার মধ্যে অযুক্তির সঙ্গে যুক্তির সমন্বয়ও পাবে। চটো না বাবাজী—আমি এবার নামবো— তুমি বড় ভাল ছেলে, বুড়োর কথা ধৈর্য্য নিয়ে শুনেছো ধন্যবাদ—এক বুড়ো পথচারীর গবেষণা হিসাবে ধ'রো।"

কিরণ উঠে বৃদ্ধকে নমস্কার করলে, বৃদ্ধ প্রতি নমস্কার করে নেমে গেলেন।

তিন

রামপুর হাটে কিরণ পৌঁছে বড়ই বিপদে পড়লো—ডুমকার বাসে একেবারেই স্থান নেই—এক ভদ্রলোক তাঁর ছোট মেয়েকে কোলে করে তাকে স্থান করে দিলেন। সে ডুমকাতে পৌঁছে দেখে যে তার ভগ্নীপতির বাড়ী শূন্য—ভগ্নী, ভাগ্নে, ভাগ্নীকে নিয়ে পূজাবকাশে বাটীর মোটরগাড়ীতে ভাগলপুর রওনা হয়েছেন—কিরণ আর কি করবে? সে জানে কেবল স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে—ডুমকায় সে যে আসবে সেটা অন্ততঃ ভগ্নীকে জানান উচিত ছিল ত'? সে কাজ ওর হয়ে স্ত্রী জানাতেন। কিন্তু এবারে কিরণের এক-গুঁয়েমীতে বিরক্ত হয়ে তিনি আর ননদকে জানান প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই।

বাড়ীতে ঠাকুর, দারোয়ান, মালী আছে—তাদের কিরণ সংবাদ নিতে বললো কবে ভাগলপুরের বাস ছাড়বে।

তারা বলল, "বাস এখন চার পাঁচদিন চলবে না, তবে গঙ্গার কাছে পুলটা ঠিক যদি হয়ে যায় তবে তিন দিনের মধ্যে চলতে পারে।"

কিরণ আর কি কর্ব্বে ভগ্নীপতির সুন্দর লাইব্রেরী আছে আর সে ভ্রমণে ভারী পটু সুতরাং তার কোন অসুবিধা নাই চা খাওয়ার তার একটা বিশেষ সখ আছে, সে চা সঙ্গে করে নিয়ে বেরোত—বাড়ীতে কাল বড় রামছাগল ছিল, অনেক দুধ দেয় সে পরের দিন ভোরে ছাগলের দুধে চা ও লুচী ও ডিমের ডালনা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ডুমকা তার খুবই ভাল লাগে—তার শুধু ভাল লাগে তা নয়, যারা কষ্ট করে Imperial Gazetteer of India পাঠ ক'রেছেন তারাই অবগত আছেন যে সাওতাল পরগণার দৃশ্য যে খুবই সুন্দর তা অনেক বিখ্যাত পরিব্রাজক ব'লে গিয়েছেন।

যাই হোক, সে একটা সিগার মুখে নিয়ে ও তার পুরাতন বন্ধু ভগ্নীপতির দু'টী বড় বড় বিলাতী কুকুরদের সঙ্গে হিজলী পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেল।

পাহাড়ের শিলাখণ্ডে ব'সে সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ কচ্ছিল। সে লক্ষ্য কর্‌লে পাহাড়ের ধার দিয়ে শ্রেণী-বদ্ধ গরুর গাড়ী একটা ছোট লাইনের মত অগ্রসর হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়ী জ্বালানী কাঠে পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ী পার্ব্বত্য পথের চড়াইএ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। বলদ অতি কষ্টে সেই বিরাট বোঝা টেনে উপরে আনছে—কখনও বা তার অপরিসীম চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে স্থির হ'য়ে সে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে পশু জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গাড়োয়ান পদব্রজেই চাবুক হস্তে গাড়ীর সঙ্গে আসছে। বলদ যাতে খাদের দিকে না যায় সেজন্য কখনও বলদের পশ্চাৎ দেশে আঘাত করছে। বলদের শরীরের প্রত্যেক অস্থি লক্ষিত হচ্ছে। বেচারী বলদ বোঝা টান্‌তে প্রাণান্ত। বেচারী ভয়ে ভয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চালকের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে এবং চালকের আদেশ পালন করছে। সে চিন্তা করল তার জীবনই বা কি, তার কষ্টই কি চালক দেখাচ্ছেন?

সে ঐ স্থান থেকে উঠে শিব পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'ল—শিব পাহাড় সহরের কাছেই। সে গিয়ে সেই মন্দির থেকে একটু দূরে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপরে ব'সে সহরের গায়ে এক পাহাড়কে কেমন মেঘ হঠাৎ আচ্ছন্ন ক'র্ল্লে, আবার মেঘ স'রে গেলে কেমন সমগ্র পাহাড় সূর্য্যা-লোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তাই একমনে নিরীক্ষণ কর্চ্ছিল।

শিব-মন্দিরের বারান্দা থেকে হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে যে এক বর্ষীয়সী মহিলা, খুব সুন্দরী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন মুখে জিজ্ঞাসু ভাব বর্ত্তমান। তার সঙ্গে একজন বর্ষীয়ান পুরুষ, একজন যুবক, এক বালিকা। তাঁহারা সকলেই এসেছেন মন্দিরে। কিরণ পাহাড় থেকে নেবে চ'লে যাবে মনে ক'রছিল এমন সময় মহিলার নিকট থেকে বর্ষীয়ান পুরুষ এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "আপনি কি কিরণবাবু, ভাগলপুরে আপনার বাড়ী—আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন।"

কিরণ জানাল যে সে কিরণবাবু বটে এই কথা শুনে মহিলা কিরণের দিকে অগ্রসর হ'য়ে কিরণকে প্রণাম ক'রে তার হাত দু'টি ধরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কিরণদা বল ত' আমি কে?"

কিরণের মনে হচ্ছে কোথাও মহিলাকে দেখেছে অথচ কিছুতেই নাম মনে প'ড়ছে না—অথচ মহিলাকে সে চিন্তে না পারলেও মহিলা যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে একদিন তার সঙ্গে মিশেছিলেন তা নিশ্চিত। কারণ তা না হ'লে মহিলা প্রণাম ক'রেই একেবারে তার হাত ধ'রে হেসে প্রশ্ন করবেন কেন? কিরণ মনে মনে ভাবলো সে যে আধুনিক যুগে বাস

করে বটে কিন্তু অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা তা বিবাহিতাই হউন আর অবিবাহিতাই হউন তাদের সঙ্গে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার ছিল না বা সে পরিচয়ের জন্ম ব্যগ্রতাও তার কোন দিন কেউ লক্ষ্য করে নি। কিন্তু একি হ'ল ?

মহিলা বললেন, "গিরিডির কথা মনে আছে কিরণদা ?"

কিরণ সোল্লাসে ব'লে উঠলো, "বেলা—বেলা—"

মহিলা স্বামীকে ডেকে ব'ললেন, "ওগো, এই আমাদের কিরণদা।" স্বামীও এসে কিরণকে প্রণাম করলেন। তারপর মহিলা ছেলে মেয়েকে এনে ব'ললেন, "এ আমার বড় ছেলে সুশীল এম-এ পড়ে, আর এই আমার ছোট মেয়ে নাম "মিনি" বেলা ছেলেমেয়েদের ব'ললেন, "প্রণাম কর মামাকে।"

কিরণ কিছু ব'লছে না একদৃষ্টে চেয়ে আছে বেলার দিকে। বেলা ব'ললে, "কিরণদা, তোমার বোনের সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হ'য়েছে—দুম্‌কাতে আমরা অল্প দিনই এসেছি। উনি এখানে ট্রান্সফার হ'য়ে এসেছেন। তোমার বোনের বাড়ীতে তো কেউ নেই—তুমি থাকো আমাদের বাড়ীতে, সন্ধ্যায় গাড়ী পাঠিয়ে দেবো, কেমন ?"

কিরণ ব'ললেন, "বেশ, ভালই হ'বে।"

স্বামী ব'ললেন, "উঃ ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হ'ল। আপনার কত গল্পই বেলা ব'লে আমাকে। সন্ধ্যার সময় ঠিক থাকলো, গাড়ী নিয়ে যাবো।"

এই সময়ে অপর দুইজন ভদ্রলোক আসতেই বেলা ঘোমটা টেনে নীচে নেমে গেল।

কিরণ এসে তার ভগ্নীপতির সুন্দর বাড়ীর তেতালার ছাদের ঘরে ব'সে কি একখানা বই নিয়ে প'ড়তে ব'স্‌লো, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ কর্ত্তে পার্‌লো না—তার পথচারী মন একমুহূর্ত্তে তাকে টেনে নিয়ে গেল বত্রিশ বছর আগের ভাগলপুরের বাটীতে। সে তখন বি-এ পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে ফেব্রুয়ারী মাসে—ওভার কোট গায় দিয়ে সন্ধ্যার সময় ল্যাম্প জেলে বি-এ পরীক্ষার দর্শন শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক Paulsen's Introduction to Philosophy অতি মনোযোগসহকারে পাঠ করছিল। হঠাৎ স্থানীয় একজন উকীল এসে সংবাদ দিলেন যে তার বাবা গিরিডিতে মোটর Accident-এ আহত হয়েছেন, তাকে সেই রাত্রেই গিরিডি যেতে হবে। এক মাস কি তার বেশীও থাকতে হবে। বাবা পাঠ্য পুস্তক সব নিয়ে যেতে ব'লেছেন, তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। মোটর গাড়ী থেকে ছিটকে প'ড়েছেন।

কিরণের মনের অবস্থা অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'লে যে রকম হয় সেই রকম। কিরণের বাবা বেহারে খুব একটা বড় মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত হ'য়ে গিরিডি গিয়েছিলেন—এই মোকর্দ্দমার একদিকে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অপর দিকে লর্ড সিংহ।

কিরণের বড় ভয় হ'ল, সে সেই রাত্রেই গিরিডি যাত্রা ক'রল। কিরণ যখন গিরিডি ষ্টেশনে নামলো, একটী ফুটফুটে অতি সুন্দরী মেয়ে বয়স বছর নয় হ'বে তার দাদার হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। কিরণ নামতেই সেই মেয়েটির দাদা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলো কিরণকে, "আপনিই কি কিরণদা—জ্যেঠামশায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মেয়েটী ব'ললে, "দাদা শীগ্‌গীর চ'লো।"

সে কিরণকে ব'ল্‌লে, "চলুন, জিনিষ-পত্র চাকর নিচ্ছে।" কিরণকে নিয়ে গেল একটী বিরাট বাড়ীতে, ষ্টেশনে এসেছিল বাড়ীর গাড়ী, প্রকাণ্ড ঘোড়া ওয়েলার হ'বে বোধ হয়। বাড়ী ঐ বালিকার পিতার।

কিরণ গিয়ে লক্ষ্য ক'র্‌লে যে তার বাবা বিশেষ ভাবেই আহত হয়েছেন। একজন বৃদ্ধ ও খ্যাতনামা ডাক্তার তখন কিরণের বাবার বুক পরীক্ষা কচ্ছিলেন। পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলে তিনি কিরণকে ডেকে বল্‌লেন, "তুমি ওর ছেলে।"

কিরণ ব'ল্‌লে, "হাঁ।"

তখন তিনি ব'ল্‌লেন, "তোমার বাবা is not likely to live খুব সম্ভবতঃ compound fracture হয়েছে আর rib ভেঙেছে, জ্বর এখনও রয়েছে, চেষ্টা করছি যাতে Pneumonia না set in ক'রে, পার্ব্ব বলে মনে হয় না।

কিরণ ডাক্তারের কথা শুনে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পিতার কাছে গেল। পিতা তার হাত দুটী নিয়ে ব'ল্‌লেন, "তোর পরীক্ষা এই সময়—এই সময় এ রকম হ'ল—যা চা-টা খাগে। মেয়েটী সামনে কিরণের কাছে দাঁড়িয়েছিল, পরে তার হাত ধরে নিয়ে গেল তার পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরে গিয়েও কিরণ টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। তখন মেয়েটি টেবিল থেকে তার মাথা তুলে ধর্‌লে, সহানুভূতির স্বরে ব'ল্‌লো, "আপনি কাঁদবেন না কিরণদা, জ্যাঠামশায় ভাল হ'য়ে যাবেন। ও ডাক্তারবাবু

পাগল—ওরকম উনি ব'লেন।" এই মেয়েটীই বেলা।

প্রায় দুই মাস কিরণ গিরিডিতে ওদের বাড়ী কাটিয়েছিল—সেই নয় বৎসরের বালিকার কতই সহানুভূতি, ভালবাসা সে পেয়েছিল।

ধীরে ধীরে যখন কিরণের বাবা সেরে উঠলেন ও দুর্ব্বল শরীর নিয়ে stretcher-এ করে তাঁকে ট্রেনে First class reserve করে কিরণ নিয়ে এলো সেদিনও ষ্টেশনে বেলা তাকে ছেড়ে কিছুতেই বাড়ী যেতে প্রস্তুত হয় নি ও কিরণ তাকে আশা দিয়ে এসেছিল যে মাঝে মাঝে গিরিডিতে যাবে—এই সব কথা তার মনে জেগে উঠলো।

সন্ধ্যার সময় বেলার ওখানে যেতে কিরণের লজ্জা কচ্ছিলো। বেলা ক্ষুদ্র বালিকা—সে তাকে একদিন দাদার মতন ভালবেসেছিল, তাকে কতো যত্নই করেছিল দীর্ঘ দুঃমাস। সে আজও কিরণের কথা মনে ক'রে ব'সে আছে—তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে বেলার মান অভিমান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কৈ মান অভিমানের পরিবর্ত্তে তার মুখে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও স্নেহের স্বর্ণরেখা। কিরণ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নারী যে কেন পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রেমের রাজ্যে তা কি কিরণ উপলব্ধি করেছে? নারী প্রেমের রাজ্যে ভালবাসার কল্পলোকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী—পুরুষ সে রাজ্যে তার সামান্য ভক্ত পুজারী মাত্র। নারীর প্রবৃত্তির মধ্যে ভগবান অন্তর্মুখীতা দিয়েছেন—বেলার মধ্যেও সে অন্তর্মুখীতা জল জল ক'রছে। আজ নারী পুরুষের বহির্মুখীতাকে অনুকরণ ক'রতে গিয়ে, পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত বৈষম্যকে পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার ন্যায় দূরে পরিহার ক'রবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। কিন্তু সে জানে না সে বোঝে না, যে প্রেম ভালবাসা পুরুষের বহির্মুখীতার একটা প্রধান অঙ্গ হ'লেও নারীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রেম ভালবাসা, ও তাকে সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে তার নম্র সলজ্জ স্বভাব যা ভগবান তাকে দান করেছেন।

কিরণ অতীতের কথা কবে বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু বেলা তো বিস্মৃত হয় নি। হায় নারীর এই প্রেম ভালবাসাকে লজ্জা ও নম্রতাকে যে শিক্ষা বর্জ্জন ক'রতে চায়, সে শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর বিদ্যা অর্জ্জনের কোন প্রভেদ নাই, সেই সর্ব্বনাশা শিক্ষাই আজ আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বনাশ সাধন ক'রছে, ভারতের ঢের আর্থিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরাধীনতার পথে ঢের অগ্রসর ক'রছে,—এর সমাধান হ্যাট্-টাই পুড়িয়ে হবে না।

সন্ধ্যার সময় বেলার স্বামী গাড়ী নিয়ে এলেন—কিরণ তার সামনেই জিনিষপত্র নিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

বেলা বাড়ীতে গানের আয়োজন করেছিল—তার বড়ছেলে এসে কিরণকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে—খুব দামীরকম হারমনিয়াম রয়েছে। বেলা এসে ব'ললে, "কিরণদা সেই গানটা গাও যা উস্রি ফল্ (fall)-এর কাছে দাদা আর আমাকে শিখিয়েছিলে।"

কিরণের চোখে জল এল গান গাইতে। উনিশ বছরের যুবক বি-এ পরীক্ষা দেবে সেই কিরণ আজ বত্রিশ বছর পরে সেই গান গাইছে, আর যে বালিকা ৯ বছরের ছিল সে বত্রিশ বছর পরে সেই গান শুনছে—আজও তার সেই গান মনে আছে, কি আশ্চর্য্য। জীবনের গতি জল-প্রবাহের মতন কত কূল উপকূলের প্রান্ত দিয়ে কখনও বা সোজা ভাবে, কখনও বা বক্রভাবে অগ্রসর হয়েছে। আজ কিরণের সেই গান কি আর বেলার ভাল লাগবে? হয় তো বেশী ভাল লাগবে কারণ সেও পিতা হারিয়েছে। কিরণও পিতা ও তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় তার ছোট কাকাকে হারিয়েছে—

কিরণ গাইল—

"একি ঠাঁই চলেছি ভাই
ভিন্ন পথে যদি
জীবন জলবিম্ব সম
মরণ দুর হৃদি।
দুঃখ মিছে কান্না মিছে
দুদিন আগে দুদিন পিছে
একই সেই সাগরে গিয়ে
মিশিবে সব নদী।
এ কি ঘোর তিমির আছে
ঘেরিয়া চারি ধারে
জ্বলিছে দীপ, নিভিছে দীপ
সেই অন্ধকারে—
অসীম ঘন নীরবতায়
উঠিয়া গীত থামিয়া যায়
বিশ্ব জুড়িয়া একই খেলা
চলেছে নিরবধি।

বেলার চোখে জল, কিরণের চোখে জল—দ্বিজেন্দ্রলালের অমর গীত চোখে জল তো আসবেই।

যাক, যে কয়দিন কিরণ ঝুমকাতে ছিল বেশ আনন্দেই তার দিন কেটেছিল। তবে তার সমগ্র হৃদয় অধিকার ক'রে বসেছিল "মিনি", তার বয়স আট হবে—কি সাদৃশ্য বেলার সঙ্গে।

বেলা ব'ললে, "কিরণদা তুমি "মিনি"কে নিয়েই ব্যস্ত।"

কিরণ হেঁসে উত্তর দিল, "জীবনের প্রভাতে যে বেলাকে দেখেছি সেই "বেলা"কে নিয়েই মশগুল হয়ে আছি—যে বেলা দাঁড়িয়ে কথা ব'লছে, সে বেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। মিনিকে দেখে মনে পড়ে তোমাকেই—"

বেলা বেচারী এই দুই তিনদিনের মধ্যে কি ক'রে তার "এ হেন" অমূল্য কিরণদাকে কতরকম ভাল খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে খাওয়াবে এই চেষ্টায় রন্ধনে ব্যস্ত যা হিন্দু রমণীর জন্মগত বিশেষত্ব। দুই তিনদিন পরে কিরণ অতি কষ্টে ভাগলপুর পৌঁছলো।

চার

ভাগলপুরে গিয়ে তার মন বড় উদাস হয়ে গেল। দুর্গাপূজা হবে না ব'ললেই হয়—সব ঘটে পূজা। দোকান পাট ব'সবে না—বন্ধুরাও অনেকে আসে নি। যাত্রা নেই, থিয়েটার নেই—দেশের মধ্যে তীব্র অশান্তি বিরাজ ক'রছে—

কিন্তু বিষাদের কালিমায় বেহারের আকাশ পরিব্যাপ্ত হলেও কিরণের ঔদাসীন্য বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পেল না। সে বোন, ভাগ্নে ছেলেদের সঙ্গে বালক হয়ে আবার শিশুর মতন হাসতে খেলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হো'ত তার স্ত্রীর কথা, বিশেষ ক'রে মনে হয়েছিল বিজয়া দশমীর দিন। তার শাশুড়ী দুইমাস হয় নি মারা গিয়েছেন। কি স্নেহময়ী জননী ছিলেন তিনি, কিন্তু মানুষ স্বার্থপর, সে কল্পনায় ব্যথার গভীরত্ব কতদূর উপলব্ধি ক'রতে পারে? কিরণ মাতৃহীন হয় নি।

বিজয়া দশমীর রাত্রে কিরণ দ্বিতলের গৃহে পিতার চিত্রের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'রলো। যে জুতা তার পিতা ব্যবহার ক'রতেন, সেই জুতা বুকে চেপে ধ'রলো। যে খাটে পিতা শয়ন ক'রতেন সেই খাটের নিকটে গিয়ে নতজানু হয়ে খাটে বুক রেখে "বাবা, বাবা" ব'লে কাঁদছিলো।

তার মা এই দৃশ্য দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে "খোকা, খোকা" ব'লে তাকে টেনে তুললেন—

কিরণের মনে হয় সে তো পিতার কথা ভুলতে পারে না। পিতার স্মৃতিকে সে বুকে ক'রে কত আনন্দ পায়, কিন্তু কিরণের পুত্রেরা কি তার কথা ভাবে? বোধ হয় না, কিন্তু এই অবস্থার জন্য কে দায়ী, কিরণ না তার পুত্র? কিরণ ঠিক ক'রতে পারে না।

কিরণের ক'লকাতা ফিরতে হবে—ট্রেণ নেই, ষ্টীমারে যেতে হ'লে Special Magistrate এর permit চাই। সে সহজেই আজ্ঞা পেল।

এ কয়দিন পথচারী হয়ে কিরণের সম্মুখে অনেক মধুর স্মৃতি এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেই স্মৃতির পসরা নিয়ে চলেছে সে আবার কঠোর বাস্তবের রাজ্যে, সন্ত্রাজের শাসনের মধ্যে, সেই নিষ্প্রাণ ক'লকাতায়।

সে যাত্রা করবার প্রাক্কালে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দেখছিল। শোভার মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রলো, জাহ্নবী আজ আর তার বাটির পার্শ্বে কল গান করেন না। কালের প্রবাহে গঙ্গার প্রবাহ বাটী হ'তে দূরে লক্ষিত হয়। বাটী ও গঙ্গার মধ্যে প্রসারিত ধূসর সৈকত—এই দৃশ্য কিরণের মনে শিশু কিরণকে জাগ্রত ক'রলো, সে চিন্তা ক'রলে যে ঐ বাড়ী থেকে যেরূপ গঙ্গা দূরে চ'লে গিয়েছে, কিরণও আজ বালক কিরণ হ'তে বহুদূরে উপনীত হয়েছে। যে জগৎ একদিন শিশু কিরণের কাছে কত সুন্দর ও মনোহর বোধ হোত আজ তাহা অতি পুরাতন সৌন্দর্য্যহীন, কিন্তু যাই হোক যখন কিরণ তার বাটী থেকে জাহ্নবীকে দেখে তার মন আনন্দে নৃত্য করে। সে তখন লক্ষ্য করে জননী জাহ্নবী তো সেই রকম কুলু কুলু নাদে গান গেয়ে চ'লেছেন, তবে তার দুঃখ কেন? সেও কি এই মন্দাকিনীর ধারাতে স্নান করে পবিত্র হবে না? সেও পবিত্র হবে স্নান ক'রে—ধন্য হবে জননীর পদরেণু গ্রহণ করে; জন্মভূমি—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" ভাগলপুরের ধূলি কণা মাথায় নিয়ে—তার কণ্ঠে সুর উদাত্ত স্বরে গেয়ে উঠলো দ্বিজেন্দ্রলালের অমর গান- "আমার জন্মভূমি"

"ভায়ের মায়ের এতো স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটী
বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম
যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটী কোথায়
খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে
আমার জন্মভূমি।"

অজন্তা

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কুল কুল নাদে স্বচ্ছ নদীটি বহিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র স্বল্পতোয়া স্বচ্ছ নদীটি। নদীর গায়ে গায়ে খর্ব্ব পাহাড় শান্ত গাম্ভীর্যে মৌন সাধনায় সমাহিত। পাহাড়ের বুকের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রজত মালার মত নদীটি ঘুরিয়া গিয়াছে। সেই পাহাড় সেই নদীকে কেন্দ্র করিয়া বনানির বৃক্ষসারি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মানবসমাজের জন-কোলাহল সংস্পর্শের বাহিরে ভগবৎ উপাসনার এরকম সুন্দর স্থান বুঝি আর কোথাও এমন অনুকুল নাই। যাহারা ধন-রত্ন, বিষয়-বৈভব, মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠা এবং নারীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভূমার আরাধনায় নিজেকে মগ্ন রাখিতে চান সেই সকল সাধকগণের প্রকৃত আনন্দের লীলাভূমি হইবার দাবী করিবার অধিকার পাহাড়টির আছে।

একদা কোন এক অনৈতিহাসিক মুহূর্ত্তে হয় তো কোন পর্য্যটক অথবা সাধনানুকুল স্থান অন্বেষণকারী বৌদ্ধসন্ন্যাসীর চোখে এই মোহন অমৃতময় স্থানটির মাধুরী ধরা পড়িয়া যায় এবং তিনি এখানে ভগবৎ উপাসনার উপযোগীতা উপলব্ধি করেন। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাত্মাগণের আনাগোনা ক্রমবর্দ্ধমানরূপে গতি লাভ করে। তাঁহারা স্থায়ী ভাবেও বাস করিতে আরম্ভ করেন।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—জল-ঝড় শীলা-শৈত্য, বনানির হিংস্র শ্বাপদাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং সাধন ভজনের বিঘ্ন নিরসন কারণে সাধকগণ আশ্রয় নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন এবং পাহাড়ের গাত্র খনন করিয়া গুহা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সাধকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নূতন নূতন গহ্বরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রয়োজনে প্রায় আটশত বৎসর ধরিয়া এমনি গুহা সৃষ্টি ও গুহা সজ্জার কাজ চলিতে থাকে। অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসা পাহাড়ের গায়ে ক্রমে ক্রমে উনত্রিশটি গহ্বর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। সর্ব্বপুরাতন গুহার যে কাজের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের এবং সর্ব্ব নূতন গুহায় যে কাজ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশেষজ্ঞদের মাপকাঠিতে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের রীতিবদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এই পর্ব্বতের নিম্নে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ক্ষুদ্র একটি নগণ্য পল্লী আছে। পল্লীটির নাম 'অজন্তা'। অজন্তার নামানুসারে এই চিত্রাবলী 'অজন্তার চিত্র' বলিয়া অভিহিত হইলেও যে পর্ব্বত গাত্রে এই সকল গুহা রচিত হইয়াছে তাহার নাম 'ইন্দ্রাদ্রি'।

যে সকল মহাত্মাগণ পার্থিব সকল প্রকার সুখভোগ রুচিকে এবং সৌন্দর্য্য রুচিকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অবহেলায়

পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর সুখ ও সৌন্দর্য্যের সাধনায় নিজেদের সমর্পণ করিতে পারেন তাঁহাদের রুচিজ্ঞান যে বহু উচ্চস্তরের তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সেই সকল উন্নত রুচিকারদের হাতে যখন গুহানির্ম্মাণ আরম্ভ হইল তখন তাহা যে সৃষ্টির দিক হইতে এক অনবদ্য অবদান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া গহ্বর রচিত হইয়াছে, কোথও বা মাত্র একটি প্রস্তর কাটিয়াই সম্পূর্ণ একটি গহ্বর তৈরী হইয়াছে, সুতরাং একটি প্রস্তরেই সম্পূর্ণ ছাদটি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ এক-প্রস্তরের ছাদকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কোন স্তম্ভ নির্ম্মাণ সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না কিন্তু এই সকল গুহায় সারি সারি স্তম্ভ রাখা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় প্রয়োজনের অপেক্ষা সৌন্দর্য্য রচনার জন্যই এই সকল স্তম্ভ সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্তম্ভগুলি পৃথক প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত হয় নাই, যে বৃহৎ পাথরখানা কাটিয়া গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে স্তম্ভগুলিও সেই পাথরখানারই অংশমাত্র, যাহা স্তম্ভাকারে বাদ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি স্তম্ভের নিম্নাংশ কালের গতিতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখনো তাহার উপরার্দ্ধ ছাদ হইতে ঝুলিতেছে দেখা যায়। যদি পৃথক প্রস্তর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত ও ছাদের সহিত যুক্ত করা হইত তাহা হইলে নিম্নার্দ্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে উপরার্দ্ধ ছাদের সহিত যুক্ত অবস্থায় ঝুলিয়া থাকিতে পারিত না। অবলম্বনহীন অতিরিক্ত ভারে জোর খুলিয়া পড়িয়া যাইত। যদি স্তম্ভটি ছাদের পাথরেরই অংশস্বরূপ হয় তবেই তাহার ছাদ হইতে ঝুলিয়া থাকা সম্ভব। তদুপরি এই প্রস্তর স্তম্ভগুলির গাত্রে এত উচ্চাঙ্গের এবং বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্করণ করা হইয়াছে যাহা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে এই স্তম্ভ সকল একমাত্র সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অঙ্গরূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই সকল স্তম্ভের আকৃতি, গঠন, সজ্জা ও অলঙ্করণ এতই বিভিন্ন প্রকারের যে শুধু স্তম্ভগুলি দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

অতঃপর গুহার অভ্যন্তর ছাদের সজ্জা, তথাকার বৃহদাকৃতি নক্সার উপর অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং রচনা কৌশল এক বিস্ময়জনক সমস্যায় দ্রষ্টার মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। ছাদের অভ্যন্তর ভাগে মাচার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া সকল দিকের নিখুঁৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অতবড় নক্সার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণ সজ্জা প্রায় ধারণাতীত। কত দীর্ঘ সময় ধরিয়া কত ধৈর্য্য সহকারে ঐরূপভাবে কাজ করা সম্ভব এবং মোটেই সম্ভব কিনা আজও তাহা সমস্যার বস্তু হইয়া রহিয়াছে।
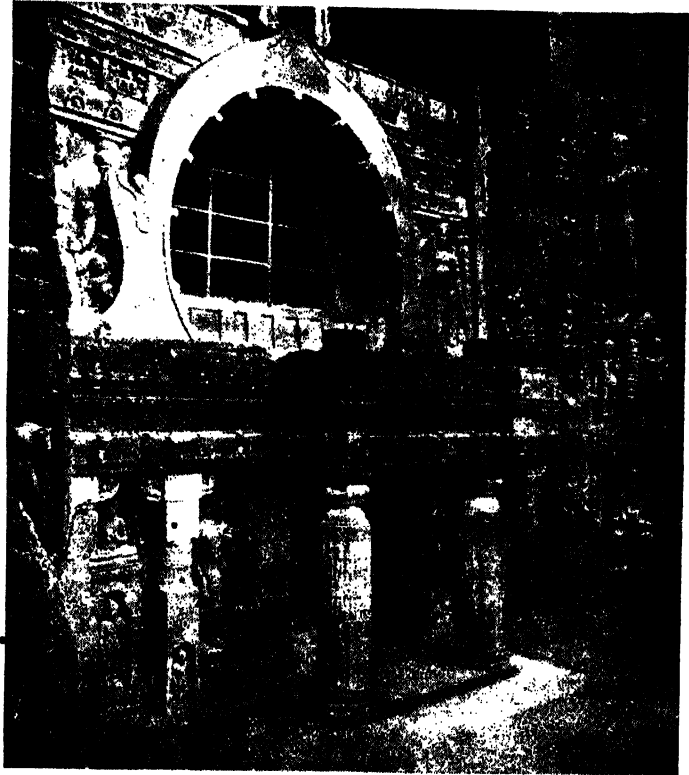
প্রবেশ দ্বার

শুধু খোদাইর কাজই নয়, গুহার প্রাচীর গাত্র ভরিয়া বহু সংখ্যক রঙিন চিত্রও অঙ্কিত করা হইয়াছে। সকল প্রাচীর গাত্রই বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পী কর্ত্তৃক নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া রঙিন চিত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। চিত্রের

বিষয়বস্তুগুলি বহুদেশের বহু শিল্পীদ্বারা বিভিন্ন যুগে অঙ্কিত হইয়াছে বটে তথাপি যেহেতু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী শিল্পীগণ কর্ত্তৃকই ইহা পরিকল্পিত ও অঙ্কিত সেই হেতু চিত্রগুলিতে মুখ্যত বুদ্ধদেবের জীবনী এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত
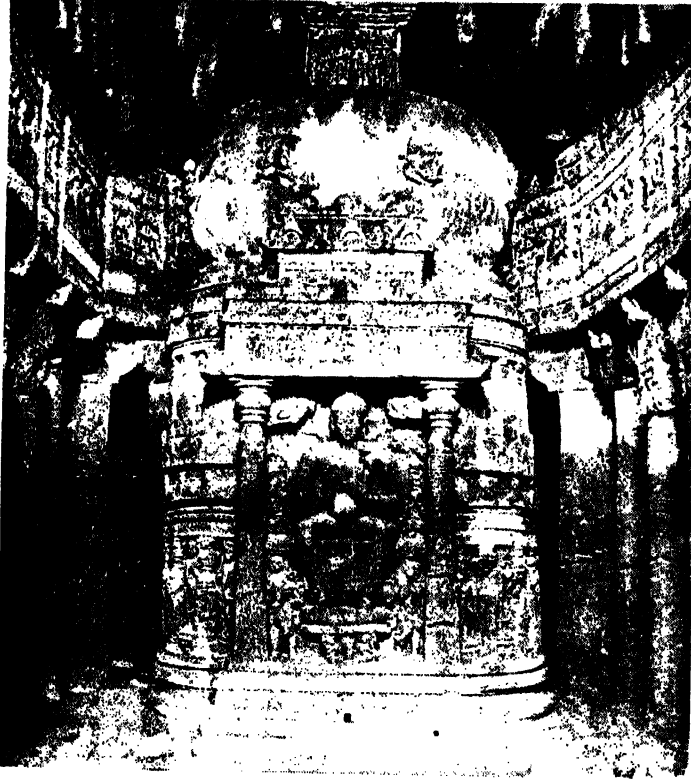
গুহার অভ্যন্তর

বিষয়ই অবলম্বিত হইয়াছে। চিত্রগুলিতে শিল্পীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবোধের আভাষ এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ভঙ্গির বহু পরিচয়ই পাওয়া যায়। একটি চিত্রে দেখা যায় বৃক্ষে সারি বাঁধিয়া পিপীলিকা শ্রেণী আরোহণ করিতেছে—পিপীলিকার মত সাধারণ প্রাণীকে লইয়া রসসৃষ্টি এবং অত ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ গঠনও শিল্পীর চোখে ধরা পড়িতে বাধা হয় নাই, এই উভয়বিধ নৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণতার পরিচয় এই চিত্রখানিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও যে বৃহৎ আকৃতির সদাগরী এবং যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত হইত অজন্তার গুহাচিত্রে তাহারও নিদর্শন আছে। বহু নাগরিকগণ পরিচালিত বিরাট এব সমুদ্রগামী জাহাজ সমুদ্রের মাঝে গতিবানরূপে চিত্রিত হইয়াছে—নাবিকগণ ভারতীয়।

এই অজন্তার গুহা সমূহ হায়দ্রাবাদে অবস্থিত এবং বর্ত্তমানে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক অতি সযত্নে সুরক্ষিত। বহুকাল ইহা অনাহত ভাবে অবহেলায় পড়িয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই এই সকল গুহার দুর্দ্দশা ও হতাদর হইতে আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ গুহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, পুনরায় চতুর্দ্দিকে জঙ্গল গভীরতর হইতে থাকে এবং ভীষণ বন্য জন্তুদের আশঙ্কায় জনসাধারণের পক্ষে চলাচল ক্রমশঃ পরিমিত হইতে হইতে গুহাগুলি বিস্মৃতির অন্তরালে বহুকাল প্রায় অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে। বিশেষতঃ তৎকালীন জনসাধারণ এই সকল গুহাচিত্রের উপযুক্ত কদরও বুঝিতেন বলিয়া মনে হয় না। ক্বচিৎ কখনো কোন বনচারী অথবা পর্ব্বতবাসী সাধু সন্ন্যাসীগণ এই পথে ভ্রমণ করিতে এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং কিছুকাল হয় ত' বাস করিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসীগণের

যে প্রাচীর চিত্রগুলি ধীরে ধীরে মসীলিপ্ত হইয়া চাপা পড়িতে থাকে। অগ্নির উত্তাপে এবং সংস্কার অভাবে ভিত্তিগাত্রগুলি ফাটিয়া কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া খসিয়া নষ্ট হইতে থাকে। এইভাবে বহুশত বর্ষের বিস্মৃতির মাঝে নানা প্রকার দুর্য্যোগ ও অত্যাচারে গুহা এবং গুহার চিত্র সমূহের বহুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। অতঃপর বর্ত্তমান যুগে কতিপয় বিদেশী এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'একজন দেশবাসী মনিষীর দরদমাখা চোখ এই গুহা চিত্রগুলির প্রতি স্নেহপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয্যে চিত্রগুলির উদ্ধার, যত্ন এবং প্রচার ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে।

জনসাধারণ ধীরে ধীরে অজন্তা গুহা এবং শিল্পসম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদের মূল্য বুঝিতে আরম্ভ করে। হায়দ্রাবাদের বর্ত্তমান গুণগ্রাহী নিজাম বাহাদুরও অজন্তার গুহাগুলি সংস্কার ও রক্ষার বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠেন এবং বহু অর্থব্যয়ে সযত্ন দরদের সহিত হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের রক্ষণাধীনে গুহাগুলির রক্ষণাবেক্ষন করিতেছেন। ধোঁয়ার কালিতে এবং বহুদিনের অযত্ন অবহেলায় চিত্রগুলির যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহা পুনরুদ্ধারের ও দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে ইউরোপ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া যথাসাধ্য সংস্কার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার সে চেষ্টা উপযুক্ত সাফল্যলাভে সক্ষম হয় নাই। গুহাগুলির প্রতি নিজাম বাহাদুরের ঐকান্তিক দরদের এমনি আরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

অজন্তার চিত্রাবলী যদিও আজ নষ্টপ্রাপ্ত এবং প্রকৃতপক্ষে চিত্রগুলিকে চিত্রের কঙ্কাল মাত্র বলা যায় তথাপি এই ধ্বংসপ্রাপ্ত চিত্রাবলী দর্শনেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন এই চিত্রগুলি কি অপূর্ব্ব লাবণ্যযুক্ত ছিল। মানব দেহের অঙ্গভঙ্গিই যে কত বিভিন্নরূপে ও ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিতে পারে তাহা এই চিত্রাবলী না দেখিলে শুধু লিখিয়া ব্যক্ত করা অসম্ভব।

অনেকেই বলিয়া থাকেন আমাদের ভারতীয় প্রাচ্য চিত্রকলার রীতিতে অস্থিবিদ্যা বা আলোআঁধার সমাবেশের কোন স্থান নাই এবং সেই অজুহাতে প্রাচ্যরীতির অনুসরণ-কারী আধুনিক কোন কোন শিল্পীগণ তাঁহাদের চিত্রে অস্থিবিদ্যা এবং আলোছায়াকে বর্জ্জন করিয়া এমন সব বিকৃত রূপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন যাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

এইসব শিল্পীগণ যদি অজন্তার চিত্রাবলী একটু মনযোগের সহিত ভাবুকতা বিসর্জ্জন দিয়া সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন অস্থিবিদ্যা ও আলোছায়ার কত সুসমঞ্জ নিদর্শনই সেখানে রহিয়াছে। তবে একথাও ঠিক যে সাত/আটশত বৎসরের এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী বিভিন্ন শতকে বহুবিধ সক্ষম ও অক্ষম গুরু ও শিষ্য শিল্পীগণের দ্বারা চিত্রিত এই গুহা সমূহের চিত্রাবলীর মধ্যে তাহার কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা নিতান্তই ব্যতিক্রম। এই প্রবন্ধের সহিত অজন্তা চিত্রের কয়েকখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইল, নিতান্তই অক্ষম প্রতিলিপি, ইহা হইতে মূল চিত্রের আভাষটুকু মাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অজন্তা গুহার চিত্র সমূহ সাধারণত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃকই অঙ্কিত হইয়াছে তথাপি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়েই ইহার পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বহু ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, আলঙ্কারিক, অদ্ভুত এবং হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গরসাত্মক চিত্রও এই গুহাসমূহে স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের বিবিধ ঘটনার বাহিরেও বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয় যাত্রা, লঙ্কার যুদ্ধ, লঙ্কা জয়, বিজয় সিংহের অভিষেক, পারস্যরাজ খসরু প্রভৃতির ঐতিহাসিক চিত্র, নাগকন্যার প্রণয় নিবেদনের পৌরাণিক চিত্র পদ্মলতা, হংসমিথুন, শঙ্খপদ্মের অপরূপ আলঙ্কারিক চিত্র, উদর
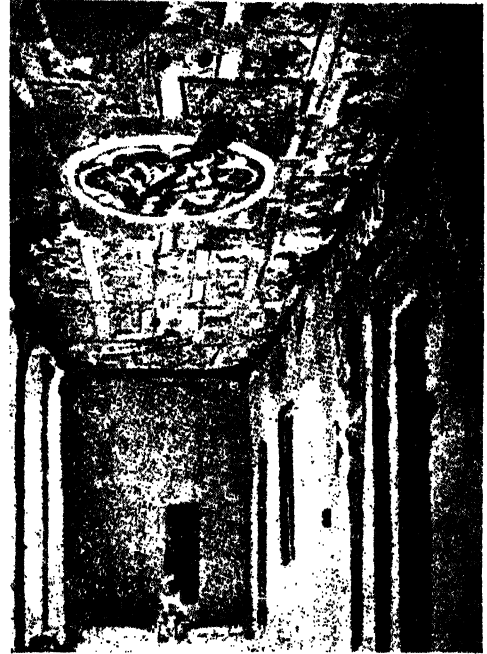
ছাদের অভ্যন্তর ভাগ

অভ্যন্তরস্থ বদন বিশিষ্ট যক্ষনা প্রভৃতির অদ্ভুত চিত্র এবং ফুলবাবু, রঙ্গিনী নাগরিকা, গোপন কথা, বাদ্যবাদন, মাতাল প্রভৃতির ব্যঙ্গ চিত্রাদিও বহু দেখিতে পাওয়া যায়। অজন্তা শিল্পীগন কর্ত্তৃক বিরাট জনতার বৃহৎ সমাবেশ এমন সুন্দর স্বাভাবিক এবং সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে অঙ্কি-

হইয়াছে যাহা দেখিয়া সেই সকল শিল্পীগণের অসীম দক্ষতা এবং পারস্‌পেকটিভ জ্ঞানের অতিবিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তার উনত্রিশটি গুহার মধ্যে ৯ ও ১০ নং গুহাই সর্ব্ব

মাতা ও পুত্র

পুরাতন গুহা—খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতকের কাজের রীতি এই দুইটি গুহায় দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে পুনরায় তাহার সহিত আরও কিছু কাজ নূতন সংযোজিত হয়। এই দুইটি গুহায় Narrative এবং Monumental এই দুই ধরণের কাজের সাক্ষাৎই পাওয়া যায়। ১০ নং গুহায় গান্ধার রীতির কাজেরও পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গুহাতে বরদ এবং অভয় মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়।

৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ নং গুহাদিতে পুরাণো রীতিতে চিত্রাদি অঙ্কিত হইয়াছে—খৃষ্টাব্দ ৪০০ শতক পর্য্যন্ত প্রচলিত রীতির চিত্রের নিদর্শন এই সকল গুহায় বিদ্যমান।

১৬ এবং ১৭ নং গুহায় খৃষ্টাব্দ ৫০০ শতকের কাজ এবং অজন্তা গুহাচিত্রের শিল্পনৈপুণ্যতার চরম উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রাদিকে Humanisticএর পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে।

১ ও ২ নং গুহার চিত্রাদি প্রায় খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই সকল চিত্রাদিই অজন্তা চিত্রের সর্ব্বশেষ নিদর্শন কাজেই অন্যান্য গুহাচিত্রের তুলনায় আধুনিক। অজন্তার সমস্ত গুহার সমষ্টিগত অঙ্কণরীতির কাজের এবং কৌশলের পরিচয় এই ১ এবং ২ নং গুহাতে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত সাতশত বৎসরেরই অঙ্কণ প্রভাব এই শেষ গুহাচিত্রের অঙ্কণ রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে।

অজন্তার প্রাচীর চিত্রসমূহ অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে সেই প্রাচীরগাত্রে সর্ব্বাগ্রে অঙ্কনোপযোগী ভিত্তি তৈরী করিয়া লওয়া হইত। এই ভিত্তি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রাচীরগাত্র অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তদুপরি বেলের আঠা, ভাতের মার, গোবর, মাটি ও চালের তুষ দ্বারা তৈরী একটা প্রলেপ লাগানো হইত—ইহাকে বলা হইত 'বজ্রলেপ'। বজ্রলেপ প্রস্তুত করিতে কোন বস্তু কি পরিমাণ মিশ্রিত করা হইত তাহার মাপ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বজ্রলেপের উপরে সাধারণ চুণ ঘন করিয়া আবার একটি প্রলেপ লাগান হইত এবং এই চুণের প্রলেপকে ডিমের খোলা দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া জমি খুব মসৃণ তেলতেলে করা হইত। অতঃপর এই জমি কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে থাকিতে চিত্রাঙ্কণের কাজ আরম্ভ করা হইত। চিত্রের বহিঃরেখাগুলি (outlines) কালো বা লাল রঙে অঙ্কিত করিয়া ছবির গায় নানাপ্রকার বর্ণ ফলান হইত।

এই সকল চিত্রাদি সমুদয়ই একমাত্র প্রাকৃতিক রঙের সাহায্যে অঙ্কিত। হলুদ রং হরিতাল, নীল রং নীল বড়ি, কালো রং ভূষা, লাল রং লাল মাটি এবং সবুজ রং গাছের পাতা হইতে তৈরী। সাদা রং পাথুরে চুণ অথবা শীলে শঙ্খ ঘষিয়া প্রস্তুত করা হইত। উচ্চশ্রেণীর রাজ-রাজরা বা বনেদি ঘরের লোকেদের এবং দেবমূর্ত্তি সমূহের গাত্রবর্ণ সবুজ রঙে চিত্রিত এবং সাধারণ দাস দাসী পরিচারিকা প্রভৃতিদের গাত্রবর্ণ বাদামি ও মেটে রঙে আঁকা হইয়াছে দেখা যায়। ভাতের মার, চালের গুড়ার জল, তিসি প্রভৃতি দ্বারা রঙ গোলা হইত, কিন্তু তুলি দ্বারা রঙ ব্যবহারের সময় সাধারণত পরিষ্কার জলের সাহায্যেই লাগান হইত। চিত্রাঙ্কণ সম্পন্ন হইয়া গেলে উত্তাপ, শৈত্য, আবহাওয়ার উত্থান পতন ও প্রাকৃতিক নানা বৈষম্য হইতে চিত্রগুলিকে নিরাপদ সংরক্ষণের

অভিপ্রায়ে বেলের আঠা দ্বারা তদুপরি আর একবার প্রলেপ দেওয়া হইত।

অজন্তা চিত্রে তিনটি বিশেষত্ব দেখা যায়, যথা—

১। Decorative flatness

২। Unscientific illusionism এবং

৩। Abstract cubism.

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অজন্তা গুহার শিল্পসম্ভারের মধ্যে ভারতের বহু বিভিন্ন প্রদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসীগণ যে ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিভিন্ন দেশীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোষাকাদি, ঘর বাড়ীর নক্সা ও বৃক্ষাদির সমাবেশে। বঙ্গদেশের চালাঘরের আকৃতিতে অঙ্কিত চালাঘর, বাঙ্গালীর মুখাবয়বের মত লাবণ্য পরিপূর্ণ মুখাবয়ব এবং কদলী বৃক্ষ ইত্যাদির চিত্র সংযোজনায় ইহা পরিষ্কারভাবেই গ্রহণ করা যায় যে, অজন্তা শিল্পসম্ভারের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীদের অবদান প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। আজও কালীঘাটের পটশিল্পের রেখা বর্ণ ও অঙ্কণরীতি অজন্তার প্রাচীন চিত্রশিল্পের রেখা ও বর্ণের মতই সরল ও লাবণ্যপূর্ণ।

অজন্তার জগৎবিখ্যাত শিল্পের মত বৃহৎ যোগ্যতা ও কৃতিত্ব ভারতের বহু প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার প্রাচীন পট ও পাটা চিত্রেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ দেয় যে, অজন্তা গুহাসজ্জায় বাঙ্গালার শিল্পীদের বিশেষ একটা অংশ ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অজন্তাগুহার এই সকল অমূল্য শিল্প-সম্পদের দিকে আমাদের অনুরাগ ও প্রীতি, ইহার প্রতি সযত্ন সদয় ব্যবহার এবং যোগ্য সম্মান দিতে আমরা প্রেরণালাভ করি ইউরোপীয় সমালোচকদের মুখে ইহার প্রশংসা শুনিবার পর হইতে। মাঝে একটা এত দীর্ঘ বিস্মরণের যুগ গিয়াছে যে এই গুহা সমূহ সম্পর্কে প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। বৈদেশিকদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি যখন এই চিত্রাবলীর উপর নিপতিত হইল তখনই ইহার ভাষা বুঝিবার চেষ্টা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইল এবং আমরা পূজা করিতে শিখিলাম। নিরপেক্ষ বিদেশীয় সমালোচকগণ যখন আমাদের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের এবং আমাদের রচিত দর্শনের, কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অঞ্জলীদান করেন শুধু তখনই নিজেদের ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমরা সচেতন হইয়া উঠি। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মিশ্যলে ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্যকে অতি অনুরাগের সহিত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—পরিষ্কার সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত দিবসে অমৃতলোকের সন্তানগণকে লইয়া আমি লিখিতে বসিয়াছি। আজিকার রোমান ও জার্ম্মান সভ্যতা যাঁহাদের সভ্যতার এক একটি টুকরা অংশ মাত্র, সেই হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক এই তিন আর্য্য গোষ্ঠিকে লইয়া আমার এই লেখন প্রয়াস। মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা কিছু এই তিন গোষ্ঠির মানবগণই তাহার প্রথম পত্তন করেন। তাহাদের পবিত্রতা, শক্তি ও ঔজ্জ্বল্য এবং বদান্যতা অসাধারণ। মানব সভ্যতার প্রথম অরুণরাগ—বেদে এবং উহার রঙিন গোধুলি পাই রামায়ণে।

ছবি শুধু দেখিলেই হয় না, দেখার মত করিয়া দেখিবার

বুদ্ধদেব-পত্নী গোপা

জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ছবির বাহিরের দিকটাই শুধু দেখি এবং অতি দ্রুত একটা অভিমত প্রকাশ

পারস্যদূত খসরুর সমাদর

খুব বেশী প্রাধান্য না দিয়া ইহার অন্তরের গভীরতাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছে—ইহা সাধনার বস্তু। বিদেশী শিক্ষা এবং বৈদেশিক চিত্রের বহিঃসৌন্দর্য্যে অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতীয় শিল্পের বিচার করিতে গেলে তাহা অবিচারই হইবে। আমাদের দেশায় এবং ভারতীয় এই শিল্পের উন্নতির দিকে দেশের মনিষীবৃন্দের সহৃদয়তার একান্ত আবশ্যক। দেশীয় শিল্পের প্রধান সহায় দেশীয় সাহিত্য—জাতীয় শিল্পের উপযুক্ত সমাদর করিতে শিল্পরস সম্ভোগের জন্য যে দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজন সাহিত্যিকগণই তাহাদের সক্ষম লেখনী ও প্রচার দ্বারা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করিলে তবেই আমরা দেশী শিল্পের মূল্য বুঝিতে শিখিব।

করিয়া ফেলি। কিন্তু ভারতীয় শিল্পরীতি বহিঃসৌন্দার্য্যকে

জননী এসেছে দ্বারে

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ

বাজারে শঙ্খ বাজারে শঙ্খ
জননী এসেছে দ্বারে—
খুলে দে আজিকে ভবন দুয়ার
বরণ করে নে তারে!
দিকে দিকে আজ আহ্বান ধ্বনি
গগনে পবনে উঠিতেছে রণি,
কুল্ কুল্ কুল্ বন্দনা গাহি
তটিনী নমিছে তারে।
জননী এসেছে দ্বারে!

বিশ্ব আজিকে পুলকে জেগেছে
ছুটিছে ভাবের বন্যা
বঙ্গ-জননী ফুলডালা বাহি'
হয়েছে আজিকে ধন্যা।
কাশের প্রদীপে দীপ জ্বলে ওঠে
বন-কুসুমের পরিমল ছোটে,
বিহগ বিহগী আরতির সুরে
ডেকে যায় বারে বারে—
জননী এসেছে দ্বারে।

জীর্ণ কাঙাল বাঙালী আমরা
বলো মা, পূজি কি দিয়া?
পেটে নাই ভাত ঘর ভেসে গেছে
দেহ ক্ষীণ, হীন হিয়া!
এস মা, এস মা, অভয় হস্তে,
রোগ শোক তাপ ঘুচাও ত্রস্তে—
সাত কোটি নর ডাকিছে কাতরে—
দাঁড়ায়ে যুক্ত করে,
জননী এসেছে দ্বারে।

মাকড়সার জাল

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ছেলের চিঠিখান হাতে পড়ামাত্র দামড়িরামের চোখে এই কঠিন কর্কশ পৃথিবীর চেহারা যেন বদলে গেল। তার আলোহীন অনুজ্জ্বল ছোট ঘর, ঘরের মলিন দেওয়াল, সমস্ত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই চিঠিখানার প্রত্যাশায় পোনেরো দিন ধ'রে সে দিন গুণছে। কোনো কাজে মন বসে না। কাজ ফেলে দিনের মধ্যে বহুবার কেবলই ফিরে ফিরে এসে দেখে, পিওন তার দরজার ফাঁক দিয়ে কোনো চিঠি ফেলে দিয়ে গেছে কি না। বারে বারেই হতাশ হয়ে ফিরে যায়, তবু আবার ফিরে আসে।

পোনেরো দিন পরে সেই বহু প্রত্যাশিত চিঠি অবশেষে এল। তার ছেলের নিজের হাতে লেখা চিঠি! কথাটা ভাবতেও দামড়িরামের হাসি আসে। এই তো সেদিন তাকে দেখে এল, এক ফোটা ছোঁড়া। এর মধ্যে কত বড় সে হয়েছে যে, একেবারে নিজের হাতে চিঠি লিখছে!

দামড়িরাম একলা ঘরে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসতে লাগলো।

কিন্তু সময় সম্বন্ধে তার হিসাব ঠিক থাকে না। যাকে সেদিন মনে করছে, আসলে তা পাঁচ বৎসরের ঘটনা। পাঁচ বৎসর আগে এমনি একটা পূজার সময় সে দেশে গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে মুঙ্গের জেলায়। যেখানে মুঙ্গের জেলা দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে তারই কাছাকাছি। অত দূরে প্রতি বৎসর যাওয়ার সুযোগ তার হয় না। সে রকম ছুটিও পায় না। সে জন্যে গত পাঁচটা বৎসরে আর সে যেতেও পারে নি।

এই পাঁচটা বৎসর তার কাছে বিভিন্ন রকম মনে হয়। কখনও এত দীর্ঘ মনে হয় যে, ভাবতেও তার প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। ক্লান্ত দিনের শেষে বাসায় ফিরে রাত্রের খাবার তৈরী করতে করতে উনানের আলোয় যাদের মুখ সে মনে করবার চেষ্টা করে, তাদের মুখ মনে পড়ে না। আবার কখনও মনে হয়, এই তো সেদিন। ক্ষুদ্র রঘুয়া উলঙ্গ দেহে বিরাটকায় মহিষটাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে চরাতে নিয়ে গেল। তার নিজের সামনে বড়শিতে দুটো টাটকা কচি ভুট্টা পুড়ছে। লছমিয়া উঠানের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে তার দিকে চেয়ে অকারণেই হাসলে।

এই তো সেদিন!

তবু সে পাঁচ বৎসরের কথা। সেদিনের ক্ষুদ্র রঘুয়া আজ নিজের হাতে বাপকে চিঠি লেখে! কে জানে লছমনিয়া আর তেমন ক'রে অকারণে হাসতে পারে কি না!

পাঁচ বৎসর তো কম নয়।

এ বারে গিয়ে হয় তো সে আর রঘুয়কে ধূলায়-ধূসর নগ্ন দেহে দেখতেই পাবে না। সকালে তার পাঠশালা, দুপুরে ক্ষেতের কাজ। কে জানে সে কত বড় হয়েছে!

দামড়িরাম চিঠিখানা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগলো। বড় বড় বাঁকা-বাঁকা অক্ষর। বানান সর্ব্বত্র ঠিক নেই। দুই একটা শব্দ মাঝে মাঝে ছেড়ে গেছে। ভুলে-ভরা চিঠির অক্ষরগুলো যেন শিশু রঘুয়ার মতো তার চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগলো।

চিঠির প্রথমেই রঘুয়া প্রণাম দিয়েছে, শেষে আর একবার। আর মধ্যখানে লিখেছে, এবারে যখন দামড়িরাম যাবে তখন তার জন্যে লাল-সাটিনের পা-জামা, নীল ফুল-তোলা সাটিনের আচকান এবং মাথায় জরির টুপি নিশ্চয় চাই।

বাপরে বাপ!

একেবারে সাটিনের আচকান, পাজামা আর জরির টুপি!

কিন্তু তখনই তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কপির ক্ষেত নীলে ভাসছে। তার উপর ঘনিয়ে আসছে ধূসর পাহাড়ের ছায়া। আকাশে অস্তরাগের বর্ণচ্ছটা। আগে হরিণশিশুর মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে রঘুয়া। পিছনে সে আর লছমনিয়া। রঘুয়ার দিকে চেয়ে ওদের দুজনেরই একটা অপূর্ব্ব আনন্দে

গতি মন্থর হয়ে আসছে। ওরা চলেছে সহরে, বাঙ্গালী-বাবুর বাড়ীতে পুজো দেখতে···

দামড়িরাম স্থির করেছে, আর কিছু হোক না হোক, রঘুয়ার পোষাক একটা কেনাই চাই।

তারপক্ষে ব্যাপারটা খুব কষ্টকরও নয়। বলতে গেলে, রোজগার তার ভালই। কোন্ একটা আফিসে সে বেয়ারাগিরি করে। সেখানে টাকা কুড়ি-বাইশ পায়। এর উপর সকালে খবরের কাগজ ফেরী করে। তাতেও আর গোটা বিশেক টাকা হয়। এর উপর এবং সেইটেই বড় আয়, তার কিছু মহাজনী কারবার আছে। আফিসের যে সমস্ত বাবু এবং সাহেব রেস খেলে, মাসের ১৫ তারিখের পর থেকেই তাদের টাকার দরকার হয়। একটু চড়া সুদে তাদের সে টাকা ধার দেয় এবং মাস-কাবারে মাইনে পেলেই সুদ সমেত টাকাটা পেয়ে যায়। পোনেরো তারিখের পরে আবার ধার দেয়। এমনি ক'রে তার রোজগারের টাকা সুদে আসলে বেশ বেড়ে যায়।

দুপুর এবং বিকেল সে আফিসেই বদ্ধ থাকে। কিন্তু সকালে তার অবসর আছে। ভোর তিনটেয় উঠে তাকে খবরের কাগজের আফিসে আফিসে ছুটতে হয়। সেখান থেকে তার প্রয়োজন মত কাগজ নিয়েই রাস্তায় হাঁটা-হাঁটি আরম্ভ করে। তারপরে পোষাকের দোকান খুললেই, সে ওরই মধ্যে বিশবার শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাজানো পোষাকগুলোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে, কোন পোষাকটা রঘুয়াকে কেমন মানায়।

পুজোর তখনও মাস ছয়েক দেরী। দামড়িরামের পক্ষে ততদিন ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

খামের চিঠিখানা সব সময়ে তার শততালিযুক্ত মলিন পাঞ্জাবীর পকেটেই থাকে। অবসর পেলেই সেটা বার করে পড়ে, পরিচিত কাউকে পেলেই তাকে দেয়।

—দেখো তো ভেইয়া, কেয়া লিখা।

– কোন লিখা?

দামড়ি সগর্ব্বে বলে, মোর লেড়কা।

লোকটা চিঠি পড়ে সহাস্তে ফেরৎ দেয়।

বলে তব কেয়া! লাগ যাও। জাস্তি তো নেহি, খালি খালি সোয়াটিনকো আচকান ঔর পায়জামা।

মুচকি হেসে দামড়ি বলে, ব্যস, উ তো ঠিক হ্যায়। লেকিন মিলতা কাঁহা?

হাম কেয়া জানে। পুছো কিসুকো।

সবই ঠিক আছে। আচকান আর পায়জামা। দামড়ি-রাম যাকে পায় পুছিয়া বেড়ায়, কিন্তু সঠিক কেউ ব'লতে পারে না। সবাই বলে, দেখ, দোকানে দোকানে জিজ্ঞাসা কর। ক'লকাত্তা সহরে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, সোয়া-টিনের আচকান পায়জামা তো সামান্য ব্যাপার।

দামড়িরাম একটা কথা বুঝলে যে, ইতিপূর্ব্বে তার পরিচিত আর কেউ তার ছেলের জন্যে এই মহামূল্য পোষাক কেনে নি। কিনলে, ঠিক কোথায় পাওয়া যায় নিশ্চয়ই বলতে পারতো। সেই কথা ভেবে তার মন গর্ব্বে এবং আনন্দে আরও ফুলে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ক'দিনের মধ্যেই ওর চেহারা চাল-চলন সব এমন বদলে গেল যে, বন্ধুরা ভয় করতে লাগলো, মাথা না খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু ঠিক মাথা খারাপের লক্ষণও নয়।

আগে সে যতখানা কাগজ নিত, এখন তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাঁকছে আরও জোরে। ছুটোছুটি অনেক বেড়েছে। এমন কি দুপুরে টিফিনে যে এক ঘণ্টা সময় পায়, তারও মধ্যে যতগুলো পারে টেলি-গ্রাম বিক্রি করে। এমন কি, ক'লকাতায় যখন ট্রাম পুড়ছে, গুলি চলছে, লোক মরছে, তখন যে সব জায়গায় কেউ যেতে সাহস করে না, সে জায়গায় সে নির্ভয়ে চলে যায়।

এমনি ক'রে তার আয় আরও বেড়ে গেল।

দামড়িরাম অবিশ্রান্ত খাটে, চরকির মতো ঘোরে, আর যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, সোয়াটিনের আচকান আর পায়জামা কোথায় পাওয়া যায়। জড়ির টুপির খবর সে জানতে পেরেছে।

অবশেষে অবশিষ্ট খবরও পেল। একজন তাকে সন্ধান দিলে, কোথায় তা পাওয়া যেতে পারে এবং কত বা তার দাম পড়তে পারে।

অন্য সময় হ'লে দাম শুনে সে ভড়কে যেত। কিন্তু কি যেন ওর হয়েছে। ডাইনে বায়ে ধ্যানমৌন ধূসর পাহাড়, পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত ঘন সবুজ কপির ক্ষেত, মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা সরু আল পথ, তারই উপর সাটিনের পোষাক পরা রঘুয়া,—এই যখন সে কল্পনা করে তখন টাকা যেন আর তার কাছে টাকা বলে মনে হয় না।

কিন্তু সাটিন কিনতে গিয়ে সে পড়লো মুস্কিলে। রঘুয়ার মাপ তার কাছে নেই। মাপ সে পাঠায়নি, পাঠানার প্রয়োজনই বোধ করে নি।

হতবুদ্ধির মত সে চারিদিকে চাইলে।

দোকানে আরও কতগুলি ছেলে আছে নানা বয়সের। তারাও এসেছে কিনতে তাদের দিকে চেয়ে ও একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। যেটির দিকে চায়, মনে হয় ওরই মতো হবে বোধ হয়।

অনেকক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে ও দোকান থেকে বেরিয়ে এল। কোমরে গোঁজলে তার নোটের তাড়া। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে কিনতে। কিন্তু হ'ল না।

মনটাই তার খারাপ হয়ে গেল।

অবশ্য এখনও অনেক সময় আছে। মুঙ্গের জেলা খুব বেশী দূরে নয়। আজকেই যদি সে চিঠি দেয়, হপ্তা-খানেকের মধ্যে মাপ চলে আসবে। বড় জোর দশ দিন লাগবে। তাই সে করবে। তবু প্রথম চেষ্টাতেই নিরাশ হয়ে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল।

একবার হাসিও এল। কত দিন হ'ল রঘুয়ার চিঠি এসেছে, কিন্তু মাপের কথাটা একবারও তার মনে হয় নি। আশ্চর্য্য! রঘুয়া না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু সে নিজে তো আর ছেলেমানুষ নয়!

বাসায় ফেরামাত্র একটা হট্টগোল আরম্ভ হইল,—

—"কি এনেছিস দেখি! দেখি!"

দামড়িরাম বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে বললে, "কিছুই না। মাপ নেই।"

—"আরে মাপে কি হবে, তোর ছেলে তোর আন্দাজ নেই?"

লজ্জিত হাস্যে দামড়িরাম বললে, "পাঁচ বছর দেখি নি।"

কথাটা ভাববার মতো

কিন্তু বন্ধুরা নিরুৎসাহ হ'ল না। পাশের একটা নয় দশ বছরের ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "এই রকমই হবে আর কি!"

দামড়িরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখলে। বললে, "ওর চেয়ে লম্বা হবে। শরীরটা ভালো কি না।"

বন্ধুরা বললে, "তাহ'লে ঐটের মতো?

ব'লে আর একটি ছেলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

দামড়িরাম ভেবে বললে, "আর একটুকু ছোট হবে। দেখি, সোজা হয়ে দাঁড়া দেখি?"

ছেলেটি হাসতে হাসতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—"হঁা, আরেকটুকু ছোটই হবে বোধ হয়। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

দামড়িরাম আবার লজ্জিত ভাবে হি-হি ক'রে হাসলে। কিন্তু তখনই উৎসাহভরে হাতে তালি বাজিয়ে বললে, "কুছ পরোয়া নেই ভাই। চিঠি ভেজ দিয়েছি, হপ্তার মধ্যে মাপ আঁযায়েগা।"

কিন্তু মনটা তবু কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগলো।

•

দামড়িরাম চিঠি দিলে, কিন্তু পোনেরো দিনের মধ্যেও তার উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

নিজে সে খবরের কাগজ ফেরি করে। সকাল বেলাতেই একখানা কাগজ ঊর্দ্ধে তুলে চীৎকার করতে করতে ছুটে, "হো গিয়া হায়, হো গিয়া হায়!"

কিন্তু কি যেন হয়ে গেল, সে নিজেও জানে না।

যতদিন যায়, চিঠি আসে না, আর সে মুষড়ে পড়ে। এখন আর সে তেমন উৎসাহভরে জোরে জোরে হাঁকতে পারে না।

বেনেটোলার মোড়ে একটা মেসে সে কাগজ দেয়। ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেকের জন্যে কাগজখানা নেন, পড়েন, তারপরে আবার ফেরৎ দেন। দামড়িরাম কাগজখানা

আবার পুরো দামে বিক্রি করে। ভদ্রলোকের সুবিধা এই যে, আধখানা কাগজের দাম সে শুধু শুধুই লাভ করে।

দামড়িরামের কাজ হয়েছে, প্রথম কাগজখানাই সে ছুটতে ছুটতে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে দেয়। অত ভোরে ভদ্রলোকের সব দিন হয় তো ঘুম ভাঙে না। যে-দিন ভাঙে, দামড়িরাম কাগজের বাণ্ডিল বগলে নিয়ে তাঁর দরজার চৌকাঠে উবু হয়ে বসে।

বলে, আগে হামকো মুঙ্গেরকা খবরঠো দেখিয়ে তো।

মুঙ্গেরের খবর কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। ভদ্রলোক তারে প'ড়ে-প'ড়ে শোনান: কোথাও উন্মত্ত জনতা রেল লাইন তুলছে, টেলিগ্রাফের তার কাটছে, রেল-ষ্টেশন, থানা আক্রমণ করছে,—বিনিময়ে গুলী খাচ্ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে, পাইকারী জরিমানা দিচ্ছে। সব দিকে ট্রেণ চলছে না, ডাক যেতে দেরী হচ্ছে, আরও কত কি। এই সবই অবশ্য তার মুঙ্গের জেলায় নয়। এক একদিন এক এক জায়গার খবর। কিন্তু এর মধ্যে মুঙ্গেরও আছে।

যে-দিন মুঙ্গেরের কোনো খবর থাকে না, সে-দিন দামড়িরাম খুশী হয়। বলে, আর সব ঠিক হো গিয়া হ্যায়, না বাবুজী?

বাবুজী তামাক টানতে টানতে বল্লেন, কি জানি বাবা।

দামড়িরাম বিজ্ঞের মতো বলে, উ তো ঠিক বাৎ বাবুজী। হামকো মালুম হ্যায়, পূজাকা বিচমে সব ঠিক হো যায়ে গা।

সে কাগজ আকাশে তুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু যে-দিন মুঙ্গেরের খবর থাকে, সে-দিন সে দ'মে যায়।

—তব তো বহুৎ মুস্কিলকা বাৎ হ্যায় বাবুজী!

বাবুজী সাড়া দেন না।

দামড়িরামের বুকে যেন একটা জগদ্দল পাথর চেপে ব'সে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। হাতের কাগজগুলো তার কাছে ভারি মনে হয়। প্রভাতের সোনালী আলো, পথে-পথে ছেলে মেয়ের হুড়া-হুড়ি কিছুই তার ভাল লাগে না। হাতের কাগজগুলো পরিচিত অন্য হকারকে দিয়ে সে বাসায় ফিরে আসে।

বিস্মিত হকার বলে, কেয়া হুয়া দামড়ি?

—তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়।

কিন্তু বাসায় ফিরেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় করতে চায়, কিন্তু তার পথ পাচ্ছে না। তাই কোথাও তাকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না।

সে একবার শোয়, একবার উঠে বসে। কখনও বা সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাইচারী করে। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না।

অবশেষে পাড়ার বাঁকের মুখে দাওয়ায় বসে বাবুরা যেখানে চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, সেইখানে গিয়ে নিঃশব্দে একপাশে বসে। তাদের উদ্দাম রাজনৈতিক আলোচনা শোনে। কিন্তু যা শোনে, তাতে তার বুকের রক্ত একেবারে শুকিয়ে যায়।

তবু নিষ্কৃতি নেই।

খবরের কাগজ অন্য হকারকে দেওয়া যায়। লাভটা না-ই পেল, আসল দামটা ফেরৎ পাবে। কিন্তু আপিসের কাজে তো আর পরিবর্ত্তন চলবে না। সে কাজ তার নিজেকেই করতে হবে।

দামড়িরাম মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে হোটেলে যায়। সেখানে দু'টি খেয়ে আপিস যাবে।

অবশেষে পূজা এসে গেল। মধ্যে আর দু'টি দিন বাকী।

রঘুয়ার কোন চিঠিই এল না। না চিঠি, না মাপ। কিন্তু তার জন্যে লাল সাটিনের পায়জামা, ফুলতোলা নীল সাটিনের আচকান, এবং জরির টুপী দামড়িরাম কিনবেই।

যে ছেলেটিকে মাথায় রঘুয়ার মতো হবে বলে তার মনে হ'ল, তারই মাপে সে কিনলে। হয় তো একটু বড় বড় হবে, তা হোক। কিছুদিন পরতে পারবে। ওদের এখন বাড়ার বয়স। এ মাসের জামা ছ'মাস পরে আর গায়ে হয় না।

দাম লাগলো অনেকগুলো টাকা। কিন্তু তা গায়ে লাগলো না। বাসায় গিয়ে মলিন ঘরের স্তিমিত আলোকেও সেগুলো খুলতেই চোখের সামনে যেন ঝলমল ক'রে উঠলো। রঘুয়ার মুখ তার ভালো মনে পড়ে না। সে যে কত বড় হয়েছে তাও জানা নেই। তবু এই সুন্দর ঝলমলে পোষাকে তাকে কল্পনা করতেই দামড়িরামের মনও আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

ষ্টেশনে সে রোজই গিয়ে খবর নেয়। ট্রেনের গোল এখনো ভাল ক'রে মেটে নি সে খবরও সে জানে। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবেই। পূজার ছুটির দু'দিন আগেই এক মাসের জন্যে বিনা মাইনের ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

ছুটির দু'দিন আগে, তবু ভিড় বেশ। কিন্তু ওরই মধ্যে কোন রকমে একটু বসবার জায়গা সে ক'রে

নিল এবং বর্দ্ধমানে পৌঁছুবার আগেই পাশের লোকটির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলে। সে যাবে আরও দূরে, পাটনা ছাড়িয়ে।

লোকটি ভালো। মেছুয়াবাজারে তার কয়লার দোকান আছে। রামজির কৃপায় মন্দ চলে না। ছেলে লায়েক হয়েছে। ছ'মাস ধরে তাকে দোকান চালানো শিখিয়ে, সে এখন দেশে চললো। এখন আর ফিরবে না।

দামড়িরামের রঘুয়ার কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল সে-ও বুড়ো হয়ে আসছে, শরীরে আর বল নেই তেমন। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। একটুতে ক্লান্ত হয়। তারও যেন বিশ্রাম নেবার সময় হয়ে আসছে।

মনে হ'ল রঘুয়াও তার লায়েক হয়েছে। নিজের হাতে সে চিঠি লিখতে পারে। ন'দশ বছর বয়সও তো নিতান্ত কম নয়। স্থির করলে ফেরার সময় তাকে ক'লকাতা নিয়ে আসতে হবে। লেখা পড়া যা হয়েছে ওতেই হবে। এবার সাইকেল চড়া শেখাতে হবে। কোন্ কাগজের আপিস কোথায় চেনাতে হবে। সঙ্গে ক'রে ক'রে ঘোরাতে হবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজও বিক্রী করাতে হবে। এ সবেও সময় কম লাগবে না। তার শরীর মজবুৎ থাকতে-থাকতেই এ সব শেখানো দরকার।

নাঃ, আর বিলম্ব করা চলবে না।

খবরের কাগজ বিক্রিতে 'নাফা' কম নয়। বহুলোক শুধু খবরের কাগজ বিক্রি ক'রে 'লাল' হয়ে গেছে। নসিবে থাকলে রঘুয়ার পক্ষে লাল হওয়াও অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হু-হু শব্দে ট্রেণ ছুটে চলেছে।

দামড়িরামের তন্দ্রা আসছিল। আশা, আনন্দ, স্বপ্নে ভরা সুন্দর তন্দ্রা। তারই মধ্যে ট্রেণ চলেছে তার নিজের আনন্দে।

যখন ট্রেন কিউলে পৌঁছুলো তখন পাশের সেই কয়লাওয়ালার ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙলো। আর কয়েকটি ষ্টেশন পরেই তার নিজের গ্রামের ষ্টেশন।

কিন্তু উঠতে চেষ্টা ক'রেও দামড়িরাম উঠতে পারে না। তার মাথাটা কে যেন প্রচণ্ড জোরে বেঞ্চের উপর চেপে ধরেছে। কে যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

তার প্রবল জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ। কিন্তু জ্ঞান আছে।

ট্রেণের সহযাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—সঙ্গে কেউ আছে?

কেউ নেই কিন্তু তার ভরসা আছে, ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে সে যেতে পারবে। ষ্টেশনের পাশেই তার গ্রাম। চেষ্টা করলে হয় তো হেঁটেই যেতে পারবে। নয় তো কারও কাঁধে ভর করে। তার লোকের অভাব হবে না।

জিনিষপত্র সঙ্গে বেশী কিছু ছিল না। সহযাত্রীরা ধরাধরি ক'রে তাকে নামিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার পোঁটলাটিও। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, লাল সাটিনের পায়জামার একটা প্রান্ত।

কয়লাওয়ালা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, সাহেবজাদাকো?

দামড়িরাম হেসে বললে, হাঁজি। মেরে গরিবজাদাকো।

সে তখন ঠক ঠক ক'রে জ্বরের ধমকে কাঁপছে। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। ট্রেণ চলে গেল। পুঁটলিটিকে কোলে ক'রে সেইখানে প্ল্যাটফর্ম্মের উপরই ব'সে পড়লো।

ষ্টেশনের লোকেরা ধরাধরি ক'রে তাকে ষ্টেশনে নিয়ে এসে একটা বেঞ্চে শুইয়ে দেয়। তার বাড়ীতে খবর দিতে আপনার লোকেরা ছুটতে ছুটতে এল। আলুথালু বেশে এল লছমনিয়া।

তখনও দামড়িরামের জ্ঞান আছে।

পুঁটলির একপ্রান্তে উঁকি দিচ্ছে লাল সাটিনের পায়জামা। সেই ইঙ্গিত ক'রে লছমনিয়াকে বললে, রঘুয়াকো।

রঘুয়ার পায়জামা দেখামাত্র লছমনিয়া আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না। একটা অব্যক্ত শব্দ ক'রে ত হয়ে প'ড়ে গেল।

দামড়িরাম প্রথমটা লাল চোখ মেলে সকলের দিকে অবাক হয়ে চাইতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরী হল না পুঁটলিটা হাত থেকে নীচে পড়ে গেল।

একুশ দিন পরে যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন সে নিজের ঘরে মলিন কাঁথায় শুয়ে।

চারিদিকে চোখ মেলে চেয়ে কি যেন মনে করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। শ্রান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে।

ঘরের কোণে একটি মাকড়সা নূতন শিকারের জন্যে তার জালখানা গভীর মনযোগে রিপু করছিলো।

নব বসন্তে রৈবতক

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শীতের কুহেলী শেষ
মৃদুমন্দ বহে মধু বায় ।
কিশোরীর শ্যাম অঙ্গে
উচ্ছল লাবণ্যসম—
শ্যাম-শোভা রৈবতক পাহাড়ের গায় ॥
মধু-মত্ত বন-বীথি—
ফোটে ফুল
গুন গুন্ ভ্রমর গুঞ্জন !
প্রেমিকের হৃদি-তন্ত্রী
সহসা ধ্বনিয়া ওঠে
মুহুর্মুহু জাগে শিহরণ ॥
হেনকালে বনানীর স্নিগ্ধ কেলি হ'তে
গাত্র পুষ্পে সুসজ্জিতা
যেন এক সঞ্চারিণী বসন্ত লতিকা
"কে তুমি,—কোথা তুমি গেলে" বলি—
কার খোঁজে বাহিরিল
ওই মুগ্ধা আকুলা বালিকা ?
দূরে—এক প্রান্তে বসি—কে ওই পুরুষ
সরল তমাল-নিভ
দীর্ঘ বপু শ্যামল সুন্দর
কপোল বিন্যস্ত কর—
আঁখিলোর ঝরে ঝরঝর ;
সহসা পড়িল দৃষ্টি
ফুকারিয়া উঠিল বালিকা
ছুটিয়া আসিল ব্যস্তে
কাছে তার দিল আসি দেখা ।
"দাদা, পূর্ণিমার নিশি,
হাসে চাঁদ ভুবন ভুলায়
ছড়ায় ফুলের বায় মলয় হিল্লোল,
বিলোল উৎসব-মদে নিখিল ভুবন
এহেন সময়—
মলিন বদনে, বিষণ্ণ নয়নে
এক প্রান্তে কেন গো বসিয়া ?
আজি সে উৎসব-রাত্রি
একেবারে গেছ কি ভুলিয়া ?"
চমকি উঠিল বিশ্ব
চমকিল পুরুষ প্রবর,
মানবের কণ্ঠ একি—
কিম্বা বন-বিহঙ্গের
কল কণ্ঠ-স্বর !
"কেরে ভদ্রা ! আয় আয় বোন,
আয় কাছে আয়
মায়ার পরশে তোর
ছিঁড়ে দেবে
এ নির্মম বন্ধন-শিকল !"
"কেন গো চঞ্চল ? কেন আঁখিজল ?
উৎসবে কি নাহি ধায় মন ?"
"উৎসব ! উৎসব ! হায় ভদ্রা !"
'ওই—ওই শোন সঙ্গীত ঝঙ্কার
অলঙ্কার, নূপুর-নিক্কণ !
মৃদঙ্গ-মঞ্জীর-কলস্বন
ওই আসি পশিছে শ্রবণে—
আনমনে আর নাহি রও
চল মিশি উহাদের সনে ।"
"হায় ভদ্রা, মন যে রে অবশ আমার,
বল ভাই, এরে লয়ে কোথা আমি যাই
ওই মত উৎসবের বাঁশী
ওই মত আনন্দ উল্লাস
শুনে হয় অধীর উদাস
বহুদিন বিস্মরিত
জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখ-স্মৃতি মোর
হাহাকার ক'রে ওঠে
ভগ্ন ছিন্ন মরমের মাঝে !"
অভিমান খিন্ন হল বালা
নীল নেত্রে দেখা দিল
অমল মুকুতা নিন্দী
বিন্দু কয় স্নিগ্ধ অশ্রুকণা !
বলে—"যে সুখ স্মৃতির কথা
এত ব্যথা দেয় গো তোমারে
আমারে সে কহিতে কি মানা ?"
—"না না—বোন নহে সে আমার
কাহিনী সে এতই মরম-স্পর্শী
এতই করুণ, ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়—
বুঝি সে আমার !"
"কাহার কাহিনী তবে ?
কেবা জ্ঞানী কেবা গুণী ?"
—"নয় বোন, নয় জ্ঞানী, নয় গুণী
নয় কোন বীরেন্দ্র যুবক
ছিল এক রাখাল বালক,
বৃন্দাবনে কালিন্দীর তীরে
মহানন্দে চরায়িত ধেনু,
বেণু-রবে তার উজান বহিত যমুনায়
ছিল সখা সুবল, শ্রীদাম,
বসুদাম, শ্রীমধুমঙ্গল,

রঙ্গময়ী ছিল সখী রাধা
প্রাণময়ী হৃদয়ের আধা,
ক্ষণিক বিরহে তার
সারাবিশ্ব হতো অন্ধকার,
কত সাধা—কত কাঁদা,
কত হতো পায় ধরাধরি
দিবস শর্ব্বরী জ্ঞান না থাকিত।"
সহসা থামিল বাণী!
ভাবাবেগে বুঝি হায় কণ্ঠরোধ হ'ল।
অধীরা সরলা বালা
সাশ্রুনেত্রে কহিতে লাগিল—
"কী সুন্দর কী সুন্দর হায়—
অমরার চিত্র কি এ
কিম্বা এই মাটির ধরার!"
—"এ মাটিরি চিত্র ভাই"
রুদ্ধকণ্ঠে কহিলা পুরুষ
"এ মাটিই স্বর্গ হ'য়ে ওঠে—
মানুষ যদি রে পায় প্রাণের মানুষ"
"তাই?—কিন্তু একি?
কণ্ঠ কেন রোধ হ'য়ে আসে
অশ্রুর প্রবাহ ভাসে নয়নের কোণে?
বল বল কহিতে তাহার কথা
কেন হেন হ'ল?
সে রাখাল ছিল কি তোমার কেহ?"
"কেউ নয়—কেউ নয় ভাই,
আমি যে রে রাজপুত্র রাজার দুলাল
সে রাখাল—আমার কে হবে?"
—"তবে?—" "আজ আর থাক বোন
বয়ে যায় উৎসবের বেলা—!"
"যাক্ বয়ে—চাই না উৎসব
বল বল—কিবা হল তারপর?"
"তারপর ফুরাল সুখের বেলা,
সন্ধ্যা এল অন্ধকার ল'য়ে,
নীলাকাশে আর ফিরে চাঁদ না উঠিল
কালমেঘে ছেয়ে গেল সমস্ত জগৎ?"
"কেন?" "হায় বোন, এমনি যে হয়
অশ্রুর প্রবাহে গড়া এ পাপ ধরায়
হাসি তরে নাই যে রে তিলমাত্র স্থান,
শুধু কান্না—কান্না শুধু বিধাতার
নিষ্ঠুর বিধান,
বিদ্যুৎ-চমক সম
হাসি যদি ক্ষণতরে
চুরি ক'রে কভু দেখা দেয়
অমনি পলায় সচকিতে,
চল, ওঠ,
যাবে না উৎসবে?"
"না-না-চাই না উৎসব—
বল বল কিবা হ'ল তারপর!"
"তারপর আইল বিপ্লব,
সাঙ্গ হ'ল সকল উৎসব—
শ্যামলী ধবলী,—লালী গাভীগুলি
শুষ্ক হ'ল সব—ভুলে গেল উচ্চ হাম্বারব,
পাখীদের কলরব সহসা মিলাল,
উষ্ণবায়ু বহিতে লাগিল
গাছে গাছে ফুল না ফুটিল
ঝ'রে গেল নবপত্র নূতন মঞ্জরী—
যমুনার নীল বারি—
মন্দানিল-আন্দোলিত-আনন্দলহরী সনে
বৃন্দাবন কোথায় লুকাল!"
"আহা—কেন? কেন বল হল গো এমন?"
"অভাগা রাখাল এতসুখ ভাগ্যে না সহিল।"
"আহা—আজি কোথা সে অভাগা?
কোথা প্রাণসখী শ্রীরাধিকা তার?"
"আজ আর থাক বোন
ওই বাজে উৎসবের বাঁশী
চল মিশি উহাদের সনে।"
"না—না—চাই না মিশিতে
বল আগে কোথায় রাখাল?
কোথা বিনোদিনী
রাধারাণী তার?"
"হায় বোন্ মরেছে রাখাল।
প্রাণাধিকা সে রাধিকা তার—"
বাক্য আর হল নাক শেষ
সহসা প্রবেশে যুবা
বীরবপু—দীপ্তযোদ্ধ-বেশ।
চকিতা লজ্জিতা বালা
অনিচ্ছায় পলাইল ছুটে
বন্ধুরে বসাল বন্ধু
সমাদরে ধরি করপুটে।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব

শ্রীকালিদাস রায়

এক

কবি যে প্রেমের কথা তাঁহার কবিতায় বলিয়াছেন—তাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থদ্যোতনাও যে হয় না তাহা নহে। প্রেম গভীর হইলেই তাহা লৌকিক গণ্ডী ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যায়—রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকিলেও তাহা হইত। কবিতাগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও বিশেষ নাই—কিন্তু বৃন্দাবনলীলার চিরন্তন স্বরূপের আলোকপাতে ইহা আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনী Romantic কবিতাগুলিকে একটা Mystic Interpretation দান করিতেছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রেম-কবিতাগুলি লৌকিক জীবনের দিকেই আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। চণ্ডীদাসের প্রেমের গান শুনিয়া ভক্তের চিত্ত স্বতই উর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত আমাদেরই চারিপাশের সমাজ-সংসারের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—

> এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
> দীন মর্ত্তবাসী এই নর-নারীদের
> প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
> তপ্তপ্রেমতৃষা?

ইহাতে চণ্ডীদাসের গানের সাহিত্যিক মূল্য বিন্দুমাত্র কমিতেছে না। কারণ, লৌকিক গণ্ডীর মধ্যে গানগুলির অবস্থান হইলেও উহাদের গভীরতম বাণী অতিলৌকিক রসলোকেই পৌঁছিতেছে। অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ্যমানতা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি না। কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থও ব্যঙ্গার্থ মাত্র। ব্যঙ্গার্থের আবিষ্কার ও রসাস্বাদন এক কথা নয়। ব্যঙ্গার্থের আবিষ্কার রসাস্বাদনে সহায়তা করে মাত্র কোন কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেই তাহা রসোত্তীর্ণ হইল না। বাচ্যার্থের সাহায্যে যেমন কোন কবিতা যে-ভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যেও তাহাকে সেই ভাবেই রসোত্তীর্ণ হইতে হইবে—নতুবা তাহা ধর্ম্মতত্ত্ব হইবে—কাব্য হইবে না। অবশ্য যে-কবিতা আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যে রসোত্তীর্ণ হয়—তাহাকে আমরা অনেক সময় Mystic কবিতা বলিয়া থাকি।

চণ্ডীদাসের কবিতার Mystic মূল্য যাহাই থাকুক—লৌকিক মূল্যেও তাহা রসোত্তীর্ণ। এখানে কবিতাগুলির লৌকিক মূল্যের কথাই বলিতেছি। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি—তিনি লৌকিকতার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন।

"আমি কুলশীল লাজ মান ভয় সমস্ত জয় করিয়া হে জীবনদেবত তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, চারিদিকে লোকগঞ্জনায় প্রাণধারণের উপায় নাই—তোমার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম তবু তুমি বাম হইলে। হে প্রিয়তম, আমি তোমার চির দাসী, তুমি বিমুখ হইবে হও আমি চিরদিন সকল জ্বালা সহিয়া তোমাকেই ধ্যান করিব।"—চণ্ডীদাসের রাধা যদি এইভাবে আক্ষেপ করিত, তাহা হইলে মধুররসের সহিত অধমরসের মিশ্রণ ঘটিয়া যাইত এবং লৌকিকতারও অভাব হইত। বিদ্যাপতির আদর্শ আসিয়া পড়িত। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে মহাসিন্ধু, চিন্তামণি, কল্পতরু, গিরিবর ইত্যাদির সহিত উপমিত করিয়া বলিয়াছেন,

> শাঙনমেহ যব বিন্দুনা বরখব সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
> গিরিবর সেবি ঠাম নাহি পাওব বিদ্যাপতি রহ ধন্দে॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন—"হে শঠ, তোমার বাঁশী আমাকে পাগল করিয়াছিল। আমি সরলা গোপবালা, সেই বাঁশী শুনিয়া আমার জীবন-যৌবন সমস্ত তোমাকে সমর্পণ করিলাম। এজন্য কুলশীল লাজভয় সমস্তে তিলাঞ্জলি দিলাম—এ-দেহ আমার কুবচনে ভাজা। এত জ্বালা যাহার জন্য সহিলাম—সে এমন খল, এমন শঠ তাহাত জানিতাম না। পিরীতির যে এতজ্বালা তাহা জানিলে কি খলের কথায় বিশ্বাস করি? এইরূপ শঠের সঙ্গে পীরিতি আর কেহ যেন না করে। তোমাকে ভুলিবার জন্য আমার চেষ্টার অবধি নাই—পাছে

তোমাকে মনে পড়ে তাই কাল কাঁচুলি ত্যাগ করিয়াছি—মেঘপানে চাহি না—যমুনার জলে যাই না। কিন্তু এমনই শেল তুমি হানিয়াছ যে মর্ম্ম হইতে তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেছি না, তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছি—তোমাকে যে কিছুতেই ভোলা যায় না। এখন উপায় কি? একবার ভাবি বিষ খাইয়া মরি কিংবা যমুনার জলে ঝাঁপ দিই—আবার ভাবি জীবন গেলে জ্বালা জুড়াইবে—কিন্তু বঁধুয়াকে ত' পাইব না। জীবন থাকিলে একদিন না একদিন তোমাকে পাইতেও পারি।"

এই যে রাধার মুখের কথা ইহাই মানবসংসারের নিখিল রাধার কথা। চণ্ডীদাস এই বিশ্বের সকল রাধার প্রাণের বাণীকেই সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা দান করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাঁথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারানিশি সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে॥

সমাজসংসার প্রেমের মর্যাদা বুঝে না—তাহারা বুঝে নিজেদের বিধিবিধান নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা। তাহারা যখন নিয়মশৃঙ্খলার বিধিবিধান রচনা করিয়াছে—তখন তাহারা সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রেমকে তাহারা হয় বিলাস—নয় স্বপ্ন—নয় অলীক মোহ মাত্র মনে করিয়াছে। প্রেমের অন্তস্তলের গভীর সত্যকে তাহারা স্বীকার করে নাই। তাহারা বলে—প্রেম করিতে হয় আমাদের বিধিবিধান মানিয়া আমাদের শাসনেই প্রেম কর। তাহা যদি না কর আমরা তোমার দণ্ড দিব—আমরা তোমার বৈরী হইয়া দাঁড়াইব।"

গোড়ায় নিয়মশৃঙ্খলার হয় ত' এত বাধা-বাঁধন ছিল না। তারপর ক্রমে লোকাচার, কুলাচার, জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক বিধিবিধানের জটিলতা ও কড়াকড়ি বাড়াইয়া দিয়াছে। সামাজিক সংস্কার ও প্রেমের এই দ্বন্দ্ব সকল দেশের সম্বন্ধেও খাটে।

প্রেমের আকর্ষণ দেশকালাতীত সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্মের উপর নির্ভর করে—প্রেম কোন দেশবিশেষের সমাজ বা সংসারের নিয়মশৃঙ্খলার শাসন মানিয়া চলে না।

সামাজিক বিধিবিধানের জটিলতাই জটিলা, তাহার প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থার ভ্রূকুটি-কুটিলতাই কুটিলা এবং প্রেমই রাধা।

সমাজ সংসারের শাসনে অবলা বালিকা একজনকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে সে বাহির হইতে প্রেমের আহ্বান না পাইয়া প্রেমালোকহীন জীবনযাপন করিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের আহ্বান পাইয়াও ক্ষোভার্ত্ত চিত্তে আত্মসংবরণ করিয়া সে চলিতে পারে—কিন্তু প্রেম যেখানে অত্যন্ত গভীর অত্যন্ত দুর্নিবার, সেখানে সে সমাজ সংসারের শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। সে সকল বাঁধন কাটিয়া সিন্ধুর উদ্দেশ্যে শৈবলিনীর মত ছুটিয়া যায় তখন সমাজ-সংসারের সকল অস্ত্র উদ্যত হইয়া উঠে—সহস্র রসনা ফণা তুলিয়া বিষোদ্গারণ করিতে থাকে। প্রেমিকার জীবনে তখন দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—এ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ, প্রেমের ইহাই দারুণ দণ্ড। এইখানেই শেষ নয়—ইহার উপর যাহার জন্য এত জ্বালা সে যদি উপেক্ষা করে অথবা ভুলিয়া থাকে—তাহা হইলে প্রেমিকার আক্ষেপের অবধি থাকে না। জগতে এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। ইহা প্রেমাহত অবলা-জীবনের নিদারুণ Tragedy, এ সংসারে ঐ হতভাগিনীর মত অসহায় নিরাশ্রয় যেন কেহই নাই। এই অবলা-জীবনের গূঢ় গভীর বেদনার বাণী আমরা চণ্ডীদাসের কবিতায় পাই। শ্রীমতীর অন্তরে জগতের নিখিল উপেক্ষিতা প্রেমিকা এককণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহাই চণ্ডীদাসের কবিতার লৌকিক রূপ।

অভিমানিনী শ্রীমতী কখনও প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছেন, কখনও তাঁহার উদ্দেশ্যে কাকুতি করিতেছেন, কখনও সমাজ-সংসারকে গালি দিতেছেন—কখনও প্রেমেরই নিন্দা করিতেছেন—কখনও প্রেমাস্পদের কপটতাকে নিন্দা করিতেছেন—কখনও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন—কখনও নিজের অশরণতার কথা বলিতেছেন এবং কখনও মৃত্যু কামনা করিতেছেন। এই আক্ষেপের জন্য আধ্যাত্মিক অর্থের প্রয়োজন নাই—শ্রীমতীকে স্বয়ং লক্ষ্মী বানাইবার প্রয়োজন নাই—কোন তত্ত্বের সাহায্য লইয়া এই আক্ষেপের ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। জগতের সকল প্রেমিকার প্রাণের বাণী যাহা তাহাই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সার্ব্বজনীন মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীদাস যে ভাষায় শ্রীরাধার আক্ষেপাভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে একদিকে পুরা বাঙ্গালীর ঘরাও ভাব আছে—তেমনি অন্তদিকে সার্ব্বজনীন আবেদন (universal appeal) আছে—একদিকে যেমন মনে হয় এই রাধা আমাদেরই গ্রামের এমন কি আমাদের পাড়ারই রাধা—অন্ত দিকে মনে হয় এ যেন যুগযুগান্তরের দেশদেশান্তরের রাধা।

চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখানি কল্পিত, কিন্তু রাধাটি একেবারে বাস্তব। স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে সত্যের এমন প্রতিষ্ঠা জগতের অল্প সাহিত্যেই আছে।

যে রাধা বলিয়াছেন প্রেমের জন্ত 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' তাঁহার জীবনে ঘর ও বাহির (Home and the world) দুইই পাইতেছি—বাঙ্গালার নিজস্ব পল্লী জীবনই ঘর, বিশ্বজনীনতাই বাহির।

রাধা বলিতেছে—

> কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
> যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
> আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
> এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
> মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
> দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
>
> ...
>
> ছার দেশে বসতি নাই দোসর জনা।
> মরমের মরমী নৈলে না জানে বেদনা॥

প্রেমের স্পর্শ সকলের ভাগ্যে ঘটে না—কচিৎ কেহ প্রেমের ছুলিবার আকর্ষণ অনুভব করে। যে অনুভব করে, তাহার যে কি জ্বালা তাহা অন্তে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে? সেজন্ত চিরকাল অপরে প্রেমিক প্রেমিকাকে পাগল, নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত, বিদ্রোহী—এমনকি পাপাত্মাই মনে করে। সেজন্ত তাহাদের প্রতি কাহারও দরদ বা সহানুভূতি থাকে না। প্রেম চিরকালই নিরাশ্রয়—অসহায়—প্রেমিকা চিরদিনই 'সোতের সেঁওলি'।

দুঃখের উপর দুঃখ, দরদী মনে করিয়া কাহারও কাছে প্রাণের কথা বলিলে সে যে কৃত্রিম হৃদয়হীন অলীক প্রবোধ দেয়, তাহাতে ব্যথা আরও দ্বিগুণ হয় আবার কেহ কেহ বা ধর্ম্মোপদেশ দেয়।

"মরম না জানে ধরম বাখানে সে আরও দ্বিগুণ ব্যথা।"

মনের কথাটি কাহাকেও বলিয়া যে হৃদয়ের ভার লঘু করা যাইবে, প্রেমিকার সে উপায়ও নাই। "এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী"।

রাধা বলিয়াছে—

> রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
> বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।
> ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
> পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
> কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
> এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।
>
> *
>
> নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে।
> নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
>
> *
>
> দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
> এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।
> ফিরি ঘরে যাও সবে ধরম লইয়া।
> দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।
> কালমাণিকের মালা গাঁথি নিজ গলে।
> কানুগুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে।
>
> *
>
> এমন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গাবে।
> অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে।
>
> *
>
> আর না করিব পাপ পীরিতির লেহা।
> পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা।
>
> *
>
> বিনি যে পরথি রূপ যে দরথি ভুলিনু পরের বোলে।
> পীরিতি করিয়া কলঙ্ক রহল ডুবিনু অগাধ জলে।
>
> *
>
> থাকিলে যে দেশে ঘরে পরে হাসে কহিতে পারি না কথা।
> অযোগ্য লোকে তত দেয় শোকে সে আর দ্বিগুণ ব্যথা।
>
> *
>
> কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া যেজন পীরিতি করে।
> তুষের আগুণ যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।
>
> *
>
> আপনা আপনি দিবস রজনী ভাবিয়ে কত যে দুখ।
> যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই না দেখাই পাপ মুখ।
>
> *

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে এমতি সঙ্কট তারে।

*

মরিনু মরিনু মরিয়া যে গেনু ঠেকিনু পীরিতি রসে।
আর কেহ যেন এ রসে ভুলে না ঠেকিলে জানিবে শেষে।

এই সকল পংক্তি হইতে বুঝা যায় চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা আগে বাঙ্গালার রাধা, তারপর বিশ্বের রাধা—চণ্ডীদাসের কবিতায় যতই অলৌকিক ইঙ্গিত থাকুক তিনি তাঁহার রাধিকাকে লৌকিক জীবনের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান নাই। সেই জন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাসের রাধা আমাদের এত অন্তরঙ্গ।

কবি-কৌশলের জন্য চণ্ডীদাস বড় কবি নহেন। চণ্ডীদাস যে পীরিতির গান গাহিয়াছেন, সে পীরিতি রসজীবনের চরম সৃষ্টি। এ পীরিতি লৌকিক জগতে দুর্লভ। ইহার কাছে জীবন-যৌবন ধন-জন মান সব তুচ্ছ। এই পীরিতির সর্ব্বস্ব লুপ্তিভাব আমাদের চিত্তকে লৌকিক জীবনেই পরিচ্ছিন্ন রাখে না। ইহা অলৌকিক—ইহা আমাদের চিত্তকে অতীন্দ্রিয় লোকে লইয়া যায়—আমাদের জীবাত্মার অন্তরে যে চিরন্তন ব্যাকুলতা অজানা অনন্তের জন্য যে শাশ্বত আগ্রহাকাঙ্ক্ষা তাহাই জাগাইয়া তুলে—আমাদের অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা অস্বাতন্ত্র্য ও পরবশতার বেদনা জাগিয়া উঠে, তাহা বিচ্ছেদের বেদনারই মত। আমাদের চিত্তও রাধিকার মত চিরন্তনের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই অজানা অনন্তের জন্য তৃষ্ণাকে বলিয়াছেন—মানবাত্মার "চিরবিরহিণী নারী"।

"আমি কহিলাম কারে তুমি চাও ওগো বিরহিণী নারী।
সে কহিল আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

শ্রীরাধার প্রেমাবেগ-বর্ণনায় চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের ভগবত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার অন্তরের মধ্যে যে চির বিরহিণী রাধা বিরাজ করিতেছে—তাহার আকুতি আকুলতাকেই তাঁহার রচনায় রসরূপ দান করিয়াছে। রাধিকার আর্ত্তি আকুলতার গহনতায় আমরাও ভাগবত বা পুরাণের কথা ভুলিয়া যাই—রাধা যে ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি তাহাও আমাদের মনে থাকে না, রাধা আমাদের কাছে চিরন্তনী নারী, জীবাত্মাও নয়—শক্তিও নয়। আমাদের অন্তরের চির বিরহিণী নারীই ঐ রাধার সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ইহার সহিত ব্রহ্মস্বাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রসের সহিতই ইহার সম্পর্ক।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় যদি সাধারণ নরনারীর প্রণয়রূপেই পরিকল্পিত হইত তাহা হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মারই হউক, আর চিরন্তনের উদ্দেশ্যে অনিত্যেরই হউক, আর মানবের উদ্দেশ্যে মানবীরই হউক প্রেম সে একই অনির্ব্বচনীয় বস্তু। সর্ব্বস্বপণ আত্মহারা এই যে প্রেমের আকুতি ইহা আমাদের চিত্তকে আখ্যানবস্তুর সকল গণ্ডী এবং দেশকালের সীমা পার করিয়া কোথায় লইয়া যায়—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সে কি কোন স্বপ্নলোক? সে কি কোন অনাবিষ্কৃত ভাবলোক? সে কি মহামানবতার হৃদয়-লোক? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা এই গভীর প্রেমের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মস্বাদ লাভ করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা যে স্বাদ পাই তাহারও তুলনা কোন লৌকিকস্বাদের সহিত সম্ভবে না, ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

তিন

স্পষ্ট কথা, সত্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরল কথা, অন্তরের অন্তস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদগীর্ণ কথা কেমন করিয়া বিনা আড়ম্বরে, বিনা কলাশ্রীমণ্ডনে, বিনা আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে কাব্য হইয়া উঠিতে পারে, চণ্ডীদাস তাহা দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের রচনা সম্পূর্ণ মনোবেগ-সঞ্জাত, ইহার রচনাক্রম সম্পূর্ণ আবেগাত্মক বা Emotional, ইহাতে যুক্তিমূলক ক্রম (Logical Sequence) সন্ধান করা বৃথা। অনেক পদে আমাদের যুক্তিসন্ধিৎসু মন ঐ ক্রম সন্ধান করিতে চায়, না পাইয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়—মনে হয় যে কথার পর যে কথার আসিবার তাহা যেন আসিল না।

মনে রাখিতে হইবে, মনোবেগের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি তাহার নিজস্ব পরম্পরা বা ক্রম অনুসরণ করে। সেই আদর্শে চণ্ডীদাসের পদের বিচার করিতে হইবে। একই পদে পীরিতির নিন্দা, আত্মধিক্কার, পীরিতির গুণ গান,

রূপমুগ্ধতা সবই পাওয়া যাইবে। অনেক পদই একই ধরণের। তাহাদের মধ্য হইতে পংক্তি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া প্রত্যেক ভাব বা বিষয়কে আলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সমঞ্জস পদ রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বোধানন্দের দিক হইতে লাভ হইতে পারে, রসানন্দের দিক হইতে লাভ নাই। প্রত্যেক পদ একই মনের অভিব্যক্তি। যে প্রেমার্ত্ত মনের উদ্গার। উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি সেই মনে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভাব ও অনুভূতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়া আছে—ঐ বিচিত্র মন আমাদের মত সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ মন নয়। প্রেমাবেগে স্থৈর্য্য ধৈর্য্যহীন রসোচ্ছল মন। সেই মনের অভিব্যক্তি যাহা হওয়া স্বাভাবিক কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

পদগুলির বিচার করিতে হইবে রাধার মনের দিক হইতে আমাদের নিজের মনের দিক হইতে নয়। প্রাণের গভীর সত্যের বাণী যেখানে রসরূপ ধরিয়াছে সেখানে অলঙ্কারশাস্ত্র হতদর্প, স্তম্ভিত। গভীর প্রেমের ভাষাই স্বতন্ত্র। এ ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য জানিত না। এ ভাষার প্রবর্ত্তক চণ্ডীদাস। অনেকে বলেন, শ্রীচৈতন্য এ ভাষা বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। তাই অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যের পর চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়াছেন।

ব্রজলীলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যে বাঙ্গালীহৃদয়-মন্থনে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই বাঙ্গালীহৃদয়ে এই ভাষামৃত নিশ্চয়ই ছিল। কবি বাঙ্গালী প্রাণের সেই অন্তর সুপ্ত ভাষাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। যুগে যুগে বাঙ্গালীর প্রেমিকহৃদয় যে ভাষায় অন্তরের গভীরতম আকূতি প্রকাশ করিয়াছে ইহা সেই ভাষা।

এক একবার তাই মনে হয় এই পদাবলী যেন চণ্ডীদাসের সৃষ্টি নয়, চণ্ডীদাসের আবিষ্কার। যুগযুগ হইতে বাঙ্গালীর অন্তরেই যেন এইগুলি বিরাজ করিতেছিল। প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, কবির অভাবে সেগুলি মূর্চ্ছনা লাভ করে নাই। চণ্ডীদাসই সেই কবি যিনি ঐগুলিকে ছন্দে সুরে রূপদান করিয়াছেন।

রাধাশ্যামের পীরিতি বাঙ্গালীর বড় আদরের, বড় আকূতির, বড় বেদনার ধন। এই শ্যাম মানুষও নয় দেবতাও নয়। বাঙ্গালীহৃদয়ের সমস্ত সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য স্নেহমমতা প্রীতি ও সরলতা বিন্দু বিন্দু করিয়া উপচিত হইয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। আর তাহার আর্ত্তি আশা আকাঙ্ক্ষার আকুলতা ও জীবাত্মার অন্তর্নিহিত অতিলৌকিক পিপাসা সমস্ত একত্র মিলিয়া রাধারূপ ধরিয়াছে। সেই রাধাশ্যামের প্রেমলীলার কথা গাহিয়াছেন রসের গুরু বাঙ্গালীর রসজীবনের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসকে তাই এই লীলা কথাকে রসোত্তীর্ণ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই, কোন আড়ম্বর করিতে হয় নাই। সেই জন্যই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকলেই উপভোগ করিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রচনায় বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্য, কলা-চাতুর্য্য বা মণ্ডনাড়ম্বর নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা বুঝিতে হইলে মস্তিষ্কের শ্রমের বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না। পাণ্ডিত্য বা ধীশক্তি অনেকেরই নাই—যাহাদের আছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এইভাবে বাদ দিলে বোধানন্দ-মূলক কাব্যের রসিক সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইয়া পড়ে। চণ্ডীদাসের কাব্যে সে সকল বালাই নাই। অবিমিশ্র মনোবেগের অভিব্যক্তি সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে—ইহার জন্য কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। পাণ্ডিত্য ধীশক্তি শিল্পজ্ঞান অনেকেই পায় নাই বটে। প্রাণের আবেগ হইতে বিধাতা কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

জাতীয় জীবনের কবিদের একটা লৌকিক পরমায়ু আছে। এই সকল কবিদের কাব্যে যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবন উপাদান উপকরণ যোগায় বা প্রতিবিম্বিত হয়—সে জীবনের জরা মৃত্যু আছে। সে জীবনের রূপান্তর ঘটিলেই বা অবসান ঘটিলেই, দেশের লোকের জীবনধারা, রুচি আদর্শ ও ভাবধারার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই এই শ্রেণীর কবিদের কাব্য আর জাতির সাধারণ সম্পদ্ হইয়া থাকে না। উহা তখন বিদ্বৎসমাজের অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণার বস্তু কিংবা সারস্বত ভবনের সম্পদ্ হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর কবি নহেন, চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জীবনের বাঙ্গালীর অন্তরাত্মার—বাঙ্গালীত্বের সেই রস সম্পদকে কাব্যের উপাদান করিয়াছেন, যাহা চিরন্তন, শাশ্বত, কখনও যাহার রূপান্তর বা লুপ্তির সম্ভাবনা

নাই। সকল মহাকবিই তাই বাহ্য জগৎকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া অন্তরের চিরন্তন সম্পদ্ লইয়াই কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীদাস আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গূঢ়তম রস সম্পদ্‌কে কাব্যের উপাদান করিয়াছেন। সে রসসম্পদ্ শুধু চিরন্তন নয়—আপামর সাধারণের উপভোগ্য, মানব মাত্রেই তাহার অধিকারী।

চণ্ডীদাসের সঙ্গীত তাই বঙ্গের আম্রকুঞ্জে বেণুবনে নাট মন্দিরে ইক্ষুক্ষেত্রে খেয়াতরীর উপরে একদিনের জন্যও থামে নাই। যদি বা কালধর্ম্মে কখনও স্তিমিত হইত, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য তাহা হইতে পায় নাই। এই চণ্ডীদাস যদি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন তবে চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের অগ্রদূত—প্রেমসূর্য্যের শুকতারা। চণ্ডীদাস যে রস সম্পদের কবি, শ্রীচৈতন্য তাহারই পরিবেষক, চণ্ডীদাস যে বাণীর গায়ন, চৈতন্যদেব তাহারই প্রচারক। চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে যে স্বপ্ন মূর্চ্ছিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গীতে তাহা সত্যরূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীকে অন্তরাত্মার ভাষা দিয়া গিয়াছেন, তারপর কত কবিই জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সে ভাষার ঐশ্বর্য্য অনেক বাড়াইয়াছেন। মানব জীবনের কত বৈচিত্র্য আজ সে ভাষায় অভিব্যক্ত হইতেছে, সে ভাষা আজ আমাদের কত সহজ ও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, চণ্ডীদাসই এই ভাষার বাল্মীকি। আজ আমাদের গৃহের দুয়ারে সুরধুনী কুলে কুলে ভরা, কিন্তু গঙ্গাধরের জটাজালকে আমরা কি করিয়া ভুলিব? আজ অনুষ্টুভ ছন্দে সহস্র সহস্র পুস্তক আমাদের সহজে অধিগম্য, কিন্তু ক্রৌঞ্চবধূর বেদনায় সেই গদ্‌গদ্ ঋষিকণ্ঠে উদ্গীরিত প্রথম শ্লোকটিকে কি করিয়া ভুলিব?

যেখানে বাঙ্গালী আছে সেখানেই চণ্ডীদাস আছেন—উদাত্ত চণ্ডীদাসের প্রেমের মাধুর্য্য বাঙ্গালী জীবন গঠনে কত যে সহায়তা করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যায় না।

স্বধর্ম্ম স্বসমাজ ত্যাগ করিয়াও বাঙ্গালার খৃষ্টান কবি চণ্ডীদাসকে ভুলিতে পারেন নাই। কেবল কবিতা রচনা করিয়া অর্ঘ্যদান করেন নাই। চণ্ডীদাসের অনুকরণে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাস চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

হৃদয় শোধি মোহে ঐছে প্রবোধবি যৈছে ঘুচায়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী বিলাস রস কিঞ্চিত মবু চিত্তে করু পয়চার॥

কানুদাস বলিয়াছেন,

কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি॥
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষায় লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে সুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন॥

নরহরি বলিয়াছেন,

১। বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত যুগল পীরিতি দাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া গড়িল ধাতা।
সতত ভক্তিরসে ডগমগ চরিত বুঝিবে কে?
যাহার পীরিতে ঝুরে পশুপাখী পীরিতে মজিল যে।
জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন গাওত জগত জনে।

২। মরি মরি কি রীতি পীরিতি রস-শশধর
তারাসহ রসঙ্কো কর ওর।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন নরনারী বিভোর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজভাবের কবি। এইগুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীনকবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। বিদ্যাপতি সুখের কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার প্রেম "কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা" তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও বিষামৃতে একত্র করিয়া। চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যাহা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হয়। বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবে মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। কঠোর ব্রতসাধন রূপে প্রেম-সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব। তিনি প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়।"

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতীমোহন সেন

এগার

বাংলো সংস্কারের কাজ শেষ হ'তে প্রায় তিন মাস সময় লাগ্‌ল। সুরথকে এজন্য যথেষ্ট খাটতে হ'য়েছিল। কাজ দেখে লীলাবতী যেদিন সম্পূর্ণ অনুমোদন ও তৃপ্তি প্রকাশ করলেন, সেই দিন সুরথ মনে করল, তার সকল শ্রম সার্থক হ'য়েছে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত হ'ল। মিঃ চৌধুরী ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হ'লেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় লোক-জন নিয়ে একটা সভা ও তারপর প্রীতি-ভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

লীলাবতী সভাস্থলে উপস্থিত থেকে সকলকে সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করলেন এবং পরে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারে, আদর আপ্যায়নে ও বক্তৃতা শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন। এঁদের ভিতর এমন বিস্তর লোক ছিলেন যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। এই শ্রেণীর লোকেরাও লীলাবতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর সম্বন্ধে উদার মত পোষণ না ক'রে পারলেন না।

রাত্রি ভোজনের পর লীলাবতী ড্রয়িং রুমে ব'সে মিঃ চৌধুরী ও সুরথের সহিত গ্রামোফোনের গান শুন্‌ছিলেন। এমন সময় একজন চাকর ছুটে এসে সংবাদ দিল ডাকাতের মত একদল লোক সদর-দরজা ভেঙ্গে বাংলোতে ঢোক্‌বার চেষ্টা কচ্ছে এবং আর একদল লোক খিড়কি দরজার নিকট জড় হ'য়েছে। লীলাবতীকে উপর তলায় পাঠিয়ে দিয়ে সুরথ তখনই বাংলো রক্ষায় আয়োজনে প্রবৃত্ত হ'ল। সুরথের আদেশের প্রতীক্ষা না ক'রেই বাংলোর লোকজন দা, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে আঙ্গিনায় জড় হ'য়েছিল। সুরথ তাদের দু'-ভাগে বিভক্ত ক'রে দুই দরজায় মোতায়েন করল—তারপর বাংলোতে যে দু'টি বন্দুক ছিল তার একটি ও একবাক্স গুলী লীলাবতীর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে, অপর বন্দুকটি মিঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে তাঁকে বল্‌ল, "আপনি খিড়কি দরজা দেখুন, আমি সদর দরজায় যাচ্ছি, খুব সঙ্গীন্ অবস্থা না হ'লে গুলী ক'রবেন না।"

একটা মজবুত লাঠি মাত্র সম্বল ক'রে সুরথ ডাকাতদের সম্মুখীন হ'ল। তারা এরই মধ্যে সদর দরজা ভেঙে ফেলে রাম-দা, লাঠি, সড়কি প্রভৃতি নিয়ে হুঙ্কারের সহিত বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই বাংলোর লোকের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল। সুরথ লাঠি হাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং প্রাণপণে দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগল। ছাদের উপর থেকে লীলাবতী সেই সংঘর্ষ দেখতে পেয়ে সুরথের জন্য বিশেষ আতঙ্কিত হ'য়ে পড়লেন। তখন তাঁর মনে হ'ল, বন্দুকটা সুরথের নিকট থাকলেই বোধকরি ভাল হ'তো। এখন সেটা তার কাছে পাঠাবারও উপায় নেই। সুরথের সাহায্যের জন্য কিছুই করতে পাচ্ছেন না দেখে, লীলাবতী তখন ব্যস্ত হ'য়ে ডাকাতদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করলেন। লীলাবতী বন্দুক ব্যবহার কচ্ছেন বুঝতে পেরে মিঃ চৌধুরীও দু'বার বন্দুক ছোড়লেন। আক্রমণকারীরা অনুমান করতে পারে নি বাংলোর লোকেরা এমন প্রবল বাধা দিতে পারবে। সুরথের লাঠির সম্মুখে তারা তিষ্ঠিতে পাচ্ছিল না। এমন সময় বন্দুকের শব্দ শুনে তারা সাহস হারিয়ে দ্রুত পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সুরথ তাদের অনুসরণ করল না—তার লোক-জনেরাও কিছু দূর গিয়ে ফিরে এলো।

এই সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষের লোকই অল্পাধিক পরিমাণে আহত হ'য়েছিল। এতক্ষণ প্রবল উত্তেজনার ভিতরে ছিল ব'লে আঘাতের প্রতি কারো বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, এখন দেখা গেল, প্রায় প্রত্যেকের দেহেই আঘাতের চিহ্ন বর্তমান। সুরথ অবিলম্বে তাদের যত্ন-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো, লীলাবতীও সাহায্য করতে লাগলেন।

এক জায়গায় নদেরচাঁদ কাৎ হ'য়ে প'ড়েছিল। তার মাথায় ও একটা বাহুতে আঘাত দেখতে পেয়ে লীলাবতী তাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন এবং দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে

ঝুমুর-নৃত্য শিল্পী—সন্তোষ লাহিড়ী

বল্লেন, "আহা, বড্ড লেগেছে দেখছি। খুব ব্যথা হচ্ছে বোধ হয়?"

"আজ্ঞে হাঁ, হচ্ছে বই কি, নিশ্চয় হচ্ছে, আলবৎ হচ্ছে।"

"ভাববেন না, সেরে যাবে।"

"না ভাববো কেন, ঠিক সারবে, নিশ্চয় সারবে, আলবৎ সারবে।"

নদেরচাঁদের মোসাহেবি অভ্যাসটা এখনো বদলায়নি দেখে লীলাবতী প্রায় হেসে ফেলেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখে চম্‌কে উঠলেন, সুরথ টল্‌তে টল্‌তে হঠাৎ এক জায়গায় প'ড়ে গেল। ব্যস্ত ভাবে ছুটে গিয়ে লীলাবতী দেখলেন, তার সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়েছে। অবস্থাটা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে তিনি তখনই ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে আন্‌লেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তার মাথার এক স্থানে একটা গভীর আঘাত হ'য়েছে ও সেখানে অনেক রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মাথার উপর অনেক জল ঢেলে ও তারপর আঘাত স্থানে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে ডাক্তার বল্লেন, "আঘাতটা খুব সংঘাতিক, খুব শক্তিশালী লোক ব'লে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাম্‌লে ছিলেন। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। সংজ্ঞা ফিরে আসতে হয় তো দেরি হবে না, কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে যে বেশি উত্তেজনা না হয়। আবার রক্ত-ক্ষরণ আরম্ভ হ'লেই বিপদের আশঙ্কা।"

ডাক্তারের বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রে লীলাবতী নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। তিনি তখনই অজ্ঞান সুরথকে অতি সাবধানে দোতলায় তুলে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। অবস্থা একান্তই সঙ্কটাপন্ন বুঝ্‌তে পেরে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। সুরথের শয্যাপার্শ্বে ব'সে তিনি তার একখানা হাত নিজ হাতের উপর তুলে নিলেন এবং তার মুখের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থেকে অঝোরে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো এই ভেবে যে তাঁর জন্যই সুরথের জীবন আজ এই রকম বিপন্ন হ'ল। নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে সুরথ কতবার তাঁকে বাঁচিয়েছে কিন্তু হায়, তিনি তার জন্য কিছুই করতে পাচ্ছেন না—এই চিন্তা তাঁকে পাগল ক'রে তুললো। মিঃ চৌধুরীও সুরথের জন্য যথার্থ দুঃখবোধ কচ্ছিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর সুরথ একবার চোখ মেলে চাইলো এবং কিছু বল্‌তে চেষ্টা করলো কিন্তু কথা স্পষ্ট হ'লনা। ডাক্তারবাবু তখন রোগীর মুখে এক ডোজ ঔষধ দিয়ে বল্লেন, "আর তেমন ভয়ের কারণ নেই, শিগ্‌গীরই সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসবে।

দুপুর রাত উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে মিঃ চৌধুরী ও ডাক্তারবাবু লীলাবতীকে বিশ্রামার্থ যেতে বল্লেন কিন্তু লীলাবতী সম্মত হ'লেন না, বল্লেন, "রোগী পরিচর্য্যার কাজটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নারীর; আপনারা নীচে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করুন, আমি ততক্ষণ এখানে থাকি। অবস্থার বৈলক্ষণ্য দেখলেই আপনাদের খবর পাঠাবো।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। লীলাবতী খাটের কাছে একখানা টুল এনে ব'সেছিলেন। এখনও সেই ভাবে ব'সে থেকে সুরথের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলেন। প্রচুর আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ভয়ানক উৎপীড়িত হ'য়ে প'ড়েছিল। ডাক্তারবাবু ভরসা দিলেও, লীলাবতীর বিশ্বাস হচ্ছিল না, সুরথ আবার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করবে। সুরথ তাঁর কত প্রিয়, কত আপন, এই দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে তিনি আজ প্রথম উপলব্ধি ক'রতে পারলেন এবং এই সত্যটি তাঁর উদ্বেগ-পূর্ণ ছল ছল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়ছিল।

এমন সময় বাইরে আবার অকস্মাৎ একটা ভীষণ হৈ হৈ শব্দ উঠলো। লীলাবতী তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখলেন, 'আগুন', 'আগুন' চিৎকার ক'রে লোকজন সব ছুটোছুটি কচ্ছে এবং এই বাংলোতেই আগুন ধ'রেছে। ব্যস্ত ভাবে ঘরে প্রবেশ ক'রে সংজ্ঞাহীন সুরথকে কি ক'রে বাঁচাবেন সেই চিন্তায় লীলাবতী অস্থির হ'য়ে প'ড়লেন। এমন সময় মিঃ চৌধুরী ও ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন।

ডাক্তারবাবু বল্লেন, "শিগ্‌গীর নীচে নেমে আসুন, বিলম্ব করবেন না, আগুন ভয়ানক রকম বেড়ে চ'লেছে, নিভানো যাবে না, আমি বাড়ী চললুম, পরিবারবর্গ বাঁচাতে হবে, আর থাকতে পাচ্ছি না এখানে।"

ঐ কথা ব'লেই ডাক্তারবাবু পলায়ন করলেন। আগুন সিঁড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে মিঃ চৌধুরী অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। অজ্ঞান সুরথকে নিয়েই বিভ্রাট—টানাটানি করতে গেলেই তার প্রাণের আশঙ্কা।

অবস্থার ভীষণতা উপলব্ধি ক'রে মিঃ চৌধুরী লীলাবতীকে সেই মুহূর্ত্তে নীচে নেমে যেতে বললেন এবং সে জন্য জেদ করতে লাগলেন। কিন্তু লীলাবতী সুরথের পার্শ্বদেশ ত্যাগ না ক'রে মিঃ চৌধুরীকে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আমায় ক্ষমা ক'রবেন, সুরথবাবুকে ফেলে আমি যেতে পারব না—এই দুঃসময়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইনিই আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার ক'রে আছেন। আমার প্রতি আপনার যদি একটুও স্নেহ থাকে তবে আগে তাঁকে নামাতে চেষ্টা করুন, যদি তা-না পারেন, তাহ'লে সময় থাকতে আপনি নেমে পড়ুন, আমি এখানে সুরথবাবুর সঙ্গে আহ্লাদের সহিত মরতে পারবো।"

"মরতে পারা অত সহজ নয় মিস্ রায়।"

কথাগুলো এলো খুব জোরের সহিত দরজার কাছ থেকে। হঠাৎ এই পরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনতে পেয়ে লীলাবতী চমকে উঠলেন এবং দরজার দিকে চেয়েই দেখলেন কেদারনাথকে। অকস্মাৎ বিষধর সাপ পথের সম্মুখে পড়লে লোকের মনের অবস্থা যেমন হয়, লীলাবতীরও তাই হ'ল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুলো না। মিঃ চৌধুরীও কেদারনাথকে চিনতে না পেরে বিস্ময়ের সহিত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কেদারনাথ তাঁদের আর সংশয়ে না রেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিষ্ঠুর হাসির সহিত বললো, "মিস রায়, এই অগ্নিকাণ্ড আমিই সৃষ্টি ক'রেছি তোমার পালাবার পথ বন্ধ ক'রে তোমায় নিয়ে যাবো ব'লে। ডাকাতির চেষ্টাটাও আমারই ইঙ্গিতে হ'য়েছিল। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, চ'লে এসো আমার সাথে এই মুহূর্ত্তে—" ব'লেই কেদারনাথ—লীলাবতীকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হ'ল।

লীলাবতী গর্জ্জন ক'রে বললেন, "শয়তান, আবার এখানে এসেছো জ্বালাতে? নরকের পথ খুঁজে পেলে না?"

"সেই পথের সন্ধান পেয়েই তো এখানে হাজির হ'য়েছি, এই সব প্রেমাস্পদদের নিয়ে তুমি কি এখানে নরকের সৃষ্টি করনি?"

মিঃ চৌধুরী এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলেন, এখন আর সহ্য করতে না পেরে কেদারনাথের বাক্যে বাধা দিয়ে বললেন, "থামো, থামো, কোন ভদ্রলোকের গৃহে তোমার মত ইতর শ্রেণীর লোকের এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিৎ নয়—ভাগো এখান থেকে?"

কেদারনাথ মৌখিক উত্তরের পরিবর্ত্তে মিঃ চৌধুরীর মাথায় এক ঘুসি মেরে তাঁকে ভূলুণ্ঠিত ক'রে তখনই পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করলো এবং সেটা বিছানায় শায়িত সুরথের দিকে লক্ষ্য করলো।

লীলাবতী ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন। কেদারনাথ হাত নামিয়ে লীলাবতীর দিকে চেয়ে বলল, "এই ব্যক্তি তোমার যত বড়ই বন্ধু হোক না, কেদারনাথের সংকল্পে বাধা দিয়ে সে নিজেই তার মৃত্যু ডেকে এনেছে, এর জন্য এই একটা গুলীই যথেষ্ট, সুবিধে এই, পৃথিবী এই গুলীর কথাটা জানবে না, সুধু জানবে সে এই ঘরের ভিতর আগুনে পুড়ে ম'রেছে।"

কেদারনাথ আবার তার হাত তুললো গুলী করবার জন্য। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক ছুটে এসে সুরথ ও কেদারনাথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো এবং সেই মুহূর্ত্তেই কেদারনাথকে লক্ষ্য ক'রে লাঠির মতো একটা জিনিষ দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। 'দুড়ুম্' ক'রে পিস্তলের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি টলতে টলতে ৩।৪ হাত দূরে গিয়ে মেজের উপর কাৎ হ'য়ে পড়লো, আর কেদারনাথও পড়লো একটা টি-পয়ের উপরিস্থিত ঔষধপূর্ণ কাচের শিশি ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের উপর উপুড় হ'য়ে। এই সংঘাতে টি-পয় শুদ্ধ সমস্ত জিনিষ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা এমন দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে ঘটলো যে লীলাবতী একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

ইতাবসরে মিঃ চৌধুরী উঠে দেখলেন রক্তাক্ত দেহে জড়-পিণ্ডের মতো একধারে প'ড়ে র'য়েছে লাইব্রেরীর ক্লার্ক গৌরদাস, কোথায় তার আঘাত লেগেছে, হঠাৎ ঠিক করতে পারলেন না, তবে বুঝলেন, প্রাণ আছে। তারপর কেদারনাথের কাছে গিয়ে দেখলেন, কাচের গ্লাস ও শিশি বোতলের উপর প'ড়ে যাওয়ার ফলে তার মুখ-চোখ সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে এবং হয় তো চোখ দু'টো একেবারেই গেছে। গৌরদাসের নাম শুনে লীলাবতী তখনই তার কাছে উঠে গেলেন এবং পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারলেন, বুকের একটু উপরে গুলি লেগেছে এবং সেই স্থান থেকে রক্ত পড়ছে।

চক্ষু মুদ্রিত ক'রে গৌরদাস 'দুলাল দা' 'দুলাল দা' ব'লে কয়েকবার ডেকে উঠলো কিন্তু এই সম্বোধন কাকে করা হ'ল, লীলাবতী বা মিঃ চৌধুরী কেউ বুঝতে পারলেন না।

ওদিকে কাচারির লোকজন সব ব্যস্ত হ'য়ে আগুন নিভাবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্ছিল কিন্তু কোনো ফল হ'ল না, আগুন বেড়েই চললো এবং দেখতে দেখতে বাংলোর সিঁড়িপথ সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে ফেললো। , এরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে পেছনের বারান্দার দিক থেকে নদেরচাঁদ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "আসুন, এ দিকে আসুন, বাঁশের মই দিয়েছি, শিগ্‌গীর নেমে পড়ুন।"

নদেরচাঁদের পশ্চাতে আরো দু'জন লোক এসেছিল। লীলাবতী নদেরচাঁদকে ধন্যবাদ দিয়ে সুরথ ও গৌরদাসকে দেখিয়ে বললেন, "আগে এদের নামাবার বন্দোবস্ত করুন।"

এই সব গোলমালের ফলে সুরথের যেন সংজ্ঞা ফিরে এলো। লীলাবতী তার একখানা হাত ধ'রে বললেন, "ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন।"

সুরথ তাঁর মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে আবার চক্ষু মুদ্রিত করলো।

এর পর অনেক কষ্টে ধরাধরি ক'রে সুরথ ও গৌরদাসকে মই দিয়ে নীচে নামানো হ'ল। লীলাবতী ও মিঃ চৌধুরী তার পরে নামলেন। কেদারনাথ তখন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলে, তাকে নামাবার জন্ম দু'জন লোক মই বেয়ে আবার উঠতে গেল কিন্তু আগুন তখন এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে তারা ওর কাছে পৌঁছবার আগেই ঐ ঘরে ছাদ ভেঙে পড়লো এবং কেদারনাথ তার নীচে চাপা প'ড়ে গেল। ঐ স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করা কিছুতেই আর সম্ভবপর হ'ল না। সুন্দর বাংলোখানা দু'ঘণ্টার মধ্যে ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ল এবং বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে সেই অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কেদারনাথও সেই সঙ্গেই ভস্ম হয়ে গেল। [ক্রমশঃ

আসমুদ্র-হিমচলা*

শ্রীদীলিপকুমার রায়

(স্তব)

শুভ্র তোমার চরণপ্রান্তে নমি মা তোমারে আজি
সিন্ধু যাহার প্রেমবিহ্বল কল্লোলে উঠে বাজি'।
অযুত শুভ্র ঢেউ-মূর্চ্ছনা
পাষাণের ঘায় আলো-উন্মনা
ভেঙে পড়ে কত…পরে ঠিকরায় জলস্তম্ভে ফলি'
অস্তকিরণ—ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে জ্বলি'।

যত দূর যায় দৃষ্টি—বিছায় উদারের শিব কান্তি
আন্দোলনের মর্ম্মে যে রাজে প্রশান্ত, বীতভ্রান্তি।
যুগে যুগে কত তাপস সাধক
এসেছে হেথায় ধ্যান-স্নাতক
তব তরঙ্গ অঙ্কে পেয়েছে ঠাঁই কত শত বার—
সংসারে যারা মানে নি বন্ধ, মানে নি অন্ধকার।

জ্যোতি যে তোমার মুকুটে শিহরে হিমাচল গম্ভীরে,
চমকে পুণ্য নূপুরে—কন্যাকুমারীর মন্দিরে।
মন্ত্রে তোমার পরম ব্যাপ্তি,
ছন্দে তোমার মহাসমাপ্তি,
শৃঙ্খল তুমি পরো মা তোমার করুণার পরশনে
রূপান্তরিতে নিয়তি-নিদেশ—মুক্তির শিহরণে।

প্রাচী দিগন্তে তপন বন্দে অম্বুধি হ'তে জাগি'
কাজ সারা হ'লে পশ্চিমে ঢলে সলিল সমাধি মাগি'
অসীম গগন চাঁদোয়া তোমার
সুন্দর মেঘে তব সন্ধ্যার
কান্ত গগন-দীপালি কে জ্বালে? কল্লোল আসে ভেসে
অরূপ শান্তি যার তরে রূপ বৈরাগী দেশে দেশে!

*(কুমারিকা—কন্যাকুমারী মন্দির)

গিরিশস্মৃতি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

[গিরিশচন্দ্রের দুর্গাপূজা]

যৌবনে গিরিশচন্দ্র কিরূপ ছিলেন তাহা তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩১২ সালের পাক্ষিক উদ্বোধনে ৭ম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বের শিক্ষা, দীক্ষা, বাল্যকালে অভিভাবক শূন্য হইয়া যৌবনসুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে যে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচয়। সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া ঈশ্বর নাই এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম্ম—ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য, কৌশলে স্বার্থ সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না।" গিরিশচন্দ্রের চলে নাই। তিনি বলিতেন যে, "লোকে পুণ্যকার্য্যের গরব করে বেড়ায়। আমি ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে গিয়েছি এই গর্ব্ব করে যে দুনিয়াতে কোন পাপকায করতে বাকি রাখি নি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম একান্ত অনুরক্ত ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, গিরিশচন্দ্রের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল কালে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দিহান সময়ে তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার বহির্ব্বাটীর দ্বার সম্মুখে একটী দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া যায়। প্রচলিত প্রথানুসারে যাহার বাড়ীতে এইরূপ ঘটনা ঘটে—সে বাধ্য হইয়া উক্ত প্রতিমার পূজা করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র গতানুগতিক ভাবের লোক ছিলেন না। যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই তিনি মৃন্ময়ী প্রতিমাকে কি করিয়া পূজা করিবেন? বিশেষ জোর করিয়া কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কায করাইবেন এইরূপ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। সমাজের নিন্দা প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি সত্য বলিয়া যাহা জানিতেন তাহা করিতেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্র উক্ত প্রতিমার পূজা করা দূরে থাক—উহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া—শৌচ হইতে আসিয়া হাতে মাটী করিতেন পর্য্যন্ত, তাঁহার সংস্কারে বাধিত না কিম্বা কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিতেন না। এমনই দুর্দ্দান্ত, পাপিষ্ঠ ও নাস্তিক ছিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের পর—তাঁহার আমূল পরিবর্ত্তন হইল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "একদিন দশহরা পর্ব্বে আমি দক্ষিণেশ্বর তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। ভক্তেরা অনেকে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। তখন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে আমার ধারনা। তাই মনে করলাম যে যাঁর পাদপদ্ম হতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার উদ্ভব তাঁকে যখন স্পর্শ করেছি তখন আবার গঙ্গাস্নানের আবশ্যক কি? আমি স্নান করতে গেলাম না দেখে ঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নাইতে গেলে না?"

আমি তাঁকে বল্লেম, "আমি আপনার পাদস্পর্শ করেছি আবার গঙ্গায় নাইবার দরকার কি?"

ঠাকুর তাই শুনে অমনি বলে উঠলেন, "সে কি? তোমরা যদি মানবে নি—তবে কে মানবে?"

সেদিন থেকে যেখানে যত ঠাকুর দেবতা আছেন, এমন কি নদী নালা বৃক্ষ প্রস্তর যা কিছু, সব স্থানে মাথা নোয়াই। নানা ভাবে তাঁর চিন্ময়ী লীলা চলছে এই জেনে। আর কোন বিচারবুদ্ধি আনি না।"

গিরিশচন্দ্র দুর্গোৎসব করিতেছেন—সন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, প্রথম বেলুড় মঠে এই সংবাদ শুনিতে পাইলাম। ইহা দেখিবার জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করিলাম

বলিতেন "গিরিশের বিশ্বাস ষোল আনার উপর পাঁচ

সিকে।" রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁহারা গুরু ভ্রাতারা এবং ত্যাগী সাধুমণ্ডলী গিরিশচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভৈরব বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কারণ, ইহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ। সেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজা করিবেন, শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমায় চিন্ময়ী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিতেছেন ইহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়?

গিরিশচন্দ্রের পৈতৃক ভবন বসু পাড়ার গলির মধ্যে। বাড়ীর ফটক উত্তরাভিমুখী। প্রবেশ করিলেই একটী নাতিদীর্ঘ প্রাঙ্গন, ইহার পূর্ব্ব দিকে একটী চণ্ডীমণ্ডপ, উত্তর ও পশ্চিমে কয়েকটী ঘর এবং দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুরের প্রাচীর ও যাইবার পথ। পশ্চিম দিকে একটি দোতলায়-যাইবার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিলে দক্ষিণদিকে একটি ঘর উহার মধ্য দিয়া অন্তঃপুরে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে ছাদ এবং উত্তরে একটি হল ঘর। এই হল ঘরে গিরিশচন্দ্র বসিতেন—ইহাই ছিল তাঁহার বৈঠকখানা। এই ঘরে তিনি অধ্যয়ন করিতেন, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, গীত গল্প ইত্যাদি রচিত হইত, বন্ধু বান্ধব এবং আগন্তুক ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ আলোচনাদি করিতেন এবং আলমারীতে পুস্তকাদি রক্ষিত হইত। এই হল ঘর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং শ্রীনাগ মহাশয়, শ্রীম প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তদের আগমনে ইহা একটি পুণ্য পীঠের মত সমুজ্জ্বল ছিল। এই হলঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে পাঠের পরদার আড়ালে গিরিশচন্দ্র শয়ন করিতেন

গিরিশচন্দ্রের গৃহ সম্মুখে অপরাহ্নে প্রতিমা দর্শন করিতে আসিলাম। সেদিন সপ্তমী পূজা। সদর দ্বারে দুই পার্শ্বে মৃন্ময় মঙ্গল কলসী। দ্বার শীর্ষে আম্রপত্রের মালা। দর্শনার্থী নর নারীর ভিড়। পূজার দালানে সুসজ্জিতা শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা পুষ্পপত্র সম্ভারে হাসিতেছেন। মূর্ত্তির সম্মুখে নানা উপচার সমন্বিত মঙ্গলঘট। প্রতিমা দর্শন করিয়া দ্বিতলে গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। সেখানে পরিচিত অপরিচিত বহু ভদ্রলোকের সমাবেশ। দলে দলে নিমন্ত্রিতেরা আসিতেছেন যাইতেছেন। ভাবোন্মত্ত হাস্যমুখে গিরিশচন্দ্র সকলকেই সম্ভাষণ ও আদর আপ্যায়ন করিতেছেন। কে প্রসাদ পাইল, কে পাইল না তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং হলঘরের সম্মুখস্থ ছাদে অনেকে প্রসাদ ধারণ করিতে লাগিলেন। তদ্বির করিতে, অভ্যর্থনা করিতে এবং প্রসাদ পরিবেশন করিবার লোকের অভাব ছিল না। দীয়তাং ভুজ্যতাং বেশ চলিতেছিল।

মহাষ্টমীর দিন মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে গিয়া দেখি শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র একটি বিরাট্ মহোৎসব করিয়াছেন। কলিকাতা ও সহরের উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর নিমন্ত্রণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নামসংযুক্ত যে সকল সমিতি আছে, সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের দুর্গাপূজা দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেছিলেন, "সাক্ষাত মা এসেছেন—প্রতিমা উপলক্ষ মাত্র। সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীজগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করছি। এতে আমার দুর্গা পূজা সার্থক হয়েছে।"—সেদিন আড়াইটার পর সন্ধি পূজা।

গভীর নিশীথে সন্ধিপূজার আয়োজন হইয়াছে। দেবীপ্রতিমার সমীপে দীপমালা সজ্জিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীমাকে সংবাদ দিয়া আনিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের "ন'দিদি" লোক পাঠাইয়াছিলেন, লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল "মা এখন শুয়েছেন—সুতরাং আসতে পারবেন না।"

এই সংবাদ গিরিশচন্দ্রকে ন'দিদি শুনাইলেন। গিরিশচন্দ্র শুনিয়া গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইলেন। এদিকে পূজামণ্ডপে গিরিশচন্দ্র পুষ্পাঞ্জলির জন্য আসিবার জন্য বারম্বার আহুত হইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় ন'দিদি সহসা চীৎকার করিয়া জানাইলেন, "গিরিশ, মা এসেছেন—শিগ্‌গীর এস।" গিরিশচন্দ্র অমনি দ্রুতপদসঞ্চারে দেখিলেন—শ্রীশ্রীমা দাঁড়াইয়া সন্ধিপূজা দেখিতেছেন।

"জয় মা" বলিয়া গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে হাস্যমুখে দেবীপ্রতিমার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ভাবোন্মত্ত গিরিশচন্দ্রের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দ মুখে, চোখে এবং সর্ব্বাঙ্গে

যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা যেন সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

পরে গিরিশচন্দ্র শুনিলেন যে শ্রীশ্রী মা তাঁহার শয্যায় শুইয়াছিলেন। সন্ধিপূজার ঢাকের বাজনা শুনিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং কাহাকেও না বলিয়া তিনি দ্রুতপদ সঞ্চারে বলরাম মন্দিরের পার্শ্বের গলি দিয়া একেবারে গিরিশচন্দ্রের পাছ দুয়ারে আসিয়া ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রী মা আসিতে পারিবেন না বলিয়া "ন'দিদি"ও বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। সহসা গভীর রাত্রে দুয়ারে আঘাত শুনিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" শ্রীশ্রী মা অমনি বলিয়া উঠিলেন "ওগো আমি এসেছি, দুয়ার খোল।" শ্রীশ্রী মার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন'দিদি ছুটিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া প্রণতা হইলেন এবং আনন্দে সেই সংবাদ তাঁহার সহোদর ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রকে দিলেন। গিরিশচন্দ্র এতক্ষণ একান্তমনে যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিলেন এবং যিনি আসিলেন না শুনিয়া তিনি গভীর বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—তাঁহার আগমন সংবাদে গিরিশের অবসন্ন দেহে তড়িত প্রবাহ বহিয়া গেল। তাই ত্বরিত বেগে তিনি পূজামণ্ডপে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

বাস্তবিক ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। পূজামণ্ডপের মধ্যস্থলে দশপ্রহরণ ধারিণী দশভুজা শ্রীশ্রীমহিষাসুর মর্দ্দিনী সিংহবাহিনী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা বামে সর্ব্ববিদ্যাদায়িনী শ্বেতপদ্মাসীনা সরস্বতী ও ময়ূরবাহন দেব সেনাপতি কার্ত্তিক এবং দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্য্যশালিনী বরপ্রদায়িনী লক্ষ্মী এবং সর্ব্ব শুভপ্রদ সর্ব্ববিঘ্নহারী গণেশ পরিবেষ্টিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একপার্শ্বে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণার্চ্চিতা পরমপবিত্রোতা স্বরূপিণী রামকৃষ্ণ গতপ্রাণা জগজ্জননীরূপে মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীসারদাদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র "জয় মা জগজ্জননী" বলিয়া দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দেরাও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। অচঞ্চল পদে শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীদেবীপ্রতিমার সম্মুখে সেই পুষ্পাঞ্জলি লইলেন। শ্রীশ্রীমাও তখন দিব্য ভাবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃতা শ্রীশ্রীমার দিব্যপ্রভায় পূজামণ্ডপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক বিমল অপার্থিব আনন্দধারায় সকলের অন্তর স্নিগ্ধ হইল। বাস্তবিকই গিরিশচন্দ্রের দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজা স্মরণ করিলে সকলের হৃদয়ে এক অলৌকিক ভক্তিরসের অমৃত প্রবাহ বহিয়া যায়। পূজ্যপাদ অভেদানন্দ স্বামিজীর রচিত শ্রীশ্রীসারদা স্তোত্র স্বতঃই স্মরণ পথে উদিত হয়।

"কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়-দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥
লজ্জা-পটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণ-প্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতা-স্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ হে মহাদেবি! প্রণত সন্তানদিগকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া তোমার করুণা প্রকাশ কর, হে কৃপাময়ী! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে সারদে! লজ্জারূপ বসনে তুমি আবৃত রহিয়াছ তবু সর্ব্বদা জ্ঞান বিতরণ করিতেছ। হে দয়াময়ি! দর্ব্বদা কলুষ সমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণা যিনি, রামকৃষ্ণ নাম শ্রবণে যাঁহার আনন্দ, তাঁহার ভাবে অনুরঞ্জিত যাঁহার আকৃতি তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিতেছি।

যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যাঁহার জীবনও তদ্রূপ পবিত্র, সেই পবিত্রতা স্বরূপিণী দেবীকে বারংবার প্রণাম করিতেছি।

গিরিশচন্দ্র ভাববিভোর হইয়া কথা প্রসঙ্গে এই সন্ধি-পূজার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন,"মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা তা কি আবার তর্ক বিচার করে প্রমাণ করতে হয়। আমি মার আগমনে বুঝতে পেরেছিলাম—আমার দুর্গাপূজা যথার্থ হবে। কিন্তু সন্ধি পূজোর সময় মনে হয়েছিল মা আসবেন না শুনে মনে একটা ধাক্কা এল। তবে কি আমার পূজা মা নিলেন না। পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য আমায় নীচে ডাকচে। আমার তখন সব বিষবৎ বোধ হচ্ছিল। আমি কি শুধু মৃন্ময়ী প্রতিমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো?—আমার সব শরীর মন অবশ হয়ে পড়ল। এমন

সময় ন'দিদির চীৎকার শুনে আমি যেন প্রাণ পেলাম—সত্যি সত্যিই মা এসেছেন। ঠাকুর আমার মত মহা-পাতকীকে তাঁর অভয় পদে আশ্রয় দিয়েছেন, সে আশ্রয় থেকে কি বঞ্চিত হব? শিব-শক্তি যে অভেদ, ঠাকুর আর মাতে কি কিছুমাত্র প্রভেদ আছে? ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখে বলতেন যে, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ। ভক্তমুখে শুনেছি যে মা বলেন যে, গিরিশ যখন আসে তখন মনে হয় ঠিক যেন পাঁচ বছরের ছেলে আসছে। আমি যে ব্রহ্মময়ীর বেটা। এই যে মা লীলা করলেন—এর তর্ক বিচারে কি মীমাংসা করবে? ঠিক সন্ধিপূজার ক্ষণে মা আমার প্রাণের আহ্বান শুনে পেছুনের দোর ঠেলে এসে বলছেন, "ওগো দোর খোল—আমি এসেছি।" একি সাক্ষাৎ ভগবতী না হলে হয়। দেখ, আমার চেয়ে নাস্তিক অবিশ্বাসী বড় একটা চোখে পড়ে না। আমার অতিবড় শত্রুও আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে হেয় করে নিন্দে করতে পারবে না। সে একদিন ছিল আজ বুঝছি সত্য সত্য ভগবান আছেন। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বুঝছি—এই চোখে তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। মহামায়ার পূজো তো শুধু মাটির প্রতিমা পূজো নয়—সাক্ষাৎ চিন্ময়ী। যারা ভক্তিভরে তাঁর অর্চনা করে তারা সত্যই তাঁকে দেখতে পায়। দেখ না সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা এসেছেন তাই আবাল বৃদ্ধ বণিতা আজ আনন্দে ভাসছে। এই আনন্দধারাই তাঁর করুণা। তাঁর করুণার ধারা—প্রেমের ধারা—সে নির্ম্মল প্রবাহ অবিরাম গতিতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে। নতুবা জীবজগৎ এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠতে পারত না। বিশ্বাস করলে সব জলের মত সহজে বোঝা যায়। সহজ বলেই শক্ত হয়েছে। সোজা কথা সোজা ভাবে আমরা নিতে পারি না—এ যে মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া। মানুষকে বিশ্বাস করে দাগা খেয়েছি, প্রাণ দিয়ে মানুষকে ভালবেসে বুক জ্বলে পুড়ে গেছে, কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা পেয়েছি—কিন্তু ঠাকুরকে বিশ্বাস করে শান্তি পেয়েছি—তপ্ত হৃদয় শীতল হয়েছে। একথা কাকে বোঝাব। হৃদয় দিয়ে হৃদয় বুঝতে হয়।

আমি গিরিশবাবুকে বলিলাম, "আপনার হৃদয় কবিতার প্রথমেই একথা বলেছেন।"

গিরিশবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেছি?" আপনি হৃদয় কবিতার প্রথমেই বলেছেন—

"কেহ কি বিশ্বাস কভু করেছ হৃদয়ে,
সত্য কহে হৃদয় তোমার?
হৃদে অবিশ্বাস জেনো বাসনার ভয়ে,
হৃদয় তোমার সত্যময়।"

স্বামিজী বলিতেন, হৃদয়ের দ্বার দিয়েই অনুভূতি আসে!

গিরিশ। অতি সত্য কথা। কিন্তু জেনো কামই, বাসনাই অন্তরায়।

আমি। এই জন্যই বোধ হয় গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন

"জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।"

গিরিশ। তাও তাঁরই কৃপা সাপেক্ষ। মানুষের সাধ্য কি এই কামনার বাসনার হাত হতে এড়ায়। তাঁর কৃপা না হলে জীবের কি সাধ্য। একমাত্র তাঁর আশ্রয় নিলে এই মায়ার হাত এড়াতে পার। সর্ব্বদা অহং অভিমান নিয়ে জীব রয়েছে। এক দেখেছি মহামায়া স্বামিজী আর নাগ মশায়কে মায়ার বাঁধনে বাঁধতে পারেনি। অহং কে স্বামিজী এত বিরাট এতবড় ক'রে দিলে যে মায়া বেড় পেলে না বাঁধতে। আর নাগমশায় অহংকে এত ছোট করে ফেললেন যে মায়া যতই বন্ধন করেন অমনি টুপ করে ততই গলে চলে আসে। বেটী এই দু'জনের কাছে হার মেনেছে।

আমি। আপনি যা বলছেন গীতাতেও তাই বলেছে

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এমনি দুরতিক্রমনীয় যে আমাকেই যে আশ্রয় করে সেই এই মায়া অতিক্রম করতে পারে। "আপনি হৃদয় কবিতার শেষদিকে তাই বলেছেন

নরনারী পৃথিবীর সবে বশীভূত
কল্পনার হের মুগ্ধচিত,
কাম তৃপ্তি, মান তৃপ্তি বাসনা সম্ভূত
পিপাসায় কি হেতু পীড়িত?
বারেক সুধাও মন, হৃদয় তোমার—
জান কি হে হৃদয় কি তব?

স্বার্থহীন বৃত্তি (নহে কিছুর আশায়)
যে বৃত্তি আশ্রিত এই স্তব।
যে বৃত্তি মিলিত ক্ষুদ্র কীটাণুর সনে
স্রষ্টার প্রধান বিশেষণ,
যে বৃত্তি আশ্রয়ে এই পাশব জীবনে—
দেবাধিক তোমার গগন।
সেই বৃত্তিময় সদা হও কায়মনে
স্বার্থহীন বাসনা বর্জ্জনে,
নিঃশোক নিরহঙ্কার মিলি বিশ্ব সনে
মৃত্যুঞ্জয়—ভঙ্গুর জীবনে।"

গিরিশ। মার এই খেলা! তুমি যেমন—শুধু বিচার করে কি হবে? যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি, তাঁর নাম করা আর তাঁর লীলা স্মরণ করাই আনন্দ। ঠাকুর বলতেন, "পোদো, গাছের ডালপত্তা গুণে কি হবে, তার চেয়ে আম খা"। তাঁর নামে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর লীলা প্রসঙ্গে যে রস পাওয়া যায়—তার কাছে আর সব চিটে গুড়। এই রস আস্বাদনে জিভ ক্লান্ত হয় না, মনের বিরক্তি আসে না—দিন রাত কেটে গেলেও শান্তি আসে না।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তি আজন্ম সিদ্ধ। যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান নাই—তখন রাবণবধ নাটকে শ্রীদুর্গাপূজার দৃশ্যে এই গীত রচনা করিয়াছিলেন,

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়
রাঙ্গামুখে রাঙ্গা হাসি রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি শশী— রাঙ্গা নখে পড়ে হায়।
পদ্ম ভ্রমে পদতলে পড়ে অলি দলে দলে
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিত প্রাণ জুড়ায়।

মাতৃভাবে বিভোর হইয়া রাবণবধের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গাহিয়াছেন—

"রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে, পরিয়ে দে মা মাথায় দু'টো।
মা বলে ডাকবো তোরে, হাত তালি দে নাচবো ঘুরে
দেখে মা নাচবি কত, আবার বেঁধে দিবি ঝুটো।

মহাপূজায় নবমী ও দশমী পরমানন্দে কাটিয়া গেল। গিরিশ মায়ের বিসর্জ্জনকে বিরহ বলিয়া মনে করিতেন না। মার বিরহ? মার বিরহে কি সন্তান বাঁচে? তিনি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির মধ্যে যে চিণ্ময়ী জননীর আবির্ভাব দেখিতেন সেরূপ যে নিত্যরূপ—তার বিসর্জ্জন কোথায়? সেই চিদানন্দময়ী রূপের আভাস দিবার জন্যই মায়ের এই মৃণ্ময়ী রূপ। নিখিল বিশ্ব যে শিব শক্তির মিলন—পুরুষ প্রকৃতির খেলা কিন্তু এই পুরুষ প্রকৃতির পারে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। গিরিশচন্দ্র তাই শ্রীশ্রীমহামায়ীর মেনকার ভাব বিজয়াতে গাহিয়াছেন—

"ডিমি ডমরুধ্বনি, শুনি চমকে রাণী
বৃষভ ঘন ঘন গরজে।
(বলে) ওই ভোলা আসে, পরাণ কাঁপে ত্রাসে
নিয়ে যেতে কনক-সরোজে।
পুরী করে আলো দেখ না উমা,
নিয়ে যাবে তবে কি হবে ওমা-ও মা,
কি কব কত বাজে বেদনা;—
মা হ'য়ে কত সব, কেমনে গৃহে রব
বল ভোলারে যাতে বোঝে॥
দেপারে ভুলায়ে বুঝায়ে রাখ ঘরে
কি কব ওহে গিরি! প্রাণ কেমন করে,
উমারে নিয়ে যাবে পরে;
কি হল বল বল, উমারে নিয়ে চল,
ভোলা যেথা নাহি খোঁজে।

ত্রিগুণাতীত না হইলে সেথায় যাওয়া যায় না।

"ভোলা যেথা নাহি খোঁজে।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই দেবতারা স্তব করিয়া বলিতেছেন—

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাঽপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।

অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের মূল এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়ী হইয়াও কলুষচিত্ত জনের দ্বারা জ্ঞাত হও না। তুমি যে হরিহরেরও নিকট অপরিজ্ঞাত—কেননা তুমি যে সকলেরই আশ্রয়। এই নিখিল বিশ্ব আমার অংশ মাত্র। তুমি যে নামরূপের দ্বারা ব্যক্ত নও, তুমি যে অধিকারী নিত্যা পরমাপ্রকৃতি। এখানে ভোলাও খোঁজ পায় না—হরিহরাদির ও অপার—"হরি হরাদিভিরপ্যপারা।

আমরা গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া বলি—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

"মজুর ও মজুরী"

শ্রীমতী পরিমল রাণী রায়

ব্যর্থতার বুক কাটা নৈরাশ্য লইয়া নবীন বাড়ী ফিরিল, একটি পয়সা তাহাকে কেহ ধার দিল না; সেই ভোর রাত্রে বাহির হইয়াছিল, কাক পক্ষী নাই ডাকিতে, আর ফিরিল এই আড়াই প্রহরের খাঁ খা সময়ে একেবারে খালি হাতে।

অনাহারে টো টো করিয়া কাহার দুয়ারে না যে ঘুরিতে বাকি রাখিয়াছে? তাহারই মত সব যাহারা, এবং তাহার চেয়ে বড়···ছোটদের কাছেও হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিতে বাকী রাখে নাই। কিন্তু, দুই গণ্ডা পয়সা তাহাকে কেহই দিল না; তাহার খাওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না; তাহারই সামনে পেট ভরিয়া তাহারা খাইয়া আসিল; একঘটী জল পর্য্যন্ত দেওয়ার কথাটাও কাহারও মুখে ফুটিয়া বাহির হইল না। অথচ, এই নবীনই কতবার তাহাদের সখ করিয়া ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে···কতদিন নিমন্ত্রণ···আদর আপ্যায়ণ করিয়া···সময় অসময়ে ধার হাওলাত দিয়াও সাহায্য করিয়াছে। সেই তাহারাই আজ তাহার দুঃসময় দেখিয়াই—

নতুবা, দুইগণ্ডা পয়সা তাহাদের মধ্যে দিতে না পারিত কে? অমনি অমনি নয়, ভিক্ষাও নয়, ধার। আজ দিবে, হাতে হইলেই নবীন আবার তাহা ফিরাইয়া দিবে; আজই না হয় সে নিতান্ত অভাবে পড়িয়াছে, কিন্তু এমন কি তাহার চিরদিনই থাকিবে? থাকেই যদি···দুইগণ্ডা পয়সা কি সে শুধরাইতে পারিত না? কিন্তু, সেটুকু বিশ্বাস তাহাকে কেহই করিতে পারিল না!

এই তো সব পাড়া প্রতিবেশী, আর এই তো তাহাদের সঙ্গে বাধ্য-বাধকতা···খাতির মৌরদ!

চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার মতই নবীনের নিজের সামর্থ্য-হীনতার সূক্ষ্ম অনুভূতিটুকু নিশ্চিহ্ন-রূপে মুছিয়া গেল এবং না পাওয়ার ক্ষোভটাই অতি বড় এবং অসংযত হইয়া কেমনই একটা অব্যক্ত রাগের ঝাঁঝে নিজের মনটাই উত্তপ্ত করিয়া নবীন ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আঁতি পাঁতি করিয়া ঘর খুঁজিতে লাগিল; হাঁড়ী, মালসা, মাটির কলসী, মায় কোনায় কোনায় হাতড়াইয়া তন্নতন্ন করিয়াও···না, ধান চাউল দূরের কথা, ক্ষুদ কুড়ার একটা দানাও নাই; মাটি খুড়িলে একটা আধলাও মিলিবে না; আসিবেই বা কোথা হইতে? পেটে আঁটে না, তার আবার সঞ্চয়। কিছু থাকিলে বরং ক্ষয়ই হইয়া যায়। তৈজস পাঁতি দুই একখানা আগে ছিল। একখানা 'সান্‌কী' থালা, একটা পিতলের ঘটী আর একটি গাড়ু; উপর্য্যুপরি অভাবের জ্বালা সহিয়া নবীনের মত লোকের ঘরে তাহা টিকিতে পারে নাই। অনেক কাল আগেই মহাজনের নিরাপদ লৌহ-সিন্দুকের আশ্রয়ে ঢুকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। নবীনই তাহাদের ঢুকাইয়া মায়া কাটাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন একেবারে খালি, ফাঁকা হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে তাহার ঘরখানা, ঘর! তাহার আবার ঘর! একখানি মাত্র চালা, উলু খড়ের।

সামনে বর্ষা, কবে এবং কোনকালে যে তাহাতে খড় গুজিয়াছিল, হিসাব করিলেও মনে পড়ে না। উপর্য্যুপরি বর্ষার অবিশ্রান্ত জলে ভিজিয়া ভিজিয়া পঁচিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। তারপর লাগিতেছে রৌদ্রের দারুণ উত্তাপ, শুকাইয়া চাপটা বাঁধিয়া কোনরূপে চালের সঙ্গে লেপটাইয়া আছে। সেই জন্য রক্ষা, কিন্তু, জলের একটু ছাট লাগিতে যেটুকু দেরী, কোনরূপেই টিকিতে পারিবে না। একটু একটু করিয়া পড়িবে পচা ঘায়ের মত—

দেশের নারিকেলের মালা, পুরাণো হাঁড়ী আর সরা কুড়াইয়া ইহারই মধ্যে নবীন জড়ো করিয়া রাখিয়া দিয়াছে ঘরের আনাচ কানাচ দিয়া। বড় বর্ষায় অজস্র জলের ফোঁটা পড়িবে চালের সহস্র ছিদ্র দিয়া, সেই জল ঠেকাইতে হইবে ঐ সব হাঁড়ী সরা আর মালসা পাতিয়া···

আর একটা বর্ষাও না হয় নবীন ভিজিয়া কাটাইবে। একটু অসুবিধা আর খানিকটা জ্বরবিকার হইবে বড় জোর, তার বেশী আর কি? কিন্তু···পেটের জ্বালা সে নিবারণ

করে কি দিয়া? দুই একটি পেট ত' নহে? অনেকগুলি; নিজে দুই সন্ধ্যা উপবাস করিয়া রহিয়াছে···আরও দুই এক সন্ধ্যা না হয় এমনই ভাবে কাটাইয়া দিবে; মনিব বাড়ী ঝি গিরি করে বিলাসী, তাহার দুইটি জুটিয়া যায় সেইখানেই। কিন্তু, কচি কাঁচা তিনটির—

ভাবিতে না ভাবিতেই কোথা হইতে ধাইয়া আসিল তাহারা পঙ্গপালের মত। লক্ষ্মীছাড়ার রুক্ষতা গায়ে মাথা ছাইয়ের মত। অন্নবস্ত্রহীন বুভুক্ষিত যেন তিনটি মূর্ত্তিমান কাঙ্গাল; সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সব চেয়ে ছোটটিও শৈশব ছাড়াইয়া প্রায়···কিন্তু, লজ্জাকুণ্ঠার ধার আজও ধারিতে শিখে নাই।

নবীন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল; কিন্তু পারিল না, ছিনে জোঁকের মত তাহারা তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।···ক্ষিধে ···ক্ষিধে··তাহারা খাইতে চাহে; জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ বেলা গড়াইয়া গেল, হতভাগাগুলির পেটে এক মুঠা দানা পড়িল না তবু; কচি হাড়ে ক্ষুধার জ্বালা আর কত সয়?

মিথ্যা আশা দিতে বুকে ব্যথা বাজে···কিন্তু নবীন নিরুপায় ···তবু নিরস্ত করিবার বৃথা খানিক চেষ্টা পাইল; এত বেলাই ত গেছে; আর একটু ধর্ষ্যি ধরে পড়ে থাক, তোদের মা আসবার সময় বাবুদের ওখেনথেকে ভাত নিয়ে আসবেনে।

তাহারা মানিতে চাহে না। মানিবার কথাও নয়। ও তো·মা নয়? সৎমা, নবীনের দ্বিতীয় সংসার। আর তাহারা তাহার প্রথম সংসারের ছেলে মেয়ে।, প্রথম সংসার গত হইবার পর নবীন এই দ্বিতীয় সংসারটি ঘাড়ে করিয়াছিল সখের জন্য নহে, এই কচি-কাঁচাগুলিকে মানুষ করিবার জন্যই। কিন্তু···

সে যাহা আনিবে, তাহা নবীনও জানে। তাহারাও জানে। সুতরাং বুঝ তাহারা কিছুতেই মানিল না। ক্ষুধার তাড়নায় নবীনের গায়ের চামড়া ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিল। নবীন আর সহ্য করিতে পারিল না; 'নাই ঘরে খাঁইটাও' যেন আরও বেশী করিয়াই বাড়ে! মোটে তো একটা দিন না খাইয়া আছে, তাহাতেই···আচ্ছা করিয়া তাহাদের পিঠে ঘা কতক বসাইয়া দিয়া তাহাদের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টা পাইল।

—ব্যথা এবং ভয় পাইয়াই বোধ করি, ক্ষুধার জ্বালা তাহাদের দমিয়া গেল। নবীনের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস আর তাহারা পাইল না।

অব্যক্ত ব্যথার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসটা চরম নিঃসহায়তায় বাহির হইল নবীনের বুক ফাটিয়া, অবুঝ বালক তাহারা; সংসারের অভাব বোঝে না; ক্ষুধার জ্বালায় তাহারই কাছে আসিয়া আব্দার জানায়; আর সে কি না বাপ হইয়া...

দারিদ্র্য আর অক্ষমতা লুকায় রাগের ঝাল ঝাড়িয়া—

তাহাদের গায়ে হাত তুলিতে নবীনেরই কি···কিন্তু উপায় নাই; ভাতের জ্বালা যে কি, যাহার যে জ্বালা আছে, সেই শুধু জানে—

আর এ জ্বালা, তাহার তো শুধু এখনকার মতই নহে?··· আজন্মের এবং চিরন্তন। যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে আরম্ভ, আর শেষ নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত যতক্ষণ ধুক ধুক করিয়া বহিবে, দারিদ্র্যের অক্ষমতার এই নিদারুণ হাহাকার ততক্ষণই মর্ম্ম ছিঁড়িতে থাকিবে—

কিন্তু, ইদানীংকার অন্নসমস্যাটা অতিমাত্রায় বীভৎস ও মারাত্মক হইয়া নবীনকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই সমস্যাটা ক্রমেই বীভৎসতর হইয়া উঠিবারও কারণ ঘটিয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠের আকাশে আগুন জ্বলিতেছে; ঝলসাইয়া একেবারেই পাংশুটে হইয়া উঠিয়াছে। মেঘের কণামাত্রও কোথায়ও নাই; বৃষ্টি এ বছর হয় নাই; হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। ওদিকে বর্ষা অন্তেই ভিজা মাটীর জো পাইয়া চাষীরা কতকটা জমি তাড়াতাড়ি চাষ আবাদ করিয়াছিল। গায়ের রক্ত জল করিয়া কিছুটা অতিরিক্ত জমিও চষিয়াছিল। ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, জলের আশায় সারা বৈশাখ মাসটাও আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু, জ্যৈষ্ঠও যায় যায়, তবুও জল আর হইল না। ক্ষেতের কচিধানের চারাগুলি জ্বলিয়া গেল, বিলের বুকে বড় বড় ফাটল হা করিয়া উঠিল।

চাষীদের মধ্যে আর্ত্তনাদ উঠিল।

ভদ্রলোক যাহারা জমির ফসলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, ভাবী অনটনের আশঙ্কায় তাহারাও সাবধান হইয়া গেল। অনর্থক কৃষাণ, মজুর কিনিয়া পয়সা এবং ভাত অপব্যয় করিতে রাজী হইল না।

নবীন তাহাদেরই দুয়ারে মজুর খাটিয়া খায়, দিন মজুর— উদয়াস্ত খাটে রক্ত জল করিয়া, শীত গ্রীষ্ম রোদ বৃষ্টি নাই,

সারাটা দিন মাথার ঘাম পায়ে ঝরায়, বিনিময়ে পায় দুইবেলা খাইতে, আর তিন গণ্ডা পয়সা মজুরী।

তাহাতেই নির্ভর করিয়া বাঁচে তাহার অতগুলি পোষ্য। নিজের তাহার জমি জমা নাই একটুও পরের ক্ষেতেই চাষ আবাদ করিয়া সে সোনা ফলায়···কাটাই মরাই করিয়া গোলায়ও তুলিয়া দিয়া আসে। প্রচুর পাওয়ায় তাহাদের চোখে মুখে নির্ভাবনার যে তৃপ্তিটুকু ঝলকাইয়া উঠে, চোখ ভরিয়া তাহাই চাহিয়া দেখিয়া নবীন তাহার প্রচুর খাটনীর দেহের ক্লান্তি জুড়ায়, আর ঐ সামান্য মজুরীতে—

কিন্তু এবার আর তাহাদেরও মুখে আনন্দ করিবার সম্ভাবনা নাই, নবীনকেও কেহ মজুর দিতে ডাকিবে না। কি করিতেই বা অনর্থক ডাকিবে? নবীন একেবারে মুসড়াইয়া পড়িল। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটি গুঁজিয়া দাবার একপাশে বসিয়া পড়িল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার অসাড় হইয়া আসিতেছিল।

মনিব বাড়ীর কাজ শেষ করিয়া বিলাসী ঘরে ফিরিল। গাল ভরা পান, পিক চুয়াইয়া ঠোঁট দুইটি রাঙা টুকটুক করিতেছে। নিজের পেটটা ভর্ত্তি করিয়াই বুঝি তাহার স্ফূর্ত্তি আর ধরিতেছে না। আর নবীন এদিকে···রাগে, দুঃখে জ্বালায় নবীনের চোখ দুইটা ফাটিয়া জল গড়াইবার উপক্রম করিল। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার আবার সংসার? সুখেরই সাথী শুধু দুঃখের কেহ নয়। আপন সুখ খোঁজে···পাইলে তাহাতেই মাতিয়া যায়; স্বামী এবং সৎপুত্র কন্যার দুঃখের দিকে চোখ মেলিয়াও তাকায় না। না পাইলে অভিমান করিয়া রাগিয়া ঝাঁজিয়া কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধায়। এমন সংসার করিবার আগে নবীন গলায় দড়ি ঝুলাইল না কেন? কিন্তু, নবীন তখন তো' ঝুলায়ই নাই,—আর এখন সেই অর্ব্বাচীনতার আক্ষেপটা মুখ দিয়া বাহির হইবার আগেই বিলাসী তাহার আঁচলটা নবীনের সামনের আলগা করিয়া ধরিল।

আঁচলের কাপড়ে চাউল ছিল সের দু'য়েক পরিমাণ। তাহারই মধ্যে হাত ঢুকাইয়া গয়াল আর তুষের গুরা বাছিতে বাছিতে বলিল, "মুনিব বাবুরা দিয়েছে। তোনাদের কাছে ব'লেছিলাম কি না"—

কে দিয়েছে? মনিব?···চাহিয়া যেখানে এক মুষ্টি পাওয়া যায় না, তাঁহারাই কি না যাচিয়া···আনন্দের পরিবর্ত্তে নবীন শঙ্কিতই হইয়া উঠিল। ক্ষুধাতুর অন্নসমস্যার আশু সমাধানেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার শক্তি যেন একটুও পাইল না। হাঁড়ীতে চাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া উনুনে চাপাইতে চাপাইতে বিলাসী আবার বলিল—"তুই ত' কাজ পাসনে ব'লে হাহুতোশ ক'রে মরিস। কিন্তু আমি তো যাতি, না যাতিই তোর কাজের হদিসও করে এনু। বাবুরগে বিলডা পাহারা দিতে হবে। দৈনিক একটাকা হিসাবে রোজ দিবে।

নবীন তথাপি উত্তর দিল না। টাকার কথায়ও কিছুমাত্র লোভ বা ব্যগ্রতা দেখাইল না। বিলাসী তাহার জন্য নূতন করিয়া যে কাজটা আজ ঠিক করিয়া আসিয়াছে, তা'হা তাহার আগে থাকিতেই জানা আছে। দৈনিক এক টাকা মজুরী হিসাবে কাজ তেমন কঠিন নহে। কিন্তু, কাজটা উচিতও নহে। যে ক্ষেতগুলি জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহারই মাঝখানে সেই বিল···কাক চক্ষুর মত কালো অগাধ জলরাশী থই থই করিতেছে। যেন সারা মাঠ খানির সমস্তটুকু রস শুষিয়া এবং সমস্ত চষীদের দেহের সবটুকু রক্ত নিংড়াইয়া নিজের কুক্ষিগত করিয়া উল্লাসের বিকট বীভৎসতায় টলমল করিতেছে।···

ঐ জল সেচ করিয়া দিলে অন্ততঃ পার্শ্ববর্ত্তী বহু জমিতে রস পাইয়া সোনা ফলিয়া যায়। ধানের যে কচি চারাগুলি জ্বলিয়া পুড়িয়া এখনও শুষ্ক অবস্থায় টিকিয়া আছে, আবার তাহারা বাঁচিতে পারে। সতেজ হইয়া ফসল ফলাইবার ক্ষমতা পায়। বহু চাষী অন্নবস্ত্রের ভাবী দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পায়।

কিন্তু, তাহা হইবার কো নাই। উহা হইতে একবিন্দু জল গ্রহণের উপায় নাই। সারাদিন রৌদ্রে লাঙ্গল চালাইয়া পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকাইয়া মরিলেও, এক ঘটী জল উঠাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই কাহারও। বিলের মালিক নবীনের মনিব···হরিশ মুখুজ্জ্যে। এই জলে তাঁহার অসংখ্য মাছ জীয়ান রহিয়াছে। বছর ভরিয়া পোলাও কালিয়ার মাছ···পিয়ারের লোকদের বাড়ী বাড়ী ভেট দেওয়ার মাছ···তারপর মোটা টাকায় বিক্রয় হইবে জেলেদের কাছে। সুতরাং কোন অজুহাতেই বিন্দুমাত্র জলও অপচয় হইতে তিনি দেবেন না। জল কমিলে তাঁহার দারুণ লোকসান।···

সেই জন্য তাঁহার এই সতর্কতা অবলম্বন। আর তাহার

যোগ্যতম ব্যক্তি নবীন। একেই সে তাঁহার ভিটা বাড়ীর প্রজা ; তারপর, গরীব হইলেও নিমকহারাম নহে। এবং দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়াল। প্রয়োজন হইলে সে একশ' লোকের মোহড়া লইতে পারে।

বিলের জল কেহ স্পর্শ করিলে, তন্মুহূর্ত্তে নবীন াঁকেও সংবাদ দিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও লোকজন এবং ক লইয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

একাজ নবীন আজ কয়দিন হইতেই এড়াইয়া আসিতেছে। ার জন্য দুর্দ্ধর্ষ অর্থশালী প্রবল মনিবের দুয়ারে তাহার ধ্যতার অপবাদে যথেষ্ট নির্য্যাতন এবং লাঞ্ছনাভোগও ষ্টে ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে শারিরীক নিপীড়নের সঙ্গে াস্ত হইবার ভয়ও পাইয়াছে। সর্ব্বহারা নিঃসহায় দরিদ্র··· ায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র প্রতিবাদেরও সাহস । নাই। নিঃসাড়ে মনে মনে শুধু ভগবানকে ডাকিয়া র্থক অভিযোগ জানাইয়াছে। কিন্তু, মনিবের হুকুম াপি মানিতে পারে নাই। সেই জন্যই বিলাসীর প্রস্তাবে আজও বিন্দুমাত্র উৎসাহ পাইল না। নিরুৎসুক এবং র্ণ চোখেই তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ল।

নবীনের নিস্পৃহ ভ্যাবাচ্যাকা মূর্ত্তি দেখিয়া বিলাসী ভয়ঙ্কর য়া গেল। এবং তাহার রাগটা এতই অসংযত হইয়া ল যে, নবীনের অকর্ম্মণ্যতা ও অক্ষমতার উপর চোখা খা দুর্ব্বাক্যে ঘৃণা ও গ্লানি মিশাইয়া রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, জর তো এক কড়ার মুরোদ নেই···ভিটের পড়ে না খেয়ে ভিছে···আর আমি মেয়ে নোক হয়ে, কাজ যোগার করে ন দিনু, তাতেও গা লাগতেছে না বাবুর ?···বাবুরা এবার টে ছাড়াই করে দেবে···তেজ করেই কয়ে দেছে ; তখন াটা বেরোবে—

দশহাত পাঁচ হাত এই চালাটুকু দাঁড়াইয়া আছে যেটুকু িতে, ওইটুকুই তাহার সম্বল। উহাও আবার বাকি জনার দায়ে মনিবে নীলাম করিয়া রাখিয়াছে অনেকদিন। ায় যদি একান্তই তাড়াইয়া দেয়···নবীন না হয় গাছতলায়ই থা পাতিবে। পেটে যাহাদের দানা নাই, তাহাদের াবার আশ্রয়ের আবশ্যক কি ? না···তাই বলিয়া একজনের র্থ বাঁচাইবার জন্য নবীন দেশশুদ্ধ লোকের ক্ষতি এবং অসুবিধা ঘটাইবে না। বিশেষতঃ, মনিব তাহার বড় লোক। ঐ সামান্য ক্ষতিটুকু সামলাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ওটুকু লোকসান তাঁহার মত লোকের পক্ষে কিছুই নহে। অথচ···বহু চাষী বাঁচিয়া যাইবে তাহাদের ছেলে মেয়ে পরিবার লইয়া—

কিন্তু···

অকস্মাৎ নবীন যেন কি এক রকম হইয়া গেল।··· তাহাদের বউ ছেলে মেয়ে হয় বাঁচুক···নতুবা মরুক···নবীনের কি আসিয়া যায় তাহাতে ? তাহার দিকে তাহারা কেহ একবার চাহিয়াছে ? অনাহারে ভাজা ভাজা হইয়াই না দুই গণ্ডা পয়সার জন্য সে আজ···প্রতিহিংসা স্পৃহায় নবীনের মরদের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। নবীন বলিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়াই—শোন্ বিলেস···বিল পাহারা দিতেই যাব আমি। আমার বাচারা না খেয়ে মরছে, এ যারা চোখে দেখেও এক 'মুষ্টি' ভাত দিতে কাতর, আমিই বা তাদের দিক তাকাই কেনে ? তুই ভাত বেড়ে দে জলদী করে ; দু'টি খেয়েই আমি বিলমুখো রওনা দেব। ফিরতি পথে বাবুর গে ওখেনথে ঘুরেই আসবানে। এক ফাঁকে তুইও একটা খবর দিস তেনাদের—

জলন্ত আগুনে যেন নিমেষে জল পড়িল। বিলাসীর এতক্ষণের সবখানি রাগ সহসা গলিয়া গেল। রাঙা দাঁতগুলি বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল সে জন্যি ভাবিস নে তুই···তেনাদের খবর আমি ঠিক দেবানে—

আহারান্তে নবীন বেশ করিয়া এক কলিকা কড়া তামাক পোড়াইল। তারপর ঘরের কোণায় ঠেস দেওয়া মোটা বাঁশের লাঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। পাঁচ হাত লম্বা ···তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিখানা নবীনের চিরসাথী। হাতে থাকিলে মানুষ তো নিতান্ত তুচ্ছ···দুর্দ্ধর্ষ হিংস্র ও বলীয়ান জানোয়ারও নবীনের সামনে পড়িলে আস্ত মাথা লইয়া ফিরিতে পারে না। এই লাঠির ঘায়ে কত বুনো শুয়োর আর মানুষের কাঁচা মাথাই যে সে ছেঁচিয়াছে ! সেই লাঠি হাতে করিতেই নবীনের দেহের সবখানি রক্ত যেন সহসা উদ্দাম হইয়া সমস্ত শিরা উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া চন্ চন্ করিয়া মাথায় উঠিয়া গেল। তৈলহীন রুক্ষ এবং ঝাকড়া চুলের রাশি সামলাইবার জন্য গামছা দিয়া মাথাটা কষিয়া জড়াইয়া—

পা বাড়াইতেই বিলাসী পিছু ডাকিল। নবীন দাঁড়াইয়া পড়িল এবং বিরক্তিতে ভ্রূ দুইটি কুঁচকাইয়া বলিয়া উঠিল—কি আবার···যাবার বেলায় পিছু ডাকতি লাগলি কেনে রে?

বিলাসী ধমকের ধার ধারে না, নিজের পেট সে নিজেই চালাইয়া খায়; অধিকন্তু নবীনকে এবং তাহার এক গোষ্ঠিকে সেই করিয়া-কর্ম্মাইয়া খাওয়ায়, তায় আবার ফোঁস করিয়া উঠিয়াই হঠাৎ কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সামলাইল। এবং কণ্ঠস্বরে যতখানি সম্ভব মদিরতা ঢালিয়া আধভাষায় মিষ্টি একটু মুচকি হাসি ঠিকরাইয়া কহিল—একটু দাঁড়াইয়া যা না কেনে?···

নবীন দাঁড়াইল। নিরুত্তরে বিলাসীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল—বিলাসী কহিল আরও বিহ্বল কণ্ঠে—কাজ ক'রে ফিরতি পথে বাবুরগে ওখেন থিকে টাকাটা নিয়ে আসিস; আর বাজার ঘুরে অমনি একটা আলতা কিনে আনিস কিন্তু। ···কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী তাহার যৌবন-পুষ্ট দেহখানি এমনই এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে মোড়াইয়া লইল, যাহাতে মানুষের মতিভ্রম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

মুহূর্ত্তে মোহ কাটিয়া গেল তাহার বিস্ময়ে। নবীন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল বিলাসীর দিকে।··· আল্‌তা!·· নবীনের জীবনে আল্‌তা কখনও কেনে নাই। প্রথম সংসার করিবার সময় তো তাহার অল্প বয়স···তখনও কোনদিন কিনিবার কল্পনাও জাগে নাই। ওসব সখই তাহার হয় নাই। সে স্ত্রীরও না। অত পয়সা বাজে ব্যয় করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না।

কিন্তু, বিলাসীর কথা আলাদা; কচি বয়স তাহার··· ভদ্রলোকের বাড়ী কাজ করিয়া অনেকটা ভদ্রঘেঁষাও হইয়াছে। তাহাদের চাল-চলন, বিলাস বাবুয়ানী তাহারও মনে কেমনই একটু রঙিন বাসনার ছোপ বুলাইয়াছে—

নবীনের মত দারিদ্র্যের উষ্ণস্পর্শে মন প্রাণ তাহার এখনও ঝলসাইয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়া—তিন আনার পয়সা সারাদিনের রোজগার নবীনের; জীবন ভরিয়া তাহাতেই তো সঙ্কুলান করিয়া আসিয়াছে সে। তাহার পরিবর্ত্তে ষোল আনা এক সঙ্গে···ইহা যেন তাহার কাছে কত বেশী···আশাতীত···অকল্পিত। একসঙ্গে এত পয়সা আসিতেছে যখন, তখন বিলাসীর ঐ সামান্য সাধটুকু অপূরণ রাখিবে কেন?

নবীন মনে মনে কি ভাবিল, তাহা সেই জানে। মনের ভাব তাহার মুখের চেহারায় বৈচিত্রের কোন রেখা ফুটাইল না। বিলাসীর জন্য আল্‌তা একটি লইয়াই আসিবে—নিস্পৃহভাবে শুধু সেইটুকুই জানাইয়া দিল। এবং তৎক্ষণাৎ, রওনা দিল বিলের দিকে···

হতভাগ্য চাষীরা! সামনে তাহাদের অগাধ জলরাশী; অথচ, সেই জল অভাবে এক একটা পুত্র সন্তানের মতই তাহাদের এক একখানি সোনার ক্ষেত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। নিতান্ত অসহায় তাহারা···হরিশের নিকট গিয়া বহু আবেদন নিবেদন···বহু কান্নাকাটি করিয়াছে; প্রায়ে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া আকুতি জানাইয়াছে···একটু জল তাহাদের এবারকার মত ছাড়িয়া দিতে। মুমূর্ষু চারাগুলিকে জলের লাগাল না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপে টিমটিম করিয়া জীয়াইয়া রাখিতে যতটুকু দরকার, তাহার অধিক তাহারা চায় না। কিন্তু···

স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ধনিকের প্রাণে দরিদ্রের দায়ে করুণা জাগে নাই। নিষ্ফলতার সঙ্গে অপমানের রূঢ় আঘাত দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে কুকুরের মত—বুকের মধ্যে গুমরান আর্ত্তনাদ তাহাদের পেটের জ্বালার সঙ্গে মর্ম্মান্তিক হতাশায় বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছে। অপমানাহত বুভুক্ষু নিঃসহায়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জ্বালিয়া দিয়াছে বিদ্রোহের ভীষণ বহ্নি।··· জল তাহারা লইবেই। জোর করিয়াই লইবে। বিল ভরিয়া পাঁচ সাতখানা গ্রামের চাষী সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছে। উত্তেজনায়, ঔদ্ধত্যে তাহারা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঢাল, সড়কী আর পাকা বাঁশের লাঠিগুলি শক্ত মাটীতে ঠোকর দিয়া হিংস্র দৃষ্টিতে মুহুর্মুহু তাকাইতেছে বিদ্রোহী দলের আসার পথের দিকে। একটি প্রাণীকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিবে না। একেবারে নিকাশ করিয়াই ছাড়িবে

যাহা হয় হইবে পরে, এই উত্তেজনায় মুহূর্ত্তে তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না কেহই। ভবিষ্যতের ভালমন্দের বিচারশক্তি তাহাদের অশিক্ষিত মন হইতে নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া গিয়াছে। আপাততঃ সাফল্যের পথে যত বড় বাধা বিঘ্নেরই সৃষ্টি হউক,

দুর্দ্ধর্ষ পাশবিকতায় তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার উল্লাসে তাহারা বিকট চীৎকারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠখানি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। বিলের কূলে কূলে পাতিয়াছে অসংখ্য ডোঙ্গা-কল...তাহাই ভরিয়া ঘন ঘন বিলের অগাধ কালো কুচকুচে জলরাশি সেঁচিয়া ঢালিয়া দিতেছে—সমগ্র মাঠখানির অভিশপ্ত ঝলসানো বুকের উপর।

নবীন আসিয়া মাঠে পড়িল ঠিক সেই সময়টিতে। বেলা তখন গড়াইয়া গিয়াছে, পশ্চিম দিগ্‌প্রান্তের ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ-পালার আড়ালে; নিস্তেজ রোদের একটু ঝিল-মিলে আভা শুধু লাগিয়া আছে সুউচ্চ গাছগুলির মাথায় মাথায়... দ্বিপ্রহরের নির্ম্মম অত্যুত্তপ্ত ঝলসানি নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; অচিরাগত গোধুলির ম্লানিমার সঙ্গে মৃদু শীতলতার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে সারা মাঠখানির সর্ব্বাঙ্গে...ঝির ঝির করিয়া অলস একটু হাওয়াও বহিতে সুরু করিয়াছে—ধানের একহারা কচি চারার মাথাগুলি অত্যন্ত মন্থরভাবে দোলাইয়া। সারা বছরের রৌদ্র-দগ্ধ শক্ত এঁটেল মাটী সদ্য জলের ছোঁওয়ায় গলিয়া গলিয়া মাখমের মত নরম এবং কোমল হইয়া আসিয়াছে; শুষ্কপ্রায় চারাগুলি যেন ইহারই মধ্যে সঞ্জীবনী স্পর্শে নূতন প্রাণশক্তি পাইয়া সতেজে মাথা খাঁড়া দিয়া উঠিয়াছে।

মুগ্ধ চোখে নবীন চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে কি করিতে আসিয়াছে, তাহা তাহার একদম ভুল হইয়া গেল। অব্যক্ত-আনন্দের তুমুল আলোড়ন পা দুইখানিকেও খানিক-ক্ষণের মত নিশ্চল আড়ষ্ট করিয়া দিল। ধানের চারায় জল পাইয়াছে...আবার তাহারা বাঁচিয়া উঠিবে; হাজার হাজার লোক খাইতে পাইবে; সেই সঙ্গে নবীনও দুটি পাইবে তাহার ছেলে মেয়ে লইয়া; দেশের এবং দশের অভাব মোচন হইবে; তাহারাও তাহাকে ডাকিবে—শুধু কি তাহাই? আত্মহারা হইয়া নবীন একটানা ভাবে ভাবিয়া চলিল—রাশকে রাশ ধান কাটা হইবে...মাঠ ভরিয়া ধানের আঁটী সাজাইয়া রাখিবে পাহাড়ের মত স্তূপাকার করিয়া—

তারপর, সকলের বাড়ী বাড়ী যাইবে মানুষের মাথায় মাথায়...গরু মহিষের গাড়ী বোঝাই হইয়া। আঁটী হইতে ধানের যে শীষগুলি খসিয়া পড়িবে...আর গাড়ী হইতে যেগুলি পথের মাঝে ঝরিয়া পড়িবে, তাহাই কুড়াইয়া নবীন আট দশ ধামা সঞ্চয় করিবে। তাহাতে তাহার অন্ততঃ দুই মাসের খোরাকী—এমন কি চিড়া-মুড়া পর্য্যন্ত চলিবে। নূতন ধানের মুড়ী...উঠানের কোণের দিকে বিলাসী উনুন তৈরী করিবে; সারা শীতকালটা ঘরে আর রান্নার পাট করিবে না; বেলা গড়াইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার না হইতেই উঠানের উনুনে ভাত চাপাইবে। নবীন তাহার ছেলে মেয়ে লইয়া উনুনের তাঁতে আগুন পোহাইবে...আর নূতন ধানের মুড়ী তেলে মাখিয়া কচি মূলা বা কাঁচা লঙ্কা দিয়া—

হঠাৎ নবীনের নজর পড়িল বিলের দিকে। অসংখ্য লোক...বিলের পাঁড়...মানুষের মাথায় মাথায় কালো হইয়া গিয়াছে এবং অজস্র জলস্রোত কলকল শব্দে সমগ্র ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ঝরণার মত। নবীনের আনন্দ যেন বুক উপচাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। দ্রুতপদে ছুটিল সেই সঙ্ঘবদ্ধ জনতার দিকে। তাহারাও তাহারই মত সব দরিদ্র, তাহার স্বজাতি...চাষা...তাহাদেরই মধ্যে গিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের কাজের সহায়তা করিবার জন্য নবীন যেন সহসা অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সেও জল তুলিবে...মুমূর্ষু বিশুষ্কপ্রায় চারাগুলিকে বাঁচাইবার অধিকার তাহারও আছে। এবং ইহা তাহার কর্ত্তব্যও উহারই দুইটি দানার অভাবেই না এই হাহাকার? উহা না হইলে মানুষের বাঁচিবার ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং—

নবীন আসিয়া হাজির হইল সেখানে। দেখিল, একটি ডোঙ্গাকলও তাহার জন্য খালি পড়িয়া নাই। অথচ—

ডোঙ্গাকল তাহার একটা চাই-ই। চোখের সামনে এবং সব চেয়ে হাতের কাছে যে লোকটা জল তুলিতেছিল, নবীন তাহারই কাছে আগাইয়া গেল। এবং মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, বা তাহাকে একটা কথাও না বলিয়া, ধরিয়া বসিল তাহার বাগাতটি।

নবীন শত্রু...হরিশ মুখুর্জ্জ্যের লোক, এবং টাকা খাইয়া স্বার্থ রক্ষা করিতে আসিয়াছে...এ কথা না জানিত কে? সমস্ত চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র সেই দলছাড়া হইয়া আসিয়াছে তাহাদের বাধা দিতে। নবীন অমঙ্গল...স্বজাতির এবং সমাজের শত্রু! বড় লোকের আস্তাকুঁড়ের কুকুর!

উন্মত্ত জনতায় যে বিক্ষোভ ক্রমে মিটিয়া আসিতেছিল, স্ব স্ব ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভাবী অন্নসমস্যা দূরী-করণের সম্ভাবনায়—

প্রতিদ্বন্দ্বহীন সাফল্যে আত্মগর্ব্বের জয়োল্লাসে বরং তাহারা মাতিয়াই উঠিয়াছিল।

সেই বিক্ষোভ—

সহসা রূপ ধরিল উদ্দাম পৈশাচিকতায়! তাহার সঙ্গে ঈর্ষার জ্বালা, আর বিজাতীয় রাগ…ঐ অতগুলি লোককে একেবারে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ক্রুদ্ধ ও হিংস্র করিয়া তুলিল।

নবীনের মনের খোঁজ কেহ পাইল না। সে দরকারও বোধ করিল না। তাহাকেও কেহ সুযোগ দিল না।

'মার মার' শব্দের বিকট উল্লাসধ্বনি করিয়া একযোগে এ বিরাট জনতা সহস্র ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল নবীনের উপর। লাথি চড় কিল ঘুসীর প্রচণ্ড ঘায়ে, অসহ্য ব্যথায় যখন হতভাগ্য আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় জলে ঝাঁপাইয়া প'ড়িল, তখন জলের তলে তাহার নিমজ্জিত সমগ্র দেহটির উপর ভাসমান শুধু মাথাটি…বাতাস…একটু বাতাসের জন্য।

কিন্তু বাতাস আর মিলিল না। সহস্র লাঠির নির্ম্মম ঘায়ে মাথাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। ফিন্‌কি দিয়া টাট্‌কা রক্তের ঢেউ বিলের অগাধ কালো জলে মিশিয়া আলতার মত ফিকে রাঙা হইয়া উঠিল।

মুমূর্ষুর অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর ঠোঁট দুইখানি শুধু একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বোধ করি অন্তিম বাসনা জানাইয়া গেল…বিলাসীর আলতাটুকু পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য।

আগমনী

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

কণ্ঠে তোমার শেফালি ফুলের মালা
চরণে তোমার অমল কুন্দ-কলি,
অপরাজিতায় সাজায় অর্ঘ্য ডালা,
গুঞ্জরি' ফেরে কমলে কমলে অলি।
শুভ্র কাশের পুষ্পিত নিবেদন
কেতকীর মনে আনিল কি আলোড়ন,
কাজরী-নৃত্য হয়েছে কি সমাপন,
বিদায় নিয়েছে শ্রাবণের ঘন দেয়া?
রজনীগন্ধা হ'ল কি তন্দ্রা-হারা
ঝরা বকুলের বন্ধ হ'য়েছে খেয়া?

গগনে গগনে মেঘ-মন্দ্রিত বাণী
থেমেছে কাননে গুঞ্জন কাণাকাণি;
কত্, শাখায় রজত তুলিকাখানি
বুলায় দুগ্ধ-ধবল পুঞ্জ মেঘে,
বুকের বসন ছিঁড়িয়া পরম খনে
কনক-কিরণে প্রভাত উঠেছে জেগে।

মরাল মরালী সরসীতে ফিরে সুখে,
সুঁদিফুলগুলি মুখ তোলে কৌতুকে,
উষার হাসিটি পড়েছে শিশুর মুখে—
তরুতলে তারা মেতেছে কলস্বরে,
কিশোর কিশোরী হেসে ওঠে অকারণে
তরুণ-তরুণী স্বপন-রচনা করে।

আলোর সাগরে জেগেছে মধুর হাসি
তটিনীর বুকে উছলিত কলকথা,
শ্রাবণ-দিনের থেমেছে পুলকরাশি
দিকে দিকে আজি অসীম প্রসন্নতা।

জেগেছে জগৎ ভুবন ভুলানো বেশে,
মধু-মালতীর মালাটী পরেছ কেশে,
যূঁই-চামেলীর বৃন্তে উঠেছে হেসে
শরৎ তোমার উজল মধুর হাসি।
কণ্ঠে তোমার শেফালি-ফুলের মালা,
চরণে তোমার অমল কমল রাশি।

চির-কল্যাণময়ী বরেণ্য মাতা,
এনেছ কি সাথে শান্তি অমিয়-বাণী?
খড়্গো খড়্গো বাজে রণ ঝঞ্ঝনা
মেঘে মেঘে এ যে মৃত্যুর হাতছানি।
এসেছে রুদ্র ধ্বংসের পায়ে পায়ে
কৃষ্ণ-পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝা-বায়ে,
আনিবে কি প্রাণ-মন্ত্র শ্যামল ছায়ে?
জীবন-মন্ত্র মাগে এ অরণ্যানী!
সুসভ্যতার সুখ মিটিয়াছে মাতা,
পল্লীজীবন যাচে অগণ্য প্রাণী।

শ্যাম অরণ্যে ছিল ওঙ্কার-ধ্বনি
সাম-যজু-ঋক্ ঝঙ্কার মধুময়,
তিমির-বিদার জ্যোতির বার্ত্তা বহি'
শোনাল ভারত আত্মার পরিচয়।
দাও প্রাণে সেই অ-মৃত মন্ত্র তব,
অ-শোক মন্ত্রে জাগুক জীবন নব,
ফিরাইয়া আলো অতীতের বৈভব—
এ ভারতে দাও সে মৃত-সঞ্জিবনী,
হে মাতঃ, বঙ্গে আসুক শান্তি ফিরে
সার্থক হোক্ তোমার এ আগমনী।

জন্মভূমিতে দুর্গাপূজার শেষ স্মৃতি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমার এই অস্থিত্ব জীবনের ষষ্টিতম বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ জীবনে কেবল ঘুরিয়াই চলিয়াছি—কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই। জীবনের অপরাহ্ন বলিতে ভয় হয়, তাই এখনও মনে হয়, মধ্যাহ্নও আসে নাই। কিন্তু সময় কেহ কি ধরিয়া রাখিতে পারিবে? অপরাহ্ন আসিবেই, ক্রমে সন্ধ্যাও আসিবে, ঘনীভূত হইয়া অন্ধকার আচ্ছন্ন করিবে। ক্রমে রাত্রিও আসিবে,—তারপর কোন্ মুহূর্ত্তে অলক্ষ্যে জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, কেহ জানিবে না।

কিন্তু কেন আসিলাম? কি করিলাম—এখনও মনে ভাবনা আসে না। বয়স হইয়াছে, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি, শীঘ্রই চক্ষুও মুদিব—তথাপি বিশ্রাম চাহি না, কাজ চাহি, এখনও যৌবনের উৎসাহ আছে। কিন্তু কি কাজ করিলাম? খতিয়া দেখিলে কিছুই নয়—না আর্থিক, না পরমার্থিক, না মানবহিতৈষণার। এইভাবেই যাইব, সকলেই যাইবে, জল বুদ্বুদের মত আসিয়াছি, আবার সেইরূপই বিলীন হইয়া যাইব। কিন্তু কোথায় যাইব?

মাতৃপদে কি পৌঁছিতে পারিব?

মা আসিতেছেন। বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, রণরঙ্গিণী দশভুজা মা, বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুবধে দ্রুতগতি আসিতেছে কি আজ? দেখ, মা, তোমার সাধের ভারত-ভূমি আজ শ্মশান—আজ ইহাতে কঙ্কাল মূর্ত্তিই কেবল বিরাজ করিতেছে—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষা-বিবর্জ্জিত—মৃতকল্প। আজ এই মৃত্যুপথ-যাত্রী জীবন্মৃত জাতির অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবে না কি মা? অন্নাভাবে, দুশ্চিন্তায়, অশান্তি,—অসুখ-অস্বাস্থ্যে, অকালবার্দ্ধক্যে, মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্যে ভারত-ভূমি আজ তো প্রায় রসাতলে যাইতেই বসিয়াছে। আজ তোমার সাধের পিতৃভূমি তুমি রক্ষা করিবে না কি, মা? পুণ্যদায়িনী অন্নপূর্ণা মা, অস্ত্র সংহরণ কর, অসুর বিনাশ না করিয়া অন্নদানে তোমার সন্তানগণকে সুখ-স্বাস্থ্যে বর্দ্ধিত কর মা। আজ তোমার সুখদা, বরদা, কমলা নাম সার্থক হউক।

মা আসিতেছেন। প্রতিগৃহ মায়ের আগমনে হাসিয়া উঠিবে, আবার জনকোলাহলে গ্রাম-প্রান্তর পল্লী পরিপূর্ণ হইবে, শিশুর কলকোলাহলে ঘরবাড়ী আনন্দে মুখরিত হইবে, আবার শঙ্খবাদ্য হুলুধ্বনিতে পাড়াগুলি প্রতিধ্বনিত হইবে। আজও বাঙ্গালীর বাড়ীই সুখ, বাড়ীই স্বর্গ, জন্মভূমিই আনন্দনিকেতন—স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু মা, এই অধমের বাড়ী কৈ? জন্মভূমি কৈ? সেই ১৯২৩ এর শরতের এক নির্দ্দয় প্রভাতে তোমারই সপত্নী পদ্মা আসিয়া ভীমগর্জ্জনে বাড়ীঘর, চিরদিনের জন্য কোন্ অতল জলে ভাসাইয়া নিয়া গেল! সেই যে গেল, আর হইল না—আজ আমি ভবঘুরে। আজ বাড়ী নাই, মা নাই, জন্মভূমি নাই—আত্মীয়স্বজন নাই, পল্লীবাসী সহপাঠীরা কেহই নাই, দেশবাসীও আপনার বড় কাহাকেও দেখিতেছি না। তবু মনে হয় সেই বাড়ী—আমাদের গ্রাম, গ্রামের দুর্গাপূজা, দশহরার ভাসান, বিজয়া সম্মিলন! হায় সে সুখের দিন কি এজীবনে আর উপভোগ্য হইবার নয়?

সেই শেষ বাড়ীর সুখ! আজ তাহাই পুনঃ পুনঃ মনে আসিতেছে। বাড়ীর সেই বিজয়া মনে পড়ে, সেবারের পূজা মনে পড়ে, মনে আসিলে চোখে জল আসে, তবু প্রাণে সুখের সঞ্চার হয়। বাঙলার সেই দুর্ব্বৎসর ১৯২২—১৩২৯-এর আশ্বিন মাস। আজ সেদিনকার স্মৃতি-অশ্রুতেই মাতৃপাদপদ্ম অভিষিক্ত করিব। কিন্তু মা, যে বিশ্বাসে রামপ্রসাদের দক্ষিণমুখী মা উত্তরদিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইয়াছিল, যে বিশ্বাসে মাতৃভক্ত রামকৃষ্ণ মায়ের সহিত কথা কহিতেন, যে বিশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্ত, অকূল, বাত্যাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গসঙ্কুল, কাল সমুদ্রে সপ্তমীর রাত্রিতে মাতৃ দর্শন পাইয়াছিলেন, সে বিশ্বাস কৈ মা? বিশ্বাস নাই, জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, ত্যাগ নাই, ত্যাগের শক্তি নাই। শক্তি দাও মা—তোমাকে একবার প্রাণভরিয়া ডাকি। তোমার নির্দ্দেশে আপনাকে জগতে ভাসাইয়া দিই।

সেই ১৯২২ সাল। আমরা তখন কালীঘাটের আদিগঙ্গা-

তীরবর্ত্তী আলিপুরের সেণ্ট্রালজেলে অবস্থান করিতেছি। এমন মহাজন সম্মিলন আর কোথাও বোধ করি, হয় নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ভক্তিভাজন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্র শাসমল, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ দুইশত সহকর্ম্মীসহ তখন এই জেলে। জেল তখন স্বরাজ আশ্রমে পরিণত—পণ্ডিতমণ্ডলীতে তখন উহা পরিপূর্ণ। কত নূতন কথা শুনিয়াছি। আজাদ সাহেবের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়াছি, শ্যামবাবুর নিকট দেশের যাবতীয় লোকের কত আখ্যান শুনিয়াছি, এবং দেশবন্ধুর নিকট হইতে ভারতীয় জাতীয় ইতিহাসের ধারা অবগত হইয়াছি। চণ্ডীদাস হইতে রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদ হইতে গিরিশ, ঈশ্বরগুপ্ত হইতে বঙ্কিম, বঙ্কিম হইতে জনজাগরণের কত কথাই না তিনি বলিতেন। বস্তুতঃ জেলের জীবন কি সুখেই গিয়াছে। খেলাধুলায় লেখাপড়ায়, সভাসমিতিতে, থিয়েটার ম্যাজিকে কাটাইয়াছি, কোন ক্লেশই বিষাদ আনিতে পারিত না। একত্রে ভূরি ভোজনে যোগ দিয়াছি, পুস্তক লিখিয়াছি, কাগজের এনভেলাপ হাসিতে হাসিতে সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে তৈয়ার করিয়াছি, আবার দোতলা হইতে ওপারের দৃশ্যও কত দেখিয়াছি! গঙ্গাস্নান দেখিয়াছি, গঙ্গার পারের বাদ্যবাজনা শুনিয়াছি। তারপরে একদিন ওপারেই ত্রিগুণেশ্বরের মন্দিরে পূজার বাদ্য আরম্ভ হইল, আমাদের প্রাণও আনন্দে সাড়া দিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে জেলের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। একদিন আমরা রাত্রির আহার করিয়া কেহ cell-এ বা ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ হইয়া নিদ্রা যাইতেছি, সকলের অলক্ষ্যে জেলার সাহেব দেশবন্ধুকে আসিয়া বলিলেন "Mr. Das, your son is ready with the car. You are to accompany him." প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, দেশবন্ধুর কক্ষ শূন্য। জেল যেন শূন্য মনে হইল, সকলের মন গভীর বিষাদে পূর্ণ হইল। তারপরে ক্রমে ক্রমে প্রতিদিনই দুইটী পাঁচটী করিয়া সঙ্গীরা কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জেল হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। আমরা বন্ধুগণ ফুলের মালা দিয়া বিদায় অভিনন্দন দিতে লাগিলাম, সহর্ষে সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া তাহারা গৃহ প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন। যাইবার সময় কাহারও কাহারও অশ্রুও বিসর্জ্জিত হইল। এইরূপে একদিন একবৎসর পূর্ণ হইবার মাস তিনেক পূর্ব্বেই জেলার রায়েন সাহেব বলিলেন,

"হেমেন্দ্রবাবু, জিনিষপত্র গুছাইয়া লউন, আপনার সমন আসিয়াছে।"

খাওয়া দাওয়া করিয়া, শ্যামবাবুদের প্রণাম করিয়া, আজাদ সাহেবদের সেলাম দিয়া, বন্ধুগণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া গলার মালা লইয়া বিদায় পর্ব্ব শেষ করিলাম, ভিতরের দরজা বন্ধ হইল। গেটে জেলার সাহেব কথাবার্ত্তা বলিয়া, নামে মাত্র জিনিষ পত্র দেখিয়া, একখানি সেকেণ্ড ক্লাস খোলা গাড়ীতে নিজে আসিয়া উঠাইয়া দিলেন। বীরের ন্যায় আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম, ফুল্লমনে ভাবিলাম এইবার বাসায় পৌছিয়া কত ফুলের মালাই পাইব!

বাহিরের বাতাস প্রথম স্পর্শ করিয়াই কোথায় স্বস্তি পাইব, আর দেখিলাম চতুর্দ্দিকে যেন নিরাশার হতাশ্বাস! ষষ্ঠীর রাত্রি বটে, কিন্তু মনে হইল যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাহিরে সাড়াশব্দ নাই, জনকোলাহল নাই, সবই যেন বিষাদে ভারাক্রান্ত। চন্দ্রদেব অস্তোন্মুখ, শিবাকুল আলিপুরের জনশূন্য প্রান্তর কাননে অশুভধ্বনি করিতেছে, আর মাঝে মাঝে জেলওয়ার্ডারগণের কথাবার্ত্তা দরজার মধ্য দিয়া বিষের মত কাণে আসিতেছে। গাড়ীতে উঠিয়াই মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আসিয়াছিলাম গভর্ণমেণ্টের মোটরে, উচ্চ ও নিম্ন পুলিশ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সসম্মানে পরিবৃত হইয়া, মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনির মধ্যে, সুশোভিত কণ্ঠাভরণে, আর যাইতেছি একাকী, কাক শৃগালের ধ্বনি শুনিয়া, নীরব রাজপথে,—ঢক্ ঢক্ গাড়ীতে। লজ্জায় ক্ষীণ মালাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

গাড়ীতে চলিতে চলিতে গঙ্গার পুলটি পার হইলাম। পূজা আসিতেছে, আমার মত নেতা জেলপ্রত্যাগত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে, অথচ কোন সাড়া নাই! সকলে আমাকে দেখিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে না! বরং সকলে আমাকে দেখিয়া যেন মুখ ফিরাইয়া নিতেছে! বড় ক্ষোভ হইল, রাগও হইল। কালীবাড়ীর রাস্তা পার হইলাম। দোকান কারখানা পার হইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ক্রমে বাসার কাছে গাড়ী থামিল। ওঃ কি পরিবর্ত্তন! কয়মাস পূর্ব্বে এখানেই দশহাজার লোক অশ্রুগর্ব্বমুখে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া বিদায় দিয়াছিল, আর আজ কোন সাড়া নাই,

কেহ আসিল না! কেহ আনন্দজ্ঞাপন করিল না! কেহ সম্মান প্রদর্শন করিতে ছুটিয়া আসিল না। ভাবিলাম এই পরিতাপেই কি তবে কর্ম্মীরা কংগ্রেস হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, খদ্দর ছাড়িয়া দিয়াছে, আবার আদালত ভর্ত্তি করিয়াছে? অভিমানে রাগে, তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি, সব অস্থায়ী, মান অস্থায়ী, নেতৃত্ব অস্থায়ী, স্বচ্ছন্দতা অস্থায়ী।

কিন্তু দেশের লোক উদাসীন্য দেখাইল বটে, আমরা তো ছাড়িলাম না। দুই পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সভায় জেলের বড়াই করিয়া কর্ম্মীগণ নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নিজের ঢাক নিজেরাই বাজাইতে লাগিলেন। 'গাঁয়ে মানে না নিজেরাই মোড়ল' হইলেন। আজ সেই সব নেতৃবৃন্দ কোথায়? কেহ কংগ্রেস ছাড়িয়া সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কেহ কাউন্সিলার হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইতেছেন, কেহ চাকুরী করিতেছে, কেহ কেহ বা রেডিক্যাল পার্টিতে যোগ দিয়াছে। তখন বুঝি নাই, ক্রমে বুঝিলাম, দেশপ্রেম বাজারের পণ্যময়, জেলে গিয়া বড়াই করিলেই দেশের কাজ হয় না, প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অভিমান নাই, অভিমান আশ্রয় করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না।

যাহা হউক, বাসায় আসিয়া দেখিলাম কেবল একজন আত্মীয়ই বাসায় রহিয়াছেন। ভোজন সারিয়াই আসিয়াছিলাম, বাসায় আর কিছু খাইলাম না। শুইয়া পড়িলাম। প্রভাতে জাগিয়াই শুনিলাম সপ্তমীর বাজনা বাজিতেছে।

কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বকথা। তখনও পাড়ায় পাড়ায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের বাহার আরম্ভ হয় নাই। সকালে উঠিয়া বৈঠকখানায় বসিলাম, আশা ছিল অনেকেই ছুটিয়া আসিবেন। বৃথা আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কেবল পাড়ার দু'একটী বর্ষীয়সী মহিলা ভিন্ন কেহই আসিলেন না। জেলে যাওয়াটাই তবে কি বৃথা হইয়া গেল! আজ কোথায় রহিল সেই সব কর্ম্মীর দল—আমার সহকর্ম্মীগণ, আমারই হাতের তৈরী স্বেচ্ছাসেবকের দল, আর বাইরের যে সকল ব্যক্তি বাহবা দিতেন সেই হিতৈষীগণ? মনটা বড়ই দমিয়া গেল। রাগে মাথা কপাল কুটিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। সেদিনকার অভিমানবাঞ্জক দুঃখমিশ্রিত স্মৃতি এমনই পীড়াদায়ক হইয়াছিল যে আজ আর সেদিনকার বান্ধব বলিয়া কাহারও কথা মনে হইতেছে না। কিন্তু একজনের কথা কখনও ভুলিব না। খুব মনঃসংযোগে খবরের কাগজখানি পড়িতেছি, হঠাৎ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আনন্দস্বরে কে যেন ডাকিয়া বলিলেন—

"বাবু এসেছেন?"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমারই মুহুরীবাবু সহায়রাম মুখোপাধ্যায়। মুহুরী এককালে ছিলেন বটে, কিন্তু গত ১৮ মাস হইতে তো ব্যবসা আমি ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন আর সম্পর্ক কি? ইনি সঙ্গতিপন্ন, বাড়ীঘর আছে, আমি চলিয়া যাইবার পরে আর কাহারও কাছে যান নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আর কি কাহারও কাজ করিতে পারি, আমার মর্যাদা বুঝিবে কে?" উঠিয়া আনন্দের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম।

ওকালতি জীবনে আমার কপালগুণে দুইজন মুহুরীই আমার পরম বান্ধব ছিলেন। প্রথমটি ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, কিন্তু আজ আর তিনি ইহজগতে নাই। ইনি খুব কর্ম্মঠ ছিলেন বটে, কিন্তু অভাবগ্রস্ত থাকায় সর্ব্বদাই টানাটান ছিল, আর সহায়বাবু বরাবরই বুনেদী লোক। তবে ললিতের বিশ্বাস আমার উপর এত বেশী ছিল যে সর্ব্বদাই বলিত, "আমার খুন করিতেও ভয় নাই, আমার বাবু আছে।" একদিন হইয়াছিলও তাই। রাত্রি দুপ্রহরের সময়ে একদিন রক্ হইতে আমাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া বলিল, "বাবু, আমাকে কয়েক ব্যক্তি বাড়ী চড়াও হইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি লাঠি দিয়া জখম করিয়া আসিয়াছি। আপনি আছেন আমি পালাইলাম।" শেষ পর্য্যন্ত এ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শেষে পেটে একটা ফোঁড়া হওয়ায় হাসপতালে যাইতে বাধ্য হয়, অস্ত্রোপচারের পর আর বাঁচে না। আজ সপ্তমীর দিনের কথা লিখিতে লিখিতে এই বান্ধবের কথা খুবই মনে আসিতেছে। মনে হইয়া একফোঁটা জলও আসিতেছে। তারপর আসিলেন সহায়বাবু। ইনিও ছিলেন আমার মস্ত সহায়—তবে ললিত ছিল অভাবের সময়—সুরুতে, আর ইনি একটু পসার হইবার পরে।

যাহা হউক সহায়বাবু দুইএক কথার পরেই বলিলেন "বাবু, মা কি বৌমা তো এখানে নাই, বাড়ী তো নিশ্চয়ই যাইবেন, যে দু'দিন থাকেন, প্রসাদ পবেন আমার ওখানে।"

সহায়বাবু ও ললিত আমার মাকে 'মা' বলিয়াই ডাকিতেন। মাও তাঁহাদিগকে খুব স্নেহ করিতেন।

প্রশ্ন করিলাম—"আপনার ওখানে প্রসাদ?"

"কেন, আপনার জন্য মায়ের বাড়ীর প্রসাদ আনাইব।"

আমার মনে হইল, কালীঘাটে দুর্গাপূজা হয় না। মায়ের সীমানার মধ্যে নাকি অন্য দেবীমূর্ত্তি আসিতে পারে না। তবে দুর্গাপূজার তিনদিনই মায়ের পূজা ও ভোগ বিশেষভাবে দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার তিনদিনই কালীমন্দিরে অসম্ভব ভিড় হয়। এমন সময়ও ছিল এক অষ্টমী পূজার সময়েই পাঁচশত পাঁঠা বলি হইত। সপ্তমী নবমীতেও বড় কম হইত না। আজকাল পূর্ব্বের কিছুই নাই।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া প্রথমেই দেশবন্ধুর বাড়ী গেলাম। তিনি তখন সপরিবারে পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য কাশ্মীর গিয়াছেন—বাড়ী তখন জনহীন, শূন্য। সেই সহস্রকণ্ঠ-নিনাদিত বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মন আরও বিষাদে পূর্ণ হইল। অতঃপর গেলাম কংগ্রেস আফিসে। আফিস বন্ধ, কিন্তু পাড়ার কেহই যেন চিনিল না, কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। মন আরও দমিয়া গেল।

বাসায় আসিয়া স্নান সারিয়া সহায়রামবাবুর বাড়ী গেলাম। আমাদের পাড়াতেই তাহার বাড়ী। কিন্তু মুগ্ধ হইলাম সমস্ত বাড়ীর লোকের যত্নে। ইনি কংগ্রেসের লোক নহেন, কিছুদিন হইতে ছাড়াছাড়িও হইয়াছি, তথাপি ইহাঁর যত্ন ও সৌজন্যের কথা কখনও বিস্মৃত হইব না। ঠিক এমনি যত্ন দেখাইয়াছিল আর একজন সাধারণ লোক। উনি শিক্ষিত নহেন, বড় চাকুরিও করিতেন না, কাজ করিতেন আদালতের পিয়নি, জাতিতে কায়স্থ। ইনি আমার পাঠশালার বন্ধু নাম অবিনাশ দাস। ইহাঁরও সৌজন্যের কথা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। হায়, ইনি এখন জীবনের পরপারে।

বৈকালে আবার কংগ্রেস অফিসে গেলাম দুই একজন কর্ম্মী উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু সকলেই বিরূপ, বুঝিলাম দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রোগ্রামেও লোকের মনে কিছু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাগ হইল। দেশবন্ধুর ভুল। দেশবন্ধুর ভুল কখনও হয় নাই, আজও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থাই অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু আহত হইয়া ঐ যে চলিয়া আসিলাম, আর কোথাও গেলাম না। অষ্টমীতেও সহায়বাবুর বাড়ীতেই পূজার মাংসপ্রসাদাদি সহ আহার করিয়া রাত্রিতে ঢাকা মেলে বাড়ী রওনা হইলাম। রাস্তায় খুব ভিড় ছিল না, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার প্রবৃত্তিও বড় হইল না, ট্রেনে আসিয়াই শুইয়া রহিলাম।

আজ নবমীর প্রভাত। আমি তখন ষ্টীমারে আসিয়া উঠিয়াছি—দূর হইতে ঢোলকের আওয়াজ কর্ণে পৌছিতেছিল। শুনিতেলাগিলাম,—আর সূর্য্যোদয় দেখিলাম। কি সুন্দর প্রভাত, কি অপরূপ দৃশ্য! শরতের প্রভাত সূর্য্য সেই বিশাল নদীবক্ষে যেন হাসিতেছে, ভাসিতেছে ও নাচিতেছে। খরস্রোতা নদী বহিয়া চলিতেছে, আর ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকাগুলি ভাটার দিকে চলিয়াছে। নিবাত নিষ্কম্প নদীবক্ষ, আর প্রভাতের সেই সৌন্দর্য্য! পাঠক, শরতের কাঞ্চন রক্তাভ জলরাশিতে নদীবক্ষে কখনও বিচরণ করিয়াছেন কি?

ক্রমে পূর্ব্বদিকে বাষ্পীয় পোত অগ্রসর হইতে লাগিল। পদ্মাতীরের শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। জেলেদের মাছধরা দেখিতে লাগিলাম, শিশুদের ক্রীড়াকৌতুক দেখিলাম, কলসীকক্ষে পুরাঙ্গনাগণকে যাতায়াত করিতে দেখিলাম, নদীপারের হাটবাজার দেখিলাম।

এপারে ফরিদপুর, কত লোক নামিয়া গেল, দেখিলাম পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি তখনও জলে ভরা। এখানে অনেকেই নামিয়া গেলেন। ক্রমে তারপাশা আসিয়া পৌছিলাম, ভিড় ঠেলিয়া পারে নামিয়া একখানি ডিঙ্গি নৌকায় উঠিয়া বাড়ী রওনা হইলাম। দশবৎসরের পূর্ব্বের কথা মনে হইল। ১৯১২ সালে একবার অসুস্থ শরীরে পদ্মার জলে স্নান করিবার পরেই অসুখ ভাল হইয়া গিয়াছিল। নৌকা চলিতে লাগিল, ক্রমে গাউপাড়া, বহর প্রভৃতি স্থানের পূজার বাদ্য শুনিতে শুনিতে ক্রমে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই বাড়ীর ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। জননীর চক্ষে অশ্রুজল আসিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, ক্রমে পাড়ার লোক আসিয়া জুটিলেন। আজ যেন বাড়ী আসিয়া খাঁটি আনন্দ পাইলাম। মনে হইল এই তো স্বর্গের সুখ।

সেদিন নবমীর অপরাহ্ন, সকলেরই মন বিষাদে পূর্ণ। গ্রামেও দেখিলাম ভীষণ পরিবর্ত্তন। একখানি মাত্র বাড়ী ছাড়া গ্রামের কোন বাড়ীতেই পূজার কথা শুনিলাম না। অবস্থার কি বিপর্য্যয়! যে গ্রাম পূজার আনন্দে হাসিয়া

উঠিত, আজ কেন সেখানে মা প্রতিধ্বনি আসিলেন না। দেখিলাম নদী একেবারে গ্রামখানিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া যেন বাজারের ঘাটে আসিয়াছে। সকলের মুখেই বিষাদ, আজ অভাবের অপেক্ষাও বাড়ী ছাড়িবার বিষাদ বাজনাই যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কাহারও মুখে হাসি নাই, হাট-বাজার ছন্নছাড়া, বাড়ী-ঘর শূন্য। অনেকেরই অবস্থারও বৈগুণ্য হইয়াছে, অনেকে আবার বাড়ী ভাঙ্গার আশঙ্কায় বিদেশে পূজা করিতেছে। বৈকালে বাহির হইলাম, সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া যে বাড়ীতে পূজা হয় সেখানে গেলাম। সেখানেও দেখি নবমীর বিষাদের গানই চলিতেছে—

> শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
> মরি ত্রাসে কৈলাসে গেলে কেমনে মা দিন কাটাবে।
> রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘিরে,
> ভূত-দানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তোর কেবা চাবে,
> ভিক্ষে ক'রে আনলে পরে, তবে হাঁড়ী চড়বে ঘরে,
> মন বোঝাবে কেমন ক'রে, কপাল পোড়া কে ঘোচাবে।
> আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
> সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে, নিত্যি ভাং-ধুতুরা খাবে।

পরের দিন যখন ভোর হইল, দশমীর যাত্রা দেখিয়া বাহির হইলাম, পরামাণিক আসিয়া মুখের কাছে দর্পণ ধরিল, সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া বিজয়ার মেলায় যাইব স্থির করিলাম। একখানি বড় নৌকা বাহিয়া বহর গিয়া উপস্থিত হইলাম। বহরের নদী পদ্মারই একটী শাখা, কিন্তু এইখানের প্রসারও কলিকাতার গঙ্গার প্রসারের চেয়ে কম নয়। পদ্মা ও উক্ত খালের সংযোগস্থলে মেলা বসিয়াছে—কতকটা ভিতরের দিক ঘেঁসিয়া। নানা গ্রাম হইতে প্রতিমা আসিয়াছে, কত বাদ্য বাজিতেছে, কত বাজী পোড়ান হইয়াছে, কত খাদ্যদ্রব্য ও খেলনা জিনিষের হাট বসিয়াছে বাদ্য বাজিতেছিল, নৃত্য চলিতেছিল, আর মনে হইতেছিল যেন দশভুজা মাও তাহা উপভোগ করিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু শীঘ্রই অন্য মূর্ত্তি দেখিলাম। মা যাইবেন, ক্ষণেক পরেই বিসর্জ্জন হইবে, বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। জীবনে আজ এই প্রথম বিজয়ার বিষাদবাণী প্রাণ স্পন্দিত করিতে লাগিল। মনে হইল যেন মা বিষাদে রোরুদ্যমানা হইয়াছেন। আর নয়নকোণে যেন বারি-রাশি সঞ্চিত হইয়াছে। এই শেষ বিজয়া দেখিয়া বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলে মেলা ছাড়িয়া গৃহে ফিরিলাম, পরস্পরে আলিঙ্গন করিলাম, বাড়ীতে আসিয়া মায়ের পদধূলী গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইলাম। কিন্তু এই শেষ বার! ইহার পর বৎসরই পূজার পূর্ব্বে বাড়ীঘর পদ্মাবক্ষে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তাই বোধ হয়, সেই ভবিষ্য বিপদ পূর্ব্ব হইতেই সকলের হৃদয় অভিভূত করিয়াছিল। তাই শেষ দিনেও কিছুই উপভোগ করিলাম না। সেবারে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হইলেই অশ্রুজল আসিত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দেখিলেই হায় হুতাশ করিতেন, শিশুবালকদের মনও বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিত। জন্মভূমির এই শেষ পূজায় যোগদান করিয়াছি, শেষ নবমীর গানে শিহরিয়া উঠিয়াছি, মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ত্রাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজও জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, চারিদিকে হাহাকার, সর্ব্বত্র শবরাশি, শোণিতের প্রবাহ! আজ মানুষ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। একে অন্যের রক্তশোষণ করিয়া খাইতেছে। এই ঘোর বিষাদ সাগর হইতে মা কি তাঁহার সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন না? 'বন্দেমাতরম্'।

ডাকঘর

বাণীকুমার

আজকে সারা জগতে ডাকের যে ব্যবস্থা চলেছে, সে ব্যবস্থা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে এক পরম সহায়। বর্ত্তমানে ডাকঘরের প্রসার, ও তা'র সঙ্গে এর বিরাট কার্য্যরীতির কথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। কোথায় হাজার হাজার মাইল দূরে লোক ঘর ছেড়ে বসে আছে, কিন্তু বিমানমেলে সেই প্রবাসীর কাছে তার সুদূরের প্রিয়জনের খবর অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছে যাচ্ছে, আবার তার উত্তর ঘরে ফিরে যেতেও দেরী লাগে না। দেশ-দেশান্তরে ব্যবসায়-সম্পর্কিত খবর পাঠাতে হবে—ঘরে বসে সামান্য খরচায় অতি কম সময়ে সেই খবর ঠিক যায়গায় গিয়ে পড়ছে রেলওয়ে-মেলে। কত দুস্তর নদী পেরিয়ে নৌকা কি জাহাজে ক'রে চিঠি-পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছুচ্চে। অসীম সমুদ্রের পারে চিঠি, টাকা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠানো হচ্ছে—জলযান-মেলে। বাড়ীতে বসে ডাকঘরের প্রসাদে অনাথা বিধবা, অনাথ নাবালক, অসহায় বৃদ্ধ পেন্‌সনের টাকা মাসে মাসে পেয়ে আসছে। ডাকের নানাদিকে নানা বিষয়ে নানা ব্যাপারে অপূর্ব্ব সুন্দর বন্দোবস্ত আজ সকল দেশের সকল গৃহস্থকে নিশ্চিন্ত করেছে। ডাকঘর ব্যবসায় ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে, যুদ্ধভূমিতে, ব্যাঙ্কার-রূপে অর্থসঙ্কটের দিনে, বিপদ কালে অতি সত্বর বার্ত্তা বা অর্থ প্রেরণে পরমবন্ধু।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার যত প্রতিষ্ঠান আছে, ডাকঘরের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের যত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ যোগ, এ-রকম আর কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেই। দেশের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিবিড় বিশ্বাস ডাকঘরের 'পরে। কারণ ডাকঘরের কাজ-কর্ম্ম এ-রকম সুশৃঙ্খলা আর নিয়মের সঙ্গে পরিচালিত হয় যে দেশবাসীর মনে আপনা হ'তেই সে বিশ্বাস জন্মেছে। সাধারণের সেবার দায়িত্ব নিয়ে কি করে নিঃশব্দে জনসাধারণের মন জয় করা যেতে পারে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ডাকঘর। আজ দেশের সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কত শত লোক কি ভাবে দিবারাত্র এই ভারতবর্ষময় পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে, বন্যায়—জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। এ গুরু দায়িত্বের বোঝা নিয়ে যারা কাজ ক'রে আসছে, তাদের করতালিহীন জীবন প্রশংসার যোগ্য।

ডাকঘর দেশের সম্পদে আপদে নানারূপে উপকার এনে দিতে পারে। এই ডাকঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা দরকার। এখন থেকে ১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজদের ডাকের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়, আর ক্লাইভ ছিলেন এর প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই ডাকের ব্যবস্থা শুধুমাত্র সরকারী কাজের জন্য প্রবর্ত্তন করা হয়। ডাকের এই রীতি ইংরেজ রাজত্বের ক্রমবর্দ্ধনের সময়েও বহুবৎসর ধ'রে চ'লে আসতে থাকে। ইংরেজ রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডাকের বিস্তার হওয়া স্বাভাবিক, তাই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১০৫ বৎসর আগে ব্যবসায় ও অন্যান্য কাজ সম্পর্কিত ডাক চলাচলের অনেকখানি প্রসার হয়। ভারতবর্ষে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা যখন ইংরেজরা প্রথমে হাতে নিলে, তখন তারা জানতো যে কি বিরাট দায়িত্ব তারা গ্রহণ ক'রতে চলেছে। কারণ এই বিশাল দেশে হাজার রকম ভাষা, নানা প্রকৃতির হরফ,আর পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, নালা ও জঙ্গলের দুস্তর বাধা আছে। কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম ক'রেও আজ ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে ডাকঘরের যে সুব্যবস্থা রচনা করা হয়েছে, জগতের ইতিহাসে তা গৌরবের বস্তু। এই ডাকঘরের প্রসাদে দূর আজ দূর নয়, প্রবাস আজ প্রবাস নয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রোল্যাণ্ড হিল্ ইংল্যাণ্ডে penny-postage বা সস্তায় ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। ডাকের এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতিতে সর্ব্বসাধারণের অশেষ সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইদিন থেকে আজকে পর্য্যন্ত সারা জগতে হিলের এই প্রথা চ'লে আসছে। ভারতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সস্তায় ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা

গৃহীত হয়। এর পূর্ব্বে ক'ল্‌কাতা থেকে বোম্বাই-এ চিঠি পাঠাতে হ'লে—এক টাকা, আর আগ্রায় পাঠাতে হ'লে—বারো আনা লাগতো। কিন্তু এই ব্যবস্থার (penny postage) পর থেকে যারা গরীব, তারাও মাত্র দু'চার পয়সা খরচ ক'রে দেশে দেশান্তরে চিঠি পাঠাতে সমর্থ হ'ল।

ডাকঘরের সুব্যবস্থার গুণে ডাকপিওন তপ্তপ্রাণে শান্তি এনে দেয়। যার ছেলে দূর দেশে যায়, সেই মা জানে ডাকপিওনের কড়া নাড়া কি আশার সংবাদ। যার স্বামী প্রবাসে, সেই স্ত্রী জানে ডাকপিওনের "চিঠি আছে"—এই ডাকের মধ্যে কি আনন্দের বার্ত্তা আছে।

অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিই,—কিন্তু এই ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তবে তার রীতি নীতি ব্যবস্থা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। প্রাচীনকালে শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য সমস্ত দেশেও ডাকের ব্যবস্থা নির্ভর ক'রত মানুষের পায়ে-হাঁটার শক্তি, গৃহপালিত জন্তু বা পাখীর সীমাবদ্ধ ক্ষিপ্রতা, প্রকৃতির আনুকূল্য, আর পথের সুগমতার 'পরে। তার ফলে ডাকের ব্যবস্থা রীতিমত সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক ডাক পথেই মারা যেত, আর রাজকর্ম্মচারী বা রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ভিন্ন অন্য সাধারণ ব্যক্তির ডাক ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'য়ে উঠত না, সুনিশ্চয়তাও ছিল না, ব্যয়ও ছিল অত্যধিক।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। যত সব আদিম বর্ব্বর জাতি কেমন ক'রে খবর পাঠাতো? অনেক আদিম জাতি পূর্ব্বে কথা বা সংবাদ প্রেরণ করত কি ভাবে, আর এখনো পর্য্যন্ত কি উপায়ে বার্ত্তা প্রেরণ ক'রে থাকে, এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে। হয় তো শত্রু আসছে, সকলকে খবর দিতে হবে। বেজে উঠলো শিঙা, জ্বলে উঠলো পাহাড়-প্রমাণ আগুন, উঠলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ভেদ ক'রে। সকলে জানলে সংবাদ আছে। সকলেই হ'ল সতর্ক। এইরূপে শব্দ, ধোঁয়া, বা ঢাকের আওয়াজে, কিংবা ঘণ্টা ছুঁড়ে, শৃঙ্গে ফুৎকার দিয়ে—নানা ব্যাপারে আদিম জাতিদের সংবাদ পাঠাবার রীতি ছিল। এখনও তারা এই ব্যবস্থাই অনুসরণ ক'রে থাকে, উপরন্তু পালিত পশু-পক্ষীর সহায়ও তাদের কাজে লাগে।

ডাক-চলাচলের ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায় যে ডাকের উৎপত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা' লেখা হ'য়েছে, তার অনেক আগে বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা প্রাচ্যে ছিল। ইতিহাসে আছে—প্রাচ্যে বড় বড় সাম্রাজ্যের গোড়ার যুগ থেকে ডাক চ'লে আস্‌ছে, অবশ্য এর প্রণালী ছিল ভিন্ন রকমের। কারণ তখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য যান বাহনাদির খুব সহজ উপায় ছিল না। ঘোড়া এক মাত্র দ্রুত গমনের সুবিধা এনে দিত, কিম্বা পায়ে হেঁটে সংবাদ-বাহককে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে চলতে হ'ত। অতি প্রাচীনকালে বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার কাজ স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার অধিকার নির্ভর করত ক্ষিপ্র ও নিয়ত সংবাদ প্রেরণ গ্রহণ ও সংবাদ প্রাপ্তির জন্য সুবন্দোবস্ত আর সংরক্ষণ নীতির 'পরে।

পারস্য-রাজ্যে শাইরাসের উত্তরাধিকারগণের অধীনে ডাক-ব্যবস্থা খুব বড় প্রথম দৃষ্টান্ত। পারসিক রাজগণের পরে ম্যাশিদন-রাজারা ক্ষুদ্র গণ্ডীতে এই রকম ডাক-ব্যবস্থা অতিরিক্ত উন্নতভাবে প্রচলিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এর পূর্ব্বেও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তখন দেশ-দেশান্তরে এ-দেশ থেকে বাণিজ্য-পোত যেত। সেকালে ডাকের নাম ছিল—"বার্ত্তা"। এখন থেকে ৩৫৬৭ বৎসর আগে হিন্দুদের সঙ্গে মিশরদেশের আদান-প্রদান ছিল। আর ৩৬২৩ বৎসর আগে যখন জোসেফ মিশরে উপস্থিত হন, ভারতবাসীরা ইজর‍্যালীয়গণের সঙ্গে যোগ-যুক্ত ছিল। এই সম্বন্ধ তৃতীয় ট্যাড্‌মাস্‌ ও ফ্যারাও রাজ-গণের সময়েও থাকা খুবই সম্ভব। প্রাচীন ভারতীয়গণ চীনদেশের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান ক'রতেন। তার প্রমাণ-স্বরূপ এখনো ভারতের বহু পুরাতন মন্দিরে চীনা-হরফে লেখা কয়েকখানি চিঠি রক্ষিত আছে। তারপর সুমাত্রা, যাভা, বলি-দ্বীপ প্রভৃতি দূর-দেশের সঙ্গে ভারতের বিশেষ যোগ ছিল। ঋকবেদ ও মনুসংহিতা থেকে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে ভারতবাসীরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক'রতেন। এক দেশ থেকে অন্য দেশে পত্র লিখে সংবাদ আদান-প্রদানেরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণেও প্রমাণ পাওয়া যায়, আর মহাভারতের সভা-

পর্ব্বে পাওয়া গেছে যে—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে সিদিয়্যান্ ও তুর্কীদের বার্ত্তা দেওয়া-নেওয়া চ'লত। বৌদ্ধযুগেও চিঠি পাঠানো ও চিঠি পাওয়া বিশেষভাবে চ'লিত ছিল। হিন্দুযুগে ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জোরভাবেই চলত তাই দেশের সঙ্গে দেশের যোগ ও সংবাদ আদান-প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সেকালেও নৌকা-যোগে, জাহাজে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় ক'রে, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি গৃহপালিত পাখীর পায়ে বা ডানায় বেঁধে ডাক-চলাচল হ'ত। হিন্দুদের ব্রতকথায়, কাব্যে বা গ্রন্থে আমরা অসংখ্য প্রমাণ পাই।

ভারতে মুসলমান-যুগে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা অনেক উন্নত হ'য়ে ওঠে। তখন ডাকের ব্যবস্থা রাজাদের রাখতে হ'ত। কারণ—দেশের কোন্ স্থানে কি রকম অবস্থা চ'লছে, তা' জানবার জন্য প্রতিনিয়ত সংবাদ আদান-প্রদান অনিবার্য্য হ'য়ে উঠত। মহম্মদ দীন্ তোগলকের আমলে ডাকহরকরার বিশেষ চলন হয়। মিশরী পর্য্যটক ইবন্ বতুতার ভ্রমণ-কাহিনী থেকে এ-তথ্যের সত্য নির্ণয় করা যায়।

হিন্দুস্থানে দুই শ্রেণীর ডাকহরকরা ছিল—অশ্বারোহী ও পদাতিক। এদের নাম ছিল—"এল্ ওয়ালাক্"। সুলতানের অশ্বারোহী ডাকহরকরা চার মাইল অন্তর অবস্থান ক'রত, ও পদাতিক ডাকহরকরা একমাইল দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকৃত। আর তিনমাইল অন্তর ডাকের ষ্টেসনের কেন্দ্র ছিল। তিনটি ক'রে 'শান্ত্রী-বাক্স' থাকৃত, সেখানে ডাকহরকরা প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকৃতো—ডাক পৌছুলেই গন্তব্য স্থানে ছুটবে ব'লে। তারপর খবর হ'লেই তা'রা ছুটতো হাতে একটি বর্শা নিয়ে—তার মাথায় বাঁধা ঘুন্টি। শব্দ ক'রতে ক'রতে ডাকহরকরা তা'র নিকট স্থডাক-হরকরার কাছে পৌছে চিঠি পত্র দিয়ে দিতো। সে আবার ছুটতো পরবর্ত্তী ডাকহরকরার কাছে—এম্‌নি ক'রেই তখন ডাক পৌছুত। দিল্লীর সম্রাট্ শের শাহ ও আকবরের সময়ে ডাক-চলাচলের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। সম্রাট্ শের শাহ চিঠি-চলাচলের জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ডাকঘর প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন। সেই প্রবর্ত্তিত ডাকঘর সকল শুধু সহরে ও থানায় থানায় ছিল। অশ্বারোহী বাহকগণ এক থানা থেকে চিঠির পুলিন্দা পৌছে দিত অন্য থানায়। তখন ডাক-টিকিটের প্রচলন ছিল না। সমস্ত চিঠিই ব্যারিং বা বিনা-টিকিটে দেওয়া-নেওয়া চলতো। চিঠির ওজন-মত মাশুল কম বেশী হ'ত না। স্থানের দূরত্ব অনুসারে যত থানা পার হ'য়ে চিঠি বাহিত হ'ত, থানা প্রতি ততগুলি আধ আনা মাশুল লাগত। প্রত্যেক থানায় একজন ক'রে ডাক মুন্সী ও একটি বরকন্দাজ মোতায়েন্ থাকতো। কেবলমাত্র বাদশাহী চিঠি, সরকারী কর্ম্মচারীগণের চিঠি, আর জমিদারদের চিঠিই বিলি করা হ'ত। তা'র মাশুল লাগতো না। জমিদারেরা ডাক-খরচা ব'লে একটা কর দিতেন। তাইতেই ডাকঘরের ব্যয়, মুন্সী ও বরকন্দাজের বেতন, আর রাস্তা-ঘাটের মেরামতী খরচ চলতো। জন-সাধারণের চিঠি বিলি করা হ'ত না। এই সমস্ত চিঠি-পত্র এক বৎসর পর্য্যন্ত ডাকঘরে রেখে দেবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ ডাকঘরে তদন্ত ক'রে নির্দ্দিষ্ট মাশুল দিয়ে যে যা'র চিঠি উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেত। এক বৎসরের মধ্যে কেউ চিঠি দাবী ক'রতে না এলে, তা পুড়িয়ে ফেলা হ'ত।

কিন্তু এখন সেকাল গত হয়েছে। একালে ডাকের অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থার সুফল ধনী-নির্ধন সকলেই ঘরে ব'সে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত বিশ্বাসে ভোগ করছে। ডাকঘরের কথা ব'লতে গেলে ডাক-পিওনকে সবার আগে মনে পড়া উচিত।—"The real pioneer of the Post Office in India is the village Post-man,"—ভারতবর্ষে ডাকঘরের প্রকৃত প্রবর্ত্তক হ'ল গ্রামের ডাকহরকরা। সকলের দ্বারে প্রহরে প্রহরে কড়া নেড়ে খাকি রঙের আধময়লা জামা পরে' যে-লোকটী নিঃশব্দে চিঠি ফেলে যায়—সেই ডাক-পিওন—সে যে জগতে কত বড় দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছে, তা অনির্ব্বচনীয়। সহরে তা'কে দেখলে তা'র কাজের গুরুত্বের কথা ততখানি মনে জাগে না। কিন্তু তেপান্তরের মাঠের পারে পারে দূর দূর সব গ্রাম, কোথায় কোন্ পাহাড়ের ওপর শুধু একটা বাংলো বাড়ী, কোন্ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজনের বাস, দুর্গম পথে চারিদিকে হিংস্রজন্তু, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ

মাইলের ভিতর সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই—এমন স্থান, দুস্তর নদনদী, সেখানেও তা'র পায়ের শব্দ বেজে ওঠে, সেরাকিটি সুর তোলে ঠুংঠুং ক'রে। বাস্তবিক এই গরীব ডাক-পিওন বা postman আছে ব'লেই ডাকঘর বেঁচে রয়েছে। যতক্ষণ সে আছে, সুদূর সুদূর নয়, কোন লোকই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের সঙ্গে সকলেরই যোগ আর, সে যোগ আছে, আর সে যোগ বজায় রেখেছে সেই পায়ে-হাঁটা চির-দরিদ্র বারো টাকা মাইনের ডাক-পিওন। যেখানে মোটর যায় না, যেখানে নৌকা চলে না, যেখানে রেলের গতি রুদ্ধ, যেখানে ঘোড়ার গাড়ী গরুরগাড়ী রাস্তা পায় না,—সেইখানে যায় শুধু সে—নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধা-মুক্ত মনে। তা'র কাছে দূর-দুর্গম কোন পথ নেই। প্রায় ষোলো হাজার 'রাণার' (runner) নব্বই হাজার মাইল দুর্গম পথে নিত্য দৌড়ে দৌড়ে চলেছে—ডাকঘরের অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা রক্ষা ক'র্‌বার জন্য। এম্‌নি এই নীরব কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই এই দায়িত্ব রাখতে গিয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। তাদের জীবন হয় পদে পদে বিপন্ন—হিংস্র মানুষ বা জন্তুর অতর্কিত আক্রমণে। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চলেছে ডাক-পিওন, বন্যবর্ব্বর জাতির মধ্য দিয়ে। পিঠে হয় তো প'ড়লো চাবুক, তবুও প্রহার তুচ্ছ ক'রে চিঠি ও মণি-অর্ডারের ব্যাগ বুকে চেপে সে চলেছে গন্তব্য স্থানে।—ডাক-পিওন চলেছে—মধ্যপ্রদেশের ঘন জঙ্গল দিয়ে। কখনো সে প্রাণ দেয় বাঘের মুখে, কখনো বা পায় পরিত্রাণ, তবুও তা'র গতি শুদ্ধ নয়।—আসামের জঙ্গল দিয়ে সে চলে—সেখানে ভল্লুক করে পিছনে তাড়া। ডাক-পিওন কাঁধে ক'রে পেঁকাটির বোঝা নিয়ে সেই নিবিড় পাহাড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। ভাল্লুকের অনুসরণ বন্ধ কর্‌বার জন্য এক এক বাণ্ডিল পেঁকাটি ফেলে দিয়ে সে ছুটতে থাকে, ভাল্লুকের রীতি—সমস্ত পেঁকাটি একটি একটি ক'রে গুণে ভাঙতে ব্যস্ত হয়, ততক্ষণ ডাক-পিওন চ'লে যায় অনেক দূরে। এই রকম ক'রে সে হিংস্র পশুদের এড়িয়ে চলে। ডাকপিওন চ'লেছে পূর্ব্ববঙ্গের নদীপথে নৌকাযোগে,—দুর্য্যোগের মধ্যে। এই ভাবেই এই সমস্ত অতি-সাধারণ ব্যক্তি প্রাণ পণ রেখে রাষ্ট্রের এক অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। এম্‌নি সুন্দর ব্যবস্থা ডাকঘরের, যে—ডাক-পিওনকে সম্মান দিয়ে বল্‌তে হয় :

শুষ্ক ঝর্ণা গেছে কি ভরিয়া
জলের ও-অভিযানে?
শিলা খসি' খসি' চলেছে ভাসিয়া—
স্রোতের প্রবল টানে?
তবু যেতে হবে ধারা উত্তরি',
হ'তে হবে পার ভয় পরিহরি',
পিঠে তা'র রহে চিঠির বোঝাটি
পঁহুছিবে ঠিক স্থানে।
বর্ষায় কি গো পথ হোলো হারা?
পাহাড়ের পথ পিচ্ছিল-পারা!
তবু যেতে হবে লঙ্ঘিয়া গিরি,
এই ব্রত সে যে জানে।
উঠেছে ঝঞ্ঝা প্রান্তর পারে!
দশদিক্‌ ভরে নিবিড় আঁধারে!
তবু চলে সে যে ধূলি-বালু-ঝড়ে,
বিপদ তুচ্ছ মানে।
বিপুল ভরসা রয় তা'র বুকে,
চলে ব্রতপাল নিতি সুখে-দুখে,
কর্ম্মের ভার বহিয়া ফিরিছে
দ্বিধাহীন প্রাণ-দানে।

*

ডাকঘরের সম্পর্কে এখানে টেলিগ্রাফের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করা দরকার। এই টেলিগ্রাফের প্রবর্ত্তনে মানুষের বহু উপকার সাধিত হয়েছে। টেলিগ্রাফের উৎপত্তি ও তা'র প্রসারের বিবরণ এ-স্থলে না দিয়ে, সাধারণের মধ্যে টেলিগ্রাফের সুফল কিরূপে প্রসারিত হয়—তারই দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'চ্ছে। টেলিগ্রাফ মানুষের বিপদের দিনে অত্যন্ত সহায়। এই টেলিগ্রাফ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাই বিদ্রোহের সময় অত্যন্ত উপকার সাধন করে। ভারত-সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে—এই ভীষণ মিউটিনীর সময় ডাকঘরের কর্ম্মীরা যে অপরিসীম সাহায্য এনে দেয়, তা'র ফলে এই দেশ সে যাত্রা সেই ঘোরতর বিপ্লব ও ধ্বংসের

হাত থেকে বেঁচে গেছে। সেই অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও এক প্রাণতার দৃষ্টান্ত সত্যই প্রশংসার্হ।

যুদ্ধের সময়ে ডাকঘর অত্যন্ত সহায় হ'য়ে দাঁড়ায়। শত্রু-শিবিরে বন্দী সেনাদের কাছে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা চিঠির আদান প্রদান করতে সমর্থ হয়—শুধু মাত্র ডাকঘরের দৌত্যে। তাই বলতে হয়—ডাকঘরের দায়িত্ব জ্ঞান একমুখে প্রশংসা ক'রে শেষ করা যায় না। এত বড় সহায়—বিপদের দিনে, অতি প্রয়োজনের সময়—কোন প্রতিষ্ঠান এনে দিতে পারে ব'লে মনে হয় না।

ডাকঘরের কাজের সংখ্যা নেই। আজকের দিনে কোন্ স্থানেই বা ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা নেই? সর্ব্বত্র। এমন কি সমুদ্রের মাঝেও ডাকঘর আছে ভারতীয় মরু-প্রান্তরেও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এই উন্নত ডাকঘর—সভ্যজগতের সুফল। কিন্তু জনসাধারণ ডাকের রীতিকে "Post" (পোষ্ট) বলে কেন? তার উত্তর এই—রেলওয়ের প্রবর্ত্তনের আগে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কিংবা নির্দ্দিষ্ট সব স্থানে—রাস্তার ধারে গতায়াতের জন্য ঘোড়া মোতায়েন থাকতো। লোকে এই উপায়ে তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে পৌছুতে সমর্থ হ'ত। তারপর, পূর্ব্বদিনের ডাকঘরে ঘোড়ার জন্য আবেদন করারও রীতি ছিল। সেইজন্য নাম হয়েছে—"Post" (পোষ্ট) বা ডাক,—অর্থাৎ এখানে ডাকহরকরা আওয়াজ দিয়ে চলাচল ক'রতো তাই "ডাক"।

ডাকঘরের প্রসার-জনিত তা'র কয়েকটি কার্য্য-বৈচিত্র্য এখানে উল্লেখ করা দরকার। বিংশ শতাব্দীর একটী নূতন ব্যবস্থা চলন্ত ব্রিটিশ ডাকঘর। সচল মোটর-যানে এই রকম বিরল ডাকঘরের প্রবর্ত্তন হয়েছে, অন্যান্য দেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে কিনা, জানা নেই। ঘোড়দৌড়ের মাঠে, পশু-প্রদর্শনী, কার্নিভ্যাল, ফেয়ার, কিম্বা বিরাট মেলায় ডাকঘর রক্ষিত মোটর-যান প্রেরিত হয়। এই গতিশীল ডাকঘরে টেলিগ্রাফ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা থাকে। এমন কি চিঠি পাঠাবার জন্য এই যানের সঙ্গে ডাক-বাক্সও সংশ্লিষ্ট থাকে। এই ধরণের সচল ডাকঘর জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত কার্য্যকরী। আর একটী বিস্ময়কর ঘটনা বলবার আছে। খবরে জানা গেছে যে বেলজিয়াম থেকে ইংল্যাণ্ডের ক্রয়ডন্ পর্য্যন্ত বিমান-যানের যে ডাক যেতো, সেই ডাকে এক জীবন্ত মানুষকে নমুনার পুলিন্দারূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক তরুণ বেলজিয়ম-সাংবাদিক। বিমান-ডাকের কাজ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হয়, তা' জানতে কৌতূহলী হ'য়ে—সে তার জামায় ঠিকানা-লেখা কাগজ ও ডাকটিকিট লাগিয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রসেল্‌স্‌এর প্রধান ডাকঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই সহরের জেনার‍্যাল্ পোষ্ট-আফিস্ থেকে সাংবাদিকটিকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হ'য়ে থাকে। বিমান-যানে যাত্রীর ভাড়া অপেক্ষা, ডাকের পুলিন্দা-রূপে যাওয়ায় প্রায় ত্রিশ শিলিং (বা কুড়ি টাকা) কম ডাক-মাশুল লাগে। তা'কে বসবার চেয়ার দেওয়া হয় নি, অচেতন পুলিন্দার মতই তা'কে ব্যবহার করা হয়। ইংল্যাণ্ডের ক্রয়ডনে পৌঁছুবার পরে তা'র জামায়-আঁটা কাগজে যা'র নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল, মানুষ-পুলিন্দার সেই মালিক ডাকঘরে এসে প্রেরিত বস্তুর (অবশ্য সজীব) দাবী না করা পর্য্যন্ত তা'কে ডাক-ঘরেই থাকতে হয়েছিল। এ ঘটনাটি কৌতুককর হ'লেও সত্য এখন বিমান ডাকে জীব-বিশেষকে পুলিন্দারূপে পাঠানো হয় কি না, সে সংবাদ জ্ঞাত নই। আর এক বিশেষ কথা এই যে—নিউ-ইয়র্ক সহরে সংবাদ পত্রে সত্বর সংবাদ-প্রেরণের জন্য ফটোতে হ্রস্ব-করা বহু দীর্ঘ বার্ত্তা একটি ছোট অ্যালুমিনিয়ামের আধারে ভরে শিক্ষিত পারাবতের পায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। কারণ মোটর গাড়ী বা মোটর-বাইকে চ'রে দূতরা সে-সময়ের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌছোয়, বার্ত্তাবহ পারাবত শূন্যে উড়ে গিয়ে তার দু'তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদাদি পৌছে দিতে পারে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই সুপ্রাচীন রীতি অনুসৃত হচ্ছে—দেখা যায়।

শেষ কথা এই যে— ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ সভ্য-জগতের এক বিশেষ দান। মানুষ সুদিনে, দুর্দ্দিনে ডাকঘরের সহায়ে অনেক উপকার পায়, তা'র কত উৎকণ্ঠা, কত চিন্তা দূর হ'য়ে থাকে। সমুদ্রের পারে, সুদূর দেশে-বিদেশে অল্প অর্থ-ব্যয়ে অতি সহজ ভাবেই বর্ত্তমান যুগের মানুষ সংবাদ আদান-প্রদান ক'রতে পারে। এই অপূর্ব্ব কর্ম্মশালা চিরদিনই অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।

ভাবপ্রবাহের বঙ্কিম গতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শুক্লা তিথির অঙ্গনতলে আনন্দ গান আসে না ভেসে,
সাথীহারাদের দিক্-হারানোর চলেছে স্বপন নিরুদ্দেশে।
ফুল-ফোটাবার যতেক আশার ফুল ঝরাতেই হয়েছে শেষ,
হাটে বেচা-কেনা দর-কষাকষি হট্টগোলের নাহিক লেশ।
ওপারের লোক এসেছিল যারা দূর-পারাবারে দিয়েছে পাড়ি,
উড়ে গেছে এবে বকের পাথায় দিবসের আলো এপার ছাড়ি।
শুদ্ধ মধুর অজানা ভুবনে এই ধরণীর প্রবাসী কত—
চলে গেছে, কবি! জীবন আলোক নিয়ে গেছে সব বকের মত।
পড়ে আছে শুধু সারা জীবনের সঞ্চিত যাহা শূন্য ঘরে,
আসে চোখে জল তাহাদের লাগি পোড়াকাঠ দেখে শ্মশান-চরে!

এই তো মানুষ! নশ্বর জীব, অতি অসহায় পুত্তলিকা,
আপনারে নিয়ে ব্যস্ত সদাই অহঙ্কারের জ্বালাতে শিখা!
আজি তো আকাশে আলো-শতদলে জীবন-দেবতা চরণ রাখি'
আগামী উষারে করে না রচনা রাত্রি শেষের তারারে ডাকি'!
তুমি আর আমি নির্জ্জন রাতে বসি বাতায়নে সেকথা ভাবি,
আমাদের মত ভাবিছে ক'জন দীর্ঘ রজনী বিরলে যাপি'!

কত রাজ্যের উত্থান আর পতনের কথা কহিলে কবি!
স্বাক্ষর যার নাহি ইতিহাসে, আমারে দেখালে তাহার ছবি।
কত অতীতের বিজয়-পতাকা সময়-অনলে গিয়েছে পুড়ে,
মানুষ আসিছে, মানুষ যেতেছে ফেলে রেখে সব প্রাসাদ-কুঁড়ে।
কতজন এসে বিষায়েছে বায়ু, কতজন গেছে শুদ্ধ করি'
বুদ্ধের মত এসেছে পুরুষ মহিমা-মুকুট গিয়েছে পরি'।
তবুও জগত প্রলোভনে পড়ি' করে হানাহানি—ভাবে না কিছু,
ধনের মানুষ বড় হয়ে আছে, মনের মানুষ হয়েছে নীচু।
তারারে ধরিতে কেন এত পণ সর্ব্বনাশের অস্ত্র হানি!
কোথা গেল আজ শতেক যুগের লব্ধ জ্ঞানের মন্ত্রবাণী?

তাই তো তোমায় শুধাই বন্ধু! সাধনাবিহীন যুগের মাঝে,
কোথা আদর্শ! চরম সত্য! চিরকল্যাণ কোথায় রাজে!
শুধাই বন্ধু! কেন পাই ভয়? সান্ত্বনা কেন জাগে না প্রাণে?
প্রলয় রাতের ক্রন্দনধ্বনি দূর হ'তে আসে বর্ত্তমানে।

সমাজ-ধর্ম্ম হোলো পঙ্কিল হয় তো সরোজ ফুটিবে পাঁকে,
কেমনে হৃদয়-সরসী তাহার বিকট-গন্ধ যতনে রাখে।
মোদের জীবন-দুর্ঘটনার মূর্ত্ত-প্রতীক কপটযুগে,
হয় তো মোদের শেষ হবে আয়ু দুর্ঘটনার আঘাতে ভুগে।
স্তুতি-আরাধনা করেছি যেথায় অভিশাপ বিনা পাইনি বর,
যেথা বসন্ত খুঁজিয়াছি কবি! এসেছে বাদল নিরন্তর।
সাকী-সুরা কভু পারিনি যোগাতে, ভাগ্য দেবীর পাইনি কৃপা,
পশ্বাচারীর পঞ্চমকারে ভাগ্য হাসিছে রাত্রি দিবা।
সে যে কলঙ্ক—ভাবিয়াছি যারে অমল ধবল চন্দ্রসম,
ভেবেছিনু যারে পরমবন্ধু সে যে গো শত্রু ভীষণতম।
দেবী বলে যারে ভেবেছিনু আমি, সম্ভ্রমহীনা হেরিনু তারে,
প্রণয়িনী হয়ে এসেছে আমার ধ্যান ধারণার কুটির দ্বারে।
কহিয়া যাহারে ঈশ-অবতার করিয়াছি সেবা ভক্তি ভরে,
দস্যুর চেয়ে উগ্র ভীষণ স্বরূপ দেখেছি পূজিয়া পরে।
নিয়ে মরীচিকা নীরব সতত রহিল আমার মনের মরু,
করুণার মেঘ সে পথে অসে না দেখা নাহি দেয় শ্যামল তরু।
সুযোগ বলিয়া ধরেছিনু যারে প্রতিকূল হয়ে' পালালো শেষে,
বিজলী শিখায় গভীর বেদনা অন্তর ছায় অট্টহেসে।
শত লাঞ্ছনা বাধা পেয়ে পেয়ে রিক্ত হৃদয়ে রহিনু আজ,
ভালবাসা প্রেম-স্নেহ-মমতারে ব্যথায় পরানু দুখের সাজ।

তুমিতো কহিলে আজিকার যত সংযমহারা দিবস-রাতি,
যত প্রলোভন ত্রুটি বিভ্রম, যত অজ্ঞান হয়েছে সাথী,
ভাবপ্রবাহের বঙ্কিম গতি দেয় দুর্গতি বিশ্বজনে
একে একে সব লীন হয়ে যাবে, স্মৃতি হ'য়ে রবে আগামী মনে,
স্বপনের মত স্রোতে যেতে শেষে মিশে যাবে কাল-সিন্ধুনীরে,
মোরা সবে আসি মিলিব আবার আগামী উষার জীবন তীরে।
নয়নের কোণে অনুতাপ ধারা মরমের মাঝে যে ব্যথা জাগে,
সব যাবে টুটে অজানা দিনের নব-প্রভাতের পুষ্পরাগে।

সেই ভরসায় দিনগুলি মোর চলে যাবে কবি! অন্তরালে,
সার্থক হবে, সেইদিন যবে দেখা দিবে দিক্-চক্রবালে।

গোবর্দ্ধন চরিত

শ্রীঅমলেন্দু দাশ গুপ্ত

এতবড় পৃথিবীতে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তিও নাকি একান্ত তুচ্ছ নহে, অর্থাৎ দেখিতে জানা চাই। কাজেই গোবর্দ্ধনও একেবারে তুচ্ছ মানুষ হইতে পারে নাই। ব্যাঙের মাথার মণির মত গোবর্দ্ধনেরও একটু বিশেষত্ব ছিল। গোবর্দ্ধনকে একদল মনে করিত যে, সে আস্ত একটী বোকা, মানে সরল মানুষ। আর একদল মনে করিত যে, সে ভয়ানক বুদ্ধিমান, মানে আস্ত একটী শয়তান। দুটা কথাই ঠিক এবং এইটুকুই গোবর্দ্ধনের বিশেষত্ব। যে, মেসে সে থাকত সেখানেও তাহার সম্বন্ধে এই দুই রকম ধারণা প্রচলিত হইল; কেহ মনে করিত তাহাকে সরল, কেহ বা তাহাকে ধূর্ত্ত বলিয়াই জানিয়াছিল। গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে হাস্য করিত এবং সেই হাসিটার ভাষাও দুই রকম হইয়া পড়িত। এ গেল গোবর্দ্ধনের মনের পরিচয়।

বাহিরের পরিচয়ে জানা গিয়াছে যে, তাহার পিতামাতা ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন বলিতে পৃথিবীতে নাকি কেহই নাই, এক কথায় গোবর্দ্ধন একেবারে বন্ধনহীন মুক্ত মানুষ। আরও একটা ভয়ানক খবরও জানা গিয়াছে যে, গোবর্দ্ধনের বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি অথচ সে বিবাহ করে নাই। অর্থাৎ মেসের বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে যে, সে আছে কোন্ আনন্দে। গোবর্দ্ধনের সেই হাসিটিই আবার উত্তরে জানাইয়া দেয়, যার অর্থ লইয়া আবার দ্বিমত দেখা দিত। অর্থাৎ কেহ অর্থ করে যে, মরে না তাই এই অর্থহীন জীবন যাপন করিতেছে; আবার কেহ ধরিয়া নেয় যে, গোবর্দ্ধন নিশ্চয় এমন আনন্দে আছে যার খোঁজ পাইতে হইলে গূঢ় গোপন স্থানে তল্লাসী করিতে হয়।

গোবর্দ্ধন বাহিরে যাইতেছিল, বুড়া কেদারবাবু ডাকিয়া নিষেধ করিলেন যে, বাহিরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নহে। গোবর্দ্ধন দরজায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, চোখে জিজ্ঞাসা যে, কেন।

"কাল গুলী চলিয়েছে, ট্রাম জ্বালিয়েছে। আজও হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। এর মধ্যে বাইরে না যাওয়াই উচিৎ।"

গোবর্দ্ধন মৃদু হাস্য অধরে দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। কেদারবাবু মনে করিলেন যে, বোকা মানুষ, মজা দেখিতে বাহির হইয়া গেল, প্রাণটা লইয়া ফিরিলে হয়। কোনার সীট হইতে জনার্দ্দন ছেলেটী মন্তব্য করিল, "গোঁয়ার কোথাকার। যাও, গুলীর সামনে বীরত্ব দেখাও গে। হুঁ, গরম সিসার কাছে চালাকী!" গোবর্দ্ধনের হাসিটী যেন জনার্দ্দনকে ভীরু অপবাদ দিবার জন্যই দেখানো হইয়াছিল। হাসির অর্থ লইয়া কেদারবাবু ও জনার্দ্দনের মধ্যে মতানৈক্য হইল, প্রচুর বাদ প্রতিবাদের পরও উভয়ে অর্থ সম্বন্ধে একমত হইতে পারিল না।

উল্লেখ থাকে যে, গোবর্দ্ধন ট্রামের অল-ডে টিকিট ক্রয় করিয়াছিল। রবিবারের এই ক্রয়টী তাহার বহু দিনের অভ্যাস। সারাদিন ঘুরিয়া আসিয়া বিকালের দিকে মেসে কাহারও নিকট কখনও তিন আনায়, দায়ে পড়িলে আরও কমে, টিকিটটা সে বিক্রয় করিয়া দিত। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কনসেশনে কিনিবার ক্রেতার অভাব আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু আজ বিশেষ রবিবার, তাই টিকিট বিক্রয় সে করে নাই। এই জনার্দ্দনই কিনিতে চাহিয়াছিল। বালীগঞ্জে এক বন্ধুর ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল; অর্থাৎ বন্ধুর একটী বোন আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটানোর অতীব আগ্রহটাকে সারাদিন মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। টিকিট পাইলেও এদিনে সে বাহির হইত কি না সে আলাদা কথা; কিন্তু না যাইয়া ক্রোধের একটা হেতু পাইল, মানে মেসেই রহিয়া গেল এবং গোবর্দ্ধনকে পুলিশের বন্দুকের সম্মুখে মনে মনে সমর্পণ করিয়া দিল।

গোবর্দ্ধন ধর্ম্মতলার দিকে চলিয়াছিল। পাশের লোকটিকে কহিল, "জানালাটা তুলে দিন।"

পাশের লোকটী জানালাটা তুলিয়া দিল না এবং উত্তরও কিছু দিল না, বুদ্ধমূর্ত্তির মত অবিচল রহিয়া গেল।

গোবর্দ্ধন মনে মনে কহিল, কানের কাম হয়েছে, তিয়ারটী নষ্ট, এবং উঠিয়া জানালাটা তুলিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইল। বুদ্ধমূর্ত্তিতে চাঞ্চল্য আসিল, গোবর্দ্ধনের প্রসারিত হস্ত ধরিয়া নামাইয়া দিল এবং কথাও কহিল, "কি করছেন?"

—"জানালাটা তুলে দিচ্ছি" কিন্তু মনে মনে বলিল, আচ্ছা হারামজাদা, কানে শোনে কিন্তু।

—"কেন?"

গোবর্দ্ধন উত্তর দিল, "হাওয়া আসবে।"

—"মাথার উপরেই তো ফ্যান ঘুরছে, হাওয়া পান না?"

—"পাই।"

—"তবে?" বুদ্ধমূর্ত্তি প্রশ্ন করিল, না ধমক দিল বোঝা গেল না।

গোবর্দ্ধন কহিল, "বাহিরটাও একটু দেখা হবে, বুঝলেন না?"

বুদ্ধমূর্ত্তিতে করুণা বা সহানুভূতি নাই, শুধু উত্তর আসিল, "খুব বুঝলাম। নেমে গিয়ে দেখুন।"

"চলন্তি-গাড়ীর জানালা থেকে দেখা, আর রাস্তায় নেমে দেখা,—"

গোবর্দ্ধন বাক্য সমাপ্ত করিতে সুযোগ পাইল না। বুদ্ধমূর্ত্তি কহিল, "আজ বারান্দায়, জানালায়, রাস্তায় মেয়ে মানুষ নাই বা দেখলেন।"

গোবর্দ্ধন কহিল, "কেন, আপনার আপত্তি কি?"

—"যথেষ্ট আপত্তি। মরবার ইচ্ছা আমার নাই।

গোবর্দ্ধন বুঝিতে না পারিয়া বুঝিবার জন্যই প্রশ্ন করিল, "মরবার কথা উঠে কিসে?"

"জানেন না, তাই বলছেন।" এমন সময় জানালার উপর কি একটা বস্তু সজোরে এবং সশব্দে আসিয়া নিপতিত হইল, কয়েকটুকরা কাঁচ ভাঙ্গিয়া ভিতরে পড়িল। সামনের ও পিছনের সীটগুলিতে চাঞ্চল্য দেখা দিল, কিন্তু অবিচল বুদ্ধমূর্ত্তি এবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কি মরবার কথা উঠে কিনা? ঐ পাথরটা মাথায় এসে পড়লে বাঁচতেন বলে মনে করেন?"

গোবর্দ্ধন সরল স্বীকারোক্তি করিল, "না, তা মনে করি না। জানালাটা খুলেই দিন বরং।"

বুদ্ধমূর্ত্তি চোখে প্রশ্ন লইয়া গোবর্দ্ধনের দিকে ভীষণ দৃষ্টি ন্যস্ত করিল।

গোবর্দ্ধন বুদ্ধমূর্ত্তির জিজ্ঞাসামূলক ভীষণ দৃষ্টিটাকে নিজের দৃষ্টি দিয়া ঠেলিয়া ধরিয়া কহিল, "বুঝলেন না, জানালা বন্ধ দেখেই তো এদের এত রাগ। খুলে দেন, দেখবেন আর কোন হাঙ্গামাই হবে না।"

বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্টি সংহরণ করিল না, গোবর্দ্ধনের উপর থাবা পাতিয়া বসিয়াই রহিল। গোবর্দ্ধন সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখুন।"

বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া তাহার সম্মুখের দিকে গোবর্দ্ধনের নির্দ্দিষ্ট পথে আগাইয়া দিতেই সেটা ড্রাইভেরের পিছনে দরজার উপরে এ-আর-পির লাল ও কালো কালিতে লেখা নোটিশের গায়ে গিয়া ঠেকিল এবং বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। গোবর্দ্ধন কহিল, "দেখছেন তো কি লেখা আছে? কিসে লোক মারা পড়ে,—ভয়ে ও আতঙ্কে। অতএব ভয় বিসর্জ্জন দিন, আতঙ্ক ভুলুন এবং আসুন আমরা সাহসী হই।"

বুদ্ধমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

—"কি যাচ্ছেন?"

—"না, আপনি এধারে আসুন।"

জায়গা বদল হইল, গোবর্দ্ধন জানালার ধারে বসিল, বুদ্ধমূর্ত্তি গোবর্দ্ধনের স্থানে জায়গা নিল।

—"নিন, জানালা খুলে দিয়ে যত খুশী দেখন।" অনুরোধ না ধমক, সুর ও স্বর কোনটা হইতেই বোঝা গেল না।

গোবর্দ্ধন কহিল, "রাগ করলেন?"

—"না।"

গোবর্দ্ধন কহিল, "বাঁচালেন। ক্রোধ মহাপাপ, শেষে হয় অনুতাপ। তুলে দেই?" বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল।

বুদ্ধমূর্ত্তি কহিল, "বল্লামই তো।"

—"থাক, দরকার নেই। আপনি রেগে গেছেন।"

—"না রাগিনি, শপথ করে বলছি। যদি বিশ্বাস না হয়, বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলছি।"

—"না না, ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস হবে না, কি বলছেন।" তারপর অতি বিনীত কণ্ঠে গোবর্দ্ধন কহিল, "তবে খুলে দেই?"

বুদ্ধমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোবর্দ্ধন কহিল, "একি উঠলেন যে?"

—"সারাজীবন গাড়ীতে থাকব বলে উঠিনি। এখানে নাবছি।"

—"ও তবে রাগ করেন নি, নেবেই যাচ্ছেন? নমস্কার।" বিবেকানন্দ ষ্ট্রীটের মোরে বুদ্ধমূর্ত্তি নামিয়া গেল। গোবর্দ্ধন

জানালাটা তুলিয়া দিয়া ভালো করিয়া হাতপা ছড়াইয়া বসিতে গিয়া বাধা পাইল, দেখিতে পাইল সিগারেট মুখে এক ছোকরার উরুর উপর সে চাপিয়া বসিয়াছে। গোবর্দ্ধন ভালো হইয়া বসিল।

গোবর্দ্ধন কহিল, "দেশলাই আছে?"

—"আছে।"

—"বিড়ি?"

—"না।"

—"তবে থাক।" বলিয়া গোবর্দ্ধন ম্যাচ প্রত্যাখ্যান করিল।

ছেলেটী কহিল, "সিগারেট নিন।"

—"দিন," বলিয়া গোবর্দ্ধন হাত বাড়াইল। সিগারেট ধরাইয়া মুখে লইয়া গোবর্দ্ধন জানালার দিকে ঘুরিয়া রাস্তার দ্রষ্টব্য বস্তু গাঁথিবার জন্য চক্ষু ফেলিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট কয়েক পরে কি রকম একটা সন্দেহজনক শব্দ শুনিয়া ও স্পর্শ পাইয়া গোবর্দ্ধন ঘাড় ফিরাইলে দেখিতে পাইল ছোকড়াটী বা' হাতে ট্রামের গদির উপর হস্ত মর্ষণ করিতেছে।

—"কি করছেন?"

—"ওদিকে চেয়ে থাকুন।"

গোবর্দ্ধন কথাটার অর্থ ঠিকই বুঝিল, ওদিকে চাহিয়া থাকিল না, শুধু চুপ করিয়া রহিল। ছেলেটীর বা' হাতে একটি ব্লেড এবং তাহারই সাহায্যে গদির চামড়া অনেকখানি কর্ত্তিত হইয়াছে, গোবর্দ্ধন নির্ব্বাক মনোযোগ লইয়াই দেখিয়া গেল। ফাঁক দিয়া নারকেলের ছোবড়াও গোবর্দ্ধনের দৃষ্টিগোচর হইল। ব্লেড পকেটে গেল, একটী ছোট্ট শিশি ছেলেটীর হাতে দেখা গেল।

গোবর্দ্ধন নিম্নস্বরে কহিল, "কি"?

—"কিছু না নড়বেন না, আছেন বসে থাকুন।"

শিশি হইতে খানিকটা তরল পদার্থ কর্ত্তিত চামড়ার আচ্ছাদনের পথে ছোবড়ার উপর নিপতিত হইল, শিশিটা পকেটে ফিরিয়া গেল। গোবর্দ্ধন নাসিকার সাহায্যে বুঝিতে পারিল যে, তরল পদার্থটা পেট্রোল জাতীয় কিছু। পাশ দিয়া সৈন্য-বোঝাই লরী বিকট শব্দে পার হইয়া গেল, শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গোবর্দ্ধন ক্ষণকালের নিমিত্ত জানালার দিকে ঘাড় ফিরাইয়াছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে গোপন কার্য্যের শেষ অঙ্গ সমাধা করিয়া ছেলেটী উঠিয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন আবিষ্কার করিল হারামজাদা ছেলেটা সিগারেটের দগ্ধাংশটুকু পেট্রোল-নিষিক্ত ছোবড়ার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরের ব্যাপার বর্ণনীয় নয়, অনুমানে বুঝিতে হইবে। দাহ্য পদার্থের সঙ্গে অগ্নির সংযোগ ঘটাইতে পারিলে অগ্নিকাণ্ডও যথানিয়মে এবং যথাসময়ে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও পাওয়া গেল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল, গোবর্দ্ধন সীট্ ছাড়িয়া উঠিল এবং মুখে সাইরেন চীৎকার "আগুন, আগুন," অর্থাৎ সামাল সামাল। গাড়ীশুদ্ধ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, নামিবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। সকলেই সকলের আগে প্রথম নামিতে চাহে, পিছনের লোক আগের লোকের আগে আসিতে চাহে, হেতু এই যে প্রাণনামক সম্পদটী সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথম রক্ষণীয়, খোয়া গেলে পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই না কি নাই। কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথে এই প্রাণগুলির বাহির হইবার উপায় থাকিলেও প্রাণশালী প্রাণীগুলির সশরীরে বাহির হইবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে বিপদে পড়িল লেডীস-সীটের তাহারা। জল নীচের দিকে গড়ায় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ আকর্ষণ বাহিরের যাবতীয়কেই চব্বিশ ঘণ্টা একটানা সমান টান টানে, এই জন্যই সেদিকেই চাপটা অত্যধিক হইতে বাধ্য। বিপদের মধ্যেও মানুষের মাথা কত ঠাণ্ডা থাকে ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

গাড়ী থামিয়া গিয়াছিল, কয়েকজন নামিতেও পারিয়াছিল, কিন্তু এক কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়ায় অগ্নিকাণ্ডে বাধা জন্মিল। এক সাহেব সার্জ্জেণ্ট তার গার্লকে লইয়া এই গাড়ীতেই যাত্রী হইয়াছিল। সেই লোকটা আগাইয়া আসিয়া বুটসমেত প্রকাণ্ড পা-খানা অগ্নির ছিদ্রমুখে পাথরের মত চাপা দিয়া ফেলিল। বহির্গমনের পথ না পাইয়া অগ্নি অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছিল। আগুন নাই দেখিয়া গোবর্দ্ধনের মাথা ঘুরিয়া গেল। মাথা বিঘূর্ণিত হইলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই সুযোগে কাজে ফাঁকি দেয়। গোবর্দ্ধনের পা টলিয়া গেল এবং ও-পাশের ভদ্রলোকের দিকে না ঝুঁকিয়া গোবর্দ্ধন সাহেব সার্জ্জেণ্টেরই গায়ের উপর সমস্ত ভার লইয়া পড়িয়া গেল। মাথা খুব বেশী ঘুরিয়াছিল, তাই গোবর্দ্ধনের

পড়াটাকে ঝাঁপাইয়া পড়ার মতই দেখাইয়াছিল। শিকার-শুদ্ধ শিকারী জড়াজড়ি করিয়া ভূমিশায়ী হইল। অর্থাৎ এই আকস্মিক দেহভারে আক্রান্ত হইয়া সাহেবের ব্যালান্স টলিয়া গেল, সবুট পা অগ্নিমুখ হইতে সরিয়া আসিল এবং বাকী পা খানা দুই জনের ভার সহিতে অস্বীকৃত হইল। আগুন এবার আত্মপ্রকাশের নিরঙ্কুশ সুবিধা পাইল। গাড়ীটাকে আগুনের হাতে রাখিয়া যাত্রীরা সকলেই নামিয়া গিয়াছিল এবং গোবর্দ্ধনকে নিজের জিম্মায় লইয়া সার্জ্জেণ্ট অবতীর্ণ হইল। গোবর্দ্ধন যেন একটী বেয়াড়া ছেলে এবং সার্জ্জেণ্ট যেন তাহারই কড়া অভিভাবক, গোবর্দ্ধনের হাত শক্তমুঠায় চাপিয়া সার্জ্জেণ্ট এমনভাবেই তাহাকে নামাইয়া আনিয়াছিল। বলা বাহুল্য রাস্তায় ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। আগুনধরা ট্রাম এবং হাতধরা গোবর্দ্ধন দুইটীই সমান দ্রষ্টব্য হইয়া পড়িল।

গোবর্দ্ধনের সঙ্গে সার্জ্জেণ্টের যে আলাপ হইল তাহা শ্যামী-শিখ্য সংবাদের মতই উচ্চাঙ্গের। রিপোর্টারের অভাবে তাহার আর বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তাই এখানে দেওয়া গেল না। সার্জ্জেণ্টের ইচ্ছা ছিল গোবর্দ্ধনকে থানায় লইয়া যাওয়া। গোবর্দ্ধনের সে স্থানে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাই সাহেবকে কাকুতি মিনতি করিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, সাহেবের উপর পড়িয়া যাওয়া ভয়ানক অপরাধ তাহা সে স্বীকার যায়; কিন্তু মাথা ঘুরিয়া যাওয়া এবং পিছনের লোকের ধাক্কা খাওয়ায় গোবর্দ্ধনের না পড়িয়া উপায় ছিল না। আর অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে তাহারও কোন হাত নাই। ছেলেটার কথা বলিল না, পাছে প্রশ্ন আসে যে ষড়যন্ত্রের সময় সে বাধা দেয় নাই কেন। সাহেবের গার্ল কি বলিল, সাহেবও গোবর্দ্ধনকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু যাইবার সময় একটী চপেটাঘাত দিয়া উপদেশ দিল যে, এমন শয়তানী যেন ভবিষ্যতে আর না করা হয়। গোবর্দ্ধন স্বীকার করিল যে, আর করা হইবে না।

ফিরতি ট্রামের জন্য গোবর্দ্ধন দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া সমবেদনাতুর কয়েকজন আসিয়া দাঁড়াইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাপ-মা তুলে গাল দিল, কিছু বল্লেন না?

গোবর্দ্ধন কহিল, বাবা-মা নেই।

—নেই? অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তারা অর্থই বুঝিতে পারিল না

—অনেকদিন মারা গেছে।

—মারা গেছে, তাই বাপ-মা তুলে গাল হজম করবেন?

—ও তাদের উপর দিয়েই গেছে, আমি চটতে যাই কেন। গোবর্দ্ধন জবাব দিল।

আর একজন অন্য দিক দিয়া আক্রমণ করিল, কুকুরের বাচ্চা বল্ল যে।

—মিথ্যে কথার কি জবাব দেব? আপনারাও তো দেখছেন কুকুর নই, মানুষই।

আর একজনের বীরত্বে ও মনুষ্যত্বে আঘাত লাগিল, বলিয়া বসিল, মানুষ হলে চুপ করে মার খেলেন কেন?

গোবর্দ্ধন এবার তাহার সেই অপূর্ব্ব হাসিটীই হাস্য করিয়া দেখাইল। ইহারা গোবর্দ্ধনকে চিনে না, অথচ হাসিটীর অর্থ সম্বন্ধে মেসের কেদারবাবু ও জনার্দ্দনের মতই সমস্যায় পড়িয়া গেল। ট্রাম আসিল এবং গোবর্দ্ধন ট্রামে চড়িল।

এবারকার ট্রাম যাত্রার বিবরণ দেওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় গোবর্দ্ধন মেসে ফিরিয়া আসিল, মাথায় পাগড়ীর মত প্রকাণ্ড একটা ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া কেদারবাবু কহিলেন, কি হয়েছে? অর্থাৎ, যাক্, তবু ফিরিয়া আসিয়াছে।

জনার্দ্দন কহিল, ফিরে এলেন? অর্থাৎ এতখানিই যখন শুনিয়াছেন, তখন বাকী প্রার্থনাটুকু পূরণে ভগবানের কি এমন বাধা ছিল। ট্রামযাত্রাকে কি অগস্ত্য যাত্রা কোন মতেই করা যাইত না।

উভয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোবর্দ্ধন সেই হাসি হাসিল এবং হাসির অর্থ লইয়া উপস্থিত সকলে একমত হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল।

সাহিত্য ও ইতিহাস

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত

শৈশব-স্মৃতি মনে পড়িতেছে, তখন দেখিতাম দিদিমা প্রভৃতি গলায় বিবিধ প্রকারের সোনার মালা পরিতেন, হাতে পরিতেন মোটা মোটা অনন্ত এবং বলয়, নাকে পরিতেন নোলক এবং কানে কানবালা। তারপর একটু একটু করিয়া আসিতে লাগিল নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢেউ,—আমাদের রুচির জগতেও ঘটিল অনেকখানি পরিবর্ত্তন। মা, দিদিমা প্রভৃতি তাঁহাদের সেই মোটা মোটা অলঙ্কার লইয়া হইয়া পড়িলেন একেবারে সেকেলে; এ কালের মার্জ্জিতরুচি মহিলাগণ নাসিকা ও কর্ণকে সোনার বন্ধন হইতে দিলেন একেবারে মুক্তি, গলার হার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার গ্রহণ করিতে লাগিল,—হাতের অলঙ্কারেও পড়িল মনের সূক্ষ্মতার দাগ।

দেখিতে দেখিতে একাল আবার সেকাল হইয়া গিয়াছে, সেকাল আবার আসিয়া দেখা দিয়াছে একালের রূপে। নাকের নোলকটি এখন পর্য্যন্ত অভিজাত সমাজে ফিরিয়া আসে নাই বটে; কিন্তু লম্বা ঝুলানো কানবালাটি আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সময়ের ঘূর্ণিপাকের সঙ্গে একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে সেই সব গলার মালা,—ফিরিয়া আসিতেছে হাতের মোটা কঙ্কণ এবং বলয়। মা দিদিমাদের যুগে যাঁহারা বলিয়ে কইয়ে মহিলা ছিলেন তাঁহাদের সহিত আর জবাবদিহি করিবার সুযোগ নাই; সুতরাং তাঁহাদের ভূষণ ব্যবহারের পশ্চাতে ছিল যে সকল গভীর তত্ত্ব, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবারও সুযোগ নাই। কিন্তু আমাদের চাপল্য এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সকল অপরাধই তাঁহাদের নিকটে সর্ব্বদা মার্জ্জনীয়, এই ভরসায় তাঁহাদের ভূষণ-ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্বকথা চালাইয়া দিতে সাহসী হইতেছি। তাঁহাদের অলঙ্কার ব্যবহারের পশ্চাতে হয় ত যেমন ছিল একটা দৈহিক সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, তেমনিই ছিল একটা আর্থিক ভারিত্বের পরিচয়। তাহাতে মন্দই বা কি? সৌন্দর্য্যের উপকরণগুলি যদি শুধু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াই থামিয়া না যায়,—তাহার কর্ত্তব্য করিয়া সময় অসময় একটা পুঁজি স্বরূপে সে যদি একটু উপরি কাজ করেই, তাহাতেই বা একটা ক্ষতি কি? পরবর্ত্তী কালের মার্জ্জিতরুচি মহিলাগণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে; তাঁহারা বলিবেন,—অলঙ্কারের স্থূলতা রুচির স্থূলতারই পরিচায়ক, আর সৌন্দর্য্য-বোধের সহিত বাস্তব প্রয়োজনবুদ্ধির যে সম্পর্ক, উহা একান্তই অশ্রদ্ধেয়। অকাট্য তাঁহাদের যুক্তি, অতএব মানিতেই হইল। কিন্তু তাহা মানিতে রাজি হইল না দুঃশীল কাল; সে তাই আবার ফিরাইয়া আনিল সেই লম্বা লম্বা কানবালা, মোটা কঙ্কণ আর বলয়। অলঙ্কারের এই নব পরিণত স্থূলতার পশ্চাতে যে আরও কত আধুনিক এবং অত্যাধুনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত আমরা নিরাশ হই নাই।

আসলে এই তত্ত্বকথাগুলি অনেকখানিই ভুয়া। ভুয়া ঠিক যুক্তির দিক হইতে নয়, ভুয়া এই দিক হইতে যে তাহারাই সব সময় কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের মূলীভূত কারণ নহে। বিশেষ বিশেষ যুগের সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত গুরু-গম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করি তাহাদের ভিতরে সত্য থাকিতে পারে, যুক্তি থাকিতে পারে,—কিন্তু তাহাই যে বিশেষ কোন যুগের রুচি বা প্রচলনের মূল কারণ, এমন কথা স্বীকার্য্য নহে। যুগের রুচিপরিবর্ত্তন এবং তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির ভিতরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার গতি এবং প্রকৃতি সর্ব্বদা তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে,—তাহার নিয়ন্তা অনেকখানিই ইতিহাস। সেই ঐতিহাসিক নিয়মে যে ক্রম-আবর্ত্তন সে আপনি চলিয়া আসে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে,—তত্ত্ব তাহাকে চালাইয়া লইয়াও যাইতে পারে না,—তাহার গতি রুদ্ধ করিতেও পারে না; সেই গতিচ্ছন্দে বিশেষ বিশেষ দেশকালে ফুটিয়া ওঠে যে বিশেষ বিশেষ রূপ, তাহার উপরে তত্ত্বের বোঝাটি অনেক-খানিই দিই পরে চাপাইয়া।

পৃথিবীতে কতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই এই একই সত্য। সাধারণতঃ সভ্যসমাজে প্রচলিত যতগুলি ধর্ম্মপথ আছে তাহাদের

পশ্চাতে ততগুলি ধর্ম্মমত আছে। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইব যে, ধর্ম্মের পথগুলিই জাগিয়াছে আগে, মতগুলি আসিয়াছে সেই পথ ধরিয়া। ঐ মতগুলিকে অবলম্বন করিয়াই যে পথগুলি জাগিয়া উঠিয়াছিল এই প্রচলিত ধারণাটাই অনেকখানি ভুল, বরঞ্চ তাহার উল্টা কথাই হয় ত অধিক সত্য। আজকাল খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে এত তত্ত্ব যিশুখ্রীষ্টের মস্তক কোনদিন আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে; বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে যতগুলি 'যান' এবং দার্শনিক 'বাদ' গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্বয়ং বুদ্ধদেবের তাহা জানা ছিল কি না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না। আমাদের উপনিষদের বচনগুলি ঋষিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টা-দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি তাত্ত্বিক মতগুলির বিশেষ কোনটিকে প্রচার করিতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। আসলে উপনিষদের ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন উপনিষদের ঋষিগণ, যিশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ,—এবং তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে মহা-কালের আবর্ত্তন—যাহাকে আমরা বলি ইতিহাস।

সাহিত্য এবং সাধারণ আর্টের ক্ষেত্রেও এই এক কথা। আমাদের সাধারণতঃ এই ধারণা যে, বিভিন্ন যুগে আমাদের সাহিত্য এবং কলা সৃষ্টির ভিতরে যে বিশেষ বিশেষ রূপ দেখি, সে রূপগুলি মূলতঃ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব বা মত-বাদকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই তত্ত্ব বা মতবাদের দ্বারাই তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত। আমরা যখন সাহিত্যের বা অন্য কোন কলা সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করিতে যাই, তখন আমরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কাজ করি। কিন্তু আসলে এই তত্ত্বগুলি বা মতবাদগুলিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা আর্টের ক্ষেত্রে বড় কথা নহে। মানুষের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে বা অন্যান্য কলা সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথমে এই কথাগুলি আসিয়াছিল এবং তাহার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়াই মানুষ সাহিত্য বা আর্টের বিশেষ বিশেষ রূপ দিয়াছিল একথা সত্য নহে; আগে সৃষ্টি, তাহার বুক হইতে বাষ্পাকারে জাগিয়া ওঠে তত্ত্বের মেঘ; সে মেঘ হয় ত সহৃদয় বর্ষণে সৃষ্টির বুকে আনিতে পারে সরস নবীনতা, বজ্রের ভ্রূকুটিতে সে হয় ত বা হানিতে পারে শ্যামল শস্যের বুকে শিলার আঘাত। তত্ত্ব সাহিত্যকে বা আর্ট-সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ঠিক এতটুকু, ইহার বেশী নহে। কিন্তু নমনীয় শস্য-শষ্প, তৃণগুল্মের কোমল জীবনযাত্রাকে আকাশের মেঘ যতখানি নিয়ন্ত্রিত করুক, যে বনস্পতি ধরণীর বুকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে তাহার সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের শিকড়জালে, সে সেই আত্ম-প্রত্যয়ের বলেই টানিয়া লয় ধরণীর বুক হইতে তাহার জীবনের রসসম্ভার, তত্ত্বের মেঘ তাহার জীবন-যাত্রাকে পলে পলে বিপর্য্যস্ত করিতে গেলে হয় ত আপনিই লাঞ্ছিত হইবে।

মোটের উপরে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে সাহিত্যের এবং কলাসৃষ্টির যে বিশেষ রূপ, তাহাদের অস্তিত্বের কারণ তত্ত্বের যৌক্তিকতায় ততখানি নহে, যতখানি ইতিহাসের আবর্ত্তনের ভিতরে। কিন্তু এই যে ইতিহাসের আবর্ত্তন ইহা একেবারেই অন্ধ বা খামখেয়ালী নহে। ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে দেশ-কাল-পাত্রের প্রকৃতি ও অবস্থান—তাহাদের অন্তর্নিহিত চাহিদা। সাহিত্যক্ষেত্রে বা সাধারণ আর্টের ক্ষেত্রে আমরা যাহাকে তত্ত্বের চাহিদা বলিয়া ভুল করি, তাহা অনেকখানিই এই ইতিহাসের চাহিদা,—এই দেশ-কাল-পাত্রের চাহিদা। এই দেশ-কাল-পাত্রের চাহিদাকে আবার অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করে এক একটি বিরাট ব্যক্তি-পুরুষ,—যাহার বিরাট সত্তার ভিতরে দেশ-কাল-পাত্র অখণ্ডরূপে বিধৃত হইয়া থাকে। তাই ইতিহাস রচনা করে জীবন্ত মানুষের প্রাণ-স্পন্দন—মতবাদই ইতিহাস রচনা করে না। মানুষ যাহা যাহা করে, তাহাকেই নিষ্কাশিত করিয়া গড়িয়া উঠে করার মতবাদ—মতবাদ দ্বারাই মানুষের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত নহে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেই আলোচনা সীমাবদ্ধ করা যাক্। সাহিত্যের ক্ষেত্র মূলতঃ প্রাণের ক্ষেত্র,—বুদ্ধির ক্ষেত্র নহে। তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির দৌরাত্ম্যও কিছু কম নহে, এই বুদ্ধির দৌরাত্ম্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সাহিত্যের হাজার হাজার মতবাদ। এই মতবাদগুলির দ্বারাই সাধারণতঃ আমরা আমাদের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়া থাকি; কিন্তু এই মতবাদদ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের দৌর্ব্বল্য ধরা পড়ে তখনই, যখন আমরা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাই। ইতিহাস কোনও মতবাদের বন্ধন মানে না—সে চলে তাহার সতেজ প্রাণ-ধর্ম্মে। যেখানেই মতবাদের

দ্বারা আমরা একেবারে চারিদিক হইতে আঁটিয়া বাঁধিতে যাইব ইতিহাসের ধারাকে, সেখানেই তাহার ধারা যাইবে থামিয়া, জমিয়া উঠিবে অক্ষম-সৃষ্টির আবর্জ্জনার স্তূপ।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তর্কের সুবিধার জন্য আমরা কতকগুলি গালভরা 'ইজম্' বা 'বাদ' তৈরী করিয়া লইয়াছি; যেমন 'আদর্শবাদ' 'রোমান্টিকবাদ' 'বাস্তববাদ' প্রভৃতি এবং সুযোগ সুবিধামত ইহাদের একটিকে অপরের পিছনে লাগাইয়া বেশ একটা ঘোলাটে পাক সৃষ্টি করিয়া লই। কিন্তু রোম্যান্টিক মতবাদকে ক্ল্যাসিক্‌বাদ অথবা বাস্তববাদের পিছনে যতই লাগাইতে চেষ্টা করি না কেন, আসলে তাহাদের ভিতরে কিন্তু কোনও বিরোধ নাই; কারণ, তাহারা যে যাহার যুগে, যে যাহার ক্ষেত্রে আপন মনে চলিয়া যায় তাহাদের স্বচ্ছন্দ গতিতে। তর্কযুদ্ধের দ্বারা যতই জয় পরাজয় লাভ হউক তাহা দ্বারা তাহাদের গতি রুদ্ধও হয় না, নিয়ন্ত্রিতও হয় না।

হোমারের যুগে তিনি এপিক্ লিখিয়া ভাল করিয়াছেন না হেলেনকে অবলম্বন করিয়া রোম্যান্টিক প্রেম-গীতিকা লিখিলে ভাল করিতেন এ প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্‌-বাদ ভাল না রোম্যান্টিকবাদ ভাল এ প্রশ্নও তেমনি হাস্যকর। বেদব্যাস মহাভারত লিখিয়া ভাল করিয়াছেন, না রবীন্দ্রনাথ লিরিক কবিতা লিখিয়া ভাল করিয়াছেন—সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমনতর অবান্তর প্রশ্নের কল্পনা করা যায় না। অথচ মজা এই যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সমালোচনার নামে আমরা এই জাতীয় অবান্তর প্রশ্ন লইয়াই মাতিয়া থাকি বহু সময়। লিরিক কবিতা যতই ভাল হোক বেদব্যাসের যুগে সে সাহিত্যের সত্য ছিল না, প্রমাণ—ইতিহাস; আবার এপিক কাব্য যতই ভাল হোক না কেন বিংশশতাব্দীতে সে অচল, তাহার প্রমাণও ইতিহাস, কারণও ইতিহাস। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ছোট গীতি-কবিতা যতখানি সত্য, হোমার, বাল্মীকি ও ব্যাসের যুগে আবার মহাকাব্যও ততখানি সত্য। এখানে ভাল-মন্দের কোন প্রশ্নই আসে না, আসল প্রশ্ন সত্যাসত্যের; এবং সে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করে যুগের ইতিহাসে। শিল্পের ক্ষেত্রে মিশরের পিরামিড বড় না আগ্রার তাজমহল বড়—একথা শুধু অবান্তর নহে, একান্ত অরসিকোচিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিতর্কটি সবচেয়ে বেশী জমকালো হইয়া উঠে তাহা আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদের ঝগড়া। অবশ্য এই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের ভিতরে যে কোথায় একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া এই ঝগড়াটিকে দাঁড়করান হয়, তাহা সব সময় বুঝিয়া ওঠা শক্ত। বহির্বস্তুর মনোময় রূপের অতিরিক্ত একটি যথাস্থিত রূপ যে মন কি করিয়া গ্রহণ করিয়া সাহিত্যে রূপান্বিত করিয়া তোলে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না। তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের কথা বলা হয় তাহাকে সাধারণ ভাবে জানিয়া লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শবাদও যেমন একক সত্য নহে, বাস্তববাদও তেমনি একক সত্য নহে। সাহিত্যকে আদর্শবাদী হওয়া উচিত ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা যদি ভুল বলেন তবে সাহিত্যকে বাস্তববাদীই হওয়া উচিত একথা যাহারা বলেন তাঁহারাও তেমনিতর ভুলই বলেন। সাহিত্যের কি হওয়া উচিত ও কি না হওয়া উচিত একথা লইয়া বুদ্ধিকে যত ইচ্ছা শানানো যাইতে পারে,—কিন্তু উচিত অনুচিত একবার নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিলেই সাহিত্য যে চিরন্তন কালের জন্য সেই ফতোয়া মানিয়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিবে এ কথা আমাদের ভাববিলাস মাত্র। সাহিত্য কি ও সাহিত্য কি না,—তাহার কোন পথে চলা উচিত, কোন পথে না চলা উচিত—এবিষয়ে স্মার্ত্ত শাসনের নিয়মাবলী যতই স্তূপীকৃত হোক্, সাহিত্য চিরবিদ্রোহী—সে চলে তাহার আপন খুশীতে, আপন প্রাণস্পন্দনে। সেই স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহেই সত্য হইয়া উঠে তাহার আদর্শবাদ, মিথ্যা হয় তাহার বাস্তববাদ; আবার সেই গতিপ্রবাহেই মিথ্যা হইয়া যায় তাহার আদর্শবাদ সত্য হইয়া উঠে তাহার বাস্তববাদের রূপ। এই যে প্রাণ-স্পন্দনের গতি—বুদ্ধির অনুশাসন তাহাকে কতটুকু মানাইয়া চলিতে পারে?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে আদর্শবাদের প্রাধান্য তাহা তৎকালীন যুগধর্ম্মের পরিচায়ক। মানুষের খাঁটি জীবনকে দেখিবার ক্ষমতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না একথা সহজেই মানিতে প্রস্তুত নই। সে দৃষ্টি না থাকিলে বঙ্কিম-সাহিত্যের কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, রোহিণী প্রভৃতিকে পাইতেই পারিতাম না। কিন্তু তাঁহার কবিধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল যুগধর্ম্ম; তাই তিনি কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া সূর্য্যমুখীকে গৃহ-লক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; শৈবলিনীকে কঠোর

প্রায়শ্চিত্তের আগুনে পোড়াইয়া ঘরে ফিরাইয়াছিলেন, রোহিণীকে গুলী করিয়া মারিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আদর্শবাদের পক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন না কেন, তাহাতে শরৎ-সাহিত্য অস্বীকৃত হয় নাই। আবার শরৎচন্দ্র সাহিত্যের বাস্তববাদের পক্ষে যতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে করিয়া একথা মনে করা একান্ত ভুল হইবে যে, সাহিত্যের আদর্শবাদের মূলে সেইখানেই একেবারে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। সৃষ্টির রাজপথে চলিয়াছে কালের রথচক্রের আবর্ত্তন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌছিতে না পৌছিতেই চারিদিক হইতে রব উঠিয়াছে—শরৎচন্দ্র প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদী, বাস্তববাদের মুখোসটি খুলিয়া ফেলিলেই তাঁহার উগ্র আদর্শবাদের স্বরূপটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হইয়া হইয়া পড়ে। শরৎসাহিত্যও তাই আধুনিক বাস্তবপন্থীদের চাহিদা ষোল আনা মিটাইতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে, বছর পনের পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই জাঁকিয়া উঠিয়াছিল একটা বেপরোয়া বাস্তববাদের তাণ্ডব; শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত সদুপদেশ দিয়া ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "থামো, থামো।" কিন্তু কে শোনে সেই কথা, কে আর থামে,—"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে।" শুধুই কি যৌবন-জলতরঙ্গ? সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া উঠিতে লাগিল কত মতবাদ—যুক্তিতর্ক, মসী-যুদ্ধ—প্রায় প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ঐ বেপরোয়া বাস্তববাদই সাহিত্যের আসল ধর্ম্ম—একেবারে টাটকা খাঁটি রূপে। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে—আসল কথা ঐ জলতরঙ্গ—আমাদের যৌবন-জলতরঙ্গ নহে—বিদেশাগত জলতরঙ্গ যাহাতে আমাদের যৌবনকে দিয়াছিল ভাসাইয়া। কিন্তু সে তরঙ্গকে যুক্তি-তর্কের বাঁধ দিয়া থামান গেল না—তাহাকে থামাইয়া দিল আর একটি তরঙ্গ, সে তরঙ্গ উঠিয়াছিল আমাদেরই পরিচিত গাঙের কূল হইতে। হঠাৎ কয়েকখানি উপন্যাস গড়িয়া উঠিল নিছক আমাদের ঘরের কথায় আমাদের ঘরের জীবন লইয়া। তাহার ভিতরে আমরা স্পর্শ পাইলাম আমাদের বাঙলা দেশের জলমাটি আকাশ-বাতাসের ভিতরে খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের, আমরা বলিয়া উঠিলাম,—'হাঁ, খাঁটি উপন্যাস-সাহিত্য বটে! সঙ্গে সঙ্গে অমনি জমিয়া উঠিতে লাগিল মতবাদের ভিড়, যে সাহিত্যের সহিত আমাদের অন্তরঙ্গের যোগ নাই—নাড়ীর টান নাই—যাহার ভিতরে বাঙ্গালার ভিজামাটির গন্ধ নাই, তাহা উপন্যাস নহে—পরগাছা, জঞ্জাল। কিন্তু একথা হলফ ক'রিয়া বলা যায় যে, আধুনিককালে যাঁহারা এইজাতীয় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সাহিত্য রচনার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই এই মতবাদটির দ্বারা 'চাঙ্গা' হইয়া উঠিয়া কলম ধরেন নাই,—তাহাদের রচনার প্রেরণা আনিয়াছিল প্রাণধর্ম্মের গতিবেগ। বাস্তববাদী পরগাছা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের মনের ভিতরে হয়ত জাগিয়া উঠিতেছিল একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া, ভিতরে ভিতরে চাহিতেছিলাম পরিবর্ত্তন—সেই চাহিদা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহে দিয়াছিল নূতন দোলা, সৃষ্টি হইল নূতন সাহিত্যের। কিন্তু এইখানেই আবার সাহিত্যের সনাতন রূপটি আবিষ্কার করিয়াছি, এমন কথা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান না দেই; কারণ যতদিনে ইহার খাঁটিত্ব ও সনাতনত্ব সম্বন্ধে যুক্তির বহর দাঁড় করাইব, ততদিনে হয় ত বাহিরে তাকাইয়া দেখিব রাজপথে জাঁকিয়া উঠিয়াছে নূতন শোভাযাত্রার হর্ষধ্বনি!

সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা সত্য, আকৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য। বাঙ্গলা-সাহিত্য হইতেই উদাহরণ লওয়া যাক্। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যে আনিয়াছিলেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ, কাব্য-সাহিত্যে সে বিদ্রোহ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে। বহু প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর একটানা স্রোতে বাঙ্গালীর প্রাণ ক্রমেই ঝিমাইয়া পড়িতেছিল,—কাব্য-জীবনে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল একটা তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রচণ্ড ধাক্কার, যাহাতে সচকিত হইয়া ওঠে বাঙ্গালীর দেহ-মন; সেই ধাক্কা আসিয়াছিল বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের কাছ হইতে। বাঙ্গালীর রক্ষণশীল বনিয়াদে অনুভূত হইল যে প্রবল কম্পন তাহার প্রতিক্রিয়াও কম হয় নাই, মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের বিদ্রূপে লিখিত হইল 'ছুঁচুন্দরী-বধ' কাব্য,—কিঞ্চিদর্থক এবং অনর্থক কোলাহলে চেষ্টা হইল 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে'র ধ্বনিটিকে ডুবাইয়া দিতে; কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই ফলবতী হয় নাই,—কারণ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' আসিয়াছিল গভীর প্রয়োজনে,—সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনই ছিল তাহার অস্তিত্বের দৃঢ় বনিয়াদ। শত বাধা

সত্ত্বেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাই বাংলা-সাহিত্যে চলিয়া গেল; এমন কি কিছুদিন পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে তাহা চলিয়াছিল প্রায় যেন অন্ধ-আবেগে। কাব্যের দেহে যেমন আসিল সবল বাহুর আস্ফালন,—প্রাণেও আসিয়াছিল তাহারই উপযুক্ত শৌর্য-বীর্য্য।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবির্ভাব হইল কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী; স্বর্গমর্ত্ত্য প্রকম্পিত করিয়া যে রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল দিকে দিকে তাহারই একপাশে একান্ত নিভৃতে নিজের মন-বীণার সূক্ষ্ম তারে করুণ-মধুর ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন বিহারীলাল। কে বিচার করিবে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টি বড় না বিহারী লালের? এ তুলনাই আসে না,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই উভয়ই সত্য। মিত্রাক্ষরের বাঁধ ভাঙিয়া উন্মাদ গতিতে যে কাব্য-প্রাণ ও যে ছন্দ পত্তন করিয়াছিল বাংলা-সাহিত্যে একটি 'বীরযুগে'র, সেই যুগের পক্ষে সে একটা বড় সত্য,—তাহার ভিতরে সাহিত্যের কোন সনাতন রূপ খুঁজিতে গেলেই ভুল করিব। মধুসূদনের মাত্রাজ্ঞান ছিল; তাই তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র ভাষায় বা ছন্দে রচনা করিবার কল্পনাও ক'রতে পারেন নাই, সেখানে তাই দেখিতে পাইতেছি,—

> কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
> বনশোভিনী।
> অলিবঁধু তার, কে আছে রাধার
> হতভাগিনী?
> হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে—
> মালা গাঁথিয়া
> আর কি নাচে লো তমালের তলে
> বনমালিয়া?

অথবা—

> 'সখি রে,—
> বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে'
> পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
> উছলে সুরবে জল, চললো বনে।'

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যে ধারাটির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বাঙ্গালার 'কোমলকান্ত পদাবলী'র কাব্য-নিকুঞ্জে তাহা আনিয়াছিল একটি পৌরুষ সরসতা,—কিছুদিন তাই চলিল তাহারই ধাক্কা। কিন্তু সেই পৌরুষ নিনাদ কিছু দূরে গিয়াই অন্ধ অনুকারকদের হাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল একটা ক্লান্ত হাঁপানিতে; কাব্যের মোড় আপনা হইতেই ফিরিয়া গেল,—আসিল বিহারীলালের নিভৃতে আপন মনে কাব্য-কূজন, আসিল বাংলাসাহিত্যে সত্যকারের রোম্যান্টিক লিরিক কবিতার যুগ এবং সে ধারা তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যকে কি দিলেন, না দিলেন, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; আমরা শুধু জানি যে দু'হাত ভরিয়া এত পাইলাম—এমন সুকুমার এবং বহু-বিচিত্র তাহার রূপ—এমন মধুর তাহার আস্বাদন যে আমরা শুধু মাতালের মত নেশায় জমিয়া উঠিলাম,—সেই রসমাধুর্য্যের ভিতরে ভুলিয়া গেলাম কালের আবর্ত্তন। মনে করিলাম—রবীন্দ্রনাথের সুর শুনিয়া চঞ্চলা কাব্য-লক্ষ্মী বুঝি অচঞ্চলা রূপ গ্রহণ করিলেন,—কাব্যের চরম প্রকাশ বুঝি এইখানেই। কিন্তু কালের রথচক্রও থামিল না, নৃত্যচপলা কাব্য-লক্ষ্মীও থামিলেন না,—আসিল 'রবীন্দ্রের যুগ',—এবং সে যুগেরও পত্তন করিলেন কতকখানি রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্য কবিতার রূপ অনেকখানিই গিয়াছে বদলাইয়া। আবার আসিয়াছে পশ্চিম হইতে নূতন 'জল-তরঙ্গ',—আবার তাহাতে দিয়াছি আমরা আমাদের যৌবন ভাসাইয়া। কাব্যে রোম্যান্টিকতা এখন রীতিমতন একটা গাল হইয়া উঠিয়াছে; শুধু রোম্যান্টিকতা নয়, কাব্য-কবিতার ভিতরে 'কাব্য'ও হইয়া উঠিয়াছে নিতান্ত একটা বিদ্রূপের বস্তু, ওটা যেন নিছকই চলিতেছে একটা 'কাব্য-করা'। ইহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে দুই দিকে,—এক চলিতেছে কাব্যের সুসজ্জিত মনোরম দেহে যতটা সম্ভব নর্দ্দমার দুর্গন্ধ কর্দ্দম এবং রান্নাঘরের ঝুল মাখাইয়া তাহাকে রীতিমতন কাব্যের আচার এবং সংস্কার বর্জ্জিত করিয়া তুলিতে, অন্যদিকে চলিতেছে বুদ্ধির ঝাঁঝালো কড়া পাক,—যে নিরন্তর ঝাঁকুনী দিয়া দিয়া সজাগ করিয়া দিতে চাহিতেছে আমাদের ভাব-বিলাসী মনকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে আমরা রীতিমতন অভিযোগ আনিতে আরম্ভ করিয়াছি রোম্যান্টিক বলিয়া, এবং আরও বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, রোম্যান্টিকতার ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রকাব্যে পলায়নবাদ।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে আজকালকার আমাদের সাধারণ অভিযোগ এই যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই বাস্তব সংসার—

বাস্তবজীবনের সম্মুখীন হন নাই। জগৎ এবং জীবনকে তিনি প্রধানতঃ দেখিয়াছেন তাঁহার কল্পনার রঙীন স্বপ্ন-বিলাসের ভিতর দিয়া, আর কতকগুলি অবাস্তব কল্পনা, আদর্শ ও ভাব ধূ্যার ভিতর দিয়া। তিনি সর্ব্বদাই জীবনের রূঢ় বাস্তবতার পাশ এড়াইয়া তাঁহার স্বপ্নের স্বর্গে বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করিয়া কোনও ওকালতির প্রয়োজন নাই। আগে আমাদের কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যাক্। আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক-পন্থী, আমরা বাস্তবপন্থী।—রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারের কালো কেশদামের ভিতরে শুধু রহস্যে মশগুল হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যে কবিতা লিখি তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারের কেশদাম লইয়া নয়, তাহা আমাদের রক্ত-মাংসের বাস্তব প্রিয়ার একান্ত বাস্তব কালো চুলগুলি লইয়া। কিন্তু কি লিখি? সেই প্রেয়সীর কালো মিশমিশে চুলগুলির ভিতরেই খুঁজিয়া পাই সন্ধ্যার অন্ধকারের রহস্য—তাহার ভিতরেই যাই একেবারে ডুবিয়া। রোম্যান্টিক বাদ এবং বাস্তববাদের ভিতরে তফাৎ হইল তাহা হইলে কোনটুকু? না—রোমান্টিক কথাটিকে উল্টাইয়া লইলেই সে হয় রিয়ালিষ্টিক্। আকাশে যখন পাখী উড়িয়া যায়, তাহার পাখার ঝাপটায় ভাঙ্গিয়া যায় নৈঃশব্দ্যের ধ্যান-ভাঙ্গিয়া যায় ধরণীর ঘুম; আমরা তখন বলি, এটা হইল নিছক রোম্যান্টিকতা; কিন্তু ধরণীর সেই ঘুমই যখন ভাঙ্গিয়া যায় আকাশচারী বিমানের পাখার ঘর্ঘর ধ্বনিতে তখনই সে হইয়া ওঠে রিয়ালিষ্টিক্! মোটের উপরে নক্ষত্র খচিত নিশায় আকাশের যে রহস্য সেটা নিতান্তই রোম্যান্টিক, আর সেই রহস্যই হইয়া ওঠে রিয়ালিষ্টিক যখন সে ফুটিয়া ওঠে কৃমিসঙ্কুল নর্দ্দমার ভিতরে। চাঁদ, নদী, ফুল, পাখীর গান প্রভৃতি লইয়া জীবনের ক্ষেত্রে যাঁহারা শুধু পলাতক হইয়া ভাববিলাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দার্হ হইতে পারেন, কিন্তু যেখানে কলের চিমনীর ভিতর দিয়া সর্ব্বহারাদের তাজা লাল রক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিয়া আকাশের মুখে মাখাইয়া দিয়াছে কালি—তাহা লইয়া যে ভাববিলাস তাহা একান্তই নিষ্ঠুর।

আমরা বলি, আমরা ভাববিলাস ছাড়িয়া বাস্তবপন্থী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু এই বাস্তবপন্থার একটা নমুনা লওয়া যাক্। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আকাশ হইতে অদৃশ্য আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে; কলিকাতার গলিয়া যাওয়া পীচের রাস্তার উপর দিয়া ঠুং ঠুং করিয়া ধুকিতেছে গরীব রিক্সাওয়ালা। তাহার সেই ঠুং ঠুং শব্দের ভিতর দিয়া আমাদের কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে আসিয়া পৌঁছিতেছে নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি—'ভুখা ভগবানের' আর্ত্তির অভিযোগ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব এই যে রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দের ভিতরে মানবাত্মার ক্রন্দন-ধ্বনি তাহাকে হয় ত রক্তমাংসের কান দিয়া শুনি নাই, শুনিয়াছি আমাদের মর্ম্মে। এই যে বাস্তব কানের শোনাকে ছাড়াইয়া গিয়া তদতিরিক্ত মর্ম্মের শ্রবণ ইহাই সকল রোম্যান্টিকতার মূল। রিক্সাওয়ালা যখন ঠুং ঠুং শব্দে রিক্সা টানিয়া চলে তখন তাহার ঠুং ঠুং ধ্বনির ভিতরে হয় ত বাজিয়া ওঠে উপার্জ্জনের আনন্দ, হয় ত জাগিয়া ওঠে তাহার অন্তরের বেদনা; ইহার কোনটা যে বাস্তব সত্য তাহা ঐ রিক্সাওয়ালার অন্তর্যামী পুরুষ ব্যতীত আর কেহই জানে না। সুতরাং ঐ ঠুং ঠুং ধ্বনির ভিতরে যে উপার্জ্জনের আনন্দের আবিষ্কার সেইটাই ভাববিলাস এবং তাহার ভিতরে যে ভুখা ভগবানের ক্রন্দন-শ্রবণ সেইটাই সত্যকারের বাস্তবদৃষ্টি—ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমাদের বাস্তবপন্থীর সাহিত্যে আমরা চাই বাস্তবজীবন ও বাস্তবজগতের আসল রূপটি কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে; কিন্তু সেই আসল রূপকে কখনও কি রক্তমাংসের চোখে দেখা যায়? তাহাকে যেটুকু দেখি সেটুকুই দেখি মনে। নিছক চোখে দেখা জিনিষ লইয়া কোনদিন কোন কাব্য-কবিতাই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

যে কথাটি বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই,—রোম্যান্টিকতা যায় নাই বিংশ শতাব্দীতে অন্তরের দৃষ্টি ব্যতীত নিছক চোখের দৃষ্টি একান্ত অসম্ভব; তাই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী যাইতে পারে না; ঠিক তেমনি আদর্শবাদও যায় নাই—যাইতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে একেবারে সাদাচোখে কোন কিছুর দিকে তাকাইবার অধিকারই আর মানুষের নাই। মাথার ভিতরে হাজার রকমের মতবাদ করিতেছে গিস্ গিস্—তাহাদের ঠেলাঠেলির গতিবেগ রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে অসহ্য তাপে,—তথাপি বাহিরের জগতের পানে জীবনের পানে তাকাইব একেবারে সাদা চোখ লইয়া—ইহা চরম মিথ্যা। রোম্যান্টিকতা আছে—সে শুধু ঢং

বদলাইয়াছে। সেই নূতন ঢংকেই আমরা মনে করি নিছক বাস্তববাদ। তেমনি আদর্শবাদও খুবই আছে—শুধু আদর্শ বদলাইয়াছে; সেই রূপান্তরিত আদর্শকে লইয়া যে আদর্শবাদ, তাহাকেই বলিতেছি নিছক বাস্তববাদ।

কিন্তু তর্ক ছাড়িয়া দিতেছি; মোটের উপরে মানিয়া লইতেছি রোমান্টিকবাদ ও বাস্তববাদের তফাৎ এবং মানিয়া লইতেছি রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গীর তফাৎ। সে তফাৎ অনেক খানি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে তফাৎ সত্যিকার কিসের জন্য? আধুনিকেরা আত্ম-পক্ষ সমর্থনে কাব্যতত্ত্বকে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইতে লাগিয়া গিয়াছে, সত্যকার কাব্য কি, সাহিত্য কি, আর্ট কি; এবং সেই নবাবিষ্কৃত সত্যদৃষ্টিতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা এবং আমাদের সবলতা। প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসকে বাদ দিয়া আবার সেই তত্ত্ববুদ্ধির ওকালতি! সত্যিকারের কাব্য কি—তাহার প্রাণ কি হওয়া উচিত—বাহিরের রূপ কি হওয়া উচিত—তাহা কেহ কখনও জানে নাই,—কোন দিন জানিতে পারিবেও না। কারণ, সাহিত্যের ধর্ম্ম প্রাণবেগে গতির ধর্ম্ম। সুদূর অতীত, চলমান বর্ত্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া রহিয়াছে তাহার সমগ্রাকার ধর্ম্ম,—বর্ত্তমানের ভাসমানতার ভিতরে সেই ধর্ম্মের কতটুকু সন্ধান মিলিতে পারে? তাই বিশেষ দেশকালের বন্ধনে বাঁধিয়া যেখানেই আমরা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি সাহিত্যের সমগ্র এবং শাশ্বতরূপের, সেইখানেই আমরা করি ভুল। সাহিত্যের সেই অখণ্ড গতিধর্ম্মের ভিতরে তাহার সকল অংশ—সকল বিশেষ বিশেষ রূপই একটা গভীর ঐক্যসূত্রের ভিতরে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে,—সেখানে তাই কোন অংশই মিথ্যা নহে। সাহিত্যের এই সমগ্রস্বরূপকে আমরা প্রতি দেশে প্রতিযুগে পাইতে চাহিয়াছি বর্ত্তমানের খণ্ডরূপের ভিতর দিয়া। এইখানেই আমাদের ভুল। চলার পথে বর্ত্তমানের যে রূপ তাহা সাহিত্যের সমগ্র স্বরূপের কতটুকু সন্ধান দিতে পারে? অবিরাম আবর্ত্তনের স্রোতবেগে ভাসিয়া উঠিতেছে এই বর্ত্তমান তাহার বিশেষ রূপকে লইয়া,—এমন যে কত, বিশেষরূপ আসিবে এবং যাইবে তাহার কতটুকু আমাদের জানা আছে? কি কি ঐতিহাসিক কারণে, কি কি পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে সাহিত্য কি হইয়া উঠিয়াছে আমরা বড় জোর তাহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে পারি, সেই সম্বন্ধেই কথা বলিতে পারি; কিন্তু চিরন্তন কালের জন্য তাহার কি হওয়া উচিত অনুচিত তাহা বলিতে যাওয়া আমাদের নিষ্ফল স্পর্দ্ধা।

বর্ত্তমান যুগে সত্যই যদি রোমান্টিকবাদের পতন হইয়া বাস্তববাদের জয়জয়কার হইয়া থাকে, তবে তাহা এই কারণে নয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে তথাকথিত বাস্তববাদ রোমান্টিকবাদ অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, তথাকথিত রোমান্টিক কবিতায় আমাদের কিছুদিনের জন্য অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, মনে আসিতেছে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া; সেই তীব্র প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়াছে প্রেয়সীকে আর—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা' না বলিয়া তাহার গায়ের চামড়া কাটিয়া খানিকটা রক্তমাংস দেখাইয়া দিবার প্রবৃত্তির ভিতরে, অথবা প্রেয়সীকে মাঝখানে বসাইয়া তাহার চারিপাশে কয়েকটী বুদ্ধির পাক খাইয়া উঠিবার ভিতরে। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে মনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একদিক হইতে যুক্ত হইতেছে বর্ত্তমান জড়বাদের ক্রম-বিবর্দ্ধমানতার ফলে দেহ-সর্ব্বস্ব দৃষ্টি,—অন্যদিক হইতে আসিয়া যুক্ত হইতেছে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য; এই ত্রয়ের সমাবেশে গঠিত আমাদের বর্ত্তমান কবিতার দেহ-প্রাণ। এই সকল ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারেই চাপা দিয়া রাখিয়া আমরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে ঘিরিয়া দিতেছি শুধু তত্ত্বের জাল। খাঁটি সত্যকথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবিতাকে যেখানে লইয়া গিয়াছেন সেখান হইতে তাহাকে আর ঠেলিয়া উর্দ্ধে তুলিবার আশা কম। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলায় রোমান্টিক কবিতা লিখিতে গেলেই তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই রবীন্দ্রনাথই হইয়া পড়ে। আমরা যতই তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে চাই বিদ্যুতের তারের ন্যায় ততই যেন তাহাতে জড়াইয়া পড়ি। মন উঠিল একটু একটু করিয়া বিদ্রোহী হইয়া, দেখা দিল তীব্র প্রতিক্রিয়া; আর ঠিক সেই সময়েই আসিয়া পড়িল ইংরেজী সাহিত্যের মারফতে সাগরপারের নূতন ঢেউ। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বর্ত্তমান যুগে জীবন-সংগ্রামের রূঢ়তাও রোমান্টিকতার প্রতি আমাদের মনে জাগাইয়া

ফুলিয়াছে একটা অপ্রবৃত্তি। এই সকল কারণে আমরা একধার হইতে সব বনিয়া যাইতে লাগিলাম অসম্ভব রকমের রিয়ালিষ্ট,—আর তার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ছাদে আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম এক রাশ তত্ত্বকথা,—কবিতা হোক, উপন্যাস হোক আর যাহাই হোক, সাহিত্যকে সর্ব্বপ্রথমে হইতে হইবে অবিশ্বাস্য রকমের রিয়ালিষ্টিক!

প্রতিপক্ষের সাহিত্যিকগণই বা কম যোদ্ধা কিসে? তাঁহারাও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন সাহিত্যের আসল তত্ত্ব—এবং গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের তত্ত্বের বনিয়াদ এত সুদৃঢ় যে তাঁহাদেরও আর মৃত্যু নাই,—পক্ষান্তরে মহাকাল আসিয়া তাহার নিষ্ঠুর সম্মার্জ্জনী দ্বারা এই সব চপলমতি বালখিল্য সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট আবর্জ্জনাকে দুই হাতে ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহাদের রাজপথ আবার পরিষ্কার করিয়া দিবে অনতিবিলম্বে। উভয়তঃ চলিতেছে বাগযুদ্ধ—মসীযুদ্ধ—অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে মহাকাল। প্রবীণ পণ্ডিতগণ এই সব চপলমতি ছেলে-ছোকরার দলকে উচ্চমঞ্চ হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাদের উপরে যতই উপদেশামৃত বর্ষণ করুন না কেন, বা নিন্দাবাদের শর নিক্ষেপ করুন না কেন "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"—সুতরাং ছেলে-ছোকরার দল যে 'হরে মুর রে' বলিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে তাহাকে একেবারে থামাইয়া দিবার কাহারও সাধ্য নাই। আমরা হয় ত আমাদের সে অক্ষমতাকে আজ স্বীকার করিব না; কিন্তু সাহিত্যের তত্ত্ববুদ্ধিকে সাহিত্যের সজীব প্রাণ ধারাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়া দিতে পারে আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিবে সেই একই মহাকাল।

বর্ত্তমান কবিতার প্রকৃতির সহিত আকৃতিও বদলাইয়া গিয়াছে অনেকখানি। মিলের বালাই একরকম উঠিয়াই গিয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় মাত্রা, যতি, ছেদ প্রভৃতিরও কোন সুস্পষ্ট রীতি নাই;—কবিতা অধিকাংশই লিখিত গদ্যছন্দে। সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যতত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে,—আমরা বলিতেছি, আমাদের কাব্যবিহারী মন আকাশবিহারী পাখীর মতন,—কড়ায় গণ্ডায় মাপা ছন্দোবদ্ধ তাহার পায়ে সোনার শৃঙ্খল,—ও শৃঙ্খল যত শীঘ্র খুলিয়া ফেলা যায়, কাব্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। সত্যিকারের কাব্য জাগে হৃদয়ের স্বতঃউৎসারণে, তাহাকে বাহিরে অনেকখানি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে গেলেই তাহার ভিতরকার সহজ প্রাণস্পর্শটুকু দুর্লভ হইয়া পড়ে,—তাহার ভিতরে আসে অনেকখানি কৃত্রিমতা। রসের অনুপ্রেরণায় তাহাদের চিত্ত যখন ভরিয়া যায় শ্রাবণ-মেঘের ন্যায় ভাবসম্বেগের প্রাচুর্য্যে, তখন তাহাকে বসিয়া ধনাইয়া বিনাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার অবসর কোথায়? আর আমাদের কাব্য-প্রেরণার ভিতরে আমাদের ভাবগুলি সর্ব্বদা কোন নৈয়ায়িক পন্থায় গুছানো বা ভদ্রভাবে সাজানো থাকে না,—সুতরাং এতখানি সাজানো গুছানো বা ছন্দোবদ্ধ কাব্যের আত্মার ধর্ম্ম নহে,—অনেকখানিই দৈহিক, সুতরাং তাহারা কাব্যের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য্য নহে। আমাদের কাব্যলোকটি সর্ব্বদা আমাদের চেতনলোকের এলাকার মধ্যবর্ত্তী নহে,—সে ছড়াইয়া আছে বেশীর ভাগই আমাদের চেতনের বাহিরে—চেতনের পটভূমি অবচেতন এবং অচেতনে। কাব্যকে আমরা যত বেশী করিয়া সাজাইতে গুছাইতে চাহি, ততখানি তাহাকে লইয়া আসি অবচেতন হইতে চেতনে,—আর এই অবচেতন হইতে চেতনে আনিয়া আমরা অনেকখানি ব্যাহত করি তাহার স্বরূপকে। তাই আধুনিক কবিরা বলেন, কাব্য আমাদের অবচেতনে তাহার যে স্বরূপে অবস্থান করে আমরা বাহিরে যতটা পারি তাহাকে তাহার সেই অব্যাহত এবং অবিকার রূপেই প্রকাশ করিব।

যুক্তিতর্ক লইয়া বিচার করিলে, ইহার বিরুদ্ধেও বলা যাইতে পারে অনেক কথা। কাব্য সেখানেই মিল, ছন্দ, অলঙ্কার-সমন্বিত হইয়া ওঠে, সেইখানেই যে তাহাকে অবচেতনের অন্ধকার লোক হইতে বাহির করিয়া আনিয়া চেতনলোকের স্পষ্ট আলোকে বহুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা হয় এবং তখন আস্তে ধীরে তাহাকে একটু একটু করিয়া ছন্দে, মিলে, অলঙ্কারে সাজাইয়া গুছাইয়া বাহিরে প্রকাশ করা হয় এই কথাটাই মূলতঃ সত্য নহে। উত্তম কাব্যের বেলায় কাব্যের দেহ ও আত্মার ভিতরে থাকে একটা নিগূঢ় অন্বয় যোগ,—শব্দ ও অর্থ থাকে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মতন অভিন্ন হইয়া। অচেতন, অবচেতন এবং চেতনের সমবায়ে গঠিত কবির চিত্তভূমিতে কাব্যের দেহ ও আত্মা গড়িয়া ওঠে একই ধারায়—একই ছন্দে,—আলঙ্কারিকেরা তাই উহাকে বলিয়াছেন, 'অপৃথক্-যত্ন-নির্ব্বর্ত্ত্যঃ'। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'

কবিতাটির ছন্দ ও ঝঙ্কারকে সমগ্র কবিতাটি হইতে কখনও পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। এই কবিতাটি ছন্দ এবং মিল সমন্বিত করিয়া ইহার প্রাণবস্তু কোনও রূপে ব্যাহত হইয়াছে এবং ছন্দ এবং মিল তুলিয়া দিলে এ কবিতাটি আরও ভাল হইতে পারিত, একথা মানিব না।

তারপরে কবিতাকে ছন্দোবন্ধে সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার জন্য যদি একটা সচেতন প্রচেষ্টা থাকেই এবং তাহার ভিতরে যদি একটু কৃত্রিমতাও থাকিয়া যায় তবেই যে কাব্যের ক্ষেত্রে যে একান্ত পরিহার্য্য-এমন কথা বলা যায় না। মানুষের সচেতন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া আসিয়া পড়ে যে কৃত্রিমতা তাহা দ্বারা আমাদের জীবন রহিয়াছে ভরপুর হইয়া,—জীবনের ভিতরে এই বিংশ শতাব্দীর মনও তাহাকে বরদাস্ত করিয়া চলিয়াছে পদে পদে; সুতরাং শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই বা হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলে চলিবে কেন? 'নগ্নবাদ' ব্যবহারিক জীবনে এখন পর্য্যন্তও কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না, এখনও তাহাকে হাজার রকম বিধি-নিষেধের ভিতরে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় সভ্য-জগতের উপকণ্ঠে,—শুধু কাব্যের জগতেই তাহাকে লইয়া মাতামাতি করার সর্থকতা কি? আর যে অনিবার্য্য ভাবসম্বেগের কথা বলি, তাহাও অনেকখানিই বলি তর্কের খাতিরে; কারণ, আধুনিক কবিতার সহিত যাঁহারই একটু পরিচয় আছে তিনিই একথার সাক্ষ্য দিবেন যে, আধুনিক কবিতার হৃদয়ের উপাদান হইতে বুদ্ধির উপাদান কিছু কম নহে। হৃদয়াবেগের যেখানে প্রাধান্য সেখানে ত' কবিতা আর খাঁটি কবিতা হইয়া ওঠে না, সে হইয়া যায় সেকেলে প্যানপেনে 'কাব্য,'—তাই, হৃদয়াবেগের ব্যঞ্জনকে বারংবার বুদ্ধির ঝাল-মশলায় সম্বরা দিয়া লইতে হয়, পদে পদে খোঁচা দিয়া, ঝাঁকুনী দিয়া 'কাব্যে'র ঝিম ভাঙিয়া দিতে হয় এবং বুঝাইতে হয়,—এ জিনিষটা নেহাৎ ই 'কাব্য' নয়,—অন্য কিছু। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, হৃদয়াবেগের মতন বুদ্ধিরও কোন অন্ধ আবেগ নাই; সুতরাং যেখানে বুদ্ধিরই এতখানি চাতুর্য্য এবং প্রাখর্য্য, সেখানে দুর্নিবার আবেগের কথাটা খুব জোরাল হইয়া ওঠে না। নিরন্তর এত বুদ্ধির পাঁচ কষিবার সময় থাকে, শুধু ছন্দ এবং মিল দিবার সময় থাকে না, একথা বলিলেই বা সকলে খুশী মনে শুনিতে চাহিবে কেন?

আসলে কিন্তু আধুনিক কবিতায় সাজান-গুছানোর চেষ্টাটা যে খুবই কম তাহা নহে; তবে সে চেষ্টা প্রাক্-আধুনিক যুগের চেষ্টারই খানিকটা বিপরীত। কিন্তু বিপরীত চেষ্টা ত' আর অচেষ্টা নয়। একদল লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহারা প্রত্যেক কাজের পূর্ব্বেই পাঁজি দেখেন শুভদিন খুঁজিবার জন্য; আর একদল লোক চাহেন এই কুসংস্কারকে দূর করিতে; কিন্তু সেই কুসংস্কারকে দূর করিতে তাঁহারাও যদি দেখেন প্রত্যেক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই পাঁজি, অশুভদিন খুঁজিয়া বাহির করিতে,—তবে সংস্কার বর্জ্জনের চেষ্টা এখানে দেখা দেয় আর একটা সংস্কারের রূপে। বর্ত্তমান যুগেও চলিতেছে মরিয়া হইয়া কবিতার ভিতর হইতে এই কাব্য সংস্কার-বর্জ্জনের চেষ্টা,—আর সেই চেষ্টার ভিতরেই যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে সাজানো-গুছানোরই চেষ্টা।

আধুনিক কাব্যরীতির জীবন-ইতিহাসের গোড়ার কথাটা কিন্তু এই সকল স্বপক্ষীয় যুক্তির ভিতরে নাই,—বিপক্ষীয় যুক্তির সারবত্তার ভিতরেও তাহার আশু বিনাশের কোন ভয় আছে বলিয়া মনে করি না। সোজা ভাবে ধরা যাক আধুনিক কবিতায় প্রচলিত ছন্দ এবং বিশেষ করিয়া মিলের প্রথা বর্জ্জনের কথা। আমার মনে হয়, সে সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, আমরা বহু দিন—বহু শতাব্দী ধরিয়া কবিতায় নিখুঁত ছন্দ করিয়াছি—একেবারে নিক্তিতে ওজন করা মাত্রা-মাপা ছন্দ; বহুদিন ধরিয়া দিয়াছি মিল; তাহার অস্তিত্বের পশ্চাতে যত প্রকাণ্ড তত্ত্বই থাক না কেন, আজ যেন তাহা আর ভাল লাগিতেছে না। কাব্যের ক্ষেত্রে এই ভাল-লাগা না-লাগাটাই সব চেয়ে বড় কথা, এই জন্যই মনে হয় আধুনিক যে কাব্যরীতি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সেও সত্য,—সে নিছক ব্যভিচার নহে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল নিখুঁত ছন্দ,—নিখুঁত মিল দিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার কাব্য-রচনায় ছন্দ ও মিলের সৌকর্য্য যেন লাভ করিয়াছে একটা চরম পরিণতি। সেই পরিণতির পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই খুঁজিতেছিলেন বৈচিত্র্য,—মুক্তক ছন্দের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া তিনি নিজেই আসিয়া পৌঁছিলেন গদ্য-কবিতায়। আর গদ্য-কবিতাকে এমনভাবে বাংলা-সাহিত্যে প্রচার করিবার সাহস অনেকখানি তিনি নিজেই দিয়াছেন আধুনিক

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদিগকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য-জীবনেই এই কাব্যরীতির পরিবর্তনের কারণ তাঁহার তত্ত্ব-বুদ্ধির পরিবর্তন নহে,—ওটা যেন অনেকখানি নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া—বৈচিত্র্যের এবং নূতনত্বের চাহিদায় তাহার জন্ম। এই যে আধুনিক কবিতায় হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য, অথবা হৃদয়-বৃত্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া পরিবেশনের চেষ্টা ইহার পশ্চাতেও রহিয়াছে ঐতিহাসিক কারণ। ইয়োরোপে রোম্যান্টিকবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল অনেকখানি বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়, আবার সেই বুদ্ধিবাদের প্রধান্য জাগিয়া উঠিতেছে রোম্যান্টিকবাদের বিরুদ্ধে আমাদের মনের প্রতিক্রিয়ায়। বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত রোম্যান্টিক সুরের মোহে আমাদের মন যেন আসিতেছিল ঝিমাইয়া,—আধুনিক কবিতা বুদ্ধির ধাক্কা দিয়া দিয়া আবার চেষ্টা করিতেছে আমাদের মনকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য। আর সেই বুদ্ধির ধাক্কার জন্যে প্রয়োজনও ছিল বর্ত্তমান কবিতার আধুনিক রীতির। কিন্তু ললিতছন্দ বা নিখুঁত মিল যে একেবারেই কবিতার জগৎ হইতে বিদায় লইল, একথা মনে করায় আমাদের সাময়িক আত্ম-প্রসাদ লাভ আছে, কিন্তু সত্য বেশী নাই। আবার হয় ত আসিবে সুনিপুণ ছন্দ, সুকুমার মিল,—সেদিন আস্তে আস্তে আমাদের বুদ্ধির ধাক্কাও যাইবে আবার একটু একটু করিয়া ফিরিয়া,—ঐ ছন্দ এবং মিল, কবিতার ঐ কমনীয় লাস্য-বিলাস তাহার ভিতরেই আমরা হয় ত আবার সন্ধান পাইব গভীর তত্ত্বের।

আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার প্রয়োজনীয়তাকে একটুকুও লঘু করিতে চাহিতেছি না, অথবা এমন কথাও বলিতে চাহি না যে, বিভিন্ন যুগের পরিবর্ত্তনশীল সাহিত্যাদর্শের গণ্ডীর ভিতর দিয়া সাহিত্যের সাধারণ স্বরূপ বলিয়া কোন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের তত্ত্বালোচনা অতীত এবং বর্ত্তমান সাহিত্যকে বুঝিতে আমাদিগকে যতখানি সাহায্য করে, ভবিষ্যৎ সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে ঠিক ততখানি সাহায্য করে না। ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলে একটা সতেজ প্রাণ-ধর্ম্ম—বুদ্ধির দ্বারা সেই প্রাণধর্ম্মকে বুঝিতে যাওয়া যত সহজ, তাহাকে প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করা তত সহজ নহে,—নিরাপদও নহে। সাহিত্যের এই প্রাণধর্ম্মের পশ্চাতে রহিয়াছে এক বিরাট ইতিহাসের পটভূমি; সেই পটভূমি হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের প্রাণধর্ম্মের উপরে অনেকটা করা হয় অবিচার। প্রাণের উপরে বুদ্ধির অভিভাবকত্ব দরকার এ কথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকার্য্য; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণপ্রবাহের গতিকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারে না; সে প্রবাহকে সৃষ্টিও করিতে পারে না। এই জন্যই প্রতিভা জিনিষটিকে আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমাদের আলঙ্কারিক জগন্নাথ বলিয়াছেন, "কাব্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ কবি-প্রতিভা,—"তস্য চ কারণং কবিগতা প্রতিভা।" আর এই প্রতিভার লক্ষণ "অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা।"

সাহিত্যের আত্মা অবিনাশী হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের দেহ-প্রাণ-মন যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। আর একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, সাধারণতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আমাদের কলহ-বিবাদ তাহা সাহিত্যের আত্মা লইয়া ততখানি নয়, যতখানি সাহিত্যের দেহ-প্রাণ ও মন লইয়া। আত্মার ইতিহাস চিরন্তন কালের হইতে পারে, (অথচ এত যুগ ধরিয়া সাহিত্যের এই আত্ম-স্বরূপের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণও এখন পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই), কিন্তু দেহ-প্রাণ ও মনের ইতিহাস জড়িত থাকে দেশ-কালের ইতিহাসের সঙ্গে, সেই দেশ-কালের সহিত জড়িত যে বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস-ধারা তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া শুধু তত্ত্বকথার দ্বারা সাহিত্যের সহিত আন্তরিক পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা কোন দিনই সফলকাম হইব না।

হাটের পথে

শিল্পী—শ্রী মতি মজুমদার
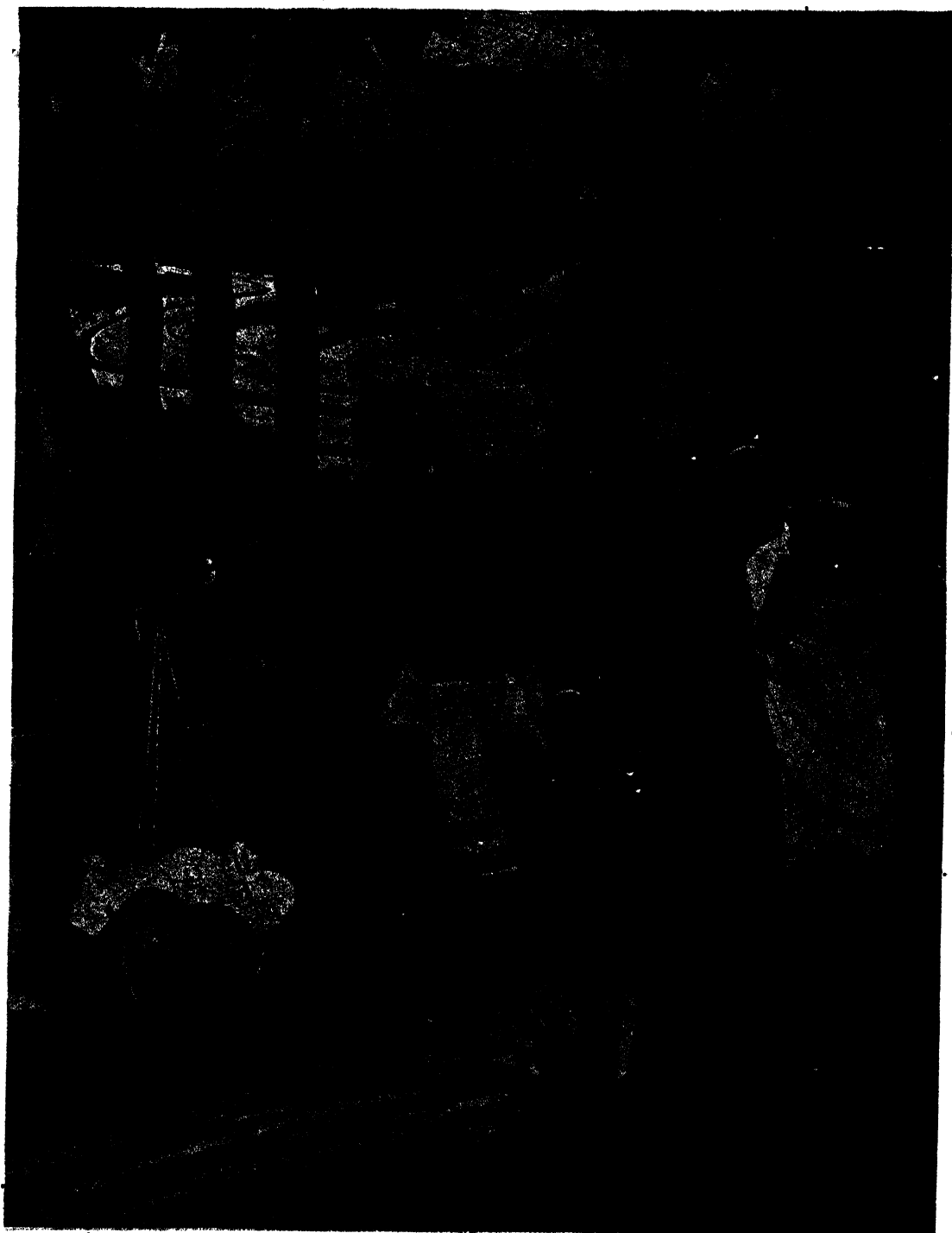
"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

দশম বর্ষ } অগ্রহায়ণ—১৩৪৯ { ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

পদাবলী-সাহিত্য

শ্রীকালিদাস রায়

প্রেম-লীলার গান বলিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে যাঁহারা লালসা সাহিত্য মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৈষ্ণব-পদাবলী আগাগোড়া বেদনারই কাহিনী। পূর্ব্বরাগ হইতে মাথুর পর্য্যন্ত সমস্তই বেদনার গভীর রঙ্গে অনুরঞ্জিত।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধার প্রাণে সোয়াথ (স্বস্তি) নাই। তাহার মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন। "বিরতি আহারে রাঙা বাস যেমতি যোগিনী পারা।"

"মন্দাকিনী পারা কতশত ধারা ও দুটি নয়নে বহে।"

"মরমিহ শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ অরবিন্দ।"

"ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচননিন্দ।"

"অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈগেল ধুস্তুর তুল।"

"অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।"

"জাগর দূরে রহু স্বপনহি রোখ।"

"মন্দির গহন দহন ভেলা চন্দনা।"

"হিয়ার ভিতরে লোটায়া লোটায়া
কাতরে পরাণ কান্দে।"

"খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহু মন ঝুরে।"

"উড়ু উড়ু আনচান ধকধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে।"

"কালার ভরমে কেশ কোলে করি কালা কালা করি কান্দি।
কেশ আউ লাইআ বেশ বনাইতে হাত নাহি সরে বান্ধি।"

এই সমস্ত কথা গভীর বেদনারই অভিব্যক্তি। রাধার অন্তরে এই যে আগুন জ্বলিল—এই আগুন একদিনের জন্যও নিভে নাই।

শ্রীকৃষ্ণের দশাও তথৈবচ। যে রূপকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত লালসার গান তাহাও বেদনায় মলিন হইয়া গেল।

শ্রীমতী কৃষ্ণ-প্রেম প্রাণে পোষণ করিয়া চির দুঃখকেই বরণ করিলেন।

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।"

"জল নহে হিমে তনু কাঁপাইছে সব জনু
প্রতি অণু শীতল করিয়া।"

"অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর।"

"শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।"

যদি বা শ্যামের বাঁশরী রাগপীড়িতাকে রাধা রাধা বলিয়া আহ্বান করিল শ্রীমতী কি করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিবেন? শ্রীমতীর আকিঞ্চন—

হাম অতি দুঃখিত তাপিত তাহে পরবশ
তাহে গুরু গঞ্জন বোল।
গৃহের মাঝারে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে হিউ উতরোল।

পরিজন গুরুজন মিলনের বাধা। তাহাদের তর্জ্জন-শাসন মাথার উপরে,

"দুরুজন নয়ন প্রহরী চারি দিকে।"

"আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥"

"বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জলন্ত আগুনি॥"

"শাণানো ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥"

"অসুখন গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।"

একদিকে কুলশীল অন্যদিকে কালা। শ্রীমতী—

"এ কূল ও কূল দু'কূল চাহিতে পড়িল বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ দেখিয়া পরাণ কাঁদে।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"ক্ষুরের উপর রাধার বসতি।" এই রাধার জীবনে লালসার ঠাঁই কোথা? তারপর কলঙ্কের জ্বালা।

"গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কিনা বোলে।
লোক ভয় লাগিয়া যে ডরে প্রাণ হালে॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে।"

"জগভগি কলঙ্ক" রহিয়া গেল। পাপিয়া পাড়ার লোকে ঠারাঠারি করিতে লাগিল।

"পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে" স্বপ্নেই তাহাকে পাওয়া যায়—সত্য সত্য রক্ত-মাংসের দেহে-ত তাহার সহিত মিলন হয় না। কুলবতী রমণী কি করিয়া মিলন সুখ লাভ করিবে? "একে হাম পরাধীনা তাহে কুল-কামিনী ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তাই "গুরুজন-নয়ন-সকণ্টক বাটে" অভিসার। এই অভিসারে প্রকৃতির বাধাও কম নয়। আকাশের চাঁদও বাধা।

"তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ পশারল কিরণক দামা।"

"হিমকর কিরণে গমন অবরোধল কী ফল চলতহুঁ গেহ।"

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে পথঘাট নির্জ্জন বটে, কিন্তু তখনও প্রকৃতির বাধা কম নয়।

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু তুলীক পুতলী জনু
হেরি সখী করত পরিতাপ॥

বর্ষা-রজনী প্রিয়-সঙ্গ ছাড়া কি করিয়া কাটে?

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

"হৃদয়ে দামিনি ঘন ঝনঝনি পরাণ মাঝারে হানে।"

পঙ্কিল-পিচ্ছিল বাটে—কঠিন কবাট ঠেলিয়া অভিসারে যাইতে হয়। সে বাট কি ভয়ঙ্কর! 'ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পাত শত আর কত বিঘিনি বিথার।'

বর্ষার দুর্দ্দিনে রাধার দুর্গতির অবধি নাই। তাহার উপর শ্যামের জন্য রাধার উদ্বেগের সীমা নাই।

"আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
তরল জলধর বরিষে ঝরঝর
গরজে ঘনঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরয়ই মোর।

অভিসারে গিয়াও দয়িতকে পাওয়া যাইবে এবিষয়েও স্থিরতা নাই। ইহা ছাড়া প্রতীক্ষার বেদনা আছে।

"পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।"

পৌষলি রজনীতে লোকে আপন গৃহে রহিয়াই কাঁপিতেছে। তেমন রজনীতে অভিসারে আসিয়াও কানুর দেখা নাই।

"না দেখিয়া উঁহি বর নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারি।
আয়লু কুলবতি চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥"

"ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে মন জীবন
উঠি বসি রজনী গোঙাই।"

দারুণ প্রতীক্ষায় 'সুদীঘল রাতি'র মুহূর্ত্তগুলিকে শ্রীমতীর এক একটি কল্প বলিয়া মনে হয়—অশ্রুতে তল্প ভাসিয়া যায়।

'চৌরি পীরিতি' যতই মধুর হউক, তাহার পক্ষে মিলন দুর্লভ।—বিরহেরই প্রাধান্য ইহাতে। এই বিরহ-বেদনার গানই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অঙ্গ।

১। যাহে বিনু সপনে আন নাহি দেখিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।

২। নব কিসলয় দলে শুতলি নারি।
বিষম কুসুম শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধয়ে তুয়া দরশন লাগি॥

৩। কবহুঁ রসিক সনে দরশ হোয় জনি
দরশনে হয় জনি লেহ।
নেহ বিচ্ছেদ জনি কাঁহুকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥

৪। অগোর চন্দন তনু অনুলেপন
কো কহে শীতল চন্দা।
পিয় বিনু সোপুন আনল বরিখয়ে
বিপদে চিনিয়ে ভাল মন্দা॥

৫। অঙ্গুলক আঙ্গুটি সে ভেল বাউটি
হার ভেল অতিভার।
মনমথ বাণহি অন্তরে জরজর
সহই না পারিয়ে আর॥

এইভাবে বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমতীর বিরহ-বেদনার বর্ণনা করিয়াছেন—নিম্নে তাঁহাদের রচনার একটী সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া দেওয়া হইল সখীদের জবানীতে—

শ্যাম বুঝি শেষে পাতকী হইবে নারী হত্যার পাপে।
ননীর পুতলি পিয়ারী আজিকে গলিল বিরহ তাপে।
দীঘল নিশাসে মুখপঙ্কজ শ্যামর হইয়া ঢুলে।
অঙ্গুরী আজি বলয় হইয়া অঙ্গুলী হ'তে খুলে।
বড় গুরুভার লাগে পিয়ারীর মুক্তা ফলের মালা।
অম্বর তার খসিয়া পড়িছে নাহি সম্বরে বালা।
গহন বিরহ দহনে দহিয়া মুহু মুহু মুরছায়।
তোমার নামটি কর্ণে জপিলে তবে সে চেতনা পায়।
নির্জ্জন পেলে তরুণ তমালে মোহে আঁকড়িয়া চুমে।
চারিধার তার হয়েছে আঁধার মনোজের ধূপধূমে।
নীল অম্বর সহিতে পারে না তব স্মৃতি মনে জাগে।
অরুণাম্বরে ও তনু ঢেকেছে যোগিনীর মত লাগে।
ঝর ঝর করি বারিধারা চোখে কাজর গলায়ে ঝরে।
তাহার সহিত নয়নের নীদ সারা নিশি গ'লে পড়ে।
নব জলধর গগনে উদিলে এমন করিয়া চায়,
মনে হয় যেন দীঘল নিশাসে উড়াইয়া দিবে তায়।
হে শ্যাম জলদ, তোমার আশায় রোপিয়া প্রেমের তরু,
নয়নের জলে বাঁচায়ে রেখেছে সখীর জীবন মরু।
বাঁধুলী অধর ধুতুরা হইল বিরহের বেদনায়,
বংশী তোমায় দংশিয়া প্রাণে কি বিষে জারিল তায়।
খই হয়ে ফুটে মুকুতার হার বক্ষের তাপে জ্বলে
কনক ভূষণ সোনার অঙ্গে মিশে যায় গ'লে গ'লে।
কবরী এলায়ে কালো কেশপাশ বক্ষের পরে দোলে
কক্ষে চাপিয়া সেই কেশপাশ ক্ষণিক বেদনা ভোলে।
নবমী দশায় এসেছে পিয়ারী হয়ো না স্ত্রী-বধ-পাপী
তোমার বিরহে হয়ে পতঙ্গী শিখা পরে মরে কাঁপি।
চরণ নখরে মাটির উপরে কি যেন লিখিছে রাই
যত তত তারে জিজ্ঞাসা করো কোন উত্তর নাই।
জ্বলে দাবানল সারাতনু ভরি পুড়ে সবি তারি আঁচে
মর্ম্ম কুহরে আশার বাঁধনে প্রাণ-মৃগ বাঁধা আছে।
জ্বালা না জুড়ায় তালবৃন্তের ব্যজনের পরিমলে।
ধূমকুণ্ডলী ভেদি হুতাশন তায় আরো উঠে জ্বলে।
শিথিল হয়েছে আমার সখীর শিরীষ-পেলব তনু
অলিসম তালে দলিত করেছে নির্দ্দয় ফুলধনু।
দরদী বসন তেয়াগি বিলাস ছাড়িয়া সখীর বুক
করিছে ব্যজন ঘুচায় ঘর্ম্ম মুচায় তাহার মুখ।
তোমার ধেয়ানে সোনার বরণ তোমারি মতন কালা
লজ্জার সাথে সজ্জা দহেছে আজিকে বিরহ-জ্বালা।
সে যে হিমকরে হেরি অম্বরে প্রলাপ বকিতে রহে।
তুলাখানি তার নাসায় ধরিলে বুঝা যায় শ্বাস বহে।
কিসলয় সাজ ঝলসিয়া যায় আর কি অধিক কব ?
ঝলে তার তনু-কনক-মুকুরে শতেক বিম্ব তব।

বিরহের সঙ্গে অনুতাপ ও আত্মধিক্কারের বেদনা আছে। লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমতী যাহার জন্য কলঙ্কের ডালা মাথায় লইলেন সে যদি উপেক্ষা করে তবে সে বেদনা রাখিবার স্থান নাই। অভিমানিনী রাধা শ্যামের সামান্য উপেক্ষাও সহিতে পারিতেন না। রাধা ত চন্দ্রাবলীর মত চিরদক্ষিণা নহেন—রুক্মিণীর মত স্বল্পে তুষ্টা নহেন। রাধা ভূমার দাবি করিতেন। স্বল্পে কেন তিনি তুষ্ট হইবেন ? তাই ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অভিমান হইত। তাঁহার প্রেমের গতি ছিল, "আহেরিব" সর্পের মত বক্রগতি ধরিয়া তাঁহার প্রেম ধাবিত হইত। ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার মনে হইত ধূর্ত্তনট শ্যামনটবর বুঝি তাহাকে ভুলিয়া গেল। এই চিন্তায় রাধার বিরহবেদনা

দ্বিগুণিত হইত। তখন রাধার অনুতপ্ত আক্ষেপ শত শিখায় ও শাখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

১। কাঞ্চন কুসুম জ্যোতি পরকাশ
রতন ফলিবে বলি বাচায়ল আশ।
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার।
ফলে কিছু না দেখিএ ঝনঝনি সার।

২। কাঠকঠিন কয়ল মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিষে পুরাইল উপরে দুধক পুর॥

৩। যত্ন করি রূপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সেঁচি আঁখিজল।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া বিরিখে বিষ ফল।

৪। শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ আনল তাপে পাষাণ সে গলে।

৫। সোনার গাগরী বিষজল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিলুঁ আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে।
নীর-লোভে মৃগী পিয়াসে যাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে
বঁড়শী লাগিল মুখে।

৬। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

৭। জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায়॥

শ্রীমতী বলিতেছেন—একে কাল হৈল মোর নহলি যৌবন। —শুধু যৌবন নয়, বৃন্দাবন, যমুনার জল, কদম্বের তল, রতনভূষণ, গিরিগোবর্দ্ধন, সবই কাল হইল শ্রীমতীর।

এ সব ত গেল অভিমানের বাণী। রাধার পক্ষ হইতে দৈন্যঘন করুণ আবেদনও আছে—

১। রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিকরুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

২। এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণবন্ধু জান মোর মন।

৩। মোর দিব্য লাগে বঁধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদ মুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে।

শ্রীমতী বলেন—

"লোকভয়ে কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।"

"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি।"

ব্যথিতা শ্রীমতী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়াছেন—

কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে।
কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।

শ্রীমতী ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারেন না—

১। এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তবুও দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ।

২। কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের এক ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা।
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সঙ্গ।

কিন্তু পাসরিলে না যায় পাসরা।

কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি বদনে না বলি কালা।
তবুও সে কালা অন্তরে ভাসয়ে কালা কৈল জপমালা।

মধুর মিলনের স্মৃতির বেদনাই কি কম দারুণ।

১। হাসিয়া পাঁজর কাটা কৈয়াছে কথাখানি
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।

২। নিরবধি বুকে থুইয়া চায় চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে।

৩। পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখে হেরল
তিলেক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেমপাশে তনু তনু গাথল
অব তেজল মোর সঙ্গ।

সঙ্কেতস্থানে গিয়া কানুর প্রতীক্ষায় শ্রীমতীর মনে নৈরাশ্যে

বেদনার সঙ্গে যে সংশয়ের বেদনা জাগিতেছে—তাহা আরও সাংঘাতিক।

বন্ধুরে লইয়া কোলে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর,
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া দিল
আমারে পেলিয়া দিগন্তর।
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাইনু গো
সকল বিফল ভেল মোর।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোন্?

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন ও অন্যান্য নিদর্শন দর্শনে শ্রীমতীর সংশয় সত্য বলিয়াই স্থির হইল।

দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহল রতিচিহ্ন হেরি প্রতি অঙ্গে।
চম্পাতি পৈড় কপুর যব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে।

শ্রীমতী বুঝিলেন—আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া। তারপর খণ্ডিতার বেদনা—ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্। ইহা শ্রীমতীর নারীমর্য্যাদায় দারুণ আঘাত।—ইহার বেদনা অপরিসীম। দারুণ বেদনায় শ্রীমতী বলিলেন—"দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"বলিলা কেমনে? চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে।" ইহার পর মান। স্বখাত হইলেও মান ব্যবধান। এই ব্যবধানের বিরহ দেশকালগত সাধারণ বিরহের চেয়েও দারুণতর। মানে বসিয়া শ্রীমতী শ্যামকে যে দণ্ড দিলেন—তাহার চেয়ে শতগুণ দণ্ড দিলেন নিজেকে। মানের গানও বিরহেরই গান—তাই বেদনাঘন। অভিমানের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যভিমান। তাহার ফলে কলহান্তরিতার বেদনা। মানভুজঙ্গের দংশনের জ্বালাও কম নয়।

"কবলে কবলে জিউ জরি যায় তায়।"

শ্রীমতী হাহাকার করিতেছেন—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঁচায়ই প্রেম করই জনি মান।
সজনি কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু নিদগধ মাধব
রোখে বিমুখী ভৈগেল।
গিরিধর নাহ কানু ধরি সাধল
হাম নহি পালটি নেহারী।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি।

শ্রীমতী আর বেদনা সহিতে পারেন না। তিনি সংকল্প করিলেন, "সো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দীবিষ-হ্রদ-নীরে।"

তারপর মানান্তে মিলন অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু এই মিলনের গান উল্লাসরসে উচ্ছ্বসিত হয় নাই। কারণ, মানের ছায়া এ মিলনের উপর হইতে একেবারে অপসারিত হয় না। With some pain fraught থাকিয়া যায়। তাই রাধা-মোহন ঠাকুর এ মিলনকে বলিয়াছেন—চরবণ তপিত কুশারি। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ।

মানান্ত মিলনের কথা ছাড়িয়া দিই। সহজ মিলনেই বা সুখ কই?

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিনি ঘটাওল
হেরইতে ঝায়রে নয়ান।
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈসে হেরব মুখ চাই।
তাহে গুরু দুরুজন লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার।

তারপর প্রেমবৈচিত্ত্য আছে—মিলনের মধ্যে তাহা হাহাকারের সৃষ্টি করে। ভুজপাশে থাকিয়াও রাধা—

"বিলাপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান।"
"আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি।"

মিলনে বিচ্ছেদের ভয় মিলনের বাহুপাশ শিথিল করিয়া দেয়—হারাই হারাই ভাব। মিলনের মাধুর্য্য—অশ্রুজল লবণাক্ত হইয়া যায়।

"প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ভয়ে।"
"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

চরমপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মিলনেও তৃপ্তি নাই।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

বর্ত্তমান যুগে কবির ভাষায়—

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়াপরি হিয়া না জুড়ায়।
মলয়জ চুয়াচীর ব্যবধানে সে অধীর প্রাণ পুড়ে যায়।
নিমেষ অন্তর হলে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে।
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পরিণত হয় হাহাকারে।
মিলনে কোথায় স্বস্তি তৃষানলে মজ্জাঅস্থি পুড়ে হয় ছাই।
ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয় গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয়—হারাই হারাই।
এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে।
চুম্বনের সুধা তার লবণাক্ত হয়ে যায় নয়নের জলে।
হাসিতে হাসি না আসে কামনা পলায় ত্রাসে ছিঁড়ে ফুলহার।
ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জ্বলি উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম ব্যথায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহ্য জ্বালায়
উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি সখীরা পলায়।
শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্ট নাম জপ এ গভীর প্রেমে।
ধনুতে জুড়িয়া শর, অতনু পানিতে স্মর রয়ে যায় থেমে।
বিরহ নিদাঘ শেষে মিলন বরষা এসে কাঁদায় কাঁদিয়া।
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মাথুর বেদনার কথা আর বলিলাম না। বেদনার সব নদীধারা যে মহাব্যথাসিন্ধুতে মিশিয়াছে তাহার কথা না বলাই ভাল। ইহাই বৈষ্ণব কবিতা।

বেদনার কালিন্দী-মূলে যে নিত্যলীলা—তাহারই সাহিত্য এই বৈষ্ণব সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে লালসার গীতি যে নাই তাহা নয়, কিন্তু সেগুলি যেন বিরহকেই গভীর করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে একটা প্রত্যন্তান্তর (another extreme) সৃষ্টির জন্য। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। বিদ্যাপতির রচনাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের বাহিরে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদির রচনায় কিছু কিছু লালসার জ্বালা আছে। অন্যদিকে তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে যৌন-বোধ-স্পর্শশূন্য করা হইয়াছে। লোচনদাস বলিয়াছেন—আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—প্রথমে নয়নের রাগে অনুরাগের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে কিন্তু অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। "যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত" বাড়িতে বাড়িতে সে প্রেম অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করিল। তারপর সে যে রমণ এবং আমি যে রমণী এ দ্বৈতভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এমন কি বিদ্যাপতি পর্য্যন্ত রাধার প্রেমকে শেষ পর্য্যন্ত নির্লালস করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

"অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই।
...আপন বিরহে আপন তনু জর জর জীবইতে ভেল সন্দেহা।"

তারপর ভাবসম্মিলনের পদে এই কবিগণই লৌকিক প্রেমের প্রাকৃতরূপ একেবারে হরণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট—যতটা তাহার প্রধান অঙ্গ তাহা কামনার গান নয়—অনুরাগের বেদনারই গান।

নারী-জন্ম

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, এম্-এ

গ্রামের নাম যোগিনীপুর। অতি প্রাচীনকালে এখানে এক যোগিনী-সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন। তাঁর এমনই প্রভাব ছিল যে, একদিন পুকুরে নেমে জলপান করবার সময় একটা সিঙ্গীমাছ তাঁর হাতে বিঁধে দেয়, আর অমনি তিনি অঙ্গুলি পুকুরেই নিক্ষেপ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার সিঙ্গীমাছ খই ছিটকান হ'য়ে পুকুরের জলের উপর ভেসে ওঠে। তিনি আবার প্রতি অমাবস্যায় মায়ের পূজা করতেন, আর ভোগের প্রসাদ মায়ের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে খেতেন, মা ঈষৎ হেসে তাঁকেই বেশী অংশ দিতেন। এই গ্রাম ব্যতীত আশ-পাশের অনেক গ্রামে তাঁর বহু বিচিত্র কাহিনী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথোপকথনের উপাদান হ'য়ে আছে। গ্রামের ঈশান কোণে যে জোড়াবেলগাছ-ওয়ালা প'ড়ো মন্দির, এইখানেই ছিল তাঁর আস্তানা। তিনি কত যুগ আগে এই মন্দিরে বাস করতেন, কে জানে! কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে গ্রামের লোকেরা বেলগাছের তলায় ধপ্ধপে কাপড় পরা এক মহাপুরুষকে স্বচক্ষে দেখেছে, তিনি সর্ব্বদাই হাতে পইতে জড়িয়ে কী যেন আউড়ে যান। ভয়ে গ্রামের লোক রাত্রে সে-দিক্ দিয়ে চলা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গ্রামের টোলের অধ্যাপক গিরিজানাথ এই মহাপুরুষের একমাত্র বংশধর। অধ্যাপক হিসাবে গিরিজানাথের বেশ খ্যাতি আছে। ছোট্ট টোল, ছাত্র গুটিকতক, একান্তে নির্ব্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে গিরিজানাথ ছাত্রদের সঙ্গে কাব্য, স্মৃতি, দর্শনের আলোচনা ক'রে কাল অতিবাহিত করেন। গিরিজানাথের স্ত্রী হৈমবতী সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিনী, টোলের সমস্ত ছেলেগুলিকে জননীর স্নেহে লালন-পালন করে। আট বছরের মেয়ে কল্যাণী গৃহীযুগলের একমাত্র সন্তান। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শিক্ষিতা স্ত্রী হৈমবতীর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা, স্নেহের কন্যা কল্যাণীর আদর-আপ্যায়ন, এই সমস্তর ভিতর দিয়ে গিরিজানাথের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটছিল।

অভাব বলতে কিছুই ছিল না—না সংসারের দিকে, না বাইরের দিকে। প্রয়োজন ছিল সীমাবদ্ধ, আয়োজন অল্প হলেই কাজ মিটত। টোলের ছেলেরাও এই আদর্শ গৃহী গৃহিণীর কার্য্যকলাপে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত হ'ত। কাব্যের ছেলেরা সরস ভাষায় বলত, স্বয়ং গিরিজানাথের অধ্যাপনা করবার প্রবৃত্তি হ'ল, কাজে কাজেই হৈমবতী পাচিকাবেশে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। ব্যাকরণের ছেলেরা বিরক্ত হ'য়ে বলত, গিরিজানাথের পাশে শিক্ষিকার আসা উচিত ছিল, হৈমবতী কেন? দর্শনের ছেলেরা মৃদু মৃদু হাস্য করত।

এক বছর যেতে না যেতেই হৈমবতীকে তার নিজ হাতে গড়া সুখের নীড় হ'তে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হ'ল। কালের বিধানই বুঝি এই রকম কঠোর বিদ্রূপাত্মক। যেখানে মানুষ দুঃখকষ্টের বহু আবর্জ্জনা ঠেলে, একটা সুখের আবেষ্টনী তৈরী করে, সেইখানেই কাল-দমকা হাওয়ায় মাকড়সার জাল ছেঁড়ার মত, তার কঠোর কণ্টকময় লৌহ গদা ঘুরিয়ে সমস্ত ছারখার ক'রে দেয়। যখন গিরিজানাথের ছোট ডিঙ্গী ঢেউয়ের দোলায় নেচে নেচে কূলে ভেড়বার জোগাড় করছে, ঠিক সেই সময়ে তার হাল ভেঙ্গে গেল। হৈমবতীর প্রয়াণে উদাসী নির্ব্বিকার গিরিজানাথের সুখের সংসার সকল দিক্ থেকে লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে গেল।

টোলের ছেলেরা অনেকেই বাড়ী চলে গেল। দুই একজন অধিক বয়স্ক ছেলে নিজেরা রান্নাবান্না ক'রে খেতে লাগল। কন্যা কল্যাণী পথে ঘাটে লুটিয়ে বেড়াতে লাগল। কে তার খোঁজ রাখে?

গভীর রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ, গিরিজানাথ তখনও প্রদীপ জ্বেলে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত। নিবাত নিষ্কম্প দীপের শিখার মত—তাঁর চিত্ত নিশ্চল নিস্তরঙ্গভাবে, শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বের ভিতর আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'য়েছে। সেই সময় কন্যা কল্যাণী উঠানের একপ্রান্তে একটা পেয়ারা গাছের তলায় আঁচল বিছিয়ে ধুলার উপর প'ড়ে আছে। সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ কে যেন তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল—মা, কত রাত পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় প'ড়ে থাকবি—অসুখ করবে যে! কল্যাণী ধড়মড় ক'রে উঠে বিছানায় শুতে গেল। হয় ত তার

সারারাত উপবাসেই কেটে গেল—কে তার খবর নেয়? গিরিজানাথও মাঝে মাঝে শোনে কে যেন পিছন থেকে বলছে, 'অত রাত জাগা কি ভাল? শরীর ভেঙ্গে যাবে যে।' গিরিজানাথ ছটফট করে উঠে পড়েন, কাকেও কোথাও দেখতে পান না।

এইরকম ছন্নছাড়া ভাবে গিরিজানাথের দিন কাটতে লাগল। তাঁর বীতরাগ জীবনের পথে কণ্টক হ'ল কল্যাণী। গিরিজানাথ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সামান্য একটু পরামর্শ ক'রে তাঁরই টোলের ছাত্র নির্ম্মলেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ দিয়ে গৌরীদান ক্রিয়া সমাপ্ত করলেন।

বংশপর্য্যায়ে নির্ম্মলেশের স্থান খুব উচ্চ। কিন্তু বুদ্ধির বেদীর অনেকখানা তার এখনও অন্ধকার হ'য়েই আছে। বয়স প্রায় একুশ। সে গিরিজানাথের টোলে পাঁচ বছর ধ'রে অধ্যয়ন করছে, কিন্তু এখনও বাইরের চন্দ্র-সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি তার অন্তরের ঘন স্থূলতার যবনিকা ভেদ ক'রে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় নি।

হৈমবতীর বিদ্যমান অবস্থায় টোলটা একটা আনন্দের মেলা ছিল; দূর দূরান্তর হ'তে ছেলেরা হৈমবতীর আদর যত্ন পাবার লোভে গিরিজানাথের টোলে এসে ভিড় জমাত। শিশু কল্যাণী ছিল তাদের সকলের আনন্দের উপাদান। তার সরল, স্নিগ্ধ, সহিষ্ণু ব্যবহার ছাত্রদের সকলের প্রাণেই আনন্দের সৃষ্টি করত। ছেলেরা পড়ত আর কল্যাণী শান্ত সংযত ভাবে একপাশে চুপ করে বসে থাকত। গুরুর অবর্ত্তমানে ছেলেরা কল্যাণীকে গুরু কল্পনা করে কত কঠোর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কল্যাণী খিল খিল ক'রে হাসত। তাদের নিজহাতে মানুষ করা কল্যাণীকে স্ত্রীরূপে পেতে নির্ম্মলেশের বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা হ'ল না।

বিবাহ-ব্যাপার অনাড়ম্বরেই নিষ্পন্ন হ'ল। কল্যাণী মৌন ম্লান মুখ জলভরা চোখ নিয়ে বাবার দিকে তাকাল—গিরিজানাথ পাথরের মূর্ত্তির মত একধারে নিষ্পন্দ হয়েই বসেছিলেন—তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরল না।

কল্যাণী শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। হৈমবতীর মৃত্যুতে আর কল্যাণীর বিয়োগে সমস্ত বাড়ীটা যেন হাঁ করে গিলতে এল।

বন্ধু বান্ধবেরা পরামর্শ দিয়ে গিরিজানাথকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে সম্মত করাল। গিরিজানাথ সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে—বিশেষতঃ টোলের কিশোর বালকদের একমুষ্টি অন্ন কে যোগায়—এই চিন্তা করে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

গিরিজানাথের শ্বশুর জাহ্নবীনন্দন রাজসরকারের বিশিষ্ট খেতাবধারী কর্ম্মচারী। শুধু কুলমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য ক'রেই তাঁর একমাত্র স্নেহের দুলালী সরযূকে গিরিজানাথের হাতে সমর্পণ করে দিলেন। তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৌরীদানের বিশেষ তোয়াক্কা রাখেন না। বিবাহের সময় সরযূর বয়স তেরো বৎসর ছিল। সরযূর স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, গঠন সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করল। অষ্টমঙ্গলার পরদিন সরযূ পিত্রালয়ে ফিরে গেল—গিরিজানাথও সঙ্গে গেলেন।

হৈমবতীর মৃত্যুর পর গিরিজানাথের যে একটা ভাবান্তর ঘটেছিল—এ বিবাহে তার বিশেষ পরিবর্ত্তন হল না। গিরিজানাথের শুধু মনে হতে লাগল—কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে। সরযূ আর হৈমবতী—বিধাতার ভিন্ন হাতের তৈরী। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নবোঢ়া সরযূর দম্ভ, অহঙ্কার, চপলতা—যোগিনীপুরের সকলের কাছেই হৈমবতী হতে সরযূর বিশিষ্টতা প্রতীয়মান করল।

বৎসরান্তে সরযূর দ্বিরাগমন হল। গিরিজানাথ যেমন নির্ব্বিকার, উদাসীন, নিরুদ্বেগ, সরযূ তেমনি ঠিক তার বিপরীত মনোবৃত্তি সম্পন্ন। টোলের ছেলেরা তটস্থ হয়ে উঠল—পদে পদে সরযূর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ—তাদের প্রতি ভুলের জন্য নিষ্ঠুর কৈফিয়ৎ তলব—তাদের ভাত হজমের বাধা সৃষ্টি করল। সবচেয়ে অসুবিধা হল গিরিজানাথের—তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনায় পর্ব্বত-বাধা মাথা তুলে দাঁড়াল। তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সাংসারিক ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত থাকা গিরিজানাথের কোনদিন অভ্যাস ছিল না। চাউল আগে দিন হতে না আনলে যে পরদিন চাউল সিদ্ধ পাওয়ার একান্ত অভাব ঘটে—গিরিজানাথ সে অভিজ্ঞতা প্রথম সঞ্চয় করলেন। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা তাঁর অবচেতন মনের উপর কোন আন্দোলন আনল না। কাজের সময় আয়োজন না পাওয়ায় পণ্ডিতের মস্ত মূর্খতার প্রমাণ সরযূ পদে পদে করতে বসে।

হৈমবতী ছিল টোলের অধ্যাপকের মেয়ে—তার যেটুকু শিক্ষা—তাও প্রাচীন প্রণালী মতে। আর সরযূ—বিশিষ্ট

সরকারী কর্ম্মচারীর মেয়ে—তার শিক্ষাও আধুনিক প্রথায়; কাজে কাজেই রুচির বিভিন্নতা হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এই বিভিন্ন রুচির বিপরীতমুখী তরঙ্গের আঘাত খেয়ে শাস্ত্রোপজীবী গিরিজানাথ ক্রমে ক্রমে স্থাণুর অবস্থা লাভ করলেন; এক কথায় যাকে কবি বলেছেন—'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

এই ভাবে বহু ঝড়-ঝাপ্টা অস্বস্তির ভিতর দিয়ে গিরিজানাথের সাংসারিক জীবনে চার বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সংবাদ এল—নির্ম্মলেশ মর্ত্ত্যের মায়ার সমস্ত জবানবন্দী শেষ করে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ যেমন আসে—তেমনি এই সংবাদের পরে পরেই একখানা কালো পাল্কীতে চড়ে কল্যাণী গিরিজানাথের ঘরে ফিরে এল।

কল্যাণী থান কাপড় পরে পাল্কী হতে নেমে—এতদিন পরে সৎমাকে প্রথম প্রণাম করল। অযাত্রা, কালপেঁচা, বাঁ দিকে দাঁড় সাপ দেখে পথিক যেমন চম্‌কে ওঠে—সরযূ তার চেয়েও বেশী আঁতকে উঠল কল্যাণীকে দেখে। তাড়াতাড়ি তার সম্মুখ হতে সরে গেল। সে কি ভাবল সেই জানে। কল্যাণী তারপর থেকে পিত্রালয়েই থাকতে লাগল।

কেমন যেন প্রবৃত্তিবশেই সরযূর কল্যাণীকে অসহ্য ধরে। এতটুকু মেয়ে বিধবা—নিতান্ত অলক্ষণা—বিধাতার অভিশাপ—পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বিধবা কল্যাণী গিরিজানাথের বুকের কাঁটা; অন্তর তাঁর বেদনায় ভরা—মুখে কিন্তু সহানুভূতির একটা শব্দ নাই। উঠতে বসতে সরযূ কল্যাণীকে ব্রহ্মচর্য্যের বার্ত্তা শোনায়—আর তাকে জানায় পূর্ব্বজন্ম আছে। তা না হলে এ কচি বয়সে তার এমন দুর্গতি কেন? গত জন্মে সে যে পাপ করেছে তার ফল ত ফলেছে—এ জন্মটা যেন সে হেলায় না কাটায়। কল্যাণী ব্যথা পায় বলেই সরযূ এই সব কথা তাকে বারবার শুনিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। কল্যাণী দাওয়ার কোণে খুঁটি ধরে কাঠ হয়ে বসে থাকে—গিরিজানাথ ব্যথাভরা ব্যাকুল চোখে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

ক্রমে ক্রমে রান্নাঘরের প্রায় সমস্ত ভার কল্যাণীর কোমল ভঙ্গুর শোকজর্জ্জর কাঁধের উপর চাপল। সরযূ ক্রমে গৃহকর্ত্রীর গুরুভার মাথায় নিয়ে কল্যাণীর যাতে ইহকালও ব্যর্থ না হয় সে জন্য তাকে দশজনের সেবার মহৎ কর্ম্মের ভার অর্পণ করে তাকে পুণ্য অর্জ্জন করাতে লাগল। শুধু দশের সেবা নয়, ঐ সঙ্গে বার ব্রত তিথি সমস্ত যাতে সে যথাযথভাবে পালন করে সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে লাগল। একাদশীর দিন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তাকে নিরম্বু থাকতে হবে। একে গ্রীষ্মকাল—তাতে আবার রান্নাঘরের কঠিন কর্ত্তব্য—কল্যাণীর কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। যখন তৃষ্ণার দাহ একান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে—জিব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—বুক হতে উষ্ণশ্বাস বেরিয়ে দম বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে সেই সময় পঞ্চদশবর্ষীয়া কল্যাণী ঐকান্তিক ইচ্ছা বা চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের বিধবার কঠোর নিয়ম রাখতে পারল না। হাতে করে এক গণ্ডূষ জল নিয়ে সে পান করল। কিন্তু সেটুকু সরযূর চোখ এড়াল না। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এই উপবাসের দিনগুলিতে সরযূ তার প্রতি কড়া পাহারা দিত।

প্রখর দ্বিপ্রহরে যখন কল্যাণী চুলাতে কাঠের পর কাঠ দিয়ে তাপে ধোঁয়ায় শীর্ণ হচ্ছিল—তখন সরযূ পাশের ঘরে তার ভোজন-পর্ব্ব শেষ করছিল। কল্যাণীর ধারণা ছিল—তার সৎ মা তখনও সেই ঘরে আছে; সে অতি ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে এক গণ্ডূষ জল নিয়ে তার যে জীবন-পাখী খাঁচা ভেঙ্গে পালাবার জন্য ছটফট করছিল—তাকে দিনান্তের মত ঠাণ্ডা করল। কিন্তু সেই গোপন পাপটুকু সরযূর দৃষ্টি এড়াল না; সে চীৎকার করে পাড়া মাথায় করল। যোগিনীপুরের অর্দ্ধেক লোক কল্যাণীর সেই মহৎ পাপের বার্ত্তা শোনবার জন্য সমবেত হল। গিরিজানাথ দাওয়ার একপাশে একটা চৌকির উপর স্থির হয়ে বসেছিলেন কল্যাণী তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল; অভিপ্রায়—শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রকার পিতা, ইচ্ছা করলেই বিধবার একাদশীর দিন জলগণ্ডূষ নেওয়া যে পাপ, এ বিধি পাল্টাতে পারেন। গিরিজানাথ অচঞ্চল দৃষ্টিতে সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর মুখে কোন সান্ত্বনা আশ্বাস বা প্রতিবাদের ভাব দেখা গেল না।

কল্যাণী উনুনের পাশে কাঠের গাদার উপর কাঠ হয়ে বসেছিল। তার নিরাভরণ গৌর দেহ হতে বহ্নির জ্যোতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। সে যৌবনের প্রথম সোপানে পা দিয়েছে, কিন্তু দৈবক্রমে সে বিধবা। এই তরুণ বয়সে কৃচ্ছ্রসাধন যত বড় মর্ম্মভেদী হোক্, আইনতঃ তাকে তা করতেই হবে। গ্রামের নানা জনে নানা রকম কথা বলতে লাগল। প্রবীণা বর্ষীয়সী

বিধবারা অনেকেই কল্যাণীর পক্ষ সমর্থন করতে লাগল। এত ছোট মেয়ে, তার এত কঠোর সাধন কি ভাল, অধ্যাপক পিতা, তাঁর অনুমতি নিয়ে ও কিছু ফলমূল আহার করলেই ত পারত। নবীনা সধবাদের মধ্যে অনেকেই সরযূর সপক্ষ হয়ে প্রবীণাদের সঙ্গে কোন্দল করতে লাগল। কেউ কেউ নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে রইল। সরযূ রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে—ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম শাসন—কল্যাণীর পূর্ব্বজন্মের পাপ—পিতার পাপ, মাতার পাপ—শোনাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামবাসীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। সরযূর তিরস্কার থামল না। সে সারাদিন ধরে কল্যাণীর শ্বশুরকুলের—পিতৃকুলের পাপের কথা উল্লেখ করে প্রখরভাষায় ভৎ'সনা করতে লাগল। কল্যাণী কোন উত্তর দিল না। সমগ্র গ্রামবাসীর নিন্দা, প্রশংসা আশ্বাস বা সৎমায়ের ভৎ'সনা অন্তরে তাকে তিলে তিলে বিঁধতে থাকলেও তার মুখে সর্ব্বদা যেমন একটা নীরব কালিমাময় ভাব মাখানো থাকে এখনও তার ব্যতিক্রম হল না।

এই ব্যাপারের পর হতে সরযূ আরও কঠোর হয়ে পড়ল। কথাবার্ত্তা—কাজকর্ম্মের সামান্য ক্রটিতে সরযূ ধারালো ছুরির মত কল্যাণীকে অস্ত্রে অস্ত্রে কাটতে লাগল। কল্যাণীকে কাজ করতে হয়—আর সরযূর কাজ তার কাজের ভুল ধরা। কল্যাণী যে সাংসারিক কাজকর্ম্মে অক্ষম, তা নয়। কিন্তু সরযূর সমক্ষে সে যত সাবধান হয়ে কাজ করতে যায়, কোন্ নিষ্ঠুর অপদেবতা যেন নির্ম্মম উল্লাসে ততই তার হাতের কাজ উল্টে দেয়! ক্রমে ক্রমে পিত্রালয় কল্যাণীর পক্ষে বড় অসহ্য হয়ে উঠল। একমাত্র ভরসা পিতা—কিন্তু তিনি যেমন বিকারহীন—কোন বেদনাই তাঁকে স্পর্শ করে না—কপালের শিরা কোনদিন স্ফীত হয় না—ভ্রূ কুঞ্চিত হয় না। শুধু তাই নয়—কল্যাণীর মত মহাপাপী কন্যার পিতা হওয়ার জন্য—মধ্যে মধ্যে তাঁর প্রতিও বহু তিরস্কার বাণী বর্ষিত হয়। গিরিজানাথের পর্ব্বতপ্রমাণ স্থৈর্য্য—আর সরযূর ঝটিকাপ্রমাণ মুখর আলোড়ন—সে দৃশ্য বড় করুণ—বড় মর্ম্মভেদী!

কল্যাণী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে—মৃত্যু তাকে ভুলে আছে কেন? মা ইচ্ছা করলেই মেয়েকে তাঁর কোলে স্থান দিয়ে সকল যন্ত্রণা জুড়াতে পারত—কিন্তু সেও আজ এত নিষ্ঠুর! সত্যই হয়ত কল্যাণী মহাপাপী। ধিক্কার নারীজন্ম! আজ যদি সে পুরুষ হ'ত! মাঝে মাঝে তার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প জাগে—জীবনটা শেষ ক'রে দিই, কি পরিণতি এ জীবনে? কিন্তু দুঃখ হয় পিতার জন্যে। হয়ত তার সেরকম মৃত্যুর জন্য পিতার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। কল্যাণীর মনে পড়ল —যোগিনীপুরের তিনক্রোশ উত্তরে তার পিসীমার বাড়ী। তার পিসেমশায় বড়লোক—জমিদার। সে জীবনাবধি পিসীমাকে দেখে নাই। পিতাও তাঁকে কোনদিন আনবার ইচ্ছা করেন নাই—তিনিও আসেন নাই। কল্যাণী সঙ্কল্প করল, পিসীমার বাড়ীতেই যাবে, নচেৎ তার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়—সে যে মেয়েমানুষ। পিসীমার বাড়ীতে পাচিকার দরকার হ'তে পারে, তার ঝিরও ত আবশ্যক হ'বে।

সে একদিন গভীর রাতে ঘর হ'তে বেরিয়ে পড়ল। সকলে নিদ্রায় মগ্ন—কেউ তার সন্ধান জানল না। কল্যাণী গ্রাম হ'তে বেরিয়ে সোজা উত্তরমুখে চলতে লাগল। সে কোন দিনের জন্য ঘরের বাইরে পা দেয় নাই। চন্দ্রখণ্ড গ্রাম কোন্‌দিকে, কোন্ পথে যেতে হয়, সে তার কিছুই জানে না—কাকেও জিজ্ঞাসা করবার উপায় নাই। ঘর হ'তে বেরোনর সময় তার মনের দৃঢ়তা ছিল অপরিসীম; কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিয়েই তার বুক কেঁপে উঠল। চলতে গিয়ে পথের পাশে ঝোপে ঝাড়ে নিশাচর জন্তুর ডাক শুনে অজানা আতঙ্কে তার দেহ শিউরে উঠল। কিন্তু ফেরা চলে না—যেখানে হোক তাকে যেতেই হবে। কল্যাণী বারবার মৃত্যু দেবতাকে স্মরণ ক'রতে লাগল। আজ একটা সাপেও কি তাকে কামড়াতে পারে না! সে এগিয়ে চলতে চলতে একটা প্রকাণ্ড গোচর ডাঙ্গার মধ্যে এসে পড়ল—সে গোচর আর শেষ হয় না। কিন্তু আরও বিপদ—তার যেন মনে হ'তে লাগল, সে একই জায়গায় বার বার ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হ'ল সামনে যেন কি একটা ছায়ার মত আসছে। পাশপানে সরতে গিয়ে সে একটা ঝোপে ধাক্কা খেয়ে 'মাগো' ব'লে চীৎকার ক'রে প'ড়ে গেল।

একটা লোক এসে কল্যাণীর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?"

কল্যাণীর সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হ'য়ে এসেছে—সে কোন উত্তর দিতে পারল না।

লোকটা একটা শিষ দিতে আর একটা লোক তার পাশে এসে দাঁড়াল, তারা দু'জনে কল্যাণীকে তাদের সঙ্গে যেতে বল্‌ল। কল্যাণী তখন অনেকটা সম্বিৎ পেয়েছিল। নিকষ কালো অন্ধকারের ভিতর যমদূতের মত ভীমকায় লোক দুটোকে দেখে কল্যাণীর আতঙ্ক খুব বেড়ে উঠল। যে মরণ সে এতক্ষণ চাচ্ছিল—এই ভীষণাকৃতি লোকদের হাতে হয়ত সেই মরণ সে এখনই পাবে—কিন্তু তবু আবার এখন মরতে ভয় হয়। জীবনের চেয়ে মূল্যবান্‌ বোধ হয় কিছুই নাই। যারা মরতে চায় তারাও ভাবে—দুঃখের মূল্য জীবনের মূল্যের চেয়ে অধিক; কিন্তু মরণ যখন আসে তখন প্রায় সকলেই প্রস্তুত থাকে না, সমস্ত দুঃখের মূল্য দিয়ে জীবন কিন্‌তে রাজি হয়। কল্যাণী আর্ত্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠল।

লোক দু'জন তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ল, "ভয় নাই মা, আমরা ডাকাত, ধনীর ধন লুঠ করি বটে কিন্তু কারও প্রাণের উপর আঘাত করি না। বিশেষতঃ তুমি মেয়েমানুষ—ডাকাতেরা মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয় না। তুমি শুধু আমাদের সঙ্গে চল, সর্দ্দারের কাছে যেতে হবে।"

ডাকাতরা কল্যাণীকে নিয়ে সর্দ্দার কেদার প্রামাণিকের কাছে হাজির হ'ল। সে একটা প্রকাণ্ড আম গাছের তলায় একটা মোটা শিকড়ের উপর ব'সে কীর্ত্তন ভাঁজছিল। কেদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার কল্যাণীর আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ল। কল্যাণী তার জীবনের ইতিহাস প্রায় সমস্তই বল্‌ল—বল্‌ল না কেবল তার নিজের নাম, পিতার নাম ও পিতার নিবাস। সে বল্‌ল—তার নাম জয়ন্তী, আস্‌ছে সুদূর পশ্চিম বিহার মুল্লুকের প্রান্ত হ'তে।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কেদার তাকে নিয়ে সনাতন বৈরাগীর আখড়ায় গেল। সনাতন বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে কীর্ত্তনগানে চতুষ্পার্শ্বে সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এই ডাকাতের দলের পোষক আবার ডাকাতদের অনেকেই তার কীর্ত্তনের দলের সাগরেদ্‌।

সনাতনের টাকাকড়ি প্রচুর, খ্যাতিও যথেষ্ট, সুখও ছিল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু বৎসরখানেক আগে হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যেই তার স্ত্রী, তিন-তিনটি পুত্র, একটি কন্যা সকলেই কলেরায় মারা গেল। সনাতনের সাগরেদ্‌রা হায় হায় ক'রে উঠল। সনাতন কিন্তু ভেঙে পড়ল না, শক্ত হ'য়েই রইল। বল্‌ল 'ব্রহ্মশাপ'। গ্রামবাসীরা বা চারপাশের লোকেরাও দুঃখিত হ'ল। সনাতনের অর্থ যেমন ছিল গরীব-দুঃখী লোকের দায়ে-বিপদে সাহায্য কর্‌তেও তেমনি কৃপণতা কর্‌ত না। লোকটির লৌকিক ব্যবহার কথাবার্ত্তাও খুব মধুর।

কেদার যখন কল্যাণীকে নিয়ে সনাতনের কাছে হাজির হ'ল, তখন সনাতন একাকী ব'সে তামাক টান্‌ছিল। এই ছিল তার কাজ, ডাকাতেরা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত আর সে সারারাত শোবার ঘরের দাওয়ায় ব'সে তামাক টান্‌ত।

কল্যাণীকে দেখে সনাতনের অন্তরটা যেন ছ্যাৎ ক'রে উঠল। তার চৌদ্দ বছরের মেয়ে দুলালী অবিবাহিত অবস্থায় মরেছে। সে মেয়েটির সঙ্গে কল্যাণীর মুখচোখের অনেকখানি মিল আছে। তার যেন মনে হ'ল, তারই মেয়ে এক বছর আগে শ্বশুরবাড়ী গেছল আজ বিধবা হ'য়ে তাকে প্রণাম কর্‌তে এসেছে। সে চীৎকার ক'রে বল্‌ল, "কেদার, কাকে এনেছিস্‌—ভাল ক'রে দেখ্‌ দেখি।"

কেদার একবার কল্যাণীর দিকে তাকাল—তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠল।

সনাতন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কোথায় যাবে মা?"

কল্যাণী উত্তর দিল, "আমি নিরাশ্রয় অনাথা, অনুমতি পেলে আপনার আশ্রমেই থাক্‌ব।" কি জানি কেন কল্যাণীর মনে হ'ল এখানে থাক্‌লে তার অসম্মান হবে না।

সনাতন জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোমার নাম কি মা?"

কল্যাণী উত্তর দিল, "জয়ন্তী।"

সনাতন দ্বিধাভরে বল্‌ল, "জয়ন্তী?" আচ্ছা, তাই হোক তুমি জয়ন্তী। তুমি আমার মা।"

কল্যাণী সেই থেকে জয়ন্তীদেবী নাম নিয়ে সনাতনের আখ্‌ড়াতেই দিন কাটাতে লাগ্‌ল। সাধারণত সনাতনের আখড়ায় অনেক রাত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়—কেদার ইত্যাদি দলের সকলেই সেই কীর্ত্তনে যোগ দেয়। কেউ কেউ বা কীর্ত্তন যখন পুরামাত্রায় চল্‌ছে সেই সময় এক ধারে জটলা ক'রে কি সব পরামর্শ করে। কীর্ত্তনের পর সকলেই সেখানে

খায়, তারপর গভীর রাতে বিদায় নেয়। হরিমতী নামে একটি মেয়ে তাদের সেই বিরাট গোষ্ঠীর অন্ন যোগায়। খাবার সময় তাদের কত আব্দার! হরিমতী হাসিমুখে সমস্তই সহ্য করে।

জয়ন্তী এখন হরিমতীকে সকল কাজে সাহায্য করে। হরিমতী জয়ন্তীকে ভক্তি করে, ভালবাসে। জয়ন্তীর আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা দেখে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে হরিমতীর মনে হয়, সে বুঝি স্বয়ং অন্নপূর্ণা, তাদের ছলনা কর্‌বার জন্যেই ছদ্মবেশে এসেছে।

প্রায় বছর দুই কেটে গেল। একদিন সনাতনের জ্বর হ'ল। কেদার পাশে এসে দাঁড়াতেই সনাতন বল্‌ল, "জয়ন্তীকে ডাক।" জয়ন্তী এলে কেদারের সাম্‌নে সনাতন বল্‌ল, "জয়ন্তী মা, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। এই কেদার আমার সবচেয়ে আপনার লোক। যে বেদীটার ওপর তুলসীগাছ তারই নীচে টাকাতে মোহরে ভর্ত্তিকরা সাতটা ঘড়া আছে। সেইগুলি সমস্ত তোমার—তুমি তার ব্যবহার ক'রো। আমি জানি তোমার হাতে পড়লে এর অপব্যয় হবে না।"

সত্যই সনাতন সেই দিন রাত্রেই দেহত্যাগ কর্‌ল। তার বয়স হ'য়েছিল প্রায় ষাট, জীবনে তার কোনদিন মাথা ধরে নাই—একদিন মাত্র জ্বরে ভুগল আর সেই জ্বরই কাল হ'ল।

কেদার বা তার সঙ্গীরা সকলেই চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে মহাসমারোহে সনাতনের অন্ত্যেষ্টি সৎকার কর্‌ল। সংবাদ পেয়ে চারদিকের গরীব দুঃখী ছুটে এসে উঠানে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল।

রাত্রে কেদারকে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তুলসী-বেদী তুলে জয়ন্তী দেখল সত্য সত্যই সাতটা ঘড়া রয়েছে। মুখ-গুলো রেকাবে ঢেকে গালা দিয়ে আঁটা হ'য়েছে। জয়ন্তী কেদারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরদিন সকালেই স্থানীয় শুভাকাঙ্ক্ষী লোকদের ডেকে একটি অনাথ-আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন কর্‌ল। শুধু যারা এখানে আস্‌বে তারাই যে এ আশ্রমে প্রতিপালিত হবে তা' নয় চতুষ্পার্শ্বের গ্রামে যে-সব দরিদ্র খেতে পায় না, পর্‌তে পায় না তাদের সাহায্য করাও এই আশ্রমের কাজ হবে।

দেখতে দেখতে একটি বিরাট বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়াল। তার নাম দেওয়া হ'ল 'সনাতন-সেবাভবন'। আর সনাতনের শ্মশানের উপর একটি ছোট মন্দির গ'ড়ে সেখানে রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবার ব্যবস্থা হ'ল। জয়ন্তী নিজে ঘুরে ঘুরে সব ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে কি না তত্ত্বাবধান করে। কেদার আশ্রমের জন্য সম্প্রদায়ের লোকদের খাটায়—নিজেও আপ্রাণ খাটে।

এ দিকে এই তিন বৎসরে গিরিজানাথের সংসারেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন এসেছিল। কল্যাণী চ'লে যাওয়ার পর চারদিকে একটু কোলাহল উঠেছিল বটে কিন্তু দিনকতক পরেই সব ঠিক হ'য়ে গেছে। গিরিজানাথের টোলটি উঠে গেছে। কোন ছাত্র আর সেখানে পড়তে আস্‌তে চায় না। জমিদার টোলের জন্য যে সাহায্য দিতেন তাও বন্ধ ক'রেছেন। গিরিজানাথের দারিদ্র্য যত বাড়ছে সরযূও তত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। গিরিজানাথ নিরুপায় হ'য়ে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী নিলেন। কিন্তু জীবন ভ'রে শুধু শাস্ত্রালোচনাই করেছেন জমিদারী সেরেস্তার কাজ কিছুই বুঝলেন না। প্রবীণ নায়েবেরা তাঁর প্রতি অনুকম্পা ক'রে তাঁকে বোঝাতে যথেষ্ট চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁর মগজ পরিপূর্ণ; সেখানে আর অন্য কোন বিদ্যা রাখবার স্থান ছিল না। এক মাসের মধ্যে সে কাজ তাঁর শেষ হ'য়ে গেল।

সংসারের দৈনন্দিন অভাব গিরিজানাথের অন্তরে শেল বেঁধাতে লাগল। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। ছেলেপুলে না থাকায় দুধের খরচ লাগে না বটে কিন্তু নিজেদের খাবার পর্‌বার সংস্থান ত চাই। সাংসারিক জীবন বহনের পক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য অকর্ম্মণ্য বিবেচনা ক'রে গিরিজানাথ অন্তরে অন্তরে পুড়তে লাগলেন। অন্তরে তাঁর অনির্ব্বাণ বহ্নি রাবণের চিতার মত জ্বলতে লাগল; কিন্তু তবু অন্তরের যাতনা তাঁর বাইরের স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গতায় কোন পরিবর্ত্তন আন্‌তে পার্‌ল না। তাঁর এই স্থির মূর্ত্তি সরযূকে অধিকতর ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। তার মনে হয়, গিরিজানাথ সরযূর কথা ভাবে না, সংসারের কথা চিন্তা করে না। অতিরিক্ত শাস্ত্রালোচনা ক'রে তাঁর মনের সমস্ত বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেছে। তিনি জীবনের বোঝা নিয়ে জীবন বহন কর্‌ছেন মাত্র। সকল অবস্থাতেই গিরিজানাথকে উদ্বেগহীন নিশ্চঞ্চল দেখে তাঁকে উদ্দীপিত কর্‌বার জন্য সরযূ বোঝায়, তিরস্কার করে, ধিক্কার দেয়।

গিরিজানাথ একদিন শুন্‌লেন—যোগিণীপুরের দেড় ক্রোশ উত্তরে মধুপল্লী গ্রামে এক প্রকাণ্ড অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। যারা আর্ত্ত অনাথের সন্ধান নিতে ও তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক তাদের উপযুক্ত বেতনে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে।

গিরিজানাথ ছেঁড়া চাদরখানি ভাঁজ ক'রে কাঁধে ফেলে, ভাঙ্গা ছাতাটি হাতে নিয়ে মধুপল্লীর দিকে যাত্রা করলেন। সরযূ কোন আপত্তি করল না, বরং গিরিজানাথ কাজের সন্ধানে গেলে সরযূ উৎফুল্ল হ'ত। কি কাজ, কেমন কাজ সে জমাখরচ নেবার প্রয়োজন তার ছিল না। অন্ততঃ গিরিজানাথের তাবৎ অচল অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তনও তার কাছে লাভজনক।

গিরিজানাথ মধুপল্লীর সনাতন সেবাভবনে পদার্পণ করলেন। হরিমতি তাঁকে নিয়ে জয়ন্তীদেবীর কাছে গেল। জয়ন্তী প্রথমে পিতাকে চিন্‌তে পারে নাই, গিরিজানাথ এই কয়েক বৎসরে অতিরিক্ত বুড়ো হ'য়ে গেছেন। জয়ন্তী তাঁকে সমাদর ক'রে বসতে বল্‌ল। গিরিজানাথ যখন তার কাছে চাকুরী প্রার্থনা করল, তখন তার কথা শুনেই জয়ন্তী তাকে চিন্‌তে পার্‌ল। বাবা'র এই দশা! তার বুক ফেটে গেল, চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝরতে লাগল। হুমড়ি খেয়ে গিরিজানাথের পায়ে পড়ে বলল, "বাবা, বাবা, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।"

গিরিজানাথ প্রথমে বড় হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। তারপর কন্যার মাথায় হাত দিয়ে তাকে তুলে বললেন, "কল্যাণী মা, তুই? তুই এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিস্? কেমন করে এসব সম্ভব হ'ল?"

কল্যাণী বাবার পায়ের তলায় মাটির উপর ব'সে একে একে সমস্ত কথা বল্‌ল। হরিমতী নীরবে দেখতে লাগল। তার চোখও জলে ভ'রে এল। সে পাখা নিয়ে দুজনের মুখের উপর বাতাস করতে লাগল।

চাঞ্চল্যের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর গিরিজানাথ বল্‌লেন, "মা কল্যাণী, আমি চল্‌লাম। এখানে আমার কাজ করা চলবে না। তোকে ক্ষমা করার অধিকারও আমার নেই। তুই আমার কন্যা হ'লেও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নারীজাতির মধ্যেই তোর স্থান। কিন্তু তুই যেন ক্ষমা করিস্ তোর এই হতভাগ্য পিতাকে। আমি যে কত নিরুপায় তাও তুই জানিস্।"

গিরিজানাথ কোণ হ'তে তার ভাঙ্গা ছাতাটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। জয়ন্তী যেমন ব'সে ছিল, তেমনি ব'সে রইল; তার সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে গেল। হরিমতী জলের ঝাপটা, পাখার বাতাস দিয়ে চৈতন্য ফিরে আনল। জয়ন্তী হরিমতীকে বাইরে যেতে ব'লে দুয়ার বন্ধ ক'রে বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে চোখের জলে বালিশ ভিজাতে লাগল।

সেদিন আর জয়ন্তীদেবীর ঘরের দুয়ার খুলল না। পরদিন সকালে অনেক বেলাতেও যখন জয়ন্তীর ঘরের কপাট বন্ধ দেখা গেল, তখন হরিমতী বড় ব্যাকুল হ'য়ে কেদারকে ডাকল। কেদার এসে জয়ন্তী-মাকে অনেক ডাকাডাকি করল, দুয়ার কিছুতেই খুলল না। তখন দুয়ার ভেঙ্গে ফেল্‌তে হ'ল। বিছানার উপর জয়ন্তীর প্রাণহীন দেহ প'ড়ে আছে। জয়ন্তী কিভাবে দেহত্যাগ করেছে, কেউই বুঝতে পারল না। হরিমতী যা দেখেছিল, তাই সকলের কাছে বল্‌ল। পাশে একটা কাগজ প'ড়ে ছিল। জয়ন্তী নিজহাতে লিখে গেছে। কেদার তাড়াতাড়ি কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ল। "নারীজন্ম অভিশাপ। নারী ব'লেই নারীকে দণ্ড নিতে হবে। সেই ব্যর্থ জীবনের অবসান কর্‌লাম।"

আর একখানা কাগজে আশ্রমের কথা লেখা রয়েছে। জয়ন্তী দেবী লিখে গেছে, "তার অবর্ত্তমানে আশ্রমের অধিকারী যোগিনীপুর নিবাসী গিরিজানাথ বিদ্যারত্ন। একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক কেদার প্রামাণিক। যদি সর্ব্ববান্ অধিকারী আশ্রম গ্রহণ না করেন, তবে কেদার প্রামাণিক স্বয়ং অধিকারী হ'বে, অথবা সে অন্য অধিকারী নিযুক্ত করতে পারে।"

সমস্ত আশ্রমে বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ উঠল। দুঃখের সমারোহের ভিতর দিয়ে জয়ন্তী দেবীর সৎকার হ'ল। কেদার শ্মশানের ছাই না ধুয়ে সকলের সাম্‌নে বল্‌ল, "এ আশ্রমের অধিকারী আমি কখনই হ'ব না। গিরিজানাথ না হ'লে অন্য লোকের সন্ধান করব। আর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের পাশে আশ্রমের জননী জয়ন্তী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।"

সেই দিনই গিরিজানাথের কাছে লোক গেল। সে জয়ন্তী দেবীর হাতের লেখা কাগজও নিয়ে গেল। গিরিজানাথ আশ্রম হ'তে ফিরে যাবার পর অন্তরের মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতি সমূহের আকস্মিক আলোড়নে ঘরের দাওয়ায় স্থির হ'য়ে ব'সে অর্দ্ধ-সমাধিস্থ অবস্থা লাভ করলেন। পত্রবাহকের কথা শুনে ও পত্র প'ড়ে গিরিজানাথের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। তারপর পত্র ফিরে দিয়ে বললেন, "আমি মহাসাধক কৌশিক ভট্টাচার্য্যের বংশে জন্মেছি। সমাজ, শাস্ত্র আমার পথের গণ্ডী টেনে দিয়েছে। এ ভার আমার নেওয়া অসম্ভব।"

পত্রবাহক ফিরে গেল। ঠিক সেই দিনেই গিরিজানাথের শ্বশুর শিবিকারোহণে এসে উপস্থিত হ'লেন। সরযূর ব্যবহারে যথেষ্ট রুক্ষতা ছিল। অভাবের তাড়ণায় সে পতিকে তিরস্কার করত, কিন্তু তার একটা গুণ ছিল, বাইরে কারও কাছে অভাবের কথা প্রকাশ করত না। দীর্ঘ সাত বৎসর হ'ল সে শ্বশুর-বাড়ীতে এসেছে। ইতিমধ্যে আর পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। তারা অনেকবার নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, সরযূ নানা অজুহাতে যায় নাই। অতএব এ পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা শোনা চিঠি-পত্রেই চলেছে। কোন দিনের জন্যে বড়লোক পিতার কাছে নিজের দারিদ্র্যের কথা জানায় নাই।

জাহ্নবীনন্দন কয়েকদিন আগে মথুরাবাসী এক পরিচিত ব্যবসাদারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার কাছ হ'তে গিরিজানাথের বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হ'য়েছেন। তাই নিজেই এসে হাজির হ'লেন। এসেই দেখলেন, শতছিন্ন কাপড়ে তালি জুড়ে জুড়ে সরযূ পরনের কাপড় করেছে, তেলের অভাবে মাথা রুক্ষ। বাড়ীতে দুবেলা খাওয়ার কোন সংস্থান নাই।

এই সব বিশৃঙ্খলা দেখে জাহ্নবীনন্দনের অপরিসীম ক্রোধ হ'ল। জামাতাকে সামনে পেয়ে আসন গ্রহণ না ক'রেই তাকে অশেষ তিরস্কার করলেন। গিরিজানাথ নীরব মৌন-ভাবে সমস্ত শুনলেন। তারপর জাহ্নবীনন্দন সরযূকে তখনই পাল্কীতে চড়ে বসতে বললেন।

সরযূ গিরিজানাথকে প্রণাম ক'রে বলল, "বিধাতার বিধানে আমি নারী—হিন্দু নারী—জীবনে মরণে তুমি আমার স্বামী। কিন্তু তোমার সংসার আমায় বহন করতে চায় না। পিতার আগমনের জন্যেও আমি দায়ী নই; কিন্তু যতদূর বুঝছি আর বোধ হয় আমার ফেরা হ'বে না।"

পাল্কীতে চ'ড়ে সরযূ পিত্রালয়ে চ'লে গেল। গিরিজানাথ কাঠ হ'য়ে ব'সে রইলেন—স্নান, আহার সমস্ত ভুলে গেলেন। সারাদিন ধ'রে তাঁর চোখের সামনে শুধু তিন জনের মুখ ভেসে বেড়াতে লাগল—হৈমবতী, কল্যাণী, নির্ম্মলেশ। এদের মাঝে সরযূর কথা ক্ষণেকের জন্যও মনে জাগল না।

সারাদিন ধ'রে দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলল। বিকালে গোধূলির সময় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই বললেন, "সমাজ, শাস্ত্র এরাই সত্য আর মন কি সত্য নয়? মহাসাধক কৌশিক ভট্টাচার্য্যের বংশ এতদিন চ'লেছিল, এইখানে তার ইতি। আমি গুরুতর অপরাধ করেছি আমার কন্যার কাছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। কল্যাণীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আমি হ'ব প্রধান যাজক। সংসার, বংশমর্য্যাদা, সমাজ—কে কার? "ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি।"

গিরিজানাথ আবার ছাতা চাদর নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। তাঁর কুঁড়েঘর শূন্য খাঁ খাঁ করতে লাগল। প্রতিধ্বনি ফিরে আসবার জন্য বারবার আহ্বান করল, কিন্তু গিরিজানাথ আর পিছনপানে ফিরে তাকালেন না।

পাগলের প্রলাপ

শ্রীহরিপদ দত্ত

মাগো! সম্বৎসর পরে যে বাঙলায় এলে তা' অন্ধকার করে', দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে, অশ্রুবর্ষণ করতে করতে এলে কেন মা? খাদ্যের অভাবে বিশ্ব জুড়ে হাহাকার, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে হানাহানি, কাটাকাটি, অগ্নিবর্ষণ, শস্যনাশ, বিত্তনাশ, গ্রন্থাদিনাশ, পশুহত্যা, নরহত্যা, দুর্ব্বলের প্রতি বলীর অত্যাচার—এই সকল দেখে শুনে তুমি এমন মুহ্যমানা হ'য়ে পড়লে যে নিরানন্দময়ীরূপে ভূতলে আবির্ভূতা হ'লে? অধিবাসের সময়েও দেখলেম সেই অন্ধকার, সেই নিঃশ্বাসের ঝড়, সেই বর্ষণ, সপ্তমীতেও দেখলেম তাই—একটিবারও হাসি দেখলেম না। মহাষ্টমীর দিন মাঝে মাঝে মৃদুহাসি দেখলেম; মহানবমীতে সে হাসি উজ্জ্বলতর হ'ল এবং বিজয়াদশমীতে তা'রও চেয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত হ'ল। বিদায়ের দিনে তোমার আনন্দ কেন মা? এ-বছর বুঝি তোমার আসতে ইচ্ছা ছিল না? সন্তানগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আর অভ্যাসের বশে একবার পদার্পণ করলে? তোমার আগমনের আশায় তোমার সন্তানগণ চতুর্গুণ দাম দিয়ে বস্ত্রাদি সংগ্রহ করবে, চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে পূজার উপচার সংগ্রহ করবে এবং এইরূপে অর্থ ব্যয় করে', বৎসরের অবশিষ্ট কাল পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়বে, সেইজন্য বুঝি পৃথিবীতে আসতে তোমার অনিচ্ছা ছিল? ত' হ'লে আগে নোটিস্ দিলে না কেন মা। ভোলানাথ-গৃহিণী নোটিস্ দিতে ভুলেছিলে বুঝি? কিম্বা আধুনিক পৃথিবীতে সকল বিষয়ের জন্য যে আগে নোটিস্ দিতে হয় সেটা বুঝি জানতে না বা খেয়াল কর নি? অগত্যা, যা সঙ্ঘটিত হ'য়েছে তা' অখণ্ডনীয় ভেবে, অনিচ্ছাসত্বেও নিজেকে আসতে বাধ্য মনে করলে? জগদম্বে, পাগলের বিনীত অভিমত এই যে, এসে ভালই ক'রেছিলে। কারণ, প্রথমতঃ তোমার আগমন-আশাজনিত উৎসাহে বঙ্গসন্তানগণ প্রায় পক্ষকাল আপন আপন দুঃখ-কষ্ট অনেকটা ভুলেছিল, দ্বিতীয়তঃ, জিনিষ-পত্রের দাম ও হাতের টাকার অনুপাত-নির্দ্ধারণের জন্য অন্যান্য বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অন্যমনস্ক হ'য়েছিল, তৃতীয়তঃ যাঁদের পেশা চাকরী তাঁরা কয়েকদিনের জন্য অবকাশ বা অব্যাহতি পেয়েছিল, চতুর্থতঃ, তোমার মুখাম্বুজের অনুজ্জ্বলতা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রু সত্বেও তোমার আগমনেই তোমায় সন্তানগণ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়েছিল। তুমি যে মা আনন্দময়ী—যেরূপে, যেভাবেই এস, তোমার উপস্থিতি আনন্দ বিতরণ করে। ভোলার সহধর্ম্মিনী বলে' এ-টাও কি তুমি ভুলে গিয়েছিলে মা? তবে এ-বছরের আনন্দও বুঝি নিয়ন্ত্রিত! কারণ স্থান হতে স্থানান্তরে গমন রেল-ভ্রমণের নিয়ন্ত্রণ ও পেট্রোল-নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রিত, নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য, উৎসবের ত কথাই নাই, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারীয়-সংগ্রহ নিয়ন্ত্রিত, সর্ব্ববিধ দ্রব্যের অচিন্ত্যপূর্ব্ব মূল্য বৃদ্ধির জন্য পোষ্যবর্গের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য উপযুক্ত উপঢৌকনাদি-সংগ্রহ নিয়ন্ত্রিত, জ্বালানী তৈলের নিয়ন্ত্রণে এবং বিমান-আক্রমণের আশঙ্কায় গৃহে গৃহে আলোক নিয়ন্ত্রিত, এমন কি ব্যয়সঙ্কোচকল্পে দৈনিক খাদ্যের আয়োজন নিয়ন্ত্রিত।

এই দুঃখ, দারিদ্র্য, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও ভয় একজন মাত্র মানবের দুরাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত, তা'ত তুমি জান মা! সে যে হিমালয়প্রমাণ দুরাশার বশবর্ত্তী হ'য়ে স্বদেশবাসিগণকে প্রচুর খাদ্যোৎপাদন-সৌকর্য্যের এবং বাণিজ্য-প্রসারবৃদ্ধির আশায় প্রলুব্ধ করে' এমন "ভেড়া বানিয়েছে" যে তা'রা সেই প্রলোভনস্বরূপ মূল্যে স্ব স্ব আত্মাকে বিক্রয় করে' আপনাদের সর্ব্বস্ব, এমন কি পরিবারবর্গকে তা'র দুরাকাঙ্ক্ষা-বহ্নিতে আহুতি প্রদান করতে ইতস্ততঃ করছে না—এ-ও ত তোমার বিদিত মা! পাশবিক বলে বলীয়ান হ'য়ে সে যে নিষ্ঠুর আক্রমণে দুর্ব্বল প্রতিবেশিগণকে বিপদগ্রস্ত ও পর্য্যুদস্ত করে' ভীতিপ্রদর্শনে সেই প্রতিবেশিগণকে ধন প্রাণ দিয়ে স্বীয় দস্যুতাকার্য্যে সহায়তা করতে বাধ্য করেছে এবং তা'রাও প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বে অন্য প্রতিবেশীর ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত হ'য়েছে—এ-ও ত তোমার অবিদিত নয় মা! এর ফলে অধুনা ধরণীবক্ষে ভীষণ রক্তস্রোত প্রবাহিত এবং বসুন্ধরার অন্তর-নিহিত ধনরাশির কতক বিধ্বস্ত, কতক বিপন্ন। সত্য বটে আহার্য্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব এই পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামের অন্যতম কারণ এবং সার্ব্বজনীন প্রীতি ও শান্তিদ্বারা এ-অভাব পূর্ণ হ'তে পারত, কিন্তু সেই দুরাশাগ্রস্ত নরদানবের প্রধান উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবৃদ্ধি—সমগ্র পূর্ব্বগোলার্দ্ধের, হয়ত সমগ্র পৃথিবীর শাসনভার করায়ত্ত করা।

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য তুমি ত মা স্বজনগণসমেত শুভ

ও নিশুম্ভকে বিনষ্ট করেছিলে, মহিষাসুরকে বিধ্বস্ত করেছিলে! তোমার ভ্রূকুটীতে, তোমার অট্টহাস্তে এই নরদানব বিধ্বস্ত হ'তে পারে—অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছাময়ি, কেন তোমার অন্তরে সে-ইচ্ছার উদ্রেক হচ্ছে না? প্রসন্নময়ি, বিধাতার সৃষ্টির প্রতি প্রসন্না হও মা! তোমারই মহাশক্তি যে সে-সৃষ্টির মূলীভূত। পৃথিবীকে দানব প্রভাবমুক্ত এবং সন্তানগণকে অত্যাচারমুক্ত করে' শান্তিবারি বর্ষণ কর মা!

'পঞ্জিকাকারের মতে তোমার এবারকার আগমন দোলায়—ফলং মড়কং। মড়কং বটে কিন্তু দৈহিক ব্যাধিসঞ্জাত নয়, পরস্পরের হানাহানির ফল। তবে হানাহানিও ব্যাধি—অতি ভয়াবহ ব্যাধি। ঐ একই মতে তোমার গমন গজে এবং তার ফলে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। অবশ্য পঞ্জিকাকার বাঁধীগৎ আউড়েছেন। বসুন্ধরা প্রভূত শস্য প্রসব করলেও তা' সাধারণের ভোগে হবে না। একে ত বসুন্ধরার শস্যপ্রসবিনী শক্তি নদ, নদী ও অন্যান্য জল প্রণালীর নানারূপ বন্ধনের ফলে খর্ব্বতাগ্রস্ত হয়েছে, অধিকন্তু, সমরপ্রচেষ্টার ফলে সম্প্রতি কত চাষের জমি পতিত অবস্থায় আছে। কত অচিরশস্য-সম্ভব গাছ বা ফলবান গাছ উন্মূলিত করে, চাষের জমি সমর-কার্য্যের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় চাষের জমির এই রূপান্তর-কার্য্য অবশ্য নিন্দনীয় নয়, কারণ, এটা দস্যুকবল হ'তে দেশরক্ষার প্রচেষ্টামূলক; এই সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট ও অপায়ের জন্য দায়ী যে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত নররূপী দানব, দনুজদলনি, তার দমনে তোমার এই বিরতি কেন মা?

শুনেছি লোক আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করে। তোমার সন্তানগণ স্ব স্ব কুকর্ম্মজনিত ফল ভোগ করছে ব'লে কি মা তাদের দুর্দ্দশাপনোদনকল্পে কিছুই করছ না? তুমি যে মা—করুণাময়ী মা-মা কি সন্তানের নিগ্রহ, সন্তানের দুঃখ দুর্দ্দশা অবিচলিতচিত্তে দেখতে পারে?—আমারই ভ্রম। তোমার করুণা অপাত্রে বর্ষিত হয় না। তুমিই বোঝ মা, কেবল মাত্র স্নেহধারাদানে সন্তানকে মানুষ করে' তোলা যায় না। সে-জন্য জননীকে যুগপৎ কোমল ও কঠিন হ'তে হয়। দোষগুণের, পাপপুণ্যের বিচার তুমিই ত কর মা! তোমার নিখুঁত তুলাদণ্ডে পাপ ও পাপের ফল এবং পুণ্য ও পুণ্যফল ওজন করে' যথাক্রমে সে-ফল তুমিই ত বিতরণ কর মা! যে-দুরাকাঙ্ক্ষীর অত্যাচারে আজ বসুমতী প্রপীড়িতা, সে-ও তোমার সন্তান বটে কিন্তু তুমি ত সন্তানেরও পাপের প্রশ্রয় দাও না, প্রত্যুত দণ্ডবিধান কর। তবে কেন তা'কে অদ্যাপি দমন করলে না? তা'র উপযুক্ত দণ্ডের জন্য রৌরব অপেক্ষা ঘোরতর নরকের ব্যবস্থা করবে বলে' কি তা'র পাপের ভরা সম্পূর্ণ হ'বার অপেক্ষায় রয়েছ? আমরা, তোমার অন্যান্য সন্তানগণ, তোমার কাছে এই যে প্রার্থনা করছি—

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ (১)

এ প্রার্থনা কত দিনে পূর্ণ করবে মা?

তোমারই হাস্যে উদ্ভাসিত বিজয়া দশমীতে তোমার মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করলেম, কিন্তু তোমাকে ত হৃদয় থেকে বিসর্জ্জন করিনে মা! তোমাকে বিসর্জ্জন করলে আমাদের কী থাকবে? কার চরণছায়ায় আমরা বাস করব? তুমিও ত আমাদিগকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, তুমি যে মা। তুমি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ কর, না কর, সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু আমরা কখনও তোমার ধ্যানে বিরত হ'ব না।

যা চণ্ডী মধুকৈটভদৈত্যদলনী যা মহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥ (২)

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, মহেশ্বর পঞ্চমুখে এবং বিষ্ণু সহস্রমুখে তোমার গুণ বর্ণনা করতে অক্ষম, আমরা শক্তিহীন মানব, কিরূপে তা' করব? তবে চাইব, মার কাছে আব্দার করব, করুণা ভিক্ষা করব, শান্তি চাইব।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালয়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ (৩)

দেখি কতদিনে তোমার দানবদলন প্রবৃত্তি জাগরিত করে' আমাদের মুক্তির পথ, শান্তির পথ উন্মুক্ত কর; কতদিনে তোমার শরণাগত সন্তানগণের আর্ত্তি হরণ কর।

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ (৪)

মাষ্টারম'শায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাষ্টারম'শায় জানিতেন নিস্তারিণী দেবী পিত্রালয় যাইবেন না। কিন্তু তবুও এবার মনের কোণে কেমন একটা আশঙ্কা জাগিতে লাগিল। কারণ এবারকার ব্যাপার কিছু অধিক গুরুতর। স্কুলের চাকুরীটি যাওয়ায় এবার নিস্তারিণী দেবীর মনে প্রচণ্ডতর অসন্তোষ ও অভিমান জাগিয়াছে। নিস্তারিণী দেবী কতদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন, "ওগো, স্কুলের কর্ত্তাদের বল মাইনে আর কিছু বাড়িয়ে দেবার জন্য, এত কমে আর তো চলে না, খরচ দিন দিন বাড়ছে অথচ আয় বছরের পর বছর একই রয়েছে।" কিন্তু তিনি কোন দিনই বেতন বাড়াইবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন নাই। যাহা পাইতেন এবার তাহাও গেল, সুতরাং অর্থাভাবে কতখানি অসুবিধা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবার জন্য এবার যদি নিস্তারিণী দেবী সত্য সত্যই চাঁদেরহাট চলিয়া যান? এইরূপ উদ্বেগকর-প্রশ্ন তাঁহার মনে কয়েকবার জাগিয়া উঠিল। হাঁচি, টিকটিকি, পিছুডাকা, তাঁহার অনুপস্থিতি কিছুই হয় তো এবার অভিমানিনী নিস্তারিণী দেবীকে বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিতেই তাঁহার এবিষয়ের উদ্বেগ আশঙ্কা চলিয়া গেল। আকাশের উত্তর প্রান্তে মেঘের পর মেঘ জমিতেছিল। তখন ভাদ্র মাস। মাষ্টারম'শায় বুঝিলেন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশ মেঘে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং প্রবল বেগে বৃষ্টি ধারা নামিয়া আসিবে। সুতরাং নিস্তারিণী দেবীকে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে।

স্কুলের ছুটির পর মাষ্টারম'শায়ের বড় ছেলে মুনীশ বাড়ী আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাকে ছেলেরা ডাকছে।"

মাষ্টারম'শায় বাহিরে গিয়া দেখিলেন ছাত্রদের মধ্যে যাহারা নেতা তাহারাই আসিয়াছে। মাষ্টারম'শায় তাহাদিগকে সস্নেহে ডাকিয়া বাহিরের বারান্দায় বসাইলেন এবং স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "আকাশের অবস্থা দেখেছ? শীগগির ঝড়ও উঠবে বৃষ্টিও নামবে। এসময় বাইরে থাকা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়।"

ছাত্র-নেতাদের মধ্যে যে প্রধান সে বলিল, "মাষ্টার-ম'শায়, আপনি তো জানেন আমরা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও খেলা করি। আমরা সব শুনেছি। আমরা সে সময় থাকলে দশটা রাম লছমন সিংএরও সাধ্যি ছিল না আপনাকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দিতে। ওর ভাগ্যি ভাল যে তখন আমরা ছিলাম না। আমরা কালই একযোগে ষ্ট্রাইক ক'রে এই ভীষণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করব স্থির করেছি। আমরা কাল স্কুলে যাব, বেঞ্চে গিয়ে বসব, কিন্তু যেমন সেকেণ্ড বেল বাজবে অমনই সকলে হুরহুর ক'রে বেড়িয়ে পড়ব। তারপর যতক্ষণ না সেক্রেটারী ও হেড-মাষ্টার হাতযোড় ক'রে আপনাকে ডেকে না নিয়ে যাবে ততক্ষণ আমরা স্কুলে ঢুকব না।"

মাষ্টারম'শায় ছাত্রদের মুখে উত্তেজনার দীপ্তি ও রোষের রক্তাভা দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তিত হইলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে ভালবাসে তাহা তিনি জানেন কিন্তু তাহারা যে তাঁহার জন্য এরূপ উত্তেজিত হইতে পারে তাহা তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে ভালবাস বলেই এ ব্যাপারে এত চঞ্চল হয়ে পড়েছ, কিন্তু একটা কথা আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করব, তোমরা আমাকে খুশী করতে চাও, না দুঃখ দিতে চাও?"

প্রধান ছাত্র-নেতা বলিল, "আপনাকে দুঃখ দিতে চাইব আমরা!"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে তোমরা ধর্ম্মঘট করার কল্পনাও মনে স্থান দিও না। তোমরা আমার জন্য ধর্ম্মঘট করলে আমার যত দুঃখ হবে স্কুল-মাষ্টারী যাওয়াতেও তত হয় নাই। যদি তোমরা আমাকে সত্যই সুখী করতে চাও আমার জন্য কোন-রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রে মন দিয়ে পড়া-শুনা করতে থাক। এই ব্যাপারের জন্য কারও উপর দোষারোপ ক'র না। রাম-লছমন সিং, হেড-মাষ্টার ম'শায়, সেক্রেটারী ভবতারণবাবু, জমিদার জয়নারায়ণবাবু কারও কোন দোষ নাই।"

ছাত্রেরা সবিস্ময়ে কহিল, "যাঁর হুকুমে এই সব হয়েছে সেই জয়নারায়ণবাবুর দোষ নাই ?"

মাষ্টারম'শায় শান্তস্বরে কহিলেন, "না, তাঁরও দোষ নাই। এসব কার ইচ্ছায়, কার হুকুমে হয়েছে, জান ?"

ছাত্রেরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মাষ্টারম'শায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা সেই অন্যায়কারী ও অত্যাচারীর নাম জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইল।

মাষ্টারম'শায় কহিলেন, "আকাশের দিকে তাকাও। যাঁর ইচ্ছায়, যাঁর হুকুমে আকাশের বুকে মেঘের পর মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে, তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই হুকুমে এসব হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হ'লে আবার আমি তোমাদের মধ্যে যাব। তোমাদের মনে হ'তে পারে, কেন তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের এমন অসুবিধার মধ্যে ফেলেন ? যেমন মা-বাপ বা শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের কল্যাণের জন্যই তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার মনে করেন, তেমনই তিনিও আমাদের শিক্ষার জন্যই মধ্যে মধ্যে দুঃখ দিতে বাধ্য হন।"

ছাত্রেরা এই ব্যাপারের উত্তেজনাপূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বলিল, "মাষ্টারম'শায়, আমাদের কি আর অতদূর দেখবার মত দৃষ্টি আছে ? আসল কথা, আমরা আবার আপনাকে পেতে চাই।"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "তোমরা তো আমাকে হারাও নি। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। তোমাদের যখন ইচ্ছা আমার কাছে আসবে, কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকলে জিজ্ঞাসা করবে। ঝড় আসবে, বৃষ্টি নামতে আর দেরী নেই, তোমাদের এইবার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।" ছেলেরা নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু মাষ্টারম'শায়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল।

ছেলেরা চলিয়া গেলে মাষ্টারম'শায়ের মনে দীর্ঘ বিশ-বৎসরব্যাপী স্কুল-মাষ্টারীর স্মৃতি, কতদিনের কত ঘটনার কত কথাই জাগাইয়া তুলিল। হেড-মাষ্টার যদুবাবু মাষ্টারম'শায়ের প্রতি তেমন সন্তুষ্ট নহেন। তিনি সর্ব্বদা মাষ্টারম'শায়ের কার্য্যের মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং না পাইয়া দুঃখিতও হন। সকল শিক্ষকই হেড-মাষ্টারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন কিন্তু মাষ্টারম'শায় কখনও করেন না। হেড-মাষ্টারের বাড়ীতে কোন কাজ উপস্থিত হইলে মাষ্টারম'শায় ছাড়া আর সব শিক্ষকই ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া যান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা হেড-মাষ্টারের অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। ঘটনাটি এই।

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট স্কুল পরিদর্শনে আসিবেন। সাহেব বিলাতের কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং বিশেষ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী। কিন্তু সকলেই বলে তিনি বিশেষ খাম-খেয়ালী, কখন কি করিবেন কিছুই ঠিক নাই। স্কুল দেখা তাঁহার একটা বাতিক। মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া পাঠশালাও পরিদর্শন করিয়া থাকেন। হেড-মাষ্টারের আদেশে ছেলেরা স্কুল সাজাইতে লাগিল। হেড-মাষ্টার শিক্ষক এবং ছাত্রদের আদেশ দিলেন, সেদিন সকলে যেন পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিয়া আসে। তিনি মাষ্টারম'শায়কে বলিলেন, "শুনুন মাষ্টারম'শায়, বড় কড়া মেজাজের লোক সাহেব। এরকম আধ-ময়লা মোটা আট-হাতী ধুতি চলবে না। সাহেব দেখলে চ'টে লাল হবে। আপনার জন্য সমস্ত স্কুলের উপরেই একটা খারাপ ধারণা জন্মে যাবে। সাধারণ ভদ্রলোকের মত ধোয়া কাপড়-জামা প'রে আসবেন। গান্ধী প্যাটার্ণ চলবে না।"

তারপর দিন মাষ্টারম'শায় নিত্যকার মতই পরিচ্ছদ পরিয়া আসিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের আসার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। মনে থাকিলে ঐ কাপড়-জামাই আর একবার সাবানে কাচিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইতেন। কারণ অন্য কোন পরিচ্ছদ তিনি পরেন না, রাখেনও না। হেড-মাষ্টার মাষ্টার-ম'শায়কে নিত্যকার মত আধময়লা আটহাতী মোটা ধুতি ও জোলাদের বোনা অতি অল্পদামী কাপড়ের সেকেলে জামা এবং প্রতিদিন যাহা পায়ে দেন সেই পুরাতন চটি পরিয়া আসিতে দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইলেন। তিনি মাষ্টারম'শায়কে কহিলেন, "আপনার মত লোকের পক্ষে লোকালয়ে বাস না ক'রে বনে গিয়া তপস্যা করা উচিত।" তিনি মাষ্টারম'শায়ের অসাক্ষাতে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্যান্য শিক্ষকদিগকে বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট যে রকম কড়া মেজাজের খেয়ালী লোক তাতে আমার ভয় হয় 'ড্রাষ্টি থিং' ব'লে কিক্-আউট না করে।"

হেড-মাষ্টার মাষ্টারম'শায়কে বলিলেন, "আপনি এক কাজ করুন, বাড়ী ফিরে যান। আমরা বলব আপনি অসুস্থ ব'লে আসতে পারেন নি।"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "কেন আমার জন্য অসত্যের আশ্রয় নিতে যাবেন? আপনারা যখন সকলেই পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে এসেছেন তখন একজনের জন্য স্কুলের বদনাম হবে না।"

তখন স্থির হইল, লাইব্রেরী-কক্ষ, যেখানে সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইবে তথায় মাষ্টারম'শায়ের বসিবার চেয়ারখানি সকলের শেষে এবং কোণের দিকে এমন ভাবে রাখা হউক যেন সাহেবের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

স্কুলের লাইব্রেরী ঘরটি বেশ বড়। সেই ঘরের মাঝখানে রক্ষিত সুদৃশ্য চেয়ারের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটকে বসান হইল। সাহেব নিজে বসিয়া সকলকে বসিতে বলিলেন। শিক্ষকগণ বসিলে তিনি একে একে সকলের আপাদমস্তক এরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যে হেড-মাষ্টারের ভয় হইল তাঁহার দৃষ্টি মাষ্টারম'শায়ের উপর না পড়ে। অবশেষে কক্ষের প্রান্তে উপবিষ্ট মাষ্টারম'শায়ের দিকে সাহেবের দৃষ্টি শুধু যে আকৃষ্ট হইল তাহা নহে, তিনি প্রায় মিনিট খানেক একাগ্র দৃষ্টিতে মাষ্টারম'শায়কে দেখিতে লাগিলেন। হেড-মাষ্টার মনে মনে বলিলেন, তবেই হয়েছে।

সাহেবের সম্মুখেই একখানি খালি চেয়ার ছিল। তিনি মাষ্টারম'শায়কে লক্ষ্য করিয়া এবং সেই চেয়ারখানি দেখাইয়া ইংরেজীতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম,—"আপনার কষ্ট না হয় তো অনুগ্রহ ক'রে ঐ কোণ থেকে উঠে এসে এই চেয়ারখানায় বসুন। আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা কইবার ইচ্ছা।" হেড-মাষ্টারের মুখ শুকাইল। তিনি প্রমাদ গণিলেন।

মাষ্টারম'শায় মৃদু পদে অগ্রসর হইয়া সাহেবের সম্মুখস্থ খালি চেয়ারখানিতে বসিলে সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মনে কিছু করবেন না। আপনার নামটি আমার জানতে ইচ্ছা হয়।"

মাষ্টারম'শায় নাম বলিলে সাহেব কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী! তা হ'লে আপনি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ পুরোহিতের জাতি?"

মাষ্টারম'শায় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ। পুরোহিতের জাতি তো বটেই তা ছাড়া আমার পিতৃ পুরুষরা পৌরহিত্যই করতেন।"

সাহেব হাস্য সহকারে কহিলেন, "পণ্ডিত চক্রবর্ত্তী, আপনিও পুরোহিত। বিদ্যা-দেবীর মন্দিরের পৌরহিত্যই কি আপনার কার্য্য নয়? আপনার সাদাসিধা ভাব আমার বড় ভাল লেগেছে। এই সারল্যও পুরোহিত-সুলভ। আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে 'সাদাসিধা ভাবে জীবন-যাপন কিন্তু উচ্চ-চিন্তা' ইহাই আপনার জীবনের আদর্শ। নয় কি?"

মাষ্টারম'শায় মৃদু হাসিলেন সাহেব বলিলেন, "বেশ-ভূষার এইরূপ অনাড়ম্বর সাদা-সিধা ভাবই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করে। আপনাদের প্রধান রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধীকে একবার দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তখন যে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই জিলায় তিনি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেন সেই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায় এবং হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত মোটা কাপড় পরা মানুষটীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের আশ্রম দেখবার জন্য একবার আমি শান্তি-নিকেতনেও গিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কবির সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। তাঁর ভাব, ভঙ্গী ও ভাষার মধ্যেও আমি ভারতবর্ষকেই দেখেছিলাম। তাঁর আশ্রম ও সেখানকার শিক্ষা-প্রণালী দেখে মনে হয়েছিল, ভারতের দূর অতীতের তপোবনগু'লই এই যুগের উপযোগী কিছু নূতনত্ব নিয়ে বর্ত্তমানের বুকে আবার ব্যক্ত হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতায় বাহ্যাড়ম্বর-প্রীতি দিন দিন বড় বেড়ে উঠছে। কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। মনে কিছু করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে আপনার পড়া-শুনা কত দূর, জানতে ইচ্ছা হয়।"

মাষ্টারম'শায় উত্তর দিলেন, "ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বিদায় নিতে হয়েছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াতে পারেন?"

মাষ্টারম'শায় বিনয়ের সহিত বলিলেন, "সাধারণতঃ নীচের

ক্লাশগুলিতে পড়াই, কিন্তু আবশ্যক হ'লে উপরের ক্লাশ-গুলিতেও পড়াতে পারি।"

সাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীকেও পড়াতে পারেন?"

মাষ্টারম'শায় বিনীতভাবে বলিলেন, "হাঁ।"

সাহেবের বিস্ময় ও কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন, "মনে কিছু করবেন না। আপনি ম্যাট্রিক পাশ হ'য়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীকে কেমন পড়ান তা দেখবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মাচ্ছে।"

সাহেব হেড-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সময় আপনি কোন ক্লাশে পড়ান?"

হেড-মাষ্টার বলিলেন, "প্রথম শ্রেণীতে।"

সাহেব কহিলেন, "তা হ'লে এ সময় পণ্ডিত চক্রবর্ত্তী যে ক্লাশে পড়ান আপনি দয়া ক'রে সেই ক্লাশে গিয়ে পড়ালে ভাল হয়। অন্যান্য মাষ্টাররাও স্ব স্ব ক্লাশে গিয়ে পড়াতে পারেন। আমি দেখতে এসেছি আপনারা কি প্রণালীতে ছাত্রদের পড়ান। আশা করি আমার এই অদ্ভুত কৌতূহলের জন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না। পড়াবার প্রণালী সম্বন্ধে আমি একখানা বই লিখছি।"

ইহার পর ব্যবস্থা হইল সাহেব ও মাষ্টারম'শায় প্রথম শ্রেণীতে যাইবেন তথায় মাষ্টারম'শায় পড়াইবেন, সাহেব শুনিবেন।

প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে মাষ্টার-ম'শায় পড়াইতে লাগিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে পড়াতে অভ্যস্ত? মাষ্টারম'শায় বিনীত ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, স্কুলে যে সব বিষয়ে পড়ান হয় সমস্তই স্বল্প-বিস্তর পড়াতে চেষ্টা করি। সাহেব ইংরেজী সাহিত্যের পুস্তকখানি খুলিয়া একটি কবিতা দেখাইয়া তাহাই ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে বলিয়াছেন।

মাষ্টারম'শায় ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতির দিকে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ না দিয়া তন্ময় হইয়া পড়াইতেছেন। ছাত্রদের পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া সাহেব সবিস্ময়ে শুনিতেছেন। মাষ্টারম'শায়ের পড়াইবার প্রণালীতে সাহেব মুগ্ধ হইতেছেন। কবিতাটি পড়ান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাও বাজিয়া গেল। মাষ্টারম'শায় উঠিয়া আসিলে সাহেব সানন্দে তাঁহার করমর্দন করিয়া কহিলেন, "আমার মাতৃভাষায় রচিত এই চিরপরিচিত কবিতাটিকে আমিও এমন সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারব না। আমি অক্সফোর্ডের এম-এ। জাতিতে খাঁটি ইংরেজ। আমার বরাবর শিক্ষকতা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু শেষ-কালে ঘটনাচক্রে আই-সি-এস পাশ ক'রে চাকরী নিয়ে এদেশে আসতে হ'ল। চাকরীর সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে বা মানিয়ে নিতে পারি না ব'লে লোকে খাম-খেয়ালী বলে।"

সাহেব হেড-মাষ্টার প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষকদের শিক্ষা-প্রণালীও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। হেড-মাষ্টার প্রতিদিন যেরূপ পড়ান সাহেব সম্মুখে ব'সিয়া থাকার জন্য সঙ্কুচিত সেদিন তাহাও পারিলেন না। যাইবার পূর্ব্বে ভিজিটার্স বুকে মাষ্টারম'শায়ের পড়াইবার পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন, অন্য কোন শিক্ষকই এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহে। এমন কি মাষ্টারম'শায়ের সাদাসিধা পরিচ্ছদের প্রশংসা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিলেন না। ইহাও লিখিলেন, আজ কাল ছাত্রদের মধ্যে যেরূপ বাবুয়ানা বা বিলাসিতা দেখা যাইতেছে তাহাতে এইরূপ দৃষ্টান্তই আমি দরকার বলিয়া মনে করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন জয়নারায়ণবাবুর পিতা হরিনারায়ণবাবু জীবিত ছিলেন। কথা ছিল সাহেব স্কুল পরিদর্শনের পর হরিনারায়ণবাবুর গৃহে গিয়া চা খাইবেন এবং তারপর ফিরিয়া যাইবেন। সাহেব চা খাইবার সময় স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে কে কেমন পড়ান তাহা সংক্ষেপে হরিনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন। এমন কি শেষে হাস্য সহকারে রসিকতা করিয়া কহিয়াছিলেন,—যদি আপনার নিকট এমন দাঁড়ি-পাল্লা থাকে যাতে শিক্ষকদের দক্ষতা ওজন করা যায়, তা হ'লে আপনি নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন। একদিকে বসাবেন আপনার স্কুলের হেড-মাষ্টার ও অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের এবং অন্যদিকে বসাবেন এই ম্যাট্রিক-পাশ মাষ্টারটিকে। শেষে দেখবেন যে পাল্লায় এম-এ ও বি-এরা ব'সে আছেন সেইটিই উপরে উঠে পড়বে।

সাহেব হরিনারায়ণ বাবুকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা হেড-মাষ্টারের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সেই দিন হইতে হেড-মাষ্টার মাষ্টারম'শায়ের প্রতি আরও অসন্তুষ্ট। সাহেবের

উচ্চপ্রশংসা মাষ্টারম’শায়ের গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অন্তরেও একপ্রকার ঈর্ষা ও অসন্তোষ জাগ্রত করিয়াছিল। তাঁহারা মাষ্টারম’শায়ের টিউটশনীগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। অভিভাবকদের নিকট বলিয়াছিলেন, আপনারা যখন সেই টাকাতেই বি-এ পাশ পাচ্ছেন তখন ম্যাট্রিক পাশের দ্বারা ছেলে পড়াতে যাবেন কেন? অভিভাবকদের উত্তর শুনিয়া তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সাত

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সমস্ত আকাশ ধূম্র-ধূসর জলদ-জালে জড়িত হইয়া পড়িল। মেঘের বুক চিড়িয়া বিদ্যুল্লতা বার বার ব্যক্ত হইতে লাগিল। বজ্রের গর্জ্জনে দশদিক কাঁপাইয়া তুলিল, যেন ক্রুদ্ধ রুদ্রের ভৈরব ভেরী সারা বিশ্ব বিকম্পিত করিয়া বার বার বাজিয়া উঠিতেছে। প্রথমে মন্দ-মন্দ ও বিন্দু-বিন্দু, তারপর বেগে ও ধারাকারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগও বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি উভয়ে মিলিয়া যেন তাণ্ডব নৃত্য সহকারে প্রলয়-লীলা আরম্ভ করিল। বাহিরের বারান্দায় বসিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব কাণ্ড কিছুক্ষণ দেখিবার পর মাষ্টারম’শায় সান্ধ্যকৃত্য করিবার জন্য ভিতরে আসিলেন। যাঁহার আদেশে বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই মেঘ-মেদুর আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারা অজস্র ঝরিতেছে এবং ঝঞ্ঝা ও বজ্র রুদ্ররবে গর্জ্জন করিতেছে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিয়া যাঁহার কল্যাণ-কামনাই প্রকাশিত হইতেছে সেই পরম দেবতার উদ্দেশ্যে মাষ্টারম’শায় বার বার প্রণাম করিলেন। বৈদিক সন্ধ্যা ও সান্ধ্য উপাসনা শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের "বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা" এই সঙ্গীতটী অশ্রু-সিক্ত-নয়নে গাহিলেন। মাষ্টারম’শায় নিত্যই প্রাতঃ-কৃত্য ও সান্ধ্য-কৃত্য সমাপনের পর যে কোন একটি তত্ত্ব-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন।

প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড প্রলয়-নৃত্যের মধ্যে টিউশনী করিতে যাওয়া অসম্ভব জানিয়া মাষ্টারম’শায় অধ্যয়নে রত রহিলেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কীয় পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি মস্তিষ্কের উপর বিভিন্ন ভেষজের ক্রিয়া সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পাঠের সময় তাঁহার সমগ্র মন পাঠ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যায় বলিয়াই পুস্তকের শিক্ষা তাঁহার পক্ষে এতদূর আয়ত্ত করা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ একাগ্রতার জন্যই তিনি সুদক্ষ শিক্ষক ও চিকিৎসক হইতে পারিয়াছেন। মাষ্টারম’শায় পড়া শেষ করিয়া যখন উঠিলেন তখন দশটা বাজিয়াছে। বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য তখনও তেমনিই চলিতেছে।

নিত্যই নিস্তারিণী দেবী দশটার সময় তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত ডাকিয়া থাকেন। কিন্তু কই আজ তো ডাকিলেন না? তবে কি তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন? মাষ্টারম’শায় রন্ধন-শালার দিকে গিয়া দেখিলেন রান্না-ঘর বন্ধ, সেখানে কেহই নাই। অন্যান্য ঘরে খুঁজিলেন। দেখিলেন ছেলে-মেয়েরা ঘুমাইয়া আছে, ছোট ছেলেটিও ঘুমাইতেছে, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী নাই। বিস্মিত হইলেন সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও জাগিল। এই দারুণ দুর্য্যোগে তিনি কোথায় যাইবেন? মাষ্টারম’শায় সন্ধ্যার পরেও পত্নীকে গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত দেখিয়াছেন। সুতরাং ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বেই রাগ করিয়া চাঁদেরহাট চলিয়া গিয়াছেন, ইহা হইতে পারে না। সন্ধ্যার পর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই কোথাও যাইবেন, তাহাও অসম্ভব। মাষ্টারম’শায় জানেন, নিস্তারিণী দেবী রোষ বা অসন্তোষের বশে উত্তেজিত হইয়া অনেক কথা বলেন বটে কিন্তু উত্তেজনার বশে কোন অসঙ্গত বা অন্যায় কার্য্য করিবেন, এরূপ স্বভাব তাঁহার নহে। কিন্তু ক্রোধ-প্রবণ প্রকৃতি সত্ত্বেও তিনি অতিশয় পতি-পরায়ণা ও সন্তান-বৎসলা, এই সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই দুর্য্যোগ-নিশায় পতি ও পুত্র-কন্যাগণকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া নিস্তারিণী দেবীর ন্যায় নারীর পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তবুও মাষ্টারম’শায়ের মন এক প্রকার আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মুণীশের মা!" কোন সাড়া আসিল না, শুধু অন্ধকারের মধ্যে ধ্বনিত প্রলয়-নৃত্য-মত্ত প্রকৃতির অট্টহাস্য শুনা গেল। পুনরায় ডাকিলেন, তবুও কোন সাড়া মিলিল না। পুনরায় ঘরে ঘরে খুঁজিলেন, কিন্তু পত্নীর সাক্ষাৎ পাইলেন না। ভাবিলেন, মুণীশ ও মায়াকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিব না কি? কিন্তু নিদ্রিত পুত্র-কন্যাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না। এতরাত্রে এবং এই

দুর্যোগে তিনি প্রতিবেশীর গৃহে যাইবেন, ইহাও তো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে খিড়কির দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে দেখিলেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না সেই মূর্ত্তি নিস্তারিণী দেবীর। ইহাতে বুঝিলেন তিনি গো-শালায় গিয়াছিলেন। এই সময় নিস্তারিণী দেবী গোয়ালে যাইবেন ইহা মাষ্টারম'শায় কল্পনা করিতে পারেন নাই। নিস্তারিণী দেবী একখানি বস্তায় মস্তক আবৃত করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তবুও বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছেন।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, "তুমি তো পরের দুঃখ দেখে বেড়াচ্ছ কিন্তু তোমার নিজের গোয়ালে গরুগুলোর কি কষ্ট হচ্ছে তা একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখছ কি? গোয়ালের চাল দু'বছর ছাওয়া হয় নি। চালের একটা দিক একেবারে প'চে গিয়েছে। সেই দিকের খানিকটা আজকের ঝড়ে উড়ে যাওয়ায় গোয়ালের একটা পাশে বৃষ্টির জল ঢুকে কাদা হয়ে গিয়েছে। পচা চালের কথা হঠাৎ মনে পড়ায় দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি যা ভেবেছি তাই হয়েছে, এপাশের গরু দুটো কাদার উপর দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমি গরু দুটোকে ওধারে বেঁধে রেখে এলাম।"

মাষ্টারম'শায় নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিলেন। কেন তিনি মাঝে মাঝে গোয়ালের অবস্থা দেখেন না? মানুষ তবু নিজের দুঃখ কথায় প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যে অসহায় অবোলা প্রাণীর দল তাহা পারে না তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা পালকের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য নয় কি?

মাষ্টারম'শায় দুঃখের সহিত কহিলেন, "আমাকে ডাকলে না কেন?"

নিস্তারিণী দেবী উত্তর দিলেন, "তোমাকে ডাকব? দেখলাম বইএর দিকে চেয়ে তুমি এমন ভাবে ব'সে আছ যে সমস্ত বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়লেও বোধ হয় তুমি জানতে পারতে না।"

মাষ্টারম'শায় তখন কাপড় ছাড়িয়া একখানি গামছা পরিলেন। একটি করোগেট সীট বহুদিন হইতে রাখা ছিল। সেই সীটটি এবং একখানা মই লইয়া তিনি গোয়ালের দিকে চলিলেন। পত্নীকে কহিলেন, "যখন ভিজেই গিয়েছ তখন আলোটা দেখাও।"

নিস্তারিণী দেবী নিষেধ করিয়া কহিলেন, "কেন এত রাত্রিতে এই বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করতে যাবে। আমি তো গরু দু'টোকে ওধারে বেঁধেই এসেছি।"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "তাহ'লেও আমার মন মানবে না, মৃণালের মা। আমি সারারাত ঘুমুতেই পারব না।" মাষ্টারম'শায় গোয়ালে গিয়া মইএর সাহায্যে চালে উঠিয়া করোগেট সীটটিকে রাখিলেন। গামছা ছাড়িয়া এবং গা মুছিয়া মাষ্টারম'শায় আহার করিলেন। তিনি রাত্রিতে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। আহারের পর যখন শয়ন করিলেন তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মাষ্টারম'শায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল কে যেন ডাকিতেছে। এত রাত্রিতে, এই দুর্য্যোগে কে ডাকিবে! বৃষ্টির শব্দ এবং ঝড়ের গর্জ্জনে সেই ডাক স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না কিন্তু কেহ ডাকিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "মাষ্টারম'শায়! মাষ্টারম'শায়!" ডাকটিকে নারী-কণ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। এই বর্ষণ-ব্যাকুল ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ রাত্রিতে—এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোন্ নারী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? এইরূপ রাত্রিতে সাহসী পুরুষের পক্ষেও বাহির হওয়া সহজ নহে। তবে কি কোন পুরুষহীন গৃহের নারী ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণের জন্য বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছে? সেইরূপ ডাকে দুই একবার দুর্য্যোগের মধ্যেও তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে বটে কিন্তু এরূপ দুর্য্যোগ-রজনীতে তাঁহাকে কেহ কখন ডাকে নাই।

মাষ্টারম'শায় বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। বারান্দায় যে লণ্ঠনটি মৃদু-মৃদু জ্বলিতেছিল তাহা ঝড়ের ঝাপটে নিভিয়া গিয়াছে। মাষ্টারম'শায় লণ্ঠনটি জ্বালিয়া বহির্ব্বাটির বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, আপাদ-মস্তক আবৃত এক মনুষ্য-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তি পুরুষ কি নারী বুঝিবার উপায় নাই। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে টর্চ্চ। আচ্ছাদনটিকে বর্ষাতি বলিয়া মনে হইল। মূর্ত্তিটি আচ্ছাদন সরাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিলে মাষ্টারম'শায় একটি অপরিচিত প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমাকে চিনবেন না।

আমি আপনাদের বৌ-রাণীর বাপের বাড়ীর ঝি। দিদিমণি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। একখানা চিঠিও দিয়েছেন।" এই বলিয়া সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মাষ্টারমশায়ের হস্তে দিল। স্বরূপগঞ্জের প্রবল-প্রতাপ জমিদার স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর রায়ের একমাত্র কন্যা, গোবিন্দপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার বিপুল সম্পদের অধিকারী ঐশ্বর্য্যাভিমানী জয়নারায়ণবাবুর পত্নী তাঁহাকে এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে পত্র পাঠাইয়াছেন! যিনি অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই, স্কুল হইতেও বিদায় দিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এই প্রলয়-নিশায় পত্র পাঠাইবেন! মাষ্টারমশায় অতিশয় বিস্ময়ের সহিত সেই পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র এইরূপ—

বাবা!

খোকার অবস্থা খুবই খারাপ। আমার তো প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি সব শেষ হ'ল। জানেন বোধ হয়, ক'লকাতা হ'তে বড় ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে না জানালেও আমি জানি, তিনি একরকম জবাব দিয়েই গিয়েছেন। এখন ভরসা শুধু আপনি। আপনাকে দেখবার আগেই যদি খোকা তার মায়ের কোল খালি ক'রে চ'লে যায় তা হ'লে চিরদিনের জন্য তার মায়ের মনে একটা আপশোষ থেকেই যাবে। আপনি কাল দেখতে এসেছিলেন কিন্তু আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। কেন হয় নি, তাও আমি জানি। জানি ব'লেই এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে আপনাকে এ রকম পত্র লিখতে সাহসী হয়েছি। আপনি সম্পদশালীর ছেলেকে দেখবার আগে দরিদ্রের ছেলেকে দেখতে গিয়ে যে মহৎ প্রাণের পরিচয় দিয়েছেন, জানি সেই প্রাণ অশেষ-আশঙ্কায় আকুল মাতৃ-হৃদয়ের প্রার্থনা পূর্ণ না ক'রে থাকতে পারবে না। এই দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে আপনাকে কষ্ট দিতে আমার কতখানি কষ্ট হচ্ছে তা অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু কি ক'রব, আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। আজ সমস্ত দিনই চেতনার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছন্ন ভাব চারদিন চলছে। সন্ধ্যা হ'তে উর্দ্ধশ্বাস যাকে বলে, তাই আরম্ভ হয়েছে। মায়ের বুকে যে বেদনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে বাইরের এই দুর্য্যোগ অপেক্ষা সে যে কতগুণ ভয়ঙ্কর তা আপনার মত ব্যথিতের বন্ধুকে জানাতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। মোটর বা পাল্কী পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু একে আমার মনের এই অবস্থা, তার উপর এই দুর্য্যোগ। তা ছাড়া আমার স্বামীকে না জানিয়েই আমাকে এ কাজ করতে হচ্ছে। পরাণ বাগদীর ছেলেকে আগে দেখে তারপর তাঁর ছেলেকে দেখতে চেয়ে আপনি তাঁর অপমান করেছেন, এই ভুল ধারণা তাঁর মন হ'তে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে তাঁর এই ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গবে। যে সৎসাহসের দৃষ্টান্ত আপনি দেখিয়েছেন তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করছি ব'লে আপনি আমাকে সেই দয়া হ'তে বঞ্চিত করবেন না। ঝি-চাকরদের মুখে আপনার দয়ার কথা সর্ব্বদাই শুনতে পাই। তারা যা বলে তাতে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার মত দীন-দরিদ্রের বন্ধু এখানে আর কেউ নাই। আজ আমার মত দীনাও তো আর কেউ নয়। সেই দীনাই আপনার কৃপার প্রত্যাশায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে শয়ান পুত্রের পাশে ব্যাকুল হ'য়ে ব'সে আছে। যখন পত্র লিখবার জন্য কলম হাতে ক'রে ভাবছি, আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করব, তখন কলমের মুখে অতি সহজেই বেরিয়ে এল 'বাবা!'। ইতি

আপনার কন্যা

প্রণতা

মমতা

মাষ্টারমশায় শুনিয়াছেন জয়নারায়ণবাবুর স্ত্রী যেমন সুন্দরী তেমনই শিক্ষিতা। পত্রের মধ্যে লেখিকার মনের যে পরিচয় মাষ্টারমশায় পাইলেন তাহাতে তিনি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আকুল মমতাময় মাতৃ-হৃদয়ের এই সকাতর আহ্বান উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সে জন্য তিনি সকল প্রকার বিপদকে বরণ করিতে প্রস্তুত। আর ভাবিবার অবসর নাই। ঝিকে দাঁড়াইতে বলিয়া তিনি ভিতরে গিয়া নিস্তারিণী দেবীকে জাগাইয়া বলিলেন, "মুণীশের মা, আমি জয়নারায়ণবাবুর ওখানে যাচ্ছি।"

নিস্তারিণী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এই রাত্রে? এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে? বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন বুঝি? ছেলের অবস্থা কেমন?"

মাষ্টারম'শায় উত্তর দিলেন, "ছেলের অবস্থা ভাল নয়। বাবু ডাকেন নি, ডেকেছেন বৌ-রাণী।"

নিস্তারিণী দেবীর বিস্ময় বৃদ্ধি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু ডাকলেন না, ডাকলেন বৌ-রাণী, এর মানে কি?"

মাষ্টারম'শায় মমতাদেবীর পত্রখানি পত্নীর হাতে দিয়া বলিলেন, "পত্রখানি পড়লেই সব বুঝতে পারবে। আমি আর এক মিনিটও দাঁড়াতে পারব না। কোন ভয় ক'র না, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও।"

মাষ্টারম'শায় একটি মাঝারি রকমের ঔষধের বাক্স সঙ্গে লইলেন। যে সকল ঔষধ প্রয়োজন হইতে পারে তাহাদের সকলগুলি সঙ্গে লওয়া ভিন্ন এ অবস্থায় উপায় নাই। ঝি ঔষধের বাক্সটি মাষ্টারম'শায়ের হাত হইতে লইল এবং মাষ্টারম'শায় ঝির হাত হইতে টর্চচটি লইয়া পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিলেন। ঝি আবার বর্ষাতির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছে। মাষ্টারম'শায় একটি মোটা সাদা চাদর মাথায় এবং গায়ে জড়াইয়াছেন। গায়ে জামা বা পায়ে জুতা নাই। বাতাসের যেরূপ বেগ তাহাতে ছাতা চলিতে পারে না।

ভট্টাচাজপাড়া হইতে বাবুপাড়া এক মাইলের কিছু কম। তাঁহারা যথাসম্ভব বেগে চলিয়া চৌধুরী-বাড়ীর ফটকের নিকট আসিলে ঝি আগাইয়া গেল। ফটক বন্ধ ছিল। ঝি তন্দ্রালস দ্বারোয়ানকে ফটক খুলিয়া দিতে বলিলে সে খুলিয়া দিল। এই দ্বারোয়ানটি নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। সে এই গ্রামের কাহাকেও চিনে না। ঝি তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল খোকাবাবুর অসুখ বেশী হওয়ায় সে ডাক্তারকে ডাকিবার জন্ম যাইতেছে। যখন সে ডাক্তার লইয়া ফিরিবে তখন যেন তাড়াতাড়ি ফটক খুলিয়া দেওয়া হয়।

তাঁহারা যখন পথে আসিতেছিলেন তখন বাতাসের বেগ ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি বিন্দু-বিন্দু পড়িতেছিল। তবে আকাশে মেঘের সমারোহ তখনও তেমনই চলিতেছিল। তাঁহারা যেমন চৌধুরী-বাড়ীর ফটক ও দেউড়ির পরবর্ত্তী প্রাঙ্গন পার হইয়া বহির্বাটির বারান্দায় উঠিলেন অমনই আবার বৃষ্টিধারা বেগে নামিয়া আসিল। বহু কক্ষ এবং কয়েকটি হল, দর-দালান ও একটি প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অন্দরের বহির্ভাগের উচ্চ বারান্দায় আসিলেন। এই স্থানে পা ধুইবার জল, গামছা, তোয়ালে, সাবান, শুষ্ক বস্ত্র প্রভৃতি রক্ষিত ছিল।

ঝি মাষ্টারম'শায়ের পা ধুইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, মাষ্টারম'শায় ব্যস্তভাবে তাহার হস্ত হইতে জলের পাত্রটি লইয়া নিজে ধুইলেন। পরিহিত কাপড়খানি ভিজে নাই বলিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করিলেন না। বারান্দার পর একটি দর-দালান, তারপর একটি সুসজ্জিত হল। হলে একটি বড় ঘড়ি ছিল। মাষ্টারম'শায় ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেড়টা বাজিয়াছে। হলের দুই পাশে দুইটি ঘর। ঝিকে অনুসরণ করিয়া মাষ্টারম'শায় ডান দিকের ঘরটিতে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত এবং বহু বাতায়ন বিশিষ্ট। কলিকাতার ডাক্তারের ইচ্ছায় শিশুকে এই ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ এই ঘরের পার্শ্বেই মুক্ত মাঠ। পূর্ব্বে অন্দরের কেন্দ্রস্থ যে ঘরে শিশুকে রাখা হইয়াছিল তথায় মুক্ত মাঠের অবাধ বায়ু আসিবার উপায় ছিল না। শিশুর অসুখ যখন আরম্ভ হয় তখন সে জয়নারায়ণবাবুর দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষে ছিল। পরে চিকিৎসার সুবিধার জন্ম তাহাকে নিম্নতলে আনা হয়।

কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক তৈল চিত্র। প্রাচীরের পার্শ্বে একখানি বড় টেবিলের চারিধারে কয়েকখানি চেয়ার। মাষ্টারম'শায় সেই টেবিলের উপর গায়ের চাদরখানি খুলিয়া রাখিলেন। কক্ষের বক্ষস্থলে রক্ষিত একখানি প্রকাণ্ড পালঙ্কের অঙ্কে শুভ্র শয্যার উপর শ্বাসের জন্ম সংগ্রামরত সংজ্ঞা-শূন্য শিশু। শিশুর পার্শ্বে উপবিষ্ট বিষাদ করুণ মনোরম মূর্ত্তিকে অপরূপ রূপবতী মমতাদেবী বলিয়া বুঝিতে মাষ্টারম'শায়ের পক্ষে বিলম্ব হইল না। যেন কোন সুদক্ষ ভাস্কর দুগ্ধ শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তর ক্ষোদিত করিয়া একখানি নিখুঁৎ নারীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়াছেন। মাষ্টারম'শায় মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন যিনি সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। সেই করুণ-মাধুর্য্য মণ্ডিত বিষাদ মলিন মুখে—সেই অশ্রু ছল-ছল আয়ত চক্ষুতে—সেই মমতাময়ী মাতৃ মূর্ত্তিতে মাষ্টারম'শায় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাইলেন। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আকুল সেই স্নেহ বিহ্বল মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে তিনি জগজ্জননীর পালনী শক্তির প্রকাশই যেন দেখিতে

পাইলেন। পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি ছোট টেবিল ছিল। ঝি তাহার উপর ঔষধের বাক্সটী রাখিল।

মমতাদেবী ঝিকে কহিলেন, "বাবাকে শুকনো কাপড় দাও নি?"

মাষ্টারম'শায় মমতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার কাপড় তো ভেজে নি। আমরা যখন পথে তখন বৃষ্টি অতি সামান্যই প'ড়ছিল, আমরা এখানে পৌঁছাবার পর আবার জোরে প'ড়তে লাগল।"

ঝড়ের জন্য ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করা হইয়াছিল। মাষ্টারম'শায় দূরের দুইটি জানালার মধ্যে একটি খুলিয়া দিলেন। বাতাস আসিতে লাগিল বটে কিন্তু পর্দা ছিল বলিয়া অত বেগে প্রবেশ করিতে পারিল না। পালঙ্কের পার্শ্বস্থ ছোট টেবলটির উপর রক্ষিত একটি টাইমপিস ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া কালস্রোত যে অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে, এই কঠোর সত্যই যেন ঘোষণা করিতেছিল। শিশুর শ্বাস-গ্রহণ চেষ্টার শব্দ ঘরের বিষাদ-গম্ভীর স্তব্ধতার ভিতর মমতাদেবীর কর্ণে মৃত্যুর পদধ্বনির মত শুনাইতেছিল। চারিদিকের ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে যেন অট্টহাস্যে উপহাস করিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল এই অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রকাণ্ড প্রাসাদ, সুখের জন্য এই অশেষ আয়োজন সমস্তই বৃথা। এই যে সমারোহ, এই যে শোভা—ইহা নিশ্চিতরূপে চলিয়াছে মরণের পানে শ্মশানের দিকে।

মাষ্টারম'শায় শিশুর পার্শ্বে বসিবামাত্র মমতাদেবী অতি সন্তর্পণে সরিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের নিকট মাথা নোয়াইয়া এবং পা-দুটি স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। মাষ্টারম'শায়ের মনে হইল দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল। মাষ্টারম'শায়ের স্বভাব কেহ পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে ব্যস্তভাবে সরিয়া গিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় নীরবে প্রণাম লওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মাষ্টারম'শায় কহিলেন—মা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমার পুত্রকে রোগমুক্ত এবং দীর্ঘজীবি ও চিরসুখী করুক।

মমতাদেবী করুণ কণ্ঠে কহিলেন—আপনাকে এই দুর্য্যোগের মধ্যে এত রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে এনে কত কষ্টই দেওয়া হ'ল। মেয়ের সব অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "মা, মায়ের ডাকে ছেলে ছুটে এলে সেখানে মায়ের দিক হ'তে কোন কৈফিয়ৎ দরকার করে না, কষ্ট দেওয়ার কথাও উঠতে পারে না। ছেলের কর্ত্তব্যই হচ্ছে মায়ের ডাকে আসা।" এই বলিয়া মাষ্টারম'শায় শিশুর ডান হাতখানি তুলিয়া লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শিশুর হাতের তল হিম-শীতল। নাড়ী পরীক্ষার পর তিনি শিশুর সর্ব্বাঙ্গ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী মমতাদেবী জিজ্ঞাসা না করিতেই পুত্রের রোগের ও চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে জানাইলেন। অবশেষে কহিলেন, "ক'ল্‌কাতার ডাক্তারের ঔষধ দুইবার খাওয়ানর চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু গিলতে পারে নি, ঔষধ গাল বেয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। পূর্ব্বেও ক'দিন অনেক কষ্টেই ঔষধ খাচ্ছিল। বেশী ঔষধ জোর ক'রে খাওয়ানই অন্যায় হয়েছে। সন্ধ্যার সময় খোকার বাবা এখানকার ডাক্তারদের ডাকতে চাইলেন, আমিই মানা করলাম। আমি বল্‌লাম, যদি আমার কোল হ'তে কেড়ে নেওয়াই তাঁর ইচ্ছা হয়, বাছার শেষ মুহূর্ত্তগুলি শান্তিময় হ'তে দাও।"

শেষের বাক্যটি বলিবার সময় মমতাদেবীর কণ্ঠ একটু কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুতেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

মাষ্টারম'শায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, যে শ্বাসকষ্ট দেখা যাইতেছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ পেট অতিরিক্ত ফাঁপিয়া উঠা। অন্ত্র ও পাকস্থলীকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধি-বিষ বিকাশ লাভ করিয়াছে উহা অবশেষে মস্তিষ্ক কেন্দ্রকেও আক্রমণ করিয়া শিশুর সংজ্ঞা হরণ করিয়াছে। অতএব এমন ঔষধ দিতে হইবে যাহার ক্রিয়া অন্ত্র ও পাকস্থলীকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ শিশুর সমগ্র শরীরে প্রভাব বিস্তার করিবে। মাষ্টারম'শায় ঔষধের বাক্সটি খুলিয়া একটি শিশি হইতে একটি মাত্র শুভ্র গোলক বা গ্লোবিউল বাহির করিয়া তাহা অতি সন্তর্পণে শিশুর জিহ্বার উপর রাখিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শিশুর জিহ্বা ঈষৎ নড়িল বলিয়া বোধ হইল। মাষ্টারম'শায়ের আদেশে ঝি দূরের অপর জানালাটিও খুলিয়া দিল। ঝড়-বৃষ্টির উদ্দাম অভিনয়ও তখন চলিতেছিল। মমতাদেবীর মনে হইতেছিল যেন প্রকৃতি কোন দুঃসহ যন্ত্রণায় উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া

অজস্র অশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত করিতেছে। কখন মনে হইতেছিল যেন ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ-প্রদীপের ক্ষীণশিখাটুকুকে নিভাইবার জন্যই প্রকৃতি আজ রুদ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়নৃত্যে মত্ত হইয়াছে।

মাষ্টারম'শায় ঔষধ দিবার পর শিশুর ডান হাতখানি নিজের হাতে লইয়া এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যিনি নিখিল-প্রাণের উৎস ও নিয়ন্তা শিশুর প্রাণের জন্য মনে মনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন প্রায় এইরূপ দুর্যোগ-নিশায় তিনি তাঁহার প্রথম জাত পুত্রের প্রাণের জন্যও কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই। মাষ্টারম'শায় ভাবেন, সেই দুর্যোগ-রাত্রির কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করা হইলে আজ হয় তো তাঁহার অন্তর সকল শোকার্ত্ত পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত না, প্রত্যেক রোগার্ত্ত শিশুর মধ্যে আপনার রোগ-কাতর পুত্রের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য হয় তো এরূপ উদগ্র ব্যগ্রতা অনুভব করিতেন না।

মমতাদেবী কখন শিশুর আসন্ন-মৃত্যু-ছায়া-মলিন মুখের দিকে সাশ্রুনেত্রে, কখনও বা পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য প্রবল প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত মাষ্টারম'শায়ের সমবেদনাময়পূর্ণ চিন্তাগম্ভীর মুখের দিকে বিস্ময় ও সম্ভ্রম-ভরা দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। যুবতীর পক্ষে অপরিচিত পুরুষের প্রতি চাহিয়া থাকিতে সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মমতাদেবী কোন প্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিতেছেন না। যখন মাষ্টারম'শায় 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখেও মমতা দেবী শিশুসুলভ নিষ্কলুষ সারল্যই দেখিতে পাইতেছেন। দাস-দাসীদের মুখে মাষ্টারম'শায়ের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা বা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সময় তাঁহাকে তদপেক্ষাও সুন্দরতর ও মহত্তর বলিয়াই মনে হইয়াছে।

আমরা এতক্ষণ মাষ্টারম'শায়ের আকৃতি সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব বলিলে তাঁহার আকারের পরিচয় দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ গৌর না হইলেও তাঁহার বর্ণ প্রায়ই গৌর। ললাট প্রশস্ত। চক্ষু বিস্তৃত। দৃষ্টি উজ্জ্বল কিন্তু বিনয়-নম্র। নাসিকা উন্নত। মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্য-জ্ঞাপক। মুখের ভাব চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁহাকে হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে কেহ কখন দেখে নাই। শরীর মোটা নহে কিন্তু সুগঠিত। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন মাষ্টারম'শায়ের বয়স চল্লিশ বৎসর; কিন্তু দেখিলে বত্রিশ বা তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক বলিয়া মনে হইত। সুতরাং প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলেও তাহার আকৃতি তখনও যুবকের মতই। আমাদের মনে হয় শুচি শুভ্র সংযতজীবন যাপনের জন্যই এরূপ হইয়াছে। এই বিষয়ে সংশয় নাই যে মমতাদেবীর সঙ্কুচিত না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ মাষ্টারম'শায়ের স্বভাবগত এই শুচিতা ও সংযম। চরিত্রহীনের সহিত একাসনে বসিয়া কথা কহিতে নারীমাত্রই স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইবেন। মমতাদেবীর বয়স বাইশ বৎসর।

যখন ঝি অনুবর্ত্তী হইয়া মাষ্টারম'শায় কক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন মমতাদেবীর মনে হইল না কোন অপরিচিত ও অনাত্মীয় লোক প্রবেশ করিতেছে। চির-পরিচিত ও পরমাত্মীয় বলিয়াই বোধ হইল। মাষ্টারম'শায়ের ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে কুণ্ঠার কণামাত্রও ছিল না। সেই অপরূপ রূপবতী তরুণী সেই প্রতাপান্বিত জমিদারের কন্যা সেই বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর পত্নীর সহিত একাসনে বসিতে তিনি কোনও সঙ্কোচ বা দ্বিধা অনুভব করেন নাই, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই বসিয়াছিলেন। মমতাদেবী তাঁহার কন্যা বা মাতা হইলে তিনি যে-ভাবে আসিয়া বসিতেন ঠিক সেই ভাবেই আসিয়া শিশুর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং তাঁহাকে না জানাইয়া মাষ্টারম'শায়কে ডাকাইতেছেন বলিয়া যে আশঙ্কা তাঁহার মনে পূর্ব্বে জাগিয়াছিল মাষ্টারম'শায়কে দেখিবার পর তাহা চলিয়া গিয়াছিল বলিলেও ভুল হয় না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে শায়িত পুত্রের চিকিৎসা-রত এই তেজস্বী পুরুষের সম্মুখ তাঁহার বিশেষ ঐশ্বর্য্যাভিমানী স্বামীও সেরূপ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, শিশুর শ্বাস লইবার কষ্টকর চেষ্টার যেন কিছু উপশম ঘটিয়াছে। মাষ্টারম'শায় দেখিলেন পেটের ফাঁপ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। মমতাদেবী শিশুর মুখের ভাবের মধ্যেও যেন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। কে জানে ইহা তাঁহার মমতাময় মনের বা অনিদ্রা-

দুর্ব্বল চোখের ভুল কি না ? আরও আধ ঘণ্টা অতীত হইল। শিশুর শ্বাসের ভাব আরও হ্রাস হইল। এখন যে অবস্থা তাহাকে জোরে জোরে শ্বাস লওয়া বলা চলে। পেটের কাঁপ আরও কমিয়া গিয়াছে। এবার মমতাদেবী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, শ্বাসের জন্য সংগ্রাম হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শান্তভাবের আভাস শিশুর মুখে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। সহসা তাঁহার সমস্ত বুক আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল, সুন্দর মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া পড়িল। রোগ-দুঃখ-কাতর দেহের দিক্ দিয়া যাহাকে অনন্ত শান্তি বলা চলে সকল সংগ্রামকে শেষ করিতে তাহাই নামিয়া আসিল না ত'? কিন্তু মাষ্টারম'শায়ের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইতেই সে আশঙ্কা দূর হইল। মাষ্টারম'শায় ঔষধের শিশি হইতে আর একটি ক্ষুদ্র ও শুভ্র গোলক বাহির করিয়া শিশুর জিহ্বায় রাখিলেন। এবার ঔষধ রাখিবামাত্রই শিশুর জিহ্বা নড়িয়া উঠিল, যেন জিহ্বা ঔষধের স্পর্শ অনুভব করিল।

মাষ্টারম'শায় মমতাদেবীর দিকে সহানুভূতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "মা, সারা রাত জেগে ব'সে আছ, ঐখানেই একটু গড়িয়ে নিলে ভাল হ'ত। ঘুম আসবে না জানি, কিন্তু তবুও একটু চোখ বুঁজে প'ড়ে থাক্‌লে অনিদ্রার জড়তা অনেকটা কেটে যায়।"

মমতাদেবী কহিলেন, "আমার পক্ষে চোখ বুঁজে প'ড়ে থাকাও অসম্ভব, বাবা। খোকার বাবা বারোটা পর্য্যন্ত এখানে ব'সেছিলেন; আমিই তাঁকে বল্‌লাম, 'তুমি শোও গে, দরকার হ'লে তোমায় ডাক্‌ব।' সন্ধ্যার পর হ'তেই দারুণ দুর্য্যোগ সত্ত্বেও আপনাকে ডাক্‌বার সুযোগ আমি খুঁজছিলাম। তিনি শুতে গেলে সেই সুযোগ পেলাম। যে সময়ে ঘুম সব চেয়ে প্রয়োজন সেই সময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে আপনাকে টেনে আনলাম। ঝিকে ব'লে দিচ্ছি পাশের হলে আপনার বিছানা ক'রে দিক্। সেই বিছানায় একটুখানি গড়িয়ে নিন্।"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "আমার পক্ষে শোওয়া চল্‌তে পারে না, মা। ঔষধ কি রকম ক্রিয়া করছে আমাকে সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে।"

কক্ষটি স্তব্ধ। টাইমপিসের টিক্ টিক্ শব্দ সেই স্তব্ধতাকে আরও বাড়াইতেছে বলিলে ভুল হয় না। মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টির বেগ কমিয়া গিয়াছে, বাহ্য-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মাষ্টারম'শায় শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শিশুর অপর পার্শ্বে বসিয়া মমতাদেবী একখানি ছোট পাখায় পুত্রের মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন। তিনি কখন পুত্রের দিকে, কখন মাষ্টারম'শায়ের দিকে, কখন বা সময় নিরূপণের জন্য টেবিলের উপর রক্ষিত টাইমপিসটির দিকে চাহিতেছেন। মাষ্টারম'শায়ের গায়ে জামা ছিল না এবং চাদরখানি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দেহ অনাবৃত ছিল। তাঁহার অনাবৃত বক্ষ ও পৃষ্ঠের উপর শুভ্র যজ্ঞ-সূত্র সত্য সত্যই শোভা পাইতেছিল। মমতা-দেবীর মধ্যে মধ্যে মনে হইতেছিল যেন অতীতের কোন আশ্রমবাসী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রাণ-প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য এই দুর্য্যোগ-রজনীতে সহসা যোগবলে আবির্ভূত হইয়াছেন। শিশুর শ্বাস-কষ্ট দেখিয়া সন্ধ্যা হইতে নিরাশা ও আশঙ্কার যে অন্ধকার তাঁহার সমগ্র অন্তরাকাশকে আচ্ছন্ন ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল মেঘরাশি সরাইয়া সহসা চন্দ্রকরলেখা প্রকাশিত হওয়ার মত তথায় অকস্মাৎ আশার আলোক-রেখা দেখা দিয়াছে। মমতাদেবী ভাবিতেছেন, যদি তিনি স্বামীর অসন্তোষের আশঙ্কায় মাষ্টার-ম'শায়কে না ডাকাইতেন!

ঠিক এই সময়ে জয়নারায়ণবাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পত্নী ও পুত্রের পার্শ্বে মাষ্টারম'শায়কে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। মাষ্টার-ম'শায়কে তিনি কয়েকবার দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু এত কাছে বোধ হয় কখন দেখেন নাই। প্রথমে মনে হইল, ইহা তাঁহার চিন্তামগ্ন মন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষুর ভ্রম নহে ত'? চক্ষু মুছিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বুঝিলেন ভ্রম নহে, সত্যই মাষ্টারম'শায় বা চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী বসিয়া আছেন। এই দুর্য্যোগ রাত্রিতে লোকটি কেমন করিয়া আসিল? কখন আসিল? ডাকিলই বা কে? এই প্রশ্নগুলি তাঁহার মনে যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। মাষ্টারম'শায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান জয়নারায়ণবাবুর মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া পুনরায় শিশুর দিকে মনোনিবেশ করিলেন। জয়নারায়ণবাবুর আকস্মিক উপস্থিতি

মাষ্টারম'শায়ের মুখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ফুটাইয়া তুলিল না, যেন এই উপস্থিতির জন্য তিনি পূর্ণরূপেই প্রস্তুত ছিলেন। জয়নারায়ণবাবুর আবির্ভাব মমতাদেবীর মনে কোন আশঙ্কা বা মুখে ভাবান্তর জাগাইয়া তুলে নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, তবে সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বক্ষ দ্রুততর তালে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুখে একপ্রকার বিবর্ণতা দেখা গিয়াছিল। তবে এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, মাষ্টারম'শায়ের নির্ভীক ও নির্ব্বিকারভাব তাঁহার প্রকৃতিস্থ হইবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহাদেরই কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত এই মহাত্মার নির্ব্বিকার নির্ভীকতার নিকট তাঁহার স্বামী কোন উদ্ধত বা অবিনীত ব্যবহার করিতে কখনও পারিবেন না। মমতাদেবী নিজেকে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া এরূপভাবে বসিয়া রহিলেন যেন সমস্ত ঘটনা-স্রোতই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। এমন কিছু ঘটে নাই যাহা অসঙ্গত, যাহা ঘটা উচিত নয়।

মুখে কোন কথা না ফুটিলেও জয়নারায়ণবাবুর বিস্ময় ও রোষ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জয়নারায়ণ চৌধুরী, তাঁহার জমিদারীর আয় বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার এক পয়সাও কম নহে। তাঁহার পত্নীর সহিত একাসনে বসিয়া আছে তাঁহারই স্কুলের ত্রিশ টাকা বেতনের এক অতি-দরিদ্র মাষ্টার! যাহা তাঁহার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন, বিশ্বাস করা কঠিন—তাহাই তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন! সম্ভবতঃ মমতাদেবী ইহাকে ডাকিয়াছেন, কিন্তু এই দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার তাঁহার ইচ্ছার কথা জানিয়াও কি সাহসে কোন্ স্পর্দ্ধায় তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মমতাদেবীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল? পালঙ্কের পাশে চেয়ারে বসিলেই ত' পারিত? আরও বিস্ময়ের বিষয়, লোকটি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল না, বিনীতভাবে নমস্কার করিল না, পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল না, গর্ব্বিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া এমন ভাবে অন্য দিকে দৃষ্টি দিল যেন উহার পক্ষে তাঁহার থাকা বা না থাকা দুই-ই সমান। যেন সে কাহাকেও কেয়ার করে না। যাহার ত্রিশ-টাকা-বেতনের স্কুল-মাষ্টারীটুকুও গিয়াছে—সে এতদূর সাহস কোথা হইতে পাইল? বিস্ময়ে ও রোষে অভিভূত জয়নারায়ণবাবু মন্ত্র-মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মমতাদেবী স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন? এই চেয়ারটায় বোস।" জয়নারায়ণবাবু রোষপূর্ণ কটাক্ষে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। বসিলেন না, কথাও কহিলেন না। অন্য সময় হইলে তিনি মাষ্টার ম'শায়কে দারোয়ানের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেন, চীৎকারে কক্ষ কম্পিত করিতেন, কিন্তু তিনি যতই অহঙ্কৃত ও ঐশ্বর্য্যাভিমানী হউন মুমূর্ষু শিশুর সম্মুখে উত্তেজনা প্রকাশ তাঁহার নিকটে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। মমতাদেবীর উপরেই তাঁহার বেশী রাগ হইল। যাহা তাঁহাদের মর্য্যাদার হানিকারক সেরূপ কার্য্য তিনি করিলেন কেন? এই কি তাঁহার পত্নীর, স্বরূপগঞ্জের মহা তেজস্বী জমিদার সত্যকিঙ্কর রায়ের কন্যার উপযুক্ত কার্য্য?"

জয়নারায়ণবাবু মমতাদেবী ও মাষ্টারম'শায়ের মধ্যস্থলে শায়িত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিশুর অপেক্ষাকৃত স্থির ভাব দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, তাহার জীবনী শক্তি ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। মাষ্টারম'শায়কে শিশু সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি ঐ দরিদ্র শিক্ষককে চিকিৎসক বলিয়া কখনও স্বীকার করিবেন না। তিনিও উহাকে উপেক্ষাই করিবেন। রোষ ও অসন্তোষ বশতঃ তিনি পত্নীকেও পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না। কোন প্রকারে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি ক্রোধ-কম্পিত বক্ষে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া হলের অপর পার্শ্বের কক্ষটিতে প্রবেশ করিলেন। বারটা পর্য্যন্ত পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া মমতাদেবী তাঁহাকে একটু শুইতে বলিলে তিনি এই কক্ষেই শুইয়াছিলেন। এই বুঝি মমতাদেবী ডাকিলেন, এই বুঝি তাঁহার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা গেল, শয়ন করিয়া ইহাই তিনি উৎকর্ণ হইয়া ভাবিতেছিলেন, কখন অজ্ঞাতসারে নিদ্রার আবির্ভাব হইয়াছিল।

ক্রুদ্ধ জয়নারায়ণবাবু ক্লান্ত ভাবে একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রচুর সম্পত্তি ও প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তিনি নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুত্রের উপরেও রাগ হইল। এইরূপ ভাবে চলিয়া যাইবার জন্য সংসারে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল। প্রভূত অর্থের বিনিময়েও তাঁহার পুত্র আরোগ্য লাভ করিলে তিনি তাহা সাগ্রহে দিতে

প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার দিক হইতে চিকিৎসার ত' কোন ত্রুটি হয় নাই। এই অঞ্চলের সমস্ত সুদক্ষ ডাক্তারকে ডাকিয়াছেন, কলিকাতা হইতে যাঁহাকে আনা হইয়াছিল তিনি শিশু-চিকিৎসার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। অবশেষে শিশুর অন্তিমসময়ে এই উন্মাদ স্কুল-মাষ্টারটা তাঁহাকে উপহাস করিতে আসিয়াছে। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা লোকটার কিন্তু ইহার অপেক্ষাও মমতাদেবীর নির্ব্বুদ্ধিতা তাঁহাকে অধিক দুঃখ দিতেছে। কেমন করিয়া তিনি সকল লজ্জায় ও মান-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া এই ভিক্ষুক শিক্ষকের সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। জয়নারায়ণবাবু বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ ব্যর্থ আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া পিঞ্জরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় তেমনই তিনিও মনে মনে গর্জ্জিয়া অস্থির ভাবে সেই কক্ষে পায়চারী করিতে লাগিলেন।

জয়নারায়ণবাবু কাহারও দ্বারা মমতাদেবীকে ডাকাইয়া এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবাধ্যতার এইরূপ অনুচিত ব্যবহারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন এমন সময় মমতাদেবী নিজেই সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পত্নীকে দেখিবামাত্র জয়নারায়ণবাবু কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "ঐ ভিক্ষুক শিক্ষকটাকে কে ডেকে আনালে এখানে?" মমতাদেবী মৃদু পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া স্বামীর ডান হাতখানি ধরিয়া মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আগে স্থির হ'য়ে ব'স, তবে উত্তর পাবে। চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে বেড়াবার সময় এ নয়, এ হচ্ছে স্থির হয়ে, শান্ত হয়ে ভাববার সময়।

ঘরে একখানি খাট ছিল। মমতাদেবী তাহার উপরই স্বামীকে হাত ধরিয়া বসাইয়া নিজেও পাশে বসিলেন। সেই মাধুর্য্যময়ী মহিমময়ী নারীর প্রভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়নারায়ণ বাবুকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতই বসিতে হইল। তারপর মমতাদেবী অকম্পিত কণ্ঠে শান্তস্বরে কহিলেন, "ওকে আমিই ডেকে আনিয়েছি। শিক্ষক উনি চিরদিনই বটে, কিন্তু ভিক্ষুক উনি কোনদিনই ন'ন। উনি চিরদিন দাতা, লোককে দিয়েই এসেছেন, নিতে জানেন না। ভিক্ষা দেওয়া ওর কাজ, নেওয়া নয়। অসামান্য পরিশ্রম ক'রে শিক্ষা দিয়ে উনি যে সামান্য পারিশ্রমিক পান তাকে ভিক্ষা বললে পৃথিবীর প্রত্যেক কর্ম্মীকেই ভিক্ষুক বলতে হয়। যাঁরা কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁদের ভিক্ষুক বললে শুধু মস্তবড় মিথ্যা নয় ঠিক উল্টাই বলা হয়। যারা পরিশ্রম করে না অথচ লোলুপ হয়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায় তাদেরই ভিক্ষুক বলা চলে। সেই হিসাবে তাদেরও ভিক্ষুক বলা যায় যারা পৈত্রিক সম্পত্তির দোহাই দিয়ে দরিদ্র প্রজাদের দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা-ভাণ্ড পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা না দিতে পারলে চোখ রাঙাচ্ছে, অত্যাচার করছে। শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী এরা যতই দরিদ্র হোক্, এরা ভিক্ষুক নয়, এরা কর্ম্মী। যারা পরের পরিশ্রমের উপর নিজেদের ভোগের আগার, বিলাসের আসন তৈরী করিয়ে অনায়াসে কাল কাটায়, যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে এবং ভগবানের দরবারে দিনরাত 'দেহি' 'দেহি' রব তুলছে তারা ভিক্ষুক হ'তে পারে। আজ আমরাই ভিক্ষুক এবং যাঁকে তুমি ভিক্ষুক বলছ তিনি তোমার বাড়ীতে এসেছেন দাতা রূপে।"

জয়নারায়ণবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাতা রূপে! কি দান করবেন শুনি?"

মমতাদেবী উত্তর দিলেন, "তোমার পুত্রের প্রাণ দান করবেন।"

জয়নারায়ণবাবু বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিলেন, "এই অঞ্চলের বড় বড় ডাক্তাররা যা দিতে পারলে না, ক'লকাতার সব-চেয়ে বড় ডাক্তার যা দান করতে পারলে না, তা দান করবেন উনি? কেন, উনি কি ভগবান?"

মমতাদেবী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না, ভগবান ন'ন, কিন্তু ভগবানের ভক্ত বটে। যে রোগ সাধ্য বড় বড় ডাক্তার শুধু তাই ভাল করতে পারেন কিন্তু অসাধ্য রোগ ভাল করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা শুধু চিকিৎসক ন'ন যাঁরা সাধক, যাঁরা ভগবানের আরাধক। ইনি সেই শ্রেণীর লোক। যে জীবন-পথের প্রান্তে প্রায়ই মৃত্যু-লোকের সীমান্তে এসে পৌঁছেছে তাকে শুধু ঔষধের শক্তিতে ফিরিয়ে আনা যায় না, তাকে ফেরাতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে আরও কোন শক্তির দরকার। ইনি সেই শক্তির অধিকারী। এর কথা তুমি লোকের মুখেই শুনেছ, হয় ত' কয়েকবার চোখের দেখাও দেখেছ কিন্তু এর সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের সৌভাগ্য তোমার কখন ঘটে নি। সেই জন্য এর সম্বন্ধে ভুল ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করছ। এই ভুল ধারণার বশে যাঁকে দরকার নাই ব'লে দ্বার হ'তে বিদায় দিতে দ্বিধা বোধ কর নি, যাঁর স্কুল-মাষ্টারীটুকুও কেড়ে

নিতে কণামাত্র কুণ্ঠা জাগে নি তিনিই এই রকম রাত্রিতে এই দারুণ দুর্যোগের ভিতর তোমারই ছেলের জন্য ছুটে আসতে সামান্যও দ্বিধা বা কুণ্ঠা অনুভব করেন নি। তুমি বড় লোক বলে এসেছেন একথা তুমিও বলতে পারবে না। তুমি এই গ্রামের সবচেয়ে গরীব লোক হ'লেও তোমার ডাকে এমনই বা এর চেয়েও বেশী ব্যগ্র হয়ে ছুটে আসতেন।"

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি যেই হোন, উনি যাই হোন, তুমি কেমন ক'রে নিজের উচ্চপদ ভুলে, সাংসারিক, সামাজিক মান-মর্য্যাদায় যাঁর স্থান তোমা অপেক্ষা অনেক নীচে তাঁর সঙ্গে একাসনে প্রায় পাশাপাশি ব'সেছিলে? প্রত্যেক ডাক্তার খাটের পাশে চেয়ার পেতে ব'সে খোকাকে দেখেছেন, কেউই খাটের উপর, তোমার পাশে বসতে সাহস করেন নি, তবুও তুমি তাদের দেখে সঙ্কুচিত হয়ে সরে গিয়েছ।"

মমতাদেবীর মুখে মুহূর্ত্তের জন্য যে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল তাহা বড়ই মধুর।

তিনি বলিলেন, "তুমি ঐ ঘরে গিয়ে যেভাবে আমার দিকে তাকালে তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে খুবই রাগ করেছ। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমি উঠব। শোন তোমরা সামাজিক মান-মর্য্যাদা কাকে বল, তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে, ঐ শিশুর মত সরল নিষ্কলুষ পুরুষের পাশে ব'সে আমি নিজেকে পবিত্র মনে করেছি। চল্লাম আমি, যাবার আগে তোমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি, খোকার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয় নাই, ভালই হচ্ছে। তুমি শান্তভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পার।" বলিয়া মমতা দেবী সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মমতা দেবীর মনে সহসা আশঙ্কা জাগিল খোকার অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে বলিয়া তিনি তো স্বামীকে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে বলিয়াছেন কিন্তু যদি ভাল না হয়? ঐ ঘরে গিয়া যদি দেখেন পুনরায় ঊর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে বা কালের ফুৎকারে তাঁহার পুত্রের প্রাণ-প্রদীপের ক্ষীণ শিখা সহসা নিভিয়া গিয়াছে?

মমতাদেবী দ্রুত পায়ে হইয়া কম্পিতবক্ষে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শ্বাস লইবার কষ্টকর চেষ্টার লেশমাত্রও আর নাই। শিশুকে সুপ্তিমগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। মায়ামুগ্ধ মাতার মমতাময় মনে মুহূর্ত্তের জন্য প্রশ্ন জাগিল, সব শেষ হইয়া যায় নাই তো? পরক্ষণে মাষ্টারম'শায়ের মুখের দিকে চাহিতেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মমতাদেবী দেখিলেন খোলা জানালার পর্দ্দা দুইটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বোধ হয় বৃষ্টিও থামিয়াছে। মেঘমালার মধ্য হইতে চন্দ্রের ক্ষীণ রশ্মিরেখা নির্গত হইয়া শরতের শস্য-শ্যাম মাঠের বুকে যেন সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেও যে প্রকৃতির দিকে চাহিলে মনে হইতেছিল যেন মহারুদ্র তাঁহার প্রলয়-ডম্বরু বাজাইয়া তাণ্ডব তালে নৃত্য করিতেছেন, এখন তাহা শান্ত ও স্তব্ধ, সুন্দর ও তন্দ্রালস। মাষ্টারম'শায় মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন যাঁহার ইচ্ছায় এইরূপ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন প্রকৃতির বুকে প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

মাষ্টারম'শায় শিশুর পেটে হাত দিয়া দেখিলেন, ফাঁপার কোন চিহ্ন আর নাই, উহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাষ্টারম'শায় ঔষধের বাক্সটি খুলিয়া আর একটি শিশি হইতে দুইটি গ্লোবিউল লইয়া শিশুর জিহ্বায় রাখিয়া দিলেন। এবার সে এমনভাবে জিহ্বা নাড়িল যেন শুধু ঔষধের স্পর্শ নয় তাহার স্বাদও অনুভব করিতেছে। ক্রমশঃ শিশুর মুখে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল তাহাতে মাষ্টারম'শায় ও মমতাদেবী উভয়েরই মনে হইল তাহার বিলুপ্ত চেতনা ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেছে। যেমন রাত্রির তিমির-যবনিকা তুলিয়া দিয়া ঊষার রক্তরাগ-রঞ্জিত রশ্মিরেখা পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করে তেমনই শিশুর মুখে চেতনার দীপ্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। যখন ভোরের আভা মেঘ মুক্ত আকাশ হইতে আসিয়া কক্ষটিকে আলোকিত করিল, তখন শিশুর মুখে চেতনার প্রত্যাবর্ত্তনজনিত পরিবর্ত্তন স্পষ্টতর হইয়া পড়িল। অবশেষে মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া প্রভাতের প্রথম রৌদ্র-রেখা যেমন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত শিশুর শিয়রে আসিয়া পৌঁছিল অমনই সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। এই চাহনিতে কোন প্রকার আচ্ছন্ন বা অস্বাভাবিক ভাব নাই, ইহা সম্পূর্ণ চেতনার পরিচায়ক। চারিদিন পরে শিশুর চক্ষুতে এইরূপ চাহনি দেখিয়া মমতাদেবীর মন

আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল মাষ্টারম'শায়ের পদতলে প্রণত হইয়া ও পদধূলি মস্তকে লইয়া অন্তরের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে কিন্তু কয়েকঘণ্টা একত্র রহিয়া মাষ্টারম'শায়ের স্বভাবের যে পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহাতে বুঝিয়াছেন এই সরল ও উদার অথচ সংযত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি এরূপ আবেগ বা উচ্ছ্বাসে খুশী না হইয়া ক্ষুব্ধই হইবেন।

মমতাদেবীর আদেশে ঝি মাষ্টারম'শায়ের প্রাতঃকৃত্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলে তিনি প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য সারিয়া পুনরায় শিশুর নিকট আসিলেন। বেলা আটটার সময় মমতাময়ী মাতার কর্ণে মধু ঢালিয়া এবং অন্তরে আনন্দের বন্যা বহাইয়া বালক 'মা' বলিয়া ডাকিল। বালকের স্বর ক্ষীণ হইলেও স্পষ্ট। বেলা দশটার সময় বালক ক্ষুধার কথা বলিল এবং মাষ্টারম'শায়ের ইচ্ছায় মমতাদেবী কয়েক চামচ কমলালেবুর রস তাহাকে ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিলেন। খাইবার পর বালক মৃদু হাসিয়া মায়ের দিকে এবং সবিস্ময়ে মাষ্টারম'শায়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। আনন্দ আত্মহারা মমতাদেবী মাষ্টারম'শায়কে দেখাইয়া পুত্রের প্রতি চাহিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে পরিচয় দিলেন, খোকা, তোমার দাদু। শিশু সহাস্যে মাষ্টারম'শায়ের মুখের দিকে চাহিয়া শিশু সুলভ অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে বলিল, দাদু! মাষ্টারম'শায় মৃদু হাস্য করিয়া শিশুর সেই সুমধুর সম্বোধনে সাড়া দিলেন। মায়ের অতুল স্নেহ-মমতা যাঁহার অনন্ত প্রেমের এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি, মাষ্টার'মশায় মনে মনে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করিলেন। শিশুর হাস্যের মধ্যেও তিনি এক পরমানন্দময় পুরুষের হাস্যই দেখিতে পাইলেন। ইহার পর মাষ্টারম'শায় কয়েক মাত্রা ঔষধ দিয়া এবং পথ্যাদি বিষয়ে কিরূপ নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা জানাইয়া মমতাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বিদায়মুহূর্ত্তে মমতাদেবী মাষ্টারম'শায়ের নিষেধ অমান্য করিয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন এবং পদধূলি লইয়া সেই হস্ত পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই জয়নারায়ণবাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যখন শিশু সহাস্যে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিল তখন তাঁহার অন্তর মাষ্টারম'শায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ না হইল তাহা নহে। এই দরিদ্র শিক্ষকের চিকিৎসা-দক্ষতা তাঁহাকে বিস্মিতও করিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত করিল সেই দরিদ্র শিক্ষকের বিচিত্র ব্যবহার। যখন মাষ্টারম'শায় বিদায় ল'ন তখন জয়নারায়ণ তাঁহারই অপেক্ষায় বহির্ব্বাটীতে ব'সিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যাইবার সময় মাষ্টারম'শায় তাঁহাকে অবশ্যই কিছু বলিবেন। তিনি অন্য কিছু না চান অন্ততঃ স্কুল-মাষ্টারী ফিরিয়া পাইবার জন্যও অনুরোধ করিবেন। কিন্তু মাষ্টারম'শায় জয়নারায়ণবাবুকে সম্মুখে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না, মৃদু হাস্যসহকারে ও বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। জয়নারায়ণবাবুর জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা ছিল এই মহোপকারের বিনিময়ে তিনি কি পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। দুই চারিশত নয় দুই চারি সহস্র চাহিলেও জয়নারায়ণবাবু মাষ্টারম'শায়কে দিতে পারেন। কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে নমস্কার করিয়া মাষ্টারম'শায় চলিয়া গেলেন যে, জয়নারায়ণবাবু কিছু জিজ্ঞাসা করিবার বা বলিবার অবকাশই পাইলেন না, বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মমতাদেবী স্বামীকে কহিলেন, "তোমাকে যে ব'লেছিলাম মাষ্টারম'শায়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা চাইতে এবং বিনীত ভাবে বলতে, আপনি দয়া ক'রে কাল হ'তে স্কুলের কাজে যোগ দেবেন।"

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, "বলব কখন, মমতা? এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না, নমস্কার ক'রে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।"

মমতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে যে বলেছিলাম ওঁকে প্রণাম করতে, করেছিলে?"

জয়নারায়ণবাবু বিচারকের সম্মুখে অপরাধ-স্বীকারকারী অপরাধীর মত উত্তর দিলেন, "চারিদিকে আমলার দল, প্রজার দল, পাইক-বরকন্দাজ চাকর-বাকরের দল, কেমন ক'রে একজন সামান্য স্কুল-মাষ্টারের পায়ের তলে মাথা নুইয়ে প্রণাম করব, মমতা?"

মমতাদেবী বিস্ময় ও বেদনা জড়িত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সামান্য স্কুল-মাষ্টার! এত দেখেও তোমার চোখ খুলল না, ভুল ভাঙ্গল না?"

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, "ওঁর চিকিৎসায় খোকার অসুখ

ভাল হয়েছে ব'লে আমরা যাই মনে করি কিন্তু লোকের চোখে উনি একজন সামান্য শিক্ষক ছাড়া আর কিছু নন।"

মমতাদেবী অতিশয় দুঃখের সহিত কহিলেন, "তুমি লোকের চোখে দেখবে? তোমার নিজের চোখ কি নেই? আমি বুঝতে পেরেছি, ঐশ্বর্য্যাভিমান মানুষের মনের দুরারোগ্য রোগ। এই দুঃসাধ্য ব্যাধি সামান্য ঔষধে যাবার নয়। কিন্তু এই ঘটনাকে তো সামান্য বলা চলে না। এই ক'দিন যে বক্ষভেদী ব্যাপার—যে দারুণ দুঃখদায়ক করুণ দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছ তাতেও অর্থের ব্যর্থতা বুঝতে পারলে না, অর্থাভিমান গেল না? যখন কাল রাত্রিতে এইখানে ব'সেছিলে একমাত্র পুত্রকে মৃত্যু-পথের যাত্রী মনে ক'রে যখন তোমার বুকের ভেতর ব্যথার বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তখন কি মনে হয় নাই এই বিপুল সম্পত্তি, এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ, এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অসংখ্য উপকরণ সবই বৃথা, এই সর্ব্বস্বের বিনিময়েও অতি ক্ষুদ্র একটি শিশুর প্রাণকে ধরে রাখা যায় না। মদের মত অর্থও মানুষকে মত্ত করে। সেই মত্ততায় মানুষ সত্যকে দেখতে পায় না, পঙ্কের অঙ্কে পদ্মের মত যে দেবত্ব দারিদ্র্যের বুকে ফুটে উঠেছে তাকে তার প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে দ্বিধা বোধ হয়। শুনেছি, মাতাল যত মদ খায় তার মদ খাবার ইচ্ছাও তত বাড়ে, তেমনই অর্থশালীরও অর্থাকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে, সে অপর অর্থশালীর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়তে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত দরিদ্রের দিকে দৃক্‌পাত করে না। এই জন্যই বৈদিক ঋষি 'ঈশাবাস্যমিদং' এই বেদবাক্যে অধিক অর্থাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান না দিতে উপদেশ দিয়েছেন। এই জন্যই আচার্য্যশঙ্কর বজ্রনাদে বলেছেন, ওরে মূঢ় ধনাগমতৃষ্ণা ত্যাগ কর্। এই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলেছিলেন, ছুঁচের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উটের প্রবেশ সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু অর্থশালীর অর্থাৎ অর্থাভিমানীর পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই রামকৃষ্ণদেব একহাতে টাকা এবং অন্য হাতে মাটি নিয়ে 'টাকা মাটি' 'মাটি টাকা' ব'লে দুটোকেই জলে ফেলে দিয়েছিলেন।"

জয়নারায়ণবাবু উচ্চশিক্ষিতা পত্নীর এই উচ্ছ্বাস, এই উদ্দীপনাপূর্ণ উক্তি নীরবে শুনিতেছিলেন। অশিক্ষিত না হইলেও বিশেষ উচ্চশিক্ষা তিনি পান নাই। স্বর্গীয় হরিনারায়ণবাবু বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্রকে সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন, বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার পুত্রের মনের গতিও বাল্যকাল হইতেই বিষয়মুখী ছিল। অন্যদিকে স্বরূপগঞ্জের স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর রায় মহাশয় একমাত্র কন্যার অন্তরকে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য যেমন সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন তেমনই মমতাদেবীর মনেও বালিকা-বয়স হইতেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

মমতাদেবী বলিলেন, "শোন, তোমার যখন এখানে বলবার অবসর হ'ল না, তখন তুমি এক্ষুনি মাষ্টারম'শায়ের বাড়ী যাও। অনেকে যেমন পরিপূর্ণ পুণ্যের প্রত্যাশায় পায়ে হেঁটে তীর্থ-ক্ষেত্রে যাত্রা করে তুমি অবশ্য তেমন পারবে না। মোটর নিয়েই যাও। গিয়ে মাষ্টারম'শায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁকে খুব বিনয়ের সহিত অনুরোধ করগে কাল হ'তে স্কুল যাবার জন্য। সেখানে তো আর আমলার দল নাই, পাইক-বরকন্দাজও নাই। যদি আত্মাভিমান বাধা না দেয়, 'আমি বড়' এই মিথ্যাভিমানে দ্বিধা বোধ না কর তা হ'লে প্রণামটাও এই অবসরে সেরে নিতে পার। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

জয়নারায়ণবাবু কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন, "যে কাজ চৌধুরী বংশের কেউ কোনদিন করে নাই আমি আজ সে কাজ কেমন ক'রে করব মমতা? ভট্‌চাজ পাড়ার কারও বাড়ীতে আমাদের কেউ কোনদিন যায় নাই।"

মমতাদেবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পূর্ব্বে ভট্‌চাজ পাড়ার কেউ কোনদিন চৌধুরীবংশের এমন উপকারও বোধ হয় করেন নাই?"

জয়নারায়ণবাবু বলিলেন, "মমতা, লোকে অত বুঝবে না, আমি গেলে সামনে না হোক পিছনে সবাই হাসবে আর বলবে চৌধুরীদের কেউ যা কোনদিন করে নি, জয়নারায়ণ চৌধুরী তাই করলে। তার ফল এই হবে, লোকে আজ আমাকে যেমন মানছে কাল তেমন মানবে না। একটু উপকার করলেই সে তার বাড়ী গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার দাবী ক'রে ব'সে থাকবে। সবারই মন যদি তোমারই মনের মত হ'ত মমতা, তা হ'লে আমি মষ্টারম'শায়ের বাড়ী যেতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করতাম না।"

মমতাদেবী বলিলেন, "থাক্, তোমাকে আর যেতে হবে না। কিন্তু একটা কথা আমি বলছি। তা হ'লে নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের বিবেকানুসারে চলবার স্বাধীনতা তোমার নাই? তোমার এই স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নেয় নি। তুমি সৎসাহসের অভাবে নিজেই নিজের স্বাধীনতাকে, নিজের বিবেককে অপরের ইচ্ছার কাছে বলিদান করছ। লোকে কি বলবে, লোকে কি মনে করবে, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে তোমার সেই কাজ করা উচিত, যা সত্য, যা ন্যায়-সঙ্গত, যা বিবেক-সম্মত।"

যেমন দর্শক কোন চিত্তাকর্ষক অভিনয় উৎসুক হইয়া দর্শন করে তেমনই শয্যায় শায়িত শিশু তাহার পুনঃ প্রাপ্ত চেতনার সহায়তায় পিতামাতার কথোপকথন কৌতূহলের সহিত সহাস্যে শুনিতেছিল। সে উভয়ের মুখভঙ্গী মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিল।

আট

সেই দিন সন্ধ্যার সময় সান্ধ্যকৃত্য সমাপনের পর মাষ্টার ম'শায় যখন টিউশনী করিতে যাইবার জন্য বাহির হইবেন সেই সময় একখানি পাল্কী আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে থামিল। বাড়ীর বালক-বালিকারা বিস্ময় বিজড়িত ব্যগ্রতা সহকারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণীদেবীও বিস্মিত ও ব্যস্তভাবে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টারম'শায় বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। সকলের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি পাল্কীর দিকে। বাহকদিগের উচ্চারিত বিচিত্র শব্দে আকৃষ্ট প্রতিবেশীদিগের গৃহের দুই একটি বালক-বালিকাও আসিয়া অবাক্ হইয়া পাল্কীর দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল। যখন সকলের বিস্ময়কে শতগুণ বাড়াইয়া মমতাদেবী পাল্কী হইতে বাহির হইলেন তখন মাষ্টারম'শায় ও নিস্তারিণী দেবী তাঁহাকে সাদরে ও সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য বিস্ময়াভিভূত বালক-বালিকার দলও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল।

নিস্তারিণীদেবী ঝুলনাদি উপলক্ষ্যে চৌধুরীদের কুল-দেবতা রাধা-মাধবজীউকে দর্শন করিতে গিয়া দুই একবার মমতাদেবীকে দেখিয়াছেন। একবার চৌধুরীবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বৌ-রাণীকে চিনিতে তাঁহার পক্ষে বিলম্ব হইল না। এই অপরূপ রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণীকে যে একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্যও দেখিয়াছে তাহার পক্ষেও চিনিতে বিলম্ব হইতে পারে না। মমতাদেবী একখানি সামান্য শাড়ী পড়িয়া এবং চার গাছি চুরি হাতে দিয়া আসিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশে তাঁহার অসামান্য লাবণ্যের গৌরব যেন আরও বাড়িয়াছিল। মমতাদেবীর পিত্রালয়ের ঝিটিও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে পাল্কার ভিতর হইতে একটি মুখ ঢাকা বড় হাঁড়ি আনিয়া নিস্তারিণীদেবীর সম্মুখে রাখিল। মমতাদেবী কহিলেন, "মা, এ অন্য কিছু নয়, রাধামাধবের প্রসাদ। আমার ভাই-বোনদের দিন।" নিস্তারিণীদেবী গৃহের এবং প্রতিবেশী বালক-বালিকাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাধা-মাধবের প্রসাদী মেঠাই বা লাড্ডু এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা গৃহজাত গব্য ঘৃতে রাধা-মাধবের মন্দিরের ভোগশালায় পূজারী ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বহস্তে প্রস্তুত।

মমতাদেবীকে বসিতে আসন দেওয়া হইল কিন্তু তিনি বসিলেন না। বলিলেন, "দেব-দেবী দর্শনে আসিয়া কেহ বসে না, যাহা প্রার্থনা থাকে দাঁড়াইয়া এবং করযোড়ে নিবেদন করিয়া চলিয়া যায়।" তিনি মাষ্টারম'শায়ের সম্মুখে গিয়া করযোড়ে মিনতিপূর্ণ করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমি আপনার বাড়ীতে এসেছি ভিক্ষার জন্য।"

মাষ্টারম'শায় মৃদু হাসিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "রোগা ছেলেকে ছেড়ে ভিক্ষুকের কুটিরে ভিক্ষার জন্য এসে ভাল কাজ কর নি, মা।"

মমতাদেবী বলিলেন, "বাপ কুটিরবাসী ভিক্ষুক হ'লেও মেয়ের কাছে সেই কুটির রাজপ্রাসাদের চেয়েও অধিক ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, মেয়ের চক্ষুতে সেই ভিক্ষুক বাপ লক্ষপতি অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী, এই সত্য কি অস্বীকার করতে পারেন, বাবা?"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "মা, অস্বীকার করবার মত কথা তোমার মুখ হ'তে বেরোয় না। কিন্তু এটাও সত্য বাপের বাড়ীতে এসে মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না।" মমতাদেবী মৃদু হাসিয়া সেই আসনখানিতে বসিলেন। মাষ্টারম'শায়

বলিলেন, "খোকা কেমন আছে সেই খবর আমাকে আগে জানাও, তারপর অন্য কথা হবে।"

মমতাদেবী কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে খোকা ভালই আছে। কিন্তু তার এই ভাল থাকা আমি ভাল ভাবে উপভোগ করতে পারছি না, বাবা। যখন মনে পড়ছে এই ছেলের জন্য ছেলের জীবন-রক্ষকের চাকুরীটুকুও গিয়েছে তখন আমার বুকে আনন্দের বদলে বেদনাই জেগে উঠছে। যতবার খোকাকে দেখছি ততবার সেই কথাই মনে হচ্ছে। আমাকে এই দুঃখ হ'তে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে কাল হ'তে আবার স্কুলে যেতে হবে। ছাত্রেরাও আপনার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। আপনাকে না পেলে তারা ধর্ম্মঘট করবে জানিয়েছে।"

মাষ্টারম'শায় বলিলেন, "মা, তরলমতি ছাত্রদের উত্তেজনার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু তুমি যে যুক্তির জালে আমায় জড়িয়ে ফেলেছ তা থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়, অতএব আমাকে কাল হ'তে স্কুলে গিয়ে কর্ত্তব্যের বোঝা আবার ঘাড়ে নিতে হবে। কিন্তু মা, আমি খোকার জীবন-রক্ষক তোমার এই ধারণা ভুল। সমগ্র জগতের জীবনরক্ষক যিনি তিনিই তোমার পুত্রের জীবন-দাতা আমি তার কাছে খোকার জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছি মাত্র। দেওয়া না দেওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। যাও মা, দেরী ক'র না। হয় ত' খোকা তোমার জন্য কাঁদছে। এখন তাকে খুশী রাখবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করতে হবে। শীঘ্র আরোগ্যের জন্য সর্ব্বাগ্রে দরকার মনের প্রফুল্লতা। তারপর সুপথ্য, সর্ব্বশেষে ঔষধ।

মমতাদেবী ভক্তিসিক্ত অন্তরে মাষ্টারম'শায় এবং নিস্তারিণী-দেবীকে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। মাষ্টারম'শায় জানাইলেন, পরদিন প্রত্যূষে তিনি খোকাকে দেখিয়া আসিবেন।

অপরূপ রূপবতী অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী বৌ-রাণীর গর্ব্বলেশ-শূন্য ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় নিস্তারিণীদেবীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এক সুন্দর সত্যের আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই সত্যের আলোকে তিনি তাঁহার দরিদ্র স্বামীকেও এক প্রকার অভিনব মহিমায় মণ্ডিত দেখিয়া বুঝিলেন দারিদ্র্যের মধ্যেও এমন কিছু থাকিতে পারে যাহার পদতলে অতুল ঐশ্বর্য্যও আপনার উন্নত শির নত করিতে বাধ্য হয় বা দ্বিধা বোধ করে না।

সহসা নিস্তারিণীদেবীর মনে তিন বৎসর পূর্ব্বের এক কৌতুককর দৃশ্য জাগিয়া উঠিল। বিবাহের পর মমতাদেবী যখন প্রথমবার শ্বশুরালয় আসেন তখন তাঁহার সহিত তিন জন দাসী আসিয়াছিল। এই তিনজনের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্কা তাহাকে সকলে 'মতির মা' বলিত। মতির মা সম্পূর্ণ সেকেলে ধরণের লোক। সে সম্পূর্ণ গ্রাম্য ভাষায় ও ভঙ্গীতে মমতাদেবীর রূপ ও গুণের প্রশংসা করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইতে ভালবাসিত। তাহার মুখে সেই প্রশংসা বড়ই কৌতুকোদ্দীপক হইত বলিয়া অনেকে তাহাকে একই প্রশ্ন বার বার করিত। একবার সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার রাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আসিলে পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছিল এবং উত্তর শুনিয়া হাসির কলরোল তুলিতেছিল। নিস্তারিণীদেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন করা হইল—আচ্ছা, মতির মা, তোমার দিদিমণি লেখাপড়া জানেন কেমন?

মতির মা চোখ দুটিকে বিস্তৃত করিয়া উত্তর দিল, "নেকা-পড়া? আমার দিদিমণির মত নেকাপড়া ও তল্লাটে কেউ জানে না। আমার দিদিমণি ইঞ্জিরি জানে, আর ঐ যে কি বলে গো সঙস্‌কিরি তাও জানে। আমার দিদিমণি যখন সঙস্‌কিরি পড়ে তখন মনে হয় পুঁথিতে চণ্ডী পাঠ করছে। ঐ যে কি বলে গো—যেখানে অনেক নোক জড় হ'য়ে বক্তিমে করে। আমরা মুরুখ্যু নোক, আমরা কি জানবো? আপনকারা জানতে পার। হাঁ, মনে পড়েছে, সোবা। তখন দিদিমণির বয়েস মোটে দশ বছর। সেই সোবায় দাঁড়িয়ে দিদিমণি এমন বক্তিমে করলে, শুনে সবাই বোবা হ'য়ে গেল। স্বরূপগঞ্জের সাতকড়ি সরকারের ব্যাটা যে সাড়ে সাতটা পাশ গো—সেও সেই সোবায় বোবা হ'য়ে ব'সে রইল। অন্য সময় বাছা-ধনের মুখে খই ফোটে, কিন্তু দিদিমণির বক্তিমে শুনে টুঁ শব্দটি করতে পারলে না।"

তারপর কোন তরুণী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা মতির মা, তোমার দিদিমণির চেহারা কেমন?

মতির মা উত্তর দিল—সাক্ষাৎ সোরস্বতী ঠাকুরুণ গো।

রং কেমন জান ঐ যে কি বলে, যারা গ্যাট্ গ্যাট্ করে চলে, ক্যাট্ ক্যাট্ করে কথা কয়। হ্যাঁ মনে পড়েছে, মেম-সাহেব। রং ঠিক মেমের মত, চোখ যেন তুলিতে আঁকা। দিদিমণির মুখখানি দেখলে পুর্ণিমের চাঁদও লজ্জায় লুকুবে গো। চাঁদেরও কোলঙ্কো আছে, কিন্তু আমার দিদিমণির মুখে কোলঙ্কো নাই।

তখন একজন তরুণী কৌতুক করিয়া কহিলেন—মতির মা দেখছি কবিও বটে।

অমনই মতির মা বিনয়ের সহিত বলিল—আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমরা কি জানবেন? আপনকারা পুণ্ডিত, আপনকারা জান। আমার মামাতো ভাইএর স্বুমুন্ধীর ভাইরা ভাই ঐ যে কি বলে গো, 'এয়ে' 'বেয়ে' পাশ করে পুণ্ডিত হয়েছে।

তারপর যিনি মতিরমার উপর কবিত্বের আরোপ করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, মামাতো ভাইএর স্বুমুন্ধীর ভাইরাভাই, তা হ'লে সে তো তোমার একান্ত আপনার জন গো?

তখন মেয়ে-মহলে বিশেষ তরুণী দলে উচ্চ হাস্য রোল উঠিল।

তিন বৎসর পরে সেই ব্যাপার স্মরণ করিয়া নিস্তারিণী-দেবীর মনে হইল সেই মমতাদেবী যিনি দশ বৎসর বয়সে সভায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে অবাক্ করিয়াছিলেন!

এক মাস পরে মাষ্টারম'শায়কে জানান হইল স্কুল কমিটি তাঁহার শিক্ষকতা বিষয়ক দক্ষতা এবং দীর্ঘ বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার দশ টাকা বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই মাস হইতেই চল্লিশ টাকা হিসাবে বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

কে তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল মাষ্টারম'শায় তাহা জানেন না কিন্তু কাহার ইচ্ছা এই বেতন-বৃদ্ধির মূলে কার্য্য করিতেছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

হেমন্তে

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ

হেমন্ত এলো স্নিগ্ধ মধুর তুষার সিক্ত প্রভাতে
ধরণীর বুক ভরে গেছে তাই কত নব নব শোভাতে।
মাঠে মাঠে খালি ধান আর ধান
পাখীরা তুলেছে গানের উজান,
ভোমরের দল আকুল হ'য়েছে কমলের মনলোভাতে,
হেমন্ত এলো স্নিগ্ধ মধুর তুষার সিক্ত প্রভাতে।

মুকুতার হার পরেছে গলায় ধরণী আজিকে পুলকে
আজিকে ধরার শ্যামল রূপের তুলনা নাইকো দ্যুলোকে!
হেথা হোথা কত নব কিশলয়,
তুষার সিক্ত মাথা তুলি রয়,
ওরা আনন্দে এসেছে জোয়ার আজিকে সারাটি ভুলোকে—
আজিকে ধরার শ্যামল রূপের তুলনা নাইকো দ্যুলোকে।

পল্লীর ঘাটে ভিড় করে আজ কত যে সোনার তরণী
ভারে ভারে কত সোনার ধান্যে তরণী সোনার বরণী।
দিকে দিকে আজ আহ্বান ধ্বনি,
গগনে পবনে উঠিতেছে রণি,
কে কোথায় আয় কে যেন শুধায় আলোকে উজলী ধরণী
ভারে ভারে কত সোনার ধান্যে তরণী সোনার বরণী।

পল্লী মায়ের সোনার ঝাঁপিটি হেমন্ত এনেছে বহিয়া—
দিকে দিকে তাই সেই কথা আজ বাতাস চলেছে বহিয়া।
আয় ছুটে আয় কে আছ কোথায়
আয়রে ছুটে আয়রে হেথায়,
ক্ষুধায় কাতর কে আছিস ওরে, কেন আর ব্যথা সহিয়া,
দিকে দিকে তাই সেই কথা আজ বাতাস চলেছে কহিয়া।

সাধু হরিদাসের পুণ্যকথা

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাঁদপুরের আশ্রমকুটীর

যে সময়ে রামচন্দ্র খাঁন বঙ্গের দেশাধ্যক্ষ সেই সময়ে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুইটী স্বনামধন্য কায়স্থ ভূম্যধিকারী এখনকার হুগলীর অতি নিকটে পুরাতন সরস্বতী তটে সপ্তগ্রাম নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পদে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ নগর, সাতটি বড় বড় গ্রাম লইয়া এই নগরের পত্তন হয়, এই জন্য ইহার নাম সপ্তগ্রাম। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস দুই ভাই এই সপ্তগ্রামের আশ্রয় ও অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। তাঁহারা ঐ প্রদেশে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার ইজারদার কিংবা প্রতিনিধিরূপে সম্ভবতঃ চব্বিশ লক্ষ টাকা রাজকর তহশীল করিতেন এবং তাহা হইতে বার লক্ষ টাকা বাদশাহকে রাজস্ব দিয়া আপনারা অবশিষ্ট বার লক্ষ পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই এই প্রভূত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, দীনদুঃখীকে সাহায্য করা, সাধুসজ্জনের পোষণ করা সদাশয় ভ্রাতৃদ্বয়ের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। নবদ্বীপের নিরাশ্রয় পণ্ডিতবর্গও হিরণ্য এবং গোবর্দ্ধনের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াই এ সময়ে হিন্দুরাজার অভাবজনিত দুঃখ কতকটা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপভাবে লিখিয়াছেন,

> "হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর,
> সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।
> মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ,
> সদাচার, সৎকুলীন' ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য,
> নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়
> অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।"

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের এক পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বলরাম আচার্য্য। সপ্তগ্রামের অনতিদূরে চাঁদপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বলরাম আচার্য্যের নিবাসস্থল। পুরোহিত বলরাম প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজবাসস্থানে থাকিয়া ছাত্রদিগকে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তি-শাস্ত্রের উপদেশ করিতেন। তাঁহাকে সাধারণ লোকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সেইরূপ সম্মান করিতেন। বলরাম চাঁদপুরের বাড়ীতে বসিয়া আছেন, হরিদাস ঠাকুর বেনাপুলের কানন পরিত্যাগের পর দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া শেষে চাঁদপুরে আসিয়া বলরামের অতিথি হইলেন।

বলরাম তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার আশ্রমের জন্য একটী নির্জ্জন পর্ণশালা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি এই পর্ণকুটীরে আনন্দে বিভোর হইয়া দিবারাত্র তাঁহার হৃদয় বিহারী হরির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং দিবসে কোন এক সময়ে বলরামের ঘরে যাইয়া ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন (আহার করিতেন)।

> "হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে,
> আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।
> হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার'
> তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর।
> হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে,
> যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেইগ্রামে।
> নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন,
> বলরাম আচার্য্যের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।"
>
> — চরিতামৃত

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন কুলপুরোহিত বলরামের কাছে হরিদাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। হরিদাস কখনও ধনীর নিকট যাইতেন না কিন্তু মজুমদারের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া বলরাম আচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একদিন বলরামের সহিত মজুমদারদের বিরাট সভাঘরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে জনস্রোত আসিয়া বিরাট সভামণ্ডপ পূর্ণ করিয়াছিল। মধ্যমণ্ডপে মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিতগণ-বেষ্টিত হইয়া হিরণ্যদাস ও গোবিন্দদাস উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের দর্শনমাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে বিশিষ্ট আসনে বসাইলেন।

"একদিন বলরাম মিনতি করিয়া,
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া।
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান,
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান।"

সভায় যে সকল বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা হরিদাসের সৌম্য শান্ত দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অশেষপ্রকার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা হরিদাসকে কিরূপভাবে গ্রহণ করেন এসম্বন্ধে একটু সংশয় ছিল, কিন্তু পণ্ডিতদের এতাদৃশ ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। যথা চরিতামৃতে—

"অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ-সজ্জন
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে,
শুনিয়া সে দুই ভাই ডুবিল বড় সুখে।"

পণ্ডিতেরা জানিতেন যে, হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করিতেন। এইজন্য তাঁহারা হরিনামের মহিমা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কেহ বলিলেন যে, হরিনামে পাপক্ষয় হয়; কেহ বলিলেন, নাম হইতে মোক্ষপদ লাভ হয়।

"তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন,
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ।
কেহ বলে নাম হ'তে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হ'তে জীবের মোক্ষ হয়।"

কিন্তু চৈতন্যদেব যেমন রামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" হরিদাসও তেমনি পণ্ডিতদিগকে "এহো বাহ্য আগে কহ আর" বলিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করিলেন।

"হরি কহে নামের এ দুই ফল নহে,
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ-নাশ,
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।"

হরিদাস তাঁহার মনের কথা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য ভাগবত ও বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি বিবিধ পুরাণের বহুশ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং পরিশেষে শ্রীধর স্বামীর প্রসিদ্ধ টীকাসহ ভাগবতের একটী সুমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সকলকে অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা শুনাইলেন। শ্লোকটী এই—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য,
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।"

হরিদাসের ইচ্ছা যে সভাস্থ কোন পণ্ডিত এই শ্লোকের বিশদার্থ বুঝাইয়া দেন কিন্তু ভক্তবীরের অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহারা কেহই তাঁহার সামনে এ ভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না।

"এই শ্লোকের অর্থকর—পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥"

—চরিতামৃত

তখন হরিদাস নিজেই বলিতে লাগিলেন—

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম আদি হয় পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

সভাস্থ সকলেই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক মজুমদারের একটী আরিন্দা ব্রাহ্মণ এই ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া হরিদাসকে ভাবুক বলিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা শুনুন, কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি লাভ করা যায় না ইনি বলেন নামাভাসেই সেই মুক্তি লাভ করা যায়।

"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাত শাহে আগে আরিন্দা গিরিকরে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতশাহারে—ভরে।
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।

কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥"

—চরিতামৃত

হরিদাস কহিলেন, ভাই, তুমি বৃথা সংশয় কর কেন? হরিনামের আভাস মাত্রেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তেরা ভক্তি-সুখের তুলনায় মুক্তিকে অতি তুচ্ছ বস্তু জ্ঞান করেন। তাঁহারা কখনও মুক্তিপ্রার্থী হ'ন না।

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্র মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়॥"

কিন্তু হরিদাসের এ-বিনীত নিবেদন গোপাল চক্রবর্ত্তীকে নিরস্ত করিতে পারিল না। গোপাল হরিদাসের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের একশেষ দেখাইতে লাগিল এবং ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে নিকৃষ্ট ভাষায় গালি দিতে লাগিল। গোপালের ব্যবহার দেখিয়া সভাস্থ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। মজুমদার তাহাকে ধিক্কার দিলেন। বলরাম পুরোহিত তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর নির্ব্বিকারচিত্তে উঠিয়া বসিলেন। মজুমদার আরিন্দা ব্রাহ্মণকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং সভাসদের সহিত তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। হরিদাস সহাস্যবদনে মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে দুঃখিত হইতেছ কেন? তোমাদের ত' কোন দোষ নাই। এই ব্রাহ্মণেরও কোন দোষ দেখি না। এ একে অজ্ঞান, তাহাতে তাহার আবার তর্কপ্রিয় মন। নামের মাহাত্ম্য এ তর্কের গোচর নহে। সে এ-সব তত্ত্ব কোথা হইতে জানিবে?

সভাপতির সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে,
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে।
তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন।
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব,
কোথা হইতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব।

হরিদাস পুনরপি বলিলেন—

"যাও ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার,
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার।

হরিদাসের স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি আপামর সকলের প্রতি শত্রুমিত্র-নির্ব্বিচারে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত। প্রেমের দ্বারা তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য সব জয় করিতে পারিতেন। হতভাগ্য গোপালকে হরিদাস ক্ষমা করিলেন কিন্তু ভগবান্ ক্ষমা করিলেন না। অচিরাৎ সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। গোপালের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। চতুর্দ্দিকের লোকেরা বলিয়া উঠিল যে, তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

"যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল,
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্ত-স্বভাব অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে,
কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।"

—চরিতামৃত

হরিদাস সপ্তগ্রামের সভা হইতে বাহির হইয়া কিছুকাল চাঁদপুরের কুটীরে বিশ্রাম করত বলরাম আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন। হরিদাস যখন বলরামের গৃহে অতিথি তখন রঘুনাথ নামক নয় দশ বৎসর বয়স্ক একটি বালক তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। এই বালক গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই উভয় ভ্রাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সংসারে সুখসামগ্রীর সীমা নাই, তথাপি বালক বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়নের নেশায় আত্মবিস্মৃত। এই বালকই কালে রঘুনাথ গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রিয় শিষ্য এবং চৈতন্যচরিতামৃত লেখক কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গুরুদেব।

বৃন্দাবন দাস ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সম্বন্ধে আর একটী সদৃশ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, গোস্বামীর বর্ণিত ঘটনা ও বৃন্দাবনদাসোক্ত ঘটনা মূলে এক, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না; কারণ, দুই ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য হইতে পার্থক্য অত্যন্ত বেশী এবং বৃন্দাবনদাসোক্ত ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘটনাটী বৃন্দাবন দাসের ভাষায় আমূল উদ্ধৃত করিলাম,

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
"ওহে হরিদাস! একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জানিবা এই সে ধর্ম্ম নয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়?

কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে···
ইত্যাদি ইত্যাদি ... ...
সে বিপ্রাধমের কতো দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥

হরিদাসের স্নেহ-করুণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হওয়াতে ভক্তি ও বৈরাগ্যের বীজ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই রঘুনাথ সংসারের সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শাক্যসিংহের ন্যায় সুখের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চৈতন্যদেবের স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তিনি বারংবার গৃহ হইতে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বারংবার তাহার পিতার সতর্ক প্রহরী তাঁহাকে ধরিয়া আনে। তাঁহার মাতা তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, ছেলে পাগল হইয়াছে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখ। পিতা উত্তর দিলেন যে, যাহাকে ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সদৃশ স্ত্রী বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, তাহাকে দড়ির বন্ধনে কি করিবে? শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলনের পর ইনি পুরীতে অবস্থান কালে যেরূপ দৈন্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা হয় না। জগন্নাথের মন্দিরের পার্শ্বে দোকানে দোকানে প্রসাদান্ন বিক্রি হয়, তাহা অনেকেই জানেন। দুই তিনদিন যাবৎ যে সকল অন্ন বিক্রি হইত না তাহা গরুকে খাইতে দেওয়া হইত। গরুও সে-ভাত দুর্গন্ধের জন্য গ্রহণ করিত না। তাহা রাজপুত্র রঘুনাথ কুড়াইয়া নিয়া অনেক জল দিয়া ধুইয়া খাইতেন। রাজপুত্রের পক্ষে এমন কৃচ্ছ্রসাধনের তুলনা কোথায়? ধন্য হরিদাস—যাঁহার ক্ষণিক সঙ্গলাভে রাজপুত্র দীনের দীন কাঙ্গাল সাজিল। সত্য সত্যই কবিবর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, হরিদাসকে স্পর্শ করা দূরে থাক, তাঁহাকে দর্শন করিলেই নিখিল ভববন্ধন ছিন্ন হয়।

রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।
তাহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন,
ব্যাখান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ।

—চরিতামৃত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিদাস ও অদ্বৈত

শান্তিপুরের কমলাক্ষ শর্ম্মা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের পঞ্চদশ-তম গুরু মহামতি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত ও ভক্তির বিবিধ তত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া বঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। বহুদিন প্রচারের পর ইনি বৃদ্ধ বয়সে অদ্বৈত আচার্য্য নামে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবভক্তের মধ্যে প্রভু-গোস্বামীর আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী টোল ছিল। এক টোল ছিল শান্তিপুরে, আর এক টোল ছিল নবদ্বীপে। উভয়েই তাঁহার সমান প্রতিপত্তি—উভয় স্থলেই তাঁহার গৃহে অহোরাত্র ভক্ত-সমাগম। হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হরিদাস অদ্বৈতকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অদ্বৈত হরিদাসকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের মিলনে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল, গঙ্গা-যমুনার ন্যায় দুইটী জীবনধারা মিলিয়া বঙ্গদেশে এক মহাতীর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। অদ্বৈত আচার্য্যের পর্ব্বতপ্রমাণ বিশ্বাস, আর হরিদাস ঠাকুরের অগাধ মহাসিন্ধুসম ভক্তি—বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে যুগ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এই দুই মহা-পুরুষের গাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের বলে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির মহাতীর্থ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তির প্রথম সাধক বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য, দ্বিতীয় সাধক ঠাকুর হরিদাস। অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিরাজ্যে ভগীরথ। ভগীরথ যেমন সগরতনয়গণের উদ্ধারের জন্য পতিত-পাবনী গঙ্গাকে সাধনার বলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, অদ্বৈত আচার্য্যও সেইরূপ শুষ্ক-প্রাণ মৃতপ্রায় বাঙ্গালার প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চনের জন্য ভক্তি-গঙ্গাকে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। ভক্তি-গঙ্গাকে আনিলেন অদ্বৈতাচার্য্য কিন্তু সগরতনয়সদৃশ ম্রিয়মাণ সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর নিকট গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন ঠাকুর হরিদাস। অদ্বৈত আচার্য্য গঙ্গার মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া কূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যিনি গঙ্গাতীরে আসেন তাঁহাকেই গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। আর হরিদাস ছুটিয়া ছুটিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সগর-তনয়দিগকে খবর দিলেন

যে, তাঁহাদের মুক্তির জন্য পতিত-পাবনী গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তি-গঙ্গা অবতীর্ণ হইলেন কিন্তু ভক্তির দেবতা তখনও অবতীর্ণ হন নাই। অদ্বৈতাচার্য্য দুইবাহু তুলিয়া শিষ্যভক্তগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, "তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি ভক্তির দেবতা অবতীর্ণ হইতেছেন।" তাঁহার হুঙ্কারে শিষ্যভক্তদের অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘ দূর হইয়া যাইত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "ভগবানকে অবতীর্ণ করাইবেন। হরিদাসও সেই প্রতিজ্ঞায় যোগ দিলেন। দুইজনে এই মহাসঙ্কল্প করিয়া মহাযজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। এমন সঙ্কল্প পৃথিবীতে কেউ কোন দিন করে নাই। অদ্বৈতের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস আর হরিদাসের বিশ্বাসময়ী ভক্তি ভগবানের সিংহাসন কম্পিত করিল। অদ্বৈত বিশ্বাস-নেত্রে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর হরিদাস বিয়োগ-কাতর স্বরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তগত প্রাণ এ কথা সকলেই জানেন, কিন্তু বিশ্বাসের ফলও অতীব আশ্চর্য্য। বিশ্বাসের বলে অসম্ভব সম্ভাবিত, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম পরাস্ত হয়। বিশ্বাসের বলে মুমূর্ষু জীবনীশক্তি লাভ করে, গহন বনেও ক্ষুধার্ত্ত অন্ন পায়। বিশ্বাসী আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। বিশ্বাসীকে দস্যু হত্যা করিতে পারে না, হিংস্র-জন্তু বধ করিতে পারে না। বিশ্বাসীর জাহাজ জার্ম্মাণ সাবমেরাইন বিদ্ধ করিতে পারে না, আইসবার্গ চূর্ণ করিতে পারে না। বিশ্বাসের জোর থাকিলে টাইটেনিক ডিজেস্টার হয় না, লুসিটেনিয়ার সর্ব্বনাশ হয় না। বিশ্বাসের বলে সকল বাঞ্ছা চরিতার্থ হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়। বিশ্বাসের বলে ভগবানের করুণা অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বাসীকে সকল সাধনায় সিদ্ধ করে। বিশ্বাসের বলে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। ভগবান মর্ত্তভূমিতে অবতীর্ণ হন, দরিদ্রের কুটীরে অতিথি হন। বিশ্বাসের ভেলায় দীনহীন জন উত্তালতরঙ্গময় ভব সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়

অদ্বৈত ও হরিদাস উভয়ই ভক্তি-বিশ্বাসের আশ্চর্য্য সাধক। তথাচ এ কথা বলিতে পারি যে ভক্তির মন্দিরে প্রধান পুরোহিত হরিদাস, বিশ্বাসের মন্দিরে প্রধান পুরোহিত অদ্বৈতাচার্য্য। যেখানে ভক্তি সেখানে বিশ্বাস, যেখানে বিশ্বাস সেখানে ভক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস এক জিনিষ নহে। ভক্তি প্রাণের জিনিষ, বিশ্বাস মনের সম্পত্তি। বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভাই-ভগ্নী সম্পর্ক। বিশ্বাস ভাই, ভক্তি ভগ্নী। বিশ্বাস দৃঢ়, ভক্তি কোমল। ভক্ত মনে করিতে পারেন না যে শ্রীহরি তাঁহার দ্বারদেশে আসিবেন, কিন্তু ভক্তবৎসল হরি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হন। ভগবানের জন্য ভক্তের যেমন ব্যাকুলতা, ভক্তের জন্যও ভগবানের সেইরূপ ব্যাকুলতা। তিনি ভক্তের দ্বারদেশে আসিয়া বলেন, "এই আমি আসিয়াছি প্রাণ ভরিয়া আমার রূপ দেখ।" ভক্ত ভগবানের এ দয়া ও করুণায় একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যান। তাঁহার মধ্যে যেটুক কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাও তরল পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু বিশ্বাসী বলেন, "ঠাকুর আমাকে তোমার দেখা দিতে হবে। আমার ক্ষুদ্র কুটীরে তোমায় দয়া করিয়া আসতে হবে। আজ এই মহাবন্যার মধ্যে পদ্মানদীর উপর দিয়া পুত্র-কলত্র সহ আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গাখানি ভাসাইয়া দিলাম, ওপারে নিরাপদে পৌছাইয়া দিতে হবে। আজ আমি নিঃসহায় অবস্থায় বন্ধুহীন স্থানে যাত্রা করিলাম, আমাকে সাহায্য করিবার জন্য ষ্টেশনে একজনকে তোমায় পাঠাইতে হবে। আজ আমি স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বিদেশে যাত্রা করিলাম তাহাদের ভার তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে। খবরদার তাহাদের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।" বিশ্বাসীর সকলই জোর-জবরদস্তী। ভগবানেরও এমনি প্রকৃতি যে, তিনি বিশ্বাসীর আব্দার কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ভক্ত কিছু চান্ না, তথাপি ভগবান তাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকেন। আর বিশ্বাসী তাঁহার সকল কাজই ভগবানের দ্বারা করাইয়া লন।

হরিদাস যখন আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন তাহার বহুপূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার জীবনের মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঘোর তার্কিকতা ও নীরস বৈদান্তিকতায় পূর্ণ নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি-সভা স্থাপন করিয়া ভক্তির উপদেশ করিতেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের ভক্তি-সভার প্রতি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ও সাধারণ জনসমাজ তীব্র ঈর্ষ্যা ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন কি, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে নির্য্যাতন করিবার জন্য নানা প্রকার

উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ভক্ত কবি বৃন্দাবনদাস ভক্তি-সভার ভক্তদের দুরবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

"অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার,
তুচ্ছরস বিষয়ে সে আদর সবার।
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন,
তাহারাও না বলয়ে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ,
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন।
তাহাতেও উপহাস করয়ে অন্তরে,
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন,
দাস প্রভু ভেদ না করয়ে কি কারণ।
সংসারী সকল বুঝে মাগিয়া খাইতে,
ডাকিয়া বোলয়ে হরি, লোক জানাইতে।
এগুলার ঘরদ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া,
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া।
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্বভক্তগণ,
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোনজন।"

বৃন্দাবন দাস ভক্তদিগের এই বিড়ম্বনার কথা তদীয় গ্রন্থের আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন,
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন।
কোথায় নাহিক বিষ্ণু ভক্তির প্রকাশ,
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস।
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি,
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ-নাম দিয়া করতালি।
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে,
পাষণ্ড পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গ করি মরে।
এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ,
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে,
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে।
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস,
ইহাতে কি জুড়ায় ডাকিতে বড় ডাক।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি,
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই।
কেহ বলে যদি ধাগু কিছু মূল্য চড়ে,
তবে এগুলারে ধরি কিলাইব ঘাড়ে।
কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ,
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ।
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ,
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ।
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ,
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরি-সংকীর্ত্তন।
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভগবানের এই আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া অদ্বৈত একদিকে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভগবানকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, ভক্তিশূন্য নবদ্বীপে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য তোমায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।" অন্যদিকে ভক্তদিগকে বলিতে লাগিলেন—আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ভগবান অবতীর্ণ হইতেছেন তোমরা নিরাশ হইও না। অরুণ যেমন অগ্রগামী হইয়া সূর্য্যোদয়ের বার্ত্তা প্রচার করে, মহাপুরুষদের আগমনের পূর্ব্বেও তেমনি বিশ্বাসী ভক্ত দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রচার করেন। প্রভু ঈশ্বর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাধু জন দি বেপটিষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমার কথা অরণ্যে রোদনের ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু একজন আসিতেছেন—তিনি যদিও আমার পশ্চাতে আসিতেছেন তথাপি তিনি আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদিগকে জল দ্বারা দীক্ষিত করিতেছি, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তোমাদিগকে দীক্ষিত করিবেন।"

জন যীশুর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছিলেন, এ ভবিষ্যৎ বাণীর মূলেও দৃঢ় বিশ্বাস। জন বলিলেন, এক মহাপুরুষ আসিতেছেন; অদ্বৈত বলিলেন, ভগবান অবতীর্ণ হইতেছেন। কেন না আমি তাঁহাকে অবতীর্ণ করাইব। বস্তুতঃ ভগীরথ যেমন সাধনার বলে গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্যও বিশ্বাসের বলে ভক্তির দেবতাকে ভক্তিশূন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ করাইয়া নবদ্বীপকে ভক্তের মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনের এই মহাসাধনার প্রধান সহায় হইলেন ভক্ত হরিদাস। হরিদাস যখন অদ্বৈতের ভক্তি-সভায় সমক্ষে উপস্থিত হইলেন তখন ভক্তগণ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের নৈরাশ্য দূর হইল।

শূন্য দেখে ভক্তগণ সকল সংসার,
"হা কৃষ্ণ!" বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।
হেনকালে তথায় আইলা হরিদাস,
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ।

হরিদাসের সংসর্গ লাভ করিয়া অদ্বৈত দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল, বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইল। দুইজনের মনপ্রাণ আত্মা এক হইল। দুইজনের বিশ্বাস ভক্তি মিলিয়া এক হইল। দুইজনের এক সঙ্কল্প হইল। দুইজনে এক ব্রতে ব্রতী হইলেন, এক যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে হেথায় নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবে এই তার মন॥
দুই জনের ভক্তি চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রচার কৈল জগতে উদ্ধার॥
—চরিতামৃত

হরিদাস অদ্বৈতের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈত গঙ্গার তটে অতি নির্জ্জন প্রদেশে হরিদাসকে একটী "গোফা" অর্থাৎ মৃণ্ময় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হরিদাসের আশ্রম লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেও যোগী ঋষির আশ্রমের ন্যায় শোভা পাইত। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গঙ্গাজল-ধৌত শান্তিপুরস্থ আশ্রমের নৈশ শোভা যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কবিদিগেরও মন মুগ্ধ করে।

"জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিগ সুনির্ম্মল,
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।
দ্বারে তুলসী, লেপা পিণ্ডির উপর,
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর।

এহেন রমণীয় আশ্রমে হরিদাস প্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন। অপরাহ্ণে ভিক্ষার অনুরোধে যখন তিনি অদ্বৈতের গৃহে আসিতেন, তখন অদ্বৈতের ভাগবত ও গীতার ভক্তিরসাত্মক ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণকথামৃত আস্বাদন করিতেন।

"গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল,
ভাগবত, গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহন,
দুইজনে মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন।"

অদ্বৈত তাঁহাকে এতদূর আদর ও সম্মান দেখাইতেন যে, তিনি দৈন্যে ও লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িতেন এবং যখন দেখিতেন যে, শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর আদর করিতেন তখন মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, পাছে তাঁহাকে সম্মান করিতে গিয়া তিনি কোনও মতে সমাজে বিড়ম্বিত হন। এইজন্য অদ্বৈতকে অতি দীন ভাবে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন সামাজিক আচার উপেক্ষা করিয়া বিপদগ্রস্ত না হন।

"হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেও কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ,
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমায় কহিতে পাই ভয়,
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়।"

অদ্বৈত যে উত্তর করিলেন তাহা যদি আধুনিক হিন্দু সমাজের কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে পারিত, তবে তাহার উদার চরিত শতমুখে ধ্বনিত হইত। কিন্তু বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তদানীন্তন ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা কোন হিন্দুর পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। বৃদ্ধ আচার্য্য সামাজিক ব্যবহারে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যে তেজস্বিতা ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার তুলনা আমাদের ইতিহাসে বিরল।

"আচার্য্য কহেন তুমি না করহ ভয়,
যেই আচরিব সেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন,
অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন।"

তিনি যে কেবল মুখে এ কথা বলিলেন তাহা নহে, কার্য্যেও সেকথার যথার্থতা প্রতিপাদন করিলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধের পাত্রটী একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করিবেন মনে করিয়া এত অসংখ্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণের মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মনের মত লোক পাইলেন না, অবশেষে হরিদাস ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্রটী দান করিলেন। হরিদাসকে অদ্বৈতের ঐকান্তিক অনুরোধে ও তাঁহার প্রীত্যর্থে অত্যন্ত দীনভাবে অগত্যা এ দান গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু তিনি এই শ্রাদ্ধপাত্র নিয়া বিপদে পড়িলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। একদল লোক তাঁহাকে

পথে বিপন্ন করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া রহিল। তাহারা ভাবিল যে হরিদাসকে যথোচিত শাস্তি দিয়া হিন্দুসমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। একদিকে অপরাধী অদ্বৈত, আর একদিকে অপরাধী হরিদাস। কিন্তু অদ্বৈত প্রতিপত্তিশালী লোক, তাঁহাকে অপদস্থ করা যাহার তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সিংহের গর্জ্জনে যেমন শৃগালের দল আতঙ্কিত হয়, বিক্রম-কেশরী অদ্বৈতের হুঙ্কারেও তেমনি নীচাশয় লোকের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইত কিন্তু হরিদাস নিতান্ত নিরীহ, তাঁহাকে প্রহার করিলে নিজের বেদনার জন্ম তিনি দুঃখ অনুভব করেন না বরং আততায়ীর প্রহারজনিত দুঃখে দুঃখিত হন। এ হেন লোকের শাস্তি বিধান করিতে বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। তাই ব্রাহ্মণদের দল হরিদাসের গমনের পথে সুসজ্জিত হইয়া রহিল। তাহারা কোনদিন হরিদাস ঠাকুরকে দেখে নাই, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াছে। হরিদাস যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা দেখিল যে, সামনে এক দেবদুর্ল্লভ দিব্যমূর্ত্তি। এমন মহাপুরুষ তাহারা কখন জন্মে দেখে নাই। সূর্য্যের উদয়ে যেমন মেঘ কাটিয়া যায় হরিদাসের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন মাত্র সেইরূপ তাহাদের হৃদয়ে দুরিত দূর হইয়া গেল। তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। হরিদাস সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহ আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষদের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে তাঁহাদের দর্শনমাত্রই লোকের সৌভাগ্যোদয় হয়। মহাপুরুষদের পুণ্যজ্যোতিঃ যাহার নেত্রকে আকৃষ্ট করিয়াছে সেই ধন্য। শান্তিপুর যখন গরম হইয়া উঠিল তখন হরিদাস ভাবিলেন যে, সেখানে আর বেশী দিন থাকা উচিত নয়। প্রাণের সুহৃদ্ অদ্বৈতাচার্য্যও তাঁহার জন্ম বিড়ম্বিত হন এই ভয়ও সতত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক। এইজন্ম তিনি শান্তিপুরের আশ্রম ছাড়িয়া ফুলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরের গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের এক অলৌকিক ঘটনা কৃষ্ণদাস গোস্বামী বর্ণনা করিতে গিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পাঠকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, "বিশ্বাস করিয়া শুন, দোহাই তোমাদের—তর্ক করিও না।"

"তর্ক না করিহ তর্ক অগোচরে তার রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি।"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এ-ঘটনা আমি গুরুদেব রঘুনাথ দাস মুখে শুনিয়াছি। শ্রীরূপ গোসাঞিও কড়চায় এ-ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

ঘটনাটী এই—

একদিন জোৎস্নাময়ী রজনীতে দশদিক্ উদ্ভাসিত। গঙ্গার লহরীর উপর সুধাংশু কিরণ পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে, জাহ্নবীজল-ধৌত হরিদাসের আশ্রম-কুটীরের শোভা বড়ই মনমুগ্ধকর হইয়াছে—লেপা পিঁড়ার উপর তুলসীগাছ গোফার দ্বারে বিদ্যমান। মধ্যে হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় এক অপরূপ রমণী অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গকান্তিতে আশ্রম পীতবর্ণ হইল। অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত হইল। ভূষণধ্বনিতে কর্ণ চমকিত হইল। রমণী আসিয়া তুলসীকে নমস্কার করিল। তুলসীকে পরিক্রমণ করিয়া গোফার দ্বারে গেল এবং জোড়হাতে হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল। তারপর সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! তুমি জগতের নমস্য ও আরাধ্য, তুমি রূপবান্ গুণবান্। তোমার সহবাসের জন্ম আমি এখানে আগমন করিয়াছি। সদয় হইয়া আমাকে গ্রহণ কর। দীনের প্রতি দয়া সাধুর স্বভাব। আমার ন্যায় দীনজনে দয়া কর।" এইরূপ বলিয়া এতাদৃশ হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যাহাতে মুনিরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। নির্ব্বিকার গম্ভীরাশয় হরিদাস সদয় হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, সংখ্যানাম সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে আমি প্রতিদিন দীক্ষিত হই। যে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন সমাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত আমার অন্যদিকে মন নাই, কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে দীক্ষার বিশ্রাম। দ্বারে বসিয়া তুমি নাম সংকীর্ত্তন শুন। নাম সমাপ্ত হইলে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে। ইহা বলিয়া হরিদাস নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রমণী দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি অবসান হইল। প্রাতঃকাল দেখিয়া রমণী উঠিয়া গেল। এইরূপে সে তিনদিন যাতায়াত করে এবং এরূপ হাবভাব দেখায় যাহাতে ব্রহ্মারও মন হরণ করে। তৃতীয় রাত্রিশেষে ঠাকুরের নিকট কহিতে লাগিল,

যায়। মাঠের কাজ করবার যখন সখ হয়েছে, একদিন করে নজাটা দেখ না।

নয়ন। বেশ আমি তাই চল্লুম। অর্দ্ধেক কাজ তো আমি এগিয়ে রেখেছি বাকীটা যদি ঠিক করে করতে পার তাই ঢের। আমি চল্লুম মাঠে। দেখা যাক তুমি কেমন কাজের লোক।

শম্ভু। (ভীতভাবে) তুমি কি সত্যিই মাঠে যাচ্ছ না কি?

নয়ন। হ্যাঁ। কেন ভয় পেয়ে গেলে?

শম্ভু। কি পাগলের মত বকছ? ভারী তো কাজ তার আবার ভয়। তুমি এসে দেখবে ও সব আমি শেষ করে বসে আছি।

নয়ন। ভালই। আমি চলে গেলে তোমার সেই বন্ধুটার সঙ্গে বসে বসে যেন গল্প কোরো না।

শম্ভু। কোন বন্ধু?

নয়ন। জানেন না—ন্থাকা। তোমার সেই সুশীল, যে গান গায় আর তার বাজায়।

শম্ভু। তার বাজায় কি গো! সে যে বেহালা বাজায়। শহরে তার কি রকম নাম। যত সব যাত্রাপার্টিতে তাকে বাজাবার জন্ত ডেকে নিয়ে যায়। এই গ্রামেই এবার যাত্রা হবে। সুশীলই সব করবে—আমাকেও নেবে বলেছে।

নয়ন। যা ইচ্ছে কর, মোট কথা আগে কাজ শেষ করে তবে গল্প করবে। তোমার ঐ শহরের বন্ধুটী কোন কাজের নয়। খালি গল্প আর গান বাজনা। তাতে সংসারে কি উপকার হবে শুনি?

শম্ভু। সে সব তুমি বুঝবে না। মেয়ে মানুষরা নাচ, গান, যাত্রার কি জানে। এখন যাও, আর দেরী কোরো না। আমিও কাজকর্ম্মে লেগে যাই।

নয়ন। যাচ্ছি। হাত পা সামলে কাজ কোরো। কিছু ভাঙ্গাচুরো কোরো না।

শম্ভু। আমাকে আর শেখাতে হবে না।

নয়ন। (যেতে যেতে) ফিরে এসে যদি বাড়ীটা আস্ত দেখতে পাই তো আমার ভাগ্যি।

(প্রস্থান)

শম্ভু। যাক্, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নিই, পরে অন্ত কাজগুলো করা যাবে। (ঝাট দিতে দিতে গুণ গুণ করে গাইছে)

রাম কাঁদে, লক্ষণ কাঁদে আর কাঁদে হনুমান
সীতার লাগি অশ্রু ফেলে সুগ্রীব জাম্বুবান—রে
রামের কি বা মহিমে

(নেপথ্যে—কি হে শম্ভুনাথ ভায়া, বাড়ী আছ নাকি?)

শম্ভু। কে? সুশীল না? আরে ভেতরে এস, ভেতরে এস। (সুশীলের বেহালা হাতে প্রবেশ, চোখে চশমা)

শম্ভু। একি একেবারে বেহালা নিয়ে এসে পড়েছ যে।

সুশীল। হ্যাঁ, তোমার সেই গানটা ঠিক করে দেবার জন্ত এলুম। চোখটা নিয়ে যা কষ্ট পাচ্ছি—

শম্ভু। কেন, কেন, চোখে কি হ'ল?

সুশীল। জান তো চশমা ছাড়া নিজের হাত দেখতে পাই না কিন্তু এ চশমাটাও যেন ঠিক চোখে লাগছে না। ক্রমাগতই জল পড়ছে। এবার যখন শহরে যাব বদলে আনব।

শম্ভু। তুমি কি চশমা পরেই রাধা সাজবে?

সুশীল। নিশ্চয়ই। কেন, তাতে কি হয়েছে? আর রাধার চোখ খারাপ যে ছিল না, এ কথা তো মহাভারতে লেখা নেই।

শম্ভু। তা বটে! কিন্তু চশমা কি তখন উঠেছিল।

সুশীল। উঠেছিল বই কি। মুনি-ঋষিরা এত লেখা পড়া করতেন, চশমা না হলে কি করে তাঁদের চলত? নাও তোমার গানটা ঠিক করে নাও। প্রস্তাবনা—গ্নের আগে তোমাকে গাইতে হবে। খুব ভাল হওয়া চাই। গানটা মুখস্ত করেছ' তো?

শম্ভু। হুঁ। কিন্তু সংসারের সব কাজ কর্ম্ম আগে সেরে না রেখে গান গাইলে গিন্নী ফিরে এসে ভয়ানক রাগ করবে।

সুশীল। সংসারের কাজকর্ম্ম তুমি করবে? কেন গিন্নী গেছে কোথায়?

শম্ভু। সে আর বোলো না ভাই। সমস্ত সকালটা মাঠে খেটেখুটে বাড়ী এসে খেয়ে দেয়ে একটু নিশ্চিন্দি হয়ে তামাক খাব তা গিন্নীর জ্বালায় হবে না। এমন তামাক সেজে দিলে যে দু'টান মারবার আগেই নিভে গেল। একটু

মনে দুঃখ হল। তাকে বলতে কাজের দোহাই দিয়ে আমাকে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। আমি বললুম যে তুমি একদিন আমার কাজটা করে দেখ সেটা খুব সহজ নয়, বল তো তোমার কাজ আমি করে দিচ্ছি। তাতে তিনি বল্লেন—রইল তোমার সংসার। আমি চললুম মাঠে ধান কাটতে। এসে দেখতে চাই সব কাজ হয়ে গেছে।

সুশীল। কিচ্ছু ভেব না। তোমাতে আমাতে দু'জনে মিলে দেখতে দেখতে সব করে ফেলব। আগে গানটা তৈরী করে নাও। তোমার ওপরই আমাদের বই নির্ভর করছে। আমি আরম্ভ করছি।

'কই এলো না মোর বংশীধারী'

শম্ভু। 'আমি তার কি বা করি'

সুশীল। 'জেগে জেগে রাত পোহাল'

শম্ভু। 'তোমার দুঃখে আমি মরি'

(সঙ্গে বেহালা বাজছে। গান বেসুরো, বেতালা হচ্ছে।)

সুশীল। তোমার গলা মিলছে না।

শম্ভু। গলা আমার ঠিকই মিলছে, তোমার বেহালা মিলছে না।

সুশীল। 'আসবে আমার কালোশশী
তাই ফুল তুলেছি রাশি রাশি'

শম্ভু। 'আ মরি সকল হল' বাসি'.

সুশীল। ছুটছ কেন? একটু আস্তে গাও, তাল কেটে যাচ্ছে।

শম্ভু। আমি ঠিকই গাইছি, তোমার তালই পেছিয়ে পড়ছে।

সুশীল। 'বাঁকা শ্যামের আসার আশে
সারা নিশি কাটল বসে'

শম্ভু। 'পিঠে ব্যথা, চোখ ফোলা,
ভয় হয় পাছে লোকে হাসে'

সুশীল। 'এবার বুঝি পরাণ গেল'

শম্ভু। 'আহা সখি কি বা হোল'

সুশীল। 'যমুনার জলে ঝাঁপ দেব'

শম্ভু। 'তা হলে সখি যাবে মরি।'

সুশীল। বেশ হয়েছে। তবে এখনও মধ্যে মধ্যে তাল কাটছে। দু'চার দিন আরও অভ্যাস করলে ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভু। তুমি কিছু ভেব না মাষ্টার, আমি সব ঠিক করে নেব।

সুশীল। আর একবার হবে নাকি?

শম্ভু। না, আর না। এখনও সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

সুশীল। ও দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, তার জন্য তুমি ভেব না।

শম্ভু। তোমার আর কি? বলে দিলে ভেব না। আমার কাজ পড়ে রয়েছে বলে সূর্য্যি তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। তারপর মাঠ থেকে গিন্নী ফিরে এসে—

সুশীল। বাড়ীর কর্ত্তা কে? তুমি না তোমার স্ত্রী?

শম্ভু। মানে বুঝলে কিনা কর্ত্তা আমি বটে কিন্তু তার কথাতেই সব হয়।

সুশীল। তুমি ভয় পাও বুলেই তো পেয়ে বসেছে। যাক্ তার আর কি করা যাবে। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে লাভ কি?

শম্ভু। বেলা চলে যাচ্ছে আর তুমি বলছ' ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? তোমার জন্যেই তো এত' দেরী হয়ে গেল। কাজের সময় গান গাওয়া আরম্ভ করলে—

সুশীল। তুমিই তো বল্লে—

শম্ভু। আমি বললুম। শম্ভু মিথ্যে কথারও একটা সীমা আছে। বেহালা বগলে হেলতে দুলতে কে এসেছিল শুনি.?

সুশীল। আসলেই যে গান গাইতে হবে তার কি মানে আছে?

শম্ভু। তুমিই তো আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে গান গাইতে বল্লে। বল্লে কাজ-কম্মে তুমি আমার সাহায্য করবে। এখন তো খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পই করে যাচ্ছ। তাতে তো আর কাজ এগোচ্ছে না।

সুশীল। বেশ, কি করতে হবে বল, এখুনি করে দিচ্ছি।

শম্ভু। পাতকো থেকে এক বালতি জল তুলে আন। কুঁজোটা ভরতে হবে। আমি ততক্ষণ ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে ফেলি।

সুশীল। বালতী দড়ি সব কোথায়?

শম্ভু। পাতকোর ধারে আছে। যাও, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তাড়াতাড়ি কর।

সুশীল। ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। আস্তে আস্তে সব কাজ ধীরে সুস্থে করে ফেলব। এখুনি জল আনছি।

(প্রস্থান)

(শম্ভু ঝাঁট দিচ্ছে আর গুণ গুণ করে গাইছে—'এবার বুঝি পরাণ গেল, আহা সখি কি বা হোল'—এমন সময় ঝাঁটা লেগে কুঁজো পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল।)

শম্ভু। যা, কুঁজোটা ভেঙ্গে গেল। গিন্নী এসে রাগ করবে। এটাকে এক রকম করে জুড়ে রেখে দিই, যাতে ভেঙ্গে গেছে বুঝতে না পারে।

সুশীল। (ছুটে এসে) শম্ভু ভাই বড় মুস্কিল হয়েছে।

শম্ভু। কেন? কি হয়েছে?

সুশীল। জল তোলবার সময় হঠাৎ আমার হাত থেকে দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে বালতী দড়ি সব কুয়োয় পড়ে গেল।

শম্ভু। বেশ করেছ। এখন তুলবো কি করে?

সুশীল। কালকে আমাদের পাড়ার হারুকে পাঠিয়ে দেব। সে তুলে দেবে।

শম্ভু। আজ কুঁজোয় জল ভরব কি করে?

সুশীল। আমি মুখুজ্জেদের কুয়ো থেকে ভরে আনছি।

(সুশীল কুঁজোয় হাত দিতেই ভাঙ্গা কুঁজো ভেঙ্গে গেল।)

শম্ভু। ভাঙ্গলে তো। কোন কাজ যদি ঠিক ভাবে করতে পার।

সুশীল। ও বোধ হয় আগেই ভাঙ্গা ছিল।

শম্ভু। আগেই ভাঙ্গা ছিল। এতদিন আমরা ভাঙ্গা কুঁজোয় জল খেয়েছি। একটু সাবধানে কাজ করতে পার না। তুমি ততক্ষণ লণ্ঠনটা সাজাও, আমি গিয়ে গরু দুইয়ে ফেলি। দেখো যেন আর কিছু ভেঙ্গো না।

সুশীল। পাগল। ভাঙ্গব কেন। (শম্ভুর প্রস্থান)

(সুশীল লণ্ঠন পরিষ্কার করতে করতে গান গাইছে। 'আসবে আমার কালো শশী, তাই ফুল তুলেছি রাশি রাশি, আ মরি সকল হ'ল বাসি'—এমন সময় চিমনী হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল।)

সুশীল। ঐ যাঃ! চিমনীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

শম্ভু। (ছুটে এসে) তাড়াতাড়ি করে নাকে মাথায় একটু জল দাও।

সুশীল। কেন? কি হয়েছে?

শম্ভু। দেখতে পাচ্ছ না, নাক দিয়ে গল্‌গল্ করে রক্ত পড়ছে।

সুশীল। তাই নাকি। তাড়াতাড়ি করে শুয়ে পড়। কি করে লাগল?

শম্ভু। (শুয়ে) দুধ দোহা প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় গরুটা এমন লাথি ছুড়লে ঠিক নাকে এসে লাগল। দুধের বালতী গেল উল্টে, আর নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

সুশীল। গরুর পা বাঁধা উচিত ছিল।

শম্ভু। এখন রক্ত থামাবার একটা ব্যবস্থা কর।

সুশীল। সহর হলে বরফের ব্যবস্থা করা যেত।

শম্ভু। যতদিন না সহর থেকে বরফ আসবে ততদিন এই রকম ভাবে রক্ত পড়বে?

সুশীল। না, পড়ে পড়ে আপনিই থেমে যাবে।

শম্ভু। ততদিনে আমি মরে ভূত হয়ে যাব। অন্ধকার হয়ে এল যে, আলোটা জ্বাল না।

সুশীল। চিমনীটা ভেঙ্গে গেছে।

শম্ভু। যা ভয় করছিলুম তাই। তোমায় কোন কাজ করতে বলাই আমার অন্যায় হয়েছে। বিনা চিমনীতেই আলোটা জ্বালো।

সুশীল। দেশালাই?

শম্ভু। ও ঘরে শিকের ওপর আছে।

সুশীল। (পাশের ঘর থেকে) শম্ভু শিগগীর এস—

শম্ভু। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কি রকম করে যাব?

(কোন জিনিষ পড়ার শব্দ)

শম্ভু। কি হোল?

সুশীল। শিকেটা ছিঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

(ঘরে ঢুকে) উঃ হাতটা একেবারে কেটে গেছে।

শম্ভু। দেখি। এর নাম কাটা। সামান্য একটু ছড়ে গেছে।

সুশীল। নিজের হলে বুঝতে পারতে। এ হাত নিয়ে আর তোমার বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারব না।

শম্ভু। বাঁচা যাবে। জিনিষপত্তর আর ভাঙ্গবে না। (একটু থেমে) সুশীল গরুটাকে বেঁধে আসতে ভুলে গেছি বোধ হয়। যাও তো ভাই।

সুশীল। কই গরু কোথায়?

শম্ভু। বাইরে, উঠানে। ঘরের মধ্যে থেকে কি করে দেখবে।

(সুশীল বাহিরে চলে গেল)

সুশীল। (নেপথ্যে) কোথায় বাঁধব ?

শম্ভু। খুঁটীর সঙ্গে।

সুশীল। খুঁটী খুজে পাচ্ছি না। (ভেতরে এসে) এই বেঞ্চিটার সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি। দড়িটা বড় আছে। বেঞ্চি নড়ে উঠলেই বুঝব গরুটা চলে যাচ্ছে।

শম্ভু। ঘরে বসেই গরুর তদারক হয়ে যাবে। সত্যি ভাই সুশীল, তোমার কি বুদ্ধি।

সুশীল। তুমি তো ধর নাড়তে পারছ না। আমি একলা ঘরের কাজ আর গরু দেখা দুই তো করতে পারি না। এক সঙ্গে দুটো কাজই চলবে।

শম্ভু। এখন একটা আলোর বন্দোবস্ত করতে হবে। ও ঘরে শেল্ফের (shelves) ওপর একটা ডেমি আর দেশলাই আছে, তুমি ভাই একটু যাও। আমি উঠতে পারছি না—

সুশীল। না না তোমায় উঠতে হবে না। আমি ধীরে সুস্থে সব ঠিক করে দেব। (প্রস্থান)

শম্ভু। গিন্নী এখনও ফিরল না। সন্ধ্যে হয়ে এল। অবশ্য যত দেরী হয় ততই ভাল। কাজগুলো এগিয়ে নেওয়া যাবে।

সুশীল। (পাশের ঘর থেকে) শম্ভু, শম্ভু, শীগগির—

(হঠাৎ হুড়মুড় কোরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ)

শম্ভু। ঐ যাঃ, আবার কি একটা কাণ্ড করে বসল।

সুশীল। (গোঙাতে গোঙাতে) দরজা কোন দিকে ?

শম্ভু। কেন, দেখতে পাচ্ছ না? এখনও তো একটু আলো রয়েছে, দরজা বেশ দেখা যাচ্ছে।

সুশীল। ওরে বাবারে (ধাক্কা খেয়ে) এটা তো দেয়াল।

শম্ভু। আর একটু ডান দিকে। আহা-হা আমার ডান দিকে—

সুশীল। তোমার ডান দিক কোনটা ?

শম্ভু। এই দিকটা। বুঝতে পার না কেন ?

সুশীল। শুধু এই দিক বলতে কি ছাই-বুঝব।

(হাতড়ে হাতড়ে অতি কষ্টে সুশীল ঘরে ঢুকল)

শম্ভু। তোমার কি হয়েছে শুনি ?

সুশীল। তোমার জন্যই তো যত ফ্যাসাদ। মাঝ থেকে, চশমাটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল।

শম্ভু। কি করে ? ধরে ফেললে না কেন ?

সুশীল। ধরব কি করে ? আমিও যে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলুম।

শম্ভু। পড়লে কেন ?

সুশীল। শেল্ফের ওপরে উঠে যেই ডেমিটা আর দেশলাই পাড়তে গেছি, অমনি শেল্ফটা গেল উলটে।

শম্ভু। যাবেই তো। ওর ওপর উঠতেই বা গেলে কেন ?

সুশীল। ওপরে নাগাল পাচ্ছিলুম না, তাই ভাবলুম—

শম্ভু। বেশ করেছ। তোমার যেমন বুদ্ধি। (একটু পরে) এই রে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সুশীল। কি হ'ল ?

শম্ভু। গিন্নী আজ আমায় বাড়ী থেকে বার করে দেবে।

সুশীল। কেন, কেন, কি হয়েছে।

শম্ভু। শেল্ফের ওপর ওর সখের আর্শী ছিল। এবারে পূজোর সময় কিনেছিল। সেটাও নিশ্চয়ই গেছে। তুমিই আমায় ডোবাবে দেখছি।

সুশীল। আমার যে চশমা গেল, অন্ধ হয়ে বসে রয়েছি, সেটা দেখছ ?

শম্ভু। তার জন্য আমি দায়ী নাকি ?

সুশীল। তোমার কাজ করে দিতে গিয়ে আমার চশমা ভাঙ্গল, আর দায়ী হবে ও পাড়ার মধুখুড়ো। চমৎকার!

(নেপথ্যে—শম্ভুদা, বাড়ী আছ নাকি ?)

শম্ভু। কে জিতেন না ? আরে এস এস ভেতরে এস।

(লণ্ঠন হাতে জিতেন ভেতরে ঢুকতে গেল। দড়ি দিয়ে গরু বেঞ্চের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পায়ে আটকে পড়ে গেল। লণ্ঠনের কাচের চিমনী ভেঙ্গে গেল। তেলে আগুন ধরে উঠল)

জিতেন। আনাগোনার রাস্তায় আবার একটা দড়ি বেঁধে রেখেছ কেন ? পড়ে গিয়ে হাত কেটে গেল, লণ্ঠনের চিমনীটা ভেঙ্গে গেল—

শম্ভু। এ দিকে যে তেলে আগুন ধরে উঠেছে। ঘরে আগুন না ধরে উঠে। সুশীল দেখ না একবার—

সুশীল। কি করে দেখব ? আমি তো বলতে গেলে এখন অন্ধ হয়ে রয়েছি। তুমিই যা করবার কর'।

শম্ভু। বেশ বলেছ। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর আমি উঠে দেখব।

জিতেন। তোমরা দুজনে ঝগড়া করছ, এদিকে আগুন যে বেড়েই চলেছে। বাড়ীতে জল নেই।

শম্ভু। না। থাকবে কোত্থেকে? সুশীল যে ওদিকে বালতী দড়ি সব পাতকোতে ফেলে দিয়েছে।

জিতেন। যদি বালতী ফেলে দিয়ে থাকে আর দড়ি ওপরে থাকে তবে দড়ি ধরে টানলেই বালতী চলে আসবে। আর যদি দড়ি ফেলে দিয়ে থাকে আর বালতীটা ওপরে থাকে তাহলে বালতী ধরে টানলেই দড়ি চলে আসবে। দড়ি আর বালতী বাঁধা ছিল তো সুশীল দা?

সুশীল। তা ছিল। কিন্তু দুই পড়ে গেছে।

জিতেন। তবেই তো মুস্কিল। তাই তো, আগুন তো নিভছে না। বাড়ীতে একটা কম্বল কিংবা লেপ নেই।

সুশীল। ঠিক বলেছ। লেপ চাপা দিলে আগুন নিবে যায় বটে।

শম্ভু। লেপ পুড়ে যাবে না তো।

সুশীল। পাগল।

শম্ভু। ঐ ঘরে খাটের ওপর আছে।

সুশীল। (পাশের ঘর থেকে) কই খাটের ওপর লেপ তো নেই।

শম্ভু। তাহলে হয় ত' পাশে পড়ে গেছে। পেয়েছ?

সুশীল। হাঁা। (লেপের একধারটা ধরে টানতে টানতে ঢুকল) আসছে না কেন?

জিতেন। হয় ত' কোথাও আটকেছে।

শম্ভু। টেন না ছিড়ে যাবে।

সুশীল। না না টানছি না। (একটান মেরে) এই যে এসেছে।

শম্ভু। ও-মা-গো। একধারটা যে একেবারে ছিড়ে বেরিয়ে গেছে।

জিতেন। দাও চট করে, আগে আগুনটা নিভিয়ে দিই।

(আগুনে লেপ ঢাকা দিতে আগুন নিভে গেল)

সুশীল। কেমন, বলেছিলুম না।

শম্ভু। লেপটা দেখি। পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে।

সুশীল। সামান্য একটু বই কি!

শম্ভু। জিতেন দেশলাই আছে?

জিতেন। আছে, কেন?

শম্ভু। তোমার হারিকেনটা একটু জ্বাল তো।

জিতেন। তেল তো সব পড়ে গেল।

শম্ভু। কিছুক্ষণ তো জ্বলবে। জ্বালো। (আলো জ্বাললে, লেপ দেখে) এই তো খানিকটা কালো হয়ে গেছে।

সুশীল। বেশী না।

জিতেন। (ভীতভাবে) রাম রাম রাম—হি হি হি।

শম্ভু। কি হল?

সুশীল। নেশা-টেশা করেছ নাকি?

জিতেন। ভূ-ভূত—

শম্ভু। অ্যাঁ ভূত। কই?

জিতেন। ঐ তো। বেঞ্চিটা নড়ছে দেখতে পাচ্ছ না।

শম্ভু। (হেসে) ওঃ ওটা। ও সুশীলের কীর্ত্তি। বেঞ্চির সঙ্গে গরু বেঁধে রেখেছে।

সুশীল। ঘরে বসে বসে গরুর তদারক চলছে। বেঞ্চি নড়লেই বুঝব গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিতেন। এ যে ক্রমেই দরজার দিকে যাচ্ছে।

শম্ভু। তা হলে তো পালাবার মতলব আছে। সুশীল বেঞ্চিটা চেপে ধর।

সুশীল। (ধরে) প্রাণপণ চেপে ধরেছি। এ যে তবুও নড়ছে।

শম্ভু। জিতেন, তুমি একটু সুশীলকে সাহায্য কর।

জিতেন। (পায়া ধরে) আমরা দু'জনেও যে ধরে রাখতে পারছি না।

সুশীল। শম্ভু তুমিও ধর।

শম্ভু। আমি কি করে ধরব। আমার যে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

সুশীল। এখনও থামে নি?

শম্ভু। থেমেছে একটু, কিন্তু উঠলেই আবার পড়বে।

সুশীল। আর তো ধরে রাখতে পারা যাচ্ছে না। তুমি এক কাজ কর। বেঞ্চিটার ওপরে উঠে শোও।

শম্ভু। বেশ তাই করছি। (শম্ভুর তথাকরণ)

(হঠাৎ বেঞ্চি শম্ভুসহ অদৃশ্য হয়ে গেল। পায়া ছ'টো দু'জনের হাতে রয়ে গেল। দু'জনেই ছিটকে গিয়ে পড়ল।)

সুশীল। উঃ রে বাপরে, মাথাটা গেছে।

জিতেন। পিঠে যেন কি লাগল। বোধ হয় কেটে রক্ত পড়ছে।

সুশীল। আমাদের হাতে তো শুধু বেঞ্চির পায়া রয়ে গেল। বাকীটা আর শম্ভু কোথায়?

জিতেন। শম্ভুদাশুদ্ধু বেঞ্চিটাকে বোধ হয় টানতে টানতে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

(এমন সময় নয়নতারা ও আরেকটী মহিলার আলো হাতে প্রবেশ। নেপথ্যে নয়নতারা বলছে—"ওমা দাওয়ার চালের অর্দ্ধেক খড় যে গরুতে খেয়ে ফেলেছে"—বলতে বলতে ঘরে ঢুকল।)

নয়ন। ঘরের একি দশা হয়েছে। সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন। তোমরা বসে রয়েছ, সে গেল কোথায়?

জিতেন। বৌঠান, তোমায় কি আর বলব। এসে দেখি শম্ভুদার নাক দিয়ে রক্তের নদী বইছে—

সুশীল। ওদিকে গরু বাঁধবার খুটীটে হারিয়ে যাওয়ার দরুণ আমি গরুটাকে বেঞ্চির সঙ্গে বেঁধে দিলুম—

জিতেন। তারপর বেঞ্চিশুদ্ধু গরু পালিয়ে যাচ্ছে দেখে আমাতে আর সুশীলদা'তে বেঞ্চির পায়া চেপে ধরলুম—

সুশীল। তবুও ধরে রাখা যায় না দেখে শম্ভুকে বেঞ্চির ওপর শুতে বললুম—

জিতেন। আর গরু বেঞ্চিশুদ্ধু শম্ভুদাকে টানিতে টানতে পালিয়ে গেল, শুধু পায়া ছ'টো আমাদের হাতে রয়ে গেল—

সুশীল। আমরা ছিটকে পড়লুম। আমার মাথায় লাগল, জিতেনের পিঠ ছড়ে গেল—

নয়ন। (কাঁদ কাঁদ সুরে) গরু টানতে টানতে নিয়ে গেছে। তবে তো সে আর বেঁচে নেই। কেন মরতে তাকে গেরস্তর কাজ করতে বলেছিলুম—

মহিলা। তাকে গেরস্তর কাজ করতে বলেছিলি কি রে?

নয়ন। হ্যাঁ দিদি। তার তামাক নিতে গিছল বলে রাগ করছিল। আমি শুধু বলেছিলুম এখন হাত জোড়া, একটু পরে সেজে দিচ্ছি। তাতে রেগে আমায় বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে বল্লে, তোমার সংসার করে দরকার নেই আমি নিজেই সব করে নেব—

সুশীল। কিন্তু শম্ভুদা যে অন্যরকম বল্লে—

নয়ন। স্বভাব দিদি স্বভাব। চিরটা কাল পাঁচজনের কাছে মিথ্যে করে আমার নিন্দে করে বেড়ায়। আমি নেহাৎ ভাল মানুষ তাই নীরবে মুখটা বুজে সব সহ্য করি।

মহিলা। কিন্তু শম্ভু গেল কোথায়? তার একটা খোঁজ করা দরকার। এই রাত্রে কোথায় পড়ে থাকবে—

জিতেন। আমরা যাই। দেখি যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়।

সুশীল। জিতেন আমার হাতটা ধর। আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

[উভয়ের প্রস্থান]

নয়ন। দিদি সে যদি আর না ফেরে—

মহিলা। কি সব অলুক্ষণে কথা বলছিস্ নয়ন!

নয়ন। না দিদি আমার মন যেন বলছে সে আর নেই। আমার যে ডাকছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—

মহিলা। ছিঃ বোন, অমন ভাবে কাঁদতে নেই আগে ওরা ফিরে আসুক। একটা জ্যান্ত মানুষের জন্য ওরকম ভাবে কান্না—

নয়ন। (নিজের মনে) ওগো তোমায় আমি রোজ দশবার করে তামাক সেজে দেব গো—

(এমন সময় কর্দ্দমাক্ত দেহে শম্ভুর প্রবেশ)

নয়ন। ও দিদিগো, এযে মরে ভূত হয়ে এল।

মহিলা। শম্ভু না।

নয়ন। না ওর প্রেতাত্মা। দিদিগো ভয়ানক রেগে আছে। আমার ঘাড় মটকাবে।

শম্ভু। আমি শম্ভু। আমায় তুমি চিনতে পারছ না।

নয়ন। তুমি কি বেঁচে আছ না মরে গেছ?

শম্ভু। মরে যাব কেন? এই তো বেঁচে রয়েছি।

নয়ন। তোমায় না গরু বেঞ্চিশুদ্ধু টানতে টানতে নিয়ে গেছল।

শম্ভু। হ্যাঁ। বেঞ্চিতে শুয়েছিলুম, হঠাৎ দেখি বেঞ্চিশুদ্ধ গরু আমায় টেনে নিয়ে চলেছে। তাড়াতাড়ি বেঞ্চিটা ধরলুম আঁকড়ে। একটু যেতে যেতেই কাঁকুলিতে হাত ছেড়ে গিয়ে নর্দ্দমায় গড়িয়ে পড়লুম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দম নিয়ে তবে এসেছি।

নয়ন। দিদি তুমি একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ সত্যি বেঁচে আছে কি না।

মহিলা। এই তো গায়ে হাত দিচ্ছি। পরিষ্কার বেঁচে রয়েছে। ('তথাকরণ)

নয়ন। বলি এসব হয়েছে কি শুনি। ঘরময় সব ছত্রাকার। জিনিষপত্তর একটাও আস্ত নেই—

শম্ভু। হি-হি-হি। উঃ বড্ড শীত করছে। এক্ষুণি জ্বর আসবে।

মহিলা। নয়ন, তুমি এক টুওর কাছে বস। বেচারা এই রাতে কাঁদা মেখে শীতে কষ্ট পাচ্ছে।

(জিতেন ও সুশীলের প্রবেশ)

সুশীল। নাঃ শম্ভুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

শম্ভু। আমি সত্যি বলছি নয়ন, যা কিছু ভাঙ্গাচোরা সব সুশীল করেছে।

সুশীল। কি, আমি করেছি। মিথ্যেকথা বলবার আর জায়গা পাও নি। এই যে আমার চশমা ভেঙ্গে গেল তার জন্য কে দায়ী।

মহিলা। জিতেন, সুশীল চল আমরা যাই। আমাকে বাড়ী অবধি এগিয়ে দাও। শম্ভুর শরীরটা ভাল নেই।

সুশীল। আচ্ছা আমি চললুম। শম্ভু কাল ক্লাবে এস, রিহার্সেল হবে।

শম্ভু। ক'টায়?

সুশীল। সন্ধ্যা ছ'টায়। ভুল না।

(তিনজনের প্রস্থান)

শম্ভু। নয়ন—

নয়ন। (ঝঙ্কার দিয়ে) কি ?

শম্ভু। কিছু মনে কোরো না। আমারই ভুল হয়েছে।

নয়ন। তুমি আর রিয়াশল টিয়াশল কোরো না।

শম্ভু। তুমি যদি বারণ কর তবে কোরবো না।

নয়ন। মাথা ব্যথা করছে। টিপে দেব ?

শম্ভু। দাও। বুঝলে নয়ন, যার কর্ম্ম তারেই সাজে। তামাকটা নিভে গেছল বলেই আমি একটু চটে গেছলুম। আমারই দোষ—

নয়ন। না না আমারই দোষ। হ্যাগা একটু তামাক খাবে ? একছিলিম সেজে দেব।

শম্ভু। না না তোমার কষ্ট হবে—

নয়ন। কষ্ট আর কি ? দিই, কি বল ?

শম্ভু। দাও।

সঙ্কেত

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

হু-হু-করা হাওয়া-বওয়া কোনো সন্ধ্যায়—
ব'সেছিনু গ্রামে এক চাষীর আঙিনাতলে বাঁশের মাচায়।
থির সন্ধ্যা চারিদিকে মৌন, চুপ্‌চাপ্—
কোথাও ছিল না কোনো পাখীরো আলাপ্ :
ছায়ারা নামিতেছিলো শুধু ঝুপ্‌ঝাপ্।
আকাশেও ছিলো না ক' এতটুকু নীল :
সারাকাশ জুড়ে শুধু
কোদালিয়া মেঘের মিছিল।
তারি এক ফাঁকে—
তীক্ষ্ণ তৃতীয়া-চাঁদ নির্ভীক্ জেগে রয় অপলক্ আঁখে।
কখনও দেখিনি ক' অত ভালো চাঁদ—
মনের গোপনপুরে লাগিল বিবাদ :

মুঠি কয় জোছনার শ্বেত পণ্য ভরি'
কোথা হ'তে ভেসে এল এ-চাঁদের তরী ?
কোথা এর দেশ ?
ধানবন কোলে যেথা নীলাকাশ শেষ !
মনের কবিটী মোর অবশেষে কয় :
রূপকথা ফেলে দাও, ও-সব এ নয়।
ওই মেঘ আর ওই চাঁদ—
ওদের কোথাও নেই ঝলোমলো স্বপনের সোঁদা আস্বাদ।
সুদূর প্রতীচ্য হ'তে ক্ষণেকের তরে—
ওদের তরণী দু'টী ভিড়েছে হেথায় এসে নীলের সাগরে।
ওরা আজ ভাবিতেছে :
এ-আকাশতলে কবে আসিবে নবীন
প্রভাতের লাল রথে
ঝলমলে কাস্তে ও কোদালের দিন !

চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-কথা

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়জন বিয়োগে থাকে স্মৃতি। সেই স্মৃতিই মানুষের মনে দেয় আনন্দ। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় দেশের এত বড় প্রিয় কে হইতে পারিয়াছে? তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর অতীত হইলেও, প্রতিবৎসর প্রথম দিবসে তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করে। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুহীন প্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন. বস্তুতঃ মহৎ প্রাণের মৃত্যু নাই। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—কীর্ত্তিই তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখে, লোকের চিত্তে যাহার স্থান চিরদিন তাঁহার মৃত্যু কোথায়? কালবশে চিত্তরঞ্জনের বিরহ ব্যথায় তীব্রতা কমিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি চিরকাল দেশবাসীর হৃদয়ে অক্ষয় ও উজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু আখ্যা লাভ করিলেন কিরূপে? দেশের প্রতি সুনিবিড় ভালবাসাই ইহার কারণ। দেশকে এমনভাবে ভালবাসিতে পারে কয়জন? দেশের দুঃখ বেদনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে যেরূপ অনুভব করিতেন, সেরূপ আর বড় দেখা যায় না। কবিতাময় ছিল তাঁহার প্রাণ, উদার ছিল তাঁহার মন, এবং লোকহিত ছিল তাঁহার ব্রত। দেশপ্রেম তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। ঐশ্বর্য্য, সম্মান, সুখ ভোগ, বিলাস, বৈভব এমন কি যথাসর্ব্বস্ব তিনি দেশ মাতার চরণে বলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ত্যাগই চিত্তরঞ্জনকে এত বড় করিয়াছে।

মহৎব্যক্তির বড় বড় কাজে সমগ্র দেশে একটা সাড়া পাওয়া যায়, বিস্ময় বিমূঢ় নরনারী তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার দৈনন্দিন সামান্য সামান্য কার্য্যে চরিত্রের উপর যে আলোক সম্পাত করে তদ্দ্বারা তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আমি ঐরূপ দু'একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিব। তাঁহার গুণকীর্ত্তনে আমরা সকলেই আনন্দিত হইব।

চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, 'ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি'র সম্পর্কে। পরে সেই আলাপ পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয়। একদিনের ঘটনা আমার মনে এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বহুকালপূর্ব্বে চড়কডাঙ্গা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভার সভাপতি হন, চিত্তরঞ্জন। আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত হই। তিনি আমার দিকে চাহিয়া মধুর হাসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করেন। সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। অবশেষে সভাভঙ্গের পর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন

চিত্তরঞ্জন

আপনার কোন কাজ আছে কি? আমি বলিলাম, 'না।' তখন তিনি বলিলেন, তবে এক কাজ করুন, আমার সঙ্গে চলুন, আজ "ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'র" বার্ষিক সভার আমি সভাপতি, পথে চলিতে চলিতে কথা হইবে। দু'জনে গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

চিত্তরঞ্জন কখন অল্পে তুষ্ট হইতেন না, যে কোন দিকেই হউক, বড় একটা কিছু না করিতে পারিলে তাঁহার

চিত্ত তৃপ্ত হইত না। তিনি বলিলেন, "দেখুন, ভবানীপুরে আপনাদের 'সাহিত্য সমিতি', ও 'সঙ্গীত সম্মিলনী' আছে। কিন্তু যে ভাবে উহারা বর্ত্তমান আছে, তাহা আদৌ আমার মনঃপূত হয় না। আমার ইচ্ছা উহাদের কার্য্যের প্রসারিতার জন্য একটা বড় বাড়ী লওয়া আবশ্যক। তাহার এক দিকে থাকিবে, 'সাহিত্য-সমিতি' অপর দিকে থাকিবে 'সঙ্গীত-সম্মিলনী।" সাহিত্য ও সঙ্গীত স্বগোত্রীয়, সুতরাং উহাদের একত্র থাকাই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে উহাদের কার্য্য ভালভাবে চলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আপনি ও সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য আগামী রবিবারে রাত্রি ৮টার সময় আসিতে পারেন, ভাল হয়।" এই বলিয়াই, একটু থামিয়া প্রাণ-স্নিগ্ধকর মধুর হাস্যে বলিলেন, "আর দেখুন, যদি আমার বাড়ীতে বামুন রাঁধে, তাহা হইলে আপনাদের খাবার আপত্তি হবে কি?" আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইলাম। কথা শেষ হইতে গাড়ী সঙ্গীত-সম্মিলনী ভবনের দ্বার দেশে পৌছিল। সম্পাদক মহাশয় সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরের হল ঘরে লইয়া গেলেন। মহতের সঙ্গ গুণে আমারও সে দিন গৌরব লাভ হইল। সভার অনুষ্ঠান শেষ হইলে, চিত্তরঞ্জন আমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন। সহাস্য মুখে আমরা বিদায় লইলাম। সাহিত্যের প্রতি চিত্তরঞ্জনের যে সত্যকার প্রাণের দরদ ছিল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। পদমর্য্যাদায় ও যশঃ গৌরবে তিনি কত মহীয়ান্, অথচ সামান্য একজন সাহিত্য সেবীর প্রতি তাঁহার ঐরূপ সৌজন্য ও ব্যবহার দেখিয়া সত্য সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়।

নির্দ্ধারিত দিনে ও সময়ে আমি কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের সহিত চিত্তরঞ্জন ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি সাদরে আমাদিগকে নীচের তলায় উত্তর পূর্ব্বদিকের ঘরটিতে বসাইলেন; বসিবার পর, তিনি বলিলেন, আজ কাজের কথা হবার আগে, আপনারা যখন এতগুলি সাহিত্য সেবী এসেছেন, তখন একটু সাহিত্যের আলোচনা করা যাক।' এই বলিয়াই, তিনি তাঁহার স্বরচিত 'মালঞ্চ' হইতে কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাবাবেশে পড়িতে লাগিলেন, আমরাও সেই রসসুধা পান করিতে লাগিলাম একটি কবিতা পড়িবার সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কবিতার ছায়া বড় সুস্পষ্ট, এমন কি কোথায় কোথায় ভাব, এমন কি ভাষাও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "হাঁ আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, তখন আমি বড় রবীন্দ্রভক্ত ছিলাম, তাঁহার কবিতা বার বার পড়িতাম। তজ্জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছে। পরে বোধ হয় আমি ঐ মোহ হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছি।"

ইহার পর, তিনি অন্যান্য কয়েকটি কবিতা পড়িবার পর 'সাগর সঙ্গীত' পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 'সাগর সঙ্গীতে'র ভাষা অনবদ্য, ভাব অনুপম, গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে অতুলনীয়। উদাত্ত মধুর কণ্ঠস্বরে চিত্তরঞ্জন যখন উহার একটির পর একটি অংশ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, তখন আমরাও তাঁহার সহিত যেন এক কল্পলোকে প্রবেশ করিলাম; কিছুকালের জন্য ভাবের আতিশয্যে আমরা আর সকলেই ভুলিয়া গেলাম, চিত্তরঞ্জন যেন আমাদের সকলের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। কাব্যপাঠ শেষ হইল, আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিলাম, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, খাবার প্রস্তুত। সুতরাং ব্যবহারিক জগতের সাড়া পড়িল।

নীচের বারান্দায় সারি সারি আসন পাতা, চিত্তরঞ্জন আমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে আহারে বসিলেন। বলাবাহুল্য নানাবিধ সুভোজ্যের আয়োজন ছিল, পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার শেষ হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রায় অনেকগুলি তরকারীতে, নারিকেলের সমাবেশ। পূর্ব্ববঙ্গে নারিকেলের ব্যবহার খুব প্রচলিত। বুঝিলাম, চিত্তরঞ্জন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইহাতেও বজায় রাখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নারিকেল সহযোগে তরকারী যেরূপ সুস্বাদু ও উপাদেয় হয় আর কিছুতে সেরূপ হয় না। নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, যে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে নারিকেল কোরা ও গুড় ব্যবহৃত হয়। আহার শেষ হইলে, বাহিরের ঘরে আমরা সমবেত হইলাম। চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "আজ সাহিত্যালোচনাই হইল, আসল আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভবিষ্যতে সুবিধামত একদিন উহা করা যাইবে।" কিন্তু নানা কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে আমরা যথারীতি বিদায় লইলাম।

এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, আমার ন্যায় অখ্যাত অনেক সাহিত্যসেবী তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এ সম্বন্ধে ছোট বড় কোন ভেদ ছিল না, সাহিত্যিক মাত্রই তাঁহার আদরের পাত্র। পণ্ডিত সমাজপতি, সুকবি অক্ষয় বড়াল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য শরৎচন্দ্র, প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকগণের সহিত ছোট ছোট সাহিত্যিকগণও তাঁহার কাব্যালোচনায় যোগ দিতেন। তিনি সমভাবে সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইহাই ছিল চিত্তরঞ্জন চরিত্রের বিশেষত্ব।

এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটির বিষয় উল্লেখ করিব। ইহার প্রযোজক সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক 'বিচিত্রা' সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আমারও ইহাতে কিছু যোগ আছে। ঘটনাটি বড়ই বিচিত্র, মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। ইহাতে চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের বিশালতা আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর, উপেনবাবু সহসা আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, "ওঠো, আজ রাত্রি ৮ টার সময় সি, আর, দাসের বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "ব্যাপার কি ?"

পথে সব বলিব বলিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি জান, ভাগলপুরে ওকালতী করিবার সময় সি, আর, দাস একটি বড় মোকর্দ্দমায় ওখানে যান, আমি সেই মোকর্দ্দমার একজন জুনিয়র উকীল ছিলাম। প্রতিদিন মোকর্দ্দমা শেষ হইলে সন্ধ্যার পর আমরা দাস সাহেবের নিকট যাইতাম। তখন কিছুক্ষণ আর মোকর্দ্দমার কথা হইত না, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মজলিস বসিত। আমিও গান গাহিতাম। ঐ দিক দিয়া আমি দাস সাহেবের অন্তরে স্থান লাভ করি, পরে বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠি। দাস সাহেবের সহিত তোমারও বিশেষ পরিচয় আছে, এই জন্য তোমাকেও সঙ্গে লইতেছি।"

আমি বলিলাম, "তুমি এখনও আসল কথা বলিলে না, যাইবার উদ্দেশ্য কি ?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে বড় মজার ব্যাপার। এক ভিখারীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। সে থাকে বলরাম বসুর সেকেণ্ড লেনে, তাঁহার ঠিকানা আমার কাছে আছে। সেখানে তাহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিতে হইবে।"

আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলাম, "ভিখারীকে লইতে হইবে কেন ?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয়ের সহিত চক্রবেড়িয়ার দিকে যাইতেছি, এমন সময় সহসা আমাদের গতিরুদ্ধ হইল। বড় সুমিষ্ট কণ্ঠে কে গান গাহিতেছে, চণ্ডীদাসের সেই প্রসিদ্ধ গানটি—

> "পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
> বসিয়া গিরির পাশে
> নাসার বেসর পরশ করিয়া
> ঈষৎ ঈষৎ হাসে। (বঁধু)"

আমাদের কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল, নিকটে গিয়া দেখি, গায়ক একজন সাধারণ ভিখারী। বড়ই বিস্মিত হইলাম, এরূপ ত বড় দেখা যায় না। ভিখারীর গান শেষ হইলে, বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গিয়া অনেকগুলি গান শুনিলাম। তাহার আশাতীত কিছু দক্ষিণা দিলাম, ঠিকানাটাও লিখিয়া লইলাম। তখনই সি, আর, দাসের কথা আমার মনে পড়িল। তাঁহাকে একথা জানাইলে তিনি শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি আজ রাত্রি ৮টা সময় নির্দ্দিষ্ট করেন। তজ্জন্য এই অভিযান।" এখন চল, বলরাম বসুর পাড়ায় গিয়া তাহাকে পাকড়াও করি। আমরা ভিখারীর বাড়ীর সন্ধান পাইলাম, কিন্তু তাহাকে পাইতে কিছু বিলম্ব হইল। আমরা যখন চিত্তরঞ্জন আবাসে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি ৮।০ টা বাজিয়া গিয়াছে। তাঁহার জামাতা সুধীর রায় (ব্যারিষ্টার) আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, এতক্ষণ আপনাদের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন, একটু আগে খাবার জন্য গিয়াছেন, আপনাদের একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আপনারা একটু বসুন। আমরা বাহিরের ঘরে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দাস সাহেব আসিলেন, মুখে সেই হাসি প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, এই যে আপনারা এসেছেন, চলুন, উপরের ঘরে। তখন তিনি বড় ব্যারিষ্টার, দেশের কাজে

তখনও ঝাপাইয়া পড়েন নাই। সাজসজ্জা, আসবাব আড়ম্বর কিছুরই তখন অভাব নাই। উপরের বড় Drawing room এ তাঁহার সহিত আমরা প্রবেশ করিলাম। বহুমূল্য গালিচায় সমুদয় কক্ষতল আচ্ছাদিত, চারিদিকে নানাবিধ আকারের সোফা, কৌচ চেয়ার প্রভৃতি সমাকীর্ণ, সুদৃশ্য চিত্রাবলীতে সুশোভিত তাহার উপর বিদ্যুতালোকে, ঘরটি যেন রঙ্গভূমির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভিখারীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ হইতেছে দেখিয়া উপেন বাবু তাহাকে সাহস দিয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। সে একটু সঙ্কোচের সহিত দ্বারদেশের নিকট গালিচার এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। তাহার যন্ত্রের মধ্যে ছিল একটি একতারা। তাহার নিকটে আমরা দু'জন দুইটি সোফায় বসিলাম। দাস সাহেব একটু দূরে, বড় একটা সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আমাদের দিকে মুখ করিয়া, ভৃত্যকে গড়গড়া আনিতে হুকুম দিলেন। গড়গড়া প্রস্তুতই ছিল, ভৃত্য অবিলম্বে গড়গড়া আনিয়া নলটি তাঁহার হাতে দিল। দুই একবার গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে বলিলেন, তাহা হইলে এইবার গান আরম্ভ হউক। সে ঘরে আমরা তিনজন ভিন্ন আর কেহ ছিল না। একতারা যন্ত্রের সহযোগে গান আরম্ভ হইল প্রথমে আমাদের দেশের প্রিয় নিধুবাবু দাশরথী, রামপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির গান শেষ হইলে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মধুর পদাবলী গায়ক প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে লাগিল আমরা সকলে নীরবে মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছিলাম। আমি চিত্তরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ভাবাবেশে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, আরম্ভ হইবার কিছু পরে গড়গড়ার টান ক্রমশঃ মন্থর হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে মনে হইল, যে তিনি তখন যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রায় দুই ঘণ্টায় গান শেষ হইল। চিত্তরঞ্জনের যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি যেন এ জগতে আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, আজ বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের দেশে কত রত্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদের খোঁজ রাখি না। বিদেশের কাচের আদর করি, ঘরের রত্নের সন্ধান লই না।'

তারপর বিদায়ের পালা। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেন। ভিখারীর হাতে দুইখানি দশ টাকার নোট দিলেন। পুলকে ও কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল, ভাবাতিশয্যে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভিখারী চিত্তরঞ্জনের চরণতলে পড়িয়া চরণের ধূলা লইল। তিনি তাহাকে নিবারণ করিয়া উঠাইলেন, এবং বলিলেন, তুমি মাঝে মাঝে গান শুনাইয়া যাইও। সে নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। অভিবাদনান্তে আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। দেশের ভিখারীও তাঁহার প্রিয়, এ জন্য চিত্তরঞ্জন পরে দেশবন্ধু হইতে পারিয়াছিলেন।

তৃপ্তি

শ্রীযামিনীমোহন কর

রাজার ছেলে রাজ্য ফেলে বাহির হ'ল ক্ষুব্ধ প্রাণে।
ভাবছে মনে কোন কারণে জীবন মাঝে বেদন আনে॥
বিদ্যা ধন স্বাস্থ্য কান্তি,
তবুও হৃদে নাইক শান্তি,
যতই যে পায়, ততই সে চায়, ঘুরে বেড়ায় কিসের টানে॥
যাদের শুধায় সেই বলে হায় জীবন কোথা দুঃখ ছাড়া।
কেউ বা কাঁদে পাবার তরে, কেউ বা হ'য়ে সর্ব্বহারা॥

গিরিগুহা সব ছাড়িয়ে,
নদী-নদ মাঠ পেড়িয়ে,
অচিন দেশে থামল শেষে, মন মাতানো জংলী গানে॥
প্রশ্ন শুনে বললে হেসে,
আমরা কেবল ভালবেসে,
কাটাই জীবন চাই না রতন তৃপ্ত মোরা তাঁহার দানে॥

দুলালের স্বপ্ন

শ্রীরেবতী মোহন সেন

বার

কাচারী ঘরের এক কামরায় দু'টি খাট—তার একটিতে সুরথ ও অপরটিতে গৌরদাস শায়িত। উভয়ের অবস্থাই শঙ্কাজনক। লীলাবতী এরকম দু'টি রোগী নিয়ে খুবই বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

গৌরদাসের বুকে যে গুলীর আঘাত লেগেছে তা পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারবাবু ও লীলাবতী অতিমাত্র বিস্মিত হ'লেন যে, গৌরদাস স্ত্রীলোক এবং তার মুখে এক জোড়া কৃত্রিম গোঁফ। গোঁফ-জোড়া উঠিয়ে ফেলে লীলাবতী তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন, দেখ্‌লেন মুখখানা বেশ শ্রীসম্পন্ন কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ছদ্মবেশ ধারণের অন্তরালে যে একটা গভীর রহস্য রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ রইল না। সুরথকে বাঁচাতে গিয়ে এই রমণীই তো নিজের বুকে আততায়ীর গুলী অকাতরে গ্রহণ করেছে! কি অপূর্ব ত্যাগ! সুরথবাবু কি এর প্রকৃত পরিচয় জানেন এবং জেনে শুনেই তাকে লাইব্রেরীর কাজে নিযুক্ত ক'রেছিলেন? তিনি লীলাবতীর কাছে এ রকম প্রতারণা করবেন, কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে পারলেন না—তাঁর দৃঢ় ধারণা, সুরথবাবু কখনই এমন হীন হ'তে পারেন না। গুলীর আঘাত খেয়ে এই রমণী 'দুলাল-দা' ব'লে ডেকে উঠেছিল। তার সেই 'দুলাল-দা' তবে কে? মনের চিন্তারাশি মুখে প্রকাশ না ক'রে তিনি তখন ডাক্তার দিয়ে তার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন এবং এই রোগীকে পার্শ্ববর্তী স্বতন্ত্র কামরায় নেওয়ালেন। বুক থেকে গুলীটা বের করবার জন্য শহর থেকে বড় ডাক্তার আন্‌বার জন্য তখনই টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হ'ল। এই রোগীর পরিচর্য্যার জন্য একজন স্ত্রীলোকেরও বন্দোবস্ত করা হ'ল। তিনি নিজে বেশীর ভাগ সময় সুরথের কাছে থাক্‌লেও, খুব ঘন ঘন এসে দেখে যেতেন।

ভোর রাত্রিতে স্ত্রী-রোগীর সংজ্ঞালাভ হ'লে লীলাবতী তার কাছে এসে বস্‌লেন। মৃদুস্বরে সংক্ষেপে রোগী যা বল্‌ল, তাতে লীলাবতী শুধু জান্‌তে পারলেন, তার নাম অশোকা, বেশী সে তখন আর কিছু বল্‌তে পারল না।

অশোকা বা দুলাল-দা বাস্তবিক কে, লীলাবতী তা জানতে পারলেন না। অশোকা যে-ই হোক, সে যে সুরথকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রেছে, এতেই তিনি তার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হ'য়ে পড়লেন এবং ভগবানের কাছে তার আরোগ্য কামনা করতে লাগ্‌লেন।

শহর থেকে বড় ডাক্তার যখন এলেন তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা। তাঁর সঙ্গে তাঁরই গাড়ীতে একজন সাধু এসেছেন, নাম অমলানন্দ স্বামী। স্বামীজী যখন শুন্‌লেন, গৌরদাস পিস্তলের গুলীতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হ'য়েছে এবং সেইজন্যই শহর থেকে ডাক্তারবাবুকে আনানো হ'য়েছে, তখন তিনি তার জন্য যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন। গৌরদাসের ছদ্মবেশ ধরা প'ড়ে তার রমণীরূপ যে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে, সে কথাও তাঁর কাণে গেল। তিনি লীলাবতীর কাছে অশোকার দীক্ষা-গুরু ব'লে নিজ পরিচয় দিলেন। তাঁকে বস্‌বার আসন দিয়ে লীলাবতী ডাক্তারবাবুকে প্রথমতঃ সুরথের নিকট নিয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন না হ'লেও সুরথ তখনও কথা বলতে সক্ষম ছিল না। ডাক্তারবাবু বিশেষভাবে রোগী পরীক্ষা ক'রে কিয়ৎক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন এবং তারপর একটা ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে বল্‌লেন, "বার ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে আসবে, তখন ইনি পরিষ্কার কথা বল্‌তে পারবেন—কোন চিন্তা করবেন না।"

লীলাবতীকে আশার কথা বল্‌লেও ডাক্তারবাবু মনে মনে সুরথের বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, অপর রোগী দেখে এসে তিনি আবার সুরথের কাছে কতক্ষণ থাকবেন এবং সময়োচিত ব্যবস্থা করবেন।

গৌরদাস ওরফে অশোকার দেহে অপারেশন ক'রে গুলী বার করা হ'ল। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, খুব অল্পের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রটা বেঁচে গিয়েছে সুতরাং তার প্রাণের আশঙ্কা খুব কম।

স্বামীজী এসে সুরথ ও অশোকাকে একবার দেখে গেলেন

এবং তারপর রোগীদের অন্তরালে লীলাবতীকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "অশোকা খুব শুদ্ধ-চরিত্র ও বিপুল সাহস-সম্পন্না মেয়ে। আমারই উপদেশে সে পুরুষের ছদ্ম-বেশ নিয়েছিল দুষ্টলোকের কুদৃষ্টি এড়াবার জন্য। আর গৌরদাস নামটিও আমারই দেওয়া।"

লীলাবতী বিনম্র ভাবে বললেন, "আপনি বয়সে পিতৃ-স্থানীয়, আমায় ক্ষমা করবেন যদি আপনার ও অশোকার প্রকৃত পরিচয়ের কথা জিজ্ঞেস করি। বিগত কয়েক ঘণ্টার ভিতরে এতো সব ঘটনা ঘ'টেছে যে, আমার মাথা আর ঠিক নেই।"

স্বামীজী বললেন, "মা, তুমি যা জিজ্ঞেস কচ্ছ তাতে অপরাধের কিছু নেই। গৃহস্থাশ্রমে আমার নাম ছিল সত্যশরণ বন্দোপাধ্যায়। নিরাশ্রয়া অশোকাকে আমিই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিতা করি। দুলাল নামে এক যুবককে এই মেয়েটি মনে মনে আত্ম-সমর্পন ক'রেছিল এবং তারই সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নানা দেশে পুরুষের ছদ্ম-বেশ নিয়ে। তার শেষ চিঠিতে জানতে পারি, সে অনেক দেশ পর্য্যটন ক'রে অবশেষে দুলালের সন্ধান পেয়েছে এখানে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তার কাছে নিজের পরিচয় দিতে পার্চ্ছেনা এবং দেবেও না। আমি তা-ই ব্যস্ত হ'য়ে তার সন্ধানে এখানে এসেছি।"

ব্যস্তভাবে লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন, "দুলালের সন্ধান পেয়েছে এখানে? তিনি কে? কোথায় থাকেন?"

"আপনার ম্যানেজার সুরথ বাবুই হচ্ছেন সেই দুলাল।"

"বলেন কি? তিনি তা হ'লে অশোকাকে……"

বাধা দিয়ে স্বামীজী বললেন, "না, এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় tragedy—সুরথ বাবু আদৌ জানেন না অশোকা তাঁর প্রতি অনুরক্তা। অশোকা হচ্ছে সুরথ বাবুর একমাত্র বোনের বন্ধু ও প্রতিবেশী কন্যা। তিনি অশোকাকে ঠিক ছোট বোনের মতই মনে করতেন। সুরথবাবু জানেন না বটে কিন্তু এই অশোকাই একদিন শত্রু-গৃহে আবরুদ্ধ সুরথবাবুকে তাঁর মুক্তির উপায় ক'রে দিয়েছিল, তিনি তাকে সে সময় চিনতে পারেন নি।"

স্বামীজী তারপর অল্প কয়েক কথায় দুলালের পারিবারিক ইতিহাসের যতটুকু অশোকার কাছে জানতে পেরেছিলেন তা বললেন এবং অশোকার নিজের বৃত্তান্তও সংক্ষেপে জানালেন। মিথ্যা চুরীর অভিযোগে দুলালের একবার সাজা হ'য়েছিল শুনে লীলাবতী তখন বুঝতে পারলেন, দুলাল কেন নিজ নাম ও পরিচয় নিরন্তর গোপন ক'রে এসেছেন এবং কেন নিজেকে একান্ত হীন ও অযোগ্য ব'লে তাঁর ভালবাসা গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়েছেন।

দুলালকে চিনতে পেরেও অশোকা কেন তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দেয় নি বরং দিতে অনিচ্ছুক ছিল, এ সম্বন্ধে স্বামীজী কিছুই বলতে পারলেন না। তবে লীলাবতী মনে মনে অনুমান করলেন, সুরথের প্রতি তাঁর প্রকৃত মনোভাবটা হয় তো বুদ্ধিমতী অশোকা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে নিজকে আর ধরা দেয় নি।

স্বামীজী পরামর্শ দিলেন, দুলালের অবস্থা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ না হওয়া পর্য্যন্ত অশোকার কোন কথা তাঁকে জানানো ঠিক হবে না।

অপারেশনের পর অশোকার অবস্থা ক্রমেই ভাল হ'তে লাগল কিন্তু দুলালের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর ডাক্তারবাবু রোগীকে একটা ঔষধ খাইয়ে বাইরে গেলেন। লীলাবতী রোগীর পার্শ্বে ব'সে নীরবে অশ্রু বর্ষণ কচ্ছিলেন। দু'দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা-পরম্পরায় তাঁর মনের স্বাভাবিক বল ও সাহস অনেক কমে গিয়েছিল, তাছাড়া দুলালের সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু বিশেষ আশার কথা বলতে পারেন নি।

অবশেষে রাত প্রায় দশটার সময় রোগী যেন হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলো এবং তার উন্মীলিত চোখের দৃষ্টি এদিক্ ওদিক্ খুজে অবশেষে লীলাবতীর মুখের উপর নিবদ্ধ হ'ল। কোন কথা না ব'লে লীলাবতী দুলালের একখানা হাত ধ'রে তার উপর হাত বুলাতে লাগলেন। মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ লীলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দুলাল জিজ্ঞেস করল, "আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?"

লীলাবতী উৎসাহ ভরে অমনি উত্তর করলেন, "স্বপ্ন নয়, আপনি জেগে আছেন সুরথবাবু।"

"কিন্তু আপনার চোখে জল কেন?"

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে লীলাবতী শুধু বললেন, "ও কিছু নয়।"

দুলাল তখন লীলাবতীর ডানহাতখানা দু'হাতে সঙ্কোচে ধ'রে আস্তে আস্তে তার বুকের উপর এনে সস্নেহে চেপে রাখলো ও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল—মিনিট দুই পর চোখ মেলে লীলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মিস্ রায়, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি এবং আপনারও হয় তো বুঝতে বাকী নেই যে আমার ওপারের ডাক এসেছে।"

লীলাবতী বাধা দিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, "ও কি কথা বলছেন, মনে বল আনুন, আপনি নিশ্চয় ভাল হবেন।"

দুলাল ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, "আর আত্ম-প্রবঞ্চনা ক'রে লাভ নেই, আমার ভিতরের দিকটা শূন্য হ'য়ে এসেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আর গোপন করব না যা এতকাল অনেক

কষ্টে চেপে রেখেছিলাম। আমার প্রকৃত নাম রাম দুলাল, যদিও লোকে শুধু দুলাল ব'লেই আমায় জানে। অনেকদিন আগে একবার মোটর-চাপা প'ড়েছিলাম, তখন আপনিই আমায় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। সেই এক দিনের একটি ব্যাপারে আপনার উপর যে গভীর শ্রদ্ধার ভাব হৃদয়ে পোষণ ক'রেছিলাম, পরে সেই ভাবই গভীরতম ভালবাসায় পরিণত হ'য়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদিন তা প্রকাশ ক'রে বলতে পারি নি নানা কারণে। প্রথমতঃ আমি হীন দরিদ্র, যদিও আমার পিতা এক সময়ে ধনী ব্যবসায়ী ব'লেই পরিচিত ছিলেন। পিতার বিষয়-সম্পত্তি গেল, পিতাও গেলেন। তারপর এই দরিদ্র পরিবারের উপর হ'ল জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার—চুরির মিথ্যা অভিযোগে আমার জেলভোগ, ভগিনী চুরি, মায়ের অকাল-মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি। যে দারিদ্র্যের জন্য এত লাঞ্ছনা, তার মূলে ছিলেন আমার পিতার এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, তিনি বাবাকে বঞ্চনা ক'রে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করেন। ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আমার প্রাপ্য সম্পত্তি ঐ লোকটি ভোগ কর্চ্ছিলেন। সংসারের কঠোর অত্যাচার ও ভগবানের অবিচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে স্থির করলাম, নিজেই এই অবিচারের প্রতিকার করব, তাঁর ঘরে ঢুকে যা কিছু নগদ টাকা-কড়ি পাওয়া যায় হস্তগত করব কিংবা নষ্ট ক'রে ফেলব। সেই মতলবে একদিন রাত্রিতে সকলের অগোচরে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ি ও লোহার আলমারি খুলে টাকা-কড়ি নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি কেমন ক'রে তা টের পেয়ে পিস্তল নিয়ে এসে আমায় গুলী করতে উদ্যত হন, তখন নিরুপায় দেখে তাঁর মাথা লক্ষ্য ক'রে একটা চেয়ার ছুড়ে মারলাম। তিনি প'ড়ে গেলেন, ছুটে গিয়ে দেখি, তাঁর দেহে প্রাণ নেই। তাঁকে মেরে ফেলার মত জঘন্য উদ্দেশ্য আমার কখনই ছিল না, কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ব্যাপারে যেমন ব্যথিত তেমনি ভীত হ'য়ে পড়লাম। তারপর বাড়ীর লোকজন আসছে বুঝতে পেরে খুনের দায়ে পড়বার ভয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেলাম। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত পালিয়ে ও নাম ভাঁড়িয়ে নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। খুনী ফেরারী আসামী হ'য়ে কোন্ মুখে আপনাকে আমার ভালবাসা জানাবো ?"

লীলাবতী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পিতার সেই বন্ধুর নামটি বলতে পারেন ?"

"হরবিলাস রায়।"

অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ ক'রে লীলাবতী বললেন, "কি আশ্চর্য্য, আমি যে তাঁরই কন্যা! যদিও পিতার গৃহে আমি কখনো বাস করি নি—মাতামহের আশ্রয়ে তাঁরই গৃহে আমি মানুষ হ'য়েছি।"

দুলালও যথেষ্ট আশ্চর্য্য বোধ করল। লীলাবতী তাকে আরও বিস্মিত করে বললেন, "আমার পিতাকে আপনি খুন ক'রেছিলেন এ ধারণা আপনার সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর মৃত্যুর পর পুলিশ তদন্তে প্রকৃত আসামী ধরা পড়ে ও সেই লোকটা সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়। তার স্বীকারোক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনার চেয়ার ছুড়ে ফেলা ও তার লাঠির প্রহার একই সময়ে হয়েছিল, বস্তুতঃ সেই লাঠির আঘাতেই বাবার মৃত্যু ঘটে। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা নিয়ে আপনি নিজেকে খুনী আসামী মনে ক'রে জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে ফেলেছেন। ঐ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দুলাল বলল, "যাক্, এখন তবে শান্তিতে মরতে পারব।"

লীলাবতী আবার বললেন, "আপনি মরণের কথা ভাববেন না, আপনার বাঁচবার প্রয়োজনীয়তা অনেক রয়ে গেছে। আপনার পিতাকে ঠকিয়ে বাবা যে যথেষ্ট অধর্ম্ম ক'রেছিলেন, তিনি সেটা পরে বুঝতে পেরে বিশেষ অনুতপ্ত হ'য়েছিলেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তাঁর উইলে তাঁর বন্ধু-পুত্র রাম দুলালের জন্য এক লক্ষ্য টাকা ও একখানা বাড়ী রেখে গিয়েছেন। দুঃখের কথা এই, আপনি আমার কাছে একদিনও আপনার প্রকৃত পরিচয়টা দেন নি। তা যাক্, আপনি বেশ জানেন, আপনার এই পরিচয় পাবার অনেক আগেই আমি আপনাকেই চেয়েছি—আপনাকেই মনে প্রাণে ভালবেসেছি, সে জন্য দাদাম'শায়ের বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও মিঃ চৌধুরীকে গ্রহণ করতে পারি নি এবং পারবও না। বলুন, আপনি আমায় গ্রহণ করবেন!" ব'লেই লীলাবতী জানু পেতে ব'সে দুলালের মুখের দিকে চেয়ে কাতর ভাবে মিনতি জানালেন।

উত্তরচ্ছলে দুলাল লীলাবতীর দু'খানা হাত নিজের বুকের উপর টেনে এনে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে রইল এবং পরক্ষণেই আবার অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ল। প্রায় দু'ঘণ্টা পর আবার যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এল, দুলাল দেখল, লীলাবতী তখনও সেই ভাবেই সেখানে ব'সে আছেন এবং নীরবে অঝোরে চোখের জল ফেলছেন। লীলাবতীর হাত দু'খানা আবার সস্নেহে চেপে ধ'রে দুলাল অতি ধীরে বলল, "আমার এই সুখের স্বপ্ন, স্বপ্ন হ'য়েই থাক, এই স্বপ্নে বিভোর হ'য়েই যেন আমি ওপারে যেতে পারি। আঃ কি আনন্দ! কি শান্তি!..."

আর বলা হ'ল না, দেহের উপর অকস্মাৎ একটা কম্পন এসে দুলালের মাথা এক দিকে কাৎ হ'য়ে পড়লো—সুখের স্বপ্ন নিয়ে দুলাল স্বপ্ন-লোকে প্রয়াণ করল।

শেষ

মুরলীবিলাস

শ্রীরামশশী কর্ম্মকার এম, এ, বিদ্যাবিনোদ

তিন

দ্বিতীয় প্রবন্ধে* পুথির পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। ঠাকুর রামাঞি প্রথম তীর্থ ভ্রমণান্তে খড়দহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। খড়দহবাসী সকলে আনন্দিত হইয়াছে। বসুধা, জাহ্নবী ও বীরচন্দ্রের আনন্দের সীমা নাই। রামাঞি সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়াছেন, বীরচন্দ্র-পত্নী সুভদ্রা দেবীকে বন্দনা করিতে ভুলেন নাই। সহচরগণ সকলে যথাযোগ্য 'শিরোপা' লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী তালিকানুসারে ভাণ্ডারগত করা হইয়াছে।

কিশোর রামাঞি স্বভাবতঃ খুব ধীর, ভক্তিপ্রবণতার জন্য অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন; তার উপর

"সকল ভকত স্থানে শুনে কৃষ্ণলীলা।
নানা ভক্তিশাস্ত্র পড়ি' প্রবনি হইলা॥" পুথি, পৃঃ ৮১ক,

অল্প বয়সেই জ্ঞান-বৃদ্ধ রামাঞি খড়দহে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আর গৃহবাসে সুখ নাই। নবদ্বীপে পিতার বিবাহ-প্রস্তাব তিনি এড়াইয়া আসিয়াছেন। বৈষ্ণব-মহাজনগণের শ্রেষ্ঠ রূপ-সনাতন রহিয়াছেন; অদ্যাপি তাঁহাদের দেখা মিলে নাই। গৌড়ের ও নীলাচলের বহু ব্যক্তি বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন দর্শন একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া রামাঞিকে উপদেশ দিয়াছেন।

"সভে আজ্ঞা কৈলা মোরে জাইতে বৃন্দাবনে।
বিশেষে দেখিতে সাধ রূপ-সনাতনে॥" পুথি, পৃঃ ৮৩খ,

রামাঞি মনে করিয়াছেন—

"ইহাদের যে জাতির মুনির্ব্ব মহিমা।
তাঁহাদের দরসন মোর ভাগ্য সিমা॥" পুথি, পৃঃ ৮৩খ

এইরূপ মানসিক অবস্থায় অধিক দিন গৃহে থাকা ঠাকুরের পক্ষে কঠিন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুথিতে উক্ত নাই কত দিন, বা কত মাস, বা কত বর্ষ পরে ঠাকুর বৃন্দাবন যাত্রার কথা তুলেন। তবে রামাঞির মানসিক অবস্থা দেখিয়া এবং পুথির ভাষা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হয় যে, পুরী হইতে প্রত্যাগমনের অচিরকাল পরেই রামাঞি দেবী জাহ্নবীর নিকট বৃন্দাবন যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অপর কোন গ্রন্থ হইতে এই বৃন্দাবন যাত্রার নির্দ্দেশ না পাওয়ায় আলোচ্য পুথির ধারাকেই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আলোচনার শেষ দিকে দেখাইয়াছি, কালনির্ণয় অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের অগাধ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান অলৌকিক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলেও, গার্হস্থ্য জীবনধারায় তাহার পুরী ভ্রমণের অব্যবহিত পরেই দীর্ঘ ও বহু-ব্যয় সাপেক্ষ বৃন্দাবন যাত্রা অনুমোদিত হওয়া চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, বৃন্দাবনের নাম শুনিয়া জাহ্নবীদেবী স্বয়ং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—

"মোর মন হয় বাপু জাইতে বৃন্দাবন।" পুথি, পৃঃ ৮৪খ,

বীরচন্দ্র গরীয়সী বিমাতার ইচ্ছাপূরণের জন্য রামাঞিকে সঙ্গে দিয়া বৃদ্ধ উদ্ধারণকে পথি প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দেবীই দত্তের কথা বলিয়া দিয়াছেন—

"পূর্ব্বে প্রভু সঙ্গে তেহোঁ সর্ব্ব তির্থ কৈলা।
তেহোঁ বৃন্দাবনে লঞা অবশ্য জাইবা॥" পুথি, পৃঃ ৮৫ক,

দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব বন্দনায়' দেখা যায়—

উদ্ধারণ দত্ত বন্দো হইয়া সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে জে ভ্রমিলা সর্ব্বতীর্থ॥
বৈষ্ণববন্দনা পুথি, (Dated 1078 B. S.) পৃঃ ২খ

অতএব তিনি যোগ্য ব্যক্তি বটেন।

জাহ্নবীদেবী মাঘ মাসেই যাত্রা করিতে চান। কারণ,

"মাঘে গেলে বৈশাখে পাইব বৃন্দাবন।
ফাল্গুনে চৈত্রে অধিক দুঃখ তপন-তাপন॥" পুথি, পৃঃ ৮৫ক,

ফাল্গুনে কিম্বা চৈত্রে যাত্রা করিলে জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ়ের পূর্ব্বে পৌঁছান অসম্ভব। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র অসহ্য।

এখন প্রশ্ন হইতেছে ইহা কোন্ বর্ষের মাঘ মাস। অবস্থা দেখিয়া এই ধারণা হইতেছে, রামাঞি যে মাসে খড়দহে পৌঁছেন, সেই মাসেই বৃন্দাবন যাত্রা হয়। অর্থাৎ ১৪৬৯ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসে রামাই দেবী জাহ্নবী সহ বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সঙ্গে উদ্ধারণ দত্ত।

* "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় প্রকাশিত।

দীনেশ বাবু জানাইয়াছেন, হারাধন দত্তের মতে উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩০৯ পাদটীকা) উদ্ধারণ বা উদ্ধরণ ত্রিবেণীতে সুবর্ণ-বণিক্ কুলের মণিরূপে আবির্ভূত হইয়া পরে শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত হন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে ১১শ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দশাখার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—

'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

কেহ কেহ বলেন উদ্ধারণ দত্ত ৪৮ বৎসর বয়সে নীলাচলে গিয়া ৬ বৎসর তথায় অবস্থান করেন; পরে বৃন্দাবনে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তথায় তাঁহার সমাধিস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ বলেন, উদ্ধারণ শেষ জীবন উদ্ধারণপুরে অতিবাহিত করেন। উদ্ধারণ দত্ত যে অধিক বয়সে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ মিলনোদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহা মুকুন্দদাসের পদেও রহিয়াছে :

"বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, সর্ব্ব পরিত্যাগ করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইল বিবেকাচারী॥
নীলাচলপুরে, প্রভু মিলিবারে, সদা ইতি উতি ধায়।
আশা-ঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায়॥"

১৪৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়া উদ্ধারণ দত্ত ৪৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে যান। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য বিরহোন্মাদে আচ্ছন্ন থাকিতেছেন; দিবারাত্র ভাবাবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দত্তমহাশয়কে সেইজন্যই 'মহাপ্রভু মিলিবারে সদা ইতিউতি' ধাইতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু ৪ বৎসর পরে অন্তর্দ্ধান করিলেও দত্ত পুরী ত্যাগ করেন নাই। ২ বৎসর পরে নিত্যানন্দের দেহত্যাগে অর্থাৎ পুরীতে ৬ বৎসর অবস্থানান্তে উদ্ধারণ দত্ত পুরী ত্যাগ করেন। আলোচ্য পুথি অনুসারে আমরা দত্তকে খড়দহের নাতি দূরবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতে দেখিতেছি। তখন ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ। উদ্ধারণ দত্ত জাহ্নবীদেবীর সহিত বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বেও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। এই পুথির ১০৭খ পৃষ্ঠায় দেখিব দত্তমহাশয় আবার বৃন্দাবন হইতে রামাইর পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স হইবে অন্ততঃ ৬৭ বৎসর। উদ্ধারণ দত্ত তারপরও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন কি না অনুসন্ধানের বিষয়।

জাহ্নবীদেবীর পদব্রজে গমনের ইচ্ছা হইলেও বীরচন্দ্রের পদমর্য্যাদার জন্য তাহা হইল না। 'মহাপাপ সজ্জায়' (পুথি, পৃঃ ৮৫খ) যাইতে হইল। 'মহাপাপ সজ্জা'র অর্থ পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে কতকটা ধারণ করা যায়,

"মহাপাপ যগাইল যে সব কাহার।
সাজ সাজ বলি পুন পড়িল হাকার॥
দোলাতে চড়িলা তবে জাহ্নবী গোসাঞি।
ছড়িদার রূপে চলে ঠাকুর রামাঞি॥
উদ্ধারণ দত্ত তার প্রধান হইঞা।
কভু আগে জান সভার পালন করিঞা॥" পুথি, পৃঃ ৮৮ক,

বীরচন্দ্র গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাতা অতঃপর ফিরিতে বলিলেন। অল্পবয়সেই সংসার নিয়মাভিজ্ঞ পুত্র বলিলেন—

"………রাজপত্রি দেখাইয়া।
তুমার সঙ্গে দিয়া তবে আসিব ফিরিয়া॥" পুথি, পৃঃ ৮৮ক,

রাজপথ ধরিয়া যাত্রীদলকে গৌড়নগরের বাহিরের পথে যাইতে বলিয়া বীরচন্দ্র চৌপালায় আরোহণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে আসিলেন। রাজ-পাত্র পত্রী লিখিয়া দিলেন। পত্রীখানি উদ্ধারণ দত্তের হাতে দেওয়া হইল। সেই দিন ও রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে বহু সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া মাতা জাহ্নবী বীরচন্দ্রকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং স-দল যাত্রা আরম্ভ করিলেন। বীরচন্দ্রের চেষ্টায় একজন রাজ-পুরুষও দলের সঙ্গে গেল। পথে সময়ে সময়ে সঙ্কটে পড়িতে হয়; 'রাজপত্রী' ও 'রাজলোক' সঙ্গে থাকিলে সে সকল সঙ্কট অনায়াসে পার হওয়া যায়। পুথিতে রহিয়াছে—

"রাজপত্রি সঙ্গে রাজার ছড়িদার।
যে স্থানে সঙ্কট পথ তাহা করে পার॥
অন্য রাজার দেশে পত্র দেখাইয়া।
সে সব সঙ্কট পার হন লোক লঞা॥" পুথি, পৃঃ ৮৮খ,

চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদেও দেখিতে পাওয়া যায়—চন্দন-কর্পূর সহ প্রত্যাগমন কালে মাধবেন্দ্রপুরীকে 'ঘাটী দানী' ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে 'রাজলেখা' সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন দানখণ্ডে রাধাকে বিষম দানীর হাত হইতে উদ্ধার পাইতে কি মূল্যই না দিতে হইয়াছে! আজও Passport ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি রাজ্যান্তরে কিম্বা দেশান্তরে গমনাগমনে সমর্থ হয় না।

ক্রমে যাত্রীদল গয়ায় উপনীত হইল।

'ফল্গুতির্থে স্নান করি দরসনে গেলা।
গদাধর দেখি প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥' পুথি, পৃঃ ৮৮খ,

গদাধর দেখি প্রেমে আবিষ্ট হইল।' পূজার জন্য কিছু 'নিছারি' (পুথি, পৃঃ ৮৮খ, পংক্তি ৬) করিলেন। তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়া ঠাকুর রামাজির ইচ্ছানুসারে যাত্রীদল অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইল।

"কথোক দিবসে উত্তরিলা কাশিপুরে।
লোক পুছি গেলা চন্দ্রশেখরের ঘরে॥
শ্রীচন্দ্রশেখর মহা আদর করিলা।" পুথি, পৃঃ ৮৮খ.

কাশীর চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। শ্রীগৌরাঙ্গ তীর্থভ্রমণকালে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ৬ মাস (চৈঃ চঃ আদিঃ, ১০ম পরিঃ) অবস্থান করিয়া বহু জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীকে ভক্তিশিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করেন। এইখানেই 'প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ।' (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পরিঃ) আর শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভে সনাতন কৃতার্থ হন। তৎকালে চন্দ্রশেখরের বয়স কত ছিল তাহা নির্দ্ধারিত নাই। কিন্তু আজ ৩৮ বৎসর পরেও তাঁহাকে দেখিতেছি। বৃন্দাবন দাসের ভৃত্য ও শিষ্য কৃষ্ণদাসের উপদেশে লোচনদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনের পথে কাশীতে যান। তিনি 'আনন্দলতিকা' (পুথি, dated B. S. 1080. পৃঃ ১২ক) গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলাঙ বারানসি গ্রাম।
জথাই চৈতন্য প্রভু করেন বিশ্রাম॥
প্রেমানন্দ দাস নাম এক মহাসয়।
রঘুনাথ ভট্টের তিহোঁ চরণ আশ্রয়॥
শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়ি হয় সেই স্থলে।
সে স্থান সুন্যেতে কিছু রহেন বিরলে॥"

এই পঙক্তিগুলি* পড়িয়া প্রেমানন্দকে স্বর্গত চন্দ্রশেখরের উত্তরাধিকারী বলিয়া বোধ হয়, এই প্রেমানন্দের উপদেশেই লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। (আনন্দলতিকা পুথি, পৃঃ ১৩ক)।

কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগে মাধবদর্শন করিয়া যাত্রীদল 'অযোধ্যার পথে সভে কৈলা আগুসার'। (পুথি, পৃঃ ৮৯খ)। বহু নগর, বহু বন-জঙ্গল, নদ-নদী অতিক্রম করিয়া কতদিনে তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। তথাকার প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিতে চারিদিন কাটিয়া গেল।

"তথা হৈতে গেলা চলি' অশক-আরাম।
সীতা লঞা জাহা লিলা করেন শ্রীরাম॥" পুথি, পৃঃ ৮৯খ,

লঙ্কার অশোক-কাননের ন্যায় প্রসিদ্ধ না হইলেও অযোধ্যার অশোক-কানন নামক উদ্যানের কথা বাল্মীকি-রামায়ণে উক্ত রহিয়াছে।

"যচ্চ মদ্ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবণিকং মহৎ।
মুক্তাবৈদূর্য্যসংকীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয়॥"
রামাঃ, লঙ্কা অঃ ১৩০। শ্লোক ৪৫।

সমস্ত মিত্রবর্গসহ রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া প্রত্যেকের বাসস্থান নিরূপণকল্পে ঐকথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভবন অশোক-বন বেষ্টিত; সেইটি মিত্র সুগ্রীবের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য পুথির লেখক ঐ উদ্যানের বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা পাঠযোগ্য।

"বনের মাধুরি যেন সীতার মাধুরি।
তাহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি॥
প্রতি বৃক্ষমুল সব মণিরত্নে বান্ধা।
যার তলে নিত্য কেলি করে রামসীতা॥
বসন্ত সময় বহে মলয়জ বা।
ভ্রমর ঝঙ্কার সদা কোকীলের রা॥
নিতি নব কিশোর মুরতি দোহাকার।
সুরতি লম্পট রাম করেন বেহার॥
নব গোরচনা গৌরী অতি সুকুমারী।
অতি সুকুমার সুর অতি বিহারী॥
নবিন জলদে যেন বিদুরীর দাম।
ঐছন সুষমা কোটিকাম মুরছাম॥
সফরি সলিলে যেন তিলে না উপেখি।
পরাণ থাকিতে যেন পান করি নিখি॥
তিলেক বিচ্ছেদে নাহি নিতি নব নেহা।
দুই এক প্রাণ দুহু মানে এক দেহা॥
রসের উল্লাসে উনমত দুই জনা।
বাহু পসারিয়া সখী-সেবা-সুঘটনা॥" পুথি, পৃঃ ৮০খ-৯০ক,

উল্লিখিত বর্ণনা পড়িলে পাঠক মাত্রেই নিশ্চয়ই বিনাশ্রমে অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবনে নীত হইবেন। এই বনে রামসীতা নিত্যলীলায় রত থাকিতেন। এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া

* 'কবি লোচনদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পঙক্তিকয়টির ব্যাখ্যা অন্যরকম করিয়া ফেলি। ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ঠাকুর রামাঞির মত আমরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। নবদ্বীপকে নববৃন্দাবনে পরিণত করিবার জন্য "স্বরূপনির্ণয়" প্রভৃতি গ্রন্থে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারা রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদও প্রভাবিত হইয়াছে। "রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণুরঞ্জিত সংকীর্ত্তন ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামারোল খোল-বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ১২০, ষষ্ঠ সংখ্যা) কিন্তু অযোধ্যাকে বৃন্দাবনে পরিণত করিতে কাহারও চেষ্টা দেখি নাই। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন দ্বাপরে বাসুদেব-সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, সীতাদেবী হ্লাদিনীস্বরূপা "পরম-সুন্দর্য্য কৃষ্ণ আনন্দদায়িনী (পুথি, পৃঃ ৯০ক)। রাধার চরিত্রের সহিত সীতাচরিত্রের কোন ভেদ এই লেখক দেখেন না।

'রসের পুষ্টিত্যা লাগি বহুমূর্ত্তি হৈলা
রামচন্দ্রে সুখ দেন বিলাসিনী হঞা॥" পুথি, পৃঃ ৯০ক,

জাহ্নবীদেবী বিদুষী—অভিনব উক্তির সমর্থনে হনুমানের উক্তির উল্লেখ করিলেন। এই হনুমদ্-উক্তি অবশ্য গবেষণা গোচর। আরও অনেক কথার মধ্যে দেবী জাহ্নবী—

"শ্রীরামচন্দ্রের রাসবিলাস বিস্তার।
অনেক কহিলা তার নাহি পাই পার॥" পুথি, পৃঃ ৯০খ,

বাঙ্গলাদেশে একটি বিরাট তত্ত্বদর্শী সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের দৃষ্টি বেদের পারের কথা দেখিতে পায়। বৃন্দাবনে যমুনার তীরে রাধামাধবীয় যে লীলা কাব্যে ও পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহাই বেদের পারের একমাত্র সত্য কথা বলিয়া এই সম্প্রদায়ের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরম সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকেও বেদের পারের লীলারত দেখাইবার জন্য "রসরাজ গৌরাঙ্গ-স্বভাব" নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগুরুকে অধিকতর খ্যাতিমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম-সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। দ্বিতীয়-সংস্করণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। শ্রীরামের রাসলীলা আধুনিক 'মুনিরা' দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের রাসলীলা দেখিতে পাইলেই বাঙ্গালীর সকল দেখা সার হয়; সব 'পাষণ্ডের' দস্তুরমত দলন হয়।

'রামরাস' বলিয়া যে পালাগান অকৃত্তিবাসী হইলেও বঙ্গে প্রচলিত রহিয়াছে, জাহ্নবীদেবীর তাহার বিবরণ শুনিলাম। 'রামরাস' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচিত জগদ্রামী রামায়ণের অন্তর্গত; তদনুসারে উত্তরকালে সরযূ-তটে রাস হয়। ১৭শ শতকের লেখক রাধালাল চট্টরাজের (অদ্যাপি অমুদ্রিত) পুথিতে দেখা যায় বনবাসকালে অগস্ত্যাশ্রম পরিত্যাগের পর পঞ্চবটিতে রাস হয়। কোন পুরাণ অনুসারে ইঁহারা রামরাস পাঁচালী লিখিয়াছিলেন কিংবা কোন সিদ্ধ-ভক্তের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়। ১৬শ শতাব্দীতে জাহ্নবীদেবীর মুখে ঐ বিচিত্র লীলার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং মূল আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম দিবসে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া "কোথ দিনে চলি চলি মথুরা আইলা।" (পুথি, পৃঃ ৯০খ) মথুরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে নগরীর 'মধুরা' নামের যাথার্থ্য অনুভব করিলেন। সনাতন তখন মথুরা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই সকলে দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে বাসা লইলেন।

মথুরার পবিত্র স্থান সকল দেখিতে তাঁহাদের চারিদিন কাটিল। এমন সময় বৃন্দাবন হইতে লোক আসিয়া রূপ-সনাতনের সাদর আহ্বান জানাইল। অবিলম্বে বৃন্দাবন-পথে যাত্রা আরম্ভ হইল। দেবী জাহ্নবী আর যানে আরোহণ করিলেন না, পদব্রজে চলিয়া ক্রমে যমুনার 'বিশ্রামঘাটে' আসিয়া উপনীত হইলেন। এই ঘাটের নামকরণের কথা পুথিতে রহিয়াছে :

"কৃষ্ণ লঞা অক্রুর যবে আইলা মথুরাকে।
এইখানে বিশ্রাম করিল যদুনাথে॥" পুথি, পৃঃ ৯৩খ,

তথায় স্নান পূজাদি সারিতে না সারিতে শ্রীজীব আসিয়া দেবীর পাদ বন্দনা করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হইল।

"পরিচয় পাঞা জীব কৈল দণ্ডবত।
ঠাকুর করিলা কোলে জানিঞা মোহিত॥" পুথি, পৃঃ৯৩খ,

এই পয়ার দ্বারা শ্রীজীব বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র 'ভক্তপ্রসঙ্গে'র ২য় খণ্ডে বলেন, "নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ১৪৩৫ শকে অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে আসিয়া রামকেলি গ্রামে শিশু শ্রীজীবকে দেখিয়াছিলেন। তখন জীবের বয়স ২ বৎসর ধরিলে জীবের জন্মবর্ষ ১৪৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫১১ খৃষ্টাব্দে হয়। বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী মতে জীবের জন্ম হয় ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে)। বিশ্বকোষ দুইটি বৎসরই উল্লেখ করিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে গৃহবাস

ত্যাগ করিয়া জীব নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীবাস ও নিত্যানন্দের পরামর্শে কাশী গিয়া ৪ বৎসর কাল বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। শ্রীবাস বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও দীর্ঘজীবী ছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের ২ বৎসর পরে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ জীবের জন্ম বৎসর হইতে পারে না। ১৫১১ খৃষ্টাব্দকে স্বীকার করিলে আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে জীবের বয়স হইবে ৩৭ বৎসর। আর ঠাকুর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক। রামাঞি শ্রীজীবের প্রণম্য হইল কিরূপে? যদি শ্রীজীবের নিত্যানন্দ-সাক্ষাৎকার অস্বীকার করিয়া ১৫২৩ খৃষ্টাব্দকেই ধরা যায় তাহা হইলেও আজ জীবের বয়স হয় ২৫। সেক্ষেত্রেও জীবই বয়োজ্যেষ্ঠ থাকেন। জীব ২৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন যান ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং উল্লিখিত পয়ারের সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন। কিম্বা নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত রামাঞি রূপসনাতনের বংশীয়ের নিকট পূজার্হ বলিয়া রামাই জীবের প্রণম্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, জীবের সঙ্গে দেবী জাহ্নবী সদলে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-আশ্রমে উপনীত হইলেন। ক্রমে সনাতন আসিলেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবমাত্রে আসিয়া দেবী জাহ্নবীর চরণ বন্দনা করিলেন। উদ্ধারণদত্ত শ্রীরূপের সহিত রামাঞির পরিচয় করিয়া দিলে রামাঞি অত্যন্ত বিনীতভাবে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রশংসা-শ্লোকে 'তত্রানুরূপে' পদের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"তত্র শব্দে কহে শ্রীরাধাঠাকুরাণি।" পুথি, পৃঃ ৯০খ,

এই অর্থ কোন্ শাস্ত্র-সমর্থিত, তাহা অবশ্য পুথিতে বলা নাই।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর বিগ্রহদর্শনান্তে দেবী জাহ্নবী স্বয়ং প্রচুর অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিলেন। পরে প্রসাদ বিতরিত হইল। এই ভোজনমহোৎসবে যে সকল ভক্ত যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছিলেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ গোসাঞি।
যাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞি॥
উদ্ধব দাস আর শ্রীমাধব গোপাল।
নারায়ণ গোবিন্দ ভকত সুরসাল॥
চিরঞ্জীব গোসাঞি আর বাণিকৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীক ঈশান বালক হরিদাস॥" পুথি, পৃঃ ৯১ক,

উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুপরিচিত হইলেও সকলের তৎকালে বৃন্দাবনে উপস্থিত থাকা সন্দেহ। অনেকেরই বৃত্তান্ত অনুসন্ধেয়। পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি ও অদ্বৈতশিষ্য ঈশান নাগর বৃন্দাবন গিয়াছিলেন কি না গবেষণার বিষয়। বালক হরিদাস বোধ হয় রামাইসহচর হরিদাস হইতে অভিন্ন।

দেবী জাহ্নবী বৃন্দাবনস্থ বিগ্রহ সকল দেখিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের অগণিত বিগ্রহের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ তিনটি;—শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীমদনগোপালজী এবং শ্রীগোপীনাথজী। শ্রীগোবিন্দজী সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে, শ্রীরূপ যমুনার জল হইতে এই বিগ্রহটি উদ্ধার করিয়া ১৪১৬ শকে অর্থাৎ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন; মহারাজ মানসিংহ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

শ্রীমদনগোপালজীর বিগ্রহটি সনাতন গোস্বামী মথুরায় ভিক্ষাচর্য্যাকালে কোন বিপ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ (১৫৩৪ খৃঃ) ঐ বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তীকালে রামদাস নামক জনৈক বণিক্ সনাতনগোস্বামীর কৃপায় বাণিজ্যজাহাজখানি চড়া-মুক্ত করিতে পারিয়া ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি মন্দির করিয়া দেন। কালে সেই মন্দির ধ্বংস হইলে নন্দকুমার বসু নামক জনৈক বাঙ্গালীভক্তের দানে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। (মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত, বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ)।

শ্রীগোপীনাথজীর বিগ্রহটি রঘুনাথ ভট্ট ব্রজধামে ভ্রমণ-কালে প্রাপ্ত হইয়া কাম্যবনে প্রতিষ্ঠা করেন। বিকানীররাজ রায়সিংহ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রঘুনাথ ভট্ট সেদিন গোপীনাথ বিগ্রহপ্রাপ্তির এক অত্যদ্ভুত ঘটনা সকলের সমক্ষে উল্লেখ করেন। একদিন ভট্টমহাশয় ব্রজধামে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রীড়ারত কতিপয় বালকের সহিত এক অদ্ভুত মূর্ত্তি বালককে দেখিতে পান। কৌতূহলবশে অগ্রসর হইতেই দেখেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ

মাত্র। দেবী জাহ্নবী এই অপূর্ব্ব কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন—

"জাহ্নবী কহেন বৃন্দাবনে ব্রজনাথ।
এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে ব্রজবাসি সাথ॥
কভু পিতামাতা সনে কভু গোপী সনে।
কভু সখা সনে কভু ব্রজবাসি সনে॥
আর যবে উৎকণ্ঠা বাড়ে দেখিবার তরে।
স্বকীয় মাধুর্য্য রূপ দেখায় তাহারে॥
ভক্তে সুখ দিতে বিলসয়ে বৃন্দাবনে।
নিগুঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে॥
আপন স্বেচ্ছাতে হৈলা বিগ্রহ স্বরূপ।
সচল অচল ভক্তভেদে অনুরূপ॥" পুথি, পৃঃ ১১১।

এবং তৎসঙ্গে গোবিন্দজী ও মদনমোহনজীর বিগ্রহের উৎপত্তির অদ্যাপি অপ্রকাশ কাহিনী প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বজন্মে জাহ্নবীদেবী শ্রীরাধার ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন। তাঁহার মুখে জন্মান্তরীণ কথা শুনিয়া ভক্তদের বিশ্বাস এবং আনন্দ দুই-ই হইল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছেন। রাধার দেহে প্রায়ই দশ দশার উদয় হইতেছে।* একদা রাধার নবম দশা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত সখীগণ কৃষ্ণমূর্ত্তি গঠন করেন এবং যমুনা তীরে উক্ত মূর্ত্তি সহ ক্রীড়া করিয়া রাধার চিত্তবিনোদন করেন। কালক্রমে সেই মূর্ত্তি যমুনাগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া যায়। শ্রীরূপ সেই মূর্ত্তিটিই উদ্ধার করিয়া গোবিন্দজী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মদনগোপালজীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রহিয়াছেন।

একদীন কুরুক্ষেত্রে জাইতে বৃন্দাবনে।
দেখিবারে জাত্রা কৈল ব্রজবাসিগণে॥
গোপগোপী সখা সখী মাতাপিতাগণ।
সুখের অবধী মধুময় বৃন্দাবন॥
ভ্রমর ঝঙ্কার সেই কোকিলের গাণ।
সখাগণ খেলে খেলা প্রেম-অগেয়াণ॥
গোপাল মুরতি আরোপিয়া তার সনে।
দিবানিসি খেলে খেলা আনন্দীত মনে॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা সেই স্থানে।
তারে দেখি সভয় হইলা জনে জনে॥
কৃষ্ণ বলেন কেন ভাই না চিন এখন।
সেই প্রাণসখা আমী ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
শ্রীদাম আদী কহে মোর সখা গোপবেষ।
তোমারে ত দেখি যেন ক্ষত্রিয় আবেষ॥
যদী মোর সখা বট রথ হৈতে আসি।
ভোজন করিব সভে মেলি আইস বসি॥
মনে ভাবি হাসি কৃষ্ণ আল্যা সভামাঝে।
গোপবেশ হঞা সভা মাঝে সুবিরাজে॥
সভা সঙ্গে করয়ে বিলাস।
কিছু ভিন্ন ভেদ নাঞি স্বরূপ প্রকাষ॥
ক্ষণেকক্ষণ বৈ কৃষ্ণ করিলা গমন।
বাহ্যস্থিতি নাঞি সভায় খেলামাত্র মন॥"
পুথি, পৃঃ ১০০খ, ১০১ক,

সেই মূর্ত্তি ঘটনাক্রমে সনাতনের হস্তগত হয়।

* আলোচ্য পুথির লেখক চতুর-মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ; অপুরাণোক্ত পুরাতন কাহিনী স্বগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়া গ্রন্থের মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় সাফাই গাহিতে ভুলেন নাই। এস্থলেও বলিলেন—

"অবজ্ঞা না কর সভে আমার কথায়।
যে শুনিল তাই লেখি নাহি মোর দায়॥" পুথি, পৃঃ ১০১খ,

অথচ উক্ত কাহিনীগুলির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিতে ছাড়িলেন না; বলিলেন—

শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ গোপিনাথ।
ইহাদের পুর্ব্বকথা যে করে আস্বাদ॥
প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি নাহি হয় তার।
কৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞান হয় অধীকার॥" পুথি, পৃঃ ১০১খ,

যাহা হউক, জাহ্নবীদেবীর মুখে অপূর্ব্ব পূর্ব্বকথা শুনিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

অতঃপর একদিন গোপালভট্ট দেবীকে আহ্বান করিয়া নিজের শ্রীরাধারমণকুঞ্জে লইয়া গেলেন। এইরূপে বৃন্দাবনের প্রায় সকল দেবস্থান দেখা হইল। বাকী কেবল কাম্যবনে গোপীনাথজীর মন্দির। ইহাতেই 'দুই তিন মাস' (পুথি পৃঃ ১০২খ,) অতীত হইয়াছে। রামাঞি ঠাকুর দেবীকে স্মরণ করাইলে, দেবী রূপসনাতন প্রভৃতিকে লইয়া কাম্যবনে যাত্রা করিলেন।

গোপীনাথজীর 'ভোগ নাঞি সরে মাত্র পূজা রসময়' (পুথি, পৃঃ ১০৩ ক,), জাহ্নবীদেবী স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করিলেন এবং যথাসময়ে দেবতাকে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ সমাগত ভক্তগণমধ্যে বিতরণ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। আজ কাম্যকাননের অপরূপ শোভা। কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাত্রি, (পুথি, পৃঃ ১০৭ খ); শুভ্রকৌমুদীস্নাত হইয়া অরণ্যানী যেন উল্লাসে হাস্য করিতেছে। মন্দিরে বিগ্রহও যেন আজ অধিকতর হাস্যরসোজ্জ্বলমূর্ত্তি। দিব্যালোকে ও পার্থিবালোকে মন্দিরও যেন হাসিতেছে। সেই হাসির সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমাপ্লুতমুখে দেবী জাহ্নবী আরতি করিতেছেন। আরতি-দর্শনার্থ সমাগত

ভক্তদের হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। আরতির অন্তে দেবতা প্রদক্ষিণ করিয়া দেবী জাহ্নবী মল্লিকা কুসুমদাম করে লইয়া দেব-বিগ্রহের গলদেশে অর্পণ করিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আবার চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিব কি না, জানি না।

'দণ্ডবৎ করি যাহীর আসিবার বেলে।
আকর্ষিল গোপীনাথ ধরিয়া আঁচলে॥
বস্ত্র ধরিতেই তেহোঁ উলটি চাহিল।
হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা॥" পুথি, পৃঃ ১০৪ক,

জাহ্নবীদেবীর দেহ শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ হইবা মাত্র স্থির নিশ্চল হইয়া গেল; তাঁহার আত্মা বিগ্রহে মিশিয়া গেল। এই ব্যাপার দর্শনে ভূতল-বিলুণ্ঠিত রামাঞির মুখে মাতৃহারা সন্তানের করুণ বিলাপ শুনিয়া সমাগত সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবীর নামেও জয়জয়কার উত্থিত হইল। এমনি করিয়া দ্বিতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত হইল।

ভক্ত

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঞ্চন মালার তব নাহি প্রয়োজন,
কেন তার কর আয়োজন?
নৃপতি ঘোষণা করে,
সবারে,
"ইহারে লইয়া যাও, মোর গুপ্ত ভাণ্ডারে।"
সন্ন্যাসী যোড় করি হাত'
নৃপতিরে করি প্রণিপাত
কহে, "হে প্রভু,
এ মিনতি না জানাই কভু
দেখাও ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
এই ভিক্ষা মাগি তব,
কর আজ্ঞা যেতে সে দ্বারে,
লুকায়ে রেখেছ মোর দেব,
যে কক্ষ আঁধারে।
তারপর নিও তুমি,
বলি' দিতে মোরে।
তবুও দেখাও তাঁরে একবার,
রেখেছ লুকায়ে যাঁরে আঁধারে॥"
"সামান্য মৃত্তিকা মূর্ত্তি
কি আছে উহাতে,
হও কেন এত বিচলিত
কি মিলবে সে পদার্থে?"
"তিনিই মোর পিতা
সবার উচ্চ দেবতা
মাগি যাহা
মিলে তাহা
সহাস্য বদনে তিনি করেন পালন,
কাটানু এতদিন তাঁরই ভরসায়,
বিকাব শেষ দিন তাঁরই সেবায়,
মোর নিকট তিনি সবার আপন।"
"পরীক্ষা করিব তোমারে
সে দেব দেখাতে পার যদি মোরে
যা মাগিবে দিব তোমারে!"
"পড়িয়া বিষম ফাপরে,
সন্ন্যাসী কাঁপে থরে থরে,
নয়ন ভরি গেল অশ্রু আসি।
কহিল সন্ন্যাসী, "এখন আসি।"
"বিলম্বের প্রয়োজন নাহি,
এক প্রহর মাঝে আসা তব চাহি।"
শোকাচ্ছন্ন সন্ন্যাসী চলে,
দেব, প্রভু বলে।
"একবার দেখা দাও'
দাও দেখা ক্ষণিকের তরে
কি ফল মিলিল তব
দেড় যুগ সাধনা করে?"
আর না চলিতে পারে,
হঠাৎ বসিয়া গেল পথিমধ্যে
কমণ্ডলু লয়ে করে'।
মার্ত্তণ্ডের প্রখর রশ্মি,
পড়িয়া তাহার ঘটে
এখনি হল বুঝি ভস্মি!
দূর হতে রাজা দেখে
চিত্ত ফাটি যায় তাঁরই দুঃখে।
আর না সহা যায়
নগ্ন পদ খোলা ঘটে
করাঘাত করি ললাটে
দ্রুত গিয়া পড়ে তাঁরি পায়,
হঠাৎ চাহিয়া দেখে,
সন্ন্যাসী নহে এ, তবে,
দেব! ক্ষমা কর প্রভু, ক্ষমা কর এবে॥

প্রেমের ব্যথা

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

"অফিস তো ছুটী হবার কথা বেলা পাঁচটায়, কিন্তু তারপর এই রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি?"

মেয়েমানুষ তো নয় যেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর! ছেলে কোলে করিয়া কেমন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখ না? প্রশ্ন করিবার ঢং দেখিয়া রাজীব একেবারে ঘাবড়াইয়া গেল। তবুও মনের কথা যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিয়া, মুখে সে বলিল, "কোথায় তা জান না? সেই যে একদল লোক থাকে, সন্ধ্যার পর একবার কাপ্তেনী কত্তে যেখানে যায়, সেইখানে।"

মুচ্‌কি হাসিয়া প্রমীলা বলিল, "সে তোমার মত মানুষের মুরোদে কুলোবে না সে আমি জানি, তা ছাড়া আর কোথায় গিয়েছিলে তাই বল?"

"তুমি কি আমার বস্, না কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে, রোজ রোজ তোমাকে সব কথার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?" অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাজীব মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কী সাংঘাতিক মেয়ে এই প্রমীলা! চরিত্রহীনতার কথা শুনাইয়াও রাজীব আজ প্রমীলাকে চুপ করাইতে পারিল না, ইহা ভাবিয়াই সে আজ আকুল হইতে লাগিল। সহসা চোখ ফিরাইতেই রাজীব দেখিল প্রমীলা সেখানে নাই। অমনি সে চটাপট জামা-কাপড়টা ছাড়িয়াই গামছা কাঁধে ফেলিয়া কলতলার দিকে প্রস্থান করিল।

সুযোগ বুঝিয়া প্রমীলা ঘরে ঢুকিয়া রাজীবের জামার পকেট হইতে নানা কাগজ পত্র ঘাঁটিয়া একটুকরা কাগজ সংগ্রহ করিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। উনানের আঁচে চায়ের কেৎলিটা চাপাইয়া ছেলেটাকে পাশ কোলে শোয়াইয়া, মাই দিতে দিতে প্রমীলা সদ্য আবিষ্কৃত কাগজ টুকরার দিকে নজর দিতেই দেখিল, পেন্‌সিলে লেখা আছে, "দাদাবাবু, শীউপ্রসাদ গাড়ী নিয়ে গেল, ও ঠিক আপনার অফিস ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে গিয়ে পৌছুবে। আপনি যেন সেই গাড়ীতে নিশ্চয় চলে আসবেন। টিকিট কেনা হয়ে গেছে। লাইট হাউসে একটা ভাল ছবি আছে।"

ইতি—আপনার স্নেহের "বীণা।"

বীণার চিঠি পড়িয়া প্রমীলা হাসিয়া ফেলিল। সে জানিত বীণা রাজীবের ছাত্রী। ছোট বেলায়, প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ফোর্থ ক্লাশ অবধি রাজীবই বীণার মাষ্টার ছিল। তারপর রাজীব এ দেশে ছিল না। অবশেষে সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া, স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস করিতেছে; সেও প্রায় আজ ১২ বৎসরের কথা। লেখা পড়ায় বীণার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া ডক্টর ঘোষ বীণাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়া ডাক্তারী পাশ করাইবার জন্য বিদেশে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন, কাজেই বীণা আজও লেখাপড়া লইয়াই আছে। কিন্তু শৈশবের শিক্ষক তাতে কবি এবং সাহিত্যিক বলিয়াই বীণা রাজীবকে আজও অতি সম্মানের চোখেই দেখিয়া থাকে। কাজেই সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া রাজীব বীণার কথা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও, বীণা কিন্তু মাঝে মাঝে ঝড়ের পাখীর মত রাজীবের এক ঘেয়ে জীবনের সাথে আসিয়া দোলা দিয়া যাইতে ভুল করে না। আজিকার ঘটনাও ঠিক সেইরূপই ঘটিয়াছিল।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই রাজীব আজ সে কথা প্রমীলাকে বলিতে সাহস করে নাই। যতবড় আপনই হোক না কেন, কোন অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে রাজীবের আজকাল মেলামেশা হয় ত প্রমীলা পছন্দ করিবে না, নয় ত এখনই এই কথা লইয়া প্রমীলা একটা উৎকট ঠাট্টা তামাসা জুড়িয়ে দিবে ইত্যাদি নানা কারণেই রাজীব কথাটা আপাততঃ প্রমীলাকে জানায় নাই। কিন্তু প্রমীলার মানসিক অবস্থা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত।

টুকরা চিঠিটুকু ব্লাউজের ভিতরে লুকাইয়া প্রমীলা মনোযোগ সহকারে রাজীবের চা এবং খাবার সাজাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যেই রাজীব তাহার পড়ার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একটী কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল। চা এবং খাবার থালা লইয়া রাজীবের মেয়ে মায়া সেগুলি টেবিলের উপর

রাখিতে রাখিতে বলিল, "বাবা! রাত্রে কি খাবে, মা তাই জিজ্ঞেস কল্লে?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মায়া বলিয়া চলিল, "বাবা, মাষ্টারম'শায় মায়না চেয়েছেন, বলেছেন, ওঁর মায়ের খুব অসুখ তাতেই তাঁর বড্ড টাকার দরকার। আর আমার দুটো খাতা চাই কাল, বুঝলে।" রাজীব কবিতার দিকে ঝুঁকিয়াই বলিল, "কাল তোমার মায়ের কাছে চেয়ে নিও। এখন বিরক্ত ক'র না পালাও।" মায়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রমীলার কাণে সব-কথাই পৌছিয়াছে।

চাটুকু প্রায় জুড়াইবার উপক্রম হইয়াছে কিন্তু রাজীবের সেদিকে কোন খেয়াল নাই। প্রমীলা ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া বলিল, "কী ওটা লেখা হচ্ছে? ওঃ সনেট!"

"আঃ বিরক্ত ক'র না! দেখছো একটা কাজ কচ্ছি?"

"কাজ না হাতী। চাটুকু চুমুক দিয়ে নিয়ে বুঝি আর কাজ করা যায় না? ও ত' গেল জুড়িয়ে জল হ'য়ে!"

এতক্ষণে রাজীবের খেয়াল হইল, সত্যাই ত'! তখন চক্ চক্ করিয়া চাটুকু গিলিয়া লইয়াই, রাজীব হালুয়াতে একখানা লুচি মাখাইয়া, মুখে পুরিয়া জাবর কাটীতে সুরু করিল।

কাণ্ড দেখিয়া প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "তুমি কি মানুষ না আর কিছু?"

সে কথার উত্তর না দিয়া রাজীব বলিল, "শোন কি ফার্ষ্ট ক্লাশ সনেট লিখেছি।"

মৃদু হাসিয়া প্রমিলা উত্তর করিল, "সে না হয় শুনছি, কিন্তু বিকেলে যে বাজার করে আনবার কথা ছিল, তা কি ভুলে গেছ? এখন রান্না হবে কি, তাই শুনি?"

অতি সত্য সাংসারিক এই খাওয়ার কথাটা শুনিয়া নিষ্ঠুর বাস্তবের দিকে নজর পড়িতেই রাজীব বলিল, "ঐ যাঃ—এখন কি হবে দেখ দিকি!" তারপর যেন আপন মনেই সে বলিয়া গেল, "বল্লুম বেটাকে আজ পারব না, কাজ আছে, তা হারামজাদা কোন মতেই শুন্‌লে না! বীণার আড্ডা যেন বেটার মাথাটাকে চিবিয়ে খেয়েছিল!" তারপর একটু থামিয়া সে বলিয়া চলিল—'এখন কি আর সেদিন আছে? যাকে বলে ঘোরতর সংসারী, সে হয়েছে তাই, একটু অন্যমনস্ক হয়েছ কি আর অমনি এসে শপাশপ্ পিঠে পড়তে থাকবে সংসারের নিষ্ঠুর চাবুক! মানুষ ত' নয় যেন আস্ত একটা ধোপার গাধা! সাধে আর নিমাই সংসার ছেড়ে দিলে?" কথাগুলা বলিয়া সে যেন শান্তি পাইয়া বাঁচিল, কিন্তু তাহার অভিমানী কবি চিত্ত একথা যদি পূর্ব্বে এতটুকুও বুঝিত যে কথাগুলি সে যাহা বলিতেছে তাহা যে অপরের কাণেও পৌছিতে পারে, এবং তাহা ঠিক প্রমীলার কাণেই পৌছিতেছে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না।

কথার ভাষা হইতে ভাব বুঝিয়া লওয়া প্রমীলার পক্ষে মোটেই কষ্টকর ছিল না, কাজেই সে বলিল, "বীণার সঙ্গে আজ আবার তোমার কোথায় দেখা হোল? বায়োস্কোপে গিয়েছিলে নাকি? তা হলে ত' তোমার পেট ভরাই আছে, আমরা মায়ে ঝিয়ে গিয়ে দু'গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ি? কি বল?"

বোকামীর প্রচণ্ড ধাক্কাটা কোন মতে সামলাইয়া লইয়া রাজীব বলিল, "না—না তা কেন হবে? আমি মাংস আর পরোটা নিয়ে আসছি।"

অভিমানের ভাব দেখাইয়া প্রমীলা বলিল, "আমার বয়ে গেছে পাঞ্জাবী হোটেলের মাংস পরোটা খেতে। প্রবৃত্তি হয় তুমি গিয়ে খাওগে। শুনেছি ওরা নাকি কুকুরের মাংস বিক্রি করে।"

কথা শুনিয়া রাজীব অসহায়ের মত প্রমীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হলে কি হবে প্রমিলা?

রাজীবের এই সব ভাব দেখিলে এবং ভাষা শুনিলেই প্রমীলার অন্তর স্বামীর প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া ওঠে। মনে মনে তখন সে এই যশলিপ্সু, সংসার অনভিজ্ঞ স্বামীর প্রতি ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে, কিন্তু কথার সুরে তাহার নাম গন্ধও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই রাজীব তাহা বুঝিতে পারে না। প্রমীলা বলিল, "বীণার কাছে যদি খাওয়া না জুটে থাকে ত' লীলার কাছে যাও। তোমার ত' আর একটী নেই, বিয়ের আগে যেখানে এত সব প্রেমের ফাঁদ ফেঁদে রেখেছো তা সে গুলোও ত' আগলাতে হবে?"

অসম্ভব জ্বলিয়া গিয়া রাজীব বলিল, "তা হবেই ত' তাতে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?" বলিয়াই সে পাঞ্জাবীটা কাঁধে ফেলিয়াই ঘর হইতে প্রস্থান করিবার জন্য পা বাড়াইল।

থপ্ করিয়া পাঞ্জাবীর হাতাটা টানিয়া ধরিয়া কৃত্রিম ঝাঁঝাল সুরে প্রমীলা বলিল, "ও সব রসিকতা এখন রাখ! রাত্রি ১০টার সময় বেরুচ্ছেন উনি প্রেম কর্ত্তে?"

রীতিমত বিব্রত হইয়া রাজীব বলিল, "তুমি ত' ভারি ঝগড়াটে লোক! খাবার আনতে হবে না?" বলিয়া সে প্রমীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। প্রমীলা বলিল, "পকেটে পয়সা আছে যে তাই খাবার আনতে চলেছ?"

পকেটে হাত দিতেই, "ওঃ যাঃ—" বলিয়া রাজীব গিয়া আবার তাহার চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে দাও পয়সা, যাই নিয়ে আসি!"

"ঘড়িতে এখন কটা বাজে একবার চেয়ে দেখেছো?" রাত্রি তখন ১২টা। দেখিয়াই রাজীব অসহায়ের মতন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এইবার প্রমীলা আর স্বকীয় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে না পারিয়া প্রাণপণে মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে সুরু করিল। তারপর হাসির বেগ কমিয়া আসিলে, সে বলিল, "না-ও যা কচ্ছিলে তাই ক'র। তোমার মত বেহিসেবী লোক নিয়ে যে আমার এ-দশা হবে সেটা বিয়ের পর থেকেই বুঝে নিয়েছি।"

ইহার পর রাজীবের আর কবিতা লেখা হইল না এবং খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল,—অতি সযত্নে প্রমীলা রাজীবের জন্য রাত্রির খাবার সাজাইয়া আনিতেছে।

*

আজ শনিবার। বেলা ২টার পরই রাজীবের ছুটী হইয়া যাইবে। কিন্তু বেলা ১২টার পূর্ব্বেই সে অফিসে বসিয়া দুইটী নিমন্ত্রণ পত্র পাইল। একটীতে শীলার জন্মদিন উপলক্ষে একটু আমোদ প্রমোদের জন্য শীলার পিতা চিঠি পাঠাইয়াছেন, অপরটী হাওড়ার সাহিত্য সেবক সমিতিতে ৺কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বার্ষিকী উৎসবে সভাপতি হিসেবে রাজীবকে যোগদানের অনুরোধ। চিঠিগুলি পড়িয়া, পকেটে রাখিয়া রাজীব ভাবিতেছিল, শুধু প্রমীলার কথা। অফিসে ঢুকিয়াই সে আজ স্থির করিয়াছে, প্রমীলার হাত হইতে তাহার মুক্তি পাওয়ার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবে না। প্রমীলা সম্বন্ধে রক্ষা করিবার বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে, কেন সে প্রমীলার কথা শুনিবে? হাজার লোক সে শিক্ষিত স্বনামধন্য কবি। বহু লোকেই তাহার অনুগ্রহ কামনা করে। আর সেই রাজীব কি না একটা সামান্য মেয়েমানুষের কথায় যা নয় তাই করিবে? তাহার কি স্বাধীন সত্ত্বা বলিতে কিছুই থাকিবে না? লীলা, বীণা, শীলা ইহারা কি ইহাকে কম ভালবাসে! শিক্ষায় বল, সৌন্দর্য্যে বল প্রমীলা তাহাদের কাছে কত তুচ্ছ, কত নগণ্য; সেই তুচ্ছ প্রমীলার কাছেই রাজীব যেন দিনে দিনে তিলে তিলে একটা ভীরু কাপুরুষ বনিয়া যাইতেছে। কেন? এত বাঁধাবাঁধি কিসের? এত নমনীয়তা, এত পরাধীনতা সে আর আজ হইতে কিছুতেই প্রমীলার কাছে স্বীকার করিবে না। সে পুরুষ, অতএব তাহার আজন্ম সঞ্চিত ইচ্ছার পৌরুষ আজ হইতে তাহাকে প্রমীলার হাত হইতে বাঁচাইতেই হইবে। ইহাতে যদি উভয়ের ভিতরে বিচ্ছেদও ঘটে তাহাতেও রাজীব পশ্চাৎপদ হইবে না। এমনি সময়ে অফিসের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল।

*

বাড়ী ফিরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেই রাজীব দেখিল, তাহার পড়ার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বিজন একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মায়ার সঙ্গে নানারকমের গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। রাজীবকে কক্ষে ঢুকিতে দেখিয়া বিজন বলিল, "এই যে হুজুরের আবির্ভাব হয়েছে দেখছি"।

গায়ের কোটটা আলনায় ঝুলাইয়া রাজীব হাসিয়া উত্তর দিল, "হঠাৎ এমন অদিনে অসময়ে মহাপ্রভুর আগমনের হেতুটা তো ঠিক বুঝলুম না।"

উচ্চহাস্য করিয়া বিজন বলিল, "তা হ'লে ব'ল সোজাসুজি চলে যাই"।

মৃদু হাসিয়া রাজীব বলিল, "আরে সেটা তো তোমার চিরাচরিত কাজ, কিন্তু তবুও বল না শুনি, হঠাৎ ব্যাপারটা কি তোমার"। এ কথার উত্তর দিল রাজীবের মেয়ে মায়া, সে বলিল, "বাবা, মামা আমাদের নিতে এসেছেন—আমি কোন্ জামাটা গায়ে দিয়ে মামাবাড়ী যাবো তুমি বল না বাবা?

মেয়ের কথার উত্তর না দিয়া রাজীব বিজনকে বলিল,

"বোনটীকে নিতে এসেছো হঠাৎ এমনি অসময়ে কেন শুনি? বিয়ের সম্বন্ধটা তা হ'লে পাকা হয়েছে ব'ল? দিন ঠিক হ'ল কবে"? এমন সময়ে ছাই-এর মত একখানি সাদা মুখ লইয়া প্রমীলা কক্ষে প্রবেশ করিতেই রাজীব যেন সহসা কেমন স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। প্রমীলা বলিল, "আমি সোনাদা'র সঙ্গে কৃষ্ণনগরে যাচ্ছি, মায়ের বড্ড অসুখ"।

মায়ের অসুখ! রাজীব অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বিজনের দিকে চাহিয়া বলিল, "হঠাৎ কি হ'ল তাঁর? একটা খবরও তো অন্ততঃ পূর্ব্বে দেওয়া উচিৎ ছিল?" উদাস গম্ভীর ভাবে বিজন উত্তর দিল, "খবর দেবার ফুরসুৎ হ'ল না বলেই নিজেকে স্বশরীরে আসতে হয়েছে ভাই!"

অশ্রু সজল চক্ষে রাজীবের দিকে চাহিয়া প্রমীলা বলিল, "ওগো আর কথা কয়ে সময় নষ্ট ক'র না, মায়ের কলেরা হয়েছে, গিয়ে হয় তো মাকে দেখতেই পাব না—। তুমিও চল না—যদি অসুবিধে না হয়, আবার সোমবার ভোরের গাড়ীতে ফিরে এলেই অফিস করতে পারবে।" তারপর বিজনের দিকে চাহিয়া প্রমীলা বলিল, "ট্যাক্সি ডাকো সোনাদা', আমি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি"।

বিজন বাহির হইয়া গেলে, রাজীব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে ঘটনাটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রমীলাকে বলিল, "আমার আজ অনেকগুলো জরুরী appointment আছে প্রমীলা, তাতেই যেতে পাচ্ছি না, তুমি বরং মায়া আর খোকাকে নিয়ে চলে যাও। লক্ষ্মণকে সব বলে কয়ে যেও।" তারপর বলিল, "যদি গিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি মনে কর তবে টেলিগ্রাম করো, তখন আমি যাব। তবে আমার মনে হচ্ছে কি জানো? গিয়ে দেখবে হয় তো মা সেরে উঠেছেন।"

হর্ষ বিষাদে বিহ্বল মুখখানি রাজীবের দিকে মেলিয়া প্রমীলা বলিল, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, গিয়ে যেন দেখি তাই হয়।" তারপর, সংসারের ব্যাপার বৃত্তান্ত যাহা কিছু সে লক্ষ্মণকে শিখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, তাহা রাজীবকে বলিয়া মায়ার গায়ে একটা জামা পরাইল। এমন সময়ে দরজার পরদা সরাইয়া বিজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "চ'ল প্রমীলা আর দেরী করলে এ ট্রেনটাও ধরতে পারবো না। সুটকেসটা আমাকে দাও ট্যাক্সি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" বলিয়াই সে পরে রাজীবকে কৃষ্ণনগরে যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া মায়ার হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। রাজীবকে একটা প্রণাম করিয়া প্রমীলা ছেলে কোলে লইয়া অশ্রু সজল চ'ক্ষে রাজীবের দিকে চাহিয়া তাহাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া বিজনের পিছু পিছু নীচে নামিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। রাজীব যেন স্বপ্নের মত ব্যাপারগুলি দেখিতে লাগিল, কিন্তু সে জায়গা হইতে না পারিল সে একটু নড়িতে, না পারিল মন খুলিয়া দুইটী কথা বলিতে। হর্ণ বাজাইয়া ট্যাক্সি ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইতেই রাজীবের যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে তখন চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল অনেক দিনের অনেক কথা। সহসা নিজের উপরে তাহার একটা প্রচণ্ড ধিক্কার আসিল। একটু পূর্ব্বেই অফিসে বসিয়া সে প্রমীলার সম্বন্ধে কত কথাই না ভাবিয়াছে! কিন্তু এখন কেন এমন হয়? এ কি বিধির নিষ্ঠুর বিধান? ঝড়ের মতন এক আকস্মিক বিপদ আসিয়া আজই প্রমীলাকে তাহার একেবারে চক্ষুর অন্তরাল করিল? রোজ প্রমীলা আসিয়া তাহার সুট, নেক্‌টাই, জুতা, মুজা ইত্যাদি একে একে তাহার দেহ হইতে খুলিয়া, গা-হাত মুছাইয়া দিয়া চা ও জলখাবার আনিয়া হাজির করে। আর আজ? ধরাচুড়া তেমনই তাহার সর্ব্ব অঙ্গে এখনো জড়াইয়া আছে; সেদিকে রাজীবের আর কোন ভ্রূক্ষেপই যেন নাই। সে যেন শুনিতে পাইল, কক্ষের দেয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের প্রত্যেকটী আসবাব-পত্র তাহাকে যেন বলিতেছে—এখন হইল তো? প্রমীলাকে শিক্ষা দিবার জন্ত, সায়েস্তা করিবার জন্ত, মাথায় মাথায় ফন্দি পাকাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলে না? দেখ এখন কে তোমাকে শিক্ষা দিয়া গেল। প্রমীলা শুধু তোমার সতী-লক্ষ্মী গৃহিণীই নয়, সে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছারও অর্দ্ধেকটা। প্রমীলা না সাজাইয়া দিলে তোমার অফিসে যাওয়া হয় না; পাশে বসিয়া তোমার আহারের তদ্বির না করিলে তোমার পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না, সেই প্রমীলাকে তুমি জব্দ করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলে? এখন সাধ মিটিয়াছে তো? প্রমীলার মা না বাঁচিলে সে যে কবে আবার ফিরিবে তাহারও কিছু ঠিকানা নাই। রাজীবের চক্ষে জল আসিয়া

পড়িল। কতক্ষণ যে সে তেমনি অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় ছিল তাহা তাহার মনে নাই, অবশেষে, ষ্টোভের শোঁ শোঁ শব্দে রাজীবের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে তখন পোঁষাকগুলি খুলিতে খুলিতে দেখিতে পাইল; চক্ষের জলে তাহার হাফ্‌ সার্টের বুকের ইস্তিরি ভিজিয়া গলিয়া গিয়াছে। লক্ষণ ষ্টোভে চায়ের জল চাপাইয়া দিয়া, হাতমুখ ধুইবার জন্য রাজীবকে একটী কাপড় এবং একখানি গামছা আনিয়া দিল।

চা পান করিয়া ধুতি পাঞ্জাবী পরিতে পরিতে রাজীব লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিল, সে আজ রাত্রে কি রান্না করিবে? উত্তরে ভৃত্য বলিল, মাছ ওবেলার রান্না করাই আছে, এ বেলায় শুধু সে ভাতে ভাত আর ডিমের ঝোল রান্না করিবে ইহাই মা-ঠাকরুণ তাহাকে করিতে বলিয়া গিয়াছেন। 'আচ্ছা' বলিয়া ঘরের তালার চাবির গোছাটা লক্ষণের হাতে তুলিয়া দিয়া রাজীব পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে বাহির হইয়াই হঠাৎ রাজীবের মনের অবস্থা বদলাইয়া গেল। 'মা-ঠাক্‌রুণ অর্থাৎ প্রমীলা বলিয়া গিয়াছে' কথাটা মনে হইতেই চলার পথে প্রমিলার প্রতি রাজীবের বড় অভিমান হইল। আর কি কারো মায়ের অসুখ হয় না? ভাই আসিতেই সচ্ছন্দে প্রমীলা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল! একবারও ভাবিল না যে তাহার অভাবে রাজীবের কত কষ্ট হইবে? কিন্তু রাজীবের বিবেক তাহার এই মনোভাবের প্রশ্রয় দিল না। সেখান হইতে জবাব আসিল,— কেন তোমাকে তো সে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই? এ কথার উত্তরে রাজীবের মন বলিল,—ও শুধু ভদ্রতার কথা। লইয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলে কি সে তাহাকে জোর করিয়াই লইয়া যাইতে পারিত না? ইহার পর রাজীবের বিবেক আর প্রমীলার সম্বন্ধে সাড়া দিল না। তখন সে প্রথমে হাওড়ার সাহিত্য-সেবক সমিতির মিটিংএ যোগ দিয়া, পরে শীলাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল।

রাত্রি প্রায় ১০৷৷টার পর বাড়ী ফিরিয়া রাজীব দেখিল, লক্ষণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া, কেমন যেন কাঁথা-কাপড় মুড়ি দিয়া কোঁকাইতেছে। 'কি হয়েছে তোর? অমন ভাবে কোঁকা'চ্ছস্‌ কেন?'—বলিতে বলিতেই সে লক্ষণের কাছে আসিয়া গায়ে হাত দিয়াই, একেবারে চমকিয়া উঠিল,—'কী সর্ব্বনাশ! তোর যে ভয়ানক জ্বর হয়েছে রে হতভাগা? এখন আমি করি কি বলতে পারিস্‌? তোর মা গেলেন শ্বশুর বাড়ী, তুই পড়্‌লি জ্বরে? আমাকে দেখছি তোরা আর পাগল না করে ছাড়্‌বিনে?'

রাজীবের বিরক্তি এবং দুশ্চিন্তা দেখিয়া লক্ষণ ভয়ে ভয়ে যতটা সম্ভব পারিল ভরসার সুরে কহিল,—'আপনার কোন ভয় নাই বাবু, শুধু আপনার জন্য বসেছিলাম। আমাকে আজ একটু ছেড়ে দিবেন, আমি আমার ভাইয়ের বাসায় একবার যাব। যদি আমি বেশী কাবু হয়ে পড়ি তো বাবু, ২৷১ দিন ভাইএর কাছে থাকলেই আমার অসুখ সেরে যাবে। আপনার কোন কষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব বাবু, সে জন্য আপনার ভয় নেই।'

'আচ্ছা, তা হ'লে তোর ভাইএর ওখানেই আজ যা। রান্না খাবার যা রয়েছে, যদি নিতে পারিস্‌ তো নিয়ে যা। আমি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।' বলিয়া সে পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া লক্ষণের হাতে দিতে দিতে বলিল,—'যদি বেশী বাড়াবাড়ি হয়, তোর ভাইকে টাকার জন্য পাঠিয়ে দিস।' লক্ষণ রাজীবকে দেখাইয়া রান্নার বস্তুগুলি লইয়া যাইবার সময় আবার রাজীব এই বলিয়া চাকরকে সাবধান করিয়া দিল, যেন অসুখ সম্পূর্ণ ভাল না হইলে সে কাজ করিতে না আসে।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। রাজীব যথারীতি পড়ার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। এমন সময়ে দরজার-পরদা ঠেলিয়া বাণী ভিতরে প্রবেশ করিল। বাণীকে এমনি সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজীব সহসা অবাক হইয়া গিয়া ব্যতিব্যস্ত ভাবে বাণীর সম্মুখে একটা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। বাণী কিন্তু বসিল না। রাজীব তখন নিজেও একবার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, তারপর বসিয়া বলিল, 'খবর কি বলুন তো?'

বাণী এবার চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল,— 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এ যেন ঢুকতেই তাড়িয়ে দেবার কথা বলছেন! আমি কি আপনার পর? যে তাই আসতে নেই?' এই কথা বলিয়াই বাণী মুখে কাপড়ের আচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল।

এইখানে জানানো উচিৎ বাণীরা রাজীবের বাড়ীতে এক-মাত্র ভাড়াটে। বাণীর স্বামী মধুসূদনবাবু দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদকের পদে কাজ করেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। বাণী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়স কুড়ি বৎসরের বেশী নহে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দ্বারা কোন সন্তান লাভ না হওয়ার দরুণই, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতেই না কি শুধু বংশ রক্ষার্থে তিনি বাণীর পানি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহ হইয়াছে সবে মাত্র ১ বৎসর। বাণীকে মধুসূদনবাবু লেখাপড়া শিখাইতেছেন,—যদি ভবিষ্যতে কিছু একটা হিল্লে হয়, এই আশায়। এই লেখাপড়ার সূত্র ধরিয়াই বাণী প্রমীলার সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্টতা সুরু করিয়া দেয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত সে রাজীবকে জামাইবাবু সম্বোধন করিয়া পড়াশুনা বুঝিবার অছিলায়, প্রমীলার অনুমতিতেই রাজীবের কাছেও উপস্থিত হয়। কিন্তু বাণীর আজিকার এই আগমন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এতরাত্রে মাত্র সাধারণ একখানা কাপড় পরিয়া বাণীকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া রাজীব প্রথমতঃ অভিভূতই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে মনের নানা সংশয়গুলি সবলে সরাইয়া বলিল,—'তাড়িয়ে দেব কেন, সেও কি কখন হয়? তা নয়, আমি ভেবেছিলাম বুঝি বিশেষ কোন দরকার আছে তাই।'

এ কথার উত্তরে বাণী বলিল,—'বাঃ রে! দরকার তো নিশ্চয়ই আছে। দিদি এখানে নেই, তাই ভাবলুম যাই আমিই গিয়ে দিদির শূন্য স্থানটা পূর্ণ করি। আর নাটক নভেলেও তো শুনতে পাই জামাইবাবুরা না কি সব বৌএর চাইতে তার শালীদেরই ভালবাসে বেশী?'—বলিয়াই সে মন-ভোলানো হাসি হাসিয়া রাজীবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বেরসিক রাজীব তাহার উত্তরে বলিল,—কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনার জানা উচিত ছিল যে, বিবাহিতা শালীদের কোন জামাইবাবুরাই বিশেষ পছন্দ করে না!' তারপর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সে বলিল,—'পড়াশুনার কোন কথা থাকে তো বলুন, আর না হয় ঘরে যান। মধুসূদনবাবু আপনার এই আগমনের বার্ত্তা জানতে পারলে নিশ্চয়ই মনে মনে অসন্তুষ্ট হবেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরেও তাঁর ধারণা খারাপ হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।'

কঠোর গম্ভীর রাজীবের এই কথাগুলি শুনিয়া বাণী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,—'ছিঃ ছিঃ, আপনি এত বেরসিক? এ কথা জানলে আমি আপনার ছায়াও মাড়াতুম না। ভাবলুম দিদি নেই, খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধে হলো কি না জিজ্ঞেস ক'রে আসি। জামাইবাবু বলে ডাকি, তাতেই আশা করেছিলুম দু' একটা ঠাট্টা তামাসার কথাও আপনি বলবেন। আর তার হল বুঝি এই প্রতিউত্তর? রাত্রে উনি কয়দিনই বা বাড়ী থাকেন! আপনি কি জানেন না, কাগজের অফিসের কাজ ওঁকে রাত্রেই বেশীর ভাগ করতে হয়? লক্ষণটা নীচে শুতো, তারও তো জ্বর হয়ে চলে গেল। একা এতবড় বাড়ীতে মাত্র একটী মেয়েছেলে আমি, তাতেই, আপনার সঙ্গে যেখানে বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় রয়েছে, ভাবলুম যাই না একটু জামাইবাবুর সঙ্গে দু'টো কথা কয়ে আসি, আর তার প্রতিদান হল কি না একখানি আচমকা চাবুকের ঘা!'

রাজীব চাহিয়া দেখিল, বাণীর দুই চক্ষে জল টলমল করিতেছে। চোখে চোখ পড়িতেই বাণী রাজীবের কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণে রাজীব বুঝিল, সত্যই সে বাণীর প্রতি অবিচার করিয়াছে। মধুসূদনবাবু যে রাত্রি ১০টার পর তাঁহার অফিসে রওনা হন এ কথা তাহার ইতিপূর্ব্বে মোটেই মনে ছিল না। বাণী প্রমীলার চাইতে অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ছোট হইবে। দেহের রং এবং গায়ের গড়ন যেন পাকা সোনার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সেই বাণী আসিয়াছিল আজ রাজীবের কাছে সামান্য একখানা কাপড় পরিয়া! তনুর প্রত্যেকটী তনিমা যেন বাণীর সেই শুভ্র লাল পেড়ে শাড়ীর ভিতর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। রাজীব ভাবিতে লাগিল,—এমন ভাবে ত' বাণী কোনদিন তাহার সম্মুখে আসে নাই! এই আগমনের ভিতর তবে কি তাহার কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল? পরক্ষণেই রাজীব ভাবিল,—উদ্দেশ্য আবার কি থাকিবে? হয় ত' শুইতে যাইবে বলিয়া সায়া, ব্লাউজ খুলিয়াছিল, হঠাৎ বোধ হয় প্রমীলার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহারই খোঁজ-খবর লইতে সে এখানে আসিয়াছিল। এখন কি সে একবার তাহাকে ডাকিবে? কিন্তু সে যদি না আসে? যদি তাহার কথায় সাড়া না দেয়? একলা মেয়েমানুষ একটী বাড়ীতে... ছিঃ ছিঃ! সত্যই ত' রাজীব বাণীর প্রতি দস্তুরমত অন্যায়

করিয়াছে। তারপর রাজীব ভাবিল,—বাণীকে গিয়া ডাকিয়া আনাই উচিত। যেখানে ঠাট্টার সম্বন্ধ, সেখানে না হয় সে একটা ঠাট্টার কথা বলিয়াই সে বাণীকে খুশী করিবে। কিন্তু কি কথা বলিবে সে? এ ভাবে ঠিক সে সব কথা মাথায় আসিবে না। একটু খোলা ছাতে গিয়া ভাবিয়া দেখিলে হয় ত' একটা যুক্তি মাথায় আসিতে পারে। এই ভাবিয়া সে ছাতের দিকে পা বাড়াইয়া চলিল।

রাজীবের কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাণী গিয়া সোজা ছাতে উঠিয়াছিল। এখন সে জনবহুল রাস্তার ধারের কার্ণিশে ঠেস্ দিয়া মহানগরীর বিচিত্র যানবাহন দেখিতে দেখিতে নানা কথা ভাবিতেছিল। এমন সময়ে রাজীব গিয়া ছাদে উঠিল।

সিঁড়ির দু'টী ধাপ বাকী থাকিতেই রাজীব নজর করিয়া বুঝিল, ওপাশে রাস্তার ধারে কে একটী মেয়ে যেন কার্ণিশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কে ও? বাণী নয় ত'? রাজীব ডাকিল—"ওখানে দাঁড়িয়ে কে?"

উত্তর আসিল,—"ভূত নই—জ্যান্ত মানুষ!"

স্বর শুনিয়া রাজীব বাণীকে চিনিয়া ক্রমশঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলুম বুঝি কোন অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়!" পরিহাসের একটা সুযোগ লইবার ছলেই রাজীব কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কথাটা যেন তাহার নিজের কাণেই কেমন বিশ্রী শোনাইল। সুচতুরা বাণীর কিন্তু তাহা বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "অহঙ্কারী লোকেরা চিরকালই নিজেদেরকে বড় সুন্দর মনে করে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে তাদের মত জীবকে অপ্সরী কিন্নরী ত' দূরের কথা, সাধারণ সুন্দর মেয়েমানুষও তাদেরকে ঘৃণা করে।"

বাণীর এ কথার উত্তর সহসা রাজীবের মস্তিষ্কে গজাইল না। তখন সে ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "একটা পরিহাসের উত্তরে আপনি শেষকালে আমাকে এমনি আঘাত দিলেন?"

"কেন দেব না শুনি? আমি কি আপনার ঘরের বৌ না কি যে তাই আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছেন?"

অত্যন্ত ভয় পাইয়া রাজীব বলিল, "সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে আপনি এমন কুৎসিত ভাবে গ্রহণ করলেন?"

"কেন করব না বলুন ত'? বাড়ীওয়ালা ব'লে কি আপনি আমাদের মাথা কিনে বসেছেন? কি সৎ উদ্দেশ্যটা নিয়ে এত রাত্রে আপনি ছাতে উঠেছেন শুনি? বউ না হ'লে যাদের এক রাত্রি চলে না—তারা বউকে বাপের বাড়ী পাঠায় কেন? ছেড়ে থাক্‌বার মুরোদ না থাক্‌লে সঙ্গে গেলেই পারে? পর মেয়ের ওপর এমন শ্যেন দৃষ্টি কেন? আমি ছাদে উঠেছি এ কথা আপনি বিলক্ষণ জেনেই ছাদে উঠেছেন। 'কেন উঠেছেন, তা আর আমি বুঝিনে?" বলিতে বলিতে সে সিঁড়ি বহিয়া দুম্ দুম্ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া, দড়াম্ করিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিল। আর ঠিক্ সেই সঙ্গে সঙ্গেই রাজীবও একেবারে ছাদের উপরে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এই ঘটনা তাহার জীবনে শুধু নূতন নয়—সাংঘাতিক! এই কি নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! এমন কি কথা সে বলিয়াছে যাহার জন্য বাণী আজ রাজীবকে এমন গম্ভীর রাত্রে, তাহারই ছাদের উপরে, শুধু অপমান নয়, রীতিমত ভয় দেখাইয়া গেল? রাজীব চরিত্রহীন! এসব কি কথা? এ কথা মধুসূদনবাবুর কাণে উঠিলে তিনি তাহাকে কি বলিবেন? প্রমীলার কাণে এ কথা উঠিলে সে যে চিরজীবনের মত রাজীবের প্রতি মুখ ফিরাইবে! সে একটা ব্যাঙ্কের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী, কবি—সাহিত্যিক হিসাবেও বাজারে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। ছিঃ ছিঃ! আজ এ কি করিল সে? শেষ পর্য্যন্ত এই সব কথা তাহার বন্ধুবান্ধবদের কাণেও উঠিবে! রাজীবের মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। কোনও মতে সে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। সুসজ্জিত কক্ষের চতুর্দ্দিকে রাজীব আজ একবার দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিল,—যেন তাহার প্রত্যেকটী প্রিয় বস্তুই কক্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমস্বরে বলিয়া যাইতেছে, 'উওম্যান ইজ এ মিষ্ট্রি'।

ঘড়িতে ২টা বাজিয়া গেল। তারপর সেই একঘেয়ে টিক্ টিক্ শব্দ গভীর নিস্তব্ধ রাত্রির নিবিড়তাকে যেন মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। তারও কণ্ঠে যেন সেই একই কথা—'উওম্যান্ ইজ এ মিষ্ট্রি'! বাতির সুইসটী টিপিয়া দিয়া রাজীব ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ঘুম আসিল না, মানসনেত্রে সে দেখিল,—বহুদিন পূর্ব্বে দেখা একখানি বিলিতি ছায়াছবির আনুপূর্ব্বিক ঘটনা। কেমন করিয়া একটী চরিত্রহীনা নারীর পাল্লায় পড়িয়া মিথ্যা মৃত্যুর

অপবাদে অত বড় একজন ব্যবসায়ী, শেষ পর্য্যন্ত যথাসর্ব্বস্ব থাকিতেও, জগতের দ্বারে একজন ভিখারীর বেশে, দিনে দিনে, তিলে তিলে নিজেকে কেমন করিয়া নিঃশেষ করিল। তাহার মনে পড়িল—এই নাটকের নায়ক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা এমিল জেনিংস্।

সমস্ত রাত্রি রাজীবের চোখে ঘুম আসিল না। সৌখীন, পোষাকী মানুষ সে; উপবাস এবং অনিদ্রার কষ্ট এমন করিয়া জীবনে সে কখনো উপভোগ করে নাই। রাত্রি ফরসা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে শয্যা-ত্যাগ করিল, ভাবিয়া দেখিল, প্রমীলা না আসা পর্য্যন্ত আর এবাড়ীতে রাজীবের থাকা উচিৎ নয়। অগত্যা ঘরের তালা বন্ধ করিয়া সে অতি প্রত্যুষেই বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও প্রথম প্রভাতের তরুণ-রশ্মি জগতকে আলোকিত করিয়া তোলে নাই। রাস্তায় করপোরেশনের মজুররা কেহ ছুটিয়া ছুটিয়া গ্যাসের আলো নিবাইতে ব্যস্ত, কেহ বা রাস্তায় জল দিয়া পাইপ ঘাড়ে লইয়া ছুটীতেছে। রাজীব বিপদে পড়িল। এত ভোরে সে কোথায় আশ্রয় খুঁজিতে যাইবে? শিয়ালদহ ষ্টেসনের একটা মেথরকে গোটা চারেক পয়সা দিয়া সে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইয়া আরও খানিকটা সময় কাটাইয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে সে পথ চলিতে লাগিল। ভোরের এই পথ চলা এবং ষ্টেসনে যাত্রীদের মত এই প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যাপারে, দুঃখের ভিতরেও রাজীব আজ যে আনন্দ উপভোগ করিল, তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিতে করিতে সে গিয়া মাখনের মেসে পদার্পণ করিল। মাখন তাহার বাল্যবন্ধু। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে বরাবর সে তাজমহল হোটেলে বাস করিতেছে। একটা বিলাতী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সে একজন অরগানাইজার। কোম্পানীর কাজে তাহাকে বাহিরেই থাকিতে হয় বেশী। রাজীব গিয়া তাহাকে পাইল না। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ করিয়া জানিল, মাখন বোম্বে গিয়াছে, ৪।৫ দিন পর ফিরিবে। বাসস্থান সংগ্রহের প্রথম চেষ্টাতেই বাধা প্রাপ্ত হইয়া রাজীবের মনটা অনেক দমিয়া গেল, কিন্তু তবুও সে আর একটা চান্স লইবার জন্ম রাস্তায় বাহির হইয়াই এস্প্ল্যানেড্‌গামী একখানি ট্রামে চাপিয়া বসিল।

দেশপ্রিয় পার্কের অনতি দূরেই লীলাদের নূতন বাড়ী। বাহির হইতে দোতলার জানালাগুলি বন্ধ দেখিয়াই রাজীবের মনে কেমন সন্দেহ হইল। কিন্তু তবুও লাষ্ট্ চান্স্ বলিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া গেটের দ্বারোয়ানের কাছে সে শুনিল, লীলারা সব মধুপুর চলিয়া গিয়াছে। লীলা রাজীবের একজন গানের ছাত্রী। সেই সূত্রেই ইহাদের বাড়ীতে তাহার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশীই ছিল। কিন্তু গত নয় মাস যাবৎ এবাড়ীতে তাহার বিশেষ যাতায়াত ছিল না। অন্য কোন কারণে নয়, রাজীবের সময়ের অভাবেই মাঝে মাঝে সে এইরূপ করিত; এবং তাহার পর ছয় মাস, নয় মাস পর হঠাৎ একদিন উদয় হইয়া সে বাটীস্থ সকলকেই অবাক করিয়া দিত।

লীলারাও চলিয়া গিয়াছে? রাজীব মনে মনে ভারি ক্ষুণ্ণ হইয়া দেশপ্রিয় পার্কের একটা বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বেলা তখন প্রায় ১০টা। রাজীব ভাবিল তাহা হইলে এখন উপায়? কিন্তু একথার উত্তর আসিল তাহার মন হইতে। কিসের উপায়? নিজের বাড়ীতে নিজে বসবাস করিবে তাহার আবার উপায় কি। বাণী তোমার এমন কে যে তাহাকে ভয় করিয়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে প্রমীলা না আসা পর্য্যন্ত? তুমি তো কোন অপরাধ কর নাই। তবে বাণীকে তোমার অত ভয় কিসের? কিন্তু বাণী যদি মধুসূদনবাবুকে বলিয়া দেয়? যদি কিছু অসংলগ্ন কথা বাণী মধুসূদনবাবুকে বানাইয়া বলিয়া একটা অনর্থ ঘটায়? রাজীবের মন গভীর দুঃশ্চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত দোল খাইতে লাগিল।

অকস্মাৎ মাথার উপরে চাহিয়া সূর্য্যের দিকে নজর পড়িতেই রাজীব অস্ফুটে বলিল, "সর্ব্বনাশ! বেলা যে প্রায় ১টা!" ইহার পর আর কোন কথাই না ভাবিয়া, ছুটিয়া গিয়া সে একখানি চলন্ত ট্রামে চাপিয়া বসিল।

* * *

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে টেলিগ্রামের পিয়ন আসিয়া রাজীবের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। সে পড়িয়া দেখিল,—কৃষ্ণনগর হইতে বিজন তার করিতেছে, "মা অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছেন, আমি প্রমীলাকে লইয়া সম্মুখের বুধবার দিনই তোমার ওখানে পৌছিব।" হতাশভাবে রাজীব টেলিগ্রামের

কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল। সবে আজ রবিবার সন্ধ্যা! আর কোথায় পড়িয়া আছে সেই বুধবার! এখনো তিন দিন বাকী। ওদিকে বাণী রাজীবকে শুধু কড়া কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই রাতেই সে প্রমীলার নামে প্রমীলার বাপের বাড়ীর ঠিকানায়, যা নয় তাই সব মিথ্যা কথা লিখিয়া, পরদিন ভোরেই রাজীবের চাকরকে দিয়া একখানি চিঠি পোষ্ট করিয়া দিয়াছে

আলোর সুইচটা টিপিয়া দিয়া রাজীব পড়ার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া অন্যমনস্কের মত একখানা বই-এর পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে মধুসূদনবাবু তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই রাজীবের বুকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহার মনকে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিল,— কি আবার বলিবে? তেমন কিছু বাড়াবাড়ির কথা বলিলে, সেও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া দিবে। রাজীব কিছু অপরাধ করে নাই, অত কিসের ভয়?

সসম্মানে মধুসূদনবাবুর দিকে একখানা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া রাজীব বলিল, "বসুন।"

চেয়ারে বসিতে বসিতে মধুসূদনবাবু বলিলেন, "আমায় আবার এক্ষুণি যেতে হবে। আপনাকে ব'লতে এলুম, বৌমা চলে যাবার পর আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?"

রাজীব মাথা নাড়িয়া জানাইল, বিশেষ কিছুই নয়। তবুও মধুসূদনবাবু বলিলেন, "তা অসুবিধে এক আধটুকুই বা কেন হবে? আমরা যখন রয়েছি, তা ছাড়া ও তো আপনার ছাত্রী। কিছু যেন সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আপনার যখন যা দরকার, লক্ষণকে বলে পাঠালেই, ও করে দেবে।" তারপর যেন আপন মনেই বলিয়া গেলেন, "বৌমা আমাদের কত করেন, আর তাঁর একটু অভাব হলেই আপনি অসুবিধেয় পড়বেন, আমরা থাকতে এ যেন কিছুতেই হয় না ভাই।" তারপর প্রমীলার মায়ের রোগমুক্তির সংবাদ পড়িয়া তিনি বলিলেন, "যাক্ তবে বিপদ কেটে গেছে।" তারপর তিনি তাহার স্বভাব-সুলভ ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়া রাজীবকে বলিলেন, "সবই মহামায়ার কৃপা ভাই, সবই তাঁর কৃপা,— মাটির মানুষ আমরা তাঁর লীলা খেলা তো বুঝতে পারি না? তাতেই কত কথাই না ভেবে মরি। আচ্ছা ভাই এখন তা হলে উঠি।" রাজীব মধুসূদনবাবুকে সিঁড়ির প্রথম ধাপ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া, আবার আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল।

গায়ে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেলে মানুষের যেমন একটা সাময়িক আরাম বোধ হয় মধুসূদন বাবুর এই আগমন এবং প্রস্থানের ব্যাপারে রাজীবের আজ যেন ঠিক তেমনি আরাম অনুভূত হইতে লাগিল। আগাগোড়া ব্যাপারটা আলোচনা করিয়া রাজীব নানা কথা ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিল। তাহা হইলে কি বাণী মধুসূদনবাবুকে কিছুই বলে নাই? একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই রাজীবের মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া আসিল "উওম্যান ইজ্ এ মিষ্ট্রী।"

লক্ষণ বাবুর কাছে অসুখের কথা চাপিয়া রাখিয়াই গোড়া হইতে নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক রাজীব টের পায় নাই। আজ আবার তাহার জ্বরের মাত্রাটা কিছু বেশী বৃদ্ধি পাওয়াতে, বাণী তাহাকে জোর করিয়াই বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, রাজীবের জন্য রান্না করিয়াছিল। অতি সযত্নে তাহাই সে একখানি বড় থালায় সাজাইয়া আনিয়া রাজীবের খাবারের টেবিলে সাজাইতে লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া রাজীব একেবারে বোকার মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একি মানুষ! না অপদেবতা? বাণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব রাগতঃস্বরে লক্ষণের নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষণের পরিবর্ত্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল বাণী। সে বলিল, "আজ আবার লক্ষণের জ্বর খুব বেশী হয়েছিল বলে আমি তাকে জোর করেই বাড়ী পাঠিয়েছি।" রাজীব কোন উত্তর দিল না দেখিয়া বাণী অনেকটা ভয়েভয়েই বলিল, "আমি যত্ন করে রান্না করেচি। আপনি কি খাবেন না?" বাণীর ব্যাথাকাতর মুখখানির দিকে তাকাইয়াই রাজীব চোখ নামাইল। কিন্তু কি যে সে বাণীকে বলিবে, তাহাই আর ভাবিয়া পাইল না।

উত্তরের বিলম্ব দেখিয়া বাণীর মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সে তখন রাজীবের পাশে আসিয়া বলিল,—"আপনি আমার উপর রাগ করেছেন বোধ হয়?" এইবার রাজীব যেন বাণীকে কিছু বলিবার একটা সূত্র খুজিয়া পাইল, সে বলিল,— "না, আপনার উপর আমার রাগ করবার এমন কি অধিকার

থাকতে পারে? ভাবছি এ কথা লক্ষণ আমাকে বলে গেলেই তো পারতো। হোটেলে খেয়ে নিলেই আপনাকে অযথা আমার জন্য এই কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হত না!"

ধরা গলায় চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাণী বলিল,—"আপনি তা হলে খাবেন না? তবে আমিও যাই এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ি!" বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে রাজীব বাণীর এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া খাবারের টেবিলটার পাশে বসিয়াই বাণীর দেওয়া অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে সুরু করিয়া দিল। তাহার মনে তখন শুধু এই কথা ভাবিয়াই কৌতুক বোধ হইতে লাগিল,—মেয়ে মানুষ জাতটাই কি রাগ হইলে ভাতের পরিবর্ত্তে এক গ্লাস জলই বেশী ভালবাসে? প্রমীলার মুখের সেইদিনকার সেই জল খাইয়া শুইয়া থাকিবার কথা আবার আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল।

রাজীবের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে বাণী একটা প্লেটে করিয়া খানিকটা রাবড়ি তাহার সম্মুখে আনিয়া রাখিল, রাজীবের তখন দস্তুরমত পেট ভরিয়া গিয়াছে। সে বলিল,—"বড্ড পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছি। এমন রান্না প্রমীলাও সহসা রাঁধতে পারে না, দেখছেন না পেট একেবারে ভরে গিয়েছে—আর পারব না!" কথা শুনিয়া বাণী মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া আবদারের সুরে মুখে বলিল,—"আমি বলছি আপনার কোন ক্ষতি হবে না, ঐটুকু চুমুক দিয়ে খেতেই হবে, নইলে আমার মাথা খান।" রাজীব বুঝিল, ইহার পর আর কোন আপত্তিই টিকিবে না!

মুখ ধুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে রাজীব ছাতে গিয়া উঠিল।

রাজীবকে পান দিয়া আসিয়া বাণী আহারে বসিল,—কিন্তু কি খাইবে সে? আজ এই নূতন অতিথিকে নিজে হাতে খাওয়াইতে পারিয়া সে মনে মনে যেন একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। শুধু তাহার মনে পড়িতে লাগিল রাজীবের সেই একটা কথা, "এমন রান্না প্রমীলাও সহসা রাঁধতে পারে না।"

ছাদে পায়চারী করিতে করিতে রাজীব ভাবিতেছিল, আজ শুধু বাণীর কথা। এমন সুন্দর রান্না করিতে জানে বাণী? যেমনি রূপ তেমনি গুণ! এত যত্ন করিয়া আজ বাণী রাজীবকে কেন খাওয়াইল? এমন করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া একটার পর একটা বস্তু, অত যত্ন করিয়া সে যে রাজীবকে খাওয়াইল, ইহার কি কোন অর্থই নাই? বাণী কি তাহাকে ভালবাসে? সেই ভালবাসারই অর্থ হয় তো গতকল্য রাজীব ভাল বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই কি বাণী তাহাকে কৃত্রিম শাসনের ভাবে ভয় দেখাইয়াছিল? কিন্তু রাজীবকে বাণী ভালবাসিয়া কি করিবে? সে কি জানে না যে, প্রমীলা জীবিত থাকিতে রাজীব বাণীর কোন ভালবাসারই অর্থ কোন মতেও উপলব্ধি করিবে না? মধুসূদন বাবুকে বাণী কি মোটেই ভালবাসে না? যদি না-ই বাসিবে তো তাহাকে লইয়া ঘর করিতেছে সে কেমন করিয়া? এমনি নানা চিন্তা করিতে করিতে অদূরের ঘড়িতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তখন রাজীব ভাবিল,—কৈ আজ তো বাণী একবারও ছাদে আসিল না? তবে কি সে খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? অথচ আজ সে এত যত্ন, এত আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল—তাহার সঙ্গে সে একবার দেখাটাও পর্য্যন্ত করিল না, ইহারই বা অর্থ কি? ভাবিয়া রাজীব আর কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে সে বলিল, "উওম্যান ইজ্ এ মিষ্ট্রী!" তারপর সে ছাদ হইতে নামিতে সুরু করিল।

একটা সাদা বাল্বের বাতি জ্বালিয়া ঘর খোলা রাখিয়াই রাজীব ছাদে গিয়াছিল। ঘরের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া সে দেখিল, দরজাটা যেন অনেকটা ভেজান রহিয়াছে, এবং ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দা পর্য্যন্ত একেবারে নীল আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কী? নীল আলোটা জ্বালাইয়া ঘরের দরজা ভেজাইয়া রাখিল কে? রাজীব ধীরে ধীরে আসিয়া দরজাটা মেলিয়াই দেখিল, তাহার বিছানায় শুইয়া বাণী ঘুমাইতেছে। এক মুহূর্ত্তে যেন রাজীবের চেতনা-শক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এত সুন্দরী বাণী? কী সুন্দর রূপ! দেহের লাবণ্যে যেন যৌবনের নবীন জোয়ার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। রাজীবের যেন কেমন একটা নেশার আবেশ বুকের ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ রাজীব, একমুহূর্ত্তেই হৃদয়ের দেবতাকে ভুলিয়া গিয়া, পশুর মত দিকবিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া বাণীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইল। এইবার সে

তাহাকে স্পর্শ করিবে। কিসের সমাজ? কাহার সংসার? বাণীকে তো সে ডাকিয়া আনে নাই, স্ব-ইচ্ছায় বাণী আজ তাহার কাছে আসিয়াছে। তাহার যদি সাধ্য থাকে, তবে কেন সে মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিবে না? এই রূপ-যৌবনসম্পন্না সুন্দরী নারীর স্বইচ্ছাকৃত আলিঙ্গন বিবাহিত পুরুষের জীবনে কদাচিৎ মিলে কিনা সন্দেহ। আর সে কিনা তাহা এমনি হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া সচ্ছন্দে বর্জ্জন করিবে? এমন সময়ে ক্রুদ্ধ-বিক্রমে রাজীবের হৃদয়ের অন্তস্তমন্তর হইতে বিবেক গর্জ্জিয়া উঠিল, সাবধান রাজীব! এ-সত্য কিন্তু গোপন থাকিবে না। তুমি সংসারী, প্রমীলা তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখে নাই। আজ এই যে কলঙ্কের কালিমা তুমি পরস্ত্রীর অঙ্গে লেপন করিতে যাইতেছ ইহাতে কিন্তু সুখী হইবে না। একবার ভাব দেখি! আজ তোমার স্ত্রীর অঙ্গ যদি কোনও পর-পুরুষ স্পর্শ করে, কিম্বা যদি শুনিতে পাও, দৈহিক সুখের লালসায় তোমার স্ত্রী অপরকে গোপনে দেহ বিক্রয় করে, তখন কি তোমার অবস্থা হইতে পারে জান? প্রবৃত্তির দুর্জ্জয় প্রতাপ যেন সহসা রাজীবকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে রাজীবের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই, সে সম্মুখে দেওয়ালের ফটোর দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রমীলার হাফ্‌বাষ্ট, মুখখানি যেন প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পিছাইয়া আসিয়া রাজীব সহসা চেয়ারে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

এইবার সে ভাবিয়া দেখিল,—বাণীর তো কোন দোষ নাই? সব দোষ তাহার। বাণীর রূপ-যৌবনের তুলনায় তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে মধুসূদনবাবু যে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহা তাঁহার অবয়ব লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। অতএব সেই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ততার জন্য এই অল্পবয়স্কা যুবতী যদি উদ্‌ভ্রান্ত মনে কোনও একটা গর্হিত কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহা কি রাজীবের প্রতিরোধ করিয়া দিতে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত নয়? বাণী রাজীবকে ভালবাসিতে চায়। কিন্তু সে ভালবাসা কি কামনা-বাসনা চরিতার্থ ব্যতীত আর কিছুর দ্বারা হইতে পারে না? আজ যদি বাণীর মত রাজীবের একটী মায়ের পেটের বোন থাকিত? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? রাজীবের মন বাণীর প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। দেহের জড়তা কাটাইয়া রাজীব চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া ঘরের সমস্ত জানালাগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া দিয়া ঘরের সব চাইতে বেশী পাওয়ারের বিজলী বাতির সুইচটা টিপিয়া, অতি কোমল করস্পর্শে মাথার আলুথালু চুলগুলি গুছাইতে গুছাইতে অতি মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "বাণী, লক্ষ্মী বোনটী আমার, একবার ওঠ! চেয়ে দেখ আমি তোমার দাদা, ঘুমের ঘোরে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বোন—একবার ওঠ! আমায় একটু শুতে দাও বাণী।"

বাণী ঘুমায় নাই, শুধু চোখ বুঁজিয়া পড়িয়াছিল। এ ডাকে তাহার মনের কুৎসিত বাসনা যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িল, সে ভাবিতে লাগিল, সত্যিই যদি আজ তাহার এমনি একটী আপন ভাই থাকিত, তবে কি তাহার পিতা, সমাজের কুটিল চক্ষুর ভয়ে বাণীকে এমন এক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতেন? উঠিয়া বসিয়া বাণী রাজীবের পিঠের ওপরে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ ফুঁপাইয়া কাঁদিল। রাজীব বাধা দিল না। তারপর কান্নার উচ্ছ্বাস খানিকটা কমিয়া গেলে, রাজীব বাণীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

"আমরা যে কত গরীব তা তুমি জান না দাদা! জানলে তো আর আমায় কখনো তুমি ভালবাসবে না।"

সস্নেহে তেমনি আদর করিতে করিতে রাজীব বলিল, "কেন বাসবো না বোন? চিরকাল আমি তোমায় এমনি ছোট বোনটীর মত ভালবাসবো।" বাণী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তারপর উভয়েই নীরব। মনের পাপ তখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষ-বিষাদে উভয়ের মন এক পবিত্র রাজ্যে বিরাজ করিতেছিল।

পরদিন আফিস হইতে ফিরিয়া সবেমাত্র রাজীব জুতা-জোড়াটী খুলিয়াছে এমন সময়ে এক হাতে এক প্লেট জল-খাবার এবং অন্য হাতে একখানা খামের চিঠি লইয়া বাণী রাজীবের কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই অত্যন্ত খুসী হইয়া রাজীব বলিল, "তুমি কি দরজায় কান পেতেছিলে?"

ছেলে-মানুষের মত ঘাড় দোলাইয়া সে কথার উত্তরে বাণী বলিল, "তা কেন? তোমার বুঝি খিদে পায় না?"

"খিদে পেলেও হাত মুখ না ধুয়েই কি খাবো?" বলিয়া রাজীব হাসিল।

বাণী বলিল, "তুমি হাত মুখ ধুয়ে নিয়েই তো খাবে,

আমার বুঝি চা করতে হবে না ?" তারপর হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই রইল চিঠি, আমি চা করতে চললুম। চিঠিটা পড়েও যদি তুমি আমার উপর রেগে না টং হও তবে বুঝবো তুমি মানুষ নও দেবতা !"

বাণী চলিয়া গেলে ঐ চিঠি সম্বন্ধে রাজীবের মনে এমন কৌতূহল হইল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেটীকে না পড়িয়া পারিল না।

খুলিয়াই দেখিল, প্রমীলা বাণীকে লিখিতেছে :—

"স্নেহের বোন্, তোমার চিঠি পেয়ে ভারি কৌতুক বোধ হচ্ছে ! তুমি নানা রকমের বাজে কথা লিখে শেষ পর্য্যন্ত যা বলতে চেয়েছ, তার অর্থ হচ্ছে, সোজাসুজি এই যে, আমার স্বামী একজন লম্পট এবং জোর করে তিনি তোমার নারীত্বে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন, এবং সে সবই সহ্য করেছ তুমি আমার মুখ চেয়ে ! আমার স্বামী যে কোন্ চরিত্রের লোক তা আমি খুব ভাল করেই জানি। তবুও যদি মেনে নি তোমার কথাই ঠিক ; তা হলে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি, তুমি তো নির্জীব পদার্থ নও, নিশ্চয়ই গিয়েছিলে তুমি তার কাছে স্বইচ্ছায়, এবং হয় তো এমন বিরক্ত তাঁকে তুমি করতে সুরু করেছিলে যার জন্য হয় তো তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন ? তা সে জন্য আবার আমার কাছে নালিশ করা কেন ? স্বামী তো আর আমার অধীন নন,বরং আমিই তাঁর অধীন, এতএব তিনি আমায় পরিত্যাগ করলেও, আমি পরিত্যাগ ক'রব কাকে ? কিন্তু আমি যেন এই চিঠির অন্তরালে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার চরিত্রবান্ স্বামীর পবিত্রতা নষ্ট করতে গিয়ে রীতিমত বাধাপ্রাপ্ত হয়েই শুধু তাঁর নামে, আমার কাছে একটা অযথা দুর্নাম রটাবার জন্যই আমাকে এই চিঠি দিয়েছ। অথবা, আমার অসংসারী স্বামীর খেয়ালের অনিয়মে, আকস্মিক স্বাস্থ্যহানির ব্যাপার অনুভব করে, দয়া মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে আমাকে এই চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখিয়ে তোমাদের ওখানে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে সত্বর গিয়ে উঠি, তারই জন্য এই চিঠি দিয়েছ। তা ভালই করেছ ! মার অসুখ যখন সেরে গেছে, তখন বুধবার দিনই আমি নিশ্চয় গিয়ে ওখানে পৌছুতে পারব"—ইত্যাদি।

চিঠিখানা বার দুই পাঠ করিয়া খামে পুরিয়া রাজীব শুধু ভাবিতে লাগিল, প্রমীলার কথা ! রাজীব জানিত, যেমন করিয়া আর পাঁচ জন স্ত্রীলোক স্বামীকে ভালবাসে প্রমীলাও ঠিক তাহাকে তেমনিই ভালবাসে। কিন্তু আজ সে বুঝিল, প্রমীলা শুধু তাহাকে ভালইবাসে না, রাজীবের মনের গোপন মানুষটীকেও প্রমীলার বিশেষ ভাবে জানা আছে। এমন সময়ে বাণী চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজীব খুব খানিকটা হাসিয়া বাণীকে বলিল, "নাও তোমার চিঠি !" তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "পৃথিবীতে যত দুষ্টু মেয়ে আছে তুমি তাদের অন্যতম !"

বাণী অভিমানের সুরে রাজীবের স্যাণ্ডেলের এক পাটি হাতে তুলিয়া অপরাধীর মত রাজীবের পাশে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "এই নাও জুতো, আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দাও ?"

রাজীব বাণীর পিঠে একটা ছোট্ট কীল্ দিয়া বলিল, "কেমন, খুব হয়েছে এবার পালাও।"

বুধবার দিন ভোর হইতেই রাজীবের শরীরটা খুব ভাল ছিল না, তবুও জোর করিয়া ভাত খাইয়া অফিসে গেল। কিন্তু আবার ১২টার ভিতরেই সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন তাহার সর্বাঙ্গে জ্বর এবং মাথায় যন্ত্রণা। লক্ষণ গিয়া খবর দিতেই বাণী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রাজীবের বিছানায় আসিয়া তাহার মাথাটা কোলে লইয়া চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজীব একটা একটা করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিল। গায়ে অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছে, মাথার যন্ত্রণা অসহনীয়, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই, লক্ষণগুলি সবই ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মত। বাণীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। রাজীব তাহাকে নানা ভাবে আশ্বাস দিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে মধুসূদন বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া রাজীবকে দেখাইয়া ঔষধের জন্য ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া আবার রাজীবের মাথাটা কোলে করিয়া বসিল। রাজীব বাণীর কাণ্ড দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মজা দেখিবার জন্য হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা বাণী, আমি যদি এই অসুখে মরি—তা হলে তোমার দিদি ভারী জব্দ হয়, না ?"

তাড়াতাড়ি রাজীবের মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বাণী

বলিল, "ছিঃ ছিঃ ও কি অলক্ষুণে কথা? দিদি আমার সতী সাধ্বী, তাঁকে উপলক্ষ করে যদি আবার কখনো তুমি এই সব যা তা কথা বল তো আমি মাথা খুঁড়ে ম'রব। দিদি এল বলে, দাঁড়াও না তারপর তোমার অসুখ দু'দিনে ভাল হয়ে যাবে।"

এমন সময়ে মধুসূদনবাবু ডাক্তার লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাণী বিছানা হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ভাল করিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া ঔষধের প্রেসক্রিপশন্ লিখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, তিন দিন পর্য্যন্তই এর জ্বালা যন্ত্রণাটা বেশী থাকবে। মধুসূদনবাবুও ডাক্তারের পিছনে পিছনে রাজীবের ঔষধের জন্য বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

বিকালে কৃষ্ণনগর হইতে ছেলে মেয়ে লইয়া প্রমীলা তাহার ভ্রাতা বিজনের সঙ্গে রাজীবের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিয়াই বাণী চট্ করিয়া রাজীবের মাথাটা কোল হইতে বালিশে নামাইতে নামাইতে প্রমীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই নাও দিদি তোমার সম্পত্তি, বেলা ১২টার সময় আজ দাদা জ্বর নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন, আমি এরই মধ্যে ডাক্তার ডাকিয়ে, ওকে পরীক্ষা করিয়ে, কর্ত্তাকে ডাক্তারের সঙ্গেই ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, ভয়ের কোন কারণ নেই, ডাক্তার তাই বলে গেলেন। এবার নাও এস, এইখানে এসে বস; আমি তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ঘরে যাচ্ছি—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!" বলিতে বলিতে সে নামিয়া প্রমীলার কোল হইতে ছেলেটীকে লইয়া, মায়ার হাত ধরিল।

প্রমীলা বলিল, "ওঃ! তুমি খাও নি বুঝি? তবে যাও।" ছেলে মেয়ে লইয়া যাইতে যাইতে বাণী বলিল, "তুমি খেয়ে এসেছ তো? না আমাকে আবার এখুনি হাড়ি ঠেলতে হবে?" প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো গিন্নী হ্যাঁ, মাত্র ৪ ঘণ্টার পথ আমার শ্বশুরবাড়ী, তারা বুঝি না খাইয়েই আমাকে পাঠিয়েছে? তুমি যাও দেখি, খেয়ে এস গে।"

সিঁড়ির পথ হইতে প্রমীলা শুনিল বাণী বলিতেছে, "আমি আবার খেয়েই আসুচি দিদি, তুমি যেন এর মধ্যে কুবুদ্ধি শিখিয়ে আমার দাদাকে পর করে দিও না।" প্রমীলা মুচকি হাসিয়া অস্ফুটে বলিল, "পাগল না মাথাখারাপ?"

বিজনকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমীলা গিয়া রাজীবের মাথাটা কোলে লইয়া বসিল। রাজীব প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা হলে তুমি আসতে পারলে?" মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রমীলা বলিল, "খুব বুঝি অনিয়ম অত্যাচার করেছ শরীরের ওপর, নইলে হঠাৎ এমনি জ্বর হবে কেন?"

ঘরের কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাজীব উত্তর দিল, "তোমার বিরহে!"

"তিন দিনের অদর্শনেই বুঝি বিরহ হয়, না? আর কি করেছিলে তাই বল?"

"আর প্রেম করেছিলাম তোমার ঐ বোন বাণীর সঙ্গে—সে অনেক কথা! কেমন জব্দ? আর যাবে কোথাও আমাকে ফেলে রেখে?" রাজীবের গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া প্রমীলা বলিল, "তা বেশ করেছ, এখন একটু ঘুমোও, নইলে মাথার যন্ত্রণা আবার বাড়বে।"

একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজীব প্রমীলার ডান হাতখানি কোলে জড়াইয়া চক্ষু বুঁজিল।

ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম পর্ব্ব বঙ্গদর্শন ১২৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়া আড়াই বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর দ্বিতীয় পর্ব্ব বঙ্গদর্শন বাহির হয় সম্পাদনায়। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে উহাও বন্ধ হয়। শেষের দিকে বঙ্গদর্শনে সাহিত্য-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজকে গোঁড়ামির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের এই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল এবং ধর্ম্মে, সমাজে ও সাহিত্যে সংস্কারমূলক চিন্তাধারা প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার পর এই নব ভাবধারাকে রূপ দিবার জন্য ঐ বৎসর শ্রাবণ মাস হইতেই ভারতী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন গোঁড়া ও আধুনিক দুই দলের ঠিক মাঝখানে। প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত যেমন তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন বঙ্গদর্শনেরও লেখক। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বঙ্গদর্শনে ১২৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতী প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনায় 'ভারতী' শিরোনামা দিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন, "ভারতী বলতে আমি দুটি সংজ্ঞা পাই। —প্রথম বাণী=স্বদেশী ভাষা। দ্বিতীয় পাই বিদ্যা=জ্ঞানোপার্জ্জন ও ভাবস্ফূর্ত্তি। তৃতীয় পাই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবস্ফূর্ত্তির উপর জোর দেন এবং ভারতীর ভিতর দিয়া চিন্তার বিকাশের পথ খুলিয়া দেন। ঐ প্রবন্ধেই তিনি লেখেন, "ভারতের প্রতি ভারতীর এমনই কৃপাদৃষ্টি যে তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না।" ভারতবাসীর তীব্র দারিদ্র্য ভারতীর সম্পাদক ও লেখকমণ্ডলী প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কিন্তু উহার চাপে মুহ্যমান তাঁহারা হন নাই, ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের মোহে দেশের দারিদ্র্যকে উপেক্ষাও করেন নাই। প্রথম হইতেই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি মূক মুখের নীরব ভাষা তাঁহারা ভারতীতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহার অসংখ্য পরিচয় ভারতীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের যে সব নব নব চিন্তাধারা ও আবিষ্কারকে তাঁহারা ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণময় বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাকেই বরণ করিয়া লইয়া ভারতীর সাহায্যে উহা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "স্বদেশে বিদেশে যেখানেই জ্ঞান সেখানেই মাথা নত করিতে হইবে।"

ভারতীর প্রথম প্রবন্ধ ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক?" দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের প্রমুখাৎ বহু বৃত্তান্ত অবগত হইতেন ও ভারতীতে উহা প্রকাশ করিতেন। প্রথম সংখ্যায় কাঁচড়াপাড়ার উমানাথ রায় নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট শ্রুত বৃত্তান্ত "মোলাকাৎ" শিরোনামা দিয়া প্রকাশিত হয়। এই উমানাথ রায়ের জন্ম ১২০৪ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ইনি ছিলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমসাময়িক লোক। প্রথম সংখ্যাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্য-রসাত্মক রচনা 'রামিয়া' ও 'গঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত লেখেন 'বঙ্গসাহিত্য' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'তুকারাম'। সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝাঁসির রাণী'ও পরে প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রথম সমালোচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কালীবর বেদান্তবাগীশ 'প্রাচীন ভারতে শিল্প' এই নামে প্রবন্ধমালা লিখিতে আরম্ভ করেন। উহার প্রথমটিতে তিনি সিংহলের বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। প্রতিবেশী সিংহলের সামাজিক ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন এবং সিংহলের সহিত যোগ সাধনের ইচ্ছার যে স্ফুরণ ১৮৬০ সালে হইয়াছিল, ১৭ বৎসর পরে তাহাই রূপায়িত হয় ভারতীর

লেখার ভিতর দিয়া। এক্ষেত্রে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কালীবর বেদান্তবাগীশের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভারতবর্ষের ও সিংহলের শিল্প সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাতে উৎসাহ দেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

'ভারতবর্ষীয় ইংরেজ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে এদেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। প্রবন্ধটি 'স:' এই স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়; উহা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত প্রহসন 'ভারতোদ্ধার' এই বৎসর ভারতীতে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নেপোলিয়ান ও ভলটেয়ারের বিখ্যাত উক্তিগুলি মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার উপরে 'ভারতী'র দৃষ্টি প্রথম হইতেই পড়ে। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি অনুবাদ করিয়া উহা ইংরেজি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর বোধগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। মুরের আইরিশ মেলডি, বাইরণ, বার্ণস ও সেক্সপীয়রের কবিতা প্রভৃতির অনুবাদও ভারতীতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু গান' ভারতীতে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ১৬ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গান যে স্বদেশী সঙ্গীত ইহাই তাহার প্রমাণ। 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে তাঁহার প্রথম কবিতা 'সজনীগো আঁধার রজনী' এই বৎসর প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'ভিখারিণী' ও 'কবিকাহিনী' কবিতাদ্বয় এবং 'করুণা' উপন্যাসটিও ভারতীতেই প্রকাশিত হয়। 'করুণা' অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

১২৮৫ বঙ্গাব্দে, ১৮৭৮ সালে, ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজের আদবকায়দা', 'গোটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ, 'পিত্রকো ও লরা' 'বিয়াত্রিচে ও দান্তে', 'এংলো নরম্যান, এংলো স্যাক্সন্ সাহিত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই সময় তিনি ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতেন এবং তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞান ভারতীর ভিতর দিয়া সকলকে দান করিতেন। এই প্রবন্ধগুলির বহুস্থানে মূল লেখার ছন্দানুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে কবি বিলাত যাত্রা করেন। ডিজরায়েলির উদ্যোগে স্বাক্ষরিত বার্লিন চুক্তি লইয়া ইউরোপে ও ইংলণ্ডে তখন প্রবল আলোচনা চলিতেছে। সুয়েজ খাল ও রাশিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈদেশিক রাজনীতিতে উহাদের স্থান সম্বন্ধে সকলেই আলোচনা করিতেছে। ভারতীতেও এই সময় সুয়েজ খাল ও রাশিয়া সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহিত সুয়েজ খাল ও রাশিয়ার সংযোগ তখনই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, ভারতীর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি উহা অতিক্রম করে নাই। সমস্যার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উহা ভারতবাসীকে জানাইতে আরম্ভ করিয়া দেন। জাতির প্রয়োজনে বৈদেশিক রাজনীতিকেও তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে বরণ করিয়া লন।

এই বৎসর কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে 'প্যারিস নগর প্রবাসী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল উচ্চবংশীয় কনৈক হিন্দুযুবকের' একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রটি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি মহাশয়কে লিখিত এবং উহার বিষয়বস্তু ছিল ভারতের স্বাধীনতা। মূল পত্রখানি ইংরেজীতে লেখা এবং ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। কার্ত্তিকের ভারতীতে উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। কোন কারণবশতঃ পত্রলেখকের নাম তখন গোপন রাখা হয়। ইঁহার নাম নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বরে ইনি ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ যাত্রা করেন। তিন বৎসর লাইপজিগে থাকিয়া জার্ম্মেণীর বহুস্থানে তিনি জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা দেন। ১৮৭৬-৭৭ এ তিনি রাশিয়া গমন করেন এবং সেখানে সেণ্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের কাজ তখন চলিতেছে। ১৮৭৮-এর বার্লিন চুক্তির পর বৃটিশ ও রুশ এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদ সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার জার-গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দাপুলিশের নেক নজর তাঁহার উপর পড়ে; নিশিকান্ত সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে পলাইয়া ফ্রান্সে চলিয়া আসেন। ১৮৮০ সালের ১২ই জানুয়ারী নিশিকান্ত সেণ্ট-পিটার্সবার্গ হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া পাঠান। বিদেশে বিপন্ন অপরিচিত যুবককে মহর্ষি

তৎক্ষণাৎ ৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী নিশিকান্তের পত্র কয়েকটি পাঠ করিয়াই মহর্ষি তাঁহার প্রতি স্নেহ সম্পন্ন হইয়াছিলেন।* অনেকের ধারণা আছে যে ভিক্টোরীয় যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবলমাত্র ইউরোপের বুর্জ্জোয়া সাহিত্যেরই প্রভাব পড়িয়াছে। ভারতীতে প্রকাশিত রচনাবলীর বিষয়সূচী দেখিলেই ইঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হইবে। ভারতীর সম্পাদক ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সন্ধান যে সর্ব্বদা রাখিতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেও যে তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় রূপ দিয়া প্রকাশ করিতেন, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্র প্রকাশ তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকের পর ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখে নিশিকান্তের পত্রখানি পুনর্ব্বার ভারতীতে মুদ্রিত হয়। ইহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে একটি বাঙ্গালী যুবক ইউরোপে গিয়া তথাকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতেছেন ইহা তাঁহারা প্রথমাবধিই সহানুভূতির চোখে দেখিতে আরম্ভ করেন এবং দেশবাসীকেও উহা জানাইয়া দিয়া বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

বাঙ্গলায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা তৎপূর্ব্বেই প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন, ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন। কেশবের বক্তৃতার রিপোর্ট পাঠ করিয়া বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক লুই ব্লাঁ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং স্বয়ং লণ্ডনে গমন করিয়া তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিয়াই সুলভ সমাচার নামে এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া যে নীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহা সাম্যবাদের মূলনীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেশে ফিরিয়াই শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারত শ্রমজীবী নামে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রায় এই সময়েই নিশিকান্ত ইউরোপ যাত্রা করেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইবার পর হইতে ভারতী তাঁহার কার্য্যকলাপ সাগ্রহে লক্ষ্য করিতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিদেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভারতীর ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে।

* ১২৮৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চীন পর্য্যটন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে লেখা হয় "সম্প্রতি আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাধানাচার্য্য মহাশয় চীনদেশ পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে হইবে।" কিন্তু পরে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এই সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্ন মুকুল', রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গ বিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ'-এর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতি প্রথমাবধিই ভারতী সম্পাদকের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই সংখ্যায় জীবরহস্য ও শবচ্ছেদ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি পুনরায় প্রকাশিত হয়। এবারও তাঁহার নাম প্রকাশ না করিয়া উহা "ইউরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভারতীর সম্পাদক ইউরোপে নিশিকান্তের কার্য্যকলাপ ও তাঁহার অভিমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের গাথা 'ভগ্নতরী' এবং তৎকর্ত্তৃক শেলীর কবিতার প্রথম অনুবাদ (Love's Philosophy) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ প্রবাসীর পত্রও এই সংখ্যা হইতেই মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'সারদামঙ্গলের' সমালোচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ চলিতে থাকে।

ভারতীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও বিজ্ঞানচর্চ্চার কোনরূপ ব্যবস্থাই হয় নাই। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সবেমাত্র ডি, এস-সি হইয়া বাহির হইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইনিই প্রথম ডি, এস্-সি। বিজ্ঞানচর্চ্চার দিকে বাঙ্গালী রীতিমত ঝুঁকিয়াছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস-সি হন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী দেশে পূর্ণোদ্যমে বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহ দিতে থাকে।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হঠাৎ নবাব' নাম দিয়া মলিয়ারের একটি ব্যঙ্গ নাট্য মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ করেন। এই বৎসরেই 'জাপানের উন্নতির মূলপত্তন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জাপান সম্বন্ধে পরে আরও অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় ইউরোপের উন্নত জাতিসমূহের প্রতিই ভারতীর সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই, এশিয়ার এই নবজাগ্রত দেশটির কার্য্যকলাপও তাঁহারা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। চীনে তখন পূর্ণোদ্যমে আফিমের ব্যবসায় চলিতেছে। একজন জর্ম্মান পাদ্রী Theodore Christlieb D. D. Ph. D., চীনে আফিমের ব্যবসায় সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন এবং ডেভিড বি ক্রুম উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নাম দিয়া ভারতীতে উহার সমালোচনা

উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি দেখান যে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে চীনে মাত্র দুইটি আফিমের বাক্স প্রেরিত হয়। উহার একটি ক্রেতাও তখন জোটে নাই। ইংরেজ বণিকেরা চীনের অভ্যন্তরে আফিম লইয়া প্রবেশ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করে, কিন্তু চীনা গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তথাপি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত তাহারা এই চেষ্টা করিতে থাকে। ধীরে ধীরে চীন আফিম সেবন আরম্ভ করে। অবশেষে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরেই চীনে ৮,০২,৬১,৩৮১ পাউণ্ড বিক্রয় হয়। আফিমের ব্যবসায়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, এই তো তাহাদের উনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় সভ্যতা; বলপূর্ব্বক বিষপান করাইতেও ইহারা কুণ্ঠিত নহে।

এই বৎসরেই অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ পুস্তকটির কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরাণীর হাট আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রকাশিত হয়। দেশের নিকটে যাহা ঘটিতেছে তৎপ্রতিও ইঁহারা উদাসীন থাকিতেন না। কাবুল যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র আসিয়া ভারতীর লেখক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ যে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতেও যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রলালের এই সারস্বত সম্মিলনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। এই বৎসরে তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত 'যমের কুকুর' প্রবন্ধটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন। নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তার' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ম্যাট্‌সিনীর জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে উহার সমালোচনা বাহির হয়। রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লেখা হয়। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপ প্রবাসে থাকিয়া ভারতীয় যাত্রা সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ভারতী উহার সমালোচনা করে। মিশরে আরবী পাশার বিদ্রোহের প্রতি তখন সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়লাল দত্ত আরবী পাশা ও ঈজিপ্টের যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'চেঁচিয়ে বলা' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধে কবি লেখেন "বড় বড় বিদেশী কথার মুখোস পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছিলাম?" বিদেশী জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় প্রচার এবং ভারতীয় ছন্দে উহাকে চালিয়া লইয়া গ্রহণ, ইহাই ছিল ভারতীর সম্পাদক ও লেখক মণ্ডলীর লক্ষ্য। প্রত্যেক রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের এই আকাঙ্খা ফুটিয়া উঠিত।

১২৯০ বঙ্গাব্দে ম্যালথাস ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত লইয়া আলোচনা সুরু হয়। ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ কুবিয়েরের গবেষণাও প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্গ মহিলা সভায় শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; উহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান প্রগতিকে গ্রহণ করিতে গিয়া জাতীয় জীবনের অতীতকে যে একেবারে উপেক্ষা করা চলিবে না ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রাবণ মাসে 'অনাবশ্যক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, "অতীত শিকড়ের মত হইয়া আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে, ঝড় ঝঞ্ঝায় বড় একটা কিছু হয় না। যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না তখন এই শিকড়ের প্রভাবে আমরা মাটির অন্ধকার নিম্নতল দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি।" ১২৯১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর ভার গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মাঝখানের সেতু। ইউরোপের বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে যেমন তিনি বঙ্গ-ভাষার মারফৎ ভারতীর ভিতর দিয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তেমনিই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা যাহাতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতে ভাসিয়া না যায় তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। নূতন নূতন লেখক তৈরী করিয়া যাহাকে দিয়া যেটি লেখাইলে ভাল হয় তাঁহাকে দিয়া সেইটিই তিনি লিখাইয়াছেন। চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে,—"আর্য্যামিকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গর্ভে আর্য্যোচিত কার্য্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে। আর সাহেবিয়ানাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গৃহাভ্যন্তরে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্য্যামির গর্ভ হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পন করিবে তখন সে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে; তাহার পরে আর্য্যোচিত কার্য্যের ঔরষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গর্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা; এ সভ্যতার গাত্রে ভারতীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্য্যদিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুই একাধারে সম্মিলিত হইবে—এ দুইটি যেদিন হইবে, সেইদিন ভারতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইবে।"

বিবাহ তাহাদের কৈশোরে হইয়াছিল। এখন তাহারা প্রৌঢ়। কিন্তু সন্তান একটীও হয় নাই। তাহাদের অভিশপ্ত জীবন মরুভূমির ন্যায় অহরহ খাঁ খাঁ করিত। স্বামী জমিদার বীরেশ রায় বিষয়কর্ম্মে রত থাকিয়া, জমিদারী দেখিয়া বেড়াইয়া তাহার অশান্তিময় জীবন কোন রকমে কাটাইয়া দিত। তাহার বিষয়ের স্পৃহা ক্রমে বৈরাগ্যে পরিণত হইয়াছিল। স্ত্রী মলিনার মুহুর্মুহু ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসে চতুর্দ্দিকের বায়ুও যেন তপ্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহার অটুট যৌবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য, নীরোগ দেহ ; তবে কেন নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে এই সুখের সংসারে এমন করিয়া নিষ্ফলা করিয়া রাখিল ? কিসের এ প্রায়শ্চিত্ত ? কি অপরাধ তাহার ? সে কত কি ভাবিত, ভাবিয়া ভাবিয়া অশ্রু বর্ষণ করিত। তাহার ব্যাথার একমাত্র সাথী ছিল ঐ অশ্রু !

মায়ের কোলে ছেলে দেখিলে মলিনার প্রাণের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত ; তাহার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছুটিয়া আসিত। পরক্ষণেই আবার তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। মাতৃ-হৃদয়ের তৃষ্ণার তাড়নায় সে যেন শিশু হইয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে মায়ের কোল হইতে ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিত এবং সহস্র চুম্বনে শিশুকে অস্থির করিয়া তুলিত। শিশুকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইত, কত উপহার দিত ; শিশুর মাও তাহাতে বাদ পড়িত না। মা শিশুর অকল্যাণভয়ে কম্পিত অন্তরে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়া যাইত কিন্তু জমিদার গৃহিণীকে কিছু বলিবার সাহস তাহার হইত না। জননী গৃহে ফিরিয়াই দুই চারিবার হরিনাম করিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে তুলসী-রজ মাখাইয়া অমঙ্গল আশঙ্কা দূর করিত। এরূপ একজন নয় মলিনা কত শিশুকে বুকে করিত, আদর করিত, যত্ন করিত। কিন্তু পুত্রবতীরা তাহাকে এড়াইয়া চলিত। সে সব বুঝিত। তাহার বুকে বড় বাজিত! জীবনে তাহার ধিক্কার আসিত!

মলিনা এবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিল। বীরেশ রায় বাধা দিল না, কেবল হাসিল। কিন্তু সে দমিল না। কিছু দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসী, বৈরাগী বৈষ্ণবে জমিদার বাড়ী গিস্ গিস্ করতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কোমর, হাত, গলা সোণা, রূপা, তামার কবচে ভরিয়া উঠিল। গ্রহ উপগ্রহের পূজা দিনের পর দিন লাগিয়া রহিল। ইহার পর দেশে বিদেশে যেখানেই শুনিল জাগ্রত দেবতা আছে সেখানেই পূজা দিয়া পুত্র প্রার্থনা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

অবশেষে একদিন বড় দুঃখে সে গোপীনাথের মন্দিরে শেষ পূজা দিতে আসিল। গোপীনাথ জাগ্রত দেবতা। পূজার সম্ভারে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছিল। সে একাকী এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় ছেলে কোলে একটি বধূ আর দুটি বর্ষিয়সী রমণীর সঙ্গে প্রবেশ করিল। ছেলেটিকে দেখিয়াই তাহার প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা হইল একবার বুকে করে। এই সময় বউটি তাহার পাশ দিয়াই যাইতেছিল। বউটিকে বলিল, "হ্যাঁ মা, গোপীনাথের প্রসাদ ছেলের মুখে দেবো—"

"তোমার ছেলেটি আমার কোলে একটু দাও।"

বউটি হাসিয়া তাহার কোলে দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার সঙ্গী একটি বর্ষিয়সী রমণী ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহার হাত হইতে ছেলেটি কাড়িয়া নিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল এবং বউটিকে ইসারায় নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি তিরস্কার করিয়া বলিল, "কোথাকার হাবা মেয়ে তুই। ছেলে ত দিচ্ছিলি, জানিস্ ও কে ? ও জমিদারনি—বাজা মাগি, ডাইনী—ষাট ষাট" বলিয়া ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে মুখামৃত বর্ষণ করিল এবং প্রাঙ্গণ হইতে গোপীনাথের নামে কিছু ধুলা উঠাইয়া উহার ললাটে এবং মাথায় মাখিয়া দিল। সরলচিত্ত বউটি বিশেষ কিছু বুঝিল না ; কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া যাহার সম্বন্ধে এত কথা তাহার দিকে চাহিতেছিল।

মলিনা সবই দেখিল এবং শুনিল। এতদিন সে যত ব্যথাই হউক নীরবে সহ্য করিয়াছে ; কিন্তু এবার যেন তাহার সহিবার ক্ষমতা সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। তীব্র ব্যথায় সে যেন

স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা কঠিন সঙ্কল্প করিয়া বসিল—এতে হয় হবে, না হয় এতেই শেষ।

পূজা শেষ হইল। মলিনা একবার স্বামীর পায়ের দিকে চাহিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া গলায় অঞ্চল জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গে গোপীনাথের সম্মুখে প্রণতা হইল। পাশে স্বামী দাঁড়াইয়া। বহুক্ষণ কাটিলে পরও যখন সে উঠিল না তখন বীরেশ বিস্মিত হইল, বলিল, "উঠ্‌বে না ?"

মলিনা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমায় ডেক না, আমি হত্যা দিয়েছি, গোপীনাথের আদেশ না শুনে উঠব না।"

বীরেশ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাহাকে উঠিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া উঠিল না। সকলে তখন মন্দির ঘিরিয়া রহিল।

অনাহারে অনিদ্রায় একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিল। কোন ঘটনাই ঘটিল না। চতুর্থ রাত্রির তৃতীয় প্রহর, স্বামী পাশে নিদ্রিত। অদূরে বৃক্ষতলে জমিদারের লোকজন পাহাড়া দিতে দিতে নিদ্রাভিভূত। এমন সময় মন্দিরে কে চাপা গলায় ডাকিল, "মা, মা, ওঠ।"

কোন উত্তর হইল না।

সে দ্বিতীয়বার বলিল, "মা, মা, ওঠ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"

মলিনার মাথা তুলিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কে আপ্‌নি ? কি বল্‌ছেন ?"

"আমি পুরোহিত। তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে মা, ওঠ।"

মলিনা উল্লসিত হইয়া বলিল, "কই, আমিত কিছু জানি না, পুরুত ঠাকুর।"

"আমি গোপীনাথের পূজক, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমায় বল্‌তে।"

"কি আদেশ গোপীনাথ জিউর ?"

"আজ থেকে সাতদিন পর্য্যন্ত তাঁর চরণামৃত পান করতে হবে।"

"দিন্, দিন্ তবে চরণামৃত—" অত্যধিক আনন্দের উত্তেজনায় তাহার দুর্ব্বল দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

পুরোহিত চরণামৃত লইয়া পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল। অতি সন্তর্পণে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাহার শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিয়া দিল। এতদিনের শুষ্ক কণ্ঠে চরণামৃতটুকু সত্যই তাহার নিকট অমৃতের ন্যায় লাগিল। সে আরো একটু চাহিল। পুরোহিত আরো সামান্য একটু দিল। বেশী দিতে তাহার ভরসা হইল না, কারণ বুকে বাঁধিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

পুরোহিত বলিল, "গোপীনাথকে প্রণাম করে এবার ঘরে যাও মা।"

সে ঠাকুর প্রণাম করিয়া নিদ্রিত স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "ওঠ।"

বীরেশ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কি ?"

মলিনা হাসিমুখে বলিল, "ঘরে চল গোপীনাথের আদেশ হয়েছে।"

"কি আদেশ ?"

মলিনা স্বামীকে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পুরোহিত গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "অন্যকে বলা নিষিদ্ধ।"

বীরেশ রায় সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পুরোহিতের দিকে চাহিল। পুরোহিত মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার অধর কোণে যে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মলিনার নিকট হইতে তাহা লুকাইল।

তাহারা সেই রাত্রেই গৃহে ফিরিয়া গেল।

তারপর সাতদিন ধরিয়া মহাসমারোহে গোপীনাথের পূজা চলিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মলিনাপ্রদত্ত মূল্যবান উপহারে পুরোহিতের ঘর-বাড়ী ভরিয়া গেল।

... ...

হঠাৎ একদিন সারা দেহে অভূতপূর্ব্ব কিসের এক সাড়া পাইয়া মলিনা চঞ্চল পুলকিত হইয়া উঠিল। আরো কিছুদিন গেলে তাহার দেহ যৌবন-শ্রী মণ্ডিত হইল; সর্ব্বাঙ্গে মাতৃচিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। স্বামী স্ত্রী সুখী হইল।

... ...

মলিনা শিশু পুত্রটিকে সর্ব্বদা বুকে করিয়াই থাকিত। শিশুটিকে মুহূর্ত্তের জন্যও বুকছাড়া করিতে সে পারিত না; তাহার ভয় হইত, সন্দেহ হইত, মনের ভিতর দুর্ দুর্ করিত। তাহার মতে তাহার বুক ছাড়া শিশুর আর একমাত্র নিরাপদ স্থান স্বামীর কোল। শিশুপুত্রকে স্বামীর কোলে রাখিয়াও

সে বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না; অন্যত্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাহার মন ও কাণ উভয়ই পড়িয়া থাকিত ঐ দিকে; শিশুর সামান্য ক্রন্দনেও সে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর কোল হইতে ছিনাইয়া নিয়া শিশুকে নিজের বুকে তুলিয়া লইত এবং শিশুর রোদনের জন্য তর্জ্জনী হেলনে স্বামীকে কত তিরস্কার করিত। বীরেশ হাসিত এবং ইহা লইয়া তাহাকে কত উপহাস করিত। মলিনা উন্মাদের ন্যায় শিশুকে সহস্র চুম্বন করিয়া স্বামীর উপহাসের উত্তর দিয়া হাসিত। ক্রমে মলিনা সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার অন্যের উপর দিয়া মাত্র দুটি কাজ নিজের হাতে রাখিল—স্বামী ও পুত্রের সেবা; এ দু'টি কায নিজে না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

মলিনার সুখে সকলেই সুখী হইয়াছিল, কেবল যে সব আত্মীয়-স্বজন তাহারই গৃহে থাকিয়া তাহারই অন্ন ধ্বংস করিত তাহারা ছাড়া। অপুত্রক বীরেশকে দেখিবার শুনিবার ছলে আত্মীয়ের দল একে একে আসিয়া স্ব স্ব স্থান করিয়া লইয়াছিল। বীরেশ বা মলিনার ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। তাহাদের বিশাল অট্টালিকা শূন্য পড়িয়া থাকিয়া সর্ব্বদা যেন হা-হা করিত। তবুও কতকগুলি লোক থাকিলে দিন তাহাদের কাটিবে একরকম; এই ছিল তাহাদের মনের ভাব। আত্মীয়েরা এই বিস্তৃত জমিদারী কি হইবে এই নিয়া সর্ব্বদাই বিস্তর আলোচনা করিত এবং প্রত্যেকেই মনে মনে বহু আশা পোষণ করিত। বাস্তবিক সেই সময় উইলের একটা কথাও চলিতেছিল। ঠিক সেই সময় কি না আগন্তুক শিশু আসিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল! শিশুর ও শিশুর জননীর উপর তাহাদের রাগের অন্ত ছিল না। তাহারা প্রকাশ্যে শিশুকে যার-পর-নাই স্নেহ করিত কিন্তু অন্তরালে তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিত। আত্মীয়েরা মলিনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিত, "এত গরিমা কিসের, এত গরিমা ভাল না—"

ইহা মলিনার দৃষ্টি এড়াইল না। ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে মনে মনে ভীত হইল। একদিন স্বামীকে বলিল, "এসব পরশ্রীকাতরদের বিদেয় ক'রে দাও। আমার নানারূপ অশান্তি হচ্ছে—"

বীরেশ ভাবিয়া দেখিল, সে তাহাদের অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া উপকার কিছুই করিতেছে না। তাহা ছাড়া একটা অশান্তির সৃষ্টিইবা সে করে কেন। সে একদিন সকলকে ডাকিয়া ভাল ভাবে সব বুঝাইয়া দিল। তাহারা কেহ চোখের জল ফেলিয়া, কেহ রাগে চোখমুখ লাল করিয়া মলিনা ও তাহার পুত্রকে অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

... ...

কিছুদিন পরের কথা। বীরেশের মৃত্যু-শয্যার পাশে বসিয়া মলিনা চোখের জল ফেলিতেছিল। নিকটে পুত্র খেলা করিতেছিল। বীরেশ অতি কষ্টে ভাঙা ভাঙা কথায় বলিল, "মলু! চল্লাম—খোকা রইল—"

মলিনা আকুল হইয়া কাঁদিয়া স্বামীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

বীরেশ পুনরায় বলিল, "মলু! কেঁদনা, খোকাকে বুকে তুলে নাও।"

রোদনরতা মলিনা নীরবে তাহাই করিল।

"...মলু! চোখের জল মুছে ফেল—" মলিনা মনকে শক্ত করিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

"প্রতিজ্ঞা কর, খোকাকে মানুষ ক'রে তুলবে।"

মলিনা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তুলব।"

"বড় সুখী হলেম মলু, বড় সুখী হলেম—" ইহার পর বীরেশ রায় চিরদিনের জন্য চোখ বুজিল। মলিনার ধৈর্য্যের বাঁধ পুনরায় ভাঙিয়া গেল। স্বামীর পা দু'টি মাথায় করিয়া সে বুক-ফাটা কান্না কাঁদিল।

ক্রমে সবই সহিয়া যাইতে লাগিল। মলিনা কার্ত্তব্যে রত হইল। ছেলেকে বুকের কাছে নিয়া যখন সে তাহার মুখের দিকে চাহিত তখন তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িত। ছেলে বড় হইয়াছে, দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিখিয়াছে, বাবা মা বলিয়া ডাকিতে পারে, আরো কত কি আধ আধ মধুর কথা বলে, এ সুখের সময় সে নাই, যাহার জন্য আয়োজন! এ সুখ যেন তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াও করে না! এ সুখ তাহার নিকট সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না! থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিত তাহার জন্য, যাহার জন্য তাহার জীবনের প্রয়োজন ছিল। মলিনা চোখের জল রোধ করিতে পারিত না। সে চোখের জল মুছিয়া ছেলেকে

বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে পড়িয়া থাকিত। ক্রমে মলিনার জগত-সংসার তাহার পুত্রেতে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল।

৬

কতগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন মলিনা শয়নকক্ষে বসিয়া স্বামীর ফটোর দিকে একাগ্র মনে চাহিয়া ছিল; স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু বুঁজিয়া আসিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে স্বামীর পাশে পুত্রের মুখখানি থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল; সে একই মুখ। পুত্রকে বাদ দিয়া স্বামীর চিন্তাও মলিনার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনের সঙ্গে স্বামী-পুত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল দেওয়ান দেখা করিতে আসিয়াছেন। পিতৃতুল্য বৃদ্ধ দেওয়ান বিশেষ গুরুতর কারণ ভিন্ন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন না। মলিনা তাঁহাকে আসিতে বলিয়া দিয়া ভিন্ন কক্ষে চিন্তিত মনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটু পরেই দেওয়ান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং প্রভুপত্নী উপবেশন করিলে নিজে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "একটা কথা বলতে এসেছি মা।"

মলিনা বলিল, "কি কথা বাবা?" মলিনা দেওয়ানকে পিতৃ সম্বোধন করিত। তিনিই এ লক্ষ্মীকে এ ঘরে আনিয়াছিলেন।

"এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম তুমি নিজে কিছু বল কিনা, কিন্তু এদিকে তোমার দৃষ্টি পড়ছে না—কর্ত্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে মা। কর্ত্তব্য যা তা করতেই হবে, তা যত কঠিনই হ'ক।"

মলিনার বুকের ভিতর দুর দুর করিয়া উঠিল। না জানি বৃদ্ধ আরো কি বলিবেন, না জানি তাহাকে আরো কি শুনিতে হইবে। মলিনা ভীত চিত্তে রুদ্ধশ্বাসে তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেওয়ান একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকার এখানকার লেখাপড়া শেষ হয়েছে; তাকে এবার সহরে পাঠাতে হবে মা, বাকী পড়া শেষ করবার জন্য—"

খোকাকে তাহার বুকছাড়া করিবে! মলিনার বুক মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিল, কোন্ নিষ্ঠুর যেন তাহার হৃদপিণ্ড সমূলে উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য বড় নির্ম্মম ভাবে সবলে টানিয়া ধরিল। একটা অব্যক্ত তীব্র ব্যথা তাহার অন্তর যেন ছুরিকাঘাতে কাটিয়া কাটিয়া রক্তাক্ত করিয়া বহির্গমনের পথ না পাইয়া অন্তরময় ছুটাছুটি করিতে করিতে আরো তীব্র হইয়া উঠিল। তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিতে দেখিতে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হইয়া গেল; শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু মুদ্রিত হইল; তাহার অজ্ঞাতসারে হাত দুখানি আসিয়া বুক চাপিয়া ধরিল।

বৃদ্ধ তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভীত চিত্তে চীৎকার করিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল। তাহার অন্তরও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। ক্ষণপরে বলিল, "মা—মা খোকাকে যে মানুষ করতে হবে···তাঁর আদেশ···একটু কঠিন হও মা।"

সহসা মলিনার হৃদয়পটে বীরেশের মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। তাহার কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল স্বামীর মৃত্যু সময়ের আদেশ—'মলু! খোকাকে মানুষ করে তুলো।' মনে পড়িল তাহার প্রতিজ্ঞা। স্বামী যেন তাহার হৃদয়ে থাকিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, 'মলু! মলু! ছি! এ কি করছ তুমি'। মলিনার অন্তঃ বাহির শিহরিয়া থরথরে কাঁপিয়া উঠিল; তাহার মন আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ক্ষমা কর প্রভু, অপরাধিনী আমি, আমায় বল দাও—বল দাও, তোমার আদেশ পালন করতে'।

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এ কথা কয়টি বড় করুণ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, 'পারব, পারব আমি···তুমি আমায় বল দাও···সব করব তোমার জন্য'—তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল। চক্ষের অবিরল বারিধারা গণ্ড সিক্ত করিতে লাগিল। বলিল, "বাবা! খোকার মঙ্গল যাতে হয় তাই করুন···আমি···আমি আর···"

মলিনা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। স্বামীর ফটোখানির নীচে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "মা—মা।" পুত্রের বিচ্ছেদ ভয়ে ভীতা মাতার বুকফাটা কান্নার শব্দ তাহার কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বড় ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে

টতে বলিল, "একদিন এক মুহূর্ত্ত বুকছাড়া করে নি লেকে, বড় কঠিন, বড় কঠিন তার পক্ষে…কিন্তু বা…"

তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ইহারই কিছুদিন পর একদিন খোকা আসিয়া বিদায় ছিল, বলিল, "মা, কিছু ভেব না তুমি, যখনই ছুটি পাব নই তোমার কাছে ছুটে আসব—মা বল একবার ও—"

মলিনা খোকার চিবুক ধরিয়া নীরবে কিছুক্ষণ তাহার খর দিকে চাহিয়া রহিল; নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। না যখন বিক্ষুব্ধ মনের ভাষা জোগাইতে অক্ষম হয় অশ্রুই য় তখন সে-কাজ করিয়া থাকে। অবিরল অশ্রু মলিনার াণের সকল কথাই ব্যক্ত করিতে লাগিল।

মলিনার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময় মুখে াকা ডাকিল, "মা—"

"বাবা" বলিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি ধান-দূর্ব্বা প্রভৃতি ঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া লল, "ওখানে প্রণাম কর।" বীরেশের ফটোখানি অঙ্গুলি র্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। খোকা ফটোর নীচে মাটিতে ণাম করিয়া মায়ের পায়ের ধুলা লইল। মা পুত্রের মস্তক াঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "এস বাবা।"

খোকা মলিন মুখে মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া াবেগরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় ডাকিল, "মা।" খোকা মায়ের বুকে াপাইয়া পড়িল।

মা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার শির ান করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, বাবা, ভয় কি… ায় যাচ্ছে, এস।"

"মা, তোমার…তোমার…" খোকা অঞ্চলে মায়ের অশ্রু াইতে গিয়া নিজেই আকুল হইয়া কাঁদিয়া মায়ের বুক হইতে টয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

মলিনা স্তব্ধ। যেদিকে খোকা চলিয়া গেল সেদিকে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া একখণ্ড পাথরের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

… …

কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। এবার খোকার কলেজের শেষ পরীক্ষা। খোকা পত্রে মাকে জানাইল এবার ছুটিতে বাড়ী যাইতে পারিবে না, পরীক্ষার অনেক পড়া পড়িতে হইবে; গৃহ-শিক্ষকও একই রকম পত্র মায়ের নিকট পাঠাইল। এরকম আজ নূতন নয়; কিছুদিন হইতেই খোকার বাড়ী যাইবার নানারূপ ওজর আপত্তি দেখা যাইতেছিল।

মলিনা একদিন দুইদিন তিনদিন করিয়া দিন গুনিতে গুনিতে শূন্য প্রাণে পথের দিকে চাহিয়া খোকার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত। যতদিন সে ফিরিয়া না আসিত ততদিন গৃহে তাহার মন তিষ্ঠিত না, ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় একাকী বসিয়া বসিয়া খোকার কথা ভাবিত; তাহার আহার, নিদ্রা একরূপ হইত না; রাত্রিতে কতরকম স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিত; বিছানায় বসিয়াই কম্পিত অন্তরে ঠাকুরের নাম পুনঃ পুনঃ জপ করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনা করিত; খোকা বোধ হয় ভাল করিয়া খাইতেও পাইতেছে না ভাবিয়া আহারে তাহার অনিচ্ছা হইত। মলিনা পত্র দুইখানি পড়িয়া বড় দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বুকে শোকের মত বিঁধিল; অন্তরে একটা হাহাকার উঠিল। প্রাণ তাহার গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল…এখনও সে শিশু, এত কি সে বোঝে—মনকে এই প্রবোধ দিয়া মলিনা খোকাকে লিখিল, পরীক্ষা শেষ করেই বাড়ী এস।

ইতিমধ্যে মলিনা লক্ষ্য করিল বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাহার বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেছে। বৃদ্ধ দেওয়ান তাহাদের মিঠা কথায় আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিতেছে। কিন্তু সে ইহার কারণ কিছুই জানিল না; জানিতে তাহার ইচ্ছাও হইল না। তাহারা কন্যার পিতা। মলিনার উপযুক্ত পুত্রকে জামাতৃপদে বরণ করিতে তাহারা সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন বৃদ্ধ দেওয়ান আসিয়া কহিল, "মা, একটা গুরুতর বিষয়ে কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

বৃদ্ধের মুখে গুরুতর বিষয়ের কথা উল্লেখ শুনিলেই মলিনা আঁৎকাইয়া উঠিত। তবুও প্রকাশ্যে বলিল, "কি কথা বাবা?"

"বলছিলাম কি, খোকার ত বয়স হল, তোমার অনুমতি হলে ওর…"

মলিনা গম্ভীর হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

বাকিটুকু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। বৃদ্ধ তাহার ভাব দেখিয়া একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, "দেখ মা, ও এখন সোমথ ছেলে, সবই ঠিক সময়ে হওয়া উচিত। এখন ওর বিয়ে দাও। আমি অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ দেখে রেখেছি, সবই তোমার সমান ঘর, যে-টা তোমার পছন্দ হয়…"

মলিনার সর্ব্বাঙ্গ একটা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তবুও সে বলিতে লাগিল।

"দেখ মা, আজকালকার ছেলে, ভাবই অন্তরকম। সবদিকটাই বুঝে দেখতে হবে, বুঝলে মা, যে কালের যা।"

মলিনা নীরবে একই ভাবে উপবিষ্ট রহিল।

"তা বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই ক'র…আমি যা বুঝেছি তা তোমায় বল্লাম; দে'খ মা সময় হারিয়ে শেষে যেন অনুতাপ ক'র না।"

মলিনা তথাপি নিরুত্তর।

বৃদ্ধ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল।

মলিনা ভাবিতে লাগিল—বিবাহ? কোথায়? কেন? কিসের জন্য? সুখ? সে কি সুখী নয়? অভাব কিসের তার? স্নেহ? ভালবাসা? আমার চেয়ে বেশী তা কে দেবে? আমি ত এখনো আমায় নিঃশেষ ক'রে সব তাকে দিয়ে ফেলি নি? এতটুকু সে, নেবার ক্ষমতা কতটুকু তার? অফুরন্ত এ ভাণ্ডার। যুগ যুগান্তর ধ'রে নিয়েও সে তা শেষ করতে পারবে না। জঠরে রেখে অনু-পরমাণু থেকে দিনে দিনে পলে পলে আমার দেহের সার দিয়ে তাকে বর্দ্ধিত করেছি, জগতের আলো দেখিয়েছি, স্তন্য দিয়ে তাকে পুষ্ট করেছি, তার মুখে কথা ফুটিয়েছি, তার মন গড়েছি একটু একটু ক'রে, তারপর একদিন তাকে জগতের সামনে মানুষ বলে দাঁড় করিয়েছি; সে আমাতে আমি তা'তে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রয়েছি, আমি ছাড়া তার অস্তিত্ব? কে সে-কথা কল্পনা করে? তার স্নেহ, ভালবাসা, সুখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার পূরণ যদি আমি না করতে পারি তবে কে পারবে? আমার চেয়ে তার বেশী আপনার কে? পাগল! বিবাহ? খোকার? কেন? কিসের জন্য? দূর, এ তার কথা নয়।

মলিনা জোর করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিলেও মন হইতে উহা গেল না। সে এটাকে চাপা দিবার জন্য অন্য বিষয় ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; সব ভাবনার মাঝখানে সেই কথাটাই পুনঃ পুনঃ মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক সময়ে মলিনা সেই ভাবনাতেই তন্ময় হইয়া গেল। তাহার চক্ষের সম্মুখে একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিল—স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার বুক রক্তাক্ত করিয়া কে যেন খোকাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। সে পাগল হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে গেল; এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ তাহার গতিরোধ করিল—খোকার স্ত্রী ও স্ত্রীর আত্মীয়বর্গের দ্বারা সে ব্যূহ রচিত; খোকা ব্যূহের মধ্যস্থলে। সেখানে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। সে পাগল হইয়া ডাকিল, 'খোকা! খোকা! ফিরে আয়, ফিরে আয়, আমি এসেছি'—সকলে হাসিল, খোকাও হাসিল। তাহার দুঃখ দেখিয়া খোকার দুঃখ হইল না; তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া খোকা বিষণ্ণ হইল না; তাহাকে দেখিয়া খোকা পাগল হইয়া 'মা মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল না—

মলিনা আর ভাবিতে পারিল না। সে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, "তার স্নেহের দাবী একমাত্র আমারই কাছে, আর কারো কাছে নয়; আর কারো অংশ তাতে নেই-নেই-নেই… আমি হাতে ধ'রে তাকে পরের ক'রে দিতে পারব না; আমার মৃত্যুর পর যা হয় হ'ক…আর কেউ এসে খোকাকে …না, না সহ্য হবে না আমার। খোকা! খোকা!…"

সহসা তাহার মুখ হইতে ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হইল। কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। মলিনা চমকিয়া চারিদিকে চাহিল। সম্মুখের আরসিতে নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—দেখিল, মুখে তীব্র জিঘাংসার চিহ্ন, ললাটে স্বেদবিন্দু, চক্ষু রক্তবর্ণ; নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুষ্টিবদ্ধ, দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, কেশ আলুলায়িত, বসন বিস্রস্ত, দেহ কম্পিত—'একি! একি হল আমার! আমি কি করছি!' শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া মলিনা টলিতে টলিতে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

ইহার পর খোকার বিবাহের কথা আর আলোচিত হয় নাই।

… … …

একদিন সহসা একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে মলিনার

কক্ষে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল সে মূর্চ্ছিতা; তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্তে একখানা খোলা চিঠি। বৃদ্ধ দেওয়ান তৎক্ষণাৎ চিঠি খুলিয়া দেখিল খোকার পত্র; কম্পিত অন্তরে রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল; তাহাতে লেখা ছিল, 'মা, বন্ধন আর ভাল লাগেনা। বেরুলাম পৃথিবী দেখ্‌তে; আমায় ডেক না, পাবে না।'

বৃদ্ধ পত্র পাঠ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর মলিনার চেতনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহার দৃষ্টি একবার কক্ষের চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিল। পরে সে বিস্রস্ত বসন যথাসম্ভব সংযত করিল। বৃদ্ধ দেওয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "মা! ভেব না তুমি, ফিরে আসবে সে নিশ্চয়। আমি যেখান থেকে পারি, যে রকমে পারি সেই অকৃতজ্ঞকে ফিরিয়ে এনে তোমার বুকে তুলে দেব, হ্যাঁ, এই প্রতিজ্ঞা আমার।"

তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

মলিনার উভয় হস্ত একবার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িল। গভীর হতাশার চিহ্ন। সে উভয় হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিল। নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ আর দাঁড়াইতে পারিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিতে চাপিতে কক্ষ ত্যাগ করিল। সন্তান অকৃতজ্ঞ, অমানুষ; তবুও কত ব্যথা, কত মমতা মায়ের; তবুও পাগল সে তাহারই জন্য। সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর সন্তান একদিকে। বৃদ্ধের ব্যথিত মনে তখন এই কথাগুলিই তোলপাড় করিতেছিল।

খোকার তল্লাসে দেশ বিদেশে লোক ছুটিল; কত বিজ্ঞাপন বাহির হইল; পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তাহার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

মলিনা অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে নীরব হইয়া গেল; নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বৃদ্ধ দেওয়ানের সঙ্গেও কথা কহিত না; কিন্তু তাহার বুকচেরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুধারার বিরাম হইল না; খোকার স্মৃতির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিল।

এই সুযোগে আত্মীয়-স্বজনেরা পুনরায় জমিদার বাড়ী অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। কেহ কেহ আসিয়া নিজ নিজ পুত্র-সন্তানটিকে মলিনার বুকে তুলিয়া দিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "এ ছেলে আজ থেকে তোমারই; এটীকে বুকে ক'রে বুক ঠাণ্ডা কর; তোমার খালি বুক ভরে থাক্।" তাহাদের সহানুভূতি-সূচক দীর্ঘশ্বাসও যে পতিত না হইত তাহাও নয়। তাহাদের উদ্দেশ্য মহৎ! তাহারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নানাবিধ চিত্র মনে মনে আঁকিয়া সুখী হইত। আর যাহাদের পুত্রসন্তান ছিল না, তাহারা অন্তের অসাক্ষাতে মলিনাকে উপলক্ষ্য করিয়া রোষদীপ্ত নয়নে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত, "হবে না, হবেই ত এমন, এত আগেরই জানা, যাবে কোথা। হুঁ, যাবে কোথা এত অহঙ্কার, পা আর মাটিতে পড়্‌ত না অহংকারে, তাড়িয়ে দিল আমাদের সব! হলি না এখন সুখী? রাখ্‌লি না এখন ছেলেকে ধ'রে? একটী মাত্র ছেলে যার ঘরে সে না কি অন্যের ভোগে কাঁটা দেয়! বুকের পাটা কত বড় তাই ভাবি···আরে ঈশ্বর কি নেই? তুই মাগি অন্ধ ব'লে কি ঈশ্বরও চোখের মাথা খেয়েছে? দেখ এখন, হাতে হাতে ফল পেলি কি না। মাগির দেমাক কত, সোমত্থ ছেলে, তা'র বিয়ে দিলে না ছেলে যদি বেহাত হয়ে যায়, বিগড়ে যায়··· জানিস্ ভিতরে ভিতরে ওর হিংসা। হুঁ, এখনও হয়েছে কি ওর; এই চ'খের জল পড়ে পড়ে ও যদি না অন্ধ হয়ে যায় ত হুঁ···"

বৃদ্ধ দেওয়ান তাহাদের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার জানিত। কতকগুলি লোকের মধ্যে বাস করিলে মলিনার মন অনেকটা সুস্থ থাকিতে পারে ভাবিয়া সে কিছু বলিত না, কিন্তু সর্ব্বদাই সাবধান থাকিত।

মলিনা নিস্পৃহ। সংসারের কিছুতেই আর সে নাই। তাহার একমাত্র প্রিয় স্থান ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনা, নির্জ্জন, পবিত্র। সে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া মনে মনে খোকার কথা বলে, ঠাকুরের নিকট খোকাকে ভিক্ষা চাহে। ঠাকুর কথা কহেন না জানে, তবুও আশার

উৎকণ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মুখের পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে যদি ঠাকুর কিছু বলেন। চারিদিকের বড় বড় গাছগুলির ফাঁক দিয়া সে আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; ভাবে খোকা এখন কোথায়, কি করিতেছে। রোদে বানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোকার চেহারা বুঝি খারাপ হইয়াছে; রাত্রে সে শোয় কোথায়? পান্থশালায় ঐ সব ভিক্ষুকদের মধ্যে মাটির উপরে? আহার? আহার বুঝি তাহার জোটে না; ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে বুঝি আমার মুখপানে চাহিয়া আছে; আমি ছাড়া যে সে কারো কাছে খাবার চাহে না। ঐ যে খোকা বুঝি বিপন্ন হইয়া প্রাণভয়ে মা মা বলিয়া আমায় ডাকিতেছে।

মলিনার সর্ব্বাঙ্গ ঝঙ্কার দিয়া উঠে। বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠে! আকুল হইয়া ডাকে, 'খোকা! খোকা! ভয় কি! ভয় কি! এই যে আমি, এই যে; আমি যে এখনো রয়েছি তোরই জন্য। আয় খোকা, আয়, আমার বুকে আয়।'

খোকা বুকে রহিয়াছে মনে করিয়া বাহুদ্বারা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে গিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলে, 'ঠাকুর! কি করলে আমার'।

... ...

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। খোকা ফিরিয়া আসে নাই। আত্মীয়বর্গ পুনরায় নিরাশ হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। এবার যাইবার সময় তাহারা প্রকাশ্যেই মলিনাকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছে। মলিনা বড় দুঃখে একবার হাসিয়া নীরবে সব শুনিয়াছে। দুটী একটী দাস দাসী ছাড়া সেই প্রকাণ্ড পুরীতে মলিনা একাকী। শয়নকক্ষ এবং ঠাকুরবাড়ীর মধ্যেই তাহার জীবন সীমাবদ্ধ। তাহার অন্তরের আগুন, দেহের সার শুষিয়া নিয়াছে; দেহ কঙ্কালসার, বলহীন; অতি কষ্টে একটু একটু করিয়া দু-পা চলিবার শক্তি মাত্র অবশিষ্ট।

এই অবস্থায় একদিন বৃদ্ধ দেওয়ান কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া মলিনাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। চোখে মুখে তাহার ভয়, বিস্ময় ও সন্দেহের চিহ্ন। এই সময় মলিনা কক্ষের বাহিরে আসিতেছিল। দুই হাতে পুনঃ পুনঃ চোখ রগড়াইয়া, চোখ টানিয়া টানিয়া বিস্ফারিত করিয়া সম্মুখে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু না পারিয়া চোখ মুখ ললাট কুঞ্চিত করিয়া উভয় হস্ত ইতস্ততঃ প্রসারিত করিয়া কি যেন ধরিতে চাহিতেছিল; পরে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই এক পা গিয়া দেওয়াল ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "পেয়েছি।"

মলিনা দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে গায়ে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে আসিয়া হঠাৎ চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোনরূপে বারান্দায় উপুড় হইয়া রহিয়া গেল। একটু আর্ত্তনাদ বা একটু 'আহা' 'উহু' কিছুই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। কায়িক ব্যথাটা নীরবে চাপিতে গিয়া তাহার মুখ একটু কঠিন হইয়া উঠিল বটে কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। সে হাতে ও হাঁটুতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পুনরায় দেওয়াল ধরিয়া দুই-পা গিয়া দাঁড়াইল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আঃ, ভগবান্, এটুকুও তোমার সহ্য হ'ল না, আমার দৃষ্টিটুকুও নিয়ে গেলে, যদি সে ফিরে আসে তবে তাকে একটু দেখবার ক্ষমতাও আমার রাখলে না। উঃ—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর তুমি ভগবান। খোকা! খোকা! আয় আয়, ফিরে আয়, না হ'লে, না হ'লে বুঝি আর—" আবার সেই মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস!

"না, সে আর আস্‌বে না", মলিনা আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। একবার সে উর্দ্ধদিকে চাহিল। পরে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নত মস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা নিকটে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া মলিনা চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত। বিস্ময়ে বলিল, "কে? বাবা? অমন করলেন কেন?"

বৃদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে একখণ্ড পাথরের ন্যায় দাঁড়াইয়া এতক্ষণ দেখিতেছিল, কিন্তু মলিনার আক্ষেপোক্তি তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। বলিল, "হায় মা, কি করছিস্। আমায় একদিন যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিতিস্...।"

"কেন বাবা, কি হয়েছে? আমার চোখের কথা বলছেন? ও কিছু নয়, এখনি সেরে যাবে জলের ঝাপটা দিলে। আমি ত সেজন্যই যাচ্ছিলাম।"

"হুঁ, সারবে, কেন এ সর্ব্বনাশ করলি মা, আমি তোদের তিন পুরুষের সেবক, আমায়ও লুকোলি।"

"বাবা, আপনি দুঃখ করবেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে আর কত জ্বালাব, ইচ্ছা করেই আপনাকে কিছু বলি নি। বাবা, আর কার জন্যে এ চোখের দরকার।"

উভয়ে নীরব। নীরবে উভয়েরই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"আয় মা আয়", বৃদ্ধ মলিনাকে হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। তাহাকে বসাইয়া বলিল, "আমি চল্লাম।"

মলিনা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায় বাবা?"

"সহরে।"

"সহরে? কেন?"

"ডাক্তার আনতে।"

"ডাক্তার? কেন? আমার জন্যে? আপনি মিছিমিছি ভাবছেন বাবা, ও কিছু নয়, সেরে যাবে এখন দেখবেন।"

"হুঁ, কিছু শুনব না, চল্লাম।"

বৃদ্ধ কক্ষ ত্যাগ করিল। মলিনা পশ্চাৎ হইতে পুনঃ পুনঃ ডাকিল, "বাবা! বাবা!—"

বৃদ্ধ শুনিয়াও শুনিল না, গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিল—চক্ষুর চিকিৎসক। মলিনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, চক্ষু দুইটিই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, একটা বিশেষ করিয়া। অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন উপায় নাই। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। মলিনা আপত্তি করিল, বৃদ্ধ কতক মিনতি, কতক ভর্ৎসনা, কতক আদেশ করিয়া তাহাকে সম্মত করিল। চিকিৎসক অতি বিচক্ষণতার সহিত অস্ত্র করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিল এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া বলিল, "এর আগে কিছুতেই যেন চোখ খোলা না হয়, সাবধান! যদি খোলেন তবে ইহজীবনের জন্য চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।"

এরূপ বারম্বার সাবধান করিয়া দিয়া চিকিৎসক বিদায় হইল।

... ...

ইহার কিছুদিন পরে একদিন একটী অপরিচিত যুবক গোপনে বৃদ্ধ দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথা বলিল।

বৃদ্ধ আকুল হইয়া তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "ঠিক বলছ ভাই?"

যুবক ক্ষুণ্ণ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার অবিশ্বাসের কারণ?"

"অসন্তুষ্ট হয়ো না ভাই, এসংবাদ যদি পরে মিথ্যে হ'য়ে যায় তবে তার মা আর বাঁচবে না। তুমি যদি ভাই লোভে পড়ে..."

"যদি পুরস্কারের লোভে পড়ে এসে থাকি? তবে এই দেখুন।"

যুবক তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী বোতাম-ফটো তাহার চোখের সম্মুখে ধরিল।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "খোকা! খোকার ফটো। কে তুমি বাবা?"

"তার সহপাঠি, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়. পাঁচ বছরেরও বেশী তার জন্যে দেশে দেশে ঘুরেছি, তারপর এই সেদিন তাকে পেয়েছি।"

বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে সে, একবার ও কি..."

যুবক উত্তর না করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া কহিল, "উত্তর দিচ্ছ না যে বাবা, কোথায় আছে সে?"

"—পুরের হাঁসপাতালে।"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বল্লে, খোকা হাঁসপাতালে, খোকা... তবে, তবে কি আর তাকে ফিরে পাব না? সত্যি কি তবে তার মা'র কপাল ভাঙল?"

বৃদ্ধ আকুল হইয়া পুনরায় যুবকের হাত দুইটী ধরিয়া তাহার মুখের দিকে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

যুবক কহিল, "রোগ কঠিন, কিন্তু মারাত্মক নয়।"

"তাকে কি এখানে আনা যায় না?"

"অসম্ভব।"

বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিল, "এখন কি করি, মাকেওত নিয়ে যাওয়া যায় না।"

"কেন?"

"কেঁদে কেঁদে সে প্রায় অন্ধ হ'য়েছে, চোখে অস্ত্র করা হয়েছে, চোখ বাঁধা, খোলা নিষেধ।"

"তিনি কিছুদিন পরে যাবেন, আপনি চলুন এখন আমার সঙ্গে। অনবরত কাঁদছে সে 'মা মা' বলে, আপনি গেলেও কিছুটা শান্ত হবে।"

"শুনবামাত্র মা পাগল হয়ে উঠবে তাকে দেখবার জন্যে, কিছুতেই তাকে রাখা সম্ভব হবে না, তবুও দেখি একবার তাকে বলে।"

কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ ডাকিল, "মা।"

শায়িতা মলিনা ডাক শুনিবামাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পাগলের ন্যায় বলিল, "কাল তাকে দেখেছি স্বপ্নে, সে বড় বিপন্ন, মা মা বলে কেবল ডাকছে আমায়, বাবা! কোথায় সে, আমায় এখনই নিয়ে চল সেখানে।"

বৃদ্ধ দেখিল যুবক খোকার কথা যাহা বলিয়াছে তাহার অনেকটাই পূর্ব্বে মলিনা স্বপ্নে দেখিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিল, "মা! খোকার সংবাদ এনেছে।"

"খোকার সংবাদ! খোকার! কে এনেছে?"

"তার বন্ধু।"

"কই কই সে, দেখি একবার তাকে।"

যুবক তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "আমাকে তারই মত মনে করবেন মা।"

মলিনা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি তারই মত অনেকটা। হ্যাঁ বাবা, তুমি মায়ের ব্যথা বুঝি বোঝ, কিন্তু সে বুঝি বোঝে না?" তাহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। পুনরায় অস্ফুট স্বরে যেন যুবকের কানে কানে কহিল, "কোথায় সে বাবা, কেমন আছে সে আমার, বড় কঠিন স্বপ্ন দেখেছি, বুক বড় কাঁপছে।"

যুবক উত্তর করিল না। সত্যি সে মলিনার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন শুনিতে লাগিল।

মলিনা আরো উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "বল আমায় সব, কিছু গোপন ক'রো না তার কথা।"

যুবক ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁসপাতালে।"

"হাঁসপাতালে! হাঁসপাতালে!"

মলিনার উত্তয় হস্ত অবসন্ন হইয়া পাশে ঝুলিয়া পড়িল। "তাই! তাই সে আমায় আকুল হ'য়ে ডাকছিল।"

তাহার দেহ স্থির, কণ্ঠ নীরব হইল। সে যেন রুদ্ধশ্বাসে কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ যে শুনতে পাচ্ছি সে আমায় ডাকছে, পাগল হয়ে ডাকছে, আমায় এখনি সেখানে নিয়ে চল।"

যুবক মিনতিভরা স্বরে বলিল, "মা আপনি সেখানে···

"আমি না গেলে সে ভাল হবে না। আমাকেই সে চাচ্ছে, আর দেরী নয়, এক্ষুনি! এক্ষুনি!"

তাহারা সেদিনই রওনা হইয়া গেল। দেওয়ান সঙ্গে চক্ষু চিকিৎসককে নিতে ভুলিল না।

··· ··· ···

হাঁসপাতালের নিস্তব্ধ কক্ষ; মাঝে মাঝে পীড়িতের আর্ত্তনাদ। একটী সেবিকা রোগীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং আর্ত্তনাদকারীদের মুখের সামনে দাঁড়াইয়া চাপা গলায় ভর্ৎসনা করিতেছিল। এক কোণে বৃহৎ বাতায়নের সামনে মুক্ত বায়ুতে একটী পৃথক রোগশয্যা। রোগী একটী যুবক; রোগ কঠিন। সেই রোগমলিন দেহে তখনও সুষমার অভাব ছিল না। পার্শ্বে উপবিষ্টা সেবিকা সেবানিরতা দেবীর ন্যায়; দৃষ্টি তাহার যুবকের মুখের উপর ন্যস্ত। পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া বিখ্যাত চিকিৎসক, একাগ্রচিত্তে পর্য্যবেক্ষণশীল ধ্যানীর ন্যায়। রোগী সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "মা, মা—এলে না, এলে না এখনও, ত্যাগ করলে মা, সত্যি! সত্যি তবে ত্যাগ—"

সেবিকা মধুর কণ্ঠে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "চুপ করুন, চেঁচাবেন না, ফুসফুস্ যে আরো খারাপ হয়ে যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে ডাক্তারের দিকে তাকাইল। ডাক্তার কি ইঙ্গিত করিল। সেবিকা রোগীর কানের উপর মুখ নিয়া মৃদুস্বরে পুনরায় বলিল, "মাকে যদি দেখতে চান তবে উঠতে পারবেন না, চেঁচাতে পারবেন না, কথা কইতে পারবেন না। কেবল চুপ ক'রে দেখবেন, কেমন রাজী?"

তাহার উত্তর কিছু শুনা গেল না। সেবিকা তাহার

দিকে চাহিয়া থাকিয়া কি বুঝিল বলা যায় না। তবে তাহার কানে কানে পুনরায় বলিল, "আজই মা আসবেন।"

রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিল। চক্ষু দুটী রক্তজবার ন্যায় লাল। ছল ছল করিয়া চোখে জল ছুটিয়া আসিল। অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। শীর্ণ গণ্ডে চিহ্ন রাখিয়া অশ্রু দেহের তীব্র তাপে দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। সেবিকার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবেগ সম্বরণ করিল।

চিকিৎসক কক্ষের প্রবেশ দ্বারের দিকে তাকাইল। তৎক্ষণাৎ একজন সেবিকা বাহিরে চলিয়া গেল।

কক্ষ এমন নিস্তব্ধ যেন জনমানবহীন। বাহিরের বায়ু জানালার সার্সিতে আহত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া সোঁ সোঁ রবে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল। অদূরে অশ্বত্থের ডালে কতকগুলি পাখী কলরব করিয়া উঠিল; বড় বিশ্রী কঠোর শুনাইল। আরো দূরে একটা অচেনা সুন্দর পাখী বড় মিঠা সুরে তান ধরিল; সে গান বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া রোগীদের কানে যেন মধু বর্ষণ করিল। যুবক মুমূর্ষের ন্যায় মুদ্রিত নেত্রে শয্যায় পতিত ছিল। কায়মনোবাক্যে সে কেবল মাকে চাহিতেছিল। প্রাণ তাহার মা মা বলিয়া মুহুর্মুহু কাঁদিয়া উঠিতেছিল; শ্বাসে প্রশ্বাসে কেবল মা নাম চলিতেছিল; বহির্জগতের অস্তিত্ববোধ তাহার তখন ছিল কি না সন্দেহ। হঠাৎ সে নিকটেই যেন মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মলিনাকে ধরিয়া সঙ্গীরা রোগীর কক্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বহুকালের পর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মলিনা পাগল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐযে, ঐযে সে, খোকা, খোকা।"

মায়ের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুত্র পুনরায় বড় করুণ কণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা, মাগো।"

যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। সেবিকা তাহাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। এবার আর সে ভৎর্সনা করিতে পারিল না।

"বাবা, বাবা, ভয় কি—ভয় কি, এই যে এসেছি আমি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায়।"

মলিনা সঙ্গীদের হাত ছাড়াইয়া পুত্রের নিকট ছুটিয়া যাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের পাশে আনিয়া বসাইয়া দিল। মলিনা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বুকে করিয়া ললাটে, শিরে অজস্র চুম্বন করিয়া বলিল, "খোকা, খোকা, চেয়ে ছাখ, এই যে আমি এসেছি, ভয় কি, ভয় কি বাবা।"

পুত্র মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'মা-মা' বলিয়া ডাকিল। বলিল, "ছাখ, ছাখ মা, আমার বুকের হাড় সব বেরিয়ে গেছে।"

মলিনা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, "কই কই।"

পুত্র মায়ের হাত আনিয়া বুকের উপর রাখিল। মা বলিল, "তাই ত, তাই ত, দেখি, দেখি।"

মলিনা হঠাৎ একটানে চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। চক্ষুর চিকিৎসক চক্ষু দুইটী চিরদিন জন্য গেল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। এরূপ একটা কিছু ঘটিবে তাহা কেহই আশা করে নাই। বৃদ্ধ দেওয়ান আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "শেষে তুই সেই সর্ব্বনাশই করলি মা।"

মলিনা কতকাল—কতকাল পর পুত্রের মুখ দেখিয়া সানন্দে তাহার শির চুম্বন করিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিল। তারপর আর অন্য কোন দিকে না চাহিয়া একমাত্র পুত্রের মুখের দিকেই অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল; যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি আছে ততক্ষণ তাহাকে দেখিবে, এই তাহার বাসনা। ধীরে ধীরে জগতের আলো চোখের সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল; ক্রমে চতুর্দ্দিকের আলো হ্রাস পাইতে পাইতে এক বিন্দুতে আসিয়া স্থির হইল। মলিনা পুত্রকে দেখিতে দেখিতে শেষ চুম্বন করিল। সেই শেষ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোর বিন্দু দেখিতে দেখিতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া একসময়ে কোন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। মলিনা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। দুঃখে তাহার হাসি; জ্যোতিহীন চোখে আনন্দাশ্রুর ধারা!

বাংলার সংস্কৃতি ও গণ-শিল্প

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম্-এ

বাঙালী অতি প্রাচীন কাল হইতে ছন্দোময় জীবন-যাত্রার প্রণালী শিখিয়াছিল। বাংলার জীবন ছিল ছন্দোময়। 'ছন্দোময়' অর্থ সুসম্বদ্ধ ভাবে কর্ম্মশীল। যে বাঙালীর কর্ম্ম প্রণালীতে সুসম্বদ্ধতা বা সুশৃঙ্খলতা নাই, তাহাকে 'ছন্নছাড়া' বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'ছন্নছাড়া' অর্থাৎ ছন্দহীন হইল সে-ই যাহার চিন্তায় সুসম্বদ্ধতা নাই, যাহার গতি-ভঙ্গীতে, আচরণে সামঞ্জস্য নাই, যাহার জীবনে শৃঙ্খলা নাই—এক কথায় 'খাপছাড়া' লোক। মানুষের জীবনে, মানুষের আচরণে যে ছন্দের পরিপূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা আছে, বাঙালীর পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙালীর ছন্দোবদ্ধ জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার সংস্কৃতির অতীত ধারাগুলির ভিতর। বাংলার ছন্দধারার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে বাংলার ভাবধারায়, বাংলার ভাষার ধারায় ও বাংলার শিল্পের ধারায়। প্রকৃত জাতীয়তা ও প্রকৃত বীর্য্যবত্তা লাভ করিতে হইলে স্ব-ভূমির বৈচিত্র্যময় ছন্দশক্তির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

বাংলার ভাষার ভিতর দিয়া, বাংলার ভাবধারার ভিতর দিয়া যে বৈশিষ্ট্যময় ছন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই হইল বাংলার স্ব-ছন্দ। বাঙালী যখন এই স্ব-ছন্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে, তখনই সে হইবে স্ব-ছন্দ। আর তাহা হইলেই বাঙালী তাহার স্ব-ভাবের পরিচয় পাইবে। আমাদের এখন সেই সাধনার প্রয়োজন, যাহাতে আমরা আমাদের স্ব-ছন্দ অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিল্প, আমাদের ভাবধারাকে সত্যকার চিনিতে পারি, সত্যকার সংগ্রহণ করিতে পারি। আমরা যখনই আত্মস্থ হইতে পারিব, স্ব-ছন্দে পরিপূর্ণ হইতে পারিব, তখনই আমরা একটা অন্তঃসারহীন, সমন্বয়হীন, অধ্যাত্মহীন সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। বাংলার নিজস্ব অবদান হইল বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ হইতে অধ্যাত্ম-আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভোগতান্ত্রিক আদর্শকে পরিহার করা। বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের প্রাবল্য হইতে অধ্যাত্ম-আদর্শকে সংরক্ষণ করাই হইবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মানুষের উপর তাহার জন্মভূমির প্রভাব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। তাহার ভাষায়, তাহার সাহিত্যে, তাহার সঙ্গীতে, তাহার শিল্পে, তাহার জন্মভূমির প্রাকৃতিক ছন্দধারা প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারা যদি তাহার জন্মভূমির ছন্দধারার সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্ব-ভূমির প্রতি গভীর প্রেম জন্মিবে এবং এখানেই আসিবে সত্যকার স্বদেশ-প্রেম। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজেকে সত্যকার জানিতে চায়, তবে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম জানিতে হইবে তাহার জন্মভূমিকে। বাঙালী যদি নিজেকে জানিতে চায়, তাহা হইলে বাঙালীকে সর্ব্বপ্রথমে তাহার স্ব-দেশ বাংলাভূমিকে, বাংলার প্রকৃতিকে জানিতে হইবে। বাঙালী যদি একবার তাহার বাংলা ভূমির সত্য রূপকে জানিতে পারে, তবে তাহার অন্তরের ভিতর স্ব-ভূমির প্রতি একটা সুগভীর গৌরব ও মমতা জন্মিবে। ইহাতে এমন অপরিসীম গৌরব ও মমতার প্লাবন বহিতে পারে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণ বাঙালী একটা অপূর্ব্ব ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।

বাঙালীকে শক্তিশালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে, বাঙালীকে জাতীয় জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, তাহার আবহমানকাল হইতে প্রচলিত নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারাকে, নিজস্ব শিল্পধারাকে, নিজস্ব ভাবধারাকে পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহণ করিতে হইবে। ভ্রান্ত প্রগতির মোহে আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতি-ধারাকে, শিল্প-প্রবাহকে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে স্ব-স্থ হওয়া অসম্ভব। বাঙালীর জীবনধারার উৎস কোথায়? বাংলার জীবনধারার উৎস রহিয়াছে বাংলার ভাষার ভিতর, বাংলার শিল্প-প্রণালীর ভিতর। বাংলার শিল্পধারাগুলি বাংলার স্ব-সংস্কৃতির ধারাবাহিক সূত্র-স্বরূপ।

বাংলার পটুয়া শিল্পে বাংলার আত্মার, অধ্যাত্মের জীবন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী যতদিন এই শিল্পবিদ্যাকে অবহেলা করিবে, ততদিন শিল্পক্ষেত্রে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগে সে শক্তিবিকাশ করিতে পারিবে না। বাংলার বাউল,

কীর্ত্তন ও ভাটিয়ালী সঙ্গীতেও আমরা বাংলার আত্মার, অধ্যাত্মের জীবন্ত মূর্ত্তি পাই। বাংলার শিল্প ধারায়, বাংলার সঙ্গীত-ধারায় শুধু অধ্যাত্মের-ই প্রকাশ পায় নাই, এগুলি অপরিসীম আনন্দরূপেরও উৎস। এগুলির অনুশীলন করিলে বাঙালীর জীবনে দুর্ব্বার শক্তি, দুর্নিবার তেজ ও সুগভীর আত্ম-মর্য্যাদা জাগিয়া উঠিতে পারে। বাঙালীর জীবনে উন্নতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান উপায় হইতেছে তাহার ভূমি-সংস্কারের মধ্যে তাহার শিল্পকলার সংস্কাররূপ যে মূলগুলি জীবন্ত আছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীর জীবনের ধারাবাহিক সংস্পর্শ করিয়া দেওয়া। এই ভূমি-সংস্কারের প্রবাহকে আমাদের জীবনে আনিতে হইবে জাতীয় জীবনে আবহমান শিল্প-সাধনার জীবন্ত ধারার ছন্দ হইতে ও জাতীয় ইতিহাসের বীরত্বময় কাহিনীর ভিতর দিয়া।

কোনও জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে সেই জাতির অনুভূতির ক্ষেত্রে এবং রসকলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা রসকলার ক্ষেত্রেই শিল্পী তাহার ভূমি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বাঙালী তাহার স্বকীয়তার প্রকাশ করিয়াছে গণ-শিল্পের রসকলায়।

বর্ত্তমান যুগ যান্ত্রিকতার যুগ। আধুনিককালের শিল্প বেশীর ভাগই যান্ত্রিক সভ্যতার উপর নির্ভর করে—যান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে আত্মার সম্পদের কথা নাই; এখানে সংস্কৃতির কথা নাই, এখানে আত্মার বৈশিষ্ট্য একেবারে চাপা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের মনোবৃত্তি হইয়াছে বস্তু-প্রধান। ইহার ফলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী অতিমাত্রায় কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে; শিল্পে যে সহজ সরসতা ও শুদ্ধি ছিল তাহা হারাইয়া যাইতেছে। যন্ত্র-পূর্ব্বযুগের শিল্পে যে সরল, সহজ বীর্য্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, তাহা আজ লোপ পাইয়াছে। জাতির বিশিষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বীর্য্যাত্মক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ গণ-শিল্পে সংরক্ষিত থাকে। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে যখন অতীত শিল্পকলার ধারা অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তখন গণ-শিল্পের ধারায় অতীত প্রবাহটি সংরক্ষিত হয়। জাতি যদি তাহার আপন বিশিষ্ট শিল্পধারার পরিচয় লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে গণ-শিল্পের অনুশীলন করিতে হয়। বাংলার গণ-শিল্পেই আমরা বাঙ্গালীর অতীত সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাইতে পারি। কারণ, গণ-শিল্পই হইতেছে জাতির একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। জাতির গণ-শিল্প বাহ্যিক বা যান্ত্রিক সভ্যতা ও প্রভাব হইতে মুক্ত। দেশের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত সমাজে কৃত্রিম সভ্যতা সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, জনসমাজের নিত্যকার দুঃখ-দৈন্যের ভিতরও তাহাদের জীবন-যাত্রার ও শিল্প-সাধনার সহজ সরল আনন্দ রহিয়াছে। একটা জাতি যখন তাহার সরল আনন্দ-প্রবাহ কৃত্রিমতার প্রভাবে হারাইয়া ফেলে, তখন তাহা গণ-শিল্পের ভিতর ফিরিয়া পাইতে পারি। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব-প্রসূত অভিজাত শিল্পে একটা গভীর কৃত্রিমতা, একটা আত্মগরিমা, নিয়মানুবর্ত্তিতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়, কিন্তু গণ-শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায় একটা সহজশুদ্ধি, আন্তরিকতা ও বীর্য্যতা, এবং একটা সহজ সরল গতি।

বাংলার অমূল্য গণ-শিল্প আজ মরণোন্মুখ। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে ভূমির উর্ব্বরশক্তির ক্রমঅপকর্ষতা উদ্ভূত যান্ত্রিকতা ও অর্থদাসত্ব। ঠিক এই কারণেই অন্যান্য দেশের লোক-শিল্পও আজ মৃত।

বাংলার শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে যে প্রকার মনোযোগ দিয়াছেন, তাহার একাংশও যদি শিল্পকলার অনুসন্ধানে দিতেন, তাহা হইলে বাংলার শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক কাজই হইত। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শিল্পের গবেষণাক্ষেত্রে আশানুরূপ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শিল্পপ্রেমিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া বাংলার শিল্পকলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। বাংলার গণ-শিল্পের জীবন্ত ধারা আজও গ্রামে গ্রামে যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, অনুশীলন হইলে তাহা হইতেই অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

বাঙালীর জীবনে তাহার নিজস্ব লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্প একটি সরল, সহজ আনন্দের খনি। এইগুলি জাতীয় জীবনে নূতন জীবনের অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম এবং এই-গুলি সরলতা ও শুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। স্ব-দেশীয় সঙ্গীত ও শিল্পের অনুশীলনে জাতি একটা স্বতস্ফূর্ত্ত কলাবোধ ও আত্মবোধের

পরিচয় পায়। এগুলি জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্ট ধারা। এগুলি জাতির অতীত বীরত্ব ও সংস্কৃতির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ বলিয়া এগুলির একটা উজ্জ্বল সতেজ প্রকাশ-ভঙ্গী আছে। লোক-সঙ্গীতগুলি স্বদেশের অধিবাসীদের অন্তর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশবাসী যদি বাল্যকাল হইতে তাহার লোক-সঙ্গীতের সহিত পরিচিত হইতে পারে, তবে সে তাহার দেশ সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ পায়। ইহাতে দেশ-প্রীতি বর্দ্ধিত হয় এবং দেশ ও দেশবাসীর সহিত ব্যক্তির গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। লোক-সঙ্গীতের ন্যায় লোক-শিল্পের সহিত বাল্যকাল হইতে পরিচিত হইতে পারিলে ব্যক্তির দেশ-প্রেম ও স্বজাতীয়তা গৌরববোধ বর্দ্ধিত হইতে পারে।

যান্ত্রিক সভ্যতা ও অর্থদাসত্বের আক্রমণে বাংলার গণ-শিল্প আজ বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাংলার নিজস্ব লৌকিক শিক্ষার অবনতিতে, বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতিতে, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিলোপের ফলে লুপ্তাবশেষ যে সব লৌকিক-শিল্প আজও গ্রামে গ্রামে সংরক্ষিত আছে, তাহার পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। বাংলার লৌকিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন হইলে দেখা যাইবে যে, বাংলার শিল্পকলার একটা নিজস্ব অবদান আছে। বাংলার লৌকিক শিল্পকলা গভীর সৌন্দর্য্য, কলাশ্রী আধ্যাত্মিক সম্পদের আধার।

বাংলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, এগুলির সহিত সঙ্গীত ও শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে। বাংলার উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলি প্রধাণতঃ অধ্যাত্ম বা ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া সুংগঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের সহিত আনুসঙ্গিকভাবে সঙ্গীত ও শিল্পের সাধনা আছে। বাংলার ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির কৃত্য তখনই শেষ হয়, যখন এগুলির সঙ্গে সঙ্গীত ও শিল্পানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান, বিবাহ-অন্নপ্রাশন, গম্ভীরা উৎসব অথবা পটুয়া সঙ্গীত। মেয়েরা ব্রতানুষ্ঠানে নানা ব্রতকথা বা ব্রতগীতির আলোচনা করিয়া থাকেন, আবার তৎসঙ্গে আলিপনা শিল্পের অনুশীলন করেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়েরা সঙ্গীতচর্চ্চা করেন, আবার বরণডালা, সাজি, ঝাঁপি প্রভৃতি শিল্পকলার অনুশীলন করেন। গম্ভীরা উৎসবে সন্ন্যাসী বা ঢাকীরা জাগরণ গীতি গাহিতে থাকে, আর ভক্তগণ বিচিত্র ভঙ্গীতে মণ্ডিত মুখোস পরিয়া নৃত্য করে। গ্রামের পটুয়ারা সুদীর্ঘ পটে চিত্র আঁকে আর পৌরাণিক লোক-গাথার আবৃত্তি করে। গ্রাম্য শিল্প ও সঙ্গীতরূপে যে অমূল্য সংস্কৃতিধারা আজও সংরক্ষিত আছে, সেগুলি জাতীয় জীবনের চিরাগত ধারা। এগুলির সহিত গভীর সংযোগ স্থাপন করিয়া এগুলিকে আবার লোকশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বাংলার ও বাঙালীর জীবনের লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলার আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর ভাবধারারূপে লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্প সহজ, শুদ্ধভাবে রূপায়িত হইয়াছে। এগুলি অভিজাত সমাজের বিলাসের বস্তু হিসাবে আদৃত হয় নাই—এগুলি হইতেছে জনসমাজের অনাবিল আনন্দের ও আধ্যাত্মিকতার সরলতার স্বরূপ।

আমাদের দেশে যেমন সম্প্রতি কিছুদিন হইতে লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্পের গবেষণা চলিতেছে, সেইরূপ ইউরোপের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রচেষ্টা চলে। বিশেষতঃ, ইংলণ্ডে লোক-গীতি ও লোক-শিল্পের গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে সুরু হয়। ইংলণ্ডে লোক-গীতি ও লোক-শিল্পের সংগ্রহ প্রচেষ্টার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক সিসিল সার্প। সিসিল সার্পের অক্লান্ত উৎসাহে লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্পের উদ্ধারকল্পে ইংলণ্ডের বহুস্থানে সংগ্রহ-সমিতি স্থাপিত হয়। সিসিল সার্প লোক-গীতি ও লোক-শিল্প-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমানে অত্যন্তই বিশ্বমুখীন ; এই পদ্ধতিতে মানুষ ইংরেজ হইয়া গড়িয়া উঠে না, হয় বিশ্বমানব। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ইংরেজের। এ অবস্থায় প্রতীকার করিতে হইলে ইংরেজ জাতির যাহা একান্ত ও বিশিষ্ট সম্পদ, প্রত্যেক ইংরেজ জনক-জননীর সন্তানকে তাহার অধিকার দিতে হইবে, তাহার ধারায় বাড়িতে দিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান সম্পদ মাতৃভাষা। ইহার বাক্যসম্পদ, ইহার ব্যাকরণ-রীতি, ইহার গঠন—সবই জাতির বিশিষ্টতায় মণ্ডিত, জাতির বিশিষ্ট ভাবধারার ধারক ও বাহক এই ভাষা। ইংরেজ যেমন ফরাসী বা জার্ম্মাণ হইতে স্বতন্ত্র—ইংরেজের

ভাষাও তেমনি ফরাসীর বা জার্ম্মাণীর ভাষা হইতে পৃথক। আয়র্ল্যাণ্ডের দেশ-প্রেমিকগণ এ বিষয়ে বিশেষ সুচেতন। এই জন্য তাঁহারা আইরিস ভাষার পুনশ্চর্চ্চা সম্বন্ধে এত উদ্যোগী।

"তারপর আছে ইংরেজ জাতির বিশিষ্ট উপকথা, লোক-কাহিনী, প্রবাদবাক্য আর আছে তাহার স্বতন্ত্র ক্রীড়াকৌতুক ও নৃত্য। এই সকলের উপরে ইংরেজ সন্তানের জন্মগত অধিকার এবং এই জাতীয় সম্পদের প্রভাব হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখা কেবল অন্যায়ই নয়, অসঙ্গতও বটে।

"ইহা ছাড়া আছে আমাদের জাতির নিজস্ব লোক-সঙ্গীত, অরণ্যপুষ্পের ন্যায় যে সঙ্গীত আমাদের দেশবাসীর অন্তর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ইংরেজ সন্তান যদি তাহার এই সকল জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত শৈশব হইতে পরিচয় সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার দেশ ও দেশবাসীর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবে, প্রীতির যোগ বৃদ্ধি হইবে, দেশ ও দেশবাসীর সহিত তাহার যে নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাহা সে অনুভব করিতে শিখিবে এবং প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক হইয়া উঠিবে।

"ইংলণ্ডের লোক-সঙ্গীতের পুনরাবিষ্কারের ফলে ইহার ভিতর দিয়া দেশকর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতীগণ তাঁহাদের কর্ম্মধারার সহায়ক নূতন পথ পাইবেন। বিদ্যালয়ে লোক-সঙ্গীতের প্রবর্ত্তনা দ্বারা যে শুধু ইংলণ্ডের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রই প্রভাবিত হইবে তাহা নয়—যে দেশপ্রেম ও জাতি গৌরব-বোধের অভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা এখন চিন্তিত হইতেছি, তাহাও পুনর্জ্জাগরিত হইবে।"

বাংলার লোক-সঙ্গীত ও লোক-শিল্পের আলোচনা ক্ষেত্রে সিসিল সার্প মহাশয়ের উপরোক্ত বাক্যগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বাঙ্গালী গণ-সাম্য ও মৈত্রীর আস্বাদন বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পাইয়াছে। বাংলার শাশ্বত গণ-সাম্যের অমোঘ পন্থা হইল স্বদেশের স্ব-ভূমিগত জীবন্ত ঐক্যসূত্রের ও স্ব ভূমির সংস্কৃতিধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। স্বদেশের ভূমিগত জীবন্ত ঐক্যসূত্রের ও ধারাপ্রণালীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমরা জাতির প্রাণগত সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ হইয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ব-ভূমিগত সংস্কৃতিধারার একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। বিদেশীয় ভাবধারার প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এতটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে, আমরা আমাদের স্ব-দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধারাকে ভুলিতে বসিয়াছি। আজ আমরা বাংলার স্ব-ভূমিগত গণ-জীবনের তাৎপর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার ফলে, বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে, নাগরিক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও দূরীভূত করিতে পারি। বাংলার গণ-শিক্ষা ও গণ-শিল্পের অনুশীলনের ভিতর দিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একটা সুগভীর সাংস্কৃতিক ঐক্য-প্রবাহের সন্ধান পাইয়াছিল। আমরা স্ব-ধারাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সাম্প্রদায়িক একত্ববোধ হারাইয়া ফেলিয়াছি। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী স্ব-জাতীয় জীবনের সংস্কৃতিধারা ও স্বজাতীয় শিল্পধারা হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

বাংলা ও বাঙালীর পাল-পার্ব্বণ, বারব্রত, তীর্থপর্যটন, পথনির্ম্মাণ, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, মেলা-অনুষ্ঠান, আতিথ্য, উপনয়ন—অন্নপ্রাশন-বিবাহ সামাজিক উৎসব, কীর্ত্তন, বাউল, গম্ভীরা উৎসব প্রভৃতি গণ-শিল্পের ধারাগুলির মধ্য দিয়া গণ-সাম্যের প্রচার হইত। এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে গণ-সাম্যের স্রোত বহিয়াছে, তাহা বাহ্যিক নয়, সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং ইহা দেশ ও সমাজে শান্তি ও আনন্দ পরিবেশন করিতে সমর্থ।

বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ধর্ম্মমূলক হইলেও, এগুলির মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের উপকার সাধন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে মালাকর, নাপিত, ব্রাহ্মণ, বাদ্যকর, ধাত্রী, কুম্ভকার, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একটা উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহাদের একজনের অভাবে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলিতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত-কলার অনুশীলন হইবার সুযোগ মিলে। এই সব অনুষ্ঠান হইল সুশৃঙ্খল, সুসমঞ্জস আনন্দ ধারার প্রবাহক।

বাংলার গ্রামে গ্রামে যে নগর সংকীর্ত্তনের প্রথা আছে, তাহাতে গণ-সাম্যের রীতিমত প্রচার হয়। গ্রামে কীর্ত্তন অনুষ্ঠান হয় কাহারও গৃহের প্রাঙ্গণে। কীর্ত্তনের আসরে

গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর লোক যোগদান করেন—সেখানে পণ্ডিত মূর্খ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিচার নাই। মূল কীর্ত্তন গায়ক হয় ত নমঃশূদ্র, খোল বাজান হয় ত যোগী, মৃদঙ্গ বাজান হয় ত সূত্রধর, শঙ্খ বাজান হয় ত ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তনের দোয়ার হয় ত মালাকার। ইহাতে কোনও ভেদাভেদ নাই। সমগ্র প্রাঙ্গণ ভরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন নৃত্য চলে। কীর্ত্তনের ভাবে মত্ত হইয়া হয় ত ব্রাহ্মণ-জমিদার ভূমিতে লোটাইতে থাকেন, সাষ্টাঙ্গে সমগ্র জন মণ্ডলীকে ভক্তি করেন; তখন ইহাতে অসম্মান নাই, ছোট-বড় বিচার নাই। কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া আত্মায় আত্মায় সাম্যের ভাব উৎপন্ন হয়। খোল মৃদঙ্গের ঝঙ্কারে একতালে সকলের হাত পা উঠে পড়ে, হাতে হাতে তালি পড়ে, এক সুরে সকলে সমবেত কণ্ঠে সুর ধরে, এক ভাবেতে সকলেই উদ্দীপ্ত হয়। ইহার চেয়ে গণ-সংযোগ ও গণ-সাম্যের ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে?

তারপর গ্রামে গ্রামে আছে গম্ভীরা উৎসব। চৈত্র মাসে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে গাজন ও গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ভিতর দিয়া গণ-সাম্য সুশৃঙ্খলার সহিত জন-সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। গম্ভীরা অনুষ্ঠানে সামাজিক শাসন পদ্ধতি রহিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তিকে গম্ভীরায় অপরাধ স্বীকার করিয়া সমাজের নিকট ক্ষমা স্বীকার করিতে হয়। গম্ভীরা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া নরনারী বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া সমবেত ভাবে আন্তরিকতার সহিত বাস করিবার শিক্ষা লাভ করে। গম্ভীরার নৃত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বিভিন্ন জাতির লোকের সমাবেশে সুসম্পন্ন হয়। উৎসবের শেষ দিবসে 'শিবযজ্ঞে' সকলকে একত্রে অন্নাহার করিতে হয়। গম্ভীরা মণ্ডপে সর্ব্ব সাধারণ গ্রামবাসী সমবেত হইয়া উদার সৌভ্রাত্রমিলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। গম্ভীরা উৎসবে স্ব-ভূমিগত পল্লীজীবনের আনন্দোপভোগের ধারাগুলি নিহিত আছে।

বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলে পটুয়ারা পটচিত্র আঁকে এবং পট-চিত্রগুলি সাধারণ্যে প্রদর্শন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পশ্চিম বঙ্গের বিশেষতঃ বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াগণ কাপড়ের উপর বা কাগজের উপর চিত্র অঙ্কন করে —এই চিত্রগুলি প্রায় ১০ হাত হইতে ২৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা হয়। এই পটগুলি সাধারণতঃ জড়াইয়া রাখা হয়। কলিকাতা কালীঘাটের পটুয়াদের চিত্রগুলিও সুপ্রসিদ্ধ।

পটুয়ারা কোনও প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া পটচিত্র অঙ্কন করে। ইহারা সাধারণতঃ যে সব পটচিত্র পল্লী অঞ্চলে দেখাইয়া থাকে, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলা পট, রামলীলা পট, যমপট, শক্তিপটগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব পট প্রদর্শনের সময় পটুয়ারা স্বরচিত পটুয়াসঙ্গীত সুললিত সুরে আবৃত্তি করিয়া থাকে।

সুদূর পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া অদ্যাপি এই ধরণের পটচিত্রে প্রাচীনতার ধারাগুলি জীবন্ত রহিয়াছে। এই সব পটচিত্রে বাংলার নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বর্ত্তমান আছে। পটগুলির চিত্রকলায় আদিম যুগের সরলতা, শুদ্ধি ও তেজস্বিতার ভাব পরিস্ফুট ভাবে দৃষ্ট হয়। এইগুলি শিল্পগত বিলাসিতা বা আলঙ্কারিতা দোষে দুষ্ট হইতে পারে নাই—এইগুলির উপর কোনরূপ আড়ষ্টতার ছাপ নাই। সাধারণ রং ও তুলির সাহায্যে শিল্পী সুনিপুণ ভাবে পৌরাণিক বিষয়-গুলি আঁকিয়া থাকে। সামান্য উপকরণের সাহায্যে শিল্পীরা পটে যে সব জীব জন্তু, বৃক্ষলতা, নরনারীর চিত্র অঙ্কন করে, তাহাতে শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পটচিত্রে পুরুষদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বীরোচিত ভাবে অঙ্কিত হয় এবং এগুলির ভাবভঙ্গীর অঙ্কন প্রণালী অসাধারণ। পট চিত্রের নারী দেহের সৌন্দর্য্যসুষমা বিচিত্র ভাবে রূপায়িত করা হয়।

পটুয়াদের অঙ্কন কৌশলে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রসকলার ভিতর দিয়া ধর্ম্ম, দর্শন কিরূপে অপূর্ব ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়, এই সব শিল্পীরা বহু প্রাচীন কাল হইতেই সেই পদ্ধতিতে সুনিপুণ। এই সব চিত্রের রেখায়, বর্ণে, কল্পনায় বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের নরনারীর প্রকৃতি ও চরিত্র সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠে। 'রামপটে' শিল্পী প্রাচীন ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবন যাত্রার প্রণালী ও কর্ম্মমূলক পুরুষোচিত কাহিনীর ইতিহাস রূপায়িত করিয়া তোলে। 'কৃষ্ণপটে' শিল্পী রাধাকৃষ্ণ প্রেমের আধ্যাত্মিক চিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলে। 'শক্তিপটে' শিল্পী জ্ঞানমূলক আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের অনুপ্রকাশ করে। পটুয়াদের চিত্র-গুলির একটি অতি সাধারণ লক্ষ্য বস্তু হইতেছে যে, প্রত্যেক পটচিত্রের শেষ দিকে শিল্পী 'যমচিত্র' অঙ্কিত করে। যম-

চিত্রাংশে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের খাতার ছবি আঁকা হয়। জনসমাজে "ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়" এই নীতি প্রচারের উদ্দেশেই পটুয়ারা এই চিত্রভাগটি বিবৃত করে।

পটুয়া চিত্রগুলিতে বাংলার সামাজিক ও ধার্ম্মিক জীবনের পরিচয় মিলে। দেশ ও জাতির আত্মার সুগভীর ভাবরসের সহিত পটুয়ারা পরিচিত ছিল বলিয়াই পটচিত্রগুলিতে তাহারা তুলিকার রেখায় ও রং-এর বিন্যাসে জাতির অন্তরাত্মার গভীর ভাব-ভঙ্গিমার প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে, কৃষ্ণপটে, শক্তিপটে বাংলার নরনারীর ও বাংলার জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণপটে শিল্পী যে বৃন্দাবনের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে বাংলা দেশের প্রকৃতি ও জীবন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রামপটে শিল্পী যে অযোধ্যার ছবি আঁকিয়াছে, তাহাতে বাংলার প্রকৃতি ও জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিপটে শিল্পী যে শিবের কৈলাস আঁকিয়াছে, তাহা বাংলা দেশের কৈলাস। পটুয়া শিল্পীর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণ, শিব-পার্ব্বতী, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, গোপ-গোপীগণের চিত্রগুলি সাধারণ বাঙালী নরনারীর চিত্র। পটুয়া শিল্পী কৃষ্ণপটে যে "বড়াই বুড়ীর" ছবি আঁকিয়াছে, তাহা বাঙালী ঠাকুরমার ছবি। বাঙালী মেয়েরা যেমন শাঁখার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা করে, শক্তিপটেও সেইরূপ পার্ব্বতীর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। রামপটে দৃষ্ট হয় যে, রাম বাঙালীর মত ছাতনা-তলায় বিবাহ করিতেছেন। মোটকথা, পটুয়া শিল্পীরা পটচিত্রে বাঙালীর প্রকৃতি ও জীবন হুবহু ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

পটুয়া চিত্রসম্পদ বাংলার গণ-শিক্ষার কার্য্য অপরিসীম ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পটুয়ারা বৎসরের পর বৎসর এই চিত্রসম্পদ বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে যখন প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করে এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা লাভ করে।

বিদায়ক্ষণে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আসিব না যবে আর তোমাদের ঘরে
মোর কথা র'বে মনে ক্ষণকাল,
তোমরা ভুলিবে মোরে কিছুদিন পরে
ফেলে দেবে কবিতার জঞ্জাল।
আমার স্মরণ লাগি কোন আয়োজন,
জানি,—করিবে না কেহ কোন দিন,
প্রতিদিন হাসিমুখে করিবে ভোজন
স্মৃতি মোর হ'য়ে যাবে সব লীন।
প্রভাতের পথে নব অতিথির সনে
পরিচয়-অনুরাগে র'বে মন,
তারা-ভরা রাতে বসি' এই বাতায়নে
তোমরা করিবে নিশি-জাগরণ।

উড়ে-যাওয়া প্রাণ-পাখী আসে যদি ফিরে
মঞ্জরী দোলে যে-ই শাখাতে,
তার পানে চাহিবে কি কভু আঁখিনীরে!
চেনা নাম ধরে' তারই ডাকাতে!

কথা গেঁথে গেঁথে ভোলা মন চলে যায়
সমাদর-উপহাসে পেয়ে দাম,
যা ভেবেছি, যা লিখেছি শূন্যে মিলায়,
আশা করি না'ক সুখ্যাতি নাম।
ধরণীরে ভালবেসে সঁপে দিনু প্রাণ
রঙ্‌বেরঙের মায়াজাল বুনে,
তোমাদের সাথে গেয়ে গেনু নানা গান
পুষ্প ফুটায়ে গেনু ফাল্গুনে।
বর্ষা-শরতে মোর বাজায়েছি বীণ,
সুরে সুরে নুয়ে গেছে তরুদল,
শীতের কুহেলি নিয়ে যায় মোর দিন
ভাবিতে ভাবিতে ঝরে আঁখিজল।
দেখিতে দেখিতে বেণু বাজে বনপারে,
বেলাশেষে গেল ভেঙে সব হাট;
মৌন প্রদীপ জ্বালো কুটিরের দ্বারে,
ঐযে ডাকে মোরে ছায়া-ভরা বাট।

জলা

শ্রীওঙ্কারনাথ গুপ্ত

আলেকজান্দার কুপ্রিন্

[শেখভের পরে আজ পর্য্যন্ত রাশিয়ার কথা-সাহিত্যে কুপ্রিন্ই সবচেয়ে বড় আসন অধিকার ক'রে রেখেছেন। ১৮৭০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকে তাঁর সাহিত্যজীবনের সুরু। 'দি ডুয়েল্' বইখানা লিখে তিনি সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে পরিচিত হ'য়েছিলেন। সেই থেকে এখনও রুশীয় সাহিত্যকে তিনি নানা ভাবে পুষ্ট ক'রে আসছেন।

রুশীয় বিপ্লবের পটভূমিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র কুপ্রিন্ আঁকেন নি বটে, তবু বিপ্লবীনীতির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যোগসূত্র রয়েছে যথেষ্ট। স্পষ্টতঃ ধনিক-তন্ত্রকে আক্রমণ না ক'রলেও তথাকথিত অভিজাত-তন্ত্রকে আঘাত ক'রেছেন তিনি প্রচুর। রুশীয় পাঠক কুপ্রিন্কে ব'লেছেন—'জীবনের কবি'। সত্যিই কুপ্রিনের আগে রুশীয় সাহিত্যে এত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর এত তীব্র অনুভূতি নিয়ে 'জীবনের আলেখ্য' এত স্পষ্ট ক'রে আর কেউ এঁকেছেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু 'জীবন' বলতে তিনি বুদ্ধিজীবী উচ্চস্তরের জীবন বোঝেন নি—'জীবন'কে তিনি বিচার ক'রেছেন রুশিয়ার সাধারণের জীবনের দর্পণে। তথাকথিত অভিজাত 'জীবন'কে তিনি বলেছেন, বিশ্ব-সংস্কৃতির উন্মত্ত প্রলাপ, শবদেহের স্তূপ। সত্যকার 'জীবন'কে কুপ্রিন পর্য্যবেক্ষণ ক'রেছেন—পতিতাদের ও দাসশ্রেণীর জীবন-যাত্রায়, ইহুদিদের ঘরকন্নায়, কৃষকের কুটীরে, শ্রমিকের বস্তিতে, সার্কেসের তাঁবুতে, ভবঘুরেদের আস্তানায়, রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে—এমনি আরো কতো ভাবে। এই বহুমুখী দৃষ্টির জন্যেই তিনি 'ছবি'র পটভূমি ও বিষয়বস্তু পেয়েছিলেনও নানা ধরণের—বিপুল ও বৈচিত্র্যময়; আর জীবনকে এমনি ক'রে ভালবাসতে পেরেছিলেন বোধ করি এই জন্যেই।

তবে দরদী দ্রষ্টা হ'লেও কুপ্রিন্ পাকা আর্টিষ্ট্। প্রত্যেকটা ছবি তিনি এঁকেছেন দরদ আর নিখুঁত বিশ্লেষণের বিপুল তুলির টানে। 'সেন্টিমেন্টের' চড়া রঙে কোন চিত্রকে দৃষ্টিপীড়ক করেন নি—যাজকসুলভ উপদেশও ছিল না তাঁর কোনও মন্তব্যে। কুপ্রিনের সৃষ্টির আরেকটা বিশেষত্ব হ'লো তাঁর রচনার অনন্যসাধারণ শাব্দিক পরিসজ্জা।

গল্প, উপন্যাস, নাটিকা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লেখায় তাঁর লেখনী উর্ব্বর। 'ইয়ামা-দিপিট্' তাঁর একটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এটি অনূদিত হ'য়েছে। নানা দেশের সেন্সর-লাঞ্ছিত হ'য়েও উপন্যাসটি বিক্রী হ'য়েছে তিরিশ লাখের ওপর। এবার আমরা কুপ্রিনের 'The Swamp' গল্পটি অনুবাদ ক'রলাম।]

গ্রীষ্মের দীর্ঘ সন্ধ্যার আলো পাৎলা হ'য়ে এলো—বনানী শ্লথ আরণ্যক বিশ্রামে ঢুলে পড়বে। চারিদিক জুড়ে কেমন একটা স্থির আবদ্ধ প্রশান্তি। অস্তমান সূর্য্যের প্রতিফলকে দীর্ঘ পাইন শ্রেণীর মাথায় মাথায় পাণ্ডুর গোলাপের শেষ রক্তিমাভা তখনও মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু বনস্পতিদের পায়ে পায়ে ততক্ষণে আসন্ন রাত্রির অন্ধকার আর ঠাণ্ডা বেশ ঘন হ'য়ে উঠেছে। 'রজনের' শুক্নো মৃদু গন্ধ সরে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে, তার যায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে দূরের কোন একটা বনানীর জমাট ধূম্রজালের ভারী গন্ধ। চুপে চুপে দ্রুত পায়ে রজনী পৃথিবীকে পরিপূর্ণ গ্রাস ক'রে নিল। সূর্য্য ডোবার সাথে সাথে পাখীদের কলরব স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু কয়েকটা কাঠ-ঠোক্রার নিদ্রাজড়িত অলস চিৎকারের ধাক্কায় মৌন অটবী ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

প্রবীন্ জরাপ-আমীন জ্যাকিন্ আর তার শিক্ষানবীশ ছাত্র নিকোলাই নিকলেভিচ জঙ্গল মাপার কাজ সেরে ফিরছে। নিকোলাই সঙ্গতিপন্ন বিধবা মাদাম সাত্র্কভের ছেলে। একটি ছোট্ট মৌজা মাদামের সম্পত্তি। অন্ধকার গভীর হয়ে আসছে, পথও অনেকখানি। প্রবীন আমিন আর নিকোলাই ভেবে দেখলো, সাত্র্কভায় ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়, তার চেয়ে জঙ্গল-দারোগা ষ্টেপানের আস্তানাতেই রাতটা কাটিয়ে নেওয়া যাক্।

সরু বিসর্পিল বুনো পথ এগাছের ওগাছের গা জড়িয়ে এগিয়ে গেছে—একপা-দু'পা এগিয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টি থেকে একেবারে পিছলে পড়ে। দীর্ঘদেহ কৃশাঙ্গ জরীপকার মাথা ঝুলিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে হাঁটছে। ঢুলে ঢুলে হাঁটার কায়দায় দীর্ঘপথ অতিক্রমণের অভ্যস্ততা সুস্পষ্ট। নিকোলাই মোটা-সোটা খাটো মানুষ, পা দু'টোও ছোট—দীর্ঘপদ জ্যাকিনের সঙ্গে সে ঠিক তালে তালে যেতে পাচ্ছে না। সাদা টুপিটা তার ঘাড়ের কাছে নেমে এসেছে; কপালের কাছে বিসর্জ্জিত লাল্চে চুলের ভিড়, স্বেদসিক্ত নাকের ওপর প্যাঁশনেজোড়া

শক্ত ক'রে চেপে বসেছে। এই ধরণের রাস্তায় চলাফেরার অভ্যাস তার নেই, সেটা সহজেই বোঝা যায়। গেল বছরের ঝরা-পাতায় সারা পথটা গালিচার মত ছেয়ে আছে, পায়ের ওপর ভালো ক'রে সে পা রাখতে পাচ্ছে না। এখানে ওখানে প্রক্ষিপ্ত বনমূলগুলিও বাধা সৃষ্টি ক'রছে। বাস্তু জমাকিন্ ছোকরা নিকোলাইয়ের এই অনভ্যস্ত অসুবিধা দেখতে পেয়েছিল অনেক আগেই, তবু নিজের গতি তো এতটুকু আল্‌গা করে নি। নিজেও সে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত বোধ ক'রছিল, ক্ষুধায় মেজাজটাও মোটেই ভাল ছিল না, হয় তো এইজন্যেই ছোকরার দুরবস্থায় সে কেমন একটা সহিংস আনন্দই অনুভব ক'রল।

মাদাম সাত্‌কভের যে জঙ্গলী জমীটা পশুপাল ও চাষার দল বেওয়ারিশ ভাবে চ'রে'কেটে তছ-নছ ক'রে দিচ্ছিল, সেই বিক্ষিপ্ত খণ্ডের একটা সাধারণ মাপ-জোক ক'রার কাজেই তিনি জমাকিন্‌কে পদস্থ ক'রেছেন। তার ছেলে নিকোলাই নিকলেভিচ স্বেচ্ছায় জমাকিনকে সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সহকারী হিসাবে ছেলেটি বেশ ভালই বলতে হবে। স্বচ্ছন্দ ক্ষিপ্রতা ও উৎসাহের মধ্যে একটু একটু শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসতা প্রকট হয়ে ওঠে বটে, তবু মোটামুটিতে ছেলেটি বেশ উজ্জ্বল, উচ্ছল, সহজ এবং সহানুভূতিক। নবনিযুক্ত জরিপ-আমিনের কিন্তু সে তুলনায় বয়স হয়েছে মন্দ নয়। সাদাটে চুল আর মুখের রেখায় বরঞ্চ বুড়োই বলা চলে। তবু লোকটা কঠিন কর্মঠ, কিন্তু একচর। স্বভাবটা তাই বোধ হয় একটু সংশয়-প্রবণ। সারা জেলাটা জুড়ে লোকটার মদোমাতাল ব'লে বড় বদনাম। কাজকর্ম ভালো জানলেও লোকে তাকে সহজে বড় একটা ডাকতে চায় না। অতিকষ্টে কারো অধীনে যদি বা কাজ একটা আধটা জুটে গেল, তাতেও মজুরির অঙ্কটা পাওয়া যায় বড় ছোট্ট।

দিন-মানে প্রবীন জমাকিন তরুণ সাত্‌কভের সঙ্গে সদ্ভাবটা বজায় রাখতে খুব বেশী কষ্ট পায়নি; কিন্তু রাত্রিবেলার দীর্ঘ পথভ্রমণের ক্লান্তিতে আর দিবসের চিৎকারাজ্জিত কার্কশ্যে সে ক্রমশই তিরিক্ষে হ'য়ে উঠছিল। গোড়াতেই সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে শিকানবীশি নেওয়া বা চাষাদের আস্তানায় বসে তাদের সঙ্গে গালগল্প, এসমস্তই সাত্‌কভের একটা সস্তা ছল—আসলে মাদাম সাত্‌কভ ছেলেকে পাঠিয়েছেন গোপনে জমাকিনের ওপর তদারক করতে, মদ খেয়ে কুখ্যাত মাতালটা কাজে ফাঁকি দেয় কিনা তাই দেখতে। নিকোলাইয়ের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠার আরও একটা কারণ আছে বোধ হয়। নিজের ছাত্রবয়সে জমাকিন কঠিন জরীপ পরীক্ষায় তিনবার অকৃতকার্য্য হয়েছিল। অথচ যথেষ্ট ধারালো বুদ্ধির জোরে এ-ছোকরা জরীপতন্ত্রের সেইসব জাটিল্য এক সপ্তাহের মধ্যে আয়ত্ব ক'রে নিতে ব'সেছে—এতে একটু হিংসাবোধ স্বাভাবিক বৈকি! এর ওপর সাত্‌কভের দুর্দ্দম কথার জোয়ার, তার উদ্দাম সুস্থ তারুণ্য, তার রুচিসম্পন্ন পরিসজ্জা আর আকর্ষী সসম্ভ্রম বিনয়—এসবও কম বিরক্তির বিষয় নয়! এই প্রগল্‌ভ তারুণ্যের সান্নিধ্যে তার নিজের ক্ষুব্ধ বার্দ্ধক্য, তার স্বভাবজ কাঠিন্য; কাঁচা উজ্জ্বল প্রাণশক্তির পাশে তার নিজের মথিথ মনন, বলিষ্ঠ যৌবনের প্রতি তার এই অকারণ নপুংসক অসূয়া-বিলাস—এই সজাগ অনুভূতিটাও জমাকিনকে কম বিঁধছিল না।

তাই দিনের বেলা থেকেই কাজ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো জমাকিন ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। পায়ে পায়ে সাত্‌কভের সামান্য ত্রুটীগুলিকেও তীব্র নিষেধ-অনুযোগে অতিরঞ্জিত করতে সে রীতিমত আত্ম-প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাত্‌কভের অসুরান্ অমায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে তার এই খুঁৎ ধরার চেষ্টা সফল হয়নি। দোষ একটা করতে না ক'রতেই ছেলেটি মৃদু সপ্রতিভতায় ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। অনুযোগ উঠতেই মুখর হাসিতে সে বনভূমি শব্দিত ক'রে তুলেছে। কোন সময়েই জমাকিন্ তাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। দুরন্ত একটা কুকুর-ছানা যেন উপযাচক হ'য়ে স্থবির ধাড়ীটাকে সরল, সজীব ও অশান্ত আদরে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে—বুড়ো আমিনের অবস্থা এমনি। অজস্র হাসি-তামাসার মধ্যে সাত্‌কভ অনর্গল বকে চলেছে। জমাকিনের মনের গুমোট যেন তার চোখেই পড়ে নি।

হাঁটবার সময় জমাকিনের চোখ আপনিই মাটির ওপর নেমে আসে। চোখ নামিয়েই তাই সে হেঁটে চলেছে দ্রুত পায়ে। অনভ্যস্ত সাত্‌কভ তার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাচ্ছে না। গাছের গুঁড়ি আর বনমূলে হোঁচট খেতে খেতে ক্রমেই তাকে পিছিয়ে পড়ে আবার দৌড়ে গিয়ে বুড়োর পাশ নিতে

হচ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে পড়লেও বাচনিক আর আঙ্গিক উচ্ছ্বাসের তোড়ে সে যেন সারা ঘুমন্ত বনটাকেই জাগিয়ে তুলতে চায়।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে সার্চকভ বল্লে, "বুঝলেন ইগর্ আইভানোভিচ, গ্রামাঞ্চলে সত্যিই আমি তেমন বেশীদিন থাকি নি,"—তর্কজয়ীর ঢঙে বুকের ওপর সে একটা হাত রাখলো, কণ্ঠ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো—"তাই গ্রামের সঙ্গে আমার সত্যিকার কোন পরিচয় নেই, আপনার এই কথাটাই আমি সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি, কিন্তু যতটুকু দেখলাম, তাতেই বুঝেছি, গ্রাম কতো সুন্দর, কতো গভীর! গ্রাম্য আবেষ্টন হৃদয়কে কতখানি স্পর্শ করে! অবিশ্যি আপনি বলবেন, আমার বয়স অল্প, সস্তা ভাবপ্রবণতা আমার বয়সের ধর্ম্ম—সেকথা আপনি বলুন, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার অল্পবুদ্ধিতে কি মনে হয় জানেন ইগর্ আইভানোভিচ? মনে হয়, স্থিরবুদ্ধি আর অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে আপনার উচিত জীবনকে একটা পরিপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করা। নয় কি?"

জ্যাকিন কাঁধে একটা অনুকম্পিত ঝাঁকুনি দিলে। তার শ্লেষ-বিদগ্ধ শুকনো হাসি ফুটে উঠলো—কিন্তু তবু সে চুপ ক'রেই রইল, কোন উচ্চবাচ্য ক'রল না।

"একবার ভেবে দেখুন, প্রিয় ইগর্ আইভানোভিচ, গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিনতার ঐতিহাসিক প্রাচীনতা কত গভীর! এই যে লাঙল; এইযে বিদে, এই কুঁড়েঘর, এই গরুর গাড়ী—কে এদের প্রথম উদ্ভাবক? কেউ না। হাজার দু'হাজার বছর আগেও এসবের অস্তিত্ব ছিল ঠিক আজকের মতই। আজকের মতই তখনও মানুষ দানা বুনেছে, লাঙল চালিয়েছে, মাথা গোঁজবার আস্তানা গ'ড়েছে—দু'হাজার বছর আগে। কিন্তু এর কত আগে, কেমন ক'রে এই বিরাট কৃষিতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন হ'য়েছিল—প্রিয় ইগর্ আইভানোভিচ, সেকথা চিন্তা ক'রতেই আমাদের ভয় হয়। এইখানে, একমাত্র এই জিজ্ঞাসায় এসেই আমরা অগণন শতাব্দীর গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি। কিছু আমরা জানি না, কবে, কেমন ক'রে মানুষ প্রথমে গরুর গাড়ী সৃষ্টি করলো, কত শতাব্দী, কত হাজার বছরে মানুষের সৃজনী শক্তি পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছে, এই সবের তত্ত্ব জানে একমাত্র শয়তান,"—উত্তেজনায় নিকোলাই নিকলেভিচের স্বররজ্জুতে উচ্চতম গ্রাম ধ্বনিত হ'ল, তাড়াতাড়ি টুপিটা চোখের ওপর নামিয়ে নিয়ে সে বল্লে, "আমার সাধ্য নেই এতত্ত্বের সন্ধান রাখা, কারো নেই। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে লক্ষ লক্ষ মানুষ বংশানুক্রমে মস্তিষ্ক আলোড়িত ক'রে তবেই ত এই সব কাপড়-চোপড়, টেবিল, জুতো-জামা কোদাল, তাঁত, চালুনী—এই সব হাজার বস্তুর সন্ধান পেয়েছে! মানুষ আজ তার সঞ্জীবনীরও খোঁজ পেয়েছে, তার নিজের কবিতা, তার বুদ্ধি, তার মধুর ভাষা—এসবও সে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে একে একে? কিন্তু বলুন তো, এই মনিভাণ্ডার কি একজন মাত্র কবি, একটি মাত্র শিল্পী সাজিয়ে তুলেছে? কার সঙ্গে এই সম্পদের তুলনা হয়? অবশ্য তাই বলে যদি আপনি এক বিরাট সমরতরী বা দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সঙ্গে শস্যোত্তলক 'পিচফর্কটার' সঙ্গে তুলনা ক'রে বসেন তবে আমি নাচার। তবু জানেন, ইগর্ আইভানোভিচ, এই 'পিচফর্কের' সৌন্দর্য্য আমাকে অনেক—অনেক বেশী আনন্দ আর উদ্দীপনা জোগায়?"

'টু-রু-রু, টু-লু-লু'—যারেন অর্গ্যান বানানোর মত ইগর আইভানোভিচ কৃত্রিম স্বরে গুণ গুণ ক'রে বল্লে—'অথচ 'যন্ত্র' পুরোদমেই চলেছে, দিনের পর দিন একই একঘেয়ে সুরে। কিন্তু আশ্চর্য্য, কই এতে তো তোমাকে ক্লান্ত বোধ হচ্ছে না, নিকোলাই নিকলেভিচ?'

'না, ইগর আইভানোভিচ, না, যন্ত্র কাকে, কেমন ক'রে টেনে নিচ্ছে, সেই কথাটাই একমাত্র আমি বলতে চাই না। কথাটা সব আমার শুনুন আগে।'—সার্চকভ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—'কোথায় চাষার মনোযোগ প'ড়লো, কোথায় তার দৃষ্টি ছিটকে প'ড়ল, সেটা তেমন কিছু বড় কথা নয়। কেবল আসলে চাষাকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে সত্যের জ্ঞানবৃদ্ধ স্বরূপ। সবকিছুই তার পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতায় উজ্জ্বল, সমস্ত বস্তুই স্বচ্ছ, সাধারণ ব্যবহারসিদ্ধ। তার চেয়েও আবার বড় কথা হলো তার পরিশ্রমের মূল্য। লেখক, চিকিৎসক বা বিচারক, এদের কারো কথা ধরুন, হিসাব করে দেখুন, এদের জীবিকায় ন্যায়ের যুক্তি থাকলেও ফাঁকি রয়েছে কতখানি। নয় তো ধরুন এক শিক্ষক, বা একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, বা একজন সিভিল কর্ম্মচারী কিংবা একজন ধর্ম্মযাজক...'

'এর মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের কথাটা আর দয়া ক'রে টেনে এনো না'—জ্যাকিন্ গম্ভীর হয়ে বল্লে।

'কথাটা সে অর্থে আমি বলি নি'—সার্দ্দকভ্ অস্থির ভাবে একখানা হাত তরঙ্গায়িত ক'রে বল্লে—'আচ্ছা, এদের উল্লেখ যখন আপনার এতই অপছন্দ, তখন সুবিধামত নয় একজন আইনজীবী, বা একজন চিত্রকর বা কোন এক গাইয়ের কথাই বলি। অবশ্যই এদের যোগ্যতার বিরুদ্ধে আমার এতটুকুও বলবার নেই কিন্তু আমি কী বলতে চাইছি জানেন? এই উপজীবিরা যেন অন্ততঃ একদিনের তরেও আত্মাকে প্রশ্ন করে—মানুষের মাঝে তাদের প্রয়োজন এমন কি অপরিহার্য্য? এবার এর উল্টো দিকটায় তাকিয়ে দেখুন—চাষাদের জীবন কতো সুস্পষ্ট, কত সুসঙ্গত! বসন্তে বীজ বুনলো, শীতে সেই বোনা ধান চাষাকে পেট ভরিয়ে খাওয়াল। ঘোড়াকে দানা দিলে, প্রতিদানে চাষা পেল ঘোড়ার সাহায্য। মানুষের জীবন এর চেয়ে কিসে আর এতো সহজ হ'তে পারে আইভানোভিচ্? কিন্তু কোথায় আজ এই সহজ ব্যবহারিক জীবন? মানুষকে জোর ক'রে টেনে আনা হ'য়েছে বিকৃত সভ্যতার বেড়াজালে। চাষী আইভ্যান সিদোরভ্‌কে বলা হ'ল, 'চাষী সিদোরভ, তোমাকে এই এই আইনের বলে, এই এই নম্বরের তদন্তের ফলে, এই এই জমিতে অনধিকার প্রবেশ করার দরুন অভিযুক্ত করা হ'ল।' চাষী সিদোরভ্ অভিযোগের উত্তরে খাঁটি কথাটাই বল্লে, 'ধর্ম্মাবতার, আমার পিতামহ, প্রপিতামহ এই উইলো গা'ছটার পাশে বরাবর লাঙল চালিয়ে এসেছেন—গাছটা এখন ওখানে নেই। শুধু কাটা গুঁড়িটা প'ড়ে আছে।' হেনকালে সে দৃশ্যে প্রবেশ ক'রলো জরীপ-আমিন জ্যাকিন্।'

জ্যাকিন্ কথার মাঝখানে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো—'এর মধ্যে আবার আমায় টেনে আন কেন?'

'বেশ, আপনার নাম না ধ'রে নয় জরীপ আমীন সার্দ্দকভের কথাই বলচি। তাতে আপনি খুশী তো? এই জরীপ-আমিন সার্দ্দকভ এসে ক'রলো কি,—ঘোষণা ক'রলো যে, চাষা সিদোরভের জমি যে সীমানায় শেষ হয়েছে সেই সীমানা দক্ষিণ-পূব দিকে চল্লিশ ডিগ্রি, ত্রিশ মিনিটে টানা, অর্থাৎ চাষী সিদোরভ ও তার পূর্ব্বপুরুষেরা এতদিন অন্যায়ভাবে অন্যের জমি ভোগ ক'রে আসছে। সুতরাং পেনালকোডের অনুশাসন অনুযায়ী সিদোরভের এই অপরাধের দণ্ড কারাভোগ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ চাষী বেচারা এইসব পেনালকোড্, এই চল্লিশ ডিগ্রি-ফিগ্রির মাথামুণ্ডু কি জানে? মায়ের বুকে বসে দুধ খেতে খেতে সে তো শুধু শিখেছে, জমির মালিক মানুষ নয়, ভগবান। সুতরাং বিচারকের রায় শুনে কাঠগড়ায় বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর তার উপায় কি?

জ্যাকিন্ মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে বল্লে, 'কিন্তু মাষ্টার সার্দ্দকভ, এ-সব কথা আমাকে ঠেস্ দিয়ে বলার মানেটা কি?'

একটানা এতখানি কথা ব'লে সার্দ্দকভ্ ইতিমধ্যে রীতিমত উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। জ্যাকিনের কথায় কর্ণপাত না ক'রে সে ব'লে চ'ললো: "আরেকটা দিকও দেখবার রয়েছে। ধরুন, চাষা আইভ্যান সিদোরভ্ গিয়ে ভর্ত্তি হ'লো আর্ম্মিতে, দলপতি সার্জ্জেণ্ট তাকে নানা কায়দায় কুচকাওয়াজ শেখাতে লাগলো—য়্যাটেন্‌শান্, ডানদিকে চাও, সামনে তাকাও ফল্ ইন্, য়্যাটেন্‌শান্। অবশ্য সমর বিভাগে এই কুচকাওয়াজের প্রয়োজন যে খুব বেশী সেকথা দেশসেবার খাতিরে আর্ম্মিতে কয়েকমাস কাটিয়ে আমি নিজেই খুব ভাল ক'রে জানতে পেরেছি। কিন্তু ব'লতে পারেন, সাধারণ একটা কৃষকের কাছে নিছক পাগলামি ছাড়া আর এসবের কি এমন দাম থাকতে পারে? যে জীবনটা সহজ আর সুস্পষ্ট সেই জীবন থেকে কাউকে কি শুধুমাত্র কথার জোরেই অন্য দুর্বোধ্য জীবনের মাঝখানে টেনে আনা যায়? তা'ছাড়া আপনার কৌশলাকীর্ণ জীবন-যাত্রাকেই বা মূর্খ চাষী মহৎ বা বিরাট উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব'লে বিশ্বাস করে কি ক'রে? অপরিচিত ফটকের সামনে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভেড়ার দল যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, তেমনি সংশয়-ভীত চোখেই তো চাষী আপনাকে যাচাই ক'রতে চাইবে!"

জ্যাকিনের সহ্যের বাঁধ বোধ হয় ভেঙেই গেল। এক ঝলক কথা সার্দ্দকভের গায়ে ছুঁড়ে মেরে সে বল্লে, "দয়া ক'রে আজকের মত এখানেই শেষ কর না, নিকোলাই নিকলেভিচ্! সত্যি বলতে কি, তোমার প্রলাপের ঠেলায় আমার হাঁপ ধ'রে আসছে। হোমরা চোমরা একটা কিছু

হ'তে চাও, ডন ওয়াজ জাতীয় একটা কিছু ব'লে নিজেকে জাহির করতে চাও, অথচ অনবরত কি যে ছাই মাথামুণ্ডু বকে চলেছো, তার তো দেখি কিছুই ঠিক নেই!"

একটা বুনো ঝোপ পাক দিয়ে ঘুরে সাদ্র্কভ দৌড়ে গিয়ে অগ্রগামী জরীপ-আমিনের পাশে এসে দাঁড়ালো। "মনে ক'রে দেখুন, ইগর আইভানোভিচ, আজ সকালেই আপনি ঘৃণা-বিরক্তকণ্ঠে ব'লছিলেন, চাষার দল সব বোকা আর অকর্ম্মণ্যের দল! সবগুলি ওদের জানোয়ার! একবার ভেবে দেখুন তো এধরণের মন্তব্য কতবড় অন্যায়? চাষারা আর আমরা কি এক স্তরের? ওদের আর আমাদের জ্যামিতিক ডাইমেনশানটা ত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন! আজ যেখানে আমরা চতুর্থ ডাইমেনশানের জন্য পা বাড়িয়েছি, সেখানে ওরা তৃতীয় ধাপে এসে সবে পৌছেচে। তা হ'লে চাষাকে আপনি মূর্খ জানোয়ার বলেন কি ক'রে? আকাশের আবহাওয়া, শস্য বোনা—কাটা, তার পশুদল, এই তো হলো চাষার মুখের সহজ, সুন্দর, সাভিব্যক্ত আলাপ। তা নয়তো চাষা যদি লালাসিক্ত কণ্ঠে ব'লতে থাকে, সহরে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, আঃ কী চমৎকার! বারোয়ারী বৈঠকের ব্যারেল-অর্গ্যানের বাজনা—কী মিষ্টি? কী কদর্য্য অশ্লীল কথাবার্ত্তা বলুন তো চাষার মুখে, কী কুৎসিত!" দুহাত ছুঁড়ে সাদ্র্কভ যেন আবেদন জানাতে লাগলো যেন সমস্ত বনটাই একটা জনাকীর্ণ সভায় পরিণত হয়েছে। "চাষারা গরীব, মূর্খ, নোঙরা—সবই আমি স্বীকার করি, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপে যে সে ভাল ক'রে নিশ্বাসটাও নিতে পাচ্ছে না, একথার উত্তর দেবে কে? সমাজ, ইতিহাসের অদম্য নিষ্পেষণে তারা সবাই দলিত, মথিত! চাষাদের গায়ের এই দলিত ক্ষতকে আগে সারিয়ে তুলুন, তাদের পেট ভরে খাওয়ান, লেখাপড়া শিখিয়ে তাদেরও জাতে তুলে নিন! তবেই তো চাষী নাচবে? তা নয় তো শুধু শুধু শুক্‌নো চতুর্থ ডাইমেনশানের জর্জ্জর আঘাতে বেচারাকে টুকরো টুকরো ক'রে লাভ কী, বলুন! আলো না পেলে আপনার শিক্ষা, সভ্যতা, চতুর্থ ডাইমেনশান—এসবই তো তার কাছে নিছক প্রলাপ-বিলাপ মাত্র!"

জম্‌মাকিনের লম্বপদ গতি সহসা ব্যাহত হ'লো, অসহায়া বৃদ্ধা নারীর মত তার কণ্ঠ করুণ হয়ে এলো—"আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, দয়া ক'রে এবার একটু থামো, নিকোলাই নিকলেভিচ, এবার একটু থামো! দোহাই তোমার, এসব আর আমি শুনতে চাই না, শুনতে পারবো না। সাধারণ বুদ্ধির তো তোমার অভাব নেই, তবু কেন তুমি বুঝচো না যে এসব কথা আমাকে শোনানো বৃথা। নিজের বাড়ীতে বসে বন্ধুবান্ধবকে যত ইচ্ছা তোমার এই বক্তিমে শুনিয়ো, আমি তোমার বন্ধু নই। সুতরাং দয়া ক'রে রেহাই দাও আমায়! আমি এসব শুনতে চাই না—না-না-না! আমার পরিপূর্ণ অধিকার আছে—"

তরুণ সাদ্র্কভ এবারে প্যাশনের ওপর দিয়ে জম্‌মাকিনের দিকে অপাঙ্গে চাইল। অদ্ভুত মুখের গঠন বৃদ্ধের—সরু, লম্বা, সামনেটা তীক্ষ্ণাগ্র। অথচ একপেশে দৃষ্টিকোন থেকে সে মুখ দেখায় চ্যাপ্টা আর চওড়া—বলতে গেলে ওমুখের কোন সম্মুখাংশই নেই যেন! মুগ্ধ, ব্যাহত নাসিকা ঝুলে আছে। সন্ধ্যালোকের নরম নিমিল আলোয় সে মুখে বিরক্তি ও ঘৃণার অপরূপ প্রকাশ দেখে তরুণ সাদ্র্কভ অনুকম্পায় ভেঙে প'ড়লো। সহসা একটা ব্যথাতুর স্পষ্টতায় সে উপলব্ধি ক'রলো, ক্ষুদ্রতার নিষেধে, অর্থহীন দুর্ব্ব্যবহারে বেচারার নিঃসঙ্গ বুকটা জমাট বেঁধে গেছে।

'রাগ ক'রবেন না, ইগর আইভানোভিচ'—বিহ্বল অনুতপ্ত স্বরে নিকোলাই বল্লে—'আপনাকে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। আপনি বড় সহজেই রেগে যান।'

'রেগে যাই, সহজেই রেগে যাই,'—জম্‌মাকিন বিকৃত সুরে সাদ্র্কভকে ভেঙচে উঠলো। তার কথার সুরে আবার একটা বিদ্বেষ ফুটে ওঠে—'ওসব রাগা-টাগা নয়, মোদ্দা এসব ছ্যাঁদের কথা আমি ভালবাসি না। কি এমন যোগ্য সহচর আমি তোমার, যে এইসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ তুমি? তুমি হ'লে একজন সংস্কৃতিবান অভিজাত—আর আমি?—আমি হলাম একটা আঁধারচর বুড়ো-হাবড়া,—তার বেশী কিছু নই!'

নিকোলাইয়ের মোহ ছুটে গেল। সে চুপ করলো। অন্যায়, কার্কশ্য—এদের সংসর্গে এলেই তার বড় দুঃখ হয়। জম্‌মাকিনের পেছনে প'ড়ে নিঃশব্দে শ্লথপায়ে সে হাঁটতে থাকে। এখান থেকে বুড়োর পিঠের দিকটা সম্পূর্ণ চোখে

পড়ে—সংকীর্ণ, কঠিন সঙ্কুচিত পৃষ্ঠদেশ। সেখানেও যেন নীরব অক্ষরে বৃদ্ধের নিরর্থক আহত জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ র'য়েছে। তার একগুঁয়ে আত্মশ্লাঘা, তার প্রতি ভাগ্যের নিষ্ঠুর প্রাতিকূল্য এসমস্তেরই ইতিবৃত্ত যেন ওই কুব্জ পিঠেতেই নিঃশব্দে প্রকট হয়ে আছে।

সারা বনটা ঘিরে গভীর নিরেট অন্ধকার। আলো-আঁধারের বৈলক্ষণ্য যে-চোখে অভ্যস্ত, সেই চোখ ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না, এই অন্ধকারের অস্পষ্ট রহস্যময় ছায়ার মত গাছগুলির অস্তিত্ব ফুটে আছে। এতটুকু শব্দ, এতটুকু চলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। দূরের মাঠগুলি থেকে ঘাসের সোঁদা-গন্ধ ভেসে এসে বাতাস ভারী ক'রে তুলেছে।

সরু পথটা ক্রমশঃ নিচের দিকে হেলে গেছে। একটা বাঁকের মুখে এসে সহসা একটা স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডার ঝাপটা এসে সাদ্‌র্কভের মুখের ওপর ছিটকে পড়লো—ঠাণ্ডাটা যেন মাটির তলার কোন গভীর এক গুপ্ত কোঠা থেকে অকস্মাৎ উঠে এলো।

'সাবধানে পা ফেলে এসো। সামনেই একটা বড় খাদা আছে এখানে।'—জ্‌মাকিন না ফিরেই কথাটা ছুঁড়ে মারে।

সাদ্‌র্কভের এবারে বেশ হুঁশ হ'লো। নরম একটা কার্পেটের ওপর দিয়ে যেন তারা দুজনে হেঁটে চ'লেছে—পদক্ষেপের এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। ডাইনে-বাঁয়ে অনেকগুলি ঝাঁকড়া-মাথা ছোট ছোট পরগাছার ঝাড়। ঝোপগুলির গা বেয়ে, ডালপালার জটিল বিন্যাস ভেঙে মেঘের মত নরম সাদা কয়েকটুকরা পুঞ্জ কুয়াসা কাঁপতে কাঁপতে ভেসে গেল। সহসা বনের মধ্যে কিসের একটা মৃদু করুণ সুসমঞ্জস সুর সমৃসম্‌ ক'রে ওঠে। সুরটা যেন একেবারে পাতাল ফুঁড়ে বেরোচ্ছে নিকোলাই সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। 'ওকি?' তার স্বরে ত্রস্ত আলোড়ন।

'ওটা একটা বিটার্ন্‌ পাখী।'—জ্‌মাকিন্‌ সংক্ষেপে জবাব দিলে—'সাবধানে চ'লো, জাঙ্গালটা এখানেই।'

আর কিছু দেখা যায় না এবারে। সম্পূর্ণ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। চারদিকে পুরু পর্দার মত পুঞ্জীভূত কুয়াসা ঝুলে রয়েছে। তারই ভেজা পরশ এসে লাগচে সাদ্‌র্কভের চোখে মুখে। তার সামনে আগে আগে হেঁটে চলেছে একচাপ ঘন অন্ধকার—জ্‌মাকিনের পিঠ। পথ চেনা যায় না। কিন্তু দু'ধারে জলার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। পচা জল-গগা আর বেঙের ছাতার তীব্র গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। পায়ের নীচে পঙ্কিল কাদাটা নরম আর পিছল—পা ফেলতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আঠালো কাদা আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ে।

জ্‌মাকিন্‌ দাঁড়িয়ে প'ড়লো। সাদ্‌র্কভ দেখতে পায়নি, বুড়োর পিঠে সে হুমড়ি খেয়ে প'ড়লো।

'দেখো, পড়ে না যাও,'—জ্‌মাকিন্‌ গজ্‌গজ্‌ ক'রে বল্লে—আর দাঁড়াও এখানটায় একটু,—জঙ্গল দারোগাকে ডাকি।' ব'লে মুখের কাছে দুটো হাত চোঙার মত জড়ো ক'রে টেনে টেনে ডাকল—'ষ্টেপা-আন্‌, ষ্টে-এ-পা-আ-ন্‌।'

কুয়াশা ভেঙে এগোলো বলে ডাকটাও যেন তেমন জোরে হ'লো না। ক্ষীণ আর বেসুরো—জলাভূমির ভেজা গ্যাসে যেন গলার আওয়াজও ভিজে চুপ্‌সে গেছে।

জ্‌মাকিন্‌ দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে, 'ধুত্তোর, কোথা দিয়ে যেতে হবে তাও তো জানি না ছাই। হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়াই বোধ হয় নিরাপদ।—ষ্টেপা-আ-ন্‌!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে আবার সে চিৎকার ক'রলো।

সাদ্‌র্কভও গম্ভীর দ্রুতকণ্ঠে ডাক্‌তে সুরু করে—'ষ্টেপান—ষ্টেপান!'

এমনি ক'রে দুজনে মিলে পর-পর অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর, একসময় খানিক দূরে কুয়াশার ভেতর দিয়ে এলোমেলো একরাশ হলদে আলো দেখা দিল। আলোটা তাদের দিকে এগিয়ে না এলেও বেশ বোঝা গেল, সেটা ডানদিকে-বাঁদিকে ঘুরছে।

—'ষ্টেপান নাকি হে?' জ্‌মাকিন্‌ প্রশ্ন হাঁকল।

'গপ গপ'—একটা অবরুদ্ধ শব্দ দূর থেকে অনেক কষ্টে এগিয়ে এলো। 'ইগর্‌ আইভানোভিচ্‌ মশায় নাকি?'

মৃদু আলোটা এবারে এগিয়ে আসছে, হলদেটে আলোটা কুয়াশার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোকিত পথের উপর একটা প্রকাণ্ড ছায়া একজন বেঁটেখাটো লোক অন্ধকার ছেড়ে বেড়িয়ে এল। তার হাতে একটা টিনের লণ্ঠন।

লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে বল্লে, 'যা ভেবেচি, তাই বটে! সঙ্গে উনি কে? মাষ্টার সাদ্‌র্কভ্‌ না? নমস্কার নিকোলাই নিকলেভিচ্‌,—শুভ সন্ধ্যা, শুভসন্ধ্যা। রাত্রিটার এখানেই

থাকবেন নিশ্চয়! বেশ, বেশ—আসুন, আসুন! কে ডাকছিল বুঝতে পারি নি কিনা, তাই দরকার লাগতে পারে ভেবে বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি।'

লণ্ঠনের হলদে আলোয় লোকটার মুখ আবছা অন্ধকারের পটভূমিতে খোদাই শিল্পের মত ফুটে ওঠে। সারা মুখটা নরম কোঁকড়া চুলে, দাড়ি গোঁপে, ভুরুর লোমে বোঝাই। একটা জমাট কৈশিক স্তূপ। সেখান থেকে মাত্র নীল চোখ দুটোকে উঁকি মারতে দেখা যায়। চোখের ধারে ধারে ছোট ছোট বলিরেখা। হাসি-চঞ্চল একটা ছোট ছেলের ক্লান্ত মুখের মত।

"চলুন"—বলে লোকটা ঘুরে কুয়াসার গর্ভে ঢুকে গেল। লণ্ঠন থেকে হলদে আলোর চাপটা মাটির কাছে এসে কাঁপতে থাকে, একটুখানি আলো এসে রাস্তায় পড়েছে।

"এখনও তোমার কাঁপুনি ধরে নাকি হে ষ্টেপান?" জ্যাকিন্ পিছনে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল।

দূর থেকে ষ্টেপানের জবাব এল, 'তা ধরে বই কি, ইগর আইভানোভিচ্। দিনটায় তো একরকম ভালই থাকি। রাত্রি হলেই তড়াসে কাঁপুনি সুরু হয়···তা' আমাদের এসব স'য়ে গেছে।'

"মেরিয়া এখন বোধ হয় একটু ভালই আছে, না?"

"না, ভাল আর কই? বলতে কষ্ট হয়, কিন্তু পরিবার ছেলে মেয়েদের সবার অবস্থাই খারাপ। কোলেরটা ভগবানের দয়ায় এখনও অবধি একটু ভাল আছে বটে—কিন্তু সেও বাদ পড়বে না, সময় হ'লে সেও পড়বে। এই তো গেল হপ্তায় আপনার ছোট ধরম্ছেলেটাকে নিয়ে আমরা নিকোলস্কি গিয়েছিলাম। এই নিয়ে তো তিনটেকে গোর দেওয়া হল।···থাক্ ও সব কথা, এখন আলো ধরচি পথটা ভাল করে দেখে আসুন।"

ষ্টেপানের কুঁড়ে ঘরটা কতকগুলি খোঁটাখুঁটি দিয়ে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফিট উঁচু করে তৈরী! মাটি থেকে দরজার মুখ পর্য্যন্ত গোটা কয়েক বাঁকান সিঁড়ি। ষ্টেপান পথ দেখাতে আলোটা উঁচু করে ধরল। তার পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকবার সময় সাদ্র্কভ্ দেখল লোকটার সর্ব্বদেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্ছে। বিবর্ণ জামাটার কলারের ভেতরে অসহ্য শীতে যেন সে জড়সড় হয়ে আছে।

খোলা দরজা দিয়ে একটা বিশ্রী গন্ধ ছিটকে এল। চাষীদের ঘরে এই রকম গন্ধ সাধারণ। এর সঙ্গে মিশেছে আবার ট্যান্ করা চামড়া আর সেঁকা রুটির গন্ধ। মাথা নিচু করে জ্যাকিন্ ঘরের ভেতরে ঢুকল। 'শুভসন্ধ্যা মিসট্রেস'—উদার আন্তরিকতায় ষ্টেপান-জায়াকে সে সম্ভাষণ করল।

একটি রোগা দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোক খোলা চুল্লীটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নীরবে হেঁট হয়ে সে জ্যাকিন্কে প্রতি-সম্বর্দ্ধনা জানাল। কেমন একটু বিষণ্ণ। সম্বর্দ্ধনার সময় ঈষৎ ঘুরে দাঁড়ালেও জ্যাকিনের দিকে না তাকিয়েই আবার চুল্লী ঘাঁটতে লাগল। ষ্টেপানের কুঁড়েটা পরিসরে বেশ বড়ই কিন্তু বড় নোঙরা আর স্যাঁৎসেঁতে, পোড়ো বাড়ীর মত অনেকটা। দরজার মুখোমুখি সমস্ত কাঠের দেওয়ালটায় সরু লম্বা লম্বা বেঞ্চি থাকে থাকে ঝোলানো। বসতে, শুতে একটুও সুবিধা নেই। এককোনে গুটিকয়েক কালো পুঁতুল—ডানদিকে-বাঁদিকে দেওয়ালের গায়ে খানকতক পরিচিত উড্-কাট্ ছবি। ছবিগুলির একটার নাম 'শেষ-বিচার', আরেকটি 'ধনী আর ল্যাজারাসের রূপক', আরেকটি জীবন-সোপান, চতুর্থটির নাম 'একটি স্ফূর্ত্তিবান রাশিয়ান্।' উল্টোদিকের কোনটায় প্রকাণ্ড বড় একটা চুল্লী ঘরের প্রায় সবটাই জুড়ে নিয়েছে। চুল্লীটার উঁচু পৈঠায় দুটি ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাথা চোখে পড়ে—গেঁয়ো ছেলেমেয়েদের মত ওদের চুলও বিবর্ণ শাদাটে। পেছনের দেওয়ালের ধারে চওড়া বিছানা একটা, বিছানার ওপর দুটি লাল ছাপা মশারি টাঙানো। দশবছরের ছোট একটি মেয়ে বিছানাটিতে বসে পা দোলাতে দোলাতে ছোট একটি দোল্না দোলাচ্ছিল। অপরিচিত আগন্তুকদের দেখে বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটিতে তার শঙ্কিত বিস্ময় জেগে উঠলো।

কালো পুঁতুলগুলির নিচে প্রকাণ্ড একটা টেবিল—একটি ল্যাম্প ছাদ থেকে তার দিয়ে টেবিলটার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পটার চিমনিটা ময়লা। সাদ্র্কভ টেবিলের একপাশে বসলো। কতকক্ষণ ধরে যেন তাকে কেউ জোর ক'রে অলস অচেতনের মাঝে বসিয়ে রেখেছে, এমনি একটা বিষণ্ণ ভাব ক্রকুণি তার মনকে ভারী ক'রে তোলে। ল্যাম্পের জ্বলন্ত শীষে তীব্র প্যারাফিনের গন্ধ। সাদ্র্কভের মনে

সহসা একটা অস্পষ্ট অতীত অনুভূতি জেগে ওঠে। কি এই অনুভূতি—স্বপ্ন না স্মরণ? কবে কোথায় তার মনে এর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল? গম্বুজাকৃতি একটা বিরাট শূণ্য করিডরের মধ্যে যেন বসে আছে সে—প্যারাফিনের গন্ধ, তাওয়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল শব্দ করে উঠছে।···কেমন একটা গুমোট বিষণ্নতায় মনটা আপনিই আলোড়িত হয়ে ওঠে।

"সমোভারটা* সাজিয়ে নিয়ে এসো না ষ্টেপান! দুটো ডিমও ভাঙা যাক্"—জ্মাকিন্ বল্লে।

ষ্টেপান ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, ইগর্ আইভানোভিচ—এক্ষুণি দিচ্ছি—এক্ষুণি"—তারপর স্ত্রীর দিকে সঙ্কুচিত চোখে চেয়ে বল্লে, "মেরিয়া সামোভারটা সাজাও, ভদ্রলোকেরা চা খাবেন একটু।"

'শুনেচি, শুনেচি,—ওঁদের কথা কানে গেছে আমার,' মেরিয়া উত্তর দিল।

ঘরের মধ্যে ছোট ঘেরা জায়গাটুকুর ভেতরে গিয়ে মেরিয়া ঢুকলো—ওটা বোধ হয় রান্নাঘরের অভিনয়। জ্মাকিন্ গায়ে একটা অদৃশ্য 'ক্রশ' এঁকে টেবিলের পাশে বসলো। ষ্টেপান বসেছিল কিছু দূরের দরজার কাছে একটা বেঞ্চির কানায়। বেঞ্চির পায়ার পাশে একটা জলের বাল্তি।

ষ্টেপান লঘুস্বরে বল্লে, 'জানেন, আপনারা যখন আমার নাম ধ'রে ডাকছিলেন তখন প্রথমটায় বুঝতেই পারি নি—ডাকে কে? একবার ভাবলাম—জঙ্গলের মালিক নাকি? কিন্তু তিনিই বা এতরাত্রে এখানে আসবেন কী চাইতে? তা ছাড়া, ঠিকমত পথ চিনে এখানে তিনি তো আসতেও পারবেন না। বুঝলেন, ইগর আইভানোভিচ্—অদ্ভুত মানুষ আমাদের এই ফরেষ্টারটি। সবাই মিলে আমরা সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্ত হ'য়ে উঠি—এই তাঁর মনের ইচ্ছা। এতেই তিনি খুসী। বন্দুক কাঁধে ক'রে সবাই গিয়ে মার্চ্চের কায়দায় তাঁকে সেলাম জানাও আর খবর দাও—'হুজুর, চের্নাটিংস্কি হাউসের মত আমার এলাকায়ও সবই ঠিক আছে।' কিন্তু তা হ'লেও মানুষটাকে সুবিবেচক বলতে হবে। আর মেয়ে-

*রাশিয়ার ব্যবহৃত চা-পাত্র—অনেকটা বিলিতি টি-আর্ণ (tea-urn)এর মত। তামা দিয়ে তৈরী—ভেতরে জল থাকে তাতে(কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে জল গরম করা হয়।

মানুষ ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করেন বলে যে সব কথাগুলি—তাতে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারটা কী?'

ষ্টেপান থামল। ঘেরাটোপ কুঠরিটাতে মেরিয়া সশব্দে সামোভারে কয়লা চাপাচ্ছে শোনা গেল। চুল্লার ওপরে ছেলেমেয়ে দুটি বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেল্লে। দোলবার দড়িতে একটা বিশ্রী ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। বড় মেয়েটি বিছানার ওপর ব'সেছিল, সাহ্‌কভ এবারে মেয়েটিকে ভাল ক'রে দেখলো। বেদনা আর মাধুর্য্যের অদ্ভুত একটা মিশ্রণ মেয়েটির মুখে। গালদুটো, চোখের কোল, একটু ফুলোফুলো—তবু সমস্ত মিলিয়ে কেমন একটা মেদুর কোমলতা সে মুখে—স্বচ্ছ চীনে কাঁচের ওপর আঁকা সুন্দর একটী ছবির মত। বড়বড় সুন্দর চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—অকপট বিস্ময়ে স্বপ্নময়।

আন্তরিক সুরে সাহ্‌কভ্ জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার নাম কি, খুকি?'

মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে মশারীর মধ্যে ঢুকে গেল।

'বড় লাজুক মেয়েটা। ওর নাম ভেরিয়া।' অদ্ভুত অমায়িক হাসিতে ষ্টেপানের সমস্ত মুখটা দাড়ি-গোঁপে ঢেকে যায়। 'ভয় পেলি কেন রে বোকা মেয়ে? ভদ্রলোকটি কি আর তোকে মারবেন, যে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিস?' স্নেহ-গদগদ হ'য়ে ষ্টেপান মেয়েটিকে শান্ত ক'রতে চেষ্টা করে।

'এরও অসুখ ক'রেছে নাকি?' সাহ্‌কভ প্রশ্ন ক'রলো।

'কি, কি বল্লেন?' ষ্টেপান প্রতি প্রশ্ন ক'রলো। মুখের কৈশিক আবরণটা স'রে গেল তার। আরেকবার তার ক্লান্ত অথচ আন্তরিক ম্লান চোখদুটী চক্‌চক্ ক'রে উঠলো, একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠে সে ব'ললো,"যেন ভেরিয়ারও অসুখ করেছে কি না তাই জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মাষ্টার সাহ্‌কভ? আমাদের অসুখ নয় কার? ছেলেমেয়েরা, মেরিয়া, আমি সবাই মিলে ভুগছি। এই দেখুন না, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তো তিনটেকে একে একে গোর দিয়েছি। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তেই আমাদের পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। বড্ড ঠাণ্ডা আর স্যাঁৎসেতে কি না এখানকার হাওয়াটা!'

'তা' এর জন্যে তোমরা ব্যবস্থা কর না কেন কিছু?' —মাথা নেড়ে সাহ্‌কভ্ জিজ্ঞাসা ক'রলো—'আমাদের

াড়ীতে যেয়ো—কিছু 'কুইনিন' আমি তোমাকে দিয়ে দাব।'

'ধন্যবাদ, নিকোলাই নিকলেভিচ্, ভগবান্ আপনার ঙ্গল করুন। কিন্তু ব্যবস্থায় কি হবে স্যার?' অনেক কিছু তো ক'রেছি, কিছুতেই কিছু হয় নি।' ষ্টেপান হতাশ ভঙ্গিতে হাত দুটো ছুঁড়লো—'তিনটে তো গেছে এ পর্য্যন্ত!…অবিশ্যি এখানকার ঠাণ্ডা জলাটার দরুণই। এটার জন্যেই বাতাসের স্বাভাবিক চলাচল নেই, জলে ভিজে ভারী হ'য়ে থাকে।'

'তা' হ'লে অন্য কোথাও গিয়ে থাক না কেন?'

'অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌বো?' ষ্টেপান আবার সাত্‌র্‌-কভ্‌কে প্রতি-প্রশ্ন ক'রলো, যেন অনেক চেষ্টায় অপরের প্রশ্নগুলি-সে শুন্‌তে পাচ্ছে। প্রত্যেক কথাতেই যেন জোর ক'রে জড়তা ঝেড়ে ফেল্‌তে হয়। 'অন্য কোথাও সরে গেলে তো সত্যিই ভালো হ'ত স্যার! কিন্তু একজনকে তো থাকৃতেই হবে এখানে! ঘরটা বড়, দেখাশোনা করার লোক তো একজন চাই! আমরা না থাক্‌লে আর কেউ থাক্‌বে। একই কথা। আমার আগে ছিল এখানে গ্যালাক্‌সন্। ভারী খাঁটি আর স্বাধীনচেতা লোকটি। তারও স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা এসে এখানে মরেছে। নিজেও সে নিস্তার পায় নি জলার জ্বরের হাত থেকে। আসল কথাটা কি জানেন হুজুর—যেখানেই থাকি সেটার সন্ধান ভগবানই সব চেয়ে ভাল জানেন।'

হেনকালে ষ্টেপানজায়া সামোভার নিয়ে প্রবেশ ক'রলো।

ষ্টেপানকে গল্প ক'রতে দেখে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে মুখিয়ে উঠলো —'হাত-পা গুড়িয়ে বসে বসে গল্প ক'রতে খুব মজা, না? কাপ-ডিস্‌গুলিও তো ঠিক ক'রে রাখ্‌তে পারতে?'—ব'লে সশব্দে সামোভারটি সে টেবিলের ওপর রাখ্‌লো। অকাল-বার্দ্ধক্যে মেরিয়ার মুখটা ভাবহীন বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। রেখা-কণ্টকিত গালের নীচে লাল টক্‌টকে দুটো দাগ। চোখজোড়া অবাস্তব উজ্জ্বল। রুটি আর কাপ ডিস্‌গুলি টেবিলের ওপরে সে যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখতে লাগলো।

সাত্‌র্‌কভের চা-টা কিছু খাবার আর রুচি নেই। আজকের দিনটায় যা সে দেখতে শুন্‌তে পেল, তাতে সে বড় বিহ্বল বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে; মনটাকে বড় বেশী আলোড়িত ক'রে তুলেছে আজকের অভিজ্ঞতাগুলি। ড্‌মাকিনের অহেতুক বিদ্বেষ…ভাগ্যের কাছে ষ্টেপানের বশ্যতা স্বীকারের মৃদু ভঙ্গীটা…মেরিয়ার নিরুদ্ধ ক্রোধ আর জলার জ্বরে-ধরা মৃত্যুমুখী ছেলেমেয়েগুলি, এই সব মিলিয়ে একটা অব্যক্ত বিষাদে একটা তীব্র অসহায় অনুভূতিতে যেন সাত্‌র্‌কভ্‌ আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে।

ড্‌মাকিন্ গোগ্রাসে একটা বড় রুটির টুক্‌রো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল—কাপের পর কাপ শেষ ক'রে ফেল্‌লে। খাবার সময় তার গালের মাংসপেশীগুলি দড়ির মত পাক খায়। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চোখ সামনের দিকে চেয়ে থাকে—অনেকটা জানোয়ারের চোখের মত। ষ্টেপানের স্ত্রীরা কেউ কিছু নিলে না। অনেক বলা-কওয়ার পর ষ্টেপান নিজে এক কাপ চা ঢেলে নিল। চিনি কামড়ে, প্লেটের ঢালা চা ফুঁ দিয়ে খাবার সময় তার হাস্যকর শব্দ হয়। চা-টা শেষ ক'রে, কাপটা সসারের ওপর উল্টে রেখে চিনির বাকী টুক্‌রোটা সে টিনের একটা কৌটায় রেখে দিলে।

অতি কষ্টে টেনে হিঁচড়ে সময়টা কাটছে। সাত্‌র্‌কভ্‌ অবাক্ হ'য়ে ভাবে, এই বিষাক্ত রুদ্ধ-শ্বাস কুয়াশার সমুদ্রে এই একচর কুটীরটার আর কত সন্ধ্যা কাটবে? সামোভারের আগুণ প্রায় নিভে এসেছে—নিভন্ত আগুণের মধ্যে একটা ক্ষীণ করুণ সুর গুণ্‌গুণ ক'রছে—সার্ব্বজনীন হতাশার সঙ্গীতের মত। দোলনার কাঁদুনে আওয়াজটা থেমেছে। শুধু একটা ঝিঁঝিঁ পোকা একঘেয়ে নিদ্রালু শব্দে ঘর ভরিয়ে তুল্‌ছে মাঝে মাঝে।

বড় মেয়েটি হাঁটুর ওপর হাতদুটো রেখে বাতিটার দিকে সম্মোহিতের মতো বিষণ্ণ চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বিশাল অস্বাভাবিক চোখ দুটো তার আরো উজ্জ্বল দেখায়। মাথাটা অজানিতে শিথিল্ কমনীয়তায় এক পাশে একটু হেলে পড়ে।

বাতিটার দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে কী ভাবে মেয়েটি? কী অনুভব করে? মাঝে মাঝে শ্লথ ক্লান্তিতে রোগা রোগা হাত দুটি তার সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে চোখ দুটি তার অদ্ভুত এক অব্যক্ত হাসিতে ঝক্‌ঝক্ ক'রে ওঠে। মৃদু পেলব সেই হাসি,—কার কাছে কি যেন চায়; যেন রাত্রির অন্ধকার নিজেই তাকে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সাত্‌র্‌কভের মস্তিষ্ক বিরক্তিকর চিন্তায় ভারী হ'য়ে ওঠে। তার মনে হলো যেন ষ্টেপানের সমস্ত সংসারটাই

রোগের শক্তিজালে বাঁধা পড়েছে। হয় তো সাড়্‌কভের এটা কুসংস্কার। তবু সে ভাবতে থাকে—প্রত্যহের কোন ছায়া এই মেয়েটির চোখে কি পড়ে? আলো আর কোলাহল নিয়ে দিনগুলি যে আসে, তা' কি এই মেয়েটি জানতে পারে? তারপর আসে সন্ধ্যা। দিবসের ওপর মেয়েটির বোধ হয় কোন স্পৃহা নেই! নইলে বাতির দিকে চেয়ে সে অধীর আগ্রহে রাত্রির প্রতীক্ষা করে কেন? রাত্রির অন্ধকারেই কি অনারোগ্য ব্যাধি তার দেহকে জাগিয়ে তুলতে পারে? তার ছোট্ট মস্তিষ্ককে মধুর কল্পনায় স্বপ্নাতুর ক'রে তোলে?

অনেক দিন আগে সাড়্‌কভ্ কোথায় যেন এক নামকরা চিত্রকরের আঁকা একখানা ছবি দেখেছিল। ছবিটার বিষয় ও নামকরণ ছিল 'ম্যালেরিয়া'। প্রকাণ্ড একটা জলার জলে শালুক ফুলে ঢাকা ছোট্ট একটি মেয়ে দোল খাচ্ছে; বাদাটার মধ্যখানে একটি লিকলিকে সরু প্রেতায়িত নারীমূর্ত্তি—আবছা কুয়াশার সঙ্গে তার অঙ্গবসন মিশে আছে—বড় বড় চোখে ক্ষুধিত অশরীরী দৃষ্টি। মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মেয়েটির দিকে। হঠাৎ এই ভীষণ চিত্রটি মনে পড়তে নিকোলাই ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লো।

জ্‌মাকিন্‌ই নীরবতা ভাঙ্গলো প্রথমে। চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—'বুঝলে, এ্যামেরিকার লোকেরা বসে থাকে তো বসেই থাকে, তারপর যায় শুতে। কই, মেরিয়া, আমাদের জন্যে কিছু একটা পেতে টেতে দাও!'

সকলেই উঠলো। বড় মেয়েটি মাথাটা দু'হাতে চেপে বিছানায় ছড়িয়ে প'ড়লো। তার কচি মুখে সহর্ষ স্বপ্নিল একটা হাসি খেলে যায়। হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে মেরিয়া দুমুঠো খড় বাইরে থেকে নিয়ে এলো। তার মুখের কাঠিন্যটা যেন স'রে গেছে—চোখের চাউনিও অনেক নরম। অধীর আশার কৌতূহলী প্রকাশ সে চাহনীতে স্পষ্ট।

বেঞ্চিগুলি একজায়গায় জড়ো ক'রে মেরিয়া খড়গুলি তার ওপর বিছিয়ে দিল। সাড়্‌কভ কতক্ষণে বাইরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, ঘন পাঁশুটে সিক্ত কুয়াসা ছাড়া কোথাও আর কিছু চোখে পড়ে না। একটু পরে ঘরের ভেতর চলে আসতে লক্ষ্য করলো, জলা-ভূমির ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার চোখমুখ, চুল, কাপড়-চোপড় সব ভিজে একশা হ'য়ে গেছে।

জ্‌মাকিন্ আর সাড়্‌কভ কনুইতে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে প'ড়লো। চুল্লীটার ধারে ষ্টেপান বিছানা ক'রে নিয়েছে একটা। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ ফিস্ ফিস্ ক'রে প্রার্থনা করে; তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। মেরিয়াও খালি পায়ে চুপে চুপে বিছানার ধারে গিয়ে বসলো। খানিক পর ষ্টেপানদের কুঁড়েটা ক্রমশঃ নিঃশব্দ হ'য়ে এলো। শুধু মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকাদের একঘেয়ে ডাক আর জানালার গরাদে কয়েকটা নাছোড়বান্দা মাছির বিরক্তিকর ভ্যান্‌ভ্যানে অভিযোগ ছাড়া আর বড় কিছু শব্দ কানে এলো না।

অনেকটা পরিশ্রম হয়েছে আজকে। তবু সাড়্‌কভের চোখে ঘুম এলো না। চোখ খুলেই সে চিৎ হ'য়ে শুয়ে রইল এই অতন্দ্র রাত্রিটার সমস্ত শব্দময় সঙ্কেতগুলি সে কান পেতে যাচাই করতে চায়। জ্‌মাকিন্ হাঁ ক'রে ঘুমচ্ছে—গলার কোন সূক্ষ্ম ঝিল্লি ভেঙ্গে যেন তার নিশ্বাস পড়ছে—কুলকুচি করার মত আওয়াজ। বড় মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কয়েকটা অস্পষ্ট কথা ক'য়ে ওঠে। চুল্লীর ওপর ছেলেমেয়ে দুটি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে—জ্বরের তাপে বোধ হয় গরম ষ্টেপানের প্রত্যেকটা নিশ্বাসে কেমন একটা গোঙানির শব্দ।

"মা একটু জল!" একটি ছেলে জেগে উঠলো। মেরিয়া তাড়াতাড়ি জলের বালতিটার কাছে গিয়ে লোহার ঘটিতে জল ভরে নিয়ে এলো। ছেলেটি ঢকঢক্ ক'রে জলটা খেয়ে নিল। আবার সব স্থির—সমস্ত নিস্তব্ধ। জ্‌মাকিনের একটানা ঘড়ঘড় নিশ্বাসে আর ছোটদের ভারী নিশ্বাসের আওয়াজেও সেই নৈঃশব্দে কোন ছেদ পড়ে না। হঠাৎ বড় মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। কাঁপতে কাঁপতে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু দাঁতের খটখটানিতে কথাটা স্পষ্ট উচ্চারিত হ'লো না। অবশেষে অনেক কষ্টে সে বল্লে—'ঠা ঠা, ঠাণ্ডা!' মেরিয়া তার গায়ে একটা কিছু জড়িয়ে দিল তবু যেন অনেকক্ষণ মেয়েটির কাঁপুনি বন্ধ হ'লো না।

হাজার চেষ্টা ক'রেও সাড়্‌কভের চোখে ঘুম এলো না ষ্টেপানের ঘরের বাস্তু প্রেতটার সান্নিধ্যে বুঝি ঘুম আসা একেবারেই অসম্ভব।

কোলের ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে ওঠে। মেরিয়া দোলনার

আওয়াজের তালে তালে একটা পুরোনো ঘুমপাড়ানি ছড়া গাইতে থাকে—

আ-আ-আ—
ভালো ছেলেরা ঘুমোয় সবাই—
জীবজানোয়ার—তারাও…
আ-আ-আ—

মেরিয়ার গান যেন প্রাগৈতিহাসকে বর্ত্তমানের কোলে টেনে নিয়ে আসে।

হঠাৎ মাথার কাছে কে যেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দরজা ঠেলল। সাদ্র্কভ এর জন্তে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে প্রায় চমকে উঠে। বনদারোগা ষ্টেপান বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। এক জায়গায় খানিক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। ঘুমটাও ভেঙে যেতে তার বড় দুঃখ হচ্ছে। অসহায় ভঙ্গিতে চোখদুটি রগড়ে, মাথা বুক চুলকে নিল, তারপর দেহটা টেনে তুলে জানালার কাছে এগিয়ে শার্সিতে চোখ রেখে অন্ধকারে কাকে ডাকল, "কে হে ওখানে?"

উত্তরে বাইরে থেকে কতকগুলি জড়ানো অবোধ্য কথা শোনা গেল।

—'কিন্সিল্নস্কাতে?" ষ্টেপান অদৃশ্য আগন্তুককে প্রশ্ন ক'রলো, "বেশ সব শুনলাম, এবার তুমি যেতে পার। এক্ষুনি বেরোচ্ছি আমি।'

সাদ্র্কভ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা ক'রলে—'ব্যাপার কি হে ষ্টেপান?'

"আর বলেন কেন স্যার, এখুনি বেরোতে হবে আবার? করার তো কিছুই নেই। কিন্সিল্নস্কি কুঠিতে আগুন লেগেছে—বনের মালিক হুকুম দিয়েছেন সব দারোগাদের জড় হ'তে। তার লোকই এখানে খবর দিতে এসেছিল।'

ষ্টেপান পোষাক পরে বেরিয়ে গেল। মেরিয়া দরজা ভেজিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এসে বল্লে—'আলো নিয়ে যাও একটা।'

'লাভ কি তাতে? পথ তো লোকে আলো নিয়েও হারায়।' কাঁপা কণ্ঠে স্ত্রীকে উত্তর দিয়ে ষ্টেপান এগিয়ে যায়। সাদ্র্কভ বাইরে চেয়ে দেখে মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু পায়ের আওয়াজ কানে আসছে। কালো কুহেলিকাময় অন্ধকারের গর্ভে ষ্টেপানের দেহটা সবখানি মিলিয়ে গেছে। এতটুকু প্রশ্ন, এতটুকু অভিযোগ না তুলে এই গভীর রজনীতেই ঠাণ্ডা কুয়াসা আর বিভীষিকাময় রহস্যের মধ্যে সে নেমে গেল। এতটুকু আপত্তি তার হ'লো না।

কিন্তু কেন? এইটাই সাদ্র্কভের সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে। সন্ধ্যাবেলায় যে-পথ ভেঙে সে আর জমাকিন্ এখানে এসেছিল, সেই বুনো রাস্তাটা তার চোখে এখনও ভাসছে—সেই বাদাটার দুপাশে কুয়াশার শাদা পর্দ্দা, পায়ের নীচে নরম সেঁৎসেঁতে মাটি, বিটার্ণ পাখীটার করুণ কান্না—সেই সমস্ত মনে ক'রে সাদ্র্কভ ছোট ছেলের মত ভয় পেয়ে উঠলো? অতলান্ত পঙ্কিল জলাটা ঘিরে যে-রাত্রি এসেছে, সেই রাত্রিতে কোন্ অদ্ভুত জীবটা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে? উইলো গাছের শাখায়, নলখাগড়ার বনে সাপের মত কি যেন একটা কিলবিলিয়ে উঠেছিল না? মানুষটাকে সাদ্র্কভ চিনে উঠতে পারলো না তো। তার ঝাঁকড়া চুল-দাড়িতে, ক্লান্ত অথচ সদয় চোখদুটিতে বুঝি কোন অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে।

পাতলা একটু তন্দ্রা আসছে সাদ্র্কভের চোখে। ছায়ার মত অস্পষ্ট কয়েকটা দেহ-মুখ তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। 'এ শুধু স্বপ্ন, প্রেতায়িত কয়েকটি স্মৃতি'—মনে মনে সে বল্লে। ঘুম আসছে এটা সে জানতে পারলো।

আবছা অবচেতনের মধ্যে আবার আজকের দিনের খুঁটিনাটিগুলি জেগে ওঠে—চড়া রোদের নিচে সোঁদাগন্ধ পাইনের বনে জরীপ কাজ—বুনো রাস্তা, জলা, কুয়াশার স্তূপ, ষ্টেপানের কুঁড়ে, সে নিজে, তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সবকিছু একে একে তরুণ নিকোলাইয়ের মস্তিষ্কে ভিড় ক'রে জেগে ওঠে। আধঘুমে নিকোলাই স্বপ্ন দেখে, যেন গভীর দুঃখে দুরন্ত আবেগে বুড়ো জমাকিন্‌কে সে বলছে, 'কোথায়, কোথায় এই জীবনযাত্রার শেষ?' ব'লতে ব'লতে তার চোখের কোনে যেন গরম অশ্রু দানা বেঁধে দাঁড়ায়, 'এই কদর্য্য জীবনবৃত্তিতে কার কী লাভ? এই মৃত্যু, জলার রক্ত-শোষক এই প্রেতটা এমনি ক'রে যে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুগুলির বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে—কী এর অর্থ? ভাগ্যের তরফে এই অত্যাচারের কি কৈফিয়ৎ আছে বলতে পারেন, ইগর আইভানোভিচ্?'—জমাকিন্ এই কথা শুনে

যেন বরং আরও রেগে ওঠে, চোখ পাকিয়ে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অবোধ যৌবনের বাচালতায় বৃদ্ধ যেন কৃপা বোধ করে। মানুষের জীবন মানেই তো দারিদ্র্য আর দুঃখ, এই সহজ কথাটা তো অর্বাচীন ছোকরা জানে না! যেখানেই মৃত্যু হোক—একই তো কথা সব! আব্‌ছা ঘুমে সার্দ্‌কভ স্পষ্ট দেখলো, বুড়ো এই কথাটা ভেবে যেন তার ওপর অসীম অনুকম্পায় আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে।

তন্দ্রার মৃদু আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কাটলো, তখন সার্দ্‌কভের স্পষ্ট মনে হ'ল, ঘুম তার মোটেই আসে নি। একান্ত গভীর ভাবে ভাবছিল ব'লেই বোধ হয় জিনিষগুলি এত তীব্র হয়ে তার মনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বাইরে তখন বুঝি ভোর হ'তে সুরু হ'য়েছে। কুয়াশার আস্তরণটা রাতের মতই এখনও জমাট, শুধু বিবর্ণ ভাবটা কেটে তুষারশুভ্র রঙের প্রলেপ আসছে সেখানে। তুলে ফেলবার আগে পর্দ্দাটা যেমন কাঁপে কুয়াশার আস্তরণটা তেমনি কাঁপছে।

হঠাৎ একটা দুরন্ত আবেগ এসে সার্দ্‌কভকে আলোড়িত ক'রে তোলে—এখুনি বাইরে বেরিয়ে সূর্য্যের আলোয় স্নান ক'রে নিতে, গ্রীষ্মভোরের নিষ্কলুষ বাতাসে বুক ভ'রে ফেলতে। ছোট ছেলের মত সে আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠলো। তৎক্ষণাৎ পোষাক গায় দিয়ে সে বাইরে চ'লে আসে। ভিজে কুয়াশার ভারী একটা ঝাপটা এসে লাগলো তার চোখে-মুখে —হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাতে সে একটু কেঁপে উঠলো। নীচু হ'য়ে পথটা চিনে সার্দ্‌কভ দৌড়তে দৌড়তে বাদাটা পেরিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কুয়াশায় তার সারা মুখটা ভ'রে গেছে—ঠোঁট দিয়ে অনুভব করলো দাড়ি-গোঁপ ভিজে; চুল আর চোখের পাতাও সজল। তবু প্রতিপদক্ষেপে সে বুঝলো, নিশ্বাস নেওয়া কত সহজ এখন। অবশেষে যেন গভীর নরককুণ্ড থেকে সে উঠে এলো বালির পাহাড়ের মাথায়।

অব্যক্ত আনন্দে তার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে এলো। পুঞ্জ পুঞ্জ অসীম সাদা কুয়াশা তার পায়ের তলায় চাপ বেঁধে প'ড়ে আছে—কিন্তু মাথার ওপর র'য়েছে দিগন্ত-বিসারী নীল আকাশ, এতটুকু কালো নেই সেখানে।···সবুজ গাছেরা কাণে কাণে কথা কইচে। সূর্য্যের তির্য্যক আলোর রেখাগুলি বিজয়গর্ব্বে হর্ষোজ্জ্বল।

উলুখড়ের ভাগ্য

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

শাস্ত্রে লিখেছে ষণ্ডে ষণ্ডে দ্বন্দ্ব যখন করে,
ফলাফল যাহা হয় হোক, শুধু উলুখড়েরাই মরে'।
দূর হতে যারা দেখিছে লড়াই,
শাস্ত্র ট্র্যাজেডি জানে কি সবাই?
পদতলে কি যে দশা ঘটে ভাই সে কি কারো চোখে পড়ে?

চক্র ষণ্ড বক্র শৃঙ্গ ঊর্দ্ধে করিয়া খাড়া,
বিজয়ী দম্ভে দাপাদাপি করি ফিরিছে সকল পাড়া।
জনবুলও দেখি আস্ফালনেতে
কারো চেয়ে কম নহে কোনমতে।
মাঝ থেকে শুধু উলুবন হল ভয়ে ভয়ে কেঁপে সারা।

কটা ফ্রন্ট কোথা খুলিবে রণের বৃষরাই তাহা জানে,
উলুবনে কেন মহড়া তাহার কার কথা কেবা মানে।
চিল-চিল সদা উড়িতেছে নভে
তিনটানি ডিম পাড়িবে কবে,
সেই ভয়ে উলুবনবাসী ছিপি আঁটে নাকে কানে।

বিংশ শতকে মানুষ আবার আদিযুগে ফিরিবে কি?
কৃষ্টি সমাজ ভুলে গেল সবে, হাসি-খুসি লাগে মেকি।
খাদ্য বসন করি পরিহার
গুহবাসী যত গুহা করে সার
যত আলো সব করিয়া আঁধার বুকে হাঁটে দেখাদেখি।

ভেড়ার গোহালে আগুনে বোমার প্রাণান্ত রসিকতা,
কেমন লাগিবে এ. আর. পি ট্রেনিংএ শুনি এয়ার্কি কথা।
ব্যবসা যাহার শুধু আদা নিয়ে
জাহাজী কথা সে শোনে মন দিয়ে,
অন্নবিহীন নিধিরাম ছোটে মিলিটারী ক্যাম্প যথা।

কাগজে পড়েছি বোমা খেয়ে নিতি লোক মরে লাখো লাখো,
যা হয় একটা হয়ে গেলে বাঁচি এ ভাবে ত বাঁচিনা'ক।
চাল-ডাল নেই চিনি কেরোসিন
এক বেলা খেলে উপোষ দুদিন,
বোমার ভাবনা ভাবিও তারাই (যদি) অনাহারে বেঁচে থাক।

ফ্যাসি ডিমোক্রেসী এপিঠ ওপিঠ জোর যার সেই রবে,
ষণ্ড অথবা পাষণ্ড হোক তারি জয় গাবে সবে।
মোট কথা হ'ল, পাকিলে শ্রীফল
বায়সকুলের তাহে কিবা ফল
উলুর ভাগ্যে চিরদিন যাহা এবারো তাহাই হবে।

পৃথিবীর শেষপ্রান্তে

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

ব্রিটীশ ক্যামিরুণের উপকূল থেকে পনরদিন যাবৎ চলবার পর দেখা যাবে এক বিস্তীর্ণ বনভূমি, নিস্তব্ধ, ফিকে সবুজ পাতায় ঘেরা। থেকে থেকে দূর—বহুদূর থেকে ঘন পত্র কুঞ্জের মধ্যে জল ঝরবার এক রহস্যময় শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, সেখান থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে তৃণভূমি। যে পাহাড়টী এই দুই ভূমির মাঝখানে প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ ক'রছে, তা'র পাদদেশ থেকে তৃণভূমি অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীষ্মের সূর্য্যের সোনালী কিরণ সেই পাহাড়ের উপরিভাগকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলছে।

উত্তর-পূর্ব্বদিকে যদি আরও পনরদিন অগ্রসর হওয়া যায় তা' হ'লে দেখা যা'বে মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ হঠাৎ শেষ হ'য়ে এসেছে। এইখানেই আমাদের সভ্য জগতের শেষ চিহ্নটুকুও ফেলে রেখে যেতে হয়! একটী ধাতুপাত্র, একখানা মাত্র কাপড়, এমন কি একটুকরো কাগজও আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তা'র পরিবর্ত্তে দেখা যা'বে চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট মাটীর কুটীর, আর উলঙ্গ মানুষগুলো সশব্দে ঝোপের আড়াল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে, আর সময় সময় নেকড়ে বাঘের চীৎকার বাঁশবন থেকে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসছে।

এইখানে, পৃথিবীর শেষপ্রান্তে—একটী সুন্দর উপত্যকা-ভূমির মাঝে 'এসু' নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম নদীতীরে একটী দুষ্প্রাপ্য রত্নের মত জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। গ্রামে প্রবেশ ক'রবার সময় একটী ফটক পেরিয়ে যেতে হয়, ফটকটী আর কিছুই নয়—দু'পাশে দু'টী বৃহৎ তালবৃক্ষ—লতা-পাতায় সাজানো। যে প্রধান পথটী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে…তা'র শাখা-প্রশাখা যথেষ্ট। পিঙ্গল বর্ণের মাটীর কুটীরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন…আকর্ষণীয়, সারাটী পল্লীতেই যেন সুখের ছায়াপাত ক'রে আছে।

"এসু" গ্রামের দৃশ্য

গ্রীষ্মের শেষে যখন বর্ষা আসে, প্রবল বারিপাত, বজ্রপাত আরম্ভ হয়—আফ্রিকার প্রকৃত রূপ তখন প্রতিভাত হয়। এর মাঝে দাঁড়িয়ে এসু গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠে: রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে যায়…মাটীর ঘরগুলো ভেঙ্গে প'ড়তে আরম্ভ করে। দিনের বেলায় তাই লোকজন নূতন ঘর

বাঁধতে ব্যস্ত থাকে।. তা'রা প্রথম বাঁশ বেঁধে বেঁধে চালা তৈরী করে কাঠের পেরেক এবং লতা-পাতার সাহায্যে। তা'রপর কাদা, পাথর দিয়ে দেওয়াল প্রস্তুত করে এবং কাদা ও তৃণের সাহায্যে চালা ঢেকে দেয়।

এদের শয়ন কক্ষের বিছানা দেখলে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হ'বে। কয়েকখানা বাঁশের লাঠী একহাত অন্তর পাশাপাশি সাজানো, তা'র উপরে চামড়া বিছানো এবং একটী পাথ'রের মত শক্ত বালিশ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে দু'একখানা বাঁশ ও কাঠের তৈরী ব'সবার আসন দেখা যায়। দু' চারজনের বাড়ীতে কাঠ খোদাই ক'রে প্রস্তুত জয়ঢাকও আছে।

নাচ

গ্রামের যিনি প্রধান ব্যক্তি, তা'কে রাজা ব'ললেই চলে। দিনে দু'বার তিনি তাঁর শাসিত এলাকায় ঘুরে খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। "রাজাকে" পরামর্শ দেবার জন্য একজন মন্ত্রী আছেন, তাঁর মত ছাড়া "রাজার" কিছু ক'রবার উপায় নেই। এই মন্ত্রী সাধারণতঃ "রাজার" কাকা, দাদা বা অন্যকোন আত্মীয়ই হ'য়ে থাকেন। অবশ্য আত্মীয় না থাকলে গ্রামের মধ্যস্থিত অন্য কোন পদস্থ ব্যক্তিকে ঐ পদ দেওয়া হয়।

"রাজা" অনেকগুলো বিয়ে ক'রে থাকেন। কারও কারও কুড়ি পঁচিশ জন পর্য্যন্ত স্ত্রীর সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্ত্রীর পৃথক ঘর থাকে। তাঁর বাড়ীর পাশে তাঁর বিচারালয়, ব'সবার ঘর প্রভৃতি র'য়েছে। তা'র একটু দূরে একটী ঘর—সেখানে এস্থ গ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের মূর্ত্তি কাষ্ঠফলকে ক্ষোদিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। অনেক ক্ষেত্রে "রাজার" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যেরও মূর্ত্তি ক্ষোদিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। এইসব ক্ষোদিত মূর্ত্তির কাছে কাঠের টুল রাখা হ'য়েছে। এস্থ জাতীর বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির আত্মা এসে ঐ আসনে উপবেশন করেন। তবে এই আসন পুরাণো হ'লে বদলে দেওয়া হয়।

গ্রামের অধিবাসী সবাই অল্পবিস্তর মদ্যপায়ী। মৃত্যুর পরেও দেখা যায় কবরের উপরে নল বসিয়ে রাখা হয়। এই নল মাটীর ভেতর দিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মাঝে মাঝে কবর দর্শনকারীগণ ঐ নলের মধ্যে মদ ঢেলে দিয়ে থাকেন।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের এরা খুব যত্ন নেয়। গ্রামের মধ্যস্থলে "রাজবাড়ীর" অনতিদূরে বিশ্রামাগার বা অতিথি শালা। ভ্রমণকারীগণ এখানে থাকেন; "রাজা" সঙ্গে করে অতিথিগণকে গ্রামের সমস্ত দর্শনীয় জিনিষ দেখিয়ে বেড়ান।

কোন লোকের মৃত্যু হ'বার পর তাকে তা'র ঘরের সামনে বসিয়ে রাখা হয়—একজন পেছন দিক থেকে ধরে থাকে, আর একজন পাখা দিয়ে বাতাস দেয়। যারা দেখতে আসবে—তা'দের নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকতে হ'বে, মৃত্যুর সময় বা প'রে কোনরূপ শোক প্রকাশ বা কান্নাকাটি চ'লবে না। দুঃখে অন্তর ভেঙ্গে প'ড়লেও, বাইরে তার এতটুকু

প্রকাশ থাকতে পারবে না। শবদেহে শাদা-কালো ডোরা আঁকা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হয়, মাথায়ও টুপি জাতীয় একটী কিছু থাকে। কিছুসময়—দরকার হ'লে দু'চারদিন পর্য্যন্ত, শবদেহ ঐভাবে বসিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মৃতের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শব সরিয়ে নেবার উপায় নেই।

দু'টী ঘরের মাঝখানে সরু গর্ত্ত কাটা হয়, অনেকটা গভীর। তার মধ্যে বাঁশ টুকরো টুকরো ক'রে দাঁড়করিয়ে রাখা হয়। গর্ত্তের তলদেশে একখানা চওড়া পাতা রেখে শবদেহ তার উপরে রাখা হয়। শবদেহের পাশে একঝুড়ি ফল এবং এক কুঁজো মদও দেওয়া থাকে।

এসুর অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন আনন্দপূর্ণ এবং সুখময়। ভোরবেলা দেখা যায় একজন যুবক সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে দ্রুত নিকটবর্ত্তী ঝোপের মাঝে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তা'র অনেকক্ষণ পর খোলা দরজার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো প্রবেশ ক'রে অর্দ্ধঘুমন্ত একটী রমণীকে সচকিত ক'রে দিল। সে উঠে ব'সলো; তারপর একটী ঝুড়ি ও কাঠের কোদালি নিয়ে মাঠের দিকে ছুটলো। মাঠের কাজ শেষ ক'রে ঝুড়ি মাথায়, কোদালি কাঁধে নিতান্ত অলসভাবে সে যখন রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরে, তখন পল্লী রৌদ্রে ভরে যায়, ছেলেপিলের চীৎকারে মুখরিত হ'য়ে ওঠে, আর উলঙ্গ ঠাকুর-দাদা ও ঠাকুরমা'র দল ঘরের তৈরী টুপী মাথায় দিয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ান।

এসুর অধিবাসিগণ খুব শীকারপ্রিয়। শিকারিগণ ছুরী, বর্শা প্রভৃতি ব্যবহার করে। শীকার ক'রবার সময় ঝোপে আগুন জেলে দেওয়া হয়। বন্য ইঁদুর, বন-বেড়াল প্রভৃতি হয় আগুনে পুড়ে মরে—না হয় বন থেকে বেরিয়ে এসে শিকারীর হাতে মৃত্যুবরণ করে। কখনও কখনও আগুন জ্বালা হয় না, শিকারীকুকুর কতকগুলো ছেড়ে দেওয়া হয় বনের মধ্যে। এরা বনে ঢুকে শিকার তাড়িয়ে বের করে আনে। শিকার ক'রবার সময় এরা হৈ চৈ করে না তবে কুকুরের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়—যাতে ভুলক্রমে কেউ শিকারভ্রমে শিকার-সন্ধানীকে ঘায়েল করে না বসে।

এরা বিদেশীয় কোন ভাষাই বোঝে না। তবে এদের স্মরণশক্তি খুব প্রবল। বিদেশীয়দের সঙ্গে অল্পক্ষণ ভাব-বিনিময় ক'রতে পারলেই এরা বেশ ভালভাবে সব বুঝতে ও বোঝাতে পারে।

কাঠ খোদাই করা দুটী জয়ঢাক

এই ক্ষুদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যেও নাচ-গানের প্রচলন আছে। বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে জয়ঢাক পিটিয়ে যখন একদল উলঙ্গ নর্ত্তক নাচতে আরম্ভ করে তখন আমাদের মত সভ্যজগতের লোক হেসে বা ঘৃণা ক'রে সেস্থান ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু শত শত গ্রামবাসী আনন্দের সঙ্গে তা' উপভোগ করে। নাচের সময় স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে যোগ দেয়।

আজ সভ্যতার চরম উন্নতির যুগে যারা পৃথিবীর এক কোণে সেই বিস্মৃত দিবসের অধিবাসীর ন্যায় উলঙ্গ হ'য়ে বর্ব্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রছে; বিজ্ঞানের যুগে যা'রা সমৃদ্ধ পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত, প্রগতির যুগে যা'রা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে পরে আছে, আমরা যদি তা'দের উচ্ছৃঙ্খল, অসভ্য বর্ব্বর ব'লে উপেক্ষা করি তা'তে তা'দের কোন ক্ষতি নেই। তবে একটা জিনিস দেখবার বিষয় এই

শবদেহে পোষাক পরিয়ে কুটীরের সামনে বসিয়ে রাখা হ'য়েছে

যে তা'দের জীবন যাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় আছে ব'লে কোনো ভ্রমণকারী উল্লেখ করেন নি। তা'দের ঐ বর্ব্বর জীবনযাত্রাও যেন সহজ, আমাদের মত জীবনকে তা'রা artificial ক'রে তোলে নি। শিক্ষা বা জ্ঞানের দম্ভ তাদের নেই; ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত হ'য়ে অধর্ম্মের জয়যাত্রার পথে তা'রা অগ্রসর হ'য়ে আসেনি, তা'দের কেউ শ্রেণীস্বার্থ বা ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য অপরকে পদদলিত ক'রে চলে না। তা'দের জীবনের একটা সহজ গতি আছে...যে আবহাওয়ায় তা'রা বেঁচে আছে,—বেঁচে থাকবার মত সহজ উপায়ও তা'দের র'য়েছে সেখানে।

যাই হোক, আজ অবশ্য নিশ্চয়ই কেউ সৃষ্টির প্রথম যুগে ফিরে যেতে চাইবে না, যাওয়া উচিতও নয়—যাওয়া চলবেও না। কারণ কালের গতি উল্টো দিকে নয়! আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছি এই যে বাহির বিশ্বের প্রচণ্ড আলোড়নের পাশে সেই থেকে অতি পুরাতন জীবনযাত্রাকে এরা কেমন ক'রে ধ'রে রেখেছে—এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়!

আজ পর্য্যন্ত কোন সহৃদয় ধর্ম্মপ্রচারক সেখানে শুভাগমন ক'রে ঐসব অধার্ম্মিক অধিবাসীদের ত্রাণ ক'রবার চেষ্টা করেন নি। এমন কি কোন সভ্যজাতি ঐ অসভ্য জাতিকে সভ্য ক'রবার আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। তার একমাত্র কারণ ওদের প্রাকৃতিক সম্পদও নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও আড়ম্বর নেই। সুতরাং যা'র জন্য ধর্ম্ম প্রচার এবং সভ্য ক'রবার আগ্রহ হ'বে সেই জিনিস থেকেই যে ওরা বঞ্চিত! ওদের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠিত করা চলে, কিন্তু শোষন করা চলে না,—বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্য জাতির যেটা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে বিবেচিত হয়।

যা-ই হোক যদি তা'রা কোন দিন বহির্জগতের সংস্পর্শে না আসে...সভ্যজাতির সাথে মিশে না যায়—তাতে সভ্য-জগতের হয়তো কোন ক্ষতিই হ'বে না। এমনি করে ওরা হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থাকবে, না হয় অনাগত যুগের গর্ভে ওদের শেষ বংশধর নিমজ্জিত হ'য়ে যাবে। তারপর সভ্য-জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এককোণে শুধু থাকবে তা'দের ছোট্ট একটু নিদর্শন মাত্র কয়েকটা ছাপার হরফে—হয়তো তাও থাকবে না। তা'র জন্য আজ আক্ষেপ ক'রবো না...কারণ মানুষের প্রতি মানুষের দরদ চিরদিন এমনিই।

বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রণয়

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রণয়ের বিবিধ রূপই দেখা যায়। নর-নারীর মধ্যে যত প্রকারে প্রণয় সংঘটন হইতে পারে, তাহাদের অধিকাংশই বঙ্কিম দেখাইয়াছেন। প্রণয় ব্যাপারকে দুই ভাগে ভাগ করিলে বলা যায় বৈধ ও অবৈধ। প্রণয়িনীদের মধ্যে কুন্দ ও রোহিণী—বিধবা, শৈবলিনী—সধবা, তিলোত্তমা—কুমারী।

কেবল শান্তিময় নিরুপদ্রব দাম্পত্য প্রেম লইয়া উপন্যাস রচনা হয় না। দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, সংশয়, সমস্যা ইত্যাদির আবির্ভাব না হইলে কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের মত দাম্পত্যজীবনের দুই একটি চিত্র হইতে পারে, উপন্যাস গড়িয়া উঠে না। দাম্পত্য প্রেমই আদর্শস্থানীয়, শুচিসুন্দর ও কল্যাণময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। উপন্যাসের জন্য চাই—বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য পরকীয়া প্রেমে বা অবৈধ প্রেমের অবতারণায় প্রেমধর্ম্মের আদর্শচ্যুতি হইতেই ঘটে।

বৈচিত্র্যের জন্য বঙ্কিম বৈধ ও অবৈধ দুই শ্রেণীর প্রণয়েরই সংযত্য লইয়াছেন। নারীর পক্ষ হইতে রোহিণী, শৈবলিনী, হীরার প্রণয় অবৈধ। পুরুষের পক্ষ হইতে ভবানন্দ, নগেন্দ্র, গোবিন্দলালের প্রণয় অবৈধ। নগেন্দ্রনাথ অবৈধকে বৈধে পরিণত করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে সপত্নী-সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা প্রণয় ব্যাপারে বিশেষ বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় নাই।

বৈধ ও অবৈধ প্রণয়ের মাঝামাঝি বঙ্কিম আর এক শ্রেণীর প্রণয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম স্বকীয়াকে পরকীয়া রূপে পরিকল্পিত করিয়া তাহার সহিত প্রণয় ঘটাইয়াছেন। পাঠকের কাছে তাহা বৈধ। কারণ, পাঠক ভিতরকার খবর জানেন। প্রণয়ীর পক্ষে তাহা অবৈধ, কারণ সে পরকীয়া বলিয়া জানে। পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণী যে অতি তীব্র বঙ্কিম তাহা নিজের দেশের সাহিত্য হইতেই জানিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, "অপ্সরাগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতিঃ লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতীর প্রতি অপব্যয় করেন না…যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, তিনি প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া যাহার হৃদয়-শোণিত পান করিতে পারিবেন—তাহার সন্ধানে যান।" (আনন্দমঠ)

কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি স্বকীয়া হইয়াও পরকীয়া—নবকুমার অবশ্য প্রেমের আবেদনে সাড়া দেন নাই। মৃণালিনীতে মনোরমা স্বকীয়া হইয়াও পরকীয়া। পশুপতির প্রণয়ের প্রখরতা যেন মনোরমা বিধবা বলিয়াই বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ইন্দিরা স্বকীয়া রূপে স্বামীকে পায় নাই, পরকীয়া রূপে তাহাকে লাভ করিল। দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্ল ও সাগর বৌ দু'জনেই পরকীয়া সাজিয়া ছিল। সীতারামে শ্রী স্বকীয়া হইয়াও পরকীয়া হইয়া উঠিল। এক স্বকীয়া অস্বকীয়ার ছদ্মে দেশের স্বাধীনতা লোপের কারণ হইল, আর এক স্বকীয়া অস্বকীয়া রূপ ধরিয়া সীতারাম ও তাহার রাজ্যধ্বংসের কারণ হইল।

স্বকীয়া হোক আর পরকীয়াই হোক, নারীই পুরুষের ইষ্টানিষ্টের বিধাত্রী—বঙ্কিম ইহাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ নারী রূপ-যৌবনের বলে পুরুষের অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রী। পুরুষ অনেক বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ ও ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায় নারী অপ্সরী হইয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করে এবং তাহার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটায়। অর্থাৎ পুরুষের জীবনব্রত উদযাপনের পথে একমাত্র বাধা রূপ-তৃষ্ণা—রূপজ মোহ। যে এই মোহ জয় করিতে পারিল সেই ব্রত উদযাপন করিতে পারিল—যে পারিল না তাহার জীবনই ব্যর্থ হইল। তাহার জীবনের সহিত যাহাদের জীবন জড়িত—তাহাদেরও সর্ব্বনাশ। কেবল তাহাই নয় রূপজ মোহ জয় করিতে না পারিলে নিরুপদ্রবে নিয়তর আদর্শের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও সম্ভব নয়। বঙ্কিম মোহমুদ্গর বা শান্তিশতকের ভাষায় রূপজ মোহের নিন্দা করিয়া তাঁহার ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি ইহার শক্তি, তেজ, প্রবল প্রতাপ ও দুর্দ্দমতা,—শুধু তাহাই নয় ইহার মধ্যে যে কঠোর সত্য নিহিত আছে, তাহাকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার উদ্দেশে শত শত নমস্কার করিয়াছেন এবং ইহাকে নিয়তির

মত অনিবার্য্য মনে করিয়া ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তব রাজ্য ত্যাগ করিয়া শেষে ভাবরাজ্যে গিয়া প্রতাপের আদর্শ রচনা করিয়া ক্ষোভ মিটাইয়াছেন।

রূপতৃষ্ণায় পুরুষ দুর্ব্বল। রূপযৌবনে নারী বলীয়সী। তাহার জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমের রচনায় নারী-চরিত্রগুলি পুরুষের তুলনায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের দর্শন-শাস্ত্রে প্রকৃতিই ক্রিয়াশীলা—পুরুষ নিষ্ক্রিয়,—পুরুষের বুকের উপর যে দেশে প্রকৃতি নৃত্যরতা, সে দেশের সাহিত্যে নারী-চরিত্র যে প্রাবল্য লাভ করিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সংস্কৃত সাহিত্যেও তাই—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কি লোক-সাহিত্য—কি ময়নামতীর গানে—কি বৈষ্ণব সাহিত্যে—কি পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায়—কি মঙ্গলকাব্যগুলিতে সর্ব্বত্রই নারীচরিত্র পুরুষের তুলনায় প্রবল। বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এ দেশে সমাজশাসনে নারী অসহায়া ও নিপীড়িতা বলিয়াই কি সাহিত্যে তাহাদিগকে প্রাবল্য ও প্রাধান্য দিয়া এ দেশের কবিরা নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন?

বঙ্কিমচন্দ্র পত্নীর রূপগুণের সহিত স্বামীর চরিত্রের একটা যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন—তাহা লক্ষ্য করিবার বস্তু। রূপ ও গুণের অভাব দেবেন্দ্রকে নষ্ট করিল, ভ্রমরের গুণের অভাব ছিল না—রূপের অভাব ছিল। গরীবঘরের ছেলেরা যাহারা খাটিয়া খায়—নানা ঝঞ্জাটের মধ্য দিয়া যাহাদের জীবন কাটে, তাহাদের ভ্রমরের মত গুণবতী অথচ রূপহীনা বধূর জন্য চরিত্রের কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু ধনীঘরের নিশ্চিন্তজীবন বিলাসী রূপবান্ গোবিন্দলালের তাহাতে তৃপ্তি হইবার কথা নয়। তাহাতেও হয় ত ক্ষতি হইত না, কিন্তু এমন যোগাযোগ ঘটিয়া গেল যাহাতে সচ্চরিত্র গোবিন্দলালের চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হইল। কিন্তু মূলে রহিয়াছে গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণার অতৃপ্তি।

সূর্য্যমুখীর রূপগুণ দুই-ই ছিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসারও অভাব ছিল না—কিন্তু সূর্য্যমুখী যৌবনের শেষ সীমায় পৌছিয়াছিল। বিলাসী ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন নগেন্দ্রনাথের রূপ-তৃষ্ণা তখনও মিটে নাই। যে যৌবনসুলভ চাপল্যে এ শ্রেণীর স্বামীকে ভুলাইয়া রাখা যায় সূর্য্যমুখীর তাহা ছিল না, কমলমণির প্রাণবত্তা ও প্রফুল্লতা সূর্য্যমুখীর ছিল না। রূপ-তৃষ্ণার সঙ্গে তারুণ্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি লোভ নগেন্দ্রনাথকে বিচলিত করিল। নগেন্দ্রনাথ অবৈধ প্রণয়কে বৈধ রূপ দিতে চাহিয়াছিল, কুন্দকে বিবাহ করিয়া। এ বিষয়ে গোবিন্দলালের চেয়ে নগেন্দ্রনাথ নির্ভীক ও বিবেচক।

রূপের সঙ্গে বৈচিত্র্যের মোহ সীতারামকে রাজধর্ম্মচ্যুত করিয়াছিল। স্ত্রী স্বকীয়া হইয়াও সীতারামের পক্ষে হইয়াছিল পরকীয়া। মোহ স্বকীয়ার জন্যই হউক—আর পরকীয়ার জন্যই হউক তাহার কুফল এড়ানো যায় না।

পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ই বঙ্কিমের নিকট সকল প্রণয়ের আদর্শ। ঘরে ঘরে দম্পতীরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছে দেখিয়া আমরা যদি মনে করি ইহা খুবই সুলভ তাহা হইলে আমাদের ভুল হইবে। বস্তুতঃ ইহা দুর্ল্লভ, দাম্পত্যজীবন নিরুপদ্রব হইলেই তাহা গভীর প্রণয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা মনে করা চলে না। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন বৈবাহিক সূত্রে কচিৎ কখনও ঘটে। যোগ্যের সহিত মিলন না হইলে গভীর প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে যে অধিকাংশ স্থলে দাম্পত্যজীবন শান্তিময় বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ কতক সামাজিক, কতক সাংসারিক, কতক দৈহিক, কতক মানসিক কতক আধ্যাত্মিক। বিবাহিত জীবনে এক অদৃষ্টের অধীন হইয়া "একাভিসন্ধি" হইয়া একত্র বাসের ফলে একটা আসক্তি জন্মে—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দাম্পত্য প্রেম। হরদেব ঘোষালের মুখ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সুদিনে দুর্দ্দিনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা তাহার প্রতিই জন্মে। প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমের জন্ম একদিনে হয় না।" এই যে প্রেম তাহা সকলের ভাগ্যে জন্মে না—ইহার মধ্যে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সামাজিক সাংসারিক অনেক বাধা আসিয়া জুটে। সকলের জীবনে এই ভালবাসা জন্মিবার সুযোগও হয় না।

শৈবলিনী যদি চন্দ্রশেখরের সমস্ত ঔদাসীন্য সহ্য করিয়া স্বামি-সেবা করিয়া জীবন কাটাইত তাহা হইলে উভয়ের জীবন এ ভাবে নষ্ট হইত না সত্য। কিন্তু আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের দৃষ্টান্ত হইতে পারিত কি?

সূর্য্যমুখী যদি কুন্দকে ছোট বোনের মত হাস্য মুখে কোলে তুলিয়া লইত, অভিমানে গৃহত্যাগ না করিত তাহা

হইলে ট্রাজেডি হইত না—কিন্তু আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম কি বজায় থাকিত ?

গোবিন্দলাল তাহার অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা মুহুর্মুহু দমন করিয়া যদি কালো ভোমরা লইয়া ঘরসংসার করিত তাহা হইলেই কি আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের দৃষ্টান্ত হইত ?

লবঙ্গলতা প্রাণপণ চেষ্টাতে বৃদ্ধ স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল—তাহাতে কি আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের সৃষ্টি হইয়াছিল ?

কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া নবকুমার একত্র বাস করিতেছিল—তাহাতে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের জন্ম কি হইয়াছিল ?

শ্রী যদি সীতারামের আবেদনে আত্মসমর্পণ করিত তাহা হইলেই কি আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত হইত ?

বঙ্কিম কয়েকটি ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীর দাম্পত্য জীবন দেখাইয়াছেন—যেমন কমলমণি, শ্রীশ, সুভাষিণী ও তাহার স্বামী, জীবানন্দ ও শান্তি। এই ভাগ্য যে দুর্লভ তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

পদ্মাবতীকে যদি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে না হইত, রোহিণী ও কুন্দ যদি বিধবা না হইত তবে তাহারাও দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য্যে তুষ্ট থাকিতে পারিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় এ ইঙ্গিতও করিয়াছেন। শৈবলিনীর যদি রূপ যৌবন-লুব্ধ যুবকের সঙ্গে পরিণয় হইত, তাহা হইলে সে হয় তো প্রতাপকে ভুলিতে পারিত। বঙ্কিম শুধু প্রতাপের আকর্ষণের কথা বলেন নাই, চন্দ্রশেখরের ঔদাসীন্যের উপরই খুব বেশী জোর দিয়াছেন। যাহারা দাম্পত্য-জীবনের সুযোগ পায় নাই—তাহারা পাপিষ্ঠা, না অভাগিনী ? দাম্পত্য-জীবনের উচ্চাদর্শের কথা তাহাদের শুনাইয়া লাভ নাই। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে যদি নয়ান বৌএর এবং কমলমণির সঙ্গে যদি চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইত তাহা হইলে কি হইত ? বিষবৃক্ষের মধুর চিত্রটি কি আমরা দেখিতে পাইতাম ? সবই যেন ভাগ্যের কথা। প্রণয়ব্যাপারে মানুষ অপেক্ষা নিয়তির হাত বেশি।

বঙ্কিম লবঙ্গলতা চরিত্রের দ্বারা একটি সত্যের আভাস দিয়াছেন। সবার ভাগ্যে যখন আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম ঘটে না তখন স্বামী একনিষ্ঠ হউক বা না হউক, প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমের জন্ম হউক আর নাই হউক, সমাজের ও সংসারের কল্যাণের জন্য যে নারী আত্মত্যাগ করে, প্রাণের তৃষ্ণা দমন করে, আত্মসংযমের অভ্যাস করে,—সেই নারীকেই আদর্শ বলিতে হইবে।

সতীত্বের আদর্শ সীতা নয়—সতীত্বের আদর্শ স্বয়ং সতী। কমলমণি সতীত্বের আদর্শ নয়—লবঙ্গলতাই সতীর আদর্শ। প্রফুল্লের চরিত্রের দ্বারা এই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কণ্ব শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"কুরু সখীবৃত্তিং সপত্নী জনে।" দেবী চৌধুরাণী সেই বাণীকে পালন করিয়া আদর্শ হইয়াছেন। শৈবলিনী যদি রূপসীর জন্য আত্মত্যাগ করিত এবং লবঙ্গলতার অনুসরণ করিত তাহা হইলে আদর্শ প্রণয়িনী হইত না বটে তবে আদর্শ সতী হইতে পারিত। গোবিন্দলাল আত্মসংযম করিতে পারিলে আদর্শ প্রণয়ী না হইলেও আদর্শ সংসারী বলিয়া গণ্য হইত।

প্রকৃত প্রণয় জিনিসটা লইয়া বঙ্কিম রীতিমত সমস্যায় পড়িয়াছিলেন—ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রমও করিতে হইয়াছে। সীতারামে এ সম্বন্ধে তাঁহার একটি ছোট বক্তৃতাও আছে।

শিল্পী হিসাবে তাঁহাকে এত শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন ছিল না—কেবল যৌন-জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্য ও বিবিধ নারী-চরিত্রের মধ্য দিয়া দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেই হইত। কিন্তু বঙ্কিম ত কেবল শিল্পী নহেন—তিনি একজন চিন্তাপ্রবর্ত্তক এবং তত্ত্বজ্ঞ। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া প্রণয় জিনিসটার স্বরূপ দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

চরিত্রের মধ্য দিয়া গভীর প্রণয়ের রূপ দেখাইতে দেখাইতে তিনি সূর্য্যমুখী—শেষে ভ্রমরে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরকে গোঁড়া সমালোচকেরা যাহাই বলুক ভ্রমরের প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতি অত্যন্ত গভীর। নারী যদি তাহার নারীত্বকে সতীত্বের চরণে বিসর্জ্জন দেয় তবে বঙ্কিম তাহাকে পূজার পাত্রী মনে করেন কিন্তু যে নারী নারীত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রণয়েরও মর্য্যাদা রক্ষা করে, তাহার গৌরব তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভ্রমর অভিমানিনী না হইলে সংসারে শান্তি রক্ষা পাইত, সমাজ-কল্যাণের দিক্ হইতে তাহা স্পৃহণীয়, কিন্তু তাহাতে নারীত্ব ও প্রণয়-দেবতার মর্য্যাদা কি বাড়িত ?

বঙ্কিম যে চারিটি নারী-চরিত্রের সাহায্যে দাম্পত্য জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন—সেই চারিটি নারী-চরিত্রই বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা পরবর্ত্তী কথা-সাহিত্যিকদের রচনায় ঐ চারিটি চরিত্রকে নানারূপে দেখিতে পাই।

একটি ভ্রমর চরিত্র। তেজস্বিনী ভ্রমর আপনার তেজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া গেল—তবু অসত্য ও অমর্য্যাদার সহিত সন্ধি করিয়া নারীত্ব ও সতীত্বের অবমাননা করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় চরিত্র সূর্য্যমুখীর। স্বামিসংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী স্বামিগতপ্রাণা বর্ষীয়সী মহীয়সী রমণী। অপরকে সে প্রাণ ধরিয়া স্বামীর ভালবাসার অংশ দিতে পারিল না। 'মধ্যবর্ত্তিনী' যে ব্যবধান রচনা করিতেছে, তাহার বিদায় গ্রহণেও সে ব্যবধান দূর হইতেছে না।

তৃতীয় চরিত্র লবঙ্গলতার। স্বামিসেবার পুষ্প-চন্দন ও ধূপধুনের প্রাচুর্য্যে নিজের গোপন প্রণয়-স্মৃতিকে প্রাণপণে আচ্ছন্ন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে লৌকিক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে।

চতুর্থ চরিত্র শৈবলিনীর। বিষয়ান্তরে তন্ময় চিত্ত স্বামীর নিকট হইতে প্রণয়াবেদনের সাড়া নাই। স্বামীর ঔদাসীন্য ও নীরস নিষ্ক্রিয়তা পত্নীর চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী। প্রেমাদরের অতিশয্যে স্বামী পত্নীর প্রণয়পিপাসা মিটাইয়া বাহিরের আকর্ষণকে নিস্তেজ করিতে পারিতেছে না।

এই চারিটি চরিত্রকে আমরা বাংলার কথা-সাহিত্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেখি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালী সমাজে অবরোধ-প্রথা রহিত হয় নাই, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বালিকা বয়সেই নারীদের বিবাহ হইয়া যাইত। কুমারীর সহিত স্বাধীন প্রণয়-সংঘটনের চিত্র কথা-সাহিত্যে স্বাভাবিক ছিল না। বঙ্কিম এইরূপ প্রণয়ের চিত্র দেখাইবার জন্য বাঙ্গালী সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। কেবল দেশগত নয়, কালগত দূরত্বও ঘটাইয়াছেন। তিলোত্তমা, আয়েসা, মৃণালিনী আমাদের সমাজের নারী নহেন। এই চরিত্রগুলি অনেকটা Conventional, ইহাদের মধ্যে তিলোত্তমা ও মৃণালিনীকে আমরা যেন প্রাচীন সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আয়েষাকে বিলাতী উপন্যাসে দেখিতে পাই। দলনী যেন আমাদের দেশেরই মেয়ে, চিরপ্রচলিত আদর্শ সতী চরিত্রে একটু বেশী রঙ চড়ানো।

ভ্রমর দলনীর ঠিক বিপরীত ধরণের মনোবৃত্তি লইয়াও ভ্রমর আদর্শ সতী। ভ্রমর বলিয়াছিল—"স্বামী যতদিন বিশ্বাস যোগ্য, ততদিনই তাঁকে বিশ্বাস।"

দলনী আদর্শ নারী আমাদের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে, বর্ত্তমান যুগের আদর্শে ভ্রমরই আদর্শ নারী। দলনী মহিষী হইয়াও দাসী, ভ্রমর দাসী হইতে চায় নাই জীবন-সঙ্গিনী হইতে চাহিয়া ছিল। ভ্রমরের ইহাই অপরাধ।

প্রণয়-ব্যাপারে কমলমণির জীবনে কোন বৈচিত্র্য ঘটে নাই। কমল সুখের সায়রে মধু গন্ধে ভরপুর কমল। জীবনী-শক্তির আতিশয্যে কমল চিরপ্রফুল্ল। সাগর বৌএর জীবনী-শক্তির পরিমাণ আরও বেশি। তাহার অদৃষ্টাকাশ নির্মেঘ ছিল না, কিন্তু তাহার জীবনে প্রফুল্লতার জ্যোৎস্না-তরঙ্গের কোনদিন অভাব ঘটে নাই। বঙ্কিম তাঁহার মূল নায়িকাদের জীবনের পরিবেষ্টনীতে বৈচিত্র্য, সরসতা, মাধুর্য্য ও জীবনী-শক্তির সঞ্চারের জন্য এই দুইটি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাগর বৌএর দিন গিয়াছে, কমলমণির প্রতিপত্তি এখনও বাঙ্গালী সংসারে বর্ত্তমান।

গভীর প্রণয়ের একটি প্রধান অঙ্গ পত্নীর পক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিতা। সহধর্ম্মিণী ব্রত সাধনে সহায়িকা হইলে দাম্পত্য-জীবন সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ হয়। বঙ্কিম ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী, তাঁহার ব্রতে বাধা-স্বরূপা না হইয়া প্রেরণা দান করিয়াছেন। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের, কল্যাণী মহেন্দ্রের পত্নী মাত্র, সহধর্ম্মিণী নহেন। রমা ও নন্দা সীতারামের মহিষী, কিন্তু সহধর্ম্মিণী নহেন। সীতারামের বীর-জীবনে ও রাজ-জীবনে উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন ছিল। সীতারামের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী শ্রী। সে বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াও জ্যোতিষীর বাক্য বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সীতারামকে ধরা দিল না। বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য—সীতারাম উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর সহায়তা ও সঙ্গ পাইল না বলিয়াই রাজ্যের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

আনন্দ মঠে বঙ্কিম শান্তিচরিত্রে স্বামী ও স্ত্রীর ব্রতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেমের আদর্শ দেখাইয়াছেন।
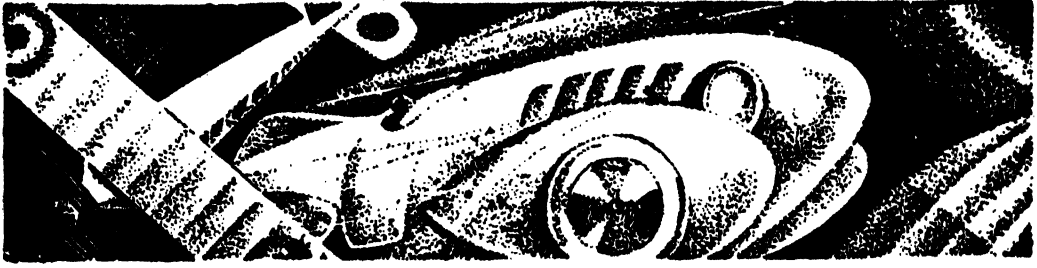
বিজ্ঞান জগৎ

বিশ্ব অসীম হ'লেও সান্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকার লীলাভূমি এই জড় বিশ্ব (space) সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, বিশ্ব যুগপৎ অসীম ও অনন্ত। বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই এ ধারণা এ যাবৎ মর্য্যাদা পেয়ে এসেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে একটা কথা উঠেছে এই যে, 'বিশ্ব অসীম হ'লেও সান্ত বটে'—the universe is finite though unbounded. কথাটা শুন্‌তে হেঁয়ালির মত, কারণ সাধারণের কাছে 'অসীম' ও 'অনন্ত' শব্দ দু'টি অল্পবিস্তর একার্থবোধক। কিন্তু বিজ্ঞানে যেমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দের আদর নেই সেইরূপ একার্থবোধক বিভিন্ন শব্দও বড় একটা স্থান পায় না। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমেই আমরা উক্ত শব্দ দু'টার অর্থ পরিষ্কার ক'রে নিতে চেষ্টা করবো।

উদ্ধৃত ইংরেজী বাক্যটার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমরা 'সান্ত' শব্দটাকে ইংরেজী 'finite' শব্দের এবং 'অসীম' শব্দটাকে 'unbounded' শব্দের সমার্থবোধকরূপে গ্রহণ করেছি। এ প্রবন্ধে আমরা ঐ শব্দ দু'টাকে সর্ব্বত্র ঐ অর্থেই ব্যবহার করবো। সুতরাং 'সান্ত' ও 'অনন্ত' শব্দ দু'টার অর্থ হবে যথাক্রমে 'finite' ও 'infinite' এবং 'সসীম' ও 'অসীম' শব্দ দু'টাকে গ্রহণ করতে হবে যথাক্রমে 'bounded' এবং "unbounded' অর্থে।

কিন্তু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না; কারণ, জিজ্ঞাস্য হয় ইংরেজী finite ও bounded শব্দ দু'টা কিম্বা infinite ও unbounded শব্দ দু'টা কি একার্থবোধক নয়? এর উত্তর এই যে, ওরা ঠিক একার্থবোধক নয়। সসীম বা bounded বলতে বোঝায় যার সীমানা বা boundary আছে এবং অসীম বা unbounded বলতে বোঝায় যার সীমানা বা boundary নেই বা খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্য পক্ষে, সান্ত বা finite বলতে বুঝতে হবে যার অন্ত আছে এবং অনন্ত বা infinite বলতে বোঝাবে যার অন্ত নেই। সুতরাং মূল সমস্যা হলো 'সীমা' ও 'অন্ত' শব্দ দু'টার অর্থ নিয়ে।

এখন 'সীমা'র কথা বলতে সহজেই আমাদের মনে জাগে কোন-না-কোন জ্যামিতিক চিত্রের কথা। উদাহরণস্বরূপ একটা সরল রেখার কথাই ধরা যাক্। ওর 'সীমা' বলতে আমরা বুঝি ওর সর্ব্বশেষ বিন্দু দু'টাকে, যাদের মধ্যে রেখাটা অবস্থান করছে। সেইরূপ একটা সমতলের (যেমন খুব পাৎলা এক টুক্‌রা কাগজের) সীমা বলতে বোঝায় যে সরল বা বক্ররেখাগুলি ওকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে ঐ সকল রেখাকে। সেইরূপ একটা ঘনপদার্থের (যেমন একটা গোলকের বা একখানা ইঁটের) সীমানা বলতে বোঝায়, ওদের ঘিরে রয়েছে এইরূপ এক বা একাধিক তলকে; অর্থাৎ গোলকের সীমাতল হচ্ছে ওর বাঁকা পিঠটা এবং ইঁটের সীমাতল হচ্ছে ছ'টি সমতল যারা চার পাশ থেকে এবং ওপর ও নীচ থেকে ইটখানাকে ঘিরে রয়েছে। অন্য পক্ষে, 'অন্ত' শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বা আমরা জড়াতে চাই একটা ছোট-বড়র ধারণা বা পরিমাণ-জ্ঞান; অর্থাৎ উপযুক্ত মাপকাঠির সাহায্যে এক, দুই ক'রে গুণে গুণে, যাকে মেপে শেষ করা যায় তাকে বলা যাবে সান্ত বা finite আর যাকে শেষ করা যায় না বা শেষ করা যাবে ব'লে কোন ভরসাই পাওয়া যায় না—তাকে আমরা মেনে নেবো অনন্ত বা infinite ব'লে।

মোটের ওপর, 'সীমা'র ধারণার সঙ্গে আমরা 'সসীম' ও 'অসীম' শব্দ দু'টাকে এবং 'ব্যাপ্তি'র ধারণার সঙ্গে 'সান্ত'

ও 'অনন্ত' শব্দ দু'টাকে জড়িত করবো এই সংজ্ঞা মেনে নিলে হেঁয়ালি অনেকটা কেটে যায় ; কারণ তা' হ'লে 'বিশ্ব অসীম হ'লেও সান্ত' এই বাক্যটার অর্থ হবে—বিশ্বের কোন সীমাতল না থাকলেও ওর একটা পরিমাপযোগ্য ব্যাপ্তি বা আয়তন রয়েছে।

তবু গোলযোগ মিটতে চায় না। কারণ, এখনও এইরূপ প্রশ্ন ওঠে : একটা সরল রেখা টানলে আমরা দেখতে পাই যে, রেখাটা কেবল সসীমই নয়, সান্তও বটে। কারণ, ওর যেমন দু'টা নির্দ্দিষ্ট সীমা-বিন্দু রয়েছে সেইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যও রয়েছে। আর এও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ সীমা-বিন্দু দু'টা ক্রমে দূরে স'রে গিয়ে একেবারে নিখোঁজ হ'তে হ'লে এবং এইরূপে রেখাটাকে অসীম হ'তে হ'লে, ওর দৈর্ঘ্যটাকেও ক্রমে বেড়ে গিয়ে শেষটা অনন্ত হ'তে হয়। সুতরাং 'অসীম' ও 'অনন্ত'র ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? একটা সমতল নিয়ে বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এই পুস্তকের একখানা সমতল পাতার কথাই ধরা যাক্। চারটা সরল রেখা ওকে চার পাশ থেকে ঘিরে রয়েছে। যদি এই সীমারেখা চারটা বড় হ'তে হ'তে একেবারে নাগালের বাইরে চলে যায় এবং ফলে পাতাখানা অসীম হ'য়ে দাঁড়ায় তবে ওর পরিমাণ বা ক্ষেত্রফলটাকেও ক্রমে বড় হ'তে হ'তে শেষটা অনন্ত হ'তে হবে। সুতরাং সরলরেখা এবং সমতলের বেলায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ওদের অসীমত্বের সঙ্গে অনন্তত্বের ধারণাও ওতপ্রোত হ'য়ে জড়িয়ে রয়েছে। আরও দেখা যায় যে, যে দেশ (space) বা জড়-বিশ্বের মধ্যে আমরা বাস করছি তার সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা খাটে। 'দেশ' অবশ্য সরলরেখার মত শুধু একদিকে বিস্তৃত নয় কিম্বা তলের মত শুধু দ্বিধা বিস্তৃতও নয় ; কারণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছাড়া, বেধের দিকেও ওর আলাদা একটা বিস্তৃতি রয়েছে। কিন্তু এই ত্রিধাবিস্তৃত দেশকেও আমরা সরল-রেখার মতই সোজা বা সমতলের মতই চেপ্টা ব'লে অনুভব ক'রে থাকি—বক্ররেখা বা বক্রতলের মত ওকে বাঁকা ব'লে আমাদের মনে কখনও কোন সন্দেহেরই উদয় হয় না। ফলে এই কল্পনাটাই এযাবৎ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে যে, এই বিরাট বিশ্ব একটা অতিমাত্রায় দীর্ঘ সরলরেখা কিম্বা অতি প্রকাণ্ড একটা সমতলের মতই যুগপৎ অসীম ও অনন্ত। যদি ঐ নীল আকাশকে আমরা আমাদের ত্রিধাবিস্তৃত দেশের সীমাতল ব'লে নির্দ্দেশ করতে চাই, তবু কল্পনাবলে ওকে সুদূর নক্ষত্র-রাজ্যের ওপারেও এতদূর ঠেলে নিয়ে যাই যে, তা' সম্পূর্ণ-রূপেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে পড়ে। ফলে, দেশের অসীমত্বের ধারণার সঙ্গে ওর অনন্তত্বের ধারণাও আমাদের মনে স্বতঃই জড়িত হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং কেবল সরলরেখা কিম্বা সমতল সম্বন্ধেই নয়, আমাদের একটানা 'দেশ' সম্বন্ধেও ঐ প্রশ্নই ওঠে—ওর অসীমত্বের ও অনন্তত্বের ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোন্‌খানটায় এবং পার্থক্যই যদি না থাকে তবে বিশ্বকে অসীম ব'লে মেনে নিয়েও সান্ত ভাবতে যাব কেন ?

এর উত্তর এইরূপ। রেখাটা সরল রেখা, তলটা সমতল এবং দেশটা চেপ্টাদেশ হলেই ওরূপ যুক্তি খাটে কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে—বক্ররেখা, বক্রতল বা বক্রদেশের বেলায়—ও-যুক্তি খাটে না। 'বক্রদেশ' কথাটার মধ্যে চমকে ওঠার মত কিছু নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, একধা বিস্তৃত রেখা যেমন সরলও হতে পারে বক্রও হতে পারে, দ্বিধা-বিস্তৃততল যেমন সমতলও হতে পারে বক্রতলও হতে পারে, সেইরূপ ত্রিধাবিস্তৃত জড়বিশ্বও কেবল চেপ্টাদেশ রূপেই নয়, সুযোগ পেলে বক্রাকারেও অবস্থান করতে পারে। আমরা এও দেখতে পাই যে, যদিও সরল রেখা এবং সমতল চিরদিন একই একটানা চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকে, তবু বক্ররেখা কিম্বা বক্রতলের চেহারার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বিভিন্ন আকারের বক্ররেখার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যথা বৃত্তের পরিধি, উপবৃত্ত (ellipse), অধিবৃত্ত (parabola), পরাবৃত্ত (hyperbola) ইত্যাদি এবং বিশ্রী রকমের আঁকাবাঁকা আরো কতশত রেখা। সেইরূপ বিভিন্ন চেহারার বক্রতলেরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যথা, গোলকের পিঠ, ডিম্বের পিঠ, স্তম্ভের পিঠ ইত্যাদি এবং এ-ছাড়াও বিভিন্ন ভঙ্গিমার কতশত পিঠ। এদের সংখ্যা এত বেশী যে, বক্রমূর্ত্তিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলবার মত ক্ষমতা কোন জগতেরই আছে কি না সে বিষয়ে স্বতঃই মনে সন্দেহ জাগে। যদিও একথা খুবই সত্য যে, 'দেশ'কে আমরা সমতলের মত চেপ্টা ব'লেই অনুভব করে থাকি তবু তা' যে আমাদের দৃষ্টির ভুল নয় এ-কথা হলফ্ করে বলবার মত কোন প্রমাণই আমরা

উপস্থিত করতে পারিনে। অন্যপক্ষে, আধুনিক বিজ্ঞান এমন সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ত্রিধাবিস্তৃত দেশকেও একটা বিশিষ্ট অর্থে বক্র বলে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

ঐ সকল যুক্তির কথা আমরা পরে তুলবো। এখানে এই কথাটাই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সরলরেখা, সমতল এবং চেপ্টাদেশের বেলায় 'অসীম' ও 'অনন্তে'র ধারণা এক হলেও বক্ররেখা, বক্রতল এবং বক্রদেশের বেলায় ঐ দুই ধারণা পরস্পর থেকে পৃথক্ হয়ে পড়ে। একটা বক্ররেখা কিম্বা বক্রতলের দিকে তাকালে এর অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কারণ, যদিও সরলরেখার সীমাবিন্দু দু'টার পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে তবু বক্ররেখার বেলায় আমরা দেখতে পাই যে, ঐ বিন্দুদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও থাকতে পারে আবার মিলে মিশে এক হয়েও যেতে পারে। এক টুক্‌রা সরু সূতাকে বাঁকিয়ে ওর সীমাদ্বয়কে আমরা অনায়াসেই মুখোমুখি করে মিলিয়ে দিতে পারি। এই অবস্থায় ওকে সীমাহীন কিম্বা অসীম ব'লে বর্ণনা করতে আমাদের কল্পনায় বাধে না; অথচ ওর পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য—দু'ফুট বা দু'ইঞ্চি—যা' ছিল তা'ই থেকে যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, যতক্ষণ সরলত্ব বজায় থাকে কেবল ততক্ষণই কোন একটা রেখা ওর অসীমত্বের ধারণাকে অনন্তত্বের ধারণার সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে, কিন্তু রেখাটা বক্রত্ব গ্রহণ করলে ঐ দুই ধারণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে একটা বৃত্তের কিম্বা উপবৃত্তের (ellipse-এর) পরিধি অসীম হয়েও সান্ত (নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) হয়ে থাকে। বক্রতলের বেলাতেও অনুরূপ কথা খাটে। একটা গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকার পদার্থের বক্রপিঠের কোন সীমারেখা আমরা খুঁজে পাই নে। ঐ সকল পিঠের ওপর এমন কোন রেখাই আমরা টানতে পারি নে যার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, ওর কেবল এ-পাশ পর্য্যন্তই তলটার বিস্তার রয়েছে, ও-পাশে আদৌ নেই। তবু পরিমাণে গোলকের পিঠটা সান্ত—পাঁচ কিম্বা দশ বর্গফুট এইরূপ। ঠিক অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে বলতে পারা যায় যে, আমাদের ত্রিধা বিস্তৃত দেশ বা এই জড়বিশ্বও যদি চেপ্টা না হয়ে সত্যই বক্র হয় এবং ঐ বক্রতা বিশিষ্ট ধরণের (বৃত্তের পরিধি, গোলকের পিঠ প্রভৃতি জাতীয়) হয় তবে বিশ্ব অসীম হয়েও সান্ত হতে পারে; অর্থাৎ ওর সীমান্তল খুঁজে না পেলেও ওর আয়তনকে অত ঘনফুট বা ঘনমাইল ব'লে মত প্রকাশ সম্ভব হতে পারে; এবং এজন্য কোন সৃষ্টিছাড়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং জড়বিশ্বকে 'সান্ত' বলে কল্পনা করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে, ওকে বক্র বলে গ্রহণ করবার পক্ষে আদৌ কোন যুক্তি আছে কি না? এর উত্তর এই যে, আপেক্ষিকতাবাদের সময় (১৯০৫-১৯১৫) থেকে আমাদের এইরূপ যুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে আসছে। কিন্তু তা' অনুসরণ করতে হ'লে যে কথাটা বিশেষ করে বোঝবার দরকার তা' হচ্ছে এই যে, বিশ্বই হোক্ বা অন্য কোন পদার্থই হোক্, ওকে বক্রভাবে অবস্থান করতে হলেই, ওর বিস্তৃতির সঙ্গে যার মধ্যে ওর অবস্থান তাঁর বিস্তৃতির একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। বক্রাকারে অবস্থিত পদার্থ মাত্রই, অবলম্বন স্বরূপ, একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জগতের অস্তিত্ব দাবি করে এবং নিজের বিস্তৃতি ও ঐ জগতের বিস্তৃতির মধ্যে একটা সম্বন্ধেরও দাবি করে। উদাহরণ স্বরূপ একটা বক্ররেখার কথা বিবেচনা করা যাক্। বক্ররেখাও সরলরেখার মতই একধা বিস্তৃত বা দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, তবু সরলরেখা টানবার জন্য একখানা কাগজের একান্তই আবশ্যক হয় না, কিন্তু বক্ররেখা আঁকতে হলেই একটা তলের, অর্থাৎ কাগজের মত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট একটা দ্বিধা-বিস্তৃত জগতের আবশ্যক হয়ে থাকে। আরো দেখা যায় যে, কাগজের ওপর (যেমন পুস্তকের একখানা সাদা পাতার ওপর) ওর দৈর্ঘ্য বরাবর বা প্রস্থ বরাবর একটা সরলরেখাই টানতে পারা যায়, বক্ররেখা পারা যায় না। ঐ দিক দু'টা অবশ্য পরস্পর নিরপেক্ষ বা পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত; সুতরাং যে দিক ধরেই সরলরেখা টানা যাক্ না কেন তার ফলে দ্বিতীয় দিক বরাবর অগ্রসর হওয়া ঘটে না মোটেই। কিন্তু ওর ওপর একটা বক্ররেখা (যেমন একটা বৃত্তের পরিধি) আঁকতে গেলে দেখা যায় যে, পাতাটা শুধু দৈর্ঘ্যের দিকে বা শুধু প্রস্থের দিকে এগিয়ে চলবে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা চলে না—ওর যে দিক ধরেই এগোই না কেন সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে কিছু না কিছু এগোতেই হয়। এও সহজে বোঝা যায় যে, পাতাটার বিস্তৃতি যদি দু'দিকে না হয়ে একদিকে (যেমন

দৈর্ঘ্যের দিকে) মাত্র হতো তা'হলে ওর ওপর আমরা কেবল একটা সরল রেখাই টানতে পারতাম, বক্ররেখা পারতাম না। এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বক্ররেখা আঁকতে হলেই, যার ওপর ওকে আঁকতে হবে তার বিস্তৃতি রেখার বিস্তৃতি থেকে অন্ততঃ একমাত্রা বেশী হওয়া চাই। রেখা মাত্রই একধা বিস্তৃত হলেও উভয় জাতীয় রেখার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। সরলরেখা তার অস্তিত্বের জন্য একাধিক দিকে বিস্তার বিশিষ্ট কোন জগতের মুখাপেক্ষী হয় না কিন্তু বক্ররেখা অন্ততঃ দ্বিধা বিস্তৃত কোন জগতের অপেক্ষা রাখে। সেইরূপ সমতল ও বক্রতলের তুলনা করলেও দেখা যায় যে, উভয়ে ওরা দ্বিধা বিস্তৃত হলেও বক্রতলের (যেমন একটা গোলকের পিঠের) বক্রাকারে অবস্থানের জন্য একটা ত্রিধা-বিস্তৃত দেশের (যেমন আমাদের এই জড়বিশ্বের) প্রয়োজন হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে, একটা সমতল সমতলের মত কোন দ্বিধা বিস্তৃত দেশের মধ্যেই অনায়াসে অবস্থান করতে পারে। সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায় যে, পদার্থবিশেষকে বা দেশবিশেষকে যদি বক্রাকারে অবস্থান করতে হয় তবে যা'র মধ্যে ওর অবস্থান তার বিস্তৃতি ওর চেয়ে অন্ততঃ একমাত্রা বেশী হওয়ার প্রয়োজন।

এর কারণও স্পষ্ট। কোন কিছুকে বক্রাকারে অবস্থান করতে হলে বা গুটিয়ে থাকতে হলে, গুটোবার জন্য ঐ পদার্থটা অন্ততঃ একটা বাড়্তি দিক খোঁজে, যে দিকে অগ্রসর হয়ে গুটানো সম্ভব হতে পারে। সমতল মেঝের ওপর একটা পাটি অনায়াসেই চেপ্টা হয়ে বিছিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ওকে গুটোতে হলে, ওপরের দিকে টেনে তুলেই ঐ কার্য্য সম্ভবপর হয়। ঘরটাও যদি মেঝের মত মাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট হতো—যদি ওর উচ্চতা না থাকতো, বা থেকেও তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকতো—তবে কোন্ দিক ধরে পাটি গুটোতে হবে তা' আমরা ধারনাই করতে পারতাম না এবং ঐরূপ ব্যাপার আমাদের কাছে একটা সৃষ্টিছাড়া কল্পনা বলেই মনে হত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যদি একধা, দ্বিধা এবং ত্রিধা বিস্তৃত দেশের মত একটি চতুর্ধা বিস্তৃত দেশের অস্তিত্বও সত্যকার ব্যাপার হয়, অথবা যে জগৎ নিয়ে আমাদের সত্যকার কারবার তা' যদি প্রকৃতই চতুর্ধা বিস্তৃত হয় তবে তা'র মধ্যে আমাদের এই ত্রিধা বিস্তৃত দেশ বা জড়বিশ্ব কেবল চেপ্টাদেশরূপেই নয়, পরন্তু ওর চতুর্থ দিক ধরে গুটিয়ে গিয়ে বক্রাকারেও অবস্থান করতে পারে—যদিও ঐ বক্রতা আমাদের অনুভূতিতে ধরা নাও পড়তে পারে শুধু এই জন্য যে, ঐ চতুর্থ দিক সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই।

সুতরাং জিজ্ঞাসা দাঁড়ায়: আমাদের বাস্তব জগৎ কি সত্যই চতুর্ধা বিস্তৃত? চতুর্ধা বিস্তৃত হলেও ওর মধ্যে আমাদের ত্রিধা বিস্তৃত দেশ যে সত্যই গুটিয়ে রয়েছে, সমতলের মত বা একটানা পাটির মত চেপ্টা হয়ে অবস্থান কর্চ্ছে না এইরূপ মনে করবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? আর গুটিয়ে রইলেই বা তা' আমরা উপলব্ধি করতে পার্চ্ছিনে কেন?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের আপেক্ষিকতা-বাদের শরণাপন্ন হতে হয়। আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের (special theory of relativityর) একটা বড় সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের ঘটনাময় বাস্তব জগৎ সত্যই চতুর্ধা বিস্তৃত, কিন্তু ওর চতুর্থদিকটাকে আমরা 'কাল' (time) নামে অভিহিত করে দেশের (space এর) কোঠা থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি যে, ঐ দিকটাও যে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও বেধের মতই বাস্তব জগতের একটা বিশিষ্ট দিক তা' এ যাবৎ ধারণা করেই উঠতে পারি নি; সুতরাং দেশের বক্রতার সম্ভাবনা মাত্রও এতদিন আমাদের কল্পনায় স্থান পায় নি। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের যুক্তি অনুসরণ করে বিজ্ঞান জগতে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠা লাভ করছে যে, ত্রিধা বিস্তৃত এই দেশ—যাকে আমরা জড় বিশ্ব আখ্যা দিয়েছি—আমাদের সত্যকার জগৎ নয়, সত্যকার জগতের ছায়া মাত্র। বাস্তব জগৎকে শুধু দেশ উপাদানে গঠিত বা শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থ-বেধময় মনে করে আমরা এ যাবৎ ভুল করে এসেছি। ঐ দিকত্রয় নিরপেক্ষ (বা ওদের প্রত্যেকের সম্পর্কে লম্বভাবে অবস্থিত) একটা চতুর্থ দিক কল্পনা করে ওদের সঙ্গে যোগ করে দিলে যে চতুর্ধা বিস্তৃত জগৎ গড়ে ওঠে তাকেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের বাস্তব জগৎ বলে। কিন্তু ঐ চতুর্থ দিককে মনে করতে হবে 'কাল' উপাদানে গঠিত বলে। কালকে আমরা দৈর্ঘ্য কিম্বা প্রস্থের মতই একধা-বিস্তৃত একটি সীমাহীন সরল রেখা রূপে কল্পনা করতে পারি,

যার একপ্রান্ত সুদূর অতীতের এবং অপর প্রান্ত অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধ তমসায় লীন হয়ে গেছে। এই কালের দিক্‌টাই ঐ চতুর্থদিক যা সম্পূর্ণ স্বাধীন দিক হলেও, দেশের দিকত্রয়ের সঙ্গে যার সংযোগ এমন দৃঢ় যে, তা বিচ্ছিন্ন করে ফেললে এই ঘটনাময় জগৎ একান্তই খাপছাড়া হয়ে পড়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কালকে দেশের কোঠা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই আমাদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভুল শুধরে নিয়ে উক্তরূপে গঠিত চতুর্ধা বিস্তৃত জগৎকেই সত্যকার জগৎ বলে গ্রহণ করতে হবে এবং ওর রচনায় দেশের দিকত্রয়ের সঙ্গে কালের দিকটাকে সমান আসন দান করতে হবে। সুতরাং ওকে 'দেশ' না বলে ঘটনা-জগৎ বা দেশ-কাল-ময় জগৎ বলাই সমীচীন।

দেশ ও কালের উক্তরূপ সংযোগ কল্পনার পক্ষে যুক্তি এইরূপ। আমাদের প্রকৃত কারবার ইঁট, কাঠ, গ্রহ, নক্ষত্র জাতীয় ত্রিধা বিস্তৃত পদার্থের তৎকালীন অস্তিত্ব নিয়েই নয়—ওদের ধারাবাহিক অস্তিত্ব নিয়ে, এবং জাগতিক পরিবর্ত্তন বা ঘটনা সমূহ নিয়ে। এখন ছোটখাটো প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কেই আমাদের মনে যুগপৎ অন্ততঃ দুটো প্রশ্নের উদয় হয়—ঘটনাটা কোথায় ঘট্‌লো এবং কখন ঘট্‌লো? এর অর্থ এই যে, ঘটনা মাত্রেরই যেমন আমরা দেশের মধ্যে অবস্থান খুঁজি সেইরূপ কাল সম্পর্কেও অবস্থান খুঁজে থাকি। ফলে প্রত্যেক ঘটনা-বিন্দুর (বা ক্ষুদ্র ঘটনার) সঠিক অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য কিম্বা পুরাপুরি বর্ণনা দানের জন্য দেশের পাদ-ত্রয়ের (তিনদিক ব্যাপী তিনটা দূরত্বের বা তিনটা space-co-ordinate এর) সঙ্গে কালের পাদেরও (time co-ordinate এর) সংযোগ সাধনের আবশ্যক হয়। বস্তুতঃ এই চারিটি পাদের ওপর ভর করেই জগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটনার সাজের ভেতর নিজের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হচ্ছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের এই সত্যেরই আভাস দিচ্ছে যে, জগতের ঘটনাপুঞ্জকে ঘটনা প্রবাহরূপে কল্পনা না করে ঘটনার সাজরূপে উপলব্ধি করতে হবে; অথবা পদার্থশাস্ত্র হতে গতিবিজ্ঞানের পাঠ তুলে দিয়ে একটা নূতন ধরণের স্থিতি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার বিশ্ববর্ণনার চিত্রপটে কালের অতীত-ভবিষ্যৎ রেখাটা দেশের রেখাত্রয়ের সহিত মিলে মিশে এক অচলায়তনের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে। এইরূপে যে দেশ-কাল-ময় নূতন জ্যামিতি গড়ে উঠবে তা প্রচলিত জ্যামিতি থেকে ভিন্ন হলেও ঐ হবে আমাদের ঘটনাময় জগতের সত্যকার জ্যামিতি। এতে আমাদের পুরাণো ইউক্লিডিয় জ্যামিতির অল্পবিস্তর ছাপ থাকতে পারে বা, না ও পারে। যদি থাকে তবে ওকে বলা যাবে আধা-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি, অন্যথায় ওর নাম হবে নন্‌-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি।

সুতরাং ঘটনা সমূহকে ভিত্তি করে জগতকে উপলব্ধি করতে হলে আমরা দেখতে পাই যে, দেশ এবং কাল পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, কালকে বাদ দিয়ে দেশের এবং দেশকে বাদ দিয়ে কালের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক দৃষ্টির অভাবেই আমরা কালকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। সেইরূপ দেশের তিন দিকের বিস্তারকেও (বা পদার্থবিশেষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধকেও) আমরা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা করে দেখাই সুবিধা-জনক মনে করি। কিন্তু একখানা ইঁটের স্থূলতার দিকে নজর না দিয়ে, শুধু অপরটার দিকে তাকিয়ে ওকে দ্বিধা বিস্তৃত মনে করলে যে ধরণের ভুল করা হয়, এই ঘটনাময় জগতের কালের দিকটাকে ছেটে ফেলে শুধু দেশময় উপাদানটার দিকে তাকিয়ে ওকে ত্রিধা বিস্তৃত বলে গ্রহণ করলেও সেই ধরণেরই ভুল করা হয়। যে অর্থে আমার ফটোটা বা দেওয়ালে পতিত ছায়াটা আমার প্রকৃত দেহ-ময় ওর বেধ-ছেটে-ফেলা অভিক্ষেপ বা projection মাত্র, সেই অর্থে ত্রিধা বিস্তৃত এই বিরাট দেশও আমাদের সত্যকার জগৎ নয়, পরন্তু চতুর্ধা বিস্তৃত ঐ ব্যাপকতর জগতের কালের-দিক্-ছেটে ফেলা ছায়া মাত্র। সুতরাং এই ত্রিধা বিস্তৃত দেশ যদি ঐ চতুর্ধা বিস্তৃত জগতের মধ্যে, ওর চতুর্দিক ধরে গুটিয়ে গিয়ে কোন না কোন ধরণের বক্রাকারে অবস্থান করে তবে ঐ ব্যাপারকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; বরঞ্চ ঐরূপ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওর না গুটোনোটাকেই অপেক্ষাকৃত আশ্চর্য্যজনক মনে হবে।

আর সত্যই যে জড়বিশ্ব গুটিয়ে রয়েছে তার অনুকূলে যুক্তিও রয়েছে আপেক্ষিকতাবাদের বিচারপ্রণালীর মধ্যেই। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে (General theory of relativityতে) জড়বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটা একটা অভিনব প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এর মূলকথা এই যে,

যে সকল দেশে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বিদ্যমান সেই সকল দেশ স্বভাবতঃই বক্রাকারে অবস্থান করে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ জড়দ্রব্যমাত্রেরই বিশিষ্ট ধর্ম্ম। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররূপে জড়খণ্ডসমূহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ কচ্ছে। জড়বিশেষের কাছ থেকে (যেমন ভূপৃষ্ঠ থেকে) যতই দূরে সরা যায় ওর আকর্ষণের প্রভাবও অবশ্য ততই কমতে থাকে, কিন্তু দূর বা নিকট এমন কোন দেশ নাই যা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ বক্রহীন দেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এই বক্রতা একটা বৃত্তের পরিধি কিম্বা গোলকের পিঠের বক্রতার মত আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হবে এ আশা আমরা করতে পারিনে। একে মেনে নিতে হয় যুক্তির দৃষ্টি দিয়ে।

এই যুক্তি সংক্ষেপে এইরূপ। আপেক্ষিকতাবাদের মূল সূত্র অনুসরণ ক'রে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আইনষ্টাইন দেশ সম্পর্কে এক নূতন ধরণের নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি রচনা করেছেন। এ জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউক্লিডের জ্যামিতি এই সাধারণ জ্যামিতিরই একটা অধ্যায় মাত্র, যেমন সমতল বক্রতলেরই একটা বিশিষ্ট ধরণের প্রকাশ-ভঙ্গী মাত্র। বস্তুতঃ ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ও সিদ্ধান্তগুলি সমতল এবং চেপ্টাদেশের পক্ষেই খাটে, গোলকের পিঠের মত বক্রতলের বেলায় কিম্বা কোন বক্রদেশের বেলায় খাটে না। উদাহরণস্বরূপ ইউক্লিডিয় জ্যামিতির একটা প্রধান স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ করা যাক্, যথা—দু'টি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে একটা এবং মাত্র একটা সরলরেখাই টানা যেতে পারে। এখানে 'সরলরেখা' বলতে বুঝতে হবে ঐ বিন্দুদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম রেখাকে। কিন্তু এ উক্তি সমতল (এবং চেপ্টাদেশ) সম্পর্কেই প্রযোজ্য, ধরাপৃষ্ঠের মত বক্রতল (কিম্বা কোন বক্রদেশ) সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কথা ধরা যাক্। ওরা ভূপৃষ্ঠেরই দু'টা নির্দ্দিষ্ট বিন্দু। আমরা জানি যে, সরলরেখা দ্বারা যদি ওদের সংযোগ সাধন কর্‌তে হয় তবে এরূপ রেখা মাত্র একটাই টানা যেতে পারে যাকে আমরা বলি পৃথিবীর অক্ষরেখা (axis) এবং যাকে টান্‌তে গিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ ক'রে যেতে হয়। সুতরাং এই রেখাটা অবস্থান করে পৃথিবীর ভেতরে এবং সম্পূর্ণরূপেই ধরাপৃষ্ঠের বাইরে। কিন্তু যদি পৃথিবীর গোলাকার পিঠের ওপর দিয়ে রেখা টেনে মেরুদ্বয়ের সংযোগ সাধন কর্‌তে হয়, তবে যে রেখাই টানি না কেন তা' আমাদের কাছে বাঁকা ব'লেই প্রতীয়মান হবে। এই সকল অসংখ্য বক্ররেখার মধ্য থেকে আবার একসেট বক্ররেখা বেছে নেওয়া যায় যারা বাদবাকি সবগুলি রেখার তুলনায় ক্ষুদ্রতম। এদেরও সংখ্যা এত বেশী যে গুণে শেষ করা যায় না। এদের বলা হয় দ্রাঘিমা-রেখা বা (Lines of Longitude)। এই রেখাগুলি পরস্পরের সমান এবং প্রত্যেকেই ওরা পৃথিবীর অর্দ্ধ-পরিধি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ক্ষুদ্রতম বলে যদি এদের সরল রেখা আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতে হয় যে, ধরাতলের ওপর দিয়ে উভয় মেরুর সংযোগকারী যে সকল সরল রেখা টানা যেতে পারে সংখ্যায় তারা একটি মাত্র নয়, অসংখ্য। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, ইউক্লিডিয় জ্যামিতির উক্ত স্বতঃসিদ্ধটা সমতলের পক্ষে (কিম্বা চেপ্টাদেশের পক্ষে) খাটলেও, বক্রতলের (কিম্বা বক্রদেশের) পক্ষে খাটে না।

তবু খট্‌কা দাঁড়ায় এই যে, ঐ দ্রাঘিমা রেখাগুলি যে সরল রেখা নয় তা'ত আমরা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যদিও ওদের ছোট খাটো (যেমন এক আধমাইল দীর্ঘ) টুক্‌রা আমাদের কাছে সরল রেখার মত প্রতীয়মান হয় এবং এক টুক্‌রা ধরাতলকেও (যেমন একবিঘা জমিকে) আমরা সমতল বলে ভুল করে থাকি তবু এরোপ্লেনে চড়ে খুব উঁচু থেকে তাকালে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, গোটা ভূতলটাও যেমন সমতল নয় সেইরূপ গোটা দ্রাঘিমা-রেখাগুলিও সরল রেখা নয়। সুতরাং ওদের সরল রেখা বলে এবং ওদের সমবায়ে গঠিত ভূপৃষ্ঠকেই বা সমতল বলে ভাবতে যাব কেন? এর উত্তর এইরূপ। ধরাপৃষ্ঠকে আমরা বাঁকা দেখছি এইজন্ত যে, যেমন ওর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের, সেইরূপ ওর ওপর লম্বভাবে অবস্থিত ঊর্দ্ধাধঃ দিকটারও আমাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আছে; সুতরাং এই তৃতীয় (ঊর্দ্ধাধঃ) দিক ধ'রে অগ্রসর হয়েই যে ধরাতল বাঁকা হতে পেরেছে তা'ও আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি। কিন্তু আমাদের দিকজ্ঞান যদি ধরাতলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিকেই সীমাবদ্ধ হতো—ওর ঊর্দ্ধাধঃ দিক সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই না থাকতো তবে

ধরাতলের বক্রাকারে অবস্থানের সম্ভাবনাটাই আমাদের কাছে হাস্যকর ব্যাপার হতো এবং ওর কেন্দ্রের খোঁজ করাটাও পাগলামি বলে মনে হতো। ফলে ধরাতলকে সমতল এবং ঐ দ্রাঘিমা রেখাগুলিকে সরল রেখা রূপে কল্পনা করতেই আমরা অভ্যস্ত হতাম।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা ত্রিধা বিস্তৃত দেহ-বিশিষ্ট ত্রিপাদ জীব। সুতরাং দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছাড়া আমাদের একটা তৃতীয় দিকেরও (বেধ বা উচ্চতার) প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে। তাই উঁচুতে উঠে ভূ-পৃষ্ঠের গোলাকারটা যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি সেইরূপ মাটি খুঁড়ে সরাসরি পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়েও উপস্থিত হতে পারি এবং সেখানে দাঁড়িয়েই পৃথিবীর এমন একটা ব্যাস টানতে পারি যা'কে উভয় মেরুর সংযোগকারী একমাত্র সরলরেখা বলে বর্ণনা করতে আমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় না। কিন্তু এমন জীবও কল্পনা করা যায় যা'দের দেহের বিস্তৃতি একটুকরা খুব পাতলা কাগজের মত মাত্র দু'দিকে; অর্থাৎ যা'দের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে কিন্তু বেধ বা উচ্চতা আদৌ নেই। এইরূপ জীবের বিস্তার জ্ঞানও ঐ দু'দিকে সীমাবদ্ধ। এইরূপ দ্বিপাদ জীব অবশ্য পৃথিবীর গোলাকার পিঠের ওপর বিচরণ ক'রে ওর কোন সীমারেখা আবিষ্কার করতে পারবে না—যেমন আমরাও পারি নে। ফলে ধরাপৃষ্ঠ উভয় শ্রেণীর জীবদের কাছেই অসীম ব'লে প্রতীয়মান হবে। তবু ওদের ও আমাদের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য দাঁড়াবে এই যে, ধরাতলকে আমরা বক্রতল রূপে প্রত্যক্ষ করলেও ওরা ওকে তৃতীয় দিকের (বা উর্দ্ধাধঃ দিকের) জ্ঞানের অভাবে সমতল রূপেই অনুভব করবে, এবং ঐ দ্রাঘিমারেখাগুলিকেও বক্রতাহীন সরলরেখা রূপেই গ্রহণ করবে। সুতরাং ওরা অনায়াসেই বলতে পারবে যে, ধরাতলের দু'টা বিশিষ্ট বিন্দুকে অসংখ্য সরলরেখা দ্বারা যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু ওদের কথা আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি নে, কারণ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, আমাদেরও যদি ঐ তৃতীয় দিকের জ্ঞানের অভাব ঘটতো এবং ফলে ওদের মতই অসহায় জীব হতাম তবে আমরাও ঠিক ঐ কথাই বলতাম।

ওদের সঙ্গে আমাদের আরো একটা মতভেদ দাঁড়াবে এই যে, আমরা বলবো ভূ-পৃষ্ঠ কেবল গোলাকারই নয় পরন্তু একটা পরিমাপযোগ্য (প্রায় আট হাজার মাইল দীর্ঘ) ব্যাস বিশিষ্ট; সুতরাং ধরাতল অসীম হ'লেও সান্ত বটে। অন্যপক্ষে ওরা বলবে, ধরাতল একটা প্রকাণ্ড সমতল এবং ওর বক্রাকার সীমারেখাটা—যাকে ওরা ওদের সমতল জগতের আকাশ বলে বর্ণনা করবে—এতদূর সরে রয়েছে যে, একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং ওরা ভাববে যে, ওদের ধরাতলরূপী প্রকাণ্ড জগৎ কেবল অসীমই নয়, পরন্তু অনন্তও বটে।

ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে আরো একটা উদাহরণ নেয়া যাক। ইউক্লিডিয় জ্যামিতির একটা সিদ্ধান্ত এই যে, একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি দুই সম-কোণের সমান। এই উক্তিটাও সমতল এবং চেপ্টাদেশের পক্ষেই খাটে—বক্রতল এবং বক্রদেশের পক্ষে খাটে না। একথা বোঝবার জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রাঘিমা রেখাগুলির মধ্য থেকে দু'টা বেশ দূরবর্ত্তী রেখা বেছে নেওয়া যাক্। প্রত্যেকেই এরা নিরক্ষবৃত্ত বা Equatorকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। এই দ্রাঘিমা রেখা দু'টাকে নিয়ে এবং ওদের অন্তর্বর্ত্তী নিরক্ষবৃত্তের অংশটা নিয়ে একটা বেশ বড় ত্রিভুজ গঠিত হয়েছে। এই ত্রিভুজের কোণ তিনটার সমষ্টি নিশ্চয়ই দু' সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর, কারণ ওর ভূমিসংলগ্ন কোণ দু'টাই দুই সমকোণের সমান। একথা আমরাও বলবো দ্বিপাদ জীবেরাও বলবে। আমরা এর ব্যাখ্যা করবো ধরাতলকে বক্রতল বলে কিন্তু ওরা তা' সহসা বলতে পারিবে না; তবু ওর ওপর ইউক্লিডিয় জ্যামিতি খাটছে না কেন তা' বুঝতে না পেরে ধরাতল সত্যই সমতল না বক্রতল এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে প্রবৃত্ত হবে। একথা ঠিক যে, ধরাতলের একটা খুব ক্ষুদ্র অংশকে আমরাও সমতল রূপেই অনুভব করে থাকি; সুতরাং ধরাপৃষ্ঠের তিনটা খুব কাছাকাছি বিন্দুকে ক্ষুদ্রতম রেখা দ্বারা সংযোগ করলে যে ক্ষুদ্র ত্রিভুজটা পাওয়া যায় তার তিন কোণের সমষ্টি প্রায় দু'সমকোণের সমানই হয়ে থাকে, কিন্তু ত্রিভুজটা যতই বড় হতে থাকে ভূপৃষ্ঠের জ্যামিতির নন্‌ইউক্লিডিয় প্রকৃতিও আমাদের কাছেই ততই প্রকট হ'তে থাকে। এই যুক্তি অনুসরণ ক'রে বলতে পারা যায় যে, আমাদের ত্রিধা বিস্তৃত দেশেও পরস্পর থেকে খুব দূরবর্ত্তী তিনটা নক্ষত্রকে পরস্পরের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম রেখা দ্বারা যোগ করে দিয়ে যদি একটা প্রকাণ্ড

ত্রিভুজ অঙ্কিত করা যায় এবং ওর কোণ তিনটা মেপে যদি সত্যই দেখা যায় যে, তাদের সমষ্টি দু'সমকোণ অপেক্ষা বড়, তবে এই ত্রিধাবিস্তৃত বিশ্বকেও আমরা বক্রদেশ বলে গ্রহণ করতেই বাধ্য হব।

বস্তুতঃ ঐ দ্বিপাদজীবদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তারা ওদের জগতের (আমাদের ধরাপৃষ্ঠের) জ্যামিতি অনুশীলন করেই ওকে বক্র বলে মেনে নিতে পারবে। ওরা দেখবে যে, ওদের জগতে ইউক্লিডিয় জ্যামিতি খাটছে না, খাটছে একটা বিশিষ্ট ধরণের নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি। এর থেকেই ওরা অনুমান করতে পারবে যে, সমতল মূর্ত্তিতে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে ওদের জগৎ একটি বক্রতল এবং ওর নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে ওর বক্রতার মাত্রাও হিসাব করতে পারবে। অন্যপক্ষে ওদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও ক্ষীণদৃষ্টি তারা ওর সঙ্কীর্ণ প্রদেশ নিয়ে কারবারের ফলে ঐ নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতির কোন সন্ধান পাবে না; সুতরাং ওদের জগতকে সমতল জগৎ ভেবেই খুশী থাকতে চেষ্টা করবে।

আমাদের অবস্থাও অবিকল ঐ সকল দ্বিপাদ জীবদেরই মত। তৃতীয় দিকের জ্ঞানের অভাবে ওরা যেমন ওদের জগতের (আমাদের ধরাপৃষ্ঠের) বক্রতা প্রত্যক্ষ করতে পারে না আমরাও সেইরূপ আমাদের চতুর্ধা বিস্তৃত বাস্তব জগতের চতুর্থ দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে এই ত্রিধা বিস্তৃত দেশের (বা জড়বিশ্বের) বক্রতা প্রত্যক্ষ করতে পারিনে। ফলে আমরাও আমাদের জড়বিশ্বকে যুগপৎ অসীম ও অনন্ত ব'লে এ যাবৎ কল্পনা করে এসেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন তাঁরা দেশের বিরাট ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই দেখতে পান যে, ওর সম্পর্কে ইউক্লিডিয় জ্যামিতি খাটে না, খাটে একটা বিশিষ্ট ধরণের নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি; সুতরাং তাঁরা জোর করেই বলে থাকেন যে জড়বিশ্ব বক্রই বটে। গ্রহ নক্ষত্ররূপী জড়খণ্ড সমূহের অস্তিত্বের জন্যই বা ওদের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবেই এই বক্রতা এবং তা' সম্ভব হতে পেরেছে আমাদের বাস্তব জগৎ চতুর্ধা বিস্তৃত বলেই; কিন্তু যে জন্যই হোক, এই বক্রতা বিদ্যমান। ওর নন্-ইউক্লিডিয় জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে আইন্‌ষ্টাইন্ এও প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন যে, ঐ বক্রতা সেই ধরণের এবং সেইরূপ মাত্রার যে, জড়বিশ্ব অসীম হয়েও সান্ত বটে। যে অর্থে গোলাকার ধরাতল অসীম হয়েও সান্ত, সেই অর্থে ত্রিধাবিস্তৃত আমাদের বক্রদেশও অসীম হয়েও সান্ত। যদি আমরা আমাদের ত্রিপাদ দেহের সঙ্গে ব্যক্তিগত কালের দিক্‌টা জুড়ে দিয়ে ঐ চতুষ্পাদ মূর্ত্তিকেই আমাদের সত্যকার মূর্ত্তি বলে অনুভব করতে পারতাম তবে ধরাতলের বক্রতার মত ত্রিধা বিস্তৃত দেশের বক্রতাও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হতো এবং বিশ্বের অসীমতা সত্ত্বেও ওর সান্তত্বের ধারণা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, প্রকাণ্ড হ'লেও বিশ্ব অনন্ত নয়। ওর প্রকাণ্ডত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। জড়বিশ্ব এত প্রকাণ্ড যে, যে বেগবান আলোকরশ্মি সেকেণ্ড পরিমিত সময় অতিবাহিত হতে না হতে ভূপৃষ্ঠকে সাত আটবার পরিক্রমণ করে আসতে পারে, তার পক্ষেও কোন কোন নক্ষত্র থেকে যাত্রা করে পৃথিবীতে পৌঁছতে সহস্র বৎসরেরও অধিক সময় আবশ্যক হয়ে থাকে। তবু বিশ্ব এত বড় নয় যে, ঘন ফুট বা ঘন মাইলের মাপকাঠিতে ওর আয়তন নির্দ্দেশ করতে গিয়ে হার মানতে হবে। বিশ্বের আয়তন নির্দ্দেশের প্রণালী বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এখানে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, আইন্‌ষ্টাইন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা থেকে জড়বিশ্বের বর্ত্তমান আয়তন ও গড় ঘনত্ব নির্নীত হয়েছে। বর্ত্তমান আয়তন বলছি এইজন্য যে, এইরূপ ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে যে, বিশ্বের আয়তন ক্রমে বেড়েই চলেছে। আবার এও দেখতে পাওয়া গেছে যে, যতই ফেঁপে উঠছে বিশ্বের ফাঁপার মাত্রাও ততই বেড়ে চলেছে—রেখাটা যেন অনন্ত হবার দিকেই। আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর বাসভূমি যে এত প্রকাণ্ড অথচ আমাদের মতই সান্ত এতেই আমাদের সান্ত্বনা। তবু ধরাপৃষ্ঠের ওপর এক একটা ক্ষুদ্র গণ্ডী টেনে একমাত্র ওকেই 'আমার দেশ' বলে আঁকড়ে ধরে খুসী থাকতে চেষ্টা করছি কেন এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আশ্রয় ও আশ্রিত

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক

অনেককাল পরে পাঁচু দেশে ফিরলো। পাঁচ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। পাঁচুর জ্যেঠতুতো ভাই শ্রীহরি ভশ্চায নির্ব্বিরোধে সব কিছু দখল করে ভোগ করছিল; গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র করেছে পাঁচু আর বেঁচে নাই, সে আজ বৎসর তিনেক হল পুরীতে মারা গেছে।

কেউ অবিশ্বাসও করতে পারে নি। সেবার গ্রামের কতজন লোক পুরীতে রথ দেখতে গিয়েছিল, তারা বাড়ী ফিরে একথা প্রচার করেছে, কাজেই সন্দেহের অবকাশ হয় নি।

পাঁচু পাঁচ বৎসর আগে সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে চলে গিয়েছিল, মনে করেছিল আর সে সংসারে ফিরবে না। বিনশ্বর সংসারের পরে তার কেমন একটা ঘৃণা এসে পড়েছিল।

কারণ অবশ্য ছিল, এবং সে কারণটা ছিল সর্ব্বেশ্বরের মেয়ে চন্দ্রা।

একদিন চন্দ্রার সঙ্গে তার বিবাহের কথা হয়েছিল, এর মধ্যে সর্ব্বেশ্বরকে বিষ্ণুচরণের কাছ হতে বেশী রকম আশ্বাস পেয়ে তারই সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। পাঁচু বেশ নিশ্চিত ভাবেই দিন কাটাচ্ছিল, কতদিন সে কল্পনা করেছে চন্দ্রা তার ঘরে এসেছে, ভাত বেড়ে তাকে খেতে দিচ্ছে, তার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক কথায় সে সবই হয়ে গেল একেবারে মিথ্যে, একেবারে স্বপ্ন।

পাঁচুর সকল উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংসারে তার মা ছিল, সেও সেই সময় মারা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে পাঁচু একদিন বার হয়ে পড়লো দূরের পানে।

পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের খবর সে পায় নি। বৎসর খানেক আগে রথের সময় পুরীতে তার সঙ্গে দেশের কয়েকজন লোকের দেখা হয়েছিল। প্রথমটা তারা পাঁচুকে চিনতে পারে নি, কারণ পাঁচু পাঁচ বৎসরে প্রাকৃতিকভাবে খানিকটা বদলেছে। আবার নিজে ইচ্ছা করে বাবরী চুল রেখেছে, গোঁফ দাড়ি রেখেছে। স্বর্গদ্বারে যেতে বাঁদিকে একটা গাছের তলায় সে হাতে একটা চামর নিয়ে সত্যনারায়ণের গান গায়, পায়ে তার নাচের তালে ঘুমুর বাজে।

দেশের লোকেরা তাকে বাবাজি বলেই ডেকেছিল, এবং পয়সা ভাঙিয়ে পাই করে দান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও দিয়েছিল। পাঁচু তাদের মাথায় চামর ছোঁয়াতে গিয়ে হঠাৎ তাদের চিনে ফেলেছিল এবং আত্মবিস্মৃত ভাবে নিজের পরিচয়ও দিয়ে ফেলেছিল।

অবশ্য তারপর দিন হতে পাঁচুকে আর সেখানে দেখা যায় নি এবং দেশের লোকেরাও দেশে এসে সকলকে জানিয়েছিল পাঁচু এতকাল বেঁচে সন্ন্যাসী হয়েছিল, সম্প্রতি মারা গেছে।

জ্যেঠতুতো ভাই অশৌচ পালন করলে, কাঁদতে কাঁদতে ভাই হয়ে ভাইয়ের শ্রাদ্ধ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর নাম জমিজমা হতে খারিজ করিয়ে নিজের নামে করে ফেললে।

সেই পাঁচুকে সশরীরে পৌঁছতে দেখে শ্রীহরি যে আকাশ হতে পাতালে পড়লো একথা না বললেও চলবে।

দুই

ঘর নেই, সব সমতল হয়ে গেছে এবং সেই সমতল জায়গার উপর শ্রীহরি সযত্নে বেগুণগাছ লাগিয়েছে। গাছগুলি বেশ বড় বড় হয়েছে, ফুল ফুটবার মত হয়ে উঠেছে, আজ বাদে কাল বেগুণ যে ধরবে এবং প্রচুর রকমই যে ধরবে তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীহরি সযত্নে গাছের পাট করে, স্নেহময়ী মা যেমন করে সন্তানকে দেখে, তেমনি করে দেখে। সে লাখটাকার স্বপ্ন দেখে—বেগুণ বিক্রয় করে হয় তো সে কোঠাবাড়ী গেঁথে ফেলবে।

এমনই সময় ঝড়ের মত আচমকে এসে পড়লো পাঁচু।

শ্রীহরি কতক্ষণ নির্ব্বাকে তার পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর হাঁপিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁরে, তুই নাকি মরে গিয়েছিলি ?"

পাঁচু গম্ভীর মুখে বললে, "হুঁ, আবার বেঁচে এসেছি, ধরে নাও ভূত হ'য়ে এসেছি ; তুমি কেমনভাবে শ্রাদ্ধ করলে তাই দেখতে এলুম।"

শ্রীহরি আর কথা বলতে পারে না।

পাঁচুকে অবিশ্যি একটা দিন সে যত্ন করেছিল, নিজের বাড়ীতে রেখেছিল, তারপরেই বাঁধলো ঝগড়া এবং পাঁচু রাগ করে বাড়ী ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়ালো।

এখন তার আশ্রয় কোথায়—কোথায় সে মাথা গুঁজবে ?

মনে পড়লো চন্দ্রার কথা।

গ্রামে পদার্পণ করেই সে শুনতে পেয়েছে চন্দ্রা বিধবা হয়েছে, বিষ্ণুচরণ আজ বৎসরখানেক হল মারা গেছে। বিধবা চন্দ্রা বিষ্ণুচরণের বিষয় সম্পত্তি যা পেয়েছে তার পরিমাণ বড় কম নয়। গ্রামের মধ্যে আজকাল সব চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু সে-ই ; দরিদ্র সর্ব্বেশ্বরের কন্যা চন্দ্রা এখন রাণীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করে।

একবার দেখতে ইচ্ছা হয়, একবার জানতে ইচ্ছা হয়—চন্দ্রা সুখী হয়েছে কি ? দরিদ্র সর্ব্বেশ্বরের কন্যা চন্দ্রা বেশী শান্তিতে ছিল না ধনী হয়ে সে শান্তি পেয়েছে বেশী ?

মনে পড়ে সেই ছোটবেলাকার কথা।

পাঁচুদা না হলে সেদিন চন্দ্রার চলতো না, পাঁচুরও চন্দ্রা না হলে চলতো না। তারা বেড়াতো খেলতো, একসঙ্গে মিলে লোকের গাছের শশা, আম, লিচু, পেয়ারা ধ্বংস করতো, কেউ ধরলে একজন নিজের স্কন্ধে সব দোষ নিতো, আর একজনকে জড়াতো না। এমনই ভাবে তাদের প্রেম গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠেছিল, দু'জন দু'জনকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে চাইতো না।

সেই চন্দ্রা—সে আজ হয়ে গেছে পর, অন্তরে বাহিরে একেবারে পর। আজ সামনে গেলেও চন্দ্রা তাকে চিনতে পারবে না। ছোটকালকার কোন স্মৃতিও আজ তার মনে জাগবে না।

মনে হয় দেশে না ফিরলেই হতো। পুরীতে তার দিব্যি আরামে দিন কেটে যেত, পাঁচ বৎসর পরে দেশের বুকে তার ফিরবার কি দরকার ছিল ?

পাঁচু মাথা নীচু করে ভাবে, এখন সে কি করবে ?

পাড়ার লোকেরা বললে, "নালিস কর, নালিস করলেই তোমার জায়গা জমি সব পাবে।"

পাঁচু শূণ্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

জায়গা জমি—কিন্তু কি হবে জায়গা জমি নিয়ে। কে বাঁধবে ঘর, কে পাতবে সংসার ?

পাঁচু ভাবে—উপস্থিত সে দাঁড়াবে কোথায়, তাকে আশ্রয় দেবে কে ?

তিন

গ্রামের লোকে পাঁচুর কাছে এক কথা বলে, আর শ্রীহরির কাছে আরএক কথা বলে আসে। শ্রীহরি শুনতে পায় পাঁচু তার নামে নালিস করবে। শ্রীহরি শাসায়, "নালিস করে বালিস হবে। নালিস অমনি মুখের কথা কি না, করলেই হল আর কি। ওতে যে রৌপ্যমুদ্রা দরকার ভায়ার বুঝি সে জ্ঞানটুকু নেই।"

প্রতিবেশী একজন চোখ মটকিয়ে বললে, "মোটে মা রাঁধে না তপ্ত আর পান্তা, আমাদের পাঁচুর হয়েছে তাই।"

"বটে, চন্দ্রা টাকা দেবে—"

খড়ম পায়ে দিয়ে শ্রীহরি তখনই চললো চন্দ্রার বাড়ী। স্নানান্তে গরদের থান পরে অতি যত্নে নিজের শুচিতা বাঁচিয়ে চন্দ্রা তখন পূজার যোগাড় করছিল।

শ্রীহরি তাকে ডেকে বললে, "শুনছো মা, সেই বাউণ্ডুলে হতভাগা পেঁচোটা এসেছে। লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে সে আমার নামে নালিস করবে, আর সে টাকা নাকি তুমি তাকে দেবে।"

"আমি দেব ?"

চন্দ্রার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—"আমি দেব সেই হতভাগাকে টাকা, আপনি ক্ষেপেছেন কাকা ? সে বুঝি মিথ্যে করে এই সব কথা বলে বেড়াচ্ছে ?"

শ্রীহরি খুসি হয়ে বললে, "বলেছে বই কি, না বললে কি বলতে এসেছি ? আমি জোর করে বলেছি এ কখনও হতে পারে না, চন্দ্রা কখনও টাকা দেবে না—দিতে পারে না ? তার হাজার দিকে হাজার কাজ হাজার দান, সে একটা বাউণ্ডুলেকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারে, তাই বলে তার মামলা

চালানোর টাকা দিতে পারে না। আর তুমিই মনে কর মা এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে মামলা। বাকি খাজনার দায়ে জমি তার নিলাম হচ্ছিল, আমি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি, এ তো গাঁয়ের আরও দশজনে জানে—তুমিও জান।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলে, "কোন কালে তোমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই সম্পর্ক ধরে সে আসে তোমার কাছ হতে টাকা ধার নিতে—শোন কথা পাগলামীর। ছোট বেলায় কত লোকে কত ভুলই তো করে থাকে, সেই ভুলের মাশুল কি সারাজীবন ধরে দেবে নাকি?"

চন্দ্রার মুখখানা লাল হয়ে উঠল, সে মুখ নিচু করে চন্দন ঘষতে লাগল, সেই সময়ে শ্রীহরি খড়মের শব্দ করে চলে গেল।

পূজার যোগাড় করে বাইরে এসেই চন্দ্রা থমকে দাঁড়াল, উঠানের দরজার কাছে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচু। জীর্ণ ময়লা একখানা কাপড় তার পরণে, কাঁধে একখানা লাল গামছা, গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই।

তার পানে তাকিয়ে চন্দ্রা অকস্মাৎ দৃপ্ত হয়ে উঠল। পাঁচু তা বুঝল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, বললে, "আজ এ দুর্দ্দিনে তোমার কাছে এলুম চন্দ্রা।"

শুষ্ক কণ্ঠে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

পাঁচু উত্তর দিলে, "গাঁয়ে থাকবার জায়গা পেলুম না চন্দ্রা, বার হয়ে যেতে ফিরে মনে পড়ল তোমার কথা, তাই তোমার কাছে এলুম।"

চন্দ্রা একবার মুখ তুলে তার পানে চাইলে; ধীর কণ্ঠে বললে," কিন্তু এখানে তো তোমার জায়গা হতে পারে না, তুমি অন্য কোথাও জায়গা দেখ।"

কথাটা বলেই সে পূজার ঘরে প্রবেশ করে ঝপাৎ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

চার

পূজারী শ্রীহরি।

চন্দ্রার প্রতিষ্ঠিত গোপালের পূজা নিত্য নিয়মিত হয়, প্রতিদিনকার নৈবেদ্য এবং ভোগের বেশী ভাগ যায় পুরোহিত শ্রীহরির বাড়ীতে। ভোগের আয়োজন নেহাৎ কম হয় না, প্রতিদিন মাখন মিছরী হতে আরম্ভ করে ক্ষীর লুচি দধি সন্দেশ পর্য্যন্ত। চন্দ্রা ধনবতী এবং একা মানুষ, ভোগের জিনিষ সামান্যই তার নিজের জন্য রাখে।

শ্রীহরি প্রতিদিন স্নানান্তে পূজা করতে আসে, পূজায় তার দীর্ঘ দুইটী ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এই দুইটী ঘণ্টা চন্দ্রা দরজার কাছে বসে অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে, গোপালের পূজা দেখে। তার ইচ্ছা হয় নিজে সে গোপালের পূজা করে, নিজের হাতে গোপালকে খাওয়ায়; কিন্তু মেয়েদের নাকি পূজার অধিকার নাই, তাই অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে তাকে বসে থাকতে হয় দূরে দর্শকের মতই।

সে দিন পূজা করতে বসে শ্রীহরি দরজার কাছে উপবিষ্টা চন্দ্রাকে লক্ষ্য করে সকৌতুকে হেসে বললে, "জান মা, পেঁচোটা একেবারে অধঃপাতে গেছে, ওর জাত জন্ম সত্যিই কিছু নেই। লোকে পুরীতে ওকে দেখে এসে যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়।"

চন্দ্রা একটি প্রশ্নও করে না, নিষ্প্রভ চোখে শুধু চেয়ে থাকে। অন্য কারও প্রসঙ্গে কথা হলে সে হয় তো অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু পাঁচুর প্রসঙ্গে সে হয়ে যায় একেবারেই নির্ব্বাক।

শ্রীহরি গোপালকে ফুলসাজ সাজাতে সাজাতে বললে, "অ্যাঁ, অবশেষে উঠল কিনা গিয়ে বাগ্দী বাড়ী—বামুনের ছেলে হয়ে।"

চন্দ্রা বলিল, "কিন্তু গলায় তো পৈতে নেই।"

"পৈতে নেই তুমি দেখেছ—সে বুঝি এসেছিল?" শ্রীহরি চন্দ্রার পানে চাইলে।

সকল জড়তা সঙ্কোচ দূর করে চন্দ্রা দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, সে কাল এসেছিল, আশ্রয় চেয়েছিল আমি আশ্রয় দিই নি।"

খুসি হয়ে শ্রীহরি বললে, "ঠিক করেছ, বেশ হয়েছে বুঝলে মা—এই পাঁচটী বছর পুরীতে নেচে গেয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটিয়েছে, কি খেয়েছে, কোথায় খেয়েছে তার কিছুমাত্র ঠিক নেই। হয় তো কত হাড়ি বাগ্দী...।"

বাধা দিয়ে চন্দ্রা বললে, "কিন্তু পুরী নাকি স্বর্গ শুনেছি, আপনারাই নাকি ব্যবস্থা দিয়েছেন পুরীতে জাত বিচার নেই, ওখানে উচ্ছিষ্টের ভেদ নেই।"

তার কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে শ্রীহরি মুখ তুললে—একটু বেসুরো শুনায় যে।

চতুর শ্রীহরি ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলে, বললে, "যাক গে পুরীতে যা করেছে তা করেছে, না হয় সে সব ছেড়েই দিলুম, কিন্তু আমাদের এই চাঁপাডাঙ্গা তো পুরী নয়, এখানে সব কিছু মানতে হবে—এখানে সমাজের নিয়ম রাখতেই হবে তো। তুই ইচ্ছিল জয়নাথ ভট্টাচার্য্যের ছেলে, তুই কিনা অবশেষে কাজলা বাগ্দীর বাড়ী গিয়ে উঠলি—এ অধঃপাতের কথা বলব কাকে, আমার বংশের ছেলে, সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই—লোকের কাছে পরিচয় দিতে যে আমারই মাথা কাটা যায়।"

চন্দ্রা শান্ত কণ্ঠে বললে, "পরিচয় না দিলেই হল। তবে আমার মনে হয়—লোকটা বাগ্দী বাড়ী হয় তো যেত না যদি আপনারা কেউ তাকে জায়গা দিতেন? তা যখন দিতে পারেন নি, তখন সে যেখানেই যাক, যা কিছু করুক তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। সে অধঃপাতে গেছে তাকে যেতে দিন; তার সম্বন্ধে আর কোন কথাও বলবেন না।"

শ্রীহরি একেবারে চুপ করে গেল।

কয়েকটা শক্ত কথা হয় তো সে বলতে পারতো কিন্তু ধনবতী ও নিঃসন্তান চন্দ্রাকে হাত ছাড়া করতে তার ইচ্ছা ছিল না। নিজের একটী ছেলেকে চন্দ্রার পোষ্যপুত্র হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা আছে, সব দিক দিয়ে দেখে শ্রীহরি চন্দ্রাকে তোষামোদ করে চলে।

পূজা করতে করতে এক সময় পিছন ফিরে শ্রীহরি দেখলে চন্দ্রা কখন চলে গেছে।

পাঁচ

কিন্তু কেবল শ্রীহরিই নয়, যে আসে সেই এ কথাটা বিশেষ করে চন্দ্রাকে শুনিয়ে যায়। পাঁচু যে অধঃপাতে গেছে এ অপরাধ যেন তার নয়, অপরাধ চন্দ্রার।

তাদের দু'দশটা কড়া কথা শুনালেও চন্দ্রা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, নিজেকে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করে।

এ সত্যকে অস্বীকার করার যো নেই পাঁচু এত বড় গ্রামে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তার কাছেই আশ্রয়ের জন্য এসেছিল।

পাঁচু যে একদিন তাকে ভালবেসেছিল এবং চন্দ্রাও পণ করেছিল পাঁচুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, এ কথা যারা জানে শ্রীহরি ছিল তাদেরই মধ্যে একজন। সেদিন যদি শ্রীহরি এসে চন্দ্রাকে সেই পূর্ব্ব কথার জের তুলে শ্লেষের ভাব না দেখাতো তা হলে চন্দ্রা তাকে আশ্রয় দিত—এ কথা ঠিক; পাঁচুকে গিয়ে পতিতা কাজলার ঘরে আশ্রয় নিতে হতো না।

চন্দ্রা গোপালের পানে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে, অন্তরে সে গোপালের ধ্যান করতে যায়, কিন্তু কোথায় সরে গেছে গোপাল, অন্তরে জেগে ওঠে পাঁচুর সেই অনাহারক্লিষ্ট মলিন মুখখানা। চন্দ্রা শুনতে পায় দু'দিন অনাহারে কাটিয়ে শেষে আর থাকতে না পেরে চন্দ্রার কাছে এসেছিল। শ্রীহরির কথামত মামলার টাকা ভিক্ষা করতে সে আসে নি, সে এসেছিল এতটুকু আশ্রয়ের জন্য, একমুষ্টি আহার্য্যের জন্য।

"গোপাল—গোপাল—।"

চন্দ্রা দুই হাতে আহত বুকখানা চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তার চোখের জলে মেঝে ভিজে ওঠে।

এরই মধ্যে শ্রীহরি তার নয় বছরের ছেলেটীর হাত ধরে নিয়ে একদিন উপস্থিত হল।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, একদিন তুমি এর পৈতে দিয়ে দেবে বলেছিলে মা। এই নয় বছর চলছে, সামনের সাত-ই বৈশাখ দিন ভাল আছে, সেদিন এর পৈতেটা দিয়ে ওকে তোমার ভিক্ষাপুত্রই শুধু নয় নিজের সন্তান বলে গ্রহণ কর; আমি একেবারে লেখাপড়া করে ওকে তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।"

চন্দ্রা বিস্ফারিত চোখ করে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি বলেছিলুম ওর পৈতে দিয়ে ওকে লেখাপড়া করে নেব?"

শ্রীহরি বললে, "এই তো একমাস দেড়মাস আগেকার কথা মা,—একদিন তুমি নিজেই বলেছিলে কিনা—"

চন্দ্রা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে গেল, একটু পরে ফিরে এসে শ্রীহরির হাতে একখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বললে, "দেখুন, আমি হয় তো পৈতে দেওয়ার কথা বলেছিলুম, পোষ্যপুত্র নেব এমন কথা কে বলেছে তা আমার মনে নেই। যাই হোক্ এই একশো টাকা দিলুম, আপনি এই দিয়ে সাত-ই বৈশাখে ওর পৈতেটা দিয়ে ফেলুন গিয়ে।"

নোটখানা হাতের মধ্যে নিয়ে শ্রীহরি শুষ্ককণ্ঠে বললে, "আর ওর ভিক্ষা মা—"

চন্দ্রা বললে, "ভিক্ষা মা, হওয়ার গৌরব অনেকেই লাভ করতে চাইবে। আমাকে দয়া করে অব্যাহতি দিন, আর কিছু বলবেন না।"

একেবারে কিছু না দিয়ে তবু যে চন্দ্রা একশো টাকা দিয়েছে এই যথেষ্ট লাভ; শুকমুখে শ্রীহরি ছেলের হাত ধরে ফিরে গেল।

"অপরাধ নিয়ো না গোপাল, অপরাধ নিয়ো না।"

চন্দ্রার দুই চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। রাত্রে কোথায় যেন বাঁশী বাজে।

কালও বেজেছিল—চন্দ্রার তখন তন্দ্রা নেমেছে। স্বপ্নে সে দেখেছিল পাঁচু সেই ছোটবেলার মতই বাঁশী বাজাচ্ছে। তার জীবনে একমাত্র নেশা ছিল বাঁশী বাজানোর, চন্দ্রা তা জানে।

আজ চন্দ্রা জেগে—খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল বাইরের জমাটবাঁধা অন্ধকারের পানে। মনে মনে সে ভাবছিল—এই বিশাল সম্পত্তি সে কি করবে? বিষ্ণুচরণের কেউ নাই, চন্দ্রারও তাই, হয় তো খুঁজলে পরে বহু দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন দু'চার জন মিলতে পারে, কিন্তু চন্দ্রা সে চেষ্টা না করে একমাত্র গোপালকে নিয়েই দিন কাটাবে স্থির করেছিল।

বাঁশীর করুণ সুর তার মনে বৈরাগ্য জাগিয়ে তুলেছিল, সে ভাবছিল, 'এ সম্পত্তি সে কি করবে, কাকে দেবে?'

সতেরো বৎসর বয়সে বিষ্ণুচরণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। পিতাকে সে স্পষ্টই জানিয়েছিল সে পাঁচুকে ছাড়া আর কাউকেই বিবাহ করতে পারে না কিন্তু তার কথা পিতা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহ বিষ্ণুচরণের সঙ্গেই তার হ'ল এবং দীর্ঘ চার বৎসর সে বিষ্ণুচরণের গৃহিণী হয়ে কাটিয়ে এক বৎসর হ'ল বিধবা হয়েছে।

এই পাঁচ বৎসর সে পাঁচুকে খুঁজেছে—কিন্তু অতি গোপনে। লোকের মুখে পাঁচুর নাম শুনতে উৎকর্ণ হয়েছে, কেউ তা ভাবে নি।

আজ পাঁচুই বাঁশী বাজাচ্ছে—তার সেই পুরানো কীর্ত্তনের সুর শোনা যাচ্ছে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

দাঁড়াতে অসমর্থ চন্দ্রা বসে পড়লে—দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

ছয়

মতি গোয়ালিনী দুধ দিতে এসে খবর দেয়, "আহা, ছোঁড়াটার বড্ড অসুখ গো, বাঁচে কি না তার ঠিক নেই।"

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "কার অসুখ, কোন ছোঁড়াটার?"

মতি বললে, "ওই যে আমাদের শ্রীহরি ভশ্চাযের ভাই গো, পাঁচু ভশ্চায। ছোঁড়া ঘরের টানে গাঁয়ে ফিরলো—ঘর তো শ্রীহরি ভশ্চায দখল করে বসেছে। তার পায়ে ধরে কেঁদে কেটে জায়গাটুকু ফেরত চাইলে, ভশ্চায লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে। গাঁয়ের লোক এমনি একচোখো, ওর কিছু নেই বলে কেউ জায়গা দিলে না, শেষে উঠলো গিয়ে ওই কাজলার বাড়ী। হোক জাতে বাগ্দিনী, হোক সে খারাপ মেয়ে, তবু মানুষ বলে তাকে জায়গা দিলে তো, মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়েছে, মরে যদি—মরবেও সেই কাজলার ঘরে।"

চন্দ্রার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

মতি বলে চললো, "লোকে বলে মদ খায়, তাড়ি খায়, বাঁশী বাজিয়ে মাতলামি করে বেড়ায়। কিন্তু তাও বলি বাপু, এলো যখন তাড়ি খেতো না, মদও ছুঁতো না, তোরাই তো তাকে ফেললি নরকে ঠেলে,—সেখানে কি নিয়ে সে থাকবে বল? নইলে ভদ্দর লোকের ছেলে, জাতে ব্রাহ্মণ, সে কিনা গেল বাগদীবাড়ী, মরছেও সেখানে, তবু কেউ তাকে দেখতে গেল না, আনা তো দূরে থাক।"

মতি চোখ মুছলে।

চন্দ্রা ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কি অসুখ হয়েছে মতি—কি হয়েছে তার?"

মতি বললে, "রোজ রাত্রে সে না কি ঘর হতে বার হয়ে যেতো বাঁশী নিয়ে, কাজলা কিছুতেই তাকে ঘরে রাখতে পারতো না গো। আজ চারদিন আগে সকালে না ফিরে আসায় তাকে খুঁজতে খুঁজতে বাগদীরা এই তোমারই বাগানে পুকুরের ঘাটে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে মা, ওরা তখনই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেছে।"

"আমার বাগানে—পুকুরের ঘাটে—?"

চন্দ্রা কথা বলতে পারে না, রুদ্ধশ্বাসে বললে, "কই, আমি তো কিছু জানি নে—"

মতি বললে, "পূজোয় ব্যস্ত ছিলে মা, আর এটা এমন বড় ব্যাপার নয় যে তুমি শুনবে। সেই হতে তার অসুখ,—এক একবার জ্ঞান হয়—বাঁশী খোঁজে, কি আবোল-তাবোল বলে, চোখ দিয়ে জল পড়ে। কাজ্‌লা ডাক্তার এনেও দেখিয়েছে, ডাক্তার বলেছে—সে দিন সারা-রাত বৃষ্টিতে ভিজে নিমোনিয়া হয়েছে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে—

ঝম্ ঝম্ করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা ঝরেছিল—সেই বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও বাঁশীর করুণ সুর চন্দ্রার জানালাপথে ঘরে এসে পৌচেছিল।

হতভাগা—

চন্দ্রার চোখে আজ জল আসে না—জল যেন শুকিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে জ্বলে আগুন—সে আগুনে জল শুকিয়ে যায়।

বৈকালে শ্রীহরি গোপালকে সন্ধ্যাভোগ দিতে এলো। কোনও ভূমিকা না করে চন্দ্রা সোজা বললে, "আপনার ভাই-এর কঠিন অসুখ, শুনলুম কাজ্‌লা না কি আপনাকে খবর দিয়েছে, আপনি একটীবারের জন্তেও গেলেন না কাকা?"

শ্রীহরি আস্ফালন করে বললে, "আরে, রামোঃ, আমি কি পেঁচো ভশ্চায যে বাগ্‌দিনীর বাড়ী যাব? আমি শ্রীহরি ভশ্চায, নরহরি ভশ্চাযের ছেলে, একশোখানা বাড়ীর পুরুত এই গাঁয়েরই, তা ছাড়া কত গাঁয়ের যজন কাজ করতে হয় আমায়, আমি যাব বাগ্‌দীবাড়ী? ভাই বলছো মা, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিসের? যে পৈতে ফেলেছে, পতিতা একটা বাগ্‌দী মেয়ের বাড়ী পড়ে থেকে যা না তাই খাচ্ছে, মাতলামো করে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে শ্রীহরি ভশ্চাযের কোন সম্পর্ক নেই, ওর নাম তুমি মুখেও এনো না চন্দ্রা, তোমার গোপাল তাতে খুসী হবেন না।"

চন্দ্রার মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল।

সাত

ঘরের কোণে একটী প্রদীপ টিপ টিপ করে জ্বলে,—মেঝেয় বিছানার পরে পড়ে আছে পাঁচু আর তার মাথার কাছে বসে পতিতা কাজ্‌লা বাগ্‌দিনী বাতাস করে।

পাঁচু বিছানা হাতড়ায়—"আমার বাঁশী চন্দ্রা, আমার বাঁশী—"

পতিতার দুটি চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে, পাঁচুর মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, "কি বলছো ঠাকুর—কি চাই তোমার? এই যে বাঁশী, এই নাও—"

মাথার বালিশের পাশেই বাঁশীটা ছিল, সেটা তুলে কাজ্‌লা পাঁচুর হাতে দিল।

বিকারের ঝোঁকে বাঁশীতে সে ফুঁ দিতে যায়, বাঁশী বাজে না।

"বাঁশী বাজলো না চন্দ্রা, বাঁশী ভেঙ্গে গেছে।"

তার শ্লথ হাত হতে বাঁশী খসে পড়ে। কাজ্‌লা যথাস্থানে সেটা রেখে তার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বললে, "বাজবে বই কি? পাঁচুর বাঁশী আবার বাজবে, তুমি আগে ভালো হয়ে ওঠো।"

পাঁচু আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

দরজায় খুট খুট শব্দ হয়, কাজ্‌লা কাণ উঁচু করে জিজ্ঞাসা করলে, "কে?"

"আমি, দরজা খোল—"

নারী-কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিতা কাজ্‌লা দরজা খুলে ফেললে, প্রদীপের সলতে বাড়াতে তার আলোয় দেখা গেল—বিবর্ণ মুখে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে আছে।

কাজ্‌লার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, তবু কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করে বললে, "ঠাকুরকে দেখতে এসেছো দিদি-ঠাকরুণ।"

চন্দ্রা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, "একথা একা তুমিই বলতে পারো কাজ্‌লা, আর কেউ পারে না। কিন্তু যাক সে কথা, আমি দেখতে এসেছি।"

"শুধু দেখবে, আর কিছু নয়?"

কাজ্‌লার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—

"এত বড় গাঁ-খানা, এত বামুনের বাস, আমি খবর দিয়েছি দিদিঠাকরুণ, কেউ এলো না? ঠাকুরমশায়ের দাদার কাছে লোক পাঠালুম, তিনি নাকি পতিতা বাগ্‌দিনীর বাড়ী আসবেন না, আমার পাঠানো লোককে যা না তাই বলে

অপমান করেছেন। একটা কথা বলি দিদিঠাকরুণ, এই গাঁয়ের অনেক নাম করা বামুন এই বাগ্দিনীর বাড়ীতে চরণ-ধূলো দিয়ে গেছেন, শ্রীহরি ঠাকুরও তাদের মধ্যে একজন। আজ এই সাধুপ্রকৃতির লোকটা যে কোন পাপ না করে, কোন দোষ না করেও এই বাগ্দিনীর বাড়ী মরতে বসেছে, এ পাপ কার হবে দিদিঠাকরুণ, তোমাদেরই নয় কি ?"

কাজ্‌লার দুই চোখ দিয়ে জল ঝরছিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে আবার বললে, "এমন লোককে তোমরা চিনলে না—আর কেউ না চিনুক, তুমিও চিনলে না দিদিঠাকরুণ ? ঠাকুরের দেশে ফিরবার কোন দরকার ছিল না, ফিরেছে তোমার নাম শুনে। এই অসুখ, এতটুকু জ্ঞান নেই, তবু তোমার নাম করছে।"

চন্দ্রা মুখ ফেরায়, চোখের জল কাজ্‌লা পাছে দেখতে পায়।

কাজ্‌লা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তুমিও মনে করলে ঠাকুর অধঃপাতে গেছে ; তা যায় নি দিদিঠাকরুণ, এই লোককে তুমি পর্য্যন্ত ঘৃণা করলে ? বাগ্দিনী কাজ্‌লা তাকে ঘরে জায়গাই দিয়েছে, তার পবিত্রতা নষ্ট করে নি। তোমার এই গাঁয়ের বামুনদের চেয়ে আমার ঠাকুর অনেক বড়—অনেক বড়।"

চন্দ্রা নিঃশব্দে পাঁচুর বিছানার পাশে দাঁড়াল। পাঁচু তখন কি বলছিল। চন্দ্রা শুনলে সে বলছে, সেই পাঁচ বৎসর আগেকার কথা।

সে কাজ্‌লার পানে তাকাল—

"আমি কাল সকালেই ঠাকুরমশাইকে আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই কাজ্‌লা, ওখানে রেখে চিকিৎসা করাতে চাই ভাল করে—বুঝলে ?"

তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

কাজ্‌লা মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললে, "তাতে যে তুমি মরবে দিদিঠাকরুণ। কাজ্‌লা-বাগ্দিনীর সমাজ নেই, ধর্ম্ম নেই, কিন্তু তোমার যে সব আছে।"

চন্দ্রা দৃঢ় কণ্ঠেই উত্তর দিলে, "তোমার পাশেই না হয় গাঁয়ের লোক আমার স্থান নির্দ্দেশ করবে, তার বেশী আর তো কিছু পারবে না। তা হোক, আমি ওদের ভয়ে আমার কর্ত্তব্য পালন করতে পেছিয়ে যাব না কাজ্‌লা, আমি কাল সকালেই নিয়ে যাব।"

আট

গ্রামে ভীষণ গোলমাল।

চন্দ্রা পাঁচুকে নিজের বাড়ী এনেছে, কথাটা দেখতে দেখতে সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কেউ হাসলে, কেউ টিট্‌কারী দিলে, কেউ গম্ভীর ভাবে বললে, "এ যে হবেই সে জানা কথা।"

শ্রীহরি ভিন্নগ্রামে গিয়েছিল, সেখানে এ কথা শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে চন্দ্রার বাড়ী উপস্থিত হল।

"বাগ্দিনী বুঝি ও আপদটাকে তোমার বাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল মা ? দরজা বন্ধ করে দিতে পারলে না, যেমন এনেছিল তেমনিই ফিরিয়ে নিয়ে যেত ?"

চন্দ্রা ধীর ভাবে বললে, "দরজা বন্ধ ছিল, আমিই খুলে দিয়ে আপনার ভাইকে ঘরে নিয়েছি।"

"তুমি ?"

শ্রীহরির কণ্ঠ দিয়ে স্বর বার হয় না।

চন্দ্রা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ আমিই। বাগ্দিনাকে মুক্তি দিলুম। ওখানে পাঁচুদা থাকার জন্যে আপনাদেরও অসুবিধা হচ্ছিল কিনা।"

"অসুবিধা—আমাদের অসুবিধা—"

শ্রীহরি টেনে টেনে হাসে।

চন্দ্রা অকস্মাৎ দৃপ্ত হয়ে উঠে। হাতখানা বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে বলে, "সোজা পথ পড়ে আছে বিদায় নিন দেখি, আমায় আর জ্বালাবেন না। এ কথা মনে রাখবেন, যাকে আমি আজ এনেছি তাকে আর কোনদিনই বিদায় দেব না, এর জন্যে আপনাদের ইচ্ছে হয় আমার বাড়ী আসবেন, না ইচ্ছে হয় চিরকালের মতই বিদায় হোন, এ বাড়ীর চৌকাঠ পার হওয়ার চেষ্টা আর কোনদিন করবেন না।"

শ্রীহরি একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল, আর একটী কথা তার মুখ দিয়ে বার হল না। আস্তে আস্তে সে যেমন এসেছিল তেমনই বার হয়ে গেল।

গোপালের পানে ফিরে দুই হাত কপালে রেখে চন্দ্রা নিবেদন করলে, "রাগ কর না ঠাকুর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়

দিয়েছি, তোমারই সেবকরূপে তাকে গড়ব বলে তাই, আমায় সে সুযোগ দিয়ো। পথ যখন দেখিয়েছ, আর যেন না হারিয়ে ফেলি।"

"চন্দ্রা আমার বাঁশী—"

চন্দ্রা বাঁশী তুলে দেয়।

"এই নাও পাঁচুদা, এই যে তোমার বাঁশী।"

বিকারের ঘোর হঠাৎ ছেড়ে যায়, পাঁচু বিস্ফারিত চোখে তার পানে চেয়ে থাকে, কিছু বুঝতে পারে না।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চন্দ্রা বললে, "তোমায় আমার বাড়ীতে এনেছি পাঁচুদা, কাজলার বাড়ীতে তুমি নেই। তোমার সব কথা আমি শুনেছি, আমার গোপালের সেবক হয়ে আমার পাঁচুদা রূপে আমার বাড়ীতে তুমি থাক, এখান হতে আর কেউ তোমায় সরাতে পারবে না। তোমার বাঁশী তুমি ভাল হয়ে গোপালকে শুনিয়ো পাঁচুদা, আমার গোপাল যে বাঁশী শুনতে বড় ভালবাসে।"

কম্পিত হাতে তার হাতখানা ধরে পাঁচু নিজের বুকের পরে রাখলে। তার মুদিত চোখের কোণ বয়ে ছটি ফোঁটা চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়লো।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল কাজলা—অস্পৃশ্য পতিতা নারী।

তার চোখ দিয়েও সেই সময় ছটি ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল মেঝের পরে, সে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে চোখ মুছলে।

সমাপ্তি

শ্রীগৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত

আমি ত ছিলাম একা
তুমি মোরে দিলে দেখা
সুনিদ্রিত বুকে মোর দিয়ে গেলে ডাক :
জাগ রে ব্যথিত কবি
চেয়ে দেখ নব ছবি
আনিয়াছে দ্বারে তব নবীন বৈশাখ।

প্রাণের নিবিড় টানে
চাহিলাম তোমা পানে
দেখিলাম তব চোখে বিমোহন রূপ ;
তোমার বিমল হাসি
মধুর সঙ্গীত রাশি
দিল মোর বুকে জ্বালি চন্দনেরি ধূপ।

সকল বেদনা ভুলি
লইলাম তোমা তুলি
শেফালী কুসুম সম বাসিলাম ভালো ;
জীবনের অন্ধকার
নিপীড়িত হাহাকার
মুছে গিয়ে একাকার দেখা দিল আলো।

আমার সোনার তরী
তোমাবুকে ভর করি
ভেসে গেল কোথা কোন অকূলের টানে ;
জীবনের মূক আশা
পেল বুঝি সব ভাষা
চাঁদ বুঝি নেমে এলো ধরণীর টানে।

তার পর একদিন
দীপ-শিখা হ'ল ক্ষীণ
তুমি দূরে গেলে চলে ভেঙ্গে দিয়ে ভুল
অকস্মাৎ মালাখানি
কে দিল রে ফেলে টানি
জীবনের পারাবারে কোথা আজি কূল।

সুখের জ্যোছনা রাশি
সব উড়ে গেল ভাসি
নিঠুর বাতাস যেন ভেঙ্গে দিল নীড় ;
আমার সকল কাজে
শুধুই বেদনা বাজে
জীবনের গতি বুঝি হ'য়ে এলো স্থির।

অনন্ত জীবন পথে
চলেছি একই রথে
দু'দিনের মুখোমুখী দু'দিনের খেলা ;
বৃথাই কোলাহল
ব্যথিত আঁখির জল
ভেসে যাবে দূরে কবে জীবনের ভেলা।

সম্মুখে অনন্ত কাল
পশ্চাতে স্মৃতির জাল
মাঝখানে আছি মোরা সত্য এইটুকু :
তোমার আমার মাঝে
রজনী ঘনায়ে আসে
ভিখারী তাই চেয়েছিনু পাই যতটুকু।

গৃহিণী

জনৈক গৃহী

আমাদের দেশে একটি শ্লোকাংশ প্রচলিত আছে—"ন গৃহং গৃহমুচ্যতে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" যাহার অর্থ—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহিণীবিহীন গৃহ গৃহপদবাচ্য নয়। বিপত্নীকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এই শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য এই যে গৃহে গৃহিণীর অভাব সঙ্ঘটিত হইলে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব ঘটিয়া থাকে। দয়িতা-হারা হইলে দয়িতের হৃদয়ে যে-বেদনা, যে-অভাব অনুভূত হয় তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ইহার বিষয় হইবে সাংসারিক বন্দোবস্ত, সাংসারিক শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব এবং সাংসারিক শান্তি। যে-সংসারে গৃহিণীর অভাব, সেখানে সুবন্দোবস্ত, সুশৃঙ্খলা, সৌষ্ঠব ও শান্তির অভাব হয়। এ-প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের গৃহিণী বা বনিতার কথা তুলিতেছি না, পূর্ণ সংসারের গৃহিণীর কথাই বলিতেছি। এই প্রবন্ধে বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় কতিপয় স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিব।

(১) শয়নকক্ষ—মধ্যবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারের বাটীতে অধিকাংশ স্থলে এক একটি দম্পতীর জন্য এক একখানি শয়নকক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়; অনূঢ় কিশোর ও যুবকদিগের জন্য সংখ্যাহিসাবে এক বা ততোধিক ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং এক একখানি ঘর তিন চারিজনে ব্যবহার করে। সজ্জাকক্ষ (dressing room) সকল বাটীতে জুটিয়া উঠে না। যাঁহাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে তাঁহাদের শয়নকক্ষে স্থান-সঙ্কুলান হইলে এক একখানি পালঙ্ক, একটি আলমারী, একখানি আয়না (পারতপক্ষে dressing table), একটী আল্‌না, কয়েকখানি (অধিক সংখ্যক নহে) ছবি ও আত্মীয়-স্বজনের ফটোগ্রাফ এবং একখানি পা-পোঁছ (পাপোশ) রাখা চলে। শয়নকক্ষে আসবাবের আধিক্য স্বাস্থ্যহানিকর। আসবাবগুলি এরূপে রাখিতে হইবে যাহাতে দরজা বা জানালা কোন অংশে বন্ধ না হয়। দম্পতীর শয়নকক্ষের সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ও রক্ষার ভার ইহার খাস অধিবাসীর উপর এ-কথা বলাই বাহুল্য।

পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, কারণ, পরিচ্ছন্নতার উপর স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। যেখানে যথেষ্ট-সংখ্যক দাসদাসীর অভাব সেখানে নিজের কক্ষ নিজেই পরিষ্কার করিতে হয়। দাসদাসী থাকিলেও নিজের দৃষ্টি ও সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ আবশ্যক। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সম্মার্জ্জনীযোগে ঘরের ধূলা ও আবর্জ্জনা বাহির করা এবং প্রত্যেক আসবাব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত। প্রয়োজন হইলে দুইবারের অধিক ঘর পরিষ্কার করিতে হয়। ছবি থাকিলেও, প্রতিদিন না হউক, মধ্যে মধ্যে ঝাড়িতে মুছিতে হয়, নচেৎ তাহাদের পশ্চাতে মাকড়সা প্রভৃতি বাসা করিবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ঘরের ঝুল ঝাড়িয়া ফেলা উচিত। খাট বা তক্তপোষের উপর বিছানা থাকিলে তাহা ঝাড়িয়া কোন মোটা আস্তরণ দ্বারা আবৃত রাখা উচিত। মেঝের উপর শয্যা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রাতঃকালে তাহা তুলিয়া, ঝাড়িয়া, পাট করিয়া এবং একপার্শ্বে রাখিয়া একখানি মোটা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয়।

এমন অনেক অভাবগ্রস্ত গৃহস্থ আছেন যাঁহাদের পক্ষে এই অল্প সংখ্যক আসবাবের সংগ্রহ ও সমাবেশ অসম্ভব, অধিকন্তু নীচের ঘরে যাহাদের বাস করিতে হয়। শয়নঘর নীচে অর্থাৎ একতলায় হইলে, খাটের অভাবে তক্তপোষের উপর শয্যা প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। বিছানা মাঝে মাঝে, সম্ভবপর হইলে প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া উচিত। অবশ্য

ভারী যদি যখন তখন রৌদ্রে বাহির করা সম্ভব নয়। ধোবার খরচ যথাসম্ভব বাঁচাইতে হইলে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সাবান বা ক্ষারের জলে সিদ্ধ করিতে হয়। মোটের উপর বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ আবশ্যক। শিশুর বিছানা রাত্রিকালে মাঝে মাঝে ভিজিবে-ই এবং তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইবে। অয়েল-ক্লথ বা রবার ক্লথ অথবা তদ্রূপ কোন আস্তরণের সাহায্যে বিছানা বাঁচাইতে পারা যায় বটে কিন্তু শিশুকে কিছুক্ষণ প্রস্রাবের উপরেই শুইয়া থাকিতে হয়, কারণ, প্রথমতঃ শিশু কিছু বিলম্বেই কাঁদে, দ্বিতীয়তঃ কাঁদিলেই নিদ্রিতা জননীর নিদ্রা অবিলম্বে না ভাঙ্গিতে পারে। শিশুর বিছানা প্রত্যহ রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয় এবং অধিক পরিমাণেই রাখা উচিত। আর্দ্র বিছানায় শুইলে শিশু সহজে অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। অভাবপক্ষে আন্‌লার উদ্দেশ্য বাঁশের বা দড়ীর আন্‌লা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রাদি যাহাতে দেওয়াল-সংলগ্ন না হয় সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) **রন্ধনশালা**—রন্ধনের ঘর সুপরিষ্কৃত রাখা উচিত। প্রায় দেখা যায় পাকশালা ঝুল ও অন্যান্য আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে মাকড়শার জালও দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতেই প্রধানতঃ ঝুলের উৎপত্তি। মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে, যখন রন্ধনশালায় লোকজন থাকে না, সেই সময়ে মাকড়শা সেখানে জাল বাঁধে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই মাকড়সার জাল ও ঝুল ঝাড়িয়া ফেলা উচিত, কেবল মেঝ ধুইলে মুছিলে চলিবে না। কুটনা সমাপ্ত হইলেই খোসাগুলা রান্নাঘরের বাহিরে লইয়া আসা উচিত, অবশ্য যদি সেই ঘরেই কুটনা তৈয়ার হয়। রান্নাঘরে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তরকারীর খোসা থাকিলে যে মাছির আমদানী হয় তৎসংস্পর্শে খাদ্য দূষিত হইতে পারে। একই কারণে ভাতের মাড় ঝাড়িয়া তফাতে রাখা উচিত। যে-বাটীতে গাভী পোষণ করা হয়, সেখানকার তরকারীর খোসা ও ভাতের মাড় গাভীর জন্য সঞ্চয় করা ভাল, কারণ, ভাতের মাড় গাভীর একটী পুষ্টিকর খাদ্য। রন্ধনের পূর্ব্বে ও পরে রন্ধনপাত্রগুলি পরিষ্কার করা উচিত। খাদ্য প্রস্তুত হইলে সে-গুলি যত্নপূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখা উচিত এবং কখনই অনাবৃত রাখা উচিত নয়।

(৩) **উপদেশ**—উপরোক্ত দুইটি বিষয় গৃহিণীর এলাকাভুক্ত। তিনি স্বহস্তে এতদ্বিষয়ক কোন কাজ না করিলেও উভয় বিষয়েই তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে গৃহিণীর পুত্রবধূ আছে, তিনি কেবল মাত্র তাহার শ্বশ্রূ নহেন, পরন্তু শিক্ষয়িত্রী ও উপদেষ্টা। গৃহিণী স্বীয় দৃষ্টান্তে ও উপদেশে আপন দুহিতা ও পুত্রবধূগণকে পাকা গৃহিণী করিয়া তুলিবেন—ইহা গৃহিণীর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। কন্যাকে সাংসারিক শিক্ষা না দিলে বিবাহের পর তাহার শ্বশুরালয়ে শুধু কন্যার নয়, কন্যার মাতারও নিন্দা হয় এবং পিতা বেচারাও বাদ যান না। পুত্রবধূগণকে এইরূপ শিক্ষা না দিলে নিজের সংসারের শ্রী বা শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে না। একাধিক পুত্রবধূ থাকিলে যাহাতে তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হয় সে-বিষয়েও গৃহিণীর দৃষ্টি ও শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বশীভূত হইয়া পুত্রবধূগণ অনেক গৃহে পরস্পরের মধ্যে কলহে নিরত হয়; গৃহিণীর কর্ত্তব্য কেবলমাত্র এরূপ কলহের মীমাংসা নহে, যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ কলহের উদ্ভব না হয় সে-বিষয়ে শিক্ষা প্রদান এবং কলহের বীজ যাহা হইতে উদ্ভূত হয় তাহার উন্মূলন। পুত্রবধূগণের প্রত্যেকের সহিত এরূপ ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ এরূপ মনে করিবার অবসর না পায় যে শাশুড়ী একজনকে অন্যের অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও আদর যত্ন করেন, অথবা একজনের পিতামাতাকে প্রশংসা ও সম্মান করেন এবং অন্যের পিতামাতাকে নিন্দা ও অসম্মান করেন। গৃহী মাত্রেই অবগত আছেন, গৃহিণীর ত কথাই নাই, যে পিতামাতার বা পিত্রালয়ের নিন্দা বধূগণের অসহ্য। পুত্র কন্যার জননী হইয়াও তাহারা পিত্রালয়কে নিজের বাটী মনে করে এবং বলে, "আমাদের বাটী।" হয় ত গৃহিণী নিজেই এক সময় তাঁহার পিত্রালয় সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, কিন্তু এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য পুত্রবধূগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে শ্বশুরের বা স্বামীর বাটীই স্ত্রীলোকের নিজের বাটী, জনকজননী ও সহোদরগণের উপর স্বাভাবিক স্নেহের দাবী ব্যতিরেকে পিত্রালয় সম্পর্কীয় সকল অধিকার হইতে সে বঞ্চিত—অবশ্য আমি সহোদরবতী হিন্দুরমণীর কথাই বলিতেছি।

এমন হইতে পারে যে, এক পুত্রবধূর পিতা ধনাঢ্য এবং

তিনি যে-সকল উপঢৌকনাদি প্রদান করেন সে-গুলি মূল্যবান; অন্য পুত্রবধূর পিতা হয় ত অবস্থাহীন এবং তৎপ্রদত্ত উপঢৌকনাদি স্বল্প মূল্যের। এ-স্থলে গৃহিণীর কর্ত্তব্য উভয়বিধ উপঢৌকন সমান আদরে গ্রহণ করা এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বৈবাহিক অকিঞ্চিৎকর উপঢৌকন-প্রদানে কন্যা-জামাতার প্রতি স্নেহ ও কন্যার শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করা। গৃহিণীর আচরণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে পুত্রবধূগণ বুঝিতে পারে যে উপঢৌকনের প্রকৃত মূল্য অর্থ নহে, আন্তরিকতা। এক উপঢৌকনের সহিত আর্থিক মূল্য বা সৌন্দর্য্যের বুনিয়াদে অন্যের তুলনা তিনি নিজেও করিবেন না, অপর কাহাকেও তুলনা করিবার অবসর দিবেন না। যে-কোন আত্মীয়ের প্রদত্ত উপঢৌকন তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন এবং কখনও তাহার নিন্দা করিবেন না। গৃহিণী কদাপি এমন ভাব প্রকাশ করিবেন না যাহাতে এক বধূ দুঃখিত এবং অন্য বধূ গর্ব্বিত হইতে পারে। বধূগণের সহিত তিনি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন ও তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্ট কথা বলিবেন। তিরস্কার করিতে হইলেও মিষ্ট ভাষায় এবং নিজের মেজাজ খারাপ না করিয়াই করিবেন ও বধূর পিত্রালয়ের দোষ দিবেন না। বধূরা যেন বুঝে যে গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যাকে যেরূপ স্নেহ ও আদরযত্ন করেন বধূদিগকেও সেইরূপ করেন। পক্ষপাতিত্ব-দোষ যেন গৃহিণীকে স্পর্শ না করে।

পুত্রবধূগণের মধ্যে যাহাতে ভগিনীত্ব ও সখিত্বভাব চিরস্থায়ী হয় এবং নিজের কন্যা বা কন্যাগণের সহিত যাহাতে তাহাদের এইরূপ সম্বন্ধ আন্তরিকভাবে স্থাপিত ও বদ্ধমূল হয় গৃহিণী সে-বিষয়ে যত্নবতী হইবেন, যেন বধূগণ ননদকে কখন "রাই বাঘিনী" মনে করিতে না পারে। নিজের প্রতি মাতৃভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বধূগণের হৃদয়ে তাঁহাদের শ্বশুরের প্রতি পিতৃভাব ও দেবরগণের প্রতি ভ্রাতৃভাব সঞ্চারিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। মুখের কথার চেয়ে দৃষ্টান্তই শিক্ষালাভের প্রকৃষ্টতর উপায় ইহা স্মরণ রাখিয়া গৃহিণী নিজের দৃষ্টান্তে কন্যা ও বধূগণকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিবেন।

(৪) **কর্ম্মনির্দ্দেশ**—গৃহিণীর আর একটি কর্ত্তব্য অনূঢ়া কন্যা ও পুত্রবধূগণকে কর্ম্মে নিয়োজন। যদি পিত্রালয়ে যথোচিত শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহা হইলে বধূগণ সহজে ও বিনা দ্বিধায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হাতে লইয়া সম্পন্ন করিবে। আধুনিক এমন গৃহস্থ আছেন যাঁহারা কোন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হইলে, পাত্রের গৃহে রাঁধুনী আছে কিনা অনুসন্ধান করেন; তাঁহারা এমন গৃহে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত নহেন যেখানে কন্যাকে সংসারের কাজ করিতে হয়—সে-কন্যা আধুনিকভাবে শিক্ষিতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্তা (?) হউক আর না হউক। সেরূপ গৃহে কন্যার সাংসারিক শিক্ষা বিশেষ হয় বলিয়া আশা করা যায় না। তবে পরিজনবহুল সংসারে কন্যাগণ মৌখিক শিক্ষা না পাইলেও পাঁচ জনের কার্য্য ও আচার ব্যবহার দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেকটা শিক্ষালাভ করে। সেইজন্য অনেক পাত্রের পিতামাতা বুনিয়াদী বংশের কন্যার অনুসন্ধান করেন। এ-দেশে যৌথ পরিবারের প্রথা থাকায় বুনিয়াদী বংশের সংসার প্রায়শঃ পরিজনবহুল হইয়া থাকে এবং এরূপ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ও আশৈশব প্রতিপালিত হইয়া কন্যাগণ দেখিয়া শুনিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা পায়। অবশ্য বুনিয়াদী ঘরের কন্যামাত্রই যে শ্বশুরালয়ে সকল সময়ে সন্তোষজনক ব্যবহার করে তাহা নয়, কারণ, কন্যার ব্যবহার তাহার স্বভাবের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তবে "পাঁচটার সংসারে" স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী না হইলেও, আংশিক পরিবর্ত্তন সম্ভব, কারণ, এমন স্বভাব বিরল, শিক্ষাগুণে ও দৃষ্টান্ত-অনুসরণে যাহার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন না হয়।

যে-সংসারে পাচক ও দাসদাসী আছে সেখানেও কন্যা ও বধূকে সখের কাজে নিয়োজিত করা যায়। তাহারা সখ করিয়া রাঁধিতে পারে—সখের খাবার প্রস্তুত করিতে পারে। পাচক কোন কারণে অনুপস্থিত বা অক্ষম হইলে তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় রাঁধিতে অগ্রসর হয়, প্রয়োজন হইলে বাটনা বাটে, বাসন মাজে, উপদেশ দিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। অধুনা এমন সংসার বিরল নহে যেখানে এরূপ ক্ষেত্রে বাজারের খাবারের উপর নির্ভর করিতে হয়। কি দূরদৃষ্ট! যে সংসারে এরূপ ঘটনা হয় তাহার কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়েই নিন্দার ভাজন। তাঁহারা বুঝেন না যে নিজের বোঝা নিজে বহন করা নিন্দনীয় নহে। তাঁহারা বুঝেন না যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। তাঁহারা

বুঝেন না যে নিষ্কর্ম্মা লোকের অন্তর দুরভিসন্ধি ও কুপ্রবৃত্তির প্রস্রবণ হইয়া উঠে। তাঁহারা বুঝেন না যে রাঁধিলে, বাটনা বাটিলে বা বাসন মাজিলে ব্যায়ামের ফল লাভ করা যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। যাঁহাদের আদর্শে আমাদের দেশের কন্যাগণ বিলাসিতা ও বাবুয়ানা অভ্যাস করে, তাঁহারা স্বদেশে কিরূপভাবে নিজ নিজ সংসার চালাইয়া থাকেন তাহা শুনিলে তাহারা হয় ত' বিস্মিত হইবে। লেখকের সমব্যবসায়ী জনৈক ইউরোপীয় বন্ধু ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ লণ্ডনের এক সহরতলীতে বাটী ক্রয় বা নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখক কার্য্যব্যপদেশে লণ্ডনে যান এবং অপর একটি বন্ধু (যিনি তাঁহারও বন্ধু) ও তিনটি বন্ধু স্থানীয় রমণীর সমভিব্যাহারে সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যাকালে দুইদিন উপস্থিত হয়েন। লেখক কোনবারেই সেখানে কোন পরিচারক বা পরিচারিকা দেখিতে পাইলেন না। হয় ত', দিবাভাগে কিছুক্ষণের জন্য কোন পরিচারিকা আসিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া চলিয়া যায়, কারণ, এরূপ পদ্ধতি লণ্ডনে আছে। কথোপকথনের মধ্যে ইউরোপীয় বন্ধুটি বলিলেন—"আমি বেশ আছি। নিজের বাড়ী করিয়াছি, বাটীসংলগ্ন কিছু খালি জমি আছে, সেখানে অল্প স্বল্প চাষ করি, আমার পত্নী উত্তম রাঁধিতে পারেন, সেজন্য পাচিকার ব্যয় বাঁচিয়া যাইতেছে।" আমাদিগকে চা ও রুটীর টোষ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। বন্ধুটির কন্যাগণ (তাঁহারা তিনটি) প্রত্যেকটিই কৃতবিদ্য। অনেক সংসারে এমন দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় গৃহিণী স্বয়ং রন্ধনাদি কার্য্য করিতে যান কিন্তু কন্যা বা বধূকে করিতে বলেন না। তাহারা জড়ভরতের মত বসিয়া থাকে এবং কোনবিষয়ে ত্রুটী হইলে দাসদাসীকে তিরস্কার করে, যেন সকল ত্রুটীর জন্যই তাহারা দায়ী। স্বেচ্ছায় দু'টা পান সাজিয়াও তাহারা দেয় না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য তাহাদিগকে এরূপে শিক্ষিতা করিয়া তোলা এবং তাহাদের চরিত্র এমন ভাবে গঠিত করা যে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাংসারিক কাজ করিতে অগ্রসর হয়, গৃহিণী কোন কাজ করিতে যাইলে তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজে সম্পন্ন করে।

(৫) **দাসদাসী**—অবশ্য পাচকও এই শ্রেণীভুক্ত। মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা অন্নবস্ত্র ও মাসমাহিনার পরিবর্ত্তে দেহ ও আত্মা একেবারে বিক্রয় করে নাই। মনে রাখিতে হইবে যে ইহারাও মানুষ, ইহাদের ভ্রম ও তজ্জনিত ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী এবং একযোগে একাধিক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন আদেশ করিলে ইহাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবার সম্ভাবনা; ইহারাও যথাসময়ে ক্ষুধায় পীড়িত হয়, পরিশ্রম করিলে ইহাদেরও ক্লান্তি উপস্থিত হয় ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, অপর মানুষের মত ইহারাও চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন এবং সেইজন্য দুঃখ ও পুলক অপরের মতই অনুভব করিতে পারে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে মিষ্ট ব্যবহারে ও মিষ্ট কথায় মানুষ প্রীত হয় এবং রূঢ় ব্যবহারে ও কথায় সেই মানুষেরই আক্ষেপ, বিরক্তি, ক্রোধ ও অনুরূপ চিত্তবিকার উদ্ভূত হয়; সাধারণতঃ তাহাদের মুখের কথায় বা আচরণে বিরক্তির বা ক্রোধের প্রকাশ হয় না, কিন্তু তাহাদের চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য বিকৃত অবস্থায় থাকে এবং তাহাদের কার্য্যে নানাপ্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিতে পারে।

পুরাকাল হইতে হিন্দু-সংসারের নিয়ম—দাসদাসীগণ পুত্রকন্যার ন্যায় পালনীয়। তাহারা গৃহিণীকে মাতৃসম্বোধন করে, গৃহিণীর পুত্রকন্যাকে দাদাবাবু ও দিদিমণি বলে, পুত্রবধূকে বৌদি বলিয়া ডাকে। এখনও পরিচারিকাকে "ঝি" বলিয়া ডাকা হয়। কন্যাই কবির ভাষায় ঝিয়ারী এবং তাহা হইতেই "ঝি"-শব্দের উৎপত্তি। পরিচারককে কেহ "চাকর" বলিয়া ডাকে না, তাহার নাম ধরিয়াই ডাকা হয়। দাসদাসীকে তিরস্কার করা যে নিষিদ্ধ তাহা নহে; পুত্রকন্যাকেও সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতে হয়। কিন্তু উভয় স্থলেই নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া তিরস্কার করিতে হয়। তবে দাসদাসীকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা-প্রদর্শন, তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কর্কশ ব্যবহার ও কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ কিছুতেই সঙ্গত নহে, ইহা হিন্দুসংসারের চিরন্তন নীতি ও প্রথার বিরুদ্ধ। আমার অদ্যাপি স্মরণ আছে বাল্যকালে বাড়ীর একাধিক চাকরের 'ডাক'-নামের সঙ্গে 'দাদা' যোগ করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিতাম। ইহাও মনে রাখা উচিত যে অধিকাংশ স্থলে মিষ্ট কথায় অধিক কাজ পাওয়া যায়। কথায় বলে, মিষ্ট ব্যবহারে বনের পশুপক্ষী বশীভূত হয়। দাসদাসী যাহার কাছে মিষ্ট ব্যবহার পাইবে তাহার পরিচর্য্যা ও তাহার আদেশ-পালন সর্ব্বান্তঃকরণে করিবে (ঔষধ-সেবনের মত নহে) এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যথাসময়ে দাসদাসীগণকে আহার ও বিশ্রামের অবসর দেওয়া উচিত। তাহারা ক্ষুধা-নিবারণের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য পাইল কি না তাহা দেখাও গৃহিণীর কর্ত্তব্য। যে-চাকরের নাম 'কাশিনাথ' তাহাকে 'কেশে' না বলিয়া কাশিনাথ বা কাশী বলিয়া ডাকিলেই ভাল শুনায় এবং সে ও খুসী হয়। মিষ্ট কথা বলিতে যখন কিছু ব্যয় বা অনুরূপ ক্ষতি হয় না, তখন মানুষকে, সে যেই হউক না কেন, মিষ্ট কথা কেন না বলিব?

দাসদাসীগণের বেতন, যদি কেহ জমাইয়া রাখিতে না চায়, যথাসময়ে দেওয়াই উচিত। তাহাদের বেতনের উপর তাহাদের পিতামাতা বা স্ত্রীপুত্র নির্ভর করে ইহা অসম্ভব নহে। [ক্রমশঃ

অন্ধকারের নির্ব্বাসন

বাণীকুমার

অতীত যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমানে যুগ পর্য্যন্ত কৃত্রিম আলোকের বিবর্ত্তন-চিত্রাবলী সাধারণের চোখের সাম্‌নে তুলে ধর্‌লে মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরম্পরাক্রমে ব্যবহারিক অবদানের মধ্য দিয়ে যুগ-মানব প্রকৃতপ্রস্তাবে রাত্রিকে দিনে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। কৃত্রিম আলোক আবিষ্কার ক'রে অন্ধকারের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয়-অভিযান একটি কাহিনীর মত। আদিমকালের মশাল ও আলোক-বর্ত্তিকা থেকে উজ্জ্বল উদ্ভাসনের বর্ত্তমান ক্রমবিকাশ কিভাবে সম্ভব হোলো,—এই নিবন্ধ তারই ইতিবৃত্ত।

মানুষ তার নিত্যনূতন বুদ্ধির প্রেরণায় কি সুন্দর কৃত্রিম বৈদ্যুতিক দীপমালার সজ্জা করেছে, তার কত বৈচিত্র্য, কত কার্য্য-কৌশল—তা' সত্যই কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। অন্ধকার-জয়ের এই যে সফল পরিণতি আজ সভ্যজগৎকে আলোকিত ক'রে তুলেছে, যুগের পর যুগ দিনের পর দিন মানুষের কত গবেষণা, কত চেষ্টা, কত উদ্যম এই বিজয়-যাত্রার সঙ্গে জড়িত, তা'র কাহিনী পৃথিবীর ক্রমগতিশীলতারই প্রমাণ দেয়। কৃত্রিম আলোকের যুগান্তকারী অভিসারের চিত্রগুলি একে একে চোখের 'পরে জেগে উঠবে।

সেই প্রথম যুগের কথা। মানবীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্মৃত যুগেই রাত্রের অন্ধকারের ওপর মানুষের বিজয়-অভিযান সূচিত হোলো। আদিম বর্ব্বর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আস্‌বার বহু পূর্ব্বে হ'তেই মানুষ আপন সুবিধামত আগুন ব্যবহার করতে পারদর্শী হয়ে উঠ্‌লো। আর রাত্রে আলো জ্বালাবার প্রথম উপাদান হোলো—জ্বালানি কাঠ। সেই আদিম যুগে দিনের আলো যখন নিভে আস্‌তো, তখন অরণ্যচারী আদিম পুরুষ ও নারী কি উপায়ে হিংস্র পশুদের আক্রমণ এড়িয়ে গুহার আশ্রয়ে এসে পৌঁছুতে পার্‌তো? সেই কথা। আদিম লোক সেদিন পাথর ঠুকে কিংবা কাঠের ঘর্ষণে গাছের ডাল-পালা জ্বালিয়ে রাত্রের অন্ধকারে সামান্য চলা ফেরা করতে সমর্থ হোতো। কিন্তু পৃথিবী যত এগিয়ে চল্‌তে থাকে গতিশীল মানুষ এই সামান্য আলোক-বর্ত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। কারণ দিনে দিনে তা'র সংসার বৃদ্ধি পেতে লাগলো—তা'র কাজও বেড়ে উঠলো, তদুপরি তা'র আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে আলোর বিশেষ প্রয়োজন হোলো। দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারে গুহার মধ্যে বন্দী হ'য়ে বসে' থাক্‌তে তা'র মন সায় দিলে না। তাই অনেক খোঁজ-খবর ও পরখের পরে গাছের জ্বলনশীল রস বা আঠা অর্থাৎ সর্জ্জরসজাত পদার্থ কিংবা রজন—খেজুর অথবা তাল পাতায় জড়িয়ে নিয়ে—আলো-জ্বালানির কাজে লাগানো হোলো। মালয় দ্বীপপুঞ্জে এই প্রণালীর প্রথম ব্যবহার। কিন্তু ঠিক এর পূর্ব্বের একটি বৃত্তান্ত আছে। প্রথম দিনের পরবর্ত্তী মানুষ আগুন জ্বাল্‌বার আরও সহজ উপায় কেমন ক'রে সন্ধান পেলে? আদিম নর-নারী একসঙ্গে খাদ্যের অন্বেষণে ও কাষ্ঠ-সংগ্রহে যখন বাইরে যেতো, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—তারা দু'একটি শুক্‌নো গাছের ডাল-পালা পাথর ঘসে' অতি কষ্টে জ্বালিয়ে আগুন উৎপন্ন করতে পারতো, কিন্তু এ উপায়ে তারা বেশীক্ষণ অন্ধকারে কাজ চালাবার সুযোগ পেতো না, পথ হাঁটায় ছিল অত্যন্ত অসুবিধা। দুর্য্যোগের দিনে সেই অতীত যুগের নর-নারীকে সাতিশয় বিপন্ন হ'তে হোতো। মানুষের সুবিধা মানুষ নিজেই সৃষ্টি ক'রে নেয়। অরণ্যে ঝড়-জলের দিনে বাড়বাগ্নি লক্ষ্য ক'রে কিঞ্চিৎ উন্নত আদিম মানুষ নিজের সুবিধামত অগ্নি-কাষ্ঠ বা উল্কা অর্থাৎ মশাল ব্যবহার করতে শিখলে। অল্পক্ষণের জন্য আলো জ্বল্‌লেও এই উপায়েই পথের অন্ধকার দূর করা হোলো। এ

ছাড়াও দহনশীল পদার্থ সংগ্রহ ক'রে কৃত্রিম আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা হোলো। দেবদারু বা পাইন্ কাঠ, গাছের জমাট রস অর্থাৎ আঠা বা রজন্, তৈলময় শস্যাদি, আর জন্তুদের মৃতদেহ এই আলো জ্বালানি কাজে নীরেট মজবুত বস্তু ব'লে ব্যবহৃত হ'তে লাগলো।

এরপরে আমরা একেবারে বৈদিকযুগে গিয়ে পৌঁছুবো। বৈদিকযুগ প্রাচ্যের সভ্যতার যুগ। সেদিন অরণি নামক অগ্নি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করা হোলো। এই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ নিয়ে জ্বলে' উঠ্‌লো হোমাগ্নি। অগ্নির যথার্থ মর্য্যাদা দান ক'রে মানুষ ধন্য হোলো। এই পবিত্র হোমাগ্নি থেকে গৃহে গৃহে অগ্নি সঞ্চারিত হ'তে লাগ্‌লো। অগ্নি সংরক্ষিত হোলো স্থায়ীরূপে। সেই বৈদিকযুগে অগ্নি-স্থাপনের ঋগুমন্ত্র হোলো উচ্চারিত ঋষির কণ্ঠে—

"অগ্নে পাবক রোচিষা, মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।
অগ্নে বিশ্বভিরা গহি, দেবেভির্হব্যদাতয়ে॥"

—"হে অগ্নি, হে পাবক—তোমার উজ্জ্বল আলোক রূপ রসনায় দেবগণকে বহন ক'রে নিয়ে এসো। তুমিই অন্ধকার দূর ক'রে দ্যুলোক-ভূলোক আলোকিত করো।" সাগ্নিকের গৃহে নিত্য প্রজ্জ্বলিত গার্হপত্য অগ্নির দ্বারা হোম-হুতাশন জ্বালানো ভিন্ন অন্ধকারকেও পরাভূত করা হোলো কিয়ৎপরিমাণে। সুদূর যুগান্তর মানবের কণ্ঠে জেগে উঠ্‌লো তিমির-বিদারী আলোকের প্রার্থনা—

"হে জগৎপোষক, হে অগ্নি—আমাদের সুপথে নিয়ে যাও। দিনশেষের পর অন্ধকারের যে আবরণ পৃথিবীর 'পরে নেমে আসে—সেই আবরণ তোমার আলোর প্রকাশে খুলে দাও। তোমার সাধনা দ্বারা তমসা রাত্রি সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবসের ন্যায় উজ্জ্বলতা লাভ করুক্। বিশ্বজনের হাতে আলোক-বর্ত্তি তুলে দাও। অন্ধকার দূর হোক্।" এম্‌নি ক'রেই অগ্নির সাধনা ক'রে বৈদিকযুগবাসীরা কৃত্রিম আলোক-বর্ত্তিকার সৃষ্টি করলে। সে-যুগে সান্ধ্য হোমের পর প্রায় সকল কার্য্য হোতো সমাপ্ত। আর প্রয়োজন হ'লে গৃহে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, উল্কা-দণ্ড, দণ্ডশাখ, ঘৃতমিশ্রিত তালপত্র প্রভৃতি দীপ-বর্ত্তিকারূপে কার্য্যকরী ক'রে তোলা হোতো। এইভাবে বহুদিন গত হ'বার পরে মোমের বাতির সৃষ্টি। খুব সম্ভব গ্রীস্‌দেশেই মোম-বাতির প্রথম উদ্ভব। এই বাতি ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতি প্রাচীন আলো-জ্বালার রীতি। মনে হয়—কৃত্রিম আলোক প্রজ্জ্বলনের বস্তু হিসাবে বাতি আদিমকালে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু কৃত্রিম আলোক আবিষ্কারের ক্রমবিকাশ-তথ্য গবেষণা করলে বোঝা যায় যে—বাতি এই ক্রমিক সময়-নির্দ্দেশের মধ্যে কোনো বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে নেই। কারণ বহু প্রকারের প্রদীপ—এমন কি শিলা-তৈল, খনিজ-তৈল, বা রেড়ির তৈলে প্রজ্জ্বলিত দীপ—অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও অধিকক্ষণ স্থায়ী বাতি আবিষ্কারের হাজার হাজার বৎসর আগে—প্রচলিত হ'য়েছিল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে—আদিম বর্ব্বর মানুষের আগুন-জ্বালার রীতি থেকে আরম্ভ ক'রে উল্কাদণ্ড বা গাছের রসে প্রস্তুত অগ্নিদণ্ডের প্রচলন—ধীরে ধীরে হয়, আর এর মধ্যে ছিল অনেকখানি সময়ের ব্যবধান। তারপরে প্রগতিশীল মানুষ বারোঘণ্টা দিন নিয়ে সন্তুষ্ট হোলো না, সে কৃত্রিম আলোর আবিষ্কার ক'রে তা'র দিনকে বাড়িয়ে নিতে প্রস্তুত হোলো। তা'র দিন বারোঘণ্টার সীমা অতিক্রম ক'রে ষোলো বা আঠারো ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছুলো।

এইবার প্রদীপের আলোর যুগ। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হবার বহুসহস্র বৎসর আগে তৈলাধার দীপের প্রথম আবিষ্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রদীপ খুব সম্ভব পাথর কুঁদে তৈরী করা হোতো। ক্রমশঃ মাটির প্রদীপ আর অগ্নি-প্রস্তর কুঁচির সঙ্গে শাদা বালি ও মাটির মিশ্রণে নির্ম্মিত মজবুত প্রদীপের ব্যবহার দেখা যায়। এই সমস্ত প্রদীপের গর্ভে তৈল বা ঘৃত কিংবা নরম চর্ব্বি অথবা কোনোরকম স্নেহময় পদার্থ ঢেলে একটি সলিতা জ্বালিয়ে দেওয়া হোতো। কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে নানা প্রকারের প্রদীপ প্রচলিত হোলো সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া দরকার।

এস্কিমোর দেশে দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গেই যে দীপ জ্বলে উঠলো—তা'র নাম এস্কিমো-দীপা। একরকম মেটেপাথরের সরার গুঁড়া শ্যাওলার তৈরী পলিতা লাগিয়ে তিমি মাছের বসা বা মাথার ঘি দিয়ে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করলে এস্কিমোরা।

সেই যুগে গুহাবাসীরাও নৃ-কপালে দীপ প্রজ্জ্বলিত করলে শিকার-লব্ধ জন্তুদের চর্ব্বি দিয়ে। এই রূপেই গুহা থেকে

ঘরে ঘরে ক্রমোন্নত উপায়ে প্রদীপের আলো জ্বলে' উঠলো। রাত্রির অন্ধকারও এই দীপালোকে কিছু দূর হোলো।

ভারতের পৌরাণিক যুগে দীপমালার সজ্জা আড়ম্বরের অনেক কথা শোনা যায়। এ-সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো অভাব নাই।

তারপরে ঐতিহাসিক যুগ। আড়াই হাজার বছরেরও আগে কৃত্রিম দীপালোক বেশ কার্য্যোপযোগী হ'য়ে উঠেছিল, তা'র যে বহুল প্রচলন ছিল, সে সম্পর্কে আমরা বিশেষ প্রমাণ পাই। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত দীপালোকের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। কারণ সেই সময়ে ভারতের বিশেষ উন্নতির যুগ। বহু রাজপথ দীপমালায় আলোকিত হোতো, রাত্রে ও দিনে গণসংখ্যা গণনা করার (census) ব্যবস্থা ছিল। তখন মোমবাতিরও বিশেষ প্রচলন হ'তে থাকে।

খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্ভবতঃ শক্ত চর্ব্বির বাতি তৈরী হয়। প্রায় একাদশ শতাব্দীতে কাঠের খণ্ড পশুমেদে বা চর্ব্বিতে ডুবিয়ে বাতি রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল সর্ব্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিমিমাছের তেলের প্রচুর সংগ্রহ ব্যাপারে ও ব্যবসায়ের প্রসাদে, তিমির মাথায় যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়—তাই অনেক পরিমাণে পাওয়ার সুযোগ ঘটে' উঠলো। এই স্নেহ-পদার্থ বাত্তি তৈরীর কাজে লাগলো। ১৮৪০-এ অন্যান্য দু'-একটি পদার্থ দিয়ে বাতির গঠন। কিন্তু বর্ত্তমানের বাতি প্যারাফিন্ মোম্ কিংবা ষ্টীরিন্ অথবা এইগুলির সংমিশ্রণে তৈরী হয়।

এর পরের প্রবর্ত্তন হোলো—গ্যাস্ বাতি। খুব সম্ভব চীনেরা কৃত্রিম আলোর জন্য প্রথম গ্যাস্ ব্যবহার করে। তারা লবণ-খণি থেকে বাঁশের চোঙায় স্বভাবজাত গ্যাস্ তুলে আলো জ্বালানোর কাজে লাগাতো। কৃত্রিম আলোক-সম্পাদক গ্যাসের বিবর্ত্তন ল্যাঙ্কাশায়ার ইংল্যাণ্ডে উইগ্যানের কাছে একটি ডোবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রায় ১৬৬৪-তে রেক্টারেও ডক্টর জন্ ক্লেটন্ এই উইগ্যান্-খানা থেকে জল শুষিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর ধারণা হয়—সেই ডোবার মধ্যে একটি স্বাভাবিক গ্যাসের কূয়ো আছে। সমস্ত জল তোলার পর দেখা যায়—গ্যাস উঠছে। পরক্ষণেই আবিষ্কৃত হয়—কাছেই আছে একটি কয়লা-খনি। বোঝা গেলো—সেই গ্যাস্-জাগানো কূয়োর সঙ্গে কয়লা-খনির অন্তরঙ্গ যোগ আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর কয়লার গ্যাস্ সংগ্রহ ক'রে কয়েকটি থলির মধ্যে রক্ষা করলেন ক্লেটন্। তারপরে এই গ্যাস্ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা সফল হোলো। ক্রমে ক্রমে স্বভাবজাত গ্যাস্কে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে কৃত্রিম আলোক-উৎপাদনের এক বিশেষ দিক খুলে গেলো। এখনো ইয়োরোপ-আমেরিকার পল্লীতে, আর এখানেও—অনেক স্থানে, আজও পথ আলো ক'রে গ্যাস্ জাজ্বল্যমান বর্ত্তমান।

এর পরবর্ত্তী যুগ—বৈদ্যুতিক আলোর যুগ। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে—বেন্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন লীডেন্ জার্ নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলেন—জারটা থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা'র হ'চ্ছে। সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে তিনি প্রকৃতির ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুতের গোপন রহস্য ধরতে সমর্থ হলেন। তাঁর আবিষ্কার হোলো জয়ী। সেই বিদ্যুৎকে বন্দী ক'রে মানব-জাতির কাজে নিয়োগ করতে তিনি ব্রতী হলেন।

তখনো কিন্তু গ্যাসের আধিপত্যের যুগ গত হয় নাই। বৈদ্যুতিক আর্ক থেকেই অ্যাসেটিলেন্ গ্যাসের উদ্ভব হোলো, আর এই কৃত্রিম আলো সকলকে চমৎকৃত ক'রে দিলে।

মানুষ চিরদিনই এগিয়ে চলে। তাই সে বহু চেষ্টায় বিদ্যুৎকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে সমর্থ হোলো। বৈদ্যুতিক আলোকের জয়জয়কার চারিদিকে প্রচারিত হ'তে লাগলো। উক্ত রাসায়নিক বিদ্যুৎঘট (galvanic cell) বা ডাইনামো আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক কৃত্রিম আলোর প্রসার হোলো। গ্যাল্‌ভানি এই cell বা বিদ্যুৎ ঘটের আবিষ্কারক। এই আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হ'তেই সারা বিশ্বে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অশেষ উৎসাহ দেখা দিল। বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ ঘট বা cell-যুক্ত ব্যাটারী তৈরী করা হোলো। সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলো প্রকাশ করলেন। আজকাল যে-রকম ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় আলো দেখা যায়, সেদিন ডেভি কর্ত্তৃক সেইরকমই নিরবচ্ছিন্ন আলোক-প্রসারী দীপ উদ্ভাবিত হোলো। এর পরেও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিক ষ্টেইট্ একপ্রকার বৈদ্যুতিক উন্নত আলো প্রকাশ করলেন—যা ঠিক দিনের আলোর মত পরিষ্কার, অথচ দীপটি যেন চোখের 'পরে লুকিয়ে থাকে। এই তাড়িত-আলো মানুষকে রাতের অন্ধকারের কাছে জয়ী

ক'রে তুলেছে। কিন্তু তাড়িতোৎপাদক (dynamo-electric) যন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যাবহারিক কার্য্যকারিতা খুব বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই। এরপরে উন্নতধরণের arc-light আবিষ্কৃত হোলো, বাতি-ধরণের আলোককে এই বৃত্তাকার বা আর্ক-আলো পরাজিত করলে সর্ব্বদিক দিয়ে।

ইন্‌ক্যান্‌ডেসেণ্ট বৈদ্যুতিক আলোর জন্মদাতা যুগকীর্ত্তি এডিসন্। আপ্রাণ চেষ্টা ও গবেষণার পর এডিসন্ ১৮৭৯ তে যুক্তরাষ্ট্রের মেন্‌লো পার্ক কৃত্রিম আলোকমালায় সজ্জিত ক'রে তুললেন। অন্ধকারময় রাত্রি দিনের আলোক-গর্ব্বে হেসে উঠলো। এডিসন্ বিশ্ববাসীর কাছে এই আবিষ্কারে ধন্যবাদভাজন হ'লেন। বিশবৎসর এডিসনের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে রইলো। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এর মূল্য অধিক ব'লে বোধ হ'তে লাগলো। তারপরে অনেক চেষ্টার ফলে অপেক্ষাকৃত কম দামে টাঙ্‌ষ্টেন্ বাতির প্রকাশ। এরপরেই এলো হেউইট্-এর পারদ-বাষ্প বাতি (mercury vapour lamp)। এই প্রকার আলো কল-কারখানায়, বহু লোক যেখানে একসঙ্গে কাজ করে, সেই সমস্ত জন-সমাগম-স্থানে বিশেষরূপে আদৃত হোলো।

এমনি ক'রে কৃত্রিম উপায়ে আলো-জ্বালাবার সুন্দর প্রণালী আজ এই সভ্যজগৎকে আরও কর্ম্মোদ্যমে মাতিয়ে তুলেছে। নানাদিকে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই বৈদ্যুতিক আলো পরম বন্ধুর কাজ করছে। এমন কি যুদ্ধের দিনে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক সন্ধানী-আলো (military searchlight) অত্যন্ত সহায়। সমুদ্রে নাবিকদের দিক নির্দ্দেশ করে—আলোঘর বা (light-house)।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে এই কৃত্রিম আলো অমৃত-প্রসাদের মত পরিগণিত। রেডিয়োতে, ফিল্মে, রাস্তায়-ঘাটে, ঘরে-বাইরে—চারিদিকে এই বন্দী বিদ্যুতের সাহায্যে অন্ধকারকে জয় করেছে মানুষ। বহু কর্ম্মক্ষেত্রে, চলচ্চিত্রে sunlight—switch-board অত্যন্ত কার্য্যকরী।

মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তার আলোক পেয়েও তৃপ্ত থাকতে পারে নাই, সে কৃত্রিম আলোর আবিষ্কার ক'রে বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিয়েছে। আজ মানুষেরই গবেষণা ও বুদ্ধির বলে রাত্রির অন্ধকার নির্ব্বাসিত।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র-সংখ্যার 'নাট্যশালার ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে ৪১১ পৃষ্ঠায় ১ম পংক্তিতে মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ 'রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ বল্লভ' স্থলে 'লোচনদাসের জগন্নাথ বল্লভ' মুদ্রিত হইয়াছে।—বঃ সঃ